গল্পসমগ্র

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্পসমগ্র

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

যূথিকা বুক স্টল
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
সত্যবান রায়
যূথিকা বুক স্টল
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পরিবেশক ঃ
সত্যনারায়ণ প্রকাশনী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য ঃ ২০০ ০০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ
বরুণ সাহা

মুদ্রণ—কে ডি এন্টারপ্রাইজ
টি/ ২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা ৬৭

রবীন্দ্র রচনাবলী (১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতবিতান (অখণ্ড)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চয়িতা (অখণ্ড)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উপন্যাস সমগ্র (অখণ্ড)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ রচনাবলী (৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্কিম রচনাবলী (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী (অখণ্ড)	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
সুকুমার রচনাবলী (অখণ্ড)	সুকুমার রায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড)	শ্রীম
গীতাঞ্জলি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
লিপিকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছিন্নপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোরা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নৌকাডুবি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বউ-ঠাকুরানীর হাট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজর্ষি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চোখের বালি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চতুরঙ্গ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘরে-বাইরে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
যোগাযোগ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষের কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবন স্মৃতি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চার অধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বলাকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
লোকসাহিত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দেনা পাওনা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দত্তা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকান্ত	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথেরদাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গৃহদাহ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চরিত্রহীন	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

*****

আদরিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকিল কুঞ্জবিহারীবাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন—"মুখুয্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেঝবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধূমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—'কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই জানিয়াছে। উকিল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলছি? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জে যাবেন কি?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন—"ভায়ারা, বস।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।—উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারি কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া ত সোজা নয়। ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী করে যেতে হলে, যেতে দুদিন আসতে দুদিন। পাল্কী করে যাওয়া—সেও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দুজনে ভাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুয্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতী টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—"এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নন—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেইছিলাম—অত ভাবছ কেন মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুয্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বৈকি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত বাই খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগ্‌গ বেঁধে, একটি খেলো হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে

শুনবে—'পেযালা মুঝে ভব দে'—কেমন?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায মহাশয় হা-হা কবিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পবদিন ববিবাব। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা কবিয়াই কবিতেন। বেলা ৯টাব সময় পূজা সমাপন কবিয়া জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদেব সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীব কথা মনে পডিযা গেল। তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পবিয়া, "প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীমন্মহাবাজ শ্রীনরেশচন্দ্র বাযচৌধুবী বাহাদুব আশ্রিত-জনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিনদিনেব জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা কবিযা পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কতবাব এইরূপে মহাবাজেব হস্তী আনাইযা লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইযা যাইতে আজ্ঞা দিযা, মোক্তাব মহাশয আবাব মক্কেলগণেব সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জযবাম মুখোপাধ্যাযেব বযস এখন পঞ্চাশৎ পার হইযাছে। মানুষটি লম্বা ছাঁদেব—বঙটি আব একটু পবিষ্কাব হইলেই গৌববর্ণ বলা যাইতে পাবিত। গোঁপগুলি মোটা মোটা—কাঁচায পাকায মিশ্রিত। মাথাব সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড, ভাসা ভাসা। তাঁহাব হৃদযেব কোমলতা যেন হৃদয ছাপাইযা, এই চক্ষু দুইটি দিযা উছলিযা পডিতেছে।

ইঁহাব আদিবাস যশোব জেলায। এখানে যখন প্রথম মোক্তাবী কবিতে আসেন, তখন এদিকে বেল খোলে নাই। পদ্মা পাব হইয়া কতক নৌকাপথে, কতক গোরুব গাডীতে, কতক পদব্রজে আসিতে হইযাছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ক্যাম্বিসেব ব্যাগ এবং একটি পিত্তলেব ঘটি ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেবো সিকায় একটি বাসা ভাডা লইযা, নিজ হাতে বাঁধিয়া খাইয়া মোক্তাবী ব্যবসায আবম্ভ কবিয়া দেন। এখন সেই জযবাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা কবিয়াছেন, বাগান কবিযাছেন, পুকুব কিনিযাছেন, অনেকগুলি কোম্পানীব কাগজও কিনিয়াছেন। যে সমযেব কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংবাজীওয়ালা মোক্তাবেব আবির্ভাব হইয়াছে বটে—কিন্তু জযবাম মুখুয্যেকে তাহাবা কেহই হটাইতে পাবে নাই। তখনও ইনি এ জেলায় প্রধান মোক্তাব বলিযা গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশযেব হৃদযখানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ? যৌবনকালে ইনি বীতিমত বদবাগী ছিলেন—এখন বক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিযাছে। সেকালে, হাকিমেবা একটু অবিচাব অত্যাচাব কবিলেই মুখুয্যে মহাশয় বাগিযা চেঁচাইযা অনর্থপাত কবিযা তুলিতেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটিব সহিত ইঁহাব বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। বিকালে বাডী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গলা গাই একটি এঁড়ে বাছুব প্রসব কবিয়াছে। তখন আদব কবিয়া উক্ত ডেপুটিবাবুর নামে বাছুবটিব নামকবণ কবিলেন। ডেপুটিবাবু লোকপবম্পবায় ক্রমে এ কথা শুনিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রীতিলাভ কবেন নাই। আব একবাব, এক ডেপুটিব সম্মুখে মুখুযো মহাশয আইনেব তর্ক কবিতেছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইঁহাব কথায় সায দিতেছিলেন না। অবশেষে বাগেব মাথায় জয়বাম বলিয়া বসিলেন—"আমাব স্ত্রীব যতটুকু আইন জ্ঞান আছে, হুজুবেব তাও নেই দেখছি" সেদিন আদালত-অবমাননাব জন্য মোক্তাব মহাশযেব পাঁচ টাকা জবিমানা হইযাছিল। এই আদেশেব বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লডিয়াছিলেন। সর্ব্বসুদ্ধ ১৭০০ টাকা ব্যয় কবিযা এই পাঁচটা টাকা জবিমানা হুকুম বহিত কবিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জ্জন কবিতেন, তেমনি তাঁহাব ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতবে অন্নদান কবিতেন। অত্যাচাবিত, উৎপীডিত গবীব লোকেব মোকর্দ্দমা তিনি কত সময বিনা ফিসে, এমন কি নিজে অর্থব্যয পর্য্যন্ত কবিয়া, চালাইযা দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাস পাশা খেলিয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকিলবাবুও আছেন। হাতীকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে, হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাসুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে,—মোক্তার মহাশয় সে সমস্ত তদারক করিতেছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়রাম, বৈঠকখানায় বসিয়া পাশাখেলা দেখিতেছিলেন। এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হাতী পাওয়া গেল না।"

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ।—পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই ত। সব মাটি?"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?"—ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বললেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতী কেন? গোরুর গাড়ীতে আসতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা ঠক ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে, ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"হাতী দিলে না। হাতী দিলে না।"

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"তার আর কি করবেন মুখুয্যে মশায়। পরের জিনিষ, জোর ত নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে রাত্রি দশটা এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। ঐ ইমামদ্দি শেখ একযোড়া নূতন বলদ কিনে এনেছে—খুব দ্রুত যায়।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন—"না। গোরুর গাড়ীতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিনজন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে,তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী হাতী আছে—এখনও বাচ্চা। বিক্রী করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত?" "দু হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্চা?"

"না, সওয়ারি নিতে পারবে।"

"কুছ পরওয়া নেই। তাই কিনব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী মশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম— আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার যাবৎ বালক বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই একজন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং

অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটীতে জল লইয়া সভয় পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দূরে তাহার ললাট রাঙা করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।—মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে হস্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরেরও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকর্দ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মুখুয্যে মশায়, ও হাতীটি কার?"

মুখুয্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার হাতী। কই ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে বললেন আমার হাতী?"

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বই আর কার?"—সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

নতুন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে যত উপার্জ্জন করিতেন এখন তাহার অর্দ্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতি বৎসর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কর্ম্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয় এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন,

তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় পাগড়ী বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না।) তাঁহারা প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া ফর ফর করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরাজি জানা জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করেন,—"উনি কি বলছেন?"—জুনিয়র তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বে হাকিমগণ মুখুয্যে মহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইঁহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজি জানে না, সে মনুষ্যপদবাচ্যই নহে। এই সকল কারণে স্থির করিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়স হইল—চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়ীতে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশী দিন চলে না। তথাপি আজি কালি করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল।

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দ্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। একজন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন—তাঁহারই এজলাসে বিচার।—তিনদিন যাবৎ মোকর্দ্দমা চলিল। সবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া "জজসাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ" বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতাশেষে এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—জজসাহেবও তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

জজসাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র বাঁধিতেছেন, এমন সময় জজসাহেব পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ উকিলটির নাম কি?"

পেস্কার বলিল—"উহার নাম জয়রাম মুখার্জ্জি। উনি উকিল নহেন—মোক্তার।"

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"আপনি মোক্তার?"

জয়রাম বলিলেন—"হাঁ হুজুর, আমি আপনার তাঁবেদার।"

জজসাহেব পূর্ব্ববৎ বলিলেন—"আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি উকিল। যেরূপ দক্ষতার সহিত আপনি মোকর্দ্দমা চালাইয়াছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি এখানকার একজন ভাল উকিল।"

এই কথাগুলি শুনিয়া মুখোপাধ্যায়ের সেই ভগ্ন চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। হাত দুটি জোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"না হুজুর, আমি উকিল নহি—আমি একজন মোক্তার মাত্র। তাও সেকালের শিথিল নিয়মের একজন মূর্খ মোক্তার। ইংরাজি জানি না হুজুর। আপনি আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন আমি জীবনের শেষ দিন অবধি তাহা ভুলিতে পারিব না। এই বুড়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন।"—বলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মোক্তার মহাশয় এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহার পর আর তিনি কাছারি যান নাই।

ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া ওঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না—মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোক ইঁহাকে বলিতেছিল—"হাতীটি আর কেন, ওকে বিক্রী করে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন—"তার চেয়ে

বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিনাতিনীদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটাকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন ঃ—

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩ টাকা মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১ টাকা এবং মাহুতের খোরাকী ।।০ একুনে ৪।।০ ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশী আয় হইল না।—মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫।৭ টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।—বড়বধূ মেজবধূ উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আরও দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এদিকে জ্যেষ্ঠ পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানাস্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে, কিন্তু ঘর-বর মনের মতন হয় না। যদি ঘর-বর মনের মতন হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এসম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাস পাশা খেলিয়া, ফ্লুট বাজাইয়া বেড়াইতেছে। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।—অবশেষে একস্থানে বিবাহের স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল-এ পড়িতেছে, খাইবার পড়িবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে; নিজেদের খরচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু ত একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে?—এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছিল, সেও ফেল করিয়াছে।—বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন—"মুখুয্যে মহাশয়, হাতীটিকে বিক্রী করে ফেলুন—করে' নাতনীর বিবাহ দিন। কি করবেন বলুন। অবস্থা বুঝে ত কাজ করতে হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।"

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটির পানে চাহিয়া ম্লান মুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।—চৈত্রসংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু বাছুর ঘোড়া হাতী উট বিক্রয়ার্থে আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রী হয়ে যাবে এখন। দু হাজার কিনেছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়, তার আর উপায় কি?

তবে পোষা জানোয়ার, অনেকদিন ঘরে রয়েছে, মায়া হয়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হয়। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন—"তোমরা সবাই যখন বলছ তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভাল খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"—মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি-পাঁচদিনই জমজমাট বেশী। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন প্রত্যূষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলী খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।"—প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে, এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তী-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হইবে।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস মস করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপই মনে হইতে লাগিল।

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল—"আহা, আদর রোগা হয়েছে। বোধ হয় এ ক'দিন সেখানে ভাল করে খেতে পায়নি। ওকে দিনকতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিলেন—"ঐ যে আবার মুখুয্যে মশায় বললেন "আদর যাও মা, মেলা দেখে এসো' তাই বিক্রী হল না। উনি ত আর আজকালকার মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন' ওঁর মুখ দিয়ে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে' কথায় বলে—ব্রহ্মবাক্য বেদবাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় নাই--সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী আসিয়া বলিল—"দাদামশায় আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বললি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।'

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—"জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্যামী কিনা। ও বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্য্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিসনি?—খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোন অভিমান করিসনে মা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে—"বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায় তবে তাহার শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটু জমি বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের আসিলেই আসা আবশ্যক।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"আমায় গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"—তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠপুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষী লোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতরে পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ।—বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে—তুই অভিমান করে চলে গেলি?"

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপা[illegible] জীবিত ছিলেন।

[সাহিত্য ভাদ্র ১৩২০]
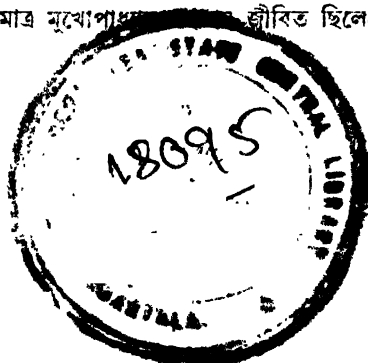
রসময়ীর রসিকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

ক্ষেত্রমোহনের বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ। 'রসময়ী'—এ নাম যে রাখিয়াছিল বলিহারি তাহার প্রতিভা! তবে রস ত অনেকগুলি আছে কিনা—এ ক্ষেত্রে রৌদ্ররস।

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীস মোক্তার; হুগলীতে থাকিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন। বাড়ী তাঁহার হুগলীতে নহে—জেলার মধ্যে কোন এক পল্লীগ্রামে। তবে কয়েক বৎসর হইল হুগলীতে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেরূপ বয়স, আর হইবার ভরসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাঁহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই। কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা চরিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া ক্ষেত্রমোহনকে দুইদিন গৃহছাড়া করিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিসহরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন রসময়ীর আর মুখদর্শন করিবেন না—অন্যত্র বিবাহ কবিবেন। এ বাড়ীতে রসময়ীকে আর ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়া কারখানায় কর্ম্ম করে; সুবোধ ইস্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে—এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ স্থলে দুইচারি দিন বা বড় জোর এক সপ্তাহ পরে, দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এইবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুলে পড়িতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল—ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহ; দিনস্থির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন—"বাবা, শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?"

বালক বলিল—"হ্যাঁ সত্যি বইকি। আমাদের ক্লাসে সুরেশ বলে একটি ছেলে পড়ে, চুঁচড়োয় তার মামার বাড়ী। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান?"

"জানি বইকি। সুরেশই ত আমাকে বলেছে। দিনস্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তার মামার নাম কি?"

"নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কর্ম্ম করেন।"
"তাদের বাড়ীটি তুমি চেন বাবা?"
"হ্যাঁ চিনি বইকি। সুরেশের সঙ্গে কতবার গিয়েছি।"
"কত বড় মেয়ে।"
"এই আমাদের বয়সীই হবে।"—বালকটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।
"কেমন দেখতে?"
"তা—বেশ সুন্দর।"
বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা, কাল একবার আমাদের দু বোনকে সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার বাছা?"
"কেন?"
"তাদের একবার মিনতি করি বলে কয়ে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"
"কখন?"
"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে।"
"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?"
"একদিনের জন্যে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন। আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ি, নাটাই এ সব কিনো।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বালকটি চুঁচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কী দরজার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল।—রসময়ী বলিল—"এই বাড়ী?"
"হ্যাঁ।"
"আচ্ছা, তুমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা চট্ করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"—বলিয়া দুইজনেই অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।
সে বাড়ীর মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল—"তোমরা কারা গা?"
বিনোদিনী বলিল, "আমরা হালিসহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"
স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"এস—বস।"
দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—"বাড়ীর গিন্নী কোন্‌টি?"
একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল—"ইনি গিন্নী।"
গৃহিণী বলিলেন—"তোমরা কি মনে করে এসেছ বাছা?"—বিনোদিনী বলিল—"তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে?"—গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।"
"কবে?"
"এই বিশে মাঘ দিন স্থির হয়েছে।"
"পাত্রটি কে?"
"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারি করেন।"
"সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?"
গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা চেন নাকি?"

বিনোদিনী বলিল—"চিনিনে আবার—খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রী পরিত্যাগ করেছে।"

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল; তাহার মনের রাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।—বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দুজ্জাল।"

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর সপাসপ্ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলে না?—জায়গা পেলে না? আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না? জুটলো না?

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, সে বাসন ফেলিয়া—"ওবে খুন কল্লে রে—খুন কল্লে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা"—বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর অপর মেয়েরা আসিয়া বসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিই যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই।"

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে সদর দরজায় লোক হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল, "রসময়ী থাম্ থাম্—ক্ষ্যামা দে বোন্—খুব হয়েছে। চল্ বাড়ী চল্।"—ঝি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ কবিয়া বলিল—"ওগো যেতে দিওনি—থানায় খবব দিয়ে এসেছি, দারোগা আসছে।"—পুলিসেব নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল—"চল দিদি, চল।"

"যাবে কোথা—দারোগা আসুক তবে যেও।"—বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসমযীকে ধবিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী এক লম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁশবঁটিখানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপব সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—"খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব।"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক "মা গোঃ" বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। "পাহারাওয়ালা—এ পাহাবাওয়ালা—আসামী পালায়"—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।—রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশ্চন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন—"সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"—পরদিন কাছারীতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক

খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়েব মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ কবিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনেব পানে দৃষ্টিপাত কবিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্ব্বে মুনিঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।—ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে কবে?"

বসময়ী অসম্ভব সংযমেব সহিত উত্তব কবিল—"একটা শ্রাদ্ধেব যোগাড কবতে।" তাহাব ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন—"শ্রাদ্ধটা কাব?"

"হবিশ চাটুয্যের মেয়ের—আব মেয়েব মাব।"

"তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেবটাও সেবে নিলে হয় না?"

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে কবছ নাকি শুনলাম?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিতভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন - কবছিই ত। কবব না কেন? তোমাব ভয়ে নাকি?"

বসময়ী চীৎকাব কবিয়া হাত নাডিয়া বলিল—"কব না, কবে একবাব মজাটাই দেখ না।"

"কি কববে তুমি?"

"এই এমন কিছু না। আঁশবঁটি দিযে সে মেয়েব নাকটা কেটে দেব—আব বুকে একখানা দশমুণে পাথব চাপিয়ে দেব।"

'আব তোমাব নাকটা কানটা কেউ যদি কেটে দেয়?"

'এস না। কাট না। তুমিই কাট না হয়।"—বলিয়া বসময়ী নিজ কোমবে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিযা, নিজেব মুখ ক্ষেত্রমোহনেব অতি নিকটে সবাইয়া দিল।

স্ত্রীব এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবাব হুঁকা উঠাইয়া লইযা আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিযা যখন ক্লান্তি বোধ হইল, বসময়ী তখন নিজেব মুখ সবাইয়া লইযা আবাব সোজা হইয়া দাঁডাইল। বলিল—"তা হলে আঁশবঁটিতে শাণ দিয়ে বাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খববটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকর্ম্মটা সেবে ফেল না।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তুমি না মবলে আব বিয়ে কবছিনে। মববে কবে?'

এই কথা শুনিয়া বসময়ী বিদ্রুপেব স্ববে হাঃ হাঃ কবিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আমি মবব কবে জিজ্ঞাসা কবছ? বসি বামনি এখনি মবছে না। তাব এখনও অনেক দেবী—বিস্তব বিলম্ব। তোমাব বিয়ে কববাবু বয়স যাবে—বুড়ো থুডথুড়ো হবে—ভুঁযে মুযে হয়ে যাবে—যখন আব কেউ তোমায় মেয়ে দিতে বাজি হবে না—তখন আমি মবব।"

দাম্পত্য বসালাপ এই পর্য্যন্ত অগ্রসব হইলে বাহিবে একখানি গাড়ী থামিবাব শব্দ হইল। রসময়ী বলিল—"তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাডায় তাব জায়েব বাড়ী গিয়েছিল—ভাবলাম তাব সঙ্গে এসে তোমাব সঙ্গে দুটো মনেব কথা কয়ে যাই।" বলিয়া রসময়ী প্রস্থান কবিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পব ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। বসময়ীব গর্ব্ব সফল হইল না। সে এখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।—সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবু হালিসহবে গেলেন। চিকিৎসাদিব কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাব জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ কবিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওয়া

গেল। মেয়েটি ডাগর—দেখিতেও ভাল। বিশেষ মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককাব মামলা মোকর্দ্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহনবাবুর করায়ত্ত হইবে। কন্যাব পিতা বজনীকান্ত ঘোষাল ইংবাজী লেখাপডা জানা ব্যক্তি।

বিবাহেব কথাবার্ত্তা পাকা হইল। ববেব খুডা মহাশয় গ্রাম হইতে আসিয়াছেন—কল্য আশীর্ব্বাদ। প্রভাতে আফিসকক্ষে বসিযা দুই চাবিজন মক্কেলেব সঙ্গে মোক্তাববাবু কথাবার্ত্তা কবিতেছিলেন—খুডা মহাশয় একখানি "বঙ্গবাসী" হস্তে ঘবেব কোণে বসিযা তামাকু সেবন কবিতেছিলেন। এমন সময ডাকপিয়ন আসিল, ক্ষেত্রমোহনবাবুব হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। খামেব উপব হস্তাক্ষবেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া ক্ষেত্রমোহনেব মাথা ঘুবিয়া গেল। দুইচাবিবাব চক্ষু বগডাইয়া বাবম্বাব খামখানিব শিবোনামা পবীক্ষা কবিতে লাগিলেন। কাছে আনিযা, দূবে সবাইযা নানা প্রকাবে দেখিলেন। —অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পডিযা তাহাব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন—"আচ্ছা, এখন তোমবা যাও —আজ সকাল সকালই কাছাবি যাব —সেইখানেই বাকি কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিযা গেলে খুডা মহাশয বলিলেন —"চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জডিত স্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাকাব চিঠি?"

'ওই ত ভাবছি।' ক্ষেত্রমোহনেব মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরেব বিকৃতি লক্ষ্য কবিযা খুডা মহাশয় উঠিযা নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীযবাব পাঠ কবিতেছেন। তাঁহাব নিঃশ্বাস বন্ধ হইবাব উপক্রম হইয়াছে চক্ষু কপালে উঠিযাছে।

খুডা মহাশয ত্রস্তভাবে বলিলেন "কি? ব্যাপাব কি? কোনও দুঃসংবাদ নয ত?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু নীববে পত্রখানি খুডা মহাশয়েব হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া চশমা অনুসন্ধান কবিয়া চক্ষে পবিলেন। জানালাব কাছে দাঁডাইয়া খুডা মহাশয পত্রখানি পডিতে লাগিলেন। সাধাবণ পাতলা চিঠিব কাগজে, বেগুনি বঙেব ম্যাজেন্টা কালি দিযা লেখা—উপবে স্থানেব নাম নাই, তাবিখ নাই—নিম্ন প্রকাব লিখিত:-

শ্রীশ্রী দুর্গা
স্বহায়

প্রণামপূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসস—

তোমাব মোতশ্চন্য ধবিয়াছে। মোনে কবিআছ বসমই মবিআছে আপোদে গিয়াছে এইবাব বিবাহ কবি। আমি মবিআছি বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিষ্কিতি পাইআছ তাহা মোনেও কবিও না। বাডিব সনমুখে যে বড বটগাছ আছে তাইতে আমি আজকাল বাস কবিতেছি। তুমি কি কব কোতায় যাও সমস্থই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। বাত্তিবে গাচ হইতে নামিযা মাজে মাজে তোমাব সয়ন ঘবে যাই। তোমাব খাটেব চাবিদিকে ঘুবিযা বেডাই। এক একবাব ইচ্ছা কবে গলাটা টিপিয়া দিয়া তোমাকেও আমাব সঙ্গি কবি। আমাব একানে বডো একলা বোধ হয়। আমাব চেহাবা একন ওতিশয় খাবাপ হইয়া গিআছে। আমাব গাএব মাংসো চামডা আব কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয। গংগাত্তিবে আমাকে জে পোডাইআছিলে তাইতে হাড়গুনো কালো কালো হইয়া গিআছে। যাহা হউক নিজেব রূপ বন্ননা নিজেব মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না কবিলে তোমাব নলাটে অসেস দুগগতি নেকা আছে।—বসমই।

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতেব লেখা কাব চিনতে পারছ?"

"খুব চিনি। তারই হাতেব লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করেনি ত?"

"ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জয়রাম—সীতারাম—রাম-রাঘব-রাবণারি—রাম—রাম—রাম।"

খুড়া মহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহনের আরও ভয় হইল। বলিলেন—"আচ্ছা খুড়ো মশায়—ভূতে কখন চিঠি লেখে?"

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র।"—দুইজনেই নির্ব্বাক। অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"দেখ—কারুব বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবেব কথা শুনেছি বটে—কিন্তু—এরকমটা কখনও ত শোনা যায়নি। আচ্ছা,—বউমার হাতের লেখা আগেকার চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"পুবাণো চিঠি আছে বই কি।"—বলিয়া বাটীব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া চারি পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশব চশমাব কাঁচ দুইখানি কোচার কাপড়ে ভাল কবিয়া মার্জ্জনা কবিযা লইলেন। পবে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"একই হাতেব লেখা ত দেখছি।"খামখানা উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সাব ছয়খানাওয়ালা সাধাবণ শাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পয়সার টিকিট আঁটা আছে। ক্ষেত্রমোহনেব হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন—"কোথাকাব ছাপ দেখ ত?"

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গলানবীশ মোক্তাব হইলেও ইংবাজি ছাপাব অক্ষব পডিতে পাবিতেন। ছাপ পবীক্ষা কবিয়া বলিলেন—"হুগলীব ছাপ। কালকেব তারিখ।" খুড়া মহাশয় চুপ কবিযা বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয় বাম—শ্রীবাম—সীতারাম।"

কাছারির বেলা হয় দেখিয়া মোক্তাববাবু স্নান কবিয়া আহারে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পাবিলেন না। বান্নাঘবের বাবান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহাব কবিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটাব অগ্রভাগ দেখা যায়। খান, আব মাঝে মাঝে সেই গাছটাব পানে চাহেন। একসময় গাছেব একটা ডাল খড় খড় কবিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহাব যেন হাসিবও শব্দ শুনা গেল। ক্ষেত্রমোহনবাবুব আব খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিবে আসিয়া বটগাছটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বহিলেন। দুই তিনটা কাঠবিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া কবিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চশাখায় বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া-ভাইপো বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়া মহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেওয়ালময় বামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিসের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত হইবে এবং ঘবে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"আমি ত তার দরকার দেখছিনে।"

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয়?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"ভয়ের কোনও কারণ দেখিনে।"

"ঐ যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই?"

"নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে।"

"আর যে বলেছে বিয়ে কোরো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে বোধ হয় এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"—ক্ষেত্রমোহনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল; কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনীবাবুরও কাণে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজি জানা ব্যক্তি,—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—ভূত! এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বিশ্বাস করতে হবে?"

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বিকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্রবাবু জনকয়েক বন্ধুবান্ধব সহ বসিয়া ছিলেন। —ইঁহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকিল—নাম মনোহরবাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোনার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়,—লোকটি থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্রবাবুর ভৌতিক পত্রপ্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবধি, মনোহরবাবু ইঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।—অপর একজন নব্যযুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল-এ ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার। বিস্তর ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ক্ষেত্রবাবু, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু, সকলেই মনে করছে অমুক লোকটা মরে গেছে, মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই,—কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁহারই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ন্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে, ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পাবা যায় না।"

থিয়জফিষ্ট উকীলবাবুটি ইহা শুনিয়া বলিলেন—"কেন মশাই—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?"

নবীন মোক্তারবাবু বলিলেন—"কারণ আমি কখনও দেখিনি।"

শুনিয়া মনোহরবাবু বিজ্ঞতার হাস্য করিয়া বলিলেন—"সম্রাট সপ্তম এড়োয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন?" "না দেখিনি।"

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন?"

"করি। তার কারণ, আমি না দেখলেও হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ বিশখানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু 'ভূত আমি নিজে দেখছি' এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে, খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।"

মনোহরবাবু তাঁহার সুঘন দাড়ির মধ্যে দীর্ঘনখ আঙ্গুলিগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"আপনি বললেন, হাজার হাজার লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমনি হাজার হাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি বললেন যে সম্রাটের দশবিশখানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশ বিশখানা ভূতেরও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পারি। যদি দেখতে চান, একদিন আমার বাড়িতে যাবেন। আমার একখানা বইয়ে কেটি কিং-এর ছবি

আছে। প্রথম চার্লসেব সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁব মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীব মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউবোপেব নানা স্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি কিং স্থূলশবীব ধাবণ কবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা কবা হয়েছে, তাঁব শবীবে ছুরি ফুটিয়ে দিয়ে দেখা হয়েছে ঠিক মানুষেব মত রক্তপাত হয়, তাঁব ফোটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে, ফোটোগ্রাফ থেকে তৈবি ছবি আমার বইয়ে আছে—আসবেন, দেখাব।"

সুবেন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাস্য কবিয়া বলিলেন—"আপনাবাও যেমন ভালমানুষ! ঐ সব বিশ্বাস কবেন? ভূতবাদীদেব কত জোচ্চুবি ধবা পড়েছে তাব সংখ্যা নেই। কেটি কিং-এব দেহে ছুবি ফুটিয়ে বক্তপাত হয়েছে ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতাব প্রমাণ বলে উল্লেখ কবলেন, আমাব ত ঠিক উল্টো মনে হয়। ছুবি ফোটালে বক্ত না পড়ত—অথচ শবীবী মানুষ একটা দাঁড়িয়ে বয়েছে দেখছি—তা হলে ববং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বাড়ীব সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পাবেন, তখন অনায়াসেই মূর্ত্তিগ্রহণ কবে নিজেব বক্তব্য বলে যেতে পাবতেন। কিন্তু তা না কবে খাম, কাগজ, কালি, কলম সংগ্রহ কববাব কষ্ট স্বীকাব কবলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠিখানি টেবিলেব উপব রেখে গেলেই হত, তা না কবে এক মাইল দূবে পোষ্ট আফিসে গেলেন তাকে পোষ্ট কবতে। আবাব দুটো পয়সা খবচ কবে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক জগতে পয়সা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয়, তা হলে না হয় সেইখানে গিয়েই প্র্যাকটিস সুরু কবি।"

মনোহববাবু একটু বিবক্তিব সহিত বলিলেন—"মশায়, জিনিসটা হাসি তামাসার নয়। এসব গম্ভীব বিষয়। অনেক চর্চা, অনেক আলোচনা না কবে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ কবা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা, এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে মহাত্মাবাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। কুটুম্বিলাল নামক এক মহাত্মা এ বকম অনেক চিঠি আমাদেব মাদাম ব্লাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁবাও মনে কবলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পাবতেন কিম্বা চিঠি উড়িয়ে টেবিলেব উপব ফেলে যেতে পাবতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁবা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিয়া শিক্ষিত মোক্তাববাবু মৃদু মৃদু হাস্য কবিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কুটুম্বিলালেব চিঠি ত কোন্ কালে জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাক্তাব হজসন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভাবতবর্ষে এসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান কবে প্রমাণ কবে দিয়েছেন যে মাদাম ব্লাভটাস্কি আব দামোদব বলে এক ব্যক্তি সব চিঠি জাল কবেছিলেন।"

একথা শুনিয়া খিযজ্ঞফিস্টবাবুটি ভ্রূকুঞ্চিত কবিয়া বিবক্তিব স্ববে বলিলেন—"ও সব ঈর্ষাপবায়ণ লেখকেব বই পড়বেন না। আমাব কাছে আসবেন, ভাল ভাল বই সব আপনাকে পড়তে দেব; তা পড়লে আপনাব সমস্ত অবিশ্বাস দূব হয়ে যাবে। মাদাম ব্লাভাটস্কি, যে কতবড় লোক তা তাঁর 'আইসিস্ আনভেল্ড' বইটে পড়লেই বুঝতে পাববেন।"

সুবেন্দ্রবাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে বইটে পড়িনি বটে, তবে এডমন্ড গ্যারেট প্রণীত 'আইসিস ভেরি মচ্ আনভেল্ড—অব দি ষ্টোব অব্ দি গ্রেট মাহাত্মা হোক্স' বইটে পড়েছি। লাইব্রেরিতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পাবি।"

এ কথা মনোহববাবু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঐ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন! গাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিষই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক মিছিমিছি মাদামের অপরাধ রটনা করেছে।"

এমন সময় বাহিরে শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—চিঠি আছে।" পরমুহূর্ত্তে ডাকপিয়ন প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়াই ক্ষেত্রমোহনবাবুব চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বলিলেন—"মশাই—আবাব সেই।"—পত্র খুলিয়া পাঠ কবিয়া সেখানি

সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থিয়জফিষ্টবাবুটি অতি আগ্রহের সহিত সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীন মোক্তারবাবুর হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা সহায়

প্রণাম পুর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস

এত্ত সাহস তোমার। আসিব্বাদ পজন্ত হইয়া গিআছে। তুমি মোনে করি আছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওযাজ। বসি বামনি তেমন মেয়ে নয। আমি মানা করা সত্ত্বেও বিবাহ করিবে। একনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভির রাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইযা থাকিবে বটগাছ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখানা দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।

বসময়ি

একে একে সকলে পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তারবাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তিনি মন হইতে সংশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি আপনার স্ত্রীর হাতের লেখার সঙ্গে, না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কোন সন্দেহ নেই। শুধু হাতের লেখা মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার লেখায় বানান যে সকল ভুল চিরকাল হত, এ চিঠিতেও তাই। সে চিঠির শিরে শ্রীশ্রী এক জায়গায়, দুর্গা এক জায়গায় লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া চিঠিতে এমন সব কথাবার্তা আছে যা সে জীবিত থাকতেও মুখে সর্ব্বদা ব্যবহার করত।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওঁর মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?" ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"ছিলাম বইকি।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন "দাহ করেছিলেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন?"

"দেখিনি আবার? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি। ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোন ভুল হয়নি।" নবীন মোক্তারবাবু তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বলিলেন—

There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.'

(হে হোরেশিও স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।

অপর একজন বলিলেন—"তা ত বটেই, তা ত বটেই। নইলে আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশেই বা বলি কেন—সকল দেশেই, আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভূত বলে একটা জিনিষ আছে তার কি কিছুই ভিত্তি নেই?"

সরকারী উকীলবাবুটি বলিলেন—"শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এক সময় বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টিণ্ডাল পর্য্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন—'of all the vulgar superstitions of the half educated, none dies harder than the

absurd delusion that there are no such things as ghosts " (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল)"—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ ক্ষেত্তর—ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক্। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম শেষ করা যাবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তা বেশ—সেই ভাল কথা।"

কন্যার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়ায় শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকর্দ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদি পক্ষে সাক্ষীদিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারি হইতে ফিরিবার সময় "বসময়ীর" তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে

"শুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ড দিতে যাইতেছে। ভাবিয়াছ বুজি পিণ্ডি দিলে আমি উধার হইয়া যাইব তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছারির পোষাকেই মনোহরবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহরবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন—"এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মশায়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারে? আপনাদের থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?"

মনোহরবাবু একখানি মোটা বহি আলমারি হইতে পাড়িয়া একস্থান খুলিয়া বলিলেন—"এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই। মুক্তাত্মাগণ সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখন কখন তাঁরা নিজেকে মেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহসম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,—এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যক পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজ দেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম সে হস্ত ছুরী ধরতে পারবে না কেন?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কি না সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে হচ্চে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা, থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকর্দ্দমায় সাক্ষী দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠিগুলো একবার পরীক্ষা করালে হয় না?"

থিযজফিষ্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনেব এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিবক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা—যদি আপনাব ইচ্ছা হয়, পবীক্ষা কবাতে পাবেন।"

পবদিন দাযবায় জালেব মোকর্দ্দমাটিব বিচাব আবম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সফটমোর-সাহেব সাক্ষ্য প্রদান কবিলেন। দিন-শেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাকবাঙ্গলোয গিয়া সফট্‌মোব সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনাব জন্য বসময়ীব কয়েকখানি পুবাতন আসল পত্রও দিযা আসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কল্য প্রাতে পবীক্ষাব ফলাফল জানাইব।"

পবদিন প্রাতঃকালে সবকাবী উকীল মনোহববাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবাব ডাক-বাঙ্গলোয উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—"পবীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তেব লেখা।"

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুব মুখখানি ছোট হইযা গেল। মনোহববাবু বলিলেন—"সাহেব, অনুগ্রহ কবিযা একখানি সার্টিফিকেট লিখিযা দিতে পাবেন?"

সাহেব মনে কবিলেন—নিশ্চযই এ পত্র লইয়া একটা মামলা মোকর্দ্দমা হইবে। আবাব সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী পাওয়া যাইবে।—সুতবাং আহ্লাদেব সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিযা দিলেন।

বাসায যাইতে যাইতে মনোহববাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—"এই চিঠিগুলিব নকল আব সাহেবেব সার্টিফিকেট যদি আমাদেব থিযজফিক্যাল বিভিউ নামক মাসিকপত্রে ছাপাতে পাঠাই তাতে আপনা'ব কোনও আপত্তি আছে কি?—আমবা যাকে স্পিবিট-বাইটিং বলি তাব সুন্দব অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—'তাতে আমাব আপত্তি নেই।"

পববর্ত্তী সংখ্যা থিযজফিক্যাল বিভিউ পত্রে সার্টিফিকেট সহ চিঠিগুলি ছাপা হইযা গেল। নানা স্থান হইতে বড বড থিযজফিষ্টগণ ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পত্র লিখিতে আবম্ভ কবিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া, পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিযা বিস্মযে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পবিচ্ছেদ

থিযজফিষ্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুব পসাবেব আব সীমা নাই—কিন্তু ইহাতে তিনি কিছু মাত্র সান্ত্বনা লাভ কবিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ কবিযা সুখী হইতে পাবিতেন। ভযে গয়ায় গিযা পিণ্ডদান কবিতেও পাবিলেন না। তাঁহাব অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আব নাই।

চৈত্র মাস আসিল—বসন্তেব বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষ্যে কাছাবি বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাডীতে বসিযা নিজ দুবদৃষ্টেব বিষয চিন্তা কবিতেছিলেন এমন সময একজন আসিযা সংবাদ দিল, হালিসহবে তাঁহাব শ্বশুববাডীতে মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোডাইতে গিযা, একটা বোম ফাটিযা তাঁহাব ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইযাছে। তাহাকে হুগলীতে হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

শুনিযা ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পাবিলেন না—গাডী ভাডা কবিযা হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিযা দেখিলেন, ছেলেটিব অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানাব নীচে মেঝেব উপব বসিযা বিধবা বিনোদিনী বোদন কবিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিযা তিনি আবও বোদন কবিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ-প্রযোগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যাব দিকে ডাক্তাবেবা বলিল আব প্রাণেব আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন—"ঠাকুবঝি, সন্ধ্যা হল—এইবাব বাডী চল।"

বিনোদিনী বলিলেন—"আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।"

"সমস্ত দিন অনাহারে আছে—স্নানাহার পর্য্যন্ত হল না!"

"তা না হোক! আমি যেতে পারব না।"

অবস্থা বুঝিয়া হাসপাতালেব ডাক্তারেরা বলিলেন—"আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আর কোন ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব—আপনার কোন চিন্তা নেই—আপনি বাড়ী যান।"

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন—"তুমি তবে আমায় হালিসহর নিয়ে চল। রাতে সেখানে থাকবে। কাল ভোবে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহরে বাত্রি কাটিল।

ভোরে উঠিয়া স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আরম্ভ কবিযাছেন, এমন সময় বাডীব বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাডাতাডি হুঁকা বাখিয়া বাহিবে গিযা দেখিলেন, লালপাগড়ীতে বাড়ী ঘেবাও কবিয়া ফেলিযাছে। অশ্বপৃষ্ঠে স্বযং পুলিসেব সুপাবিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব দুয়াবে দাঁড়াইযা। সঙ্গে কযেকজন দাবোগা ও হেড কনেস্টবলও আছে।

পুলিস সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পবিচয ছিল। নত হইযা সাহেবকে সেলাম কবিলেন।

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন—"হেল্লো মুখটিয়াব, টুমি হেথানে কি কবিটেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"হুজুব, এই আমার শ্বশুববাডী।"

"ইহা টোমার শ্বশুরবাড়ী আছে? উটম, হামি টোমাব শ্বশুববাডী সার্চ্চ কবিবে। হেথানে বোমা টৈয়াড়ি হয় কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ্চ-ওযাবেন্ট আছে।"—বলিয়া সাহেব সার্চ্চ ওয়াবেন্টখানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান কবিলেন।—ক্ষেত্রবাবু সেখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিযা, সাহেবেব হাতে ফিবাইয়া দিলেন। বলিলেন—"হুজুর মালেক—যা ইচ্ছে করিতে পাবেন।" সাহেব বলিলেন—"স্ত্রীলোক সবাকে লুকাইযা বাখ।"—পুলিস গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিল। স্ত্রীলোকগণেব মধ্যে কেবল বিনোদিনী। তিনি পুলিসেব ভযে কোথাও লুকাইবাব প্রয়োজন দেখিলেন না। হবিনামের মালাটি হাতে কবিয়া উঠানে তুলসীতলায বসিয়া বহিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট, বোমা, বর্ত্তমান রণনীতি, যুগান্তব, গীতা, দেশের কথা, বিভিউ অব্ বিভিউজ প্রভৃতি কিছুই বাহিব হইল না। বাহিব হইল—হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভাবত এবং একখানা বটতলাব ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশনায়কেব কোনও ছবি বাহিব হইল না—বাহিব হইল কেবল খানকতক কালীঘাটেব পট এবং একখানা আর্ট ষ্টুডিওব গণেশ মূর্ত্তি। জমিদাবেব খানকতেক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠিব ফাইল বাহিব হইল। বিনোদিনীব বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিয়া জমা কবা হইল। একজন দাবোগা কাগজপত্রগুলিব ফিবিস্তি প্রস্তুত কবিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন, শাদা খামগুলির প্রত্যেক খানিতে তাঁহাবই শিবোনামা লেখা এবং বসময়ীর হস্তাক্ষব! পুলিস সাহেবের অনুমতি লইয়া খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পবীক্ষা কবিতে লাগিলেন। খান কুড়ি চিঠি রহিয়াছে—সমস্তই বেগুনী বঙের ম্যাজেন্টা কালিতে, রসময়ীব হস্তাক্ষবে লিখিত। কয়েকখানি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্রবাবু পাঠও করিলেন। নানা অবস্থা করিয়া অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছে বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—"গয়ায় পিণ্ডদান কবিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিওনা আমি আব তোমাব অনিষ্ট কবিতে পাবি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে" একখানাতে রহিয়াছে—"শুনিলাম

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এখনও সাবধান।" একখানাতে আছে—"কন্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব।" ইত্যাদি।-সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এসব কি?"—ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

[মানসী, পৌষ ১৩১৬]

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ।। একাদশী-তত্ত্ব

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসে রামনিধি দাস নামক একটি যুবক থাকিয়া কলেজে লেখাপড়া করিতেন। রামনিধিবাবু ছাত্র হইলেও একটু বয়ঃপ্রাপ্ত—অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। লোকটির বাড়ী বীরভূম জেলায়। কথায় বার্ত্তায় একটু 'রেঢ়ো" টান বেশ বোঝা যাইত। এ কারণে পরোক্ষে বাসার ছেলেরা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া নানাবিধ হাসি তামাসা করিত।

রামনিধিবাবু লোকটি বড় সৌখিন। পিতার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল,—সে সবই তিনি পাইয়াছেন। বাসার একটি কক্ষ তিনি একলা লইয়া থাকেন,—তজ্জন্য বেশী ভাড়া দিতে হয়। ঘরের মেঝেটি আগাগোড়া শতরঞ্চ দিয়া আবৃত। ছত্রীওয়ালা একটি নেওয়ারের খাটে শাদা ধবধবে নেটের মশারি ঝুলিতেছে। এক দিকে একটি টেবিল—তাহার চারি পাশে কেদারা। নিকটে পুস্তকাধারে তাঁহার বাঁধানো চকচকে পাঠ্য পুস্তকগুলি। অপর দিকে একটি তেপায়ার উপর বৃহৎ দর্পণ। আশেপাশে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য—পোমাড পাউডার প্রভৃতি সুশোভিত।

সেদিন রবিবার, বাসা অনেকটা খালি হইয়া গিয়াছে। যে সকল ছাত্রের বাড়ী অথবা শ্বশুরালয় নিকটে, তাহারা প্রস্থান করিয়াছে – আবার সোমবারে ফিরিয়া আসিবে। রামনিধি ও অপর দুইজন ছাত্র মাত্র বাসায় আছেন।

এই দুইটি ছাত্র বৈকালে রামনিধিবাবুর কক্ষে বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরব্ধ হইয়াছে। বিগত যুগের কলেজী ছাত্রের মত, এখনকার ছাত্রগণ আর স্বেচ্ছাচারী নহেন। মুসলমানের দোকানের চপ, কাটলেট, শিক কাবাব ত দূরের কথা—পাঁউরুটি, বিস্কুট পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রের মস্তকে টিকি। ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। বঙ্কিমবাবুর 'দেবীচৌধুরাণী' সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র হরিনাম ধ্বনিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে হরিসভা। ষ্টেজের উপরেও শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকেরা শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গদেব সাজিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

দুইজন ছাত্র একদিকে, রামনিধি একদিকে। রামনিধিবাবুর মতটা একটু খৃষ্টানী রকমের ছিল। ম্যানেজারের হুকুমে প্রতি একাদশীতে বাসায় ভাত বন্ধ। সকালে ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল প্রভৃতি আহার করিয়া কলেজে যাইত,—রাত্রে লুচী, পায়স, মোহনভোগ প্রভৃতির বন্দোবস্ত। রামনিধিবাবু রাত্রে সকলের সঙ্গে 'একাদশী' করিতেন বটে, কিন্তু দিবসে করিতেন না। দিবসে দোকান হইতে পাঁউরুটি, হাঁসের ডিমের কালিয়া, গলদাচিংড়ী ভাজা প্রভৃতি আনাইয়া ভক্ষণ করিতেন। এই জন্য বাসার সকলে তাঁহার উপর রুষ্ট ছিল। কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত,—কেহ বা গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিত।

শরৎবাবু বলিলেন, "রামনিধিবাবু যাই বলুন না কেন, আমাদের হিন্দুধর্ম্মটা একেবারে হাম্বাগ নয়। এতে আগাগোড়া সায়েন্স—উঠতে সায়েন্স—বসতে সায়েন্স—শুতে সায়েন্স। আপনি আমাদের মত কিছু দিন একাদশী করে দেখুন দেখি স্বাস্থ্যের কত উপকার হয়।"

রামনিধি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একাদশী করার মধ্যে কতটুকু সায়েন্স আছে বুঝিয়ে দিন দেখি।"

বাসার ম্যানেজার কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "কতটুকু সায়েন্স?—সম্পূর্ণ সায়েন্স—ষোল আনা সায়েন্স। অমাবস্যা পূর্ণিমাতে মানুষের শরীর খারাপ হয়, হাত পা কামড়ায়, বেতো রোগীর বাত বৃদ্ধি হয়, জ্বর হয়—এ সব মানেন ত? না, তাও মানেন না?"

"মানি।"

"কেন হয়?"

"জানিনে।"

"শরীর রসস্থ হয় বলে। সেই রসকে শুকিয়ে রাখবার জন্যে একাদশী করার ব্যবস্থা।"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "বেশ ত; তা হলে অমাবস্যা পূর্ণিমাতে উপবাস করলেই হয়—একাদশীতে কেন?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ওর মধ্যে একটু গণিতশাস্ত্রঘটিত গূঢ় কথা আছে। এই দেখুন, চন্দ্র এক মাসে পৃথিবী পরিক্রমণ করেন, বটে ত?"

"বটে।"

"একবার পরিক্রমণে হল তিনশো ষাট ডিগ্রী। ঠিক কিনা?"

"ঠিক।"

"এক পক্ষে হল একশো আশী ডিগ্রী। প্রতিপদ থেকে একাদশী হয় তার দুই-তৃতীয়াংশ। একাদশী থেকে পূর্ণিমে হল এক-তৃতীয়াংশ, কেমন?"

"আচ্ছা বেশ?"

"একশো আশী ডিগ্রীর এক-তৃতীয়াংশ হল ষাট ডিগ্রী। একটা সমত্রিভুজের প্রত্যেক কোণ কত ডিগ্রী করে মশায়?"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "ষাট ডিগ্রী।"

কার্ত্তিকবাবু সগর্ব্বে বলিলেন, "এই দেখুন—সেই জন্যেই একাদশীর দিন উপবাসের ব্যবস্থা। ষাট ডিগ্রী—equlateral triangle—সমত্রিভুজ—শরীরের সমস্ত রস equilibrium—সমতা প্রাপ্ত হবে বলেই একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা মুনি ঋষিরা করে গেছেন।"

শরৎবাবু বলিলেন, "আর এটাও ত আপনার বোঝা উচিত রামনিধিবাবু, যে যাঁরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা রচনা করে গেছেন,—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের যাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁরা খামকা আপনাকে ঠকিয়ে জব্দ করবার জন্যে একাদশীতে উপবাস করবার বিধি দিয়ে যাবেন? আপনার সঙ্গে তাঁদের কি এমন শত্রুতা ছিল?" রামনিধিবাবু কিয়ৎক্ষণ একটু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কার্ত্তিকবাবু, এই যে একাদশীর আর ষাট ডিগ্রীর কথাটা বললেন, এটা কি কোনও শাস্ত্রে পড়েছেন, না আপনার মনগড়া কথা?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "শাস্ত্রেও পড়িনি মনগড়া কথাও নয়। অঙ্ক কষে বের করেছি জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি পড়েছি কি শুধু এগ্‌জামিন পাস করবার জন্যে মশায়?"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, শরীরের রস শুকিয়ে নেওয়াই যদি দরকার, তবে ফলমূল খেলে রস শুকোয়, আর পাঁউরুটি, গলদাচিংড়ী ভাজায় শুকোয় না এর মানে কি? আমার ত পাঁউরুটির চেয়ে ফলমূলই বেশী ভিজে মনে হয়।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ওটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা। মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যখন চর্চা করব, তখন নিশ্চয়ই এরও একটা কারণ বের করে ফেলব দেখে নেবেন।"

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া কার্ত্তিকবাবু ও শরৎবাবু সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য উঠিলেন, রামনিধিবাবু ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।। ভট্টাচার্য্য-সংবাদ

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে, একদিন সন্ধ্যাকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গাত্রে একখানি নামাবলী চরণে চটিজুতা, এক হস্তে একটি ছিন্ন মলিন ক্যাম্বিশের ব্যাগ, অন্য হস্তে একটি ভা ছাতা। বাসার দরজায় কার্ত্তিকবাবু ও শচীন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন, "বাপ সকল, এ বাড়ী কার?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এটি একটি মেসের বাসা।"

বৃদ্ধ যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, "মেষের বাসা? সে আবার কি?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "মেসের বাসা—অর্থাৎ এখানে ছাত্রেরা থেকে লেখাপড়া করে।"

"তোমরা সব কি জাতি?

"ব্রাহ্মণ আছে, কায়স্থ আছে, একজন বৈদ্যও আছে।"

"কোন্ জেলায় তোমাদের বাড়ী বাপু?"

"অনেক জায়গার ছেলে আছে। হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান,—বীরভূম জেলারও একজন আছে।" বৃদ্ধ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "বীরভূম জেলায় কে আছে বাবা?"

"রামনিধিবাবু বলে একজন আছেন। রামনিধি দাস—কায়স্থ। শিউড়ীর কাছে কোন গ্রামে বাড়ী।"

"আমারও বাড়ী শিউড়ী। আমি আজ বিকালের গাড়ীতে কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। আমার একজন শিষ্য এখানে ছিলেন, তাঁরই বাসায় যাব মনে করেছিলাম, সে ঠিকানায় গিয়ে শুনলাম তিনি বাসা বদলেছেন- নূতন বাসার ঠিকানা কেউ বলতে পারলে না। ক কাতায় এই প্রথম আসা— তাতে রাত্রিকাল। কোথায় যাই? কেউ কেউ পরামর্শ দিলে হোটেলে যান। না বাবা, আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, হোটেলে ছত্রিশ জেতে বসে খাচ্ছে সেখানে ত ঢুকতে পারিনে। ওসব খৃষ্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার দ্বারা ত হবে না। তোমরা দেখছি সব ভদ্রসন্তান, যদি একরাত্রির জন আমায় আশ্রয় দাও, তবে বড় উপকার হয়।"

ইহা শুনিয়া ছাত্র দুইজন সাদরে তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেল। উপরতলায় একটি কক্ষ খালি ছিল। সেখানে তাঁহাকে স্থান করিয়া দিল। জল আনাইয়া হস্তপদাদি ধৌত করাইয়া দিল। তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের ব্যবস্থা করিল। বাজার হইতে ফলমূল আনাইয়া তাঁহাকে জলযোগ করাইল, অবশেষে একটি নূতন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া জল ভরিয়া তামাক সাজিয়া দিল।

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মশায়, আপনি রাত্রে কি খান? ভাত, রুটি না লুচী?"

"চারটি ভাতই খান এখন। ভাল কথা, এখানে কাছে কোথাও গয়লাবাড়ী আছে? পয়সা দিচ্ছি, আধসের দুধ আনিয়ে ভাল করে জ্বাল দিয়ে দাও যদি ত হয়। আমি আফিম খাই কিনা। একটু দুধ না হলে প্রাণ বাঁচে না।"

শরৎবাবু বলিলেন, দুধের বন্দোবস্ত হইবে, পয়সা দিতে হইবে না। দুই তিন জনে পরামর্শ করিয়া, নিজ নিজ দুধ একত্র করিয়া ক্ষীরের মত করিয়া জ্বাল দিবার জন্য ঠাকুরকে বলিয়া আসিল।

সম্পূর্ণ সেকেলে পরম হিন্দু বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। বাসার ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া শাস্ত্র নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেহ বলিল, উপনিষদের মধ্যে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন? কেহ বলিল, সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ"—ইহা হইতে কি নিরীশ্বরবাদ সমর্থিত হইতেছে? কেহ বা বলিল, "ম্যাক্সমূলার যে বলিয়াছেন, দেড় হাজার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্পষ্টই সকলকে বলিলেন, সংস্কৃত তাঁহার বিশেষ জানা নাই। বাল্যকালে

টোলে প্রবেশ করিয়া কিছু দিন কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঘুর দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ করিতেই পিতৃবিয়োগ হয়—সুতরাং টোল ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনে মন দিতে হইল। যজন যাজন দশকর্ম্ম করিবার মত সামান্য বিদ্যা মাত্র তাঁহার আছে—তাহাতেই কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ্ করিয়া থাকেন।—দর্শনাদি শাস্ত্র জানা না থাকিলেও, গল্প ও উদ্ভটশ্লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিস্তর জানা ছিল। তাহাতেই আসর মাত করিয়া তুলিলেন। ছাত্রেরাও তাঁহার অহমিকাশূন্য সরল ব্যবহারে বড় প্রীত হইল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে, নিম্নে শঙ্খধ্বনি হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ওকি? এখন শাঁক বাজে কোথায়? কারু ছেলে হল নাকি?"

একজন বলিল, "খাবার ঠাঁই হয়েছে, তাই বামুন শাঁক বাজালে। আসুন ভট্‌চায মশায়—গা তুলুন!"

সকলের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নে অবতরণ করিলেন। রান্নাঘরের নিকট বিস্তৃত ভোজনকক্ষ। ব্রাহ্মণেরা এক সারি এবং অল্প দূরে কায়স্থগণ এক সারিতে বসিত। দুই সারিতে দশ বারোজন খাইতে বসিল। ব্রাহ্মণ ছেলেদের সহিত এক সারিতে না দিয়া, একটু তফাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভোজন আরম্ভ হইল। বামুন ঠাকুরও ছুটাছুটি করিয়া কাহাকেও ডাল, কাহাকেও তরকারী পরিবেষণ করিতে লাগিল। খাইতে খাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "শুনেছিলাম যে এ বাসায় শিউড়ী জেলার একটি ছাত্র আছেন—কই তাঁর সঙ্গে ত আলাপ হল না।"

কয়েকজন রামনিধিবাবুকে দেখাইয়া বলিল, "এই যে, এঁরই বাড়ী শিউড়ী জেলায়। কোথায় ছিলেন রামনিধিবাবু? আপনাদের ওদিক থেকেই ভট্‌চায মশায় এসেছেন।"

রামনিধিবাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া মনোযোগের সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।—ভট্টাচার্য্য বলিলেন, বাবুর বাড়ী কোথা?"

"শিউড়ী জেলায়।"

"নিজ্ শিউড়ী।"

"আজ্ঞে না।"—"কল্যাণপুর।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কল্যাণপুর?—তবে ত আমাদের ওখান থেকে বেশী দূর নয়। বাবুর নাম?"

"শ্রীরামনিধি দাস।"

"আপনারা কায়স্থ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পিতার নাম?"

"ঈশ্বর রাধানাথ দাস।"—বলিতে বলিতে রামনিধিবাবুর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "রাধানাথ দাস? কত বৎসর হল তিনি গত হয়েছেন?"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "তিন বৎসর।"—তাঁহার স্বর বিকৃত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তিন বৎসর?—কই চিনতে পারলাম না।"—কথা কহিতে কহিতে ডাল ভাতে মাখিতেছিলেন, সে মাখা ভাত ফেলিয়া রাখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাত গুটাইলেন।

প্রথমে রামনিধি ছাড়া অপর কেহ ইহা লক্ষ্য করে নাই। ক্রমে একজন বলিল,

"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর কি নেবেন?" বলিতে বলিতে তাঁহার পাতের পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "কই মশায়, খাচ্ছেন না?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "খুব খেয়েছি। আর পারব কেন?"

দুই তিনজন বলিয়া উঠিল, "কই খেলেন? সব ভাতই ত পড়ে রয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর বাবা, তোমাদের মত কি বয়স আছে? রাত্রে বেশী খেলে আমার আবার সহ্য হয় না।"

একজন বলিল, "তবে একটু দুধ খান। ঠাকুর, ঠাকুর, ভট্‌চায মশায়ের দুধ এনে দাও।"

ঠাকুর ছুটিয়া একবাটি দুধ আনিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, দুধ চাইনে।"

"সে কি ভট্‌চায মশায়! আপনি বলেছিলেন আফিম খান—একটু দুধ চাই। তাই আমরা তিন চারজনের দুধ একত্র করে ক্ষীরের মত করে জ্বাল দিইয়ে রেখেছি। খান—খেতেই হবে,—দাও ঠাকুর, বাটি নামিয়ে দাও।"

ঠাকুর বাটি নামাইবার জন্য ঝুঁকিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না—দিও না! নষ্ট হবে—আমি খেতে পারব না। বাবুদের দাও—আমি খেতে পারব না। আমার মাথাটা বড় ধরেছে।"

ছাত্রেরা বুঝিল, ভিতরে কোনও কথা আছে। আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। নিঃশব্দে সকলে নিজ নিজ পাত খালি করিয়া উঠিয়া পড়িল।

রামনিধিবাবু উঠিয়া আচমন করিয়া একেবারে নিজ কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।। আইন প্রসঙ্গে

ছেলেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে তাঁহার শয়নকক্ষে গেল। বলিল, "কেন আপনি খেলেন না বলুন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছু নয়। পেটে কেমন হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ হল।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এই বললেন মাথা ধরেছে, আবার বলছেন পেটে ব্যথা—আসল কথাটা কি খুলে বলুন। কি হয়েছে? কেন খেলেন না? মাখা ভাত ফেলে রাখলেন, তার কারণ কি?"--ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে কলিকায় ফুৎকার দিতে লাগিলেন।

শরৎবাবু বলিলেন, "ভট্‌চায মশায়?"

"কি?"

"কি হয়েছে বলুন।"

ভট্টাচার্য্য তখন হুঁকাটি নামাইয়া, ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বর অত্যন্ত নামাইয়া বলিলেন, "সে রামনিধি কোথায়?"

"বোধ হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে।"

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে —অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন, ঐ রামনিধি—পাজি বেটা— নচ্ছার বেটা—তোমাদের কাছে নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভট্টাচার্য্য ক্রোধে স্বর কাঁপাইয়া বলিলেন, "হুঃ! কায়স্থ! বেটা সাতজন্মে কায়স্থ নয়—হারামজাদা বেটার চৌদ্দপুরুষ কায়স্থ নয়। ছি ছি ছি--ঘোর কলি!—ঘোর কলি।'

দুই তিনজনে জিজ্ঞাসা করিল "এ কি তবে?'

ভট্টাচার্য্য বলিলেন- "ধোপা -ধোপা ওর বাপের নাম রেদো ধোপা' বেটা বলে আমার বাবার নাম রাধানাথ। -রাধানাথ! রেদো ধোপা বলেই ত চিরকাল জানি। ইদানীং রেদো হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে পড়েছিল বটে--আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ--কিন্তু আমরাই ছেলেবেলায় তাকে কালীদীঘির ঘাটে হিসসে' হিসসো করে কাপড় কাচতে দেখেছি। ছি ছি ছি ছি! ধোপার সঙ্গে এক ঘরে বসে কি আমি ভাত খেতে পারি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ওসব খ্রীষ্টানী স্বেচ্ছাচার আমার সইবে কেন? ছি ছি ছি ছি - তোমরা এতগুলো ভদ্রসন্তান- কায়স্থ সেজে এসে তোমাদেরও জাতটে খেয়েছে। মহাভারত! মহাভারত!"

বলিয়া ভট্টাচার্য্য মশায় চুপ করিলেন। ছেলেরা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

শেষে শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, 'কার্ত্তিকবাবু— এর একটা বিহিত করুন।"

"কি করতে বলেন?"

"পুলিসে দিন। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের এতগুলো লোককে ঠকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশটা করলে। কনেষ্টবল ডেকে হ্যাণ্ডোভার করে দিন।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এতে কি পুলিস কেস হতে পারে? তা ত জানিনে। বিনয়বাবু কি বলেন?"—বিনয়বাবু কাছে বসিয়া ছিলেন—তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেন। বলিলেন, "পুলিস কেস? কোন্ ধারায় হবে?"

বিনয়বাবু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জানি চীটিং-এর মধ্যে পড়ে কিনা।—হুয়েরার—হুয়েরার—দূর হকগে ছাই—চীটিং-এর ডেফিনিশানটাও ভাল মনে পড়ছে না। বইটা দেখি তা হলে।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, মহা বিপদ উপস্থিত। রামনিধিকে পুলিসে দিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই প্রধান সাক্ষী হইতে হইবে। একবার তিনি একটা বিবাহের মোকর্দ্দমায় শিউড়ীতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন—উকীলের জেরায় তাঁহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য শব্দরূপ ধাতুরূপ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই অবধি উকীলগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, পুলিসে দিয়ে কাজ নেই—পুলিসে দিয়ে কাজ নেই। কালকে ওকে বোলো এখন যে আপনি অন্য বাসায় যান।"

শচীন্দ্রবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাড়াও। কাণ ধরে বের করে দাও। কাল কি? আজ—এই দণ্ডে—এখ্খুনি। এস।"

বাসার অন্য সকলেও যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সমবেত হইয়া ক্রোধে রামনিধির শয়নকক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও উঠিলেন। বলিলেন, "শোন শোন। আস্তে আস্তে ভাল কথায় বিদায় করে দাও। খবর্দ্দার যেন গায়ে হাত তুলো না।"—পুলিশকোর্ট এবং উকীলের ভয়াবহ মূর্ত্তি বিভীষিকার ন্যায় ভট্টাচার্য্যের মনে ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

শরৎবাবু বলিলেন, "ভটচায মশায় ঠিক বলেছেন। দৈহিক বলপ্রয়োগ করাটা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ।"

সাত আটজন চটিজুতার চটপটধ্বনি করিতে করিতে রামনিধির দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। কেহ রামনিধিবাবু—হেরে রামনিধি—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ শিকলটা ধরিয়া ঝম ঝম করিতে লাগিল, কেহ কবাটের উপর দমাদ্দম করিয়া কিল মারিতে লাগিল।

রামনিধিবাবু উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? ডাকাতি করবেন নাকি?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডাকাতি আমরা করি, না তুমি কর? ধোপার ছেলে হয়ে নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের সকলের জাতিনাশ করেছ। বেরোও এই দণ্ডে বাসা থেকে।"—শরৎবাবু বলিলেন, "ধোপা ভদ্রলোক হল কবে থেকে?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "ও সব বাগ্‌বিতণ্ডা নিষ্ফল। আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এরই মধ্যে আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে যান। নইলে বলপ্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য হব।"

ইহা শুনিয়া অন্যান্য ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া বুক চিতাইয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল।

রামনিধি বলিল, "আর, আমার জিনিষপত্তর?"

"কাল কোন সময়ে এসে নিয়ে যাবেন। দরজায় ডবল তালা বন্ধ করে যান।"

রামনিধিবাবু দেখিলেন জোর করা নিষ্ফল। ইহারা দলবদ্ধ ও দৃঢ়সঙ্কল্প। বলিলেন, "আচ্ছা—আমার জিনিষপত্রগুলো ঠিক করে নিই।"

বলিয়া তিনি বাক্স পেটরা খুলিয়া নিজের টাকাকড়িগুলি বাহির করিয়া পকেটে লইলেন। একটি হ্যাণ্ডব্যাগে দুইখানি বস্ত্র, চিরুণী, বুরুষ, তোয়ালে প্রভৃতি ভরিয়া লইলেন। কার্ত্তিকবাবু ঘড়ি খুলিয়া দশ মিনিট গণনা করিতেছিলেন।

রামনিধি বাহির হইয়া, দরজায় তালা বন্ধ করিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "শীঘ্রই এর ফলভোগ আপনাদের করতে হবে। আমি চললাম থানায়—আপনাদের নামে নালিশ করতে। আপনারা আমার মানহানি করেছেন, এখন শুতে যাবেন না—প্রস্তুত হয়ে থাকুন। এখনই গেরেপ্তারি ওয়ারেণ্ট আসবে। এ মোকর্দ্দমায় আপনাদের প্রত্যেককে আর ঐ বদমায়ের ভট্চায্যিকে জেলে পাঠাব।"—বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে রামনিধিবাবু নামিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার কাছে গিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তিনি বলিলেন, "গেল নাকি থানায়?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "যাক না—ভয় কিসের?"—বলিতে বলিতে সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কক্ষে আসিয়া বসিল। শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভট্চায মশায়, আর এক ছিলিম তামাক সাজব?"

"তা সাজ না হয়।"—শরৎবাবু বলিলেন, "সত্যি থানায় গেল নাকি? একজন কেউ পিছু পিছু গিয়ে দেখলে হয়।"

তামাক প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কম্পিত হস্তে হুঁকাটি ধরিয়া টান দিতে লাগিলেন।

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "বিনয়বাবু, আচ্ছা এতে কি মানহানি হয়?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "মানহানি? হয় কি না জিজ্ঞাসা করছেন?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "আব বলে গেল ভয় প্রদর্শন।"

বিনয়বাবু অত্যন্ত বিজ্ঞতাব সহিত বলিলেন, "মানহানি হল ডিফ্যামেশন—আর ভয় প্রদর্শন হল ক্রিমিন্যাল ইন্টিমিডেশন।"

শরৎবাবু বলিলেন, "কোনও ধারার মধ্যে পড়ে নাকি?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "তাই ত ভাবছি। ও সম্বন্ধে কি যেন একটা রুলিং আছে! মাদ্রাজের কি বোম্বাই হাইকোর্টের নজিব সেটা। উঁহু—বোধ হয় এলাহাবাদ। বইতে দেখতে হত।"—বলিয়া বিনয়বাবু উঠিয়া গেলেন।—ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি বাখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন "দেখ, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাদুড়বাগান এখান থেকে কত দূব?"

একজন বলিল, "কাছেই।"

"সেখানে আমাব একটি জানিত লোক আছে। তাব কাছে একবার যেতে হল।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "উহুঁ—না না। বড়ই জরুবি কাজ, এখ্খুনি না গেলেই নয়।"

কম্পিতপদে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চটিজুতা পরিধান করিলেন। কম্পিত হস্তে ক্যাম্বিশেব ব্যাগটি লইয়া, সকলেব বিস্তব বাধা সত্ত্বেও, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মুখে অনবরত বলিতে লাগিলেন, 'রাম রাম" "দুর্গা দুর্গা", আর ক্রমাগত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন, গেরেপ্তারি ওয়ারেন্ট লইয়া পুলিস আসিতেছে কি না। তিনি চলিয়া গেলে বাসার ছেলেরা দেখিল তাড়াতাড়ি ভুলিয়া ব্রাহ্মণ ভাঙ্গা ছাতাটি ফেলিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।। গৃহহীন

রামনিধিবাবু পথে বাহির হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন? কলিকাতায় বিশেষ কোনও পরিচিত লোক নাই। কোথায় আশ্রয় লইবেন?—তখন রাত্রি পৌনে এগারোটা। ধর্ম্মতলা অভিমুখে শেষ ট্রাম যাইতেছে। না ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

রামনিধিবাবুর মস্তিষ্ক তখন বিকৃত। ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় তিনি জর্জ্জর। ট্রাম একটা থানার পাশ দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া হঠাৎ নামিয়া পড়িলেন। নালিশ করিতে হইবে—তাঁহার অপমানকারিগণকে জব্দ করিতে হইবে।

থানার সম্মুখে আসিয়া থামিলেন। ভাবিলেন, আজ থাক। রাগের মাথায় একটা কাজ

করিয়া বসা ভাল নয়। কল্য তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া যাহা হয় করা যাইবে।

ব্যাগটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে রাজপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে গড়ের মাঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাত্রি অন্ধকার। গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে মনুমেণ্টের দিকে পদচালনা করিলেন।

মনুমেণ্টের চারিপাশে যে উচ্চ চবুতারা আছে, তাহাতে উপবেশন করিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।—রজকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার এই অপরাধ? এই রাত্রে, পথের কুক্কুরের মত তাঁহাকে আশ্রয়হীন হইতে হইল! কেন, তাঁহার বাসার লোকেরা—শরৎবাবু, কার্ত্তিকবাবু, শচীন্দ্রবাবু, জ্ঞানবাবু প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ? তিনি তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা অল্প ধনী নহেন, অল্প শিক্ষিত নহেন, কাহারও অপেক্ষা তিনি চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবু তাঁহাকে এই সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে?

গ্রীষ্মকাল—ঝুর্ ঝুর্ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। সমস্ত মাঠের গ্যাস লণ্ঠন যেন নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। রামনিধিবাবু যোড়হস্ত করিয়া, ভগবানের নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আব তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ ধারায় জল পড়িতে লাগিল।—কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার হৃদয় অনেকটা সুস্থ হইল! তখন তিনি চাদরখানি বিছাইয়া, ব্যাগটি মাথায় দিয়া, সেই স্থানে শয়ন করিলেন।

মনে হইতে লাগিল, রাত্রি ত এইখানে কাটিল—কল্য কোথায় যাইব? তখনই আবার ধর্ম্মভাব তাঁহার মনে প্রবেশ করিল। কল্যকার উপায় ভগবানের ভার। আমি কেন চিন্তা করিয়া মরি?—ইহার পর, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে রামনিধিবাবু সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। আব বাসায় কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতি নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া, 'কখন পুলিস আসে, কখন পুলিস আসে', এই চিন্তায় চক্ষের পল্লব ফেলিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।। আশ্রয়লাভ

ভোব হইল। বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীগণ কলরব আরম্ভ করিল। বামনিধিবাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলেন—এ কোথায় আসিয়াছি!—পরক্ষণেই সমস্ত স্মরণ হইল।

ধীবে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্যাগটি হাতে লইয়া সহর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার সহাধ্যায়িগণেব কয়েকটি মেসের বাসা তাঁহার জানা ছিল এবং তথায় গতিবিধিও ছিল। কিন্তু তাহার কোনওটিতে স্থানান্বেষণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তাঁহাব নিকট যে টাকা ছিল, তাহাতে অনায়াসে তিনি স্বয়ং একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহা অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে।

ধীরে ধীরে রাজপথ বাহিয়া, ভবানীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে একটি মেসের বাসা পাইলেন। সেখানে গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনাদের বাসায় সীট খালি আছে?"

ম্যানেজারবাবু হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেন, "সীট আছে। মশায়েব নাম কি?"

"শ্রীরামনিধি দাস।"

"কি করেন?"

"কলেজে পড়ি।"

"বাড়ী কোথায়?"

"বীরভূম জেলায়।"

"আপনারা?"

রামনিধি পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবার আর জাতি সম্বন্ধে ছলনা অবলম্বন করিবেন না—তাহাতে কলিকাতার বাসায় স্থান হয় ভাল, না হয় নাই হইবে।

বলিলেন, "আমরা রজক।"

রজক শুনিয়া ম্যানেজারবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। শুধু বলিলেন, "ওহ্"—বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।—কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রামনিধিবাবু বাহির হইলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুই তিনটি মেসে সন্ধান করিলেন—কোথাও কেহ স্থান দিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে কালীঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাত্রীগণের থাকিবার জন্য অনেক ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তাহারই একটি দৈনিক আট আনায় ভাড়া করিয়া লইলেন। বাড়ীওয়ালা বলিল, "মশায়, রোজকার রোজ ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিতে হবে।"

রামনিধিবাবু একটা আধুলি ফেলিয়া দিলেন। দোকানী বলিল, "বাবুর বিছানাপত্তর ত কিছু দেখছিনে।"

"বিছানা অন্য জায়গায় আছে। আনিয়ে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পার?"

"উনুন কাটিয়ে দিচ্ছি। চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ সবই আমার দোকানে আছে। কি কি চাই বলুন।" "আর বামুন?"

"বামুন চান তাও আনিয়ে দিতে পারি। ওরে, ভোলা চক্রবর্ত্তীকে খবর দে। বামুন রোজ আট আনা করে নেবে কিন্তু।"—রামনিধিবাবু বলিলেন, "তাই দেওয়া যাবে।"

বামুন আসিল। উনান তৈয়ারী হইল। ক্রমে রান্না চড়িল। রামনিধিবাবু স্নান করিতে যাইবার সুযোগ পাইলেন না—ব্যাগটি কাহার কাছে রাখিয়া যান? তাই দোকানীদত্ত মাদুরখানি পাতিয়া তিনি ঘরের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ভাবিলেন, এরূপ করিয়া আর কতক্ষণ কাটিবে? একটা বাড়ীর সন্ধান না করিলেই নয়।

কোথায় বাড়ী—কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন। পথে বাহির হইয়া কালীঘাট অঞ্চলে কোথাও বাড়ী খালি আছে কি না দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না।—তখন হঠাৎ তাঁহার মস্তকে এক মৎলবের আবির্ভাব হইল। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চাঁদনীতে উপস্থিত হইলেন। —সেখানে একটা দোকানে ঢুকিয়া, আগাগোড়া সমস্ত সাহেবী পোষাক খরিদ করিলেন। দোকানেই তাহা পরিধান করিয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া, ধর্ম্মতলার একটি সস্তা হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর তিনি ঘৃণিত, দ্বার দ্বার হইতে বিতাড়িত ধোপা নহেন—এখন তিনি সাহেব। হোটেলের দ্বারে গাড়ী থামিতেই দরওয়ান তাঁহাকে লম্বা সেলাম করিল। ভৃত্যগণ আসিয়া তাঁহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। ম্যানেজার সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একটু উৎকৃষ্ট শয়নকক্ষে স্থান দান করিল। বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, গোসল হোগা?" —রামনিধিবাবু বলিলেন "নেহি। চা লে আও।"

দশ মিনিটের মধ্যে একটি ট্রে সুসজ্জিত করিয়া খিদমৎগার চা, রুটি, মাখন, ফল প্রভৃতি আনিয়া দিল। রামনিধিবাবু চা পান করিয়া ড্রয়িং রুমে গিয়া বসিলেন। অনেকগুলি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল, একখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

সেখানি খৃষ্টানী সংবাদপত্র। একটি প্রবন্ধ ছিল, তাহার শিরোনামা "মানবের ভ্রাতৃত্ব" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম অনুসারে, ঈশ্বর এক এবং তিনি সমস্ত মানবের পিতা, —সমস্ত মানব পরস্পর ভ্রাতা। প্রবন্ধটিতে হিন্দুদিগের জাতিভেদ-প্রথার তীব্র নিন্দা ছিল।

অন্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দেখিলেন, এক স্থানে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

Come unto me all ye that labour and are heavy laden and I will give you rest.

Mathew....11.28.

(অনুবাদ—হে পরিশ্রান্ত ও ভাবাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।)

এই বচনটি পড়িয়া তাঁহার অমৃতবৎ মধুর বোধ হইল। যে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, যীশু তাহাকে বিশ্রাম দিবেন। তাঁহার মত পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত কে? অপমানভরে তাঁহার মস্তক অবনত। তাঁহারা স্বধর্ম্মিগণ তাঁহাকে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও হেয়জ্ঞান করিয়াছে। তিনি সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কবিলে সব দুঃখ, সব অপমানেব হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

সে রাত্রে হোটেলে শয়ন কবিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সুন্দব কক্ষখানি, সুন্দরভাবে সজ্জিত। আহারাদির বন্দোবস্ত সুন্দর। কেমন দুগ্ধ-শুভ্র টেবিলক্লথেব উপর, সুচিত্রিত পবিষ্কার প্লেটগুলি সাজাইয়া, রজত-শুভ্র কাঁটা চামচাদিব সাহায্যে খাইতে হয়। মেসের বাসাব চাকরের অযত্নমার্জ্জিত কাঁসার গেলাস মনে কবিয়া রামনিধিবাবু নাসিকা কুঞ্চন করিলেন। টেবিলেব স্থানে স্থানে কেমন সুন্দব পুষ্পগুচ্ছ। কেমন প্রথা। এ সকল রামনিধিব কাছে খৃষ্টধর্ম্মেব অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তিনি অবিবাহিত। হয় ত কালক্রমে কোন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার পাণিগ্রহণ কবিযা জীবন সার্থক করিবেন, ইহাও সুখ-স্বপ্নবৎ তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

পবদিন তিনি বাজার হইতে একখানি বাইবেল গ্রন্থ ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন কবিতে লাগিলেন। একজন পাদ্রীসাহেবেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজেব সমস্ত অবস্থা জানাইলেন।

পাদ্রীসাহেব তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান কবিলেন। দেশীয় খৃষ্টানগণেব একটি আশ্রম ছিল, সেখানে তাঁহাকে স্থান কবিয়া দিলেন।

রামনিধি তখন পূর্ব্ব বাসায় গিয়া, হিসাব চুকাইয়া দিয়া জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন।

বাসার লোকেরা তাঁহার হ্যাটকোট দেখিয়া অবাক। জিজ্ঞাসা কবিল, "কোথায বাসা কবেছেন?"

"খৃষ্টীয় যুবকসমিতিব আশ্রমে।"

"আপনি কি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কবেছেন নাকি?"

"না, এখনও কবিনি । শীঘ্র করব।"

বাসার লোকেবা বলিল, "তা বেশ। আপনি আমাদেব নামে নালিস টালিস কবেছেন নাকি?"

"না। আমি আপনাদিগকে ক্ষমা করেছি। আশা করি ঈশ্বব আপনাদিগকে ক্ষমা কববেন।"

রামনিধিবাবু গেলে বাসাব লোকেবা ইহা লইয়া বড়ই রঙ্গবস করিতে লাগিল। একজন বলিল, "ঈশ্বরের চেয়েও উদার ক্ষমাশীল হয়ে উঠেছেন। উনি আগেই আমাদিগকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এখন আশা আছে ঈশ্বরও ওঁর মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসবণ করবেন।"

সেই রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাঙ্গা ছাতাটি লইবাব জন্য চুপে চুপে বাসায় আসিয়া উ'পস্থিত হইলেন। কার্ত্তিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে রামনিধেটাব খবব কি?"

"আজ এসেছিল। জিনিষপত্তর নিয়ে গেল। সে খৃষ্টান হচ্ছে।"

"অ্যাঁ। খৃষ্টান হবে? বল কি!"

"হ্যাঁ। সাহেবী পোষাক ধবেচে, খৃষ্টানদেব হোটেলে আছে। শীঘ্রই খৃষ্টান হবে।"

কল্যাণপুব গ্রামখানি ক্ষুদ্র। গ্রামেব অধিবাসীগণ অধিকাংশই তথাকথিত নীচজাতীয়, দুই চাবি ঘব ব্রাহ্মণ কায়স্থও আছে। বামনিধিবাবুব পিতা বাধানাথ দাস, এই গ্রামখানি ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নীলামে খবিদ কবিয়াছিলেন। গ্রামেব মধ্যভাগে জমিদাবী কাছারী ও বামনিধিবাবুর বাসভবন।—বেলা একপ্রহব অতীত হইযাছে। কাছাবীবাড়িতে বসিয়া নায়ে ব গোবিন্দ সবকাব একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স সম্মুখে বাখিয়া হিসাবপত্র পরীক্ষা কবিতেছিলেন। তাঁহাব আশে পাশে বসিযা কযেকজন মুহুবী জমা-ওয়াশীলবাকী, সুমাব প্রভৃতি প্রস্তুত কবিতেছিল।

অন্তঃপুবেব একজন ঝি কাছাবীব সম্মুখ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ সবকাব তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "ঝি, একবাব গিন্নীমাব সঙ্গে দেখা কবব, কলকাতা থেকে ছোটবাবু বড জরুবী চিঠি লিখেছেন।"

বামনিধি জননী জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি চিঠি এসেছে সবকাব মশাই? বামনিধি ভাল আছে ত?"

"শাবীবিক কুশলে আছেন। লিখেছেন হঠাৎ তাঁব কিছু টাকাব প্রযোজন হযেছে। দু হাজাব টাকা চেয়ে পাঠিযেছেন।"

"দু হাজাব টাকা? সে ক কুড়ি বাবা?"

সবকাব মহাশয় মনে মনে হাস্য কবিয়া বলিলেন "দু হাজাব টাকা—সে অনেক কুড়ি। পাঁচ কুড়িতে হল একশো, পঞ্চাশ কুড়িতে হল হাজাব, একশো কুড়িতে হল দুহাজাব।"

বামনিধি জননী হিসাবটা ভাল হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবিলেন না,—তবে বুঝিলেন যে অনেকগুলি টাকা। বলিলেন, "এত টাকা নিয়ে কি কববে?"

"তা ত কিছু লেখেননি। শুধু বলছেন টাকাটাব বডই দবকাব, শীঘ্রই পাঠিযে দিও পূর্ব্বে যে বাসায় ছিলেন, সেখান থেকে উঠে গেলেন দেখছি—এ ঠিকানা নতুন।" —বলিয়া সবকাব মহাশয় আদেশেব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন।

বামনিধি জননী একটু ভাবিযা বলিলেন, "তবে দাও পাঠিয়ে"

গোবিন্দ সবকাব কহিলেন, "লিখব কি, যে মাঠাকরুণ জিজ্ঞাসা কবছেন এত টাকাব এখন কি প্রযোজন" —জননী বলিলেন, "না না—দেবী কবে কাজ নেই। এত টাকা যখন চেযে পাঠিয়েছে, তখন বাছাব কোনও দায় বিপদ উপস্থিত হযে থাকবে। তাবই ত টাকা বড ভাল ছেলে তাই আমাদেব মত জিজ্ঞাসা কবে। আজই টাকা পাঠিযে দাও। আহা আমাব বাছাব কি বিপদ হল? হে মা কালীঘাটেব কালী আমাব বাছাকে ভাল বেখ, নইলে যেন মাথাব কেশ না ছেঁড়ে, আমি তোমায় জোড়া পাঁঠা দিযে পূজো দেব।"

সেই দিনই দুই হাজাব টাকাব নোট বেজেষ্ট্রি কবিযা বামনিধিবাবুকে পাঠান হইল

ইহাব দুই দিন পবে অপবাহ্নকালে, পূর্ব্বকথিত ভট্টাচার্য্য মহাশয, ভাঙ্গা ছাতাটি মাথায় দিয়া হেলিতে দুলিতে কাছাবী বাডীতে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ সবকাব তাঁহাকে প্রণাম কবিয়া কুশল জিজ্ঞাসা কবিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আব কুশল। সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখানে বডই একটা দুঃসংবাদ শুনে এলাম।"

গোবিন্দ সবকাব চকিত হইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি? কি?"

ভট্টাচার্য্য গম্ভীবভাবে বলিলেন, "তোমাদেব বডই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

"কি হয়েছে, ব্যাপাবখানা কি? বামনিধিবাবু ভাল আছেন ত? তাঁব সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"দেখা হযেছিল। সে যে বাসায় থাকে, সেই বাসায় আমিও গিযে উঠেছিলাম। আহা, বাধানাথেব ছেলেটিকে আমবা ববাববই অতি সৎ ছোকবা বলে জানতাম। যেমন বিনয়, তেমনি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি। তাব যে এমন কুবুদ্ধি হবে কে জানত? অদৃষ্টের ফেব,

অদৃষ্টের ফের!"—ইহা শুনিয়া গোবিন্দ সরকার বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি হয়েছে দাদাঠাকুর খুলেই বলুন না।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বলব বলেই ত এসেছি। তোমাদের গিন্নীকে একবার খবর দাও।"

সরকার মহাশয় অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহ্বান হইল।—ভট্টাচার্য্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে দণ্ডায়মান হইলেন। রামনিধি-জননী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। বারান্দায় তাঁহার জন্য একখানি গালিচা বিছানো ছিল, তাহাতে তিনি বসিলেন না। "বড় সুখের কথা ত বলতে আসিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে যাই। সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলাম, তোমাদের রামনিধিকে দেখে এলাম।"

শঙ্কিত হইয়া রামনিধি-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি কথা বলতে এসেছ? আমার রামনিধি ভাল আছে ত?"

"শরীর গতিক ভাল আছে বটে। কিন্তু হায় হায়—এমনটাই হল কেন?"

ইহা শুনিয়া রামনিধি-জননী আবও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি বাবা, কি হয়েছে?"—ভট্টাচার্য্য তখন গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিলেন,—"ধোপাবউ, তোমরা ত কারু পরামর্শ শোন না, নিজের মতেই কাজ কর। যে সময় রাধানাথ বড়লোক হল, বিষযটি পেলে, সে সময় আমরা সকলেই বললাম, আহা, রাধানাথ লোকটি বড়ই ভাল ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে বড়ই ভক্তি রাখত, দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই তাব ভাল হল। মা লক্ষ্মী কৃপা করলেন, আর তোমার দেমাকে চোখে কাণে দেখতে পেলে না। হাজারই বড়লোক হও, তোমরা সেই ধোপা ত বটে! তা তোমাদের ছেলেকে ইংবিজি লেখাপড়া শেখাবাব জন্যে কলকাতা পাঠাবার কি দরকার ছিল? এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায়? বেশ ত, যেমন দু পযসা হল, গ্রামের পাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখে নিজেব বিষয কার্য্যে মন দিতে হয। তা তোমরা গোঁ ধবলে, ছেলে বাবু হবে। এখন তোমাদেব বামনিধি কি কবছে জান? খৃষ্টান হচ্চে—খৃষ্টান হচ্ছে।"—ইহা শুনিয়া বামনিধি-জননী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিযা পড়িলেন। বলিলেন, "অ্যাঁ বাবা! খৃষ্টান হযেছে? ও মা, কি সর্ব্বনাশ হল গো।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এখনও হয়নি। হবে, হবে। আগে যে বাসায় ছিল, সে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। খৃষ্টানদের হোটেলে আছে। কোট প্যান্টলুন ধবেছে, মাথায় ধুচুনীব মত একটা টুপী পরেছে—ঠিক সাহেবের মত। মুখে কেবল গ্যাট্ ম্যাট্ ড্যাম ফুল্—ইংরিজি ছাড়া আব বাঙ্গলা বলে না। আবও গুজব শুনে এলাম, খৃষ্টান হয়েই একটি মেম বিয়ে কববে।"

বামনিধি-জননী অধীব হইয়া বলিলেন, "তবে আমাদেব কি হবে বাবা?"

"হবে আব কি! সে মেম এসে বলবে, এইও বুড্‌টী হারামজাদি!—নিকাল হিঁযাসে—বলে গলা টিপে তোমাদেব সব বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

বামনিধি জননী কাঁদতে লাগিলেন। বলিলেন, "বাবা, আমবা ছোট নোক—আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নেই বাবা—তুমি আমাদের একটা সৎপরামর্শ দাও। কি কবলে এ বিপদ থেকে উদ্ধাব হই তাব তুমি উপায় কব বাবা।"—বলিয়া বামনিধি-জননী ভট্টাচার্য্য মহাশযেব পা জড়াইযা কাঁদিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কেঁদ না—কেঁদে আর কি হবে! তোমবা সকলে আজই রওনা হয়ে কলকাতায় গিযে পড। যেখানে সে আছে, সেখানে গিয়ে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড। এতেও যদি তার মনে দযা হয! এমনই কি নবাধম পাষণ্ড হবে যে মাযেব চোখের জল দেখেও ক্ষান্ত হবে না?"

বামনিধি-জননী বলিলেন, "তাই যাব বাবা—আজই আমবা যাব। সরকাব মশাইকে নিয়ে আজই আমরা রওনা হয়ে যাই। বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কব যাতে আমার বাছাব সুমতি হয।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা যাও। আমিও আশীর্ব্বাদ করছি। আর, তোমার ছেলের কল্যাণে আমি নারায়ণকে তুলসী দেব এখন। নাবায়ণের দয়া হলে সবই হতে পারে।"

ভূলুণ্ঠিতা জননী উঠিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, আমার বাছার কল্যাণে নারায়ণকে তুলসী দিও রোজ! পুজোর খরচ দশটি টাকা নিয়ে যাও।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না ধোপাবউ, রাখ রাখ টাকা রাখ। শূদ্রের দক্ষিণা ত আমি গ্রহণ করিনে। আমি তোমার ছেলের কল্যাণে নারায়ণকে রোজ একশো আট তুলসী এখন কিছুদিন দিতে থাকব।"—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, "হরি হে দীনবন্ধু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মাগী পা জড়িয়ে ছুঁয়ে দিলে, এখন আমি অবেলায় স্নান করে মরি আবার!"—বামনিধির মা, মাসী, পিসী প্রভৃতি গোবিন্দ সরকারকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।। ডাকবাঙ্গলোয়

অপরাহ্নকাল। বঙ্গোপসাগরবক্ষে "হিরন্ময়ী" নামক জাহাজখানি ছুটিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ সমুদ্রের সুনীলজলে পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। জাহাজখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, শত শত পুরীযাত্রী লইয়া চাঁদবালী যাইতেছে। চাঁদবালী পৌঁছিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দূরে অস্পষ্ট শ্যামরেখাবৎ তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ডেকে, কাম্বিশের আরাম-কেদারায় পড়িয়া বামনিধিবাবু চিন্তামগ্ন। তাঁহার অঙ্গে ইংরেজি বেশ। সেদিন প্রভাতে উঠিয়া খৃষ্টীয় যুবকসমিতির আশ্রমে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, এমন সময় ফটকের বাহিরে গাড়ীতে আবদ্ধ স্ত্রীলোকের সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। উৎসুকচিত্তে উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিলেন, গাড়ীর কোচবক্সে বসিয়া বাড়ীর গোমস্তা গোবিন্দ সরকার। ভিতরে তাঁহার মা, মাসী পিসীর যুগপৎ আর্ত্তস্বর—"ওরে বাবা বামনিধি,—কি করলি রে!" বামনিধিবাবু কয়েক মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, "উহাদের চলিয়া যাইতে বল, দেখা হইবে না।"

ইহার পর দিনই, পাদ্রীসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, বামনিধি কটক যাত্রা করিলেন তখনও ওদিকে রেল খোলে নাই। পাদ্রীসাহেব বলিয়া দিয়াছিলেন—কটক নিরাপদ স্থান, সেখানে তোমার মা, মাসী গিয়া হঠাৎ বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। অনুরোধ করিয়াছিলেন, কটকে পৌঁছিয়া যেন দীক্ষিত হইতে বিলম্ব না করা হয়।—ক্রমে জাহাজ তীরভূমির নিকটবর্ত্তী হইল। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টাধ্বনির সহিত জাহাজ নোঙর ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে তট হইতে কয়েকখানি বোট আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল। যাত্রীগণ কোলাহল করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া সেই সকল বোটে অবতরণ করিল। এক প্রথম শ্রেণীর পান্সীতে বামনিধিবাবু ও তিনজন ইংরাজ সাহেব নামিয়া, তীরে উপনীত হইলেন।

মহানদী-কেনাল দিয়া পরদিন প্রভাতে স্টীমার ছাড়িয়া কটক যাইবে। ঘাটের নিকটেই চাঁদবালীর ডাকবাঙ্গলো। সেইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

বামনিধিবাবু তিনজন সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডাকবাঙ্গলোয় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখা গেল দুইটি মাত্র কামরা আছে, দুইটি মাত্র পালঙ্ক।

দুইজন সাহেব এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। অপর সাহেব অন্য কামরাটি দখল করিলেন। বামনিধিবাবুও সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব বাধা দিল। বলিল—দেখিতেছ না, আমি এ ঘরে উঠিয়াছি, আর স্থান কোথায়?"

বামনিধি বলিল, "কেন, অপর ঘরটিতেও ত দুইজন উঠিয়াছেন।"

"এ ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক।"

ও ঘরেও তাই। আপনি স্বচ্ছন্দে পালঙ্কে শয়ন করিতে পারেন, আমি মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইব এখন।"—সাহেব রাগিয়া বলিলেন "অসম্ভব। একজন নেটিভকে আমার

ঘরে শুই তে দিতে পারি না। ডাকবাঙ্গালো সাহেবদের জন্য। নেটিভগণের জন্য বাজারে সরাই আ ছে, আপনি সেইখানে যাইতে পারেন।"

রামনি ধিবাবু এতক্ষণ বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সাহেবের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া, তিনিও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করিলেন। বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কি মনে করেন এই পৃথিবী টা সাহেবদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? নেটিভগণের কোথাও কি স্থান নাই? এ ডাকবাঙ্গলো গভর্ণমেণ্ট সাধারণের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া সাহেবদের জন্যই নহে। আমি জোর করিয়া থাকিব।"

ইহা শুনিয়া সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বুক চিতাইয়া ঘট্ মট্ করিয়া বারান্দা প্রান্তে গিয়া, "বোই" "খানসামা" বলিয়া চীৎকার ক রিতে লাগিল। "হুজুর" বলিয়া খানসামা ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বলিল, "খানসামা, ইয়ে বাবুকো নিকাল দেও। সাহেবলোগকা ডাকবাঙ্গলামে বাবুকো কাহে আনে দিয়া?"

খানসামা বলিল, "হুজুর, বাবুলোককো ভি অ ানেকা হুকুম হায।"

সাহেব সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন, "ইউ ড্যাম্ শুয়ারকা বাচ্ছা! কাঁহা তুমরা রুলস্ লে আও।"—খানসামা বলিল, "সাহেব, আমি মুসলমা ন। আমাকে শুযারকা বাচ্ছা বলিও না। ঘরে ঐ রুল টাঙ্গানো আছে দেখ গিয়া।"

সাহেব গিয়া মুদ্রিত নিয়মাবলী পাঠ করিল। তাহাতে লেখা আছে, পথিক ভদ্রলোকগণ আসিযা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আশ্রয় দাবী করিতে পাবেন। শাদা কালার কোনও প্রভেদ উল্লিখিত নাই। এক ঘরে একাধিক ব্যক্তি থাকিবে না, এমনও কোন নিয়ম নাই। বরং লেখা আছে, এক ঘরে যতজন থাকিবে, প্রত্যেককেই দৈনিক এক টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইবে।

সাহেব বারান্দায় আসিয়া বলিলেন, "অলরাইট। হামারা সামান ভি উস্ কামরামে লে চলো।"—বলিযা তিনি অপর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভৃত্য তাঁহার জিনিষপত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া গেল।

রামনিধিবাবু তখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নিজ একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। খানসামা বলিল, "হুজুর, কি বলব ইংরাজের রাজত্ব। যদি আজ দিল্লীর বাদশারা থাকতেন, ত বেটার টুটি ছিঁড়ে ফেলতাম। মুসলমানকে শুয়ারকা বাচ্ছা বলেও আজ পার পেয়ে গেল। কি করব হুজুর, আমাদের কেসমৎ খারাপ।"

জিনিষপত্র গোছগাছ করিয়া, চা পান করিয়া, বারান্দায় ঈজিচেয়ার টানিয়া রামনিধিবাবু বাইবেলে মনোনিবেশ করিলেন। পড়িতে পড়িতে একস্থানে পাইলেন—

But I say unto you That whosoever is angry with his brother without cause shall be in danger of the judgment* * *But whosoever shall say Thou fool, shall be in danger of hell fire.

Matthew-5, 22

অনুবাদ—কিন্তু আমি (যীশুখৃষ্ট) তোমাদিগকে বলিতেছি যে-কেহ বিনা কারণে আপন ভ্রাতার উপর রাগ করিবে, তাহাকে (ঈশ্বরের) বিচারাধীন হইতে হইবে*

* * যে কেহ বলিবে, ওরে মূঢ, তাহার নরকাগ্নির আশঙ্কা থাকিবে।

(মথি, ৫—২২)

এদিকে কক্ষান্তরে তিনজন খৃষ্টশিষ্য, ফটাফট সোডার বোতল খুলিয়া ব্রাণ্ডির গ্লাসে ঢালিতে লাগিলেন। একজন রামনিধিবাবুকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজকাল ড্যাম্ নিগারগণ চাঁদনীর সস্তা সুট ও দুই টাকা মূল্যের সোলাহ্যাট পরিয়া, য়ুরোপীগণের সমকক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

অন্য সাহেব বলিলেন, "আমাদেরই ত দোষ। আমরা উহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াই ত উহাদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিয়াছি।"

তৃতীয় সাহেব বলিলেন, "এখন এ রোগের ঔষধ কি?"

প্রথম বক্তা সাহেব উত্তর করিলেন, "A few kicks judiciously administered." (অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক বারকতক পদাঘাত প্রয়োগ)।

সন্ধ্যার আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। রামনিধিবাবু ঝুঁকিয়া কষ্টে পাঠ করিতে লাগিলেন—

At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the Kingdom of heaven?

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

And said, Verily I say unto you except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of heaven.

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest the Kingdom of heaven.

Matthew-18.1.4.

(অনুবাদ—তখন শিষ্যগণ আসিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কে?

যীশু একটি ক্ষুদ্র শিশুকে নিজের কাছে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া এই ক্ষুদ্র শিশুর তুল্য হইতে না পারিলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সেই জন্য স্বর্গরাজ্যে মহত্তম। মথি ১৮, ১-৪)

অন্ধকার হইয়া আসিল। রামনিধিবাবু উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাতির নিকট বসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অপর কক্ষে সাহেবেরা মদ্যপানে মত্ত হইয়া একটা অশ্লীল হাসির গান জুড়িয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, ষ্টীমারযোগে রামনিধিবাবু কটক যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তথায় পৌঁছিয়া ডাকবাঙ্গলোয় উঠিলেন।

কটক সহরটি সুন্দর। যে নগরে নদী নাই, সে নগর সমৃদ্ধ হইলেও শ্রীহীন। কটকে দুই-দুইটি নদী। উত্তর সীমা দিয়া মহানদী, দক্ষিণ দিয়া কাটজুড়ী বহিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার নামে রামনিধিবাবু পরিচয়পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমেই পাদ্রীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সাধারণ শিষ্টাচারের পর পাদ্রীসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কবে দীক্ষিত হইতে বাসনা করেন?"

রামনিধি বলিলেন, "খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি। আর একটু অগ্রসর হইলেই, খৃষ্টধর্ম্মের সার সত্য হৃদয়সঙ্গম করিতে পারিলেই, দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।"

পাদ্রীসাহেব বলিলেন, "ইহা উত্তম পরামর্শ। আপনাদের দেশের অনেকেই, খৃষ্টধর্ম্ম কি পদার্থ না বুঝিয়া সুঝিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করেন—তাহা ভাল নয়। বোধ হয় ইহার জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা আমরাই অধিক দোষী। আমরা মনে করি, লোকটাকে একবার দীক্ষিত করিয়া ফেলতে পারিলে আর পলাইবে কোথা? কিন্তু ইহা বড় ভুল। ধর্ম্ম, ঔষধ নহে যে ধরিয়া বাঁধিয়া গিলাইয়া দিলেই উপকার।

তা ছাড়া, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে সে যাহা না করিল, সে করার মূল্য কি? আমরা ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য প্রটেষ্ট্যান্টগণের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা শিশু জন্মিবার কয়েক দিবস পরেই, গির্জ্জায় লইয়া গিয়া

তাহাকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া দীক্ষিত করিয়া আনেন। আমরা তাহা করি না। আমাদের পুত্র কন্যাদের পনেরো ষোল বছর বয়স হইলে, তাহারা যখন নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে খৃষ্টধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করি।"

ধর্ম্মসম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিয়া রামনিধিবাবু বিদায়গ্রহণ করিলেন।

বিকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মহান্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মহান্তি মহাশয় উড়িষ্যাবাসী—কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। বিলাত হইতেই একটি য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইনি কটক কলেজে বহু বৎসর হইতে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার দুই পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। কনিষ্ঠটি কটক-কলেজের ছাত্র—বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। কন্যাটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া—নাম থিওডোরা (ঈশ্বরের দান)—কিন্তু সকলে তাঁহাকে ডোরা বলিয়াই ডাকে।

মহান্তি পরিবার অতি সমাদরের সহিত রামনিধিবাবুর অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহারা ইংরাজি ভাষাতেই সর্ব্বদা কথোপকথন করিতেন। গৃহিণী বলিলেন, "আপনাকে আমরা বড় সুসময়ে পাইলাম। শীঘ্রই আমাদের পরিবারে একটি শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দশ দিন পরে আমার কন্যা ডোরার বিবাহ।"

কুমারী ডোরা সেখানে বসিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তাঁহার সুকোমল গণ্ডস্থল রক্তাভ হইয়া উঠিল।—রামনিধি বলিলেন, "বেশ—বেশ। সুসংবাদ। আমার সৌভাগ্য যে আমি এমন আনন্দ-উৎসবের সময় আসিয়া পড়িয়াছি। কুমারী মহান্তিকে অভিনন্দন করিতেছি। সেই সুখী মনুষ্যটি কে?"

মিসেস মহান্তি বলিলেন, "তাঁহাকে শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। তাঁহার নাম ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী মাদ্রাজ প্রদেশের সিভিল সার্জ্জন্। তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য ছয় মাস ছুটি লইয়া কন্যাটিকে কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।"

রামনিধিবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড় অন্যায় ত। তাঁহার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কুমারী মহান্তি কি বলেন?"

ডোরা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "Judge not, that you be not judged."—(অর্থাৎ কাহারও বিচার করিও না, পাছে তোমার ঈশ্বরের বিচারাধীন হইতে হয়।)

গৃহিণী বলিলেন, "দেখিলেন, বাইবেলখানি আমার ডোরার একেবারে কণ্ঠস্থ।"—তাঁহার মাতৃহৃদয় কন্যা-গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রামনিধি বলিলেন, "উঁহার উপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসনীয়। বেশ কৌশলে জাল কাটিয়া বাহির হইলেন।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী রামনিধিবাবুর সহিত ইঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ক্রমে অধ্যাপক মহান্তিও আসিয়া সভায় যোগদান করিলেন।

মহান্তি মহাশয় বলিলেন, "মিষ্টার দাস—আপনি আমাদের গির্জ্জা দেখিয়াছেন?"

"দেখিয়াছি। কলেজের নিকট বড় বাগানওয়ালা গির্জ্জাটি ত?"

"না, সেটা য়ুরোপীয়দিগের গির্জ্জা। আমাদের গির্জ্জা মিশন প্রেসের নিকট। আমাদের গির্জ্জাটি য়ুরোপীয় গির্জ্জার মত অত সুন্দর না হউক, তথাপি মফঃস্বল ষ্টেশনের পক্ষে বেশ ভাল গির্জ্জা বলিতে হইবে। রবিবারে আপনাকে লইয়া যাইব।"

কুমারী ডোরা বলিলেন, "বাবা, এবার রবিবারে ত হোলি কমিউনিয়ন সার্ভিস আমাদের য়ুরোপীয় গির্জ্জায় যাইতে হইবে।"

অধ্যাপক মহান্তি বলিলেন, "হাঁ হাঁ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ রবিবারে য়ুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ একত্র হইয়া হোলি কমিউনিয়নে যোগদান করিবেন।"

রামনিধি বলিলেন, "দেশীয় গির্জ্জায় হোলি কমিউনিয়ন হয় না কেন?"

"হইবার অবশ্য কোনও বাধা নাই। তবে মানবের ভ্রাতৃত্ব সূচিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ঐ দিন য়ুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ বড় গির্জ্জায় সমবেত হন।"

রামনিধি বলিলেন, "বৎসরে একদিন মাত্র? অন্য সময়ে য়ুরোপীয় গির্জ্জায় দেশীয় খৃষ্টানগণের কি প্রবেশ নিষিদ্ধ?"

কথাটা বড় রূঢ় শোনাইল। মহান্তি পরিবারের মুখ যেন অন্ধকার হইল। মিসেস মহান্তি য়ুরোপীয় হইলেও, নেটিভ বিবাহ করার গুরুতর অপরাধে কটকের য়ুরোপীয় সমাজে জাতিচ্যুত ছিলেন।—মহান্তি মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। ইচ্ছা করিলে দেশীয় খৃষ্টানও সাহেবদের গির্জ্জায় গিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে পারে। অবশ্য, পোষাক পরিচ্ছদ একটু সভ্য ভব্য হওয়া আবশ্যক।"

কুমারী ডোরা বলিলেন, "বাবা, পোষাক পরিচ্ছদের এরূপ কড়া নিয়মে, যীশু যে দ্বাদশ গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে পাইতেন না; কারণ যীশু আদেশ দিয়াছিলেন, তোমাদের কাহারও একটির বেশী দুইটি কোট থাকিবে না, পায়ে জুতা থাকিবে না।"—মহান্তি-গৃহিণী দেখিলেন, কথাবার্ত্তায় স্রোত ক্রমে অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাই তিনি নিপুণভাবে সহিত বিষয়ান্তরের অবতারণা করিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী অন্যের অলক্ষিতে রামনিধিবাবুর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন—তাঁহার ভাবটা যেন, "ভায়া হে, এখনও চৌকাঠ পার হও নাই। পার হইলে অনেক আশ্চর্য্য সংবাদ জানিতে পারিবে।"

নবম পরিচ্ছেদ।। ভ্রাতৃত্বের পরিচয়

মহান্তি পরিবারের অমায়িক সাদর ব্যবহারে রামনিধিবাবু বড় প্রীত হইলেন। ইঁহাদের বিশেষ আগ্রহে, ডাকবাঙ্গলো ছাড়িয়া এখন রামনিধিবাবু মহান্তি গৃহেই অতিথি।

রবিবার আসিল। রামনিধিবাবু সুসজ্জিত হইয়া মহান্তি পরিবারের সহিত সাহেবদের গির্জ্জায় হোলি কমিউনিয়ন ধর্ম্মোৎসব দেখিতে গেলেন।

অন্যান্য বৎসর যে যখন আসিত, নিজ নিজ মনোনীত স্থানে উপবেশন করিত। এ বৎসর দেখা গেল সম্মুখের কয়েক সারি আসন, শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত। ইহা দেখিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণ মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন।

একে একে সাহেবেরা আসিলেন। তখন উপাসনাদি আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে একটি পাত্র হইতে সকল খৃষ্টানকে এক এক চুমুক মদ্যপান করিতে হয়। পাত্রটি প্রথমে শ্বেতাঙ্গের সারিতে অর্পিত হইল। উপস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ পান সমাধা করিলে পর, সেটি দেশীয়দিগের করায়ত্ত হইল।

দেশীয় খৃষ্টানগণ কেহ কিছু বলিলেন না, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল, তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছেন।

উৎসবান্তে সকলে আসিলেন। তখন এই ব্যাপারের আলোচনা হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণ এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দুইজন যুবক অগ্রগামী হইয়া, গির্জ্জায় পাদ্রীসাহেবের নিকট ইহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "তাহাতে দোষ কি? জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, কমিশনর সাহেব, ইঁহারা সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, সকলেই ইঁহাদের সমকক্ষতা করিতে চাহিলে চলিবে কেন?"

যুবকেরা বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, উঁহারাই যেন সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। উঁহারা ছাড়া ত অনেক শ্বেতাঙ্গ সাহেব ছিলেন, যাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ দেশীয় খৃষ্টান সমাজে রহিয়াছেন। তবে কি কারণে তাঁহাদিগকে পশ্চাতের আসন দেওয়া হইল? পদগৌরবের কথা তুলিবেন না,শাদা কালো বর্ণানুসারে এ প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন স্বীকার করুন।"

পাদ্রীসাহেব এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দেশীয় খৃষ্টানগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এইরূপ ব্যবহারের

জন্যই ত শিক্ষিত ভারতবাসীগণ সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন না। খৃষ্টের উপদিষ্ট মানবের ভ্রাতৃভাবের উত্তম পরিচয় আজ পাওয়া গেল।"*

এই ব্যাপারটি আগাগোড়া প্রত্যক্ষ করিয়া, রামনিধিবাবু হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। যে আশায় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে আশা মরীচিকার ন্যায় শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেদিন বাড়ী গিয়া তিনি অনেক চিন্তা করিলেন। কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন না। বাড়ীর লোকেও তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, কারণ বুঝিতেও তাঁহাদের বাকী রহিল না। রামনিধিবাবুর মন হইতে এই বিষাদচ্ছায়া মুছিয়া দিবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারী ডোরার বিবাহের আর সপ্তাহমাত্র বাকী আছে। বিবাহের সময় গৃহাদি কিরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কোথায় বসাইতে হইবে, তাঁহাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, মহান্তি গৃহিণী এই সকল পরামর্শ রামনিধিবাবুর সহিত বিশেষ ভাবে করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাবৎ আনন্দ উৎসবের আয়োজনে তাঁহার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ক্রমে বিবাহের দিন সমাগত হইল। দেশীয় গির্জ্জায় গিয়া শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। সহরের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণ আসিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, আনন্দ উৎসবে যোগদান করিলেন। হিন্দুগণ ফলমূল মাত্র, মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টানগণ নানা প্রকার রসনারসাল উপাদেয় ভোজ্য পেয়াদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সাহেবদের জন্য একটি নূতন তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। বাক্স বাক্স শেরি-শ্যাম্পেন আমদানি হইয়াছিল। ভাল ভাল হাভানা, ম্যানিলা চুরুট আসিয়াছিল। কিন্তু দুইজন পাদ্রী সাহেব এবং স্থানীয় ইউরেশিয়ান পোষ্টমাষ্টার ছাড়া, আর কোনও সাহেবই আসেন নাই। কমিশনার সাহেব লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী পীড়িতা বলিয়া আসিতে অক্ষম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিমন্ত্রণ পত্রের কোনও উত্তর দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই। ডাক্তার সাহেব প্রথমে আসিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের দিন একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ফোটো ফ্রেম বরকন্যাকে উপহার পাঠাইয়া লিখিলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে অতিথিসমাগম হওয়াতে আসিতে পারিলেন না। শেরি-শ্যাম্পেনের বাক্সগুলি অর্দ্ধমূল্যে দোকানে ফেরৎ দেওয়া হইল।

নবদম্পতি ভুবনেশ্বর ডাকবাঙ্গলোয় "মধুচন্দ্র" যাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কঁপেতি (মাঙ্গলা) বৃষ্টির মধ্যে শকটারোহণ করিয়া অপরাহ্নকালে তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।। প্রত্যাবর্তন

"মিষ্টার দাস—মিষ্টার দাস—বেড়াইতে যাইবেন?"—মহান্তি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পল আসিয়া বলিল, "চলুন না, একটু বেড়াইয়া আসি।"

রামনিধিবাবু বলিলেন, "কোন্ দিকে যাইবে?"

"মহানদীর তীরে। এমন সুন্দর প্রাতঃকাল, ঘরে বসিয়া নষ্ট করিতে আছে?"

রামনিধি উঠিয়া বলিলেন, "চল।"

উভয়ে প্রভাতবায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলেন। টেলিগ্রাফ আপিসের সম্মুখ দিয়া, ইংরাজপাড়া ভেদ করিয়া, নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর জল শুকাইয়া মধ্যস্থল আশ্রয়

* ঘটনাটি অবিকল সত্য। কটক হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত ১০শে জুলাই ১৯০৭ তারিখের Star of Utkal নামক সংবাদপত্রে A Christian স্বাক্ষরিত একখানি চিঠিতে উপরিউক্ত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

করিয়াছে। দূরে ধোপারা কাপড় কাচিতেছিল। উভয়ে বালুচর অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া ধোপাদের কাপড় কাচা দেখিতে লাগিলেন। তীরে বাঁশ পুঁতিয়া, কাপড় দিয়া ঘেরিয়া, ধোপারা বায়ুরোধার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে—তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চুল্লীর উপরে ক্ষারজলে মলিনবস্ত্র সিদ্ধ হইতেছে।

পল বলিল, "উঃ! এ ধোপাদের রং কি কালো!"

রামনিধি বলিলেন, "তোমার চেয়ে কালো হইতে পারে। আমার চেয়ে আর বিশেষ কি এমন কালো, পল?"

রামনিধির কণ্ঠস্বরে যেন একটু তিক্ততা মিশানো ছিল। তাই পল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "না-না, আমি সে ভাবে বলি নাই। আপনি রাগ করিতেছেন কেন?

রামনিধি বলিলেন, "না, রাগ করি নাই। একটা কথা বলি। জান পল, আমিও একজন ধোপা?"

পল বলিল, "না আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

"না, পরিহাস নয়, সত্য কথা। আমিই নিজে কখনও কাপড় কাচি নাই বটে, কিন্তু আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এইরূপে নদীতীরে কাপড় কাচিয়া দিনপাত করিয়াছেন।"

পল গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি তাহা কিছুই অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি না। দৈহিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া কাহারও লজ্জিত হইবার কারণ নাই।"

রামনিধি বলিলেন, "ইহা নব আবিষ্কৃত নীতিশাস্ত্রের কথা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে—এবং য়ুরোপেও,—কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করাটা লজ্জার কথা বলিয়া পরিগণিত।"

পল বলিল, "তাহা সত্য বটে। আপনি, আমি, নব্যযুগের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, এ ভ্রান্ত বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিব।"

এইরূপ কথোপকথনে দুইজনে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একস্থানে চরের উপর বিস্তর জ্বালানি কাষ্ঠ জমা করা রহিয়াছে। উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে এই কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া নদীপথে ভাসাইয়া আনা হয়।

এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, নদীর জল বেশ ঘোরালো দেখা গেল। সেখানে গভীরতা সম্ভবতঃ অধিক। প্রভাতের নবীন কিরণে নদীর জল স্বচ্ছ সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তটপ্রান্ত পাথর দিয়া বাঁধানো। সেই পাথরের উপর দুইজন কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন।

অল্প দূরেই একটি সুদীর্ঘ উচ্চ সদ্য চূণকাম করা প্রাচীর দেখা যাইতেছিল। ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষের অগ্রভাগও লক্ষিত হইল। রামনিধিবাবু বলিলেন, "উহা কোনও বড়লোকের বাগানবাড়ী বুঝি?"

পল বলিল, "না, উহা গোরস্থান। দেখিবেন? ঐদিক দিয়া ঘুরিয়া গেলে উহার গেট পাওয়া যাইবে। এটা পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীর।"

রামনিধি বলিলেন, "চল না, দেখিয়া আসি।"

উভয়ে প্রাচীরের কোল দিয়া অগ্রসর হইয়া, ঘুরিয়া অপর দিকের ফটকে পৌঁছিলেন। দ্বারে দ্বারবান বসিয়া আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামনিধিবাবু দেখিলেন, স্থানটি ফুলে ফুলে লতায় পাতায় অতি মনোরম। ভাল ভাল গোলাপের গাছ—তাহাতে শ্বেত, পীত, রক্ত গোলাপ ফুটিয়াছে। বিচিত্রবর্ণ বিলাতী ফুলের গাছ—পলি, ব্লু-বেল, মার্গারিটা, প্যান্সি প্রভৃতি। নানা প্রকার পাতাবাহারের গাছ। মালীগণ নানা স্থানে কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ ফুলগাছে জল দিতেছে, কেহ ঘাস নিড়াইতেছে, কেহ শুষ্কপত্র কুড়াইয়া স্থানান্তরিত করিতেছে।

গোরস্থানটির সর্ব্বত্র রক্তকঙ্করময় পথ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট

ফুলগাছ ছাড়া বড় ফুলগাছও আছে। কর্ণিকার, করবী, কুর্চ্চি, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি। দেবদারুর নবপত্রগুলি বায়ুভরে তর তর করিয়া কাঁপিতেছে। পাখীগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে। সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও একটি কুটা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে, হেড মালী দুইটি ফুলের তোড়া বাঁধিয়া আনিয়া দুইজনকে উপহার দিল। রামনিধি তাহাকে চারি আনা বখসিস্ করিলেন।

গোরস্থানে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইজনে সমাধি-লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, শত বৎসরের পুরাতন সমাধি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ রামনিধিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এত সমাধি দেখিলাম, দেশীয় খৃষ্টানের ত একটিও দেখিলাম না? এখানে দেশীয় খৃষ্টানেরা অমর নাকি?"

পল বলিল, "দেশীয় খৃষ্টানের গোরস্থান পৃথক। ইহার পাশেই আছে। ঐ যে দূরে দেওয়াল দেখা যাইতেছে, ঐ দেওয়ালের পর দেশীয় খৃষ্টানের গোরস্থান।"

রামনিধির বক্ষে আবার সেই পুরাতন ব্যথা দ্বিগুণ বলে বাজিয়া উঠিল। বলিলেন, "পৃথক? গোরস্থানও পৃথক?"

"হ্যাঁ।" "চল দেখি।"

"তেমন দেখিবার কিছুই নাই।"

"আছে বইকি। তোমার, আমার, ভাইযেরা, বোনেরা সেখানে আছে। অপমানিত লাঞ্ছিত আমাদের স্বজাতিরা সেখানে আছে। চল দেখি গিযা।"

"আচ্ছা, চলুন।"

যাইতে যাইতে রামনিধি বলিলেন—"দেশীয় খৃষ্টান মরিলে, কি এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ?"

পল নতশিরে বলিল, "তা তা জানি না।"

রামনিধি বলিলেন, "আচ্ছা পল, যদি কোনও দেশীয় খৃষ্টান, ব্যাঙ্কেন কিম্বা হ্যারি কার্কের বাড়ীর পোষাক পরিয়া মরে, তাহা হইলেও কি এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ?"—রামনিধির স্বর তিক্ততাপূর্ণ।

পল কিছুই বলিল না, অবনত মস্তকে রামনিধির সঙ্গে চলিল।

য়ুরোপীয় গোরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুইজনে দেশীয়দিগের গোরস্থানে প্রবেশ করিলেন। ইহার প্রাচীর জরাজীর্ণ। বর্ষে বর্ষে বর্ষার জলে সিমেণ্ট ধুইযা ধুইযা ইষ্টকের মাঝে মাঝে ফাঁক হইযা গিয়াছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন। স্থানে স্থানে প্রাচীরের গাত্র ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ বাহির হইযাছে। দ্বারে দ্বারবান নাই।

ফটক অর্দ্ধ ভগ্ন—গোরু ছাগলের অবাধ গতি। মালী নাই—কোথাও জনপ্রাণী নাই। সর্ব্বত্র আগাছার, কাঁটা গাছের জঙ্গল। পুরাতন আগাছা শুষ্ক হইযা ভাঙ্গিযা পড়িযাছে, তাহার পাশে নূতন আগাছা জন্মগ্রহণ করিযাছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গো-ছাগলের শুষ্ক বিষ্ঠা, আগাছাগুলির সারের কার্য্য করিতেছে। এক স্থানে একটা মৃত বিড়াল পড়িয়া রহিয়াছে। ফুলগাছের মধ্যে এখানে ওখানে কেবল কতকগুলি শেযালকাঁটার গাছ দেখা গেল।

সমাধিগুলির অবস্থাও তদ্রুপ। অধিকাংশই কাঁচা—খানিকটা মাটির ঢিবি। কাহার সমাধি নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নেই। ইহার অপেক্ষা একটু উচ্চদরের গুলি ইঁটে গাঁথা। শিরোভাগে প্রোথিত কেরোসিন তৈলের বাক্সভাঙ্গা কাঠে, আলকাৎরার অক্ষরে সমাধিস্থের নাম ধাম লেখা আছে। মাত্র গুটি দশ বারো সমাধি আছে, যাহা একটু ভাল করিযা নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে দুইটি দুইজন ইংরেজ পাদ্রীর।

রামনিধিবাবু ভাবিতে লাগিলেন দেশীযগণের সহিত এত মাখামাখি করার অপরাধে, এই দুই পাদ্রীর প্রেতাত্মারা সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় পরলোকে জাতিচ্যুত হইযাছে।

দেশীয় খৃষ্টানদের সমাধি-লিপিতে নাম অধিকাংশই বিদেশী—যথা এলিজাবেথ চক্রবর্ত্তী—জন ইজিকিয়েল মহাপাত্র—ইত্যাদি।

বামনিধি ঘুবিতে ঘুবিতে দুইটি সমাধি দেখিতে পাইলেন, যাহাতে নামই বজায় বাখা হইয়াছে। একটিতে লেখা আছে—

IN MEMORY
OF
COOMARI SUSHI MUKRI

অপবটিতে বহিযাছে—

IN LOVING MEMORY
OF
OUR SWEET LITTLE INDIRA

বামনিধি মনে মনে বলিলেন, 'তবু ভাল—তবু ভাল—স্বদেশীয় নামটা যে তোমবা বজায বাখিযাছ সেও ভাল।' ভাবাবেগে বামনিধিবাবুব চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

পল বলিল, 'চলুন মিষ্টাব দাস, বৌদ্র পড়িয়া উঠিল।''

বামনিধি বলিলেন ' ভাই, আমি মিষ্টাব দাস নহি। আমি বামনিধিবাবু।''

দুইজন বাহিব হইলেন। বামনিধিবাবু অগ্রে অগ্রে, পল পশ্চাতে। ফটক পাব হইবাব সময় একবাব পশ্চাৎ ফিবিয়া বামনিধিবাবু বলিলেন, ''দেখ পল, মৃত্যুব পবেও ইহাবা শাদা কালোব পার্থক্য ভুলিতে পাবে নাই।

যীশু খৃষ্ট যদি আজ সহসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে নিজ শিষ্যগণেব আচবণ দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া স্বর্গবাজ্যে ফিবিয়া যান।''

পল নতমুখ হইয়া বামনিধিবাবুব সঙ্গে চলিল।

বাড়ি ফিবিয়া বামনিধিবাবু দেখিলেন তাঁহাব নামে কয়েকখানি পত্র আসিযাছে। তন্মধ্যে একখানি তাঁহাব মাতাব জবানী লিখিত, সেখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

কল্যাণপুব

পবম শুভাশীর্ব্বাদ

বাবা বামনিধি, আমি তোমায দশ মাস দশ দিন জঠবে ধাবণ কবিযাছিলাম, তাহাব কি এই প্রতিদান তুমি আমায দিতেছ? বাবা ভট্টাচার্য্য মহাশযেব মুখে শুনিযাছিলাম তুমি নাকি খৃষ্টান হইতে মনস্থ কবিয়াছ। এই সংবাদ শুনিযা, অন্নজল পবিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় ছুটিযাছিলাম, কিন্তু তুমি এমন পাষাণ যে আমাদেব সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত কবিলে না। পবদিন তোমাব বাসায গিযাছিলাম কিন্তু শুনিলাম তুমি কোথায চলিযা গিযাছ।

সেই দিন বাড়ী ফিবিযা আসিযা বোগশয্যা গ্রহণ কবিযাছি। দ্বাববানগণকে টাকা দিযা অনেক কষ্টে গোবিন্দ সবকাব তোমাব কটকেব ঠিকানা সম্প্রতি লইযা আসিযাছেন। তাই আজ তোমাকে পত্র লিখিতে সমর্থ হইলাম। আমাব এ বৃদ্ধ শবীবে সামর্থ্য নাই, থাকিলে এখনই আবাব কটকে ছুটিতাম। আব একবাব তোমাকে ফিবাইযা আনিবাব চেষ্টা কবিতাম। বাবা, তুমি কি খৃষ্টান হইযাছ? যদি হইযাই থাক, প্রাযশ্চিত্ত কবিযা তোমাকে জাতিতে তুলিযা লইব, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধান দিযাছেন। যদি এখনও খৃষ্টান না হইযা থাক, তবে তোমায মিনতি কবিযা বলিতেছি, হইও না।

আমাব বুকেব ধন বুকে ফিবিযা এস। তাহা যদি না আস, তবে মাতৃহত্যাব পাতক

তোমায় লাগিবে। তোমাব পাদ্রীসাহেবকে জিজ্ঞাসা কবিও, মাতৃহত্যা কবায় কি কোনও পুণ্য আছে? আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছি। আমাব অন্ধেব নয়নমণি, ফিবিয়া এস।

তোমাব দুঃখিনী
মা

লেখক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সবকাব।

পত্র পাঠ কবিয়া বামনিধিবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তখনই কাগজ কলম লইয়া মাকে লিখিলেন—"মা, আমি এখনও খৃষ্টান হই নাই। খৃষ্টান হইবাব বাসনাও আব নাই। তোমাব অধম সন্তান শীঘ্রই তোমাব শ্রীচবণে ফিবিয়া যাইবে।"

চিঠি ডাকে দিয়া, মহান্তি পবিবাবেব নিকট বিদায় গ্রহণ কবিয়া, ইংবাজি পোষাক ফেলিয়া দিয়া ধুতি চাদব পবিয়া, গোকব গাড়ী ভাড়া কবিয়া সেই দিনই বামনিধিবাবু পুবী যাত্রা কবিলেন। সেখানে মাথা মুড়াইয়া, প্রায়শ্চিত্ত কবিয়া, জগন্নাথ দর্শন কবিযা, সপ্তাহ পবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

[প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৬]

নূতন বউ

॥ ১ ॥

শ্রাবণ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। মাধব দত্ত মহাশয় তামাকু সেবন কবিতে কবিতে তিনজন নিষ্কর্মা পল্লীবৃদ্ধেব সহিত গল্প কবিতেছেন—হাবাণ মুখুয্যে, বাখাল মিত্র ও কেদাব চক্রবর্ত্তী। দত্ত মহাশয়েব বয়সও পঞ্চাশেব উপবে উঠিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া, গঙ্গাস্নান সাবিযা আহ্নিক-পূজা শেষ কবিযা কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বৈঠকখানায আসিযা বসিয়াছেন।—বেলা তখন প্রায দশ ঘটিকা। পিয়ন আসিযা তাঁহাব হস্তে দুইখানি খামেব চিঠি দিযা গেল—একই হস্তাক্ষবে ঠিকানা লেখা। একখানি তাঁহাব নিজেব নামে, অপবখানি তাঁহাব মধ্যমা কন্যা নির্ম্মলকুমাবীব নামে।

হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিযা হাবাণ মুখুয্যেব হাতে দিযা, চোখে চশমা লাগাইযা দত্ত মহাশয নিজ নামেব পত্রখানি পাঠ কবিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহাব বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, উহাতে সন্তোষ ও প্রসন্নতাব চিহ্ন ফুটিযা উঠিল।

পত্রপাঠ শেষ কবিযা দত্ত মহাশয হাঁকিলেন, 'বামা।" বৃদ্ধ বামা ভৃত্য আসিলে, তাহাব হাতে কন্যাব নামেব পত্রখানি দিযা বলিলেন, "তোব মেজদিদিমণিকে দিগে যা।"

হাবাণ মুখুয্যে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কাব চিঠি হে, দত্তজা?"

"কলকাতা থেকে মেজজামাই লিখেছেন--এই দেখ না।"—বলিযা পত্রখানি মুখুয্যেব হস্তে দিলেন।—পত্রখানিব মর্ম্ম প্রতিবেশীগণেব মধ্যে প্রচাবিত হয ইহাই দত্ত মহাশযেব অভিপ্রায়। তাহাব একটু বিশেষ কাবণও ছিল। দত্ত মহাশয় বড় মেয়েটিব বিবাহ বেশ খবচ-পত্র কবিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাই তাদৃশ সুবিধাজনক হয় নাই। মেজ মেয়ে নির্ম্মলাব বিবাহ দিয়াছিলেন বলিতে গেলে এক কুড়াইয়া পাওয়া গোত্রহীন পাত্রেব সহিত—সে পাত্রেব বয়সও তখন ৩০ বৎসবেব কম হইবে না। পিতামাতা জীবিত নাই, কলিকাতায় মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছিল, সে মামা মামীও পবলোকগত—ছেলেটি তখন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া দালালী ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন কবে। আয অল্প, সুতবাং বিবাহ কবিয়া বধূকে লইয়া যাইতে পাবে নাই। আজ পাঁচ বৎসব বিবাহ হইযাছে, চাবি বৎসব হইল একটি কন্যা জন্মিয়াছে, কিন্তু এতাবৎকাল নির্ম্মলা পিতৃ-গৃহেই বহিয়াছে।

ইহাতে পাড়ার লোক দত্ত মহাশয়কে ছি ছি করিত। জামাই প্রতি মাসে দুই-তিন বার করিয়া আসে, দুই-এক দিন থাকিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কি? লোকে বলে, সস্তায় কিস্তি পাইয়া দত্ত মহাশয় চালচুলাহীন এমন জামাই করিলেন যে, মেয়েটা বাপের বাড়ীতেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, স্বামীর ঘর করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। নির্ম্মলাও এ জন্য লজ্জিত—তার মা ইদানীং মাঝে মাঝে জামাইকে ইহা লইয়া একটু গঞ্জনা দিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। জামাই লিখিয়াছেন, এতদিনে কর্ম্মে তাঁহার একটু উন্নতি হইয়াছে, আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, একটি ছোট বাড়ীও স্থির করিয়াছেন, এখন শ্বশুর মহাশয়ের আদেশ পাইলে স্ত্রী-কন্যাকে আসিয়া লইয়া যান।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে দত্ত মহাশয় বলিলেন, "পড় না, হেঁকে হেঁকেই পড়।" তাঁহার ইচ্ছা, উপস্থিত অপর দুইজনেও পত্রখানি শ্রবণ করিয়া, যথাসময়ে পাড়ায় এই কথা রটনা করুক।

মুখোপাধ্যায় তখন পড়িতে লাগিলেন,—

কলিকাতা
৯ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল

সংখ্যাতীত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

অদ্য একটি শুভসংবাদ আপনাকে দিবার জন্য এই পত্রখানি লিখিতেছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এতদিনে আমার একটু উন্নতি হইয়াছে। আমি একটি ভাল চাকরি যোগাড় করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বের দালালী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিগত ইংরাজী ১লা তারিখ হইতে নূতন কর্ম্মে বহাল হইয়াছি। আমার বেতন আপাততঃ দেড়শত টাকা হইয়াছে। সাহেব খুব অনুগ্রহ করিতেছেন এবং বলিয়াছেন যে, কাজকর্ম ভাল করিতে পারিলে বৎসরান্তে আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এতদিনে অর্থাভাববশতঃ আমার স্ত্রী-কন্যার ভরণ-পোষণের কোনও ভারই আমি লইতে সমর্থ হই নাই। এ জন্য আমি মহাশয়ের নিকট নিতান্তই লজ্জিত ছিলাম। এখন ঈশ্বরের কৃপায় কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে কাছে আনিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ায় শ্যামবাজারে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহও ঠিক করিয়াছি। এখন যদি মহাশয়ের অনুমতি হয় এবং পূজনীয়া শ্বশ্রূদেবী আপত্তি না করেন, তবে একদিনের ছুটি লইয়া গিয়া নির্ম্মলাকে লইয়া আসি। আগামী ১৭ই শ্রাবণ ইংরাজী মাসের ১লা তারিখ হইবে, ঐ দিন আমি আফিসে বেতন পাইব—ইহার পরে শ্রাবণ মাসমধ্যে একটি শুভদিন যদি স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। কারণ, ভাদ্র মাস পড়িয়া গেলে, এক মাস আবার অপেক্ষা করিতে হইবে।—পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইবেন এবং আপনিও জানিবেন। আমি ভাল আছি। আপনাদের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার পূর্ব্ব ঠিকানাতে পত্র লিখিলেই আমি পাইব। ইতি—

সেবক
শ্রীবসন্তকুমার বসু

পাঠ শেষ করিয়া পত্রখানি দত্ত মহাশয়ের হস্তে ফেরত দিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বেশ বেশ! ছোকরা বাহাদুর আছে—দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি বাগানো—আজকালকার বাজারে কি সোজা কথা।"

রাখাল মিত্র বলিলেন,"ছোকরা বেশ চালাক-চতুর, সে ত আমরা বরাবর দেখছি!"

কেদার চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আর, বেশ বিনয়ী। চিঠিখানি কেমন বিনয় করে লিখেছে দেখ! আজকালকার ছেলেদের মত উদ্ধত-প্রকৃতি নয়। তারা হলে মনে করত, নিজের লিগাল ওয়াইফকে নিয়ে আসবো, তার জন্যে অত দয়া ভিক্ষা, অত কাকুতিমিনতি কেন?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—মুখ্যু তো নয়, ছোকরার লেখাপড়া জ্ঞান আছে—সদ্বংশে জন্মও বোধ হয়, হবে না কেন?"

সুবিধা পাইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আহা, সেই জন্যেই ত! কি ঘটনায় বিবাহ দিয়াছিলাম, সবই ত তোমরা জান। গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে নির্ম্মলা ডুবে গিয়েছিল। বসন্ত নৌকায় যাচ্ছিল, তাই দেখে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে নির্ম্মলাকে জল থেকে তোলে। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম, পাল্কী করে মেয়েকে বাড়ী নিয়ে এলাম—বসন্তকেও সঙ্গে নিয়ে এলাম। ৩/৪দিন তাকে বাড়ীতে রাখলাম, যেতে দিলাম না। দেখলাম, ছেলেটি রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বংশে, সব বিষয়েই ভাল, কেবল মাত্র দোষ—গরীব। বললে দালালী করে, মেসে থাকে, সামান্য আয়, মা-বাপ নেই, বাড়ী-ঘর নেই, তাই এতদিন আইবুড়ো আছে—নইলে কুলীন কায়েথের ঘরের ত্রিশ বছরের ও রকম ছেলে কি আব অবিবাহিত থাকে? গিন্নীরও ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল; মেযেও অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম, বেশ ত, ও যখন নির্ম্মলার জীবন দান করেছে, তখন নির্ম্মলা ওবই প্রাপ্য। হলেই বা গরীব—চিরদিন কি কারও সমান যায়? আমার মেযের ভাগ্যে ধন থাকে, জামাই ধনী হবে; যদি না থাকে, আমি মস্ত জমিদাবের ছেলে এনে বিয়ে দিলেও, সে ছেলে বাপের বিষয় পেয়ে দুদিনে বরবাদ করে গবীব হয়ে যেতে পাবে।"—মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আসল কথাই তাই। অদৃষ্টই মূল, ও ছাড়া আব পথ নেই, যতই যিনি হাঁকুপাকু করুন না কেন!"

বাখাল মিত্র বলিলেন, "কোন্ আফিসে চাকরি হযেছে, তা বাবাজী লেখেননি! কোনও গভর্মেণ্ট আফিস বোধ হয়।"—দত্ত মহাশয বলিলেন, "তা কি করে হবে? পঁয়ত্রিশ বছব বয়সে কি কেউ গভর্মেণ্টের চাকরি পায? কোনও মার্চেণ্ট আফিসে-টাপিসে হয়ে থাকবে বোধ হয়। যা হোক, বাবাজী এলেই জানতে পারা যাবে। মুখুয্যে ভায়া, ভাল দিন একটা স্থির করে দাও না, পাঁজিখানা নিয়ে আসি।"

বলিয়া দত্ত মহাশয উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী কন্যাব প্রমুখাৎ সংবাদটা পূর্ব্বেই জানিতে পাবিয়াছেন। কর্ত্তা বলিলেন, "তা হলে একটা দিন ঠিক করে পাঠাই, কি বল?"

মেয়েকে লইয়া যায় না বলিয়া গৃহিণী জামাতাকে কত গঞ্জনা দিযাছেন সত্য, কিন্তু এখন কন্যার আসন্নবিবহে তাঁহাব মাতৃহৃদয কাতর হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এই পূজো আসছে—দুটো মাস পরে পাঠালে হত না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এখন যাক না, কিছুদিন পবে তখন মেযে নিয়ে এলেই হবে। আমার কলঙ্কভঞ্জনটা হয়ে যাক।"

"আচ্ছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর"—বলিয়া গৃহিণী পঞ্জিকা বাহির করিয়া দিলেন।

মুখোপাধ্যায মহাশয় ২১শে শ্রাবণ শুভদিন বলিয়া ধার্য্য করিলেন। দত্ত মহাশয বিকালে তদনুসারে জামাতাকে পত্র লিখিয়া দিলেন।

।। ২।।

আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—প্রায় সারাদিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। বৈঠকখানায তক্তপোষের বিছানায় মাধব দত্ত মহাশয় বৈকালিক নিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় দেওয়ালের ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। সেই শব্দে দত্ত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া, জানালা দিয়া চাহিয়া, আকাশের অবস্থা দেখিয়া, আরও খানিক ঘুমাইবার লোভে তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ মধ্যম জামাতা বাবাজী সন্ধ্যার ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিবেন, সুতরাং রাত্রি-ভোজনের জন্য একটু বিশেষ আয়োজন করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, তিনটি তুড়ি দিয়া হাঁকিলেন, "রামা, তামাক দে।"

রামা ভৃত্য উঠানে বঁটী পাতিয়া ধস্ ঘস্ শব্দে গোরুর জন্য খড় কাটিতেছিল, উত্তর দিল, "আজ্ঞে, যাই কত্তা।"

এই সময় দত্ত মহাশয়ের চারি বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রী কমলা (নির্ম্মলার কন্যা) নাচিতে নাচিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও দাদু, এখনও ঘুমুচ্ছ? কখন উঠবে তুমি, বেলা যে গেল!"—দত্ত মহাশয় দৌহিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া, তাহার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে শালী! আমি ঘুমুচ্ছি কি উঠেছি, তা কি তুই দেখতে পাচ্ছিসনে?"

কমলা বলিল, "তা ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দিদিমা যে বললে, বৈঠকখানায় গিয়ে তোর দাদুকে বল্‌গে ও দাদু এখনও ঘুমুচ্ছ, কখন উঠবে তুমি?—তবে দিদিমাকে বলি গে যাই, তুমি উঠেছ?"

"আচ্ছা, বলবি এখন। বোস না একটু। আজ কে আসবে জানিস?"

"জানি। বাবা।"

"বাবা আসা অবধি তুই জেগে থাকতে পারবি?"

বালিকা আগ্রহভাবে উত্তর করিল, "থাকতেই হবে! বাবা যে আমার জন্যে পুতুল নিয়ে আসবে মাকে লিখেছে, আমি পুতুল দেখবো না?"

রামা হুঁকা হাতে জ্বলন্ত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল। দত্ত মহাশয় হুঁকা লইয়া বলিলেন, "ওরে রামা, তুই একবার চট করে গঙ্গার ঘাটে যা দেখি। আজ সারা দিন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আজ খুব ইলিশ মাছ উঠবে। জেলেরা এতক্ষণ মাছের নৌকো ঘাটে লাগাচ্ছে। কেষ্টা, কি মতিলাল, কি রামধন—যে জেলের কাছে ভাল ইলিশ মাছ দেখবি, একটা নিয়ে আসবি। বেশ বড় দেখে একটা, আর বেশ চ্যাটালো রকম—লম্বা সরুঙ্গে মাছ আনিসনে যেন, সেগুলো তেমন সোয়াদি হয় না। জেলেকে বলিস যে, আজ কত্তার জামাই আসছেন, বেশ ভাল মাছ যেন দেয়। কাল সকালে এসে দাম নিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ—বাজারে হরিশ ময়রার দোকানে অমনি বলে যান যেন, এক সের ভাল কাঁচাগোল্লা চাই। বেশ বড করে যেন মণ্ডা বেঁধে রাখে। আসবার সময় এক হাতে ইলিশ মাছ, এক হাতে সন্দেশ নিয়ে আসবি। বেশ করে ওজন দেখে নিবি, বুঝলি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া রামা প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে হারাণ মুখুয্যে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের হুঁকাটি সংগ্রহ করিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন, বলিলেন, "আজ যে রকম ইলশেগুঁড়ি বর্ষাচ্ছে—মাছ আজ ভালই পাবে বোধ হয়। তা, জামাই কখন এসে পৌঁছবেন?"

"সন্ধ্যে ৭টার গাড়ীতে। কলকাতায় থাকেন, রেলের ইলিশের মুখে-ন্যাজে দড়ি বেঁধে ধনুকাকার করে জেলে বেটারা যা বেচে, তাই গঙ্গার ইলিশ বলে খান ত! আসল গঙ্গার ইলিশ যে কি বস্তু, তা আজ বাবাজীকে দেখিয়ে দিই।"

মুখোপাধ্যায় কমলাকে আদর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, তুই নাকি আমাদের ছেড়ে চললি? তোর দাদুকে দিদিমাকে ছেড়ে চলে যাবি, তোর মন কেমন করবে না? সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি?"—বালিকা গর্ব্বভরে বলিল, "খুব পারবো!"

দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "শুনলে হে মুখুয্যে! হ্যাঁ রে নেমখারাম, এত দিন যে আমরা তোকে বুকে করে মানুষ করলাম, আমাদের ছেড়ে চলে যেতে তোর মনে একটু কষ্টও হবে না?"

বালিকা বুঝিল, কথাটা ভুলক্রমে সে বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছে। বড় লজ্জা হইল। মাতামহের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার বুকের পাকা চুল টানিতে টানিতে বলিল, "মনে কষ্ট হবে না? খুব হবে। কিন্তু বেশী দিন ত সেখানে থাকবো না দাদু, আবার শীগ্‌গির চলে আসবো। আর তোমার জন্যে একটা খুব ভাল পুতুল কিনে আনবো। কলকাতায় অনেক পুতুল পাওয়া যায়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, দুশো তিনশো।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া কমলার গাল টিপিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? কলকাতায় আর কি পাওয়া যায় রে?"

কমলা উত্তর করিল, "উঃ—অনেক জিনিষ। থিয়েটর পাওয়া যায়, চিড়িয়াখানা পাওয়া যায়, কালীঘাট পাওয়া যায়—আরও কত সব ভাল ভাল জিনিষ মা বলছিল, সব আমার মনে নেই।"

এমন সময় ঝি আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, "খুকী, মা ডাকছে, দুধ খাবি চল্।" কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "গিন্নীমা আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

"চল যাচ্ছি।"—বলিয়া দত্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যাব পর মুখুয্যে আসছো ত?"

"হ্যাঁ, আসবো বইকি। জামাই বাবাজীব সঙ্গে দেখা কববো। জামাই বাবাজী সাতটার গাড়ীতে এসে পৌঁছবেন ত? তুমি কি নিজে যাবে ইষ্টিশানে?"

"না, যে জল কাদা! লণ্ঠন হাতে রামাকেই পাঠিয়ে দেবো এখন।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে, আমি তা হলে ৮টার মধ্যেই আসবো।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় লইলেন, দত্ত মহাশয়ও নাতনীর হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন।

॥ ৩ ॥

বাত্রি ৮টার পর মুখোপাধ্যায় লাঠি ও লণ্ঠন হস্তে দত্তভবনে আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানা শূন্য। শুনিলেন, জামাইবাবু আসিয়াছেন, এখন জলযোগ করিতেছেন। মুখোপাধ্যায় প্রতীক্ষায় বহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পবে স-জামাতা দত্ত মহাশয় প্রবেশ কবিলেন। "কি বাবা বসন্ত, ভাল আছ ত?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি কাকা।"—বলিযা জামাতা, মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম কবিলেন।

সকলে বসিলে মুখোপাধ্যায বলিলেন, "তোমাব ভাল চাকবি হযেছে, তোমাব শ্বশুবেব কাছে শুনে বড়ই সুখী হলাম, বাবাজী! সে দালালী-ফালালী ছেড়ে দিয়েছ, ভালই কবেছ। তোমবা শিক্ষিত লোক, ঐ সব উঞ্ছবৃত্তি কি তোমাদেব পোষায? তা, কোন্ আফিসে চাকবি হল?"

"আজ্ঞে, ইংলিশম্যান আফিসে।"

"কিসেব কাববাব তাদেব?"

"ইংলিশম্যান খববেব কাগজ। সাহেবদেব কাগজ, খুব প্রতিপত্তি—বড কাগজ। বড বড় ইংবেজ কর্ম্মচাবিবা, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনাব সাহেববা পর্যন্ত বেনামীতে তাতে প্রবন্ধ লেখেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বটে? মস্ত কাগজ তা হলে। অনেক সব বাঙ্গালী সেখানে চাকবি কবে বোধ হয?"

"বিস্তব।"

"কত মাইনে সব?"

"তাব কি ঠিক আছে? ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশো, দুশো—যাব যেমন পদ।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বটে! তোমাব পদটি ত তা হলে বড় পদই বলতে হবে! তুমি যদি আমাব একটি উপকাব কব বাবা।"

"কি, বলুন।"

"আমার মেঝ ছেলেটা—তাকে তুমি দেখেছ—গেল বছব ম্যাট্রিক ফেল কবলে। কত করে বললাম, ওবে আব এক বছব পড়, ওবে আব এক বছব পড়, তা সে কিছুতেই শুনলে না। সে অবধি বাড়ীতেই বসে আছে। গাঁয়েব যত সব বওয়াটে ছেলেব সঙ্গেই তাব

মেলামেশা। ফ্লুট বাজায়, থিয়েটার করে—এইসব নিয়ে আছে। তাকে যদি বাবা, সাহেবকে বলে কয়ে তোমার আফিসে একটা ছোটখাট কাজে ঢুকিয়ে নিতে পার, তবে গরীব ব্রাহ্মণের বড়ই উপকার করা হয়।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় জামাতার হাত দুটি ধরিলেন।

বসন্ত বিব্রত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, কাকা। অত করে, আমায় বলতে হবে কেন? এখন ত আমাদের আফিসে কোনও কাজ খালি নেই—একটা খালিটালি হলেই আমি চেষ্টা করব বইকি।"

মুখোপাধ্যায় হাত ছাড়িয়া বলিলেন, "তাই কোরো, বাবা। দেখ, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার বন্ধুত্ব। একসঙ্গে পাঠশালায় গিয়েছি। সেই সময় থেকে দুজনে আমরা হরিহর আত্মা বললেই হয়। তোমার উপর তোমার শ্বশুরের যদি কোন দাবী থাকে, তবে আমারও সেই দাবী আছে জেনো।"

বসন্ত বলিল, "আজ্ঞে, সে ত ঠিক।"

তাহার পর অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। কোথায় বাড়ী ভাড়া লইয়াছে, কিরূপ বাড়ী, আফিস হইতে কতদূর—ইত্যাদি। ক্রমে রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। বসন্তকে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডাকিয়া পাঠাইলে সে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

পরদিন বসন্ত উঠিয়া, মুখহাত ধুঁয়া চা পান করিতেছে, এমন সময় তাহার শাশুড়ীঠাকুরাণী আসিয়া, আধঘোমটা দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, নির্ম্মলের কাছে একটা কথা শুনে যে আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।"

বসন্ত কহিল, "কি কথা, মা?"

"তোমার আফিস নাকি রাত্তিরে?"

"হ্যাঁ মা, এই বটে। সকালবেলা আমাদের খবরের কাগজ বেরোয় কিনা, তাই রাত ৯টা ১০টার সময় আমায় আফিসে যেতে হয়, সারা রাত সেখানে থাকতে হয়। আবার, দিনের বেলাও ২/৪ ঘণ্টার জন্যে গিয়ে একটু দেখাশুনা করে আসতে হয়।"

"তবেই ত। বড়ই যে ভাবনার কথা হল, বাবা। তুমি নাকি নির্ম্মলাকে বলেছ যে, দিন রাত থাকবার জন্যে একটা ঝি ঠিক করে রেখেছি, সেই তোমায় রাত্রে আগলাবে, তোমার ভয় কি? কিন্তু নির্ম্মলা যে মোটেই সাহস পাচ্ছে না বাবা। বিদেশ-বিভুঁই, তায় ছেলেমানুষ, সারা রাত বাড়ীতে একটা পুরুষমানুষ থাকবে না, অসুখ-বিসুখ আছে, দায়-বিপদ আছে, আফিস থেকে তোমায় যদি ডেকে আনতে হয় ত কে যাবে বল দেখি? নির্ম্মলা ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে। কর্ত্তাও শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।"

বসন্ত বলিল, "সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই, মা। আমি যে বাড়ীটা নিয়েছি, সেটা একটা বড় বাড়ীর আধখানা অংশ। এক অংশে বাড়ীওয়ালা সপরিবারে বাস করেন, এক অংশ ভাড়া দিয়েছেন। অবশ্য দুই অংশই আলাদা,--আলাদা সদর দরজা, কল, পাইখানা সবই আলাদা। দু বাড়ীর একতলায় দোতলায় মাঝের দরজা জানালা আছে। সেই দরজা খুললেই দু বাড়ীর মেয়েদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াত চলতে পারে। বাড়ীওয়ালা বাবুটির প্রবীণ বয়স, অতি ভদ্রলোক। তিনি আমায় বলেছেন, কোনও ভাবনা নেই তোমার, আমরা রয়েছি, দেখবো শুনবো--যখন যা দরকার।"

এই সময় দত্ত মহাশয় আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "বাবা বসন্ত, এক কাজ কর তুমি। দিনরাত্রির ঝি রেখেছ, বেশ সে ও থাক্ বামাকেও তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। বামা নির্ম্মলাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, বাড়ীতে ও থাকলে, নির্ম্মলার কোনও ভয় থাকবে না, আমরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো।"

বসন্ত বলিল, "বামাকে নিয়ে যেতে বলছেন? তা হলে—"

দত্ত মহাশয় বুঝিলেন, বামাকে লইয়া যাইতে জামাতার তেমন ইচ্ছা নাই। বলিলেন,

"তুমি কেন দোমনা হচ্ছ, তা আমি বুঝতে পারছি। অবশ্য, এখন তোমার অল্প বেতন, তায় কলকাতার খরচ, পেরে উঠবে কি না, তাই ভাবছ ত? বামাকে কেবল দুটি দুটি খেতে দিও। ও মাইনে যেমন এখান থেকে পায়, তেমনিই পাবে। আর দুমত কোরো না বাবা, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওর দ্বারা তোমার অনেক উপকারও হবে।"

বসন্ত, "আজ্ঞে, আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন ওকে নিয়েই যাব।"

বেলা দুইটার পর বসন্ত যাত্রা করিল। তিনটার সময় ট্রেন। দত্ত মহাশয় স্টেশনে গিয়া কন্যা-জামাতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। হারাণ মুখুয্যেও সঙ্গে গিয়াছিলেন। ট্রেন ছাড়িবার সময় বসন্তকে তিনি গত দিনের আবেদনের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

নির্ম্মলা কলিকাতার বাসায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাড়ীখানা ছোট হইলেও সুন্দর সুসজ্জিত। দ্বিতলে দুইখানি মাত্র ঘর, কিন্তু ঘরগুলি বেশ বড় বড়। দেয়ালগুলি সুন্দর পেণ্টিং করা। মেঝেগুলিতে চক্‌চকে সাদা কালো মার্ব্বেল-পাথরের টালি বসানো। ধবধবে নেটের মশারিযুক্ত দুইখানি "হোপ্নি পালিস" পালঙ্ক পাশাপাশি রক্ষিত। ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল রহিয়াছে, দেওয়ালে মানুষ সমান দুইখানা বড় বড় বেলোয়ারি আর্শি টাঙ্গানো। উভয় কক্ষেই বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিতেছে। জানালা দরজাগুলিতে চিকণের কার্টেন দেওয়া। একতলার ঘরগুলিও বেশ সুপরিসর—আলো বাতাস যথেষ্ট। সুন্দর একটি স্নানের ঘর, তার শুধু মেঝেতে নহে, আধখানা দেওয়াল পর্যন্ত মার্ব্বেল টালি বসানো। কলিকাতাবাসী ওয়াকিবহাল কেহ এই বাড়ীখানি দেখিলে বলিত—"পাগল নাকি! এই বাড়ীর ভাড়া ৫০ টাকা!" কিন্তু নির্ম্মলা বা বামার নিকট ভাড়ার এই অসঙ্গতি ধরা পড়িল না। তবে আসবাবগুলি দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, 'হ্যাঁ গা এই সব তুমি কিনেছ? এ সব ত দামী দামী জিনিষ, অনেক টাকার জিনিষ।'

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "এ সব একটাও আমার নয়। আমি এত টাকা কোথায় পাব?"

'কা'র তবে এ সব? বাড়ীওয়ালার?'

"না। আমাদের আফিসের বড় সাহেব সেদিন বিলেত গেলেন কিনা। এক বছরের ছুটি নিয়েছেন তিনি। আমাকে বললেন, "বসন্ত আমার আসবাবপত্রগুলো রাখবার জন্যে মিছামিছি কেন এক বছর বাড়ী ভাড়া গুণবো। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর, সাহেব বললে, এগুলো তুমি রাখ। আমি এসে আবার নেবো, বেশ যত্ন করে রেখ, যেন নষ্ট না হয়।" আমি দেখলাম, আমার কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনতেই হবে—একেবারে সব পারবো না হয়ত—মাসে মাসে দুটো একটা করে কিনতে হবে। আপাততঃ এগুলোতে কাজ চালাই—তারপর সাহেব এলে, তখন নিজের কেনা যাবে। সাহেবের বাড়ী থেকে এইগুলো নিয়ে আসতে—মুটে ভাড়াই গেল ১৭ টাকা—অবশ্য সাহেবই দিলেন।"

সরলা বালিকা গালে হাত দিয়া বলিল "ও বাবা! মুটে ভাড়া স-তে-রো টাকা? আর, এই সব বিদ্যুৎ পাখাগুলো?"

"এগুলোও সব বড় সাহেবের জিনিষ।"

সে রাত্রি বসন্ত বাড়ীতেই রহিল। বলিল, 'দু'দিনের ছুটি নিয়েছিলাম কিনা। কাল খাওয়া দাওয়ার পর দিনের বেলা একবার বেরুতে হবে। তারপর আবার রাত্রে যেতে হবে।

॥ ৪ ॥

সপ্তাহ পরে একদিন নির্ম্মলা তার স্বামীকে কহিল, "হ্যাঁ গা, এ বাড়ীর ভাড়া না কি শুনলাম একশো টাকা? তুমি যে বলেছিলে, পঞ্চাশ টাকা?"

বসন্ত বলিল, "কে বললে তোমায়?"

"বাড়ীওয়ালাবাবুর মেয়ে সুহাসের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে কিনা। তুমি যখন

দুপুরবেলা কাজে বেরিয়ে যাও, তখন আসে। আমায় লুডো খেলতে শিখিয়েছে, আমরা লুডো খেলি। আজ আমাকে সুহাস জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার স্বামীর মাইনে কত, ভাই?' আমি বললাম, 'দেড়শো টাকা।' সে বললে, 'কক্ষণো নয়। তোমার স্বামীর মাইনে নিশ্চয়ই বেশী। যার দেড়শো টাকা মাইনে, সে কি কখনও মাসে একশো টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া নিতে পারে?"

বসন্ত হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি এই বাড়ী যখন ভাড়া নিই, তখন বাড়ীওয়ালা আমায় বলেছিল, অনেক খরচপত্র করে বাড়ী তৈরী করেছি, এ বাড়ীর একশো টাকা ভাড়াই আমি ধার্য্য রেখেছিলাম, কিন্তু একশো টাকা কেউ দিতে চায় না। খালি পড়ে থাকে, তার চেয়ে আপনাকে পঞ্চাশ টাকায় দিচ্ছি—কিন্তু কাউকে বলবেন না, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলবেন, একশো টাকা ভাড়া, কেননা আপনি যদি অন্য বাড়ীতে উঠে যান, তা হলে কেউ আর তখন ৫০ টাকার বেশী দিতে চাইবে না'—মেয়েদের পেটে ত কথা থাকে না, তাই বোধ হয়, বাড়ীতে বলেছেন, একশো টাকা ভাড়া পান।"

নির্ম্মলা বলিল, "ওঃ—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।"

বসন্ত বলিল, "ফের যদি এ কথা ওঠে ত তুমি বোলো যে হ্যাঁ, একশো টাকাই ভাড়া ঠিক হয়েছে বটে, তবে ওঁকে ত সব টাকা পকেট থেকে দিতে হয় না, অর্দ্ধেক বাড়ীভাড়া আফিস থেকে পান।"

"আচ্ছা, তাই বলবো।"

প্রাতে বসন্ত যখন আসে, তখন বেলা প্রায় ৯টা। আসিয়া স্নানাহার করে, তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। কোনও দিন বৈকালে ৫টায়, কোনও দিন ৬টায় ফিরিয়া আসে, আবার রাত্রি ৯টা কিম্বা ১০টার সময় বাহির হইয়া যায়। প্রথম দিনই সে নির্ম্মলাকে বলিয়াছিল, "রাত্রির জন্যে আমার খাবার কোরো না—আফিসে গিয়ে খাই কিনা। রাত্রিতে যারা কাজ করে, আফিসেই রোজ তাদের জন্যে খানা তৈরী হয়—আফিসেরই খরচে।" সুতরাং নির্ম্মলা একবেলা রাঁধিয়া দুইবেলা খায়। দুর্গা ঝি বামার স্বজাতীয়, সে নিজের জন্য ও বামার জন্য রন্ধন করে, সে-ও এক বেলা রাঁধে। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে উনান জ্বলে না।

বসন্ত রামাকে বাজার চিনাইয়া দিয়াছে, বাজার হাট সেই করে। দুর্গা ঝি গোয়ালা বাড়ীতে গিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাঁটি দুধ দোহাইয়া আনে। একদিন বামা বলিল, "জামাইবাবু, আপনার আফিসটি ত আমায় চিনিয়ে দিলেন না। যদি হঠাৎ কোনও দরকার হয়!"

বসন্ত বলিল, "আরও দিনকতক যাক্, নিয়ে যাব একদিন তোকে সঙ্গে করে। কলকাতার পথঘাট আগে তোর অভ্যাস হোক। নইলে শেষে কি মোটর চাপা পড়ে বুড়ো বয়সে প্রাণটা খোয়াবি?"

একদিন সন্ধ্যার সময় বসন্ত বাড়ী আসিলে নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো, আজ সুহাস আমায় একটা ভারি মজার কথা বলেছে।"

বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"ও বললে কি জান? বললে, 'তোমার স্বামী রোজ রাত্রে বাড়ীতে থাকেন না, বাড়ীতে খানও না, রাত ৯টা ১০টার সময় চলে যান, আবার পরদিন সেই বেলা ৯টায় আসেন, কেন বল দেখি?' আমি বললাম, 'কি করবেন ভাই, ছাপাখানার চাকরি, সারারাত খবরের কাগজ ছাপেন, সকালবেলা কাগজ বেরোয়, কাজেই রাতে বাড়ী থাকতে পারেন না।' সে বললে, 'তুমি ভাই সরল মানুষ; আমার স্বামী যদি আমায় ঐ কথা বলতেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। আমি মনে করতাম, আমায় বুঝি ঐ রকম বোকা বুঝিয়ে—"

এই পর্যন্ত বলিয়া নির্ম্মলা থামিল। বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বোকা বুঝিয়ে—কি?"

নির্ম্মলা বলিল, "যাও, আমি বলবো না, সে ছাই-কথা।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, 'তোমার সখী এই কথা বললে যে, আমি হলে মনে করতাম যে আমায় বোকা বুঝিয়ে, হয়ত আমার স্বামী কোন কু-স্থানে গিয়ে রাত-কাটান।"

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, তাই। তবে, এমন রূঢ়ভাবে বলেনি। বলেছিল, 'অন্য কোথাও হাওয়া খেতে যান।' প্রথমে ত আমি 'হাওয়া খাওয়া' মানেই বুঝতে পারিনি, শেষে সে বললে। তুমি কিন্তু ইসারাতেই বুঝতে পেরেছ—উঃ, তোমার খুব বুদ্ধি কিন্তু!"

বসন্ত হাসিতে লাগিল। বলিল, "সুহাস আর কতদিন বাপের বাড়ী থাকবে?"

"পূজো পর্যন্ত। পূজোর সময় ওর বর আসবে—পূজোর পর ওকে নিয়ে আবার পশ্চিমে চলে যাবে।"

ইহার কয়েক দিন পরে, একদিন বসন্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি ভ্রান্তিবিলাস পড়েছ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি। তুমিই ত সে বই কিনে বাপের বাড়ীতে আমায় দিয়ে এসেছিলে! কেন?"

বসন্ত বলিল, "আচ্ছা, কাল বেলা দুটোর সময় আমি কোথায় ছিলাম?"

"কেন? তুমি এইখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে।"

"কাল সারাদিন আমি একবারও বেরিয়েছিলাম বাড়ী থেকে?"

"না, সেই রাত ৯টার সময় ত আফিসে গেলে। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ গা?"

"একটা ভারি মজা হয়েছে। আজ দুপুরের পর আমি আফিসে গেলে, একজন আমায় বললে, 'কাল বেলা দুটোর সময় মোটরে চড়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?" আমি বললাম, 'কই, আমি ত কোথাও যাইনি—আমি ত কাল সারাদিন বাড়ীতেই ছিলাম।' সে বললে, 'বিলক্ষণ! আপনি একখানা হলদে রঙের মোটরে চড়ে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন, একজন বুড়ো মত লোক আপনার পাশে বসেছিল, আর আপনি বলছেন, আমি যাইনি!' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আমি নয়, তা হলে আমার মত চেহারার অন্য কাউকে আপনি দেখেছেন।' সে কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করলে না। বললে, 'না, নিশ্চয়ই আপনি। ঠিক আপনার চেহারা, এই রকম পাঞ্জাবী গায়ে, চাদর এই রকম খুলে গায়ে জড়ানো, আপনি ভিন্ন অন্য কেউ হতেই পারে না।'—ঠিক ভ্রান্তিবিলাস নয়?"—নির্ম্মলা বলিল, "হ্যাঁ তাই ত! ভারি আশ্চর্য্য ত!"

কয়েক দিন পরে নির্ম্মলা একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি আফিস থেকে অন্য কোথাও গিয়েছিলে কি?"—বসন্ত বলিল, "না। কেন বল দেখি?"

"সুহাসের মুখে শুনলাম, আজ তার বাবা দেখেছেন, একখানা হলদে মোটরে চড়ে তুমি হাওড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছ।"

বসন্ত কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, 'তাই ত! ভারি মুস্কিল হল যে! নিশ্চয়ই সেই লোকটা। আচ্ছা, আমি বাড়ী না থাকার সময় সেই লোকটা এসে তোমায় যদি ডাকে, তুমি ত তা হলে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চলে যাবে!"—নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "রক্ষে কর!"

বসন্ত বলিল, "কেন মন্দ কি? গরীব স্বামীর পরিবর্ত্তে ধনী স্বামী পাবে। মস্ত মোটরে চড়ে চলে যাবে, আমি ব্যাচারী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবো!"

নির্ম্মলা বলিল, "দেখ ফের যদি ঐ সব অকথা কুকথা আমায় বলবে, তা হলে তোমার সঙ্গে আমি আর কথাই কইব না।"

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিয়া পড়িল। সুহাসিনীর স্বামী পশ্চিম হইতে আসিলেন; তিনি বসন্তের সমবয়সী। দুইজনে আলাপ-পরিচয় হইল।

।। ৫ ।।

সপ্তমী পূজার দিন বেলা ৫টার সময় বসন্ত বলিল, "আজ আমি এখনই বেরুচ্ছি। আফিসে কাজ বেশী পড়েছে—আজ আর সন্ধ্যাবেলা আমি আসতে পারবো না।—কাল একেবারে বেলা ৯টার সময় আসবো।"

নির্ম্মলা বলিল, "ভ্যালা চাকরি হয়েছে বাপু, হ্যাঁ! পূজোর তিন দিনও ছুটী নেই!"

বসন্ত বলিল, "ছুটি চুলোয় যাক—কাজের আরও বেশী ভিড়। রেল, পোস্ট আফিস, খবরের কাগজের আফিসে, আর যারা থিয়েটারে চাকরি করে, তাদেব পালে-পার্ব্বণে ছুটী ত নেই-ই; বরং কাজ চতুর্গুণ বেড়ে যায়।"

স্বামী চলিয়া গেলে নির্ম্মলা সুহাসিনীর নিকটে দুর্গাকে পাঠাইয়া একখানা উপন্যাস আনাইয়া তাহাই পড়িতে বসিল। অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা সে গা ধোয়, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে, আজ আর সে সব কিছু করার তার চাড় হইল না।

ছয়টার সময় সুহাসিনী আসিয়া বলিল, "তোমার ঝির কাছে শুনলাম দাদাবাবু না কি আজ সন্ধ্যেবেলা আর আসবেন না?"

"হ্যাঁ, সে ত সেই ৫টার সময়ই বেরিয়ে গেছে।"

"এক কাজ করবে ভাই?"

"কি?"

"আমরা থিযেটারে যাচ্ছি। আমার আর মার জন্যে উনি একটা বক্স নিয়েছিলেন। মা প্রথমে যাবেন বলেছিলেন, এখন আর যেতে চাচ্ছেন না। তুমি খুকীকে নিয়ে, চল না ভাই আমার সঙ্গে!"

নির্ম্মলা বহি বন্ধ করিয়া বলিল, "যাব? কিন্তু ওঁকে ত বলা হয়নি।"

"তার জন্যে কি আর হয়েছে?"

"তোমার উনি কোথায় বসবেন?"

"উনি কখ্‌খনো বক্সে বসেন না। বলেন, মেয়েদের সঙ্গে বসতে আমাব লজ্জা কবে। চল চল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাও, খুকীকে দুধ-টুধ খাওয়াও, ঠিক ৭টার সময বেরুতে হবে।"

"কি বই হবে?"

"কৃষ্ণকান্তের উইল।"

"সেই ভ্রমর, রোহিণী-টোহিণী?"

"হ্যাঁ।"

"যেতে ত ইচ্ছে করছে খুবই।"

"বামাকেও নিয়ে চল। তুমি আমি একখানা গাড়ীতে যাব, রামা কোচবাক্সে বসে যাবে এখন। উনি ট্রামে যাবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা, রামাকে জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিল। রামা আসিলে নির্ম্মলা তাহাকে সুহাসিনীব প্রস্তাবেব কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোদেব জামাইবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা কবা হযনি, এ ভাবে গেলে তিনি শেষে রাগ কববেন না ত বামুদা?"

বামা বলিল, "না, বাগ কববেন কেন? কোনও অমন্দ কাজ ত করা হচ্ছে না।"—সুতবাং নির্ম্মলা থিয়েটাবে যাইবাব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিজ প্রসাধনে নিযুক্ত হইল।

নির্ম্মলা ও সুহাসিনী যখন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বক্সে প্রবেশ করিল, তখন অভিনয আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুইজনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে আলো জ্বলিয়া উঠিল। সোডা-লেমনেড পান-সিগারেটওযালাবা মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। নির্ম্মলা ও সুহাসিনী অন্যান্য বক্সেব

অধিকারিণী মহিলাগণের বসনভূষণের পরিপাট্য দেখিতে লাগিল। কোনও কোনও বক্সে মহিলাগণের সঙ্গে দুই একটি পুরুষও বসিয়া আছে। তারপর তাহারা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল। সুহাসিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাই, ঐ খুকীর বাবা নয়?"

নির্ম্মলা বলিল, "কোথায়?"

"ঐ যে একেবারে সামনের সীটে, গদী-আঁটা বেঞ্চির মাঝখানে?"

নির্ম্মলা সেই লোকটির পানে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তিনিই ত! তা, এখানে তিনি কি করে এলেন? বলে গেলেন যে, সন্ধ্যে থেকেই আফিসে খুব কাজ!"

সুহাস বলিল, "তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। খবরের কাগজওয়ালাদের আবার থিয়েটারের অভিনয়ের সমালোচনা লিখতে হয় কিনা, নইলে তারা বিজ্ঞাপন দেবে কেন? ওঁর আফিস থেকে আর কাউকে না পেয়ে আজ ওঁকেই পাঠিয়েছে বোধ হয়।"

নির্ম্মলা যেন সান্ত্বনা পাইয়া বলিল, "তা হতে পারে বটে।"

খুকী এই সময় বায়না ধরিল, "মা, আমি বাবার কাছে যাব। এখান থেকে আমি ভাল দেখতে পাচ্ছিনে—আমি বাবার কাছে বসবো।"

নির্ম্মলা বলিল, "কি করে যাবি? কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, তা কি তুই জানিস? শেষে হারিয়ে যাস যদি! উনি যদি আমাদের দেখতে পায়, তা হলে নিশ্চয়ই এখানে আসবেন, তখন তুই সঙ্গে যাস।"

চোখা-চোখি হইবার আশায় নির্ম্মলা একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল; কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তি উপরে চাহিল না। ক্রমে কনসার্ট থামিল, আলো নিভিল, দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষে আলো জ্বলিলে দেখা গেল, নিম্নের সে আসন শূন্য, সেখানে কেহই নাই। ক্ষণকাল পরে নির্ম্মলা দেখিল, তাহার সম্মুখে, বিপরীত দিকের বক্সে তার স্বামী প্রবেশ কবিযা, দুইটি মহিলার সহিত কথা কহিতেছেন। উভয়েই যুবতী—একজন স্থূলাঙ্গী, একজন কৃশকায়া। দুইজনের মাঝখানে একটি সাত আট বৎসরের বালক বসিয়া আছে। দেখিয়া নির্ম্মলা খুব বিস্মিত হইল। সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিল। খুকী বলিল, "ঐ মা, বাবা ওখানে এসেছে—আমি বাবার কাছে যাই!"

নির্ম্মলা বলিল, "যা, গিয়ে ডেকে আয়।"

বালিকা চলিয়া গেল। নির্ম্মলা সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ভাই ওরা? উনি ওদের সঙ্গে কথা কোচ্ছেন কেন?"

সুহাস বলিল, "তাও আর বুঝতে পারলে না নেকুরাম। ওঁদের দুটির মধ্যে একটি তোমার উপ-সতীন। ওঁরই আফিসে ত রোজ রাত্তিরে তোমার স্বামী চাকরি করতে যান।"

নির্ম্মলা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া, একদৃষ্টে সেই বক্সের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার যেন কান্না আসিতে লাগিল। অর্দ্ধ মিনিট পরেই দেখিল, স্বামী সেই বক্স হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য হইলেন।'

একটু পরেই খুকী ফিরিয়া আসিল। তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুকী, কি হয়েছে?"

খুকী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "মা, বাবা বললে, আমি তোর বাবা নই। বললে আমি ত তোকে চিনি না বাছা! কার মেয়ে তুই? কোথায় থাকিস?"—বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা বলিল, "ও মা, সর্ব্বরক্ষে! ছি ছি রাম রাম, কাকে আমার স্বামী বলে মনে করেছিলাম? না রে খুকী, ও তিনি নন। ঠিক তাঁর মত দেখতে আর একজন। তুই তাঁর বুকের কল্‌জে, তোকে কি তিনি বলতে পাবেন, আমি তোর বাবা নই!"

সুহাস বলিল, "তুমি কি বলছ ভাই, আমি বুঝতে পারছিনে।"

নির্ম্মলা বলিল, "কেন, তোমায় কি আমি বলিনি? বলিনি বোধ হয়। সেদিন যে তুমি আমায় বলেছিলে, একখানা হলদে রঙের মোটর গাড়ীতে উনি হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছেন. তোমার বাবা দেখে এসেছেন—সে উনি নন। ঠিক ওঁর চেহারা এই কলকাতায় আর একজন লোক আছে, সে একখানা হলদে রঙের মোটর চড়ে বেড়ায়। ওঁর কত বন্ধু কত সময় তাকে দেখে উনি মনে করেছে— উনি সে কথা আমায় বলেছেন।"

সুহাস বলিল, "বল কি! খুব আশ্চর্য্য ত!"

এই সময় থিয়েটারের ঝিকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া, নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও ঝি, তুমি একবার গিয়ে দেখে এস ত বাছা, একখানা বাড়ীর মোটর গাড়ী, হলদে রঙের, দাঁড়িয়ে আছে কি না; যদি থাকে ত জিজ্ঞাসা করো, কার গাড়ী।"

"আচ্ছা"—বলিয়া ঝি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, "হলদে রঙের মোটর দাঁড়িয়ে আছে, বললে, ভবানীপুরের হেমন্তবাবুর গাড়ী।"

নির্ম্মলা সহাস্যে সুহাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "শুনলে ত?"

কনসার্ট থামিল, আলো নিভিল। তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল।

পরদিন বেলা ৯টার সময় বসন্ত বাড়ী আসিলে নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, কাল তুমি থিয়েটারে গিয়েছিলে?"

বসন্ত সবিস্ময়ে বলিল, "থিয়েটারে! তুমি স্বপ্ন দেখেছ নাকি? কাল সেই সন্ধ্যে থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত মাথার ঘাম মোছবার অবকাশ পাইনি—আমি যাব থিয়েটার দেখতে? তুমি ত বেশ!"

নির্ম্মলা তখন গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। সুহাস প্রথমে কি সন্দেহ করিয়াছিল তাহা এবং ঝি পাঠাইয়া খবর লইবার কথাও বলিল। শুনিয়া বসন্ত বলিল, "তুমিও তা হলে দেখেছ তাকে? কি সর্ব্বনাশ! সে যদি তোমায় এসে বলত, চল, বাড়ী যাই, তুমি ত তা হলে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চলে যেতে?"

নির্ম্মলা বলিল, "বোকো না বাপু, যাও। রোজ রোজ এক ঠাট্টা কি ভাল লাগে? দূর থেকে দেখেছি বলেই আমার ভুল হয়েছিল, কাছে এসে ডাকলে কি আব আমার ভুল হত?"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের মেয়েই যখন চিনতে না পেরে তাকে বাবা বললে,—আমার শ্বশুরের মেয়ে কি তফাৎ বুঝতে পারত?"

নির্ম্মলা বলিল, "যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আর কক্ষনো আমি তোমার সঙ্গে ভিন্ন এক পা বাইরে যাব না।"

।। ৬ ।।

পূজা অন্তে সুহাসিনী তার স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমে চলিয়া গেল। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে নির্ম্মলা একটি সমবয়সী সহৃদয়া সখী পাইয়াছিল—তাহার অভাবে নির্ম্মলার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, নির্ম্মলার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল । সন্ধ্যাব পর যথারীতি বসন্ত আফিসে চলিয়া গেল, কিন্তু তার পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে ফিরিয়া আসিল না। ১০টা বাজিল, ১১টা বাজিল, তথাপি স্বামী না আসায় নির্ম্মলা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রামাকে ডাকিয়া বলিল, "রামুদা, তুমি একবার আফিস গিয়ে খবর নিয়ে এস না। কি হল, কেন এলেন না, কিছুই বুঝতে পারছিনে যে!"

রামা বলিল, "কত দিন বলেছি, আমাকে কি জামাইবাবু তাঁর আফিসে চিনিয়ে দিয়েছেন যে যাব?"

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তা হলে কি হবে, রামুদা?"

"বাড়ীওয়ালাবাবুকে বলিগে। তিনি বোধ হয় সে আফিস চেনেন, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।"

"তুমি যাও দাদা—শীগ্‌গির যাও।"

নির্ম্মলা উৎকণ্ঠিতভাবে রামার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ মাঝের দরজা খুলিয়া, বাড়ীওয়ালাবাবুর স্ত্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বাছা, রামু বলছে, আজ ছেলে নাকি বাড়ী আসেননি?"

"হ্যাঁ মা। আমি বড় ভাবনায় পড়েছি। কি হবে মা?"

"ভয় কি, হয়ত কোনও কাজে আটকে পড়েছেন। তিনি বললেন, মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে এস, জামাই কোন্ আফিসে চাকরি করেন, তা হলে উনি এখনই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবেন।"

নির্ম্মলা সরোদনে বলিল, "খবরের কাগজের আফিসে কাজ করেন।"

"তা ত হল, কিন্তু কোন্ খবরের কাগজের আফিসে?"

"ইংরাজী খবরের কাগজ।"

"কিন্তু সে কাগজের নাম কি? ইংরিজী খবরের কাগজ ত অমন কত বেরোয় কলকাতায়।"

"তা জানিনে মা, ইংরিজী খবরের কাগজ, তাই জানি।"

"আচ্ছা, কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করি, দাঁড়াও।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পাঁচ মিনিট পবে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরেজী খবরের কাগজের আফিসেই আমি যাব, গিয়ে খোঁজ করব।"

নির্ম্মলা তখনও আহার করে নাই জানিয়া তিনি তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা বলিল, "না মা, তাঁর খবর না পেলে আমি কিছুতেই খেতে পারব না। আমার গলা দিয়ে অন্ন-জল গলবে কেন?" অবশেষে অনেক কষ্টে তিনি নির্ম্মলাকে এক গ্লাস সরবৎ পান করাইয়া গৃহে গেলেন।

বেলা দেড়টার সময় বাড়ীওয়ালাবাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া নির্ম্মলাকে জানাইলেন, কলিকাতায় সমস্ত ইংরাজী দৈনিকেব আফিসেই তিনি গিয়াছিলেন, কিন্তু বসন্তকুমার বসু কেহ কোথাও চাকরি করে না।

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাব বাবাকে এখানে আসবার জন্যে টেলিগ্রাফ করে দিতে বল।"—নির্ম্মলা পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল।

সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হইল, তথাপি বসন্তের দেখা নাই অথবা তাহাব তরফ হইতে কোনও সংবাদও নাই। পিতাও আসিয়া পৌঁছিলেন না।

রাত্রি এগারোটার সময় দুয়ারের কড়ায় খট্-খট্ করিয়া আওয়াজ হইল। পিতা আসিয়াছেন মনে করিয়া নির্ম্মলা নিজে ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। একটি ৭/৮ বৎসর বয়স্ক বালকের হাত ধরিযা তার স্বামী দাঁড়াইয়া—তাহার চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকাইয়া আধখানি হইয়া গিয়াছে। সে ভগ্নস্বরে ডাকিল—"নির্ম্মল!"

সেই মুহূর্ত্তে খোলা দরজার ভিতর দিয়া নির্ম্মলার দৃষ্টিতে পড়িল, হলদে রঙের বৃহৎ এক মোটরকার বাহির-বারান্দার নিম্নে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলা একটা অস্ফুট ভীতধ্বনি করিয়া দুই তিন পদ পিছাইয়া গেল।

"ভয় নেই নির্ম্মলা!—তোমারই স্বামী আমি, অন্য কেউ নই। এইমাত্র নিমতলার ঘাট থেকে ফিরছি। সেদিন থিয়েটারে বক্সে যে রোগা স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলে, সে সত্যিই তোমার সতীন—উপসতীন নয়—আমার প্রথমা স্ত্রী—তাকে পুড়িয়ে এলাম।—এই ছেলেটিকেও সেদিন তুমি বক্সে দেখেছিলে। এই নাও—আজ থেকে খোকা তোমারই ছেলে হল।"

বালক এই কথায় হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে নির্ম্মলা সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে ছুটিয়া গিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্বামীর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ভিতরে এস।"

বসন্ত—অথবা হেমন্ত (কারণ, হেমন্তই এই দুর্ভাগ্যের আসল নাম) বলিল, "দাঁড়াও, গাড়ীটার ব্যবস্থা করে আসি।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া বলিল, "বিনোদ, গাড়ী নিয়ে আবার নিমতলায় যাও। ওঁদের সব বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, গাড়ী সেখানেই রেখ। আজ রাত্রে আমি আর খোকা এইখানেই রইলাম—কাল বেলা ৯টার সময় গাড়ী নিয়ে আসবে।"

নির্ম্মলা রান্নাঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি লেবু দিয়া চিনির সরবৎ প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে ও খোকাকে পান করাইয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, দুটি ভাত চড়িয়ে দিই, ভাতে-ভাত?"

হেমন্ত বলিল, "আমি ত কিছুই খেতে পারবো না। খোকাও বোধ হয়, ভাত হতে হতে ঘুমিয়ে পড়বে। দুধ-টুধ থাকে ত ওকে একটু দাও।"

"আজ সারাদিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয়নি?"

"না হওয়ারই মধ্যে। ক'দিন থেকেই খোকার মা অসুখে পড়েছিলেন। কাল রাত ১০টার সময় ভবানীপুরের বাড়ী গিয়ে দেখলাম, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, জীবনের আশা ডাক্তারেরা ছেড়েই দিয়েছে। সেই তখন থেকে, আজ বেলা তিনটে অবধি যমে-মানুষে যুদ্ধ। তিনটের সময় সব শেষ হয়ে গেল। যোগাড়যন্তর করে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যে হল। আমি না আসাতে তুমি কত ভাবছো—তা মাঝে মাঝে মনে পড়েছে বটে—কিন্তু কাউকে দিয়ে একটা খবর যে পাঠাব তোমাকে, তা পেরে উঠলাম না। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

নির্ম্মলা বলিল, "দুপুরবেলা সরবৎ খেয়েছি।"

হেমন্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা আগেই জানি। আচ্ছা, দাও দুটো ভাত চড়িয়ে—দুজনেই খাব এখন। খুকী কোথা?"

"সে উপরে ঘুমুচ্ছে।"

"তুমি উপরে চল।"

"আচ্ছা, তাই চল।"

দ্বিতলে গিয়া নির্ম্মলা খোকাকে কোলে করিয়া সোফার উপর বসিয়া তাহাকে দুধ ও সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিল। হেমন্ত খাটের উপর বসিয়া, ঘুমন্ত খুকীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুমো খাইতে খাইতে বলিতে লাগিল, "মা—আমায় বাবা বললে যে, আমি তোর বাবা নই!—এই বলে বাছা আমার সেদিন কেঁদেছিল। 'আমি তোর বাবা নই'—বলতে আমার বুকটা ফেটে গিয়েছিল রে, তা কি তুই জানিস?"—বলিয়া হেমন্ত ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

পরদিন বেলা ১০টার ট্রেনে দত্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রথমটা জামাতার উপর মনে মনে তাঁহার খুব রাগ হইল—কিন্তু শেষে যখন শুনিলেন, সম্প্রতি 'ইংলিশম্যানে' চাকরি করার কথাটা কল্পিত হইলেও, প্রথমে কথিত দালালী ব্যবসাটা খাঁটি সত্য, সে ব্যবসা বিশেষ জাঁকালো রকমের, এবং সে ব্যবসা হইতে বাবাজীউ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তখন তাঁহার সমস্ত রাগ জল হইয়া গেল।

পরদিন দত্ত মহাশয় জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবাজী, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা, তখন তুমি পরিচয়টি গোপন করেছিলে কেন?"

হেমন্ত বলিল, "আজ্ঞে না। নির্ম্মলাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে আপনি যখন পাল্কী এনেছিলেন, আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তখন আমার প্রকৃত নামই বলেছিলাম—হেমন্তকুমার বসু। বাড়ী নিয়ে গিয়ে আপনি আমায় বসন্ত বসন্ত বলে

ডাকতে লাগলেন। আমি প্রতিবাদ কবিনি, কাবণ তা কবাব কোনও দবকাব মনে কবিনি।"

"গবীব সেজেছিলে কেন?"

"আজ্ঞে, কুলীন কায়েথেব ছেলে, ৩০ বছব বযস হয়েছে, গবীব না সাজলে, ততদিন পর্য্যন্ত আইবুড়া থাকাব কৈফিযৎ কি দিই? আব প্রকৃত কথা জানলে আপনি কি আব সতীনেব উপব মেয়ে দিতেন?"—নির্ম্মলা এক দীর্ঘ পত্রে সুহাসিনীকে সমস্ত ব্যাপাব জানাইল। শেষে লিখিল, "তুমি যাহা অনুমান কবিযাছিলে, তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইল,—উনি বাত্রে চাকবি কবিতে যাইতেন না,—আমাকে বোকা বুঝাইযা হাওয়া খাইতেই যাইতেন বটে। তবে সৌভাগ্যেব বিষয় যে, উহা বিশুদ্ধ বায়ু, দূষিত হাওযা নহে।"

পরলোকগতা পত্নীব শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ম্মলাকে হেমন্ত এই বাড়ীতেই বাখিল। তাহার পর একটা ভাল দিন দেখিয়া, হেমন্তেব জননী তাঁহাব নূতন বউকে আনাইয়া ববণ কবিয়া ঘবে তুলিলেন।

[বার্ষিক বসুমতি, আশ্বিন ১৩৩৪]

বউ-চুরি

॥ ১ ॥

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবাব একটা ভাবি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল সেই সময়েব কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলাব একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ বেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট অফিস হইতে পাঁচ মাইল দূবে অবস্থিত। গ্রামেব মধ্যভাগে দেবী মহামায়াব একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতে ইহাব নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটিব একটি ক্ষুদ্র জমিদাব আছেন তাঁহাব নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাব মধ্যম পুত্র অনাথশবণ বি-এ পবীক্ষা দিয়া কয়েক দিন হইল বাড়ী আসিয়াছে। ছেলেটিব বয়স বাইশ বৎসব হইবে, বেশে পাবিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপবে কয়েকটি কাবণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত কবিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত কবে না। তাহাব কাবণ কি জান সে বলে যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ কবি নাই, সে আমাব স্ত্রী নহে, ভগিনী। যদি জিজ্ঞাসা কব উহাকে বিবাহ কবিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ কবিয়াছিলাম, তখন আমাব এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকাব দশা কি হইবে জিজ্ঞাসা কবিলে বলে, আমবা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহাব পব ব্রাহ্মবিবাহেব যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসাবে আমাদেব বিবাহ বন্ধন ছিন্ন কবিব, ও তখন ভালবাসিয়া আব যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে ববণ কবিতে পারিবে।

বিবাহেব পব কলিকাতায় গিয়া অনাথশবণেব একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল, তাহাব নাম হেমন্তকুমাব সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহাব সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতেব অল্পকাল পবেই অনাথের মনে ধাবণা জন্মিল যে, সে হেমন্তকুমারের দূবসম্পর্কীয়া ভগিনী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনেব এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্ববিক শক্তিব বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমাবেব প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্ববাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে

ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগিনী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইয়াছে। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা—বিবাহ নাই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্যন্ত, তাহার অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগতপ্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের আম পাকানো রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্বাটির কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসংগীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্য-প্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠি রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরো কাগজ লইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল :—

"আজ রাত্রে বারোটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া কাগজখানিকে পাকাইয়া গুটাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামশুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছিলেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া কুল-আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর, নারায়ণশিলা আছেন মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল, বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, অঞ্চলাগ্রগলায় জড়ানো। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল, স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে।

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল,—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতর বসিয়া কোকিল

ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছ পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানি বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণশিলার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন! বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জ্বরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল; ফুলশয্যা হইতে পায় নাই। যে তিনদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেবো বৎসরেব। মাঝে একবার আসিয়া কযেক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গেব বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুবে শয়ন করে নাই। এবাব রাগ কবিযা তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবাব চেষ্টা করে নাই। অনাথেব মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পডিয়াছে? মন্দার এ জীবনটা তবে কি বিফল হইবে না? তাহাব আত্মীয়াগণের, সখীদেব স্বামীব ভালবাসার কথা সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহাব বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে কবিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বব তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন? এইবাব কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুযাবে বাহিব হইতে কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়াব খুলিয়া দিল। তাহাব ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসব হইল তাহাব এ দশা ঘটিযাছে। হরিমতি মন্দাব অপেক্ষা তিন বৎসবের বড, তবু দুইজনে খুব ভাব। দুইজনে দুইজনেব সকল সুখদুঃখেব ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল, "তোব কি হয়েছে লা?"

মন্দা ধীবে ধীবে উত্তব কবিল, "হবে আবাব কি?"

"দোব বন্ধ করে কি কবছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহাব ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতিব ভাবি সন্দেহ হইল। সে মন্দাব গলাটি জডাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বলবিনে ভাই?"

"বলব।"

"কখন বলবি?" "বাত্তিরে" "না এখন বল্।"

মন্দাও বলিবে না হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া হরিমতি প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। তাহাব পব অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছিস কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল, "হাসছি তোব ববটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দাব উস্‌খুস্ করে বেড়ান হচ্ছে। বলেওছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো এবাব হযত ছোড়দাব মত হয়েছে। এবার তোমবা চেষ্টা কবে দেখ, এবার হয়ত ঘবে আসবেন। তা বউদিদি বললেন—মন হয়েছে তা আসুক না, আমি কি বারণ কবেছি নাকি? আমি বললাম—এতদিন আসেননি এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন? লজ্জা কবে হয়ত। তিনি বললেন—সেবার অমন করে আমাদেব অপমান কবলে, আবার আমি সাধতে যাব? আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দু'মাস ত ছুটি আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল, "আমি কিন্তু ভাই যেতে পাবব না।"

"কেন?"

"সে আমাব ভারি লজ্জা কববে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল "ওগো দেখিস! কচিখুকিটি কিনা? বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা রাখ্। আমার ভয় হচ্ছে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে। তা একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে?"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব; কিন্তু আজকের দিনটা চুরি করেই তোদের দেখা হোক! দেখিস চুরির কাঁচা আমটা পেয়ারাটার মতন চুরির সব জিনিসই বড় মিষ্টি।"

।। ২ ।।

"ছোটবউ, ও ছোটবউ, ঘুমুলি ভাই?"

রাত্রে শয্যার হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বারোটা হয়েছে?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজলো ছোড়দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"নাঃ—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল, "নে এইখানা পর্।"

মন্দা বলিল, "না ভাই—আর অততে কাজ নেই।"

হরিমতি বলিল, "দূর ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় পরে বুঝি যায়?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল, "বল্ এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে নাকি?"

মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল, "নইলে আমি বউ মানুষ একলা যাব নাকি?"

দুইজনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল, "আ মরণ! মল চারগাছা খুলিসনি? ভাবে বিভোর হয়েছিস যে!"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তারপর দুইজনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কানে কানে বলিয়া দিল, "দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল; ভাবিল— ইনি আমার স্বামী। আমার স্বামী ত বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত! লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি করে নিদ্রে হচ্ছে।"

কি করবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল-প্রায় আধ ঘণ্টা—কাটিলে, মন্দা স্বামীর পায়েব কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবামাত্র অনাথেব নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তিব প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে; যতক্ষণ জাগিযাছিল, তাহাবই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বাবোটা হইয়া গেল, তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন কবিযাছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পবিবর্ত্তন কবিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীব গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিযাছে; মন্দাকিনীর মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দু'খানি এক একবাব কাঁপিযা উঠিতেছে, মন্দা বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল।

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর ত! এ যেন নগেন্দ্রবালাব চেযেও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এইভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল; চক্ষু মুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হে ঈশ্বব, আমার হৃদযে বল দাও।"

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনযন করে ভাবিয়া অনাথ তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিযাছে। মন্দাকিনীব গায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড়চোপডগুলা কিছুতেই যেন আব বাগ মানে না! অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল, "মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতব হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল, "তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কলকাতায় যেতে হবে। যাবে?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল, "যাবে কি?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল, আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজান্তে। যেতে পারবে?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না।

অনাথ বলিল, "কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে? বল।" সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্ছে।"

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতিগতির স্থিরতা কি? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক। বাড়ীর বউটাকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি?"

"আমরা দু'জনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গণিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল, "আমি ঠাকুর দেবতা মানি, কি করে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, "ও সকল বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ওসব ভুল। আমি কি করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে?"

"তোমাকে লেখাপড়া শেখাব। কলকাতায় গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেবো।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ভুল বুঝছ; আমরা দু'জনে একত্রে এক বাড়ীতে থাকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কোথায় থাকব?"

"সেই ইস্কুলেই; সেইখানে মেয়েরা পড়ে থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থিরস্বরে বলিল, "তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল, "কেন আমি এত দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল, "শুনেছি কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি শোন। প্রথমতঃ আমাদের বিবাহ ভালবাসার বিবাহ নয়। দ্বিতীয়তঃ তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি কারণে আমার মতে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝলে?" "না, ছি ছি।"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি শোন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কলকাতায় নিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি, সেই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার উপর তোমার বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কলকাতায় গেলে আমাদের একত্র বাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয়; কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই গভীর রাত্রে নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল, "মন্দা কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল, "মন্দা!"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ কেন? এত ক্লেশ কেন?

একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ অনুভব করিল না? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না—তাহা জানে; এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল, "আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল, তাঁহার হাতখানি ধরিল, ধরিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল আবার এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল।

মন্দা বলিল, "আচ্ছা—বলিয়া সে বাহিব হইয়া গেল।

॥ ৩ ॥

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবার একটি সোনার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে, কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে দেখিতে পাইল, বাটির একজন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মাখন? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর দাদাঠাকুর সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনই অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পদক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়তে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়ীতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাগানে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষন্নতা মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ব্যস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—আমি সব জানি গো সব জানি।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, হরি কাকে সাপ কামড়েছে?"

হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সাপে কামড়েছে? কই কাকে তা ত জানিনে।"

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন

সে মাখনেব বাড়ীব অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনেব যে কান্না' পাঁচ বৎসরেব বালকেব মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য কবিতে পাবিল না, হায় হায় কবিতে কবিতে সে স্থান পবিত্যাগ কবিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিবিল। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকেব অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা? ইচ্ছা কবিল হেমন্তকুমাবকে আনিয়া একবাব এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত মন্ত্রপড়া বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পাবে না, তাহা একেবাবেই অসম্ভব।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল হেমন্তকুমাবেব একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জয়তে

কলিকাতা—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবাব

প্রিয় ভ্রাতঃ

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অন্য একটা সুসংবাদ আছে। বাস্তপুবেব বাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীবঞ্জন বায় বাহাদুব তাঁহাব পুত্রেব জন্য গৃহশিক্ষক অন্বেষণ কবিতেছিলেন, বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা' আমি ইহা শ্রবণ কবিয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত কবিতে পাবিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহেব মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পবামর্শমত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহাবে লইয়া চলিয়া আইস। তোমাব উত্তব পাইলেই বালিকাবিদ্যালয়ে তাঁহাব জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত কবিয়া বাখিব।

আমাব সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমাব কথা জিজ্ঞাসা কবেন। তোমাব প্রতি তাঁহাব প্রেম যে উত্তবোত্তব বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগিনী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা কবিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মবণ কবিও, পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম কবিতে হইয়াছিল, ঈশা স্বীয় প্রিয় প্রচাব কবিবাব জন্য আপনাব প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা তোমাব সহায় হউন।

ভবদীয়— শ্রীহেমন্তকুমাব সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমাবেব পত্রেব কোনও উত্তব দিল না। মন্দাকিনীব অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহাব মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়। সে যে ভাবি দুঃখিত' কি কবিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দাবেব ব্যাপাব দেখিয়া তাহাব মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয়ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহবন্ধনে ছিন্ন কবিবাব প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুব' বিবাহেব পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চাব না হইলে পবে যে তাহা হইবেই না, তাহাব স্থিবতা সম্বন্ধে অনাথেব মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা তাহাব ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহাব হাতে একটি পত্র দিয়া সবেগে পলায়ন কবিল। খাম আঠা দিয়া বন্ধ, ভিতবে চিঠি বহিয়াছে, অথচ কোন শিবোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহিব কবিয়া পড়িল, তাহাতে লেখা আছে :—

প্রিয়তমেষু,

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমাব অনুগামিনী হইব। আজ বাত্রে সাক্ষাৎ কবিতে পাবিব না।

চবণাশ্রিতা দাসী—শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এই পত্র পাইয়া অনাথ ভাবি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহবন্ধন ছিন্ন কবিতে আব দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বাবংবাব পাঠ কবিল। যদি দুঃখ নাই, তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে ‘প্রিয়তমেষু’—চবণাশ্রিতা দাসী—ইহাব অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থিব কবিল, ওগুলা বাঁধিগৎ ওগুলাব বিশেষ কোনও অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহাব মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা কবিল সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমাব কি? মন বলিল—না। তাহাব জন্য আমাব কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালাব মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহেব সহিত বুকে চাপিয়া ধবিল। ভাবিল, আব একদিনও বিলম্ব কবা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা কবিতে হইবে। বাত্রি একটাব সময় বাহিব হইবে। দুই ক্রোশ দূবে বতনপুব গ্রাম সে অবধি পদব্রজে যাইবে। সেখান হইতে গরুব গাড়ী কবিয়া ষ্টেশনে যাইবে। তাবকেশ্বব দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগাব ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাওযাই শ্রেয়ঃ। গ্রামেব লোকজনেব সঙ্গে দেখা হইবাব সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূব হইবে বিলম্ব হইবে, তা আব কি হইবে? সাবা বাত্রি তাহাব নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকাবে কাল্পনিক আযোজন তাহাব মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পবদিন সকালে উঠিযাই মন্দাকিনীকে লিখিলঃ—

প্রিয় ভগিনী,

আজ বাত্রি একটাব সময় যাত্রা কবিতে হইবে। ঐ সময আমাব ঘবে আসিও। জিনিষ পত্রেব মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আব কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশবণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাত্রি একটাব সময, স্ত্রীকে চুবি কবিয়া অনাথ পলায়ন কবিল।

॥ ৪ ॥

দুই দিন পবে বেলা বাবোটাব সময যখন পাণ্ডুয়াব বাজাবে অনাথশবণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীব সহিত অবতরণ কবিল, তখন বৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধাবণ কবিযাছে। দুইজনেই স্বেদাক্ত কলেবব। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা কবিয়া মাদুব বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদেব বসিবাব স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘবেব পশ্চাতেই বাবান্দা। বাবান্দায় নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড নির্ম্মল মন্দাকিনীব শবীব বড উত্তপ্ত, পিপাসায কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজাব কবিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান কবিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম কবে নাই, গায়েব ঘাম পর্যন্ত মবে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিবিল না, ততক্ষণ—আধঘণ্টা হইবে—মন্দা জলে পড়িয়া বহিল। ঝি আসিলে উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া বান্না চড়াইযা দিল।

এই অত্যাচারেব প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। বন্ধন সমাপ্ত হইবাব পূর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল গাড়ীব খবব লইতে, এবং হেমন্তকুমাবকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিবিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপাব। মন্দাব গায়ে

হাত দিল গা একেবাবে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবাফুলেব মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক্ ঠক্ কবিয়া কাঁপিতেছে। সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস, না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন কবে, কি বা গাত্রে দেয়?

অনাথ বলিল, "একটু অপেক্ষা কব, আমি একখানা কম্বল চেয়ে এনে বিছানা কবে দিচ্ছি।"

মন্দাকিনী বলিল, "তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তাবপব শোব এখন।"

অনাথ বলিল, "পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমাব এমন অসুখ, আমি কি খেতে পাবি।"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমাব অসুখ তা কি? তা বলে তুমি উপবাসী থাকবে? দু'দিনেব কষ্টে তোমাব মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীব নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আব খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা কবিয়া মন্দাকে বলিল, "শোবে এস।"

মন্দা বলিল, "ওকি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না—মন্দাকিনীকে শয়ন কবাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বাব বলিল, "ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আব বেশীক্ষণ জিদ কবিবাব শক্তি তাহাব বহিল না, অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

তিন দিন পবে যখন মন্দাকিনীব জ্ঞান হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানাব কাছে স্বামী বসিয়া। অনাথ জিজ্ঞাসা কবিল "মন্দা কেমন আছ?"

মন্দা বলিল "ভাল আছি। তুমি কি খেয়েছ?"—বলিতে বলিতে আশেপাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল সে টেবিলের নিকটে, কাহার গৃহে পালঙ্কের উপর শয়ন কবিয়া বহিয়াছে। জিজ্ঞাসা কবিল, "এটি। আমি এ কোথায় বয়েছি?"

অনাথ বলিল, "মন্দা তোমাকে যে আবাব কথা কইতে শুনব তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার [illegible] বাগানবাড়ী।"

মন্দা বলিল, "তিন দিন!"

"হাঁ মন্দা তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে। এখন যদি বাঁচাতে পাবি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্ববে বলিল "তোমায় একটা কথা বলব।"

অনাথ বলিল, "কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথেব চক্ষু দিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিল, "ছি মন্দা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দাব ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভবা চোখ দুইটি অনাথেব পানে ফিবাইয়া বলিল, "কি হবে আমাব বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল, "না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।"

"কি কববে আমায় নিয়ে?"

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

বোগিণীব দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তাব ভার আব সহিতে পাবিল না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পবে ডাক্তাববাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কাব করিয়া বলিল, "দুপুববেলাকাব ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দু'দিনে সারিয়ে দেবো; কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।

অনাথ মনে মনে বলিল, খুব কমই বটে। প্রকাশ্যে বলিল। "আমার স্ত্রী আমি ত স্বভাবতঃই করব; কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তারবাবু আত্মপ্রশংসায সঙ্কুচিতচিত্ত হইযা বলিলেন, "আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি, সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের বলে এ বাগানবাড়ী খুলিয়ে না দিতেন তাহলে দোকানের সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে কম্বলের উপর শুযে আমার স্ত্রী ক'দিন বাঁচতেন?"

ডাক্তারবাবু কথা উল্টাইয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পর ঔষধ-পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মুক্ত হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয়দিনের পর খুব ঘুমাইল।

॥ ৫ ॥

প্রভাতে যখন ডাক্তারবাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিযা মাথায কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিযা ডাক্তারবাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রযোজন।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিযমিত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল, "এ কয়দিন কি খেলে?"

"ডাক্তারবাবুদের বাড়ী থেকে ভাত আসত?"

"তবে চেহারা এমন হযে গেল কেন? একেবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে?"

অনাথ মৃদু হাসিযা বলিল, "যদি আমার ব্যারাম হয, তা হলে তুমি আমার জন্যে করতে না?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিযা, আস্তে আস্তে বলিল, "আর ব্যারামের প্রার্থনায কাজ নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিযা আদর করিযা বলিল, "প্রার্থনা নাই করলাম, হলে করতে কি না?"

"করি না ত কি?"

"কেন?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল, "তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিযা বলিল, "তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে থেকে?"

"যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিযা রহিল। শেষে বলিল, "তুমি না ব্রাহ্ম? তুমি না মিছে কথা বল না?"

অনাথ বলিল, "আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বললে ভালবাসব।"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল, "তুমি ত আমায় ভালবাস না।"

"কিসে জানলে?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে। তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিয়া বলিল, "তা বুঝি?"

"কি তবে?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম? ঠাকুরঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তার ভারি ইচ্ছে তোমার আর একটি বিয়ে হয়?"

"হ্যাঁ—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে?"

"যমরাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল "ঠাকুরঝিই বলেছিলে, তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তুই তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—'

অনাথ বাধা দিয়া বলিল, "তবে ঐ যে বন্দোবস্ত? তা ডাকাতিই করেছ বটে! এদিকে অন্য বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ করে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল, "কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। কখন আমি তোমার মনে ডাকাতিটে করেছি, শুনতে পাইনে?"

"সে সব পরে বলূব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল না!

"কখন? যে দিন আমার বিছানায় পায়ের তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি! তারপর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণেব প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না করিলে বিপদ ঘটিতে পাবে। সেই নরনারী যদি স্বামী স্ত্রী হয় এবং তাহাদের বয়স যদি তরুণ হয, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে?

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল, "পথে কেন তবে আত্মসমর্পণ করনি?"

অনাথ কিছু না বলিয়া স্ত্রীব মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "নগেন্দ্রবালা? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি! চল একবার কলকাতায় তাকে আমি দেখব!"

অনাথ বলিল, "কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিমে যাব, তোমার শবীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কানে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি সে তোমায় ভালবাসে? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ হবে।"

"সে আমায ভালবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বর জানেন।"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা করনি?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে? "কি করে জানবে?"

মন্দা অভিমান ভবে বলিল, "সে না জানুক, তুমি ত বাসতে!"

অনাথ বলিল, "কই আর বাসতাম? তা হলে তুমি শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি করে? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি যথার্থ ভালবাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুইজনে বাগানবাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যেয় ডাক্তারবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া কল্য প্রভাতেব গাড়ীতে তাহাবা মুঙ্গেব যাত্রা কবিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যাব পব ডাক্তাববাবুব বৈঠকখানায় বসিযা অনাথ হেমন্তকুমাবেব নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

কলিকাতা

২৫ জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবাব।

প্রিয় ভ্রাতঃ

ভগিনী মন্দাকিনীব অসুস্থতাব সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বব শীঘ্র তাঁহাব আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটি দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিযাছিলে, তোমাব দৃঢ বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল, কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমাব সে ধাবণা চূর্ণ হইযাছে। শুনিলাম, শবতেব সঙ্গে নগেন্দ্রবালাব বিবাহ স্থিব। আবও শুনিলাম, দুই বৎসব হইতে তাঁহাবা পবস্পরেব প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতবাং নগেন্দ্রবালাব ব্যবহাবে তুমি যে অনুমান কবিয়াছিলে তোমাব প্রতি তিনি প্রণয়বতী, তাহা তোমাব ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি কবিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন কবিয়া বহন কবিবে?

তোমাব আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দুমতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইনেব সঙ্গে তাহাব কোনও সম্পর্ক নাই। সুতবাং তোমবা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও সে সম্বন্ধ ছিন্ন কবিবাব পথ বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায আসিবে? চাবি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগিনী আবোগ্য লাভ করেন এখানে আসিতে পাব, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ীব সেই কার্য্যটি হস্তান্তবিত হইবে না, কিন্তু আমাব পবামর্শ, ভগিনীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়েব কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন কবতঃ তপস্যা ও উপাসনাব দ্বাবায় চিত্তস্থিব ও আত্মশান্তিবিধান কবিবে।

ভবদীয়—শ্রীহেমন্তকুমাব সিংহ

বাত্রি নয়টাব পব ডাক্তাববাবুব বাড়ী হইতে ফিবিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "তবে আব নগেন্দ্রবালাব উপব আমাব রাগ নাই। মুঙ্গেবে না গিযে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালাব বিযেটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল, "তাই চল। মুঙ্গেবে যাবার আব একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসব দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভাবি অভিমানেব ভান কবিল। বলিল "তাই তখন মনেব কথা খুলে বললেই ত হত। বলা হল তোমাব শবীব সাবাবাব জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি।"

বাহিবে অন্ধকাব বকুলগাছে একটা কোকিল বসিযা ছিল, সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পাবে। বুঝি মন্দাকিনীব এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভাবি আমোদ পাইল, তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কাব দিতে আবম্ভ কবিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষেব নিকট টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন কবিয়া বলিল "না গো না—তা নয়।"

[বৈশাখ, ১৩০৭]

একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত

আমি একদিন রাত্রে আহারের পর রাস্তার ধারে বারান্দায় ঈজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় আল্‌বেলায় নলটি মুখে দিয়া ঢুলিতেছিলাম। দারুণ গ্রীষ্মকাল, কিন্তু সে সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টা দুই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে কিছু ঠাণ্ডা ছিল। পল্লীগ্রাম—অধিক রাত্রি হইবার বহুপূর্ব্বেই পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। হালদারদের বাগানের ভিতর একটা নারিকেল গাছে দুইটা পেচক বাস করিত, তাহারাই মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছিল, আর সব নিস্তব্ধ। ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ যেন মনে হইল, আমার মুখনলটা আস্তে আস্তে বলিতেছে বলি শুনিতেছ? এত ত লেখ, আমার জীবনের ইতিহাসটা লিখিয়া ছাপাইয়া দাও না, বেশ একটা গল্প হইবে।” আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম—“তুমি অচেতন পদার্থ, একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পার না—তোমার আবার ইতিহাস কি?” সে বলিল—“আমি এখনই অচল হইয়াছি, চিরদিনই কি এমন ছিলাম? যখন জীবিত ছিলাম, তখন আমি যেমন দ্রুত ও নিয়ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতাম তেমন তোমার জীবজগতের কেহ পারে না কি!” আমি বলিলাম—“ভাল তুমি না হয় সচলই ছিলে তা বলিয়া তোমার ইতিহাস আবার কি?” মুখনল একমুখ হাসিয়া উত্তর করিল—“বৃথা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি। মানুষেরই বুঝি সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ, সোনাকপার বুঝি সে সব কিছুই নাই? তবে আমার জীবনের কাহিনী শ্রবণ কর, তাহার পর বিচার করিও।” বলিয়া আরম্ভ করিল :—

আমার জন্মদিনটা ঠিক মনে নাই, বৎসরটা গায়ে লেখা ছিল, দেখিয়াছিলে কি? আশ্বিন মাস—শীঘ্র পূজার বন্ধ হইবে বলিয়া ট্যাকশালে কাজের ভারি ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। দিবারাত্রি যন্ত্রের শব্দে মনে হইত, যদি চিরবধির হইয়া জন্মিতাম সেই ভাল ছিল। আমার জন্মের তিন চারি দিন পরেই বড়বাজারের এক মাড়োয়ারি মহাজন বড় বড় থলি করিয়া দশ হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল—আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইল। আমি তখন সংসারের ব্যাপার কিছুই জানি না মনে করিলাম, ভারি মহাজনের দোকানে যাইতেছি, দোকানে বসিয়া কত কি দেখিতে পাইব, শুনিতে পাইব, কত আমোদ হইবে। ও মহাশয়, গাড়ী হইতে নামিয়া দুষ্ট মহাজন দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে থলিগুলো একটা অন্ধকূপের মত ঘরে লইয়া গিয়া মেঝেতে দমাদ্দম্‌ করিয়া ফেলিল, তাহার পর বলিল, “লে আও।” তাহার পর এক এক করিয়া থলিগুলোর নিম্নকর্ণ দুইটা ধরিয়া লোহার সিন্দুকে হড়্‌ হড়্‌ করিয়া ঢালিতে লাগিল। আমাদের শরীরটা শৈশব হইতেই কিছু কঠিন নচেৎ সেই পতনেই, বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রাজা বা রাণীর ন্যায়, মৃত্যু অনিবার্য হইত।

মহাজন যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চলিয়া গেল, তখন আমরা সকলে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ছেলেমানুষ সংসারের কিছুই জানি না। বাঙ্গালীর ঘরের কচি মেয়ে শ্বশুড়বাড়ী আসিলে তাহার যে কি মনে হয়, তাহা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিলাম। যাহা হউক, সকলে মিলিয়া নীরবে আপন আপন অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, এমন সময় মহাজন আসিয়া সিন্দুক খুলিল। একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল, আরও দুই তিনটা লইয়া, সিন্দুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তখন পূজার বাজার, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা বারোটা অবধি দোকানে ক্রেতাগণের অবিশ্রাম কোলাহল শুনিতে পাইলাম। অধিকাংশ লোকই নোট লইয়া আসিত, তাহাদের বাকী টাকা ফিরাইয়া দিবার সময় সিন্দুক খোলা হইতে লাগিল এবং মুঠা মুঠা টাকা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আশা হইল, এ অন্ধ-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ হইবে—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক। দুই দিন পরেই আমি বাহির হইলাম। পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ

তাঁহার পুত্রবধূর জন্য একখানি বোম্বাই শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিলেন, পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট ছিল ফেবৎ টাকাব সঙ্গে আমি তাহাব হাতে গিয়া পড়িলাম।

কিন্তু বৃদ্ধের নিকট আমাকে বহুক্ষণ থাকিতে হইল না। বড়বাজাব ছাড়াইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি কাঁচি দিয়া তাঁহার পিরাণেব পকেট ছিন্ন কবিল এবং সেই সুদ্ধ আমাদের লইয়া সবিয়া পড়িল। বোধ কবি বাসায় ফিরিয়া তিনি আমাদেব বিরহে অনেক অশ্রুপাত হা হুতাশ কবিয়াছিলেন; আমবা তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই। আমবা দুর্গন্ধময গলিব ভিতব দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি খোলার চালের ঘবে নীত হইলাম এবং সেখানে কিছুদিন রহিলাম। সমস্ত দিন ঘরে কেহ থাকিত না; সন্ধ্যা ৮টাব পরে সহসা বহুলোকেব সমাগম হইত, বোতল বোতল মদ আসিত, গান বাজনা হইত, অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প চলিত;—তাহাবা সমস্ত দিন কেমন কবিয়া কৌশলে লোককে ঠকাইযা অর্থ উপার্জন কবিয়াছে; তাহাবই কাহিনী তাহাবা এক ভাগ সত্যের সহিত তিনভাগ মিথ্যা মিলাইয়া বলিত, শুনিযা বিস্ময়ে আমবা স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। একদিন টাকা ভাগ হইল, আমি যাহাব ভাগে পড়িলাম সে আমাকে লইয়া যাইতে পথে এক দোকানে আমাকে দিয়া এক জোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে টাকার মধ্যে আমি জুতাবিক্রেতার বাড়ীওযালাব হাতে গিযা পড়িলাম।

যাঁহার বাড়ী, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিজে চাকবি কবেন, দুইটি পুত্র চাকরি কবে, আব দুইটি বিবাহিতা কন্যা, তাহাব মধ্যে ছোটটি পিত্রালযে ছিল, সেই আমাকে অধিকাব কবিল, বাড়ীভাড়া আদায় কবিয়া আসিয়া বাবুটি টাকাগুলি বাক্সে বাখিবাব সময় দেখিলেন, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ও উজ্জ্বল। মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চারু একটা জিনিষ নিবি?"

"কি বাবা?"

"এই দ্যাখ"—বলিযা তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীব মধ্যে আমাকে ধবিযা হাসিতে হাসিতে ঘুবাইতে লাগিলেন।

মেযে বলিল—"দাও বাবা, দাও বাবা, দাও।"

"তা দোব।"

"তবে এই নে।"

মেয়েটি আমাকে পাইয়া ভারী খুসী—বাবম্বাব উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিতে লাগিল, দেখা শেষ হইলে সিন্দুকের কৌটার ভিতর আমাকে বাখিয়া দিল।

তাহাব সিন্দুকেব কৌটাব ভিতর আমাকে অনেক মাস থাকিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সেই নোলকপবা ছোট মেয়েটি আমাকে বাহির করিয়া দেখিত আছি কি নাই। আমি কি পালাই? পা ত নাই, সুতবাং এ কথা বলা আমাব সাজে না; কিন্তু যদি থাকিত, তবে শপথ কবিয়া বলিতে পারি, আমি পলাইতাম না। তত সুখ, তত যত্ন আব কোথায় পাইতাম? আমি তখন দেখিতে কি সুন্দরই হইযাছিলাম। যন্ত্র হইতে সদ্য বাহিব হইযাছি; ঝক্‌মক্ করিতেছি; দেহে স্থানে স্থানে সিন্দুর মাখা, এমন রূপ অল্প টাকাবই ভাগ্যে ঘটিযা থাকে।

একদিন বাড়ীতে "জামাই এসেছে, জামাই এসেছে" এই কোলাহল শুনিতে পাইলাম। দুইদিন খুব লোকজন, হাস্যপরিহাসে বাড়ী গুলজার রহিল; তাহাব পরদিন ক্রন্দন; মেয়েটি ফুঁপিযা ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। জামাইটাব উপর ভাবী বাগ হইল; মনে হইতে লাগিল, যদি আমি উহার হইতাম, তবে এই দণ্ডেই হারাইযা যাইতাম। যেন হাবাইয়া যাওযাটা আমাব সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন! তোমরা পাঠকেরা বোধ হয় এ কথায় কেহ আপত্তি কবিবেন না; তাহাবা কি শত সহস্রবাব এমন ইচ্ছা করেন নাই যাহা তাঁহাদেব পক্ষে এমনই অসম্ভব? সে কথা যাক্। ঘোড়ার গাড়ী, তাহার পর বেলেব গাড়ী, তাহার পব স্টীমারে চড়িয়া আমি অনেক দূর গেলাম; ক্রমে মেয়েটিব শ্বশুববাড়ী পৌঁছিলাম। বিবাহের পর বধূ এই

প্রথম "ঘরবসত" করিতে আসিল। দেখিলাম, তাহার শ্বশুর শাশুড়ী দরিদ্র; ছেলেটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে, গুটিকত টাকা, বেতন পায় তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসারটি চলিয়া যায়। ছেলের মা-টি রুগ্না মাসেব মধ্যে পনেরো দিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। চারু আসিয়া রন্ধনশালায়, তাঁহার "প্রবেশ নিষেধ" করিল। যে চারু কলিকাতায় অট্টালিকায় বাস করিত, মায়ের কোলের মেয়েটি, কত আদরেব, তিনি কখনও তাহাকে একটি কাজ করিতে দেন নাই, সেই চারু সকালে উঠিয়াই চৌকাঠে জল দিতে লাগিল, ঘব বারান্দা অঙ্গন পরিষ্কার কবিতে লাগিল, দেখিয়া আমার যেমন দুঃখ হইত, তেমনই আহ্লাদ হইত। একটি ঠিকা ঝি ছিল, সে-ই বাসন মাজিয়া কাপড় কাচিয়া দিয়া যাইত; চারু ধুচুনি করিয়া পুকুরের ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনিয়া তরকারি কুটিয়া, মসলা বাটিয়া দশটার সময় স্বামীর "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত করিয়া দিত। চারু তাহাদের পবিবারে আসিয়া যত শোভা করিল, তত কাজ করিল, তত সহ্য করিল। তাহার স্বামীটিও দেখিলাম বেশ মানুষ, অর্দ্ধরাত্রি অবধি তাহাদের কত গল্প হইত, কত হাসিখুশি হইত, কোন কোনও দিন প্রদীপ লইয়া দুইজনে তাস খেলিতে বসিত। কিন্তু তাহাদের এ সুখ অধিক দিন রহিল না। তাহার স্বামী জ্বরে পড়িল, তিন মাস মাহিনা পাইল না; সংসারে দৈন্যদশা ফিরিয়া আসিল। পিতাব নিকট চাক সাহায্য প্রার্থনা কবে নাই—নিজের যতগুলি টাকা ছিল, সব খরচ কবিয়া ফেলিযাছে; শেষে একদিন বাক্স খুলিয়া আমার থাকিবার কৌটটি বাহির করিল। আমাকে লইযা আমার গায়ের সিন্দুর বস্ত্রে ঘষিযা মুছিয়া ফেলিল, তাহার পর জলে ধুইয়া ফেলিল, যখন দেখিল কোথাও সিন্দুরের আর চিহ্নমাত্রও নাই, একটি দীর্ঘনিশ্বাস মনঃকষ্ট পাইয়াছিলাম। পবে ভাবিযা দেখিলাম, আমাদের জাতিটাই বড় খারাপ; আমাদের যে অধিক ভালবাসে সেই নিন্দাব পাত্র হয়। চারু যদি আমায় বিদায় দিবার সময় অশ্রুপাত কবিত, তবে সে কার্য্যটা নিতান্ত অচারু হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সে রাত্রি মুদির তহবিল বাক্সে যাপন করিলাম।

পবদিন প্রভাতে বাক্সে বসিয়া বেচাকেনা, দরদস্তুর, তাগাদা স্তোকবাক্যের বিচিত্র কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। যত বেলা হইতে লাগিল, ততই খরিদ্দার বাড়িতে লাগিল। বেলা নয়টার পব ক্রমে কমিয়া আসিল, ঘণ্টা দুই পবে দোকান একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে দুই এক খানা গোরুর গাড়ীর চাকার ক্যাচকোঁচ্ এবং চালকের জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত অদ্ভুত শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, তখন মাথায় গামছা বাঁধিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মুদির ছেলে আসিয়া বলিল, "বাবা খেয়ে আসগে আমি আগ্‌লুই।" মুদি তহবিল বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির গোছা ঘুন্‌সিতে বাঁধিয়া লইল; ছেলেকে বলিল, "দেখিস যেন খদ্দের ঠকিয়ে না যায়—আর বেশী টাকাব জিনিস চায় ত বলিস্ বসো তামাক খাও, বাবা এল বলে।" মুদি চলিয়া গেল; অল্পক্ষণ পরে গুন্ গুন্ করিয়া মুদিপুত্র গান ধরিল,—

প্রাণপতি করি এই মিনতি
আমার জীবন রামকে বনে দি-ই-ওনা।

একবার পথে নামিয়া দেখিয়া আসিল, বাবা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন সে আপনার ঘুন্‌সি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া তহবিল বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। তৈলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমণ্ডলে শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা বিস্তার করিয়া বলিল—"এঃ আজ, আর মেলা নেই; বেশী নিলে বাবা শালা টপ্ করে ধরে ফেলবে"—বলিয়া আমাকে তুলিয়া লইল আর একটা আধুলি লইল, লইয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিল, বাঁধিয়া সমস্তটা পেটকাপড়ে গুঁজিয়া রাখিল। বাক্স বন্ধ করিয়া তখন আবার পূর্ব্বমত ঘাড় কাঁপাইয়া তাহার সঙ্গীতচর্চ্চা চলিতে লাগিল—

জীবন রামকে সঙ্গে করে, না হয় খাব ভিক্ষা করে,
অযোধ্যা পুরে।
জীবন রামকে বনে দিলে
জীবনে জীবন রবে না—আ-আ-আ। ইত্যাদি।

তাহার আচরণ দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম; ভাবিলাম দেখ একবার, কলিকালে বাপ-বেটার বিশ্বাস নেই, অন্য লোকের মধ্যে থাকিবে কি করিয়া? সেই দিন বৈকালে তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া একটি ভাঙ্গা টিনের পেটরায় বন্ধ হইলাম। এ অবস্থায় আমায় মাস দুই থাকিতে হইয়াছিল।

একদিন শুনিলাম, মুদিপুত্র মামার বাড়ী যাইতেছে। যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল; যাত্রা করিবার সময় আমার থলিটি চুপে চুপে বাহির করিয়া লইযা গেল। পথে যাইতে যাইতে পিতৃদত্ত সদুপায়ে অর্জিত আরও কয়েকটি টাকা থলির ভিতব রাখিয়া দিল গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কৃষাণ, রাস্তামেরামতকারী কন্ট্রাক্টরমিস্ত্রী প্রভৃতি বহুলোকেব নিকট হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সহচারী লোকদিগের নাম, ধাম, গন্তব্যস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সহস্র অনর্থক প্রশ্ন করিতে করিতে, বগলে ছাতা বামহস্তে জুতা ও দক্ষিণে পুঁটুলি লইয়া অবশেষে স্টেশনে উত্তীর্ণ হইল। টিকিট কিনিবাব সময আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমি সেই দুর্গন্ধময় বস্ত্রকাবাগার হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া বাঁচিলাম।

টিকিটবাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন—আমি ভাবিলাম, "বাবা, বহুনি হইল মন্দ নয়, এইরূপ বারকতক হইলেই ত গিয়াছি।" যতক্ষণ টিকিট বিক্রয় চলিতে লাগিল, ততক্ষণ আমি চিৎ হইয়া টেবিলেব উপবই পড়িয়া রহিলাম। আমার উপরে, পার্শ্বে, ঝন্‌ঝন্ করিয়া আরও টাকা আধুলি, সিকি, দুয়ানি, পয়সা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিক্রয় শেষ হইলে, বাবু ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের মুদ্রা পৃথক্ করিয়া গণিয়া সাজাইয়া ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেন। শেষে আলমারি বন্ধ কবিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। আবাব আলমাবি খুলিল। কিয়ৎক্ষণ পবে টিকিটবাবুর একটি কার্য্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আলমারির একটি কোণে একটি টাকা একাকী পড়িয়া ছিল; বেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম সেটি অভিজাতবংশীয় নহে—অর্থাৎ তোমবা যাহাকে বল মেকি টাকা। টিকিটবাবু এক ব্যক্তির নিকট টাকা লইয়া সাঁ কবিয়া সেই টাকা বাহির কবিয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলেন, বলিলেন,—"বদলাইয়া দাও, এটা চলিবে না।" সে বেচাবী তাঁহাব জুয়াচুরী ধরিতে পারিল না; "দোহাই হুজুর আর আমার একটিও টাকা নেই, এই দ্যাখেন আমার কাপড়-চোপড়। যেমন কবে হোক্ দ্যান আমাব নির্ব্বাহ কবে কর্ত্তা।" বাবু রূঢ়স্বরে বলিলেন—"একি কর্ত্তার বাবার ঘরের কথা? কি করে তোমায় নির্ব্বাহ করে দেব? যখন আমার মাইনে থেকে কেটে নেবে তখন কোন বেটাকে ধরবো?" লোকটা যত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, বাবু মহাশয় ততই সপ্তমে চড়িতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসেই সেই টাকা পবে অন্য কাহাবও স্কন্ধে চাপাইতে পারিতেন, কিন্তু কি জানি কেন তিনি রণে ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না। বাবু অবশেষে অগ্নিশর্মা হইয়া তাহার বাকী টাকা পয়সাগুলি মুঠা করিয়া হুহুঙ্কারের সহিত সেই গরীবের গায়ে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন; সে ব্যক্তির আর যাওয়া হইল না। আহা, আবার বোধ হয় তাহাকে পাঁচ সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া একটি ভাল টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে ডাকগাড়ীর পূর্ব্বে এক সাহেব আসিয়া বোম্বাইয়ের টিকিট চাহিলেন। নোট দিয়া তাঁহার যে টাকা ফিরিল, তাহার সহিত আমাকেও যাইতে হইল। আমি সুকোমল চর্মপেটিকায় বদ্ধ হইয়া সাহেবের পকেটে বাসা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে কথায়

বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম, তিনি নূতন ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া ইংলন্ড হইতে আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি ছুটি লইয়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন। আমি মনে করিলাম, এই সুযোগ একবার বিলাতটা বেড়াইয়া আসা হইবে; আশায় উৎফুল্ল হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না; সাহেব জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্বে যে হোটেলে পানাহার করিলেন, তথায় আমায় পরিত্যাগ কবিয়' গেলেন। আমি হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে স্থান প্রাপ্ত হই ়াম।

আমি এই সময় তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম -"ওহে তোমার গল্প যে ক্রমশঃ 'ডল্' হইয়া পড়িয়াছে; আমার পাঠকেরা যে বিরক্ত হই; উঠিবেন; তাহা ছাড়া তোমার জীবনের প্রতি ঘটনা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর যে নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তুমি বরং তোমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিয়া যাও।" মুখনল বলিল—বটে? আচ্ছা তাহাই হইবে। আর আমার জীবনের বেশী বাকীও নাই, কিন্তু আসল ঘটনাগুলিই বাকী বহিয়াছে। উঃ—আমি এত দুঃখ সহ্য করিয়াছি, এত সুখভোগ করিয়াছি যে, তোমরা হইলে আতিশয্যে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইতে। মন দিয়া শুন।

হোটেলের আয়রণচেষ্টে প্রতিদিন টাকা যাহা জমা হয়, পরদিন সমস্ত ব্যাঙ্কে গিয়া পৌঁছে— কিন্তু আমাকে ব্যাঙ্কে যাইতে হইল না। হোটেল-সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। সে সেই দিন বহু বন্ধু সমভিব্যাহারে দূরদেশে শিকার করিতে চলিল। পথখরচের জন্য একখানা নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লইল, তাহার মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। সাহেবতনয়গণ বোম্বাই ষ্টেশনে গাড়ী চড়িয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর এক স্থানে অবতরণ করিল, ষ্টেশনের কিছু দূরে তাম্বু ফেলা ছিল; সেখানে পানাহার করিয়া হিপ্ হিপ্ হুররে নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতে করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। দুম্‌দাম্ বন্দুকের আওয়াজ, বিজাতীয় চীৎকার কখনও ধীরপদে গমন, কখনও ধাবন, কখনও লম্ফন এইরূপ করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সকলে তাম্বুতে ফিরিল। এইরূপ সাহেবের পকেটে থাকিয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতে লাগিলাম। একদিন একটা কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ সাহেবদের লক্ষ্য ব্যর্থ কবিয়া একটা গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। সে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহেবরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না। সেই স্থানে কাঠুরিয়াদের একটি ছোট মেযে কাঁসার মল পরিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, সে বলিল—"সাহেব লোক, আমি প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারি, আমায় কি দিবে আগে বল।" আমার সাহেব, পেণ্টালুনের পকেট হইতে আমাকে বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইল; দেখাইয়া আমাকে বুক-পকেটে ফেলিয়া দিল। মেয়েটি আগে চলিল, সাহেবরা তাহার অনুগমন করিল। শেষে মেয়েটির দর্শিত পথে এক স্থানে খুব ঝুঁকিয়া দুই হাতে ডালপালা ঠেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল, মেয়েটি তখন প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাহিল; সাহেব বন্দুক উঠাইয়া বিকৃত মোটা গলায় বলিল, "ব্যা—গো!" সে বেচারী সুবিধা নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সাহেবের এ আচরণ দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হইতে লাগিল; ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই দুরাচারের কাছ হইতে হারাইয়া যাই। এবার আমার অভীষ্ট সফলও হইল এবং আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের কাল আরম্ভ হইল। সাহেবগণ হরিণের জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিল। যখন সন্ধ্যা হয় হয়, মোটা ঘাসগুলি বেশ দেখা যাইতেছে সূক্ষ্মগুলি ভাল দেখা যাইতেছে না, তখন সাহেবরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপর উঠিল। সেখান হইতে কিছু দূরে খালের ধারে বনহংস চরিতেছিল। সাহেবরা তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল। একটা বৃক্ষের স্থূলবক্রশাখার উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার সাহেব যখন নিশানা করিতেছিল, তখন আমি তাহার বুক-পকেট হইতে ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার পতনশব্দ বোধ হয় শুনিতে পাইল, কারণ

তাহার মুখে "ড্যাম" এইরূপ শব্দের অস্ফুটধ্বনি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে যেমন করিতেছিল, তেমনি করিতে রহিল। আমি এই অবসরে পাথরের উপর দিয়া ঘাসের উপর দিয়া, বালির উপর দিয়া, গড়াইয়া ঠিকরাইয়া একটা গ্যাবভেরেণ্ডার ঝোপের পাশে গিয়া পড়িলাম। সাহেবের বন্দুক সেবার বিশ্বাস রাখিল। পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল কিন্তু দুইটা পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সাহেব মত্ত হইয়া সেইদিকে ছুটিল, আমার কথা আর খেয়াল হইল না।

সাহেবরা চলিয়া গেলে, আমি মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে পড়িয়া রহিলাম। আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি। এমন আরাম, এমন স্বাধীনতা জন্মের পর আমার ভাগ্যে এই প্রথম ঘটিল। সে রাত্রি অতি আহ্লাদে আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘনাইয়া আসিল, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে লাগিল, দূরে কাছে ঝোপে ঝোপে বনপুষ্প ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার গন্ধ এক প্রকার নূতনতব। আমি বাক্সে বাক্সে আতব ও বিলাতী এসেন্স, বাগানে বাগানে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা, কত পুষ্পেব আঘ্রাণ পাইয়াছি, কিন্তু এমনটি আব কোথাও পাই নাই—সে অতি অপূর্ব্ব।

আমি বলিলাম,—"ভুল; তোমার ওটি ভুল। সৃষ্টির আদিকালে বাগানেব ফুলও বনে ফুটিত কিন্তু যে সকল ফুলকে শোভায় সৌরভে শ্রেষ্ঠ বলিযা মানুষ বিবেচনা করিল, তাহাদিগকেই তুলিয়া আনিযা বাগান সাজাইল। বাগানের ফুল অপেক্ষা বনফুলকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া আধুনিক কবিদিগের একটা ফ্যাসান্‌ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবিচার।"

মুখনল বলিল—আমি ত আব কবি নহি, কোনও আধুনিক কাব্য পাঠ করি নাই, তবে আমার সে গন্ধ এত ভাল লাগিযাছিল কেন?

আমি অধ্যাপককোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম—"উহার ভিতব একটু মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতা আছে। যখন তুমি আতব, এসেন্স, বেলা, গোলাপের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভব করিয়াছিলে, তখন তুমি পবাধীন। এখন তুমি স্বাধীন। তখন ভালও মন্দ লাগিবাব কথা, এখন মন্দও সুধাবৎ লাগিবে; সেই শ্লোকটি জান না?"

মুখনল বলিল,—থাম, থাম, অত বিদ্যা আমার নাই। আচ্ছা, না হয় তোমাব থিওবিই মানিয়া লইলাম। শুনিয়া যাও, বৃথা তর্ক করিয়া রসভঙ্গ করিও না। হাঁ কি বলিতেছিলাম? চারিদিক হইতে ফুলের গন্ধ আসিতেছিল, আকাশে দুইটি একটি করিয়া শত সহস্র নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল, জীবজন্তুব কোথাও আব কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল অনেক বাত্রে একটা নেকড়ে বাঘ জল খাইতে আসিয়াছিল, তাহাব পা লাগিয়া একটা পাথব গড়াইয়া আমার অতি নিকট দিয়া নীচে গড়াইয়া গেল। রাত্রি গভীব হইল, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রখণ্ড ভাসিয়া উঠিল, শিশির পড়িতে লাগিল,—সে কি স্নিগ্ধ! প্রাণমন শীতল হইল; ভাবিলাম, এই ভারতবর্ষে সম্রাজ্ঞীর মুখমণ্ডল-চিহ্ন বক্ষে ধারণ কবিয়া কত কোটি কোটি আমাব স্বজাতীয়গণ বিচরণ করিতেছে, তাহাদেব মধ্যে কয়জন এমন কবিযা শিশির জলে স্নান করিতে পাইতেছে? সকলে আয়রণ-চেস্টে না হয় কাঠেব বাক্সে—না হয় চর্ম্মপেটিতে বা রুমালে নয় ত বেশী লোকের কাপড়ের কিম্বা চাদরের খুঁটে ট্যাকে, এবং অবস্থাবিশেষে কচ্ছে আবদ্ধ আছে, ভাল করিয়া নিঃশ্বাসও ফেলিতে পাইতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে কোনও বৃহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই সুকৃতির বলে আমার এই সুখলাভ হইল। যদি কেহ লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে সেও আমার ন্যায় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্তু সে তাহার কতক্ষণ? প্রভাত হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত কবিয়া পকেটে ফেলিবে, আবার যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা! আর আমি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইখানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব, শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাখীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়া

পড়িব, মুখে প্রভাতে রৌদ্র আসিয়া লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা! যদি চলিতে পারিতাম, তবে ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আসিতাম, আর গোটাকতক ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর ঐ কি একটা লাল টুকটুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে; উহার রস নিয়া মুখটি একটু রাঙাইয়া লইতাম। বাসনার এইরূপ নিষ্ফল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে আঘাত করিত, তথাপি বড় সুখে ছিলাম, কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিস্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয় পড়িতেছি। একটু দুঃখ হইল, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। মাসের পব মাস চলিয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গেলাম। আব পাখীর গান শুনিতে পাই না ফুলেব গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা দেখিতে পাই না, আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম। কতকাল পরে বলিতে পারি না, একদিন কিঞ্চিৎ শীতলতা অনুভব করিলাম। দেখিলাম আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিক্ত হইতেছে; ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত হইয়া গেল; আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশটা পুরিয়া গিয়াছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার এমন সুখবোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে! তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রুফ ব্যবহার কর, প্রকৃতিদত্ত একটা মহাসুখ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তোমাদের কথাই স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছপালা উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, যেন কতদিনকার তৃষ্ণা আজ সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিদ্যুতেব ঝিলিক্ দিতে লাগিল; সেই এক চমৎকার ব্যাপার, একবার করিয়া বিদ্যুৎ চমকে, আব আমি নিঃশ্বাস বন্ধ কবিয়া থাকি—যতক্ষণ মেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলিব না। সে একটা খেলা মাত্র তাহাব কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে জল ছাড়িযা গেল, পূর্ব্বদিকে রামধনু দেখা দিল; ক্রমে সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইযা আসিল; বর্ষাকাল, প্রাযই এইরূপ জল হইত,; ক্রমে বর্ষা ছাড়িয়া শবৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবাব ঢাকা পড়িয়া দুরন্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা কবিলাম। আবার বর্ষাকালে সহসা একদিন বাহিব হইলাম। এইরূপ প্রতিবৎসর হইতে লাগিল; কযবৎসব কাটিয়া গেল, তাহাব কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই; একদিন আমাব অবস্থা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডিটেকটিভ-পুলিশেব এক দেশীয কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে সেই বনে প্রবেশ কবিযা, যেখানে আমি পড়িযাছিলাম, তাহাব অতি নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। যেই আমাকে দেখিতে পাওযা, অমনি অশ্ব হইতে লম্ফ দান, এবং বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ।

তুমি আমাব জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; সুতরাং কেমন করিয়া আমি পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পোষ্ট আফিসে এবং তৎপরদিন সেভিংস্ ব্যাঙ্কেব টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট ও ক্রমে ক্রমে ফল-বিক্রেতা, সাহেবের খানসামা, মৎস্যবিক্রেতা, আয়কব কর্ম্মচারী, গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিযা মিরজাপুরের এক পূজারীর হস্তে আসিয়া পড়িলাম, তাহাব সবিস্তার বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। পূজারী মহাশয় আমাকে ট্যাকে গুঁজিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, কম্পিতস্বরে উচ্চাবণদুষ্ট সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ সুমসৃণ মস্তকখানিতে সঘন করসঞ্চালন করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতেছিলেন। সহসা তাঁহাব নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি তাঁহার ট্যাক হইতে স্খলিত হইয়া অতি কোমল মৃত্তিকাশয়ন লাভ করিলাম। স্নানান্তে তীরে উঠিলে তিনি জানিতে পারিলেন আমি হারাইয়াছি। আবার জলে নামিয়া দুই দণ্ড ধরিয়া ডুব পাড়িয়া অনেক ব্যর্থ অন্বেষণ করিলেন; আমার আশে পাশে তাঁহার হস্ত ধরিয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি যেখানকার সেইখানেই রহিলাম। স্রোতে স্রোতে চুল পরিমাণ সরিয়া সরিয়া সমস্ত

দিবারাত্রে, যেখানে পড়িয়াছিলাম সেখানে হইতে দুই হস্ত পরিমিত দূরে দূরে গিয়া পড়িলাম। সেখানে মগ্ন-জল, সুতরাং পরদিন স্নানের বেলা কেহই সেখানে আসিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণিগণের আহার, ক্রীড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত উদ্যম দেখিতে লাগিলাম। সে রাজ্য সম্পূর্ণ অরাজক। সবল দূর্ব্বলের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে; কেহ তাহার প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয় না। কুম্ভীর রাজার মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। আর করিবেনই বা কাহার সঙ্গে? কেহ তাঁহার নিকট ঘেঁসিতেই সাহস করে না। মৎস্যগণ খুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুনা পুঁটিরা কিছু চপল প্রকৃতির, প্রপিতামহ, রোহিতের স্কন্ধে, পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্কটকুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাড়া নাড়িতেছে। এইরূপ জলবাসে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া একদিন আমাকে স্বীয় কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্দমের আচ্ছাদন রাখিয়া গেলেন; বোধ হয় আশা ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটি প্রৌঢ়া দাসী তীরে বসিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছিল সে আমাকে দৈবধন বলিয়া, ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করণান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে। তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, সুতরাং গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে ক্রমে আমি বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট স্বরূপ কেমন করিয়া তোমার হাতে আসিয়া পড়িলাম, সে কথায় আর কাজ নাই, বিশেষ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু হায় হায়! তাহার পর যে বিপদ ঘটিয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই বলিতে হয়। তুমি যখন গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, একটা নূতন মুখনল গড়াইবার জন্য স্বর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভগ্নাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তখনি আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার দিতে দিতে যখন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলাস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তখন উঃ—"

আমি বলিলাম—ভাই। আর কাজ নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন? আমার দোষ কি?"

মুখনল বলিল,—তোমার আর দোষ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন পাই নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিও। [ভাদ্র, ১৩০৩]

বাস্তুসাপ

॥ ১ ॥

বৈঠকখানার ঘড়িতে চারিটা বাজিবামাত্র দিদিমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিছানার উপর বসিয়া বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা দুর্গা।" পাশে বিধবা নাতিনী সুরবালা ঘুমাইতেছে, তাহাকে ডাকিলেন, "সুরি ও সুরি ওঠ্, আজ যে অমাবস্যে।"

জৈষ্ঠ্যমাস সারারাত্রি খুব গ্রীষ্ম গিয়াছিল। এখন খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। সুরবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দিদিমা আর অপেক্ষা করিতে পারেন না; সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে আর গঙ্গাস্নানের পূর্ণফল হইবে না। তাই আবার ডাকিলেন, "সুরি, ও সুরি!"

সুরবালা উঠিয়া বলিল, "ওমা তাই ত, ভোর হয়ে গেছে যে!"

দিদিমা বলিলেন, 'সব জিনিসপত্তর গোছান আছে, চল্ শীগগির বেরিয়ে পড়ি।"

কাপড, গামছা, নামাবলী ইত্যাদি লইয়া দুইজনে বাহির হইলেন। তখন অল্প আলো হইযাছে। উঠানে নামিয়া দিদিমা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; সুরবালা তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

খিড়কী দরজার কাছে যে আতাগাছ আছে, তাহার নিকট আসিয়াই দিদিমা 'ওগো মাগো! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুরবালা সভয়ে বলিল, "কি দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "হায় হায় হায়, সর্ব্বনাশ হযেছে।"

সুরবালা বলিল, "কি? কি হযেছে দিদিমা?"

দিদিমা অঙ্গুলি দিয়া আতাগাছের তলা দেখাইয়া দিলেন। ভযে ভযে নিকটে গিয়া সুরবালা দেখিল, একটি ছোট মোটা কালো সাপ, রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সুরবালা বলিল, "হ্যাঁ দিদিমা, বাস্তু?"

দিদিমা বলিলেন, "বাস্তু বইকি। দেখছিস নে? আহাহা! এমন মহাপাপ কে করলে? বাবা, কে তোমায় এমন করে হত্যা করলে?"

দিদিমার চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গঙ্গাস্নানে যাওযা আর হইল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া, হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ঠক্‌ঠক করিযা কাঁপিতে লগিল, হাতের মালা দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দিদিমার ভাবগতি দেখিযা সুরবালা কাঁদিযা ফেলিল। বলিল,"কি হবে দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন "হবে আর কি---আমার মাথা হবে। ভিটের ব্রহ্মহত্যে হল। এ বংশ কি আর থাকবে? নির্ব্বংশ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে কোথায দাঁড়াব হে নারাযণ। হে মধুসূদন। হায় হায় হায়।"

একটা ঘোর আশঙ্কায় সুরবালার মন বিপর্য্যস্ত হইল। সে চলৎশক্তি রহিত হইল। পিতামহীর জানু জড়াইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এই সময় উঠানে দূরে শ্বেতবস্ত্র -পরিহিতা একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল।

দিদিমা বলিলেন,"কেও, বউমা?"

"হ্যাঁ, কেন মা?"

"এদিকে এস।"

সুরবালার মা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীতা হইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন,"এখনো গঙ্গাস্নানে যাওনি মা?"

"আর মা, গঙ্গাস্নানে যাব! মা গঙ্গা এখন শীগগির নিলে বুঝতে পারি। সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি? কি হয়েছে মা?"

দিদিমা সব খুলিয়া বলিলেন।

বধূ শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

বলিলেন, "বেশ করে দেখেছ, বাস্তুবাবাই বটে?"

"বাস্তুবাবা বইকি। ঐ দেখ না, আতা-তলায় পড়ে রয়েছেন। আজ তিন পুরুষ ধরে অধিষ্ঠান করে রয়েছেন, বাবার কৃপায় কোনও বিপদ আপদ হয়নি। এইবার সংসার ছারখার হয়ে যাবে।"

ক্রমে বাড়ীর সকলে উঠিল। বাড়ীতে একটা বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলের মুখ শুষ্ক। কর্ত্তা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়া রাগে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কে এ কাজ করেছ বল, নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেবো।"

এ কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় একজন বলিল, "ঐ দেখ, আতাগাছের তলায় রক্তমাখা লাঠি পড়ে রয়েছে। ভোজুয়ার লাঠি। আর কিছু নয়, সেই বেটার কাজ।"

সকলে বলিল, "নিশ্চয় ওরই কাজ।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভোজুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন খোট্টা – কয়দিন হইল এ বাটীতে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে । দেহের বর্ণটা মহিষের মত কালো, মাথার অগ্রভাগ কামানো। বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর । এই নূতন বাঙ্গলা দেশে চাকরি করিতে আসিয়াছে।

কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, "ভোজুয়া ইধার আও।"

ভোজুয়া তাঁহার কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন, "তোম সাপ মারা হ্যায়?"

'কাহে মারা?"

"সাপ আদ্‌মিকা দুশমন হ্যায়, মারেগা নেহি? মারা ত ক্যা হুয়া।"

কর্ত্তা বলিলেন "ক্যা হুয়া রে শালা? তোর বাবার সাপ?"

ভোজুয়া পিছু হটিয়া উদ্ধতভাবে বলিল "মু সামালকে বাত কহনা বাবু।"

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া, পাগলের মত ভোজুয়ার উপর পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। গলা ধরিয়া নিকাল যাও শালা, নিকাল যাও বলিতে বলিতে দরজার বাহির করিয়া দিলেন।

॥ ২ ॥

ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। প্রতিবেশীরা একে একে আসিয়া সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া পুরোহিত আসিলেন। দিদিমা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, "বাবা এ বিপদে রক্ষে কর। আমার সংসার যাতে বজায় থাকে বাবা তাই কর ।"

পুরোহিত বলিলেন, ' ভয় কি মা, কোনও ভয় নেই। তোমরা ত আর করনি— তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে ভিটের ব্রহ্মরক্তপাত হল, এইটেই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

একজন প্রতিবেশী বলিলেন, "পুরুতমশায়, এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য এখন—প্রথম কর্ত্তব্য সৎকার করা—ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে সর্পের মুখে একটা তাম্রখণ্ড দিয়ে, গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে।"

পাড়ার ছেলেরা যেই শুনিল গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া মৃত সর্পকে দাহ করা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্থির করিল সেদিন ইস্কুলে যাইবে না।

সর্পকে বহন করিবার জন্য খাটুলী প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, " তোমরা

কোন চিন্তা কোরো না। সর্পজোনিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর। ভাদ্রমাসে নাগপঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান আর একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলো, তা হলেই সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। বাস্তুসাপ হচ্ছেন কুলদেবতা কিনা। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে—

সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ
পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়োর্বাস্তুদেব নমোস্তুতে।"

এদিকে খাটুলি তৈয়ারী হইল। সর্পের মুখে তাম্রখণ্ড দিয়া খাটুলীতে তুলিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোনও বয়স্ক লোক তাহা বহন করিতে রাজি হইল না। সকলেই বলিল সাপকে বিশ্বাস নেই, মরে আবার বেঁচে ওঠে শুনেছি। ছেলেরা বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, আমরা যাব।"

ক্ষুদ্র খাটুলিখানি দুইদিকে দুইজনে ধরিয়া লইয়া চলিল। পরিবারস্থ পুরুষগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে লগিল যখন শ্মশানঘাটে পৌঁছিল, তখন এত লোক জমিয়াছে যে গ্রামের জমিদার মরিলেও তত লোক জমিত কিনা সন্দেহ।

যথারীতি শবদাহ হইল। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

। ৩ ।।

এই অস্বাভাবিক শোকের মধ্যে সাতদিন কাটিল। সন্ধ্যাবেলায় বড়ঘরের বারান্দায় বসিয়া কর্ত্তা ধূমপান করিতেছেন। দেওয়ালে একটি বাতি জ্বলিতেছে। সদর দরজা খোলা ছিল। আস্তে আস্তে ভোজুয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল তাহার হাতে একটা বৃহৎ হাঁড়ি মুখে ময়দা দিয়া সরা আঁটা।

ক্রমে সে আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল। দিদিমা দূর হইতে বলিলেন, 'কে রে ভোজুয়া নাকি?' সে প্রথমতঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ কোথাও নেই। দেখিয়া বলিল, "বাবু হাম্ তুমহারা এক্ঠো সাপ মার ডালা—উস্‌কা বদলা দোঠো সাপ লায়া ইয়ে লেও।"—বলিয়া হাঁড়িটা দড়াম করিয়া কর্ত্তার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা সাপ বাহির হইয়া পড়িল

কর্ত্তা মহাভীত হইয়া 'ওরে বাপ রে' বলিয়া লাফাইয়া পলাইতে গেলেন, কিন্তু সাপ দুইটা তাঁহার পায়ে দুই তিন ছোবল বসাইয়া দিয়া, দ্রুতবেগে কোথায় অদৃশ্য হইল। কর্ত্তার চীৎকারে বাড়ীশুদ্ধ লোক আসিয়া জড় হইল। আসিয়া দেখিল তিনি মাটিতে পড়িয়া চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কেবল বলিতেছেন--হরে নারায়ণ ব্রহ্ম হরে নারায়ণ ব্রহ্ম।'

দিদিমা আকুল হইয়া তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়ে গিয়াছে, দূর হইতে তিনি তাহার সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বাস্তুহত্যার প্রতিফল হাতে হাতেই আরম্ভ হইল। সুরবালা ও সুরবালার মা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল, পুরোহিত ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, নয়ত বাস্তুবাবা তুষ্ট হইলেন না কেন?

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল, সকলের কথা অনুসারে সে রোঝা ডাকিতে ছুটিল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বেদিয়া বাস করে, সে চারিপাশের বহু গ্রামের সর্প-বৈদ্য। বেদিয়া আসিলে তাহার কথায় প্রকাশ হইল, তাহারই নিকট হইতে একটা খোট্টা পাঁচ টাকা দিয়া একজোড়া সাপ কিনিয়াছিল।

বেদিয়া বলিল, "সেই খোট্টা শালারই এই কাজ ? এমন জানলে কি আমি তাকে সাপ বেচি মশাই? পাঁচ টাকা ছেড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেও দিতাম না। সে বললে আমি সাপ মেরে ওষুধ তৈরি করব। হায় হায় হায়।"

নাড়ী টিপিতে টিপিতে তাহার মুখ কিন্তু ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। "কোন ভয় নেই,

আপনাদেব আশীর্ব্বাদে আমার পুণ্যিব জোবে, তাকে দুটো বিসদাঁত ভাঙ্গা সাপ দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ বাঁচলাম। নবহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলাম। বিষের কোনও লক্ষণই নেই— শুধু একটু রক্তপাত হয়েছে আব ভয়ে অবসন্ন হযে পড়েছেন। কোনও চিন্তা নেই।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "জয় মা দুর্গা।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়ই জান, বিষ ছিল না?

বেদিয়া রাগিযা বলিল, "আমি আর জানিনে মশাই? আমি হলাম গিয়ে সাপেব রোঝা।"

সে যাত্রা কর্ত্তা বক্ষা পাইলেন। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, খোট্টা চাকব আব বাড়ীব ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই। বৈশাখ, ১৩০৯

ভুলশিক্ষার বিপদ

বডদিনেব ছুটিটা মধুপুবে গিযা যাপন কবিবাব জন্য তাগাদাব উপব তাগাদা পাইতেছি, না গেলে আব চলে না। মধুপুবে আমাদেব একটি ছোট বাঙ্গলা আছে। শীতকালে প্রাযই আমাদেব বাড়ীব কযেকজন কবিযা সেখানে গিয়া অবস্থান কবেন। এবাব বড়দিদি নিজেব পুত্র কন্যাদেব লইযা সেখানে অবতীর্ণ, সুবেন ভাযা এবাব বি এ পবীক্ষা দিবেন - তিনি সেখানে আপন পাঠ অভ্যাস এবং পবিবাবেব বক্ষণাবেক্ষণ কবিতেছেন। দিদিব মেয়ে মিনি বা মেনকাবাণী আমাব মাবাত্মক বকম শাসাইযাছে। লিখিযাছে এবাব যদি তুমি না আস তবে আব তোমাব মাথাব একটিও পাকা চুল তুলে দেবো না— যাও। অ... কি কবিয়া থাকি? সুতবাং জিনিসপত্র গুছাইযা অপবাহ্ন তিন ঘটিকাব সময হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

উঃ— সেদিন কি ভীড। —কিন্তু একটা এই শুভ গ্রহ, শুধু ভদ্রলোকেব ভীড। অধিকাংশই নব্যযুবক—উত্তম পবিচ্ছদে আবৃত সুগন্ধময। সকলেবই মুখ প্রফুল্ল, হাস্য পবিহাসে প্রদীপ্ত। মনে হইল যেন কলিকাতাব অধিকাংশ তরুণবিবহী যুক্তি কবিয়া এই ট্রেনেই শ্বশুবালয যাত্রা কবিয়াছে। এরূপ জনসংঘ ক্লান্তিজনক নহে—-বরং তাহাব বিপরীত।

গাড়ী ছাড়িল। যুবকগণ উচ্চহাস্যে ও সিগাবেটেব ধূমে কক্ষ্ণ... সমাক্রান্ত কবিয়া তুলিল। ব্যাণ্ডেল অবধি খুব ভীড বহিল—তাহাব পব হইতে একটু কমিতে আবম্ভ কবিল।

পাণ্ডুযা ষ্টেশনে একটি স্থূলকায ভদ্রলোক আসিয়া আমাদেব কামবায প্রবেশ কবিলেন। তাঁহাব মাথায় একটি কালো কম্ফর্টাব পাগড়ীব আকাবে জড়ান - চোখে রূপাব ফ্রেমযুক্ত চশমা, দেহটি একজোড়া সেকালেব দৌড়দাব হাসিযাবুটে গঙ্গাজলী শালে আবৃত, পায়ে ফুলমোজাব উপব ইংবাজি জুতা। বযস বোধ কবি যাটেব কাছাব... হইবে।

বাবুটিব সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছিল, জিনিষপত্রও বিস্তব। জিনিষপত্রে কামরা বোঝাই হইয়া গেল। নীচে হইতে একজন বলিল, 'সব উঠেছে ত—একবাব গুণে নিন।' শ্রবণমাত্র বাবুটি এক দুই কবিয়া উচ্চৈস্বরে জিনিস গণনা আবম্ভ কবিলেন, গাড়ী ছাড়িবাবও ঘণ্টা দিল।

দুইবার গণনা কবিয়া বাবুটি বলিলেন, "ওবে ছটা কেন বে—কি ওঠেনি বে দ্যাখ্ দ্যাখ্।"

তখন গাড়ী চলিতে আবম্ভ কবিয়াছে। বাবুটি হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহিব কবিয়া প্রাণপণে চীৎকাব করিয়া উঠিলেন—"হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—"

একজন গাড়ীর সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তাঁহার হাতে হাঁডিটা দিতে গেল। কিন্তু তিনি

ধরিতে পারিলেন না; হাঁড়িটা পড়িয়া গেল। আমরা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার শব্দটা শুনিতে পাইলাম।

ভদ্রলোকটি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সবেগে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে আমাকেই একটু মুরুব্বি গোছেব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখলেন মশাই? একবার কাণ্ডখানা দেখলেন? দিলে হাঁড়িটে ফেলে।"

আমি লোকটার এই নালিসে অত্যন্ত আমোদ অনুভব কবিলাম। কষ্টে হাসি চাপিযা বলিলাম, "কি ছিল হাঁড়িতে?"

"মশাই—খাবার ছিল। এক হাঁড়ি খাবার ছিল—দু'টাকাব মাল। গেল প্ল্যাটফর্মে পড়ে ধূলো মাখামাখি হয়ে। ভোগে হল না। সেই বাড়ী থেকে পৈ পৈ কবে বলতে বলতে আসছি—ওবে দেখিস, যেন খাবাবেব হাঁড়িটে ভুলে যাসনে—ওবে দেখিস, যেন খাবাবেব হাঁড়িটে ভুলে যাসনে!--তা সেই খাবাবের হাঁড়িটেই ভুলে গেল? এক হাঁড়ি খাবার মশাই। ভোগে হল না। আমি আবাব বাজাবেব খাবাবগুলো খাইনে কিনা। ও আমাব আদৌ সহ্য হয না। আমি যেখানে যাই, নিজেব খাবাব নিজে সঙ্গে কবে নিযে যাই। আমাব পিসিমা আজ ভোব পাঁচটাব সময উঠে লুচি ভাজতে বসেছেন। (এখানে বাবুটি আঙুল গণিতে আবম্ভ করিল) লুচি ছিল, কচুবি ছিল, আলুভাজা ছিল, বেগুনভাজা ছিল, মোহনভোগ ছিল, মোল্‌নাইযেব গোল্লা ছিল, আধসেব-- মোল্‌নাইযেব গোল্লা খেযেছ কখনও?"

বক্তৃতাব আরম্ভ হইতে সহযাত্রী যুবকগণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এই প্রশ্নে হাহা কবিয়া হাসিযা ফেলিল। আমি যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকাবে বলিলাম, "কই মনে ত পড়ে না।"

বাবুটি বলিলেন, "তা হলে খাওনি। খেলে মনে থাকত। সে ভোলবাব জিনিস নয।"

আমি বলিলাম, "খুব সম্ভব।"

"মোল্‌নাইযেব গোল্লাব নামডাক শোননি?"

"না—ও বিষয়ে বড চর্চ্চা বাখিনে।"

"কোথা থেকে আসছ?"

"কলকাতা।"

"নিবাস?" "কলকাতা।"

"আঃ--নিতান্ত ক্যালকেশিযান তুমি! আচ্ছা মোল্‌নাইযেব গোল্লাব একটা গল্প বলি শোন। দাঁড়াও তামাক একছিলিম সেজে নিই।" এই বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে লাগিলেন।

এতকাল বেলপথে যাতাযাত কবিতেছি, এমন অদ্ভুত মনুষ্যেব সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয নাই। হায হায, এমন বক্তা বঙ্গীয বাজনীতিক্ষেত্রে স্থান পাইল না। মনে কবিলাম, একটা বড সুবিধা হইযাছে। মধুপুব ট্রেনটা পৌঁছে অতি বিশ্রী সমযে—ঠিক ঘুমেব সময। ঘুমাইযা পড়িলে মধুপুবে ছাড়িযা যাওযাব আশঙ্কা। এই বাগ্মীবরেব কল্যাণে জাগিয়া থাকিতে পাবিব, নিদ্রাদেবী দূবে থাকিযা নিজ মন বক্ষা কবিবেন।

তামাক সাজিতে সাজিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবুব নাম?"

"মহানন্দ চট্টোপাধ্যায।"

"আমাব নাম শ্রীমদনগোপাল দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়। নিবাস মোল্‌নাইয়েব নিকট ইলছোবা গ্রাম। জেলা বর্দ্ধমান। যজ্ঞেশ্বব পণ্ডিতেব সন্তান আমবা, নৈকষ্য কুলীন। যজ্ঞেশ্বব পণ্ডিতের সাত পুত্র ছিলেন—"যজ্ঞেশ্বরেব সুত সাত—শঙ্কব জানকীনাথ।"

আমরা সেই শঙ্কর জানকীনাথেব সন্তান।"

এ বক্তৃতাটি এত সংক্ষিপ্ত হইল, তাহাব কারণ মদনগোপালবাবু কলিকায় ফুঁ দিতে আরম্ভ কবিলেন। তাঁহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে করুণভাবাপন্ন ছিল—তাহাব কারণ বোধ

হয সদ্যপ্রাপ্ত সন্দেশেব শোক। এখন ববং একটু গর্ব্বিত দেখাইতে লাগিল, তাহা বোধ হয় কুলগৌববেব স্মৃতিজনিত। যাহা হউক, আমি পবম কৌতুকেব সহিত লোকটিব পানে চাহিতে লাগিলাম। গাড়িও বর্দ্ধমানে পৌঁছিল।

আমাব চুকট ফুবাইযাছিল, নামিযা কেলনাবে গেলাম চুকট কিনিতে। যতক্ষণ গাড়ী ছাড়িবাব শেষ ঘণ্টা না হইল, ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মেব উপব পাযচাবি কবিযা বেড়াইতে লাগিলাম।

গাড়ী ছাড়িলে দেখিলাম, আব সকলে নামিয়া গিযাছে, শুধু আমবা দুইজনে আছি।

মদনগোপালবাবু আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "তাবপর—সদানন্দবাবু—"

আমি বাধা দিযা বলিলাম, "আজ্ঞে আমাব নাম মহানন্দ।"

"ওহো ঠিক ঠিক। মহানন্দবাবু কতদূব যাওযা হবে?" "মধুপুব।"

"আমি যাব কাশী। তুমি ত এখনি পৌঁছে যাবে হে। দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা জোব। আমায যেতে হবে আজ সমস্ত বাত, কাল সমস্ত দিন। তাই ত বলছি কিনা, এই সমস্ত বাত সমস্ত দিন যে গাড়ীতে কাটবে, কি খেযে প্রাণধাবণ কবি? কাল সন্ধ্যাবেলা কাশী পৌঁছে যাব এখন। কাশীতে আমাব মা ঠাকুবণ বযেছেন কিনা। আজ তিন বৎসব তিনি কাশীবাসী। বৃদ্ধ হযেছেন—বযস সত্তব বৎসবেব উপব হযেছে। এখনও প্রত্যহ ভোবে উঠে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিযে স্নান কবে আসেন—কি শীত—কি গ্রীষ্ম—কি বর্ষা—কি বাদল। গত ভাদ্র মাস থেকে একটু একটু ঘুসঘুস কবে জ্বব হচ্ছে শুনেছি। তাই একবাব ভাবলাম দেখে আসি। আছেন ভাল জাযগাতেই— কোন চিন্তাব কাবণ নেই। তবে কিনা কানে শুনে, সন্তান হযে কি কবে চুপ কবে থাকি বলুন। আমাব গুরুদেবেব মধ্যম পুত্রটি কাশীব কলেজে ধ্যাপক সপবিবাবে থাকেন সেখানে, সেইখানেই আমাব মা ঠাকুবণকে বেখে দিযেছি। গু- ত্রটি অতি উপযুক্ত লোক। ন্যাযে তাঁব সমকক্ষ কাশীতে নেই বল্লেই হয। আমাবই বযস। একত্র খেলা কবতাম সেই অল্প বযস থেকেই বুদ্ধিব সূক্ষ্মতা দেখা গিযেছিল—"

আমি বলিলাম, "মশাই চুরুট খান কি?"

"চুরুট? খাই কখনও কখনও। ছেলেবেলায যখন কলকাতায ছিলাম, ইংর্জ্জে পড়তাম, তখন খুবই খেতাম। তখন তোমাদেব ও বাড়সাই ফাড়সাই ওঠেনি।—ভাল চুরুট?"

আমি বলিলাম, "মন্দ নয, দেখুন না।"—বলিযা আমাব সিগাব- কেস খুলিযা তাঁহাব সম্মুখে ধবিলাম। তিনি একটি চুরুট লইযা ধবাইযা লইলেন, আমিও একটি ধবাইলাম।

গাড়ী তখন বাণীগঞ্জ পাব হইযাছে। দুইধাবে অনেক কয়লাব খনি। স্থানে স্থানে স্তূপাকাবে কয়লাব আগুন ধবাইয়া দিয়াছে—খুব আলো হইয়াছে। কাছে খোলা ইঁট সাজাইযা অস্থায়ী ঘব নির্ম্মাণ করিয়া কুলিবা বসিয়া আছে—কেহ বা খাদ্য পাক কবিতেছে।

আমাবও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ভাবিলাম এইবেলা কিছু খাইয়া লই। সঙ্গে আমাব টিফিন বাস্কেট ছিল, তাহাতে বাড়ী হইতে খাবাব আনিয়াছিলাম। মদনগোপালবাবুব জিনিসপত্র সবাইযা কষ্টে টিফিন বাস্কেট বাহিব কবিলাম। ভাবিলাম, আমি আহার কবিব, আব আমাব এই সহযাত্রীটি অভুক্ত থাকিবেন? অথচ যদি আহ্বান কবি, তবে খাইবেন কিনা তাহাবও স্থিবতা নাই—কাবণ আমাব এ জিনিসগুলি ঠিক হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থিব কবিলাম, বলিয়াই দেখি, খান উত্তম—না খান কি কবা যাইবে?

টিফিন বাস্কেটটি বেঞ্চেব উপব তুলিয়া খুলিয়া বলিলাম, "মদনবাবু—আপনি খাবাব যা এনেছিলেন, তা ত গেল। আমাব সঙ্গে কিছু খাবাব বয়েছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনাব তবে দু'জনে খাওয়া যায়।"

মদনবাবু আমাব বাস্কেটেব প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রপাত কবিয়া বলিলেন, "কি আছে তোমাব ওতে?"

আমি (আঙ্গুল না গণিয়া) বলিলাম, "রুটি আছে, ডিম আছে দু'তিন রকম মাংস আছে মাখন-টাখন আছে।" "হিন্দু মাংস? হোটেলের নয় ত?"

"মাংস হিন্দু। আমার বাড়ীর ব্রাহ্মণের পাক করা, শুধু রুটিটি হোটেলের—নইলে আর সব জিনিস বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তৈরী।"

মদনবাবু বলিলেন, "তা হোক, হোটেলের রুটিতে আপত্তি নেই। যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরেজি পড়তাম, তখন হোটেলের রুটি ঢের খেয়েছি। কত কি খেয়েছি সে সব দিনে ছাত্রসমাজ ভারি উচ্ছৃঙ্খল ছিল।"—বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া, মাংসাদি বাহির করিয়া প্লেট সাজাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছুরী কাঁটা ব্যবহার করেন কি?"

"না ভাই ওসব পোষাবে না। দাও হাতে করেই খাই।"

খাইতে খাইতে মদনগোপালবাবু হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সার মত এই যে, মুসলমানের হাতে খাইতে নাই এ কথা শাস্ত্রে পাওয়াই যাইতে পারে না, কারণ শাস্ত্র যখন তৈয়ারি হইয়াছিল তখন মুসলমান জন্মগ্রহণই করে নাই। তাহারা যখন আসিয়া আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখনই আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এ প্রকার লোকাচারের প্রবর্ত্তন করিলাম।

মাংস ফুরাইলে মদনবাবুকে বলিলাম, "রুটি আরও রয়েছে। মাখন আছে, জ্যাম, আছে, মার্ম্মালেড আছে, কি নেবেন?"

মদনগোপালবাবু বলিলেন, "মার্ম্মালেড? মার্ম্মালেড? মার্ম্মালেড দাও একটু খেয়ে দেখি—কখনও খাইনি।"

দিলাম। আহারান্তে গেলাসে জল লইয়া জানালার বাহিরে তিনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। আবার শালখানি উত্তমরূপে দেহে জড়াইয়া বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহাকে আর একটা চুরুট দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন—"নাঃ—তামাক সাজি। হুঁকো কলকের কাছে কেউ লাগে নারে দাদা!"

তামাক সাজা হইলে আমি বলিলাম, "কই মদনবাবু। সে মোলনাইয়ের গোল্লার গল্পটা বললেন না?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিলাম। আমাদের আমলের কথা নয় এ—আমরা গল্প শুনেছি! —গল্পটা এই। বর্দ্ধমানের মহারাজ মোলনাইয়ের গোল্লা খেয়ে ভারি খুসী। তাই মহারাজ হুকুম করলেন—মোলনাইয়ের যে প্রধান মোদক, তাকে নিয়ে এস, বর্দ্ধমানে বসে সে গোল্লা তৈরি করুক। রাজার হুকুম, কি করে, প্রধান মোদক চাটু খুন্তী নিয়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হল। গোল্লা তৈরি করলে, কিন্তু সে রকম স্বাদটি হল না। রাজা বললেন— মোদকের পো! কই সে রকম ত হল না!" মোদক জোড়হস্ত করে বললেন (এই স্থানে মদনগোপালবাবু স্বয়ং জোড়হাত করলেন)— মহারাজ ভয় ক'র না নির্ভয় ক'র? মহারাজ বললেন—ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।' মোদক বললে—মহারাজ! মোল্‌নাই থেকে আমাকেই নিয়ে এসেছেন, মোল্‌নাইয়ের মাটিও আনতে পারেন নি, মোল্‌নাইয়ের জলও আনতে পারেন নি।'—বলিয়া মদনবাবু অত্যন্ত হাসিতে ও কাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসি ও কাশি থামিলেই বলিলেন, "মোল্‌নাইয়ের গোল্লা না খেলে তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আমি কাশী থেকে ফিরে আসি দাঁড়াও। একটা রবিবার কি শনিবার আমাদের এখানে আসতে পার না?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা তা হলে তোমায় নিমন্ত্রণ করে পাঠাব—এস! ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব— তোমায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুয়া থেকে ইলছোবা বেশী দূর নয়। মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খাইয়ে দেব—আর আমাদের দেশী মার্ম্মালেডও খাইয়ে দেব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "দেশী মার্ম্মালেড হয় নাকি? তা ত জানিনে।"

মদনগোপালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "অ্যাঃ তুমি নিতান্ত একবারে ক্যালকেশিয়ান্! খালের বাইরের আর কোন খবর রাখ না! ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছের লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে বড় বড় তক্তা হয়ে।"—বলিয়া তিনি পুনশ্চ হাসিতে ও কাসিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "মার্ম্মালেড—বেলের মোরব্বা গো। কেন, কলকাতাতেও ত পাওয়া যায়।"

আমি চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়া বলিলাম, "মাফ করবেন, মার্ম্মালেডের বেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

"কি?"

"মার্ম্মালেডের সঙ্গে বেলের কোন সম্পর্ক নেই।"

"কেন? মার্ম্মালেড মানে কি? বেলের মোরব্বা নয়?" "না।"

"বিলক্ষণ। তুমি বললেই শুনব? আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি মার্ম্মালেড মানে বেলের মোরব্বা।"

"মাষ্টার আপনাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছিল।"

"বেলের মোরব্বা নয় ত কিসের মোরব্বা?"

"যদি মোরব্বাই বলেন ত কমলানেবুর মোরব্বা।"

এই কথা শুনিয়া মদনগোপালবাবু চমকিয়া উঠিলেন। ভীতস্বরে বলিলেন, "কমলানেবুর মোরব্বা?"

আমি ভাবিলাম ব্যাপারখানা কি? বিস্মিত হইয়া বলিলাম। "কমলানেবুর বইকি। কমলানেবুর হলে একেবারে মিষ্টি হত। কমলানেবুর যদি, ত স্বাদ একটু মিষ্টির সঙ্গে কষা কষা কেন?"

"আমাদের এ রকম সাধারণ কমলানেবুর নয়। স্পেনে সেভিলদেশে একরকম কমলানেবু হয়, দেখতে ঠিক এই রকমই, তার স্বাদ একটু কষা। সেই নেবুতে মার্ম্মালেড হয়।"

মদনগোপালবাবুর মুখে ভয়ের স্থানে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। বলিলেন, "ঠিক জান তুমি?" স্বরটি কিছু রুক্ষ।

"ঠিক জানি।"

মদনবাবু আমাকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "ঠিক জানি!"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ভয়ানক রাগও হইল। বলিলাম, "মশাই! মুখ ভেঙ্গানোটা অনেকে ভদ্রতার লক্ষণ মনে করে থাকেন। এই বলিয়া আমি জানালার দিকে পিঠ করিয়া বেঞ্চের উপর পা রাখিয়া কক্ষের ছাদে বাতির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মদনগোপালবাবু বলিলেন, "মনে করে না ত রাজ্জা করে! তোমার সঙ্গে কি আমার শত্রুতা ছিল? আমি আজ বিশ বচ্ছর কমলানেবু খাইনি—তুমি কি জন্যে আমায় কমলানেবু খাইয়ে দিলে?"

আমি বলিলাম, "কেন? কমলানেবু ত আর বিষাক্ত জিনিস নয়।"

"তোমার পক্ষে বিষাক্ত জিনিস না হতে পারে। আমার পক্ষে বিষাক্ত। আমি যখন কমলানেবু খাইনে, তখন তুমি কি জন্যে আমায় খাওয়ালে?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "মশাই কি আমায় সে কথা বলেছিলেন?"

মদনগোপালবাবু আবার মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "মশাই কি আগে আমায় সে কথা বলেছিলেন। তুমি কেন সেই সময়ে বল্লে না যে ওতে কমলানেবু আছে?"

লোকটার ব্যবহার দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন।"

"যাও যাও ঢের দেখেছি তোমার মত কলকাতার বাবু। সীমা লঙ্ঘন করছেন!" ভদ্রতা শিক্ষা দিতে এসেছেন! ছুরী কাঁটা দিয়ে মাংস খেতে জানলেই ভদ্রলোক হয় না। একজন

নিরীহ ব্যক্তি, যা খায় না, তাকে তাই খাইয়ে দেওয়া খুব ভদ্রতা!"

আমি বলিলাম, "ক্ষিধেয় মরছিলেন—নিজের খাবার থেকে খেতে দিলাম, বেশ প্রতিফল তার!"

"ক্ষিধেয় মরছিলাম বই কি! তোমার কাছে কেঁদে পড়েছিলাম খাবার জন্যে!"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "যা ইচ্ছে হয় বলুন।"—বলিয়া আমি কম্বল মুড়ি দিয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম।

বাবুটি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর নরম হইয়া আসিতে লাগিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে খাবারের হাঁড়ি লোকসানের শোক নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন, "খাবারের হাঁড়িটে যদি সঙ্গে থাকত, তা হলে ত আর এ বিপত্তি হত না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবিলাম লোকটা দেখিতেছি বদ্ধ পাগল। অনেক বকিয়া বোধ হয় শ্রান্তি বোধ হইল; তখন তামাক সাজিতে বসিলেন, শব্দে জানিতে পারিলাম। তাহার পর ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি কম্বলে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইলেন। ক্রমে গাড়ী আসিয়া আসানসোলে থামিল। মদনবাবু জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া বলিলেন, "চাপরাশি—ও চাপরাশি।"

কে একজন জানালার কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু ক'টা বেজেছে বলতে পার?"

সে বলিল, "সাড়ে এগারোটা বেজেছে।"

"মধুপুরে কখন গাড়ী পৌঁছবে?"

"বারোটা।"

ভাবিলাম আমার উপর লোকটার এতই ক্রোধ হইয়াছে যে আমি না নামিয়া গেলে—পাপ না বিদায় হইলে—আর সুস্থির হইতে পারিতেছেন না।

গাড়ী ছাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কম্বলের উপর হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম।

"সদানন্দবাবু—ওঠ।"

আমার নাম সদানন্দ নয় সুতরাং আমি উত্তর করিলাম না।

"ভায়া—ওঠ। মধুপুর এল বলে। ওঠ।"

আমি মুখ হইতে কম্বল খুলিলাম।

"ভায়া রাগ করেছ?"

আমি উঠিয়া বসিলাম। শুষ্কভাবে বলিলাম, "কেন, সব রাগ কি আপনারই একচেটে নাকি?"

ধীরে ধীরে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "না না রাগ কোরো না। বুড়ো মানুষ যদি দুটো কথা বলেই থাকি, তাতে কি আর রাগ করতে হয়? হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল। সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল। আমায় মাফ কর।"

ভাবলাম মনুষ্যচরিত্র এই রকমই বটে। এখনও বলিতেছেন, সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল। অর্থাৎ এখনও মনে এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সবটা না হোক, অন্ততঃ কিছুটা দোষ আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের স্বর এমন কোমল ও কারুণ্যপূর্ণ যে তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব বিরাগ তখন আমি মন হইতে বিদূরিত করিয়া ফেলিলাম। ক্ষমা সূচক হাস্য করিলাম।

মদনবাবু বলিলেন, "কমলানেবু আমি কেন খাইনে, তা যদি তোমায় খুলে বলি, ত তুমি বুঝতে পারবে।"

মদনবাবুর চক্ষু যেন কালিমাময়। একটু কাসিয়া বলিলেন, "শুনবে?"—তাঁহার স্বর অত্যন্ত নীচু।

তিনি আরম্ভ করিলেন, "সে বিশ বছরের কথা, আমি একটা মানুষ খুন করেছিলাম।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "মানুষ খুন?"

"খুন বইকি! সে খুনই বলতে হবে। শোন। দোসরা মাঘ আমার বড় মেয়ের বিয়ে দেবো বলে পৌষের শেষে কলকাতায় গিয়েছিলাম বাজার করতে। একটা মেসের বাসায় গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে সব কলেজের ছেলেরা থাকত। কোনও ঘরে জায়গা ছিল না, শুধু একটি ঘরে জায়গা ছিল, সে ঘরে একজন জ্বররোগী পড়ে ছিল, আর তার শালাও সেই ঘরে থাকত। ভগ্নীপতির নাম কেদার, শালার নাম প্রবোধ। ভগ্নীপতিটি বাঙ্গাল—বয়স কুড়ি বাইশ হবে। প্রবোধ তার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট ছিল। প্রবোধ কলেজ কামাই করে ভগ্নিপতির খুব সেবাটা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, তাপ নেওয়া, মাথায় হাত বুলানো, পায়ে হাত বুলানো, রাত্রে দু'বার তিনবার করে উঠত। ক'দিন ছোকরা খুব লুটোপুটি খেয়ে, একদিন কতকটা সুস্থ হল। জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল। আমি সেইদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী যাব। সকালে মাধববাবুর বাজার থেকে ভাল দেখে একশোটা কমলানেবু কিনে আনলাম। প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলাম, রুগী মানুষ—এ ঘরে নেবুগুলো—। প্রবোধ বললে—পাগল হয়েছেন! তা কোনও চিন্তা নেই, স্বচ্ছন্দে রাখুন। রেখে আমি আবার বাজার করতে বেরুলাম, প্রবোধ ভগ্নীপতি একটু ভাল আছে দেখে ক'দিনের পর কলেজে গেল। সন্ধ্যেবেলা বাসায় এসে দেখি, সর্ব্বনাশ হয়েছে আর কি! একা ঘরে লোভ না সামলাতে পেরে কেদার সতেরোটা নেবু খেয়ে ফেলেছে, জ্বর একেবারে বিকারে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী যাওয়া ঘুরে গেল রোগীর সেবা করতে বসলাম। মেয়ের বিয়ের টাকা ভেঙ্গে ভাল ভাল ডাক্তার আনলাম। কলকাতা সহরে যতদূর যা হতে পারে কিছুর ত্রুটি করলাম না। অনাহারে অনিদ্রায় বসে তিনদিন শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না। বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিলাম। বাহিরে মহা অন্ধকার গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ছাদের উপর লণ্ঠনটির আলো ম্রিয়মাণ, পলিতায় গুল জমিয়াছে। গভীর রাত্রে একটি কামরায় আমরা দুইটি প্রাণী বসিয়া। আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম।—"তাতে আপনার অপরাধ কি? আপনি ত আর জেনে শুনে করেন নি। বিশেষতঃ তার শালা যখন ঐ কথা বললে।"

"শালা ছেলেমানুষ। আমি তার বাপের বয়সী। সে যে ভুল করলে আমার সে ভুল করবার কি অধিকার ছিল?"

আমি বলিলাম, "ব্যাপারটা খুব শোচনীয় সন্দেহ নেই। তবু আপনি নিজেকে এর জন্যে যতটা দোষী স্থির করেছেন, সেটা নিতান্ত অনুচিত। পাপের পরিমাণ ত কার্য্যের ফলে নয়, কার্য্যপ্রণোদক ইচ্ছায়।"

মদনগোপালবাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "সে কথা বললে মন বোঝে না। আমিই এর জন্যে দায়ী। প্রবোধের কান্নাটা যদি দেখতে। সে বললে তারা পাঁচ ভাই এক বোন—ঐএকমাত্র বোন—কত আদরের বোন—তেরো বছর মোটে বয়স—তার এই সর্ব্বনাশ হল!—আমারও মেয়ে তখন তেরো বছরের। বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলাম। আমি আমার মেয়ের পানে চাইতে পারিনে। মেয়েকে দেখলে, সেই যে মেয়েকে দেখিনি যার সর্ব্বনাশ করেছি—তারই কথা খালি মনে হয়।"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। এইবার মধুপুর। বৃদ্ধকে কি সান্ত্বনা দিব? বলিলাম, "মদনগোপালবাবু!—আপনি বৃথা নিজেকে দোষী করেন। জন্ম মৃত্যু—এ সব ঈশ্বরাধীন ঘটনা মনুষ্যের অধীন নয়। আপনি আমাদের শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না?"

মদনগোপালবাবু নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল।

গাড়ী থামিল। নিদ্রাতুর খালাসীর ক্ষীণ জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মধুপুর—মধুপুর। আমি মদনগোপালবাবুকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেলাম।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯]

ধর্ম্মের কল

॥ ১ ॥

হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনোরো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া গেল।

সেকালের কথা। পিতা বিক্রমপুর হইতে বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান এক দিগ্‌গজ কুলীন দেখিয়া জামাতা করিয়াছিলেন। দুইবেলা মাছভাত খাওয়া এবং সিঁদুর পরিতে পাওয়া ছাড়া মনোরমা আর কোনও সধবাসুখের অধিকারিণী ছিল না; তথাপি তাহার এই তরুণ বৈধব্যে পিতা মাতা অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। মনোরমাও তাহাদের দেখাদেখি দিনকতক একটু কাঁদিল, মুখটি ম্লান করিয়া রহিল। কিন্তু আসলে তাহার নিজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না তার কিবা ছিল, কিবা গেল। মেয়েটির বছর পনেরো বয়স যদিও কিন্তু বুদ্ধি ও প্রকৃতি শিশুবৎ। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের বৃদ্ধি এ পর্যন্ত হয় নাই।

ঠিক এই সময় গ্রামে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়ের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র হীরালাল পিতা মাতাকে শোকে ভাসাইয়াই চিতারোহণ করিল। ব্রজহরির স্ত্রী হৈমবতী অনেকগুলি সন্তানের মুখ দেখিয়াছিলেন। একে একে পাঁচটিকে যমের মুখে সমর্পণ করিলেন। একটি যখন বারো বৎসরের, তখন সন্ন্যাসীরা তাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়—সে আজ দশ বৎসরের ঘটনা। এখন শুধু একটি রহিল—সেটি দুই বৎসরের। তা যে রকম অদৃষ্ট, উহার আশাই বা কি ভরসাই বা কি!

শোকের প্রথম বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ব্রজহরি স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন গৃহ সংসার আর কাহার জন্য, চল গিয়া তীর্থবাস করা যাউক। বাড়ী, বাগান বিষয় সব বিক্রয় করিয়া, গোরু বাছুর বিলাইয়া দিয়া, বাস উঠাইয়া কাশীতে বসিয়া হরিনাম করা যাউক। এই গুঁড়াটুকু যদি বাঁচে, তখন আবার সব হইবে।

কিন্তু সংসারের মায়া বড় মায়া, গৃহত্যাগ করা বড় কঠিন। আরও কিছু দিন পরে স্থির হইল, বাস উঠাইয়া কাশী যাইবার কল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, মাস দুই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসা যাউক।

মনোরমা এই সব শুনিয়া বাড়ী আসিয়া বলিল—"মা, আমিও যাব কাকীমার সঙ্গে।" ব্রজহরি হারাধনের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—উভয় পরিবারে বহুদিনের সম্প্রীতি।

তাহার পিতামাতা উভয়েই আপত্তি করিলেন। মনোরমা কাঁদাকাটা করিল। এক বেলার এক মুঠা অন্ন, তাহাও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মা তখন স্বামীকে বুঝাইয়া বলিয়া মত করাইলেন।

কাশীর রেল তখন নূতন খুলিয়াছে—লোকের তখন কাশী যাইবার ভারি ধুম। নৌকাপথে যে কাশী যাইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিত, সেই কাশী দুই দিনের পথ হইয়া পড়িল। ইঁহাদের কাশী যাইবার পরামর্শ শুনিয়া ও পাড়ার কলুগিন্নি আসিয়া বলিল—"বামুনদিদি, আমাকে যদি নিয়ে যাও সঙ্গে করে তা হলে তোমাদের চরণ সেবা করি, দুটি দুটি পেসাদ পাই, আর বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একটু গঙ্গাজল দুটো বিল্লিপত্র দিয়ে আসি।"

কলুগিন্নীর প্রার্থনা বিফল হইল না। যাত্রার দিন স্থির হইল ২৮শে ফাল্গুন।

যাইবার উৎসাহে মনোরমা ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। এমনভাবে চলিতে বলিতে লাগিল, যেন তাহার সর্ব্বনাশ হয় নাই, কপাল যেন পোড়ে নাই, সে যেন সেই মনোরমাই আছে! তাহার এই প্রফুল্লতায় তাহার পিতামাতাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

কাশীর বিশ্বনাথ অপেক্ষা মগরার রেল দেখিবার জন্যই মনোরমা শতগুণ অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িল। গ্রামের কত লোক কলিকাতা গিয়াছে, বর্দ্ধমান গিয়াছে—তাহারা যে ব্যাখ্যাটা করে। যাহারা কোথাও যায় নাই, তাহারা সাত ক্রোশ দূর ষ্টেশনে গিয়া শুধু রেলগাড়ী দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া আসিয়াছে। সেই রেলে মনোরমা চড়িবে। উঃ—ভাবিতে তাহার বুক গুরগুর করিতে লাগিল; শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। শব্দে ভয় করিবে না ত? না জানি সে কী শব্দ। বর্ষাকালে জলে যখন সমস্ত মাঠ ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন একদিন অনেক রাত্রে, মার কাছে শুইয়া মনোরমা রেলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। অতি ক্ষীণ, শুধু একটা অনেক—অনেক দূরের গুম্‌গুম্‌গুম্‌ শব্দ।—আঃ—২৮শে ফাল্গুন কবে আসিবে গো;

মনোরমার আরাধনায় ২৮শে ফাল্গুন আর না আসিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে যাত্রা করিতে হইবে। যথাসময়ে দুইখানি গোরুর গাড়ী ভাঙ্গা লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া চক্রশব্দে সুপ্ত গ্রামবাসীর কর্ণে বিদায়ের করুণ-গীতি গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল।

॥ ২ ॥

মগরায় যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা নয়টা। গাড়ী যখন বাজারে প্রবেশ করিতেছে, সেই সময় অদূরে একখানা এঞ্জিন বংশীধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া মনোরমার যে আমোদ। কাকীমার গলা জড়াইয়া—"ওগো কাকীমা, ওটা কী গো?"-

একটার সময় পশ্চিমের গাড়ী। দোকানে নামিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি হইল।

যথা সময়ে ট্রেন ছাড়িল। তখন সহসা সমস্ত উৎসাহ সমস্ত আনন্দ মনোরমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শব্দে, দোলানিতে, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভয়ে জানালার বাহিরে চাহিতেও পারিল না। শেষে হৈমবতীর কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তিনি তাহার কপালে হাত বুলাইয়া আঁচল দিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

রাত্রি কাটিল। পরদিন মনোরমা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিল। জানালার কাছে বসিয়া মাঠ, ক্ষেত, নদী, পাহাড় দেখিতে ও দুই বৎসর খোকাকে দেখাইতে লাগিল। পাহাড় দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত।

"কোন কোনও পাহাড় সবুজ গাছপালায় ভরা, আর কোন কোনটা ওরকম শুকনো পোড়া মতন কেন কাকীমা?"

"সব পাহাড় কি আর সমান হয় বাছা?"

"সব মানুষ কেন তবে সমান?"

"সমান? কই সমান মা?"—বলিয়া হৈমবতী মুখ ফিরাইয়া, একবিন্দু জল চক্ষু হইতে আঁচলে লইলেন। - কাহার জন্য?

তাহার পরদিন প্রভাতে মোগলসরাইয়ে নামিতে হইল। সেখানে অনেক পাণ্ডা আসিয়া বসিয়া আছে। একজন ব্রজহরিকে দখল করিয়া ফেলিল।

মোগলসরাই হইতে অন্য গাড়ীতে রাজঘাট। রাজঘাট ষ্টেশন ঠিক গঙ্গার উপর। ওপারে কাশীর সৌধমন্দিরমালা নববৌদ্রলোকে ঝক্‌মক করিতেছে। পুণ্যময়ী জাহ্নবী সফেন তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ট্রেনসুদ্ধ লোক—'জয় বাবা বিশ্বনাথজীকে জয় বলিয়া বারম্বার উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতে লাগিল।

ইহারাও কাশীর পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া, গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া প্রণাম করিলেন। হৈমবতী বলিলেন,—'জয় বাবা বিশ্বনাথ—হে মা অন্নপূর্ণা— মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। এত সাধু সন্ন্যাসী এখানে তোমার সেবা করছে, আমার বাছাকে যেন দেখতে পাই। দেবাদিদেব মহাদেব, বাবা বিশ্বনাথ দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমার।"

॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ বিশ্বের অল্প লোকেরই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া থাকেন। হৈমবতী সেই অল্পের মধ্যে একজন পরিগণিত হইলেন। তিনি দশ বৎসরের হারানো পুত্রের দেখা পাইয়াছেন।

সেদিন তাঁহারা কালভৈরবের বাড়ী পূজা দিতে যাইতেছিলেন, পথে সাধনানন্দ স্বামীর মঠ। পাণ্ডা বলিল, "মাঈ—সাধুনানন্দ্ সোয়াম্মিজিকো দেখবি না? বড়া ভারি মহাৎমা আছে।"

সকলে সাধনানন্দ স্বামীকে দর্শন করিলেন। স্বামী তখন অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কয়েকজন গৈরিকবালাধারী নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া তাহা শ্রবণ ও তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতেছেন। শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে হৈমবতী তাঁহার শশীভূষণকে চিনিতে পারিলেন।

আশ্চর্য্য পরিবর্তন। যে ছিল দ্বাদশবর্ষীয় বালক যে এখন পূর্ণাবয়ব দীর্ঘায়তন নবীন যুবাপুরুষ হইয়াছে। তপশ্চর্য্যার ফলেই হউক আর যে কারণেই হউক, তাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত প্রভাসম্পন্ন। মস্তকের তাম্র জটাভার ললাটের উর্দ্ধ প্রান্তে বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছে।

তাহাকে পাইয়া তাহার পিতামাতা যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে কিছুতেই সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। এমন কি মঠ ছাড়িয়া পিতামাতার সহিত কেদারঘাটের বাসায়ও থাকিতে সম্মত হইল না। তবে প্রত্যহ আসিয়া সারাদিন ইঁহাদের সঙ্গে যাপন করিত।

সপ্তাহকাল এইভাবে কাটিলে, একটু গোলযোগ ঘটিল। যতদিন হইতে উপন্যাস লেখার সৃষ্টি হইয়াছে—কোন কোনও পণ্ডিতের মতে আরও পূর্ব্ব হইতেই—অর্থাৎ যতদিন হইতে পৃথিবী নরনারীসম্পন্ন এবং নরনারী হৃদয়নয়নসম্পন্ন হইয়াছে ততদিন হইতেই এ গোলোযোগ ঘটিয়া আসিতেছে। অন্যের—ও প্রথম প্রথম নিজেরও—অগোচরে এই সন্ন্যাসীবর মনোরমার প্রতি একটু বেশীরকম চাহিতে লাগিল। সে দেখে আর দেখে। মনোরমার বুকের মধ্যেও কেমন একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে কেমন একটা অশোয়াস্তি, একটা সুখ।

একদিন এই চোখের ও বুকের ভাষা, মুখের ভাষায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল। খোকা ঘুমাইতেছে—গৃহে আর কেহ নাই। শুনিল তাহার পিতামাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, কলুগিন্নি বাজারে গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ গঙ্গাস্নানে যাওনি?"

"আমার একটু অসুখ করেছে।"

শশী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অসুখ করেছে? হাত দেখি?"

মনোরমা হাত বাড়াইয়া দিল, হাসিয়া বলিল, "তুমি বদ্দি নাকি?"

উত্তর না করিয়া শশীভূষণ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর কপালে হাত দিয়া বলিল, "ইস! খুব গরম যে।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "খুব বদ্দি হয়েছ! আমার মোটেই জ্বর হয়নি।"

"হয়নি ত কি! তোমার কপাল ভারি গরম।"

"ও বোধ হয় আগুনের-তাতে বসে থেকে।"

"আচ্ছা, আগুনের কাছে থেকে সরে এস, দেখি ভাল করে হাত— বলিয়া শশিভূষণ মনোরমার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া তাহার সুন্দর কোমল হাত নিজের একটি হাতে সতৃষ্ণভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, অন্য হাতের অঙ্গুলি দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। মনোরমার মনে কি রকম একটা ভয় হইতেছিল। একটা যেন না—না—শব্দ উঠিতেছিল। তাহার পা স্পষ্টই কাঁপিতেছিল, আর বোধ হয় শরীরও।

শশী বলিল—"মনো!" এই প্রথম 'মনো' বলিল—পূর্ব্বে বরাবর মনোরমা বলিয়াছে।

মনোরমা বলিল—"কি?"

ভারি আশ্চর্য্য! চুপি চুপি 'কি' বলিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? বোধ হয় হৃদয়যন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্তটা একটু বিশেষভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকিবে, কথার স্বরটা ভারি নামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ কাটিল, আর কোন কথা হইল না।

শেষে বাহিরে কলুগিন্নির স্বর শোনা গেল—"ওমা! এরা যে এখনো ফেরে না গো! ঠাকুর দেখে ফিরবে না কি? আমি তবে যাব কার সঙ্গে?"

শশী মনোরমার হাত ছাড়িয়া বাহির হইল। বলিল, "কলুগিন্নি! কোথায় গিয়েছিলে?"

কলু গিন্নি বলিল, "কে, দাদাঠাকুর? পেন্নাম হই। দেখনা! আধপয়সার এই রত্তা থোড়। দেশে হলে কেউ ছোঁয়ও না। বললাম ত মাগী ক্যারোড় ব্যারোড় করে কি সব বল্লে কিছুই বুঝতে পারলাম না। গাল দিচ্ছে মনে করে, আমিও যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে চলে এলাম।" শশিভূষণ এ নালিশে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া প্রস্থান করিল।

॥ ৪ ॥

সেদিন সারাদিন আর শশী আসিল না। মঠে গিয়া নিজের ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল যেন নেশা হইয়াছে। মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে, মনে হইতে লাগিল, আজ সে মহা একটা দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়াছে।

নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় সে অনবগত ছিল না। তাহার জন্যে সে নিজেকে 'কম' করিত। একরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পূর্ব্বে কখন-কখনও হইয়াছে—কিন্তু মনের পাপ কর্ম্মে কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ চাঞ্চল্য রক্তমাংসের দুরবচ্ছেদ্য ধর্ম্ম, উন্মূলন করিবার উপায় নাই। সহ্য করিতে হইবে, সংযত থাকিতে হইবে। ইহাই ধার্ম্মিকের, সজ্জনের কর্ম্ম। কিন্তু অদ্য প্রভাতে সে সংযম তাহার কোথায় গেল? আজ সে কি করিয়া বসিল। আর কখনও আকাঙ্খা লইয়া কোনও স্ত্রীজাতিকে সে স্পর্শ করে নাই; আজ কি হইল?

নিজের প্রতি ধিক্কারে, অনুশোচনায় শশিভূষণ অস্থির। উঃ এই তার সন্ন্যাসধর্ম্ম? এত গর্ব্ব—এত তেজ—সব মুহূর্ত্তের মধ্যে পথকর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইল।

পুরাণ স্মরণ করিল—অপ্সরা পাঠাইয়া দেবতাগণ মুনিগণের তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেন—চিৎশক্তির পরীক্ষা লইতেন। সে কত কঠিন পরীক্ষা। তাহার তুলনায় এ কি? কিছুই নয়। পরীক্ষাই নয়। তবু ত তাহার এই লজ্জাকর পরাজয়।

ক্রমে মনে হইল—মুনিগণের শত শত বর্ষের সাধনা—সে ত পরশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। আর, দশ বৎসর সে যাহা করিয়াছে তাহা ত তপস্যা নহে। —খানকতক ব্যাকরণ পড়িয়াছে—কাব্য পড়িয়াছে—দর্শনের সূত্র মুখস্থ করিয়াছে—শ্রুতির ভাষ্য নকল করিয়াছে মাত্র।

একটু একটু করিয়া তাহার মনে সান্ত্বনার আলোক ক্রমে পড়িতে লাগিল। ভাবিল, আ মরি, মুনিগণই বা কি চিৎশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশই ত পরাজিত।

পুরাণের আরও অনেক কথা মনে পড়িল, তাহাতে আত্মসান্ত্বনার পথ আরও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

তখন চিন্তা করিল—এ ভ্রম মনে পোষণ করা কেন? সে ত সন্ন্যাসী নহে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য এতদিন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছিলেন মাত্র।

তাহার পিতামাতার সপ্তাহব্যাপী করুণোক্তিগুলি ক্রমে ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল—আমার আর কেউ নেই বাবা—বাড়ী চল। আমার ঘর অন্ধকার—আমার চক্ষের মণি তুমি—বিয়ে কর—বিয়ে কর—বিয়ে করে সংসারী হও।'

ধর যদি সে বিবাহই করে, যদি সে সংসারী হয়—তাহা হইলে কি হয়?

কি ভয়ানক, তাহা কখনও হয়? গুরু সাধনানন্দ বলিবেন কি? সহাধ্যায়ীবৃন্দ—বালগোপাল করুণানন্দ, মাধো উপাধ্যায়, সীতাপতি বলিবে কি?

তখন ভাবিল—কি আশ্চর্য্য! কে কি বলিবে না বলিবে তাহাই ভাবিয়া আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিব? কি বলিবে? যাহা ইচ্ছা বলুক, যত পারে হাসুক, যত ছিলম খুসী গাঁজা ভস্ম করুক। আমার তাহাতে কি আসিয়া যাইবে?

নিজের ভবিষ্যত জীবন কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। এ চুল নাই, গৈরিক বসন নাই, দেশে গিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে। ঘরে বধূ—দেখি কেমন বধূ?—মনোরমা। ছি। মনোরমা নহে—আর কেহ। কিন্তু মন মানিল না। বালকের হাত হইতে একটি খেলনা কাড়িয়া লইয়া সেটি লুকাইয়া অন্য শত শত খেলনা তাহার হাতে দিলেও সে যেমন আছাড়িয়া ফেলে, শশিভূষণের প্রণয়শিশুও সেইরূপ মনোরমা ভিন্ন অন্য কোনও দেবীনারী বা কিন্নরীকে বধূত্বে গ্রহণ করিতে চাহিল না।

তখন হঠাৎ এক বৎসরের পুরাতন একটা ঘটনার কথা মনে হইল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক শিষ্য, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচার করিতে কাশী আসিয়াছিলেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজে সে কি উত্তেজনা তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। লোকে সে পণ্ডিতকে কত না বিদ্রূপ করিয়াছিল—কত না কঠিন কথা বলিয়াছিল। একজন প্রস্তাব করিয়াছিল, ইহার টিকি কাটিয়া আঠা দিয়া পশ্চাদ্ভাগে জুড়িয়া লেজ বানাইয়া দাও।

সেই পণ্ডিতের যুক্তি-তর্ক শশী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া ঘরে আলো আনিয়া নিজের পুঁথিপত্র পড়িল। মনু যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, রঘুনন্দন—পাতা উল্টাইয়া বিসংবাদের শ্লোকগুলি, পড়িতে লাগিল, তাহার টীকা ভাষ্য পড়িল, স্বার্থের নূতন আলোকে, সকল শ্লোকের অনুকূল অর্থই উপলব্ধি করিল।

বিধবা-বিবাহের আইন লইয়া বঙ্গদেশে কি প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল সে জানিত না। সে ছিল কাশীতে। কাশীর পাণ্ডাগণ বিরোধ উত্থাপন করিলেন, বটে, কিন্তু দুই একজন মতও দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের উদ্যোগে আইন পাস হইল বলিয়া, কাশীর পণ্ডিতগণ তাবৎ বাঙ্গালীকে খৃষ্টান বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ সিদ্ধান্ত করিল, বাঙ্গালীর চক্ষে এটি আর নিন্দনীয় নহে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থির করিল, মনোরমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবে। এই সকল শাস্ত্র দেখাইয়া যুক্তি দেখাইয়া উভয়ের পিতামাতাকেই স্বমতে আনয়ন করিবে। হায় বালক।

যখন বাহির হইল, তখন বিশ্বেশ্বরের আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। দলে দলে লোক মন্দিরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কি সুন্দর সুগম্ভীর দৃশ্য! সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রময় বন্দনা গান।

॥ ৫ ॥

আরতির পর শশিভূষণ কেদারঘাটের বাসায় আসিল। দেখিল, বাড়ীতে মনোরমা ছাড়া আর কেহ নাই। শশীকে দেখিয়া মনোরমা আহ্লাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"মনো—সবাই কোথা?"

"তারা সব আরতি দেখতে গেছেন, এখনও ফেরেননি ত।"

"আমিও আরতি দেখতে গিয়েছিলাম, ভীড়ে বোধ হয় তাঁদের দেখতে পাইনি। তাঁরা অন্নপূর্ণার আরতি দেখে ফিরবেন হয়ত। কেমন আছ মনো?"

"ভাল আছি। সারাদিন আসনি কেন?"

"এই এবার যে এলাম, এখন আর শীগগির যাচ্ছিনে—তা জান?"

"সত্যি? মঠে যাবে না?"

"না, মঠ ছেড়ে দিয়েছি। এবার সংসারী হব, বিয়ে করব মনো।"

"সত্যি?—কাকীমা তা হলে কত খুসী হবেন। কত ঠাকুরদেবতাকে মানত করেছেন।"—বলিয়া মনোরমা ঘামিতে লাগিল।

দুইজনে অনেক কথা হইল। যে কথা চোখে চোখে অনেক বার হইয়া গিয়াছিল—সেই কথা মুখে মুখেও হইল। শশী বলিল—বিধবার বিবাহ এখন শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে। সে উভয়ের পিতামাতাকে বুঝাইয়া তাহাকে বিবাহ করিবে।

মূঢ় বালিকা সংসারের কিছুই জানিত না—এই কথা ধ্রুব সত্য বলিযাই বিশ্বাস করিল। বিধবার বিবাহ হইবে এমন একটা কাণাঘুষা সেও শুনিয়াছিল কিনা। শশিভূষণকে মনে মনে স্বামী বলিযাই গ্রহণ করিল।

শশী বলিল, "আজ রাত্রেই তবে মাকে বলি?"

মনোরমা বলিল, "না—দেশে গিয়ে বোলো।"

শশী মনোরমার হাতটি ধরিয়া বলিল, "কেন মনো?"

"তা হলে আমার ভারি লজ্জা করবে। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। এ বাড়ীতে যতদিন আছি, ততদিন বোলো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শশী বলিল, "তবে দেশে গিয়েই বলব।"

পিতামাতা ফিরিলেন। শশীর মা যখন শুনিলেন, শশী আর মঠে যাইবে না, বাড়ীতেই থাকিবে—তিনি হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনের সুখে বেশী করিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এই দুটি যুবক যুবতীও বেশী করিয়া পরস্পরের নিরালা সঙ্গলাভ করিতে লাগিল।

শশীর পিতামাতা বড় অদূরদর্শী।—অবশ্য শশী বা মনোরমা যে পরস্পরকে বিবাহ করিবার কথা ভাবিতেও পারে, এ তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। তথাপি এ দুইজনের প্রতি তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য ছিল—ইহাদের নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই তাঁহাদের উচিত ছিল না। কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহাদের এ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল—প্রথম শশীর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধার্ম্মিকত্ব—দ্বিতীয়তঃ সন্তানস্নেহ, 'আমার ছেলে দেবতুল্য সে কখনও, ইত্যাদি।

॥ ৬ ॥

শেষে দেশে ফিরিবার সময় হইল—শশীর মাতা ক্রমাগত মনোরমার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, কাহার মেয়ের সঙ্গে শশীর বিবাহের সম্বন্ধ করা যাইবে।

একদিন নির্জ্জনে শশীর কাছে এই সব গল্প করিতে করিতে মনোরমা বলিল, "মাকে যখন তুমি বলবে যে আমাকেই বিয়ে করবে, আর শাস্ত্র থেকে সব দেখিয়ে দেবে যে এতে আছে—তখন মার ভারি আহ্লাদ হবে—বোধ হচ্চে।"—

মনোরমা মনে করিত এই আমার শ্বশুর, এই আমার শাশুড়ী। ভাবিত, আমিই যে ইঁহাদের পুত্রবধূ হইব, তাহা এখন জানিতেও পারিতেছেন না—কি মজা।

সকলেই দেশে ফিরিলেন। শশিভূষণকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার বাঙ্গালা কেমন বাঁকা বাঁকা হিন্দী সুরের হইয়া গিয়াছে।

হৈমবতী দেশে আসিয়াই শশীর বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

শশী তাঁহাকে বলিল, "মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথাটা বলিল,—শুনিয়া মা আকাশ হইতে পড়িলেন।

শশী বলিল, "সে কি মা! শোননি বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত হয়েছে—আইন হয়েছে।"

মা বলিলেন, "আইনের মুখে আগুন! ইংরাজেরা ম্লেচ্ছ, ওরা আইন করবে না কেন?"

"ইংরাজেরা ম্লেচ্ছ—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই যে পরম পণ্ডিত, পরম হিন্দু। তিনি প্রমাণ করেছেন।"

মা বিদ্যাসাগরের প্রতি এমন একটি কটূক্তি করিলেন যাহা লেখনীর মুখে আনয়ন করা অসাধ্য।

শশিভূষণ ভারি হতাশ হইল। ভাবিল, মা নিরক্ষর, আমার পিতা শাস্ত্রদর্শী, তিনি বুঝিবেন।

পিতা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া কহিলেন, "ছি ছি ছি! এতদিন শাস্ত্রচর্চার এই ফল তোমার?"

শশী শাস্ত্রের তর্ক পাড়িতে চাহিল। পিতা বলিলেন, "মহাভারত! এ কথার আলোচনাতেও পাপ আছে।"

শশী বিদ্যাসাগব মহাশয়ের কথা বলিল। পিতা বলিলেন, "বিদ্যাসাগর হোটেলে খায়। এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"*

*একবার কোথাকার ষ্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এক পণ্ডিতের দেখা হয়। পণ্ডিত জানিত না যে ইনিই বিদ্যাসাগর। সে তর্কের মুখে বলিয়াছিল—"বিদ্যাসাগর হ্যাট কোর্ট পরে। হোটেলে খায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"বিদ্যাসাগরকে চেন তা হলে?" সে উত্তর করিল—"চিনি না?" বিলক্ষণ চিনি। কতবার দেখেছি।"—এ গল্প বিদ্যাসাগর জীবনীতে আছে।

ইহার অপেক্ষা প্রবলতর বিরুদ্ধযুক্তি আর কি হইতে পারে? শশী যখন দেখিল পিতার কাছেও কূল পাইল না, তখন হতাশ হইয়া নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল।

ঠিক এই সময়, ও পাড়ার একটি কুটীরে শশিভূষণের নাম উচ্চারিত হইতেছিল। কলুগিন্নি তাঁতিদিদির সহিত কাশীর গল্প করিতেছিল। তাঁতিদিদি বলিল—"আহা, বামনীর ভাগ্যি ভাল। সে ছেলেটা যখন মরে গেল, আমরা মনে করলাম মাগী শোকে পাগল হয়ে যাবে। ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল আছে বইকি দিদি, এই দেখ ধর্ম্ম করতে কাশী গেল বলেই না হারা ছেলেটিকে পেলে! খাসা ছেলে রাজপুত্তুরেব মত চেহাবা, নিষ্ঠের শরীর কিনা।"

কলুগিন্নি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, নিষ্ঠের কথা আর বলে কাজ কি! কলিকালে আবার ধর্ম্ম আছে না নিষ্ঠে আছে!"

তাঁতিদিদি শুনিয়া অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম—কি রকম?"

"কি রকম আবার? আমার মাথা আর মুণ্ডু!"

অতঃপর চুপি চুপি অনেক কথা হইল। তাঁতিনী শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল—"অ্যাঁ! গলায় দড়ি গলায় দড়ি।"

কলুগিন্নি অবশ্যই সাবধান করিয়া দিল—"কাউকে বলিসনে দিদি—দরকার কি আমাদের কথায় থাকবার? যে আগুনে হাত দেবে সে নিজেই পুড়ে মরবে।"

তাঁতিনী বলিল, "দরকাব কি বোন, এ কথা কি আর কাউকে বলবার না কারু শোনবার? কাউকে বলতে হবে না। ধর্ম্মের কল আপনিই বাতাসে নড়ে যাবে।"

সপ্তাহ মধ্যে গ্রামে টীটী পড়িয়া গেল।

মনোরমার পিতা হারাধন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শশীর পিতা ব্রজহরির বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুয়ার বন্ধ করিয়া দুজনে অনেক পরামর্শ হইল। ঘণ্টাখানেক পরে ব্রজহরি বাহির হইয়া শশিভূষণকে আনিয়া সেই ঘবে দুয়ার বন্ধ করিলেন।

ইহার পর হারাধন প্রচার করিলেন, তাঁহার কন্যা মনোরমার হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইয়াছে, ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতায় যাইবেন। সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পরে গ্রামের লোক শুনিল; শশিভূষণ আবার কাশীব মঠে ফিরিয়া গিয়াছে।

আরও কয়েকদিন পরে শুনিল, মনোরমার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুপারিশের চিঠি দিয়া '—' কলেজে শশিভূষণকে সংস্কৃতের অধ্যাপক করিয়া পাঠাইলেন।

এখন শশিভূষণ পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। মাঝে মাঝে সুপক্ক টিকিটি নাড়িয়া, স্ত্রীর হাতখানি হাতে লইয়া সন্দেহে তাহাকে বলেন—"বলি ব্রাহ্মণী, তোমার হৃদ্‌রোগটা কেমন আছে?"

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুরে, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখা পড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত একযোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, 'চতুরি—ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।'

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটি বাজার হইতে কিছুদূরে সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা একা ঝমঝম শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরিষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিবতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলার শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব ছড়ী।"

গুলাবছড়ি ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ী—

যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে,
যো চাখ্‌খে— ইয়াদ রাখখে —গুলাব ছড়ী।

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব ছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, 'গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, সোহন হালুয়া—কি লইবে বল।"

বালক গুলাব ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাবছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পয়সা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাব-ছড়ি" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাঁথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—"বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বামহস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িলঃ—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। রিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। লালা মুরলীধর লাল

মহাদেও মিশ্রের বাটী,—কেদারঘাট,—বেনারস সিটি।

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম? "প্রার্থনাসমাজী"র কন্যা। বাঙ্গলা দেশে যে "বরম্‌সমাজী"রা আছে—"প্রার্থনাসমাজী"রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন যে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কাজ করা যাউক। উঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উঁহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উঁহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ্ করিয়া তাহার পর চম্পট! রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রীগণেশায নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনাসমাজে"র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে! সুতরাং আর একখানা কাগজে "শ্রীশ্রীঈশ্বরোজয়তি" বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহ্নাইয়ালাল—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকরেদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহ্নাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটি, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে।"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নকলৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ্ কি সমাচার।"

কাহ্নাইয়া বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল, "আরে,—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে। খোল—পড়্।"

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যার বিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী, একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র এবং সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

—ইতি। লালা রাম অওতার লাল,—মহল্লা গোবাবাজার, সহর গাজিপুর।

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখ্‌বারে লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল। কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। লুটিস পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কাহ্নাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়, একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা

লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আব ভিতবে তসবীব উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কাহ্নাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবাব মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহাব কাছে আব কি মিলিবে? দুই চাব দশ টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ।"

কাহ্নাইযালাল বলিল, "না। সে যখন সাদি কবিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চযই সোনাব ঘড়ি চেন আংটি লাগাইযা আসিবে। নিজেব না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইযা আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিবাপটাব কি কবি?"

মহাদেও বলিল, সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিবাপ বাজাবে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানেব দোকান আছে কি না, সেখানে পার্সী থিযেটাব দলেব অনেক খাপসুবৎ আউবতেব তসবীব আছে। সেই একখানা কিনিযা পাঠাইলেই হইবে।"

পবামর্শ তখনই স্থিব হইযা গেল। ইহাও স্থিব হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পবে পুলিসে সন্ধান পাইতে পাবে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইযা, সেইখানে লইযা গিযা, কার্য্য সমাধা কবিতে হইবে। এক পোযা ভাঙ, সঙ্গে একটু ধুতুবাব বস— আব কিছুই কবিতে হইবে না।

তৃতীয় পবিচ্ছেদ

অপবাহ্নকাল। গোবাবাজাবেব সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশযান অবস্থায বাম অওতাব ধূমপান কবিতেছে, এবং মাঝে মাঝে বাজপথেব পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিতেছে। ডাকওযালাব আসিবাব আব বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে বাম অওতাব এই প্রকাব সপ্রতীক্ষ, কাবণ এখনও পত্রেব উত্তব আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষব অপবিচিত। বেনাবস সিটিব মোহব বহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইযা বাম অওতাব তক্তপোষেব উপব উঠিযা বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত কবিল ফটোগ্রাফ—সুন্দবী যুবতীব সর্বাঙ্গ সুন্দব ছবি। সতৃষ্ণ নযনে বাম অওতাব ছবিখানির প্রতি চাহিয়া বহিল। পার্সী মহিলাদের ধবণে শাড়ীখানি পবিহিত। "ববমসমাজী"দেব স্ত্রী কন্যাবা এইরূপ ধবণেই শাড়ী পবিধান কবে বটে—তাহা সে বেলে যাতাযাতেব সময অনেকবাব দেখিযাছে। মুখ চক্ষুব গঠন কি সুন্দব। বাম অওতাব মনে মনে বলিতে লাগিল— "বাহবা কি বাহবা। বাহ্ বে বাহ্।"

ছবিখানি বাখিযা সে পত্রখানি খুলিল।—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

মহাশয,

আপনাব পত্রিকা প্রাপ্ত হইযাছি। আগামী শনিবাব সন্ধ্যাব গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয। আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ পবিচয হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল কবিযাছি, সুতবাং কেদাবঘাটেব বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইযা দিব, আপনাকে সঙ্গে কবিযা লইযা আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমাব আলযে আপনি ভোজন কবিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুবলীধব লাল

পত্র বাখিয়া আবাব ফোটোগ্রাফখানি লইয়া বাম অওতাব দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপবটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধবিযা আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহাব সহিত আলাপ হইলে কি মজাদাবই হইবে!

ভ্রুকুঞ্চিত কবিয়া রাম অওতাব ভাবিল,—লিখিযাছে শনিবাব সন্ধ্যাব গাড়ীতে যাইতে।

সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল,—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি!" বলিয়া, নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথমদর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কযদিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোনার ঘড়ি, সোনার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা", "লয়লা-মজনু", "গুল-ই-বকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ" বলাই সমীচীন হইবে—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা। কথাটা হইতেছে—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারিদিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জ্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হাঁ আপনার নাম কি?"

"কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণপ্রসাদ বলিল, জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্টলোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।'

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিযাছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরনের হইবে। দেখিল তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবেলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ ওরফে কাহ্নাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন"—"চাচাজী" আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহ্নাইলালকে ডাকিয়া বলিল, "কিষুণ—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহ্নাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণপ্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধ ক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেমন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহ্নাইলাল বলিল. "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি?—আমাদের বাড়ীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্য প্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বইকি? শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চম্ চম করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গীত? শুনিবে একটা?" বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল— বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম

গোকুল ঢুঁড়ি—বিন্দ্রাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কাহ্নাইয়া ঔষধ ধরিয়াছে?"

কাহ্নাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বইকি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্ ত কি আছে।" কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি নগদ দুই শত টাকা রৌপনির্ম্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল্, দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কাহ্নাইলাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে! কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপিন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহ্নাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল—"দে—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টাদুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে

শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারবিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল, সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

আমার উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইলাম তখন আমার বয়ংক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষমাত্র। আমার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই বলিলেন—যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাকটিস না করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা যথার্থ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা চাপকান পরিহিত স্থূলকায় (কারণ ভাল পসার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল।

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য। বাল্যকাল হইতেই উপন্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিমবাবুর "আনন্দ মঠ।" মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই বৎসর নূতন "আনন্দ মঠ" বাহির হইয়াছে। আমার মেজদাদা কলিকাতায় কালেজে পড়িতেন, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন 'সন্তান' চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না,—আশা দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া "আনন্দ-মঠ"খানি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজদাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই পাইলাম না। হতাশ হইয়া অবশেষে তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় আঁড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাঁহাদের সভা বসিত পূর্ব্বে হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ দাদা মহাশয় এখন পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকর্দ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেজেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকার জন্যই অথবা অত্যধিক পরিমাণে কাঁচা তেঁতুল খাইয়াই হউক, ইহার একদিন পরেই আমি জ্বরে পড়িলাম। জ্বর ছাড়িলেও কয়েকদিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা আমাকে সাগু বার্লি ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ "আনন্দ-মঠ"খানি একদিন হাতে পড়িল। সেইদিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এ সময় দুই একটা পোড়া ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি।

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গলা ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অভিভাবকগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিবাহ করিলাম না; পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, অ্যাডভেঞ্চরলেশ-হীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না।

উপন্যাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্যাবয়ব। চেহারাটি আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে।

কিন্তু বিধাতা যে কি উপায়ে কোন্ সিদ্ধ করেন, বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূর্ত্তিই একদিন আমাকে উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল। বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই কৃতসংকল্প হইয়াছিল। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব—বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ঔষধ আলমারি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম, সেইখানেই গিয়া উঠিলাম। সপ্তাহখানেক থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আসবাব পত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম—এটি আমার বহুদিনের অভ্যাস। একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদে সাতটার পূর্ব্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাস্নানের জন্য একজোড়া স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল, কারণ সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, কাপড় ময়লা হইয়া যাইত।

তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে। একদিন স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। লোকটির স্নানের বেশ ছিল না, কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য না হওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে—যেন তাঁহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া, বোধ হইল। তিনি আসিয়া স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর?"

আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু বামুন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভাবিলাম, বোধ হয় লোকটি আমাকে অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাবুটি অধীর হইয়া বলিলেন, "কি বিপদ! উত্তর দাও না কেন? তুমি কি বামুন ঠাকুর?"

হায়! আমার মূর্ত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একেবারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত? বুঝিলাম, বাবুটি একজন রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাও চাকরি কর?"

"আজ্ঞে না।"

"করবে?"

"পেলে ত করি।"

"রাঁধতে জান?"

"আজ্ঞে জাতব্যবসা—ওটা আর জানিনে?"

"বাড়ী কোথা?"

"যশোর।"

"নাম?"

"শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।"

"কলকাতায় কতদিন এসেছ?"

"এই চার পাঁচদিন হবে।"

"চাকরির চেষ্টায়?"

"আজ্ঞে তা নইলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি?"

বাবুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখ হ্যা, তোমার মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই রকম করে কথা কইতে হয়?"

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম। ইহার রাঁধুনিগিরি দিন দুই করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এই যে অ্যাডভেঞ্চরের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিনীত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি শুনিনে। তা, অপরাধ নেবেন না কর্ত্তা।"

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন, "হুঁ।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্যি বামুন? না বামুন সেজেছো? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাঁড়ি মুচি কলকাতায় এসে বামুন হয়।"

হায় হায়, আমার মূর্ত্তিটি কি তবে হাড়ি মুচির বলিয়াও ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা? বাবুটির "সভ্যতা"র আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে ও সব জাল জুয়াচুরির ধার দিয়েও যাইনে।"

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

"আচ্ছা, কেমন বামুন, গায়ত্রী বল দেখি?"

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার সময় সুপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে অপরাধ অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "কিছু বোঝা গেল না। আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ করে নিলেই হল।"

একটু দুঃখের ভাণ করিয়া বলিলাম, "কর্ত্তা যদি বিশ্বাস না করেন তা হলে কি করি?"

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল। সহসা বলিলেন, "আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র বলে, বল দিকিন? এটা আর কোন ছাপার কেতাবে নেই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরস্য।"

শুনিয়া বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক বামুনই বটে। কত মাইনে নেবে?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তার কি হুকুম হয়?"

"তুমিই বল না।"

"কলকাতার রেট তো বাঁধা আছে।"

"কত?"

আমাদের বাসার বামুনের মাহিনা পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক ছিল। তাই সাহস করিয়া বলিলাম, "পাঁচ টাকা।"

"পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বললে তোমায় কলকেতার রেট পাঁচ টাকা?"

"আজ্ঞে, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে।"

"মেসের বাসা আর গেরস্তের বাড়ী সমান? ছাত্রদের মেসের বাসার চাকরি, আজ আছে কাল নেই। যদি চার টাকায় রাজি হও ত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছর দু'খানা কাপড় দু'খানা গামছা।"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম, "আজ্ঞে চার টাকায় কি করে চলবে? বহু পরিবার; তাদের খাওয়াব কি?"

"বহু পরিবার? ক'জন খানেওয়ালা?"

"আজ্ঞে বুড়ো মা বাপ, ভাই—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন, "ঈশ! রাঁধুনিগিরি করে বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা মাইনে, আমিই পারিনে!—নিজের স্ত্রীসন্তানকে খাওয়াতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা জমাবে—তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও এখন।"

"আজ্ঞে বিবাহ করিনি।"

"কি কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি?"

"না।"

"কেন? কোনও দোষ-টোষ আছে নাকি?"

"দোষ—দারিদ্রদোষ। এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে?"

"বিয়ে করনি ভালই করেছ। সাহেবরা নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরাজি জানতে, ওদের কেতাবেই দেখতে পেতে। আমাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও বিবাহ করেনি।"

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় রফা হইল। বাবুটি বলিলেন—যদি ভাল কাজকর্ম্ম করিতে পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে "বিবেচনা" করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাঁহার গৃহিণী পীড়িতা। আজ দুই দিন তাঁহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে অভাবনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক অ্যাডভেঞ্চর জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্য হইতে কোনও রহস্যলাভ হয় কি না।

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাসা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও শালপাতার রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্শ্বে একটি হাউজ। নলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাঁশের চোঙা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে।

কালীকান্তবাবু প্রবেশ করিয়া, উর্দ্ধে দ্বিতলের বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন—"গিন্নী—অ গিন্নী"—তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবা চেঁচিও না। মা এখন ঘুমুচ্ছেন।"

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট আলুলায়িত-কুন্তলা, দোতলার বারান্দা হইতে দেখিলেন স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচক-ব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাহার দেহবর্ণটি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন হইলেও কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য্য অপরাভূত।

কালীকান্তবাবু বলিলেন, "প্রিয়, আয় নেমে আয় দিকিন।"

"প্রিয়?" প্রিয়তমা না প্রিয়ম্বদা? প্রিয়বালাও হইতে পারে। প্রিয়তমা না হইলেই ভাল।

পৃথিবী শুদ্ধ লোকই কি প্রিয়তমা বলিয়া ডাকিবে? প্রিয়বালা নামটি মধুর। কিন্তু প্রিয়ম্বদা নামটা মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার, কিন্তু প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র।

পায়ের চারিগাছি মল ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া, বালিকা নামিয়া আসিল। আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল।

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্তবাবু বলিলেন, "প্রিয়, এই একজন বামুনঠাকুর এনেছি। সব যোগাড়-যন্তর করে দে।"

হায়, এরূপ সূচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না। বালিকা কি পরীকন্যা ও রাজকন্যাদের গল্প পাঠ করিয়া, জাগ্রত বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও পাচক ব্রাহ্মণ কি ইঙ্গিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে?

আমার কবিত্বময় চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "আটটা বাজে। দশটার আপিসের ভাত চাই, পারবে?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা করে।"

"যা হয় দুটো ভাতেভাত। দুটো উনান জ্বেলে একদিকে ভাত একদিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আনি। তরী তরকারী সব ঘরেই আছে।"

প্রিয় বলিল, "সব আছে।" অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে বাহির হইলেন। আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রান্নাঘর কোন্‌ দিকে?"

"এই দিকে এস।"—বলিয়া প্রিয়, আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্য বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বলিল,—"এই রান্নাঘর।" প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখন চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। বলিলাম, "এখনও যে কিছুই যোগাড় হয়নি। ঝি কোথায়, উনুন ধরিয়ে দিক না।"

বালিকা বলিল, "ঝি ত আমাদের নেই। মাসখানেক হল ঝি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন না। আমিই সব করি। আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।"

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে। আমি বলিলাম, "ঝি নেই? আচ্ছা তবে আমিই ধরাচ্ছি। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।"—বলিয়া কয়লার গাদার নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম। উনান জ্বালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এ কার্য্য যে এত কঠিন তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রিয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ঐ রকম করে বুঝি কয়লা ধরায়?"

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম করে ধরায় বল দেখি?"

"সব আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের জন্যে আলু পটোলগুলো কুটে ফেল।"

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি, উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় হৈচৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলা বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে বসিলাম।

দেখিলাম, বঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরি দিয়া এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর পলাইত, তখন আমরা বসিয়া ছুরি দিয়া তরকারী কুটিতাম। যাহা হউক কোনমতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কা ছিল। উনান ধরাইয়া প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গালে হাত দিয়া বলিল, "ও হরিবোল!"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি?"

"এই কি মাছের ঝোলের আলু কোটা নাকি?"

"কেন?"

"মাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা করে কোটে? ও ত ভাজার আলু হচ্ছে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "ওহ্।"

প্রিয় বলিল, "সর দেখি। আমি কুটি।"

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল, "রাঁধতে জান? না সেও এই রকম?"

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম, "এই রকমই।"

"এই রকমই? আর কখনো এ কাজ করনি বুঝি? এই প্রথম নাকি?"

"এই প্রথম।"

"তবে চাকরি নিলে কেন?"

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখানে দিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন দুই পরে যাইবার সময়, আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্যরূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "তুমি বড় গরীব বুঝি?"

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আমি যে নতুন, কিছু জানিনে, তা শুনলে তোমার বাবা আমায় রাখবেন কি?—তাড়িয়ে দেবেন হয়ত।"

আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বালিকা বলিল—"আচ্ছা আমি কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব এখন তুমি দু'দিনে সব শিখে ফেলবে।"

"তোমার মা জানতে পারবেন না?"

"মা কি কখনও রান্নাঘরে আসেন? তিনি উপরেই থাকেন।"

"তাঁর নাকি অসুখ করেছে শুনলাম?"—"কি অসুখ?"

"এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুব বকেন বটে, কিন্তু উপর থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন।"

"খুব বকেন নাকি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায়?"

বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

"প্রিয়ম্বদা।"

"প্রিয়ম্বদা? বেশ নামটি ত!"

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভাই বোন ক'টি?"

"আমার আপনার একটি ভাই।"

"আরও যে দু তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে দেখলাম?"

"ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলেপিলে।" তখন বুঝিলাম গৃহিণী প্রিয়ম্বদার বিমাতা। ঝি কেন আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমলা বালিকার জন্য সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কত দূর?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আর বেশী দূর নেই।"

"যা হয় চটপট্—বুঝলে? বেশী বাহুল্য কোরো না। আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো এখন।"—বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন দুই রাঁধুনিগিরি আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ করিব—অর্থাৎ পলায়ন করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ স্থিরনিশ্চলভাবে চাকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রিয়ম্বদার সুন্দর মুখখানি আমার স্বর্ণশৃঙ্খলরূপ হইয়াছে। অথচ প্রিয়ম্বদা আমাকে এখনও রাঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ বামুনঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বসিয়াই সে মনে করে। প্রিয়ম্বদা মোটামুটি রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিত, আমি রান্নাঘরে বলিয়াই গৃহকার্য্যের অবসরে, তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই একমাসের মধ্যে দুই তিনখানি ভাল ভাল বাঙ্গলা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন আমায় সে বলিয়াছিল, "তুমি রাঁধুনি বামুন না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হলে না কেন?"

আমি বলিয়াছিলাম, "তাই করব মনে করেছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার গাল দুটি রক্তাভ হইয়া উঠিল। পরে জানিয়াছি, প্রিয়ম্বদার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে—ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে পারিলাম—কালীকান্তবাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট শুনিলাম—প্রিয়ম্বদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু ইঁহারা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন বর পাওয়া যায় না।

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, একদিন কালীকান্তবাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম দুই তিনদিন যাইতে না যাইতেই প্রিয়ম্বদার সাহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সুখ দিনের পর দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে সাহচর্য্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন তীব্রতর হইতে লাগিল। তখন ভাদ্র মাস। রাত্রে শয়ন করিবার জন্য অল্পদূরে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। কর্ম্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেইখানেই অবস্থিতি করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। ছবিতে, পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকার, ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘরখানিই আমার সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক একদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাহিরে অন্ধকারে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। প্রিয়ম্বদাকে স্মরণ করিয়া কত সুখকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস পড়িলেই কালীকান্তবাবুকে বলিব, পূজার পূর্ব্বেই প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।

কিন্তু আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্তবাবু যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি না, তথাপি যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতাম না। আমার অদৃষ্টে যদি প্রিয়ম্বদা-লাভের সুখ না থাকে তবে কি হইবে? কেমন করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে গাহিতাম—

এ ভরা বাদর— মাহ ভাদর। —শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যায়?

কিন্তু আশ্বিন মাস আগমন করিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় একটি অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ম্বদা-লাভ শুধু সম্ভাবিত নহে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য

পিপাসায় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের কাছে আনিয়া একজন বলিল—"পান কর—পান করিতেই হইবে।" একদিন প্রভাতে কর্ম্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ম্বদা গায়ে একখানি র‍্যাপার দিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে একটু জ্বরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন শীত শীত করিতেছে।

এইরূপ পরদিনও হইল। জ্বরগায়ে, উপবাসে প্রিয় তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহকার্য্যগুলি করিতে লাগিল। সে কার্য্য বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত।

সেদিন কালীকান্তবাবুকে বলিলাম। "তাঁহার কন্যার যেরূপ অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়।

শুনিয়া বাবু রাগিয়া উঠিলেন, "তুমি ত বলে খালাস। পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি?"

বড় রাগ হইল। দুঃখও হইল। প্রিয়ম্বদার প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে ঝির সন্ধান পাওয়া যায় আমি ত কিছুই জানিতাম না। তথাপি বলিলাম, "একটা সন্ধান করে দেখব কি?"

"পাও, দেখ" বলিয়া বাবু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

আর একটা বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগু বার্লি কিছুই খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সদ্য অনাহারে ছিল। দ্বিতীয় দিন তাহার জন্য মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল।

প্রিয় খাইতে খাইতে বলিল, "এ আমার ভাল লাগে না।"

আমি সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খেতে ইচ্ছা করে তোমার?"

"একটা বেদানা-টেদানা পেলে খাই।"

পরদিন বাবুকে বলিলাম, "প্রিয় সাগু বার্লি খায না, ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আঙুর আনিয়া দিলে ভাল হত।"

বাবু বলিলেন, "বেদানা! আঙুর! জ্বরের উপর ওসব খেলে সদ্য বিকারে দাঁড়াবে। সর্ব্বনাশ। ওসব ভারি ঠাণ্ডা জিনিষ।"

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জ্বর হইয়াছিল, বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাদ্য আনিব;—তাহাতে যদি ইঁহারা রাগ করেন ত করিবেন। সেদিন বৈকালে কর্ম্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। কিন্তু প্রিয়ম্বদা সেদিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই সুধীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্বর খুব প্রবল। মনের অশান্তিতে সান্ধ্যকর্ম্ম সমাপন করিলাম। বাসায় গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি কেমন আছেন?"

"দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে।"

"গা কি খুব গরম?"

"একেবারে আগুনের মত।"

"এখন কেমন?" "এখন ঘুমুচ্ছে।"

"রাত্রে তাঁর কাছে কে ছিল?"

"আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক সঙ্গে শুই কিনা।"

"তোমার মা কি বাপ দেখতে আসেন নি?"

"বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। অনেক রাত্রে দিদি যখন মাগো মাগো করে চেঁচাচ্ছিল, তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে

বললেন—অত চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন? বাড়ীসুদ্ধ লোককে ঘুমুতে দিবিনে? চুপ করে শুয়ে থাক্ পোড়ারমুখী।' তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।"

আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্বদাই বরাবর লইয়া যাইত। গত কল্য সন্ধ্যার সময় কেবল বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আর তোমার দিদি যে ঘরে থাক, সেটা কোনখানে?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্ম্মান্তে প্রিয়ম্বদাকে গিয়া দেখিয়া আসিব। সুধীরকে বলিলাম—"দেখ, তুমি আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ লোক নেই।"

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়া বাহির হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার নহে, একজন ঝি। বলিলেন, "একটি ঝি এনেছি। কি করতে কর্ম্মান্তে হবে একে সব বলে দাও।"

দুইদিন পূর্ব্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আজ সেই ঝি সুপ্রাপ্য হইল। দিনকতক আগে আনিলে হয় ত মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত না। লোকটার প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিবই দেখিব, তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার সেজন্য আমি নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন জানাই।

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা (সুধীর ছাড়া) ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া আসিলাম। সর্ব্বকর্ম্মান্তে যখন অবসর হইল তখন সুধীরকে বলিলাম, "চল, তোমার দিদিকে দেখি।"

সুধীরের সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা ছটফট্ করিতেছে। আমি কাছে শানের উপর বসিলাম। তাহার হাতখানি লইয়া বলিলাম, "প্রিয়, কেমন আছ?" প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল, "বামুনঠাকুর? আমার মাথা যে যায়। কি করি?" দেখিলাম, প্রবল সর্দ্দিজ্বর। বলিলাম, "তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? আচ্ছ', এখনি আমি ভাল করে দিচ্ছি।"

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। উপরে গিয়া, প্রিয়ম্বদার পায়ের নীচে সেই গরম তৈল দশ মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন মাথাটা কেমন আছে?"

প্রিয় বলিল, "অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।"

তখন আবার প্রিয়ম্বদার নিকট গিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি প্রেস্ক্রিপ্সন লিখিলাম। বলিলাম, "প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি একঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে ওষুধ আনছি।" বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধালয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম।

সেদিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ করিল।

এইরূপে আমি তিন চারিদিন চিকিৎসা চালাইলাম। প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। দেখিলাম, তাহা কিছুই হইল না। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই—ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যাক, থাকে থাক। আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর নিকট তাঁহার জামাতৃপদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও যেন এই অবহেলা ভরেই আমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার আর আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিয়ম্বদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নকাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে কত গল্প বলিতাম; অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনিয়া দিতাম।

সেদিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম। প্রিয়ম্বদা উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম।

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্রিয়ম্বদার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রিয়ম্বদা ঘুমাইয়া পড়িল। বহুদিন তৈলাভাবে তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। ললাটের প্রান্তভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাণ্ডুর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম। আজ ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাহ পরে আমি কালীকান্তবাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিব। পূজার পূর্ব্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্বদার স্নেহের আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে আমাকে সে নিজের পরমাত্মীয়স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে।

যে বালিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধর্ম্মপত্নী করিয়া সুখী হইব আশা করিতেছি—সে বিশ্বস্তচিত্তে, আমার শুশ্রূষাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্না। আমি যে মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সস্নেহে রক্ষা করিব, আমি তাহারই সুনির্জ্জন শিয়রে বসিয়া। আমি অবনত হইয়া, আঙুরের রসসিক্ত, আঙুরেরই তন কোমল লাবণ্যপূর্ণ তাহার অধরযুগল একবার চুম্বন করিলাম। মাথা তুলিয়া দেখিলাম, যে জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, তাহার বাহিরে একটি মহিলা দাঁড়াইয়া। অনুমানে বুঝিলাম তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়া গেলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন—"মুখুয্যে।"

"আজ্ঞে।"

"একবার এ দিকে এস ত।"

বাবুর স্বর রোষযুক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। মনে মনে হাস্য করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। ছেলেরা যে ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে ঘর তখন শূন্য ছিল। কালীকান্তবাবু আমায় সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন—"কি শুনছি?" "কি শুনছেন?"

"তুমি জান, প্রিয়ম্বদা নিতান্ত বালিকা নয়?"

"জানি।"

"তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অসুখের সময় প্রিয়ম্বদার সেবা শুশ্রূষা করায় কোন আপত্তি করিনি, তা জান?"

"আপনার অনুগ্রহ।"

"তুমি প্রিয়ম্বদাকে চুমো খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"কাজটা কি বকম হয়েছে জান?"

"আপনিই বলুন।"

"পিনাল কোডেব একটা ধাবা অনুসাবে অপবাধ হয়েছে। আমি যদি পুলিশ কোর্টে তোমাব নামে নালিশ কবি ত কি হয় জান?"

নিতান্ত ভালমানুষেব মত, যেন কতই ভীত হইযাছি এইরূপ ভান কবিযা বলিলাম, "কি হয়?"—"জেল হয়।" "জেল—অ্যাঁ?"

বাবু গম্ভীবভাবে বলিলেন—"জেল হয়। সেদিন বঙ্গবাসীতে পডলাম, একজন মুসলমান, একটি ইউবেশিয়ান বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন কবেছিল, তাব ছয় সপ্তাহ জেল হয়েছে।"

আমি অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম—"অ্যাঁ! বলেন কি? তবে আমাব কি হবে?"

বাবু বলিলেন, 'যদি তোমাব নামে নালিশ কবি ত তুমি কি কববে?"

কাতর স্ববে বলিলাম, "আজ্ঞে উকিল ব্যাবিষ্টাব দিয়ে একবাব দেখব। নিতান্তই অদৃষ্টে থাকে ত জেল হবে।"

"উকিল ব্যাবিষ্টাব দেবে, পয়সা পাবে কোথা?"

"আজ্ঞে, দেশে যে সামান্য জমিজমা আছে তা বিক্রি কবতে হবে।"

"জেল থেকে বেবিয়ে খাবে কি? আব ত কেউ চাকবি দেবে না।"

আমি অত্যন্ত ভীতভাব দেখাইয়া, ফ্যাল ফ্যাল কবিয়া বাবুব মুখেব পানে চাহিয়া বহিলাম।

শেষে তিনি বলিলেন, "শোন। তুমি আমাব যুবতী মেয়েব অজ্ঞাতসাবে তাব অঙ্গস্পর্শ কবে, তাব ভয়ানক অনিষ্ট কবেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ কবতে হবে।"

আমি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাঠ কবিয়াছি। বঙ্গ দেখিবাব জন্য বলিলাম,—"আজ্ঞে তা—তা—তাতে কিছু আপত্তি নেই। তবে আমবা কুলীন ব্রাহ্মণ। গণ, পণ, কুলমর্য্যাদা, সকল বিষযে যদি মানবক্ষে কবেন তবে আব আমাব আপত্তি কি?"

বাবু অত্যন্ত বাগিয়া বলিলেন, "বটে? কুলমর্য্যাদা! আচ্ছা যাও একবাব জেল খেটে এস,—তাতে তোমাব কুলমর্য্যাদা অনেক বাডবে এখন। বিয়ে কবে আবও বেশী বোজগাব কবতে পাববে।" শেষে বলি৻ · "গণ পণ? চাও কোন লজ্জায? তোমায় জেলে না দিযে যে মেযে দেবাব প্রস্তাব কবেছি এই তোমাব পবম সৌভাগ্য।"

বিনয়েব ভাণ কবিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে, তা ত বটেই, তা ত বটেই! তবে কিনা—"

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "কিনা ফিনা নয়। আমাব এক কথা। সিকি পযসা পাবে না। বাজি হও উত্তম। না হও, জেল। ব্যস।"

আমি আব একটু বঙ্গ দেখিবাব অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আজ্ঞে আপনাব কন্যাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের পক্ষে ত বিশেষ সৌভাগ্যেই কথা—তবে কিনা—তবে কিনা—"

বাবু বাগিয়া বলিলেন, "তবে কিনা কি? জেলে যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কব, তাই যাও।"

"আজ্ঞে তা নয়,—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা ত ঠিক নয়। খাওয়াব কি?"

"কেন, এই ত বললে, জমিজমা বিক্রী করে উকিল ব্যারিষ্টাব লাগাবে। সেই জমিজমা চাষবাস করে স্ত্রীর ভরণপোষণ কবতে পাববে না?"

"আজ্ঞে সে অতি সামান্য। কোনও বকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতে পাবে বটে—কিন্তু

তার উপর নির্ভর করে কি বিবাহ করা উচিত? এই ধরুন আপনাদের আপিসের ছোটসাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, এখনও বিয়ে করছেন না।"

ইহা শুনিয়া বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওরা সাহেব। আমরা কি সাহেব নাকি? ওরা যা করবে তাই কি আমাদের করতে হবে? অন্ধ অনুকরণ করে করেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল!" ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়া ভাল মনে করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, তবে না হয়—তবে না হয়—বিবাহই করব।"

"সেই ভাল কথা। এই আশ্বিন মাস সম্মুখে। পূজোর ছুটি হলে, পশ্চিমে বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর ঐ রকম কোথাও গিয়ে, পুরুত ডেকে, বিয়ে দেব।"

"আজ্ঞে, আবার অতদূর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় না?"

"এখানে? রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? না না—সে হবে না। সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপচাপ। এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূজোর ছুটি হইল। বাবু সপরিবারে দেওঘর যাত্রা করিলেন,—আমাকেও সঙ্গে লইলেন। এ পর্যন্ত প্রিয়ম্বদা এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতামাতা গোপনে পরামর্শ করিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়াছেন। আমার একটি উকিল বন্ধু সেবার ছুটিতে মধুপুর যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্য একখানি ভাল বাড়ী যেন ভাড়া করিয়া রাখেন।

শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাহ হইল। নববধূকে লইয়া যাত্রা করিলাম। শ্বশুরমহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজব্যয়ে আমাদিগকে যশোরে দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন।

বিবাহ-রজনীর পর, প্রভাতে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন প্রিয়ম্বদা জানে আমরা যশোরেই যাইতেছি।

মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে প্রিয়ম্বদাকে নামাইলাম।

প্রিয় বলিল, "এখানে যে?"

আমি বলিলাম, "এখানে দিনকতক থেকে তারপর যাওয়া যাবে।"

যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেইখানে গিয়া উঠিলাম।

প্রিয় বলিল, "এ বাড়ী কার?"

"এখন আমাদের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই আমরা মাসখানেক থাকব দু'জনে।" অপরাহ্নকাল। দুইজনে নিভৃতসুখে বসিয়াছিলাম। এইবার প্রিয়ম্বদাকে সমস্তই বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল, "আমি তা জানি।"

"তুমি জান? কেমন করে জানলে?"

"কেন, সেই যে তুমি আমাকে অসুখের সময় একবার রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়তে এনে দিয়েছিলে, মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"তার মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার কোনও বন্ধুর চিঠি।"

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "বন্ধুর চিঠি? কার চিঠি বল দেখি? কি লেখা ছিল তাতে?"

"নাম ত মনে নাই। তাতে লেখা ছিল, একি পাগলামি তোমার। জমিদারের ছেলে হয়ে, নিজে ডাক্তারি পাস করে, শেষে করছ রাঁধুনিগিরি? আরও সব লেখা ছিল।"

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকিল-বন্ধু যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনি

সেই পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বাবধি সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তাঁহার চিঠিতে ওকথা লেখা ছিল—আরও লেখা ছিল, যদি আমি "প্রভু" কন্যার প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নিজের পরিচয় দিয়া বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাঁড়িঠেলার ভিতর কি কবিত্ব আছে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম—"ওহো মনে পড়েছে। আচ্ছা তাতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি।"

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "যাও, বলব না।"

"না, বল।"

"না, বলব না।"

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম, "আমি তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই জানতে পেরেছিলে?"

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। বলিলাম, "তোমার ভারি অন্যায় ত!"

"কি?"

"পরের চিঠি পড়া।"

"তুমি বুঝি আমার পর?"

"তখনও ত বিয়ে হয়নি। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তাও তখন জানতে না। তখ৹ আমি পর নই?"

"তা বুঝি?"

"তবে কি?"

"আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত বিধাতাপুরুষ আমাদের বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হজুর, মালী ফুল এনেছে।"

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার ফুলশয্যা হইল। [আশ্বিন, ১৩১৩]

বাপকী বেটী

এক

বৈশাখ মাস। আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে, মিষ্টার জি. লাহিড়ী বার-এট-'ল (পুরা নাম গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী) সন্ধ্যার পর পায়জামা সুট পরিধান করিয়া, দ্বিতলের খোলা বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে, দুই এক পেগ হুইস্কি পান করিয়া ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার বেয়ারা, একটি কলাই করা ট্রের উপর একখানা চিঠি আনিয়া, টেবিলের উপর তাঁহার সামনে রাখিয়া প্রস্থান করিল। চিঠিখানি পড়িয়া লাহিড়ী সাহেব ডাকিলেন, "সরযূ ও সরযূ—শোন।"

তাঁহার পত্নী মিসেস লাহিড়ী এই আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া, বলিলেন, "কেন?"

সুরেশের মুহুরি কি চিঠি লিখেছে দেখ।"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্রখানি পত্নীর হস্তে দিলেন।

সরযূ পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন, "তাই ত। সুরেশবাবুর এমন অবস্থা? পরশুও ত তুমি তাঁকে দেখে এসে বললে অনেকটা ভাল। তা তুমি কি এখনই বেরুতে চাও? ডিনার খেয়ে গেলে হত না? দেরী পথ। সেখানে গিয়ে কি অবস্থা দেখবে, ফিরতে কত রাত হবে, বলা ত যায় না।"

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "না, দেরী ক'রে দরকার নেই। দেখছ না, লিখেছে, এখন-তখন অবস্থা। আমি এখনই যাই, ফিরে এসেই ডিনার খাব। তোমরা বরং খাওয়া দাওয়া সেরে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিও। এই বেয়ারা—একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জলদি।"

"বহুৎখু"—বলিয়া বেয়ারা ট্যাক্সি আনিতে গেল।

মিসেস লাহিড়ী নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আহা সুষমা ছুঁড়ির অদৃষ্টটা দেখ, একবার। বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী গেল। মা ত আগেই গিয়েছিল, বাপও চলল। কি যে দশা হবে মেয়েটার কে জানে। আত্মীয়স্বজন কে কে আছে?"

"বাগবাজারে সুষমার মামারা আছে। সুরেশ তার শ্বশুরবাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়তো কিনা। তারপর, আমি গেলাম ব্যারিষ্টারি পড়তে, সুরেশ ল কলেজ জয়েন করলে।'

"ওর শ্বশুরবাড়ীতে?"

"শ্বশুর শাশুড়ী ত আগে থেকেই ছিল না। দেওর ভাসুর-টাসুর আছে বোধ হয়। কিন্তু সে কি এখানে? মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর গ্রামে। তাদের সংসারে গিয়ে পড়'ল বউকে তারা ফেলতে পারবে না বটে। কিন্তু সুষমা লেখাপড়া গান বাজনা জানা নব্যতন্ত্রের মেয়ে, সেখানে বাস করা কি ওর পোষাবে? বিশেষত তারা গরীব গৃহস্থ। ও সেখানে গিয়ে তাদের ঘরও নিকোতে পারবে না, ধানও সিদ্ধ করতে পারবে না।"

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "দেখ, এইগুলো কিন্তু বাপ মায়েদের ভারি অন্যায়। মেয়েকে যদি কলেজে পড়িয়ে মেমই ক'রে তুললি, তা হলে সেই রকম ঘর বরে তাকে দে—গরীবের ঘরে দিস্ কেন?"

'গরীবের ঘরে কি আর সাধে লোকে মেয়ে দেয়?—টাকার জোর না থাকলে কাজেই দিতে হয়। ওকালতী ব্যবসাতে কোন দিন তেমন সুবিধে ত করতে পারেনি। তবে বাঙ্গালী ষ্টাইলে থাকে, খরচপত্র কম, এই যা সুবিধে। নইলে অবস্থা ত সুরেশের আমারই মত। তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘটে বইত নয়।"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল ট্যাক্সি আসিয়াছে। লাহিড়ী সাহেব বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই, সেই পায়জামা সুটের উপরেই একটা ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া বাহির হইয়া

পড়িলেন। ট্যাক্সির নিকট গিয়া দেখিলেন, পত্রবাহক ভৃত্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুই এখনও রয়েছিস? আচ্ছা গাড়ীতে ওঠ্ ড্রাইভারের পাশে বোস্।"—বলিয়া নিজেও আরোহণ করিয়া আদেশ দিলেন, "বৌবাজার।"

ট্যাক্সি ছুটিল। এই সময় লাহিড়ী সাহেবের ঘর গৃহস্থালীর কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। আজ প্রায় বিশ বছর তিনি ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ, তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে রিসিভারি কর্ম্ম পান। ব্রীফও মাঝে মাঝে দুই চারিটা যে না পান, এমন নহে। কিন্তু পূরাদস্তুর সাহেবিয়ানার খরচ তাহাতে পোষায় না। বাড়ীখানি তাঁহার নিজের নয় ভাড়ার। মোটর কিনিতে পারেন নাই, ট্যাক্সিতে আদালত যান। গৃহে তাঁহার স্ত্রী মাত্র। কোনও সন্তানাদি জীবিত নাই। একটা বাসনমাজা জলতোলা চাকর এবং একটা বেয়ারা আছে। ঝিকে ঘাগরা পরাইয়া তাহাকে আয়া বানাইয়াছেন। বাবুর্চ্চি আছে কিন্তু রাঁধে সে দিনেবেলায় ভাত, ডাল, "ছেঁচকি কারি", মাঝের ঝোল—বাঙ্গালীর খাদ্য সবই রাঁধে তবে সে সব ব্যঞ্জনেই পেঁযাজ দেয়, মায় মাছের ঝোলে পর্যন্ত। রাত্রে লুচি ভাজে, বেগুন ভাজে, কোনও দিন বা মাছের, কোনও দিন বা পাঁঠার কালিয়া রাঁধে, ফাউল কারিও মাঝে মাঝে রাধে। সে সকল রান্না, ডিশেব ভিতর ভরিয়াই টেবিলে আসে,—ছুরি কাঁটা চামচের সাহায্যেই ভক্ষিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী বাল্যবন্ধু সুরেশবাবুও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া খাইয়া যাইতেন। সুরেশবাবু কুসংস্কারবর্জ্জিত আধুনিক হিন্দু। তবে তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া, রাঢ়ী শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন—অবশ্য হিন্দুমতেই। আজকাল ত অনেকেই বলিতেছেন, ইহাতে জাতি যায় না এবং না যাওয়াই ত উচিত।

দুই

বৌবাজারে বন্ধুগৃহে পৌঁছিয়া লাহিড়ী সাহেব দেখিলেন, সুবেশবাবুর দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। কন্যা সুষমা পিতার পদতলে পাষাণ-প্রতিমাব মত বসিয়া। শয্যাপার্শ্বে চেয়ারের উপর একজন ডাক্তার এবং দুইজন বন্ধু—ইঁহারাও হাইকোর্টের উকীল, লাহিড়ী সাহেবেরও পরিচিত। কিয়দ্দূরে, মাদুর পাতিয়া বসিয়া সুরেশবাবুর মুহুরী প্রৌঢ়বয়স্ক হরনাথ চক্রবর্ত্তী। ভৃত্য তাড়াতাড়ি লাহিড়ী সাহেবের জন্য একখানি চেয়ার আনিয়া দিল।

লাহিড়ী নিম্নস্বরে একজন উকীল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুচ্চেন?"

"হ্যাঁ,—একটু আগেও জিজ্ঞাসা করছিলেন, লাহিড়ী এখনও এল না? উইল করেছেন আপনাকেই তার একজিকিউটাব করেছেন। মুখে আপনাকে কিছু বলে যাবেন, সেই জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

"ডাক্তাব কি বলছেন?"

"আজ রাত কাটার আশা কম।"

নিদ্রিত বন্ধুর মুখপানে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে লাহিড়ী সাহেব উঠিলেন। ইঙ্গিতে সুষমাকে ডাকিয়া, তাহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেলেন।

সোফার উপর নিজ পার্শ্বে সুষমাকে বসাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মা, সব বুঝছ ত?"

সুষমা এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হবে জেঠামশাই?"

লাহিড়ী সাহেব সুষমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেঁদ না মা, চুপ কর। ঈশ্বর যা করবেন, তাই হবে। তোমার মামাদের খবর দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, বড়মামার কাছে মুহুরীবাবুকে পাঠিয়েছিলাম।" "কবে?"

"আজ বেলা দুটোর পর। তার আগে ত বিশেষ কোনও ভয় আছে ব'লে জানতে পারিনি।"

"মামারা কি বলেছেন? এখনও এলেন না?"

"সন্ধ্যার পর আসবেন বলে দিয়েছেন।"

এই সময় উকীল বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "আসুন মিষ্টার লাহিড়ী, সুরেশবাবু জেগেছেন।"

লাহিড়ী তাড়াতাড়ি রোগীর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর একখানি হাত নিজ দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন, "কেমন আছ ভাই, এখন?"

সুরেশবাবু কোনও উত্তর না করিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া লাহিড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লাহিড়ী আবার বলিলেন, "কোন কষ্ট হচ্ছে কি?"

রোগী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কষ্ট? কই? হ্যাঁ—গিরীন, ভাই, আমি ত চললাম। একটা বিশেষ কথা—তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।"

একজন উকীল বন্ধু দাঁড়াইয়া উঠিয়া অপর সকলকে বলিলেন, "চলুন না, আমরা একটু ও ঘরে যাই।"

রোগী ধীরে ধীরে একটি শীর্ণ হস্ত তুলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "না—না—কেউ যেও না। থাকো।"

উকীলবাবু আবার বলিলেন।

রোগী তখন কন্যার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "জল।"

সুষমা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া ফীডিং কাপের সাহায্যে পিতাকে পান করাইয়া দিল। জলপান করিয়া, রোগী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "গিরীন, ভাই, আমার সুষীকে আমি তোমার জিম্মায় দিয়ে যেতে চাই। ওর ভার তুমি নিতে পারবে ভাই?"

লাহিড়ী বলিলেন, "নিশ্চয়! ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে। আমার ত কোনও সন্তানাদি নেই, আমি ওকে নিজের মেয়ের মতন করেই পালন করবো, তার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেব না ভাই।"

রোগী বলিলেন, "তুমিই নাও। ও যেমন লেখাপড়া শিখছে, তেমনি শিখতে থাকুক। ওর মার পনেরো হাজার টাকা ছিল, সেই টাকাটা ওর জন্যে রেখে যাচ্চি। তাই থেকে ওর খরচপত্র চালিও। একটি ভাল পাত্র দেখে ওর আবার বিয়ে দিও ভাই। ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়েছে—পুরো দুটি বছরও স্বামীর ঘর করতে পায়নি। ওর জীবনের কোনও সাধ আহ্লাদই ত মেটেনি। সেজন্যেই ওকে আমি তোমার হাতেই দিয়ে যেতে চাই। ওর মামারা বড়লোক হলেও, গোঁড়া হিন্দু—তারা ওর বিয়ে দেবে না। ওর ভাসুর দেওররা, তাদের ত কথাই নেই। তুমিই আমার মেয়েটিকে নিয়ে যেও ভাই,—নিয়ে গিয়ে, যাতে ওর ভাল হয়, যাতে ও সুখে থাকে, তাই কোরো—তা হলে পরলোকে আমি শান্তি পাব।"

কথাগুলি শেষ করিয়া, সুরেশবাবু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাঁপাইতে লাগিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে সুষমা কহিল, "বাবা একটু বেদানার রস খাবেন?"

ইঙ্গিতে সুরেশবাবু সম্মতি জানাইলেন। দুই চামচ বেদানার রস পান করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই সময় সংবাদ আসিল, বাগবাজার হইতে সুষমার মামারা আসিয়াছেন। মুন্সিবাবু ইঁহাদের আনিতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। সুষমার দুই মামা ও তিন মামী উপরে উঠিয়া আসিলেন। সিঁড়িতে উঁহাদের পদশব্দ পাইয়া, ডাক্তারবাবু প্রভৃতিকে লইয়া লাহিড়ী সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমার বড়মামা অবিনাশবাবু সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন, "হাঁ হে গিরীন, সুরেশের এ রকম অসুখটা হয়েছিল, আগে আমাদের খবর দিতে নেই?"

লাহিড়ী বলিলেন, "আগে কি আমরাই জানতে পেরেছিলাম? পরশুও ত আমি দেখে গেছি, তখনও কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, কল্য প্রাতেই আবার আসিবেন বলিয়া লাহিড়ী সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবুরা সকলেই রাত্রে এখানে থাকিবেন।

ভোর রাত্রে সুরেশবাবুর আত্মা, দেহপিঞ্জর ভেদ কবিয়া অনন্তের পথে উধাও হইল। লাহিড়ী সাহেব বেলা ৮টার সময় আসিয়া দেখিলেন, "বল হরি হরিবোল" শব্দে শবাধার সিঁড়ি বাহিয়া নামান হইতেছে।

তিন

সুষমার বয়স যখন ১১ বছব, সেই সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হয। সুরেশবাবুব বয়স তখন ৩৫ বৎসর মাত্র। বন্ধুবান্ধব সকলেই তখন পুনরায বিবাহ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কয়েকজন "ডাগর" মেয়ের পিতাও তাঁহাকে এজন্য বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশবাবু সম্মত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে মেয়েকে তিনি বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখাইতেন। চাকর বামুন লইয়া বাসা—তিনি আদালতে চলিয়া গেলে দীর্ঘ দিন মেয়েকে দেখে কে, তাই সুষমাকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি কবিয়া দিলেন। তিন বৎসর পরে, গরীব গৃহস্থ ঘরের একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবাকে পাইয়া, তাহাব হস্তে কন্যা সমর্পণ কবিযাছিলেন। মেয়েকে তখন অবশ্য স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইয়াছিল। ষোল বৎসর বয়সে সুষমার কপাল পুড়িল। মেয়েকে সুরেশবাবু শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন। আবাব তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সুষমা এখনও সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রী, আগামী বৎসর তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা।

বিধবা হইয়া, থান কাপড় পরিয়া, রিক্ত প্রকোষ্ঠেই সুষমা শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়ের সে বেশ দেখিয়া বাপের বুকে বড় বাজিল, তাই পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সুষমা সরুপাড় ধুতি, গলায় একটি সরু গোট হাব এবং দুই হাতে দুইগাছি কবিয়া চারিগাছি সোনার চুড়ি পরিল। হিন্দু বিধবার নিরম্বু একাদশী পিতা তাহাকে করিতে দিলেন না;—বলিলেন, "তুই যদি মা নিরম্বু উপবাস করিস, তবে আমিই বা কোন্ লজ্জায় খাব?" পিতা পুত্রী উভয়েরই একাদশীর দিন ফল ও মিষ্টান্ন মাত্র গ্রহণ করিতেন। মাছ খাওয়াইবার জন্য কন্যাকে তিনি পীড়াপীড়ি করেন নাই, বিপত্নীক হইবার পর হইতে নিজে তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুঁৎমার্গের পথিক তিনি ছিলেন না। দুই তিনমাস পূর্ব্বেও তিনি লাহিড়ী-গৃহিণী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কন্যা সহ তাঁহার টেবিলে বসিয়া নিবামিষ আহাব করিয়া আসিয়াছিলেন।

মামা মামীরা উপস্থিত থাকিয়া, বৌবাজারের বাসাতেই সুষমাকে দিয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইলেন। সুষমা লাহিড়ী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া অতঃপর বাস করিবে, একথা উইলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। ইহা অবগত হইয়া মামারা কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইলেন। একে ত ভাগিনেয়ীর কপালদোষে ইহকালটি তাহাব নষ্ট হইয়াই গিয়াছে, তদুপরি ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন বিলাতফেরত লাহিড়ী সাহেবের গৃহে অবস্থান করিয়া এবং সম্ভবতঃ পুনরায় বিবাহ (তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'নিকা') করিয়া পরকালটিও নষ্ট হইয়া যায় ইহা তাঁহাদের অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু তাঁহাদের গৃহিণীরা একবাক্যে বলিলেন, "সেই ভাল সেই ভাল। নিকুড়ে পড়ুনে গাইয়ে বাজিয়ে ঐ আগুনের খাপরা ক'ড়ে রাঁড়িকে আগলে থাকা কি সোজা কথা? ও দায় যে আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে সে ভাগ্যিই বলতে হবে।"

শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে, লাহিড়ী সাহেব উদ্যোগী হইয়া মৃত বন্ধুর জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া, সুষমাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। মিসেস লাহিড়ী স্নেহ ও সমাদরে তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

চার

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুষমা বেথুন স্কুলে পড়িতেছে, স্কুলের গাড়ীতে যাতায়াত করে। তবে এখন পূজার ছুটি-সারাদিন সে বাড়ীতেই থাকে। তার বড়মামা অবিনাশবাবু, মাঝে একদিন মাত্র আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।

লাহিড়ী সাহেব সুষমার সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া তাহারই নামে হিসাব খোলাইয়া দিয়াছেন। তবে চেক-বহিখানি তিনি নিজের কাছে রাখেন। তাহার খরচ-পত্রের হিসাবে প্রতিমাসে একখানি করিয়া চেক তিনি তাহাকে দিয়া সহি করাইয়া লন।

সুষমা যে পনেরো হাজার টাকার মালিক, ইহা হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী ও উকীল লাইব্রেরীতে প্রচার হইতে দেরী লাগে নাই। সুষমার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্যই যে তাহার পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে লাহিড়ী সাহেবের জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেকে শুনিয়াছে। কিছু দিন হইতে হাইকোর্টের দুই চারিজন জুনিয়র ব্যারিষ্টার লাহিড়ী সাহেবের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সুষমার নিকট তাহারা কেহই আমল পায় না। লাহিড়ী সাহেব তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনিও উহাদিগকে উৎসাহ দেন না। কারণ তিনি জানেন এই যুবকগণের অবস্থা কাহারও তেমন ভাল নয় এবং সুষমার টাকার গন্ধেই তাহাদের এই ঘন ঘন যাতায়াত।

একদিন বিকালে স্বামীস্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সুষমা তখন তাহার সখী ললিতার গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। সুষমা ও ললিতা এক ক্লাসে পড়ে। মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "হাঁ-গা সুষীর বিয়ের কি করছ?"

লাহিড়ী বলিলেন, "তেমন মনের মতন পাত্র কই?"

"চেষ্টা করলে পাত্র কি আর মেলে না?"

"এ ত সাধারণ হিন্দু ঘরের মেয়েব বিয়ে নয় যে ঘটক লাগিয়ে পাত্র স্থির করব। লভ ম্যারেজ (প্রেমের বিবাহ) ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? কোনও ছেলের সঙ্গে যদি ওর ভালবাসা জন্মে যায়,—সে ছেলে নিজেই তখন বিয়ের প্রস্তাব করবে, তার গুণাগুণ, আর সাংসারিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমরা যদি ভাল বুঝি, তখন মত করবো।"

"ঐ যে কুমুদ চাটার্জ্জি আসে, ও ছেলেটি ত মন্দ নয়। সুষীর সঙ্গে ওর একটু মেলামেশায় দিনকতক একটু উৎসাহ দিলে হয় না?"

"ও তো এই সবে বছর তিনেক হল ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। এখনও কিছুই করতে পারেনি। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। বিয়ে ক'রে সংসার চালাবে কোথা থেকে?"

"আর, বিনয় সেন?"

"বাপের বিষয় সম্পত্তি কিছু পেয়েছিল বটে, কিন্তু শুনি, তার বেশীর ভাগই উড়িয়েছে। পাঁড় মাতাল!" "আর ঐ যোগেশ মজুমদার?"

"ওঁর মা বাপ মহা হিন্দু। বিষয় আয় বেশ আছে বটে; কিন্তু ছোঁড়াটা বড় অলস কিছু করতে চায় না। বাপের কাছে মাসহারা পায়, তাইতে সাহেবিয়ানা চলে। ওর বাপের চেষ্টা, খাঁটী হিন্দু মতে ওর বিয়ে দেন। তাঁর অমতে যদি ও বিধবা বিবাহ করে বাপ হয়ত রেগে মাসহারাটি বন্ধ ক'রে দেবেন, তখন খাবে কি?"

শুনিয়া লাহিড়ী গৃহিণী নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ তেমন মনের মতন পাত্র একটি পাওয়াই যদি যায়, সুষী আবার বিয়ে করতে রাজি হবে ত? এত চেষ্টা করেও ওকে মাছ মাংস খাওয়াতে পারা গেল না। তারপর তোমারই কাছে ত শুনেছি, আয়াকে দিয়ে ফুল আনায়, রোজ ঘরে দোর বন্ধ ক'রে ঠাকুরপুজো করে। ওকি ফের বিয়ে করতে রাজি হবে? তুমি বরঞ্চ আগে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, ওর মনটি বুঝে দেখ। এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়েছিলে কোনও দিন?'

"না, তা কইনি বটে। কিন্তু মনের মত বর পেলে বিয়ে করতে ওর আপত্তি হবে ব'লে ত বোধ হয় না। এত লেখাপড়া করছে, জুতো মোজা পরে বেড়াচ্চে, টেবিলে ব'সে বাবুর্চ্চির রান্না খাচ্চে—তা মাছ মাংস নাই খাক, বিলেতেও দুষ্য ব'লে মনে ক'রবে না।"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ওটা ভাবা কিন্তু তোমার ভুল। জুতো মোজা প'রে বেড়ায়, বাবুর্চ্চির রান্না খায়, ওগুলো সব বাইরের জিনিষ। কোনটা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম—এ সব হল অন্তরের জিনিষ। বাইরের আচারের সঙ্গে তার যে বড় বেশী যোগ আছে তা নয়। যা হোক, কথায়বার্ত্তায় তুমি ওর মনটি বুঝে দেখবার চেষ্টা কোরো।"

"আচ্ছা তা আমি করবো।"

এই সময় সুষমা ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে ফিকা নীল ফিতায় বাঁধা সুন্দর একটি বাক্স। আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলল, "জ্যেঠাইমা, তোমার জন্যে আমি একটি গন্ধ এনেছি।"—বলিয়া বাক্সটি মিসেস লাহিড়ীর হাতে দিল।

মিসেস লাহিড়ী উহা খুলিয়া বলিলেন, "বাঃ শিশিটি কি সুন্দর! কোথায় কিনলি মা?

আমরা যে মার্কেটে গিয়েছিলাম।"

"তোরা কারা? কে কে গিয়েছিলি?"

"ললিতা, আমি, আর ললিতার দাদা ডক্টর ঘোষ।"

"কত দাম নিলে?"

"সাত টাকা। গন্ধ অবশ্য কেমন হবে জানিনে, কিন্তু শিশিটি দেখে আমার ভারি পছন্দ হ'ল, কিনে ফেললাম। আমার সঙ্গে টাকা ছিল। দাম দিতে গেলাম, কিন্তু ডক্টর ঘোষ কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। মনে করলাম তা হ'লে ফিরিয়ে দিই, নেবো না। কিন্তু হয়ত সেটা অভদ্রতা হবে, তাই অগত্যা নিতে হ'ল। আমাকেও এটা কিনে দিলেন, ললিতাকেও ঠিক এই রকম একটা কিনে দিলেন। আচ্ছা জ্যেঠামশাই, নিয়ে অন্যায় ক'রেছি কি?"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ফিরিয়ে দিলে অসৌজন্য হ'ত বইকি।'

গৃহিণী বলিলেন, "ওরাই তোকে নামিয়ে দিয়ে গেল, বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের উপরে আনলিনে কেন, চা-টা খেয়ে যেত।"

"চা আমরা ওদের বাড়ী থেকেই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তবু আমি বললাম, চলুন, উপরে চলুন, জ্যেঠাইমা জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না? ডক্টর ঘোষ বললেন, তোমার জ্যেঠাইমা জ্যেঠামশাইকে আমার নমস্কার দিও আমি আর একদিন এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা এখনও চা খাইনি। যাও ত মা, আমাদের চা দিতে বল, আর গন্ধটিও আমার ঘরে রেখে এস।"

সুষমা চলিয়া গেলে মিসেস লাহিড়ী স্বামীর প্রতি কুটিল চাহনি হানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি গো? হাওয়া কোন্‌ দিক থেকে বইছে, কিছু বুঝতে পারছ?" লাহিড়ী সাহেব উত্তর করিলেন, "কিছু না। ঐ ঘোষ ছোকরা কি রকম ডাক্তার? পুরো নাম কি?"

"সুষীর কাছে শুনেছি, তার নাম সরোজনাথ-সে বিলেতফেরৎ ডাক্তার।

"বয়স কত?"

"তা শুনিনি।"

অল্পক্ষণ পরে সুষমা ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাদের নিকট বসিল।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ সুষী, ললিতারা তোকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, জিনিষ দেয়, তুই ওদের নেমন্তন্ন করিস না কেন?"

"করবো জ্যেঠামশায়?"

"করা উচিত নয় কি? তুমি কি বল গো?"—বলিয়া তিনি পত্নীর পানে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিল, "নিশ্চয়ই উচিত।"

স্থির হইল। আগামী রবিবারে, ললিতাদের ভাই বোনকে সুষমা নিমন্ত্রণ করিবে—দিনের বেলায়।

পাঁচ

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলিতে লাগিল।

ইঁহারা দেখিলেন, সরোজ ছেলেটি ভাল। তার বাপ-মা জীবিত নাই। ঐ বোন ললিতা, আর, একটি ছোট ভাইও আছে। লাহিড়ী সাহেব খবর লইয়া জানিলেন, সরোজ যদিও তিন চারি বৎসর মাত্র বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, তথাপি ইহারই মধ্যে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, সরোজের পক্ষে সুষমা একটা আকর্ষণের বস্তু।

মাস দুই পরে একদিন সরোজ আসিয়া লাহিড়ী গৃহিণীর নিকট বলিল, "আপনারা কি সুষমার আর বিয়ে দেবেন না?"

গৃহিণী বলিলেন, "দেবারই ত ইচ্ছে। ওর বাবা এই জন্যেই ত ওকে আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। নইলে ওর মামারা অবস্থাপন্ন লোক,—সেইখানেই ত ওর থাকবার কথা। কিন্তু তাঁরা আবার গোঁড়া হিন্দু কিনা! এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ, সরোজ? তোমার সন্ধানে কি কোনও ভাল পাত্র আছে?"

সরোজ বলিল পাত্র একটি আছে—তবে ভাল কি মন্দ সেটা অবশ্য আপনাদেরই বিচার্য্য।"

"কে বল দেখি?"

সরোজ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে কি আপনি সুষমার যোগ্য পাত্র মনে করবেন?"

গৃহিণী, খুব বিস্মিত হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি?" তুমি সুষীকে বিয়ে করবে? সে ত তার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু সুষীর মন কি তুমি বুঝেছ?"

"না, চেষ্টাই আমি এখনও করিনি মিসেস লাহিড়ী। আপনাদের অনুমতি না পেলে—"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত ঠিক। তুমি যেমন ভদ্র ছেলে, তার উপযুক্ত কাজই করেছ। আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। উনি যে রকম বলেন, তোমায় জানাবো।"

"তাহলে দয়া ক'রে আজ কি মিষ্টার লাহিড়ীর মতটা জেনে রাখবেন? কাল আবার এ সময় আমি আসবো কি?"

মিসেস লাহিড়ী মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, বাবাজীর যে আর তর সইছে না দেখছি! প্রকাশ্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ এত, আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে রাখবো এখন, কাল আবার তুমি এস।"

সরোজ আশান্বিত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

রাত্রে নিভৃতে গৃহিণী স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। লাহিড়ী বলিলেন, "সরোজ যে সুষীর দিকে খুব ঝুঁকেছে তা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত বটেই। কেমন, তোমার কোনও অমত নেই ত?"

লাহিড়ী বলিলেন, "ছেলেটি ত বেশ ভালই। ডাক্তারীতে এরই মধ্যে বেশ পশার ক'রে নিয়েছে। সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র—কিন্তু সুষী বেটী কি রাজী হবে?"

"কেন রাজি হবে না? এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবে শুনি?"

"ভাল মন্দর কথা আমি বলছিনে। আমার কিন্তু মনে হয় ওর কেবল বাইরেটাই আধুনিক, কিন্তু ভিতরটা নিতান্ত সেকেলে। বিধবার আবার বিয়ে করা, ও হয়ত মহাপাপ

ব'লে মনে করে। তা যদি না হত, তবে ও মাছ মাংসও ছাড়তো না, একাদশীতে ফলমূলও খেত না, আর লুকিয়ে ঠাকুর পূজোও করত না।"

"বেশ ত, সরোজ চেষ্টাই করুক না।"

"হ্যাঁ—সবোজকে বোলো সে আগে বেশ করে ওর মন বুঝে দেখুক। সবোজ যেমন ওকে ভালবেসেছে, সুষীও যদি তাকে সেই বকম ভালবেসে থাকে, তাহলে আব কথা কি!"

"তা হলে ঐ কথাই সবোজকে বলি?" "হ্যাঁ, বোলো।"

দিন পনেরো পবে সুষমা একদিন মিসেস লাহিড়ীকে বলিল, "পরশু ববিবার বিকেলে ললিতার দাদা ললিতাকে আর তার ছোট ভাইকে আলিপুবে ফ্লাওযার শো (পুষ্প প্রদর্শনী) দেখাতে নিযে যাবেন। ললিতা আমাকে জিজ্ঞাসা কবেছে তুই যাবি ভাই, তাহলে তোকে আমবা তুলে নিয়ে যাই। আমি বলেছি আচ্ছা, জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা কবে কাল বলবো।"

গৃহিণী সস্নেহে সুষমাব গায়ে হাত বুলাইযা বলিলেন, "বেশ ত। তা যেও মা। আর ওদেব দু'জনকে নেমন্তন্ন কোবো, শো থেকে ফিবে, বাত্রে এখানে এসে খাওযাদাওযা কবে যাবে।"

ববিবাব বিকালে সবোজ আসিল, কিন্তু ললিতা কিংবা তাব ছোট ভাই আসে নাই। বলিল, ললিতাকে এবং ছোট ভাইকে মাসীমা নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন, আজ রাত্রে সেখানে তাবা থাকিবে।

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "তা হ'লে আর কি হবে?"

সবোজ বলিল, "সুষমাকে নিযে যেতে পাবি?"

মিসেস লাহিডী বলিলেন, "বেশ ত নিয়ে যাও।"

সুষমা বলিল, "আজ থাক্না জ্যেঠাইমা। অন্য একদিন গেলেই ত হবে।"

সবোজ বলিল, "আজ কিন্তু বিশেষ ক'বে গোলাপ ফুলেবই এগ্‌জিবিশন। এটা মিস্ কবা উচিত নয।"

সুষমা বলিল, "তা হলে তুমিও চল জ্যেঠাইমা।"

"আমার কি সময় আছে মা? কত কাজ আমার পড়ে বয়েছে, তা ছাড়া উনিও বাড়ী নেই। যাওনা, সঙ্গে গিয়ে তুমি ফুল দেখে এস। সবোজ, ফিবে এসে এইখানেই খাবে ত তুমি?"

"হ্যাঁ, খাব বইকি মিসেস লাহিড়ী।"

সুষমা নিতান্ত অনিচ্ছায় বেশ পরিবর্ত্তন জন্য উঠিয়া গেল।

এই সুযোগে, সবোজ বলিল, "দেখুন, অনেক চেষ্টা কবেও ওব মনেব কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পাবলাম না।"

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা কবিয়া তারপর বলিলেন, "ওঁর পবামর্শে চলতে গিয়েই ত এ রকম হল। নইলে এতদিন কোন্‌কালে যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।"

"আমাব প্রতি ওব যে মন আছে তাব কোনও লক্ষণ আপনি কি বুঝতে পারেন?"

"ও বড় চাপা মেয়ে। ও সবে আর দরকার নেই। আমি নিজে ববং আজ বাত্রে খোলাখুলি ওকে জিজ্ঞাসা করি।"

সবোজ মিনতির স্বরে বলিল, "আমি চলে গেলে তাবপব জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বেশ, তাই হবে।"

ছয়

লাহিড়ী সাহেব সস্ত্রীক ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পব সুষমাকে লইয়া সরোজ ফিবিয়া আসিল। সুষমাব হস্তে গোলাপ ফুলের মস্তবড একটা সাজি, তাহাতে নানা আকাব

ও বর্ণের ফুল ফার্ণ-পাতা সহযোগে সজ্জিত। লাহিড়ী সাহেব ও তাঁহার গৃহিণী পর্য্যায়ক্রমে সাজিটি হাতে লইয়া পরীক্ষা ও আঘ্রাণ করিয়া উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "সরোজ, তুমি মুখ হাত ধোবে না?"

"হ্যাঁ ধোব।"

লাহিড়ী সাহেব বেয়ারাকে ডাকিয়া সরোজকে গোসলখানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। সরোজ চলিয়া গেল।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিলে ফুলগুলো রে সুষী?"

"সাড়ে আট টাকা। কিনে, আমি দাম দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সরোজবাবু কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। একবার ভাবলাম তবে থাক্—নিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, সেটা হয়ত একটু অভদ্রতা হয়, তাই অগত্যা নিলাম। অন্যায় করেছি জ্যেঠামশাই?"

"না অন্যায় করনি মা।" —বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "না নিলেই অন্যায় হত। যাও মা তুমি কাপড়চোপড় বদলাওগে—তারপর ফুলগুলি, কয়েকটা ফুলদানীতে জল দিয়ে বেশ করে সাজিয়ে ফেলো।"

পনেরো মিনিট পরে সরোজ ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিল। আর কিছুক্ষণ পরে সুষমাও আসিল—তার হাতে দুটি গোলাপ। একটি জ্যেঠাইমার চুলে পরাইয়া দিল, একটি জ্যেঠামহাশয়ের কোটে বটন্ হোল করিয়া দিতে লাগিল।

লাহিড়ী সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি বুড়োমানুষ আমার কি সাজে রে বেটী? সরোজের কোটে পরিয়ে দে।"

সুষমা কিন্তু শুনিল না, জ্যেঠামহাশয়ের কোটেই ফুলটি পিন দিয়া আটাকাইয়া দিল।

লাহিড়ী সাহেব উহা খুলিয়া, হাসিতে হাসিতে সরোজের কোটে লাগাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহিণী নিজের খোঁপার ফুলটি সুষমার চুলে গুঁজিয়া দিলেন।

"বাঃ—এ কি?"—বলিয়া সুষমা আর দুইটি ফুল লইয়া, জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমাকে অলঙ্কৃত করিল।

আহারান্তে, রাত্রি ১০টার সময় সরোজ বিদায় গ্রহণ করিল। লাহিড়ী সাহেবও রাতকাপড় পরিবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুষী বলিল, "আমিও তা হলে শুইগে জ্যেঠাইমা!"

হ্যাঁ মা। চল্—আমিও তোর ঘরে যাচ্ছি,—একটু কথা আছে।"

সুষমার শয়নকক্ষে গিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সরোজ ত মহা বায়না নিয়েছে মা।"

নিজ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সুষমা বলিল, "কি বায়না জ্যেঠাইমা?"

"তোকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র সুষমা চক্ষু অবনত করিল। গৃহিণী দেখিলেন, তাহার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। ক্ষণপরে সুষমা বলিল, "তা হলে, তিনি ক্ষ্যাপার মত কাজই করেছেন জ্যেঠাইমা!"

"কেন?"

"কারণ, বিয়ে ত আমি করবো না।"

"কেন করবে না বাছা? তোমার এই কাঁচা বয়স; ভাল ঘর বর পেলে বিয়ে ত করাই উচিত। কেন, সরোজকে কি তোমার পছন্দ হয় না? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, দেখতেও ভাল, নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে মা?

সুষমা বলিল, "সে কথা নয় জ্যেঠাইমা। কিন্তু আমি যে—বিধবা।'

"কেন বিধবা-বিবাহ কি তুমি তবে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত মনে কর না? লেখাপড়া লেখার ফল কি হল তবে?"

"সকল বিধবার পক্ষে আবার বিবাহ অধর্ম্ম বা অন্যায় ব'লে আমিও মনে করিনে জ্যেঠাইমা।"

"তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাওনা বাছা?"

সুষমার মুখে আসিয়াছিল, "কারণ, আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, আর যতদিন বেঁচে থাকবো, বাসবো।"—কিন্তু একথা বলিতে তাহার লজ্জা করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনি ত জানেন জ্যেঠাইমা, আমার মা যখন চ'লে গেলেন, কতলোক ত বাবাকে ফের বিয়ে করার জন্যে বলেছিলেন। বাবার তখন মাত্র ৩৫ বৎসর বয়স—পুরুষ মানুষের পক্ষে সেটা পূর্ণ যৌবন কাল। কিন্তু বাবা ত বিয়ে করেন নি। বাবার ঘরে, মার যে অয়েলপেন্টিং ছবিখানি টাঙ্গানো থাকতো, বাবা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে, মার সেই ছবিখানি ফুল দিয়ে সাজাতেন—ব্যারাম হবার পরও কয়েক দিন তার অন্যথা হয়নি। বাবা যদি আবার বিয়ে করতেন, তা হলে কেউ ত তাঁকে বলতে পারতো না যে তিনি অন্যায় বা অধর্ম করলেন।"

লাহিড়ী গৃহিণী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কথাগুলির তাৎপর্য্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে নিয়ে কত বচ্ছর ঘরকন্না করেছিলেন—কিন্তু তুমি ত বাছা, তোমার স্বামীর সঙ্গে পুরো দুটি বছরও পাওনি।"

সুষমা, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। কোনও উত্তর করিল না।

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিলেন। সুষমার প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে বড্ড ভালবাসতেন তা আমরা জানতাম। তোমার মার মৃত্যুর পর কিছুদিন অবধি তিনি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, একটা কথা আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তুমি রোজ মায়াকে দিয়ে ফুল আনাও আমরা মনে করতাম, লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ঠাকুর পূজো ক'রে হিঁদুয়ানী বজায় রাখো। তুমিও কি তোমার বাবার মতন—"

সুষমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমার স্বামীর একখানি ফোটোগ্রাফ আমার কাছে আছে।"

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা রাত হল, শোও এখন। এ বিষয়ে আর কখনও আমি তোমায় অনুরোধ করবো না, তুমি আমার উপর রাগ কোর না মা।"

"না জ্যেঠাইমা, রাগ করবো কেন? আপনি ত ভাল ভেবেই বলেছিলেন। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না, জ্যেঠাইমা।"—বলিয়া সুষমা, গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলে সুষমা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া, যে দেরাজে তার মৃত স্বামীর ছবি থাকিত, উহা খুলিল। ছবিখানির চারিদিকে অদ্য প্রাপ্ত তাজা গোলাপ ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া সুষমা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল; বস্ত্রাঞ্চলে ছবিখানি বেশ করিয়া মুছিয়া, উহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—আমি ত জানতাম না যে ও ফুলগুলোর সঙ্গে অলক্ষ্যে একজনের বাসনার কালি মাখানো আছে।"

বিষবৃক্ষের ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে একটি দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়ীটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধবিহীন। প্রবেশ করিলেই তাহাকে "মেসের বাসা" বলিয়া ভ্রম জন্মে না। সিঁড়িগুলি প্রশস্ত—জলে কাদায় পিচ্ছিল নহে, অন্ধকার নহে। উপরের কক্ষগুলি কোনটিতে একাধিক শয্যা নাই এবং সেগুলি টেবিল, চেয়ার, পুস্তকাধার, কাঁচের আলমারি প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। ভিত্তিগাত্র দুই চারিখানি করিয়া সুরুচিসঙ্গত নয়নাকর্ষক চিত্রে অলঙ্কৃত। গৃহটির সর্বত্রই আরাম ও স্বচ্ছলতার একটা ভাব বিদ্যমান।

এটি কিন্তু মেসের বাসা না হইলেও পুরুষের বাসা বটে। নোনাদীঘির জমিদার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের দুইটি যুবক এ বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করে। দুইজনের একজন কার্য্যোপলক্ষে বাটী গিয়াছে। যে আছে তাহার নাম চারু, বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করে। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। মুখশ্রী স্ত্রীলোকের মত কোমল ঢল ঢল ভাবাপন্ন, চক্ষু দুইটি সরলতামাখা, দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রবল আকাঙ্খা জন্মে।

আজ জন্মাষ্টমীর ছুটি। কলেজ বন্ধ। আহারান্তে চারু একখানি উপন্যাস হস্তে শয্যাগ্রহণ করিয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় তাহার দুজন বন্ধু বিপিন ও নগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন ও নগেন্দ্র চারুর সমবয়স্ক। ইহারা বি-এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছে। নগেন্দ্র মহা ধনীর সন্তান, বিপিন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। ইহারা চারুর ন্যায় সুকোমল নহে। ক্রিকেটে, ফুটবলে খুব নাম, বাল্যকাল হইতে জিমন্যাস্টিক পরায়ণ। নব্যতন্ত্রের এক একটি গুণ্ডা বলিলেই হয়। নাগেন্দ্র ত দুইবার পাহারাওয়ালাকে প্রহার করিয়া পুলিসকোর্টে জরিমানা দিয়াছে।

চারুকে দেখিয়াই দুইজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"কি চারু শ্বশুরবাড়ী যাওনি?"

চারু শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে কি না, এই বিষয় লইয়া নগেন্দ্র ও বিপিন পথে মহা তর্কবিতর্ক করিতে করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা হাসিতে হাসিতে সেই সকল গল্প করিল। তাহার পর নানা কথা আসিয়া পড়িল। কথাবার্ত্তার স্রোত মন্দা হইলে, চারু নগেন্দ্রকে গাহিতে অনুরোধ করিল। নগেন্দ্রর পিতা ওস্তাদ রাখিয়া বাল্যকালে কয়েক বৎসর তাহাকে গীত বাদ্য শিখাইয়াছিলেন—দিব্য গাহিতে পারিত। বলিল—"কি গাইব?"

"আজ জন্মাষ্টমী—একটা কৃষ্ণবিষয় গাও।"

নগেন্দ্র রাগিয়া বলিল—"দেখ তোমার ভণ্ডামীগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। নোনাদিঘির বাঁড়ুয্যেরা যে পরম বৈষ্ণব তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হতভাগা যে আমাদের চেয়েও যবন, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন তাও বিলক্ষণ জানি। তোমার কৃষ্ণভক্তির ভান আমার অসহ্য।"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"অত চট কেন হে? সেদিন তোমাদের বাড়ীতে শ্যামবাজারের নাট্যসমিতি বিষবৃক্ষের যে অভিনয় করেছিল, তাতে হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানটি কেমন হয়েছিল বল দেখি?—সেইটি গাও না—আমার ত ভারি চমৎকার লেগেছিল ভাই।"

চারু বলিল—"খবরদার অশ্লীল গানটান আমাদের বাড়ীতে গেও না—আমরা কৃষ্ণপ্রেমী লোক।"

হাসিয়া নগেন গুণ গুণ করিয়া সুর ধরিল, বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—"গোড়াটা কি হে?"

"শ্রীমুখ পঙ্কজ—"

নগেন্দ্র গাহিল—

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখব বলে হে
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে। —ইত্যাদি।

সুব ক্রমে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চাক ও বিপিন একে একে যোগ দিল। গান খুব জমিয়া গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। নিম্নে পথচাবী লোকজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া শুনিয়া লইল। একবাব—দুইবাব—তিনবাব গাহিয়া গান শেষ হইল। ক্ষণকাল বিশ্রামেব পব নগেন্দ্র আবাব গুণ গুণ গুণ কবিযা ধবিল—মানেব দাযে তুই মানিনী,

তাই সেজেছি বিদেশিনী।

—গানটাব নেশা যেন আব কিছুতেই ছুটিতেছে না।

বিপিন হাসিযা বলিল—"নগেন, তোব বউ মান কবেছে নাকি বে? মান মান কবে অত ক্ষেপলি কেন তুই?"

নগেন গান বন্ধ কবিযা বলিল—"আমাব বউ ত এখানে নেই। আমাব শালীব বিযেব সময গেছে এখনও আসেনি।"

"চিঠিতেও ত মান হয়।"

"কি জানি ভাই মনে হয়েছে কিনা, এক হপ্তা কিন্তু চিঠি পাইনি।"

"তবে যাও বৈষ্ণবী সেজে গিযে মান ভাঙ্গিযে এসগে। বেশ গলাটি আছে, গান শোনাবে, যখন পুবস্কাব দেবাব সময হবে তখন বলবে, 'ধনি তব মান বতন দেহ মোয। যথাবীতি গদগদ হযে বলবে, হেসে ফেলো না যেন।"

চাক গম্ভীব হইয়া বলিল—"আব ভাই! ইংবিজি শিক্ষাব জ্বালায মান টান সব দেশ থেকে উঠে গেল।"

এই উৎকট নূতন মন্তব্যটা শুনিযা নগেন ও বিপিন চমকিযা উঠিল। বলিল—"কি বকম—কি বকম?"

চাক বলিল—"ইংবাজি পড়ে লোকে যে বকম স্ত্রীবৎসল হযে উঠেছে—চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীব শ্রীচবণেব ছুঁচো হযে পড়ে থাকলে সে বেচাবি মান কববাব অবসব পাবে কখন বল?"

বিপিন ও নগেন চাকব এই গবেষণায বিস্মিত হইযা পড়িল। বিপিন বলিল—"ব্রাভো চাক!—মনোজগতে তোমাব এই আবিষ্কাব, জড়জগতে কলম্বসীয় আবিষ্কাবেব চেয়ে একটুও কম নয়।"

নগেন বলিল—"বাঃ চাক! তুই দুদিন বিয়ে কবে প্রেমশাস্ত্রে এমন পবিপক্ক হযে উঠলি? আমি দু বছবে যে এ তত্ত্ব পাইনি!"

বৰ্দ্ধিত উৎসাহে চাক বলিল—"মানটা প্রণযে অপবাধেব দণ্ডস্বরূপ। অপবাধ আবাব যে সে অপবাধ নয়—সন্দেহ হওয়া চাই যে প্রণযপাত্র অবিশ্বাসী—"

বাধা দিয়া নগেন্দ্র বলিল—"না চারু! তোমাব থিওবি ভাবি খেলো হয়ে পড়ল। তুমি প্রেমতত্ত্বেব কিচ্ছু জান না—তুমি নিবেট মুখ্য ষ্টুপিড ফুল। তুমি ক'বাব শ্বশুববাড়ী গিযেছ?"

"এই ত সেদিন গিয়েছিলাম। বল ত আবাব যাই।"

"যাও, আজই যাও। ববং আমরাও সঙ্গে যাই।"

বিপিন বলিল—"তীর্থেব পাণ্ডা হয়ে নাকি? বাস্তবিক চাক! তোব বউকে এখনও দেখাতে পারলিনে। এইবেলা দেখা, এখনও কনে আছে। এব পব ধেড়ে মাগী হযে উঠলে কি আর দেখাতে পারবি না দেখতে পাবি?"

চাক বলিল—"কেন? জান ত আমি অববোধপ্রথাব পক্ষপাতী নই। আমি কোন দিন আমার স্ত্রীকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসে তোমাদেব সকলকে ডিনাবে নেমন্তন্ন কবব। তাঁব সঙ্গে তোমাদেব আলাপ করিয়ে দেব।"

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ,ও সব বাজে কথা বেখে দাও। তোমাব স্ত্রীকে আমবা দেখতে চাই—এবং অবিলম্বে। চল তোমাব শ্বশুববাড়ী।"

"চল"—বলিয়া চারু ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। চাদব লইয়া ছাতা লইয়া যাইবাব ভান কবিল।

নগেন বলিল—"ও সব চালাকি নয়। সত্যি আমি একটা মৎলব ঠাউরেছি। ভারি নূতন আর ভারি সাহসিক।"

বিপিন ও চারু বিস্মিত হইয়া নগেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিল।

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ চারু, তুমি শ্বশুরবাড়ীতে দু'তিনবার মাত্র গিয়েছ। একদিনের বেশী কখনও ছিলে না। বাস্তবজীবনে একবার বিষবৃক্ষের অভিনয় করা যাক এস। আমরা তিনজনে বৈষ্ণবী সেজে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গোটা দুই গান শুনিয়ে আসি চল।"

চারু ও বিপিন হাসিল। কারণ এ প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। নগেন্দ্রকে তাহারা সে কথা বলিল।

শুনিয়া নগেন্দ্রর মুখ হইতে তর্কযুক্তির বৈদ্যুতী মাতিয়া উঠিল। ফলতঃ অনতিবিলম্বে চারু ও বিপিনকে তাহার সহিত একমত হইতে হইল।

তাহাদের মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। কি সুন্দর! কি চমৎকার! কি মজা! বাস্তবিক ইহা এমন একটা জিনিষ যাহার জন্য অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে গল্প করিবার কত বড় একটা উপাদান হইবে!

এই বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিবামাত্র তাহা যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে, এই নবীন বন্ধুত্রয়ের কল্পনাও তেমনি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিল।

চারু বলিল—"আমরা বৈষ্ণবীর সাজপোষাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেটার বিষয় কি ভাবছ?"

নগেন্দ্র বলিল "কেন, আমাদের করুণাময় রয়েছে। সে সাজিয়ে দেবে এখন। সাজপোষাকও সব তার আছে।"

"করুণাময় আবার কে?"

"করুণাময়—আমাদের করুণাময় হে। শ্যামবাজার নাট্যসমিতির ড্রেসিং মাষ্টার। ও সব বিষয়ে সে একজন খুব পাকা লোক।"

"আর, গোটাকতক বৈষ্ণবীর গান শিখে অভ্যাস করে নিতে হবে, শ্রীমুখপঙ্কজটা ত আর সেখানে গাওয়া চলবে না।"

"নিশ্চয় না। সন্দেহ করবে যে। বিষবৃক্ষ আর কোন মেয়ে পড়েনি?"

পরামর্শ সমস্ত ঠিক হইলে বিপিন বলিল—"সব যেন হল, কিন্তু চারুর বউকে কে চিনিয়ে দেবে?"

নগেন্দ্র বলিল—"তার জন্যে ভাবনা কি? কথাবার্ত্তায় আমি সব বের করে নেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার দুই দিন পরে, বেলা বারোটার সময়, চাঁদপাল ঘাট হইতে নবীনা বৈষ্ণবীত্রয়ের নৌকা ছাড়িল।

করুণাময়ের বাহাদুরী আছে বটে। তিনজন যুবাকে সে চমৎকার ছদ্মবেশে সাজাইয়াছে। মুখমণ্ডল হইতে গুম্ফশ্মশ্রুর চিহ্নমাত্র তিরোহিত। চুলেরই বা কি বাহার! কে বলিবে তাহা কৃত্রিম। ছদ্মবেশে সাজাইতে করুণাময় বিশিষ্ট প্রতিভান্বিত।

আন্দুলমৌরি গ্রামে চারুর শ্বশুরালয়। দিবসে চারিবার ষ্টীমার ছাড়ে। ষ্টীমারে এক ঘণ্টার পথ, নৌকায় যাইলে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। প্রথমে ষ্টীমারে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল। কিন্তু ষ্টীমারে সহস্রলোকের নয়নপথবর্ত্তী হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে হইল না; তাই যাতায়াতের জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে।

নৌকাও ছাড়িল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। বিপিন বলিল—"বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! বিষবৃক্ষ গোড়া থেকেই বিষবৃক্ষ। আকাশে মেঘের ঘটাখানা দেখ একবার। ওহে, নগেন্দ্র, তোমার সূর্য্যমুখী কি বলে দিয়েছেন?"

নগেন্দ্র বলিল—"ভার্য্যা সূর্য্যমুখী বলে দিয়েছেন, মেঘ উঠলে ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে নৌকা ঘাটে লাগাতে। মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন। তা, আন্দুলের ঘাটে নৌকা বেঁধে একবার কুন্দনন্দিনীদের বাড়ীতে যাওয়া যাবে এখন।"

চারু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল—"দূর হতভাগা!"

আকাশে মেঘ, গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ-সঞ্চার। দেহ দোদুল্যমান, মন পুলকপূর্ণ। তিনজনে নৌকার মুখের কাছে বসিযা ক্ষেপণীব তালে তালে গান আরম্ভ করিল। এই গানগুলা তাহারা দুই তিন দিন ধরিযা ক্রমাগত অভ্যাস করিতেছে। পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে হলে প্রবেশ করিবার সময়, বালকেরা যেমন বহিগুলা একবার শেষবার উল্‌টাইয়া লয় সেইরূপ আব কি।

বর্ব্বর মাঝিগুলা দাঁড় টানিতে টানিতে সহাস্য নেত্রে উহাদের পানে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন আরোহী বহুভাগ্যে মিলে। বিপিন তাহাদেব একটা ধমক দিয়া বলিল—"কি দেখছিস্ হাঁ করে?"

গানে গল্পে তিন ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইল। মেঘ মেঘই রহিল, বৃষ্টি হইল না, ঝড়ও উঠিল না। লাভের মধ্যে রৌদ্রক্লেশ নিবারিত হইল।

বাজগঞ্জের ঘাটে নৌকা ভিডিবামাত্র, বৈষ্ণবী তিনজন এক এক লম্ফে নিম্নে অবতরণ করিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকের এইরূপ চপলতা ও তৎপবতা দেখিয়া সমস্ত লোক অবাক হইযা ইহাদের পানে চাহিয়া বহিল। দুই চাবিটা কুরসিকতাব বাক্যও বৈষ্ণবীদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিপিন হাসিল, নগেন রাগিল, চারুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। বাজগঞ্জেব ঘাট হইতে আন্দুলে চারুব শ্বশুরালয় একক্রোশ পথ। চারু বলিল—"একটু ধীবে সুস্থে যাওয়া যাক্ চল। চারটের কমে আমার শ্বশুর ডিস্পেন্সারিতে যান না।"

চারুর শ্বশুর আন্দুলেব প্রসিদ্ধ ডাক্তার বমণীমোহনবাবু। বেশ হাতযশ, খুব পশাব প্রতিপত্তি। বেলা এগাবোটা বাবোটাব সময় তিনি কল্ হইতে ফিবিযা আসিয়া স্নানাহাব করেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম কবিয়া আবাব বৈকাল চারিটাব সময় বাহির হন। বাজারে তাঁহাব ডিস্পেন্সাবি আছে, তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে যান। আবার সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বাড়ী আসেন। চারুব এ সমস্ত জানা ছিল। গৃহসন্ধানী ভিন্ন অপব কেহ কি চুরি করিতে যাইতে সাহস পায়?

তিন বন্ধু অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পাকা রাস্তা হইতে নামিযা বনপথ। সঙ্কীর্ণ পথ, দুইধাবে বন। এই বনের দৃশ্য কলিকাতাবাসী যুবকগণেব পিপাসিত চক্ষুতে বড়ই ভাল লাগিল। কখনও গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বটানি বিদ্যার আলোচনা করে, কখনও কোনও পচা শৈবালময় পুষ্করিণীর তীবে দাঁড়াইয়া বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার কবে, কখনও একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরের সোপানে বসিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় গাম্ভীর্য্যেব সহিত তাহার বযস নির্ণয় করে, আর কখনও বা একটা বনের ফল তুলিয়া দংশন করিয়া দেখে তাহা আহারযোগ্য কি না। একবার একটা হেলে সাপ বাহির হইয়া কিল্‌বিল্ করিতে করিতে তাহাদের পায়ের অতি নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সাপ দেখিবামাত্র তাহারা আঁৎকাইয়া সাত হাত পিছু হটিয়া গেল এবং ওজস্বিনী ভাষায় সর্পজাতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। কোথায় আশ্রয়? চারিদিকে বন। দূরে কেবল একটা ভগ্ন জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে। চারু ও বিপিন বলিল—"এই তেঁতুল গাছটার তলায় দাঁড়াই এস। কোথায় ও মন্দিরে যাবে, সাপ আছে না কি আছে।"

নগেন বলিল—"যদি বেশী আসে," বলিয়া সে মন্দির লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। চারু ও বিপিন বৃক্ষতলেই দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দিরে পৌঁছিয়া নগেন্দ্র দেখিল, ভিতরে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল একটা ছাগল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন দরোয়ানবেশী ষণ্ডামার্কা খোট্টা সেও ছটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ কবিল।

নগেন্দ্রকে দেখিযাই সে ব্যক্তি ফিক্ কবিয়া হাসিয়া ফেলিল। নগেন্দ্র নিতান্ত আমোদ বোধ কবিল। তাহাকে স্ত্রীজনোচিত কোমলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গো?"

"আমাব নাম নাথু মণ্ডল। আমি বাজাদেব বাড়ীর দাবোয়ান।"

এই সময অন্ধকাব কবিযা জলটা খুব জোবে আসিল। সে ব্যক্তি নগেনেব কাছে ঘেঁসিযা দাঁড়াইল। একগাল হাসিযা বলিল—"বোষ্টমী দিদি তুমি বড় খপ্‌সুবত।" নগেন্দ্র সবিয়া দাঁডাইল এবং বিবক্তিব সহিত অন্যদিকে চাহিল। সহসা লোকটা নগেন্দ্রব স্কন্ধে হস্তার্পণ কবিল।

মুহূর্ত্তেব মধ্যে নগেন্দ্রব বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ডবেগে তাহাব নাসিকায় পতিত হইল। এই অতর্কিত আঘাতে সে ঠিকবাইয়া দেওয়ালেব উপব পডিল। তাহাব নাসিকা দিয়া ঝব ঝর কবিয়া বক্ত বহিল।

স্ত্রীলোকেব নিকট এ প্রকাব মাব খাইযা সে ব্যক্তি প্রথমটা হতভম্ব হইযা পডিল। কযেক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, তাহাব বসিকতা দারুণ বোষে পবিণত হইল।

চক্ষু পাকাইযা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কবিযা সে বলিল—"মেযেমানুষ হযে আমাব সঙ্গে লডবি হাবামজাদি? আমি তোকে খুন কবে এইখানে পুঁতে ফেলব।"

বলিযা সে নগেন্দ্রকে আক্রমণ কবিল। নগেন্দ্র দুর্বৃত্তটাব উপব শিক্ষিত হস্তে ঘুঁসিব উপব ঘুঁসি চালাইতে লাগিল। ক্রমে বসিকচূডামণি জখম হইযা পড়িলেন। তখন নগেন্দ্র তাহাকে মন্দিরেব কোণে ঠাসিযা বিপুল বলেব সহিত বামহস্তে তাহাব বক্ষ এবং দক্ষিণ হস্তে তাহাব গলা চাপিযা ধবিল। সে ব্যক্তি যাতনায কাতব হইযা গোঁ গোঁ শব্দ কবিতে লাগিল।

জলটা ছাডিযা যাওযাতে এই সমযে চারু ও বিপিন আসিযা পৌঁছিল। ব্যাপাব দেখিযা নিমেষেব মধ্যে তাহাবা সমস্তই বুঝিতে পাবিল। বলিল—"নগেন কল্লি কি? শেষে কীচক বধ? ছাড় ছাড়—মবে যাবে বেটা।"

কীচক দেখিল, একজন দ্রৌপদী ছিল, তিনজন হইল—আতঙ্কে তাহাব প্রাণ উড়িযা গেল। কাতব কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মাযি। দোহাই মাযি। তোদেব পাযে পডি মাযি।"

নগেন্দ্র বলিল—"আব কখনো কববি এমন কাজ?"

"না মাযি। আব কখনো কবব না মাগি।"

নগেন্দ্র তাহাকে ছাডিয়া দিয়া বলিল—"দে বেটা নাকে খৎ দে। এক হাত মেপে।"

প্রাণের দায়ে নাথু মণ্ডল যথাদিষ্ট কার্য্য কবিল।

তাহাব পব নগেন্দ্র তাহাকে ধবিযা ধাক্কা দিযা পথে নামাইযা দিল। সে ব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁডাইতে কাতবাইতে কাতবাইতে অদৃশ্য হইল।

তিনজনে তখন মন্দিরে দাঁডাইযা মহা হাসি। নগেন্দ্র গাত্রেব ধূলা ঝাডিযা বস্ত্রাদি সুসম্বৃত কবিযা লইল। চাবিটা বাজিযা গিয়াছে, গন্তব্য পথাভিমুখে সকলে অগ্রসব হইল।

তৃতীয় পবিচ্ছেদ

অপবাহ্ণকাল। চাকব শ্বশুববাড়ীতে, বান্নাঘবেব রকে বসিয়া বডবধূ একখানি আধুনিক উপন্যাস পাঠে ব্যাপৃত আছেন। গৃহিণী (চাকব শ্বশ্রু) এবং একপাল মেযে তাহা শ্রবণে তৎপব।

গৃহিণী বলিলেন—"বউমা, আব না, বেলা গেল—আজ বই বন্ধ কব।"

নবীনাবা বলিল—"তাও কি হয?—আগে সুবালাব সঙ্গে শবৎকুমাবেব বিযেটা হোক।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে তোমরা বিয়ে দাও বাছা, আমি উঠি।"

এই সমযে সদর দবজাব বাহিবে শব্দ শ্রুত হইল—"জয় রাধে।"

বড়বউ তাঁহাব ছোট মেযে সুশীলাকে বলিলেন—"দেখ্ ত দেখ্ ত কে?"

সুশীলা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সদব দবজাকে আডাল কবিয়া একটুখানি ইষ্টকেব প্রাচীব। সুশীলা প্রাচীবেব সীমান্তে দাঁডাইযা উঁকি মাবিযা বাহিবে দেখিল। পবক্ষণেই পুলকহাসোব সহিত চীৎকাব কবিযা বলিল—"ওমা বোষ্টুমি মা— গান গাইতে এসেছে মা।"

তাহাব মা শ্বশ্রুব প্রতি চাহিলেন। তিনি সম্মতিসূচক শিবশ্চালনা কবিলেন। বডবউ মেযেকে ইশাবা কবিযা বলিলেন—"ডাক ডাক।'

সুশীলা বৈষ্ণবীগণকে লইযা আসিল।

বৈষ্ণবীগণেব বেশবিন্যাস, ধবণধাবণ ও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত চক্ষু দেখিযা বমণীমণ্ডলীব মনে একটা সম্ভ্রমেব ভাব উদয় হইল। অবক্ষিত অভুক্ত প্রভুবিহীন দেশী বিডালেব সঙ্গে সযত্নপালিত শুভ্রকান্তি আদবেব বিলাতী যে প্রকাব বিভিন্নতা, সচবাচব দৃষ্ট বৈষ্ণবী ভিক্ষুকেব সঙ্গে ইহাদেব সেই প্রকাব বিভিন্নতা অনুভূত হইল।

বৈষ্ণবীবা বাবান্দায উঠিযা দাডাইল। কোথায বসিবে? ভূমিতে বসিতে তাহাবা ইতস্তত কবিতে লাগিল। তাহা দেখিযা গৃহিণী একজনকে বলিলেন— 'একখানা কম্বল এনে দে।'

বৈষ্ণবীবা কম্বলেব উপব উপবেশন কবিল। চাক বাদ্ধ কবিযা দুইজনেব পশ্চাতে একটু আডালে বসিল।

নগেন্দ্র খঞ্জনীতে একটু আওযাজ দিল। জিজ্ঞাসা কবিল— কি শুনবেন?'

কেহ ' গোবিন্দ অধিকাবী " কেহ ' গোপাল উডে কেহ "দাশুবায' ফবমাস কবিল না। হায! এখনকাব মেযেবা এ সকলেব আস্বাদন কি জানিবে? গৃহিণী বাল্যকালে এ সকল শুনিযাছেন বটে, কিন্তু তিনিও কুসঙ্গে পডিযা তৎসমুদয বিসর্জ্জন দিয়া বসিযা আছেন। তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কিযৎক্ষণ পূর্ব্বেই এই সভায় বামাযণ কিংবা মহাভাবতেব পবিবর্ত্তে প্রণয়প্রাণ উপন্যাস পাঠ চলিতেছিল। বামায়ণ মহাভাবতাদিব অপেক্ষা আধুনিক নাটক নভেলই গৃহিণীব বিশেষ কচিকব লাগিত। যদিও তিনি তাহা মুখে কখনও স্বীকাব কবিতেন না তথাপি তাঁহাব কন্যাবা পুত্রবধূবা ইহা জানিত। তাই তাহাবা তাঁহাব মৌখিক অনিচ্ছাব বিকদ্ধে আব্দাব কবিয়া তাঁহাকে ধবিয়া আনিত। তিনি সাবাক্ষণ আগ্রহেব সহিত কান খাড়া কবিযা সমস্ত শুনিতেন। কিন্তু শেষ হইলে বলিতেন—"কি সব বাপু! ঠাকুব দেবতাদেব কথা নয কিছু নয।"

যাহা হউক, সকলে পবামর্শ কবিয়া বলিল—"আমবা আব কি বলব বাছা। তোমাদেব যা ভাল আছে তাই গাও।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা কবিল—"কৃষ্ণবিষয়?"

গৃহিণী বলিলেন—"বেশ, কৃষ্ণবিষয়ই গাও।"

নগেন্দ্র গান আবম্ভ কবিল, তাহাব পব বিপিন যোগ দিল। সুব যখন উচ্চে উঠিল, তখন পশ্চাৎ হইতে চাক সাবধানে নিজ কণ্ঠ মিলাইল। গানটি জ্ঞানদাসেব একটি পদ। শ্রোতৃগণ তাহাব সকল কথা বুঝিতে পাবিল না। কিন্তু জ্ঞানদাসেব সুমধুব পদবিন্যাস এবং সুকণ্ঠ গাযকগণেব মিলিত উচ্ছ্বসিত সুস্ববলহবীতে সকলে একেবাবে আত্মহাবা হইযা পডিল। দুইবাব তিনবাব গাহিয়া তবে গান শেষ হইল।

এই [illegible] আবাব বৃষ্টি আবম্ভ হইল। বডবধূ বলিলেন—"কি বাছা তোমাদেব হিন্দীমিন্দী আমবা সকল কথা বুঝিতে পাবিনে। এইবাব একটা বাঙ্গালা গাও। একটা থিযেটাবেব গান গাও না। আজকাল ত কত বোষ্টুমি এসে থিয়েটাবেব গান গায— নন্দবিদায়, তবে গিয়ে প্রভাস মিলন, আবও সব কত কি।"

নগেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, একটা আধুনিক গান গাই তবে শুনুন।" এই বলিযা আবম্ভ কবিল—

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এ মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো ত নিশি শেষে ওঠেনিক শুক-তারা,
এখনো ত রাধিকার শুকায়নিক অশ্রুধারা।
সেথাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কিহে?
চকের হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস?

দুইবার উপর্য্যুপরি গলা ছাড়িয়া গাহিয়া বৈষ্ণবীরা যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গৃহিণী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা একটু জিরিয়ে নাও বাছা—চেঁচিয়ে ভারি মেহন্নত হয়।"

গান বন্ধ করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র বলিল—"মা ঠাকুরণ আপনি ভাগ্যবতী তার সমস্ত লক্ষণ আপনাতে দেখতে পাচ্ছি।"

কয়েকজন নবীনা ইহা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—"হাঁগা তোমরা কি সামুদ্রিক জান?

"জানি, কিন্তু হাত দেখতে পারিনে মুখ, চক্ষু, চুল, কণ্ঠস্বর থেকে কিছু কিছু অনুমান করতে পারি। তা গিন্নিমা, আপনার ছেলেমেয়ে কটি?"

"বাছা, আমার দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। এই বড়বউমা, ছোটবউমা বাপের বাড়ী আছেন, বড় মেয়ে মেজ মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে এইটি ছোট মেয়ে—এর এই সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।" এই বলিয়া গৃহিণী চারুর স্ত্রী কুমুদনীকে দেখাইয়া দিলেন।

বন্ধুত্রয়ের চোখে চোখে চারুর বিদ্যুৎ-র্ভাব আদান প্রদান হইয়া গেল। চারু উভয়ের প্রতি চোখ রাঙাইয়া যেন বলিল—"কি ছেলেমানুষি কর? শেষকালে কি ধরা পড়বে?"

আর একটা গান হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবীরা বিদায় চাহিল।

বড়বধূ তাঁহার শ্বশ্রুদেবীর কানে কানে গোপনে কি বলিলেন।

গৃহিণী বৈষ্ণবীদিগকে বলিলেন—"তোমরা বাছা আজ নেইবা ফিরে গেলে। রাত্তিরে এখানে থাক, সিধেপত্তর দিই, বাঁধ বাড় খাও দাও। কাল সকালে যেও এখন।"

কি সর্ব্বনাশ। তাহারা রন্ধন করিতে জানে নাকি? আর বাড়াবাড় করিলে ধরা পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং তাহারা সম্মত হইল না।

একজন প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে গৃহিণীর নাত্ বৌ—তিনি বলিলেন—'তোমার যে অন্যায়, দিদি। এই কাঁচা বয়সে ওরা কি আপন আপন বোষ্টম ছেড়ে থাকতে পারে?"

রমণী সভায় হাসির ফোয়ারা ছুটিল। বৈষ্ণবীরাও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল।

নগেন বলিল—"তা যা বল বাছা, রাত্তিরে আমরা থাকতে পারব না।'

যথাবিধি পুরস্কৃত হইয়া, বৈষ্ণবীরা বাহিরে আসিয়া দেখিল একজন কনেষ্টবল দরজার কাছে প্রহরায় নিযুক্ত। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সে হাঁকিল—"জমাদার সাহেব। আসামী নিকালা।"

তিনজন সবিস্ময়ে বৈঠকখানায় বারান্দার পানে চাহিল। দেখিল পুলিসের জমাদার সদলবলে আসিয়া বসিয়া আছে।

জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন—"গিরেফতার করো।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। হাস্যকারী আর কেহ নয়, সেই দারোয়ান নাথু মণ্ডল। নিরাপদে ব্যবধানে দাঁড়াইয়া সে নগেন্দ্রকে বলিল—"কি গো বোষ্টুমি দিদি। কুস্তি লড়বি?"

রাত্রি দশটার সময় চারু তাহার শ্বশুরবাড়ীর একটি শয়নকক্ষে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার শালাজ—পূর্ব্বকথিত বড়বউ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"ছি ছি ছি—একি বুদ্ধি চারু? তোমার দুটো বন্ধুকে এনে কি করে তুমি আমাদের বাড়ীসুদ্ধ মেয়েকে দেখিয়ে দিলে? আর তোমার বন্ধুরাই বা কি রকম লোক? কি রকম

তাদের আক্কেল? সাহসও ধন্যি! ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর কি করেই বা ঢুকলো? একটু লজ্জা একটু আত্মসম্ভ্রম নেই?"

চারু বলিল—"আর বউদিদি। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের পায়ে পড়ি, এ কথা যেন বাইরে প্রকাশ করবেন না। তা হলে কিন্তু আর কখনো এমুখো হতে পারব না।"

বড়বধূ একটু অভয়হাস্য হাসিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, বাবা যদি থানায় গিয়ে তোমাদের ছাড়িয়ে না আনতেন তা হলে কি দশা হত তোমাদের?"

চারু বলিল—"সমস্ত রাত্তির আজ হাজতে পচতে হত। আরপর কাল সকালে যা হয় হত। কিন্তু ভাগ্যিস ব্যাপারখানা কি দেখবাব জন্যে বাবা থানায় গিয়েছিলেন।"

"বাবা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যান নি। বাড়ী এসেই শুনলেন যে এই রকম হয়েছিল। তখন তাঁব মনে নানা রকম সন্দেহ নানারকম আশঙ্কা উপস্থিত হল। তাই তিনি থানায় ছুটে দেখতে গিয়েছিলেন।"

"বাবার কিন্তু আশ্চর্য্য চক্ষু। আপনারা এতগুলো মেয়েতে আমায় চিনতে পারেন নি দিনের বেলায়, আব তিনি বাত্তিবে কেমন আমায় চিনে ফেললেন।"

বড়বধূ হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আমবা চিনবো কোত্থেকে, তুমি যে আড়ালে বসেছিলে মশাই। আব একটিও কি কথা কয়েছিলে?—তা হলেও না হয় চেনা সম্ভব হত গলার স্বর শুনে। বাবা তোমার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছেন বললেন।"

"বাবার কিন্তু খুব উপস্থিত বুদ্ধি। আমাকে চিনে কোন বকম বিস্ময় প্রকাশ করলেন না,—কিছু নয়। ধীবে ধীরে শান্তভাবে দারোগাকে বললেন—"সাহেব! যে বকম শুনছি তাতে ত দারোয়ানটারই সম্পূর্ণ দোষ। মাবের কথা কি বলছ, ও বকম অবস্থায় পড়লে স্ত্রীলোক খুন পর্যন্ত করেছে এমন কত শোনা যায়। তা এবা ফকিরিণী, ভিক্ষে কবে খায়, এদের ছেড়ে দাও। নাথু মণ্ডলকে আমি পাঁচটা টাকা বখসিস দিচ্ছি—ও—মোকদ্দমা তুলে নিক। আমি ত লজ্জায় মাথা হেঁট কবে বাবাব সঙ্গে সঙ্গে এলাম। নগেন বিপিন যে অন্ধকারে কোথায় সবে পড়ল কে জানে!"

"বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তিনি কি বললেন?"

"হাসলেন। পাছে আমি অপ্রতিভ হই তার জন্যে কত রকম কথা বলে আমায় সান্ত্বনা কবলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কথায় আমাব মাথা কাটা যেতে লাগিল।"

বড়বধূ ঘড়িব পানে চাহিলেন। বলিলেন—"কাল আবার সব গল্প হবে ভাই, আজ রাত্তিব হল—কুমিকে নিয়ে আসি।"

চারু বলিল—"কাল আমি থাকব বুঝি? ভোবে উঠে অন্ধকাবে অন্ধকারে চম্পট।"

বড়বধূ কৃত্রিম রোষের সহিত বলিলেন—"খববদাব চারু—অমন কাজটি কোরো না—তা হলে পাড়াশুদ্ধ ঢাক পিটিয়ে দেব, খবরেব কাগজে পর্যন্ত তুলিয়ে দেব।"

চারু অত্যন্ত শিহরিয়া বলিল—"না না মাফ করুন, মাফ করুন, বিনা অনুমতিতে আমি যাব না।"

"এই সুবুদ্ধির কথা বলেছ। যাই কুমিকে তুলে আনি।" এই বলিয়া বউদিদি প্রস্থান করিলেন।

চারু বসিয়া একখানা পুস্তক উল্টাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে ঝুম ঝুম করিয়া মলের শব্দ থামিয়া গেল। বড়বধূর স্বর শুনা গেল, রাগিয়া বলিতেছেন—"দাঁড়ালি কেন লা পোড়ারমুখি? সঙ আর কি! দিনে দিনে কচি খুকি হচ্ছেন। দেখে আর বাঁচিনে।" এই বলিয়া তিনি কুমুদিনীকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন। বেচারি পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

[কার্ত্তিক, ১৩০৬]

প্রিয়তম

॥ ১ ॥

প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিণীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের—তাহাকে ঠিক সখিত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মতই আচরণ করিত। তাহাদের পত্রগুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাতে আদর সোহাগ ও মান অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকিত। দেখা হইলে দুইজনে নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিত; কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাদের মুখে কথা ফুটিত না। তরঙ্গিণী কতদিন প্রিয়তমার গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—প্রিয় ভাই, আমাকে বেশী ভালবাসিস না তোর বরকে? প্রিয়তমা বলিয়াছে—তোকে। একদিন প্রিয়তমা তাহার স্বামীর প্রতি অধিক অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিল, সেদিন আর তরঙ্গিণী অন্নজল মুখে তুলিল না। কত করিয়া তবে প্রিয়তমা সখীর মান ভাঙ্গাইল। সেই অবধি প্রিয়তমা কপটতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

তরঙ্গিণী সপ্তদশবর্ষীয় যুবতী। তাহার পরিধানে কালাপেড়ে দেশীয় সূক্ষ্ম বসন এবং হাতে সোনার চুড়ি আছে বটে, কিন্তু সীমান্তে সিন্দুর নাই। আট বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া নয় বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে।

তরঙ্গিণী যখন প্রথম শ্বশুরগৃহবাসে আসে, তখন তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে ছিলেন শুধু শাশুড়ী ও দিদি শাশুড়ি। প্রিয়তমা তাহাদের প্রতিবেশিনী, কিন্তু তাহার সাহচর্য্য লাভ প্রথমেই হয় নাই, সেও তখন নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। প্রিয়তমা ফিরিয়া আসিলে প্রথম সাক্ষাতেই তরঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিল।

বিধবা বালিকা তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সখীর প্রতি অর্পণ করিল। তাহাকে সে কখনও ডাকিত প্রিয় বলিয়া, কখনও বলিত প্রিয়তম। চিঠিতেও তাহাকে প্রিয়তমা না বলিয়া, প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রতি সন্ধ্যায় নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরের সহিত দেখা হইত, তাহা ছাড়া তরঙ্গিণী প্রতিদিন প্রিয়কে চিঠিও পাঠাইত। তরঙ্গিণীর শ্বশুরালয়, কিন্তু প্রিয়তমার পিত্রালয়। প্রিয়তমা মনে করিলেই তরঙ্গিণীর কাছে আসিতে পারিত; প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিতে হইত না। খিড়কি খুলিয়া পুকুরের ধার দিয়া বাগানের ভিতর দিয়া তরঙ্গিণীদের খিড়কী দরজায় উপস্থিত হইবার সুযোগ ছিল। পথ উভয়ের সমান, কিন্তু তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তাহাকে কোথাও যাইতে আসিতে দিতে ভালবাসিতেন না। তাহাতে কিছু ক্ষতি ছিল না; তরঙ্গিণীদের বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও নির্জ্জন হওয়াতে এইখানেই দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের, আমোদ প্রমোদের সুবিধা হইত।

তরঙ্গিণীর ভালবাসার অত্যাচার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—কিন্তু প্রিয়তমা সে সমস্ত সকরুণ সহিষ্ণুতায় সহিত সহ্য করিতে থাকিল। সে ভাবিত আমার স্বামী আছে, ভালবাসার পাত্র আছে; আহা তরঙ্গিণীর যে কেহ নাই, কিছু নাই। তাই সব সময় মনে না আসিলেও মুখে তাহাকে আদর করিত।

প্রিয়তমা তরঙ্গিণীকে সচরাচর বলিত তরী, কখনও বলিত তরণী, কখনও বলিত সাধের তরণী। একবার শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে থিয়েটারে মৃণালিনীর অভিনয় দেখিয়াছিল; সে অবধি মাঝে মাঝে সে তরঙ্গিণীর গলাটি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গান করে—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

প্রিয়তমা শুধু তরঙ্গিণীকে আদর করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত না। তরঙ্গিণী যেমন কথায় কথায় তাহার উপর অভিমান করিত, প্রিয়তমাকেও সেইরূপ করিতে হইত। যদি কোনও দিন রাগ না করিত, তাহা হইলে তরঙ্গিণী বলিত— তোমার ত বয়ে গেল। তুমি কি আমাকে ভালবাস যে রাগ করবে? প্রথম প্রথম এই মৌখিক মান অভিমান প্রিয়তমার নিকট অত্যন্ত

বিসদৃশ মনে হইত, কিন্তু ক্রমে সমস্ত বেশ অভ্যস্ত হইয়া গেল। নিতান্ত কর্ত্তব্য পালন করিতেছি বলিয়া আর মনে হইত না।

।। ২।।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তরঙ্গিণী আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল— "দারুণ মানেরি ভরে করেছি তার অপমান।
কোথায় সে গেল সখি, আন্ তারে ডেকে আন্।"

তরঙ্গিণীর কণ্ঠবিনিঃসৃত মৃদুতান ভ্রমর গুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল। আজ প্রভাতে যখন প্রিয়তমা তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল তখন তরঙ্গিণী রাগে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।—প্রিয়তমা কাঁদকাঁদ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অন্য দিন তাহারা দিনে দশবার করিয়া নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরকে দর্শন করে; আজ সারাদিন তরঙ্গিণী প্রায় ছাদেই যাপন করিয়াছে, তথাপি একটিবারও প্রিয়তমার দেখা পায় নাই। নিরাশ হইয়া তরঙ্গিণী এইমাত্র ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তরঙ্গিণী একবার ভাবিল প্রিয়কে একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু আজ প্রভাতে তাহার অভিমানের কারণ, পূর্ব্বদিনে লিখিত পত্রখানির উত্তর না পাওয়া। সুতরাং চিঠি লিখিতে তরঙ্গিণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অথচ সকাল বেলার আচরণটা নিতান্তই রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়তমারও কি যথেষ্ট দোষ নাই? প্রিয়তমার স্বামী আসিয়াছে সত্য; তাই বলিয়া কি সে একটিবার ছাদে আসিবার অবসর পায় না? আর তরঙ্গিণী যে রাগ করিল, তা কাহার দোষ? প্রিয়তমার ত দোষ। কেন সে নিয়মিত সময়ে পত্রোত্তর দেয় নাই? স্বামী কি তাহার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? না, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল? না, কালি ফেলিয়া দিয়াছিল?

ক্রমে অন্ধকার হইল। দাসী আসিয়া টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া গেল। তরঙ্গিণী টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, বাক্সটি খুলিয়া চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম বাহির করিল। একখানি সুন্দর রঙীন কাগজ লইয়া চিঠি লিখিল। তরঙ্গিণী উত্তম লেখাপড়া জানিত। বিধবা হওয়া অবধি ছয় বৎসরকাল সে পিত্রালয়ে ছিল। তাহার দাদা তাহাকে সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্ঞানচর্চ্চা করিবার অবসর পাইলে দুঃখিনী ভগিনীটি আজন্মবৈধব্য তবু কিয়ৎ পরিমাণে সহনীয় হইবে।

চিঠিখানি শেষ করিয়া তরঙ্গিণী সেখানিকে খামের মধ্যে পুরিল। শিরোনামা লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার ভাবিল চিঠি পাঠাইব কিনা। এ কি পায়ে ধরিয়া মানভিক্ষা করা হইতেছে না?

এই সময় তরঙ্গিণীর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিল। হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। পনেরো বৎসর বয়স হইতে মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়া হইতেছে। বেশী অধ্যয়ন অথবা বেশী চিন্তা করিলে, কিংবা বেশীক্ষণ মন খারাপ করিয়া থাকিলে এই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিত। আজ ত সারা দিনটা সে মন খারাপ করিয়াই আছে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছিল, রোগ আসন্ন জানিতে পারিলে শীতল জল পান করিবে এবং মুখে চক্ষে জলের ঝাপটা দিবে। ঘরের কোণে জল রাখা ছিল, তরঙ্গিণী জল পান করিয়া মুখে চোখে জল দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। কিন্তু আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। চেয়ারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। ক্রমে চেয়ার সুদ্ধ সশব্দে মেঝেতে পড়িয়া গেল।

তরঙ্গিণীর এই ব্যাধি আছে বলিয়া বাটীর লোক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। পাশের ঘরে এক দাসী ছিল সে শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নে সংবাদ দিল।

গতকল্য তরঙ্গিণীর খুড়শ্বশুর হৃদয়নাথবাবু স্ত্রী পুত্র লইয়া বাটী আসিয়াছেন, পুত্র সুধীরচন্দ্রের শুভ উপনয়ন।

তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তখন মাকে লইয়া পাল্কী করিয়া সুধীরের উপনয়নে পাড়ার মেয়েদের

নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ী ছিলেন শুধু নবাগতা ছোটকাকী। তিনি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার এক বোনের হিষ্টিরিয়া আছে; মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার নিয়মাদি সব তাঁহার জানা ছিল ঝির সাহায্যে তরঙ্গিণীকে উঠাইয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন এবং চেতনা সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। হঠাৎ নিকটস্থ টেবিলের উপর রঙীন খামখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দক্ষিণ হস্তে তরঙ্গিণীকে পাখা করিতে করিতে, বাম হস্তে খামখানি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলি সাহায্যে চিঠিখানি বাহির করিয়া খামখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া আলোকে পড়িলেন—'প্রিয়তম!'

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত পা অবশ হইয়া আসিল। নিঃশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। ঝিকে বলিলেন, "তুই বাতাস কর, আমি শীগগির আসছি।"—বলিয়া পাখা ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ইঁহার স্বামী হৃদয়নাথ মীরাটের প্রধান ডাক্তার। বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। লোকটি পরম হিন্দু। এক সময়ে নাকি গোমাংসও ইঁহার উদরস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সে সব ভূত-কথা। আপাততঃ তাঁহার মস্তকে একটি প্রকাণ্ড 'শিখা' দোদুল্যমান। স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী। ইঁহার প্রথমা পত্নী পরলোকগতা। সুধীর সেই প্রথমার গর্ভজাত। এই দ্বিতীয় সংসারটি এখনও কোন সন্তান-সন্ততি সংসারে আনিতে কৃতকার্য হন নাই। আর বড় আশাও নাই কারণ ইঁহার বয়ঃক্রম এখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইয়াছে।

হৃদয়নাথ একটি ঘরে একাকী বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পত্নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রী চিঠিখানি, তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়।"

হৃদয়নাথ চশমা-আঁটা চক্ষু দুইটি স্ত্রীর পানে ফিরাইয়া বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি?"

"দেখ না পড়ে।" "কে লিখেছে?"

"যেই লিখুক—দেখ না।"

হৃদয়নাথ চিঠিখানি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিলেনঃ—

প্রিয়তম,

তুমি এমন নিষ্ঠুর? এই তুমি আমায় ভালবাস? আমি যদি রাগ করি, অভিমান করি, তাহা হইলে কি তুমি সে অভিমান ভাঙ্গাইবে না? ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? কাল সকালে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তার জবাব দাও নাই কেন? তাইত আমি রাগ করিয়াছিলাম, তাইত তোমার সঙ্গে দেখা হইলে ভাল করিয়া কথা কহিলাম না। আমি কেন রাগ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জানিতে না? যদি না জানিতে তবে জিজ্ঞাসা করিলেও ত পারিতে। তুমি চলিয়া গেলে পর আমার ভারি কষ্ট হইল। আজ প্রায় সারাদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছাদে কাটাইলাম, তুমি তোমাদের ছাদে আসিলে না কেন? শেষে আমি মানে খোয়াইয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমি যদি আমার বেদনা না বুঝিবে তবে কে বুঝিবে প্রিয়তম? তোমার সাধের তরণী বুঝি পুরোণো হইয়াছে, তাই এ অনাদর?

তোমারই।

চিঠি পড়িয়া হৃদয়নাথ বলিলেন, "এ কার চিঠি?"

"কার আবার, মেজবউয়ের?"

"আমাদের মেজবউমার?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের মেজবউমার। সর্ব্বনাশী শেষে এই করলে। কুলে কালি দিলে! এ ত আমি তখনি জানি। যার কপাল পুড়েছে, তার আবার কালাপেড়ে কাপড় পরা কেন? গহনা পরা কেন? পাণ খাওয়া কেন?"

স্ত্রীর বক্তৃতা-স্রোতে হৃদয়নাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি ঠিক জান এ তাঁরই হস্তাক্ষর?"

"তোমার কথা শুনে গা জ্বলে যায়! এ আবার নতুন করে জানতে হবে নাকি? আজ চার বৎসর ধরে যে কালামুখী আমায় চিঠি লিখছে।"

"তা হলে, এখন কি হয়?"

"কি হয়, ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদায় করে দাও। কাশীতে পাঠিয়ে দাও।"

"লোকে শুনবে না?"

"শুনতে কি কারু বাকী থাকবে? তুমি কার মুখে সরা চাপা দেবে?"

হৃদয়নাথ স্ত্রীর হস্তে পত্রখানি প্রত্যার্পণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ, বোধ হয় তা নয়; এমনটাই কি হতে পারে?"

"না তা কি আর হতে পারে? তুমি যেমন ভালমানুষটি, সবাইকে নিজের স্ত্রীর মত সতীলক্ষ্মী মনে কর।"

হৃদয়নাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। বলিলেন, দেখ, আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না যে, বউমা পাপে ডুবেছেন। আর যদি, তুমি যা বলছ তাই হয়, তা হলে এখনও হয়ত উনি ধর্ম্মচ্যুত হননি, হবার উপক্রম হয়েছে মাত্র।"

"উপক্রম হয়েছে মাত্র বইকি! তুমি বুঝি ভেবেছ শুধু চিঠিপত্র চলেছে?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"যেমন তোমার বুদ্ধি, তাব উপযুক্ত কথাই বলেছ। কেন, চিঠিতে ত স্পষ্ট লেখাই রয়েছে।"

"কি লেখা রয়েছে?"

"তবে কি পড়লে চিঠি? তুমি ত নিজে পড়েছ, আমি শুধু শুনেছি। চিঠিতে ত লেখাই রয়েছে তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন ভাল করে কথা কইলাম না। শুধু কি চিঠি চলেছে? দেখাশুনা হয়েছে সব হয়েছে।"

এই সময় ঝি আসিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল—"ছোটমা শীগগিব এসগো, মেজবউমা বড্ড কি রকম করছেন।"

ছোটগিন্নী ঝির সহিত চলিয়া গেলেন। হৃদয়নাথ একাকী বসিযা নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার প্রকৃতিটি কিছু শীতল। মনোবৃত্তিগুলি সহসা উত্তেজিত হয় না; কোনও একটা বিষয়ে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করেন না। কিন্তু যে প্রকারে হউক, একবার তিনি জাগ্রত হইলে, কোনও বিষয়কে সত্য বলিয়া স্থির করিলে, আর কিছুতেই তাহা হইতে স্খলিত হন না। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে আজন্মবিধবা, সংসারের শত প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা তাহার পক্ষে একান্ত কঠিন বটে। তাহাতে আবার তরঙ্গিণী লেখাপড়া জানে। স্ত্রীশিক্ষাব বিপক্ষে যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, স্ত্রীলোক লিপিলিখনক্ষম হইলে সমাজে অপবিত্র প্রণয়ের প্রসার বৃদ্ধি হইবে। হৃদয়নাথ স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিদ্বেষ তাঁহার মনকে তরঙ্গিণীব বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষাক্ত করিতে লাগিল। ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা বলা উচিত কি না। না বলিলেও ত প্রতিকারের কোনও সম্ভাবনা নাই। এখানে তরঙ্গিণীকে রাখা আর কোনও মতে চলিতে পারে না। আজিও জানাজানি হয় নাই; কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহার ত আব অধিক বিলম্বও নাই। তখন যে সমাজে মুখ দেখান দুষ্কর হইবে। পুত্রকন্যাগণের বিবাহ দেওয়াও কঠিন হইবে। উহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেই বা ফল কি? যেখানে যাইবে, সেখানেই মরিবে।

যখন রাত্রি আটটা বাজিল, তখন বড় গৃহিণী ও তাঁহার জননী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বধূগতপ্রাণা। তরঙ্গিণীর মূর্চ্ছার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গেলেন। গিয়া দেখেন তখনও মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। ঝি ও ছোটগিন্নী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

এমন ত কখন হয় না, এতক্ষণ ত মূর্চ্ছা কখনও থাকে না। এ কি সর্ব্বনাশ হইল?

কখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল তাহার পর হইতে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সমস্ত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী বলিলেন, ভারি অন্যায় হয়েছে। ছোটগিন্নীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, অতক্ষণ ধরিয়া একা ঝির হাতে রোগীকে সমর্পণ করিয়া যাওয়া ভাল হয় নাই।

ঝি বলিল, "বাছা, আমার গায়ে কি ক্ষ্যামতা আছে? আমি কি একলা ওনারে ধরে রাখতে পারি? হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়িয়ে খাট থেকে দুম্ করে প'ড়ে গেলেন, সেই অবধি মুখে একটু একটু রক্ত উঠছে।

ক্রমে কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "হৃদয় তুমি এতক্ষণ কি করছ?—যাও যাও, কিছু বিহিত কর। ক্রমেই যে কেস খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

হৃদয়নাথ অনিচ্ছুকের মত রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষার পব বলিলেন, পড়িয়া গিয়া হৃদপিণ্ডস্থ রক্তকোষে আঘাত লাগিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তরঙ্গিণীর চিকিৎসা ও শুশ্রুষা চলিতে লাগিল।

॥ ৩ ॥

প্রিয়তমার স্বামীর নাম অনঙ্গমোহন। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় সে কল্যপ্রভাতে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। তবঙ্গিণীর সহিত প্রিয়তমার সখিত্ব সংবাদ সে পত্রেই পাইয়াছিল। মিলনের প্রথম রাত্রে তাহারা পরস্পবকে লইয়া বিভোর, তরঙ্গিণীর কথা, কহিবার অবসর পায় নাই। পরদিন রাত্রি দশটার সময় প্রিয়তমা স্বামীর নিকট আসিল। প্রথম কথাবার্ত্তার পবই অনঙ্গ বলিল, "তোমার তরঙ্গিণীর চিঠিপত্র দেখাও না।"

প্রিয়তমা বলিল, "সে কি দেখাতে পারি? সে যে বারণ করে দিয়েছে কারুকে দেখাতে।"

অনঙ্গ বলিল, "আমি বুঝি কারুর মধ্যে গণ্য হলাম। আমাকে দেখাতে হবে।"

প্রিয় বলিল, "তবে তরীকে জিজ্ঞাসা করি আগে।"

"সে যদি হুকুম না দেয়?"

"না দেয় ত কেমন করে দেখাব?"

অনঙ্গ রাগ করিল। বলিল, "না দেখাও না দেখাবে। আমি তোমাব পর, সেই তোমার আপনার।"

প্রিয়তমা এ কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

পরদিন গিয়া সে তবঙ্গিণীকে সব কথা বলিল। তরঙ্গিণী বলিল, "না ভাই না ভাই, লক্ষ্মীটি আমার তোর পায়ে পড়ি, চিঠি তাঁকে দেখাসনে।"

সে রাত্রে অনঙ্গমোহন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম পেলে?"

প্রিয় বলিল, "না, সে ত কিছুতেই রাজি হয় না।"

ইহাতে স্বামী ভারি অভিমান করিল। আজকালকার দিনে লিখিতে লজ্জা হয়—আমাদের স্ত্রীবৎসল যুবা নায়কটি বালকের মত অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

প্রিয়তমা তখন বাক্স হইতে চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "ওগো দেখ গো দেখ। অত দুঃখুতে কাজ নেই।"

অনঙ্গ চিঠির বাণ্ডিল ফেলিয়া দিল। বলিল, "যাও আমি দেখতে চাইনে।"

এই অপমানে প্রিয়তমা মর্ম্মাহত হইল। মেঝের উপর বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহাকে তদবস্থ থাকিতে দেখিয়া অনঙ্গের রাগ ভাঙ্গিল। স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিল, "ওগো কাঁদতে হবে না।"

ইহাতে প্রিয়তমা আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ তখন নানাপ্রকারে স্ত্রীকে আদর করিয়া সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। চিঠির বাণ্ডিলটি কুড়াইয়া আনিয়া প্রথম চিঠিখানির প্রতি চক্ষু রাখিয়া বলিল, "তরঙ্গিণীর ত হাতের লেখাটি বেশ, না?"

"খাসা লেখা, ঠিক পুরুষমানুষের মত!"

"আচ্ছা তুমি দু'চারখানি ভাল ভাল চিঠি বেছে দাও, আমি পড়ি।"

প্রিয়তমা একখানি নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "এইখানা পড়।"

অনঙ্গ যতক্ষণ সেখানি পড়িতে লাগিল, প্রিয়তমা ততক্ষণ আরও খানকয়েক চিঠি বাছিয়া বাছিয়া স্বামীর হাতে দিল। অনঙ্গ সবগুলি একে একে পড়িয়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া রহিল।

প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছ কি?"

অনঙ্গ বলিল, "দেখ, তুমি আর তোমার সখীর সঙ্গে ভাব রাখতে পাবে না।"

"কেন?"

"না। এ যে রকম চিঠি, তাতে যদি আমি সব না জানতাম, ত মনে করতাম প্রণয়ের চিঠি।"

"কেন সখীতে সখীতে প্রণয় কি দোষের?"

"দোষের কি না সে বিচারে কাজ নেই। আমি ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালবাসতে পাবে না। কোনও সখীকে এতদূর ভালবাসলে আমার প্রাপ্য ভালবাসায় কম পড়ে যাবে।

প্রিয়তমা হাসিয়া বলিল. "তুমি পাগল নাকি?"

"হাসির কথা নয়, আমার প্রাণটা কেমন করছে এ সব চিঠি পড়ে। সখীতে সখীতে এ রকম চিঠি লেখালেখি করে কস্মিনকালে আমি স্বপ্নেও জানতাম না।"

"সে যে নিত্যি আমায় চিঠি লেখে, তাকে জবাব না দিলে সে আবার রাগ করবে।"

"তা করে করবে।"

"তার আর অভিমান! কথায় কথায় অভিমান করে। কাল আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল; অবসর পাইনি বলে তার জবাব দিতে পারিনি; রোজ সন্ধ্যেবেলা ছাদে উঠি, দু'জনে দেখা হয়। কাল সন্ধ্যেবেলা আর সে ছাদে পর্যন্ত উঠল না। সকালবেলা আজ কাউকে না বলে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে কথাই কইলে না এত রাগ। আমি বললাম, ভাই কেন রাগ করিস—জানিস ত অবসর পাইনে।" বললে জানি গো জানি তোমার স্বামী এসেছেন। তাই তুমি অবসর পাও না। আমরা বিধবা মানুষ, আমাদের সদাই অবসর্।—কথাটা শুনতে আমার এমন খারাপ লাগল; আমি চলে এলাম। আমিও আজ ছাদে যাইনি, প্রতিশোধ নিচ্ছি। কেন আমি কি রাগ করতে জানিনে?"

ভোর রাত্রে এই দম্পতি সবেমাত্র জাগিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিল। প্রিয়তমার মা দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাকিলেন—"পিরি।"

প্রিয়তমা উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

মা বলিলেন, "শোন্ একটা কথা বলি।"

মার কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গিতে প্রিয়তমা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা? কি হয়েছে?"

মা তাহাকে বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া বলিলেন, "তরীর বড় ব্যামো। তাদের ঝি তোকে ডাকতে এসেছে।"

"প্রিয়তমা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি ব্যামো মা? কই ঝি?"

"ওঘরে বসে রয়েছে। আয়, তোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।"

মাতা কন্যাতে একটি ঘরে প্রবেশ করিল। তরঙ্গিণীদের ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। প্রিয়তমাকে দেখিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদিমণি, মেজবউ বুঝি আর বাঁচে না। তোমাকে

দেখতে চাইছে। যখন জ্ঞান হচ্ছে, তখনি শুধু তোমার নাম করে ডাকছে। চল্ শীগগির।"

এ সংবাদ শ্রবণে প্রিয়তমার হস্ত পদ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জননীর অনুমতি লইয়া ঝির সহিত সে তরঙ্গিণীদের কাছে চলিল।

যখন তরঙ্গিণীদের বাটীর খিড়কী দরজায় পৌঁছিল, তখন ক্রন্দনের রোল তাহাদের কর্ণে গেল।

ঝি বলিল—"যাঃ সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো! হা। হায় হায়।"

প্রিয়তমা সেখান হইতেই ফিরিল। ঝির কাঁধে ' র দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

॥ ৪ ॥

এক মাস পরে হৃদয়নাথ বাটীর সকলকে লইয়া মীরাট যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে রহিলেন কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁহার শ্বাশুড়ী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, মীরাটে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করেন। সহরের রাজপথে লোকচলাচল দশটা বাজলেই কমিতে আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে সমস্ত দোকান-পাঠ বন্ধ; রাজপথ লোকশূন্য নীরব শ্মশানের ন্যায় মনে হয়। অফিস আদালত ইত্যাদি সমস্তই প্রভাতে। সেই আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথে মানুষ বাহির হয়।

একটি অন্ধকারপ্রায় ঘরে, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, হৃদয়নাথ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই শীতল, তাই মধ্যাহ্নকালে পরিবারস্থ সকলেই এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। দুয়ার ও জানালা খসখসের পরদা দিয়া রুদ্ধ। ঘরের ভিতরেই বসিয়া এক ছোঁড়া চাকর পাখা টানিতেছিল। দূরে ছোটবধূ ছেলেপিলেকে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। বড়বধূ ধোয়া শানের মেঝেতে একটি বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়া দেবরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। ক্রমে তরঙ্গিণীর কথা উঠিল। বড়বধূ দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আহা বাছা যে এমন করে দাগা দিয়ে যাবে তা আমি কখনও ভাবিনি।"

হৃদয়নাথ বলিলেন, "বড়বউ তার জন্যে আর দুঃখ করে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলেও সুখ হত না।"

বড়বধূ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কেন এ কথা বলছ ঠাকুরপো?"

"অনেক দিন থেকে একটা কথা বলব মনে করি, কিন্তু বলতে পারিনে বড়বউ। তিনি গিয়েছেন, সে ভালই হয়েছে।"

বড়বধূ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা ঠাকুরপো? কি হয়েছিল?"

হৃদয়নাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আর কি বলব মাথামুণ্ড। তাঁর স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া বড়বধূ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "ও কি কথা ঠাকুরপো? অমন বোলো না। তিনি আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন।"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, "বড়বউ—আমি স্বচক্ষে তাঁর হাতের চিঠি দেখেছি।" "কি চিঠি?"

"সে আর কি বলব?"

"কাকে লেখা?"

"কে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে তা ঈশ্বরই জানেন।"

বড়বধূ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো ভুল করেছ। তা হতেই পারে না।"

হৃদয়নাথ পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "চিঠি যে আমার কাছে রয়েছে বড়বউ।"

"কই দেখি।"

হৃদয়নাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। বড়বধূ তাঁহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া জানালার কাছে গেলেন। খসখসের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া আলোকে চিঠিখানি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিলেন। তাহার পর শয্যার ফিরিয়া আসিয়া, চিঠিখানি হৃদয়নাথকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন, "তবু ভাল। দেহে প্রাণ এল।"

হৃদয়নাথ পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

বড়বউ ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও তো তার সখী প্রিয়তমাকে লেখা, সেই ও বাড়ীর চাটুয্যেদের গিন্নি, তার সঙ্গে ভারি ভাব ছিল কিনা। রোজ দুজনে চিঠি লেখালেখি করত। আহা গিন্নি ছুঁড়ি শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; কেঁদে আর বাঁচে না।"

হৃদয়নাথের কপাল ঘামিয়া উঠিল। নিঃশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। বলিলেন, "তবে চিঠির উপরে 'প্রিয়তম' লেখা রয়েছে কেন?"

"ঐ বলেই ত সে ডাকত। গিন্নি ওকে বলত তরণী, সে গিন্নিকে বলত প্রিয়তম।"

হৃদয়নাথের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আলোকাভাবে বধূ তাঁহার মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন আপনা-আপনি বলিলেন, "হায় রে, এ কথা যদি আগে জানতাম।"

বড়বধূ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আগে জানলে কি হত ঠাকুরপো? তা হলে তাকে ধরে রাখতে পারতে? তাই কি তার চিকিৎসায় তেমন মনোযোগ করনি?"

হৃদয়নাথের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। বড়বধূ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তবে কি চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারতে?"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বড়বউ যার নিয়তি উঠেছে, মানুষের চেষ্টায় কি তাকে বাঁচান যায়? অদৃষ্টলিখন খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য?"

বড়বধূর মন এ উত্তরে সন্তোষ মানিল না। তিনি আজিও নির্জ্জনে তরঙ্গিণীকে চিন্তা করেন....

[অগ্রহায়ণ, ১৩০৬]

পোষ্টমাষ্টার

খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোষ্ট অফিসের ভিতরে নড়বড়ে টেবিলের সামনে হাত ভাঙ্গা চেয়ারের উপর, বেগুনে রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কাজ করিতেছে, ওই এখানকার পোষ্ট মাষ্টার বা ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিতেই, বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনা গেল; 'রাণার' ডাক লইয়া আসিয়াছে। 'রাণার, প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাকবাবু ব্যাগের শিলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার তখন 'তামুক' খাইতে বাইরে চলিয়া গেল।

আফিস গৃহ এখন জনশূন্য। পিয়নেরা রান্না খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটিবে, এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি, মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটিয়া বিমল উহা টেবিলের উপর উবুড় করিয়া ধরিল। চিঠিপত্র পার্শেল প্রভৃতির সঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেরাজের মধ্যে রাখিল। (ইহা সে বাসায় লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুলিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতাগুলির রসাস্বাদন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে)। তার পর, চিঠির গাদা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে ৪/৫ খানি বাছিয়া লইয়া, দেরাজের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষরে

স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসায় লইয়া গিয়া, জল দিয়া খুলিয়া পাঠ করিবে;—শুধু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াই মনে করে; কারণ চিঠিগুলি সে নষ্ট করে না, আবার জুড়িয়া পরদিন ছাপ মোহর লাগাইয়া বিলির জন্য পিয়নদের দিয়া থাকে। ছয় মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আসিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপহরণ করে;—এটা তাহার একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাড়ে দশটা বাজিল; পিয়নেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে আমার এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।

।। দুই ।।

বিমলের নিবাস যশোর জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামে। তথায় একটি হাইস্কুল আছে—সেই স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার গোঁফদাড়ি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল "বিমল যে দিন পাস হবে, সেদিন পুবের সূয্যি পশ্চিম দিকে উঠবে।" এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রামের যত বকাটে ছোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সখের থিয়েটার দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা, এবং গঞ্জিকা সেবন ত অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল, ইদানীং থিয়েটারের রিহার্সালে যে বোতলও গোপনে আমদানী হইত, তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটিয়া গেল; গেজেট বাহির হইয়া দেখা গেল, বিমল তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়াছে—অথচ সূর্যদেব গ্রামের লোকের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও খাতিরই করিলেন না।

বিমল ছোকরাটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তাঁহার মন্দস্বভাবের জন্য আজিও বিবাহ হয় নাই। সংসারে তাহার মা ও জ্যেঠাইমা (উভয়েই বিধবা), একটি ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং দুইটি জ্যেঠতুতো ভাই বর্ত্তমান। বড়টি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে সামান্য বেতনে সুমারনবীশের কর্ম্ম করে—ছোট ভাই দুটি স্কুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্থোপার্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল—সামান্য যাহা জোৎজমা আছে তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক আত্মীয়র সঙ্গে ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল; তাহারই সুপারিশে সে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম পায়। আলিপুরের হেড আপিসে বৎসরখানেক শিক্ষানবিশী ও একটিনি করিয়া, আজ ছয় মাস হইল সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব-পোষ্ট মাস্টার হইয়া আসিয়াছে।

হেড আপিসে থাকিতে পাঁচজন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না। এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিয়নেরা আজ্ঞাকারী, খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ, এমন কি পল্লীগ্রাম হইলেও এখানে "বিলাতী" পাওয়া যায়—তবে সোডা পাওয়া যায় না, জল মিশাইয়া খাইতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

।। তিন ।।

পিয়নগণ স্ব স্ব ব্যাগ ভরিয়া পত্রাদি লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলে, বিমল অপহৃত মাসিকপত্রখানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তালাবদ্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, "বামুন মা, রান্নার কত দূর?"

একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "রান্না আমার

শেষ হয়েছে, তুমি চান করে এস বাবা।" ইঁহার বাড়ী এই পাড়াতেই, বড় গরীব, মাত্র চারিটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া, চিঠিগুলি ও মাসিকপত্রখানি বালিসের নীচে গুঁজিয়া, কোট প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তেল ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান গামছা ও বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া জামা পরিয়া, আর্সি চিরুণী ও বুরুষ লইয়া পরিপাটি রূপে নিজ কেশসংস্কার করিল। তারপর রান্নাঘরের বারান্দায় বিছানো আসনখানির উপর বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া 'বামুন মা' যখন চলিয়া গেলেন তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পান চিবাইতে চিবাইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, শয়নঘরে প্রবেশ করিল। এক গেলাস জল ও একখানি ছুরি লইয়া শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) ছোট টেবিলখানির উপর রাখিয়া, বিছানায় বসিয়া, বালিসের তলা হইতে মাসিকপত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙ্গুল ভিজাইয়া, প্রত্যেক চিঠির মুখে বেশ করিয়া বুলাইয়া সেগুলি সাববন্দি টেবিলের উপর রাখিয়া মাসিকপত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির মুখের জল শুষ্ক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির মুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিকপত্রখানি রাখিয়া ছুরির ফলা চিঠির মুখে ঢুকাইয়া উন্টাদিকের চাপ করিয়া একে একে চিঠিগুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আজ বউনি হল মন্দ নয়!" নোটখানি বালিশের তলায় গুঁজিযা বাখিয়া চিঠিব ভাঁজ খুলিল। প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। কলিকাতা প্রবাসী বিরহী স্বামী স্বীয় বিবহ যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিযা তাহার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধরিয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে-সে জন্য দিন-গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া, খোকার দুধ খরচেব জন্য ১০টি টাকা পাঠাইতেছে। এ ব্যক্তির আরও কয়েকখানি পত্র ইতিপূর্ব্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতায় চাকবিব জন্য উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাখিয়া, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল। "পূজনীয়া পিসিমা!" সম্বোধন দেখিয়া—"ধুত্তোর" বলিয়া সক্রোধে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের পূর্ব্বকথা কিছু কিছু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চারুশীলা—সে বিধবা, বোধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপুর গ্রামের দক্ষিণে রসুলপুরে তাহার বসতি—খুব সম্ভব এ স্থানে তাহার শ্বশুরালয়। তাহার পিত্রালয়ে কলিকাতায়;—কলিকাতা নিবাসী এই পত্রলেখকের সহিত তাহার প্রণয় সংঘটিত হয়। পত্রলেখককে পত্রশেষে কখনও নিজের নাম স্বাক্ষব করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না—সে সহি করে—"তোমার প্রেমাকাঙ্খী" "তোমার ভালবাসা"—"তোমার সে"— এইরূপ সব মাথামুণ্ড। বিগত ৩/৪ মাস হইতে ইহাদের এইরূপ প্রেমপত্র চলিতেছে—তবে, মেয়েটির লেখা চিঠি বিমল কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই,—নাম না জানাতে, রওয়ানা চিঠিগুলির মধ্য হইতে সেখানি বাছিয়া বাহির করা শক্ত বলিয়াও বটে; এবং সময় পাওয়া যায় না বলিয়াও বটে—কারণ ভিন্নগ্রামের ডাক বাক্স হইতে পিয়নেরা চিঠি কাড়িয়া আনিবার সময় ডাকঘরে অনেক লোকজন থাকে, ছাপ-মোহর দিয়া ব্যাগ ভর্ত্তি করিবার ধুম পড়িয়া

কলিকাতা—২২শে অগ্রহায়ণ

আমার হৃদয়েশ্বরী,

গতকল্য তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছি—তাহা তুমি পাইয়া থাকিবে। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, আমি আগামী শনিবার দিন গিয়া তোমায় লইয়া আসিব। কিন্তু শনিবারে যাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন অর্থাৎ রবিবার দিন আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি পূর্ব্ব পরামর্শ মত, রাত্রি ঠিক ১২টার সময় তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে সেই শিবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি মন্দিরের পার্শ্বস্থ সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় লুকাইয়া থাকিব, এবং তুমি আসামাত্র তোমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিব। যান বাহনাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারি না—হয়ত হাঁটিয়াই উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আইন অনুসারে আমাদের বিবাহের সমস্ত আয়োজন আমি করিয়া রাখিয়াছি—পুরোহিতও ঠিক হইয়াছে—সোমবার দিন আমি যথাশাস্ত্র তোমার পাণিগ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আমি উকিল ব্যারিষ্টারগণের পরামর্শও লইয়াছি। তাঁহারা বলেন, যদি তোমার শ্বশুরকুলের কেহ, এই লইয়া আমার উপর মামলা মোকর্দ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তবে তোমার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইয়াছে এবং স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই কেহ আর আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না; সেইজন্যে আমি জন্মমৃত্যু রেজেষ্টারি আপিস হইতে তোমার জন্মদিনের সার্টিফিকেটের নকল পর্য্যন্ত আদায় করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং সকল দিকেই আটঘাট বাঁধা রহিল। ববিবার সন্ধ্যার ট্রেনে আমি রওয়ানা হইয়া ষ্টেশনে নামিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই তোমাদেব গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিব। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, গৃহের বাহির হইও—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার শূন্য গৃহে আসিয়া তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও—আমার শূন্য হৃদয়ে বসিয়া আমায় চিরসুখী কব। ইতি—তোমার (মন) চোর।

এই পত্রখানি পড়িয়া বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল—কি চমৎকার! এ যে রীতিমত একটা নভেলী ব্যাপার! বাঃ—বাঃ—ক্যা মজাদার! ক্যা তোফা। বাহবা চারুশীলা—ব্রাভো! জিতা রহো বাবা—থ্রি চিয়ার্স ফর্ চারুশীলা। বেশ বেশ—বরের কাছে তুমি যাবে—মাইকেল ত বিধানই দিয়ে গেছে—"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে"—ব্রজাঙ্গনা কাব্য দেখহ! গড ব্লেস্ দি হ্যাপি পেয়ার—তোমাদের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করবে না বাবা? নুচি খেয়ে আসতাম!

অতঃপর বিমল বাকী পত্র দুইখানি পড়িয়া দেখিল; এ দুইখানিই মামুলি স্বামীর মামুলি প্রেমের চিঠি—তাহাতে প্রেমের চেয়ে ঘরকন্নার কথাই বেশী—কোনও বিশেষত্ব নাই। বিমল এই ছয় মাসের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সহস্রাধিক প্রেমপত্র পড়িয়াছে, সে জানে বৈধ প্রেমের চিঠি অপেক্ষা অবৈধ প্রেমের চিঠিতেই 'মজা' বেশী থাকে; পত্রগুলি আবার জুড়িয়া রাখিয়া বিমল মাসিকপত্রখানি পড়িতে আরম্ভ কবিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে উহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সে তখন পাশ ফিরিয়া পাশের বালিসে পা দিয়া আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

।। চার ।।

অপরাহ্নকালে বিভিন্ন গ্রাম হইতে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিলে বিমল তাহাদের নিকট হইতে মনি অর্ডার রেজেষ্টারি প্রভৃতির রসিদ দেখিয়া লইয়া, খাতাপত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কার্য্যশেষ হইলে, ভৃত্যকে বলিল, "ওরে, যা দেখি, হরেন স্যার দোকান থেকে এক

বোতল বিহ্বাইব নিয়ে আয়। চাদরের ভেতর বেশ করে লুকিয়ে আনবি—বুঝেছিস? আর, করিমদ্দিকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাস।"—বলিয়া বিমল, সরকারী তহবিল হইতে ভৃত্যের হস্তে ছয়টি টাকা দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পিয়ন করিমদ্দি সেখ আসিয়া বলিল, "হুজুর ডেকেছেন?"

বিমল বলিল, "হ্যাঁ। আজ একটা ফাউলের কারি বানিয়ে দিতে পারবে হে শেখের পো?"

করিম বলিল, "কেন পারবো না হুজুর?"

"আচ্ছা—এই টাকা নাও। বেশ মোটা তাজা দেখে একটা মুরগী কিনে এনো। বেশ করে লঙ্কাবাটা দিও—আমরা বাঙ্গাল মানুষ, ঝালটা কিছু বেশী খাই।"—বলিয়া বিমল ক্যাশ হইতে তাহাকেও একটি টাকা দিল।

কাজকর্ম্ম শেষ হইলে, ক্যাশ হইতে আর তিনটি টাকা লইয়া, দ্বিপ্রহরে লব্ধ সেই দশ টাকার নোটখানি ক্যাশে রাখিয়া ক্যাশ পূরণ করিল। ক্যাশ মিলাইয়া তাহা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, আপিস ঘরে চাবি দিয়া বিমল বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বামুন মাকে দেখিয়া বলিল, "মা আজ শরীরটে কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, আজ রাত্রে ভাতটা আর খাব না, খানকতক পরোটা ভেজে রেখে যেও। তরকারী ফরকারী বেশী কিছু দরকার নেই খানকতক আলুভাজা হলেই চলবে।"—বলিয়া সে মুখহাত ধুইতে চলিয়া গেল। (মাঝে মাঝে—বিশেষ বেতন পাইবার পর দুই চারি দিন বিমলের এরূপ গা ম্যাজ ম্যাজ করিয়া থাকে—এবং রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে লুচি বা পরোটা ফরমাস করে।)। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া বিমল এক পেয়ালা চা পান করিয়া, পাণ মুখে দিয়া ঘোষেদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে গেল—প্রত্যহই এইরূপ যায়।

রাত্রি ৮টা বাজিতেই বামুন মা পরোটা ও আলুভাজা বিমলের শয়নঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিমল বাসায় আসিয়া রামচরণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "করিমদ্দি এসেছিল?"

রামচরণ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ রেখে গেছে।"—বিমল দেখিল একটি এনামেলের বড় বাটীতে তাহার আকাঙ্খিত ফাউল কারি ঢাকা রহিয়াছে।

বিমল তখন ভৃত্যকে রাত্রের মত বিদায় দিয়া, সদর দরজা বন্ধ করিয়া, শয়নঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেওয়ালে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—তাহার আলো বাড়াইয়া দিয়া যথাস্থান হইতে বোতল গ্লাস এবং 'কাক ইস্কুরু' বাহির করিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) টেবিলের উপর রাখিল; জুতা মোজা ত্যাগ করিয়া, বিছানার ধারে বসিয়া বোতলটি খুলিয়া ফেলিল।

এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালাটি পাড়িয়া তাহাতে ছড়ি দিতে লাগিল। একটা গৎ বাজাইয়া আর এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালা যথাস্থানে রাখিয়া ভাবিল, সেই মজার চিঠিখানা আর একবার পড়িতে হইবে। দেওয়াল আলমারি খুলিয়া, চিঠিগুলি বাহির করিয়া, চারুশীলার খানি বাছিয়া লইয়া বলিল—"এঃ জুড়ে ফেলেছি যে দেখছি। কুছ পরোয়া নেই—ফের খুলবো।"—বলিয়া টলিতে টলিতে বিছানায় আসিয়া বসিল। চিঠিখানিকে সামনে ধরিয়া বলিল, "কি চাঁদ, জল খাবে? না ব্র্যাণ্ডি?"—বলিয়া গেলাসে খানিক ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া, আঙ্গুলে একটু লইয়া চিঠির মুখ ভিজাইয়া বলিল, "যা বেটা, তোর চিঠি জন্ম সার্থক হয়ে গেল।" পরে ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে জনম সার্থক হয়ে গেল।" পরে ব্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে চেষ্টা করিতেই উহার মুখ ছিঁড়িয়া গেল। চিঠিখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে ফেলি? কাল বিলি হবি কি করে রে শালা?"—বলিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া, খামখানা ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল "জাহান্নামে যা।" চিঠি খুলিয়া পড়িল—আমার হৃদয়েশ্বরী!" চিঠি

রাখিয়া নিজ বক্ষে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—"হৃদয়েশ্বরী!—হৃদয় জ্বলে গেল,—পুড়ে গেল,—খাক্ হয়ে গেল! আর একটু খাই"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, গেলাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জিহ্বা তখন তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেশা হইলে, সে আর 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না—'স' স্থানে 'ছ' বলিত। একটি কথায় জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু—ছনিবাবে,—যাওয়ার ছুবিধা করিতে—পারিলাম না। পরদিন—পরদিন—অর্থাৎ রবিবারে—আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন ছন্দেহ নাই। তুমি—পূর্ব্ব পরামর্ছ মত— রাত্রি ঠিক ১২টার ছময়—তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে ছেই ছিবমন্দিরের ছম্মুখে আছিয়া দাঁড়াইবে।"

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল। অর্দ্ধমুদিত নেত্রে, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি! খামখানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। আগেকাব চিঠি মত—তুমি ছনিবারে রাত বারটায় এছে ছিবমন্দিবের কাছে দাঁড়াবে ত? তার আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে ছুয়ে পড়বে। কি‌ং ছে ত হায় আছবে না। অল্‌রাইট—আমি যাব আমি গিয়ে তোমায় বলবো—

উঠ উঠ হে ছুন্দরী
তব পদছ‌্ পছ যোগ্য নহে এ ধরণী।
তুমি কেন ধূলায় পতিত?

তুমি চল—আমার ছঙ্গে চল। চল ছ‌্র্‌্‌র, তুমি আমার হৃদয়েচ্ছরী হবে। হৃদয়ের চ্ছরী—না ছুরি? হৃদয়ের ছুরি হোয়ো না দোহাই বাবা ছাতদোহাই তোমাব!"—বলিয়া চক্ষু খুলিযা আপন রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া বিমল একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া পড়িতে বসিল। পড়িল—

"আমার ছুন্য গৃহে আছিয়া, তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও। আমার ছুন্য হৃদয়ে বছিয়া আমায় চিরছুখী কর। ভগবানের নাম ছরণ করিয়া গৃহের বাহির হইও—আছা করি তাঁহার আছীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ ছকল বাধাবিঘ্ন অপছারিত হইবে।"

চিঠি রাখিয়া বিমল বলিতে লাগিল—"উত্তম কথা!—কিন্তু দাদা, তোমাবই হৃদয় কি ছুন্য? আমারও যে তাই ভাই। আমার ছব ছুন্য ছব ছুন্য। আমার হৃদয় ছুন্য—প্রেম নেই; গৃহ ছুন্য—ইছ্‌তিরী নেই—বাক্‌ছো ছুন্য, টাকা নেই! আমার ছব ছুন্য—মহাব্যোম—ব্যোম ভোলানাথ—ছনিবার রাত বারটায় আমি যাব—তোমার মন্দিরের কাছে বটগাছের নীচে আমি নুকিয়ে থাকবো—চারুছীলাকে নিয়ে এছে, আমার ছুন্য গৃহ ছুন্য হৃদয় পূর্ণ করবো। তুমি হচ্চ বিঘ্ন বিনাছনের বাপ—তাকে ছাবধান করে দিও—যদি কোনও বাধা বিঘ্ন ঘটে—তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্তুরকে এব জন্যে রেছ্‌পানছিবিল হতে হবে—এই ছাপ্ কথা আমি বলে রাখলাম।"—বলিয়া বিমল বীররসের সহিত বিছানায় এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া। চক্ষু খুলিল। আর খানিকটা সুরা ঢালিয়া, জল মিশাইয়া পান করিয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল, "লেডিজ এণ্ড জেনেল্‌মেন, তোমরা ভাবছো—মাতালছ্য নানাভঙ্গি—এখন এ বেটা মদের খেয়ালে এই ছব বলছে—কাল এছব কিছুই মনে থাকবে না। তা নয় তা নয়—হাম যায়েঙ্গা।—আলবৎ যায়েঙ্গা—ঢেকে যায়েঙ্গা—আমায় চিনতে পারবে না। তারপর এই বাছায় এনে তাকে বন্দিনী। আদরে যত্নে মিছ্‌টি কথায় তিরিলোককে বছীভূত করতে কতক্ষণ?—আর আমার এ চেহারাটাও কি কোনও কাজে লাগিবে না?—এখন একটু ছোয়া যাক।"—বলিয়া মাতাল বিছানায় দেহ লুটাইয়া দিয়া, নিদ্রাঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল। কোথায় রহিল তার পরোটা—আর কোথায় রহিল তার সাধের কাউলকারি!

॥ পাঁচ ॥

খামের উপর শ্রীমতী চারুশীলা দাসী ঠিকানা লেখা থাকিলেও এবং রসুলপুর গ্রামে যথার্থই একজন দাসী থাকিলেও, পত্রখানি তাহার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। তাহার নামেই পত্র আসে বটে, কিন্তু পত্র না খুলিয়াই, চারুশীলা সেখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া পাশের বাড়ীতে তাহার প্রিয়সখী বনলতাকে দিয়া আসে। ইহাই গোপন বন্দোবস্ত। সব কথা তবে খুলিয়াই বলি।

বনলতা, বনে জন্মগ্রহণ করে নাই—খাস কলিকাতা সহরে তাহার মাতুলালয়ে জন্মিয়াছিল। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া বনলতা মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতে থাকে। মামা বড়লোক ছিলেন, নিজের মেয়েদের সঙ্গে বনলতাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় একটি যুবক কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত—তাহার সহিত বনলতার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরেই সেই হতভাগ্য যুবক কালকবলিত হয়। বনলতার মামা, অভাগিনী ভাগিনেয়ীকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। গত বৎসর উইল করিয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া, ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

যে লোকটি "তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী" "তোমার মনচোর" ইত্যাদি বলিয়া চিঠি সহি করে তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইঁহাদের জ্ঞাতি। সে লোকটি সুশিক্ষিত এবং উদারমতাবলম্বী। ব্রহ্মদেশে সেগুন কাঠের তাহার বিস্তৃত কারবার আছে—কলিকাতায় তাহার ব্র্যাঞ্চ আছে। বনলতার মামার শ্রাদ্ধ উপলক্ষেই বর্ম্মা হইতে নরেন কলিকাতায় আসে এবং বিধবা বনলতার সহিত পরিচিত হয়। তাহাদের বাড়ী ভিন্ন হইলেও, প্রত্যহই এ বাড়ীতে সে আসিতে লাগিল এবং এসব ক্ষেত্রে যাহা হয়—প্রথমে আঁখি মজিল, তারপর মন মজিল। ব্যাপাব অবগত হইয়া বনলতার মামাতো ভাইয়েরা, নরেনের সহিত তাহাব বিধবা-বিবাহ দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই খবর কাকমুখে রসুলপুর গ্রামেও আসিয়া পৌঁছিল। উইলেব সংবাদও পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল। বনলতার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া, বনলতার মা-'তো ভাইদের উপর উকিলেব চিঠি দিয়া, মহা হাঙ্গামা কবিয়া, বিধবা পুত্রবধূকে "উদ্ধার" করিয়া আনেন।

রসুলপুরে আসিয়া বনলতা প্রথমে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। মাসখানেক পরে পাশের বাড়ীর সমবয়সী চারুশীলার সহিত তাহার সখিত্ব জন্মে। চারু তাব স্বামীর অভিমতে, বনলতার সহিত তাহার হস্তাকাঙ্ক্ষীর পত্রবিনিময়ে এইভাবে সহাযতা করিতে সম্মত হয়।

অপহৃত পত্রখানিতে লেখা ছিল "গত কল্য তোমায় পত্র লিখিয়াছি যে, শনিবার রাত্রে গিয়া তোমায় লইয়া আসিব।" সে পত্রখানি যথাসময়ে চারুর হস্তগত হয়, এবং যথানিয়মে বনলতাকে সেখানি সে দিয়াও আসে। অন্যান্য পত্র, বনলতা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এ পত্রখানিতে সময় তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিল বলিয়া, বাক্স লুকাইয়া রাখে। বনলতার শাশুড়ী তাহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে তিনি তাহার বাক্স পেঁটরা গোপনে খানাতল্লাসীও করিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত "দোষজনক" কিছুই পান নাই। এই পত্রখানি পৌঁছাবার পর দিন, দ্বিপ্রহরে বনলতা চারুশীলাদের বাড়ী গিয়াছিল—সেই সুযোগে তাহার শাশুড়ী অন্য চাবি দিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, পত্রখানি পাঠ করেন এবং স্বামীকে দেখান। স্বামী বলেন, "আচ্ছা, আসুক না পাজি, তাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যাবে।"

শনিবার দিন বনলতার শ্বশুর তাঁহার দুইজন বন্ধুকে রাত্রে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শাশুড়ী, নানা অছিলায়, রান্নাবান্নায় বিলম্ব করিলেন। অতিথিদ্বয়ের আহার যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন ১১টা।

অন্য দিন রাত্রি ১০টা না বাজিতেই বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ বনলতা ছট্‌ফট্ করিতেছে, কিন্তু বাড়ীর সকলে জাগিয়া; শাশুড়ী-ননদেরা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। ওদিকে বৈঠকখানা হইতে ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বনলতার শ্বশুর, তাঁহার বন্ধুদ্বয় সহ, লাঠি ও দড়ি সঙ্গে লইয়া, শিব-মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই, ওভারকোট গায়ে, মাথায় মুখে কম্ফর্টার জড়ানো, বিমল ধীরে ধীরে আসিয়া বটবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই তিনজন লোক আসিয়া তাহার মাথায়, পার্শ্বে, বুকে, পদদ্বয়ে লাঠি, কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি মারিতে মারিতে তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। প্রহারের চোটে তৎপূর্ব্বেই বিমল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল।

লোক তিনজন তখন, অচেতন বিমলের হস্তপদ উত্তমরূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এক ব্যক্তি কহিল, "বেটা বেঁচে আছে ত? না মরেছে?"

অপর ব্যক্তি তাহার নাকের কাছে হাত দিয়া বলিল, "না—নিঃশ্বাস বেশ পড়ছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এখন, একে কি করা যায় বল দেখি? এইখানেই কি পড়ে থাকবে?"

"না না—আমাদের বাড়ীর কাছে কেন? শেষকালে কি কোনও পুলিস হাঙ্গামায় পড়বো?

"তবে চল বেটাকে নিয়ে খানিক দূরে কোথাও ফেলে রেখে আসা যাক।"

"দেশলাইটে জ্বাল ত, লোকটা কে, দেখি।"

এক ব্যক্তি দেশলাই জ্বালিল। তিনজনেই তখন বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে মহেশপুরের পোষ্ট মাষ্টার!"

দেশলাই পুড়িয়া গেল। আবার যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

তখন তিনজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। "এ বেটাই বা এখানে এল কেন? যে বেটার আসবার কথা সেই বা এল না কেন?"

"সে যা হোক তা হোক—এখন চল একে মহেশপুর পোষ্ট আপিসের বারান্দায় শুইয়ে দিয়া আসা যাক।"

তিনজনে তখন বিমলের অচেতন দেহ বহন কবিয়া লইয়া চলিল। পল্লীগ্রামের পথ—রাত্রি দ্বিপ্রহর—রাস্তায় আলো নাই—জনমানবের সঞ্চার নাই।

।। ছয় ।।

শীতে, খোলা বারান্দায় পড়িয়া থাকিয়া, ঘণ্টা দুই পরেই বিমলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে সেই আবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া, নানারূপ উপায় ফন্দি চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। একজন পিয়নকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বিমল ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল।

পিয়ন আসিয়া বলিল, "বাবু, ব্যাপার কি?"

বিমল চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, "ডাকাতি রে, ডাকাতি! আগে আমার প্রাণটা বাঁচা।"

সে ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া অন্যান্য পিয়নকে ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বিমলের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিল।

বিমল বলিল, "আমার বুকপকেট থেকে চাবি নে। ডাকঘর খোল্, খুলে, মেঝের উপর আমায় শুইয়ে দিয়ে থানায় খবর দিগে যা।"

পিয়নেরা তাহাই করিল। বিমল কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিল, "সব পিয়ন যা। দারোগা প্রথমে তোদেরই জবানবন্দি নেবে কিনা!"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবো হুজুর?"

"যা জানিস—যা দেখেছিস—সবই বলবি।"

পিয়নগণ যখন চলিয়া গেল তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে। বিমল টলিতে টলিতে উঠিয়া সরকারী লোহার সিন্দুক খুলিল। তাহার মধ্যে নোটে টাকায় ৫৪২ ছিল—সেগুলি সমস্ত

বাহির করিয়া, রুমালে বাঁধিয়া, বাসায় গিয়া নিজ ট্র্যাঙ্কে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়া, ডাকঘরের মেঝেতে পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিল।

।। সাত ।।

দুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে ছাপা হইল—

ভীষণ ডাকাতী—পোষ্ট আফিস লুট!

বিগত শনিবার রাত্রে, ২৪পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামের পোষ্ট আফিসে একটি ভয়ানক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট. মাষ্টার বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাত্রি ১১টার সময় ডাকঘরে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিলেন, পিয়নেরা তৎপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। ৫।৬ জন যুবক হঠাৎ ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রিভলবার বাহির করিয়া বলে—"খবর্দ্দার চীৎকার করিও না, গুলি করিব। লোহার সিন্দুকের চাবি দাও।" ইহাতে পোষ্ট মাষ্টার বলেন, "তা কখনই দিব না—প্রাণ দিব তবু সরকারের টাকা দিব না।" একজন যুবক তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাঁট দিয়া বিমলবাবুর মস্তকে সজোরে প্রহার করে। অপর যুবকগণ তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার বুকে বসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তারপব হস্তপদাদি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া চাবি খুঁজিতে থাকে। চাবি পাইয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া পূর্ব্বদিনের ক্যাশ ৫৪২ লইয়া, সিন্দুক বন্ধ করণান্তর পোষ্ট মাষ্টারকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া শোয়াইয়া দেয়। অফিস ঘরে তালাবন্ধ করিয়া, চাবির গোছা পোষ্ট মাষ্টারের পকেটেই ভরিয়া দিয়া তাহারা পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতগণের মুখে কালো মুখস, গায়ে কালো কোট পায়ে বুটজুতা ছিল, এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহাব করিতেছিল। এই ডাকাতি সম্পর্কে গতকল্য কলিকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে এবং পুলিস, তিনজন যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত ডাকাতের কেহই ধরা পড়ে নাই। বিমল আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্ণমেন্ট তাহাকে ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

রবিবার রাত্রে নরেন,যথাস্থানে আসিয়া, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বনলতা পত্রে এখানকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়াছিল। মাসখানেক পরে, একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে, বনলতা পলায়ন করিয়া পদব্রজে রেলের ষ্টেশনে গিয়া নরেনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং উভয়ে বাড়ীতে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। নরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

কাজির বিচার

পুরাকালে পারস্য দেশের কোনও গ্রামে একজন অতি ধনবান ওমরাহ্ বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল নবাব কুদরৎউল্লা খাঁ। তিনি ছিলেন সেই গ্রাম এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। প্রকাণ্ড পাঁচমহল প্রাসাদে তিনি বাস করিতেন। প্রাসাদসংলগ্ন বাগানে এত গোলাপ ফুটিত যে, তাহার সৌরভে চারিদিক অনেক দূর পর্যন্ত আমোদিত থাকিত। নবাব বাহাদুর প্রত্যহ গোলাপ জলে স্নান করিতেন।

নবাব বাহাদুরের তখন যৌবন কাল; বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হয় নাই; কিন্তু নিত্য কালিয়া পোলাও ও নানাবিধ শিরনী (মিষ্টান্ন) আহার করিয়া তাঁহার দেহটি অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িয়াছিল। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি আবলুশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, লাল মখমল মণ্ডিত এক সোফায় শয়ন করিয়া কাটাইতেন। শয়ন করিয়া, সোনার ফর্সিতে তামাকু সেবন করিতে করিতে তিনি কিছুক্ষণ বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; অবশিষ্ট সময় নিদ্রায় অথবা মোসাহেবগণের খোস গল্প শ্রবণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। কেবল বিকালে একবার তাঞ্জামে চড়িয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন।

গ্রামের বাহিরে বলিলেই হয়, নদীর নিকট একস্থানে একটি ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরে আবদুল নামক একজন গরীব লোক বাস করিত। রাস্তা হইতে এই কুটীরখানি বেশী দূরে নহে;—মাঝে খানিকটা পতিত জমি মাত্র। কুটীরের উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে নদীতীর মধ্যে প্রবেশ করিত;—এবং বেশ পাকাপাকা শরগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাটিয়া, বোঝা বাঁধিয়া তার কুটীরের সম্মুখে আনিয়া ফেলিত। ধারালো ছুরীর সাহায্যে শরের ছালগুলি ছাড়াইয়া তাহা দিয়া সারাদিন বসিয়া কুলা, ডালা, পাখা, ছোট ছোট বাক্স ইত্যাদি নানা দ্রব্য বয়ন করিত। বাজারে বা গৃহস্থ বাড়ী গিয়া, সেই সব বিক্রয় করিত—ইহাই তাহার উপজীবিকা।

নবাব বাহাদুর বিকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইলে, প্রায়ই তাঁহার তাঞ্জাম আবদুলের কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাইত। তিনি দেখিতেন, সারাদিনের পরিশ্রমের পর, আবদুল কোন দিন কুটীরের বাহিরে বসিয়া অন্নপাক করিতেছে, কোনও দিন দেখিতেন, বৃহৎ শানকীতে লাল মোটা চাউলের একরাশি ভাত ঢালিয়া, যৎসামান্য ব্যঞ্জন অথবা কেবলমাত্র লবণ সহযোগে পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। কোনও দিন বা দেখিতেন, তাহার খাওয়া হইয়া গিয়াছে, ধূলা মাটির উপর ছেঁড়া চেটাই বিছাইয়া, গ্রীষ্মের ফুরফুরে হাওয়ায় আবদুল গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দেখিয়া, নবাব বাহাদুরের মনটা ঈর্ষায় জ্বলিয়া যাইত।

তিনি ভাবিতেন, "উঃ—হতভাগার কি স্পর্দ্ধা! উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী চাউলের পোলাও, তাহাই আধপোয়ার বেশী আমি খাইতে পারি না;—বাবুর্চ্চিরা প্রত্যহ ৮/১০ প্রকারের মাংস রন্ধন করিয়া দেয়, কোনওটা একটু চাখিয়া দেখি মাত্র—মুখে রুচে না—খাই না,—কোনওটার দুই চারি টুকরা খাই; একদিন দুই চামচ বেশী খাইলেই বদহজম হয়। আর ঐ শয়তান, শুধু খানিকটা নুন বা খানিকটা কুমড়ার ঘ্যাঁট্ দিয়া সেরখানেক বুকড়ি চাউলের অন্ন গোগ্রাসে গিলিতেছে; রেশমের গদি তোষকের উপর শুইয়া থাকি, ভৃত্যেরা দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গোলাপজলে ভিজানো পাখায় আমায় হাওয়া করে, তবু আমার ঘুম আসে না, অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত আমি জাগিয়া কেবল এ পাশ ও পাশ করি! আর, ও কিনা ধূলাব উপর চেটাই পাতিয়া এমন ঘুমায় যে, আমার তাঞ্জামবাহ গণের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পায় না,—উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করে না! উঃ, অসহ্য!"

গ্রীষ্মকাল! সমস্ত শরবন পাকিয়া শুকাইয়া উঠিয়াছে। একদিন রাগের মাথায় নবাব বাহাদুর ভৃত্যগণকে হুকুম দিলেন, "দে—ওর শরবনে আগুন লাগাইয়া দে।"

শুধু শরবন পুড়িল না;—সেই আগুনে আবদুলের কুটীরখানিও ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

নবাবের এইরূপ অত্যাচারে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়া, আবদুল রাজধানীতে গিয়া, প্রধান কাজির নিকট নবারের নামে নালিশ করিয়া দিল।

।। দুই ।।

কাজী সাহেব উভয় পক্ষের সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিলেন। কূট প্রশ্ন করিয়া, আবদুলের উপর সাহেবের রাগের যথার্থ কারণও তিনি অবগত হইলেন।

বিচার-শেষে কাজি সাহেব রায় প্রকাশ করিলেন। ফরিয়াদীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন :—

"আবদুল, তুই অতি অভদ্র ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিস। এত বড় তোর গোস্তাকী যে নবাব সাহেবের দৃষ্টিপথে বসিয়া তুই কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত মারিস্! এমন ঘুমাস্ যে তাঞ্জামবাহকগণের উচ্চ চীৎকারেও তোর ঘুম ভাঙ্গে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাব সাহেবকে সেলাম করিস্ না। এই অপরাধে, আমি তোর এক বৎসরকাল দ্বীপান্তরেব দণ্ডবিধান করিলাম।"

আদেশ শুনিয়া, নবাব বাহাদুরের মুখে হাসি আর ধরে না। তাঁহার মোসাহেবগণ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মোবারক্! মোবারক্!—হাঁ, সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার যদি বলিতে হয় তবে ইহাকেই বলা যায়। ধন্য কাজি সাহেবের শিক্ষা, ধন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধন্য তাঁহাব সমদর্শিতা!"

এই উচ্চ প্রশংসাবাদ শ্রবণেও কাজি সাহেবের মুখখানি গম্ভীর। ইহার পব তিনি বলিলেন :—

"আর শুন, নবাব সাহেব। তুমি বড়লোক, জমিদার—আর গরীব আবদুল খাটিয়া খুটিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ করে! সামান্য অপরাধে তুমি এই গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; ইহা নিতান্ত অন্যায়, অধর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে। অতএব তোমার প্রতি আমার দণ্ডাজ্ঞা যে, তুমিও এক বৎসরকাল দ্বীপান্তরের শাস্তিভোগ করিবে।"

বলিয়া কাজি সাহেব, এজলাস ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

আদেশ শুনিয়া, নবাব বাহাদুরের মুখখানি শুকাইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে "অ্যাঁ? অ্যাঁ?" বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মোসাহেবগণ হতভম্ব হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এই রায়ের বিরুদ্ধে, বাদশাহের নিকট নবাব বাহাদুর আপীল কবিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না।

কয়েক দিন পরে, আবদুল ও নবাব সাহেব উভয়কে রাজকীয় জাহাজে উঠানো হইল। সমুদ্র পারে, একটি দ্বীপে গভীর রাত্রে উভয়কে নামাইয়া দিয়া, কাপ্তেন জাহাজ লইয়া ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, "বৎসর অতীত হইলে, তোমরা উভয়েই এইখানে অপেক্ষা করিও, আমি আবার আসিয়া তোমাদের তুলিয়া লইয়া যাইব।"

।। তিন ।।

এই দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহারা সভ্যজগতের কোনও সংবাদই রাখিত না, কোনও সভ্যজাতির ভাষা অবগত ছিল না, বনের ফল মূল আহরণ করিয়া কিংবা পশু শিকার করিয়া তাহার মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত এবং পশুচর্ম্মই ছিল তাহাদেব বস্ত্র। প্রাতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া এই দুইটি নবাগত অতিথিকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই সংবাদ ক্রমে তাহাদের বস্তিতে গিয়া পৌঁছিলে, বহুসংখ্যক নর-নারী ও বালকবালিকা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের দেখিতে আসিল। তাহারা নিজ ভাষায় এই দুইজনকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নবাব ও আবদুল তাহাদের একটা কথাও

বুঝিতে না পারিয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কেহ কেহ বলিল, "এ উৎপাত কোথা হইতে আসিয়া জুটিল! না জানি ইহারা কবে আমাদের কি অনিষ্ট করে, ইহাদের মারিয়া ফেলাই উচিত।" কেহ বলিল, "না না, আমরা এত লোক, ইহারা দুইজনে আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারে? মারিয়া ফেলা উচিত নহে।" আবার কেহ বলিল, "আমাদের সর্দ্দার আসুন, তিনি যেমন বলিবেন, সেইরূপ ব্যবস্থাই করা যাইবে।"

নবাব বাহাদুর দুঃখে ও অপমানে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। আবদুল হাত দুটি যোড় করিয়া, কাতর নয়নে, ইঙ্গিতে তাহাদের দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

সর্দ্দার মহাশয় অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া পৌঁছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, আবদুল গিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অনেকেই তাঁহাকে পরামর্শ দিল, ইহাদের হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু সর্দ্দার এ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, "মিছামিছি মনুষ্য হত্যা করিয়া কি হইবে? বরং ইহাদেব দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে। চল, ইহাদের বস্তির ভিতর লইয়া চল। ইহাদের কাজ দেওয়া যাইবে,—খাটিবে খাইবে।"

বস্তির ভিতর লইয়া গিয়া, সর্দ্দারের লোকেরা দুইখানি কুড়ুল আনিয়া ইহাদের হাতে দিয়া, দুইটা শুকনা গাছ দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিল, "এই গাছ দুইটি তোমরা কাটিয়া ফেল কাজ শেষ হইলে তবে খাইতে দিব।"—বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আবদুল কুড়ুলখানা লইয়া, গাছের গোড়ায় কপাকপ্ কোপ বসাইতে লাগিল। তাহার দেহে বিপুল শক্তি—এ সকল কার্য্যে সে বিলক্ষণ অভ্যস্থ। সারাদিন গাছটাকে ভূমিসাৎ করিয়া শাখাগুলাও একে একে কাটিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিল।

নবাব বাহাদুর প্রাণের দায়ে, কুড়ুলখানি উঠাইয়া গাছে কোপ্ দিতে লাগিলেন বটে কিন্তু একটা কোপও গাছের গুঁড়িতে ভাল করিয়া বসিল না। দশ মিনিট অতীত হইতে ন হইতেই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দরদর ধারায় ঘাম ছুটিল; হাত ব্যথা হইয়া গেল, তিনি কুড়ুল ফেলিয়া, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, আবার শুরু করিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ কুড়ুল চালাইতে পারিলেন না। ক্রমে দিবা অবসান হইল।

সর্দ্দারের লোকেরা আসিয়া আবদুলের কার্য্য দেখিয়া খুব খুসী হইল। তাহার পিঠ থাবড়াইয় সেই খুসী প্রকাশ করিল। নবাবের গাছটা অর্দ্ধেকও কাটা হয় নাই দেখিয়া রাগিয়া তাঁহাকে এব লাথি মারিয়া বলিল, "তুই পাজি কোনও কর্ম্মের নোস্। কেবল ভুঁড়িই সার!"

আবদুলকে তাহারা আদর করিয়া কতকগুলি ফল, ও খানিকটা মাংস খাইতে দিল নবাবকে গোটাকতক নিকৃষ্ট ফল মাত্র খাইতে দিল, মাংস মোটেই দিল না।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আবদুলকে তাহারা যে কার্য্যে লাগায়, তাহা যতই পরিশ্রমসাধ্য হউক না কেন, আবদুল তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। নবাবকে যে কার্যই দেয়, কোনটাই তিনি সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। ফলে, আবদুলের খুব আদর হইল। সে ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ঘরে থাকিতে পায়। নবাবকে খাইতে দেয় অন্য সকলের উচ্ছিষ্ট—কদন্ন। পেটের জ্বালায় নবাব তাহাই খাইয়া কোনও মতে জীবনধারণ করেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিলে পর, নবাব বাহাদুরের শরীরে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল তিনি এখন আর সেরূপ স্থূলকায় নাই। তাঁহার চর্ব্বি গলিয়া ভুঁড়ি ধসিয়া, দেহের আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে। খাইবার সময় উপস্থিত হইলে, ক্ষুধায় তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। রাত্রে কুঁড়ে ঘরে চেটাইয়ের উপর শয়ন করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন—এবং প্রায়ই একঘুমে তাঁহার রাত কাটিয়া যায়। প্রভাতে উঠিয়া দেহে নূতন বল অনুভব করেন এবং এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াও কাতর হইয়া পড়েন না। এতদিনে ইহাদের ভাষাও তিনি কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছেন। আবদুলও শিখিয়াছে।

।। চার ।।

এই অসভ্যগণের একজনের একটি বালক পুত্র আবদুলের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আবদুল যখন কাজ করিত, তখন সে প্রায়ই তাহার কাছে কাছে থাকিয়া খেলা করিত;—কার্য্য শেষ হইলে, আবদুল তাহাকে কোলে বা কাঁধে তুলিয়া বেড়াইতে যাইত। সেই দ্বীপে নানা জাতীয় শরগাছ ছিল—কোনটার ছাল শাদা ধবধবে, কোনটার পীতবর্ণ, কোনটার বা টক্‌টকে লাল। আবদুল একদিন অবসর সময়ে বসিয়া, নানা বর্ণের শরকাঠি হইতে ছাল ছাড়াইতে লাগিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ সব কি হইবে আবদুল?"

আবদুল বলিল, "তোর জন্য একটা মজার জিনিস তৈরী কবিয়া দিব।"

পরদিন কার্য্যশেষে আবদুল বসিয়া সেই শরের ছালগুলি দিয়া, বালকের জন্য একটি টুপী বুনিয়া দিল। সেই টুপী মাথায় দিয়া বালক ত আনন্দেই আটখানা।—সে নাচিতে নাচিতে গিয়া তাহার জনক জননীকে উহা দেখাইল।

সেই সুন্দর টুপী দেখিয়া, অসভ্যগণের মনে সেইরূপ টুপী পরিবার জন্য অত্যন্ত লোভ জন্মিল। তাহারা আবদুলকে কাঠ কাটা, মাটী খোঁড়া প্রভৃতি কার্য্য হইতে অবসর দিয়া বলিল, "তুমি কেবল সারাদিন বিভিন্ন মাপের এইরূপ টুপী প্রস্তুত কর—আমাদের সকলের জন্যই এইরূপ টুপী চাই। অবশ্য সর্দ্দার মহাশয় ও তাঁহার পুত্র পরিবারগণের টুপীগুলিই প্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে আবদুল কেবল টুপীই বুনিতে লাগিল। তাহার কাজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অসভ্যগণ অত্যন্ত প্রীত হইল। বাসের জন্য তাহাকে ভাল ঘর দিল, এবং খাদ্যদ্রব্যাদিও ভাল ভাল দিতে লাগিল।

নবাব বাহাদুর সেই কাঠ কাটা এবং মাটি খোঁড়ার কার্যেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দেহে এখন বিলক্ষণ বলসঞ্চয় হইয়াছে—দেহ নীরোগ,—ভাগ্যবিপর্য্যয় সত্ত্বেও, মন এখন বেশ প্রফুল্ল থাকে। আবদুলের প্রতি এখন আর তাঁহার মনে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই—তাহার সহিত বন্ধুভাবেই মিশিয়া থাকেন। আবদুলও তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে, এবং নিজের ভাল খাবারগুলির ভাগ দেয়।

বৎসর অতীত হইল। পারস্য রাজ্যের জাহাজ আবার এই দ্বীপে আসিয়া লাগিল। কাপ্তেন নামিয়া আসিয়া, নবাবকে এবং আবদুলকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

।। পাঁচ ।।

যথাসময়ে জাহাজে গিয়া পারস্য দেশে পৌঁছিল। রাজাদেশে, আবদুল ও নবাব উভয়কেই সেই কাজি সাহেবের নিকট উপস্থিত করা হইল। তখনও উভয়েরই বন্দী-বেশ।

কাজি সাহেব নবাব বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অলস ও অকর্ম্মণ্য ধনী ব্যক্তির সহিত দরিদ্র ও শ্রমশীল লোকের পার্থক্য কি, তাহা আপনি হৃদয়াঙ্গম করিয়াছেন কি?"

নবাব বলিলেন, "করিয়াছি, মহাশয়।"

"এখন আপনার ক্ষুধা কিরূপ হয়?"

"আর নিদ্রা?"

"অতি সুনিদ্রা হয়—রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায় তাহা জানিতেও পারি না।"

"ইহার কারণ কি, তাহাও বোধ হয় আপনি উপলব্ধি কবিয়াছেন?"

"ইহার কারণ—মিতহার ও শ্রমশীলতা।"

কাজি সাহেব বলিলেন, "উত্তম কথা। এখন আপনি নিজগৃহে গমন করিতে পারেন। দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া যে শিক্ষালাভ করিয়া আসিলেন, তাহা যেন আর ভুলিবেন না। আর এক কথা আপনি অতি অন্যায়পূর্ব্বক এই গরীবের ঘর দুয়ার ও জীবিকার এক মাত্র উপায়

ইহার শরের ক্ষেত জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ঘর দুয়ার নিজব্যয়ে আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ আপনি উহাকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা দিবেন। এই সর্ত্তে আপনি সম্মত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব, আপনি গৃহে যাইতে পারিবেন।"

নবাব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কাজি সাহেবের আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, বন্ধুভাবে আবদুলের হস্ত ধারণ করিয়া আদালত-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

বিনোদিনীর আত্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। বাল্য-কাহিনী

আমার নাম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। হাল সাকিন কলিকাতা। মৃত্যু নিকট জানিয়া, আমি নিজ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা যদি কোনও দিন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তবে আমাব মত অবস্থাপন্না বঙ্গরমণীগণ সাবধান হইতে পারিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক আশা ও অভিপ্রায়। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল কোনও কুলই আমি উজ্জ্বল করি নাই—সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত নামধামগুলির পবিবর্ত্তে আমি কাল্পনিক নামধামই ব্যবহার করিয়াছি। তবে আমার আসল নাম বিনোদিনীই বটে।

আমি বলিতে গেলে, জন্মদুর্ভাগিনী। আমার শৈশবেই, প্রথমে মাতা এবং বৎসর না ঘুরিতেই আমার পিতা পরলোকগমন করেন। আমার অন্য কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন ছিল না, কেবল এক জ্যেঠামহাশয় ছিলেন, তিনি পুরুলিয়াতে চাকরি করিতেন। তিনিই আসিয়া গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে আমার পিতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করেন। জিনিষপত্র কতক বেচিয়া, কতক বিতরণ করিয়া, পৈতৃক বাটীতে তালা লাগাইয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া পুরুলিয়াতে চলিয়া যান। তখন আমার বয়স চারি বৎসর মাত্র।

জ্যেঠামহাশয়ের একটি পুত্র ছাড়া তিনটি কন্যা ছিল। পরে শুনিলাম, আমাকে পৌঁছিতে দেখিয়া জ্যেঠাইমা নাকি বলিয়াছিলেন, "বেশ হল, এবার গণ্ডা ভর্ত্তি হল।"

আমার জ্যেঠতুতো বোন তিনটির নাম—নীহাববালা, শৈলবালা এবং ননীবালা; শৈল ছিল আমাব সমবয়সী—কিন্তু তথাপি তাহার সহিত আমার তেমন ভাব হয় নাই। আমি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলাম বলিয়া শৈলবালা আমায় হিংসা করিত; জ্যেঠাইমা আমাকে লুকাইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে এটা ওটা খাওয়াইতেন বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম। আর একটু বয়স হইলে যখন আমরা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম, তখন সে আমার চেয়ে ভাল পড়া বলিতে পারিত, ভাল প্রাইজ পাইত বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম; এবং তার চেয়ে আমার বং ফরসা বলিয়া সে আমায় হিংসা করিত।

নীহারদিদি আমাদের চেয়ে দুই বৎসরেব বড় ছিল। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইল। জ্যেঠামহাশয়ের পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহার বেশীর ভাগই এই বিবাহে নিঃশেষিত হইয়া গেল। জ্যেঠাইমা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একটির বিয়েতেই যা কিছু ছিল, সব খরচ করে ফেললে, বাকীগুলি বেকার, তা কিছু ভেবেছ?' জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছিলেন, "উপায় করবার মালিক আমিও নই। তুমিও নও; যে উপায় করনেওয়ালা, সেই উপায় করবে, তুমি দেখে নিও।"

নীহারদিদির ত কিনাবা হইয়া গেল, এবার আমার এবং শৈলর পালা। একযোড়া ভাল পাত্রের সন্ধান করিবার জন্য জ্যেঠামহাশয় নানা স্থানে চিঠি লিখিলেন, দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ অন্বেষণ চলল। কিন্তু একযোড়া ত দূরের কথা, মনের মত অথচ দামে সস্তা একটি

পাত্রও মিলিল না। আমাদের দুই বোনকে তেরো বছরের ধিঙ্গি দেখিয়া, জ্যেঠাইমা সর্ব্বদা ম্রিয়মান হইয়া থাকিতেন এবং এক একদিন জ্যেঠামহাশয়ের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। শচীন আসিল

এই সময় নীহারদিদির শ্বশুর, জ্যেঠামহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ (জামাইবাবুর ছোট ভাই) গত ভাদ্র মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে; কলেজে তাহার পার্সেণ্টেজ গিয়াছে, সে এবার পরীক্ষা দিতে পাইবে না; ডাক্তার বায়ুপরিবর্ত্তন করাইতে উপদেশ দেন; অতএব বৈবাহিক মহাশয়ের যদি অসুবিধা না হয়, তবে শীতের কয়টা মাস শচীন পুরুলিয়াতে থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে।

জ্যেঠাইমার সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যেঠামহাশয় শচীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করিবার জন্য তাঁহারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই; এই উপকারটুকুর বদলে, শচীনের পিতাকে চক্ষুলজ্জার ফেরে ফেলিয়া সস্তায় শচীনকে জামাই করিয়া লইতে চেষ্টা করাই তাঁহাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল। নীহারদিদি অনেক দিন পিত্রালয়ে আসেন নাই; তাঁহাকেও শচীনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। যথাদিনে দেবর সহ নীহারদিদি আসিয়া পৌঁছিলেন।

শচীনের বয়স তখন ১৮/১৯ বৎসর, রংটি বেশ পরিষ্কার মুখ চোখও সুগঠিত—এক কথায় বেশ সুশ্রী যুবা পুরুষ। তবে রোগে ভুগিয়া তাহার দেহকান্তি অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মাসখানেক পুরুলিয়ায় থাকিয়াই শচীন তাহার স্বাস্থ্য, বল, কান্তি আবার ফিরিয়া পাইল। জ্যেঠাইমার সঙ্গে মাঝে মাঝে নীহারদিদির পরামর্শ হইতে লাগিল, শচীনের সহিত শৈলবালার বিবাহটি হইলেই বেশ হয়। শৈল আমার চেয়ে তিন মাসের বড ছিল, সুতরাং প্রথম দাবী তাহারই সন্দেহ নাই; আমার কিন্তু সে কথাটা শুনিতে ভাল লাগিত না। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিতে করিতে আমি মনে মনে বলিতাম—"হে ঠাকুর, শৈলর সঙ্গে যেন শচীনের বিবাহ না হয়।"

প্রার্থনা আশ্চর্য্যভাবে অতি সত্বর সফল হইয়া গেল। এক ভদ্রলোক সপরিবারে পুরুলিয়াতে বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন; শৈলকে দেখিয়া এবং তাহার কোষ্ঠী নিজ পুত্রের কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া শৈলকে তাঁহার এমনই পছন্দ হইয়া গেল যে, একরূপ বিনা পণেই অগ্রহায়ণ মাসেই শৈলকে তিনি নিজ পুত্রবধূ করিয়া লইলেন।

তখন "আমিই শুধু রইনু বাকী।" (ননীবালা ৮ বৎসরের বালিকামাত্র, তাহার কথা ধর্ত্তব্য নহে)। শৈল পুরুলিয়াতে শ্বশুরবাড়ীর বাসায় থাকিতে লাগিল; মাঝে মাঝে অল্পসময়ের জন্য এ বাড়ীতে আসিত। তাহার স্বামী, কলেজ কামাই হইবে বলিয়া বিবাহের এক সপ্তাহ পরেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল।

এখন জ্যেঠাইমা ও নীহারদিদিতে পরামর্শ হইল, "বিনির সঙ্গে শচীনের বিয়েটি হলে বেশ হয়।" যেদিন কথাটি আমি শুনিলাম, সেদিন কানে যেন আমার মধুবর্ষণ হইল।

পরামর্শ, ক্রমে মেয়ে-মহল ছাড়াইয়া, পুরুষ-মহলে পৌঁছিল। পৌষ মাসে, জ্যেঠামহাশয় শচীনের পিতাকে পত্র লিখিয়া আমার সহিত শচীনের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

এই পত্র রওয়ানা হইবার পর হইতে, শৈল আসিয়া শচীনকে আমার বর উল্লেখ করিয়া আমায় "ক্ষেপাইতে" সুরু করিল। দিদির মুখে ঐ রূপ শুনিয়া আট বছরের ননীবালা ছুঁড়িটাও ঐ বলিয়া ক্ষেপাইত। শৈল তবু শচীনের অসাক্ষাতে বলিত; নির্ব্বোধ ননীবালা একদিন তাহার সামনেই বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া শচীন আমার দিকে চাহিয়া, ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম—ছি ছি!

পত্রোত্তর আসিল। শুনিলাম দিদির শ্বশুর লিখিয়াছেন, মেয়েটির রূপগুণের কথা বধূমাতার 'শ্রীমুখাৎ' পূর্ব্বাবধিই তিনি 'শ্রুত' আছেন; পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহার অমত নাই, তবে "নূন্যসংখ্যা" কত টাকা জ্যেঠামহাশয় দিতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কয়েক দিন কর্ত্তা গিন্নীতে পরামর্শ চলিল। অবশেষে জ্যেঠামহাশয় উত্তর দিলেন, (চিঠিখানা রওনা হবার পূর্ব্বে লুকাইয়া আমি দেখিয়াছিলাম)—"বড় মেয়েটিকে যখন আপনার পুত্রবধ করিয়াছিলেন তখনই আমার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তারপর সম্প্রতি আর একটি মেয়ে পার করিয়াছি। তবে, এ বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপা ও উদারতাগুণে, এবার অল্পেই রেহাই পাইয়াছি—তাঁ ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিব—নচেৎ তাহাও আমার উপস্থিত ক্ষমতায় কুলাইত না। জানিবেন এই টাকাও সমস্ত আমার ঘরে নাই, কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে। আশা করি, নিজগুণে"—ইত্যাদি।

আমার ঘাড়ে যে কি ভূত চাপিল, শচীন শচীন করিয়া আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। সুবিধা পাইলেই আড়াল হইতে আমি তাহার পানে চাহিয়া থাকিতাম। আমার এই "চুরি করে চাওয়া" দুই একদিন শৈল আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়া আমায় ঠাট্টাও করিয়াছিল।

আজকালকার নভেলে দেখিতে পাই হিন্দুঘরের "ধেড়েকেষ্ট" মেয়েরা প্রায়ই অমুক "দার" সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া কোর্টশিপ চালাইতেছে; সেই "দাদার সহির কাহারও বা বিবাহ হইতেছে, কাহারও বা ফস্কাইয়া যাইতেছে। আমাদের বাড়ীতে কিন্তু সেরূপ হইতে পাইত না। শৈল, আমি, দুইজনেই 'সামন্ত' মেয়ে, শচীনের সামনে বাহির হইতাম, তাহার সহিত আবশ্যকমত দুই একটি কথা কহিতাম বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। জ্যেঠাইমার সর্ব্বদা সজাগ সাবধানতা ও কড়া শাসনে, শচীনের সহিত আমাদের কিছুমাত্র মেলামেশার অবসর ছিল না। তথাপি শচীন এমনই দুষ্টু যে, সুযোগ পাইলেই অন্যের অলক্ষিতে আমার পানে চাহিয়া হাসিত। একদিন বৈকালে ঘটনাক্রমে তাহার সহিত আমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেদিন শচীন শুধু হাসিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই—আমার গাল টিপিয়া দিয়াছিল। আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম, "ও কি?" শচীন হাসিয়া বলিয়াছিল, "দোষ কি? আমি যে তোব বর।" আমি মনের আহ্লাদ মনেই গোপন করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধভরে সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম।

শচীনকেই আমার স্বামী কল্পনা করিয়া, অবোধ বালিকা আমি কত সুখের স্বপ্নই যে দেখিতাম, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এমন সময় আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। শচীনেব পিতা উত্তর দিলেন, তিন হাজার টাকার কমে কিছুতেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে পারিবেন না। শচীনকেও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে তিনি কড়া হুকুম জারি করিলেন।

পরদিন শচীন তাহার জিনিসপত্র বাঁধিয়া, আমাদের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যাত্রার পূর্ব্বে, একটিবারও তাহার সহিত আমার দৃষ্টি-বিনিময়ের সুযোগ হয় নাই। সে চলিয়া যাওয়ার পর, আমি দ্বিতলের একটি জানালা দিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চেষ্টা কবিলাম, দেখাও হইল। তাহার উৎসুক চক্ষু সেই জানালার মাঝেই আমাকে খুঁজিতেছিল বোধ হয়। তাহার সেই ছলছল চোখ দুটি আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সে দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, আমি বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন নীচে সবাই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত—কেহ আসিয়া এ অবস্থায় যে আমায় দেখিতে পাইবে, এ সম্ভাবনামাত্র আমার মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার পৃষ্ঠদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, শৈল। শৈল আমার অশ্রুমাখা মুখ দেখিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "বাঃ, বেড়ে! এতদূর!

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে!"

—বলিয়া গা দুলাইয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহির হইয়া গেল। কথাটা শৈল বাড়ীতে প্রচারও করিয়া দিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। আমার বিবাহ

মাসখানেক পরে শুনিলাম, পাত্র ঠিক হইয়াছে, সোনাপুরে তাঁহার বাড়ী, নিঃসন্তান, দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স ৪০ বৎসর, গ্রামে ঘি ও ময়দার দোকান আছে, অবস্থা স্বচ্ছল। এক দিন পাত্র আমাকে দেখিতে আসিলেন, দেখিয়া পছন্দও করিলেন। অল্প টাকায় হইবে বলিয়া, জ্যেঠামহাশয় এই পাত্রই স্থির করিয়াছিলেন। ৫ই বৈশাখ আমার শুভ বিবাহ হইয়া গেল; আমি শ্বশুরবাড়ী গেলাম। আমি তখন চৌদ্দ বছরে পড়িয়াছি।

সেখানে গিয়া দেখিলাম, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নাই। বিধবা পিসিশাশুড়ী আছেন, তিনিই ঘরের গৃহিণী।

স্বামীভক্তি, স্বামীপূজা, স্বামীসেবাই নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, এই শিক্ষাই আবাল্য পাইয়া আসিতেছিলাম। একদিন মনে মনেও যে আমি অন্য পুরুষকে কামনা করিয়াছিলাম, সে জন্য লজ্জায় ধিক্কারে মরিয়া যাইতাম। শচীন একদিন আমাকে স্পর্শ কবিয়াছিল, আমাব গাল টিপিয়া দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনের ক্ষোভে আমার ইচ্ছা করিত, এক খণ্ড লোহা পোড়াইয়া বেশ লাল করিয়া, তাহা গালের উপর টিপিয়া ধরিয়া, ঐ স্থানটা অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লই।

স্বামী আমাকে যথেষ্ট স্নেহযত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমাব পোডা মন এমনই অপদার্থ যে, শচীনকে আমি ভুলিতে পারিলাম না। শচীনের চিন্তাও যে আমাব পক্ষে মহাপাপ, তাহা বেশ জানিতাম; কিন্তু মনকে বশে আনিতে পাবিতাম না। এই সময় "চন্দ্রশেখর" পুস্তকখানি আমার হাতে পড়িল। জ্যেঠামহাশয়ের গৃহে থাকিতে আমবা সকল বোনই লেখাপড়া ভাল রকমই শিখিয়াছিলাম; কিন্তু জ্যেঠামহাশয় মেয়েদের উপন্যাস পড়াব বিরোধী ছিলেন বলিয়া, উপন্যাস বেশী পড়িবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাই এতখানি বয়স পর্যন্ত 'চন্দ্রশেখর' আমার অপঠিত ছিল।

বহিখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। কপালদোষে বিবাহের পূর্ব্বেই কোনও মেয়ের যদি অন্য পুরুষের প্রতি মন গিয়া থাকে, তবে বিবাহেব পর তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহা 'চন্দ্রশেখর' পড়িয়া বেশ বুঝিতে পাবিলাম। অধিকাংশ হিন্দু মেয়েই পতিভক্তি বিনাসাধনায় লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমাব মত দুর্ভাগিনী যাহাবা, তাহাদের ঐ বস্তুটি লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনায় রত হইতে হইবে—হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ইহাই চন্দ্রশেখরের উপদেশ বলিয়া বুঝিলাম এবং তদনুসারেই নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিব স্থির করিলাম।

আমি সর্বদা বিষণ্ণ থাকি দেখিয়া স্বামী একদিন বলিলেন, "সমবয়সী সঙ্গী সাথী একটিও নেই, একলা তোমার বড় কষ্ট হয় না?"—শচীনের কথা তখনও তিনি জানিতে পাবেন নাই, পরে জানিয়াছিল।

আমি বলিলাম, "না, কষ্ট আর কি?"

তিনি বলিলেন, "কষ্ট হয় বইকি। তোমার যদি দুই একটি যা কি নন্দ থাকত, তাদের সঙ্গে হাসিতে গল্পেতে দিন কাটাতে পারতে। কিন্তু সে সব কিছুই ত নেই। আচ্ছা একটা কাজ না হয় কর না।"

"কি?"

"বই পড়তে তুমি খুব ভালবাস। একখানি বই পেলে, তুমি খুব আগ্রহের সঙ্গে সেখানি

পড় দেখতে পাই। আমাদের গ্রামে একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। অনেক বাঙ্গলা বই আছে, কত সব মাসিকপত্র আসে,—নূতন বইও প্রায় তারা কিনে আনায়। আমি সেই লাইব্রেরীর মেম্বর হব,—যত তুমি পড়তে পার, তত বই তোমায় এনে দেবো। তা হলে তোমার সময় কাটাবার বেশ একটা উপায় হবে; কি বল?"

আমি উৎসাহের সহিত এ বিষয়ে সম্মতি জানাইলাম।

স্বামী মেম্বর হইলেন এবং লাইব্রেরী হইতে কৃত্রিম সিল্কের চক্‌চকে মলাটযুক্ত নূতন নূতন উপন্যাস-গ্রন্থ আনাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম নিজে তিনি দুই একখানা বহি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভালো লাগে নাই বলিয়া, সে চেষ্টা আর করিতেন না। তিনি ছিলেন "দাতাকর্ণ" যুগের মানুষ। আমি কিন্তু সেগুলি গ্রোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

এইরূপ কিছুদিন চলিতে চলিতে আমার মনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন আসিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এত কাল মা-দিদিমার কাছে পতিভক্তি সম্বন্ধে যে শিক্ষা আমি পাইয়া আসিয়াছি, তাহা নিতান্তই ভুল শিক্ষা। পতির প্রতি যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে একটু আধটু ভক্তি বা সেবা করিলেও ততটা দোষ নাই। কিন্তু যে পতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসি না, তাঁহাকে ভক্তি করা নিজেকে অপমান করা মাত্র। দেখিলাম, আজকালের বড় বড় লেখকগণের মতে, বঙ্কিমবাবু নিতান্তই সেকেলে লেখক। প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই নারীর "নারীত্ব" সফল হয়, তাহার জীবন যৌবন ধন্য হয়, সকল যুবতীরই এই বিষয়ে যত্নবতী থাকা উচিত। নবযুগের নবীন-আলোক-আমদানীকারক এই ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে কাহারও হস্তে যদি 'চন্দ্রশেখর' সংশোধনের ভার থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই গভীর জলে সন্তরণকালে, প্রতাপকে দিয়া শৈবলিনীকে ওরূপ দারুণ শপথ করাইতেন না। তাহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া কোনও নিভৃত কুটীরে স্থাপন করিয়া আর্টের "নগ্নচিত্র" আঁকিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক ও বোধদয়-বিদ্যাবতী যুবতীগণকে মোহিত কবিয়া দিতেন।

সে যাহা হউক, আমিও মূর্খ সেকেলে স্ত্রীলোকদের মত, পতিভক্তিকে জীবনের সার বলিয়া আর গ্রহণ করিলাম না; শচীনের চিন্তাকে আর বিষবৎ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিলাম না; একদিন নিজগালে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবার বাসনা করিয়াছিলাম বলিয়া নিজ মূর্খতায় মনে মনে লজ্জিত হইলাম।

আমি অনেক সময় ভাবিতাম, শচীন বিবাহ করিয়াছে কি না। মনে করিতাম, করিয়া থাকে, করুক—আমার শচীন আমার অন্তরের ধন; আপন অন্তর মধ্যে তাহাকে লুকাইয়া আমি নিত্য তাহার পূজা করিব। কিন্তু এ জীবনে আমার "নারীত্ব" বিফল হইয়া গেল, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

একবার পুরুলিয়ায় গিয়া নীহারদিদিব, দেখা পাইলাম। শুনিলাম, শচীন কলিকাতায় আইন পড়িতেছে; এখনও বিবাহ করে নাই, বিবাহে তাহার মন নাই। ছেলে এম-এ, বি-এল পাশ করিলে পর বিবাহের বাজারে তাহাকে নীলামে তুলিবেন, এই অভিপ্রায়ে পিতাও পীড়াপীড়ি করেন না। পিতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, শচীনের যে বিবাহে কোনও আগ্রহ নাই, ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম, আমি যেমন তাহাকে ভুলিতে পারি নাই, সেও তেমনই আজিও আমাকে ভুলে নাই, মনে বড় আহ্লাদ হইল।

এবার পুরুলিয়ায় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমি মাসখানেক সেখানে থাকিবার পর স্বামী আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে শচীন আমাদের বাড়ীতে থাকিত, তার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, আমি আড়ালে থাকিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া শচীনকে দেখিতাম, এবং বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়া সে চলিয়া যাওয়ার পর আমি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। ননীবালা তাঁহাকে এই খবরগুলি দিয়াছিল—সম্ভবতঃ শৈলরই শিক্ষানুসারে। সেই অবধি স্বামী মাঝে মাঝে শচীন সম্বন্ধে

আমাকে রূঢ় কথা বলিতেন, একটা কুৎসিত সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আচরণে, তাঁহার প্রতি ভক্তি ত আমার ছিলই না—একটু স্নেহমমতা যাহা ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। গঙ্গাস্নান

সে বৎসর আষাঢ় মাসে সূর্য্যগ্রহণের সঙ্গে আরও কি কি সব যোগ একত্র হইয়াছিল; পিসীমা আমার স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "চল বাবা, কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসা যাক।" গঙ্গাহীন দেশে আমাদের বসতি, গঙ্গাস্নানের সুযোগ আমাদের দুর্লভ, সুতরাং স্বামী সম্মত হইলেন।

সমস্ত রাত্রি রেলগাড়ীতে কাটাইয়া, পরদিন বেলা নয়টার সময় আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলাম। বেলা দশটায় গ্রহণ লাগিবে, এক ঘণ্টাকাল স্থিতি। পরামর্শ ছিল, প্রথমে আমরা জগন্নাথ ঘাটে গিয়া গ্রহণেব স্নান সারিয়া, তারপর সোজা কালীঘাটে চলিয়া যাইব। সেখানে এক-টা বাসা ঠিক করিয়া, মাকে দর্শন করিয়া, আহারাদির ব্যবস্থা হইবে। দুই তিনদিন সেই বাসায় থাকিয়া পশুশালা, যাদুঘর, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া দেশে ফিরিব।

শিয়ালদহে ঘোড়াব গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসি নাই; গাড়ীর খড় খড়ির ফাঁক দিয়া কলিকাতার বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যতই আমরা গঙ্গার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, পথে মানুষের ভিড় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গাড়ী আব অগ্রসর হইতে পারিল না—আমাদের নামিতে হইল। স্বামী বলিলেন, "উহা বড়বাজার—গঙ্গার ঘাট আর বেশী দূবে নহে, এইটুকুই পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে।"

গাড়ী বিদায় করিয়া, আমাকে মধ্যে রাখিয়া, স্বামী ও পিসীমা সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রথমটা আমরা তিনজনেই হাত ধরাধরি করিয়া চললাম। কিন্তু ভিড় বাড়িয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। অনেক কষ্টে আমরা পুনরায় একত্র হইলাম। কিন্তু হইলে কি হইবে, খানিক অগ্রসব হইয়া দেখি, রাস্তার মাঝখানে দড়ি খাটাইয়া মেয়ে পুরুষের পথ পৃথক করিয়া দিয়াছে। খাকী কোটের বুকে লাল কাপড়ের ফুল আঁটা কয়েকজন যুবক দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামী আমাদের লইয়া পুরুষগণের রাস্তা দিয়াই অগ্রসর হইবার চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু সেই বাবুরা বলিযা উঠিল—"মা লক্ষ্মীরা এই দিকে—এই দিকে"—এবং বলপূর্ব্বক আমাদের পৃথক করিয়া দিল। পুরুষের সারি পুরুষদিগেব ঘাটে যাইবে, স্ত্রীলোকের সারি স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে যাইবে, এই প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে আমার স্বামী জানিতেন না; এখন জানিয়া তিনি চীৎকার করিয়া আমাদের বলিয়া দিলেন, "চান করে উঠে ঘাটেব চাঁদনীতে তোমরা দাঁড়িয়ে থেক, কোথাও যেও না, এক পা নোড়ো না, ভিড় কমলে আমি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবো।" পিসীমা উচ্চস্বরে উত্তর করিলেন "আচ্ছা।"

প্রথমটা আমি পিসীমাব হাত ধরিয়া ছিলাম—ক্রমে ভিড়ের চাপে হাত ছাড়িয়া গেল। পিসীমা একটু পিছাইয়া পড়িলেন। আমি মাঝে মাঝে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। খানিক পরে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমে ভিড়ের চাপ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন আর আমি চলিতে ছিলাম না, ভিড় আমাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভিড়ের চাপে মাঝে মাঝে পা দুটি আমার রাস্তা ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িতেছে,—সেই অবস্থার কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া পা আবার মাটিতে ঠেকিতেছে। ভাগ্যিস ইহা স্ত্রীলোকের ভীড়—এই ভীড় পুরুষের হইলে কি কেলেঙ্কারীই হইত, ছি ছি!

শুনিয়াছিলাম, ঘাট অধিক দূরে নহে; কিন্তু অনেকক্ষণ চলিলাম, চালিত হইলাম বলিলেই ঠিক হয়। কোথায় যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একটা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রাণটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখিলাম, ঘাটের উপরে চাঁদনী রহিয়াছে; বুঝিলাম স্নানান্তে এইখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া পিসীমার আশায় চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি জলে নামিলাম; অন্য সকলের সঙ্গে আমিও স্নান করিতে লাগিলাম, এবং চারিদিকে চাহিয়া পিসীমাকে খুঁজিতে লাগিলাম। আসিবার সময়, ভিড়ের মধ্যে ২/৩ জন স্ত্রীলোকের সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়াছিল; দেখিয়াছিলাম, খাকী কোটের উপর লাল ফুল পরা যুবকেরা ভিড় সরাইয়া তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া কোথায় লইযা গিয়াছিল। ভাবিলাম, পিসীমারও কি সেইরূপ হইল নাকি? আহা, বুড়ামানুষ, দুর্ব্বল শবীর— হায় হায়, এইরূপ অপঘাত মৃত্যুই কি শেষে তাঁব অদৃষ্টে লেখা ছিল।

যাহা হউক, আমি স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া চাঁদনীতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও হুড় হুড় করিয়া স্নানার্থিনী রমণীরা আসিতেছে। আমি ভিজা কাপড়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া দুরু দুরু ব্যাকুলহৃদয়ে পিসীমাকে খুঁজিতে লাগিলাম।

ক্রমে দেখিলাম, স্নানার্থিনীদিগের প্রবাহ মন্দীভূত হইল, স্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তবে আর পিসীমার আসিবার আশা কি? ভয়ে আমার কান্না পাইতে লাগিল, হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমি সেইখানে শানের উপর বসিয়া পড়িলাম।

বোধ হয় পুরা আধঘণ্টাকাল আমি এই ভাবে সেই চাঁদনীতে বসিয়া রহিলাম। কখনও মুখ ঢাকিয়া কাঁদি কখনও ব্যাকুল নয়নে চাবিদিকে চাহিয়া দেখি। স্বামী যে বলিয়াছিলেন, স্নানান্তে আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবেন, তিনিই বা বিলম্ব করিতেছেন কেন? এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রন্দনে ও অন্বেষণে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা আর আমার হুঁস রহিল না।

আমি মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিলাম, হঠাৎ আমার কানে গেল, "কে গো তুমি বসে কাঁদছ? তুমি কি হারিয়ে গেছ?"

পরিচিত কণ্ঠস্বর—আমি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে হঠাৎ আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পাবিলাম না। যদি ইহা স্বপ্ন না হয়, তবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—শচীন। গায়ে তার খাকী রঙের কোট, বুকে লাল কাপড়ের ফুল সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটা, পায়ে বুট জুতা, ধুতিখানি মালকোঁচা বাঁধা। আমরা উভযে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া আছি, হঠাৎ শচীন বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী?"

তিন বৎসর পরে আবার তাহাকে দেখিলাম। সজল নেত্রযুগল তাহার পানে স্থাপন করিয়া বলিলাম, "শচীন!"

শচীন বলিল, "ব্যাপার কি, শীঘ্র বল। এখানে তুমি কি করে এলে?"

আমি ব্যাপারটা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। সে শুনিয়া বলিল, "কিন্তু, এটা ত জগন্নাথ ঘাট নয়, এ যে বাবুঘাট। বুঝেছি, ভিড়ের মধ্যে পড়ে জগন্নাথঘাট ছাড়িয়ে তুমি এত দূরে চলে এসেছ। তোমার স্বামী তোমায় জগন্নাথঘাটেই খুঁজবেন, এখানে ত আসবেন না!"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলাম, "তা হলে কি হবে শচীন?"

শচীন বলিল, "ভয় কি? আমি একটা ব্যবস্থা করছি। তোমার স্বামীকে খুঁজে দিতে পারি না পারি, দেশে ত তোমায় পৌঁছে দিতে পারবো। তুমি এক কাজ কর। এইখানে একটু ব'সে থাক, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি। খবর্দ্দার এখান থেকে এক পা নোড়ো না, তাহলে আর আমি তোমায় খুঁজে পাব না"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন গাড়ী আনিয়া আমায় বলিল, "এস। গাড়ীতে ওঠ।"

আমি উঠিলে, গাড়োয়ানকে "জগন্নাথঘাট" আদেশ দিয়া শচীন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমি যে দিকে বসিয়াছিলাম, তাহার উল্টা দিকে সে বসিল।

গাড়ী জগন্নাথঘাটেব উপর আসিযা দাঁড়াইল। শচীন নামিয়া, গাড়ীব নম্বর তাহার পকেটবুকে টুকিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "তুম হিঁয়া খাড়া রহো। হাম আভি আতা হ্যায়।"—বলিযা সে ঘাটেব দিকে নামিল।

প্রায দশ মিনিট পবে শচীন ফিরিযা আসিয়া বলিল, "আমি ঘাটে গিয়া মশাই, কার পরিবাব হাবিয়েছে—কাব পরিবার হারিয়েছে—বলে কত চীৎকার করলাম, কই, কেউ ত কোন উত্তব দিলে না। তোমার স্বামী এখানে নেই। বোধ হয়, তোমায় খুঁজে না পেয়ে তিনি চলে গিয়ে থাকবেন।"

কি বলিব, কি কবিব, আমি কিছুই বুঝিতে পাবিলাম না। আমার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। আমি মাথাটি হেঁট কবিয়া নীববে বসিয়া বহিলাম।

শচীন বাস্তায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহাব পর গাড়ীর খড়খড়িগুলো একে একে সব উঠাইযা দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো বউবাজাব।" বলিয়া সে উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।। বন্ধুর আশ্রয়ে

আমি যে দিকটায বসিযাছিলাম, শচীন এবাবও তাহাব বিপবীত দিকেই বসিল। বসিয়া বলিল, "বিনি, তুই বড হযেছিস। আমি প্রথমটা তোকে দেখে চিনতেই পারিনি বে।"—পুকলিযাতে ইদানীং শচীন আমাকে ও শৈলকে তুই বলিয়াই কথা কহিত।

উত্তব কবিলাম, "চিবকালই কি ছোট থাকবো?"

শচীন বলিল, "তোব বিযেব খবব আমি বউদিদিব কাছেই শুনেছিলাম। ছেলেপিলে হযেছে?"

"না।"

"কেন?"

এই "কেন'ব আমি কি উত্তব দিব, কিছুই স্থিব কবিতে পাবিলাম না, নীববে অবনত মুখে বসিযা বহিলাম।

খড়খড়িগুলাব কোন কোনও পাখী ভাঙ্গা ছিল, তাই সেগুলি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতবে কিছু আলো ছিল। আমি একবাব মুখ তুলিযা দেখিলাম, শচীন আমাব পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিযা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'গাড়ী কোথায যাচ্ছে?"

"আমাব বাসায।"

"তোমাব ত মেসেব বাসা। সেখানে পাঁচজন পুরুষমানুষেব মধ্যে আমায় রাখবে কোথায়?"

শচীন বলিল, "না বে, সেখানে কি তোকে বাখবো? আমাব জিনিষপত্র কতক নেবাব জন্য যাচ্ছি। তাব পব আব এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তোকে খাওয়াব-দাওয়াব, তাব পব দুজনে পবামর্শ কবে যা কবতে হয় কবা যাবে।"

ভাবিলাম, শচীন আমায় কোথায় লইয়া চলিল? ভযে আমার বুকের ভিতরটা গুরুগুরু কবিতে লাগিল।

শচীন খড়খড়িব ফাঁক দিযা বাস্তাব পানে চাহিয়া ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হাঁকিল, "এই কোচম্যান, ঐ সামনের বাড়ী বাখো।"

গাড়ী দাঁড়াইল। শচীন বলিল, "তুমি চুপটি কবে গাড়ীব মধ্যে বসে থাক। আমি উপরে গিয়ে আমার বাক্স আর বিছানাটা নিয়ে আসি।"

গাড়ীর দরজা খুলিয়া শচীন নামিয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। খড়খড়ির ফাঁকে দেখিলাম, একজন চাকর একটা মাঝারি আকারের বাক্স ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছে। বাক্সটা সে গাড়ীর ছাদে তুলিয়া দিল। শচীন তাহাকে বলিল, 'বিছানা আউর সোরাইঠো লে আও জলদি।'' চাকর চলিয়া গেলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ''আর কাঁহা জানে হোগা বাবু?'' শচীন বলিল, ''শেয়ালদা ষ্টেশনকে পাশ।'' চাকর ফিরিয়া আসিলে বিছানার বাণ্ডিলটা ছাদে দিয়া, সোরাই হাতে করিয়া শচীন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

শচীন বলিল, ''শেয়ালদা ষ্টেশনের কাছে যাত্রিনিবাস বলে একটা বাঙ্গালী হোটেল আছে। কেউ পরিবার নিয়ে এলে তাদের থাকবারও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। তোমার স্বামীকে খোঁজবার জন্যে ২/১ দিন যে কলকাতায় থাকতে হবে, সেইখানেই তোমায় রেখে দেবো। আর কোনও স্থান নেই। সেখানকার কোনও ঝি-টি তোমায় যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি আমাকে স্বামী বলেই পরিচয় দিও। নইলে, তারা অজ্ঞ লোক, অকারণ একটা মন্দ কিছু ভাবতে পারে। বুঝেছ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, শচীনের মতলবটা কি। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?''

শচীন বলিল, ''সকালে এক পেয়ালা চা আর একটু মোহনভোগ খেয়ে ভলান্টিয়ারি করতে বেরিয়েছিলাম। তুমিও তো খাওনি, তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়?'

আমি বললাম, 'মেয়েমানুষের আর ক্ষিদে।''

শচীন বলিল ''নাঃ তারা ত আর মানুষ নয়।''

আমি বলিলাম, ''ক্ষিদে-তেষ্টা তাদের দমন করতে শিখতে হয়।''

শচীন বলিল, 'বিনি, তুই এই নবযুগের নূতন আলোর দিনে বললি, মেয়েমানুষকে ক্ষিদে তেষ্টা দমন করতে শিখতে হবে' কেন তারা দমন করবে? কি অপরাধে শুনি? ও সব মতটত মহাভুল—অত্যন্ত সেকেলে নারী-সমস্যার ত এখন মীমাংসাই হয়ে গেছে। দেহধর্মের বা মনোধর্মের কোনও ক্ষুধা দমন করার চেষ্টাই মহামূর্খতা তার তৃপ্তিসাধনই পুরুষের যথার্থ পুরুষত্ব, নারীর আদর্শ নারীত্ব।''

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তুমি কি বই লেখ নাকি?''

''কেন?''

''বইয়ে এই রকম কথা দেখতে পাই।'

শচীন বলিল, ''লিখি না, পড়ি। আজকাল কত সব ভাল বই বেরুচ্ছে, সে সব তুই পড়েছিস? হ্যাঁ—তুই যখন পুরুলিয়াতে ছিলি,—তখনই ত তোরা কোনে বেশ লেখাপড়া করতিস দেখেছি।'' বলিয়া কয়েকখানা পুস্তকের নাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই সব বই তুই পড়েছিস?''

আমি বলিলাম, ''পড়েছি। দু'বার তিনবার করে পড়েছি।''—বহিগুলির নাম আজ সাত বৎসর পরে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, যদিও তখন সেগুলি সাহিত্যাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, নবযুগের বিজয়স্তম্ভ, মনস্তত্ত্বের মনুমেন্ট বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, লেখকগণ ''অমর'' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির নাম এখন শুনা যায় না। এমন কি, গুরুদাসবাবুদের ক্যাটলগে অথবা চৈতন্য লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকাতেও দেখিতে পাই না।

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, ''আচ্ছা নারীর অধিকার সম্বন্ধে তোর মত কি বল। আমাদের সেই মা-দিদিমাদের, বঙ্কিমবাবু টাবুদের মতই ঠিক, না আজকাল এই এঁদের মতই ঠিক?''

আমি বলিলাম, ''আজকালকার মতই ত আমার ঠিক বলে মনে হয়।''

শচীন পুলকিত হইয়া বলিল, ''বেশ বেশ। শুনে সত্যি বড় সুখী হলাম, বিনি'—বলিয়া সে আমার স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া দিল। আজ এই প্রথম সে আমায় স্পর্শ করিল।

ক্রমে গাড়ী যাত্রীনিবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন আমাকে গাড়ীতে রাখিয়া, ঘর ঠিক করিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে হোটেলের একজন ভৃত্য সহ ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য গাড়ীর ছাদ হইতে বাক্স-বিছানা নামাইল। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া শচীন আমাকে নামাইয়া লইল। আমি ঘোমটা দিয়া, তাহার স্ত্রী সাজিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তেতলায় উঠিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, যাহা সাজিয়াছি, সত্যই যদি আমি তাহা হইতাম, তবে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর কে থাকিত?

উপর-ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘোমটা তুলিলাম। দেখিলাম, ঘরখানি মাঝারি আকারের; একধারে একখানি কেওড়া-কাঠের তক্তপোষ, অপর দিকে একটি ছোট গোল টেবিল, একখানি চেয়ার, দেওয়ালে একটি আরসি টাঙ্গানো। রাস্তার ধারে চিক-ফেলা ছোট বারান্দাটি এই ঘরখানিই নিজস্ব; অন্য কোনও ঘরের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।

চাকর বিছানা-বাক্স নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু খাবার-টাবার কিছু আনতে হবে কি?"

শচীন বলিল, "আনতে হবে বইকি। তোদের ম্যানেজারবাবু ত বললে, এত বেলায় ভাত কোথা পাব। এই টাকা নে।"—বলিয়া কি কি আনিতে হইবে, শচীন তাহা বলিয়া দিল।

চাকর টাকা লইয়া চলিয়া গেল। একজন মধ্যবয়স্কা, কপালে উল্কিপবা ঝি আসিয়া বলিল, "বউমা, চানটান করবে কি?"

আমি বললাম, 'না, এই তো আমরা গঙ্গাস্নান করে আসছি।"

ঝি বলিল, "কত দিন তোমাদের থাকা হবে?"

শচীন বলিল, "দুই এক দিন। কাল কি পরশু আমরা দেশে ফিবে যাব। এই সোবাইটেতে জল ভরে এনে দাও ত ঝি।"

ঝি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ বউমা, খাবাবটাবার দবকাব হলে আমাকেই ববং আনতে দিও। খোট্টা বেটারা আমাদের বাঙ্গালী-পছন্দ খাবাব কি আনতে জানে?"—বলিয়া সোরাই লইয়া চলিয়া গেল।

শচীন জামা ছাড়িয়া বিছানার বাণ্ডিলের দড়ি খুলিতেছিল; বলিল, "দেখ, আমি স্নান করবো। যদিও সকালবেলা বাসা থেকে স্নান কবে বেরিয়েছিলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে ভলন্টিয়ারি করে ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। তুমি আমাব কোটটা আর গেঞ্জিটা ঐ বারান্দায় টাঙ্গিয়ে দাও। আর এই চাবি নাও, বাক্স থেকে আমাব ধুতি, তোয়ালে, সাবান বের কবে দাও।"

বাক্স খুলিয়া জিনিষগুলি বাহিব কবিয়া দিলাম, শচীন স্নানার্থে গমন কবিল। আমি নিজ বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, আধময়লা একখানি মিলের সাড়ী পরিয়া সমস্ত বাত্রি রেলে আসছিলাম, তাহাই পরিয়া গঙ্গাস্নান কবিয়া গায়েই শুকাইয়াছি, এবকম পেতনীব মত বেশে শচীনের সামনে থাকিতে আমার লজ্জা করিতেছিল। তাই আমি তার বাক্স হইতে একখানি ধোয়া কালোপেড়ে ধুতি বাহির করিয়া পাবিলাম; সোরাইয়ের জলে মুখটা, হাত দু'খানা ধুইয়া ফেলিলাম; শচীনের চিরুণী-বুরুষ লইয়া, দেওয়ালে টাঙ্গানো সেই আরসির সামনে দাঁড়াইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া, শচীনেব জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শচীন ভিজা তোয়ালে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, হাসিভরা চোখে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "বাঃ ধুতি পরে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে! ও ধুতির আজ জন্ম সার্থক হল!"—তাহার কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলাম।

চাকর খাবার আনিল। ঝি আসন, থালা প্রভৃতি দিয়া গিয়াছিল। শচীনকে খাবার দিলাম। আহারান্তে তক্তপোষের উপর বসিয়া পাণ ও সিগারেট সেবন করিতে বসিল।

তাহার পাতে আমি খাইতে বসিলাম। আমার খাওয়া হইলে, শচীন বলিল, "এইবার আমি বেরুই, তুমি দোর বন্ধ কর শুয়ে একটু ঘুমোও।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথা যাবে?"

"থানায় থানায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, তোমার স্বামী কোনওখানে ডায়েরি করিয়েছেন কিনা। যদি করিয়ে থাকেন তবে তাঁর ঠিকানাও পাব। কিংবা পুলিশকে জানিয়ে আসতে পারবো, তুমি অমুক ঠিকানায় আছ।"

আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি এখানে একলা থাকবো?"

"দিনের বেলা, ভয় কিসের?"—বলিয়া শচীন বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।। বুকের হার

আমি ঘুমাইলাম। কাল সারারাত্রি জাগরণ, আজ ভিড়ে কষ্টের পর, শরীর আমার অবশ হইয়া গিয়াছিল—খুব ঘুমাইলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম, বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া, শচীনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা হইল, ঝি আসিয়া ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল। প্রায় ৮টার সময় শচীন ফিরিল। বলিল, কোনও থানায় কেহ আমার সম্বন্ধে কোনও ডায়েরি করায় নাই। অবশেষে সে কালীঘাটে গিয়াছিল; প্রত্যেকটি যাত্রীবাসা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিয়াছে, কোথাও আমার স্বামীর সন্ধান পায় নাই।

চাকরকে ডাকিয়া শচীন দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া শচীন বলিল, "এখন উপায়? তোমায় কি তোমার স্বামীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে আসবো?" আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, "যদি বল, আমাদের বাড়ীতে নীহারবউদির কাছেও তোমায় রেখে আসতে পারি।"

তথাপি আমি চুপ করিয়া আছি দেখিয়া শচীন বলিল, "কি ভাবছ তুমি?"

"আমি ভাবছি, তুমি আমায় স্বামীর বাড়ীতেই রেখে এস, আর নীহারদির কাছেই রেখে এস, তুমি আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ, একদিন এক রাত তোমার সঙ্গেই আমি ছিলাম, এ কথা শুনলে আমার স্বামী কি ভাববেন?"

চা আসিল। শচীন এক পাত্র লইল অন্য পাত্র আমায় দিতে চাহিল। আমি চা খাই না শুনিয়া সে নিজেই উভয় পাত্র গ্রহণ করিয়া বলিল, "এতে আর দোষটা কি? একজন ভদ্রলোক যদি এ রকম অসহায় অবস্থায় কোনও বিপন্না স্ত্রীলোককে পায়, সে কি তাকে তার বাড়ী পৌঁছে দেবে না?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি যে!"

"কেন, আমি কি দোষ করেছি?"

"তুমি না কর, আমি যে করেছিলাম। আর, সে কথা যে আমার স্বামীর কানে উঠেছে।"

শচীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল. "কি কথা?"

আমার ভারি লজ্জা করিতেছিল, তথাপি কোনও মতে আমি বলিলাম, "বিয়ের পর, আমার স্বামী একবার পুরুলিয়াতে এসেছিলেন। ননীবালা তখন ন বছরের। আমার স্বামী রঙ্গ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোর বিনোদদিদি আমাকে কি রকম ভালবাসে বল দেখি।' ননী বলেছিল, 'না তোমাকে ভালবাসে না, শচীনদাকে ভালবাসে।' স্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শচীনদা কে?' ননী বলেছিল, "সে আমাদের বাড়ী থাকতো। তার সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ে হবার কথা হয়েছিল কিনা। দিদি লুকিয়ে তাকে দেখত, দু'জনে হাসাহাসি করত, তারপর যখন বিয়ে ভেঙে গেল, সে চলে গেল, দিদি সেদিন কেঁদে একবারে কুরুক্ষেত্র করেছিল। তার পরেই ত তোমার সঙ্গে দিদির বিয়ে হল কিনা!"

শচীন বলিল, "আচ্ছা দুষ্টু মেয়ে ত! তা এ রকম সব কথা সে বানিয়ে বললে কেন?"

"বানিয়ে বলবে কেন?"

"তবে কি সত্যিই তুমি—"

"সত্যিই আমি"—বলিয়া মুখ নত করিলাম; বোধ হয় আমার গাল দুটিও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তা হলে আমিও বলি। সেই পুরুলিয়াতে, যখন আমি সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে দিন দিন সুস্থ সবল হয়ে উঠছিলাম, তোমায় যে আমি কি চোখে দেখেছিলাম, তা বলতে পারিনে, বাবা যখন চিঠি লিখলেন যে, তিন হাজার টাকার কমে তিনি কিছুতেই আমার বিয়ে দেবেন না, আমায় চলে আসতে হুকুম দিলেন, তখন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তোমার আশা জন্মের মত ছেড়ে, আমিও চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সেখান থেকে চলে এসেছিলাম। এত দিনেও কি আমি তোমায় ভুলতে পেরেছি? এ তিন বছরের মধ্যে বোধ হয় এমন একটি দিন যায়নি যেদিন তোমার কথা আমার মনে পড়েনি।

শচীনের মুখে এই কথা শুনিয়া পুলকে আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর আশা আমি একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিলাম। একেই ত শচীন সম্বন্ধে আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ। শচীন যদি তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়, অথবা সঙ্গে করিয়া আমায় দেশে রাখিয়া আসে, তথাপি তিনি যে আমায় আর গ্রহণ করিবেন, এ সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে আর মিছা কেন সে চেষ্টা। বিশেষ, সেই স্বামী! কেন? মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, নিজেকে তাঁহারই পায়ে বলি দিতে হইবে নাকি? নারী-সমস্যার ত মীমাংসাই হইয়া গিয়াছে; "নারীর অধিকার" সম্বন্ধে এখন ত আর কোনও সন্দেহই নাই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, শচীন আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবা আমার বিয়ে দেবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোমায় ভুলতে পারিনি বলেই আমি বিয়ে করতে রাজি হইনি। কিন্তু তুমি ত বেশ মনের সুখে স্বামীর ঘর করছিলে!"

আমি বলিলাম, "তা তুমি বলবে বইকি!"

শচীন ভারি গলায় বলিল, "বলবো না কেন? তবে কি, তুমিও কি আমায় ভুলতে পারনি, বিনোদ?"

ইচ্ছা হইল বলি, "ভোলা কি যায় প্রিয়তম?"—কিন্তু লজ্জায় শেষ শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। চোখের জল চোখে চাপিয়া মাথাটি হেঁট করিয়া বলিলাম, "ভোলা কি যায়? পতিভক্তি পতিসেবা করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি, পারিনি। বিজয়ার রাতে যখন তাঁকে প্রণাম করেছি, মনে হয়েছে, যেন তোমায় প্রণাম করছি। তিনি যদি কখনও আমায় আদর করেছেন, তখন চোখে বুজে কল্পনা করেছি, যেন তুমিই আদর করছ।"

শচীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখেও বোধ হয় জল আসিতেছিল, ল্যাম্পের আলোকে সে দুটি চক্‌চকে দেখাইল।

ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ভাত আনবে কি? রান্না-বান্না হয়ে গেছে।"

রাত্রি প্রায় তখন ৯টা। শচীন ভাত আনিতে বলিল। ঝি ঠাকুরকে বলিয়া, আবার ফিরিয়া আসিল, ঠাঁই করিয়া আসন বিছাইয়া দিল। ক্ষণকাল পরে ঠাকুর অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দুই থালা ভাত আনিয়া ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে শচীন বলিল, "তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, আমি তবে এখন বাসায় যাই। তুমি খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেক। কাল সকালে আবার আমি আসবো; কি করা উচিত দু'জনে পরামর্শ করা যাবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার বিছানা ত এখানে। সেখানে গিয়ে তুমি শোবে কিসে?"

শচীন বলিল, "সেখানে আর একটা তোষক, বালিস আমার আছে।"

আমি বলিলাম, "তা যেন আছে। কিন্তু আমি কি এখানে একলা থাকতে পারি? আমার ভয় করবে না বুঝি?"

শচীন বলিল, "তোমার ভয় করবে?"

আমি অভিমানের স্বরে বলিলাম, 'না, করবে না। আচ্ছা, তুমি যাও না, কাল এসে দেখবে, চোরে আমার গলা টিপে মেরে রেখে গেছে।"—বলিয়া আমি চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইতে লাগিলাম। ইহা আমার অভিনয় নহে—এই অপরিচিত নির্ব্বান্ধব স্থানে রাত্রিতে একা থাকিতে হইবে শুনিয়া সত্যিই ভয়ে আমার শরীর কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

আমাকে কাঁদতে দেখিয়া শচীন বলিল, "ছিঃ কেঁদ না, চুপ কর।'—বলিয়া চক্ষু হইতে আমার হস্ত অপসারিত করিয়া লইল।

আমি চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আমি ত জন্মের মতই গেছি। বাপ নেই, মা নেই, স্বামীর ঘরে আমার জায়গা নেই। এখন তুমি যদি আমায় ত্যাগ করে যাও, তা হলে আমার দশা কি হবে?"

শচীন আমার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া, আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তোমায় আমি ত্যাগ করবো? কখনই নয়। আজ তিন বৎসর তোমার নাম জপ করে কাটিয়েছি। দেবতা যদি সদয় হয়ে তোমায় মিলিয়ে দিলেন, তোমায় আমি ত্যাগ করবো? নিশ্চয়ই না! তোমাকে আমি বুকের হার করে রেখে দেবো।"

শেষের দিকের কথাগুলো বলিবার সময় শচীনের গলা ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি বুঝিলাম, বিধাতা সদয় হইয়া এত দিনে আমার "নারীত্ব" সফল করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।। শচীনের মৃত্যু

তাহার পর তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন—সেই সর্ব্বনাশের দিন—সোমবার, ২২শে বৈশাখ। তিনটি বৎসর মাত্র শচীনকে পাইয়াছিলাম, সুখের মুখ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে সুখে আমার বাজ পড়িল।

একদিন তুমি বলিয়াছিলে, আমায় তোমার বুকের হার করিয়া রাখিবে—রাখিয়াছিলেও তাই-তবে আজ তোমার সেই কত সাধের কত যত্নের বুকের হারকে, পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়া কোথায় চলিলে, প্রাণাধিক?

আর কি লিখিব? কিছুতেই কিছু হইল না। ভোর রাত্রে, আমার জগৎ আঁধার করিয়া, আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া শচীন চক্ষু বুজিল। আমি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম। সে চীৎকার শুনিতে পাইয়া নবীনবাবুর স্ত্রী কমলাদিদি, কেদারবাবুর স্ত্রী নিরুপমা ছুটিয়া আসিয়া আমায় তুলিয়া জড়াইয়া ধরিল।

সারাটা দিন যে কি করিলাম, কি হইল, সে সকল আমি ভাল করে স্মরণ করিতে পারি না। দাহকার্য্য সমাধা হইবার পর নিমতলার ঘাটে আমায় স্নান করাইয়া কমলাদিদি আমার হাতের কাচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া সিঁথির সিন্দুরের দাগ গঙ্গামৃত্তিকা ঘষিয়া ধুইয়া দিয়া, ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া, আমায় সাদা থান পরাইয়াছিল, তাহা বেশ স্মরণ আছে। তাহার পর গাড়ী করিয়া আমায় বাড়ী আনিয়াছিল এবং পীড়াপীড়ি করিয়া সন্ধ্যাবেলা আমায় একটু গরম দুধ খাওয়াইয়াছিল, তাহাও আমার মনে আছে।

দুই তিন দিন পরে কমলাদিদি বলিল, "যা অদৃষ্টে ছিল, তা তো হয়ে গেল। তোমাব শ্বশুরকেই না হয় একখানা চিঠি লেখ। এ বিপদ শুনলে কি এখনও তাঁর মনে দয়া হবে না?"

শিয়ালদহ যাত্রিনিবাস হইতে যখন এই চোরবাগানের বাড়ীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া আমরা আসিয়া স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাস করিতে লাগিলাম, তখন সে বাড়ীর অন্য ভাড়াটিয়া গৃহস্থদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বাপ-মার অমতে আমার স্বামী আমাকে বিবাহ করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন, তখন তিনি চাকরি যোগাড় করিয়া এখানে কলেজে পড়িতে থাকেন, বিবাহের পর এ কয় বৎসর আমি আমার বিধবা মা'র

কাছে থাকিতাম; স্বামী মাঝে মাঝে গিয়া আমায় দেখিয়া আসিতেন। সম্প্রতি মার মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ায় তিনি আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। আমার এই কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মত হইয়াছিল। তখন অবশ্য শচীনের পিতা কিছুই জানিতে পারেন নাই; পরে জানিয়াছিলেন এবং জানিয়া শচীনকে সত্যই তিনি ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

কমলার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "তাই না হয় লিখি তাঁকে চিঠি।"

কমলা বলিল, "তোমার স্বামী টাকাকড়ি কি রেখে গেছেন, বল দেখি?"

আমি বলিলাম, "কি আব রেখে যাবেন, দিদি? নতুন উকীল এই ত এক বছর মাত্র পাশ করে ছোট আদালতে বেরুচ্ছিলেন। যা আনছিলেন, তাতে ভাত-কাপড় ঘরভাড়া কুলোতো না, তাই সন্ধ্যেবেলা প্রাইভেট টিউসনি করতেন। আমার গায়ে ২/৫ খানি যা গহনা ছিল, তাও তাঁর অসুখের সময় বিক্রী করে ডাক্তার দেখাতে হল। সবই ত জান দিদি!"

কিন্তু কাহাকেও আমি পত্র লিখিলাম না, কোন্ মুখে লিখিব? কি করিয়া নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইব, ইহাই আমি দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম। অবশেষে স্থিব কবিলাম, কোনও ভদ্রপবিবাবে ঝি-গিরি করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটাইযা দিব।

যে নাপিতানী আমাদের কামাইতে আসিত, তাহাবই সাহায্যে আমি একটি চাকরির যোগাড় করিলাম। জিনিসপত্র যাহা ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া ঘরভাড়া মিটাইযা দিয়া, সেই নাপিতানীর সহিত আমি গিয়া ঝি-গিবি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। অদৃষ্টে শেষে এও ছিল!

গৃহস্বামী প্রৌঢ়বযস্ক ভদ্রলোক, তাঁহাব কয়লার আড়ত ছিল। বড় ছেলে মণিমোহনকে তিনি একটি স্বতন্ত্র কারবাব করিয়া দিয়াছিলেন। সে-ও দুই পয়সা আনিত। গৃহে তাহাব স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান ছিল। তাহার আর দুইটি ভাই ছিল, তাহারা তখন নাবালক। সাংসাবিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। গৃহিণী আমায় বেশ যত্ন করিতেন; কিন্তু বউবুড়ি আমাকে দেখিতে পারিত না। সর্ব্বদা আমাব কাজে দোষ ধরিত এবং কড়া কথা শুনাইয়া দিত। তাহাব কারণ বোধ হয়, অন্য সকলে আমায় ঝি বলিয়া ডাকিলেও তাহার স্বামী মণিবাবু আমায় নাম ধবিয়া ডাকিতেন। একদিন আমি আড়ালে থাকিয়া শুনিলাম, গৃহিণী তাঁহার ছেলেকে তিরস্কার করিতেছেন। মণিবাবু বলিলেন, "আহা, ভদ্রলোকের মেয়ে, একদিন একজন উকীলেব পরিবার ছিল, অবস্থাগতিকে এসে ঝি-গিরি করছে, ওকে ঝি ঝি বলে ডাকাটা উচিত নয় মা?" আমার প্রতি মণিবাবুর এই অনুকম্পায়, তাঁহাব প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনটি ভবিয়া উঠিল।

কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতেই মণিবাবুর এই অনুকম্পা ভিন্ন আকার ধারণ করিল। এক দিন, অন্যের অসাক্ষাতে তিনি আমার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।। আবার ভাগ্য পরিবর্ত্তন

আর এক বৎসর কাটিয়াছে। এ এক বৎসর আমি কলিকাতার যে পল্লীতে বাস করিয়াছি তাহার আর নামোল্লেখ করিব না। "পিতৃ আদেশে কারবাব সম্পর্কে এক সপ্তাহের জন্য বোম্বাই যাইতেছি" বলিয়া সেই যে মণি চলিয়া গেল, আর ত আসিল না! যখন দেখিলাম, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সে আর আসে না, তখন সংবাদ জানিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইলাম। দুই তিনদিন পরে চব আসিয়া জানাইল, বোম্বাই যাইবার কথা ডাহা মিথ্যা, মণিবাবু কোথাও যান নাই, বরাবব কলিকাতাতেই আছেন, তাঁহাব একজন নূতন জুটিয়াছে। আমি তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, সে আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম; তাহার বিরহে নহে, কারণ, তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাটুকু এবং প্রথম প্রথম তাহার প্রতি যে আকর্ষণটুকু জন্মিয়াছিল, এখানে আসিয়া, এই এক বৎসর তাহার ব্যবহারে দিনে দিনে আমার মন হইতে সে সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি কাঁদিতেছিলাম, আমি কি ছিলাম, কি হইলাম ভাবিয়া—আমার উপায় এখন কি হইবে ভাবিয়া।

বাড়ীউলি এবং এই গৃহের অন্যান্য ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকগণ আমার কাছে আসিয়া সর্ব্বদা আমায় সান্ত্বনা দিত এবং উপায় নির্দ্দেশ করিত।

ক্রমে আমার টাকা ফুরাইল। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তখন বাধ্য হইয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট উপায়ই আমাকে অবলম্বন করিতে হইল।

নানারূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, আমার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিছুকাল বা দিনের পর দিন কালিয়া পোলাও মাছের মুড়া চলে; সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া বারাণসী শাড়ীর বাহার দিই; আবার কিছুকাল বা সমস্ত বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করি; দুই পয়সার কুচা চিংড়ি আনাইয়া "বাটিচচ্চড়ি" করিয়া ভাত খাই। ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরিয়া যায়। গহণাপত্র খালাস করিয়া আমি আবার কালিয়া পোলাও মাছের মুড়া, বক্সে বসিয়া থিয়েটার দেখা আরম্ভ হয়। এইরূপে জীবনের আরও সাতটি বছর কাটিয়া গেল। কিন্তু সুখে কাটিল কি?

জীবনের শেষে সাতটি বৎসর কি দুঃখেই যে আমার কাটিল, তাহা সেই সর্ব্বলোকসাক্ষী ব্যতীত আর কে জানিবে? শেষে বইকি, কারণ ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, আমার এই রোগ শিবের অসাধ্য—তিন মাসের মধ্যেই আমার ইহলোকের সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। ইহলোকের যন্ত্রণা ত শেষ হইবে,—কিন্তু পরলোক? পরলোক আছে কিনা কে জানে? যদি থাকে? তবে সেখানে আমার কি দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, দেহের স্বল্পাবশিষ্ট রক্তও যেন জল হইয়া যায়।

এদিকে তিন বৎসর আমি অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাই নাই—বরং সাধারণ গৃহস্থবধূর অপেক্ষা সে বিষয়ে প্রাচুর্য্যই ভোগ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব নহি। কিন্তু মনের সুখ? গহনা গায়ে দিয়া আড়ংধোলাই জরিপাড় শাড়ি ব্লাউজ পরিয়া থাকিয়াও, মনে সর্ব্বদা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ডাক্তারবাবু বলেন, শুধু শারীরিক অত্যাচার নহে, ঐ মানসিক অশান্তিও আমার এই ক্ষয়রোগের একটা প্রধান কারণ।

দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রহণে যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলাম, তখন হারাইয়া না গিয়া গঙ্গায় যদি ডুবিয়া যাইতাম তাহা হইলে উঃ—কি সৌভাগ্যই আমার হইত। ডুবিলাম না— "নারীর অধিকার"—অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার অধিকার—লাভ করিলাম

কলিকাতায় প্রথম তিন বৎসর, শচীনের স্ত্রী সাজিয়া যে তিন বৎসর যাপন করিয়াছি সেই সময়টা আমার সুখেই কাটিয়াছিল সত্য। কিন্তু সে-ও অনাবিল সুখ নহে। আধুনিক মতানুযায়ী, আমি আমার "নারীত্ব সফল" করিতেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি সর্ব্বদা বহিয়া যাইত, তাহার হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতাম না। আমাদেরই মত গরীব যে কয়টি গৃহস্থপরিবার সে বাড়ীতে ঘরভাড়া লইয়া বাস করিত. তাহাদের নিকট আমাদের যে কাল্পনিক পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিল—অবিশ্বাসের কোনও কারণই বর্ত্তমান ছিল না। তথাপি আমার মনে হইত, হায়, ইহারা যাহা, আমি ত তাহা নহি!

যাক্, সে সকল কথার অনুশোচনায় আর ফল কি? এখন আমার এই দুঃখময় লজ্জাময় জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করিয়া ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর ইহা যেন তিনি জনসমাজে প্রচারিত করিবার জন্য যত্ন করেন। "নবযুগের নূতন আলোক" বলিয়া যাহা এখন কথিত হইতেছে, তাহা যে "আলোক" নহে—তাহা যে আগুন, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই আমার সেই আগুনে পুড়িয়া মরিবার ইতিহাস আমি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি; ইহা পাঠ করিয়া যদি বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের একটি মেয়েও ভুলপথে পা দিতে দিতে, পা উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসে, তবে পরলোকে আমার আত্মা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবে।

[আশ্বিন, ১৩৩০]

শাহ্জাদা ও ফকিরকন্যার প্রণয়-কাহিনী

॥ ১ ॥

পারস্যদেশে প্রাচীনকালে এক মহা প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাদশাহের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে বাদশাহ নিজ ভ্রাতাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন—"ভ্রাতঃ, আমি ত চলিলাম। আমার পুত্রটি অতি শিশু। যতদিন পর্য্যন্ত সে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার স্থানে তুমিই রাজ্য শাসন কর। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের মুখ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, এইরূপ দয়া-ধর্ম্ম সহকারে প্রজাপালন করিতে থাক। আর আমার পুত্রটি শাস্ত্রপাঠ, অস্ত্রশিক্ষা, ব্যায়ামাদি বিষয় প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত বিদ্যায় যাহাতে পারদর্শী হইতে পারে, তাহার জন্যও তুমি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। পুত্র বয়প্রাপ্ত হইলে, নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, উহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিবে।"—ইত্যাদি প্রকার কহিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বর ও মোহম্মদের পদে মন সমর্পণ করিয়া, তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট ভাই বাদশাহ্ হইলেন, শাহজাদা যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। নূতন বাদশাহ পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুবরাজের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু বাদশাহ হুকুম করিলেন—"যুবরাজ সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিবেন, বাহিরে আসিতে পাইবেন না।"

শাহজাদা দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বিচক্ষণ মৌলবীগণের যত্নে নানা শাস্ত্রে ও নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবনাবস্থা উপনীত হইল। তখন তিনি মাঝে মাঝে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, পিতৃব্য-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে, এই সমগ্র রাজ্যের আমি অধীশ্বর হইব, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিব। কিন্তু পিতৃব্য যুবরাজের বিবাহ বা রাজ্যাভিষেকের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। পরলোকগত বাদশাহের একটি অতি বিশ্বস্ত হিন্দুস্থানবাসী ভৃত্য ছিল, তাহার নাম মুবারক। সে সর্ব্বদা রাজপুত্রের নিকট অবস্থিতি করিত এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। একদিন রাজপুত্র মুবারকের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেখ, একজন রাজভৃত্য আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মুবারক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নানা প্রকারে রাজপুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিল। বাদশাহ দোষী ভৃত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রাজপুত্রকে মিষ্ট কথায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন। আরও বলিলেন—"শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিব।" মুবারক শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বলিল—'প্রভু, তবে আর বিলম্ব কেন? নজুমী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া দিন স্থির করিতে আজ্ঞা হয়।" বাদশাহ্ বলিলেন—"আমি কল্যই জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব।"

অতঃপর একজন বিশ্বস্ত রাজভৃত্য গিয়া পণ্ডিতগণকে কহিল—"দেখ, বাদশাহ কল্য প্রকাশ্য-সভায় তোমাদিগকে যুবরাজের শুভবিবাহের জন্য দিন স্থির করিতে বলিবেন। তোমরা বলিবে যে, এখন এক বৎসর বিবাহের দিন নাই। এইরূপ বলিলেই বাদশাহ সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা তোমাদের বিপদ।"

পরদিন যথাসময়ে প্রকাশ্য-দরবারে পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। মুবারকও রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়া বসিল। প্রথমত পণ্ডিতগণ কহিলেন—"শাহানশাহ, আমরা গণনা করিয়া দেখিতেছি, এখন এক বৎসরকাল বিবাহের কোনও শুভ দিন নাই।" ইহা

শুনিয়া কপটী বাদশাহ মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করিলেন। মুবারককে বলিলেন—"শুনিলে ত মুবারক, এখন এক বৎসর দিন নাই। কি করা যাইবে , এখন এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। তুমি যুবরাজকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও, যুবরাজ এখন মন দিয়া লেখাপড়া করুন। এক বৎসর পরে বিবাহ দিয়া তাঁহার পৈত্রিক গদী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল আমীর ওমরাহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বর্ত্তমান বাদশাহের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। সকলের আন্তরিক ইচ্ছা, যুবরাজ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার ন্যায় রাজ্য পালন করেন। বাদশাহ্ সকলের এই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন মুবারক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া যুবরাজ অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন—"মুবারক দাদা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে আমায় বল; তোমার কোনও অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমাকে কেহ কি অপমান করিয়াছে? কি হইয়াছে আমায় খুলিয়া বল।"

মুবারক কহিল—"যুবরাজ, তোমায় সে দিন বাদশাহের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে মহা বিপদের সূচনা হইয়াছে। হায় হায়, যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে এমন কার্য্য করিতাম না।"—যুবরাজ শঙ্কাকুল হইয়া কহিলেন—"কেন মুবারক, কি বিপদ হইয়াছে?"

মুবারক বলিল—"সে দিন তোমাকে রাজসভায় দেখিয়া, আমীর, ওমরাহ, রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যগণ, সাধারণ প্রজাবর্গ,—সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। বৎসরান্তে তুমি বাদ্শা হইবে শুনিয়া সকলেই পুলকিত। সকলেই বলিতেছে—আহা, আমাদের স্বর্গগত বাদশাহ পরম দয়াবান, ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজসিংহাসন পাইলে আবার রাজ্যের সেইরূপ সুখ সম্পদ হইবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তোমার পিতৃব্য রোষে ও হিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মুবারক, তুমি যদি কোনও মতে যুবরাজকে মারিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব।' শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিলে সমূহ বিপদ, সেই কারণে কপটতাপূর্ব্বক বলিলাম—"বাদশাহ্, ইহা আর শক্ত কথা কি—আমি অনায়াসেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিব। তবে উপায় স্থির করিতে কিছু সময় লাগিবে।' বাদশাহ্ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় দিয়াছেন।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া যুবরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মুবারকের পদে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মুবারক দাদা, কিরূপে আমার প্রাণ বাঁচিবে?"—মুবারক বলিল—'ভয় কি, ঈশ্বর আছেন। আমি কোনও উপায় করিব। তুমি কাতর হইও না।"—নানা প্রকারে যুবরাজকে সান্ত্বনা দিয়া মুবারক কহিল—"আমার সহিত এস, তোমাকে একটি গুপ্ত বিষয় দেখাইব।"

বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র মুবারকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যেখানে স্বর্গীয় বাদশাহ্ সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন, সে মহাল এখন বন্ধ ছিল। সেই মহালে উপস্থিত হইয়া, মুবারক ভিতরে প্রবেশ করিল। স্বর্গীয় বাদশাহ যে কুর্শীখানিতে উপবেশন করিতেন, সেই রত্নাসনখানিকে মুবারক বহু সম্মানে সেলাম করিল। তৎপরে, সেই কুর্শীর দক্ষিণ দিকে মেঝের একটি তক্তা ধরিয়া টান দিল। টান দিবামাত্র সেখানি সরিয়া গেল এবং নিম্নে ভূগর্ভে সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছে দেখা গেল। যুবরাজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি মুবারক? মুবারক বলিল—'ইহা তোমার পিতার গুপ্ত গৃহ। আমার সঙ্গে নামিয়া আইস।" বলিয়া মুবারক সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, যুবরাজও পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলেন।

ভিতরে গিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি কামরা আছে। প্রত্যেক কামরায় দশটি করিয়া কলসী, সোনার শিকলে বাঁধা, কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। প্রত্যেক কলসীর মুখে একখানি করিয়া সোনার ইঁট রাখা আছে। উনচল্লিশটি কলসীতে সোনার ইঁটের উপর একটি করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি বসানো আছে, কেবল একটিতে নাই। যে কলসীতে বানর নাই, তাহার মুখ খুলিয়া শাহজাদা দেখিলেন, সেটি মোহরে পরিপূর্ণ। অন্য কলসীগুলি শূন্য। এই সমস্ত দেখিয়া যুবরাজ বিস্ময়ে মুবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা এ সব কি?"

মুবারক বলিল—"জিনদৈত্যগণের রাজা মালেক সাদেক তোমার পিতার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৎসর একদিন করিয়া তিনি তোমার পিতার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে আসিতেন। এই ভূগর্ভস্থিত কক্ষগুলিতে তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিতেন। যাইবার সময় তোমার পিতা, মালেক সাদেককে এক কলসী মোহর উপহার দিতেন, মালিক সাদেক তোমার পিতাকে একটি করিয়া ভৌতিক প্রস্তর নির্ম্মিত বানর দিয়া যাইতেন। এই বানরের আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি এইরূপ চল্লিশটি বানর পায়, তবে পৃথিবীতে আর তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। উনচল্লিশটি বৎসর মালেক সাদেক যাতায়াত করিয়াছিলেন,—এই উনচল্লিশ ঘড়া মোহর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইযাছিল। তিনিও উনচল্লিশটি বানর দিয়াছেন। পর বৎসর আসিলে তাঁহাকে দিবার জন্য এক ঘড়া মোহর এইখানে রাখা আছে। ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইল। নহিলে চল্লিশটি বানর পূর্ণ হইত, এবং ক্ষমতায় তোমার পিতা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইতেন। কিন্তু একটি কম বলিয়া এ সকল বানবের দ্বারায় কোন কার্য্যই হইবে না।"

রাজকুমার বলিলেন—"তবে ত সকলই ব্যর্থ হইল।"

মুবারক বলিল—"ব্যর্থ বইকি। আমি মনে করিতেছি—এখানে যখন তোমার এখন মহা বিপদ, তখন এখান হইতে তোমার পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর। মালেক সাদেকের নিকট গিয়া, তোমাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে সকল কথাই বলি। তোমার পিতার প্রতি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি তোমার সহায় হইতে পারেন। তোমাকে সকল বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিতে পাবেন। এক কলসী মোহর যাহা রাখা আছে, লইয়া গিযা তাঁহাকে উপহার দেওয়া যাইবে। যদি শেষ বানবটি তিনি তোমায় দেন, তবে তোমার তুল্য নরপতি ধরাধামে কেহ থাকিবে না।"

শাহজাদা বলিলেন—"কিরূপে আমরা পলায়ন করিব?"

মুবারক বলিল—"তাহার জন্য কোনও চিন্তা নাই। সে উপায়ও আমি স্থিব কবিয়াছি।"

॥ ২ ॥

এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে, মুবারক একদিন রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"প্রভু, আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাব একটি উপায় আমি স্থির কবিয়াছি।"

বাদশাহ প্রীত হইয়া কহিলেন—"কি উপায় স্থিব কবিয়াছ?"

মুবারক বলিল—"যুবরাজকে যদি এখানে হত্যা করা হয, তাহা হইলে লোকের মধ্যে ক্রমে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে আপনার বিলক্ষণ অপযশ আছে। তাহা অপেক্ষা দেশভ্রমণের ছলে তাঁহাকে দূরদেশে লইয়া গিয়া হত্যা করাই নিরাপদ। ফিরিয়া আসিয়া রটনা করিয়া দিব যে, তিনি কোনও মারাত্মক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রজাবর্গের এবং অপর কাহারও কোন সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বাদশা বলিলেন—"মুবারক, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। যাও, যুবরাজকে লইয়া গিয়া, কোনও দূরদেশে কার্য্য শেষ কর। তাহা হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে

রাজ্যভোগ করিতে পারিব এবং তোমাকেও পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করিব।"

মুবারক, দূরদেশে যাইবার ব্যয় এবং নিজ পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া, বাদশাহকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সৈন্য সামন্ত বা ভৃত্যাদি কেহই যাইবে না। মুবারক বাজার হইতে মালেক সাদেকের জন্য বিবিধ বহুমূল্য উপহারাদি ক্রয় করিল। ভূগর্ভস্থ সেই এক কলসী মোহর উঠাইয়া লইয়া, শুভদিন দেখিয়া, যুবরাজসহ যাত্রা করিল। দুইজনে দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমাগত চল্লিশ দিন গমন করিল।

সে দিন চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি এক প্রহর হইলে মুবারক বলিল—"খোদাতালাকে ধন্যবাদ, এতদিনের পর আমরা জিনদৈত্যের দেশে পৌঁছিয়াছি।"

শাহজাদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কই?"

মুবারক বলিল—"এই যে,—এত আলো জ্বলিতেছে, এত লোকজন যাতায়াত করিতেছে বাদ্য বাজিতেছে, পথ, বাগান, ঘরবাড়ী, ইহাই জিনদৈত্যপতি মালেক সাদেকের রাজধানী।"

রাজপুত্র বলিলেন—"মুবারক দাদা! আমার সহিত কৌতুক কর কেন? ইহা ত জঙ্গল এবং কেবল অন্ধকার।"

মুবারক তখন ঈষৎ হাসিয়া নিজ পকেট হইতে একটি ডিবিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সুলেমানী সুর্ম্মা ছিল। অল্প লইয়া রাজপুত্রের দুই চক্ষুতে লাগাইয়া দিল।

সুর্ম্মা চক্ষে লাগাইবামাত্র শাহজাদা দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে আলোকপূর্ণ। বিস্তৃত রাজপথ। স্থানে স্থানে লণ্ঠন জ্বলিতেছে। অনেক ঘরবাড়ী, লোকজন, কোনও কোনও গৃহের উপরতলায় নর্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। বাজারে বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শাহজাদার মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুবারককে দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল এবং বন্ধুতাসূচক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে রাত্রি একটি বন্ধু-গৃহে মুবারক অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে মালেক সাদেকের দরবারে রাজপুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইল।

দৈত্যপতির রাজসভা স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ মণিমুক্তা দ্বারা খচিত। স্থানে স্থানে চাঁদনী, জরী এবং মখমলের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। বহু পণ্ডিত, গুণী, আমীর, ওমরাহ, উজীর ও ফকীর বসিয়া আছে। অঙ্গরক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান। মণিময় সিংহাসনের উপর, হীরকের মুকুট পরিয়া, মোতির হার গলায় দিয়া, মালেক সাদেক বসিয়া আছেন। মুবারক রাজপুত্রসহ নিকটে গিয়া সেলাম করিল। মালেক সাদেক দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"কি মুবারক? তুমি কবে আসিলে?"

মুবারক নত হইয়া বলিল—"শাহানশাহ। এ দাস পারস্যরাজ্য হইতে গত রাত্রিতে পৌঁছিয়াছে।"

মালেক সাদেক কহিলেন—"বেশ। তোমার সহিত এই যুবকটি কে?"

মুবারক উত্তর করিল—"মহারাজ! ইহাকে চিনিতে পারিলেন না? আপনি চিনিবেনই বা কি করিয়া, অতি বাল্যকালে ইহাকে দেখিয়াছিলেন কিনা। আপনার বন্ধু পারস্যের স্বর্গীয় বাদশাহের ইনি পুত্র।"

অতঃপর মুবারক এই কয়েক বৎসরের ঘটনা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। এক কলসী মোহরও তাঁহাকে উপহার দিল। শেষে বলিল—"রাজপুত্রের বড়ই বিপদ। এ বিপদে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? আপনি যদি কৃপা করিয়া শেষ বানরটি দেন, তাহা হইলে ইহার আর কোনই কষ্ট থাকে না। আপনার বন্ধুর রাজ্য ও বংশ সমস্তই বজায় থাকে।"

সকল কথা শুনিয়া মালেক সাদেক বলিলেন—"আচ্ছা, সে উত্তম কথা। এ যখন এতদূর আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমি ইহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু উহাকে একটু পরীক্ষা করিতে চাই। আমার একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র করযোড়ে কহিলেন—"যাহা হুকুম হয়, এ অধীন তাহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"কার্য্যটি বড়ই কঠিন। পারিবে কি? যদি কার্য্যটি করিতে পার, তবে তোমার পিতাকে আমি যে পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার অধিক অনুগ্রহ তোমাকে করিব। যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কিন্তু যদি কার্য্যনাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

রাজপুত্র বলিলেন—"কার্যটি যদি আমার শক্তির মধ্যে হয়, তবে অবশ্যই তাহা আমি প্রাণপণে সম্পন্ন করিব। কার্য্যটি কি?"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি চিত্র বাহির করিলেন। রাজপুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার, আমি তোমার সহিত চিরদিনের জন্য মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিব। আব যদি না আনিতে পার, কিম্বা কোনওরূপ অন্যায় কর, তবে তুমি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইবে। দেখ, এখনও সময় আছে, যদি কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে পার, তবেই ভার গ্রহণ কর। নতুবা এখনও নিবৃত্ত হও।"

রাজপুত্র দেখিলেন ছবিখানি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি রমণীর মূর্ত্তি। বলিলেন—"প্রভু! কেন পারিব না? আমি এই রমণীকে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিব এবং যে প্রকারে পারি আপনার নিকট আনিয়া দিব।"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ছবিখানি দিয়া, বিবিধ ধনরত্ন ও পরিচ্ছদ দিয়া, রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

॥ ৩ ॥

মালেক সাদেকের নিকট বিদায় লইয়া, শাহজাদা ও মুবাবক সেই মনুষ্যকন্যাব উদ্দেশে বাহির হইলেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ও জঙ্গলে জঙ্গলে বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সেই মনুষ্যকন্যার সংবাদ পাইলেন না। এইরূপে সাতটি বৎসর অতীত হইয়া গেল।

একদিন এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে বেড়াইতে অপরাহ্ন সময়ে শাহজাদা দেখিলেন, একজন ছিন্নবসন কৃশকায় বৃদ্ধ ফকীর রাজপথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। ফকীর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে কিন্তু কেহই তাহাকে একটি পয়সাও দিতেছে না। যাহার দ্বারে যাইতেছে সেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। দেখিয়া শাহজাদার অন্তঃকরণে বড়ই দয়া হইল। তিনি পকেট হইতে একটি মোহর বাহিব করিয়া ফকীরকে দিলেন। ফকীর বলিল—"হে দাতা! ঈশ্বব তোমাব মঙ্গল করুন। তুমি বোধ হয় পথিক, এ সহরের অধিবাসী নহ।"

বৃদ্ধ এইরূপে রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল। কিছুদূরে একটি দোকানে গিয়া, মোহর ভাঙ্গাইয়া, স্ত্রীলোকের উপযুক্ত একটি সুন্দর রেশমী বস্ত্র খরিদ করিল। বাকী টাকাব খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া, আবার চলিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রাজপুত্র কিছু বিস্মিত হইলেন। স্বীয় সহচরকে বলিলেন—"মুবারক! এ ব্যক্তি ফকীর, তবে স্ত্রীলোকের উপযোগী রেশম বস্ত্র ক্রয় করে কেন?"

মুবারক বলিল—"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না। বোধ হয়, উহার গৃহে স্ত্রী কন্যা কেহ আছে। তোমার যদি এতই কৌতূহল হইয়া থাকে, চল না, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

যাই, তাহা হইলেই জানিতে পারিব।"

মুবারকসহ শাহজাদা ফকীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ফকীর ক্রমে নগর-সীমা ছাড়িয়া বাহিরে গেল। সেখানে রাজপুত্র দেখিলেন, বড় বড় অট্টালিকা গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। বাগান ছিল অনুমানে বুঝা গেল, এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলের ফোয়ারা ছিল, তাহা ভগ্ন। দেখিয়া রাজপুত্র মনে করিলেন, বোধ হয় পূর্ব্বে এখানে কোনও রাজা বা ধনবান ব্যক্তির বসতি ছিল, এখনও তাহারই চিহ্ন বিদ্যমান। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য মৃত্তিকাময় কুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বেটী! কোথা আছিস?" কুটীর হইতে উত্তর আসিল—"বাবা! আসিয়াছ? আজ এত শীঘ্র ফিরিলে কেন? মঙ্গল ত?" বৃদ্ধ বলিলেন—"বেটী। আজ ঈশ্বর করুণা করিয়া একটি যুবা পথিককে আমার সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। সে আমাকে একটি মোহর দিয়াছে। তাই আজ অনেকদিনের পর তোর জন্য একটি রেশমী বস্ত্র কিনিয়া আনিয়াছি। মাংস, ঘৃত, মশলা, চাউল প্রভৃতিও কিনিয়া আনিয়াছি। পাক কর, অনেকদিনের পর আজ সুস্বাদু খাদ্য আমাদের মুখে উঠিবে; এই নে।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের কন্যা প্রফুল্লমুখে বাহিরে আসিল। রাজপুত্র তাহাকে দেখিবামাত্রই বুঝিলেন এ আর কেহ নয়, যাহার সন্ধানে আজ সাত বৎসর কাল দেশে দেশে বনে জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন, তসবীর অঙ্কিত এই সেই যুবতী। দেখিয়া রাজপুত্র নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে বহু ধন্যবাদ দিলেন। মুবারকও বলিল—"হ্যাঁ, এই সেই মনুষ্যকন্যা বটে।" তাহার অভিনব যৌবন, আশ্চর্য্য রূপ যেন সেই স্থানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, আমি সাত বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য কখনও চক্ষুগোচর করি নাই।

রাজপুত্র তখন উচ্চৈঃস্বর বলিলেন—"হে ফকীর দুইজন পথিককে একটু বিশ্রামের স্থান দিবেন কি?" ফকীর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিতে পারিলেন; এবং মহা সমাদরে আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। বসাইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মত দয়াবান লোকের আগমনে আজ আমার কুটীর পবিত্র হইল। বৎস! তুমি কে এবং কি জন্যই বা দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ?"

রাজপুত্র কহিলেন—"আমি পারস্যদেশের যুবরাজ। ঘটনাক্রমে একখানি ছবি আমার হস্তগত হয়। সেই ছবিখানিতে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সেই যুবতীর দর্শন লালসায় আমি সাত বৎসরকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। এতদিন পরে সেই যুবতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তিনি আর কেহই নহেন, আপনারই কন্যা।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া রাজপুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বলিলেন—"না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনার পদগৌরব অবগত ছিলাম না। অতএব ক্ষমা করিবেন।" অতঃপর বসিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—"হায়, আমি কি হতভাগ্য! আপনার মত এমন সুপাত্রের হস্তে যদি আমি কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার কন্যা বড়ই বিপন্না। কাহারও সাধ্য নাই যে উহাকে বিবাহ করে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"কেন ফকীরসাহেব, এ কন্যা বিপন্না বলিতেছেন কেন? কেহ ইহাকে বিবাহ করিতেই বা পারিবে না কেন?"

কন্যাটি এই সময় খাদ্য পাক করিবার জন্য রন্ধনশালায় গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

"আমার ইতিহাস শুনিবেন? সে অনেক কথা। আমি পূর্ব্বে এই সহরের একজন বিশিষ্ট রইস ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম। এই যে সকল ভগ্নস্তূপ দেখিতেছেন, এইখানেই এক সময়ে আমার প্রাসাদ শোভা পাইত। আমরা বহুপুরুষ ধরিয়া এইখানে বসবাস করিয়াছি। ঈশ্বর

আমাকে কেবলমাত্র এই কন্যা সন্তানটি দিয়াছিলেন। কন্যা বড় হইলে, ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিল যে, দেশ বিদেশের বড় বড় লোকগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব করিতে লাগিল। একমাত্র কন্যা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, এই কারণে আমি স্নেহাধিক্যবশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এই নগরের রাজপুত্র একদিন ইহাকে দৈবাৎ দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে প্রণয়বিহ্বল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল, বাতুলের মত হইল, ক্রমে তাহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহ এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন রাজবাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া, নিজ পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি রাজাজ্ঞা অমান্য করিতে সাহসী হইলাম না। আরও ভাবিলাম, কন্যার বিবাহ ত একদিন না একদিন কাহারও সঙ্গে দিতেই হইবে, তবে যদি শাহজাদাকে জামাতা পাওয়া যায়, তাহাব অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সুতবাং সম্মত হইলাম। উভয় পক্ষে মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে শুভদিন উপস্থিত হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ শেষে, মহাসমারোহে, বর-কন্যাকে শয্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিয়া, বর-কন্যার মনোরঞ্জন কবিতে লাগিল। ক্রমে 'ত্রি অধিক হইলে তাহাবা বিদায় লইল, বাদশাহজাদা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বত্র নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নৃত্যাদি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পবে বব কন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল। যেন একত্র শত শত কামান গর্জ্জন করিতেছে। যেন শত শত বজ্রপাত একত্র সংঘটিত হইতেছে। রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্র নৃত্যগীত বন্ধ হইল। রাজপরিবাবের নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবৃন্দ, দাস দাসী, সকলেই মহা ত্রাসে নবদম্পতির শয়নকক্ষেব দিকে ছুটিল। অনেক ডাকাডাকি, কেহই দ্বাব খুলে না। অবশেষে বাদশাহেব আজ্ঞায় দ্বাব সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলা হইল। সকলে ভিতরে প্রবেশ কবিযা দেখে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদশাহজাদার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত, রক্তে, শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার কন্যা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। কেহ কিছুই স্থিব করিতে পারিল না। সে কক্ষে কোনওরূপে অস্ত্রও ছিল না। অনেক কষ্টে দাসীগণ আমাব কন্যার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। বাদশাহ পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"পরদিন শোক কতকটা প্রশমিত প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রোধে আদেশ করিলেন—'এই কন্যা অতিশয় মন্দভাগিনী, সত্বর ইহার মস্তক কাটিয়া ফেল।' আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসীগণ, সৈন্য সামন্ত ডাকিয়া, আমার কন্যাকে বধ করিবার আয়োজন করিল। রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বধ্যভূমি নির্ম্মিত হইল। সশস্ত্র সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিবিয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ ও রাজকর্ম্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন। আমার কন্যাকে বধ কবিবার জন্য জল্লাদ যখন প্রস্তুত হইতেছে তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিল, অজস্র পরিমাণ প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদশাহ ও সৈন্য সামন্ত পভৃতি প্রস্তরাঘাতে জর্জ্জরিত হইযা কে কোথায় পলায়ন করিল ঠিকানা নাই। কেবল আমার কন্যার গায়ে একখানি প্রস্তরও লাগিল না।

'ক্রমে প্রস্তবপাত বন্ধ হইল, শব্দ থামিয়া গেল, মেঘ অপসৃত হইল, তখন বাদশা বলিলেন,—'এই কন্যা ভূতগ্রস্ত, নহিলে এমন ভৌতিক কাণ্ড হইবে কেন? ইহাকে কিছু আব বলিও না। রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দাও। এবং ইহাব পিতাকে বধ কবিয়া ইহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, সমস্ত ধন সম্পত্তি বাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।'

'আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজভৃত্যগণ আসিয়া আমার গৃহাদি সমস্ত ভগ্ন কবিল, আমার দ্রব্যাদি লুটিয়া লইল। আমার কন্যা রাজবাটী হইতে তাড়িত হইয়া একবস্ত্রে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল। ক্রমে রাজসৈন্যগণ আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে জল্লাদের হস্তে

দিল। এমন সময় পুনরায় আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা গেল, অন্ধকার হইয়া প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈন্যগণ কেহ মরিল, কাহারও মস্তক, হস্ত, পদ ভগ্ন হইল। তাহারা ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমার এবং কন্যার গায় কোন প্রস্তর লাগিল না।

"সেই অবধি ভীত হইয়া বাদশাহ আমার প্রতি আর কোনওরূপ অত্যাচার করেন না। তবে আমার ধন সম্পত্তি সমস্ত যাওয়াতে আমি পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য একটু কুটীর বাঁধিয়া কন্যাসহ কোন মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।"

এই পর্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ মৌন হইয়া রহিলেন। রাজপুত্র ব্যাপার সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। ইহা মালেক সাদেকেরই কীর্ত্তি। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এরূপ হইল, আপনার কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কন্যা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'যখন আমাদের শয়নকক্ষ হইতে নর্ত্তকীগণ বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাহজাদা উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পালঙ্কে শয়ন করিলাম। শাহজাদা পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। শূন্য হইতে যেন এক মণিময় সিংহাসন নামিয়া আসিল। তাহার উপর এক রূপবান যুবাপুরুষ রাজবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ। তরবারির এক আঘাতে শাহজাদার মস্তক কাটিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, আর কিছুই জানি না'—আমার বোধ হইল কোনও ভৌতিক কাণ্ড হইবে। সেই অবধি ভূতের ভয়ে বাদশাহ বহু প্রকার তাবিজাদি ধারণ করিয়াছেন, এবং সহরের সর্ব্বত্র মৌলানাগণ ইসিম আজম ও কোরান পাঠ করিতেছে।"

বৃদ্ধ আবার মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজপুত্র ও মুবারক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিদায় গ্রহণ কবিলেন।

।। ৪ ।।

রাজপুত্র বাসস্থানে ফিরিয়া, আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। মুবারক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"শাহজাদা, এতদিনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তোমার মন এমন বিষণ্ণ কেন?"

রাজপুত্র কহিলেন—"মুবারক, সেই রূপসী-রত্নকে দেখিয়া আমার মনে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মুবারক বলিল—"কেন রাজকুমার, বিষাদ কিসের?"

শাহজাদা বলিলেন—"মুবারক, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, আমার মনের দুঃখ কি বুঝিবে? আমি যে দিন হইতে ঐ কন্যার ছবি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মন প্রেমঅগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এতদিন পরে যদিবা তাহার দেখা পাইলাম, তাহাকে লাভ করিতে পারিব না।"

মুবারক শুনিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! এমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িনীকে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া দিবার উপায় চিন্তা কর। অন্যরূপ কামনা পরিত্যাগ কর। এদেশের বাদশাহজাদার কি দশা হইয়াছে তাহা ত তুমি স্বকর্ণেই শুনিলে।"

রাজপুত্র বলিলেন—"শুনিলাম বলিয়াই ত এই বিষাদ।"

মুবারক তখন ফকির-কন্যাকে কি উপায়ে লইয়া গিয়া মালেক সাদেকের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহার পরামর্শই করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, ফকীরকে বলিয়া কহিয়া, বুঝাইয়া বিবাহ করিবার ছল করিয়া, শাহজাদা ঐ কন্যাকে লইয়া গিয়া মালেক সাদেক সমীপে অর্পণ করিবেন।

সে রাত্রি শাহজাদা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সেই সুন্দরীর চন্দ্রমুখ যতই তাঁহার

মনে পড়ে ততই অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কোনও ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রাজপুত্র স্নান করিয়া, কেশ বিন্যাস করিয়া, বাজারে গিয়া বিবিধ প্রকার শুষ্ক ও হরিদ্বর্ণ মেওয়া ফল, মাংস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য ও পেয়, বিবিধ প্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি উপহার দ্রব্য ক্রয় করিয়া, মুবারকসহ ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ফকীর মহা সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর রাজপুত্র বলিলেন—"মহাশয়, আমি গত রজনীতে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি, আপনার নিকট আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। আমার যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে আপনার কন্যাকে লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবনে সুখ নাই। আপনি মৃত্যুশঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সুখহীন জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"বৎস, ও কথা বলিও না। জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এই আশঙ্কাটি যদি না থাকিত, আমি এখনি তোমাকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইব।"

রাজপুত্র অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। রাজপুত্র প্রত্যহই নানা উপহার দ্রব্যাদি লইযা ফকীরের আলয়ে আসিতেন। এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই অনেক প্রকারে বৃদ্ধকে বুঝাইতেন। কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের মত করিতে পাবিলেন না। বৃদ্ধ কেবলই বলিতেন, তোমাকে কন্যাদান করিয়া, তোমার বধের ভাগী আমি হইতে পারিব না।

এক মাস পরে হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজকুমাব ও মুবাবক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন, ঔষধাদি আনিযা বৃদ্ধকে সেবন করাইতে লাগিলেন। রাজকুমার নিজ হস্তে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে খাওয়াইতেন। ফল কথা, বৃদ্ধের সেবা শুশ্রুষার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই বাঁচিলেন না।

তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমান-ধর্ম্ম অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম শাহজাদা সম্পন্ন কবিলেন। সর্ব্বদা কন্যার নিকটে থাকিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে আবও মাসখানেক কাটিল।

মুবারক একদিন জনান্তিকে রাজকুমারকে বলিল—"আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট কবিয়া ফল কি? চল এবাব ফকীরকন্যাকে লইয়া মালেক সাদেকের নিকট সমর্পণ করি।"

রাজপুত্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। অন্তরের বাসনা বড়ই প্রবল, অথচ মৃত্যুভয়ও কাটাইয়া উঠিতে পারেন না।

মুবারক সে দিন ফকীরকন্যাকে বলিল—"বেটী, আমবা বিদেশী লোক, এখন ত আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ?"

ফকীরকন্যা বলিল—"মহাশয়, আমার আর এখানে কে আছে? আমি একা স্ত্রীলোক এখানে থাকিবই বা কি করিয়া? আমার কি উপায় হইবে?"

মুবারক বলিল—"এখানে একা থাকা যদি তোমার অনভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তাহার পর কোন একটা বন্দোবস্ত কবা যাইবে।"

ফকীরকন্যা সম্মত হইল। মুবারক পাল্কী ও বাহক সংগ্রহ করিয়া ফকীরকন্যা ও রাজপুত্রকে লইয়া, মালেক সাদেকের রাজ্য-অভিমুখে যাত্রা করিল।

বহুদিনের পথ। নানা বন, উপবন, পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করিয়া ইঁহারা যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কোনও সুন্দর স্থান প্রাপ্ত দুই এক দিন সেখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। কুমারীর নিয়ত সাহচর্য্যে রাজপুত্রের মনে প্রণয়-বহ্নি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। দুইজনে বিশ্রাম স্থান হইতে অনেক দূর অবধি বেড়াইতে যাইতেন। কোথাও একটি সুন্দর বনপুষ্প দেখিলে, রাজপুত্র তাহা যত্নে তুলিয়া ফকীরকন্যার কেশদামে পরাইয়া দিতেন। এইরূপে কয়েক মাস কাটিল। কিন্তু মালিক সাদেকের ভয়ে শাহজাদা কোনও দিন ফকীরকন্যার নিকট স্বীয় প্রণয় ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

একদিন মুবারক নির্জ্জনে রাজপুত্রকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। ইহার মনোভাব জানিতে মুবারকের বাকী ছিল না। মুবারক বলিল—"রাজকুমার, তোমাকে পূর্ব্বাবধিই সাবধান করিয়া দিয়াছি, এ বাসনা মনে স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কতদূর বিপজ্জনক তাহা কি তুমি অবগত নও? শেষে কি প্রাণটা খোয়াইবে?"

রাজপুত্র কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে মুবারক। কিন্তু আমি যে কিছুতেই হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ফকীরকন্যাকে বিবাহ করিলে মালেক সাদেকের হস্তে আমার মৃত্যু, আর প্রণয়বাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আমার অবধারিত মৃত্যু। এখন আমি কি করিব?"

মুবারক যুবরাজের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। বলিল—"ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। হয়ত মালেক সাদেকের নিকট কন্যাকে উপস্থিত করিলে তিনি প্রীত হইয়া কন্যা তোমাকেই দান করিবেন। তাহাতে তোমার প্রাণরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, সকল দিকই বজায় থাকিবে।"

যুবরাজ বিষণ্ণ মনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে তাঁহারা একটি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি সুন্দব দেখিয়া, কিছুদিন বিশ্রামের জন্য তাঁহারা সেইখানেই ছাউনি ফেলিলেন। তখন বসন্তকাল বিরাজ করিতেছে। নদীতীরে সহস্র সহস্র বন্য গোলাপ ফুটিয়া বায়ুকে আতর গন্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। বুলবুল পক্ষীর গান শুনিলে বৃদ্ধেরও মনে তরুণ-ভাব উপস্থিত হয়। একদিন যুবরাজ ও ফকীরকন্যা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত হইয়া একটি গোলাপের ঝাড়ের নিকট তৃণাস্তরণে উপবেশন করিলেন। সে দিন কথায় কথায়, শাহজাদা নিজ প্রণয় ব্যক্ত করিলেন। কিরূপ উন্মাদনা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিছুতেই নিজেকে সেদিন সংযত করিতে পারিলেন না। রাজকুমারের প্রণয়-কথা শুনিয়া কুমারীর গণ্ডযুগল, নিকটস্থ ঝাড়ের গোলাপ পাপড়ির মতই লাল হইয়া গেল। যুবরাজের বারম্বার প্রশ্নে কুমারীও স্বীকার করিলেন, যে দিন হইতে তিনি পিতৃগৃহে যুবরাজকে দেখিয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহাকে নিজ হৃদয় মন সমর্পণ কবিয়াছেন। এই প্রথম প্রণয় ব্যক্ত করিতে সেই অসামান্যা সুন্দরীর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজপুত্র আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার গোলাপী অধর চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কুমারী বলিলেন—"না প্রাণাধিক, আত্মসম্বরণ কর, আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইতে পাবিব না।" যুবক বলিলেন—"তোমার অধর চুম্বনের মূল্যস্বরূপ যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, আমি তাহাতেও কাতর নহি।" কুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া, গোলাপের ঝাড় হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া তাহা চুম্বন করিয়া যুবকের কোলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন—"ঐ ফুলে আমার চুম্বন আছে, উঠাইয়া লও।"

যুবক সাগ্রহে ফুলটি উঠাইয়া বারম্বার তাহা চুম্বন করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মুহর্মুহ বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। শত বজ্রনির্ঘোষের শব্দ শ্রুত হইল।

যুবরাজ বুঝিলেন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। ফকীরকন্যাও বুঝিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ হইল। তিনি ভয়ে যুবরাজের কণ্ঠলগ্না হইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মালেক সাদেক আসিয়া সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইয়া বিকট শব্দ উত্থিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া ফকীরকন্যার মূর্চ্ছা

উপস্থিত হইল।

মালেক সাদেক শাহজাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতী যুবক! তোর উত্তর কি?"

শাহজাদা বলিলেন—"কিসের উত্তর?"

মালেক সাদেক বলিলেন—"এই কন্যার প্রতি তুই কেন প্রেমাভিলাষ করিয়াছিস?"

শাহজাদা কহিলেন—দৈত্যপতি, এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নাই। আমি উহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"মনে ভালবাসিয়াছিস, কিন্তু মুখে প্রকাশ করিলি কেন?"

যুবরাজ উত্তর করিলেন—"যদি জানিতাম, আপনি যেরূপ এই কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী তিনিই সেইরূপ আপনার প্রতি অনুরক্ত, তবে আমি কখনই তাঁহার কাছে আমার প্রণয় ব্যক্ত করিতাম না, কিন্তু তিনি যখন আমাকেই হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন ইহা বুঝিলাম, তখন প্রণয় ব্যক্ত না করিব কেন?"

দৈত্যপতি বলিলেন—"আমার ক্রোধের ভয় করিস না? প্রাণেব মায়া নাই?"

শাহজাদা বলিলেন—"দৈত্যরাজ, মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান। প্রেম কি কখনও মৃত্যু-ভয় করে? ইচ্ছা হয় আমাকে বধ করুন, তথাপি আমি আমার প্রিয়তমাব নিকট প্রণয় ব্যক্ত করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমও যে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য মৃত্যুর পব নরকে যাইলেও আমার আত্মা স্বর্গসুখ অনুভব করিবে।"—ধীরে ধীবে আকাশ পরিষ্কার হইল। পুনশ্চ দিবার তরুণালোক দেখা দিল। অল্পে অল্পে দৈত্যপতির মুখমণ্ডলে ক্রোধেব পরিবর্ত্তে, প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"যুবা—উঠ। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। আমি দৈত্যবংশোদ্ভব, তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াছি। মনুষ্যকন্যায় আমার কোনই প্রয়োজন নাই। উঠ, নদী হইতে শীতল জল আনিয়া তোমার প্রিযতমার চেতনা সম্পাদন কর। তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

একথা শুনিয়া, শাহজাদা মহা আশ্বস্ত হইয়া, নদী হইতে জল আনিয়া, সযত্নে স্বীয় প্রণয়িণীর চেতনা সম্পাদন করিলেন। যুবতী একটু সুস্থ হইলে, মালেক সাদেক বলিতে লাগিলেন—"যখন তুমি শিশু, তখন একদিন তোমার পিতা এবং আমি উভয়ে ছদ্মবেশে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে এই কন্যাকে দেখি। ইনিও তখন অতি শিশু। তোমার পিতা ইহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার পুত্র যদি বাঁচে তবে এই কন্যার সহিত বিবাহ দিব। ইস্তাম্বুলের শাহজাদা যখন ইহাকে বিবাহ করিল, তখন সেই কারণেই আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। পরে তোমার পিতার মৃত্যুব পর, অনেক বৎসর ধরিয়া আর ওকথা আমার স্মরণ ছিল না। তোমাকে আসিতে দেখিয়া আবার আমার স্মরণ হইল। তোমার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে অন্বেষণ করিবার ভার তোমাকেই দিয়াছিলাম। বৎস,—তোমার ক্লেশতর পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ইতিমধ্যেই তোমার নিষ্ঠুর পাপাত্মা পিতৃব্যকে তোমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। তোমার পিতৃসিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই তোমার পারস্য-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, এই কন্যাব সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

মহা সমাবোহে যুবরাজের অভিবেক ও উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, নবীন বাদশাহ রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিকে ডাকাইয়া নিজ জীবনের ইতিহাস বলিয়া, একখানি কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই কাব্যের শীর্ষদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল—

[ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩০২]

বেকসুর খালাস

চব্বিশ বৎসর বয়সে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তখন আমি কয় ছেলের বাপ হইয়াছি, এই কথাই তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ ত? না, আমার সন্তানাদি তখনও কিছু হয় নাই। লোকে বলিত, হইবার আশাও খুব কম, কারণ, আমার স্ত্রীর বয়স তখন কুড়ি বৎসর।

আমার নাম নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জাতিতে আমরা সদ্‌গোপ। নিবাস, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালীনগর গ্রামে। যে দেবীর নাম হইতে গ্রামের নামের উৎপত্তি, তিনি খুব জাগ্রত দেবতা—দুরদূরান্তর হইতে লোকে তাঁহার মন্দিরে মানস-পূজা দিতে আসে।

গ্রামে আমাদের বহু ঘর সদ্‌গোপের বাস। সহর অঞ্চলের সদ্‌গোপরা অনেকে সে দিনেও ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া "বাবু" হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গ্রামটা নাকি "অজ" পাড়াগাঁ, তাই আমার স্বজাতিয়েরা তখনও "বাবু" হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের কোণেও স্থান দিত না। কিন্তু পিতা আমার কলিকাতা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, আমি চাষবাস করিব না, ইংরাজী পড়িয়া "বাবু" হইব এবং চাকরি করিব।

যথাকালে আমি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পাঠশালার পাঠ যখন সাঙ্গ করিলাম, তখন আমার বয়স চৌদ্দ উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন আমি উপযুক্ত হইযাছি বিবেচনায়, পিতা আমার বিবাহ দিলেন এবং লোকের টিটকারী অগ্রাহ্য করিয়া আমায় দেড় ক্রোশ দূরে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দশ বৎসরের একটি বধূ এবং প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক" প্রায় একসঙ্গেই ঘরে আসিল। আমার স্ত্রীর নাম মন্দাকিনী; দেখিতে শুনিতে ভালই, নেহাৎ "পাঁচ-পাঁচি" শ্রেণীর নহে। এমন সুশ্রী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের জাতির মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ, এ কথা আমি বলিলে হয় ত জাঁক করা হইবে; কিন্তু না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে ইহা নিশ্চয়।

খাজনার জমি আমাদের যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশই ভাগে দেওয়া ছিল। অল্প কয়েক বিঘা, বাবা "কৃষাণ" রাখিয়া চাষ করাইতেন। বলিতেন, খোকা পাশ করিয়া যখন চাকরি-বাকরি করিবে, তখন সে জমিগুলিও তিনি ভাগে বিলি করিয়া দিবেন।

কিন্তু তাঁর এত সাধের খোকার পাশ করা তিনি ত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। দুই বছর পূর্ব্বে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে তিনি ও আমার জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সেই আমার পাস করিবার কথা, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবার ফেল হওয়ায় বয়সটা একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পাসের সংবাদ পাইয়া আমি পাঁঠা বলি দিয়া কালীমন্দিরে পূজা দিলাম; বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি মাংস ভোজন করাইলাম। সে দিন বড় আনন্দ হইয়াছিল। আবার বাবার কথা মনে পড়িয়া চোখে জলও আসিয়াছিল।

অতঃপর চাকরির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিজ চাষের জমিগুলি বাবার মৃত্যুর পরেই আমি ভাগে বিলি করিয়া দিয়াছিলাম; চাষবাস দেখিতে হইলে আর পড়াশুনা হয় না। এখন চাকরি কোথায় পাই? এ পল্লীগ্রামে চাকরি আমায় কে দিবে? বউ বলিল, "আমায় বাপের বাড়ী রেখে, দুর্গা শ্রীহরি বলে তুমি বেরিয়ে পড়, কলকাতায় যাও। এত বিদ্যে শিখেছ, সেখানে গেলে তোমার চাকরির ভাবনা কি? চাকরি হলে একটা ছোট দেখে বাসা ভাড়া করে আমায় এসে নিয়ে যেও।"

এ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম। সদ্‌গোপের ঘরের মেয়ে, প্রায় কুড়ি বৎসর মাত্র বয়স, মন্দার বুদ্ধি দেখিয়া সত্যই সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া যাই। কিন্তু বড় সর্ব্বনেশে কথা যে! সাত আট বৎসরকাল একাদিক্রমে দুইজনে একসঙ্গে রহিয়াছি। গ্রামেই শ্বশুড়বাড়ী, বউ বাপের বাড়ী গেলেও, দুইজনের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। তাহাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে ভাবিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তার হাতের রান্নাটি আমার

যেমন মিষ্টি লাগে, কই, আর কাহারও রান্না ত তেমন লাগে না! সে কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে আমার সে খাইয়াই সুখ হয় না। তার হাতের সাজা পাণ না হইলে পাণ খাইয়া আমার তৃপ্তি হয় না;—কত লোকের বাড়ী বেড়াইতে যাই, তারা পাণ দেয়, খাই ত! সে কাছে থাকিবে না, শয়ন করিলে আমার পায়ে হাত বুলাইয়া দিবে না, আমার ঘুম আসিবে কি করিয়া? এই সাত আট বৎসরকাল, প্রতিদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া তার মুখখানি দেখিয়াছি—দিন ত এতকাল এক রকম সুখেই কাটিয়াছে। কলিকাতায় প্রভাতে উঠিয়া কার মুখ দেখিব,—তার পর ট্রাম হইতেই পড়িয়া যাইব, না গুণ্ডার ছুরীতেই প্রাণ হারাইব, কে বলিতে পারে?

বউয়ের প্রস্তাব শুনিয়া এই সকল কথাই আমি মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, সে আমাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অত কি ভাবছ গা? কলকাতায় যেতে বলেছি বলে রাগ হল বুঝি?"

বলিলাম, "না, রাগ হবে কেন?"

"তবে? মুখখানি অমন করে রয়েছ যে?"

খোলাখুলি বলিয়াই ফেলিলাম। জানি, ইহা শুনিয়া তাহার দেমাক বাড়িবে,—তা বাড়ে বাড়ুকগে! বলিলাম, "তোমায় ছেড়ে একলা আমি কলকাতায় কি করে থাকবো, তাই ভাবছি!"

একথা শুনিয়া তাহার মুখখানি প্রসন্ন হইল। মিষ্টস্বরে বলিল, "তা কি করবে বল? পুরুষমানুষ হয়ে যখন জন্মেছ, তখন এ সব কষ্ট না সইলে চলবে কেন? পুরুষমানুষ বিদেশে যখন চাকরি করতে যায়, সবাই কি আর বউকে গলায় বেঁধে নিয়ে যায়? ঐ ত মিত্তিরদের যদুবাবু রয়েছে, চাটুয্যেদের কেদারবাবু, তারপর তোমার গিয়ে ঐ হারাণ ঘোষ—কেউ বিদেশে চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ বউকে ত নিয়ে গিয়ে সঙ্গে রাখে না। ছুটিছাটা হলে বাড়ী আসে।"

আমি বললাম, "ওগো, ওটা কি জান? ওটা হচ্ছে সহ্যগুণের কথা, ওদের সহ্যগুণ বেশী, তাই ওরা পারে। এই দেখ না কেন, কেউ বা দশ ক্রোশ পথ স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারে, কারু বা দুক্রোশ হাঁটতেই জিভ বেরিয়ে পড়ে। সবাইকার সহ্যগুণ কি আর সমান? তোমার সহ্যগুণ বোধহয় আমার চেয়ে ঢের বেশী।"

বউ বলিল, "বেশীই ত! সহ্য করিতে শিখতে হয়।"

এ কথা শুনিয়া আমার মনে একটু অভিমান হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "শিখতে হয় বললে, এটা কিন্তু ভুল। এটা জিওমেট্রি না অ্যালজ্যাবরা যে শিখতে হবে? অভ্যাস করতে হয় বলা তোমার উচিত ছিল।"

বউ বলিল, "ঐ হল, যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি। আমি ত আর তোমার মত পাস করিনি।"—বলিতে বলিতে তাহার মুখে স্বামীগর্ব্ব স্পষ্টতঃ ফুটিয়া উঠিল। সত্যই ত, গ্রামের কয়টা মেয়ের পাস-করা স্বামী আছে? বিশেষ সদ্‌গোপের ঘরে। আমার মনের ব্যথাটুকু দূর হইয়া গেল!—গ্রামের হারাণ ঘোষ কলিকাতায় চাউলের কারবার করে। চাউল কিনিবার জন্য সে গ্রামে আসিয়াছিল, তাহাকে ধরিলাম। সে বলিল, "বেশ, চল আমার সঙ্গে কলকাতায়। আমার ত সেখানে একটা বাসা আছে, যতদিন না চাকরি-বাকরি হয়, আমার বাসায় থাকবে, খাবে-দাবে, চাকরির চেষ্টা করবে।"—হারাণ বয়সে আমার চেয়ে ৫/৬ বৎসরের বড়। তাহাকে আমি হারুদাদা বলিয়া ডাকি। সে লেখাপড়া না জানিলেও দশ বৎসর কলিকাতাবাসের ফলে বেশ চালাক-চতুর হইয়াছে। মনটাও তার সাদা।

যাত্রার পূর্ব্বদিন বাড়ী-ঘরে তালা বন্ধ করিয়া, বউকে তাহার বাপের বাড়ীতে লইয়া গেলাম। স্থির হইল, শ্বশুর সর্ব্বদা আসিয়া আমার বাড়ী-ঘর দেখাশুনা করিবেন।

সে রাত্রে বউ ত কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইল। আমিও চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলাম, "বাঃ এই বুঝি তোমার সহ্যগুণ?"

সে বলিল, "সহ্যগুণের মুখে আগুন, তুমি কবে আসবে তাই বল?"

"চাকরি-বাকরি একটা জুটুক—তবে ত আসবো।"

"যদি জুটতে দেরীই হয়, এক মাস বাদে তুমি এসে একবার আমায় দেখা দিয়ে যেও। বুঝলে?"

"বেশ, তাই আসবো।"

পরদিন দ্বিপ্রহরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

শ্বশুর মহাশয় আমাকে হারাণ ঘোষের হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাকে অনেক মিনতি করিলেন, যাহাতে আমাকে কোনও অমঙ্গল স্পর্শ করিতে না পারে।

।। দুই ।।

হাওড়া স্টেশনে নামিয়া হারুদা আমাকে লইয়া ট্রামযোগে ভবানীপুরে উপস্থিত হইল। এক স্থানে ট্রাম হইতে আমরা নামিলাম। হারুদা বলিল, "এইটি হচ্চে জগুবাবুর বাজার।" বড় রাস্তা দিয়া খানিক গিযা হারুদা একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু দূরে একটা ছোট পুরাতন একতলা বাটীর সামনে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বুঝি তোমার বাসা? কিনেছ, না ভাড়া দাও?"—হারুদা বলিল, "মাসে বাইশ টাকা করে ভাড়া দিই।"

অল্পক্ষণ পরে, ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "কে?"—স্ত্রীলোকের কণ্ঠ।

হারুদা বলিল, "আমি। খোল।"

দ্বার খুলিল। দেখিলাম, ২৩/২৪ বৎসর বয়স্কা একজন সধবা স্ত্রীলোক। আমাকে দেখিয়াই সে মাথায় ঘোমটা দিল।

হারুদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও উঠানে প্রবেশ করিলাম। হারুদা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ছিলে ত ক্ষান্ত?"—স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ!

উঠানের কোণে চৌবাচ্চায় কল্ কল্ করিয়া কলের জল পড়িতেছে। "ক্ষান্ত, তামাক সাজ একটু"—বলিয়া হারুদা আমাকে লইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, "জামা খুলে ফেল। সঙ্গে গামছা আছে ত? হাত-পা ধুয়ে ফেল। তারপর একটু চা খাওয়া যাবে।"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হারুদা, এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে নাকি?"

"না, আবার কে থাকবে?"

"ও স্ত্রীলোকটি কে?"

"বামনী। রাঁধে-বাড়ে—কাজ-কর্ম্ম করে।"—বলিয়া হারুদা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

বাড়ীতে আর কেউ নাই, কেবল হারুদা আর ঐ যুবতী স্ত্রীলোক—তার উপর সেই হাসি দেখিয়া, ব্যাপারটা আমি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করিলাম এবং তাহার "সহ্যগুণের" রহস্যটাও বুঝিতে বাকী রহিল না।—হাত-পা ধুইতে ধুইতে আমি মনে মনে স্থির করিলাম, ও স্ত্রীলোকের হাতে আমি খাইব না। আমি নিজে রাঁধিয়া খাইব। ওর ছোঁয়া জলও পান করিব না।

মুখ-হাত ধুইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, হারুদা হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছে, আর "বামনী" হারুদার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা বলিতেছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তক্তপোষের উপর হারুদার পাশে বসিয়া আমি বলিলাম, "হারুদা, আমার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?"

"কেন, আমরাও যা খাব, তুমিও তাই খাবে।"

বলিলাম, "কিন্তু তোমার ও বামনীর হাতে আমি খেতে পারবো না দাদা; হিঁদুয়ানী বলে একটা জিনিষ আছে ত?"—হারুদা গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি কি মনে করেছ, ও বামুনের মেয়ে নয়? সত্যি ও বামুনের মেয়ে। মেদিনীপুর জেলায় ওদের বাড়ী। ওর এক ভাই রয়েছে কলকাতায়, সে বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ী রাঁধে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু দাদা, তবু—"

হারুদা বলিল, "তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। আর ভাই, হিঁদুয়ানী কি আমারই নেই? কিন্তু শাস্ত্রে যে বলেছে, প্রবাসে দোষং নাস্তি। কত সুবিধে, বুঝছ না? পরিবার নিয়ে এসে এ কলকাতা সহরে বাস করতে হলে খরচ কত পড়ে যেত? এ রাঁধুনীকে রাঁধুনী, ঝিকে ঝি, ভাত-কাপড় দিয়েই খালাস।"—আমি বলিলাম, "তা হোক দাদা, তুমি এক কাজ কর। আমায় তুমি একটু জায়গা দাও, আমি নিজেই রেঁধে-বেড়ে খাব এখন।"

হারুদা বলিল, "জায়গা তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু হাত পুড়িয়ে নিজে বেঁধে খাওয়া কি তোমার পোষাবে? তার চেয়ে বরং এক কাজ করতে পার। গলিতে ঢোকবার সময় ঐ মোড়ই দেখছ ত সাইনবোর্ড রয়েছে "পবিত্র হিন্দু হোটেল"—ঐখানেই বরং দুবেলা গিয়ে খেয়ে আসতে পার। এ-বেলা তিন আনা, ও-বেলা তিন আনা—এই ছ আনা করে রোজ লাগবে।"

আমি বলিলাম, "তবে দাদা, সেই ব্যবস্থাই আমায় করে দিও।"

ক্ষান্তমণি দুই পেয়ালা চা লইয়া আসিল। তাহার ঘোমটার বহর এখন কমিয়াছে, মুখ কতকটা দেখা যাইতেছে। হারুদা এক পেয়ালা লইয়া আমার দিকে ধরিয়া বলিল, "চা খাও হে।"—আমি বলিলাম, "না হারুদা, চা খাব না, সহ্য হবে না।"

হারুদা বলিল, "কেন, আমাদেব সহ্য হয়, তোমার হবে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার মত সহ্যগুণ আমি কোথায় পাব হারুদা?"

চা-পান করিয়া হারুদা বলিল, "তুমি বস ভাই, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।"—বলিয়া গামছা কাঁধে করিয়া কলতলার দিকে গেল। আমি সেই তক্তপোষেই বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম—যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি কেমন করিয়া তাহা সিদ্ধ করিব?

মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া হারুদা বলিল, "চল, একবার দোকানে যাওয়া যাক্। পথে, তোমার হোটেলের বন্দোবস্তটাও অমনি করে যাব।"—বলিয়া তিনি হাঁকিলেন, "পাণ সাজা হল গা তোমার?"

ক্ষান্তমণি কাঁসার ডিবার একটি খোলে চারিটি পাণের খিলি আনিয়া হারুদার হাতে দিল। হারুদা নিজে দুটি লইয়া আমায় দুটি দিল। লইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ফিরাইয়া দিতেও চক্ষুলজ্জা হইল। ফি হাত কাঁহাতক আর "এটা খাব না" "ওটা খাব না" বলা যায়! পাণ লইয়া মুখে দিয়া হারুদার সঙ্গেই বাহির হইলাম।

গলির শেষে মোড়ে পৌঁছিয়া, হারুদা আমাকে লইয়া সেই "পবিত্র হিন্দু হোটেলে" প্রবেশ করিয়া ডাকিতে লাগিল, "চক্রবর্তী মশাই—ও চক্রবর্তী মশাই!" হোটেলের মালিক বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারুদা তাঁহার নিকট সবিস্তারে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি দুবেলা এখানে খাবেন। কিন্তু চার্জ্জো সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করতে হবে চক্রবর্ত্তী মশাই। চাকরি-বাকরির চেষ্টায় আসা, অবস্থা ত বুঝতেই পারছেন।"

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলেন, "তা যখন উনি আপনার লোক, তখন আর কথা কি। তিন আনাব জায়গায় উনি না হয় দু আনা করেই দেবেন, দু বেলায় চার আনা। আপনি তা হলে ক'টার সময় আসবেন নগেনবাবু? এই ৯টা আন্দাজ আমাদের রান্নাবান্না শেষ হয়ে যায়।

নয়টার পর আসিব বলিয়া, হারুদার সঙ্গে আমি তাঁহার দোকানে চলিলাম। বলিলাম,

"হারুদা, তোমার খুব খাতির ত, এক কথায় ছ আনার জায়গায় চার আনা হয়ে গেল!"

হারুদা হাসিয়া বলিলেন, "আমার দোকান থেকে চক্রবর্ত্তী উঠনোয় চাল নেয় যে!"

দোকানখানি তেমন বড় নয়,—তবে বড় রাস্তার উপর, তাই খরিদ্দার অনেক আছে। ঘণ্টা দুই হারুদা তাঁহার দোকানের হিসাবপত্র দেখিলেন। তারপর টাকা-কড়ি থলিয়াতে বাঁধিয়া আমায় বলিলেন, "চল হে, নগেন।"

গলির মোড়ে আসিয়া বলিলেন, "তুমি ঢোক,—একেবারে খেয়েই এস। বাড়ী চিনতে পারবে ত? সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি, ১৯ নম্বর বাড়ী।"

"হ্যাঁ, চিনতে পারবো বইকি!" বলিয়া আমি সেই পবিত্র হিন্দু হোটেলে ঢুকিলাম।

খাদ্য যাহা খাইলাম, সারাদিন অভুক্ত ছিলাম বলিয়াই সে সমস্ত উদরসাৎ করিয়া ফেলিলাম, নহিলে সাধ্য হইত না।

॥ ৩ ॥

হারুদাদার আশ্রয়ে এইভাবে বাস করিতে লাগিলাম। কি ভাবে, কাহার কাছে গিয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে, হারুদাদাকে সে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তাহাতে উত্তর করিলেন, বড় বড় আফিসে গিয়া বড়বাবুদের সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত। কোথায় আফিস, তাও চিনি না, বড়বাবুরা কোথায় থাকেন, তা-ও জানি না। হারুদা একদিন অবসর মত আমায় আফিস অঞ্চলে লইয়া গিয়া কয়েকটি আফিস চিনাইয়া দিলেন।

প্রতিদিন আহারের পর আমি চাকরির চেষ্টায় আফিস অঞ্চলে যাই, ঘুরি ফিরি, বিকালে পদব্রজেই ভবানীপুরের বাসায় ফিরিয়া আসি। যেখানেই যাই, সেখানেই তাড়া খাই। দেশে থাকিতে মনে করিতাম, পাশ করিয়া আমি মস্ত একটা 'কেউকেটা' হইয়াছি। এখন দেখিলাম, আমি ত একটা মাত্র পাস, কত বি-এ, এম-এ চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ তাহাদের ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না।

কিছু দিন এইভাবে হাঁটাহাঁটি করিয়া আমার ভারি বিরক্তি ধরিয়া গেল। বাবা ছিলেন অত্যন্ত সেকেলে, ভালমানুষ লোক। আজকাল চাকরির বাজার যে কিরূপ, তাহা তিনি জানিতেন না বলিয়া আমার সম্বন্ধে মনে তিনি ওরূপ অভিপ্রায় পোষণ করিতেন। ভাবিলাম, আসিয়াছি যখন, আরও দিনকতক না হয় দেখি। তারপর দেশে ফিরিয়া যাইব।

হঠাৎ এক অচিন্ত্যনীয় বিপদের মধ্যে পতিত হইলাম। দিনান্তে বাসায় ফিরিতেছিলাম। সে দিন একটু বিলম্বই হইয়া গিয়াছিল। ময়দানের পথ ধরিয়া আসিতেছিলাম, একটা রাস্তা পার হইবার সময় অতর্কিতে একটা মোটরগাড়ী আমার উপর আসিয়া পড়িল। ভীষণ একটা ধাক্কা খাইলাম, এইটুকুমাত্র আমার স্মরণ আছে—তারপর সব অন্ধকার!

যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম, আমি এক পালঙ্কেব উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছি। মাথার উপর বিদ্যুৎ পাখা মৃদুভাবে ঘুরিতেছে। স্পষ্ট দিব্যলোক, কিন্তু ঘরে মনুষ্য নাই।

পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। পিঠে-কোমরে অত্যন্ত ব্যথা। কি করিয়া যে আমি এখানে আসিলাম, তাহা কিছু স্মবণ করিতে পারিলাম না; তবে এটুকু মনে পড়িল যে, আমি নগেন্দ্র মণ্ডল, ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছি, চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমি যে মোটর চাপা পড়িয়াছিলাম, এ কথা আমার তখন কিছুমাত্র স্মরণ হইল না।

কক্ষটির চারিদিকে আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। আসবাবপত্রগুলি সমস্তই মূল্যবান। ইহা কোনও ধনী ব্যক্তির গৃহ, তাহা বেশ বুঝিলাম। কিন্তু আমি এখানে আসিয়া এ বিছানায় শুইলাম কি করিয়া?—শুইয়া শুইয়া এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় কাহার পদশব্দ শুনিতে

পাইলাম। দেখিলাম, একজন সুবেশা রমণী, বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর, চটিজুতা পায়ে দিয়া পালঙ্কের নিকট আসিতেছেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

নিকটে আসিয়া মহিলাটি বলিলেন, "এই যে, জেগেছেন আপনি? কেমন আছেন বলুন দেখি?"—কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মুখ দিয়া কোনও শব্দ বাহির করিতে পারিলাম না। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

রমণী আমার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না, জ্বর আর নেই, জ্বরটা তাহলে ছেড়েছে। এখন কি কষ্ট আছে আপনার বলুন দেখি।"—আমি পূর্ব্ববৎ তাঁহার পানে নীরবে চাহিয়া রহিলাম, তিনি বলিলেন, "আমার কথায় উত্তর দিচ্ছেন না কেন? উত্তর দিন।"

আমি প্রাণপণে কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

এই সময় আর একজনের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই রমণীব পার্শ্বে আসিয়া যে দাঁড়াইল, সে বালিকা, অত্যন্ত সুন্দরী, বয়স বোধ হয় ১৬/১৭ মাত্র। আমার চোখের পানে চাহিয়াই সে বলিয়াই উঠিল, "এই যে, ইনি জেগেছেন দেখছি!"—মহিলাটি বলিলেন, "জেগেছে ত, কিন্তু কথা কইছে না যে! তুই কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি লায়লী!"

মেয়েটি বলিল, "আমি কি জিজ্ঞাসা করব মা? তুমিই জিজ্ঞাসা কর।" বলিয়া একদৃষ্টে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আমি একবাব তার মুখের দিকে একবাব তার মা'র মুখেব দিকে চাহিতে লাগিলাম। মা-ও সুন্দরী বটে, কিন্তু মেয়ে তাব বহুগুণ অধিক সুন্দরী। মহিলাটি এইবার প্রায় চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি? বাড়ী কোথায়?"

আমি পূর্ব্ববৎ নীরব। তিনি কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখলি? আমার বোধ হয় ছেলেটি বোবা-কালা।" বোবারা সাধারণতঃ কালাও হইয়া থাকে, এই কাবণেই বোধ হয়, আমাকে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া ইনি আমায় কালাও স্থিব করিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল, "তাই হবে মা। নইলে আর মোটর চাপা পড়ে! যাক্, এত দিনে আমার মনের আপশোষ গেল। সেই দিন থেকে মা, খালি আমার মনে হত,—ছি ছি, কি করলাম? শেষে মানুষ চাপা দিলাম! তা হলে মা, আমার ত কোনও দোষ ছিল না, দেখতে পাচ্ছ ত!"

"মোটর চাপা দিলাম" শুনিবামাত্র আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ঠিকই ত বটে, আফিস-অঞ্চল হইতে বাসায় ফিরিবার সময় মোটরেই ধাক্কা খাইয়াছিলাম। এই মেয়েটিই বোধ হয় সে মোটরে ছিল, অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আমায় বাড়ী আনিয়াছে। সে কবে, কত দিন হইল কে জানে!

সকল কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিবার জন্য চক্ষু মুদিলাম। তারপর কখন আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।—আবার যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম, পালঙ্কের নিকট সেই মহিলাটি দাঁড়াইয়া, এবং চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসিয়া আমার নাড়ী টিপিয়া আছেন। আমাকে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?" আমার উত্তর শুনিতে না পাইয়া বলিলেন, "এবার দুধটুকু খাইয়ে দিন পিয়ারী বিবি।"

লায়লী, পিয়ারী বিবি।—এরা মুসলমান নাকি? কিন্তু সাজপোষাক ত হিন্দুরই মত। জাতটা বোধ হয় গোল্লায় গেল। কিন্তু উপায় কি?

পিয়ারী বিবি একটা নলওয়ালা চীনা মাটির পাত্র আনিয়া আমার মুখে একটু একটু করিয়া দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। দুধ পান করিয়া আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক, ইংরাজি পোষাক পরা, ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পিয়ারী বিবির সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পিয়ারী বিবি সেই পুরুষকে "নবাব সাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

"নবাব" ইতিপূর্ব্বে কখনও চক্ষে দেখি নাই, লোকটির মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, নবাব যদি ত ইংরাজী পোষাক কেন? তাঁহারা নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, কোনও কথা আমি শুনিতে পাইলাম না।

নবাব সাহেব চলিয়া গেলে আমাকে আবার দুগ্ধ পান করানো হইল।

পরদিন প্রাতে আমার মনে হইল, আমি বোধ হয় উঠিয়া বসিতে পারি। চেষ্টা করিলাম, কৃতকার্য্যও হইলাম। লায়লী আসিয়া বলিল, "এই (. আপনি উঠে বসেছেন! মাকে ডেকে আনি।"—বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

॥ ৪ ॥

তিন চারি দিন পরে আমি খাট হইতে নামিতে পারিলাম, ঘরের মধ্যে একটু চলিয়া বেড়াইলাম। পরদিন খোলা ছাদে বাহির হইয়া একটু বেড়াইলাম। সেদিন লায়লী একটি বড় গোলাপ ফুল আনিয়া আমায় উপহার দিল। ফুলটি লইয়া আমি মাথায় ঠেকাইয়া, মাথা ঝুঁকাইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

তিন চারি দিন পরে আমি সেই শয়নকক্ষে একটা চেয়ারে বসিয়া আছি, পিয়ারী বিবি অদূরে বসিয়া এক টুকরা রেশমের উপর সূচের সাহায্যে ফুল তুলিতেছিলেন, এমন সময় সেই নবাব সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিয়ারী বিবি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলেন। আমিও তাহার দেখাদেখি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিলাম। নবাব সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বা রে বোবা-কালা, তোর ত বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি!"

তাঁহারা বসিলে, আমিও উপবেশন করিলাম। তখন তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল—নবাব সাহেব। চল না ও-ঘরে একটু বিশেষ কথা আছে।

পিয়ারী। এখানেই বলুন না—আর, ও ত বোবা-কালা, ওকে আর ভয় কি?

ইহা শ্রবণমাত্র আমার মনে একটা প্রবল কৌতূহল জন্মিল। ব্যাপার কি? কিন্তু মনের সে ভাবটা দমন করিয়া, আমি নির্লিপ্তভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলাম।

নবাব সাহেব।...মহারাজ ত আর বেশী দিন এখানে থাকবেন না। আমাদের শেষ কথা জানতে চান।—(নবাব সাহেব পশ্চিমের একজন বিখ্যাত করদ নৃপতির নাম করিলেন।)

পিয়ারী। পাঁচ লাখের কম কি আর রাজী হওয়া যায়?

নবাব। তিনি কিন্তু দুলাখের বেশি উঠতে চাচ্ছেন না। তিন লাখ বলবো? তোমার এক আমার দুই।

পিয়ারী। আমার এক, আপনার দুই বইকি! আধা-আধি।

নবাব। আচ্ছা, তাই তাই। কিন্তু লায়লীকে কি রাজী করানো যাবে? ও ত মহারাজের নাম শুনলে জ্বলে যায়।

পিয়ারী। না, সে আমি ওর মন বুঝে দেখেছি। ও কিছুতেই রাজী হবে না।

নবাব। সেই বুঝেই মহারাজ একটা ফন্দী বের করেছেন। তিনি বলেন, তুমি আমি লায়লীকে নিয়ে দেশ বেড়াবার ছলে ওঁর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হই। উনিও তার পরেই রাজ্যে ফিরে যাবেন। তখন লায়লীকে ওঁর হাতে দিয়ে আমরা চলে আসবো। আমাদের যাতায়াতের সমস্ত খরচ মহারাজ দেবেন বলেছেন।

পিয়ারী। এ পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু কোনও পুলিশ হাঙ্গামা হবে না ত?

নবাব। ইংরাজের পুলিশ সেখানে কোথা? সেখানে ওঁর নিজের পুলিশ। উনি যা খুশী তাই করতে পারেন। মহারাজ যদি ওকে খুনও করে ফেলেন, তা হলেও কেউ বলবার নেই।

পিয়ারী। খুন করবে নাকি? তা হলে কিন্তু আমি মেয়ে দেবো না নবাব সাহেব। নাই বা হল পেটের মেয়ে, এত দিন পুষেছি, একটা মায়া জন্মে গেছে ত! আখেরে ওর ভাল হবে, রাজরাণীর মত সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমি রাজী হয়েছিলাম।

নবাব। না না, পাগল নাকি? খুন করবে কেন? ওর উপর মহারাজের ভয়ানক ঝোঁক হয়েছে—মিষ্টি কথা বলে, ভালবেসে, ক্রমে ওকে বশীভূত করে নেবেন।

পিয়ারী। এত ঝোঁকই হয়েছে যদি, তবে পাঁচ লাখ দিতে রাজী হচ্ছেন না কেন? আড়াই লাখ পেলে আপনার অনেকটা দেনাই ত মিটে যেত।

নবাব। চেষ্টা করতে আমি কি কসুর করছি, না করবো? যদি তিন লাখের বেশী মহারাজ উঠতে না-ই চান, তা হলে দেড় লাখ তোমারই বটে, কিন্তু আপাততঃ এক লাখ তুমি নিয়ে দু লাখ আমায় দিও পিয়ারী। তা হলে দুটো বড় বড় মহল আমি ছাড়িয়ে নিতে পারবো, আমার আয় বাড়বে, তোমার টাকা আমি দুই এক বছরেই শোধ করে দেবো।

পিয়ারী। মহারাজ কবে আমাদের যেতে বলেন?

নবাব। তিনি এক হপ্তার বেশী আর কলকাতায় থাকতে চাইছেন না। বলছেন, আমি যে দিন রওনা হব, তার দুই এক দিন আগেই তোমরা রওয়ানা হলে ভাল হয়।

পিয়ারী। তা হলে আজ থেকে ধরুন, পাঁচ দিন পরে। কালা-বোবাটার সম্বন্ধে কি করা যায়?

নবাব। ও ত এখন ভাল হয়েছে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে। ওকে তখন বিদায় করে দিলেই হবে।

পিয়ারী। সেই ভাল।

নবাব। এখন তবে আমি উঠি পিয়ারী।

পিয়ারী। এখনই যাবেন? সন্ধ্যার পর আসবেন কি?

নবাব। না, আজ নয়। বড় ব্যস্ত আছি। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যার পর এসে তোমার দুটো গান শুনবো।

পিয়ারী। এখানে কিন্তু আপনার খাবার তৈরী থাকবে।

নবাব। বেহেতর।

ব্যাপার আমি সবই বুঝিলাম। এই নর-রাক্ষস ও নারী-রাক্ষসীর প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধে আমার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি নবাবকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিলাম।

নবাব আবার আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "গুড্ বয়। গুড্ বয়!" পিয়ারী নবাবের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।—সে রাত্রে লায়লী আসিয়া আমার খাবার দিল। দুধে ভিজানো পাঁউরুটী এবং একটা আপেল। আমি আহার-দাত্রীর পানে বিষণ্ন-নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহার শেষ করিয়া পিয়ারী লায়লীকে বলিল, "আজ নবাব সাহেব রাত্রে এখানে খাবেন। আমি মার্কেটে চললাম। তুই ঘর-দোর দেখিস শুনিস, বুঝলি?"

লায়লী বলিল, "আচ্ছা মা।"

"খানিকটা সেগো-পুডিং তৈরী করা আছে,—বেলা তিনটের সময় বোবা-কালাকে খেতে দিস।"—"আচ্ছা। তুমি কখন ফিরবে মা?"

"আমার ফিরতে চারটে বাজবে।"—বলিয়া পিয়ারী প্রস্থান করিল। গাড়ীবারান্দা হইতে শব্দ করিয়া মোটরগাড়ী বাহির হইয়া গেল, আমি শুনিতে পাইলাম।

লায়লী তখনও সেই ঘরে দাঁড়াইয়া, জানালায় মুখ দিয়া বাহিরে কি দেখিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে মুখ ফিরাইল, আমি অমনই তাহাকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিলাম—লায়লী আশ্চর্য্য হইয়া আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমি হস্তেঙ্গিতে তাহাকে কাগজ পেন্সিল দিতে বলিলাম।

অদূরে একটি টেবিলের উপর হইতে সে একটা রাইটিং-প্যাড এবং পেন্সিল আনিয়া আমার হাতে দিল।

আমি প্যাডে লিখিলাম—"আমি কালা ত নই-ই, জন্ম-বোবাও নই। তোমার মোটরের

ধাক্কা খেয়েই আমি বাক্‌শক্তি হারিয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। লিখবো কি? তুমি উত্তর দাও, আমি সে কথা শুনতে পাব।"—লায়লী সবিস্ময়ে বলিল, "কি কথা?"

আমি লিখিলাম, "কাল বিকেলে যখন নবাব সাহেব এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার পালিকা মা'র অনেক কথাবার্ত্তা আমি শুনেছি। আমাকে কালা মনে করে তাঁরা অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা চালিয়েছিলেন। তাঁদের কথা থেকে আমি বুঝেছি যে, তোমার সম্মুখে মহাবিপদ।"

লায়লী বলিল, "অ্যাঁ, বলেন কি? কি বিপদ?"

লিখিলাম, "তুমি...মহারাজকে জান?"

"হ্যাঁ, জানি। তিনি আমাকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে যেতে চান।"

লিখিলাম, "তুমি একান্ত অনিচ্ছুক, তা-ও আমি ওঁদেরই মুখে শুনেছি। নবাব সাহেব আর তোমার পালিকা মা, একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছেন। দেশ-ভ্রমণের ছলে, তোমাকে নিয়ে তাঁরা সেই রাজ্যে গিয়ে, তিন লক্ষ টাকায় তোমাকে রাজার নিকট বিক্রী করে আসবেন।"

লায়লী বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! আপনি বলেন কি? তবে আমার কি হবে?"

লিখিলাম, "তুমি কি এঁদের আশ্রয় পরিত্যাগ করতে চাও?"

সে বলিল, "নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি কখনও সে পোড়ার মুখো রাজার উপরাণী হব না তার চেয়ে বরং আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো।'—লিখিলাম, "ইচ্ছা করলে তুমি পালাতে পার!"

"কাজেই। আমি যদি বলি, না, আমি তোমাদের সঙ্গে দেশভ্রমণে যাব না, ওরা হয়ত আমায় কিছু খাইয়ে-টাইয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে ট্রেনে তুলবে। মায়া-দয়া ত নেই, পেটের মেয়ে ত নই আমি। আমার আসল মা এই কলকাতায় গঙ্গা নাইতে এসে আমায় হারিয়ে ফেলেন। আমি যাদের হাতে পড়ি, আমায় খুব সুন্দরী দেখে, এই পিয়ারী বাইজী তাদের কাছ থেকে আমায় কিনে নিয়ে পুষেছে। আমার এক দিনও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না—এক মুহূর্ত্ত না। পালাতেই হবে আমায়। কিন্তু পালিয়ে আমি কোথায় যাব, আমায় বলে দিন আপনি। আমায় রক্ষা করুন।'—বলিয়া লায়লী কাতরভাবে আমার দুই হাত জড়াইয়া ধরিল।

আমার তখনই মনে হইল, ইহা ত ভাল নহে!—একজন অনাত্মীয়া মেয়ে নির্জ্জনে এমনভাবে আমার হাত জড়াইয়া ধরিবে, সেটা কি উচিত? আমি হাত ছাড়াইয়া প্যাডে লিখিলাম—"তুমি যদি আমায় দাদা বল, তবে আমি তোমার উদ্ধারের উপায় করতে পারি।"

লায়লী বলিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়। আপনি দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন, আমি আপনার মায়ের পেটের বোনের মতই চিরদিন আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবো।"

লিখিলাম, "আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমিও বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বিছানায় শুয়ে একটা কোনও উপায় চিন্তা করি। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা? কলকাতা ত?"

লায়লী বলিল, "হ্যাঁ, কলকাতা বইকি, পার্ক লেন; কিছু দূরেই লোয়ার সার্কুলার রোড।"

"পিয়ারী কি হিন্দু, না মুসলমান?"

"হিন্দু। তবে বাইজী কিনা, তাই মুসলমানী নাম নিয়েছে। আমাকেও বাইজী বানাবে বলে আমারও মুসলমানী নাম দিয়েছে—নইলে আমার আগেকার নাম ছিল—হিরণকুমারী।"

"বেশ। তুমি এখন যাও।"

"আচ্ছা দাদা"—বলিয়া সে আমার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল। আমিও খাটে উঠিয়া

শুইলাম।—উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িল—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।—সন্ধ্যার পর আবার ঘুম ভাঙ্গিলে, কক্ষান্তর হইতে গানের শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম, নবাব সাহেব আসিয়াছেন।

।। ৫ ।।

পরদিন অপরাহ্নকালে লায়লী আমার ঘরে আসিলে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মা কোথায়?"—সে কহিল, "নবাব সাহেব এসে মাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গেছে। বোধ হয় তারা সেই রাজা পোড়ারমুখোর সঙ্গে দেখা করতে গেছে—কারণ, শুনলাম, শোফারকে হুকুম দিলে গ্র্যান্ড হোটেল। সেই রাজা পোড়ারমুখো গ্র্যান্ড হোটেলে থাকে কিনা।—হ্যাঁ দাদা, আপনার বোনটির উপায় কিছু স্থির করলেন?"

আমি লিখিলাম, "ভেবে চিন্তে দেখলাম, তোমার শুধু পালালেই চলবে না, কোনও নিরাপদ স্থানে কিছুকাল তোমার লুকিয়ে থাকা দরকার। তাই ভাবছি, তোমায় আমাদের দেশে নিয়ে যাব, সেখানে আমার স্ত্রী আছেন, তাঁর কাছে তুমি থাকবে। এরা আমার নাম-ধাম কিছুই জানে না, কস্মিন্‌কালেও তোমায় খুঁজে বার কবতে পারবে না।"

"আপনার দেশ কোথা দাদা? বউদিদির নাম কি?"

লিখিলাম—"সে সবই দুদিন পরে জানতে পারবে। এখন বাজে কথার সময় নষ্ট কোরো না। আমি যে তোমায় নিয়ে যাব, আমার কাছে কিন্তু টাকা-কড়ি কিছুই নেই। ভবানীপুরে আমার বাসায় কিছু টাকা আছে বটে, কিন্তু সেখানে গিয়ে আনি কি কবে?"

লায়লী বলিল, "টাকার জন্যে কোনও ভাবনা নেই, দাদা। আমাব কাছে শ-খানেক নগদ টাকা আছে। তাতে হবে না?"—লিখিলাম, "ঢেব হবে। তোমাব মা কি তোমাব কাছে কখনও দেশভ্রমণে যাবার কথা পেড়েছে?"

"না। আজ রাজার সঙ্গে সব কথা পাকাপাকি করে এসে বোধ হয় বলবে।"

লিখিলাম, "তুমি মৌখিক আহ্লাদ প্রকাশ কোরো। তা হলে ওদেব কোনও সন্দেহ হবে না। তাবপর, সুযোগ বুঝে তোমাকে নিয়ে আমি পালাবো।"

"আপনার দেশে যেতে হলে কোন্ ইষ্টিশানে গাড়ী চড়তে হয় দাদা? শিয়ালদা না হাওড়া?"

"হাওড়া।"

"ভালই হয়েছে। দেখুন, হাওড়ায় আমরা ট্রেনে উঠবো না। এবা হয়ত আমাদের না দেখতে পেয়ে, হাওড়া আর শিয়ালদহে লোক পাঠাবে আমাদের ধরতে। তার চেয়ে বরং ট্যাক্সিতে আমরা চন্দননগর কি ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত গিয়ে ট্রেনে উঠবো। কেমন, সেই ভাল হবে না?"

"সেই ভাল হবে।"

পরদিন প্রভাতে লায়লী আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, "কাল সন্ধ্যায় পঞ্জাব মেলে দেশভ্রমণে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাল ভোরেই আমাদেব পালানো দরকার।"

দ্বিপ্রহরে নবাব সাহেব আসিয়া পিয়ারীকে লইয়া জিনিষপত্র কিনিতে গেলেন। লায়লীকেও তাঁহারা সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিরঃপীড়ার ছুতা করিয়া সে গেল না।

খালি বাড়ী পাইয়া আবার আমাদের পরামর্শের বৈঠক বসিল। লায়লী বলিল, "নবাব আজ রাত্রে এখানেই থাকবে। দুজনেই মদ খাবে, কাল বেলা ৮টা ৯টার কম ওদের ঘুম ভাঙ্গবে না। চাকর-বাকর সকলেই জানে, নবাব সাহেব রাত্রে এখানে থাকলে ওরা কখন ওঠে, তাই তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে বেলা অবধি ঘুমোয়।"

পরামর্শ স্থির হইল, ভোর পাঁচটায় লায়লী আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দিবে, আমরা উভয়ে পদব্রজে বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়া সেখানে ট্যাক্সি ধরিব।

বেলা তখন ৯টা হইবে, আমাদের ট্যাক্সি পুরা দমে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া ছুটিতেছিল। কিছু দূরে দেখা গেল, কয়েকখানা গোরুর গাড়ী রাস্তার মধ্যভাগ জুড়িয়া চলিয়াছে। সে গাড়ীগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাইবার জন্য ট্যাক্সিচালক ক্রমাগত হর্ণ দিতে লাগিল, নিজ গাড়ীর বেগও কমাইয়া দিল। গাড়ীগুলা পাশে গেলও। কিন্তু আমাদের ট্যাক্সিটা গাড়ীগুলার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া হর্ণ দিবামাত্র একটা গাড়ীর গরু ভয় পাইয়া, ছুটিয়া গাড়ীখানা আড়াআড়িভাবে রাস্তার মধ্যস্থলে লইয়া গেল! ফলে আমাদের ট্যাক্সি ভীষণ ধাক্কা খাইয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ খালের দিকে কাৎ হইয়া পড়িল। আমি ছিটকাইয়া কিয়দ্দূরে আছাড় খাইয়া পড়িবামাত্র হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—বাপ্!

কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। ট্যাক্সি কাৎ হইবার পূর্ব্বেই ড্রাইভার লাফ দিয়া নামিয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, গাড়ীর দরজা খুলিয়া, লায়লীর হাত ধরিয়া তাহাকে সে টানিয়া বাহির করিতেছে।

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া লায়লী থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। দুই হাতে নিজ মাথা চাপিয়া ধরিল। আমি যেখানে পড়িয়াছিলাম, সেইখান হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড্ড লেগেছে লায়লী?"

অস্ফুট স্বরে যাহা বলিল, তাহা বুঝিতে পারলাম না। এই সময় কলিকাতার দিক হইতে আর একখানি মোটরগাড়ী ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। আমি ভাবিলাম, "এই রে! আমাদের ধরতে আসছে বোধ হয়।" কিন্তু দেখিলাম, সে আশঙ্কা অমূলক। এক সাহেব ও এক মেম সে গাড়ীর আরোহী। আমাদের অবস্থা দেখিয়া, তাহারা গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমাদের নিকট আসিল। লায়লীর অবস্থা দেখিয়া সাহেব বলিল, "মেয়েটি মূর্ছা যাইতেছে—"বলিয়া পকেট হইতে ব্র্যান্ডি-ফ্লাস্ক বাহির করিয়া লায়লীকে পান করাইয়া দিল। বলিল, "কুছ ডর নেই বেটী! আভি আচ্ছা হো যায়গা।" আমার কাছেও আসিল এবং হাত ধরিয়া আমাকেও তুলিল, আমাকেও ব্র্যান্ডি পান করাইয়া দিল। আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইতেছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম—"ব্যান্ডেল।"

সাহেব বলিল, "ব্যান্ডেল আর বেশী দূর নহে—চল, আমরা তোমাদের পৌঁছাইয়া দিই।"

আমি এক দিকে, সাহেব এক দিকে লায়লীকে ধরিয়া, গাড়ীর নিকট লইয়া গেলাম। মেমসাহেব তাহাকে তুলিয়া লইয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। আমি সামনের দিকে সাহেবের পার্শ্বে বসিলাম।

ব্যান্ডেল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শুনলাম, দশ মিনিট পরে একখানি 'আপ্ ট্রেন' আসিবে। লায়লীকে ওয়েটিং রুমে বসাইয়া আমি গিয়া টিকিট কিনিয়া আনিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলাম। যাহাতে লায়লী আরামে শুইয়া যাইতে পারে।

ট্রেণ ছাড়িলে লায়লী বলিল, "দাদা, তুমি এত দিন বোবা সেজেছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "সেজেছিলাম? তুমি কি মনে কর, আমি ভাণ করতাম?"

"তবে এখন কথা কইছ কি করে?"

বলিলাম, "কি করে তা জানিনে। একটা ধাক্কায় বাক্‌শক্তি হারিয়েছিলাম, আর একটা ধাক্কায় বাক্‌শক্তি ফিরে পেলাম। কি করে পেলাম, তা আমি জানিনে,—তা ডাক্তারেরা বলতে পারেন বোধ হয়।"

।। ৬ ।।

ট্রেনে আমি লায়লীকে বলিলাম, "দেখ, তুমি আর লায়লী নও, আজ থেকে তুমি আগেকার হিরণকুমারী।" ষ্টেশনে নামিয়া গরুর গাড়ী ভাড়া করিলাম। সন্ধ্যার পর গো-যান আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিল। গরুর গাড়ী বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড় করাইয়া আমি ছুটিলাম শ্বশুরবাড়ী, বউকে আনিতে। বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া তখনই একবস্ত্রে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিয়া বলিলাম, "গরুর গাড়ীতে তোমার ননদ বসে আছে, যাও ওকে নামিয়ে আন।"

"ননদ?"—বউ ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমার সঙ্গে গিয়া লায়লীকে নামাইয়া লইল। ভাড়া দিয়া গরুর গাড়ী বিদায় করিলাম।

বউ বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ গা? কি হয়েছে বল না? কে ও? কোথায় পেলে ওকে?"

আমি বলিলাম, "সে অনেক কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বলবো। এখন কিছু খাবার যোগাড় কর দেখি। সারাদিন অন্নের মুখ দেখিনি।"—বউ তাড়াতাড়ি আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল। সারাদিনের পর তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া দেহে প্রাণ আসিল।

ছোট ঘরে হিরণের জন্য বউ শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া আসিল। গ্রাম ছাড়িবার পর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে সমস্তই তাহাকে বলিলাম।

শুনিয়া বউ খানিকক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তারপর বলিল, "হ্যাঁ গা, তারা সব বড়লোক, রাজা-উজীর, তোমায় কোনও বিপদে ফেলবে না ত?"

বলিলাম, "বিপদ কিসের? কোনও মন্দ কাজ ত আমি করিনি,—ভাল কাজই করেছি। তার জন্যে বিপদ হবে কেন? তুমিও যেমন, কি করেই বা তারা আমাদের সন্ধান পাবে!'

শেষে বউ বলিল, "কাল সকালে পাড়ার লোক যখন হিরণকে দেখে জিজ্ঞাসা কববে এ মেয়েটি কে, তখন কি বলা যাবে?" আমি ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই কূলকিনারা পাইলাম না।—অবশেষে বউ বলিল, "দেখ, বলা যাবে, তোমাব যেখানে চাকরি হয়েছে সেই মনিবের মেয়ে। চিরকাল কলকাতায় মানুষ, কখনও পাড়া-গাঁ দেখেনি, তাই পাড়া-গাঁ দেখতে এসেছে। কাল সকালে উঠেই ওকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে নেবো।"

বুদ্ধির তারিফ করলাম। বাস্তবিক, সদ্গোপের ঘরের মেয়ে, তায় মোটে ১৮ বছর বয়স, এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।—বউয়ের সঙ্গে হিরণের খুব ভাব হইয়া গেল। প্রথম দিন হইতেই হিরণ মন্দাকে বউদিদি সম্বোধন করিতেছিল।

দিন পনেরো পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বাড়ীর চারিদিকে পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর আসিয়াছে। ওয়াবেন্টের বলে তাহারা হিরণকে এবং আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া চলিল। হিরণের জন্য পাল্কীর বন্দোবস্ত তাহারা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল।

।। ৭ ।।

পরদিন বেলা ১০টার সময় তাহারা আমাদিগকে লালবাজারে আনিয়া এক বাঙ্গালী ডেপুটি কমিশনারের নিকট হাজির করিল। ডেপুটি কমিশনারবাবু আমায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; আমি আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই খোলাখুলি বলিয়া দিলাম।

একজন দেশীয় করদ নৃপতি এ ব্যাপারে জড়িত শুনিয়া বাবুটি কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর তিনি উঠিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগকে অন্য কামরায় এক সাহেবের ঘরে যাইতে হইল। পরে শুনিয়াছি, তিনিই স্বয়ং পুলিশ কমিশনর। সাহেব আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি সমস্তই আবার তাঁহাকে বলিলাম। নবাব সাহেব ও পিয়ারী বাইজীব ষড়যন্ত্রের বিষয় আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম। তাহা সমস্ত বলিলাম।

কমিশনার সাহেব উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। তারপর ঘটনা যাহা হইয়াছিল, আমি তখন সে সব কিছু জানিতে পারি নাই, পরে জানিয়াছি।

কমিশনার সাহেব মোটর ছুটাইয়া তখনই নবাব সাহেবের বাড়ী গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। নবাব সাহেব সমস্তই অস্বীকার করেন। এমন কি!...মহারাজার সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের কথা পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। তখন কমিশনার সাহেব ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্টের খাতা খুলিয়া নবাব সাহেবকে দেখাইয়া দিলেন,—নবাব সাহেব কবে কবে কোন্ কোন্ দিন গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, মহারাজা কোন্ কোন্ দিন কোন কোন সময় পিয়ারী বাইজীর বাড়ী গিয়া নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন—সে সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডিটেক্‌টিভগণ তাহাতে লিখিয়া রাখিয়াছে!

(এই ডিটেক্‌টিভগণ অদ্ভুত জীব; ইহাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। শুনিয়াছি, আমাদের পলায়নের পর পিয়ারী বিবি আমার নামে 'কিড্‌ন্যাপিং' চার্জ্জ আনিলে, ডিটেক্‌টিভগণ কলিকাতার সমস্ত ট্যাক্সিচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার নিকট খবর পাইয়া ব্যাণ্ডেলে যায় এবং ব্যাণ্ডেল হইতে ঐ ট্রেণ দুইখানি মাত্র সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট বিক্রয় হওয়া দেখিয়া আমাদের ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আমায় বাহির করে।)

সেখান হইতে কমিশনার সাহেব নাকি সোজা গভর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া লাট সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। করদ নৃপতির নাম শুনিয়া, লাট সাহেব বিশেষ চিন্তিত হইযা পড়েন এবং এ ব্যাপারে নাকি 'হাশ্-আপ' করিতে (চাপিয়া যাইতে) আদেশ দেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া কমিশনার লালবাজারে ফিরিয়া আসেন।

কমিশনার সাহেব আসিয়া আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, "ইয়ংম্যান—তুমি বেকসুর খালাস।" লায়লীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "পিয়ারী বিবি তোমায় হেপাজতে পাইবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। কিন্তু তুমি প্রাপ্ত বয়স্কা। তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। পিয়ারী বিবির কাছে যাইবে?"

লায়লী বলিল, "না সাহেব, দয়া করিয়া সেখানে আমায় পাঠাইবেন না। সে পতিতা স্ত্রীলোক; আমি পবিত্র জীবনযাপন করিতে চাই। আমি শুনিয়াছি, আমার ন্যায় অসহায়া স্ত্রীলোককে, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা পাইলে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করেন। আমি সেইরূপ স্থানে যাইতে চাহি।"

সাহেব আবার টেলিফোন ধরিলেন; একজন উচ্চপদস্থ ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, একজন ডেপুটি কমিশনারের জিম্মায় লায়লীকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইয়ংম্যান, তোমার সাহস, কার্য্যতৎপরতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিষয় শুনিয়া লাট সাহেব অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। পুলিসের চাকরি করিতে তুমি সম্মত আছ?"—আমি বলিলাম, "হ্যাঁ হুজুর।"

"উত্তম! আজই তোমায় বহাল করিলাম।—আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি নিয়োগপত্র পাইবে। কিন্তু এখন ছয় মাস তুমি রাঁচি গিয়া কাজকর্ম্ম শিখিবে। এ ছয় মাস ৩০ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবে। সেখানকার পরীক্ষায় পাস করিলেই তুমি ৭০ টাকা বেতনে সাব ইন্সপেক্টর হইবে। কেমন, খুসী হইলে ত?"—আমি বলিলাম, "ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

তারপর সাহেব হাসিতে হাসিতে অঙ্গুলি নাড়িয়া বলিলেন, "যে ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া আজ তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা কিন্তু জীবনে কোনও দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না, ইহাই লাট সাহেবের আদেশ। যদি কর, তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাইবে। যে কয়দিন তুমি দেশের বাড়ীতে ছিলে, মহারাজার বিষয়ে তুমি কাহারও কাছে গল্প করিয়াছিলে কি?"

"কেবল আমার স্ত্রীর কাছে বলিয়াছিলাম, আর কাহারও কাছে না।"

"তোমার স্ত্রী কি কাহারও কাছে গল্প করিয়াছেন?"

"সম্ভব নয় কারণ কলঙ্ক ভয়ে লায়লী সম্বন্ধে গ্রামে আমরা একটা কাল্পনিক কথা প্রচার করিয়া আসল ঘটনা চাপা দিয়াছিলাম।"

"ভাল করিয়াছিলে? আজই তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, তোমায় ৭ দিনের ছুটী দেওয়া গেল। তোমার স্ত্রীকে তুমি খুব সাবধান করিয়া দিবে, কাহারও কাছে এ ব্যাপার যেন প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাইবে,—তোমার জেলও হইতে পারে।"

সাহেব টাকা দিলেন; সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেণেই আমি আবার বাড়ী ফিরিয়া গেলাম।

বউ তাহার পিত্রালয়েই ছিল। যে দিন আমি গ্রেপ্তার হই, সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে শ্বশুর মহাশয় আমার উদ্ধারের চেষ্টায় কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলেন। আমার খালাসের সংবাদ পাইয়া, পরদিন তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

বাবার অভিলাষ পূর্ণ হইল,—চাকরি হইল, আমি বাবু হইলাম। তা-ও যে সে বাবু নহে,—পুলিসের বাবু—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।—ছয় মাস পরে, কলিকাতায় ফিরিয়া পাকা দারোগা হইলাম। বাসা ভাড়া করিয়া বউকে লইয়া আসিলাম।

হিরণ, ব্রাহ্মসমাজের এক উচ্চশিক্ষিত যুবককে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মাঝে মাঝে বউয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে।

[মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৫]

যোগবল না সাইকিক ফোর্স?

অধিক বয়স পর্য্যন্ত মেয়ের বিবাহ না দিয়া ইংরাজি বোর্ডিং-এ রাখিয়া কলেজের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাকে "মেম সাহেব" বানাইবার পর, সে যদি পিতৃনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়,—পিতামাতার অবাধ্যতা করে,—তবে সে দোষ কাহার? মেয়ের, না তার পিতার? নবগোপালবাবু এখন স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতেছেন!

ইঁহার পুরা নাম নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়। বহির্ব্বাটিতে বাবুর্চ্চি প্রকাশ্যভাবে মুর্গীও রন্ধন করে, আবার অন্তঃপুরে লক্ষ্মীপূজা ইতুপূজাও হয়। আমদানী রপ্তানির কারবার—ক্লাইভ স্ট্রীটে ইঁহার বড় 'হাউস' আছে, তিনটা ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব, দুইখানা মোটর কার। দুটি পুত্র সুবোধ ও প্রবোধ—সুবোধ বিলাতে; প্রবোধ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতেছে। একটি মাত্র কন্যা প্রমীলা—সেই সর্ব্বকনিষ্ঠা—বয়স আঠারো বৎসর—চেহারাটিও ভাল। আই-এ পরীক্ষা শেষ হইলে সিমলা পাহাড়ে তার মাসি ও মেসোমহাশয়ের নিকট বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিল। সেখানে তার মাস দুই অবস্থানের পর, মাসিমা পত্র লিখিলেন, তাঁর কর্ত্তার কোনও পাঞ্জাবী বন্ধুর এক বিলাতফেরত পুত্র নব্য ব্যারিস্টার মিস্টার যোশীর সঙ্গে প্রমীলার অত্যন্ত "ভাব" হইয়াছে—উহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে ব্যাকুল।

নবগোপালবাবু ইতিমধ্যে কিন্তু কন্যার জন্য অন্য একটি পাত্র ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। রায়বাহাদুর খেতাবধারী জমিদারের ছেলে, এম-এ এবং আইন একসঙ্গে পড়িতেছে, দেখিতেও সুপুরুষ, কলিকাতায় বাপের পাঁচখানা বাড়ী আছে, ছেলে আইন পাস করিয়া এক বড় অ্যাটর্ণি আফিসের অংশীদার হইবে স্থির হইয়া আছে। পাত্রটিকে কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েরই ভারি পছন্দ; প্রমীলা সিমলা হইতে ফিরিলে আষাঢ় মাসে কিংবা শ্রাবণের প্রথমেই বিবাহ হইবে পরামর্শ হইয়া আছে।—এমন সময় সিমলা পাহাড় হইতে ঐ ভয়ানক পত্র

আসিল। নবগোপালবাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। পাঞ্জাবী পাত্রটি ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যজাতি, পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ হইলেও, বাঙ্গালীতে পাঞ্জাবীতে বিবাহ সমাজ নিয়মের একান্ত বহির্ভূত কর্ম্ম—জাতি যাইবে। তাঁর গৃহিণী ত কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইলেন। পূর্ব্বে তাঁর ফিটের ব্যারাম ছিল, এদিকে অনেক দিন সেটা আর দেখা হয় নাই। আবার ফিট হইতে লাগিল। নবগোপালবাবু কন্যাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন, "তোমার জননী অত্যন্ত পীড়িতা, শীঘ্র এস।"

টেলিগ্রাম পাইয়া প্রমীলা একটি মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। মা কত স্তুতি-মিনতি কত কান্নাকাটি করিলেন, পিতা কত বুঝাইলেন, শেষে রাগ করিলেন, কিন্তু প্রমীলার মন অচল অটল! সে বলিল, "যাকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, তার সঙ্গে তোমরা বিয়ে যদি না দাও ত আমি বরং চিরকুমারী থাকবো—অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।"

।। দুই ।।

গেজেট বাহির হইলে, প্রমীলা আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্য সময় হইলে, ইহা লইয়া পরিবারে যেরূপ আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইত, এখন সেরূপ কিছুই হইল না। নবগোপালবাবুর মুখখানি সর্ব্বদাই গম্ভীর, গৃহিণীর মুখখানি বিষণ্ণ, 'ছোড়দা' প্রবোধ কেবল বোনটির দুঃখের সমদুঃখী।

গ্রীষ্মাবকাশের পর সমস্ত কলেজগুলি খুলিল। কর্ত্তা ও গৃহিণীতে পরামর্শ করিয়া প্রমীলাকে বি-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়াই স্থির করিলেন—পড়াশুনা লইয়া থাকিলে, তবু উহার মনটা একটু ভাল থাকিবে—এমন কি ক্রমে সেই অসামাজিক উদ্ভট বিবাহের বাসনা সে পরিত্যাগ করিতে পারে। তবে বোর্ডিং-এ মেয়েকে আর রাখা হইবে না, বাড়ী হইতেই প্রত্যহ কলেজে যাইবে।

প্রমীলা নিয়মিতভাবে কলেজ যায়। কলেজের ফেরৎ সব সময় বাড়ী আসে না, তার সখীদের গৃহে গিয়া সময় যাপন করে। মেয়ের মন খারাপ, মা বাপ তাহাতে আপত্তি করেন না। সুকুমারী-নাম্নী তাহার এক সখীর, গত বৎসর নব্য বারিস্টার বসন্ত রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে—তাহারা ভবানীপুরে বাস করে, প্রমীলা অনেক সময় সেই সুকুমারীর গৃহে গিয়া দীর্ঘ সময় যাপন করে। সুকুমারীও মাঝে মাঝে প্রমীলাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসে।

কার্ত্তিক মাসের শেষে প্রমীলা জ্বরে পড়িল। জ্বরের বিরাম হয় না। গৃহচিকিৎসক দত্ত সাহেব আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন—জ্বরটা টাইফয়েডে না দাঁড়ায়!

সপ্তাহ অতীত হইল। রক্ত পরীক্ষা করিয়া, টাইফয়েডই সাব্যস্ত হইল। বড় বড় ডাক্তারদের পরামর্শ সভা বসিল। শুশ্রূষার জন্য তিনজন মেম নার্স নিযুক্ত হইল। যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

মহা দুশ্চিন্তায় এক একটা করিয়া তিনটা সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সুকুমারী প্রত্যহ আসে। সারাদিন থাকে, বিকালে বাড়ী যায়। ক্রমে ডাক্তারেরা বলিলেন, আর আশঙ্কা নাই। কিন্তু অন্য একটা মহা বিভ্রাট উপস্থিত! গত তিন দিন প্রমীলার মুখে কেহ বাক্যস্ফুরণ হইতে শুনে নাই। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ইসারায় উত্তর দেয়।

পিতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন আছ মা?"

প্রমীলা মাথা হেলাইয়া জানায়—"ভাল।"

মা আসিয়া বলেন, "ক্ষিদে পেয়েছে কি? একটু বেদানার রস খাবে?"

প্রমীলা মাথা নাড়িয়া জানায়—খাইবে না।

ছোড়দা জিজ্ঞাসা করে— 'তুই কথা কোস্‌নি কেন পিমি?"

প্রমীলা ওষ্ঠযুগল সঙ্কুচিত করিয়া জানায়—কি জানি?

"তুই কি কথা কইতে পারছিসনে?"

প্রমীলা স্পষ্টভাবে মাথা নাড়িয়া জানায়—"না।"

ডাক্তারেরা বলিলেন, ব্রেণের স্পীচ্ সেণ্টর ডিস্টার্ব্ড্ হইয়াছে—একটু সুস্থ হইলেই, দেহে একটু বল পাইলেই ওটা বোধহয় আপনিই ঠিক হইয়া যাইবে।

নির্জ্জর হইবার দশ দিন পরে প্রমীলা অন্নপথ্য করিল;' কিন্তু কথা কহিল না।

প্রমীলা এখন উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়—বই পড়ে—কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইসারায় অথবা কাগজে লিখিয়া উত্তর দেয়। পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কাগজে লিখিয়া দিল—"বাবা, আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না।"

আবার বড় বড় ডাক্তারদের বৈঠক বসিল; প্রেস্ক্রিপশন প্রস্তুত হইল, ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল; কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না।

পিতামাতা আত্মীয়স্বজন তখন হতাশ হইলেন; স্থির করিলেন, মেয়েটি জন্মের মত বোবা হইয়া গেল। দুঃখের দিন, একটি একটি করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল।

।। তিন ।।

পূজার ছুটিব পর আবার কলেজ খুলিয়াছে। নবগোপালবাবু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কলেজ যাবে না?"

প্রমীলা একটা কাগজে লিখিয়া দিল, "না বাবা, আমি বোবা মেয়ে, কলেজে আমার ভারি লজ্জা করবে।" নন্দগোপালবাবু রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

নবগোপালবাবু ও তাঁহার পত্নী, নানাবিধ উপায়ে দুঃখিনী কন্যার মনস্তুস্টির জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কন্যার ব্যবহারের জন্য একখানি স্বতন্ত্র মোটর গাড়ী কিনিয়া দিলেন। সেই গাড়ীতে প্রমীলা সকালে বিকালে বেড়াইতে বাহির হয়। সুকুমারী বাড়ী গিয়াও মাঝে মাঝে সারাদিন যাপন করে।—শীতকাল আসিল। কলিকাতা বিবিধ প্রকার আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী হোটেলগুলি, য়ুরোপ হইতে আগত ভূপর্য্যটনকারিগণে পরিপূর্ণ। সংবাদ বাহির হইল, সম্মোহন-বিদ্যাপারদর্শী (Hypnotist) সাবাটিনি নামক একজন ইতালীয় ভদ্রলোক আসিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সম্মোহন-বিদ্যা বলে নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন।

ক্রমে, সংবাদপত্রে আশ্চর্য্যজনক দুই-একটা আরোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল। সুকুমারী আসিয়া প্রমীলাব মাতাকে ঐ সমস্ত পড়িয়া শুনাইল। নবগোপালবাবুর বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনার মেয়েটিকে একবার দেখান না।"

নবগোপালবাবু বাড়ী গিয়া, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী লইয়া "রজনী" উপন্যাসের অন্তর্গত "যোগফল না সাইকিক ফোর্স" পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলেন। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসেও, রামানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক, শৈবলিনীর সম্মোহন ব্যাপারটিও মনোযোগ সহকারে পড়িলেন। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন প্রাতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির হইল।

নবগোপালবাবু ইংরাজী পোষাকেই গিয়াছিলেন। হোটেলের দ্বারবানের নিকট সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্তি সসম্মানে তাঁহাকে দ্বিতলে লইয়া গিয়া সাহেবের খাস চাপরাশির জিম্মা করিয়া দিল। চাপরাশি বলিল, সাহেব এখন ছোট হাজরী খাইতেছেন, দশ মিনিট মধ্যেই সাক্ষাৎ হইবে। বলিয়া তাঁহাকে একটি বসিবার কক্ষে লইয়া গেল। নবগোপালবাবু দেখিলেন, কক্ষখানির সমস্ত দেওয়াল ও উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত, সেই বস্ত্রাবরণের স্থানে স্থানে বিভিন্ন বর্ণের রেশম সূত্রের সূচিকর্ম্মে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জানোয়ার ও মানুষ্যের কঙ্কাল অঙ্কিত। এক কোণে টেবিলের উপর একটা মড়ার মাথা, অপর এক কোণে বিভিন্ন বর্ণের কয়েকটি স্ফটিক গোলক রক্ষিত।

নবগোপালবাবু একটা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ঐ সব কঙ্কালের চিত্রের প্রতি চাহিয়া তাঁহার গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। তারপর ভাবিলেন, আমি ত কোনও জঙ্গলে, কোনও কাপালিক বা যাদুকরের গুহামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হই নাই! ইংরাজ রাজধানী কলিকাতা এবং তাহার সর্ব্বোত্তম হোটেল—এখানে ভয় কি?

কিয়ৎক্ষণ পরে সাবাটিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সুশ্রী যুবাপুরুষ, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না, চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল, তারকাযুগল ইংরাজের ন্যায় নীলবর্ণ নহে—ইতালীয়গণের অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণ। যুবক সহাস্যবদনে নবগোপালবাবুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া ইংরাজী ভাষায় বলিলেন, "আমি আপনার জন্য কি করিতে পারি, মহাশয়?"

নবগোপালবাবু তখন তাঁহার কন্যার পীড়ার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া সাহেব নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মেয়েটির বয়স কত?"

নবগোপাল। আঠারো।

সাহেব। বিবাহ হইয়াছে?

নব। না,—সে এখনও কলেজে পড়ে—অর্থাৎ পীড়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত পড়িয়াছে।

সাহেব। ক্ষীণাঙ্গী না স্থূলাঙ্গী?

নব। ক্ষীণাঙ্গী।

সাহেব। গাত্রবর্ণ কিরূপ?

নব। আমার চেয়ে ফর্সা।

সাহেব। স্বভাব কিরূপ? একগুঁয়ে—যা ধরেন তাই করেন? না, অন্যে সহজেই তাঁহাকে চালিত করিতে পারে?

নব। না, অন্যে সহজে তাহাকে চালিত করিতে পারে না। মেয়েটি আমার বিলক্ষণ একগুঁয়েই বটে।

সাহেব। তরল-প্রকৃতি না গম্ভীর? মাপ করিবেন মিস্টার চ্যাটার্জ্জি—তাঁহাকে হিপ্‌নটাইজ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে, না কঠিন হইবে, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য এ সকল কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

নব। তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার কন্যা তরল-প্রকৃতি নহে, বরঞ্চ গম্ভীর।

সাহেব। বেশ আমি তাঁহার আরোগ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি—অবশ্য সফল হইব কি না তাহা বলিতে পারি না। আপনার কন্যাকে আমি হিপ্‌নটিক নিদ্রায় অভিভূত কবিব। করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব। যদি তাঁহার এই ব্যাধির কোনও ঔষধ বা নিরাময়ের অন্য কোনও উপায় থাকে, তবে তিনি সেই হিপ্‌নটিক নিদ্রাব অবস্থায় স্বয়ং তাহা বলিয়া দিবেন। যদি না থাকে, তবে তাহাও তিনি বলিবেন। আমার ফী কত আপনি জানেন কি?

নব। না।

সাহেব। হিপ্‌নটাইজ কারবার জন্য আমি ৫০০ টাকা লইব। যদি ব্যাধি আরোগ্যের উপায় করিয়া দিতে পারি—তবেই আর ৫০০ টাকা লইব; নচেৎ আর কিছু লইব না। আপনি সম্মত আছেন?

নব। আহ্লাদের সহিত।

সাহেব। আপনার কন্যাকে কি এখানে লইয়া আসিবেন, না, আমি আপনার বাড়ীতে যাইব?

নব। আমার বাড়ীতে হইলেই ভাল হয়।

সাহেব। আচ্ছা, তবে কাল রাত্রি ১০টার সময় আমি আপনাব কন্যাকে হিপ্‌নটাইজ করিব। কাল সারাদিন মেয়েটিকে উপবাসী থাকিতে হইবে; জলবিন্দুটিও তাঁহার মুখে যেন না প্রবেশ করে। সারাদিন তিনি কোথাও বাহির হইবেন না, শয্যায় শুইয়া কাটাইবেন। আমার করণীয় শেষ হইলে, তবে তিনি খাইতে পাইবেন। আপনি কি আমায় লইতে

আসিবেন, না আপনার ঠিকানা দিয়া যাইবেন? এই অপরিচিত নগরে রাত্রে কিন্তু আপনার বাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে।

নব। না, আমিই আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। চেকখানাও সঙ্গে আনিব।

"উত্তম। রাত্রি সাড়ে নটার মধ্যেই আপনি আসিবেন। গুড মর্ণিং।" বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। নবগোপালবাবু তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন।

।। চার ।।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সুকুমারী আসিল। প্রমীলার মাতা হিপ্‌নটাইজ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল কথা তাহাকে জানাইলেন। সুকুমারী বলিল, "দেখুন, ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চান।" ঘণ্টা দুই প্রমীলার নিকট থাকিয়া, বিদায় গ্রহণ কালে সুকুমারী বলিয়া গেল, "কি হল না হল শোনবার জন্যে আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করবে মা—কাল বেলা দশটার পর, ওঁর সঙ্গেই আমি বেরুব, ওঁকে হাইকোর্টে নামিয়ে দিয়ে সেই গাড়ীতেই এখানে চলে আসবো।"

"আসবে বইকি মা!"—বলিয়া গৃহিণী সুকুমারীকে বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে নবগোপালবাবু সাহেবকে লইয়া আসিলেন। সাহেব প্রমীলার শয়নকক্ষে গিয়া, একটি চেয়ার নির্ব্বাচিত করিয়া, উহাতেই তাহাকে বসাইলেন। সে কক্ষের মধ্যস্থলে বিদ্যুৎবাতির একটি ঝাড় জ্বলিতেছিল। সাহেব বলিলেন, "এত বেশী আলোতে ত ঠিক হইবে না। এ আলো নিবাইয়া, দুইটি মোমবাতি জ্বালিয়া দিতে বলুন।"

সাহেবের আদেশ মত কার্য্য হইল। তারপর তিনি বলিলেন, "আপনার স্ত্রী এবং আপনি ভিন্ন, এ কক্ষে অপর কেহ থাকিতে পাইবে না। সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিন, বাহিরের কোনও শব্দ এখানে না আসিতে পারে। আপনারা দুজনে কন্যার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকুন। আমি পাস্‌ দিতে আরম্ভ করি।"

এ আদেশও সম্পন্ন হইল।

তারপর, সেই ক্ষীণ আলোকে, সাহেব নিজ প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাস দিবার পর, প্রমীলার চক্ষু মুদ্রিত হইল, মাথাটি চেয়ারের পিঠে ঢলিয়া পড়িল। সাহেব মাঝে মাঝে সুগম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—Sleep—Sl—eep—Dee—p sl—eep!

প্রায় ১৫ মিনিট কাল এইরূপ প্রক্রিয়া চলিলে পর, সাহেব নিরস্ত হইলেন। নবগোপালবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার কন্যা, গভীর হিপ্‌নটিক নিদ্রায় অভিভূত। এইবার আমি ইহাকে প্রশ্ন করি?"—নবগোপালবাবু শিরশ্চালনে সম্মতি জানাইলেন।

সাহেব, ইংরাজি ভাষায়, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যে, তোমার নাম কি?"

প্রমীলার পিতামাতা দুরু দুরু হৃদয়ে প্রতীক্ষায় রহিলেন। আহা!—এতদিন পরে আবার কি তাঁহারা আদরিণী কন্যার কণ্ঠস্বর শ্রবণে কর্ণ জুড়াইবেন?

প্রমীলা কিন্তু নিরুত্তর।

প্রায় এক মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া, এবারে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কন্যে, তোমার নাম কি বল। আমার আদেশ! তোমায় বলিতেই হইবে।"

অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল—"প্রমীলা—চ্যাটার্জ্জি।"

সেই ক্ষীণস্বর প্রমীলার পিতামাতার কর্ণে যেন মধুসিঞ্চন করিল, তাঁহাদের হৃদয়ে আবার নব আশা জাগরিত হইয়া উঠিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "স্বাভাবিক অবস্থায়, যখন তুমি জাগিয়া থাক, তখন কথা কহ না কেন?"

ইংরাজি ভাষায়, ক্ষীণস্বরে অতি ধীরে ধীরে উত্তর হইল—"আমি টাইফয়েড জ্বরে ভুগিয়াছিলাম, সেই অবধি—বাক্‌শক্তি হারাইয়াছি।"

সাহেব। সে টাইফয়েড জ্বরে তোমার বাক্‌শক্তি কি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে?

প্রমীলা। না—ধ্বংস হয় নাই। জগতে—কিছুই—ধ্বংস হয় না। বাক্‌শক্তি আছে,—তবে তাহা—চাপা পড়িয়া—গিয়াছে—আমি তার—তাহাকে—খুঁজিয়া পাই না।

সাহেব। কিসে চাপা পড়িয়াছে?

প্রমীলা। দুঃখে। আমার—জীবনে—একটা—গভীর দুঃখ আছে—সেই দুঃখরাশির নিম্নে—আমার বাক্‌শক্তি—চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সাহেব। তোমার জীবনে কি সে দুঃখ? তোমার পিতামাতা কি তাহা অবগত আছেন?

প্রমীলা। হ্যাঁ আছেন বইকি—দুঃখের—কারণ কি—তাহা জানেন,—কিন্তু—সে দুঃখের পরিমাণ কি,—তাহা কত গভীর—তাহা আমার জীবনীশক্তিকে কি পর্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেটা উঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

সাহেব। কি সে দুঃখ, তুমি আমায় বল।

প্রমীলা নীরব। সাহেব অর্দ্ধ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমার আদেশ, তোমার সে দুঃখ কি, তাহা এই মুহূর্তে আমার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।"

তথাপি প্রমীলা নীরব। নবগোপালবাবু হস্তসঙ্কেতে নিরস্ত করিলেন এবং ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "থাক্, ও বিষয়ে উহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া কাজ নাই। আপনি শুধু জিজ্ঞাসা করুন, তোমার সে দুঃখ তোমার পিতামাতা যদি ঘুচাইয়া দেন, তবে তুমি তোমার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইবে কি না?"

সাহেব ফিরিয়া আসিয়া, প্রমীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ প্রকার প্রশ্ন করিতেই প্রমীলা উত্তর দিল, "ফিরিয়া—পাইব। আমার—পতি দেবতার চরণে—যেদিন আমি—প্রথম প্রণাম করিব—তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ মাত্র—আবার আমি—বাক্‌শক্তি সম্পন্ন—হইব। নচেৎ এ জীবনে আর তাহা হইবে না।"

সাহেব, নবগোপালবাবুর পানে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাগাই?"

নবগোপালবাবুর ইঙ্গিত পাইয়া, সাহেব উল্টা পাস দিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট মধ্যে প্রমীলা জাগিয়া উঠিল।

সাহেব বলিলেন, "আপনার স্ত্রী ইহাকে এখন খাইতে দিন। আপনি একটু বাহিরে আসুন।"

নবগোপালবাবু সাহেবকে লইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। সাহেব বলিলেন, "আপনার কন্যার কথা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন ত? আমি কিন্তু ভাল বুঝিতে পারি নাই।"

নবগোপালবাবু বলিলেন, "আর কিছু নয়, ও একটি যুবককে বিবাহ করিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়াছিল, বিবাহে আমরা সম্মতি দিই নাই সেই উহার দুঃখ।"

সাহেব বলিলেন, "Oh! I see!—তা, যদি মেয়েকে আরোগ্য করিতে চান, তবে তাহারই সঙ্গে উহার বিবাহ দিন—এ ছাড়া কিন্তু অন্য উপায় নাই।"

নবগোপালবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই দিব।"

সাহেবকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আর একখানি ৫০০ টাকার চেক তাঁহার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া, নবগোপালবাবু তাঁহাকে নিজ কারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

।। পাঁচ ।।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে নামিয়া, নবগোপালবাবুর শোফেয়ারকে দুইটি টাকা বখশিস করিয়া, সাবাটিনি উপরে নিজ বসিবার কক্ষে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন—ব্যারিস্টার বসন্ত রায় ও সুকুমারী, যুগল মূর্ত্তিতে তথায় বিরাজ করিতেছে।—সাবাটিনি টুপী খুলিয়া সহাস্য বদনে বলিল, "Hallo, Mrs. Roy,—you here? What an unexpected pleasure!" (বিবি রায়! আপনি এখানে? এ আনন্দ যে আশার অতিরিক্ত!)

বসন্ত রায় বলিল, "কি করি, গিন্নী ছাড়িলেন না। খবরটা জানিবার জন্য আমিই এখানে আসিব কথা ছিল, ইনি ছাড়িলেন না—সঙ্গ লইলেন। রাত-বিরাত উনি আমায় একা কোথাও যাইতে দেন না।"—বলিয়া বসন্ত স্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

"Silly!"—বলিয়া সুকুমারী তার স্বামীর বাহুতে মৃদু চপেটাঘাত করিল।

স্যাবাটিনি বসিয়া বলিল, "তাই নাকি? তবে ত তুমি খুব শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছ। লণ্ডন মিউজিক হলের সেই গানটা মনে পড়ে?—যার প্রতি কলির শেষে আছে—"And his little wife was with him all the time!" (বউটি তার, সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকতো)।

বসন্ত বলিল, "খুব মনে পড়ে। তুমি, আমি, যোশী—তিনজনেই দিনকতক সে গানটা খুব গাহিয়াছিলাম।—সে যাক। ওখানে কি রকম হইল তাই বল।"—সাবাটিনি বলিল, "যাহা যাহা পরামর্শ হইল—ঠিক সেইরূপই হইল। প্রমীলাকে মিসেস রায় যেমন শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে ঠিক ঠিক সেইরূপই বলিল। মেয়েটা অভিনয় করিল চমৎকার—বাহাদুরী আছে!"

সুকুমারী বলিল, "তারই বুঝি বাহাদুরী! তোমার মাথা হইতে যে এতবড় ষড়যন্ত্রটা বাহির হইল মিস্টার সাবাটিনি, তোমার বাহাদুরী নয়? তারপর 'পাপা' কি বলিলেন?"

সাহেব বলিল, "রাজী—On the spot! বিবাহ স্থির।"

রায় বলিল, "সাবাটিনি তোমার বেয়ারাকে ডাক ত, একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম দিক। সেই রাস্কেল যোশীকে আনন্দ সংবাদটা তার করিয়া দিই।"

রায়ের মোটর গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। টেলিগ্রাম লিখিয়া, নিজ শোফেয়ারকে ডাকাইয়া রায় উহা 'বড়া তারঘরমে' 'লাগাইয়া' আসিতে আদেশ দিল।—সাবাটিনি বলিল, "আজিকার আনন্দ উৎসবটা শ্যাম্পেনে সম্পন্ন করা যাক।—অবশ্য মিসেস রায় যদি অনুমতি করেন।"

মিসেস রায় অনুমতি দিলেন। শ্যাম্পেন আসিল। বয়, তিনজনের সম্মুখে তিনটি শ্যাম্পেন গ্লাস রাখিল। সুকুমারী এক গ্লাসের বেশী গ্রহণ করিল না। ইঁহারা দুই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে শ্যাম্পেনের বোতল শেষ করিয়া, হুইস্কির ও সোডার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। হাস্য পরিহাসের মধ্যে গল্প খুব জমিয়া উঠিল। গল্পের মধ্যে যে তথ্যগুলি প্রকাশ পাইল তাহা দফাওয়ারি এই :—

(১) যোশী, বসন্ত ও সাবাটিনি তিনজনে একই সময়ে লণ্ডনে প্রবাস যাপন করিয়াছিল—তখন হইতেই ইহাদের বন্ধুত্ব।—(২) সাবাটিনি যথার্থই হিপনটিজম ও ম্যাজিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, প্রাচ্য দেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় আসিয়াছিল; সে প্রথমে সিমলায় গিয়া যোশীর আতিথ্য গ্রহণ করে। এবং সেইখানেই বন্ধুর প্রণয়-সঙ্কটের বিষয় অবগত হয়।

(৩) যোশী ও প্রমীলার মধ্যে, বসন্ত ও সুকুমারী মারফৎ রীতিমত প্রেমপত্র-বিনিময় চলিত। প্রমীলার পীড়ার সময়, সুকুমারী প্রত্যহ যোশীকে টেলিগ্রাম করিত প্রমীলা কেমন আছে।

(৪) বাক্‌শক্তি হারাইবার ভাণ করার মতলব সর্ব্বপ্রথমে সাবাটিনির মস্তিষ্কেই উদিত হয়। পরে পত্রযোগে বসন্ত ও সুকুমারীর সহিত ও ষড়যন্ত্র পাকা করা হইয়াছিল।

কিন্তু পিতামাতার সহিত এরূপ প্রতারণা করা প্রমীলার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই—অন্ততঃ, আমাদের মতে। কিন্তু পাশ্চাত্য মত এই যে, Everything is fair in love and war—প্রেমে ও যুদ্ধে কিছুই দোষের নহে।—এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল। সাবাটিনি তখনও কলিকাতায় ছিল, তাহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যৌতুকরাশির মধ্যে দেখা গেল, নবগোপালবাবুর প্রদত্ত চেক দুখানি, বরকন্যাকে সাবাটিনির উপহার।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ ১৩৩৩]

ভোজরাজ্যের গল্প

(ভোজ প্রবন্ধ হইতে)

প্রথম পরিচ্ছেদ

খৃঃ একাদশ শতাব্দীর কোনও একদিন (যার তারিখ এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই) মালব দেশাধিপতি ভোজরাজ, একটা খুব খারাপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন—বনের মধ্যে একটি পুকুরের ধারে নামিয়া, নিতান্ত চাষাভুষার মত, অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া জল পান করিয়াছিলেন। অবশ্য মৃগয়া করিতে করিতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াই তিনি এ কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু মৃগয়া যাত্রার পূর্ব্বে একটা থার্ম্মস-ফ্ল্যাস্কে ভরিয়া চূর্ণ বরফ—অভাব পক্ষে শীতল জল, ষ্ট্র্যাপে বাঁধিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া গেলেই হইত। কিন্তু সেকালের রাজারা—ঐ এক রকমের মানুষ ছিলেন।

মৃগয়া করিয়া রাজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু মাথাব ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মাথার ভিতর কি যেন খুস খুস করে। ঘুম হয় না, খাদ্যে রুচি চলিয়া গেল। হইল কি?

দুই চারিদিন এইভাবে কাটিলে, মাথার ভিতর রীতিমত যন্ত্রণা হইল। রাজবৈদ্য মহাশয় আসিলেন, তাহা ঢাকিয়া লইবার জন্য অনেক শ্লোক ঝাড়িলেন; খাইবাব ঔষধ, মাথায় মালিসের তৈল—খুব দামী দামী সব ঔষধ আনিয়া রাজার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না; উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। "মাথা গেল মাথা গেল" শব্দ—আর বিছানায় পড়িয়া ছটফটানি। রাজা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। রাজ্যের যেখানে যে চিকিৎসক ছিল, সবাই আসিল, সকলে মিলিয়া বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া 'কন্‌সল্টেশন' করিল; দিনে দুইবার করিয়া প্রেস্ক্রিপশন বদল হইতে লাগিল;—কিন্তু রোগ যেমন তেমনি—রোজ রোজ বাড়িয়াই যাইতেছে।

অবশেষে সকলেই রাজার প্রাণের আশা পরিত্যাগই করিল। রাণীরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল, আমলারা বিষণ্ণ বদন, প্রজারা হায় হায় করিতে লাগিল—"আহা এমন রাজা আর হবে না!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের সমস্ত এবং মর্ত্ত্যের অনেকগুলি খবরের কাগজের গ্রাহক ছিলেন। সব কাগজ যে তিনি পড়িবার সময় পাইতেন তাহা নহে। তথাপি মূল্য দিয়া লইতেন, কারণ সংসাহিত্যকে উৎসাহ দান করা তিনি নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

একদিন রবিবারে, কাছারি না থাকায়, অলস মধ্যাহ্ন যাপনের জন্য তিনি খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। "মালোয়া টাইম্‌স্" খুলিয়া দেখিলেন, কি সর্বনাশ! ভোজরাজ যে মরো মরো! আহা, বড় ভাল রাজা! যেমন পণ্ডিত তেমনি পুণ্যবান। কাগজে লিখিয়াছে চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফল পাওয়া যাইতেছে না। দেবরাজ আপন মনে বলিলেন, "নাঃ, এ কাজের কথা নয়।" কাগজ ফেলিয়া, চশমা খুলিয়া রাখিয়া হাঁকিলেন, "কোই হ্যায়।"

"হুজুর"—বলিয়া একজন দেব-বেয়ারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

দেবরাজ সংক্ষেপে বলিলেন, "ডক্তর সা'বলোগ্।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেবরাজ কাগজখানা তাঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

পড়িয়া তাঁহারা বলিলেন, "এ কি কাণ্ড! রোগী মরে অথচ এখনও পর্য্যন্ত রোগ নির্ণয় হল না। হুঃ—সত সব—"

ইন্দ্র বলিলেন—"বড়কুমার, এখনি তুমি যাও—অদৃশ্যভাবে যাবে। রাজাকে দেখে এসে আমাকে বল তাঁর কি হয়েছে।"—বড়কুমার হুস্ করিয়া মর্ত্তে নামিয়া গেলেন,—একেবারে ভোজরাজের শয়নকক্ষে। রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাঁহার (রণ্টগেন রে অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ) দিব্যদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিলেন, মস্তিষ্কের মধ্যে একটি পাঠীন (বোয়াল) মৎস্যের "পোনা" শুইয়া আছে, এবং মাঝে মাঝে নড়িতেছে চড়িতেছে। দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গে ফিরিয়া, দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।—ইন্দ্র। কিহে বড়কুমার, কি দেখে এলে?—বড়কুমার। মহারাজ! কেস সঙীন। ভোজরাজের মস্তিষ্কমধ্যে বোয়াল মাছের একটি জ্যান্ত ছানা।

ইন্দ্র। অ্যাঁ?—বল কি হে? বোয়াল মাছের ছানা? রাজার মাথায় কি করে ঢুকলো?

বড়কুমার। তাও আমি যোগবলে জানতে পেরেছি। রাজা একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে, বনের মধ্যে এক পুকুরে নেমে আঁজলা আঁজলা ভরে' জলপান করেছিলেন, সেই সময় তাঁর নাকের ফুটো দিয়ে সদ্য ডিমপোনা বোয়াল মাছের এক সূক্ষ্ম ছানা প্রবেশ করে এবং ক্রমে মস্তিষ্কে গিয়ে বাসা বাঁধে। রাজমস্তকের খাঁটি ঘি খেয়ে খেয়ে সে এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন উপায়?

বড়কুমার। উপায়—অপারেশন। মাথার খুলি উঠিয়ে ফেলে মাছটাকে বের করতে হবে; এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

ইন্দ্র। এ ত সাংঘাতিক অপারেশন। তুমি তবে যাও—তাই কর। ছোটকুমার এখানেই থাকুন, সময়টা বড় খারাপ—কখন কার কি হয়। কাল থেকে আমার শরীরটেও কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ কচ্ছে! তুমি গিয়ে রাজার চিকিৎসা কর। মোট কথা তাঁকে বাঁচাতেই হবে। আহা, বড় ভাল রাজা।

বড়কুমার। আজ্ঞে, আমি তা'হলে যাই।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, আর দেখ, এবার ত অদৃশ্য হয়ে গেলে চলবে না। বৃদ্ধ কবিরাজের বেশ ধরে যাবে—'রাজাকে আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি' একথা বললেই, তারা তোমার হাতে রাজাকে ছেড়ে দেবে এখন।—বড়কুমার তাঁহার ব্যাগে যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র ভরিয়া, সেই দিনই যাইয়া ধারানগরীর রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোগীর কক্ষ হইতে সমস্ত লোক বাহির করিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, বড়কুমার ভাবিলেন, "যে রকম শক্ত অপারেশন, আর রোগী যে রকম দুর্ব্বল, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যদি পটল তোলে? তার চেয়ে ক্লোরোফর্ম্ম করি।" (পাঠক ইহা পবিহাস ভাবিবেন না। মূল ভোজপ্রবন্ধে আছে, মোহচূর্নেন "মোহয়িত্বা শিরঃকপালমাদায়...— সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৯০০ বৎসর পূর্ব্বেও কবিরাজ মহাশয়গণ ক্লোরোফর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত ছিলেন।)

ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অশ্বিনীকুমার রাজাকে বসাইয়া তাঁহার মাথায় চামড়া কাটিয়া খুলি খসাইয়া ফেলিলেন। মাছটাকে বাহির করিয়া জলপূর্ণ একটা হাঁড়ির মধ্যে ফেলিলেন। তারপব খুলি বসাইয়া, চামড়া সেলাই করিয়া, ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিযা দিয়া রাজাকে আবাব শোয়াইয়া দিলেন। আরামসূচক একটা আঃ শব্দ করিয়া পাশ ফিরিয়া রাজা ঘুমাইতে লাগিলেন।

দ্বার খোলা হইল। সকলে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রোগ হইবার পব, এই প্রথম তাহারা রাজাকে ঘুমাইতে দেখিল। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছিল মশাই?"—অশ্বিনীকুমার হাঁড়ি দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমাদের রাজার

মস্তিষ্কের ভিতর ঐ মাছ ছিল।" কি করিয়া মাছ ঢুকিয়াছিল, তাহাও তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন। সকলে শুনিয়া ত অবাক।

পুরা ৪৮ ঘণ্টা রাজা ঘুমাইলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন, মাথায় আর কোনও যন্ত্রণা নাই—কেবল দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাঁহাকে বলকারক ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইতে লাগিল।

প্রজারা, আমলারা, চিকিৎসক মহাশয়কে তখনই যাইতে দিল না। বলিল, "রাজা আগে শরীরে বল পান, উঠে হেঁটে বেড়ান, তখন আপনি যাবেন। কি জানি, আবার যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়!"—সুতরাং অশ্বিনীকুমার কয়েকদিন রহিয়া গেলেন। রাজা দিন দিন সবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খুব উচ্চ বেতনে ইঁহাতে তিনি নিজ ষ্টেট-ফিজিসিয়ান নিযুক্ত করিতে চাহিলেন—কিন্তু কবিরাজ মহাশয় রাজি হইলেন না।

অবশেষে তাঁহার বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। ভোজরাজ রাজসভা মধ্যে কবিরাজ মহাশয়কে বহুসম্মানে ভূষিত করিলেন। ঘড়া-ঘড়া মোহর, মণি-মুক্তা, হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদত্ত হইল। অবশেষে রাজা বলিলেন, "কবিরাজ মশায়, আপনি ত চললেন—আপনাকে রাখতে আমরা পারলাম না। তা, সে ক্ষোভ করা আর বৃথা। আপনার তুল্য মহাপণ্ডিত সুচিকিৎসক ত আমাদের নজরে কখনও আসেনি। তা, একটা কথা, আপনার কাছে জেনে নিতে চাই!"

"কি বলুন?"

"আহার বিহার প্রভৃতিতে, কি রকম নিয়ম পালন করলে, আমাদের দেহ বেশ ভাল থাকে,—সেইটে আমাদের বলে' দিয়ে যান। অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল পথ্য কি কি?"

অশ্বিনীকুমার কহিলেন—অশীতেনাম্ভসি স্নানং, পয়ঃ পানং, বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।

এতদ্ বো মানুষাঃ পথ্যং—

শ্লোক শেষ হইল না—ভোজরাজ খপ্ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"মানুষাঃ! আপনি আমাদের 'হে মানুষগণ' বলে সম্বোধন করছেন, আপনি কি তাহলে মানুষ ন'ন? আপনি কে বলুন।"—ভানুমতীর খেলা!—কবিরাজ মহাশয় অদৃশ্য। ধরা পড়িয়াই একদম অন্তর্দ্ধান। পারিতোষিকের ঘড়া-ঘড়া মোহর, মণিমুক্তা, হাতী-ঘোড়া সবই পড়িয়া রহিল। রাজা বোকা বানিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

বিস্ময় কতকটা অপগত হইলে, রাজা বলিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই অশ্বিনীকুমার—আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যফলে, আমায় এসে বাঁচিয়ে গেলেন। কিন্তু হায় হায় কি আপশোষ, শ্লোকটি যে শেষ হল না! উপদেশটি যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এখন উপায়? কে এই শ্লোকটির যথার্থরূপে পাদপূরণ করে দিতে পারে?"—সকলে বলিল, "কালিদাস ভিন্ন আর কেউ এ শ্লোক পূরণ করতে পারবে না। পারবে না কেন? একটা যাতা দিয়ে শ্লোক পুরিয়ে, ষোল অক্ষর গুণে দেখিয়ে দেবে এখন। বাধা না পেলে অশ্বিনীকুমার যা বলতেন, তা কেবল কালিদাসের মুখ থেকেই বেরুবে, কেননা তাঁর জিহ্বাগ্রে মা সরস্বতী বাস করেন।"

কালিদাসের ডাক পড়িল। তিনি আসিয়া পাদপূরণ করিলেন—"স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্।" সম্পূর্ণ শ্লোকটি দাঁড়াইল—

অশীতেনাম্ভাসি স্নানং, পয়ঃ পানং, বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্ বো মানুষ্যঃ পথ্যং স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্।।

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তোমাদের উৎকৃষ্ট পথ্য এইগুলি—

"অ-শীতল জলে স্নান, দুগ্ধপান, উত্তমা স্ত্রীগণের সঙ্গ, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিযুক্ত) দ্রব্য ভোজন।"

—অতএব, পাঠকগণ, এখন হইতে জলকে সামান্য মাত্র গরম করিয়া স্নান করুন, ঘৃত দুগ্ধের বরাদ্দটা কিছু বাড়াইয়া দিন—দিনের বেলা আফিস যাইতে হয়, গরম ভাত

খাইয়াই থাকেন—রাত্রে বেশী দেরী না করিয়া বাড়ী ফিরিবেন—নহিলে ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে,—এবং যাঁহাদের একটি মাত্র স্ত্রী, তাঁহার অন্ততঃ আর দুইটি সুপাত্রীর সন্ধানে ঘটক লাগাইয়া দিন—কারণ শ্লোকে আছে, "স্ত্রিয়ঃ"—একবচনও না দ্বিবচনও না—একেবারে বহুবচন।

[সচিত্র, শিশির, আশ্বিন ১৩৩১]

ঢাকার বাঙ্গাল

ঢাকা কলেজ হইতে পরেশনাথ প্রথমে এম-এ ও পরে বি-এল পাস করিয়া, পঞ্জিকা মতে এক অতি শুভদিনে, ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য ঢাকার বার লাইব্রেরীতে প্রবেশ কবিয়াছিল।

· পরেশের পৈতৃক-ভবন ঢাকা সহর হইতে কিছু দূরে কোনও গ্রামে; নৌকায় যাইতে ৫।৬ ঘণ্টা মাত্র লাগে। উকীল হইয়াও পরেশ প্রথমে নিজ স্বতন্ত্র বাসা করে নাই; কারণ তাহার হাতে এ পবিমাণ মজুদ টাকা ছিল না যে, ওকালতীব অনশন-কাল কাটাইয়া ওঠে। তাই সে মেসের বাসাতে থাকিয়াই, শেয়ারের ছক্কড় গাড়ী আবোহণে আদালতে "বাহির" হইতে লাগিল।

পরেশনাথের বয়স এ সময় ২৫ বৎসর মাত্র—গৌববর্ণ যুবা, দিব্য সুঠাম চেহারা; পড়াশুনাও বেশ ভাল রকমই করিয়াছে—এবং এখনও করিয়া থাকে,—কিন্তু হইলে কি হইবে, সে, যাহাকে বলে, একটু 'মুখচোরা'। সকল প্রসঙ্গে সকলেব সঙ্গে ফব্ ফব্ করিয়া কথা বলা তাহার মোটেই আসে না। ইহাও একটা কারণ বটে;—দ্বিতীয় কাবণ, এখানে তাহার কোনও সহায় ছিল না—তাহা পরেশ পশার জমাইতে পারিল না। পশাব চুলায় যাউক, মাসে মাসে মাসিক বাসা-খরচটা উপার্জ্জন করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সামান্য যাহা পুঁজি ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। তারপর বিধবা জননীর সামান্য সঞ্চয়ে হাত পড়িল। তারপর স্ত্রীর অলঙ্কারেও হাত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এইভাবে, বছর দুই কাটিয়া গিয়াছে।

বছরখানেক বার লাইব্রেরীতে ধরণা দিবার পর হইতেই, ওকালতী ব্যবসার প্রতি পরেশের ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল; ইহাও সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার প্রকৃতির মানুষের, এ ব্যবসায়ে কোনও দিনই কোনই সুবিধা হইবে না। তাই সে একটা চাকরির সন্ধান করিতেছিল। বিজ্ঞাপন দেখিয়া নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও ফল দর্শে নাই।

পরেশের ওকালতী জীবন দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পর, একদিন সংবাদপত্রে সে এক বিজ্ঞাপন দেখিল, কলিকাতাস্থ কোনও সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির পুত্রগণকে পড়াইবার ৫০ টাকা মাত্র কিন্তু বাসা-খরচ লাগিবে না।

প্রথম দর্শনে, এ বিজ্ঞাপন পরেশনাথের নিকট তেমন লোভনীয় মনে হইল না। এম-এ, বি-এল পাস করিয়া শেষে ছি ছি, ৫০ টাকা বেতনের গৃহশিক্ষক? তাও কোনও করদ রাজা মহারাজার গৃহেও নয়,—একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোকের গৃহে।—কিন্তু পরদিন সাত পাঁচ ভাবিয়া, সে একখানা দরখাস্ত ঝাড়িয়াই দিল। ভাবিল—"হইবে না সে ত জানাই আছে। কত দরখাস্ত ত করা গেল, হল কি কোনওটা? যাক্, দেখাই যাক্ না, দুটো পয়সা বইত নয়!" ইহা ডাকমাশুল বৃদ্ধির পূর্ব্বের ঘটনা।

এ দরখাস্তের কিন্তু জবাব আসিল। "হইল" ঠিক বলা যায় না, "হইলেও হইতে পারে"।—ভবানীপুরের ঠিকানা দিয়া রায় বাহাদুর খেতাবধারী এক ভদ্রলোক চিঠি

লিখিয়াছেন,—"আপনার সহিত সাক্ষাতে কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি আসিয়া আমার সহিত আগামী শুক্রবার বেলা দশটার মধ্যে দেখা করুন। যদি আপনি মনোনীত না হন, তবে আপনার যাতায়াতের ইন্টার ক্লাসের ভাড়া আমি দিব।"

এ পত্র পড়িয়া পরেশ চটিয়া গেল। সে আপন মনে বলিতে লাগিল "হ্যাঁঃ—ভারি ত চাকরি তাও আবার জাঁকড়ে। রায় বাহাদুর হৃদয়নাথ চ্যাটার্জ্জি! কে হে তুমি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি? তোমার নামও ত কখনও শুনিনি জীবনে। ভেবেছিলাম হয়ত বা রবীন্দ্র ঠাকুর, কি জগদীশ বোস কি প্রদ্যোৎকুমার, কি দীঘ পাতিয়া,—এই রকম কেউ একজন নামজাদা লোকের বিজ্ঞাপন। তা নয়, হৃদয়নাথ চ্যাটার্জ্জি। ঘোড়ার ডিম যাবে।"

পরদিন ডাকে পরেশ তার স্ত্রীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। সে লিখিয়াছে, জমিদারের গোমস্তা খাজনার জন্য বড়ই বিরক্ত করিতেছে; খোকার গোয়ালার দুধের দামও তিন মাসের বাকী, সে বলিয়াছে অন্তত এক মাসের টাকা শোধ না করিলে সে দুধ বন্ধ করিবে—অতএব গোটা কুড়ি টাকা না হইলেই চলে না ইত্যাদি।

এই পত্র পড়িয়া পরেশের মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিল, দূর হোক্ ছাই—এরকম করে আর কতদিন চলবে?—অত মান অপমানের হিসেব করতে গেলে চলে না—যাই, মহা সম্ভ্রান্ত ও মহাপদস্থ সেই অজ্ঞাতনামা রায় বাহাদুরের তাঁবেদারীই করিগে। মাস গেলে পঞ্চাশটে টাকা পাব ত? বাসা-খরচ লাগবে না, নিজের কাপড় জুতো—সে আর কতই? বাড়ীতে মাসে মাসে যদি কুড়িটে টাকাও মনিঅর্ডার করে পাঠাই তাহলেই তারা বেশ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। যাই দেখি মহামতি চাটুজ্যে মশাই আমায় 'মনোনীত' করেন কি না।"

কিন্তু টাকা কোথায়? বাড়ীতে ২০ টাকা এবং কলিকাতার পাথেয় স্বরূপ অন্ততঃ ২০ টাকা—এই ৪০ টাকা এখনই প্রয়োজন। শ্বশুরদত্ত একছড়া সোনার চেন তাহার ছিল; ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীর অলঙ্কার সে বিক্রয় করিয়াছে কিন্তু এটিকে বিক্রয় করে নাই—কারণ পেটে অন্ন থাকুক আর নাই থাকুক, তদুপরি সোনার চেন ঝুলাইয়া আদালতে না গেলে উকীলের মর্য্যাদা থাকিবে কেন? সেই চেনছড়াটি বিক্রয় করিয়া, বাড়ীতে ২০ টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাকী অর্থ সঙ্গে লইয়া পরেশ কলিকাতা যাত্রা করিল।

।। দুই ।।

শিয়ালদহে নামিয়া, "পান্থ-নিবাস" নামক হোটেলে নিজের বাক্স ও বিছানা রাখিয়া, চা খাইয়া পরেশ ভবানীপুর যাত্রা করিল। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া দেখিল, বাড়ীটি বড়মানুষী ধরনের বটে। ফটকে কাঠের চেয়ারের উপর ভোজপুরী দ্বারবান গর্ব্বিতভাবে বসিয়া আছে—বেটা যেন লাট!

ইহা দেখিয়া পরেশ সেখানে দাঁড়াইল না। অল্পদূরে রাস্তায় মোড়ে একটা পাণের দোকান ছিল, সেখানে গিয়া এক পয়সার মিঠা খিলি কিনিল। দেড় পয়সা দিয়া একটা কাঁচি সিগারেট কিনিয়া, তাহা ধরাইয়া পাণওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যে বড় বাড়ী, ফটকে দারোয়ান বসে আছে, ও বাড়ী কার হে?"

পাণওয়ালা বলিল, "জানেন না বাবু? উনি রায়বাহাদুর রিদয়বাবু। ঐ যে চিড়িয়াখানার কাছে ছোটলাট সাহেবের কুঠী আছে না? উনি সেই কুঠীর মেনেজার, মস্ত লোক!"

"ওঃ"—বলিয়া পরেশনাথ ধীর পদে, সেই বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারবান হস্তে, রায়বাহাদুরের চিঠিখানি পাঠাইয়া দিল।

ক্ষণকাল পরেই তাহার ডাক পড়িল। পাজামা সুট পরিয়া রায়বাহাদুর ড্রয়িংরুমে বসিয়া, গুড়গুড়িতে তামাক সেবন করিতে করিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। চোখে সোনার চশমা। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের উপরে উঠিয়াছে—দেহখানি স্থূল, বর্ণটি খুব উজ্জ্বল শ্যাম—প্রায় গৌরবর্ণ বলিলেই হয়।

পরেশনাথ প্রবেশ করিতেই তিনি তাহার সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "বসুন।"

পরেশ বসিলে, রায়বাহাদুর তাহার প্রতি নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

রায়বাহাদুর পরেশের আবেদনপত্রখানি বাহির করিয়া, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এম-এ, বি-এল পাস করেছেন; ঢাকাতে প্র্যাকটিস করেন লিখেছেন; বিশেষ সুবিধে হয়নি তা অবশ্য বুঝতেই পারছি; কিন্তু তা হলেও, ৫০ টাকা মাইনেতে কি আপনার চলবে? এতে কি আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন?"

পরেশ সবিনয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে,তা পারবো, কেন না আমার অভাব কম।"

"ওঃ—সে ভাল।"—বলিয়া রায়বাহাদুর গুড়গুড়ির নলটায় দুই চারি টান দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমি ২৪ ঘণ্টার লোক চাই—এখানে আপনার থাকতে কোনও অসুবিধে হবে না ত?"

পরেশ বলিল, "আজ্ঞে, অসুবিধে হবে কেন?"

"আমি যদি আপনাকে মনোনীতই করি, কবে আপনি জয়েন করতে পারেন?"

"যবে বলেন। একবার আমায় ঢাকায় যেতে হবে, সেখানকার বাসা তুলে দিয়ে, দেশে গিয়ে মার সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে আসতে পারি।"

"দেশে আপনার মা আছেন বুঝি? আচ্ছা বেশ। যতগুলি দরখাস্ত এসেছিল, তাব মধ্যে থেকে বেছে বেছে আমি যাদের ডেকেছিলাম, তাদেব প্রায় সকলেব সঙ্গেই দেখা করা হয়ে গেছে। আপনি আজ এলেন। আর দুজন মাত্র বাকী—তাঁদের কাল ডেকেছি। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই, পরশু আমি স্থির করবো কাকে এ পদ দেবো। আপনি কি করবেন? এ দুদিন কি কলকাতাতেই অপেক্ষা করবেন?"

পরেশ বলিল, "আপনি যা বলেন।"

"আমি তবে আপনাকে স্পষ্টই বলি। পূর্ব্বে যতগুলি লোক এসেছিলেন, তাঁদের সকলের চেয়ে, আপনাকেই আমি বেশী যোগ্য মনে করি। কাল যে দুজনের আসবার কথা আছে, তাঁদের অবশ্য এখনও দেখিনি।"

এই সময় একটি ১২।১৩ বৎসরের সুন্দরী মেয়ে, অঙ্গে তাব ইংরাজী ফ্রক, রুখু এলোচুল ফিতায় বাঁধা, লাফাইতে লাফাইতে সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং আগন্তুকের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, রায়বাহাদুরের গলাটি জড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "ড্যাডি-মণি, আজ ত 'কান্‌-ফ্রাইডে', আজ কি আমরা বায়স্কোপে যাব?"

পরেশ মনে মনে বলিল, "আ মোলো যা! ধেড়েকেষ্ট মেয়েটাব রকম দেখ! আবার ড্যাডিমণি! ইঙ্গবঙ্গ এই জন্যেই বলে বোধ হয়!"

রায়বাহাদুর কন্যার পৃষ্ঠে আদরের মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "যাবি ত পাগলী!"

মেয়ে মহা আনন্দে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। রায়বাহাদুর বলিলেন, "দুদিন আপনি থেকেই যান না। আপনার বাসার ঠিকানাটা দিয়ে যান, পরশু রবিবার সকালেই, যাহোক একটা কিছু খবর আপনাকে পাঠাব। যদি অন্য লোককেই এপয়েন্ট করি, আপনার রাহা খরচের টাকা পাঠিয়ে দেবো—নয়ত, আপনাকে ডেকে পাঠাব।"

পরেশ বলিল, "আজ্ঞে কোনও বাসা ত এখনও ঠিক করিনি। যদি বলেন ত পরশু—"

"আচ্ছা, তা হলে পরশু সকালে একবার এই সময় এসে খবরটা নেবেন।"—বলিয়া রায়বাহাদুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া, পরেশের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন।

পরেশ ভয়ে ভয়ে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রায়বাহাদুর তখন টেলিগ্রামের কর্ম্ম লইয়া তাঁহার পরিচিত ঢাকার কোন প্রবীণ উকীলকে এই মর্ম্মে একটি জবাবী তার করিলেন।

"জুনিয়র উকীল পরেশ ব্যানার্জি কি চরিত্রের লোক? আমার সন্তানদের গৃহশিক্ষক হইবার সে উপযুক্ত কি না?"

তার লেখা হইলে রায়বাহাদুর ঘণ্টা বাজাইলেন। আর্দ্দালি আসিল। তখনই সে তার রওনা হইয়া গেল।

অপরাহ্ন কালে তারের জবাব আসিল—"ঐ যুবক অতি সচ্চরিত্র সর্ব্বাংশে উপযোগী।"

এই উত্তব যখন আসিল, রায়বাহাদুর তখন তাঁহার কর্ম্মস্থানে ছোট লাটসাহেবের কুঠী বেলভেডিয়াবে। পাণওয়ালা বর্ণিত "মেনেজার" তিনি নহেন, তিনি বেলভেডিয়ারের এঞ্জিনিয়র। বহুকাল সরকারী পূর্ত্ত বিভাগে কর্ম্ম করিয়া, এই কয়বৎসর তিনি বেলভেডিয়ারেব এঞ্জিনিয়র হইয়াছেন। লোকে বলে, ইনি ছোট লাটসাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। লাটসাহেবের পত্নীর ত, চাটার্জ্জি না হইলে এক মুহূর্ত্ত চলে না। নেকলেস মেরামত করাইতে হইলে চ্যাটার্জ্জিকেই হ্যামিল্টনের বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। চাটার্জ্জি বলরুম সাজাইয়া না দিলে তাঁর নৃত্যোৎসব সম্পন্ন হয় না।

রবিবার প্রভাতে রায়বাহাদুর-ভবনে আসিয়া পরেশ শুনিল, তাহাকেই মনোনীত করা হইয়াছে। সাত দিন পরে আসিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে এই কড়ারে, সেইদিনই সে ঢাকা রওনা হইল।

।। তিন ।।

যথাসময়ে পরেশ আসিয়া নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ছাত্র দুইটি তার বেশ বাধ্য; বড়টির নাম সুবোধ, ছোটটির নাম সুশীল। পড়াশুনাতেও মন আছে। সুবোধ স্কুলে যায়। সুশীল এখনও স্কুলে ভর্ত্তি হয় নাই, বাড়ীতেই পড়ে; রায়বাহাদুরও পরেশের কর্ম্মকুশলতায় তার উপর খুসী।

ছাত্রগণকে পড়াইবার অবসর কালে, রায়বাহাদুরেব লাইব্রেরী হইতে বহি লইয়া পরেশ তাহার অধ্যয়নতৃষা মিটাইতে থাকে। মাঝে মাঝে বায়বাহাদুরের সহিত নানা প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা হয়;—রায়বাহাদুর তাহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

আহারাদির ব্যবস্থা ভাল, ইঁহাদের ব্যবহার ভাল, অর্থচিন্তা নাই,—পরেশ বেশ আরামেই দিন কাটাইতে লাগিল; এইরূপে ৩।৪ মাস কাটিবার পর, হঠাৎ রায়বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলের দুই একটা কথায় তাহার মনটা বড় আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

সুশীল একদিন অপরাহ্নে (তার দাদা তখনও স্কুল হইতে ফিরে নাই) হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা স্যার, ডেপুটি কাকে বলে?"

পরেশ বলিল, "ডেপুটি? ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বোধ হয়। তাঁরা মফঃস্বলে হাকিমী করেন।"

"হাকিমী কি, স্যার?"

"এই—তাঁরা অপরাধীদের বিচার করেন, লোককে জেলে দ্যান।"

বালক বলিল, "ওঃ—আচ্ছা স্যাব, আপনার ডেপুটি হতে ইচ্ছে করে?"

পরেশ বলিল, "পেলে ত বেঁচে যাই।"

"কেন? ডেপুটিদের অনেক মাইনে বুঝি?"

"হ্যাঁ,—মাইনে বেশী। মান সম্ভ্রমও খুব।"

বালক বলিল, "আচ্ছা, স্যার, আপনার কি বিয়ে হয়েছে?"

বালকের মুখে এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে পরেশ কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "কেন বল দেখি?"

সুশীল বলিল, "ডেপুটি হতে আপনার খুব ইচ্ছে বলছেন; কিন্তু যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা ত আর ডেপুটি হতে পারে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এই কথা শুনিয়াই, পরেশ বুঝিতে পারিল, বালকের এই উক্তির অন্তরালে একটা কিছু রহস্য লুক্কায়িত আছে। সে সাবধান হইল; এবং বালকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা ডেপুটি হতে পাবে না তোমায় কে বললে?"

বালক বলিল, "আমায় কেউ বলেনি। কাল রাত্রে আমরা যখন ঘুমুচ্ছিলাম, বাবা মা শুয়ে যে সব কথা বলাবলি করছিলেন, তাই থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের আর ডেপুটি হবার যোটি নেই।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ঘুমুচ্ছিলে ত বাবা মার কথা শুনলে কি করে?"

বালক বলিল, "সবটা কি ঘুমুচ্ছিলাম? একটু একটু ঘুমুচ্ছিলাম, একটু একটু জেগেও ছিলাম।"

পরেশ নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিলেন তাঁরা?"

"মা বলছিলেন, পরেশ ছেলেটি ত দেখতে শুনতে বেশ, স্বভাবটিও ভাল, ওর বিয়ে হয়ে গেছে কিনা খোঁজ নাও না। যদি না হয়ে থাকে, লাটসাহেব ত তোমার হাতধরা, তুমি কি আর ওকে একটা ডেপুটি করে দিতে পার না? বাবা বললেন, তা পাববো না কেন, বোধ হয় পারি। আচ্ছা কাল পরেশকে জিজ্ঞাসা করবো।"

পরেশ বলিল, "আর কি বলছিলেন তাঁরা?"

বালক বলিল, "আরও বাবা কি কি বললেন আমি ভুলে গেছি, স্যাব।"

শুনিয়া পরেশ হাসিতে লাগিল। এই সময় আয়া দুধ খাইবার জন্য সুশীলকে ডাকিতে আসিল, সুশীল ভিতরে চলিয়া গেল।

পরেশ আপন মনে কথাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথম নম্বর, বাড়ীতে একটি বিবাহযোগ্য কন্যা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ পরেশ তাহাদের স্বজাতি ও স্বঘব, এবং সে যে বিবাহিত, একথা কোনও দিন প্রকাশ কবে নাই,—কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়াই প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তৃতীয়তঃ রায়বাহাদুরের জামাতার জন্য একজন পদস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন, পঞ্চাশ টাকা বেতনের গৃহশিক্ষক হইলে চলিবে কেন? যতই সে ভাবিয়া দেখে, ততই তাহার মনের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, তাহাকে জামাই কবিবাব অভিপ্রায়েই রায়বাহাদুর-দম্পতি গত রাত্রে ঐ প্রকার কথোপকথন করিয়াছিলেন।

সেই দিনই রাত্রি-ভোজনের পর, রায়বাহাদুব খোলা বারান্দায় ঈজি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে, পরেশকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরেশ আসিলে বলিলেন, "বস হে। একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।"

পবেশ বসিল। প্রথমে দুই-একটা অবান্তর কথার পব রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর চিঠিপত্র পাও? সবাই ভাল আছেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন বলেছিলে?"

"আজ্ঞে আমার বিধবা মা আছেন, একটি ছোট বোন আছে, বিধবা জ্যেঠাইমা আছেন, তাঁব একটি ছেলে আছে বছর বারো তেরো।"

"আজও বিবাহ করনি নাকি?"

পরেশের বুকটি দুর দুর করিয়া উঠিল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট স্বরে মিথ্যা বলিল, "আজ্ঞে না।"

"কেন? তার কারণ?"

"আজ্ঞে, নিজে ভাল রকম উপার্জ্জন করতে পাবার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা উচিত মনে করি না, সেই জন্যই করিনি। অন্য কোনও কারণ নেই।"

কথাটা শুনিয়া রায়বাহাদুর খুসী হইলেন। সেদিন এ প্রসঙ্গে আর অধিক কথা চালাইলেন না।—দিন পাঁচ ছয় আর কোন কথা এ সম্বন্ধে উঠিল না। ইহাতে পরেশ একটু হতাশ হইয়াই পড়িল। কিন্তু সপ্তম দিনে, রাত্রি দশটার সময় রায়বাহাদুর তাহাকে তলব করিলেন।

আজ স্পষ্ট কথা। রায়বাহাদুর বলিলেন, "দেখ পরেশ, আজ আমি তোমার কাছে একটি প্রস্তাব করবো। বিষয়টি একটু, কি বলে গিয়ে, ডেলিকেট। ইচ্ছা হয়, আজই তুমি উত্তর দিও। কিম্বা, যদি ভেবে চিন্তে দেখতে চাও, আজই তোমার উত্তর আমার আবশ্যক নেই; ভেবে চিন্তে দেখে, দুদিন পরেই তুমি আমায় বোলো।"

রায়বাহাদুর ঈজি চেয়ারে একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে সুনীতিকে তুমি ত দেখেছ। ডায়োসিজনে পড়ছে, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, তাও বোধ হয় শুনেছ। ওর বিবাহ দেবার জন্যে, গিন্নী কিন্তু বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যেখানে সেখানে পাত্র দেখা হল, কোথাও তেমন পছন্দ হল না।—তোমার গিন্নী কি সুনজরে দেখেছেন জানিনে, ওঁর ভারি ইচ্ছে হয়েছে, তোমার হাতেই সুনীতিকে সমর্পণ করেন।"—বলিয়া রায়বাহাদুর নীরব হইলেন। পরেশও লজ্জিতভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

প্রায় একমিনিট পরে, রায়বাহাদুর আবার বলিতে লাগিলেন, "সুনীতিকে তোমার পছন্দ কি না জানি না। আর, তোমার মা বেঁচে রয়েছেন, তাঁরও মতামত নেওয়া অবশ্য দরকার। আরও একটা কথা বলে রাখি। যদি অন্য বাধা না থাকে, তবে তুমি সেদিন যে বাধার কথা উল্লেখ করেছিলে যে উপার্জ্জনক্ষম না হলে তুমি বিবাহ করবে না, সে বিষযেব একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারবো। তুমি বোধ হয় জান যে লাটসাহেব আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁকে ধরে, তোমার একটা কিনারা আমি করে দিতে পারবো বোধ হয়।"

পরেশ প্রায় জড়িত স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আপনি যা বললেন, এ ত আমার আশাব অতীত, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তবে, মাকে একবার জিজ্ঞাসা কবা দবকাব। তাঁর মত না নিয়ে—"

রায়বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "সে ত নিশ্চয়—আমি ত তা আগেই বলেছি। তুমি তাঁকে চিঠিতে সব কথা লেখ। কিম্বা, না হয় বাড়ীই যাও, মুখে তাঁকে সব কথা বল। আব, তিনি যদি মেয়ে দেখতে চান, তাঁকে সঙ্গে করেও এখানে আনতে পার।"

পরেশ বলিল, "আজ্ঞে, সেই বোধ হয় ভাল হবে।"

"বেশ, তবে তাই যাও। কথাটা পাকা হয়ে গেলেই, তোমাকে আমি লাটসাহেবের কাছে নিযে যেতে চাই।"—পবেশ কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বলিল, "আজ্ঞে হেঁহেঁ—আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

পরদিনই সন্ধ্যার ট্রেণে পরেশ ঢাকা যাত্রা করিল। এখানে চাকরি কবিতে কবিতে আরও দুইবার সে বাড়ী গিয়াছিল,—শিয়ালদহে গিয়াছিল, ভাড়াটিয়া অশ্বযানে। এবাব রায়বাহাদুরের নিজের মোটর গাড়ী তাহাকে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিয়া আসিল! গত দুইবাব বাড়ী যাইতে নিজ পকেট হইতে তাহাকে কষ্টসঞ্চিত অর্থ বাহিব করিতে হইয়াছিল। এবাব উন্টা কিছু লভ্য হইল,—বায়বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতেব ভাড়া দিয়াছিলেন; পরেশ কিন্তু শিয়ালদহে গিয়া ইণ্টার ক্লাসের টিকিটই খরিদ করিল!

।। চার ।।

পাঁচদিন পরে পরেশ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, তার মা জ্যেঠাইমা উভয়েই এ বিবাহে মত দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আমরা এখন বউমাকে দেখবো না। অদিনে অক্ষণে কি দেখতে আছে? বিয়ের পর যখন বউ বরণ করে ঘরে তুলবো সেই সময় মুখ দেখবো।"

এখন হইতে গৃহিণী, আহারাদি ও অন্যান্য বিষয়ে পরেশকে আরও বেশী যত্ন করিতে লাগিলেন।

লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত হইবার উপযুক্ত পোষাক, রায়বাহাদুর নিজ ব্যয়েই তাহাকে লইয়া গিয়া, নিজ হবু-জামাই বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। লাটসাহেব সহাস্য বদনে পরেশের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। বিদায় গ্রহণকালে, পরেশের সাক্ষাতেই তিনি রায়বাহাদুরকে বলিলেন, "বেশ উজ্জ্বলবুদ্ধি যুবক। দেখি আমি উহার জন্য কি করিতে পারি।"

মাসখানেকের মধ্যেই, বার্ষিক ডেপুটি মনোনয়নের সময় উপস্থিত হইল। গেজেট হইবার পূর্ব্বেই পরেশ জানিতে পারিল, শিক্ষানবীশ ডেপুটিদের তালিকায় তাহার নাম উঠিয়াছে এবং আলিপুর আদালতে তাহাকে কর্ম্মশিক্ষা করিতে হইবে।

কিছুদিন পরেই, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া পরেশ আদালতে যাইতে আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর গৃহেই এখনও সে বাস করে—এবং পূর্ব্ব মতই তাঁহার পুত্রগণেব শিক্ষকতা করিয়া থাকে। সুনীতি আর তাহার সামনে বড় আসে না; যদিও এখনও সে ফ্রক ছাড়িয়া শাড়ী ধরে নাই এবং ডায়োসিজনেব গাড়ীতে নিয়মিতভাবে স্কুলে যায়, তথাপি ববকে "লজ্জা" করিবাব বংশানুক্রমিক প্রথা সে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এপ্রিল মাসে সুনীতির ম্যাট্রিক পরীক্ষা হইবে—মে মাসে পবেশের ডেপুটি পদে পাকা হইবার কথা—তাই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি বিবাহ হইবে এইরূপই প্রায় স্থির আছে।

সুনীতির পরীক্ষা হইয়া গেল। লিখিয়াছে ভাল, পাস সে নিশ্চয়ই হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটিল। বেলভেডিযারে রায়বাহাদুরের নিকট টেলিফোনে সংবাদ গেল, এজলাসে বসিয়া কাজ করিতে কবিতে হঠাৎ পরেশের ফিট হইয়াছিল, চেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করিয়া সে পড়িয়া যায়, ভবানীপুরেব ডাক্তাব যতীন ঘোষ সেদিন ঘটনাক্রমে কোনও মোকর্দ্দমার সাক্ষী স্বরূপ আদালতে উপস্থিত ছিলেন, খাস কামরায় লইয়া গিয়া তিনিই রোগীব চিকিৎসা ও শুশ্রূষা কবিতেছেন।

শুনিয়া, রায়বাহাদুরের মাথায় ত বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ মোটর ছুটাইয়া, আদালতে গেলেন। পরেশ তখন কতকটা সুস্থ হইয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। ডাক্তারবাবু তাহার নাড়ী পবীক্ষা করিতেছেন।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ডাক্তাববাবু?"

ডাক্তারবাবু, রায়বাহাদুবকে চোখ টিপিয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়। বড় গরমটা পড়েছে কিনা, তাই ফিট হয়েছিল।'

"এখন বিশেষ কোনও আশঙ্কা আছে কি?"

"না, উপস্থিত কোন আশঙ্কা নেই।"

রায়বাহাদুর পরেশকে এবং ডাক্তারকে নিয়ে মোটরে তুলিয়া লইয়া বাড়ী আসিলেন। পরেশকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার শুশ্রূষাব ব্যবস্থা কবিয়া, ডাক্তারকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, ব্যাপার কি বল দেখি?"

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার গুরুতর। এ, যে সে মূর্চ্ছা নয়,—মৃগী রোগ।"

"অ্যাঁ? বল কি!"—বলিয়া রায়বাহাদুর সেখানেই হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। জড়িত স্বরে বলিলেন, "তবে ত, যে কোনও সময়ে, হঠাৎ—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে।"

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, দিন দুই সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া, ভিজিটের টাকাগুলি লইয়া ডাক্তারবাবু প্রস্থান করিলেন।—পরদিন প্রাতে পরেশকে দেখিতে আসিয়া রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, আর কি কখনও এ রকম ফিট তোমার

হয়েছিল, না এই প্রথম?"—পরেশ ক্ষীণস্বরে বলিল, "আজ্ঞে আরও দুবার হয়েছিল। শেষবার, এখানে দিনকতক আসবার আগেই। বার লাইব্রেরীতে বসে অন্য জুনিয়র উকীলদের সঙ্গে তাস খেলছিলাম, হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ি।"

"প্রথম বার?"

"সেবার আমি বি এ পাস করে দেশে গেছি, একটা বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে বসেছিলাম,—খেতে খেতেই ফিট হয়।"

রায়বাহাদুর মুখখানি গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া বাড়ীব মধ্যে গেলেন।

গৃহিণী স্বামীর মুখে পবেশ সম্বন্ধে ডাক্তারের মন্তব্য গতকল্যই শুনিয়াছিলেন; এখন তার আরও দুইবার মূর্ছা হওয়ার ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন, "ওগো তুমি অন্য পাত্র দেখ; ও ছেলেকে কিছুতেই আমি মেয়ে দেবো না।"

পরেশ সুস্থ হইয়া আবার আদালতে বাহিব হইতে লাগিল।

রায়বাহাদুর একদিন অবস্থা বুঝিয়া, মিষ্ট কথায় স্নেহপূর্ণ ভাষায় তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। পরেশ দুঃখিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, আমি নিজেই আপনাকে জানাব ভেবেছিলাম। যতীনবাবু ডাক্তাবও আমাকে বলেছেন, এ অবস্থায় বিবাহ করা কিছুতেই আমার উচিত নয়।"

এই কথোপকথনেব অল্পদিন পরেই পরেশের বদলির সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হইল। ভিতব ভিতর রায়বাহাদুরই কল টিপিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

রায়বাহাদুর অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ছেলেটি শিবপুর ইঞ্জিনিয়াবিং কলেজে পড়িতেছিল; শাঁসালো শ্বশুব দেখিয়া বিলাত যাইতে চাহিল, এবং মাস দুই পরেই শ্বশুবেব টাকায় বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে চলিয়া গেল।

ডেপুটি পথে পাকা হইয়া পরেশ টাঙ্গাইল মহকুমায় সেকেণ্ড অফিসব স্বরূপ বদলি হইল। প্রথম প্রথম বায়বাহাদুর পরেশের সংবাদ লইতেন। ক্রমে সেটা কমিযা গেল; শেষে বন্ধই হইয়া গেল।

।। পাঁচ ।।

বৎসরখানেক পরে পবেশের সাবডিভিসন্যাল অফিসার প্রবোধবাবু ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। একদিন রায়বাহাদুরের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। টাঙ্গাইলে ছিলেন শুনিয়া রায়বাহাদুব তাঁহাকে পরেশের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রবোধবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, পবেশ সেখানে বেশ আছে। রাজকর্ম করছে। এই কিছুদিন হল সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার পেয়েছে।"

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ কবেছে?"

"হ্যাঁ। করেছে বইকি।"

"ছেলেপিলে কিছু হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, তাব একটি ছেলে, একটি মেয়ে।"

বিবাহই বা করিল কবে? আব বছর না ঘুরিতেই একটি ছেলে একটি মেয়ে! সবিস্ময়ে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত বড় ছেলে মেয়ে?"

"ছেলেটি বড়। বছর ছয়েকের হবে। মেয়েটি বছরখানেকের।"

রায়বাহাদুর শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু মনের বিস্ময় মনে গোপন করিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ!"

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশের এখন স্বাস্থ্য কেমন?"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "স্বাস্থ্য ভালই!"

"সেখানে কোনদিন তার ফিট-টিট হয়েছিল?"

"না, ফিট হবে কেন?"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "এখানে যখন ছিল, তখন একদিন এজলাসে বসে তার ফিট হয়েছিল।"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "না, সেখানে কোনও দিন ত ফিট-টিট হতে দেখেনি তার।'

রায়বাহাদুর একটু গোপন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, যতীন ডাক্তার যিনি আলিপুরে পরেশের ফিটের দিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি পরেশের স্বগ্রামবাসী ও সতীর্থ, এবং পরেশ এখানে থাকাকালীন সে প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া আড্ডা দিত।

রাত্রে রায়বাহাদুর পরেশঘটিত নূতন খবরগুলি সমস্তই তাঁহার গৃহিণীর নিকট প্রকাশ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, ও ফিট-টিট সবই মিথ্যে—নিজের কাজটি বাগিয়ে নিয়ে, কেবল বিয়েটা বন্ধ করবার জন্যেই ঐ কৌশল করেছিল।"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "আমরা গর্ব্ব করে থাকি আমরা কলকাতার লোক ভারি চালাক।—কিন্তু ঢাকার বাঙ্গালটা এসে আমাদের কি ঠকানটাই ঠকিয়ে গেল বল দেখি।"

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩]

শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীবিলাসবাবুর বিবাহিত-জীবন সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী সরোজবাসিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাস শত সহস্রবার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধুরাশির মধ্যে মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার হুলের দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। আসল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল। আর শ্রীবিলাসও বোধ হয় একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের ঐক্যতানবাদনে সুর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের শ্বশুর হরিগোপালবাবু—লক্ষ্ণৌয়ের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপালবাবু। ও অঞ্চলের লোক, কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে, এবং—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক—কোন্ ভ্রমণকারী বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে অন্ততঃ একটিবারও পাত পড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া খাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে। সে কথা যাউক—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল সারা বাঙ্গলা দেশে দুই তিনখানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ফেরতা ঘর"—অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চল—ছিল। পাত্র জুটানই মুস্কিল ছিল, কিন্তু যদি পাত্রও বা জুটিল, তবে হয় সে একটি হস্তীমূর্খ; নয় ত একেবারে নিঃস্ব। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল। তাহাকে স্বজাতীয় এবং 'স্বঘরের' দেখিয়া হরিগোপালবাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন, এবং লক্ষ্ণৌয়ে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। সেই ভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আঠারো বৎসর বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন কন্যার বয়ঃক্রম বারো বৎসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপালবাবু দুইজনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি একবৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তখন এফ-এ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার শ্বশুরমহাশয়ের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হইলে তাঁহার শ্বশ্রুঠাকুরাণী বলিলেন—"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি। এই যমপুরী লক্ষ্ণৌ সহরে আমি আর একদিনও টিকিতে পারিব না।"

তাহাই হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার সিকি মূল্যেই বিক্রীত হইল। জিনিষপত্র কতক বিক্রীত, কতক বিতরিত এবং অবশিষ্ট গোলেমালে অপহৃত হইল। দিন পনের কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী, হরিগোপালবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সরোজবাসিনীর আর দুই ভগ্নী এবং একটি ভ্রাতা ছিল। ভগ্নী দুইটি নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। ভ্রাতাটির নাম সতীশ। সাত আট বৎসর বয়স। সুতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসরখানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন,—"জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই।"—বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শ্রীবিলাস কলিকাতায় গিয়া এফ-এ, বি-এ, এবং দুইবার অনুত্তীর্ণ হইবার পর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপ সাত আট বৎসর অতীত হইল।

শ্রীবিলাসের এখন সাতাশ আঠাশ বৎসর বয়স হইয়াছে—কিন্তু এ পর্যন্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এতখানি বয়স হইল, তথাপি তিনি সিকি পয়সাও উপার্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে শ্রীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হইয়া থাকিতেন। এই সময় তাহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী তাঁহার অকৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাব সহ্য না করিয়া একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিতেন। বলাবাহুল্য ইহাতে সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ষ্টিমহ্যামারের সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাই তিনি পরামর্শ করিলেন, পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন। শ্বশ্রু বলিলেন—"সেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভদিনে দুই জনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাঁকীপুরে। সেইখানে বাসা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই। কোনও মাসের আয়ে বাসাখরচটার সঙ্কুলান হয়—কোনও মাসে তাহাও হয় না। প্রথমে উকিলী পাস করিয়া শ্রীবিলাসের মনে যে আত্মমর্যাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে পড়িতেছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্যন্ত বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা যোগাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন ভারি অসন্তোষের ভাব। তিনি দেশে প্রায়ই আত্মীয় প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর বুদ্ধির দোষ দিয়া বলিতেন—"দেখ দেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে, তাহার টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে হইল। খতাইয়া দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক টাকা বিবাহে ব্যয় করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা খরচ করিলাম, তবুও জামাইটি মানুষের মত হইল না।" ইদানীং

শ্রীবিলাসও নিতান্ত অনিচ্ছায় সহিত শাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ "গতিরন্যথা" ছিল না।

যখনকার যাহা ঠিক, সেই সময়ে মানুষের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বুই জনের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিংশ বৎসর বয়স হইলেও সন্তান হইল না;—হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশানুরূপ ত নহেই—প্রয়োজনানুরূপও নহে। এই দুইটি কারণে তাঁহার জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহ্য হয়, যদি পত্নী অনুকূলা হয়েন। এমন কোন্ সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায়? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণযবতী হইলেও এই দুইটি ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সে দিন রবিবারের সন্ধ্যা। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদেব উকিলবাবুর বৈঠকখানা ঘবে একটিও মক্কেলনামক সেই প্রিযদর্শন জীব উপস্থিত ছিল না।

শ্রীবিলাস এই বর্ষা প্রদোষে একাকী বসিয়া সুর করিয়া ঋতুসংহারের দ্বিতীয় স্বর্গ পড়িতেছিলেন। ক্রমে এই স্থানে আসিলেন ঃ—

শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে
শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ।

এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি পুস্তক বন্ধ করিযা উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায ধীরমন্থবগতিতে অন্তঃপুব অভিমুখে চলিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে স্ত্রী নাই। দাসী জানাইল, ঠাকুর পলাইয়া গিয়াছে; সেই জন্য মা-জী স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত আছেন। ইহা শুনিযা শ্রীবিলাস বাহিরে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—এমন সময সবোজবাসিনী প্রবেশ করিলেন; আজ অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ ঠাকুবেব তিরোভাবে সরোজ যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একটা পরিহাস করিলেন, কিন্তু সবোজবাসিনী মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। শ্রীবিলাস নাকি এই সরোজার সহিত অনেক দিন হইতে ঘর করিতেছেন—এই কারণে তিনি এরূপ আচবণে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তখন কাব্যলব্ধ নায়কভাব বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত সাধারণ সাংসারিকজনোচিত প্রশ্ন করিলেন—"আজ আবার বাবাজীর কি হইল?"

সরোজবাসিনী নিরুত্তর। শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়া ছিলেন, পালঙ্কের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর পারাও যায় না। এমন করে তিন দিন অন্তর ঠাকুর পালালে—"

সরোজবাসিনী বাধা দিয়া বলিলেন—"সস্তার ঠাকুর ঐ রকমই হয়ে থাকে। তিন টাকার মহিমায় কি আর ভাল ঠাকুর হয়?"

শ্রীবিলাস স্ত্রীর এই কয়টি সামান্য কথাতেই নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মনে হইল, স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অকৃতিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। স্মরণ হইল সেই বাল্যকালে সরোজবাসিনীর পিতা কি শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন;—তিনি ত এক প্রকার পথের ভিক্ষুক হইতেই চলিয়াছিলেন। সরোজবাসিনী বাল্যকাল হইতে শ্রীবিলাসকে স্বীয় পিতার অন্নদাস বলিয়াই জানিতেন—এখন সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই কি ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইবে? তিনি নিঃসশয়িত ভাবে স্থির করিলেন, এই উক্তিতে তাঁহার "প্লীবিয়ন্ অরিজিনের" প্রতিও বক্রকটাক্ষপাত আছে—অর্থাৎ তাঁহার নজর ছোট, তাই তিনি তিন টাকায় রসুয়ে বামুন রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিলাস এই কল্পিত অপমান সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন—ইহা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাসেব ফল। বলিলেন—

"আজ আব থাক্। বাজার থেকে জলখাবার আনিযে নেওয়া যাবে এখন। তুমি বস।"

সরোজবাসিনী যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন। শ্রীবিলাস কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সরোজার হস্তধারণ করিয়া সাদরে বলিলেন,—"চল।" সরোজবাসিনী একটা যন্ত্রণাসূচক উহুহু শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন।

শ্রীবিলাস সভয়ে দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

সরোজবাসিনী বলিলেন—"হয়েছে আমার মাথা ও মুণ্ড' (যেন মাথা ও মুণ্ড দুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ)।

শ্রীবিলাস হাত টানিয়া দেখিলেন—অনেকটা স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে সাদা সাদা ঔষধ লেপিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল;—বলিলেন, "আহাহা, বড় কষ্ট হয়েছে ত! কেন তুমি রান্নাঘরে গেলে? ছিঃ—এমন অসাবধান!"

বেশ চলিতেছিল এবং সম্ভবত নিরাপদে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত; কিন্তু এই শেষের কথাটিই সব মাটি করিয়া ফেলিল! "এমন অসাবধান!"—সরোজবাসিনী আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। সে চিরকাল ধনী পিতামাতার আদরের মেয়ে ছিল;—তাহাকে কখনও কোন গৃহকার্য্য করিতে হয় নাই। রন্ধনাদি সম্বন্ধে তাহার একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং সরোজবাসিনী রন্ধনশালায় অসাবধান একথা তাহার পক্ষে কোন দোষেরই নয়; তথাপি তাহার সহ্য হইল না যে, স্বামী তাহাকে অসাবধান বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সে ক্রোধ ও ক্রন্দনের মিশ্রিত স্বরে শ্রীবিলাসকে কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিয়া দিল। স্বামী মহাশয়ও নিতান্ত নীরব রহিলেন না। ফলকথা সে রাত্রে শ্রীবিলাস বৈঠকখানা গৃহে শয়ন করিলেন। সেই বালক সতীশ অনেক জিদ করিয়া দুইজনকে কিছু খাওয়াইল নহিলে অভুক্ত অবস্থাতেই উভয়ের রাত্রি কাটিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে শ্রীবিলাস শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল—"এক নিকট আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অতএব সরোজবাসিনীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।" শ্রীবিলাসের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাও লেখা ছিল যে "যতদিন ভালরূপ পসার না হয় ততদিন সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া অনর্থক খরচ বাড়াইবার প্রয়োজন কি?"—শ্রীবিলাস নিশ্চয়ই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেন, যদি এ আর্থিক অসচ্ছলতার কথাটার উল্লেখ না থাকিত। ইহা তীরের মত আসিয়া তাঁহার সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত আত্মাভিমানকে বিদ্ধ করিল। তিনি যথাসময়ে বালক সতীশের হাতে এই পত্রখানি স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। সরোজবাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি যাইব, সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বল।" শ্রীবিলাস ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন—"এখন কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে আর সরোজবাসিনী কোনও কথা বলিয়া পাঠাইলেন না; পরন্তু জননীর সেই পত্রখানি লইয়া যে অংশে শ্রীবিলাসের অর্থসঙ্কটের উল্লেখ ছিল, সেই অংশটি মোটা পেন কলম দিয়া লাল কালীর দাগ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীবিলাস অন্যমনস্কভাবে সে পত্র লইয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলেন—তখন আর খুলিয়া দেখিলেন না। আহারাদি করিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। কাছারি হইতে প্রায়ই তাঁহাকে খালি পকেটে ফিরিতে হইত। সে দিন দৈবাৎ পকেটটা কিছু ভারি করিয়া ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। শুনিলেন তিনটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে সতীশকে লইয়া "মা-জী" প্রস্থান করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া তাম্রকূট সেবা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীবিলাস ও পাড়ার অন্য সকলে ঠাকুরদাদা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সংস্কৃতটা কিছু পড়া ছিল;—ইংরাজিও অল্প

জানিতেন; এ কালেব লোক-জন আচাব-ব্যবহাব, এ সকলেব উপব তিনি হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহাব একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ভ্রম ছিল—তিনি বছব ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ভুল কবিযা এ পর্যন্ত এই ভাবতবর্ষটাকে কোম্পানীব বাজ্য বলিযাই উল্লেখ কবিতেন। এই ঠাকুবদাদা মহাশয, শ্রীবিলাসের স্ত্রীর পলায়ন সংবাদ পাইবা মাত্র, হেলিতে দুলিতে বৈঠকখানায আসিযা উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিযা তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বর্তমান সময়ে স্ত্রীলোকগণেব এই প্রকাব যথেচ্ছাচাবিতাব বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আবম্ভ করিয়া দিলেন। দুই চারিটা শাস্ত্র বচন আওড়াইয়া প্রমাণ কবিলেন, স্ত্রীলোকেবা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইযা উঠিলে সমাজেব আব ভদ্রস্থতা নাই,—এমন কি কলিব শেষ অবস্থা ঘনাইয়া আসিযাছে বুঝিতে হইবে। শ্রীবিলাসের এখন এই সমস্ত কথা নিবতিশয যুক্তিসঙ্গত বলিযা বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমাব শ্বাশুড়ীঠাকুরানী এমন কিছু জিদ করিয়া লেখেন নাই যে, পাঠাইতেই হইবে—এমন কোনও বিশেষ প্রযোজন ছিল না,—এই দেখুন না পত্রখানা।" বলিয়া পত্রখানা বাহিব কবিযা বৃদ্ধেব হস্তে দিলেন। পত্র খুলিবামাত্র লাল কালির মোটা মোটা দাগ উভয়েব চক্ষে পড়িল।

ঠাকুবদাদা বলিলেন—"এ লাল কালিব দাগ কে দিলে?"

শ্রীবিলাসেব বুঝিতে বাকী রহিল না দাগ কে দিয়াছে। ক্ষোভে অপমানে তাঁহার সর্ব্বশবীব সর্পদষ্ট মনুষ্যেব মত ঝিম্ ঝিম্ কবিতে লাগিল। স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহিব হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবাব জন্য বিপুল চেষ্টা কবিলেন; কিন্তু পাবিলেন না।

ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ কবিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্ব্বাব জিজ্ঞাসা কবিলেন—"এ লাল কালিব দাগ কে দিয়েছে হে?"

শ্রীবিলাস প্রথমবার কথা কহিতে পাবেন নাই বলিয়া ঠাকুদাব প্রশ্নেব উত্তব দেন নাই, এবাব বলিলেন—"যখন আমি পত্র খুলি, তখন এ দাগ ছিল না। আমাব স্ত্রী এ দাগ দিযাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার! স্ত্রীলোকেব স্পর্দ্ধা দেখিলে! স্বামী—যে স্বামী গুরুব গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান! হায়রে কলিকাল! এই বয়সে (ষষ্ঠি বৎসরের কম ত নহে)! কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে। এমন শয়তানী স্ত্রীলোকের নবকেও স্থান হইবে না। মনুর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।

অর্থাৎ কিনা যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া ভর্ত্তারং—নিজ পতিকে লঙ্ঘয়েৎ—অর্থাৎ অপমানিত কবে, বাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে—কিনা অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া শ্বভিঃ বলতে কুক্কুব দিয়া খাওয়াইবেন।—কিন্তু এখন মনুর আইন চলে না—এখন হনুব রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস তুমি যদি এই অপমান, এই নাবীপদাঘাত সহ্য কব, তবে ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমায় ধিক্, তোমার পুরুষত্বে ধিক। তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী হইতে দূর কবিয়া তাড়াইয়া দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা তোলপাড় করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীবব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতাব স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন,—"আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলাকে আদর দিয়া দিয়া—মাথায চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্ব্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাতি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—ইষ্টেশনে দেখিয়াছি—বেটারা বেটীদের মাথায় ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন খানসামা! সেই সাহেবের শিষ্য ত তোমরা! তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গর্হিত আচবণ ক্ষমা কর—প্রশ্রয় দাও—তবে তাহাব দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতিব স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া

যাইবে। আর যদি তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে শ্রীবিলাস! কোম্পানী বাহাদুর যে খুনীর ফাঁসী দেন, সে কেন? খুন হইল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ করিয়া রাজস্ব কমাইবার প্রয়োজন কি? না—দশ জনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে—বাপ্‌রে খুন করলে ত ফাঁসী যেতে হয়! সুতরাং তুমি আর ইতস্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, বিবাহ করিয়া ফেল। আমি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থাবিশেষে পড়িয়া মানুষের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঊনবিংশতি শতাব্দীর এই শেষভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক শ্রীবিলাস—মিল্, বেকন্, কার্‌লাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস—মিল্টন—শেক্সপিয়র—শেলি—মাইকেল—বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোদ্যানের মধু-রসগ্রাহী শ্রীবিলাস, অম্লান বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব!"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে, এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন যে, কন্যাটি বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে কিন্তু মনে শান্তি বহুদূরে নির্ব্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন কি? সে গর্ব্বিতা মদোদ্ধতা, সরোজবাসিনী এখন "ধরায় ধূলির চেয়ে নীচে" হইয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্বলয়ের লোক, তাহাকে একবাক্যে নিন্দা করিতেছে। দিন নাই রাত্রি নাই, গ্রামে যেখানে সেখানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে—"ছি ছি ছি—এমন বুদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল! একটা সামান্য জিদের জন্য চির-জীবনটার দুঃখ কিনিল!—গলায় দড়ি!" ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সরোজার মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার এই শেষ অনুরোধ। এটি রাখিও। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে যাইয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার জন্য আর কি করিবে মা? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই কমিয়াছে—নহিলে সে কালে সতীনের জ্বালা ভোগে নাই এমন কয়টা স্ত্রীলোকের ছিল? তুমি পূর্ব্বজন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই কষ্ট পাইতেছ। এই জন্মে ভাল করিয়া ভক্তি করিয়া পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে। আমি চলিলাম—তুমি পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এখন আর কে তোমার আশ্রয় রহিল মা? আমার এ অনুরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি পাইব না।"

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজার মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাসময়ে এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে লইয়া সরোজবাসিনী বাঁকীপুরে

যাত্রা করিলেন। পৌঁছিয়া একেবারে গিয়া শ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। শ্রীবিলাস তখন কাছারিতে। চাকর-বাকরেরা, "মা-জী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্নাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ী ঘর দুয়ারের আর সে শ্রী নাই—দেখিয়া সরোজার চক্ষে জল আসিল। কোথাকার জিনিস কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলার আচ্ছাদন নাই। আলমারি, টেবিল, সিন্দুক বাক্স ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়সার জাল। ঘরের কোণে তামাকের গুল ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই হয়। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজবাসিনী তাহাদিগকে লইয়া কাজ করিতে লাগিয়া গেলেন; সমস্ত ঝাড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন। ঘটী বাটী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিষগুলা মাজাইয়া ঘসাইয়া তকতকে ঝকঝকে করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বেলা পড়িলে রসুই ঘরে গিয়া স্বহস্তে নানাপ্রকার জলখাবার প্রস্তুত করিলেন। পান সাজিয়া কাপড় বদলাইয়া, স্বামীসম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মনে হইল, সে সব দিনে মিলনের এইরূপ অনতিপূর্ব্বে কি উৎকণ্ঠা, কি হর্ষ, কি চঞ্চলতা আসিয়া বুকের ভিতর দৌরাত্ম্য করিত! আর আজ এ কি ভাব! ভাবিতে ভাবিতে সরোজার মুখখানি যেন মেঘ করিয়া আসিল।

শ্রীবিলাস কাছারি হইতে ফিরিলেন। প্রথমেই বাহিরে সতীশের সাক্ষাৎ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন—পা যেন উঠে না।

সরোজার সঙ্গে দেখা হইল। উভয়ের তখনকার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে? অনেক পুরাতন কথা মনে আসিয়া উভয়ের চক্ষে জল বহাইল। সেই রাত্রি সে দম্পতির কি ভাবে কাটিল কে বলিতে পারে? দিনের পর দিন গেল, সংসার চলিতে লাগিল; কাহারও মনে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই; অথচ উভয়ে স্বামী স্ত্রী সাজিয়াই সংসার করিতে লাগিল।

আমার পাঠকেরা না হউন, পাঠিকারা নিশ্চয়ই শ্রীবিলাসের কৃত দুষ্কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাহার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার চিত্র দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। শ্রীবিলাসের নবপরিণীতা বধূটি বঙ্গদেশের এক নিভৃত গ্রামে, জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিল।

শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়া অবধি শুভদৃষ্টির বস্ত্রাবরণের মধ্যে ভিন্ন সে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান নাই। ফুলশয্যার রাত্রে কম্প দিয়া তাহার ত ভারি জ্বর আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শ্রীবিলাসের কোনও কষ্ট হইবার কথা নহে। আমাদের সরোজবাসিনীও আদর্শ রমণী নহেন; তিনি সপত্নীর মৃত্যু সংবাদে খুসী হইয়া দাস দাসীকে বখ্সিস্ এবং দেবতাকে হরিনুট দেন নাই বটে;—কিন্তু তাহার পর হইতে হাসিতে গল্পেতে মনের প্রফুল্লতা ও লঘুতারের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীবিলাসেরও অনুতাপক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল। এখন হইতে এই দম্পতি, প্রত্যেক উপকথার নায়ক নায়িকার মতই, সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, শ্রীবিলাস এখনও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই; এবং শত পুত্রের একটি মাত্র এ পর্যন্ত পৃথিবীর আলোক দর্শন করিতে পাইয়াছে।

[বৈশাখ, ১৩০৫]

বেনামী চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মূলভিত্তির উপর কত বড় বড় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কথিত আছে, কোনও দেশের রাজা মৃগয়া করিতে যাইবার মানসে ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দেন। ভৃত্য যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার শিশুপুত্র আসিয়া মিঠাই খাইবার জন্য মহা আব্দার আরম্ভ করে। পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল, ইহাতে সেই ক্রুদ্ধ শিশু একটা বংশদণ্ড তুলিয়া পিতার পদে নিক্ষেপ করিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ও মনের বিরক্তিতে ভৃত্য ভাল করিয়া জিন কষিতে পারিল না। এই ক্রটিবশতঃ মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী রাজাটি ভয়ানক অত্যাচারী হইল। দেশসুদ্ধ লোক তাহার কু-শাসনে অশ্রুপাত কবিতে লাগিল। অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল—এক কথায় রাজ্যটা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। এখন এত বড় একটা ব্যাপারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেই সহিসপুত্রের সন্দেশ খাইবার লোভে আসিয়া পৌঁছিতে হয়!—আমাদের এই আখ্যায়িকাটিতেও একটি সামান্য ঘটনায় একটি বৃহৎ ফল ফলিয়াছিল। বুদ্ধিহীনা বালিকার লিখিত একখানি দুই তিন ছত্র বেনামী চিঠিতে, একটি মনুষ্যজীবনের গতি আশ্চর্যরূপে ভিন্নদিকে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন গল্প আরম্ভ করি।

আজ প্রায দুই বৎসর হইল রামসুন্দরের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য!—সে এখন পর্যন্ত একটিবারও শ্বশুরবাড়ী যাইতে পাইল না। সে যখন বি-এ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাহার বিবাহ হয়। তখন পবীক্ষা সন্নিকট বলিয়া "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে, তাহার শ্বশুর সপরিবারে নিজ কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে ফিরিয়া যান। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ আসিল। সে বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম।—কলেরা ও বসন্ত সেই দিকটাতেই নিজেদের দিগ্বিজয়ের শিবির স্থাপন করিয়াছিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রামসুন্দরের পিতা পুত্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। তাহার পর পূজার ছুটির সময় আবার যথারীতি নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু রামসুন্দর জ্বরে পড়িল, যাওয়া হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর দিন আবার নিকটে আসিতে লাগিল। এবার রামসুন্দর যাইবেই। এবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইতেছে; কোনও প্রকার রোগের উপদ্রব নাই। এবার আর রামসুন্দরের আশালতা পুষ্পিত হইতে বাকী থাকিবে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একখানা "টাইম-টেবিল" সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই "টাইম-টেবিলখানি" এখন তাহার "বেদ"—অথবা একালের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের "গীতা" হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি দশটার সময় হুগলীতে গাড়ী চড়িতে হইবে। ছাড়িবার পূর্ব্বে "অমুক সময়ে পৌঁছিতেছি" বলিয়া এলাহাবাদে একখানা টেলিগ্রাম্ পাঠাইতে হইবে। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া উপরের বাঙ্কে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা;—নিদ্রা হইবে কি? গ্রীষ্মকালের রাত্রে রেলপথে ভ্রমণ কি আরামদায়ক। কি সুন্দর শীতল বায়ু! তাহার উপর রজনী যদি চন্দ্রালোকিত হয়!—মোকমায় গিয়া প্রভাত হইবে। তখন এক পেয়ালা গরম গরম চা। নিশ্চয়ই খুব আরাম হইবে। বেলা দুইটার সময় এলাহাবাদে পৌঁছান যাইবে—ইত্যাদি প্রকারে রামসুন্দর-মিস্ত্রী কল্পনার মালমসলায় আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু হরি হরি, সব পণ্ড হইয়া গেল। যাত্রার অবধারিত দিনের কিয়ৎপূর্ব্বে রামসুন্দরের মাতার ভয়ানক জ্বর।—আর যাওয়া হইল না। আমরা রামসুন্দরের প্রতি অবিচার করিব না। সে এমন

কথা ভাবে নাই, আমি যাত্রা করিলে পর তখন মার জ্বর হইল না কেন? অথবা আমার যাত্রা করিবার দিন আরও কিছু পূর্ব্বে ধার্য্য হয় নাই কেন?—সে প্রাণপণে জননীদেবীর সেবা করিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হইল না, ইহার দরুণ কোনও ক্ষোভ কোনও অসন্তোষ তাহার মনে স্থান পাইল না। রামসুন্দরের মাতা আরোগ্যলাভ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল। এখন রামসুন্দর আইন পড়িতেছিল, বাক্স বিছানা পুস্তকাদিব তল্পী বাঁধিয়া পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

. কলেজে তাহার সহপাঠী বিবাহিত বন্ধুরা আসিয়া নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ীর গল্প ফাঁদিল। রামসুন্দর তাহাদের গল্পে নিজের কোনও অভিজ্ঞতা যোগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে বিদ্রুপের বান আসিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে মুখটি চুন করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছুরির অগ্রভাগ দিয়া পেন্সিলের মস্তকে নিজ নামের আদ্যাক্ষরটি খোদিত করিয়া সময় কাটাইল।

এ বৎসব বামসুন্দরের আইন পরীক্ষা। পূজার ছুটির পূর্ব্বে বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইল "পবীক্ষা নিকট, পড়াশুনার চাপ অত্যন্ত অধিক, এবার বাড়ী যাইব না।" বামসুন্দবেব জননী ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব সে আপত্তি টিকিল না। ছুটিতে রামসুন্দবের মেসের বাসার সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল; রামসুন্দব একা হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। দুই চাবি দিন এইরূপে কাটিলে, একদিন ভোবের বেলার নিদ্রাভঙ্গেব পর বিছানায় পড়িয়া হঠাৎ তাহার মস্তকে একটা মৎলবের আবির্ভাব হইল, একবাব এই ফাঁকে এলাহাবাদ সহরটা দেখিয়া আসিলে হয় না?—সেদিন প্রভাতে আব তাহাব পডাশুনা কিছুই হইল না। কেবল "যাব কি যাব না"—এই ভাবনায মগ্ন বহিল। অবশেযে যাইবার পবামর্শই স্থিব করিল। আহারান্তে বাজারে বাহির হইয়া, স্ত্রীর জন্য নানাপ্রকাব সাবান, চিরুণী, এসেন্স সুগন্ধি তৈল, লতা, পাতা-ফুল-আঁকা চিঠির কাগজ ও খাম দুই একখানি গল্পের ও কবিতার বহি এবং আরও কত কি সব আমাদেব স্মবণ নাই--ক্রয় করিল। সন্ধ্যাব পর হাওড়ায় গিয়া, যাত্রা করিবার সংবাদ এলাহাবাদে টেলিগ্রাম করিয়া, ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রামসুন্দর এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছে। তাহার শ্বশুর স্বয়ং ষ্টেশনে সাদর সম্ভাষণে প্রাণাধিক জামাতাকে গৃহে লইয়া গিয়াছেন। রামসুন্দবেব শ্বশুরের নাম নিমাই বাবু। সেকালেব অনেক লোকে নিজ নাম অদ্ভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন;— ইনিও নিজের নাম Nemye Loll এইরূপ লিখিতেন। নিমাইবাবু বাল্যকালে মিশনাবী স্কুলে পড়িতেন, কিঞ্চিৎ সাহেবী ধরনের লোক। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রামসুন্দর হ্যাটকোটধারী শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই, বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে নামাবলী গাযে দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কি না। তাহার পর চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম কবিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া শেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন। নিমাইবাবু ইংলিশ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী মোগলডিসগুলির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ অল্প ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়; অন্তঃপুরে তাহা মোটেই প্রশ্রয় পাইত না। সেখানে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, "জুজুটি" হইয়া থাকিতেন।

রামসুন্দর নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া খুব আমোদে দিন কাটাইতেছে। তাহার স্ত্রীর কোনও সহোদব বা সহোদরা ছিল না; কিন্তু খুড়তুতো ও পিস্‌তুতো একটি দুইটি তিনটি শ্যালিকার-রত্ন সমস্তদিন তাহাকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিল। এই তিনটির মধ্যে বড়টির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছিল, অপর দুইটিব মধ্যে একটির দুধে দাঁত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল,

অন্যটির মাথায় একগাছিও চুল ছিল না। সম্প্রতি রোগশয্যা হইতে উঠিয়া তাহার এ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রামসুন্দরের বড় শ্যালিকাটি চিরদিনই বাঙ্গলা দেশের বাহিরে—তথাপি তাহার সংবাদ পাইতে বাকী ছিল না যে, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে হয়। অতএব সে এই কর্ত্তব্যভার স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিতে নিমেষমাত্রকাল বিলম্ব করিল না। ছোট বোন দুইটিকে লইয়া সে একটি ফৌজ গঠন করিয়া, রামসুন্দরের ভগ্নপতিত্ব দুর্গে অবিশ্রান্তভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল। পানের ভিতর সুপারির পরিবর্ত্তে কয়লার গুঁড়া ভরিয়া দিয়া, জলে গেলাসে লবণ মিশাইয়া দিয়া, ন্যাতা গুলিয়া চা করিয়া দিয়া, রুমালে বাঁধা পোর্টমেণ্টের চাবি হরণ করিয়া লইয়া এমন কি জুতা একপাটি পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়া রামসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরিবারস্থ একটি সুরসিকা, পরিচিত তাবৎ দম্পতির নামে ছড়া বাঁধিয়াছিলেন—রামসুন্দর ও তাহার পত্নীর নামেও বাঁধিয়াছিলেন। সেই ছড়াটি তিনজনে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি মানিল না। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই ছড়াটি এখানে বলিতেছি।

বেল ফুলের গড়ে মালা
রামসুন্দরের সুরবালা।

এই কাহিনীর অন্যান্য কবিতায় তাঁহার আরও অদ্ভুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের হিতার্থে তাহার দুই একটি নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। আমার কি হৈল
অক্ষয়ের শৈল।
২। আমি কি হয়েছি কালা (!)
যতীশের নগেন্দ্রবালা।

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া, রামসুন্দর তাহার বড় শ্যালিটিকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব উপায় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই বালিকাটির নাম চিরদিনই ডেমি ছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সে হঠাৎ ইন্দুবালা হইয়া গিয়াছে। এই নূতন নাম পুরাতন মেয়েটিকে মানাইয়া লইবার জন্য বাড়ীর লোকেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই তাহাকে ইন্দুবালা বলিয়া ডাকিতেন। রামসুন্দর তাহাকে দুই একবার ডেমি বলিয়া ডাকিল, তাহাতে ইন্দুবালা কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত আপত্তি জানাইল। রামসুন্দর আর ছাড়িবে কেন? সে তাহাকে ক্রমাগত ডেমি বলিতে লাগিল। ইহাতে সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে এবং তাহার অনুকরণে ছোট মেয়েটি "ডেমি-ড্যাম্‌-ডেমি" এই পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে বাহু তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা দেখিয়া রামসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। ইন্দুবালা প্রথম প্রথম অন্তঃপুরে গিয়া নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তত্রস্থ ধর্ম্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালিকার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে রামসুন্দর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

সে দিন গেল। পর দিন আবার এই অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। আর কিন্তু ডেমি অন্তঃপুরে নালিশ করিতে গেল না। সে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি গল্পের বহিতে পড়িয়াছিল, কোনও লোক তাহার শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান করিতে করিতে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করে। তাহার পিতা মাতা ইহা জানিতে পারিয়া সময়মত আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে জামাইবাবুর নাকালের শেষ থাকে নাই। ইন্দুবালা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া এক টুকরা কাগজে বামহস্তে লিখিল :—

"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।"

এই কাগজখানি খামে ভরিয়া, রামসুন্দরের পিতার নামে ঠিকানা দিয়া দাসীহস্তে

ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্র তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় রামসুন্দরের পিতার হস্তগত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামসুন্দরের পিতার নাম হরিবল্লভবাবু। লোকটি সম্পূর্ণ সে কালেরও নহেন, এ কালেরও নহেন। সামান্য ইংরাজি জানেন। বয়স পঞ্চাশ। পূর্ব্বে কোথাকার নীলকুঠিতে চাকুরি করিতেন। শুনা যায় সে কার্য্যটিতে তাঁহার বেশ দু'পয়সা ছিল। এই 'দু পয়সা' সম্বন্ধীয় কি গোলযোগ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। এখন বাড়ীতে বসিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেছেন। পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত জমিদারী সম্পত্তির আয় হইতে সংসারটি বেশ চলিয়া যায় এবং "কোম্পানির" কাগজের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

হরিবল্লভবাবু বৈঠকখানায় ঘরে বসিয়া ঘোষেদের কন্যা-বিবাহের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিতেছিলেন। এমন সময় উল্লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে পৌঁছিল। খুলিয়া পাঠ করিয়া তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এ সংবাদ গৃহিণীকে অবগত করাইলেন। তিনি ত ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়াময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী বন্ধু, আত্মীয় স্বজন অনেকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে, কলিকাতায় গিয়া যাহাতে ছেলেকে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ পাল্কী বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। রামসুন্দরের পিতা অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থাতেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাহা আর হইতে পাইল না। হরিবল্লভবাবু গৃহদেবতাকে সজলনেত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন; গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যদি মা কালী মা দুর্গার ইচ্ছায় এখনও সে বিলাত না গিয়া থাকে, তবে যেন তাহাকে বাড়ীতে আনা হয়; আর ছাই ইংরাজি পড়িয়া কাজ নাই, বামুনের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া খাইবে।

হরিবল্লভবাবু কলিকাতায় পৌঁছিয়া রামসুন্দরের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দরজায় চাবি বন্ধ। পাশে একটি মুসলমান দোকানদার ছিল, সে বলিল ছুটিতে সব বাবুরাই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একটি বাবু ছিলেন, কয়দিন হইতে তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ হরিবল্লভবাবু দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ছেলে যে বিলাত গিয়াছে, এ বিষয়ে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমনটা যে হইবে, তাহা কি তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? এত কাল বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পোষণ করিয়াছেন, সে তাঁহার এই বৃদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল? ভাবিলেন—আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসে তবে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়া আসিবে; তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না—শ্রাদ্ধের পর্য্যন্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয়ত একটা খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে;—এমনও ত অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, রামসুন্দর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময় গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারটি জুটিয়াছিল, তাহা করিতে দিলে কলিকাতায় আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেটি খারাপ হইত না। বাসার দরজার বাহিরে দুই ধারে যে ইষ্টক নির্ম্মিত দুইটি বসিবার স্থান আছে, সেইখানে বসিয়া বৃদ্ধ ব্যথিতমনে এই সমস্ত চিন্তা ও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া ধীরপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বাল্যসখা জীবনকৃষ্ণবাবু হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন বাসা বাগবাজারে, তাঁহারই কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর অনেককালের পর সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, হরিবল্লভবাবু নিজের বিপদের কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু

সমস্ত শুনিয়া নীরবে কিয়ংকাল চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"আচ্ছা বিলাত যে গেল, টাকা পেল কোথায়?" হরিবল্লভবাবু বলিলেন—"টাকা কোথায় পাইল, তাহা ত আমিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" জীবনকৃষ্ণ বলিলেন—"বিলাত যাওয়া ত মুখের কথা নহে, বিস্তর টাকার প্রয়োজন। তা ছাড়া, সেখানে ত অবশ্য পড়িতে গিয়াছে, সেখানে তাহার খরচ যোগাইবে কে?"—এই কথাটা শুনিয়া হরিবল্লভবাবু যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাহার মনে হইল ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ আছে। পকেট হইতে বেনামী চিঠিখানা বাহির করিয়া, জীবনকৃষ্ণবাবুর হাতে দিলেন। জীবনকৃষ্ণ পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, দেরাজ হইতে চশমাটি বাহির করিলেন। বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, চশ্‌মাটি সাবরের চামড়ায় বেশ করিয়া মুছিলেন। চশ্‌মা পরিয়া উকিলোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার, তাহা তুমি কিছু আন্দাজ করিতে পার? অবশ্য বাম হাতে লেখা।"—হরিবল্লভবাবু "না" উত্তরসূচক শিরশ্চালন করিলেন। আরও কিছুক্ষণ গেল। জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"ছেলের বিবাহ দিয়েছিলে এলাহাবাদে না?" হরিবল্লভবাবু বলিলেন—হ্যাঁ। কেন বল দেখি?"—জীবনবাবু উত্তর করিলেন, "পত্র এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই দেখ এলাহাবাদের ছাপ রহিয়াছে।"

হরিবল্লভবাবু সাগ্রহে বলিলেন—"তবে ত সে নিশ্চয়ই এলাহাবাদে গিয়াছে।"

জীবনবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"শুন। হয় ত এ চিঠির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোনও লোকের দুষ্টামি। কিন্তু তথাপি রামসুন্দর হঠাৎ বাসা ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মীমাংসা হয় না। নহে ত সে বিলাত যাইবার বাস্তবিকই আয়োজন করিয়াছে। পত্রে এ কথা বৌমাকে লিখিয়া থাকিতে পারে কিম্বা হয় ত এই মুহূর্ত্তে সে এলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছে।"

হরিবল্লভবাবু প্রস্তাব করিলেন,—"তবে এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ করিয়া দিই, যাহাতে সে না যাইতে পারে।" জীবনবাবু বলিলেন,—"পূর্ব্বে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন, সে এলাহাবাদে আছে কি না।" হরিবল্লভবাবু ইহাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন—"যদি এলাহাবাদে থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিব যাহাতে বিলাত না যাইতে পারে এবং কল্যকার ডাকগাড়ীতে আমি স্বয়ং এলাহাবাদে গিয়া ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব।"

তৎক্ষণাৎ নিমাইবাবুকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর ওখানে আছে কি না এবং কেমন আছে।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন—"যদি সে বাস্তবিকই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে পথের মাঝে এলাহাবাদ, ওখানে না হইয়া কখনই যাইবে না। আজকালকার ছেলে কি না!—যদি এখনও না গিয়া থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া এলাহাবাদে তাহাকে আটক করান যাইবে। আর যদি কোনও উপায়ে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে, তবে তাহার পড়িবার খরচ তোমাকে জোগাইতে হইবে। অদৃষ্টে থাকে ত ছেলেটা মানুষ হইয়া আসিবে।"

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনকৃষ্ণবাবুর বারম্বার অনুরোধে হরিবল্লভবাবু হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। এই সময়ে এলাহাবাদ হইতে উত্তর আসিল—"রামসুন্দর এখানে আছে। ভাল আছে।"

বৃদ্ধ হরিবল্লভ এ সংবাদ পাইয়া আনন্দের অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। জীবনবাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"ভাই তুমি আজ আমার প্রাণদান দিলে। আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এজন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না। ঈশ্বর তোমার [illegible] পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর করুন।"

জীবনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপকারটা কি করিলাম?"

হরিবল্লভবাবু বলিলেন—"বিলক্ষণ! তুমি না পরামর্শ দিলে ও সব বুদ্ধি কি আমার পাড়াগেঁয়ে মাথায় প্রবেশ করিত?"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে আৰ্জেণ্ট টেলিগ্রাফ প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর বিলাত পলাইবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে আটক কর। আমি আসিতেছি।"

ইহার পর দুই বন্ধু রাত্রের মত পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মানসিক উৎকণ্ঠাবশতঃ সমস্ত রাত্রি হরিবল্লভবাবুর নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাতটি বড় সুন্দর হইয়া এলাহাবাদ সহরে দেখা দিয়েছে। পূর্ব্বদিনের মেঘ ও বৃষ্টি একেবারে অন্তর্হিত। রামসুন্দর প্রাতর্ভ্রমণের পর ফিরিল। তখন বেলা ৩টা হইবে। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুরমহাশয় সেই মাত্র চা পান শেষ করিয়া আরামকেদারায় বসিয়া চুরুট সেবা করিতেছেন এবং একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

রামসুন্দর তাঁহার কাছের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। জামাতাকে দেখিয়া নিমাইবাবু সংবাদপত্রখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন। নেত্রলগ্নে চশ্‌মাটি ঠিক করিয়া চুরুটটি দন্তে দংশন করিয়া, ইংরাজি ভাষায় বলিলেন—"তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? বেশ ত—অতি উত্তম কথা।"

রামসুন্দর ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল।

নিমাইবাবু স্বীয় জামাতার ভাবী পদগৌরব কল্পনায় সূচিত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং সেই উচ্ছ্বাসে কেবল ইংরাজি কথাই বলিতে লাগিলেন। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদগুলিই নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

জামাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিমাইবাবু বলিলেন—আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে বিলাত যাইবার কল্পনা করিয়াছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তুমি খরচের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ জানি না, হয় ত বিলাতে পৌঁছিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছ। এইরূপ কেহ কেহ করিয়াছে শুনিতে পাই। তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে খরচ যোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন। তাহাতে কাজ নাই। আমি তোমার সমস্ত খরচের ভার লইলাম।"

রামসুন্দর এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, শ্বশুর বুঝি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখে কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে সে ভাবের কণিকামাত্রও লক্ষিত হইল না। উত্তরে সে যে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিমাইবাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বশুরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ, আমি তাহা জানি। আমাদের সময়ে এরূপ ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয়ই ত আমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, লেখা পড়া শিখাইয়া, চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহা না করিলে আমি এতদিন কোথায় থাকিতাম? আমার একটিমাত্র কন্যা। আমার যাহা কিছু আছে তাহা ভবিষ্যতে তোমার হইবে। তুমি আমার নিজের টাকায় বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহ কর। আজকাল যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে এখানে থাকিয়া আর কিছুই হয় না। সুতরাং মনে কোনও প্রকার দ্বিভাব করিও না।"

তখন রামসুন্দর মনে করিল, "বাঃ এ ত দেখিতেছি ব্যাপার মন্দ নয়। শ্বশুরের অর্থে

যদি একটা 'কেষ্ট-বিষ্ণু' হইয়া আসিতে পারা যায়, তবে সে সুযোগ ছাড়ে, এমন হস্তিমূর্খ কে আছে? প্রকাশ্যে সাহস করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"আমি বিলাত যাইব আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

নিমাইবাবু পকেট হইতে টেলিগ্রাম দুইখানি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে রামসুন্দরের হাতে দিলেন। রামসুন্দর সে দুইটি, আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল—"আর কিছুই নয়, বাবা কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিতে পান নাই। অনুসন্ধান করিযাছেন, কেহ তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া একটু মজা দেখিতেছে। বাল্যকাল হইতে আমার বিলাত যাইবার ঝোঁক, ইহা তিনি অবগত আছেন, এইজন্যে এ কথা সহজেই বিশ্বাস হইযাছে। যাহা হউক, তিনি নিশ্চযই আমাকে ধরিতে আসিবেন। সুতরাং আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।" শ্বশুরকে বলিল—"বাবা ইহাতে রাগ করিবেন, মা কাঁদিবেন, এমন কাজ করা কি আমার উচিত?'

নিমাইবাবু একটু যেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কোন্ পিতা কোন্ সন্তানের উপর রাগ না করেন? আর কান্না ত স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই। তোমার পিতা এখানে আসিলে তাঁহাকে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিব। বলিব আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই। বরং প্রথমে তুমি অসম্মত ছিলে। আর তাঁহার সহিত সুরবালাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার মা বধূকে পাইযা পুত্রবিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা করিবেন। যখন তুমি মনে জানিতেছ এ কাজ গর্হিত নয, ইহার ভাবীফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে, তখন একটু আধটু অসুবিধা ও সেন্টিমেন্টালিটির জন্য কাজ হারান নিতান্ত বোকামি।"—এই পর্যন্ত বলিযা অল্প হাসির ভূমিকার সহিত বলিলেন—"আর তোমার উপর তোমার সে পিতার অপেক্ষা আমারই অধিকার বেশী—কারণ আমি হইলাম ফাদার-ইন ল,—আমিই তোমার আইনসঙ্গত পিতা।" এই বলিযা তিনি হোঃ—ওহ্—ওহ্ করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন এবং নির্ব্বাপিত চুরুটটি পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত করিযা স্বচ্ছন্দমনে সতেজে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বৈকালে দুই তিন ঘণ্টাকাল রামসুন্দর শ্বশুরের সহিত দোকানে ঘুরিযা ঘুরিযা পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর এক পরিচিত সাহেব ব্যারিষ্টারের নিকট নিমাইবাবু তাহাকে লইযা গেলেন। তাঁহার কাছে বিলাতে বাস করা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ এবং কয়েকখানি পরিচয় পত্র পাওয়া গেল। জাহাজে স্থান রাখিবার জন্য বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাফ করা হইল। সেইদিন রাত্রেই তিনটার মেল-ট্রেনে রামসুন্দর সাহেব সাজিয়া যাত্রা করিল।

কোনওরূপ বিদ্রোহশঙ্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না। নিমাইবাবু গৃহিণীকে বড়ই ভয় করিতেন। মেযেরা জানিলেন, রামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিযা গিযাছে। কিন্তু পরদিনই হরিবল্লভবাবু আসিযা উপস্থিত হইলেন। তখন সকল কথা ফাঁস হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে বিলক্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইন্দুবালা এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই।

সুখের বিষয়, হরিবল্লভবাবুকে ঠাণ্ডা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বেহাই তাঁহার পুত্রের জন্য অত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইযাছেন, বেহাইযের উপর রাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নিমাইবাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন, বিলাতে প্রবাসকালে অথবা পথে কোনও বিপদসম্ভাবনা নাই, কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই, কত লোক যাইতেছে ইত্যাদি।

পূর্ব্বপরামর্শমত সুরবালাকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

উপসংহার

আমরা গল্পলেখকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, তাঁহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতাসীমার অতীত। মিষ্টার রামসুন্দর বিলাত হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দুই বৎসরেই বেশ পশার জমিয়া গিয়াছে। পিতা মাতা পুত্রের সম্পদে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। একটা জাঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ায় সমাজও রামসুন্দরকে মার্জ্জনা করিয়াছে। আপাততঃ মার্জ্জনা করিয়াছে বটে কিন্তু কন্যার বিবাহেব সময় কোনও গোল উঠিবে কিনা বলা যায় না। রামসুন্দব দেশের বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া পিতা মাতাকে মাঝে মাঝে লইয়া আসেন, কিন্তু এখানে অত্যন্ত গরম বলিয়া তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে চাহেন না।

এক বেনামী চিঠিই যে তাঁহার বিলাত যাওয়ার মূলসূত্র, তাহা রামসুন্দব অনেক দিন পরে জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু কে যে তাহার লেখক, বহু চেষ্টাতেও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আমাদের পাঠিকাগণের প্রতি ইন্দুবালার বিশেষ অনুরোধ যদি কখনও তাঁহারা নিমন্ত্রণ সমাজে তাহার সুরদিদির সহিত মিলিত হন, তবে যেন কথায় কথায় এটা প্রকাশ কবিয়া না ফেলেন।

[ভাদ্র, ১৩০৫]

অংগহানী

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। কন্যাদায়

চোববাগানের শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকে বলে "বোমভোলানাথ" নিজে তিনি নিতান্ত ভালমানুষ; পৃথিবীসুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমানুষ মনে কবেন। সকলকে অত্যন্ত অধিক বিশ্বাস করা যেন তাঁহাব একটা মানসিক রোগ। জিনিষ কিনিয়া কখনও টাকাব ফেরত পয়সা গণিয়া লন না। কেহ বিপদে পড়িলেই শ্যামাচরণবাবু তাহার উপকার কবেন; তিনি নিজে বিপদে পড়িলে সে যে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া তাঁহার উপকার কবিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

শ্যামাচরণবাবু বেঁটেখাটো বকমেব মানুষটি। চোখদুটি ভাসা ভাসা হাসি হাসি। গৌরবর্ণ প্রৌঢ় পুরুষ; মাথাটি নাড়িযা নাড়িযা চিবাইযা কথা কহেন। সওদাগবি আফিসে চাকবি;— বেতন অল্প, ষাট টাকা মাত্র। একটি প্রাইভেট্ ট্যুযশণও আছে। এই সামান্য আযেব উপর নির্ভব কবিয়া কলিকাতা শহবে সপবিবাবে বাস করা কম দুঃসাহসেব কাজ নহে। একটি ঠিকা ঝি আছে সে কতক কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায়। বাকী কর্ম্ম নিজেদের করিয়া লইতে হয। কষ্ট হয় বটে কিন্তু উপায় ত নাই।"

শ্যামাচরণবাবুব একটি ছেলে, তিনটি মেযে। ছেলেটির বযস সতেবো আঠাবো বৎসর বি-এ ক্লাসে পড়ে। বড় মেয়েব নাম সুলোচনা, হবিপুবে বিবাহ হইযাছে। তাহার ছোট শৈলবালা, তাহার ছোট ক্ষান্তমণি। শৈলবালাব আজিও বিবাহ হয় নাই, দিলেই হয়। ক্ষান্তমণি ছোট।

শ্যামাচবণবাবুর হাতে পৈত্রিক আমলের কিছু টাকা ছিল, তাহা বড় মেযেটিব বিবাহে সমস্তই খবচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত অবস্থা;—বাখিযা ঢাকিয়া বুঝিযা সুঝিযা খবচ কবিতে হয়। কিন্তু বোমভোলানাথকে তখন সে কথা বুঝায কাহাব সাধ্য? তখন শৈল ছোট ছিল;—এখন সে বাবো তেরো বছবেব হইযাছে—এখন শ্যামাচবণ নিজেব ভ্রম

বুঝিতে পারিতেছেন। কন্যাদায় এমনি জিনিষ, বোমভোলানাথ শ্যামাচরণকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্ভাবনায় এই দরিদ্র দম্পতির মুখ ক্লিষ্ট, মন বিষাদভারাক্রান্ত। গৃহিণী বলিলেন—"আমার গায়ের যা কিছু গহনা আছে, সব বিক্রয় কর। হাজার টাকার উপর পাওয়া যাইবে। তাহাতেই এ যাত্রা জাতি রক্ষা হউক।"

শ্যামাচরণ ঠেকিয়া শিখিয়াছে, বলিলেন—"তাহার পর? ক্ষেন্তির বেলায় কি উপায় হইবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "আশু ততদিন যদি নারায়ণের ইচ্ছায় মানুষ হয় তাহা হইলে আর ভাবনা কি?"

ক্ষান্তমণি শৈলবালার চেয়ে দুই তিন বৎসরের মাত্র ছোট। আজিকালকার বাজারে বি এ ক্লাসের ছাত্র আশুতোষ যে দুই তিন বৎসরে মানুষ হইতে পারিবে, সে আশা অপর কেহ হইলে সাহস করিয়া মনে স্থান দিতে পারিত না, কিন্তু শ্যামাচরণবাবু দিলেন। গহনা বিক্রয়ের পরামর্শই স্থির হইল।

কিন্তু আবার মনের মত পাত্রও ত চাই। গৃহিণী বলিলেন, 'যখন আমি গা খালি করিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছি, তখন যে সে-একটাকে ধরিয়া দিলে চলিবে না। জামাই দেখিতে সুশ্রী হইবে, দুইটা বি একটা পাস করা হইবে, খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে—এইরূপ চাই।"

শ্রীমান আশুতোষের একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাহার নাম মোহিনীমোহন। সে জমিদারের ছেলে, কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। মাঝে মাঝে আশুর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিত। অনেক বার নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়ান হইয়াছে। যে লক্ষণগুলি গৃহিণী জামাতায় চাহিয়াছেন, এই মোহিনীমোহন তাহার সকলগুলিই বিদ্যমান। সুতরাং স্বভাবতঃ তাহারই কথা সকলের মনে হইল।

যেমন কর্ত্তা, তেমনি গৃহিণী তেমনি ছেলেটি। জমিদারের ছেলে, বি এ পড়িতেছে গহনা বেচিয়া হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাহাকে ক্রয় করিবেন। সত্যযুগ আর কি। শ্যামাচরণবাবু বামন, প্রাংশুলভ্যফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন। ইহার প্রতিফলস্বরূপ 'উপহাস" নহে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

আশু বলিল, —মোহিনীর বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারা কাহার সন্তান কয় পুরুষে নৈকুষ্য অথবা ভঙ্গকুলীন, এ সব আশু কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন কলেজে কথায় কথায় কৌশল করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে আশু সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইল। সমস্তই মিলিয়াছে। বড় সুখের কথা। আশু একে ত শ্যামাচরণবাবুর পুত্র, তাহাতে অল্পবয়স্ক সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই নাই—সে মনে করিল যেন বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। প্রথম হইতেই মোহিনীর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখন মনে মনে তাহাকে ভাবী ভগ্নীপতি স্থির করিয়া সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিল। ইহার ফলস্বরূপ আশুদের বাড়ীতে মোহিনীর যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। শনিবার কলেজের ছুটির পর সে প্রায়ই আসিয়া আশুদের বাড়ীতে সন্ধ্যাযাপন করিত। রবিবারে এবং অন্য ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আশুর মা তাহাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন। ইঁহাদের গোপন অভিপ্রায় জানিতে মোহিনীমোহনের অধিক দিন বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথাবার্তা হইবার পূর্ব্বে শৈলবালা মোহিনীর সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিত না বটে, কিন্তু তাহার সম্মুখে বাহির হইত এবং প্রতিদিনই দুই একবার পরস্পরে চোখাচোখি হইয়া যাইত। আশু ও মোহিনী আহারে বসিলে আশুর মা পরিবেশন করিতেন, প্রয়োজন হইলেই শৈল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। কিন্তু যেদিন শৈববালা এই বিবাহের কথা শুনিল, সে দিন হইতে মোহিনীর সাক্ষাতে আর সে প্রাণান্তেও বাহির হইত না। মোহিনী

আসিলেই ক্ষান্তমণি সুর করিয়া বলিতে থাকিত, "দিদির বর এসেছে গো।" মোহিনী বাহির হইতে এই গান শুনিয়া মনে মনে হাসিত—ভাবিত কোথায় কি তাহাব ঠিক নাই, বিবাহ! কিন্তু শ্যামাচরণের কন্যা শৈলবালার ত সে বুদ্ধি ছিল না। সে যখন মোহিনীমোহনকে দেখিত, তখন তাহাকে স্বীয় ভাবী পতিস্বরূপ পাইত, মোহিনীমোহন সুন্দর শান্ত সমুজ্জ্বল চক্ষু দুটিতে স্নেহ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ক্রমে মোহিনীমোহনেরও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। তাহার সমস্ত তর্কযুক্তি শীঘ্রই তাহাকে কল্পনার কমনীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মোহিনী ভাবিত, যদি শৈলবালার সঙ্গেই আমার বিবাহ হয় তবে কেমন হয়? মনে হইত, বেশ হয়। বেশ নামটিও কিন্তু। শৈলবালার লজ্জাটা বড় বেশী—কখনও ভাবিত, তা বেশ ত, লজ্জাই ত স্ত্রীলোকেব ভূষণ। আবার কখনও বা ভাবিত, এই ভূষণবাহুল্যে আমার নব-প্রণয়েব কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইবে না ত? লজ্জা ভাঙ্গিতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। এখন ত দেখিলেই পলাইযা যায়; ফুলশয্যাব বাত্রে কথা কহাইতে অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হইবে। কল্পনায় সেই ফুলশয্যা-রাত্রিটিব অভিনয় কবিত। শৈলবালা যেন খস্‌খসে কাপড় পরিয়া, সাটিনের বডিস্ পরিয়া, কপালে একটি খয়েবের টিপ কাটিয়া, চুলে সুগন্ধি মাখিয়া, জড়সড় হইয়া, মুখখানি ঢাকিয়া, পাশ ফিবিয়া শুইয়া আছে। শয্যায় প্রবেশ করিয়া সে শৈলকে কি বলিয়া ডাকিবে? নাম ধরিয়াই ডাকিবে। শৈল কি তার উত্তব দিবে? সে ফিরিবেও না চাহিবেও না, কথাও কহিবে না। অনেক চেষ্টাতে যেন কথা কহিল। কিন্তু সে যেন শৈলর নিজ কণ্ঠস্বব নহে। সে পিতৃগৃহের সুপরিচিত শাণিত দ্রুত কোমল কণ্ঠস্বর কি এই? এ যে ভাঙ্গা জড়ান, সঙ্কুচিত, বাধাপ্রাপ্ত স্বর, কিন্তু নিরতিশয মধুব।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বজনীশেষে তাহাব নিদ্রাকর্ষণ হইত। স্বপ্ন দেখিত—সে স্বপ্নও যেন শৈলবালাব স্মৃতিপরিমলে আমোদিত। যে বাত্রিতে পূর্ণিমাব চন্দ্র পৃথিবীব উপর বেশী করিয়া উন্মাদনা বর্ষণ কবিত, সে রাত্রিতে হয় ত কল্পনা কবিত, যেন এক সমুদ্রবেষ্টিত জনহীন দ্বীপের প্রান্তবে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা শৈলবালাব সাক্ষাৎ পাইল। তখন নূতন বিবাহ হইয়াছে। শৈল, তুমি এখানে কেমন কবিয়া আসিলে?—কেমন করিয়া আসিয়াছে, তা ত শৈল জানে না। বাডীতে বিছানায় মা'ব কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া দেখিল এই বনে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, আবব্যোপান্যাসেব জিন-দৈত্য অথবা পবীদেব বাজ্য উড়াইয়া আনিয়া থাকিবে। ভয় পাইয়া, শৈলবালা কাঁদিতেছিল। এখন আব ভয় কবিতেছে না। মোহিনী যেন বলিল, তোমার ক্ষুধা পাইযাছে, তোমার জন্য ফল সংগ্রহ কবিয়া আনি? শৈল বলিল, না আমি একলা থাকিতে পারিব না, আমাব ভয় কবিবে যে। তবে চল দুইজনেই যাই। কিন্তু শৈল কি সেই কঙ্করাকীর্ণ পথে চলিতে পাবে? চল তোমায কোলে কবিযা লইয়া যাইব।—ফল যদি না পাওয়া যায়? ফল যদি বা থাকে, আব জল যদি না থাকে? কি হইবে?—বিধাতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বলিয়া গেলেন—তোমাদেব পবস্পবের জন্য পরস্পরের মুখে চুম্বনের অমৃত সঞ্চিত রাখিয়াছি, ফল ও জলের প্রয়োজন হইবে না।—আর কত সমস্ত অসম্ভব কল্পনা। সে আর বলিয়া কাজ নাই। শুনিলে বিজ্ঞ লোকে বিদ্রুপের হাসি হাসিবেন। নাটক নভেল মোহিনীব বিস্তব পড়া ছিল। সে যে ভালবাসাব পথে পদার্পণ কবিল, তাহা বেশ জানিয়া শুনিয়াই করিল। সে পথ বড় পিচ্ছিল। প্রণয়ের সে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল একগলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি স্নিগ্ধতা তাহাব সর্ব্বশরীবকে আলিঙ্গন করিল। চারিদিক পদ্মবিকাশ। ডুবিয়া মরিতেও সুখ আছে।

এখন অবধি আগু ডাকিলে মোহিনী আর সহজে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহিত না। মনে ষোল আনা ইচ্ছা যাইবার—কিন্তু বোধ হইত, যেন সকলে তাহার এ ভাবপরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলিয়াছে। যেন কত অপ্রতিভ হইয়া থাকিত।

একদিন শ্যামাচরণ মোহিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু আমার অনেক দিনের সাধ, শৈলর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ? তোমার যদি সম্মতি থাকে ত বল, তোমার পিতাঠাকুরের নিকট আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।"

মোহিনী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। মাটির পানে চাহিয়া কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। শ্যামবাবু ভাব বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?" মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বেশ ত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। সম্বন্ধ

গৃহিণী মাঝে মাঝে তাগাদা করেন,—"মোহিনীর বাপকে যে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিলে তাহার কি হইল?"—শ্যামাচরণবাবুর আঠারো মাসে বৎসর;—তিনি বলেন, এই লিখিব এবার। গৃহিণী বলেন—মেয়ে যে এ দিকে বলতে নেই বড় সড় হয়ে উঠল। আর আইবুড় রাখা কি ভাল হয়? এব পরে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে যে! শ্যামাচরণবাবু বলেন,—এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে—পবীক্ষাটা হয়ে যাক্ তার পরে প্রস্তাব করব।

"এখন পডাশুনার ব্যাঘাত হবে"—একথা শুনিয়া হাসি পায়। যেন বিবাহের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; প্রযোজন শুধু শ্যামাচরণবাবুর প্রস্তাব করাটা। সাধে লোকে তাঁহাকে বলিত "বোম্ ভোলানাথ।"

পরীক্ষা শেষ হইল। মোহিনী বাড়ী গেল। আরও দুই তিন মাস কাটিল। আজ লিখি কাল লিখি করিয়া এখনও শ্যামাচরণবাবু পত্র লেখেন নাই। বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, বৈশাখের পূর্ব্বে ত বিবাহের দিন নাই;—এখন অবধি অনর্থক পত্র লিখিয়া কি হইবে!

বৈশাখ মাসে পবীক্ষার ফল বাহির হইল। আশু মোহিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশু এই শুভসংবাদ মোহিনীকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইল। বাড়ীতে আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল।

এইবার শ্যামাচরণবাবু চিঠি লিখিলেন। মোহিনী ও আশুতোষের পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্ণনা করিয়া মোহিনীর পরীক্ষা-ফলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অতিশয় বিনয়সহকারে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে পত্রের উত্তর আসিল। মোহিনীর পিতা বল্লভপুরের জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মোহিনীর সহিত আশুতোষের বন্ধুত্বের কথা পূর্ব্ব হইতেই তিনি অবগত আছেন এবং শ্যামাচরণবাবুর গুণের কথাও তিনি মোহিনীর নিকট সর্ব্বদাই শুনিতে পান। তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ইহা অতি সুখের কথা। তবে দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা কথা কহা যে এখন রীতি হইয়াছে, সেটা চুকিয়া গেলেই সমস্ত ঠিকঠাক করা যাইতে পারে। সেটা পত্রের দ্বারায় না হইয়া বাচনিক হইলেই উভয়পক্ষের সুবিধা ও সময়সংক্ষেপ হইবে। অতএব এই অভিপ্রায়ে একবার যদি শ্যামাচরণবাবু অনুগ্রহ করিয়া দীনের কুটীরে পদধূলি দেন, তবে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইবেন।

এই পত্র পড়িয়া শ্যামাচরণবাবু যারপরনাই সন্তোষলাভ করিলেন। গৃহিণীকে বলিলেন,—"আহা দেখেছ: যেমন ছেলেটি তেমন বাপটি। আজকালকার দিনে এমন কুটুম্ব পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা।"—স্থির হইল, আগামী শনিবার আফিসের পর যাত্রা করিবেন।

পরদিবস এক সময় নিরিবিলি পাইয়া শৈলবালা লুকাইয়া উপরোক্ত পত্রখানি পাঠ করিতেছিল—তাহার দিদি সুলোচনা আসিয়া এই চৌর্যকার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া শৈলর মুখ চোখ কান রাঙা হইয়া উঠিল; দিদি পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"শৈলি, তোর যে আর দেরী সইছে না! বাবাকে বলব এখন, যেন এই মাসেই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে আসেন।"

বাস্তবিকই পিতার যাত্রাকালে সুলোচনা তাঁহাকে বলিয়া দিল—"বাবা যদি সব ঠিক হয়, তবে এই মাসেই নয়ত জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তেই বিবাহের দিন স্থির করে এস। সামনের জামাইষষ্ঠীতে যেন আমরা আমোদ আহ্লাদ করতে পাই।"

শ্যামাচরণবাবু যথাসময়ে বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ রায় আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মোহিনীদের বাড়ীঘর লোকজন সোর সাবরৎ দেখিয়া, সেই প্রথম শ্যামাচরণবাবু ভাবিলেন—এমন লোকের ছেলেকে মেয়ে দেওয়া তাঁহার অবস্থার লোকের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ।—তবে নাকি মোহিনীর পিতার পত্রে যথেষ্ট অভয় পাইয়াছিলেন, তাই অনেকটা ভরসা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় তিনি মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিলেন। স্নানাহার করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রায় মহাশয় বলিলেন—"পথশ্রমে আপনার ক্লেশ হয়েছে। এ বেলা বিশ্রাম করুন। ও বেলা তখন সে সমস্ত কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে।"

অপরাহ্নে রায় মহাশয়দের বহির্ব্বাটিতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইল। অনতিবৃহৎ কক্ষটির মধ্যস্থলে দুইখানি চৌকী জোড়া করিয়া পাতা। তাহার উপর আগ্রার একখানি শতরঞ্চ। তাহার উপর রজকালয় হইতে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি চাদর বিছান। কয়েকটি তাকিয়াও স্থানে স্থানে সজ্জিত। রায় মহাশয় জমিদারগর্ব্বে মধ্যস্থলে সুখাসীন। শ্যামাচরণবাবু তিনি সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন—'শ্যামাচরণবাবুর মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার চেয়ে আর কি সুখ আছে?"

রায় মহাশয় এ কালের লোক ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া সভাকার্য্যের সূচনা করিলেন। বিবাহে টাকা লওয়া যে একটা রীতি হইয়াছে, তাহার প্রতিই নিন্দার বেশী ঝোঁকটা পড়িল। বলিলেন—"আমাদের সে সব দিন কাল এক আলাহিদা রকমের গিয়াছে। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন মনে আছে, একশত-এক টাকা পণ একটি সোনার আংটি, আর একটি চেলির জোড় মাত্র পাইয়াছিলাম। আর বুঝি ভরি দশ পনেরো সোনা আর ভরি পঞ্চাশ ষাট রূপা। ইহাতেই একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব কতই লজ্জিত। বলেই বৈবাহিক মহাশয়, আমি ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়াছি বই ত ছেলে বিক্রয় করিতে আসি নাই।'—আর এখন?—এখন মহাশয় সে দিন আমার বড় সম্বন্ধিটির মেয়ের বিবাহ হইল, পঞ্চাশ ভরি সোনা, দুই শত ভরি রূপা হাজার এক টাকা নগদ তাহার উপর দানসামগ্রী আছে, খাট বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা তা মহাশয়? এই একন ঘড়ি— সোনার ঘড়ি, সোনার গার্ডচেন হীরার আংটি চেলীর জোড় তা ছাড়া আবার রূপার টী-সেট। জামাই বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়াইবেন, তাই রূপার টী-সেট্ চাই। এই নতুন বরাভরণ সাহেব-বাড়ী হইতে আনাইতে প্রায় দুই শত টাকা লাগিয়া গেল। জামাইয়ের গুণের মধ্যে কি?—না এল এ পাস করিয়া বি এ পড়িতেছেন। বাপ জজকোর্টের সেরেস্তাদার। বিষয় আশয় কিছুই নাই, চাকরি ভরসা। চাকরি ত তালপত্রের ছায়া। আজ যদি চাকরি যায় তবে কাল কি খাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। আরে ছি-ছি—একালে কেবল অর্থ, কেবল অর্থ। অর্থ ছাড়া আর কথাটি নাই।"

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে রায় মহাশয়ের এ মত সমর্থন করিলেন। শ্যামাচরণবাবু মনে মনে বলিলেন, যে যথার্থ ভদ্রলোক হয়, সে সর্ব্বদোষাবহ একালেও আপনার ভদ্রতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"তাহা হইলে এইবার উপস্থিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া যাক।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তবে আমি একবার বাড়ীর ভিতর ওঁয়াদের জিজ্ঞাসা করে আসি।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব হইল না। তিনি বালির কাগজে লেখা এক সুদীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা

ছেলেপিলেকে দিয়া নিজেদের মনের মত এই ফর্দ্দ লেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন—বাড়ীর ওঁয়ারা অলঙ্কার এই চাহেন। তাহার পর আর আর যাহা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা কহিবেন না বলিয়াছেন—আমারই উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। আমার এক্তারের মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই যথাসম্ভব সুলভে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিষ্কৃতি দিব, কিন্তু মেয়েদের ফর্দ্দ হইতে অধিক কমান আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না।"

ফর্দ্দ পড়া হইল। তাহার বিস্তারিত বিবরণে পাঠককে ক্লিষ্ট করিব না। এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শ্যামাচরণবাবুর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন পদতল হইতে সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর গণ আছে, পণ আছে, ফুলশয্যা আছে, নমস্কারী আছে নিজেদের খরচ আছে। ফলকথা মোহিনীমোহনকে জামাতা করিতে হইলে অন্যূন তিন হাজাব টাকার প্রয়োজন।

সম্বল মাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া বড়জোর দেড় হাজার টাকা হইতে পারে।

এত দিন ধবিয়া এত সাধ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ আকাশে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা ধূলিস্যাৎ হইয়া গেল।

অনুনয় বিনয় করিযা হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলে হয়ত কিছু কমিতে পারে। কিন্তু সে আর কত কমিবে? নিজেব সাধ্যের মধ্যে আসিবে না। ভূমিকায় ত রায় মহাশয় বলিয়াই দিয়াছেন যে, গহনাব তালিকা হইতে বিশেষ কিছু কমান তাঁহার ক্ষমতাব বহির্ভূত। কিন্তু—"মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধবে তৃণে যদি আর কিছু না পায় সম্মুখে"—সুতরাং শ্যামাচবণ মনে করিলেন, কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কি আর অলঙ্কারের তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পাবেন না? স্ত্রীলোকের কথাই কথা থাকিয়া যাইবে, এও কখন হয়? নিজের স্ত্রীর কথা স্মবণ করিলেন। তিনি যদি স্ত্রীকে বলেন—ইহা করিতে হইবে, তাহাতে স্ত্রী কি দ্বিরুক্তি করিবেন? কখনই না। তাই শ্যামাচরণবাবু সহসা হাত দুইটি জোড় করিয়া রায় মহাশয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমি কন্যাদায় হইতে যাহাতে উদ্ধার হই, তাহা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।"

রায় মহাশয় অমনি—"হাঁ হাঁ করেন কি?—আমার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া আমাকে অপরাধী করেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি"—ইত্যাদি প্রকার উক্তি করিয়া সকলে শ্যামাচরণবাবুর দুই হাত ছাড়াইয়া দিলেন।

শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—"আমি মহাশয় ব্যক্তি নহি। মহাশয় ব্যক্তি আপনি। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোক। আমাকে কৃপা করিয়া এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।"

সভার একজন বলিলেন—"অত টাকা ব্যয় করা যদি আপনার সাধ্যাতীত হয়, তবে কত ব্যয় আপনি করিতে পারেন, তাহাই বলুন না।"

শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—"মহাশয়গণ, আমার সমস্ত অবস্থা আমি অকপটে নিবেদন করিতেছি, সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যাহা বিচার হয় করিবেন!—আমি ষাটটি টাকা মাহিনা পাই। একটি ছেলে তিনটি মেয়ে, এই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি লইয়া ঘর করি। হাতে কিঞ্চিৎ পিতৃদত্ত অর্থ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। সে টাকার একটি কাণা কড়িও আর অবশিষ্ট নাই। আছে এখন কেবল ব্রাহ্মণীর গায়ের অলঙ্কার কয়খানি। সেইগুলি বিক্রয় করিলে, হাজার বারোশত টাকা হইতে পারে। ঐ টাকার ভিতব যাহাতে জাতি রক্ষা হয়, সব দিক রক্ষা হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে,—তাহাই আপনারা পাঁচজনে করিয়া দিন।"

এ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে শ্যামাচরণের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। বায

মহাশয়ের মুখে কিন্তু একটু অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল, শ্যামাচরণের মত বোম্ ভোলানাথ লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল জমিদারের ঘরে বি-এ পাস করা ছেলে সন্ধানে আসিয়াছেন, হাতে কিছু নাই সে কি হইতে পারে? সওদাগিরি আফিসে চাকরি করেন, বেতন ষাট টাকাতে কি আসে যায়?—অমন কত ষাট টাকা রোজগার করেন তাহার কি কোনও হিসাব আছে?

তথাপি রায় মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা তবে একবার বাড়ীর ভিতর যাই। বলিয়া কহিয়া দেখিগে, মেয়েরা যদি কিছু কমাইতে রাজি হন।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"কমাইবার কথা শুনিয়া মেয়েরা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। বলিয়াছেন, তোমার যাহা খুসী তাহাই কর। আমাদের কথা যদি থাকিবেই না তবে জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ইহার পর খোসামোদ করা চলে না। সকল জিনিসেরই একটা সীমা আছে ত? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরও আত্মসম্মান একটা সীমাব পব আব মাথা নোয়াইতে ঘৃণা বোধ করে। শ্যামাচরণবাবু এইবার একটু "শুষ্ক শ্বেত হাসি" হাসিলেন—তাহা "জমাট অশ্রুর মত তুষারকঠিন।" বলিলেন—"তাহা হইলে ত আপনাব সঙ্গে কুটুম্বিতাব সম্মান আমাব অদৃষ্টে নাই।"

ইহাতে রায় মহাশয় এমন ভাবটা প্রকাশ করিলেন, যেন তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আর শ্যামাচরণ যেন উভয়েই এক অত্যাচাবী রাজার শাসনাধীনে পীড়িত—তাই সমবেদনা অনুভব করিতেছেন। অপর সকলে মনে মনে ভাবিল, ছি এমন স্ত্রীবশ।

যাহা হউক নিরাশার পাথর বুকে বাঁধিয়া সেই রাত্রেই শ্যামাচবণ গৃহে ফিবিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। বিবাহ

বাড়ীতে একটা আশা আনন্দেব যে কোলাহল উঠিয়াছিল, শ্যামাচবণ ফিবিবা মাত্র তাহা থামিয়া গেল। বাড়ীসুদ্ধ লোকেব মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীব কান্না পাইতে লাগিল। আর শৈলবালা অত্যন্ত গোপনে বাস্তবিকই ফুঁপিয়া ফুঁপিযা কাঁদিল।—শুধু কি মা বাপেব দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল না আরও কিছু কারণ ছিল?—আমার ত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে পণ করিয়া বসিল না—যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি সে ছাড়া আর কাহাকেও আত্মদান করিব না;—আমি চিরকুমারী থাকিব। সে অতশত জানিত না। তাহাব বুকে যে কিসেব বেদনা আসিয়া বাজিল, তাহা সে ভাল বুঝিতেই পারিল না।

গৃহিণী বলিলেন—"এখন উপায়?"

শ্যামাচবণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি আর কি উপায় কবিব। ঈশ্বর কি উপায় করেন দেখি। আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বেশী দিন থাকিতে পাবিলেন না। পাত্রেব সন্ধানে বাহির হইতে হইল। হাজার বারো শত টাকায় হয় এমন একটি পাত্র। পাস-টাস হোক আর নাই হোক্—দুইটা খাইতে পরিতে দিতে পাবে। আব নিতান্ত মূর্খ গোঁয়াব, মাতাল, দুশ্চবিত্র না হয়। অনেক সন্ধান করিতে হইল। অধিক আব কি বর্ণনা করিব,—এ ভোগ কাহাকে না ভুগিতে হইয়াছে? কয়েকটা স্থানে ত এই হইল—এই হইল—সব ঠিক্‌ঠাক্—আর হইল না। সেই বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পর্যন্ত এইভাবে কাটিল। পূজাব সময় একস্থানে স্থির হইল। হাজার টাকা দিতে হইবে। পাত্রটি উকিল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের। তাই বলিয়া বয়স অধিক নয়,—এই ত্রিশেব মধ্যে। মেয়েটি বয়স্কা ও সুন্দবী, "বি-এ, বি-এল্"-এর পিতা তাই হাজার টাকাতেই স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকৃত হইবাব আবও একটু বিশেব গোপনীয় কাবণ ছিল; পাঁচ বৎসর ছেলেব স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই পাঁচ বৎসর বিস্তর সাধ্য সাধনাতেও ছেলেকে বিবাহে সম্মত কবিতে পাবেন নাই। এবাব কোন

শুভগ্রহবশে ছেলে রাজি হইয়াছে। সুতরাং টাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্য্যটা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ কি জানি, যদি বিলম্বে মতি ফিরিয়া যায়।

১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। শ্যামাচরণ গহনাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পূর্ব্বে একটি ভারি দুর্ঘটনা ঘটিল। রান্নাঘরের সম্মুখেই বারান্দায় শৈল বসিয়া ছিল। একটি জল খাবার ছোট ঘটির ভিতর বামহস্তে মাঝের আঙ্গুলটি দিয়া, ঘটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, রান্নাঘরের ভিতর সুলোচনার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে চুন সুরকির একটা চাঙড় খসিয়া সেই হাতের উপর পড়িল। ঘটির কানাটা ভাঙ্গিয়া গেল, আঙ্গুলও আধখানা সেই সঙ্গে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই খুব জ্বর। পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটি দ্বিতীয়বার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচ দিনে জ্বর ছাড়িল; কিন্তু আঙ্গুল ভাল হইতে পনেরো কুড়ি দিন লাগিয়া গেল।

একে মেয়ের বিবাহ হয় না, তাহার উপর আবার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! খুব সাবধান, যেন প্রকাশ হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া না যায়।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বরপক্ষীয়েরা পল্লীগ্রাম হইতে প্রভাতেই আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের জন্য কাছেই একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া ছিল, তাঁহারা সেইখানে উঠিলেন।

বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল শৈলবালার মুখখানি মলিন। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দুইটি জলে পুরিয়া উঠিতেছে। তাহাব আর সে পূর্ব্বেকার আকাব নাই। যেন সে সম্প্রতি ছয় মাসের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে।

বেলা দশটার সময় গায়ে হলুদ হইল। বরপক্ষীয়দের একটা দাসী গায়ে হলুদের সময় বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে দেখিয়া গেল মেয়ের একটি আঙ্গুল কাটা। যথাসময়ে সে বরেব পিতার নিকট গোপনে এ সংবাদ দিতে ভুলিল না। বরকর্ত্তা শুনিয়া ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি নিজে পূজার সময় মেয়েকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হয়ত বাম হাতটা কাপড়েব ভিতর লুকান ছিল, তাই কি অত লক্ষ্য কবেন নাই? যাহা হউক প্রিয়বন্ধু ক্ষুদিবাম খুড়ার সহিত অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিলেন, বিবাহেব পূর্ব্বে কৌশলে এইটা জানাজানি করিয়া দিয়া, আরও দুই একশত আদায় করিয়া লইতে হইবে।

সন্ধ্যা হইল। বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বব আসিয়া সভাস্থ হইল। ইয়া গোঁফ—ইয়া চেহারা-পাড়ার ছেলেরা বরকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে ভাবিয়া আসিযাছিল, বরের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব কিছুই করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্ত্তা যথারীতি গলবস্ত্র হইয়া সভায় নিবেদন করিলেন—"লগ্ন উপস্থিত গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি হউক।"

বর গিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপবেশন করিল। শ্যামাচরণ জামাতাকে বর করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বরকর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের একটা চিরকালের কৌলিন প্রথা আছে, তাহা পালন করিতে হইবে। কনেকে সভায় আনা হউক। বর কনের হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিবে। তাহার পর বরণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়রা নিজেদের পুরোহিতের মুখপানে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি নাই। যাহা উঁহাদের করিবার প্রথা আছে তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি কি?"

কনেকে আনা হইল। বরকর্ত্তা বরের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"এইটি

তুমি কনের হাতে দাও।" কনেকে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী হাত পাত।" শৈল বস্ত্রাঞ্চলের মধ্য হইতে কম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি বাহির করিয়া দিল। বরকর্ত্তা বলিলেন—"না না, এক হাতে কি নিতে আছে মা? দুইটি হাতই পাতিতে হয়।" শৈল ত কিছুতেই বাম হস্ত বাহির করে না। শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়া পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়িব পর শৈল বাম হস্তখানি বাহির করিল। সকলেই দেখিল, মাঝের আঙ্গুলটির আধখানা নাই।

বরকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"একি! অঙ্গহীন!" পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীগুরু! অঙ্গহীনা কন্যা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে! মুখুয্যে মহাশয়, বিবাহ স্থগিত করুন।"

বিবাহ স্থগিত করুন! কন্যাপক্ষীয়েরা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"কোথাকার অশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য! একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে অঙ্গহীন হয় একথা কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন?"

ভট্টাচার্য অশাস্ত্রজ্ঞ! ভট্টাচার্য্য কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন। তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"কে হে বেল্লিক অকালকুষ্মাণ্ড আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক নাকি?"

শ্যামাচরণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি এখন বিবাহ স্থগিত করেন, তাহা হইলে আমার জাতি থাকে কেমন করিয়া?"

এইবার ক্ষুদিরাম খুড়া সর্ব্বসমক্ষে ববকর্ত্তাকে বলিলেন—"কন্যাকর্ত্তা পণস্বরূপ আর দুইশত টাকা ধরিয়া দিউন, মিটমাট করিয়া ফেলা যাইতেছে। কি বল হে ভট্টাচার্য?"—সেই মাত্র একজন ভট্টাচার্যকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ভট্টাচার্য প্রমাণ কবিবেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায আছে। তিনি বলিলেন—"টাকা ধরিয়া দিলে শাস্ত্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নাকি?"

সেই স্থানে কন্যাযাত্রী কলেজের একজন জ্যাঠা ছোকরা চশমা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—"ঢের দেখেছি, আর ভট্টাচার্যগিরি ফলাতে হবে না। নর শব্দ রূপ কব দেখি?"

ভট্টাচার্য মহাশয় এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে আসন ছাড়িয়া একলম্ফে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। দুই হাত অতি বেগে ঝাড়িয়া বলিলেন—"এ বিবাহে যদি আমি মন্ত্র বলাই তবে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

বরপক্ষীয় পাঁচজন হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল—"ভট্টাচার্য মহাশয়, করেন কি! কবেন কি!" ভট্টাচার্য বরকর্ত্তাকে লক্ষ্য কবিয়া বলিলেন—"যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে তবে উঠাও বব।"

বর বলিল—"আমিও আঙ্গুলকাটা মেয়েকে বিবাহ করিব না"—বলিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা ববের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "কি! বিবাহ করিবে না? লাঠির চোটে মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিব না!".

শৈলবালার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এতক্ষণ কেহ তাহার খবব রাখে নাই। একটা দাসী শ্যামাচরণকে ঠেলিয়া বলিল—"ওগো বাবু, মেয়ে যে এলিয়ে পড়ল।" তৎক্ষণাৎ শৈলকে ধরাধরি করিয়া অন্যত্র পাঠান হইল।

এই গোলমালটা থামিলে বরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলিয়াছি, প্রথমাবধিই সে বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। পিতামাতার একান্ত উৎপীড়নে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সে এই সুযোগে চম্পট দিল।

মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়া, বাতাস করিয়া, অনেক কষ্টে, শৈলবালার চেতনা সম্পাদিত হইল। শৈলর মা কাঁদিয়া বলিলেন—"উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হবে গো। উহার যে কপাল পুড়িল।"

আমরা এতক্ষণ মোহিনীর কোনও উল্লেখ করি নাই। সে কলিকাতাতেই ছিল। আশু বলিল—"বাবা, আমি মোহিনীকে আনিয়া বিবাহ দিব।" এই বলিয়া মুহূর্ত্তেব মধ্যে নিজেকে

ডেস্ক হইতে একখানা বৃহৎ ছুরি বাহির করিয়া লইয়া পাগলের মত মোহিনীর বাসার উদ্দেশে ছুটিল। বাসার দরজা তখনও বন্ধ হয় নাই। দুইটা তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া দোতলার ছাদে গিয়া পৌঁছিল। দোতলার ছাদে একটি মাত্র কক্ষ, তাহাতে মোহিনী একাকী থাকিত। দুয়ার বন্ধ, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কম্পিত স্বরে আশু ডাকিল—"মোহিনী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সংক্ষেপে আশু মোহিনীকে সমং ঘটনা বলিয়া বলিল—"ভাই তুমি এ রাত্রিতে আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আমাদের ।তি কুলমান রক্ষা কর। নহে ত বল, এই ছুরি আনিয়াছি, তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা ক রিব।"

মোহিনী আপাদমস্তক শিহরিয়া আশুর হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইল। বলিল, "ভাই চল, আমি তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব। আত্মহত্যা করিতে হইবে না।"

মোহিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল। এই রাত্রে যে শৈলবালার বিবাহ, তাহা সে পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিল। টেবিলের উপর একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে সে দুই মিনিট পূর্ব্বে "বিসর্জন" নাম দিয়া একটি কবিতা আরম্ভ করিয়াছে;—তাহার শেষ পংক্তিটির কালি এখনও শুকায় নাই।

চটিজুতা পায়ে, আলুথালু বেশে মোহিনী আশুর সঙ্গে চলিল। তখন রাত্রি দশটা হইবে। একটার মধ্যে শৈলবালার সঙ্গে মোহিনীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঠক, রাগ কবিবেন না। ঘটনাটা কিছু নভেলিয়া না রকমের হইল বটে;—কিন্তু এ জগতে বাস্তবজীবনেও যে প্রতিদিন শত শত নভেলের ঘটনা ঘটিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। দ্বিরাগমন

মোহিনী পিতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু পিতা ইহা শুনিয়া কি বলিবেন? তিনি যদি এই অপবাধ ক্ষমা না করেন?—বিবাহের পর এই ভাবনা মোহিনীর ও তাহার শ্বশুরের প্রধান ভাবনা হইল।

শ্যামাচরণবাবু কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছেন; মোহিনীকে জামাতা পাইয়া তাঁহার বহুদিনের সযত্নপালিত আকাঙ্খাটি পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এই একটা সমস্যার জন্য আনন্দটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী বলেন—"কে জানে বাপু কপালে কি আছে। ছেলের মা বাপ বউকে নিলে হয়।"

শ্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই মোহিনীর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শনিবার ত ফাঁক যায় না। মোহিনী একদিন শৈলকে বলিল—"দেখ শৈল, আমি মনে মনে ভাবি যে ভাগ্যে তোমাব আঙ্গুলটি কাটিয়াছিল—তাই—নহিলে এতদিন তুমি—।" আর বলিতে পারিল না। সে অবস্থা কি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায়? শৈল স্বামীর এই অসমাপ্ত কথাটুকু বুঝিল। পাঠ্যপুস্তকের অনেক কথা তখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই। মনে মনে বলিল—ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

মোহিনী যখনই আসিত, তখনই শৈলর জন্য কিছু না কিছু সখের জিনিষ লইয়া আসিত, কিন্তু শৈল মহা আপত্তি করিত—কিছুতেই লইবে না। বলিত—"কোথায় রাখব? সবাই দেখে ফেলবে।" মোহিনীও ছাড়িত না; বলিত—"দেখে দেখবে, তুমি ত আর চুরি করছ না।" শেষকালে শৈলকে লইতে হইত, নহিলে স্বামী রাগ করেন। বিশেষ চেষ্টা করিত, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। ধরা পড়িয়া প্রথম প্রথম লজ্জায় যেন সে মরিয়া যাইত, কিন্তু বারকতক এইরূপ হইতে হইতেই লজ্জা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল।

মোহিনী শৈলকে একবার বলিল—"আমাকে পত্র লিখো, নইলে এ শনিবার আমি আসব না" শৈল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"কি লিখতে হয় আমি কি তা জানি?"

তোমার দিদি তাঁর স্বামীকে যে সব চিঠি লেখেন, তা কি তুমি দেখনি?"

"হ্যাঁ কতবার দিদি আমাকে দেখিয়েছে৷"

"সেই বকম তুমি লিখবে।"

শৈল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে আমার ভারি লজ্জা করবে;—সে আমি পারব না।"

"দিদির কেন লজ্জা করে না?"

"আগে দিদির মত বড় হই"—একথা বলিয়াই শৈল হাসিয়া ফেলিল। সে বেশ বুঝিল, এ ওজরটি নিতান্তই "পঙ্গু" হইতেছে। তাহার সমবয়স্কাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সকলেই চিঠি লেখে। চিঠি লিখিতে ইচ্ছা তাহারও হইত, কিন্তু সে কথা কি স্বামীব কাছে স্বীকার করিতে আছে? ছি! বেহায়া মনে করিবেন যে।

চিঠি লিখিবার জন্য শৈলকে বেশী বড় হইতে হইল না; দুই তিন সপ্তাহ বয়স বাড়িতে না বাড়িতেই সে স্বামীকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম চিঠিগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতি হইত। ক্রমে বাড়িয়া দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া হইতে লাগিল। কোন বিশেষ কথা থাকিলে চারি পৃষ্ঠাও পুরিয়া যাইত।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দারুণ দুর্ভাবনা বহন করিয়াও এই নবদম্পতিব জীবন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। ক্রমে গ্রীষ্মাবকাশ নিকটে আসিল। মোহিনীকে বাড়ী যাইতে হইবে। দুই তিন মাস দেখাশুনা হইবে না, এই আশঙ্কায় দুই জনে অত্যন্ত কাতব হইয়া পড়িল। শৈল বলিল,—"কোনও উপলক্ষ্য কবিয়া মাঝখানে একবাব কলিকাতায় আসিতে পাবিবে না?"

মোহিনী বাড়ী গেলে বাড়ীব লোক দেখিয়া আশ্চর্য হইযা গেল। মুখচক্ষুব ভাব যেন সমস্তই পবিবর্ত্তন হইয়াছে। মোহিনী কি ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে একদিক পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কাবণ জিজ্ঞাসা কবিয়া কেহ কিছু উত্তব পায় না।

একদিন পাড়াব একজন প্রবীণা দিদিমা, মোহিনীব সাক্ষাতে তাহাব মাকে বলিলেন, "ছেলে বেটেব বড় হয়েছে—বিয়ে দাওনি—তাই মন গুমিয়ে থাকে।" ইহা শুনিয়া মোহিনী ফিক্ কবিযা হাসিযা ফেলিল। পবক্ষণেই তাহাব মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইযা গেল। মোহিনীব মা ইহা লক্ষ্য কবিলেন। সে অন্যত্র চলিয়া গেলে দিদিকে বলিলেন,—"ঠিক বলেছ বাছা। আমি কর্ত্তাকে বলে শীঘ্রই ওব বিবাহ দিতেছি।"

গ্রামেব পোষ্টমাষ্টার মোহিনীব একজন প্রিয় বন্ধু। তাহাকে বলা ছিল, মোহিনীব পত্রাদি বাড়ীতে না পাঠাইয়া যেন ডাকঘবেই বাখা হয়, মোহিনী স্বয়ং গিযা লইবে। একদিন পোষ্টমাষ্টাব কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তবে গিযাছিল। যথাসময়ে ডাক আসিল। অধীনস্থ পিয়ন নিজেই ব্যাগ খুলিয়া পত্রগুলি বিলি কবিল। পল্লীগ্রামেব ডাকঘবে এরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সেই সঙ্গে শৈলবালাব লিখিত, মোহিনীর একখানি পত্র ছিল, তাহা মোহিনীদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এত লোক থাকিতে, পত্রখানি কি ছাই মোহিনী ছোট বোন মালতীব হাতেই পড়িতে হয়? মোহিনী তখন বাড়ী নাই। পত্রখানিব আববণ বঙীন সমচতুষ্কোণ, এসেন্সেব গন্ধে ভুব ভুব কবিতেছে। মালতীব কেমন সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ সে জল দিয়া পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল।

পত্র পড়িযা মালতী অবাক্। ছুটিযা মাব কাছে গিয়া বলিল—"মা সর্ব্বনাশ হযেছে। দাদাব স্বভাব চবিত্র বিগড়ে গেছে"

মা পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন। মেয়েব কথায় তাঁহাব কোনও সংশয় বহিল না।

ও বাড়ীব বড়বউ এই সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি পত্র পড়িয়া বলিলেন—"আমি জানি, আমাব খুড়তুতো ভাই কলকাতায় পড়ত। তারও ঐ রকম হয়। সেও চিঠি ধবা পড়াতে জানাজানি হয়েছিল। তারপর আমবা ধরে বেঁধে তার বিয়ে দিলাম। এখন বোগ শুধরেছে। একেবারে কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে। তা তোমরাও মোহিনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যে জানতে পেরেছি, তা যেন মোহিনী না শোনে। হয়ত বাছা লজ্জায় আত্মহত্যা করে ফেলবে; নয়ত বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে। চিঠি জুড়ে ঠিকঠাক করে তোমরা রেখে দাওগে।"

তাহাই হইল। মোহিনী যথাসময়ে আসিয়া পত্র পাইল। খুলিতে গিয়া দেখে, পরিষ্কার একটি জলের দাগ। একবার বন্ধ করিয়া যে আবার খোলা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভাবিল বাড়ীতে কেহ নিশ্চয়ই ইহা খুলিয়াছে। কিন্তু পত্রের ভিতর একটা পুনশ্চ ছিল। হয়ত শৈলবালাই পত্র বন্ধ করিয়া ঐ পুনশ্চটির জন্য আবার খুলিয়া থাকিবে। যাহা হউক বিস্ময়ে সন্দেহে মোহিনী পত্রখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিল।

গৃহিণী যথাসময়ে একথা কর্ত্তার কানে তুলিলেন। কর্ত্তা বলিলেন—"ক্ষেপেছ, তাও কি সম্ভব? ও হয়ত কোনও বন্ধু এয়ার্কি করে ওরকম লিখেছে। ছেলেয ছেলেয় অমন করে।" গৃহিণী মনে মনে বলিলেন—"হে মা কালীঘাটের কালী! তাই যেন হয়। আমার বাছার এ দুর্নাম যেন বেঁচে থাকতে আমায় শুনতে না হয়।"

পরদিন একথা শুনিয়া ও বাড়ীর বড়বউ বলিলেন—"আচ্ছা, এ বিষয়ের তদন্ত আমরা করছি।"

মোহিনীর অনুপস্থিতিতে, বড়বউ মালতীকে লইয়া ভিন্ন চাবি দিয়া মোহিনীর কলিকাতার তোরঙ্গ খুলিয়া ফেলিলেন। বিস্তর খুঁজিতে হইল না। একখানি লাল রেশমী রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠি। সবই এক হস্তাক্ষরে লিখিত। সবগুলিই প্রণয়ের চিঠি। প্রিয়তম, প্রাণসখা, অভিন্ন হৃদয় ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ। তোমার শৈলবালা, তোমার আমি, তোমার শৈ, তোমার সাধের সই—ইত্যাদি বলিয়া শেষ। অনেকগুলিতেই লেখা, তুমি শনিবাবে নিশ্চয় আসিবে। আশা দিয়া নিরাশ করিও না। অধিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

বেশী পড়িবার সময় নাই, কি জানি যদি হঠাৎ মোহিনী আসিয়া পড়ে। সমস্ত চিঠি পড়িলে কিন্তু প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি একখানিতে লেখা ছিল—"আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে মা বাপ জানিলেন না, কি উপায় হইবে",—ইত্যাদি।

বড়বউ ও মালতী আসিয়া মাকে বলিল—"মা, আর কোনও সন্দেহ নেই। গাদা গাদা চিঠি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারিখানির মর্ম্মও শুনাইয়া দিল। মা শুনিয়া বাষ্পাকুলালোচনে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করিলেন—"বাছাকে আমার ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর,—আমি পূজা দিব।"

সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন—"আর ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে কাজ নেই। একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও, আমি একটি পয়সাও চাই নে।"

কর্ত্তা বিরক্তির সহিত বলিলেন—"এতদিন ত কোনকালে বিবাহ হয়ে যেত। তুমি যে এক বারোহাত লম্বা ফর্দ্দ বের করে বসলে। ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল। তার শাপেই ত এ সব হল।"

গৃহিণী বলিলেন—"তার মেয়েকে যদি মোহিনীর পছন্দ হয়ে থাকে তবে তারই সঙ্গে বিয়ে দাও। তারা যা পারে তাই দেবে।"

কিন্তু কর্ত্তা এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। বলিলেন—"তাও কি হয়? একবার ফিরিয়ে দিয়েছি। আবার কোন মুখে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব? দেশে কি আর সুন্দরী বড় মেয়ে নেই?"

গৃহিণী বলিলেন—"তা যেখানে হয় দাও। আর কিন্তু দেরী করলে চলবে না।"

সেই গ্রামেই অবিলম্বে এক বিবাহযোগ্য কন্যা বাহির হইল। যখন টাকাকড়ি সম্বন্ধে আর হাঙ্গামা নাই, তখন মনোমত পাত্রীর অভাব কি?

এক সপ্তাহের পর বিবাহের দিন স্থির হইল। মোহিনী বলিল, আমি বিবাহ করিব না। অনেক পীড়াপীড়ি কান্নাকাটি চলিল। শেষে মোহিনী মাকে বলিল—"আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাতে যদি আপত্তি না কর, তবেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।"

"কি প্রস্তাব"

"শ্যামাচরণবাবুদের সপরিবারে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে।"

"সে আর বিচিত্র কি? তবে কেমন কেমন দেখায় না? যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে?"

"হাঁ, সে গত অগ্রহায়ণ মাসেই হয়ে গিয়েছে।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা, কর্ত্তাকে বলে দেখব।"

বহু কষ্টে কর্ত্তা রাজি হইলেন। মোহিনী স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ইঁহাদিগকে আনিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই সন্দেহ করিলেন, এ কেবল পলাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার একটা ছল মাত্র।

অগত্যা মোহিনী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা শ্বশুরকে জানাইল। যাহা ঘটিযাছে অকপটে তৎসমুদয়ই বর্ণনা করিল। বলিল, ঘটনা আব গোপন রাখা চলে না। আমি যেমন আপনার বিপদে সহায়তা করিয়াছি, আপনি সেইরূপ আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করুন। আমি পারিব না—আপনি আসিয়া সমস্ত খুলিয়া বাবাকে বলুন। আর যে ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া বাবা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আশুব বিবাহ দিন। তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

শ্যামাচবণ পত্র পাইয়া অনেক কষ্টে আফিসে ছুটি লইলেন। যে দিন বিবাহ সেই দিন বেলা দশটার সময় সপরিবারে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

সেই বৈঠকখানায় আবার আজ লোকপূর্ণ। স্বর্ণকাব বিবাহের অলঙ্কার লইয়া উপস্থিত। রায় মহাশয় মধ্যস্থলে বসিয়া সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। শ্যামাচরণবাবুও সেইখানে বসিলেন। রায় মহাশয় ভাবি অপ্রতিভ;—আদর অভ্যর্থনা যেন একটু অতিবিক্ত মাত্রায করিলেন। বেলা হইয়াছে, স্নানাহারেব জন্য অনুবোধ করিলেন।

শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—"আমাকে যদি একটি ভিক্ষা দেন, তবেই আমি আহাব করিব।" অত্যন্ত উৎসুখ হইয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি?"

তখন সেই গৃহপূর্ণ লোকেব সম্মুখে শ্যামাচবণবাবু কন্যার বিবাহের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর মোহিনী পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। শেষে সহসা রায় মহাশয়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনাব নিকট ইহা গোপন রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আমাকে আর আপনার পুত্রকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সকলেই বলিল—যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। এমন বিপদে মোহিনী যে ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিয়াছে, সে কুলোচিত কার্যই করিয়াছে। রায় মহাশয়েরা গ্রামের জমিদার; বংশাবলীক্রমে চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু।

হরেকৃষ্ণবাবু বৈবাহিককে সাদরে উঠাইয়া বলিলেন—ভাই, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন হয় ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল। নারায়ণ সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এখন তোমরা বস, আমি বধূমাতার মুখ দেখিয়া আসি।"

স্বর্ণকারের নিকট হইতে কয়েকখানা অলঙ্কার লইয়া রায় মহাশয় বধূ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকেরা শুনিয়া অবাক। বিস্ময়ের ঢেউ কতকটা প্রশমিত হইলে বধূকে বরণ করিবার ধূম পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীমান্ আশুতোষের সহিত সেই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। মেয়েরা ছাড়ে নাই; মোহিনীকেও বাসরে গিয়া গান গাহিতে হইয়াছিল। [চৈত্র, ১৩০৫]

হিমানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিভূষণ আজ হিমানীর নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

হিমানীর পিতা বাবু কালিদাস মিত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী—কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ মিশনারি কলেজের অধ্যাপক। মণিভূষণ আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ এই কলেজের ছাত্র। কলেজে মণিভূষণের মত প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র দুইটি ছিল না। যেমন তাহার মেধা, তেমনি বুদ্ধি।—তাহার উপর ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর দেহসৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া মণিকাঞ্চনযোগ সাধন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মণিভূষণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মণিভূষণ তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। অনেকবার চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে গুরুগৃহে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকের পরিবারস্থ সকল স্ত্রী-পুরুষের সহিত সে অবাধে মিশিতে পাইত। মণিভূষণ সুকণ্ঠ গায়ক, চিত্রবিদ্যানিপুণ, চমৎকার কবিযা ইংরাজি ও বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে,—এই সমস্ত গুণের জন্য সে সকলেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে সর্ব্বনাশ করিযা বসিয়াছে। আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে—এবং অন্যেব পায়েও মারিয়াছে। দিনে দিনে অল্পে অল্পে সে অধ্যাপকের কুমারী কন্যা হিমানীব হৃদয় অধিকার করিয়াছে, এবং নিজেও হিমানীকে ভালবাসিযা মরিয়াছে। মণিভূষণ হিন্দু—তাহাব পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলেই গোঁড়া হিন্দু। তাহাতে আবাব সে বিবাহিত। খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে হিমানীর পাণিগ্রহণ করিবে, সে পথও বন্ধ। সে যে বিবাহিত তাহা এই পরিবাবে কাহারও অবিদিত ছিল না—হিমানীও তাহা প্রথমাবধিই জানিত। তাহাদের পরিণয় অসম্ভব জানিযাও কেন তাহারা যে পরস্পরকে প্রথমে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল—কেন যে সেই ভালবাসা অঙ্কুরে বিনাশ না করিয়া মনোমধ্যে স্নেহবারিসিঞ্চনে পরিপুষ্ট, পল্লবিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলিল, আমি তাহার কি সদুত্তর দিব?

উভয়ের মনোভাব যখন ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত হইল, যখন জানাজানি হইল তখন সেই প্রবীণ অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী, কি উপায় হইবে, এই বিমর্শ স্থির করিতে বসিলেন। ইহাদিগকে চিরদিনেব জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় দেখা গেল না। অধ্যাপক মিত্রের অন্তঃকরণটি বড়ই কোমল ছিল,—তিনি সাশ্রুনয়নে মণিভূষণকে পরামর্শের কথা জানাইলেন। মণিভূষণ বুদ্ধিমান—বলিবামাত্রই সম্মত হইল। কিন্তু বলিল—"যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, একবার হিমানীর নিকট জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি দিন।" তাহার ভিক্ষামিনতিপূর্ণ সকাতর চক্ষু দুইটি অধ্যাপক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না—সম্মত হইতে হইল।

তাই আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণিভূষণ আসিয়া, সযত্নরক্ষিত হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি, তাহার হাতের খান চারি পাঁচ পত্র—এই সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র—হিমানীর উপহার একটি অতি শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ এবং একখানি কবিতাপুস্তক, এই সমস্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দ্রব্যগুলি হিমানীর পিতাব হস্তে সমর্পণ করিয়া হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা করিতে চলিল।

আজ সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজকক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়দ্দূরে টেবিলে তাহাব ভোজনসামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উষ্ণ। চক্ষু দুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একখানি সোফায় হিমানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল, মণিভূষণ গিয়া সেই সোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে আব সে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার সুখ উপভোগ করে নাই। হিমানীর একখানি সুকোমল তপ্ত হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ

হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা যাহা যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধ্যা দশটার মেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায়গ্রহণের নিষ্ঠুর মুহূর্ত্ত নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া গদগদস্বরে দুই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহজগৎকে কেন জানি না মণিভূষণের পরজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অশ্রুধৌত ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই স্বল্পালোকে নিরীক্ষণ করিল। আত্মবিস্মৃতির মোহে সে সমাজ ভুলিল, নীতি ভুলিল, পাপপুণ্য ভুলিল, বিবেক বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠযুগল হিমানীর ওষ্ঠে মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল, কিন্তু মুখ সরাইল না।

সহসা যেন মণিভূষণের হৃদয়ে অশান্তির তুফান কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। সে উঠিয়া হিমানীকে বলিল—"তবে যাই।" —তবে আসি" কথাটাই মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সংশোধন করিয়া বলিল, "তবে যাই"। বলিয়া ঠিক মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হিমানী সেই সোফায় মুখ লুকাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদেব মণিভূষণের জীবনে প্রভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সামন্তপুর গ্রামের উত্তর সীমা হইতে কিছুদূর সরস্বতী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত।প্রস্থে চারি পাঁচ হাতের বেশী হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হাঁটিয়া পার হওয়া চলে। দুই তীরে আমবাগান, বাঁশঝাড়, ঝাউবন প্রভৃতি শাখাবিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যাতাপ হইতে এই ক্ষীণতোয়া নদীটিকে রক্ষা করিতেছে।

এই নদীর তীরে মণিভূষণের নবনির্ম্মানিত আবাস গৃহ। বাংলো ধরনের একটি ক্ষুদ্র বাড়ী। চারিপার্শ্বে দেশী বিলাতী নানাজাতীয় ফল ফুল ও পাতার গাছ। বাগান ঘিরিযা সবুজ রং করা লোহার রেলিং।

এই গৃহে মণিভূষণ একাকী বাস করে। এখন তাহার বিস্তৃত ইষ্টকের ব্যবসা। সরস্বতীর উভয়তীরে যতগুলি পাঁজা দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার। যখন কলেজে পড়িত, তখন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অধিক অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া সে জানিয়াছে, এই স্থানের মৃত্তিকাই ইষ্টক নির্ম্মাণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বিলাত হইতে এই ব্যবসা সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক আনাইয়া সে পাঠ করিয়াছে। এক বৎসরকাল ক্রমাগত টেষ্টট্যুর ভাঙ্গিয়া এবং স্পিরিট্ পোড়াইয়া একটি চূর্ণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা কাদায় মিশাইলে ইষ্টক বেশ লাল আর খুব শক্ত হয়। এই উৎকর্ষের জন্যই মণিভূষণের ইষ্টকের অনেকদূর পর্য্যন্ত এত আদর।

এই গৃহে একটি অনতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে, সেটি মণিভূষণের আফিস। খাতা ও পুস্তকভরা কাচের আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আসবাবই সাহেবী কেতায় সজ্জিত;—এমন কি চুরুটের ছাই ঝাড়িবার পাত্রটি পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আজ বৈশাখের মধ্যাহ্নে মণিভূষণ আপনার নির্জ্জন আফিসগৃহে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টকের হিসাব করিতেছিল না,—কবিতা লিখিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদও সাহেবী;—খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুণ পূর্ব্বাবধিই তাহার আদব কায়দা সমস্ত সাহেবী হইয়া গিয়াছিল।

মণিভূষণের সম্মুখে যে একখানি সুন্দর বিলাতী বাঁধাইকরা খাতা রহিয়াছে সেখানি প্রেমের কবিতায় পরিপূর্ণ। এক একবার সে খাতাখানির এখানে ওখানে খুলিয়া পড়িতে

ছিল—আবার বন্ধ করিয়া রাখিতেছিল। কবিতাগুলি সমস্তই স্ত্রীলোকের উক্তি। আবরণে লেখা, শ্রীমতী হিমানী দেবী বিরচিত।

কিয়ৎক্ষণ কবিতা লেখার পর দেরাজ হইতে মণিভূষণ তিনখানি চিত্র বাহির করিল,—তিনখানিতেই হিমানী। প্রথমখানিতে হিমানীর কুমারী-বেশ; সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি; চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছে; যেন কাহার নিকট কি শুনিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের হাসি হাসিতেছে। দ্বিতীয়খানিতে হিমানী বিবাহসাজে সজ্জিতা;—মুখে সলজ্জ সুরক্তিম হাসির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। চক্ষু আনত। হিমানী যেন আপনাকে আপনি লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। শেষের খানিতে যুগলমূর্ত্তি। হিমানী ও মণিভূষণ পরস্পরের মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া। সে দৃষ্টিতে অতৃপ্তি, মোহ ও চাঞ্চল্য মাখান একটা ভাব নিপুণতার সহিত চিত্রিত।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, হিমানীর সঙ্গে মণিভূষণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রম করিয়াছেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পর হইতেই মণিভূষণ হিমানী অথবা তাহার মাতাপিতার কোন সংবাদ পায় নাই এবং লয়ও নাই। হিমানী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহাও সে অবগত ছিল না।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, মণিভূষণ এখন একটা বিষম চিত্তব্যাধিতে আক্রান্ত। ডাক্তারেরা ইহাকে মনোমেনিয়া বলেন। এক প্রকার পাগল আর কি—সম্পূর্ণ পাগল নহে। এ ব্যাধি যাহার হয় তাহার কেবল একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তবিকার ঘটে;—আর সমস্ত বিষয়ে তাহার মন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কিন্তু একটু পূর্ব্বের ইতিহাস বলার প্রয়োজন।

বাড়ী আসিয়া মণিভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে সে হিমানীকে ভুলিয়া স্বীয় পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী নবদুর্গাকে ভালবাসিতে পারে। জলমগ্ন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁচাইতে হইলে তাহার মুখপথে ফুৎকারবায়ু প্রেরণ করিয়া কৃত্রিম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহাইতে হয়, তাহার পর স্বাভাবিক নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পুনরাগমন করে। মণিভূষণপ্রথমে নবদুর্গাকে এইরূপ কৃত্রিম মৌখিক ভালবাসা জানাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। সে নিজের সঙ্গে যেপ্রাণান্তকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে যদি নবদুর্গার সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, এই দুরাশায় একদিন তাহাকে সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত অকপটে জ্ঞাত করিল। কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া বিপরীত হইল। স্বামীর মুখে যাহা শুনিল, তাহা ত নবদুর্গা বিশ্বাস করিলই, তাহা ছাড়া স্বামীর প্রতি অন্য সন্দেহ করিল; এবং স্বামীকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ডতপস্বী বলিল; অকথ্য ভাষায় হিমানীর প্রতিও আক্রমণ করিল। তাহার পর একটা বীভৎস শপথ দিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না।"

ইহার পর স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ হইল। মণিভূষণ জ্বরে পড়িল; কয়েকদিনকাল খুব জ্বর রহিল; মস্তিষ্কবিকারের সূত্রপাত তখন হইতেই। নবদুর্গা যদি আত্মীয় স্বজনের একান্ত অনুরোধে মণিভূষণকে শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে যাইত, তাহা হইলে সে রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিত। তাহার নিকট নবদুর্গা নাম পর্য্যন্ত করিবার যো ছিল না।

জ্বর নরম পড়িল, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। ডাক্তার বৈদ্যরা পরামর্শ করিয়া নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ নবদুর্গারপ্রতি বিদ্বেষেই এখন মণিভূষণের ব্যাধিরপ্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। জ্বর ক্রমে ছাড়িল বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটু গোলযোগ রহিয়া গেল। নবদুর্গার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সে কেমন একরকম হইয়া যাইত। নবদুর্গাকে এই কারণে পিত্রালয় হইতে আনা হইল না, এবং পরিবার-মণ্ডলীতে তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ বর্জ্জিত হইল।

ইহার পর গ্রামের চতুর্দ্দিকে মণিভূষণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে সরস্বতী তীরে তাহার আফিসগৃহ পাঠক দেখিয়াছেন।

নির্জ্জনেই সে ভাল থাকিত; কেহই তাহার নির্জ্জনবাস সম্বন্ধে আপত্তি করিল না। যে দিন সময় হইত সেই দিন বাড়ী আসিত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। সুতরাং নবদুর্গা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল।

অতঃপর মণি আর হিমানীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল না। মধ্যাহ্নে বিজন আফিসগৃহে বসিয়া হিমানীর কথা ভাবিত। বাড়ী আসিবার সময় স্বেচ্ছায় হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি তাহার পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, এখন সেজন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইল। কলেজে পাঠকালে সে চলনসই রকম ছবি আঁকিতে জানিত; হিমানীর একখানি ছবির জন্য সেই বিদ্যার শরণাপন্ন হইল। প্রথম প্রথম কিছুই মিলিল না; ক্রমে একটু আধটু সাদৃশ্যের ছায়া আসিতে লাগিল। চক্ষু দুইটির ভাব যেন কিছু কিছু মিলিল। ক্রমে ওষ্ঠযুগলের ভাবও আসিল। দুইমাস পরিশ্রমের পর হিমানীর একখানি অতি সুন্দর ছবি সমাপ্ত হইল। সে দিন মণিভূষণের কি আনন্দের দিন। কত আদরে সে স্বহস্তাঙ্কিত প্রিয়ামূর্ত্তিকে চুম্বন করিল। এখানি হিমানীর কুমারীবেশের ছবি।

ছবি শেষ হইলে মণিভূষণ ভাবিল, এখানি বাঁধাইয়া না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য কাহারও হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতে বিশ্বাস হইল না। স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া দোকানে বসিয়া থাকিয়া ছবি বাঁধাইল। কিন্তু যে দিন ছবি বাঁধাইল, সেই দিনই রাত্রে তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছবিখানি বক্ষে চাপিলে আর পূর্ণ মিলন হইল না, মাঝখানে কাচের ব্যবধান রহিয়া গেল। ইহা কি সহ্য হয়? বিদ্যাপতির রাধিকাও ত ঐ কারণে গলায় হার পরিতেন না।

তাহার পর হিমানীর হইয়া সে নিজে কবিতা রচনা করিতে লাগিল। সংস্কৃত কবিয়া লিখিয়াছিলেন, প্রেমিকা নায়িকা বিরহ-বিকারে নিজেকে নায়ক ভ্রম করিয়া নিজের প্রতি প্রেম সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। মণিও তাহাই করিল। সে শুধু হিমানীর হইয়া কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, হিমানীর হস্তাক্ষর পর্যন্ত অনুকরণ করিল। সে চিত্রবিদ্যায় নিপুণ, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন নহে। হিমানীর হস্তাক্ষরে কল্পিতা হিমানীর কবিতাবলী খাতায় তুলিতে লাগিল। হিমানীর ছবিখানি বাক্সের গায়ে দাঁড় করাইয়া কল্পনা করিত যেন হিমানী তাহার কবিতাগুলি একে একে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যেখানে ভাবের উন্মাদ গভীরতা আসিত, সেখানেই ছবিখানি লইয়া চুম্বন করিত। ক্রমে তাহার স্বচরিত হিমানীকে বিবাহের বেশে সাজাইয়া ছবিতে তাহাকে বিবাহ করিল। পাগল আর কাহাকে বলে?

এইরূপ করিয়া তিন বৎসর কাটিয়াছে। আজ সে তাহার নির্জ্জন আফিসগৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল।

বেলা একটা হইতে আকাশে মেঘ করিল। কিছুক্ষণ পরে ধূলায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ঝড় উঠিল। খুব ঝড়। মণিভূষণের গৃহের উপরিস্থিত টিনের ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে। সে একবার বাহির হইয়া আকাশের পানে চাহিল। জল আসিতে বিলম্ব নাই।

ফিরিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মধ্যাহ্নের মেঘাচ্ছন্ন আলোক ঠিক সন্ধ্যালোকের মত দেখাইতেছিল। জানালার কাচের মধ্য দিয়া মণিভূষণ প্রকৃতির উন্মাদনৃত্য দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিল, তাহার কম্পাউণ্ডের ভিতর, বাগানে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। চিনিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না,—হিমানী। হিমানীর বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতেছে; বাগানের গোলাপফুলের পাপড়ি খসিয়া আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িতেছে। হিমানী দাঁড়াইয়া চকিতা হরিণীর মত ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে।

মণিভূষণ কলের পুতুলের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। বাগানে গিয়া হিমানীর মুখপানে চাহিল। তাহার পর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"এস।"

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহার পরিধানে একখানি মেঘলা রঙের দেশী শাড়ী সেই কাপড়েই জ্যাকেট শাড়ীখানি

অল্প তুলিয়া মাথায় দেওয়া, এদিকে ওদিকে একটি আধটি ব্রোচ্ দিয়া আটকানো, যাহাতে মাথা হইতে সরিয়া না যায়। বামস্কন্ধের একটু নিম্নভাগে হরতনের আকারে একটি ছোট কালো ঘড়ি, অলঙ্কার এবং আবশ্যকতা দুই সম্পাদন করিতেছে। বেশে কোনও আড়ম্বর নাই, কিন্তু পারিপাট্য-গুণে নয়নাকর্ষক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া মণিভূষণ হিমানীকে একখানি চেয়ারে বসাইল। হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছিল, সুতরাং কপাট বন্ধ করিয়া দিতে হইল। এইবার বৃষ্টিও আসিল; মাথার উপর টিনের ছাদে নববর্ষাজলপাতে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হইল।

তখনও হিমানী নীরবে বসিয়া। মণিভূষণ ডাকিল—"হিমানী।"

হিমানী কম্পিতস্বরে উত্তর করিল—"কি মণি?"

"একি স্বপ্ন দেখিতেছি না সত্য?"

"সত্য। স্বপ্ন হইলে বেশ হইত।"

"কেন বেশ হইত? আমার ত শঙ্কা হইতেছে, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।"

"দুঃসংবাদ আনিয়াছি। তোমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

"আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"কৃষ্ণনগর!—কৃষ্ণনগরে কি করিতে গিয়াছিলে?"

হিমানী তখন সংক্ষেপে পূর্ব্বকথা বলিল। বলিল—"তুমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে তিন মাস পরে আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য আমার মা যীশুখৃষ্টের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যে জেনানা—মিশন্ খুলিয়াছে, তিনি তাহার কর্ত্রী। আমিও তাঁহার কাছে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করি। এইরূপ দুই বৎসর আমরা কৃষ্ণনগরে।"

শুনিয়া মণিভূষণ বলিল—"আমার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদকে দুঃসংবাদ কেন বলিতেছ হিমা? আমার স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহারও জীবন দুঃখময়, আমারও তাহাই।"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ওকথা মুখে আনিও না। স্বর্গে ঈশ্বর আছেন তিনি ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন? আমি তোমার কথায় লজ্জিত হইতেছি।"

মণিভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"দুটি প্রাণীকে চিরপিপাসায় দগ্ধ করা কি ঈশ্বরের মত কাজ?"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ওকথা বলিও না। ঈশ্বরের উপর বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা ছাড়া, কেন তুমি ভুলিয়া যাও যে তুমি বিবাহিত ব্যক্তি এবং তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান?"

মণিভূষণ বলিল—সত্য বলিয়াছ হিমানী, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি এই ঘরেই আছেন। দেখিবে? তোমাকেও ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখিতে, তাই ভ্রম করিয়াছিলাম।"

হিমানী ভয় ও বিস্ময়ের সহিত মণিভূষণের মুখপানে চাহিল। তাহার উন্মাদব্যাধির কথা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল।

মণিভূষণ ছবি তিনখানি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিল। হিমানী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অল্প আলোকে ছবিগুলি দেখিল। ওদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে দুই ফোঁটা অশ্রুমোচন করিল। মনে মনে ভাবিল—মানুষ-জন্ম অপেক্ষা ছবি-জন্ম অনেক ভাল। শেষে ছবিগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—এ তুমি কোথায় পাইলে?"

মণিভূষণ উত্তর করিল—"তুমি দিয়াছিলে মনে নাই? আমার বুকের ভিতর রাখা ছিল, তিল তিল করিয়া বাহির করিয়াছি।

আর হিমানী পারিল না। ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা বহিয়া তাহার কপাল ভাসাইল।

মণিও কাঁদিল। হিমানী একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"মণি, এতদিন তবে কি করিলে?"

মণিভূষণ বলিল—"তুমিই বা কি করিলে?"

হিমানী বলিল—"আমি যে কি করিয়াছি তা ঈশ্বরই জানেন।"

মণিভূষণ বলিল—"আমিও জানি, এই দেখ।" বলিয়া কবিতার খাতাখানি হিমানীর হাতে দিল।

হিমানী দেখিল, তাহার হস্তাক্ষর। পড়িল—তাহারই মনের কথা বটে। মণিভূষণকে একটা কথা বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু তখনি আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ভাবিল—"এ কি করিতেছি! নবদুর্গার মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে, কিন্তু আমি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিতেছি। নিবান আগুন আবার জ্বালিতে বসিয়াছি!"

তখন জল ছাড়িয়াছে; আকাশও পরিষ্কার। হিমানী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"মণি, অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিলাম। পাঁচটার গাড়ীতে আমাকে কৃষ্ণনগরে ফিরিতেই হইবে। আমার হাতে ভিন্ন নবদুর্গা ঔষধ খায় না। তুমি কাল যাইবে ত?"

মণিভূষণ ভাবিয়া বলিল—"যাইব।" মনে মনে বলিল—'প্রাণেশ্বরী, তোমার দেখা পাইবার জন্য নরকেও যাইতে পারি।"

হিমানী বলিল—"তবে আমি চলিলাম।"

মণিভূষণ ষ্টেশন অবধি হিমানীকে রাখিয়া আসিতে চাহিল। হিমানী আপত্তি করিল, কিন্তু মণিভূষণ শুনিল না, সঙ্গে গেল। পথে হিমানী মণিভূষণকে সাবধান কবিয়া দিল, তোমার স[illegible] আমি পূর্ব্বাবধি পরিচিত তাহা সেখানে প্রকাশ করিও না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন মণিভূষণ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীব পীড়া সাংঘাতিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, একটু সুরাহা হইয়াছে। হিমানী স্বযং চিকিৎসা করিতেছে। তাহার শ্বশ্রুঠাকুরাণী আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বাবা, এতদিন পবে কি মনে পড়িল! ও ছেলেমানুষ, ওর কি বুদ্ধি আছে? ওর কথা কি আর ধরিতে হয়!" মণিভূষণ অপ্রতিভের মত মাটিব পানে চাহিয়া বামহস্তে গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল। কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

হিমানীকে সেখানে সবাই মেমডাক্তার বলিত। মণিভূষণ মেমডাক্তাব দুই বৎসর যাবৎ নবদুর্গাব সহিত সখীত্ববন্ধনে বদ্ধ। এই দুই বৎসরের প্রায় প্রতিদিনই তিনি আসিয়া নবদুর্গাকে লেখাপড়া এবং নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম শিখাইয়াছেন। পীড়ার প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছেন। এখন যে নবদুর্গার বাঁচিবার আশা হইয়াছে তাহা কেবল মেমডাক্তারের সযত্ন শুশ্রূষা এবং অশ্রান্ত চিকিৎসার গুণে।

শুনিয়া মণিভূষণের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেবীকে সে এতদিন হৃদয়মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছে, সে দেবীর দেবীত্ব সত্যকার—কল্পনার নহে।

হিমানী ও মণিভূষণ দুইজনে রাত্রি জাগিয়া নবদুর্গার সেবা করিতে লাগিল।

এইরূপে দুইদিন কাটিল। তৃতীয় দিনে হিমানী তাহার চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া সমস্ত প্রভাতকালে অধ্যয়ন করিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পরিবারস্থ সকলকে বলিল—"যদিও রোগিনীর অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন নহে বটে কিন্তু দুর্ব্বলতা এত অধিক যে হঠাৎ জীবন সংশয় হইতে পারে । এই দুর্ব্বলতার আশু প্রতিকারের জন্য ইহার শরীরে কোনও রোগশূন্য স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। জীবিত ব্যক্তি কে রক্ত দিবে? কাহার এত সাহস? হিমানী বলিল—"কোনও চিন্তা নাই। আমি দিব।"

কেহ কেহ বলিল—"তাও কি হয়! শেষে কি হইতে কি হইবে?"

হিমানী বলিল—"তাহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আমি সবল ও সুস্থকায়, বয়সেও রোগিণীর সমান, আমার রক্তেই সবচেয়ে বেশী উপকার হইবে।"

নবদুর্গার দাদা বলিলেন—"ঐরূপ বয়সের কোন ছোটলোকের মেয়ের টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।"

হিমানী বলিল—"না তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমিই দিব। কোনও ভয় নাই, ভয় থাকিলে আমি এমন কাজ কেন করিব? প্রাণের মায়া আর কার নাই?"

লোকে মনে করিল, তা বটেও ত! ভয় থাকিলে রোগীর জন্য কেন ডাক্তার এত করিতে যাইবে, গরজ কি?—চিকিৎসায় হিমানীর বেশ পশার ছিল, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কিছু সন্দেহ হইল না। নবদুর্গার মা শেষে বলিলেন—"যা তুমি ভাল বোঝ বাছা! কিন্তু যেন কোনও বিপদ ঘটাইও না।"

পাড়ায় একজন নবপরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিভ ডাক্তার ছিল হিমানী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রক্রিয়ার সময় একজন চিকিৎসাব্যবসায়ীর সাহায্য প্রয়োজন। সকলে বলিল—"যদি সাহায্যেরই প্রয়োজন, তবে সাহেব ডাক্তার আনান যাউক। ও অভিজ্ঞতাবিহীন ডাক্তারকে বিশ্বাস কি?"

হিমানী বলিল—"বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। কেন বৃথা অর্থব্যয় ও বিলম্ব বৃদ্ধি করিবেন?"—বুঝি হিমানীর শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে বিজ্ঞ সাহেব ডাক্তার আসিয়া তাহার চিকিৎসা প্রণালীতে বাধা দেয়।

পরামর্শ ঠিক হইল, এই রক্ত সঞ্চালন-কার্য্য রাত্রে ঠাণ্ডার সময় করিতে হইবে। নিজের হাসপাতাল হইতে হিমানী প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া রাখিল। নেটিভ ডাক্তারকেও বলিয়া কহিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিল।

রাত্রি নয়টার সময় যথারীতি কোট প্যাণ্টালুন আঁটিয়া, ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া, নেটিভ্ ডাক্তার উপস্থিত। সাবধানে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে রোগিণীর হাতে কব্জির একটা শির ছিন্ন করিয়া যথারীতি নল বসান হইল। পরে সেই নল আনিয়া হিমানীর হস্তের ছিন্ন শিরার মুখে যোজিত করা হইল। নেটিভ্ ডাক্তার ধীরে ধীরে কল চালাইল। হিমানীর শরীর হইতে রক্তধারা নল বহিয়া নবদুর্গার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চলিলেন, হিমানীর মুখ পাণ্ডবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু বসিয়া গেল, হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ক্ষীণস্বরে সে সহকারী ডাক্তারকে বলিল—"এইবার বন্ধ করুন, আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

কল বন্ধ হইল। ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে নল খুলিয়া একে একে উভয়ের ছিন্ন শিরা বাঁধিয়া দিল ক্ষতমুখে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিল।

নবদুর্গার মা হিমানীকে ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। মণিভূষণ আর দুই একজন তাহার সঙ্গে গেল। হিমানী শয়ন করিল। তাহার কথা জড়ান, যেন নেশা হইয়াছে। বলিল—"আমার মুখে অল্প অল্প করিয়া সেই ঔষধ ও ব্রাণ্ডি মিশান গরম দুধ দাও।"

দুগ্ধ পানে হিমানী একটু সুস্থ হইল। বলিল—"আর কিছু করিতে হইবে না। তোমরা যাও। আমি ঘুমাইব। ঘুমাইলেই সব সারিয়া যাইবে।"

সকলের সঙ্গে মণিভূষণও চলিয়া যাইতেছিল। হিমানী বলিল—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন রোগিণীর সম্বন্ধে আপনাকে দুই চারিটা কথা বলিব।"

সকলে চলিয়া গেল। মণিভূষণ হিমানীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার মাথা যেন ঘুরিতেছে। কিছু বলিতে চাই—কিন্তু হয় ত কি বলিতে কি বলিব।"

মণিভূষণ হিমানীকে ব্রাণ্ডি মিশান আর একটু দুগ্ধ পান করাইল। হিমানী আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

সে রাত্রি পূর্ণিমা ছিল। সমস্ত বহির্দ্দেশ জ্যোৎস্নাবন্যায় প্লাবিত। কতকটা জ্যোৎস্না মুক্ত বাতায়নপথে উছলিয়া আসিয়া হিমানীর শয্যার উপরেও পড়িয়াছে। নারিকেলের পাতা কাঁপাইয়া এক একবার ঝিরঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে।

হিমানী বলিল—"মণি, আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। কিন্তু এখন তাহা কতকটা সফল করিতে পারিলাম মনে হইতেছে। তুমি যদি ব্যাঘাত না দাও তবেই হয়।"

মণিভূষণ বলিল—"সে কি হিমা। আমি ব্যাঘাত দিব?"

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এলান কথায় ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্ত—তাহা আমি নবদুর্গাকে দিলাম। উহার আত্মা লইয়া যদি আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে ওই তোমার হিমানী হইতে পারিত।"

মণিভূষণ নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার কি নেশা হইয়াছে? আমি যেন কত কি দেখিতেছি, শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্য্য। ভারি চমৎকার। যেন ঈশ্বর আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, দেবদূতেরা আসিয়াছে। আমি ত যাইব না, নবদুর্গা যাউক।

মণিভূষণ বলিল—"হিমা, তুমি অমন করিতেছ কেন? আব একটু দুধ দিব?

হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল। আবার একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"কতকগুলো কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন। দেখ মণি, আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিযাছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই, তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে?"

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—"হাঁ হিমা, এমনিই ভালবাসিবে।"

হিমানী বলিল—"তবে কাল প্রাতে আমার আত্মা নবদুর্গাব সঙ্গে বিনিময় করিব।"

এই সময় নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন একজন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল :—

সুখসাগবমে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

হিমানীর কানে এই গান পৌঁছিল, সে জাগিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার অল্পালোকে মণিভূষণের ম্লান মুখখানির পানে চাহিল। মণিভূষণ তখন হিমানীকে নিদ্রাতুর দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। হিমানী ডাকিল—"মণি"।

মণিভূষণ এই সোহাগের স্বরে গলিয়া উত্তর করিল—"কি হিমা?"

হিমানী বলিল—"মনে পড়ে?"

মণি হিমানীর মুখের পানে চাহিল। হিমানী বলিল—"সেই একদিন কলিকাতায় যে দিন, তুমি আমাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলে?"

সেই হিন্দুস্থানী তখনও গলা কাঁপাইয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতেছে—

সুখসাগর মে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসে।

মণিভূষণের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। হিমানী বলিল—"আমার বড় ঘুম পাইতেছে; সে দিন যাইবার সময় যাহা দিয়াছিলে, তাই দিয়া যাও।"

মণিভূষণ হিমানীর বিবর্ণ শীতল ওষ্ঠাধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিল। হিমানী বলিল—"সেবারে দুইজনেই মনে করিয়াছিলাম, এই দেখা শেষ দেখা। কিন্তু আবার দেখা ত হইল। সে দিনের বিদায়-চুম্বনের যাহা গুণ ছিল, এটিতেও যেন তাহাই থাকে। আবার যেন দেখা হয়। আমার ঘুম পাইতেছে, এখন তুমি যাও।"

মণিভূষণ বাহির হইয়া গেল।

হিমানীকে একাকী রাখিয়া আসিয়া তাহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার শালাজকে হিমানীব শয়ন কক্ষে পাঠাইয়া দিল।

তিনি গিয়া দেখিলেন, হিমানীর বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, বুকে হাত দিয়া দেখিলেন হৃৎ-স্পন্দনও থামিয়াছে। নিঃশ্বাস বহিতেছে না।

চীৎকার করিয়া ছুটিয়া তিনি বাহিবে গেলেন। সকলে আসিল ডাক্তাব আসিল, আলো জ্বলিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তাব বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! ইনি ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়াছেন, শিরার মুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছেন। শরীরে যাহা রক্ত অবশিষ্ট ছিল, তাহা নির্গত হইয়া গিয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা।"

মণিভূষণের পাগলামি-ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা সুলক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি তাহার মন আশ্চর্যরূপে ফিরিয়া গিয়াছে। এখন সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে। [বৈশাখ, ১৩০৬]

ভুলভাংগা

আজকাল শাশুড়ীকে নিন্দা কবা বধূদের একটা ফ্যাসান হইয়াছে। নাটকে নভেলে পর্যন্ত শাশুড়ী বেচারীদের পরিত্রাণ নেই। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—"মুর্খেবে তুষিবে তাব মত কদ্যাচাবে"—গ্রন্থাকারেরা কি এই মহাজন-বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ কবেন? নবীনা পাঠিকাদের তুষ্টিসাধন ব্যতীত বাঙ্গলা বহি বিক্রয় হইবার আর উপায় নাই বুঝি?

আমি শাশুড়ীদের হইয়া ওকালতী করিতে বসিয়াছি, তাই যেন তোমবা পাঁচজনে আমাকে বুড়ি মাগী বলিয়া গাল দিও না। আমার বয়স এখনও কুড়ি পাব হয় নাই, সুতরাং তোমরা কোনও মতেই আমাকে বুড়ি বলিতে পাবিবে না—আমার শাশুড়ীব মত এমন শাশুড়ী কলিকালে হয় না। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তোমরা যদি তাহা কবিতে, তবে তোমাদের শ্রাশুড়ী—থাক্ আর অপ্রিয় সত্য কথাটা বলিব না—আমাব গল্পটা শাশুড়ীকে শুনাইয়া তাঁহার মতটাই না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

কলিকাতার নিকট বরাহনগরে আমার পিত্রালয। আমরা দুই বোন তিন ভাই। আমিই সবার ছোট, মায়ের কোলের মেয়েটি বলিয়া ছেলেবেলায় মা বাপের আদব একটু বেশী পরিমাণেই পাইয়াছিলাম। আহা, আমাব সে বাবা-ই বা কোথা গেলেন, আমার সে মা-ই বা কোথায় গেলেন। দাদাবা এখন ঠাকুর দেবতাদের আশীর্ব্বাদে চিরজীবি হইয়া বাঁচিয়া থাকুন, তাহা হইলেই সব।

মা বাপের আদরে সোহাগে আমার শৈশব কাটিতেছিল। যখন আমি ছয় বৎসরেব কি সাত বৎসরেব হইয়াছি, তখন বাবা আমাকে একখানি প্রথমভাগ আনিয়া দিলেন। আমি সমস্ত দিনে অ আ ক খ সব চিনিয়া ফেলিলাম। যে দেখিল সে-ই আশ্চর্য হইল, যে শুনিল, সে-ই অবিশ্বাস করিল। আমার বুদ্ধি আর স্মরণশক্তি দেখিয়া ছোট দাদা বলিলেন—"হরি! আমি তোকে পড়াব আয়।" বলিয়া রাখি, আমার নাম শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী।

দাদার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। একখানি দুইখানি করিয়া প্রাথমিক বহিগুলি শেষ করিলাম। যখন রামায়ণ, মহাভারত আরব্যোপন্যাস পড়িতে লাগিলাম, তখন আমার বয়স নয় বৎসর কি জোর দশ বৎসর।

আমার ঐই দাদাটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গুরুনিন্দা করিতে নাই—কিন্তু বলিতে চাহি না;—ইনি আমার সর্ব্বনাশের জোগাড় করিয়া তুলিয়াছেন। আমার নিতান্ত জোর কপাল, তাই আমি ভাসিয়া গিয়াও ফিরিতে পারিয়াছি।

আমি তখন খুব ছোট ছিলাম—লোকের মুখে গল্প শোনা—দাদা, কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, হঠাৎ একদিন একজন আসিয়া সংবাদ দিল—"তোমাদের চিত্তরঞ্জন (দাদার নাম চিত্তরঞ্জন) ব্রহ্মজ্ঞানী হবে—সমস্ত ঠিক হয়েছে,—এই ১১ই মাঘ তার দীক্ষা।"—এই সংবাদে আমার পিতামাতার মাথায় বজ্রপাত হইল। তাহারা সকলে হাঁ হাঁ করিয়া কলিকাতায় দাদার বাসায় গিয়া পড়িলেন। কান্নাকাটি করিয়া আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া দাদাকে বাড়ীতে আনা হইল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কে দাদাকে পরাজিত করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে একজোড়া অধ্যাপক আমদানী করা হইল। ব্রাহ্মণধর্ম্মদ্বেষী যত কিছু পুস্তক-পুস্তিকা ছিল, সে সব কলিকাতা হইতে আসিল। ক্রমে দাদা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম হইতে না পাইয়া ক্রমে কর্ণেল্ অল্‌কেটের শিষ্য হইয়া পড়িলেন। দাদা বড় বড় নখ রাখিলেন, বড় বড় চুল রাখিলেন মাছ মাংস ছাড়িলেন, আতপ চাউল ধরিলেন;—এমন কি সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া আর জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না। যখন দাদা আমায় লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইলেন, তখন তিনি ঘোর থিয়জফিষ্ট। মনে আছে, বিবাহ করিবার জন্য মা কত সাধ্যসাধনা করিতেন, দাদা বলিতেন—"মহাত্মাগণের ইচ্ছা নয় যে আমি বিবাহ করে সংসারজালে জড়ীভূত হয়ে পড়ি।" গ্রামের যুবকদিগের মধ্যে দাদার একটি ভক্ত-সম্প্রদায় ছিল, তাহারা গোপনে যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইত, হিমালয়ের গুহায় শত সহস্র বৎসর বয়স্ক মহাত্মারা আছেন, তাঁহারা দাদাকে মাঝে মাঝে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন।

দাদার উপর আমার ভক্তি এত বেশী ছিল যে, তিনি বলিলে আমি মরিতে পর্যন্ত পারিতাম। দাদা যখন একান্তে বসিয়া আমাকে পড়াইতেন, তখন মুগ্ধনেত্রে আমি তাঁহার প্রতিভায় সমুজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম। এমন দাদার সহোদরা ভগ্নী আমি—নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। দাদা আমাকে উপদেশ দিতেন, বিশ্বজগৎ মায়ারচনা, সংসার কারাগার, আত্মীয় পরিজনের প্রতি স্নেহভালবাসা জীবের মুক্তির প্রধানতম অন্তরায়। দাদা নিজের উপদেশবাক্য রামায়ণ মহাভারত খুলিয়া সপ্রমাণ করিতেন।

যখন আমি এগারো বৎসর পড়িলাম, তখন দারুণ শোক পাইলাম। ছয় দিনের জ্বরবিকারে বাবা মারা গেলেন;—দুইটি মাসও পোহাইল না, সতীলক্ষ্মী মা-ও তাহার স্বামীর পদানুসরণ করিলেন। দুই মাসের মধ্যে বাপ মা দুই হারানো;—যাহার এমন হইয়াছে সেই জানে। দাদা না থাকিলে কি সেই বয়সে সে শোক আমি সহ্য করিতে পারিতাম! দাদা এই সময়ে আমাকে গীতা পড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত জানিতাম না, তবু শ্লোকগুলি মুখস্থ করিতাম। বাঙ্গলা অনুবাদ পড়িতাম। দাদা টীকা টিপ্পনী করিয়া বুঝাইয় বুঝাইয়া দিতেন। শোকদগ্ধ হৃদয়ে গীতার শ্লোকগুলি যেন অমৃতসিঞ্চন করিত।

যখন বারো বৎসরের হইলাম তখন আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা উঠিল। বড় দাদা মেজ দাদা সপরিবারে বিদেশে থাকিতেন—তাঁহারা ছোটদাদাকে চিঠির উপর চিঠি লিখিতে লাগিলেন—হরির বিবাহের বন্দোবস্ত কর, আর বিলম্ব করিও না।

দাদাকে প্রার্থনা জানাইলাম, আমি বিবাহ করিব না; ধর্ম্মালোচনায় কুমারী-জীবন যাপন করিব।

দাদা না-হঁ-না-হঁ ভাবে কিছুদিন কাটাইলেন। শেষে যখন বড় দাদারা তাঁহাকে কড়া কড়া চিঠি ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন তখন দাদা পাত্র সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। আমাকে বুঝাইলেন, বিবাহ করিলেই যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সর্ব্বনাশ হইয়া যায় তাহার কিছু মানে নাই। বরং সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই বেশী প্রশংসার বিষয়।

দাদা যখন এ কথা বলিলেন, তখন আমি বিশ্বাস করিব না কেন? বলিলাম—"আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"

কয়েকটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া একটা স্থির হইল। পাত্র জামালপুর রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম

করেন। প্রথম পক্ষের বিবাহ বটে;—কিন্তু একটু বয়স হইয়াছে। বৎসর পঁচিশের কম নহে। তিনি স্বয়ং আমাকে দেখিতে আসিবেন লিখিলেন।

কালো গর্ণেটের কোট পরিয়া, সোনার চেন ঝুলাইয়া, বার্নিশ করা জুতা পায়ে দিয়া, টেরি কাটিয়া, সুগন্ধি মাখিয়া, রূপা-বাঁধান ছড়ি হাতে করিয়া তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিলেন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লেখা পড়া করি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই, দ্বিধাও নাই, সঙ্কোচও নাই;—মুখ মাটির দিকে না নামাইয়া তাঁহার পানে নির্ভীক নেত্রপাত করিয়া স্পষ্ট কথায় চট্‌পট সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে বাড়ীর লোকের কাছে আমাকে ভর্ৎসনা শুনিতে হইল। সবাই বলিল—"তোর কি ভয়, লজ্জা কিছুই নেই? লেখা পড়া শিখেছিস্ বলেই কি অমন বাহাদুরী না করলেই নয়?" আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, পাত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা যাহা দিব তাহাতেই রাজি। ফল-কথা আমাকে বিবাহ না করিয়া ছাড়িবেন না।

ভাবিলাম, তা না ছাড়ুন। বিবাহ যখন আমাকে করিতেই হইবে, তখন আর কথা কি। রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলাম।

শ্রীরামপুরের নিকট আমার শ্বশুরবাড়ী। আমার স্বামী একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমি নববধূ,—নববধূর যেরূপ লজ্জা সরম থাকা আবশ্যক, আমার সেরূপ নাই দেখিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিল। শাশুড়ী বলিলেন—"আহা, তা হোক্— ছেলেমানুষ— বুদ্ধি হলেই সব হবে এখন।" আমার সম্বন্ধে কে কি বলিল কে কি না বলিল তাহা আমি গ্রাহ্য করিতাম না, নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম। পড়াশুনার জন্যও কিছু কিছু বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। সপ্তাহকাল ছিলাম। স্বামী আমার মন ভুলাইবার জন্য প্রতিরাত্রেই কিছু-না-কিছু জিনিষ উপহার দিতেন। নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ। আমি লইতাম—কিন্তু মনে মনে হাসিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, পৃথিবী অসার, ইহলোকের সুখ দুঃখ কিছুই সত্য নহে—আমি দুইটা ফুলের তোড়া অথবা দুই শিশি গন্ধ লইয়া কি করিব? তবু লইতাম,—স্বামীর মনে বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? স্বামী আমাকে আদরে সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ঠিক ভাল লাগিত না বলিতে পারি না। জনকজননীর জীবিত কালে আদর সোহাগ আমার প্রচুর পরিমাণেই ছিল, দুই বৎসর যাবৎ আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। স্বামীর আদর শুষ্কহৃদয়ে নববর্ষার জলবিন্দুর মত বোধ হইত। কিন্তু বড় ভয় করিত। নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম, "হে দয়াময় প্রভু, যেন সংসারের মায়াকুহকে ভুলিয়া যাই না, রক্ষা করিও।"—বধূজনোচিত লজ্জার অভাবে অন্যের কাছে নিন্দাভাজন হইতাম বটে, কিন্তু স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন বুঝিতে পারিতাম। একে তিনি একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন—তাহার উপর আবার কাঁচিয়া ছেলেমানুষ সাজিয়া যে কচি খুকীটির মত লজ্জা ভাঙ্গাইতে হইল না, ইহাতে তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সাতদিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আমি পিত্রালয়ে ফিরিলাম। স্বামী আমার সঙ্গে "জোড়ে" আসিলেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে লইয়া কত আমোদ করিল। তাঁহার ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, তিনি দেশে ফিরিলেন। যাত্রা করিবার সময় দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতেছে আমাকে বলিয়া গেলেন—"চিঠি লিখো।" বিবাহের পর প্রায় তিন বৎসর কাল আমি বরাহনগরে রহিলাম। পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে স্বামী আসিতেন।

আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একটা না একটা বিঘ্নবশতঃ হয় নাই; একবার সব ঠিকঠাক;—শেষ মুহূর্ত্তে পত্র আসিল সাহেব তাঁহাকে ছুটি দিল না। আর একবার যাইবার সময় আমার পীড়া উপস্থিত হইল।

আরও একবার
ঐ রকম কি একটা ব্যাঘাত হয়।

এই তিন বৎসরে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। প্রথম দাদার বিবাহ। দ্বিতীয় আমাদের উভয়ের গুরুলাভ।

এই সময়ে দাদা শাস্ত্রচর্চ্চার অবসরে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, সেখানে একজন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী পরম জ্ঞানীপুরুষের দর্শন পাইয়াছেন, সেখানে উপদেশার্থে গমন করেন। দাদা যাহাই শিখুন, ভবিষ্যতে একদিন আমিও তাঁহার সেই বিদ্যার অধিকারিণী হইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইতাম। দাদা সেখানে কি শিখিয়াছিলেন না শিখিয়াছিলেন সে পরিচয়লাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাঁহার উপদেষ্টা স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয়া ভগ্নীটিকে দাদার গলায় বাঁধিয়া দিলেন;—দাদা বিবাহ করিলেন। আত্মীয়-স্বজন ইহাতে সকলেই সুখী। দাদার বয়স তখন প্রায় ত্রিংশবর্ষ। দাদা বলিলেন—"মহাত্মাগণ এত দিনে আমার বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন।" যাহা হউক, বিবাহ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় দাদার আগ্রহ বাড়িল বই কমিল না। যোগাশাস্ত্র সম্বন্ধে নিত্য নূতন গ্রন্থাদি বোম্বাই ও কাশী হইতে আসিতে লাগিল। আমি ক্রমে উপযুক্ত হইতেছি বিবেচনা করিয়া দাদা আমাকেও যোগের দুই চারিটি জিনিষ শিখাইতে লাগিলেন। লেখা পড়া আমি যত শীঘ্র শিখিয়াছিলাম, এগুলি কিন্তু তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। একদিন দাদা রাগ করিয়া বলিলেন—"তোর কর্ম্ম নয়—তোর মন চঞ্চল হয়েছে।"

আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ধরা পড়িতাম। বাস্তবিকই ইদানীং আমার মনে চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে একখানি হাসিমাখা, স্নেহভরা মুখ মনে পড়িয়া দেহমন অবশ করিয়া দিত।

সে দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিলাম আর প্রার্থনা করিলাম—হা জগদীশ, এত শিখিলাম, এত সাধনা করিলাম, আমার সব ব্যর্থ হইবে? ফিরিতে হইবে জানিলে, এ পথে কে পদার্পণ কবিত। আমি কি এখন সব ছাড়িয়া বেশবিন্যাস করিয়া, নাটক পড়িয়া, স্বামীকে প্রণয়-পত্র লিখিয়া দিন কাটাইতে পারিব? বাসুদেব! কুরুক্ষেত্রে তুমি পাণ্ডবদিগকে জয়শ্রী দান করিয়াছিলে, আমার এই মানসক্ষেত্রে আসিয়া বরাভয় মূর্ত্তিতে দর্শন দাও—আমি মোহরূপ দুর্যোধনকে সংহার করি। তুমি জগতের স্বামী—তুমি আমারও স্বামী;—তোমার ভাবনা ছাড়া আর কাহারও ভাবনা আমার মনে যেন প্রকাশ করিতে না পারে।

ইহার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যোগচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলাম। অজপাসাধন, ষট্‌চক্র, নাদ ও মুদ্রার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিল। কিন্তু মনে সেই গুপ্ত চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে কৃতকার্য্য হইলাম না। সে ভাবনাকে যত বলিতাম—আসিও না, তত সে আসিয়া মনের দুয়ারে মাথা কুটাকুটি করিত। তথাপি আমি কিছু কিছু শিখিলাম।

এই সময় একদিন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী দাদার সেই বন্ধু—আপাততঃ শ্যালক স্বীয় গুরুদেবের সঙ্গে আসিয়া দর্শন দিলেন। গুরুদেব উন্নত ললাট গৌরবর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটা ব্রহ্মচর্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসরের কম হইবে না। চক্ষে ও ওষ্ঠাধরে প্রশান্ত হাস্যরেখা দেদীপ্যমান।

তাঁহার সঙ্গে দুই তিন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া দাদা আমাকে বলিলেন—"হরি, আমরা ইঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করি আয়; সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত,—এমন গুরুলাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

উপযুক্ত দিনে আমরা ভাই বোনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। এতদিন, আমি ইষ্টদেবতাবিহীন ছিলাম; ইষ্টদেবতা পাইয়া এইবার সাধনার সুবিধা হইল। ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। পূজার ধূম দেখে কে! কিছুদিন পরে গুরুদেব কলিকাতায় গেলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া সম্মত করিয়া বহুব্যয়ে সাহেববাড়ীতে

তাঁহার ছবি তোলান হইল। সেই ছবি বহুব্যয়ে বাঁধাইয়া দাদা স্বয়ং একখানি রাখিলেন, আমাকে একখানি দিলেন। পূজাকালে সেখানিকেও রীতিমত পূজা করিতাম। বেশ দিন কাটিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে আমার স্বামী দাদাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—ছুটিতে আসিয়া বিজয়াদশমীর দিন আমায় লইয়া যাইবেন। শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া কেমন করিয়া পড়াশুনা হইবে, পূজার্চ্চনাই বা কেমন করিয়া হইবে? বড় ভাবনা হইল। যাহা হউক, ইহার জন্য পূর্ব্বাবধিই প্রস্তুত ছিলাম। ভাবনা যাদশীর্যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশীঃ। তবে আমার বিঘ্নাশঙ্কা কোথায়? নির্দ্দিষ্ট দিনে দাদার চরণে প্রণাম করি। অশ্রুহীন চক্ষে স্বামীর সহিত গাড়ীতে উঠিলাম। দাদাকে অনেক করিয়া বলিয়া গেলাম, যদি গুরুদেব আসেন তবে অবশ্য আমাকে গিয়া লইয়া আসিও।

আমার স্বামী আমাকে লইয়া একেবারে জামালপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্বশ্রুদেবী মিষ্ট কথায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে স্থানে আমাদের বাসা, তাহাকে বৈদ্যপাড়া বলে। জানালা খুলিলে আধ মাইল দূরে পাহাড় দেখা যায়। বৈদ্যপাড়ায় সবই বাঙ্গালী;—শুনিলাম জামালপুরময় সবই বাঙ্গালী। হিন্দুস্থানীর সংখ্যা জামালপুরে মুষ্টিমেয়। হিন্দুস্থানী যত, তাহারা সব জানালপুরেব বাহিরে আশেপাশে পল্লীগ্রামে থাকে। জামালপুরে সমস্তই আফিসের বাবু। নয়টা হইতে চারিটা পর্যন্ত জামালপুর সুদ্ধ বাবু আফিসে আবদ্ধ থাকেন, সুতরাং ঐ সময়ের জন্য জামালপুরটা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন হইলে দল বাঁধিয়া এপাড়া ওপাড়া করাও চলে। এইটি জামালপুরের স্ত্রীসমাজের বিশেষত্ব। বঙ্গদেশেব বাহিরে আর কোথাও স্ত্রীলোকদেব এ সুযোগ নাই। অন্যের পক্ষে ইহা যতই সুবিধাজনক হউক, আমার মহা বিপদ হইল। পাড়াব লোকে দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। আমার সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা হইতে লাগিল, সেগুলা তাহারা আমার অসাক্ষাতে করার শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখাইল না। আমি অসঙ্কোচে সরলভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতাম, প্রতিফলস্বরূপ কেহ আমাকে বেহায়া বলিত, কেহ বলিত দেমাকে, কেহ বলিত কিছু। ক্রমে ক্রমে আমাব বিরক্তি ধরিয়া গেল। আমার পড়াশুনা পূজার্চ্চনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা আসিলেই আমি লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম। হাজার ডাকাডাকি করিলেও উত্তর দিতাম না। তাহারা আমার প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া আমার ঘব ছাড়িয়া যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না, তাহা হইলে ত বাঁচিতাম; কখনও বারান্দায় কখনও উঠানে পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা পাকাইত। তাহারা চলিয়া না গেলে আর আমি বিছানা ছাড়িতাম না। শাশুড়ী মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন—"বাছা, ওরা সব তোমায় দেখতে আসে, তুমি মাথাধরার ভান করে বিছানায় পড়ে থাক, ওঠ না, কথাও কও না, দেখ্‌তে কি সেটা ভাল হয়? ভারি সবাই নিন্দে করে।" মাকে আমি কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম ভাল হয় না ত হয় না, নিন্দা করে ত করুক। এরূপ অলস নিন্দার ভয়ে কি আমি ভীত হইব? তাহা হইলে আমি ঐ শত সহস্র সাধারণ স্ত্রীলোকের সাগরে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া যাই না কেন? তাহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সমস্ত দিন আমার পূজা ও শাস্ত্রচর্চা কিছুই হইত না;—রাত্রে আমাকে সে সব করিতে হইত। রাত্রি দুইটা তিনটা পর্যন্ত জাগিতাম। সুতরাং দিবানিদ্রা ভিন্ন উপায় ছিল না।

প্রতিবেশিনীরা আমার বিরুদ্ধে আমার শাশুড়ীর নিকট নানাপ্রকার অভিযোগ করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। আমি যে তাহাদের সঙ্গে সংস্রব মাত্র রাখিতে স্বীকৃত হইলাম না, ইহাই তাহাদের চক্ষে আমাকে মহা অপরাধে অপরাধিণী করিল। তাহারা যত আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি তত তাহাদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলাম।

নানা কারণে আমি লোকের বিরাগভাজন হইতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ীর নিকট তাহারা শুনিয়াছিল যে আমি সর্ব্বদা পড়াশুনা করি। দুই চারিজন নবীনা, নাটক নভেলের দুরাশায় আমার সঙ্গে ভাব করিল। একজন আসিয়া একদিন বলিল—"বউ তোমার কাছে নাকি সব অনেক ভাল বই আছে, কি কি বই দেখাও না ভাই।"

আমি মনে মনে হাসিয়া বাক্স হইতে দুই চারিখানি বহি বাহির করিয়া দেখাইলাম। বইগুলি সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল—"এই বই তুমি পড়?"

আমি বলিলাম—"পড়বার জন্যেই ত এনেছি।"

"এ যে শাস্ত্র।"

"শাস্ত্র কি পড়তে নেই?"

"পড় ভাই। আমরা মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ।"—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি কি পুরুষমানুষ নাকি?" বলিয়া বহি তুলিয়া রাখিলাম। ঐ যে একটু হাসিলাম, তাহাতেই বোধ হয় সখী মনে করিলেন, আমি তাঁহাকে অপমান করিলাম। যাহা হউক তিনি অভিমানে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার সঙ্গে যাহাদের আলাপ হইত, বারান্তরে দেখা হইলে তাহাদেব সকলকে চিনিতে পারিতাম না। কে অত মনে করিয়া রাখে বাপু! ইহাও আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার করিল। কেহ কেহ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—"তা হোক্ বড় মানুষেব মেয়ে, তাই বলে কি অমনিই করতে হয়? আমি কি ওঁর দ্বারস্থ হতে গিয়েছিলাম যে আমাকে চিনতে পারলেন না?"

এই সকল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আমি আবশ্যক বোধ কবিতাম না। তাহাবাও তিল কে তাল করিয়া আমার শাশুড়ীর মন বিষাক্ত করিয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল।

শাশুড়ী আমায় মাঝে মাঝে একটু আধটু ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল। কিন্তু আমি তাঁহার ভর্ৎসনায় দুঃখিত বা বিরক্ত হইতাম না; বোধ হয় সেই কারণে তাঁহার ক্রোধও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

নিজমুখে নিজদোষের কথা বলিতেছি, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবাব প্রয়োজন নাই। মনেব ভাব যেমন যেমনটি হইয়াছিল, তেমনি বলিয়া যাইতেছি। আমার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া যেন তোমরা আমাকে ভুল বুঝিও না—যেন মনে করিও না যে, আমার ভাবখানা—দেখ দেখি আমি কেমন বাহাদুরী করিয়াছিলাম। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন মনে হইত বুঝি ভারি বীরত্ব কবিতেছি। আমার শাশুড়ী বালবিধবা। চিরদিন পাঁচটার সংসারে খাটিয়া খাটিয়া পরের মন যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কেবল ছেলেটিকে মানুষ কবিবার জন্যই না? সেই ছেলের বউ আসিল—কত সাধের বউ—তিনি মনে ভারি আশা কবিয়াছিলেন, বধূর হাতে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, বসিয়া আপন মনে হরিনাম কবিবেন। বধূ যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পূজা করিবে আর গীতা মুখস্থ কবিবে, আব সমস্ত দিন লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অনেক দিন হইতে প্রথা আছে, ছেলে বিবাহ করিতে যাইবার সময় মা জিজ্ঞাসা কবেন—"বাবা তুমি কোথায় যাইতেছ?" ছেলে বলে—"মা আমি তোমার জন্যে দাসী আনিতে যাইতেছি।" স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় একালের বধূগণের গুণকীর্ত্তন করিবার সময় বলেন যে, ঐ উত্তর পরিবর্ত্তন করিয়া এখন বলা উচিত—"মা তোমাব মুগুর আনিতে যাইতেছি।"—আমার শাশুড়ীর পক্ষে আমি ঠিক মুগুর হই নাই বটে, কিন্তু দাসী যে হই নাই তাহা নিঃসন্দেহ। বরং তিনি দাসীর মত আমার সেবা করিতেন। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কত দিন হয়ত দাই আসে নাই, আমার ছাড়া কাপড় পর্যন্ত মাকে কাচিতে হইয়াছে, আমি কি যে ভাবিতাম, কি অহঙ্কারে যে মত্ত থাকিতাম, তাহা বলিতে পারি না।

শ্বাশুড়ী যে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন, তাহার আর দোষ কি? তিনি যতই ভালমানুষ হউন, রক্তমাংসের শরীর ত বটে।

শুধু শাশুড়ীকে নহে, স্বামীকেও আমি জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম আমার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তিনি হাসিতেন। আমি আসিয়া পূজার জন্য একটা আলাহিদা ঘর দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। অগত্যা আমার শয়ন ঘরের একটি কোণে আসন বিছাইয়া আলো জ্বালিয়া পূজা করিতে বসিতাম। গুরুদেবের বাঁধান ছবিখানি দেবেকে টাঙ্গান থাকিত। প্রথম প্রথম একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। রাত্রে আহারান্তে স্বামী নিকটস্থ মেসের বাসায় গল্প করিতে গিয়াছিলেন। আমি যথাসময়ে শয়নগৃহে গিয়া পূজার আসনে বসিলাম। প্রথমে গুরুদেবের ছবি নামাইয়া পূজা করিলাম। তাহার পর চৈতন্যভাগবত খুলিয়া বসিলাম। এমন সময় স্বামী আসিলেন। আমাব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলাম—"জুতা পায়ে দিয়ে আমার পূজোর এত কাছে আস কেন?"

"আসিলে কেন" না বলিয়া বলিলাম—"আস কেন?"—যেন পাঁচ দিন আসিয়াছেন।

স্বামী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"ওঃ"—বলিয়া জুতা, ছাড়িয়া আসিলেন।

তোমরা আমার স্পর্দ্ধাখানা দেখিলে? তাঁহার সেই জুতা, তাহা লইয়া পূজা না করিয়া, বলিলাম, কি না, জুতা পায়ে দিয়া আমার পূজার অত কাছে আস কেন!

যাহা হউক জুতা ছাড়িয়া আমার স্বামী একটা কি বিছাইয়া আমার কাছে বসিলেন। আমার হাতখানি ধরিয়া সোহাগস্বরে বলিলেন—"আর লেখাপড়া করতে হবে না—চল।"

আমি বলিলাম—"না না, তুমি শোওগে, আমার এখন অনেক কাজ বাকী আছে।"

"যা বাকী আছে তা কাল হবে। আজ ঢেব হয়েছে চল।"

আমি নীরবে ঘাড় নাড়িলাম।

তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা তবে একটা পান এনে দাও।"

আমি বলিলাম—"ঐ টেবিলের উপর ডিবেতে আছে, উঠে নাও না।"

স্বামী বলিলেন—"তুমি দিতে পার না?"

কি করি, উঠিলাম, পান আনিয়া হাতে দিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি আপনি হাতে করে খাব না। তুমি খাইয়ে দাও।"

ভাল বিপদ! হাত এঁটো হইয়া গেল। বামহস্তে করিয়া কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিলাম। আবার চৈতন্যভাগবতে মন দিলাম। স্বামী বসিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম—"তুমি কতক্ষণ বসে থাকবে? আমার অনেক রাত্রি হবে, আফিস থেকে খেটেখুটে এসেছ, যাও শোওগে।"

তিনি বলিলেন—"একলা আমি শোব না। আমি এইখানে শুই"—এই বলিয়া আমার কোলে মাথা দিয়া সটান্ শুইয়া পড়িলেন।

আমি বহি বন্ধ করিলাম। তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। সে দিনের সে মুখ আমি কখনও ভুলিব না। শরতের আকাশে যেমন মেঘ ও বৌদ্র পরস্পরকে শিকার কবিয়া ফিরে তাঁহাব মুখেও তেমনি অভিমান ও কৌতুক পরস্পরকে শিকাব করিয়া ফিবিতেছিল। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা দুর্ব্বলতা আসিল, আমি মুখ নত করিয়া—বুঝিলে?—তোমরা হইলে পারিতে? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই আমি লজ্জা সরমের ধার ধারি না।

সেদিনকার মত পূজাপাঠ বন্ধ করিতে হইল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনুশোচনায় কাটিল। ভাঙ্গাচোরা ছিন্নভিন্ন কতই স্বপ্ন দেখিলাম। একবার যেন দেখিলাম, গুরুদেব ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যেন কঠোরস্বরে বলিলেন—"এই তোর নিষ্ঠা!"

পরদিন প্রাতে জাগিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবার অবধি মনকে দৃঢ় করিব। এমন করিয়া

সংসারের স্নেহ-প্রেমে আকৃষ্ট হইলে চলিবে না। যতটুকু নহিলে নয়, ততটুকু সংসারকে দিব। বাকী সব শাস্ত্রের ও দেবতার।

তারপর হইতে স্বামী ডাকিতে আসিলে আর অমন গলিয়া যাইতাম না। প্রায়ই দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতাম। কতদিন নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়াছেন আর আমি গীতার গূঢ়ার্থ বুঝিতে প্রাণপাত করিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমায় কিন্তু একটি দিনও একটি উচ্চ কথা বলেন নাই। আমার জন্য বন্ধুসমাজেও তাঁহাকে বিদ্রূপ সহিতে হইত কি কম? কেহ বলিতে—"ওহে, স্ত্রীকে গুরু করে মন্তোর নাও।" কেহ বলিত—"তোমার ভাবনা কিহে! রোজ একটু একটু করে স্ত্রীর চরণামৃত খেও—শরীর নীরোগ হবে। কেহ বলিত—"ওহে, আফিসে বেরুবার সময় তোমার পুণ্যবতী স্ত্রীকে প্রণাম করে বেরিও, কাজে ভুলচুক হবে না। চাই কি হঠাৎ পাঁচজনকে ডিঙ্গিয়ে প্রোমোশনও পেয়ে যেতে পার।"

ছয় মাস আমি শ্বশুরবাড়ীতে রহিলাম, ছয় মাসে শাশুড়ীকে ও স্বামীকে তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিলাম। ইদানিং স্বামী দারুণ অভিমানে আর আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। লোকে আমার শাশুড়ীকে বলিতে লাগিল, "ও বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।" সেখানে গিয়ে ও আপনার পূজো অর্চ্চনা করুক, তুমি ছেলের আবার বিয়ে দাও।" মা প্রথম প্রথম সে কথা কানে তুলিতেন না। কিন্তু আমি পাড়ায় যাহাকে তাহাকে বলিতে লাগিলাম, আমার স্বামী স্বচ্ছন্দে পুনর্ব্বার বিবাহ করুন, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যথাকালে তাহারা এ কথা আমার শাশুড়ীর কানে তুলিল। তিনি তাঁহার ছেলের শুষ্কমুখ দেখিয়া, পরামর্শদায়িনীদের মতে মত দিলেন। মধ্যে মধ্যে মাতা পুত্রে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল দেখিলাম। সব বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কিছুই দুঃখ হইল না। স্বামীকে আমার সাধনার বিঘ্নস্বরূপ মনে হইত। তিনি যেন আমার মূর্ত্তিমান প্রলোভন—আমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার জন্য সংসার সুখের নিষিদ্ধ ফল হাতে করিয়া আহ্বান করিতেছেন। ভাবিলাম, করুন না বিবাহ, করিয়া সুখী হউন, আমি উঁহার পথের কণ্টক, উনিও আমার বিঘ্ন। আমি দাদার কাছে চলিয়া যাইব। চিরজীবন দুই ভাই বোনে আপনাদের সাধন ভজন লইয়া থাকিব।

একদিন রবিবারে ও ঘরে বসিয়া মাতাপুত্রে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আমি বাহির দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ আমার কানে গেল—আমার স্বামী বলিতেছেন—"শেষকালে যদি ও আবার খোরপোষের দাবী করে—আমার এই ত অবস্থা কোথা থেকে দু দুটো স্ত্রীকে প্রতিপালন করি?" বলিয়া স্বামী চুপ করিলেন, শাশুড়ীও নীরব হইলেন। এ কথা কি কথাবার্ত্তার উপসংহার তাহা আমি বুঝিলাম। একটু যেন আনন্দ হইল। ভাবিলাম স্বামীর যাহার বাধা আমি স্বহস্তে ছিন্ন করিব। রীতিমত দলিল লেখাপড়া করিয়া দিব যে, আমি স্বামী চাহি না, স্বতঃ কিংবা পরতঃ কখনও তাঁহার নিকট ভরণপোষণের দাবী করিব না। স্বামীতে আমার সমস্ত অধিকার আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলাম। তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারী হউন।

কালামুখী আমি—আনন্দে গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। পার্থ যখন কুরুক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে, আমার সেইরূপ আনন্দ হইল। আমি যেন মোহ-প্রলোভনাদির বিরুদ্ধে মানসিক মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিলাম। মনে হইল, যেন আমার গুরুদেব, আমার ইষ্টদেব আমার পানে প্রসন্ন হাস্যমুখে চাহিয়া রহিয়াছেন।

আমার সে দুর্ব্বুদ্ধির কথা আনুপূর্ব্বিক লিখিতে লজ্জা করিতেছে। তোমরা আমায় যদি ক্ষমা কর, তবে এই স্থানটা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া যাই। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলাম। দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিলাম। টেলিগ্রাফ করিয়া দাদাকে আনাইলাম।

আমার এরূপ আচরণের পর আমার প্রতি আমার স্বামীর মনের ভাব কিরূপ হইল বল দেখি?—অন্য স্বামী হইলে আর অতঃপর আমার মুখদর্শন করিতেন না। কিন্তু আমার স্বামী আমায় কত বুঝাইলেন—বলিলেন—"হরি! এখনও মতি পরিবর্ত্তন কর। বড় ভুল করছ।"

আমি তখন ভাবে মত্ত। তাঁহার এই অনন্যসুলভ সহৃদয় উদারতা আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যাইবার সময় তিনি বলিয়া দিলেন—"বলে রাখছি, যদি কখনও বিপদে পড় তবে আমাকে সংবাদ দিতে সঙ্কোচ করো না।"

দাদার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তাঁহার নিকট কৃতকার্য্যের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা ও উৎসাহ পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। তিনি যেন কিছু অপ্রসন্ন। গাড়ীতে যতক্ষণ দুইজনে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"হরি! কাজটা ভাল করলে না।"

শুনিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। দাদার মুখে এই কথা? কিন্তু কে আমায় এ পথের পথিক করিল? লক্ষকোটি বঙ্গরমণীর জীবনের স্রোত যে পথে প্রবাহিত, আমার জীবনের স্রোত সে পথে বহিতে দিল না কে. তিনি আমার জীবনে হস্তক্ষেপ না করিলে, এই ভর্ৎসনার সুযোগ ত পাইতেন না!

আমার চোখে জল দেখিয়া দাদা আমায় সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ কবিলেন। যে উৎসাহের কথা আশা করিয়াছিলাম, তাহা দিয়া আমাকে সুস্থ করিলেন। ভবিষ্যতে আমরা কোন্ পথে চলিব, কি কবিব, কি পড়িব, এই সমস্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া আর প্রাণে মধুবৃষ্টি করিলেন।

বাড়ী আসিয়া রীতিমত পূজার্চ্চনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমটা দাদাও খুব উৎসাহ দেখাইলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সে উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিত। আমি যেমন সমানে ছুটিতাম, তিনি তেমন পারিতেম না। তিনি যেন খানিক ছুটিতেন, খানিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। আমার কথা স্বতন্ত্র;—আমি এখন স্বাধীন জীবন যাপন ক[illegible]তেছিলাম, আমাব স্বামী নাই, কোনও বন্ধনও নাই, আমি বনবিহঙ্গীর মত যেমন দ্রুত উ[illegible]তেছিলাম, দাদা তেমন পারিবেন কেন? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ কবিয়া। এক টু ছুটিয়াই হাঁফাইয়া পড়িতেন। আমি একদিন সুযোগ দেখিয়া বলিলাম,—"দাদা। তোমাব কর্ম্ম নয়, তোমার মন চঞ্চল হয়েছে।"

তোমরা বুঝিতে পারিলে ত, আমি কেমন মজার প্রতিশোধটি লইলাম? দাদাও একদিন আমাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। সে দিন আমার সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়াছিল। দাদার মুখে চক্ষে সে ভাবেব লেশমাত্র না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যেন ভাবটা, এ আপদ চুকলেই বাঁচি। হায় মহাত্মাগণ। কেন তোমরা দাদাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলে?

ছোটবউ শুধু দাদার বিঘ্ন জন্মাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, সুযোগ পাইলেই আমারও পথরোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। দাদাব পৃষ্ঠে আরোহণ কবিয়া তাঁহার গতির খর্ব্বরতা করিয়াছিলেন, আমাকে নিকটে পাইলেন, যথাস্থানে বসিয়া আমার পৃষ্ঠে চাবুক হাঁকাইতেন। উপমার খাতিরে কথাটা যেমন লঘুভাবে বলিলাম, তাহা নয়। পরের মুখে অনেক কথা শুনিতে পাইতাম;—একদিন স্বকর্ণে শুনিলাম—তাঁহার একটি প্রিয় সখীকে বলিতেছেন—"এমন ত কখন সাতজন্মেও শুনিনি।"

ছোটবউয়ের সখী বলিলেন—"আমার ত বিশ্বাস হয় না ভাই যে ও ইচ্ছে করে স্বামী ত্যাগ করে এসেছে। বোধ করি স্বভাব চরিত্র দেখে স্বামী দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে।"

বলা বাহুল্য এ কথা আমি কানে তুলিলাম না; কিন্তু একদিন আরও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অশ্রাব্য কথা শুনিলাম। সে দিন আমার সহনাতীত হইল।

তাহার পর গুরুদেব দর্শন দিলেন। তিনি আমার স্বামীগৃহত্যাগের কথা শুনিয়াছিলেন।

বলিলেন—"মা, তুমি যে জীবন নির্বাচন করিলে, তাহা একান্ত কঠিন। এ সমুদ্রে যখন ডুব দিলে, তখন গভীরতর গভীরতম প্রদেশে নামিতে হইবে, নহিলে রত্ন মিলিবে না। শুধু শিকারার্থী হাঙ্গর-কুম্ভীরের দংশনে প্রাণান্ত হইবে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদ।"

তিনি আমাদের বাড়ীতে রহিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে শিখাইবার ভার লইলেন। বলিতে ভুলিয়াছি কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সমস্ত দিন এত পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিলাম যে কলেজের আসন্ন-পরীক্ষা-ভীত ছেলেরাও তত পারে না। গুরুদেব আমাকে অধ্যাপনা করিতে করিতে আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। দাদার কাছে আমার প্রশংসা আর তাঁহার ফুরাইত না।

কিন্তু ছোটবউ আমার উপর বড় উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আমার অদৃষ্টটা বড় মন্দ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিলাম, যেখানেই যাইব, সেইখানেই পরিবারে ঘোর অশান্তির ঝড় বহিবে। দাদা ভালমানুষ, বধূর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না। বধূ তাঁহাকে কি মন্ত্রে কি ঔষধিতে বশীভূত করিয়াছিল বলিতে পারি না—যেন তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দাদার আচরণ দেখিয়া মনে মনে ভারি ঘৃণা হইত; তাঁহার উপর সেই পূর্ব্বেকার ভক্তি আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে আমার পড়াশুনা পূজাচর্চ্চনার বিশেষ ব্যাঘাত হইতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"বিপদের কাণ্ডারী হরি, আমার কি দুই কূল যাইবে!"

একদিন গুরুদেব আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন—"দেখ, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির বড়ই বিঘ্ন হইতেছে। এ অবস্থায় সংসারশ্রমে থাকাও ঠিক নয়। আমি বলি কি আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল। জব্বলপুরের নিকট পাহাড়ে নর্ম্মদা নদীব তীরে আমার কুটীর আছে। সেখানে তোমাকে কন্যাবৎ পালন করিব, শিক্ষা দীক্ষার পরম সুযোগ হইবে।"

আমি সম্মত হইলাম। একদিন গভীর রাত্রে, ঋষিতুল্য পিতৃতুল্য গুরুদেবের হস্তধারণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলাম। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই, গুরুদেবের নিষেধ ছিল। গুরুদেব স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সব কথা জানাইয়া শয্যাব উপর রাখিয়া গেলেন।

অনেক পথ চলিয়া রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্যন্ত মনুষ্যবাস দৃষ্টি হইল না। একটা বিপুলদেহ বটবৃক্ষ ছিল, তাহার মূলে বসিয়া দুইজনে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার পোঁটলা হইতে সন্ন্যাসির উপযোগী গৈরিক বস্ত্রাদি বাহির করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাছা, তুমি এইগুলি পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীবেশ ধারণ কর, নহিলে পথে বিপদ ঘটিতে পারে।"

বলিয়া তিনি আড়ালে সরিয়া গেলেন। আমি বেশ পরিবর্তন করিয়া সন্ন্যাসী-পুরুষ সাজিলাম। পথে পদার্পণ করিয়াই এই ছলনা! মনটা যেন বিমর্ষ হইল; কিন্তু গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, তখন আর কথা কি?

গুরুদেব শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে আমার পরিত্যাগ বস্ত্রাদি ভস্মীভূত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কাঁচি দিয়া আমার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। গায়ে মাথায় বিভূতি মাখিলাম। সেই বেশ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার মা যদি আসিয়া আমাকে দেখিতেন তাহা হইলে তিনিও চিনিতে পারিতেন না।

সমস্ত দিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার পূর্বে একস্থানে আসিয়া রেল পাইলাম। রেলে চড়িয়া তৃতীয় দিনে কাশীধামে পৌঁছিলাম।

কাশীতে পাঁচ সাত দিন কাটিল। সমস্ত দিবাভাগ ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কত আনন্দ।

কাশী হইতে প্রয়াগ। প্রয়াগেও কয়েক দিন কাটিল। প্রয়াগ হইতে জব্বলপুরে গমন করিলাম।

জব্বলপুরে নামিয়া গুরুদেবের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কি সুন্দর পার্বতীয় দৃশ্য। কোথাও কোথাও জঙ্গল। দুই একটা বন্যজন্তু বাহির হইয়া চকিতের মধ্যে আবার বনে প্রবেশ করিতেছে। আমি তৎপূর্বে আর কখনও পর্ব্বতারোহণ করি নাই। পর্ব্বতারোহণ করিতে অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কলনাদিনী নৃত্যপরা নর্ম্মদার তীরে গুরুদেবের আশ্রম গৃহ। সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকটি মহাবলী শালতরু দণ্ডায়মান। পাথরের গাঁথা তিনটি শ্রীহীন কক্ষ। পাহাড়ীরা আসিয়া গুরুদেবকে ও আমাকে ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। আমি নীরব রহিলাম, গুরুদেব সস্মিতমুখে আশীর্ব্বচন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা তৃণসংগ্রহ করিয়া আনিল। দুইটি কক্ষে আমরা দুইটি শয্যা প্রস্তুত করিলাম। কেহ কেহ বনজাত ফলমূল আনিয়া দিল। একজনকে পল্লী হইতে তণ্ডুলাদি কিনিয়া আনিতে পাঠান গেল।

কয়েকদিন পড়াশুনা পূজার্চ্চনা বেশ চলিল। চারিদিকে যেন শান্তির রাজ্য, কোলাহল নাই, সংসারের শতপ্রকার বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই। সাধন ভজনেব পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান বটে। কিন্তু এইবার আমি এই আখ্যায়িকার পরম সঙ্কটস্থানে আসিয়াছি। আমার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে কেমন করিয়া ফিরিল, এইবার তাহাই বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এখন মনে হইতেছে বটে, যাহা হইয়াছিল তাহা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু তখন স্বর্গ আর মর্ত্ত্য, রসাতলের মত অন্ধকার ও ভুজঙ্গমসঙ্কুল মনে হইয়াছিল। আমি ফিরিলাম, কিন্তু কি নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া ফিরিলাম। স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি কল্পনায় যে পুণ্যময় প্রভাময় স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, একদিন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিয়া গেল। যে গুরুকে দেবতাজ্ঞানে এতদিন পূজা করিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার ভিতর হইতে পাপের ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

তোমরা স্তম্ভিত হইয়াছ? স্তম্ভিত হইবার কথা বটে। মানুষকে কখনও বিশ্বাস কবিও না। যে যত বড় জ্ঞানী, যত বড় ধার্ম্মিক, যত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হউক, বিশ্বাস করিও না। পুরাণে যে মহা ঋষি তপস্বীর পদস্খলনের বর্ণনা আছে, তাহার এক কণিকামাত্র অতিরঞ্জন নহে। যখন আমার পিত্রালয়ে গুরুদেব সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া আমার অন্তরে জ্ঞানমৃত সঞ্চার করিতেন, আমি কি জানিতাম যে, আমি ততক্ষণ অজ্ঞাতসাবে তাঁহাব হৃদয়ে কুবাসনার বিষকীটের সঞ্চার করিতেছি? তিনি যখন আমাকে বলিলেন— "বৎসে, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির ব্যাঘাত হইতেছে, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল", তখন যদি তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে, সুপ্তিভঙ্গে শয্যাশিয়রে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, আমি কি সেইরূপ চমকিত হইতাম না? আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি; আমার যাহা হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অবস্থাটা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। সারাজীবনের তপস্যা তিনি আমাব পায়ে ঢালিয়া দিলেন! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তাঁহার এই দুর্দ্দশার জন্য আমিই আংশিকরূপে দায়ী কি না; আমার কি দোষ? আমি কিসের জন্য দায়ী হইব?

কিন্তু হয়ত আমি তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছি। গুরু স্বভাবতঃ নীচ বা কুপ্রবৃত্তিশালী নহেন, আমি তাঁহার শতসহস্র প্রমাণ পাইয়াছি। হয়ত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। ঘটনাক্রমে মুহূর্ত্তের প্রলোভনে তিনি হয়ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতেও ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। শুনিতে পাই তিনি সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার সন্ন্যাসীবেশকে ভণ্ডামি জ্ঞান করিয়া তাহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন নাকি বাহ্যাড়ম্বরহীন সাধুতার জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

আর একবার তোমাদের নিকট আমাকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইল। সে ঘটনাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। শুধু তাঁহার পরিণাম মাত্র বলি। একদিন

গভীর রাত্রে যে গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে অপসৃত হইয়াছিলাম, সেই জব্বলপুরের পাহাড়ে আর একদিন গভীর রাত্রে—গুরুদেব আর বলিব না—সেই গুরুদানবকে গর্ব্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া স্বীয় অমূল্য সতীত্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার ভুল ভাঙ্গিল।

তৃতীয় দিন রাত্রি দুইটার সময় জামালপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখনও আমার অঙ্গে সেই পূর্ব্বধৃত সন্ন্যাসীপুরুষের বেশ।

রাত্রি আছে দেখিয়া আমি মোসাফিরখানায় বসিয়া রহিলাম। আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই জামালপুর ষ্টেশনে দাদার সঙ্গে গাড়ীতে উঠি। তাহার পর হইতে আর স্বামীর কোনও সংবাদ পাই নাই। তিনিও আমার কোনও সংবাদ লন নাই—যদি গোপনে লইয়া থাকেন তবে আমি জানি না। এত দিন কি আর তিনি বিবাহ করেন নাই? বিবাহ না করিলেও আমাকে যে গ্রহণ করিবেন, তাহার কি সম্ভাবনা আছে? তিনি কি আমাব নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিবেন? তিনি যদি করেন, তবে আমার শাশুড়ী বিশ্বাস করিবেন কেন? যদি শাশুড়ীও বিশ্বাস করেন, তবে পাঁচজনে বিশ্বাস করিবে কেন? এই পাঁচজনের জন্যই ত রামচন্দ্র সতীকুলের আরাধ্যা দেবী সীতাসুন্দরীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তবে কি আমি তাঁহার সংসারের দাসী হইয়া থাকিতে পাইব না? না হয় আত্মপরিচয় দিব না। আর একবার বনে যাইব। বনে গিয়া এ পোড়ামুখ আগুন দিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিব। ক্ষত শুষ্ক হইলে আমার মুখ বিকৃত হইবে; কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তখন আসিয়া স্বামীর সংসারে দাসী হইব। যদি না রাখেন?—আমি বলিব, "আমি অর্থ চাহি না, শুধু একবেলা দুইটি খাইতে দিও। আমি ভিখারিণী, আমায় দয়া কর।" ইহাতেও কি দয়া হইবে না? আমাব স্বামীর দয়ার শরীর। আমার শাশুড়ীরও সেইরূপ।—আর যদি দেখি বিবাহ করেন নাই? ছদ্মবেশে থাকিয়া কৌশলে মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশ করিব। তাহার পর কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। দাদার বাড়ী আর ফিরিব না। বউ পোড়ারমুখী বাঁচিয়া থাকিতে নয়। কোনও উপায় না হয়, মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইব। সে ত আর কেহ রোধ করিতে পারিবে না!

ফর্সা হইল। আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ষ্টেশন ছাড়িলাম। বৈদ্যপাড়ায় সদর রাস্তার ধারেই আমাদেব বাড়ী। চিনিয়া চিনিয়া গেলাম। বাড়ীর বাহিরেই দুইটা ঘোড়ানিমের গাছ ছিল, বাড়ী চিনিতে কষ্ট হইল না। কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম, সদর দরজা খোলা; একটা হিন্দুস্থানী ছেলে, পিতলের ঘড়া মাথায় করিয়া বাহির হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার শ্বশ্রুদেবী নামাবলী গায়ে জড়াইয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা, বুঝিলাম মা ভোরের গাড়ীতে মুঙ্গেরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।

মা দৃষ্টিপথের বাহির হইলে, সাহসে ভর করিয়া বাড়ী ঢুকিলাম। শরীর কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কই, কোথাও ত নোলকপরা একটি নববধূ দেখিতে পাইলাম না। স্বামী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইতেছেন। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। হায়, আমার কপালে এতও ছিল। আমি মনে মনে তাঁহার পায়ে সহস্রবার মাথা খুঁড়িলাম।

তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে কৌতূহলপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাহিতেছিলেন। আমি সাবধানে চাপা গলায় বিকৃত স্বরে কহিতে লাগিলাম। স্ত্রী এখানে নাই কেন কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার উত্তর পাইলাম না, চাপিয়া গেলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তায় জানিলাম, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার চক্ষুর কোণে করুণার জলরেখা দেখা দিল;—বুঝিলাম এ পোড়ারমুখীকে এখনও

ভুলেন নাই। কতবার মনে করিলাম, আত্মপ্রকাশ করি কিন্তু পারিলাম না। ভাবিলাম শাশুড়ী আসুন তাহার পর যাহা হয় হইবে।

স্বামী স্নান করিয়া পাশের মেসের বাসায় আহার করিয়া, আফিসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা দশটার গাড়ীতে মা ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর সেবাদি সম্বন্ধে মাকে গোপনে কিছু বলিয়া স্বামী আফিসযাত্রা করিলেন। একে পূর্ণিমা—পুণ্যাহ;—বাড়ীতে সন্ন্যাসীকে অতিথি লাভ করিয়া মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

এই সময় দাই চলিয়া গেল। বাড়ী নির্জ্জন হইল। আমি বুঝিলাম এই শুভ সুযোগ উপস্থিত। বলিলাম, "স্নান করিব, তোমাদেব একখানা কাপড় দাও।"

স্নানান্তে সেই কাপড়খানিকে শাড়ীর মত করিয়া পরিলাম। ঘোমটা দিয়া স্নানের স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া থাকিবেন—ঘোমটার ভিতব হইতে তাঁহাব মুখ আমি দেখি নাই। শুধু পা দুখানি দেখিতে পাইতেছিলাম—টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম।

মা বলিয়া উঠিলেন,—"ওমা, ওমা, ওমা—সন্ন্যাসী না পাগল?"—বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আমাব অবগুণ্ঠন অপসৃত করিলেন। চোখাচোখী হইবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন—রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন—"একি! বউমা!"

কেমন করিয়া তাঁহাব পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলাম, তাহা আর বিস্তাবিত বলিবাব প্রয়োজন নাই। প্রথমে বিস্ময়ে তাঁহাব মুখে কথা বাহিব হইল না। তাহাব পব আমাব সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বুকে টানিয়া লইযা স্নেহভরে বাবম্বার আমাব মুখচুম্বন কবিলেন। শেষে বলিলেন—"বাছা, ছেলে বাড়ী আসুক, নইলে আমি কিছুই বলতে পারছিনে।"

বলিলেন, গুরুর সঙ্গে আমাব পিতৃগৃহত্যাগেব সংবাদমাত্র তাঁহারা পান নাই।—সুতবাং "পাঁচজন" সম্বন্ধে আর কোনও আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু তথাপি বাড়ীতে লোকজন আসিয়া পাছে আমায় দেখিযা ফেলে, পাছে কিছু সন্দেহ কবে, সেইজন্য তিনি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

শাশুড়ী ক্ষমা কবিলেন,—স্বামীর সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর্সি চিরুণী লইয়া সমস্তদিন স্বল্পবিশিষ্ট চুলের জটা ছাড়াইলাম। দুইখানা চিরুণী ছিল, দুইখানারই প্রায় সব ক'টা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। সেই পূর্ণিমারজনীতে স্বামীর সঙ্গে আমার সুখসম্মিলন হইল। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমা কবিতে পারিয়া থাক, তবে এইবার আমার কল্যাণে শাঁখ বাজাইয়া দাও।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬]

কুড়ানো মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ।। বেহাই বাড়ী

অপরাহ্ন কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থমূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকালের ভাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি লাঠিখানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ী মাঝির খোরাকীর জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভরবে?"

"সে কিরে চার আনা কি অল্প হল?"

"ঠাকুর চার সের চাউল কিনতেই ত চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, নুন তেল আছে—"

"নে নে—আর দু গণ্ডা পয়সা নে।" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গুণিয়া আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পুরোপুরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে মাঝিকে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি করতে এসেছ, বলিস্ আমাদের ঠাকুরমশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নূতন লোকটির পানে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। সকালবেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্ব্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁহার কৃপণতাখ্যাতি বহুদূর ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাই বাড়ী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বৎসরখানেক হইবে তাঁহার বধূমাতা সন্তানসম্ভাবনাবশতঃ পিতৃগৃহে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাঁচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়ে রাখিয়া বধূটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসববেশ পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্কী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা, বিশেষ নহে, একটু যেন বিষন্ন হইল।

বৈবাহিকের বাটী পৌঁছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্রে বসুধারার সপ্তরেখা আজিও বিদ্যমান। মনে হইল, পুত্রের বিবাহান্তে এই কক্ষে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের সমকালে তাঁহার বৈবাহিক হৃষীকেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চালানের ব্যবসায় করেন। পাঁচ বৎসরকাল উপর্য্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন শুধু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বসুধারার চিহ্নগুলি যে বহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চুন পড়ে নাই, সামান্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে চাহিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, বুড়া নিশ্চয়ই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে

গিয়া নিশ্চয়ই সেও দুটান টানিয়া লইবে। বেচারী নূতন তামাক খাইতে শিখিয়াছিল, ধূমপিপাসাটা তখন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্রই বলিলেন—"ওহে বাবুকে একবার খবর দাও, নগাঁয়ের সীতানাথ মুখুয্যে এসেছেন।"

আশাহত বালক এ অনুরোধ বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল। গম্ভীরভাবে কাস্তেখানি বেড়ার গায়ে ঝুলাইল। দড়ির তালটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল জায়গায় রাখিল। তাহার পর অপ্রসন্নমুখে মন্থরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হৃষীকেশ আধময়লা ধুতি পরিয়া, একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া, বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থূলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষু কোটরাগত। দুইজনে নমস্কারের আদান-প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা হইল। হৃষীকেশের চক্ষু ছলছল, গোটাকত বড় বড় জলবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রে পতিত হইল।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ধূমপান করিলেন, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সে ত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল? মেয়েটিকে একবার আন দেখি।"

হৃষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। পশ্চাতে ঝি, তাহার কোলে ফরাসী ছিটে দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুকন্যা। সে হাসিতেছে না, কাঁদিতেছে না, নিতান্ত নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মুখ দেখিবার জন্য নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটা টাকা বাহির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসন্তুষ্টের মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বলা বাহুল্য, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নব্যবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে, পাড়ার লোকে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না। সুতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন? সে ভাবিল "মর মিনসে, এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি—আহা, তাতে আবার মা-মরা,—একটু সোনা জুটল না মুখ দেখতে।"

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, 'ওগো মা আমার কোথায় গেলিগো' বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত শোকার্ণবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। হৃষীকেশের চক্ষু হইতেও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সীতানাথ মূঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি করলে?"

কান্না থামিলে সীতানাথ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন। তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিয়া ধরিয়া থাকিল। যে কাজের জন্য এতখানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—"দূর হোক্ গে, কাল সকালেই বলব, রাত্রিটা কোন মতে কাটিয়া দিই।

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল। হৃষীকেশ রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকথিত ভৃত্যবালক একপাশে কম্বল পাতিয়া শুইল।

দুশ্চিন্তায় সমস্তরাত্রি ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি হইবে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়াই রাত্রি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইল। রাত্রি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্য আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুর সব ফুরিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকী তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।। কার্য্যোদ্ধার

সকাল হইলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূমপান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সূচনাটা এইরূপ হইল।—

'বেয়াই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের যা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডন করবে বল? আমার আর চারটি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত গুণের বউকে গিন্নী দেখে যেতে পাননি, সেই দুঃখই চিরকাল থাকবে। মার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। তাঁর গুণে পশুপক্ষী পর্যন্ত বশ হয়েছিল। বাড়ীতে বাঙী বলে একটা গাই আছে, এমনি বজ্জাৎ তার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারে না, শিঙ পেতে গুঁতোতে আসে, কেবল ছোট বউমা কাছে গেলে সে কিছু বলত না। জায়ে জায়ে ঝগড়া কলহ এ ত চিরদিন সকল সংসারে চলে আসছে, কিন্তু আমার অন্য বউরা ছোট বউমাকে নিজেদের সহোদরা ভগ্নীর মত মনে করতেন। দুঃসংবাদটা শুনে বড় বউমা একবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি জলস্পর্শ করেন নি। আজও বলেন, আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হত না।"

হৃষীকেশ চক্ষুর জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বেয়াই মশাই, থাক আর সে সব কথা কয়ে ফল কি অন্য কথা বলুন।"

সীতানাথ চুপ করিলেন। তাঁহার ভূমিকাই তাঁহাকে মাটি করিয়া দিল। নীরবে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আবার এ কথা সে কথা পাঁচ কথায় কাটিল। এবার সীতানাথ নিজের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া, ভূমিকামাত্র বর্জ্জন করিয়া, কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। শুনিতে এমন কাঠখোট্টা রকম ঠেকিল যে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

কথাটা আর কিছুই নয় বধূমাতার অলঙ্কারগুলির কথা। তাহাই বৃদ্ধ আদায় করিতে আসিয়াছেন।

প্রস্তাবটা শুনিয়া হৃষীকেশ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বৈবাহিকের আগমনসংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।—আর, এত জানা কথা। তবু তাঁহার মনে এক একবার দুরাশা উপস্থিত হইল, গহনাগুলি আটকাইবেন, দিবেন না। নাতিনীটি যদি বাঁচে—কুলীনের ঘরের মেয়ে, বাঁচিবারই ষোল আনা সম্ভাবনা—তবে তাঁহারই ঘাড়ে পড়িল। ঐ অলঙ্কারগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়া তিনি যখন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার ছেলেগুলাও কেহ মানুষের মত হয় নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে, কি করিয়া যে তাহারা সংসার চালাইবে, তাহাই তিনি মাঝে মাঝে ভাবিয়া আকুল হইতেন। এই সব ন পাঁচ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অলঙ্কারগুলি রাখিবার দুরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ অশুভস্য কালহরণং, যত বিলম্ব হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। বলিলেন—"মুখুয্যে মশাই, সেই জিনিষগুলি আপনারই। যখন একবার আপনার পুত্রকে দান করেছি,

তখন আর তার একরতি মাত্রও ফিরে নেব না। তবে কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আপাততঃ আপনাকে দিতে পারছিনে।"

শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। ভাবিলেন, বুঝি বেহাই অলঙ্কারগুলি কোথাও বন্ধক দিয়াছে। তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ। বলিলেন—"কেন, এখন দিতে বাধা কি?"

হৃষীকেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এই সদ্য শোকটা পাওয়া গিয়েছে, এখনও ছ মাস হয়নি। আর কিছু দিন যেতে দিন। বাক্স থেকে সে অলঙ্কার এখন বের করে কে বলুন? মেয়েদের কোথায় কি থাকে কোথায় কি না থাকে, আমি ত কিছুই জানিনে। গিন্নী সে কালরাত্রির পর থেকে সে ঘরেই আর ঢোকেন নি। তাঁর বড় আদরের শেষ মেয়েটি, কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে। তার ঘরে পদার্পণ করেন না, তার কোন জিনিষটি ছুঁতে হলে কেঁদে আকুল হন। এমন অবস্থায় কি করে তাঁকে বলি, তোমার মেয়ের বাক্স খুলে গহনাগুলি বের করে দাও। শোকটা এখন বড্ড নতুন, কিছু দিন আর যেতে দিন।"

গহনা দেওয়ার বাধাস্বরূপ হৃষীকেশ কারণ যাহা দেখাইলেন, তাহা নিতান্তই সত্য;—তবে সকলের কাছে এ কারণ যথেষ্ট বলিয়া মনে না হইতে পারে। সীতানাথেরও মনে হইল না। একটু রাগ হইল। বলিলেন—

"ভাই, শোক আমারই কি লাগেনি? তবে কি করব? সংসার করতে গেলে শোক তাপ ত আছেই। এ থেকে কেউ নিস্তার পেলে এমন ত দেখলাম না—তা সে রাজাই বল, বাদ্‌শাই বল, আর পথের ভিখারীই বল। তবু সংসারী লোককে দুদিনে তা ভুলে গিয়ে, খেতে হয়, শুতে হয়, হাসতে হয়, সংসার ধর্ম্মের সবই করতে হয়। তা তাঁর যদি অত শোকই হয়ে থাকে, তবে তুমিই না হয় চাবিটা খুলে আনগে না।"

হৃষীকেশ আবার কিছুক্ষণ মৌনভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া সীতানাথ একবার তাগাদা করিলেন। তখনও হৃষীকেশ গহনাগুলি রাখিবার আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একটু কাতর ভাবে বলিলেন—"বেয়াই মশায, একটা বৎসর যেতে দিন। তখন এসে গহনাগুলি নিয়ে যাবেন। যদি আজ্ঞা করেন ত আমিই মাথায় করে সেগুলি আপনার বাড়ী পৌঁছে দেব।"

সীতানাথই রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"মানুষের শরীর—পদ্মপত্রের জল। আজ আছে কাল নেই। এক দণ্ডের কথা বলা যায় না, এক বৎসর যদি আমি না বাঁচি?"

হৃষীকেশ মনে মনে বলিলেন—"না বাঁচ ত ঐ গহনাতে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করা যাবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা হলে আপনার গহনা আমাদেরই কাছে থাকবে। ঐ গহনা দিয়ে আপনার পৌত্রীর বিবাহ দেব।"

সীতানাথ শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"তুমি কি মনে করেছ আমার নাত্‌নী চিরদিনই তোমার ঘরে থাকবে? একটু বড় হলেই ওকে আমি নিয়ে যাব। বড় বউমা মেয়েটিকে দেখবার জন্যে পাগল। আসবার সময় আমাকে বললেন—বাবা আমিও তোমার সঙ্গে যাব? খুকিকে দেখে আসব? বিবাহের কথা বলছ, তা ভাই আমাদের এমন কপাল কি হবে? ঐ মেয়ে কি বাঁচবে? ওর যে রকম চেহারা দেখলাম তাতে কোন মতেই ত সে আশা করা যায় না।"

হৃষীকেশ ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক;—স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র নহেন। বলিয়া ফেলিলেন—"তা গহনা এখন থাকুক না। যখন মেয়ে নিয়ে যাবেন তখনই গহনা নিয়ে যাবেন।"

কথাটা শুনিয়া সীতানাথ জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ভায়া হে, আমাকে কি অবিশ্বাস করলে? জিনিষগুলি আটক করে ব্রাহ্মণকে মনঃক্ষুণ্ণ করে ফিরিয়ে দিলে কি তোমার মঙ্গল হবে?"

হৃষীকেশ বেহাইয়ের চরিত্র পূর্ব্বাবধিই জানিতেন। তিনি যখন ধরিয়াছেন, গহনা লইয়া যাইব, তখন যে না লইয়া ফিরিবেন এমন আশা নাই। সুতবাং আর আপত্তি উত্থাপন করা নিষ্ফল মনে করিলেন। বলিলেন—"তবে নিয়ে যান।"

সীতানাথেব মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। বলিলেন—"আহারাদির পর সকাল সকাল আজই বেরুতে হবে। তুমি তবে সেগুলো বের করে ঠিক কবে রাখ, আমি গঙ্গা স্নানটা সেরে আসি।"

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অনেক দুব হইতে মাঝিকে উচ্চস্বরে সীতানাথ বলিলেন—"ও মাঝি যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলাম, সে তারা রাজি নয়। বলে অত গরীবের ঘবে আমরা মেয়ে দেব না। নৌকো ঠিক করে রাখ, খাওয়া দাওয়ার পর ছাড়া যাবে।"—বলিয়া ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ চাহিয়া দেখিল, ঘাটসুদ্ধ লোক তাহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছে কি না। যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে নিতান্ত বধির ভিন্ন আর কাহারও না শুনিতে পাইবাব সম্ভাবনা ছিল না। লোকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

তাহার পব সীতানাথ গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ঘাটে আহ্নিক কবিতে বসিলেন। আজ দেবতাগণের বড়ই শুভদৃষ্টি। এরূপ ভক্তিবাহুল্যের সহিত পূজা সীতানাথ অনেককাল করেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলেন। বুড়ার আব দেবী সহে না। হৃষীকেশকে বলিলেন—"ভাই এইবার জিনিষগুলি নিয়ে এস, দুর্গা বলে সকাল সকাল যাত্রা কবি।"

হৃষিকেশ অন্তঃপুবে প্রবেশ করিয়া বড় বিলম্ব কবিতে লাগিলেন। সীতানাথ ভাবিলেন সেই দিতেই হইবে, তবু কেমন যেন কৃপণের মত যতক্ষণ পাবে ততক্ষণ দেবী কবিতেছে। যাহা হউক মনটার অবস্থা বেশ উৎফুল্ল থাকার দরুন সীতানাথ গুণ গুণ কবিয়া একটি বাগিণী ধবিলেন—

ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসাব,
শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা আনিবাব।

হৃষীকেশকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সীতানাথের গান সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি হল?"

"হল না।"

"সে কি?"

হৃষীকেশ ব্যাপাবখানা বুঝাইলেন—"মুখুয্যে মশাই, জিনিষগুলি আপনাকে দিতে প্রস্তুতই হয়েছিলাম। গিন্নীকে গিযে বলাতে প্রথম তিনি কেঁদে ভাসিযে দিলেন। শেযে বললেন—চাবি ত নেই, চাবি আমাব মাযেব কাঁকালে ছিল, সে তাঁবই সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

কথাটা সীতানাথের বিশ্বাস হইল না। বাগিয়া বলিলেন—"সে আমি শুনব না। চাবি না থাকে বাক্স ভাঙ্গ। জিনিষ আমি না নিয়ে যাচ্ছিনে।"

হৃষীকেশ বলিলেন—"যদি না যান তবে বসে থাকুন। চাবি নেই, আমি কি কবব? এই ত অবস্থা। এর ওপব কি কামার ডেকে এনে দমাদ্দম করে সিন্দুক ভাঙ্গান ভাল দেখায়, না সেটা কবান আপনাবই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়?"

সীতানাথ মুখ চোখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, আমাব কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয না। ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়াটাই তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়। দেবে কি না দেবে সেটা খোলসা কবে বল দেখি। যদি না দাও, তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে, তেবাত্তির পোয়াবে না।"

বৈবাহিক-প্রবরেব মুখচোখেব ভঙ্গিমা দেখিয়া হৃষীকেশ বড় অপমান বোধ কবিলেন, মনে মনে ভাবি ঘৃণা হইল। স্বয়ং গিয়া কামার ডাকিয়া আনিলেন। দোতলার উপর তাহাকে

লইয়া গিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইলেন। মেয়ের মা এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া মাটিতে লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক গহনা লইয়া বিদায় হইলে হৃষীকেশও শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে দিন আর এই দম্পতীর মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।। বুড়া বর

ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নগ্রাম। ভোব হইয়াছে। সকল পাখী এখন প্রভাতী কলকূজন আরম্ভ করে নাই। একখানি ছেঁড়া বালাপোব গায়ে দিয়া মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া বৃদ্ধ সীতানাথ ধীরে ধীরে স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিতেছেন। পূর্ব্বারাত্রির বৃষ্টিজল বৃক্ষপল্লব হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া তাঁহার পাগড়ি ও বালাপোব ভিজাইয়া দিতেছে।

ক্রমে তিনি নিজবাটীর সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজা বন্ধ। দুই পাশে দুইটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেউড়ি বা বসিবার স্থান। তাহা বহুকাল সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষাতঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিকে দুইটি কলিকাফুলের গাছ এক গা করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণরুগ্নকণ্ঠে সীতানাথ ডাকিলেন—"নিতাই।" একবার, দুইবার, তিনবার ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর পাওয়া গেল—"যাই গো।" নিতাই ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রভুর পানে চাহিয়া সে অবাক্‌। সপ্তাহের মধ্যে আকাব প্রকার যেন একবাবে পবিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে ছাতা নাই, লাঠি নাই, ব্যাগ নাই, এ বালাপোষ কোথা হইতে আসিল। ভাবিয়া, নিতাই কিছুই ঠিক কবিতে পাবিল না। নিতাই তাঁতির ছেলে ভৃত্য বালক—এপ্রেন্টিসি করিতেছিল, মাহিনা পায় না, "প্রসাদ" পায মাত্র। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে নিতাই, বাড়ীর সব ভাল?"

"নিতাই বলিল—"ভাল। আপনার লাঠি আর ছাতা কই?"

বৃদ্ধ অতি করুণভাবে নিতাইয়ের প্রতি নেত্রপাত কবিলেন। নিতাই বলিল—"ফেলে এসেছেন বুঝি?" বৃদ্ধ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"হাঁ নিতাই, সে গেছে।"

পাকা বাঁশের লাঠিগোছটির উপর নিতাইয়ের অনেক দিন হইতে লোভ পডিয়াছিল। একদিন সুযোগ পাইলে লাঠিখানি সে চুরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিবে, অনেক দিন হইতেই ইহা তাহার মনে মনে ছিল। সেই জন্য সে কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করিল। মনে করিল নিশ্চয়ই সেই মতিগঞ্জেব বাড়ীর কোনও ছোঁড়া চাকরের কাজ, সেই লইয়াছে, লোভ সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু ছাতাটাও লইল। সে ছাতা এমন ছেঁড়া ছিল যে তাহা মনিব তাহাকে বখ্‌সিস্‌ করিলেও নিতাই লইত কি না সন্দেহ। যদিও বা লইত তবে তাহার বেতের শিকগুলি খুলিয়া লইয়া ধনুকের তীর করা চলিত মাত্র, সে ছাতা আর কোনও কাজে লাগিত না।

সীতানাথ একবারে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। নিতাই—চক্‌মকি ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরাইল। তামাক সাজিয়া কর্ত্তার হাতে দিল।

কর্ত্তা হুঁকাটি কলঙ্কধরা পিতলের বৈঠকের উপর রাখিয়া দিলেন। তাম্রকূটের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। চক্ষু নত করিয়া মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন—

"হা হা হা হা—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

ব্যাপারখানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জ্জনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে নিতাই কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন,—"বড়বাবুকে উঠাগে যা।"

বড়বাবু সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে

পতাব ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? কোন বিপদ আপদ হয়নি ত?"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক দুলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

"কি হল, দিলে না?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাঁহার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে াহিয়া বহিলেন। বৃদ্ধের মুখ হইতে হা হুতাশের অস্ফুটধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল? খোয়া গেল?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন—"হা হা হা হা সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কি হল, খুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে রে, নোকসান্ হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল? চুরি গেছে?"

"না।"

"ডাকাতে নিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

অনেক কষ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে কি করে গহনার বাক্স নিলে? ছিনিয়ে নিলে? আপনি চুপি চুপি চলে এলেন, পুলিসেব সাহায্য নিলেন না?"

"পুলিসে কি আমি যাইনি? পুলিসেও গিয়েছিলাম। থানার দারোগা ভূধব চাটুয্যের ভগ্নীপতি বে ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক্ আর বাবাই হোক এত্তেলা দিলে ডাইবিতে তাকে লিখে নিতেই হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিখে নেবে কি, উল্টে সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেসের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাইতেন। সে অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি "মোক্তার গাইড" পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের সহায়তা করিয়া পরামর্শ দান করেন। গম্ভীরভাবে পিতাকে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আদ্যোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কালব্যাপী সকরুণ বক্তৃতাব ভিতর হইতে সমস্ত হা-হুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশ্যক মন্তব্য বাদ দিয়া আমরা সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একখানা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শ্রীনিবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজেমুখে স্বীকার করেছে?"

"প্রথম স্বীকার করেনি। আমার যখন জ্ঞান হল তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিঠে যে একটা বাক্স বাঁধা ছিল সেটা কোথায়? বললে, তা ত কই আমরা পাইনি। তখন আমি চীৎকার করে বললাম, আমার সর্ব্বস্ব গেল রে, ব্রহ্মহত্যে করলে রে—বলে আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফের যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি কোথা থেকে একটা ডাক্তার নিয়ে এসেছে—ডাক্তারটি বললে তোমার কোনও ভয় নেই, তোমার বাক্স আছে। আমায় সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, নাড়ি দেখে ওষুধ দিলে, বলে গেল তোমার কোনও ভয় নেই, তিন দিনের মধ্যে তুমি সেবে উঠবে।"

শ্রীনিবাস উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তবে আদালতে নালিস করে ডাক্তারকে সাক্ষী মানব। কান ধরে ভূধর চাটুয্যের কাছ থেকে গহনা আদায় করে নেব না!"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে দফাও রফা রে, সে দফাও রফা। ডাক্তারের কাছে কি যাইনি, ডাক্তাবের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললে গহনার কথা সে কিছুই জানে না। কেবল আমায় সান্ত্বনা করিবার জন্যে মিছে করে বলেছিল। আদালতে নালিস করলে আর কি হবে, ডাক্তাব ঐ কথা বলে বসবে।"

"তবে কি করে জানলেন ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে?"

"তাব পবে চাটুয্যে নিজেই বলেছে।"

"স্বীকার করলে নিয়েছে, অথচ দিলে না? বাঃ—বেশ লোক্ ত! তবে তার স্বীকার কববার উদ্দেশ্যটা কি? অস্বীকার করাই ত তার পক্ষে সুবিধে ছিল।"

"উদ্দেশ্য আছে রে, উদ্দেশ্য আছে। বলে, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। তা হলে ঐ গহনাগুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেয়ের বিয়ে হয় না। তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে; পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধাব করবে।"

কথাটা শুনিয়া শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"—বলিয়া অভ্যাসবশতঃ গুম্ফপ্রান্ত দন্তে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানাথের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান অন্নদাচরণ। তিনি এল, এ, ফেল করা নব্যযুবক। মেজাজটা নিতান্তই সাহেবী ধরণের। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিস্কুট সহযোগে নিয়মিতরূপে চা পান করিয়া থাকেন। গ্রামের বালকদিগের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। চেহারাটি দিব্য—রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁহার কমনীয় মুখসৌন্দর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ করিয়া, "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামধেয় একখানি চটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। যতবার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখান করিয়াছেন। বন্ধুসমাজে পত্নীবৎসল বলিয়া তাঁহার সম্মানের আর সীমা নাই। তাঁহাকে এ বিবাহে রাজি করা যাইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, তাই শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ চেষ্টা করে, বলে কয়ে দেখ, নইলে এ বুড়ো বয়সে অতগুলি টাকার গহনার শোক আমি সহ্য করতে পারব না। আমি মারা যাব। ওকে বোলো বিবাহ না করলে পিতৃহত্যার পাপ ওকে লাগবে।"

অন্নদার চারিটি দাদা অন্নদাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন; কত মিনতি করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন,—কিন্তু কিছুতেই অন্নদার মন টলিল না।

অন্নদার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণকে খোসামোদ করিয়া তাহাদের দ্বারায় অনুরোধ চলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দারগ্রহণের বিরুদ্ধে অন্নদা যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করিল, তাহার বন্ধুরা সেগুলি, যখন যেরূপ সুবিধা হইল, সুতর্ক বা কুতর্কের সাহায্যে একে একে খণ্ডন করিল। কার্য্যের কথা ছাড়িয়া যখন ভাবের কথা আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা বিজয়ীর মত অবজ্ঞাহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শোকাবিহ্বল মৃতপত্নীদের দ্বিতীয় দারগ্রহণের অজস্র

উদাহরণ আনিয়া স্তূপীকৃত করিল। "দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে লোটা কম্বল কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিল।— দেখ অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর একজন যশস্বী কবি হইয়া পড়িল, বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলেই সমস্বরে বলিল, বাঙ্গলা ভাষায় একখানা কাব্য জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সে-ই আবার একটা আধটা নয়, দুই দুইটা বিবাহ করিল!"—ইত্যাদি প্রকারের যুক্তিতর্ক-সমরে অন্নদা শেষে পরাজয় স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

এ দিকে আর সময় নাই। ভূধর চট্টোপাধ্যায় দশদিন মাত্র সময় দিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ বিবাহের শেষ দিন। তাহার তিন দিন কাটিয়াছে, সপ্তাহ মাত্র বাকী।

ছেলে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন বাপ বলিল, "তবে আমিই বিবাহ করিব। দু-হাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না, ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।"

এই সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্রকর হইবামাত্র একটা মহা হাসি টিট্‌কারি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, গহনা হারান, নৌকা উল্টান সব ছল মাত্র। সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে দেখিয়া হারাইয়াছে বুড়ার মন আর উল্টাইযাছে বুড়ার বুদ্ধিসুদ্ধি। কেহ বলিল, বুড়াকে চেনা ভার, দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়াছে। কেহ বলিল, দীনবন্ধু মিত্রের একখানা "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" নাটক কিনিয়া উহাকে প্রেজেন্ট কর। কেহ বলিল, বুড়ার প্রাণের ভিতরটা যে এমন করিয়া হামাগুড়ি দিতেছে তাহা ত আমরা জানিতাম না। একজন গান বাঁধিতে জানিত, সে বহুলোকের অনুরোধে এই উপলক্ষ্যে একটা মজাদার গান বাঁধিয়া দিল।

যাঁহারা সমাজের বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের দুই একজন আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন "মুখুয্যে মশাই আপনি ত বিবাহ করতে যাচ্ছেন, তারা যদি আপনাকে মেয়ে না দেয়? আপনি কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হয়েছেন কিনা, হঠাৎ মেয়ে দিতে সম্মত নাও হতে পারে।"

সীতানাথ বলিলেন—"ও পাজি যে বিবাহ করবে না তা আমি আগে থেকেই জানতাম। ছেলে যদি বিবাহ না করে, তবে আমি বিবাহ করলেও অলঙ্কার দেবে বলেছে। পেল্লায় মেয়ে এত বড়, অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয়নি, তাদের আর জাত থাকে না যুবো বুড়ো বিচার করলে তাদের কি করে চলবে?"

পাড়ার লোকেরা গ্রামের লোকেরা যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। চারি ছেলে চারি বধূ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—"দেখ, আমার বিবাহ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে সোনার চাঁদ বউ ঘরে আনি।"

অন্নদা বেচারি কিয়ৎ পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই কথার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। শেষে অন্নদা চোখ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—"তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক্‌ করবে, তবে আমি বিবাগী হয়ে এক দিক্‌ পানে চলে যাব।" বড় বধূ রাগিয়া বলিলেন—"ঢের দেখেছি ঢের দেখেছি ঠাকুরপো এই বয়সে কত দেখলাম বাঁচি ত আরও কত দেখবো। এখন এ রকম করছ, কিন্তু শেষরক্ষে হলে হয়।"

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বাকী। সীতানাথ টাকাকড়ি লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই নিজে বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্রা করিলে পর বাড়ীতে নূতন করিয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একেবারে খড়্গহস্তে। প্রায় দশ বৎসর কাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে;—ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই—লোকেও সে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধূ ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ নোলকপরা মূর্ত্তিমতী উপদ্রবরূপিণী একটা কচি মেয়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই য ,ণাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদাকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলে ন—"অনু ভাই লক্ষ্মীটি, এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোনাব সংসার ছারেখারে যায়।"

অন্নদা হঠাৎ বলিল—"দেখ বউদিদি, আমি একটা মৎলব স্থির করেছি। শুনলাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজারখানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি সেই টাকা ভূধর চাটুয্যেকে দিয়ে বলি আপনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিৎ সাহায্য করলাম, মনোমত সুপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তাবা দিতে পারে। তারা যে অধার্ম্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই ত গহনাগুলির কথা অস্বীকার করতে পারত।"

কথাটা সকলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামর্শ মন্দ নহে। চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

প্রাণের দায়;—পবিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ করিয়া, হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাব সময় অন্নদাব নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে বওয়ানা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।। একখানি পত্র

চন্দ্রবাটী—২৭শে শ্রাবণ

পবম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু
সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি কলিকাতায় রওয়ানা হইবার পরদিবস আমি কার্য্যগতিকে চন্দ্রবাটী গ্রামে উপস্থিত হই। প্রথমেই মহাশয়ের জীবনদাদা বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ চট্টোপাধ্যায়েব সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত মহাশয় পরম সজ্জনব্যক্তি—যারপরনাই আদর অভ্যর্থনায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আমি তাঁহারই গৃহে অতিথি।

আমার পরিচয় পাইয়া গ্রামেব কযেকটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন বিজ্ঞব্যক্তি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাপু হে, শুনিতেছি নাকি তুমি এই ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" আমি সবিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে আমি নহি, পবন্তু আমার পূজনীয় পিতৃদেব উক্ত বালিকাটির পাণিপীড়ন করিতে অভিলাষী। কথাটা শুনিয়া বিজ্ঞলোকটি থতমত খাইয়া গেলেন। মনে করিলেন বুঝি আমি তাঁহার সঙ্গে বিদ্রুপ করিতেছি। অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া বিজ্ঞভদ্রলোকটি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ, তোমার পিতাঠাকুর যেন এমন কার্য্য না করেন। ও মেয়েটির জাতিকুলের ঠিকানা নাই। ওটি কুড়ানো মেয়ে। বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বে যেবার মহাবারুণীযোগে ত্রিবেণীতে লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, সেই বৎসর সপরিবারে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় ঐ মেয়েকে কুড়াইয়া পায়। ও মেয়ের বয়স তখন দুই বছর আন্দাজ। নিঃসন্তান বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মেয়েটিকে কন্যার মত প্রতিপালন করিয়াছে। অনেকবার ও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু পাছে কোনও সৎকুলীন ব্যক্তির জাতিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমরা

প্রতিবারেই বরপক্ষীয়গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছি;—তোমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলাম।"

মহাবারুণীযোগের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েটিকে একবার দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম, আমার পিতাঠাকুর যখন আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, তখন মেয়েটিকে একবার দেখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে যথাসাধ্য বসন ভূষণে সাজাইয়া আমাব সম্মুখীন করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। মুখখানি অবিকল আমাদের পরলোকগতা ছোটবধূর মত।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটির কোনও স্থায়ী রকমের ব্যাধি আছে কি না। তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই স্বীকার করেন না। অনেক জেরা করিয়া বাহির করিলাম যে, মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে অম্লশূলের মত একটা বেদনা দেখা যায়, দুই দিন কখনও বা তিন দিন বুক যায় বুক যায় শব্দ—তাহার পর ভাল হইয়া যায়। বৎসরে এরূপ দুই একবাব হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই বিশ্বাসে পরিণত হইল। মেয়েটি আমার শ্যালিকা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেই আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী মেয়েটিকে ত্রিবেণীব চতুর্দ্দিকে অনেক নিষ্ফল অনুসন্ধান হয়। মেয়েটির গায়ে অনেক সোনার গহনা ছিল, এই নিমিত্ত সকলে সিদ্ধান্ত করেন যে, গহনার লোভে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। এ সমস্ত ইতিহাস আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। অম্লশূলের ব্যারামটা—উহাও একটা প্রধান কথা। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উহা আছে, আমাব স্ত্রীব ছিল, আমার শ্যালকগণও অল্পাধিক পরিমাণে ঐ পীড়াক্রান্ত।

যাহা হউক আমি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াই শ্বশুর মহাশয়কে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করি। অদ্য প্রভাতে তিনি আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমভিব্যাহাবে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। মেয়েটি যে তাঁহাবই সে বিষয়ে শ্বশ্রূদেবীর আব সংশয়মাত্র নাই।

অতঃপর আপনি যদি কন্যাটিকে বিবাহ করেন তাহা হইলে কতকটা সম্পর্কবিরুদ্ধ হয়। এই কারণেও বটে, আর মহাশয়কে এই বয়সে একটা গলগ্রহ করিয়া দিয়া (বিশেষতঃ কন্যাটি বয়স্থা) কষ্টে ফেলা উপযুক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় না ভাবিয়া, আমিই অগত্যা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রয়োজনীয দ্রব্যাদি লইয়া সত্বর আগমন করিবেন। বাড়ীতে দাদামহাশয়গণকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ কবিলাম। নিবেদনমিতি।

শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা

পুনশ্চ—

যদি সময় থাকে তবে আসিবার পূর্ব্বে একবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মদ্রচিত "ভগ্নহৃদয়ে মহাশোকাশ্রু" নামক কাব্যখানির সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি সঙ্গে আনয়ন করিবেন। চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানি পত্র লিখিয়া এই সঙ্গে দিলাম, আপনার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের কোনও কারণ থাকিবে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি যদি "আত্মজীবন চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তবে তিনি সে পুস্তক নিজব্যায় প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই অলিখিত পুস্তকখানি অতীব মনোরম ও কৌতূকাবহ হইবার সম্ভাবনা।—ইতি শ্রীঅন্নদা

পুঃ—ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলঙ্কারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পাছে মহাশয় সেগুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-দুঃখ অনুভব করেন, তাই এখন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথ্যাচারণের জন্য আমি তাঁহার কৈফিয়ৎ

চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মুখুয্যে মহাশয় সম্বিত পাইয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাক্স কোথায়—আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম ও সত্য বলিয়াছিলাম কোন বাক্স পাই নাই। তাহার পর ডাক্তার আসে, এবং পরামর্শ দেয় ও কথা বলিও না, পীড়া বাড়িবে; বলিও বাক্স আছে; উহাকে ভাল হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম এই সুযোগে মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। বাপু হে আমার মেয়ের কিনারা হইতেছিল না; তাই দুইটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে মিথ্যা কতক্ষণ টিকিত? বিবাহ হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইত। তখন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরিয়া দিতে পারিতে না।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যতই বিনয়ী ও অতিথিবৎসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার অতি শোচনীয়। এরূপ শিথিলনীতি মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি—শ্রীঅঃ

[আষাঢ় ১৩০৬]

পত্নীহারা

চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ত্রিতল অট্টালিকা। তাহার একটি সুসজ্জিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী সুনীতিবালা বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর। চোখে এখনও বালিকাসুলভ চপলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। স্নান সমাপ্ত হইয়াছে; চুল এখনও শুকায় নাই, তাই সেইগুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বায়ু আসিয়া সেগুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই সুন্দরী পাঠিকার মন তেমন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাসমাত্র কানে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে. সুনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্যমুখে সুনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

সুনীতির, স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে সুনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগ্যকে যোগ্যের সহিতই যোজনা করিয়াছেন;—ইহার অপেক্ষা সুবোধচন্দ্রের আর বেশী বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কবিতাপুস্তকখানি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল,—"অত হাসি কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"সহ্য হয় না নাকি?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি বাইরে থেকে হাসতে হাসতে এসেছ। তা ত হবে না। আমার কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাসবে।"

"তুমি কি শুধু ঘরে আছ? তুমি কি বাইরে নেই?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, পরাজয় স্বীকার করলাম। রাজন্। তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে। এখন ব্যাপারখানা কি বল দেখি শুনি।"

"দেখবে আবার শুনবে?"

"চালাকি রাখ। কাগজে তোমার বউয়ের সুখ্যাতি বেরিয়েছে নাকি?"

"আমার বউয়ের?"

"কি জ্বালা! তোমার কেতাবের গো মশাই কেতাবের। তোমার ফুলহারের সুখ্যাতি কবে কাগজে কেউ সমালোচনা করেছে বুঝি?"

"যদি বলি তাই।"

"তবে আমি রাগ করব।"

"অপরাধ?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, পরাজয় স্বীকার করলাম। রাজন্! তোমারি স্পর্দ্ধ করবে কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"তবে তা নয়।"

"তবে কি?"

"আন্দাজ কর।"

সুনীতি তাহার সেই হাসিমাখা চক্ষু দুইটি উল্টাইয়া দুই বার ঢোক গিলিয়া শেষকালে বলিল—"বুঝেছি।"

"কি বল দেখি?"

দুষ্টামিব হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিল—"বলব কেন?"

সুবোধ বলিল—"না তোমায় বলতেই হবে।"

সুনীতি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"ইস্! হুকুম নাকি?"

"নয়ত কি?"

"বটে! জাননা আমি রাণী, তুমি মোর প্রজা।"

"তবে তোমার সখীদের ডাক। আমায় ফুলপাশে বেঁধে ফেলুক। দুটো গান শুনে নিই।"—বলিয়া সুবোধ সুর করিয়া আরম্ভ করিল—"যদি আসে তবে কেন যে-এ-এ-তে চায।"

সুনীতি বাগ করিয়া বলিল—"রঙ্গ রাখ। কি হয়েছে বল।"

"তুমি কি আন্দাজ করেছ সেইটে আগে বল।"

"সে আমি বলব না। তুমি বল চাই নাই বল।"

সুবোধ বলিল—"না, সে আমি শুনব না। তোমায় বলতেই হবে।"

সুনীতি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"নাঃ—যদি না মেলে, তবে তুমি ভারি হাসবে।"

"হাসলামই বা?"

"আমি যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে যাব।"

"হলেই বা?"

"আমার চোখ যে ছলছল করবে।"

"তোমাব চোখে একটি ওষুধ দিয়ে সে ছল্‌ছল্ ভাব ভাল কবে দেব।"

এই বলিয়া সুবোধ স্নেহভবে প্রিয়তমার চক্ষু দুটিতে দুটি চুম্বন মুদ্রিত কবিল।

"সুনীতি বলিল—"একি রোগ না হতেই ওষুধ!"

সুবোধ হাসিয়া উত্তর করিল—"Prevention is better than cure"—সুনীতি অল্প ইংবাজি জানিত।

সুনীতি বলিল—"ধন্যবাদ ডাক্তাব মশাই।"

"শুধু ধন্যবাদে ডাক্তার সন্তুষ্ট হয় না, ভিজিট চাই"—বলিয়া ডাক্তাব মহাশয় রোগিণীব ওষ্ঠাধর হইতে ভিজিট আদায় কবিয়া লইলেন।

তখন সুবোধ সুনীতির স্কন্ধে হস্তযুগল অর্পণ করিয়া বলিল—"আন্দাজটা তুমি কি কবেছ বল সত্যি। আমার ভারী কৌতূহল হচ্ছে।"

সুনীতি বলিল—"বিলক্ষণ নিজের কথা যা বলবার আছে তা বলবেন না, আমায়

খালি খালি জেরা করবেন। ভারী মজার লোক ত! তুমি বল আর না বল, আমি সে কথা বলছিনে।"

সুবোধের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে সুনীতি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। শেষে সুবোধ বলিল—"আচ্ছা, আমিই আগে বলি; কিন্তু তুমি বলবে বল?"

"বলব।"

"আমার শুনে শুনে যদি বল যে আমিও তাই মনে করেছিলাম।"

"আচ্ছা, আমি কাগজে লিখে রাখি। বলা হলে তুমি খুলে দেখো।"

সুনীতি হাসিতে হাসিতে একখানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিল। লিখিয়া বলিল—"বল এইবার।"

সুবোধ বলিল—"আজ সন্ধ্যেবেলা বহুকাল পবে আবার ষ্টারে চন্দ্রশেখর। অনেকদিন থেকে তোমার চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখবাব সাধ, আজ দুজনে যাই চল।"

শুনিয়া সুনীতি ভারি খুসী। লিখিত কাগজখানি হাতে লইয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা, এতে কি লিখেছি এইবাব তুমি আন্দাজ কর।"

"বাঃ সে কথা ত ছিল না।"

"নাই বা ছিল, তবু বল না।"

"আমি যদি আন্দাজ করি, তবে কি আন্দাজ করলাম সেটা ফেব তোমায় আন্দাজ কবে বলতে হবে কিন্তু।"

"বেশ, আমিও তোমায় আবাব সেটা আন্দাজ কবাব। তা হলে আন্দাজ কবতে কবতে চিরটা জীবন কেটে যাক্ আর কি!—আচ্ছা তুমি আমায যে বকম খুসী কবেছ. তোমাকে আব কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই দেখ।"

সুবোধ কাগজ খুলিল। তাহাতে লেখা আছে—"হিজি বিজি কি লিখি ছাই আমি ত কিছুই আন্দাজ কবিতে পারিতেছি না। তোমাব মনে কৌতূহল সঞ্চার কবিবাব চেষ্টা কবিতেছি মাত্র।"

পড়িয়া সুবোধ হাসিয়া উঠিল। বলিল—"তুমি ভারি দুষ্টু।"

"কি সাজা দেব?"

"সাজা দেব? সাজা দিয়েছি। আসল কথা এখনও বলিনি। তোমাকে মেম সাজাব"।

"সে আবার কি কথা।"

সুবোধ বলিল—না সত্যি। অনেক দিন থেকে আমার সাধ, মেমেব পোষাক তোমাকে কেমন দেখায় দেখব। তোমার জন্যে একটা পোষাক আনিয়ে বেখেছি। থিয়েটারে যাব, দুজনে আলাদা আলাদা বসে দেখলে কি সুখ হয়? বক্স বিজার্ভ কবে দুজনে একত্রে বসতে হবে। পোড়া বাঙ্গালীব পরিচ্ছেদে ত সে হবাব যো নেই—দুজনে সাহেব মেম সেজে যাই চল।"

সুনীতি বলিল—"আ সর্ব্বনাশ! সে আমি পারব না। হাজার লোকের সমুখে কি আমি বেরুতে পারি?"

"ছদ্মবেশে লজ্জা কি? যে তোমাকে দেখবে সে ত আর তোমাকে তুমি বলে চিনতে পারবে না। তোমাকে সকলে খাঁটি বিলিতি মেম মনে করবে, আমাকে বরং ট্যাস্ ফিবিঙ্গিব মত দেখাবে। সাহেবেরা হিংসেতে ফেটে মববে আব ভাববে বিধাতা বানর গলে দিল মোতির হার।"

সুনীতি বলিল—"যাও যাও ভাবি ঠাট্টা শিখেছ। তোমার আর পাগলামি কবতে হবে না। সে সব হবে টবে না।"

অনেক মিনতি, অনেক সাধাসাধি অনেক মান অভিমানের পর সুনীতি বলিল, "আচ্ছা ঘরে পরে দেখি কেমন দেখায়, তার পরে বলব।"

আহাবাদিব পব সুবোধ দুইটা তোবঙ্গ শয়নকক্ষে আনাইযা লইল। সে দুইটাব ভিতব সুনীতি ও সুবোধেব দুই সুট সাহেবী পবিচ্ছদ।

সুনীতি বলিল—"তুমি আগে সাহেব সাজ।"

সুবোধ বলিল—"আমাব সাহেবী বেশ তুমি কখনও দেখনি নাকি?"

সুনীতি বলিল—"না, তবু সাজ। দেখে আমাব ভবসা হোক্।"

"সুবোধ সাহেব সাজিল। এইবাব সুনীতিব পালা। সুনীতি অনেক মেম দেখিয়াছিল বটে, এবং মেম শিক্ষযিত্রীব কাছে কিছুদিন লেখাপড়াও শিখিযাছিল, কিন্তু কোথায় কি পবিতে হয়, তাহা অত লক্ষ্য কবে নাই। যাহা হউক তথাপি পাশেব ঘবে গিযা আন্দাজি এক বকম পবিযা আসিল। যা কিছু ভুলচুক ছিল, সুবোধও আন্দাজে সংশোধন কবিযা দিল।

সুনীতিব সজ্জা সম্পূর্ণ হইলে, সুবোধ সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল—"গুড মর্ণিং মেম সাহেব।"

"সুনীতি হাসিয়া আকুল। সেও বলিল—"গুড মর্ণিং সাহেব।"

তাহাব পব দুইজনে দর্পণেব সম্মুখে গিযা দাঁড়াইল। সোনাব জলকবা ফ্রেমে আঁটা প্রশস্ত মুকুব ভিত্তিগাত্রে লম্বিত ছিল। তাহাতে সুনীতিব প্রতিবিম্ব দেখিযা সুবোধ, হা হা কবিযা হাসিযা উঠিল। সুনীতিও হি হি কবিযা তাহাব সহিত যোগ দিল। মানুষকে যেমন ভূতে পায, আজ সকালে তেমনি এই দুইটা প্রাণীকে যেন হাসিতে পাইযাছে। সুনীতি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"এ বেশে আমি বাইবে যেতে পাবব না, তুমি যাই বল। ঝি চাকববাই বা কি মনে কববে।"

সুবোধ বলিল—"এক কাজ কবা যাবে। বাড়ী থেকে শাড়ী পবে বেরুবে। ট্রেনে পোষাক বদলে নিলেই হবে। একটা কামবা বিজার্ভ কবে নেব এখন।"

সুনীতি বলিল—"সে পবামর্শ মন্দ নয। কিন্তু আমাব ভাবি লজ্জা কবছে। কাজ নেই আমাব থিযেটাবে গিযে, যেমন আছি তেমনি থাকি।"

সুবোধ স্ত্রীব চিবুক ধবিযা আদব কবিযা বলিল—"আমাব এত দিনেব সাধ তুমি পূর্ণ কববে না?"

দুই ঘণ্টা পব হুগলি ষ্টেশনে আসিযা সুনীতি ও সুবোধ বিজার্ভ কবা সেকেণ্ড ক্লাস কক্ষে আবোহণ কবিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সুবোধ গৃহ হইতেই সাহেবী পোষাক পবিযা আসিযাছিল। গাড়ী ছাড়িবামাত্র সুনীতিকে সে স্বহস্তে বিবি সাজাইয়া দিল। কেবল জুতাব লেস্ সুনীতি নিজে বাঁধিল, সুবোধকে কিছুতেই বাঁধিয়া দিতে দিল না। সুনীতিব শাড়ী ও বাহুল্য অলঙ্কাবাদি তোবঙ্গে বন্ধ কবিযা বাখিল।

সেখানা প্যাসেঞ্জাব গাড়ী। প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিযা থামিযা চলিতেছে। গাড়ী ছাড়িযা দিলে সুনীতি স্বামীব পার্শ্বে বসিয়া বাহিবেব দৃশ্য অবলোকন কবে, ষ্টেশনেব নিকটবর্ত্তী হইলেই পলাইয়া ও-কোণে গিয়া বসে, সুবোধ কিছুতেই তাহাকে ধবিযা বাখিতে পাবে না। গাড়ীর ছাদে যেখানে লণ্ঠনেব গহ্বব সেখানে চাবিপাশে চাবিখানা আর্শিব টুকবা আঁটা আছে, সেই আর্শিতে সুনীতি নিজেব প্রতিবিম্ব দেখে আব সুবোধেব পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ কবিযা হাসে। এক একবাব বলে—"খুব সঙ সাজলে যা হোক—মাগো—মাগো! এতও তোমাব আসে।"

যখন হাওড়ায় আসিয়া গাড়ী থামিল, তখন ঠিক সন্ধ্যা হইযাছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে থিয়েটাব আরম্ভ হইবে।

সুবোধ সুনীতির হাত ধবিয়া চলিল, একটা কুলী তোরঙ্গটা মাথায় লইয়া অগ্রসব হইল। সুবোধ সুনীতির পানে চাহে আর হাসে। সুনীতির কপালে ঘর্ম্ম, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ছেলেবেলায় যা জুতা পায়ে দিয়াছিল, জুতা পায়ে দিয়া চলিতে পারিবে কেন? দুই পা তিন পা চলিয়াই হোঁচট খাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

সুবোধ গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?"

সুবোধ বলিল, "ষ্টার থিয়েটার, হাতিবাগান।"

সুনীতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, সুবোধ বাহিরে দাঁড়িয়াই তাহাকে বলিল—"তোরঙ্গটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে, থিয়েটারের বাইরে গাড়ীতে পড়ে থাকবে, যদি কেউ উঠিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা গাড়োয়ানটাও নিয়ে চম্পট দিতে পাবে, ভিতরে ঢের জিনিষ রয়েছে, ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেখে আসি।"

সুনীতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। সুবোধ কুলীটাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সুবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গাড়োয়ান হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা জানে হোগা হুজুর?" সুবোধ মুখ ফিরাইয়া বলিল—"হাতিবাগান—ষ্টার থিয়েটার।"

সুবোধ গিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধান করিল, ষ্টেশন মাষ্টার নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই ষ্টেশন মাষ্টার আসিল। সে বলিল—"প্যাসেঞ্জারগণের জিনিষপত্র আমি রাখি না, হেড্ পার্শেল ক্লার্কের কাছে যান, চারি আনা ফি লাগিবে, রসিদ পাইবেন।"

সুতরাং সুবোধ হেড্ পার্শেল ক্লার্কের সন্ধানে চলিল। অনেক কষ্টে তবে তাহাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। তিনি এক টি বাঙ্গালী বাবু—চক্ষু দেখিলে মনে হয় বিলক্ষণ অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে।

অত্যন্ত ধীরভাবে সে ব্যক্তি সুবোধের প্রস্তাব শ্রবণ করিল। শেষে বলিল—"চারি আনা লাগিবে।" এই বলিয়া রসিদের বহি বাহির করিল। পেন্সিলটা খুঁজিতে কিয়ৎক্ষণ গেল। পেন্সিল যদি মিলিল, তবে কার্ব্বণ কাগজ আর পাওয়া যায় না।

এ দেরাজ সে দেরাজ, এ আলমারি সে আলমারি বহু অনুসন্ধানেও যখন কার্ব্বণ কাগজ পাওয়া গেল না, তখন সুবোধ বলিল—"মহাশয়! আমার সময় নাই, না হয় হাতেই লিখিয়া দেন না।"

সুবোধের অঙ্গে ইংরেজ বেশ ছিল, সুতরাং অনুরোধটা উপেক্ষিত হইল না।

রসিদ লইয়া কুলীকে বিদায় দিয়া, সুবোধ তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, যেখানে সুনীতির গাড়ী ছিল, সেখানে নাই।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীখানা বিদ্যুদ্মণ্ডিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সুবোধ তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বর করিয়া ভাবিল, এইখানে কোথাও গাড়ী নিশ্চয়ই সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টেশনের অঙ্গনে তখনও বহুসংখ্যক গাড়ী দণ্ডায়মান। সুবোধ প্রত্যেক গাড়ীর কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গাড়ীর নম্বরটা কেন দেখিয়া রাখে নাই, কেন এমন মূর্খতা করিল, এই ভাবিয়া নিজ বুদ্ধিকে অত্যন্ত ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু অনুশোচনার সময় নাই। ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে। একে একে গাড়ীগুলিও বাহির হইয়া যাইতেছে। সহসা একটা কথা সুবোধের মনে হইল। যখন গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাইতে হইবে, তখন সে বলিয়াছিল ষ্টার থিয়েটার। গাড়োয়ান সুনীতিকে লইয়া যদি ষ্টারে উপস্থিত হইয়া থাকে?"

এই কথাটা মনে হইবামাত্র সুবোধ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টার থিয়েটারে ছুটিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়াছে। সে যখন কুলী সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট বাক্স রাখিতে গেল, তখন ত গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যায় নাই। মেমসাহেবরা একাকীও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, গাড়োয়ান কোনও সংশয় না করিয়া আপন মনে হাঁকাইয়া গিয়াছে আর কি। সুনীতি কি আর মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে পারিয়াছে! এই ঘটনায় সে ভয়ে বিস্ময়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছে—হয়ত কাঁদিতেছে—নয়ত মূর্চ্ছা গিয়াছে।

ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে গাড়ী পৌছিল। মহা সমারোহে চন্দ্রশেখরের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। জনতা অত্যন্ত অধিক। বহুলোক স্থানাভাবে টিকিট পাইতেছে না, ফিরিয়া যাইতেছে।

সুবোধ লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়ীগুলি একে একে অন্বেষণ করিল। কোনও খানিতে সুনীতি নাই। তাহাব মাথা ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ হইবার উপক্রম হইল।

ফিরিবার সময় প্রত্যেক গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুম্ কোই মেমসাহেবকো লায়া?" সকলেই বলিল—"না।" একজন বলিল—"হাঁ হুজুর লায়া।"

সুবোধের বুকেব ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। মনে হইল এইবাব যেন অকুল সমুদ্রে কুল পাইয়াছি। ঘোড়া দুইটি দেখিল, গাড়োয়ানের পানে চাহিল, ঠিক যেন সেই ঘোড়া ও সেই গাড়োয়ান বলিযাই মনে হইল।

এক মুহূর্ত্তেব মধ্যে এ সমস্ত ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সুবোধ গাড়োযানকে জিজ্ঞাসা কবিল—"কাঁহাসে লায়া? হাওড়া ষ্টেশন সে?"

"হাঁ হুজুব, হাওডা ষ্টেশন সে লায়া।"

"হাম্‌কো দেখা থা?"

কোচবাক্সে বসিয়া মুখ ঝুঁকাইয়া সেই অল্পালোকে গাড়োয়ান সুবোধেব মুখ নিবীক্ষণ করিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"হাঁ হুজুব আপকো মাফিক্ একঠো সাহেবকো তো দেখা থা।"

সুবোধ তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল—"মেমসাহেব কীধাব গিয়া?"

"মেমসাহেব ভিতব মে তামাসা দেখ বহিহে!" শুনিয়া সুবোধ ভাবি নিবাশ হইল। ভাবিল তবে এ ত সুনীতি নহে। সুনীতি হইলে সে কখনও গাডী ত্যাগ কবিয়া টিকিট কিনিয়া থিযেটাবের ভিতব প্রবেশ কবিত না। তাহা একান্তই অসম্ভব। তথাপি ভাবিল—একবাব দেখা যাউক।

ভিড ঠেলিয়া ফটক পার হইয়া সুবোধ থিয়েটাবেব অঙ্গনেব ভিতব প্রবেশ কবিল। যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রয় কবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল—'ইংরেজবেশধাবিণী কোনও বঙ্গ মহিলা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন কি?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচবণ; বলিল—"মহাশয় কত লোক টিকিট লইয়াছে এই ভীড়ে কি কাহাবও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসব পাইয়াছি। তবে মনে হইতেছে যেন একজন লইয়াছেন।"

সুবোধ লোকটার হাতে একখানা নোট দিয়া বলিল, "মহাশয় একবাব বাহিবে আসুন।"

ভবচরণ সসম্ভ্রমে বাহিব হইয়া আসিল। ঔৎসুক্যেব সহিত বলিল— "কি মহাশয়?"

সুবোধ বলিল—"আমাকে একটু সাহায্য কবিতে হইবে। আপনাদেব কোনও লোক দিয়া একবাব সেই মহিলাটিকে সংবাদ দিতে হইবে। যদি আমাব কার্য্য সফল হয়, তবে আর একখানি নোট দিব।"

ভবচরণ হাসিয়া বলিল—"তা মহাশয় নিশ্চয়ই কবিব। একজন ভদ্রলোকেব যদি উপকাব কবিতে পারি, তবে তা না কবিব কেন? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।"

বলিয়া ভবচরণ একটু অভূতপূর্ব্ব বকম আচরণ করিল। একটা গোলযোগের ব্যাপার সন্দেহ করিয়া, থিয়েটারের কোন ঝিকে ডাকিয়া তাহার দ্বাবা উপবে সুবোধেব বার্ত্তা না পাঠাইয়া, ইহা নির্ব্বিবাদে হাসিল করা কোন ঝির কর্ম্ম নয় মনে কবিয়া, সে পশ্চাৎ দিক দিয়া থিয়েটারের সাজঘরে উপস্থিত হইল। দেখিয়া তাহার পরিচিতা রোহিণী নাম্নী নটী দলনী বেগমের পরিচ্ছদ পরিয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তাহাকে গিয়া চুপি চুপি বলিল—"একটা কাজ করবে?
"কি?"
ভবচরণ সংক্ষেপে ব্যাপারখানা রোহিণীকে বুঝাইয়া দিল। রোহিণী বলিল—"কি দেবে?"
"একটা ফোব্‌ ক্রাউন হুইস্কি।"
"আরে রামঃ-গলা জ্বলে। —গ্রীন শীলিং।"
"আরে তাই, এস তবে।"

বেগমের পরিচ্ছদ পবিত্যাগ না করিয়া বাহিরে যাওয়া চলে না; অথচ ছাড়িলে, আবাব পরিতে অনেক কষ্ট ও সময় নষ্ট হইবে সুতরাং রোহিণী একখানা বিলাতী শালে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ভবচবণেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভবচরণ সুবোধবাবুকে দেখাইয়া বলিল--"এঁরি কথা বলছিলাম।"
সুবোধ কার্ডকেস হইতে নিজের একখানি কার্ড বাহিব কবিয়া রোহিণীব হাতে দিল। বলিল—"যদি কোনও ইংবেজবেশধারিণী বঙ্গমহিলাকে ভিতরে দেখেন, তবে এই কার্ড দেখিয়ে অনুগ্রহ কবে তাঁকে ডেকে আনবেন।"
বোহিণী সুবোধের পানে চাহিযা একটু মুচকি হাসি হাসিল। কার্ডখানি লইয়া, হেলিয়া দুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিযা উপবে উঠিল।
সুবোধ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা কবিতে লাগিল।
পাঁচ মিনিট পবে বোহিণী কার্ডখানি হাতে কবিয়া নামিযা আসিয়া বলিল--"ভিতবে ইংরেজবেশধাবিণী আপনার কোনও মহিলা নেই। একজন আছেন তিনি আপনাব আত্মীয়তা অস্বীকার কবলেন।"
সুবোধ কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে সে স্থান হইতে চলিযা গেল।
রোহিণী তাহাব সঙ্গীকে বলিল, "আজ ভাল বিপদে ফেলেছিলে ভাই। একটা গ্রীণশীলেব লোভে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! খুঁজে খুঁজে ইংরেজবেশধাবিণী মহিলাব কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম—"আপনার স্বামী বাইবে অপেক্ষা কবছেন, আপনি শীঘ্র আসুন: বলে কার্ড দেখালাম। মাগী কার্ডখানা ছুঁড়ে আমার গাযে ফেলে দিলে। চটে লাল। আমাকে মারে আর কি!"
"তুমি কোন সাহসে বল্লে—তোমাব স্বামী বাইবে অপেক্ষা কবছেন? স্বামী কি অন্য কেউ কি কবে জানলে?"
"নিশ্চয় স্বামী। দেখছ না, লোকটা মণিহাবা ফণী হয়ে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতাওযালা আলোকপ্রাপ্ত লোক। স্ত্রীটি হারিয়ে বসে আছেন। অমৃত বোসকে বলব এখন, ভারি একটা মজার নুতন প্রহসন হবে।"
সুবোধ অঙ্গনেব বাহিরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল। এমন বিপদে সে ইহজন্মে আর কখনও পড়ে নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল—এ সকল কি সত্য, না স্বপ্ন দেখিতেছি। ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়, যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি যে এ সব কিছু নহে, সুনীতি আমার পার্শে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, তাহা হইলে কি সুখ, কি আনন্দ হয়!—সুবোধেব দুইটি চক্ষু জলপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিল—সুনীতি, কোথায় তুমি, কি অবস্থায় রহিয়াছ, কোন দস্যুহস্তে কি মহাবিপদে তুমি পতিত হইযাছ, আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না—হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে সুনীতিব সেই লজ্জারক্তিম মুখখানি কেবলই সুবোধের মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় হায় আমিই তোমাব সর্ব্বনাশ করিলাম।
কিন্তু এমন ভাবে কালক্ষেপ করিয়া কি ফল হইবে। সুবোধ মনে করিল, আব একবার

হাওড়ায় গিয়া অনুসন্ধান কবি, যদি সে গাড়ীখানা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে গাড়ী সুবোধ হাওড়া হইতে ভাড়া করিয়া আসিয়াছিল, তাহা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। সুবোধ তাহাতে আরোহণ কবিয়া হাওড়ায় যাইতে কহিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সুবোধ দেখিল, অঙ্গন বহু শকটে পবিপূর্ণ। পঞ্জাব ডাকগাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত। হৃতবুদ্ধির মত সকল গাড়ীগুলির কাছে এক একবার দাঁড়াইল, কেমন করিযা সে গাড়ী চিনিয়া বাহির ববিবে।

ডাকগাড়ী ছাড়িয়া গেল। সুবেধ একটা মৎলব স্থিব করিযাছে। ষ্টেশন মাষ্টারেব কাছে গিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনাব সমস্ত কুলীকে যদি দয়া করিযা একত্র করেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হই। বৈকালের ট্রেনে যে ব্যক্তি আমার তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, তাহাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

ষ্টেশন মাষ্টাব গম্ভীবমূর্ত্তি ধাবণ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, জি-আর-পুলিসকে আবেদন করুন।"

চলিল সুবোধ রেলওয়ে পুলিসের দারোগার সন্ধানে। দাবোগা সাহেব মুসলমান, চারপাই পাতিয়া নিদ্রাব আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাব সমীপে সুবোধ উপস্থিত হইয়া আপনাব "আবেদন" জানাইল।

প্রথমে ত দারোগা সাহেব কথা কানেই তোলেন না। অবস্থা বুঝিয়া প্রাণের দায়ে, সুবোধ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দাক্ষিণাত্ত কবিল।

তখন দাবোগা সাহেব সতেজে উঠিয়া বসিলেন। বাইটাব কনেষ্টবলকে হুকুম দিলেন—"বোলাও সব শালা কুলী লোগকো।"

পুলিসেব হাঁকডাকে ষ্টেশন প্রকম্পিত হইযা উঠিল। দলে দলে বহু কুলী আসিয়া সুবোধেব সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্রমে যে ব্যক্তি সুবোধের তোবঙ্গ নামাইয়াছিল, সে উপস্থিত হইল। সুবোধ তাহাকে চিনিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বিকালের ট্রেনে নামিয়া, যে গাড়ী আমি ভাডা করিযাছিলাম, সে গাড়ীর গাড়োয়ানকে তুমি চেন কি?"

সে ব্যক্তি বলিল—"চিনি বইকি হুজুব, তার নাম রহিমবক্স।"

"বহিমবক্সের আড্ডা কোথায় জান?"

"যোড়াসাঁকো।"

"সেখানে আমাকে লইয়া যাইতে পার? ভাল করিয়া বখ্‌শিশ দিব।"

বখ্‌শিশের নাম শুনিয়া কুলিপঙ্গুর অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—"চলুন না হুজুর। এখনই যাইতেছি।"

কুলী সুবোধের সঙ্গে চলিল। পুলিসের সেই রাইটার কনষ্টেবল অর্থাৎ "মুন্সীজি" সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"বাবুসাহেব।"

সুবোধ বলিল—"বখ্‌শিশ?"

সে ব্যক্তি গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"বাবুজি, আমি চাপরাশি না দাবোয়ান যে বখ্‌শিশ দিবেন? তবে পান খাইবার জন্য যদি কিছু দেন ত আলবৎ লইতে পারি।"

সুবোধ মনে মনে বলিল—"বাধিত করিতে পার।" সুবোধের মন তখন অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। টাকার প্রতি মায়া মমতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। ঠন্ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মুন্সী বলিল—"বন্দিগি বাবু সাহেব।"

কুলীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া সুবোধ যোড়াসাঁকোর এক অন্ধকার গলিতে উপস্থিত হইল। পথে বরাবর শঙ্কা করিতে করিতে আসিয়াছিল, হয়ত গাড়োয়ানের দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হইল। গাড়ী আছে। গাড়োয়ান পার্শ্বে খাটিযায শুইয়া ঘুমাইতেছে

কুলী তাহাকে জাগাইল—"রহিম—ও রহিম—ওঠ্ ওঠ্।" রহিম ঘুমের ঘোরে বলিল—"আজ আর আমি ভাড়া যাব না। আজ ও মেরে নিয়েছি।"

শুনিয়া সুবোধের মনটা ছনাৎ করিয়া উঠিল। ভাবিল কি অমঙ্গলের কথাই শুনিব না জানি।

কুলী তাহাকে আশ্বাস দিল—"ওঠ্, ভাড়া যেতে হবে না। শীঘ্র ওঠ্।"

রহিম কোন মতে উঠিল। মুখে ভয়ানক মদের গন্ধ। বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল কিছুই বোঝা গেল না। বকিতে বকিতে আবার ধপাস্ করিয়া খাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

কুলী তখন গাড়ীর জ্বলন্ত লণ্ঠনটা খুলিয়া আনিয়া সুবোধের মুখে আলোক ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এঁকে চিনতে পারিস?"

সুবোধ দেখিবামাত্র গাড়োয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটি যোগ করিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল—"হুজুর, আপনার মেমসাহেব আজ আমাকে দশ টাকা বখ্শিশ দিয়েছেন।"

সুবোধ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মেমসাহেবকে কোথায় রেখে এসেছিস?"

গাড়োয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। একে মদের প্রভাব, তাহার উপর একদমে দশ টাকা লাভ করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। ভাবিয়া, পূর্ব্বৎ করুণস্বরে বলিল—"হুজুর, ভবানীপুর।"

"কোন স্থান?"

"ছক্করবেড়িয়া।"

সুবোধের দেহে প্রাণ আসিল। ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ায় সুবোধের ভায়রাভাই অবিনাশচন্দ্রের বাড়ী। সুনীতি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়াছে। আর কোনও ভাবনা নেই। তবু সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কত নম্বর?"

লম্বর ত মনে নাই হুজুর।" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কান্না দেখিয়া সুবোধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কুলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কাঁদে কেন?"

কুলী জিজ্ঞাসা করিল—"রহিম! কাঁদিস্ কেন রে? ভয় কি তোর?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—"ভয় আবার কি? বেশী দারু পিলেই আমার কান্না পায়। মনে হয় যেন আমার বিবি মরে গেছে।"

শুনিয়া সুবোধ মনে মনে হাসিল। বিবির বিরহে মানুষের অন্তরে যে কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সে এতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

সুবোধ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা দুজনে এই পাঁচ পাঁচ টাকা বখশিশ্ নাও।"

পর মুহূর্ত্তেই সুবোধের গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। রাত্রি তখন এগারোটা। শীতল নৈশ বায়ু তাহার ললাটের ঘর্ম্ম অপনোদন করিয়া দিল। সুবোধ মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব লঘুতা অনুভব করিল। বারম্বার অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—"এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ। কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে!"

চক্রবেড়িয়া রোডে অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে সুবোধের গাড়ী দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া মুক্ত দুয়ারে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। একেবারে অবিনাশচন্দ্রের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। কেরোসিনের ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। অবিনাশচন্দ্র বিছানায় আড় হইয়া শুইয়া। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুবোধ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"সুনীতি?"

অবিনাশচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিলেন—"সুনীতি কি?"

"সুনীতি এসেছে?"

অবিনাশচন্দ্র আবার হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"কোথা থেকে নেশা করে এলে? কি ভুল বক্‌ছ যে হে!"

সুবোধ হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এই সময় তাহার শ্যালিকা সুমতি প্রবেশ করিলেন। সুবোধকে দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো সাহেব! চন্দ্রশেখর অভিনয়টা কেমন দেখলে?"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলেন—"আচ্ছা পাগল। পেটে এক মিনিট কথা থাকে না? আমি ভায়াকে একটু চান্‌কে নিচ্ছিলুম।"

সুবোধ বলিল—"খুব লোক যা হোক্। এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে!"

মহা হাসি পড়িয়া গেল। সুমতি ও অবিনাশচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া সুনীতির দুর্গতির ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন। সুবোধ কুলীর সঙ্গে ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধানে প্রস্থান করিলেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে ষ্টার থিয়েটারে হাজির। গাড়ীও ছুটিল, সুনীতিও কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। থিয়েটারের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া গাড়োয়ান আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়োয়ানকে দেখিবামাত্র সাহসে ভর করিয়া সুনীতি বলিল—"চল্ আবার ষ্টেশ্যনে চল্। আমার স্বামীকে ফেলিয়া আসিলি কেন?" গাড়োয়ান আবার হাওড়া ষ্টেশনে যায়। অনেক খুঁজিয়া সুবোধকে পাইল না। তখন কি ভাগ্যিস সুনীতির বুদ্ধি যোগাইল। এখানকার ঠিকানা বলিয়া দিল। দশ টাকা বখশিশ কবুল করিল। আমরা ত মেমসাহেবকে দেখিয়া চিনিতেই পারি না। শেষকালে সুমতি উপসংহার করিলেন—"আহা মরি কিবা ছিরিই বেরিয়েছিল! সে বেশ আর সে অবস্থা দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যদি থিয়েটারে বক্সে নিয়ে যাবারই সাধ, তবে অমন কিম্ভূতকিমাকার না সাজিয়ে, পূজোর সময় সখ করে যে নতুন পোষাক তৈরী করিয়েছ তাই পরালেই ত হত। সেও শাড়ী হোক, কিন্তু এ কালের ছাঁদের কত সুন্দর! যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোন তাঁরা ত ঐ পরে বেরোন, তাঁরা ত আর গাউন পরতে যান না। এ বুদ্ধিটুকু তোমার ঘটে কেন জোটেনি?"

সুবোধ মহা অপ্রতিভ হইয়া ভাবিল—"তাই ত!"

বৃত্তান্ত শেষ হইলে সুমতি সুবোধকে ডাকিল—"এখন এস সাহেব মশাই! তোমার বিবির সঙ্গে দেখা করবে এস। সে ত এসে অবধি জল-গেলাসটি অবধি খায়নি, কেঁদে কেঁদে মরছে। এই এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে ওঠাইগে চল। তোমার অবস্থাটা কি হয়েছিল সব বলবে এস।"

[শ্রাবণ, ১৩০৬]

দেবী

সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা।

পৌষ মাসের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়শী পত্নী এক পাশে গুটিসুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানা চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক রহিতেছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই;—পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস উমাপ্রসাদেব পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব কবিতে আরম্ভ করিযাছে। পাঁচ ছয় বৎসব পূর্ব্বে তাহাব বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতাব সূত্রপাত এই নূতন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীবে ধীবে পত্নীর মুখচুম্বন কবিল।

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিঃশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহাব ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিযাছে। মৃদুস্বরে ডাকিল—"দয়া।"

দয়া বলিল—"কি"। "কি-টা খুব দীর্ঘ করিযা বলিল।

"তুমি বুঝি জেগে রয়েছ?"

দযা ঢোক গিলিয়া বলিল—"না ঘুমুচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর কবিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিযা আনিল। বলিল—"ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তব দিলে কে?"

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন? ঠিক কোন্ সময়?"—উমা ভাবি দুষ্টু।

"কোন সময় আবাব?—সেই তখন!"

"কখন?"

"যাও আমি জানিনে।"—বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবাব বৃথা চেষ্টা কবিল।

ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিযৎক্ষণ মান অভিমানের পব দয়ার পরাজয় হইল। উত্তব দিল "সেই যখন তুমি"—বলিয়া থামিল। "আমি কি করলাম?"

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যখন তুমি আমায চুমু খেলে—হল। মাগো মা! এত জান!"

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনেব কত কথা আবম্ভ হইল। অধিকাংশ কথাবই না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। হায়, শত বৎসব পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণেব তরুণবযস্ক পিতামাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত এমনি চঞ্চল মতি গতি ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ যে পর্যন্ত একদিনও স্ত্রীব নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকন্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমানিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।"

দয়া বলিল—"তোমার আবার চাকরি করা কেন? তোমার কিসের দুঃখ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে নাকি?"

"আমার এখানে দুঃখ আছে বইকি।"

"কি?"

"তুমি যদি আমার দুঃখ বুঝবে তা হলে আর আমার দুঃখ কিসের!"

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি দুঃখ?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি আসিল। বলিল "তোমার কি দুঃখ?" আমি বুঝি মনের মত হইনি?" দয়া জানিত এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—

আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব, সারাদিন সারারাত!"

"চাকরি করবে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাকবে কেমন করে? আমাকে ত একলা ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে।"

"কাছারি গিয়ে খুব শিগগির ফিরে আসব।"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা বিপত্তি যে অনেক।

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন?"

"এখান থেকে কি নিয়ে যাব? যখন শুনব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ তখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব নাকি?

"কতদিন আমরা থাকব সেখানে?" "অনেক বচ্ছর থাকব।"

দয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিল—"খোকাকে ফেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাকতে পারব?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কানের কাছে বলিল—"ততদিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়া ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসনে বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর; খোকা বাড়ীসুদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। খোকার মা হরসুন্দরী—তাঁর ত আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—"আজ এখনো খোকা এল না কেন?—ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে একমুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে—ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা কাকীমা বলিয়া কান্না জুড়িয়া দেয়। এই প্রগলভতা, এই অন্যায় আবদারের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা

পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ, ও ছোট বউ, এই নে তোর খোকাকে।" বলিয়া দয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, "কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পানের ডিবায় কোনও দিন কদা , কোনও দিন বাতাসা কোনও দিন নারিকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকে, তাই খোকা ভক্ষণ ক রে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এখনও খোকা আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল—"বাছার অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষবহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল—"রাত আর বেশী কই?"

শীতেব হিমবায়ু হু হু কবিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুজনে সেই অল্পালোকে পবস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল—"দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও খোকার আসবার সময় হয়নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে সে দিন ত আসতে দেরীও হয়। তোমার মন সেজন্যে খারাপ হয়নি। কেন হয়েছে আমি জানি।"

"কেন বল দেখি?"

"বলেছি কি না আমি পশ্চিমে যাব চাকরি করতে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজেব আরও কাছে টানিয়া লইল।

দযা একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন আব তোমাব সঙ্গে দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছপালা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। জানালা বন্ধ কবিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা আধটা পাখীর ডাক শোনা গেল। পরস্পরের বক্ষোনিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধ্রপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখনও দুইজনে নিদ্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন—"উমা"।

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল দয়ার। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবার ডাকিলেন—"উমা"। স্বরটা কম্পিত, যেন অন্যরূপ ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন?—তবে সত্য সত্যই খোকার কিছু অসুখ বিসুখ করিয়াছে বুঝি উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমাল্য লম্বমান। এ কি! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্য দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এই চিন্তাপরাম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোটবউমা কোথায়?"

স্বর পূর্ব্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছুদূরে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

কালীকিঙ্করও সেইদিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরেব এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—"মা আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু এতদিন কেন বলিসনি মা?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা ইঁহাকে প্রণাম কর।"

"উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!—আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?"

"উন্মাদ হইনি বাবা! এতদিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আবোগ্যলাভ কবেছি, সেও মার কৃপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতাব কথায় কিছুই অর্থগ্রহণ কবিতে পারিল না। বলিল—"বাবা! আপনি কি বলছেন?"

কালীকিঙ্কব বলিলেন—"বাবা! আমার বড় সৌভাগ্য। যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এত দিন যে সাধনা, যে আবাধনা কবলাম, তা নিষ্ফল হয়নি। মা জগন্ময়ী কৃপা কবে ছোটবউমাব মূর্ত্তিতে আমাব গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হযেছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমাব জীবন ধন্য হল।"

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে; এই দিবসত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূব ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশেব বহু গ্রাম হইতে বহুজন আসিযা প্রসিদ্ধ শাক্ত জমিদাব কালীকিঙ্কর রায়েব বাটীতে দযাময়ী-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে দর্শন কবিযা গিযাছে।

দয়ামযীব রীতিমত পূজা আবম্ভ হইয়াছে। ধূপ দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, ষোড়শপচারে তাঁহার পূজা হয়। এ কয়দিনে দয়ামযীর সম্মুখে বহুসংখ্যক ছাগবলি হইযা গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবীব পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহাব নিদ্রা এক প্রকাব ত্যাগ কবিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায তাহাকে এমন অভিভূক্ত বিপর্যস্ত কবিয়া ফেলিয়াছে যে, সে দুই দিন আগে এ বাটীব বধূ ছিল, শ্বশুব ও ভাসুবেব সাক্ষাতে বাহিব হইত না, এ সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আব তাহাব মুখে অবগুণ্ঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শূন্য-দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহাব কণ্ঠস্বব অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, বক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসম্বৃত নহে।

বাত্রি দ্বিপ্রহব। পূজাব ঘরে একটি কোণে ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমী বস্ত্রের আবরণ, তাহাব উপর দয়াময়ী শয়ন কবিয়া আছে। গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরেব মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উষাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া! একি হল?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা কথা শুনিল। এ-তিন দিন কেবল ভক্তগণের 'মা মা' শব্দে তাহার হৃদয়দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীব মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহাব প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃষ্টি কবিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়েব শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিতস্বরে বাবংবাব বলিতে লাগিল—"দয়া। একি হল—একি হল?" দয়া নির্ব্বাক্।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীবব রহিল। তাবপরে বলিল—"দয়া। তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি? তুমি আমাব দয়া নও, তুমি দেবী?"

এইবাব দয়া কথা কহিল—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমাব দয়া ছাড়া আব কিছু নই—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীব মুখচুম্বন করিল। বলিল—"দয়া। তবে চল আমবা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাকব, যেখানে কেউ আব আমাদের সন্ধান পাবে না।"

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক করব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গিব ঠিক কব—নইলে বেশী দিন আমি বাঁচব না। আমাব প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া।—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আজ শনিবাব। আগামী শনিবাব রাত্রে তোমার কাছে আসব আবাব—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ কবব। এই সাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।" দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না পড়ে"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন কবিয়া বিদায় লইল।

পবদিন প্রভাতে দয়াময়ীব পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামেব একজন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভব করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব কোটরাগতগর্ত চক্ষু দিয়া দব দব ধাবায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহাব সম্মুখে জানু পাতিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমি চিবকাল তোমায় পূজা কবে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা! আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধেব পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পুবোহিত বলিলেন—"কেন দাদা! তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয়দিন জ্বরবিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচিলে আমার বংশলোপ হবে আমার ভিটের সন্ধ্যে দেবাব আর কেউ থাকবে না। তাই মার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কব চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীব মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো। বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—"দাদা! তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমেব বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুশি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী, দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।" কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন, আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্বে আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষ শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অতি সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতেই অপর একজন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিন দিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায় এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ-খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি জুটিবে না? নিশ্চয় জুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। একদিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিলেন যে দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম? ওঠ চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায়?"

"কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছ কোথায়? চল—আজ রাত্রে নৌকো করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ—ওঠ, পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ করো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—"না না, হয় ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—"দয়া, তুমিও পাগল হলে?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন? তা হলে কি দেশসুদ্ধ লোক পাগল?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই হয় ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল?"

দয়াময়ী এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল—"দয়া আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বই কি।"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই,—আমিও দেবতা আমি স্বয়ং মহেশ্বর।"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এখানে যত দিন থাকব, ততদিন তোমার আমার বিচ্ছেদ থাকবে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল।"

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌঁছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছুদূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না।" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদোয় হইল না। দয়া বলিল, "আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি,

দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহার বড়বধূ হরসুন্দরী-খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড়বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি আমার এ কি হল?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি করবো বোন ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জ্বর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্ষুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওব কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, মাতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য কবেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবরদার ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খোকাব যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তাবাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকাব মা একদিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিবাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু বোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—"মাঠাকরুণকে বলিস, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগো কিছু ওষুধ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে—"ওমা ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘবে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।"

খোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, "খোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। খোকা অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একান্ত মনে একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া

আসিল—দয়াময়ীকে বলিল—"রাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ করতে পারলি নে?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল—"ও দেবী কোথায়? ও ডাইনি। দেবী কখন ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

দয়াময়ী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজকে উদ্দেশ্য করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল;—আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমবাজা খোকাব প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না। তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল। পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।
[ভাদ্র, ১৩০৬]

ভিখারী সাহেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখসিসের প্রলোভন দেখাইয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, আব ট্রেনখানিও ছাড়িয়া দিল। মহা মুস্কিল। সন্ধ্যাব পূর্ব্বে আর গাড়ী নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম একটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিয়ারিতে ফিরিবাব এমন যে কিছু তাড়াতাড়ি ছিল তাহা নহে, তবে এখন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ট্রেনের প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ কালটা যে কাটাইব কিছু সম্বল ছিল না।

গাড়ী হইতে নামিলাম। ঘোড়া দুইটা তখনও হাঁফাইতেছে। তাহাদের গাত্র বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম্মজল মাটিতে পড়িতেছে। গাড়োয়ান বেচারার মুখখানি ম্রিয়মাণ; সেলাম কবিয়া বলিল—"হুজুর আমার কিছু অপরাধ নাই। জানোয়ার দুটাকে মারিয়া ফেলিয়াছি বলিলেই হয়।"—কথাটা মিথ্যা নহে। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কার দিলাম। তখন তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

আমার চাকর হরি তেওয়ারি বলিল—"বাবু! ওয়েটিং রুমে জিনিবপত্রগুলা লইয়া যাই?" নিকটে একটা প্রকাণ্ড সুচ্ছায় নিমগাছ ফুর ফুর করিয়া প্রাণ-কাড়িয়া-নেওয়া চৈতী হাওয়া বহিতেছে—গাছটার তলদেশের প্রতি আমি কিয়ৎক্ষণ লুব্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। চাকরটা অনেককাল আমার সঙ্গে ঘুরিয়াছে—আমার মুখ দেখিয়া আমার মনের ভাব বুঝিতে পারে। বলিল—"হুকুম হয় ত এই গাছের তলাতেই বিছানা বিছাই।" আমি বলিলাম—"তাই বিছাও, এইখানেই একটু আরাম করি।"

বৃক্ষতলে সুকোমল হরিদ্বর্ণ শষ্পরাজির উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর শতরঞ্চ বিছাইয়া, একটি তাকিয়া রাখিয়া, হরি তেওয়ারি আমার বিছানা করিয়া দিল।

আমি জুতা ছাড়িয়া কোটটা খুলিয়া বাখিয়া একটা সুদীর্ঘ আঃ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তাকিয়া হেলান দিলাম। তেওয়াবি গুড়গুড়িতে জল ফিবাইয়া তামাক সাজিতে গেল।

তেওযাবি চক্ষুব অন্তবাল হইবামাত্র একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ইংবাজ আসিয়া আমাব বিছানাব কাছে দাঁড়াইল। টুপি খুলিযা ইংবাজিতে বলিল—"যীশু খ্রীষ্টেব নামে আমাকে একটি পয়সা দিন।"

লোকটির পবিচ্ছদ একটু মূল্যবান কিন্তু খুব পুবাতন সিল্ক হ্যাট, তাহাব উপরকাব কাপড়টিতে এত ধূলা জমিয়াছে যে তাহাব আদিম কৃষ্ণবর্ণ এখন ধূসববর্ণ ধাবণ কবিযাছে। তাহা যে সিল্ক তাহাও কষ্টে ঠাহব হয়। বস্ত্রাদি, তাহাও তদবস্থ। কলাব, নেকটাই—অনুষ্ঠানেব ত্রুটি কিছুই ছিল না। মাথার চুলগুলা বড বড—বাতাসে এদিক ওদিক উডিতেছে। বযস ষষ্টি বৎসবেব কম হইবে না। লোকটাকে হঠাৎ বিনা কাবণে আমাব মনে কেমন একটা কৌতূহল জাগিযা উঠিল। ভাবিলাম ইহাব অন্তবালে নিশ্চযই একটা ভগ্নজীবনেব সকরুণ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস শ্রবণ কবিবাব জন্য আমাব মন ব্যগ্র হইযা উঠিল। ভাবিলাম যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ ইহাকে লইযাই সময় যাপন কবি।

তাহাকে বলিলাম—"এইখান বস।" কি আপদ। আমাব বিছানায় বসিতে চায়। যদিও আমি ব্রাহ্ম মানুষ, স্পর্শদোষ মানি না, তথাপি ঐ একটা জীবন্ত ভূতকে কি বিছানায় বসিতে দিতে পাবি? তাডাতাডি বলিলাম—"এই নীচে ঘাসেই বস না।" লোকটা গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"মহাশয়! আমাব কাপড ময়লা হইয়া যাইবে যে।"

শুনিযা হাসি পাইল। ভাবি পবিষ্কাব কাপড কিনা! আমাব বিছানাব তলা হইতে কম্বলখানা টানিয়া বাহিব কবিয়া দিলাম। লোকটা পা দুটা ছডাইয়া বসিল। আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল—"চুরুট খাইবে?" আমি বলিলাম—"না তুমি খাও।"

লোকটা চুরুট বাহিব কবিল। অতি উৎকৃষ্ট হাভানা জাতীয় চুরুট। বড বিস্মিত হইলাম। এই ভিখাবী এত মূল্যবান হাভানা কোথায় পাইল? কাহাবও চুবি টুবি কবিয়া আনে নাই ত?

ইত্যবসবে আমাব চাকব গুডগুডি ভবিযা উপস্থিত হইল। আমিও তাম্রকূট সেবন আবম্ভ কবিলাম। তেওযাবি অপ্রসন্ন কুটিল দৃষ্টিতে ভিখাবি সাহেবেব পানে চাহিয়া বহিল।

উভযে ধূমপান কবিতে কবিতে কথাবার্ত্তা আবম্ভ হইতে লাগিল। নাম বলিল—হেন্‌বি। আমি বলিলাম—"ও ত গেল তোমাব ক্রিশ্চান নেম্, তোমাব সবনেম কি?" সে বলিল—"আমাব সব্‌নেম নাই।" জীবনেব ইতিহাস কিছুই বলিতে চাহে না। শুধু বলে—"আমি অতি দবিদ্র, খাইতে পাবি না, পথে পথে ঘুবিযা বেডাই।" জিজ্ঞাসা কবিলাম—"তোমাব আব কেহ আছে?" সে বলিল—"আমাব মা বাপ কেহই নাই, আমি একটি অনাথ বালক।" বালকই বটে! আবাব জিজ্ঞাসা কবিলাম—"স্ত্রী, পুত্র পবিবাব?" সে বলিল—"স্ত্রী পুত্র পবিবাব আমার কেহই নাই।"

আমাব মনে একটা মৎলব আসিল। ভাবিলাম অনেক বাঙ্গালীই ত সাহেব হইয়াছে, একটা সাহেবকে বাঙ্গালী কবিয়া দেখিলে হয়। ইহাকে আমাব কয়লাব খনিতে লইয়া গিয়া কুলীব সর্দ্দাব কবিব, ভাত ডাল খাওয়াইব, ধুতি চাদব পবাইয়া বাখিব। যদি বাজি হয়, তবে এ একটা অভিনব দর্শনীয় পদার্থ হইবে—ইহাকে কুড়াইয়া লইযা যাই।

প্রস্তাব কবিলাম। হেন্‌বি মহা উৎসাহেব সহিত সম্মতি জানাইল। বলিল—"ও ইয়েস বাবু, আমি বাঙ্গালী হইব। আমাদের জাতি বাঙ্গালীকে অত্যন্ত ঘৃণা কবে। আমি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া আমাদের স্বজাতিব পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত কবিব। জগৎকে দেখাইব যে বাঙ্গালীরা হেয় পদার্থ নহে।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম জগতের কর্ণে যদি তোমাব বাঙ্গালী হওয়াব

সমাচার পৌঁছে তবে জগৎ বলিবে তুমি অন্নদায়ে এ কাজ করিয়াছ। বলিলাম—"তবে চল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী। কোথাও তোমার কিছু জিনিষপত্র থাকে যদি লইয়া আইস।"

সে বলিল—"বাবু, আমার আর কোথাও কিছু নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সেখানে ভাল হাভানা পাওয়া যায় ত?"

আমি বলিলাম—"এত খবর রাখি না, বোধ হয় পাওয়া যায় না।"

হেন্‌রি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"বাবু! তবে আমার যাওয়া হইল না।"

অদ্ভুত লোক! এ দিকে অন্ন জুটে না, অথচ হাভানা চুরুটটি চাই। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আশ্রয় দিতে চাহিলাম, অন্নের সংস্থান কবিয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু এক হাভানা চুরুটের জন্য সকল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই অদ্ভুতত্বের জন্যই তাহাকে সংগ্রহ কবিবার নেশা আমাব বাড়িয়া উঠিল। বলিলাম, "তুমি যদি চাও ত আমি কলিকাতা হইতে হাভনা আনাইয়া দিতে পারিব। প্রতি সপ্তাহে একজন করিয়া আমাব চাপরাসি কলিকাতায যায়।"

শুনিয়া হেন্‌বি মহা খুসী। আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বলিল—"বাবু, আমার একটি হাভানা তোমাকে খাইয়া দেখিতেই হইবে।" আমি চুরুট বড় একটা খাই না, কিন্তু হেন্‌বি নাছোড়বান্দা। লইলাম একটি। দিব্য জিনিস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেন্‌বি খুব কাজেব লোক বটে। আমার বাহিরের ঘবে তাঁহাকে স্থান দিযেছি। বাঙ্গালী সাজাইযাছি। বাঙ্গালীব বেশ তাহাব অঙ্গে এমন মানায়! সম্প্রতি আমাব একটি ইংবাজ বন্ধু আমাব সঙ্গে দেখা কবিতে আসিযাছিলেন। তিনি হেন্‌রিকে দেখিয়া হেন্‌বিব ইতিহাস শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইযাছেন। তাহাব একখানি ফোটোগ্রাফ তুলিয়া "ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন" এব "কিউবিযসিটি কলম" এব জন্য পাঠাইযা দিয়াছেন। নিম্নে লিখিয়া দিযাছেন—"বাঙ্গালী পবিচ্ছেদে ইংবাজ।" হেন্‌বিব একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখিয়া দিয়াছেন। ছবিটি ষ্ট্র্যাণ্ডে প্রকাশিত হইলে অনেক সাহেব বাঙ্গালী পবিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে পারেন। খাইযা-দাইয়া এখন হেন্‌বিব চেহাবায় অনেক পরিবর্ত্তন হইযাছে। বাস্তবিক সেই তেজোদৃপ্ত ইংবাজ-মূর্ত্তি বাঙ্গালীব পবিচ্ছদে এক অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য। কুলীগুলো তাহাব এমনি বশীভূত হইয়াছে। আমাকে যদি দিনে দুইবার সেলাম করে ত তাহাকে দশবাব করে।

শুধু হেন্‌রি আমায় কুলী খাটাইয়া নিরস্ত নহে;—আমার বড় মেয়ে গিরিবালাকে ইংবাজি পড়াইতে আরম্ভ কবিয়াছে। মেযেটাও হেন্‌বির এমন নেওটা হইযাছে। এই মাসখানেকেব মধ্যেই তাহাকে এক বকম চলনসই বাঙ্গালা শিখাইয়া লইয়াছে। তাহাকে সে বলিত হেন্‌বি কাকা। প্রথম দিন শুনিয়া ত আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। গিরিকে (গৃহিণীব সাক্ষাতে) বলিলাম, "কাকা কি রে রাক্কুসি? ও তোর বাবার চেয়ে বয়সে ছোট না কি? জ্যেঠা বল্‌। নয় ত মামা বল্‌।"—তাহাব পব হইতে গিরি তাহাকে হেন্‌রি দাদা বলিয়া ডাকিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গিবিবালা জ্বরে পড়িল। দুই তিন দিন সকালবেলা ভিজিয়া ভিজিযা ফুল তুলিয়াছিল। আমি ভোরে চা খাইয়া আফিসে চলিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্য করিত না। এই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহার সর্দ্দিজ্বরের মত হইল। প্রথমে আমরা ততটা খেয়াল করি নাই;—অমন জ্বর ত ছেলেপিলের মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। দুইটা উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে।

পাঁচ ছয় দিনে জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে আমাদের কলিয়ারির নেটিভ্ ডাক্তারবাবুটি চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া রাণীগঞ্জ হইতে এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জনকে প্রত্যহ একবার করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

হেন্‌রি তাহার ছাত্রীর মাথার শিয়রে বসিয়া খুব সেবাটা করিতে লাগিল। আমরা বাপ মায়ে যা সেবা না করিলাম, তা সে হেন্‌রি করিল। তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল বলিলেই হয়। ঔষধ পথ্যাদির সম্বন্ধে আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে হেনরি রাগিয়া অনর্থপাত করিত।

মাঝে একদিন এমন অবস্থা হইল যে, বুঝি রাত্রি আর কাটে না। আমার স্ত্রী ত মেয়ের রোগশয্যা ছাড়িয়া ও ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। রাণীগঞ্জের ডাক্তারবাবুটি অন্য দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেন, সে দিন আর যাইতে পারেন নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন রাত্রি দুইটা হইবে তখন ডাক্তারবাবু নূতন একটা ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যখন যে ঔষধ দেওয়া হইত হেন্‌রি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। প্রশ্ন করিয়া করিয়া ডাক্তারকে বিরক্ত করিযা তুলিত। এবার বলিল, "Now, I won't allow that"—অর্থাৎ ও ঔষধ আমি দিতে দিব না। ডাক্তার চটিয়া গেলেন। বলিলেন,—"মহাশয়, এ ব্যক্তি এমন বাধা দেয় কেন?"

হেন্‌রি লোকটা এ দিকে ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি খামখেয়ালি করে। অন্য সময় তাহাতে বরং আমোদ পাইয়াছি, কিন্তু এখন ভারি বিবক্ত বোধ হইতে লাগিল।

হেন্‌রি ডাক্তারকে ষ্টুপিড্ ফুল বলিয়া গালি দিল। আমাকে বলিল—"এ কিছু জানে না, ইহাকে তাড়াইয়া দাও। এখনি রোগীকে মারিয়া ফেলিযাছিল আর কি!" ডাক্তার বলিলেন—"যদি অমন করিয়া আমার চিকিৎসা কার্য্যে বাধা দিবে তবে আমি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া যাইব।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ব্যাপারে আমাদের স্ত্রীপুরুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হেন্‌রিকে বলিলাম—"কর কি? তুমি চিকিৎসার কি জান? ডাক্তার যা ভাল বোঝেন তাই করুন, তার পর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

হেন্‌রি বলিল—অদৃষ্ট আবার কি? জানিয়া শুনিযা এ ঔষধ এখন খাওয়াইলে নিশ্চিত মৃত্যু। আধঘণ্টার মধ্যে গা হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।"

ডাক্তারবাবু হেন্‌রিকে বলিলেন—"তুমি ত ভারি পণ্ডিত দেখিতেছি। কেন, নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে কেন?"

আমি বলিলাম—"হেন্‌রি ডাক্তারবাবু যাহা বলিতেছেন তাহাই আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কোনও আশঙ্কা করিও না।"

শেষকালে হেন্‌রি ডাক্তারকে বলিল,—"আচ্ছা তবে তোমার ঔষধই দাও। কিন্তু যদি আমার মেয়ে মরিয়া যায় তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিসে দিব। আর তুমি যে ঔষধ দিতেছ, তাহার একটা তালিকা করিয়া নাম দস্তখৎ করিয়া রাখ।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হেন্‌রি প্রেস্‌ক্রিপসনখানা লিখিয়া ফেলিল। ডাক্তারকে বলিল,—"সহি কর।"

ডাক্তারবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম ইহাদের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার মেয়ের প্রাণ যায়। আমি ডাক্তারবাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলাম—"মহাশয়! ওটা পাগল, ওর কথা শুনিবেন না। আপনি যে ঔষধ ইচ্ছা তাহাই দিন।" প্রেসক্রিপসনখানা হেন্‌রির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

ঔষধ দেওয়া হইল। হেন্‌রি রোষকষায়িত লোচনে বলিল—"ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন।" ডাক্তারের কাছে একটা উৎকৃষ্ট থার্ম্মিটার ছিল, অর্দ্ধ মিনিট রাখিলেই কার্য সম্পন্ন হয়। পাঁচ মিনিট অন্তর তাপ লওয়া হইতে লাগিল। হু হু করিয়া টেম্পারেচার নামিতেছে।

ডাক্তারের মুখ শুকাইয়া গেল। মেয়ের হাত পা শীতল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

হেন্‌রি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দেখ মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। আমি উহাকে হত্যা করিব।" এই বলিয়া সে ক্ষিপ্তের মত ডাক্তারের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে চাহিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার। ডাক্তারবাবু এ ব্যাপার দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহার বাঙ্গালী-প্রাণ আর তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দিত কি না সন্দেহ। আমি হেন্‌রিকে বলিলাম,—"দেখ, তুমি যখন এতই জান, তবে এখনও যদি কিছু প্রতিকার থাকে ত কর।" আমার স্ত্রী বলিলেন—"হেন্‌রি এ মেয়েকে তুমি যদি বাঁচাতে পার, তবে এ মেয়ে তোমাকে দিলাম।"

হেন্‌রি বলিল—"এ মেয়ে আমাকে দিলে?" আমার স্ত্রী বলিলেন—"দিলাম।"

হেন্‌রির মুখ আনন্দপূর্ণ হইল। সেই বিপদের সময়ও তাহার ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। লোক্‌টা পাগল নাকি?

হেন্‌রি বলিল—"ঈশ্বর সাক্ষী, এ মেযেকে যদি বাঁচাইতে পারি, তবে এ মেযে আমার?"

আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হাঁ হেন্‌রি এ মেয়েকে যদি বাঁচাইতে পার ত এ মেয়ে তোমার।"

হেন্‌রি বলিল—"আচ্ছা তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" বলিয়া ডাক্তারের ঔষধের বাক্সটা কাছে টানিয়া লইল। ক্ষিপ্র হস্তে এ ক্টা ঔষধ প্রস্তুত করিল। খানিকটা গিরির মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু কে গিলিবে? ঔষধ ঠোঁটের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া হেনরি সূচের মত কি একটা যন্ত্র বাহির কবিল। তাহা ঔষধ সিক্ত করিয়া গিরির দেহের স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিয়া 'ইল।

পাঁচমিনিট পবে শরীব উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টা; তখন আবার গিবিবালার পূর্ণ জ্বর! হেন্‌রি আহ্লাদে আটখানা। বলিল—

ঈশ্ববেব সহস্র ধন্যবাদ; এ যাত্রা ইহা ক বাঁচাইতে পারিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের কৃপায হেন্‌রির চিকিৎসা-গুণে, গিরিবালা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। সপ্তাহের পর পথ্য লাভ করিল। হেন্‌রি সর্ব্বদা তাহার কাছে কাছে থাকে। কুলীব সর্দ্দারি করা সে একেবাবে ছাড়িয়া দিযাছে।

দিন দিন কিন্তু হেন্‌রির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আজ দুই দিন তাহাব হাভানা ফুবাইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় চাপরাসি পাঠাইল না। হেন্‌রির হাভানা ফুরাইলে নিয়মিত দিনে দুই চাবি দিন পূর্ব্বেও চাপরাসিকে এখন কলিকাতায পাঠান হয়। হেন্‌রি সদাই অন্যমনস্ক, কি ভাবে। মুখখানি ম্লান করিয়া থাকে। কেবল গিরিবালা কাছে আসিলেই যেন তাহার মনে অন্ধকাব দূর হয়, মুখে হাসি ফুটে।

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেন্‌রি তোমার কি হইয়াছে বল ত, তুমি সর্ব্বদা ভাব কি?"

হেন্‌বি বলিল—"বাবু আমি আমার ভূত জীবনেব ইতিহাস ভাবি। একটু একটু করিযা আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যাই, আবার ভাল হই। এবার আমার ভাল হইবার সময় আসিয়াছে।"

ভারি বিস্মিত হইলাম। হেন্‌রি পাগল? কই পাগলের কোনও লক্ষণ ত দেখি নাই। তথাপি কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না। এটা আমি ববাবর লক্ষ্য করিয়াছি, হেন্‌রির কথাবার্ত্তা নিতান্ত পথে কুড়ানো ভিখারীর মত নহে। তা ছাড়া, গিরিবালার রোগের সময় চিকিৎসাশাস্ত্রে সে ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যেব পরিচয় দিল। ও হয়ত কোথাও একটা বড়গোছের ডাক্তার ছিল, এখন পাগল হইয়া গিয়াছে। হেন্‌রিকে নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। সে স্বয়ং স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছিল, তার বেশী আর একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

এই সময় গিরিবালা আসিয়া হেন্‌রিকে ডাকিল। হেন্‌রি বালকের মত প্রফুল্ল ও চঞ্চল হইয়া গিরিবালার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, পাগলই বটে। নহিলে এত সত্বর উহার ভাব-পরিবর্ত্তন হয় কেন? সহজ মানুষ বিষণ্ণ হইলে, প্রফুল্লতা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে। পাগলের সে সময়টুকু আবশ্যক হয় না।

কিয়দ্দিন পরে আমি কলিয়ারির আফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, দারোয়ান একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত আমার সেই ইংরাজ-বন্ধু মরিসন্ স্বয়ং উঠিয়া গিয়া সমাদর কবিয়া বন্ধুকে লইয়া আসিলাম। অভিবাদন ও প্রথম শিষ্টাচার বচনাদির পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—"আপনাব সে ইংরাজ বাঙ্গালী কুলীর সর্দ্দারটি আছে ত?"

"আছে বইকি! কেন বলুন দেখি?"

"তাহা হইলে আপনি ভারি বিপদে পড়িয়াছেন!" এই বলিয়া মরিসন্ মুখখানি অতিশয় গম্ভীর করিলেন।

আমি একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর। হেন্‌রি একজন ফেরারি আসামী। ও লণ্ডনের নিকট একটা জেলে আবদ্ধ ছিল। দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাব অপরাধে অপরাধী, উহার প্রাণদণ্ড হইত। জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় দিয়া আপনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।"

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নিজের জন্য নহে, হেন্‌রিব জন্য। হেন্‌রিকে আমরা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। হেন্‌রি এমন ভাল, উহাব ভৃত্য জীবন নরশোণিতে কলঙ্কিত? দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? উহাব প্রাণদণ্ড হইবে? হেন্‌রি যে আমাদেব পরমাত্মীয়ের মত! হেন্‌রি যে আমার প্রাণাধিকা কন্যাব জীবনদাতা! উহাব ফাঁসী হইবে?

বন্ধু বলিলেন—"এখন কি উপায় ভাবিতেছেন? এইবেলা পুলিস ডাকিয়া উহাকে ধবাইয়া দিন, তাহা হইলে প্রমাণ কবা সহজ হইবে যে আপনি যে উহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা না জানিয়া।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"হেন্‌বিকে আমি ধবাইযা দিব? বরং উহাকে এখনি গিয়া সাবধান করিয়া দিব।"

মরিসন্ পা দুটা খুব ফাঁক কবিয়া দিয়া, চেয়াবেব পৃষ্ঠে এলাইয়া পড়িয়া যেন ভাবি নিরাশ হইয়া বলিলেন—"বাবু আপনি একজন সুশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি হইয়া এমন কথা বলিতেছেন? আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য শিকাবকে কাড়িয়া লইবেন? সকলেই যদি আপনাব মত এইরূপ ভাবাপন্ন হয় তবে ত এই সুবিপুল সুখময় জনসমাজস্বরূপ অট্টালিকা দুইদিনে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়!"

আমি ভারি দমিয়া গেলাম; কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু আমি কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ নীতি অনুসাবে আমাব কন্যার প্রাণদাতার প্রাণদণ্ডে সহাযতা করিব?

মরিসন্‌কে বলিলাম—"হেন্‌রি যদি প্রকৃতই অপবাধী হয়, তাহা হইলে সে বাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিযা উহাকে ধবাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

মরিসন্ বলিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন যে উহাকে আপনি সাবধান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিবেন।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"কই তাহা ত আমি বলি নাই। উহাকে সাবধান করিয়া দিব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিব এমন কথা কখন বলিলাম?" মরিসন্ ইহার উত্তর দিবাব পূর্ব্বেই আবার বলিলাম—"যদিও ধর্ম্মতঃ আমার তাহাই করা উচিত বটে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" আমি গিরিবালার রোগ এবং হেন্‌রি কেমন করিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বলিলাম।

শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এ সকল সংবাদ আপনি পাইলেন কোথা বলুন দেখি?"

তিনি বলিলেন "মনে আছে হেন্‌রি যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন আমি তাহার বাঙালী পরিচ্ছদ দেখিয়া অত্যন্ত হাসি এবং তাহার ফোটোগ্রাফ তুলিয়া লই?"

"মনে আছে।"

"সেই ফোটোগ্রাফ্ আমি লণ্ডনের ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। উহা ঐ পত্রের কিউরিয়াসিটির ভিতর মুদ্রিত হইয়াছে। সে ছবি দেখিয়া লণ্ডন-পুলিস হেন্‌রিকে চিনিতে পারিয়াছে। হেন্‌রিকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস-কমিশনারকে তাহারা অনুরোধ করিয়াছে। পুলিস-কমিশনার আমার কাছে হেন্‌রির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।"

"আপনি ঠিকানা বলিয়াছেন?"

"কি করিব আইন অনুসারে আমি বলিতে বাধ্য।"

শুনিয়া আমি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। হেন্‌রিকে বাঁচাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। আহা! বুড়া বয়সে বেচারির অদৃষ্টে এই লেখা ছিল? আর আমার চোখের সম্মুখে তাহাকে হাত-কড়ি লাগাইয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই বা কি করিয়া সহ্য কবি! আমি কি তাহার জন্য কিছুই করিবার অধিকারী নহি? আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেন আমি বাহাদুরী করিয়া তাহাকে বাঙ্গালীর কাপড় পরাইলাম; তাহা না করিলে ত ষ্ট্র্যাণ্ডে তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইবার অবসর হইত না! আমি যদি আমার প্রাণাধিকা দুহিতার জীবনদাতার প্রাণরক্ষার জন্য সচেষ্ট হই, তবে কি তাহা অন্যায়—অধর্ম্ম? আইনের চক্ষে আমি দোষী হইলেও হে ঈশ্বর, তোমার চক্ষেও কি তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে? পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম নহে?

আমি মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছি—হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। আমার বন্ধু হা হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভারি বিরক্ত হইলাম। মানুষ না পিশাচ? এই কি হাসিবার সময়? বিরক্তভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে আর আপনাকে কষ্ট দিব না। হেন্‌রি আপনার এবং আমার মতই সাধু সজ্জন ব্যক্তি। এবং উহার নাম শুধু হেন্‌রি—সার হেন্‌রি রবিন্সন্।"

আমি ত অবাক । সার হেন্‌রি রবিন্সন্ কি আবার? আমার বন্ধু উন্মাদ হইয়াছেন নাকি? বলিলাম—"কি বলিতেছেন আপনি?"

"বলিতেছি এই কথা যে, আপনার ঐ কুলীর সর্দ্দারটি একদিন হাউস অব্ কমন্সে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।"

আমার মনে হইল এ সকল প্রসঙ্গ এমনি অসম্ভব যে, হয় ত আমি জাগিয়া নাই, স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। বন্ধু আমার মুখের ভাব দর্শনে সমস্তই বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। আমার হাতে একখানি বড় লেফাফা দিলেন। তাঁহারই স্বনামীয় পত্র, বিলাতী ডাকে আসিয়াছিল, শীলমোহর করা রেজেষ্ট্রী করা ছিল। চিঠি বাহির করিয়া আলোকের কাছে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

এখানি ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনের কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ" ফোটোগ্রাফ্খানি আমরা সাদরে ষ্ট্র্যাণ্ড

ম্যাগাজিনের কিউরিয়সিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। ইহার মূল্যস্বরূপ একখানি চেক্ পাঠাইলাম, প্রাপ্তিস্বীকার করিলে বাধিত হইব।

আপনি এই ফোটোগ্রাফ্‌খানি পাঠাইয়া শুধু আমাদের পাঠকের আমোদের আয়োজন করেন নাই, পরন্তু বেচারি "হেন্‌রির" বড়ই উপকার করিয়াছেন। উঁহার পুরা নাম সার হেন্‌রি রবিন্সন। অদ্য প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

সার হেন্‌রি লণ্ডন-সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক। উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুইবার পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি একজন পারদর্শী ব্যক্তি। গত দশ বৎসর হইতে তিনি এইরূপ ব্যধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যান;—গৃহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যান কেহ সন্ধান পায় না। তাঁহার পাগলামির লক্ষণ এই যে, তিনি নিজেকে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া মনে করেন এবং পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আত্মীয়স্বজনেরা অন্বেষণ করিযা আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন, সব সময়ে যে অন্বেষণে কৃতকার্য্য হন তাহা নহে। একবার পাগল হইলে ছয় মাস আট মাস বা এক বৎসর ব্যধিগ্রস্ত থাকেন। যেবার ধৃত না হন সেবাব আরোগ্যলাভ করিলে নিজেই আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন। যত দিন ভাল থাকেন, ততদিন উঁহার প্রধান কাজ, নিজের জমিদারীভুক্ত দীন দুঃখী প্রজাদেব রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া বেড়ানো।

গত বৎসর শীত-ঋতুতে ইনি রোগমুক্তাবস্থায় বন্ধুগণের সহিত ভাবতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান। তথায় পৌঁছিবাব মাস দুই পরে বন্ধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তাহার পর হইতে বেচারি সার হেন্‌রির জন্য অনেক বিফল অনুসন্ধান হইয়াছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে তাঁহাব ছবি না বাহিব হইলে আবও কত দিন যে এরূপ অনুসন্ধান হইত তাহার স্থিবতা নাই। শুধু ছবি হইতে আমার বন্ধু তাঁহাব খুল্লতাতকে হয়ত নাও চিনিতে পাবিতেন, কিন্তু আপনি যে তাঁহার হাভানা সিগারেব প্রতি একান্ত আনুরক্তির কথা উল্লেখ কবিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আপনি যদি অনুগ্রহ কবিয়া সার হেন্‌বিব বর্ত্তমান ঠিকানা আমাদিগকে জানান, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিবেন। (স্বাক্ষর)

পত্রখানি পাঠ করিয়া বন্ধুকে প্রত্যর্পণ কবিলাম। বলিলাম—"এমন ব্যাপাব!"

মরিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা আপনি এতদিন সাব হেন্‌বিব আচার ব্যবহাবে, কথাবার্ত্তায় কোনও রূপে তাঁহার পবিচয় সন্দিহান হইয়াছিলেন?"

হেন্‌রি সেদিন আমাকে তাহার ভূতজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিযাছিল। তাহাই মবিসন্‌কে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"সুসংবাদ বটে। সার হেন্‌রি তবে আরোগ্যের পথে আসিয়াছেন।"

আমি অনেকক্ষণ নীরব বহিলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি তাঁহাদিগকে হেন্‌রির—অর্থাৎ সার হেন্‌বির—ঠিকানা জানাইয়াছেন?"

"না। জানাইব বলিয়াই ত সংবাদ লইতে আসিয়াছি যে এখনও এখানে তিনি আছেন কি না।"

"তবে সংবাদ দিন। আহা, বেচারা কত কষ্টই পাইয়াছে!"

"তা আর নয়? অত বড়মানুষ হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান! কেমন কবিয়া উহার দিন গুজরাণ হইত কে জানে?"

"দিন গুজবাণ শুধু নহে, হাভানা সিগাব কোথা হইতে আসিত? পাগল সব ভুলিত,—পবিবার, পরিজন, বিষয়, পদমর্যাদা—কিছুই মনে থাকিত না; কেবল হাভানা সিগারটি ভুলিতে পারিত না। মৌতাত এমনি জিনিস!"

মরিসন্ বিদায় গ্রহণ কবিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন—"সাব হেনবিকে কখন, কি ভাবে একথা জানাইবেন?"

আমি বলিলাম—"অবসর বুঝিয়া এক সময় কথা পাড়িব।"

বন্ধু সাবধান করিয়া দিলেন—"দেখিবেন, হঠাৎ না হয়। তাহা হইলে হয়ত বিপরীত ফল হইবে। একটু যা আরোগ্যর লক্ষণ দেখা গিয়াছে তাহা অন্তর্হিত না হইয়া যায়।"

আমি বলিলাম—"সে সাবধানতা অবশ্য গ্রহণীয়। আপনার ষ্ট্র্যাণ্ড-খানা আর চিঠিখানা দিয়া যান।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে হেন্‌রির সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে তাহাকে ষ্ট্র্যাণ্ড-ম্যাগাজিনে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলাম। ছবি দেখিয়া এবং ছবির নিম্নস্থ বিবরণ পড়িয়া সে মৌন হইযা রহিল।

অপরাহ্নে তাহার সহিত আম-বাগানে পদচারণা করিতেছিলাম। খোকার অসুখ করিয়াছে বলিয়া গিরিবালা বেচারি বেড়াইতে আসিতে পারে নাই। ষ্ট্র্যাণ্ডের কথা তুলিলাম। এ কথা সে কথার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্ট্র্যাণ্ডের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

হেন্‌রি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিল—"আছে। কেন?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া হেন্‌রির হাতে ষ্ট্র্যাণ্ড সম্পাদকের পত্রখানি দিলাম। তখনও যথেষ্ট দিবালোক ছিল। হেন্‌রি পত্রখানি হাতে করিয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিতে লাগিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার পত্র?"

"ষ্ট্র্যাণ্ড সম্পাদকের পত্র।"

"না। এ কাহার নামে আসিযাছে? মরিসন্ কে?"

"সেই যে আমার সেই বন্ধু যিনি তোমার ফোটো তুলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মরিসন্। পড় না।"

হেন্‌রি পত্রখানি পড়িল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। যতক্ষণ পত্র পড়িতেছিল, ততক্ষণ তাহার স্বচ্ছ সুন্দর বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত মুখে কত রকমের ভাব খেলিয়া গেল।

পত্র পড়িয়া হেন্‌রি মুখখানি ম্লান করিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"সার হেন্‌রি।"

হেন্‌রি যেন চমকিয়া উঠিল। বুঝিলাম এখনও হেন্‌রি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। পত্রে পড়িল আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াছি, অথচ তাহারা প্রকৃত নামে ডাকাতে সে চমকিল।

হেন্‌রি বলিল—"কি?"

আমি বলিলাম—"আমাদিগকে মাপ কর।"

"কেন?"

"তোমার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলাম না; আতিথ্যের কত ত্রুটি হইয়াছে! কত কষ্ট পাইয়াছ। আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর।"

হেন্‌রি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিযাছ, তাহাতে তোমাদের আশ্চর্য্য সহৃদয়তা, অমায়িকতা ও পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ পাইযাছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমাদের উপকার বিস্মৃত হইব না।"

"আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি সার হেন্‌রি? তুমিই বরং আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাইয়াছ।"

হেন্‌রির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল। গিরিবালার প্রসঙ্গ মাত্রেই সে আনন্দিত হইত। বলিল—"আমি যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাইয়া থাকি, তুমিও ত আমাকে তাহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়াছ।"

আমি মনে করিলাম, হেন্‌রি আতিথ্যের উল্লেখ করিতেছে। বলিলাম—"আমি আর তোমায় কি দিয়াছি? আমি যৎসামান্য যাহা তোমার জন্য কবিয়াছি তুমি আমার কর্ম্মে সহায়তা করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিযাছ।"

হেন্‌বি আবার হাসিল; বলিল—"না না, তাহাব অপেক্ষা তুমি আমাকে ঢের বেশী মূল্যবান জিনিষ দিয়াছ।

"কি?"

"কেন, গিরিবালাকে আমায় দিয়াছ। হাসিলে যে, কেন? ভারি অসম্ভব নাকি? তুমি ত ব্রাহ্ম, তোমার ত জাতিচ্যুতির ভয় নাই। গিরিবালাকে আমি বিলাতে লইয়া গিয়া উহাকে সেখানে কোনও প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, উহাকে মানুষ করিব, লেখাপড়া শিখাইব, তাহার পর হয়ত কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় সচ্চবিত্র সুশিক্ষিত লণ্ডন প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

আমি বলিলাম—"না। সে কি হয়? আমি ছাড়িলেও আমার স্ত্রী ছাড়িবেন কেন?"

হেন্‌রি ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া বলিল—"বেশ! মনে নাই? তিনি ত গিরিবালাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

সার হেন্‌বি এখন বিলাতে। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত কথাবার্ত্তার একমাস পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রতি মেলেই চিঠি পাই।

গিবিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য হেন্‌রি মহা হাঙ্গামা করিয়াছিল। পাগলামী প্রায় অন্তর্হিত হইলেও এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। এক একবার বুঝিত অন্যায় আব্দার করিতেছে, কিন্তু তবু আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না। শেষকালটা আমি মত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তাঁহাকে আমি কত বুঝাইলাম, তাঁহার শপথ স্মরণ করাইলাম, কিছুতেই তিনি শুনিলেন না। এইবার গিরিবালাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়া দিব ভাবিতেছি, নহিলে মেয়েটা মূর্খ হইবে যে। গিরির মা যেরূপ কন্যাগত প্রাণ, মেয়ের সঙ্গে যাইতে না চাহিলে হয়। তা গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিদ্যার দৌড়—

[আশ্বিন, ১৩০৬]

সারদার কীর্ত্তি

॥ ১ ॥

ষ্টীমারে খুলনা যাইতেছিলাম—সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন। ক্যাবিন্ রিজার্ভ করা ছিল। সারা দ্বিপ্রহরে দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎ পূর্ব্বে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি ভাবিলাম এই অবকাশে ছাদে গিয়া একটু সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া আসি।

সেই মাত্র ষ্টীমারে মাণিকদহঘাট ছাড়িয়াছে। ক্যাবিনের ভিতর বসিয়া মনে হইয়াছিল, আর বেলা নাই; বাহির হইয়া দেখিলাম সূর্য্যাস্ত হইতে তখনও বিলম্ব রহিয়াছে। সুতরাং ছাদে যাওয়া হইল না। অলসভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটি অপরিচিত যুবা আমার কাছে আসিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

দূরের দৃশ্য দেখিবার জন্য চশমা বদলাইয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়াছিলাম। চশমা খুলিয়া যুবকটির মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। পূর্ব্বে তাহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

লোকটির বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। একহারা চেহারা, চক্ষু বসা, মাথায় বড় বড় চুল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য অবস্থার পরিচায়ক।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীসারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কুমারখালি।"

"আমাকে চিনলেন কি করে?"

যুবক একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল, "মশায়কে বাঙ্গলা দেশে কে আর না চেনে? আপনার তুল্য স্বদেশহিতৈষী বাগ্মী—"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "কি চান আপনি?"

"আমি যা চাই, তা ক্রমে নিবেদন করছি। সে অনেক কথা। যদি দয়া করে শোনেন, তবে কৃতার্থ হই।"—বলিয়া লোকটা ডেকেব তক্তার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যাপারটা কি আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম হয়ত কিছু অর্থসাহায্য চাহে। অন্যদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "তা বলুন শুনছি।"

"মশায় একটু নির্জ্জন স্থান আবশ্যক। একটু ওদিকটেয় যাবেন কি?"

"চলুন"—বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম।

সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। রেলিং-ধরিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পাশে দাঁড়াইয়া আমাব মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া মনে করিলাম, পূর্ব্বে হয়ত এ অবস্থাপন্ন ছিল, এখন এরূপ দশা হইযাছে। যাজ্ঞার ভাষা বুঝি মুখে আসিয়া বাধিয়া যাইতেছে।

"আপনাকে আমি প্রণাম করলাম কেন বুঝতে পেরেছেন?"

"না, কেন বলুন দেখি?"

"আপনি আমাব পিতা।"

শুনিয়া হা হা কবিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "কি রকম?"

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আপনি আমাব পিতা কিনা ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু আপনার স্ত্রী আমার মাতা।" বলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিল।

বুঝিলাম, লোকটা পাগল। পূর্ব্বের অশ্রদ্ধার ভাবটা মন হইতে তিরোহিত হইয়া, একটা দয়া হইল।

সে বলিতে লাগিল, "আপনি অবিশ্বাস করছেন? আপনি ভাবছেন লোকটা পাগল? তিনি আমার মা বটেন, তবে এ জন্মের মা নন। আসল কথাটা তবে খুলে বলি। আমি পাঁচ বচ্ছর ধরে কাসরোগে কষ্ট পাচ্ছি। কত রকম চিকিৎসা করলাম, কিছুই হল না। মেট্রোপলিটনে বি-এ পড়ছিলাম, পড়া বন্ধ করতে হল। দেখুন না চেহারাখানা, একেবারে অস্থিচর্ম্মসাব হয়ে পড়ছি। বেশী দিন আর বাঁচতে হবে না। দিন সাতেক হল গ্রামেব বাইরে বিশালাক্ষীর মন্দিবে গিয়ে সারা সন্ধ্যেটা উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। মা মা বলে কত কাঁদলাম, কত প্রার্থনা করলাম। সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে এলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন মা বিশালাক্ষী আমাব মাথাব শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন—আপনাব নাম করে—তাঁর যিনি স্ত্রী—তিনি আর জন্মে তোর মা ছিলেন। তুই তাঁকে মদ খেয়ে একদিন বাপান্ত করে গাল দিয়েছিলি, সেই পাপে তোব এই কঠিন বোগ হয়েছে। তাঁর কাছে যা, তাঁর পাদোদক পান কর্‌গে যা, ভাল হয়ে যাবি। বলেই মা বিশালাক্ষী অন্তর্দ্ধান করলেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

হাত দুটি যোগ করিয়া সে বলিল, "সব শুনেছেন, আর এ অধমকে 'আপনি' বলে কেন সম্ভাষণ করেন? 'তুমি' বলুন বা 'তুই' বলুন।"—বলিয়া হেঁট হইযা আমার জুতা দুইটা ছুঁইয়া স্বীয় ললাট স্পর্শ করিল।

"তুমি এখন কোথা যাচ্ছ?"

"আমি যাচ্ছি দৌলতপুর। সেখানে আমার মামার বাড়ী। সেখান থেকে কলকাতায় যেতাম, আপনার সন্ধানে।"

"আমি কলকাতায় যাচ্ছি, এ সংবাদ আপনাকে কে দিলে?"

আকুলস্বরে সে বলিল, "আবার আপনাকে?"

"তোমায় কে বললে?"

"কেউ বলেনি। আমি কি জানিনে যে কলকাতায় এবার কন্‌গ্রেসের অধিবেশন? আমি কি জানিনে যে ব্যারিষ্টারশ্রেষ্ঠ মিষ্টার অতুল ব্যানার্জ্জি না হলে স্বদেশহিতকর কোন কার্যই হবাব যো নেই? দেশের মধ্যে কে এমন—"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "তা ভালই হয়েছে। আপনাব—তোমার অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সারদা জিজ্ঞাসা কবিল, "আমার মা কি আপনাব সঙ্গেই আছেন?"

"আছেন। আজই চাও পাদোদক?"

"আজ পেলে কি আব কালকের জন্যে অপেক্ষা করিতে পাবি?"

"তবে দাঁড়াও এখানে।" বলিয়া আমি ক্যাবিন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ক্যাবিন পরিত্যাগেব পর বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই মুখে হাতেব আডাল করিয়া একটি হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

আমি তাঁহাব শয্যার নিকট বসিয়া তাঁব হাতখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "একটি বড় মজা হয়েছে।"

"কি গা?"

"তোমার ছেলে এসেছে।" বলিয়াই অনুশোচনায় মরিয়া গেলাম। আমাদের একটি দুই বৎসরের সন্তান ছিল, সে এই ঘটনার দেড় বৎসব পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। আমি একটা অসাবধানতায় আমার স্ত্রীর মনে কি শোকস্মৃতি জ্বালিয়া দিলাম!

তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমাব মুখেব পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলছ?"

আমি তাঁহাকে কাছে টানিয়া বলিলাম, "ষ্টীমারে একজন সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি। তিনি আমাব হাত দেখে বলেছেন শীগ্‌গির আমার ছেলে হবে।"

উপস্থিত বুদ্ধিতে এইটুকুব বেশী যোগাইল না। কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাঁহার দুইটি চোখের কোণে জল দেখা দিল। আমি তাঁহাকে বক্ষে বাঁধিলাম। মুখচুম্বন করিলাম। রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলাম, নিজের চোখও মুছিলাম। কি কথা বলিয়া চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিবাই ভাবিতে লাগিলাম।

গবাক্ষপথে দেখিলাম, সূর্য্যাস্তকাল সমুপস্থিত। বলিলাম, "চল ছাদে চল সূর্য্যাস্ত দেখিগে। পদ্মাবক্ষে সূর্য্যাস্ত কখনো ত দেখিনি।"

তিনি উঠিলেন। পাশের কামরায় গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া, কেশবেশ বাহিরে যাইবার মত করিয়া আসিলেন।

দুইজনে ছাদে গিয়া পদচারণা করিতে লাগিলাম। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হইল। ষ্টীমার হু হু শব্দে জল কাটিয়া ছুটিতেছে। ক্রমে নাগতকান্দি ষ্টেশন ঘাট নিকটবর্তী হইল, আমরা ছাদ হইতে নামিয়া গেলাম।

সিঁড়ির পাশে সারদা দাঁড়াইয়া। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি আমার মা?"—উত্তবের প্রতীক্ষা না করিয়াই আমার স্ত্রীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "একটা কথা আছে, ক্যাবিনে গিয়ে বলব।"

সারদার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। কোথা হইতে ভাল আপদ জুটিয়াছে। বলিলাম, "অপেক্ষা করুন না। আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

সারদা সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল, "আমি ঐ এঞ্জিনের কাছে থাকব।"

স্ত্রীকে লইয়া ক্যাবিনে গিয়া সকল কথা বলিলাম, শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পাদোকজল দিতে পারব না।" আমি বলিলাম, "তাতে আর হানি কি?"

"তুমি ঐ গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাস কর নাকি?"

"করিনে। কিন্তু ওর মনে যদি ঐ বিশ্বাস হয়, তবে হয়ত উপকার পাবে। এমন অনেক শুনতে পাই।"

"কি শুনতে পাও? জন্মান্তরের মা বাপকে স্বপ্ন দেখে, ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়ে তাদের পাদোকজল খেতে যায়?"

"না;—একটা কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস করলে রোগ অনেক সময় আরাম হয়।"

এ কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তা শুধু জলই একটু দাওগে না। বিশ্বাস হলেই হল যে পাদোকজল।"

"তার দরকার কি? সে যে ছলনা করা হবে"—বলিয়া চায়ের একটা পেয়ালাতে একটু জল ঢালিলাম।

আমার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে মোজা খুলিলেন। বলিলেন, "ভাল জ্বালা! তোমাকে যেমন বোকা ভালমানুষটি পেয়েছে! বিলেতে যে কোনও মেম ভুলিয়ে তোমায় বিয়ে করে ফেলেনি, সেই আমি আশ্চর্য্য হই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হলে তোমার কপালের এ কষ্টটা কোথায় যায় বল? এতদিন তুমি ত তাহলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।"

ঠাট্টা করার লোভটি আমার স্ত্রী সম্বরণ করিতে পারেন না, কিন্তু উল্টিয়া একটু ঠাট্টা কর দেখি, তাহা আর সহ্য হয় না। বলিলেন, "যাও যাও, তোমার আর চালাকি করতে হবে না। ভারি রসিকতা হল কিনা।"

আমি বাক্যব্যয় না করিয়া পেয়ালাটি লইয়া তাঁহার কোমল পদপল্লব ধারণ করিলাম।

তন্মুহূর্ত্তেই তিনি পা কাড়িয়া লইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, " পা ছোঁয়া কেন?" আমার উত্তরের অবসর না দিয়া, আমার হাত হইতে পেয়ালা লইয়া জলে পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। পার্শ্বস্থ টেবিলে সেটি রাখিয়া বলিলেন, "বেয়ারাকে বল দিয়ে আসুক।"

আমি উঠিয়া বলিলাম, "বেয়ারা কি তাকে চেনে? আমিই দিয়ে আসি।" বলিয়া পেয়ালাটি তুলিয়া লইলাম।

তিনি বলিলেন, "ও কি কর? কথা বললে শোন না কেন?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "দেখ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা। এত লেখাপড়া শিখলে ভাই, তবু এই সামান্য প্রেজুডিস্‌টে গেল না?"

বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

॥ ২ ॥

কন্‌গ্রেস শেষ হইয়াছে, ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছি, একদিন সন্ধ্যার সময় দারোয়ান স্লেট হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা দেখা করিতে আসিলে কার্ড আনে না, তাহাদের জন্য একখানা স্লেট রাখিয়া দিয়াছিলাম। স্লেটে ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে, "সারদাপ্রসন্ন চ্যাটার্জ্জি।"

দুই মাসের পুরাতন কথা সহসা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, বুঝি কোনও নূতন মক্কেল আসিয়াছে।

ডাকিয়া পাঠাইলাম। চেহারা দেখিবামাত্র সারদাকে অবশ্য চিনিতে পারিলাম। আসিয়াই সে আমাকে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

'কি হে? কেমন আছ বল দিকিন? কিছু উপকার টুপকার পেলে?"

সারদা প্রথমতঃ কথার কোন উত্তর না দিয়া, বুকে হাত দিয়া বারকতক কাসিল। শেষকালে বলিল, "বেশ দিনকতক সেরে গিয়েছিল (খক্ খক্)—আবার (খক্ খক্)—দিন পাঁচ সাত" (খক্ খক্)—আর বলিতে পারিল না, কাসিতে কাসিতে নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তাহার কাসির ধমক থামিলে বলিলাম, "পাদোকজলের কর্ম্ম নয়। ওষুধ খাও।"

"পাই কোথা?"—বলিয়া আবার কাসিতে আরম্ভ করিল।

সাড়ে সাতটা বাজে। বাড়ীতে একটা ডিনার পার্টি ছিল। এখনি লোকজন আসিতে আরম্ভ হইবে। এ সময় এ আসিয়া জুটিল কেন? তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার অভিপ্রায় পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিলাম। সারদাকে দিয়া বলিলাম, "এই নাও, কোনও ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে একটা ওষুধপত্র খাওগে, পাদোকজলে কি রোগ ভাল হয়?"

এই সময় মিষ্টার বোসের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমি সারদাকে তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আজ আমি ভারি ব্যস্ত আছি—যাও!"

সারদা টাকা কয়টি পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। উঠিয়া সার্সির কাছে দাঁড়াইয়া নিম্নে বাগানের পানে দৃষ্টিপাত করিলাম। কালো সার্জ্জের চাদর গায়ে দিয়া কে একজন পায়চারি করিতেছে। আমার পানে যতক্ষণ পিছন ফিরিয়া ছিল, ততক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারি নাই, সম্মুখে ফিরিলেই দেখিলাম সারদা। পিত্ত জ্বলিয়া গেল। প্রভাত হইতে না হইতেই আসিয়া জুটিতেছে! এখনি দারোয়ান শ্লেট লইয়া আসে দেখিতেছি!

চায়ের টেবিলে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের সহিত তাহার কার্ড উপস্থিত। আমার স্ত্রী তখনও নামেন নাই। সারদা আসিয়া প্রথমেই আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল তাহাব পর বলিল, "কাল সারা রাত আমার নিদ্রা হয়নি। আমার প্রতি আপনার অহেতুক স্নেহ দেখে আমি অবাক হয়ে আছি। আমি কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই। আমার চিকিৎসার জন্যে পাঁচটা টাকা! এ টাকা ক'টি ফিরিয়ে নিন।" বলিয়া টাকা কয়টি টেবিলে রাখিয়া দিল।

সারদার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। বলিলাম, "না না, ও টাকা আর ফিরে দিতে হবে না; তোমার চিকিৎসা ব্যয়ের জন্যে দিয়েছি।"

সারদা বারকতক কাসিয়া বলিল, "দেখুন, দৈবশক্তিতেই আমার বেশী বিশ্বাস। ডাক্তারি কবিরাজিতে আমার বিশ্বাস নেই। এ অবস্থায় ওতে অর্থব্যয় কি মিছে হবে না?"

আমি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলাম, "একেবারে বিশ্বাস না থাকলে ফল হওয়া শক্ত বটে।"

সে বলিল, "আমার আন্তরিক বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা ঠাকুরুণের (উদ্দেশে করপুটে প্রণাম করিল) পাদোকজল দুবেলা খেতে পাই, আর তাঁকে দুবেলা প্রণাম করতে পাই, তা হলে আমি একেবারে আরাম হয়ে যাই। নইলে এ যাত্রা আমার নিষ্কৃতি নেই।" বলিতে তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। দুইবেলা পাদোদক দিতে এবং প্রণাম লইতে আমার স্ত্রী রাজি হইবেন কি? এই সময় লোকটা অত্যন্ত কাসিতে লাগিল। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে ভারি দয়া হইল। ভাবিলাম—আহা রাজি হওয়া উচিত। আমার স্ত্রীকে রাজি করাইব। কত রকমে লোকে পরের উপকার করে। এই সামান্য উপায়ে যদি ইহার উপকার হয়, যদি ইহার প্রাণটা বাঁচে, তাহা হইলে করা উচিত।

সারদাকে বলিলাম, "তুমি নীচে গিয়ে কর্ম্মচারীদের ঘরে অপেক্ষা কর। আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।"

স্ত্রীর সন্ধানে গেলাম। শুনিলাম তিনি স্নানের ঘরে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার দর্শন পাইলাম।

বারান্দায় একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া তিনি চুল শুকাইতে বসিলেন। আমি বলিলাম, "সারদা আবার এসেছে।"

"সেই ষ্টীমারের সারদা? আবার কেন এসেছে?"

বাঃ—আমার স্ত্রীর কি স্মরণশক্তি! আমি কিন্তু শ্লেটে সারদার নাম দেখিয়া প্রথমতঃ উহাকে চিনি নাই।

"তার কাসি আবার বেড়েছে।"

"আর আমি পাদোকজল দিতে পারব না কিন্তু। একবার দিয়ে বিশ্বাস-বিরুদ্ধে কাজ করেছি। আমি পীর না পয়গম্বর যে আমার পাদোকজল খেয়ে ওর ব্যারাম ভাল হবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার মত সকলে ত উচ্চশিক্ষিত নব্য আলোকপ্রাপ্ত নয়;—ওর যদি তাই বিশ্বাস হয়! সেবার ত ভাল হয়ে গিয়েছিল বললে।"

আমি দেখিলাম, এবার একটু বেগ পাইতে হইবে। স্পষ্টতঃ ইনি মনে করিয়াছেন, সেবারকার মত এক পেয়ালা পাদোদক দিলেই চুকিয়া যাইবে। যদি শুনেন তা নয়, এখন কিছুদিন ধরিয়া ক্রমাগত দুইবেলা উক্ত মহার্ঘ দ্রব্যটি বিতরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবেন।

তথাপি বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যতটা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলাম—ততটা হইল না। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি কবিরাজি কোন ওষুধে ওর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই? দু'বেলা আমার পাদোকজল খাবে? তাতেই ও ভাল হবে?"

"ও ত তাই বলছে। বলছে নইলে এ যাত্রা ও বাঁচবে না। আহা ওর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

আমার স্ত্রী মৌন থাকিয়া সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

সারদাকে এ শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাতে সে আনন্দে অধীর হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাসা কোথায়?

"আমার এখানে কেউ নেই।"

"কোথায় থাকবে?"

এখানে আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না দয়া করে? যদি এত দয়া করলেন" বলিয়া চুপ করিল।

আমি বলিলাম, "আমার কর্ম্মচারিদের একটা মেসের মত আছে। সেখানেই থাকতে বলিয়া চুপ করিল।

সারদা বলিল, "সে ত বেশ হবে। কাল রাত্রে আমি সেইখানেই খেয়েছিলাম কিনা"—বলিয়া সারদা কাসিতে আরম্ভ করিল।

কাসি থামিলে বলিল, "আজ একবার যদি অনুমতি করেন, তবে মার শ্রীচরণ দর্শন করি।"

স্ত্রীর কাছে তাহাকে লইয়া গেলাম। সারদা তাঁহাকে প্রণাম করিল। আর স্ত্রী তাহার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

টেবিলে গ্লাসে জল ছিল। সারদা তাহাই একটু হাতে লইয়া মাটিতে বসিয়া, পাদোদক জল খাইল। পান করিয়া অবশিষ্ট জল মাথায় মুছিয়া ফেলিল।

এইরূপ দুই তিন দিন করিল। [illegible] রোগের কিছুমাত্র উপশম দেখা গেল না। আমার

সারদা বলিল, "মা কি ভাল মনে আমায় পাদোদক দিচ্ছেন না? এবার সারছে না কেন?"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সেদিন এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ওযুধ খাবেনা বিষুধ খাবে না, পাদোদকজল খেয়ে মানুষের রোগ ভাল হয়? যত সব অনাসৃষ্টি আবদার!"

আমি বলিলাম, "দেখ, ইচ্ছাশক্তিতে বোধ হয় কিছু কাজ হয়। তুমি পাদোদকজল দেবার সময় মনে মনে খুব আগ্রহের সহিত ভেবো, এই জলে এর রোগ ভাল হবে।"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "দিনকের দিন যেন সং হচ্ছ। বিলিতি ময়ূরপুচ্ছ ক্রমশঃই তোমার গা থেকে খসে খসে পড়ছে।"

আমি কপট অভিমান সহকারে বলিলাম, "অর্থাৎ আমাকে প্রকারন্তরে দাঁড়কাক বলা হল। এতই যদি কালো দেখছিলে, তবে বিয়ে করলে কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—"

আমার স্ত্রী এবার আর চটিলেন না। বলিলেন "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবাই তোমার মত কালো হলে জগৎ আলো হয়ে যেত।"

কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। আমি যে একজন সুপুরুষ, তাহা বিলাতের অনেক বিবিই স্বীকার করিয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

প্রতিদিন সারদার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। তাহার কাসি প্রায় সারিয়া উঠিল, মুখের ফ্যাকাসে রঙ কালো হইতে লাগিল। চোখের কোলে মাংস জমিতে লাগিল। দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। আমার স্ত্রীও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি প্রায়ই সারদাকে ডাকাইয়া ফায়ফরমাস করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিদিগকে বিশ্বাস করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে না পাঠাইতে পারিতেন, তাহা সারদাকে ভার দিতেন।

২৭শে বৈশাখ একটি বিবাহ উপলক্ষ্যে বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক রাত্রি অবধি থাকিবার কথা ছিল। বিবাহান্তে থিয়েটারের অভিনয় হইবে। বাড়ী ফিরিতে অন্ততঃ রাত্রি দুইটা বাজিবে, ইহা আমাদের চাকরবাকর কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়াছিলাম।

সারদাকে কিছুদিন হইতে আমার আইন পুস্তকের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম, "আজ লাইব্রেরীতে শুয়ো। একটু সজাগ থেকো।"

সে বলিল, "আমাকে বলতে হবে না, আমি আজ জেগেই থাকব এখন, যতক্ষণ আপনারা না ফেরেন।"

জাগিয়াই সে ছিল বটে, পরে প্রমাণ পাইলাম।

ফিরিতে রাত্রি তিনটা বাজিল। আমার স্ত্রী বেশপরিবর্ত্তন করিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি একা শয়নকক্ষের দ্বারমুক্ত করিয়া সে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

বড় সিন্দুকের সম্মুখে সারদা বসিয়া আছে। আশে পাশে খানকতক রুপার বাসন ছড়ান। বাসনের আলমারী খোলা। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সারদা বাবা—বাবা বলিয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তাহার কাছে গিয়া দেখিলাম, সে বন্দী। এই সিন্দুকে যে কলটি লাগান ছিল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। বিলাতে অবস্থানকালীন আমি নীলামে অনেক মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়াছিলাম। একটি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়, কলটা সেই ব্যাঙ্কের। কলে একটা তালা আছে কিন্তু তাহার চাবি নাই। ঘূর্ণ্যমান কয়েকটা অঙ্গুরীয়াকার ধাতুখণ্ডের যথাসন্নিবেশে একটা নির্দ্দিষ্ট ইংরাজি নাম সাজাইতে হয়, তাহার পর টানিলেই খুলিয়া যায়। কিন্তু খুলিবার পূর্ব্বে তৎসংলগ্ন একটা পিন স্থানভ্রষ্ট করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে, যে খুলিতেছে সে তৎক্ষণাৎ বন্দী হইবে। দুইদিক হইতে দুইটা লৌহখণ্ড স্প্রিঙের জোরে

ছুটিয়া গিয়া হাত বাঁধিয়া ফেলিবে। আমার স্ত্রীর অসাবধানতায় সারদা কোনও দিন খুলিবার নামটি জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আবার এ ব্যাপার আছে, তাহা ত সে জানিত না।

পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সুখ নাই। সারদাকে দেখিতে নিরীহ ভালমানুষটি। যাহারা বলে, মানুষের মুখ দেখিয়া স্বভাব চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়, তাহারা মূর্খের মূর্খ। আইনের ব্যবসা করিতে করিতে আমি এ মতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম; সারদার এই আচরণে আমার বিপক্ষমত স্থায়ী হইয়া পড়িল।

তাহার কাছে গিয়া রোষকষায়িত নেত্রে বলিলাম, "খুব কাজ করেছিস—উপযুক্ত পুত্রের কাজ করেছিস।" রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সারদা কাতর স্বরে বলিল, "বাবা, আমার দোষ নেই।"

ইচ্ছা করিল তাহার মুখে একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করি। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলাম।

এই সময়ে আমার স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। সারদাকে তদবস্থ দেখিয়া চমকিত হইলেন। কাঁপিতে লাগিলেন। আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি কাণ্ড!"

আমার স্ত্রীকে দেখিয়া সারদা দ্বিগুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। আমি রাগিয়া বলিলাম, "চুপ রও শূয়ার—মেরে হাড় গুঁড়ো করে ফেলব।"

আমাব স্ত্রী বলিলেন, "ও ঘরে চল।"—বলিয়া আমাব হস্তধারণ করিয়া প্রায় টানিয়া লইয়া গেলেন।

একটা কৌচে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কি হবে?"

"কি আর হবে? পুলিশে দেবো।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পবে বলিলেন, "দেখ কাজ নেই পুলিশে দিয়ে। ছেড়ে দাও। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এ কাজ করে ফেলেছে। প্রথম অপবাধেব মার্জ্জনা হওয়া উচিত। ও যদি অনুতাপ করে, নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা কবে, তবে ওকে সে অবসর দাও। পুলিশে দিলে ওর জীবন একেবারে মাটি হয়ে যাবে।'

সারদা যদি চুরি কবিয়া পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইত তবে তাহাকে ক্ষমা কবা অসম্ভব হইত বটে। কিন্তু সে নাকি অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাই তাহার প্রতি যেন কতকটা দয়া অনুভব করিলাম। কিন্তু সেটা করিলে কি সামাজিক কর্ত্তব্যের ক্রটি হয় না? স্ত্রীকে সেই কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "না। পুলিশে দিলেই সামাজিক কর্ত্তব্যেব ক্রটি হয়। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের উপরই সামাজিক কর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত । একটি জীবনকে চিবদিনেব জন্যে নষ্ট করে দিও না।"

সারদাকে ছাড়িয়া দিলাম।

কলিকাতায় কন্‌গ্রেস হইয়াছিল কবে?—১৮৯৬ সালে। তিন বৎসর পরে সারদার নিকট হইতে সে দিন একখানি পত্র পাইয়াছি। সে এখন জামালপুর মিউনিসিপালিটিতে ট্যাক্স দারোগার কার্য্য করিতেছে। তাহাব মাতুল তাহার জন্য পাঁচশত টাকা জামিন দিয়া ঐ কাজটি জুটাইয়া দিয়াছেন। কিছুদিন তাহার অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়াছিল, প্রায় ভিক্ষাকে উপজীবিকা করিতে হইয়াছিল। তাহার প্রতি আমাদের অহেতুক স্নেহ সম্বন্ধে অনেক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে তাহাব কাসিটা এবার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এবার বোধ হয় বাঁচিবে না। ইচ্ছাটা এখানে আসে কিছুদিনেব জন্য। অথচ সে প্রস্তাব কবিতে সাহসী হইতেছে না। তাহার পত্রের শেষ কয় ছত্র এই:

"যদি আপনার কাছে যাইতে পারিতাম, যদি আমার মাতৃদেবীর পাদোদক পান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আরোগ্য লাভ করিতাম। কিন্তু কোন্ মুখে আর সে প্রস্তাব করিব? আমার যদি মৃত্যু হয় তবে সেই শাস্তিই আমার উপযুক্ত।"

আমার স্ত্রী এই পত্রখানি দেখিয়া বলিলেন, "একটা কথা রাখবে?"

"কি?"

"তাকে আসতে লেখ।"

"চাকরি করছে, এখানে এসে কি করবে?"

"ছুটি নিয়ে আসুক।"

"কেন, পাদোদক জল দেবে বলে?—তার চেয়ে একটা শিশি করে আউন্স চারেক পাদোদক জল পার্শেলে পাঠিয়ে দিলেই হয়।"

"না না—তাকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি জান, এ জীবনের জন্যে আমার কাছে সে ঋণী। আমার কাছে যে উপযুক্ত, তাকে আমার ভারি ভাল লাগে, এটা আমার একটা দুর্ব্বলতা।"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "আমিই ধন্য যার এমন স্ত্রী, পাদোদক খেয়ে কত লোক জীবন পেয়ে যায়।"

"আহা ঠাট্টা কর কেন? আমার পাদোদক পান করে সে জীবন পেয়েছে আমি কি বলছি? জীবন মানে তার নৈতিক জীবন ভেবে বলেছিলাম। তুমি তাকে পুলিশে দিলে তার কি সর্ব্বনাশ হত বল দিকিনি!"

আমি বলিলাম, "নৈতিক জীবন ছাড়া ভৌতিক জীবনও তুমি দিয়েছ তাকে। তুমি পাদোদক না দিলে হয়ত এতদিন বাঁচত না।"

আমার স্ত্রী একথা শুনিয়া ভারি হাসিতে লাগিলেন। হাসির অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহার পানে নির্ব্বোধের মত চাহিয়া রহিলাম। হাসি থামিলে বলিলাম, "অত হাসছ কেন?"

"তুমি বুঝি মনে করেছ সারদা আমার পাদোদক খেয়ে ভাল হয়েছে?"

"তবে কি? তোমায় প্রণাম করে করে?"

"না গো না তাও না। একটা রহস্য আছে। প্রথম দু'তিনদিন যখন দেখলাম, তার কাসিটা ক্রমশঃই বেড়েই যাচ্ছে, তখন জলে পদস্পর্শ করার পরিবর্ত্তে এ বেলা একটা ও বেলা একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটা করে স্পর্শ করাতে লাগলাম। ওয়াইন গ্লাসে ঔষধ তৈরি করে টেবিলে কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিতাম। সারদা এলে বলতাম—ঐ জল রেখেছি নিয়ে যাও।"

স্ত্রীর বুদ্ধি শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সারদাকে আসিতে লিখিলাম—সে উত্তর দিল, এ কালামুখ আর আপনাদিগকে দেখাইতে ইচ্ছা নাই। অগত্যা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুইটা কিনিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে পার্শেল ফিরিয়া আসিল। যে দিন প্রভাতে পার্শেল ফিরিল, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা একজন পুলিশ কর্ম্মচারি আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত। সারদাকে লেখা আমার পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এর কোনও সন্ধান দিতে পারেন?" ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সারদা মিউনিসিপ্যালিটির বারো হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার স্ত্রী এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। [মাঘ, ১৩০৬]

বন্যশিশু

॥ ১ ॥

প্রচুর পরিমাণে শীতবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ১লা ডিসেম্বর কুমুদনাথ স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে সিমলা পাহাড় যাত্রা করিলেন। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীকৃত পঞ্জিকায় সে দিনটি যাত্রার পক্ষে শুভতম বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া অলখনিরঞ্জন মানুষের গণনায় কখন কি উলটপালট করিয়া দিলেন, গ্রহগণের অবস্থানের কোথায় কি বিপর্যয় ঘটাইলেন, কেহ জানে না। এই দম্পতির পক্ষে এমন অশুভক্ষণে যাত্রা জীবনে আর ঘটে নাই।

বৎসরখানেক ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কুমুদনাথের দেহখানি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন, "আপনি পশ্চিমে গিয়ে শীতঋতুটা যাপন করে আসুন।"

কুমুদবাবুর স্ত্রীর নাম গিরিবালা। সিমলা পাহাড় তাঁহার জন্মস্থান। নয় দশ বৎসর অবধি তিনি সিমলায় ছিলেন—তাঁহার পিতা কালীকান্ত মিত্র মহাশয় সিমলায় কর্ম্ম করিতেন। গিরিবালা স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "সিমলা চল।"

কুমুদনাথ বলিলেন, সর্ব্বনাশ! এই শীতে সিমলা?"

"ওগো যত ভয় করছ তত কিছুই নয়। সিমলায় শীত ভারি সুন্দর। বরফ পড়া ত কখনো দেখনি, তাও দেখবে; সে অতি চমৎকার দৃশ্য।"

কুমুদবাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ক্ষতি নেই, সে বরং আরও ভাল। তবে যদি খুব সাবধানে থাকতে পারেন।"

ডাক্তারের উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনপূর্ব্বক তাঁহারা যাত্রা করিলেন। তিন সপ্তাহকাল মহা আনন্দে সিমলায় কাটিল। সিমলা কালেক্টরী আফিসে কুমুদনাথের একটি সতীর্থ ছিলেন—যদুবাবু। তিনি একটি সুন্দর দ্বিতল বাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুমুদনাথ প্রথম প্রথম বেশী চলাফেরা করিতে পারিতেন না। কখনও সোফায় শুইয়া সিমলা গাইডবুক হাতে সিমলার সর্ব্বত্র কল্পনায় পর্য্যটনের সুখ অনুভব করিতেন, কখনও বা বাতায়নের নিকট চৌকি পাতিয়া রাজপথে ভারবাহী উষ্ট্রশ্রেণী, এক্কা, টোঙ্গা কিংবা ঝাপানের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেন। ভারি আনন্দ বোধ হইত—সবই নূতন। বিশেষতঃ একটা দুধে-আলতা বর্ণের পাহাড়ী মুখ দেখিলে কুমুদনাথের পরিতৃপ্তির সীমা থাকিত না। অদূরে কোনও খাদের গায়ে সিঁড়ির মত থাক্ থাক্ কাটা শস্যক্ষেত্র, পাহাড়ীদের কুটীর, তাহাদের বেশভূষা, তাহাদের আকার প্রকার—এ সবরেই প্রতি কুমুদবাবু কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতেন।

আবার নূতন বিস্ময়। ২০শে ডিসেম্বর ভাল রকম একটা তুষারপাত হইয়া গেল। কুমুদবাবু তাঁহার শিশু পুত্রেরই মত আনন্দে অধীর। গিরিবালা প্রসন্ন হাস্যে স্বামীর আনন্দে আনন্দিত হইলেন।

আজ ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন। প্রাতে আটটার সময় যদুবাবু আলস্টার গায়ে দিয়া, বুটের উপর পট্টি বাঁধিয়া, সুদীর্ঘ বরফের লাঠি হাতে করিয়া বালুগঞ্জে কুমুদবাবুর বাসায় আসিয়া দর্শন দিলেন। কুমুদনাথ তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছেন। দেখা হইবামাত্র যদুবাবু হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? গায়ে একটু বল পেলেন?"

"হ্যাঁ, অনেকটা উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। দু'বেলায় আধসের তিনপোয়া মটন হজম করছি।"

যদুবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মোটে আধসের তিনপোয়া? তাও দুবেলায়?"

কুমুদবাবু হাসিয়া বলিলেন, "মশায় কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের এখানে আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

যদুবাবু লোকটি বড় ভালমানুষ। একটু ঘুবান কথা হঠাৎ বুঝিতে পারেন না। বালকের মত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন কি? বলিয়া দিলে, তখন বালকেরই মত হা হা করিয়া হাসিয়া আকুল হন। নিমন্ত্রণ করায় বলিলেন, "কেন বলুন দেখি? হঠাৎ নেমন্তন্ন করে বসলেন যে?

কুমুদবাবু বলিলেন, "আধসের তিনপোয়া মাংস খাই শুনে নিরাশ হলেন, আপনি কত খান সেইটে আমি দেখতে চাই।"

যদুবাবু হা হ' কবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই সময় ভৃত্য চা আনিল।

হাসি থামিলে যদুবাবু বলিলেন, "আমি একবেলায় একসের দেড়সের অনায়াসে পার করি। এখন আর বেশী পারিনে; পূর্ব্বে যখন নীচে রাবলপিণ্ডিতে ছিলাম, একবার সখ হয়েছিল ভেড়ার মাথা খাবার। প্রত্যহ একটা করে এত বড় ভেড়ার মাথা ক্রমাগত চল্লিশ দিন খেলাম। চল্লিশ দিনের পর চর্ব্বিতে গা ফাটতে লাগল। একজন ডাক্তার ছিল, সে বারণ করলে। বললে গায়ে বেশী চর্ব্বি হয়ে হৃদ্‌রোগে মাবা পড়বে।"

কুমুদনাথ শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। বলিলেন, "কাল আপনাব জন্যে একটা ভেড়ার মাথাও প্রস্তুত থাকবে।"

দুইজনে আরাম করিয়া উষ্ণ চা পান করিতে লাগিলেন। যদুবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "খুব বেড়াচ্ছেন ত?"

"হ্যাঁ—খুব নয়; তবে বেড়াচ্ছি বইকি। কাল জ্যাকো প্রদক্ষিণ করে এসেছি।"

"আব একটু সবল হোন, তারপব আমি আপনাকে নিয়ে বেড়াব। এখন আপনি পাববেন না আমার সঙ্গে, হাঁফিয়ে পড়বেন।"

প্রথম পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু দ্বিতীয পাত্র চা গ্রহণ কবিলেন। এতক্ষণ ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, বাহিরে আলো রহিয়াছে দেখিয়া ভৃত্য সার্সিব উপব হইতে পর্দা সবাইয়া দিল, বাতি নিভাইল।

দ্বিতীয় পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু বিদায় চাহিলেন।

কুমুদবাবু বলিলেন, "বসুন না, অত তাড়াতাড়ি কি?"

"একটু কাজ আছে।"

"যোগ-টোগ নাকি?"

যদুবাবু যে গোপনে যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন, এ কথা সিমলাব আবালবৃদ্ধ সকল বাঙ্গালীই অবগত আছে।

সলজ্জ হাসি হাসিয়া যদুবাবু বলিলেন, "সে সব হয়ে টয়ে গেছে।"

"তবে?"

"আজ একটু অন্য কাজ আছে। সকাল সকাল খেয়ে, একবাব তারাদেবী যেতে হবে। মেয়েরা অনেক দিন থেকে ধরেছে।"

"তারাদেবী যাবেন? তা আমায় বলেননি কেন? আমার স্ত্রীও যে এসে অবধি একদিন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। কতদূর বলুন দেখি?" "এই ছ সাত মাইল।"

"রিক্‌শা যায়?"

"নীচে অবধি যায় টিব্বেতে অবিশ্যি কি করে উঠবে?"

"কখন বেরুলে সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা যায়?"

"বারোটার সময় বেরুলেই যথেষ্ট।"

সমস্ত পরামর্শ ঠিক হইল। যদুবাবু বলিলেন—আরও সকাল—১১টার সময়—বাহির হওয়া ভাল। আজ সৌভাগ্যক্রমে আকাশটাও বেশ পরিষ্কার আছে। বিগত তুষারপাতের

পর পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে—তুষার গলিয়া শুকাইয়া পথও বোধ হয় পরিষ্কার হইয়া গিয়া থাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন ১১টার সময় তাঁহাদের রিক্‌শ এবং ইঁহাদের জন্য তিনখানি খালি রিক্‌শ (একখানি খোকার চাকরের জন্য) আসিয়া উপস্থিত হইবে। বলিয়া তিনি বরফের লাঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে মস্‌ মস্‌ শব্দে অন্তর্হিত হইলেন।

কুমুদবাবু ভাবিতে লাগিলেন, "বাস্‌রে! একটা যেন অসুর বিশেষ! কি করলে অমন হওয়া যায়?"

কিয়ৎক্ষণ পরে এই কক্ষে গিরিবালা আসিলেন। তিনি কিন্তু তারাদেবী যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ততটা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "আবার সঙ্গী যোটালে কেন? আমরা দু'জনে যেতাম। তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পাব না কিছুই নয়।"

কুমুদবাবু বলিলেন, "বিদেশে সঙ্গীহীন হয়ে কোথাও যাওয়া কিছু নয়—আর ওঁরা সব জানেন শোনেন; ভাল করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।"

গিবিবালা মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমিও এখানকার সব জানি, সব শুনি।"

তখন বেলা প্রায় ১০টা। ইঁহারা ক্রমশঃ স্নানাহাব শেষ করিলেন। খোকাকে দুধ খাওয়ান হইল। তাহাকে কাজল পরান হইল। সাজসজ্জা হইল।

সাড়ে এগারোটার সময় যদুবাবুরা ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় গিরিবালার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হয় নাই, ভাবী অমঙ্গলের কোন সূচনাই তাঁহাকে চঞ্চল কবে নাই। তথাপি কেমন বিষণ্ণ-মনা হইয়া রহিলেন। এখন যখনই এই তারাদেবী যাত্রা ঘটনা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হয়, সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে।

সিমলার সীমা পার হইয়া কুমুদবাবু রিক্‌শ হইতে অবতরণ করিয়া যদুবাবুর সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বধূদের সাধ হইল, তাঁহারাও হাঁটিয়া যাইবেন। নামিলেন; কিছুদূর যাইতে না যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া, আবার রিক্‌শয় উঠিলেন। যদুবাবু সহাস্য মন্তব্য করিলেন, "মেয়েদের কোন ক্ষমতাই নেই, কেবল সকল কাজেই একটা আঁকুপাকু আছে। এই পাহাড়েব পথে চলা কি ওদের কাজ!"

গিরিবালা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাস্যালাপে আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে আর কোনও বিষণ্ণতা নাই।

দুইটার সময় তারাদেবীতে রিক্‌শ পৌঁছিল। সে একটা পর্ব্বতচূড়া। স্বীয় পাদমূল হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ। রিক্‌শ ছাড়িয়া ইঁহারা চূড়ারোহণ আরম্ভ করিলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে পাথরে সিন্দুর মাখান তারাদেবী বিগ্রহ। দেখিলে ভীতির সঞ্চার হয়। মেয়েরা পূজা আদি করিলেন। পুরুষ দুইজন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া স্বভাবের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে গভীর খাদ, অন্যদিকে সমুচ্চ অরণ্য। অত্যন্ত নির্জ্জন, ভাবুক-জনপ্রিয় স্থান। অদূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অতি-ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌ঝক্ কবিতেছে।

মন্দিরের পূজারী বাবাজী ইঁহাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিল। বাবাজীর বাড়ী জিলা হোসিয়ারপুর। কিরূপ আয় হয়? সে অতি সামান্য। পাহাড়িয়াগণ প্রায়ই পয়সাকড়ি দেয় না, কেহ বা গোধূম কেহ বা আলু কেহ বা মধু দিয়া যায়। বড়লোক, দলপতি, রাজা মহারাজ আসিলে একদমে অনেক লাভ হইয়া যায়। জলের বড় কষ্ট। নীচে বাউলিতে ঝরণার জল সঞ্চিত থাকে, সেইখান হইতে কলসী ভরিয়া লইয়া আসিতে হয়। এই সময়, অদূরে চিড়বৃক্ষের তলে, শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল। একটা পাহাড়িয়া শিশু রৌদ্রে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, সে উঠিয়া বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুরোহিত বলিল, "বাবাজি আজ দুদিন উহাকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছি।"

বন্ধুদ্বয় ধীরে ধীরে শিশুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গায়ে কিসের চামড়ার একটা জামা। মাথায় সে-লোম চামড়ায় একটা অদ্ভুত টুপী। গলায় কতকগুলি নানাকৃতি হাড়গাঁথা মালা। বৎসর দুই বয়স হইবে। বাবাজী বলিল, দুইদিন হইল ছেলেটিকে সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। কোনও পাহাড়িয়া রমণী ইহাকে হারাইয়া গিয়াছে, আজিও খুঁজিতে আসিল না। কেই বা ইহাকে খাওয়ায় কেই বা কি করে।

কুমুদনাথ যদুবাবুকে বলিলেন, "চলুন একে আমরা নিয়ে যাই।"

"পাগল হয়েছেন? কি করবেন একে নিয়ে?" "মানুষ করব।"

"যদি এর মা এখানে খুঁজতে আসে?"

"বাবাজীকে ঠিকানা দিয়ে যাব; মার ছেলে মাকে ফিরিয়ে দেবো।"—বলিয়া কুমুদনাথ স্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিলেন। তাঁহাকে বলিতে প্রথমে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। কুমুদনাথ অসহায় শিশুটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "দেখ, এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোনও দুঃখ আছে? তাহলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাকলে ছেলেটি দু'দিনে মারা পড়বে।"

এ কথায় গিরিবালার মাতৃহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি শিশুটিকে লইতে সম্মত হইলেন। বোতলে খোকার জন্য দুগ্ধ ছিল, তাহার কিয়দংশ তাহাকে পান করান হইল।

নামিবার সময় উপস্থিত। ৪টা বাজিতে বেশী বিলম্ব নাই। ৫টার সময় সূর্য্যাস্ত হইবে। খোকা স্বীয় পিতৃক্রোড় দখল করিল—তাহার চাকরের কোলে বন্য-শিশুকে দেওয়া হইল। রাত্রি ৭টার সময় ইঁহারা দলবলে সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

।। ২ ।।

পরদিন গিরিবালা বন্য-শিশুকে উষ্ণজলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, গলার মালা খুলিয়া ফ্ল্যানেল মুড়িয়া কাজল পরাইয়া, মানুষের মত করিয়া তুলিলেন। কুমুদনাথ বলিলেন, ইহার নাম রহিল 'বুনো'।

খোকা এইবার তাহার সহিত ভাব করিল। এতক্ষণ তাহার কিম্ভূতকিমাকার বেশ দেখিয়া ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসে নাই।

সন্ধ্যাবেলায় যদুবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বৃথা আস্ফালন করা তাঁহার অভ্যাস নহে। আহারান্তে বলিলেন, "কোত্থেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে আনলেন, একদিন এর ফলভোগ করতে হবে।"

কুমুদনাথ হাসিলেন; বলিলেন, "মশায় এ ত আর বাঘের শিশু নয় যে বড় হয়েও জাতিধর্ম্ম ভুলবে না, একদিন ঘাড় শুষে রক্ত খাবে!"

যদুবাবুর কোনও উত্তর যোগাইল না। একটু থমকিয়া গিয়া, এক মিনিট পরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তা ঠিক, তা ঠিক। তা দেখুন মানুষ করে, এ বুনো যদি পোষ মানে।"

বন্য-শিশু সারাদিন বেশ খেলা-ধূলা করিল; কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, তাহার গা ভারি গরম হইয়াছে—জ্বর হইয়াছে।

সারাদিন ছেলেটা জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। বৈকালে কুমুদনাথ ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বলিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া ফুসফুসে বিকৃতি ঘটিয়াছে। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হইল। রীতিমত চিকিৎসায় দুইদিন কাটিল। কিন্তু শিশুটি কিছুতেই বাঁচিল না।

২৯শে ডিসেম্বর রাত্রি দুইটার সময় গিরিবালার কোলে তাহার মৃত্যু হইল।

গিরিবালা অনেক কাঁদিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আহা কার বাছা? আমরা যদি না আনি ত ভালই করি। কেন এ কুবুদ্ধি হল? মিছিমিছি নিমিত্তের ভাগী হতে হল। এখন যদি তার মা আসে তবে কি হবে, কি জবাব দেবো?"

সঙ্গীহারা হইয়া খোকা একটু বিমনা হইল। থাকে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে, "বুনো কোথায় গেল?"

সারাটা দিন এই দম্পতির মনের অসুখে কাটিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা; আহারাদির পর কুমুদবাবু শয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় নিম্নে ডাকপিয়নের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ভৃত্যকে পত্র দিয়া সে ফিরিয়া গেল, তাহার পদশব্দও পাওয়া গেল। কুমুদনাথ প্রতিমুহূর্তে পত্রহস্তে ভৃত্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সে আর আসে না। নাম করিয়া ডাকিবার জন্য জানালা খুলিলেন। অত্যন্ত শীতল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট কোলাহলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কুমুদনাথ লণ্ঠন লইয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া গেলেন। দেখিলেন, চাকর বিশুয়া একটি সুন্দরী যুবতী পাহাড়িয়া স্ত্রীলোকটা ধরিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটা অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কুমুদনাথকে দেখিবামাত্র সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে কুক্‌রী ছুরি বাহির করিল। তাহা দেখিয়া কুমুদনাথ পিছু সরিয়া আসিলেন, বিশুয়াও তাহাকে ত্যাগ করিল। তখন সে উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

বিশুয়া মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বাবু— চোর।"

কুমুদবাবু তাহার বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিয়া বলিলেন, "ধরলি ধরলি, হাতদুটো যদি ধরতিস, তবে ছুরি বার করতে পারত না।"

বিশুয়া বলিল—উহাদের গায়ে ভারি জোর; জাপটাইয়া না ধরিলে রাখা যাইত না।

যাহা হউক, কুমুদনাথ বিবেচনা করিলেন, চোর চুরি করতে পারে নাই, পলাইয়াছে মাত্র, ইহাই ভাল। ধরিলে পুলিশে দিতে হইত, এবং তাহা লইয়া অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হইত। ফিরিয়া উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। গিরিবালা সব শুনিয়া বলিলেন—"চোর নয়, তোমার চাকরের সখী। ধরা পড়বার ভয়ে উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহার করেছে।"

"তবে ছুরি কেন?"

"জান না বুঝি? ও পাহাড়ী মেয়েদের দস্তুর। সঙ্গে সর্ব্বদা ছুরি থাকে।"

পরদিন প্রভাতে কুমুদবাবু চাকরটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই ঐ রমণীকে স্বীয় প্রণয়িণী বলিয়া স্বীকার করিল না।

॥ ৩ ॥

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। খোকাকে ঠেলাগাড়ীতে বসাইয়া তাহার চাকর তাহাকে বেড়াইতে লইয়া গেল। তখন বেলা দুইটা। গিরিবালা চাকরকে বারংবার করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন এক ঘণ্টার বেশী বিলম্ব না হয়!

তিনটা বাজিল তবু খোকা ফিরিল না। সাড়ে তিনটার সময় স্বামী স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। খোকার অন্বেষণে চাকর পাঠাইবার পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় পুলিশ আফিস হইতে পত্র আসিল; বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে দারোগা কুমুদবাবুকে এখনি থানায় আহ্বান করিতেছেন।

একে ছেলে ফিরিল না, তাহার উপর পুলিশ হইতে এই পত্র; একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে দুই জনেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কুমুদবাবু তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। গিরিবালা শূন্যগৃহে হরিণীর মত ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর, গিরিবালা ভৃত্য বিশুয়াকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন বাবুর যদি আসিবার বিলম্ব থাকে, তুই যত শীঘ্র পারিস সংবাদ আনিবি কি হইয়াছে।

কুমুদবাবু থানায় গিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত জনতা। বারান্দায় ঠেলাগাড়ীতে খোকা ক্রন্দন করিতেছে; একজন কনষ্টেবল প্রহরায় নিযুক্ত। কুমুদবাবু গিয়া খোকাকে কোলে করিলেন। তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা তখন আশ্বস্ত হইয়া চুপ করিল।

দারোগা সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু আর একটু হইলে আজ আপনার সর্ব্বনাশ হইত। ভৃত্য বাধা দিতে তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে।"

"চাকর কোথায়?"

"তাহাকে রিপন হাসপাতালে পাঠাইয়াছি।"

"বাঁচিবে ত?"

"শঙ্কা নাই, বাঁচিবে। ছেলেকেও খুন করিত, কিন্তু খোদাবক্স সিপাহী গিয়া তাহাকে ধৃত করে।"

কুমুদবাবু অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, কল্য রাত্রির সেই পাহাড়িয়া রমণী নহে ত? দারোগাকে বলিলেন, "বন্দিনী কোথায়?"

দারোগা কুমুদবাবুকে গারদ ঘরে লইয়া গেল। কুমুদনাথ দেখিলেন, সেই বটে, সেই পাহাড়িয়া সুন্দরী। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার মনের রহস্য উচ্ছেদ কবিতে পারিলেন না। সে কেন তাঁহাব প্রতি এমন শত্রুতাপন্ন?

দারোগাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "এ কেন আমার ছেলেকে মারিতে চেষ্টা কবিয়াছিল কিছু জানেন? কিছু স্বীকাব কবিযাছে?"

দারোগা বলিল, "ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়াছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।"

কুমুদবাবু বলিলেন, "আমি মারিয়া ফেলিয়াছি!—আমি—"

দারোগা বলিল, "সে আমি আপনার ভৃত্যের এজেহারে সমস্ত জানিতে পাবিযাছি। দেখুন বাবু ইহারা অসভ্য জাতি, ইহারা কি বুঝিবে যে আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া, উহার শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্যই লইয়া আসিয়াছিলেন? উহাদের বিশ্বাস, আপনি মাবিয়া ফেলিবার জন্যই আনিয়াছিলেন এবং মারিয়াই ফেলিয়াছেন।"

কুমুদনাথ পূর্ব্বেই বিশুয়ার কোলে খোকাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার নিজ এজেহার দিয়া, একটা কুলি ডাকিয়া খোকার ঠেলাগাড়ী সহ বাড়ী ফিরিলেন।

গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার বাছার পুনর্জ্জন্ম হল আজ। কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। চল, ফিরে চল দেশে, এখানে আর একদণ্ডও আমার থাকতে ইচ্ছে নেই।"

পরদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বৃষ্টিপাতের পর তুষারপাত আরম্ভ হইল। খোকার যে আমোদ! জানালা দিয়া হাত বাহির করিয়া তুষার স্পর্শ করিতে চায়।

ভারি অন্ধকার। চারিটা বাজিতে না বাজিতে ঘরে আলো জ্বালিতে হইল। কুমুদবাবু বলিলেন আজ সকাল সকাল আহার করিয়া লওয়া যাউক।

খোকা সারাদিন খেলা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছয়টার সময় কুমুদনাথ আহারে বসিলেন। গিরিবালা তাঁহার কাছে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

আহার শেষ হইলে কুমুদনাথ ঘেরা বারান্দায় বাহির হইলেন। দেখিলেন একটা স্ত্রীলোক বিদ্যুতের মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া দ্রুত ছুটিয়া গেল। সে আর কেহ নয়; সেই সর্ব্বনাশী লেপচা-রমণী; কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনাবশতঃ কুমুদনাথ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; নিম্নে অবতরণ করিবামাত্র দেখিলেন, বিশুয়া চাকরের গলদেশ ছিন্ন, রক্তে ঘর প্লাবিত। দেখিয়া কুমুদনাথের গা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। বুদ্ধি লোপ হইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গিরিবালা মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে; সেই রাক্ষসী খোকাকেও হত্যা করিয়া গিয়াছে!

বাহিরে শীত-রজনী অবিরাম তুষার বর্ষণ করিতে লাগিল। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭]

কাশীবাসিনী

॥ ১ ॥

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর সহর পাঁচ মাইল দূরে, ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে ষ্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসাবাড়ী। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দার মত। তাহার পরই অন্তঃপুর। দু'খানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই);—উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া সাড়ে তিন টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া সম্প্রতি বৎসর-দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে—অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড় সড়;—বড় সড় দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্যমাখা। রঙটি তত ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে। শাশুড়ী নাই—ননদ নাই—দেখিবার যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই ভজুয়ার মা। দিনরাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে—এইজন্য বেতন এক টাকা বেশী। খগোল্ অনেকদিন স্থায়ী একটি বাঙ্গালী পরিবার এই দাইটিকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্ম্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে এবং বোধ হয় বিশ্বাসীও বটে, কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভালমানুষ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণ বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যথাস্থানে চট বিছাইয়া, কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্ব্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—আঃ হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল!"

এমন সময় বাহিরে একটা পুরুষকণ্ঠ বাবু বাবু শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ—একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল একজন রেলওয়ে কুলি মাথায় একটা তোরঙ্গ হাতে একটা পুঁটলি—দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া, দাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল! কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—আগে ভজুয়াকে মা—ঈ বলিয়া জোরে নাড়া দিতে লাগিল। দাই তখন উঠিল—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিল, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও আসিবার কথা ত ছিল না; প্রণাম করিবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলে, "এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ।"

"তুমি তাঁর বউ?"

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল যে তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যে চিনতে পারলাম না—কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল তাই নামিয়ে দিল। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ী। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই—তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খুঁজে এলাম।"

মালতী বলিল, "তা বেশ করেছেন। হাত পা ধুয়ে ফেলুন।"

দাই জল দিল। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী ততক্ষণ একটি শতরঞ্চ আনিয়া বারান্দায় বিছাইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন গাড়ীতে উঠেছিলেন? খাওয়াদাওয়া হয়নি বোধ হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কই আর হয়েছে?"

মালতী দাইকে বলিল, "শীঘ্র করে উনানটা জ্বেলে দে। দিয়ে বাজাব যা, আলোচাল কিনে নিয়ে আয়।"

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "না মা, আলোচাল কিনতে দিতে হবে না আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা?"

"আমার নাম মালতী।"

"বাপের বাড়ী?"

"উত্তরপাড়া।"

"তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?"

মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল "বাবা ত মারা গেছেন আমি যখন আঁতুড়ে—মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের।"—বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল—উনান জ্বালিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দাইকে বকিল, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া, রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইল। সেইখানে বসিয়াই গল্প আরম্ভ হইল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"এই বোশেখ মাসে।"

"তবে ত অল্পদিনই হল। এখানে এসেছ কি মাসে?"

"এই দু'মাস।"

"তোমার স্বামী কখন আপিসে যান?"

স্বামী প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইল। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্চ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "ন'টার সময়।"

"কখন আসেন?"

'কোনও দিন ছ'টার সময় আসেন, কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।"

"কত মাইনে পান?"

"ত্রিশ টাকা।"

"তা ছাড়া উপরি আছে?"

মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি জানি।"

কাশীবাসিনী একটু খুসী হইলেন।

।। ২ ।।

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ভারি সকাল সকাল যে?"

গিরীন্দ্র একটু হাসিল। বলিল, "তুমি একলাটি থাক, তাই এলাম আজ সকল-সকাল।"

মালতী বলিল, "আজ আমি ত একলা নই। আজ বাড়ীতে কে এসেছে বল দেখি?"

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে?"

"একটি বিধবা; তিনটের প্যাসেঞ্জার কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন; টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।"

"কাশী-থেকে? সঙ্গে কেউ ছিল না? কত বয়স?"

"সঙ্গে কেউ ছিল না, বয়স ত্রিশ চল্লিশ।"

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিল। বলিল, "ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ, নিজেব ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।"

এ কৌতুক ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই কেন এল?"

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন তাহা ত সে একবারও ভাবে নাই, সে ত খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল।

গিরীন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কাশী থেকে—একলা মেয়েমানুষ—কি রকম বিধবা তাই ভাবছি।"

মালতী বুঝিল। বলিল "না না—যা ভাবছ তা নয়। ভাল লোক।"

গিবীন্দ্র বলিল, "ভাবি ত জান। যেমন তোমার বুদ্ধি। কখন যাবে বলেছে?"

"তা ত কিছু বলেননি।"

"বাত একটাব সময় আবার গাড়ী।"

"অত রাত্রে কি করে একলা ষ্টেশনে যাবেন? কে পৌছে দেবে?"

গিবীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পৌঁছে দেবো। এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। আমি যাব—সঙ্গে করে পৌঁছে দেবো।"

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিযা বসিয়া রহিল। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিযা আসিল।

তখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিয়া আছে। গিরীন্দ্র বলিল, "ব্যাপারখানা কি?"

মালতী বলিল, "বাড়ীতে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে দেবে কি করে? উনি নিজে থেকে বলেনি, কি করে বলবে যে তুমি যাও রাত একটার গাড়ীতে?"

গিবীন্দ্র বিবক্ত হইযা বলিল, "ওগো সে জন্যে তোমার ভাবনার দরকার কি? সে ভার আমার?"

ইহার পর গিরীন্দ্র তোরঙ্গ খুলিযা একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, একটা সোডা ভাঙ্গিয়া কয়েকবার পান কবিল।

মদ্যের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তির ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিল। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কাশীবাসিনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।"—বলিয়া প্রণাম করিল। 'দিল্' তখন তার 'দরিয়া'।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস?"

"আপাততঃ কাশীবাস করছি বাবা।"

"কোথা যাওয়া হচ্ছিল?"

"একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল—নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—"

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তা বেশ করেছেন। উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়ীতে যাবেন এখন।"

"আজ রাত একটার গাড়ীতে—"

"পাগল! অত শীতে, বুড়োমানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন ত নেই?"

"তা নেই যদিচ।"

অতঃপর গিরীন্দ্র শাল গায়ে দিয়া ছড়ি লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিল। কাশীবাসিনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত, মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকাডাকিতে সেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিল।

মালতী বলিল, "এত রাত!"

"একটা ভাল খবর আছে।"

"কি?"

"বদলি হল তাড়িঘাটে।"

"মাইনে বেড়েছে?"

"পাঁচ টাকা।" "মোটে।"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে শয়নগৃহে আসিয়া পৌঁছিল। গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা দিক না দিক, সেখানে দু'পয়সা আছে।"

"কবে যেতে হবে?"

"তিন চার দিন পরে।"

গিরীন্দ্র বলিল বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী নিদ্রিত।

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরীন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিল। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী কাল যায়নি?"

মালতী বলিল, "বেশ! নিজে কাল মানা কবলে ওঁকে যেতে। উনি ত একটার গাড়ীতে যেতে চেয়েছিলেন।"

গিরীন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল। বলিল, "আজ তিনটেব প্যাসেঞ্জারের আগে কুলি পাঠিয়ে দেবো। পাপ বিদেয় কবে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেক কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।"

মালতী ডাগব বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশীবাসিনীকে বলিল, "আসুন আমরা স্নান করে ফেলি।"

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইল। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই কূপজলেই 'ইদং গঙ্গোদকং' বলিয়া সারিতে হইল।

আহারান্তে উঠানে কূপের আলিসায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চুল শুকান এবং বিশ্রাম করা হইলে, মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভাল করিয়া চুল বাঁধা যায়? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটা ঘণ্টা ধরিয়া, অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিল। এইবার কুলি আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "মা, একদিনেই তোমার উপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্ছে।"

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিল। বিদেশে কতদিন পরে একজন রমণীর স্নেহব্যবহার পাইয়া তার যেন পরমাত্মীয় লাভ হইয়াছে মনে হইতেছিল। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহারও বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

মালতী বলিল, "আজ নেই বা গেলেন। দু'দিন থাকুন না। এ দু'দিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় কান্না পায়।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা তোমার স্বামী কিছু ভাবেন যদি।"

মালতী মুখে বলিল, "ভাববেন আবার কি?"—কিন্তু মনটি তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যিই ত স্বামী যে ইঁহার উপর প্রসন্ন নহেন। কুলিটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী পাছে বেশী রাগ করেন?

তাহার পর ভাবিল—তা করেন করিবেন। এমন কিছু গর্হিত কার্য্য করা হইতেছে না। আমি এই একলাটি এই সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুইদিন রাখিতে পারি না?—স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে সব মনে মনে গড়িয়া রাখিতে লাগিল।

দুইটা বাজিল, কুলি আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল, তথাপি কুলির দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—তখন আবার মনের সুখে কাশীবাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিল, কাশীবাসিনী বলিলেন, "ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও তোমরা? ঘরে খাবার তৈরি করতে জান না?"

মালতী বলিল, "কে অত হাঙ্গামা করে বাপু!"

"হাঙ্গামা আবার কি? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্ছি।"—বলিয়া তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিল, "ও কি কথা। আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি টাকা দিই।" দাইকে বলিল, "টাকা ফিরিয়ে দে দাই।"

দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল—তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্যে একটা টাকা খরচ করলামই বা; তোমরা আমায় কত যত্ন আদর করছ।"

মালতী বলিল, "ভারি আদর ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কিনা! আদর যত্ন করতে জানি কিনা! নিন টাকাটা রাখুন।"

তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, তা হলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়ীতে চলে যাব।"

তখন মালতী ক্ষান্ত হইল, বলিল, "কর বাছা তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু অন্যায় হল বলে রাখছি।"

দাই টাকা লইয়া বাজারে গেল।

।। ৩ ।।

আজ গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল অনেক বিলম্বে; রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে বলিল, "আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাজের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু'দিন যখন কষ্ট পেলে আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই। কাল নিজে গিয়ে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো।"

মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে মদ্যগন্ধ পাইল। বলিল, "তোমার গতিক ভাল নয়। তাড়িঘাটে গেলে হাতে বেশী পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।"

গিরীন্দ্র বলিল, "আরে রামঃ, সে ছোট ষ্টেশন, অজ পাঁড়াগা, সেখানে কি কেলনার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গঙ্গাস্নান করে, সব ছেড়ে দেব—ব্যস একদম।

"তুমি কাল আপিসে যাবে না?"

"না, আমার এখানকার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড়যন্ত্র করে রাখতে হবে।"

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আর জলখাবার খাব না, কোথাও বেরুব না; রুটি দাও একেবারে খাই।

মালতী লুচি, মোহনভোগ, মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশীবাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিল। গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বলিল, "দেখ উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞাসা কর দিকিন।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল, "জানেন কিছু কিছু।"

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দুই এক দিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকেন না? তা হলে পরশু ভোজ পর্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা কর না।"

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল, "এ অবস্থায় কি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারি?"

মালতী বলিল, "আহা মরে যাই! আজ বাড়ী এসেই ওঁর সঙ্গে কথা কইলে না?"—বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিল। তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ্দ করিল। কাশীবাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্ত্তনাদি প্রস্তাব করিলেন, তাহা গিরীন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আড়ালে মালতীকে বলিল, "দেখ ইনি একজন খলিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।"

মালতী রাগ করিয়া বলিল, "কি বল যাও! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ।"

দুই ক্রোশ দূরে শুরগাঁও নামক, পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেইখানে ছাগবলি পাঠান হইল। রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া গেল। রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিল। যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিত, তবে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে পারিত।

।। ৪ ।।

আজ রবিবার। আজ রাত্রের গাড়ীতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে। কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি আর দেশে যাব না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।"

মালতী বলিল, "বেশ ত, আপনিও আমাদের সঙ্গেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার পাঁচটা ষ্টেশন বইত নয়।"

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিল, "গোটা ত্রিশ টাকা বের করে দাও—বাজারের দেনাগুলো মিটিয়ে আসি।"

মালতী বলিল, "অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে নাকি?"

"কেন সে দিন যে আশি টাকা এনে দিলাম।"

"পর্শু বাজারে যাবার সময় ত্রিশ নিয়ে গেলে, বাকী যা ছিল কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে সে সবই ত প্রায় দিলাম তিন চার বারে। আর টাকা কোথায়?"—বলিয়া মালতী বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিল, "এখন উপায়? আমার কাছে ত কিছু নেই।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "আমি কি করব? মদেই তোমার সর্ব্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।"

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দেখি কারু কাছ থেকে ধার নিইগে।"

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন। মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওঁকে বারণ কর মা, আমার কাছে টাকা রয়েছে, আমার ত এখন দেশে যাওয়া হল না।"

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিল। গিরীন্দ্র বলিল, "সে কি কাজের কথা? ওঁর কাছে টাকা নেব, আলাপ নেই পরিচয় নেই!"

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি বাবা? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বস; আমি কিছু দিন পরে আবার আসব এখন তোমাদের কাছে; দেখাশুনোও হবে, টাকাও নিয়ে যাব।"

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তা হলে আপনি অনুগ্রহ করে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটেই চলুন আমাদের সঙ্গে। পাঁচ ছ দিনেই আপনার টাকা ক'টি ফিরে দিতে পারব।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কত চাই? তিরিশ? যদি বেশী দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে, যা লাগে বল বাবা।"

গিরীন্দ্র বলিল, "না মা বেশী চাইনে, ত্রিশ দিলেই হবে।"

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেই দিন রাত্রি এগারটার গাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ, স্ত্রী ও কাশীবাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিল। ভজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিল। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না।

ষ্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন, "বাছা, বাবাকে বল যেন আমার কাশীর টিকিটই করেন। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরীন্দ্র ইঁহাকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিল, কিন্তু ফল হইল না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারনগরে নামিয়া গেল;—কাশীবাসিনী চলিয়া গেলেন।

॥ ৫ ॥

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্ম্মস্থান, তাড়িঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। সরকারী বাসা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইখানে গিয়া উঠিল। জিনিষপত্রগুলো কতক গুছাইয়া ষ্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ খুলিল। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিত। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্স নাই।

তখন মালতী ভাবিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিল, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিষ আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিল, তথাপি পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া ধুলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। ষ্টেশনমাষ্টারের মেয়ে চম্পকলতা তাহার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া বউ দেখিতে আসিয়াছিল, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিল।

শেষে গিরিন্দ্র আসিল। সে দেখিয়া বলিল, "এ কি।"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল "বেশ করে সব খুঁজেছ?

"কিছু বাকী রাখিনি।"

"শেষ তাকে কখন দেখেছ?"

"কাল খগোলোতে গুছিয়ে একখানি শালুর টুক্‌রোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি, বেশ মনে পড়ছে।"

"গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে। কোন জিনিসপত্তর বের করতে?"

"খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগল, শালটা বের করেছিলাম।"

"সে সময় গহনার বাক্স বের করে ফেলে রাখনি ত?"

মালতী বলিল, "কখখনো না। উপরে শালখানা ছিল—শুধু তয়ে তয়ে শাল তুলে নিয়েছি।"

"চাবি কোথা রেখেছিলে?"

"কোমরে ছিল।"

"তারপর ঘুমিয়েছিলে?"

"তা, ঘুমোলাম বইকি।"

গিরীন্দ্র নিশ্চিত স্বরে বলিল, তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিল, যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে, গহনার বাক্সটি বের করে নিয়েছে। তার নাম কি জান?"

"না। বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কখনও?"

"কাশীতে কোথায় থাকে জান?"

"কি একটা মঠে।"

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "কাশীতে ত দুশো ছাপ্পান্নটা মঠ আছে—কোন্ মঠে—কোনখানে সে মঠ কিছু শুনেছ?"

"না।"

"সেইকালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস কোরো না। ওরা সর্ব্বনেশে লোক—কাশীর ঘাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথাসর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল!"

মালতী বলিল, "তিনি কখখনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন? আমিই বোধ হয় খগোলের বাসায় ফেলে এসেছি।"

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল, "ও সব কথা রেখে দাও—জান না ত পৃথিবীর গতিক। আচ্ছা সে মাগী কোনও দিন তোমার গহনা দেখতে চেয়েছিল?"

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা চেয়েছিলেন; সেই ভোজের দিন। বললেন, মা তোমার কি কি গহনা আছে দেখি।—আমি বের করে সব দেখালাম।"

গিরীন্দ্র বলিল, "তবে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি চললাম পুলিশে টেলিগ্রাফ করতে।"—বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল।

মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

॥ ৬ ॥

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতি গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বমত হাসে, গল্প করে, আমোদ করে। নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতেই বোধ হয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল।

সে দিন পুলিশে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল, সেই দিনই দিলদারনগর হইতে হেড কনষ্টেবল আসিযা গহনাগুলির ফর্দ্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাব পর হইতে পুলিসের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় দিলদাবনগর হইতে গাড়ী আসিল। গিরীন্দ্রনাথেব বাসা প্ল্যাটফর্ম্মের নীচেই দুয়ারে দাঁড়াইলে প্ল্যাটফর্ম্ম গাড়ী লোকজন সব দেখা যায়। যতবার গাড়ী আসিত, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিত প্রতি গাড়ীতে না দেখিলে যেন তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে; গাড়ীর শব্দ শুনিবামাত্র মালতী থালা ফেলিযা এঁটো হাতে এঁটো মুখে গাড়ী দেখিতে গেল। বন্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলি তাঁহার জিনিষ নামাইতেছে; তিনি কুলিকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলিটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিযা আচমন করিল। কম্পিত বক্ষে কাশীবাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কত কি যে তাহার মনে হইল। কত আহ্লাদ হইল, আর কতবার মনে মনে বলিল, হে ঠাকুব, স্বামী যে তাঁহাকে গহনা চুরির অপবাদ দিয়াছেন, সে কথা যেন উঁহাব কর্ণগোচর না হয়।—তিনি যে গহনা লন নাই এই বিশ্বাস মালতীর ছিল। আসিতে দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন?

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকটে পৌঁছিলেন।

"মা এসেছেন?"—বলিয়া মালতী প্রণাম করিল। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মালতী বলিল, "আপনি স্নান করে ফেলুন, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "স্নান করেছি। ভাত চড়াতে হবে না—আজ একাদশী।"

মালতী লক্ষ্য কবিল, কাশীবাসিনীর মুখখানা যেন বড় গম্ভীর—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ছলছল করিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনটা এত ভার কেন?"

তিনি বলিলেন, "জান না?"

মালতী ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"তোমার সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না?"

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয়নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি?"

কাশীবাসিনী ম্লান মুখে বলিলেন, "তোমার স্বামীর ত বিশ্বাস হয়েছিল বাছা!"

মালতী বলিল, "পুলিশ আপনার সন্ধান পাবে তা উনি ভাবেন নি। উনি ত আজও বলছিলেন, কাশীতে কত লক্ষ লক্ষ মঠ, কোটি কোটি সেবাধারী, কে কার সন্ধান পায়?"

"বের ত করেছিল আমায়। আমার উপর জুলুমটা কি করেছে কম? দুটিশো টাকা নগদ ঘুস গুণে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পেয়েছি।"

মালতী বলিল, "আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল।"

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরীন্দ্র কখন আসবেন?"

"সন্ধ্যেবেলা।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

"আজই যাব।"

"আজই যাবেন?"

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভারি ছেলেমানুষ। তোমার স্বামী আমাকে চোর বলে সন্দেহ করেন, আর তোমার ইচ্ছে যে আমি থাকি! আমি আড়াইটের গাড়ীতে ফিরব। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিনে ফিরবেন?"

"কেন? ফিরলে কি দেখা হবে?"—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনীর চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "একটি কাজ করবে?"

মালতী সাগ্রহে বলিল, "কি?"

"আমার কতকগুলি গহনা আছে, সেগুলি তুমি পর দিকিন।"—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাতবাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভাল ভাল জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন, "এইগুলি সব তুমি নাও।"

সোনা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী, পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত। তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "সে আমি পারব না।"

"কেন?"

"আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব?"

"আমি দিচ্ছি।"

"আপনি দিচ্ছেন, কিন্তু আমি কোন অধিকারে নেব? সে আমি পারব না।"

আকাশে মেঘ বাড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল। দিবালোক অত্যন্ত কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকার যদি থাকে?"

মালতী বলিল, "অধিকার? কি অধিকার?"

কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন, "তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।"

মালতীর বুক গুরগুর করিয়া উঠিল। অবাক হইয়া সে কাশীবাসিনীর মুখপানে চাহিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কি সত্যি মরেছে?"

মালতী থতমত খাইয়া বলিল, "কেন?"

"তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"সবাই ত বলে।"

"তা হলে তুমি জান। আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।"—বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্পদিনের ঘটনা সে ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠানদি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই,

সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিল, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইযা যেন তাব চক্ষেব সম্মুখে ঘুবিতে লাগিল। যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিত, শুনিল তিনি বাস্তবিক জীবিতা, তাঁহাব সহিত ঠানদির কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইযাছে। জানিল, যে মার স্মৃতি সে পবিত্রতম বলিয়া পবম ভক্তিভবে আশৈশব বক্ষে ধাবণ কবিযা আছে—সে মার স্মৃতি সংসাবে ঘৃণিত মা তাব কলঙ্কিনী। তাহাব সে বাত্রেব কষ্ট অবর্ণনীয়। এই সেই মা? আবাব সেই বাত্রের তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে ফিবিয়া আসিল।

মালতী শিহরিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসাবে একটু দূবে সরিয়া বসিল।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই জানেন?" "না।"

"তুমি কতদিন হ্‌ল শুনেছ?"

"বিয়েব পর।"

"মোক্ষদাপিসীর কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"মোক্ষদাপিসীর মুখেই শুনলাম, তোমাব বিয়ে হযেছে, দানাপুবে মালঘবে জামাই কর্ম্ম কবেন, পূজোব সময় তুমি দানাপুরে আসবে তাও ঠিক হযেছে।"

মালতী বলিল, "তা হলে দানাপুবে তুমি হঠাৎ এসে পড়নি, জেনে শুনে এসেছিলে? কেন?"

মালতীব স্বব এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনাব সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পাবে?"

মালতীব একবাব একটু একটু কান্না আসিতে লাগিল। আপনাব মা না জানিযাও ইঁহার যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইযাছিল, তাই মনে পড়িল। কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল, "কেন তুমি জানালে তুমি কে?"

"কি জানি। থাকতে পাবলাম না।"

মালতী আবেগভবে একবাব বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েছ ভালই কবেছ। নইলে মাকে ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, "এ মা! নাই দেখতাম।"

এই দ্বিধায় সে কিছুই বলিল না, চুপ কবিযা বহিল।

গাড়ীর সময় হইল। কাশীবাসিনী কুলিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিস লইতে আসিল।

মালতী বলিল, "গহনা নিয়ে যাও। আমি পরব না।"

কাশীবাসিনী কন্যাব মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "যা ভেবেছ তা নয। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ কবেছি, আজ চৌদ্দ বছব ধবে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর, এব একখানিও পাপের অর্জ্জন নয়। আমি মস্ত বডমানুষেব মেয়ে ছিলাম—শোননি?"

মালতী বলিল, "তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পাবিনে।"

"তাই কোরো। যদি তিনি তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।"

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিল না। "মা আবাব দেখা দিও"—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধবিল, প্রণাম করিল।

"সাবিত্রী হও, রাজবাণী হও"—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইযা গেলেন।

[বৈশাখ, ১৩০৮]

প্রণয়-পরিণাম

॥ ১ ॥

হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—'কে এমন প্রেমিক আছে, যে প্রথম দর্শনেই ভালবাসে নাই?'—কে আমাদের মাণিক লাল! কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিয়াছে, ঘোড়া সাজিয়া পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত সে কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদযের হৃদয়ে ভালবাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মাণিকলাল নিজের কাছে নিজে ধবা পড়িয়াছে সংপ্রতি মাত্র। সেদিন মাণিক কুসুমদেব বাগানে, পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম-মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজিব প্রান্ত দিযা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোনালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ কবিতেছে। দেখিয়া, মাণিক হৃদয় হাবাইল।

ইহারা চলিয়া গেলে পর, মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব্ব আলোকেব বশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহারা মনোদেহের প্রতি পবমাণুটিকে যেন বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহাব চক্ষুযুগল আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচবে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশেব পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য্য নীল—এমন কখনও দেখে নাই।—বসুন্ধবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরমা সুন্দবী। দূরে দীর্ঘিকাতীবে ঘুঘু ডাকিতেছে—উকু পাখী কলরব করিতেছে, বউ-কথা-কও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে; পাখীর ভাষায় যেন আজ দূজন প্রাণ, নূতন সুব। মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেবতঃ কোবো পেয়াবায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সেদিন রবিবার ছিল—স্কুল যাইতে হইবে না। আহতবৎ বাড়ী আসিয়া মাণিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। পড়িবার জন্য? হায়, না, পুড়িবার জন্য, চিন্তাব অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্য। শতরঞ্জ বিছান মেঝেতে ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাণিকের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া, বটতলার 'পারুলবালা', 'সোহাগিনী', 'বউরাণী' প্রভৃতি কিছুই আব বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মাণিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। 'কেন দেখিলাম। হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার—কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে—হায় কতদিনে?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিশ দিতে দিতে লম্ফ দিয়া মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ

প্রবেশ করিল। বিপিন আসিয়া একেবারে মাণিকের চুল ধরিয়া বলিল, "কি রে ইষ্টুপিট্ ঘুমুচ্ছিস নাকি? মার্ব্বেল খেলবিনে?"

মাণিক উঠিয়া বিপিনের গালে হঠাৎ এক চড় কসাইয়া দিল।

বিপিন হতভম্ব। শরৎ বলিল, "তোর কি হয়েছে কি? মারামারি করতে চাস, আয়"—বলিয়া শরৎ আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "আঃ শরতা কি করিস।" মাণিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "লেগেছে ভাই, রাগ করেছিস?"

মাণিক বলিল,"মানুষ শুয়ে রয়েছে, চুল ধরে টাননি কি বলে?"

শরৎ মাণিকের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল—"আহা এ রকম করে টানলে বুঝি আবার লাগে?"—তাহার আশা ছিল, তাহাকেও মানিক চড় মারিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শরৎ তাহার সহিত ঘুঁসি লড়িতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু শরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মাণিকের ক্রোধ নিরীহ বিপিনের উপরেই সবটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। মাণিক সটান আবার শুইয়া পড়িল।

শরৎ বলিল, "না খেলিস—না খেলবি। ভারি ত বয়েই গেল কিনা।"বলিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ রে বিপনে।"

বিপিন যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মাণিক রাগ করিসনে ভাই—যদি লেগে থাকে তোর, বিলক্ষণ শোধ ত নিয়েছিস।"

। ২ ।।

মাণিক আর ফুটবল খেলে না—জিম্‌ন্যাষ্টিক্ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে—দ্বিপ্রহরে ইস্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।

কুসুম মেয়েটি দেখিতে খুব সুন্দরী না হউক, মুখখানি বেশ ফুটফুটে। পিতামাতার শেষের সন্তান—ভারি আদরের মেয়ে। কুসুম এই কার্ত্তিক মাসে এগারো বছরে পড়িয়াছে। দুই এক স্থানে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, কিন্তু এখনও পাকাপাকি কোথাও স্থির হয় নাই।

মাণিক ক্রমাগত কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া, কথা কহিয়া, জিনিষ দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মাণিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান যেন দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে কলেজ বন্ধ হওয়াতে মাণিকের এক পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মাণিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু কলিকাতার বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে আসিয়া মাণিকের ভাবগতি দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি?

মাণিক ত কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিয়া শেষে একদিন প্রভাস মাণিকের কাব্যর খাতা হাতে পাইল। কবিতা পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝতে বাকী রহিল না। মাণিকের উপর তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্য বোধ হইল।

সেদিন জলখাবার খাইয়া প্রভাস মাণিককে বলিল, "গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক চল।"

মাণিক প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি।"

মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি?"

"তোমার গোপন কথা।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ডসাই কাগজ প্রভৃতি প্রভাসদাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বেশী চালাকি কোরো না যাও।"

প্রভাস বলিল, "এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের সমস্যা।"

এবার মাণিক যথার্থ বিষয়টি সন্দেহ করিল, বলিল, "কি হয়েছে কি? কি বিষয় বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত মৃদুগামী নৌকোর পালে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দিবে এবং মার খাওয়াইবে, সুতরাং শত্রুভাব ধারণ করিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "আহা যা বল্লে আর কি। ইয়ার্কি ভাল লাগে না।"

প্রভাস বলিল, "ভাই—আমার কাছে আর লুকাও না কেন? আমি সব জেনেছি। তোমাদের দুঃখে আমি খুব দুঃখী। তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি।"

মাণিক কতকটা আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল, "কে বললে তোমায়?"

নৌকোর গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল, "তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুয্যের মেয়ে কুসুম ত?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্ছে, আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল—তাই কি?"

মাণিক বলিল, "মনে ত হয়।"

স্পষ্ট কখনও বলেছে?"

"না।"

"তুমি কখনও তাকে স্পষ্ট করে বলেছ?"

"না।"

ইহার পর দুজনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল—"দেখ ওরা আমাদের স্বঘর। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানোর আগে, কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান ফনুমান নয়, "স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মাণিক বলিল, "সে কখনও পারা যায়?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে না পারলে চলবে কেন? তুমি যদি সত্যিই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য, সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কি করে হবে? আর দেরী করলেও চলবে না। কুসুমের কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্ছে, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমায় আপশোষ করতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতদিন সে শুধু ভাল বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কখনও করে নাই। এখন মনে হইতে লাগি[illegible] বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয়।

"দাদা। কি করে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন?

"তা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। একটু অবসর খুঁজে আড়ালে পেলে, তার হাতখানি এমন করে ধরে, তাকে বলবে—দেখ কুসুম—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমাকে ভালবাস কি?' যদি বলে 'বাসি'—তা হলে জিজ্ঞাসা করবে,তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কি?' যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তা হলে তাব হাতটি এই রকম করে ঠোটে তুলে চুমো খাবে।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু দাদা। সে যদি রাজি না হয়?"

প্রভাস বলিল, "তা প্রথমবারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথমবারের কেউ কেউ একেবারেই না বলে। কেউ কেউ বা বলে—ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে। সে রকম হয়—তখন আবাব তোমাকে শিখিয়ে দেবো।"

চাঁদ উঠিয়াছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

।। ৩ ।।

পরদিন হইতে মাণিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েকদিন চেষ্টার পর তাহা লাভও করিল। একদিন সকালে কুসুমদের বাড়ী গিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মাণিক বলিল, "কুসুম! বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, 'চল না মাণিকদাদা!"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া মাণিক বলিল, "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল, "খবদ্দার--ফুল তুলো না—ফুল তুললে দিদিমা যে বকে।"

মাণিক বলিল, "না তুলছিনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা কে না জানে?—পুষ্প। আমাদের পদ্যপাদপে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর।।

আচ্ছা মাণিকদাদা তুমি ত ইংরেজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিন?"—কুসুমের চক্ষু দুইটি মাণিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মাণিক বলিল, "পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আহা! তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না মশাই। শাখী মানে কি?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে!"—বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মাণিক বলিল, "এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আর কি নাম? দাঁড়াও ভাবি।"—বলিযা কুসুম ঠোট নাড়িয়া বিজ্‌বিজ্ করিয়া কি বকিতে লাগিল। বোধ হয় কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মাণিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু? কু কি?
কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল।
কুসুম—
ওগো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম।
কুসুম দুলায়ে ধীরে বহিছে অনিল।।

আচ্ছা, মাণিকদাদা, অনিল মানে যদি বলতে পারে তবে ত বুঝি!"

মাণিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মাণিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি, তার মানে, আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

মাণিক বলিল, "দেখ কুসুম, অনেক দিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে?'

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটার মানে বুঝিল। কিন্তু ঐ কথাতেই সব মাটি হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পায়ের মল ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাণিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে, মাণিক ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহের নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার অর্থ কি? তবে কি কুসুম সম্মত নয়?

অধীত উপন্যাসগুলি মাণিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা মীমাংসা পাইল। লজ্জা প্রণয়ের চির-সহচর। কুসুমের পলায়নের কারণ যে লজ্জা সে সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

॥ ৪ ॥

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোনও চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন বিবাহে সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। এখন উভয় পক্ষের পিতামাতার সম্মতি করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

মাণিক বলিল, "বাবাকে তুমি বললে বাবা রাজি হবেন ত?"

প্রভাস বলিল, "দেখ, তার চেয়ে বরং তুমিই বল, আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা—আমার মামা বই ত নয়! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মাণিক বলিল, "সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকেই বললে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্ছো কেন?"

প্রভাস প্রথমটা মাণিককে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। মাণিকের পিতা নন্দলালবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপে ইতস্ততঃ করিতে করিতে সপ্তাহখানেক কাটিল। মাণিক ও প্রভাস যখনই নির্জ্জনে থাকিত—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মাণিক কুসুমের নামে একটি মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল—স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তর চিঠির কাগজে লালকালির বর্ডার টানিয়া, নীল কালি দিয়া মাণিক কবিতাটি নকল করিল তাহার পর আবার অবসর খুঁজিয়া কুসুমের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পড়িল। কি বুঝিল সে জানে! মাণিক বলিল, 'কুসুম তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল, "রাখব বইকি।"

মাণিক কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কারুকে নয়।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় রাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে।"

মাণিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

ওদিকে পরম সত্যাবাদিনী কুসুম বাড়ী গিয়াই বলিল, "দিদি একটা কথা বলি শোন্।"

তাহার দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভরপুব—মনের সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল, 'মেজদি একটা মজা দেখবি?"

"কি?"

কুসুম খামখানি বাহির কবিয়া বলিল, "কারুকে বলবিনে?"

"কার চিঠি লা?"—বলিয়া নলিনী ছোঁ মাবিয়া খাম কাড়িযা লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল :—

"কুসুমলতা—মনের কথা—শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিযা, কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা কবিল, "এ কোথা পেলি?"

"মাণিকদাদা দিয়েছে।"

"কে? ম্যান্কা?"

"হ্যাঁ।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কি হবে। তোকে এ সব লিখেছে কেন?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল, "তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা! তোদেব ভালবাসা হয়েছে নাকি লো?"

কুসুম বলিল, "ম্যানকা আমায় একদিন বলছিল যে আমি তোকে ভালবাসি।"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আহা তা বেশ! ছেলেটিব পছন্দ ভাল"—বলিযা পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা—মনের কথা—শুন সই।
দিবা রজনী—তব মুখখানি—মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটিকুটি। বলিল—"দুনিয়াব আব মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কিনা মনে লই।" তার চেয়ে চিঁড়ে দই লিখলে ঢেব বেশী সবস হত। কি বলিল কুস্মি? শোন্ দিকিন—

কুসুমলতা—মনেব কথা—শুন সই।
দিবা রজনী—তব মুখখানি—চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে, কারু কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমাব মুখখানি দেখলে—আমারও সেই রকম—লোভ হয়।"—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, 'অত হাসছিস কেন? হয়েছে কি?'

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল, "এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কি লিখেছে দেখ।"

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কথায় ছিরি দেখ না। কি বলি। তার ঠিক নেই। কি এ?"

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হল বিয়ে দিচ্ছ না—তা মেয়ে নিজের বর নিজেই ঠিক করে নিয়েছে।"

মা ত অবাক। বলিলেন, "কে লিখেছে এ সব?"

"সে পরে বলব। আগে শোনই না।"—বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা—মনের কথা—শুন সই।
তব মুখখানি—দিবা রজনী—মনে লই।
শয়নে স্বপ্নে—কিম্বা জাগরণে—সদা সর্ব্বদা
চিন্তা করি তোমা—রূপ নিরুপমা—ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া—নিদ্রা তেয়াগিয়া—ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু—হনু এবে সরু—দেহ টলমল।—"

মা বাধা দিলেন। বলিলেন, "কি পাগলামি করছিস, রঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল না?"

"চৌধুরীদের ম্যানকা লিখেছে।"

"ম্যান্‌কা? আরে গেল যা! কি দস্যি ছেলে গো! এ কি বিদ্যে?"—বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন, "কুস্‌মি, কুস্‌মি কোথা গেল?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গ্রেপ্তার করিলেন। বলিলেন, "এ কি রে শতেক-খোয়াবী?"

কুসুম গোঁ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি।"

"তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী?—খেয়ে খেয়ে দিনের দিন হাতী হচ্ছেন—আর এই সব বিদ্যে হচ্ছে! কি হয়েছে বল্‌।"

কুসুম বলিল, "হতভাগা লক্ষিছাড়া ম্যান্‌কা আমায় দিলে ত আমি কি করব?—আমার বুঝি দোষ বা রে!"

"কি বলেছে দেবার সময় তোকে?"

"বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে—বাক্সতে নুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেরা করিলেন। জেরার শেষে কুসুম বলিল, "একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্‌কা আমায় বললে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেবো তুই আমায় বিয়ে করবি? দূর পোড়ারমুখো বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগের মধ্যেও মার ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। শেষে তিনি বলিলেন—"শোন্‌ বলছি। ফের যদি ম্যান্‌কার ত্রি-সীমানায় যাবি কি ওর সঙ্গে কথা কবি, কি খেলা করবি—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব। বুঝেছিস?"

কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বা রে! আমি কি করব? আমায় দিলে কেন?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

॥ ৫ ॥

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনও মসৃণ হয় নাই। যে ভালবাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে কেবলি যাতনাময়, তাহাতে যে কেবলি চোখের জল এ কথা কি অস্বীকার করিবে?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, কিন্তু মাণিকলালের অদৃষ্টে আরও দুর্গতি লেখা ছিল।

মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরি গ্রামের ডাক্তার—খুব পশার। প্রাতে রোগী দেখিতে বাহির হন, যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় বাবোটা। স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মাণিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুইজনে বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় দুইজনের মুখই কালিমাময়।

শেষে চারিটা বাজিল শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন, "ওরে বুনো—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তারপর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামাবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত। ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল তাহাতে বসিল।

নন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কি প্রভাস!" তাঁহার স্বব বৈকালিক নিদ্রায় শ্লেষ্মাজড়িত।

প্রভাস কপালেব ঘাম মুছিয়া বলিল, "আজ্ঞে একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া প্রভাসেব পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম?—কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে নামিয়াছে, শেষ পর্যন্ত যাইতেই হইবে। সুতরাং বাক্যস্ফূরণ করিতে বাধ্য হইল। বলিল, "আমাদের মাণিক্যের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন? কি হয়েছে? কোনও ব্যারাম-স্যারাম নাকি?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়।

প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী গুড়গুড়ির নল পুনরায় মুখে লইয়া বলিলেন—"কি রকম?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে Love-এ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বললে?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া বিপদ গণিল। বলিল, "আজ্ঞে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে।"

"প্রণয় হয়েছে? সে আবার কি রকম? ব্যাপারখানা কি? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে?"

"আজ্ঞে, অতুল বাঁড়ুয্যের যে কুসুমলতা বলে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ও লবে পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি ওর জীবনের সুখ চান, তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কি রকম করে লবে পড়ল?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে কি রকম করে পড়ল তা বলা কঠিন—তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি যে আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল।"

চৌধুরী বলিলেন, "উভয়তঃ প্রবল?—বটে!"—বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করতে চায়?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে এই ত একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওঁর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন "মরুভূমি? ওঃ!"—বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্ব্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন, "ম্যান্‌কাকে ডাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল, হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মাণিক শুইয়া আছে। একটু হাসিমুখে বলিল, "মাণিক যাও ভাই, মামাবাবু ডাকছেন।"

মাণিক বলিল, "কি রকম বুঝলে?"

"এ পর্য্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মাণিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহাব হইবে? বলিল, "চল তবে।"

প্রভাস বলিল, "তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কিনা।"

মাণিক বলিল, "না ভাই তুমি এস—নইলে আমাব ভাবি ভয় কববে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা মিনিট দশ পরে আমি যাচ্ছি"—বলিয়া মাণিককে ঠেলিয়া দিল।

মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহাব পিতা আর্সির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁপ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আর্সিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোব এগ্‌জামিন কবে?" মাণিক বলিল, "আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হল?"

"আজ্ঞে হয়েছে এক রকম।"

"পড়াশুনো করছিস বেশ মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না, খেলা বেশী করিনে।"

"তবে কি করিস? লবে পড়েছিস নাকি শুনলাম?"

মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস কবিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বাবা মাণিকেব দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "উত্তর দিচ্ছিসনে যে?"

মাণিক কি একটা কথা বলিবাব চেষ্টা কবিল। কিন্তু কথা বাহিব হইল না।

তাহার পিতার রক্ত-চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইষ্টুপিড শুয়োর! আজ বাদে কাল এগ্‌জামিন—লেখা গেল পড়া গেল, লব্ হচ্ছে?"—বলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময়ে দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মাণিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এ ক'দিন দিবেরাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ হচ্ছেই হচ্ছেই—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মৎলব করছে—না কি করছে? হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! লবে পড়া হয়েছে। মরুভূমি হয়ে যাবে! এত কথা শিখলে কোথা তাই ভাবি।

আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, এত কথা ত জানিনে! পড়াশুনোর নাম নেই। খাবি কি এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় করে, রুগীর নাড়ী টিপে বেড়াচ্ছি, দুটো পয়সার জন্য মুখে রক্ত উঠে মরছি—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কাজ কিনে নে—তা নয় লবে পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না! ওকালৎনামা নিয়ে এসেছে। আরে গেল যা!—ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।'

অতঃপর মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহখানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শ খর্ব্বতার জন্য মাণিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনেই ভাল হইলে—বাকী দিনগুলির অধিকাংশ সময় মাণিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

[ভাদ্র, ১৩০৮]

কলির মেয়ে

॥ ১ ॥

চৈত্রের দিবা অবসিতপ্রায়। গোপাল সরকারের বৈঠকখানায় বসিয়া বিজয় মিত্র পাশা খেলিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "বাবা শীগ্‌গির বাড়ী এস, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া বৈঠকখানা-সুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম সর্ব্বদা আসে না—যাহা আসে, তাহা প্রায়ই দুঃসংবাদ, বিপদের সংবাদ।

বিজয় মিত্র খেলা ফেলিয়া ভিজা গামছায় কপালের ঘাম মুছিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া ত্বরিদ-পদে বাড়ী আসিলেন। দূর ষ্টেশন হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর টেলিগ্রাম পেয়াদা আসিয়াছে। সদর দরজার বারান্দায় বৃহৎ লাঠি লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। অসংখ্য কুতূহলী বালক-বালিকা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া।

বিজয় মিত্র রসিদে নাম সহি করিয়া দিয়া কম্পিতহস্তে টেলিগ্রাম খুলিলেন। পাঠমাত্র তাঁহার মুখে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বলিলেন, "ভাল খবর।"

"কি?"

"বিনু বাড়ী আসছে!"

"বিনু? কোথা থেকে? কবে আসবে?"

"তা লেখেনি। মোকামা থেকে তার করেছে, কাল এসে পৌঁছবে বোধ করি।"

বিজয়হরি ও বিনোদবিহারী দুই ভাই—সহোদর। বিনোদ যখন ছোট, তখন ইহারা পিতৃমাতৃহীন হয়। বিজয়হরির স্ত্রীই বিনোদকে মানুষ করিয়াছিলেন।

বিনোদ বড় হইলে ভারি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। এই সূত্রে দাদার সঙ্গে প্রায়ই তাহার বচসা হইত। একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া বিজয়হরি বিনোদকে জুতার দ্বারা প্রহার

করিয়াছিলেন। সেইদিন বিনোদ পলায়ন করিল। একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ গেল, বিনোদ ফিরিল না। তখন বিজয়হরি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলেন। দশ টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করিলেন—তথাপি বিনোদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে মাস কাটিল বৎসর কাটিল, এইরূপে তিনটি বৎসর কাটিয়াছে। বিনোদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আত্মীয় বন্ধু সমাজে বিজয়হরি লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারেন না—আজ সহসা সংবাদ আসিল সেই ভাই বাড়ী আসিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা উঠানের তুলসীগাছ সওয়া-পাঁচ আনা হরিলুট পাইয়া গেল। গ্রামময় এ সংবাদ রটিত হইল। বন্ধুবান্ধব উৎসুকচিত্তে বিনোদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নকালে বিনোদের গাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিল। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিল। হাতে একটি সবুজ বনাতের ঘেরাটোপযুক্ত ক্যাশবাক্স। গাড়োয়ান এবং বাটীর ভৃত্য মিলিয়া জিনিসপত্র নামাইল।

বিনোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাদা ও বউদিদিকে প্রণাম করিল। ছেলেপিলেকে কোলে করিয়া, আদর করিয়া অনর্থ করিল। বউদিদিকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া ক্যাশবাক্সটি তাঁহার হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল, "এটি খুব সাবধানে তোমার সিন্দুকে রেখে দাও বউদিদি।"

বউদিদি দেখিলেন বাক্সটি বিলক্ষণ ভারি।—খুসি হইয়া সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—"এতদিন কোথা ছিলে ঠাকুরপো?"

ছিলাম মোতিহারিতে।"

"এতদিনে মনে পড়ল?"

"চাকরি ফেলে কি করে আসি বউদিদি?"

"কত টাকা মাইনে হয়েছে?"

"একশো কুড়ি টাকা।"

"বিয়ে করেছ?"

"বিয়ে? বিয়ে করে কি হবে?"

বউদিদি হাসিয়া কি একটা ঠাট্টা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিজয়বাবু আসিয়া বলিলেন, "সারাদিন খাওয়া হয়নি, যাও ঝাঁ করে রান্না চড়িয়ে দাওগে, গল্প পরে কোরো এখন।"

জলযোগাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে লোকজন আসিয়া বৈঠকখানা ছাইয়া ফেলিল। দুই ভ্রাতা গিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলেন। গুরুসম্পর্কীয়গণকে প্রণাম করিতে করিতে বিনোদের স্কন্ধে বেদনা ধরিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, "এতদিন বাড়ী আসবার নাম নেই, আমরা ভাবি হল কি? ছোকরা গেল কোথায়? ছেলে বাহাদুর বটে। আজকালকার বাজারে, একশো কুড়ি টাকার চাকরি বাগানো সাধারণ কথা।"

গ্রামের অন্যান্য হতভাগ্য যুবক, যাহারা বি-এ পাস করিতে কলিকাতা কন্‌ট্রোলর জেনারেলের আপিসে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী করিতেছিল, এম-এ পাশ করিয়া যাহারা পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারি জুটাইতে পারিতেছিল না, তাহাদের অনেকেরই কথা উঠিল। বৃদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "সকলই অদৃষ্টে করে রে ভাই, ও বি-এ পাশ করিলেও হয় না, মহা বি-এ পাশ করলেও হয় না।"

অনেকে বলিল, 'তা বটেই ত'—তার আর ভুল কি।—নব্য গোছের একজন বলিল, "অদৃষ্ট ত বটেই,—তার সঙ্গে উদ্যমও চাই।"

অন্য একজন মন্তব্য করিল, "বিনোদ বুদ্ধিমান, আমরা বরাবরই বলে এসেছি।"

সরকার মহাশয় এ-মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন, "ছেলেবেলায় একটু দুর্দান্ত ছিল—তা অমন অনেকে থাকে,—একটু বয়স হলেই সেরে যায়। তা হোক, চাকরিটি

এখন ভালয় ভালয় বজায় থাকুক—ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হোক পদ বৃদ্ধি হোক, এই আমাদেব আশীর্ব্বাদ।"

বিজয় ভ্রাতাব পানে সন্দেহ দৃষ্টিপাত কবিয়া বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ করুন সবকাব মশায়।"

।। ২ ।।

পরদিন প্রভাতে দাদাব বালক-বালিকাগণকে লইয়া বাবান্দায় বসিযা বিনোদ বলিল "তোদেব জন্যে কি নিয়ে এসেছি তা এখনো দেখিসনি বুঝি?"

কি কাকা? কি এনেছ কাকা—ইত্যাকাব প্রশ্নে বিনোদকে তাহাবা ছাঁকিয়া ধবিল। বিনোদ উঠিয়া তোবঙ্গ খুলিযা একটা ববারের বানর, কাহাকেও একটা লাল বল, কাহাকেও একটা মেমপুতুল বিতবণ কবিল। তাহা লইয়া বালক-বালিকাগণ মহা লম্ফঝম্ফ আবম্ভ কবিযা দিল। হাস্যমুখী বউদিদিব পানে চাহিযা বিনোদ বলিল "তোমার জন্য কি এনেছি জিজ্ঞাসা কবলে না বউদিদি?"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কি এনেছ ভাই?"

"কি বল দিকিন?"

"কি জানি।"

"কি পেলে খুশী হও?"

"কি পেলে খুসী হই? দাঁড়াও দেখি, বাঁদব নয়, সে ত ঘবেই বয়েছে—"

বিনোদ কৃত্রিম কোপসহকাবে বলিল, "অ্যাঁ! আমাব দাদাকে বাঁদব বলছ বউদিদি?"

বউদিদি বলিলেন, "এই দেখ, কারু নাম কবেছি? নিজেবা ধবা দিলে আমি আব কি কবব?"

বিনোদ বলিল, "মেমপুতুলও বোধ হয় চাও না, সেও ত নিজেই বয়েছ।"

বউদিদি বলিলেন, "না, মোমেব মেমপুতুল চাইনে বটে। একটি সত্যিকাব জ্যান্ত মেমপুতুল যদি বিযে কবে এনে দিতে ভাই, তা হলে খুব খুশী হতাম।"

"যা এনেছি তা দেখলে আবও খুশী হবে। এই জন্যেই ত এতদিন বাডী আসিনি—টাকা জমাচ্ছিলাম। আমাব ক্যাশবাক্সটা বেব কব দিকিন বউদিদি।"

বউদিদি সিন্দুক খুলিয়া, সবুজ বনাত ঢাকা ক্যাশবাক্সটি বাহিব কবিলেন। বিনোদ চাবি খুঁজিতে লাগিল। এ পকেট সে পকেট এ জামা সে জামা—কোথায়ও চাবি পাওযা গেল না। শেষে তোরঙ্গ দুইটা খুলিয়া উলট পালট কবিল, কোথাও চাবি নাই।

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন, "চাবি হাবিয়েছ তার আব ভাবনা কি ঠাকুবপো? মাল ত আব হারাওনি—বাক্স ত ঘবেই আছে, চাবি হবে এখন। না হয বাক্স ভাঙ্গতে হবে, এব বেশী আব কি হবে?"

বিনোদ একটু বিষাদেব হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার যে হাত খবচেব টাকা অবধি বাইরে নেই বউদিদি।"

বউদিদি বলিলেন, "তা তোমাব যখন যা দবকাব হবে, আমাব কাছে নিও এখন।"

"কলকাতায় গিয়ে বাক্স না খোলালে আব উপায় নেই। এত সাধ কবে তোমাব জন্যে গহনা গড়িয়ে নিয়ে এলাম দেখাতে পেলাম না, এই দুঃখ।"

বউদিদি বলিলেন, "না দুঃখ কোবো না। দু'দিন পরেই না হয় দেখব। কি এনেছ বলই না—কানে শুনি,"

"দশ ভরি দিয়ে তোমাব জন্যে পুষ্পহাব গড়িয়ে এনেছি।"

বউদিদি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। বিনোদ ক্রমে সুস্থ হইল। তখন বলিল, "বউদিদি, চা তৈবী করতে পাব? সকালে চা খাওযাটা ভারি অভ্যাস হয়ে গেছে।"—শুনিযা বউদিদিব মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঠাকুবপোব এতদূব সৌখীন চালচলন হইযাছে।

কিন্তু কিছু অপ্রতিভও হইলেন। বলিলেন, "সে পাট ত আমাদের নেই ভাই।"

বিনোদ বলিল, "চা আমার কাছে আছে শুধু গরম দুধ আর চিনি পেলেই হয়।"

এই কথা শ্রবণমাত্র বালক-বালিকাগণ ও কাকা, আমি চা খাব ও কাকা, আমায় চা দিও বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

উপযুক্ত পাত্রাভাবে একটা ঘটি করিয়া চায়ের জল গরম হইয়া আসিল। তাহারই মধ্যে একমুঠো চা ফেলিয়া মুখে পাথরটি চাপা দেওয়া হইল। বালকবালিকাগণ কেহ বাটি কেহ গেলাস কেহ বা পানের ডিবার একটা খোল লইয়া বসিয়া গেল। তা সিদ্ধ হইলে, সেই ঘটিতেই দুধ ও চিনি ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঘটির মুখে গামছা দিয়া ছাঁকিয়া, বউদিদি সকলকে চা পরিবেশন করিলেন। চা বালকবালিকাগণের উদরস্থ যত হউক না হউক, ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিয়া গেল।

।। ৩ ।।

নিকটস্থ গ্রামের জমিদার অতুল ঘোষ মহাশয়ের এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্বাজাতীয়, সদ্বংশজাত, কৃতী, অবিবাহিত একটি নব্য যুবক বিনোদবিহারী গ্রামে উপস্থিত। অতঃপর ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা?

সেইদিন অপরাহ্নেই ঘোষজা মহাশয় বিজয় মিত্রের নিকট লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব কবিলেন।

মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন, "তা যদি হয়, তার বাড়া আর সুখ কি? বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি, বিনোদ কি বলে দেখি।"

বাড়িতে বলিলেন, "মেয়েটি চোখে দেখা—কিছু নিন্দের নয়। দেওযা থোওয়া সম্বন্ধে যদি কৃপণতা না করে, আমাদের মান রাখে, তা হলে আর বাধা কি, এই বৈশাখ মাসেই হযে যাক।"

মেয়ে পূর্ব্বে হাজার বার দেখা থাকিলেও বিবাহের সম্বন্ধ হইলে একবাব ঘটা করিয়া মেয়ে দেখিতে যাইতে হয়। সুতরাং শুভক্ষণে বন্ধু বান্ধব লইয়া বিজয় মিত্র মেয়ে দেখিতে গেলেন। ঘোষজা মহাশয় অনেক বিনয় প্রকাশ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু টাকার বেলায় হাজারের বেশী আর উঠিতে চাহিলেন না।

বরপক্ষীয়েরা এ প্রকার অযৌক্তিকতায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "এন্ট্রাস পাশ করা ছেলে, এল-এ পড়ছে, তারই ত হাজার টাকা বাঁধা। তাব কি ক্ষমতা বলুন? যদি চাকরির চেষ্টা করে ত পনেরো টাকা মাইনে জুটলে খুব সৌভাগ্য।"

কন্যাপক্ষীয়গণ বলিল, "আহা সে যে আলাদা কথা! সে যে পড়ছে। জলের মাছ— কত বড় হবে তার ত ঠিকানা নেই। চাই কি একদিন সে হাইকোর্টের জজও হতে পারে। আর যে কর্ম্মে ঢুকেছে, তার উন্নতি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কিনা, এটা ত স্বীকার করেন?"

ইত্যাদি প্রকার বাদপ্রতিবাদের ঘোষজা মহাশয় দুই হাজারে উঠিলেন। ইঁহারা বলিলেন, "হাজার নগদ হাজার গহনা, দানসামগ্রী ও অন্যান্য বাবদ হাজার, এই তিন হাজার নইলে আমরা পেরে উঠব না।"

ঘোষজা মহাশয় বলিলেন, পরে বিবেচনা করিয়া যেরূপ হয় বলিয়া পাঠাইবেন।

"উত্তম কথা।"—বলিয়া বরপক্ষীয়গণ শেষবার ধূমপান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন সংবাদ আসিল, অনেক কষ্টে মারিয়া কাটিয়া ঘোষজা মহাশয় আড়াই হাজার পর্যন্ত উঠিবেন। ইহাতে যদি হয়, উত্তম—নচেৎ অগত্যা তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

বিজয় মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, কুটুম্বসুখই বেশী প্রার্থনীয়।

ঘোষজা মহাশয়ের সহিত কুটুম্বিতার লোভে তিনি আড়াই হাজারেই সম্মত। এখন দিন স্থির হইতে পারে।

বিনোদকে রাজি করিতে কোনও কষ্ট হইল না, কিন্তু হাজার টাকার গহনা শুনিয়া সে ভারি খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। হাজার টাকার কি গহনা হবে বউদিদি? এই তোমার জন্যে পুষ্পহার গড়ালাম, দুশো পঁচাত্তর টাকা পৌনে তেরো আনা লাগল। হাজার টাকায় ক'খানা গহনা হবে?"

বউদিদি বলিলেন, "হাজার টাকায় কি আর গা সাজানো গহনা হয় ভাই? নইলে নয় খানকতক তাই হবে। তারপরে, বেঁচে বর্ত্তে থাক, রোজগার কর, কত গহনা দেবে দিও না।"

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। বলিল—"দেখ বউদিদি, এক কাজ করলে হয় না? ওদের বল, যেন গহনা না দিয়ে গহনার ঐ হাজার টাকা নগদে দেয়। ওতে আর এক হাজার আমরা মিলিয়ে, দু'হাজাব টাকাব পছন্দ মত গহনা তৈরি করাই। কলকাতায় ত যেতেই হবে বাক্সটা খোলাবার জন্যে।"

বউদিদি কিয়ৎক্ষণ কপালে হাত দিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই বলা যাক, মেয়ে ফিবিয়ে পাঠাবার সময় আমরা গা সাজিয়ে ফিরে পাঠাব।"

"কলকাতায় গিয়ে গহনা গডিযে আনতে কতদিন লাগবে বল দিকিন বউদিদি?"

"কতদিন আব? নেবুতলায় কমলাদিদিদের বাড়ী যাবে, বাড়ীতে স্যাক্‌রা ডাকিয়ে বসে থেকে সাত দিনে গহনা তৈরি করিয়ে নেব। ওরা ত যখন গহনা গড়ায় ঐ রকম করেই গড়ায়।" বিনোদ বলিল, "ঘোষেবা রাজি হবে ত?"

বউদিদি বলিলেন, 'ইঃ রাজি হবে না ত কি?"

বউদিদি গিয়া স্বামীর সহিত এ বিষয়ে কথা কহিলেন। বিজয় মিত্র বলিলেন, "রাজি না হবাব ত কোন কাবণ দেখিনে।" কিন্তু সব দেখিয়া শুনিয়া তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ ভাবিলেন—ভায়ার আমার বড় চাকরি হয়েছে কিনা, মেজাজটা ভাবি বেড়ে গেছে।

অতুল ঘোষ রাজি হইলেন। একেবারে স্বর্ণ-শূন্য করিয়া মেয়েকে বিবাহের আসবে নামাইতেও পারিলেন না, অত্যাবশ্যক দুই চারিখানা গহনা দিতেই হইল। অথচ হাজার টাকাও দিতে হইল। শেষে সেই তিন হাজারেই দাঁড়াইল। সমারোহ কবিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যার নাম শরৎকুমারী।

বিনোদেব বউদিদি নববধূর মাতাকে বলিলেন, গহনা গড়াইতে একটু সময় লাগিবে, সুতবাং বধূকে দুই সপ্তাহের কম ফিরিযা দিতে পারিবেন না।

মাতা বলিলেন, "তা বেশ, এই ত কাছেই মাঝে দুই একদিন পাল্কী পাঠিয়ে দেবো, একবেলার জন্যে পাঠিয়ে দিও এখন তা হলেই হবে।"

সমীপস্থ একজন নবীনা বলিল, "ওগো এখন আর আগেকাব মত মেয়েবা শ্বশুরবাড়ী এসে কাঁদেকাটে না। দু'দিনে স্বামী চিনে নেয়।"

বিবাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি বিনোদ কলিকাতা যাইবার নাম কবে না। ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল—বলিল গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। বউদিদি আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো আর গহনা গড়াতে না দেওয়া যে ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। বউয়ের পিসির সঙ্গে কাল ও-পাড়ায় দেখা হল, জিজ্ঞাসা করলে শরতের গহনা গড়িয়ে এসেছে?"

বিনোদ বলিল, "আমায় তাড়াতে চাও বউদিদি? খুব সুহৃদ ত!"

বউদিদি বলিলেন, "বুঝি ভাই, সব বুঝি। এক কাজ কর, যাতে দু'কূল বজায় থাকে। ভোরের বেলা উঠে কলকাতায় যাও। সাবাদিন সেখানে থেকে সোনা কিনে স্যাকরা ডাকিয়ে মাপ দিয়ে কমলাদিদিদের উপব ভার দিয়ে এস। সন্ধ্যের গাড়ীতে চলে এস রাত

বারোটার সময় পৌঁছবে এখন। আমি তোমার শোবার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো!"

বিনোদ বলিল, "তোমার কি বুদ্ধি বউদিদি,"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "এখনই আমরা বুড়োসুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদেরও একদিন ছিল তো ভাই। এখনও বেশ মনে পড়ে—বউদিদি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, সামলাইয়া লইলেন।

বিনোদ বলিল, "বল বল, কি বলছিলে বউদিদি।"

বউদিদি, "না এমন কিছু নয়।"—বলিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিলেন।

বিনোদ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। না বলিলে আড়ি করিবে।

বউদিদি তখন বলিলেন, "ঐ যে বললাম শোবার ঘরে খাবাব ঢাকা দিয়ে রাখার কথা ঐ থেকে একটা পুরাণো কথা মনে পড়ল। কারুকে না বল ত বলি।"

বিনোদ বলিল, "কারুকে বলব না।"

বউদিদি বলিলেন, "আমাদের তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। তোমার দাদা হুগলি গিয়েছিলেন সেখানে কি দরকার ছিল। অনেক রাতে ফেরবার কথা ছিল। শোবার ঘরে তাঁর খাবার ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার দাদা এসে, আমাকে উঠিয়ে আমাকে সুদ্ধ সেই পাতে একসঙ্গে খেতে বাধ্য করলেন।"

বিনোদ শুনিয়া ভারি আমোদ অনুভব করিল। বলিল, "আমার দাদাব এত বিদ্যে! আমি ভাবি উনি চিরকালই বুঝি চশমা চোখে দিয়ে ভাগবত পড়েন।"

স্থির হইল, আগামী কল্য ভোর রাত্রে বিনোদ কলিকাতা যাত্রা করিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—আহারাদি হইল, শযনের সময় উপস্থিত হইল। খোলা জানালার কাছে পালঙ্ক টানিয়া নববধূর সহিত বিনোদ শয়ন করিল। বাহিবে বাগান, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মিষ্ঠ বাতাস বহিতেছে।

বিনোদ অন্য দিনের অপেক্ষা আজ নীরব। শরৎকুমাবী বলিল, "কি ভাবছ।"

বিনোদ বলিল, "অনেক দুঃখের কথা।"

কি দুঃখ শুনিবাব জন্য এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিনোদ বলিল, "আমি যদি বলি, তা হলে তুমি আর আমাকে ভক্তি করবে না।"

শরৎ বলিল, "স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে?"

বিনোদ বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারি গুচ্ছ স্খলিত কুন্তল তাহার ললাটে লুটাইতেছিল। তাহার চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছিল।

বিনোদ বলিল, "আমি মহা পাষণ্ড। আমি তোমাদের সবাইকে ঠকিয়েছি।"

বালিকা নীরবে বিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিতে লাগিল, "আমি মোতিহারিতে চাকরিও করিনে, আমার একশো কুড়ি টাকা মাইনেও নয়।"

শবৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে কোথায় চাকরি কর?"

"কোথাও করিনে। এলাহাবাদে রেল অফিসে চাকরি করতাম, সে চাকুরি গেছে। আর কোনও উপায় না দেখে, বিয়ে করে কিছু টাকা সংগ্রহ কবব বটে এ ফন্দি করে এসেছি। জানতাম বড় চাকরি শুনলে বিয়ে হতে এক দণ্ডও দেরী হবে না। তারপর টাকাকড়ি সব নিয়ে পালিয়ে যেতাম।"

কিছু পূর্ব্বে অগাধ সরলতায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে বালিকা বলিয়াছিল, স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে—কিন্তু সন্ধ্যাগমে দিবালোক যেমন দেখিতে দেখিতে কোথায় দ্রুতপদে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, স্বামীর প্রকৃত পরিচয়ে তার স্বামীভক্তিও কোথাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল বালিকা ঠিকানা পাইল না। একটা দারুণ আঘাতের বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

বিনোদ বধূর স্কন্ধে হাত দিয়া আবার বলিল, "বিয়ের আগে যখন বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়াতে দেবো, তখন এই মৎলবেই বলেছিলাম। গহনা গড়াতে যাবার নাম করে এতদিন কোন্‌কালে পালিয়ে যেতাম। তুমিই সব মাটি করে দিয়েছ।"

শরৎ চট করিয়া স্বামীর হস্তস্পর্শ হইতে স্কন্ধ সরাইয়া লইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমি কি করেছি?"

"তুমি সোনার শিকল হয়ে আমায় বেঁধে ফেলেছ—তোমায় ফেলে যেতে পারিনে। অথচ থাকতেও পারিনে। থাকলে আজ বাদে কাল সব প্রকাশ হয়ে যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।"

ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় বালিকার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তবু জিজ্ঞাসা করিল, "পালিয়ে কোথা যেতে?"

"কয়লার খনিতে যেতাম, এখনও তাই যাব—সেখানে কনট্রাক্টের কাজ করব—খুব খাটুনি কিন্তু খুব লাভ।"

শরৎ সহসা বলিল, "আমি সঙ্গে যাব।"

বিনোদও শয্যায় উঠিয়া বসিল। আহ্লাদে বলিল, "তুমি যাবে শরৎ? পারবে?"

"পারব। তুমি কি ভেবেছ তুমি চলে গেলে আমি এখানে বসে লোকের বাক্যযন্ত্রণা সইব? দেশসুদ্ধ টী টী পড়ে যাবে—যার মুখে যা আসবে সে তাই বলবে, আর আমি বসে বসে শুনব?

বিনোদের আনন্দ ম্লান হইল। শরতের পলায়ন তবে আত্মসমর্পণ নহে—আত্মরক্ষা মাত্র। একটু পরে বলিল, "তবে দুজনে পালাই এস।"

"কখন?"

"পরশু ভোরে আমার কলকাতা যাবার কথা। শোবার আগে হাতবাক্সে টাকা গুছিয়ে এই ঘরে এনে রেখে দেবো। রাত একটা কি দুটোর সময় উঠে আমরা পালাব। কয়লার খনির কাছে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব দুজনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস। জীবন নতুন করে আরম্ভ করব।"

বালিকা নববধূর মনে রাগের ও দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কি ভাব দ্বন্দ্ব করিতেছিল। মনের দুয়ারে একটা কথা বারবার ধাক্কা দিতেছিল—তুমিই সব মাটি করে দিয়েছ। ভাবিতে মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহারই জন্য তাহার স্বামী পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। কাঁটাবনের মধ্যে যেন এই একটি মিষ্ট ফল। সেই সুখটুকু মনের মধ্যে ওলটপালট করিতে করিতে সে রাত্রি সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন কাটিল। শয়নঘরে টাকার বাক্স লইয়া রাত্রে বিনোদ শয়ন করিল।

ভোরে বউদিদি তাহাকে জাগাইয়া আসিতে দেখেন—কেহ নাই। শয্যায় তাঁহার স্বামীর নামে এই পত্র পড়িয়া রহিয়াছে :—

"শ্রীচরণেষু—দাদা, আমি বউকে লইয়া পশ্চিম চলিলাম। আমি আপনাদের সকলকে ঠকাইয়াছি। আমি মোতিহারিতে চাকরি করি না। এলাহাবাদ রেল অফিসে একটি সামান্য চাকরি করিতাম মদ খাইয়া সেটি খোয়াইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া জুয়াচুরি করিয়া বিবাহ করাই স্থির করি। অনুসন্ধানে পাছে ধরা পড়ি তাই ডিরেক্টরি খুঁজিয়া দেখিলাম, আমার নামের কেহ কোথাও ভাল চাকরি করে কিনা। দেখিলাম মোতিহারিতে একজন বিনোদবিহারী মিত্র ভাল চাকরি করে। তাহার বেতনের পরিমাণ মুখস্থ করিয়া বাড়ী আসিয়া বিবাহ করিলাম।

"আমার এক পয়সাও নাই, আমার ক্যাশবাক্সে শুধু ভাঙ্গা কাঁচ বোঝাই করা আছে। বউদিদির পুষ্পহারও এখনও তৈরি হয় নাই; আমার বিবাহে যে হাজার পণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার জন্য পুষ্পহার গড়াইয়া দিবেন। গহনার হাজার টাকা সম্বল করিয়া,

ব্যবসায় করা স্থির করিয়াছি। যদি কোনও দিন নিজের স্বভাব ও অবস্থা সংশোধন করিতে পারি তবে আবার দেখা দিব। আপাততঃ প্রণামান্তে বিদায়।— সেবকাধম

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র

পত্র পড়িয়া বউদিদি স্তম্ভিত হইলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ঠাকুরপোর উপর ততটা রাগ হইল না। কিন্তু নিরপরাধ বৌয়ের স্বামীসঙ্গগ্রহণেই যেন বেশী খট্‌কা লাগিল। মন আপনা হইতেই বলিতে লাগিল—কলি! ঘোর কলি। [আশ্বিন, ১৩০৮]

একদাগ ঔষধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুকুমারী আজ দুইদিন তাহার স্বামীর পত্র না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সে এ বাটীর ছোট বউ। তাহার শ্বশুর বড়লোক। তাহাকে কোনও সাংসারিক কাজ করিতে হয় না— খালি অনেক উপন্যাস পড়িতে হয়, বড় জায়ের সঙ্গে, ননদ দুটির সঙ্গে, গল্প করিতে হয়, তাস খেলিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ঝগড়াঝাটিও করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে পত্র লেখা ও পত্র পাওয়া সুকুমারীর দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান কাজ। আর একটা কাজ তাহার আছে, সেটা বড় প্রীতিকর নহে। তাহাকে অনেক ঔষধ খাইতে হয়। কারণ, মাঝে মাঝে কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসে।

সুকুমারী যে স্বামীর পত্র না পাইয়া ভাবিতেছে, তাহা বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত অবগত ছিল। আজ বেলা দশটার সময় সুকুমারী কাপড় ছোপাইবে বলিয়া শিউলী ফুলের বোঁটা কাটিতে বসিয়াছিল এমন সময় তাহার ছোট ননদ মন্না আসিয়া বলিল, 'ওলো ভেবে মরছিলি, এই নে তোর বরের চিঠি এসেছে।'' সুকুমারী আগ্রহের সহিত চিঠি লইয়া নিজের শয়ন ঘরে পলায়ন করিল। চিঠি খুলিয়া যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চিঠি এইরূপ :—

সুকুমারী,

আমি নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। আমি আর তোমার ভক্তিযোগ্য স্বামী নহি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল- কুসঙ্গের দোষে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সব কথা পত্রে লিখিবার নহে, সাক্ষাতে বলিব। আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিব। অকপটে তোমার কাছে সব বলিব। তোমার ভালবাসা যদি আমায় ক্ষমা করিতে পারে তবেই আমি আবার আমি হইব— নচেৎ সব ফুরাইতেছে।

তোমার হতভাগ্য—অবিনাশ

পত্রখানি প্রথম বার পাঠ করিয়া সুকুমারী বুঝিল, একটা কোনও ভয়ানক জিনিষ ঘটিয়াছে, কিন্তু কি ঘটিল ভাল উপলব্ধি করিতে পারিল না। বারম্বার পড়িতে পড়িতে একটা অর্থ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার শরীর শিথিল হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারিল না। খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া, আর একবার পত্রখানি পাঠ করিল। করিয়া, সেখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুষ্টি ভরিয়া ছিন্নপত্র জানালা গলাইয়া বাহিরে বাগানে ফেলিয়া দিল।

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, যদি কেহ ছেঁড়া কাগজগুলি কুড়াইয়া লয়, জোড়া দিয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ সে বাগানে গিয়া ছেঁড়া কাগজগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইল।

তাহার আঙুলের কচি ডগাগুলিতে শিশির ও কাদা লাগিয়া গেল। কিছুদূরে অন্যবাটীর সদর দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল, দাঁড়াইয়া আনমনে একটু তাহাই শুনিল। ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি আঁচলের খুটে বাঁধিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল।

ভারী শীত করিতে লাগিল। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বিছানায় উঠিয়া লেপ মুড়ি দিয়া সুকুমারী শয়ন করিল। লেপের মধ্যে প্রথম তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। একা ঘরে পরিজনের অলক্ষিতে, সুকুমারী অনেক কাঁদিল।

এই সময় তাহার বড় ননদ বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সুকি, শুলি যে অসুখ করেছে নাকি?" বলিয়া সে সুকুমারীব মুখ হইতে হঠাৎ লেপ খুলিয়া দিল। মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "একি কাঁদছিস! কি হয়েছে লা? দাদা ভাল আছে ত?"

সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "না কাঁদিনি ত।"

"না কাঁদিসনি বইকি। দাদা ভাল আছ ত?"

"হ্যাঁ ভাল আছে।"

শুনিয়া বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে কাঁদছিস কেন?"

গালে চোখেব জলেব দাগ, তথাপি সুকুমাবী বলিল, "কই কাঁদিনি ত?"

"দাদা বকেছে?"

"দূর।"

"বল্‌না কি হয়েছে বল্‌না ভাই?"

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "কিছু হয়নি হবে আবার কি?"

"না হয়নি। বল্‌বিনে তাই বল। না বল্লি ত ভাবি বয়ে গেল।"—বলিয়া বিনোদিনী বাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী একা হইযা আবাব লেপে মুখ ঢাকিল। ভাবিতে লাগিল, সত্যই যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে ত সবই শেষ হইয়াছে। সবই গিয়াছে! সে স্বামীকে আর কেমন করিযা স্পর্শ করিবে, যত্ন করিবে, সেবা কবিবে?

সে কি কবিবে? তাহার এ কি হইল? এ সর্ব্বনাশ তাহার কে কবিল?

এই সময় তাহার শাশুড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আবাব জ্বর করে বসেছ? বেশ করেছ! কি কুপথ্যি কর্ব্বেছিলে? আবার তেঁতুল-আচাব খেয়েছিলে?"

সুকুমারী লেপের মধ্য হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তেঁতুল-আচাব ত খাইনি মা।"

"খাওনি ত কি করেছিলে? এত করে বারণ করি ভিজে মাথায় শুয়োনা। তা ত শুনবে না; ভাতটি খেয়েই চুপ করে শুয়ে পড়। যা খুসি কর বাছা। গা কি খুব গরম হয়েছে? ভারী শীত করছে? এখনও আমার মালাজপ শেষ হয়নি, বিছানা ছুঁতে পারব না, যাই মন্না কি বিনিকে পাঠিয়ে দিইগে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী আবার ভাবিতে লাগিল। কে সে? কোন রাক্ষসী তাহার সর্বনাশ কবিল—তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল? তাহাকে যদি পায় একবার, তবে নখে কবিয়া তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলে।

ভাবিল না জানি সে কেমন সুন্দরী। আমার স্বামী ভুলিল—অবশ্যই সে আমার অপেক্ষা সুন্দরী। আর কেহ নয়, আমার স্বামী। আমার স্বামীকে যে আমি দেবতার তুল্য জ্ঞান করিতাম। কত লোক বলিয়াছে কলিকাতা অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান—যুবকগণের পক্ষে অতি বিষম স্থান—কিন্তু আমার স্বামীর উপর আমার যে অগাধ বিশ্বাস ছিল!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর জ্বর দ্বিগুণ প্রবলতা ধারণ করিল। জ্বরের ঘোরে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুকুমারী যখন চক্ষু খুলিল, তখন দেখিল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিকটে বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার শ্বশুর কিছুদূরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মন্না মেঝের উপর বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেল দেখি মা!"—বলিয়া মুখের কাছে ঔষধ ধরিলেন। সুকুমারী পান করিল।

ডাক্তার বলিলেন, "অনেকটা নরম পড়েছে এখন। কোনও ভাবনা নেই। যতক্ষণ একেবারে জ্বরটা না ছাড়ে ঐ ফিবার মিক্‌শ্চারটা দু'ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দেবেন।"—বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

ডাক্তার গেলে সুকুমারীর শাশুড়ী আসিলেন। কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "অনেকটা কম বইকি। গায়ে একবারে হাত রাখা যাচ্ছিল না। এখন কেমন আছ মা?"

সুকুমারী চুপি চুপি বলিল, "ভাল আছি।"

তিনি বলিলেন, "বিকেলের গাড়ীতে অবিনাশ এসেছে। মন্না, যা দিকিন, তোর দাদাকে ডেকে দে।"—তারপর স্বামীকে বলিলেন, "তোমার জলখাবার সাজিয়ে রেখেছে—যাও, দেরী কোরো না।"

ঘরে শুধু সুকুমারীর শাশুড়ী রহিলেন। আর সকলে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ আসিল। তাহার মা তখন কার্য্যাপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেন।

অবিনাশ বিছানার উপর বসিয়া, সুকুমারীর কপালের উপব হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ সুকু?"

সুকুমারী বলিল—"ভাল আছি।"

"আজ সকালে আমার চিঠি পেয়েছ?"

" পেয়েছি।—সত্যি?"

অবিনাশ বলিল, "সত্যি বইকি।"

"আমায় মনে পড়লো না?"

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল, "সে কি বড় সুন্দরী?"

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে?"

"সে।"

"কে সে? কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

অবিনাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল সুকুমারী কি ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ। বলিল, "না—না—সুকু। তুমি কি ভেবেছ? তা নয়।"

"কি তবে?"

"যা জীবনে কখন স্পর্শ করতে বারণ করেছিলে, তোমার ভারি ঘৃণা জানিয়েছিলে, তাই খেয়েছি। মদ খেয়েছি। বেশী নয়, উপরোধে পড়ে এক চুমুক মাত্র খেয়েছি।"

দুই ঘণ্টা পরে সুকুমারীর আবার ঔষধ খাইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। একদাগ ঔষধেই তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। বাস্তবিক ডাক্তারবাবুর ঔষধগুলি বড়ই তেজস্কর বলিতে হইবে। [পৌষ, ১৩০৮]

ছদ্মনাম

।। ১ ।।

প্রেসের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া ছুটির পূর্ব্বেই পূজার 'বঙ্গপ্রভা' বাহির করিয়া ফেলিলাম। ডেস্প্যাচ সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষকে উপদেশ দিতেছি, হ্যাটকোট পরিয়া সিগারেট মুখে করিয়া সতীশ আসিয়া উপস্থিত। বলিল, "দার্জ্জিলিং চল।"

সতীশ আমার বাল্যবন্ধু। আমরা এক ক্লাসে পড়িতাম, একত্র বসিতাম, একত্র বেড়াইতাম—পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন কানাই বলাই।

এন্ট্রান্স পাস করিয়া দুইজনে কলিকাতায় কলেজে আসিলাম—তখন হইতে আমাদের দুইজনের জীবনের আদর্শ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সতীশ সর্ব্ববিষয়ে সাহেব হইয়া উঠিতে লাগিল;—আমি আমার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগশালী হইলাম। আমি বাঙ্গালা পড়ি বাঙ্গালা লিখি বলিয়া সতীশ আমাকে বিদ্রূপ করিত; সতীশের সাহেবিয়ানাকে আমি সুযোগ পাইলেই গালি দিতাম।

তারপর সতীশ বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিল—সাহেবিয়ানার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল।

আমরা বাল্যকালে যেরূপ এক-প্রাণ এক-আত্মা ছিলাম, এখন আর সেরূপ নাই। সতীশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সতীশ আমাকে হয় ত তাহার সকল মনের কথা আর বলে না। তথাপি আমরা পরস্পরের পরম বন্ধুই আছি।—সতীশ বলিল, "দার্জ্জিলিঙ চল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে যাচ্ছ?"

সে বলিল, "আজ।"

আমি বলিলাম, "পাগল! আজ সময় কোথা?"

সতীশ ঘড়ি খুলিয়া দন্তে চুরোটিকা দংশন করিয়া বলিল, "মোটে দশটা বেজেছে। চারটের সময় ট্রেন। ছ ঘণ্টা। তিনশো ষাট মিনিট। রাশি রাশি সময়।"

আমি বলিলাম, "সাহেব! অনুগ্রহ করে যদি বাংলাই বলছ, তবে খাঁটি বাংলাটাই বল। ইংরেজি থেকে তর্জ্জমা করে বোলো না। রাশি রাশি সময় কি রকম বাংলা হল?"

সতীশ অধীর হইয়া বলিল, "হ্যাঁ ইওর বাংলা। যাবে কিনা বল।"

আমি বলিলাম, "ভাই! তুমি সাহেব হয়েছ—তোমরা যত চট্‌পট্ কাজ করতে পার, আমরা কালা আদমি কি তা পারি? স্নান করতে খেতে বারোটা বেজে যাবে। তারপব একটু বিশ্রাম—"

সতীশ বলিল, "নন্‌সেন্স! ওসব ওজর রেখে দাও।"

আমি বলিলাম, "তা দার্জ্জিলিঙ যদি যাবারই ইচ্ছে, তবে দু'দিন আগে বললে না কেন?"

"আজ সকালে মাত্র দার্জ্জিলিঙ থেকে ডাক্তার সেনের নিমন্ত্রণ পেলাম।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম। "কি! ডাক্তার সেন দার্জ্জিলিঙে? সপরিবারে? সকন্যা?"

সতীশ বলিল, "অবশ্য।"—বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

ডাক্তার সেনের বিদূষী কন্যা নির্ম্মলা আমার বন্ধুরত্নের মনোহরণ করিয়াছেন ইহা সত্য।

আমি বলিলাম, "কি ভয়ানক! চারটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে গাড়ী নেই?"

সতীশ অভিনেতার মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না।"

আমি গান ধরিলাম—"এমন কেমনে রব না হেরে তাহার রে—

গণিয়ে নিমেষ পল, দিন না ফুরায় রে!"

যদিও নিজে কখনও রমণীর প্রেমে পড়ি নাই, তথাপি ব্যাপারটা জানা আছে। সতীশকে একদিন দেরী করিতে বলাও যা, আর ব্যাঘ্রকে অহিংসাধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টাও তাহাই। সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম। জিনিসপত্র গুছাইয়া চারিটার গাড়ীতে দুইজনে যাত্রা করা গেল।

।। ২ ।।

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই কিছুদূর হইতে দেখা গেল, ডাক্তার সেন পুত্রকন্যা লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে জুতা মোজা পরিয়া প্রকাশ্যভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। ব্রাহ্মমহিলা আমি এ জীবনে অনেক দেখিয়াছি দুই একজনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে, এরূপ আঘাতটা লাগিল। আমি স্ত্রীশিক্ষার খুব পক্ষপাতী কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা জিনিসটা আচরণ কিছুই নূতন নহে, তথাপি সতীশের ভাবী বধূ ভাবী শ্বশ্রূ বলিয়াই নতুন কবিযা দু'চক্ষে দেখিতে পাবি না। আমার কাগজে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে আবও লিখিবাব উপকবণ তখনই মাথার ভিতব গজাইতে লাগিল। খুব কড়াকড়া চোখা-চোখা বাক্যাবলী মস্তিষ্কের ভিতব শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু অল্পক্ষণেই তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই সতীশ আমাকে সকলের কাছে 'ইন্ট্রোডিয়ুস' কবিয়া দিল। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত না জানা থাকায়, আমি থতমত খাইয়া কোনও কথা বলিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত দন্তবিকাশ কবিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া বহিলাম। সতীশটার লজ্জা সবম কিছুই নাই, নির্ম্মলার ভাইকে লগেজের সন্ধানে প্রেরণ করিয়া, নির্ম্মলার সঙ্গ জোঁকেব মত ধবিয়া রহিল।

নির্ম্মলা একটু পরেই আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "মন্মথবাবু, আমি আপনার কাগজের একজন নিয়মিত পাঠিকা।"—আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, বলিল না।

নির্ম্মলাব মা বলিলেন, "পূজোর বঙ্গপ্রভা কবে বেরুবে মন্মথবাবু?"

আমি বলিলাম, "পূজোর বঙ্গপ্রভা? সে ত বেবিয়ে গেছে।"

মিসেস সেন কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "পেয়েছিস?"

নির্ম্মলা বলিল, "কই না।"

আমি বলিলাম, "না, না মাফ করবেন। এখনও আপনাদের পাবার সময় হয়নি। এই কাল মোটে বেরিয়েছে। বিস্তর গ্রাহক, মফঃস্বলে সব ডেস্প্যাচ একদিনে হয়ে উঠে না কিনা!"

নির্ম্মলা বলিল, "ওঃ—আমার বঙ্গপ্রভা প্রথমে ঢাকায় যাবে, তারপর ঠিকানা কেটে এখানে আসবে, তবে আমি পাব। আপনার কাছে একখানা নেই মন্মথবাবু?"

বঙ্গপ্রভার প্রতি নির্ম্মলার টান দেখিয়া আমার সম্পাদক-প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ আছে বইকি। আপনাকে কালই এক কপি পাঠিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা বলিল, "বেশী কষ্ট করবেন না, সুবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।"

নির্ম্মলার মা বলিলেন, "মন্মথবাবু কাল বিকেলে আমাদের বাড়ী চায়ে আপনার নিমন্ত্রণ বইল আসবেন।"—বলিয়া সম্মতি অভিবাদনান্তর তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি স্যানিটোরিয়ম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভাবিলাম, শিক্ষা ও সংসর্গের এমনই গুণ, বাঙ্গালীর মেয়েও কথাবার্ত্তায় নিঃসঙ্কোচে হইতে পারে!

রাত্রে বিছানায় ক্লান্তদেহ রাখিয়া সমাজতত্ত্বের অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই যে নূতন শিক্ষার সঙ্গে নূতন আচার ব্যবহার আমরা ইউরোপ হইতে আমদানি করিতেছি, ইহার ভাবী ফল কিরূপ দাঁড়াইবে?—চিন্তা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

।। ৩ ।।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিলাম। সমাজে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা আমি সামাজিক নীতির পক্ষে নিরাপদ মনে করি না। তাই ভাবিলাম চায়ের নিমন্ত্রণে যাইব না; নিজের বিশ্বাসবিরুদ্ধ কাজ করিব কেন? 'বঙ্গপ্রভা'খানা চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু সতীশটা এমনই গর্দ্দভ—আসিল না। বোধ হয় নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল না। মনে মনে উহাদের প্রেমলীলা কল্পনা করিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর মনে হইল, চায়ের নিমন্ত্রণ যদি রক্ষা না করি, তাহা হইলে ঠিক ভদ্রতা হয় না। নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। যদি বিশ্বাসবিরুদ্ধই হইল, তবে সেই সময়েই আমার উচিত ছিল—নিমন্ত্রণ কাটাইয়া দেওয়া। আজিকার মত যাই। ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া যাইবে—আর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি না।

বৈকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেশবিন্যাস একটু যত্নপূর্ব্বকই করিলাম। নিজেকে বুঝাইলাম শুধু পুরুষ-সমাজে বিচরণ করিতে হইলে বেশভূষার তারতম্যে আসিয়া যায় না—কিন্তু রমণীসমাজে একটু পারিপাট্য অবশ্যকর্ত্তব্য।

দার্জ্জিলিং আমি বহুবার আসিয়াছি—পথঘাটে আমার সর্বত্র পরিচিত। যখন বাড়ীর কাছে পৌঁছিলাম, তখন চারিটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে—নিমন্ত্রণ চারিটার সময়। ভাবিলাম, ইহারা ইংরাজি মেজাজের লোক, যথাসময়ের পূর্ব্বে যাইলে হয়ত বা বর্ব্বর মনে করিবে। তাই বাহিরে এদিক ওদিক একটু বেড়াইয়া ঠিক চারিটার সময় কার্ড পাঠাইয়া দিলাম।

সকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নির্ম্মলাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টেশনে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার গায়ে ইংরাজি কেপ, পায়ে ইংরাজি জুতা—দেখিতে আমার মোটে ভাল লাগে নাই। এখন দেখিলাম, পায়ে লাল মখমলের দেশী জুতা, নারাঙ্গি রঙের তাফ্‌তা শাড়ীখানি নব্য প্রথায় পরা, মাথায় মাথাভরা চুলের এলো খোঁপা এবং খোঁপায় একটি পীতবর্ণের পাহাড়ী গোলাপ। নির্ম্মলা বেশ সুন্দরী বটে!

সতীশকে প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে নির্ম্মলার লাল মখমলের জুতার প্রসঙ্গে রাঙা পা দুখানি বলিয়া কেমন রসিকতা করিব, তাহা মনে মনে সাধিয়া রাখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশ আসিল। চা পান ও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইলে পর সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাইবার পরামর্শ হইল।

ঘণ্টাখানেক ভ্রমণের পর যখন বিদায় লইলাম, তখন মিসেস সেন বলিলেন, "মন্মথবাবু কাল যদি আবার চায়ের সময় আসেন, তবে একত্রে বেড়াতে যাওয়া যায়।"

মনে হইল, এইবার সময় হইয়াছে এই বেলা নিমন্ত্রণ স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করি। সেই সঙ্গে অস্বীকার করিবার প্রকৃত কারণটাও খুলিয়া বলিব কি? তাহার ভিতর সমাজনীতি-ঘটিত কত বড় একটা উচ্চতত্ত্বও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার এই অবসর গ্রহণ করা উচিত নয় কি? কিন্তু আবার ভাবিলাম, নিমন্ত্রণ কই? যদি আসেন—ইহাকে কি নিমন্ত্রণ বলা যাইতে পারে? এইরূপ মানসিক তর্কে ব্যস্ত থাকায় কোনও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলাম না; এইদিকে ইঁহারাও নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে বেলা দশটার সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত। নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "তোমার সেই হতভাগা কাগজ বঙ্গদর্শন না বঙ্গ-প্রভা কি দিয়ে এসেছ, সকাল থেকে তাই নিয়ে ব্যস্ত। আমি রাগ করে চলে এলাম।"

শুনিয়া আমার মনটা ভারি খুসী হইল। সাহিত্যের প্রতি নির্ম্মলার এত অনুরাগ! নির্ম্মলা যদি বাঙ্গলা লেখেন তবে সংশোধন করিয়া বঙ্গপ্রভায় ছাপাই।

নির্ম্মলার অনেক গল্প সতীশ করিল। এই দুইটি নব-প্রণয়ীর সুখে আমারও মনটা তারুণ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সতীশ বলিল, "এখন যাই। কেমন ঘর পেয়েছ দেখতে এসেছিলাম। চায়ের সময় দেখা হবে। আসছ ত?"

আমি বলিলাম, "চায়ে? আজ আর না। মিসেস সেন ত আমায নিমন্ত্রণ করেন নি।"

সতীশ বলিল, "করেছেন বইকি! আমি নিজে শুনেছি।"

"কোথা করছেন। শুধু বলেছেন "আসেন যদি।"

"বিলক্ষণ। ঐ ত নিমন্ত্রণ হল। তবে কি তোমার দরজায় এসে গলায় বস্ত্র দিয়ে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ করে যেতে হবে নাকি? আচ্ছা সেকেলে তুমি ত হে।"

আমি বলিলাম, "বল কি? কিন্তু আমি ত আজ যেতে পাবছিনে। না গেলে কি ভয়ানক অভদ্রতা হবে? কি জানি, তোমাদের সব বিলিতি এটিকেট ফেটিকেট জানিনে ভাই।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ভয়ানক অভদ্রতা হবে।"

শুনিয়া আমি নিজের প্রতি ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই সময় মিসেস সেনকে অন্ততঃ এইটুকু বলিলেই হইত, 'না কাল আর আসতে পারব না, একটু কায আছে'—তা না করিয়া এটা রীতিমত নিমন্ত্রণ হইল কিনা সেই মানসিক তর্কে ব্যস্ত রহিলাম, এখন এই অবস্থা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, "না না, 'ভয়ানক অভদ্রতা' হবে না, অত চিন্তিত হয়ো না। শুধু আবার দেখা হলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে। কিন্তু আসবে না কেন? না না—এস।"

প্রকৃত কারণ সতীশকে একা বলিতে ততদূর উৎসাহ হইল না। আমি বলিলাম, "ওহে আজ একটু বিশেষ—

সতীশ বলিল, "বিশেষ কায কাল হবে, আজ ত এস। অন্ততঃ আসতে চেষ্টা কোরো।"—বলিয়া সে অন্তর্দ্ধান করিল।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "যাই বল যাই কও, আর আমি যাচ্চিনে।"

কিন্তু সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বড় একা অনুভব করিতে লাগিলাম। পূজাব 'বঙ্গপ্রভা'খানা নির্ম্মলার কেমন লাগিল জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্যও জন্মিল। বিশেষতঃ আমার স্বলিখিত সেই 'নারী-জীবনের আদর্শ' প্রবন্ধটা সম্বন্ধে।—নির্ম্মলার শ্রেণীব আজি কালিকার আলোক-প্রাপ্তা নারীগণের জন্যই সে প্রবন্ধটা লিখিয়াছি কিনা। সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নির্ম্মলার মতামত কিরূপ হইল তাহা জানা আবশ্যক।—সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম।

॥ ৫ ॥

গিয়া দেখিলাম, ড্রইং রুমে কেহ নাই। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, নির্ম্মলা আসিলেন, হাস্যমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! আপনার আশা ত আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। বাবা, মা, সতীশবাবু বাগান দেখতে গিয়েছেন। সতীশবাবু বললেন আপনি আজ আর আসবেন না—ভারি ব্যস্ত আছেন। কোনও নূতন লেখায় বুঝি?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, না—একটু কায ছিল, তাই ভাবলাম—" ·

নির্ম্মলা বলিল, "আচ্ছা, বঙ্গপ্রভায় রোজ ক'ঘণ্টা করে আপনার সময় যায়?"

"আমার সমস্ত সময় প্রায় বঙ্গপ্রভায় যায়। আমি ত বঙ্গপ্রভা নিয়েই আছি।"

"বেশ আছেন। আমারও ইচ্ছে করে, আমিও ঐ রকম সাহিত্যচর্চ্চা নিয়ে দিনরাত থাকি। কিন্তু আপনার কাছে এ মত ব্যক্ত করা বোধ হয় খুব দুঃসাহসের কায?"

"কেন?"

"আপনি নারীজীবনের আদর্শ প্রবন্ধে যে সব কথা লিখেছেন—আপনার মতে স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহ, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পরসেবায় আত্মনিয়োগই যথার্থই নারীধর্ম্ম।"

"আপনি তা হলে প্রবন্ধটা পড়েছেন?"

"পড়েছি বইকি; সব পড়ে ফেলেছি। কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি—মোমবাতিটা শেষ অবধি পুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, ঘরে ভয়ানক আলো হয়েছে, দেখে প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল।"

আমি বললাম, "ওঃ—ভাগ্যে কিছু ধরে-টরে যায়নি।"

স্মিতমুখে নির্ম্মলা বলিলেন, "আপনার বঙ্গপ্রভা পড়তে গিয়ে যদি আমার মশারিতে আগুন ধরে যেত, আমি পুড়ে যেতাম, তবে এই দুর্ঘটনা কাগজে কাগজে ছাপা হ'লে আপনার বঙ্গপ্রভার খুব একচোট বিজ্ঞাপন হয়ে যেত।"

ইহার উত্তরে প্রথমটা আমার কথা যোগাইল না—শুধু একটা উপমা মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। যে মোমবাতি জ্বলার কথা বলিতেছেন, এই সুশিক্ষিতা নারীটি তাহারই মত কি সুকোমল, অথচ তাহারই শিখার মত কি দীপ্তিমতী? আমি একটু অর্থশূন্য হাসি হাসিলাম, শেষে বলিলাম, "বাঙ্গলা সাহিত্যে আপনার এত ভক্তি বাঙ্গলা লেখেন না কেন?"

"আমি লিখলে কে পড়বে? প্রথমতঃ, কে ছাপাবে?"

আমার খুব সন্দেহ হইল, নির্ম্মলা গোপনে লিখিয়া থাকেন। কিন্তু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে ছোট গল্পের কথা উঠিল। আমি বলিলাম—প্রতিমাসে একটা করিয়া ছোট গল্প দেওয়ার যে রীতি হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে ভাল গল্পাভাবে সম্পাদককে মুস্কিলে পড়িতে হয়।

নির্ম্মলা বলিলেন, 'আমার একটি বন্ধু ছোট গল্প লেখেন। আমার কাছে একটা রয়েছে। আপনি দেখবেন?"

এ বিপদের সম্ভাবনা জানিলে ছোট গল্পের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতাম না। সম্পাদকীয় ঘানি টানিতে টানিতে শিক্ষানবীসের অনেক গল্প আমাদিগকে পড়িতে হয়। কিন্তু এ একমাস আমি ছুটি লইয়া পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছি।—তথাপি নিরুপায়। সুতরাং নির্ম্মলাকে বলিলাম, "তা দেবেন, দেখব।"

"দেখে আপনার যথার্থ মতামত আমায় বলতে হবে।" "তা বলব।"

"আমার বন্ধু বলে কিছু ঢেকে বলবেন না?"

"আপনার যদি যথার্থ মতই শোনবার জন্য উৎসুক্য হন, তা হলে আমি যথার্থ মতই বলব।"

নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে, কল টানা ফুলস্ক্যাপে হাফ মার্জ্জিনে সুন্দর সাবধান হস্তাক্ষরে লেখা, লাল রেশমে কোণ গাঁথা একটি পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া আমি বলিলাম, "নতুন লেখক?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "হ্যাঁ, কি করে জানলেন?"

"নূতন লেখকেরা প্রায়ই বেশ ধরে ধরে যত্ন করে পাণ্ডুলিপি লিখে থাকেন। পুরোনো লেখকদের হস্তাক্ষর প্রায়ই অস্পষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়া, সম্পাদকীয় অভ্যাসবশতঃ শেষ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া নাম খুঁজিলাম। নাম নাই। শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইয়া দেখিলাম, নায়ক বা নায়িকা বিষপান করিয়াছে কিনা। নূতন লেখকের নায়ক নায়িকা শেষটায় প্রায়ই বাঁচে না। দেখিলাম নায়ক নায়িকা বাঁচিয়াই আছে—অনেকটা ভরসা হইল।

সন্দেহ হইল, এ লেখা হয়ত বা নির্ম্মলার নিজেরই। অনেক লাজুক লেখক, প্রথম প্রথম অন্যকে নিজের লেখা দেখাইবার সময়, বন্ধুর লেখা বলিয়া থাকেন।

নির্ম্মলাকে বলিলাম, "আজ আমি বাসায় গিয়ে এ লেখা পড়ব, কাল এসে আপনাকে মতামত বলব।"

লেখা নির্ম্মলার হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা। মতামত কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করিব তাহা আগে হইতেই জানা আছে। বন্ধুত্বের স্থলে নূতন লেখকের লেখার সমালোচনা শতসহস্রবার করিতে হইয়াছে। বাঁধা গৎ আছে—সেইগুলি গুছাইয়া বলা মাত্র। স্থানে স্থানে বেশ হৃদয়গ্রাহী'—চর্চ্চা রাখিলে ক্রমে একজন ভাল লেখক হইতে পারেন'—ইত্যাদি।

ক্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। চা পানাদির পর বাড়ীতে বসিয়াই গল্প চলিল—বেড়াইতে যাওয়া আর হইল না।

।। ৬ ।।

বাড়ী গিয়া গল্প পড়িলাম। দেখিলাম, খুব ভুল করিয়াছি। প্রথমতঃ নূতন লেখকেব রচনা নহে। হাত বেশ পাকা—ভাষা তেজস্বী অথচ সংযত। দ্বিতীয়তঃ নির্ম্মলাব লেখা নহে। এতকাল বৃথাই সম্পাদকতা করিতেছি না। কাহার লেখা তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। গৌরীকান্ত রায়ের লেখা। সাক্ষাৎ আলাপ নাই—শুনিয়াছি ঢাকার ঐ দিকেই কোথায় থাকেন। লেখা তাঁহাব অনেক পড়িয়াছি। তিনি নব্য লেখকগণের মধ্যে একজন প্রধান। তবে লেখায় অনেক দোষও আছে—সে সব অল্প বয়েসের দোষ। ক্রমে শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন নির্ম্মলার কাছে গিয়া, লেখাটির সুখ্যাতি করিলাম। দুই এক স্থলে দোষও দেখাইলাম—কিন্তু প্রশংসার ভাগই বেশী দিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেখকের বয়স কি অল্প?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "হ্যাঁ—আমার চেয়ে কিছু বড়।"

"আপনার খুব বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমার একজন বিশেষ বন্ধু।"

কথাটা শুনিতে আমার ভাল লাগিল না। একজন যুবতী কন্যার একজন যুবক 'বিশেষ বন্ধু' থাকিবে কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এঁর লেখা দুই একটা আমরা পেতে পারিনে?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "কেন, আপনার খুব লোভ হচ্চে নাকি?"

"তা হচ্চে!"

"আচ্ছা, তা হ'লে আপনাকে একটা দেওয়াতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নয়।"

"আপনার কাছে কি তাঁর অনেক লেখা আছে?"

"তাঁর অনেক লেখাই আমার কাছে আছে। তিনি নূতন লেখা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে পাঠিয়ে দেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গতিক ভাল নয়। এত অন্তরঙ্গতা। বলিলাম, "আপনিই তাহলে তাঁর প্রধানা পাঠিকা?"

"অন্ততঃ প্রথমা বটি। আমিই বোধহয় তাঁর লেখার সবচেয়ে বেশী ভক্ত।"

আমি বলিলাম, "তাঁর নামটা শুনতে পাইনে?"

নির্ম্মলা একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন "গৌরীকান্ত রায়।" বলিতে তাঁহার কপোলদেশে কিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল।

সতীশের জন্য আমার দুঃখ হইল।

তারপর, গৌরীকান্তের প্রকাশিত লেখার সম্বন্ধে আমরা কথা কহিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম তাঁহার নব প্রকাশিত 'নন্দরাণী' উপন্যাস 'ামরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

ইহার পর দুই তিন দিন নির্ম্মলার সঙ্গে গৌ ীকান্ত রায়ের লেখার বিষয় অনেক আলোচনা করিলাম। নির্ম্মলা গৌরীকান্তকে একেব. র পূজা করেন বলিলেই হয়। লোকটার উপর আমার কেমন একটা বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিতে লাগিল।

।। ৭ ।।

সতীশ এখনও সেন-দম্পতির নিকট নির্ম্মলার পাণিপ্রার্থনা করে নাই। করিলে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশ যেরূপ ডাক্তার সেনের জামাতৃপদাকাঙ্ক্ষী, ডাক্তার সেনও সেইরূপ সতীশের শ্বশুরত্বের জন্য সমুৎসুক। এ কয়দিনের ভাব-গতি দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয়।

কিন্তু ঐ গৌরীকান্ত বিভ্রাট আমায় দুশ্চিন্তান্বিত করিয়াছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে 'পরম বন্ধুত্ব' আমি মোটেই বুঝিতে পারি না।

এখন ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। সতীশ ও নির্ম্মলার বিবাহ হইল। নির্ম্মলা বাঙ্গালা সাহিত্যেব প্রতি বিশেষ অনুরাগশালিনী। সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের নামে জ্বলিয়া যায়। এদিকে গৌরীকান্ত একজন প্রতিভাশালী লেখক, সে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মধ্যে বাছিয়া নির্ম্মলাকেই তাহার সাহিত্য-সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে। আর, নির্ম্মলার মনও গৌবীকান্তেব প্রতি একটা ভাবাবেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা অজ্ঞাত বীজস্বরূপ;—ইহা হইতে ভবিষ্যতে কি জাতীয় তরু উদগত হইতে পারে তাহা কে জানে?

আমি ইহা হইতে দিব না। আমি আমার বন্ধুব দাম্পত্যজীবন নিষ্কণ্টক করিব। নির্ম্মলা গৌবীকান্তেব পূজাব জন্য নিজেব মনের মধ্যে যে ভক্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে মন্দির আমি সমালোচনাব বজ্র দিয়া ভস্মীভূত করিব। দেখাইব, গৌরীকান্ত অপেক্ষাও প্রতিভাবান লেখক-নব্যবঙ্গে আছে। আমি গৌরীকান্তের ভাষার ভুল ধরিব, নূতন পুরাতন পাশ্চাত্য সাহিত্য তন্ন তন্ন কবিযা ঘাঁটিয়া কোথায় গৌরীকান্তের কোন্ ভাবের সাদৃশ্য আছে আবিষ্কার করিব; পাশাপাশি দুই স্থান উদ্ধৃত করিয়া গৌরীকান্তকে চোর বলিয়া জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিব। এইরূপ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়ে নির্ম্মলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিব যে তাহার পূজার দেবতা মাটির পুতুল মাত্র, ভিতরে শুধু খড। সতীশকে, নির্ম্মলাকে রক্ষা করিব, সে আত্মবক্ষাবই সমান। ঘরের টাকা দিয়া এতদিন বঙ্গপ্রভা চালাইয়া আসিয়াছি। আমার সমালোচনার রাজদণ্ড ছোট বড় সমস্ত লেখকেরই বিভীষিকা। এবার সে দণ্ডের সাহায্যে বন্ধুকৃত্য সাধন করিয়া লইব। একবার মনে সন্দেহ হইল, তাহাতে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের হানি হইবে না ত? কিন্তু অনুকূল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া মনকে সহজেই আঁখি ঠারিলাম।

এইরূপ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ 'নন্দরাণী' খানার একটা ভয়ঙ্কর তীব্র সমালোচনা লিখিলাম। কার্ত্তিক মাসের কাগজের জন্য সমালোচনা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে অর্ডার প্রুফ আসিল। অর্ডারে স্থানে স্থানে সমালোচনা আরও তীব্র করিয়া দিলাম।

সেদিন বৈকালে সতীশ আসিল। আমার টেবিলে 'নন্দরাণী', দেখিয়া বহিখানা উঠাইয়া লইল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "উঁহু উঁহু ছুঁয়ো না, এটা বাঙ্গালা বই।"

সতীশ বলিল, "এইখানা নিয়ে ক'দিন থেকে এমনই মেতে আছ যে একহপ্তা আমাদের

ওদিকে যাওনি। যখনই আসি তখনই দেখি এই বইখানা নিয়ে লিখছ, তাই এটা কেড়ে নিতে এসেছি।"

আমি বলিলাম, "বইখানা সমালোচনা করছিলাম। এখন কেড়ে নিতে পার, শেষ হয়ে গেছে।"

"সমালোচনা শেষ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ—এই কতক্ষণ অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়েছি।"

সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের খবর লইতেছে দেখিয়া ভাবিলাম, হইল কি?

সতীশ আমার মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম, "ব্যাপার কি হে?"

সতীশ বলিল, "এবার আমার জীবনের একটা গোপন কথা তোমায় বলি। শুধু নন্দরাণী'র সমালোচনা তোমার কাগজে বেরুবাব অপেক্ষায় ছিলাম।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "নন্দবাণীর সমালোচনা। নন্দবাণীব সমালোচনাব সঙ্গে তোমার জীবনের গোপন কথার যোগ কোথায়?"

বলিল, "বিশেষ যোগ আছে। আমিই গৌরীকান্ত রায়।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম, "তুমি?"

"আমি। দেখছ না—সতী মানে গৌবী, আর ইশ মানে কান্ত।"

আমি বলিলাম, "তুমি?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডাকিবাব জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। চাকর আসিলে টেলিগ্রাম কবিবাব কাগজ আনিতে বলিয়া দিলাম।

সতীশ বলিল—বিলাতে থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া সমস্ত ভাল বাঙ্গালা বহি মনোযোগের সহিত সে পাঠ করিয়াছিল। পবে লেখা অভ্যাস কবিয়াছে। তাহাব প্রথম উপন্যাস 'নন্দরাণীব সমালোচনা বঙ্গপ্রভায় বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা কবিতেছিল, তাহার কারণ, আগে জানিলে পাছে আমি তাহাকে অন্যায় প্রশংসায় বাড়াইয়া তুলি।

চাকর টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনিল। ম্যানেজারকে সংবাদ পাঠাইলাম—নন্দরাণী সমালোচনাব অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়াছি—কিন্তু উহা যেন ছাপা না হয়। তাহাব স্থানে অন্য একটা প্রবন্ধ দিতে বলিয়া দিলাম।

সচ্চরিত্র

॥ ১ ॥

যে বুধবারে গেজেটে খবর বাহির হইল সুবেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি-এ পবীক্ষায উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের-বুধবাবেই ভাগলপুর হইতে তাহাব কাকাব মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুবেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহার ও দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুবে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন; সুতরাং তাহাব কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্র দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে নাই—তাহাদের তিনি সামান্য চাকুরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আইন পাশ করিয়া সুরেন ওকালতী করে;—সুরেনও নিজের জীবনেব গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল, আইন পড়ার খরচা যোগাইবাব আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন 'ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।' কিন্তু সুরেন বলিল, "কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।"

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মৎলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না। মাকে বলিল, 'কলিকাতায় যাই, ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করব, তাইতে আমাব বাসা-খরচ চলে যাবে।"

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। আইন ক্লাসে নাম লেখাইল। কয়েক দিনের চেষ্টায়, দশটাকা বেতনের একটি প্রাইভেট টিউসনও জুটিল; আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনও রকমে বাসা খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে টাকা যাহা আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল। সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাঁদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুন্‌গুন্ করিয়া থিয়েটাবের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে একটি কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"সুরেনবাবু হ্যায়?"

সরমন্ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল "বাবু ছাদমে আছে দেখা হোবে।" বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাবে; কেহ তাহাকে হিন্দিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্ খট্ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

"কে—রজনীদাদা যে!"

"সুরেন, ভাল আছিস?"

রজনীদাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। কন্‌ট্র্যাক্‌টারী ব্যবসা কবেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন।

হ্যাবিসন বোড হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল—সে আলোকে সুবেন্দ্র দেখিল বজনীব পাযে রেশমী মোজা চিক্‌চিক্ করিতেছে—তদুপরি পম্প্‌শু। গাযে রেশমী পাঞ্জাবীব উপর জবিব পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেন্টেব ও মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছে

"সুরেন ভাল আছিস?"

"ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনীদাদা? খবর কি?"

রজনী বলিল, "একটা কথা আছে, এখানে বলব? তোর ঘরে চল না।"

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল "ঘবেও ত লোক আছে?"

রজনী বলিল, "তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট্ করে জামা পবে একটা চাদর নে।"

এই বলিযা রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পবে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দবজার কাছে একখানা ঠিকাগাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল, "আয়।"

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল, "কোথায় নিয়ে যাচ্চ আমায়? কি বলবে এইখানেই বল না।"

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বাবংবাব সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন রোজেটার সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল, "আমি যাচ্চি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বললে আমার দেরী হয়ে যাবে। পথে বলব। এইটুকু আব হেঁটে আসতে পারবিনে? ভারি নবাব হয়েছিস যে দেখছি! আয় আয়।"

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল, "বিডিন ইষ্টিট্।"

॥ ২ ॥

গাড়ী চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কি?"

"তোর জন্যে একটা প্রাইভেট টিউশন ঠিক করেছি।"

সুরেন খুসী হইয়া বলিল, "কোথায়? কত?"

"মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।"

সুরেন শুনিয়া মহা খুসী। বলিল, "পঁচিশ টাকা? বল কি রজনীদাদা? কখন?"

"বিকেলে দু'ঘণ্টা।"

"কি পড়াতে হবে?"

"এক ঘণ্টা বাংলা, এক ঘণ্টা ইংবেজী।"

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল, "কটি ছেলে?"

রজনী বলিল, "একটিও না।" বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল, "একটিও না। তার মানে কি?"

"ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।"

"মেয়ে? কত বড় মেয়ে"

বজনী হাসিয়া বলিল, "তোব সে খোঁজে কায কি? তুই যাবি, পড়াবি। বয়স যতই হোক না।"

সুবেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা কবছি।"

বজনী তখন উদার ভাবে বলিল, "বয়স পনেবো ষোলো।"

সুবেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্ম?"

"না।"

"ক্রিশ্চান্?"

"না।"

"তবে কি? হিন্দু নাকি?" তাই।"

"হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে? কাব মেয়ে, বাপেব নাম কি?"

বজনী হাসিয়া বলিল, "খোদা জানে। মাব নাম জিজ্ঞাসা কবিস ত বলতে পাবি।"

সুবেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কি?"

"মাব নাম আমোদিনী। বেঙ্গল থিয়েটাবেব আমোদিনী। নাম শুনেছিস?"

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনেব সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিযা বলিল, "শুনেছি।"

বজনী বলিল, "কি বলিস?"

সুবেন দৃঢ় ভাবে বলিল, "আমাব দ্বাবা হবে না।"

বজনী জিজ্ঞাসা কবিল, "কেন?"

সুবেন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিল, "বেশ্যাব মেয়েকে পড়াব? কখনই না।"

বজনী বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! কেন, আপত্তিটা কি শুনি?"

সুবেন বলিল, "আপত্তি অনেক।"

"কি? এ উপার্জ্জন অনেষ্ট নয়?"

"অনেষ্ট হবে না কেন?"

"তবে? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস?"

সুরেন গর্ব্বিতভাবে বলিল, "সে ভয় কবিনে।"

"তবে? তবে কি আপত্তি বল্।"

"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? লোকে শুনলে বলবে কি?"

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! বি-এ পাশ করে এমন কথাটা বললি? লোকে কি বলবে না বলবে সেই ভয়েই জড়সড়?"

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

রজনী বলিল—"শোন্। ও আপত্তি কোন কাযের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি? পড়াতে যাচ্চিস না পড়তে যাচ্চিস। কাকে পড়াতে যাচ্চিস, কোথায় পড়াতে যাচ্চিস, এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস নিজের মনে যথেষ্ট বল নেই, চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে, তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ করে বুঝে দেখ্ নিজেব মনে।"

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হইল। সগর্ব্বে বলিল, "সে জন্যে ভেব না।"

রজনী বলিল, "তবে নে। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই. যে টাকা দেবে তাব কায করব। অমনি ত আব টাকা নিচ্চিনে।"

সুবেন ভাবিয়া বলিল, "বাড়ীব লোক যদি শোনে ত কি বলবে?"

রজনী বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! বাড়ীব লোক জানবে কি কবে? এ কলকাতা সহব সমুদ্দুর! কে কাব খবর রাখে—তুইও যেমন!"

গাড়ী এই সময় থিয়েটাব পৌঁছিল। রজনী বলিল, "তা হলে কি বলিস? আজ আমোদিনীব সঙ্গে দেখা হবে আমাব—কি বলব?"

সুরেন একবাব মনে কবিল বলিল—'না।' আবাব ভাবিল, 'এত তাড়াতাড়ি কি—না হয় দু'দিন পরে বলব।" বলিল, "বজনীদা, ভেবে তোমায় দুই একদিন পবে বলব।" বলিয়া বিদায় চাহিল।

বজনী বলিল, "আচ্ছা, তা যে বকম হয় আমায় লিখিস, কিন্তু ঐ কথা বে ভাই। যদি বুঝিস নিজে ঠিক থাকতে পারবি, নিজেব মনে এক চুল এদিক ওদিক হবে না—তবেই নিস। আমবা ত বয়ে গেছিই। তোবা এখন ছেলেমানুষ আছিস—গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"—বলিয়া বজনী থিয়েটাবে প্রবেশ কবিল।

সুবেনও ধীবপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিল।

॥ ৩ ॥

সে বাত্রি সুবেনেব ভাল নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল। পবদিনও সাবাদিন ভাবিল। তাহাব মনে হইতে লাগিল, যদি কাযটা অস্বীকাব কবি তবে বজনীদাদা ভাবিবে, নিজেব চবিত্রবলেব প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিযাই অগ্রসব হইল না। এই ভাবেব সহিত—অর্থকৃচ্ছ্র তাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য কবিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আব পঁচিশ টাকা—পঁযত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা কবিযা খবচ কবি, তাহা হইলে পনেবো টাকা করিযা জমিবে। তিন বৎসব যদি মাসে পনেবো টাকা কবিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে. ওকালতী পাস কবিয়া, তাহা লইয়া ব্যবসায় আবম্ভ কবিতে পারিব।

আবাব ভাবিল, তিন বৎসব ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যাব মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে? ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কাবি হইবে।

অবশেষে স্থিব কবিল, এক কায করা যাউক। এখন কাযটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আব একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। বজনীদাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে—পবিশ্রম করিব, টাকা লইব—কিরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব, কবিবাব দরকার কি?

জানাজানিব ভযটা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু তাহাব উৎসাহ

ভারি কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। কলকাতা সহর সমুদ্দুর—কে কার খবর রাখে!

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনীদাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া, সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল—কাগজে কলমে এর সাক্ষী সাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনীদাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া, আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারের রজনীদাদার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, খবর কি?"

সুরেন বলিল, "খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

রজনী বলিল, "ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া।"—বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, "আয়।"

দুইজনে একাকী হইলে রজনী বলিল, "কি ঠিক করলি?"

সুরেন বলিল, "নেওয়াই ঠিক করলাম?"

রজনী বলিল "তা বেশ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস ত! তোকে জানি ছেলেবেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোকরা, তাই সাহস ক'রে তোকে এ কাযে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব্ব করে বলেছি যে তুই অতি সচ্চরিত্র কোনও রকম খেলাপ হবে না।"

সুরেন বলিল, "কেন রজনীদাদা, সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মাতামাতি কেন এসব লোকের?"

রজনী বলিল, "আঃ—এইটুকু বুঝতে পারলিনে, বি-এ পাস করেছিস! অতি গর্দ্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস। ওর ইচ্ছে, ওব মেয়েও একদিন একটা মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস্ হয়। সেইজন্যে ভাল রকম লেখাপড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়াবার জন্যে বুড়োগোছের পণ্ডিত-টণ্ডিত রাখত; কিন্তু বুড়ো হলে হবে কি—বুড়োদের প্রাণে আবার বেশী সখ! পড়ায় না—খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চবিত্র দেখে লোক রাখলে কোনও ভয় থাকে না—এই জন্যে আর কি—বুঝেছিস?"

সুরেন বলিল, "ওঃ তা বটে।" ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এ বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল, "তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পবশু একদিন যাস—গিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিস।"

সুরেন বলিল, "না রজনীদাদা, আমি একলা যেতে পারব না।"

"কেন? মসজিদবাড়ী স্ট্রীট চিনিসনে?"

"তা চিনি, কিন্তু একলা যেতে পারব না রজনীদাদা।"

"অতি গর্দ্দভ তুই। আচ্ছা আসিস কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে করে।"

পবদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল।

॥ ৪ ॥

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস, আর র‍্যাল রীডার থ্রী। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরেজী কি পড়ে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল, "রয়্যাল রীডাব নম্বর থার্ড।" সুরেন

সংশোধন করিয়া দিল, "নম্বর থ্রী বলিবে, থার্ড হয় না।" তখনই বিনীতভাবে 'নম্বর থ্রী' বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিত সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবার ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল, 'আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।' যতটা খুসি হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুসি হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে—পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশতঃ এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পুরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে হইতে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনে করিল—আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল, বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হইবে—ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় কি নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল, যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে সে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পডাইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল, "কি করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?"

সুরেন বলিল, "এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন দিনের বেলা আমরা যা চিন্তা কবি রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখি।"

নলিনী বলিল "না তা নয। আমাদের আত্মা আছে কিনা। একজনকাব আত্মা, যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায, তাহলে দু'জনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে শুধু একজনকার মনে থাকে, একজন ভুলে যায়।"

সুবেন বলিল, "বাঃ বেশ ত!"

মাষ্টারবাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পান রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল, "আজকের পানটা খুব ভাল হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে।"

নলিনী বালিকাসুলভ গর্ব্বে বলিল, "ভাল হযেছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাষ্টার মশায়।"

সুরেন বলিল, "বটে। তুমি এমন পান সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পান সাজে, রাম রাম।"

পবদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল, "আপনাদের বাসায় পান ভাল হয় না বলছিলেন, গোটাকতক পান তৈরী করেছি নিয়ে যাবেন?"

সুরেন পান লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভারি লক্ষ্মী তুমি।"

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল। তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন; তাহার জগৎ যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ! সুরেন তাহার মার গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের, বিবাহের গল্প যখন করিত, কি একটা অনির্দিষ্ট আকাঙ্খায় নলিনীর হৃদয় ভবিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় ও অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছু দিনে সে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল;

কিন্তু কোনও প্রতিকার-চেষ্টা করিল না। বুঝিল, মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই সে তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতেই তাহার মানব জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাঁহাকে শ্রদ্ধায়, আশায় ও সুখে পুলককম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—"আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্যে ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা এমন কোথাও যাব সেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। কি খাব? পরিশ্রম করব;—আবশ্যক হয় দু'জনে পরিশ্রম করব। দু'বেলা না জোটে, একবেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকিব।—"

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে সে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুইজনেই ত্রস্ত হইযা হাত সরাইয়া লইল।

॥ ৫ ॥

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপুর মাতিয়া রহিল।

সোমবার বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল, নলিনী নাই—সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল—নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয় তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়া ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল? বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল?

গিয়াছে, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহারও অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না। বাজে কথা। আজ দুইমাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছে, একদিনও ত সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল, আকাশে নক্ষত্র অদূরে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে, মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই একমাসে কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা—সেই স্বপ্নের জাগ্রৎ অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহে শোক অনেকটা লঘু হইল। তখন মনে হইল—উঃ খুব বাঁচিয়া গিয়াছি! কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম? কি সর্ব্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল। কি মোহেই

পড়িয়াছিলাম। ভগবান ও জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না। কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে। যদি শুনিতাম তাহাব মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার কবিতেছে, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে লইয়া কোথাও চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙ্গা আব জোড়া লাগিত না।

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বিকালবেলা সুবেন বাসাব ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিমবাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুবেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল—নলিনীব হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল—ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

৪৪/১নং নীলমণি বসুব গলি,—ভবানীপুব

প্রিয়তম,

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার বক্ষয়িত্রী তাহাব কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব কবিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা তাহাব প্রতি ভাবি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা কবে—আমি স্বীকাব কবি যে আমি তোমায় ভালবাসি। মা বলিল—তুমি ভিক্ষুক নিজে খাইতে পাও না ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কব, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থিব হইয়া দুইদিন বাদেই আমাকে পবিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পবদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া বাখিযা গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমাব চিববিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্ত্তেব তরেও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমাব অবস্থা কি হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে তাহা মনে কবিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমাব একার সুখেব জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম; কিন্তু হে আমার স্বামী, আমায় না পাইলে তুমিও সুখী হইবে না এ বিশ্বাস তুমি আমার মনে জন্মাইয়াছ; তোমাব সুখের ও আমার সুখের জন্য, আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্খা কবি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুব আছে, তাহার উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী

পুঃ। ঠিক সাতটার সময় আসিও।

পত্র পড়িয়া সুরেন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসাব লোককে বলিল, "বাড়ী হতে এইমাত্র চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।"

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল, "সরমন্ একখানা গাড়ী ডাক্ জল্দি।" গাড়ী আসিলে জিনিসপত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ী পৌঁছিল। মাকে বলিল, "কলকাতায় ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।

[ফাল্গুন, ১৩০৮]

অযোধ্যার উপহার

।। ১ ।।

অখিলবাবু কাছারি হইতে বাড়ী আসিবামাত্র গৃহিণী তাঁহাকে ভৃত্য অযোধ্যার সকল গুণের কথা বলিয়া দিলেন।

অখিলবাবু সেদিন একটা মোকর্দ্দমা হারিয়া আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ উকিল তাঁহাকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিঁধিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মেজাজটা অত্যন্ত বিগড়াইয়া ছিল। তাহার উপর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার। গৃহিণী চক্ষুযুগল জবাবর্ণ ও পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। অখিলবাবু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। অদূরে একজন ঝি যাইতেছিল, অযোধ্যাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক মিনিট পরে অযোধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্ষু অন্যদিনের মত আনত নহে। গোঁফজোড়াটা সে উত্তমরূপে পাকাইয়া জর্ম্মণ সম্রাটের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মস্তকে পাগড়ী। বাড়ীতে সচরাচর অযোধ্যা পাগড়ী পরে না—কিন্তু কোনও কারণে তাহার মেজাজটা যখন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে, তখনি সে তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লয়। মনে বীরত্বের ভাব জাগিয়া উঠিলে বাহিরে তাহার চিহ্ন-প্রকাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

অযোধ্যার আকার প্রকার দেখিয়া অখিলবাবুর ক্রোধবহ্নি আরও প্রখরতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আত্মস্থ হইয়া শান্তভাবে অথচ কঠোরস্বরে জজের রায় পড়ার মত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অযোধ্যা তুই অনেক কালের চাকর। কিন্তু পুরোনো হয়ে কোথায় ভাল হবি, না যতই বুড়ো হচ্ছিস, ততই তোর বজ্জাতি বাড়ছে। মনিব বলে যে একটা সমীহ কি ভয় ডর তা তোর নেই। হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিস। তুই পুরোনো চাকর বলে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। তুই যা। এই পয়লা তারিখ থেকে তোকে জবাব দিলাম।"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া, উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "যো হুকুম মহারাজ, হম্ রাজিকা সাথ চলা যায়েঙ্গে। আপ জবাব নেহি দেতে তো খুদ্ হম্ আজ ইস্তফা দেনেকো তৈয়ার হুয়া থা।" অযোধ্যার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

কেহ না মনে করেন যে অযোধ্যা বাঙ্গলা কহিতে জানে না। সে এ বাড়ীতে আঠারো বৎসর চাকরি করিয়াছে—প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গলা কহিতে পারে। কিন্তু রাগিলে সে আর বাঙ্গালা কহিত না। বাঙ্গলাভাষাটা ভালমানুষীর ভাষা; তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু জাতির ভাষা। অযোধ্যা কেন— অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গালা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

অযোধ্যার এ দুর্ব্বিনীত উক্তিতেও অখিলবাবু আত্মহারা হইলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে বলিলেন, "বেশ। কিন্তু খবরদার আর যেন এসে জুটিসনে। বার বার তিনবার কসুর মাফ করেছি—আর করব না। এবার এলে আর কিছুতেই রাখব না। এই শেষ।"

অযোধ্যা বলিল, "নেহি গরীব পরবর, আওর নেহি আওয়েঙ্গে। হম্ভি দিকদারী হো গিয়া—"

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া, দুয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঘূর্ণিতচক্ষে বাবু বলিলেন, "যাও।"

অযোধ্যা যাইতে যাইতে তাহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া লইল, "থক্ গিয়া। নোক্রী আওর নেহি করেঙ্গে। যো কিয়া সো কিয়া—বস্ অব্ হদ্ হো চুকা।"

অখিলবাবু চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া ঝিকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্যদিন অযোধ্যাই তাঁহার তামাক সাজিত।

॥ ২ ॥

বেলা দ্বিপ্রহর, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অখিলবাবু কাছারি গিয়াছেন, ছেলেরা কলেজে, গৃহিণী পালঙ্কে নিদ্রামগ্না।

আজ শীতটা কিছু বেশী। অযোধ্যা বারান্দার রৌদ্রে বিছানা টানিয়া একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতেছে না। খুকী তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকাচুল তুলিয়া দিতেছে।

খুকী বলিল, "অযুধ্যা তুই কেন যাবি ভাই?"

অযোধ্যা বলিল, "তোর বাবা যে হামায় ছোড়ায় দিয়েছে ভাই।"

কাল পয়লা তারিখ, অযোধ্যা কাল যাইবে। খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবি অযুধা?"

অযোধ্যা বলিল, "আর কেন আসব দিদি? এবার যাব আর আসব না।"

খুকী অযোধ্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না অযুধা তোকে আসতে হবে।"

অযোধ্যা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোর যখন সাদি হবে, তখন তুই হমায় খৎ লিখিস হামি আসব।"

খুকী দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমি কি লিখতে জানি?"

"দাদাবাবুকে বলবি—দাদাবাবু লিখে দেবে তোর খৎ।"

অযোধ্যা কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল, "তুই হামার সাদিতে যাবিনে ভাই?"

খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "দূর পোড়ারমুখো—তোকে আবার সাদি করবে কে? তুই যে বুড়ো হয়ে গেছিস।"

অযোধ্যা বলিল "দূর পোড়ারমুখী, হামি বুঢ়া হব কেন?"

অযোধ্যার মাথায় চুল পাকাইতে পাকাইতে খুকী বলিল, "না তুই বুড়ো নস্! আমি যেন আর কিছু জানিনে! সেদিন দিদি, মা, সবাই বলছিল।"

"কি বলছিল?"

"বলছিল অযুধা ড্যাকরার বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বলে কিনা বিয়ে করব। ওকে কেউ বিয়ে করলে ত ও বিয়ে করবে।"

অযোধ্যা বলিল, "আরে দেখিস দেখিস, যখন সাদি হবে তখন সবাই কি বলে দেখিস।"

খুকী বলিল, "অযুধা, তুই কেন সাদি করবি ভাই?"

"নইলে হামায় কে ভাত রেঁধে দেবে দিদি?"

এই উত্তরে অযোধ্যার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস লুক্কায়িত ছিল। সে তিনবার কর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশে গিয়াছিল, পুনরায় যখনি হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল—আসিয়া বলিয়াছিল হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয় মা, তাই চলে এলাম।' বাল্যকালে অযোধ্যার একবার বিবাহ হইয়াছিল। অযোধ্যা যখন অখিলবাবুর কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হয়—তখন তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল। এখন সে বহু বৎসর ধরিয়া বিপত্নীক।

খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি এবার বিয়ে করবি অযুধা?"

"সত্যি না ত কি ঝুট্ বলছি?"

"ক' হাজার টাকা পাবি?"

অযোধ্যা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "টাকা মিলবে কি আউর দেনে পড়ি রাক্কুসি! এ কি বাঙ্গালীর সাদি?"

"গহনাও দিতে হবে?"

"গহনাভি দেনে পড়ি না ত কি। বহুৎ রুপিয়া খরচ রে দিদি—বহুৎ রুপিয়া খরচ।" বলিয়া অযোধ্যা পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুকী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আগ্রহের স্বরে বলিল, "অযুধা তোর বউকে আমি একটা গহনা দেবো।"

অযোধ্যা হাই তুলিয়া বলিল, "কি গহনা দিবি ভাই?"

খুকী বলিল, "কেন? আমার পুরানো বালা রয়েছে সাড়ে তিন ভরিব সে ত আর আমার হাতে হয় না, সেই বালা তোর বউয়ের জন্যে দেবো এখন নিয়ে যাস।"

অযোধ্যা হাসিল। বলিল, "আগে কনিয়া ঠিক হোক—তখন বালা দিস, তাবিজ দিস, মল দিস—সব দিস।"

খুকী বলিল, "না তুই বালাজোড়াটি আমার নিয়ে যা।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খুকী উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালা দুইটি আনিয়া বলিল, "রেখে দে এই বেলা। মা উঠলে জানতে পারলে হয়ত দিতে দেবে না।"

অযোধ্যা বলিল, "বালা কোথা থেকে নিয়ে এলি রাক্কুসি?"

"কেন, বালা কোথায় থাকে আমি জানিনে বুঝি?"

"যা যা বালা যেখানে ছিল রেখে আয়।"—বলিয়া অযোধ্যা হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল।

খুকী বালা দুইটি বাজাইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে লাগিল। অযোধ্যা বলিল, "যা রেখে আয় বলছি, হারিয়ে ফেলবি ত মুস্কিল হবে।"

খুকী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। অযোধ্যা শেষবার একবাব নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল।

॥ ৩ ॥

খুকী তাহার মার ঘরে গিয়া দেখিল, মা তখনও নিদ্রিত। পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহাব রাশিকৃত চুল মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকী তাহার পর পূজার ঘরে গিয়া কোশা হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিল—"আঃ।" ঘরের কোণে বিড়ালটা বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। খুকী পূজার ফুল এক মুঠা লইয়া আস্তে আস্তে বিড়ালটার কাছে গিয়া 'নমো নমো' তাহার মাথায় একটি একটি করিয়া ফুল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিড়াল মস্তকে শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। কাতরসূচক একটি মেও শব্দ করিয়া পলাইয়া গেল।

পূজা ভঙ্গ হইল দেখিয়া ভক্ত খুকী বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ ধাবিত হইল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, কবাটে শিকল দেওয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা টুল বুকে করিয়া আনিয়া, দুয়ারের কাছে রাখিল। টুলের উপর উঠিয়া শিকল টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তখন নামিয়া ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক টুকরো কয়লা কুড়াইয়া পাইবামাত্র, তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। কয়লাটি লইয়া খুকী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের স্থানে অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই— বেশ শুকাইয়া ছিল। সেই শুষ্ক স্থানে কয়লাটি দিয়া খুকী কয়েকটা ঘর আঁকিল এবং প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া 'ক' লিখিয়া দিল। তাহার পর টব হইতে ঘটি করিয়া জল লইয়া, ধীরে ধীরে স্বরচিত চিত্রের উপর ঢালিতে লাগিল। অন্ততঃ বিশ ঘটি জল ঢালিবার পর নিরস্ত হইল। একটু শীতও করিতে লাগিল। তখন খুকী বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। গিয়া দেখিল অযোধ্যা দিব্য নাসিকাধ্বনি করিতেছে।

খুকী আস্তে আস্তে অযোধ্যার বিছানায় বসিল। তাহার কোমরে একটি চাবি বাঁধা ছিল,

সাবধানে সেটি খুলিয়া লইল। অযোধ্যার দেবদারু কাঠের বাক্সটি কোথায় থাকিত তাহা খুকী জানিত। বাক্সটি খুলিয়া বালা দুইটি আস্তে আস্তে সব জিনিসের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে সে বাক্স টিনে বাঁধানো—পৃষ্ঠদেশে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত একখানি আর্সি ও একটি কাঠের চিরুণী ছিল। খুকী নিজের চুলটা একটু আঁচড়াইয়া লইল। শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটা আবার পূর্ব্বমত অযোধ্যার কোমরে বাঁধিয়া রাখিল।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে সকাল সকাল আহার করিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া বাবুকে প্রণাম করিয়া, দাদাবাবু ও খুকীর নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিল। খুকী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—গৃহিণীও বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিলেন।

অযোধ্যার গ্রাম মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পথ। মুঙ্গের হইতে একখানি গোরুর গাড়ী করিয়া অযোধ্যা বাড়ী গেল।

এই মুঙ্গেরে সে প্রথম অখিলবাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। সে কি আজিকার কথা? অখিলবাবু তখন নূতন আইন পাস করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরে তাঁহার উত্তমরূপে পশার জমিলে তিনি হাইকোর্টে আসিলেন। যাত্রার দিন এই মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী চড়িবার গোলমালে অখিলবাবুর পুত্র সতীশ হারাইয়া যায়। কেল্লার ফটকের নিকট অশ্বত্থ গাছের নিম্নে দাঁড়াইয়া সতীশ কাঁদিতেছিল অযোধ্যাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। বাবু খুশি হইয়া তাহাকে নিজের নূতন বিলাতী জুতাজোড়াটা বখশিশ দিয়াছিলেন। সে সকল কথা মনে পড়িল। তাহার পর সেই সতীশ কলিকাতায় জ্বরবিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমানে রাত্রি জাগিয়া একুশ দিন অযোধ্যা সতীশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। শব দাহ করিয়া আসিয়া অখিলবাবু অযোধ্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—অযুধা—একবার তুই আমার হারা ছেলে খুঁজে দিয়েছিলি—এবার খুঁজে নিয়ে আয়।—সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অষ্টাদশ বৎসর যাহাদের সহিত কাটিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধন এবার চিরদিনের তরে ছিন্ন হইল। অযোধ্যার গাড়ী অনেক দূর অবধি গঙ্গার ধার দিয়া গেল। পথ যখন বাঁকিল, গঙ্গা দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলেন—তখন অযোধ্যা জোড়হস্তে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনের একটা কামনা নিবেদন করিল।

বাড়ী হইতে অনেক মাস অযোধ্যা কোনও পত্রাদি পায় নাই। বাড়ীতে তার এক বৃদ্ধ চাচী ছিল, আর কেহ ছিল না। এতদিন সে চাচী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াই গিয়াছে, মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগৃহে সন্ধান করিতে গেল। শুনিল তাহার চাচী ছয়মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। পাড়ার বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ করিয়া, অযোধ্যা মাহাতো, মোকাম কলকত্তা এই ঠিকানা দিয়া, দামড়িলালের দ্বারা তাহাকে (বেয়ারিং) পত্রও লেখাইয়াছিল—কিন্তু সে পত্র মাস দুই পরে ফিরিয়া আসে এবং বেচারা দামড়িলালের এক আনা পয়সা জরিমানা দিতে হয়। অযোধ্যাকে তাহারা পরামর্শ দিল, দামড়িলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যা যেন তাহার এক আনা পয়সার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

চাবি লইয়া অযোধ্যা বাড়ী আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানাজাতীয় আগাছা জন্মিয়াছে। ঘর খুলিল—বহুকাল বন্ধ থাকায় ঘরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হইয়া গিয়াছে। খাটিয়ার একটা পায়ার আধখানা উইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। গোটাকতক ইন্দুর ও আরশুলা হঠাৎ আলো দেখিয়া খড়্‌খড় শব্দে পলাইয়া গেল।

অযোধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চাবি আবার বন্ধ করিয়া, একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে

আশ্রয় লইল। কর্ম্ম গিয়াছে, এ কথা তাহাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিল না;—বলিল ছুটি লইয়া আসিয়াছি।

তাহারা অযোধ্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া তামাক দিল। সে তামাক দুই টান টানিয়াই খকখক করিয়া কাসিয়া অযোধ্যা হুঁকা নামাইয়া রাখিল। বাবুর বাড়ী অম্বুরী তামাক খাইয়া খাইয়া তাহার পরকাল গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অযোধ্যা মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার করাইল। লোকে বলিল, অযোধ্যা চাকরি করিয়া আমীর হইয়া আসিয়াছে, নহিলে, যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরা মজুরী করিয়া দেহপাত করিয়াছিল, সে কখনও দিনে দুই আনা হিসাবে মজুর নিযুক্ত করে!

নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া অযোধ্যা অন্নপাক কবিল। আহারান্তে ঘবে প্রবেশ কবিয়া, রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালাইল। সে ম্লান আলোক দেখিয়া, কেবলই তাহাব প্রভুগৃহের বিদ্যুৎ-আলোক মনে পড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল—মাস কাটিল। লোকে ক্রমাগত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কতদিনের ছুটি, আবার কবে কলিকাতা যাইতে হইবে? সে বলে, এই যাইব এবাব দিনকতক পরে। অযোধ্যা একাকী থাকে—কাহারও সঙ্গে মেশে না। তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রতিবেশীগণকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়। তাহাদেব সহিত হাস্যামোদ করিতে অযোধ্যাব প্রবৃত্তিই হয় না। সে নিজের ঘরে নীরবে বসিয়া থাকে—আর কেবল ভাবে। অখিলবাবুর ছেলেমেয়েগুলিকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছিল—তাহাব মনটি অষ্ট প্রহব কলিকাতাব সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে দুই মাস কাটিলে অযোধ্যা স্থির করিল—দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখিযা সকলের সংবাদ আনাইতে হইবে। ইংরাজিতে চিঠি লেখাইতে হইবে। গ্রামে কেহ ইংরাজি জানিত না। এ অঞ্চলে ইংরাজি জানিত কেবল খড়গপুবের পোষ্টমাষ্টাব। গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে খড়গপুবে গিয়া, পোষ্টমাষ্টাবকে উহা উপঢৌকন দিয়া, অযোধ্যা কলিকাতায় চিঠি লেখাইয়া আসিল।

সপ্তাহ পরে দাদাবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। যে পেয়াদা এ চিঠি আনিয়া অযোধ্যাকে দিল, অযোধ্যা তাহাকে মাচা হইতে একটা বিলাতী কুমড়া পাড়িয়া বখশিস্ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পাগড়ী বাঁধিয়া খড়গপুরে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা চিঠি পড়াইল।

দাদাবাবু তাহার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে খুশী হইয়াছেন। ৫ই বৈশাখ খুকীর বিবাহ। অযোধ্যার জন্য খুকীর ভারি মন কেমন করে।

চক্ষের জল মুছিয়া অযোধ্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল, দশটা টাকা মণিঅর্ডার করিয়া সে দাদাবাবুকে পাঠাইবে—দাদাবাবু যেন অযোধ্যার হইয়া খুকীর বিবাহে তাহাকে একখানি রঙীন-শাড়ী কিনিয়া দেন।

টাকা বাহির করিবার জন্য অযোধ্যা বাক্স খুলিল। এ বাক্স সে বাড়ী আসিয়া অবধি একদিনও খুলে নাই। বাক্স খুলিয়া দেখিল, সোনার বালা!

দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক হইয়া গেল। চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, তাহাতে খুকীর দুইগাছি লম্বা চুল লাগিয়া রহিয়াছে। তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না। পরদিন সে ঘরেদুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত মহাজন ছিল। তাহার আড়তে গিয়া অযোধ্যা কয়েকদিবস রহিল। কিছু সোনা কিনিয়া, খুকীর বালাজোড়াটি ভাঙ্গিয়া ভাল করিয়া বড় করিয়া গড়াইয়া লইল।

নিজের জন্যও বস্ত্রাদি খরিদ করিল। একখানি ধুতি হরিদ্রায় রঞ্জিত করিল। গোলাপী রঙের একটি পাগড়ী তৈয়ারী করিল। উৎসব-বেশ পরিধান করিয়া পাতলা নীল কাগজে মুড়িয়া বালা দু'গাছি লইয়া, অযোধ্যা ৫ই বৈশাখ অপরাহ্ন সময়ে অখিলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর সকলেই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। খুকী বালা পরিয়া আমোদে আটখানা। অখিলবাবু আসিয়া বলিলেন, "অযুধা ত্ৃ ই আমার চিঠি পেয়েছিস!"

অযোধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "দাদাবাবুর চি ঠি?"

"দাদাবাবুর কেন? আমার চিঠি। খুকীর বিয়ে ত আমি তোকে এক সপ্তাহ হল নেমন্তন্ন করে রেজেষ্টারি চিঠি লিখেছি—গাড়ীভাড়ার জন্যে দশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়েছি—তুই পাসনি?"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি দেশে ছিল নাকি? ও এই কলকাতায় ছিল, খুকীর জন্যে বালা গড়াচ্ছিল।"

বালার কথা শুনিয়া বাবু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুই গরীব মানুষ খেতে পাসনে, অত টাকা খরচ করতে গেলি কেন? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোর?"

অযোধ্যা তখন হাসিয়া হাসিয়া বালাব ইতিহাস বলিল।

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! তাই বলি খুকীর পুরাণো বালাজোড়াটা গেল কোথা? আলমারিতেই রেখেছিলাম, না সিন্দুকেই ছিল ঠিক করতে পারিনে।"

অখিলবাবু বলিলেন, "তা বেশ। খুকীরই জিৎ।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান কবিলেন।

অযোধ্যা নিজের রঙীন পাগড়িটি খুলিয়া সন্তর্পণে উঠাইয়া রাখিয়া বিবাহ বাড়ীর কার্য্যে মাতিয়া গেল।

প্রতিজ্ঞা-পূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবতোষ কলেজে ইংরাজি পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। ইংরাজি বিদ্যাব প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল ইহাই তাহাব মত। দেশে আর্য্যভাব ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, সে কালের সে শুভদিন ভারতে ফিরিবাব আব উপায় থাকিতেছে না, এই বলিয়া ভবতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করিত। আত্মীয়-স্বজনের তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি পড়িতে হয়, নহিলে তাহার ইচ্ছা নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীতে গিয়া কোনও টোলে প্রবেশ করে। যাহা হউক, ইংরাজি পড়া স্বত্তেও ভবতোষ যেরূপ নিজের আচার ব্যবহার ও চিন্তাপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আজিকালিকার দিনে সেরূপ দেখা যায় না।

ভবতোষ কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, হঠাৎ একদিন পূজার ছুটি হইল। ভবতোষ বাড়ীর জন্য নূতন বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া, বাক্স পুঁটুলি বাঁধিয়া, গৃহযাত্রা করিল। তাহাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে।

পূজা হইয়া গেল, পূর্ণিমা আসিল, সেদিন ভোরে ভবতোষের বিধবা মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। ঘাটে বহুসংখ্যক পুরস্ত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্নানান্তে ঘাটে উঠিছিলেন, এমন সময় ভবতোষের মাতা দেখিলেন, তাঁহার একটি বাল্যসখী—উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

"কি দিদি, ভাল আছ ত?"—বলিয়া উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ভবতোষের মাতার কাছে আসিলেন। দুই সখীতে কুশল প্রশ্নাদির পর, উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ভবতোষ বাড়ী এসেছে?"

"এসেছে। তার ছুটিও ফুরিয়ে এল—আবার কলকাতায় আসবে গিয়ে।"

উপেন্দ্রবাবুর একটি সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা আছে, তাহার নাম পুলিনা। মেয়েটি অবিবাহিতা। উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "দেখ দিদি, আমার পুলিনার সঙ্গে তোমার ভবতোষের যদি বিয়ে দাও, তা হলে বেশ হয়।"

ভবতোষের মা বলিলেন, "আমারও তাই ত অনেক দিন থেকে ইচ্ছে বোন—ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না, কি করি, কত সম্বন্ধ এসে ফিরে ফিরে গেল।"

"আচ্ছা, একবার বলে দেখ না। তোমার বড় ছেলেটি, একটি বউ আসবে, তোমার কত আহ্লাদ হবে, কেন বিয়ে করে না?"

ভবতোষের মা বলিলেন, আচ্ছা বলিয়া দেখিবেন। ছেলে যদি রাজি হয়, তাহা হইলে এমন কি অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইতে পারে।

মা যখন গৃহে ফিরিলেন, ভবতোষ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া, বঙ্গবাসীর উপহার পরাশর-সংহিতির একখানি তর্জ্জমা মন দিয়া পাঠ করিতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা বাড়ীর ভিতর এস, একটা কথা আছে।"

ভবতোষ বহি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাতার অনুগমন করিল।

নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মা পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এইবার একটা বিয়ে থাওয়া করে ফেল। তুমি আমার বড় ছেলে, বউয়ের মুখ দেখব আমার কতদিনের সাধ, সে সাধ পূর্ণ কর।"

বলিয়াছি, পূর্ব্বে ভবতোষ বিবাহ করিতে অত্যন্ত অসম্মত ছিল। পাঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয়—কিম্বা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়—এরূপ কোনও বিলাতী আপত্তি ভবতোষের ছিল না। তাহার আপত্তিটা অন্যরূপ এবং শাস্ত্রসঙ্গতও বটে। সে শুনিয়াছে (এবং সংবাদপত্রেও পাঠ করিয়াছে) যে আজিকালকার নব্যস্ত্রীবা আর যথার্থ হিন্দু গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপ আবির্ভূতা হন না। তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী ও "বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে স্বামীদিগকে ভক্তিটক্তি আর করেন না, পরন্তু স্বামীর সহিত সখ্য ব্যবহার করিতে উদ্যত। আরও নানা প্রকার অভিযোগ সে শুনিযাছে।

কিন্তু বিধবা মাতার একান্ত অনুরোধ—বেচারি কি করে? মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিবার পাপও সে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অল্পদিন হইতে স্থির করিয়াছে, মা এবার অনুরোধ করিলেই বিবাহ করিবে, কিন্তু সে নিজের আদর্শানুযায়ী একটি মেয়ে বিবাহ করিবে।

এখন, এ সম্বন্ধে ভবতোষের স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত অনেকগুলি মতাদি ছিল, তাহা তাহার বাসার সহপাঠীরা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে। রাত্রে আহারের পর ছাদের উপর যখন বাসার ছেলেদের একটি দণ্ডায়মানসভা সমবেত হইত, যখন অনেকগুলি সিগারেটাগ্র যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন অনেক সময় এই বিষয়ের আলোচনা হইত। তর্কস্থলে ভবতোষ কতবার বলিয়াছে—"যদি আমি কখনও বিয়ে করি, যদি করি তবে একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব। কারণ সুন্দর মেয়ে প্রায়ই দেমাকে হয়। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, স্বামীকে গুরুজ্ঞান করে না, সহধর্ম্মিনী না হয়ে সহবিলাসিনী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, তারা অত্যন্ত বাবু হয়। একটু রূপ আছে বলে সে রূপকে ভাল করে সাজিয়ে প্রকাশ করবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। সাবান চাই, সুগন্ধি চাই, পাউডার চাই, ভাল ভাল শাড়ী চাই, সেমিজ চাই, চাই,—স্বামী বেচারীর প্রাণও ওষ্ঠাগত।—দ্বিতীয়তঃ লেখাপড়া জানা মেয়েও বিয়ে করব না। তারা খালি নভেল পড়ে (কেউ কেউ নভেল

লেখেও) আর তাস খেলে, স্বামীকে কবিতা করে চিঠি লিখতেই দিন যায়, গৃহকার্য্য হয় না, ব্রত নিয়মাদির ত সময়ই নেই— ছেলে মাটিতে পড়ে কাঁদে।'—ইত্যাদি।

এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া ছেলেরা কেহ কেহ বলিত, "আচ্ছা ভবতোষবাবু, কার্য্যকালে কি করেন দেখা যাবে। ও রকম বলে অনেকে। বলায় করায় ঢের তফাৎ।"

এই সন্দেহবাদে ভবতোষ আগুন হইয়া বলিত, "আচ্ছা দেখবেন মশায়, দেখে নেবেন। আমার যে কথা সেই কাজ।'

মা যখন বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন ভবতোষ সম্মত হইল। বলিল, "আচ্ছা মা, আমি বিয়ে করব, কিন্তু নিজে দেখেশুনে বিয়ে করতে চাই।'

শুনিয়া মা অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন, "দেখেশুনে বিয়ে করতে চাও? তা বেশ ত। একটি খাসা সুন্দর মেয়ে আছে, তেরো বছরের।"

ভবতোষ শুনিয়া চমকিয়া বলিল, "খুব সুন্দর নাকি?"

মা সোৎসাহে বলিলেন—"খুব সুন্দর। মুখখানি যেন একবারে প্রতিমের মত। যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি কপালের ভুরু। রঙটি যেন একেবারে গোলাপফুলের মত।"

ভবতোষ ধীরে ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিল, "সে ত আমি বিয়ে করব না মা।"

মা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

"সুন্দর মেয়ে আমি বিয়ে করব না।"

"তবে কি রকম মেয়ে বিয়ে করবি?"

"আমি একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব।"—ভবতোষের স্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

মা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন, "পাগল ছেলে! সকলেই ত সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়। লোকে পায় না।"

"সকলে করুক, আমি একটু অন্য রকম করব।"—বলিতে বলিতে ভবতোষের মুখমণ্ডল আত্মগৌরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি সকলের মধ্যে একজন? সে কি সকলের মত বিলাসের জন্য বিবাহ করিতেছে?"

মাকে একটু দুঃখিত দেখিয়া ভবতোষ সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী মেয়ে যে আদর্শ হিন্দু-গৃহলক্ষ্মী কেন হইতে পারে না, তাহা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। শেষে বলিল—তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির—অটল—অচল।

সেদিন আর জননী অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। ভবতোষেরও ছুটি ফুরাইল, সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন পাল্কী করিয়া উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভবতোষের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

প্রথম অভ্যর্থনার কুশলপ্রশ্নাদির পর উপেনবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, ভবতোষ রাজি হল?"

ভবতোষের মাতা বলিলেন, "বিয়ে করতে ত রাজি হয়েছে—কিন্তু তার আবার এক আজগুবি মত।" "কি রকম?"

"প্রথমে বলল আমি দেখেশুনে বিয়ে করব। আমি বললাম তা বেশ ত, একটি খাসা সুন্দরী মেয়ে আছে, দেখে এস। সে বলে, আমি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব না, একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করতে চাই।"

উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এমন অনাসৃষ্টি আবদারও ত কখন শুনিনি। এ রকম ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ, তুমি এক কাজ কর দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই

শনিবারে আসতে লেখ। লেখ যে, তোমার যে রকম মেয়ে বিয়ে করার মত, সেই রকম মেয়ে স্থির করেছি, তাকে দেখবে এস। তারপর এলে, রবিবার দিন বিকেলে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। আমি সব ঠিক করে নেব।"

ভবতোষের মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, হয়ত উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আর বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য্য নয়, কারণ মেয়েটি খুবই সুন্দরী বটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবতোষ শনিবার বাটী আসিল। পরদিন বৈকালে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া, চুল উস্কোখুস্কো করিয়া (কারণ সেকালে মুনি ঋষিরা চুল আঁচড়াইতেন না) গ্রামান্তবে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গিয়া শুনিল সেদিন উপেন্দ্রবাবু বাড়ী নাই, কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। একটি যুবক মহা সমাদরে তাহাকে নামাইয়া লইল এবং বৈঠকখানায় বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্রবাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষের মুখের পানে চাহিয়া একটু ফিক করিয়া হাসিয়া গেল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল, চাকর-বাকব সকলেই যেন হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপে সাজানো। মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্প দূবে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময়ে বাহিবে মলেব ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসনখানিতে বসিয়া, ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে বেগুনে রঙের আসনখানিতে বসিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

মেয়েটির রঙটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট কোটরান্তগর্ত। সে দুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখেব দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, রূপ সম্বন্ধে মেয়েটি তাহাব আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল—"অ্যাঁ?"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষে কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "জগদম্বা নয়—আমার নাম পুলিনা।"

যুবকটি বলিল, "আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা, এখন বদ্‌লে পুলিন রাখা হয়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল, পরিবর্ত্তনটা ভাল হয় নাই। পুলিনা—গা জ্বলিয়া যায়। তাহার অপেক্ষা জগদম্বা ঢের ভাল—পৌরাণিক নাম, ঠাকুর দেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বহাল রাখিবে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পড়?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া বলিল, "অ্যাঁ?"

"তুমি কি পড়?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে—"

ঝি ও সেই যুবক তাহার প্রতি সরোষ কটাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয়া গেল।

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দুগৃহিণী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। সেই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল, "আচ্ছা তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকশিত করিয়া পূর্ববৎ বলিল—"অ্যাঁ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ ক্রমে শেষ হইল। এই সময় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, রূপার ডিবায় ভরিয়া পান লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, একখানা দেশী কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারিগাছি মল। হাতে গিনি সোণার টুকটুকে দুইগাছি বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের টিপ।

পান রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর, যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? আমার সকল আদর্শ, সকল সঙ্কল্প, অতল জলে ডুবিয়া যাইত। বিলাস-বিভ্রমে মজিয়া হয়ত, আমি যে আমি, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জীবনের জন্য বিবাহ করিতেছি না—আমি ধর্ম্মের জন্য, সংযমের জন্য, আদর্শ হিন্দুগার্হস্থ্যজীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি। প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল।

ঝি আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বাড়ীর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে?"

ভবতোষ সগর্ব্বে বলিল—"হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্নের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসীতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে সকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিতই দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে কালো মেয়েও অনেক আছে—কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিতে পাইল না।

গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মন আত্মজয়ের উৎসাহে ভরপুর। তথাপি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে এত কুৎসিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক পছন্দ হইয়াছে যখন বলিয়া আসিয়াছে তখন সে আলোচনায় ফল কি?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ী পৌঁছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, মেয়ে পছন্দ হল?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তাহলে?"

"আচ্ছা।"—বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন, ছেলের মন যেন ভার ভার। ভাবিলেন, সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না বলিয়া অনেক লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার করিল না। বলিল, উহাদের বাড়ী অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত উৎসাহে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিত না হইয়া, শ্যামবর্ণের উপর মুখচোখগুলা একটু মানানসই হইত তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেনে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে; দুই দিন পূর্ব্বে ভবতোষ যেন বাড়ী আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি যেন মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজ কক্ষ মধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষবাবু, খবর কি?"—বলিতে বলিতে রজনীবাবু, শরৎবাবু, রাখালবাবু, সতীশবাবু, কুমুদবাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ী যাইবার সময় ইঁহাদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল। "খবর কি ভবতোষবাবু?"

ভবতোষ একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "খবর ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতির সমস্ত খবর জানিয়া লইল। শরৎবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটির নাম কি?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলেরই মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেনবাবু আত্মসংযম হারাইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন—"হা—হা—হা—জগদম্বা—হি—হি—হি—বেশ নামটি ত!"

শরৎবাবু বলিলেন, "নৃপেনবাবু, এটা এমনই কি হাসির কথা? হাসছেন কেন?"

নৃপেনবাবু বলিলেন, "না, হাসিনি। হি—হি—হি—হাসব কেন? হা—হা—!"

রজনীবাবু বলিলেন, "না, নামটি মন্দ কি? পৌরাণিক নাম। তোমাদের আজকালকার জ্যোৎস্নাময়ী, সরসীবালা, তড়িল্লতা, মণিমালিনী—এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব উত্তেজনা আজি যেন আর নাই।

বিবাহের আর নয়দিন বাকী আছে। এই নয় দিন যে ভবতোষের কি অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে, ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায়, কিন্তু লেক্‌চার কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্য বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্নব্যঞ্জন অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে হাস্যালাপ করে না, সদাই অন্যমনস্ক থাকে। বাসার লোক তাহাকে বলিতে লাগিল, "ভবতোষবাবু, প্রেম-ব্যাধির সমস্ত লক্ষণগুলিই ক্রমে আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে। অতিকষ্টে যখন নিদ্রা আসে, তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন

দেখিল, জগদম্বা যেন কালীমূর্ত্তি ধারণ কবিয়াছে। তাহাব অল্প পরিমাণ রসনা ভবতোব যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাখা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষের মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন একটা কণ্টকময় জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙেব বোম্বাই শাড়ী; তাহার মুণ্ডেব স্থানে যেন জগদম্বাব মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সেদিন, অসুস্থতাব ভাণ করিয়া সে কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা কি বলিবে? তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ সে কেমন কবিয়া সহ্য করিবে?

সেদিন রাত্রে শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিমে পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইমটেবল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবাব তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কি এত কাণ্ড কাবখানার পর সে ভীরু নাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূবণ কবিবেই তাহাব পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ী গেল। যথাসময়ে সে বিবাহমণ্ডপেও উপস্থিত হইল। সেখানকাব লোকসমাগম, আলোক ও কোলাহলে, আজ দশদিন পবে তাহার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আবম্ভ হইল। তখন ভবতোষের চিত্ত নির্ব্বিকার। তখন তাহাব মনে ভয় বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টিব জন্য বব ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহা, তাহাব দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন জগদম্বা নহে। এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি যে রূপাব ডিবায় পান রাখিয়া গিয়াছিল।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নববধূকে কথা কহাইবাব জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সেও আপনার আত্মীয়স্বজনেব অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ কবিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল—"তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরী করলেন কেন?"

পুলিনা তখন বলিল, "আমি সুন্দর বলে, তুমি নাকি আমায় বিয়ে কবতে চাওনি? কেমন জব্দ!"

ভবতোষ এ পর্য্যন্ত এ প্রহেলিকাব মীমাংসা কবিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "যাকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি কে?"

"সে, পাড়ার কলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ!"

ক্রমে এমন দিনও আসিল, যখন ভবতোষ ডাক আসিবাব পূর্ব্বে বাসাব দবজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিয়নের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে লাগিল। [ভাদ্র, ১৩১১]

খুড়া মহাশয়

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকটে চন্দ্রদেবপুর। ইঁহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। কেহ বলে ইহা বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা; কিন্তু কেহই সে টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে টাকা যে লোহার সিন্দুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্দুকটিমাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়নকক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই সেই ঘরে থাকিয়া সিন্দুকটি আগলাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্দুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তারবাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল। ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশাই। খবর কি?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু? এস, খবর ভাল। এখনও বেহুঁশ রয়েছেন—বড্ড জ্বরটা রয়েছে কিনা। কিন্তু নাড়ী বেশ চলছে এখনও! উঠে এস—একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। পিল্‌সুজের উপর একটি মাটির প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ রোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া দিল। গগন চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—থার্ম্মমিটার দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরীক্ষান্তে বলিলেন, "এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার্ মিক্‌চারটা খাওয়ান হচ্চে?"

সাবিত্রী ঘোমটাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "আজ সারাদিন ওটা দেওয়া হোক। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবুকে খবর দিয়েছেন?"

"না, দিইনি। কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হয়ে উঠবেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচপত্র করে বাড়ী আসবে—তাই খবর দিইনি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না কিন্তু। আজ পাঁচ-পাঁচ দিন জ্বরটা ছাড়ল না—ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়বার সময় সামলাতে পারলে হয়!"

গগন বলিলেন, "আরে না না। আমি এতকাল দেখেছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক। অনেক বয়সটা হয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল—ভোরবেলায় প্রাণপাখী বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া

গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই এক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, "নবু—নবু এসেছে?"

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইটি একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

সকলেই বলিল, "তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল—তোমাদের সব রেখে গেছেন—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাকলেই ভাল হত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে একটি যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন, "তুমি বাবা গিয়ে, নবুকে একখানি টেলিগ্রাম করে দাও, আমার আর হাত-পা সরছে না।"

সত্যচরণ বলিল, 'আচ্ছা, আমি আপিস যাবার সময় ষ্টেশন থেকে টেলিগ্রাম করে দেবো এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেনে আপিস যায়।

॥ ২ ॥

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রি হইল—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নেই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন। শোকটা যেন ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি? ইহা শোক না আতঙ্ক?—দুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়—তাহার মনে হয়, এইবার ত আমার পালা আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে নিজের ঘরের খিলটি খুলিয়া নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার—তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে—সে ঘরটি আজ তালাবন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার বুকটা দুর্‌দুর্‌ করিয়া উঠিল। হায় মাত্রস্নেহ!—এতরাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন।

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া দিয়া, একটি দিয়াশলাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্দুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্দুকটির উপর হইতে একটি ভাঙ্গা কাঠের হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহাভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামাইয়া সিন্দুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহা নামাইবার পর, নীচের দিক হইতে পুরাতন লাল চেলী বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়াবন্দী অনেক নোট রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র, সেই ক্ষীণালোকে সেই মৃত্যুকক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্তপংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে অন্য পুঁটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া গগনচন্দ্র সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাঙ্গা বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া রাখিয়া, প্রদীপ নিভাইয়া দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশমার খোলটি ছিল। চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোটের তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশ টাকার নোট—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোটগুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন;—একশতখানি আছে—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন—প্রত্যেকটিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশ হাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না—গগনচন্দ্র নোটগুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি নিজের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিভাইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন।

দুই একটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটি হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া আমবাগানেব ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীবে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচন্দ্র, দাদার লোহার সিন্দুকের চাবিটি ছুঁড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ কবিলেন। তাহার পর হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

।। ৩ ।।

এই দিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সদ্যপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পৌঁছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া, কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমার বাড়ী পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনেব ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীবা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদ না বাবা, চুপ কর। বাপ মা কি আর কারু চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়োমশায রয়েছেন, ইনিই এখন তোমার বাপ হলেন। চুপ কর বাবা।"

প্রতিবেশীরা গৃহ ত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা—গগন চক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটা কি হয়ে গেছে, দেখেছ, একদিনে? চোখ-টোক সব একেবারে বসে গেছে।"

একজন বলিল, "আহা, ভাইয়ের শোকটা বড্ড লেগেছে বামুনের।"—চক্ষু বসার আসল কারণ যে সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য, তাহা কেহই অনুমান কবিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়ামহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল।

ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। খুড়ামহাশয় বলিলেন, "শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এই বেলা থেকে করতে হবে। টাকাকড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমাব বলিল, "টাকাকড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্দুক থেকে কিছু বেরুতে পাবে বোধ হয়।"

"তা দেখ—যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায় তা ত বলতে পারিনে। হয়ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী বলিল, "আমাকে ত দিয়ে যাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুম্‌সিতে ছিল দেখেছি। খুড়োমশায় হয়ত খুলে নিয়ে থাকবেন।"

"না—উনি ত বললেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "তাঁর কোমরে ছিল? তা ত লক্ষ্য করিনি। তবে হয়ত তাঁর চিতায় উঠেছে।"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল, "ওটা আপনি লক্ষ্য করলেন না?"

খুড়ামহাশয় হুঁকা নামাইয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিলেন, "আরে বাবা, সে সময় কি আমার চাবি সিন্দুক টাকাকড়ি ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা পাব।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। খুড়ামহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল, "তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্দুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্দুক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটি ত্রিশেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগতা জননীর খানকয়েক সোনা রূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারও বরাবর মনে ধারণা ছিল যে, তাহার পিতার সিন্দুকে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। তাহার মনে বিশ্বাস হইল, খুড়ামহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন অথচ তাহার সাক্ষিসাবুদ কিছুই নাই।

খোলা সিন্দুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় খুড়ামহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু পেলে?"

সিন্দুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দশ হাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কত টাকা?"

"দশ হাজার।"

খুড়া মহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, দশ হাজার টাকা? পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল, "কেন, সকলেই ত বলত এই সিন্দুকে তাঁর দশ হাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন দাদা ত সর্ব্বদাই বলতেন, তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকাকড়ি পাঠাতে মাঝে মাঝে, তাই খরচপত্র করতেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হ্যাঁ—দশ হাজার টাকা। দশ হাজার টাকা কি সোজা কথা রে বাবা?"

নবকুমার আর কি করিবে? নীরবে মনে সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই, তাহার ছুটি ফুরাইল—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল, পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে একটা বাসা ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

॥ ৪ ॥

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড় কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজারে ও বড়বাজারে ঘুরিয়া আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেটবুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেটবুক বাহির করিতে গিয়া দেখে, পকেটবুক নাই—গাঁটকাটায় কখন চুরি করিয়াছে জানিতে পারে নাই।

বিপদের উপর বিপদ! সেই পকেটবুকে তাহার রিটার্ণ টিকিটখানি পর্যন্ত ছিল, আড়াইশত টাকার নোট ছিল—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল।

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ পাঞ্জ

মেলে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল—এমন টাকা নাই যে নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া কোনও রকমে নবকুমার বাসায় রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই—বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "নবকুমারবাবু, দেখুন ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল। সেটা একটা খুব মঙ্গল বলতে হবে।"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, ব্যাপারটা কি?"

স্থূলকলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পাঞ্জাব মেল আসানসোলের নিকট পৌঁছিলে একটি মালগাড়ীর সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইয়া যায়। দুই তিনখানি যাত্রীগাড়ী চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিক রকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে নবকুমার চক্রবর্ত্তীর নামও পাওয়া গেল।

স্থূলবাবুটি বলিলেন, "কি রকম? আপনিও মরেছেন নাকি?"

নবকুমার বলিল, "বোধ হয় আমার নামের অন্য কেউ।"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নবকুমারের ভূত ন'ন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।"—বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথার উদয় হইল।—সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া আসানসোলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিশ আফিসে সন্ধান হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী বলে যে মরেছে—আপনারা তার নাম জানলেন কি করে?"

দারোগা বলিল, "তার পকেট থেকে এই পকেটবুকটি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেটবুক—তাহাতে তাহার নোট, চিঠি, রিটার্ণ টিকিট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল তাহাই—সেই গাঁটকাটাই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপে এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

"আমি নবকুমারের একজন বন্ধু।"

"লাসের কি হবে? অ্যাক্সিডেণ্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাসের আত্মীয়েরা একে কেউ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে নইলে আমরা পুঁতে ফেলব।"

নবকুমার একবার ভাবিল, পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাস জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল, "আর এ টাকা-কড়ি? লাসের ওয়ারিশান কে?"

"লাসের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে এসে টাকা নিয়ে যাবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানা নোট করিয়া লইল।

লাস জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থূলবাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল, "গিয়ে দেখলাম—আমি নই—আর একজন মরেছে বটে!"

বাবুটি বলিলেন, "তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল যদিও পল্লীগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যাকালে—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকেব শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আসানসোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট আনিয়াছিলেন, তাহাবই মধ্য হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ কবিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল—সম্প্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেই দিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি কবিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাব কিছুই দেখা যায় না। প্রায় বোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহাব উচিত? একপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে দেখা যায় না।

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পবিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছিলেন—"সংসার অনিত্য সকলই মায়া!' কেহ বলিতেছেন—'আহা নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল—আজকালকার দিনেও এ রকম প্রায় দেখা যায় না।'

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গলদঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কত্তা! কত্তা!" তাহার মুখে আর কোনও বাক্যনিঃসরণ হইল না—লোকটা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে চিনিবাস, অমন করলি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল, "রাম রাম রাম! ভূত গো কত্তা।"

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধ বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "দূর বেটা চাষা—ভূত কি? ভূত আছে নাকি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ভূত নাই? ঐ পুকুরধারে বাঁশতলায় দেখগা ঠাকুর।"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমস্তক শাদা-কাপড়ে ঢাকা একটা কি বেড়াইতেছে। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল—ঠিক নবকুমারের মত চেহারা—আর বলিল—ওঁরে চিনে—একবার খুঁড়োমঁশাইকে ডেঁকে দিঁতে পাঁরিস?'—তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে আছাড়িয়া ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়ামহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠিক দেখেছিস?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কত্তা? ওরে বাবারে, আর আমি সন্ধ্যাবেলায় বাসন মাজতে যাব না।"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-প্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশায়, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? বেটা অসাবধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে, তাই এসে ঐ কথাটা ওজর করছে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতবটা গোপনে দুরদুর্ করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পব, তিনচার দিন ধরিয়া, পাড়াব ভদ্রলোকেবা আসিয়া গগন চক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙ্গা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অন্য কোথাও নবকুমারকে দেখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহিব হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগন চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "শাস্ত্র ত মিথ্যে হবাব নয়। অপঘাতমৃত্যুটা হল কিনা—ও রকম ত হবাবই কথা। বছরটা পুরুক, গয়ায় গিবে প্রেতশিলায় একটা পিণ্ডি দিইয়ে দাও, উদ্ধাব হয়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় পুষ্করিণীর তীর হইতে মুখ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্রপরিহিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র সে বলিল, "খুঁড়োমঁশায়—সেঁ দঁশ হাঁজার টাঁকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বে, খুড়ামহাশয় সেইখানে গাড়ু আছাড়িয়া ফেলিয়া রাম রাম শব্দ করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা—সন্ধ্যার পব খুড়ামহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। বাত্রি নয়টাব সময় আহার করিয়া শয়ন কবিলেন। যখন তিনি গভীব নিদ্রায় মগ্ন—বাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়ামহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চমকিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন, "কে—ও?"

অন্ধকারেব মধ্য হইতে শব্দ হইল, "আঁমি নঁবকুমার।"

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমেব ঘোর চট্ কবিয়া ছাড়িয়া গেল।

ভূত বলিল, "সেঁ দঁশ হাঁজাব টাঁকা আঁমাব বঁউকে যঁতদিন নাঁ দিঁচ্চ, তঁতদিন রোঁজ আঁসব তাঁগাদা কঁরতে—রোঁজ আঁসব—রোঁজ আঁসব—রোঁজ আঁসব।" বলিয়া নবকুমার চুপ করিল।

খুড়ামহাশযের নিশ্বাস তখন ঘনঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাব দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন মেঝের উপর হইতে বরফ বাঁধা পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া, খোলা জানালার কাছে গিয়া একটি গরাদ সরাইয়া, বাহির হইল। বাহিরে কিয়দ্দূরে সত্যচবণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারই গৃহে লুক্কাইত নবকুমারকে সংবাদ দিল—খুড়ামহাশয় তাহার সহিত এক ট্রেণেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন—সাবিত্রীর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল, এ টাকা কোথা থেকে এল? গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বলত, তাঁর দশ হাজার টাকা আছে—তা দেখছি মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিন্দুক থেকে বেরোয়নি। কালকে রাত্রে হঠাৎ তাঁর পুরাণো টিনের বাক্স খুলে দেখি, এক টুকরো লাল-চেলীতে মোড়া দশ হাজার টাকার নোট। দেখে আমায় হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল আর কি। আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাকত! পিতৃধন!—যা হোক, বিধবাটার উপায় হল।'

ইঁহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া, খুড়ামহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল, সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ীতে আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিমে যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়ামহাশয় কি একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল। [আশ্বিন, ১৩১১]

গুরুজনের কথা

॥ ১ ॥

ডাক্তার চৌধুরী হুগলির সিভিল সার্জ্জন স্বরূপ বদলি হইয়া আসিবার মাস দুই পরেই শুনা গেল, কলেজের অধ্যাপক রজনীবাবুর সহিত তাঁহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন প্রভাতে এই দুইটি নবীন প্রণয়ী দুইখানি বাইসিক্রে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়।

প্রভা ও রজনী হুগলির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামেব ভিতর দিয়া চক্রচালনা করিয়া তত্তৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর মেয়েকে বাইসিক্রে দেখিয়া বৃদ্ধেরা মন্তব্য করিলেন ঠিক এতদিনে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে;—নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা পরামর্শ করিয়া, ঘটনাটির উপর বিলক্ষণ রঙ দিয়া—সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইল;—আর যুবতীরা ঘোমটার আড়াল হইতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, পরস্পরকে বলিতে লাগিল—ধন্যি মেয়ে বটে।'—কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যাদি প্রভা ও রজনীব কর্ণগোচব হইবার কোনই সুযোগ ছিল না;—তাহারা কেবল পবস্পরের বিরল সঙ্গসুখ উপভোগ কবিতেই ব্যস্ত রহিয়া গেল।

এইরূপ করিয়া আরও মাস দুই কাটিয়াছে। বিবাহেব দিনস্থির হইয়াছে ইংরাজি নববর্ষের দিন—১লা জানুয়ারী। ডাক্তার চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল বিবাহ হুগলিতেই সম্পন্ন হয়—কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছা তাহা নহে। তাঁহার ইচ্ছা কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ হয; নহিলে আমোদ উৎসবের সুযোগ পাওয়া যাইবে না। ডাক্তার চৌধুরী প্রথমে ক্ষীণভাবে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন—বলিলেন কলিকাতায় গেলে খরচপত্র বেশী হইয়া যাইবে ইত্যাদি। কিন্তু গৃহিণী সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। সর্ব্বত্র যাহা হয়—গৃহিণীর মতই বজায় রহিয়া গেল—কর্ত্তাকে পরাস্ত মানিতে হইল।

কলিকাতায় গিয়া বিবাহ হইবে শুনিয়া কিন্তু প্রভা ও রজনী একটি অভিনব পরামর্শ করিয়া বসিয়াছে। তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনই বিপজ্জনক। তাহারা পরামর্শ করিযাছে ঐ দিন প্রভাতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে রেলে কলিকাতায় না গিয়া—দুইজনে একাকী বাইসিক্রে যাত্রা করিবে। কিন্তু অভিভাবকেরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। প্রভা ও রজনীব উপস্থিতিকালে পারিবারিক সভায় এ বিষয়ের একদিন আলোচনা হইল। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রভার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন সকলে রজনীকে বলিল, "আচ্ছা প্রভা না হয় ছেলেমানুষ, তুমি কি বল?"

হায়, প্রেমটা এমনি জিনিস—তাহাতে পড়িলে কলেজের অধ্যাপকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়। রজনী একটু হাসিয়া বলিল, "আপনারা যে রকম বিপদ আশঙ্কা করছেন, তার কোনও কারণ নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে বরাবর ভাল রাস্তা আছে। শীতের সকালবেলা রোদ্দুরের প্রভাবে কোনও কষ্ট হবার ভয় নেই।"

প্রভার মা বলিলেন, "আচ্ছা কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই যেন, কিন্তু তোমরা কি ঠিক সময় পৌঁছুতে পারবে? কখখনো পারবে না। এখান থেকে দধিমঙ্গল করে বেরুতে হবে। কলকাতায় গিয়ে গায়ে-হলুদের বন্দোবস্ত। নটা দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছুতে পারবে? কখ্খনো পারবে না। ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

বলিয়া রাখি, যদিও ইঁহারা নব্যতন্ত্রের লোক তথাপি বিবাহের আপত্তিহীন সনাতন আচারগুলি রক্ষা করিতে সমুৎসুক। দধিমঙ্গলে শাঁখ বাজাইবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রভার দিদি নলিনী সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন।

রজনী বলিল, "কলিকাতা এখান থেকে চব্বিশ মাইল বই ত নয়—ন'টা দশটার অনেক আগে আমরা পৌঁছুতে পারব।"

নলিনী বলিলেন, 'গুরুজনের কথা না শোন কানে—শেষকালে অনুতাপ করতে হবে দেখো।"

ইহা শুনিয়া প্রভা তাহার দিদির উপর কট্মট্ করিয়া সরোষ নেত্রপাত করিল। তাহার চক্ষে যদি সম্প্রতি জলের পরিবর্তে অগ্নি থাকিত তবে দিদি অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ক্রমে সকলের মত হইয়া গেল। প্রভারও সজলচক্ষে আবার হাসি দেখা দিল।

।। ২ ।।

আজ নববর্ষ—আজ প্রভা ও রজনীর বিবাহ। ভোরবেলা চৌধুরী পরিবারের সকলে জাগিয়া উঠিয়াছেন। এখনি দধিমঙ্গল হইবে। প্রথমে অনেক আপত্তিসত্ত্বেও রজনীও আসিয়া এইখানে প্রভার সহিত দধিমঙ্গল খাইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

সমস্ত প্রস্তুত। রজনী আসিলেই হয়। ক্রমে বাহিরের অন্ধকার হইতে চক্রের শব্দ এবং ঘণ্টার ঠুংঠুং ধ্বনি আসিল।

মুহূর্ত পরেই রজনী আসিয়া প্রবেশ করিল। সে তাহার জিনিসপত্র ভৃত্যহস্তে রেলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

নলিনী পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আগে বরকনের দধিমঙ্গল আলাদা আলাদা হত।"

প্রভার মা বলিলেন, "তুই ত জিদ্ করে বেচারিকে আনালি। এখন আবার ঠাট্টা করছিস কেন?".

রজনী বলিল, "দেখুন ত একবার অন্যায়। উনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—আমার বিয়ের সময় আমাকে একলা দধিমঙ্গল খেতে হয়েছিল সে দুঃখ আমার এখনও মনে আছে। আমার ত দিদি ছিল না। প্রভাকে দিয়ে আমার সে সাধ পূর্ণ হোক। এখন এই কথা বলছেন।"

নলিনী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি বলেছি? কখন বললাম তোমায়?"

"আপনি বলেন নি?"

"কখনো না।"

"তা না হতে পারে। কিন্তু তখন আপনার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনার মনের ভিতর ঠিক ঐ রকম ভাবটাই জাগছে।"

সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নলিনী বলিলেন, "তোমার ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা। মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা বলতে পার নাকি?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, আমার মনে এখন কি হচ্ছে বল দেখি?"—বলিয়া নলিনী মুখখানি পরম গম্ভীর করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী গম্ভীরতর ভাবে, পকেট হইতে তাহার চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইল। পরে অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে, ঝুঁকিয়া, নলিনীর মুখখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ভয়ে কব, কি নির্ভয়ে কব?"

"ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।"

"আপনার মনে হচ্ছে, কতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছবেন—কতক্ষণ একটি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" নলিনীর স্বামী তখন কলকাতায় ছিলেন।

নলিনী বলিলেন, "ভুল। আমার মনে হচ্ছিল তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ।"

রজনী অত্যন্ত বিনয়ের ভান করিয়া বলিল, "আহা অযথা আমায় কেন বাড়িয়ে তোলেন? আমি ক্ষুদ্র-প্রাণী মাত্র।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। এইরূপ হাস্যামোদের মধ্যে দধিমঙ্গল সমাপ্ত হইল।

তখন ভোর পাঁচটা। ছয়টার সময় ট্রেন ছাড়িবে—সেই ট্রেনে সকলে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভার মা রজনীকে বলিলেন, "খুব সাবধানে যাবে তোমরা। পথে যেন কোনও বিপদ ঘটিও না বাছা। আর, খুব সকাল সকাল পৌঁছতে হবে। বেলা আটটার বেশী দেরি না হয়। কলকাতায় গিয়ে তবে গায়েহলুদ হবে। তোমাদের বাড়ী থেকে তেল আসবে, ক্ষীর আসবে, মাছ আসবে, তবে সেই তেল হলুদ মেখে প্রভা স্নান করবে—সেই ক্ষীর, মাছ প্রভা খাবে। আর, পথে যেন কিছু খেও না। গায়েহলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

নলিনী বলিলেন, "খালি তেল, হলুদ, ক্ষীর, মাছ আসবে কেন? তার সঙ্গে সঙ্গে রজনীও আসুক না।"

রজনী বলিল, "ফাউস্বরূপ নাকি?"

নলিনী বলিলেন, "না—বাহক হয়ে, বকশিস পাবে।"

হাস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও প্রভার মা জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিতেছেন, "খুব সাবধানে যাবে।" নলিনীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "গুরুজনের কথা না শুন কানে—।"

আর শুনা গেল না। গাড়ী ফটকের বাহিরে গিয়া পড়িল।

॥ ৩ ॥

ক্রমে আলো হইতে লাগিল। রজনীকে একাকী রাখিয়া প্রভা যাত্রার জন্য সজ্জিত হইতে গেল। কয়েক মিনিট পরে দুইখানি বাইসিক্ল লইয়া দু'জনে বারান্দার নিম্নে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও আলোকের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। বাগানে দেশী বিলাতী অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—দূরের ফুল তখনও ভাল নজর হয় না। তাহাদের মিশ্রিত সৌরভটুকু অনুভব করা যায় মাত্র। প্রভা ও রজনী কয়েক মুহূর্ত্ত একাকী এই বাগানে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাত্রার পূর্ব্বে সস্নেহে রজনী প্রভার হস্ত নিজ হস্তযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিল, "প্রভা, আজ আমরা কোথা যাচ্ছি?"

প্রভার মনে উত্তর জাগিল, সুখসাগরে স্নান করিতে—কিন্তু লজ্জায় সে কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু সমীপস্থ একটি গাছ হইতে একটি শিশিরসিক্ত নবস্ফুট গোলাপ তুলিয়া রজনীর কোটে লাগাইয়া দিল। রজনী ধন্যবাদ দেওয়ার হিসাবে স্বীয় প্রিয়তমার আরক্তিম ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

তখন আরও একটু আলো হইয়াছে। আকাশ ধূসরতা পরিত্যাগ করিয়া নীলাভ হইয়া আসিতেছে। বাইসিক্রে আরোহণ করিয়া দুইজনে যাত্রা করিল।

হুগলি সহরের সীমানা অতিক্রম করিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। এ পথে পূর্ব্বে ইহারা কতবার গিয়াছে—তবে কখন পাঁচ সাত মাইলের বেশী যায় নাই। বেশ শীত করিতে লাগিল। বাইসিক্ল দুইখানি দ্রুতভাবে পাশাপাশি যাইতেছে।

পথের দুইধারে তরুগুল্মের সারি। বামে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণে মাঠ। খানিকটা মাঠ—তাহার পরেই রেলওয়ে লাইন। কিয়ৎক্ষণ পরে সশব্দে কলিকাতাভিমুখে প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাহির হইয়া গেল। তাহাতে প্রভার পিতামাতা প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ দেখা গেল না।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল—তখন শীতক্লেশ অনেকটা নিবারিত হইল। এখন ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে ভ্রমিত পথের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে দুই একটি করিয়া লোকসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। দুই একখানি গরুর গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেলওয়ে লাইন আর দেখা যায় না। পথ গঙ্গার সন্নিকটে দিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ পার্শ্বে দূরে বৃক্ষাবলীর মধ্যে কোনও গ্রামের মন্দিরচূড়া জাগিয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে তাহা দ্রুতগামী আরোহীদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

ক্রমে সূর্য্য উচ্চে উঠিল, বেশ রৌদ্র হইল। কিন্তু এখন একটু অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ঠিক সম্মুখে সূর্য্য। উত্তাপে প্রভার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। এ সম্ভাবিত অসুবিধাটির কথা কিন্তু পূর্ব্বে প্রভা বা রজনী কাহারও মনে হয় নাই। নবপ্রণয়ীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কবেই বা কার্য করিয়া থাকে।

যখন অনুমান পনেরো যোল মাইল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন সম্মুখরৌদ্রে প্রভার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রজনী বেশ বুঝিতে পারিল যে প্রভার কষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রভা তা স্বীকার করিল না। স্বীকার করিলেই বা উপায় কি?

কিন্তু প্রভার যখন অত্যন্ত পিপাসা পাইল—তখন আর প্রভা থাকিতে পারিল না—রজনীকে বলিল। পার্শ্বেই গঙ্গা। রজনী প্রস্তাব করিল—এইখানে থামিয়া, গঙ্গাতীরে গিয়া তাহারা উভয়ে জলপান করিয়া আসিবে। পথে একজন রাখাল-বালক চলিতেছিল, বক্‌শিসের লোভে সে বাইসিক্ল দুইখানা আগলাইতে সম্মত হইল।

প্রভা ও রজনী বাইসিক্ল হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল। রাস্তা হইতে নামিয়া শস্যক্ষেত্র—মধ্যে সরু আল-পথ। গঙ্গার ঠিক তীরের উপর আমের বাগান।

ঘাটে পৌঁছিয়া, ঠিক সেইখানটাতেই জল খাইবার সুবিধা হইল না। একটুকু ওদিকে সরিয়া যাইতে হইল। সেখানে একটা বৃহৎ পাথর অর্দ্ধজলমগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার উপর বসিয়া প্রভা ও রজনী মুখে হাতে জল দিয়া শ্রান্তি দূর করিল। অঞ্জলি ভরিয়া শীতল গঙ্গার নির্ম্মল জল পান করিয়া বাঁচিল।

ঈষৎ বায়ুসঞ্চার গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। ওপারে একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। দুই একখানি জেলে-নৌকো নাচিতে নাচিতে অনেক দূর দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রান্তি দূর হইলে প্রভা ও রজনী ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যেখান দিয়া নামিয়াছিল সেইখান দিয়া উঠিয়া নির্জ্জন আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। অনেকগুলি গাছে আম্রমুকুল ধরিয়াছে, তাহার মদিরগন্ধে বাতাস পরিপ্লাবিত। আমবাগানের পরেই শস্যক্ষেত্র। একদিকে কড়াইসুঁটির ক্ষেত, অপরদিকে সরিষা। সরু আল-পথ দিয়া দুইজনে চলিয়াছে; দাঁড়াইয়া কড়াইসুঁটির ক্ষেতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী বলিল, "দেখ, ফুলগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।"

প্রভা বলিল, "চমৎকার।"

"আমি অনেক সময় ভাবি, এমন সুন্দর ফুল আমাদের কাব্যে কেন কখনও স্থান পায়নি।"

প্রভা বলিল, "ইংরাজি কাব্যে ত দেখা যায়, সুইট্ পীজ্। আমাদের কাব্যে যে সকল ফুলের আদর বেশী, সবই গন্ধযুক্ত ফুল। গন্ধ নেই বলে এ ফুল আমাদের কাব্যে অনাদৃত।"

রজনী বলিল, "আবার দেখা যায়, রূপের কোনও ভান নেই, শুধু গন্ধের জোরে ফুল কাব্যে স্থান পেয়েছে—যেমন বকুল।"

এইরূপ গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে রিতে প্রণয়িদ্বয় চলিল। পথের কাছে একথোলো মটরসুঁটি ফলিয়াছিল, প্রভা কয়েকটি তুলিয়া নিজে খাইল এবং রজনীকেও খাওয়াইয়া দিল।

যখন ইহারা রাস্তায় উঠিল, তখন যাহা দেখিল, তাহাতে দুইজনেরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

রাখাল-বালক পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহার নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। প্রভার বাইসিক্লখানি শুধু আছে, রজনীর খানি নাই।

রাখাল বলিল—একটা পল্টনের গোরা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একখানা বাইসিক্ল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাসিকার উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গিযাছে।

রজনী উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা কবিল, "কোন্ দিকে গেল?"

বাখাল অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া হুগলির দিকে পথ দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, সে অধিকক্ষণ যায় নাই, এইমাত্র গিয়াছে।

বজনী প্রভাকে বলিল, "তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দেখি।"—বলিয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রভাব বাইসিক্লে আবোহণ করিয়া তীরবৎ বেগে সেইদিকে ছুটিল।

একমিনিট—দুইমিনিট—তিনমিনিট, বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া, শেষে দূরে বাইসিক্লচোরকে দেখিতে পাইল। লাল কোর্ত্তা পবা মূর্ত্তি, বাইসিক্ল ছুটাইয়া চলিয়াছে।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া, দ্বিগুণ বেগে রজনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। ক্রমে নিকটে, আবও নিকটে আসিযা পডিল। গোবাটা বোধ হয় নিজেকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরাপদ মনে কবিয়া, সানন্দচিত্তে চলিযাছে। বজনী ইংরাজিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "থাম্ বদমায়েস!"

এই অপ্রত্যাশিত শব্দে গোরাটা তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। চালনাকার্য্যে অপটুবশতই হউক অথবা পথে ইষ্টকাদির বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই হউক, সে তৎক্ষণাৎ বাইসিক্লসুদ্ধ মহাশব্দে পথে পড়িয়া গেল।

রজনী তাহাব বাইসিক্ল পথে ফেলিয়া রাখিয়া, কয়েক লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্রের মত সেই গোবাটাব কাছে আসিয়া পড়িল।

সেই নবাকাব বৃটিশ বন্যজন্তুটি সেইমাত্র পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রজনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাব উপব পড়িয়া অবিশ্রান্ত ঘুসি ও লাথির চোটে তাহাকে পুনশ্চ ভূমিশায়ী করিয়া ফেলিল।

গোরা মাটিতে পড়িলে রজনী দেখিল, তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইতেছে। তখন তাহার মনে হইল, ইহা ঠিক ন্যায়যুদ্ধ হইতেছে না—উহাকে প্রস্তুত হইবার জন্য সময় দেওয়া উচিত। ইহা ভাবিয়া রজনী আক্রমণ হইতে বিরত থাকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গোবাটা আবাব ঝাড়িয়া উঠিল। রজনী বলিল, "প্রস্তুত?"

রজনীর সেই জিমন্যাষ্টিক করা ডাম্বেল ভাঁজা বদ্ধমুষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোরাটা বলিল, "থাক্—যথেষ্ট হইয়াছে। ক্ষমা কর। শুনিয়াছিলাম বাবুর বাইসিক্ল। বাবুদের মধ্যে এমন কেহ আছে তাহা জানিতাম না।"—বলিয়া লোকটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হুগলী অভিমুখে রওনা হইল।

এতক্ষণ রজনী অপহৃত বাইসিক্লটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পায় নাই। এখন দেখিল, চক্রদ্বয়ের যোজক-দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া বাইসিক্ল হইয়া গিয়াছে। চাকাও স্থানে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে।

রজনী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে থাকিয়া, বাইসিক্লটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পথ দিয়া একজন কৃষক যাইতেছিল, তাহাকে বলিল, "চাকা দু'খানি কাঁধে করে খানিক দূরে নিয়ে যেতে পারিস। বকশিস পাবি।"

সে স্বীকৃত হইল। রজনী তাহাকে বলিল, "তুই নিয়ে আয়। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে রাস্তায় যে পাকা সাঁকো আছে—আমি সেইখানে থাকব।" বলিয়া রজনী বাইসিক্ল ছুটাইয়া প্রভার নিকট পৌঁছিল।

॥ ৪ ॥

প্রভা তখন সাঁকোর উপর একখানি রুমাল বিছাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রাখালবালক গঙ্গা হইতে নাক মুখ ধুইয়া আসিয়াছে, প্রভা তাহাকে চক্‌লেট দিয়াছে। সে তাহাই খাইতেছে।

রজনী পৌঁছিয়া সংক্ষেপে সমস্ত জানাইল। প্রভা দেখিল বজনীর ভ্রূ কুঞ্চিত মন অত্যন্ত বিষণ্ণ। প্রভা তখন নিপুণা গৃহিণীর মত রজনীর মন হইতে বিবক্তি ও চিন্তা অপমোদন করিতে যত্নবতী হইল। সে হাসিয়া বলিল, "তার জন্যে অত ভাবনা কেন?"

রজনী বলিল, "এখন কলকাতায় পৌঁছবার উপায়?"

প্রভা বলিল, "কেন? রেলে যাব আমরা। এখান থেকে বেল ত বেশী দূর হবে না। পরের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠিগে চল।"

রজনী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, শ্রীরামপুর সেখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

প্রভা বলিল, "চল তবে আমরা শ্রীরামপুরে যাই। সে লোকটা ভাঙ্গা বাইসিক্ল নিয়ে এলেই হয়।"

রজনী বলিল, "তুমি কি এত রোদ্দুরে দু'ক্রোশ চলে যেতে পার? তোমাব ভাবি কষ্ট হবে।"

প্রভা প্রফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত বলিল, "কিছু না। দু'ক্রোশ ভারি ত; আমি খুব যেতে পারি।"

"রজনী রাখাল-বালককে বলিল, "কোনও গ্রাম থেকে একখানা পাল্কী ডেকে আনতে পারিস?"

রাখাল বলিল—অবশ্য পারে। কিন্তু গ্রাম দূর, যাইতে আসিতে দুই ঘণ্টা লাগিবে।

প্রভা বলিল, "না না—পাল্কীর কোনও দরকার নেই। আমি বেশ চলে যেতে পারি। ওগো, তুমি আমায় যত সুকুমারী মনে করছ আমি তা নই। আমি সেকালের বাজকন্যাদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইনে।"

ফুলের কথা শুনিয়া রজনী তাহার কোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভারও চক্ষু সেইদিকে পড়িল। প্রভা বলিয়া উঠিল, "আমার ফুল কি করলে? যুদ্ধে খুইয়ে এসেছ নাকি বীর-মশাই?"

রজনী দুঃখিতভাবে বলিল, "ফুলটি গেছে দেখছি।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, অত দুঃখ করতে হবে না।"—বলিয়া প্রভা ক্ষেতে নামিয়া গিয়া একগুচ্ছ কড়াইসুঁটি ফুল তুলিয়া আনিল। রজনীর কোটে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এ ফুলের যে ভারি প্রশংসা করছিলে—এই নাও।"

এতক্ষণে রজনীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সেখানে রাখাল-বালক উপস্থিত ছিল,

সুতরাং এবার আর ধন্যবাদ দেওয়া হইল না। শুধু প্রভার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া সস্নেহে নিষ্পেষণ করিল।

এমন সময় দেখা গেল, হুগলির দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে। উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আশা করিতে লাগিল, গাড়ীখানি যদি খালি থাকে ত বড় ভাল হয়।

গাড়ীখানি খালিই আসিতেছিল। শ্রীরামপুর হইতে কোনও গ্রামের জমিদারের জামাতাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

রজনী গাড়ীকে আটক করিল। একটু পরে ভগ্ন বাইসিক্ল গাড়ীর ছাদে তুলিয়া লোক দুইটাকে পুরস্কৃত করিয়া প্রভা ও রজনী শ্রীরামপুর অভিমুখে চলিল।

গাড়ী ছাড়িল। রজনী বলিল, "প্রভা, আজ তোমার বড় কষ্ট হল। খুব ক্ষিদে পেয়েছে না? তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "গুরুজনের কথা না শোন কানে—!"

রজনী বলিল, "সে ত ক'দিন থেকেই শুনছি। আমার কথার উত্তর দাওনা। খুব ক্ষিদে পেয়েছে না? চল, শ্রীরামপুরে গিয়ে কিছু খাবে।"

প্রভা বলিল, "ক্ষিদে পেলে কি খেতে আছে? মা বলে দিয়েছেন গায়েহলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

রজনী বলিল, "সে ব্রত ত একবার ভঙ্গ হয়ে গেছে।

প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কখন গো?"

"কড়াইসুঁটির ক্ষেতে।"

প্রভা বলিল, "ওগো, তাই ত। তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন?"

"আমার দোষ? তুমি আমাকেও খাইয়ে দিয়ে আমারও ব্রতভঙ্গ করেছ।"

"তোমার দোষ নয় ত কার দোষ তবে?"

রজনী বলিল, "বেশ! তোমার দোষও বুঝি আমার দোষ? তবু এখনও বি॰ে হয়নি।"

প্রভা কৃত্রিম রোষসহকারে বলিল, "আমার কখনও কোনও দোষ হতে ॰ারে? সব দোষ তোমার!"

এই অন্যায় অপবাদ রজনীর একান্ত অসহ্য হইল। সে প্রভাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে রাস্তার দুইপাশ জনশূন্য দেখিয়া—প্রভার মুখখানি নিজের বক্ষের কাছে টানিয়া লইল।

[ফাল্গুন, ১৩১১]

স্বর্ণ-সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে "প্র্যাক্‌টিস্" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাস ছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকিলগণের সহিত নানাবিধ খোসগল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিমে যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্‌টারি বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকিলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা মহকুমা আছে, সেখানে ব্যঙ্গালী উকিল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। যাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া এক্কা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস, এইখানে গেলেই আমার পসার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীব এখনও বেশ খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরাম পৌঁছিয়া প্র্যাক্‌টিশ আরম্ভ করিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দুওয়ালা উকিল ছিলেন—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকিল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"আরে উও তো বাচ্চা হ্যায়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা হ্যায়?"—প্রথম প্রথম একটা মোকর্দ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকিল নিযুক্ত ছিলাম। মোকর্দ্দমা শেষে বক্তৃতার দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালাপ্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন—

"হুজুর—দেখিয়ে তো তামাশা! কল্‌কত্তা সে এক উকিল আয়েহে-ন মোচ-ন দাড়ী-ঔর বয়স্ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কিতাব লে আয়েহে। হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙ্গ তেহ্যায়-যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায়!"

হাকিম একটু হাস্য করিয়া উকিল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার প্রতি জোয়ালাপ্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজি জানা উকিল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতুকপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনতর জীবন প্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি বালক বালিকারা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারম্বার গাহিতে লাগিল :—

"বাঙ্গালী বিটিয়া,—কলকত্তা মে বেচে তামাকুল টিকিয়া।"

আমার স্ত্রী তখনও হিন্দী শিখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি বলছে গো?"

আমি বলিলাম, "ওরা যা বলছে তার ভাবার্থ এই—হে বাঙ্গালীর মেয়ে—আমাদের

দেশে এসে তোমরা ভারি নবাব হয়েছ; চিকের আড়ালে দোতলায় বসে আছ—কিন্তু কলকাতায় তো তোমরা টিকেও বিক্রি কর শুনেছি।"

আমার স্ত্রী গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে!"

গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার বাড়ীর চারিদিকেব তালগাছগুলিতে পাসীরা তাড়ির জন্য "লাবনি" বাঁধিয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে চারিদিক হইতে পাসীদের চীৎকার শুনা যায়—"তার চিঢ়ো"—অর্থাৎ—"আমি তালগাছে চড়িতেছি—কুলবধূগণ, তোমরা উঠান হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাক।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদেব পুত্রটি পাটনা হইতে আসিল। সহরে ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমাব সহিত তাহার বন্ধুভাব জন্মিল। তাহার নাম সুন্দরলাল। আমি তাহার পিতৃবৈবি হইলেও আমাব কাছে সে সর্ব্বদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন "সাহেব" হইবার উচ্চাভিলাষ—সুন্দরলালের দেখিলাম সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার গৃহে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, সে যে শুধু ইংরাজি-শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা নহে একটি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্য-বিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ব্বাচিত কন্যাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই কাবণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েক দিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্ঠভাব ধারণ করিল। একদিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুইজনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সে দিন আমাকে বলিল—সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গ দেশের বাহিরে এখনও বুঝি প্রবেশ করে নাই।

জিজ্ঞাসা কবিলাম, "তাহার নাম কি?"

"পান্না।

"কত বড়?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

দেখিলাম—তবে ত ইহা একটি রীতিমত বোমান্সের কাণ্ড। বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কোথায়?"

"আমাদের গ্রামে।"

আমি জানিতাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদেব বাড়ী সদব হইতে ছয় মাইল দূরে পার্টালি গ্রামে। রহস্য করিয়া বলিলাম, "তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি?"

সুন্দরলাল বলিল, "কোথায় ঘন ঘন যাই? আসিয়াই একবাব গিয়াছিলাম, আর সেদিন আর একবার গিয়াছিলাম মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম।"

হাসিয়া বলিলাম, "এখানে তবে মবিতেছ কেন? আমি হইলে ত ছুটিব কয়টা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম।"

সুন্দরলাল বলিল "আকাঙ্খার যদি অনুসরণ করিতাম, তবে আমিও তাহাই কবিতাম। আমি জানি, আমি যদি কাছাকাছি থাকি, তবে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে নিজেকে সংযত কবিয়া রাখিতে পারিব না। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কে?"

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি?'

"স্বজাতি বইকি!"

"তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমাব বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্য লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতজামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেব কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে পিতা কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে মেয়েব আরও অনেক স্থলে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সম্মত হয় না। নহিলে আমাদের ঘরে অত বড় মেযে কখনও অবিবাহিত থাকে?"

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ণ হইল। এ যে উপন্যাসের মতই কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছি। কিন্তু উপন্যাসে সুখ-সম্মিলনটা প্রায়ই কোন না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কি তাহা হইবে না?

তাহার পর সুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল কথাই তাহাব প্রণয়িনীব সম্বন্ধে। সুন্দবলাল স্পষ্ট বলিল—প্রণয়ের আবেগটা সমস্ত তাহাব তরফ হইতে। বালিকা সম্ভবতঃ ভালমন্দ কিছুই জানে না। তাহার জানিবার বয়সও নহে, সুযোগ ঘটে নাই।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর আর দুই মাস কাটিল। আমার বেশ পসার হইয়া আসিতেছে। এখন প্রত্যেক বড় মোকর্দ্দমায় কোন না কোন পক্ষে আমি নিযুক্ত থাকি। সুন্দবলাল পাটনায় ফিবিয়া গিযাছে।

ইতিমধ্যে কয়েকবার সুন্দরলালের সহিত তাহাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। সুবেদাব অযোধ্যানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। দূর হইতে অতর্কিতে আমাব বন্ধুর মনোহারিণীকেও দেখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে। তাহাকে ভালবাসিযাছে বলিয়া সুন্দরলালকে দোষ দিতে পারা যায় না।

প্রথম যেদিন পাটোলি হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, আমার স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্নাকে দেখলে?"

"দেখলাম বইকি।"

"কেমন দেখতে গো?"

জ্ঞানীজনেরা বলিয়া থাকেন, নিজের স্ত্রীর সমক্ষে কখনও অন্য কোন স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা করিও না; করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "দেখতে মন্দ কি?"

স্ত্রী বলিলেন, "তবু কি রকম দেখতে, কি রকম রঙ, মুখ চোখ কি রকম?"

বলিলাম, "তা—ভালই।"

আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব সুন্দরী?"

পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, 'কি জানি অত বুঝিসুঝিনে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা কথার শ্রী দেখ। কচি খোকা কিনা—কিছু বোঝেন না! আচ্ছা,

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সুন্দরলাল হতে, তা হলে তুমি ভালবাসতে কি না?

আমি দুষ্টামি করিয়া বলিলাম, "কাকে'? তোমাকে?"

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন, "গা জ্বালা করে কথা শুনে। পান্নাকে—পান্নাকে।"

"আমি যদি সুন্দরলাল হতাম?"

"হাঁ গো হাঁ। একটা কথা বুঝতে পার না? এত পাস করলে কি করে?

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে হইবে জ্ঞানীজনেরা তাহার কোনও নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কপাল ঠুকিয়া বলিলাম, "তা, বাসতাম বোধ হয়।"

কপাল ঠুকিয়া বারুদের বাক্সতে দিয়াশলাই ধরাইয়া দিলাম না কেন? ফল ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইত না।

অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গাইলাম। মানান্তে তিনি পান্নার পরিজনাদি-সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রায় সকলগুলিরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম।

সুবেদারজী লোকটি বড় ভাল। ঐ কন্যাটি তাঁহার সর্ব্বস্ব। বলেন, ইচ্ছা করিলেই এখনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু মেয়েটিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া কি লইয়া থাকিবেন? আজীবন তিনি যুদ্ধ ব্যবসা করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহার অনেক গল্প করিলেন।

আষাঢ় মাস। রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। সহসা কি একটা শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কান পাতিয়া রহিলাম। দরজার বাহির হইতে শব্দ আসিল—"বাংগালীবাবু—এ বাংগালীবাবু।"

আমার নাম এখানে অল্প লোকেই জানে। সাধারণে আমি "বাংগালী উকিল" অথবা "বাংগালীবাবু" বলিয়াই পরিচিত।

পুনশ্চঃ শব্দ হইল—"বাংগালীবাবু—এ বাবুজী।"

আমি "কোন্ হায়?" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

"জাবা বাহার তো আইয়ে।"

আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কোনও অমঙ্গলের টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি।"

বাতি জ্বালাইয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—কিন্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল, তাই জ্যোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। উঠানের পার্শ্বে টগরগাছে একগাছ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

সদর দরজা খুলিয়া দেখি, একটি অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। "কে তুমি?"

লোকটি বলিল, "মোহাক্কেল।" "এত রাত্রে কেন?"

"একটি বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উইল করিতে হইবে। এখনি না গেলে নয়। ভোর অবধি তাঁহার নিশ্বাস থাকিবে কিনা সন্দেহ।"

"কত দূর যাইতে হইবে?"

"বেশী নয়। এখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র।"

"যাইব কি করিয়া?"

"ঘোড়া আনিয়াছি।"

"ফীজ্ আনিয়াছ?"

"আনিয়াছি। কত লাগিবে?"

"এই রাত্রে আমি একশত টাকার কমে যাইব না।"

"এই লউন।"—বলিয়া লোকটি তাহার চাদরের প্রান্ত হইতে টাকার নোটে একশত টাকা গণিয়া দিল।

আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাটীর ভিতরে প্রস্তুত হইতে গেলাম।

টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে, আলিপুর বারের সেই নিরন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়িল। সেই একদিন আর এই একদিন। তখন সারাটা দিন কাছারিতে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াও মক্কেল-দেবতার দর্শন পাওয়া যাইত না;—আর এখন সেই দেবতা দুই প্রহর রাত্রে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া ঘুমটুকু নষ্ট করিয়া দিল।

গৃহিণীকে অভয় দিয়া, ভৃত্যগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধটি কে?"

আমার সঙ্গী বলিল, "সুবেদার অযোধ্যানাথ।"

"সুবেদারজী? তাঁহারই আসন্নকাল উপস্থিত?"—বলিয়া আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন হইল তাঁহার কাছে বসিয়া কত যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের পর আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম।

সুবেদারজী আমাকে বলিলেন, "বাবু আসিয়াছেন? আসুন—বসুন। আমি ত চলিলাম।"

আমি বলিলাম, "না সুবেদারজী। ও কথা কেন বলেন? আপনি ভাল হইবেন। আবার আপনার কাছে কত যুদ্ধের গল্প শুনিব।"

শুনিয়া সুবেদারজীর মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। এখন আমার একটি কাজ করুন। অনেক রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

সুবেদারজী বলিলেন, "আপনি জানেন বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল। সে বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে—স্বর্গে গিয়াছে। হতভাগ্য আমাকে রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইল। রামজীর ইচ্ছা। আমার সেই পুত্রের একটি কন্যা আছে। তাহাকে বুকে করিয়া আমি জীবনের শেষভাগ কাটাইলাম। আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে পঞ্জাবে চাকরী করে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাকে এবং আমার পৌত্রীকে বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি এই মর্ম্মে একটি উইল প্রস্তুত করুন। আমার একটি স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহ আছে। আমি যখন বর্ম্মাযুদ্ধে গিয়াছিলাম, সেই সময় রাজবাটী লুট করিতে গিয়া সেটি পাই। সিংহটি ওজনে ত্রিশ সেরের উপর। সোনাটার দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। আমার পৌত্রীকে যে বিবাহ করিবে, সে ওই সিংহটি যৌতুক পাইবে। আমার লোহার সিন্ধুকটিতে ঐ সিংহ রক্ষিত আছে। এ কথা এতদিন কেহ জানিত না। জানিলে ডাকাতেরা আসিয়া সিংহটি লইয়া যাইত। লোহার সিন্ধুকে আমার এক হাজার টাকা আছে। ঐ টাকা আমার পৌত্রী পান্নার নামে লিখিয়া দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্য জমিজমা যাহা আছে, বাসনপত্র, আর মেডেলগুলি, সমস্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে লিখিয়া দিন।"

উপরিউক্ত কথাগুলি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে লাগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ উইলের অছি কাহাকে নিযুক্ত করিবেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এই দেখুন। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম। অছি আপনি হইবেন। ইহাও লিখিয়া দিন, আপনার মনোনীত পাত্র পান্নাকে বিবাহ করিলে তবেই সে ঐ সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উইলের অছি হইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি সুন্দরলালের বন্ধু—তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সহি লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন। "উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্ধুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন?"

'আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাখিয়া খাইতে হইবে কেন?"

উঠিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেক দিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে আর টাকাকড়ি, সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয় তাহাই আপনি করিবেন।"

আমি সুবেদারজীকে আমার প্রতিশ্রুতি প্রদান কবিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার পর একটি দিন মাত্র বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাস কাটিয়াছে। সুবেদারজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গিয়াছে।

পান্নাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া দিয়াছি। তাহার টাকা ও সিংহসুদ্ধ লোহার সিন্ধুকটি আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবারে, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল বাবু জোয়ালাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদাবজীর সিন্ধুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীব প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম, আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ কবিতেছেন না কেন?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকিল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পব তিনি বলিলেন, "দেখুন আপনার জন্য আমাদেব ত বড় নিন্দা হইযাছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে যে, বুড়া মবিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ আমাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "খাইতে না পাইয়া? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই?"

জোয়ালাপ্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন, "উইল করিয়াছেন? তাঁহার ছিল কি যে তিনি উইল করিবেন? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকিল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। অমায়িকভাবে বলিলাম, "না উইল করিয়া গিয়াছেন। আমিই সে উইল লিখিয়াছি।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তা ভাল। বাড়ীটি আর দুই-দশ টাকা যাহা বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হয়। তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছে। ঐ যে পান্নার পিতা, সে

বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটি গুজব আছে কিনা। উইল না করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি।"—বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

লোকটার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আসল কথাটাই তাঁহার মনে তোলপাড় করিতেছে, অথচ প্রকাশ করিবার সাহস হইতেছে না।

নানা অসম্বন্ধ কথা পাড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দরলালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

আমি মনে মনে বলিলাম, "হে স্বর্ণ-কেশরী—ধন্য তোমার মহিমা!"

জোয়ালাপ্রসাদকে বলিলাম, "মেয়েটির ঐ যে কুলগত দোষ আছে—তাহাতে আপনার জাতি-ভাই কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "করিবে। আমি বিলক্ষণ জানি—তাহারা আমাকে একঘরে করিবে। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্ব্বোধ সমাজ-শাসনের এত ভয় করিয়া চলি, তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করেন নবীনবাবু?"

অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে আমি মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। বলিলাম, "ঠিক ঠিক—উকিল সাহেব। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "ইংরাজি পড়ি নাই বটে,—কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাদি ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মতই।"

আমি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তা বটেই ত। তা বটেই ত!"

জোয়ালাপ্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন তাঁহার এ ভণ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই।

তাই উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা নবীনবাবু, আপনি ত সুন্দরলালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম—সুন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। তাহা সত্য কি?"

আমি বলিলাম, "সত্য।"

জোয়ালাপ্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তবে আমার মনে সকল দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক পান্না কু-জাতি—হউক সে অর্থহীনা—আমার পুত্র যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে—আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। আমরা পুত্রের সুখ বড়, না আমার জাতি বড়, নবীনবাবু?"

হাস্যের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা আমার আছে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিলাম, "অবশ্য আপনার পুত্রের সুখই বড়, উকিল সাহেব।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তবে আপনার মত আছে?"

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভান করিলাম। জোয়ালাপ্রসাদের মুখ কালিমাময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, তবে বুঝি বা আমি অমত করি।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন।"

শেষে আমি বলিলাম—"আমার মত আছে।"

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্বর্ণসিংহের অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার ভানটুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এখন এই অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অন্য সকল চিত্তবৃত্তি অপে[illegible] [illegible]ল আনন্দ গোপন করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক[illegible]

পান্না-সুন্দরলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উইলে প্রোবেট লইয়াছি। পান্নার হাজার টাকা, তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সিংহটি জোয়ালাপ্রসাদ লইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পরে, আবার নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—এ লোবিন বাবু!"

জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, "আবার কাহারও উইল করিতে হইবে নাকি?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লণ্ঠনহস্তে একটা ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহাব পশ্চাতে পান্না ও সুন্দরলাল।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে? ব্যাপার কি?"

"ভিতরে চল—বলিতেছি"।

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল পান্নাকে লইয়া আমার অঙ্গনে প্রবেশ করিল। বলিল, "বাবা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"কেন?"

"সে সোনার সিংহটা সমস্ত সোনার নহে। খুব পাতলা সোনার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত তামা। বাবা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনারা রাখিবেন, নহিলে ডাকাইতে কোন্‌দিন সিংহটা লইয়া যাইবে। আজ সন্ধ্যা হইতে গলানো হইতেছিল। দুইশত টাকার আন্দাজ সোনা বাহির হইয়াছে—বাকী সমস্ত তামা; বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্তেব মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে লইয়া একটি কক্ষে বসিলাম।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১]

মুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে একটি বিদ্যুৎ-আলোকিত কক্ষে একজন বঙ্গীয় যুবক একাকী বসিয়া ছিল।

কক্ষটি অনতিপ্রশস্ত। মধ্যস্থলে একটি টেবিল, তাহা গৈরিকবর্ণের "বেজ" কাপড়ে আবৃত। চারিপাশে চারিখানি চেয়ার রহিয়াছে। কিছু দূরে জানালার কাছে একটি সোফা। দেওয়ালের কাছে একস্থানে একটি পুস্তকের আলমারি, তাহার মধ্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক সারিবদ্ধ রহিয়াছে। আলমারির মাথায় খানকতক "ডেলি নিউজ" সংবাদপত্র এবং কয়েকখানা সচিত্র মাসিকপত্র গোছান আছে। অপর পার্শ্বে দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ডের কয়লাগুলি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কুণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ম্যাণ্টেল-প্লেস্—তাহার মধ্যভাগে একটি ঘড়ি। দুই পার্শ্বে কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ ও টুকিটাকি সৌখিন দ্রব্য সাজান আছে। ফোটোগ্রাফের মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই সেই দেশীয়। বাকীগুলির একখানিতে একটি বঙ্গীয় যুবতীর মুখ রহিয়াছে।

যুবকটির নাম চারুচন্দ্র চৌধুরী। সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে; আই-এম-এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই বাড়ীটি লণ্ডনের কেন্‌সিংটন অংশে অবস্থিত। চারু পূর্ব্বে অনেকবার এই বাড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছে।

টেবিলের নিকটে একখানি চেয়ারে চারু উপবিষ্ট। তাহার মুখে একটি পাইপ, হস্তে একখানি সবুজরঙের সান্ধ্য-সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদের প্রতি চারুর বিশেষ মনোযোগ দেখা যাইতেছিল না। সে মুহুর্মুহু ঘড়ির পানে চাহিতেছিল।

তাহার কারণও ছিল। আজ শনিবার শেষ ডেলিভারিতে ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবার কথা আছে। ব্রিণ্ডিসি হইতে যে দিন যে সময় ডাকগাড়ী এবার লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইয়াছে, তাহাতে ঘণ্টা হিসাব করিয়া, আজ শেষ ডিলিভারিতে পত্রবণ্টন হয় কি না হয় ইহা সংশয়ের বিষয়। আজ না আসিলে আর সোমবার প্রভাতের পূর্ব্বে পত্র পাওয়া যাইবে না, কারণ সভ্য-জগতের মধ্যে লণ্ডনই একমাত্র স্থান যেখানে রবিবারে চিঠি বিলি হয় না।

পৌনে দশটা হইল। তখন দূরের গৃহদ্বারগুলিতে ডাকওয়ালার "নক্"—খট্ খট্ শব্দ—উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিতেছে। ক্রমে সেই বাড়ীর দরজাতেও শব্দ হইল। চারু নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দাসী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দুয়ারে আঘাত করিল। বলিল, "ভিতরে আসিতে পারি মহাশয়?"

"এস।"

দরজা খুলিয়া ঈডিথ্ প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটি ট্রে, সেটি পত্র, প্যাকেট ও পার্শেল পরিপূর্ণ। সেগুলি সে চারুর সম্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিতে লাগিল।

চারু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "Good night Edith."

"Good night sir"—বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

চারু তখন পত্রগুলি একে একে পাঠ করিল। তাহার মধ্যে একখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

কলিকাতা।

প্রিয় চারু,

এ মেলে তোমার পাস হওয়ার সংবাদ পাইয়া যে কি সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তুমি এডিনবরা ছাড়িবার সময় লণ্ডনের ঠিকানা দাও নাই। টমাস্ কুকের কেয়ারে পাঠাইলে পাছে পত্র পৌঁছিতে দেরী হয়, তাই আমি আন্দাজ করিয়া কেনসিংটনে তোমাব পূর্ব্ব ঠিকানাতেই দিলাম। জানি তুমি সেখানে স্থান পাইলে অন্য কোথাও যাইবে না। অহো পোলাওয়ের কি মহিমা! তোমার কারিপোলাও-রন্ধন-নিপুণা ল্যাণ্ডলেডির জন্য কিছু মশলা আজ পার্শেল করিয়া পাঠাইলাম।

তোমার পত্র যখন আসিল তোমার দাদা তখন কাছারিতে ছিলেন। তাই খোকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই শুভসংবাদটা বলিলাম। শুনিয়া কিন্তু সে মোটেই প্রসন্ন হইল না। কেবল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি ঔষুধ খাব না।" তাহার বিশ্বাস বাড়ীতে ডাক্তার হইলে প্রত্যহই তাহাকে ঔষধ খাইতে হইবে।

তোমার শেষ পরীক্ষাটা হইয়া গেলে বাঁচা যায় বাপু। ঘরের ছেলে শীঘ্র ফিরিয়া এস। আমি তোমার জন্য একটি কনে ঠিক করিতেছি।

ভাল কথা—নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহার বরটি যে বিলাত চলিল। নরেন এই মেলেই যাইতেছে। তাহার শাশুড়ী আমাকে বলিলেন, "চারুকে লেখ, সে যেন ষ্টেশন থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বাসা-টাসা ঠিক করে দেয়। একটু দেখে শোনে।" নরেন মার্বেল্স্ হইয়া যাইতেছে সুতরাং পত্র পৌঁছিবার পরদিন সে লণ্ডনে পৌঁছিবে। ডোভারে নামিয়াই তোমায় টেলিগ্রাফ করিয়া দিবে। ছেলেটি যদিও বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিল, তবু সে অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকাবোকা রকমের। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের এ সমাজে কখনও মিশে নাই—একটু থতমত ভাবটা। বেচারি নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসী-পিসীর অঞ্চলের নিধি। লণ্ডনে হারাইয়া না যায় দেখিও।

তোমার দাদাকে রোজ বলিতেছি, "কেবল ব্যারিষ্টারি করিয়া টাকা জমাইয়া কি হইবে, চারু সেখানে থাকিতে থাকিতে আমায় একবার বিলাত দেখাইয়া আনিবে চল।" তা তোমার দাদা রাজি হন না। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাঁহার গুড়গুড়িটাই কাল হইয়াছে। বলিলেই বলেন, "ও গুড়গুড়িটে নিয়ে বিলেত যাই কি করে? ফেলেও ত যেতে পারিনে।"—তোমার নূতন ডাক্তারি বিদ্যা খাটাইয়া, গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া মহাদোষ এই বলিয়া, খুব ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে পার? তিনি গুড়গুড়ি পরিত্যাগ না করিলে আমার বিলাত দেখার কোনও আশা নাই।

আমরা সকলে ভাল আছি। আজ তবে আসি।

তোমার স্নেহের—বউদি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতরাশের পর ঈডিথ্ যখন টেবিল পরিষ্কাব কবিতেছিল, চারু তাহাকে বলিল, "মিসেস, জোন্সকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন কি?"

মিসেস জোন্স চারুর ল্যাণ্ডলেডি। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্যবয়স্কা, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী, হাস্যমুখী মিসেস জোন্স আসিয়া চাককে গুভপ্রভাত ইচ্ছা কবিয়া দাঁড়াইল।

চারু বলিল, "মিসেস জোন্স এ বাড়ীতে আর কোনও ভাড়া দিবার কক্ষ আছে কি? একটি শয়নকক্ষ ও একটি বসিবার কক্ষ দিতে পার?"

"বসিবার কক্ষ ত নাই মিষ্টাব চৌধুরী। কেবল একটি শয়নকক্ষ আছে। ঐ যে সে দিন ডাবিন হইতে আইবিশ দম্পতি কন্যাসহ আসিলেন কিনা, তাই একটি বসিবাব কক্ষকে শয়নকক্ষে পবিণত করিতে হইয়াছে। সুইট্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"আইরিশ দম্পতি? তাঁহারা কতদিন থাকিবেন?"

"এখন অনেক দিন থাকিবেন, কিন্তু মেয়েটি এক সপ্তাহ্ পরে স্কুলে চলিয়া যাইবে।"

"তবে এক সপ্তাহ্ পরে একটি বসিবার কক্ষও ত দিতে পাব?"

"তা পারি বটে। কিন্তু দুই সপ্তাহ্ পর হইতে ও দুইটি কক্ষও বন্দোবস্ত হইয়া গিযাছে। যিনি আসিবেন তিনি স্থায়ী লোক, ছুটিতে সমুদ্রতীবে গিয়াছেন।"

"তবে ঐ শয়ন-কক্ষটিই দুই সপ্তাহের জন্য দাও। একটি বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে পৌঁছিবেন। আমার বসিবার ঘবই দুইজনে ব্যবহার করিব এখন।"

"ধন্যবাদ মিষ্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়ীভাবে আপনার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম তবে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু উপায় নাই।"

"ঐ শয়নকক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিসেস জোন্স?"

"পঁচিশ শিলিং।"

"বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া বিছানাপত্র ঠিক কবিয়া রাখ। আজ ডিনারের পূর্ব্বে আমার বন্ধু আসিবেন।"

চারুকে ধন্যবাদ দিয়া মিসেস জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর শুন মিসেস জোন্স, ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদিদি এই পোলাওয়ের মশালা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লইয়া যাও।"

পার্শ্বেলটি লইয়া—"Oh how good of her, how kind of her"—বলিতে বলিতে মিসেস জোন্স হাস্যমুখে প্রস্থান করিল।

বৈকালে চারু যখন চা পান করিতেছিল, তখন ডোভার হইতে নরেনের টেলিগ্রাম পৌঁছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে Bus-এ আরোহণ করিয়া, "চেয়ারিং ক্রশ" ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়টার সময় ডোভার-ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। নরেনকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রথমেই নরেন বলিল, "দেখুন, ডোভারে আমার জিনিষপত্র ব্রেকভ্যানে দিলাম, কিন্তু কোনও রসিদ দিলে না। এখন সেগুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই?"

চারু বলিল, "না, এখানে রসিদ-টসিদ অত প্রচলিত নেই। চলুন ব্রেকভ্যানের কাছে, আপনার কোন্‌গুলো জিনিষ দেখিয়ে দিলেই পোর্টার (মুটে) গাড়ীতে তুলে দেবে এখন।"

নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "বটে! ডোভারে আপনাকে টেলিগ্রাম করলাম, তারও রসিদ দিলে না। ভাবলাম আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ করে নিলে বুঝি।"

চারু হাসিয়া বলিল, "না, ও রকম হয় না।"—বলিতে বলিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের কাছে উপস্থিত হইল। জিনিষ লইয়া হ্যান্‌সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী লণ্ডনের সেই কাঠের-উপর-রবার-গলাইয়া ঢালা রাস্তা দিয়া, দ্রুতবেগে ছুটিল।

পথে কথাবার্ত্তা কহিয়া পথপার্শ্বস্থ দৃশ্যাদি দেখাইয়া, চারু নরেনের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ট্রাফালগর স্কোয়ার, ঐ নেলসন-কলম ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঐ একটু দূরে ন্যাশনাল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় His Majesty's Theatre, সেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা Beerbhom Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলি দিয়া যাইতেছি, ঐ হাইড পার্ক—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঈডিথের সাহায্যে জিনিসপত্রসহ নরেনকে তাহার শয়নকক্ষে তুলিয়া দিয়া চারু বলিল, "এখনও সাতটা বাজেনি। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার।"

নরেন বলিল, "দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

চারু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলুন দেখি?"

অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নরেন বলিল, "আমাকে আপনি মশাই বলবেন না। আমাকে নিজের ছোট ভাইটি বলে মনে করবেন স্নেহ করবেন—আমিও আপনাকে দাদার মতন ভক্তি সম্মান করব।"

চারুর পাঁচ বৎসরকাল বিলাতী শিক্ষায়, নরেনের এই উক্তিটি অসহনীয় ন্যাকামি বলিয়া মনে হইল এবং তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। কিন্তু সেই বিলাতী শিক্ষার বশেই মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিল, "তথাস্তু। তুমি প্রস্তুত হও। দাসী এখনই দরজার বাইরে গরম জল রেখে যাবে।"

সাড়ে সাতটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, নরেন প্রস্তুত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য চারু তাহার দুয়ারে গিয়া আঘাত করিল। নরেন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার মুখে একটি সিগারেট ছিল, চারুকে দেখিয়াই সেটি ফেলিয়া দিল।

নরেন তখন হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত। চারু ভিতরে গিয়া বসিয়া, কক্ষখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ঘর পছন্দ হয়েছে?"

নরেন একটু সমস্যায় পড়িয়া গেল। এ ঘর পছন্দ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, এই দ্বিধায় পড়িয়া সাবধানে বলিল, "মন্দ কি।"

চারু বলিল, "হ্যাঁ। আমিও দুই একবার এসে এ ঘরে বাস করেছি। আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, কেবল এই Wall paper-এর design-টা বড় aggressive—ওটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমি মিসেস জোন্সকে বলেওছিলাম, কিন্তু এসব অশিক্ষিত ল্যাণ্ডলেডিকে বোঝান শক্ত। কিম্বা হয় ত বদলাতে খরচ হবে বলে বুঝতে চায় না।"

নরেন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবিল—"কেন বেশ ত লতা পাতা আঁকা রয়েছে; মন্দটা কি?"—ইহাও মনে হইল—আর একটু হইলেই ত সে বলিতেছিল সুন্দর ঘরটি—তাহা হইলে চারু তাহাকে মনে মনে কি জানোয়ারই ঠাওরাইত। খুব রক্ষা হইয়াছে।

অন্য কথা পাড়িল। সে সমুদয়ই বিলাতী আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথা। এক সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, ঐ যে ঝিটা আছে, ওকে ডাকতে হলে কি বলে ডাকব?" "ওর নাম ঈডিথ্।"

"মিস ঈডিথ্ বলে ডাকব না শুধু ঈডিথ বলব?"

"শুধু ঈডিথ্ বলবে।"—বলিয়াই একটু পরে চারু বলিল, "যেন মনে কোবো না ঝিকে তাচ্ছিল্য করা হিসেবে মিসটা বাদ দেওয়া হয়। তা মোটেই নয়। এখনও অনেক সেকালকার chivalrous spirit-এর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাঁরা পথে ঘাটে ঝির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে টুপী স্পর্শ করে থাকেন। ওরকম দেখা হলে, কোন একটা pleasant remark করাই নিয়ম। তুমি যে ঝিকে দেখেও তাকে notice না করে চলে যাবে, তা ভয়ানক অভদ্রতা। "Fine afternoon Edith"—"Isn't it sir?" বলে সে চলে যাবে এখন। তোমার যদি একটু বেশী বয়স হয়ে থাকে, তবে পরিহাস করে এমন কথাও বলতে পার—'Going to meet your young man Edith?—সে হয়ত বলবে—'Ain't go nôt young man, sir.' বলে হেসে চলে যাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় হইল। নরেনকে সঙ্গে করিয়া চারু নিজের বসিবার কক্ষে লইয়া চলিল। পথে নরেন বলিল, "দেখুন এই থ্যাঙ্কিউটা বলতে সব সময় মনে থাকে না। এই ঈডিথ, গরম জল দিয়ে গেল থ্যাঙ্কিউটা বলতে ভুলে গেলাম। চলে গেলে পর মনে হল। হয় ত কি জানোয়ারই মনে করবে।"

চারু বলিল, "কিছু ভয় নেই। এখানে-এর সাত খুন মাফ। এরা বিদেশী মাত্রকেই অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে থাকে—তা সাদা আদমি কালা আদমি নেই।"

ডিনারের পর, চারু নরেনকে হুইস্কি দিতে চাহিল, কিন্তু নরেন লইল না।

চারু বলিল, "খাওনা বুঝি, সে ভালই।"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "না, আসবার সময় প্রতিজ্ঞা করে এসেছি ও সব স্পর্শ করব না।"

চারু নিজের গ্লাসে একটু হুইস্কি ও সোডা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছ?"

নরেন লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার পাইপটি পরিষ্কার করিতে করিতে একটি গানের এক চরণ সুর করিয়া বলিল—"He is married—He is married."

পাইপ ভরিতে ভরিতে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার দেখা নির্ম্মলার সেই বালিকা মূর্ত্তি স্কুলের গাড়ীতে চড়িয়া সেই লক্ষ্মীটির মত পড়িতে যাওয়া, বাড়ী ফিরিয়া ছোট ভাইদের সঙ্গে পশ্চাতের বাগানে সেই ফুটবল খেলা করে, চারুর মনে পড়িল। মনে মনে হাসিয়া সে ভাবিল, "তারই এখন এত প্রতাপ!"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঈডিথ্ প্রবেশ করিয়া নরেনকে বলিল, "আপনার বাক্সের চাবিগুলি কি পাইতে পারি মহাশয়?"

শুনিয়া নরেন একটু বিস্মিত হইয়া, বাঙ্গলায় চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাবি চায় কেন?"

চারু বলিল, "তোমার বাক্স থেকে কাপড়চোপড় বের করে wardrobe-এ সাজিয়ে রাখবে। খালি বাক্স সব box-room-এ নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখবে।"

"কেন, তোরঙ্গেই আমার কাপড় থাকুক না?"

"না না। শয়নঘরে কি তোরঙ্গ পেঁটরা স্তূপাকার করে রাখা হয়? তাতে সৌন্দর্য্যহানি হবে যে।"

ঈডিথ্ চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

কোথায় নরেনের থাকা হইবে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। নরেন বলিল, "কলকাতায় যেমন ছাত্রদের মেস থাকে সে রকম এখানে কিছু নেই?"

"না।"

"তবে এখানে থাকবার কি রকম বন্দোবস্ত?"

চারু বলিল, "তিন রকম বন্দোবস্ত হতে পারে। এক তুমি কোনও পরিবারে থাকতে পার; কিন্তু ভদ্রপরিবারের মধ্যে থাকতে পাওয়ার সুযোগ দুর্লভ। তাঁরা নিজেদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যথেষ্ট সুপারিশ না পেলে রাখেন না। তুমি তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে ঠিক তাঁদের একজন হয়ে বাস করবে, তুমি যে ভাল লোক, তা তাঁরা না জানলে তোমায় রাখবেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ পরিবারে ঢুকতে চেষ্টা করেছে। ঢুকে দেখে তারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দু'এক সপ্তাহ থেকে পালিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ তুমি কোন বোর্ডিং হাউসে থাকতে পার, কিন্তু সেখানে, অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হতে হয়। তৃতীয়তঃ রুম্‌সে থাকতে পার—এই আমি যেমন আছি। এই একটা ধর মস্ত বাড়ী রয়েছে, এর একজন ল্যাণ্ডলেডি আছে, সেই বাড়ীর কর্ত্রী। এই আমি একটা শয়নঘর একটা বসবার ঘর নিয়ে আছি,—এমন আরও দু'চারজনে আছে—তাদের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নেই, তাদের আমি চিনিও না। আমার বসবার ঘরে ল্যাণ্ডলেডি আমার খাবার দিয়ে যায়। আমি হপ্তায় হপ্তায় ওকে পঁয়ত্রিশ শিলিং করে ফেলে দিয়ে খালাস।"

"এ তিন রকমে খরচের বিভিন্নতা কি?"

"তা বড় নেই। এই রকমই খরচ। তবে এর চেয়ে ভাল ষ্টাইলে থাকলে আরও পাঁচ সাত শিলিং বেশী লাগতে পারে। একটু কম ষ্টাইলে থাকলে দু'পাঁচ শিলিং কমেও হতে পাবে।"

"আপনি আমায় কোন্ রকম থাকতে উপদেশ দেন?"

"যদি ভদ্রপরিবারে স্থান পাও, তবে সেই খুব বাঞ্ছনীয়। আমি এই পাঁচ বৎসরেব প্রায় তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বাস করে কাটিয়েছি। পরিবাবে বাস না করলে, ওদেব সামাজিক রীতি নীতি ভাল করে শিক্ষা করা যায় না। আমাদের মত ভারতবর্ষীয়দেব পক্ষে তার একটা Educative value মস্ত আছে।"

"তবে দাদা অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও ভদ্রপরিবারে স্থান করে দেবেন।"

চারু চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইল। আপাততঃ আগামীকল্য তাহাকে "ইনে" গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে। চারু হিসাব করিয়া দেখিল, ভর্ত্তি হইবার টাকা অপেক্ষা নরেন পঞ্চাশ পাউণ্ড অধিক আনিয়াছে। বলিল, "আচ্ছা, ঐ টাকা থেকে গোটা দুই তিন সুট তৈরি কবিয়ে নাও—বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিও এখন।"

নবেন্দ্র বলিল, "দাদা, কলকাতার এই সুটে যতদিন চলে চলুক না। মিথ্যে টাকা খরচ করে কি হবে?"

চারু বলিল, "সে ভাল কথা।"

রাত্রি দশটার পর, চারুকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া নরেন শয়ন করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার বাক্স তোরঙ্গ সমস্ত অন্তর্হিত। ওয়ার্ড-রোব খুলিয়া দেখিল, তাহার কামিজগুলি একস্থানে সুটগুলি একস্থানে রুমালগুলি একটা ছোট দেরাজে, অন্য একটাতে তাহার নেকটাইগুলি আর একটাতে তাহার কলারগুলি—এইরূপ সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত। আলোকের নিকট কালো বনাতে সোনালি কাজ করা বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি টেবিল। তাহার উপর নরেনের রাইটিং কেশটি, চিঠির কাগজ, খামগুলি রক্ষিত। ম্যাণ্টেল-প্রেসের উপর দেখিল, তাহার স্ত্রীর ও অন্যান্য ফোটোগ্রাফগুলি সাজান, দুই পাশে দুইটি শুভ্র—"ভাজে" দুই গুচ্ছ শুভ্রবর্ণ নার্সিসস্ ফুল। বিছানার কাছে একটি টীপয়—তাহার উপর বাতিদানে একটি নূতন মোমবাতি। তাহার সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া সেখানে রাখা হইয়াছে। দস্তার উপর পিতলের কাজকরা একটি অ্যাশ-ট্রে কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার চিরুণী, বুরুষ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ড্রেসিং টেবিলের উপর সজ্জিত।

নরেন দেখিয়া শুনিয়া, তখন সেই ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া, স্ত্রীকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে, মেল-ডে আসিলে সাতখানি চিঠি লেফাফায় ভরিয়া একত্র রওনা করিয়া দিবে।

চারু শুনিলে ভাবিত—"সেই নির্ম্মলার এত প্রতাপ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আবার আজ, কেন্‌সিংটনের সেই কক্ষটিতে বসিয়া চারু ভারতবর্ষীয় ডাক পাইল। এবার শনিবার প্রভাতে ডাক আসিয়াছে। প্রাতরাশের সঙ্গে চারু চিঠি পাইল।

তাহার বউদিদির পত্রখানি এইরূপ :— কলিকাতা

ভাই চারু,

তোমার পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় অত্যন্ত ব্যস্ত আছ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিশ্রম করিও। তুমি নিজে ডাক্তার, তোমায় বলাই বাহুল্য।

একটা বড় মজা হইয়াছে জান? তোমাব দাদাকে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন—"এখন আমরা গেলে চারুর পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে। তার পরীক্ষাটি হয়ে যাক, তখন যাওয়া যাবে।" দুই মাস পরে তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে, আমরা দেড় মাস পরে যাত্রা করিব—তাহা হইলে ঠিক তোমার পরীক্ষার পরে গিয়া পৌঁছিব।

নির্ম্মলা বেচারির বড় অসুখ। মাসখানেক হইতে ভুগিতেছে। আজ শুনিতেছি, অসুখ খুব বাড়িয়াছে। এ মেলে সে সংবাদ পাইয়া নরেন বেচারি বোধ হয় খুব চিন্তিত হইবে। আহা তুমি যদি সময় পাও, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিও।

বেশী বড় চিঠি লিখিলাম না। তোমার সময় নাই, পড়িবে কখন? এখন তবে আসি।

তোমার স্নেহের—বউদি।

পত্রখানি শেষ করিয়া চারু ভাবিতে লাগিল। নরেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে সে একবার টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল—তাহার পর হইতে আর কোনও সংবাদ পায় নাই।

নরেন এখন বেজ্‌ওয়াটারে রুম্‌সে থাকে। সেখানে মাস দুই তিন আছে। মিস ম্যানিংয়ের সাহায্যে চাক তাহাকে প্রথমে একটি ভদ্রপরিবারে স্থান করিয়া দিয়াছিল। প্রথমে সেখানে থাকিয়া নরেন খুব সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে যখন সে বেজ্‌ওয়াটারের দলে মিশিতে আরম্ভ করিল তখন একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষু ফুটিতে লাগিল। সে দেখিল তাহার যে সকল বন্ধুরা রুম্‌সে থাকে, তাহারা বেশ থাকে। তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রাতরাশে নামিয়া আসিতে হয় না। দশটা, এগাবোটা যখন খুসী শয্যাত্যাগ করিয়া ল্যাণ্ডলেডিকে প্রাতরাশ আনিতে হুকুম করিলেই হইল। রাত্রিবসানের উপর ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া ব্রেক্‌ফাষ্ট খাইয়া বেলা তিনটা চারিটার সময় পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যাবেলা যত ইচ্ছা বন্ধু লইয়া যেরূপ ইচ্ছা আড্ডা দেওয়া যাইতে পাবে—এবং অন্যত্র আড্ডা দিয়া যত রাত্রে খুসী ফিরিয়া আসিতে কোনও বিঘ্ন নাই। তাই নরেন চারি মাস কাল হ্যালাম্ পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, বেজ্‌ওয়াটারে আসিয়া রুমস্ লইয়াছে।

অনেক বৎসর হইতে লণ্ডনে বেজ্‌ওয়াটার অংশটিই অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের বাসের স্থান। বেজ্‌ওয়াটারে "আর্টেজিয়ান্" নামক একটি "পাবলিক-হাউস" বা পানালয় আছে। যদি কখনও ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা বেজ্‌ওয়াটার হইতে উঠিয়া অন্যত্র যায়, তবে ঐ "আর্টেজিয়ানের" স্বত্বাধিকারিগণকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তবে সর্ব্বত্র যেমন সম্মানিত

ব্যতিক্রম থাকে, বেজ্ওয়াটারেও সেরূপ আছে। কর্ত্তব্য বোধে ইহা আমি এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চারু সেদিন বৈকালে নরেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। টল্‌বট্ রোডে যে বাড়ীতে নরেন থাকিত, তাহার সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, নরেনের দ্বিতলের বসিবার কক্ষটির জানালা অল্প খোলা রহিয়াছে—এবং তাহার মধ্য হইতে পিয়ানো ও সঙ্গীতের শব্দ এবং হাসির গর্‌রা বাহির হইতেছে। গানের এই পদটি নরেনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

There once was a black bird gay,
A splendid fellow was he ;

সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস ম্যানিং ভারতবর্ষীয় জননীস্বরূপা ছিলেন—তবে অনেক ছাত্র তাঁহার উপদেশ বা ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের মঙ্গলার্থে এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ ছিল। বিপদে আপদে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকে।—লেখক।

And thought he went oyt every day
He always came home to tea,—To tea—to tea—to tea.

—সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা হাসির ফোয়ারাও ছুটিল।

চারু দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল। পত্নীর পীড়ার জন্য নরেনের মনে যে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তাহার ঠিক ধারণা হইল না। একবার ভাবিল ফিরিয়া যাই। আবার কি ভাবিয়া দরজায় আঘাত করিল।

সে কক্ষে চারু যখন প্রবেশ করিল, তখন শুধু পিয়ানো চলিতেছে, গান বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই নরেন পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"Hellow—Hellow—Here's a black-bird come to tea. How d'ye do birdie?"

পাইপ মুখে, হুইস্কির গ্লাস পার্শ্বে—সেন বসু, ব্যানার্জি প্রভৃতি আরও চারি পাঁচজন লোক বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল—"Hellow Chow—hellow."

একজন বলিল, "Black-bird-কে একটু হুইস্কি দাও—চায়ে উহার গলা শানাইবে না।"

নরেন চারুর পানে চাহিয়া বলিল, "Have a drop old chap?"

চারু এই প্রথম দেখিল, নরেন হুইস্কি পান করিতেছে। বলিল, "না—ধন্যবাদ।"

একজন বলিল, "Is he a damned T—T ?"

নরেন বলিল, "Give the devil his due—He isn't that.—'Do Have a wee little drappie', as the Scotch say—just to keep us comapany, Chow"

চারু বলিল, "না—ধন্যবাদ। আমি ডিনারের পূর্ব্বে পান করি না।"

একজন বলিল, What a good little boy!"

অপর জন বলিল, Are You married?"

নরেন বলিল, "Heaven forbid."

সেন বলিল, "Then why the devil are you so tic'l'r ?"

ব্যানার্জি বলিল, "His mamma will be cross."

একজন গান ধরিল—"He is his mammie's ae bairn,
with unco folk weary, sir.

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এইরূপ কিছুক্ষণ চলিলে পর একজন উঠিয়া বলিল, "I must be off, boys."

একজন বলিল, "Why in such a darned hurry ?"

ব্যানার্জি বলিল, "Perhaps he's got an appointment to meet his girl."

পাইপ মুখে, বসু অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "Which of em?"

দস্তানা পরিতে পরিতে গমনোন্মুখ ব্যক্তি বলিল, "Oh shut up. I'am not like. You fellows. One at a time is my motto."

সকলে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। তখন চারু ও নরেন কেবল একাকী রহিল। বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর খবর পেলে?"

নরেন বলিল, "এখনই?"

"কেন, এবার Caledonia জাহাজে ডাক এসেছে, জান না?'

"Caledonia-তে নাকি? তবে এবার শীগগির পাওয়া যাবে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল শনিবার সকালে চিঠি পাওয়া যেতে পারে।"

চারু বলিল, "কাল শনিবার সকালে? কেন, আজ কি তুমি শুক্রবার বলে মনে করছ নাকি?"

নরেন বলিল, "কেন আজই ত শুক্রবার। আমি ঐ দেশের চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—ওবা এল—এখনই শেষ করে ছ'টার মধ্যে ডাকে পাঠাব।"

মনেব বিরক্তি মনে চাপিয়া চাক বলিল, "আজ শুক্রবার নয়, আজ শনিবার। আজ সকালে আমি দেশের চিঠি পেয়েছি।"—এই বলিয়া উঠিয়া, কিয়দ্দূরে সোফার উপর হইতে অপঠিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি আনিযা সেদিনকাব বার ও তারিখ দেখাইয়া দিল।

নরেন বলিল, "তবে এবার মেল মিস্ করলাম।"

চারু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন বলিল, "আমার চিঠিগুলো বোধ হয়, হ্যালাম্‌দেব ওখানে এসে পড়ে আছে। তাঁরা বিডাইবেক্ট করে দেবেন, সন্ধ্যাবেলা পাব বোধ হয়।"

চারুর মনে পড়িল, নরেন প্রথম প্রথম যখন হ্যালাম্‌দের বাড়ী গিয়াছিল, ২ য়েকসপ্তাহ যখন তাহাবই কেয়াবে নরেনের চিঠিপত্র আসিত—নরেন সংবাদপত্র দেখিয়া ডাক পৌঁছিবার সময় ঘণ্টা হিসাব করিয়া চারুর কাছে আসিয়া চিঠির জন্য ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিত। তখনকার দিনে প্রতি মেল-ডে আসিলে, সাতখানি করিয়া চিঠি তাহার স্ত্রীকে পাঠাইবাব কথাও মনে পড়িল।

কিন্তু চারু কিছুই বলিল না। কি অধিকারে সে তাহাকে তিরস্কার করিবে? নরেন তাহার আত্মীয় নহে, বিশেষ বন্ধুত্বও তাহার সহিত জন্মে নাই। কি অধিকারে সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে?

কিয়ৎক্ষণ পবে চারু উঠিল।

নরেন অনেকক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। এইবার বলিল, "চৌধুরী—আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

"কি?"

"এ সব কথা বাড়ীতে লিখ না কাউকে।"

"কি সব কথা?"

"এই হুইস্কি-টুইস্কির কথা।"

চারু একটু শ্লেষ করিয়া বলিল, "কেন, তাতে আর দোষ কি? আমিও ত হুইস্কি খাই—আমার বাড়ীর সকলেই জানেন।"

নরেন বলিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভারি রাগ করেছ। For Heaven's sake চৌ, আমায় মাফ্ কর।"

চারু এবার তাহার সুযোগ বুঝিল। বলিল "বাড়ীতে লিখব না এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুমি আমায় একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পার?".

"কি বল?"

"বেজ্‌ওয়াটার ছাড়, দলটি ছাড়, আবার হ্যালামদের ওখানে যাও।"

"আচ্ছা—তা ছাড়ব।"

"এখনই। এই সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে নোটিশ দাও।"

নরেন বলিল, "Damn it—ল্যাণ্ডলেডির কাছে যে আট দশ পাউণ্ড বাকী পড়ে গেছে—সে শোধ করে ত নোটিশ দেব!"

"কেন, তোমার সে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ পাউণ্ড কোথা গেল?"

"Bless my soul—সে অনেক দিন গেছে।"

চারু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি নোটিশ দাও। আমি তোমায় দশ পাউণ্ড ধার দেব।"

চারুর সঙ্গে সঙ্গে নরেন নীচ অবধি নামিয়া আসিল। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল, "লিখবে না ত চৌ?"

"Honour bright?"

"Honour bright"—বলিয়া চারু নরেনের করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন হ্যালাম্‌দের ওখানে গেল বটে, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু চারুর ভয়ে বেজ্‌ওয়াটারে ফিরিয়া রুমস্‌ লইতেও সাহস করিল না।

একদিন মিসেস্‌ হ্যালাম্‌কে সে বলিল, "আজ কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে, আজ ফিরিতে একটু দেরী হইবে!"

মিসেস্‌ হ্যালাম্‌ বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, আমি দুয়ারে চাবি দিব না। হলে মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিব।"

এখানে বিলাতী দুয়ারের সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। সেখানে সদর দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। দরজায় দুইটি করিয়া চাবিকল থাকে। একটি কল খুলিতে হইলে ভিতর হইতে হাতে টানিয়া খোলা যায়, কিন্তু বাহির হইতে খুলিতে হইলে চাবি ভিন্ন তাহা খুলে না। বাড়ীর প্রত্যেকে বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের কাছে একটি করিয়া সেই চাবি থাকে। তাহার নাম ল্যাচ্‌ কী। তুমি বাড়ীর লোক, বেড়াইয়া আসিলে, তোমার পকেটে যদি ল্যাচ্‌-কী থাকে, তাহার দ্বারা তুমি কল খুলিয়া দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার। যদি ল্যাচ্‌-কী না লইয়া গিয়া থাক, তবে তোমায় নক্‌ করিতে হইবে, কিম্বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটি টিপিতে হইবে, দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। দ্বিতীয় যে আর একটি চাবিকল আছে, তাহা কেবলমাত্র ভিতরদিকের কল, বাহির হইতে তাহা খুলিবার উপায় নাই। এ কলটি সমস্ত দিন খোলা থাকে, গৃহস্থ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। সেটি বন্ধ থাকিলে, তুমি রাত্রে ফিরিয়া আর ল্যাচ্‌-কীর সাহায্যে দুয়ার খুলিতে পারিবে না।

নরেন সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল। লণ্ডনের সমস্ত থিয়েটার যদিও রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। তথাপি নরেনের ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। হলে প্রবেশ করিয়া, মোমবাতিটির পানে সে একটু বিরক্তির সহিত চাহিয়া রহিল।

বিলাতী গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত এই মোমবাতিটি ভয়ানক জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন ফিরিয়াছে, মোমবাতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই মোমবাতিটি কতখানি পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব করিয়া লইতে পারেন, তুমি কাল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। সেই মোমবাতিটা সরাইয়া, হিসাব করিয়া অপর একটা সেখানে বসাইয়া মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে। দুয়ার খুলিবার

শব্দটুকু, সিঁড়ি বহিয়া তোমার শয্যাকক্ষে যাওয়ার শব্দটুকু গৃহিণীকে জাগাইতে পারে। পরদিন তোমার মিথ্যাসাক্ষী ধরা পড়িয়া যাইবে। সে দেশে যে যতই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী বা Snake বলিয়া সহজে ধরা পড়িতে কেহ চাহে না।

অত রাত্রে ফিরিবার সঙ্গত কারণাভাব—নরেন মনে করিল, পরদিন বোধ হয় হ্যালাম্ পরিবারের মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু প্রাতরাশের সময় কাহারও বিশেষতঃ মিসেস হ্যালামের মুখে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। মিসেস হ্যালাম অন্যান্য দিনেও যেমন তাহার সঙ্গে—এবং সকলেরই সঙ্গে—হাস্যকৌতুকের ভাব ব্যবহার করেন, আজও তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর সে সকলের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে সারা সন্ধ্যা গীতবাদ্য ও আমোদ আলাপে কাটাইল, তখনও মিসেস হ্যালাম পূর্ব্ববৎ। ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল। একে একে শয়ন করিতে গেল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নরেন একাকী হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতি মিসেস হ্যালামের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নরেন অগ্রসর হইয়া, নত হইয়া বলিল, "শুভরাত্রি মিসেস হ্যালাম।"

মিসেস হ্যালাম একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "শুভরাত্রি। তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পাইয়াছে মিষ্টার ঘোষ। গতরাত্রে বেশী ঘুমাইবার অবসর তুমি ত পাও নাই।"

শয়নকক্ষে গিয়া, নরেন এই নীরব ভর্ৎসনাটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল। স্থির করিল, আর না, এবার অবধি জীবনের গতি অন্য পথে ফিরাইবে, পূর্ব্বের মত স্ত্রীকে প্রত্যহ একখানি পত্র লিখিবে, খরচপত্র বুঝিয়া-সুঝিয়া করিবে—ভাল হইবে।

সপ্তাহখানেক ভাল হইয়া রহিল। টেম্প্‌লে আইনের লেকচার শুনিতে যাইতে লাগিল, লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে লাগিল, ডিনারের পর ড্রয়িংরুমেই থাকিত। কিন্তু এক সপ্তাহেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইল। আমোদের নেশা আবার তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। আবার সেই দলের ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পড়িল—নিজেকে সামালাইতে পারিল না।

একদিন—সেদিন শুক্রবার—প্রাতরাশের পর টেম্প্‌লে যাইবার সময় মিসেস হ্যালামকে বলিল, "আজি আমি টেম্প্‌লেই ডিনার খাইব। পরে আলস্‌কোর্ট এগ্‌জিবিশন দেখিতে যাইবার ইচ্ছা আছে।"

মিসেস হ্যালাম বলিলেন, "বেশ। ট্রেনে ফিরিবে কি? না ক্যাব্ লইয়া আসিবে?"

নরেন বলিল, "না, ট্রেনেই ফিরিব। পাঁচ পেনির স্থানে আড়াই শিলিং খরচ করিব কেন?"

মিসেস হ্যালাম বলিলেন, "আচ্ছা তোমায় টাইম্ টেবেল দেখিয়া বলিয়া দিতেছি শেষ ট্রেন কখন।" বলিয়া মিসেস হ্যালাম টাইম টেবেল আনিয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ দিকের শেষ ট্রেন ১১টা ৩৭ মিনিটে ছাড়িবে, ১২টা ৫ মিনিটে এখানে পৌঁছিবে।"

নরেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সময়টা টুকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

টেম্প্‌লে যখন ডিনার শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। অপর দুইজন যুবকের সহিত সে টেম্প্‌ল ষ্টেশন হইতে আর্লসকোর্ট যাত্রা করিল।

প্রতি বৎসরের মধ্যে ছয় সাত মাস ধরিয়া আর্লস্‌কোর্ট স্থায়ীভাবে এগ্‌জিবিশন হইয়া থাকে। ইহা কৃষি বা শিল্প বা পশ্বাদির এগ্‌জিবিশন নহে। ইহা প্রধানতঃ আমোদের এগ্‌জিবিশন। প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি সাড়ে এগারটা অবধি খোলা থাকে। রাত্রেই চমক বেশী। তখন সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠে। লণ্ডনের সর্ব্বস্থান হইতে রেলগাড়ী সহস্র সহস্র নর-নারী বোঝাই করিয়া আনিয়া এই আমোদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ধনী আসে, দরিদ্র আসে, পণ্ডিত আসে, মূর্খ আসে, সাধু আসে, অসাধু আসে, পাদ্রী আসে, নাস্তিকও আসে। যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি সে সেইরূপ আমোদ বাছিয়া লইতে পারে।

নরেনের সাথী দুইটির নাম রায় এবং চ্যাটার্জ্জি। ইহারা পৌঁছিয়া নানা আমোদে যোগ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। পানশালায় প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণও চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল।

একস্থানে একটা বৃহৎ কৃত্রিম "লেক" আছে, তাহার তট বেষ্টন করিয়া শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত অসংখ্য বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোকচ্ছটা জলে পড়িয়া জল ঝল্‌মলায়মান। লেকের একপ্রান্তে water-chute-এর তীব্র আমোদ চলিতেছে। তীর হইতে অনেকটা উচ্চ করিয়া একটা বেদী নির্ম্মিত আছে। সেই বেদীর উপরিভাগ হইতে জল পর্য্যন্ত ঢালুভাবে গাঁথা। সেই ঢালুস্থানের উপর দুই সেট্‌ রেল পাতা আছে। চক্রযুক্ত বোটে মানুষ বসাইয়া বেদী হইতে সেই রেলের উপর ছাড়িয়া দিতেছে। বোট নামিতে নামিতে প্রতি মুহূর্ত্তে গতিবল সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। বোট জল স্পর্শ করিয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত জলের উপর দিয়া বায়ুর উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া তীরবৎ বেগে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে—তাহার পর আরও অনেকদূর জলের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গতিবেগ প্রশমিত হইলে বোটকে তীরে লাগাইয়া লোক নামাইয়া দিতেছে। আবার সেই বোট কলের সাহায্যে বেদীর উপর উঠিতেছে—আবার লোক বোঝাই হইয়া নামিতেছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বোট। এক মিনিট অন্তর একখানা করিয়া নামিতেছে এবং আরোহী স্ত্রীলোকগণের ভয়োল্লাসমিশ্রিত তীব্র চীৎকারে নৈশবায়ু যেন শাণিত তরবারি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে।

যুবকত্রয় water-chute অভিমুখে.অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূরে কয়েকটা যুবতী, লেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। রায় বলিল, "Let's pick up some of these girls."

চাটার্জ্জি বলিল, "Let's একা একা ওয়াটার-শুটে কোনও fun নেই। Let's go and speak to them."

নরেন বলিল, "নন্‌সেন্স। উহারা যদি ভাল মেয়ে হয়?"

রায় বলিল, oh, they are game. ওদের পোষাক দেখছ না?"

নরেন বলিল, "না-না।"

"Just for a lark"—বলিয়া চাটার্জ্জি তাহাদের নিকট গিয়া হ্যাট্‌ উত্তোলন করিয়া বলিল, Good evening."

Good evening. How d'ye do?"—বলিয়া তাহারা হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

রায় বলিল, "Been on the water-chute?

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "Not this evening."

"Come along then"—বলিয়া রায় ও চাটার্জ্জি দুইটা যুবতীকে আহ্বান করিল। নরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাটার্জ্জি নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদিগকে বলিল, "Won't one of you girls come with my shy little friend?"

একজন অল্পবয়স্কা অগ্রসর হইয়া বলিল, "I'll have him"—বলিয়া নরেনের কাছে আসিল। "Trot along, my beauty"—বলিয়া নরেনকে টানিয়া লইল।

রায় ও চাটার্জ্জি নিজ নিজ সঙ্গিনীর বাহুর সহিত বাহু সম্বদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নরেন, তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে মাত্র।

এক এক শিলিং দিয়া টিকিট কিনিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক। পুলিশ দুই দুই করিয়া ভীড়কে সারিবদ্ধ করিয়া দিতেছে। উপর হইতে যেমন একখানি করিয়া বোট নামিতেছে, সম্মুখে খালি হইতেছে, অমনই পশ্চাতের লোক

একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নরেন ও তাহার সঙ্গিনী, দলের অপর যুগলদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। যে বোটে নরেনের উঠিবার পালা আসিল, তাহার সঙ্গীরা তাহার দুই বোট পূর্ব্বে নামিয়া গিয়াছে।

বোট লম্বা ধরনের, তাহাতে অনেক সারি। প্রত্যেক সারিতে দুই-দুই জনের বসিবাব স্থান। ইহারা দুইজনে বোটে উঠিল। এখনই বোট নামিবে।

নরেনের সঙ্গিনী বলিল, "আমার বড় ভয় করিতেছে। আমার বাহু তোমার বাহুতে বদ্ধ করিয়া লও।"—নরেন তাহাই করিল।

Sit tight—বলিয়া বোট নামাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে ইহারা যখন তীরে অবতরণ কবিল, তখন দলেব বন্ধুরা হাবাইয়া গিয়াছে। নরেন একটু খুঁজিল। তাহাব সঙ্গিনী বলিল, "তাহাদের জন্য কি ভারি কাতব হইয়াছ?"

নরেন বলিল, "না।" আমিও না।"

তখন দুইজনে বাহুসম্বদ্ধভাবে ভীড় ছাড়িয়া চলিল।

নবেন জিজ্ঞাসা কবিল, "তোমার নাম কি?"

"ক্লারা ব্রুকস্।"

ক্লারা বলিল, "দেখ, ওয়াটাব-শুট আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমি ভারি নার্ভস্। আমাব বুক দুড় দুড় কবিতেছে।"

"তবে আসিলে কেন?"

আবক্তিম ওষ্ঠ দুখানি ফুলাইয়া, কাঁদকাঁদ স্ববে ক্লারা বলিল, "Oh how cruel of you! তোমাবই সঙ্গলাভের জন্য।"

নরেন দেখিল, বাস্তবিকই তাহাব গা কাঁপিতেছে। বলিল, "চল গিয়া কিছু পান কবা যাউক। তাহা হইলে তুমি সুস্থ হইবে।" "চল।"

দুইজনে তখন কথা কহিতে কহিতে, একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ পানশালাটি একটি খোলা হলের মত, তাহার ভিতর বহুসংখ্যক ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া অনেক নর-নারী পান করিতেছে। সম্মুখে খানিকটা স্থান খোলা,—একটু বাগানের মত। সেখানে আকাশেব নিম্নে এখানে ওখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গোলাকাব মার্ব্বলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লাবা ও নরেন একটু নিভৃতে, অল্পালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমেব প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল, "কি হুকুম করিব?" "ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ওয়েটার রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির করিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনালী রঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার আগ্নেয় মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

দুইজনেই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল, "আর এক গ্লাস করিয়া হুকুম করিব?"

ক্লারা বলিল, "আমি আর চাহি না। আমি এক গ্লাসের বেশী stand করিতে পারি না। আর তুমি?"

নরেন বলিল, "দেখি হিসাব করিয়া। টেম্পলে ডিনারে বোধ হয় তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি ঠিক মনে নাই।"—বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে গ্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে,—তখন কিয়দ্দূরে একব্যক্তি হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘাড় তুলিয়া দেখিল, তিন মিনিট মাত্র বাকি আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া ভীড় অতিক্রম করিলে ক্লারা তাহাকে বলিল, "What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Won't you look in and have a drop?"

নরেন বলিল, "না—ধন্যবাদ, আমায় শেষ ট্রেনে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল, What an awful baby you are! Will mamma be cross if you stay our late? Come along you silly dear!"

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, "এখনই আমায় যাইতে হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া তাহার হস্তে একটি হাফ ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল, "কাল তবে এগজিবিশনে আসিবে?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে?"

"আসিব।"

নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল, "Good night—Pleasant dreams."

Then I must dream of you, Clara, Good night"—বলিয়া নরেন ট্রেন ধরিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নরেন দেখিল তাহার নামীয় কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল। সেগুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠিগুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাবি দিয়া মোমবাতিটি লইয়া সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল।

শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, ক্লারার মুখ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্বর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক একবার আপশোষও হইতে লাগিল। ভাবিল, কাল আবার নিশ্চয় যাইবে—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পরদিন প্রভাতে নরেন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করিবার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া "নক্" করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "Please Mr. Ghose, মিসেস হ্যালাম জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না?"

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া, আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ আমায় পাঠাইয়া দেন।"

কয়েক মিনিট পরে দাসী আবার বাহির হইতে বলিল, "আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেস হ্যালাম দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া চলিলাম।"

দাসী নামিয়া গেল। কোনও ক্রমে নরেন উঠিয়া, দুয়ার খুলিয়া প্রাতরাশের ট্রে টানিয়া লইল। বিছানার কাছে টীপয়ের উপর তাহা রাখিল। কিছু খাদ্য এবং গরম চা-টার সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থবোধ করিতে লাগিল।

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা পড়িল, "May I come in, Ghose?"—বৃদ্ধ মিষ্টার হ্যালামের কণ্ঠস্বর। "Come in."

মিষ্টার হ্যালাম প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে? কি অসুখ?"

"Very kind of you to come and enquire, Mr, Hallam. এমন কিছু অসুখ নাই। একটু run down মত অনুভব করিতেছি।"

অসুখটা যে কি, মিষ্টার হ্যালামের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "Gay young dog! I can see what you have been up to."—পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "Bad, very bad."

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; শেষে বলিলেন, "ঘুমাও।"—বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা বারটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্ক অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।

একে একে তাহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল। মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল—"কি করিতে যাসিয়াছিলাম। আমি ত চূড়ান্ত অধঃপতনের সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।"—লণ্ডনে যে দিন পৌঁছিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা, নিজের সমস্ত কার্য্যকলাপ, একে একে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়, অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে যেন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। নিজের ভূতজীবনের কথা স্মরণ করিতে করিতে সহসা নির্ম্মলার মুখখানি মনে পড়িল। বিদায়ের দিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি। সেই বিদায়ের ক্ষণে যদি কোনও দেবতা তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎজীবনের এই দৃশ্যগুলি দেখাইয়া দিত, তবে সে বিলাতে আসিতই না। নিজের উপর তখন তাহার কি অগাধ বিশ্বাস ছিল! সে বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ এখনও নিজের দুর্বলতা অপদার্থতা স্মরণ করিয়া তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিল। নির্ম্মলাকে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গত রাত্রের সেই পত্রগুলির কথা স্মরণ করিয়া লইল। সে ত ভারতবর্ষীয় ডাক। উঠিয়া কোটের পকেট হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া আনিল। কই, এবার ত নির্ম্মলার পত্র নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ীর কাহারও পত্র নাই। একি হইল? তবে নির্ম্মলার পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে—তাই নির্ম্মলা পত্র লিখিতে পারে নাই? নির্ম্মলা আজ দুই মাস পীড়িত, কিন্তু চিঠি ত কোনও মেলেই বন্ধ যায় নাই। যেমন করিয়া হউক অন্ততঃ দুই এক লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে। তবে কি নির্ম্মলা বাঁচিয়া নাই? নিজের প্রতি ধিক্কারে মনে হইল,—"যদি তাহা হয়, তবেই আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়।" আবার বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অশ্রুপাত করিল। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা, কিছুতেই নির্ম্মলার মৃত্যু-কল্পনা করিতে চাহিল না। সে আশা করিতে লাগিল, চিঠির গোল হইয়া থাকিবে, আগামী মেলে নির্ম্মলার দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিবে। ক্রমে দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল—দাসী দুয়ারে ধাক্কা দিতেছে।—"মহাশয়, আপনার জন্য একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।"

নরেন বলিল, "নেলি, দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ফেলিয়া দাও।"—দাসী তাহাই করিয়া চলিয়া গেল।

নরেন টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, চারুর নিকট হইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ সন্ধ্যাবেলা নরেন গিয়া Hotel Cecil-এ তাহার সহিত ডিনার খাইতে পারে কি না।

টেলিগ্রাম পড়িয়া নরেন ভাবিল, তবে নির্ম্মলা সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই। মন্দ সংবাদ কিছু

থাকিলে, চারু তাহার বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিত এবং তাহাকে ভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করিত না।

নিজের প্রতি বিরাগ আবার তাহার মনে উথলিয়া উঠিল। ভাবিল, "এখন আমার শরীরের উপর অ্যালকোহলের শেষ ফল, অবসাদের প্রভাব বর্ত্তমান। এই অবসন্ন অবস্থায় আমার মনে অনুতাপ প্রভৃতি যাহা উদিত হইয়াছে, আমার শোণিত আবার স্বাভাবিক সবলতা প্রাপ্ত হইলে তাহা টিকিবে কি? হয় ত আবার এ সব ভুলিব, প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িব, অধঃপতনের সোপানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিব। এখন আমার এরূপ অবস্থা; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবাব যে আর্লসকোর্টে ছুটিব না, তাহা কে বলিতে পারে? নিজের প্রতি আমার আর তিল মাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। আমার আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই।"—আবার সে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিছানায় মুখ লুকাইল।

চিন্তা করিয়া দেখিল, এই যে চারু আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এটা বড় পরিত্রাণ। আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম করিব। সেখানে গেলে, আজ আর্লসকোর্টে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আজিকার মত অন্ততঃ পরিত্রাণ হইবে। তাহাই লাভ।

এই ভাবিয়া নরেন স্নান করিতে এল। স্নানান্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চারুকে টেলিগ্রাম পাঠাইল।

সন্ধ্যাবেলা হোটেল সেসিলের একটি কক্ষে চারু তাহার দাদা ও বউদিদি এবং নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন। বউদিদি বলিলেন, "চারু, আমার চিঠি তুমি কখন পেলে? মার্সেলস্ দিয়ে আসায় চিঠি তুমি একদিন আগে পাবে বলে তাড়াতাড়ি খালি দু ছত্র লিখে দিয়েছিলাম।"

চারু বলিল, "আমি আপনার চিঠি কাল রাত্রে পেলাম।"

"নির্ম্মলা আমাদের সঙ্গে আসছে, তা ঘুণাক্ষরেও নরেনকে জানাওনি ত? আগে ত কিছু ঠিক ছিল না। ছাড়বার দুই একদিন আগে নির্ম্মলার মা এসে বললেন, ডাক্তার বলছে সমুদ্রযাত্রায় নির্ম্মলার শরীরে খুব উপকার হবে, তা তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। নরেনকে একটা খুব pleasant surprise দেবার জন্যে নির্ম্মলাকে বারণ করে দিলাম, তুই নরেনকে কিছু লিখিসনে।'তোমাকেও তাই লিখলাম, কিছু নরেনকে যেন বোলো না। কেবল কৌশলে তাকে নিয়ে এস।"

চারু ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "আর ত দেরী নেই। সাতটা বেজেছে। এখনই নবেন এসে হাজির হবে।"

বউদিদি বলিলেন, "এ মেলে নির্ম্মলার চিঠি না পেয়ে আহা বেচাবি হয় ত কত ভেবেছে! তা এখনই তার সকল কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ফুট্‌ম্যান দুয়ার খুলিয়া, নত হইয়া বলিল—"মিষ্টার ঘোষ।"

চারু নির্ম্মলার হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নরেন প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রসর হইয়া গেল, রঙ্গ করিয়া স্মিতমুখে বলিল—Allow me to introduce, Mr, Ghose—Mrs, Ghose."

[আষাঢ়, ১৩১১]

ফুলের মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগবের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশনাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটি মাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস্ আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডাব দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্ত্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূবে আব একখানি টেবিলেব প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরাজ-বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিবাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেব কোন নূতনত্ব নাই, কাবণ শ্বেতদ্বীপে আমাদের চমৎকার দেহবর্ণটিব প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে এবং মনোযোগেব অংশ, প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপব পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে এমন ভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস্ আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহিব হইবার দরজার নিকট আফিস আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসবণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহাব মূল্য প্রদান করিয়া, কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভাবতবর্ষীয়?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদাই এখানে আসেন?"

"বোধ হয় না। আব কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবাব কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন? ব্যাপার কি? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেস্‌কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেব জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি?"

"হয়ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আচ্ছা, কে বালিকা? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে বিশেষতঃ ষ্ট্র্যাণ্ডে অনেক দোকানে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়।* অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেন্‌সিল ছবিপোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম—"Good afternoon."

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল—"Good afternoon, Sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষীয়?" "হ্যাঁ"।

"আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি কি নিরামিষভোজী?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কেন বল দেখি?"

"আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

---

* ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধও বটে। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য, খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walker দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে—"Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, বারম্বার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল Shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপছন্দ হইলেও তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।—লেখক।

"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি ; তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও?"

"না, অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেইজন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা কবিতেছেন আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয়?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, "না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত?"

বালিকা একটি মৃদুরকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, "মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহাব মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না; অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রেব কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমাব কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম, "চল না—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মার নিকট আমায় পবিচিত করিয়া দিবে?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, "Thank you ever to much,—it would be so kind of you! এখন আসিতে পারিবেন কি?"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত?"

"না—না, মোটেই না। আজ অপরাহ্ণ আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটি কি জানিতে পারি?"

"আমার নাম অ্যালিস মার্গারেট ক্লিফর্ড।"

রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"ওঃ হে—তুমিই Alice in Wonderland-এর অ্যালিস বুঝি?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষুস্থির করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিতাম, এমন কোনও ইংরাজ বালিকা নাই, যে Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই। বলিলাম, "সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই?"

"না, আমি ত পড়ি নাই।"

বলিলাম, "তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট.মার্টিন্স চার্চের পাশ দিয়া চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া হু হু করিয়া বৃহদাকার দ্বিতল অমনিবস্‌গুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম, "এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্টমিনষ্টার বাসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল, "চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না?"

"না, আমি ত রোজই বাড়ী চলিয়া যাই।"

কোথায় সে কর্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজ হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁক আছে কিনা। যেমন রেলগাড়ীতে উঠিয়া সহযাত্রীকে, "কোথায় যাইতেছেন, মহাশয়?" জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে "অধিকদূর যাইবেন কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে, "আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।" ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, "না এমন বেশী দূর নয়।" আমার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহার পর্দ্দা বজায় রহিল। সেই হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি?"

বালিকা বলিল, "হাঁ। আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোর্সে টাইপরাইটারের কাজ করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "চল ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম।" বলিয়া তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা পার করিয়া দিলাম।

টেমস্‌ নদীর উত্তর কূল দিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম, "তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও।"

বালিকা বলিল, "না, এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, তথাপি ময়লা কাপড়পরা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি তাই ষ্ট্র্যাণ্ড এবং হোয়াইট হল দিয়াই বাড়ী যাই।"

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরাজ জাতির সৌন্দর্য-প্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েস্টমিষ্টারের ব্রিজের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমি বলিলাম "তোমাকে কি অ্যালিস বলিয়া ডাকিব, না মিস ক্লিফর্ড বলিব?"

মৃদু হাসিয়া বালিকা বলিল, "আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।"

"তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত?" "হ্যাঁ।"

"কেন বল দেখি?"

"বড় হইলে আমি কর্ম্ম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার মা বৃদ্ধা হইয়াছেন।"

"তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত?"

"না। আমার কর্ম্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম্ম করিতে চাহি, যাহাতে আমার মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারির কাজ।"

হাউসেস অব পার্লামেন্টের নিকট পুলিসপ্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজ পার হইয়া, আমরা ল্যাম্বেথে গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী। ম্যাগি বলিল, "আমি যদি কখনও সেক্রেটারি হইতে পারি, তবে মাকে এ পাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।"

ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাকনাম হইল কেন?"

ম্যাগি বলিল, "আমার মার প্রথম নামও অ্যালিস, তাই আমার পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।"

"তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন না, ম্যাগ্‌সি বলিয়া ডাকিতেন?"

"যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগ্‌সি বলিয়াই ডাকিতেন। আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "হাঁ হাঁ, আমরা ভারতবর্ষীয় কিনা, আমাদের যাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।"

বালিকা বলিল, "তাহা আমি শুনিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বটে। কি শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাহাদিগকে ইয়োগী (Yougi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন।"

"কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?"

"ইয়োগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।"

"তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি নিরামিষভোজী কি না?"

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সঙ্কীর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ল্যাচ-কী বাহিব কবিয়া ম্যাগি দবজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, "আসুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি প্রবেশ করিলে ম্যাগি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সিঁড়ির নিকট গিয়া একটু উচ্চস্বরে বলিল, "মা, তুমি কোথা?"

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "আমি রান্নাঘরে রহিয়াছি বাছা, নামিয়া আইস।"

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘব, প্রায়ই রাস্তার সমতলতা হইতে নিম্নে হয়।

মার স্বর শুনিয়া আমার প্রতি চাহিয়া ম্যাগি বলিল, "Do you mind?"

আমি বলিলাম, "Not in the least, চল।"

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে নামিয়া গেলাম।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল, "মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কই তিনি?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিত মুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do?"—বলিয়া আমি করপ্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।" বলিয়া নিজ হস্ত প্রসাবণ করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "আজ শনিবার তাই কেক্ প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যাবেলা লোক আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

দরিদ্রপল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলাগাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কাবণ সেইদিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসারের* উপর ময়দা, চর্ব্বি, কিসমিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। টিনের আধারে সদ্য পক্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "গরীব মানুষের পাকশালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে? আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনই আসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "না না। আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক্ তৈয়ারী করিতেছেন ত!"

মিসেস ক্লিফর্ড সস্মিতমুখে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল, "মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়া দেখিবেন?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক্ তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয়?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?"

"নিরাপদ বইকি। তবে এদেশেব মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।"

"আব জ্বর?"

"জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্বত্র নহে এবং সব সময়েও নহে।"

"আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক-পুরুষ। পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয়?"

"পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক্ তৈয়ারী শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন, "ম্যাগি, তুই মিষ্টাব গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।"

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাবপত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেঝের উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে-স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দ্দাগুলি সরাইয়া, জানালাগুলি খুলিয়া দিল। একটি কাচে আবৃত পুস্তকের কেস ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে কবিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান কবিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প বলিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস্ অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন ইহাতে সিমলা-শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরেব পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"To Maggie on her birthday from her loving brother Frank."

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি, সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না।"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন নাকি? কই ম্যাগি কী রকম আংটি দেখি?"
ম্যাগি বলিল, "সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল।" বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটিতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া, আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়াচিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না। আপনি হিন্দু আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম কুসংস্কারের শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং একটুকরো সাধারণ কাচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?"

মিসেস ক্লিফর্ড ও ম্যাগিব আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "কই, আমি ত কিছু দেখিলাম না।"

মাতা, কন্যা উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট কবিবাব জন্য বলিলাম, "ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমাব বুঝি ম্যাগি?"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "হ্যাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দে না ম্যাগি।"

ম্যাগি তাহাব মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল—"Oh, mother!"

আমি বলিলাম, "ম্যাগি, একটা বাজাও না। আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন আছে সেও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল, "আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন?"

"আমি ফরমাস করিব? আচ্ছা তাহা হইলে তোমার music-case লইয়া এস—কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ায় নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস বাহির করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা "Goodbye Dolly Grey", "Honeysuckle and the Bee" প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থই ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাসান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা, "Annie Laurie", "Robin Adair", "The Last Rose of Summer", ইত্যাদি। দেখিলাম, কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই "Blue-bells of Scotland" নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালা বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর করিয়া গানটি গাহিতে লাগিলাম—

'Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone !"

বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র। যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে উহাকে lesson লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না।"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। বলিল, "কি বাজাইব নির্দ্দেশ করুন।"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখিন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটা যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Ground কর্ত্তৃক বিরচিত Faust-নামক Opera হইতে Flower-song গান-হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম, "এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তব অবধি প্রবেশ কবিয়াছে ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দব বাজাইল—অথচ সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকামাত্র। ভাঁবিলাম, কলিকাতায় কোনও দিগ্‌গত ব্যাবিষ্টাব বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোব ফাউণ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দবভাবে বাজাইতে পাবিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটিও কি তুমি নিজে শিখিযাছ?"

"না। এটি আমি নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিন্‌ষ্টাবেব কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেবা শুনিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "না। আমি অপেবায় কখনও ফাউণ্ট শুনি নাই। তবে গইটেব ফাউণ্টেব ইংরাজি অনুবাদ, লাইসীয়মে অভিনয় দেখিযাছি বটে।"

"লাইসীয়মে? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন?"

"হাঁ। তুমি কখনও আর্ভিং-এর অভিনয় দেখিয়াছ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল, "না, আমি কোন ওয়েষ্ট-এণ্ড থিয়েটার কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবিব দোকানের জানালায় তাঁহার ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিংলাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয় যাই।"

মিসেস ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপ সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন না অপবাহ্নেব অভিনয়?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটার সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটারের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে "হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড"—কাল নাটকান্তবে "হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আমোদের ফোয়ারা" উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ সেখানে থিয়েটারে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া) ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই "ম্যাটিনে" অর্থাৎ অপরাহ্ন-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিবেটাবে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি দর্শকের অভাব না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপ

কোনও নাটক দুই তিন বা ছয় মাস—বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে এমন কি দুই তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ণ-অভিনয়ই সুবিধা। এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম। সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনিবারের জন্য পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহা যদি কেনেন তবে, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

আমি বলিলাম, "না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন? আপার সার্কলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নই—ভাল কথা, Merchant of Venice পড়িয়াছ।"

"মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ কবিলাম।

সোমবাব দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়নেব বক্স-অফিসে গিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "আগামী শনিবার অপরাহ্ণ-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপাব সার্কেলেব টিকিট দিতে পারেন?"

কর্ম্মচারী বলিল, "না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবাব দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

"তৃতীয় শনিবার?"

"সেদিন দিতে পারি।"—বলিয়া সে ব্যক্তি, সেই তাবিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। দেখিলাম সে তারিখেও আপার সার্কেলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া, পরস্পবের সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিনখানি টিকিট ক্রয় করিয়া বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে India Rajah নামক হস্তীর পৃষ্ঠে অন্যান্য বালকবালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছে। হাতী চড়িয়া তাহার খুসীর আর সীমা নাই।

এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে না। একদিন মিসেস ক্লিফর্ডেব অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেন্টে ফ্রাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত-সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস ক্লিফর্ড চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত,

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ কাল কর্ম্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি দয়া করিয়া যদি একবার আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব। ম্যাগি

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "Oh, thank you Mr. Gupta, It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আপনার নিকট আমার ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ম্যাগি?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই?—ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই জানেন। পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে, ইহাব দশা কি হইবে? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা, এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা?

আমি জোব করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিযা দিলাম। বলিলাম, "ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙমুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল, "মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি? কি প্রস্তাব?"

"গতকল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকেব প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয়ত ফ্রাঙ্কের কোন সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন।—আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, "কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয়?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, "মিষ্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন, ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে

আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমাব সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ম্যাগি তুমি চুপ কর, কাঁদিও না। কই সে অঙ্গুরীয় দাও একবাব ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা কবিবেন।"

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, "যাও, তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কি না।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মা জাগিয়াছেন। আপনাব আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাবি?"

"আসুন।"

বৃদ্ধাব রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাব হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস ক্লিফর্ড, আপনাব পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধ তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, "আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, "হাঁ মিসেস ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।'

বৃদ্ধাব মস্তক আবাব উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহাব চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্ববে বলিতে লাগিলেন, "God bless you-- God bless you."

মিসেস ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার দেশে ফিবিযা আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবাব ইচ্ছা হইল, ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহাব জননীব নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবাব এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইযাছে। মাসখানেক হইল, কালো বর্ডাব দেওযা চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব কবিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম তাঁহাব পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহাব পূর্ব্বেই ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কাবণে মিসেস ক্লিফর্ডেব নিকট আমাব আব মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া, ম্যাগি ও তাহাব মাতাব নিকট বিদায় বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অদ্য দেশযাত্রা করিব। পবিবাবস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময় বহির্দ্বাবে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পবে দাসী আসিয়া বলিল, "Please Mr. Gupta, মিস ক্লিফর্ড আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয নাই। বুঝিলাম ম্যাগি আমাব নিকট বিদায়গ্রহণ কবিতে আসিয়াছে। পাছে তাহাব কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায, তাই আমি তখনই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পবিচ্ছদে, দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া বহিয়াছে।

নিকটেই পাবিবারিক লাইব্রেবী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিযা বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, "আপনি আজ চলিলেন?"

"হাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবাব দিন।"

"দেশে পৌঁছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন্ স্থানে আপনি থাকিবেন?"

"আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর?"

"না, অধিক দূর নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মনুরোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল।

বলিলাম, "আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন কবিয়া, তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না?"

"কি কষ্ট? কি অসুবিধা? আমি যেখানে থাকিব, সেখানে হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয়ই একবার সুবিধামত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।"

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া, আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।"

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বালিকার এই বহু কষ্টার্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদেব দেশে ফুল যেখানে সেখানে অজস্র পবিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখটুকু ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম, "ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া, তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।"

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye;—পত্রাদি যেন পাই।"

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজহস্তে লইলাম। বলিলাম—"Good bye Maggie—God bless you";—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল। চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম। [ভাদ্র, ১৩১১]

পুনর্মূষিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল। বারীন্দ্রনাথের সান্ধ্যাভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আটটা বাজিয়াছে—কিন্তু এখনও লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। জুন মাসে বাত্রি নয়টার পূর্ব্বে অন্ধকার হয় না।

বারীন্দ্রনাথ বেজ্ওয়াটারে থাকিত, আইন পড়িত—অন্ততঃ আইন পড়িবার জন্যই তাহার খুড়া মহাশয় তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। সে দুই বৎসর আসিয়াছে—কিন্তু এখনও কোনও পুস্তকাদি ক্রয় কবিবার কিম্বা আইনের বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা কবিযাছে। এবাব দেশ হইতে টাকা আসিলেই সে দুই একখানি আইনের বহি ক্রয় করিবে এবং গ্রীষ্মের বন্ধের পর টার্ম আরম্ভ হইলেই বীতিমত লেক্চব শুনিতে যাইবে। অধিক কি, সে আজ দুই সপ্তাহ কোনও থিযেটাবে যায় নাই এবং গত ববিবাব মিস ম্যানিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিযা আসিয়াছে।

ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া টেবিল পরিষ্কার কবিতে লাগিল। সিগারেট মুখে বাবীন্দ্র বলিল—"মিসেস ব্রাউন।"

"কি মহাশয?"

"আমাকে দশ শিলিং ধাব দিতে পাব?"

এপ্রন-বস্ত্রে হাত মুছিতে মুছিতে মিসেস ব্রাউন বলিল, "দশ শিলিং? মিষ্টাব চ্যাটার্জ্জি আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আমাব কাছে ত নাই। তিন সপ্তাহ আপনাব বিল বাকী পড়িয়া গিযাছে—সেই জন্য আমাকে অনেক কষ্টে চালাইতে হইতেছে। দুধওয়ালা দাম লইতে আসিযাছিল, তিনবাব ফিবাইযা দিয়াছি। মাংসবিক্রেতাকে—"

বাবীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "মিসেস ব্রাউন।"

"মহাশয়?"

"ও সব আমাকে বলিযা কোন ফল আছে কি? দেখ, আগামী সপ্তাহে দেশ হইতে আমাব টাকা আসিবে। কুড়ি পাউণ্ড আসিবে, এক আধ টাকা নয। তোমাব বিশ্বাস না হয, এই দেখ আমাব বাড়ীব চিঠি।"

বলিযা, পকেট হইতে একখানা বাঙ্গলা চিঠি বাহিব কবিয়া বাবীন্দ্র সগর্ব্বে মিসেস ব্রাউনের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহাব পব মুখ টিপিয়া টিপিযা হাসিতে লাগিল।

মিসেস ব্রাউন পত্রখানা লইয়া আলোকের নিকট ধবিযা উল্‌টিযা পাল্‌টিযা দুই মিনিট কাল নিবীক্ষণ কবিল। শেষে বলিল, "এ কোন্ ভাষা মহাশয়?"

"কোন্ ভাষা কি? বাঙ্গালা—বাঙ্গালা—পড়িতে পাবিতেছ না?"

"বাঙ্গলা? Dear me!—তা, আমি কি বাঙ্গলা জানি মহাশয়?"

"বাঙ্গলা জান না?"

"না মিষ্টাব চ্যাটার্জ্জি।"

"I see—আমি মনে করিতাম তুমি বাঙ্গলা জান বুঝি। আচ্ছা, সেই স্থানটা তোমার অনুবাদ কবিযা শুনাইতেছি।"

বলিয়া, বাবীন্দ্র উঠিয়া ল্যাণ্ডলেডির নিকট গেল। পত্রখানি লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই দেখ—এই লেখা রহিয়াছে—এখানে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। ববফের সের এক টাকা কবিয়া।'—দেখিতেছ ত?"

মিসেস ব্রাউন সংশয়ের সহিত বলিল, "দেখিতেছি বটে।"

বারীন্দ্র বলিল, 'ইহার অনুবাদ—I am sending you twenty pounds next week—দেখ এখন বিশ্বাস হইল ত? যাও, তোমার কাছে না থাকে, তোমার স্বামীব নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া দাও। আগামী সপ্তাহে দিব্য একখানি ভারি গোছের চেক পাইবে।"

মিসেস ব্রাউন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "এখনই চাই কি? কাল সকালে দিলে হইবে না?"

বারীন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিল, "The idea! দেখ, আজ রাত্রি নয়টার সময় মিস্ ম্যানিংয়ের Soiree-তে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি কি সান্ধ্যবেশ পরিয়া; সাধারণ লোকের মত অমনিবসে আরোহণ করিয়া যাইব? আমার ক্যাব চাই।"

"কোথায় যাইবেন মহাশয়?"

"মিস্ ম্যানিংয়ের Soiree-তে। 'Soiree' কাহাকে বলে জান?"

"কখনও শুনি নাই ত।"

"ঈভনিং পার্টি শুনিয়াছ? সেই তাই। ফরাসী ভাষায় সোয়ারি বলে।"

সবিস্ময়ে মিসেস ব্রাউন বলিল, "Dear me!"

"যাও যাও যাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া আসি।"

"আচ্ছা যাই।"

"আর, আমার এই বসিবার ঘরে খানকতক বিস্কুট আর একটু হুইস্কি রাখিয়া দিও। সেখানে সুন্দরী মহিলাগণের সহিত প্রেমালাপ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিব। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবে; বুঝিলে?"

"আচ্ছা, রাখিয়া দিব এখন।"

মিসেস ব্রাউন অন্তর্হিত হইয়া গেল। বারীন্দ্রও গুণগুণ স্বরে গান করিতে করিতে সান্ধ্যবেশ পরিধান করিবার জন্য নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি নয়টার পর, বারীন্দ্রনাথের ক্যাব্ আসিয়া ইম্পীরিয়ল ইনষ্টিট্যুটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ইহা একটি প্রকাণ্ড বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার বহু বিভাগ আছে, অনেক হল আছে। "জাহাঙ্গীর হলে" মিস্ ম্যানিংয়ের সান্ধ্যমিল-সভা সমবেত। মিস্ ম্যানিং মাঝে মাঝে এইরূপ মিলন-সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। লণ্ডন-প্রবাসী সকল ভারতবর্ষীয়গণেরই নিমন্ত্রণ হয়। বহুসংখ্যক ভারতহিতৈষী তদ্দেশবাসী পুরুষ ও মহিলারও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিছু আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত থাকে। এই সভার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষীয়গণের সহিত তথাকার বিশিষ্ট সমাজের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া।

ক্যাব্ হইতে অবতরণ করিয়া বারীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ি হইতেই আলোকের উচ্ছ্বাস তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। নর-নারীর মৃদু-আলাপের গুঞ্জনধ্বনিও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল, সেই সুপ্রশস্ত হল বহুজনাকীর্ণ। মহিলাগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য নয়নলোভনীয়। দেখিল, একস্থানে একজন ভারতবর্ষীয় মহারাজা, প্রাচ্যবেশে সুসজ্জিত হইয়া কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত সদালাপ করিতেছেন। অন্যত্র, ভারতবর্ষের একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর, একটি পার্সী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত হাস্যালাপে নিযুক্ত। অধিকাংশ লোকই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়াও বেড়াইতেছেন। এখানে ওখানে কয়েকখানি মখমলমণ্ডিত দীর্ঘাসনও রহিয়াছে—কেহ কেহ সেখানে গিয়াও বসিতেছেন।

বারীন্দ্র প্রবেশ করিয়া প্রথমে মিস ম্যানিংকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে, হলের এক স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিস্ ম্যানিংয়ের পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহার্ঘ পরিচ্ছদ। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও হাস্যোদ্ভাসিত। তাঁহার শুক্ল কেশগুচ্ছ বিদ্যুতের আলোকে অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত।

বারীন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ দেখিয়া সুখী

হইয়াছি।" আরও দুই চারিটি এইরূপ স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ করিয়া তিনি বারীন্দ্রকে কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

বারীন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিল। এমন সময় হলের এক প্রান্তে বেহালার শব্দ উত্থিত হইল। একজন ইংরাজ মহিলা, সার এডুইন আর্ণল্ড রচিত একটি ভারতবর্ষীয় কবিতার অনুবাদ সুরসংযোগে গান করিলেন।

ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বারীন্দ্র দেখিল তাঁহার একটি বন্ধু, ভুবনচন্দ্র দত্ত, একজন বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলার সহিত আলাপ করিতেছে। বারীন্দ্রকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মহিলাটির নিকট পরিচিত করিয়া দিল, "মিষ্টার চাটার্জ্জি—মিস্ টেম্পল।"

মিস্ টেম্পল একটি দীর্ঘাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি বারীন্দ্রকে বলিলেন, "আসুন,—আমার কাছে উপবেশন করুন।"

বারীন্দ্র উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন।"

"আমি আসিয়াছি আধ ঘণ্টা হইবে। আপনার নামটি কি ভাল শুনিতে পাইলাম না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমার নাম চ্যাটার্জ্জি।"

"চাটার্জ্জি? চাটার্জ্জি? চ্যাটোপাড়িয়া? আপনি ব্রাহ্মণ?"

"তাহাই বটে। আপনি সব জানেন দেখিতেছি।"—বলিয়া বারীন্দ্রনাথ হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল তাহার কৌতুকহাস্য মোটেই লক্ষ্য না করিয়া, স্বীয় যুগ্মহস্ত প্রাচ্যভাবে ললাটের নিকট উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "নমস্কার।"

হাসিতে হাসিতে বারীন্দ্রনাথও বলিল, নমস্কার—নমস্কার! আপনি এ সব শিখিলেন কোথা?"

ভুবন দত্ত বলিল, "মিস্ টেম্পল যে সম্প্রতি ভারতভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।"

বারীন্দ্র বলিল "Oh, how inetere ting! কতদিন আপনি ভারতবর্ষে ছিলেন?"

"ছয় মাস।" আপনার এই সময় আমোদে কাটিয়াছিল ত?"

বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি আমোদ করিতে যাই নাই। শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।"

মিস্ টেম্পলের এই ভাব দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া বারীন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু মৌখিক গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বলিল, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম। এদেশের অধিকাংশ লোকেই আমোদের উদ্দেশ্যে ভারতভ্রমণ করিতে যান। ভারতবর্ষের বহুসহস্র বৎসরের জ্ঞান গরিমার সন্ধান তাঁহারা পান না!"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দুই চারিটি মহাৎমার সহিত সেখানে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া আসিয়াছি।"

বারীন্দ্র পরম ধার্ম্মিক সাজিয়া বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য—এই দুইটিই আমাদের চিরগৌরবের বিষয়।"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আপনি কি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন?"

"সামান্য!"

"আমি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াছি। সে ধ্বনি যেমন মধুর তেমনই গম্ভীর। আপনি দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করুন না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, শ্রবণ করুন—

> কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।।"

বলিয়া বারীন্দ্র নিস্তব্ধ হইল।

মিস্ টেম্পল বলিলেম, "কি সুন্দর! মিঃ চ্যাটার্জ্জি, এ শ্লোকটি কি কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিলেন?"

বারীন্দ্র তাহার সঙ্গী ভুবন দত্তের প্রতি চাহিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিল, "ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে পারি না। ইহা দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।"

মিস্ টেম্পল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! এ শ্লোকের ভাবার্থটি কি?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বারীন্দ্র বলিল, 'ইহার ভাবার্থই অত্যন্ত দুরূহ। এক কথায় বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব-প্রতিপাদক দুই একটি যুক্তি ইহাতে আছে।"

"গ্রন্থখানির নাম কি মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি?" "মেঘদূত।"

মিস্ টেম্পল তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "মেঘা ডুটা? By ক্যাল ডাসা?"

কথা কয়েকটি শুনিবামাত্র বারীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, তবে বোধ হয় মিস্ টেম্পল সংস্কৃতে অভিজ্ঞা—মেঘদূত কোনও সময়ে পাঠ কবিয়া থাকিবেন—তাহার সকল চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া বারীন্দ্রকে একা ফেলিয়া ভুবন দত্ত চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

এদিকে তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিলেই নয়! বারিন্দ্র বলিল, "হাঁ কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই বটে।"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আহা, আমি যদি সংস্কৃত জানিতাম। ঐ গ্রন্থ যদি পাঠ করিতে পারিতাম।"

শুনিয়া বারীন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুঝিল, বিপদাশঙ্কা অমূলক।

মিস্ টেম্পল বলিতে লাগিলেন, "আমি মনে করিতাম মেঘদূত একখানি কাব্যগ্রন্থ।"

বারীন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিল, "হাঁ মিস্ টেম্পল, উহা কাব্যগ্রন্থও বটে। উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রই দর্শন। আর সুন্দর দার্শনিকতত্ত্বমাত্রই কবিতা।"

এই সময় হলের অপর প্রান্তে টুং টাং করিয়া পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক গান ধরিলেন।

গান শেষ হইলে বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে বলিল, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। আপনাকে কিছু পানীয় আনিয়া দিব কি?"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

বারীন্দ্র স্বীয় বাহুতে তাঁহার বাহু সম্বদ্ধ করিয়া, যে কক্ষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল সেখানে লইয়া গেল।

সেখানে কতিপয় মহিলা চা, কফি প্রভৃতি পান করিতেছেন। তাহাদের সহচব পুরুষগণ তাঁহাদেব সেবায় ব্যস্ত।

বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে একটি আসনে উপবেশন করাইয়া বলিল, "আপনাকে কি আনিয়া দিব? চা না কফি?"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "বড় গরম। ঠাণ্ডা কিছু আনিয়া দিন।"

"ক্লারেট্ কপ্?"*

"না না। উহাতে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আর স্পর্শ করি না।"

মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বারীন্দ্র বলিল, "তবে একটু হোম্ মেড্ লেমনেড?"**

"ধন্যবাদ।"

* ক্লারেটমিশ্রিত এক প্রকার সরবতের নাম Claret cup.

** গ্যাসবিহীন লেমনেডের নাম Home made lemonade.

মিস্‌ টেম্পলকে শীতল করিয়া, বারীন্দ্র তাঁহাকে পুনশ্চ হলে ফিরাইয়া আনিল। মিস্‌ টেম্পল বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে, আমি গৃহে চলিলাম। আপনার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই লউন আমার কার্ড।

বারীন্দ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া, নিজের কার্ড একখানি দিল। বলিল, "আপনি কি একা আসিয়াছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি নীচে আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিতে পারি কি?"

"না—ধন্যবাদ। আপনি কষ্ট করিবেন না।"

"কষ্ট কি? আমার তাহা অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে।"

"বহু ধন্যবাদ। আচ্ছা, তবে আসুন।"

বারীন্দ্র ভাবিয়াছিল, একটা ভাড়াটিয়া ক্যাব ডাকিয়া মিস্‌ টেম্পলকে উঠাইয়া দিবে। অবতরণ করিয়া রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিল, একটি প্রকাণ্ড নিজস্ব জুড়ীগাড়ী মিস্‌ টেম্পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া বারীন্দ্রের মন বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া উঠিল, কারণ লণ্ডনে যে সে লোক এরূপ গাড়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না।

গাড়ীতে উঠিবার সময় মিস্‌ টেম্পল বলিলেন, "কাল অপরাহ্নে আপনার কোথাও কোন কাজ আছে কি?"

"না।"

"তবে কাল আসিয়া আমার সহিত চা পান করিবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত।"

বারীন্দ্রকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া মিস টেম্পল গাড়ীতে উঠিলেন। নিমেষের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতরাশের পর বারীন্দ্রের ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল, "গতরাত্রে সেখানে আপনার আনন্দে কাটিয়াছিল ত মহাশয়?"

একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে, বারীন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মিসেস ব্রাউন।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "অমন নিঃশ্বাস ফেলিলেন যে?"

ভণ্ডামি করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন, আমার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"গতরাত্রে আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।"

ল্যাণ্ডলেডি উচ্চহাস্য করিল। বলিল, "ভাল ভাল, সে ত সুখের কথা। মেয়েটি কি অত্যন্ত সুন্দরী?"

"হাঁ মিসেস ব্রাউন, মারাত্মক রকম সুন্দরী।"

"How interesting! বলুন মহাশয়, সব কথা আমাকে বলুন।"

"কি বলিব? কথা খুঁজিয়া পাই না।"

মিসেস ব্রাউন মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয়ের সময় ঐরূপই হয় বটে।"

বারীন্দ্র চেয়ারে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল, "মিসেস ব্রাউন, তোমার সঙ্গে কেহ কখনও প্রেমে পড়িয়াছিল?"

মিসেস ব্রাউন রুষ্ট হইয়া বলিল, "কেন মহাশয়? আমি কি কাহারও প্রণয় উদ্রেক করিবার উপযুক্ত নহি?"

"না না, তা বলিতেছি না। শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ কর কেন?"

"কেহ যদি আমার সঙ্গে প্রণয়ে পড়ে নাই, তবে আমার বিবাহ হইল কেমন করিয়া মহাশয়?"

"তাও ত বটে। তুমি যে বিবাহিতা রমণী, আমি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তোমায় দেখিলে ত গিন্নীবান্নী বলিয়া মনে হয় না।"

মনে মনে খুসী হইয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমাকে কেহ কেহ বলে বটে যে, আমার আসল বয়স অপেক্ষা আমাকে অনেক ছোট দেখায়। আচ্ছা আমার বয়স কত আপনি বলুন ত।"

মিসেস ব্রাউনের বয়স যে পঞ্চাশ বর্ষের উপর উঠিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও দর্শকের ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা নাই। বারীন্দ্র রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিল, "কত? ত্রিশ?"

মিসেস ব্রাউনের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "না, কিছু বেশী হইয়াছে। আপনার প্রণয়িণীর নাম কি মহাশয়?"

"মিস্ টেম্পল।"

"আপনার প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব?"

"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না, তবে তিনি আজ আমায় চা পান কবিতে নিমন্ত্রণ কবিয়াছেন।"

"বেশ বেশ। I wish you a happy afternoon—বলিয়া ল্যাণ্ডলেডিকে প্রস্থান করিল।

পাইপ মুখে কবিয়া বাবীন্দ্র ভাবিতে লাগিল। গতকল্য তাহার মেঘদূতেব শ্লোক লইয়া কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হাসি পাইল। আব যাহাই হউক, মিস টেম্পল লোকটি যথেষ্ট অদ্ভুত বটে। আজ ঘণ্টা দুই আগে বাহির হইয়া, ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে গোটাকতক "আসল" ধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ কবিয়া লইয়া যাইবে। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও দুই চারিটা বোল সংগ্রহ করিয়া লইযা গিয়া মিস্ টেম্পলকে অভিভূত কবিয়া ফেলিব।

বেলা চারিটা বাজিলে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে বাহিব হইয়া, ক্যাব লইয়া বাবীন্দ্র মিস্ টেম্পলের গৃহে উপস্থিত হইল। বাড়ীটি পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে অবস্থিত। এখানে অনেক ধনবান ব্যক্তি বাস কবেন।

বাবীন্দ্র ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা কবিল। ক্রমে মিস্ টেম্পল প্রবেশ করিয়া প্রাচ্য প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন কবিলেন।

মিস্ টেম্পল বসিয়া বলিলেন, "দেওয়ালে ঐ ছবিখানি দেখিতেছেন? উনি আমার গুরু।"

বাবীন্দ্র দেখিল, মুদ্রিতনেত্রে যোগাসনস্থ অর্দ্ধনগ্নকলেবর একটি বাঙ্গালী মূর্ত্তি। নিম্নে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা রহিয়াছে—"স্বামী যোগানন্দ।"

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া নিজ সদ্য উপার্জিত বিদ্যা প্রকাশ কবিয়া বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি স্বামীজীর নিকট যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন উপদেশ লইয়াছেন কি?"

"না, কারণ অভ্যাস করিবার অধিকার আমার এখন নাই। স্বামীজি বলিয়াছেন, তিন বৎসরকাল নিরামিষ ভোজন করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিয়া আবার ভারতবর্ষে গেলে আমাকে তিনি শিখাইবেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাজল পান করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু এখানে পাইব কোথায়? আমি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত জল এখানে পান করিয়া থাকি, যাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অপকার না হইতে পারে।"

বারীন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, "গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অতি সাধারণ। আপনি Mark Twain-এর More Tramps Abroad পুস্তক পাঠ করিয়াছেন?"

"সে পুস্তকে Mark Twain ভারতবর্ষে নিজের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। বারাণসীতে একটি ইউরোপীয় সিভিল সার্জ্জেনের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব Mark Twain-কে গঙ্গাজল সম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাব বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক।"

মিস্ টেম্পল কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "কি রকম?"

"লেখা আছে, ঐ ডাক্তার এক সময়ে একটা পাত্রে গঙ্গাজল ও অন্য পাত্রে কূপজল লইয়া একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পাত্রেব মধ্যে কিছু কিছু কলেরার জীবাণু নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা কবিয়া দেখিলেন, গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত সমস্ত জীবাণু মরিয়া গিয়াছে, কূপজলের জীবাণুগুলি বহুসহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া মিস্ টেম্পল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আরও দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক এবং গল্প বলিয়া বারীন্দ্র তাঁহাকে একবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল।

ছয়টা বাজিল বারীন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উঠিল। মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনার কোনও কার্য্য আছে কি?"

"না।"

"তবে, সেদিন আসিয়া আমার সঙ্গে ডিনাব খাইবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আসিব।"

"আমি কিন্তু নিরামিষভোজী। আপনি মাংসভোজন কবেন?"

"করি বটে।"

"তবে ত আপনার কষ্ট হইবে।"

"না মিস্ টেম্পল, আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমাব হিন্দুসংস্কার নিরামিষ ভোজনেরই পক্ষপাতী। তবে এ দেশে আসিযা স্বাস্থ্যেব অনুবোধে মাংসভোজন কবিতে হয়।"

মিস্ টেম্পল উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "ভুল। মহা ভুল। মাংসভোজন না করিলে এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, ইহা একটা কুসংস্কাব মাত্র। এই দেখুন, আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আজ ছয় মাসকাল নিরামিষ ভোজন কবিতেছি। আমার কি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে?"

বারীন্দ্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "বলেন কি! তবে আমিও এবাব অবধি নিরামিষ ভোজন করিব। তাহাই আমার তৃপ্তিজনক।"

মিস্ টেম্পল শুনিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন, "শনিবাব ৭টার সময় আসিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবার আসিল। বারীন্দ্র সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া বলিল, "মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি আজ কি আপনি বাহিরে ডিনার খাইবেন নাকি? আমায় ত পূর্ব্বে বলেন নাই।"

বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন, আমি বলিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইযাছিলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "প্রেমে পড়িলে মানুষেব ঐ বকমই হয়। আপনাব প্রণয়িনীর গৃহে নিমন্ত্রণ বুঝি?"

"হাঁ মিসেস ব্রাউন। নহিলে দেখিতেছ না এত সাবধানতার সহিত বেশবিন্যাস করিব কেন? আমাকে দেখিতে কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

মিসেস ব্রাউন বলিল, "Stuning। আপনি যদি আজ প্রোপোজ করেন, তবে তিনি প্রত্যাখ্যান কবিতে পারিবেন না।"

"মিসেস ব্রাউন, কি বলিয়া প্রোপোজ করিতে হয় আমাকে শিখাইয়া দিতে পার? আচ্ছা, তুমি যখন মিষ্টার ব্রাউনকে প্রোপোজ করিয়াছিলে, কি বলিয়াছিলে?"

এই কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "মহাশয়! মহাশয়! প্রোপোজ করিয়াছিলাম কি আমি?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "তবে কে?"

"স্ত্রীলোক কখনও প্রোপোজ করে? মিষ্টার ব্রাউন আমাকে প্রোপোজ করিয়াছিলেন।"

বারীন্দ্র বলিল "I see—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই বুঝি করিয়াছিলে। আচ্ছা, তিনি কি বলিয়াছিলেন?"

"শুনিবেন? আচ্ছা তবে বলি।"—বলিয়া মিসেস ব্রাউন জানালার নিকট একটি সোফায় উপবেশন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।—

"একদিন আমরা হাইড পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একটি গাছতলায় দুইখানি চেয়ার ছিল, আমরা দুইজনে সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।"—

বাধা দিয়া বারীন্দ্র বলিল, "হাইড পার্কে—একাকী একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে—তুমি বেড়াইতে গিয়াছিলে? বিনা chaperone-এ? তোমার পিতামাতা জানিতেন?"

হাসিয়া ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "না, আমার পিতামাতা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত কড়া ছিলেন। এমন কি engaged হইবার পরেও বিনা শ্যাপেরোনে আমাদিগকে বাহির হইতে দিতেন না।"

"তবে তুমি লুকাইয়া গিয়াছিলে?"

মৃদু হাস্য করিয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "হাঁ মহাশয়।"

দুই হস্ত উপরে উঠাইয়া বারীন্দ্র বলিল, "Joly Moses! Oh, naughty Mrs. Brown! I am shocked."

বারীন্দ্রের ভাব দেখিয়া প্রৌঢ়া ল্যাণ্ডলেডি কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিল। পরে বলিল, "আচ্ছা, আপনি যদি অত shocked হইয়া থাকেন, তবে আর বলিব না।"

"না, বল। আমি শিখিয়া যাই।"

মিসেস ব্রাউন বলিলেন, "গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন, "বস বস, একটা কথা আছে।' বসিলে বলিলেন, 'মেরি, আমাকে তুমি বিবাহ করিবে?' আমি ত প্রথমে কিছুতেই রাজি হই না। শেষে তিনি ঘাসের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, 'মেরি, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি সৈন্য হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইব এবং যুদ্ধ করিয়া মরিব।"

বারীন্দ্র বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তখন তুমি কি করিলে?"

"কি আর করি মহাশয়, বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলাম।"

বারীন্দ্র বলিল, "আহা! আমার প্রণয়িনী কি তোমার মত কোমলহৃদয়া হইবেন? আমি তাঁহাকে বলিব, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা যাইব এবং তথায় বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।"

পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে ডিনারের পর বারীন্দ্রের পক্ষে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

মিস্ টেম্পলের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বারীন্দ্র বসিয়া আছে। আজ এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কিছু চিন্তাযুক্ত।

দাসী আসিয়া কফি দিয়া গেল। কফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল বলিলেন, আজ কয়েক দিন হইতে আমার মনে একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। আমি আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি ক্ষমা করিবেন কি?"

বারীন্দ্র একটু সাবধানতার সহিত বলিল, "যদি কোন আপত্তিজনক প্রশ্ন না থাকে, তবে অবশ্যই আমি আহ্লাদের সহিত উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার পিতামাতা জীবিত নাই, ইহা পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন। আপনি বিবাহিত?"

"না।"

"আপনার এখানকার ব্যয় কে বহন করেন?"

"আমার পিতৃব্য আমার খরচ দেন।"

"আইন ব্যবসায়ের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে?"

"না।"

"এ কয়দিন আপনার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি হিন্দুধর্মের প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগ।"

বারীন্দ্র মনে মনে হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখুন, হিন্দুধর্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি। এই ধর্ম্ম আমি য়ুরোপে প্রচার করিতে বাসনা করি। আমার বিস্তর অর্থ আছে। আমি সেইজন্য আজ আপনাব নিকট একটি প্রস্তাব করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহায়তা চাই। আমি একজন শিক্ষিত হিন্দু-যুবককে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি হইবেন?"

বারীন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "এখনই আপনাব উত্তর আমি চাহি না। আপনি ভালরূপ চিন্তা করিয়া আমায় উত্তর দিবেন। যদি স্বীকাব করেন, তবে আপনাকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র ও ইউবোপীয় ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে, আপনাকে লইয়া আমি য়ুরোপে হিন্দুধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হইব।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমি চিন্তা করিয়া পবে আপনাকে উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আমার আব কেহ নাই। আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্ব্বাহ করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি কবিয়া আপনাকে পকেট খরচ দিব। আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে হইবে, এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুব ন্যায় থাকিতে হইবে।"

বারীন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা, এক সপ্তাহের পবে আপনাকে উত্তর দিব।"—বলিয়া, সে রাত্রিব মত বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়াছে। বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের পোষ্যপুত্র হইয়া তাঁহাব গৃহে বাস করিতেছে। তাহার নাম এখন "বারীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি-টেম্পল।"

বারীন্দ্র এক হিসাবে বেশ সুখে আছে। পূর্ব্বে তাহাব টাকাকড়ির অত্যন্ত টানাটানি ছিল, এখন আর তাহা নাই। বণ্ড স্ট্রীট ভিন্ন অন্য কোথাও এখন আর সে সূট তৈয়ারী করায় না। অম্‌নিবসে আবোহণ কবা একেবাবে ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎকৃষ্ট হাভানা ভিন্ন অন্য চুরুট মুখে করে না। বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যখন থিয়েটারে যায়, তখন তিন চারি গিনি মূল্যে প্রায়ই বক্স লইয়া থাকে।

কিন্তু তাহাব অসুবিধা আহারে ও অধ্যয়নে। সে যখন ভণ্ডামি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ খাদ্যেরই পক্ষপাতী, তখন ভাবে নাই যে, তাহার হিন্দু জিহ্বা একদিন এরূপভাবে দণ্ডিত হইবে। নিরামিষ খাদ্য বসনার তৃপ্তিদায়ক করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক। সে নিপুণতা ইংরাজ রাঁধুনীর নাই। মিস্ টেম্পলের টেবিলে দুগ্ধমিশ্রিত 'হোয়াইট সস্' আবৃত যে সকল নিরামিষ খাদ্য উপস্থিত তাহা প্রায়ই অখাদ্য।—বারীন্দ্রের দ্বিতীয় অসুবিধা,—তাহার আলস্যচর্চ্চার অবসর একেবারেই নাই।

সপ্তাহে তাহাকে দুই দিন ফরাসী ও দুই দিন জর্ম্মন ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিস্ টেম্পল স্বয়ংও পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সপ্তাহে যে দুই দিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া হিন্দুশাস্ত্র চর্চ্চা করিবার কথা, সেই দুই দিনই আরামে কাটে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া মনোরম উপন্যাসাদি সে পাঠ করে। অথবা সেখানে না গিয়া অন্য কোথাও বেড়াইতে যায়।

তিন মাস কাল মিস টেম্পলের সহিত বাস করিয়া, অর্থের স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও বারীন্দ্র একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন এই বৃদ্ধার সঙ্গ তাহার কৌতুকজনক মনে হইত। কিন্তু কৌতুক রস জিনিষটা একটু পুরাতন হইলেই বিস্বাদ হইয়া পড়ে। ডিনারের পরে যে সন্ধ্যাগুলি তাহার মিস্ টেম্পলের সহিত কাটাইতে হইত, তাহা কষ্টে কাটিতে লাগিল। এই জন্য সে প্রায়ই থিয়েটারে যাইত। মিস্ টেম্পল তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইতেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বাঁধা দিতেন না। তবে জাতিচ্যুতির ভয়ে তাহাকে বাহিরে ডিনার খাইতে দিতেন না, বাড়ীতেই বারীন্দ্রকে ডিনার খাইয়া বাহির হইতে হইত।

আজ লণ্ডনে বড় ধুম। ঐতিহাসিক পুরাতন "গেয়েটি থিয়েটার" ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। আজ রাত্রে "নিউ গেয়েটি থিয়েটার" প্রথম খুলিবে। "অর্কিড' নামক একটি নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। বারীন্দ্র বহুপূর্ব্ব হইতে একটি বক্স লইয়া রাখিয়াছিল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখা গেল, বারীন্দ্রের বক্সে তাহার তিন জন বন্ধু সমবেত। একটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভুবন দত্ত, অপর দুইটি পুরুষ নহে। তাহাদের বেশে জমক আছে, কিন্তু পারিপাট্য (refinement) নাই। তাহাদের ভাষায় মাধুর্য্য আছে কিন্তু শালীনতা নাই। স্ত্রীলোক হইলেও, মহিলা বলিয়া তাহাদিগকে ভ্রম করিবার কাহারও সম্ভাবনা অল্প।

তিন ঘণ্টা অভিনয়ের পর নাটক সমাপ্ত হইল। উহারা তখন বাহির হইয়া রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়াইল। বারীন্দ্র প্রস্তাব করিল—"Let's go and have some supper at the Troc."

'Troc' অর্থাৎ Trocadero, লণ্ডনের একটি উচ্চশ্রেণীর ভোজনালয়। ট্রকাডেরোতে ভোজন করা সৌখীনতার একটি বিশেষ লক্ষণ। থিয়েটারফেরৎ ধনশালী ব্যক্তিরা সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গৃহে বা ক্লাবে যান। এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনিয়া একজন যুবতী বলিল, "You are a dear."

অন্য একজন বলিল—"I like their champagnes awfly." গাড়ী লইয়া ইহারা ট্রকাডেরোতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতে একটি টেবিল বারীন্দ্র রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল সেখানে গিয়া চারিজনে উপবেশন করিল।

মূল্যবান রৌপ্য পাত্রে ভরিয়া বিবিধ খাদ্য আসিল। বরফের বালতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যাম্পেনের বোতল আসিল। সান্ধ্যবেশধারী ওয়েটারগণ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ভোক্তাগণের সেবায় তৎপর। মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভায় ভোজনশালা ঝল্‌মলায়মান। উপরে অদৃশ্য স্থানে যন্ত্রিগণ বসিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রালাপ করিতেছে। পুরুষ ও রমনীগণের অবিশ্রাম গল্পের গুঞ্জনধ্বনি, মুহুর্মুহুঃ হাস্য ও সাম্পেনের কর্ক খুলিবার শব্দ বাদ্যযন্ত্র ধ্বনির সহিত মিলিয়া স্থানটিকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে ইহাদের পানাহার ও হাস্যামোদ চলিতে লাগিল। হলের অপর প্রান্তে, ইহাদের অদৃশ্যে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মিস্ টেম্পল।

তাঁহারা বসিয়া, দুই পেয়ালা কফি আনিতে হুকুম করিলেন। কফি পান করিতে করিতে গল্প করিতে লাগিলেন। মিস্ টেম্পল তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন, "অদ্যকার এ কন্‌সার্টে আপনাদের অনাথাশ্রমের জন্য কত টাকা উঠিল?"

অন্য মহিলাটি বলিলেন, "অনেকগুলি আসনই পূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয় দুই শত গিনির উপরে উঠিয়া থাকিবে।"

সকল যন্ত্রিগণই বেশ সুন্দর বাজাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ যিনি শোপেঁয়া (Chopin) হইতে কয়েকটি বাজাইলেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

"আপনি ত আসিতেন না, আমিই ত আপনাকে টানিয়া আনিলাম।"

কফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আমি আপনাদের এ কনসার্টের জন্য টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আজ যে ইহা হইবে, তাহা মোটেই আমার স্মরণ ছিল না।"

কফি পান শেষ করিয়া ইঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় হলের অপর প্রান্তে মিস্ টেম্পলের দৃষ্টি পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে তিনি পকেট হইতে নিজ চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল, প্রলয়ের আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

সঙ্গিনীকে বলিলেন, "আমায় এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করিবেন, আমি আসিতেছি।"

বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু পদক্ষেপে হলের অপর প্রান্তে গিয়া, বারীন্দ্রের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহা নিমেষমাত্রকালের জন্য।

তাহাকে দেখিয়াই বারীন্দ্র ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Good evening"—তাহার সম্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমণ্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা এবং আপত্তিজনক নারীমূর্ত্তি।

"Good evening. Don't let me interrupt you"—বলিয়াই মিস্ টেম্পল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই রাত্রে বারীন্দ্র যখন গৃহে ফিরিল, তাহার পূর্ব্বেই মিস্ টেম্পল শয়ন করিতে গিয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটাইল। পর দিন প্রভাতে, প্রাতরাশের সময় শুনিল, মিস্ টেম্পল তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই—তাঁহার শরীর অসুস্থ।

বেলা দুইটা বাজিলে, লাঞ্চ খাইবার জন্য ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুনিল, মিস্ টেম্পল তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। একাকী নীরবে সে লাঞ্চ খাইল। উঠিবার সময় দাসী একখানি পত্র আনিয়া বারীন্দ্রের হাতে দিল। মিস্ টেম্পলের হস্তাক্ষর। তাহাতে লেখা আছে—"কাল রাত্রে যাহা দেখিলাম মর্ম্মাহত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তিন মাসে তোমার যে সময়ের ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ স্বরূপ এই পত্র মধ্যে তোমায় একশত পাউণ্ডের একখানা চেক দিলাম।—এড্না টেম্পল।"

জিনিষ পত্র গোছাইয়া, ক্যাব ডাকিয়া সন্ধ্যার মধ্যে বারীন্দ্র বেজওয়াটারে ফিরিয়া আসিল।

(কার্ত্তিক, ১৩১২)

বলবান জামাতা

॥ ১ ॥

নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্টমাষ্টার। বেলা অবসানপ্রায়; আপিসে নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস—সম্মুখে পূজা—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিসপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes".

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন। নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকীটাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি) নিম্নে সোণার জলে মুদ্রিত—
"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘবিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্যে আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ ভুল না।

তোমারই—সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন। পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes".

॥ ২ ॥

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইঁহার আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন এবং সেইজন্যেই বিশেষতঃ এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। দিনাজপুরের মেজদির উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে—

তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক—তিনি দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলের সাহেব বাঙ্গলা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার আইডিয়াল সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিস ত কেবল স্ত্রীলোক আর বাবুতে মাখে;—পুরুষমানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভালমানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহাব মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলাল ধরনের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দুখানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতর অনুমোদিত না হইলেও বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

নলিনীর মত চেহারা তাহাব নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল, তেমনি আলস্য ধাম,—
নলিনীর মত চেহারা তাহার নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরীমুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিবিয়া আসিলেন, তাঁহাব শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজিচেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মৎলবের উদয় হইল—কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্য তালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি

আরও অধিক মাত্রায় পুরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্যশূকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিলেন।

এইরূপ দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে ; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্খিত। হায় নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত। নলিনীবাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

॥ ৩ ॥

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটা বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কই, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই কি? কুলি ডাকিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, নলিনীবাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু উকিলকা বাসা জান্‌তা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল, "হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই; এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনীবাবু বলিলেন—"এই মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ী?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন?"

"না। তিনি কিদারবাবু উকিলের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল, "ওগো তোমাদের জামাইবাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "আরে! জামাইবাবু?"—বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিসপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালকবালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "বাবু চান করা হোবে কি?"

নলিনী বলিল, "হাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভাল ছিলেন ত?"

"হাঁ ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে?"

হাসিয়া ঝি বলিল, "যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—দিদিমণি বল্লেন, এই ছুটি হলেই আসবেন। তা এতদিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান কবে ফেলুন। মা ঠাকুরণ জিজ্ঞাসা কবলেন, এখন কি জলটল খাবেন না, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন, "এখন ভাত চড়াতে হবে না;—জলটল খাব এখন।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে স্নান করে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব। আমার বখশিসের জন্যে কি গহনা টহনা এনেছেন বেব করে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল, "তুই বখশিস লিবি, হামি বুঝি বখশিস লেব না?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্পবয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জ্বলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, "দেখ জামাইবাবু দেখ, কেমন সোনার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, "বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহিব করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা ওমা ওকি? নোকে বলবে কি গো? রূপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া আর কোথাও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া নলিনী বলিল, "সোনা ত আনিনি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল, "সে কথা শোনে কে? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোনার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। ছেলের বাপ হলেই হয় না ইহার অর্থ কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ নাকি? শিশুকে ঝির কোলে ফিরাইয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জলখাবার দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দরমহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী বাটী গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুমঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। "কি ভাই এত দিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই-তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল :—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ও যে অন্য লোক।" "অন্য লোক কি লো? আমাদের শরৎ নয়?"

"না শরৎ হবে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জুয়াচোর নাকি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ—ওমা কি সর্ব্বনাশ হল গো! ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি? যা, শীগ্‌গির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট; প্রত্যেকখানির নিম্নে সোনার জলে নাম লেখা—এম. এন. ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপারটা নলিনী দিনের আলোকেব মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও কবিয়াছে। নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি কবিয়া ফেলিল।

।। ৪ ।।

এদিকে রামশরণ ভৃত্য উর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদারবাবু উকিলের বাসায় ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকিল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত অসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল, "বাবু—বাবু—জল্‌দি বাড়ী আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "কেন বে—কারু অসুখবিসুখ?"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "ডাকু? দিনের বেলায ডাকু?"

রামশরণ বলিল, "ডাকু হোবে কি জুয়াচোব হোবে কি পাগল আদ্‌মি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল? কি করছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোগ্‌কো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন, "জোবসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকিল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—"না পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোনও বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীব শ্বশুর) বলিয়া দিলে, "পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে হ্যাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল—বাড়ীতে পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কই? কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনিই মহেন্দ্রবাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্রবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা।

মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাত দু'খানি নিজ হস্তে ধারণ কারিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন। শেষে বলিলেন, "মহিনের জামাই তুমি? বেশ বেশ। দেখ, এখানে দু'জন মহেন্দ্রবাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয়ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল, আমার কাছে এক মোকর্দ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম!"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্পগুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

॥ ৫ ॥

এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্নে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকিলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ঈজিচেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকিলের বাড়ী কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে, "এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

"হাঁ বাবু।"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

এই জামাই শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে ষণ্ডামার্কা আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, "কোই হ্যায় রে?"—বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন, "পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না? বেটা বদ্‌মায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দারোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন, "মারকে নিকাল দাও। গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "খবরদার! হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন যো হাম্‌কো ছুঁয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুরচুর করে ডালেঙ্গে!" নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনাব জামাই নলিনী।"

একথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "বেটা জুয়াচোব! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে—নয়ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে—"

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীব ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো ষ্টেশন।"

।। ৬ ।।

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদাব তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন। তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "মদ খেয়েছ নাকি? জামাইকে তাড়ালে?'

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর!"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু পাশা খেলিবাব কালে কেদাববাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম—বাড়ী ভুল কবে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য নয়?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিযা মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—এ সকল কথাব ভালরূপ বিচার কবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে যদি হত—তা হলে খবর দিয়ে আসত—আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সে জুয়াচোর—জুয়াচোর!"

"কেন আসবার কথা থাকবে না? আসবার কথা ত রয়েচে। পূজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন, "ওগো, সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুই দেখেছিস নাকি? বল্ ত!—বল্ ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হল, আমি দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছিস। আমি ত সে কথা তার মুখের উপরই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন মিরাজপুরী গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধব বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে—তা বলে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু টেলিগেরাপ এসেছে।" টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকাব চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন, "খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই-ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল ষ্টেশনে চল। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছে। যাই গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালীশালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুববাড়ীতে পায় না।"

[বৈশাখ, ১৩১৩]

খালাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুবালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্বস্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যায়; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প প্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ। তাঁহাব তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকিল। একজন গভর্নমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা কবিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবু বয়ঃক্রমে সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সে জন্য ইঁহার শালীশালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে ঘটিরাম বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু ঘটিরাম রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগেব বা দুঃখের কারণ হয়। পদ-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবু ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটিবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "ফরিদসিংহে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল, "স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কই দেখিনি।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথম যে রকম দেখেছিলাম—

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী" চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলাতী কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল, "জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছু বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে—এ জি, এ জি. সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেবেন?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ! চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?"

গিরীন্দ্র বলিল, "এমন চাকবি করেন কেন?"

"খাব কি?"

"কেন, আপনার ত ল-লেকচার কমপ্লীট বয়েছে। ওকালতিতে পাস করে দিব্যি বড় দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বযসে এগজামিন পাস কবা পোষায ভাই!"

ইন্দুমতী বলিল, "ফিরিঙ্গির চাকবি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত, আপনি স্বদেশীয় স্বপক্ষে না বিপক্ষে?"

"স্বপক্ষে। এই দেখ না, পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড় চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারিসনে ইন্দু? সেখানে কিনলে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভযে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল, ঐ 'মাতৃপূজক সমিতি' কন্‌গ্রেসের জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহ বা মন্দিরা বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দেমাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা বহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

	কে কোথা আছিস	জনমভূমির	ভকত সন্তান,
	মা'র পূজা হবে,	আয় নিয়ে আয়	কে কি করিবি দান।
	কার আছে সোনা,	কার আছে রূপা	অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই	এমন সুদিন	কবে আর পাবি	দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।

যার বেশী নাই দিক্ সে কিঞ্চিৎ ছেড়ে লাজ অপমান,
যার কিছু নাই, সে দিক্ কেবল ব্যথিত হৃদয়খান।

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া, খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল, "মশায়ের নাম?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "নাম দরকার কি?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন 'জনৈক বন্ধু'।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "ওহে, লেখ 'জনৈক ডেপুটি'। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন, "না, না। 'জনৈক বন্ধু' বলেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল। দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি?

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল, "ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়!"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল, "বিলাতী চীজ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল, 'তোবা. তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে?"

"দেড় রুপিয়া"।

"অ্যাঁ—দেড় টাকা! এঁর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটি সাহেবের চাপরাসি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়েছে, ইক টাকায় যদি ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আর আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল, "সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল, হাঁ, সত্য বইকি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"

চারি পাঁচ জন বালক সেই চাপরাসিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরাইয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল, "একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোনক্রমে ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাসিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাসি বলিল, "বাবু, ইস্কাতো দাম এক রুপিয়া। হামারা বাকী আঠ আনা পয়সা?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল, "আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।"—আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাসিকে দিল।

চাররাসি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল, "বাবু আচ্ছা বিস্কুট তো?"

"বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

"তোবা তোবা"—বলিয়া চাপরাসি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল, "ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে "বন্দেমাতরম্' এবং বিদেশী বাণিজ্যে কর পাদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া; এক লাথিতে রাস্তায় পার্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

চাপরাসি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুলোগ পাগল হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল, "বন্দেমাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কালোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মাবম্?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে বাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোগ ঐ বাৎ বোল্তা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পযসা 'লভ্য' করিয়া, চাপবাসি প্রফুল্ল মনে ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাসিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেঁও এত্তা দেরী কিয়া?"—বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাসির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, চাপরাসির পতনে দৃকপাত না করিয়া বলিলেন, "ড্যাম শূয়ারকা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া?"

চাপরাসি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বলিল, "হুজুর—হাম বিলাতী বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকেন—"

"ক্যা হুয়া?"

"লেকিন ইস্কুলকা লেড়কালোক"—চাপরাশি আট আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কালোক? বন্দেমাতরম্? ছিন্ লিয়া?"

এতক্ষণে চাপরাসিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রের কূল পাইল। বলিল, "হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া?"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উত্তলোগ বিশ পঁচিশ আদমি—হাম একেলা কেয়া করেঁ?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন, "ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহেঁ নেই বোলায়া?"

চাপরাসি বলিল, "হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কানেটিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাস আপনা একঠো রুপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রুপিয়ামে তো বিলাতী টিন দেতা নেই, গরীবপরবর।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা পাস আভি যাতা। লেড়কা লোগকে হাম্ জেহেলমে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েন্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাঁহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবরা হুইস্কি-পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "Very sory to intrude"—তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন, "I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "আমি এখনই যাইতেছি।"—বলিযা তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন, "কোতায়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন, "Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিশ সাহেব বলিলেন, "দিন দিন 'বন্দেমাতরম্' নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা-কর সাহেব বলিলেন, "While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডাওযাটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুইজনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বে-আদবী, গভর্ণমেন্টেব শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু"গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জানতা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী ইঁহা হায়, ইতলা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাসিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল চাপরাসি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দাবোগা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাও জখম আছে?"

সাহেবের প্রহারে তাহার কপাল যে জখম হইয়াছিল, চাপরাশি তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—"ড্যাম্ নেটিভগণ এইরূপ

মিথ্যাবাদীই বটে!"—দারোগা লিখিয়া লইল—'বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এতেলা গ্রহণ শেষ হইলে পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন, "আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।"—হুকুম দিয়া, চাকরকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আপনার এই চাপরাসিকে আসামী সনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right, চাপরাসি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।"

চাপরাসি বলিল, "হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি?"

সাহেব রাগিয়া বলিলে, "শূযার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্‌ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপবাসি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, একেবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘবে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপবাসি অম্লানবদনে সনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তাব করিল।

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছু জানিত না। বালকত্রয় বলিল, "দারোগা সাহেব আমাদের কেন গ্রেপ্তাব কবিতেছ? আমরা কি করিযাছি?"

দারোগা বলিল, "কি কবিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।"—বলিয়া দাবোগা তিনজন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাসিকে হাসপাতালে লইয়া গিযা সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইযা সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল। "থানায় চল।"

"কেন?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

'আরে না না, ছেলেদের ভাল কবিয়া চিনিয়া বাখিবে এস। কাল কোনও ডেপুটি বাবু আসিবে; অন্যান্য ছেলেদেব সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পাবিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিযা সেই তিনজনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও সাহেবের কাছে ছুটি লইযা আইস।"

চাপরাসি গিয়া সাহেবেব কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম্‌ নেটিভ পুলিস এই বকম dishonest-ই বটে!"

দারোগা তখন বাজাব ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সেই সওদাগরকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটিবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন "আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"না—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়াছে।"

চারুশীলা বলিলেন, "তোমাদের কাছে হবে? সে ত ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে, কার কাছে বা মোকর্দ্দমটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটিবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে' তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন, "ছি, অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়, ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেকে বললেন যে ছেলেরা চাপরাসিকে রাজি করে', তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে ; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয় নি, মারেও নি। তা ছাড়া, যে তিনজন ছেলেকে পুলিস ধরছে তাবা মোটে সেখানে ছিল না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটিবাবু একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ সব প্রমাণ হয় তবে না!"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"প্রমাণ হয় ত ভালই।"

"আর যদি প্রমাণ না হয়, কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাহাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটিবাবুর মনের বিষণ্নতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটিবাবু যেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েক ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাসি আসিয়া তাঁহাকে আফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল, "সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন। বলিলেন, "এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই?"

"কই তেমন ত কিছুই দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot; নগেন্দ্রবাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

"আজ্ঞে—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা—সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হল্লা, কাপড় পোড়ান, এসব কি?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন, "ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা। গরীব চাপরাসিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন, "নগেন্দ্রবাবু ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গি পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওযা যায় না। সেখানে দশ টাকায় বাবুর্চ্চি বেয়ারা প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি-ন-বৎ-স-র। Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতিব জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন, "স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out—at any cost.

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেনবাবু বলিলেন, "হাঁ হুজুর। আমার যথাসাধ্য আমি করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীলবাবু জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাসি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কিল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও ড্যাম-নেটিভের পদানুসরণ করিয়া বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটেব টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটেব গুঁড়া কাগজে করিয়া পুলিস কর্তৃক 'এগ্‌জিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সনাক্ত করিয়া বলিলে, ইহারা এবং অপর কয়েকজন, চাপরাসির সহিত বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহূর্মুহুঃ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট্ করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন, "কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেবায় বলিলেন, "চড় কিল দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীব জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল। আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এখানে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাসি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে, স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়াব আছে এবং তিনি নিজে একজন পাক্কা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলাব খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাসিকে টিন ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইযাছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসেব জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে, উকীলবাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীব রোষ্ট; কাটলেট্ প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটিবাবু তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামীপক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচাবক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies'—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে, হাঙ্গামাব সময় পনেরো কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ বাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে, ছেলেরা চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন, কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত

হইয়াছে, চড় চাপড়ে হইতে পারে না। ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে, তাহাতে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের সমস্ত সাক্ষীগণের সমস্ত কথাই যে মিথ্যা তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন, ডাকবাঙ্গলার খানসামা উকীলবাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। যে বারো মাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপীল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বালকগণ ভীষণ রবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুট্‌বে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ডেপুটিবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটিবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটিবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসব হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনই সেরে যাবে।" চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "থাক দরকার নেই।" ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীবে বলিলেন, মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন সারে নাই।

নগেনবাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন, "এস এস, উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেনবাবু বলিলেন, "আজ সাহেব আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনর সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন, "ওকি, চোখের জল ফেল কেন?"—বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "ওগো আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনও কথা বোলো না।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম?—কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি ছি। পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটিবাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সে পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পর দিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আজ মফস্বল যাইব।"—সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন, "কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে কোমলহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওকি—ও কি? শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে! এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন, "আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি বল।"

"এ চাকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোনা রূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও আমি তাতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটিবাবু একমুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেনের সময় সন্নিকট। ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তাই হবে। তুমি কেঁদ না।"—বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটিবাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা।

"ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারি পার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ কবিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্রবাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা" গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটিবাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারি গেলেন। চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন, "আজ ইস্কুলে গেলিনে?" "না, আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে নাকি?" "না।" "তবে?"

ইস্কুলে গেলে ছেলেরা আমায়—" বলিয়া আর বলিতে পারিল না। তার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তবে থাক্। আমারও একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্তবাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোনও কথা বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে। চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর, ছেলেদেব মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন। একটি মহিলা বলিলেন, "ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপীলে বোধ হয় টিক্‌বে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন, "তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপীলের দিন কবে হয়েছে জানেন।"

"কবে ঠিক বলতে পারিনে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এঁরাই করবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিলেন—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বললেন, "আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলা মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন, "আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্যে কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগস্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্যে কিছু ত্যাগস্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই একযোড়া বালা আর একযোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপীলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।'—ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুক, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপীল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু হইল না। জজ সাহেব আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানেও এ কথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাস-কামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষ্যে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও কার্যে ভুল ধরিয়া আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে সাহেব অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আফিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন; চুনাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাসি ফিরিয়া তাঁহাকে আফিস কামরায় না লইয়া গিয়া, সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন 'চুনাপুঁটি' পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাসি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "বাবু জুতাকা আওয়াজ মৎ কীজিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হয়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। 'চুনাপুঁটিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহুঃ কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আফিস কামরায় আসিলেন। প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন—নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে,—অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে,

সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না। "গুড্‌মর্ণিং সাব্।" "গুড্ মর্ণিং বাবু।"

"বাবু!"—অন্য দিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু বাবু বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে নূতন কোন বেদনা অনুভব করিল না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন, "সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকর্দ্দমার কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিলেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন, "তবে 'ভালই' কেন বলিলেন? আপনি কি একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি, এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন যে, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না! তিনি বুঝিলেন যে, এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, এই নীতির অনুসবণ করিয়া সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলাবা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।"—বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—"By the way"—শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপীলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য নাকি?" সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহাব খরচ বহন করিতে আমাব স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ ধৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এটা কি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইযা বলিলেন, "সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা গভর্ণমেন্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময়ের ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই! সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহাব অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে, চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনই নতজানু হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাযকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধপত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত আপনাকে ডিগ্রেড করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল কিনা। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবু মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া

উঠিল। তিনি বলিলেন, "তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আফিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 'আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুডমর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"গুডমর্ণিং।"

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরির শেষ দিন। বিকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দে মাতরম্ ধ্বজা। তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফেটন্‌গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না। বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল, ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি বাহে? বাবুর সাদি নাকি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হইছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে।"

এ দিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুইমাসব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

[ভাদ্র, ১৩১৪]

আইনের গল্প

(মাতঙ্গিনীর কাহিনী)

ষোড়শীবর্ষীয়া যুবতী এলোকেশী, তারকেশ্বরের মোহান্তের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিল বলিয়া, এলোকেশীর স্বামী তাহাকে খুন করিয়াছিল। সেই ব্যাপার লইয়া একদিন বাঙ্গালা দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সে সম্বন্ধে কত ছড়া কত গান উঠিয়াছিল, গ্রামে গ্রামে ভিখারীরা সেই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এলোকেশীর মত না হউক, মাতঙ্গিনীর ব্যাপারেও এক সময় বাঙ্গালা-দেশকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মাতঙ্গিনী অথবা তাহার জার অথবা দুইজনে মিলিয়া, মাতঙ্গিনীর স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার জার পলাইয়াছিল—পুলিস তাহাকে ধরিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়।

এই ঘটনাটি, বিখ্যাত সাহিত্যিক কৃষ্ণনগরনিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুরের মুখে যেমন শুনিয়াছি, নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিলাম।

মাতঙ্গিনীর স্বামীর (নামটি শুনি নাই) বাস ছিল নদীয়া জেলার কোনও এক পল্লীগ্রামে। সংসারে কেবল স্বামী, স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র। স্বামী বড় গরীব, কিছু ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়াছিল, নানাস্থানে চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠাইত। ক্রমে তাহার চাকরি একটি জুটিল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন্ এক শহরে। কিন্তু বেতন এত অল্প যে, সে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রকে নিজ সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। প্রতিবেশীরা তাহাকে অভয় দিলেন, "তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কোনও চিন্তা তুমি কোরো না। যাও গিয়ে কর্ম্মে ভর্ত্তি হও, মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করলে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে, তখন এসে তোমার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে নিয়ে যেও।"

যুবক, প্রতিবেশীদের তত্ত্বাবধানে স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে রাখিয়া কর্ম্ম স্থানে গমন করিল। সেখানে গিয়া কঠোর পরিশ্রমে সে আপন কার্য্য কবিতে লাগিল। মনিব খুসী হইয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু করিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

মাতঙ্গিনী, তখনকার দিনেও লেখাপড়া জানিত। স্বামীর সহিত নিয়মিতভাবে সে পত্র-বিনিময় করিত। স্বামী তাহাকে মাসে মাসে খরচের টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিত।

সতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া বাস করিবার উপযোগী বেতন যখন তাহাব হইল, তখন তাহার চাকরি প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

স্বামী তখন এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিল—ছুটি মঞ্জুরও হইল। সে তখন স্ত্রীকে পত্র লিখিল, "ভগবান এতদিন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিনে আমার এমন ক্ষমতা হইয়াছে যে, বাসা ভাড়া করিয়া তোমাদের আনিয়া নিজের কাছে রাখি। এক মাসের ছুটি পাইয়াছি। অমুক দিন হইতে আমার ছুটি আরম্ভ। অমুক তারিখে বাড়ী পৌঁছিব, এক মাস বাড়ীতে থাকিয়া, বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া, তোমাদের লইয়া এখানে চলিয়া আসিব।"

মাতঙ্গিনী ছিল, অত্যন্ত রূপসী। স্বামীর বিদেশগমনের বছরখানেকের মধ্যেই, তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ক্রমে প্রতিবেশীরা সকল কথা জানিতেও পারিযাছিল, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীকে এ অপ্রিয় সংবাদ প্রেরণ করে নাই।

পত্র আসিবার পর, মাতঙ্গিনী ও তাহার জার, মহা ভাবনায় পড়িযা গেল। "তাই ত! এক মাস পরে লইয়া যাইবে, আর দেখাশুনা হইবে না।" এই জাতীয় চিন্তাই বোধ হয়।

ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইল, সে আসুক, রাতারাতি তাহাকে হত্যা করিয়া, লাসে পাথর বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই হইবে। কেহ জানিবে না শুনিবে না। পরদিন প্রচার করিয়া দিলেই হইবে যে, ভোরে উঠিয়া সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হতভাগ্য স্বামী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। প্রবাস-যাপনকালে নিজেকে সকল রকম সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি কষ্টে তাহার স্বল্প বেতন হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিত। আসিবার সময় এই সঞ্চিত অর্থে, স্ত্রীর জন্য একযোড়া সোনার বালা সে গড়াইয়া আনিয়াছিল—তাহা স্ত্রীকে উপহার দিল।

পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল—একটু সকালেই নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া পুত্রসহ সে শয্যায় আশ্রয় লইল। ছেলেটি তখন তাহার পাঁচ বৎসরের হইয়াছে। তারপর কি ঘটিল, নদীয়া জজ আদালতে সেই পাঁচ বৎসরের ছেলের মুখে শুনুন।

"একদিন এক ব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসিল, মাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "তোর বাবা।" আমি বলিলাম, "আমার একটা বাবা ত রহিয়াছে।" মা বলিল, "এও তোর বাবা, সে বাবার কথা এ বাবাকে কিছু বলিস্ না।"

নূতন বাবা আমাকে কাছে লইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। আমায় কত চুমো খাইলেন, কত আদর করিলেন। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, আমার মা ও পুরাতন বাবা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, আমার নূতন বাবা যে সেদিন আসিয়াছিল, তার গলা কাটা, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবা আমায় ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর্ পাজি! চেঁচাবি ত তোরও গলা এমনি ক'রে কেটে দেবো।" ভয়ে আমি চক্ষু মুদিলাম এবং ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

গ্রামের একজন ডোম এ মোকর্দ্দমায় একটা প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহার উক্তি হইতে প্রকাশ—

খুনের পর মাতঙ্গিনী তাহার জারকে বলিতে লাগিল, "চল, এবার দু'জনে লাসটা নদীতে দিয়ে আসি।"

সে ব্যক্তি বলিল, "দাঁড়াও, একটু স্থির হয়ে নিই। রক্ত দেখে আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। ভয় কি? একটু সবুর কব—সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণের পর সে ব্যক্তি বলিল, "একবার চট্ করে বাইরে থেকে আসি"—বলিয়া সে বাহির হইয়া, রাত্রির অন্ধকাবে কোথায় গেল, পুলিস তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারেন নাই।

মাতঙ্গিনী বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দশ মিনিট—পনেরো মিনিট আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার পেয়ারের লোকটি—এই অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া—পলায়ন করিযাছে।

মাতঙ্গিনী তখন বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া, সেই অন্ধকারে বাহির হইল। গ্রামের ডোমপাড়ায় গিয়া, তাহার বিশ্বস্থ একজন ডোমকে জাগাইল। তাহার নিকট আমূল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি আমার বাবা তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও। এখন মাত্র দুপুর রাত, রাতারাতি লাসটা নদীতে ফেলে দাও। তোমার পুরস্কার, আমার হাতের এই নূতন বালাযোড়াটা। একটা তোমায় আমি এখনি দিয়ে যাচ্চি—আগাম। আর একটা, কাজ শেষ হ'য়ে গেলেই তুমি পাবে।'—বলিয়া মাতঙ্গিনী এক হাতের বালা খুলিয়া ডোমকে দিল।

সমস্ত শুনিয়া বালা লইয়া ডোম বলিল, "আচ্ছা মাঠাকরুণ, যা করবার আমি সব করছি। তামাকটা খেয়ে নিই, খেয়ে, আমার এক বন্ধু ডোমকেও ডাকি। তাকেও সঙ্গে নেওয়া দরকার, একলা ত আমি পারবো না। অন্য বালাটা বরঞ্চ তাকেই দেবেন, সেও ত পুরস্কারের আশা করবে। আপনি বাড়ী যান, আমি আধ ঘণ্টার ভিতরই তাকে নিয়ে আসছি।"

মাতঙ্গিনী বাড়ী চলিয়া গেল। ডোম, তামাক শেষ করিয়া, অন্য কোনও ডোমকে

জাগাইতে গেল না,—সে গেল থানায়। দারোগাকে জাগাইয়া মাতঙ্গিনী যাহা যাহা তাহাকে বলিয়াছিল, সমস্তই দারোগাকে জানাইল এবং বালাটিও দারোগাকে দিল।

দারোগা সেই রাত্রেই গিয়া মাতঙ্গিনীকে গ্রেপ্তার করিলেন।

অবশেষে সেসন জজের আদালতে মাতঙ্গিনীর বিচার হইল। কে যে হত্যা করিয়াছিল,—মাতঙ্গিনীই গলা কাটিয়াছিল, অথবা তাহার জারই ও-কার্য্য করিয়াছিল,—তাহা নির্ণীত হইল না। চাক্ষুস সাক্ষী কেবলমাত্র সেই পাঁচ বৎসরের বালক। কিন্তু আইন এই যে, যদি দুই বা তদধিক ব্যক্তি একমত হইয়া কোনও দুষ্কার্য্য করে, তবে প্রত্যেকেই সমভাবে অপরাধী (পীনাল কোড, ৩৪ ধারা)। স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার ধারাতেই জজ মাতঙ্গিনীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া দয়া করিয়া চরম-দণ্ড (ফাঁসি) না দিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন।

জজ আদালত হইতে মাতঙ্গিনীকে কয়েদী গাড়ীতে (Prison van) যখন জেলে লইয়া যাইত, সেই সময় পথের দুই ধারে কৃষ্ণনগরের লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। গাড়ী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, তাহারা অকথ্য ভাষায় মাতঙ্গিনীকে গালাগালি দিত,—কেহ গাড়ীর কাছে যাইয়া তাহাতে থুথু ফেলিত ছেঁড়াজুতা প্রভৃতি, এমন কি কাগজে মোড়া বিষ্ঠা পর্য্যন্ত গাড়ীতে ছুঁড়িয়া মারিত। জনসাধারণের ক্রোধ (Public indignation) এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। তারকেশ্বরের মোহান্তের বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মোহান্তের চারি বৎসর জেল হয়—হুগলী জেলে সে আবদ্ধ হইয়াছিল। গুজব রটিয়াছিল. মোহান্তকে ঘানি টানাইতেছে। সহরে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের একটা দোকান (Jail depot) ছিল। মোহান্তের নিষ্কাশিত সর্ষপ তৈল সে দোকানে একটাকা সেরে বিক্রয় হইয়াছিল। (তখনকার দিনে এক সের সর্ষপ তৈলের মূল্য দুই আনা দশ পয়সা মাত্র ছিল—আমিই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চারি আনা সের সর্ষপ তৈল কিনিয়াছি।)

সান্যাল-মহাশয় ছিলেন একজন সরকাবী ডাক্তাব—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। (ক্রমে তিনি সিভিল সার্জ্জন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এমন সময় পোর্ট ব্লেয়াবের মেডিক্যাল অফিসারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বদলি করে। তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পাঁচ বৎসর কাল পোর্ট ব্লেয়াবে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন—

"পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছানর অল্প দিনের মধ্য আমি জানিতে পারি যে, মাতঙ্গিনী তথায় রহিয়াছে। একজন বাঙ্গালী অফিসার আসিয়াছেন শুনিয়া, মাতঙ্গিনী আমাদের বাসায় আসিল, আমার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া গেল। তারপর হইতে মাঝে মাঝে সে আসিত, আমার স্ত্রীর সহিত গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তখন সে বৃদ্ধা, সমস্ত চুল তার পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, যৌবনে সে খুব সুন্দরীই ছিল।

একদিন নির্জ্জন পথে মাতঙ্গিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথার পর বলিলাম, "মাতঙ্গিনী, তোমার মত, আমিও নদীয়া জেলার লোক, কৃষ্ণনগরে আমার বাড়ী, ইহা আমার স্ত্রীর কাছে তুমি শুনিয়া থাকিবে। সেসন আদালতে যখন তোমার মোকর্দ্দমা হয়, তখন আমি বালক, স্কুলে পড়ি। সে সময় লোকে বলাবলি করিত, খুনটা কে করিল, তুমিই করিলে, অথবা তোমার লোকই করিল, তাহা কিছুই জানা গেল না। এ বিষয়ে, অন্য সকলের মত, আমার মনেও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। সে ঘটনার পর বহু বৎসব গত হইয়াছে। এখন তুমি আমায় সে কথা বলিবে?"

সান্যাল-মহাশয় আমায় বলিলেন, "এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী কযেক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইযা নতমুখে রহিল।" তার পর ধীরে ধীরে, মুখ পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে কথা আজ আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

পরের চিঠি

এক

আহারাদি করিয়া, ধড়াচূড়া পরিয়া, বেলা ১১টার সময় সাব-ডেপুটিবাবু কাছারি রওয়ানা হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা মণিকা দেবী তখন চুল খুলিয়া উহাতে চিরুণী দিতে দিতে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

মণিকার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, সবেমাত্র এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে। মণিকা বেথুনে আই-এ পড়িতেছিল, বিবাহ হইয়া পড়া বন্ধ হইল। স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ দেব, জাতিতে কায়স্থ, বয়স ২৭ বৎসর, বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, তবে রঙটি মণিকার মত ধবধবে নহে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই বলিতে হইবে। সুরেনবাবু ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম-এ, তাহার উপর একজন সুকণ্ঠ গায়ক। মণিকার মনে স্বামিসৌভাগ্য গর্ব্বের অন্ত নাই।

কৈশোর কাল হইতে উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া দাম্পত্য প্রেমের একটা উচ্চ আদর্শ মনের মধ্যে মণিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষ জীবনে একবার মাত্র ভালবাসিতে পারে। যদি কেহ প্রথমা স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, তাহার মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করে, তবে সেই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতি তথাকথিত ভালবাসা জাল ও জুয়াচুরি মাত্র। উহাতে দেহের মিলন হয় বটে, প্রাণের মিলন, আত্মার মিলন অসম্ভব। মণিকার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ;—সুশিক্ষিত এবং আধুনিক ভাবাপন্ন। সংসার খুব স্বচ্ছলের না হইলেও, কষ্টে সৃষ্টে মেয়েকে পড়াইতেছিলেন। মেয়ের রূপ আছে, তাহার উপর বিদ্যা-সংযোগ হইলে, কালে এমন কি একটা সিভিলিয়ন জামাতা, জুটিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে, ইহাই ছিল তাঁহার মনের গোপন আশা। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন, বিলাত-ফেরৎ হইলে কি হইবে? চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! সে শ্রেণীর পাত্রের দর অতিরিক্ত চড়া। চারি অঙ্কে কুলায় না, পাঁচ অঙ্ক আবশ্যক। তাই অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া একটি উচ্চপদস্থ দ্বিতীয়পক্ষ পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। বয়স তাহার এমন কিছু বেশী নয়, সন্তান সন্ততিও ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষ শুনিয়া মণিকা এমন বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। অবশেষে সাব-ডেপুটি সুরেন্দ্রনাথের হস্তেই তিনি কন্যাদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু এক্ষণে রঙ্গপুরে কার্য্য করিতেছেন। স্নান সারিয়া, মণিকা ঝিকে আদেশ করিল, "বামুনঠাকুরকে বল্ আমার ভাত বেড়ে নিয়ে আসতে।"

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে মণিকা একটা ব্যঙ্গচিত্র মাসিক পত্রিকা হস্তে সোফায় অঙ্গ ঢালিল। এখানি "তরুণ" দলের কাগজ। মণিকা একটা গল্প পড়িতে আরম্ভ করিল। স্বামিপ্রেম-বঞ্চিতা এক তরুণী গোপনে কিরূপ ভাবে পুরুষান্তরের সহিত প্রেম করিয়াছিল তাহারই বর্ণনা। কিছুদিন পরে স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে স্বামীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সেই সেকেলে সঙ্কীর্ণমনা নরপশুটা মাঝে মাঝে অসময়ে অতর্কিতে গৃহে আসিয়া দেখিত স্ত্রী কি করিতেছে। এই ভাবে লাঞ্ছিতা অপমানিতা তরুণী অবশেষে স্বামীর নামে সমাজতত্ত্বঘটিত খুব উচ্চ দরের চিন্তাপূর্ণ একটা পত্র লিখিয়া রাখিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া তাহার প্রণয়ীর গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল এবং তথায় নিজ নারীত্ব সফল করিতে লাগিল। গল্প পড়িয়া ঘৃণায় মণিকার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রেমে অমন অভিশাপ লাগেনি।"

গল্পের শেষাংশ পাঠ করিতে করিতে মণিকার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। গল্প শেষ করিয়া, মাসিকপত্রখানি পার্শ্বস্থ টেবিলে রাখিয়া মণিকা সেই সোফাতেই একটু গড়াইবার আয়োজন করিতেছে,—এমন সময় বাংলোর হাতায় একটা গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ শুনিতে পাইল। কে আসিল? ইন্‌স্পেক্টারবাবুর স্ত্রী? যদুবাবু উকিলের স্ত্রীও হইতে পারেন। কিন্তু সিঁড়িতে পদশব্দ উঠিল—তার স্বামীর। মণিকা দেওয়াল-ঘড়ির পানে চাহিয়া

দেখিল, বেলা সবে তখন দেড়টা। পাঁচটার পূর্ব্বে স্বামী ত কোনও দিন ফেরেন না, তবে আজ এমন অসময়ে কেন? সে মনে মনে হাসিয়া বলিল, "ওগো, আমার নারীত্ব বিফল হয়নি। তোমার গোয়েন্দাগিরির কোনও দরকার নেই।"

পদশব্দ হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুভাব ধারণ করিল। মণিকা বেশ বুঝিতে পারিল, আগন্তুক সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছেন। সত্যই তবে এটা গোয়েন্দাগিরি নাকি? অবশেষে সুরেনবাবু ভেজানো দুয়ারটি আস্তে আস্তে ফাঁক করিলেন। তারপর ভিতরে আসিয়া বলিলেন, কি গো, তুমি এখনও ঘুমোওনি? পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই ভয়ে আমি পা টিপে টিপে আসছি।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মণিকা সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল। বলিল, "আজ হঠাৎ এমন অসময়ে যে?"

হঠাৎ সাহেবের হুকুম হল, একটা সবেজমিন তদন্তেব জন্যে বাইরে যেতে হবে। তিনটের গাড়ীতেই রওয়ানা হতে হবে।"

"কোথায়?"

"তিস্তা জংসন থেকে নেমে ১২ মাইল। তুমি যাবে? চল না বেড়িযে আসবে। সেখানে ছোটখাট রকমের একটা ডাকবাংলো আছে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, আমাকে বাড়ীতে একা বেখে যেতে তোমার অবিশ্বাস হয় নাকি?"

"অবিশ্বাস? তোমাকে? তোমাব প্রতি যেদিন অবিশ্বাস হবে সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।"—বলিতে বলিতে তিনি স্ত্রীর পাশে সোফায় বসিলেন।

মণিকা রাগিয়া স্বামীর গালে একটা ঠোনা মাবিযা বলিল, "আহা! কথার ছিরি দেখ না পুরুষের! খুব রসিকতা হল, না?"

"রসিকতা আমি করলাম? না তুমি কবলে?"

"আমিও করিনি। দেখ, ঐ হতভাগা মাসিকপত্রের একটা হতভাগা গল্প আমাব মাথার ভিতরে ঘুবছিল। আমি যেতাম গো, তোমাব সঙ্গে গিয়ে এই বাহেব দেশের পাড়া-গাঁ দেখে আসতাম। কিন্তু শবীরটে কেমন ভাল ঠেকছে না।"

কেন আবাব জ্বব কববে নাকি?" "কি জানি।"

তাই ত! ভাবি মুস্কিল কবলে যে! স্নানটা আজ বাদ দিলেই হত। কিন্তু আমার ত না গেলেই নয়!"

তুমি এস গিয়ে। ও আমার কিছু নয়! বাত্রে একটা উপোস দেবো না হয়। চল তোমার গোছ-গাছ ক'বে দিইগে।"

গোছগাছের বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। দুই একদিনেব জন্য টুবে যাইবার বস্ত্রাদি একটা সুটকেসে গোছানই থাকিত। গৃহভৃত্য ও আর্দ্দালিতে মিলিয়া বিছানা বাঁধিয়া ফেলিল। আর্দ্দালি ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া আনিল। বিছানা, সুটকেস ও জলের সোরাই সহ সাব-ডেপুটিবাবু ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলিয়া গেলেন, পরশু দুপুরবেলা নাগাইদ ফিরিয়া আসিবেন।

সেইদিন বৈকালে ধোবা আসিল। গতবাবে তাড়াতাড়িতে ধোবাকে দেওয়া কাপড়ের তালিকা লিখিয়া রাখা হয় নাই—তবে কোন্ কোন্ কাপড গিয়াছে তাহা মণিকাব বেশ মনে ছিল। মণিকা কাপড়গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "বাবুর একটা এণ্ডির কোট গিয়েছিল যে! সেটা আনিসনি?"

ধোবা বলিল, "না মা, এ ক্ষেপে ত যাযনি।"

মণিকা বলিল, "গিয়েছিল বইকি। আমার মনে হচ্চে।"

ধোবা সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল। বলিল, উহা গত মাসে গিয়াছিল এবং যথাসময়ে সে উহা দিয়াও গিয়াছে, মা খুঁজিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই উহা বাড়ীতেই পাইবেন।

মণিকা বলিল, "আচ্ছা আমি খুঁজে দেখবো। কিন্তু যদি না পাই তা হলে তোমার হিসেব থেকে দাম কাটা যাবে বাপু!"

দুই

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মণিকা দেখিল, মাথাটা কেমন ভার ভার, চোখ দু'টাও জ্বালা করিতেছে। চা-পান শেষ করিয়া সে স্বামীর এণ্ডির কোটের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। শয়নকক্ষের আলমারি ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খোঁজা শেষ হইলে, অপর এক কক্ষে একটা কালো রঙের সুটকেসের প্রতি মণিকার নজর পড়িল;—তখন তাহার স্মরণ হইল; ঐ সুটকেস দেখিল, উহা ভারি মন্দ নহে, বস্ত্রাদি থাকাই সম্ভব। সেই এণ্ডির কোট স্বামী যদি উহার ভিতর রাখিয়া থাকেন। কিন্তু উহার চাবি কই? সে রিঙে অন্যান্য চাবি হইয়াছে, সৌরভে উহার চাবি ত নাই! সে রিঙের সব চাবিই ত মণিকার সুপরিচিত। আর একটা রিঙ আছে, উহাতে স্বামীর আপিসের চাবি থাকে। উহা শয়নঘরে শেলফের উপর থাকে, আপিস যাইবার সময় স্বামী উহা পাৎলুনের পকেটে পুরিয়া লইয়া যান। মণিকা শয়নঘরে গিয়া সেই রিঙ লইয়া আসিয়া, দুই তিনটা চাবি লাগাইতেই কলটা খুলিয়া গেল।

সুটকেসের ভিতর হইতে কয়েকটা পুরাতন কাপড় জামার তলেই বাহির হইল, সিল্কের রুমালে বাঁধা কতকগুলি চিঠি, কোনওখানিরই খাম নাই। স্ত্রীলোকের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি, স্বাক্ষর স্থানে "তোমারই মনোরমা।" রুমালখানি সহ চিঠির বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া লইয়া, সুটকেস বন্ধ করিয়া মণিকা শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোফায় বসিল। চিঠিগুলি কোলের উপর রাখিয়া, পড়িবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কার চিঠি কে জানে! তবে স্বামীর সুটকেসের মধ্যে আর কার চিঠি থাকিবে? পরের চিঠি পড়া কি উচিত?—কিন্তু স্বামী কি পর? স্বামী যে তার অন্তরের অন্তরতম দেবতা। তারা দু'জনে যে এক প্রাণ এক আত্মা, দেহই কেবল ভিন্ন। না না, পর তিনি কখনই নহেন। মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া, অবশেষে মণিকা মাঝখান হইতে একখানি চিঠি টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পত্রখানির আরম্ভ ভাগ পড়িয়াই মণিকার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! চিঠিতে তারিখ দেখিল, তার বিবাহের পূর্ব্বের তারিখ। রচনায় ভাষার ভুল নাই, বানান ভুল নাই,—কোনও শিক্ষিতা মেয়ের হস্তাক্ষর। তবে, বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী কি অন্য কাহারও সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছিলেন? উঃ—কি সর্ব্বনাশ!

পত্র শেষ করিয়া মণিকার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। আর একখানি খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিল। পরস্পরের অটুট অনাবিল গভীর প্রেমের পরিচায়ক। মনোরমার পিতা-মাতা কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিবেন কি না, সে বিষয়ে আকুল আশঙ্কা। পড়িয়া মণিকার কান্না আসিতে লাগিল।

তৃতীয় পত্রে, পিতা-মাতা মত করিলেন না ইহাই প্রকাশ। আজীবন উভয়ের কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনে, জন্মান্তরে মিলনপ্রতীক্ষায় এ জীবন যাপনের প্রস্তাব। মণিকার চক্ষু হইতে ঝর ঝর ধারায় অশ্রু বহিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "মা, ১১টা যে বাজতে চলল,—চান করবে না?"

মণিকা চক্ষু মুছিয়া ধরা গলায় বলিল, "না স্নান করবো না, শরীরটে আজ ভাল বোধ হচ্চে না।"

"তা হলে, বামুন ঠাকুরকে ভাত বাড়তে বলি?"

"না খেতেও ইচ্ছে নেই।"

ঝি কাছে আসিয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "গা যে গরম হয়েছে দেখছি ওমা, জ্বর করবে নাকি? বাবুও যে বাড়ী নেই! কি হবে গো মা।"

আর কোনও পত্র পড়িতে মণিকার প্রবৃত্তি হইল না। সবগুলি গুছাইয়া, বাঁধিয়া মণিকা এখন বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ঝির কথা মিথ্যা নয়, জ্বরই আসিতেছে বটে।

মণিকা তখন চিঠির বাণ্ডিল আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে খুব কম্প দিয়াই জ্বর আসিল। ম্যালেরিয়া। রঙ্গপুরে আসিয়া আর একবার সে এইরূপ জ্বরে পড়িয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবুর স্ত্রী কল্যাণী বেলা দুইটার সময় বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, এই ব্যাপার! মণিকা তখন বেহুঁস তিনি তখনই বামুন ঠাকুরকে কাছারিতে পাঠাইয়া নিজ স্বামীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু আসিয়া, স্ত্রীর নিকট সাব-ডেপুটি-গৃহিণীর অবস্থার কথা শুনিয়া, নিজেই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ দিলেন, বলিলেন, "কোনও ভয় নেই, ম্যালেবিয়া জ্বর। সহরে জ্বরটা আজকাল খুবই হচ্ছে।"

পরদিন বেলা ২টাব সময় সাব-ডেপুটিবাবুও ফিবিলেন।

তিন

এক সপ্তাহ অবিশ্রান্ত শুশ্রূষার পর গতকল্য হইতে মণিকাব জ্বরটা ছাড়িয়াছে আজ সে দু'খানা সুজির রুটি খাইবে। বলা বাহুল্য সে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুরেনবাবু তাহাব মুখধোয়ানো শেষ করিয়া ঔষধ পান করাইযা দিয়াছেন। খোলা জানালার কাছে সোফা টানিয়া, দুই তিনটা কুশনে ঠেস দিযা তাহাকে বসাইয়াছেন। বুক অবধি একটা পাৎলা শাল চাপা। সুরেনবাবু পার্শ্বে একটা চেয়াব টানিয়া বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

বেলা ৯টা বাজিলে মণিকা গম্ভীবভাবে বলিল, "তুমি আব কতদিন আফিস কামাই করবে?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমি যে তিন মাসের ছুটি নিযেছি।"

"তিন মাসের! তুমি কি মনে করেছিলে আমাব এদিক ওদিক যা হোক একটা কিছু হ'তে তিন মাস লেগে যাবে?"

"এদিক—আবার 'ওদিক' কেন?"—বলিয়া সুরেনবাবু শাস্তি স্বরূপ পত্নীব গাল টিপিয়া দিলেন। তার পর বলিলেন, "রঙ্গপুবে থাকবার আব ইচ্ছে নেই। যে ম্যালেরিয়া। তিন মাস ছুটি নিলে অন্য জায়গায় বদলি ক'বে দেয কিনা, তাই তিন মাসের ছুটিই নিয়েছি। তুমি একটু সেরে উঠলেই, আমি তোমায দার্জ্জিলিঙে নিয়ে যাব হাওয়া বদলাতে। এপ্রিল মাসে লাট সাহেবের দপ্তরও দার্জ্জিলিঙ যাবে। সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা ক'বে আলিপুরে বদলি হবার চেষ্টা করবো।"

মণিকা ক্লান্তভাবে বলিল, "কেন, তোমার মনোরমা আলিপুরে থাকে নাকি?"

সুরেনবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার মনোরমা? আমার মনোরমা আবার কে? কি বলছো তুমি?"

মণিকা স্বামীর পানে না চাহিয়া ক্লান্তভাবে বলিল, "মনোরমা—তোমার ভালবাসা গো। আজকাল সে আর তোমায় চিঠি লেখে না? চিঠি এখন আপিসের ঠিকানায় আনাও বুঝি? ওহো, তুমি কৌমার্য্য ব্রত ভঙ্গ কবেছ কিনা, সেই রাগে মনোরমা আর বোধ হয় চিঠি লেখে না তোমায়, না?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এ সব কি তুমি ভুল বকছো বল দেখি? মনোরমা ব'লে কোনও জন্মে আমার কোনও ভালবাসাও ছিল না, কেউ আমায চিঠিও লেখে না।"

মণিকা বলিল, "বিয়ের পর থেকে তোমায় কতবার আমি জিজ্ঞাসা করেছি, হ্যাঁ গা, আমি ছাড়া তুমিও কোনও দিন আর কাউকে কি ভালবেসেছিলে? তুমি বরাবর ১৮০ উত্তর করেছ—স্বপ্নেও না। আমি আগে মনে করতাম তুমি সত্যবাদী। এখন দেখছি সেটা আমার ভুল। আমি তোমার চিঠি দেখেছি। নিজে পড়েছি।"

"আমার চিঠি? কাকে চিঠি লিখেছি আমি? কোথা সে চিঠি?"

"তুমি লেখনি। তোমার মনোরমা তোমায় লিখেছিল। তোমার সুটকেসের ভিতরে ছিল। যত্ন করে রেশমী রুমালে তুমি বেঁধে রেখেছিলে মনে নেই? এক গাদা চিঠি। ভয় নেই, বেশী পড়িনি আমি, তিন চারখানা মাত্র পড়েছি। আর পড়তে ভাল লাগলো না।"

সুরেনবাবু বলিলেন "আমার সুটকেসের ভিতর কারু কোনও চিঠি ত কোনও দিন ছিল না। কই সে চিঠি?"

"যে সুটকেস তুমি টুরে নিয়ে যাও, সে সুটকেস নয়। যে সুটকেসটা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে ও-ঘরে। তুমি যেদিন টুরে যাও, তার পরদিন সকালে তোমার এণ্ডির কোট খুঁজতে গিয়ে আমি সেই সুটকেস খুলে সেই সব চিঠি দেখতে পাই।"

সুরেনবাবু আর বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া সেই সুটকেস হাতে করিয়া লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সুটকেসের মধ্যে চিঠি ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এ সুটকেস ত আমার নয়।"

"ঐ যে ডালায় তোমার নামের অক্ষর ছাপা রয়েছে—S. D.!"

সুটকেস মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া, সুরেনবাবু স্ত্রীর পানে চাহিয়া হা হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। দীর্ঘ এবং উচ্চ হাসি। তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মণিকা একটু বিব্রত হইল। বলিল, "ও সুটকেস তোমাব নয় ত কার তবে শুনি!"

কষ্টে হাসির বেগ সম্বরণ করিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা আমি কি তোমায় বলিনি যে আমার একজন বন্ধু আছে তার নাম শরৎ দত্ত?"

"যে কাশ্মীরে চাকরি করতে গেছে?"

"হ্যাঁ! আমি কি তোমায় বলিনি যে কলকাতায় সে টিউশনি করতে করতে ল আর এম-এ পড়তো?"

"বলেছ।"

"আমি কি তোমায় বলিনি, যে ব্রাহ্ম মেয়েটিকে সে পড়াতো, তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়ের বাপ-মাও রাজি হয়নি, আর শরতের বাপ তাকে ধ'রে নিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়?"

"হ্যাঁ, সে কথা, বলেছ।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আর এ কথাও বোধ হয় তোমায় বলেছি যে, এখানকার কলেজে একটা মাষ্টারির চেষ্টায় সে এসে আমার বাসায় দিন ক'য়েক ছিল—তখনও তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।"

"কই আমার মনে পড়ে না।"

"ও সুটকেস তারই। এখানকার সে মাষ্টারি চাকরিটা হল না। যাবার সময় সুটকেসটা এখানে সে ভুলে ফেলে কলকাতায় চ'লে যায়। আমি তাকে ওটা রেল পার্শ্বেলে পাঠিয়ে দিতেও চেয়েছিলাম। সে লিখলে কাশ্মীরে একটা চাকরি পেয়ে সে রওয়ানা হচ্চে; ওতে বিশেষ দরকারী জিনিব তার কিছু নেই,—আমার কাছেই রেখে দিতে বলে,—পরে এসে নেবে।"

মণিকা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওঃ তাই বুঝি!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা এ সুটকেস তুমি খুললে কি ক'রে? এর চাবি ত আমাদের কাছে নেই!"

মণিকা বলিল, কেন, তোমার আপিসের রিঙে এর চাবি ছিল। আমি ভেবেছিলাম, পাছে আমি ও সুটকেস কোনও দিন খুলি, সে ভয়ে ওর চাবি তুমি বাড়ীর রিঙে রাখনি।"

সুরেনবাবু চাবির রিং লইয়া আসিয়া বলিলেন, "কোনটা?" মণিকা একটা চাবি বাছিয়া বলিল, "এইটে বোধ হয়।"

"এটা ত আমার আপিসের একটা টানার চাবি।"—বলিয়া সেই চাবি দিয়া সুটকেস খুলিলেন। কাপড় জামা হাঁটকাইতে হাঁটকাইতে দুইখানা বহি এবং একটা খামে ভরা খানকতক সার্টিফিকেট বাহির হইল। বহিগুলিতে ইংরাজিতে নাম লেখা এস ডট্। সার্টিফিকেটগুলি কলেজের প্রোফেসারদের লিখিত। তাহাতে পুরা নাম শরৎচন্দ্র দত্তই লেখা আছে। সেগুলি স্ত্রীকে দেখাইয়া সুরেনবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুরাইন ধর্ম্মাবতার, আমার এই সাফাই সাক্ষীগুলির এজেহার কি আপনি বিশ্বাস করছেন না?"

হুজুরাইন রায়প্রকাশ করিলেন—"যাও, তুমি বে-কসুর খালাস।"

দিব্যদৃষ্টি

এক

জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাসে আজ মহা উৎসব লাগিয়াছে। ব্যাপারটা এই—

সুরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াই পাস হইয়াছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষার মনোবিজ্ঞান বিভাগে সে একেবারে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম হইবার খবর যে দিন বাহির হইল, সে দিন ছিল বুধবার।

সুরেনের পিতা জীবিত নাই—দেশে, পাবনা জেলায় চৌরীপুর গ্রামে, তাহার জননী আছেন; সুরেনের পিতৃব্যের অভিভাবকতায় তিনি বাস করেন। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নহে। তাই বি-এ পরীক্ষা, কবে শেষ হইয়া গেলেও সুরেন কলিকাতায় থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতেছে। সুরেনের বয়স তেইশ বৎসর, দিব্য সুশ্রী চেহারা, সদাই হাস্যবদন। সুরেন আজিও অবিবাহিত।

তাহার পরবর্ত্তী শনিবারে মেস-বন্ধুগণ এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করিল। খরচটা অবশ্য সুরেনেরই। বাসার শরৎবাবু, বিপিনবাবু, যোগেশবাবু, উমাপদবাবু, যতীন্দ্রবাবু, সতীশবাবু, ললিতবাবু ত আছেনই। বাহির হইতে অতুলবাবু, কুমুদবাবু ও কুঞ্জবাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ভোজন-শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সিদ্ধির আয়োজন হইয়াছিল। যুবকগণ সকলে একত্র হইলে, সিদ্ধি বিতরিত হইল। কেহ এক পাত্র, কেহ দুই পাত্র গ্রহণ করিলেন, মাত্র দুইজন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সিদ্ধি তাঁহাদের মোটেই সহ্য হয় না।

কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর, গান-বাজনা আরম্ভ হইল। হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়াতবলা সহযোগে দেড় কি দুই ঘণ্টা গান-বাজনার পর গায়ক ও বাদকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সিদ্ধির নেশা সকলেরই বেশ জমিয়া আসিয়াছে। আবার গল্প-গুজব আরম্ভ হইল।

সতীশবাবু এক কোণে বসিয়া সে দিন প্রভাতের সংবাদপত্রখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, একটা মজার খবর শুনেছ?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "কি? কি?"

"এই যে পড় না শুনি—অর্থাৎ শোন না, পড়ি।"—বলিয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

মফঃস্বল সংবাদ—কৃষ্ণনগর—নদীয়া

ছাত্রীর কৃতিত্ব। কৃষ্ণনগর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামজীবন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা কুমারী কুন্দমালা দেবী বিগত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা কৃষ্ণনগরবাসী সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এই উপলক্ষ্যে রামজীবনবাবু সহরস্থ তাবৎ গণ্যমান্য লোককে আগামী শনিবারে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্থানীয় যুব-নাট্যসমিতি নিমন্ত্রিতগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ ঐ রজনীতে রামজীবনবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে ডি-এল্ রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয় করিবেন।

ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল—"হুর্‌রে—থ্রী চিয়ার্স ফর এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা মুণ্ডমালা!"

সুরেন বলিল, "মুণ্ডমালা নয় রে, কুন্দমালা। নামটি কিন্তু বেশ মিষ্টি।"

অতুলবাবু নামক এক ভদ্রলোক দেওয়ালে হেলান দিয়া উর্দ্ধমুখে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য।"

ললিত বলিল, "আহা কি আর আশ্চর্য্য? বাঙ্গালীর মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হওয়া, আজকালকার দিনে মোটেই আর আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।"

অতুলবাবু বলিলেন, "সে জন্যে আশ্চর্য্য বলিনি হে।—দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাপারটা যা দেখতে পাচ্ছি—তা আশ্চর্য্য। অতীব আশ্চর্য্য!"

যোগেশবাবু বলিলেন, "দিব্যচক্ষে কি দেখছ অতুল, বলই না শুনি!"

অতুল বলিল, "এর ভিতরে প্রজাপতির হাত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উমাপদ বলিল, "কিসের ভিতর?"

অতুল বলিল, "প্রথমতঃ দেখ, সুরেনও ফার্ষ্ট হয়েছে, কুন্দমালাও তাই।"

"দ্বিতীয়তঃ?"

"দ্বিতীয়তঃ সুরেনের কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন আজ এখানে পটলডাঙ্গায়, কুন্দমালার কৃতিত্বের জন্যে আনন্দভোজের আয়োজন ঠিক আজই, ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণনগরে চলছে।"

"তৃতীয়তঃ?"

"তৃতীয়তঃ, সে কুমারী, আর আমাদের সুরেন্দ্র—কুমার।"

"তার পর?"

"একজন চাটুয্যে, একজন মুখুয্যে—করণীয় ঘর।"

"আর কিছু আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্ত্তে সুরেনের কানের ভিতর দিয়া কুন্দমালা নামটি পশিল, অমনি আকুল করিল ওর প্রাণ! নামটি শুনেই ও বলেছে—খাসা মিষ্টি নামটি কিন্তু।—সুরেন, বলনি তুমি? এই একঘর লোক সাক্ষী আছে।"

সুরেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিনি, তবে ঐ ভাবের কথা বলেছি বটে।"

অতুল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বিবাহ অনিবার্য্য!"

শরৎ বলিল, "কি হে সুরেন, তুমি কি বল? অনিবার্য্য নাকি?"

সুরেন হাসিয়া বলিল, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটের কোনটাই ত মানুষের হাতে নয় ভাই। প্রজাপতির তাই যদি নির্ব্বন্ধ হয়, তবে আমায় পরতেই হবে মাথায় টোপর, পালাবে কোথা?"

ললিত বলিল, "কি ভয়ানক কথা! আমাদের মধ্যে যে এমন একজন দিব্যদৃষ্টিওয়ালা মহাপুরুষ বিচরণ করছেন, তা আমরা কোন দিনই সন্দেহ করিনি! আচ্ছা অতুলবাবু, মেয়েটির বয়স কত হবে?"

অতুল বলিল, "সতেরো—সতেরো বছরে পড়েছে, এখনও পূর্ণ হয়নি।"

"আচ্ছা, তার চেহারাটা কি রকম, দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছ ত?"

"আলবৎ পাচ্ছি।"

"কি রকম, বল না শুনি। কৃষ্ণা, না শ্যামা, না গৌরী?"

"গৌরী। নাম শুনেই বুঝতে পারছ না? কুন্দফুলের রঙ কি?"

উমাপদ বলিয়া উঠিল, কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা, অয়ি অনিন্দিতা।"

যতীন চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে অতুল, এই দেখ আর একটা ভয়ঙ্কর মিল। সুরেন ভাই, সুরেন— তোমার ভাবী প্রিয়ার একটা বন্দনা-গান গাও।"

কুঞ্জ গাহিয়া উঠিল—

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল। হাসির হিল্লোল থামিলে যতীন বলিল, "যাই বল তাই বল ভাই, এতগুলো মিল কিন্তু আশ্চর্য্য বটে!"

অতুল যতীনের পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে ভেঙ্গাইল—দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হে.ভন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান আব ড্রেম্‌ট্ আফ ইন ইওর ফিলাজাফি!"

ললিত বলিল, "সে যাক্—তুমি ব'লে যাও হে। মেয়েটির বয়স মাত্র সতের বছর, গৌরবর্ণা,—আর কি কি সব বল দেখি?"

"সংক্ষেপেই বলি। মুখ, চোখ, চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই ভাল, তবে একটু ত্রুটি আছে। চোখের তারা দু'টির মিশ কালো নয়, একটু ফিকে বাদামী বঙের। এই ত্রুটিটুকু ছাড়া, মেয়েটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দবী বলা যেতে পাবে।"

সুরেন বলিল, "ওটা কি ত্রুটি নাকি? আমি ত ওটা সৌন্দর্য্যেব লক্ষণ ব'লেই মনে করি।"

এই সময় খবর আসিল, আহার্য্য প্রস্তুত। যুবকগণ আনন্দকলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

দুই

পরদিন বিকালে ৫টার সময় যতীনবাবু কলকাতায় স্নান কবিতেছিলেন, দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক বাসায় প্রবেশ করিলেন। একজন প্রবীণ-বয়স্ক, অন্য জন যুবা-পুরুষ। প্রবীণ ভদ্রলোক যতীনবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "এ বাসায় সুরেন্দ্রবাবু বলে কেউ থাকেন কি? সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী।"

যতীন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"কৃষ্ণনগর থেকে।"

শুনিবামাত্র যতীনের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উত্তর করিল, "সুরেনবাবু ত এখন বাসায় নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন তিনি?"

"সন্ধ্যার আগেই আসবে বোধ হয়।"

"তাঁর ঘরে ব'সে আমরা কি অপেক্ষা করতে পারি?"

"নিশ্চয়। তাঁর ঘর বোধ হয় তালাবন্ধ আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ডানহাতি প্রথম ঘরটা আমার। দয়া ক'রে সেখানে ব'সে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান সেরে আসছি।"

"আচ্ছা থ্যাঙ্কস্"—বলিয়া বাবু দুইজন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া নিজ কক্ষে গিয়া দেখিল, বাবু দুইটি দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া আছেন। যতীন মাথায় শুষ্ক তোয়ালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আপনাদের এক এক পেয়ালো চা দিতে পারি কি?'

প্রবীণ বাবুটি বলিলেন, "দোকানের চা? না, থ্যাঙ্কস্।"

যতীন বলিল, "দোকানের চা নয়। ঐ যে ষ্টোভ রয়েছে, আমি নিজে তৈরী করবো।"

প্রবীণ ভদ্রলোক সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আবার কষ্ট করবেন আপনি?"

যতীন বলিল, "ষ্টোভ ত আমার জ্বালতেই হবে। আমি একটু খাব কিনা।"

বাবুটি বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে—"

যতীন ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, নিজ তক্তপোষের প্রান্তে আসিয়া বসিল। বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপানার নাম কি?"

"শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

"এখানে পড়াশুনো করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—সিটি কলেজে বি-এ পড়ি। এবার ফোর্থ ইয়ার।"

"বাড়ী কোথায় আপনার?"

"আজ্ঞে, খুলনা জেলায়।"

"কোথায়?"

"মাধবপুর গ্রামে।" একটু থামিয়া যতীন বলিল, "যদি বেয়াদবি না মনে করেন, মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি?"

আমার নাম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় মুন্‌সেফের পেস্কার। এটি আমার ভাগ্‌নে, নাম সুধীরকুমার মুখুয্যে। ইনি সম্প্রতি ওকালতী পাস ক'রে কৃষ্ণনগরেই প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করেছেন। এঁর পিতার নাম আপনি শুনে থাকবেন বোধ হয়, তিনি কৃষ্ণনগরের খুব নামজাদা উকীল, রামজীবন মুখুয্যে।"

গত কল্যকার আসরে, সংবাদপত্র হইতে পঠিত নামটা যেন রামজীবন বলিয়াই যতীনের মনে হইল। সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, "রামজীবন? রামজীবন? আচ্ছা, তাঁরই মেয়ে কি এবার ম্যাট্‌রিকে ফার্ষ্ট হয়েছেন?"

সঞ্জীববাবু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—কুন্দমালা—আমার ভাগ্‌নী।"

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য, অতুলবাবু কি তবে একটা ছদ্মবেশী যোগী নাকি? মানুষের দিব্যদৃষ্টি সত্যই কি তবে থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম কি তবে নিতান্ত বুজরুকি নয়? সে মনে মনে বলিল, "নাঃ সন্ধ্যে-আহ্নিকটা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি। কাল থেকে ফের সুরু করতে হবে।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন, জানতে পারি কি?"

সঞ্জয়বাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, তার পর বলিলেন, "আমরা শুনেছি, সুরেনবাবু এখনও অবিবাহিত। তাঁর পিতাও বর্ত্তমান নেই, নিজেই তিনি নিজের অভিভাবক। কোথাও তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে কি না, তিনি এখন বিবাহ করতে রাজি আছেন কি না, আপনি বলতে পারেন?"

যতীন বলিল, "আজ্ঞে না—তা—ঠিক জানিনে।"

চায়ের জল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যতীন তিন পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা-পান করিতে করিতে সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেনবাবু বি-এ ত পাস করলেন, এবার তিনি কি করবেন? আইন-ক্লাসে জয়েন করবেন কি?"

"না, উকীল হবার তার ইচ্ছে নেই। এইবার এম-এ পড়বে।"

"বাড়ীতে ওঁর কে আছে?"

"মা আছেন। কাকা-টাকাও আছেন শুনেছি।"

"ক' ভাই ওঁরা?"

"ভাই-টাই কিছু নেই। একটি বোন আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

এই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। যতীন বলিল, "এই বোধ হয় আসছে।" সুরেন্দ্র,

যতীনের ঘরের সামনে আসিবামাত্র যতীন বলিল, "ওহে এদিকে এস। এই ভদ্রলোক দু'টি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব'সে আছেন।"

"ওঃ, আচ্ছা—আমার ঘরে আসুন।"—বলিয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। আগন্তুকদ্বয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ঘন্টাখানেক পরে বাবুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতীনের ঘরের সামনে আসিয়া সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আজ আসি তা হ'লে যতীনবাবু। আবার দেখা হবে, নমস্কার।"

—যতীন লক্ষ্য করিল, সঞ্জীববাবুর মুখখানি হাসি হাসি। "আজ্ঞে, আসুন, নমস্কার।"—বলিয়া সে ইঁহাদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেল। তার পর দ্রুতপদে সুরেনের ঘরে গিয়া দেখিল, সুরেন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। বলিল, "ব্যাপার কি হে?"

সুরেন চমকিয়া উঠিয়া যতীনের মুখপানে চাহিল। বলিল, "এঁরা কি জন্যে এসেছিলেন, তুমি জান যতীন?"

"স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করেছিলাম হে! উত্তর দেন নি, অন্য কথা পেড়ে আমার প্রশ্নকে চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু কি জন্যে এসেছিলেন, তা অনুমান করতে পারি। কুন্দমালার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন ত?"

সুরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা, বল দেখি!"

"আশ্চর্য্য বইকি!"

"কিন্তু এর এক্সপ্ল্যানেশন্ কি?"

"আমি ত কিছুই খুঁজে পাইনে।—কি হ'ল, তাই বল। রাজি হয়েছ?"

"হয়েছি। দেখ, যাই শুনলাম, উনি কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন,কুন্দমালার মামা, আমি যেন কি রকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। যা যা বললেন, তাতেই আমি হাঁ ব'লে গেলাম। আসছে রবিবারে আমি কৃষ্ণনগর যাব মেয়ে দেখতে। মেয়ে দেখে আমার পছন্দ হ'লে ওঁরা দেশে আমার কাকামশাইকে চিঠি লিখবেন, পবে যা যা করতে হয়, সব করবেন। আষাঢ় মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান, কেন না, তার পরেই মেয়ের জোড়া বছর পড়বে। আচ্ছা যতীন, একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"কি?"

"ওর ভাইয়ের চোখের তারা? অতুলবাবু কুন্দ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, এরও অবিকল তাই। চেখের তারা কালো নয়, ফিকে বাদামী রঙের।"

"না ভাই, আমি ত সেটা লক্ষ্য করিনি!"

"আমি করেছি। কিন্তু যা-ই বল যতীন, অতুলবাবুর কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

"ব্যাপার কি, অতুলবাবুকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না? এখন ত কোনও কাজ নেই, চল না যাওয়া যাক তার বাসায়। একটু বেড়ানও হবে।"

সুরেন বলিল, "তাকে এখন কি বাসায় পাবে? সে ত আজ চলল রাইবেরেলী। সেখানে একটা চাকরি জুটিয়েছে যে। এতক্ষণ বোধ হয় সে হাওড়া ষ্টেশনের পথে।"

তিন

অবিলম্বে মেসের অন্যান্য লোকের মধ্যে কথাটা প্রচার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া সুরেনের ঘরে জটলা আরম্ভ করিল। যোগেশবাবু বলিলেন, "অতুলটা কি কোনও সূত্রে জানতে পেরেছিল যে, কুন্দমালার মামা তোমাকে আজ দেখতে আসবেন? জেনে শুনে ঐ রকম চালাকি খেলে গেল নাকি?"

শরৎ বলিল, "আমি ত' তার পাশেই বসে ছিলাম, কিন্তু সে সময় তার মুখ-চোখ দেখে ত ওরকম আমার মনে হয়নি ভাই! বিশেষ, সে ত নিজে কোন কথাই তোলেনি,—

হঠাৎ খবরের কাগজ পড়ে শোনালে ত সতীশ।—সতীশ, তুমিই প'ড়ে শোনালে না?"

সতীশ বলিল, "হ্যাঁ আমিই ত প'ড়ে শোনালাম। কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, হঠাৎ ঐ প্যারাটা আমার চোখে পড়লো। তারও ফার্ষ্ট হওয়ার জন্যে আনন্দভোজ শনিবারই হচ্ছে এই কথা প'ড়ে আমার ভারি মজা লাগলো, তাই তোমাদের সেটা প'ড়ে শোনালাম।"

বিপিন বলিল, "হয় ওৎলোটা জানতো নয়, সত্যিই তার একটা ক্ষমতা আছে—ওকেই ত ক্লেয়ারভয়েন্স বলে।"

উমাপদ বলিল, "যারা সাধনার খুব উচ্চ স্তরে উঠেছে, তাদের এ রকম ক্ষমতা জন্মে তা স্বীকার করি কিন্তু ওৎলাটা ত মহা নাস্তিক। মুসলমানের রান্না মুর্গী ভক্ষণ করে, ওর ওরকম একটা আর্শ্চয্য ক্ষমতা থাকা আমি ত অসম্ভব বলেই মনে করি। নিশ্চয়ই সে জানতো।"

শরৎ বলিল, "জানতো কি না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে অবশ্য, কিন্তু কোন কোনও মানুষের স্বভাবতঃ ওরকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে, সেটা আমি জানি। আমি যখন প্রথম বছর কলকাতায় আসি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা সার্কাসের দল এসেছিল খেলা দেখাতে। তখন বড়দিনের ছুটী। গড়ের মাঠে প্যাণ্ডাল খাটিয়ে তারা খেলা দেখাচ্ছিল। নানা রকম খেলা হবার পর, একটা খেলা দেখালে, তা একেবারে অদ্ভুত। এক ছুঁড়ী মেম, বয়স এই আঠারো উনিশ, সে এসে বললে, দর্শকদের মধ্যে যে কাউকে আমি ছুঁয়েই, তার জন্ম বার বলে দেবো। যদি আমার ভুল হয়, অনুগ্রহ ক'রে তিনি যেন বলেন।' এই ব'লে সে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এক এক জনকে ছোঁয়, আব এক একটা বারের নাম ব'লে যায়, যেমন—শনিবার, বুধবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার—এই রকম। একটি লোকও বললে না যে, না ঠিক হল না, তোমার ভুল হয়েছে।" আমি তৃতীয় সারিতে ব'সে ছিলাম, খালি ভাবছি, আমার জন্মবার ত সোমবার, দেখি ঠিক বলে কি না। ঐ রকম বলতে বলতে তৃতীয় সারিতে এসে, ছুঁড়ী আমার দিকে চ'লে এল, আমাকে ছোঁবামাত্র বললে—সোমবার।"

অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ বল কি ? নিজে তুমি দেখেছ—"

শরৎ বলিল, "নিজে নয় ত কি প্রক্সিতে?—পাঁচটি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে আমি ঐ তামাসা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। তার পর আরও মজা শোন। তৃতীয় সারি শেষ ক'রে ছুঁড়ি ফিরে গেল। তার পর বললে, প্রত্যেক লোককে ছুঁয়ে, কার পকেটে কি আছে আমি তা ব'লে দিতে পারি। এই ব'লে আবার প্রথম সারি থেকে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে ছোঁয় আর বলে রুমাল, চাবি, পেন্সিল, নস্যির ডিপে ইত্যাদি। জনপ্রাণী কেউ প্রতিবাদ করলে না। আমার সারিতে এসে, আমায় ছুঁয়ে ছুঁড়ী বললে—ঐ সব রুমাল চাবি-টাবি আর একটা জিনিষ, যা বয়স্ক পুরুষমানুষদের পকেটে থাকা সম্ভব নয়,— ছেলেপিলের পকেটে থাকতে পারে। বললে, ভাঙ্গা বিস্কুট রয়েছে আমার পকেটে— কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, আমার নিজেরই তা মনে ছিল না। হয়েছিল কি জান? তার চার পাঁচ দিন আগে, সেই কোট গায়ে পায়ে হেঁটে আমি সহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। চাঁদনীতে এসে বড় ক্ষিদে পায়। চার পয়সার বিস্কুট কিনেছিলাম খানকতক খেয়েছিলাম, খান দুই পকেটে প'ড়ে ছিল।—এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। কি বলতে চাও তোমরা? সে ছুঁড়ী ঋষি-তপস্বীও নয়, সাধনাও করে না, গরু-শূয়োর খায়, মদ খায় এবং সম্ভবতঃ খারাপ চরিত্রের মেয়ে। ও কি জান? কোন-কোনও লোকের ঐ রকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে,—তাকে ক্লেয়ারভয়েন্সই বল, আর দিব্যদৃষ্টিই বল, আর যাই বল।"

বিপিন বলিল, "মাদ্রাজ অঞ্চলের গোবিন্দ চেট্টির কথা শুনেছ ত? এই পনর-যোল

বছর আগেকার কথা। সে সময় খবরের কাগজে প্রায়ই তার কথা বেরুতো। তবে সে ভবিষ্যৎ বলতো না, বর্ত্তমান বলতো। মাদ্রাজে সে নিজের ঘরে ব'সে তোমায় ব'লে দেবে, দেশে তোমার মা সে সময় কি করছেন, বাবা কি করছেন, তোমার স্ত্রী কি করছেন ইত্যাদি। কলিকাতা থেকে কত লোক দেখতে গিয়েছিল। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' কাগজে তার বিবরণ বেরিয়েছিল। মনে আছে, আমার বাবা বলতেন, 'যদি আমার দেহটা ভাল থাকতো, আমি যেতাম।' সেই গোবিন্দ চেট্টিও শুনেছিলাম বদ্ধ মাতাল।"

কুমুদবন্ধু থিয়জফি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। সেও কয়েকজন মহাত্মার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিল। এইরূপ আলোচনায় রাত্রি-ভোজনের সময় সমাগত হইল।

পরবর্ত্তী রবিবারে সুরেন্দ্র কয়েকজন মেসবন্ধুসহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করিল। মেয়ে দেখিয়া সকলেই খুশী। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিল, কুন্দমালাব চক্ষুতাবকা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত কালো নহে, উহা ফিকা বাদামী রঙেরই বটে।

চার

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কুন্দমালার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথেব শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে দেশ হইতে তাহার পিতৃবৎ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরদিন সকলে সদলবলে কৃষ্ণনগর যাত্রা কবিলেন।

শুভ দিনে কুন্দমালার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণনগরেই কুশণ্ডিকাক্রিয়া শেষ করাইয়া কাকা-মহাশয় বর-কনে লইয়া দেশে গেলেন, বরযাত্রীরা কলিকাতায় ফিবিয়া আসিল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে প্রথম সম্ভাষণেব পব সুরেন্দ্র নববধূকে বলিল, "দেখ, আমাদের এ মিলন-ব্যাপারের সঙ্গে খুব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা জড়িত আছে।"

কুন্দ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা?"

সুরেন বলিল, "যখন তোমাতে আমাতে বিয়ের কোনও কথাই হয়নি, যখন তোমাব মামা আমাকে দেখতেও যান নি, তখনই আমাদেব এক বন্ধু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তোমাতে আমাতে বিয়ে অনিবার্য্য। আমাব সে বন্ধুর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবিষ্যতের সব ঘটনা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান।"

কুন্দ বলিল, " বল কি? আমার নাম তোমার সে বন্ধু জানলেন কি ক'বে?"

পটলডাঙ্গার বাসায় এক মাস পূর্ব্বে শনিবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুরেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। 'কুন্দমালা' নামটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াও সুবেন সে মধুর মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না।

কুন্দ অবাক্ হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সুরেনের কথা শেষ হইলে বলিল,"খুব আশ্চর্য্য ত! তোমার সে বন্ধু নিশ্চয়ই একজন খুব ভাল গুরু পেয়েছেন, যোগসিদ্ধ বোধ হয়?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ছাই সিদ্ধ।"

"তবে? তিনি কি করেন?"

"এই, আমরা সকলেই যা করি। অন্নের জন্যে রাত জেগে বই মুখস্থ ক'রে এগ্‌জামিন পাশ করেছেন,তার পর চাকরীর উমেদারী।—ওটা কি জান? এক একজন মানুষের ঐ রকম একটা ক্ষমতা জ'ন্মে যায়। আপনা আপনি জন্মায়, তার জন্যে জপ-তপ সাধনা-টাধনা কিছুই করতে হয় না। ওকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্স—ক্লিয়ার ভিশন—দিব্যদৃষ্টি আর কি। আর, ওরকম ক্ষমতা যার আছে, তাকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্ট।"—মুরুব্বিয়ানা-স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া সুরেন গোবিন্দ চেট্টির ক্ষমতার কথা এবং অষ্ট্রেলিয়ান সার্কাস দলের সেই মেয়ের ক্ষমতার কথাও যথাশ্রুত বর্ণনা করিল।

কিয়ৎক্ষণ কুন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মিনতির স্বরে বলিল, "হ্যাঁগা, তুমি এবার যখন এখানে আসবে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস না। আমি তাঁকে দেখবো।"

সুরেন বলিল, "সে ত এখন কলকাতায় নেই। পাঞ্জাব গেছে চাকরী করতে। যে দিন সে ঐ সব কথা বললে, তার পরদিনই সে চলে গেছে। রাইবেরেলী হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী চাকরী নিয়ে গেছে।"

কুন্দ শুইয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি বললে? রাইবেরেলী ইস্কুলের হেড মাষ্টার?

সুরেন, কুন্দমালার এই হঠাৎ উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ।'কেন?"

তোমার বন্ধুর নাম কি বল দেখি?" "অতুল—অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।"

"ও আমার পোড়াকপাল!—বলিয়া কুন্দ মুখে হাত চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি আর থামে না।

"কেন? কেন? হাসছ কেন?"—বলিয়া সুরেনও উঠিয়া বসিয়া, কুন্দমালার মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া দিল।

আর মিনিটখানেক হাসিয়া তার পর কুন্দ আত্মসম্বরণ করিতে পারিল। বলিল, "হাসছি কেন জান? তোমার সে বন্ধুটি যোগীও নন, ঋষিও নন, গোবিন্দ চেট্টিও নন ক্লেয়ারভয়ান্টও নন। তিনি আমার অতুল-দা। ঐ যে আমার মামা তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তিনি অতুলদার পিসেমশাই। অতুলদা ত কতবার এখানে এসেছেন। বাবা তাঁকে একটি ভাল পাস-করা পাত্রের সন্ধান করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলেন, অতুলদা-ই ত বাবাকে তোমার কথা লেখেন। অতুলদা রাইবেরেলী চ'লে যাবেন ব'লেই দাদাকে নিয়ে মামা তাড়াতাড়ি ঐ দিন তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তোমাদের ভোজের সভায় ঐ ক্লেয়ারভয়েনজটগিবি ফলাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, মামাবাবু দাদাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন ১০টার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা রওয়ানা হবেন। বাবা আগে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যে!"

"তোমায় সে দেখেছে?"

"হাজার দিন।"

সুরেন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? ভারি ঠকানটাই শালা আমাদের ঠকিয়েছিল ত। উঃ—আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গেল। আমায় এক গেলাস জল দাও।"

সুশোভনা

এক

শরৎকাল, পূজার ছুটীতে সহরের আফিস আদালত সবেমাত্র বন্ধ হইয়াছে। সেদিন বেলা ৯টার সময় রাইনগর ষ্টেশনে, কলিকাতা হইতে আগত ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে গুলী, বন্দুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জামসহ দুইজন বাঙ্গালী যুবক অবতরণ করিল। একজনের অঙ্গে ইংরাজি ধরনের শিকারীর বেশ—বয়স আন্দাজ পঁচিশ হইবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, রঙটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাম অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অপর যুবকটি বয়সে ইহার অপেক্ষা দুই একবৎসরের ছোট, হাতে বন্দুক থাকিলেও পরিধানে ধুতি ও কোট। ইহার রঙটি অপেক্ষাকৃত ফরসা, দেহ-গঠনেও পারিপাট্য আছে—বিশেষ করিয়া তাহার চুলগুলি ও চোখ দু'টি বড় সুন্দর। ইহার নাম সুকুমার মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে খানসামার উর্দ্দি-পরা এক মুসলমান ভৃত্য নামিল। তাহার সঙ্গে নামিল আমকাঠের এক সিন্দুক এবং একটা বড় বালতী। ঐ বালতীর ভিতর একটা বিলাতী চুলা (ষ্টোভ) ও অন্যান্য জিনিষ ভর্ত্তি ছিল। যুবকদ্বয় ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে গিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা বাজিয়াছে। কুলীর মাথায় আমকাঠের সিন্দুক ও হাতে বালতী দিয়া খানসামাও আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিল এবং কুলীকে পশ্চাতের বারান্দায় লইয়া গিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

বখশিস লইয়া কুলীটা প্রস্থান করিতেছিল, অমরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে, তোর নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম হরিদাস, আমরা কৈবর্ত্ত।"

"এইখানেই বাড়ী?"

"আজ্ঞে না, এখান থেকে কোশ-তিনেক হবে।"

"আচ্ছা, কুমীরদীঘি কোথায় জানিস?"

"তা আর জানিনে হুজুর? আমাদের গাঁ থেকে কোশখানেক পথ বইত নয়!"

"এখান থেকে কত দূর, সেই দীঘি?"

"এখান থেকে কোশ-দুই-আড়াই হবে।"

"কুমীরদীঘিতে কি সত্যি সত্যি কুমীর আছে?"

"আজ্ঞে ছিল, খুবই ছিল। কলকাতা থেকে সাহেববা এসে মেবে মেরে তাদের বংশনাশ ক'রে দিয়েছে। তবে এখনও কুমীর যে একেবারে নেই, তা বলতে পারলাম না, হুজুর!"

অমরেন্দ্র ইংরাজিতে সুকুমারকে বলিল, "আমাকে বন্দুক-টন্দুক, টিফিন-বাক্স বইবার জন্যে একটা লোক ত দরকার, একেই নিযুক্ত করা যাক না।"

সুকুমার বলিল, "সেই ভাল। সেই জায়গারই লোক, চেনে শোনে।"

অমরেন্দ্র হরিদাসের মজুরী স্থির করিযা, সারাদিনের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিল। হরিদাস বলিল, "কখন বেরুতে হবে, হুজুর?"

"এই, আধ ঘন্টা পরেই।"

"আজ্ঞে হুজুর, তবে আমি বাসা থেকে ঘুরে আসি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

চায়ের জল তৈয়ারি হইলে, খানসামা টেবিল "লাগাইয়া" টিফিন-বাক্স হইতে লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, ফুলকপি-ভাজা ইত্যাদি বাহির করিয়া মনিব ও তাঁহার বন্ধুকে "ব্রেকফাষ্ট" খাওয়াইল। জলের পরিবর্ত্তে চা দিল।

ব্রেকফাষ্ট খাইতে খাইতে অমরেন্দ্র দেখিল, কয়েকজন লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া, হাঁ

করিয়া তামাসা দেখিতেছে। অমরেন্দ্র খানসামাকে বলিল, "পর্দ্দা টেনে দে।" খানসামা ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে ধমক দিয়া, তাড়াইয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিল।

প্রাতরাশ সমাধা করিয়া দুই বন্ধু সিগারেট সেবন করিতেছিল, হরিদাস আসিয়া পৌঁছিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, মুর্গী পাওয়া যায় এখানে?"

হরিদাস অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখাইল, "হুজুর, ঐ যে দেখছেন মাঠের পারে আমগাছগুলো, ঐখানে মোমিনপুর গেরাম। ওখানে অনেক চাষী মুসলমানের বাস। তাদের কাছে তালাস করলে মুর্গী, এগুা সবই পাওয়া যাবে।"

অমরেন্দ্র নিজ ভৃত্যকে বলিল, "আমরা বেরিয়ে গেলেই ঐ মোমিনপুরে গিয়ে গোটা দু'চ্চার মুর্গী আর ডজন-খানেক ডিম কিনে আনবি। রাত্রের জন্যে একটা মুর্গীর রোষ্ট আর একটা মুর্গীর কারি বানিয়ে রাখবি। আমরা ফিরে এলে, তার পর ভাত বানাবি— বুঝলি?"

খানসামা বলিল, "জি হুজুর।"

বিধাতাপুরুষ কিন্তু অদৃশ্যে থাকিয়া এই ভোজনের আয়োজন শুনিয়া হাসিলেন,— কারণ, এখন কিছুকাল এই দুই যুবকের অন্ন তিনি স্থানান্তরে "মাপাইয়া" রাখিয়াছিলেন।

খানসামা, প্রভুর আদেশ অনুসারে, তাহার আমকাঠের সিন্দুক হইতে, বরফজলপরিপূর্ণ দুইটি বড় বড় থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক বাহির করিয়া, টিফিন-বাক্স সাজাইতে বসিল। হরিদাস সন্দিগ্ধনেত্রে টিফিন-বাক্সের পানে চাহিয়া বলিল, "হুজুর, এই বাক্সে রান্না মুর্গী-টুর্গীও যাচ্ছে নাকি?" অমরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না রে না। ঐ দেখ্ না, কচুরি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ-টন্দেশ ছাড়া আর কিছু নেই। ও কচুরি-সিঙ্গাড়াও আমার বাড়ীর বামুন-ঠাকুরের ভাজা। তোর কোন ভয় নেই।"

টিফিন-বাক্স, বন্দুকের বাক্স প্রভৃতি হরিদাসের মাথায় চাপাইয়া দুই বন্ধু শিকারে যাত্রা করিল। উভয়েই হিন্দুর ছেলে "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কলির প্রাবল্যে সে কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না।

দুই

এইখানে এই যুবকদ্বয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক। কলিকাতা বাদুড়বাগানে উভয়েরই বাস, উভয়েই বৈদ্যবংশসম্ভূত। অমরেন্দ্রনাথ "মুখে রূপার চামচ" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তার পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার বিস্তৃত কারবার। নিজ বসত-বাটী ছাড়া এখানে ওখানে তাঁহার পাঁচখানি বাড়ী ভাড়া খাটে। তিনি এখন স্বর্গগত, তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রনাথই তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যবসায় ও তাবৎ ভূসম্পত্তির মালিক। তিন বৎসর পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। স্ত্রী সুভাষিণী রূপে-গুণে অমরেন্দ্রনাথের মনোমত সহধর্ম্মিণী, তাহার সহিত অমরেন্দ্রনাথের প্রণয় এখনও উদ্দাম। অমরেন্দ্রনাথের জননী, সধবা অবস্থাতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী ছাড়া, গৃহে তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তার নাম সান্ত্বনা এবং এক বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা আছেন, তিনি বধূর হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া এখন হরিনাম জপ এবং লোকজনকে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও এ-কালের সর্ব্ববিষয়ের নিন্দা করিয়া কাল-যাপন করেন।

অপর যুবক সুকুমার মজুমদার দরিদ্রের সন্তান। তার পিতা অল্পবেতনে কেরাণীগিরি করিতেন, দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুকুমারও কেরাণীগিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছেন। গৃহে বিধবা জননী ছাড়া দুইটি ছোট ভাই এবং একটি অবিবাহিতা ভগিনীও বর্ত্তমান।

সাংসারিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও, অমরেন্দ্র ও সুকুমারের মধ্যে বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড়। বিদ্যালয়ে তাহারা একই শ্রেণীতে পড়িত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অমরেন্দ্র পড়া ছাড়িয়া, পিতার হাউসে প্রবেশ করে। সুকুমার বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, কাজেই উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইল। বাপের আফিসে বড়সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে চাকরী দিলেন;—সেই চাকরীই সে করিতেছে।

আর একটি কথা বলিলেই ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হয়। অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে স্থির করিয়াছে, তাহার ভগিনী সান্ত্বনার সহিত সুকুমারের বিবাহ দিয়া নিজেদের বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইবে এবং তাহার মনের গোপন অভিপ্রায়, বিবাহান্তে সুকুমারকে তার অল্পবেতনের কেরাণীগিরি ছাড়াইয়া নিজ ব্যবসায়ে শূন্য অংশীদার করিয়া লইবে। কিন্তু সান্ত্বনা অগ্রজের মনের এই গোপন অভিপ্রায় অবগত ছিল না। এখন সে আর নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা নহে, তাহার বয়স হইয়াছে চতুর্দ্দশ বর্ষ। এ বিবাহের প্রস্তাব হওয়া অবধি সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। সুকুমারদের বাড়ী কতবার গিয়াছে। সে বাড়ীতে বিদ্যুৎ নাই—সুতরাং ফ্যান নাই এবং তেলের আলো জ্বলে। আসবাবপত্র কুশ্রী এবং বিরল। দাস-দাসী ও অশন-বসনের ব্যবস্থাও তাহার পিতৃগৃহের তুলনায় অত্যন্ত হীন। তাই এ বিবাহে তার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। ফলে সুকুমারকে দেখিলেই তাহার গা জ্বলিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মুখ, ফুটিয়া সে এ কথা কাহাকেও না বলিলেও তার বৌদিদি তার মনের ভাব বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইহা বালিকাসুলভ নির্ব্বুদ্ধিতা বিবেচনা করিয়া, ওটা বড় গ্রাহ্য করেন না।

বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসের সুরুতেই হইবে, ইহার স্থির হইয়া আছে।

তিন

চারিদিকে নীচু প্রাচীর-ঘেরা একটি ছোট বাগান, মধ্যস্থলে একটি নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকা। ফটকের দুই পাশে দুইটি ঘর, একটিতে একজন দ্বারবান্ থাকে, অপরটিতে মালী বাস করে। গৃহের নিম্নতলের ঘরগুলি প্রায় সবই খালি মাত্র একটিতে বাড়ীর সরকার থাকে। বাটীর পশ্চাতে কয়েকটি মৃৎকুটীরে কয়েকজন দুলিয়া-জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা গৃহস্বামীর পাল্কীবাহক। দ্বিতলে গৃহস্বামী তাঁহার একমাত্র কন্যাকে লইয়া বাস করেন, তাঁহার আর কেহ নাই।

দ্বিতলে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় একটি চেয়ারে পড়িয়া গৃহস্বামী পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ্ বৃদ্ধ হরিশঙ্করবাবু মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

একটি ছোট টেবিলে রূপার ডিবায় দুই খিলি পান। অপর পার্শ্বে মেঝের উপর তাঁহার গুড়গুড়ি রহিয়াছে-সটকা-নলটি চেয়ারের হাতলের উপর পড়িয়া। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কাগজ নামাইয়া নলটি তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎকাল ধূমপান করিতেছেন, আবার নল রাখিয়া কাগজ উঠাইয়া পাঠে মন দিতেছেন।

চটিজুতা পায়ে ষোল-সতেরো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তার কুঞ্চিত কেশরাশি পিঠের উপর পড়িয়াছে—পরিধানে একখানি দেশী ডুরে শাড়ী, গায়ে শিমপাতা রঙের ফ্ল্যানেলের একটি হাপ-হাতা ব্লাউজ। রঙটি যাহাকে বলে দুধে-আলতা, চক্ষু দুইটি বড় বড়, দেহটি যৌবন-লাবণ্যে টলটল করিতেছে। মেয়েটি বৃদ্ধের চেয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, আপনাকে আর দু'টো পাণ দিয়ে যাব কি?"

হরিশঙ্করবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দিয়ে কোথা যাবি? শুতে?"

"না বাবা, আমি ছাদে যাব চুল শুকুতে।"

"তা যাবি যা, কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমুসনে মা। শীতকাল দিনে ঘুমুলে শরীর খারাপ হয়।"

"না বাবা, ঘুমুবো না আমি। যদি ঘুম পায়, নেমে বাগানে গিয়ে বেড়াব। কিন্তু পানের কথা ত আপনি বললেন না, আর দু'টো পান দিয়ে যাব কি?"

হরিশঙ্করবাবু পানের ডিবায় পানে এক নজর চাহিয়া বলিলেন, "ঐ ত দু'টো রয়েছে আর পাণ কি হবে?"

মেয়েটির নাম সুশোভনা। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

সুশোভনা তখন ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আপন শয়ন-ঘরে গিয়া, টেবিলের উপর বিক্ষিপ্ত খানকয়েক বহি হইতে একখানি উপন্যাস বাছিয়া লইয়া ছাদে গিয়া দেখিল, বাটীর ঝি কিশোরীর-মা, আহারান্তে পান ও দোক্তা গালে দিয়া, এক বাটি দাইলবাটা লইয়া বড়ী দিতে বসিয়াছে। সুশোভনা কিছুক্ষণ ঝির নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বড়ী দেওয়ার কৌশল দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ডাল বেটিছিস্, কিশোরীর-মা?" ঝি বলিল, "কড়াইয়ের ডাল, দিদিমণি।"

সুশোভনা তখন ঝির নিকট হইতে সরিয়া, ছাদের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, কোথাও একটা বৃক্ষের অন্তরাল পর্য্যন্ত নাই। মাঠের মাঝে উচ্চ পাড়যুক্ত কুমীরদীঘি নামক জলাশয়। সুশোভনা লক্ষ্য করিল, দীঘির পাড়ে তিনটি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে—একজনের মাথায় সাদা শিকার-হ্যাট রৌদ্রে চক্ চক্ করিতেছে। বলিল, "ঐ দেখ্ কিশোরীর-মা, কারা আবার কুমীর মারতে এসেছে!"

কিশোরীর-মা বড়ী-হাত বাটির কাণায় মুছিয়া সুশোভনার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, একজন সাহেব এসেছে দিদিমণি।"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব তোকে কে বললে?"

ঝি বলিল, "দেখছনি, টোপা মাথায় দিয়েই বেড়াচ্চে।"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব না হাতী! টোপা মাথায় দিলেই বুঝি সায়েব হয়? বাঙ্গালীরাও ত শিকার করতে যাবার সময় ইংরাজি কাপড় পরে, হ্যাট মাথায় দেয়। যা না, আমাব ঘর থেকে দূরবীণটে নিয়ে আয় না, ভাল ক'রে দেখি ওদের।"

কিশোরীর-মা নামিয়া গিয়া, একটা বাইনকুলার দূরবীণ লইয়া আসিল। এটি তাহার গত জন্মদিনে, তাহার পিতার উপহার। সুশোভনা বাইনকুলার চোখে দিয়া ফোকাস্ ঠিক করিয়া দীঘির পাড়ে মনুষ্যদিগকে দেখিল। একজন ইংরাজী বেশধারী এবং একজন ধুতি-পরা বাঙ্গালী, উভয়েরই হাতে বন্দুক। অপব ব্যক্তি মুটিয়া-শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইল। তখন যন্ত্রটি ঝির হাতে দিয়া বলিল, "বাঙ্গালীই ত। সবাই বাঙ্গালী। দ্যাখ্।"

ঝি কিন্তু যন্ত্রটি চোখে লাগাইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সে কথা সে বলিলে, সুশোভনার স্মরণ হইল, বয়সের পার্থক্য-হেতু উভয়ের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক। তখন সে ঝির চক্ষুলগ্ন যন্ত্রটির পেঁচ ঘুরাইতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে ঝি বলিল, "হ্যাঁ, এইবার বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সায়েব ত নয়, বাঙ্গালীই ত বটে, দিদিমণি!"

কয়েক মুহূর্ত্ত ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, ঝি বলিল, "ঐ দেখ দিদিমণি, অন্য লোক দু'টো স'রে গেল, সায়েবটা শুয়ে পড়লো।"

সুশোভনা বলিল, "বোধ হয়, কোনও কুমীরে গা ভাসান দিয়েছে, গুলী করবে।"—বলিয়া যন্ত্রটি চাহিয়া লইয়া সে নিজ চক্ষুতে লাগাইল।

তাহার অনুমানই সত্য হইল। ধোঁয়া দেখা গেল, দুই তিন সেকেণ্ড পরেই বন্দুকের আওয়াজও কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

সুশোভনা দেখিল, শিকারী উঠিয়া দাঁড়াইল, যে লোক দুই জন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ছুটিয়া আসিল। তিনজনেই একত্র উচ্চ পাড় হইতে নামিতে লাগিল, এবং হঠাৎ শিকারী পদস্খলিত হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে জলের কাছে গিয়া স্থির হইল।

সুশোভনা দূরবীণ নামাইয়া বলিয়া উঠিল, "যাঃ, প'ড়ে গেল।"
"কে দিদিমণি?"
"ঐ শিকারী।"
"দূরবীণটে দাও না দিদিমণি, দেখি।"
"দাঁড়া!"—বলিয়া সুশোভনা দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, অপর লোক দুইজন সাবধানে পাড় হইতে নামিয়া সেই শিকারীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শিকারীর নিকট তারা ঝুঁকিয়া বসিল। একজন দীঘি হইতে জল আনিয়া শিকাবীর মুখে-চোখে সেচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে, ভূপতিত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, তার পর আবার সে শুইয়া পড়িল।
সুশোভনা বলিল, "আহা, বড্ড জখম হয়েছে!" বলিয়াই তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আহা, এই জনশূন্য তেপান্তব মাঠে, এই বিপদে, উহাদের কি হইবে? বাইনকুলার ঝির হাতে দিয়া, সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল—বাবা।"
হবিশঙ্করবাবুব একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মা?"
সুশোভনা বলিল, "বাবা কুমীরদীঘিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিকার করতে এসে, পাড় থেকে নীচে প'ড়ে ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন। এই তেপান্তব মাঠের মধ্যে তাঁর কি উপায হবে, বাবা?"
হরিশঙ্করবাবু চেযারে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে বললে তোমায়?"
"আমি ছাদ থেকে বাইনকুলাব দিয়ে দেখছিলাম বাবা। তাঁকে প'ড়ে যেতে দেখলাম। অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধ হ'ল।"
"কতক্ষণ?"
"এখনও পাঁচ মিনিট হযনি বোধ হয়। বাবা, পাল্কী-বেয়ারা ছুটিযে দিন, তাঁকে নিযে আসুক এখানে। নইলে আব ত কোনও উপায় নেই!"
হবিশঙ্কববাবু চেযাব ছাড়িযা দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজেই তা হ'লে পাল্কী নিযে যাই। তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর, মা। তাকে এনে উপরে তোলা বোধ হয় চলবে না। নীচেব ঘরে যে লোহার খাটখান আছে, তারই উপর ততক্ষণ বিছানা ক'বে বাখ। আমার জামাটা জুতোটা দাও।"
সুশোভনা ছুটিযা ঘরেব মধ্যে গিযা পিতার জামা ও জুতা লইয়া আসিল। পাল্কী-বাহকগণ বাড়ীতেই থাকিত—তাহারা তখন আহাবান্তে দিবানিদ্রার আয়োজন কবিতেছিল। পাল্কীতে বিছানা বিছাইযা হবিশঙ্করবাবু স্বয়ং উহাতে আরোহণ করিয়া কুমীরদীঘি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।
সুশোভনা ছাদে ঝিব হাত হইতে বাইনাকুলাব লইযা, চোখে লাগাইয়া দেখিল, শিকারীর সঙ্গে যে দুইজন লোক ছিল, তাহাদের একজন কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে,—অপর জন আহতেব শুশ্রূষায নিযুক্ত। তাব পর ঝিকে বলিল, "কিশোরীর-মা, বাবা বোগীকে আনতে পাল্কী নিযে নিজে গেছেন। নীচেব ঘবে যে লোহাব খাটখানা আছে, তাতে গদি পাতাই আছে গদিটাব ধূলো বেশ ক'বে ঝেড়ে, তার উপব একখানা তোষক আর একটা সাফ চাদব পেতে, বালিস [illegible] দিযে বিছানা পেতে [illegible] গে—বাবা ব'লে গেছেন।"
ও মা, কি আপ[illegible] মা মধুসূদন [illegible]-বলিযা ঝি প্রস্থান কবিল।
সুশোভনা দেখিতে লাগিল। ঐ তাহাব পিতার পাল্কী ছুটিযাছে, এক মিনিট, দুই মিনিট প্রায় মাঝামাঝি গিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। সে নীচে নামিয়া গেল। কিশোরীর-মা, তোষক ও বিছানার চাদর অন্বেষণে-ব্যাপৃত। সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিশোবীর-মা, তুই চুণ-হলুদ তৈরি করতে জানিস?"
"হ্যাঁ দিদিমণি, তা আর জানিনে?"

"তবে যা, তুই হলুদ বেটে একটা এনামেলের বাটিতে চূণ আর হলুদ মিশিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে চড়িয়ে দিগে যা, বিছানা-টিছানা আমিই সব ঠিক ক'রে রাখছি।"

কিশোরীর-মা চলিয়া গেল। তোষক প্রভৃতি লইয়া সুশোভনা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, আবার ছাদে গিয়া উঠিল। যন্ত্রে চটুলগ্ন করিয়া দেখিল, পাল্কী ফিরিতেছে—তাহার পিতা ও অপর ভদ্রলোকটি পদব্রজে আসিতেছিলেন। পাল্কী দ্রুত আসিতেছে।

তাইতো, রোগী আসিয়া পড়িবে, পিতা পশ্চাতে রহিলেন যে। সুশোভনা আবার নামিয়া গেল। সরকারবাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিল। সরকারবাবু ফটকের নিকট গিয়া দ্বারবান্ ও মালীকে ডাকিয়া, রোগীকে নামাইয়া বিছানায় লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। বামুনঠাকুর ও রামকিষণ ভৃত্যও সাহায্য করিবে। সুশোভনা বারান্দায় উঠিয়া পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। পাল্কী বারান্দার উপর উঠানো হইল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রোগীকে নামাইয়া শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল। রোগী যন্ত্রণায় কাৎরাইতে কাৎরাইতে, একবার চক্ষু খুলিয়া সুশোভনার প্রতি চাহিল। বলিল, "টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান্—বড় যন্ত্রণা।"

সুশোভনা বলিল, "তাই আনাচ্ছি। বাবা আসুন। আপনার কোন্‌খানে বেশি লেগেছে, বলুন দেখি!"

রোগী কাৎরাইতে কাৎরাইতে বাম পদে হাঁটুর নিম্নস্থান দেখাইয়া বলিল, "বোধ হয়, ফ্র্যাকচার হয়েছে।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই, হরিশঙ্করবাবু রোগীর বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলেন। চূণ-হলুদ প্রস্তুত জানিয়া তিনি জখমের স্থানে উহা লাগাইয়া ফ্লানেল জড়াইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হইল, তাহার কাৎরানি বন্ধ হইল, নিদ্রার আবেশ দেখা দিল।

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে কলকাতায় যাবার ট্রেন ত নেই—তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে যে। বরঞ্চ অমরবাবুর ফার্ম্মের ম্যানেজার—কি নাম বললেন যে—তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিন, তিনি মেডিকেল কলেজের কোন ভাল সার্জ্জনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। এখন বেলা দেড়টা—সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ডাক্তার নিয়ে এসে পড়তে পারবেন।"

তদনুসারে রোগীর অবস্থার সব কথা খুলিয়া একখানি দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল।

রোগী জাগিলে, মাঝে মাঝে তাহাকে গরম দুধ পান করানো হইল।

বেলা পাঁচটার সময় তার আসিয়া পৌঁছিল, ম্যানেজারবাবু সাহেব ডাক্তারসহ সন্ধ্যা আটটার ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিবেন, অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী ঐ সঙ্গে আসিতেছেন; ষ্টেশনে যান-বাহনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

হরিশঙ্করবাবু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। সুকুমার বলিল, "সরকার মশাই, অমরেন্দ্রবাবুর একজন বাবুর্চ্চি এসেছিল আমাদের সঙ্গে, ওয়েটিং-রুমে বারান্দায় তাকে দেখতে পাবেন, তাকে একখানা টিকিট কিনে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলবেন, এই টাকা নিন।"

রাত্রি নয়টার মধ্যেই সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ডাক্তার সাহেব অমরেন্দ্রনাথের ভাঙ্গা হাড় "সেট" করিয়া দক্ষমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, এক্সটেন্সন প্রোসেসে লোহার শিকের ফর্ম্মায় উহা আটকাইয়া, সেই ফর্ম্মা পালঙ্কের ছত্রীতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভাঙ্গা পা বিছানা হইতে চার-পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে, বদ্ধ অবস্থায় দোদুল্যমান। বলিলেন, পুরা তিন সপ্তাহকাল, যত দিন ভাঙ্গা হাড় না যোড়া লাগিবে, ততদিন রোগীকে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। সে শুইয়া থাকিবে, যদি যন্ত্রণাবোধ না হয়, তবে একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে পারিবে না।

ডাক্তার সাহেব সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন স্থির হইল। অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েই এখানে রহিয়া গেলেন। সুকুমারও রহিল। হরিশঙ্করবাবু ও তাঁহার কন্যার যত্ন ও সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত।

চার

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে—এখনও অমরেন্দ্রনাথের বদ্ধাবস্থা। প্রথমে ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের কথা বলিলেও গত সপ্তাহে তিনি রোগীর ভাঙ্গা পায়ের এক্স-রে ফটো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেই ছবি আনিলেন এবং সকলকে উহা দেখাইলেন যে, হাড় বেমালুমভাবে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। বলিলেন, তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য আরও দুই সপ্তাহ রোগীর বাঁধন খুলিবেন না। বাঁধন খুলিলেও রোগী বাড়ী যাইতে পাইবে না, এক সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া পায়ে মালিস করাইতে হইবে, কারণ, এই দীর্ঘকালের অ-সঞ্চালনে থাকিয়া পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, আরও যাইবে।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুভাষিণী ও ভগিণী সান্ত্বনা দু'জনেই এখানে। প্রথম চারি পাঁচ দিনের পর যখন দেখা গেল যে রোগীর কোনও প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা আর নেই, অধিক শুশ্রূষারও আবশ্যক হয় না, তখন ইঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, সান্ত্বনাকে লইয়া সুভাষিণী ফিরিয়া যাউন, গৃহস্থের যথেষ্ট আশ্রমপীড়া ঘটানো হইতেছে, তাহার যতটুকু লাঘব করা যায়। সুকুমারের আপিস খুলিলে একদিনমাত্র গিয়া সে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়া থাকুক। কিন্তু হরিশঙ্করবাবু কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি হন নাই—বিনীতভাবে উত্থাপিত আশ্রমপীড়ার কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "আমরা এতগুলি লোক যদি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই, তবে তোমাদেরও দু'মুঠো দিতে আমার কষ্ট হবে না। এই সঙ্কটের দিনে স্ত্রী, ভগিনী কাছে থাকলে, আর কিছু না হোক মনটাও ভাল থাকবে, তাই কি কম লাভ? না না, ও সব ছেলেমানুষী খেয়াল তোমরা ছেড়ে দাও।"

ও দিকে আবার এক বিষম বিভ্রাট বাধিয়া গিযাছে। সুভাষিণী, সান্ত্বনা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য রহিয়া গেল, সুকুমারের থাকিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু সে-ও আছে। আপিস খুলিবার দিন আপিসে গিয়া সে দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া আসিয়াছে—এবং তাহার কথা এই যে, এ বাড়ীর মেয়ে সুশোভনাকে তাহার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। সান্ত্বনা, সুভাষিণী প্রায় সারাদিনই রোগীর নিকট থাকে, সুকুমার আসিলে সুভাষিণী একটু সঙ্কুচিতা হয়, সান্ত্বনা "মুখ হাঁড়ি" করে,—সুতরাং রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকার তাহার প্রয়োজনও হয না এবং উহা প্রীতিকরও নয়। সুতরাং সে প্রায় সারাদিন সুশোভনার আশে-পাশেই থাকে এবং এটাও সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুশোভনা তাহাতে বিরক্ত ত নয়ই, বরং তাহার উল্টা। সুশোভনা ও সান্ত্বনাকে যখনই সে একত্র দেখে, তখনই তাহার মনের কম্পাস-কাঁটা সান্ত্বনার প্রতি বিমুখ হইয়া, সুশোভনার প্রতি বেগে ধাবিত হয়। মেয়েরা স্নান করিতে গেলে, সুকুমার আসিয়া বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসে। বন্ধুকে সব কথাই সে বলিয়াছে।

কবে এবং কি অবস্থায় ইহাদের দু'জনের মন জানাজানি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু সুশোভনার কলেজ খুলিবার দুই দিন পূর্ব্বে, অপরাহ্নে বাগানের আমগাছের ছায়ায় লোহাব বেঞ্চে বসিয়া দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

সুকুমার। পরশু ত তোমার কলেজ খুলছে, তুমি ত চললে!

সুশোভনা। হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। ঐ দিন তোমারও ত ছুটী ফুরোবে?

সুকু। হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তার আগে, বাবার কাছে আমি কথাটা পাড়তে চাই, তুমি কি বল?

সুশো। আমি আর কি বলবো? বাবা শুনে যে কি বলবেন, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপছে।

সুকু। আমি অবশ্য তাঁকে বলবো যে আমার সাংসারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ জেনে শুনেই তুমি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ। তা' হলেও কি তিনি অমত করবেন?

সুশো। কি জানি, হয়ত বলবেন, ও ছেলেমানুষ, ও নিজেব ভাল-মন্দের কি বোঝে, ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।

সুকু। তিনি যদি বোঝেন যে, আমাদের এই মিলনে বাধা দিলে দু'টো বুক ভেঙ্গে যাবে—আমার যাক না হয়, তাতে তাঁর কি আসে যায়?— তোমার বুকও ভেঙ্গে যাবে—তা হ'লে কি তিনি মত না দিয়ে থাকতে পারবেন? মা যদি বেঁচে থাকতেন এ সময়, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের এত ভাবতে হ'ত না।

সুশো। বাবা যে মার চেয়ে আমায় কম ভালবাসেন, তা নয়। কিন্তু তবু ভয় যে ঘোচে না!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, কলকাতায় কি তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না?"

সুশো। তা কি রকম ক'রে হবে ?

সুকু। বোর্ডিং-এ ত মেয়েদের আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়ে দেখা করতে পারে, সপ্তাহে একদিন না মাসে একদিন, কি একটা নিয়ম আছে, শুনেছি।

সুশো। হ্যাঁ, সে বাপ-মা। অন্য কেউ দেখা কবতে চাইলে, বাপেব চিঠি চাই।

সুকু। আচ্ছা, বাবা যদি রাজি হন, তা হ'লে তিনি কি আমাকে ঐ রকম চিঠি দেবেন না?

সুশো। কি জানি। কিন্তু বাবা অনুমতি দিলেও, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহা মুস্কিল হবে যে।

সুকু। কেন?

সুশো। অন্য মেয়েরা সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করবে, ও তোব কে? তুমি যে আমাব কে এবং কি, তা আমি প্রকাশ করতে পারবো না। তা হ'লেই তারা বুঝে নেবে—ভাবি ঝানু মেয়ে সব। তখন ঠাট্টা ক'রে তারা আমায় দেশ ছাড়া করবে যে। কিন্তু তার দরকারই বা কি, সে শুভযোগই যদি আসে, বাবা যদি সম্মতই হন, তা হ'লে পরীক্ষা পর্য্যন্ত এ ক'টা মাস আমরা ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবো না?

এই সময় দেখা গেল, রামকিষণ ভৃত্য এই দিকে আসিতেছে, সুতরাং ইহারা কথাবার্ত্তা স্থগিত রাখিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের চা কি এইখানে পাঠানো হবে, না আপনারা টেবিলে যাবেন?"

সুকুমাব সুশোভনার প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এইখানেই আনুক না।" কিন্তু সুশোভনা বলিল, না, আমরা বাড়ীতেই যাই চল। বামকিষণ, বাবাকে বলগে, আমরা আসছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাব সঙ্গে ও-কথা কখন কইবে তুমি?"

"রাত্রে, খাওয়ার পর। তুমি কি বল?"

"বেশ।"

পাঁচ

রাত্রিতে আহারের পর, সুশোভনা সুভাষিণীর সহিত দেখা করিতে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল, সুকুমার হবিশঙ্কববাবুব সহিত উপরে চলিয়া গেল।

হরিশঙ্করবাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবেশন কবিলেন। রামকিষণ তামাক দিয়া গেল। হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সুকুমার, তোমার কবে আপিসে জয়েন করতে হবে....পরশু। কালই আমি কলকাতায় ফিরবো ভাবছি।"

"কোন্ ট্রেনে?"

"বিকেলের ট্রেনে!"

আমিও ত ঐ ট্রেনই শোভনাকে কলেজে রাখতে যাব।"

"ভালই হ'ল, তা হ'লে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সুকুমাব নীরব হইল। হরিশঙ্করবাবুও নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক মিনিটকাল অপেক্ষা করিবার পর সুকুমার হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরিশঙ্করবাবু, আজ আমি একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

হরিশঙ্করবাবুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল, কিন্তু অন্ধকারে সুকুমার উহা দেখিতে পাইল না। তিনি শান্তস্বরে বলিলেন, "কি বলবে, বল।"

সুকুমার তখন তাহার আবেদন জানাইল। নিজ দারিদ্র্যের কথাও অকপটে প্রকাশ করিল। সুশোভনা যে উহা জানিয়া শুনিয়াই তাহাব সহধর্ম্মিণী হইতে সম্মত সে কথাও বলিতে সে ক্রটি করিল না।

সুকুমারের কথা শেষ হইলে হরিশঙ্করবাবু কিযৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। সুকুমারের বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল,—খুনী আসামী যেন জজ সাহেবের রায় শুনিতে আসিয়াছে।

অবশেষে, হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সুকুমার, তোমরা ত পাকা হিন্দু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের আত্মীয়স্বজনদেব মধ্যে কেউ বিলেত-টিলেত গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার মা বেঁচে আছেন বলেছিলে না?"

"হ্যাঁ।"

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, দেখ, তুমি তোমাব সাংসাবিক অবস্থার কথা যা বললে সেটা আমাব পক্ষে কোনও বাধা নয়। মেয়েব বিয়েব সময জামাইকে আমি যে যৌতুক দেবো, তাতে অনেক বছর তাদের জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে। আমার ঐ একমাত্র মেয়ে। আমার অবর্ত্তমানে সমস্তই আমার মেযে-জামাইয়ের হবে। তবে আর একটু বাধা আছে—সে বিষয়ে আজ রাতটা আমায় বিবেচনা কবতে সময় দাও—আমি কা'ল সকালে তোমার কথার উত্তর দেবো।"

পরদিন বেলা আটটার সময় সুকুমাব যখন হরিশঙ্কববাবুব শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহাব মুখখানি উল্লসিত।

নীচে নামিবার সিঁড়ির কাছে সুশোভনা দাঁড়াইয়া ছিল, কোন ভৃত্যাদি তখন সেখানে নাই। সুশোভনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "বাবা কি বললেন?"

সুকুমার সুশোভনা দাঁড়াইয়া ছিল, কোন ভৃত্যাদি তখন সেখানে নাই। সুশোভনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিল "বাবা কি বললেন?" সুকুমার সুশোভনাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আসছি, এসে বলবো।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে নিম্নে অবতরণ করিল। সুশোভনাও হাসি-মুখে নিজ কার্য্যে গেল। সুকুমার রোগীর কক্ষে গিয়া দেখিল, অমরেন্দ্র একা। জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা কোথায়?"

অমরেন্দ্র বলিল, "স্নানের ঘরে।"

"ভালই হ'ল।—বলিয়া সুকুমার শয্যাপার্শ্বস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর হাতখানি

ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি তোমার বোনকে বিয়ে করতে পারবো না বলেছিলাম, তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলে, নয়?"

"সেটা ত খুব স্বাভাবিক।"

"না ভাই, তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না, আমার উপর রাগ কোরো না, তোমার বোনকেই আমি বিয়ে করবো।"

"কেন, কি হ'ল? সুশোভনা সম্বন্ধে হরিশঙ্করবাবু অমত করলেন? তবে তোমার মুখ এমন হাসি হাসি কেন ? তুমি যে একটি প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়ালে হে!"

"তোমায় বুঝিয়ে বলছি। হরিশঙ্করবাবু একটা বাধা সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে আজ আমার প্রস্তাবের উত্তর দেবেন বলেছিলেন, জান ত?"

"কাল রাতে তুমি আমায় ব'লে গিয়েছিলে।"

"ওঁর বাধাটা কি শোন। শোভনা ওঁর ঔরস-কন্যা নয়, ওঁর পালিতা-কন্যা, একরকম কুড়িয়ে পাওয়া। ও কি জাতের মেয়ে, তা-ও তিনি জানেন না। আমরা পাকা হিন্দু হয়ত সব কথা জানলে আমাদেব আপত্তি হ'ত, তাই ছিল ওঁর বাধা। চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে, তিন বছর বয়সের সুন্দরী মেয়েটিকে কোথায় কি অবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন, সমস্ত আমায় আজ বললেন।"

"কোথায় পেয়েছিলেন?"

"লক্ষ্ণৌয়ে।"

শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল "লক্ষ্ণৌয়ে?"

সুকুমার বলিল, "হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌয়ে। যে বদমাইসরা লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌবাসী ওঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে মেয়েটির কথা শোনে,—আর শোনেন যে, বদমাইসরা বলেছিল, ওটি বাঙ্গালীর মেয়ে। উনি সেই পতিতা স্ত্রীলোককে পুলিসের ভয় দেখিয়ে তার উপর পাঁচশো টাকা দিয়ে, মেয়েটি কিনে নেন। তার পর থেকে নিজের মেয়ের মত পালন করেছেন। তোমাব বোন হারানোর ত! স্থান, কাল, সমস্তই দেখ মিলে যাচ্চে। সুশোভনাই যে তোমার সেই হারানো বোন তাতে আমার মনে ত কোন সন্দেহই নেই।"

অমরেন্দ্র বলিল, "তুমি এ কথা হরিশঙ্করবাবুকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"ভাই, তুমি একবার গিয়ে তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, আমি নিজে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হরিশঙ্করবাবু আসিলেন। বোন হারানোর সময় অমরেন্দ্রনাথ বারো বৎসরের বালক। সকল কথা তাঁর স্মরণ ছিল। হরিশঙ্করবাবুর প্রদত্ত বিবরণ সমস্তই ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

অমরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সুশোভনার বাঁ-কনুয়ের উপরটায় একটা জড়ুল আছে কি? আমার নিজের অবশ্য সেটা ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু মা'র কাছে আমি শুনতাম যে, আমার সে বোনের হাতে ঐ চিহ্ন ছিল।"

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক সেইখানে জড়ুল আছে।"

স্থির হইল, এখন শোভনাকে এ-সব কথা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ, হরিশঙ্করবাবু তাহার জন্মদাতা পিতা নহেন শুনিলে বালিকার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে। বিবাহের পর, সময় বুঝিয়া, প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সুকুমারই তাহাকে আসল কথা জানাইবে।

সম্পাদকের কন্যাদায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক "আর্য্যশক্তি" মাসিক পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাদায় উপস্থিত হইয়াছে।

মনতোষবাবুর তিনটি সন্তান। প্রথমটি পুত্র, অপর দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা মণিমালার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করে, কিন্তু সুপাত্র জুটিতেছে না। কয়েক স্থানে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; এমন কি কেহ কেহ আসিয়া মেয়ে দেখিয়াও গিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন সম্বন্ধই টিকে নাই। যে পাত্রকে মনতোষবাবু পছন্দ করেন, তাহাব পিতা বিস্তব টাকা চাহিয়া বসে। যুদ্ধের বাজারে তিন গুণ মূল্য দিয়া "আর্য্যশক্তি"র জন্য কাগজ কিনিতে হইতেছে—পাত্রের উচ্চ মূল্য শুনিয়া মনতোষবাবু পিছাইয়া পড়েন। আবার দরে যদি পটিল, পাত্রের রূপ গুণ শুনিয়া গৃহিণী খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন। দরেও হইবে সস্তা, জিনিষটিও হইবে উচ্চ শ্রেণীর, এমন একটি 'ব্রাহ্মণের গরু' মনতোষবাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—এই হইয়াছে মুস্কিল। অনুসন্ধানের ত্রুটি ছিল না, তথাপি তাঁহার গৃহিণী মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া থাকেন—"কোনও চেষ্টা নেই, বাড়ী থেকে এক পা নড়বে না, পাত্র জুটবে কোথা থেকে! থাকুক মেয়ে থুবড়ো হয়ে! "একদিন গৃহিণীর নিকট এই প্রকার মুখনাড়া খাইয়া, আপিস ঘরে আসিয়া গালে হাত দিয়া বিষণ্ণ মনে মনতোষবাবু বসিয়া ছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ আসিয়া প্রবেশ করিল। অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কি ভাবছেন?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "ভাবছি, মেয়েটির বিয়ের কথা। একটা পাত্রও ত মনের মত পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়!"

অবিনাশ বলিল, "ভেবে আর কি করবেন—ও যখন হবাব হবে তখন আপনিই হবে। ভবিতব্যতা—" "সে ত জানি, কিন্তু—"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে বসিযা থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?" "কি?"

"আর্য্যশক্তিতে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক না কেন? অবশ্য নাম ধাম গোপন করে'—নইলে আবার শত্রু হাসবে কিনা।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "তা, দিয়ে দেখতে পার। মেয়ের বাপ যখন হয়েছি, তখন শত্রু হাসলেই বা করবো কি! কবি বলে গেছেন, কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। খুব ঠিক কথাই বলে গেছেন।"—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অবিনাশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "দেখুন, আপনি অমন করে মন খারাপ করবেন না। হয়ে যাবেই একটা। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু। মেয়ের বিয়ে কি আর আটকে থাকবে?" পরবর্ত্তী সংখ্যা "আর্য্যশক্তি"তে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল।

পাত্র আবশ্যক

ত্রয়োদশবর্ষীয়া গৃহ-কর্ম্মনিপুণা সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার জন্য, শাণ্ডিল্য ভিন্ন অপর কোনও গোত্রের একটি সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা সদ্বংশজাত এবং সমাজে মান্যগণ্য, কিন্তু অধিক অর্থব্যয় করিতে আপাততঃ অক্ষম। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রব্যবহার করুন। "ঘটকরাজ" কেয়ার অব্ ম্যানেজার, "আর্য্যশক্তি"।

পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতেই খান পঁচিশ পত্র

আসিয়া পড়িল। অধিকাংশই, পাত্রের অভিভাবক কর্তৃক লিখিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অধিক টাকাকড়ি দিতে না পারিলেও, ন্যূনসংখ্যা কত দিতে পারেন? কোন কোনও পাত্র স্বয়ং লিখিয়াছেন, কন্যার পিতা যদি তাঁহার বিলাত যাইবার খরচ বহন করিতে পারেন এবং মেয়েটি যথার্থই সুন্দরী ও শিক্ষিতা হয়, তবে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। উহারই মধ্যে বাছিয়া কোন কোনও অভিভাবকের সহিত পত্রব্যবহার করা হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলে কিছুই দাঁড়াইল না।

তাহার পর অবিনাশ আর এক ফন্দি করিল। একদিন সে মনতোষবাবুকে বলিল, "এত সব ছোকরা কবি, ছোকরা-লেখক আমাদের লেখা পাঠাচ্ছে, তাদেরই মধ্যে থেকে একজন ভাল ছেলে বেছে নিলে ত হয়!"

মনতোষবাবু বলিলেন, "নিলে ত হয়, কিন্তু বাছবে কি রকম করে?"

"সে আমি একটা উপায় স্থির করেছি।"

"কি বল দেখি?"

"ছোকরা-লেখকদের মধ্যে যারা দেখব ব্রাহ্মণ সন্তান অথচ শাণ্ডিল্য গোত্র নয়, চিঠি লিখে তাদের ডেকে পাঠাব। আচ্ছা, ধরুন তাদের যদি এইভাবে একখানা ছাপা পোষ্টকার্ড পাঠানো যায়—'সবিনয় নিবেদন, আপনার রচনাটি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আর্য্যশক্তিতে উহা ছাপিতে হইলে কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। অতএব এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আপনি অবসর মত একদিন আসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়। নিবেদন ইতি।'—তা হলে দেখবেন, রোজ দুটো একটা করে ছেলে আসবে। কথার ছলে তাদের পরিচয় জেনে নিয়ে, যাদের সুবিধে গোছের মনে হবে, তাদের অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে চেষ্টা চরিত্র করা—আপনি কি বলেন? পোষ্টকার্ড ছাপাব?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "তা ছাপাও পোষ্টকার্ড। দেখ কি হয়।"

পোষ্টকার্ড ছাপান হইল। শাণ্ডিল্য-ভিন্ন-অন্য-গোত্রজ কত নিরীহ লেখক-যুবক এই পোষ্টকার্ড পাইয়া, স্বীয় প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হইবার দুরাশায় উৎফুল্ল হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু উভয় পক্ষের কাহারও পূর্ণ হইল না।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাস। মনতোষবাবু দ্বিতলের কক্ষে দিবানিদ্রায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল। এই শব্দে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। সুখভঙ্গকারী দুর্বিনীত সেই ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি আরক্ত নেত্রে একবার চাহিলেন। মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও যথেষ্ট রৌদ্র রহিয়াছে। তাই একটা হাই তুলিয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া থাকাতেও যখন ঘুম আর আসিল না, তখন মনতোষবাবু উঠিলেন। মুখ ও চক্ষু ধৌত করিয়া, ভাণ্ডার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন। কন্যা মণিমালা পান সাজিতেছে; একেবারে গৌরবর্ণা না হইলেও, তাহার রঙটিতে ঔজ্জ্বল্য আছে। চোখ দুটি ভাসা ভাসা টানা টানা। মুখের গড়নটি দেখিলে তাহাকে সুন্দরী বলিতে ইচ্ছে হয়। মেয়ের মুখখানে চাহিয়া মনতোষবাবু একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পিতাকে দেখিয়া মণিমালা তাড়াতাড়ি একটি ডিবার খোলে দুইটি পান আনিয়া দিল। পান দুইটি লইয়া মনতোষবাবু হেলিতে দুলিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

আপিস কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অবিনাশ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত মুখে টেবিলের

কাছে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে থাকবন্দী কাগজপত্র। মনতোষবাবু বলিলেন, "কি হে, ভাবছ কি অমন করে?"

অবিনাশ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, এসেছেন? দেখুন একবার ব্যাপারখানা! আজকের ডাক দেখুন!"

"কি এ সব? কবিতা?"

"আজ্ঞে, বর্ষার কবিতা। গুণেছি, সবশুদ্ধ, ৫৪টা।"

মনতোষবাবু স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে ব্রাহ্মণেব ছেলে কেউ আছে নাকি?"

"আজ্ঞে আছে বইকি গোটাকতক। কিন্তু তাদের বানান ভুল দেখলে মনে হয় না যে সরস্বতীর কোনও তোয়াক্কা রাখে। যাই হোক, কাল তাদের ছাপা পোষ্টকার্ড পাঠাব, এখন মনতোষবাবু কাগজগুলির প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এতগুলি সবই বর্ষার কবিতা?"

"আজ্ঞে একধার থেকে। হেডিং অনুসারে সাজিয়ে রেখেছি। এই দেখুন না—'শ্রাবণে' ৭টা, 'শ্রাবণের মেঘ' ৯টা, 'শ্রাবণ নিশীথে' ৫টা, 'বর্ষা মঙ্গল' ১১টা, 'বর্ষায় বিরহ' ৭টা, 'বৃন্দাবনে বর্ষাগম' ৫টা, অন্যান্য ১০টা। আচ্ছা মশায়, বলতে পারেন, আজ মোটে ৫ই আষাঢ়, রৌদ্রে কাঠ ফেটে যাচ্ছে, এরই মধ্যে এই সকল কবি শ্রাবণের কবিতা লিখছেন কি করে?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "কল্পনাশক্তির বলে।"

অবিনাশ করুণস্বরে বলিল, "এদের শক্তির চোটে আমি গরীব যে মারা গেলাম! রোজ রোজ এই রাশি রাশি কবিতা আমি পড়িই বা কখন, অমনোনীতই বা করি কখন? তার উপব আবার তাগিদের চিঠি। এই যে এঁরা আজ কবিতা পাঠিয়েছেন, কেউ তিন দিন, কেউ চার দিন, যাঁরা খুব বেশী ধৈর্য্যশীল তাঁরা সাতটি দিন অপেক্ষা করবেন। তার পর থেকেই চিঠি আসতে আরম্ভ হবে।—'মহাশয়, আমি বিগত অমুক তারিখে তিনটি কবিতা আর্য্যশক্তিতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, আপনাদের নিয়মানুসারে একখানি দুই পযসার টিকিট তৎসহ পাঠান সত্ত্বেও অদ্যাবধি কবিতাগুলি মনোনীত হইবার সংবাদও পাইলাম না, সেগুলি অমনোনীত হইয়া ফিরিযাও আসিল না। আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই।"—চিঠিতে চিঠিতে অস্থির মশায়। দোহাই আপনার, 'ধূমকেতু'ওয়ালাদের মত আমাদেরও নিয়ম করে দিন যে 'অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনওরূপ পত্রব্যবহার করিতে সম্পাদক অসমর্থ।'—ধূমকেতুর মত. বুঝেছেন, যেমন কবিতা পাওয়া, অমনি ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা। কাজ তা হলে অর্দ্ধেক কমে যায়।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "সেটা কি ঠিক হবে? কবিরা চটবে যে! ওদের মধ্যে অনেকেই গ্রাহক কিনা—কাগজ ছেড়ে দেবে।"

"তবে আমায় একটা অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দিন। একা ত আমি আর পেরে উঠিনে মশায়!"

মনতোষবাবু বলিলেন, "বর্ষা আসছে—এই মাসটাই একটু ভীড় বেশী।"

অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে কহিল, "শুধু এই মাসটা? বছরে চার বার মশায়, চারবার। এই হিসেব নিন না। এখন এই 'বর্ষা' কবিতার বান ডেকে উঠেছে ত? আবার ভাদ্র মাস পড়তেই হু হু শব্দে 'আগমনী' কবিতার আগমন আরম্ভ হবে। তারপব মাঘের কাগজ বেরিয়ে গেলেই 'বসন্ত' কবিতার রীতিমত এপিডেমিক লেগে যাবে। আবার মাস দুই পরেই 'নববর্ষ'—কবিদের চিঠির উত্তর দিতে দিতেই হাত যে ব্যথা হয়ে গেল মশায়! আর শুধুই কি পত্রাঘাত? যাঁরা স্থানীয় কবি, সহরে থাকেন, তাঁরা স্বয়ং সশরীরে আপিসে এসে চড়াও করেন। আপনি আসবার এই আধঘণ্টা আগে, লম্বা চুল সোনার চশমা চোখে

এক ছোকরা-কবি এসে, তাঁর কবিতা অমনোনীত হয়েছে বলে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে আমায় গালাগাল দিয়ে গেলেন। এ রকম ত প্রায়ই হয়। আপনি সব সময় আপিসে ত বসেন না, তাই জানতে পারেন না।"

ঠিক এই সময় বাহির হইতে এক অপরিচিত কণ্ঠের শব্দ আসিল, "সম্পাদকবাবু হ্যাঁয়?"

উভয়ে খোলা জানালা দিয়া দেখিলেন, একজন সুবেশ ও সুশ্রী যুবক, দ্বারবানকে ঐ প্রশ্ন করিতেছে। অবিনাশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া শঙ্কিত ভাবে বলিল, "ঐ আবার একজন কবি এসেছে।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "চেন নাকি?"

"না।"

"তবে কি করে জানলে কবি?"

"হ্যাঁ কবি। ওর বাপ কবি। চেহারা দেখছেন না? আসছে। আপনি ওর সঙ্গে কথা ক'ন; আমার ভারি তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল খেয়ে আসি।"—বলিয়া অবিনাশ দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

মনতোষবাবু মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "ছোকরার দেখছি কবিফোবিয়া ব্যারাম হয়ে দাঁড়াল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুবকটি প্রবেশ করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আপনিই কি মনতোষবাবু।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মশায়?—"

যুবক হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিল, "আমাকে আজ্ঞে মশায় বলবেন না, আমি আপনার সন্তানতুল্য।"—বলিয়াই সে অবনত হইয়া মনতোষবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

প্রবীণ সম্পাদক, যুবকের এই আচরণে একটু বিস্মিত হইলেন। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি—তুমি—কে?"

"আমায় চিনিতে পারেন নি? তা, কি করেই বা পারবেন? আমার নাম শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, নিবাস টাকী। বাবা যখন শ্যামবাজারে থাকতেন, তখন আপনি আমাদের বাড়ী যেতেন আমার মনে আছে, যদিও তখন আমি খুব ছোট। আমার পিতার নাম কালীচরণ ভট্টাচার্য্য—যাঁর বই-টই আজকাল—"

এই পর্যন্ত শুনিয়াই মনতোষবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কালীর ছেলে তুমি? তাই বল! এস, বাবা এস, কোলাকুলি করি।"—কোলাকুলি হইয়া গেলে, নিজে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বস বাবা, এই বেঞ্চিখানায় বস। এই সেদিনও যে আমরা তোমার কথা কইছিলাম। তোমার বাপ যখন মারা গেলেন, তখন আমি এখানে ছিলাম না কিনা, তখন আমি কটকে চাকরি করি। ফিরে এসে শুনলাম, তোমার মা যা কিছু ছিল, সমস্ত বেচে কিনে দেশে চলে গেছেন। এদানী আমি প্রায়ই ভেবেছি, কালীদাদার সেই ছেলেটি যে ছিল, যদি বেঁচে থাকে এতদিন যুবা হয়েছে, কিন্তু সে যে কোথায় আছে, কি করছে, কোনও খবরই পাইনে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমাদের বাড়ী যেতাম বইকি! তখন তোমার বয়স আট কি বড় জোর নয়। তারপর, এখন কোথায় আছ বল দেখি? সব খবর বল বাবা।"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে, এখন আমি কলকাতাতেই আছি। বেণেটোলায় মেসের বাসায় থাকি, গত বৎসর বি-এ পাশ করেছি, তারপর ক্যালকাটা কর্পোরেশনে চাকুরিতে ঢুকেছি।"

"চাকরি করছ? বেশ বেশ। তোমার মা ঠাকরুণ কোথা?"

"দু'বছর হল তাঁর কাল হয়েছে।"

"আহা, তাই ত! দেশে তোমার কে কে আছেন?"

"খুড়োমশায় খুড়ীমা আছেন। তাঁদের ছেলেপিলে আছে। পিসিমা আছেন।"

"বিবাহ করেছ?"

একটু লজ্জিত হইয়া ললিত বলিল, "আজ্ঞে না।"

"দেশে যাও-টাও ত? তোমার খুড়োমশায় এখানে আসেন?"

"আজ্ঞে না, তিনি আমার উপর তত সন্তুষ্ট নন। তাঁর সর্বদাই আশঙ্কা, সামান্য যা বিষয় আছে, পাছে আমি তার অর্দ্ধেক ভাগ চাই। মার মৃত্যুর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বড়ই অসদ্ব্যবহার করে আসছেন। গুরুজনের নিন্দে করতে নেই, কিছু বলতে চাইনে। সেই দুঃখেই দেশে যাওয়া-টাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছি।"

"বটে! ভারি দুঃখের বিষয় ত! কত মাইনে পাচ্চ বাবাজী?"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে ৫০ টাকায় ঢুকেছিলাম, এ বছর ৬০ টাকা হয়েছে।"

"তা হোক, ও চাকরীতে উন্নতি আছে। শুনে বড় খুশী হলাম বাবা। বড়ই আনন্দ হল। আহা আজ যদি কালীদাদা বেঁচে থাকতেন! এদানী তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল না। একটু কষ্টেই পড়েছিলেন। দেখ একবার সংসারের গতি! যাঁর বই বেচে পান্নালাল মিত্তির আজ ফেঁপে উঠেছে, তিনি শেষ দশায় অর্থাভাবে ওষুধ পান নি, পথ্য পান নি। তাঁর ছেলেকে আজ কিনা ষাট টাকা মাইনের চাকরি স্বীকার করতে হয়েছে। শুনেছি তোমার মা নাকি বইগুলির কপিরাইট বিক্রী করে গিয়েছিলেন। এমন কাজ তিনি কেন করেছিলেন? আহাহা, বাপের বইগুলি যদি তোমার হাতে থাকত, তা হলে আজ তোমার ভাবনা কি?"

ললিত বলিল, "তিনি ত বিক্রী করেন নি, নিলামে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বাবার কিছু দেনা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে পাওনাদার নালিস করে ডিক্রী করে। বাড়ীতে আসবাবপত্র যা কিছু ছিল সবই নিলামে চড়ে। ঐ উপন্যাস পাঁচখানির পাণ্ডুলিপি বাবার কেতাবের আলমারিতে থাকত। সেই আলমারি সুদ্ধ কেতাব আর পাণ্ডুলিপি পান্না মিত্তির নাকি ১০০ টাকায় কিনে নেয়।"

মনতোষবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, অ্যাঁ! বল কি হে? ১০০ টাকায় মায় আলমারি, কেতাব, পাণ্ডুলিপি সব?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ত শুনেছি। সব এক লাটে ছিল কিনা, লাটকে লাট ১০০ টাকায় কিনে নিয়ে যায়।"

"কি ভয়ানক কথা!"—বলিয়া মনতোষবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন "ঐ যে পান্না মিত্তির আগে ও পুরোণো কেতাব বিক্রী করত কিনা, হ্যারিসন রোডের মোড়ে সামান্য একখানি দোকান ছিল ওর। তাই গিয়েছিল তোমার বাবার পুরোণো কেতাব কিনতে। পুরোণো কেতাব কিনতে গিয়ে দাঁও মেরে নিলে আর কি! তখন পান্না মিত্তির এত বড় ছিল না, ও পান্না-লাইব্রেরিও তার হয়নি। নতুন বইয়ের দোকান ত মোটে এই বছর পাঁচ ছয় খুলেছে কিনা। লাইব্রেরি খুলেই তোমার বাবার উপন্যাস ছাপাতে আরম্ভ করলে। কি কাটতি! দেশে একেবারে টী টী পড়ে গেল। একশোটি টাকা দিয়ে কিনে, বই বেচে এ ক'বছরে অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার টাকা তা মেরে নিয়েছে!"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে, তা খুব নিয়েছে। সব বইয়েরই তিন চারটে করে সংস্করণ হয়েছে। বইগুলি থাকলে যেমন করে হোক মাসে ১০০/১৫০ টাকা আয় ত আমার হ'ত! সে আপশোষ করে আর কি হবে! যা হয়ে গেছে তার ত চারা নেই।"

"তা ত বটেই। আহা সেই সময়েই আমি বলেছিলাম, দাদা বইগুলি ছাপিয়ে ফেল, দাদা বইগুলি ছাপিয়ে ফেল। তা ত শুনলেন না, কেবল লিখে লিখে জমা করতে লাগলেন। অর্থাভাবেই ছাপাতেই পারেন নি। তখন ত আমার 'আর্য্যশক্তি' ছিল না, নইলে মাসে

মাসে 'আর্য্যশক্তি'তেই আমি বের করে দিতে পারতাম। আমার 'আর্য্যশক্তি' কাগজ দেখেছ বোধ হয়? বিস্তর গ্রাহক—মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই বের হয়।"

ললিত এই সময়ে একটু যেন উস্‌খুস্ আরম্ভ করিল। কম্পিত হস্তে পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল—"হ্যাঁ, আর্য্যশক্তি দেখেছি বইকি। আমাদের বাসায় একজন নেয়, প্রতিমাসেই পড়তে পাই।"—বলিয়া একবার মনতোষবাবুর মুখের পানে, একবার নিজ হস্তস্থিত কাগজগুলির পানে চাহিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনতোষবাবু মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "কাগজগুলি কিসের?"

"আজ্ঞে, গোটা দুই কবিতা এনেছিলাম।"

"তুমি লিখেছ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ। এগুলো যদি—আর্য্যশক্তিতে—চলে—"

মনতোষবাবু কাগজগুলি লইয়া মনে মনে অবিনাশের দূরদৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কাগজগুলি খুলিয়া প্রথম কবিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তা, কবিতা কেন? উপন্যাস লেখ না। দেখ না যদি বাপকা বেটা হতে পার।"

"আজ্ঞে সে ইচ্ছেও আছে। এ সময়টা আপিসে বড়ই খাটুনি পড়েছে, একটু ফুরসৎ পেলেই একবার চেষ্টা করে দেখব। কবিতাগুলি কি—"

মনতোষবাবু হতাশভাবে বলিলেন, আচ্ছা, পড়ে দেখব এখন।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া ললিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এখনি উঠবে? একটু জলটল—"

"আজ্ঞে, আজ ত সময় নেই। এখনি একটা কাজে আমার বেরুতে হবে। আর একদিন আসব।"

"কবে আসবে বল। এক কাজ কর না। এই রবিবারে এস—দুপুরবেলা এখানে চাট্টি খাবে, কেমন?"

"যে আজ্ঞে, তাই আসব।"

"ভুলো না যেন। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে রকম বন্ধুত্ব ছিল, এ তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে করা উচিত। এতদিন যে আসনি, দেখা করনি, সেইটি অন্যায় কাজ করেছ বাবাজী। রবিবারে, বেলা ১০টার মধ্যে নিশ্চয় এস।"

"আজ্ঞে আসব বইকি।"—বলিয়া প্রণাম করিয়া ললিত প্রস্থান করিল।

অর্দ্ধ মিনিট পরে অবিনাশ প্রবেশ করিল। মনতোষবাবু বলিলেন, "ওহে, তুমি ঠিকই বলেছিলে। কবিতা দিয়ে গেল।"

"আজ্ঞে, শুনেছি।"

"কখন শুনলে?"

"আমি ঐ পাশের ঘরে বসে ছিলাম কিনা, আপনাদের কথাবার্ত্তা যা কিছু হয়েছে সমস্তই শুনেছি। আচ্ছা, সেদিন আপনি এরই কথা বলছিলেন ত? এরা ত আপনাদের স্বঘর?"

"হ্যাঁ, স্বঘর বইকি।"

"ও কি বললে, ওর বাপের বইগুলি সব নিলেমে বিক্রী হয়ে গেছে?

"হ্যাঁ। একটা আলমারি, সেই আলমারি ভরা বই, উপন্যাস পাঁচখানির পাণ্ডুলিপি—সব এক লাটে পান্না মিত্তির ১০০ টাকায় কিনেছিল। দেখ একবার লোকটার অদৃষ্ট!"

"এক লাটে কি বলছেন?"

"অর্থাৎ সব জিনিষগুলো একত্র আর কি, আলাদা আলাদা নয়।"

"এক লাটে!"—বলিয়া অবিনাশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "এরা আপনাদের স্বঘর যদি, তবে এরই সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দেওয়া যাক না?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, বলেছ মন্দ নয়। মা-বাপ নেই, কোনও অভিভাবক নেই, খাঁই বোধ হয় তেমন হবে না। বিয়ে হলে কিছু মন্দ হয় না।"

অবিনাশ বলিল, "হলে বেশ হয়। কথাবার্ত্তায় ছোকরা বেশ বিনয়, ভদ্র। লেখাপড়া শিখেছে। চাকরিটিও ভাল। কেবল এক দোষ, কবিতা লেখে—তা অমন বয়সে অনেকেরই ও ব্যারাম থাকে, একটু বয়স হলেই ওটা আপনি সেরে যাবে। চেষ্টা করুন।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "তুমিই ঘটকালি কর না।"

"আমি করব? তা বেশ ত! আমি রাজি আছি। দেখি চেষ্টা করে।"

"তুমি চেষ্টা করলেই পারবে। আমি বলি কি, কাল থেকেই লেগে যাও—ও আর দেরী নয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল থেকেই আমি লেগে যাচ্ছি। কাল এক জায়গায় যাব—আমার আপিসে আসতে একটু দেরি হতে পারে।"

"তা হোক। দেখ একবার চেষ্টা করে। তোমার যে রকম বুদ্ধি, বোধ হয় তুমি পারবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন অবিনাশ আহারান্তে ট্র্যামে চড়িয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নামিয়া পান্না-লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিল।

সুপরিসর দোকান ঘরটি বহুবিধ নূতন পুস্তকে বোঝাই আলমারিতে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে টেবিল, উপরে বন্ বন্ করিয়া বিদ্যুতের পাখা ঘুরিতেছে। মাথায় টাক, প্রৌঢ় বয়স্ক পান্নালাল মিত্র চেয়ারে বসিয়া গতদিনের হিসাব পরীক্ষা করিতেছেন। কিয়দ্দূরে আর একটা টেবিলে একরাশি প্যাকেটবন্দী পুস্তক, প্রত্যেক প্যাকেটে ঠিকানাযুক্ত লেবেল আঁটা। একজন কর্ম্মচারী সেখানে বসিয়া, এক একটি প্যাকেট লইয়া ভি পি ফরম পূরণ করিতেছে, পুস্তকের মূল্য চেক করিতেছে, অর্ডারি চিঠিখানির সহিত ঠিকানা মিলাইয়া দেখিতেছে এবং শেষ হইলে প্যাকেটটি পার্শ্বে রক্ষিত ঝুড়িতে ফেলিয়া দিতেছে।

অবিনাশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পান্নালালবাবু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কবিলেন। পুস্তক ব্যবসায়ীরা মাসিক পত্রিকার সহকাবী সম্পাদকগণকে যথেষ্ট খাতির করিয়া থাকেন, নহিলে তাঁহাদের স্বপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনায় গোলযোগ ঘটে।

"তারপর অবিনাশবাবু? ভাল আছেন ত? মনতোষবাবু ভাল আছেন? খবর সব ভাল?"

অবিনাশ আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, খবর সব ভাল। কালী ভট্‌চায্যির বই একসেট বের করতে বলুন ত।"

পান্নালালের আদেশ অনুসারে, কর্ম্মচারী একসেট ঐ পুস্তক বাহির করিয়া অবিনাশের নিকট রাখিল। অবিনাশ এক একখানি বহি তুলিয়া, প্রথম প্রকাশের বৎসর, কোনটার কয়টা সংস্করণ হইয়াছে, মূল্য প্রভৃতি নীরবে পবীক্ষা করিতে লাগিল। একখানি বহির সদর পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—"এই যে লেখা রয়েছে, 'সত্ত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে এই পুস্তকের অনুবাদ কেহ প্রকাশ করিলে, আইন অনুসারে খেসারত দিতে বাধ্য হইবেন'—তা এর অনুবাদ-টনুবাদও বেরিয়েছে নাকি?"

পান্নাবাবু সগর্ব্বে বলিলেন, "হ্যাঁ বেরিয়েছে বইকি। সব বইগুলিরই অনুবাদ হয়েছে। হিন্দীতে, গুজরাটীতে, মারহাট্টিতে—অনুবাদ হয়ে গেছে। দেশ বিদেশে বইগুলির আদর। আরও অনেক ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে লোকে চিঠি লেখে—কিন্তু তারা টাকা দিতে চায় না—বিনা টাকায় ত কাউকে অনুমতি দিইনে!"

"হিন্দী, মারহাট্টি, গুজরাটী অনুবাদকেরা টাকা দেয়?"

"হ্যাঁ, রীতিমত টাকা দেয়। নইলে অনুবাদ করতে দিই? পান্না মিত্তির তেমন ছেলেই নয়!"

"আচ্ছা, অনুবাদের জন্যে কি রকম টাকা পান?"

ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন পান্নালাল এ কথার সরল উত্তর না দিয়া কহিলেন—"মারহাট্টিরাই সবচেয়ে বেশী টাকা দেয়। বিক্রীও ওদের তেমনি। এই কালী ভট্টাচায্যির এক একখানা বই, আমরা দু'হাজারের করে এডিসন দিই ত, আর মারহাট্টি অনুবাদের এডিশন হয় পাঁচ হাজার করে। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য বলে যতই জাঁক করি, মারহাট্টি সাহিত্য আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর—অন্ততঃ আর্থিক হিসেবে।"

অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ তা জানি। 'মনোরঞ্জন' বলে ওদের একখানা মাসিক পত্র আছে, তার যত গ্রাহক, আমাদের বাঙ্গালা কোনও মাসিকপত্রের অত গ্রাহক নেই।—সে যা হোক, আপনার কাছে একটু বিশেষ কাজে এসেছিলাম, মনতোষবাবু আমায় পাঠিয়েছেন। একটু নিরিবিলি হলে কথাবার্ত্তার সুবিধে হত।"

"ওঃ—আচ্ছা, আসুন।"—বলিয়া পান্নালালবাবু অবিনাশকে দ্বিতলে তাঁহার খাসকামরায় লইয়া গেলেন।"

অবিনাশ বসিয়া বলিল, "এই যে কালী ভট্‌চায্যির নভেল আপনারা ছাপান, এর রীতিমত হিসেবপত্র সব থাকে ত?"

পান্না মিত্র একটু বিস্মিত হইয়া, সন্দিগ্ধভাবে অবিনাশের মুখের পানে চাহিলেন। বলিলেন, "কেন?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "খাতাপত্র চট্‌ পট্‌ বদলে ফেলুন।"

"খাতা বদলাব? কেন, কি হয়েছে? ইনকম্‌ ট্যাক্সের কোনও—"

"না, ইনকম্‌ ট্যাক্স নয়। আপনার নামে এক সঙ্গীন মোকদ্দমা হবে, তারই আয়োজন হচ্ছে।

এ কথা শুনিয়া পান্নাবাবুর মুখে ভীতিচিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন, "মোকদ্দমা হবে? কেন, কিসের মোকদ্দমা? কি করেছি আমি?"

"কালী ভট্‌চায্যির ছেলে ললিতমোহন, আপনার নামে বিস্তর টাকার দাবীতে মোকদ্দমা করবার চেষ্টায় আছে। সে বলে, আমার বাবার বই পান্না মিত্তির কার হুকুমে ছাপিয়ে বিক্রী করে? এ ক'বছরে যত টাকা লাভ করেছে, কড়াক্রান্তি হিসেব করে আদালতের সাহায্যে ওর কাছ থেকে আমি আদায় করে নেব।"

শুনিয়া পান্নাবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই কথা! তা, করুক না নালিস। কার হুকুমে ছাপিয়েছি, আদালতেই তা দেখাব। ললিত নালিস করবে! ভারি ত মুরদ ললিতের! যাট টাকা মাইনের গোলামী করে ত খান। তাকে চেনেন নাকি?"

"চিনি বইকি! সে এই তিন বছর হল কলকাতায় এসেছে, আসেই ত মাঝে মাঝে আমার কাছে। আমায় বলে ১০০ টাকা দিয়ে বাবার বইগুলি কিনেছিলেন, অনেক ১০০ টাকা ত তুলে নিয়েছেন, এখন বইগুলি আমায় দিন। আমি তাকে বলি বাপু হে! যখন আমি ১০০ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, তখন কি কেউ তোমার বাপের নাম জানত? আমি কত টাকা খরচ করে, কত কষ্ট করে, কত লোকের খোসামুদি করে বইগুলির ভাল ভাল সমালোচনা করিয়ে নাম বের করলাম, এখন কি আর দিতে পারি? আর দেবই বা কেন? প্রকাশ্য নিলেমে কিনেছি, খামকা তোমায় দিয়ে দেব?"

অবিনাশ বলিল, "কোনও দলিল আছে নাকি?"

"আছে বইকি। নইলে কি এমনিই বই ছাপিয়ে বিক্রী করছি?"

"তবে যে ললিত বলে, কোনও দলিলপত্র নেই!"

"ললিত বললেই ত হবে না। আচ্ছা আপনাকেই দলিল দেখাই।"—বলিয়া পান্না মিত্র উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া, আদালতের মোহর-অঙ্কিত একখানি সেল সার্টিফিকেট অবিনাশের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এই দেখুন। আপনি ত একজন শিক্ষিত লোক, আপনি দেখুন আমি কালী ভট্‌চায্যির বই বিনা অধিকারে ছেপেছি কি ছাপবার অধিকার আমার আছে!"

অবিনাশ দেখিল, সেল সার্টিফিকেটে বিক্রীত দ্রব্যের তালিকায় আলমারি, পুরাতন পুস্তকগুলির সংখ্যা এবং পাণ্ডুলিপি পাঁচখানির উল্লেখ রহিয়াছে। দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই ত লেখা রয়েছে। উক্ত মৃতকের হস্তলিখিত পুঁথি ৫ খানি।—পাঁচখানিই ত বই কালী ভট্‌চায্যির? এই ত রীতিমত দলিল রয়েছে। যাক্, একটা মস্ত ভাবনা গেল।"

পান্না মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দুর্ব্বুদ্ধি আবার ললিতের কবে থেকে হল? কে তাকে নাচাচ্চে বলতে পারেন?"

"কি জানি, তা ত জানিনে। মনতোষবাবু ললিতের কাছেই শুনেছেন। কালী ভট্‌চায্যি নাকি মনতোষবাবুর ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন। ললিত কাল মনতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে চলে গেলেই মনতোষবাবু আমাকে বললেন, ওহে যাও, পান্নাবাবুকে এই খবরটা দিয়ে এস, তিনি আমাদের কাগজের একজন প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা, অনেক টাকা খেয়েছি তাঁর, এখনও প্রায় দেড়শ টাকার বিল বাকী রয়েছে—তাঁকে সাবধান করে দিয়ে এস—কি জানি বলা ত যায় না, যদি শেষে ডিক্রি-ফিক্রীই হয়ে যায়—তাঁর যা করবার কর্ম্মাবার এই বেলা যেন সেরে ফেলেন।—খাতা বদলাবার কথাটা স্পষ্ট করে বললেন না, ঐ রকম করে ইঙ্গিতেই জানালেন। আমারও মশায়, কথাটা শুনে অবধি, ভারি ভাবনা হয়েছিল; তাই এসেই প্রথমে বইগুলো চেয়ে নিয়ে দেখলাম, কোন্‌টার কটা করে সংস্করণ হয়েছে। ও বই পাঁচখানা থেকে আপনার খুব লাভ হয় বোধ হয়?"

পান্না মিত্র সাবধানে বলিলেন, হ্যাঁ—তা কিছু কিছু হয় বইকি! তবে বাজার বড় ডল্।"

"যথেষ্ট বিক্রী হওয়াই ত উচিত। অমন সব ভাল ভাল বই! বঙ্কিমের পর অমনি বই ত কেউ আর লিখতে পারলেন না—যতই যিনি বিজ্ঞাপন দিন। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি মশায়।"

পান্না মিত্র অবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া কথা কহিতে কহিতে দরজা অবধি আসিলেন। শেষ বিদায় লইয়া, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা। আমাদের টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে পান্নাবাবু। শ্রাবণ সংখ্যার জন্যে কাগজ এখনও কিনতে পারিনি। আপনার বিজ্ঞাপনের টাকাটা কি—"

পান্নাবাবু বলিলেন, "দারোয়ান পাঠিয়ে দেবেন। কালই ওটা পেমেণ্ট করে দেব।"

"বেশ। এখন আসি তবে—নমস্কার"—বলিয়া অবিনাশ বিদায় লইল। সম্মুখেই হাইকোর্টগামী একখানি ট্রাম আসিতেছিল, ছুটিয়া গিয়া তাহাতে আরোহণ করিল।

হাইকোর্টে পৌছিয়া উকীল লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতেই, "কি অবিনাশবাবু কি মনে করে?" বলিয়া চারি পাঁচজন নব্য উকীল তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। ইহাদের কেহ আর্য্যশক্তি'র লেখক, কেহ গ্রাহক।

অবিনাশ বলিল, "আপনাদের কাছেই এসেছি। একটা আইনের পরামর্শ দিন ত আপনারা।"

একটি নিভৃত টেবিল অন্বেষণ করিয়া সকলে গিয়া উপবেশন করিলে, নামধাম গোপন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি অবিনাশ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি বইগুলোর কপিরাইট গেছে?"

একজন উকিল বলিয়া উঠিলেন, "সার্টেনলি নট। কপিরাইট যাবে কি জন্যে?"

অন্যান্য উকিলেরাও বলিলেন, "না, কপিরাইট বিক্রী হয়নি।"

অবিনাশ বলিল, "কিন্তু বিক্রী ত হয়েছে! কি বিক্রী হল তা হলে?"

প্রথমোক্ত উকিল বলিলেন, "খানকতক হাতের লেখা কাগজ। কপিরাইট ইজ্ কোয়াইট্ এনাদার থিং। ধরুন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে, তাঁর বিষবৃক্ষ বইখানির মূল পাণ্ডুলিপি আছে। একজন পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক, ইংরেজিতে যাকে ম্যানস্ক্রুপ্ট হাণ্টার বলে, গিয়ে যদি ৫০০ টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি ওঁদের কাছ থেকে কিনে আনে, তাহলে কি বিষবৃক্ষের কপিরাইট

তার হয়ে গেল? কপিরাইট বিক্রী তাকে বলে না। আপনার এ কেসে কপিরাইট বিক্রী হলে সে কথা সেল সার্টিফিকেটে খুলে স্পষ্ট করে লেখা থাকত।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "দেখবেন, আপনাদের এ মতটি খুব পাকা ত?"

একজন উকিল চট করিয়া উঠিয়া গিয়া লাইব্রেরী হইতে একখানি বহি লইয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া সেখানির এক অংশ পাঠ এবং আলোচনা করিয়া বলিলেন, "না, কপিরাইট যায়নি।"

অবিনাশ প্রফুল্লমনে "আর্য্যাশক্তি" আপিসে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মনতোষবাবুর নিকট কোনও কথা ব্যক্ত করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ রবিবার। সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে অবিনাশেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সে স্নানাদি করিয়া, বেলা আটটার মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিল।

মনতোষবাবু বাড়ী ছিলেন না। অবিনাশ একবারে অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিল । সে বৎসর পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পব হইতে, এ বাড়ীতে অবিনাশের খুব আদর বাড়িয়া গিয়াছে। তখন হইতে ঘরের ছেলের মতই অন্তঃপুরেও তাহার অবাধ গতিবিধি। গৃহিণীকে গিয়া বলিল, "মা, ললিত ছেলেটির বিষয় কর্ত্তা কি আপনাকে কিছু বলেছেন? আচ্ছা, ওর সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ, বলেছেন। দেখতে শুনতে, লেখাপড়ায় ছেলেটি ত ভালই শুনছি। তোমাকেই ত ঘটকালির ভার দিয়েছেন বললেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কিছু কয়েছ নাকি ?"

"না, এখনও কইনি। তার আগে একটু গোড়া বাঁধতে হবে মা। এক কাজ করুন।"

"কি, বল।"

"ললিত আজ এলে, তাকে একবার মণিমালাকে দেখিযে দিন। বেশী কিছু সাজগোজ করে দেবেন না, বুঝেছেন—'মেয়ে দেখাচ্ছে'—এটা তার মনে যেন সন্দেহ না হয। একখানা কালাপেড়ে দেশী শাড়ী,.আর ওরই মধ্যে সুশ্রী একটা জ্যাকেট পরিয়ে দেবেন, কপালে একটা কাঁচপোকার টিপ, গহনা-টহনা বেশী নয়। মুখে পাউডার-টাউডার যদি দিতে হয় ত অতি যৎসামান্য, বুঝেছেন। আমরা যখন খেতে বসব, মণি কর্ত্তার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করবে। আজকালকাব ছেলে কিনা, দেখুক আগে। তারপর সুবিধে মত আমি কথা পাড়ব—যা যা করতে হয় করব।"

গৃহিণী সম্মত হইলেন।

ললিত আহারাদির পর গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কাকীমা, এখন আসি তা হলে?"

গৃহিণী বলিলেন, "এখনই চললে, বাবা? এই দুপুর রোদ্দুরে না গেলে কি হত না?—এইখানেই এখন একটু বিশ্রাম করনা, বিছানা করে দিক।"

ললিত বলিল, "না কাকীমা, আমার অনেক কাজ রয়েছে—এখন বাসাতেই যেতে হবে। আবার আসবো একদিন।"

"আসবে বইকি বাবা। ওঁদের দুজনে যে বকম বন্ধুত্ব ছিল, তোমার মাব সঙ্গে আমার যে রকম আত্মীয়তা ছিল, তোমায় ত পর বলে মনে হয় না, যেন ঘরের ছেলেটি বলেই মনে হয়। ঘরের ছেলেব মত আসবে যাবে। এইখানেই এখন থাক না দিন কতক। বাসায় খাবার দাবার কষ্ট।"

মাতৃবিয়োগের পর হইতে এমন মিষ্ট স্নেহপূর্ণ কথা ললিতকে কেহ বলে নাই। তাহার

ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "বাসায় থেকে থেকেই অভ্যাস হয়ে গেছে কাকীমা, এখন আর কোনও কষ্টবোধ হয় না। তা ছাড়া আমার আপিসও এখান থেকে অনেকটা দূর হবে। মাঝে মাঝে আসবো, দেখাশুনা করে যাব।"

"আবার কবে আসবে?"

ললিত একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "পরশু বিকেলে আসবো কাকীমা।"

নীচে নামিয়া গিয়া ললিত দেখিল, আপিস ঘরে বসিয়া অবিনাশ প্রুফ সংশোধন করিতেছে। ললিতকে দেখিয়া সে বলিল, "চললেন নাকি?"

"হ্যাঁ, এবার যাই।—আপনার শ্রাবণের কাগজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে নাকি?"

"হ্যাঁ, দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডার প্রুফ এসেছে। প্রথম ফর্ম্মায় আপনার একটা কবিতা গেছে যে।"

ললিত একথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "গেছে নাকি? কোন্‌টা?"

"শ্রাবণের মেঘ"—বলিয়া অবিনাশ দেরাজ টানিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রথম ফর্ম্মার ছাপা ফাইল বাহির করিল। ললিতের হস্তে সেটি দিয়া বলিল, "এই দেখুন।"

ললিত দেখিল, প্রথম পৃষ্ঠাতেই তাহার "শ্রাবণেব মেঘ" ছাপা হইয়াছে। দেখিয়া তাহার মন উল্লাসে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। নিজের রচনা ছাপার অক্ষরে দেখিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাহার হয নাই। নিবিষ্ট চিত্তে সেটি পাঠ করিতে লাগিল। অবিনাশ তাহার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া একবার হাসিল, কারণ এ ব্যাপারটি তাহারই কীর্ত্তি। মনতোষবাবু কবিতাটিকে "রাবিশ" আখ্যা দিয়েছিলেন, ছাপিতেই চাহেন নাই—অবিনাশ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়াছিল।

কবিতাটি পাঠ করিয়া ললিত বলিল, "এ যে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দিয়েছেন!"

অবিনাশ বলিল, "কবিতাটি মনতোষবাবুর ভারি পছন্দ হয়েছে কিনা! তিনি বললেন এ রকম ভাল কবিতা খুব কমই আমরা পেয়ে থাকি; এটিকে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দিয়ে দাও।—আরও একটি কবিতা আপনি দিয়ে গেছেন না? বোধ হয় শেষের দিকে সেটিও যাবে।

এই কথাগুলি শুনিয়া ললিত একবারে মোহিত হইয়া গেল। বলিল, "সে কবিতাটি মনতোষবাবুর কেমন লেগেছে আপনাকে বলেছেন নাকি?"

"না, তা এখনও বলেন নি। তবে একটি কথা আমায় বলেছেন, সেটি আপনার কাছে প্রকাশ করা আমার উচিত কি না তাই ভাবছি।"—বলিয়া অবিনাশ ললিতের পানে সহাস্য নেত্রে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, "বলেই ফেলি। আপনার কবিতা পড়ে মনতোষবাবু আমায় বললেন, 'ওহে, এ যে একটা জীনিয়স্‌!—এতদিন এ ছিল কোথা? যে রকম দেখছি, কালে এ একজন খুব উঁচুদরের কবি হবে। ভাগ্যিস অন্য কাগজে না গিয়ে আমাদের কাগজেই প্রথমে এসেছে। খুব সাবধান, দেখো যেন ছোকরা আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। তুমি খুব ঘন ঘন ওর বাসায় যেতে আরম্ভ কর—ওর সঙ্গে খুব ভাবসাব করে নাও—এইবেলা ওর কাছ থেকে কথা নিয়ে নাও যেন অন্য কোনও কাগজে ও কবিতা না দেয়।'—যান মশাই, ঘরের খবর সব আপনাকে বলেই ফেললাম—আমি সরল মানুষ!—বলিয়া অবিনাশ হাসিতে লাগিল।

ললিত আহ্লাদে অভিভূত হইয়া বলিল, "তা, আমার কবিতা যদি আপনাদের ভাল লাগে, আপনারা ছাপেন, তবে অন্য কাগজে কখনই যাব না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ললিতের অন্য কাগজে না যাইবার অপর কারণও ছিল—তাহার বহু কবিতাই অন্যান্য অনেক কাগজের আপিস হইতে ইতিপূর্ব্বে ফেরৎ আসিয়াছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করিল না। মনতোষবাবুর সুদুর্লভ

কাব্যবিচারশক্তি দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল এবং সেই অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের প্রতি তাহার মন আত্যন্তিকী ভক্তিতে একবারে অবনত হইয়া পড়িল। সে যে একটা জীনিয়স্ এবং তাহার কবিতাগুলি যে যথার্থই অতি উচ্চশ্রেণীর, সে বিষয়ে মনতোষবাবুর সহিত তাহার কিছুমাত্র মতভেদ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবিনাশ অতঃপর ঘন ঘন ললিতের বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ললিতও প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইয়া মনতোষবাবুর বাড়ীতে আসে, আহারাদি করে, ঘরের ছেলের মত গৃহিণীর সহিত, মণিমালার সহিত বসিয়া হাসি রঙ্গ গল্পগুজব করে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির সহিত খেলা করে।—বাসায় ফিরিবার সময় নীচে নামিয়া আফিস ঘরে গিয়া আটক পড়িয়া যায়; অবিনাশের সহিত দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। অবিনাশ তাহার কবিতার অজস্র প্রশংসা করিয়া করিয়া অতি শীঘ্রই তাহার মনটিকে জয় করিয়া লইল। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশী নহে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটা সখ্যে পরিণত হইতে অধিক দিন লাগিল না। "অবিনাশবাবু" দেখিতে দেখিতে "অবিনাশদা" হইয়া গেল—ক্রমে এখন দাঁড়াইয়াছে শুধু 'অবিনাশ'।

একদিন বৈকালে গোলদীঘির ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে ললিত বলিল, "অবিনাশ, তুমি এত লেখাপড়া শিখেছ, ৫০ টাকা মাইনের সহকারী সম্পাদকী আব কত কাল করবে? তোমার পরিবারটি ত নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা দেখনা কেন? ৫০ টাকায় তোমার চলে?"

"তা কি আব চলে? পৈতৃক কিছু টাকা আছে তাব সুদ পাই, খানকতক বই লিখেছি তা থেকে কিছু পাই, ছোট ভাইটি চাকবি কবে কিছু আনে, সব মিলিয়ে কোনও গতিকে সংসার চালাই। অন্য চাকরি এখন আর কে দেবে ভাই? তবে ব্যবসাব একটা মৎলব আছে—দেখি কি হয়।"

"কি ব্যবসা?"

"একখানা বইয়ের দোকান খুলব। বেশ লাভ। নিজের বইগুলো ত রয়েইছে। ঔপন্যাসিক অনাদিবাবুও হাতে আছেন, তাঁর বই-টইও পাবলিশ করা যাবে। আর্য্যশক্তিখানা রয়েছে, সমালোচনার সুবিধা হবে। বিজ্ঞাপনগুলোও অর্দ্ধমূল্যে হবে মনতোষবাবু ভরসা দিয়েছেন।"

"কবে দোকান খুলবে?"

"শীগগিরই। পূজোর আগেই। হয়ত বা শ্রাবণের মাঝামাঝিই খুলে ফেলব। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটি ঘরও ঠিক করেছি।"

"দোকান চালাবে কে?"

"ভাইটিকেই দোকানে বসাব। রেল আপিসে বেরোয়, কুড়িটি টাকা পায়, তাও অস্থায়ী চাকরি। সে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকেই দোকানে বসাব। আর আমিও অবসর মত দোকানে বসব। তোমার বাবার বইগুলো যদি এ সময় হাতে থাকত। তা হলে ভারি সুবিধে হ'ত হে!"

দিন দুই পরে অবিনাশ বলিল, "ওহে ললিত দেখ, একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে।"

"কি?"

"কিন্তু ভারি গোপনীয় কথা ভাই। মনতোষবাবুর কাছে কিম্বা গিন্নীর কাছে, এমন কি মণিমালার সঙ্গেও কথায় কথায় যদি প্রকাশ না কর তবে বলি।"

"তুমি যখন অত করে বারণ করছ, নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ করব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এখন ব্যাপারটা কি শুনি?"

অবিনাশ অত্যন্ত নিম্নস্বরে বলিল, "পান্না মিত্তির তোমার বাবার বইগুলি এক রকম ফাঁকি দিয়েই কিনে নিয়েছে বলতে হবে। ওর সঙ্গে শঠে শাঠ্যং করে দেখলে হয় না?"

"কি রকম?"

"এই ধর, তুমিই ত তোমার বাপের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার বাপের যা কিছু ছিল, সবই এখন তোমার। তুমি আমায় একখানা দলিল লিখে দাও যে "এতদ্বারা আমার পিতাঠাকুরের পুস্তকগুলির কপিরাইট আমি শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।' কিছু টাকাও তোমায় আমি দেব তার জন্যে, নইলে বিক্রীটা আইনসঙ্গত হবে না।—তারপর দোকান খুলেই ঐ দলিলের বলে আমি তোমার বাবার বইগুলি ছাপাতে আরম্ভ করে দেব।"

ললিত বলিল, "পান্না মিত্তির নালিশ করবে না?"

"করুক। আমার মামাশ্বশুর হাইকোর্টের উকীল আমার এক পয়সা উকীল খরচা নেই। হাইকোর্টে মামলা হতেও দুটি বছর লাগে। এ দু'বছর ত তোমার বাবার বই আমি দেদার বিক্রী করে নিই! পান্না মিত্তির যা দাম রেখেছে, আমি প্রত্যেক বইয়ের দাম তার চেয়ে চার আনা কম রাখব। সবাই আমার দোকান থেকে কিনবে। তারপর ক্রমশঃ যা দাঁড়াবে—অন্ততঃ আমার বিশ্বাস যা দাঁড়াবে—তাও বলি। পান্না যখন দেখবে, মোকর্দ্দমা করতে করতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, দোকানের কাজ ফেলে কাগজের তাড়া বগলে উকীল বাড়ী আর হাইকোর্ট ছুটোছুটি করতে করতে প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন সম্ভবতঃ একটা আপোসের প্রস্তাব করবে। তখন আমি তাকে বলব, সবগুলো না দাও, অন্ততঃ খানকতক বইয়ের কপিরাইট আমায় লিখে দাও। যদি দু'খানাও পাওয়া যায় ত সেই বা মন্দ কি? ঘরপোড়া বাঁশ, যা উদ্ধার হয় রে ভাই! কি বল, দেবে—"

ললিত বলিল, "আচ্ছা, ভেবে চিন্তে তোমায় আমি বলব।"

পরদিন ললিত বলিল, "দেখ ভাই, এ বিষয়ে আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম। লিখে তোমায় আমি দিতে পারি এখনি। কিন্তু আমাব ভয় হয়, শেষে এই নিয়ে তুমি হয়ত জেরবার হয়ে পড়বে। উকীলের ফী না লাগলেও, আরও কত রকম খরচ ত আছে। হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা চালানো কি সোজা কথা দাদা? পান্না মিত্তির যদি আপোস নাই করে—শেষে মায় খরচা যদি তোমার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়—তখন তুমি করবে কি? না না—ও সব ফন্দি ছেড়ে দাও।"

অবিনাশ কিন্তু দেখা হইলেই ললিতকে এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু ললিত কিছুতেই রাজি হয় না, অবিনাশও ছাড়ে না। শেষে ললিত বলিতে লাগিল—"আচ্ছা তুমি দোকানই ত খোল আগে তারপর যা হয় করা যাবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহ। ভোর হইতে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া আকাশ যতটা দেখা যাইতেছিল, তাহা মেঘে মেঘে পরিপূর্ণ। মেসের বাসায়, কেওড়া কাঠের তক্তপোষের উপর বসিয়া ললিত এক পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া, একখানি নূতন এক্সারসাইজ খাতা খুলিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিন, প্রায় প্রত্যহই একটা করিয়া কবিতা সে লিখিয়া ফেলিয়াছে। শুনিতে পাই, ফুল ফুটিবার পক্ষে দক্ষিণ বাতাস যেমন উপকারী, কবিত্বের পক্ষে কাব্যরসিকের প্রশংসাবাদও নাকি সেইরূপ। বলা বাহুল্য এ দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া অবিনাশই এই কাব্যকাননে দক্ষিণ বাতাসের কাজ করিয়াছে।

আগামী সংখ্যা 'আর্যশক্তি' যতদিন ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ললিতের উভয় কবিতাই গিয়াছে। অবিনাশ বলিয়াছে—"শেষের দিকের জন্যেও তোমার একটি কবিতা চাই—এ

মাসে ভাল কবিতার আমাদের বড় অভাব।”—ললিতের খাতায় পূর্ব্বলিখিত কবিতা অবশ্য অনেকগুলিই আছে—কিন্তু এবার সে একটি নূতন কবিতা দিবে এবং এরূপ করিবার একটা গভীর উদ্দেশ্যও তাহার আছে ও বেলা মনতোষবাবুর বাড়ী তাহার চা পানের নিমন্ত্রণ আছে—কবিতাটি সঙ্গে কবিয়া লইয়া যাইবে।

আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। ললিত লিখিতেছে—মাঝে মাঝে পেন্সিল উঠাইয়া চিন্তা করিতেছে,—আবার লিখিতেছে। এইরূপ ঘণ্টাখানেক লিখিবার পর কবিতাটি শেষ হইল, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টিও আবার নামিল।

ললিত তখন খাতা বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া বৃষ্টি দেখিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল। সারাদিন যদি এ রকম বৃষ্টি থাকে, তবে ওবেলা নিমন্ত্রণে যাওয়ার কি হইবে? ভিজিতে ভিজিতে গিয়া উপস্থিত হইলেই বা তাঁহারা মনে করিবেন কি? অথচ না গেলেও যে নয়! দুই দিন মনতোষবাবুর বাড়ী সে যায় নাই—এ দুইদিন তাহার কাছে বড়ই নীরস মনে হইয়াছে, বড় কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়াছে। কারণটা গোপনীয়। বৃষ্টি কি তাহার সঙ্গে এমন করিয়া বাধ সাধিবে?

ক্রমে সে মনে মনে স্থির করিল, ভদ্রলোককে কথা যখন দিয়াছে, তখন তাহা রক্ষা করিতেই হইবে—ঝড়ই হউক, জলই হউক আর বজ্রপাতই হউক!

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহাব পদশব্দ হইল। ললিত দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। কয়েকমুহূর্ত পরে আসিয়া দাঁড়াইল—অবিনাশ। বেচারীর আপাদ মস্তক জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধ ছাতার ডগা দিয়া জলের ধারা নামিতেছে।

“একি অবিনাশ—একি—অ্যাঁ?—ভয়ানক ভিজে গেছ যে!” অবিনাশ হাসিতে হাসিতে বলিল “হ্যাঁ, অবস্থা শোচনীয়। ট্রাম থেকেও নামলাম বৃষ্টি, ঐ বৃষ্টিতে এইটুকুই আসতে আসতেই দেখ না ব্যাপার!”—ছাতাটি বারান্দায় রাখিযা, জুতাজোড়াটি খুলিয়া অবিনাশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ললিত বলিল, “ইস্—কাপড় জামা চাদর বিলকুল ভিজে গেছে যে হে। ছেড়ে ফেল ছেড়ে ফেল—আমি শুকনো কাপড় জামা বের করে দিই।”

ভিজা পিরাণ খুলিয়া ফেলিয়া, গামছায় গা হাত পা মুছিয়া অবিনাশ শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিল। ললিতের গেঞ্জি তাহাব গায়ে একটু আঁটো হওয়ায়, তাহা রাখিয়া কোঁচাব খুঁটে দেহ আবৃত করিয়া লইল। ঝি আসিয়া, ভিজা কাপড়গুলি নিংড়াইয়া শুকাইবার জন্য বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিল।

অবিনাশ বসিয়া বলিল, “কই, আমাব কবিতা দাও।”

ললিত বলিল, “তুমি কি কবিতার জন্যে এসেছ এতদূর, এই জল বৃষ্টিতে?”

“তবে আর কিসের জন্যে বল? তুমি তো আমায় নেমতন্ন কবনি।”—বলিয়া অবিনাশ হাসিতে লাগিল।

ললিত বলিল, “ওবেলা ত তোমাদের ওখানে যেতেই হবে কিনা, কবিতাটি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। সকালে উঠেই লিখতে বসেছিলাম—এই কতক্ষণ হল শেষও করেছি।”

“কই কই—দেখি?”

ললিত বলিল, “এখনও সংশোধন কবিনি ত, আগে সংশোধন কবি তার পর দেখো।”

“না—না—দাও, দেখি। যা হয়েছে তাই দেখি।”

“এখনও ঠিক মনের মতনটি হয় নি হে। এখনও অনেক জায়গায় বদলাতে টদলাতে হবে।”

“বেশ ত, এস না, দু’জনে একসঙ্গে পড়তে পড়তেই বদলান যাক্। কই, বের কর। এই খাতাখানি বুঝি?”—বলিয়া অবিনাশ খাতাখানি খুলিয়া ফেলিল। প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—“শ্রাবণ-নিশীথে—বাঃ বাঃ—নামটি ত বড় চমৎকার হয়েছে।”—বলিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল। পাঠশেষে খাতাখানি বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া মেঘপ্লাবিত

আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিল—"বাঃ—সুন্দর! অতি সুন্দর!" শেষে ললিতের মুখপানে চাহিয়া, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে গদগদভাবে বলিল—"সার্থক কলম ধরেছিলে ভাই!"

ললিত লজ্জা ও পুলক জড়িত কণ্ঠে বলিল, "যাও যাও—ঠাট্টা করতে হবে না।"

অবিনাশ বলিল, "না ঠাট্টা করিনি ভাই, বাস্তবিকই কবিতাটি অতি চমৎকার হয়েছে। এতকাল সহকারী সম্পাদকী করছি—কত হাজার হাজার কবিতা ঘেঁটেছি, কিছু কিছু বুঝি ত! এ রকম কবিতা, সচরাচর আমরা পাইনে! যেমন ভাষার সরলতা, তেমনি ভাবের নূতনত্ব!"—বলিয়া খাতাখানি আবার সে খুলিল। পড়িতে লাগিল।

"দেখিতেছি বসে বসে বাতায়ন পথে,
মেঘরাজা উঠিয়াছে আকাশের রথে।

বাঃ—উপমাটি একেবারে নতুন। মাইকেল লেখেনি, হেম বাঁড়ুয্যে লেখেনি, রবি ঠাকুর লেখেনি।

থেকে থেকে ছুটে এসে সৌদামিণী রাণী,
করিছেন প্রিয়তম সাথে কাণাকাণি।
দেখিয়া এ দৃশ্য হায়, অন্তর আমার,
না জানি কিসের লাগি করে হাহাকার!"

খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়া, বাহিরে আকাশেব দিকে চাহিয়া,, আপন মনেই অবিনাশ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—"করে হাহাকাব—করে হাহাকার!—বাঃ, অতি সুন্দর!"

এইরূপে কয়েক মুহূর্ত কবিত্বরসটুকু উপভোগেব ভাণ করিবার পব অবিনাশ আবার পড়িতে লাগিল—

"সেদিন, যেদিন তাবে দেখিনু প্রথম,
ভরে গেল আঁখি তার রূপে অনুপম।
নয়নের নিদ্রা গেল, বয়নের হাসি,
তারই মুখ স্মরি আব আঁখিজলে ভাসি।
শ্রাবণ-নিশীথ আজি আঁধারে মগন,
হায় হায়, কোথা মোর হৃদয়ের ধন!"

এই পর্যন্ত পড়িয়া অবিনাশ হঠাৎ থামিল। কৌতুকের সহিত ললিতের মুখপানে দুই একবার চাহিল। শেষে বলিল—"কি হে ভায়া, ব্যাপার কি? কারুর সঙ্গে প্রেমে পড়েছ নাকি?"

ললিত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "প্রেমে না পড়লে বুঝি কবিতা লেখা যায় না?"

অবিনাশ বলিল, "তা যাবে না কেন? যায়—আমাদের মনতোষবাবু বলেন, কল্পনাশক্তির বলে লেখা যায়। হ্যাঁ—তার পর—

কেন বা দেখিনু তারে, লভিনু কি ফল?
না জানি সে মোর ভাগ্যে সুধা কি গরল।
পোহাইবে এ আঁধার শ্রাবণ-রজনী,
আকাশে উদিবে পুনঃ নব দিনমণি।
আমার এ জীবনের অন্ধকার রাতি
পোহাবে কি?—দেখিব কি দিবাকর ভাতী?

—আচ্ছা ভাই, তুমি সত্যিই বলছ এ একেবারে নিছক কল্পনা?"

ললিত কোন উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

অবিনাশ আবার খাতাখানির উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "শেষের ষ্ট্যানজাটিই সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে—

নাহি জানি আছে কিবা বিধাতার মনে—
পাব কি পাব না তারে কভু এ জীবনে!
যদি পাই—মোর তুল্য কেবা সুখী ভবে?
নাহি পাই—সারা জন্ম কাঁদিতেই হবে!
পাই বা না পাই তারে—এ জীবন ভরি
সে-ই রবে হয়ে মোর হৃদয় ঈশ্বরী।—

—একেবারে গ্র্যাণ্ড! সিম্‌প্লি গ্র্যাণ্ড! কবিতা যদি বলতে হয়, তবে এই রকম রচনাকেই। আজকাল যে সব কবি হয়েছেন, কেবল শব্দাড়ম্বর! ভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। কেমন ছোট ছোট সহজ কথায় তুমি লিখেছ, অথচ রসের ফোয়ারা ছুটেছে।"

ললিত বলিল, "তুমি ত আমার সব কবিতাই সোনাব চোখে দেখ। মনতোষবাবুর পছন্দ হবে কিনা তাই বল।"

অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হবে না আবার? তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। তাঁর মত কাব্যরসিক সম্পাদক বাঙ্গালায় ক'টা আছে? যাক্ এবার আমাদের আর্য্যশক্তিকে, অন্ততঃ কবিতায়, অন্য কোনও কাগজ হটাতে পারছে না।"

অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া আর্য্যশক্তি সম্বন্ধে, বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে, মনতোষবাবুদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। মণিমালার বিবাহেব কথাও উঠিল। অবিনাশ বলিল, "মণিমালার বিয়ে কি আর এতদিন বাকী থাকে? এতদিন কোন্ কালে হয়ে যেত। মনতোষবাবু যে গোঁ ধরে আছেন, নিজে সাহিত্যিক, সাহিত্যিক ছাড়া আর কাউকে জামাই করবেন না। এই এক বাধা। দ্বিতীয় বাধা—বরপণেব উনি ভয়ানক বিরোধী কিনা, আর্য্যশক্তিতে এ সম্বন্ধে ওঁব কয়েকটা প্রবন্ধ বেবিযে গেছে, পড়েছ বোধ হয়। বরপণ স্বরূপ এক পয়সা দেবেন না—কেউ মাথা খুঁড়লেও না,—তাতে মেয়ের বিয়ে হয়, বহুৎ আচ্ছা, না হয়, মেয়ে আইবুড়ই থাকবে—এই তাঁব মত। এক পযসা নেবে না, এ রকম সাহিত্যিক কোথা খুঁজে পাওয়া যাবে বল? একটা প্রস্তাব এসেছে, দেখা যাক্ কি হয়। মনতোষবাবুর ত খুব ইচ্ছে আছে—কিন্তু ওঁব স্ত্রী রাজি হচ্ছেন না।"

অবিনাশ লক্ষ্য করিল, এ কথা শুনিয়া ললিতের মুখ যেন পাংশুবর্ণ হইযা গেল। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে?"

অবিনাশ নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বলিল, "ঢাকার অনাদিবাবুর সঙ্গে—ঔপন্যাসিক অনাদিবাবু আর কি। ঢাকায় তিনি ওকালতী করেন। খুব পশার। গত ফাল্গুন মাসে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। মাসখানেক হল তিনি এখানে এসেছিলেন, মণিমালাকে দেখে তাঁর ভারী পছন্দ হয়েছে। নিজে লজ্জায় মনতোষবাবুকে বলতে পারেন নি। আমায় এসে ধরলেন। বললেন—"এটি ভায়া তোমায় যেমন করে হোক্ করে দিতেই হবে। মনতোষবাবুকে বোলো তাঁর মতামত আমি জানি। সিকি পয়সা আমি নেব না। মেয়েকে গহনা-টহনাও কিছু তাঁকে দিতে হবে না; গায়েহলুদের তত্ত্বে আমি গা-সাজান সমস্ত গহনা পাঠিয়ে দেব।' তাঁর এই কথা শুনে হেসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় ঘটকালি কি দেবেন বলুন দেখি?' তিনি বললেন, 'এবার যে উপন্যাস আমার বেরুবে সেখানি তোমার নামে উৎসর্গ করব।'—আমি বললাম, 'আচ্ছা, চেষ্টা কবে দেখি।'—শুনে, মনতোষবাবু সহজেই রাজি হলেন। বললেন—'পাত্রটি ত খুবই ভাল, যেমন বিদ্বান তেমনি প্রতিভাশালী, উপন্যাস লিখে নামও যথেষ্ট হয়েছে। ওকালতীতে টাকাও পান বিস্তর। আমার খুবই মত আছে। গিন্নী কি বলেন দেখি।'—ওঁর স্ত্রী কিন্তু দোজবরে শুনে একদম বেঁকে বসলেন। একে দোজবরে, তায় আবার তিন চারটি ছেলেমেয়ে আছে কিনা। কর্ত্তা কত বলছেন, হলেই বা দোজবরে। বয়স ত এমন কিছু বেশী নয়, এই বেয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ।' গিন্নীকে কত বোঝাচ্ছেন। এখন নাকি গিন্নী অনেকটা নরম হয়েছেন শুনছি। দেখা যাক কতদূর কি

হয়।"—বলা বাহুল্য, অনাদিবাবু সংক্রান্ত সমস্ত কথাগুলিই অবিনাশের স্বকপোল-কল্পিত।

ললিত কি যেন বলি বলি করিতে লাগিল। তাহার ওষ্ঠযুগলও অল্প নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোনও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অধোমুখে মৌনভাবে সে বসিয়া রহিল।

জলটা এতক্ষণে ছাড়িয়া গিয়াছিল। অবিনাশ বলিল, "বেলা হল ভাই, এখন তা হলে উঠি।"

ললিত কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমার কাপড় জামা ত শুকোয়নি অবিনাশ। আমার জামাও ত তোমার গায়ে হবে না। এইখানেই স্নানাহার কর না। ওবেলা তখন দুজনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

অবিনাশ বলিল, 'না ললিত, আমার যে বিস্তর কাজ রয়েছে ভাই! থাকলে ত চলবে না—নইলে থাকতাম। তোমার এই ধুতিখানা পরেই যাই। তুমি বরঞ্চ একখানা চাদর-টাদর আমায় দাও, তাই গায়ে দিই।"

ললিতের সিল্কের চাদর গায়ে দিয়া, ছাতাটি হাতে লইয়া অবিনাশ বলিল, "ও বেলা আসছ ত ঠিক?"

"ঠিক আসব।"

"কবিতাটি আজই কিন্তু ছাপাখানায় পাঠাতে হবে। ওটি নিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।"

"না, ভুলব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক্।"

"আচ্ছা—আসি তবে"—বলিয়া অবিনাশ ভিজা জুতাজোড়াটি পায়ে দিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা সাতটা না বাজিতেই ললিত, অবিনাশের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল, "কে" বলিয়া অবিনাশ তাহার দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র "ললিত যে!" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিল, ললিতের হস্তে খবরের কাগজে আংশিকভাবে জড়ানো, তাহার পূর্ব্বদিনের ধুতি ও পিরাণটি। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটি বসিয়া গিয়াছে। অবিনাশ বলিল, "তোমার চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? শরীর ভাল আছে ত হে?"

ললিত বলিল "কাল সারা রাত্রি আমার ঘুম হয়নি।"

অবিনাশ নষ্টামি করিয়া বলিল, "কেন, কোনও কবিতা লিখছিলে নাকি?"

"না, কবিতা-টবিতা নয়। একটা বড় বিষম ভাবনায় পড়ে গেছি। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি ভাই।"

"ওঃ"—বলিয়া অবিনাশ ললিতকে বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

ললিত বলিল, "অবিনাশ, কাল যে কবিতাটি তোমায় দিয়েছি—"

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিল, "হ্যাঁ, সে ত মনতোষবাবু কাল সন্ধ্যেবেলাই পাশ করে দিয়েছেন। তুমি চলে গেলে সেটা তাঁকে দেখালাম কিনা। বললেন, এটিও অতি উঁচুদরের কবিতা হয়েছে।—ছাপাখানার বাণ্ডিলের মধ্যে সেটি বেঁধে রেখে এসেছিলাম। এতক্ষণ বোধ হয় কম্পোজ সুরু হয়ে গেছে। এ মাসেই বেরুবে।"

ললিত বলিল, "না, সে কথা জিজ্ঞাসা করছিনে। আমার সে কবিতাটি—"

অবিনাশ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "কবিতাটি, কি?"

"সেটি ভাই, নিছক কল্পনা নয়।"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখখানি গম্ভীর করিয়া অবিনাশ ললিতের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কি বলছ তুমি? তুমি সত্যি সত্যিই কি—"

ললিত বলিল, হ্যাঁ, অবিনাশ—আমি—সত্যি—সত্যিই—"

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কষ্টে ললিত নিজ মনের গোপনীয় কথা অবিনাশের নিকট প্রকাশ করিল।

সকল কথা শুনিয়া, অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এমন ব্যাপার? তা ত জানতাম না!"

ললিত বলিল, "সব ত শুনলে। এখন উপায় কি বল।"

অবিনাশ যেন কত চিন্তিত হইয়া বলিল, "অনাদিবাবু—অনেক টাকার মানুষ! বিশেষ তিনি আগাগোড়া সমস্ত গহনা দেবেন বলেছেন। এই ত হয়েছে মুস্কিল কিনা!"

এইবার ললিতের মুখ খুলিল। সে বলিল, "ভাই, তোমরা শিক্ষিত লোক হয়েও কি এ কথা বলবে? গহনাই কি এত বড় হল? মনের সুখ কি কিছুই নয়? মানি অনাদিবাবু আমার চেয়ে ধনে মানে অনেক বড়। কিন্তু তেমনি তিনি আমার চেয়ে বয়সেও যে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড়। মণিমালার ত বাপের বয়সী। এ বিবাহে কি মনের মিল কখনও হতে পারে? সেটা তোমরা মোটেই বিবেচনা করবে না?"

অবিনাশ বলিল, "সবই ত বুঝি। কিন্তু কথাটা কি জান ললিত, মনতোষবাবুর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। তুমি এখন এক রকম আপনার লোক হয়ে পড়েছ, তোমাকে বলতে দোষ নেই—আৰ্য্যশক্তির এত গ্রাহক তত গ্রাহক বলে বাইরে আমরা যতই লম্ফ ঝম্ফ করি, সে কেবল ব্যবসাদারী—ভুয়ো কথা। দিনকতক কাগজখানা খুব জেঁকে উঠেছিল বটে, কিন্তু এদানী বছর দুত্তিন আর্য্যশক্তির অবস্থা ক্রমেই খাবাপ হয়ে আসছে। কাউকে বোলো না, আর্য্যশক্তির জন্যে মনতোষবাবু বিলক্ষণ দেন্‌দার হযে পড়েছেন। অথচ নামডাক যথেষ্ট বড় বড় সব লোকের সঙ্গেই আলাপ, তারা সব আসবে বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে। দু'একখানি অলঙ্কার যা আছে, তা পরিয়ে মেয়েকে বিবাহ সভায় বের করেন কি করে বল দেখি? অনাদিবাবু গা-ভরা গহনা দেবেন, সেইজন্যেই তাঁর দিকে ঝুঁকেছেন বইত নয়!"

ললিত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা, কত টাকাব গহনা হলে চলতে পারে অবিনাশ?

"হাজার টাকার গহনা হলে কোনও গতিকে এক রকম গা-সাজানো হয়। কনে-গয়না বইত নয়!"

"আচ্ছা, ভাই, আমি যদি হাজার টাকার গয়না মণিমালাকে দিতে পারি, তা হলে কি আমার কোনও আশা আছে? আমার একটি হাজার টাকা সম্বল আছে। আমার জন্যে তুমি একবার বলে দেখবে?"

অবিনাশ বলিল, "তোমার যখন এত ঝোঁকই হয়েছে, তোমার জন্যে আমি চেষ্টা করে না হয় দেখতাম। কিন্তু অনাদিবাবু যে রকম ধরেছেন—"

ললিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "দেখ, তুমি ক'দিন থেকেই বাবার বইগুলোর কপিরাইটের কথা আমায় বলছ—কিন্তু এ পর্যন্ত আমি স্বীকার হইনি। স্বীকার না হওয়ার কারণও তোমাকে বলেছি। আচ্ছা, এখন একটি প্রস্তাব করি। তুমি ভাই আমার এই উপকারটি করে দাও, আমি তোমায় কপিরাইট লিখে দিচ্ছি। কিন্তু দাম-টাম আমি নিতে পারব না ভাই—তোমাকে আমি কপিরাইট দানপত্রে লিখে দেব। বল, এই ঘটকালিতে রাজি আছ?"

অবিনাশ বলিল, "কেন কিছু দাম নিতে তোমার আপত্তি কি? বেশী ত আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, এই ধর শ'দুই টাকা—"

ললিত বলিল, "তুমি এ কাজ করতে যাচ্ছ একটা খেয়ালের বশে। নিশ্চয়ই তোমায় এর জন্যে লোকসান সইতে হবে। তার উপর আবার তোমার কাছে টাকা নিয়ে—না ভাই সে হবে না—সে অন্যায় হবে।"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, তুমি অত করেই বলছ যখন, তখন দাম নিও না। আমি মনতোষবাবুকে, গিন্নীকে বলে কয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি।"

ললিত আবেগের সহিত বলিল, "তুমি চেষ্টা করলেই পারবে ভাই।"

অবিনাশ অন্য দিকে চাহিয়া আরও কিয়ৎক্ষণ যেন ভাবিল। শেষে বলিল,"কিন্তু যদি সফল হই, আমার ঘটকালিটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চাই ভাই। তুমি যে বলবে, আগে দুই হাত এক হয়ে যাক, তারপর কপিরাইট লিখে দেব—সে আমি শুনব না কিন্তু।"

ললিত উৎসাহের সহিত বলিল, "এই ত কথা। আচ্ছা, যেদিন তুমি এসে আমায় সংবাদ দেবে যে ওঁরা রাজি হয়েছেন, সেইদিনই আমাকে দিয়ে তুমি দলিল লিখিয়ে নিও।"

"আচ্ছা, তবে আমি চেষ্টা করি । কিন্তু দেখো ভাই, কথার যেন খেলাপ না হয়।"

"হবে না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

নবম পরিচ্ছেদ

দুইদিন পরে অবিনাশ ললিতের বাসায় আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই রাজি হইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার পর তাঁহারা ললিতকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বোধ হয় এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

শুনিয়া ললিত যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। অবিনাশের হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,"ভাই তুমি আমায় জন্মের মত কিনে রাখলে!"

সন্ধ্যার পর ললিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

মনতোষবাবু তখনও সান্ধ্যভ্রমণ হইতে ফিরেন নাই। গৃহিণী ললিতকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, তুমি আমার মণিকে বিয়ে করতে চেয়েছ?"

ললিত লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

গৃহিণী বলিলেন, "তা, এ ত বেশ সুখের কথা বাবা। মণিকে তোমার যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে, ওকে তুমি নাও—আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আছে।" ললিত বলিল, "কি মা, বলুন।"

শুভকর্ম্মটি তা হলে এই শ্রাবণ মাসেই সেরে ফেলতে হয়। নইলে অগ্রহায়ণ মাসের আগে ত আর বিয়ের দিন নেই—ভাদ্র মাসে মণির আবার যোড়া বছর পড়বে। ভাদ্র মাসে ওর জন্মমাস কিনা, চোদ্দয় পা দেবে। যোড়া বছরে ত বিয়ে হতে নেই।"

ললিত বলিল, "তা, শ্রাবণেই হোক না কেন।"

"আমিও তাই বলি । শুভস্য শীঘ্রং। দেশে কি তোমার খুড়োমশায়কে চিঠি লিখব আমরা?"

"না, কিছু দরকার নেই মা। আমার জন্যে ত ভেবে ভেবে তাদের ঘুম হচ্ছে না কিনা! আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি সে খবরও তাঁরা নেন না। তাঁদের চিঠি লেখবার কোন দরকার নেই।"

"সে তুমি যে রকম বলবে তাই হবে। আর একটা কথা বাবা!"

"কি মা, বলুন।"

"মণিকে, বিয়ের পরে কোথায় রাখবে? প্রথম অবশ্য দু'মাস ছমাস এইখানেই থাকবে। তার পর?"

"তার পর ছোটখাট একটা বাড়ীভাড়া করে ওকে নিয়ে যান?"

গৃহিণী বলিলেন, "ওই একটু মুস্কিল রয়েছে কিনা বাবা । তোমার ত কেউ স্ত্রীলোক অভিভাবক নেই—মাসি পিসি খুড়ি জ্যেঠি—মণি ছেলেমানুষ, একলা কি একটা বাড়ীতে

থাকতে পারবে ও? তা ছাড়া, তোমার মাইনেও এখন কম। মাইনে কিছু না বাড়া পর্যন্ত মণিকে যদি এখানে রাখ তা হলেই ভাল হয় বাবা।"

"দেশে আমার এক পিসিমা আছেন, চেষ্টা করলে হয়ত তাঁকে আমি পরে এখানে নিয়ে আসতে পারব। তার ত এখনও দেরী আছে মা, সে পরের কথা পরে হবে। সব রকম বিবেচনা করে, আপনারা যা ভাল বুঝে আমায় পরামর্শ দেবেন, তাই আমি করব।"

কর্ত্তা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া, ভাবী জামাতাকে নানা স্নেহবাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। পঞ্জিকা দেখিলেন, ২৭শে শ্রাবণ বিবাহের ভাল দিন পাওয়া গেল।

পরদিন অবিনাশ বেলা ৮টার মধ্যে ললিতের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আজকে বেলা দুটোর পর হাইকোর্ট পাড়ায় আসতে পারবে?"

"কেন?"

"তা হলে সেই দলিলটা আজ লেখা হতে পারত।"

"বল ত আসি।"

অবিনাশ এটর্নি-বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। বলিল, "আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় তাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি ত দেরী করবে না?"

"না, দেরী করব কেন?"

"ললিত, আমার এই তাড়াতাড়ি দেখে তুমি কি মনে করছ জানিনে। হয়ত ভাবছ, তোমায় আমি অবিশ্বাস করছি—পাছে বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেলে আর না দাও, ফাঁকি দাও। তা নয় ভাই। দোকানটি খোলবার সব বন্দোবস্ত করেছি। জন্মাষ্টমীর দিনেই খুলব। সেইদিনই তোমার বাবার প্রথম বইখানি প্রকাশ করব এইটে আমার ভারি ইচ্ছে। সেইজন্যেই একটু তাড়াতাড়ি করছি।"

ললিত বলিল, "লিখে ত দিচ্ছি, কিন্তু দেখো ভাই, শেষে যদি বিপদে পড় ত আমায় দোষ দিও না।"

যথাসময়ে এটর্নি-বাড়ী গিয়া দানপত্র লেখা হইল। পরদিন তাহা রেজিষ্টারিও হইয়া গেল।

রেজিষ্ট্রি আফিস হইতে বাহির হইয়া অবিনাশ বলিল, "একটা কথা বলে রাখি ভাই। মনতোষবাবুকে কিম্বা তাঁদের কাউকে, এ কপিরাইট কেনার কথা ঘূণাক্ষরেও কিছু যেন বোলো না—বুঝেছ?"

"না, এতদিন যখন বলিনি, তখন এখনই বা বলব কেন?"

ললিতকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া অবিনাশ এর্টর্ণি অফিসে গেল। সেখানে গিয়া বলিল, "বারো হাজার টাকার দাবিতে পান্না মিত্তিরের নামে একখানা নোটিস লিখতে হবে। বিনা অধিকারে অন্যায় ভাবে কালী ভট্‌চায্যির পাঁচখানি উপন্যাস ছাপিয়ে বিক্রী করে, এ সাড়ে পাঁচ বছরে খরচ খরচা বাদ অন্ততঃ দশ হাজার টাকা লাভ করেছে। অনুবাদ-সত্ত্ব বিক্রী করেও অন্ততঃ দু'হাজার টাকা সে পেয়েছে। এই বারো হাজার টাকার দাবীতে তাকে একখানা নেটিস লিখে পাঠান।"

এটর্নি তদনুসারে নোটিস পাঠাইল যে, সপ্তাহ মধ্যে পান্না মিত্র যদি এই টাকা দাখিল না করে, তবে সপ্তাহান্তে হাইকোর্টে তাহার নামে মোকর্দ্দমা রুজু হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ সংখ্যা 'আর্য্যশক্তি' বাহির হইয়া গেল। বিবাহের আয়োজনে মনতোষবাবু মনোযাগ দিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"এটা রীতিমত সাহিত্যিক বিবাহ। ছোট বড় সমস্ত সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করে বিবাহ রজনীতে একটা সাহিত্যসম্মিলন করে ফেলতে হবে।"

সবই ত হইতে পারে, কিন্তু টাকা কই? ঐ জিনিষটারই যে বড় টানাটানি। টাকার অপ্রতুলতাবশতঃ বিবাহের আয়োজন অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিবাহের পাঁচদিন মাত্র বাকি। মনতোষবাবু বিমর্ষ চিত্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন, অবিনাশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অত ভাবছেন কি?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "টাকার জন্যে যে মহা মুস্কিলে পড়ে গেছি হে! গহনা কিম্বা নগদ টাকাই দিতে হবে না বটে; বরাভরণ, দানসামগ্রী, লোকজন খাওয়ান খরচ, এসব ত আছে। এক জায়গায় হাজারখানেক টাকা ধারের বন্দোবস্ত করেছিলাম, তখন ত বলেছিল নিশ্চয় দেবে, এখন বলছে দিতে পারবে না! শেষকালে কি দাঁড়িয়ে অপমান হতে হবে নাকি?"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

অবিনাশ বলিল, "তাইত, এখন উপায়?"

"উপায়, আমার মাথা আর মুণ্ডু!—আমি এ সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে পালাই। তোমরা যা হয় কর।"

অবিনাশ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি টাকার চেষ্টা দেখব?"

"দেখ যদি পাও। পাবে? কোনও আশা আছে?"

"চেষ্টা করলে পেতে পারি বোধ হয়। দেখি চেষ্টা করে।"

পরদিন অবিনাশ এক হাজার টাকা আনিয়া মনতোষবাবুকে দিল। তিনি মহা খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা পেলে হে?"

অবিনাশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ওটা একটু সুযোগ পাওয়া গেছে।"

মনতোষবাবু অবিনাশকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বিয়ে হয়ে যাক—কিছু সুদ ধরে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব তোমায়। না না—সে তুমি বললেও শুনব না, সুদ কিছু তোমায় নিতেই হবে। তুমি গরিব মানুষ, বিনা সুদে আমায় এত টাকা ধার দেবে সে কি কথা!"

আজ ২৭শে শ্রাবণ। আজ ললিতের সহিত মণিমালার বিবাহ। এক সপ্তাহের জন্য নিকটে একখানি বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে—সেই বাড়ীতেই বিবাহ হইবে। দেশ হইতে মনতোষবাবুর আত্মীয় কুটুম্বগণ আসিয়াছেন। বিবাহবাড়ী গম্‌গম্ করিতেছে।

মনতোষবাবুর বন্ধুর অভাব নাই। বিবাহের দিন অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতে আসিলেন। অবিনাশকে মনতোষবাবু প্রাতের গাড়ীতে নাটোরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুই মণ কাঁচাগোল্লা সেখানে ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল, সন্ধ্যার ট্রেনে তাহা সঙ্গে লইয়া অবিনাশ আসিয়া পৌছিবে।

ললিত গায়েহলুদ হইতে এই বাড়ীতেই আছে। আজ সেও পাঁচজনের সঙ্গে কাজকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার ছোট বড় বহুসংখ্যক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যসম্পর্কিত ভদ্রলোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই দুই একজন করিয়া পৌছিতে আরম্ভ করিলেন।

উপেন্দ্রবাবু নামক একজন উকীলের সহিত মনতোষবাবু বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার বেয়াইয়ের বইগুলি যে আপনারা পান্না মিত্রের হাত থেকে উদ্ধার করিতে পেরেছেন, এটা খুব ভাল হয়েছে।"

মনতোষবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি বললেন আপনি? বই আবার কবে উদ্ধার করলাম?"

"কেন, আপনার অবিনাশ ত পান্না মিত্রের কান মলে তার কাছ থেকে বইগুলির কপিরাইট কেড়ে নিয়েছে। আপনি কি কিছু জানেন না?"

"না, আমি ত কিছুই জানিনে। কি করে কেড়ে নিলে?, কবে?"

"বিলক্ষণ! আমি মনে করেছি আপনি সবই জানেন। অন্ততঃ অবিনাশ ত আমাকে

তাই বুঝতে দিয়েছিল। সে বললে, "আমি ত কেবল বেনামদার।" ব্যাপার কি হয়েছে?"

উপেন্দ্রবাবু তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ঐ পান্না মিত্তির আমার মক্কেল কিনা। দিন পনেরো হল, একদিন পান্না এসে আমায় বললে, এই দেখুন এটর্ণি-বাড়ী থেকে এক নোটিস পেয়েছি; কালী ভট্‌চায্যির ছেলে ললিত ভট্‌চায্যির কাছ থেকে সব বইয়ের কপিরাইট অবিনাশ দানপত্র লিখিয়ে নিয়েছে—নিয়ে এখন বলছে আমি কালী ভটচায্যির বই বিনা অধিকারে ছাপিয়ে বারো হাজার টাকা লাভ করেছি—সেই টাকা না দিলে আমার নামে নালিশ করবে।—আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিনা অধিকারে ছাপিয়েছ নাকি?'—সে বললে, 'না মশাই, এই দেখুন আমার দলিল।" দলিল দেখলাম, সে দলিল কিছুই নয়। কিনেছে কেবল খানকতক হাতের লেখা কাগজ। কপিরাইট যার তারই আছে। বললাম তাকে সেই কথা। সে ত বিশ্বাসই করতে চায় না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে, তিন চার দিন বড় বড় উকিল কৌঁসুলির কাছে গিয়ে, বিস্তর ফী গুণে, মত নেওয়া হল। সকলেই বললে, কপিরাইট পান্নালাল কেনেনি, কপিরাইট যার ছিল তারই আছে। শেষে অবিনাশের এটর্ণির বাড়ী গিয়ে, অবিনাশকে ডাকিয়ে মিটমাট করা হল। পান্নালাল নগদ দু'হাজার টাকা অবিনাশকে দিলে, আর স্বীকারপত্র লিখে দিলে যে কপিরাইটের অধিকারী সে কখনও ছিল না এবং এখনও নয়; আর কখনও বই সে ছাপবে না। অবিনাশ লিখে দিলে, সে কপিরাইটের মালিকস্বরূপ নগদ, দু'হাজার টাকা পান্নার কাছ থেকে পেয়ে তার উপর সমস্ত দাবী দাওয়া ছেড়ে দিলে। এই ত দিন পাঁচ ছয় হল মিটমাট হয়েছে। আপনাকে অবিনাশ কিছু বলেনি?"

"না, কিছুই ত আমি জানিনে। এই ত আপনার কাছে প্রথম শুনছি।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবে কি এর মধ্যে কোনও গোলযোগ আছে নাকি?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "সেই রকমই ত দেখছি। অবিনাশ যদি জানতেই পেরেছিল যে পান্নার ও দলিল কিছু নয়, তার ত উচিত আমাকে এসে সেই কথা বলা। চুপি চুপি ও এত কাণ্ড করলে কেন? ওর মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তাই ত এখন বোধ হচ্চে। নইলে আপনার জামাইয়ের কাছ থেকে দানপত্র লিখিয়ে তা রেজিস্টরি করিয়ে নেবে কেন?"

"দেখি"—বলিয়া মনতোষবাবু উঠিয়া গেলেন। ললিতের সন্ধান করিয়া তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সকল কথা বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তার নামে দানপত্র লিখে দিয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে বললে, তোমার বাপের বইগুলোর কপিরাইট যদি উদ্ধার করতে পারি, একবার চেষ্টা করে দেখি।"—বলিয়া অবিনাশের সঙ্গে দিনের পর দিন এ সম্বন্ধে তাহার যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্তই মনতোষবাবুকে বলিল।

"ওঃ—কি বিশ্বাসঘাতক! কি বিশ্বাসঘাতক!"—বলিয়া মনতোষবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দলিল লেখার আগে আমাকে যদি একটিবার জিজ্ঞাসা করতে বাবাজী!"

ললিত বলিল, "এর মধ্যে যে এত কাণ্ড আছে তা কি করে জানব বলুন। দোকান খোলা, বাবার বই ছাপান সমস্তই তা হলে মিথ্যে কথা। ও যে আমাদের সঙ্গে এ রকম জুয়াচুরি করবে তা কে জানে?"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনতোষবাবু বলিলেন, "পিতৃধন তোমার অদৃষ্টে নেই, তুমি কি করবে বল!—কিন্তু অবিনাশটা যে আমাদের সঙ্গে এই চাতুরি খেলবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিনে। এতকাল আমার নুন খেয়ে, শেষকালে এই বিশ্বাসঘাতকতা! ছি ছি। আসুক আগে সে। আজ আর তাকে কিছু বলব না। বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকে গেলেই, তাকে

দূর করে তাড়িয়ে দেব। বিয়ের জন্যে হাজার টাকা তার কাছে ধার করেছি; দেব না ত! সিকি পয়সাও দেব না। ভাগ্যিস হ্যাণ্ডনোটখানা লিখে দিইনি। কি নরাধম!"

রাত্রি আটটার সময় সন্দেশ লইয়া অবিনাশ আসিয়া পৌঁছিল। মনতোষবাবু তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অবিনাশ সন্দেশ রাখিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে বাড়ী গেল। রাত্রি ৯টায় অবিনাশ ফিরিল। বর তখন সভাস্থ হইয়াছে।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি মনতোষবাবুর কাছে গিয়া একখানা মোটা লেফাফা দিয়া বলিল, "দেখুন, মার হাতে এই লেফাফাখানা দেবেন ত। বিয়ে হয়ে গেলে, বাসর ঘরে বর কনে গিয়ে বসলে সকলে যখন যৌতুক দেবে, তখন মা যেন মণিমালার হাতে এই খামখানা দেন। আমি ত সেখানে তখন যেতে পাব না!"

মনতোষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?"

"ওটা—মণিমালাকে আমার যৌতুক। দেখুন না, লেফাফার উপরেই ত লেখা আছে।"

মনতোষবাবু লেফাফা আলোকের নিকট ধরিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে— "স্নেহময়ী ভগিনী শ্রীমতী মণিমালা দেবীকে তাহার শুভবিবাহে আমার যৌতুক।"

"এতে আছে কি হে?"—বলিয়া মনতোষবাবু লেফাফাটি ছিঁড়িবার উপক্রম করিলেন।

অবিনাশ "খুলবেন না খুলবেন না" বলিতে বলিতে মনতোষবাবু ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যস্থিত কাগজপত্র বাহির করিলেন। দেখিলেন তাহার ভিতর ১০০০ টাকার একখানি নোট এবং রেজিষ্টারী করা একখানি দলিল।

রুদ্ধশ্বাসে মনতোষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি অবিনাশ—অ্যাঁ?"—বলিয়া দলিলখানি আলোকের নিকট ধরিলেন।

অবিনাশ বলিল, "দেখে ফেললেন। ওখানা মণিমালার নামে দানপত্র। পান্না মিত্তিরের কাছ থেকে কপিরাইট উদ্ধার করেছি। উপরন্তু ২০০০ টাকা—"

মনতোষবাবু হঠাৎ অবিনাশের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমায় মাফ কর অবিনাশ!"—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অবিনাশ পরম বিস্ময়ে বলিল, "কেন, মাফ কিসের?"

"মনতোষবাবু—কোথায় গেলেন—লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, বরকে নিয়ে চলুন।"— বিবাহ-সভা হইতে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। লেফাফাখানি বগলে করিয়া, বরকে লইয়া মনতোষবাবু অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলশঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। [শ্রাবণ, ১৩২৪]

আম্রতত্ত্ব

দানাপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে, ইংরাজটোলায়, লাল টালি আচ্ছাদিত লম্বা ধরনের একখানি একতলা পাকা বাড়ী। ইহা রেলওয়ে গার্ডগণের জন্য নির্ম্মিত 'রেষ্ট হাউস' বা বিশ্রামগৃহ। সারি সারি অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ—সম্মুখে ও পশ্চাতে লম্বা টানা বারান্দা। বাড়ীটির পশ্চাদ্ভাগে, দেশী খোলার ছাপ্পরযুক্ত কয়েকখানি ঘর—তাহার মধ্যে একটা বাবুর্চ্চিখানা, অপর কয়েকখানি ভৃত্যগণের অবস্থানের জন্য। সম্মুখভাবে খানিকটা খোলা জমির উপর ফুলের বাগান। দুইটি বড় বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছ সর্ব্বাঙ্গে ফুল ফুটাইয়া বাতাসে দুলিতেছে; বাকীগুলির অধিকাংশই বিলাতী ফুলের ছোট গাছ, দুই একটি দেশী ফুলও আছে।

আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখের বারান্দায় লোহার খাটে নেটের মশারির মধ্যে গার্ড ডিসুজা সাহেব নিদ্রিত। মাঝে মাঝে ফুরফুরে হাওয়ায় সে মশারি কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাত্রি দুইটার সময় মোগলসরাই হইতে ২৬নং মালগাড়ী লইয়া ডিসুজা সাহেব দানাপুরে আসিয়াছিলেন। অদ্য বেলা ১০টায় আবার ১৫নং লোকাল প্যাসেঞ্জার লইয়া তাঁহাকে মোগলসরাই ফিরিতে হইবে।

বেলা ৮টা বাজিল। রৌদ্র নাই, তাই বেলা বুঝা যাইতেছে না। বাঙ্গলাব খানসামা নগ্নপদে ধীরে ধীরে আসিয়া সাহেবের শয্যার নিকট দাঁড়াইল। লাল ডোরাকাটা কাণপুব টুইলের পায়জামা-সুট পরিয়া সাহেব গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কোটের বুকের অধিকাংশ বোতামই খোলা। খানসামা ডাকিল, "হুজুর।"

হুজুরের সাড়া নাই।

খানাসামা আবার ডাকিল, "আঠ বাজ গিয়া সাহেব—জাগিয়ে।"

অবশেষে খানসামা মশারির ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সাহেবের হাঁটু ধবিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "জাগিয়ে হুজুর। আঠ বাজ গিয়া।"

সাহেব তখন উঃ করিয়া চক্ষু খুলিলেন। একটি হাই তুলিয়া, বালিসের নীচে হইতে নিজ বৃহদাকার সরকারী ওয়াচটি বাহির করিয়া দেখিলেন, আটটা বাজিয়া বারো মিনিট।

সাহেব বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "গোসল ঠিক করো।"

"ঠিক হায় হুজুর"—বলিয়া খানসামা চলিয়া গেল।

সাহেব শয্যা হইতে নামিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হুক হইতে ঝুলানো নিজ কোটের পকেট হইতে পাইপ, দেশলাই ও তামাকের পাউচ বাহির করিয়া লইলেন। ভিতরের বুকপকেটে একখানি চিঠি ছিল, তাহাও বাহির করিলেন।

একখানি ঈজিচেয়ারে বসিয়া, পাইপ ধরাইয়া, পত্রখানি খুলিয়া সাহেব পড়িতে লগিলেন। পত্রখানি মজঃফরপুর ষ্টেশন মাষ্টারের কন্যা, কুমারী বার্থা ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক লিখিত। বার্থার সহিত ডিসুজা সাহেব বিগত এপ্রিল মাস হইতে বিবাহপণে আবদ্ধ। অক্টোবর মাসে ডিসুজা সাহেব একমাস ছুটি 'ডিউ' হইবে—ছুটি হইলেই বিবাহ, ও সিমলাশৈলে গিয়া মধুচন্দ্রযাপন স্থির হইয়া আছে।

পত্রখানি আজ তিনদিন হইতে সাহেবের পকেটে পকেটে ঘুরিতেছে। ফেরৎ ডাকে উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ ছিল, তাহা হইয়া উঠে নাই—আজ উত্তর দিয়া পত্রখানি ডাকে ফেলিতেই হইবে।

পাইপ শেষ করিয়া, ক্ষৌরকার্য্য ও স্নানাদি অন্তে সাহেব যখন বাহির হইলেন তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। মোকামা-মোগলসরাই লোক্যালখানি ঠিক সাড়ে নয়টার সময় দানাপুরে পৌঁছিবে। সেই সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, ট্রেনের চার্য বুঝিয়া লইতে হইবে—সুতরাং পত্র লেখার বাসনা পবিত্যাগ করিয়া সাহেব "হাজরি" আনিবার হুকুম করিলেন।

পত্রলেখার সময় হইল না বলিয়া সাহেবের মনটা কিছু অপ্রসন্ন, তাঁহার মুখভাব হইতে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইতেছিল।

খাদ্যদ্রব্যের প্রথম কিস্তি টেবিলে আসিল। দুইখানি টোষ্ট, মাখন ও চা, দুইটি "আণ্ডা বাইল" ছিল—সাহেব প্রথম ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া দেখিলেন—পচা। তাহা সরাইয়া রাখিয়া, দ্বিতীয়টি ভাঙ্গিয়া, মাখন ও টোস্ট সহযোগে ভক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔর ক্যা হ্যায়?"

খানসামা উত্তর করিল, 'মটন চাঁপ হ্যায়, ঠান্‌ঢা রোস হ্যায়, কারি-ভাত হ্যায়।"—বলিতে বলিতে খানসামার সহকারী একটি ঢাকা পাত্রে মটন চপ টেবিলে রাখিল।

সাহেব ৩/৪ খানি চপ প্লেটে তুলিয়া লইয়া, ছুরি দিয়া কাটিয়া মুখে তুলিলেন। খানিক চর্ব্বণ করিয়া বলিলেন, "বহুৎ কড়া হ্যায়, মটন নেহি হ্যায়।"

খানসামা বলিল, "গোট্‌-মটন হ্যায় হুজুর—আসল মটন আজ মিলা নেহি।"

সাহেব দ্বিতীয় একখানি চপ কাটিয়া, চর্ব্বণ করিবার বৃথা চেষ্টার পর রাগিয়া বলিলেন, "লে যাও। ফেঁক দেও। কুত্তাকো মৎ দেও—উস্কা দাঁত টুট যায়েগা।"

খানসামা প্লেট উঠাইয়া লইয়া সহকারীকে বলিল, "রোস লাও—কারি-ভাত লাও—জল্‌দি।"

গত রাত্রে রোষ্ট করা লেগ্‌-অব্‌-মটনের কিয়দংশ ছিল, তাহা হইতে টুকরা দুই কাটিয়া সাহেব ভক্ষণ করিলেন—ভাল লাগিল না।

সাহেব তখন কারি-ভাত চাহিলেন। মুর্গীর কারি-পাত্র হইতে হুহু করিয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। প্লেটে লইয়া মুখে দিয়া দেখিলেন, চর্ব্বণ করা তাঁহার কর্ম্ম নয়।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ক্যা হুয়া!—ইয়ে ক্যা হ্যায়! ইউ ড্যাম উল্লুকা বাচ্চা, হাম তুমারা উপর রিপোর্ট কর দেঙ্গে—সী ইফ্‌ আই ডোণ্ট"—বলিয়া কাঁটা চামচ ফেলিয়া সাহেব উঠিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—নয়টা বাজিয়া সাতাশ মিনিট। হ্যাট লইয়া বাহির হইয়া দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যথাসময়ে ট্রেন দানাপুর ছাড়িল। খান পাঁচ ছয় আরোহীগাড়ী, বাকী সমস্তই মাল বোঝাই ওয়াগন। প্রত্যেক ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা নাগাদ গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিবে।

গোটা দুই তিন ষ্টেশন পার হইলে, ডিসুজা ক্ষুধার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ট্রেনের চার্য লইবার সময় সে দেখিয়াছিল, ব্রেকভ্যানে মেঝে হইতে গাড়ীর ছাদ পর্যন্ত আমের ঝুড়ি বোঝাই করা আছে। এ সময় দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল হইতে বিস্তর আম চারিদিকে চালান যাইয়া থাকে। সাহেব ভাবিল, গোটাকতক আম বাহির করিয়া ততক্ষণ খাওয়া যাউক।

এই ভাবিয়া সাহেব ব্রেকভ্যানের দ্বার খুলিল। পক্ক ফলের লোভনীয় সুমিষ্ট গন্ধ ক্ষুধার্ত্তের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

সামনেই একটা বৃহৎ ঝুড়ি—মুখটার উপর আচ্ছাদনখণ্ড দড়ি দিয়া সেলাই করা, সেলাইয়ের ফাঁক দিয়া কালো কালো আমপাতা উঁকি দিতেছে। ডিসুজা পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া সেলাই কাটিয়া, ভিতরে হাত ভরিয়া দিল। প্রথমটা কেবল পাতা, আরও নিম্নে হাত ঢুকাইয়া ডিসুজা একটি আম বাহির করিল। দেখিল, বৃহদাকার উৎকৃষ্ট ল্যাংড়া। আরও একটা আম বাহির করিয়া, ব্রেকভ্যানের দ্বার বন্ধ করিয়া স্বস্থানে আসিয়া বাক্স হইতে একখানি প্লেট বাহির করিল। সাহেব আম দুইটিকে সোরাইয়ের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিল। তাহার পর আম দুইটি কাটিয়া, পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন আরম্ভ করিল।

ভোজন অর্দ্ধ শেষ হইতেই, গাড়ী আসিয়া কৈলোয়ার ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ষ্টেশন মাষ্টার

রামতারণ মিত্র ধুতির উপর ছেঁড়া চাপকান পরিয়া 'গাড়ী পাস' করিতে আসিয়াছেন। ব্রেকভ্যান আসিয়া বলিলেন, "গুড মর্ণিং মিষ্টার ডিসুজা—কিছু পার্শেল-টার্শেল নামিবে নাকি?"

সাহেব আম খাইতে খাইতে বলিল, "কুছুনা।"

"বাঃ—বেশ আম ত! খাসা গন্ধ বেরিয়েছে—পার্শেলের আম বুঝি?"

সাহেব শিরশ্চালনা করিয়া বলিল, "খাইবে?"

"দাও না সাহেব।"—বলিতে বলিতে রামতারণবাবু ব্রেকভ্যানে উঠিলেন।

সাহেব বলিল, "দরজা খোল। ঐ—ঐ সামনের বাস্কেট হইতে দুইটা লও।"

রামতারণবাবু ঝুড়ির আবরণ চাড়া দিয়া তুলিয়া ধরিয়া, এ পকেটে দুইটা ও পকেটে দুইটা এবং হাতে দুইটা আম লইয়া বাহির হইলেন।

সাহেব বলিল, "পান আছে?"

"আছে বইকি"—বলিয়া বাবু পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া, দুইটি পান সাহেবের "ভ্যানবুক" নামক বহিখানির উপর রাখিয়া দিলেন। নামিয়া, ঘণ্টা দিতে বলিলেন—গাড়ী ছাড়িল।

সাহেব হাত ধুইয়া, ড্রাইভারকে সবুজ ঝাণ্ডী দেখাইয়া পান দুইটি খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার মনে হইল, ক্ষুধা এখনও ভাঙ্গে নাই, আর গোটা দুই আম খাইলে মন্দ হইত না। যেমন ভাবনা—কার্য্যও সেইরূপ। আহারান্তে মুখ হাত ধুইয়া পান খাইতে খাইতে, গাড়ী আরা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরা অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশন—ষ্টেশন মাষ্টার গাড়ী পাস করিতে আসেন নাই—আসিয়াছেন জেনারেল এ্যাসিস্ট্যান্ট। বাবুটির বয়স হইয়াছে, চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশমা। ব্রেকভ্যানে উঠিয়া বলিলেন, "হ্যালো মিষ্টার ডিসুজা—ম্যাঙ্গো স্মেলিং—বিউটিফুল।"

সাহেব হাসিয়া বলিল, "ফাইন ল্যাংড়াজ্। খাইবে?"

"দাও না সাহেব গোটাকতক।"

ডিসুজা সেই ঝুড়ি হইতে গোটা চারি আম বাহির করিয়া বাবুটিকে দিল। ব্রেকভ্যান বন্ধ করিয়া ষ্টেশনের আপিসে গেল—এখানে কয়েকখানা মালগাড়ী কাটিতেছে—দেরী হইবে। ষ্টেশন মাষ্টার তখন বাড়ীতে, আহারান্তে নিদ্রাগত। তাঁহার পুত্র চারু ও কন্যা কমলা সেখানে খেলা করিতেছিল। জেনারেল বাবুর হাতে আম দেখিয়া এবং তাহা ডিসুজা সাহেব দিয়াছে শুনিয়া, চারু ও কমলা বাহানা ধরিয়া বসিল, "সাহেব, আমরাও আম খাব।"—বলিয়া তাহারা সাহেবের হাঁটু ধরিয়া লাফাইতে লাগিল।

সাহেব বলিল, "আচ্ছা, তুমিরা হামার জন্যে পান লইয়া আসে। হামি আম দিবে।"

চারু ও কমলা ডিসুজা সাহেবের জন্য পান আনিতে ছুটিল। তাহারা ইহাকে "পানখেকো সাহেব" বলিত, পূর্ব্বেও কতবার সাহেবকে পান আনিয়া দিয়াছে।

পান লইয়া, সাহেব ইহাদিগকে ব্রেকভ্যানে লইয়া গিয়া, স্বহস্তে ঝুড়ি হইতে বাহির করিয়া আম দিল। ইহারাও "আরও দাও—আরও দাও" করিয়া, কোঁচড় ও অঞ্চল ভরিয়া আম লইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে কবিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এইরূপে প্রতি ষ্টেশনে "দাতব্য" করিতে করিতে এবং মাঝে মাঝে খাইতে খাইতে, বেলা ৫টা নাগাইদ ঝুড়িটি প্রায় খালি হইয়া গেল। সকলডিহার ষ্টেশন মাষ্টারকে ঝুড়ির ইতিহাস বলিতে বলিতে দুইটি আম দিবার সময় ডিসুজা দেখিল, বড় জোর আর গুটি ১৫/১৬ আম নিম্নে পড়িয়া আছে। ষ্টেশন মাষ্টারবাবু বলিলেন, "তা সাহেব, দিলে দিলে, একটা ঝুড়ি থেকেই সব দিলে কেন? এত ঝুড়ি ত রয়েছে। ভাগাভাগি করে নিলেই ত হ'ত!"

সাহেব বলিল, "এ আমগুলি খুব চমৎকার যে! অন্য ঝুড়ির আম কেমন হইত তাহার ঠিক কি?"

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে।—আর, পাঁচজনের অভিশাপ কুড়ানোর চেয়ে, একজনের অভিশাপই ভাল।"

সাহেব বলিল, "ঝুড়িটা একেবারেই খালি হইয়া গেল। এই খালাসী—লাইন সে থোড়া পাথল উঠাও ত।"

খালাসী পাথর উঠাইয়া ব্রেকভ্যানের উপর রাখিতে লাগিল। অনেকগুলো জমিলে, সাহেবের আদেশ অনুসারে খালাসী উঠিয়া, আমের ঝুড়ি হইতে আমগুলা বাহির করিয়া, পাথর ভরিয়া তাহার উপর আম, তাহার উপর আমপাতা চাপাইয়া দিল। গাড়ী ছাড়িলে সাহেব স্বহস্তে ঝুড়ির মুখ আবার সেলাই করিয়া দিল। গুনছুঁচ দড়ি প্রভৃতি গার্ডসাহেবদের বাক্সেই মজুত থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ট্রেন মোগলসরাই পৌঁছিল।

কাজকর্ম্ম সারিয়া বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে ডিসুজা কেল্‌নারের হোটেলে গিয়া এক পেয়ালা চা হুকুম কবিয়া, রুটিতে মাখন মাখাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

চা পানান্তে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতেছিল, পথে রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিট্যুটের কাছে দুইজন বন্ধু তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। বলিল, "চল, এক হাত পোকর খেলা যাউক।"

ইন্‌ষ্টিট্যুটে 'পানীয়' মিলে, তাহার নগদ দামও দিতে হয় না। ডিসুজা সহজেই সম্মত হইল।

দুই বাজি পোকর খেলিতে ও কয়েকপাত্র হুইস্কি পান করিতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। ডিসুজা তখন বলিল, "বাড়ী যাই—আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।"—বাড়ীতে কেবল ডিসুজার বৃদ্ধা মাতা আছেন।

বাঙ্গলায় পৌঁছিয়া ডিসুজা দেখিল, তাহার মাতা রাগিয়া আগুন হইয়া বসিয়া আছেন। মেঝের উপর আমের একটি ঝুড়ি, আশেপাশে আমপাতা ছড়ান, একস্থানে গুটি ১৫/১৬ আম এবং এক বোঝা পাথরেব টুকরা।

মত্ততার অবস্থায় ডিসুজা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

মিসেস ডিসুজা বলিলেন, "এই যে জন্—কোন ট্রেনে ফিরিলে?"

ডিসুজা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ—বাস্কেট—কোথা হইতে আসিল?"

"মজঃফরপুর হইতে। আজ দ্বিপ্রহরে তোমার হবুশ্বশুরের পত্র পাইলাম, ১৫০টা ভাল ল্যাংড়া আম পাঠাইতেছেন, খুব সম্ভব ১৫ নম্বরে তাহা এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। লিখিয়াছিলেন, রসিদ ডাকে বিলম্ব হইতে পারে, ১৫ নম্বর আসিলে লোক পাঠাইয়া যেন ঝুড়িটা আনাইয়া লই। ট্রেন পৌঁছিবার আধ ঘণ্টা পরেই আমি ষ্টেশনে গিয়া বাস্কেট আনিলাম। আনিয়া খুলিয়া দেখি—আম সব চুরি গিয়াছে, আমের স্থানে পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। দেখ দেখি কাণ্ড। ফিফ্‌টিন আপ-এ গার্ড কে ছিল খবর নাও ত!"

ডিসুজা বলিল, "ফিফ্‌টিন আপ—আমিই ত—লইয়া আসিয়াছি।"

"তুমি?—তুমি তবে এতক্ষণ ছিলে কোথা?—তুমি?—তবে আম কে লইল? বোধ হয় দীঘায়—অথবা বাঁকীপুরে—"

ডিসুজা বলিল—"না—না—ও—ও—আম আ—আ—আমিই খাইয়াছি।"

বৃদ্ধা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পুত্র প্রকৃতিস্থ নাই। বলিলেন, "তুমি খাইয়াছ—এই এক ঝুড়ি আম? অসম্ভব।"

ডিসুজা নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া বলিল, "বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল—তাই খা—খা—খাইয়া ফেলিয়াছি।"

মাতা বলিলেন—"ননসেন্স! একথা [illegible] বলিয়া কোনও ফল নাই। কল্য প্রাতে এসম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করিয়া, ব্যাপারটা উপরওয়ালাদের জানাইতে হইবে। সহজে আমি ছাড়িতেছি না। এতগুলো আম!—রেলের কর্ম্মচারীরা কি চোর! কি পাষণ্ড! ছি ছি ছি।"

[কার্ত্তিক, ১৩২৪]

বাজীকর

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। "ভগবান, আর কষ্ট দিও না।"

লোকটির বয়স ৬০ বৎসরের নিতান্ত কম হইবে না। গালের মাংসগুলি ঝুলিয়া গিয়াছে, চুল ও গোঁফ বিলফুল পাকা, লাঠি ধরিয়া একটু কোঙা হইয়া পথ চলেন। দেহের বর্ণটি এককালে খুব সুন্দর ছিল, এখন মলিন হইয়াছে, স্থানে স্থানে মেছেতা পড়িয়াছে, তথাপি এখনও রাগিলে গাল ও কপাল হইতে লাল আভা ফুটিয়া বাহির হয়। চোখ দুটি বড় বড়, তবে সাদা অংশগুলি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। এককালে ইনি সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।

ইঁহার নাম শ্রীরামরতন বসু—অথবা প্রোফেসার বোস। বাড়ী বরিশাল জেলায়। আজ ৭/৮ দিন হইল রঙ্গপুরে আসিয়াছেন; স্থানীয় টাউন হল ভাড়া লইয়া প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাজিক দেখাইতেছেন। বাজারের নিকট টিনের ছাপ্পরওয়ালা দুইখানি দর্ম্মাঘেরা ঘর ভাড়া লইয়াছেন। একখানিতে রান্না হয়; অপরখানির এক দিকে এক তক্তপোষে তিনি ও তাঁহার সহকারী যুবক, সম্পর্কে ভাগিনেয়, কুলদাচরণ শয়ন করেন। অন্য দিকে আর একখানি তক্তপোষের উপর তাঁহার ম্যাজিকের আসবাব পত্র স্তূপীকৃত—তাহারই প্রান্তভাগে এক হাত চওড়া খালি স্থানটিতে ভৃত্য হরিদাস গুটিশুটি হইয়া কোন মতে রাত্রি যাপন করে। তক্তপোষ দুইখানি জরাজীর্ণ ও ছারপোকা-বহুল, তথাপি তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়।

অপরাহ্ন কাল। ফাল্গুন মাস, কিন্তু এখনও রঙ্গপুরে বেশ শীত আছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া, বালাপোষ গায়ে দিয়া তক্তপোষে বসিয়া বসুজা মহাশয় ধূমপান করিতেছেন—আর, ভাবিতেছেন। বারান্দায় হরিদাস বসিয়া সশব্দে মশলা বাটিতেছে; বামুন ঠাকুর তরকারী কুটিতেছে।

কুলদা গিয়াছে বিজ্ঞাপন বিলি করিতে। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সহরময় সে "অদ্যকার অত্যাশ্চর্য্য" ম্যাজিক খেলার বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া বেড়ায়, গাড়ীর ছাদে ইংরাজি বাজনা বাজিতে থাকে।

রামরতন বসু তামাক খাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন—ভাবিয়া কোনও কূল কিনারা পাইতেছেন না। গৃহে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং দুইটি কুমারী কন্যা। উভয় কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। বড়টির ত বৈশাখ নাগাদ না দিলেই নয়। অন্ততঃ পক্ষে একটি হাজার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

রামরতন যৌবন কালে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া প্রসিদ্ধ বাজীকর ভুরে খাঁ ও চাঁদ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাকরেদী করিয়া ম্যাজিক শিখিয়াছিলেন। তাহার পর গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করেন। কিছু পৈত্রিক জোৎজমি ছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, স্বামীকে একে একে তিনটি কন্যা উপহার দিলেন। সে তিনটির বিবাহ দিতে দিতে জোৎজমিগুলি সমস্তই গেল। উপরন্তু কিছু ঋণও হইল। ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, রামরতন কলিকাতা হইতে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কতক কতক ক্রয় করিয়া আনিলেন। তখন হইতে মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাইতে বাহির হন। এই উপায়ে ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তখন তিন চারিমাস ম্যাজিক দেখাইয়াই সম্বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইদানীং ৫/৭ বৎসর হইতে এ ব্যবসায়ে কিছু মন্দা পড়িয়াছে। লোকে আর ম্যাজিক দেখিতে বড় চাহে না—তাহারা চাহে থিয়েটার কিংবা সার্কাস। সুতরাং এখন বৎসরে ছয় মাসেরও অধিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; কিন্তু বয়স ত দিন দিন কমিতেছে না—বাড়িয়াই

চলিয়াছে। আর সে শক্তি-সামর্থ্য নাই—এ দেশ ও দেশ ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু না করিয়া উপায়ও ত নাই।

রঙ্গপুরে আসিয়া প্রথম দুই একদিন রোজগার মন্দ হয় নাই। দুইদিনে শতাধিক টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইতে মোকর্দ্দমা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কৃষক-শ্রেণীর যে সকল লোক শহরে আসে—স্থানীয় ভদ্রলোকরা যাহাদিগকে "বাহে" বলেন,—তাহারা ঐ দুইদিন অনেকেই চারি আনার টিকিট লইয়া "তম্‌সা" দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু এ তামাসায় কোনও স্ত্রীলোক না থাকায় তাহারা চটিয়া গেল। বলাবলি করিতে লাগিল—"না একটা বিটিছাওয়া, না কিছু, শুধুই পয়সা দিমু—হঃ!"—বিগত পৌষ মাসে এখানে এক সার্কাস কোম্পানি আসিয়াছিল; গোলাপী রঙের গেঞ্জি পরিহিত যুবতীগণের ব্যায়ামলীলা দেখিয়া ইহারা খুব খুশী ছিল; এখন লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের বক্তৃতা ও বুজরুকি তাহাদের পছন্দ হইল না।

প্রতিদিন ঘর ভাড়া, তক্তপোষ ভাড়া, চারিজন লোকের আহারের ব্যয়, বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যয় ও তাহা বিতরণের জন্য গাড়ী ভাড়া, বাজনাওয়ালাদের মজুরি, টাউন হলের ভাড়া ও আলো—খরচ ত বড় সামান্য নয়! লোক না জুটিলে এমনভাবে কয়দিন চলিবে? খরচপত্র কুলাইয়া প্রতিদিন অন্ততঃ ২০/২৫ টাকা উদ্বৃত্ত না থাকিলে, বৈশাখ মাসে কন্যার বিবাহের আশা যে মরীচিকায় পরিণত হয়!—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মনটি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হে ভগবান! আর কষ্ট দিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। ছেলেগুলো ভারি জ্যাঠা হইয়াছে

প্রথমে বাদ্যের, ক্রমে তাহার সহিত ছক্কড়ের চক্রশব্দ শ্রুতিগোচর হইল; কুলদা ফিরিয়া আসিতেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া কুলদা গাড়োয়ান ও বাজনাওয়ালাদের ভাড়া প্রভৃতি মিটাইয়া দিয়া, আগামী কল্য ঠিক দুইটার সময় তাহাদের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই রামরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্কুলে কি রকম হল?"

কুলদা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বড় সুবিধে নয়।"

"কোন্ কোন্ ইস্কুলে গিয়েছিলে?"

"জেলা ইস্কুল, টাউন ইস্কুল, কৈলাসরঞ্জন—তিনটেতেই গিয়েছিলাম। মোট ৫২খানি টিকিট বিক্রি হয়েছে।"

"তিনটে ইস্কুলে কিছু না হবে হাজার বারোশো ছেলে, মোটে ৫২খানি টিকিট বিক্রি! সবই চার আনা বোধ হয়?"

কুলদা বলিল, "না, চার আনাও আছে, আট আনাও আছে।"—বলিতে বলিতে পকেটে হাত দিয়া সে গোটা কয়েক আধুলি ও সিকি বাহির করিয়া তক্তপোষের উপর রাখিল।

রামরতন সেগুলি গণিতে লাগিলেন। কুলদা বলিল, "ছেলেগুলো বলে, ম্যাজিক আর দেখব কি, ও ত আমরাও করতে পারি।"

রামরতন বলিলেন, "হ্যাঁঃ—ভারি ত মুরোদ। কই, কর্ না বেটারা, দেখি। ছেলেগুলোও সব জ্যাঠা হয়ে উঠলো। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, মনে আছে, ম্যাজিক হচ্চে শুনলে ত উন্মত্ত হয়ে উঠতাম। একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। মায়ের বাক্স ভেঙ্গে পয়সা নিয়ে ম্যাজিক দেখতে ছুটতাম। আর আজ ছোঁড়াগুলো বলে কিনা ম্যাজিক আর দেখব কি! হায় রে কলিকাল!"—বলিয়া তিনি উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে রাজপথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কুলদাও বিষণ্ণ মুখে তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা মামা, ইস্কুলের ছেলেদের অর্দ্ধমূল্য করে দিলে হয় না?"

রামরতন বলিলেন, "আসবে কি? যদি বেশী ছেলে আসে ত হাপ প্রাইসে আপত্তি নেই।"

কুলদা বলিল, "হাপ প্রাইস হলে অনেক ছেলে আসে বোধ হয়।"

"আচ্ছা, কাল থেকে না হয় তাই করে দাও। সকালে উঠেই হ্যাণ্ড বিলটি ছাপতে দিয়ে এস।"

কুলদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ছাপাখানায় ২০/২২ টাকা বাকী পড়ে গেছে; তারা বলেছে ধারে আর ছাপাবে না। কাল গোটা পনের টাকাও অন্ততঃ দিতে হবে।"

"দেখি আজ কি রকম হয়।"—বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন বিদ্যালয়ের বালকগণের জন্য টিকিট অর্দ্ধমূল্য করা হইল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না।

তৎপরদিন ঘোষিত হইল—"অদ্য শেষ রজনী! শেষ রজনী!! শেষ রজনী!!! সকলে আসুন, দেখুন, বিস্মিত হউন।" তাহাতে অন্য দিন অপেক্ষা ৫/৭ টাকা মাত্র বেশী পাওয়া গেল।

পরদিন আবার বিজ্ঞাপন বিলি হইল—"বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ মহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে, প্রোফেসর বোস অদ্য তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। অদ্য রজনীতে নূতন নূতন খেলা, নূতন নূতন বিস্ময়, কেহ কখনও দেখেন নাই, শোনেন নাই, স্বপ্নেও ভাবেন না। এই শেষ, এই শেষ।" কিন্তু রঙ্গপুরের ভবী তাহাতেও ভুলিল না।

সেদিন রাত্রে ম্যাজিক হইতে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া রামবতন একখানি ডাকের পত্র পাইলেন। ইহা তাঁহার স্ত্রী লিখিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রী লিখিয়াছেন, ছোট মেয়েটির এগারো দিন জ্বর, ডাক্তার বলিয়াছে বিকারে দাঁড়াইতে পারে; ঘরে একটি পয়সা নাই, পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট কর্জ্জ করিয়া দুই দিন ডাক্তাবের ভিজিট দেওয়া হইয়াছে; অর্থাভাবে চিকিৎসা ও পথ্য দুই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তুমি যদি দিন কতকের জন্য একবার আসিতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যদি নিতান্তই আসিতে না পার তবে অন্ততঃ পঁচিশটি টাকা পত্রপাঠ মাত্র আমায় পাঠাইয়া দিবে, ইহাতে কোনমতে যেন অন্যথা না হয়।"

হরিদাস তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। রামরতন হুঁকা হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মেয়েটা তাঁহার বড় আদরের; তাহার রোগশয্যা যেন চোখের সমুখে দেখিতে লাগিলেন। কল্পনাচক্ষে আদরিণী কন্যার রোগখিন্ন মুখখানি দেখিতে, তাঁহার বাস্তব চক্ষু দুইটিতে জল ভরিয়া আসিল।

কুলদা ম্যাজিকের পোষাক ছাড়িয়া বাহিরে বারান্দার দাঁড়াইয়া গোপনে তামাক খাইতেছিল। ভিতরে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কি হয়েছে?"

রামরতন চিঠিখানি ভাগিনেয়কে পড়িতে দিলেন। ঢিবরীব আলোকে ধরিয়া চিঠি পড়িয়া কুলদা বলিল, "কি করবেন?"

আজিকার টিকিট বিক্রয়ের টাকা লইয়া, তহবিলে মোটে ত্রিশটি টাকা আছে। এখানকার দেনা পাওনা মিটাইতেই তাহা প্রায় শেষ হইয়া যাইবে; চারিজনের রাহাখরচ কুলাইবে না।

রামরতন বলিলেন, "কাল সকালে উঠেই পোষ্ট আপিসে গিয়ে ২৫ টাকা টেলিগ্রাফ মানি অর্ডারে পাঠিয়ে দাও।"

কুলদা বলিল, "পাঠাতেও পাঁচসিকে খরচ। তার পর উপায়?"

রামরতন উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। মাতুলের মাথা খারাপ

পরদিন বেলা ৯টার সময় কুলদা টাকা টেলিগ্রাফ করিয়া পোষ্ট অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মাতুল তক্তপোষে বসিয়া একমনে কি লিখিতেছেন। কাছে গিয়া দেখিল, অদ্যকার বিজ্ঞাপনের জন্য হ্যাণ্ডবিল রচনায় তিনি ব্যস্ত।

লেখা শেষ হইলে কাগজগুলি ভাগিনেয়কে দিয়া রামরতন কহিলেন, "ছাপাখানায় যাও। তুমি বসে থেকে কম্পোজ করিয়ে, দু'হাজার ছাপতে অর্ডার দিয়ে এস। যেন দুটোর মধ্যে পাই।"

কুলদা কাগজখানি পড়িতে পড়িতে বলিল, "কিন্তু আজ তাদের গোটা দশেক টাকা দেবো বলে রেখেছিলাম যে, ছাপতে আবার গোলমাল না করে।"

রামরতন বলিলেন, "তাদের বোলো কাল সকালে তাদের সমস্ত বাকী টাকা চুকিয়ে দোবো, পাইপয়সা বাকী রাখব না।"

কুলদা পুনরায় হ্যাণ্ডবিলের খসড়াখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এটা লিখে ত দিলেন, কিন্তু—কি রকম হবে—কিছু যে বুঝতে পারছিনে! শেষকালে একটা ধাষ্টমো না হয়।"

রামরতন রাগিয়া বলিলেন, "তু-তু তুমি ছাপিয়েই আন না! কি রকম হবে না হবে সে তখন জানতে পারবে। যাও, দেরী কোর না।"

কুলদা চিন্তিত মুখে প্রস্থান করিল। তাহার চিন্তার কারণ এই যে, হ্যাণ্ডবিলে অদ্য শেষতম—নিতান্তই শেষতম রজনীতে যে নূতন ম্যাজিক দেখাইবার কথা ঘোষণা করা হইতেছে, তাহা শুধু দর্শকমণ্ডলীর নহে—কুলদার পর্য্যন্ত অশ্রুতপূর্ব্ব। মাতুল এ ম্যাজিক এতাবৎকাল কোথাও দেখান নাই; এমন কি তিনি প্রসঙ্গক্রমেও কখনও এ ম্যাজিকের উল্লেখ করেন নাই। অপর কোনও ম্যাজিকওয়ালা যে ইহা দেখাইতে পারে তাহা পর্য্যন্ত কস্মিনকালেও শুনে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, মাতুল এরূপ বিজ্ঞাপন কেন দিতেছেন? গতকল্য সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই। খালি ছটফট করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া তামাক খাইয়াছেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহাব মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি, কুলদা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া লোক জড় করিয়া, শেষে ফাঁকি দিলে অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। রঙ্গপুরেব ছাত্রগণ যেরূপ দুর্দ্দান্ত, প্রহার পর্য্যন্ত করিতে পারে!

যাহা হউক, মাতুলের হুকুম কুলদা তামিল করতে গেল।

প্রেসের ম্যানেজারবাবু তখনও আসেন নাই। কম্পোজিটরগণ বিজ্ঞাপনের কপি পড়িয়া কুলদাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হ্যাঁ মশায়, এ কি সত্যি?"

কুলদা গম্ভীরভাবে বলিল, "সত্যি অবশ্য নয়, ইন্দ্রজাল।"

"সে আপনাদের ইন্দ্রজালেই হোক চন্দ্রজাল হোক—এতে যা সব লেখা আছে, আমরা তা চোখে দেখতে পাব ত?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"তবে মশায়, আজকে আমাদের পাস দিতে হচ্চে। আমরা তিনজন কম্পোজিটর, জমাদার, আর ম্যানেজারবাবুও যেতে চাইবেন নিশ্চয়—এই পাঁচজনের পাস লিখে দিয়ে যান।"

"তা দিচ্চি। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলগুলি দুটোর মধ্যে চাই।"

"দুটো কি বলছেন!—একটার মধ্যেই ছাপা হ্যাণ্ডবিল আপনাদের বাসায় আমরা পৌঁছে দেবো। পাসখানা লিখুন।" শেষ রজনী—শেষ রজনী—

অদ্য নিতান্তই শেষ রজনী

বিপরীত ব্যাপার—লোমহর্ষণ কাণ্ড। অদ্য সর্ব্বজন সমক্ষে, প্রোফেসাব বসু একটা জীবন্ত মানুষ ধরিয়া ভক্ষণ করিবেন আবার ইন্দ্রজাল প্রভাবে সর্ব্ব-জনসমক্ষে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিবেন।—ইত্যাদি আহারাদি করিয়া, কুলদা বিজ্ঞাপন লইয়া গাড়ীতে বাহির হইল। রামরতন বাজনাওয়ালাদের বলিয়া দিলেন, "আজ তোরা খুব জোরে জোরে বাজাবি। কাল আমরা চলে যাব—তোদের ভাল করে বখশিস দিয়ে যাব।"

বেলা ২টা হইতে বিকাল ৫টা অবধি সহরময় বিজ্ঞাপনটি বাশি রাশি বিতরিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া সহরময় একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। অন্য দিনের ন্যায় অদ্যও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খেলা আরম্ভ। কিন্তু ছ'টার সময় রামরতন বাসায় বসিয়া সংবাদ পাইলেন, টাউন হলের মাঠে ইতিমধ্যেই লোক জমিতে শুরু হইয়াছে। ভাগিনেয়কে বলিলেন, "ঠাকুরকে বল, চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নিক। রান্না যদি কিছু বাকী থাকে, নামিয়ে রাখুক, ফিরে এসে তখন হবে।"

খেলার সময় টিকিট বিক্রয়ের ভার এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপর। হরিদাস ও কুলদা গেটে বসিয়া থাকে, টিকিট লইয়া শ্রেণী অনুসারে দর্শকগণকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। রামরতন হরিদাসকে বলিলেন, "আমাদের ফাষ্টো কেলাস দু'টাকার টিকিট এক সারি চেয়ার ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর এক টাকার সেকেন কেলাস তিন সারি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা দড়ি খুলে, এই চার সারিই আজ ফাষ্টো কেলাস বানিয়ে দিও। বাকী আর্দ্ধেকে সেকেন কেলাস, থার্ডো কেলাস, ফোর্থো কেলাস—ও কেলাসে দু' তিন সারি বেঞ্চি রেখ মাত্র।"

কুলদা বলিল, "তাতে চার আনার টিকিট বড্ড কমে যাবে যে!"

রামরতন বলিলেন, "তা যাক। গুণতি মতন টিকিট নিয়ে বসবে। এক কেলাসের টিকিট ফুরিয়ে গেলেই, তার উঁচু কেলাসের টিকিট বেচবে।"

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া, জিনিষপত্র ও লোকজন সহ রামবতন রওয়ানা হইলেন। টাউন হলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যা নহে,—মাঠে বিস্তর লোক টিকিটের জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।.বামুন ঠাকুর দ্বারেব কাছে গিয়া টিকিট বিক্রয় করিতে বসিল। কুলদা ও হরিদাস গেটে বসিল। রামরতন ষ্টেজের উপর পর্দ্দার আড়ালে ম্যাজিকের সরঞ্জামগুলি গুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। মনুষ্য-ভোজন

সাড়ে সাতটার সময় পর্দ্দা উঠিলে রামরতন দেখিলেন, হল একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ; প্রথম শ্রেণীর দুই টাকা মূল্যের সমস্ত চেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং পুলিশ সাহেব সস্ত্রীক প্রথম সারির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। অপরাপর শ্রেণীর সমস্ত আসনই পূর্ণ—উভয় পার্শ্বের দেওয়ালের নিকট বিস্তর লোক দণ্ডায়মান। ষ্টেজ হইতেই রামরতন ঝুঁকিয়া, পুলিশ সাহেব ও তদীয় মেমকে ভক্তিভরে সেলাম করিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে তাসের কৌতুক। ষ্টেজ হইতে নামিয়া, প্রথম সারির দর্শকগণের সমক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামরতন তাসক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তাহার পর ভৌতিক ফুলগাছ জন্মানো, দর্শকের ঘড়ি লইয়া চূর্ণীকরণ এবং অবশেষে তাহা অক্ষত অবস্থায় প্রত্যর্পণ, ছড়ির মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রবেশ, কুলদাচরণকে হিপ্নটাইজ করিয়া এবং তাহার চোখ বাঁধিয়া তাহার কর্ত্তৃক দর্শকলিখিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান ইত্যাদি মামুলি খেলাগুলি শেষ হইতে প্রায় ৯টা বাজিল।

অবশেষে রামরতন বলিলেন—

"ভদ্র মহোদয়গণ, এবার আমি একটা নূতন খেলা আপনাদিগকে প্রদর্শন করিব—সেটি জীবন্ত মনুষ্য-ভক্ষণ। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে জনৈক মুসলমান ফকির কর্তৃক ইহা প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই অত্যদ্ভুত ক্রীড়াটি ভারতীয় প্রতিভারই অক্ষয় কীর্ত্তি। পাশ্চাত্য যাদুকরগণ ইহা অবগত নহে—ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়। আমি বহু সাধনায় গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছি। একটি মনুষ্যকে আপনাদের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে আমি সম্পূর্ণ রূপে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব এবং অবশেষে উহাকে অক্ষত দেহে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। দর্শকগণের মধ্যে কে ভক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসুন।"

রামরতন দর্শকমণ্ডলীর উপর তাঁহার সপ্রতীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভামধ্য হইতে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল, তিন মিনিট গেল,—কিন্তু ভক্ষিত হইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না।

রামরতন তখন বলিলেন—"মহাশয়গণ, আপনারা কি ভয় পাইতেছেন? ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি মনুষ্যটিকে আহার করিয়া, আবার তাহাকে বাঁচাইয়া দিব। আপনারা তখন সকলেই দেখিবেন, তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্নমাত্রও নাই। কে আসিবেন, আসুন।"

রামরতন পূর্ণ দুই মিনিট কাল অপেক্ষা করিলেন। সভাস্থলে বহুলোকের চাপা গলায় কথা ও চাপা হাসির শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু কেহই খাদিত হইতে আগ্রহ দেখাইল না।

অবশেষে রামরতন বলিলেন, "আপনারা কি ভয় করিতেছেন যে পাছে আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিতে সমর্থ না হই? সে আশঙ্কা করিবেন না মহাশয়গণ, ইহা নির্দ্দোষ আমোদ মাত্র। আমি যদি খাইয়া আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ত আমি খুনী—খুনের দায়ে পড়িব। স্বয়ং ধর্ম্মাবতার পুলিশ সাহেব বাহাদুর, পুলিশের বড় ইন্‌স্পেক্টরবাবু, স্থানীয় হাকিমগণের মধ্যে অনেকেই আজ দয়া করিয়া এখানে পদধূলি দিয়াছেন দেখিতেছি; যদি আমি মানুষটিকে আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তবে ইঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ঘটিবে না। কোনও ভয় নাই কে আসিবেন আসুন।"

তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বেঞ্চিতে কয়েকজন ছাত্র বসিয়া গোলমাল ও হাসিতামাসা করিতেছিল; তাহার ঠেলিয়া এক বালককে উঠাইয়া দিল। সে উঠিয়া স্টেজের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, সমস্ত দর্শক তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বালক ক্রমে ষ্টেজের পাদদেশে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। রামরতন বলিলেন, "উঠে এস বাবা, উঠে এস। কোনও ভয় নেই তোমার।"

বালকের বয়স পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বর্ষ মাত্র। রঙ্গপুর টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ে, সাহসী বলিয়া সহপাঠী মহলে তাহার খ্যাতি আছে। কিন্তু ষ্টেজের উপর উঠিতে তাহার পা দুটি কাঁপিতে লাগিল।

রামরতন বালককে তাহার গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন, দেহের ঊর্দ্ধভাগ নগ্ন করিয়া বালক দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার বুকটি দুর দুর করিতেছে, মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

রামরতন দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই বালককে ভক্ষণ করি।"—বালকের দিকে চাহিয়া মাথা হেলাইয়া বলিতে লাগিলেন—"বাঃ বাঃ—খাসা নধর দেহ। অনেক দিন মানুষ খাইনি, কচি মাংস বেশ লাগবে খেতে।"—বলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা নিজ ওষ্ঠযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

হলভরা সমস্ত লোক একেবারে নিস্তব্ধ। একটি সূচ পড়িলে তাহার শব্দটুকু শুনা যায়। বালকের একবার ইচ্ছা হইল, সরিয়া পড়ে—কিন্তু লোকলজ্জায় সে তাহা করিতে পারিল না। উভয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কোনমতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামরতন সহসা বালকের স্কন্ধোপরি সজোরে এক কামড় বসাইয়া দিলেন।

"বাপরে—মারে উহুহু"—বালকের এই আর্ত্ত চীৎকারে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। দর্শকগণের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ওকি মশায় ওকে কামড়ালেন কেন?"

রামরতন বলিলেন, "কামড়াব না ত খাব কি করে মশায়? অত বড় মানুষটা ত গপ্ করে গিলে খেতে পারিনে, একটু একটু করে আমায় খেতে হবে ত! সমস্তটা খাব, খেয়ে ইন্দ্রজালের জোরে আবার বাঁচিয়ে দেব।"

ইহা শ্রবণমাত্র, বালক ষ্টেজ হইতে এক লম্ফ দিয়া খোলা দরজায় দণ্ডায়মান প্রহরীকে ঠেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

হলের ভিতর তখন মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ কেহ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"এ কি জচ্চুরি নাকি মশায়? ইন্দ্রজালের প্রভাবে খাবেন ত কামড় দিলেন কেন? সব বুঝি ফাঁকি?"

রামরতন দেখিলেন, হলের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পুলিশ সাহেব ও তাঁহার মেম মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। রামরতন কহিলেন, "কেন মশায়, ফাঁকিটা আমি কি দিলাম? বিজ্ঞাপন পড়ে দেখুন, ইন্দ্রজাল প্রভাবে খাব বলিনি, ইন্দ্রজাল প্রভাবে বাঁচিয়ে দেবো বলেছি। আগে খাই, তবে ত বাঁচাব। যাব ইচ্ছে হয় আসুন না, বিজ্ঞাপনে যে খেলা দেখাব বলেছি তাই দেখাচ্ছি।"

দর্শকগণ উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, "থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে, আর খেলা দেখাতে হবে না। আমরা তোমায় কি রকম খেলা দেখাই তা দেখ। হল থেকে বেরোও দিকিন একবার জোচ্চর কাঁহেকা।"

রামরতন ক্রন্দনের মত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ তোমরা আমায় মারবে নাকি? কেন, আমি কি দোষ করেছি? (যোড়হস্তে পুলিশ সাহেবের পানে চাহিয়া) দোহাই গবর্ণমেণ্টের, দোহাই ইংরেজ বাহাদুরের—আমি নির্দ্দোষী। তোমরা আমার হ্যাণ্ডবিল পড়ে দেখ, আমি কি জচ্চুরি করেছি?"

পুলিশ সাহেব তাঁহার মেমকে হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছিলেন, রামবতনের ক্রন্দন ও দোহাই শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এ বুঢ়া টুমি ভয় করিও না। কেহ টোমায় মারিটে পারিবে না। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) বাবুলোগ, টোমরা সব চুপচাপ আপন আপন গৃহে গমন কর। বে-আইন জনটা করিলে গ্রেফ্‌টার হইবে।"

অতঃপর দর্শকগণ গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া বাহির হইতে লাগিল। পুলিশ সাহেব চুরুট মুখে করিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হল খালি হইয়া গেলে, রামরতন ষ্টেজ হইতে নামিয়া পুলিশ সাহেব ও তাঁর মেমকে দুই দীর্ঘ সেলাম করিয়া, করযোড়ে বলিলেন, "আজ হুজুর ছিলেন বলেই অধীনের প্রাণ বাঁচলো। আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে যদি দয়া করে দুজন কনস্টেবল হুকুম করে দেন তবে ভাল হয়; কি জানি রাস্তায় যদি—"

পুলিশ সাহেব রামরতনের স্কন্ধে মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"টুমি বড় শয়তান আছ—A downright scoundrel! পুলিশের উপযুক্ট লোক। টোমার বয়স কম হইলে, আমি টোমায় পুলিশে ডারোগা কার্য্য দিট। এখন গৃহে যাও—কল্য প্রাটেই টুমি রঙ্গপুর পরিট্যাগ করিয়া যাইবে।"—মেমসাহেবও হাসিতেছিলেন।

পুলিশ সাহেবের হুকুম অনুসারে তথায় উপস্থিত দুইজন কনস্টেবল রামরতনকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

পরদিন পাওনাদারগণের প্রাপ্য নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়া, বাকী টাকার রাশি পুটলি বাঁধিয়া লইয়া রামরতন রঙ্গপুরের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরকৃপায় মেয়েটির পীড়ার অনেকটা উপশম হইয়াছে। [পৌষ, ১৩২৪]

গহনার বাক্স

ছিন্ন পুরাতন কালো সার্জ্জের চাপকানের উপর পাকানো দড়ির মত চাদর ঝুলাইয়া, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক শীতসন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আলিপুর হইতে খিদিরপুরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। লোকটির বয়স ৪০ পার হইয়াছে; রংটি ফর্সা, গোঁফগুলি বড় বড়, দাড়ি কামানো, দেহখানি কৃশ ও দুর্ব্বল, চক্ষু দুইটি কোটরগত। ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন—যেন বড় ক্লান্ত, বড় পথশ্রান্ত। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম ছুটিয়া আসিতেছে, বাবুটি পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। দুর্ব্বৃত্ত মোটর গাড়ী, গভীর গর্জ্জনে পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাবুটির পরমায়ু থাকায় সে চেষ্টায় বিফল হইয়া, প্রচুর ধূলায় তাঁহার মলিন বেশ মলিনতর করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাবুটি খিদিরপুর গির্জ্জার কাছাকাছি আসিতেই পথপার্শ্বস্থ গ্যাসলণ্ঠন প্রজ্জ্বলিত হইল। পুলের সম্মুখে চৌরাস্তায় পৌঁছিতেই খববের কাগজের খোট্টা ফিরিওয়ালারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"নায়েক—বাবু নায়েক। পাঁচ কৌড়ি বাবু গাঁজা খেয়ে ভারি গালাগালি দিয়েচে। আজকার বাস্‌সুমতী—বিষোম কাণ্ড হল বাবু—বাস্‌সুমতী"—ইত্যাদি। তাহাদের প্রতি নীরব উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, মোড় ঘুরিয়া পদ্মপুকুরের রাস্তা ধরিয়া পাঁচ সাত মিনিট পরেই বাবুটি একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলেন। দ্বারপার্শ্বে জীর্ণ বিবর্ণ কাষ্ঠফলকে লিখিত রহিয়াছে, "শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম-এ, বি-এ, উকীল জজকোর্ট, আলিপুর।"

হাঁ—ইনিই সতীশচন্দ্র বসু,—এবং আকার প্রকার দেখিলে হঠাৎ বিশ্বাস হওয়া কঠিন হইলেও, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, এম-এ, বি-এল উপাধিধারী। আজ দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ আলিপুরে ওকালতী করিতেছেন, তথাপি ছয়টি মাত্র পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্রামে না আসিয়া, সারাদিন আদালতে হত্যা দিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইযাও, এই দেড় মাইল পথ পদব্রজেই আসিয়াছেন—এবং নিত্য আসিয়া থাকেন। ছয়টি পয়সা অর্দ্ধসের চাউলের দাম, দুই বেলা তাহাতে একজনের আহার হয়; জমিলে মাসান্তে একজোড়া বস্ত্র কেনা চলে;—ছয়টি পয়সা সতীশবাবুর ফেলিয়া দিয়ার জিনিষ নহে।

ঝি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিয়াই দুই পাশে দুইটি বৈঠকখানা;—একটি সতীশবাবুর আপিস, অপরটি তাঁহার পুত্র বিমলকুমারের পড়িবার ঘর; বন্ধু-বান্ধব আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলে এই ঘরে শয়নের ব্যবস্থাও আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গণ—তাহার তিন পাশে বারান্দা। একটি বাবান্দার কোণে সিঁড়ি—তাহার মুখে একটি কেরোসিনের টিবরী জ্বলিতেছে। সতীশবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিযা শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বহি কাগজ ছড়ান, মাঝখানে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সমস্তটা কাঠের একখানি চেয়ার তাহার সম্মুখে।

রামটহল রামটহল বলিয়া সতীশবাবু ভৃত্যকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। চেয়ারে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার পত্নী সরমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান যুগের "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ" ও "নারী-অধিকার" তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায়, সরমা স্বামীর জুতা খুলিয়া লইলেন, চটিজুতা পরাইয়া দিলেন। সতীশ্ তখন উঠিয়া চাপকানের পকেট হইতে অদ্যকার উপার্জ্জন চারিটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীর হস্তে দিয়া, চাপকান কামিজ ও গেঞ্জি একে একে পরিত্যাগ করিলেন। সরমা টাকা চারিটি টেবিলের উপর রাখিয়া, স্বামী-পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি আলনায় ঝুলাইয়া তাঁহার ধুতিখানি আনিয়া দিলেন। চারিটি টাকা বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি হাত-মুখ ধুয়ে ফেল, আমি জলখাবার নিয়ে আসি।"

সতীশ বলিলেন, "মনোরমা কোথা?"—মনোরমা তাঁহার কন্যার নাম।

"রান্নাঘরে রুটি বেলছে।" "বিমল?"

"গড়েব মাঠে খেলা দেখতে গেছে, এখনও ফেরেনি।"

দেওয়ালে ঘড়ির পানে চাহিয়া সতীশ দেখিলেন, প্রায় ছয়টা। "এখনও ফেরেনি!"—বলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একটি রেকাবীতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও দুইটি ক্ষুদ্র রসগোল্লা আনিয়া সরমা টেবিলের উপর রাখিলেন। জানালার উপর সোরাই-ভবা জল ছিল, এক গেলাস জল ঢালিয়া আনিলেন।

জলযোগ করিতে করিতে সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের সারাদিনের খবর কি বল।"

সরমা বলিলেন, "আজ সেই ঘট্‌কী এসেছিল। একটি পাত্রের সন্ধান দিয়ে গেল।"

"কি রকম পাত্র?"

"ছেলে বি-এ পড়ছে। বাপ মুঙ্গেরের সবজজ। নাম-টাম সব লিখে দিয়ে গেছে।"—বলিয়া সরমা আঁচল হইতে খুলিয়া এক টুকরো কাগজ স্বামীর হস্তে দিলেন।

সতীশবাবু পড়িয়া বলিলেন, "ছেলে বি-এ পড়ছে, বাপ সবজজ—এ হাতী কেনবার ক্ষমতা কি আমার হবে?"

সরমা বলিলেন, "ছেলে নাকি বলেছে, মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তবে টাকাকড়ির জন্যে আটকাবে না। তার বাপ মা খুব ভাল লোক, বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগাব করার মৎলব তাঁদের মোটেই নেই।"

"ছেলে বলেছে, তার বন্ধুরা প্রথমে এসে দেখবে। মেয়ে আমি যদি পছন্দ কবি, তা হলে বাপকে আমাদের চিঠি লিখতে হবে।"

সতীশবাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মেয়ে দেখুক এসে। আমার মনোরমাকে অপছন্দ বোধ হয় হবে না।"

বিমলকুমার এই সময় আসিয়া পৌঁছিল। ছেলেটির বয়স পঞ্চদশ বর্ষ—হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়। ফুটবল ম্যাচে কোন্ পক্ষ কিরূপ নিপুণতার সহিত বিপক্ষকে 'গোল' দিয়াছে, তাহারই বিবরণ উচ্ছ্বসিত স্বরে পিতাব নিকট সে ব্যক্ত করিতে লাগিল। মনোরমাও রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ময়দা-হাত ধুইয়া ফেলিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিমুখে বিস্ফারিত নেত্রে দাদার গল্প শুনিতে লাগিল। মেয়েটি সুন্দরী; ইহাকে দেখিয়া যে বর অপছন্দ করিবে, ডানাকাটা পরী ভিন্ন আর কেহই তাহার কৌমার্য্য ঘুচাইতে পারিবে না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল, পাশের ঘরে মেঝের উপর শতরঞ্চের মধ্যভাগে সতীশবাবু বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছেন—তাঁহার একদিকে বিমল, অপর দিকে মনোরমা বসিয়া নিজ নিজ পাঠ অভ্যাসে নিযুক্ত। সতীশবাবু প্রতিদিন দুই ঘণ্টা কাল এইরূপে পুত্রকন্যা দুইটিকে পড়াইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পটলডাঙ্গার কোনও ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে আজ প্রাতঃকাল হইতে তিনটি তরুণ বয়স্ক বন্ধুতে মিলিয়া গোপন পরামর্শের ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে। শচীন্দ্র (পূর্ব্বোক্ত সবজজবাবুর পুত্র) বলিতেছে, "না ভাই, সে আমি পারব না—তোমরাই যাও।"

ক্ষিতীশ বলিতেছে, "কেন, তোর ভয়টা কিসের? এমন নার্ভাস হলে চলবে কেন?"

নির্ম্মল বলিতেছে, "না না, তুমিও চল হে শচীন। তারা কি তোমাকে কোনও দিন দেখেছে যে চিনতে পারবে?"

ব্যাপারটা এই ঘট্‌কী প্রমুখাৎ সতীশবাবুকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, আজ রবিবার অপরাহ্নকালে বরের দুইজন বন্ধু খিদিরপুরে গিয়া কন্যা দেখিবেন। সতীশবাবুও সম্মতি

জানাইয়াছেন। বরের আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু ক্ষিতীশ এবং নব্যকবি ও ললনাসৌন্দর্য্যের বিশেষজ্ঞ নির্ম্মল গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিবে, এইরূপ পরামর্শই ছিল। আজ ক্ষিতীশ প্রস্তাব করিয়াছে, স্বয়ং বরও নিজের বন্ধু সাজিয়া এই কমিশনের মেম্বর হইলে মন্দ হয় না—নির্ম্মলও উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। বলা বাহুল্য পরামর্শ এই তিনটি বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ— মেসের আর কেহ এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

শচীন্দ্র বলিল, "তোমরা দুজনে যাচ্চ যাও আমাকে আবার টান কেন? কথায় বার্ত্তায় যদি কোনও রকমে টের পেয়ে যায় যে আমিই বর! বিশেষ বর যাবে, সে কথা তাদের ত বলে পাঠান হয়নি—বরের দুজন বন্ধু যাবে, এই কথাই বলা হয়েছে।"

ক্ষিতীশ বলিল, "না হয় দুজনের জায়গায় তিনজন বন্ধুই হল, তাতে আর আপত্তি কি? অধিকন্তু ন দোষায় হুঁকোর জল ছাড়া। কথাবার্ত্তা যা ক'বার আমরাই কইব। তুই শুধু চুপ করে বসে থাকবি, আর চোখ দুটো দিয়ে বেশ করে দেখে নিবি। তোর জিনিষ, তুই ভাল করে দেখে নিবিনে হতভাগা? এ কি কলেজে প্রেজেন্ট হওয়া যে প্রক্সি দিয়ে কাজ চলে যাবে? কি বল নির্ম্মল?"

নির্ম্মল বলিল, "ঠিক ত।"

শচীন্দ্র বলিল, "আচ্ছা বন্ধু সেজেই না হয় গেলাম। কিন্তু হঠাৎ যদি নাম জিজ্ঞাসা করে বসে?"

ক্ষিতীশ বলিল, "পাগল! সে কি একটা অজবুক মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত যে নাম ধাম 'ব্যাতন' সব জিজ্ঞাসা করবে?—সে একজন এম-এ, বি-এল!"

আরও কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর শচীন রাজি হইল। সাজগোজ করিয়া বেলা তিনটের সময় বাহির হইয়া তিন বন্ধু ট্রামযোগে ধর্ম্মতলায় গেল। তথা হইতে যাতায়াতের ভাড়া করিয়া একখানি রবার দেওয়া ফেটন গাড়ী লইয়া, বেলা চারিটের সময় খিদিরপুরে সতীশবাবুর বাড়ী পৌঁছিল।

সতীশবাবু প্রস্তুত হইয়া আপিসঘরে বসিয়া ছিলেন, গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র বাহিরে আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া যুবকত্রয়কে নামাইয়া লইলেন। বিমল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ছুটিয়া উপরে খবর দিতে গেল।

ইহাদিগকে লইয়া সতীশবাবু আপিসঘরে প্রবেশ করিলেন। একখানি টেবিলের ধারে একখানি মাত্র চেয়ার। পাশে লম্বা চৌড়া তক্তপোষের উপর জাজিম বিছানো—তাহার উপর গুটিকয়েক তাকিয়া বালিস। সতীশবাবু নিজে সেই তক্তপোষের উপর বসিয়া, যুবকগণকেও তথায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলও আসিয়া পিতার নিকট বসিল।

বর্ত্তমানকালে বরপণপ্রথা সম্বন্ধে সতীশবাবু আলোচনা উত্থাপন করিলেন। দেখিলেন, যুবকগণের অভিমত যে, এ প্রথা একান্ত অভদ্র, নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত। সতীশবাবু কাহারও নাম জানিতে চাহিলেন না বটে, তবে কে কি পড়ে এবং কোথায় থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বরেরা কয় ভাই, কোন্ কোন্ পরীক্ষা কোন্ ডিবিজনে সে পাস করিয়াছে, তাহার স্বাস্থ্য কেমন—এ সকল সংবাদও লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সতীশবাবু বলিলেন, "আপনারা একটু বসুন—আমি আসছি।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

বিমলকে লইয়া তিনি উঠিয়া গেলেই ক্ষিতীশ বলিল, "বোধ হয় মেয়ে আনতে গেলেন, নয়?"

নির্ম্মল বলিল, "নিশ্চয়। ভাইটির চেহারা দেখে ত মনে হয়, বোনটি মনোনীত হলেও হতে পারে।

শচীন অনুচ্চস্বরে হাসিয়া বলিল, "মনোনীত হবার কথা বলছ, বোনটি কি কবিতা?"

নির্ম্মল বলিল, "দেখি, তোমার ভাগ্যে কি রকম কবিতা যোটে।"

কয়েক মিনিট পরে ঝুম্‌ঝুম্ মলের আওয়াজ আসিল। যুবকত্রয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে পরস্পরের পানে চাহিল। সতীশবাবু কন্যা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মনোবমা একখানি জড়ি-পাড় খয়ের-রঙের শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে সেই রঙের একটি রেশমী জ্যাকেট, হাতে চারিগাছি করিয়া আটগাছি হরতন-চিড়িতন চুড়ি মাথায় একটি পালিসপাত চিরুণী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রজাপ্রতি-কাঁটা। টেবিলের কাছে যে একখানি মাত্র চেয়ার ছিল, কন্যাকে সতীশবাবু তাহাতেই বসাইয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে।"—মেয়ে নতনেত্রে চেয়ারে বসিয়া, যুবকগণকে একটি নমস্কার করিল।

ক্ষিতীশ ও নির্ম্মল উভয়েই আশা করিতেছে, অপর জন মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিবে। নির্ম্মলকে বাঙবিমূঢ় দেখিযা শেষে ক্ষিতীশচন্দ্রই বলিল, "তোমার নামটি কি?"

মেয়েটি চক্ষু না তুলিযাই বলিল, "মনোরমা।"

"কি পড়?"

"এখন গ্রিম্‌স ফেয়ারি টেলস্ পড়ছি।"

যুবকগণ মনে ভাবিতেছিল, বালিকা 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চারুপাঠ'—বড় জোর 'সীতার বনবাস' অথবা "মেঘনাদবধ' পড়ে বলিবে। সুতরাং পুস্তকের নামে ও উচ্চারণেব বিশুদ্ধতায় তাহার একটু চমকিত হইল; খুশীও হইল। নির্ম্মল এইবার কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ স্কুলে পড়?"

"স্কুলে পড়ি না, বাবাব কাছে পড়ি।"

"বাঙ্গলা কতদূর পড়েছ?"

সতীশবাবু বলিলেন, "বাঙ্গলা সমস্ত ভাল ভাল বই-ই ও পড়েছে।"

নির্ম্মল মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ববিবাবুর কাব্য পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"কোনও কবিতা মুখস্থ বলতে পাব?"

মনোরমা অবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার পিতা বলিলেন, "রবিবাবুর অনেক কবিতাই ওর মুখস্থ। বল ত মা একটা—এঁদের শুনিয়ে দাও।"

মনোরমা মৃদুস্বরে গলা ঝাড়িয়া ধীবে ধীবে বলিতে লাগিল—

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী

হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করিযা নীরব হইল।

ক্ষিতীশ বলিল, "বাঃ—সুন্দর। লেখাপড়া ত বেশ ভালই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রান্নাবান্না কিছু শেখা হয়েছে কি?"

মনোরমা মস্তকসঙ্কেতে জানাইল যে তাহাও হইয়াছে।

সতীশবাবু বলিলেন, "সে বিষয়েও আমাব মেয়ের খুঁৎ পাবেন না। ঘরের কাজকর্ম্ম, রান্নাবান্না—সবই মা আমার শিখে নিয়েছেন। দু'দিন বামুন পালালে বাজারের খাবাব আনতে হবে না—মোটামুটি ডালভাত-তরকারী রেঁধে বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে দিতে পারবেন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "বেশ বেশ। এইটি শুনে সবচেয়ে খুশী হলাম সতীশবাবু। নির্ম্মল, তুমি রাগ করোনা ভাই, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে পারার চেয়ে, অসময়ে বাড়ীর লোকের উপবাস নিবারণ করতে পারা অল্প বাহাদুরী নয়।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

সতীশবাবু বলিলেন, "তা ঠিক। আর কিছু যদি জিজ্ঞাসা করতে চান, তাও করুন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। দেখে শুনে আমরা খুবই খুশী হয়েছি সতীশবাবু, আর এখন এঁকে কষ্ট দেব না।"

"আচ্ছা, একটু বসুন তবে।"—বলিয়া সতীশবাবু কন্যা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সতীশবাবু অদৃশ্য হইবামাত্র ক্ষিতীশ শচীনকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "কি রে, পছন্দ হল?" শচীন বলিল, "তোমাদের কি মত, তাই আগে শুনি।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আমার ত ভালই লাগল।"

নির্ম্মল ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মেয়েটি সুন্দরী, তবে পরী বলা যায় না।"

শচীন বলিল, "আমার বেশ লাগলো। পরী-ফরীতে আমার দরকার নেই ভাই।"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল, "কিরে সত্যি বলছিস?"

শচীন বলিল, "খুব সত্যি। নির্ম্মল, তুমি কোনও গোলমাল তুলো না ভাই। একেই আমি বিয়ে করব।"

নির্ম্মল বলিল, "পরী না হোক, মেয়েটি সুন্দরী এ কথা ত আগেই বলেছি। রঙটি একেবারে গোলাপ ফুলের মত নয় বটে—কিন্তু সে আর বাঙ্গালীর ঘরে কোথা পাবে? সে চাইলে, পার্সী কি আর্ম্মাণী মেয়ে খুঁজতে হয়। সংস্কৃতে যাকে বলে গৌরী, এ মেয়ে তা বটে। মুখে, চোখে, গড়নেও তেমন কোন খুঁৎ নেই। তা, একে তুমি বিয়ে করতে পার শচীন।"

শচীন বলিল, "ইচ্ছে ত তাই। কপালে এখন ফস্কে না যায়, সেইটি তোমরা দেখো দাদা।"

সরমা স্বামীকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলে? পছন্দ হল? কি কি সব জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করলে?"

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "খুবই জেরা করেছে—যেন এক একটি কৌঁসুলি বসে গেছেন!—কেবল একটি ছেলে ছিল, নিতান্ত ভালমানুষ। আর দুটো—জ্যেষ্ঠতাত! পছন্দ ত হয়েছে বলেই বোধ হল। জল-টল খাবার ঠিক আছে ত?"

"আছে; পাশের ঘরে সব সাজিয়ে রেখেছি। নিয়ে এস তাদের।"

জলযোগান্তে, গাড়ীতে উঠিবার সময় ক্ষিতীশ বলিল, "সতীশবাবু, এক মিনিট একটা কথা আছে; একটু এই দিকে আসুন।"

সতীশবাবু বলিলেন, "রাস্তায় কেন? ঘরেই আসুন তা হলে—ওঁবা গাড়ীতে বসুন একটু।"

বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ক্ষিতীশ চুপি চুপি বলিল, "মেয়ে বরেব পছন্দ হয়েছে।"

সতীশবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হয়েছে? কি করে জানলেন?"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল, "ঐ যিনি চুপচাপ বসে ছিলেন, তিনিই বর। ওঁর বাপের ঠিকানা এই নিন, তাঁকে আপনি চিঠি লিখুন। তবে, আমরা যে ঘট্‌কী পাঠিয়েছিলাম, দেখতে এসেছি, এসব কথাগুলো কাইণ্ডলি গোপন রাখবেন। আপনি যেন কারু কাছে খবর পেয়েছেন যে অমুক বাবুর বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে সে কলকাতায় পড়ে, এই খবর পেয়েই যেন আপনি লিখছেন—বুঝলেন?"

সতীশবাবু বলিলেন, "আচ্ছা বাবাজী বস বস—চিঠি আমি কালই লিখব—আর, এ সব কথা প্রকাশও করব না। কিন্তু সবজজ বাবু যদি অনেক টাকা হেঁকে বসেন, তা হলে কি হবে? আমি ওকালতি করি বটে, কিন্তু অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ বাবাজী—কোনও রকমে দিন গুজরান করি। বেশী টাকা আমি কোথা পাব?"

ক্ষিতীশ বলিল, "সে জন্যে আপনি ভাববেন না। সে ঠিক করে নেওয়া যাবে এখন। শচীনের বাপ মহেন্দ্রবাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি কিনা; একজন উঁচুদরের লোক তিনি। জ্যেঠাইমাও খুব ভাল। এ বিয়ে যাতে হয় সে আমরা করব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কাছে আর গোপন করে কি হবে—আপনার মেয়েকে, আমাদের শচীনের ভা-রী পছন্দ হয়েছে।"

"আচ্ছা, কালই আমি চিঠি লিখব।"—বলিয়া সতীশবাবু বাহিরে আসিয়া ক্ষিতীশকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। "নিতান্ত ভালমানুষ" ছেলেটিব প্রতি পূর্ব্বে তিনি ততটা নজর করেন নাই—এইবার উত্তমরূপে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সতীশবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিজের প্রতি স্থাপিত জানিয়া বিব্রত হইয়া শচীন্দ্র মাথা হেঁট করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালব্যাজ না করিয়া সেই রাত্রেই সতীশবাবু বরের পিতাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। শচীনকে তাঁহারও ভারী পছন্দ হইয়াছে; ছেলেটি যেমন শিষ্ট শান্ত, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান। সরমা বলিতে লাগিলেন, "এমন পাত্রটি মনোর ভাগ্যে কি হবে!"

চতুর্থ দিনে মুঙ্গের হইতে পত্রোত্তব আসিল। সবজজ মহেন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই মাঘমাসেই শচীন বাবাজীবনের বিবাহ দেওয়া আমার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ ইচ্ছা—কারণ আগামী বৎসর বাবাজীবনের এগ্‌জামিনের তাড়া আছে এবং এগ্‌জামিন শেষ হইলে তাহার যোড়া বৎসর পড়িবে। কিন্তু প্রথমে মেয়েটি দেখা আবশ্যক। দুই একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে গিয়া আপনার কন্যাটিকে দেখিয়া আসিবার জন্য বাবাজীবনকে অদ্য পত্র লিখিলাম। মেয়েটি যদি পছন্দ হয় এবং অন্যান্য বিষয়ও যদি মনঃপূত হয, তবে মাঘমাসেই বিবাহ হইতে পারিবে।"

পত্র পাঁড়য়া সরমা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজীবন যে রাম না হতেই রামায়ণ সেরে বসে আছেন তা ত কর্ত্তার খবর নেই। অন্যান্য বিষয়টা কি?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঐ অন্যান্য বিষয় নিয়েই ত যত গোল! ওর মানে, 'দরে যদি পটে'—এই আর কি!"

পত্র লিখিয়া, রবিবারে শচীন ও ক্ষিতীশকে সতীশবাবু নিমন্ত্রণ কবিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে চিঠি দেখাইলেন।

ক্ষিতীশ বলিল, "মেয়েটিকে আর একবাব তাহলে দেখান। দেখে, এইখানে বসেই চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

সতীশবাবু অন্দরে গেলেন। গৃহিণী আপত্তি করিতে লাগিলেন, "এই স্নান করেছে, এখনও চুল শুকোয়নি, বাঁধা হয়নি—এখন দেখাব কি করে?"

সতীশ ফিরিয়া আসিয়া ইহাদিগর্কে বলিলেন, "তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করে নাও, ও-বেলা দেখো এখন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আজ্ঞে সে কি হয়? এক ঘণ্টার বেশী ত আমরা থাকতে পারব না। কেন, এখন দেখাতে বাধা কি?"

সতীশবাবু গুঁইগাঁই করিয়া অবশেষে বাধা কি তাহা প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া ক্ষিতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "নেইবা চুল বাঁধা হল—তাতে হয়েছে কি?—হা হা হা! খোলা চুল দেখলামই বা। আপনিও যেমন! ওসব ফর্ম্মালিটি আমরা মানিটানিনে। নিয়ে আসুন—জষ্ট্ অ্যাজ্ সি ইজ্। আসল কথা কি জানেন সতীশবাবু, জ্যেঠামশায়কে এই যে চিঠি লিখব, "আসিলাম, দেখিলাম'—এ কথাগুলো মিথ্যে না হয়ে যায়।"

সতীশবাবু মনে মনে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ-তাত!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা; বসুন নিয়ে আসি।"

সতীশবাবু যাইবামাত্র ক্ষিতীশ তাহার বন্ধুকে ঠেলিয়া বলিল, "আর একবার দেখবার জন্যে মরছিলি দম ফেটে—কেমন ফাঁকি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্চি তোকে! দে হতভাগা, সন্দেশ খাইয়ে দে।"

মেয়ে দেখা হইল। আহারের পরে সেইখানে বসিয়াই ক্ষিতীশ মুঙ্গেরে পত্র লিখিয়া, বন্ধুসহ বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিনে আবার মুঙ্গের হইতে পত্র আসিল। সবজজ বাবু লিখিয়াছেন, মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, এখন অন্যান্য বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। সতীশবাবু যদি আগামী শনিবার লুপ মেলে রওনা হইয়া মুঙ্গেরে একবার পদধূলি দেন, তবে রবিবার সে সব কথা আলোচনা করিয়া, ঐ দিনই বৈকালের ট্রেনে তথা হইতে আবার তিনি ফিরিতে পারিবেন।

মনে মনে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সতীশবাবু মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

সোমবার প্রাতে সতীশবাবু যখন মুঙ্গের হইতে বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে—এবং তাহা কেবল গাড়ীর কষ্টের জন্যই নহে।

অনেক কাকুতি মিনতি ও কষামাজা করিয়া দর দাঁড়াইয়াছে—অলঙ্কার ও বরাভরণ প্রভৃতি ২০০০ টাকার এবং ৫০১ টাকা নগদ। নিজেদের খরচের জন্যও অন্ততঃ ৫০০ টাকা ধরিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং একুনে তিন হাজার।

সরমা শুনিয়া বলিলেন, "তা, আজকালের বাজারে এর কমে অমন ঘর বর আর কোথায় পাওয়া যাবে! তুমি কি বলে এলে?"

সতীশবাবু বলিলেন, "বলেছি, বাড়ী গিয়ে পরামর্শ করে, যেমন হয় আপনাকে জানাব। তিনি বললেন, বেশী দেরী করবেন না,—আরও দুই এক জায়গায় কথাবার্ত্তা হচ্চে, মাঘমাসেই শুভকর্ম্মটি শেষ করতে চাই।"

দুই তিন দিন ধরিয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক পরামর্শ হইল।

সরমার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে পাঁচশত টাকার একখানি কোম্পানির কাগজ দিয়াছিলেন, সেখান আছে; অলঙ্কার যাহা আছে তাহা বেচিলে হাজার দেড়েক টাকা হইতে পারে। বাকী থাকে হাজার টাকা। তা, এত বন্ধুবান্ধব রহিয়াছে, হাজারখানেক টাকা ঋণ সংগ্রহ কি অসম্ভব হইবে?

সতীশ বলিলেন, "এতদিনে একখানি গহনা তোমায় দিতে পারলাম না,—যা দু'চারখানা আছে তাও বেচে ফেলব?"

সরমা বলিলেন, "তা হোক। তুমি বেঁচে থাকলে আমার অনেক গহনা হবে। আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয় ঐ একটা মেয়ে, মনের মতন পাত্রটি যদি পাওয়াই গেল তবে তাকে হাতছাড়া করে কাজ নেই। তুমি চিঠি লিখে দাও যে ঐতেই আমরা রাজি—এদিকে টাকার চেষ্টায় থাক। মাঘমাসে বিয়ে, এখনও ত দেরী আছে!"

সতীশবাবু সেইরূপই পত্র লিখিয়া দিলেন। মহেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, সম্মুখে বড়দিনের ছুটি, সেই ছুটির সহিত যোগ করিয়া তিনি আরও এক মাস ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছেন। সপরিবারে তিনি কলিকাতায় পৌঁছিলে বিবাহের দিন স্থির, পাকাদেখা প্রভৃতি হইবে। বাড়ীভাড়া করিবার জন্য পুত্রকে পত্র লিখিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন ধরিয়া বন্ধুবান্ধবগণের নিকট অনেক হাঁটাহাঁটি করিয়া, মাত্র দুইশত টাকা ঋণ সংগ্রহ হইল। এখনও বিস্তর বাকী। উপকার করিতে পারে এমত বন্ধুবান্ধব কলিকাতায় আর কেহ নাই—এখন একমাত্র ভরসা হেমন্ত দাদা। তিনি সতীশের মামাতো ভাই, বর্দ্ধমানে ওকালতী করেন, উপার্জ্জনও মন্দ নহে। গুজব, তিনি নাকি বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন। একটু কৃতজ্ঞতার দাবীও ছিল—সতীশের পিতাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। সতীশবাবু নিজের দায় জানাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন—টাকাটা পাইলেন, মাসে মাসে ২৫ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন এমন আভাসও দিলেন। হেমন্তবাবু লিখিলেন—"বড়দিনের বন্ধের মধ্যে একদিন আসিও, কতদূর কি করিতে পারি দেখি—তবে আমারও সময় ভাল যাইতেছে না।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিনই এখন কন্যাবিবাহের জল্পনা-কল্পনা চলে। মহেন্দ্রবাবু গহনার ফৰ্দ্দ যাহা দিয়াছেন, তাহার দুইখানি মাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারের অনুরূপ—তবে সেগুলি কনে-গহনা নহে, ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারি। গৃহিণী বলিলেন, "তা হোক, ও আর ভেঙ্গে কাজ নেই, রঙ করিয়ে নিলেই নতুনের মত দেখাবে। দু'ভরি বেশী আছে তা থাকুক; পরকে ত দিচ্ছি নে—নিজেব মেয়ে জামাইকেই ত দিচ্ছি।"—বাকীগুলি ভাঙ্গিতে হইবে। স্যাকরা বলিয়াছে, বিবাহের দিন পনেরো আগে পাইলেই সময়মত সে সমস্তই ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।—দেশ হইতে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আনিতে হইবে, সে পরামর্শও চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িল। ক্ষিতীশ ইতিমধ্যে একদিন আসিয়াছিল। সে বলিল, জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ অনুসারে দুইমাসের জন্য বউবাজারে তাঁহার জন্য বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

যেদিন কাছারি বন্ধ হইল, তাহার পরদিনই সতীশবাবু অর্থ সংগ্রহ করিতে বৰ্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। গিয়া দেখিলেন হেমন্ত দাদার মনটা কিছু ভার-ভার। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আমার টাকাটা ঠিক আছে ত?"

হেমন্তবাবু বলিলেন, "ঠিক আর আছে কই?—আমার হাতে ত নেই, থাকলে কোনও কথাই ছিল না। রোজগার পত্রও বড়ই মন্দা পড়ে গেছে—বছর বছর খবচ যেমন বাড়ছে আয়ও তেমনি তেমনি কমছে। কাযকৰ্ম্ম ভয়ানক ডল্। তার উপর আবার উকীলের সংখ্যা বৰ্দ্ধমানে এত বৰ্দ্ধমান যে, রাস্তার একটা লাঠি মারলে তিনটে উকীল মরে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে দেখ—উকীল থাকে না এমন দশখানা বাড়ী উপবোউপবি পাবে না। একধাব থেকে তক্তা ঝুলছে—শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, উকীল, জজকোর্ট। মফঃস্বল বারের সে দিন আর নেই রে ভাই। এখন পেট চলা দুষ্কব—তাব উপর গাড়ীঘোড়া কিনে আবও বিপন্ন হয়েছি, আমি ত আমি,—গিয়ে দেখগে, বড় বড় নামজাদা সব উকীল, বাব-লাইব্রেবীতে বসে হাই তুলছেন আর গুড়ুক ফুঁকছেন।"

এই বক্তৃতা শুনিয়া সতীশচন্দ্রের বুক দমিয়া গেল। দাদা বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন এ কথা দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন। সুতরাং টাকা নাই ইহা একটা আছলামাত্র। টাকা যথেষ্টই আছে; দিবার যদি ইচ্ছা না থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে দাদা আমার উপায় কি হবে? বারো বছরের মেয়ে গলায় বেঁধে কি আমি ডুববো?"

হেমন্ত বলিলেন, "দুই একজন বন্ধুকে বলে বেখেছি; টাকাটা তাঁদের কাছে ধার পেলেও পাওয়া যেতে পারে। কতকটা সেই ভরসাতেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। বৈকালে বেরুব একবার। এখন বেলা হল, স্নান-টান করে ফেল ভায়া।"

বেলা সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী যোতাইয়া হেমন্তবাবু বাহির হইলেন। যে সকল হাকিম ছুটিতে কোথাও যান নাই, বৰ্দ্ধমানেই আছেন, তাঁহাদের বাসায় গিয়া, নানা খোস-গল্প ও চাটুবাক্যে তাঁহাদিগের সন্তোষবিধান করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিলেন। সতীশ তীর্থের কাকের মত আশায় বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হেমন্ত মুখখানি নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কোথাও সুবিধে হল না। তাঁরা বললে হ্যাঁ আপনাকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু বড়ই এখন টানাটানি, দু'চারমাস পরে বরং হতে পারে।—চেষ্টা ত করলাম, কি করি বল ভায়া! আমি বলি, কি, কলকাতাতেই বরং আর একবার চেষ্টা করে দেখগে।"

রাত্রি নয়টা সাতাশ মিনিটের প্যাসেঞ্জারে সতীশবাবুর কলিকাতায় ফিরিবার কথা। একটা দিন থাকিবার জন্য হেমন্তবাবু অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। আহারের জন্য আসনে বসিলেন মাত্র; খানদুই লুচি খাইয়াই তাঁহার ক্ষুধা

ফুরাইয়া গেল। সতীশের পুত্রকন্যার জন্য হেমন্তবাবু এক হাঁড়ি মিহিদানা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই লইয়া, নয়টার পূর্ব্বেই হেমন্তবাবুর গাড়ীতে তিনি ষ্টেশনে রওয়ানা হইলেন। আকাশে মেঘ করিয়াছে, বাতাস বহিতেছে—শীতটাও আজ বেশ কন্‌কনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ট্রেন ছাড়িল। মধ্যম শ্রেণীর একখানি বেঞ্চির কোণে বসিয়া, জুতা খুলিয়া পা তুলিয়া পায়ে শাল ঢাকা দিয়া সতীশবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। বড় আশা করিয়াই তিনি হেমন্ত দাদার নিকট আসিয়াছিলেন। সেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। মনোরমা জন্মিয়া অবধি তাঁহার সাধ ছিল, একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অবস্থাপন্ন পাত্রে তাহাকে অর্পণ করিবেন। সে সাধ আর পূর্ণ হইল না; এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। হাজার দেড়েক টাকায় হয় এমন একটি পাত্রের সন্ধান করিতে হইবে। সে পাত্র যে কেমন হইবে, তাহা মনোরমার অদৃষ্ট-বিধাতাই জানেন। বাড়ী ফিরিলে এই বিফলতার সংবাদ যখন তাঁহার স্ত্রী শুনিবে, তখন তাহার মুখখানি কেমন হইয়া যাইবে ভাবিতে ভাবিতে সতীশবাবুর চোখের কোণে জল আসিল। সেই সে যে সুপাত্রটির জন্য নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইতেও প্রস্তুত হইয়াছিল,—কিন্তু এমনই অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, তাহাতেও কোন ফল হইল না।

নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়াছে—হাওড়ায় পৌঁছিতে রাত্রি পৌনে একটা। আরোহিগণ যাহারা শয়নের স্থান পাইয়াছে তাহারা ঘুমাইতেছে, বাকী লোক বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। শীতের জন্য কামরার সমস্ত জানালাগুলি রুদ্ধ। কোন একটা ষ্টেশনে সতীশবাবুর বেঞ্চিটা খালি হইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া, চামড়ার ব্যাগটি মাথায় দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিলেন, গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে—অপর সকলে নামিয়া গিয়াছে। উঠিয়া ব্যাগ ও ছড়িটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে তিনি নামিলেন। সীতাভোগ ও মিহিদানার হাঁড়ি দুইটা, কুলীর হাতে দিয়া প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করিয়া ঠিকাগাড়ী দাঁড়াইবার স্থানে গিয়া দেখিলেন, দুইখানি গাড়ী মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। অনেক দরদস্তুরের পর, দেড় টাকায় একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বাড়ী পৌঁছিতে দুইটা বাজিল। বৈঠকখানায় ভৃত্য রামটহল শুইয়া থাকে, ডাকাডাকিতে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সতীশবাবু বলিলেন, "গাড়ীর মধ্যে দুটো হাঁড়ি আছে, আর ছড়িটা—নিয়ে আয়। আর এই নে, ভাড়া দিস।"—বলিয়া তিনি আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিলেন—কি প্রয়োজন ছিল।

আপিস ঘরের কাজটুকু সারিয়া ব্যাগ হস্তে সতীশবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সরমা দাঁড়াইয়া আছে—টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে।

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পেলে?"

সতীশ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পেলাম ঐ সীতাভোগ আর মিহিদানা।"—বলিয়া তিনি মেঝের উপর রক্ষিত হাঁড়ি দুইটি দেখাইয়া দিলেন।

"টাকা?"

"টাকা পাইনি।"

সরমা হাসিয়া বলিলেন, "যাও যাও ঠাট্টা করতে হবে না। টাকা পেয়েছ। এই যে বাক্সতে টাকা।—বলা হচ্চে পাইনি!"—বলিয়া সরমা টেবিলের উপরে একটি বাক্স দেখাইলেন।

সতীশ দেখিলেন, সবুজ বনাতের ঘেরাটোপ ঢাকা একটি বৃহৎ ক্যাশবাক্স। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার বাক্স?"

সরমা বলিলেন, "নাও নাও, রঙ্গরস রাখ। নিজে নিয়ে এলেন, আবার জিজ্ঞাসা করছেন কার বাক্স?—সব টাকা পেয়েছ ত?"

সতীশ বাক্সটির ঘেরাটোপ মুক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি কখন এ বাক্স নিয়ে এলাম?—পাগল নাকি!"

সরমা ইহাতে বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আননি কি বলছ গো? এই ত এক্ষুণি রামটহল তোমার ছড়ি, হাঁড়ি দুটো আর এই বাক্স রেখে গেল।"

সতীশ বলিলেন, "রামটহল এনে রেখে গেল? কোথায় পেলে সে? আমি এ বাক্স ত কখনও চক্ষেও দেখিনি। ডাক দিকিন রামটহলকে। আচ্ছা আমিই ডাকছি।"—বলিয়া তিনি বাহিরে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"রামটহল—এ রামটহল।"

রামটহল আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ি থেকে তুই কি কি নামিয়েছিস রে?"

রামটহল বলিল, "হাঁড়ি দুটো, ছড়ি, আর এই বাক্স। নীচে হাঁড়ি দুটো ছিল। উপরে, ঘোড়ার দিকে সেই বসবার জায়গায় এই বাক্স ছিল। আমি ত লণ্ঠন নিয়ে বেশ করে ভিতরে দেখেছি বাবু, আর ত কিছু ছিল না।"

সতীশ বলিলেন, "আচ্ছা যা।"

রামটহল চলিয়া গেলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। সতীশবাবু বাক্সটি তুলিয়া দেখিলেন, উহা বিলক্ষণ ভারি—ভিতরে ঝম্‌ঝম্‌ করিতেছে। বলিলেন, "এ নিশ্চয় কেউ ঘোড়ার গাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল, কোচম্যানও জানতে পারেনি। এখন উপায়?"

সরমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে একবার স্বামীর মুখপানে, একবার বাক্সপানে চাহিতে লাগিলেন।

সতীশ বলিলেন, "কার বাক্স জানাই বা যাবে কি করে? খুলতে পারলে হয়ত কিছু সন্ধান পাওয়া যেত। কোনও চিঠিপত্র কাগজ-টাগজ যদি ভিতরে থাকে।"

"কি করে খুলবে?"

"খুলবে কি? না পুলিশে গিয়ে জমা দিয়ে আসব?"

সরমা বলিলেন, "পুলিশে জমা দিয়ে কি হবে? তারা কি আর, যার জিনিষ তাকে খুঁজতে যাবে? মাঝে থেকে নিজেরাই গাপ করে ফেলবে। অত টাকা মিছামিছি পুলিশের পেটে যায় কেন?"

"তা ঠিক, পুলিশের পেটেই বা যায় কেন? চাবির রিঙটা দাও দেখি"—বলিতে বলিতে সতীশবাবু দ্বার বন্ধ করিলেন।

সরমা আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমাদের চাবি দিয়ে খুলবে কি?"

"দেখাই যাক না। তেমন দামী বিলিতী বাক্স এ নয়—সাধারণ জিনিষ"—বলিয়া সতীশবাবু স্ত্রীর হস্ত হইতে চাবিগুলি লইয়া, একটা বাছিয়া কলে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। সেটা লাগিল না। আর একটা—আর একটা—তৃতীয় চাবিতে কল ঘুরিয়া গেল।

কম্পিত হস্তে সতীশবাবু বাক্স খুলিলেন। উপরের ডালায় কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার সেই ক্ষীণ বাতির আলোকেও ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। ডালাটি নামাইয়া দেখিলেন, বাক্সের খোলাটিও, নানাবিধ স্বর্ণাভরণে পরিপূর্ণ। হার, বাজু, ফুল, কাঁটা, চিরুণী, নথ, নেকলেস, ব্রেসলেট, টায়রা প্রভৃতি—নানাবিধ অলঙ্কার। কোন কোন রকম দুই তিনটা করিয়া। দেখিয়া সরমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

সতীশবাবু একে একে অলঙ্কারগুলি বাক্স হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন, কোথাও প্রকৃত অধিকারীর নাম গন্ধও নাই। তখন তিনি বাম হস্তে কপাল টিপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সরমা গহনাগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া আলোকে ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন—হাতে নাড়িয়া নাড়িয়া কোন্‌টি কয় ভরির তাহা অনুমান করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা কার গহনা! হায় হায়!—একি অল্প গয়না! চার পাঁচ হাজার টাকার কম ত নয়! ওগো দেখ, একছড়া গিনিগাঁথা হার। এ সব কি বাঙ্গালীর? না মাড়োয়ারীর? বাঙ্গালীর মেয়ে গিনিগাঁথা হার পরে নাকি?"

পাঁচ মিনিট এইরূপে কাটিলে সতীশবাবু বলিলেন, "আমায় এক গ্লাস জল দাও ত।"

সরমা তখন বাক্স বন্ধ করিয়া, স্বামীকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। তিনি জল পান করিলে তাঁহার হাত হইতে গ্লাস লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তুমি বর্দ্ধমানে যখন শুনলে যে টাকা পাওয়া যাবে না, তখন তুমি কি করলে?"

"কি আর করব? ষ্টেশনে এসে ট্রেনে উঠলাম।"

"তোমার মনে কি হচ্ছিল তখন?"

"কন্যাদায় থেকে কি করে যে উদ্ধার হব, তাই ভাবতে লাগলাম; আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।"

"আর কিছু ভেবেছিলে?"

"আর কি?"

"ভগবানকে ডেকেছিলে?"

"তা—ডেকেছিলাম বইকি।"

সরমা তখন উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "তবে আর সন্দেহ নেই। এ কারু বাক্স নয়—কেউ ফেলে যায়নি। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে, ভগবানই তোমাকে এ দিয়েছেন।"

সরমার কথার স্বরে সতীশবাবুর মনে হইল, কাব্য রচনা হিসাবে একথা সে বলিতেছে না—নিজের মনের সংশয়লেশহীন দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করিতেছে। স্ত্রীর এই নির্ব্বোধ সরল বিশ্বাসে সতীশের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সরমা বলিলেন, "কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্চে না?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা সে কথা ভেবেচিন্তে পরে দেখা যাবে। বাক্স এখন তুলে ফেল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল যে। এখন শোয়া যাক এস।

সরমা আলমারি খুলিয়া বাক্সটি অনেকগুলি কাপড়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া, আলমারি বন্ধ করিলেন।

সে রাত্রি স্বামী স্ত্রী কেহই মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পাতা বুজিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন সতীশবাবুর আর অন্য চিন্তা রহিল না। গহনার বাক্সটি সম্বন্ধে কি করিবেন, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে দিন শেষ হইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর, পুত্রকন্যাকে শয়ন করাইয়া সরমা স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "তা তুমি অত ভাবছ কেন? ভেবে ভেবে যে একটা ব্যারাম জন্মে যাবে!"

সতীশ বলিলেন, "ভাবছি কি আর সাধে? এমন প্রলোভনে ঈশ্বর আমায় কেন ফেললেন তা বুঝতে পারছিনে!"

সরমা বলিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বর মানবে, অথচ তাঁর দয়া মানবে না!—ঈশ্বর তোমার বিপদ দেখেই তোমাকে ও গহনার বাক্স দিয়েছেন—একথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না কেন?"

সে রাত্রেও কিছুই মীমাংসা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নির্ম্মলকে সতীশবাবু চৌমাথা হইতে কয়েকখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র কিনিয়া আনিতে বলিলেন। প্রত্যেকখানি

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেন, গহনা হারানোর কথা সংবাদস্তম্ভে কোথাও পাইলেন না, কেহ সে সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপনও দেন নাই।

আরও দুইদিন কাটিল। এ দুইদিনও সতীশবাবু সংবাদপত্র অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিলেন, কেহই গহনার বাক্স হারানোর বিজ্ঞাপন দিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন অতগুলো টাকার গহনা হারালো, অথচ এ তিন চাবদিনে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না।—তবে সরমা যা বলেছে তাই কি সত্যি নাকি?"

বেলা নয়টার সময় আপিস ঘরে বসিয়া গালে হাত দিয়া সতীশবাবু খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, এমন সময় ক্ষিতীশ আসিয়া উপস্থিত। সে ইঁহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "এ কি মশায়, আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছিল নাকি?"

সতীশবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না অসুখ হয়নি। বস। বল, খবর কি?"

"জ্যেঠামশায় এসেছেন।"

"কবে এলেন?"

"এই তিন চারদিন হল। বৌবাজারে রযেছেন, সেইখানে তাঁর জন্যে বাড়ী ভাড়া করেছি কিনা। তিনিই আমায় পাঠালেন। বললেন, সতীশবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হত। আপনার মেয়েকে তিনি একদিন এসে দেখতে চান।"

"কবে?"

"সাহেবদের নববর্ষের ডালি সংগ্রহ করতে তিনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন। ১লা জানুয়ারিব পর যেদিন আপনাব সুবিধে হবে, সেইদিনই তিনি মেয়ে দেখতে আসবেন। আপনি যদি ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তবে সে দিনটাও অমনি স্থির করে আসবেন।"

সতীশবাবু রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া সজল নেত্রে ক্ষিতীশের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবাজী, এ বিবাহ হবে না।"

ক্ষিতীশ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিযা উঠিল, "কেন?"

"মহেন্দ্রবাবু যা চেয়েছেন, তা দেওয়া আমাব সাধ্য হবে না।"

"কেন? এমন বেশী কিছু ত তিনি চান নি।"

সতীশবাবু ধীবে ধীবে বলিলেন, "ছেলেব গুণের তুলনায় আজকালকার বাজাবে তিনি যা চেয়েছেন তা খুবই অল্প বটে,—কিন্তু সেই অল্প আমার সাধ্যের বাইরে।"

ক্ষিতীশ বলিল, "বলেন কি?"

সতীশবাবু নিরুত্তব হইয়া বহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষিতীশ বলিল, "এঃ—যে ভারি কেলেঙ্কারি হল মশায়। সমস্ত ঠিকঠাক—এখন বলছেন হবে না?"

সতীশ বলিলেন, "কি করি বল বাবাজী! মানুষ অবস্থার দাস। এক জায়গায় কিছু টাকা পাবার আশা ছিল, সেই আশার উপর নির্ভর করেই সম্বন্ধটি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে নিরাশ হতে হয়েছে।"

"তা হলে, জ্যেঠামশায়কে গিয়ে কি বলব?"

"বোলো, তিনি মহৎ, আমি গরীব, তিনি যেন আমার অপরাধ না নেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা নিতান্ত সঙ্গত হলেও, আমার ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠলো না, তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নিরস্ত হতে হল। তিনি অন্য পাত্রীর সন্ধান করুন।"

ক্ষিতীশ অনেকক্ষণ বিষণ্ণ মুখে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা সতীশবাবু, আপনি কত হলে পারেন?"

সতীশ বলিলেন, সে কথায় আর ফল কি বাবাজী? মহেন্দ্রবাবু মুঙ্গেরে আমায় বলেছিলেন, আমি এই যে দর দিলাম, এর একটি পয়সা কমে হবে না।"

ক্ষিতীশ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভারি দুঃখের বিষয়।"

সতীশ বলিলেন, "হ্যাঁ বাবাজী। দুঃখ আমারই। মহেন্দ্রবাবুকে তুমি বুঝিয়ে বোলো, আমি চেষ্টা যতদূর যা করবার তা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঐ পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারলাম না।"

ক্ষিতীশ বলিল, "তার চেয়ে, সকল কথা খুলে আপনিই তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে দিন না কেন? সেই চিঠি তাঁকে আমি দেব।"

"ঠিক বলেছ। একটু বস তা হলে।"—বলিয়া সতীশবাবু উঠিয়া টেবিলের নিকট গিয়া বসিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ক্ষিতীশকে বিদায় দিয়া সতীশবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীকে নিভৃতে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "আমি মনস্থির করে ফেলেছি, সরমা।"

সরমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সতীশ বলিলেন, "প্রলোভনকে আমি জয় করেছি। সরমা, তোমার স্বামী গরীব—কিন্তু চোর নয়। আমি এইমাত্র বিবাহ ভঙ্গ করে মহেন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখে দিয়ে এলাম। আজই ওবেলা কলকাতায় গিয়ে আমি ইংরেজি বাঙ্গলা খবরের কাগজে কাগজে গহনার বাক্স সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসব।"

সরমা বলিলেন, "কেউ যদি দাবী না করে?"

"তা হলে ও সমস্ত গহনা বিক্রী করে, কোনও অনাথ আশ্রম কিম্বা হাসপাতালে দান করব। আমার মেয়ের অদৃষ্টে যদি ভাল পাত্র থাকে, তবে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না সরমা, তুমি নিশ্চয় জেনো।"

সরমা বলিলেন, "আচ্ছা, সেই ভাল। তাই কর। বেলা হয়ে গেছে, এখন স্নান করে ফেল দেখি।"

বিকালে বাহির হইয়া কাগজে কাগজে সতীশবাবু এই বিজ্ঞাপন ছাপিতে দিয়া আসিলেন—

গহনার বাক্স

কুড়াইয়া পাইয়াছি। কবে, কোথায় হারাইয়াছিল, বাক্সের রঙ ও গঠন, তাহাতে কি কি গহনা আছে যিনি বলিতে পারিবেন, তাঁহাকে ঐ বাক্স দেওয়া যাইবে। ১৭নং পদ্মপুকুর রোড, খিদিরপুর দাবীদার স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করুন।

উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি অনিদ্রার পর, আজ সতীশবাবু ঘুমাইয়া বাঁচিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটি শেষ হইয়া গেল। সতীশবাবু কাছারি গিয়াছেন, বিমল স্কুলে গিয়াছে; সরমা আহারের পর ছাদে চুল শুকাইতেছেন ও সুপারি কাটিয়া কাটিয়া ডালাতে রাখিতেছেন। মনোরমা ঘরে বসিয়া কি পড়িতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল, "মা, আমাদের বাড়ীতে কে এসেছেন।"

"কোথা রে?"

"ঐ যে সদরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কোচম্যান বলছে এই ত ১৭নম্বর বাড়ী। একজন ঝি নেমেছে, রামটহলের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কইচে।"

বলিতে বলিতে, নিম্ন হইতে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল। ঝি-বেশধারিণী এক স্ত্রীলোক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সরমাকে দেখিয়া বলিল, "আপনিই কি এ বাড়ীর গিন্নী?"

সরমা বলিলেন, "হ্যাঁ। কেন গা? কোথা থেকে আসছ?"

"আমরা কলকাতা থেকে আসছি গো। আমাদের গিন্নীমা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে এসেছেন।"

সরমা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কোথায় তিনি? আসুন না।"

"আচ্ছা মা, নিয়ে আসি।"—বলিয়া ঝি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সরমা বলিলেন, "মনো, যা ত মা, তোদের পড়ার ঘরে শতরঞ্চিটে চট্ করে পেতে ফেল।"

এক মিনিট পরে, অনুমান চত্বারিংশৎ বর্ষবয়স্কা, সুবেশা কিন্তু প্রায় নিরাভরণা, স্থূলাঙ্গী কিন্তু সুন্দরী একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন। সরমা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আসুন।"

মহিলাটি সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আসি। ক'টাই বা সিঁড়ি, এই উঠতেই হাঁপিয়ে পড়েছি। শরীলে আর পদথ নেই। চলুন।"—বলিয়া তিনি সরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরমা তাঁহাকে শতরঞ্জে বসাইয়া, নিজে নিকটে বসিলেন।

মহিলাটি তখনও হাঁফাইতেছেন। একটু সুস্থ হইয়া, মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওটি কে? তোমার মেয়ে? ঐ দেখ, তোমায় তুমি বলে ফেললাম। তা ফেললামই না হয়, কি বল? তুমি ত দেখছি, বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে। তুমি বউ মানুষ, আমি গিন্নীবান্নী—তুমি বলায় কোনও দোষ আছে?

সরমা হাসিয়া বলিলেন, "না, কিচ্ছু না।"

"তোমার কত বয়স হয়েছে, তিরিশ?" "না, আটাশ।"

"আটাশ? তাই হবে। আমার বোধ হয় বত্রিশ কি তেত্রিশ। আচ্ছা, এর বেশী বলে মনে হয় কি? আমার প্রথম ছেলে অবিনাশ যখন কোলে হল, তখন আমার বয়স চৌদ্দ—এই চৌদ্দ পেরিয়ে সবে পনেরোয় পা দিয়েছি। সে ছেলে আমার আজ ষেঠের চব্বিশ বছরের, এই কার্ত্তিকে তার জন্মমাস গেছে। গেল বছর তার বিয়ে দিয়েছি। বউটি ডাগর-সাগর কিনা, এই ভাদ্র মাসে তার একটি ছেলেও হয়েছে। বলতে নেই তোমাদের কল্যাণে ছেলেটি হয়েছে যেন রাজপুত্তুর। এখন বাঁচে, তবেই। তা, অবিনাশ যখন আমার কোলে, তখন যদি আমার বয়স পনেরো হয়, তবে দেখ না হিসেব করে আমার বয়স এখন কত? বত্রিশ তেত্রিশের বেশী হবে কি?"

হাসি চাপিয়া রাখা সরমার পক্ষে কষ্টকর হইতেছিল। যথাসাধ্য সংযম অবলম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "না, এমনই কি বেশী?—তা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"বলি। হ্যাঁগা, তোমাদের পান বেশী সাজা আছে? থাকে ত দাও না দুটো—আমি বড্ড পান খাই। আমি ত কী পান খাই—আমার মেঝ যা, সে বাঁকীপুরে থাকে—তার স্বামী মুন্সোব—সে যা পান খায়—আমার দেওর বলে কি, পান খেয়ে খেয়েই বউ আমায় ফেল করবে। এক ডিপে পান আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম, তা গাড়ীতেই ফুরিয়ে গেল। অনেকটা পথ— এই যে পাণ এনেছ দেখছি—ওঃ এ যে অনেক! আচ্ছা দুটো খাই। এই মরেছি! জর্দ্দার কৌটোটা বুঝি গাড়ীতেই ফেলে এলাম! ঝি, যা ত মা, ছুটে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে আয় ত। এমনি বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে, জর্দ্দা না হলে পান আবার মুখে রোচে না। তুমি জর্দ্দা খাও?

সরমা বলিল, "না, কখনও ত খাইনি।"

"আচ্ছা, আসুক আমার কৌটো—খেয়ে দেখো একটু; গয়া থেকে আমার স্বামী ফি মাসে ভি-পি করে আনান। জর্দ্দা-টর্দ্দা খাওয়া যদি কখনও অভ্যেস কর ত বলে রাখছি, গয়ার জর্দ্দা আনিয়ে খেয়ো। অমন জর্দ্দা আর কোথাও পাবে না। লক্ষ্ণৌ খেয়েছি, কাশী খেয়েছি—আমার ত আর খেতে বাকী নেই কিছু! কিন্তু গয়ার তুল্য জর্দ্দা খেলাম না আজ অবধি। কেউ কেউ

বলে বটে যে লক্ষ্ণৌয়ের জর্দ্দা খুব ভাল। শুনোনা ও সব কথা। ছাই-ছাই। গয়াতে ১৬ টাকা সের জর্দ্দা পাওয়া যায়, তার কাছে লক্ষ্ণৌয়ের ৮০ টাকা সের দাঁড়াতে পারে না—এ কথা আদালতে গিয়ে জজের সামনে আমি বলতে পারি। গয়ার চামারী সা'র দোকান থেকে আনিও ১৬ টাকা সের। আমি তাই খাই। ৩২ টাকা সের আছে, ৬৪ টাকা সের আছে। আমাদের হল নিত্যি খাওয়া, রোজ রোজ কি অত দামের জর্দ্দা খাওয়া পোষায়? ১৬ টাকাই খাই। এত হিসেব করে চলি, তবু আমার স্বামী আমায় বলেন উড়নচণ্ডী। তাঁর মত কেপ্পণ না হলেই মানুষ বুঝি উড়নচণ্ডী হয়? আমাকে বে-হিসেবী, উড়নচণ্ডী, কত কি বলেন! তা, তিনি স্বামী গুরুজন, বলুন যা ইচ্ছে হয়; সে জন্যে কে আর তাঁর নামে মোকদ্দমা করতে যাচ্ছে—কি বল ভাই অ্যাঁ? এই এই যে ঝি, এনেছিস?—দে।" বলিয়া কৌটা খুলিয়া কিঞ্চিৎ জর্দ্দা আলগোছে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন।

তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা কলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায় কাজ করেন?"

সরমা বলিলেন, "আলিপুর আদালতে।"

"কি কাজ করেন? নাজির, না সেরেস্তাদার?—না, নাজির সেরেস্তাদার নন—তা হলে তোমার গায়ে অনেক গহনা থাকত। আমার স্বামী বলেন, নাজির সেরেস্তাদারেরা খুব বড়লোক। তিনি হাকিম কিনা। বলেন, আমার পৈত্রিক আমলের যোড়া দুই শাল আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হলে তাই গায়ে দিয়ে যাই; কিন্তু আমার নাজির সেরেস্তাদারেরা দেখি একদিন সবুজ শাল গায়ে দিয়ে আসে, একদিন নীল শাল, একদিন বাদামী, একদিন নেবু রঙের—তাদের বাপ পিতামহ ক'যোড়া শাল রেখে গেছে কে জানে!—হ্যাঁ কি বলছিলাম ভুলে গেলাম। তোমার স্বামী কি কাজ করেন বললেন?"

"উকীল।"

"উকীল? ওঃ—তা বেশ। উকীলী কাজও বেশ ভাল। ঢের পয়সা। আমি জানি কিনা, আমার স্বামীর এজলাসে অনেক উকিল কাজ করে—আমাদের বাড়ীতেও আসে। কারু ফী দশ, কারু বিশ, কারু পঞ্চাশ, কাক একশো—উকীলদের ঢেব পয়সা। তবে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট, একটু টানাটানি যায়। তোমার স্বামী বোধ হয় এখনও তত পুরোনো হন নি, নয় ভাই?"

"না—আপনি কোথায় থাকেন?"

"কোথা থাকি? সে ভাই-অনেক কথা। ঝি, তুই যা ত মা, নীচে গিয়ে বসগে। দোরটা ভেজিয়ে দাও—বলি। কথাটা ভারি গোপনীয়।"

মনোরমা মার পানে চাহিল। সরমা বলিলেন, "দোরটা টেনে দিয়ে তুমি ও ঘরে গিয়ে বসগে মা।"

মনোরমা চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কক্ষ নির্জ্জন হইবামাত্র মহিলাটি নিম্নস্বরে বলিলেন, "আমি যে কে, কোথায় থাকি, কি বৃত্তান্ত সে সব কিছু তুমি জিজ্ঞাসা করতে পাবে না ভাই, তা বলে রাখছি কিন্তু। কথাটা রটে গেলে আমার ভয়ানক মুস্কিল হবে"—প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল নীরবে কি ভাবিয়া, শেষে আঁচলের গিরো খুলিয়া তিনি এক টুকরো কাগজ বাহির করিলেন। কাগজখানি সরমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, এই বিজ্ঞাপন কি তোমরা দিয়েছ?"

সরমা পড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার স্বামী দিয়েছেন।"

"বাক্স আছে তোমাদের ঘরে?"

"আছে।"

"কালো রঙের ক্যাশ বাক্স, ডালাটার চাবিধারে সোনালী আঁজি কাটা, সবুজ বনাতের ঘেরাটোপ দেওয়া?"

"হ্যাঁ।"

হস্তসঙ্কেতে দেখাইযা বলিলেন, "এই—এতখানি বাক্সটা হবে।"

"হ্যাঁ।"

শুনিয়া তাঁহার মুখটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আঃ—বাঁচালে। আমারই বাক্স। আমিই বাক্স হারিয়েছি। হারিয়ে অবধি আমার মন এমন খারাপ ভাই—কাউকে বলিনি, আমার স্বামীকেও নয়। ভয়ে মরি! মুখে ভাত যায না জল যায় না। তিনি ভারী কেপ্পণ আর ভারী রাগী কিনা—শুনলে অনথ করতেন। এক আধ টাকার নয়,পাঁচ হাজার টাকার গহনা, সোজা কথা! একেই ত তিনি আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী! ভালয় ভালয় যে পাওয়া গেল, এই মঙ্গল। আজ সকালেই কাগজে আমি এই বিজ্ঞাপন দেখেছি। দেখে, বোনঝির বাড়ী যাবার নাম করে এখানে ছুটে এসেছি।—আমার বাক্স তবে আমায় দাও।"

সরমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তিনি বাড়ী না এলে—"

"কখন আসবেন?" "সন্ধ্যার সময়।"

মহিলাটি চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তবেই ত মুস্কিল। ততক্ষণ কি থাকতে পারব? না—পারব না। আমার বোনঝির বাড়ী আমায় আনতে তারা যদি দারোয়ান-টারোয়ান পাঠায়, তা হলেই চিত্তির আর কি!"

সরমা বলিলেন, "কাল একবার আপনি আসতে পারবেন না?"

মহিলাটি একটু ভাবিযা বলিলেন, "তা পারবো না কেন? পারবো।"

"তা হলে দয়া করে, আপনার বাক্স কবে কোথায় কেমন করে হারালো, আর তাতে কোন্ কোন্ গহনা ছিল আমায় বলে যান; তিনি এলে তাঁকে আমি বলব।"

মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা সব বলি তা হলে শোন। আমরা থাকি পশ্চিমের একটা সহরে। নামটা নাইবা শুনলে। আমার স্বামী সেখানকার হাকিম। ডেপুটি কি মুন্সেব কি সবজজ—সেটা আর নাই বললাম। আমার মেঝ ছেলে, সে এখানে কলেজে পড়ে। একজন উকীল—কোথাকার উকীল সেটা আর নাই বললাম—তার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। বেচারী গরীব—গিয়েছিল মুং—আমাদের বাড়ী। কর্ত্তা দর যা হাঁকলেন, তাই শুনেই তার চক্ষু চড়ক-গাছ! সে মেয়েকে দেখে আমার ছেলের নাকি ভারি পছন্দ হয়েছিল, তাই কর্ত্তাকে আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, দেড় হাজার টাকার গহনা, দানসামগ্রী বরাভরণ পাঁচশো টাকার, নগদ পাঁচশো টাকা—এই আড়াই হাজারে রাজি করলাম। বাবুটিও স্বীকার হলেন। কর্ত্তা একমাসের ছুটি নিলেন, কলকাতায় বাড়ী ভাড়া হল, আমরা সবাই কলকাতায় আসছি। ডাকগাড়িতে রিজাভ পাওয়া গেল না, প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে রিজাভ হল। সেই ভোরবেলা গাড়ী চড়েছিলাম, সারাদিন গেল, রাত একটার সময় হাওড়ায় এসে পৌঁছলাম। গহনার বাক্সটি আমার হাতে কর্ত্তার হাতে তাঁর কুরিয়ার ব্যাগ, কুলিদের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে—"

সরমা এই সময় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে? কোন্ দিন আপনারা হাওড়ায় এসে পৌঁছলেন মনে আছে?"

মহিলাটি বলিলেন, "ঐ যেদিন কাছারি বন্ধ হল, তার পরদিন গো; বড়দিনের আগের দিন আর কি। কুলিদের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে, ঠিকেগাড়ী যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে এলাম। কেউ হাঁকে দু'টাকা, কেউ হাঁকে সাতসিকে, কেউ চায় দেড় টাকা—তা কর্ত্তা বললেন, এক টাকার এক পয়সা বেশী দিচ্ছিনে—যাবি ত চল্। শেষে পাঁচসিকেয় একখানা গাড়ী ঠিক হল। জিনিসপত্র কুলিরা ছাদে তুলতে লাগল, আমি গহনার বাক্সটি গাড়ীর ভিতর রাখলাম। বিষম ভারি—হাত ভেরে গিয়েছিল। উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আর এক গাড়োয়ান এসে বললে, আমায় আঠারো আনা দেবেন বাবু। কর্ত্তা বললেন—আঠারো

আনায় যাবি? তবে চল্ তোর গাড়ীতেই যাই। গারোয়ানে গাড়োয়ানে বেধে গেল বিষম ঝগড়া।—এই মারে ত এই মারে। দেখে ত আমি ভয়ে মরি—ফৌজদারী দাঙ্গাই বুঝি দাঁড়ায়। কর্ত্তা বললেন—চলো কুলিলোগ, মাল উতারো—কেয়া দেখতা?—আমার হাত ধরে বললেন,—এস। তাঁর সঙ্গে গেলাম; এমনি মনিষ্যি, গহনার বাক্সটি যে সেই আগেকার গাড়ীতেই পড়ে রইল তা আমার হুসই হল না।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলের বিয়ে কবে হবে?"

মহিলাটি বলিলেন, "কবে হবে তা ত জানিনে ভাই। সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। সবই ঠিকঠাক ছিল—কিন্তু এই পরশু না তরসু, মেয়ের বাপ ওঁকে চিঠি লিখেছে—অত টাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, ছেলের আপনি অন্য সম্বন্ধ করুন। সেই শুনে অবধি বাছা আমার মুখটি চুন করে বেড়াচ্চে—মেয়েটিকে ভাবি তার পছন্দ হয়েছিল কিনা। আরও দু'তিন জায়গায় কথাবার্ত্তা চলছে—কিন্তু মেয়েগুলি তেমন সুন্দর নয় তাই মন সরছে না। দেখি, ভাল মেয়ে একটি পাই যদি।—অনেক দেরী হয়ে গেল, এখন তবে উঠি ভাই। তোমার স্বামীকে সব কথা বোলো। কাল আবার আমি এসে বাক্স নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা, আপনি একটু বসুন"—বলিয়া সরমা উঠিয়া গেলেন। দুই মিনিট পরে ঘেরাটোপ সুদ্ধ বাক্সটি আনিয়া, মহিলাটির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এই নিন আপনার বাক্স। দেখুন, এই বাক্সই আপনার ত?"

"এই ত!"—বলিয়া তিনি অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বাক্স খুলিয়া ফেলিলেন।

সরমা বলিলেন, "দেখে নিন, আপনাব সব জিনিস ঠিক ঠিক আছে ত?"

তিনি গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা! তুমি যে অবাক্ করলে ভাই! তোমরা কি সেই মানুষ যে আমার জিনিস তছরূপ করবে? তা যদি হত—তাহলে ত সবই নিতে পারতে; বিজ্ঞাপন দিতে যাবে কেন? তা ভাই, আমায় যে বাক্স নিয়ে যেতে বলছ, তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে না? গহনার লিষ্টিও আমি এখনও তোমায় বলিনি!"

সরমা বলিল, "আর কিছু দরকার নেই। আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।"

"চিনতে পেরেছ? কে আমি বল দেখি?"

"আপনি মুঙ্গেরের সবজজ মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী। যে ছেলের বিয়ের জন্য এসেছেন, তার নাম শচীন।"

মহিলাটি নির্ব্বাক, বিস্ময়ে সরমার মুখ পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমি কে?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যার মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সেই আমি। ঐ বড়দিনের আগের দিন উনি বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন—এক জায়গায় হাজার খানেক টাকা পাবার কথা ছিল, সেই টাকা আনতে। টাকা পাওয়া গেল না। রাত একটার সময় ঐ ট্রেনে বর্দ্ধমান থেকে উনি ফিরলেন। ঘোড়াগাড়ি করে বাড়ী এলেন। বাক্স আগে উনি গাড়ীতে দেখেন নি। বাড়ী এসে পৌঁছে, চাকর গাড়ী থেকে অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ঐ বাক্সও নামিয়ে এনেছিল, উনি ত দেখে অবাক!"

মহিলাটি গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমিই মেয়ের মা?"

সরমা বিষণ্ন মুখে হাসিয়া বলিলেন, "আমিই মেয়ের মা।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বর্দ্ধমানে ঐ হাজার টাকা পাওয়া গেল না বলেই কি বিয়ে ভেঙ্গে গেল?"

"হ্যাঁ।"

"একটি হাজার টাকার জন্যে? হায় হায়। খাসা মেয়েটি তোমার ভাই। এখন তবে

বলি, ওকে দেখেই আমাব মনে হয়েছিল—আহা এমনি একটি বউ আমার হয়!"

সরমা অবনত মস্তকে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। শেষে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তা, ওকেই কেন আপনার বউ করুন না? আপনারই ত হাতে!"

মহিলাটি বলিলেন, "পোড়াকপাল!—আমার হাতে হলে কি আর ভাবনা ছিল? আচ্ছা—তোমাব মেয়েকে একবার ডাক ত ভাই।"

সরমা কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "এঁকে প্রণাম কর।"

মনোরমা প্রণাম করিলে, সবজজ গৃহিণী কাছে বসাইয়া, সস্নেহে তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পান ও জর্দ্দা খাইয়া উঠিলেন। সরমাকে বলিলেন, "আজ তা হলে উঠি ভাই। বাক্স নিয়ে চললাম। কাল কি পরশু আবার আমি আসব।"—বলিয়া তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পরদিনই তিনি আবার আসিয়া উপস্থিত। সিঁড়ি উঠিবার ক্লান্ত লাঘব হইলে, সরমাকে নিভৃতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমার স্বামীকে অনেক বলে কয়ে দেখলাম, তিনি একটি পয়সাও কমাতে চান না। এমন কেপ্পণ দেখিনি ভাই! এ কি কম আপশোষ যে হাজার টাকার জন্যে এমন বউটি আমি হারাব? তাই, ও টাকাটা আমি সঙ্গে কবেই এনেছি—এই নাও ক'খানা নোট। আমার টাকা তুমি আমাকেই দেবে; তুমি ত আর নিচ্চ না। তুমি মনে কিছু 'কিন্তু'কোর না ভাই। তোমার স্বামীকে বোলো, কালই যেন আমাদের ওখানে গিয়ে একবারে পাকাপাকি বিয়ের দিনস্থির কবে আসেন। কিন্তু ভাই একটা কথা বলি—সাবধান সাবধান—আমি যে এই নোট দিয়ে যাচ্ছি, কাগে কোকিলেও যেন টের না পায়। আমার স্বামী শুনলে অনর্থ করবেন, একেবাবে ক্ষেপে যাবেন! একেই ত আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী! হ্যাঁ ভাই, আমি উড়নচণ্ডী?"—বলিয়া সরমার হাতে তিনি নোটের গোছা দিলেন।

"না—আপনি লক্ষ্মী—আপনি কমলা"—বলিয়া সরমা সজল নয়নে সবজজ গৃহিণীর পদধূলি লইলেন।

[ফাল্গুন, ১৩২৪]

ডাগর মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। আগন্তুক

মুটিয়ার মাথায় মসীবর্ণ ষ্টীলট্রাঙ্ক, তদুপরি লাল-নীল ডোরাকাটা শতরঞ্জ জড়ানো এক বাণ্ডিল বিছানা, পশ্চাতে, একহাতে ছাতা অন্য হাতে মাঝারি আকারের একটি চামড়ার ব্যাগ লইয়া, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ জনৈক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ফুলপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বেলা তখন তিনটা কিম্বা সাড়ে তিনটা। আষাঢ় মাস, আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে, ছাতাটি তাই খুলিতে হয় নাই। রেল ষ্টেশন অধিক দূর নহে, ক্রোশখানেক মাত্র ব্যবধান;—তথা হইতে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ পাড়ায় যাবেন বাবু?"

"পশ্চিমপাড়া।"

"কাদের বাড়ী?"

বাবুটি কোনও উত্তর না করিয়া, পথের উভয় পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে আপন মনে চলিলেন। দুই ধারেই জঙ্গল, মাঝে মাঝে একখানি করিয়া বাড়ী। কিয়দ্দূর আসিয়া, এক পুরাতন মজিয়া-যাওয়া পুষ্করিণী দেখিয়া বাবুটি সেইখানে দাঁড়াইলেন; পুকুরটির পানে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এ পশ্চিমপাড়া নয়, জেলেপাড়া।"—"ওঃ" বলিয়া বাবুটি আবার পথ চলিতে লাগিলেন। আরও কিছুদূর আসিয়া এক প্রাচীন বটবৃক্ষ—সেখানে দাঁড়াইলেন। গাছটির পানে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়া আবার বলিল, "বাবু আবার দাঁড়ালেন যে! এটা মোড়লপাড়া।"—"ওঃ" বলিয়া বাবুটি পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া মুটিয়া বলিল, "এই পশ্চিমপাড়া আরম্ভ হল বাবু। কোন বাড়ীতে যাবেন?"

বাবুটি বলিলেন, "চল্ না, দেখা যাক।"

মুটিয়া ভাবিল, বাবুটি বোধ হয় কোনও ভদ্রগৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইবেন—তখন সে যেখানেই হউক। কিয়দ্দূর গিয়া সে বলিল, "এইটে বিদ্যেভূষণ মশায়ের বাড়ী, তিনি মস্ত পণ্ডিত।" আর কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "এই চাটুয্যেবাড়ী। আগে এঁরাই ছিলেন গাঁয়ের জমিদার।" বাবু তথাপি দাঁড়ান না দেখিয়া, মুটিয়া অগ্রসর হইল।

আরও কিছুদূর গিয়া, বাবুটি আবার দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিকে জঙ্গলে ঘেরা একখানি ভাঙ্গা বাড়ী, অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে, এখানে ওখানে এক-আধটা দেওয়াল মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি সেই ভগ্নাবশেষের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়াও কিয়দ্দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "কতক্ষণ দাঁড়াব বাবু? কোথায় যেতে হবে চলুন।"

বাবুটি তাড়াতাড়ি চাদরের প্রান্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "আয়, চাটুয্যে-বাড়ীতে যাব।"

"চাটুয্যে-বাড়ী ত ছাড়িয়ে এলাম। সেইকালে বললেই হত।"—বলিয়া মুটিয়া ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-ভবনে প্রবেশ করিয়া বামদিকে বৈঠকখানা। বাবুটি সেই বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন। বারান্দায় এক ভৃত্য বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে ইঁহাকে দেখিয়া হুঁকাটি নামাইল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে কে আছেন হে?"

ভৃত্য বলিল, "কর্ত্তাবাবু আছেন।"

"রমণকৃষ্ণবাবু?"

ভৃত্য একটু বিস্মিত হইয়া, ইঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি ত স্বর্গে।"

"তবে কে, হৃদয়কৃষ্ণ বাবু আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না, তেনারও কাল হয়েছেন। রিদয়কিষ্ট বাবুর মধ্যম পুত্তুর বিনয়কষ্ট বাবুই এখন মালিক। জ্যেষ্ঠ পুত্তুর অতুলকিষ্ট বাবুও গত হয়েছেন।"

বাবুটি বলিলেন, "বটে! তাঁরাও গত হয়েছেন? বিনয়বাবু বাড়ী আছেন ত?"

ভৃত্য বলিলেন, "আজ্ঞে না, তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

ইহা শুনিয়া, বাবুটির ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুটিয়ার মাথা হইতে বাক্স বিছানা নামাইয়া লইয়া, বখ্‌শিস্ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। জুতা খুলিয়া চৌকির উপর পা তুলিয়া বসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "ওহে তোমার নামটি কি বাপু?"

"আজ্ঞে, আমার নাম কেষ্টধর্ন মণ্ডল। আমরা সদ্গোপ।"

"সদ্গোপ? বেশ বেশ। তা, একছিলিম তামাক খাওয়াতে পার বাবা?"

"আজ্ঞে, পারি বইকি! ব্রাহ্মণের হুঁকো?"

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণধন কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হুঁকাটি আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথা থেকে আসছেন?"

"উপস্থিত কলকাতা থেকে।"

"নিবাস?"

আগন্তুক হাত বাড়াইয়া হুঁকাটি লইয়া বলিলেন, "তোমার বাবু ঘুম থেকে উঠেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করছেন?" ঘুমিয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করছেন।"

বাবুটির মুখে পুনর্ব্বার একটু হাসি দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুকে আমার কথা বলেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছি। তিনিই বললেন, বাবুটি কে, কোথা থেকে আসছেন, জিজ্ঞাসা করে আয়।"

"তোমার বাবু আমায় চিনবেন হে, চিনবেন। যাও, তাঁকে ডেকে আন।"—আগন্তুক ধূমপান আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। বৈঠকখানায় ঘড়িটিতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। পূর্ব্বকথা

থেলো হুঁকাটি হাতে ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া যিনি তামাক খাইতেছেন, তাহার নাম নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রামেই ইঁহার আদিবাস। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে ভগ্নস্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া চাদরের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়াছিলেন, সেই ছিল ইঁহার পৈত্রিক ভিটা ও জন্মস্থান। বিনয়বাবুদের সহিত জ্ঞাতি সম্পর্ক।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইস্কুল-পলায়নের জন্য পিতৃব্যের নিকট জুতা খাইয়া, খুড়ীমার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পিতৃমাতৃহীনা নন্দলাল যখন পশ্চিমগামী হন, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। পশ্চিম বলিয়া পশ্চিম—একেবারে দেশীয় রাজ্য ভাওয়ালপুর। কতক রেলে, কতক গরুর গাড়ীতে, বাকী হাঁটিয়া। নবাব সাহেবের নিজস্ব আদালতে পেস্কারী কর্ম্মে নিযুক্ত, নদীয়া জেলা নিবাসী রামজয় বিশ্বাস নামক এক কায়স্থ ভদ্রলোক ভাওয়ালপুরে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনিই তখন সেখানে একমাত্র বাঙ্গালী। ক্ষুধাতুর ছিন্নবসন কপর্দ্দকশূন্য বালক নন্দলাল তাঁহারই নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করিল। রামজয় দয়াপরবশ হইয়া, খোরাক পোষাক দুই টাকা বেতনে নন্দলালকে নিজগৃহে পাচক নিযুক্ত করিলেন। যাহারা ফার্সী জানে, রাজ্যে তাহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি দেখিয়া নন্দলালেরও সখ

হইল সে ফার্সী পড়িবে। বেতনের দুইটি টাকাই ব্যয় করিয়া, প্রতিবেশী মুন্সী নেউলকিশোরের নিকট অবসর সময়ে প্রত্যহ সে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। দেশে থাকিতে যে বালক বাগ্দেবীকে বাঘতুল্য মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত, সেই, বিদেশে উদরান্নের জন্য হীনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, লেখাপড়ায় আশ্চর্য্য মনোযোগ দেখাইতে লাগিল। দুই-তিন বৎসরেই সে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। তাহার মেধা ও অধ্যবসায় দেখিয়া রামজয় ভারি খুসী হইয়াছিলেন; পাচকবৃত্তি ছাড়াইয়া, আদালতের নকল সেরেস্তায় ২০ টাকা বেতনে তাহাকে একটি মুহুরীগিরি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। আরও দুই তিন বৎসর পরে, পেন্সন লইয়া রামজয়ের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইলে, আদালতে নন্দলালের ওকালতী করিবার সনন্দের জন্য প্রধান কাজি মির্জ্জা আসমৎউল্লা খাঁ সাহেবকে তিনি ধরিলেন। খাঁ সাহেব ফার্সীতে নন্দলালের অসাধারণ অধিকার দেখিয়া, সহজেই সনন্দ সহি করিয়া দিলেন। নবাব সরকার হইতে ভূমিদান পাইয়া রামজয় ভাওয়ালপুরে যে গৃহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঁচ বৎসর মধ্যে মূল্য পরিশোধের মেয়াদে নন্দলালকে কোবালা করিয়া দিয়া তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন।

অল্পদিনেই নন্দলালের পশার জমিয়া গেল, ওকালতীতে বেশ অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল। গান্ধর্ব্ব-মতে এক সুন্দরী যোড়শী রাজপুত বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা হইয়াছিল; এখন হইতে অবসর মত সে বিদ্যারও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

ফুলপুর হইতে নন্দলালের পলায়নের পর তাঁহার খুড়ো কিছুদিন তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদারকে তাঁহার এই অনুসন্ধান, নিতান্তই "ঢেলামারা গোছ" হইয়াছিল। মুহুরীগিরি চাকরী হওয়ার পর নন্দলাল বাড়ীতে প্রথম চিঠি লেখেন এবং মনি-অর্ডার করিয়া খুড়ার নামে দুটি টাকা পাঠাইয়া দেন। খুড়া তখন প্রাপ্ত, খুড়তুতো ভাই সে টাকা সহি করিয়া লইয়াছিল। তখন হইতে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলিত। তাঁহার উকীল হওয়ার সংবাদও গ্রামে পৌঁছিয়াছিল। রাজপুতনীকে গৃহে আনিবার পর হইতে নন্দলাল পত্রাদি বন্ধ করেন। এই রাজপুতনীর গর্ভে তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই। গত বৎসর রাজপুতনীও ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। প্রথমটা নন্দলাল তাহার শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন সামলাইয়া উঠিয়াছেন। তবে, ভাওয়ালপুরে আর মন টেকে না। টাকাকড়ি বিস্তর জমিয়াছে, কে তাহা ভোগ করিবে এই চিন্তাই এখন তাঁহার মনে প্রবল। সঞ্চিত অর্থে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া, একটি স্বজাতীয়া ডাগর মেয়ে বিবাহ করিয়া অতঃপর পৈত্রিক ভিটায় বাস করিলেই মনে শান্তি পাইবেন, এখন ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তাই আজ পঁচিশ বৎসর পরে নন্দলাল দেশে ফিরিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, বিনয়বাবু প্রথমে নন্দলালকে চিনিতে পারিলেন না। পরে পরিচয় পাইয়া, খুব সমাদর করিয়াই তাঁহাকে গৃহে রাখিলেন। সেদিন অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত দুই বন্ধুর সুখ-দুঃখের কথা আর ফুরায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। পাত্রী অন্বেষণ

সপ্তাহ মধ্যে গ্রামে রটনা হইয়া গেল, নন্দ চাটুয্যে ভাওয়ালপুরে ওকালতী করিয়া একেবারে টাকার 'কুমীর' হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, বিবাহ করিবার জন্য একটি ডাগর মেয়ে এবং ক্রয় করিবার জন্য জমিদারী সম্পত্তি খুঁজিতেছেন, পৈত্রিক ভিটায় এক ইমারত তৈয়ারি হইবে, কলিকাতায় মার্টিন কোম্পানী তাহাব নক্সা প্রস্তুত করিতেছে ইত্যাদি।

এই জনরবের কিছু যে ভিত্তি ছিল না, এমন নহে। দূর-গ্রামবাসী যে ধনী মহাজন বিনয়বাবুদের বিরুদ্ধে ডিক্রী বলে ফুলপুর গ্রাম নিলাম-খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন

তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দর হাঁকিয়াছেন অসম্ভব। দরের কষামাজা চলিতেছে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য কার্ত্তিক মাসে ইষ্টক প্রস্তুত আরম্ভ হইবে, তাহার জন্যও জমি ঠিক হইয়াছে এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর লোক, খুব একটি ভাল মেয়ে খুঁজিয়া দিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন।

একে একে অনেকগুলি মেয়ে দেখা হইল কিন্তু কোনটিই তাদৃশ পছন্দ হইল না। বেশী ডাগর মেয়ে পাড়াগাঁয়ে পাওয়া একটু শক্ত—যাহাও বা দুই একটি আছে, তাহারা সুন্দরী নহে। একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, বয়স ১৪/১৫, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।—আর একটি আছে, খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বয়স তাহার ১২ বৎসর মাত্র। এই দুইটি মেয়ে সম্বন্ধে নন্দবাবু বিষম দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছেন, কাহাকে মনোনীত করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। পাড়ার একজন রসিক ঠাকুর্দ্দা বলিয়াছেন, "তুমি ত কুলীনের ছেলে হে, তার আর ভাবনা কি? ও দুটিকেই বিয়ে করে ফেল, ল্যাঠা চুকে যাক।"

আগামী রবিবারে বিনয়বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। স্বর্ণকার ডাকাইয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া নন্দবাবু বন্ধু-তনয়ের মুখ দেখিবার জন্য একছড়া হার ফরমায়েস দিতেছিলেন, এমন সময় একখানি চিঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বিনয়বাবু প্রবেশ করিলেন। নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, হাসছ কেন?"

বিনয় বলিলেন, "আগে সেকরাকে বিদায় কর, তারপর বলছি।"

স্বর্ণকারকে কয়েকটি গিনি ও উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, "বুঝলে ত, শনিবার বিকেলবেলা হারছড়াটি চাই-ই-চাই—দেখো যেন দেরী না হয়" প্রভৃতি কথায় সাবধান করিয়া নন্দবাবু তাহাকে বিদায় দিলেন। তখন নিরিবিলি পাইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, "ওহে, ডাগর মেযে ডাগর মেয়ে করে হেদুচ্চ, একটি খুব ডাগর মেয়ে আসছে।"

"কোথা আসছে?"

"এই আমাদের বাড়ীতেই আসছে।"

"কোথা থেকে আসছে?"

"কলকাতা থেকে। আমার মেজ শালা হরিভূষণ কলকাতায় থাকেন, তিনি তাঁব স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে খোকার অন্নপ্রাশনে আসছেন। এই মেয়েটি, আমার শালাজ ঠাকুবণেব মাসতুতো বোন। তারা অন্য বাড়ীতে থাকে। সেও এঁদের সঙ্গে আসছে।"

"তুমি দেখেছ সে মেয়েকে?"

"দেখেছি। গত বৎসর কলকাতাতেই দেখেছি।"

"কেমন দেখতে? বয়স কত?"

"দেখতে খুব সুন্দরী যে, তা নয়, তবে মুখশ্রী গড়ন-পিটন, বেশ। কথাগুলি তাব ভারি মিষ্টি। বয়স—এই ষোল কি সতেরো হবে আর কি। কিন্তু, তাই বলে লাফিয়ে উঠো না ভায়া, কিঞ্চিৎ বাধাও আছে।'—বলিয়া বিনয়বাবু ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিলেন।

নন্দলাল উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাধা?"

"তারা ব্রহ্মজ্ঞানী।"

শুনিয়া নিবাশ ভাবে নন্দলাল বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানী! তবে আর কি হবে? বেল পাকলে কাগের কি, বল!—তা, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, হিঁদুর বাড়ীতে যে আসছেন। বাড়ীতে শালগ্রাম আনতে হবে, সহ্য করতে পারবেন?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "সে ওসব ধর্ম্ম-টর্ম্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না—সে হল একজন কবি। মাসিকপত্রে শ্রীমতী কাননবালা দেবী সই-করা কবিতা ছাপা হয়, দেখেছ কখনও?

"কই, না।"

"চিরকাল পড়ে আছ খোট্টার দেশে, বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন খবরই রাখ না!—এ সেই কবি কাননবালা।"

"বেশ লেখাপড়া জানে তা হলে?"

"খুব।—সে কি করতে আসছে জান? পাড়াগাঁ দেখতে আসছে। আজকাল পাড়াগাঁ বর্ণনা করা কবিদের ভারি ফেসান হয়েছে কিনা! যত জেলে কলু হাড়ি মুচির ঘরকন্নার কথা, পানা-পুকুর পচা-ডোবা শেওড়া-বনের বর্ণনা, কবিরা আদা-জল খেয়ে বর্ণনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাননবালা ত কখনও পাড়াগাঁ দেখেনি, চিরকাল কলকাতাতেই মানুষ; ঐ সব বর্ণনা করতে না পেরে অন্য কবিদের কাছে সে হেরে যাচ্ছে। তাই তার খেয়াল হয়েছে পাড়াগাঁ দেখবে। এই যে আমার শালাজ কি লিখেছেন দেখ না"—বলিয়া বিনয়বাবু পত্রখানি নন্দলালের হস্তে দিলেন।

নন্দলালবাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া ধীরে ধীরে পত্রখানি পাঠ করিলেন—শেষে বলিলেন, "তা, এসে দেখুন। পানাপুকুর শেওড়া-বনের কিছু অভাব নেই এখানে। আমরাও এই সুযোগে কবিদর্শন করে' নিই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। কবি-দর্শন

শুক্রবার হইতেই বিনয়বাবু গৃহে জ্ঞাতি-কুটুম্ব-সমাগম আরম্ভ হইল। শনিবার অপরাহ্নে গাড়ীতে হরিভূষণবাবু সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্যালক ও শ্যালকপত্নীকে অভ্যর্থনা করিয়া বিনয়বাবু অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সোনার চশমা চোখে, বছর বাইশ তেইশ বয়সের এক যুবক ব্যাগ হাতে করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ব্যাগটা ধুপ করিয়া ফেলিয়া চৌকির উপর বসিয়া খবরের কাগজ নাড়িয়া নিজেকে হাওয়া করিতে লাগিল "উঃ কি গরম। ফ্যানও নেই দেখছি"—বলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

নন্দবাবু সেইখানে বসিয়া ছিলেন। বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ে আর ফ্যান কোথায় পাবেন। বলুন? এখানে ত বিদ্যুতের কল নেই।"

যুবক বলিল, "গোটাকতক ইয়ষ্ট-ফ্যান এনে রাখলেই হয়। কেরোসিন তেলে চলে। কিংবা টানা-পাখা।"

নন্দবাবু বলিলেন, "তা আছে বইকি,—বড় বড় লোকের বাড়ীতে আছে। আমাদের ত সে অবস্থা সে রকম নয়!"

একথা শুনিয়া যুবক যেন একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, "আর পাড়াগাঁয়ে বোধ হয় অত দরকারও হয় না। চারিদিকে এই সব খালবিল বন জঙ্গল থাকাতে অনেকটা ঠাণ্ডা রাখে। মশায় কি—এই বাড়ীবই—"

নন্দলাল বলিলেন, "না আমি এ বাড়ীর নই। এঁরা আমার বন্ধু, জ্ঞাতিও বটে। আপনার নামটি কি?"

যুবক বলিল, "আমার নাম দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। হরিভূষণবাবু যিনি এসেছেন, উনি সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি হন।"

নন্দলালবাবু বলিলেন, "ওঃ তা বেশ বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন।"—বলিয়া হুকাটি বাড়াইয়া দিলেন।

দেবকুমার বলিল, "সর্ব্বনাশ!—হুঁকোর জাতটি এক্ষণি মারা যাবে। আমি যে ব্রাহ্ম।"—বলিয়া সে হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আমি তামাক খাইনে।"

নন্দলাল বলিলেন, "হলেনই বা ব্রাহ্ম, তাতে কি হয়েছে? হুঁকোর জাত যাবে কেন? ওসব প্রেজুডিস আমার নেই।"

অন্যান্য দুই চারিটি কথার পর নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সঙ্গে কে একটি মেয়ে এসেছেন, তিনি নাকি খুব ভাল পদ্য লিখতে পারেন?"

যুবক বলিল, "কানন? হ্যাঁ, কবিতা লেখে বটে।"

"উনি কি আপনার কেউ হন?"

"আমার মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো বোন। ওঁদের বাড়ীতে আমি মানুষ; তবে এখন আলাদা থাকি বটে।"

মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো বোন পদার্থটা কি নন্দলালবাবু হঠাৎ ধারণা করিতে পারিলেন না। মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিনয়বাবু আসিয়া বলিলেন, "ওহে দেবকুমার, তোমার দিদি ডাকছেন, বাড়ীর ভিতর যাও। মুখ হাত ধুয়ে একটু জলটল খাওগে। কেষ্টা, যা, বাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা।"

দেবকুমার চলিয়া গেলে বিনয়বাবু চুপি চুপি বলিলেন, "যদি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি না থাকে, তবে এই সুযোগ ভায়া। আমি তোমার পথ অনেকটা পরিষ্কার করেও এসেছি।" নন্দবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি রকম?"

বিনয়বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কানন আমায় বললে জামাইবাবু,—আমাকে, আমার শালাজের সম্পর্ক ধরে ডাকে কিনা—বললে জামাইবাবু সাতটি দিন ত আমার মেয়াদ, এই সাত দিনে, পাড়াগাঁয়ে যা কিছু দেখবার আছে আমায় দেখিয়ে দিতে হবে কিন্তু। আমি বললাম বেশ ত, খুব চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াও। সে বললে, আমি কার সঙ্গে যাব? আপনি আমায় নিয়ে যাবেন? আমি মাথা চুলকে বললাম—আমার ত অত সময় হবে না। আমি বরঞ্চ তোমায় একজন গাইড ঠিক করে দিচ্চি। আমারই একজন বন্ধু, প্রবীণ লোক—আর তিনিও কবি। তবে বাঙ্গলা কবি নন, ফার্সী ভাষায় অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা তাঁর আছে।"

নন্দলাল বলিলেন, "এতগুলি মিথ্যে কথা বলেছ?"

"কেন, মিথ্যেটা কি বলেছি?"

"প্রথম নম্বর, আমি নিজে কবি নই। যে সব ফার্সী কবিতা মাঝে মাঝে তোমার কাছে আওড়াই, তা সব বড় কবির রচনা—হাফেজ, সাদী ফির্দৌসী। দ্বিতীয় নম্বর, আমি প্রবীণ লোক নই। আমার বয়স মোটে একচল্লিশ বছর। মাথায় টাক পড়লে আর চশমা নিলেই কি মানুষ প্রবীণ হয়?"

বিনয় বলিলেন, "ওহে বুঝচ না? তোমায় প্রবীণ বলে বর্ণনা না করলে মেয়েটি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইবে কেন? তাবপর, কবিতা-টবিতা বলে তুমি তোমার নবীনত্ব করে দিও এখন।"

নন্দলাল বলিলেন, "ওঁকে নিয়ে রোজ আমায় বেড়াতে যেতে হবে নাকি?"

"হবে না?—নইলে কে নিয়ে যাবে?"

"কেন, ঐ যে ছোকরাটি এসেছে—পিসতুতো বোনের মাসতুতো ভাই নাকি শুনলাম।"

বিনয় বলিলেন, "তাও কি হয়? তোমাকেই যেতে হবে। তুমি কবি শুনে, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মেয়েটি অস্থির হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর কি কোনও ছাপানো ফার্সী কেতাব আছে? আমি বললাম—তা ত জানিনে, একটু পবেই তিনি জল খেতে ভিতরে আসবেন, সেই সময় তুমি বরং জিজ্ঞাসা কোরো।"

নন্দলালবাবু বলিলেন, "তুমি ত ভাল কাণ্ডটি বাঁধিয়ে বসেছ দেখছি! ওসব স্বাধীনতাওয়ালা মেয়েছেলের সঙ্গে আমি কি বেড়াতে পারি? আমার চৌদ্দ পুরুষে কখনও বেড়ায়নি! সে সব আমি পারবো না ভাই। আমরা সেকেলে মানুষ ও সব ইংরিজি ধরণ-ধারণ জানিও না বুঝিওনে; কি বলতে কি বলব, শেষে আমায় একটা জানোয়ার ঠাওরাবে।"

কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা পরে নন্দবাবু যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কাননবালা আসিয়া প্রণাম করিয়া অতি সহজ ভাবে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল, তখন "স্বাধীনতাওয়ালা মেয়েছেলে" সম্বন্ধে নন্দলালবাবুর সকল শঙ্কা দূর হইয়া গেল;—এমন কি, যে যে পত্রিকায় কাননবালার কবিতা ছাপা হইয়াছে, তা যদি সঙ্গে থাকে তবে সেগুলি দেখিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।। ভালবাসায় নূতন থিওরি

বিনয়বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। সোমবার প্রাতের ট্রেনে হরিভূষণবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। দেবকুমার রহিল, সে এক সপ্তাহ পরে মেয়েদের লইয়া যাইবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে কাননবালা সাজিয়া গুজিয়া জুতামোজা পরিয়া নন্দলালবাবুর সঙ্গে পাড়াগাঁ দেখিতে বাহির হয়। চাষাভূষার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মেয়েদের সঙ্গে নানা গল্প জুড়িয়া দেয়, নন্দলালবাবু বাহিরে বসিয়া কলাপাতার নলে দা-কাটা তামাকু সেবন করেন। কাননবালা মাঠে গিয়া চাষাদের লাঙলচষা, পুকুর ধারে দাঁড়াইয়া জেলেদের মাছ ধরা, ছুতার-বাড়ী ছুতার মেয়েদের চিঁড়ে কোটা—এই সব দেখিয়া বেড়ায় এবং প্রশ্নে প্রশ্নে নন্দলালবাবুকে অস্থির করিয়া তুলে। মাঝে মাঝে পকেট হইতে ছোট একখানি খাতা বাহির করিয়া নোট করিয়া লয়। নোটগুলি কতকটা এই ধরনের ঃ—"ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমরে একপ্রকার রঙীন সূতা বাঁধা থাকে, তাহাকে ঘুন্সী বলে। মেয়েরা চেরা বাঁশে নির্ম্মিত এক প্রকার লম্বা গোল (cylindrical) পাত্রে পুকুর ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনে, ঐ পাত্রের নাম ধুচুনী। পল্লীগ্রামে তামাককে গুড়ুক এবং দাড়ি কামানোকে খেউরি হওয়া বলে। বর্ষাকালে বনে জঙ্গলে পাতালফোঁড় নামক একপ্রকার বৃহৎ লাল ফুল (ডাল নাই, পাতা নাই) মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়, অনেক দূর হইতে ইহার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।" ইত্যাদি। শ্রান্ত হইলে পাকা সড়কের পুলের আলিসায় বসিয়া দুইজনে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন।—এক একটির কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে কাননবালা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; খাতা বাহির করিয়া সমগ্র কবিতাটি অর্থসহ লিখিয়া লয়। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

দেবকুমার নন্দবাবুর সহিত বৈঠকখানাতেই শয়ন করিত। একদিন রাত্রে সে বলিল "নন্দবাবু, আপনি শুনলাম অবিবাহিত?"

নন্দবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ।"

"আপনি শুনলাম একটি বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে খুঁজছেন, কিন্তু মনের মতনটি পাচ্ছেন না।"

নন্দলালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি ঘটকালি করবে নাকি?"

দেবকুমার বলিল, "যদি বলেন ত পারি বইকি! আচ্ছা, আপনার ত ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কোনও প্রেজুডিস নেই সেদিন বললেন। যদি একটি বয়স্থা সুন্দরী ব্রাহ্ম মেয়ে পান তা হলে কোনও আপত্তি আছে কি?"

নন্দবাবু বলিলেন, "কোথা সে মেয়ে?"

দেবকুমার বলিল, "এই ধরুন, আমাদের কাননবালার কথাই যদি বলি। ওর জন্যে একটি ভাল পাত্র দরকার ত!

নন্দলালবাবু বলিলেন, "তা, আমাকে কি তুমি ভাল পাত্র ঠাওরালে?"

'কিসে নয়? বিদ্যায়, অর্থে, পদমর্য্যাদায়—"

"আমার বয়স চল্লিশ বৎসর।"—কথা সংক্ষেপ করিবার জন্যই নন্দলালবাবু একচল্লিশ স্থানে চল্লিশ বলিলেন, অথবা বলিবার ভুল, তাহা আমরা অবগত নহি।

দেবকুমার বলিল, "চল্লিশ আর বেশী বয়স কি? আমাদের সমাজে ত লোকে নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জনক্ষম না হলে বিবাহই করে না। চল্লিশ বৎসরে প্রথম বিবাহ ত আমাদের সমাজে ঢের লোকেরই হয়।"

নন্দলাল বলিলেন, "বয়স সম্বন্ধে আপত্তি না হলেও, অন্য সব বিষয়ে ত আপত্তি হতে

পারে। রূপে, গুণে কিসে আমি কাননবালার যোগ্য? ওর মা বাপের যদি আপত্তি নাও হয়, ওর নিজের ত আপত্তি থাকতে পারে!"

দেবকুমার হেঁ হেঁ হেঁ করিয়া হাসিতে লাগিল।

নন্দবাবু বলিলেন, "হাসছ যে?"

দেবকুমার বলিল, "আপনার কথা শুনে। বললেন কিনা, কানন কি আমায় পছন্দ করবে?—তাই হাসি পেল।"

নন্দবাবু বলিলেন, "কেন। তাতে হাসবার কারণ কি হল?"

"সে কথাটা গোপনীয়। আপনাকে বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি। আচ্ছা, বলিই না হয়। কিন্তু কাউকে আপনি বলবেন না প্রতিজ্ঞা করুন।"

নন্দবাবু অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা কাউকে বলব না। কথাটা কি?"

দেবকুমার উঠিয়া, নিজের মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া, নন্দলালবাবুর মশারিতে মুখ চাপিয়া তাঁহার কানের কাছে বলিল "আপনাকে কাননের ভারি পছন্দ হয়েছে।"

নন্দলালবাবু উচ্চ শব্দে বলিয়া উঠিলেন—"ধুৎ!"—কিন্তু তাঁহার বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্‌ করিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল, "সত্যি বলছি আপনাকে।"

নন্দ বলিলেন, "যাও যাও ঠাট্টা করতে হবে না। কিসে বুঝলে শুনি?"

"এ আর বোঝাবুঝি কি? কাননের কথাতেই আমি বুঝেছি।"

"কথাতেই? কি বলেছে সে?"

"আপনার কথা সে যে রকম করে' বলে, তাতেই বেশ বুঝতে পারা যায়। আপনার সুখ্যাতি তার মুখে আর ধরে না। আপনার ফার্সী কবিতা শুনে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। সে স্পষ্টই আমাকে বলেছে নন্দবাবুকে আমি ভালবাসি। আমার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ওর ভাব কিনা, এক বাড়ীতে ছিলাম, একসঙ্গে খেলা করেছি—আমার কাছে ওর কোন কথাই গোপন নেই। এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছে—উনি ত একটি ডাগর মেয়ে খুঁজছিলেনই, কি জানি যদি আমাকে ওঁর পছন্দই হয়, আমাকে প্রোপোজই করেন, আমার বাপ মা রাজি হবেন ত?—এই ত অবস্থা মশায়। আপনাকে খুলেই বললাম—দোহাই আপনাব কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

নন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য ত!"

"আমারই প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল যে আপনার দিকে ও এ-রকম ঢলে পড়লো কেন! তারপর ভেবে-চিন্তে কাবণটা বেশ জলের মত বুঝতে পারলাম। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরিই আছে কিনা।"

"কি থিওরি?"

"থিওরিটা এই। দুই আর দুই—চাব। তিনও নয়, পাঁচ নয়। সেই রকম, উপযুক্ত বয়সের ও সামাজিক অবস্থার একজন মেয়ে কবি আর একজন পুরুষ কবিকে একসঙ্গে করে' দিন—তারা পরস্পরকে ভালবাসবেই বাসবে। কিন্তু অন্য কিছু হলে, হবে না, দু'জনেই কবি হওয়া চাই। কবিদের প্রাণটা ভারি মোলায়েম কিনা! আপনিও কবি—না—প্রতিবাদ করবেন না—পাখী সব কবে বব রাতি পোহাইলো, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিলো—ইলো আর টিলো মিল করতে জানলেই কবি হয় না। যার কবির হৃদয় আছে সেই কবি—সেই হিসাবে আপনি কবি। দুজনেই কবি—সুতরাং দুই আর দুইয়ে চার হয়েছে; এ আর নতুন কথা কি?"

নন্দবাবু নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবকুমার আধ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"নন্দবাবু।"

"কি?"

"একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—একথা মানেন ত?"

নন্দবাবু ভাবলেন, আমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে কোনও আপত্তি হইবে কিনা, তাহা জানিবার জন্যই বোধ হয় জেরা করিতেছে। বলিলেন, "মানি বইকি।"

দেবকুমার বলিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—এখানেও তিনি উপস্থিত। আপনি ঈশ্বরসাক্ষী বলুন দেখি, কাননবালার প্রতি এ ক'দিনে আপনার কিঞ্চিৎ প্রেমভাব হয়েছে কি না?"

কয়েকমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নন্দবাবু বলিলেন, হয়েছে।

দেবকুমার বলিয়া উঠিল, "তা হলে, আমার থিওরি নিঃসংশয়েই প্রমাণ হয়ে গেল। আপনারা যখন পরস্পরকে ভালবেসেছেন, তখন এর একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—বিবাহ। কথাটা আপনি ভেবে দেখবেন নন্দবাবু। আজ আর এ বিষয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কাল দুজনে কোনও সময়ে নিরিবিলিতে একথা হবে।"—বলিয়া দেবকুমার পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল।

নন্দলাল কিন্তু সারারাত্রি চক্ষুর পাতা বুজিতে পারিলেন না।

পরদিন নিভৃতে দেবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "ভায়া, কাননকে আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'প্রোপোজ' কি করে' করতে হয় আমি তা কিছুই জানিনে। ওঁর বাপ মাকে চিঠি লিখব?—না, কি করবো?—আমি ত ভাই এ সব ব্যাপারে একেবার আনাড়ি, কি করতে-টরতে হবে সব আমায় বলে দাও।"

দেবকুমার বলিল। "আমরা ত আজ রাত্রের ট্রেনেই চললাম—দু'চারদিন পরে আপনাকেও তা হলে কলকাতায় আসতে হয়।"

"তার পর?"

"ওঁদের বাড়ী আপনাকে আমি নিয়ে যাব, ওঁর বাপ মার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি যাতায়াত আরম্ভ করবেন।"

"তার পর?"

দেবকুমার বলিল, "যাতায়াত করতে করতে, একদিন সুযোগ বুঝে, কাননের কাছেই আপনি 'প্রোপোজ' করবেন।"

"তার পর?"

"কানন রাজি হলে,—রাজি ত হবেই, ও ত আপনারই দিকে—তার পর ওর বাপ মাকে বলতে হবে। তাঁদের মন আমি আগে থাকতেই ভিজিয়ে রাখব এখন। তাঁরা সম্মতি দিলেই বিবাহ স্থির হবে—অর্থাৎ আমরা যাকে এনগেজমেণ্ট বলি তাই হবে।"

"তার পর?"

"তার পর থেকেই ওঁরা আপনাকে প্রায়ই আহারের নিমন্ত্রণ করবেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি ছুরি কাঁটা ব্যবহার করতে জানেন ত? ওঁরা আবার টেবিলে খান কিনা।"

"না, ছুটি কাঁটা ত কখনও ধরিনি ভাই।"

"আচ্ছা, সে আপনাকে আমি শিখিয়ে নেব। এমন কিছু শক্ত নয়। দু'চারদিন অভ্যেস করলেই হবে—আপনি কলকাতায় আসুন ত। ভাল কথা—রামপাখী-টাখী আপনার চলে?"

নন্দলাল বলিলেন, "না, ভাই। মুসলমান রাজ্যে থাকি বটে, কিন্তু ওটা ত কখনও খাইনি। না খেলে কি—নিতান্তই—চলবে না?"

দেবকুমার একটু চিন্তিত হইয়া বলিল, "চলা একটু শক্ত বটে। আর কিছু নয়, ওঁরা মনে করতে পারেন, লোকটা ভারি কুসংস্কারাপন্ন। আজকাল না খাচ্চে কে? ওটা আর শিখে নিতে পারবেন না?"

"তা, নেহাৎ যদি দরকার হয়, না হয় শিখেই নেব। তার জন্যে আটকাবে না।"

সারাদিন ধরিয়া দুজনে নানারূপ পরামর্শ চলিল। স্থির হইল, দেবকুমার কলিকাতায়

পৌঁছিয়াই ইঁহার জন্য একটি ছোটখাট বাড়ীর সন্ধান করিবে। বাড়ী ও চাকর বামুন ঠিক করিয়া সংবাদ দিলেই নন্দলালবাবু কলিকাতা যাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।। সমাজ-সমস্যা

দেবকুমার, কাননবালা প্রভৃতিকে লইয়া রাত্রের ট্রেনেই কলিকাতা চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিনয়বাবুও একটু কাজে গ্রামান্তর গমন করিলেন, দুই তিনদিন পরে ফিরিবেন।

নন্দলালবাবুর মনটা বড় উদাস। কিছুই আর ভাল লাগে না। লোকজন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বিরক্ত হন। কোথাও বাহির হন না—বৈঠকখানায় বারান্দায় চুপটি করিয়া বসিয়া তামাক খান, আর মনের মধ্যে কাননবালাকে ধ্যান করেন। কবে সে কোন্ মিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল, দিনে দশবার তাহাই মনে পড়ে। কেবলই কল্পনা করেন, কাননের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, কানন তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহখানি আলো করিয়া রহিয়াছে। সুখের ও আনন্দের পার নাই কূল নাই—ভাবিতে ভাবিতে নন্দবাবু বিহ্বল হইয়া পড়েন। খালি মনে হয়, কানন এখন কলিকাতায় কি করিতেছে, তাঁহারই কথা ভাবিতেছে কি না! কলিকাতায় যাইবার জন্য, কাননকে আবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তিনদিন পরে বিনয়বাবু বাড়ী ফিরিলেন। বন্ধুর মনটি উদাস দেখিয়া বলিলেন—"ভায়া তুমি যেন একটু হতাশ হয়েচ মনে হচ্চে। আমি বলি কি, ঐ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মেয়েটিকেই বিয়ে করে ফেল। আমি শুনলাম, অন্য মেয়েটির চেয়ে রূপে একটু খাটো হলেও গুণে সেটুকু পুষিয়ে নিয়েছে। আমার স্ত্রী বলছিলেন, মেয়েটির স্বভাবটি ভারি নরম—যেমন বুদ্ধি বিবেচনা সেবা যত্ন করতেও তেমনি পটু। কি বল, কথা দেবো ওর বাপকে?"

নন্দলালবাবু বলিলেন, "না ভাই, থাক। আমি ওকে বিয়ে করতে চাইনে।"

"তবে? কাকে বিয়ে করতে চাও?"

"যাকে চাই, তাকে দিতে পারবে?"

"কাকে চাও, শুনি?"

"কাননবালাকে।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "বল কি হে? অ্যাঁ! ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবে? জাতটি যাবে যে!"

"জাত গেল ত বয়েই গেল।"

বিনয় কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ও কি কথা হে? সত্যি বলছ তুমি?"

নন্দবাবু যেন একটু অধীর হইয়াই বলিলেন, "তোমার যে অন্ত পাওয়া ভার দেখছি। গোড়ায় তুমিই বলেছিলে খাসা একটি ডাগর মেয়ে আসছে, যদি বিয়ে করতে চাও ত এই সুযোগ!—এখনও এ রকম কথা বলছ কেন?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "আমি তখন আমোদ করে বলেছিলাম বইত নয়। আমি কি তখন জানি যে সত্যিই তুমি ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপবে—বিশেষ এই বয়সে?"

ইহার পর নন্দলাল নিজের মনের অবস্থাটা অল্পে অল্পে সবই বিনয়বাবুকে বলিলেন। দেবকুমার যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছে—সকল কথা নয়—তাহারও কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, "তাইত হে, বুড়ো বয়সে তোমায় এ রোগে ধরলো? এ ত বড় সোজা রোগ নয়!"

নন্দ বলিলেন, "রোগ ত সোজা নয়ই;—আরোগ্য হতেও ইচ্ছে করে না।"

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও রোগের লক্ষণই ত তাই ভায়া। তা, তোমার মনের ভাব যখন ও রকমটাই দাঁড়িয়েছে, তখন বিবাহ কর, আমি বাধা দেবো না। আর ব্রাহ্ম

হলেও ব্রাহ্মণের মেয়ে ত বটে। ওর বাপ ব্রাহ্ম হবার আগে মস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিয়েটা ত হয়ে যাক, তার পর দুজনে একটা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত করে নিও। ফুলপুর যদি তোমায় কিনে দিতে পারি—আশা ত আছে পারবো—তখন তুমি হবে গ্রামের জমিদার; কোনও ব্যাটা ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না। ভট্‌চায্যি মশায়দের—"

নন্দলাল বলিলেন, "তাই হবে। সেই ব্যবস্থাই হবে। শুভকর্ম্মটা ত আগে হয়েই যাক। এখন থেকে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে দরকার নেই।"

বিনয় হাসিয়া বলিলেন, "যে রকম শুনছি, সে ত হয়েই গেছে ধর। কথায় বলে গাইবাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ খাওয়ায়।"

নন্দলাল কৃত্রিম রোষে বলিলেন, "চুপ! এটা কি একটা উপমা হল?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "কেন, মন্দ কি হল? তুমি একটা উপমা দিলে, তাই আমিও একটা দিলাম।—সম্পর্কে গাই বাছুর না হলেও, বয়সে ত বটে!"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

দুই দিন ধরিয়া উভয় বন্ধুতে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। স্থির হইল, এখন বিবাহ করিয়া দেশে না আসিয়া, কলিকাতা হইতেই ভাওয়ালপুরে চলিয়া যাওয়া ভাল। বাড়ীখানি তৈয়ারি হইতেও অন্ততঃ পক্ষে বছরখানেক লাগিবে। ফুলপুরের বর্ত্তমান অধিকারী এখন যেরূপ মূল্য হাঁকিয়েছেন, কিছুদিন চুপচাপ থাকিলে সে মূল্যও কিছু কমিতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া এখন দুই তিন বৎসর এখানে বধূসহ না আসাই ভাল।

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে দেবকুমারের পত্র আসিল, বাড়ী প্রভৃতি ঠিক হইয়াছে। নন্দলালবাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বিনয়বাবু ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।। ভ্রান্তি-নিবাস

আজ একমাস নন্দবাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন। কাননবালার পিতা সুরেশবাবুর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, যাতায়াতও আরম্ভ করিয়াছেন। কাননের মাতা বলিয়া থাকেন—"লোকটি ভারি চমৎকার। এমন সরল আর অমায়িক যেন ছেলেমানুষটি।" প্রায়ই বিকালবেলা উহাদের বাটীতে যান। ভাওয়ালপুর রাজ্যের নানাবিধ গল্প করেন, ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন; কাননবালা একখানি মস্ত খাতায় ইঁহার নিকট শ্রুত ভাল ভাল ফার্সী টুকিয়া রাখে। খাতা প্রায় ভরিয়া আসিল। সে ইঁহার নিকট ফার্সী কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যে যে মাসিকপত্রে কাননের কবিতা বাহির হয়, নন্দবাবু তাহার সকলগুলির গ্রাহক হইয়াছেন। কাননের অনেক কবিতা তিনি ফার্সীতে তর্জ্জমাও করিয়াছেন। শীঘ্র সেগুলি বহি করিয়া ছাপাইবেন।

কিন্তু একটা বিষয় নন্দবাবু কিছুই বুঝিতে পারেন না। দেবকুমার, কাননের মনের ভাবের যে সংবাদ দিয়াছিল, অদ্যাবধি কাননের ব্যবহারে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যচিহ্ন নন্দবাবু দেখিতে পান না। ভাবেন, দেবু কি তবে উপহাস করিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিল? না, তরুণীর স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃই কানন তাহার মনোভাব প্রকাশ করে না?—নন্দবাবু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

একদিন তাঁহার পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হইল। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সুরেশবাবু স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, কানন বাড়ী আছে। কাননের সঙ্গে বসিয়া তিনি গল্পগুজব ও কাব্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর ছাদে জ্যোৎস্নায় বেড়াইতে বেড়াইতে, নন্দবাবু কাননকে নিজের মনের কথাটি বলিলেন।

শুনিয়া কাননবালা যেন কাঠ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কথা কহিতে পারিল না।

নন্দবাবু বলিলেন, "বল কানন, উত্তর দাও। আমি নিজেকে তোমার পায়ের কাছে রেখে দিলাম। বল কানন, তুমি আমায় নেবে কি না। এ দেড় মাস, দিনে তুমি আমার ধ্যান, রাত্রে তুমি আমার স্বপ্ন—তোমার আশাতেই আমি প্রাণ ধরে আছি। বল, তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে কি না।"

এইবার কাননের চক্ষে জল আসিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নন্দবাবু, এ কথা আপনি আমায় কেন বলছেন?—ছি ছি আর বলবেন না। বড় ভাইকে কিংবা অন্য কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে লোকে যে চোখে দেখে, আমি যে এতদিন আপনাকে ঠিক সেই চোখেই দেখে এসেছি। আপনার কাছে আমি কত শিখেছি—আমি ছাত্রী, আপনি গুরু—আপনার আমার মধ্যে এই সম্পর্কই ত এতদিন জানতাম!"

নন্দলাল বলিলেন, "কানন, তোমার আমার মধ্যে বয়সে যা তফাৎ তাতে আমাকে ওরকম মনে করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। আমি তোমার নিতান্তই অযোগ্য, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু যে অযোগ্য, তাকে কি খুব সামান্য একটুখানি ভালবাসা যায় না? আমি এমন বলছিনে যে আজ থেকেই তুমি আমাকে, লয়লা যেমন মজনুকে ভালবাসতো, সেই ভালবাসা আমায় দাও। আমি খুব সামান্য পেলেও এখন বেঁচে যাই কানন। তুমি আমার গৃহিণী, হও—হয়ত কালক্রমে—"

কানন বলিয়া উঠিল, "তা অসম্ভব নন্দবাবু—তা একবারেই অসম্ভব। আপনি আমার কাছে যা চাচ্ছেন—তার কণামাত্র আপনাকে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

নন্দবাবু বলিলেন, "এখনি না হোক—পরে যদি—"

কানন প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "সারা জীবনেও তা পারবো না নন্দবাবু। আপনি আমায় মাফ করুন। আমাব অপরাধ নেবেন না। আমি ত—জানতাম না নন্দবাবু। আমি যে কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।"

নন্দলালবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর বলিলেন, "তুমিই আমায় মাফ কর কানন। আমারই ভারি ভুল হয়ে গেছে। যদিও জিজ্ঞাসা করবার আমার কোনও অধিকার নেই—তুমি কি—আর কাউকে—

কানন বলিল, "ও কথা জিজ্ঞাসা করবার আপনার খুব অধিকার আছে নন্দবাবু। আপনাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত মনে করি।"—তাহার পর কানন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিল—"আপনি—যা অনুমান করেছেন—তাই ঠিক।"

"তিনি কোথায়।" "বিলাতে। তিন মাস পরে ফিরে আসবেন।"

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা কানন—এখন তবে আসি।"

কানন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "এখনি যাবেন?—কলকাতায় এখন আছেন ত?"

"না, কালই চলে যাব।" "ফুলপুর যাবেন?"

"হ্যাঁ। সেখানে দুই একদিন থেকে কাজকর্ম্ম সেরে আবার ভাওয়ালপুরে চলে যাব।"

"আবার কবে আসবেন?" "তা ঠিক নেই।"

কানন নিজ হাতখানি তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বলুন নন্দবাবু, আমায় ক্ষমা করলেন?"

নন্দবাবু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে হয়েছে। বিয়ের সময় আমায় খবর দিও—ভুলো না।"

কানন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আসবেন নন্দবাবু?"

"পারি যদি। এখন আসি তবে।" কানন নীরবে তাঁহাকে সিঁড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

পরদিন ফুলপুরে ফিরিয়া নন্দলাল, বিনয়বাবুকে সব কথাই বলিলেন। শুনিয়া তিনি

বলিলেন, "বটে!—এ সবই তা হলে ঐ দেবাটার কারসাজি। কাল রাত্রেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, দেবা এক সময় কাননকে বিয়ে করবার জন্যে মহা ক্ষেপেছিল,—কানন রাজি হয়নি—একটি ছেলের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই নাকি ওর ভাব, তাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিয়ে করবে না। সেই ছেলেটিই বোধ হয় বিলেত গেছে।"

নন্দবাবু বলিলেন, "সম্ভব। সেই আক্রোশে, নিজে না পেলে নাই পা'ক, তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে সমাজে তাকে অপদস্থ করবার মৎলবেই দেবা বোধ হয় এই ফন্দিটি এঁটেছিল।"

পরদিন বিনয়বাবু বলিলেন, "ওহে, আজ আমি একটি মেয়ে দেখে এলাম, দিব্যি চেহারা। আর বয়সও ১৫/১৬—ও তোমার কাননবালা কোথায় লাগে তার কাছে! যতই যা বল না কেন, কাননবালার রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—তার বেশী নয়। এবার যেটি দেখে এলাম, যেমন মুখ চোখ, তেমনি গড়ন, টক্ টক্ করছে রঙ—যেন ইহুদীদের মেয়ে। বংশও ভাল। আমি তোমার কথা বলাতে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। বীরপুরের বাঁড়ুয্যেরা আর কি। উঁচু বংশ কিন্তু এখন অবস্থা খারাপ। সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেল ভায়া। গতস্য শোচনা নাস্তি—ওসব যা হয়েছে ভুলে-টুলে যাও।"

নন্দলাল বলিলেন, "না ভাই, সে আমি পারবো না। আর না।"

দুইদিন ধরিয়া বিনয়বাবু নন্দলালকে অনেক জপাইলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। নন্দলাল ভাওয়ালপুর চলিয়া গেলেন।

পর বৎসর কাননবালার বিবাহ-সভায় দেখা গেল, রাশিকৃত উপহারদ্রব্যের সহিত বহুমূল্য কিংখাবে বাঁধানো, সোনার ক্লাচ্ দিয়া আঁটা একখানি পুস্তক। বহিখানির বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিমন্ত্রিতগণ সকলেই সেখানিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। সুন্দর পার্চ্চমেন্ট কাগজে উজ্জ্বল কালিতে ছাপানো ফার্সী কবিতা। কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। হাইকোর্টের জনৈক মুসলমান উকিল অবশেষে সেখানির পাঠোদ্ধার করিয়া বলিলেন—"এগুলি প্রেমের কবিতা। নূতন কবিতা বলিয়াই বোধ হইতেছে—কখনও পড়ি নাই। রচয়িতার নামও ইহাতে ছাপা নাই; একটা ছদ্মনাম মাত্র আছে—তাহার অর্থ—ব্যথাতুর।"

[আষাঢ়, ১৩২৫]

নয়নমণি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আশ্বিন মাস, বেলা ৯টা বাজিয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। কাশী, বাঙ্গালীটোলায় একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গৃহে, দ্বিতলের রন্ধনশালায় ১৫/১৬ বৎসর-বয়স্কা একটি মেয়ে, বঁটি পাতিয়া বসিয়া কুটনা কুটিতেছে। মেয়েটি সুন্দরী। চোখ দুটি বেশ ডাগর, কিন্তু যেন বড় বিষণ্ণ। পরিধানে একখানি চৌড়া লাল .পাড় শাড়ী। স্নান হইয়া গিয়াছে, আর্দ্র কেশগুলির অধিকাংশ পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, দুই চারি গুচ্ছ স্কন্ধ বেড়িয়া সম্মুখে আসিয়া বক্ষের নিকট দুলিতেছে। দুই হাতে দুইগাছি ডায়মণ কাটা সোনার বালা, আর কতকগুলি রেশম চুড়ি। বাঁ হাতে একটি সোনা বাঁধানো "সাবিত্রী লোহা"। উপর হাতে দুই গাছি আঙুর পাতা প্যাটার্ণ কুকুরমুখো তাগা, গলায় একগাছি ছোট চেন-হার।

মেয়েটি কুটনা কুটিতেছে। অদূরে চুল্লীর উপর পিতলের কড়াইয়ে সেরখানেক দুধ চড়ানো আছে। কয়লাগুলি এখনও ভাল করিয়া ধরিয়া উঠে নাই, অল্প অল্প ধূম বাহির হইতেছে। একে মেঘ করিয়া গুমট হইয়া রহিয়াছে, ছোট ঘরখানিতে উনানভরা কয়লা পুড়িতেছে—মেয়েটির কপালে ক্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। দ্বারের বাহিরে একটি সাদা বিড়াল চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি কুটনা কুটিতে কুটিতে এক একবার তাহার সেই বিষণ্ণ আয়ত চক্ষু দুটি তুলিয়া উন্মুক্ত দ্বাবপথে বিপরীত দিকের বারান্দা পানে চাহিতেছে; তথায় কম্বলের উপব তাহার বৃদ্ধ পিতা বসিয়া আপন মনে হরিনামের মালা ফিরাইতেছেন।

আলু বেগুন উচ্ছে ও কাঁচাকলাগুলি কোটা হইয়া গেল। মেয়েটি তখন উঠিয়া, একটি ভাঙ্গা পাখা লইয়া চুল্লীর মুখে মৃদু মৃদু বাতাস দিতে লাগল। দেখিতে দেখিতে কয়লাগুলি গণ্ গণ্ করিয়া ধরিয়া উঠিল। এমন সময় বারান্দা হইতে বৃদ্ধ হাঁকিলেন—"নয়ন।"

মেয়েটির নাম নয়নমণি। "কেন বাবা?"—বলিয়া সে দ্বারেব বাহিরে গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "একটু তামাক সেজে দিতে পাব মা?"

"দিই বাবা"—বলিয়া নয়নমণি ক্ষিপ্রপদে অপর বারান্দায় পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তথা হইতে আবশ্যক উপকরণগুলি লইয়া আবার রান্নাঘরে আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। দুধটুকু ইতিমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। নয়ন তখন তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিয়া, হাতা দিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল।

ওদিকে তামাকু-পিয়াসী বৃদ্ধ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। হাঁকিলেন—"তামাক সাজা হল?"

"যাই বাবা"—বলিয়া নয়নমণি কলিকাটি উঠাইয়া লইয়া ফুঁ দিতে দিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। হুঁকাটি দ্বারের কোণে দাঁড় করানো ছিল, তাহাতে কলিকাটি বসাইয়া পিতার হস্তে দিল।

বৃদ্ধ ধূমপান করিতে লাগিলেন। নয়ন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার হরিনাম হয়েছে বাবা?"

"হয়েছে।"

"দুধও জাল হয়েছে। নিয়ে আসি?"

"দাঁড়াও, তামাকটা আগে খেয়ে নিই।"

"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ দুধটুকু জুড়োতে দিইগে বাবা।"—বলিয়া নয়ন রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বসিয়া আরামে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এই বৃদ্ধের নাম হরিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, নিবাস যশোহর জিলার দুজাপুর গ্রামে। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরি করিতেন, দশ বৎসর পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইঁহার পুত্র

নাই; তিন কন্যা—রতনমণি, গৌরমণি এবং এই নয়নমণি। বড় এবং মেঝ মেয়ে বিধবা—ইঁহার নিকটেই থাকে। ছোট মেয়ে সধবা হইয়াও বিধবা; বিবাহ হইবার এক বৎসর পরে ইহার স্বামী কোথায় পলাইয়া গিয়াছে; অদ্যাবধি তাহার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। সে আজ চারি বৎসরের কথা। ইহার কয়েক মাস পরে বুড়ার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। এই সকল ব্যাপারে মনের দুঃখে হরিকিঙ্কর দেশের বাড়ী বাগান জমিজমা বিক্রয় করিয়া, কাশীতে এই বাড়ীখানি কিনিয়া, মেয়ে তিনটিকে লইয়া আজ তিন বৎসর কাশীবাস করিতেছেন।

নয়নমণি কড়াই নামাইয়া, সেই ফুটন্ত দুধ হাতায় করিয়া একটি বড় পাথরের খোরায় ঢালিতে লাগিল। পোয়া দেড়েক দুধ লইয়া কড়াইটি সরাইয়া, তারের 'ঢাকা' চাপা দিয়া একটি কোণে রাখিল। খোরাটি অল্প অল্প হেলাইয়া পাখার বাতাস করিয়া, দুধটুকু জুড়াইল। পরে একটি কাঁসার বাটিতে সেটুকু ঢালিয়া পিতার নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'টা বাজল?"

নয়ন একটু সরিয়া, পিতার শয়নঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন ক্লকটির পানে চাহিয়া বলিল, "সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। প্রায় পৌনে দশটা।"

"উঃ—এত বেলা হয়েছে। আকাশটা মেঘলা করে রয়েছে কিনা, তাই বেলা বোঝা যাচ্ছে না।"—বলিয়া তিনি দুগ্ধটুকু নিঃশেষিত করিলেন।

নয়নমণি জল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার হাত মুখ ধোয়াইয়া তাঁহাকে গামছা দিল।

হাত মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, এত বেলা হয়ে গেছে দশটা বাজে, রতনমণি গৌরমণি এখনও স্নান করে, ফিরলো না কেন? এত দেরী ত কোনও দিন হয় না।"

"ফিরবে এখনি, বোধ হয় কোথাও ঠাকুর-টাকুর দেখতে গেছে'—বলিয়া নয়নমণি পিতার জন্য পান আনিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশাশ্বমেধ ঘাটে শত শত নরনারী—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারাহাট্টি, মাড়োয়ারী—স্নান করিতেছে। বৃদ্ধগণ উচ্চৈস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া, শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রস্তর সোপানে আহ্নিক করিতে বসিতেছেন। অনেকে ঘাটওয়ালাদের নিকট গিয়া দুই এক পয়সা দিয়া, কপালে ফোঁটা তিলক লইয়া প্রস্থান করিতেছে।

রতনমণি ও গৌরমণি যুবতী। উভয়ের বিধবা বেশ। রতনের শ্যামবর্ণ দেহখানির মধ্যে স্বাস্থ্য যেন টলমল করিতেছে, মাথায় চুলগুলি পুরুষ মানুষের মত ছোট, ভ্রূযুগলমধ্যে ক্ষুদ্র একটি উল্কির চিহ্ন, হাতে ভিজা গামছা। গৌরমণি ক্ষীণাঙ্গী, রঙটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, কক্ষে গঙ্গাজলপূর্ণ ছোট একটি পিতলের কলসী।

দশাশ্বমেধের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া, দুই বোনে কালীতলার দিকে চলিল। সেখানে তরকারীর বাজার বসিয়াছে। চলিতে চলিতে রতনমণি কোনও দোকান হইতে দুই ফালি বিলাতী কুমড়া, কোনও দোকান হইতে শাক, বেগুন প্রভৃতি কিনিয়া গামছাখানিতে বাঁধিয়া লইতে লাগিল। বাজার করা শেষ হইলে, দুই বোনে বাঙ্গালীটোলার একটি গলি ধরিয়া চলিল।

কিছুক্ষণ চলিয়া সহসা উভয়ে পথের মাঝে দাঁড়াইল। সম্মুখে অল্পদূরে একটি শিবমন্দির, তাহারই উচ্চ বারান্দায় ভস্মমাখা দেহ এক সন্ন্যাসী বসিয়া; নিম্নে পথের উপর গলাখোলা কোট গায়ে এক বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে। দুই ভগিনী সেই যুবকটির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

রতনমণি মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁলা, ও কে বল্ দেখি?"

গৌরমণি লোকটিকে আর এক নজর দেখিয়া উত্তর করিল, "আমাদের বিনোদ না?"

রতন বলিল, "সেই ত! আমি ত দেখেই চিনেছি। আচ্ছা চল্ দিকিন, একটু এগিয়ে ভাল করে' দেখি।"

গৌরমণি বলিল, "নিশ্চয়ই সে-ই দিদি। দেখছ না ঠিক সেই রকম মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কথা কচ্ছে—ও বিনোদই বটে।"

রতনমণি বলিল, "আচ্ছা চল্ না, একটু কাছে যাই। ওলো দেখ্ দেখ্ আমাদের পানে তাকাচ্চে, মুখ নীচু কল্লে। আমাদের চিনেছে বোধ হয়।"—বলিয়া বতনমণি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যুবক তাঁহাকে প্রণামান্তব বিদায় লইয়া, হন্ হন্ করিয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ কবিল। রতনমণি চীৎকার করিয়া উঠিল—"বিনোদ, ও বিনোদ্—যাও কোথা? বলি শোন শোন।"

যুবক তথাপি থামিল না। রতনমণি তখন প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল—" ওগো—ও কোট-গায়ে বাবু—দাঁড়াও—পালাও কোথা—কনষ্টেবোল—এ কনষ্টেবোল!"

বলা বাহুল্য, সে গলির ত্রিসীমানায় কোনও কনষ্টেবোল ছিল না। যুবক কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিল; দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি আপনি ডাকছেন?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ"—বলিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে রতনমণি কাছে আসিয়া পৌঁছিল। পথচারী দুই চারিজন নরনাবীও ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দাঁড়াইল। যুবকেব মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রতনমণি জিজ্ঞাসা কবিল, "কবে এলে বিনোদ?"

যুবক বলিল, "আমি ত এইখানেই থাকি।"

"কোথায় থাক?"

"বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে। কিন্তু এ সকল কথা আপনি আমায় কেন জিজ্ঞাসা কবছেন? আমি ত আপনাকে চিনিনে। তা ছাড়া, আমার নাম বিনোদও নয়। আমাব নাম সুধীব—শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু।"

রতনমণি বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ তোমায় আর চালাকি করতে হবে না। তুমি বিনোদ নও! তুমি সুধীরচন্দ্র বসু—কায়েত্। তুমি কায়েত যদি, তবে কোটের গলার ফাঁক দিয়ে ঐ পৈতে দেখা যাচ্ছে কেন?"—পথচারী লোকেরা নিকটস্থ হইয়া, সত্যই লোকটির গলায় পৈতা আছে কি না দেখিবার জন্য গলা বাড়াইল।

যুবক সহসা কোটের ফাঁকে হাত দিয়া পৈতাটি ভিতরে ঢুকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আজকাল কায়েতরাও পৈতে নিচ্চে যে। কায়েতরা আসলে ক্ষত্রিয় কিনা! আপনাব ভুল হয়েছে, আমার নাম বিনোদ নয়। একটু তাড়াতাড়ি আছে—আচ্ছা এখন তবে চললাম।"—বলিয়া যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিল।

রতন এক লম্ফে অগ্রসর হইয়া, যুবকের কোটের পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া বলিল, "খপর্দ্দার—এখান থেকে এক পা নড়েছ কি চেঁচামেচি কবে, লোক জড় করব।"—পাঁচ সাতজন লোক তৎপূর্ব্বেই সেখানে জমিয়া গিয়াছে।

যুবক সেই লোকগুলির পানে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া, একটু রুষ্টস্বরে বলিল, "আপনি দেখছি বিষম ভুলে পড়ে গেছেন। চেঁচিয়ে লোক জড় করে' আর কেলেঙ্কারী করবেন না, কি চান আপনি বলুন। আমি কিন্তু আপনাকে চিনিও না—দোহাই আপনার।"

রতনমণি বলিল, "তা চিনবে কেন? নিজের স্ত্রীর বড় বোনকে চিনবে কেন? এই তোমার ছোট শালী গৌরমণি—একে চেন, না তাও চেন না? চেনাচেনি পরেই হবে না হয়, এখন বাড়ী এস দিকিন। বাবা আজ তিন বছর হল কাশীবাস করছেন। নদীয়া ছত্রে আমরা থাকি। আমরা তিন বোনেই এখানে আছি। বিয়ে করে' তার পরের বছরেই যে

বাড়ী থেকে পালালে, যাকে বিয়ে করলে তার দশাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছিলে কি? জনতার মধ্য হইতে কে বলিল, "অ্যাঁ! ভারি অন্যায় ত!"—কেহ বলিল, "বউ বোধ হয় পছন্দ হয়নি, তাই পালিয়েছে।"

যুবক গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনি বলছেন আমি আপনার ছোট বোনকে বিয়ে করেছি?"

"শুধু আমি বলব কেন? গাঁ-সুদ্ধ লোক সবাই বলবে যে তুমি আমার বোন নয়নমণিকে আজ পাঁচ বছর হল বিয়ে করেছ।"

যুবক ক্ষণমাত্র কাল কি ভাবিল। তাহার পর, মুখের বিরক্তভাব পরিবর্ত্তন করিয়া, জনতার দিকে সহাস্য নয়নে একবার নেত্রপাত করিয়া, ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল, "ওঃ—তা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আমি অবিবাহিত। নামটি কি বললেন—নয়নমণি?—নামটি মিষ্টি বটে। তা, আমাকে ভগিনীপতি বলেই যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, আমায় নিয়ে চলুন না, বেশ ত! নয়নমণি দেখতে কেমন বলুন দেখি—বয়সই বা কত?"—বলিয়া যুবক ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া রতনমণির দিকে চাহিল। জনতার মধ্য হইতেও হাসি টিটকারী শোনা গেল।

রতনমণি রাগে ফুলিতেছিল, তাহার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছিল, প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না। অবশেষে তীব্রস্বরে বলিল, "তোমার ও সব ন্যাকামি রাখ বলছি! তুমি কি ভেবেছ ঐ রকম ইয়ার্কির কথা বললেই আমি ভয় পেয়ে যাব, মনে করব কি জানি তা হলে এ বোধ হয় আমাদের সে বিনোদ নয়! (যুবকের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া) রত্নী বাম্‌নীর চোখে ধূলো দিতে পারে এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি, বুঝলে?"

জনতার মধ্য হইতে একজন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—শক্ত ঘানি।"

যেদিক হইতে এই শব্দ আসিয়াছিল, সেইদিকে একবার সরোষ কটাক্ষ করিয়া রতনমণি যুবককে বলিল, "আচ্ছা তুমি যদি বিনোদ নও—তবে হাতটি একবার পাত দিকিন।" যুবক বলিল, "কেন, হাত পাতব কেন? কিছু দেবেন নাকি?"

"হ্যাঁ, দেবো। হাত পাত। ভাবছ কি? কোনও ভয় নেই, হাতটি পাত না। পাত পাত!"—জনতার মধ্যে ঔৎসুক্যবশতঃ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

যুবক হাত পাতিল। রতন, ভগিনীর কলসী হইতে এক অঞ্জলি গঙ্গাজল লইয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল, "আচ্ছা, এইবার বল আমার নাম সুধীরচন্দ্র বসু, আমার নাম বিনোদ চাটুয্যে নয়।"

যুবক জল ফেলিয়া দিয়া, কোঁচার খুঁটে হাতটি মুছিতে মুছিতে রুষ্টভাবে বলিল, "আপনার ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন, না ইচ্ছে হয় না করুন। কাশীতে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে আমি দিব্যি করতে যাব কেন?"

রতন বলিল, "হেঁ হেঁ—এখন পথে এস ত চাঁদু। যা হোক, ধর্ম্মভয়টা এখনও আছে দেখছি। আর কথা বাড়াচ্ছ কেন, চল বাড়ী চল। সোমত্ত বউ তোমার, তাকে তুমি কি দোষে পরিত্যাগ করলে বল দেখি! দিনে রেতে চোখে তার জল শুকোয় না। সোনার অঙ্গখানি কালি হয়ে গেছে! বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখে তাকে একবার দেখবে চল।"

যুবক বলিল, "দেখুন, এখন ত আমার সময় নেই। আপনারা এখন বাড়ী যান, ঠিকানাটা বরং বলে দিয়ে যান, আমি ওবেলা আসবো এখন। নদে ছত্তর বলছেন না? কত নম্বর?"

রতন ভেঙ্গাইয়া বলিল, "আর নম্বরে কাজ নেই। নম্বর জেনে নিয়ে ও-বেলা উনি আসবেন। আমায় কচি খুকীটি পেয়েছ কিনা!"

জনতা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "ছেড় না বামুনগিন্নী, মৎলব ভাল নয়, ফাঁকি

দেবে।"—একজন বখাটে যুবক গাহিয়া উঠিল,—"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না—আ।"

ইহাদের প্রতি সরোষ কটাক্ষপাত করিয়া, যুবকের দিকে ফিরিয়া রতন স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "দেখ, ও সব চালাকি রাখ। ভাল চাও ত আমার সঙ্গে বাড়ী এস। নইলে আমি পুলিশ ডাকবো তা কিন্তু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ।"

যুবক বলিল, "আমি এখন কিছুতেই আপনার সঙ্গে যেতে পারব না—আপনি পুলিশই ডাকুন আর যাই করুন।"—বলিয়া সে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদিও সেই ছোট গলি, তথাপি আগে পিছে আশে পাশে এতক্ষণে অন্ততঃ ১৫/২০ জন লোক জমা হইয়া পড়িয়াছিল। একজন বলিয়া উঠিল—"আহা যানই না মশাই, মেয়েমানুষটি কি রকম দেখেই আসুন না। হায় হায়, আমাদের কেউ ডাকে না বে!"

রতন দেখিল, এখানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া কথা কাটাকাটি করিয়া আর কোনও লাভ নাই—জনতা বাড়িতেছে এবং তাহারা অপমানসূচক মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরভাবে যুবকের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা আছ বললে?"

"অগস্ত্যকুণ্ডে—বিশ্বনাথ মিশনের সেবাশ্রমে। আপনি বিশ্বাস করুন, ওবেলা আমি আসবো। এখন আমায় রেহাই দিন—দোহাই আপনার। দেখছেন ত!"—বলিয়া যুবক জনতার দিকে নেত্রপাত করিল।

রতন বলিল, "নিশ্চয় আসবে? আমরা থাকি ডি-২৬ নম্বর নদীয়া ছত্তরে। তিন সত্যি কর যে আসবে।"

যুবক বলিল, "তিন সত্যি করছি—আসবো, আসবো, আসবো। ওবেলা ৫টার সময় নদে' ছত্তরে আপনার ডি-২৬ নম্বর বাড়ীতে আসবো। আপনাদের বাড়ীতে অন্য লোকরাও আছেন ত? তাঁরা বোধ হয় আমায় দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি আপনাদের বিনোদ নই। তখন আমায় রেহাই দেবেন ত?"

রতন বলিল, "পরের কথা পরে হবে। আমি বিশ্বনাথ সেবাশ্রম চিনি। যদি না আস, পাঁচটার পর আমি কিন্তু সেখানে গিয়ে সোর হাঙ্গাম বাঁধিয়ে দেবো;—গলায় গামছা বেঁধে তোমায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসবো। রত্নী বামনী সোজা মেয়ে নয়!"

"আসবো আসবো। এখন বাড়ী যান।"—বলিয়া যুবক গমনোদ্যম করিল।

রতন বলিল; আর একটা কথা। কোন্ দিকে মুখ করে রয়েছ বল দেখি?"

যুবক বলিল, "কেন? দক্ষিণ দিক।"

"বাবা বিশ্বানাথের মন্দির এখান থেকে খাড়া দক্ষিণ। বাবার মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, আমি ব্রাহ্মণকন্যে, আমার সমুখে তুমি তিন সত্যি করেছ—সেইটি মনে রেখ। আমি আর এ হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে তোমায় কি বলবো! এখন তুমি জান আর তোমার ধর্ম্ম জানে!"—শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে রতনের গলাব স্বর যেন ভারি হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল।

"ঠিক আসবো। ডি-২৬ নম্বর নদীয়া ছত্তর। প্রণাম।"—বলিয়া যুবক জনতা ভেদ করিয়া প্রস্থান করিল। দুই ভগিনীও বিষণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কন্যাদ্বয়ের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর সন্দিগ্ধভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "আসতে ত বললে, কিন্তু সে যদি বিনোদ না হয়?"

রতনমণি গৌরমণি উভয়েই জোর করিয়া বলিল—সে যে বিনোদ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"কিন্তু অত করে তোমরা বললে তবু শেষ পর্যন্ত নাম পরিচয় সে স্বীকার করচে না কেন?"

রতন বলিল, "তা তো করবেই না বাবা। তার মনে একটা বৈরাগ্য হয়েছিল, তাই না সে সংসার ছেড়ে পালিয়েছে! ভাবলে এরা যদি এখন আমায় বিনোদ বলেই চিনতে পারে, তা হলে ধরপাকড় আরম্ভ করবে—আবার কি শেষে সেই সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাব! তাই মিথ্যা করে বলছে আমি সুধীর বোস।"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "সাধু পুরুষ!—সংসাব বন্ধনে বড় ভয়, কিন্তু মিথ্যেটি মুখে আটকায় না।"—কিন্তু তাঁহার এ ব্যঙ্গের ভাব অধিকক্ষণ রহিল না; আবার গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

গৌরমণি বলিল, "আর একটা কথা ভেবে দেখুন বাবা! সত্যিই যদি সে সুধীর বোস হত, তা হলে, দিদি যখন তার হাতে গঙ্গাজল দিয়ে বললে—"বল আমি সুধীর বোস, আমি বিনোদ নই'—তখন সে গঙ্গাজল ফেলে দিয়ে হাত মুছে ফেললে কেন?"

বৃদ্ধ ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "পাগলী! ওতেই কি প্রমাণ হল সে বিনোদ! কাশী হেন স্থান, এখানে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্যি করে' সত্যি কথা বলতেও অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। বেশ করে ভেবে চিন্তে দ্যাখ—শেষকালে চৌদ্দ পুরুষকে নরকে ডোবাসনে যেন।"

পিতার এই অবিশ্বাসে রতন একটু চটিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমরা এত করে বলছি তবু আপনার মনে সন্দেহ যাচ্চে না বাবা? আমাদের কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই একেবারে? আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, সে বিনোদ।"

কন্যাকে কুপিত দেখিয়া হরিকিঙ্কর বলিলেন "পাঁচ বছর আগে তোমরা তাকে দেখেছিলে—সেই বা ক'দিন? মাঘ মাসে বিয়ে হল, জষ্টি মাসের ষষ্টিবাটায় এসেছিল—তিনটি দিন ত মোটে ছিল। তার পর, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে একবার এসেছিল। এক দিন না দু'দিন ছিল বুঝি?"

গৌর বলিল, "এক দিন এক রাত ছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তবেই ত বোঝ দিকিন! তিন দিন আর এক দিন—চার দিন, এই ত তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয়। আমি বরঞ্চ তাকে তোমাদের চেয়ে বেশীবার দেখেছি। যখন ছেলে দেখতে গিয়েছিলাম, তার পর আশীর্ব্বাদের সময়, তার পর বিয়ের পর নয়নকে সেখান থেকে আনতে গিয়ে। সে যাই হোক, আসবে ত বলেছে—আসুক, দেখি।"

রতন বলিল, "আপনিও দেখলেই তাকে চিনতে পারবেন বাবা; তবে আগেকার চেয়ে মাথায় একটু ঢেঙা হয়েছে, রঙটাও যেন একটু ফর্সা হয়েছে—পশ্চিমে রয়েছে কিনা! কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর, সেই কথা ক'বার ভঙ্গি।"

পিতাকে সযত্নে আহার করাইয়া, নিজেরা খাইয়া, সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া গৌর ও নয়ন পাশের ঘরটিতে গিয়া তিন বোনের জন্য তিনখানি মাদুর বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। রতনমণি পিতাকে শোয়াইয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে পানের ডিবা ও সুর্ত্তির কৌটা হাতে করিয়া সেও আসিয়া প্রবেশ করিল। নিজের মাদুরে বসিয়া দুই চারিটি অন্য কথার পর বলিল, "নৈনি, তোর বাক্সে সেই যে সাবান ছিল সে কি আছে?"

নয়ন বলিল, "আছে। কেন দিদি?"

"বের করে রাখিস। আর এই চাবি নে বাবার ঘরের আলমারি খুলে দুটো টাকা বের করে আন্ ত।"

গৌরমণি দিদির কৌটা হইতে দুইটি সুর্ত্তিগুলি লইতে লইতে বলিল, "কেন দিদি? এখন টাকা কি হবে?"

রতন বলিল, "যাই, সরোজিনীর দেওয়রকে দিয়ে একটা রেজলী আরও দুই একটা জিনিস-টিনিস আনাই।"

গৌর জিজ্ঞাসা করিল, "রেজলী কি?"

নয়নমণিও কৌতূহলের সহিত দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিল। রতন বলিল, "রেজলী জানিসনে? এই যে কাঁচের কৌটোতে থাকে, আজকালকার মেয়েরা সাবান-টাবান মেখে মুখে তাই মাখে—তাকে রেজলী বলে।"

একটু ভাবিয়া নয়নমণি বলিল, "রেজলী—না হেজলীন, বল? সেই সাদা দুধের মত—বেশ মিষ্টি গন্ধ আছে? সেই হেজলীনের কথা বলছ বুঝি?"

রতন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ হেজলীই বুঝি বলে!"

গৌরমণি হাসিতে লাগিল। বলিল, "হা-হা রেজলী। রেজলী কি। হেজলীনকে বলে রেজলী! দিদি যেন ঢঙ—তেলাকুচো রঙ! হা-হা!"

রতন বলিল, "যা যা—আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমি সেকেলে মানুষ অতশত কি জানি! আমাদের আমলে ও-সব ওঠেওনি, আমরা জানিওনে। আজকালকার ছুঁড়িগুলো মুখে মাখে দেখতে পাই, তাই ভাবলাম যে একটা আনিয়ে নিই। যা-যা নয়ন, টাকা দুটো বের করে নিয়ে আয়।"

নয়নমণি উঠিল না, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। রতন রাগিয়া নিজে উঠিয়া টাকা বাহির করিয়া, সরোজিনীদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেই গলিতে কাছেই তাহারা থাকে।

প্রভাতের মেঘ-মেঘ ভাবটা কাটিয়া গিয়া, এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গুমোটও কাটিয়া গিয়াছে—জানালা দিয়া ঝুরঝুর করিয়া শরতের মিষ্ট বাতাস আসিতেছে। গৌরমণি তাহাব মাদুরখানি জানালার নিকট সরাইয়া লইয়া শয়ন করিল এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া গেল।

নয়নমণি শুইয়া রহিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। সে কেবল আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। এত দিনের পর, বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণা কি তার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন? এতদিন ধরিয়া মনে মনে গোপন সে যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, আজ কি তাহা পূর্ণ হইবে?

কিন্তু—আবার মনে হইল, সত্যই কি তিনি? যদি তিনি না হন। দিদিরা দুইজনেই বলিতেছেন বটে, কিন্তু বাবা যে বিশ্বাস করিতেছেন না। কিন্তু বাবা ত দেখেন নাই, দিদিরা দেখিয়াছে। আচ্ছা, আসুন ত, নয়নও দেখিবে। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া তিনটি দিন সেখানে থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। জামাইষষ্ঠীর সময় আসিয়াও তিনি তিন দিন ছিলেন—আর একবার আসিয়াছিলেন সেই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে। তিনে আর তিনে ছয় আর একে সাত—এই সাত রাত্রি সে স্বামীকে কাছে পাইয়াছিল—কিন্তু লজ্জায় কখনও চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতে পারে নাই। তবে দিনের বেলায়, আড়ালে থাকিয়া দুই চারিবার তাঁহাকে সে দেখিয়াছে—তাহাতেই স্বামীর মুখখানি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখ কি ভোলা যায়? যথার্থই যদি তিনি হন, তবে "আমি অমুক নই, আমি সুধীরচন্দ্র বসু" বলিলেই কি নয়নমণিকে তিনি ঠকাইতে পারিবেন? কখনই না। সে, দেখিলেই তাঁহাকে চিনিবে। এখন বাবা বিশ্বনাথের কৃপায়, সত্যই যদি তিনি হন—তবেই। নহিলে—পোড়া কপাল ত পুড়িয়াইছে!

আবার নয়নমণির এ কথাও মনে হইল—যদি তিনিই হন, অথচ কোন মতেই সে কথা স্বীকার না করেন, কিংবা আত্মপ্রকাশ করিয়া, গৃহী হইতে—নয়নকে গ্রহণ করিতে সম্মত না হন? নয়ন ভাবিল, তবু ত তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব। এই সহরেই তিনি রহিয়াছেন, তাহাও ত জানিয়া মনকে একটু স্থির করিতে পারিব। বড়দিদি মাঝে মাঝে তাঁহার খবরটাও ত আনিয়া দিতে পারিবেন!

এইরূপ নানা চিন্তায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশে পিতার ঘরে ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। নয়ন মনে মনে বলিল, "আর দু'ঘণ্টা। পরে অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!"

কিয়ৎক্ষণ পরে রতনমণি অঞ্চলে কয়েকটি প্রসাধন সামগ্রী লইয়া প্রবেশ করিল। দেওয়াল আলমারিতে সেগুলি সাজাইয়া রাখিয়া, গৌরমণিকে ডাকিতে লাগিল, "গৌরি, ওলো ওঠ্ ওঠ্। বেলা যে পড়ে এল। নৈনিকে ওঠা, গা মুখ ধুইয়ে ওর চুল-টুল বেঁধে দেবার জোগাড় দ্যাখ। আমি ততক্ষণ কয়লায় আগুন দিইগে, একটু জলখাবার তৈরি করতে হবে ত!"

গৌরমণি উঠিয়া বসিল। একটি হাই তুলিয়া, আঙুলে তুড়ি বাজাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কটা বেজেছে?"

"চারটে বাজে প্রায়। একটু হাত চালিয়ে নে।"—বলিয়া রতনমণি চলিয়া গেল।

নয়নমণি পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। গৌরমণি তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া উঠিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল এবং গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, "নয়ন—ও নয়ন—ওঠ্ দিদি।"

নয়নমণি ফিরিয়া দিদির পানে চাহিল। গৌর বলিল, "ওঠ্। সাবান কোথা আছে বের কর্—চল্, হাতটা মুখটা ধুইয়ে দিই। তার পর চুল বাঁধতে হবে—ওঠ্।"

নয়ন বলিল, "থাক্ দিদি, চুল বেঁধে আর কি হবে?"

"বর আসছে যে!"—বলিয়া গৌরমণি আদরে ভগিনীর চিবুক স্পর্শ করিল।

নয়ন উঠিয়া মুখখানি নীচু করিয়া বলিল, "কার বর তাই বা কে জানে!"

গৌরমণি চটিয়া বলিল, "বাবার সঙ্গে তুইও ঐ সুর ধবলি? দিদি বলছে সে-ই আমি বলছি সে-ই; যারা দু'জন দেখেছে তারা বলছে সে-ই; আর তোরা দেখলিনে কিছু না, তোরাই বলবি সে নয়?"

নয়ন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি দিদি, তোমরাই জান ভাই! তোমরা আমার চুল বেঁধে গহনা কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখবে, আর বাবা যদি বলেন সে নয়—তখন? সে সব গয়না কাপড় খুলে দিতে যে পথ পাবে না! ছি ছি, কি,ঘেন্না! সে লজ্জায় পড়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। না না, আমি চুল বাঁধবো না, গয়না কাপড়ও পরবো না—যেমন আছি তেমনই আমায় থাকতে দাও দিদি, তোমার পায়ে পড়ি!"

রতনমণি এই সময় কি লইতে ঘরে আসিয়াছিল, শেষ দিককার কথাগুলি শুনিয়া সেও আসিয়া ভগিনীদ্বয়ের নিকট বসিল। নয়নমণির কপালের কাছে দুই চারিগাছি এলোমেলো চুলকে ঠিক করিয়া দিয়া বলিল, "অমন অবুঝপনা করে কি, ছি! আমি বলছি সে বিনোদ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবা এখন যাই বলুন, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন। সে জন্যে ত আমি ভয় করছিনে—আমার ভয় কি তা শোন্। তার একটা বৈরাগ্য হয়েছিল, তাই না সে ঘর সংসার ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। সে কি অম্‌নি মনে এক কথায় আবার সংসার ধর্ম্মে আসতে চাইবে? আমরা অবশ্যি যতদূর সাধ্যি তাকে বোঝাব। কিন্তু আমাদের কথায় তার মন যদি না ফেরে, তখন ত তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে।"

নয়নমণি বলিল, "আমার পোড়াকপাল আর কি! আমি আবার কি চেষ্টা করবো? আমি কথাটি কইতে পারবো না—সে আমি কিন্তু বলে রাখছি!"

রতন বলিল, "তোকে কি তার কাছে হাত নেড়ে মুখ নেড়ে উকীলের মত বক্তিমে করতে "বলছি?

তবে?"

"যদি দরকারই হয়, সে তখন যা করতে হবে আমি তোকে বলে দেবো। এখন লক্ষ্মীটি

হয়ে, যা বলি তাই শোন্। মুখে হাতে সাবান দিয়ে চুলটুল ততক্ষণ বাঁধ্—আমি আবার আসছি।"—বলিয়া রতনমণি উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচটা বাজিতে তখনও পাঁচ সাত মিনিট বাকীই ছিল, বদ্ধ সদর দরজার শিকল ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "বাড়ীতে কে আছেন?"

গৌরমণি বোনের চুলবাঁধা ছাড়িয়া পিতার ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছিল; সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা, বিনোদেরই গলার স্বর না?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কি জানি! ঠিক—বুঝতে পারছি কই?"

দ্বিতীয়বার শব্দ আসিল—"বাড়ীতে কে আছেন?"

রতনও রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, "সাড়া দিন বাবা। নইলে সে তিনটে বার ধর্ম্মডাক ডেকে, হয়ত চলেই যাবে।"

গলির উপর যে জানালা খুলিয়াছে, তাহার নিকটেই বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিলেন, হাঁকিলেন—"কাকে চান আপনি?" উত্তর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি কান খাড়া করিয়া রহিলেন।

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "হরিকিঙ্করবাবু কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—আসছি?"—বলিয়া তিনি নীচে নামিবার জন্য বাহির হইলেন। রতন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, আপনি থাকুন, আমি গিয়ে দরজা খুলে দিচ্চি। কিন্তু বাবা (রতন হাত দুটি যোড় করিল) দোহাই আপনার, সে নিজের পরিচয় যতই অস্বীকার করুক, আপনি যেন তার উপর চটে উঠে কিছু তাকে বলবেন না। আপনি শুধু দেখুন, সে যথার্থ বিনোদ কি না। আপনার মন যদি নিঃসন্দেহ হয়, তখন আর যা করবার আমরা করবো।"—বলিয়া রতন প্রায় ছুটিয়া, সিঁড়ি নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

রতনকে দেখিবামাত্র যুবক বলিল, "দেখুন, আমি সত্যরক্ষা করেছি।"

রতন বলিল, "এস ভাই এস। তুমি যে ফাঁকি দিয়ে পালাবে না, সে বিশ্বাস আমার ছিল। চল, উপরে চল।"

সদর দরজা বন্ধ করিয়া আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া রতন হঠাৎ দাঁড়াইল। বলিল, "দেখ ভাই, একটা কথা বলে দিই। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁকে প্রণামটা কোরো। নইলে তিনি চটে যান—বুড়োমানুষ কিনা!"

যুবক বলিল, "আমার আবার শ্বশুর কে আছে? আমি ত আপনাকে বলেছি আমি অবিবাহিত।"

রতন বলিল, "হল! আবার বুলি ধরলে বুঝি? আচ্ছা শ্বশুর নাই হলেন, ব্রাহ্মণ ত—প্রাচীন হয়েছেন, পুণ্যের শরীর, জপতপ নিয়ে আছেন, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একটা প্রণাম করলে কোনও দোষ আছে কি?"

"না, তা দোষ নেই—প্রণাম করবো এখন। কিন্তু একটা কথা। আমায় দয়া করে, একটু শীঘ্র ছেড়ে দিতে হবে। আমার অনেক কাজ আছে।"—বলিয়া রতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুবক সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর শয়নকক্ষের দ্বারদেশে হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া সিঁড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। আগন্তুক তাঁহার চক্ষুগোচর হইবামাত্র তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা—চিরজীবী হও"—বলিয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন।

শয়নকক্ষে, জানালার কাছে মাদুর বিছানা ছিল। বৃদ্ধ আগন্তুককে লইয়া গিয়া সেখানে বসাইলেন। বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল আছে ত?"

যুবক তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"
"কাশীতে কতদিন আসা হয়েছে?"
যুবক পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, "বছর দুই হবে।"
"বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে আছ শুনলাম?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ।"
"তুমি সেখানে কি কর?"
"রোগীদের চিকিৎসা করি। সেবা শুশ্রূষা করি।"
"মাইনে দেয়?"
"আজ্ঞে না। সেখানে খাই-দাই থাকি। হাতখরচ বলে সামান্য 'কছু দেয়। এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করেছি।"
বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সেবাশ্রম ব্যাপাবটা কি?"
যুবক বলিল, "এই যে সেবাশ্রম এটা বিশ্বনাথ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের অনেক বড় বড় লোক— রাজা মহারাজা সব এই মিশনের পৃষ্ঠপোষক। কাশীতে এসে যারা পীড়িত হয়ে পড়ে, সহায় সম্পত্তি নেই, ওঁরা তাদের ঐ সেবাশ্রমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান, সেবাশুশ্রূষা করান। হাসপাতালেব মত আর কি।"
বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশীতে আসবার আগে কোথায় ছিলে বাবা?"
"নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতাম।"
"তোমার বাপ মা বেঁচে আছেন?"
"আজ্ঞে না।"
"বাড়ীতে এখন কে কে আছেন?"
"তা জানিনে।"
বৃদ্ধ এক একবার আকুল নয়নে ছেলেটিব পানে চাহেন, আবার উর্দ্ধমুখ হইয়া কি চিন্তা করেন। দেওয়ালে 'পান 'কাটি লইয়া, কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, আগুন নিভিয়া গিযাছে। বলিলেন, "বাবা, তুমি একটু বস, তামাকটা সেজে আনি।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।
পার্শ্বের ঘরে যাইবামাত্র রতনমণি গৌরমণি উভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাদেব বিনোদ নয়?"
বৃদ্ধ বলিলেন, "অনেকটা ত সেই রকমই বোধ হচ্ছে—কিন্তু—"
"আবার কিন্তু কি বাবা?"
"কিন্তু—ঠিক ত বুঝতে পারছিনে। নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে যে মা! গলার স্বরটা তারই মতন যেন বোধ হচ্ছে; আর সেই রকম মাথা দুলিয়ে কথা কয়। কিন্তু, ও রকম ত অনেকেরই দেখেছি।"
"মুখ চোখ?"
"মুখ চোখ? হ্যাঁ, তাও কতকটা যেন তারই মত। কিন্তু—কিন্তু আমার চোখের সে জ্যোতি যে আর নেই! তা ছাড়া, আজ চার বছর তাকে দেখিনি। আমি ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে মা।"
গৌরমণি ম্লানমুখে চক্ষু নত করিল। রতনমণি বলিল, "সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর—তবু আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না—এ যে আপনার অন্যায় বাবা!"
বৃদ্ধ একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা, কি করব মা? বাবা বিশ্বনাথই জানেন।"
গৌরমণি বলিল, "তা হলে—এখন কি করা যায়? ওকে কি ছেড়ে দেব?"

"ছেড়ে দেবে?—কিন্তু যদি সেই হয়? হাতছাড়া করাটা—! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে! তোমরা যা ভাল বোঝ তা কর বাছা। একটু তামাক সেজে দাও খাই।"—বলিয়া সেইখানে তিনি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

পিতাকে তামাক সাজিয়া দিয়া, গৌরমণি আগন্তুকের জন্য আসন বিছাইল, রতনমণি খাবার সাজাইয়া আনিতে গেল। বৃদ্ধ আসিয়া আগন্তুককে ডাকিয়া আনিলেন; সে আসিয়া কিঞ্চিৎ আপত্তির পর জলযোগে বসিল্। গৌরমণি নিকটে রহিল।

তামাকু সেবনান্তর, বৃদ্ধ নিজ কক্ষে গিয়া জামা গায়ে দিয়া কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া লাঠিহস্তে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রতন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চললেন বাবা?"

"আমি একবার বিশ্বনাথ দর্শন করে আসি।"

রতন বলিল, "ওকে একটু বোঝালেন না?"

"তোমরা বোঝাও—যা ভাল হয় কর।"

রতন বলিল, "আমরা ত বোঝাব; কিন্তু সে শুনবে কি? আপনি থাকলে—"

"না না, সে আমি পারব না। আমার মনটা ভারি অশান্ত হয়েছে। আমি এখন মন্দিরে গিয়ে বাবার পায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকব।" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

রতন তাঁহার পথ আগলাইয়া বলিল, "শুনুন বাবা। আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই বিনোদ। আমরা দুই বোনে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি না পারি, তবে একটা মৎলব ঠাউরেছি—আপনার হুকুম পেলে তা করতে পারি?"

"কি, বল।"

"নয়নকে ওর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিই। আমাদের কথায় ওর যদি মন না গলে—নয়নের মুখখানি দেখেও গলতে পারে। দেখুক, কি মহা নিষ্ঠুরের কাজ সে করেছে।—আপনি কি বলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "নয়নের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে বলছ? সেটা কি ঠিক হবে? কি জানি। একটু ভাবি দাঁড়াও। দূর হক্‌গে—আমার মাথাই ঘুলিয়ে গেছে। দুর্ব্বল মাথা—বুদ্ধিও দুর্ব্বল। হরি হে! সে তোমরা যা হয় কর। বেশ করে বুঝে দেখ, যদি মনে তোমাদের কোনও সন্দেহ না থাকে, তবে দেখা করাও। আচ্ছা, নয়নকে একবার এখানে ডাক।"

রতন গিয়া নয়নকে লইয়া আসিল। বৃদ্ধ ব্যাকুলনেত্রে মেয়ের অবনত মুখখানির প্রতি চাহিয়া, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা বিশ্বনাথ তোমায় রক্ষা করুন। সীতা, সাবিত্রী তোমায় তাঁদের পায়ের ধূলো দিন।"—বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

রতন ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখন ফিরবেন বাবা?"

"আরতির পর"—বলিয়া তিনি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন।

জলযোগ শেষ হইলে রতনমণি আগন্তুককে পিতার কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল। গৌরমণি ডিবায় পান আনিয়া দিল। দুই ভগিনী মেঝের উপর বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

রতন বলিল, "তা হলে, কি ঠিক করলে ভাই?"

যুবক বলিল, "কিসের কি ঠিক করলাম?"

"ছুঁড়িটিকে কি ভাসিয়ে দেবে? সেই কি ধর্ম্ম?"

যুবক বলিল, "এখনও কি আপনাদের ভ্রম গেল না? এখনও আপনারা মনে করছেন আমি আপনাদের ভগিনীপতি? আপনার বাবা আমায় দেখে কি বললেন?"

রতন বলিল, "তিনিও তোমায় চিনেছেন—তুমি বিনোদ।"

যুবক বলিল, "না, আমি আপনাদের বিনোদ নই। কেন মিছে আমায় ধরপাকড় করছেন?"

দুই বোনে তখন যুবককে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল। বলিল—ভাই, অনেক দিন তোমায় দেখিনি বটে, কিন্তু আপনার জনকে কি মানুষ ভোলে? সেই মুখ, সেই চোখ, সব সেই। সেও কলকাতা ক্যাম্বেল ইস্কুলে ডাক্তারী পাশ করেছিল, তুমিও এখানে ডাক্তারীই করছ। তারও বাপ মা ছিল না, তোমারও নেই। কেন মিছে আমাদের ভোলাচ্ছ ভাই?"—কিন্তু তথাপি কিছুতেই যুবক স্বীকার করে না যে সে বিনোদ।

এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। যুবক বলিল, "এখন তবে আমায় বিদায় দিন।"

রতন বলিল, "একটু বোস। বাবা ফিরে আসুন।"—বলিয়া সে উঠিয়া, বাতিটা জ্বালিয়া দিয়া, বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাকিল—"গৌরী, শোন্।"

গৌরমণিও চলিয়া গেল—যুবক একা রহিল। একবার সে ভাবিল, এই সুযোগে পলায়ন করি। উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় দ্বারের নিকট মলের ঝুম ঝুম্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী, তৎপশ্চাৎ গৌরমণি দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৌরমণি বলিল, "ভাই, এত করে আমরা সকলে মিলে তোমাকে বোঝালাম, কিছুতেই তুমি শুনলে না। দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে, যার চিরজীবনের সুখদুঃখের ভার নিয়েছ তুমি তাকে পরিত্যাগ করলে তার উপায় কি হবে, সেইটে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে, যদি যেতে ইচ্ছা হয় যাও!"—বলিয়া গৌরমণি বোনটিকে ভিতবে ঠেলিয়া দিয়া, কবাট টানিয়া ঝুম কবিযা শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

যুবক মাদুরের উপর বসিয়া ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া উঠিল। নয়নমণি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া, গলবস্ত্র হইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবক নির্নিমেষ নয়নে, এই যুবতীর সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "তুমি আমায় চিনতে পারছ?"

নয়নমণি নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কে?"

নয়ন অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, "আমার স্বামী।"

"বেশ চিনেছ?" নয়নমণি আবার নীরবে মাথা হেলাইল।

যুবক মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি ত তোমার স্বামী নই!"

নয়ন এবার মুখখানি তুলিল। বলিল, "তুমি আমার স্বামী নও একথা তুমি বোলো না। আমাকে যদি তুমি পায়ে না রাখ ফেলে দিতেই চাও, বরং বল, 'তুমি আমার স্ত্রী নও।'—তুমি আমার ইহকালের—আমার পরকালের সম্বল।"—কথাগুলি শেষ হইবামাত্র তাহার চক্ষু হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তাহার দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

যুবক বলিল, "বস বস! নইলে পড়ে যাবে। বস—এ কি বিপদে পড়লাম।"—বলিয়া নিজে সে মাদুরের উপরে বসিল।

.নয়ন মেঝের উপর বসিয়া বামহস্তের উপর মাথাটি ঝুঁকাইয়া দিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবক বলিল, "কেঁদ না, কেঁদ না, চুপ কব। তোমার সমুখে কি বিপদ তা তুমি বুঝতে পারছ না? ধর আমি যদি বলি, আচ্ছা হ্যাঁ আমিই তোমার স্বামী, তোমায় নিয়ে ঘরকন্না করি—তার পর যদি প্রমাণ হয়ে যায় আমি তোমার স্বামী নয়, আমি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত নয়—আমি কায়েত, আমার নাম সুধীরচন্দ্র বসু—তখন কি সর্ব্বনাশটা হবে বল দেখি! এটা তুমি ভাবছ না?"

নয়ন তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া বলিল, "তুমি আমার স্বামী।"

যুবক মুখ নীচু করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আমি এখন চললাম। এ সব ভয়ানক অন্যায় কথা। একজন পুরুষের সঙ্গে এ রকম ভাবে'—বলিয়া সে উঠিয়া জুতো পায়ে দিল।

নয়ন বলিল, "কি করে যাবে? বাইরে যে শিকল বন্ধ।"

"তাও ত বটে।"—বলিয়া যুবক থামিল।

নয়ন বলিল, "বস। যদি যেতেই হয়, যেও, আমরা ত তোমায় ধরে রাখতে পারব না। একটা কথা আমায় বলে দাও। তুমি যে বিয়ে করে আমায় পরিত্যাগ করে চললে, আমার উপায় কি হবে?"

যুবক বসিল না। বলিল, "সে আমি কি জানি?"—বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কবাটে করাঘাত করিতে করিতে বলিল, "দুয়ারটা খুলে দিন।"

কেহ দুয়ার খুলিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। ক্রমে যুবক অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত পদাঘাত করিয়া সে চিৎকার জুড়িয়া দিল। তখন রতনমণি আসিয়া শিকল খুলিল।

যুবক বলিল, "এ রকম সব, ভারি অন্যায় আপনাদের। আমি চললাম।"

রতনমণি বলিল, "সেইটেই কি তোমার ধর্ম্ম হল?"

"আমার ধর্ম্ম আমি জানি।"—বলিয়া যুবক হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় হরিকিঙ্কর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। গৌরমণি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল?"

গৌরমণি সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে, পিতাকে সকল কথা বলিতে লাগিল।

বৃদ্ধ নিজ শয়নকক্ষে আসিয়া, জামা জুতা ছাড়িয়া হস্তপদাদি ধৌত করিতে করিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "এখন বোধ হচ্ছে, আমার মনে যা সন্দেহ ছিল, সেইটিই ঠিক—সে আমাদের বিনোদ নয়। তোমরা এত করে বললে, নয়ন পর্য্যন্ত অত কাঁদাকাটি করলে, সে যদি বিনোদ হত তা হলে অন্ততঃ নিজের পরিচয়টা স্বীকার করে বলত, আমি আর সংসারী হব না, কেন তোমরা আমায় এত আকিঞ্চন করছ! যা হোক, নয়নকে সে ছোঁয়নি ত?"

গৌর বলিল, "নয়নের কাছে শুনলাম, সে মাদুরে বসে ছিল, নয়ন নীচে ছিল। প্রণাম করেছিল, তাও পায়ে হাত দেয়নি!"

"ভাগ্যিস ছোঁয়নি। কাল তোমরা যখন গঙ্গাস্নান করতে যাবে, নয়নকেও নিয়ে যেও—ও-ও যেন একটা ডুব দিয়ে আসে। ছি ছি কি লজ্জার কথা। বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন।"—বলিয়া বৃদ্ধ ওঁর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, একদিন বেলা নয়টার সময় বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর সেই মাত্র সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া কন্যা-প্রদত্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নয়ন সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় নিম্নে উঠান হইতে শব্দ শুনিতে পাইল, "এ দাই, বাবু হ্যাঁয়?" দাই বলিল, "বাবু উপরমে—যাও না!"

নয়ন বারান্দার প্রান্তে রেলিঙের নিকট গিয়া নীচে চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—একমাস পূর্ব্বে স্বামী বলিয়া সাশ্রুনয়নে যাহার পদপ্রান্তে সে বৃথা লুটাইয়াছিল—সেই আবার আসিয়াছে।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইবামাত্র নয়ন তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া আশ্রয় লইল।

যুবক আসিয়া পৌঁছিবামাত্র হরিকিঙ্কর চীৎকাব করিয়া উঠিলেন, "কে?"

যুবক জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ্ঞে আমি।"—বলিয়া ঢিপ করিয়া তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল।

"কে? জিজ্ঞাসা করিলেও পূর্ব্বেই বৃদ্ধ তাহাকে চিনিয়াছিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কোনও আশীর্ব্বাদ না করিয়া, কঠোরস্বরে বলিলেন, "তা, এ মেয়েছেলের বাড়ী, কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ তুমি ঢুকে পড়লে কোন্ আক্কেলে?"

তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিয়া যুবক একটু শঙ্কিত হইল। বলিল, "নীচে দাই বাসন মাজছিল, তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, সে বললে আপনি বারান্দায় বসে আছেন—যা হোক, আমার দোষ হয়ে গেছে, মাফ করবেন।"

এ কথায় বৃদ্ধেব মন যেন একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বস। এখন কি মনে করে এসেছ?"

"আজ আপনার কাছে সেদিনের অপরাধের আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—আমায় আপনি মাফ করুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কেন? ক্ষমা কিসের?"

যুবক বলিল "নিজের পরিচয় গোপন করার অপরাধ। আপনারা সেদিন এত করে আমায বললেন, আমি তখন কিছুতেই স্বীকাব কবলাম না যে আমি আপনার জামাই বিনোদ। আমার ভারি অপরাধ হযে গেছে, আমায় মাফ করুন।'—বলিয়া সে মুখখানি নীচু করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ওষ্ঠযুগল গুটাইয়া, ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "সেদিন অত সাধাসাধি কিছুতেই স্বীকাব করলে না যে তুমি বিনোদ, বললে আমি সুধীর বোস, আমি কায়েত—আর একমাস যেতে না যেতেই তুমি বিনোদ চাটুয্যে হয়ে গেলে? হঠাৎ এ মতটা বদলাবার কাবণটা শুনতে পাই কি?"

যুবক বলিল, "ভেবে চিন্তে দেখলাম, বিবাহিত স্ত্রীকে এ রকমভাবে ভাসিয়ে দিলে সেটা ঘোর অধর্ম্ম হয।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাই কি? না, মতটা বদলাবার অন্য কিছু একটা কারণ ঘটেছে?"

"আজ্ঞে, আব কি কারণ ঘটতে পারে? আমিই বিনোদ—এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত যুবকের পানে তাচ্ছিল্যভাবে চাহিদা থাকিয়া বলিলেন, "তুমি যে বিনোদ তার প্রমাণ?"

যুবক মুখ তুলিল। বলিল, "একমাস আগে আপনারা সকলেই আমাকে নিঃসন্দেহে বিনোদ বলেই চিনেছিলেন, এর বেশী আর কি প্রমাণ হতে পারে?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমি তখন তাই মনে করেছিলাম বটে, স্বীকার করি; তবে গোড়া থেকেই মনে একটু সন্দেহ যে না ছিল তা নয়। বাপু হে, তুমি যদি সত্যি আমার জামাই বিনোদ হতে, তবে সেই দিনই স্বীকার করতে। অত কবে আমরা সবাই তোমায় সাধাসাধি করলাম, মেয়েটা পর্য্যন্ত তোমার কাছে গিয়ে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলে, তুমি সত্যি বিনোদ হলে সে রকম করে কখনই তাকে ফেলে যেতে পারতে না! বামুন কায়েতে ত পারেই না, চণ্ডালেও পারে কিনা সন্দেহ।"

যুবক কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কাজটা আমি চণ্ডালের মতই করেছি বটে, স্বীকার করি। যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। এখন কি হলে আপনার মনের সন্দেহ যায় তাই বলুন। আমায় সব কথা জিজ্ঞাসা করুন—আমাদের গ্রামের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা—আপনার যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করুন।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত লোকটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেনারস ব্যাঙ্কে তোমার কি কোনও আলাপী বন্ধুবান্ধব চাকরি করে?"

"না। কেন?"

"তাই বলছি। ব্যাঙ্কে আমার যে হাজার কয়েক টাকা আছে সে খবরটি কি করে পেলে তুমি, বল দেখি বাপু?"

যুবক বলিল, "আজ্ঞে সে সব কোন খবরই ত আমি জানিনে। আর সে খবরে আমার দরকারই বা কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দরকারই যদি নেই, তবে তুমি কি লোভে আজ আমার জামাই সেজে এসেছ শুনি? তোমার চালাকি আমি কি কিছু বুঝতে পারছিনে ভেবেছ? এই সময়ের মধ্যে দেশে গিয়ে সব সুলুক সন্ধান খবর বার্ত্তাগুলি জেনে এসেছ, যাতে আমরা তোমায় কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে ঠকে না যাও। জোচ্চোর কাঁহেকো!"

একথা শুনিয়া যুবক একটু গরম হইয়া একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ওকি কথা বলছেন আপনি! আমি জোচ্চোর?"

বৃদ্ধ রাগিয়া বলিলেন, "তুই জোচ্চোর, তোর বাপ জোচ্চোর, তোর চৌদ্দপুরুষ জোচ্চোর! নিকালো হিঁয়াসে।"—বলিয়া তিনি কম্পিতহস্তে সিঁড়ির দরজার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন।

যুবক উঠিলেন। জুতা পরিতে পরিতে বলিল, 'অন্যায় সন্দেহ করে আমায় তাড়ালেন। শেষে পসতাতে হবে এর জন্যে।"

"হয় হবে। তুমি সরে পড়।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে যুবক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া, গলির মধ্যে অল্পদূর অগ্রসর হইতেই দেখিল, রতনমণি গৌরমণি দুইজনে গঙ্গাস্নান করিয়া, গামছায় তরীতরকারী বাঁধিয়া ফিরিতেছে। যুবক নিকটস্থ হইয়া বলিল, "দিদি, আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কোরো। সেদিন তোমাদের সঙ্গে আমি বড়ই কুব্যবহার করেছি। আমিই তোমাদের বিনোদ।"

যুবকের কথার স্বর ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া উভয় ভগিনী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। রতন বলিল, "যাচ্ছ কোথা, বাড়ী চল।"

যুবক বলিল, "বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। বাবা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, তিনি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

রতন বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ? বল কি? কি বললেন তিনি?"

যুবক কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "বললেন, তুই জোচ্চার, আমাব টাকার লোভে জামাই সেজে এসেছিস। আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত তুলে গাল দিয়েছেন।"

রতন ও গৌর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। রতন হঠাৎ যুবকের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "ভাই, তুমি বাবার উপর রাগ কোর না—তিনি বুড়োমানুষ, চোখে ভাল দেখতে পান না, তাই তিনি তোমায় চিনতে না পেরে ঐ সব কথা বলেছেন। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, রাগ কোর না। তুমি এখন সেবাশ্রম যাচ্ছ ত? সেখানে তুমি থেক, আমি ওবেলা গিয়ে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।"

যুবক বলিল, 'না দিদি ছেড়ে দিন, আর আমি আসবো না দিদি। ঢের হয়েছে! বাবা বিশ্বনাথের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েও সংসারসুখের লোভে সে সংকল্প ছেড়ে চলে আসছিলাম, বাবা বিশ্বনাথ তাই আমার জন্য এই চাবুকের ব্যবস্থা করেছেন, চাবুক খেয়ে আবার তারই পায়ে ফিরে যাচ্ছি।"—বলিয়া যুবক ঝুঁকিয়া, রতন ও গৌরমণির পদস্পর্শ করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিল।

রতন ও গৌরমণি তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, পিতা হাতের উপর মাথাটি নিচু করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। গৌরমণি রান্নাঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও দিদি, শীগ্‌গির আয়, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি কি' বলিয়া রতন সেইদিকে ছুটিল। বৃদ্ধও উঠিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, নয়নমণি ঘরেব মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

রতন বলিল, "বাবা, রাগের মাথায় জামাইকেও তাড়ালে, মেয়েটারও প্রাণবধ করলে?"—বলিয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে সে বসিয়া পড়িয়া, নয়নমণির মাথা কোলে তুলিয়া লইল। গৌরমণি জল আনিয়া মূর্চ্ছিতার মুখে চোখে ঝাপটা দিতে লাগিল। বৃদ্ধ হতাশ ভাবে সেখানে বসিয়া, মুখে শুধু হায় হায় করিতে লাগিলেন।

প্রায় পনেরো মিনিট শুশ্রূষার পর নয়নমণিব মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

রতনমণি ও গৌরমণি সারাদিন পিতাকে অনেক বুঝাইল। তাহারা বলিল, "সে যখন বললে যে আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমায় পরীক্ষা করুন, দেখুন আমি সত্যি আপনার জামাই কি না, তখন তাকে গালমন্দ দিয়ে তাড়ানো ঠিক হয়নি। আপনি বলছেন যে সে টাকার লোভে, এই একমাস দেশে গিয়ে সমস্ত খবর সন্ধান জেনে তৈরি হয়ে এসেছে। বেশ ত, এমন ঢের কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারা যেত, যা আসল বিনোদ ছাড়া আর কেউ জানে না। অন্য কথায় কাজ কি, নয়নের সঙ্গেই সাত রাত্তির সে একত্র ছিল ত? নয়নই তাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারত, যার উত্তর আসল বিনোদ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।"

অবশেষে বৃদ্ধ সম্মত হইলেন। বলিলেন, আচ্ছা বেশ, তাহাকে আবার ডাকিয়া আনা হউক, রীতিমত পবীক্ষান্তে যদি মনেব সন্দেহ দূব হয়, তবে তাহাকে জামাই বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পাবে।

এই কথা শুনিয়া, বিকালে ৪টার সময় মহোল্লাসে রতনমণি বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিল, তথায় সে যুবক সকলের নিকট বিনোদ চট্টোপাধ্যায় নামেই পরিচিত ছিল, অদ্য বেলা দুইটার সময় জিনিসপত্র লইয়া, গাড়ী ডাকিয়া সে ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে, কোথায় যাইবে কাহাকেও বলিয়া যায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কন্যার মুখে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, বৃদ্ধ শিবে করাঘাত করিযা বলিলেন, "হায় হায়! রাগের বসে এ কি কাজ করে বসলাম!" অনুশোচনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। রতনমণি তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, "আপনি আর কি কববেন বাবা? যার অদৃষ্টে যা আছে তাই ত হবে; সে ত কেউ রদ করতে পারবে না—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও না।"

একদিন কাটিল, দুইদিন কাটিল। এ দুইদিন নিয়মিত সময়ে হরিকিঙ্কর আহারে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া থাকিয়াছে। রাত্রে নিদ্রা হয় না, উঠিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন, আর হায় হায় করেন। তৃতীয় দিনে, বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে গিয়া তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদের কোনও সংবাদ তাহারা পাইয়াছে কি না। তাহারা বলিল, কোনও সংবাদই তাহারা পায় নাই। নয়নমণির বিশীর্ণ পাণ্ডুর দেহখানি ও ম্লান মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা হাহাকার করিতে থাকে।

চতুর্থ দিনে তিনি রতন ও গৌবমণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, মনের খেদে কাশী ছেড়ে আর কোনও তীর্থস্থান গিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছে। এখানকার বাড়ী বন্ধ করে চল আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুবে বেড়াই—যদি কোথাও আবার তার দেখা পাই।"

দুই তিনদিন ধবিয়া পিতা ও কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এই বিষযে বাদানুবাদ চলিল। রতন বলে, "আপনাব এই দুর্ব্বল শরীরে, এ অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান কি আপনার শবীরে সইবে? বিদেশ বিঁভুইয়ে যদি কোনও অসুখ বিসুখ হযে পড়ে, তা হলে আমবা মেয়েমানুষ, আপনাকে নিয়ে আতন্তরে পড়ে যাব যে! সে কাশী ছেড়ে গিযেছে, আবাব হয়ত ফিবে আসবে। মাঝে মাঝে সেবাশ্রমে গিয়ে খবর নিলেই হবে—দিনকতক দেখাই যাক না।"

এইরূপ একমাস কাটিল। দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি একদিন বৃদ্ধ পূজা আহ্নিক সাবিযা.

দুগ্ধপান করিয়া নয়নমণিকে বলিলেন, "আমি একবার অগস্ত্যকুণ্ডে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানেক পবে ফিরবো।" দাই নিম্নে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, বৃদ্ধ তাহাকে বলিয়া গেলেন, "আমি বেরুচ্ছি, ছোটদিদিমণি একলা রইল, বড়দিদি মেজদিদি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুই বাড়ীতে থাকিস, কোথাও যেন যাসনি।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

নয়নমণি রান্নাঘর বন্ধ করিয়া, পিতার ঘরে আসিয়া তাঁহার মহাভারতখানি লইয়া, মেঝের উপর বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পর, দাই নিম্ন হইতে আসিয়া বলিল, "ছোটদিদিমণির ডাকওয়ালা এই রেজেষ্টারী চিঠি নিয়ে এসেছে; রসিদ লিখে দাও।"

নয়ন চিঠিখানি হাতে করিয়া দেখিল, তাহার নামেরই চিঠি। উপরে বাঙ্গলায় স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে শ্রীমতি নয়নমণি দেবী। তাহার পর, নীচে ইংরাজিতে কি সব আছে তাহা নয়ন পড়িতে পারিল না।

এ চিঠি কে লিখিল? নয়নকে কেহ ত কোনও দিন চিঠি লেখে না। যাহা হউক, কম্পিত হস্তে রসিদে সহি করিয়া চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল, একখানি দশ টাকার নোট তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তখন চিঠিখানি সে পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণং

আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ২২শে অগ্রহায়ণ।

নয়নমণি,

তুমি আমার এ পত্র পাইয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবে কারণ বিবাহের পর পাঁচ বৎসর মধ্যে কখনও তোমাকে আমি কোনও পত্র লিখি নাই, এই প্রথম।

যেদিন প্রথম রাস্তায় তোমার দিদিদের সহিত দেখা হয় সেদিন বিকালে তোমাদের বাড়ী যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম কারণ সত্যবদ্ধ হইয়াছিলাম এবং দ্বিতীয়তঃ, আমি না যাইলে বড়দিদি সেবাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেবাশ্রমে সকলেই আমার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত ছিল, সুতরাং ধরা পড়িতাম। সেদিন বিকালে আমি তোমাদের কাশীর নদীয়া ছত্তরের বাড়ীতে গিয়া, মহাপাবণ্ডের মত তোমাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, কিছুতেই স্বীকার করি নাই যে আমি সেই বিনোদ। তুমি যখন আমার কাছে বসিয়া কাঁদিয়াছিলে, তখন এক একবার আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে স্বীকার করি; কিন্তু আমি বাবা বিশ্বনাথের সেবার জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, গৃহী হইলে আমার ব্রতভঙ্গ হইবে এই ভাবিয়া তখন অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসি।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু যে ব্রতের জন্য তোমাদের সহিত এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কবিয়া আসিলাম, সে ব্রতে আমি আর মন দিতে পারিলাম না। সারাদিন কেবল তোমার সেই অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি স্মরণ হয়,—যে কাজে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলাম সে কাজে আর মন লাগে না। তোমার সেই মুখখানি, সেই কথাগুলি কেবলই মনে পড়ে—আর বুকের মধ্যে কেমন হু হু করিতে থাকে। কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তোমায় ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেবলই মনে হয়, দীন দুঃখী ও আর্ত্তের সেবাশুশ্রূষার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তাহাকে চিরজীবন রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার উপায় কি করিলাম? নিজ ধর্ম্মপত্নীকে চিবদুঃখে ডুবাইয়া আমি এ কি ধর্ম্ম পালন করিতে বসিয়াছি!

একমাস কাল নিজের মনে অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম, আমি যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ধর্ম্ম নয়, ঘোর অধর্ম্ম। তাই সেদিন ৯টার সময়, নিজ প্রকৃত পরিচয় দিয়া, তোমাদেব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আবার গৃহবাসী হইবার অভিপ্রায়ে তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম। বাবার সঙ্গে আমি যখন বসিয়া কথা কহিতেছিলাম, তখন রান্নাঘর হইতে তোমার চক্ষু দুইটি একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার

করিয়াছিলেন তাহা তুমি স্বকর্ণে সমস্তই শুনিয়াছ। তাহার পর, মনের ধিক্কারে সেখান হইতে আমি চলিয়া আসি। পথে দিদির সহিত দেখা হয়, তাঁহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি। কেবল তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ আমি পাই নাই—এই পত্রে তাহা করিতেছি। তুমি সেদিন আমায় বলিয়াছিলে, "আমি তোমার স্ত্রী না হই, তুমি আমার স্বামী।" তোমার স্বামীর পূর্ব্ব-আচরণের সমস্ত অপরাধ তুমি ক্ষমা কর, তোমার নিকটে এই আমার প্রার্থনা।

আমি এখানে বলরামপুর হাসপাতালে ডাক্তাবী চাকবি গ্রহণ কবিয়াছি। তোমার বাবা আমায় তাড়াইয়া দিলেও আমি তোমার স্বামীই রহিলাম। যদি কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা কর, আমার কাছে আসিতে চাও, তবে লিখিও, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার প্রথম উপার্জ্জন হইতে দশটি টাকা এই পত্রের মধ্যে তোমায় পাঠাইয়া দিলাম, তুমি গ্রহণ করিলে সুখী হইব এবং আমার উপার্জ্জন সার্থক হইবে। কিন্তু কি জানি, বাবা যদি এ টাকা তোমায় লইতে না দেন, তবে বিশ্বনাথ সৈবাশ্রমে ইহা পাঠাইয়া দিও।

তুমি যে আমায় পত্র লিখিবে, এ আশা করা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। আমি মাঝে মাঝে তোমায় চিঠি লিখিব। বাবার যদি অমত না হয়, তাহা হইলে দিদিরা যেন দয়া করিয়া মাঝে মাঝে আমায় তোমার সংবাদটা দেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইও।

তোমার হতভাগ্য স্বামী,—বিনোদ।

নয়নমণির তখনও পত্র পড়া শেষ হয় নাই, রতনমণি ও গৌরমণি গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নয়ন পত্রখানি তাহাদিগকে দেখাইল। গৌবমণি বলিল, "বাবা এলে তাঁকে এ চিঠি দেখিয়ে, কালই আমরা সকলে লক্ষ্ণৌ যাই চল।"

অল্পক্ষণ পরে, বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী আসিয়া বলিলেন, "ওরে রত্নী আমার আলমাবিটা খোল্ দেখি চট্ কবে।"

"কেন বাবা, কি হয়েছে?—বলিয়া রতন চাবি বাহির করিল।

বৃদ্ধ অধীর হইয়া বলিলেন, "ওরে, খোল্ খোল্—কথা পরে হবে এখন।"

রতনমণি আলমারি খুলিবামাত্র বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহাব একটা স্থান হইতে এক বাণ্ডিল পুরাতন কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে বিনোদের লেখা পাঁচ বৎসরের পুরাতন একখানি পত্র পাওয়া গেল। সেই পত্রখানি খুলিয়া, বৃদ্ধ নিজ পকেট হইতে একখানি তাজা পত্র বাহির কবিযা মিলাইতে লাগিলেন। কন্যাদ্বয়কে বলিলেন, "দেখ্ দেখি—দেখ দেখি দুই চিঠিই এক হাতেব লেখা নয়?"

রতনমণি গৌরমণি নূতন পত্রখানি তুলিযা দেখিল, তাহাও বিনোদ লক্ষ্ণৌ হইতে সেবাশ্রমে লিখিয়াছে, বেতন পাইয়া আশ্রমের সাহায্যকল্পে পত্রমধ্যে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আজ ওদের ওখানে খোঁজ নিয়ে গিয়ে শুনলাম, একটু আগেই তারা এই চিঠি পেয়েছে। চিঠি দেখেই মনে হল, আমার কাছেও তার দুই একখানি চিঠি ত আছে, হাতের লেখা মিলিয়ে দেখি না! তাই চিঠিখানি তাদের কাছে চেয়ে নিয়ে, ছুটতে ছুটতে এসেছি। আমার ত ভাল নজর হয় না, তবু মনে হচ্ছে দুই লেখা এক তোরা বেশ করে দেখ্ দেখি—তোদের কি মনে হয় বল দেখি?"

রতন হাসিয়া বলিল. "একই লেখা বাবা। এই দেখুন, বিনোদেব আর একখানি চিঠি একটু আগেই এসেছে, নয়নকেও বিনোদ প্রথম মাইনে পেয়ে দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।—বলিয়া পত্রখানি সে পিতাব হাতে দিল।

বৃদ্ধ পত্রখানি হাতে লইলেন, কিন্তু পড়িলেন না, ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "জয় বাবা বিশ্বনাথ, এমনি কৃপা যেন চিবদিন থাকে বাবা!" তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দবদব ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পরদিন সকলে মিলিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা কবিলেন। (কার্ত্তিক, ১৩২৬)

অদৃষ্ট পরীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

চোগা চাপকান পরিয়া শ্যামলা মাথায় দিয়া, নব্য উকীল শ্রীযুত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ হাতে করিয়া হুগলী ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিতেই ট্রেনখানি আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি কামরায় দুইজন ইংরাজ বসিয়া আছে, অন্যটি খালি। সুতরাং সেই খালি কামরাটিতেই তিনি উঠিয়া পড়িলেন। জানালাগুলি খুলিয়া রুমাল দিয়া চামড়ার গদির ধূলা ঝাড়িয়া মনোমত স্থানটিতে বসিতেই ঘণ্টা হইল, গাড়ির সবুজ নিশান উড়িল, এঞ্জিনের বাঁশি বাজিল, ট্রেনখানি চলিতে আরম্ভ করিল। হেমন্তবাবু তখন পায়ের জুতা খুলিয়া ছিদ্রবহুল মোজা-সংযুক্ত চরণ দু'খানি বেঞ্চির উপর ছড়াইয়া দিয়া, আরাম করিয়া বসিয়া মক্কেলের উপহার সিগারেটের একটি প্যাকেট বাহির করিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

হেমন্তবাবু বর্দ্ধমানে ওকালতী করিয়া থাকেন। আজ তিন বৎসর কাল আদালতে যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু উপার্জ্জন আশানুরূপ হইতেছে না। অথচ, গৃহে স্ত্রী, দুইটি কন্যা, একটি বিধবা ভগিনী এবং বৃদ্ধা মাতা। বাড়ীখানি পৈতৃক, ভাড়া দিতে হয় না, তিন মাস অন্তর মিউনিসিপ্যাল টেক্স দিয়াই খালাস—ঐ যা একটু সুবিধা। কিন্তু কঠোর মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়াও মাসে একশোটি টাকার কমে সংসারটি কিছুতেই চলে না। মাঝে মাঝে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। পরিবারস্থ কাহারও পীড়াদি হইলে, অথবা অন্য কোনওরূপ অভাবিতপূর্ব্ব দায় উপস্থিত হইলেও পুঁজিতে হাত পড়ে। এই প্রণালীতে সেই পুঁজিও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। হুগলিতে একটি মোকর্দ্দমা পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছিলেন। একদমে পঁচিশটি টাকা ফী পাইয়া মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল। দশদিন পরে আবার তারিখ পড়িয়াছে, আবার আসিতে হইবে। মোকর্দ্দমাটি এখন কিছুদিন চলিলেই মঙ্গল।

ট্রেন, ছোট ছোট ষ্টেশনকে গ্রাহ্য না করিয়া, নিজ আভিজাত্য গর্ব্বে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমন্তবাবুর সিগারেট শেষ হইল, গোটা দুই ছোট ষ্টেশনও পার হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া গোসল কামরায় প্রবেশ করিলেন। হাত মুখে জল দিয়া রুমালে মুখ মুছিতেছেন, এমন সময় উপরে জালতি র‍্যাকের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। দেখিলেন, ময়লা মোটা কাপড়ে বাঁধা একটি পুলিন্দা। "কাহারও মোকর্দ্দমার কাগজপত্র নাকি?"—মনে এই ভাবিয়া পুলিন্দাটি তিনি নামাইলেন। গোসল কামরা হইতে বাহির হইয়া, স্বস্থানে আসিয়া বসিয়া, সেটি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিতে লাগিলেন। পুলিন্দাটি খুলিবেন, অথবা বর্দ্ধমানে নামিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিবেন, ইহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে হইল, ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দেওয়ায় একটা বিপদ আছে। নিজ নামধাম লিখাইয়া দিতে হইবে। পরে, যাহার পুলিন্দা সে যদি বলে, উহার মধ্যে আমার এত টাকা ছিল, অথবা অমুক মূল্যবান দ্রব্য ছিল, তাহা নাই, তখন কি করিয়া আমি প্রমাণ করাইব যে, উহা আমি আত্মসাৎ করি নাই? কামরায় এমন একজন সহযাত্রীও নাই যে, আমার সাধুতার বিষয় সাক্ষ্য দিবে। অবশ্য প্রমাণের ভার বাদীর উপরে, আদালতে না হয় আমি বেকসুর খালাস পাইয়াই আসিলাম। কিন্তু বদনামটা যাইবে কোথায়? সুতরাং কি করা যায়? কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে? শেষ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ী সাইডিং-এ গেলে, মেথর ঝাড়ু দিতে আসিয়া উহা কুড়াইয়া পাইবে এবং ভিতরে কি আছে দেখিবার জন্য গোপনে বাড়ী লইয়া যাইবে। টাকাকড়ি যদি কিছু থাকে তবে তাহা অপহরণ করিবে; কাগজপত্র যাহা

আছে যথার্থ অধিকারীর কাছে সেগুলি যতই দরকারী হউক, ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবে অথবা পোড়াইয়া ফেলিবে। আহা, যে বেচারী ইহা ফেলিয়া গিয়াছে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে! আমি যদি ইহা খুলি, তবে খুব সম্ভব প্রকৃত অধিকারীর নাম ধামের সন্ধান পাইব—যাহার জিনিষ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিব। সুতরাং খুলিয়া দেখাই উচিত হইতেছে।

পকেট হইতে আর একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া হেমন্তবাবু দপ্তরের দড়ি খুলিতে লাগিলেন। বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত হইলে, দেখা গেল, আদালতের নীলাম ইস্তাহারি বৃহৎ মোটা ফরমে পুলিন্দাটি জড়ানো এবং আবার দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহা খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন নোট—কেবল নোট—সমস্তই নোট, অন্য কাগজপত্র কিছুই নাই। নোটগুলি থাকবন্দি করিয়া সাজানো, এইরূপ দশটি থাক, প্রত্যেকখানি নোট ১০০ টাকার করিয়া। দেখিয়া হেমন্তবাবুর মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। ভয় হইল হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। নোটগুলি সেই অবস্থায় বেঞ্চির উপর ফেলিয়া হেমন্তবাবু টলিতে টলিতে আবার গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন এবং জলের কল খুলিয়া পাগলের মত মাথায় জল দিতে লাগিলেন। কলার ভিজিল, চাপকান ভিজিল, কতক জল কামিজের ফাঁকে প্রবেশ লাভ করিয়া পৃষ্ঠে গিয়া পৌঁছিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ জলসেকের পর কল বন্ধ করিয়া হেমন্তবাবু রুমালে মাথা মুখ মুছিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র রুমাল ভিজিয়া যায়, জল গালিয়া ফেলিয়া,আবার হেমন্তবাবু মাথা মুছেন। আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলেন, চক্ষু দুইটি লাল টক্‌টক্ করিতেছে, চুলের টেড়ি বিলুপ্ত হইয়া মাথাটি অসভ্য বন্য জাতির মত হইয়াছে। অঙ্গুলি সাহায্যে নোটের একটি থাক গণনা করিয়া দেখিলেন একশোখানি আছে, দশ হাজার টাকা। অন্য থাকগুলিও সমান মোটা। দশটি থাক—লক্ষ টাকা।

নোটগুলি সেই নীলাম ইস্তাহারি কাগজে জড়াইয়া হেমন্ত নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরিলেন। ময়লা মোটা কাপড়খানা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

ট্রেন যথাসময়ে বর্দ্ধমানে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমন্তবাবু নামিয়া ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ প্রায় একমাস কাল পরে হেমন্তবাবু রোগশয্যা ত্যাগ করিলেন, পথ্য পাইলেন। হুগলি হইতে ফিরিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া সেই রাত্রেই তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, প্রবল জ্বরে কয়েকদিন তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন। দিন পনেরো ষোল অবস্থা খুবই খারাপ গিয়াছিল। যমে মানুষে টানাটানি বলিলেই হয়। তাহার পর হইতে একটু সুরাহা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার—মায় সিভিল সার্জ্জন "সাহেব" পর্য্যন্ত—আসিয়াছিলেন। বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে—তা যাউক, প্রাণটা যে বাঁচিয়েছে ইহাই পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।

শিঙি মাছের ঝোল সহ পুরাতন চাউলের চারিটি ভাত খাইয়া হেমন্তবাবু বিছানায় উঠিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার জননী আসিয়া বলিলেন, "বাবা এতদিন তোমায় বলিনি, এই অসুখে আমার হাতে পুঁজিপাটা যা ছিল, তা সমস্তই প্রায় খরচ হয়ে গেছে। এখন দিন চলবে কি করে আমি সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়েচি। কি যে হবে আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে।"—বলিয়া তিনি মুখখানি গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

"গায়ে একটু বল পেলেই আদালতে বেরুই আবার।"—বলিয়া হেমন্তবাবু ঘরের কোণে আলমারিটির পানে চাহিলেন। হুগলি হইতে সেদিন বাড়ী আসিয়াই ব্যাগটা আলমারির ভিতর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে একটু জ্ঞান হইলেই স্ত্রীর দ্বারা

আলমারি খোলাইয়া ব্যাগটি বাহির করাইয়াছিলেন এবং স্ত্রী কার্য্যান্তরে গেলে সেটি খুলিয়া দেখিয়াছিলেন, পুলিন্দাটি যেমন ছিল তেমনই আছে। এ কয়দিন শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিলেন, যাহার টাকা সে নিশ্চয়ই দুই একদিন পরে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে, বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাইলে, পুরস্কারের টাকাটা পাইবার উপায় হয়। কিন্তু বাড়ীতে খবরের কাগজ নাই, পাড়ার বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতে এতদিনের পুরাতন কাগজ এখন খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। উকীল লাইব্রেরীতে বড় বড় তিনখানি দৈনিক কাগজের ফাইল আছে, যথাসম্ভব শীঘ্র লাইব্রেরীতে গিয়া সেগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার প্রলোভনও তাঁহার মনের মধ্যে বিষম উৎপাত করিয়াছে—১০০ টাকার নোটের নম্বর রাখা হয় না, ধরা পড়িবার তেমন আশঙ্কাও নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হেমন্তবাবু সে প্রলোভনকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাবিয়াছেন ছি ছি, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, এত লেখাপড়া শিখিয়া শেষে কি চোর হইব? তবে পুরস্কারের টাকাটা লইতে হইবে বইকি! সেই বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের টাকাটার পরিমাণ কি হইতে পারে, ইহাই শুইয়া শুইয়া এ কয়দিন তিনি চিন্তা করিয়াছেন। যদি কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাও তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মস্তিষ্ক এখনও দুর্বল কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

অন্ন পথ্য পাইবার চার দিন পরে আদালতে যাইবার জন্য হেমন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মা আসিয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "এখন এই দুর্ব্বল শরীর, হয় ত মাথা ঘুরে পড়ে যাবে; নাই বা কাছারি গেলে বাবা! আরও দু'চার দিন যাক, শরীরে একটু বল পাও তারপর বেরিও।" স্ত্রী কমলিনী আসিয়া অনেক মিনতি করিলেন। হেমন্ত অনেক করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া অভয় দিয়া, কাছারি যাত্রা করিলেন।

উকীল লাইব্রেরীতে পৌঁছিলে তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আরোগ্য লাভের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু ফাঁক পাইয়া, হেমন্ত লাইব্রেরী ঘরে গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া, খবরের কাগজগুলির ফাইলের নিকট বসিলেন। যে তারিখে হুগলি হইতে ফিরিয়াছিলেন, সেই তারিখ হইতে ৮/১০ দিনে কাগজের বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি তন্ন তন্ন করিয়া একঘণ্টা কাল খুঁজিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন না। এই পরিশ্রমে তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মুখে কানে জল দিয়া এক গেলাস জল পান করিয়া, গাড়ী ডাকাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া রহিলেন।

হেমন্তরে স্ত্রী আসিয়া কাছে বসিয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিল, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, এইরূপ ঘণ্টাখানেক শুশ্রূষার পর তিনি কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

কয়েকদিন পরে পুনরায় কাছারি গিয়া পুলিশ গেজেটের ফাইল, কলিকাতা গেজেটের ফাইল অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনও সন্ধান মিলিল না। টাকা হারানোর কোন রূপ বিজ্ঞাপন কেহ দেয় নাই। মাসখানেক পরে হেমন্ত কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরিলেন, কারেন্সি আপিস, রয়াল এক্সচেঞ্জের নোটিশ বোর্ডগুলি খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও কোনরূপ সূত্র পাইলেন না।

অবশেষে নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া একখানি প্রধান ইংরাজি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিলেন—"রেলগাড়ীতে ভ্রমণ কালে আমি একটি পুলিন্দা কুড়াইয়া পাইয়াছি। হারাইবার তারিখ, স্থান পুলিন্দায় কি ছিল ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা সহ আবেদন করুন।"—ইত্যাদি।

উপর্য্যুপরি ছয়দিন ধরিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, কিন্তু একখানি পত্রও হেমন্তের নিকট আসিল না।

তখন তিনি এ বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া একদিন তাঁহাব জননীর নিকট আদ্যোপান্ত

সমস্ত কথা জানাইয়া টাকাটা এখন কি করা উচিত সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা সমস্ত শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "অতগুলি টাকার লোভ তুমি যে বাবা সংবরণ করতে পেরেছ, তাতে আমি বড় সুখী হয়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলের উপযুক্ত কাজই তুমি করেছ। এত করেও যখন টাকার মালিকের সন্ধান পেলে না, তখন একটা কাজ কর। টাকাগুলি কলকাতায় কোনও ভাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে এস। ব্যাঙ্ক থেকে ঐ টাকার সুদ যা পাওয়া যাবে, তা তুমি স্বচ্ছন্দে নিজে ভোগ করতে পার, তাতে কোনও দোষ নেই, আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি। যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন টাকার যথার্থ মালিক এসে উপস্থিত হয়, ঐ সমস্ত টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দিও।"

হেমন্ত জননীর আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিলেন। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় গিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত রাখিয়া আসিলেন।

ছয় মাস অন্তর ২৫০০ টাকা সুদ আসিতে লাগিল। সেই টাকায় এবং নিজের উপার্জ্জনে হেমন্ত স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল; ক্রমে ওকালতীতে হেমন্তের পশার জমিয়া গেল; আরও কয়েকটি নাতি নাতিনীর মুখ দেখিয়া তাঁহার জননী স্বর্গারোহণ করিলেন; বড় মেয়েগুলির বিবাহ হইল; বড় ছেলেরা পাশ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিল; হেমন্তের দেহখানি স্থূল হইল, মস্তকের অগ্রভাগে টাক পড়িল; পৈতৃক বাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া তিনি নূতন ইমারত প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু ব্যাঙ্কে জমা সেই লক্ষ টাকার দাবীদার কেহ উপস্থিত হইল না; কিংবা তাহাকে আবিষ্কার করিবার কোন সূত্রও হেমন্ত পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ রবিবার। বেলা ৭টার সময়, অন্তঃপুরে বসিয়া হেমন্তবাবু চা-পান করিতেছিলেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, আপিসঘরে একটি বাবু দেখা করিবার জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মক্কেল?" ভৃত্য বলিল, "বগলে ত কাগজ পত্র কিছু দেখলাম না।"—"আচ্ছা বসতে বল্"—বলিয়া হেমন্তবাবু চা-পানে রত হইলেন।

চা-পানান্তে কিয়ৎকাল তামাকু-সেবন করিয়া হেলিতে দুলিতে মন্থরপদে তিনি আপিসঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। একজন খর্ব্বকায় প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুগ্মকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম।"

হেমন্তবাবু আশীর্বাদ-সূচক হস্তসঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি কলকাতা থেকে কবে এলেন? বাবু ভাল আছেন ত? বসুন বসুন।"

উভয়ে উপবেশন করিলে আগন্তুক বাবুটি বলিলেন, "আজ্ঞে, আজ ভোরের ট্রেনেই এসে পৌঁছেছি। আবার আজই ফিরে যেতে হবে। বাবুজী একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

হেমন্তবাবু হাসিয়া বলিলেন, "স্বয়ং দেওয়ানজীকে পাঠিয়েছেন, কাজটা তা হলে গুরুতর বলুন!"

লোকটির নাম হরিহর দত্ত—ইঁহার মনিব শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এই জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের জমিদার। আসলে ইঁহারা জমিদার নহেন, বর্দ্ধমান রাজএষ্টেটের পত্তনীদার—কিন্তু লোকে জমিদারই বলিয়া থাকে। আজ প্রায় বিশ বৎসর হইতে ইন্দ্রবাবু কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে জমিদারীতে আসা প্রায়ই ঘটে না।

হেমন্তবাবু ইঁহার এষ্টেটের বাঁধা উকীল। শুধু উকীল নহেন—বন্ধু। বাল্যকালে উভয়ে যখন একত্রে স্কুলে পড়িতেন, সেই সময় হইতেই দুই জনে অকৃত্রিম প্রণয়। যৌবনেও সেই বান্ধবতা অব্যাহত ছিল। ওকালতীর প্রথম অবস্থায় সেই দুঃখের দিনে, হেমন্ত কতবার ইন্দ্রবাবুর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন। তাহার পর ইন্দ্রবাবু কলিকাতাবাসী হইলেন। তখন হইতে দেখাসাক্ষাৎ কমিল। হেমন্তবাবু এখনও কলিকাতা গেলে, মামলা-মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত কোনও পরামর্শ না থাকিলেও ইন্দ্রবাবুর বাটীতে গিয়া মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা যাপন করিয়া থাকেন।

দেওয়ানজি বলিলেন, "আপনি ত জানেনই দেনাপত্রে আমরা এদানীং বড়ই জড়ীভূত হয়ে পড়েছি। বাবুজী এতদিন খরচপত্র খুব দরাজ হাতেই করে এসেছেন। এষ্টেটের যা আয়, তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ করতেন। টাকাকে টাকা জ্ঞান করতেন না। আমি মাঝে মাঝে বুঝিয়েছি, কিন্তু চাকর মনিব সম্বন্ধ, বেশী কিছু বলতেও পারতাম না। ফলে—যা হবার তাই হয়েছে। মেরে কেটে বড় জোর লাখ দেড়েক টাকা ত আয়; তাতে আর কত সয় বলুন। দেনার জ্বালায় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হবার জোগাড়। কিন্তু এইটুকু সুখের বিষয় যে এতদিনে বাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে। খরচপত্র কমিয়ে দিয়েছেন। বাড়ীতে 'সাহেব ভোজন বন্ধ হয়েছে; তিনখানা মোটরগাড়ী ছিল, তার দু'খানা বেচে ফেলেছেন; বাড়ীতে রাণীমার, কুমারদের আটপৌরে ব্যবহারের জন্যে এখন মিলের কাপড় কেনা হচ্ছে—অধিক আর কি বলবো,—নিজে এখন O.H.M.S. খাচ্ছেন।"

শুনিয়া হেমন্তবাবুর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "এ সব ত গেল ভূমিকা। আসল কথাটা কি?"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "বলছি। আসল কথার জন্যেই ত এসেছি। পাওনাদারেরা জোট বেঁধে এখন নালিশ করা শুরু করেছে। তিনটে ডিক্রী হয়ে গেছে—এখনও টাকা দাখিল করতে পারা যায়নি। আরও গোটা চার পাঁচ মামলা ঝুলছে। এরা সব দোকানদার—বেশীর ভাগই 'সাহেব' দোকানদার। কিছু হ্যাণ্ডনোটও আছে—কেউ কেউ উকীলের চিঠিও দিয়েছে। কিছুদিন হল, একজন ত বাড়ী বয়ে এসে, চাকরবাকর কর্ম্মচারীদের সামনেই বাবুজীকে অপমান করে গেছে। সেইদিন বাবুজী প্রতিজ্ঞা করেছেন, এক শালার এক পয়সাও আর বাকী রাখবো না—সমস্ত মিটিয়ে দেব—তাতে যদি আমার সমস্ত এষ্টেট বিক্রী করতে হয়, সো ভি আচ্ছা।"

হেমন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেনার পরিমাণ সবসুদ্ধ কত হবে?"

"আমরা হিসেব করে দেখেছি, এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হলেই সমস্ত দেনা মিটে যায়—কারুর এক পয়সাও আর বাকী থাকে না। সেই টাকার এখন প্রয়োজন। টাকাটা তোলবার জন্যে বাবুজী স্থির করেছেন, তাঁর জমিদারীর দুই একটা মহাল বিক্রী করে ফেলবেন।"

হেমন্তবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "একেবারে বিক্রী করে ফেলবেন? তার চেয়ে বন্ধক রেখে—"

আমরাও সেই পরামর্শই বাবুজীকে দিয়েছিলাম। আগে আগে কোনও পাওনাদাব এ রকম নালিশ-টালিশ করে ব্যতিব্যস্ত করলে, আমরা অন্য কোথাও থেকে টাকাটা ধার করে এনে সেটা মেটাতাম। কিন্তু বাবুজী সে দিন ঐ রকম অপমানিত হওয়ার পর, পৈতে ছুঁয়ে শপথ করেছেন, ধার আর তিনি করবেন না—তাতে যদি ছেলেপিলে নিয়ে উপবাস করতে হয়, সো ভি আচ্ছা। সুতরাং কিছু সম্পত্তি বিক্রী করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

হেমন্তবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে বলিলেন, "খদ্দের কেউ ঠিক হয়েছে?"

"আজ্ঞে না। কলকাত্তার ধনীরা, পাড়াগাঁয়ের জমিদারী বড় কিনতে চায় না। চাইলেও

দর অসম্ভব কম বলে। বাবুজি এই কাজটির জন্যে আপনার উপরেই ভার দিতে চান। ঐ জেলায় আপনার ত অনেক বড় বড় মক্কেল আছে—কোথাও যদি—"

হেমন্তবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "খদ্দের—অবশ্য—আমি ঠিক করে দিতে পারি। কিন্তু এটা যে বড়ই দুঃখের বিষয় হল দেওয়ানজি!"

দেওয়ানজি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে সে ত বটেই! কিন্তু উপায় কি? বছরে সাত আট হাজার টাকা—হয় ত আরও বেশী—আয় কমে যাবে। কিন্তু আবার এও ভাবি, শরীরের যে অঙ্গে দুষ্ট ক্ষত হয়েছে, সে অঙ্গটা কেটে ফেলে, বাকী দেহটা যদি সুস্থ নিরাময় হয়, প্রাণটা যদি বাঁচে—তবে সেই কি একটা কম লাভ? দুই একটা মহাল গিয়ে বাকী সম্পত্তিটি যদি বজায় থাকবার উপায় হয়—এই ঘটনা থেকে বাবুজী যদি স্থায়ীভাবে নিজেকে সংশোধন করতে পারেন—তা'হলে দুঃখ করবার কিছু নেই।"

হেমন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কোন্ মহাল বিক্রী হবে, কিছু স্থির হচ্ছে কি?"

"না স্থির এখনও কিছু হয়নি। যে কিনবে, তার সুবিধের উপর কতকটা নির্ভর করছে ত! এই একটা লিষ্ট আমি এনেছি।"—বলিয়া দেওয়ানজি তাঁহার পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উকীলবাবুর হাতে দিলেন। অতঃপর দুইজনে মহালগুলির সম্ভাবিত মূল্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

বেলা দশটা বাজিলে দেওয়ানজি উঠিলেন। হেমন্তবাবু তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে হেমন্তবাবুর গাড়ী তাঁহাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনেব পর, আপিস-কক্ষে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে জন দুই মক্কেল বিদায় কবিযা, ববিবাসবিক দিবানিদ্রার জন্য হেমন্তবাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাব পত্নী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে টেবিলের উপরকার বহি কাগজগুলা সাজাইয়া রাখিতেছেন। কমলিনী এখন আর সেই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ক্ষীণকায়া যুবতী নাই। অবয়বে প্রৌঢ়া জননীব লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। দেহখানি বড় উকীলেব গৃহিণীব যেরূপ স্থূল হওয়া উচিত, সেইরূপেই হইয়াছে। হেমন্তবাবু পালঙ্কে বসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাওয়া হল?"

"হ্যাঁ, এই কতকক্ষণ খেয়ে উঠলাম"—বলিয়া গৃহিণী স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "বস তবে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক।"

আদালত খোলা থাকিলে, পশারওয়ালা উকীলগণের পত্নীরা ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন ভিন্ন স্বামীর সহিত বিশ্রম্ভালাভের আর বড় সুযোগ পান না। প্রাতে কাক ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপিসগৃহে মক্কেলের আবির্ভাব; বেলা দশটা বাজিলে অন্দরে আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া বাবুর আদালত-যাত্রা; আদালত হইতে ফিরিযা সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আবার মক্কেলের উপদ্রব, তাহাদের 'বয়ান' শুনিতে শুনিতে ও কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে বাবুর রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়—এগারোটাও বাজে, তাহার পর অন্তঃপুবে আসিয়া ঠাণ্ডা লুচি ভোজনের পর শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে শয্যালিঙ্গন—দাম্পত্য আলাপের একান্ত সময়াভাব।

পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতির প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার পর গৃহিণী বলিলেন, আজ সকালে নবেন্দ্রপুরের দেওয়ান এসেছিল, ওঁদের জমিদারী নাকি কিছু বিক্রী হবে?"

"হ্যাঁ। তুমি কোথায় শুনলে?"

গৃহিণী একটু হাসিয়া মাকড়ি দুলাইয়া বলিলেন, "আমার কি চর নেই? ঘরে বসেই আমি অনেক খবর রাখি গো! কত টাকায় বিক্রী হবে?"

"লাখ টাকার উপর। এক লাখ বিশ হাজারের কম নয়। কেন, কিনবে নাকি? কেনো ত কওলা মুসাবিদা বাবদ আমার ফীজের টাকা এই বেলা বায়না দাও।"—বলিয়া হেমন্ত হাসিলেন।

গৃহিণী এদিক ওদিক চাহিয়া, নির্জ্জন দেখিয়া, এই নাও বলিয়া একটি পাণ স্বামীর মুখে গুঁজিয়া দিলেন।

দাম্পত্য-লীলা শেষ হইলে গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, ঐ জমিদারীর আমাদের কিছু কিনে নিলে হয় না? আমার অনেক দিনের সাধ, কিছু জমিদারী সম্পত্তি আমাদের হয়। ছেলেরা বড় হয়ে উঠলো, ওরা বেঁচে থাক, সকলেই যে বেশী লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে পারবে, এমন ভরসা কি? কিছু ভূসম্পত্তি থাকলে খাওয়াপরার ভাবনাটা থাকবে না।"

হেমন্ত গড়গড়ার নল মুখ হইতে খুলিয়া বলিলেন, "সে ত সব বুঝি। কিন্তু অত টাকা কোথা পাব? এতদিন যা রোজগার করলাম, মেয়েদের বিয়ে দিতে আর এই বাড়ীখানি করতেই ত গেল। খানকতক কাগজ যা আছে, তাতে কি আর জমিদারী খরিদ হয়?"—বলিয়া হেমন্তবাবু গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "কেন, ব্যাঙ্কে আমাদের যে লাখ টাকা জমা রয়েছে, সেই টাকা, আর ঘরে যে কাগজ আছে, তাতে ত হয়ে যায়।"

হেমন্ত স্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন।

কমলিনী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "দেখ, ও টাকা ভগবান তোমাকে দিয়েছেন, ও তোমারই টাকা। নইলে আজ পঁচিশ বছর কেউ কি তার খোঁজ করত না? ও টাকা স্বচ্ছন্দে তুমি নিজের বলে মনে করতে পার, তাতে কিছু অন্যায় হবে না।"

হেমন্ত বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু—মা যে বলে গেছেন ও টাকা রেখে দিতে—যার টাকা, সে যদি কোনও কালে উপস্থিত হয় তা তাকে দিতে।"

গৃহিণী বলিলেন, "মা বলেছিলেন, তাঁর আজ্ঞা পঁচিশ বছর তুমি ত পালন করলে। যক্ষের ধন ত নয় যে, চিরজীবন ঐ টাকা তোমায় আগলে বসে থাকতে হবে?"

হেমন্তবাবু নীরবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কিন্তু ধর, কেউ যদি এসে টাকাটা দাবী করে?"

গৃহিণী বলিলেন, "শুধু দাবী করলেই ত হবে না। ভাল রকম প্রমাণ ত চাই। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আইনকানুনের কিছুই বুঝিনে, কিন্তু তোমাদের মুখেই ত শুনি যে, দিন যত যায়, কোন বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া ততই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক আধ বচ্ছর নয়, পঁচিশ পঁচিশ বচ্ছর কেটে গেছে!"

"তা ঠিক!"—বলিয়া হেমন্ত গড়গড়ার নল ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গৃহিণী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে, হেমন্ত মুদ্রিত নয়নে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! এক লক্ষ টাকা যার হারিয়ে গেল, পঁচিশ বৎসরকাল সে টুঁ শব্দটি করলে না!—এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা আমি ত কখনও শুনিওনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি? তুমি এখনও ঘুমোওনি বুঝি? আমি ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছ।"

হেমন্ত উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ঘুমের পথ কি আর তুমি রেখেছ গিন্নী?"

"কেন, আমি কি করলাম?"

"মাথায় প্রলোভনের আগুন জ্বেলে দিয়েছ যে!"

গৃহিণী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "অন্যায় ত আমি কিছু বলিনি। আমার কি দোষ?"

হেমন্ত হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দোষ কিছু না। বাইবেলের গল্প শোননি? সর্পরূপী শয়তান ইডেন বাগানে এসে, বহু কষ্টে মানব-মাতা ঈভকে নিষিদ্ধ ফলটি খাইয়েছিল। তার পর ঈভ কিন্তু অতি সহজেই আদমকে সেই ফল খেতে রাজী করেছিলেন। সেই ঈভের বংশেই জন্ম ত!"

গৃহিণী বলিলেন, "পোড়া কপাল আর কি! আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ঈভের বংশে আমার জন্ম হতে যাবে কেন? তুমি শোও ঘুমোও।"

হেমন্ত বলিলেন, "সে হবে এখন; লোহার সিন্ধুক খুলে ব্যাঙ্কের বইখানা বের করে আন ত।"

গৃহিণী বই আনিয়া দিলেন। হেমন্তবাবু চশমা চোখে দিয়া দেখিলেন, কয়েকদিন হইল, সেই লক্ষ টাকার শেষ ডিপোজিটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে; পুনরায় ডিপোজিটের পত্র লেখা হয় নাই—অর্থাৎ টাকাটা যেদিন খুসী তুলিয়া লওয়া যায়।

ব্যাঙ্কের বহি সিন্ধুকে ফেরৎ পাঠাইয়া হেমন্তবাবু আবার শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না, বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "কি করি? দারিদ্র্যের অবস্থায় যে প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলাম, এখন স্বচ্ছলতার দিনে সেই প্রলোভনের হাতে আত্মসমর্পণ করব কি?"

এইরূপ নানা চিন্তায় বেলা তিনটা অবধি কাটিল। হেমন্তবাবু তখন উঠিয়া, আপিসকক্ষে গিয়া দেওয়ানজি-প্রদত্ত সেই বিক্রেয় গ্রামগুলির তালিকাখানি দেরাজ হইতে বাহির করিলেন। প্রত্যেক গ্রামের হস্তবুদ জমা, আঞ্জামী খরচা, বর্দ্ধমানরাজকে দেয় বাৎসরিক খাজনা, মুনাফা প্রভৃতি তাহাতে লেখা আছে। বর্দ্ধমান জেলার সার্ভে ম্যাপ দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল, তিনি তাহাতে বিভিন্ন গ্রামগুলির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাকালে দেওয়ানজি পুনরাগত হইলে, হেমন্তবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "দেখুন, খদ্দের আর কোথায় খুঁজে বেড়াব? আমি নিজেই কিনে নেবো মনে করছি। (তালিকা বাহির করিয়া) এই বাঁশডাঙ্গা আর খাসবেড়িয়া গ্রাম দু'খানি লাগাও আছে—এই দু'খানি, যদি এক লাখ বিশ হাজারে আপনারা দেন ত আমি কিনে নিতে রাজী আছি।"

এত শীঘ্র খরিদ্দার স্থির হইবে, দেওয়ানজি তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "সব টাকাটা—কিন্তু নগদ চাই। কেন না—"

হেমন্তবাবু বলিলেন, "সে জন্যে চিন্তা নেই। সব টাকাটা এক সঙ্গেই দেবো।"

দেওয়ানজি বিস্মিত নয়নে হেমন্তবাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রথম প্রথম সেই দুই টাকা ফীজের অবস্থা হইতেই উকীলবাবুকে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন; বৎসরের পর বৎসর অল্পে অল্পে কেমন করিয়া পশার বাড়িয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন; কিন্তু এক সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা যে ইঁহার হইয়াছে, এটা দেওয়ানজির জানা ছিল না।

পক্ষকাল পরে গৃহিণীর আশা পূর্ণ হইল। হেমন্তবাবু জমিদার হইলেন—বাঁশডাঙ্গা ও খাসবেড়িয়া গ্রামদ্বয়ের মালিক হইলেন। এই উভয় গ্রামে অনেক ঘর গোয়ালার বাস। অল্প মূল্যে খাঁটি গব্যঘৃত, ক্ষীর, ছানা, দধি সেখান হইতে আসিতে লাগিল—গৃহিণীর স্থূলদেহ স্থূলতর হইয়া উঠিল।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। একদিন প্রাতে হেমন্তবাবু হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইলেন, কলিকাতায় তাঁহার বন্ধু ও মক্কেল ইন্দ্রভূষণবাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত; হেমন্তবাবুর সহিত তিনি অন্তিম সাক্ষাৎ কামনা করেন।

হাতের মোকর্দ্দমাগুলির কাগজপত্র জুনিয়ার উকীলবাবুকে বুঝাইয়া দিয়া, আহারান্তে সেইদিনই হেমন্তবাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দীর্ঘকাল অত্যাচারের ফলে, ইন্দ্রভূষণবাবু কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সহরের বড় বড় "সাহেব"ডাক্তার, বাঙ্গালী ডাক্তার, কবিরাজ আজ মাসাধিক কাল চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই একটু সুরাহা হয় নাই, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে; অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অন্য সকলেই তাঁহার বাঁচিবার আশা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিল;—গতকল্য ডাক্তারেরাও জবাব দিয়াছেন। অনেক সময় ইন্দ্রবাবু সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই থাকেন, মাঝে মাঝে দুই একঘণ্টার জন্য জ্ঞান হয় মাত্র। গত কল্য অপরাহ্নকালে এইরূপ অবস্থায়, হেমন্তবাবুর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে তিনি দেওয়ানজির নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে বর্দ্ধমানে তাঁহাকে তার করা হইয়াছিল।

বেলা পাঁচটার সময় হেমন্তবাবুর গাড়ী আসিয়া ইন্দ্রবাবুর ফটকের কাছে দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, নিম্নতলেই দেওয়ানজি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেওয়ানজি সজল নয়নে তাঁহার প্রভুর অবস্থা সমস্তই হেমন্তবাবুকে জানাইলেন। হেমন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দাদা এত ব্যাকুল হয়েছেন কেন, তা কিছু আপনি শুনেছেন? কোনও বিশেষ কারণ আছে কি?

দেওয়ানজি বলিলেন, "আপনি তাঁর বাল্যকালের বন্ধু, সেইজন্যেই বোধ হয়। তা ছাড়া কোনও কারণ যদি থাকে, সেটা আমি জানতে পারিনি।"

দেওয়ানজি হেমন্তবাবুকে মুখাদি ধাবনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার আগমন সংবাদ দিবার জন্য উপরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনার চা দেওয়া হয়েছে, উপরে চলুন।"

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কি জেগেছেন?"

"না"—বলিয়া দেওয়ানজি অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

একটি কক্ষে হেমন্তবাবুর জন্য জলযোগ সাজানো ছিল। তিনি জলযোগে বসিলেন। যুবা সুরেন্দ্রভূষণ, ইন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র, "কাকাবাবু, ভাল আছেন ত?" বলিয়া কাছে আসিয়া বসিল; চিকিৎসা ও চিকিৎসকগণ সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিল।

জলযোগ শেষে হেমন্ত বলিলেন, "যাও দেখি বাবা, আর একবার দেখে এস জেগেছেন কি না?"

কিয়ৎক্ষণ পরে সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না, বাবা এখনও জাগেন নি। মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি ভিতরে আসুন।"

ইন্দ্রভূষণ দুই তিন বছরের বড় বলিয়া হেমন্ত তাঁহাকে দাদা ও তাঁহার স্ত্রীকে বউঠাকুরণ বলিতেন। পূর্ব্বকালে যখন ইন্দ্রবাবু নূতন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, হেমন্ত কখনও কখনও আসিয়া দেবরের ন্যায় বধূঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে হাস্য-পরিহাস, আমোদ-আব্দার করিতেন, তিনিও তাহার জবাব দিতেন—কিন্তু অন্তরাল হইতে। সাক্ষাৎভাবে এ পর্যন্ত কখনও বাক্যালাপ হয় নাই। তাই হেমন্তবাবু অনুমান করিলেন, যে বিশেষ কারণের জন্য ইন্দ্রভূষণ অন্তিম-শয্যায় তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই বউঠাকুরণ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।

সুরেন্দ্র তাঁহাকে লইয়া গিয়া একটা ঘরে বসাইয়া, মাকে আনিতে গেল। ক্ষণকাল পরে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একজন প্রৌঢ়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। "বউঠাকুরণ?"—বলিয়া হেমন্ত তাঁকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার বিষাদখিন্ন স্ফীত অবনত চক্ষু দুইটির পানে চাহিলেন।

গৃহিণী মাথার কাপড় একটু তুলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি ওঘরে গিয়ে ব'স।"

হেমন্ত সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন। কি এমন কথা ইনি বলিবেন, যাহা উপযুক্ত পুত্রেরও অশ্রাব্য? ইহাই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ।

সুরেন্দ্র চলিয়া গেলে গৃহিণী অশ্রুভরা কণ্ঠে কহিলেন, "ব'স ঠাকুরপো, ব'স।"

"আপনি বসুন"—বলিয়া হেমন্ত চেয়ারখানিতে বসিলেন।

গৃহিণী বসিলেন না; তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমন্ত তাঁহার এই সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে কি বলবেন, বউঠাকুরণ?"

গৃহিণী সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "ঠাকুরপো, কর্ত্তা তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তা কিছু তুমি জান কি?"

"না, আমি ত কিছু জানিনে। আপনি জানেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, আমি কিছু জানিনে, তবে এইটুকু মাত্র তিনি আমায় বলেছেন তোমার নাম করে, "এক সময়ে আমি তার একটা ভযানক অনিষ্ট কবেছি। সে আমাকে ক্ষমা না করলে, পরলোকে আমার সদ্‌গতি হবে না। এইটুকু মাত্র তিনি আমায় বলেছেন, আর কিছুই বলেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দেননি চুপ করে ছিলেন। হয় ত তাঁর মনে কষ্ট হচ্ছে, এই ভেবে আমি আর পীড়াপীড়ি করিনি, খুব সম্ভব, সেই বিষয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যেই তিনি তোমায ডেকে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো, আমি ত আজ ত্রিশ বছর তোমাদের দেখছি, সব খবরই জানি, কিন্তু তিনি তোমার প্রতি কোনও দিন কোন অন্যায় করেছেন, তা তো আমি জানিনে। কি অন্যায় তিনি করেছেন, যদি বলতে কোনও বাধা না থাকে, তবে তুমি আমায় তা বল, ঠাকুরপো।"

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তিনি আমাব প্রতি অন্যায় কবেছেন? আমার অনিষ্ট করেছেন? কবে? কি অনিষ্ট করেছেন? কই, আমিও ত কিছু ভেবে পাচ্ছিনে!"

গৃহিণী বলিলেন, "এ ত আশ্চর্য কথা! তিনি বলেন, তোমাব তিনি ঘোব অনিষ্ট করেছেন, অথচ তুমি বলছ তুমি কিছুই জান না?"

"জ্বরেব ঘোরে তিনি ভুল বকেছেন বোধ হয।" —বলিযা হেমন্তবাবু মুখ অবনত করিযা রহিলেন।

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা কবিযা, মুখখানি তুলিয়া, অশ্রুগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "আজকে দু' তিনবার, যখনই ওঁর জ্ঞান হযেছিল, জিজ্ঞাসা করেছেন, 'হেমন্ত এসেছে?' আমরা বলেছি, তাঁকে 'তার' করা হয়েছে, আজ কোনও সময়ে তিনি এসে পৌঁছবেনই। এখন অঘোবে ঘুমুচ্ছেন, আবার জ্ঞান হলেই তিনি তোমায় ডেকে পাঠাবেন। তোমায় কি বলবেন, তা জানিনে—তোমাব কি ক্ষতি কবার কথা বলে' তোমার কাছে মাপ চাইবেন, কিছুই আমি অনুমান কবতে পারছিনে। তুমি নিজেই যখন এব বিন্দুবিসর্গ জান না, আমি কি ক'রে জানব? কিন্তু দোহাই তোমার ঠাকুরপো"—(গৃহিণী গলবস্ত্র হইয়া যোড় হাত করিলেন)—"তিনি তোমার প্রতি যে অন্যায় করাব কথাই বলুন, যে ক্ষতি, যে অনিষ্ট করার কথাই বলুন, তুমি প্রসন্ন মনে তাঁকে ক্ষমা করো। নইলে, এই অন্তিম সময়ে—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইযা আসিল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

হেমন্তবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি হাতযোড করেন কেন, বউঠাকুরণ? করেন কি! আমায় অত ক'রে বলতে হবে না। খুব সম্ভব জ্বরেব ঘোরে একটা কোনও কাল্পনিক অনিষ্টেব কথাই তাঁর মাথায় ঢুকেছে। যদি বাস্তবিকই কিছু হয়, আমি আপনার কাছে কথা দিচ্ছি, আমি এমনভাবে উত্তব করব, যাতে তাঁব মনে কোনও ক্ষোভ, কোন অশান্তি আর না থাকে। আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন বউঠাকুবণ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক ঘণ্টা পরে ইন্দ্রভূষণবাবুর পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল। গৃহিণী যেরূপ বলিয়াছিলেন, জাগিয়াই তিনি হেমন্তবাবুর খোঁজ করিলেন। হেমন্তবাবু অনতিবিলম্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নীত হইলেন।

ইন্দ্রভূষণ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "হেমন্ত, এসেছ ভাই? আমার মেয়াদ ত শেষ হয়ে এসেছে। তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে, সেইটি না বললে আমার প্রাণ বেরুচ্ছে না। ওগো, তোমরা সবাই এবার ও-ঘরে যাও।"

উপস্থিত সকলে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় গৃহিণী মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে হেমন্তবাবুর পানে চাহিয়া গেলেন।

নির্জ্জন হইলে, ইন্দ্রভূষণ বলিলেন, "বেশী কথা ক'বার সময় নেই, শক্তিও নেই। হেমন্ত মনে আছে, তোমার ওকালতীর সেই প্রথম অবস্থা? বড় কষ্টে তোমার দিন যাচ্ছিল।"

হেমন্ত বলিলেন, "হ্যাঁ দাদা, মনে পড়ে বইকি! তোমার কাছে সে সব দিনে অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি, জীবনে তা কি ভুলবো?"

ইন্দ্রভূষণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাক। তখন তিন বছর না চার বছর তোমার প্র্যাকটিস হয়েছে। জার্ম্মানীতে যে লটারী খেলা হয়, আমি সেই লটারির দু'খানি টিকিট কিনেছিলাম। একখানি তোমার জন্যে, একখানি আমার নিজের জন্যে। তোমার আসল ঠিকানাটি না দিয়ে, আমার কেয়ারেই লিখে দিয়েছিলাম। উঃ গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু জল।"

হেমন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই কাহিনী শুনিলেন। তাঁহার মনে হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা ত জ্বরের প্রলাপের মত শুনাইতেছে না। পাশের টেবিলে জলের গেলাস ছিল। দুই তিন চামচ জল রোগীকে তিনি পান করাইয়া দিলেন।

জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া ইন্দ্রভূষণবাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "উভয়ের অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্যে টিকিট দু'খানি কিনেছিলাম। কত দিন হ'ল, সে আজ বোধ হয় ত্রিশ বছরের কথা, নয়?—আজ ত্রিশ বছর পরে তোমায় জানাচ্ছি, তোমার টিকিটখানি এক লক্ষ টাকা প্রাইজ পেয়েছিল।"

হেমন্ত অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ!"

ইন্দ্রবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"যখন চিঠি এল, তখন আমি দেশের বাড়ীতে। একখানি ক্রশ-কবা চেক। কলকাতায় যে জার্ম্মানীর ব্যাঙ্ক আছে, সে ব্যাঙ্কের উপর চেক। তোমার নামে, আমার কেয়ারে রেজেষ্ট্রী করা চিঠি, তার ভিতর তোমার নামে লক্ষ টাকার চেক আমার টিকিটে শূন্য উঠলো, তোমার টিকিট লক্ষ টাকা প্রাইজ পেলে, দেখে আমার বুকের ভিতরটায় যেন আগুন জ্বলতে লাগলো। আমি যে এত ক্ষুদ্রমনা, তা আগে জানতাম না। বুকের সেই আগুন বুকে চেপে রেখে, ভাবলাম, তোমায় গিয়ে খবরটা দিই, চেকখানা তোমায় দিয়ে আসি। উঃ—আর একটু জল।"

হেমন্ত আবার তাঁহাকে জলপান করাইলেন। পানান্তে ইন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "তার পর, শয়তান আমার স্কন্ধে এসে ভর করলে। ভাবলাম, আমিই আত্মসাৎ করবো। আমিই ত টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলাম, সুতরাং তোমাব ও টাকায় কিসের অধিকার? এই কুযুক্তি শয়তানই আমার মাথায় এনে দিলে। কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ক্রশ করা চেক, কোনও ব্যাঙ্কের মারফৎ ভিন্ন ভাঙ্গানো যাবে না। চেকের পিঠে তোমার নামটি আমি জাল করলাম। কলকাতায় গিয়ে, আমার ব্যাঙ্কে সেই চেক জমা দিয়ে, পরদিন লক্ষ টাকা বের ক'রে নিলাম। সেই সময় জয়রামপুরের বাবুদের একখানা খুব ভাল মহাল দেনার দায়ে বিক্রী হচ্ছিল, সে মহালটা কিনে নেবার জন্যেই টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে বাড়ী আসছিলাম।

"আমি যে নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা, তা নয়—আমি যে এত লোভী, এমন শঠ, প্রবঞ্চক,—পূর্ব্বে আমি তা জানতাম না। যা হোক, টাকাটা নিয়ে বাড়ী আসছিলাম—কিন্তু মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন যে! আর, অদৃষ্ট ব'লে একটা জিনিষ আছে—সেটা ভুললেই বা চলবে কেন? ঐ লক্ষ টাকা যদি আমার অদৃষ্টে থাকতো, তা হলে আমার টিকিটেই ত উঠতে পারতো। তা তো ওঠেনি। লক্ষ টাকার নোটের সেই বাণ্ডিল নিয়ে ট্রেনে বর্দ্ধমান যাচ্ছিলাম; সঙ্গে হুইস্কি ছিল; গাড়ীতে বসে ঢালছিলাম আব খাচ্ছিলাম। এক সময় বাথরুমে যাই। নোটেব বাণ্ডিলটি র‍্যাকের উপর রেখে মুখ ধুচ্ছিলাম। এমন সময় গাড়ী শ্রীরামপুরে এসে দাঁড়ালো। সোডা ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি নেমে, আইস ভেণ্ডারকে সোডা আনতে বলতে গিয়েছিলাম—হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে গেল। লক্ষ টাকার নোটের বাণ্ডিল, গাড়ীতে গোসলখানাব সেই র‍্যাকেই পড়ে রইল। চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে ওঠবার জন্যে আমি ছুটলাম। ষ্টেশনের লোকেরা হাঁ হাঁ করে আমাব পিছু পিছু ছুটে আমায় ধরতে এল। টানাটানিতে আমি ধড়াস্ করে প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে গেলাম। একখানা ইট না পাথর কি ছিল, মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরমায়ু ছিল, তাই গাড়ী আর প্ল্যাটফর্মের ফাঁকের মধ্যে পড়িনি। ষ্টেশনের লোক, অজ্ঞান অবস্থায় আমায় হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে আট দশ ঘণ্টা পবে আমার চৈতন্য হয়। পরদিন বাড়ী আসি।"

এই কাহিনী শুনিয়া হেমন্তর বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্তই যেন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। মাথার দুই রগ আঙ্গুলে টিপিয়া তিনি নীববে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"তাই কি তাই কি?"

ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "হাসপাতালে জ্ঞান হতেই টাকাব খোঁজ নেওযাব কথা আমার মনে হযেছিল। কিন্তু ভাবলাম, তাতে ফল কি হবে? কেউ না কেউ সেটা পেয়েছে। সে কখনই দেবে না, বা স্বীকার করবে না। যদি এই নিয়ে এখন গোলামাল বাধাই, তা হলে আমার জাল করাটি ধবা পড়ে যাবে, সকল ব্যাপাব খববেব কাগজে উঠবে—কেলেঙ্কারির একশেষ। হয ত আমায় জেলেও যেতে হবে। তাই চুপ কবে গেলাম।

"এবার এই ব্যাবামে পড়ে, প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, তোমার আমি এই যে মহাক্ষতিটি কবেছি, এই যে প্রবঞ্চনাটি তোমায করেছি, তার পাপ কি আমার লাগবে না? তার প্রতিফল, পরলোকে গিযে কি আমায় নিতে হবে না? দিন যতই এগিয়ে আসছে এই চিন্তা আমাব মনে ততই প্রবল হয়েছে। তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, ভাই। সে সময় এই টাকা পেলে তোমাব কষ্ট ঘুচে যেত। কিন্তু ঈশ্বরেব ইচ্ছায়, এখন তোমার কোনও অভাব নেই। এক লক্ষ বিশ হাজাব টাকা দিয়ে তুমি সম্পত্তি কিনেছ। ত্রিশ বচ্ছর আগে, তোমার এই যে ক্ষতিটি আমি করেছি, আজ তুমি তার জন্য আমায় মাপ কর, ভাই! বল, আমায় ক্ষমা করলে!" ইন্দ্রবাবুর দুই চক্ষু হইতে ঝব্ ঝর্ ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হেমন্তবাবু তাঁহার হাত দুইখানি নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন, "দাদা, শান্ত হও, শান্ত হও। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই তুমি যে বলেছ, সেই কথাই ঠিক। সেই টাকা আমারই অদৃষ্টে ছিল, আমিই ত পেয়েছি।"

ইন্দ্রবাবু প্রায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমিই সে টাকা পেয়েছ? বল কি? কোথা পেলে? অসম্ভব।"

হেমন্ত তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "দাদা, উত্তেজিত হোয়ো না। তোমার মনের সমস্ত ক্ষোভ সব সন্তাপ দূর কর। তোমার দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হয়নি। সেই লক্ষ টাকার বাণ্ডিল, সেই ট্রেনে আমিই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

ইন্দ্রবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হেমন্তব মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; বলিলেন, "মৃত্যুকালে আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে মিছে কথা বোলো না, ভাই। তুমি আমায় অকপটচিত্তে ক্ষমা করেছ, এইটুকু জানতে পারলেই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা।"

হেমন্ত বলিল, "না দাদা, তোমায় ভোলাবার জন্যে আমি মিছে কথা বলিনি। তোমার দু'খানি গ্রাম আমি যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম, সে টাকার মধ্যে লক্ষ টাকা সেই টাকা।"

কোথায় কবে, হেমন্তবাবু বাণ্ডিল পাইয়াছিলেন। বাণ্ডিল কিরূপ ভাবে জড়ানো ছিল, কত কত টাকার নোট তাহাতে ছিল, সমস্তই ইন্দ্রবাবু খুঁটিয়া খুঁটিয়া হেমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত কথার উত্তর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় গোপীবল্লভজি! তোমার অসীম দয়া। মহাপাপ থেকে তুমি আমায় রক্ষা করলে!"—বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে মুখখানি প্রসন্নভাব ধারণ করিল, দুই চোখের কোণ হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ইহার কিয়ৎপরে, ইন্দ্রবাবুর স্ত্রীর সহিত হেমন্ত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিলেন। পরামর্শ হইল, ছেলেকে বা অন্য কাহাকেও এই পুরাতন কলঙ্ককাহিনী জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

পরদিন প্রাতের ট্রেনে হেমন্তবাবু বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। দু'দিন পরে ইন্দ্রবাবুর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল।

শ্রাদ্ধের দিন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য হেমন্তবাবু কলিকাতায় গেলেন। মুণ্ডিতমস্তক সুরেন্দ্রভূষণ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, জলযোগান্তে আসিয়া হেমন্তবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমন্তবাবু সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে নানা মিষ্ট বাক্য বলিয়া, অবশেষে পকেট হইতে একখানি বড় লেফাফা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবা এইটি আমার লৌকিকতাস্বরূপ তুমি গ্রহণ কর।"

"কি এ?"—বলিয়া সুরেন্দ্র খামখানি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, স্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রী আপিসের মোহরযুক্ত একখানি দলিল। জমিদারের ছেলে, অল্পদূর পড়িয়াই বুঝিতে পারিল ইহা একখানি দানপত্র—চারিবৎসর পূর্ব্বে পিতার নিকট হইতে ক্রীত দুইখানি গ্রামের একখানি (বাঁশডাঙ্গা) পুত্রকে, পিতৃ-শ্রাদ্ধে লৌকিকতাস্বরূপ হেমন্তবাবু দান করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে হেমন্তবাবুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি, কাকামশাই!—এ আপনি কি করেছেন? এর নাম কি লৌকিকতা দেওয়া? না না—এ আমি কোন মতেই নিতে পারিনে।"

হেমন্তবাবু বলিলেন, "না, বাবা, তুমি মনে কোনও সঙ্কোচ কোরো না। যে টাকা দিয়ে তোমাদের ঐ গ্রাম দু'খানি আমি কিনেছিলাম, সে টাকার অধিকাংশই তোমার বাপের অনুগ্রহেই আমার পাওয়া—তোমার বাপের টাকাও বলা যেতে পারে এক হিসাবে। বাঁশডাঙ্গা আমি তোমায় দান করছিলাম, ও ত তোমারই, তোমার বাবাই বরং খাসবেড়ে আমায় দান ক'রে গেছেন।"

সুরেন্দ্র ফ্যাল ফ্যাল করিয়া হেমন্তবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, "আপনি কি বলছেন?—এ যে প্রহেলিকার মত। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে কাকা।"

হেমন্ত বলিলেন, "এর মধ্যে অনেক কথা আছে, বাবা, সে সব তোমার শুনে কাজ নেই। তোমার মা সমস্তই জানেন। তুমি বিনা দ্বিধায় বাঁশডাঙ্গা গ্রামখানি ফিরিয়ে নাও। তাতে কোনও দোষ কোনও অন্যায় হবে না।"

"আচ্ছা, মাকে তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। তিনি যদি অনুমতি করেন ত নেবো।"—বলিয়া সুরেন্দ্র চলিয়া গেল।

মাতা শুনিয়া অনুমতি দিলেন। সুরেন্দ্র আসিয়া হেমন্তবাবুকে তাহা জনাইয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। [বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩২৯]

হতাশ প্রেমিক (ডায়েরি)

৩১শে চৈত্র। রাত্রি ১০টা।

হে ১৩২৮ সাল! আজ কি সত্য সত্যই তুমি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? আজ নিশাশেষে, ঊষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যই কি তুমি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইবে? তোমার পায়ে ধরি ২৮ সাল, এত শীঘ্র তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আরও কিছুদিন অবস্থিতি কর—তোমায় যে আমি বুক ভরিয়া ভোগ করিতে পাইলাম না। ভাই ২৮ সাল, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই তোমার আসন্ন বিরহে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। তুমি আসিবার কিছুদিন পরেই আমি আই-এ পরীক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু যথাসময়ে গেজেটে নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক নামটি খুঁজিয়া পাই নাই বলিয়াই যে আমার দুঃখ, তাহা তুমি মনে করিও না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হওয়াকে আমি দুঃখ বলিয়াই গণ্য করি না। এ বৎসর ফেল হইয়াছি, আগামী বৎসর পাশ করিব। কিন্তু ভাই ২৮ সাল! অপর একটি বিষয়ে যে ফেল তুমি আমায় করাইয়া দিয়াছ, ইহজীবনে তাহা ত আর কখনও সংশোধিত হইবার নহে! যাহাকে হারাইলাম, এ জীবনে তাহাকে ত আর পাইব না, তুমি আমার জীবনের সকল আলো, সকল গান, সকল আশা, সকল উৎসাহ হরণ করিয়া লইয়াছ, তবু তোমায় ভালবাসি। ভালবাসার ধর্ম্মই বুঝি এই!

ভাই ১৩২৮ সাল! তুমি যেদিন প্রথম আসিয়াছিলে, সেই শুভ বৈশাখের প্রথম প্রভাতে যখন তুমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সেদিন তুমি আমাকে কি দেখিয়াছিলে, আর আজ তুমি আমাকে কি দেখিয়া যাইতেছ! সেদিন আমি ছিলাম দুঃখ-ক্লেশশূন্য, চিন্তালেশশূন্য নব্যযুবক, হৃদয়াকাশ মেঘহীন, সুখ-রবির কিরণসম্পাতে সমুজ্জ্বল; আর আজ? চিন্তা আমার প্রিয় সহচরী, দুখক্লেশ আমার অন্নপান, সুখরবি চিব অস্তমিত, হৃদযাকাশ ঘনঘোর মেঘে সমাচ্ছন্ন, দশদিক অন্ধকার—অন্ধকার!

মনে আছে ভাই সেই ১২ই আষাঢ়? ঐ তারিখে শৈলকে আমি শেষ দেখিয়াছি। ইহার কয়দিন পরেই সেই চিঠি-বিভ্রাট, শৈলর পিতা আমাদের পাড়া হইতে পার্শীবাগানে উঠিয়া গেলেন। সেই শেষ দেখার ১২ই আষাঢ় তারিখটি আমার বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। আর লেখা আছে, বিলাতফেরত ইঞ্জিনিয়ার প্রবোধ গুপ্তের সহিত তাহার বিবাহের তারিখ—২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮—ইহা আগুনের অক্ষরে আমার হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে লিখিত হইয়া দিবারাত্র আমায় দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং হে ১৩২৮ সাল, তোমায় আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

কিন্তু দোহাই ভাই, তুমি ভুল করিও না। তোমার উপর আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব নাই। সে ভাব থাকিলে কি তোমায় আমি এতখানি ভালবাসিতে পারিতাম?

কেন, তোমায় ভালবাসিয়াছি, তাহাও বলি। ভালবাসিয়াছি, কারণ কাব্যাদি পড়িয়া এখন আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি, লোকে যাহাকে পাওয়া বলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে হারানো;—এবং যাহাকে না পাওয়া বলে, তাহাই যথার্থ পাওয়া। সেই ২২শে অগ্রহায়ণ, শ্যামবাজারের প্রবোধ গুপ্তের পরিবর্ত্তে যদি আমার সঙ্গে শৈলজার বিবাহ হইত, তবে সেই হইত তাহাকে আমার না পাওয়া। সে এখন আমার বধূ হইত বটে, কিন্তু কালক্রমে আমার পুত্র-কন্যার জননী হইত এবং আমার গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাসময়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইত। কিন্তু তাহাকে পাই নাই বলিয়াই সে আমার হৃদয়মন্দিরে স্থিরযৌবনা চির বধূ—প্রেম-প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিবে। এই ত যথার্থ পাওয়া। তাই বলিতেছিলাম, আমি তাহাকে না পাইয়াই যথার্থ পাইয়াছি এবং প্রবোধ গুপ্ত তাহাকে পাইয়া সম্যকরূপেই হারাইয়াছে।

ভাই ১৩২৮ সাল, নিতান্তই কি তুমি যাইবে? আমার এই ব্যাকুল প্রার্থনায়, আরও

কিছুদিন—অন্ততঃ দুইটা দিন,—একটা দিনও কি থাকিতে পারিবে না? অহো, স্মরণ হইয়াছে, বিধিলিপি আমাদের যেমন অলঙ্ঘনীয়, তেমনই তোমাদেরও পঞ্জিকালিপি লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই—তোমায় যাইতেই হইবে।

তবে যাও ১৩২৮ সাল, সেই অন্তধামে যাত্রা কর। তোমার স্মৃতিরক্ষাকল্পে "বর্ষবিদায়" নামক একটি কবিতা আমি আজ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও শেষ করিতে পারি নাই। আর শেষ করিয়া কোনও ফলও নাই, কারণ কোনও ভাল মাসিকপত্রে আর তাহা ছাপা হইবার উপায় নাই, কেননা সেগুলি আগামীকাল ১লা বৈশাখ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বারান্দা আলোকিত করিবে।

১লা বৈশাখ, ১৩২৯।

স্বাগত হে নববর্ষ, তোমায় প্রণাম করি। লোকে বলে মুখ মনের দর্পণ স্বরূপ, কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া তোমার মনে কি আছে আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রভাতের সোনালি রৌদ্রে তুমি মুচকি হাসিতেছ। আমার জন্য সুখ আনিয়াছ কি দুঃখ আনিয়াছ তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার এই সরল হাসি দেখিয়া, তোমাকে মন্দ লোক বলিয়া আমার মনে হইতেছে না।

আজ প্রায় দশ মাসকাল তাহাকে দেখি নাই, তবু বাঁচিয়া আছি। আমার সে, অন্যের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে, তবু আমি বাঁচিয়া আছি। শৈল আমার বাল্যসখী; তাহারা আমাদের পাড়াতেই থাকিত। এক সময় ছিল, যখন আমি প্রায় প্রত্যহ তাহাদের বাড়ী যাইতাম; তাহাকে পড়া বলিয়া দিতাম, তাহার খেলায় যোগদান করিতাম। সেও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিত। তার পর শৈল বড় হইল। তাহার মা তাহাকে আমাদের বাড়ীতে আর আসিতে দিত না; তাহাদের বাড়ী গেলে আমিও আর বড় একটা তাহার সাক্ষাৎ পাইতাম না। এই সময় বাবা ঢাকায় বদলি হইলেন; বাড়ীটা ভাড়া দিয়া আমরা ঢাকায় গিয়া প্রায় তিন বৎসর রহিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া শুনি, সে ইস্কুলের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতে যায়। গাড়ী হইতে ওঠা নামার কালে মাঝে মাঝে তাহার সহিত আমার চোখাচোখি হইতে লাগিল। যে ছিল কিশোরী, যে এখন নব যুবতী; আমার হৃদয়-নিহিত সে বাল্যস্নেহ, উদ্দাম প্রণয়ে পরিণত হইল। হৃদয়ের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইস্কুলের ঠিকানায় তাহাকে আমি চিঠি লিখিতাম। তখন জানিতাম না, মেয়েদের নামে চিঠি আসিলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রথমে তাহা খুলিয়া পাঠ করেন। ফলে চিঠি শৈলর কাছে না পৌঁছিয়া তাহার বাবার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার বাবা আমার বাবাকে উহা দেখাইলেন। বাবার নিকট কাণমলা ও মার নিকট গালি খাইলাম;—কয়েকদিন পরে অন্য বাড়ী ভাড়া লইয়া শৈলর পিতা পার্শীবাগানে উঠিয়া গেলেন। বিলাতফেরত প্রবোধ গুপ্তের সঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসে শৈলর বিবাহ হইল, সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম। আমার হৃদয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল।

১৭ই শ্রাবণ, বেলা ৯টা।

গত রাত্রে তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যেন একখানি কল্কাপাড় শাড়ী পরিয়া, পুস্তক ও খাতা হস্তে কলেজের গাড়ী হইতে নামিয়া জুতা খুট খুট করিতে করিতে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; প্রবেশের পূর্ব্বে একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, চকিতের ন্যায় একটু হাসিয়া গেল। ইহা পার্শীবাগানে কি শ্যামবাজারে, স্বপ্নে তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়া অবধি, জাগ্রত তাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। কিন্তু সে এখন পরস্ত্রী, প্রেমনয়নে তাহাকে দেখা কি এখন আর আমার উচিত? আবার ইহাও মনে হইতেছে, শুধু একটিবার চোখের দেখা বই ত নয়, তাহাতে দোষ কি? এখন উঠি কলেজের বেলা হইল।

১৯শে শ্রাবণ, রাত্রি ১০টা।

খবর লইয়া জানিয়াছি, শৈল এখন তাহার স্বামীগৃহে—শ্যামবাজারে। বাড়ীটাও সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি। বাড়ীর প্রায় সম্মুখে একটা চায়ের দোকান আছে; বেলা সাড়ে তিনটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত আজ সেখানে বসিয়া পাঁচ ছয় পেয়ালা চা পান করিলাম; কিন্তু ইস্কুলের গাড়ীও সে রাস্তায় আসিল না, তাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

৯ই ভাদ্র।

হে আমার লাল রঙের নূতন ষ্টাইলো পেন, আজ তোমায় কেন কিনিয়া আনিয়া তোমার বুকে লালকালী ভরিয়াছি, তাহা জান কি? উপরের ঐ তারিখটি লিখিবার জন্য। ঐ তারিখটি আমার জীবনে একটি লাল অক্ষরের তারিখ (red letter day); আজ আমি তাহাকে দেখিতেছি—প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছি। রাত্রি ৯টার সময় বায়স্কোপ হইতে বাহির হইয়া ট্রামের জন্য গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময় দক্ষিণ দিক হইতে আগত একখানি মোটরগাড়ির প্রতি নজর পড়িল; ভিড়ের জন্য থামিয়াছে এবং ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতেছে; সেই গাড়ীতে ইংরাজী বেশে সজ্জিত প্রবোধ গুপ্তের পার্শ্বে বসিয়া—সে। পরিধানে একখানি নীলাম্বরী বেনারসী শাড়ী। গ্যাসলণ্ঠনের আলো তাহার সুন্দর মুখখানির উপব পড়িয়াছে; সে মুখখানি যেন বড় গম্ভীর, যেন বড় বিষণ্ণ—একটু যেন বিরক্ত—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ বিবাহে সে সুখী হয় নাই। ভিড়েব জন্য প্রায় দুই মিনিট কাল গাড়ীখানি সেইখানেই আটকাইয়া রহিল এবং আমি প্রাণ ভরিয়া, নয়ন ভরিয়া তাহার রূপসুধা পান করিলাম। অবশেষে ভিড় কমিলে গাড়ীখানি শ্যামবাজারের দিকে চলিয়া গেল; আমিও বউবাজারগামী ট্রামে লাফাইয়া উঠিলাম। সারাপথ মনে মনে বলিতে লাগিলাম—ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অভাগার, কার ধন কারে দিলি, সে আমার হল না?

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। এইবার আলো নিভাইয়া শয়ন করি? হে আমার মানসী প্রিয়া, আজ স্বপ্নে আমায় একটিবার দেখা দিও—আমার সহিত দুটি কথা কহিও। আমি বড় দুঃখী।

১৩ই আশ্বিন। মধুপুর।

তাহার দর্শন-মধুলুব্ধ হইয়া আজ মধুপুরে আসিয়াছি। সমস্ত পূজার ছুটি প্রবোধ গুপ্ত এইখানেই যাপন করিবে। তাহার বাঙ্গলাটি কোথায়, আজ বিকালে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রতিদিন সে শৈলকে লইয়া নিশ্চয়ই বেড়াইতে বাহির হইবে; প্রতিদিন তাহাকে দেখিব। লাল ষ্টাইলোটিও সঙ্গে আনিয়াছি।

১৬ই আশ্বিন। রাত্রি ৯টা। তিনদিন বৃথা অন্বেষণের পর, আজ তাহার দর্শন পাইয়াছি। প্রবোধের সঙ্গে সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু চকিতের ন্যায় দেখা—আমরা বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলাম—সন্ধ্যাও আসন্ন হইয়াছিল। পরস্পরকে অতিক্রম করিতে যে সময়টুকু লাগে—সেইটুকু সময় মাত্র দেখা। তপ্ত সাহারার বুকের উপর একটি বিন্দুমাত্র বারি পতন।

১৭ই আশ্বিন। সন্ধ্যা। —আজও তাহাকে দেখিলাম, স্বামীর সহিত বেড়াইতেছে।

১৮ই আশ্বিন। সন্ধ্যা। ,, ,, ,, ,, ,, ,,

১৯শে আশ্বিন। সন্ধ্যা। ,, ,, ,, ,, ,, ,,

২০শে আশ্বিন। সন্ধ্যা। ,, ,, ,, ,, ,, ,,

২১শে আশ্বিন রোজ রোজ আর ঐ ঐ লিখিতে ভাল লাগে না। কতক্ষণের জন্যই বা দেখা, সিকি মিনিটও নহে। আজ আমার ইচ্ছা হইতেছে, খোট্টা সাজিয়া উহাদের বাড়ী গিয়া চাকরি প্রার্থনা করি। যদি রাখে তবে সারাদিন তাহাকে মনের সাধে দেখিতে পাই। কিন্তু হিন্দী যে জানি না; আর চেহারাটাও যে আমার আদপেই কাঠখোট্টা নহে!

২২শে আশ্বিন।

বায়ুভোজী বাবুরা চাঁদা করিয়া এখানে পূজা করিতেছেন। কলিকাতা হইতে কারিগর আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ প্রায় সমাধা করিয়াছে। আমি ৫ টাকা চাঁদা দিয়াছি এবং কাজকর্ম্মও অনেক করিতেছি। চাঁদার তালিকায় দেখিলাম, মিষ্টার ও মিসেস গুপ্ত ২০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। নিমন্ত্রণপত্রে ঠিকানা লেখার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। মিষ্টার ও মিসেস গুপ্তের নামে দুইখানি স্বতন্ত্র খাম লিখিয়াছি। প্রবোধবাবুর খামের মধ্যে কেবল ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র; শৈলজার খামের মধ্যে নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে একটি ক্রোড়পত্র—তাহাতে প্রাণের আবেগে অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে সেই বেশে সেই যে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। শেষে লিখিয়াছি, "জানি না, তুমি আজও আমায় মনে কর কি না। আমাদের সে বাল্য-প্রণয় যদি আজিও তোমার মনে থাকে, তবে সেইটুকু তুমি আমায় জানাইও। সেইটুকুই আমি কেবল জানিতে চাই—এ জীবনে তোমার কাছে আমি আর কিছুরই প্রার্থী নহি। যদি তোমার হৃদয়ের এক কোণেও আমার জন্য একটু স্থান থাকে, তবে বিজয়দশমীর দিন বিকালে তুমি যখন ভাসান দেখিতে যাইবে, তখন তোমার সেই নীলাম্বরী বারাণসী শাড়ীখানি পরিয়া যাইও। যদি আমায় ভুলিয়া থাক, অথবা আমার প্রতি বিরূপ হইয়া থাক, তবে অন্য কোনও শাড়ী পরিও।"

২৩শে আশ্বিন।

উভয় পত্র পকেটে লইয়া স্বয়ং পত্রবাহক হইয়া, আজ বেলা ৯টার সময় আমি প্রবোধ গুপ্তের বাঙ্গলোয় গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ শৈলজাকে তাহাদের ফুলবাগানে একা বেড়াইতে দেখিলাম; ফটক খুলিয়া সাহসে ভর করিয়া, আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম এবং পত্র তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "এইখানি তোমার—আপনার। আর এইখানি তোমার স্বা—স্বা—স্বামীর জন্যে।"—পত্র দিয়া প্রস্থান কবিতেছিলাম। শৈল আমার মুখপানে চাহিতে আমি দাঁড়াইলাম। সে নিম্নস্বরে বলিল, "চলুন বসবেন। তিনি এখনই বাড়ী ফিরবেন।" আমি বললাম, "না, আজ না, আমার অনেক কাজ আছে। তোমার চিঠিখানি তুমি নিজে খুলে দেখো। আমি যাই।" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। ফটকের নিকট পৌঁছিয়া, ফিরিয়া, চাহিয়া দেখিলাম, খামখানি সে খুলিয়াছে; লাল নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে আমার লেখা সাদা কাগজখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। একটা কার্য্য করিয়া বসিলাম—জানি না ইহার ফল এখন কিরূপ হইবে।

২৮শে আশ্বিন। বিজয়াদশমী। রাত্রি ১১টা।

উঃ ভয়ানক সিদ্ধি খাইয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই খাইয়াছি, কারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। বিষম নেশা হইয়াছে। উঃ চোখে ভাল দেখিতে পাইতেছি না; লিখিতে পারিতেছি না! হাত কাঁপিতেছে। তবু একটা কথা আজ লিখিয়া রাখিতেই হইবে। সে আজ নীলাম্বরী বারাণসী শাড়ী পরিয়াই প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছিল। উঃ, শোয়া যাক।

২৯শে আশ্বিন। রাত্রি ১০টা।

এ কি হইল। আজ বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া, এ পথে সে পথে কোন পথেই তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এরূপ অবশ্য পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে; প্রত্যেক দিনই যে উঁহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে। তথাপি মনটা কেমন চঞ্চল হইল। ফিরিবার সময় উহাদের বাঙ্গলার নিকট দিয়া আসিলাম। দেখিলাম কোনও ঘরে আলো জ্বলিতেছে না। এই সময় মালী ফটকের নিকট আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সাহেব ও মেমসাহেব বেলা দ্বিপ্রহরের ট্রেনে 'কলকাত্তা' ফিরিয়া গিয়াছেন।

সহসা এ বজ্রাঘাত কেন? বিনা মেঘে? না মেঘ উঠিয়াছিল? প্রবোধ গুপ্ত কি কিছু জানিতে পারিয়াছে? শৈল হয়ত অসাবধানে আমার চিঠিখানা কোথাও ফেলিয়া রাখিয়াছিল, প্রবোধ তাহা গোপনে দেখিয়াছে। হয়ত সে অপেক্ষা করিতেছিল, দেখি ও আজ কোন্

শাড়ী পরিয়া বেড়াইতে বাহির হয়। নীলাম্বরী বারাণসী দেখিয়া সে বুঝিয়াছে—সে নিজে চন্দ্রশেখরের সজীব সংস্করণ মাত্র। আমার বড় ইচ্ছা করে শৈলজার সঙ্গে আমিও এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে অগাধ জলে সাঁতার দিই—এবং তাহাকে শৈ—বলিয়া ডাকি। কিন্তু সাঁতার যে জানি না!

এতক্ষণ তাহারা কলিকাতায় আহারাদিও শেষ করিয়াছে। প্রবোধ না জানি শৈলকে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত তিরস্কার করিতেছে। শৈল কি উত্তর করিতেছে? সে কি বলিতেছে—"আমরা এক বোঁটায় দুটি ফুল ফুটিয়াছিলাম, তুমি ছিঁড়িয়া পৃথক করিলে কেন?"

৪ঠা কার্ত্তিক।

আজ তিনদিন কলিকাতায় ফিরিয়াছি, তিনদিনই শ্যামবাজারে গিয়া শৈলদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথে ঘোরাঘুরি করিয়াছি, যদি কোনও সুযোগে একটিবার তাহার মুখখানি দেখিতে পাই। কিন্তু পাই নাই। প্রবোধ গুপ্ত মোটরে বাহির হইতেছে দেখিয়াছি কিন্তু সঙ্গে শৈল নাই। তাহাকে বোধ হয় সে একটা অন্ধকার ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছে—বোধ হয় অশেষ প্রকারে কষ্ট দিতেছে। হয় ত অপমানে শৈল নিজ প্রাণ নষ্ট করিতেও পারে। উঃ কি ভয়ানক।—তাহাই যদি হয়? নৃশংস জানোয়ার প্রবোধ গুপ্তকে আমি তাহা হইলে গুলি করিব।

৯ই অগ্রহায়ণ।

আজ বিকালে ৪টার সময়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম। দ্বিতলে একটি জানালায় তাহার মুখখানি দেখিলাম। চারি চক্ষে মিলন হইবামাত্র জানালাটি সে বন্ধ করিয়া দিল। ভয়ে—সন্দেহ নাই; বাড়ীর কে কোথা হইতে দেখিবে, আবার লাঞ্ছনা গঞ্জনা শুরু হইবে। চোখ দুটি তার বড় ম্লান দেখিলাম—বড় মনের কষ্টে আছে। হায় শৈলজা, কেন তুমি আমার হইলে না প্রিয়তমে?

১৭ই অগ্রহায়ণ।

কলেজ পলাইয়া দ্বিপ্রহরে, বিকালে, সন্ধ্যায় আরও কয়েকদিন সে রাস্তায় ঘুরিয়াছি, কিন্তু আর তাহার দেখা পাই নাই। কিন্তু একটা ফন্দি করিয়াছি। সেই বাড়ীর একজন ঝির সঙ্গে আলাপ করিয়াছি—তাহার নিকট শৈলর সংবাদটা মাঝে মাঝে পাইতে পারিব। আজ যখন শৈলদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক সন্দেশের একটা ঠোঙা হাতে করিয়া সেই দিকে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিলাম—কারণ মধুপুরে তাহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ গলির সে অংশটা তখন নির্জ্জন ছিল। আমি সাহসে ভর করিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "হ্যাঁগো, তুমি কি প্রবোধবাবুর বাড়ীর ঝি?"

সে বলিল, "হ্যাঁ, কেন বাবু?"

"তোমার নাম কি?"

ঝি একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমার নাম শুনে আপনি কি করবেন? আমার কাছে আপনার কি দরকার তাই বলুন।"

"তুমি আমায় আর কখনও দেখেছ?"

"দেখেছি বইকি। মধুপুরে দেখেছি, সেখান থেকে ফিরে এখানেও কতদিন দেখেছি—আপনি আমার মনিববাড়ীর সামনে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ান, দেখেছি বইকি!"—বলিয়া সে আমার প্রতি একটা বিশেষভাবে চাহিয়া হাসিল। বোধ হয় এইরূপ চাহনিকেই কবি ও ঔপন্যাসিকেরা 'কটাক্ষ' আখ্যা দিয়া থাকিবেন।

কি প্রয়োজনের কথা তাহাকে বলি ভাবিতেছি, এমন সময় ঝি তাড়াতাড়ি বলিল, "কি দরকার শীগ্‌গির বলুন; এখনই কে কোথা দিয়ে এসে পড়বে।"

"আমি দেখ ঝি, সে অনেক কথা; একটু নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে?"

ঝি। "নিরিবিলিতে? আচ্ছা কাল বেলা ১২টার সময় আপনি এইখানে আসবেন।"

আমি। "এই গলির মোড় কি নিরিবিলি?"

ঝি। "দূর, তা কি বলছি? সেই সময় আমি মনিববাড়ী থেকে ছুটি পাই; ঘরে যাই। আপনাকে আমার ঘরে নিয়ে যাব।"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই বেশ হবে ঝি। কাল ঠিক ১২টার সময় আমি এইখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকব।"

"বেশ। আসবেন।"—বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

সুতরাং স্থির করিয়াছি, আগামী কল্য কলেজ পলাইয়া ঝির সহিত তাহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করিব এবং শৈলজার সমস্ত খবর শুনিব।

১৮ই অগ্রহায়ণ।

বেলা সাড়ে ১১টার সময় কলেজ হইতে বাহির হইয়া, শ্যামবাজারের ট্রাম ধরিয়া, ১২টার মধ্যেই যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেখি, গামছা ঢাকা এক থালা ভাত হাতে করিয়া ঝি আসিতেছে। নিকটে আসিয়া সে আমাকে চুপে চুপে বলিল, "সঙ্গে সঙ্গে আসবেন না; একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসুন।" আমি সেই ভাবেই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এ রাস্তা সে রাস্তা এ গলি সে গলি ঘুরিয়া ক্রমে একটা খোলার ঘরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, "আসুন।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, উঠানে একটা পেয়ারাগাছের ছায়ায় বসিয়া এক বৃদ্ধ ভাত খাইতেছে; চৌবাচ্চার কাছে বসিয়া দুইজন ঝি-শ্রেণীর স্ত্রীলোক বাসন মাজিতেছে; বারান্দায় নেকড়া ঢাকা দিয়া কাহার শিশু সন্তান ঘুমাইতেছে। ঝি বাম হস্তে আঁচলে বাঁধা চাবি লইয়া একটা ঘরের তালা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া আমায় বলিল, "ভিতরে আসুন।"

প্রবেশ করিতেই, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আমার নাকে গেল। ঘরখানা ক্ষুদ্র ও অন্ধকার। মেঝেটা সিমেন্ট করা হইলেও স্যাঁৎ স্যাঁৎ করিতেছে। এক দিকে একটা তক্তপোষে মাদুর পাতা রহিয়াছে, প্রান্তভাগে কতকটা বিছানা গুটানো; অন্যদিকে দেওয়ালের কাছে ইঁটের উপর একখানা তক্তা বসানো; তাহার উপর একটা বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং আমকাঠের সিন্দুক পাশাপাশি রক্ষিত। একটা জানালা ছিল, ঝি সেটাকে বাম হস্তে খুলিয়া দিল, ঘরে একটু আলো হইল। পরে আমার দিকে ফিরিয়া বিনীতভাবে বলিল, "গরীবের এই ভাঙ্গা তক্তপোষে বসতে বলতে পারি কি?" আমি বসিবার উপায়ন্তর না দেখিয়া, তাহাতেই বসিলাম; সেটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া উঠিল।

ঝি বাহিরে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিল, "পান সেজে দেবো কি?"

আমি বললাম, "না, থাক্।"

"কেন, আমার সাজা পান খেতে কোনও দোষ আছে? আমি যদি আপনাদের বাড়ীরই ঝি হতাম, পান সাজতাম না? কি ধরুন, আপনি যদি আমার মনিববাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, তারা পান দিত, খেতেন ত? সেও ত আমার সাজা পান। তবে শুদ্দূরের ঘরে নারায়ণ শিলে থাকলে ব্রাহ্মণেরা প্রণাম করে না। স্থানমাহিত্র একটা আছে বইকি!—আচ্ছা তবে সিগারেট খান।"

বলিলাম, "দরকার নেই, থাক্।"

"বাজে সিগারেট নয় বাবু, ভাল সিগারেট—কাঁচি মার্কা—আমি আপনার জন্যেই কিনে রেখেছি। ভদ্দরনোকেরা কাঁচি খায় তা কি আর আমি জানিনে?" বলিতে বলিতে সে কুলুঙ্গি হইতে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট পাড়িয়া আমার কাছে রাখিল।

আমি বলিলাম, "সত্যি আমি সিগারেট খাইনে। আচ্ছা, তুমি দুঃখিত হবে, একটা পানই বরং সেজে দাও।"

ঝি পিতলের ডাবর লইয়া পান সাজিতে বসিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রবোধবাবুর বাড়ীতে কতদিন আছ?"

"অনেক দিন।"

"কি কাজ করতে হয় সেখানে তোমায়?"

"বাবুর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমি দেশে বাবুদের বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে সব কাজই করতে হত। বাবুর বিয়ের পর, দেশ থেকে আমি এখানে এসেছি। এখানে আমি কেবল বউগিন্নীর ঘরের সব কাজ করি, আর তাঁকে আগলাই। অন্য সব কাজের জন্যে ঝি আছে। আপনার সঙ্গে আমাদের বউমার আগে থেকে চেনাশুনো ছিল, নয় বাবু?"

ভাবিলাম, সর্ব্বদা কাছে থাকে, শৈল হয় ত কোনও দিন প্রসঙ্গক্রমে আমার কথা উল্লেখ করিয়াছে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "তা ছিল বইকি।"

ঝি বলিল, "ওঃ বুঝেছি তা হলে।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বুঝেছ ঝি?"

ঝি প্রথমে একটু হাসিল। একটা এনামেলের ছোট পিরিচে দুইটি সাজা পান আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "খান।" অন্য একটি আলগোছে নিজের মুখে ফেলিয়া একটা টিনের কৌটা হাতে লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দোক্তা নেবেন?" আমি অসম্মতি জানাইলে, সে নিজে কিঞ্চিৎ দোক্তা খাইয়া বলিল, "তা, আমায় কি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে নিরিবিলিতে দেখা করতে চেয়েছিলেন বাবু?"

আমি বললাম, "তোমাদের বউগিন্নীর খবর বার্ত্তা সব জানবার জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছিল, তাই তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবু হঠাৎ মধুপুব থেকে চলে এলেন কেন? প্রথমে শুনেছিলাম, কালীপূজো অবধি থাকবেন।"

ঝি মাটির দিকে চাহিয়া নীরবে হাসিল। বলিল, "সে আর আপনার শুনে কাজ নেই।"

"কেন ঝি, শুনে কাজ নেই কেন?"

ঝি মুখ তুলিয়া বিনীতভাবে বলিল, "আমি ধরুন, সে বাড়ীর ঝি; আমার কি উচিত ঘরের কথা প্রকাশ করা? তা ছাড়া, যে কথা শুনে পৃথিবীতে কারু কোন উপকার হবে না, মনের আপশোস বাড়বে বই কমবে না, নেবা আগুন জ্বলে উঠবে, সে কথা শুনে লাভ? ওসব এখন—আপনাদের—মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত।"

ঝির কথাগুলি মনে মনে আমি আলোচনা করিতে লাগিলাম। 'আপনাদের' শব্দটি সে ব্যবহার করিয়াছে; আমারও উচিত—এবং তাহারও উচিত—সে সব কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলা, ইহাই ঝির উপদেশ। ঝিকে সেই কথাটা স্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিব কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি অবনতমুখে এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম, সহসা ঝির কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—"কেন মিছে মন খারাপ করেন বাবু? সে সব আশা ত্যাগ করুন।"—পরক্ষণেই আমার রক্তটা চন্ করিয়া গরম হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, ঝি কি মনে করিয়াছে, আমি ইতরজনোচিত কোনও "আশা" সফল করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহায়তা-প্রার্থী হইয়া এই খোলার ঘরে উপস্থিত হইয়াছি? আমি গর্ব্বভরে একটু তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলাম, "তুমি ভুল বুঝো না ঝি, আমার মনে কোনও কুমৎলব নেই। আমি তাকে ভালবাসি, কিন্তু সে অতি পবিত্রভাবে। তার সঙ্গে, তার বিয়ের ৫/৬ মাস আগে থেকেই আমার দেখাশুনো বন্ধ আছে। তার কথা শোনবার জন্যে আমার মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছিল, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।"

ঝি বলিল, "আরে রাম রাম! আমিও সেভাবে বলিনি। শুধু এই বলেছি, যা হবার তা হয়ে গেছে, সে সব কথা ভেবে এখন আত্মাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন? তা বেশ ত, আপনি কি জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন, আমি যা জানি বলছি।"

কিন্তু আমার রাগটা তখনও পড়ে নাই। জিজ্ঞাসা করিবার কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলাম, "সে ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, এখন ভালই আছেন।"

"বেশ। তা হলে এখন উঠি"—বলিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

ঝি বলিল, "এখনি চললেন?"

"হ্যাঁ—বলিয়া পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার বিছানায় রাখিয়া বলিলাম, "তোমার ছেলেকে সন্দেশ কিনে দিও।"

ঝি মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছেলেকে? ছেলে কোথা পাব বাবু? আমার কি ছেলে আছে?"

"ওঃ। আচ্ছা, তোমার ভাইকে, কি যাকে হোক কিনে দিও।"

ঝি আমার মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিল, "বাবু আপনি কি রাগ করে চললেন?"

"না, না, রাগ কিসের?"

"দেখুন, আমরা হলাম মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েমানুষ! আমরা কি কথা জানি? কি কথা বলতে কি কথা বলে ফেলি; তায় কি রাগ করতে আছে?"

এইবার আমার মনটা নরম হইল। বলিলাম, "না ঝি, রাগ করিনি।"

"আচ্ছা, আবার কবে আসবেন বলুন।"

"আবার শীঘ্রই একদিন আসবো।"

"এই সময় বুঝেছেন। বারোটা বাজলেই আমি মনিব-বাড়ী থেকে বেরুই। আপনি বরঞ্চ সোজা এই বাড়ীতেই আসবেন, রাস্তাপথে আর দেখা করে কাজ নেই।"

"আচ্ছা, তাই আসবো।"—বলিয়া আমি কলেজে ফিরিয়া গেলাম। প্রক্‌সির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম, সুতরাং হাজিরার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই।

রাত্রি ১০টায় এ ডায়েরি লিখিতে বসিয়াছিলাম এখন প্রায় ১২টা বাজে! খানিক ভাবিতেছি, খানিক লিখিতেছি। ঝির অনেক আবোলতাবোল বাজে কথার মধ্যে দুইটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ১ম—মধুপুর হইতে উহাদের অকালে তিরোধানের কারণ আমার শ্রবণযোগ্য নহে; তাহাতে আমার আপশোস বাড়িবে বই কমিবে না। ২য়—সে সব এখন আমাদের মন থেকে মুছে ফেলাই ভাল। তবে, তাহারও মনে মুছিয়া ফেলিবার যোগ্য জিনিস আছে। মোছা কি যায় পাগলী? মুছিতে গেলে যে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা হউক, মধুপুরে শাড়ীসঙ্কেতে মনে যে আশার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, আজ ঝির কথায় তাহা পত্রশোভিত হইয়া উঠিল। 'পত্র'—পল্লব অর্থেই লিখিয়াছি; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, ঝির হাতে আমি যদি তাহাকে পত্র অর্থাৎ চিঠি পাঠাই এবং সে আমাকে ঐ উপায়ে পত্র লেখে, তাহা হইলে যথার্থই আমাদের প্রেমতরু পত্রশোভিত হয়।

২২শে অগ্রহায়ণ।

আজ আবার বামা ঝির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম—তাহার নাম বামাসুন্দরী। শৈলর অনেক গল্পই সে করিল। বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, শৈলও আমার স্মৃতিকে তাহার অন্তরের অন্তস্থলে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। চিঠি পাঠাইবাব প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু বামা ত রাজি হয় না। বলে, "বউগিন্নীর সঙ্গে সেভাবের কোন কথা ত আজ পর্য্যন্ত আমার হয়নি; চিঠি দিতে গেলে যদি তিনি রেগে চেঁচিয়ে হিতে বিপরীত করে বসেন!" ঠিক বটে। মনে যার যাই থাকুক, অন্য কাহারও কাছে ধরা পড়িয়া গেলে ত সেটা সুখের হয় না। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে বলিল, "আচ্ছা, আগে বেড়া নেড়ে

গেরস্তের মন বুঝে দেখি।”—অর্থাৎ আমার ২/১টি কথা সে তাহার কাছে বলিয়া দেখিবে। আগামী পরশু দ্বিপ্রহরে আবার আমায় যাইতে বলিয়াছে।

২৪শে অগ্রহায়ণ।

আজ গিয়াছিলাম; ঝি বলিল, গতকল্য বিকালে কৌশলে আমার নাম তাহার নিকট সে পাড়িয়াছিল। শৈল কাঁদিয়াছে, কিন্তু রাগ করে নাই। চিঠির কথা পাড়িতে সাহস হয় নাই, আজ কিংবা সুবিধামত সে কথা পাড়িবে।

২৫শে অগ্রহায়ণ।

চিঠির কথা ঝি পাড়িয়াছিল; সে আংশিকভাবে রাজি হইয়াছে, অর্থাৎ আমি চিঠি লিখিব, কিন্তু সে লিখিবে না—তাহার যাহা বক্তব্য তাহা ঝির মুখে বলিয়া পাঠাইবে মাত্র। সে বলিয়াছে, “তিনি অবিবাহিত, সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমি এখন পরস্ত্রী, আমার কি উচিত চিঠি লেখা?” আচ্ছা, আপাততঃ তাহাই হইবে—শনৈঃ পন্থা।

২৭শে পৌষ।

চিঠি ত একে একে অনেকগুলিই লিখিলাম; উত্তর ত একখানিরও মিলিল না। ঝির মুখে উত্তর যাহা পাই তাহাতে কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি হয় না; অথচ বখশিশ আকারে এই একমাসে চিঠির মাশুলও অনেক টাকা। ঝি বেটি আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছে কি না কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজ সে বলিয়াছে, আমার সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ শৈলর কোন একটা নিদর্শন সে আমাকে আনিয়া একদিন দেখাইবে।

২৯শে পৌষ।

ঝি বলিল, শৈল বলিয়াছে, “তাঁকে চিঠি লিখে সে কি আমার অসাধ, কিন্তু আমি যে পরস্ত্রী! তবে তাঁর সন্তোষের জন্যে এই একখানা কাগজে আমার নামটি লিখে দিচ্ছি, এইটি তাঁকে দিও।” এক টুকরো শাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী গুপ্তা। বড় হইলে শৈলর হাতের লেখা আমি কখনও দেখি নাই—লেখাটি আমার চোখে এমন সুন্দর লাগিতেছে! যেন প্রায় পুরুষ মানুষের লেখা। হইবে না কেন, সে ত বোধদয় পড়িয়া মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লয় নাই; অনেক বয়স অবধি ইস্কুলে রীতিমত লেখাপড়া করিয়াছে। পাইয়া অবধি কাগজখানি অমূল্য নিধির মত আমি বুকে করিয়া রাখিয়াছি। কতবার যে সেখানি পড়িয়াছি বলিতে পারি না। ঝি আরও বলিল, কাগজখানি লিখিয়া দিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শৈল উঠিয়া গিয়াছিল। কথাটা শুনিয়া অবধি আমি ভাবিতেছি—এ কান্নার অর্থ কি? ইহার একমাত্র অর্থ যাহা আমার মনে হইতেছে তাহা এই—যাহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারিলেও তৃপ্তি হইত না, তাহাকে দিলাম কিনা, কালির আঁচড় কাটা একটুকরো তুচ্ছ কাগজ! আর কিছু দিবার অধিকার আমার নাই।

অধিকার আছে শৈল, সবই দিবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিবে কি? আমি কয়েকখানি আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িয়াছি, তাহাতে লেখকগণ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিলেই যথার্থ বিবাহ হয় না; পরস্পরের প্রতি প্রেম থাকিলে তাহাই আসল বিবাহ। যে নরনারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, কেবলমাত্র লৌকিক বিবাহের বন্ধনই যাহাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন, তাহাদের পরস্পর সাহচর্য্যকে একটা অতি কদর্য্য আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমের মিলনকেই তাঁহারা যথার্থ পবিত্র মিলন বলিয়া মনে করেন। বহিগুলি ঝির হস্তে শৈলকে পাঠাইয়া দিব মনে করিয়াছি; পড়িলে সে বুঝিতে পারিবে, যে যাহাকে যথার্থ ভালবাসে, সে তাহাকে চিঠি লিখিলে কিছুমাত্র দোষের কার্য্য হয় না; বরং যথার্থ ভালবাসার পাত্রকে ত্যাগ করিয়া, মন্ত্রপড়া বিবাহের স্বামীর ঘর করিতে থাকিলেই নারীর অধিকার খর্ব্ব হয়, নারীত্বের অপমান হয় এবং তাহার শুভ্র আত্মা কলঙ্কলিপ্ত হইয়া যায়।

৫ই মাঘ।

আজ কয়েকখানি বাঙ্গলা উপন্যাস ও মাসিকপত্র ঝির হস্তে শৈলকে পাঠাইয়াছি।

১০ই মাঘ।

বহিগুলি পড়িয়া শৈল বলিয়াছে বেশ বহি। আরও বহি চাহিয়াছে। আজ ঝিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি, শৈলর সঙ্গে একটিবার আমি দেখা করিতে চাই—আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। যদি কোনও নিভৃত স্থানে দশ পনেরো মিনিটের জন্যও একবার তাহার দেখা পাই, দুইটা কথা কহিতে পাই, তবে প্রাণে অনেকটা শান্তি পাই। ঝি বলিল, সে বলিয়া দেখিবে, কিন্তু শৈল এ প্রস্তাবে সম্মত হয় কি না খুব সন্দেহ।

১৪ই মাঘ।

ঝি বলিল, শৈল কিছুতেই রাজি হইতেছে না। বলিয়াছে আমরা মনে মনে দুজনে ত দুজনারই আছি, এ জন্মে ইহার অধিক আর কিছুই হইবার নয়। আজ শৈলকে একখানি খুব ভাল উপন্যাস পাঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে লেখক অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, প্রেমহীন বিবাহে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও সতীত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি, নারীচিত্তে একটা সেকেলে অন্ধ কুসংস্কার মাত্র।

২২শে মাঘ।

নারীর অধিকার, বিবাহ বন্ধনের কুসংস্কার, প্রেমের স্বাধীনতা প্রভৃতি নব্যমতের সমর্থক বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে শৈলর মন ফিরিয়াছে। সে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইয়াছে। তবে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে আসিবে না; স্থান সে নিজে নির্ব্বাচন করিবে। কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেই সে আমায় জানাইবে।

সে ত রাজী হইয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত আমাব গোপনে সাক্ষাৎ করাটা উচিত হইবে কিনা, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বোক্ত বহিগুলি আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতে হইবে। যুক্তিতে বেশ বুঝিতে পারি যে এ কার্য্য কিছুমাত্র অন্যায় নহে, কিন্তু জন্মগত সংস্কার এমনি জিনিষ, তাহার প্রভাব কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় না। এইখানেই স্ত্রীলোক ও পুরুষে প্রভেদ। যে প্রথমে আমায় চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে অত আপত্তি করিয়াছে, সে আজ আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে প্রস্তুতঃ আর আমি গোড়ায় পাদ্রীগিরি করিয়া, কত কষ্টে তাহাকে জপাইলাম, কিন্তু শেষ পৈঠায় পৌঁছিয়া জলে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে আমিই ইতস্ততঃ করিতেছি। আসল কথা, স্ত্রীলোকেরাই যথার্থ এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট; আমরা পুরুষরা মডাবেট হইয়া—দুই নৌকায় পা দিয়া মারা গেলাম।

১৭ই ফাল্গুন।

ঝি বলিল, শনিবার বিডন ষ্ট্রীটের কোনও গৃহে একটা বিবাহ আছে, শৈল সেখানে নিমন্ত্রিতা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেখানে সে যাইবে—অবশ্য বাড়ীর গাড়ীতে। রাত্রি দশটায় মোটর আবার শৈলকে আনিতে সেখানে যাইবে। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঠিক সাড়ে-সাতটার সময়, হেদুয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ফুটপাতে আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বিডন ষ্ট্রীটের দিক হইতে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া সেখানে দাঁড়াইবে। সেই গাড়ীতে নীলাম্বরী বারাণসী শাড়ী পরিহিতা একজন মহিলা থাকিবেন এবং ঝিও থাকিবে। ঝি নামিয়া আমায় সঙ্কেত করিলেই আমি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িব। ট্যাক্সিতে যতক্ষণ থাকিব, শৈলর সহিত আমি একটিও কথা কহিতে পাইব না; কথা কহিলে, হিতে বিপরীত হইবে। সহরের বাহিরে কোনও নির্জ্জন স্থানে সেই ট্যাক্সি আমাদের লইয়া যাইবে। কোথায় যাইতে হইবে ইত্যাদি পূর্ব্বেই ঝি ট্যাক্সিওয়ালাকে উপদেশ দিয়া রাখিবে। সেখানে, ঘড়ি ধরিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কালমাত্র সেই শাড়ীধারিণীর সহিত আমি কথোপকথন করিতে পারিব। তাহার পরে ট্যাক্সি হইতে আমায় নামিয়া যাইতে হইবে, ঝি সেখানে উপস্থিত থাকিবে।

ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি সে ট্যাক্সিতে যাবে না?"

"না। আমি সঙ্গে থাকলে আপনাদের কথাবার্ত্তার কি সুবিধে হবে? আমার না থাকাই ভাল।—বলিয়া সে আমার প্রতি একটি বক্র কটাক্ষপাত করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে জায়গাটা কোথায়?"

ঝি বলিল, "তা বউগিন্নী এখনও আমায় বলেন নি। সেইদিন আমায় জানাবেন। তবে বললেন, স্থানটি খুব নির্জ্জন, কোনও বাধা বিঘ্নের ভয় সেখানে নেই।"

কিন্তু আমার মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। কি জানি, ইহার ভিতর কোনও দাগবাজি নাই ত? আমি ঝিকে বলিলাম, "দেখ, ও ভাবে ট্যাক্সিতে উঠে কলকাতায় বাইরে যেতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই; কিন্তু আমি শুধু তোমার মুখের কথার উপর নির্ভর করতে পারিনে।"

"কিসে নির্ভর করতে পারেন?"

"শৈল নিজে হাতে আমায় চিঠি লিখলে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।"

ঝি একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু, তিনি কি চিঠি লিখতে রাজি হবেন?"

আমি বলিলাম, "তার হাতের চিঠি না পেলে আমি কিন্তু যাব না; একথা তাকে বোলো।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা বলে দেখি; তিনি কি বলেন। আপনি কাল একবার—উঁহু পরশু—পরশু ত শুক্রবার? পরশু একবার আসবেন। তিনি কি বলেন, আপনাকে জানাব।"

১৯শে ফাল্গুন।

শৈল আমায় চিঠি লিখিয়াছে। প্রিয়তম কিংবা প্রাণেশ্বর এরূপ কোনও সম্ভাষণ তাহাতে নাই। কেবল মাত্র লেখা আছে—

"শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় হেদুয়ায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া থাকিও। আমি ট্যাক্সিতে আসিয়া তোমায় তুলিয়া লইয়া যাইব।

শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী গুপ্তা।"

শৈলর সেই নাম স্বাক্ষরযুক্ত ফুলস্ক্যাপ কাগজের টুকরাটি বাহির করিয়া, হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিয়াছি—সেই লেখা, সেই টান,—কোনও প্রভেদ নাই! এখানি তাহারই স্বহস্তে লিখিত লিপি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হৃদয়! তুমি শান্ত হও—সুখের আতিশয্যে ফাটিয়া যাইও না। আজ এখন রাত্রি ৯টা—আর ২২টা ঘণ্টা। এ ২২ ঘণ্টা কি করিয়া কাটাইব জানি না। দেহ ক্ষণে ক্ষণে পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। আহ্লাদে পাগলের মত হইয়াছি। কত আশা, কত কল্পনাই যে মনোমধ্যে উদিত হইতেছে।

২৯শে ফাল্গুন।

দশদিন ডায়েরি ছুঁই নাই—এ ডায়েরি রাখিবার আর আবশ্যকতা নাই—এ পৃথিবী যদি মুহূর্ত্তে রসাতলে যায় তাহাতেও আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

সেই শনিবারের কাল—সন্ধ্যায়, যথাসময়ে আমি হেদুয়ায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। বিডন ষ্ট্রীটের দিক হইতে ট্যাক্সিও আসিয়াছিল, তাহাতে নীলাম্বরী বারাণসী পরিয়া একজন বসিয়াও ছিল, ঝিটাও নামিয়াছিল, আমিও ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়াছিলাম। ট্যাক্সি তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া ধর্ম্মতলা পার হইয়া, গড়ের মাঠের দিকে ছুটিল। ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি গিয়া ইচ্ছা হইয়াছিল বলি, "এই বাগানেই নামা যাক এস, বেশ নিরিবিলি পাওয়া যাবে।" কিন্তু গাড়ীতে কথা কহিতে বারণ, পাছে হিতে বিপরীত হয়, এই আশঙ্কায় নীরব রহিলাম। ট্যাক্সি গঙ্গার ধার দিয়া খিদিরপুর অভিমুখে ছুটিল। তাহার পর, কোথা দিয়া কোথায় যে গেল আমি কিছুই নির্ণয় কবিতে পারিলাম না। ওদিকটা আমি একেবারেই চিনি না। ক্রমে দেখিলাম, দুই ধারে খোলা মাঠ রাখিয়া ছুটিতেছি। সরকাবী পাকা রাস্তা, কিন্তু একেব... নির্জ্জন—রাস্তার পার্শ্বে আলোকস্তম্ভও নাই। ট্যাক্সি আর থামিতে চাহে না। অনুমান হইল, প্রায় এক ঘণ্টা কাল

আমরা ছুটিতেছি। অবশেষে ট্যাক্সি একটা বাগানের ফটকের কাছে থামিল। ভিতরে একটা বাগানবাড়ীর মত দেখা গেল, গাড়ীবারান্দায় আলো জ্বলিতেছে। সে নামিয়া নিম্নস্বরে আমায় বলিল, "আসুন।"—আমি কম্পিত বক্ষে নামিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। বাড়ীটার বারান্দায় উঠিবামাত্র নীল শাড়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসৃত হইল; সভয়ে দেখিলাম, খিরের খাকী পোষাক পরা পুরুষ মূর্ত্তি,—স্বয়ং প্রবোধ গুপ্ত—হস্তে চাবুক।

দেখিয়া আমার মাথাটা বন বন করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি দেওয়াল ধরিলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম ঝি শয়তানী এই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

প্রবোধ তখন মালী মালী বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মালী আসিয়া কক্ষদ্বার খুলিয়া ভিতরে আলো জ্বালিয়া দিল। প্রবোধ কঠোরস্বরে আমায় বলিল, "এস।" মালীকে বলিল, "তুম্ আভি যাও।"

আমি কম্পিত পদে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দরজা বন্ধ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া প্রবোধ বলিল, "কি প্রেমিকবর? প্রেম করবে?"

আমার মুখ দিয়া কথা সরিল না। আমায় কাঁপিতে দেখিয়া বলিল, "বস।"

আমি একটা চেয়ারে বসিলাম। প্রবোধ বলিল, "পরের স্ত্রীর প্রতি লোভ করলে কি দণ্ড শাস্ত্রে বিহিত আছে জান? নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন।"—বলিয়া পকেট হইতে একটা বৃহৎ শিকারীর ছুরী (hunting knife) বাহির করি[illegible] হার ফলা খুলিল।

দেখিয়া, আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি কাঁদিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "আমায় মাফ করুন, আমার কিছু দোষ নাই। আপনার স্ত্রীই আমায় চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিল।"

প্রবোধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কই সে চিঠি?"

"এই যে"—বলিয়া বুকপকেট হইতে সেই অভিশপ্ত চিঠিখানা বাহির করিয়া আমি প্রবোধ গুপ্তের সামনে ফেলিয়া দিলাম।

প্রবোধ তাহা খুলিয়া বলিল, "তোমার বিশ্বাস, এই চিঠি শৈল তোমায় লিখেছে?—নির্ব্বোধ! এ আমার হাতের লেখা। দেখ।" বলিয়া বুকপকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া কি লিখিয়া চিঠিখানা আবার আমার সামনে ফেলিয়া দিল। দেখিলাম, যেখানে শৈলর স্বাক্ষর ছিল তাহার নিম্নে দ্বিতীয় স্বাক্ষর হইয়াছে শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী গুপ্তা। একই লেখা।

তখন বুঝিলাম, সেই ফুলস্ক্যাপের টুকরায় সেই স্বাক্ষরও ইহারই লিখিত। ঝি সর্ব্বনাশী প্রথমাবধিই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

প্রবোধ বলিল, "শোন বলি। ছেলেবেলায় একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করেছ বলেই, বড় হয়ে, বিবাহের পরও সে মেয়ে—বিশেষ হিন্দুর মেয়ে—তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাবে এ বিশ্বাস ত্যাগ কর। আমাদের বিবাহের পর, তোমার গল্প শৈল আমার কাছে করেছিল, ঢাকা থেকে ফিরে ইস্কুলের ঠিকানায় তুমি তাকে যে চিঠি লিখেছিলে—যদিও সে চিঠি সে দেখেনি—সে চিঠির কথাও আমাকে বলেছিল। তারপর মধুপুরে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন আমায় বলেছিল, এই যে লোকটি গেল, ঐ সেই নির্ম্মল। নির্ম্মলের মনে যে এত ময়লা, তখনও আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, পাঁচজনের মত তুমিও মধুপুরে পূজোর ছুটিতে শুধু বুঝি বেড়াতেই এসেছ। তারপর পূজোর নিমন্ত্রণের সঙ্গে তোমার সেই প্রেমের চিঠি শৈল আমায় দেখালে। সে প্রথমে রাজি হয়নি, আমারই পীড়াপীড়িতে সে বিজয়া দশমীর বিকালে নীলাম্বরী বারাণসী পরে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আমি শুধু একটু আমোদ করবার জন্যেই শৈলকে দিয়ে ঐ কাজটি করিয়েছিলাম? তার পর সাহস পেয়ে পাছে তুমি আব কোনও বকমে তাকে বিরক্ত কর, এই ভয়ে তারই অনুরোধে, পরদিন আমরা মধুপুর ত্যাগ করি। তার পর, তুমি কলকাতায় এসে ঝির সঙ্গে দেখা করলে। ঐ ঝির মা, আমার

মায়ের ঝি ছিল, এখন ও আমার স্ত্রীর ঝি, অত্যন্ত বিশ্বাসী, সে এসে প্রথম দিনই তোমার সব কথা আমাদের দুজনের কাছে প্রকাশ করে। তুমি ঝির হাতে যে সমস্ত চিঠি পাঠাতে, ঝি আমাকে নিয়ে গিয়ে দিত। আমি কোন কোন দিন আমোদ করে শৈলকে পড়ে শোনাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনত না, ছুটে পালিয়ে যেত। তার পর আজকের এ ব্যাপারে পরামর্শ শুনে শৈল আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে কি সাজা দেবে? আমি বলেছিলাম, শাস্ত্রেই আছে, এ অপরাধের দণ্ড নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন, তাই করব। শুনে সে আমাকে মিনতি করেছে, তা যেন আমি না করি। সুতরাং এ যাত্রা তোমার নাক কান বেঁচে গেল। কিন্তু সাবধান, ফের যদি কখনও তুমি আমাদের ত্রিসীমানায় আস, তবে তোমার নাক কান আমি নিশ্চয়ই কেটে নেবো। আজ তোমাকে, পরস্ত্রীর পানে পাপচক্ষে চাইতে নেই, এই উপদেশটি শিক্ষা দেবার-জন্যে, কেবল ঘা কতক চাবুক মেরে বিদায় করব।''—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাবুক হাতে লইল। আমার প্রতি ঘূর্ণিত লোচনে চাহিয়া, বজ্রগম্ভীর বলিল, ''উঠে দাঁড়াও।''

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম, কিন্তু দাঁড়াইলাম না। এক লম্ফে দরজার নিকট গিয়া, তাহা খুলিয়া বারান্দা হইতে বাগানে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণপণে ফটকের দিকে ছুটিলাম। ফটক হইতে বাহির হইয়া সেই অন্ধকার পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া পথে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম; কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, শরীরে রক্তপাত হইল, একপাটি জুতা ছিটকাইয়া কোথায় গিয়া পড়িল। উঠিয়া ভাবিলাম, ট্যাক্সিতে প্রবোধ যদি আমায় ধরিতে আসে? তৎক্ষণাৎ অপর জুতাপাটি খুলিয়া ফেলিয়া, রাস্তা হইতে নামিয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মাঠের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সাপে খাইবে কি বাঘে খাইবে, তখন সে জ্ঞান আমার কিছুমাত্র ছিল না। কি একটা বড় গাছ দেখিয়া তাহার গুঁড়ির আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, বাগানের দিক হইতে একখানা মোটর আসিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া গেল। আমি তখন নগ্ন পদে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় আসিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। দেহ অবসন্ন—চলি, আবার পথে বসি। এ কোন্ স্থান, কলিকাতা হইতে কত দূর আসিয়াছি, কিছুই জানি না। বিশ্রাম করিয়া, আবার উঠিয়া অন্ধকারে পথ চলি।

এইরূপে ক্রমে রজনী প্রভাত হইলে, একখানি গ্রাম পাইলাম। শুনিলাম সেখান হইতে কলিকাতা হাঁটা পথে সাত ক্রোশ—দুই মাইল দূরে ষ্টেশন আছে, সেখান হইতে কলিকাতা যাওয়া যায়। টাকা পয়সাও সঙ্গে নাই যে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া বাড়ী আসিব, গতকল্য সন্ধ্যায় বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় এমন উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে মানিব্যাগটিও সঙ্গে লইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। পা কাটিয়াছে, ফুলিয়াছে, ব্যথায় আড়ষ্ট—চলিবার শক্তি নাই। তবু প্রাণের দায়ে, গ্রামের বাজারে ভিক্ষা করিয়া কিছু খাইয়া, ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। দ্বিপ্রহরে আর একটা গ্রাম পাইলাম। সেখানেও ভিক্ষা করিয়া কিছু খাইয়া সন্ধ্যার সময় খিদিরপুরে পৌঁছিলাম। বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি আটটা বাজিল। সেখানে পিতামাতার নিকট দস্যুহাতে পতিত হওয়ার যে কাল্পনিক কাহিনী বলিলাম, সেটা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না; তবে সারাদিন উৎকণ্ঠায় যাপন করার পর, আমাকে পাইয়া তাঁহারা ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন। মা স্বহস্তে গা মুছাইয়া ভাত বাড়িয়া খেতে দিলেন। রাত্রেই কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তিন দিন তিন রাত্রি জ্বর-ঘোরে অচেতন ছিলাম। পরশু হইতে জ্বর ছাড়িয়াছে। আজ রুটি খাইয়াছি। [আশ্বিন ১৩২৯ (?)]

অলকা

কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে একদিন অপরাহ্নকালে বিনোদবিহারী নামক একটি যুবক তাহার কেওড়া কাঠের তক্তপোষখানির উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে কড়িকাঠ গণনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের ঘড়িতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। ভৃত্য আসিয়া ঘরে ঘরে বাবুদের নিকট হইতে জলখাবারের ফরমাস ও পয়সা লইতে লাগিল; কিন্তু বিনোদের নিকট সে আসিল না। কারণ মাসখানেক হইতে "অম্বল" হওয়ার অজুহাতে বাজারে খাবার খাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সাড়ে চারিটা বাজিলে ভৃত্য খাবার লইয়া আসিল। অন্যান্য ছাত্রেরা খাবার খাইতে লাগিল; কেহ কেহ তদুপরি চা পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। "পান নিয়ে আয়" "সোরাইয়ে জল রাখিসনি।" প্রভৃতি শব্দে বাসা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদ সেই ভাবেই শুইয়া আছে। শুইয়া শুইয়া সে কেবল আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছে।

বেচারী বিনোদ বড়ই বিপন্ন। তাহার বাড়ী কুমিল্লা জেলার কোনও গ্রামে। আজ প্রায় দুই মাস কাল তাহার বাড়ী হইতে না আসিয়াছে টাকাকড়ি, না কোন চিঠিপত্র। মা বাপ বাঁচিয়া নাই, খুড়া মহাশয় বাড়ীর কর্ত্তা, তিনি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে নায়েবী কর্ম্ম করেন, অবস্থা ভালই। টাকাকড়ি এতদিন নিয়মিত ভাবেই ত তিনি পাঠাইতেন, হঠাৎ এ কি হইল? পূজোর ছুটি হইতে আব দুই সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে। কলেজের বেতন দুইমাস বাকী পড়িয়াছে, আগামী কল্য তাহা দাখিল করিবার শেষ দিন—না পারিলে, সে 'ডিফল্টার' হইয়া যাইবে, লেকচারে উপস্থিত থাকিলেও প্রতিদিন তাহাকে "অ্যাবসেন্ট" করিবে, হয়ত পার্সেন্টেজ নষ্ট হইয়া যাইবে। একটা বৎসরই মাটি! মেসের টাকার জন্য ম্যানেজারবাবু ত নিত্য অপমান করিতেছেন। এই দুইমাসে বন্ধুগণের নিকট ১০/১২্ ধাব হইয়াছে। ছুটিতে তাহারা বাড়ী যাইবে, জিনিষপত্র কিনিবে, তাহাবাও টাকার জন্য তাগাদা লাগাইয়াছে। বাড়ী নিকটে নয়, তথাপি টিকিট কিনিবাব টাকা থাকিলে একবাব না হয খোঁজ লইয়া আসিত যে ব্যাপারটা কি; তাহাবও উপায় নাই। গ্রামস্থ দুইজন বন্ধুকেও বিনোদ পত্র লিখিয়াছে, তাহারাও কোনও জবাব দেয নাই।

পাঁচটা বাজিল। অন্যান্য ছাত্রগণ কেহ বায়স্কোপ দেখিতে, কেহ গোলদীঘি বা গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইযা গেল। বিনোদ তখন উঠিযা, সোরাই হইতে জল ঢালিয়া মুখ হাত ধুইয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া সেই জল খানিকটা খাইয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর জামাটি গায়ে দিয়া, বাসা হইতে প্রাপ্য পান দুটি মুখে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। বড় রাস্তায় পড়িযা সে উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গ্রামস্থ এক ভদ্রলোক গোয়াবাগানে থাকিয়া কবিরাজী করেন, বিনোদকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি যদি গোটাকতক টাকা ধার দেন তবে আগামী কল্য কলেজের বেতনটা সে দাখিল করিতে পারিবে। সেই আশাতেই বিনোদের এই অভিযান।

যথাসময়ে সে গোয়াবাগানে কবিরাজ মহাশযের বাটীতে উপস্থিত হইল। দেখিল, বৈঠকখানা জনশূন্য। গামছা কাঁধে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এক ভৃত্যবালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবিরাজ মশায় বাড়ী আছেন?"

বালক বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি আঁচি গিযেছেন।"

বিনোদ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আঁচি? আঁচি কোথা? সেখানে কি জন্যে গেছেন?"

বালক বলিল, "উগী দেখতে গেছেন।"

বিনোদ বলিল, "ওঃ রুগী দেখতে রাঁচি গেছেন? ফিরবেন কবে?"

বালক বলিল, "আজ্ঞে, তা কিছু কয়ে যান নি।"

বিনোদ মনে মনে বলিল—"যাক—এ দফায় তা হলে নিশ্চিন্দি!" একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৈঠকখানা হইতে নামিল। গলি পার হইয়া বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই হেদুয়া পুষ্করিণী। অন্যমনস্কভাবে ধীরপদে সে হেদুয়ার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল।

॥ ২ ॥

হেদুয়াতীরস্থ বাগানখানির একটা বিশেষত্ব এই যে ইহা বহুসংখ্যক পেন্সনপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বৈকালিক বিচরণভূমি। এ সময়ে গোলদীঘির চারিটি ধার যেমন ক্ষিপ্রগামী কলেজের যুবকগণে ভরিয়া যায়, হেদুয়ার তীরদেশে তেমনি মন্থরচরণ বৃদ্ধগণেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এখানে ইঁহারা কিয়ৎক্ষণ পাদচরণে ক্লান্ত হইলে, কাষ্ঠমঞ্চনিম্নস্থ বেঞ্চগুলি অধিকার করিয়া বসিয়া পড়েন। বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় নানাবিধ গল্প-গুজবে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কোনও দিন বা কোনও দল, নিকটস্থ তিনকড়ি মোদকের দোকান হইতে প্রসিদ্ধ 'কস্তুরী' সন্দেশ আনাইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দে ভক্ষণ করেন।

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ক্লান্তপদে এদিক ওদিক একটু বেড়াইল। কিন্তু দেহেও বল নাই, মনেও উৎসাহ নাই—সুতরাং শীঘ্রই সে একটি বেঞ্চের প্রান্তভাগ খালি পাইয়া বসিয়া পড়িল। সেই বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, চশমা চোখে দিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিলেন; বিনোদ একনজর মাত্র তাঁহার পানে চাহিয়া হেদুয়ার স্নিগ্ধশ্যামজ জলরাশির উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল।

দিবালোক ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বিনোদ জলের পানে একদৃষ্টে সেইরূপ তাকাইয়া, আপন সঙ্কটের বিষয় চিন্তা করিতেছে। ক্রমে তাহার পরলোকগত মাতাপিতাকে মনে পড়িল। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে, আজ কখনও অমনভাবে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইত না। পিতা আগে যান; তাহার পর, এই দুই বৎসর হইল মাতৃদেবীও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মার মৃত্যুসময়ে বিনোদ উপস্থিত ছিল; সেই দৃশ্য মনে পড়িবামাত্র সে কিছুতেই আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল—সেই বৃদ্ধ বাবুটি কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিতেছেন "ছোকরা!"

বিনোদ লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া ভারি গলায় বলিল, "আজ্ঞে!"

"কে তুমি, তোমার নাম কি?"

বিনোদ নাম বলিয়া, অবনত নেত্রে বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ অতি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?"

বিনোদ কথা কহে না।

"বাড়ী কোথা তোমার?"

"কুমিল্লা জেলা।"

"এখানে কি কর? কোথা থাক?"

"ল কলেজে পড়ি। মেসে থাকি।"

"তোমার কি হয়েছে? আমি বুড়োমানুষ, আমায় বলনা, তাতে লজ্জা কি বাবা!"

এইবার বিনোদ মুখ তুলিল। বাবুটির পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না। উন্নতকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, হাতের হাড় গুলি মোটা, বক্ষদেশ প্রশস্ত—ইনি যৌবনে একজন বলশালী লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। [illegible]

সাদা হইয়া গিয়াছে। গুম্ফ শ্মশ্রু ক্ষৌরিত; গায়ে সাদা জিনের কোট, পরিধানে থান ধুতি, পায়ে প্যানেলার জুতা. পঠিত বহিখানির ভিতর একটি আঙুল পুরিয়া বহিখানি মুড়িয়া হাতে ধরিয়া আছেন। বিনোদ মলাটে সেখানির নাম দেখিল "ভক্তিযোগ।"

বিনোদকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কুমিল্লা জেলায় বাড়ী বললে না? আমি এক সময় কুমিল্লায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, বোধ হয় তখন তুমি জন্মাওনি। কুমিল্লা জেলায় অনেক স্থানেই আমি টুর করে বেড়িয়েছি। কোন্ জায়গায় তোমার বাড়ী বল দেখি?"

এই বৃদ্ধ পূর্ব্বে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন শুনিয়া বিনোদের মনে একটু সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমাদের বাড়ী সুবর্ণগ্রাম।"

বৃদ্ধ বলিল, "সুবর্ণগ্রাম। কই মনে করতে পারছিনে।"

অতঃপর তিনি বিনোদকে তাহার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে এক আধটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার উপস্থিত সঙ্কটের বিষয় সমস্তই অবগত হইয়া বলিলেন, "এই জন্যে তুমি কাঁদছিলে?"

এবার বিনোদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। সে একটু গর্ব্বিত ভাবেই বলিল, "না সেজন্যে আমি কাঁদিনি। আমার মাকে মনে পড়েছিল, তাই চোখে জল এসেছিল।"

এতক্ষণে দিবালোক প্রায় নিভিয়া আসিয়াছিল। বেঞ্চখানিতে স্থান রহিয়াছে দেখিয়া, অপর দুইটি লোক আসিয়া তথায় উপবেশন করিল। বৃদ্ধ দেখিলেন, সেখানে কথাবার্ত্তার আর সুবিধা হইবে না। বলিলেন, "আমার সঙ্গে তুমি আসবে? কাছেই আমার বাড়ী, বেশী দূর নয়। তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যাইতে প্রথমে বিনোদের মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইল। তারপর সে ভাবিল, "ইনি গুণ্ডাও নন, আমার কাছে টাকাকড়িও নেই, তবে আর ভয়টা কিসের?" বলিল, "বেশ ত চলুন।"

বৃদ্ধ উঠিয়া ধীরপদে বাগানের বাহির হইলেন, বিনোদ তাঁহার অনুসরণ করিল।

পথে যাইতে যাইতে বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার পরিচয় তোমায় এখনও দিইনি। আমার নাম শ্রীকেদারনাথ সরকার, আমরাও কায়স্থ। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করতাম, বছর পাঁচ ছয় হ'ল পেন্সন নিয়েছি। দেশে শরীর ভাল থাকে না, তাই কলকাতাতেই থাকি।"

বিনোদ নীরবে কেদারবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাণিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া চলিল, ক্রমে একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবুটি এক বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলেন। উপর বারান্দা হইতে তরুণী কণ্ঠে শব্দ হইল, "কে?" কেদারবাবু বলিলেন, "আমি মা, দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

অর্দ্ধমিনিট পরে দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হইল, "বাবা, আজ যে এত দেরী?" বিনোদ দেখিল লণ্ঠন হস্তে একটি মেয়ে; পিতার সহিত একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

"এই বাবুটির সঙ্গে কথা কইতে কইতে আজ একটু দেরী হয়ে গেল মা। এস হে বিনোদ।"—বলিয়া কেদারবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বিনোদ প্রবেশ করিলে, কেদারবাবু দরজায় খিল বন্ধ করিলেন। মেয়েটি লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইল, দুইজনে তাহার পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বিনোদকে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মেয়েটি অপর দিকে চলিয়া গেল। বিনোদ দেখিল কক্ষটি ক্ষুদ্র, তাহার এক পার্শ্বে একটা তক্তপোষের উপর ফরাস বিছানা পাতা, তাহার উপরে দুইটা তাকিয়া বালিস, অপর পার্শ্বে একটু ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট দুইখানি চেয়ার। কেদারবাবু বিনোদকে সেই তক্তপোষের উপর বসাইয়া ডাকিলেন, "রাধে!"

বিনোদ মনে করিয়াছিল, যে মেয়েটি লণ্ঠন দেখাইয়া আনিয়াছিল তাহারই নাম বুঝি

রাধে। কিন্তু দেখিল, সধবাবেশিনী গৌরবর্ণ নাতিস্থূলা এক রমণী, বয়স বোধ হয় চল্লিশ হইবে, প্রবেশ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদারবাবু বলিলেন, "রাধে এ'র নাম বিনোদবাবু—বিনোদবিহারী দত্ত, আমাদের কায়স্থ। ল কলেজে পড়ছেন, আজ হেদোর ধারে আলাপ হল, তাই কথাবার্ত্তা কইবার জন্যে সঙ্গে করে এনেছি।" বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।"

বিনোদ মনে করিল, "এ ত দেখছি ইংরাজি প্রথার ইন্‌ট্রোডাক্‌শান! পর্দ্দাটর্দ্দাও মানেন না বোধ হয়—ব্রাহ্ম নাকি?"

রাধারাণী বলিলেন, "বেশ। এখানেই কি আপনাদের বাড়ী?"

অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে কথা কহিতে বিনোদের কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। মাথা নীচু করিয়া সে সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিল।

কেদাববাবু বলিলেন, "রাধে, আমাদেব একটু চা দিতে পার?—আব এঁর জন্যে কিছু জলখাবার?"

রমণী বলিলেন, "চায়ের জল ত তৈরি নেই, চড়িয়ে দিইগে। জলখাবার আগে নিয়ে আসবো কি?"

কেদারবাবু বিনোদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আগে খাবারটা খেয়ে নাও, কি বল? ততক্ষণ চা হোক?"

বিনোদ তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, জলখাবার আমাব জন্যে দরকার নেই। শুধু এক পেয়ালা চা হলেই চলবে।"

কেদাববাবু বলিলেন, "তা কি হয়? গৃহস্থের বাড়ীতে এসে একটু মিষ্টিমুখ না করলে তারা ছাড়বে কেন? চা—সে ত বিলিতী ফাঁকি, জলভাজা বইত নয়।"—বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "যাও, কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও।—রাধাবাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণেই পাশের ঘব হইতে ষ্টোভ [illegible] গোঁ গোঁ শব্দ উঠিল। তাব পরে সেই মেয়েটি একটি কাঁসার বেকাবীতে [illegible]ক টুক্‌বো ফল এবং দুইটি বড় রসগোল্লা আনিয়া দাঁড়াইতেই কেদারবাবু বলিলেন, "রাখ মা, ঐ টেবিলেব উপর রাখ।"

মেয়েটি খাবারের রেকাবী ও জলের গ্লাস টেবিলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, কেদারবাবু বলিলেন, "দাঁড়াও মা—এঁর সঙ্গে তোমার পবিচয় করিয়ে দিই। বিনোদবাবু এইটি আমাব মেয়ে অলকা। আর দেখ অলকা, ইনি খুব লেখাপড়া শিখেছেন। এম-এ পাশ করেছেন, আইন পড়ছেন।"—বলিতেই মেয়েটি বিনোদের পানে চাহিয়া নমস্কার করিল। বিনোদও প্রতিনমস্কার করিয়া ভাবিল, ইহার মার সঙ্গে যে সময় সে পরিচিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা ত ভুল হইযা গিয়াছে—ছি ছি! কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার মেয়েটিও মুখ্যু নয় বিনোদবাবু। আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়ে। বাপ হযে বলা উচিত নয়,—বেশ বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে।—যাও মা, দেখ চায়ের জল হল কিনা। চল হে বিনোদ, খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নেবে চল। তার পর দুজনে একসঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।"

অলকা চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বিনোদকে লইয়া গিয়া টেবিলেব নিকট বসিলেন। খাবার খাইয়া শীতল জল পান করিয়া বিনোদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। চা পান করিতে করিতে কেদাববাবু বলিলেন, "দেখ বিনোদ, তুমি যে বিশেষ রকম অর্থসঙ্কটে পড়েছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তোমার কলেজের দু'মাসের মাইনে, মেসের পাওনা, ধার শোধ কবা, গোটা পঞ্চাশ টাকা এখনই তোমার প্রয়োজন। এ টাকা আমি এখনই দিতে পারি। কিন্তু সেটা দানস্বরূপ হলে, তোমাব তা কখনই ভাল লাগবে না। সেইজন্যে আমি

প্রস্তাব করছি, তুমি আমার মেয়েটিকে দু'মাস পড়াও—তোমার দু'-মাসের বেতন স্বরূপ অগ্রিম ৫০ টাকা আমি তোমায় দিচ্ছি। কেমন, তুমি রাজি আছ?"

বিনোদ প্রায় একমিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ পড়াতে হবে? কখন?"

কেদারবাবু বলিলেন, "বিকেলবেলা একঘণ্টা। এই, চারটে থেকে পাঁচটা, কিম্বা পাঁচটা থেকে ছটা যেমন তোমার সুবিধে হয়। তোমার কলেজ কখন?"

"সকালবেলা। আর, এ কটা দিন পরে ত কলেজের ছুটিই হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হলে, তোমার মত কি বল।"

বিনোদ বলিল, "আপনি যখন এই সঙ্কটে আমায় উদ্ধার করছেন—আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করলাম।"

"আচ্ছা বেশ। তা কাল থেকেই এস। ইংরেজি, সংস্কৃত আমি নিজেই ওকে পড়াই। এই সন্ধ্যের পর, চা খেয়ে ওকে নিয়ে রোজ বসি। বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অঙ্কটা তুমি কষিও—অঙ্কে ও একটু কাঁচাই আছে। বস, টাকাটা আমি নিয়ে আসি।"—কয়েকমিনিট পরেই পাঁচখানি নোট আনিয়া তিনি বিনোদের সম্মুখে রাখিলেন।

বিনোদ টাকা কয়টি উঠাইয়া লইল। নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া, নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, দেশ হইতে তাহার এক বন্ধুর পত্র আসিয়াছে। যে জমিদারের এষ্টেটে তাহার খুড়া মহাশয় চাকরি করিতেন, সেই জমিদার কর্ত্তৃক আনীত তহবিল তছরূপের মোকর্দ্দমায় তাহার খুড়া মহাশয়ের দেড় বৎসর জেল হইয়া গিয়াছে। পত্র পড়িয়া বিনোদ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, খুব সময়েই কেদারবাবুর ন্যায় দয়ালু পরোপকারী মহাত্মার দর্শন সে পাইয়াছিল, নহিলে ত তাহাকে অথই জলে পড়িতে হইত।

॥ ৩ ॥

পরদিন বিনোদ তাহার নূতন ছাত্রীকে পড়াইতে গেল। কেদারবাবু অধ্যাপনা সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া, তাঁহার নিয়মিত হেদুয়া-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পাঁচটা বাজিলে, অলকার মা তাহাকে চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। প্রথমে কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অবশেষে জলযোগ সমাপনান্তে বিনোদ বাসায় ফিরিয়া আসিল।

এইরূপ দিনের পর দিন চলিতে লাগিল—এবং এ বয়সে এরূপ সান্নিধ্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বিনোদের প্রথমে মনে হইল, তাহার ছাত্রীর স্বভাবটি বড় মধুর! তার পর মনে হইল তাহার দেহের গঠন—বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি—বড়ই সুন্দর; মেয়েটি যেরূপ রূপবতী, বাঙ্গালীর ঘরে সেইরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তার পর মনে হইতে লাগিল, এ মেয়ে যাহার গৃহলক্ষ্মী হইবে, তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান পুরুষ এ জগতে দুর্লভ। তাহার পর বিনোদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বসিল, অলকাকে সে অতিশয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কেন না, যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, তাহার চিন্তা এক দণ্ড মন হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহাকে ত চাই—নহিলে জীবনটি যে একান্ত বিস্বাদ হইয়া যাইবে। এখন উপায়? এ অবস্থা, মাসখানেকের মধ্যেই উপস্থিত হইল।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু সে অলকার কাছে নিজ মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করে নাই। পড়াব সময় অলকার মা প্রায়ই কাছে আসিয়া বসিতেন। কেদাববাবুর সহিত সাক্ষাৎ সব দিন তাহার হইত না; যে সমযে সে অলকাকে পড়ায়, সেই সময়টাই তাঁহার হেদুয়া ভ্রমণের জন্য নির্দ্ধারিত।

মাসখানেক পরে একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, অলকা বাড়ী নাই; তাহার পিতা তাহাকে [illegible] থিয়েটারের বৈকালিক অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়াছেন।

অলকার মা আসিয়া, পড়িবার ঘরে বিনোদের কাছে বসিলেন। প্রথমে অলকার পড়াশুনার প্রসঙ্গেই কথাবার্ত্তা হইল; তারপর হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমার ত বয়স হল, বিয়ে-থাওয়া করবে না?"

বিবাহের প্রসঙ্গে বিনোদের লজ্জা হইল। সে মাথাটি নীচু করিযা বলিল, "আমার অবস্থা সবই ত জানেন।"

"অবস্থা কি চিরদিন মানুষের সমান থাকে? আজ বাদে কাল তুমি পাস করবে—অবস্থার কি উন্নতি করতে পারবে না? আচ্ছা, আইন পাস করে কোথায় তুমি প্র্যাকটিস করবে স্থির করেছ?"

"তা এখনও স্থির করিনি। প্র্যাকটিস করব কি না সন্দেহ। প্রথম দু'চার বছর বসে খাবার সংস্থান ত আমার নেই। বোধ হয় আমাকে চাকরির চেষ্টাই করতে হবে।"

রাধারাণী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমাকে দেখে অবধি একটা বাসনা আমার মনে উদয় হয়েছে। আমার ইচ্ছে হয়, তোমাকে আমার পুত্রস্থানীয় করি। তুমি আমার অলকাকে বিয়ে কর না কেন।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া বিনোদ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। কিন্তু লজ্জায় তাহার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠিল। জড়িতস্বরে বলিল, "সে ত আমার আশাতীত সৌভাগ্য! কিন্তু এখন আমার অবস্থা কি তা ত আপনি জানেন। কেদারবাবু কি আমার মত একজন নিঃস্ব লোককে তাঁর জামাই করতে সম্মত হবেন?"

রাধারাণী হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি যদি রাজি থাক ত বল; কর্ত্তার সম্মতি আদায় করে নেবার ভার আমার উপর রইল। তবে সব কথা তোমায় ভেঙ্গেই বলি বাবা, লুকোছাপির কোনও দরকার নেই। আমি এখন তোমার কাছে যে প্রস্তাব করলাম, তা ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছি। ওঁরও খুব ইচ্ছে যে তোমার হাতে মেয়েটিকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।"

বিনোদ অধোবদনে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। পরে বলিল, "কিন্তু দেখুন, একটা কথা আছে। অলকা বড় হয়েছেন। তাঁর মতামত—তা ছাড়া আমি উপার্জ্জনক্ষম না হলে ত—"

রাধারাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অলকার মতের জন্যে তুমি ভেবো না। অপর কথা, কর্ত্তা পূর্ব্বে একজন প্রথম গ্রেডের ডেপুটি ছিলেন, তা বোধ হয় তুমি শুনেছ। ওঁর প্রথমপক্ষের তিনটি ছেলে, একটি ঢাকায় ওকালতী করছে, আর দুজন ভাল করে লেখাপড়া শিখলে না, তারা দেশে থাকে, বিষয় সম্পত্তি দেখে। চীফ সেক্রেটারী সাহেব ওঁকে খুব ভালবাসেন। কর্ত্তা সেদিন বলছিলেন সাহেবকে আমি বলে রেখেছি, ছেলেদের জন্যে আমি ত কিছুই চাইলাম না, আমার যে জামাই হবে তাকে একটি ডেপুটিগিরি দিতে হবে। সাহেব বলেছেন, আচ্ছা। সেদিন সাহেবের সঙ্গে উনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মেয়ের কত বয়স হয়েছে? উনি বললেন, সতেরো। শুনে সাহেব ভারী খুসী। বললেন, তুমি যে মূঢ় দেশাচারের ভয়ে অন্যান্য লোকের মত ছোট বয়সে মেয়ের বিয়ে দাওনি, লেখাপড়া শেখাচ্চ, এতে তোমার খুব সৎসাহস প্রকাশ পাচ্ছে। তোমার যে জামাই হবে সে যদি বি-এ পাশ হয়, তবে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, লাটসাহেবকে বলে নিশ্চয়ই আমি তাকে ডেপুটি করে দেব। তাই আমি বলি কি বাবা, তুমি ত নিজেই নিজের কর্ত্তা, কারু মতামতের অপেক্ষা ত তোমায় রাখতে হবে না, আর বেশী দেরী না করে এই সামনে অগ্রাণ মাসেই শুভকর্ম্মটা হয়ে যাক।"

বিনোদ মনে মনে ভাবিল, "একেই বলে বিধাতা যখন মাপায তখন উপরে উপরি চাপায়। আধঘণ্টা আগে অলকাকে পাবার আশাই আমার পক্ষে, বামনের চন্দ্রস্পর্শের মত দুরাশা ছিল—আর এখন শুধু অলকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটিগিরি ফাউ!"

বলা বাহুল্য বিনোদ সানন্দে সম্মতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। রাধারাণীর বারম্বার অনুরোধসত্ত্বেও জলখাবার পর্যন্ত সে খাইল না। ক্ষুধা বলিয়া কোন জিনিষ যে পৃথিবীতে আছে, তাহা আজ সে অনুধাবন করিতেই পারিল না।

।। ৪ ।।

কেদারবাবুর বাসা হইতে বাহির হইয়া সহসা বিনোদের মনে হইল, চলিতে পা দুখানা যেন ধূলিমলিন রাজপথে মোটেই ঠেকিতেছে না—সে যেন হাওয়ার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার মাথার ভিতর হইতে আগুন ছুটিতেছে। নিকটে হেদুয়া পুষ্করিণী পাইয়া, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠিক করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তীরস্থ বাগানে প্রবেশ কবিল। একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দুই তিনবার হেদুয়াকে প্রদক্ষিণ করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; একবার মনে হইল বাসায় যাই। কিন্তু ছুটিতে বাসা এখন খালি, একলা সেখানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা অত্যন্ত অসহ্য হইবে; রাত্রে যে ঘুম হইবে এমন আশাও দেখা যাইতেছে না। আজ শনিবার, তার চেয়ে বরং কোনও থিয়েটারে গিযা বসিলে, রাত্রি দুইটা অবধি একরকম কাটিয়া যাইবে। পকেটে টাকা ছিল; বিনোদ বাহিব হইয়া বিডন ষ্ট্রীটের এক থিয়েটারে গিয়া প্রবেশ কবিল।

দুইটি অঙ্ক হইয়া গেলে, বিনোদ বিলক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করিল। বাহির হইয়া একটা দোকানে লুচি ডিম ও চপ খাইয়া, হাত ধুইয়া চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় তাহার এক বন্ধু প্রকাশবাবু সেখানে দর্শন দিলেন। ইনি এক সময় বিনোদের সহপাঠী ছিলেন। বি-এ পাস করিয়া শ্বশুরের সুপারিশে সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়াছেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র বিনোদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—প্রকাশকে "স্বজাতীয়" এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহার মনে হইল। মনে মনে বলিল, 'তুমিও শ্বশুরের কৃপায় ডেপুটি—আমিও তাই।"

অভিনয় শেষে বাহিরে আসিয়া উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ বলিল, "এত রাত্রে বাসায় গিয়ে কি করবে? কাছেই আমার শ্বশুরবাড়ী, সেইখানে কিছু খেয়ে, বৈঠকখানায় শুয়ে থাকবে চল।" অনেক দিনের পর বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, বিনোদ সহজেই সম্মত হইল।

বাড়ীতে পৌঁছিযা, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে, বৈঠকখানায় শয্যার উপর বসিয়া উভয় বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এ কথা সে কথাব পর প্রকাশ বলিল, "কার মেয়েকে পড়াচ্ছ বলছিলে? কেদার সরকার কে?"

"আগে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন পেন্সন নিয়েছেন।"

প্রকাশ বলিল, "ওঃ ডেপুটি কেদার সবকাব? তাই বল! তাঁকে ত আমি জানি—অর্থাৎ অন্যান্য ডেপুটিদের কাছে তাঁর খবব শুনেছি। তিনি একজন প্রথম গ্রেডের ডেপুটি ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন ত?"

বিনোদ বলিল, "হ্যাঁ, তিনিই।"

প্রকাশ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই তিনি। তাঁর সেই অবিদ্যাটিকে নিয়ে এইখানেই আজকাল আছেন বুঝি?"

ইহা শুনিয়া বিনোদ চমকাইয়া উঠিল। বলিল, "অবিদ্যা কি রকম?"

প্রকাশ বলিল, "কেন হে, অবিদ্যা শুনে তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? তুমি তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করবার মৎলব-টৎলব করেছ নাকি?" বলিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

বিনোদ নিজেকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইযা বলিল, "না, তুমি বোধ হয় ঠিক জান

না। তুমি যা বলছ, তাঁদের ব্যবহারে সে রকম কোন লক্ষণই ত কোনও দিন দেখিনি আমি।"

প্রকাশ বলিল, "এখন আর কি দেখবে? এ বয়সে কি আর ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচবে? এখন যে—তপস্বিনী!"

বিনোদ ক্ষীণভাবে বলিল, "তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ। আমার ত তা মনে হয় না।"

প্রকাশ বলিল, "না হে, আমি খুব জানি। শুনেছি ওঁর স্ত্রী মারা গেছে অনেকদিন হল। সে যাক—তুমি ও প্রাইভেট ট্যুসিনি জোটালে কি রকম করে বল দেখি?"

বিনোদ তখন তাহার ট্যুসিনি জুটিবার ইতিহাসটুকু বলিল। গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে, তাহা গোপন রাখিল।

শুনিয়া প্রকাশ হাসিতে লাগিল। বলিল, "উঃ বুড়ো কি কম চালাক! কেমন কৌশলটি করেছে দেখ। যুবতী মেয়েটা, তাকে পড়াবার জন্যে চব্বিশ বছরের একজন অবিবাহিত যুবক ছাড়া আর অন্য মাষ্টার খুঁজেই পেল না। শাস্ত্রের কথা ঘি আর আগুন-বেশ জানে; কিছুদিনেই দুজনে দুজনার প্রেমে হাবুডুবু খাবে; তখন তুমি বলবে ওকেই আমি বিয়ে করব—জাতফাৎ আমি ডোণ্ট কেয়ার করি। আচ্ছা, তোমায় গাঁথবার জন্যে মেয়েটাও বোধ হয় খুব উঠে পড়ে লেগেছে?"

তখন অলকার সরলতামণ্ডিত শান্ত সংযত মুখখানি বিনোদের মনে পড়িল। একটু উষ্মার সহিতই সে বলিল, "ছিঃ—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সে তা করেনি।"

প্রকাশ বলিল, "করেনি, করবে। এই ত সবে মাসখানেক যাতায়াত করছ বইত নয়! আগে লোহা বেশ করে লাল হোক, তখন ত' পিটবে। সাধু সাবধান! আচ্ছা, রাত প্রায় পুইয়ে এল, এখন তুমি একটু শোও ভাই। আমি কিঞ্চিৎ নিদ্রার চেষ্টা দেখি।"—বলিয়া প্রকাশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

॥ ৫ ॥

বাকী রাতটুকু বিনোদ ছটফট করিয়াই কাটাইল—নিদ্রাদেবীর কৃপালাভের জন্য সে একটুও ব্যস্ত ছিল না। আর একটু হইলেই ত না জানিয়া সে একজন ভ্রষ্টা রমণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিল। ছি ছি, তাহা হইলে কি কেলেঙ্কারীটাই হইত বল দেখি! কেদারবাবুর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

তিনি যে বাড়ী লইয়া গিয়া জলখাবার খাওয়াইয়া তাহাকে টাকা দিয়াছিলেন, সেটা তবে দয়া-ধর্ম্মের অনুবোধে নহে, তাহা স্বার্থপরতা-প্রসূত একটা গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র! দেশ হইতে এখন খুড়িমা তাহাকে দুই মাসের টাকা পাঠাইয়াছেন। বিনোদ ভাবিল, কেদারবাবুর পঞ্চাশ টাকাই সে মণিঅর্ডার যোগে তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে এবং কুপনে লিখিয়া দিবে, সমস্তই সে জানিতে পারিয়াছে—ধর্ম্মভ্রষ্টার কন্যাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না—ডেপুটিগিরির লোভেও নয়।

কিন্তু অলকার মুখখানি মনে পড়িবামাত্র, তাহার বুকের মধ্যে দারুণ বেদনা বাজিয়া উঠিল। অলকার মা বাপের অপরাধ যতই গুরু হউক, অলকার কি দোষ? হয়ত সে জানেও না যে তাহার মা বাপও তেমনি, ইহাই সম্ভবতঃ বালিকার বিশ্বাস। তবে, তাহার কি অপরাধ? অলকার মা যাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়—তাহা সত্যই ত! সে বিষয়ে বিনোদের মনে ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—তবে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান—এই অপমানে তাহার বুকটি কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? একজনের অপরাধে আর একজন সম্পূর্ণ নিরীহ প্রাণীকে শাস্তি দেওয়া কি ঘোর অধর্ম্ম নহে? আর শুধুই কি তাহাকে শাস্তি দেওয়া? নিজেকেও ত সেই শাস্তি চিরজীবন ভোগ করিতে হইবে। এই আত্মনির্য্যাতনই বা কিসের জন্য?

কিন্তু এ ভাব তাহার মনে বেশীক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিল না। কেদারবাবুর উপর আবার তার বিষম রাগ হইতে লাগিল;—কেন তিনি এরূপ ভাবে তাহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিলেন? তাঁহাকে মহদন্তঃকরণ লোক বলিয়াই ত ধারণা ছিল—কিন্তু তিনি এত নীচ—ছি ছি ছি!

বিনোদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"এইবার বুঝতে পেরেছি, হিন্দুঘরের অতবড় মেয়ের এতদিন বিবাহ হয়নি কেন।—এইবার বুঝতে পেরেছি, দেশে কেন বাবুর থাকা হয় না—ছেলেরাই বা অন্য জায়গায় থাকে কেন, বুড়ো মিন্সে—ছি ছি। আবার "ভক্তি যোগ" পড়া হয়!"

এই মত নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোর হইয়া আসিল; কাক ডাকিতে লাগিল। ভোরের শীতল বায়ু জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া বিনোদকে তন্দ্রাতুর করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা হরণ করিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বাহিরে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে, প্রকাশ বিছানার পাশে বসিয়া তাহাকে জাগাইতেছে—"ওহে ওঠ ওঠ—বেলা হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে ফেল, চা তৈরী।"

॥ ৬ ॥

বন্ধুগৃহে চা পানান্তে বিনোদ তাহার মেসের বাসায় প্রবেশ করিবামাত্র ভৃত্যের নিকট শুনিল, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে তাহার ঘরে বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। চেহারা ও পোষাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যাহা উত্তর পাইল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিল, কেদারবাবু আসিয়াছেন। মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া ভাবিল, "জোচ্চর বেটা! এসেছেন বোধ হয় সাততাড়াতাড়ি একটা দিনস্থির করে ফেলবার মৎলবে—শেষে আসল কথা প্রকাশ পেয়ে সব ফেঁসে না যায়! আচ্ছা করে, দু'কথা শুনিয়ে দিচ্ছি গিয়ে, দাঁড়াও।"

হঠাৎ তাহার মনে এইরূপ বীররসের আবির্ভাব হওয়াতে, সিঁড়িগুলাকে সজোরে লাথি মারিতে মারিতে সে উপরে উঠিয়া গেল। দ্বিতলে নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া কেদারবাবুর মূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাহার বীরত্ব কিন্তু অনেকখানি উবিয়া গেল। কেদারবাবুর চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল যেন কি একটা বেদনার স্পষ্ট ছায়া—দেখিয়া বিনোদ কতকটা থতমত খাইয়া গেল। সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনি! আপনার শরীর কি ভাল নেই?"

কেদারবাবু বলিলেন, "না বাবা, শরীর আমার ভালই আছে। বস। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

বিনোদ সংক্ষেপে বাসা হইতে গতরাত্রে তাহার অনুপস্থিতির কারণ বলিল।

কেদারবাবু বলিলেন, "আমি কাল বিকেলে অলকাকে এম্পায়ারে ম্যাক্‌বেথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে ত তুমি শুনেই এসেছ। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে আমার স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুনলাম।"

বিনোদ মনে মনে বলিল, "স্ত্রী! স্ত্রী বইকি! ভণ্ডামী দেখে আর বাঁচিনে!"

কেদারবাবু বলিলেন, "সকল কথা শুনলাম। শুনে আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী একটু অন্যায় করেছেন। তিনি একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমার কাছে গোপন করেছেন। তাই দুশ্চিন্তায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি। সেই বিষযটি তোমায় জানাবাব জন্যেই—"

বিনোদের মনে হইল, তবে ত প্রকাশ যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। এই বৃদ্ধ লম্পট নিজ মুখে সে কথা স্বীকার করিতেও লজ্জা অনুভব করিতেছে না!

সে ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, বৃথা আপনি কষ্ট করেছেন। আপনার বাড়ী থেকে চলে

আসবার পর ঘটনাক্রমে সে সকল কেচ্ছাই আমি জানিতে পেরেছি। আপনার সেই মেয়েমানুষটিকে বলবেন—"

বৃদ্ধ হঠাৎ তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ঘূর্ণিত লোচনে বলিলেন, "খবর্দ্দার!"—বলিয়া তিনি রাগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

বিনোদ গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল, "কেন? মারবেন নাকি? মশাই, আপনাকে আমি স্পষ্ট কথা বলি। আপনি আমায় ডেপুটি করে দিন আর লাটসাহেব করে দিন, আপনার ঐ মেয়েকে বিবাহ করে' আমি সমাজচ্যুত হতে প্রস্তুত নই।"

কেদারবাবু এবার অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে বলিলেন, "উত্তম কথা! কিন্তু এই কথাই তুমি ভদ্রভাবে বলতে পারতে। তুমিও জেনো, তোমার মত এমন অসভ্য দুর্ব্বিনীত চাষাকে মেয়ে দিতেও আমি প্রস্তুত নই।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

॥ ৭ ॥

কেদারবাবু চলিয়া গেলে, বিনোদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া রহিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, দশটা বাজে, কলের জল চলিয়া যাইবে, এই বেলা স্নান করিয়া লইলে হইত। বিনোদের মাথাটা ঘুরিতেছিল, একটু শীতল জলের আকাঙ্খায়, সে স্নান করিতে নামিয়া গেল, কলের নীচে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে স্নান করিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না।

কাল প্রায় সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়াছে। শয্যায় গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, "অলকাকে হারাইলাম। কি করিব, উপায় কি? এ অবস্থায় কেমন করিয়া তাহাকে বিবাহ কবি? কিন্তু 'কুস্থানদপি কাঞ্চনম্, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' আহরণ করিয়া লইতে দোষ নাই, ইহাও প্রাচীন নীতিবচন। রাগের মাথায় বুড়াকে ওরূপভাবে অপমান কবিয়া অন্যায় কবিয়াছি, সেটা ভাল হয় নাই। নীতি ও ধর্ম্ম সকলের এক নয়। এমন হইতে পারে, ওরূপ কার্যকে তিনি কিছুমাত্র অন্যায় বা অধর্ম্ম মনে করেন না। শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিযা মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হয় নাই বলিয়াই যে সে মিলন সর্ব্বদোষেব সর্ব্বপাপেব আকব, এমন নাও হইতে পারে। সে আকরে, অলকার ন্যায় সুপবিত্র শুভ্র সুন্দব ফুলটির উদ্ভব হইযাছে ত! সে ফুল, বুকেব কাছাকাছি পাইযাও আমি হারাইলাম—আমার অদৃষ্টে ধিক্।"

তক্তপোষের এ-পাশ ও-পাশ কবিতে কবিতে এইরূপে চিন্তায় বিনোদ বেলা চাবিটা অবধি কাটাইল। তখন উঠিয়া ভাবিল, হেদুয়ার ধাবে এতক্ষণ কেদারবাবু বেড়াইতে আসিযাছেন; যাই, ওবেলার রূঢ় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসি।

জামা পরিতে গিযা, তক্তপোষের নিম্নে নজর পড়িল, একখানা ইংরাজি খবরের কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানি তুলিযা লইযা দেখিল, ২০ বৎসর পূর্ব্বে লাহোর হইতে প্রকাশিত Arya Patrika সংবাদপত্র। কেদাববাবুর হাতে আজ সকালে একখানা খববের বিনোদ দেখিযাছিল—তিনিই তবে এখানা ফেলিযা গিয়াছেন। কৌতুহলবশতঃ কাগজেব ভাঁজ খুলিতেই একটা সংবাদ তাহার চোখে পড়িল। সেটি আগাগোড়া বিনোদ পড়িল। পড়িযা জামা গায়ে গিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বড় রাস্তায় পড়িয়া, হেদুযার দিকে প্রায় ছুটিয়াই সে চলিতে লাগিল। সেখানে তাঁহাকে না পাইয়া, তাঁহাব বাড়ীর দিকে চলিল, কেদারবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া, উপরেব ঘবে গিয়া দেখিল, তিনি বসিয়া অলকাকে পড়াইতেছেন। বিনোদকে দেখিয়া অলকা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিযা গেল। কেদাববাবু সবিস্ময়ে বিরক্তিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদ সহসা কেদাববাবুর পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "আমায মাফ

করতে হবে। আজ সকালবেলা আপনার প্রতি যে আচরণ আমি করেছি, তা নিতান্ত একটা ভুল সংবাদ শুনেই করেছিলাম। এই খবরের কাগজখানি আমার ঘরে আপনি ফেলে এসেছিলেন—এইটে পড়েই আমার সেই বিষম ভুল বুঝতে পারলাম। আমাকে আপনার পুত্রস্থানীয় বলে গ্রহণ করুন আর না করুন, আমার অজ্ঞানকৃত সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।"

কেদারবাবু সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "কেন, কেন? তুমি কি শুনেছিলে বল দেখি? কার কাছেই বা শুনলে?"

বিনোদ লজ্জায় অধোবদনে রহিল। তখন, প্রাতে বিনোদ কর্তৃক উচ্চারিত একটি শব্দ কেদারবাবুর মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, "ওঃ বুঝতে পেরেছি। সব কথা শোন তাহলে। আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেদের মামার বাড়ী পাঠিয়ে আমি ছ'মাসের ফার্লো নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। লাহোরে এসে, অলকার মার সঙ্গে আমার আলাপ হয়—উনি পাঞ্জাবী কায়স্থের মেয়ে ছিলেন। বাঙ্গালী কায়স্থে পাঞ্জাবী কায়স্থে বিবাহ বাঙ্গলা দেশের ভট্টচার্য্য মহাশয়েরা অনুমোদন করবেন না জেনে, সেই দেশেই আর্যসমাজের আশ্রয়ে আমি ওঁকে বিবাহ করি। আর্যসমাজীরাও হিন্দু, কারণ তাঁরা বেদকে অভ্রান্ত বলেই স্বীকার করেন। ছুটি ফুরালে, আমি যখন অলকার মাকে নিয়ে কর্ম্মস্থানে ফিরে আসি, তখনও উনি বাঙ্গলা শেখেনি নি। ওঁকে অ-বাঙ্গালী দেখে, কুলোকে আমার নামে সে সময়ে মিথ্যা গুজব রটিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি কোন দিনও তা গ্রাহ্য করিনি। অলকার মা বাঙ্গালী কায়স্থ নন, আর আমাদের বিবাহ বাঙ্গালী ভট্টাচার্য পৌরহিত্য করেন নি, এই কথাটা আমার স্ত্রীর উচিত ছিল কালই তোমায় জানানো। সমস্ত জেনে শুনে যদি তুমি অলকাকে বিবাহ কর ত করবে, নচেৎ তোমায় ঠকিয়ে জামাই করা আমি উচিত মনে করিনে; সেই কথা জানাতেই আজ সকালে আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। তুমি একটু বস, অলকার মাকে সব কথা আমি বলে আসি; কারণ ও-বেলাকার ঘটনা শুনে বাড়ীসুদ্ধ সবাইকার মন খারাপ হয়ে রয়েছে।"

সকলের মনই ভাল হইয়া গেল। বিনোদ.ও অলকার মন সকলের চেয়ে বেশী ভাল হইল। অগ্রহায়ণ মাসে এই দুইজনের মন এত ভাল হইল যে, সোহাগে গলিয়া আদরে মিশিয়া দুইটি মন একটি হইয়া গেল।

কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্তকথা

"ছোটবউ—ও ছোটবউ! ছোটবউ কই? ডাক্ না তাকে। খাবে কখন, রাত কি হয়নি?"

জ্যৈষ্ঠ মাস, পল্লীগ্রামের রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কর্ত্তাদেব এবং বাড়ীর অন্যান্য পুরুষগণের আহার সমাপ্ত হইয়াছে। রান্নাঘরে বসিয়া বড় গিন্নী হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে ঐ কথাগুলি বলিলেন। বড় মেয়ে সাবিত্রী বলিল, "কোথায় পড়ে ঘুমুচ্ছে বোধ হয। যা ত সুরি, খুঁজে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আয়।" সুরবালা গজব্ গজর্ করিতে করিতে ছোটবউকে খুঁজিতে গেল।

একতলা, দোতলা, তিনতলার ঘরে ঘরে, বারান্দায় বাবান্দায়, নানা সম্ভব অসম্ভব স্থানে সুরবালা ছোটবউকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলে না। অবশেষে ছাদের সিঁড়িতে উঠিল—ছাদ অন্ধকার—দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সভয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল—"ছোটবউ, ও ছোটবউ!—কুমি, ও কুমি! কুমি লো!—পোড়ারমুখী হতভাগী বাঁদরী—কই, এখানেও ত দেখছিনে!"—বলিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ছোটবউয়ের অপ্রাপ্তিসংবাদ সকলকে জানাইল।

শুনিযা গৃহিণীরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মেঝগিন্নী—কুমি বা কুঙ্কুমকুমারী যাঁহার পুত্রবধূ—নিজে গিয়া বাড়ীময় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না। বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, কিন্তু সন্ধ্যার পর ছোটবউকে দেখিয়াছে এমন কথা কেহই বলিল না। তখন বড়গিন্নী বলিলেন,—" ও মা, এ কি সর্বনাশ হল! আমার যে বুক কাঁপছে!"

বধূদের কন্যাদের মুখ শুকাইযা গেল। গৃহিণীদেব মনে একটা ঘোর আশঙ্কার ছায়া পড়িল। একজন উঠানের চাবিদিকে ঘুবিয়া আসিয়া বলল, "সদব দবজা, দুই খিড়কী দবজা—সবই ত বন্ধ!"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "বাত দশটা বাজে, দবজা বন্ধ হবে না? সন্ধ্যাব সময ত সব দবজাই খোলা ছিল, তখন থেকেই ত সে বাড়ীতে নেই!"

কর্ত্তাবা আহারান্তে তখন নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ কবিযাছেন। বয়স্ক পুত্রগণ কেহ বা শযন কবিয়াছে, কেহ কেহ বা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বন্ধুবান্ধবসহ তখনও তাস পাশা চালাইতেছে। গৃহিণীরা স্থির করিলেন, কর্ত্তাদেব খবব দেওযা উচিত। বড়গিন্নী তখন হবিনামের মালা হস্তে, দ্বিতলে স্বীয় শযনকক্ষ অভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

।। ২ ।।

এই ছোটবউয়ের নাম কুঙ্কুমকুমারী—বয়স এখন ১৬ বৎসর। আজ তিন বৎসর সে শ্বশুরঘর করিতেছে। পিতার নাম হারাধন বসু, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তিনি একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। এইটি তাঁহাব একমাত্র কন্যা।

বাপ আদর করিয়া মেয়ের নাম বাখিযাছিলেন কুঙ্কুমকুমাবী। কিন্তু গোড়াতেই যাহার কু, (মাঝেও কু) সে কি কখনও সু হইতে পাবে? এই কাবণেই হউক, অথবা জন্ম-নক্ষত্রের ফলেই হউক, বাল্যকালেই কুঙ্কুম অত্যন্ত দুষ্ট ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিযাছিল। পাড়ার পুকুবে ছিপ হাতে করিয়া সে মাছ ধবিতে ভালবাসিত, ভাইদেব ঘুড়ি লাটাই লইযা ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, প্রতিবেশীদেব বাগানে বেড়া ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া স্বচ্ছন্দে গাছে উঠিয়া ফল চুরি করিয়া খাইত। এই সকল কারণে পিতামাতার নিকট কুঙ্কুমকে সময়ে সময়ে প্রহারও খাইতে হইত কম নয়—এমন কি তার নামে পাড়ায় এই ছড়াই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল—

কুম্‌কুম্—তোর পিঠে দুম্ দুম্।

একদিন এক সমবয়সী বালক, কুঙ্কুমের সহিত বিবাদ করিয়া উপরি-উক্ত ছড়াটি বলিতে বলিতে এবং হস্তদ্বারা দুম্‌দুমের ইঙ্গিত করিতে করিতে তাহাকে ক্ষেপাইতে থাকে—কুঙ্কুম ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া, খুব খানিকটা ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা মারিয়াছিল যে ছেলেটা টাল খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহার নাক হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে থাকে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া গ্রামের প্রবীণারা কুঙ্কুম সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন, তাহা সুরুচিসঙ্গত নহে এবং সেগুলি কুঙ্কুমের পিতা মাতার কর্ণে যে মধুবর্ষণ করিত না ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পিতামাতার স্নেহ আদরে প্রতিপালিত হইয়া কুঙ্কুম ওরফে কুমি ক্রমে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণ আরম্ভ হইল। মেয়েটি দেখিতে শ্যামবর্ণ, তবে মুখশ্রী ভাল। চুল বেশ ঘন ও বড়। একমাত্র মেয়ে, বেশী দূরে বিবাহ দিতে পিতামাতার মন সরিল না। বৎসরখানেক খোঁজাখুঁজির পর একটি সুপাত্র মিলিল, পার্শ্ববর্তী গ্রামের যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র নির্ম্মলকুমার। ছেলেটি গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন কলিকাতায় কলেজে এফ-এ পড়িতেছে। দেখিতে শুনিতেও ভাল। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। কুমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে চড়িয়া শ্বশুরবাড়ী গেল।

কুঙ্কুমের শ্বশুরবাড়ী বৃহৎ বাড়ী। বাড়ীর পশ্চাতে প্রাচীর ঘেরা বৃহৎ বাগান। তাহার মধ্যে পুষ্করিণী ও বহুজাতীয় ফলবান বৃক্ষ। শ্বশুরেরা তিন ভাই—হরিনাথ, যদুনাথ ও কুমুদনাথ—তিন ভাই একত্রে আছেন। তিন গৃহিণী, তাঁহাদের প্রত্যেকের পুত্র, কন্যা, বধূ, নাতি, নাতিনী ত আছেই, তাহা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরও অভাব নাই। চাষবাসও বিস্তৃত পরিমাণে আছে—চাকর, কৃষাণ প্রভৃতির সংখ্যাও অল্প নহে। চাষের বলদ ও দোহাল গাই রাখিবার সুবিস্তীর্ণ পাকা গোহাল বাড়ীটি নির্ম্মাণে যাহা ব্যয় হইয়াছিল, তাহাতে অনায়াসে একটি ছোটখাট গৃহস্থ পবিবারের আবাস বাটী নির্ম্মিত হইতে পারে।

শ্বশুরবাড়ীতে এই জনবহুলতা দেখিয়ে কুঙ্কুমের প্রাণ যেন হাফাইয়া উঠিল। বউ সাজিয়া ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা হইয়াছিল। তাই সে তৃতীয় দিন বিকালে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক সুযোগমত শ্বশুরালয় হইতে চম্পট দিল। পথঘাট তাহার অপরিচিত নহে—প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পিতৃভবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, ধূলিধূসবিত বসনে মেয়েকে এই ভাবে গৃহে আসিতে দেখিয়া তাহার পিতামাতা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, অথবা বাগই করিবেন, কিছুই স্থির কবিতে পারিলেন না। বেহাইবাড়ীর দুশ্চিন্তা দূবীকবণার্থ তৎক্ষণাৎ লোক ছুটাইয়া দিলেন। অপর একজন গোরুর গাড়ী আনিতে গেল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া কন্যা সঙ্গে লইয়া পুনরায় তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। কুঙ্কুমের পিতা তাহার শ্বশুরগণের নিকট এবং মাতা অন্তঃপুরে গৃহিণীদের কাছে অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করিয়া তাঁহাদের রাগরোষ মিটাইযা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সেই কুঙ্কুম এখন ষোল বছরের হইয়াছে। সেই এখন এ বাড়ীর ছোটবউ পদবী লাভ করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার দুষ্টামি অনেকটা কমিয়াছে বটে—কিন্তু এখনও সে আদর্শ হিন্দু কুলবধূ হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই পাড়াতেই তাহার দুই তিনটি সখী আছে, তাহারা এ গ্রামেরই মেয়ে। তাহাদের সঙ্গে কুমির বড় ভাব—তাহারা সর্ব্বদাই এ বাড়ীতে আসে। কুঙ্কুমও মাঝে মাঝে শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়। এ জন্য তাহাকে যথেষ্ট বকুনি খাইতে হয়, কিন্তু কিছুতেই তাহার এ কু-অভ্যাস দূর হইল না।

বৈশাখের শেষে গ্রীষ্মের ছুটিতে কুঙ্কুমেব স্বামী নির্ম্মল বাড়ী আসিল। কয়েকদিন পরে,

এই পাড়াবেড়ানো লইয়া নির্ম্মল তাহাকে খুব বকিল। স্বামী স্ত্রীতে রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল। নির্ম্মলের এক বন্ধু তখন দার্জ্জিলিঙে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল। বাপ মার মত করিয়া রাগের ভরে নির্ম্মল দুই সপ্তাহের জন্য দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেল।

ইহার তিনটি দিন পরেই বাড়ীতে এই বিষম বিভ্রাট। ছোটবউ কোথায় গেল?

॥ ৩ ॥

দ্বিতলে উঠিয়া স্বামীসাক্ষাৎ জন্য বড়গিন্নী শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। পালঙ্কের নিম্নে জলচৌকির উপর গুড়গুড়িতে তামাক সাজা রহিয়াছে—কলিকা হইতে অল্প অল্প ধূম উদগত হইতেছে, কিন্তু পালঙ্কে কেহ নাই। গৃহিণী দেখিলেন, সেই ঘরের কোণে একটি আমের ঝুড়ির নিকট বড়কর্ত্তা বসিয়া আছেন, তন্মধ্যস্থ আমগুলি বাহির করিয়া আলোয় ধরিয়া একে একে পরীক্ষা করিতেছেন এবং সুপক্ক গুলি পৃথক করিয়া রাখিতেছেন। এই আম বড়কর্ত্তার বড় যত্নের—গোহাল বাড়ীর সংলগ্ন যে গাছটি আছে, এগুলি তাহারই ফল। বাগানের কোনও গাছের আম এগুলির তুল্য সুস্বাদু ও সুমিষ্ট নহে। এ আমগাছে কাহারও হাত দিবার পর্যন্ত হুকুম নাই। কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া উপযুক্ত ফলগুলি পাড়াইয়া, নিজ শয়নকক্ষে গুদামজাত করিয়া রাখেন এবং স্বহস্তে সাবধানে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়া দেন।

গিন্নী মুহূর্ত্তকাল কর্ত্তার কার্য দেখিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ওগো, এখন আম বাছা রাখ, বড় বিপদ।"

আম্র-নির্ব্বাচনে কর্ত্তা এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে স্ত্রীর কথা তাঁহার কর্ণগোচরই হইল না।

গৃহিণী এবার একটু নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ওগো শুনছ? এ দিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

কর্ত্তার তখন চমক ভাঙ্গিল। "কেন কি হয়েছে?" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী পুনরুক্তি করিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! ছোটবউকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

কর্ত্তা নিকটে সরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "বল কি? কখন থেকে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে ত বাড়ীতেই ছিল। বাড়ীময় খোঁজা হয়েছে, কোথাও সে নাই। সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সন্ধ্যার পর আর কেউ তাকে দেখেনি।"

কর্ত্তা গুম্ হইয়া নিজ কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে দুই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "গা ধুতে গিয়েছিল কি? একলা গা ধুতে গিয়ে যদি ডুবে-টুবে থাকে! কার সঙ্গে গা ধুতে গিয়েছিল খবর নিয়েছ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, তা ত নিইনি।"

কর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঃ—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি; যাও সেইটে আগে ভাল করে জানো।"

"আচ্ছা সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"—বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিতেছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আর শোন। যদুকে কুমুদকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাও।" বলিয়া হরিনাথবাবু বিছানায় বসিয়া উত্তেজিত চিত্তে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

এই তলার অপর প্রান্তে মেঝকর্ত্তা ও ছোটকর্ত্তার শয়নগৃহ। বড়গিন্নী মেঝকর্ত্তাকে খবর দিয়া ছোট দেবরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি বিছানায় পড়িয়া এক মনে একখানি বহি পড়িতেছেন। বাঙ্গলা উপন্যাসের ইনি একজন অক্লান্ত পাঠক—স্থানীয় লাইব্রেরীর সেক্রেটারি। "চমকপ্রদ" অথবা "লোমহর্ষক" কোন উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দেখিলেই ইনি তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরীর জন্য তাহা অর্ডার দিয়া থাকেন এবং ভি. পি. আসিলে প্রথমে স্বয়ং তাহার রসাস্বাদ গ্রহণ করিয়া তার পর লাইব্রেরী-ভুক্ত করেন। বড়গিন্নী ইঁহাকে

সংবাদটা দিয়া, নিম্নে আসিয়া সকল বধূ সকল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আজ কোনও দলের সঙ্গে ছোটবউ যে গা ধুইতে গিয়াছিল এমন সংবাদ পাওয়া গেল না।

।। ৪ ।।

তিন কর্ত্তা তখন একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বয়স্ক পুত্রেরাও আসিয়া যোগদান করিল। গৃহিণীরা, নবীনারা বাহিরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, গা ধুইতে গিয়া খুব সম্ভব সে খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া গিয়াছে; একা গিয়াছিল, তাহাতেই এ দুঃসংবাদ এতক্ষণ কেহ জানিতে পারে নাই অথবা হয়ত বাগানে তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে, সেইখানেই সে মরিয়া পড়িয়া আছে। বাগানটা একবার ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।

পুত্রগণের মধ্যে সাহসী ও বলিষ্ঠ দুইজন, তখনই বাঁশের লাঠি ও হারিকেন লণ্ঠন লইয়া বাগানে ছুটিল। বাগান, পুকুরঘাটের চারিপাশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কোথাও কোনও চিহ্ন নাই!

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, তাঁহার সন্দেহ হয়ত কোনও দুর্ব্বৃত্ত বদমায়েস পাঁচিল টপকাইয়া বাগানে আসিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটা কেহই সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন না। মেঝকর্ত্তা—কুঙ্কুম যাঁহার পুত্রবধূ—বলিলেন, "আমার বোধ হয়—ভুলি, কি খেঁদি, কি মনোরমা, পাড়ার কারু বাড়ীতে সন্ধ্যার আগে সে বেড়াতে গিয়েছিল, কোনও অভাবনীয় কারণে আসতে পারেনি। কিম্বা হয়ত পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে।"

অনেকেই বলিলেন, এতদিন পরে আবার পলাইয়া বাপের বাড়ী যাইবে ইহা সম্ভব কি? তবে ভুলি, খেঁদি বা মনোরমাদের বাড়ী গিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেখানে আটকাইয়া পড়ারই বা কি কারণ ঘটিতে পারে? যদি হঠাৎ অসুখ বিসুখ করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি এতক্ষণ খবর দিত না?

তিন কর্ত্তায় এবং বড়গিন্নীতে মিলিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল, কিন্তু এই রাত্রে "আমাদের ছোটবউ তোমাদের বাড়ীতে আছে কি?"—এ সন্ধান লইতে প্রতিবেশীদের গৃহে লোক পাঠানো কাহারও মত হইল না—কারণ, আর একটা অব্যক্ত আশঙ্কা সকলের মনে জাগিতেছিল, এখন এ সম্বন্ধে কোনও রূপ গোলযোগ করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। তবে কুঙ্কুমের পিত্রালয়ে গোপনে লোক পাঠাইতে আপত্তি নাই—এবং তাহা পাঠানো হইল। ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাসভক্ত ছোটকর্ত্তা বারম্বার বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই ছোটবউ কোনও গুণ্ডা বা ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে; পুলিশে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু তাহার মতে কেহই মত দিল না।

রাত্রি দুইটার সময় কুঙ্কুমের পিত্রালয় হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কুঙ্কুম সেখানে যায় নাই।

।। ৫ ।।

সে রাত্রে বাড়ীর অনেকেই আপন শয্যায় গেল না। যে যেখানে পাইল পড়িয়া রহিল। বিষম দুশ্চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগে রাত্রি শেষ হইল।

শেষরাত্রে বড়কর্ত্তা মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ছোট ভাই কুমুদ তাঁহাকে ডাকিতেছেন, "বড়দা—বড়দা উঠুন। ছোটবউয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

বড়কর্ত্তা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ? কোথা?"

ছোটকর্ত্তা মুখখানা পেচকের মত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমার কথা তখন কেউ শুনলেন না। কে তাকে হত্যা করে, গোয়ালবাড়ীর ছাদের উপর লাস তুলে রেখে চলে গেছে।"

"অ্যাঁ! লাস তুলে রেখে চলে গেছে? খুন করেছে? কি সর্ব্বনাশ—তুমি কি করে জানলে?"

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, "এইমাত্র আমি গাড়ুটি হাতে করে মুখ হাত ধোবার জন্য পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম। গোয়ালবাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি ছাদের আলসের উপরটায় একখানা শাড়ীর আঁচল ভোরের হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়ছে। পাড় দেখেই আমি চিনতে পারলাম, ও শাড়ী ত গত মাসে আমিই ওর জন্যে কিনে এনেছিলাম।

বড়কর্ত্তা কাপড় পরিতে পরিতে পালঙ্ক হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া বলিলেন, "শুধু শাড়ী দেখেছ? তবে লাসের কথা বললে যে!"

ছোটকর্ত্তা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত ভাব ধাবণ করিয়া কহিলেন, "শুধু কাপড়খানা ছাদের উপর উঠবে কি করে বড়দা? কাপড় যখন রয়েছে, তখন লাসও নিশ্চয়ই ছাদের উপর আছে—এই সবই ত ক্লু কিনা! লাসটা আলসের জন্যে দেখা যাচ্ছে না।"

"চল চল, ছাদে উঠে ত দেখা যাক।"

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, "না দাদা, অমন কাজটি করবেন না। এখন প্রথম কর্ত্তব্য পুলিশে খবর দেওয়া। লাস যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় পুলিশ এসে দেখুক। এই হচ্চে নিয়ম—তবে ঠিক সুরতহাল হবে, ডিটেক্‌টিব্‌ এসে ক্রমে খুনের কিনারা করবে। ছাদে এখন আমাদের কারু উঠা উচিত নয়।"

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "আরে না না—কি বল তুমি! চল চল, ছাদে উঠে আগে আমরা দেখি গিয়ে।" বলিয়া কর্ত্তা শুধু-পায়েই ছুটিলেন।

বাড়ীর অপর কেহ তখনও জাগে নাই—এমন কি ভৃত্যেবাও ঘুমাইতেছে। মেঝ ভাইকেও জাগাইয়া তিনজনে নামিলেন। উঠান পার হইযা গোহাল বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সকলে দেখিলেন ছাদেব আলিসার উপব একখানা শাড়ীর প্রান্তভাগ বাতাসে উড়িতেছে বটে।

কিছু দূবেই একখানা মই পড়িয়াছিল। মেঝকর্ত্তা সেখানা টানিয়া আনিয়া ছাদে লাগাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। তিনি উপরে উঠিলে, বড়কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখছ?"

মেঝকর্ত্তা বলিলেন, "ছোট বউমাই ত বোধ হচ্ছে।"

ছোটকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্তের চিহ্ন আছে?"

মেঝকর্ত্তা উত্তর কবিলেন, "কই, সে রকম ত কিছু দেখছিনে।"

"ও বুঝেছি, তা হলে অস্ত্রাঘাত করেনি। বিষ প্রয়োগ কিম্বা গলা টিপে মেরেছে।"—বলিয়া তিনিও মই বাহিয়া ছাদে উঠিয়া পড়িলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বড়কর্ত্তাও কষ্টেসৃষ্টে উঠিলেন।

তিনজনে দাঁড়াইয়া লাসের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ বড়কর্ত্তা বলিলেন, "ওহে, নিঃশ্বেস পড়ছে যে!" বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "ছোট বউমা। ও ছোট বউমা!" এই শব্দে, লাস পাশ ফিরিল, চক্ষু মেলিল এবং তিন শ্বশুরকে তথায় সমবেত দেখিয়া, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! শ্রীগুরু রক্ষা করেছেন। ওঃ—বলিযা দুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া সেইখানেই বসিযা পড়িলেন। বসিয়া ছাদের চারিদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন বহুসংখ্যক আমের আঁঠি ও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—কতক বা শুষ্ক ও পুরাতন, কতকগুলি বা সদ্যোভুক্ত। দেখিয়া তিনি এই "গুপ্ত রহস্যের" সূত্র পাইলেন।

মেঝকর্ত্তা ক্রোধের স্বরে বলিলেন, "বউমা, তুমি এখানে এলে কি করে?"

বউ নীরব—বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

বড়কর্ত্তা তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সে সব কৈফিয়ৎ পরে হবে এখন। আমি সমস্তই বুঝতে পেরেছি। এখন তোমরা সব নামো দেখি। আমি নেমে যাচ্ছি। তারপর বউমা, তুমি আস্তে আস্তে খুব সাবধানে নেমে এস। কিছু ভয় নেই তোমার মা! কেউ তোমায় বকবে না, কিচ্ছু বলবে না। বাড়ীর লোক এখনও কেউ ওঠেনি—এইবেলা নেমে এস, কেউ দেখতে পাবে না।"

মেঝকর্ত্তা নামিলেন, তৎপশ্চাৎ বড়কর্ত্তাও নামিয়া গেলেন। মই নামিতে বউমা পাছে পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় মেঝকর্ত্তা একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। বড়কর্ত্তা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "এস এস, কিচ্ছু ভয় নেই। ও সব ওদের অভ্যাস আছে।" ভাইদের লইয়া তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বড়দাদার আচরণ ও কথাবার্তা উভয় ভ্রাতার নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। তাঁহারা অবাক হইয়া, প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠের পানে চাহিয়া রহিলেন। বড়কর্ত্তা তখন বলিলেন, "কাল বিকেলবেলা, আমি যখন বাগানে যাচ্ছিলাম, দেখলাম মইখানা গোয়ালের পিছনে লাগানো রয়েছে। দেখে বললাম, মইখানা এখানে কে এনে রাখলে রে। কেষ্টাকে ডেকে সেখানা সরিয়ে ফেললাম। তখন কি জানি যে ছোটবউমা সেই মই দিয়ে ছাদে উঠে বসে আছেন!"

এত বড় একটা "রহস্য" এত সহজে মীমাংসা হইয়া যায় দেখিয়া ছোটকর্ত্তা ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলে, "মই দিয়ে ছোট বউমা গোয়ালের ছাদেই বা উঠতে যাবেন কেন?"

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "কেন? আমার পিণ্ডি চটকাতে আর কেন? আম খেতে উঠেছিল বোধ হয়। ছাদময় ত আমের খোলা আর আঁঠি ছড়ানো রয়েছে দেখলাম।"

এতক্ষণে বেশ ফর্সা হইল। গৃহিণীরা জাগিলেন, বাড়ীর সকলে জাগিল; সকলে ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছোটবউকে ঘিরিয়া বসিল। বড়কর্ত্তার আশ্বাস সত্ত্বেও, বকুনি যে তাহাকে একেবারেই খাইতে হইল না এমন নহে।

ক্রমে প্রকাশ পাইল, গত দিবস বিকালে মুখুয্যেদের মনোরমা এবং কুঙ্কুম দুজনে আম খাইবার জন্য গোহালের পশ্চাতে মই লাগাইয়া ছাদে উঠিয়াছিল। গোটাকতক আম খাইয়া মনোরমা নামিয়া যায়, কুঙ্কুম বলে, এই আঁমটা খেয়ে নামছি। নামিবার সময় সে আর মই পায় নাই। লজ্জায় কাহাকেও ডাকিতেও পারে নাই। গাছের অনেকগুলা ডাল, ঘনপল্লব ও প্রচুর ফলের ভারে অবনত হইয়া গোহালের ছাদ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। ডালপালা সরাইয়া ছাদের সে কোণটায় কেহ গিয়া বসিলে, নিম্নের লোক তাহাকে দেখিতে পায় না। যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ কুঙ্কুম সেই আম-ঝোপের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া ছিল। বেশ অন্ধকার হইলে, আবার ডালপালা সরাইয়া বাহির হইয়া খোলা ছাদে আসে। অনেক রাত্রি অবধি সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর, শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জেরায় ইহাও প্রকাশ পাইল যে শুধু কুঙ্কুম ও মনোরমা নহে, এ বাড়ীর অন্যান্য মেয়ে ও বধূরাও মাঝে মাঝে এইরূপভাবে ছাদে উঠিয়া গোপনে আম্রভক্ষণ করিয়া থাকে। তবে এদিন যে কুঙ্কুম ও মনোরমা আম খাইতে গিয়াছিল, একথা তাহারা জানিত না।

জ্যোতিষী মহাশয়

কলিকাতা দৰ্জ্জিপাড়ার কোনও ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর একটি কক্ষে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মুণ্ডিত-গুম্ফশ্মশ্রু প্রৌঢ়বয়স্ক কৃষ্ণকায় শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। গৃহিণী ও কন্যারা নিম্নতলে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত, ছেলেরা ফুটবলের ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। জ্যোতিষী মহাশয় একাকী বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, আর আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছেন।

আজ প্রায় কুড়ি বৎসরকাল এই কলিকাতা সহরে তিনি জ্যোতিষ "প্র্যাকটিস" করিতেছেন, কিন্তু এমন দুর্ব্বৎসর কখনও হয় নাই। খবরের কাগজে তাঁহার বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে—সে সকল বিজ্ঞাপনের বিলের তাগাদায় তিনি অস্থির,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটি কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডারও আসিতেছে না। গরদ পরিয়া, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, তিনি তাঁহার দ্বারলগ্ন সাইনবোর্ডের ঘোষণা অনুসারে প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া হত্যা দিতেছেন, কিন্তু একটি লোকও হাত গণাইতে আসিতেছে না। বাড়ীর ভাড়া, ভৃত্যের বেতন, বিজ্ঞাপনের বিলের অনেক টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে; প্রতিদিনকার বাজার-খরচ চলাই কঠিন, এখন কি উপায় করিলে কিছু টাকা আসে, এই চিন্তাতে তিনি মূহ্যমান ছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উত্থিত হইল—"জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন?"

শ্রবণমাত্র, হুঁকাটি দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সন্তর্পণে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়া, চিক ফাঁক করিয়া লোকটাকে দেখিলেন। বুঝিলেন বাড়ীওয়ালার লোক নহে, বিজ্ঞাপনের বিল আদায়কারী সরকারও নহে—মক্কেল হইলেও হইতে পারে। তখন নির্ভয়ে হাঁকিলেন—"কে ও?"

নিম্ন হইতে স্বর উত্থিত হইল, "জ্যোতিষী মহাশয় বাড়ী আছেন কি? তাঁর কাছে একটু দরকারে এসেছি।"

"আচ্ছা দাঁড়ান"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় চট করিয়া তাঁহার মিলের ধুতি ছাড়িয়া গরদ পরিলেন, চটিজুতা ছাড়িয়া খড়ম পায়ে দিলেন। আশান্বিত হৃদয়ে খট্ খট্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিযা তিনি প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন।

লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর; পরিধানে ধুতির উপর আধময়লা চাপকান, তাহার উপর পাকানো চাদর বিন্যস্ত—অফিসের বেশ। তিনি বলিলেন, "একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"আসুন"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন। অয়েলক্লথ মোড়া একটি টেবিলের তিনদিকে তিনখানি চেয়ার এবং একদিকে একখানি বেঞ্চি। জ্যোতিষী মহাশয় একখানি চেয়ারে বসিয়া অপর একখানিতে আগন্তুককে বসাইলেন।

।। ২ ।।

আগন্তুক আসন গ্রহণ করিয়া, যেন বড় ক্লান্তস্বরে বলিলেন, "জ্যোতিষী মশায়, শারীরিক কুশল ত?"

জ্যোতিষী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন। যাহারা গণাইতে আসে, তাহারা কেহ ত কই এরূপভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করে না। যাহা হউক, তিনি শিরশ্চালনা ও একটা অস্ফুট ধ্বনির দ্বারা নিজ কুশল জ্ঞাপন করিলেন।

লোকটি অৰ্দ্ধমিনিটকাল নীরব থাকিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "তারপর—কাজকর্ম্ম চলছে কেমন?"

এই প্রশ্নে জ্যোতিষী মহাশয়ের মনে একটু রাগ হইল। কেন রে বাপু? তোর সে খোঁজে দরকার কি? গণাইতে আসিয়া থাকিস, তাই বল, টাকা বাহির কর্। কিন্তু এই বিরক্তিভাব মনেই গোপন করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "চলছে মন্দ নয়। আপনার নামটি কি?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমার নাম?—নামটা, আচ্ছা—সেটা পরে জানাব না হয়। এখন যে কাজের জন্য এসেছি, সেইটে প্রথমে নিবেদন করি।" বলিয়া চুপ করিলেন।

নিজ নাম বলিতে লোকটির এই অনিচ্ছা দেখিয়া জ্যোতিষী যেন একটু সন্দেহযুক্ত হইলেন; মুখে বলিলেন, "সেই ভাল।"

বাবুটি তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি বললেন, আপনার কাজকর্ম্ম মন্দ চলছে না। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, যতটা ভাল চলা উচিত, তা চলছে না। কেমন কি না?"

লোকটা যে গণাইতে আসে নাই, ইহা জ্যোতিষী মহাশয় এবার নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া বড় রাগ হইল। তিনি আর ধৈর্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "আঃ ও সব ভূমিকা যেতে দিন না, মশায়! কি জন্যে আপনি এসেছেন, সেইটে খোলসা করে বলুন। সন্ধ্যে হয়ে এল, আমার পূজো আহ্নিকের সময় ব'য়ে যাচ্ছে।"

বাবুটি এই মৃদু ভর্ৎসনাটুকু মোটেই গায়ে মাখিলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, যে ব্যবসাই বলুন, আজকাল যে রকম দিন-সময় পড়েছে, বিনা বিজ্ঞাপনে—"

জ্যোতিষী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কি কোনও খবরের কাগজেব বিজ্ঞাপন ক্যানভাসার? তা হলে বৃথা আপনার সময় নষ্ট করবেন না। আমি দু'খানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। আর নূতন কোনও কাগজে—" বলিযা তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

লোকটি শান্তভাবে বলিলেন, "আহা চটছেন কেন? আমি বিজ্ঞাপন ক্যানভাসার নই। বসুন বসুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কি? ডিটেকটিভ?"

"আজ্ঞে না, তাও নই। আমার চৌদ্দপুরুষে কখনও পুলিশের ছায়া মাড়ায়নি। আমি বলছিলাম কি, আপনার নামে আমি খবরেব কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। আপনাব এক পয়সাও লাগবে না; খরচ আমাব।"

এতক্ষণে জ্যোতিষী মহাশযের সন্দেহ হইল [illegible]টা বোধ হ[illegible] পাগল। যাহা হউক, বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনেব কথা শুনিয়া তাঁহার এক[illegible] [illegible]তূহলও হইল, আবার তিনি বসিয়া, আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বাবুটি বলিলেন, "আপনি বোধ হয ভা[illegible] [illegible]কাথাকার কে [illegible] [illegible]ঠিক নেই, নিজেব খরচে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার উপকার [illegible] আসে কেন [illegible]পনটির দ্বারায পরোক্ষভাবে আপনার কিছু উপকাব হবে [illegible] কিন্তু আসলে [illegible] আমাবই একটা অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে। অত কথায় কাজ [illegible] [illegible]পনটি পড়েই [illegible] না।"—বলিযা ভদ্রলোক পকেট হইতে একখানা হস্তলিপি কাগজ ব[illegible] ক[illegible]। [illegible]ষী মহাশয়েব সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় টেবিলের দেরাজ [illegible] নিয়া তাঁহার চশমাটি বাহিব কবিয়া চোখে দিলেন। তাহার পর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করি[illegible]ন—

হিন্দু জ্যোতিষ! ফলিত জ্যোতিষ!

আমি বহুকালাবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রের সম্যক, আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া উভয় প্রণালীর সমন্বয়সাধনে যত্নবান আছি। আমার রিসার্চ্চের (গবেষণার) সুবিধার জন্য জাতি ও বয়স নির্ব্বিশেষে কয়েকজন পস্থিউমস্ চাইল্ড (ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যাঁহাদের পিতৃ-বিয়োগ ঘটিয়াছে) তাঁহাদেব শরীর স্থান ও হস্তরেখা পরীক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। আজন্ম পিতৃহীন যে সকল যুবকের চক্ষে এই বিজ্ঞাপনটি পড়িবে, আমার সানুনয় অনুরোধ, দেশীয় তত্ত্ববিদ্যার উন্নতিকল্পে তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্র দ্বারা নিজ নিজ জন্ম তারিখ-সমন্বিত পারিবারিক ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে আমায় লিখিয়া পাঠান; আমি অবসরক্রমে একে একে তাঁহাদের আলযে উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিব। ইতি—

শ্রীকমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব। ৮নং বেণী দত্তের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া জ্যোতিষী মহাশয় সন্দিগ্ধভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি? আপনার উদ্দেশ্যটা কি?"

বাবুটি বলিলেন, "উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলেন না? কোনও কারণে একটি লোকের আমি সন্ধান করছি; সে লোকটি আজন্ম পিতৃহীন। কিন্তু কোথায় যে সে আছে, তাও জানিনে, তার নাম কি, তাও জানিনে। তবে পারিবারিক ইতিহাসটুকু পেলেই আমি বুঝতে পারবো, ঠিক সেই লোক কি না।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কেন, তাকে খুঁজছেন কেন?"

"সে কথাটি এখন প্রকাশ করা ঠিক হবে না। যদি সে লোককে পাওয়া যায়, তা হ'লে আপনি তখন সব জানতেই পারবেন। এখন আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলেই, এই বিজ্ঞাপনটি আমি কয়েকখানি কাগজে ছাপতে দিই। আপনার এতে কিছুই লোকসান নেই, বরং দেশ-বিদেশে নামটা আরও জাহির হয়ে যাবে। বিশেষ, যাঁরা কোনও রকম রিসার্চ্চে প্রবৃত্ত, আজকাল লোকে তাঁদের খুব সম্মানের চক্ষে দেখে। এতে পরোক্ষভাবে, আপনার কাজকর্ম্মের সুবিধাই হবে। বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আচ্ছা, তা যেন হল। সে লোকটিকেই যখন আপনার দরকার তখন তার পারিবাবিক ইতিহাসটুকু দিয়ে নিজেব নামেই বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছেন না কেন?"

বাবুটি বলিলেন, কেন জানেন? সে লোক যদি এখন বেঁচে না থাকে, অন্য কেউ যদি জাল সেজে এসে তার নাম নিয়ে ঠকাতে চেষ্টা করে, এই জন্যে আর কি! বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমি আরও ৩/৪ লাইন যোগ করে দিতে চাই।

"কি যোগ করবেন বলুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় তখন কলম লইয়া, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে যোগ করিয়া দিলেন—

"নির্ভুল ও অকাট্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার পাবিশ্রমিক ১০ হইতে ৫০ মাত্র। প্রতিদিন প্রাতে সাতটা হইতে দশম ঘটিকা পর্যন্ত সমাগত নরনাবীগণেব হস্তরেখা বিচারে ফলাফল বর্ণনা করিয়া থাকি, পারিশ্রমিক ২ মাত্র।"

বাবুটি দেখিলেন, ইহা যোগ কবিতে হইলে ৩/৪ লাইনেব মূল্য বাড়িয়া যায়। তথাপি তিনি স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তা বেশ। এই বিজ্ঞাপনের উত্তবে চিঠিপত্র যা আসবে, তা সব রেখে দেবেন, আমি মাঝে মাঝে এসে সেগুলি দেখে যাব।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান. সেগুলো চাকব দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এখন। আবার কষ্ট করে বোজ রোজ আপনি আসবেন।"

বাবুটি বলিলেন, "না না, কষ্ট কিছুই নয়; চাকর দিয়ে পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখে যাব। আজ হল গিয়ে বুধবার ত? বিজ্ঞাপন বেরুতে, তার জবাব আসতে, অন্ততঃ ৩/৪ দিন লাগবে। রবিবারে এই সময় আবার আমি আসবো। আচ্ছা, এখন উঠি তবে—প্রণাম।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান কবিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন "কে লোকটা? নামধাম কিছুই বললে না। যাবাব সময় প্রণাম করে বলে গেল, তা হলে ব্রাহ্মণ নয়। কোনও মন্দ উদ্দেশ্য আছে কি না, তাই বা কে জানে!"

সন্ধ্যা হইল দেখিয়া, সদর বন্ধ কবিযা, জ্যোতিষী মহাশয় খট্ খট্ করিতে কবিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

॥ ৩ ॥

রবিবার দিন যথাসময়ে বাবুটি আসিয়া দর্শন দিলেন। এখনও পর্যন্ত কোন চিঠি আসে নাই জানিয়া, ক্ষুণ্নমনে তিনি প্রস্থান করিতেছিলেন জ্যোতিষী আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। কথার কৌশলে তাঁহার পরিচয়, এবং বিজ্ঞাপন দিয়া লোক খোঁজার উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বাবুটি জ্যোতিষী মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিয়া হাত দুটি যোড় কবিযা কহিলেন, "আমার পরিচয় দিলাম না বলে, সব কথা খুলে বললাম না বলে, আপনি আমাব অপবাধ নেবেন না। কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা আছে বলেই এ সব কথা এখন প্রকাশ করতে পারছিনে। যদি সে লোককে আমি খুঁজে পাই, তা হলে আমার যথাসাধ্য প্রণামী আপনাকে দিযে, আপনাকে খুসী করবার চেষ্টা করবো।"

"না, না, তার জন্যে আর কি, তাব জন্যে আর কি! ওটা একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম বই ত নয়। সে যাক।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। জিনিষপত্রে মহার্ঘতা, রাজপথে গুণ্ডার উপদ্রব, স্বদেশহিতৈষিগণের ভণ্ডামী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে দুইজনে আলোচনা চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জানালার বাহিরে, "পেনছুট" চুলে টেড়িকাটা, চক্ষু-বসা, খালি গা, এক যুবক দেখা দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ইসারায় তাহাকে কি জানাইতেই সে তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিল। আগন্তুক সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি যুবককে দেখিতে পান নাই বা তাহার প্রতি জ্যোতিষী মহাশয়ের ইঙ্গিতও লক্ষ্য করেন নাই।

অবশেষে সন্ধ্যা হয় দেখিয়া বাবুটি উঠিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, তা হলে, পরশু-পরশু বিকেলে আর একবার খবর নিয়ে যাব। এখন আসি তা হলে—প্রণাম।"

"জয়োস্তু" বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সদব দরজার বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বোক্ত টেড়িকাটা চক্ষু-বসা যুবক, রাস্তার অপর পারে পানের দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত চোখাচোখি হইতেই সে একটু হাসিল। বাবুটি অল্প দূর অগ্রসর হইলে, জ্যোতিষী মহাশয় একটা ইঙ্গিত করিলেন। সেই যুবক তৎক্ষণাৎ বাবুটির পিছু লইল। জ্যোতিষী মহাশয় দরজা বন্ধ করিয়া উপরে গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই যুবক ফিরিয়া আসিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের সদর দরজার কড়া নাড়িল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠন হস্তে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া যুবককে ভিতরে ডাকিলেন। সে ভিতরে আসিলে, দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে কেব্‌লা, কিছু সন্ধান পেলি?"

যুবকের নাম কেবলরাম। সে দন্তবিস্তার করিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, সব সন্ধানই নিয়ে এলাম। আপনার ছিচরণ আশীববাদে, এই কেবলরামের অসাধ্যি কি কিছু আছে?"

"কি সন্ধান পেলি বল্ দেখি!"

কেবলরাম মাথাটি এক ধাবে নত করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, টাকা দুটো?"

জ্যোতিষী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আগে টাকা নিয়ে তবে কথা বলবি? পাড়ার ছেলে তোর, আমাকে এত অবিশ্বাস?"

কেবল বলিল, "হেঁ হেঁ অবিশ্বাসের কথা কে বলছে? তবে আজ টাকা দুটোর বিশেষ প্রিয়জন, ঠাকুর মশায়। আগে রাত ন'টা অবধি খোলা থাকত, আজকাল আবার শালারা ৮টা বাজলেই দোকান বন্ধ ক'রে দেয়। তখন পানওয়ালার দোকান থেকে ডবল দাম দিয়ে জলমিশানো কিনতে হয়। সাতটা বেজে গিয়েছে কিনা, তাই বলছি।"

কেবলরামের এই স্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি শ্রবণ করিয়া, একটু হাসিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কেবলরামের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "এই ঘরটার মধ্যে আয়।—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকিলেন।

কেবলরাম টাকা দুইটি টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ কবিল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠনটি টেবিলের উপর রাখিয়া, চেয়াবে বসিয়া বলিলেন, "কি কি জেনে এলি বল্ দেখি। খুব আস্তে আস্তে কথা কোস্।"

কেবল তাঁহার অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "তাঁর নাম হরিহর মিত্তির। টম্নি বাড়ীতে চাকরী করে। ১০০ মাইনে পায়। শ্যামবাজাবে ৩২নং কালুঘোষ লেনে থাকে। নিজের বাড়ী নয়, ভাড়া বাড়ী। যা যা জানতে চেযেছিলেন, দেখুন সবই জেনে এসেছি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক খবর পেয়েছিস ত? ভুলটুল হয়নি?"

কেবল বলিল, "আজ্ঞে না, ভুল হবার যো কি? সেই পাড়ার ৩/৪ জন লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনে এসেছি।"—হঠাৎ কক্ষস্থিত ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় বলিল, "উঃ, সাড়ে সাতটা যে! এখন আসি তবে ঠাকুর মশায়—প্রেণাম।" বলিয়া দ্বাবের দিকে অগ্রসব হইয়া, আবার ফিরিয়া নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি। তাহাকে প্রেহার ট্রেহার দিতে হবে কি? তা যদি দরকার হয় ত বলবেন। কিন্তু সে ১০ টাকার কমে হবে না, আবও ২/১ জন সঙ্গে নিতে হবে কিনা!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "না, সে সব এখন কিছু দবকাব নেই।"

"আচ্ছা—যদি দবকার হয় ত পরে জানাবেন। আমরা আপনাব হুকুমের চাকর। চল্লুম তবে প্রেণাম।"—বলিয়া কেবলরাম দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

॥ ৪ ॥

পরদিন অপরাহ্নকালে জ্যোতিষী মহাশয়ের গৃহিণী, চৈতন্য লাইব্রেরীর একখানি উপন্যাস হস্তে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, কাল থেকে দেখছি সর্ব্বদাই তুমি অন্যমনস্ক হয়ে থাক, মনে মনে কি যেন ভাবছ। কি হযেছে গা?"

জ্যোতিষী মহাশয় প্রথমে তাঁহার চিন্তাব বিষয স্ত্রীকে বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া অবশেষে ব্যাপারটা জানাইতে হইল। শুনিয়া গৃহিণী কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন। শেষে উপন্যাসখানি কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া, তিনি স্বামীব নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"কি বল দেখি?"

"লোকটি ত এটর্ণি আপিসের বড়বাবু?"

"বড়বাবু কিনা, তা জানিনে, ১০০ টাকা মাইনে পায় তাই শুনেছি।"

"আচ্ছা ধর, যদি এই রকম হয়?"

জ্যোতিষী মহাশয় সোৎসুকে তাঁহার স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বহিলেন।

স্ত্রী কহিলেন, "মনে কর, একজন লোক, তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে, অর্থোপার্জ্জনের জন্যে কোনও একটা দূরদেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে কোনও অভাবনীয় উপায়ে তার বিপুল অর্থলাভ হল। সেই অর্থ নিয়ে সে বাড়ী ফিরেছে, পথে তার আসন্ন কাল উপস্থিত। সে হিসেব করে দেখলে, তার সন্তান তখনও জন্মায়নি। কোনও সাধু বা সচ্চরিত্র বন্ধুলোকের কাছে টাকাগুলি সে গচ্ছিত রেখে বললে, আমি ত মরছি, আমার যে সন্তান সে এখনও তার মাতৃগর্ভে আছে, সে যেন আমার এই টাকাগুলি পায়, তুমি তার ব্যবস্থা কোরো। এই রকম অনুরোধ করে টাকা গচ্ছিত রেখে, লোকটি মরে গেল। সেই সাধু বা বন্ধুলোক, কার্য্যগতিকে অনেকদিন বাঙ্গলা দেশে আসতে পারেন নি। এখন এসেছেন। এটর্ণিবাবুর সাহায্যে সেই ছেলেকে আবিষ্কার কবতে চেষ্টা করছেন। তাকে পেলে টাকাগুলি তাকে দিয়ে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে যাবেন।"

জ্যোতিষী মহাশয় অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "গিন্নী, কি বুদ্ধি তোমার। অন্ধকারে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু বোধ হচ্ছে, ঠিক জায়গাটিতে না হোক তার অনেকটা কাছাকাছি তুমি পৌঁছেছ। কিন্তু একটা কথা থেকে যাচ্ছে যে।"

"কি কথা?"

"তা হল সে বন্ধু বা সাধুলোক, ছেলের বাপের নাম কি, তার বাড়ী কোথায়, এ সবই ত জানতো। সেই গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিত। এটর্ণির শরণাপন্ন হবে কেন? হরিহর ত বললে, সে কোথায় আছে, তাও তারা জানে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "এত বছরের পরে, সেই বাবুটির নাম, তাঁব গ্রামটির নাম বন্ধুলোক যদি ভুলে গিয়ে থাকেন? সম্ভবতঃ সে বন্ধুটি নিজে বাঙ্গালী নন, সুতরাং বাঙ্গালীর নাম, বাঙ্গলা গ্রামের নাম মনে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন নয় কি?"

"তা বটে!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় অবনতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, গৃহিণী বলিলেন, "কিংবা"—বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিংবা কি?"

'কিংবা ধর, বাঙ্গলাদেশের কোনও রাজা বা জমিদার লোক, অবিবাহিত ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনও দূর জিলার পল্লীগ্রামে গিয়ে, স্বজাতীয়া একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে, তাকে বিবাহ করে, কিছুদিন সেইখানেই বাস করছিলেন। ক্রমে জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রীর সন্তনাসম্ভাবনা হয়েছে। তখন তিনি মনে ভাবলেন, দেশে ফিরে যাই, আত্মীয়স্বজনকে এ বিবাহের কথা জানাই, তারপর ফিরে এসে স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাব। কিন্তু পথে, কিংবা বাড়ী পৌঁছেই তাঁর মৃত্যু হল। এদিকে তাঁর স্ত্রীও জানে না যে, তার স্বামী কে, কোথাকার রাজা বা জমিদার। সুতরাং স্বামী ফিরে না আসতে, সেইখানে পড়ে পড়েই সে হা হুতাশ করতে থাকলো। এদিকে বহুকাল পরে সেই রাজা বা জমিদারের ভাই কিংবা ভাইপো, দাদা কিংবা খুড়োর বাক্স থেকে পুরানো কাগজপত্র বের করে পড়তে পড়তে, আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছে, তখন সে শিউরে উঠেছে—অ্যাঁ!—কার বিষয় এতদিন আমি ভোগ করছি! সেই গর্ভে দাদার যদি ছেলে হয়ে থাকে, তা হলে সেই ত এই সম্পত্তির মালিক। অথচ সে কাগজপত্র থেকে দাদার শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা সে আবিষ্কার করতে পারেনি; তাই কলকাতায় এসে এটর্ণির শবণাপন্ন হয়েছে, আর এটর্ণি ঐ বিজ্ঞাপনের কৌশল খাটিয়ে তার হেডবাবুকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল।"

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় প্রশংসামান নেত্রে, স্ত্রীব মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ প্রথমে তুমি যেটা বলেছিলে, তার চেয়ে এইটি [illegible] সম্ভব বলে আমার মনে, হচ্ছে। কি বুদ্ধি তোমার! এ যেন একেবারে [illegible] উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এত উপন্যাস ত তুমি পড়লে, একখানা লেখ না কেন?'

গৃহিণী মনে মনে খুসী হইয়া মুখে বলিলেন, "যাও যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। আচ্ছা, তুমিও একটা কিছু ভাবছিলে ত? তুমি কি ভাবছিলে শুনি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমি এটর্ণির কথা শুনে পর্যন্ত একটা উইল-টুইলের ব্যাপারের মধ্যে কিছু আছে, তাই ভাবছিলাম।"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা উইল-টুইল ঘটিতই হোক আর যাই হোক, একটা সম্পত্তির ব্যাপার এর ভিতরে আছেই আছে। নইলে দেখছ না, পাছে সে লোক মরে গিয়ে থাকে, আর কেউ জাল সেজে এসে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে এত সাবধান হওয়া দরকার কি? নিশ্চয়ই দশ বিশ লাখ টাকা এর ভিতর আছে।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া গৃহিণী গৃহকার্যের জন্য এবং জ্যোতিষী মহাশয় সন্ধ্যাবন্দনার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

॥ ৫ ॥

মঙ্গলবার হরিহরবাবু আসিয়া দেখিলেন, একখানি মাত্র পত্র আসিয়াছে। তিনি সেখানি পাঠ করিয়া, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল? এ নয়?"

"না।"

"বিজ্ঞাপনটি চালাচ্ছেন ত? কোন্ দেশে সে আছে, তা ত ঠিক নেই। কিছুদিন ধরে বিজ্ঞাপন চললে, ক্রমে তার চোখে পড়বেই পড়বে। বিজ্ঞাপনটি আরও কিছুদিন চলুক।"

"হ্যাঁ, তা ত চালাতেই হবে। পরশু আবার আসবো।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় যে বিজ্ঞাপনটি চালাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহার কারণ, আজন্ম পিতৃহীনের পত্র যত আসুক আর নাই আসুক, এই বিজ্ঞাপনগুলির ফলে কোষ্ঠী প্রস্তুতেব অর্ডার কিছু কিছু আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রমে সেগুলি প্রস্তুত করিয়া একে একে ভি-পি করিতেছেন।

বৃহস্পতিবার ডাকে আর একজন আজন্ম পিতৃহীনের পত্র আসিল। পূর্ব্ব পত্রখানি হরিহরবাবু ছিঁড়িয়া ফেলাতে, জ্যোতিষী মহাশয় এই পত্র গোপনে নকল করিয়া লইয়া মূলপত্র হরিহরবাবুর জন্য রাখিয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া, সে পত্রখানি পাঠ করিয়া হরিহববাবু অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে ঠিক লোকটি পেয়েছি এবার। এতদিনে আমার চেষ্টা সফল হ'ল।"—বলিয়া ভদ্রলোক জ্যোতিষী মহাশয়ের টেবিলেব উপর পাঁচ টাকার একখানি নোট প্রণামী স্বরূপ অর্পণ করিয়া হাসিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় দেরাজেব গুপ্তস্থান হইতে নকলটি বাহির কাবিয়া একবার তাহা পাঠ করিলেন, তার পর, সেখানি হাতে লইয়া উপরে গিয়া ডাকিলেন, "ওগো, একটা কথা শুনে যাও।"

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইতেই চুপি চুপি বলিলেন, "হরিহর যাকে খুঁজছিল, তার চিঠি এতদিনে এসেছে। এই দেখ।"—বলিয়া নকলখানি তাঁহার হস্তে দিলেন।

পত্রখানি এই ঃ—

বেঙ্গলী মেস—মোরাদপুর। বাঁকীপুর।

মহাশয়,

বিশ্বদূত সংবাদপত্রে আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলাম। তদুত্তরে লিখিতেছি আমি আজন্ম পিতৃহীন। আমার পিতা ৺বরদাচরণ ঘোষ মহাশয় সিমলা-শৈলে বড় লাটসাহেবের দপ্তরে চাকরি করিতেন, আমার মাতাঠাকুরাণী নদীয়া জিলায় মুকুন্দপুর গ্রামে

আমার মাতুলালয়ে ছিলেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে সিমলা-শৈলে জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে আমার পিতৃদেবের দেহান্ত হয়। আমার জন্ম তারিখ জানি না, সন ১৩০০ সাল বৈশাখ মাস, এইটুকুমাত্র জানি। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি মাতৃহীন হইল। পরে আমার মাতুল মহাশয় ও মাতুলানী ঠাকুরাণীও স্বর্গারোহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে আমি প্রাতঃস্মরণীয়া মহাবাণী স্বর্ণময়ীর আশ্রয়লাভ করিযা বহরমপুর কলেজে পড়িয়া তথা হইতে বি-এ পাস করিযা, এখন বাঁকীপুরে ৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়িতেছি। আমাব আত্ম-বিবরণ সংক্ষেপে আপনাকে জানাইলাম, ইতি—

বিনীত—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

পত্রখানি গৃহিণী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া, স্বামীকে বলিলেন, "উঃ দেখ একবাব কাণ্ড! ৫০ টাকা মাইনের মাষ্টারি করছে,—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একটা মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে। একেই বলে অদৃষ্ট!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কিন্তু আমরা যে দুটো অনুমান করেছিলাম কই, তার কোনওটার সঙ্গে ত মিলছে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা, কি করে জানলে মিলছে না? অবিশ্যি ঠিক ব্যাপারটা কি হযেছে তা আমরা জানিনে। ধর, ঐ সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে তার বাপ যদি মস্ত একখানা হীরেই কুড়িয়ে পেয়ে থাকে, যার দাম বিশ লাখ, সে হীরে হয় ত কারু কাছে গচ্ছিত আছে, সে এখন উত্তরাধিকারীকে খুঁজছে। কিংবা মরবার আগে ওর বাপ হয় ত কোনও রাজা মহারাজার বিশেষ কোন উপকার করেছিল, সেই রাজা, সেই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ কোনও জায়গীর-টায়গীর দেবার জন্যে ছেলেকে এখন খুঁজছে। ঠিক কি, তা তো আমরা জানিনে।"

জ্যোতিষী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ তাব আছে বলে আমারও বিশ্বাস হচ্ছে, তা হলে এখন কি করা যায় বল দেখি?"

"যা পরামর্শ ছিল, তাই কর। আজই রওনা হয়ে তুমি বাঁকীপুরে যাও। তার সঙ্গে দেখা করে, যে রকম বলেছিলে সেই রকম একখানা দলিল তার কাছে লিখিযে কালই রেজিষ্টারি করে নাও। তার পর যা আছে অদৃষ্টে। কি রকম দলিল লেখাবে আর একবার বল দেখি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "লেখাব—আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপন-মূলে এবং আপনার উপদেশে চালিত হইয়া, আমি যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি লাভ করিতে পারিব, তাহাব অর্দ্ধাংশ আপনার পারিশ্রমিক ও পরামর্শের মূল্য স্বরূপ, বিনা ওজরে আপনাকে দিতে আমি বাধ্য রহিলাম।—উকীল সব ঠিক করে লিখে দেবে এখন।"

স্বামীস্ত্রীতে আরও কিছুক্ষণ গোপন পরামর্শ চলিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পঞ্জাব মেলে, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় বাঁকীপুব যাত্রা করিলেন।

।। ৬ ।।

পবদিন প্রাতে, একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে কবিয়া জ্যোতিষী মহাশয় পদব্রজে বাঁকীপুব সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোবাদপুবে গিয়া "বেঙ্গলী মেস" অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রথমে পথচাবী কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। অবশেষে একজন বাঙ্গালীবাবু বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি, কাউ-লজ,—আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।" নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন, মেস বাড়ীটির সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় বিস্তর গরু বাঁধা রহিয়াছে। পদপ্রদর্শক বাবুটি বলিলেন, "ঐটিই বেঙ্গলী মেস, তবে ঐ গরুগুলো সামনে থাকার জন্যে লোকে এটাকে কাউ-লজ বলে। যান ঐ দরজা দেখা যাচ্ছে।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় সাবধান গরুর ভিড় ঠেলিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, নিম্নতলের বারান্দায় ২/৩ জন বাবু চলাফেরা কবিতেছেন। তখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, সুধীরবাবু এখানে আছেন কি?" বাবুরা বলিলেন, "ছাদে ঐ তেতলার ঘরে আছেন। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।"

জ্যোতিষী মহাশয় তেতলায় উঠিয়া দেখিলেন, তথায় একখানি মাত্র ঘর, বাকী সমস্ত ছাদ। সুধীর তখন নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ-হাত ধুইতে যাইবার আয়োজন স্বরূপ নিজ তক্তপোষে বসিয়া সিগারেট সেবন করিতেছিল। "বাবাজী, তুমিই সুধীরকুমার?"—বলিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতবেশী প্রবীণ ভদ্রলোকটিকে প্রবেশ কবিতে দেখিয়া, সুধীর সিগারেটটি লুকাইয়া ফেলিয়া, তক্তপোষ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

প্রশ্নের উত্তর দিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাবাজী তুমি মুখহাত ধুয়ে এস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। এ ঘরে কি তুমি একাই থাক?"—বলিয়া কক্ষটির অপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর একখানি তক্তপোষে কম্বলে ঢাকা বিছানা গুটানো রহিয়াছে।

সুধীর বলিল, "আপাততঃ একা বটে। আর একজন থাকেন, তিনি সম্প্রতি বাড়ী গেছেন।"

"তোমার ইস্কুল কখন?"

"সাড়ে দশটা থেকে।"

"ল-কলেজ?"

"বেলা ৪টে থেকে ৫টা।"—বলিযা সুধীর সবিস্ময়ে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল. লোকটিই বা কে, আমার সকল খবর জানিলই বা কোথা হইতে? বিবাহের ঘটক নাকি? জিজ্ঞাসা করিল, "মশাইযের নামটি কি?"

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, পবে সে সমস্তই জানতে পারবে।"

"আচ্ছা, আপনি বসুন তা হলে"—বলিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিষী মহাশয় তখন সেই তক্তপোষেব উপর জাঁকিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধীব ফিবিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মুখ-হাত ধোবেন?"

"না, আমি সব ইষ্টিশান থেকেই সেরে এসেছি।"

"আপনার স্নানাহার—"

"সেটা, এইখানেই কবতে পারলে ভাল হয়। সে সব হবে এখন, বস দেখি, সব কথা তোমায় বলি।"

সুধীর উপবেশন করিলে, জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া, একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া বলিলেন, "আমিই কাগজে কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম; আর, তুমি তাই প'ড়ে, আমায় যে পত্রখানি লিখেছিলে, এই তার নকল।"—বলিয়া নকলখানিও সুধীরের হস্তে দিলেন।

দেখিয়া সুধীর বলিল, "ওঃ বুঝেছি। আপনি হস্তরেখাটেখা দেখতে এসেছেন।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "হ্যাঁ. তোমার হাত দেখি, দাও।"

সুধীর হাত বাড়াইয়া দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুতে দিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ মনোযোগের ভান করিয়া সুধীবের করাঙ্ক পরীক্ষা করিলেন; শেষে বলিলেন, "যা গণনা করেছিলাম, ভুল হয়নি, ঠিকই সমস্ত মিলে যাচ্ছে।"

সুধীর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মিলে যাচ্ছে? প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "না হে না, সে সব কিছু নয়; ও প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য

রিসাচ-ফিসাচ নয়, বিজ্ঞাপনের ও সমস্তই বাজে কথা। আসল কথা তোমায় বলি, শোন। আমি গণনায় জানতে পেরেছিলাম যে, সম্প্রতি কোনও আজন্ম পিতৃহীন যুবকের একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ আছে। কিছু ধনরত্ন সে পাবে। সে যুবকটি যে কে, তাই আবিষ্কার করবার জন্যে আমি ঐ বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছিলাম, তোমার জন্ম সন ও মাস তোমায় চিঠিতে পেয়ে বুঝলাম যে, সে ভাগ্যবান যুবা তুমিই। তোমার কর-রেখাতেও সেই কথা মিলে যাচ্ছে।"

যুবক বলিল, "তা, কবে আমার সে প্রাপ্তিযোগ ঘটবে? কি পাব?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক কবে তা বলতে পারিনে বাবাজী তবে অধিক বিলম্ব নেই। আর কত তাও শাস্ত্রে লেখে না। দশ টাকাও হতে পারে, দশ লাখ হতেও আটক নেই। তবে, ধনরত্ন প্রাপ্তিযোগটা ধ্রুব। কিন্তু তার জন্যে একটি বিশেষ কষ্টসাধ্য দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক এবং সে দৈবকর্ম্মটি আমি ছাড়া অপর কারুর দ্বারা হবে না।"

কথাটা শুনিয়া সুধীর কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে তাহার মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

জ্যোতিষী মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজী! ভাবছ, বাম্‌না এই বলে ভুজং দিয়ে দৈবকর্ম্ম করার নাম ক'রে কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার মৎলবে এসেছে। তা নয় বাবাজী! কি মৎলবে আমি এসেছি, তা বলি শোন। আমি কলির ব্রাহ্মণ, লোভটা পুরোমাত্রাতেই আমার আছে; তুমি আমার সহায়তায় যা কিছু ধনরত্ন লাভ করবে, তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে, এই অঙ্গীকার করে যদি তুমি রীতিমত দলিল লিখে রেজেষ্টারি করে দাও, তবেই আমি সেই দৈবকর্ম্মটি করব। নচেৎ নয়। এই জন্যেই গাড়ীভাড়া খরচ করে এত দূর এসেছি; ব্যস্‌, সমস্ত খোলাখুলি তোমায় বললাম।"

সুধীর অবাক হইয়া জ্যোতিষীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

জ্যোতিষী বলিলেন, "ভেবে দেখ কথাটা, এই যে দলিলের কথা বললাম, এর সমস্ত খরচ—ইষ্টাম্পের মূল্য, রেজিস্টারি খরচা, উকীলের ফী—সমস্ত আমি বহন করব, তোমার এক পয়সা লাগবে না। যদি আমার গণনায় কিছু সত্য না থাকে, দৈবকর্ম্মের কিছু শক্তি না থাকে, তোমার তাতে সিকি পয়সাও লোকসান নেই। যদি থাকে, আমার পারিশ্রমিক-স্বরূপ বল, গুণের পুরস্কারস্বরূপ বল, যা পাবে তার অর্দ্ধেক আমায দেবে। যদি দশ টাকা পাও, পাঁচ টাকা আমায় দিও। যদি দশ লাখ পাও, পাঁচ লাখ দিও।"

সুধীর বলিল, "পাঁচ লা—খ!"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "কি ছেলেমানুষ তুমি! যখন আমার বিনা সাহায্যে তুমি মোটেই কিছু পাচ্ছ না, তখন তুমি অর্দ্ধেক হোক, সিকি হোক, যা পাবে তাই ত তোমার লাভ। কথাটা ভেবে দেখ।"

সুধীর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল; শেষে বলিল, "আচ্ছা, টাকা যা পাব, তার অর্দ্ধেক না হয় আপনাকে দিলাম। আপনি বলেছেন ধনরত্ন। যদি একটি রত্ন পাই, তার অর্দ্ধেক আপনাকে ভেঙ্গে কি করে দেবো?"

"তার উচিত মূল্যের অর্দ্ধেক আমায় দেবে। সে সব কথা দলিলে স্পষ্ট করেই লেখা থাকবে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া কোথায় হবে?"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "যে কোনও একজন ভাল উকীলের বাড়ীতে। বড় রাস্তার মোড়ে যে একজন বাঙ্গালী উকিলের সাইনবোর্ড দেখে এলাম, উনি কেমন?"

সুধীর বলিল, "কেশববাবু? ভাল উকীল।"

"তবে বাবাজী, যদি রাজি থাক, এখনই ওঠ! চল, কেশববাবুর বাড়ী যাই। আর বিলম্ব

নয়। রাজি না থাক, বল, আমি বিদায় হই।''—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলুন, আমি রাজি।"

এই সময় ভৃত্য সুধীরের চায়ের পেয়ালা হস্তে প্রবেশ করিল। সুধীর মুখ পুড়াইয়া সেই গরম চা এক নিশ্বাসে পান করিয়া লইয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত উকীল-বাড়ী গেল।

সেইদিন অপরাহ্নের ট্রেনে, রেজিষ্টারি দলিলখানি ব্যাগে ভরিয়া জ্যোতিষী মহাশয় কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময়, সুধীরকে নিজ যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়া লইলেন যে, প্রাপ্তিযোগটি সফল হইবামাত্র সে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে সে সংবাদ প্রদান করিবে।

॥ ৭ ॥

কলিকাতায় ফিরিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় গৃহিণীকে সকল সংবাদ জানাইলেন এবং আশান্বিত হৃদয়ে উভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ কাটিল, পক্ষকাল কাটিল, কিন্তু সুধীরের নিকট হইতে কোনও প্রকারেব সংবাদ নাই। এদিকে এটর্ণিরা তাহাকে লইয়া কি করিল না করিল, তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই।

তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় পুনরায় বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। বেঙ্গলী মেসে গিয়া শুনিলেন, সপ্তাহখানেক হইল, ইস্কুলের চাকবীতে ইস্তফা দিয়া সুধীর চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যাইতেছে, তাহা কাহাকেও কিছু বলিয়া যায নাই।

কলিকাতায় ফিবিয়া আসিয়া কর্ত্তা-গৃহিণীতে আলোচনা করিয়া স্থির কবিলেন, যে রাজা জায়গীব দিবে, সেই বাজার নিকটেই সুধীব বোধ হয় গমন কবিয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, "শেষে কি ফাঁকি দেবে আমাদেব?"

জ্যোতিষী বিমর্ষভাবে বলিলেন, "পৈতে ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছি, ফাঁকি দেন, নবকে পচে মরবেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাতে ত আমাদের ভারি লাভ! আচ্ছা এই দু'বার বাঁকীপুর যাতায়াতে, দলিল-টলিলে, কত খরচ হল?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "সেই হিসেবেই সেদিন দেখছিলাম। ৪০টাকা খরচ হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ ৪০টাকা জলে গেল!"

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। সেদিনও অপরাহ্নে জ্যোতিষী মহাশয় দ্বিতলের সেই কক্ষটিতে বসিয়া আপন মনে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উঠিল—"জ্যোতিষী মশায়! জ্যোতিষী মশায়!"

বারান্দায় গিয়া চিক ফাঁক কবিয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন—সুধীর। কিন্তু সে নিজস্ব মোটরগাড়িতে বা ল্যাণ্ডো হাঁকাইয়া আসে নাই—সাধারণ গৃহস্থের সাজে পদব্রজে আসিয়াছে, দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের বুকটা দমিয়া গেল।

জ্যোতিষী মহাশয় ভগ্নমনে নামিয়া গেলেন; দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "এই যে সুধীর বাবাজী, এত দিনে মনে পড়িল? এস এস, ভিতরে এস।"—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন।

সুধীর তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার কৃপায় ধনরত্ন আমি লাভ করেছি। আমার সর্ত্ত অনুসারে, তার অর্দ্ধভাগ আপনাকে আমি দেবো বলে ডাকতে এসেছি।"

যুবকের অঙ্গে লক্ষপতির পোষাক না থাকিলেও তাহার মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের একটু ভরসা হইল। ভাবিলেন, 'লাখলিখ' না হউক, তবু বোধ হয়,

বেশ ভাল রকমই কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়াছে। নিজে বসিয়া সুধীরকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমটা হল, সব বল দেখি বাবাজি!"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ্ঞে আগে কিছু বলবো না;—আমার সঙ্গে আসুন, একেবারে দেখাব। আপনাকে নিতে এসেছি চলুন।"

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দূর?"

"কাছে। শ্যামবাজার।"

"আচ্ছা বস বাবা, আমি কাপড় বদলে আসি।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। কি ধনরত্ন সুধীর লাভ করিয়াছে যাহার অর্দ্ধেক তিনি এখনই পাইবেন, তাহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীকে সংবাদটা জানাইয়া আসিবারও অবসর হইল না।

যুবকের সহিত শ্যামবাজারে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, ইহা ত সেই হরিহর মিত্রেরই ঠিকানা—৩২নং কালু ঘোষের লেন!

সুধীর বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে বসাইয়া, পার্শ্বদ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া সুধীর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জ্যোতিষী মশায়, আপনার কৃপায় আমি নগদ ১০১ৄটি টাকা পেয়েছি। এই নিন আপনার ভাগ।"—বলিয়া দশ টাকার পাঁচখানি নোট এবং একটি রূপোর আধুলি সে জ্যোতিষী মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "নগদ এই। আর পেয়েছি, একটি রত্ন। ওগো, এস।"

বলিতেই—পর্দ্দা সরাইয়া ১৪/১৫ বৎসরের একটি সুন্দরী মেয়ে, একখানি আসমানী রঙের শাড়ী পরিয়া, সভয়-পদক্ষেপে অবনতবদনে প্রবেশ করিল। সুধীর, হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আর—এই স্ত্রীরত্ন।"—বলিয়া যুগলে জ্যোতিষী মহাশয়কে প্রণাম করিল। তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিল—"রত্ন অবিভাজ্য। মূল্যের অর্দ্ধাংশ আপনার প্রাপ্য হলেও কোনও উপায় নেই—কারণ আমার এ রত্নটি অ-মূল্য।" বলিয়া সুধীর হাসিতে লাগিল।

জ্যোতিষী মহাশয় মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইলেন। সুধীরের দেওয়া পাঁচখানি নোট হইতে একখানি তুলিয়া লইয়া, মেয়েটির হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—আচ্ছা তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। মেয়েটি কার হে সুধীর?"

বধূকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিয়া, সুধীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, "এটি হরিহরবাবুরই মেয়ে। হয়েছে কি জানেন? আমার বাবা, আর হরিহরবাবু এঁরা বাল্যবন্ধু ছিলেন; একসঙ্গে পড়তেন। তাঁহার পাঠদ্দশাতেই আমোদ করে পরস্পর বেহাই সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। আমি যখন মাতৃগর্ভে, তখনও বাবা সিমলা থেকে হরিহরবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন, "আমার যদি ছেলে হয়, তবে সে তোমার জামাই হয়ে রইল।' তার পর বাবা ত মারা গেলেন। হরিহরবাবু প্রথম প্রথম আমার মা'র খোঁজখবর নিয়েছিলেন, তার পর সে সব আর হয়নি। ক্রমে তাঁর ছেলে-মেয়ে হতে লাগলো। ১০০ টাকা মাইনের চাকরি, কলকাতা সহরের খরচ, বুঝতেই ত পারছেন। তার উপর, এর পূর্ব্বে দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন—এইটি তৃতীয় এবং শেষ মেয়েও। মেয়েটি বড় হল। মনের মত পাত্রের দর ওঠে ৫ হাজার—১০ হাজার। অথচ এ দিকে একটি পয়সা সঞ্চয় নেই। তখন সেই বাল্য ও যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়ল। আমি যদি বেঁচে থাকি, কোথায় আছি, তা জানেন না, তাও বটে, আর লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে আছি, না চোর-গুণ্ডা হয়েছি, তাও জানেন না, তাই ঐ কৌশল করে আপনার নামে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন। আপনি বাঁকীপুর থেকে চলে আসবার পরের রবিবারে, হরিহরবাবু আমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত। সব কথা

আমায় ভেঙ্গে বললেন, বাবার চিঠিপত্র আমায় দেখালেন। পিতৃ-আজ্ঞা—আমি পালন করতে প্রস্তুত আছি জেনে বললেন—বাবাজী তবে এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চল। সেখানে ল-কলেজে ভর্ত্তি হবে এবং আমি যে এটর্ণি বাবুদের বাড়ী চাকরী করি, সেখানে তোমায় আর্টিকেল করিয়ে দেবো, আমি বাবুদের বলে রেখেছি। সেই আপিসে তুমি 'কাজকর্ম্মও করবে, পকেটখরচ স্বরূপ গোটা ৫০ টাকা বাবুরা তোমায় দেবেন স্বীকার করেছেন।'—এই কথা শুনে, আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। এই এক হপ্তা হল বিবাহ হয়েছে।

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় মৌখিক সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি উঠিলেন। নোটগুলো ও আধুলিটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। বলিলেন, "বাবাজী, টাকাগুলো তুলে রাখ।"

সুধীর বলিল, "সে কি জ্যোতিষ মশায়! টাকা রেখে যাচ্ছেন কেন? আপনার ভাগের টাকা ব'লে রহস্য করেছি বইত নয়! ঐ টাকা দিয়ে আমরা দুজনে আপনাকে প্রণাম করেছি। নিন্-নিন্।"—বলিয়া সুধীর নোটগুলি জ্যোতিষী মহাশয়ের পকেটে ফেলিয়া দিল।

"আচ্ছা তবে তাই!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয়, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "গিন্নী—বাঁকীপুর যাতায়াতে, দলিল খরচায় ৪০টাকা জলে গিয়েছে বলেছিলে; তা যায়নি, সেই ৪০টাকা জল থেকে উঠে ফিরে এসেছে। এই নাও।"—বলিয়া টাকাগুলি স্ত্রীর হস্তে প্রদান কবিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তিনি স্ত্রীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জানাইতে লাগিলেন।

[আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩০]

হীরালাল

হীবালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসবেব কম হইবে না, আকার খর্ব্ব, দেহখানি ঘোব কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে কৃশও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও তাহাব দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; একদিনে সে অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ চলিতে সমর্থ, তাহার চক্ষুর জ্যোতি আজিও অটুট আছে; প্রদীপের আলোকেও ছুঁচে সূতা পরাইতে পারে।

গ্রামখানির নাম মাণিকপুব। গ্রামের যেটা ডোমপাড়া, যেখানে অন্যান্য ডোমেদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে একখানি মাটির ঘরে সে একাকী বাস করে। তাহার স্ত্রী-পুত্র পবিবার কেহই নাই; একে একে সকলেই মরিয়াছে; লোকে বলে ভূতেদের সহিত হীরুর ষড়যন্ত্র আছে। শ্মশান হইতে ভূতেরা গভীর রাত্রিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, কথাবার্ত্তা কয়। সেই কারণেই হীরু নাকি ডোমপাড়ায় থাকে না এবং কথাবার্ত্তায় অসুবিধা হয বলিয়াই হীকব সম্মতিক্রমে সেই ভূতেরাই নাকি উহার স্ত্রীপুত্র কন্যাকে একে একে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই ভয়েই ডোমপাড়ায় হীরুর যে সকল আত্মীয় স্বজন আছে, তাহারা কেহই আসিযা হীরুর সহিত বাস করিতে সম্মত নহে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলে, হীরুর এই ভূত অপবাদ নিতান্ত মিথ্যা কথা; তবে সে একজন গুণী লোক বটে। অনেক রকম ঔষধ তাহার জানা আছে, মন্ত্রে তন্ত্রে ঝাড়ফুঁকেও সে ওস্তাদ। অমাবস্যার বাত্রে জঙ্গলে ঔষুধ তুলিতে যায়। গোখুরা সাপ মারিয়া তাহার বিষ নিষ্কাসিত করিয়া লয়—ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহা সত্য যে পাঁচখানা গ্রামের ছোটলোক, বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য হীরুর কাছে ঝাড়াইতে অথবা ঔষধ লইতে আসে।

হীরুর ঘরখানির দুই ধারে বাঁশের দুইটি মাচা বাঁধা আছে, একটিতে রাত্রে শয়ন করে,

অন্যটিতে হাঁড়ি কলসীতে তাহার চাল ডাল এবং ঔষধপত্র থাকে। বাহিরের দাওয়ার একদিকে তাহার উনান পাতা আছে। অপর দিকে সে আপন জাতিধর্ম্ম করে; কুলা ডালা ধুচুনি বুনিয়া, গ্রামে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে।

রাত্রি তখন ১১টা। শ্রাবণ মাস, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া চারিদিক অন্ধকার। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। হীরু ঘরের মধ্যে প্রদীপের আলোয় বসিয়া, একটা ধুচুনি বোনা শেষ করিতেছিল। দ্বার খোলা ছিল, প্রদীপের খানিকটা আলো দাওয়ার উপর গিয়া পড়িয়াছিল। হীরু হঠাৎ বাহিরে চাহিয়া দেখিল স্ত্রীলোকের মত কাপড়পরা কে একজন মানুষ তাহার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। হীরু জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

মানুষটি আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিধানে একখানি কল্কাপেড়ে বিলাতি শাড়ী, ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা। হীরু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

আগন্তুক আস্তে আস্তে সেখানে বসিল। বসিয়া অতি স্নিগ্ধস্বরে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হীরু, তুমি বাবা, আমার একটু উপকার করবে?"

হীরু সবিস্ময়ে বলিল, "কি উপকার বল।"

স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, "একটা ওষুধ"—বলিয়া সে চুপ করিল।

হীরু বলিল, "কিসের ওষুধ চাই তোমার? কি ব্যারাম হয়েছে?"

আগন্তুক একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার কাছে বিষ-টিষও থাকে ত?"

হীরু সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "বিষ? বিষ কোথা পাব? কিছু ওষুধ-বিষুধ রাখি বটে। কিসের ওষুধ চাই তোমার, তাই বল না!"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "ওষুধ না। বিষই দরকার। কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছ হীরু? তোমার কাছে অনেক বিষ আছে তা আমি জানি। খানিকটা বিষ আমায় দাও, বিশেষ দরকার।"

হীরু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "কেন, বিষ নিয়ে তুমি কি করবে?"

হীরু "বিষবৃক্ষ" পড়ে নাই, ইহা মনে নিশ্চয় জানিয়া, স্ত্রীলোকটি বলিল, "শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে, বুঝেছ! রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পার?"

হীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কেন মিছে কষ্ট করে এই আঁধার রেতে, এই জলকাদা ভেঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ী যাও। ও সব কথার মধ্যে আমি কোনও দিন থাকিওনি, থাকবও না। পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে, কোথাও কোনও দুগ্‌ঘটনা হলে, তোমরা এসে আমাকেই নিয়ে টানাটানি কর কেন বল দেখি? দুটো ওষুধ-পালা জানি, তাই পাঁচজনে আমার কাছে আসে। বিষ-টিষ রাখিও না, কাউকে দিইও না। কেন তোমরা মিছামিছি আমায় সন্দেহ কর?"

রমণী বিস্মিতভাবে বলিল, "আমরা সন্দেহ করি?"

"হ্যাঁ, তোমরা সন্দেহ কর। তুমি কে তাও আমি জানি, কি জন্যে এসেছ তাও আমি জানি।"

সভয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে আমি?"

"তুমি পুলিশ। তুমি পুরুষমানুষ, ছিরিলোক সেজে এসেছ। নইলে এই আঁধার রাতে এই শ্মশানের মোওড়ায়, ছিরিলোকের বাবার সাধ্যি কি যে আসে।"

রমণী এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "আমি পুরুষমানুষ? গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছ না আমি পুরুষ কি স্ত্রীলোক?"

হীরু বিস্মিত হইল—স্ত্রীকণ্ঠস্বরই ত বটে! তা ছাড়া স্বরটা যেন হীরুর পরিচিত বলিয়াও বোধ হইল। কার কণ্ঠস্বর তাহাই সে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে সংশয়াপন্ন মনে করিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "এখনও সন্দেহ? তবে দেখ!"—বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী যুবতী, কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে নিজ বক্ষের বসন সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। নষ্টপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

"রাম রাম!"—বলিয়া হারু মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, "মা, বস্।"

রমণী উপবেশন করিল। হীরু বলিল, "আজকাল পুলিশের ভারি উপদ্রব হয়েছে। তোমার ঘোমটা দেখে, তোমার ফিস ফিস কথা শুনে তাই আমি সন্দেহ করেছিলাম, তুমি জাল মেয়েমানুষ, আসলে পুলিশের কোনও টিক্‌টিকি।"

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল, "এখন ত তোমার সন্দেহ গেল। আমি যা চাই, আমায় দাও তবে।"—এখন আর ফিস্ ফিস্ করিয়া নহে, রমণী স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা কহিতে লাগিল।

হীরু বলিল, "তুমি যা চাও, তা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এ সব জিনিষের দাম খুব বেশী তা জান ত?"

রমণী বলিল, "জানি। পঞ্চাশ টাকা আমি এনেছি। এই নাও।"—বলিয়া নিজ কটিদেশ হইতে একটি "গেঁজে" খুলিয়া লইয়া, হীরুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "গুণে নাও।"

হীরু বলিল, "তোমার শেয়াল মরলে, পুলিশ এসে যখন আমায় ধরে নিয়ে যাবে, তখন ও পঞ্চাশ ত তাদের পূজো দিতেই যাবে। আরও পঞ্চাশ চাই।"

স্ত্রীলোকটি ক্ষুণ্ণস্বরে বলি, "আরও পঞ্চাশ চাই? আর ত আনিনি। অত বেশী লাগবে তা তো জানতাম না।"

"কাল টাকা এনে জিনিষ নিয়ে যেও।"

স্ত্রীলোকটি কাতর কণ্ঠে বলিল, "কাল হলে চলবে না হীরু—আজই আমার চাই যে! তা ছাড়া কাল আমার আসবার উপায়ও নেই।"

হীরু বলিল, "সে তুমি বুঝো, কিন্তু একশ টাকার কমে এ কাজ আমি পারব না বাছা, আমার সাফ কথা।"

রমণী ক্ষণকালমাত্র কি চিন্তা করিল। তারপর নিজ বাম প্রকোষ্ঠ হইতে স্বর্ণবলয় উন্মোচন করিয়া বলিল, "এই নাও। এর দাম পঞ্চাশ টাকার বেশী। দাও, আমার জিনিষ দাও।"

হীরু বালাটি হাতে লইয়া, প্রদীপের আলোকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটি পরীক্ষা করিল। তাহার পর গেঁজে হইতে টাকাগুলি খুলিয়া সাবধানে নিঃশব্দে সেগুলি গণিয়া দেখিল ঠিক পঞ্চাশ টাকা আছে। টাকা এবং বালা মাচার উপর শয্যাতলে লুকাইয়া অপর মাচা হইতে একটি হাঁড়ি নামাইয়া লইল। তাহার ভিতর গাছের কতকগুলি শুষ্ক শিকড়, কয়েকটা শিশি ও অনেকগুলো ছোট ছোট পুঁটুলি ছিল। একটা শিশি আলোতে ধরিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজের উপর তাহা উপুড় করিল। কাগজে পড়িল কিসের কতকটা গুঁড়া। শিশি ছিপিবন্ধ করিয়া কাগজের মোড়ক করিয়া, রমণীর হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিও।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "এতেই হবে ত? দুটো শেয়াল মরবে?"

হীরু বলিল, "যথেষ্ট হবে।"

রমণী মোড়ক লইয়া বলিল, "এ কি?"

"শেঁখো বিষ। ভয়ানক জোর। যে শেয়ালকে খাওয়াবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তার শরীরে কলেরার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাবে। দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ। লোকে মনে করবে, সে কলেরা হয়ে মরেছে বুঝেছ? কলেরা মনে রেখ।"

"বেশ।" বলিয়া রমণী অঞ্চলের কোণে মোড়কটি বাঁধিয়া লইল, বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া ধীর পদে বাহির হইয়া গেল।

হীরু তখন আলোকটি নিভাইয়া দিল। দাওয়ায় বাহির হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল কিছুদূরে শ্বেতবস্ত্রাবৃতা রমণী গ্রামাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। আর কয়েক পদ গিয়া রমণী দাঁড়াইল। নিকটেই একটা বটগাছ ছিল, তাহার ছায়াতল হইতে একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। ছাতা খোলার মত খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল; তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। উভয় মূর্ত্তি অগ্রপশ্চাৎ ব্যবধানে, গ্রামের দিকে চলিল। হীরু আস্তে আস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে কুলুপ লাগাইয়া, টোকা মাথায় দিয়া পথে নামিয়া, নিঃশব্দে সেই শ্বেতবস্ত্রযুগলের অনুসরণ করিল।

সেই নিশাচর ও নিশাচরীর অনুসরণে হীরু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুদূর গিয়া, তাহাদিগকে একটা বাড়ীর সদর দরজার তালা খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল।

হীরু তখন মনে মনে বলিল, "ওঃ তোমায় ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম তা হলে!"

হীরু জানিত, ইহা শশী মুখুয্যের বাড়ী—বুঝিল, যুবতী তাঁহারই পুত্রবধূ নীরদা।

এই বাড়ীতে হীরু মাঝে মাঝে আসিয়া নীরদাকে কুলাটা ডালাটা বিক্রয় করে। গত দুই বৎসর যাবৎ ইহার স্বামী বিদেশে। হীরু শুনিয়াছিল, নীরদার স্বামী শীঘ্র বাড়ী আসিবে। চারি বৎসরের একটি ছেলে মাত্র লইয়া, যুবতী একাকিনী এই গৃহে বাস করে। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে একটা কাণাঘুষা আছে, হীরুও তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিত না। এবার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া, আপন মনে সে বলিল, তবে ঠিকই ত বলতো লোকে! যা করছিস, করছিস—তার উপর আবার এই! ওরে হারামজাদী!"

হীরু নিঃশব্দে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিযা পা ধুইয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইয়া মাচাটির উপর উঠিয়া শয়ন করিয়া, অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

॥ ২ ॥

পরদিন প্রাতেও আকাশ তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

মাণিকপুর গ্রামের দুই ক্রোশ দূবে রেলওয়ে ষ্টেশন। বেলা সাতটার সময়, পশ্চিম হইতে একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। মাণিকপুর গ্রামের "শশী মুখুয্যের পুত্র বিনোদলাল, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে ব্যাগ ও ছাতা হস্তে নামিয়া পড়িল। প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছে কিনা। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে মনে বলিল, "কেই বা আছে যে নিতে আসবে। বাইরে গিয়ে দেখি যদি গোরুর গাড়ীটাড়ী একখানা পাঠিয়ে থাকে।" এই সময় বৃষ্টি আসিল। ছাতাটি খুলিয়া তখন সে টিকিট দিবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। টিকিটখানা দিয়া, বাহির হইয়া দেখিল ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে দুইখানি গোরুর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও গাড়ীর গাড়োয়ানকে নিজ গ্রামের বলিয়া চিনিতে পারিল না। তথাপি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইল—তাহারা স্থানীয় গাড়োয়ান, ভাড়া জুটিবার আশায় ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিনোদ একবার ভাবিল, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া লয়। আবার ভাবিল, হয়ত একটা টাকা ভাড়া চাহিয়া বসিবে, সে টাকায় ছেলের জন্য, গ্রামে প্রবেশ করিয়া একহাঁড়ি রসগোল্লা কিনিতে পারা যাইবে। রৌদ্র নাই, ঠাণ্ডায় এই দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে? পথে কাদা হইয়াছে বটে, তা জুতাযোড়াটা খুলিয়া হাতে করিয়া লইলেই চলিবে। এইরূপ ভাবিয়া, বিনোদ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ পার হইয়া জুতাযোড়াটি হাতে লইয়া, নিজ গ্রামের পথ ধরিল।

এই বিনোদ লোকটির বয়স এখন ৩০ বৎসর। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, চোখ দুইটি বড় বড়, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল বদন। বাল্যকালে লেখাপড়ায় বড় মন দেয় নাই। ১৮ বৎসর বয়সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাজারে পিতাব একখানি মণিহারির দোকান ছিল, তাহার আয়েই সংসার চলিত। জমিজমা ছিল—খুব বেশী নয়—তবে সম্বৎসরের ধানটা কলাইটা তাহা হইতে পাওয়া যাইত, কিনিতে হইত না। পিতার মৃত্যুর পর দোকানখানি হাতে পাইয়া, বৎসরখানেকের মধ্যেই বিনোদ তাহা লোপাট করিয়া ফেলিল। কিছুদিন ঘবে বসিয়া রহিল; কিন্তু দিন চলে না। সংসারে যদিও দুইটি বিধবা মাত্র—মা এবং পিসিমা—তথাপি দিন গুজরাণ করা কষ্টকর হইল। প্রতিদিনের বাজারখরচ মা পিসিমার দশমী দ্বাদশীর খরচ, তাঁহাদের ব্রত পার্ব্বন, কাপড় চোপড়—নিজের জুতোটা জামাটা, ছাতাটা, সিগারেটটা, তারপরে জমিদারের খাজনা আছে—এ সব আসে কোথা হইতে? এ দিকে ছেলে 'সোমত্ত হইল' মা পিসিমা তাহার বিবাহ দিবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু গোত্রহীন নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবককে ভাল মেয়ে কে দিবে? এই অবস্থায় পড়িয়া বিনোদ কলিকাতায় গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি সামান্য কেরাণীগিরি জোগাড় করিয়া লইল। পাঁচ বৎসব সে চাকরি করিল। ইতিমধ্যে তাহাব বিবাহ হইল; বেতনও কিছু বৃদ্ধি হইল। ছেলের বিবাহের বৎসরখানেক পরে, মাবও বৈধব্য যন্ত্রণা শেষ হইল—একটি নাতির মুখও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

২০ টাকা বেতনে ঢুকিয়াছিল, ৫ বৎসরে যদিও তাহাব ৩০ টাকা বেতন হইয়াছে, তথাপি দুঃখ ঘুচে না। কলিকাতার মেসের খরচ, ট্রামভাড়া, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়িয়া মাঝে মাঝে থিয়েটাব বায়স্কোপেও যাইতে হয, মাসে দুইবাব বাড়ী যাওযা আছে—বাড়ীর খরচের জন্য মাসে ৫/৭ টাকার বেশী আব দিতে পারে না। ছেলেটি হইয়াছে, তাব দুধ আছে, খাবার আছে, অসুখ করিলে বিস্কুট বার্লি আছে—৫/৭ টাকায কি কবিয়া চলিবে?

এই সময় বড়বাজারেব অমৃতসব-নিবাসী এক শালেব মহাজনের সহিত বিনোদেব আলাপ হইল। আহার ও বাসস্থান ছাড়া তিনি তাহাকে ৪০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া অমৃতসরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কাজকর্ম্মে পটুতা দেখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের ২/১ আনার অংশীদারও করিয়া লইবেন ভরসা দিলেন। আশায় লুব্ধ হইয়া, কলিকাতাব চাকবিতে ইস্তফা দিয়া, বিনোদ সেই চাকবি গ্রহণ কবিল। বাড়ী গিয়া দিন দশ বাবো থাকিয়া স্ত্রীপুত্রকে পিসিমার জিম্মায় রাখিয়া, দুই বৎসব পূর্ব্বে আষাঢ় মাসে বিনোদ অমৃতসবে চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ ফিরিতেছে।

অমৃতসরে পৌঁছিবার মাস দুই পরেই পিসিমার মৃত্যুসংবাদ পায়। মাত্র দুই মাসেব চাকরি, মনিব ছুটি দিল না, বলিল ইচ্ছা কবিলে চাকরি ছাড়িযা চলিয়া যাইতে পাব। বিনোদ পাড়া প্রতিবেশী অভিভাবক স্থানীয়গণকে চিঠি লিখিল; তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দিলেন, আমরা রহিয়াছি ভাবনা কি? বউমাকে আগলাইবাব জন্য একজন প্রবীণা ঝি বাখিয়া দিব, নিজেরা সর্ব্বদা দেখাশুনা করিব।—বিনোদের শ্বশুরবাড়ী গ্রাম হইতে অধিক দূরে নহে; কিন্তু তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি নাই, শালারাও কেহ জীবিত নাই; বিধবা খুড়শ্বাশুড়ি তাঁহাব নাবালক পুত্রকন্যাগণ সহ সেখানে বাস করেন। তথাপি বিনোদ সেই খুড়শ্বাশুড়ীকে পত্র লিখিল; তিনি উত্তব দিলেন, "সে কি হয় বাবা? তোমার বাপ পিতামহের ভিটায় সন্ধ্যা পড়িবে না এ কেমন কথা। নীবদা সেইখানেই এখন থাকুক। পরে তুমি সুবিধামত তাহাকে তোমার চাকরিস্থানে লইয়া যাইও।"—নীরদা অমৃতসরে গেলে বাপ পিতামহের ভিটায় কে সন্ধ্যা দিবে, সে সম্বন্ধে কোন সদুপায খুড়ীমা কিন্তু নির্দ্দেশ করেন নাই।

পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেরা যত দেখাশুনা করুন আর না করুন, প্রবীণা ঝি একটি তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মাস দুই পরে নীরদার সহিত ঝগড়া করিয়া সে

চলিয়া যায়। একটি ঠিকা ঝি রাখা হইল, সে হাটবাজার করিযা বাসন মাজিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

বিনোদ বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে লইয়া আসিবে বলিয়া মাঝে মাঝে ছুটি চাহিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আপিস ত নহে, মহাজনী কারবার, আজ না কাল, এ মাসে না ও মাসে, এই করিয়া এত দিনের পর তাঁহারা বিনোদকে এক মাসের ছুটি দিয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

"কে রে, হীরেনাল নাকি? এখনও তুই বেঁচে আছিস?"

হীরু ডোম তাহার দাওয়ায় বসিয়া ডালা বুনিতেছিল, চাহিয়া দেখিল, ছাতা মাথায়, জুতা ও ব্যাগ হাতে বিনোদ রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঐরূপ চীৎকার করিতেছে।

হীরুকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদ রাস্তা হইতে নামিয়া হীরুর কুটীরের দিকে আসিতে আসিতে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "কিরে হীরু, এখনও বেঁচে আছিস?"

এইবার হীরুর কথা যোগাইল—"আছি বইকি দাদাঠাকুর। এস, দাবায় উঠে এস, প্রণাম করি।"

বিনোদ বলিল, "পায়ে যে কাদা রে হীরু।"

বলিয়া রাস্তা হইতে নামিল। নিকটে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে পা ধুইয়া হীরুর দাওয়ায় গিয়া উঠিল। হীরু তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য নতুন এক টুকরা বাঁশের চাটাই বিছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন বাড়ী ছেড়ে কোথায় ছিলেন দাদাঠাকুর?"

"অমৃতসরে চাকরি করছিলাম রে। কেন, যাবাব সময় ত তোকে বলে গিয়েছিলাম। মনিব ছুটি দেয় না, কাজেই আসতে পারিনি। একমাসের ছুটি পেয়ে বাড়ী এসেছি।"

হীরু গম্ভীর মুখে, অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা কবিল "হীরু, তুই মুখখানা অমন হাঁড়ি করে বসে রয়েছিস কেন? দু'বছর পরে দেখা, একটা কথা কচ্ছিসনে। হাঁরে, আমাদেব বাড়ীতে কোনও খারাপ খবর আছে নাকি? তুই আজকালের মধ্যে আমাদেব ওদিকে গিয়েছিলি? আমার ছেলে, পরিবার সবাই ভাল আছে ত?"

হীরু গম্ভীর ভাবে বলিল, "অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি।"

বিনোদ বলিল, "তা যাবি কেন। আমি বিদেশে যাবাব সময় তোকে বলে গেলাম হীরু আমাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাবি, বউ একলা রইল, দেখবি শুনবি খোঁজখবর নিবি। তুই বললি, তা আর খোঁজখবর নেব না দাদাঠাকুব, তোমার বাপ একদিন আমার যে উপকারটা করেছিলেন, আমি ত তোমাদের বিনি মাইনের বাঁধা চাকর। তুই এ কথা বলেছিলি কিনা, বল্।"

হীরু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "মাঝে মাঝে আমি গেছি বইকি। তোমাদের বাড়ীতে না গেলেও খবরটবর পাই। বউমাকে কালও আমি পথে দেখেছি। সবাই ভালই আছে।"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা হীরু, তুই বস্—আমি এখন উঠি। বাড়ীতে হয়ত তারা কত ভাবছে।"—বলিয়া বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

হীরু বিনোদকে প্রণাম করিয়া, গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। বিনোদ চলিয়া গেলে সে আপনার মনে বলিল, "হায়রে সংসার!"

॥ ৪ ॥

আজ আর হীরু কুলা ডালা লইয়া গ্রামে বিক্রয় করিতে বাহির হইল না। সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া রহিল, তামাক খাইল, অনেক চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল। যখন প্রায় বারোটা হীরু তখন গতরাত্রে প্রাপ্ত সেই বালা ও টাকা পঞ্চাশটি লইয়া কোমরে বাঁধিয়া ঘর বন্ধ করিয়া, আস্তে আস্তে বাহির হইল।

গ্রামের ভিতর দিয়া ক্রমে বিনোদের বাড়ীর নিকট পৌঁছিল। বাড়ীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল, ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নাই, নিস্তব্ধ কিন্তু উঠানের আমগাছে আলো পড়িয়াছে। খিড়কী দুয়ারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের একটা স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া কৌশলে তাহার উপর উঠিয়া হীরু নিঃশব্দে ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, রান্নাঘরের নিকটে হারিকেন লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। হীরু ধীরপদে সম্মুখে গিয়া বলিল, "কি দিদিঠাকুরণ; এখনও ঘুমাওনি?"

সহসা হীরুর আগমনে নীরদা ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না। হীরু বলিল, "ভয় পেয়েছ দিদিঠাকুরণ? আমি হীরু, ভয় কি?"

এইবার নীরদার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। সে বলিল, "হীরু তুই চোরের মত এখানে কি করছিস? বাড়ী ঢুকলি কি করে?"

হীরু বলিল, "পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল ওষুধ নিয়ে এলে, ওষুধের ফলটা কি রকম হল তাই দেখতে এসেছি।"

নীরদা বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "ওষুধ? আমি আবার কবে তোর কাছ থেকে ওষুধ আনলাম? কি বলছিস পাগলের মত? মদ-টদ খেয়েছিস বুঝি?"

হীরু একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ন্যাকামি রাখ না দিদিঠাকুরণ! আমি সবই জানি। কাল রাতে তোমার গলার স্বর শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তুমি। তারপর, অন্ধকারে পিছু পিছু এসে, তোমাকে আর—তাকে এই বাড়ী ঢুকতে ত দেখেই গেলাম। সে যাক্। এখন বল দেখি, যেমন বলে দিয়েছিলাম, দুধের সঙ্গে সেই গুঁড়োটা মিশিয়ে দিয়েছ ত?"

নীরদা দেখিল, আর ভণ্ডামি করা নিষ্ফল। বলিল, "হ্যাঁ হীরু, খাইয়ে ত দিয়েছিলাম। কই, এখনও ত কিছুই হল না। দিব্যি ত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।"

হীরু মৃদুস্বরে হাসিয়া বলিল, "ঘুমবেই ত। ওষুধ দিতে আমারই যে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল কিনা!"

নীরদা শঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিল, "কেন কি দিয়েছিস?"

হীরু বলিল, "তুমি বিষ চেয়েছিলে ত? বিষও আমার ছিল, কিন্তু একে বুড়োমানুষ, তায় রাত্তির কাল, বিষের গুঁড়ো না দিয়ে ভুলে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ফেলেছিলাম।"—বলিয়া হীরু ব্যঙ্গভরে আবার হাসিল।

নীরদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীরুর মুখ পানে চাহিল। ক্রোধ কম্পিত স্বরে কহিল, "তবে তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস বল্? আমাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছিস, জোচ্চোর কোথাকার!"

এই গালি শুনিয়া হীরু রাগিয়া গেল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ-লো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারানী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই ত টাকা নিয়েছি। এখন আমি যে জন্য এসেছি, তা বলি শোন্। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে, পুঁটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাত্রেই কলকাতায় যেতে হবে।"

নীরদা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কলকাতায়? কলকাতায় আমি যাব কেন?"

হীরু ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "কলকাতায় যাবিনে ত কি এখানে থেকে স্বামীহত্যে ব্রহ্মহত্যে করবি হতভাগী? নে, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে; ভোর তিনটেয় গাড়ী। আমি তোকে ইষ্টিশনে পৌঁছে দিয়ে, টিকিট কেটে, গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে চলে আসব।"

নীরদা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, "হীরেলাল, তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়? আমায় হুকুম করছিস? আমি যদি কলকাতায় না যাই?"

হীরু বলিল, "না যাস, এখনই বিনোদ দাঠাকুরকে জাগিয়ে সব কথা তাকে বলে, তাতে আমাতে দুজনে মিলে তোকে খুন করে উঠোনে গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলবো।"

হীরুর ভঙ্গি দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া নীরদা ভয়ে, কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "হীরু, আমি যদি দোষ কবে থাকি আমার স্বামী তার বিচার করবেন। তিনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তখন আমি কলকাতায় যাব—যেখানে হয় যাব। তুমি কেন এর মধ্যে—"

হীরু বলিল, "আহা, নেকু! স্বামী তোমার বিচার করবেন। বেচারি অঘোবে পড়ে ঘুমুচ্ছে, তুমি যদি আজ রাতেই তার গলাটি ছুরি দিয়ে কেটে দাও? যে বিষ খাওয়াতে পারে, সে কি আর গলা কাটতে পারে না? ওসব কথা আমি শুনবো না। ভোর তিনটেব গাড়ীতে তোমায় যেতেই হবে কলকাতা। না যদি রাজি থাক, বল, আমি সোরগোল সুরু করে দিই।"

নীরদা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে ধপ করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু হীরু, কলকাতায় যে আমায় যেতে বলছ, সেখানে গিয়ে আমি কি খাব?"

হীরু বলিল, "তোমাদের দলের লোক সেখানে ঢের আছে। তারা যেমন করে খায়, তুমিও সেইরকম করে খাবে?"

"কিন্তু হীরু, আমি যে কলকাতায় কখনও যাইনি, কাউকে চিনিনে। আমি কি করে সেখানে যাব, কি ক'রে কি করব?"—বলিয়া নীবদা চোখে আঁচল দিল।

কথাটা শুনিয়া হীরু একটুখানি ভাবিল। শেষে বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে। আচ্ছা, চল, আমি নিজেই তোমায় সঙ্গে করে বেখে আসবো। রামবাগানে যে ডোমপাড়া আছে সেই ডোমপাড়ায় আমাদের ক'জন আত্মীয় লোক থাকে। তাদের ধরে, তোমার একটা ঠায় ঠিকানা করে দিয়ে, আমি আসবো।"

নীরদা দেখিল, হীরু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার হাত হইতে নিস্তাবের কোনই আশা নাই। তখন সে বলিল, "আচ্ছা তাই চল তবে।"

হীরু বলিল, "তোমার স্বামীকে যা ঘুমেব ওষুধ দিয়েছি, সে ঘুম সহজে এখন ভাঙ্গবে না। কাল বেলা ৮টা ৯টা পর্যন্ত খুব ঘুমোবে। তোমাব কোনও ভয় নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটিগুলো বের কবে নাওগে। আমি কিন্তু ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবো।"

"কেন?"

"পাছে তুমি তোমার স্বামী গায়ে হাত দাও, কি পালাও।"

নীরদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল। হীরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বারান্দায় উঠিয়া, ঠিক দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। খাটেব উপর দেখিল, ছেলেটিকে পাশে লইয়া, বিনোদ নাসিকাগর্জ্জন পূর্ব্বক অঘোবে ঘুমাইতেছে।

নীরদা বাক্স পেটরা খুলিয়া নিজ বস্ত্রালঙ্কাব বাহির করিয়া একটি পুঁটুলিতে বাঁধিতে লাগিল। হীরু বলিল, "এই নাও, তোমার বালা নাও, আর চল্লিশ টাকা—পুঁটুলিতে বেঁধে নাও। দশটা টাকা আমি রাখলাম পথ খরচের জন্যে।" নীরদা দ্বারের কাছে আসিয়া টাকা ও বালা লইল। পুঁটুলি বাঁধা হইলে, সেটি কাঁখে করিয়া হীরুর সহিত বাহিব হইল।

হীরু, নীরদাকে লইয়া, প্রথমে নিজ কুটীরে আসিল। বাক্স খুলিয়া, সাফ ধুতি বাহির করিয়া পরিল, বহুকালের একটি পিরাণ ছিল তাহা গায়ে দিল, একখানি উড়ানি চাদর ছিল তাহা মাথায় বাঁধিল। জুতা পায়ে দিয়া, ছাতা লইয়া, ঘরে দ্বারে কুলুপ দিয়া নীরদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশনের দিকে চলিল।

॥ ৫ ॥

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ স্ত্রীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে বিনোদ, অভাগিনীর পদস্খলনের বৃত্তান্ত অবগত হইল, কিন্তু সেই রাত্রে কাহার সহিত কোথায় যে নীরদা অন্তর্দ্ধান করিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ ঘটনার পর গ্রামে আর বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বাস্তুভিটা ও জমিজমাগুলা আধাকড়িতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, ছুটি অন্তে ছেলেটিকে লইয়া বিনোদ অমৃতসরে চলিয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিল। ছেলেটির কষ্ট দেখিয়া পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসেই অমৃতসর-প্রবাসী একজন সদ্ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীর কন্যাকে সে বিবাহ করিল। তদবধি বিনোদ সেইখানেই বাস করিতেছে। চাকরিতে তাহার উন্নতি হইয়াছে; নিজের একখানি বাড়ীও সেখানে নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিতে পাই। [শ্রাবণ, ১৩৩০]

প্রেম ও প্রহার

পদ্মা তীরবর্ত্তী রায়গঞ্জনামা এক পল্লীগ্রামে একটি খড়ে ছাওয়া মৃৎকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া একদিন বেলা ৮টার সময় স্বামীস্ত্রীতে নিম্নলিখিত প্রকার দাম্পত্যালাপ হইতেছিল।

ভজহরি গোপ মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া চোখ ঘুরাইয়া উচ্চস্বরে বলিল, "খপর্দ্দার মাগী মুখ সামলে কথা কোস্ নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"

মোক্ষদাসুন্দরী, স্বর আর এক পর্দ্দা তুলিয়া উত্তর দিল 'ইস্! রাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন। জুতো পাবি কোথা তাই শুনি? বাপের জম্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস রে মিনসে?"

দন্ত খিঁচাইয়া মিন্সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোপ রও হারামজাদী শুয়রকে বাচ্ছি। তুই আমার বাপ তুলি্স এত বড় আস্পদ্দা তোর?"

মোক্ষদা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল, "তুলেছি তুলেছি! ঝাঁটা তুলিনি এই তোর ভাগ্যি!"

"তোল্ না ঝাঁটা, তোর ক'গাছা ঝাঁটা আছে আমি দেখি একবার। ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটীকে বিয়ে করে এনে রাজার হালে রেখেছি, তুই আমায় ঝাঁটা দেখাবি বইকি! নইলে আর কলিকাল বলেছে কেন হায় রে!"

মোক্ষদা হাত উল্টাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "মরি না মশারি ছিঁড়ে! কি আমার নাজার হালে নেখেছেন গোঃ। আমি নোকের বাড়ী ধান ভেঙ্গে বাসন মেজে উঠোন ঝাঁট দিয়ে যাই দুটো আনি, তাই গুবুর গুবুর চলে; নইলে ঐ বাকর কি দিয়ে ভরাতিস বল্ দেখি? খেটে খেটে গতর আমার জল হয়ে গেল; উনি আমায় নাজার হালে নেখেচেন! যে পুরুষ পয়সা নোজগার করতে জানে না, তার অত তেজ কেন?"

ভজহরি বলিল, "নাঃ—আমি কি আর পয়সা রোজগার করতে জানি? যত জানিস তুই। আমি গেল বছর শ্যামপুরে বাবুদের বাড়ী খানসামাগিরি করতে যাইনি? আমার খোরাক পোষাক ৫ টাকা মাইনে হয়নি? তখন কেঁদে কেটে অনর্থ করেছিলি কেন? ওগো আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না; তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ী এস, যা জুটবে তাই দুজন দুমুঠো খাব। কে বলেছিল রে মাগী?—নাঃ, আমি রোজগাব করতে জানিনে! আমার মতন হুঁসিয়ার খানসামা এ অঞ্চলে ক'টা আছে শুনি? এ পাড়াগাঁয়ে আমাদের কদর ত কেউ বোঝে না, কাজেই বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে বসে আছি।"—বলিয়া ভজহরি কয়েক টান তামাক টানিয়া আবার আরম্ভ করিল—"আর তাও বলি—বাড়ীতে কি আমি বসেই থাকি? তুই খাটিস আর আমি খাটিনে? তুই দুটো ক্ষুদকুঁড়ো যা হয় নিয়ে আসিস বটে, কিন্তু মাছ ধরে না আনলে খেতিস কি দিয়ে বল্ দেখি? এদিকে মাছ না হলে যে একেবারে খাবি খায়; একটি গেরাস ভাত মুখে ওঠে না। মনে করি খোঁটা দেবো না,

তোর স্বভাবের গুণে দিতে হয়।”—বলিয়া ভজহরি ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিল।

মোক্ষদা দেওয়ালের কাছে সরিয়া বসিয়া, পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া নিজ হাঁটু দুইটিতে সকরুণ ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, “ন্যাকা মিনসের ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনে! ভারি খোঁটার কাজ করেছেন কিনা! মাছ ধরে আনেন, তবেই ত সংসারের সকল দুঃখুই ঘুচে গেল। কাল থেকে আমার শরীলটে খারাপ, গায়ে গতরের ব্যথায় মরে যাচ্ছি—বল্লাম মুখুয্যেদের বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আয় ত! তাতে অমনি বাবুর অপমান হল! অ্যাঁ আমি পুরুষ মানুষ হয়ে বাসন মাজবো?” আমি বল্লাম, “যে পয়সা নোজগার করতে পারে না সে আবার পুরুষ মানুষ কিসের? এই ত বলেছি! এতেই অমনি জুতিয়ে আমার মুখ ছিঁড়ি দিতে এলেন! এমন নোকের হাতেও আমি পড়েছিলাম, মাগোঃ—উঠতে বসতে আমায় নাতি ঝাঁটা মারে!”—বলিয়া মোক্ষদা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ভজহরি তামাক খাইতে খাইতে, স্ত্রীর পানে আড়চোখে আড়চোখে চাহিতে লাগিল। স্ত্রীর আঁখি-জলে তাহার পৌরুষগর্ব্ব টলমল করিতে লাগিল, বুঝি বা ভাসিয়াই যায়। কান্না থামে না দেখিয়া বলিল, “বলি অত কান্না হচ্ছে কিসের জন্যে? তোকে মারিওনি, কিছুই না, দুটো মুখের কথা বলেছি বইত নয়! যাচ্ছি না হয়, বাসনগুলো মেজে দিয়ে আসছি। আর কাঁদতে হবে না, ওঠ্।”

হুঁকা দ্বারের কোণে ঠেকাইয়া রাখিয়া, ভজহরি কাছে গিয়া স্ত্রীর মুখ হইতে তাহার হস্ত ও অঞ্চল অপসারিত করিয়া লইয়া নিজ কোঁচার খুঁটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মুখুজ্যে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মোক্ষদা তখন বলিল, “থাক্, তোমায় আর যেতে হবে না, আমিই গিয়ে বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আসছি। যতক্ষণ শরীরে শক্তি আছে ততক্ষণ করি, তারপর যা হয় হবে।

ভজহরি বলিল, “তোর গায়ে গতরে ব্যথা, নাই বা গেলি তুই, আমিই যাচ্ছি। তুই এই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে একটু শুয়ে থাক্। বাসন মেজে দিয়ে গিন্নীমার কাছ থেকে আমি বরঞ্চ একটু তার্পিণ তেল চেয়ে আনবো, তোকে বেশ করে মালিস করে দেবো, ব্যথাটা অনেক কমবে তা হলে।”

স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ কলহ নিত্যই চলিত। মাঝে মাঝে কিলটা চড়টা চাপড়টাও যে না চলিত এমন নয়। তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে—দম্পতির কলহ অবশেষে লঘুক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে।

।। ২ ।।

উপরে বর্ণিত ঘটনার দিন পনেরো পরে, একদিন উভয়ের কলহ একটা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইল না।

মোক্ষদা দুঃখধান্দা করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা আনিত, তাহা হইতেই বাঁচাইয়া কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিত। সেই সঞ্চিত অর্থ কোথায় লুকানো থাকিত, তাহা ভজহরির অজ্ঞাত ছিল না। একদিন স্ত্রীর অনুপস্থিতি কালে, সে সেই গোপনীয় স্থান হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া ছিপে লাগাইবার জন্য একটি পিতলের হুইল কিনিবার অভিপ্রায়ে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী সহরে চলিয়া গেল।

হুইল কিনিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া পুকুরের ঘাটে গিয়া হাত পা ধুইয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভজহরি পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল, এমন সময় মোক্ষদা দত্তদের গোহালে সাজাল দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। টাকা চুরি গিয়াছে ইহা সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল এবং সন্দেহ ঠিক লোককেই করিয়াছিল। ফিরিয়া কুলুঙ্গির উপরে

সেই নূতন চক্‌চকে হুইলটি দেখিবামাত্র মোক্ষদার মুখ, আগ্নেয়গিরির ন্যায় বচনাগ্নি উদ্গীরণ আরম্ভ করিল। অপর পক্ষও নীরব রহিল না। অবশেষে রাগের বসে ভজহরি তাহার হুঁকা হইতে জ্বলন্ত কলিকা খুলিয়া লইয়া মোক্ষদার মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। আগুন মোক্ষদার মুখ দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বস্ত্র ও গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল। আগুন ঝাড়িয়া ফেলিয়া মোক্ষদা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, ভজহরির হাত হইতে তাহার হুকাটা কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা সজোরে তাহার মস্তকে প্রহার করিল। হুঁকার খোলটা চুরমার হইয়া গেল; জাঠ মোক্ষদার হাতে রহিল। বাপ্ বলিয়া ভজহরি মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তখন সেই জাঠ দিয়া মোক্ষদা তাহার পিঠে পটাপট ঘা কতক বসাইয়া দিয়া, একটু সরিয়া চালের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল। এইবার ভজহরি কি ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং ঐ আক্রমণ কি উপায়ে সে ব্যর্থ করিতে পারিবে ইহাই অবধারণ করিবার জন্য সে সতর্ক হইয়া রহিল।

ভজহরি কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিল না। উভয় হস্তে মাথাটি চাপিয়া ধরিয়া উহু উহু করিতে করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে উঠানে নামিল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়া শালী হারামজাদি; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, যাচ্ছি পুলিশে নালিস করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই তাহলে মিনসের ছেলেই নই।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ভজহবি চলিয়া গেলে, মোক্ষদা কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল, ক্রমে তাহার শ্বাসযন্ত্র সুস্থ হইলে ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যিই মিন্সের মাথা ফেটেছে নাকি? হুঁকোর খোলের ঘায় কখনও মাথা ফাটে?—ধেৎ! ও সব মিন্সের ঢঙ—ঢঙ। কিন্তু গেল কোথা? সত্যিই কি থানায় গেল নাকি? হুঃ—থানায় আর যেতে হয় না। থানা প্রায় এখানে! দুকোশ দূর। এই রাত্তিরে সে আবার থানায় যাবে, তুমিও যেমন। দেখ না, এখনই ফিরে আসবে বোধ হয়।"

মনকে এই প্রকারে প্রবোধ দিয়া মোক্ষদা গৃহকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। কাজ করে, আর বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে স্বামী ফিরিল কিনা। কাজ শেষ হইয়া গেল, জ্যোৎস্নাভরা উঠানের পানে চাহিয়া মোক্ষদা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া রহিল। রাত্রি এক প্রহর, দেড় প্রহর হইল, কই, স্বামী ত ফেরে না!

তখন মোক্ষদা স্থির করিল, নিশ্চয়ই মিন্সে থানায় গিয়াছে। মনে একটু রাগ হইল, ভয়ও হইল। 'সেপাই' আসিয়া সত্যিই কি তবে তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে? মোক্ষদা উঠিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ক্রমে তাহার ঘুম পাইতে লাগিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও বোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীর জন্য ভাত চাপা দিয়া রাখিয়া নিজে আহার করে। আবার ভাবিল, না থাক্, যদি আমায় ধরাইয়া দিবার জন্য সেপাই সঙ্গে করিয়াই আনে, আসিয়া দেখুক, যে স্ত্রীর সহিত সে এমন ব্যবহার কবিল, সে কিরূপ পতিব্রতা, স্বামীর খাওয়া হয় নাই বলিয়া নিজে উপবাসী আছে। তাই সে না খাইয়া, রোয়াকে আঁচল বিছাইয়া শুইল এবং ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

মোক্ষদার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন গভীর রাত্রি, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, শেয়াল ডাকিতেছে। তাহার বিশ্বাস শেয়ালেরা প্রহরে একবার করিয়া ডাকে—রাত্রি কি এখন দ্বিতীয় প্রহর, না তৃতীয়? ক্ষুধার যেরূপ প্রাবল্য তৃতীয় প্রহর হওয়াই সম্ভাবনা। থানার লোকে সম্ভবতঃ স্বামীকে বলিয়াছে, এত রাত্রে গিয়া আর কি হইবে, তুই এইখানে শুইয়া এখন ঘুমা, কাল সকালে তখন তোর বউকে ধরিতে যাইব, কাল বেলা এক প্রহর আন্দাজ সে সিপাহী লইয়া নিশ্চয়ই আসিবে। মোক্ষদা উঠিয়া, মুখে হাতে জল দিয়া, স্বামীর জন্য ভাত তরকারী ঢাকা দিয়া রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে আহারে বসিল। মাছের চচ্চড়ি খাইতে খাইতে তাহার

মনে হইল, "আমি খেতে ভালবাসি বলেই, বড় বড় মাছ ধরে আমায় খাওয়াবে বলেই, সে হুইল কিনে এনেছিল গো! তার জন্যে তাকে অমন করে "নাঞ্ছনা' করা আমার ভাল হয়নি।"—তাহার পর মনে হইল, 'আমি ত খাচ্ছি' থানায় তাকে তারা খেতেটেতে দিয়েছে কি না কে জানে! হয়ত না খেয়েই সেখানে পড়ে আছে।'—এই কথা মনে হওয়ায় মোক্ষদার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, আহার সমাপ্ত করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া রোয়াকে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঢুলিতে লাগিল; তাহার পর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

।। ৩ ।।

প্রাতে উঠিয়া, নিজ কুটীরের 'বাসিপাট' সারিয়া, মোক্ষদা পরগৃহে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ-কর্ম্মগুলি করিবার জন্য বাহির হইল। সে সব সারিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় দেড় প্রহর বেলা হইল। আসিবার সময় তাহার মনটা কেমন ভয় ভয় করিতেছিল, খুব সম্ভব বাড়ী গিয়া দেখিবে যে সিপাহী সহ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাই বাড়ীতে সহসা প্রবেশ না করিয়া, দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল—কই উঠানে বা রোয়াকে কেহই ত নাই!

মনিব বাড়ী হইতে মোক্ষদা দুইটি বেগুন আনিয়াছিল; ঘর খুলিয়া সে দুটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। অন্য দিন এই সময় সে উনান ধরাইযা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আজ আর রাঁধবার জন্য তাহার কোনও ব্যস্ততা দেখা গেল না। "আমি ওঁব জন্যে রেঁধে বেড়ে রাখি, আর উনি সেপাই এনে আমায় ধরিয়ে দিয়ে আরাম করে ভাত খেতে বসুন!—হ্যাঁঃ—রাঁধবে না আরও কিছু। অত সুখে আর কাজ নেই!" সুতরাং মোক্ষদা উনান ধরাইল না।

বেলা ক্রমে দুই প্রহর হইল, আড়াই প্রহর হইল; না স্বামী, না সেপাই, কই, কেহই ত আসে না! এখন মোক্ষদার মনে হইল, তবে কি সে থানায় যায় নাই? থানায় যদি না গেল, তবে গেল কোথায়? বিবাগী হইয়া কোনও দিকে চলিযা গেল নাকি? যদি আর ফিরিয়া না আসে?

এই সব ভাবনা চিন্তায় দিবা অবসান হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষদা কিছুই খায় নাই। স্বামীর জন্য গত রাত্রে যে ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া খাইতে বসিল। ভাবিল স্বামী যদি আসে, তাহাকে চারিটি গরম ভাত রাঁধিয়া দিবে।

ভাত রাঁধিতে হইল না। স্বামী ফিরিল না। কাঁদিয়া কাটিয়া মোক্ষদা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মোক্ষদা ভাবিল, "নাঃ এ কোন কাজের কথা নয়। থানায় গিয়ে খবর নিতে হচ্ছে, সেখানে সে আমার নামে নালিস করতে গিয়েছিল কিনা।" তখনই ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া, কিছু পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া থানা অভিমুখে যাত্রা কবিল।

থানায় গিয়া শুনিল, কোনও গ্রামের কোনও গোয়ালা, সে পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রীর নামে নালিস কবিতে আসে নাই। মোক্ষদা কাতব স্বরে বলিল, "তবে দারোগাবাবু, আমাব স্বামী গেল কোথায়?" কবে এবং কি অবস্থায় তাহাব স্বামী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, সমস্ত মোক্ষদাব মুখে শুনিযা দারোগাবাবু হুকুম দিলেন, "ওবে সেই কাপড়েব পুঁটুলিটা মালখানা থেকে বের কর্ ত।"

পুঁটুলি খোলা হইলে দাবোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ধুতি এ গামছা তুই চিনিস?"

মোক্ষদা শঙ্কিত হইযা বলল, 'এ ত তাবই ধুতি তাবই গামছা। তবে সে কোথায গেল দারোগা মশাই?"

দারোগা জানাইলেন, গতকল্য প্রাতে একজন মাঝি আসিয়া এই ধুতি গামছা দিয়া গিয়াছে এবং এজাহার করিয়াছে যে, রায়গঞ্জের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে রান্নার যোগাড়

করিতেছিল। রাত্রি তখন আন্দাজ এক প্রহর, তখন সে দেখিতে পাইল কালো মত লম্বা মত একটা লোক, তীরে আসিয়াই এই ধুতি গামছা ছাড়িয়া রাখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকটা হয়ত আত্মহত্যা করিবার জন্যই ওরূপ করিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া, মাঝি নৌকা খুলিয়া জলে জলে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল না। তখন সেই ধুতি গামছা সে নৌকায় তুলিয়া রাখিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া মোক্ষদা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

দারোগাবাবু অনেক যত্ন ও চেষ্টায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া, "মৃতকের" নাম ধাম বয়স পেশা আত্মহত্যা করিবার কারণ প্রভৃতি জানিয়া লইয়া, তাহা ডায়েরিভুক্ত করিয়া, মোক্ষদাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

॥ ৪ ॥

কোনও মতে স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি সারিয়া মোক্ষদা সেই ভগ্ন কুটীরেই বাস করিতে লাগিল। কোনও কাজ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পেট বড় শত্রু—আবার দুঃখধান্দা করিতে মোক্ষদাকে বাহির হইতে হইল। মাথায় গায়ে সে আর তেল মাখে না, রুক্ষ স্নান করে, দিনান্তে একমুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া খায়, খাইয়া নিজকুটীরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া কেবল কাঁদে। এখন কাঁদিয়াই তাহার সুখ।

কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোক তাহার এ সুখেও বাদ সাধিল। মোক্ষদার বয়স এখনও ত্রিশ বৎসরের নিম্নেই। একাকিনী বাস করে। অনেক রাত্রে বদলোক আসিয়া তাহার দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত এবং স্তুতি মিনতি আরম্ভ করিল। নিতান্ত অতিষ্ঠ হইলে মোক্ষদা ঝাঁটা হস্তে বাহির হইত। তথাপি শান্তি নাই—ক্রমে সে উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় একদিন ও পাড়ার কামারদের বিধবা বউ নিস্তারিণী কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সে কলিকাতায় কোন্ বাবুদের বাড়ী ঝিগিরি চাকুরী করে, বোনপোর বিবাহ উপলক্ষ্যে একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। তাহার কাছে কলিকাতার সব খবর শুনিয়া, মোক্ষদার মনে হইল, বদ্‌লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের এখন একমাত্র উপায়, কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া। নিস্তারিণী তাহাকে ভরসা দিল, একটি ভাল গৃহস্থ দেখিয়া, সেখানে মোক্ষদাকে নিযুক্ত করিয়া দিবে; কোনও কষ্ট হইবে না—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

মোক্ষদা বলিল, "কিন্তু দিদি, যে ভয়ে গাঁ ছাড়লাম, সেখানেও যদি সেই ভয় থাকে? কলকাতার লোকেরাই কি আর ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির?"

নিস্তারিণী বলিল, "সব রকম লোকই আছে। তা, তোকে এমন ভদ্র গেরস্তের বাড়ী দেখে রাখিয়ে দেবো, যেখানে সে সব আপদ বালাই থাকবে না।"

মাসান্তে দুই একখানা তৈজসপত্র এবং সামান্য গৃহোপকরণ যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া, ঘরে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, নিস্তারিণীর সহিত মোক্ষদা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

॥ ৫ ॥

নিস্তারিণী যে বাড়ীতে চাকরি করিত, সে বাড়ীতে অপর ঝি প্রয়োজন না থাকায়, মোক্ষদার জন্য সে একজন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের সন্ধানে রহিল। কয়েক দিন অন্বেষণের পর ঐরূপ একটি গৃহস্থের সন্ধান পাইল। শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে একজন ঝির প্রয়োজন। মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের একজন প্রবীণ উকীল; তাঁহার পুত্রগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া পাড়ার খ্যাতি আছে। নিস্তারিণী সেই বাড়ীতে মোক্ষদাকে লইয়া গেল।

রামদয়ালবাবুর গৃহিণী মোক্ষদাকে অল্পবয়স্কা এবং সুশ্রী দেখিয়া প্রথমে একটু আপত্তি

করিয়াছিলেন। পরে যখন তাহার বৈধব্যের ইতিহাস এবং গ্রামত্যাগের প্রকৃত কারণটা শুনিলেন, তখন সম্মত হইলেন। বাড়ীতে আরও দুইজন ঝি ছিল, তন্মধ্যে একটিকে বড়বধূমাতার শিশুসন্তানগুলির লালন পালনের ভার দিয়া মোক্ষদাকে তাহার স্থানে মায় খোরপোষ ৪টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন।

রামদয়ালবাবুর গৃহিণী বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী এবং দয়ামায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী। তাঁহার সংসারে আশ্রয় পাইয়া, কোনও বিষয়ে মোক্ষদার কোনও অসুবিধা রহিল না। নিজ গ্রামে থাকিলে অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে যে পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদান নির্ব্বাহ হইতে লাগিল এবং মাসে মাসে তাহার বেতনের চারটি টাকা গৃহিণী ঠাকুরাণীর নিকট জমা হইতে লাগিল।

গৃহিণী দেখিলেন, মোক্ষদা খুব পরিশ্রম করিতে পারে, মুখটি বুজিয়া আপন কাজ কর্ম্মগুলি করিয়া যায়, গোয়ালার মেয়ে হইলেও ভদ্রঘরের বিধবাদের মতই নিষ্ঠার সহিত বৈধব্য-আচার পালন করিয়া থাকে; তবে দোষের মধ্যে রাগটা একটু বেশী। অপর দুইজন ঝির সহিত মাঝে মাঝে সে কোন্দল করে; গৃহিণী তখন মধ্যস্থ হইয়া, কাহাকেও বা মৃদু তিরস্কার করিয়া, কাহাকেও মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া মিটমাট করিয়া দেন।

এইরূপে মোক্ষদা তিন বৎসর এই বাড়ীতে চাকরি কবিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, কিছুদিনের ছুটি লইয়া দিনকয়েকের জন্য নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়; তাহার ঘর দুয়ারের এখন কি অবস্থা তাহা দেখিয়া আসে; কিন্তু আবার মনে হইত, আর সে শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া লাভ কি?

শ্রাবণ মাসে জ্বরে পড়িয়া মিত্র গৃহিণী কিছু দিন খুব ভুগিলেন, তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গেল, দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়েন। তাই পূজার ছুটির সময় রামদয়ালবাবু সপরিবারে মধুপুরে গিয়া গৃহিণীকে তিনমাস বায়ুপরিবর্ত্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এক এটর্ণি বন্ধু কালীপদবাবুও সপরিবাবে মধুপুর যাইতেছিলেন,—সেখানে তাঁহার নিজ দুইখানি বাড়ী আছে, বাড়ী দুইখানি পাশাপাশি, তাহারই একখানি রামদয়ালবাবু ভাড়া লইলেন।

রামদয়ালবাবুর মধ্যম পুত্র চারুভূষণবাবু গ্রিণ্‌লে ফিওর কোম্পানির বাড়ী কেশিয়ারি কর্ম্ম করেন; তাঁহার ছুটি অতি অল্প দিন মাত্র, তাই তিনি সপরিবারে বাড়ীতেই থাকিবেন, অপর সকলে মধুপুরে যাইবেন স্থির হইল। ঝিয়েদের মধ্যে মোক্ষদা ও বিমলা মধুপুরে যাইবে; কামিনী কলিকাতায় থাকিবে।

গাড়ী রিজার্ভ করা হইল। যথা দিনে রামদয়ালবাবু সপরিবারে যাত্রা করিয়া মধুপুবে পৌঁছিলেন।

এটর্ণিবাবুরা তখনও পৌঁছেন নাই। বাড়ীতে পূজা—পূজা সারিয়া তবে তাঁহারা বাহির হইবেন।

কয়েকদিন মধুপুরে মোক্ষদার বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। গৃহিণী যখন বিকালে পুত্রকন্যাগণ সহ বেড়াইতে বাহির হইতেন, মোক্ষদাও তাঁহার সহিত যাইত। তিন বৎসর কাল কলিকাতায় গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। খোলা মাঠে বেড়াইতে পাইয়া মোক্ষদা বড় আরাম বোধ করিল।

পূজার পর এটর্ণিবাবুরা সদলবলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহিণীর সহিত বেড়াইয়া আসিয়া মোক্ষদা দেখিল, বৈঠকখানা ঘরে তার মনিব এবং পাশের বাড়ীর এটর্ণিবাবু বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। রামদয়ালবাবু বলিলেন, "আপনি তামাকখোর মানুষ; আমাদের ত ও পাট নেই;—আপনাকে একটা সিগারেট দিতে বলবো কি?"—তিনি জানিতেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাংশু সিগারেট ব্যবহার করিয়া থাকে।

এটর্নিবাবু বলিলেন, "দরকার কি? আমার গুড়গুড়িটা আনিয়ে নিচ্ছি।"—বলিয়া তিনি বাহিরের বারন্দার প্রান্তে গিয়া হাঁকিলেন, "ভজা—ও ভজা।"

পাশের ঘরে মোক্ষদা বসিয়া পান সাজিতেছিল, "ভজা" নামটা শুনিবামাত্র সে কান খাড়া করিল। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আবার নিজ কার্য্যে মন দিল।

দুই তিনবার ডাকাডাকির পর ও বাড়ী হইতে সমুচ্চ স্বরে উত্তর আসিল—"আজ্ঞে।"

ও কি? কার কণ্ঠস্বর? মোক্ষদার মাথার ভিতর বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এটর্নিবাবু হাঁকিলেন, "আমার গুড়গুড়িটি নিয়ে আয় ত ভজা!"

উত্তর আসিল "আজ্ঞে যাই।"

মোক্ষদার আর পানসাজা হইল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। চুনের আঙুল বস্ত্রপ্রান্তে মুছিয়া, কম্পিত পদে, দুরু দুরু বক্ষে সে বাহির হইয়া এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, যেখান হইতে বৈঠকখানা ঘরেব মধ্যভাগটি স্পষ্ট রূপে দেখা যায়।

কিয়ৎক্ষণ পবেই কুণ্ডলীকৃত নললগ্ন এক প্রকাণ্ড ফরসী হস্তে এটর্নিবাবুর ভৃত্য প্রবেশ করিল।

তাহাব মুখের পানে এক নজর মাত্র চাহিয়া দেখিয়াই, মোক্ষদার হস্তপদ একেবারে অবশ হইয়া আসিল। পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সে দুই হাতে সম্মুখের দেওয়ালটায় ভর দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না; ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ভৃত্যকে দেখিয়া, বৈঠকখানা ঘরে এটর্নিবাবু বলিলেন, "কল্‌কে কই রে? তামাক সেজে আনিসনি?"

ভজা বলিল, "আজ্ঞে তা তো আপনি বলেননি!"

এটর্নিবাবু উকীলবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেটা গয়লার বুদ্ধি দেখলেন মশাই!" ভৃত্যকে বলিলেন, "যা তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর খানিকটে তামাক গোটাকতক টিকে, দেশলাইয়ের বাক্স, এই সবও নিয়ে আয়। এবার বুঝলি ত?"

"আজ্ঞে" বলিয়া ভজহরি প্রস্থান করিল।

রামদয়ালবাবু বলিলেন, "আপনি এ রত্নটি পেলেন কোথা?"

এটর্নিবাবু বলিলেন, "সে মশায়, এক মস্ত ইতিহাস—উপন্যাস বললেও চলে।"

"কি বকম?"

এটর্নি বলিতে লাগিলেন, "বছর চারেক আগে ডিস্পেপসিযার জন্য ডাক্তারেরা আমাকে দিনকতক স্টীমারে বেড়াবার পবামর্শ দিয়েছিল, না? তিনমাসের জন্যে একটা ষ্টীমলঞ্চ ভাড়া করে, পদ্মানদীর উপর আমি ঘুরে বেড়াতাম। একদিন সন্ধ্যার পর ঘাট থেকে কিছুদূরে নোঙর ফেলে ডেকে বসে আমি তামাক খাচ্ছি। চাঁদ উঠেছে, জলের শোভা দেখছি; এমন সময় দেখলাম খানিক দূবে একটা মানুষ একবার জল থেকে মাথা তুলছে আবার ডুবছে। ষ্টীমারের দুজন খালাসীকে তখন বললাম—ওরে, একটা মানুষ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে, দেখ্ দেখি যদি তোরা ওকে বাঁচাতে পারিস। তারা তখনি, দড়ি বাঁধা দুটো লাইফ বেল্ট নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। কাছাকাছি গিয়ে সেই বেল্ট দুটো ছুঁড়ে লোকটার কাছে ফেলে দিলে। একটা বেল্ট সে ধরে ফেললে। তার পর খালাসীরা নানারকম কৌশল কবে তাকে ষ্টীমাবে এনে তুললে। রাম বাম—একেবাবে উলঙ্গ ল্যাংটা মশাই! খালাসীরা তাকে একটা লুঙ্গি পরিয়ে দিলে। বেটা অনেক জল খেয়েছিল, আমার সঙ্গে ডাক্তারবাবু ছিলেন তিনি ওকে বমি-টমি করালেন, ব্রাণ্ডি খাওয়ালেন, ক্রমে বেটা সুস্থ হয়ে উঠলো। তিনিই হন ঐ ভজহরি।"

রামদয়ালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে ডুবেছিল তা কিছু বললে?"

"বললে বইকি। বললে আমার 'ইস্তিরী' মারা গেছে, সেই 'শোগে' আমি আত্মহত্যা করছিলাম। কাপড় কি হল জিজ্ঞাসা করায় বললে, কাপড় গামছা ডাঙ্গায় রেখে আমি

জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। ভাবলাম, আমি ত মরছিই ধুতিখানা এখানেই ফেলে রাখি, কোনও গরীব কুড়িয়ে পেয়ে পরে বাঁচবে।"

রামদয়ালবাবু বলিলেন, "অদ্ভুত!"

এটর্ণিবাবু বলিলেন, "অদ্ভুত বইকি! আমি ভাবলাম একাধারে এত পত্নীপ্রেম, আর এত বিশ্বপ্রেম ত দেখা যায় না। একে হাতছাড়া করা হবে না। চাকর স্বরূপ ষ্টীমারেই ওকে রাখলাম। মাসখানেক পরে কলকাতায় ফিরে এলাম। তার পর, ওর আমি বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, বলেছি টাকা দিচ্ছি, দেশে গিয়ে আবার বিয়ে থাওয়া করে আয়। তা বেটা কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, যার মুখে আগুন দিয়েছি, তাকে যে ভুলতে পারিনি হুজুর! বিয়ে আর আমি করবো না।"

রামদয়ালবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য মানুষ ত!"

"আশ্চর্য্য বইকি!"

মোক্ষদা পূর্ব্ব স্থানেই ছিল, কিন্তু এ সকল কথাবার্ত্তার একটি বর্ণও সে শুনিতে পায় নাই। মৃত স্বামীকে জীবিত মূর্ত্তিতে দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল।

॥ ৬ ॥

মোক্ষদার সহিত ভজহরির গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে—কিন্তু কোনও পক্ষের মনিব পরিবারকে এ পর্যন্ত কিছুই জানানো হয় নাই। মোক্ষদার ভারি লজ্জা করে—ছিঃ এতদিন বিধবার মত থাকিয়া কেমন করিয়া বলিবে ও বাড়ীর ঐ ভজা আমার স্বামী! লোকে যদি অবিশ্বাস করে, তখন সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাইবে? ভজাও তাহার মনিবকে বলিতে সাহস করে না—তিনি শুনিলেও হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না; হয়ত ভাবিবেন, ও বাড়ীর ঐ সুশ্রী ঝিটার উপর তাহার লোভ পড়াতে ছুঁড়িকে বাজি করিয়া এই মিথ্যা দাবী উপস্থিত করিয়াছেন এবং জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দিবেন।

এখন আর মোক্ষদা গৃহিণীর সহিত বিকালে বেড়াইতে যায় না; উভয় বাটীর লোকে বেড়াইতে বাহির হইলে সে স্বামীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করে এবং মাঝে মাঝে সে সুযোগ পাইয়াও থাকে। উভয় বাটীর বাগানের সীমানার পশ্চাদ্‌ভাগে একটা মস্ত কামিনী ফুলের ঝাড় আছে, তাহার আড়ালে বসিয়া উভয়ে প্রায়ই কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্ত্তা কহে।

প্রথম দিন মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হ্যাঁবে, তুই এমন কাজ কেন করতে গিয়েছিলি বল্ দেখি?"

ভজা বলিয়াছিল, "থানায় যাচ্ছি বলে তোকে শাসিয়ে সেই যে বাড়ী থেকে বেরুলাম;—বুঝলি মুখী, খানিক দূরে গিয়ে ভাবলাম, তুই হলি আমার আপন ইস্তিরী, তোকে জেলে দেওয়াটা ত ভাল হবে না, লোকে শুনলে বলবে কি? গায়ে থুতু দেবে যে! তার চেয়ে বরং অন্য রকমে তোকে জব্দ করাই ভাল। মাছ খেতে তুই বড্ড ভালবাসিস, মাছ না পেলে ধড়ফড়িয়ে মরিস, তাই ভাবলাম, দাঁড়া তোকে জব্দ করছি। তোকে বিধবা করে তোর মাছ খাওয়া বন্ধ করছি শালী!—এই ভেবেই ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে পদ্মায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।"

"ধুতি গামছা ডাঙায় ছেড়ে রেখে গিয়েছিলি কেন?"

"গাঁয়েরই ঘাট ত'! সেই ধুতি গামছা ওখানে দেখে, কেউ না কেউ চিনতে পারবে— আমার লাস যদি ভেসে নাও ওঠে, তা হলেও বোঝা যাবে যে জলে ডুবে আমি আত্মহত্যে করেছি। তবে ত তোর মাছ খাওয়া বন্ধ হবে!"

মোক্ষদা বলিল, "তোর কি বুদ্ধি রে! আচ্ছা যখন দেখলি যে বেঁচে আছিস, তখন বাড়ী এলিনে কেন?"

"চাকরি করছিলাম যে? ভেবেছিলাম, মাসকতক চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো আমি রোজগার করতে পারি কি না। দেশে গিয়ে শুনলাম, তুইও কলকাতায় এসেছিস চাকরি করতে। সেই অবধি কত জায়গায় যে তোকে খুঁজেছি তার ঠিক নেই। কারু বাড়ীর ঝিকে পথে ঘাটে দেখলেই অমনি তার পিছু নিয়েছি। জিজ্ঞাসা করেছি 'হ্যাঁগা, রায়গঞ্জের মোক্ষদা গয়লানী কোথায় ঝিগিরি চাকরি করে জান কি? কেউ বলতে পারেনি।"

পরদিন বিকালে যখন কামিনী ঝাড়ের আড়ালে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন ভজহরি কলাপাতায় জড়ানো একখণ্ড ভাজা মাছ বাহির করিল দেখিয়া মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, "মাছ আনলি কোত্থেকে?"

ভজহরি বলিল, "আজ চার বচ্ছর তুই মাছ খেতে পাসনি—আহা তোর কত কষ্ট হয়েছে! তাই তোর জন্য এনেছি।"

"কোথা পেলি?"

"বামুন ঠাকুর আজ ভাতের সঙ্গে আমায় যে মাছ দিয়েছিল, সে মাছ আমি খাইনি, তোর জন্যে নুকিয়ে রেখেছিলাম। নে, খা"—অল্প দূরেই একটা খাল ছিল। মোক্ষদা চারি বৎসব পরে স্বামীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, সেই খালের জলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে বসিল।

প্রায় প্রতিদিনই উভয়ের এইরূপ সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ২/৪ মিনিটের অধিক উভয়ে একত্র থাকিত না। ক্রমে সাহস বাড়িয়া গেল, অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পরও বসিয়া থাকিত।

উভয়ের বিরহাবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা পবস্পরের নিকট তাহারা করিয়াছে। ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইয়াছে যে, এখন বিদেশে যাইতে চাহিলে তাহা মঞ্জুব হইবে না, মাস দুই পরে কলিকাতায় ফিবিয়া, উভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবে এবং উভয়ের সঞ্চিত অর্থে গুটিকয়েক গাভী কিনিয়া, বাড়ীতে বসিয়া জাতি ব্যবসায় আরম্ভ করিবে।

প্রথম সাক্ষাতের দশ বারোদিন পরে, একদিন যথানিয়মে যথাস্থানে দুইজনে মিলিত হইল। কলিকাতা হইতে ভজার মনিবের ইলিশ মাছ আসিয়াছিল। বামুন ঠাকুরের খোসামোদ করিয়া বেশ বড় একখানা পেটির মাছ সেদিন ভজা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মাছ বাহির করিযা বলিল, "খাসা মাছ রে! যখন ভাজছিল গন্ধে বাড়ী মাত করে দিয়েছিল। কত বড় পেটিখানা তোব জন্যে এনেছি দ্যাখ্ দ্যাখ্। আজ আমার সাধ হয়েছে আমি হাতে করে তোকে খাইয়ে দেবো। কাছে সরে আয়, হাঁ কর্।"

মোক্ষদা হাসিয়া স্বামীর কাছটি ঘেঁসিয়া বসিল। ভজা আদর করিয়া বাম হস্তে স্ত্রীর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে মাছ খাওযাইতে লাগিল।

কিন্তু এ দাম্পত্যলীলায় সহসা বাধা পড়িল। পশ্চাদ্দেশে কাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে, ভজহরি হুমড়ি খাইয়া বিপুলবেগে মোক্ষদার গায়ের উপর পড়িয়া, উভয়ই ধরাশায়ী হইল। চমক ভাঙ্গিলে উভয়ে চোখ চাহিয়া দেখিল এটর্ণিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রবাবু, বীরবিক্রমে রক্তনেত্রে চাহিয়া আছেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র মোক্ষদা এঁটো মুখে ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অবিলম্বে সেখান হইতে পলায়ন করিল। ভজহরিও কষ্টে কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্রবাবু ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, "তবে রে হারামজাদা! ভারি যে সাধুগিরি ফলাতিস!" বলিয়া তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা থাপ্পড় কষাইয়া দিলেন।

ভজহরি হস্ত দ্বারা সে প্রহার রোধ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হুজুর মারেন কেন? ও যে আমার ইস্তিরী—আপন বিয়ে করা ইস্তিরী হুজুর।

বাবু বলিতে লাগিলেন, "তোর বিয়ে করা ইস্তিরী বইকি পাজি নচ্ছার শুয়ার! সে ত

কবে মরে গেছে! ও ছুঁড়িটাকে আমি কি চিনিনে মনে করেছিস? ও তো উকীলবাবুর ঝি—বিধবা মানুষ। আর বদমাইসির জায়গা পেলিনে হতভাগা গাধা! ক'দিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছে। সন্ধ্যেটি হলেই তুইও দেখি এদিকে আসিস আর ও বাড়ীর ঐ ঝি হারামজাদীও এই দিকে আসে। তাই আমি তক্কে তক্কে থেকে আজ এসে ধরেছি। চল্ বাবার কাছে, সব কথা গিয়ে তাঁকে বলি, রাস্কেল তিনি তোর কি শাস্তি করেন দ্যাখ্।"—বলিয়া বীরেন্দ্রবাবু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। ভজহরি কাঁদিকে কাঁদিতে কোমরটি দুই হাতে ধরিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয় বাটীর লোকেরা বৈকালিক ভ্রমণ হইতে ফিবিবামাত্র কথাটা তাঁহাদেব নিকট প্রচাবিত হইয়া পড়িল। ভজহরি যে মোক্ষদাকে স্ত্রী বলিয়া দাবী করিতেছে, তাহাও তাঁহারা শুনিলেন। মিত্রগৃহিণী ও বড়বধূব নিকট মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই খুলিয়া বলিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন; কিন্তু উভয় বাটীর পুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।

তখন রামদয়ালবাবুর বৈঠকখানায় ভজহরির বিচারের জন্য ফুলবেঞ্চ বসিল। এটর্ণিবাবু বলিলেন, "এর মীমাংসা ত সহজেই হতে পারে। ওহে সুধাংশু! দুজনাকে তুমি আলাদা জেরা কর না! ওদের কথা যদি মিথ্যে হয় জেরায কতক্ষণ টিকবে?"

সুধাংশুবাবু তাহাই করিলেন। মোক্ষদাকে অন্তঃপুবে নিজ স্ত্রীব জিম্মায় বসাইয়া রাখিয়া, ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পদাঘাতজনিত কোমবের ব্যথায় কাতরাইতে কাতরাইতে সে আসিয়া মেঝেয় বসিল। সুধাংশুবাবু তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা কবিলেন, যথা—তোদের বাড়ীতে ক'খানা ঘব, কোন্ কোন্ মুখো ঘব, কোন্ ঘরে কি কি থাকত, যে পুকুরে তোরা জল সরতিস, সে পুকুর বাড়ীর কোন্ দিকে তার কটা ঘাট সে পুকুবে যেতে হলে কোনও গাছের তলা দিয়ে যেতে হয় কি না, সেগুলো কি কি গাছ, যাদের বাড়ীতে মোক্ষদা কাজকর্ম্ম করত তাদেব নাম কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। ভজহরিব উত্তরগুলি সুধাংশুবাবু লিখিয়া লইলেন।

তারপর মোক্ষদাব ডাক পড়িল। তাহাকেও অবিকল ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা কবা হইল। উভয়ের উত্তরে বিশেষ কোনও পার্থক্য পাওয়া গেল না। ভজহরি তখন স্ত্রীব উপর সত্ত সাব্যস্তের ডিক্রী পাইল।

যতদিন মধুপুরে থাকা হইবে ততদিন এই দম্পতীব বাসের জন্য মিত্রগৃহিণী তাঁহার বাসার আস্তাবলের পার্শ্বস্থ কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহাবই পবামর্শে শয়ন কবিতে যাইবার পূর্ব্বে মোক্ষদা একটা বাটীতে কর্পূব মিশানো খানিকটা তার্পিণ তৈল লইয়া গিয়া স্বামীর ব্যথিত কোমরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে মালিস করিয়া দিল।

একমাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া উভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া, সঞ্চিত অর্থ লইযা দেশে চলিয়া গেল। তথায় কুটীরখানিব জীর্ণসংস্কাব কবিযা, একটি গোয়াল ঘব তুলিয়া গাভী কিনিয়া জাতি ব্যবসায সুরু কবিয়া দিল। দুধে যে কি পরিমাণ জল স্বচ্ছন্দে মিশানো যাইতে পারে, সে বিষয়ে উভয়ের কলিকাতার অভিজ্ঞতা খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছিল।

ঔপন্যাসিক

কলিকাতার কোনও একটি মেসের বাসায়, নবীন ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রবাবু বসিয়া তাঁহার নূতন উপন্যাসের শেষ প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। ভাদ্রমাস, রবিবার বেলা নয়টা, আকাশে মেঘ থমথম করিতেছে, একটুও বাতাস নাই, মাঝে মাঝে তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া প্রুফশীটের উপর পড়িতেছে। মাঝে মাঝে প্রুফগুলোর উপর দোয়াত চাপা দিয়া পার্শ্বস্থ পাখাখানা উঠাইয়া লইয়া নগেন্দ্রবাবু নিজেকে বাতাস করিতেছেন;—আবার সংশোধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন। সম্মুখে পূজা, বহিখানি এই সপ্তাহেই বাহির করা প্রয়োজন।

এই নগেন্দ্রবাবুর বয়স এখন ২৬ বৎসর মাত্র। নিবাস, পাবনা জেলার কোনও এক দূর পল্লীগ্রামে। আই-এ পরীক্ষায় একবার ফেল করিয়া আর পড়িবার সঙ্গতি হয় নাই—বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না—অনেক চেষ্টা চরিত্র ও সহি-সুপারিসের বলে গ্রিন্‌লে ফিওর কোম্পানির আপিসে চারি বৎসর হইল সামান্য বেতনে কেরাণিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এখন বেতন ও পদবৃদ্ধি হইয়াছে। অসচ্ছল অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া, দেশস্থ আত্মীয়গণের প্রবল অনুরোধ সত্ত্বেও আজিও বিবাহ করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্রবাবুর মনে ঔপন্যাসিক হইবার একটা প্রবল আকাঙ্খা ছিল। চাকরিতে ভর্ত্তি হইয়া প্রথম বৎসরে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া, মাসিকপত্রে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও সম্পাদকই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। এই কারণে বৎসরখানেক ধরিয়া তিনি ভগ্নোদ্যম হইয়া বসিয়া ছিলেন। তারপর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের "আর্ট"-এর যুগ আরম্ভ হইল; এবং যাঁহারা "আর্ট"-মূলক উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পুস্তক (বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়গামী বালক ও তরুণ যুবকগণের মধ্যে) হু হু করিয়া বিকাইতে লাগিল। এই উপন্যাসগুলি নানা কাগজে যতই "অশ্লীল" বলিয়া গালি খাইতে লাগিল ততই ইহাদের কাট্‌তি বাড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া নগেন্দ্রবাবুও আবার খাতা বাঁধিলেন। ৩/৪ মাস পরিশ্রম করিয়া আর্টমূলক একখানি উপন্যাস লিখিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এমন কোনই মূল্যবান জিনিস নহে, যাহার জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সতীত্ব বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, তাহার মূলে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নাই। শাস্ত্র ও সমাজে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া এতকাল স্ত্রীজাতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, এ নূতন আলোর যুগে আর তাহা চলিবে না। পুরুষের যেমন যা-খুশী করিবার অধিকার আছে, স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ অধিকার থাকাই ন্যায়সঙ্গত—ইত্যাদি। লিখিলেন বটে তাহাতে আর্ট কিছু রহিল বটে, কিন্তু আর্টের "নগ্নচিত্র" তাহাতে তেমন ভাল ফুটিল না। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে, কতকটা লেখাপড়াও শিখিয়াছেন, তাই একটু সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন উদ্যমশীল প্রকাশক বহিখানি ছাপাইবার ভার লইলেন, পুস্তকের মধ্যে আর্টের যেটুকু অভাব ছিল প্রকাশক তাহা বিজ্ঞাপনের দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, বৎসর না ঘুরিতেই প্রথম সংস্করণ কাটাইয়া দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। কিন্তু টাকাও নগেন্দ্রবাবুর পকেটগত হইল।

এইরূপে উৎসাহ পাইয়া, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার এই তৃতীয় উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। এবার পূর্ব্ব সঙ্কোচ অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন—বেশ "নির্ভীক" ভাবেই এবার আর্টের "নগ্নচিত্র" অঙ্কিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের মূর্খ অন্ধ সমাজ যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই যথার্থ স্বর্গের দেবী—তাহাদের হৃদয়গুলি কুসুমের মত কোমল ও পবিত্র—দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে তাহারা ভূষিত, অপরপক্ষে গৃহস্থ

মেয়েদের মন অতি নীচ, অতি সঙ্কীর্ণ; তাহার নিতান্ত স্বার্থপর, ক্রোধী, কটুভাষিণী—এক কথায় তাহাদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী।

নগেন্দ্রবাবু বসিয়া প্রুফ দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে দশটা বাজিল, সাড়ে দশটা বাজিল। ঝি আসিয়া স্নানের জন্য তাগাদা জানাইল; নগেন্দ্রবাবু সে কথা কানে তুলিলেন না। ক্রমে সুধীর নামক একজন সুদর্শন যুবা আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলিল, "দাদা আর বাকী কত?"—সুধীরও এই বাসাতেই থাকে।

নগেন্দ্রবাবু অসংশোধিত কাগজগুলি গণিয়া বলিলেন, "আর চার শীট আছে।"

সুধীর বিনীত স্বরে বলিল, "স্নান আহার করে ওগুলো দেখলে হত না?"

নগেন্দ্র বলিল, "দেরী হয়ে যাবে যে ভাই। আজকেই তারা পেজ বেঁধে অর্ডার প্রুফ দেবে বলেছে, সেইজন্যেই আজ রবিবার হলেও ছাপাখানার লোক বের করেছে। কালই তারা ছাপা শেষ করতে চায়। বইখানা যাতে এই হপ্তার মধ্যে বেরিয়ে যায়, তার জন্যে প্রকাশক তাদের কড়া তাগাদা দিচ্ছেন।"

সুধীর বলিল, "আচ্ছা দাদা, এক কাজ করুন না। আপনি স্নানাহার করতে যান, প্রুফ যতগুলো দেখা হয়েছে, আমি এখনই গিয়ে ছাপাখানায় দিয়ে আসছি। ততক্ষণ তাদের কাজ চলুক। বলে আসবো, আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বাকীটুকু দিয়ে যাব।"

নগেন্দ্র বলিল "এই রোদ্দুরে দু'দুবার তুমি সেই দর্জ্জিপাড়া হাঁটাহাঁটি করবে? তার চেয়ে বরঞ্চ আধঘণ্টা খানিক বস, শেষই করে দিই—একেবারে নিয়ে যেও।"

সুধীর বলিল, "না দাদা, দু'বার প্রেসে যেতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আপনি উঠুন স্নান করে ভাত খান। কলের জল ত বহুক্ষণ চলে গেছে, চৌবাচ্চার জলেও তলানি পড়ে গেছে। ভাতও প্রায় শুকিয়ে উঠলো।"

এই সুধীর কলেজের একজন ছাত্র এবং নগেন্দ্রবাবুর একজন পরম ভক্ত। কেহ নগেন্দ্রনাথের লেখা নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিলে সুধীর তাহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্কে লাগিয়া যায়;—বলে, "তোমরা সব পেঁচার জাত, একাল অন্ধকারেই অভ্যস্ত ছিলে; এখন সাহিত্যের এই নবযুগের আলো দেখে কিচির মিচির আরম্ভ করেছ।" আরও কত কি বলে।

ভক্তের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, নগেন্দ্র উঠিল। সংশোধিত শীটগুলির পত্রাঙ্ক মিলাইয়া, পিনে গাঁথিযা সুধীবেব হস্তে দিয়া, স্নানার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুধীর প্রুফগুলি লইয়া প্রেসে দিতে গেল।

॥ ২ ॥

নগেন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস "সমাজদ্রোহী" প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তাহখানেক পরে, অফিসের ফেরৎ একদিন বিকালে নগেন্দ্র তাহাব প্রকাশকের দোকানে আসিয়া দর্শন দিল। প্রকাশক মহাশয় তখন তাঁহার খাসকামরায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া বলিলেন, "এক পেয়ালা চা দিক?" নগেন্দ্র সম্মতি জানাইলে প্রকাশক মহাশয় হাঁকিলেন, "ওরে, নগেন্দ্রবাবুকে এক পেযালা চা দে; আর আমার জন্যেও আর এক পেয়ালা আনিস।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সমাজদ্রোহী কিরকম বিক্রী হচ্ছে?"

প্রকাশক বলিলেন, "বেশ টানছে। এই এক সপ্তাহ ত বই বেরিয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় ২৫০ গেছে। পূজোর মধ্যে ৪/৫ শো কেটে যাবে বোধ হয়।"

শুনিয়া নগেন্দ্রের মনটি পুলকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কেমন বলছে?"

প্রকাশক বলিলেন, "তা—ভালই বলেছে। কিন্তু কেউ কেউ আবার বলছে, অন্য সব জায়গা ভাল হয়েছে, কিন্তু গণিকা-চরিত্রগুলো ভাল হয়নি।"

নগেন্দ্র একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রুচিবাগীশ মহাশয়েরা বুঝি?"
প্রকাশক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না, তারা রুচিবাগীশ দলের লোক নয়। বরং একটু—অর্থাৎ—ইয়ে দলের। তারাই ত বেশীরভাগ খদ্দের কিনা। তারা বলছে মশাই, নগেনবাবু ঐ যে গণিকা-চরিত্রগুলি এঁকেছেন, ও সাফ কল্পনা। তাদেরকে চাল চলন কি ঐ রকম, না তাদের কথাবার্ত্তা ঐ রকম রবিঠাকুরী ধাঁচের? নগেন্দ্রবাবু বোধ হয় জ্যান্ত গণিকার সঙ্গে কখনও কোনও কারবার করেন নি; তাই তাদিকে এমন অদ্ভুত করে এঁকেছেন। চিত্রগুলি যদি বাস্তব হত তা হলে বইখানি আরও বেশী হৃদয়গ্রাহী হতে পারতো। এই কথা তো তারা বলে।" বলিয়া প্রকাশক মহাশয় অবনত মুখে চা পান করিতে লাগিলেন।
নগেন্দ্র এই সমালোচনা খণ্ডন করিতে পারিল না। বাস্তবিকই ত, গণিকা-চরিত্র অঙ্কিত করিতে সে নিজ অভিজ্ঞতার কিছুমাত্র সাহায্য পায় নাই। নাটকে উপন্যাসে গণিকাদের বর্ণনা এবং লোক মুখে কিছু কিছু শুনা মাত্রই ত তাহার অবলম্বন! এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চা পান শেষ করিল।
নগেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া প্রকাশক বলিলেন, "আপনি যদি ঐ সব দলে মাঝে মাঝে একটু আধটু মেশেন, তাতে আর ক্ষতিটা কি? বিলাতী ঔপন্যাসিকেরা যাঁরা দরিদ্রপল্লীর গল্প লিখবেন, তাঁরা রীতিমত দরিদ্র সেজে তাদের পল্লীতে গিয়ে বাস করে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে' নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' এনে নভেল লেখেন শুনেছি।
আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নগেন্দ্র উঠিল। প্রকাশক বলিলেন, "আমার কথাটা ভেবে দেখবেন তা হলে?"
"হ্যাঁ—ভেবে দেখব বইকি।" বলিয়া নগেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

॥ ৩ ॥

সেই দিন রাত্রে আহারের পর, বাসাব নির্জ্জন ছাদে বসিয়া নগেন সুধীরকে তাহার প্রকাশকের মন্তব্য ও প্রস্তাবটা জানাইল। শুনিয়া সুধীর প্রথমটা শিহরিয়া উঠিল; বলিল ছি ছি, তাও কি হয়?"
নগেন্দ্র সুধীরকে বুঝাইল, উদ্দেশ্য যখন মন্দ নহে, উদ্দেশ্য যখন কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়—জ্ঞান আহরণ—তখন আর ইহাতে দোষটা কি? কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সুধীর স্বীকার করিল যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওরূপ কার্য্য দোষাবহ হইবে না বটে। জিজ্ঞাসা করিল, "তা আপনি তাদের সঙ্গে কি করে মিশবেন? কাউকে তা আপনি জানেন না!"
নগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচযের জন্যে কোনও সুপারিশ বা পরিচয়-পত্র আবশ্যক হয় না হে! কিঞ্চিৎ অর্থ থাকলেই হল। কিন্তু আমি যে মৎলবটি ঠিক করেছি তাতে বোধ হয় টাকারও কোনও আবশ্যক হবে না।"
সুধীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"
নগেন্দ্র বলিল, "আমাদের রজনাথ মল্লিক—আমাদের চা-বাগানগুলিতে যিনি কোদাল আব কম্বল সরবরাহ করেন তিনি বছর দুই আগে আমাকে একবার তাঁর বাগান পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে, ঐ দলের একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এমন তার স্বভাব, এমন কথাবার্ত্তা যে, সে আর তোমায় কি বলব! সে আমায় তার ঠিকানা দিয়েছিল; তার সঙ্গে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল। ভাবছি, তাকেই চিঠি লিখে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তার মন যে রকম উঁচু কখনই সে আমার কাছে টাকা চাইবে না। কিছুদিন মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করলে তাকেও বেশ চিনতে পারবো, ঐ দলের আরও কত স্ত্রীলোক ত সেখানে যাওয়া আসা করে, তাদেরও চালচলন, কথাবার্ত্তা, জীবনযাত্রা প্রণালী 'ষ্ট্যাডি' করবার বেশ সুযোগ পাব।"

সুধীর কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিল। শেষে বলিল, "কিন্তু দাদা, মানুষের মন; শেষে হিতে বিপরীত ঘটিয়ে বসবেন না ত?"

নগেন হাসিয়া বলিল, "সে ভয় নেই। আমি তার গোড়া মেরে রেখে তবে গিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।"

সুধীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে দাদা?"

নগেন বলিল, "সে তুমি কাল জানতে পারবে।"

॥ ৪ ॥

নগেন্দ্র রাত্রে শয়নঘরে খিল বন্ধ করিয়া এই পত্রখানি লিখিল—

স্নেহের ভগিনী,

তোমার স্মরণ আছে কি না জানি না, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কাশীপুরের এক বাগানে এক রাত্রে তুমি মুজরা করিতে গিয়াছিলে, সেইখানে তোমার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। রাত্রি একটু অধিক হইলেই, সমবেত স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুরাপানে হতজ্ঞান অবস্থায় ভূমিতে লুটাইতেছিল, কেবল তুমি এবং আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সহিত আসিয়া আলাপ করিয়াছিলে এবং আমাকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া তুমি নিজে উদ্যোগিনী হইয়া পাকশালা হইতে খাবার আনাইয়া পরম যত্নে আমায় খাওয়াইয়াছিলে। আশা করি এখন তোমার সব কথা মনে পড়িবে।

সে রাত্রে তোমার ঠিকানাযুক্ত একখানি কাগজ তুমি আমায় দিয়াছিলে এবং অনুরোধ করিয়াছিলে যে, আমি যেন একদিন গিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তখন তোমায় মৌখিক সম্মতি জানাইয়াছিলাম, যদিও মনে মনে স্থির জানিতাম যে, তোমার অনুরোধ আমি কখনও পালন করিব না। কারণ তখন ওরূপ কার্য্যকে আমি অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত বলিয়া মনে করিতাম। তাই আমার সে মৌখিক প্রতিশ্রুতি এতদিন রক্ষা করি নাই। কিন্তু এখন নবযুগের নূতন আলোকে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখন আমি অভিলাষী হইয়াছি। তোমার ব্যবহারে ও তোমার সঙ্গে সেই অল্পক্ষণ আলাপেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে জগতের চক্ষে তুমি একজন পতিতা নারী হইলেও তোমার অন্তঃকরণ অতি কমনীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত। আজ স্বীকার করিতে বাধা নাই, আমি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কোনও কুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নহে;—ফুলের সৌন্দর্য্যে, পাখীর কলগানে মনুষ্য-হৃদয় যে কারণে মুগ্ধ হয়, সেই কারণেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। (আর. এ. পত্রখানিও কোন কুভাব প্রণোদিত হইয়া আমি যে লিখিতেছি না. উপরে যে শব্দে তোমায় সম্বোধন করিয়াছি তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে)। দুই বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু আজিও তোমাকে আমি ভুলতে পারি নাই। তোমার সেই ঢল ঢল সুন্দর মুখখানি আমার মানস পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। তাই তোমার হৃদয়খানি আরও কাছাকাছি পাইবার জন্য—সেখানির পরিচয় আরও নিবিড়ভাবে লাভ করিবার জন্য—আমার মনে প্রবল বাসনা জন্মিয়াছে। আমি জানি তোমাদের জীবন বড় নিঃসঙ্গ—বড় একা—কেহ তোমাদের আপনার হয় না—বা তাহাদিগকে যথার্থ আপনার কেহ করে না—হাটের বিকিকিনি মাত্র। আমার অভিলাষ, আমি তোমার বন্ধু হই, সখা হই, আত্মীয় হই—এই জন্যই আমি তোমার দর্শন কামনা করিতেছি; অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে। ইতি—

পুনশ্চ—খামে পত্র দিও।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়।

ঠিকানা—২৭নং দুর্গাচরণ ঘোষের লেন, বউবাজার, কলিকাতা।

পরদিন প্রাতে এই পত্রখানি পড়িয়া সুধীর একেবারে মোহিত হইয়া গেল। বলিল, "দাদা, সামান্য একখানা চিঠি লিখেছেন, তাতেও জিনিয়াসের ছাপ! এই ঠিক হয়েছে। সকল কথা গোড়া থেকে স্পষ্ট করে বলা রইল, ভালই হল।"

।। ৫ ।।

দুইদিন ধরিয়া নগেন্দ্রনাথ পত্রোত্তবের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কালযাপন করিল। তৃতীয় দিনে পত্রোত্তর আসিল।

পত্রখানি সুলিখিত নহে, সুরচিত নহে, বানান ভুল অত্যন্ত বেশী। সংশোধনান্তে নিম্নে উহার প্রতিলিপি আমরা প্রকাশ করিলাম ঃ—

মহাত্মন্,

আপনার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া আমি যে কি পর্যন্ত সুখিনী হইলাম তাহা এই সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। আপনি অধিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই আমার স্মরণ আছে। সেই বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতেব পর আপনার নাম আমি জপমালা করিয়াছি জানিবেন। আপনি দয়া করিয়া আগামী মঙ্গলবাব দিবস সন্ধ্যার পরে আসিবেন, আমি তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার আশাপথ চাহিয়া থাকিব।

আপনার চিরাধিনী—শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী।

এই পত্র যথাসময়ে নগেন্দ্রনাথ, সুধীরকে দেখাইল। সুধীর পত্র পড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল। বলিল, "আপনার কাছে তার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে কেমন ধারণা হয়েছিল যে স্ত্রীলোকটি বেশ শিক্ষিতা। রাম রাম এ ত দেখছি নিতান্ত মূর্খ!"

সুধীরের এ উক্তি শুনিয়া নগেন্দ্র মনে মনে যেন একটু বিরক্ত হইল। বলিল, কলেজে পড়ার সুযোগ ত কখনও পায়নি, কাজেই এ রকম চিঠি সে লিখেছে। কিন্তু বেশী লেখাপড়া না জানলেই যে মানুষ একেবারে অপদার্থ হয়ে গেল তা মনে করা ভুল সুধীর।"

সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা মনে করিনি দাদা। তবে শুধু এই বলছিলাম যে ভাষাটা—"

নগেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "চিঠির ভাষার কথা ছেড়ে দাও। তার মুখের ভাষা শুনলে তাকে আর মূর্খ বলে মনে হবে না। এমন কি, তাকে—সে যা, তাই বলেই মনে হবে না।"

নগেন্দ্র মনে মনে স্থিব করিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সে ত নিজে যাইবেই, সুধীরকেও লইয়া গিয়া, উহার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিবে।

।। ৬ ।।

ঠিক এক সপ্তাহ কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির পর, আজ মঙ্গলবার প্রাতে, তবলা বাঁয়া বেহালা হার্ম্মোনিয়াম বিছানা বাক্স ভৃত্য ওস্তাদজি ও কুকুর সহ, নর্ত্তকী প্রভাবতী মফঃস্বল হইতে মুজরা করিয়া তাহার বাসায় ফিরিল। এ বাড়িখানি তাহার নিজের নহে, এগ্রিমেণ্ট করিয়া লওয়া; ত্রিতলের সমস্ত কক্ষগুলি সে নিজে অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতলের কক্ষগুলিতে দুইজন ভাড়াটিয়া আছে—ইহারাও নর্ত্তকী, তবে তাহাদের তেমন পশার নাই। যে আসরে প্রভার ৫০ টাকার বায়না হয়, সে আসরে ইহারা ১০ টাকার বেশী পায় না, এই কারণে ইহারা মনে মনে প্রভার বিলক্ষণ ঈর্ষা করে; কিন্তু প্রভা বাড়ীওয়ালী, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে সাহস করে না। একতলায় পাকাদি হয়, ভৃত্যেরা থাকে।

প্রভাবতী দ্বিতলে উঠিয়া, সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই বাড়ীর খবর সব ভাল ত?"

কুসুম বলিল, "বাড়ীর খবর ত এক রকম ভালই। কিন্তু পাড়ায় আজকাল বড় ভয় হয়েছে দিদি!"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হয়েছে?"

কুসুম বলিল, "বড় গুণ্ডার উপদ্রব হয়েছে। পরশু রাত্রে একটা গুণ্ডা বাবু সেজে যামিনীর ঘরে এসেছিল। ছুরি দেখিয়ে তার গহনাগুলি সব কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"সে চেঁচামেচি করেনি?"

"তার মুখ বেঁধে ফেলেছিল, চেঁচাবে কোত্থেকে? ভাগ্যিস একটু পরে একজন ভাড়াটে সে ঘরে গিয়ে পড়েছিল, সে তার মুখ থেকে কাপড়েব বাঁধন খুলে দিলে, নইলে দম বন্ধ হয়েই মরে যেত।

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ হয়েছে বইকি। তা, সে চোরকে পুলিশ আব কোথায় খুঁজে পাবে?"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিঠিপত্র কিছু এসেছিল?"

কুসুম বলিল, "হ্যাঁ এসেছিল একখানা। তোমার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছি।"

এমন সময় অপর ভাড়াটিয়া সারদাসুন্দরী হাঁফাইতে হাঁফাইতে সিঁড়ি উঠিয়া বলিল, "এই যে প্রভাদিদি, এই আসছ বুঝি? দাঁড়াও আগে হাঁফ ছাড়ি। ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসেছি।"

প্রভা ও কুসুম যুগপৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে সারদা?"

"ওগো ঐ গলিতে পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেছে। গলি দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই ধরছে। তাই দেখে আমি ভয়ে ছুটতে ছুটতে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

প্রভা জিজ্ঞাসা কবিল, "কেন, এত পুলিশ কেন?"

"খুন হয়েছে যে গো!"

"কে খুন হল?"

"কামিনী।"

"অ্যাঁ—কামিনী খুন হয়েছে? কি করে খুন হল? কে খুন করলে?"

"শুনলাম, কাল রাত্রে একজন গুণ্ডা, বাবু সেজে কামিনীর ঘরে এসেছিল। তাবপর অনেক রাত্রে, কামিনীকে খুন করে তার গয়নাগাঁটি সব নিয়ে সরে পড়েছে। গায়ের গয়না ত নিয়েছেই, আঁচল থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবি নিয়ে লোহার সিন্ধুক খুলে বাকী গয়না টাকা কড়ি যা ছিল সমস্ত নিয়ে গেছে।"

শুনিয়া প্রভাবতী ও কুসুম উভয়েই হায় হায় করিতে লাগিল। আর দুই চারি কথাব পর প্রভা ত্রিতলে উঠিয়া নিজ শয়নঘরের চাবি খুলিল। খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইল, কুসুম কথিত ডাকের চিঠিখানা মেঝের উপর পড়িয়া বহিয়াছে।

চিঠিখানা কুড়াইয়া প্রভা শিরোনামা দেখিল, হস্তাক্ষর অপরিচিত। চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া ভৃত্যকে চায়ের জল চড়াইতে আদেশ দিয়া মুখ হাত ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া বাজার আনিবার জন্য ঠাকুরকে টাকা দিয়া, চা পান করিতে করিতে চিঠিখানা খুলিল।

চিঠি পড়িয়া, প্রভার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "কুসুম ও কুসুম, ও সারদা, তোরা শীগ্‌গির আয়।"

কুসুম ও সারদা উভয়েই একত্র বসিয়া ছিল। এই ডাক শুনিয়া তাহাবা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। পরে বাহির হইয়া বলিল, "কেন বাড়ীউলি দিদি? ডাকছ?"

উপর হইতে পূর্ব্ববৎ আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর আসিল—"শীগগির আয়—সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

কুসুম ও সারদা তখন মুখের হাস্যরেখা গোপন করিয়া মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন লইয়া ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মেঝের উপব চা ঢেউ খেলিতেছে, প্রভার কুকুর তাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে; পেয়ালা ও পিরিচ টেবিলের উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রভা চক্ষু কপালে তুলিয়া তাহার ফরাস বিছানায় বসিয়া হাঁফাইতেছে।

কুসুম ও সারদা প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদি, কি হয়েছে?"

প্রভা চিঠিখানি তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ্।"

কুসুম তখন চিঠি লইয়া পড়িল।

মেছুয়াবাজার।

শ্রীচরণকমলেষু—

প্রাণপ্রিয়সি একদিন কোনও স্থানে তোমাব মুজরো শুনিয়া আমি প্রাণে এতই আনন্দ পাইয়াছিলাম, যদিও আমি একজন সামান্য গুণ্ডা, সেই অবধি মনে মনে তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি ও ভক্তি করি। তাই এ পত্র তোমায় লিখিতেছি। আমাদের দলের অপরাপর গুণ্ডা লোকেরা জানিতে পারিয়াছে যে মফঃস্বল হইতে মুজরো কবিয়া অনেক টাকা লইয়া মঙ্গলবার দিবস তুমি কলিকাতায় ফিরিবে; তাহারা পরামর্শ করিয়াছে রাত্রে তাহারা তোমাব নিকট বাবু সাজিয়া যাইবে এবং তোমাকে হত্যা করিয়া তোমাব অলঙ্কার ও টাকা কড়ি সমস্ত অপহরণ করিবে। তোমার গলায় ছুরি দিবে ইহা আমার সহ্য না হওযাতে, এই পত্র লিখিয়া তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম। এ পত্র পড়িয়া তুমি পুড়াইয়া ফেলিবে, কারণ ইহা আমাদের দলের লোকেব হস্তগত হইলে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহারা আমাকেই হত্যা করিবে সন্দেহ নাই। ইতি—

তোমার প্রেমাকাঙ্খী অধম ভৃত্য—শ্রীগুণ্ডা।

চিঠি পড়িয়া কপটী কুসুম দুই চক্ষু কপালে তুলিযা বলিল, "তাই ত বাড়ীউলি দিদি, কি হবে?

সারদা পেচকের মত গম্ভীর স্বরে বলিল, "এখন উপায?"

প্রভাবতী শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুদিত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। কুকুবটি চা পান শেষ করিয়া তাহার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিল।

সারদা কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ ভাই কুসুম, যদি আমাদিগেও খুন করে? এইবেলা কোথাও পালাই চ।"

কুসুম বলিল, "পালিয়ে যাব কোথা? কোনও চুলো কি আছে? আর আমাদেব আছেই বা কি ভাই, যে নেবে? খানকতক পিতলের গহনা, এনামেলের ডিশ আর ফেঁসোর গদি! তবে প্রভাদিদির বোধ হয় পালানোই উচিত। সাতদিনের বাযনা নিয়ে মফঃস্বলে গেছে, অনেক টাকাকড়ি নিয়ে আজ তার ফিরে আসবার কথা, তা কেমন করে তারা টের পেয়েছে ভগবান জানেন। দিদি, ও রকম করে পড়ে থাকলে কি হবে ভাই? ওঠ, একটা পরামর্শ যুক্তি করা যাক।"—বলিয়া সে সারদার পানে চাহিয়া অলক্ষিতে একটু হাসিল।

প্রভা উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমার চাকরকে ডাক্ ত।"

ভৃত্য নিম্নতলে বসিয়া মশলা বাটিতেছিল. কুসুমেব ডাক শুনিযা হাত ধুইয়া উপরে আসিল।

প্রভা বলিল, "একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জলদি।"

সারদা ও কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথা যাবে দিদি?"

প্রভা বলিল, "লালবাজার। পুলিশ কমিশনার সাহেবকে গিয়ে চিঠিখানি দেখাই। তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেন কিনা দেখি।"

ট্যাক্সি আসিবার শব্দ শুনিয়া, প্রভা উঠিয়া তাহার কেশবেশে একটু পারিপাট্য সাধন করিয়া লইল। তাহার পর জুতা মোজা পরিয়া, কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সারদা ও কুসুম দ্বিতলে নামিয়া গেল। সারদা বলিল, "পুলিশে গেল, আমার কিন্তু ভয় করছে ভাই।

কুসুম বলিল, "তখনই তো তোকে আমি বারণ করেছিলাম, তুই কি শুনলি? বললি, 'এ দেখছি হুবহু তরুবালার অখিল, কোনও কু-অভিপ্রায় নেই, পবিত্র প্রেম করতে আসছেন। দাঁড়াও একটু মজা করা যাক!"—

"মজা ত করলি, কিন্তু শেষে আমরাই জাল করার দায়ে পড়ে যাব নাকি?"

কুসুম বলিল, "ইস্! আমাদের কে ধরে? কিছু প্রমাণ আছে? হাতের লেখা ত আর আমাদের কারু নয়।"

সারদা বলিল, "সেই ভরসায় কি নিশ্চিন্দি থাকা যায় ভাই?"

"তুই তবে বসে বসে 'চিন্দি' কর্। আমি যাই, নেয়ে নিইগে, আবার কলের জল চলে যাবে।"—বলিয়া কুসুম তাহার ঘটি সাবান ও গামছা লইয়া প্রস্থান করিল।

॥ ৭ ॥

সন্ধ্যার পরেই নগেন্দ্র আপিস হইতে ফিরিয়া আসিল। আপিসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "ওঃ আজ কি গরমটাই গেল! আপিসে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছিলাম। স্নান করে ফেলি।"

সুধীর বলিল, "দাদা, এই অবেলায় স্নান করবেন? তার চেয়ে মা হয় ভিজে গামছা দিয়ে—"

নগেন্দ্র বলিল, "না না—কিছু হবে না!"—বলিয়া সে নিজ সাবানদানী ও তোয়ালে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া সাবধানে কেশবিন্যাস করিয়া, নগেন্দ্র খাবার খাইয়া চা পান করিল। সুধীরকে বলিল, "ওহে তৈরী হয়ে নাও।"

সুধীর বলিল, "আমি—আমার আর যাবার দরকার আছে কি? হয় ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে নিজের জীবন কাহিনী—

নগেন্দ্র বলিল, "জীবন কাহিনী কি আজই তাকে জিজ্ঞাসা করবো? আজ একটু আলাপ পরিচয় করে আসা মাত্র। চল চল। অন্ততঃ আজকের দিনটে ত চল। অন্যদিন না হয় আমি একাই যাব।"

সুধীর অগত্যা কাপড় বদলাইতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নগেন্দ্রর ঘরখানি সৌগন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। নগেন্দ্র জামাইবাবুটি সাজিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে। প্রভাবতীকে উপহার দিবার জন্য হাতে একখানি "সমাজদ্রোহী" পুস্তক। উভয়ে তখন বাসা হইতে বাহির হইল। বড় রাস্তায় পৌঁছিয়া নগেন বলিল, "ওহে একখানা ট্যাক্সি ধরা যাক।"

সুধীর বলিল, "কত দূরই বা? মিছিমিছি আর টাক্সি কেন দাদা?"

নগেন্দ্র বলিল, "ওহে গরমটি কি রকম দেখছ? হেঁটে গেলে, ঘামে ভিজে ভিজে বিড়ালটি হয়ে সেখানে পৌঁছব।" দশমিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি ঠিকানায় পৌঁছিল।

নগেন্দ্র টাক্সি হইতে নামিয়া দরজার উপর বাড়ীর নম্বরটি দেখিল। ঠিক হইয়াছে জানিয়া, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় একজন ভৃত্যকে বাহির হইতে দেখিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এজি দেখো, প্রভাবতী বিবি হিঁয়া রহতা হায়?"

ভৃত্য বলিল, "হ্যাঁ বাবু তেতলায় আছেন।"

দুইবন্ধু তখন অঙ্গনে প্রবেশ করিল। নির্জ্জনে অঙ্গন পার হইয়া উঠিয়া দ্বিতলে এবং ক্রমে ত্রিতলে উঠিল। দেখিল, একটি কক্ষে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলিতেছে, পাখা চলিতেছে, ফরাস বিছানায় একজন স্ত্রীলোক একটি কুকুর কোলে করিয়া বিমর্ষ বদনে বসিয়া আছে। দুই বৎসর পরে দেখিলেও নগেন তাহাকে চিনিতে পারিল।

অগ্রে অগ্রে নগেন্দ্র, পশ্চাতে সুধীর। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া নগেন বলিল, "প্রভাবতী—ভাল আছ ত?"

প্রভাবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনারা কে? চিনতে পারছিনে ত?"

নগেন্দ্র বলিল, "চিনতে পা‚ছ না?"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধীর তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া।

প্রভাবতী রুক্ষস্বরে বলিল, "কি রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরে ঢুকে পড়লেন যে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "পুলিশ, পুলিশ!"

পর মুহূর্ত্তে, পাশের ঘরখানির বন্ধদ্বার খুলিয়া গেল। চারিজন কনষ্টেবল তন্মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া "শালা গুণ্ডা"—বলিয়া এক একজনের উভয় হস্ত দু-দুজন ধরিয়া ফেলিল।

প্রভা বলিল, "এই লোক গুণ্ডা হায়। হামকো খুন করনে আয়া হায়।"

নগেন্দ্র বলিল, "প্রভা এ কি কাণ্ড? আমি নগেন্দ্র—নগেন্দ্র—এদের বল—"

প্রভা বলিল, "নগেন্দ্র তোমাব কুন্দনন্দিনীব কাছে যাও। এখানে কেন মরতে এসেছ? পাহারাওয়ালা এই দুনো আদমি গুণ্ডা হায়, হামকো খুন করনে আয়া হায়। পাকড়কে লে যাও।"

"চল্ বে চল্" বলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কনষ্টেবলদ্বয় ঔপন্যাসিক ও তাঁহার ভক্তকে থানায় লইয়া চলিল।

সেখানে হাজত ঘরে সারারাত্রি বন্ধ থাকিয়া পরদিন প্রাতে থানার ইনস্পেক্টরবাবুর সম্মুখে তাহারা নীত হইল। নগেন্দ্র কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, আত্মপরিচয় সহ আমূল বৃত্তান্ত ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে নিবেদন কবিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রভাবতীর স্বাক্ষরিত পত্রখানি নগেন্দ্রের পকেটেই ছিল, সেখানি বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে সে দেখাইল। প্রভাকে উপহার দিবার জন্য যে বইখানি লইয়া গিয়াছিল, তাহাও দেখাইল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবুটি শিক্ষিত লোক এবং ভদ্রলোক। নগেন্দ্রর কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। একটু হাসিয়া উভয় আসামীকে তিনি মুক্তি প্রদান করিলেন।

যাইবার সময় নগেন্দ্র ইন্‌স্পেক্টরবাবুর হাতটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই মশাই, ব্যাপারটা যেন খবরের কাগজে না ওঠে। তা হলে আমার মান ইজ্জৎ ত যাবেই, বই বিক্রিও বন্ধ হয়ে যাবে।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা খবরের কাগজে যাতে ব্যাপারটা না ওঠে, আমি তার ব্যবস্থা করব এখন। কিন্তু সাবধান, আপনি আর ওসব পাড়ায় হাঁটবেন না।"

নগেন্দ্র বাসায় ফিরিয়া আসিল। রাত্রে অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ স্বরূপ বাসার লোককে বলিল, খিদিরপুরে নিমন্ত্রণ ছিল, আহার শেষ হইতে অধিক রাত্রি হইয়া গেল, ট্রাম পাওয়া গেল না, তাই উভয়ে সেইখানেই শয়ন করিয়া ছিল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া নগেন্দ্র আপিসে চলিয়া গেল. পরদিন নিজ গ্রন্থাবলী এক সেট ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে "ভক্তি উপহার" স্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

গুণীর আদর

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

বেলা তখন প্রায় দশটা, বৈশাখ মাস, রৌদ্রের তেজ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাটে, জেটির একপার্শ্বে দুইজন বাঙ্গালী যুবক গঙ্গার দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

শুধু তাহারা নহে, অনেকগুলি ইংরাজ নরনারীও সেই ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ বেলা দশটার সময় পি এণ্ড ও কোম্পানীর "সুমাত্রা" নামক যাত্রী জাহাজখানি এই ঘাটে আসিয়া লাগিবার সম্ভাবনা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে।

যুবক দুইজনের একজন বলিল, "আচ্ছা ভাই, আমরা ত এই রকম হা-পিত্যেশ করে এখানে দাঁড়িয়ে আছি; বিনয় যদি জাহাজ থেকে নেমে, আমাদের চিনতেই না পারে, ড্যাম নেটিব বলে ঘৃণা করে? যদি তোমার বাসায় গিয়ে উঠতে রাজি না হয়ে, গ্যাড ম্যাড করে কোনও হোটেলে চলে যায়, তা হলে কি হবে? সেটা কিন্তু বড়ই মর্ম্মান্তিক হবে—নয় ভাই?"

অপর যুবক বলিল, "তা হবেই ত! কিন্তু তিন বচ্ছব বিলেতে বাস করে আমাদের সেই বিনয় যে ও রাম একটা জানোয়ার হয়ে ফিরে আসবে, এটা ত বিশ্বাস করা শক্ত। বিশেষ, চিঠিপত্র লিখতো, সুমাত্রা জাহাজে এসে পৌঁছাবে সে খবর পর্যন্ত দিয়েছে ত!"

প্রথম যুবক বলিল, "কিংবা ধর, ততটাই যদি না করে, বেশ ভাল ভাবেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে, তোমার বাসায় গিয়ে উঠতে রাজি হয়—তুমি ত তার জন্যে ভাতটাত রাঁধিয়ে রেখেছ, কিন্তু সে যদি বলে আসনে চাপ্‌টিখেলে' বসে খাওয়া আমাব পোষাবে না—আমার কষ্ট হবে তখন কি করবে?"

দ্বিতীয় যুবক বলিল, "আমাব পড়বাব টেবিলটা খালি কবে, তার উপর তাকে খেতে দিলেই হবে। হাতে খেতে পারবে কিনা সেটা তাকে এখানেই প্রথম জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে; যদি বলে পারবে না, তাহলে পথে যেতে যেতে চাঁদনি থেকে ছুরি কাঁটা চামচ কিনে নিতে হবে বইকি।"

"আচ্ছা তা যেন হল; কিন্তু যদি সে বলে ভাত-টাত খাওয়া আমার অভ্যাস নেই ও আমার সহ্য হবে না তখন?"

"তা যদি বলে, তবে নবীন ফার্ম্মাসি থেকে একখানা গ্রেট ইষ্টার্নের পাঁউরুটি কিনে এনে দেওয়া যাবে।"

এই যুবকদ্বয়ের একটির নাম—অনিলকুমার, অপরের নাম সুবোধচন্দ্র। ইহারা এবং আসন্ন অতিথি বিনয়ভূষণ একই জেলার লোক; একই বৎসরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়া এক মেসে অবস্থানের বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; চারিবৎসর কাল একত্র অবস্থানে সে সূত্র আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। বি-এ পাস কবার পর অনিল ও সুবোধ ল-কলেজে ভর্ত্তি হয়, বিনয় বিলাত যাত্রা করে। বিনয়ের পরলোকগত পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সঙ্গীতকলায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য নিজ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে গীতবাদ্যের প্রতি অত্যন্ত সে অনুরক্ত; কলিকাতায় পঠদ্দশায়, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে সম্বর্দ্ধনা সভায়, লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে এবং অন্যান্য স্থানে গান গাহিয়া লোককে সে মোহিত করিয়া দিত। তাই পিতার মৃত্যুর পর নিজ অংশে অনেকগুলি টাকা পাইয়া, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার জন্য সে বিলাত চলিয়া গিয়াছিল। কেনসিংটন কলেজ অব্ মিউজিক হইতে শেষ পবীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রী লাভ করিয়া, সে আজ দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। সুবোধ নিজের বাসায় তাহাকে

লইয়া যাইবে, এই আশায় সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া অনিলকে লইয়া জেটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনিল অন্য বাসায় থাকে।

বেলা সাড়ে দশটা হইল, এগারোটাও প্রায় বাজে—তখন দূরে গঙ্গার বাঁকে ধূমবেখ দৃষ্ট হইল। সাহেব মেমেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল—সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, "ঐ জাহাজ আসিতেছে।" অনিল ও সুবোধও সেই দিকে চাহিয়া, এতক্ষণ প্রতীক্ষা করার ক্লেশ ভুলিয়া গেল।

ক্রমে জাহাজখানি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। আরও কিছুক্ষণ পরে, ধোঁয়ানলের ভস্ ভস্ আওয়াজটাও বেশ শুনা যাইতে লাগিল। জাহাজ গঙ্গাবক্ষের মাঝখান দিয়া ধীর মন্থর গমনে আসিয়া, ক্রমে জেটি লক্ষ্য করিয়া মুখ ফিবাইল।

সুবোধ ও অনিল দেখিল, ডেকের উপর বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষ যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কেহ জেটিতে আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে পাইয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিল। জেটির উপর হইতেও অনেকেই রুমাল ঘুরাইতে লাগিল। সুবোধ ও অনিল নিজ নিজ পকেটে রুমালের প্রান্তভাগ ধরিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের প্রিয় বান্ধবের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না।

ক্রমে জাহাজ আরও নিকটে আসিল, ক্রমে উহা জেটির সংলগ্ন হইল। অমনি বহুসংখ্যক "কুলি" লাফাইয়া জাহাজে উঠিল। জাহাজের উপর একটা ভারি সোরগোল পড়িয়া গেল; যাত্রিগণ কুলি সঙ্গে লইয়া নিজ নিজ ক্যাবিনের দিকে ছুটিতে লাগিল; কিন্তু কই, বিনয় কই?"

অল্পক্ষণ পবেই জাহাজ হইতে যাত্রিগণের অবতরণ আরম্ভ হইল। সুবোধ ও অনিল ভিড় ঠেলিয়া "গ্যাংওয়ে"র যথাসম্ভব নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া পুরুষ যাত্রিগণের মুখ নিবীক্ষণ কবিতে লাগিল। সবাই সাদা মুখ—কালোরূপও ক্বচিৎ দুই একটি নামিল; কিন্তু তাহারা ত বিনয় নহে!

জাহাজেব ডেক প্রায যখন খালি হইয়া আসিয়াছে, তখন সুবোধ ও অনিল উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ধুতি পরা বেশমী চাদব গায়ে তাহাদের বিনয়—ঐ যে আসিতেছে, জেটির ভিড়ের পানে চাহিয়া দেখিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে মাথায় ব্যাগ প্রভৃতির বাণ্ডিল এবং হাতে একটি গ্ল্যাডস্টন ব্যাগ লইয়া একজন কুলি। চিৎকার শুনিয়া বিনয় দেখিল, সেই মুহূর্ত্তে অনিল ও সুবোধ নিজ নিজ পকেট হইতে রুমাল টানিয়া বাহির করিয়াছিল, কিন্তু অত কাছে যে আছে, কথা বলিলে যে শুনিতে পায়, তাহাকে অভিনন্দন করিতে রুমাল ঘোরান হয়ত অবৈধ হইবে ভাবিয়া, সেগুলি আবার পকেটজাত করিল। বন্ধুগণের দর্শন পাইয়া বিনয়ের মুখে হাস্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইয়া অনিল ও সুবোধ মনের আনন্দে যেন দিশাহাবা হইয়া পড়িল।

'গ্যাংওয়ে' হইতে বিনয় জেটীতে নামিবামাত্র সুবোধ ও অনিল তাহার নিকট ছুটিযা গিয়া শেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বিনয় সে হস্ত গ্রহণ না করিয়া, সুবোধের সহিত কোলাকুলি কবিয়া অনিলের সহিত কোলাকুলি করিতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে শব্দ শুনিল, "Hello, Banerjee, met your friends? Good Bye"—বিনয় ফিরিয়া সহাস্যে মুখে বলিল, "Good Bye."

অনিল বলিল, 'ওহে, কোলাকুলি বাসায় গিযেই হবে, এখানে তোমার ইংরেজ বন্ধুবা হয়ত তোমায় অসভ্য মনে করতে পারে।"

"ওরা তা মনে করলে ত বয়েই গেল।"—বলিয়া বিনয় হাসিয়া অনিলকে আলিঙ্গন করিল।

সুবোধ সসঙ্কোচে বলিল, "আমার বাসাতেই গিযে উঠবে ত?"

বিনয় বলিল, "যদি ওঠাও—অর্থাৎ যদি তোমার বাসার অন্য লোকদের আপত্তি না থাকে।"

"না—সে কোনও আপত্তি হবে না। বরং বাসার লোকেরা তোমায় দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।"

"তবে চল।"

তিন বন্ধুতে তখন তীরে উঠিয়া, একটা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিল। কুলিকে বিদায় করিয়া কোচম্যানকে পটলডাঙ্গা যাইতে আদেশ দিয়া, তিনজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর সব জিনিসপত্র?" বিনয় বলিল, "সে সব জাহাজের খোলে আছে। টমাস কুক কোম্পানী সে সব ডেলিভারি নিয়ে নিজেদের গুদামে রেখে দেবে, আমি সুবিধা মত তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাব।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলেই অনিল বলিল, "সুবোধ, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা কর না।"

সুবোধ আনন্দের আবেগে পূর্ব্ব পরামর্শ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিল। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথা?"

অনিল বলিল, "সেই কথা—চাঁদনী থেকে যদি কিছু কিনে নিতে হয়।"

বিনয় বলিল, "কি? আমার জন্যে একটা সুট? হ্যাট ট্যাট? সে সবই আমার আছে হে!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সুবোধ একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "না না—সে নয়। আমরা কি সত্যি পাগল হয়ে গেছি? সে সব নয়, তবে, এতদিন কাঁটা চামচে খেয়ে, হাতে খেতে যদি তোমার কোনও অসুবিধে হয়, তাহলে চাঁদনী থেকে—"

বিনয় বলিল, "কাঁটা চামচ কিনে নিয়ে যাবে? বাপ পিতামো চৌদ্দপুরুষ, আমি নিজে এই তিন বছর আগে পর্যন্ত—হাতে খেয়ে, আজ হাতে খেতে আমার অসুবিধা হবে কে বললে তোমায় শুনি?"—বলিযা বিনয়, অপর দিকে উপবিষ্ট সুবোধের স্কন্ধে চটাস্ করিয়া এক চপেটাঘাত করিল।

বাসায় পৌঁছিতে প্রায় বারোটা বাজিল। মেসের অন্যান্য ছাত্রগণ তখন স্নানাহার সমাধা করিয়া নিজ নিজ সীটে কেহ বসিয়া কেহ বা শুইয়া খবরের কাগজ বা নভেল পড়িতেছে। কেহ বা একমনে শ্বশুবকন্যাকে পত্র লিখিতেছে। সুবোধকে প্রবেশ করিতে দেখিযা তাহারা চঞ্চলভাবে বাহিরে আসিল। সঙ্গে কোনও "সাহেব" না দেখিতে পাইয়া তাহারা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "কই, আপনাদের বন্ধু আসেন নি?" সুবোধ তাহাদের ভ্রমের কারণ বুঝিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "এই যে—ইনিই বিনয়বাবু।"—বলিয়া তাহাদের সহিত বিনয়কে পরিচিত করিয়া দিল।

একজন রসিক ছাত্র বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! সদ্য জাহাজ থেকে নামা বিলেত-ফেরৎ ধুতিপরা—তায় আবার বিনয়বাবু? কালে কালে হল কি? ঘোর কলি, ঘোর কলি!"—খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

বিনয় তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে গিয়া দেখিল, তাহা সম্ভবমত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একপাশে একখানি তক্তপোষের উপর ধোপদস্ত বিছানা পাতা, মাঝখানে একটি টেবিল, তাহার চাবিপাশে চারিখানি চেয়ার; ঘরের এক কোণে একটা টুলের উপর জলের সোরাই; অপর কোণে এক ডজন সোডার বোতল সারি সারি শুইয়া আছে। শেষেরগুলি দেখিয়া বিনয় বলিল, "এত সোডা কেন হে?—তোমরা কি জল খাও না নাকি?"

সুবোধ লজ্জিতভাবে বলিল, "আমরা ত জলই খাই। তোমার জন্যে রেখেছি।"—অনিলের সহিত সুবোধের চোখের ভাষায় কি কথাবার্ত্তা হইয়া গেল, তাহা বিনয় জানিতে পাবিল না।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

সুবোধ বিনয়কে স্নানাহারের কথা বলিলে, সে উত্তর করিল, জাহাজেই স্নান সারিয়া ব্রেকফাস্ট (প্রাতঃরাশ) শেষ করিয়াছে; এখন আর কিছুই খাইবে না; ও-বেলা তখন চায়ের সঙ্গে কিছু খাইলেই হইবে। সুবোধ বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি বস, আমি খেয়ে নিই!" বিনয় বলিল, "তুমি এখনও খাওনি বুঝি? যাও যাও খেয়ে এস।" সুবোধ খাইতে গেল; অনিল বসিয়া বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আহারান্তে সুবোধ ফিরিয়া আসিলে, কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, তিনজনে নানারূপ গল্প চলিতে লাগিল। বেশীর ভাগই বিলাতের কথা—প্রবাসজীবন সম্বন্ধে নানা বিচিত্র সংবাদে বিনয় বন্ধুদ্বয়ের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অতঃপর বিনয় কি করিবে, সে সম্বন্ধেও অনেক পরামর্শ হইল। বিনয় বলিল, য়ুরোপে যেমন মিউজিক্যাল রিসাইটাল হইয়া থাকে, সেইরূপ বাঙ্গলায় স্বরলিপি তৈয়ারি করিয়া মাঝে মাঝে কোনও ষ্টেজ ভাড়া লইয়া, "পারফরম্যান্স" দিতে হইবে। য়ুরোপে গুণীলোকে এরূপ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন কবিয়া থাকে—এমন কি রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত তাহাদের ডাক হয়। সে দেশে একপ রিসাইটালে, প্রত্যেক টিকিট, আধগিনি—এক গিনি মূল্যেও বিক্রয় হয়; কিন্তু এটা গরীব দেশ, এক টাকা, দুই টাকার বেশী টিকিট করিলে চলিবে না। প্রথম অবস্থায় কিছুদিন, বড়লোকের বাড়ীতে lessons দিবার কার্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সপ্তাহে ধর দুই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা প্রত্যেক lesson-এ যদি, ২৫ টাকা—কিংবা অত যদি এ দেশে সম্ভব নাও হয—১৬ টাকাও যদি পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি? এইরূপ ২/৩ ঘর পাইলে, খবচটা উঠিয়ে আসিবে। এইরূপ নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। য়ুরোপে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদগণের সম্মান ও প্রভূত অর্থাগমের গল্প শুনিয়া সুবোধ ও অনিল স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "বড় বড় মিউজিসিয়ানদেব কথা ছেড়েই দাও; তোমাদের এই অধম ভৃত্য যেদিন আমাদের কলেজেব ডিগ্রী বিতরণ হয়, অনেক বড় বড় লর্ড, লেডি, কাউণ্ট, কাউন্টেস প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন—আমবা, যারা ডিগ্রী পাব—তাদের মধ্যে বাছা বাছা জনকযেককে, তাঁদের সামনে সেদিন বিদ্যার পবিচয়ও দিতে হয়েছিল। আমি Wanger-এব Parsifal থেকে একটা পীস্ বাজিয়েছিলাম। উপাধি বিতরণ হয়ে গেল, Duchess Of Devonshire আমায় ডাকিয়ে, শেকহ্যাণ্ড করে বলেছিলেন, "তুমি একটি জীনিয়স—তোমাব বাজনা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। যুবক, তোমার ভবিষ্যৎ অতি সমুজ্জ্বল, এ আমি বলে দিলাম।"

অনিল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "একটা কাজ আমাদেব সব প্রথমে করা উচিত। তুমি আজ দেশে ফিরেছ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে কত দূর বিদ্যালাভ করে এসেছ, এ খবরটা কাল সকালেই খানকতক ইংরাজি দৈনিকে বেবিয়ে যাওয়া উচিত।"

সুবোধ বলিল, "ঠিক ত—অনিল, তুমি এ বন্দোবস্ত করতে পারবে ভাই?"

"আমি নিজে না পাবি, আমাব হাতে এমন লোক আছে, যার দ্বারা আমি এ কাজটি করিয়ে দিতে পাবি। আচ্ছা, আজ বিকালেই আমি গিয়ে তাব সঙ্গে দেখা কবে, সব ঠিক করে ফেলবো।"

বিনয়কে প্র্যাকটিস করিতে হইলে, মেসের বাসায় থাকিয়া করা চলিবে না; একটি স্বতন্ত্র ভদ্রগোছের বাড়ী চাই, বাড়ীর দ্বারপার্শ্বে, নামের একটি পিত্তলফলক চাই, তাহাতে উপাধি ও মেডেল প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকা চাই—ইত্যাদি বিষয়েরও পরামর্শ হইয়া গেল।

এইরূপ গল্প ও পরামর্শে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। সুবোধ তাহার সহবাসী বন্ধুগণকে

আজ নিজের ঘরে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সকলে আসিয়া জুটিল, ষ্টোভ জ্বলিল, জল চড়িল, সুবোধ তাহার দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া কেক ও বিস্কুটপূর্ণ ৩/৪টি পাত্র বাহির করিল, সেগুলি দেখিয়া বিনয় হঠাৎ বলিয়া বসিল, "এ সব কেন হে? এ সব তোমরা খেও, আমি মুড়ি খাব।"

বাসার অন্যান্য ছাত্রেরা এতদিন মুড়িকে পাড়াগেঁয়ে খাদ্য জানিয়া আন্তরিক ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। সদ্য বিলেতফেরৎ বিনয়ের মুখে একথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং সহসা মুড়ির প্রতি তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। ঝি পাছে তাজা মুড়ি কিনিয়া আনিতে না পারে, তাই একজন ছাত্র স্বয়ং গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুড়ি ভাজাইয়া আনিল। কিছু গরম কচুরি, সিঙ্গাড়াও আনীত হইল। চায়ের জল প্রস্তুত। চা তৈরী করিয়া সুবোধ সকলের পেয়ালা ভরিয়া দিয়া, মুড়ি সিঙ্গাড়া প্রভৃতি পরিবেষণ করিল। বিনয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, "লণ্ডনে ডাচেস্ অব্ ডেভনসায়ার যার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করেছিলেন, সে এই পাঁচুখানসামার গলিতে আমার বাসায় আমারই কেওড়া কাঠের তক্তপোষের উপর বসে মুড়ি খাচ্ছে।" আনন্দে গর্ব্বে তাহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

চা-পান শেষে, খবরের কাগজে প্যারা ছাপাইবার চেষ্টায় অনিল বাহির হইয়া গেল; বিনয় ২/১ জন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুবোধকে লইয়া বাহির হইল।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া নিজ ঘরে বসিয়া সুবোধ চুপিচুপি বিনয়কে বলিল, "ওহে, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো কিনা ভাবছি।"

"কি কথা?"

"আর কিছু না—সন্ধ্যার পর, বুঝলে কিনা—একটু ইয়ে-টিয়ে খাওয়া তোমার অভ্যাস আছে কি? বিলেতে যারা যার তারা অনেকেই ঐ অভ্যাসটি নিয়ে আসে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "কেন? ইয়ে-টিয়েও সংগ্রহ করে রেখেছ নাকি?"

সুবোধ সলজ্জভাবে বলিল, "তা—রেখেছি বইকি?"

"কই দেখি?"

সুবোধ উঠিয়া গিয়া তাহার ট্যাঙ্ক খুলিয়া অতি সন্তর্পণে একটি বোতল বাহিব করিযা আনিল। বিনয় দেখিল, উহা হুইস্কি। দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

সুবোধ বলিল, "একটা কর্ক ইস্ক্রুপও এনে রেখেছি। খুলে দেবো? সোডা ত ঘরেই রয়েছে।"

বিনয় বলল, "ভাই কেন এসব করতে গেলে বল দেখি? ও সব কি আমি খাই? ছি ছি! ছ'সাতটা টাকা মিছামিছি জলে ফেলেছ। এখন এটা দোকানে ফিরে দিতে গেলে নেবে?"

সুবোধ ম্লানমুখে বলিল, "তা কি আর নেয়? তাই ত—এটাকে নিয়ে এখন করি কি ভাই?"

বিনয় বলিল, "কি আর করবে? কাল দোকানে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো। না নেয়, একটি কোনও কুলীন মাতাল দেখে দান করে দিও, কিছু পুণ্যসঞ্চয় হবে।"

সুবোধ বলিল, "কুলীন মাতাল কি রকম?"

বিনয় বলিল, "যার বাপ পিতামহও মাতাল ছিল।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। সুবোধেও সে হাসিতে যোগ দিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ভাল পাবিল না—সাতটি টাকাব শোকে সে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

পরদিন কয়েকখানি সংবাদপত্রে, বিনয়ের আগমনবার্ত্তা ও গুণগ্রামের পরিচয় প্রচারিত হইল। সুবোধ ও অনিল কয়েকদিন বিনয়ের জন্য বাড়ী অন্বেষণে ব্যস্ত রহিল। কিছুদিন

হাঁটাহাঁটির পর সুবিধামত একটি ছোট বাড়ী পাওয়া গেল। বিনয় তখন নিজ লগেজ পত্র খালাস করিয়া আনিয়া, কিছু আসবাব ক্রয় করিয়া তাহার নূতন বাড়ীতে গিয়া অধিষ্ঠান করিল। মিস্ত্রী আসিয়া নাম ও উপাধি প্রভৃতি খোদিত পিত্তলফলকটি প্রবেশ দ্বারের একপার্শ্বের দেওয়ালে গাঁথিয়া দিয়া গেল।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

সংবাদপত্রে প্যারা ৩ পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে, বড় রাস্তার উপর স্বতন্ত্র বাড়ী হইল, দ্বারপার্শ্বে পিত্তলফলকও গ্রথিত হইল, কিন্তু কই কাজকর্ম্মের ত কোনও চিহ্নই নাই! বিনয় প্রাতে উঠিয়া টোস্টের উপর দুইটি 'পোচ' করা ডিম্বসহ এক পেয়ালা চা পান করিয়া, নিজ 'ষ্টাডি' ঘরখানিতে বসিয়া, কোনও একটি বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঘণ্টাখানেক বাজায়; তারপর পিয়ানোর কাছে বসিয়া, কাগজ পেন্সিল লইয়া কোনও দিন একটা 'ফ্যাণ্টাসিয়া' কোনও দিন একটা 'সার্জ্জোব' বাঙ্গলা স্বরলিপি তৈরী করে। দ্বারে উর্দ্দিপরা দ্বারবান বসিয়া আছে, কেউ দেখা করিতে আসিলে তাহার কার্ড লইয়া আসিবে, অথবা যাহারা কার্ড আনিবে না, দ্বারবানের শ্লেটে নিজ নাম লিখিয়া দিলে, সেই শ্লেট সে লইয়া আসিবে; কিন্তু না আসে কাহারও কার্ড, না শ্লেটে লিখিত কাহারও নাম। অনিল, সুবোধ মাঝে মাঝে আসে বটে— কিন্তু তাহারা ঘরের লোক, যদৃচ্ছা আবির্ভাবের অধিকার তাহাদের আছে।

অনিল ও সুবোধ আজ সন্ধ্যার পরেই আসিয়া জুটিয়াছে—আজ এখানে তাহাদের সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ। বিনয় তাহার বিদ্যুৎ-আলোকিত ড্রয়িংরুমে বসিয়া বন্ধুদ্বয়ের সহিত নানারূপ গল্পগুজব করিতে করিতে, বুককেস খুলিয়া একটি আলবাম বাহির করিয়া আনিল। তাহার ভিতর হইতে, নামজাদা য়ুরোপীয় সঙ্গীতাচার্য্যগণের ফটো বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। তাহার কলেজের ফটো এবং ডিগ্রীপ্রাপ্তির দিন কলেজ হলে সমবেত ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের একটি বৃহৎ ফটোও তাহাতে ছিল। আর চারিটি বিনয়ের নিজের ফটো ছিল—চারিটি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার ফটো।

ফটোগুলি দেখিতে দেখিতে অনিল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বিনয় এই ক'খানা ফটো তুমি দিনকতকের জন্য আমায় দিতে পার?"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি করবে?"

অনিল বলিল, "এই ছবিগুলি দিয়ে তোমার সম্বন্ধে কারুদ্বারা একটা সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়ে কোনও মাসিকপত্রে ছাপাবার চেষ্টা করবো।"

সুবোধ বলিয়া উঠিল, "বাঃ এ বেশ মতলব। আর কিছু না হোক, খুব খানিকটে বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে—মক্কেল জোটবার সুবিধে হবে।"

আহারাদির পর, ফটোগুলি লইয়া অনিল প্রস্থান করিল।

কয়েকদিন পরে অনিল আসিয়া, একটি প্রবন্ধ বিনয়কে দেখাইল। সে নিজেই ইহা রচনা করিয়াছে। ইহাতে বিনয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে, বিলাতে তাহার প্রতিষ্ঠা লাভের বৃত্তান্তও আছে; বলা বাহুল্য ড্যাচেস্ অব ডেভনসায়ারের করমর্দ্দন ও তাঁহার উক্তিটুকুও বাদ যায় নাই। উপসংহারে লেখা আছে মিষ্টার ব্যানার্জ্জি উপযুক্ত পারিশ্রমিকে, ছাত্র ছাত্রীগণকে মিউজিক শিক্ষা দিতে এবং প্রকাশ্য সভাসমিতিতে ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের গৃহবৈঠকে, যন্ত্রালাপ করিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রবন্ধটি পড়িয়া, বিনয় স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বলিল, "তা যেন হ'ল; কিন্তু এটা বেরুবে কিসে?"

অনিল বলিল, "সে বন্দোবস্ত আমি করেছি। 'আর্যশক্তি'র সাব-এডিটর অবিনাশবাবুকে আমি প্রবন্ধ ও ছবিগুলি দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন—ছাপাতে পারি, কিন্তু ছবির ব্লক করাবার খরচটি আপনাদের দিতে হবে। কত টাকা লাগবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললে,

গোটা পঞ্চাশের কম ত নয়ই। সত্যি কথা বলি ভাই—সেই কথা শুনেই আমি পেছিয়ে গেছি। অতগুলো টাকা!"

বিনয় বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল; শেষে বলিল, "তা, দাওগে ৫০টে টাকা। আর্যশক্তি কাগজের খুব গ্রাহক আছে শুনেছি, কলকাতায় নগদ বিক্রীও ত যথেষ্ট দেখতে পাই। প্রবন্ধটা বেরুলে কিছু কাজ হতে পারে।"—বলিয়া সে বাক্স খুলিয়া ৫০টি টাকা বাহির করিয়া অনিলকে দিল। পরের সংখ্যাতেই প্রবন্ধটি ছাপা হইয়া গেল।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

আজ তিনদিন মাত্র আর্যশক্তি বাহির হইয়াছে। বেলা ৮টার সময়, বিনয় তাহার ষ্টাডিতে বসিয়া ম্যাণ্ডেলিনে ঝঙ্কার দিতেছিল, এমন সময় দ্বারবান শ্লেট হস্তে প্রবেশ করিল। বিনয় দেখিল উহাতে লেখা রহিয়াছে—শচীনাথ সান্যাল;*** মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি। বিনয় উঠিয়া গিয়া আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। শচীনবাবু বলিলেন, "মহারাজ বাহাদুর আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আর্য্যশক্তিতে আপনার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তা তিনি পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছে, একদিন আপনাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এনে, দু'চারজন বন্ধুবান্ধবকে আপনার যন্ত্রালাপ শোনান।"

বিনয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে—কখন?"

"পরশু শনিবারে আপনার সুবিধা হবে কি? এই ধরুন, সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।" "হ্যাঁ, সুবিধে হবে।"

"তা বেশ। আপনি ফী কত নিয়ে থাকেন?"

বিনয় একটু ভাবিল। তাহার পর বলিল, "আপনাকে আমি খোলাখুলিই বলি শচীনবাবু। আমি এই সম্প্রতিই বিলেত থেকে এসে এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি—আপনার মহারাজই আমার প্রথম মক্কেল। তবে, ফী কত নেবো সেটা মনে মনে আমি একটা স্থির করে রেখেছি। বড়লোকদের বাড়ীতে, ড্রয়িংরুম এণ্টারটেনমেণ্টে ঘণ্টায় ৩২ টাকা এবং দু'ঘণ্টায় ৫০ টাকা ফী নেবো স্থির করিয়ে রেখেছি।"

শচীনবাবু বলিলেন, "তা বেশ! আমি এই ২০ টাকা এখন বায়না দিয়ে যাচ্ছি। বাকী ৩০ টাকা ঐদিন সেখানে দেবো।"—বলিয়া পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া বিনয়ের সম্মুখে রাখিলেন।

বিনয় মহারাজ সম্বন্ধে শচীনবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিল। বলিল, "মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ আমার কখনও হয়নি—কিন্তু অনেকদিন থেকেই তাঁর গুণগ্রামের, তাঁর পাণ্ডিত্যের, তাঁর রসগ্রাহিতার অনেক প্রশংসা আমি শুনেছি। আর শুনেছি, তিনি নিজে নাকি একজন খুব ভাল পাখোয়াজী—পাখোয়াজে, তাঁর মত মিঠে হাত এই কলকাতা সহরে নাকি খুব কমই আছে।"

শচীনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সে খ্যাতি তাঁর আছে বটে। আচ্ছা, আমি তবে এখন উঠি। শনিবার দিন আপনি আসবেন তা হলে। টাকার একটা রসিদ আমায় অনুগ্রহ করে দিন। সেদিন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে কি আসতে হবে?"

"না—না; আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় রাজবাড়ীতে উপস্থিত হব।"—বলিয়া বিনয় টাকার রসিদ লিখিয়া শচীনবাবুর হস্তে দিল।

সেদিন বিকালে অনিল ও সুবোধ আসিবামাত্র বিনয় বলিল, "ওহে ব্লক করাবার খরচ সে ৫০টি টাকা উঠে গেল।"

অনিল বলিল, "কি রকম? কি রকম?"

বিনয় তখন মহারাজের আহ্বানের কথা তাহাদিগকে সবিস্তারে জানাইল। তাহারা এ সংবাদ শুনিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বলিল, "আমরা সেখানে যেতে পেলে বেশ হত ভাই। কিন্তু আমরা ত মহারাজের বন্ধুবান্ধব নই যে নেমন্তন্ন পাব।"

বিনয় বলিল, "আমার বন্ধু ত তোমরা! আচ্ছা কালই আমি মহারাজকে চিঠি লিখে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চাইব— নিশ্চয়ই তিনি আপত্তি করবেন না।"

যথাদিনে ও সময়ে, বিনয় বন্ধুদ্বয় সহ, রাজবাড়ীতে গিয়া যন্ত্রালাপ শুনাইল। মহারাজের বিনয় ও সৌজন্যে এবং তাঁহার রসগ্রাহিতার সাক্ষাৎ পরিচয়ে তিনজনেই মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সুবোধ ও অনিলকে পথে নামাইয়া দিয়া বিনয় বলিল, "কাল রবিবার আছে, সকালে উঠেই আমার ওখানে চলে আসবে তোমরা, ঐখানেই স্নানাহার এবং দিবাযাপন।"

"তথাস্তু" বলিয়া সুবোধ ও অনিল নিজ নিজ বাসা অভিমুখে পদচালনা করিল।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

পরদিন বেলা ৭টার মধ্যেই সুবোধ ও অনিল, বিনয়ের বাসায় গিয়া জুটিল। বিনয় তখন দ্বিতলস্থ ডাইনিংরুমে বসিয়া 'ছোট হাজরী' খাইতেছিল; বন্ধুদ্বয়ও সেই টেবিলে এক পেয়ালা চা গ্রহণে আপত্তি করিল না।

চা-পানান্তে তিনজনে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে—এমন সময় গৃহদ্বারে মোটর দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল। অনিল লাফাইয়া জানালার নিকট গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "ল্যাও ঠ্যালা। আবার বোধ হয় মক্কেল এসেছে।"

বিনয় ও সুবোধ উঠিয়া জানালার নিকট গেল। দেখিল, মোটরে একজন স্থূলকায় প্রবীণ বয়স্ক বাবু বসিয়া আছেন; তাঁহার পার্শ্বে ১৩/১৪ বৎসর বয়স্কা একটি সুন্দরী সুবেশা বালিকা। বাবুটি হস্তেঙ্গিতে দ্বারবানকে ডাকিয়া, নিজ কার্ড দিয়া কি বলিলেন। দ্বারবান কি বলিল; তাহাতে বাবু নামিয়া, মেয়েটিকে হাত ধরিয়া নামাইলেন এবং দ্বারবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরেই দ্বারবান কার্ডখানি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। উহাতে যে নামটি লেখা ছিল তাহা তিনজনের কাহারও পরিচিত নহে। সুবোধ বলিল, "কলকাতায় কত বড়লোক রয়েছে, আমরা কি সবাইয়ের নাম জানি?"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, তোমরা বস ভাই, ব্যাপারটা কি জেনে আসি।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুবোধ বলিল, "ওরা কারা—কি জন্যে এসেছে বল দেখি অনিল?"

অনিল বলিল, "কোনও বড়লোক—সম্ভবতঃ ব্রাহ্ম। বিলেতফেরৎ নয়, তাহলে হ্যাটকোট পরা থাকতো। মেয়েটি বিনয়ের ছাত্রী হবে; বিনয়ের একটা ভাল রকম প্রাইভেট ট্যুশন বোধ হয় জুটলো।"

সুবোধ বলিল, "আরও বোধ হয় কিছু জুটলো।"

"আর কি "

"একটি মোটা রকম শ্বশুরও বোধ হয় জুটলো।"

অনিল বলিল, "ধুৎ! তুমি কি ভাবছ, ঐ ছুঁড়িটাকে লেশন্‌ দিতে দিতে বিনয় ওর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকবে? আর ছুঁড়িটা বলবে, "তেষ্টার সময় মাষ্টার মশাই তোমায় আমি হৃদে বসাই!"

সুবোধ বলিয়া উঠিল, "ধুৎ—পাগল আর কি!"

অনিল বলিল, "ভায়া সেই টিকিধারী বুড়ো চাণক্য পণ্ডিত যে বলে গেছে ঘি আর আগুন—বুদ্ধিমান একত্র স্থাপন করিবে না—সে কথাটা নেহাৎ গাঁজাখুরি মনে কোরো না। আর, তাই হয়েই যদি যায়—মন্দ কি? মেয়েটি যদি সৎস্বভাব, সদবংশজাতা হয়, সুশিক্ষিতা হয়—হোক না তার সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে—তোমায় মিতবর করে দেওয়া যাবে এখন!'—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে বিনয় ফিরিয়া আসিল। উভয় বন্ধু উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি হে?"

বিনয় বলিল, "ব্যাপার গুরুতর। ঐ মেয়েটিকে ওদের বাড়ী গিয়ে, হপ্তায় তিনদিন করে, ইংরেজি গান বাজনা শেখাবার জন্যে বাবুটি আমায় এন্‌গেজ করতে এসেছিলেন।"

"কি দেবেন?"

"প্রথমে বলেছিলেন, মাসে ১০০ টাকা—তারপর ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিলেন।"

অনিল বলিল, "হপ্তায় তিন ঘণ্টা—মাসে ১২ ঘণ্টা—কিছু কম হয় বটে। কিন্তু ভাই, প্র্যাক্‌টিসের প্রথম অবস্থায়—তা আর কি করবে বল—স্বীকার করলে ত?"

বিনয় বলিল, "না। টাকা কম বলে যে স্বীকার করিনি—তা নয়। সব কথা বলি শোন। বাবুটি প্রথমে ত আমার খুব প্রশংসা-ট্রশংসা করলেন। বললেন, মেয়েটির এখনও বিবাহ দেন নি, ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়ে তবে তার বিবাহ দেবেন। আর্য্যশক্তিতে আমার বিষয় পড়ে, তাঁর মনে বড়ই ইচ্ছে হয়েছে যে আমাকে তাঁর মেয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করে, ইংরেজি গান বাজনাও তাকে শেখান। এই পর্যন্ত বলে, মেয়েটিকে বললেন, তুমি একটু ওপরে গিয়ে বস ত মা, আমি এঁর সঙ্গে আর সব বিষয় ঠিক করি। মেয়েটি উঠে গেল। তখন তিনি চুপি চুপি আমায় বললেন, ঐ মেয়েটি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নয়—ওঁর রক্ষিতার মেয়ে। মেয়েটি কুপথে যায় এটি ওঁদের ইচ্ছে নয়—সেইজন্যেই তাকে ভাল রকম লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন—আশা করেন, হিন্দু সমাজে ত হবার উপাই নেই—হিন্দু সমাজের বাইরে, অথবা বিলাতফেবৎ সমাজের কোনও সুপাত্রের সঙ্গে হয়ত একদিন ওর বিবাহও দিতে পারবেন।"

অনিল বলিল, "এবং সে বিলাতফেরৎ তুমি হলেও হতে পার, এই আশাও বোধ হয় ওঁর মনে ছিল!"

বিনয় বলিল, "তা জানিনে। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম, যে কোনও ভদ্রপরিবারে গিয়ে আমি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ অবস্থায় আমার দ্বারায় ও কাজ হবে না—আমায় মাফ করতে হবে! এই ত বলে এলাম ভাই রূঢ়ভাবে নয়—বেশ বিনয় করে, মিষ্টি করে বলেছি।" সুবোধ ও অনিল উভয়েই বলিল, "বেশ করেছ।"

।। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।।

কিন্তু কোনও ভদ্র পরিবার হইতে, পুত্র-কন্যাকে গীত-বাদ্য শিক্ষা দিবার জন্য বিনয়ের আহ্বান আসিল না।

চারি পাঁচ দিন পরে হরিবাবু নামক একব্যক্তি আসিয়া কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণির নাম করিয়া, নিজেকে তাঁহার কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিলেন। বলিলেন, 'আমাদের বাবু আর্য্যশক্তি কাগজে আপনার বিষয় পড়েছেন। তিনি এই শনিবারে কাশীপুরে তাঁর বাগানবাড়ীতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে একটি ইভনিং পার্টি দেবেন—তাঁর ইচ্ছা, আপনি সেখানে গিয়ে, কিছু গান বাজনা শোনান।"

বিনয় ভাবিল, হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—সে বৈঠকে নিশ্চয়ই কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত থাকিবেন। এরূপ সমজদারের সভায় নিজ বিদ্যার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ সহজে ত্যাগ করা হইবে না—এমন কি ফী কিছু কম হইলেও এ এন্‌গেজমেণ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ আমায় বাজাতে হবে?"

হরিবাবু বলিলেন, "এই ধরুন, সন্ধ্যা ৭টা কি ৮টা থেকে রাত ১০টা কি ১১টা পর্যন্ত—এর বেশী নয়।"

বিনয় বলিল, "তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টায় আমার ফী ৬৪ টাকা লাগবে।"

হরিবাবু কিছুক্ষণ বিনয়ের মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "৬৪ টাকা! কিছু কমসম হয় না?"

বিনয় বলিল, "ঐ আমার ফী।"

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হরিবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, তাই না হয় বাবুকে বলেকয়ে আমি রাজী করাব। কিন্তু হেঁহে—আমাব সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করবেন ত?"

"কি বিবেচনা?"

"আজ্ঞে, আমরা একটা কমিশন পেয়ে থাকি কিনা। বেশী নয়, শতকবা ২৫ টাকা টাকা আমরা পেয়ে থাকি।"

বিনয় ভাবিল, "সে কি! দালালী দিতে হবে নাকি? তা কোন্ ব্যবসায়েই বা দালালী দিতে না হয়! উকিল ব্যারিষ্টারেরাও ত দেন শুনেছি। কিন্তু এ নিয়ে এখন একটা গণ্ডগোল করলে শেষে কাজটা ফস্‌কে যেতে পারে। ও আপনার মনিবেরই টাকা চুরি করছে করুক গে—আমার এত মাথাব্যথা কিসের?" ভাবিয়া সে বলিল, "আচ্ছা তার জন্যে আটকাবে না।"

হরিবাবু বলিলেন, "৬৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা গেলে বাকী রইল ৪৮ টাকা এই নিন।"—বলিয়া পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমরা মোটর পাঠিয়ে দেব এখন। ঐ ৬৪ টাকার রসিদটা অনুগ্রহ করে লিখে দিন।"

বিনয় দালালী দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল—ও আপনার মনিবেব টাকা চুরি করছে তা আমার কি? এই যুক্তিতে নিজ মনকে আঁখিঠার দিয়া; কিন্তু ৪৮ টাকা লইয়া ৬৪ টাকা টাকার রসিদ দিতে তাহার মন উঠিল না। সে বলিল, মশাই, মাফ করবেন ৪৮ টাকা পেয়ে ৬৪ টাকা টাকাব রসিদ আমি দিতে পাবি নে।"

হরিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা থাক্‌গে রসিদ—না হলেও চলবে। এখন তবে আসি মশাই—গুডমর্ণিং সার।"—বলিয়া সেলাম করিযা প্রস্থান করিলেন।

শনিবার সন্ধ্যার পর নিজ যন্ত্রাদি সহ বিনয় প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। সাতটা বাজিল, ৮টা প্রায় বাজে—এখনও তাহাকে লইতে মোটর আসিল না। সে মনে মনে রাগিয়া ভাবিতে লাগিল, "সময়ের মূল্যজ্ঞান আমাদের দেশেব লোকের মধ্যে বড়ই কম—তা তিনি যত বড়ই ধনী বা বিদ্বান হোন না কেন, আচ্ছা যখন নিতে আসে আসবে; আমি কিন্তু ১১টার বেশী এক মিনিট সেখানে থাকছিনে।"

রাত্রি ৮টা বাজিলে, বিনয় আহার করিতে বসিল। সাড়ে আটটায় আহার শেষ হইল তখনও কেহ আসিল না। বিনয় ভাবিল, হয়ত এটর্ণিবাবুর বাড়ীতে কোনও বিপদ আপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাঁহার ইভনিং পার্টি স্থগিত হইয়া গিয়াছে; তাই লোক আসিল না। আহারান্তে ড্রয়িংরুমে পিয়ানোর নিকট বসিয়া, সে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইল।

৯টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে, গৃহদ্বারে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কর্ম্মচারী বাবুটি আসিয়াছেন। বিলম্বের জন্য ক্রটী মার্জ্জনা চাহিয়া তিনি বিনযকে ত্বরা করিতে অনুরোধ কবিলেন। বিনয় ত প্রস্তুতই ছিল। তাহার বেহারা কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের বাক্স গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া শোফেয়ারের পার্শ্বে গিয়া বসিল। বিনয় কর্ম্মচারীর সহিত ভিতরে বসিল। গাড়ী ছুটিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে মোটরখানি কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করিল। দ্বিতলের কক্ষ হইতে কেবল যে অজস্র বিদ্যুৎ-আলোক ছুটিয়া বাহির হইতেছে তাহা নহে, বামাকণ্ঠোত্থিত গীতলহরী, হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া তবলার ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া, আকাশ বাতাস প্লাবিত করিতেছে। হরিবাবু বিনয়কে দ্বিতলের বারান্দায় লইযা গিয়া বলিলেন, "এইখানে একটু বসুন, এই গানটা হয়ে গেলেই আমি বাবুকে খবর দেবো এখন।"—বলিয়া তাহাকে

একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিল। বারান্দা হইতে বিনয় উঁকি মারিয়া দেখিল, বিস্তৃত হলঘরে, প্রায় ২০ জন ভদ্রলোক কেহ বসিয়া কেহ অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আছেন। কাহারও অঙ্গে ইংরাজী সান্ধ্যবেশ কেহ ধুতি পাঞ্জাবীতে সজ্জিত। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই মদের গেলাস। একপার্শ্বে ডজনখানেক "বিদ্যাধরী" উপবিষ্ট—তাহাদের একজন আসরের মাঝখানে নূপুরের তালে তালে—হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছে—

আমার হৃদ্ মাঝারে জ্বলছে যেন
ছাই চাপা আগুন।

—দেখিয়া বিনয়ের রক্ত গরম হইয়া চন্ চন্ করিয়া মাথায় উঠিল। সে মনে মনে বলিল, হৃদ্‌মাঝারে নয়, তোমার কপালে! ক্রোধভরে কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই এই কি আপনার ইভনিং পার্টি?"

লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন মশায়?"

বিনয় তীক্ষ্নস্বরে বলিল, "আপনি কেন সে সময় আমায় খুলে বলেন নি? তা হলে ত এ এন্‌গেজমেন্ট আমি স্বীকার করতাম না!"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনি যে অবাক্ কল্লেন মশায়। আবার কি খুলে বলবো আপনাকে? বলিনি কি যে, আমাদের বাবু তাঁর কাশীপুরের বাগানে—"

"ইভনিং পার্টি দিচ্ছেন বলেছিলেন। কিন্তু এই কি আপনার ইভনিং পার্টি?"

"তবে কি এটা?"

"এটা ত লম্পট পার্টি—মাতাল পার্টি!"

বিনয়ের রাগ দেখিয়া হরিবাবু থতমত খাইয়া গেলেন। বলিলেন, "অত শত জানিনে মশায়। কলকেতার বড়লোকেরা যখন বাগান দেন, এই রকমই ত হয়ে থাকে চিরকাল দেখছি।"

বিনয় পূর্ব্ববৎ কুপিতস্বরে বলিল, "আপনি কি আশা করেছিলেন যে এই আসরে আমি বাজাব?"

এবার হরিবাবুও রাগিয়া গেলেন। বলিলেন, "আপনিই কি আশা করেছিলেন যে শনিবারের বাগানে ভাগবত পাঠ হবে? আচ্ছা মশায় ত আপনি!"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, আমি আচ্ছা মশায়ই বটে! আপনার বাবুকে বলবেন, এখানে আমি বাজাব না—হাজার টাকা ফী দিলেও নয়। আপনি কাল আমার বাসায় গিয়ে আপনার টাকা ফেরৎ নিয়ে যাবেন। এখন দয়া করে, আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দিন।"

"বেশ, তাহলে বাবুকে গিয়ে আমি সেই কথা বলি।"—বলিয়া হরিবাবু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সভামধ্যে ঢুলু ঢুলু নয়নে উপবিষ্ট তাঁহার প্রভুর কানে কানে কি কথা বলিলেন,—তাহা বিনয় শুনিতে পাইল না।

বাবু উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, নেভার মাইণ্ড—যানে দেও শালাকো। নেই মাংতা।"

বিনয়ের ইচ্ছা হইল, এক লম্ফে সে ভিতরে পড়িয়া লাথি ও ঘুষিতে সেই অর্দ্ধশায়িত মাতালকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মদমন করিল। হরিবাবু বাহিরে আসিয়া বিনয়কে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য মোটরের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কলিকাতার ধনী সম্প্রদায় বাগানে যে ইভনিং পার্টি দিয়া থাকেন, তাহার স্বরূপটা এইভাবে অবগত হইয়া বিনয় প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও সে বাগানের এন্‌গেজমেন্ট গ্রহণ করিবে না।

সঙ্গীতকলার প্রতি এদেশে ধনী সম্প্রদায়ের কতদূর আদর, তাহা ক্রমে বিনয় হাড়ে

হাড়ে বুঝিতে পারিল। সঞ্চিত অর্থ ফুরাইতে লাগিল; ক্রমে তাহার দিন চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব পরামর্শ অনুসারে মিউজিক্যাল রিসাইটাল দিবার অভিপ্রায়ে, বহুপরিশ্রমে সে স্বরলিপি প্রস্তুত ও অভ্যাস করিতে লাগিল। ভাবিল, ধনী সম্প্রদায় হইতে কিছু আশা নাই, মধ্যবিত্ত সমাজে সম্ভবতঃ তাহার বিদ্যার আদর হইবে। দিন স্থির করিয়া, ষ্টেজ ভাড়া লইয়া, সহরময় প্লাকার্ড ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সে উপর্য্যুপরি তিন সোমবার পারফরম্যান্স দিল। কিন্তু ইহাতেও তাহাকে নিরাশ হইতে হইল। টিকিট বিক্রয়ের অর্থে বিজ্ঞাপন খরচ, ষ্টেজভাড়া, আলো খরচও সম্পূর্ণ উঠিল না—লাভ হওয়া ত দূরের কথা। পারফরম্যান্স শেষে অনেকেই এই বলিতে বলিতে বাড়ী গেল—"দূ দুঃ, না আছে একটা মেয়েমানুষ, না কিছু পয়সা খরচ করে, এও আবার মানুষ দেখতে আসে!"

চেষ্টা চরিত্র করিয়া, ভদ্রপরিবারে ক্রমে তিনটি ট্যুশনি বিনয়ের জুটিল। টাকার পরিমাণ অত্যন্ত কম—কিন্তু অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল, নহিলে দিন চলে কেমন কবিয়া?

এইরূপে পূজা পর্য্যন্ত কাটিল, পূজা গেল, শীত পড়িল, ডিসেম্বর মাসে উপযুক্ত ফীতে একটি বৈঠকী মজলিসে বিনয়ের আহ্বান আসিল। কোনও "বাগানে" নহে—ভদ্রগৃহে। যথা দিনে ও সময়ে বিনয় তথায় উপস্থিত হইয়া, নিজ বিদ্যার পরিচয় দিল। অনেকগুলি ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। পর্দ্দার আড়ালে, বাড়ীর মেয়েরাও শ্রোত্রী হইয়া বসিয়া ছিলেন। তিন ঘণ্টাকাল বাজাইয়া, বিনয় প্রচুর প্রশংসা লাভ করিল। রাত্রি ১০টার সময় সভাভঙ্গ হইবার কালে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা! আজ তুমি আমাদের বড়ই খুসী করেছ। বিলেতে গিয়ে যা শিখে এসেছ—তা সার্থক বটে। তোমার পাবিশ্রমিক যা, গৃহকর্ত্তা তা ত তোমায় দেবেনই; আমি একজন নিমন্ত্রিত আমি এই শালখানি তোমায় বক্‌সিস্ করলাম।"—বলিয়া হাসি হাসি মুখে, নিজ গাত্র হইতে শালখানি খুলিয়া, তিনি বিনয়েব গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রশংসা লাভে আজ বিনয়ের মনে যে আনন্দটুকু সঞ্চাবিত হইয়াছিল—মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা ক্রোধে ও ক্ষোভে রূপান্তরিত হইয়া গেল। কম্পিতস্বরে সে বলিল, "মশায় আমি বাজাই বটে, কিন্তু আমি বাজন্দেরে নই, আমায় এভাবে অপমান করবার কোনও অধিকার আপনার নেই।" বলিয়া শালখানা সে ছুড়িয়া বাবুটির দিকে ফেলিয়া দিল।

উৎসবে সভায় সহসা যেন বজ্রপাত হইল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বাবুটি বলিলেন, "কেন মশায়, এতে কি আপনাকে অপমান করা হল? এই রকমে গুণীর আদর করা, আমাদের দেশে ত বহু কাল থেকে চলে আসছে!"—বলিয়া তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু অবনত করিয়া, শালখানি কুড়াইয়া লইলেন।

গৃহকর্ত্তা ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ ছুটিয়া আসিয়া, উভয়কে মিষ্ট বাক্যে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে, পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা ও করমর্দ্দনান্তে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল।

অতঃপর বিনয় কিন্তু এ ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিল। কলিকাতার কোন বেসরকারী কলেজে, একটি প্রোফেসারী যোগাড় করিয়া এখন সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুবোধ ও অনিল আইন পাশ করিয়াছে, তাহারা এখন ছোট আদালতে বাহির হয়। তিনজনে একটি মেস স্থাপন করিয়া একত্রই বাস করিতেছে।

হারাধন

মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বহুকাল তাহাতে তৈলস্পর্শ ঘটে নাই, কৃষ্ণবর্ণ কৃশ দেহ, কোটরগত চক্ষু, অত্যন্ত ছিন্ন মলিনবেশী এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সিরাজগঞ্জ বাজারে রামলোচন সরকারের চাউলের আড়তে আসিয়া বলিল, "বাবু মশায়, আজ সারাদিন আমি কিছু খেতে পাইনি।"

রামলোচন তহবিল মিলাইবার জন্য সম্মুখে রাশিকৃত টাকা পয়সা, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি লইয়া গণিয়া গণিয়া থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। ভিখারীর প্রতি চোখের কোণে একবার দৃষ্টিমাত্র করিয়া, একটা পয়সা তাহার দিকে ঠক্ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পয়সাটি কুড়াইয়া লোকটা ট্যাকে গুঁজিয়া করুণস্বরে বলিল, "একটা পয়সায় কি হবে বাবু? সারাদিন কিছু খাইনি।"

এইবার রামলোচন ভাল করিয়া লোকটার মুখের পানে চাহিলেন। চেহারা দেখিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় একটু দয়ার সঞ্চার হইল; বলিলেন, "ভাত খাবে?"

লোকটা বলিল, "আজ্ঞে, তাই যদি দুটি আজ্ঞে হয়।"

"আচ্ছা বোস তা হলে। সন্ধ্যেটা দেখিয়েই দোকান বন্ধ করবো। বাসায় নিয়ে গিয়ে তোমায় ভাত খাওয়াব; ঐ যে পয়সাটা দিলাম, ময়রার দোকানে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে ততক্ষণ জল খাওগে।"—বলিয়া তিনি তহবিল মিলাইতে মন দিলেন।

রামলোচন সরকার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার নিবাস এ স্থানে নহে, তবে এই জিলাতেই বটে। বাজারে এই চাউলের আড়তটি তাঁহার পৈতৃক আমলের; বাজার হইতে কিছু দূরে নদীর সন্নিকটে দ্বিতল বাসাবাটীখানিও তাঁহার পিতা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচন ও তাঁহার কনিষ্ঠ পদ্মলোচন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কারবার চালাইতেন। পিতার জীবিতকালেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল, বড়বধূর নাম তারাসুন্দরী, ছোটর নাম রাধারাণী। বাড়ীতে বিধবা মাতা ছিলেন, তাঁহার সেবা ও ঘর গৃহস্থলী কর্ম্মের জন্য উভয় বধূ এককালে এখানকার বাসাবাটীতে আসিয়া থাকিতে পারিতেন না—পালাক্রমে ছয় মাস করিয়া এক জন বাটীতে থাকিতেন, এক জন বাসাবাটীতে আসিয়া স্বাধীন গৃহিণীপনার সুখাস্বাদন করিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর এই বন্দোবস্তই চলিয়া আসিতেছিল; এক দিন হঠাৎ কলেরা রোগে পদ্মলোচনের মৃত্যু হইল। ইহার পর বিধবা জননীও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, মাস ছয়েক পরেই তাঁহার পুত্রশোক, চিতার আগুনে নির্ব্বাপিত হইল। সেই অবধি তারাসুন্দরীই সিরাজগঞ্জের বাসাবাটীতে কায়েম হইলেন, রাধারাণী তাঁহার শ্বশুরের ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া রহিলেন। বড়বধূও অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন; কিন্তু অধিকদিন থাকিতে পারেন না, বাসাবাটীতে কর্ত্তাকে অতিথি-অভ্যাগতকে ভাত জল দেয় কে? সম্প্রতি দিন পনেরো হইল, ছোট বধূ বাসাবাটীতে আসিয়া রহিয়াছেন, কারণ তারাসুন্দরী এখন সন্তানসম্ভাবিতা—দিনও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

।। দুই ।।

তহবিল মিলানো শেষ করিয়া টাকাগুলি বাসায় লইয়া যাইবার জন্য খেরুয়ার থলিতে ভরিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামলোচন খেলো হুঁকা হাতে করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বকথিত সেই ভিখারী আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। রামলোচন বলিলেন, "কি হে, জল্‌টল্ কিছু খেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এক পয়সার বাতাসা কিনে জল খেলাম।"

"বেশ। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীহারাধন দত্ত। কায়স্থ।"

"কায়স্থ? বেশ বেশ। আচ্ছা, বস ঐখানটায়।"—বলিয়া যে চৌকিখানিব একপ্রান্তে তাঁহার "গদী", চক্ষুর ইঙ্গিতে রামলোচন তাহারই অপর প্রান্ত দেখাইয়া দিলেন। হারাধন বসিল।

হুঁকায় কয়েক টান দিয়া রামলোচন বলিল, "কায়স্থ? বটে! তা, তোমাব এমন অবস্থা হল কি করে?"

হারাধন নীরবে আপন ললাটে হস্তার্পণ করিল।

রামলোচন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ত বটেই, সে ত বটেই। অদৃষ্টই হচ্ছে মূলাধার। বাড়ী কোথা তোমার?"

"কোথাও নেই। বাড়ী ঘর থাকলে কি আর পথে ভিক্ষা কবে বেড়াই বাবু?"

"তবু—তোমার বাপ-পিতামহ কোথায় থাকতেন, কোথায় তুমি জন্মেছিলে, কোথায় ছেলেবেলা কাটিয়েছ, সে সব ত বলতে পার?"

হারাধন মাথাটি নাড়িয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে মশাই অনেক কথা! বলতে গেলে মহাভারত।"

বামলোচন ভাবিলেন, পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহার অবস্থা ভাল ছিল, গ্রহবৈগুণ্যবশে এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, সে সকল কথা বলিতে বোধ হয় লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিতেছে। ভাবিলেন, সকলই অদৃষ্টেব খেলা, কখন কার কি অবস্থা দাঁড়ায়। কিছুই ত বলা যায় না। এ বিষয়ে উহাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ কবিবাব প্রয়োজন নাই। করুণাপূর্ণ নয়নে লোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন, "তামাক খাবে?"

"আজ্ঞে দিন"—বলিয়া হারাধন হাত বাড়াইল। রামলোচন কলিকাটি খুলিয়া তাহা হাতে দিলেন; হুঁকা দিলেন না, কারণ যদিও এ ব্যক্তি নিজেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে—সত্যই কাযস্থ কি না, তাই বা কে জানে! লোকে কথায় বলে, "জাত হাবালে কায়েত।"

হারাধন কলিকাটি লইয়া তাহা অঙ্গুলিপুটে ধারণ করিয়া, হস্তদ্বারা কৃত্রিম হুঁকা রচনা করিয়া খুব জোরে জোরে তিন চারিটা দম লাগাইল। তাহার দাপট দেখিয়া রামলোচন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে নাকি?"

"বড় তামাক"—অর্থাৎ গাঁজা। হারাধন বলিল, "মাঝে মাঝে তাও চলে বইকি!"—বলিয়া কলিকাটি সে রামলোচনকে প্রত্যর্পণ করিল। রামলোচন তখন সেটি নিজের হুঁকায় বসাইয়া দুই এক টান দিযাই বুঝিতে পারিলেন, উহাতে আব কিছুই অবশিষ্ট নাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। রামলোচন ডাকিলেন—বেজা! "পিদিপ্‌টে জ্বাল রে।" বালক ভৃত্য ব্রজনাথ গদীর উপর একটি পিতলের রেকাবী বসাইয়া প্রদীপসহ পিলসুজটি তাহার উপর রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। রামলোচন তখন "হরিবোল হরিদুর্গা দুর্গা, জয় মা অন্নপূর্ণা" প্রভৃতি দেবদেবীর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বেজা তারপর প্রদীপটি হাতে করিয়া, দোকানে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, "সন্ধ্যা দেখাইয়া" আসিল। দোকানের গোমস্তা এবং ওজনদার উভয়ে মিলিয়া সকল দ্বার ও জানালাগুলি সাবধানে বন্ধ করিয়া, মোটা মোটা হুড়কা তুলিয়া দিল। চাউলের বস্তা প্রভৃতিও যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, নিজ নিজ পিরিহান ও চাদর প্রভৃতি লইয়া দাঁড়াইল। রামলোচন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া, গোমস্তার হাতে দিয়া, টাকার থলি হাতে লইয়া আড়তের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ম্মচারিগণ বাহির দ্বারটি বন্ধ করিয়া তাহার নানা স্থানে বড় বড় তালা লাগাইয়া চাবির গুচ্ছ প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিল। "এস হে হারাধন"—বলিয়া রামলোচন অতিথি ও ভৃত্যসহ বাসা অভিমুখে চলিলেন; কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

।। তিন ।।

হারাধনকে বাসায় লইয়া গিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় তাহাকে বসাইয়া রামলোচন বলিলেন, "রান্নার ত এখনও দেরী আছে; তুমি এখানে বস ততক্ষণ, আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসি।"—বলিয়াই তিনি আগন্তুকের বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কাপড় ছাড়বে? একখানা ধুতিটুতি পাঠিয়ে দেবো?"

হারাধন বলিল, "হলে ত ভালই হয়।"

"আচ্ছা বস।" বলিয়া রামলোচন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজ শয়নঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, ভিতরে তাঁহার স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছেন—ছোটবউ সেখানে বসিয়া ছিলেন, ভাসুরের পদশব্দ পাইয়া অপর দ্বার দিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। রামলোচন প্রবেশ করিয়া, টাকার থলি এবং আড়তের চাবির গুচ্ছ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিতে বলিলেন, "ওগো দেখ, একজন ভিকিরী সারাদিন কিছু খায় নি, তাকে সঙ্গে করে এনেছি, তাকে দুটি ভাত দিতে হবে। আর কিছু জলখাবার—দুই এক টুকরো শসা কি পেঁপে, আর কিছু মিষ্টি যদি থাকে—বেজাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, বাইরের ঘরের বারান্দায় সে বসে আছে। আর দেখ, আমার একখানা ছেঁড়াখোঁড়া ধুতি যদি খুঁজে বের করে দিতে পার ত ভাল হয়, সে কাপড় ছাড়বে।

প্র৩।৲গুলি শুনিয়া তারাসুন্দরী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। বলিলেন, "ভিখিরী না কুটুম? এত খাতির যে?"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড় কুটুম—তোমার ভাই। ওগো ভিকিরী হলেও সে ছোটলোক নয়—কায়স্থ সন্তান! আমিও যা, সেও তাই, তবে অবস্থার গতিকে সে এখন ভিকিরী, আমি চেলের মহাজন!"

"ওঃ—আচ্ছা, তা দিচ্ছি"—বলিয়া তারাসুন্দরী খোকাকে দুধ খাওয়ান শেষ করিতে মন দিলেন। রামলোচনও মুখ-হাত ধুইবার আয়োজন করিলেন।

জলযোগাদি শেষ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলেন, হারাধনের আর সে চেহারা নাই। স্নানান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, এখন তাহাকে ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে। রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, চান করেছ যে দেখছি।"

হারাধন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নদীতে গিয়ে চান করে এলাম।"

"খেলে-টেলে কিছু?"

"খেলাম বইকি। বড় গিন্নী খানিকটা ফুটি আর গুড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে প্রাণটা শীতল হল।"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড়গিন্নী কি মেজোগিন্নী তা তুমি জানলে কি করে? তুমি এরই মধ্যে আমার সাংসারিক খবর সব পেয়ে গেছ দেখছি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার বেজা চাকরকে জিজ্ঞেস করে সব কথাই জেনে নিলাম।"

রামলোচন সেখানে বসিয়া হারাধনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর, প্রতিদিনই তিনি এই বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া আহারের পূর্ব্বে দুই এক ছিলিম "বড় তামাক" সেবন করিয়া ক্ষুধায় শান দিয়ে লন—কেহ সাথী জুটিলে তাহার সঙ্গে বসিয়া—নচেৎ একাকী। বড় তামাকের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই হারাধনের সহিত তাঁহার হইয়া গিয়াছিল—এবার তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। নেশাটি ক্রমে জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রামলোচন অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িলেন। হারাধনের কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার মনটি তৎপ্রতি অত্যন্ত স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, প্রস্তাব করিলেন, হারাধন যতদিন ইচ্ছা এখানে অতিথিস্বরূপ অবস্থান করিতে পারে।

রাত্রি নয়টার সময় বেজা আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। হারাধনকে লইয়া রামলোচন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শয়নঘরের বারান্দাতেই আহারের স্থান হইয়াছিল। হারাধন বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই ঘরেই আপনার শয়ন হয় বুঝি?"

রামলোচন বলিলেন, "হ্যাঁ, এই ঘরখানিতে আমি শুই। এই পাশাপাশি ঘর দু'খানি আমার দু'ভাইয়ের ছিল আর কি। ভাই ত আমায় দাগা দিয়ে চলেই গেলেন!"—বলিয়া গাঁজার প্রভাবে তাঁহার পুরাতন ভ্রাতৃশোক নূতন হইয়া উঠিল। ভাত খাইতে খাইতে, কোঁচার খুঁটে তিনি চক্ষু মুছিলেন।

"হ্যাঁ—সবই ত আমি শুনেছি।"—বলিয়া হারাধন উর্দ্ধমুখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছোট বধূ রাধারাণীই ভাত বাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল। এই সময় সে ভাসুরের দুধের বাটি লইয়া আসিয়াছিল—ভাসুর ও আগন্তুকের এই কথোপকথন শুনিয়া, ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া আগন্তুকের পানে চাহিল। হারাধনের দৃষ্টিও ঠিক এই সময় অবগুণ্ঠনবতীর পানে ফিরিল। উভয়ে চোখোচোখি হইবামাত্র রাধারাণীর দৃষ্টি বোধ ও বিরক্তি জ্ঞাপন করিল। হারাধন তখনই মাথাটি নিচু করিয়া, সন্তপ্তস্বরে বলিল, "হরি হে, তোমারই ইচ্ছা!"

।। চার ।।

রামলোচনেব সুনজরে পড়িয়া গিয়া, হারাধন পরম আরামে তথায় অধিষ্ঠান করিল। প্রাতে উঠিয়াই বাবুর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে যায়, স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাবুর সহিত আড়তে গিয়া বসে। রামলোচন দেখিলেন, হিসাব-পত্র লিখিতে সে সুদক্ষ; গত বৎসরের সালতামামি হিসাব এখনও করা হয় নাই—সেই হিসাব প্রস্তুত করিবার ভাব তিনি হারাধনের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিজে হুঁকা হাতে করিয়া মনের সুখে ধুমপান কবিতে লাগিলেন।

এইরূপে দশ বার দিন কাটিলে, রামলোচনের স্ত্রী তারাসুন্দরী একটি পুত্র প্রসব কবিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল; সুতিকাগৃহ হইতেই নানা বোগে ভুগিয়া তাহারা জননীর কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। তাই রামলোচন এবার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ও পাসকরা ধাত্রী প্রতিদিন আসিয়া সকল বিষয় তদারক করিয়া, উপদেশ ও ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন। এই গোলমালে রামলোচন আর নিয়মিতভাবে দোকানে যাইতে পারেন না। মাঝে মাঝে দুই একঘণ্টা গিয়া গদীতে বসেন; তার পর হারাধনের প্রতি দোকানের ভার দিয়া চলিয়া আসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিয়া ক্রয়বিক্রয়ের হিসাব পরীক্ষা করেন, তহবিল বুঝিয়া লন; গোপনে কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও দেখিয়াছেন, হারাধনের হিসাব কোথাও একটি পয়সার গরমিল পান নাই।

হারাধনের প্রতি বাবুর এই নির্ভর ও বিশ্বাস দেখিয়া, কর্ম্মচারীরা কিন্তু মনে মনে চটিতে লাগিল। চাল নাই চুলা নাই কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, তাহার প্রতি এতটা বিশ্বাস স্থাপন করা যে বাবুর পক্ষে নিতান্তই মূঢ়তা হইতেছে, ইহাই তাহারা অন্তরালে বলাবলি করিতে লাগিল। দোকানের গোমস্তা নরহরি সাহা একদিন তাহার মনের এই সন্দেহের কথা বাবুকে বলিয়াছিল, কিন্তু বাবু তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নরহরি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, সরকার ও ওজনদারের নিকট বলিয়াছিল, "ভালোর তরেই বলেছিলাম, কিন্তু বাবু শুনলেন না। শুনবেন কেন, কাঙালের কথা বাসি না হলে ত মিষ্টি লাগে না!"

অশৌচান্তে তারাসুন্দরী আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া, নাইয়া ধুইয়া ঘরে উঠিলেন। এক দিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা তোমার গেলবছরের সালতামামি হিসেবটা হয়ে গেছে কি?"

"কেন?"

"ছোটবউ বলছিল, দিদি, বটঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরো, এ ক'বছরে কত টাকা মুনাফা হয়েছে। আমার ভাগের অর্দ্ধেক টাকাটা যদি বট্‌ঠাকুর দেন ত তীর্থধর্ম্ম করে আসি।"

শুনিয়া রামলোচন গুম্ হইয়া রহিলেন।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবছ কি?"

রামলোচন বলিলেন, "আমি ভাবছি কি শুনবে? পদ্মলোচন ত আজ পাঁচ বৎসর হল গিয়েছে। কই, এত কাল ত ছোট বউমা এ কথা কোনও দিন উত্থাপন করেন নি। আজ হঠাৎ এ কথা কেন!"

বড়বউ বলিলেন, "কেউ বোধ হয় সলাপরামর্শ দিয়েছে, যে আড়তের অর্দ্ধেক মালিক ত তুই, তোর ভাসুরই বা সব একলা খায় কেন?"

"কে ওঁকে এ বুদ্ধি দিলে সন্ধান নিতে পার?"

"দেখব চেষ্টা করে। আপাততঃ ওকে কি বলি, তা আমায় বলে দাও।"

"বোলো যে হিসেবপত্র এখন তৈরী হয়নি—আর হিসেবের জন্যে আটকাচ্ছেই বা কি? দু'একশো টাকা যদি ওঁর দরকার হয় ত চেয়ে নেন যেন।"

ছোটবউ কিন্তু দুই এক শত টাকার কথা কানে তুলিলেন না। বলিলেন, "না দিদি, দু'একশো টাকায় আমার কিছু হবে না। পাঁচ বছরে লাভ লোকসানে মিলিয়ে কিছু না হয়ে থাকে, অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকাও লাভ হয়েছে—আমায় এখন আড়াই হাজার টাকা বট্‌ঠাকুর দিন, পরে হিসেবপত্র হলে আমায় পাওনার বাকী টাকা দিলেই চলবে।"

সংসারে এই লইয়া বড়ই একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে উভয় যা'য়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিত, এখন উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। ইতিমধ্যে রামলোচন একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছে খবর পাইলেন, হারাধন এক দিন স্থানীয় কোনও প্রসিদ্ধ উকিলের বাড়ীতে গিয়া বসিয়া ছিল।

।। পাঁচ ।।

সে দিন সন্ধ্যায় বাসায় আসিয়া রামলোচন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বউমার সম্বন্ধে তোমার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

তারাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"উকিল বাড়ী যায় কেন হারাধন?"

তারাসুন্দরী স্বামীর প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি কথা! ছি ছি—এমন কি কখনও হতে পারে?"

রামলোচন বলিলেন, "হারাধনের কি এমন তালুক-মুলুক জ্যোৎজমা আছে, যার জন্যে ওকে উকীল-বাড়ী যেতে হয়? আরও দেখ, এত দিন না তত দিন, হারাধন আসার পর থেকেই ছোট বউমা এই গণ্ডগোল সুরু করেছে। আর একটা কথা। আমার যেমন মতিচ্ছন্ন, গেল বছরের সালতামামী হিসেবটা আমি ঐ হেরোকেই তৈরী করবার ভার দিয়েছিলাম।"

"গেল বছর লাভ কি হয়েছে?"

"প্রায় হাজার টাকা। সেই ধরেই ছোট বউমা বোধ হয় হিসেব করেচেন, পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার টাকা। দেখ, আমি নিশ্চয়ই বলছি, হেরোর সঙ্গে ছোট বউমার কোনও যোগাযোগ আছে। বাড়ী থেকে হতভাগাকে তাড়িয়ে দিই কি বল?"

"তা দাও! কিন্তু, আমার ত ও কথা বিশ্বাসই হয় না। ছি ছি, এ কি কখনও হতে পারে? চব্বিশ ঘণ্টা ত দু'জনে একসঙ্গে রয়েছি, তার কথায় বার্ত্তায় চালচলনে কই কোন দিন মনে ত কিছু সন্দেহ হয় না।"

এ কথা শুনিয়া রামলোচন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন "তুমি যা-ই বল না কেন বড়বউ ভিতরে কোনও গোলযোগ আছেই আছে। ছোটবউই বা লাভের অংশ দাবী করে কেন, আর হেরোই বা উকীল বাড়ী যায় কেন? ভারী ত আমাদের মাসীমার কুটুম, পরমুণ্ডে দু'বেলা খাচ্ছেন দাচ্ছেন—দিই ওকে দূর করে কি বল?"

তারাসুন্দরী নীরবে কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "এখন হঠাৎ কিছু না করে দিন কতক চোখ-কান খুলে থাকা যাক এস। যদি সে রকম কোনও বেচাল দেখতে পাই, তখন দুটোকেই ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে দূর করে দিলেই হবে।"

রামলোচন পত্নীর এ যুক্তিই উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

।। ছয় ।।

ছোটবউ ও হারাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যে কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা কর্ত্তা বা গিন্নী নিজ নিজ কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এক দিন বেলা দশটার সময়, রান্নাঘরের বারান্দায় বড়বউ ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, ছোটবউ কুটনা কুটিতেছেন, এমন সময় "কি গো বড় গিন্নী, কেমন আছ গো?"—বলিয়া একজন বয়স্কা বিধবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই স্ত্রীলোক দেশে ইঁহাদেব বাড়ীর কাছেই বাস করে, ইঁহাদেরই প্রজা। তারাসুন্দবী বলিলেন, "দুলেবউ যে!—ভাল আছিস ত দুলেবউ?"

"হ্যাঁ, মা, তোমাদের ছিচরণ আশীব্বাদে ভালই আছি।'—বলিয়া নিম্নে দাঁড়াইয়া বারান্দার প্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া সে উভয় বধূকে প্রণাম কবিযা বলিল, "এই খোকাটি এবার বুঝি হয়েছে? তোমার খোকা হযেছে, তা আমি দেশে থাকতেই শুনেছিলাম। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেঁচে থাকুক।"

বড়বউ বলিলেন, "বস্ দুলেবউ বস্। এখানে কোথায় এসেছিলি? কবে এলি?"

"এই পবশু দিন এসেছি মা। আমাব জামাই এখন এইখানেই চাকরী করে কিনা, সে এখন আদালতের পেয়াদা হয়েছে। তোমাদের আশীব্বাদে বেশ দু'পয়সা ওজগারিও করছে। আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছে, এইখানেই বাসা ভাড়া নিয়ে আছে। মেয়েকে অনেক দিন দেখিনি তাও বটে, তোমার খোকাটি হয়েছে শুনেছিলাম তাও বটে, তাই মনে করলাম যাই, একবার দেখা-শুনো করে আসি।"

"তা বেশ কবেছিস। তোব মেযে জামাই ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ মা, তাবা ভাল আছে।"

দুলেবউ বসিয়া বসিয়া গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে বলিল, "আচ্ছা তা হলে এখন উঠি মা, বেলা হয়ে গেল। সকালেই দেশে যাব মনে করছি।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "উঠবি কেন দুলেবউ? এতদিন পরে এলি, এইখানেই দুটি খেয়ে যা। নাওয়া হয়েছে?"

"না মা, নাওয়া এখনও হযনি। তা বেশ, দুটি পেসাদ দিও, খেযেই যাব। তোমাদের খেয়েই ত মানুষ মা; আজ বলে নয়, সাত পুরুষ। তা একটু তেল দাও, নদীতে যাই।"

দুলেবউ নদী হইতে স্নান করিয়া যখন ফিরিল, তখন প্রতিদিনের প্রথামত রামলোচন হারাধনকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। দুলেবউ গোয়ালঘরের ছায়ায় নারিকেলগাছের আড়ালে বসিয়া হাবাধানের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পুরুষদের আহার শেষ হইলে, দুলেবউকে ভাত দিয়া, বড়বউ ও ছোটবউ খাইতে বসিলেন। আহারান্তে ছোটবউ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন। দুলেবউ পুকুরঘাটে গিয়া আঁচাইয়া আসিয়া নিজ আহাবস্থান পরিষ্কার করিল। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, আলগোছে

গিন্নীর হাত হইতে একটি পান লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "গিন্নীমা একটি কথা আছে, কিছু যদি মনে না কর ত বলি।

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা দুলেবউ?"

"ঐ যে মিন্সেটা বাবুর সঙ্গে বসে খেলে ও কে? তোমাদের কেউ হয়?"

"না, আমাদের কেউ না, দোকানের মুহুরী।

"কত দিন এসেছে?"

"এই মাসখানেক হবে। কেন দুলেবউ একথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন?"

দুলেবউ এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "ও লোক ভাল নয় মা ওকে তাড়িয়ে দাও। ছোট গিন্নী এখানে আসবার মাসখানেক আগে, ও মিনসে আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিল। ও কে কি বৃত্তান্ত কেউ জানে না। যদি মিথ্যে বলি ত আমার জিভ যেন খসে যায় মা—সন্ধ্যের পর তোমাদের বাড়ীর বাগানের ধারে, পুকুরঘাটের পথে—এইরকম সব জায়গায় দু'তিন দিন ছোটবউয়ের সঙ্গে ফুসুর ফুসুর করে কথা কইতে ওকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি কেন, আরও কত লোক দেখেছে। এ নিয়ে গাঁয়ে একটু কাণাকাণিও শুরু হয়েছিল। তার পর মিন্‌সে কোথায় চলে গেল, আর দেখতে পাইনি। আবার এখানে এসেও জুটেছে দেখছি। কার মনে কি আছে তা নারায়ণই জানেন, কিন্তু এসব কি ভাল মা। তোমরা ভদ্দরনোক, গাঁয়ের মাথা, ছি ছি, এ কি কাণ্ড!"—বলিয়া দুলেবউ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তারাসুন্দরী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, তবে ত স্বামী যাহা সন্দেহ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক আমার বিশ্বাসই ত ভুল!

॥ সাত ॥

অপরাহ্নকালে ছোটবউ বলিলেন, "দিদি, এখন তুমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছ, বট্‌ঠাকুর আমার টাকাগুলির ব্যবস্থা করে দিলেই আমি দেশে চলে যেতে পারি। আড়াই হাজার টাকা যদি এখন নাও হয়ে ওঠে, আপাততঃ দু'হাজার পেলেও আমার চলবে—পরে তখন হিসেবপত্র দেখে যা হয় ত দেবেন। আজকে বট্‌ঠাকুরকে তুমি বোলো মনে করে দিদি।"

বড়বউ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তা বলবো।" মনে মনে বলিলেন, "তোমায় হাতেনাতে একবার ধরি দাঁড়াও, ধরে আচ্ছা ঝাঁটাপেটা করি, তার পর বোধ হয়, তুমি দেশে না গিয়ে কাশী কি বৃন্দাবন যেতেই চাইবে।"

রাত্রে আহারাদির পর নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া তারাসুন্দরী স্বামীকে বলিলেন, "ওগো তুমি যা সন্দেহ করেছিলে, তাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।"—বলিয়া দুলেবউ কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদটি তিনি স্বামীর গোচর করিলেন। টাকার জন্য আজ আবার ছোটবউয়ের তাগাদার কথাও বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "টাকাটা ফেলেই দাও। দিয়ে পাপ বিদেয় কর। নইলে এখানে বাসায় আমাদের চোখের সামনে কি কাণ্ড হতে কি কাণ্ড হবে, ভাবতেও আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রামলোচন নীরবে ধূম্রপান করিতে লাগিলেন। কোনও মতামত ব্যক্ত না করিয়া অবশেষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু নিদ্রা তাঁহার চক্ষুতে আসিল না। ঘণ্টাখানেক এ পাশ ও পাশ করিয়া তিনি উঠিলেন, নগ্নপদে বাহিরে গেলেন। উঠানে নামিয়া দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। এ কয়দিন গভীর রাত্রে প্রায়ই তিনি এইরূপ "রোঁদে" বাহির হইতেছেন, দেখিতে আসেন, হারাধন নিজ স্থানে শয়ন করিয়া আছে কি

না। অন্যান্য দিন বৈঠকখানা ঘর ভিতর হইতে বন্ধ দেখিতে পান; আজ দেখিলেন বাহিরে শিকল চড়ানো।

দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল। বৈঠকখানার পাশ দিয়া, তিনি বাগানে প্রবেশ করিয়া নিজ শয়নকক্ষের পশ্চাতে গিয়া পৌঁছিতেই দেখিতে পাইলেন, ছোটবউয়ের ঘরের পশ্চাতের জানালার কাছে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ভিতরের মানুষের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

সাবধানে আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিয়া চিনিলেন, ও ব্যক্তি হারাধনই বটে। রাগে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যে পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাঘের মত লম্ফ দিয়া গিয়া সজোরে টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাজি নচ্ছার হারামজাদা! এই তোর কাজ? আয় শালা তোকে আজ খুন করে এইখানেই পুঁতি।"—বলিয়া হারাধনকে পাড়িয়া ফেলিলেন। উভয়ে মহা ঝটাপটি আরম্ভ হইল।

ব্যাপার দেখিয়া ছোটবউ নক্ষত্রবেগে নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তারাসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল—"দিদি দিদি, ওঠ। সর্ব্বনাশ হল, বট্‌ঠাকুর খুন করছেন।"

"কি কি"—বলিয়া তারাসুন্দরী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ছোটবউ বলিল, "দিদি বারণ কর, বারণ কর। ও অন্য কেউ নয়—ও আমার দাদা—আমার সহোদর ভাই। আমি টাকা চাইনে দিদি—তোমার পায়ে পাড়, আমার দাদাকে বাঁচাও।"

তারাসুন্দরী খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার প্রায় নীচে বাগানে একটা প্রবল মারামারির শব্দ এবং স্বামীর কণ্ঠস্বরে "খুন করব তোকে" এই কথা কয়টি শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

বড় বধূর অবস্থা দেখিয়া ছোটবউ নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা, দাদা, পরিচয় দাও।"—কিন্তু এই সময় হারাধন উঠিয়া চোঁচাঁ দৌড় দিল এবং রামলোচন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; সুতরাং ছোটবউয়ের কথাগুলি উভয়েব মধ্যে কাহাবও কর্ণগোচর হইল না।

॥ আট ॥

হারাধনকে ধরিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে রামলোচন যখন ক্ষতবিক্ষতপদে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ কবিলেন তখন দেখিলেন, উভয় বধূই একত্রে মেঝের উপর বসিয়া আছেন, তিনি প্রবেশমাত্র ছোটবউ উঠিয়া অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন। "হেরো শালাকে ত ধরতে পারলাম না, পালিয়ে গেল; এখন ডাক ঐ হারামজাদীকে। নাক কান কেটে ঝাঁটা মেরে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও।"

বড়বউ বলিলেন, "চুপ চুপ। অমন কথা মুখে এনো না।"

রামলোচন স্ত্রীর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? ও কথা বলছ কেন?"

বড়বউ বলিলেন, "ওগো মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ হারাধন আব কেউ নয়, ছোটবউয়ের দাদা।"

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "সে কি?"

"ওর এক দাদা ছিল, সে পাবনার বাজারে এক রাত্রে একটা খারাপ স্ত্রীলোককে খুন করে ফেরার হয়েছিল শোন নি? ওই সেই দাদা। হারাধন ত নয়, ওর আসল নাম হীরালাল।"

রামলোচন বলিলেন, "বল কি? ও ছোটবউয়ের ভাই? তা সে হল ফেরারী আসামী, এখানে কি করতে এসেছিল শুনি?"

"বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে।"

রামলোচন মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া, খাটের পায়ায় ঠেস্ দিয়া বলিলেন, "জল দাও।"

তারাসুন্দরী উঠিয়া এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। সমস্ত জলটুকু ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিয়া গেলাস নামাইয়া রাখিয়া রামলোচন বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু—কথাটা কি সত্যি? না নষ্ট স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধি?"

ইঁহারা জানিতেন না, ছোটবউ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে তখনই দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া নিজ কক্ষে গিয়া বাক্স খুলিয়া তাহা হইতে কতকগুলো কাগজ বাহির করিয়া লইল। বড়বউয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কোলের উপর কাগজগুলো ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বট্‌ঠাকুরকে এগুলি পড়ে দেখতে বল দিদি।"

লণ্ঠনের আলো বাড়াইয়া দিয়া রামলোচন কাগজগুলি পড়িতে লাগিলেন। এগুলি এই বাসাতে থাকাকালীন "হারাধন" লিখিয়াছে। ভগিনীর নিকট টাকার তাগাদা, ভাসুরের নিকট পাঁচ বৎসরের মুনাফার অংশ হিসাবে অন্ততঃ ২৫০০ টাকা দাবী করার জন্য উপদেশ; উকীলের পরামর্শের কথা; অবশেষে একখানি পত্রে অন্ততঃ পক্ষে আপাতত ২০০০ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি। স্পষ্টই বুঝা গেল, "হারাধন" এই পত্রগুলি রাত্রে পশ্চাতের জানালা দিয়াই হউক, অথবা অপর কোনও সুযোগেই হউক, তাহার ভগিনীর হাতে দিয়াছিল।

পত্রগুলি পড়িয়া রামলোচন বলিয়া উঠিলেন—"জয় ভগবান! জাত কুল রক্ষে করলে বাবা!"—বলিয়া পত্রগুলির মর্ম্ম স্ত্রীকে জানাইলেন।

অতঃপর রামলোচন বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে ব্যবসায়ে তাহার লাভের অংশস্বরূপ ৩০ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পূজার চিঠি

ভাগলপুর—৬ই অক্টোবর, ১৮৯৬।

প্রাণাধিক,

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি খোকাকে লইয়া জানালায় বসিয়াছি, ঝি আসিয়া তোমার চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়া পড়িবার আগেই কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল। মনটা ভারি বিষণ্ণ হইল; আহা, যাহা স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা যদি সত্য হইত! অথচ এই সেদিন তোমার চিঠি পাইয়াছি এত শীঘ্র আবার চিঠি আসিবার কিছু কথা নহে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটে না, যে বলে, তাহা কিন্তু যথার্থ। স্বপ্নটা মনে বড় বেদনা দিতে লাগিল। বাল্যকালে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহাব কথাগুলি মনে নাই, ভাবটা এই যে, স্বপ্নে সুখী হয়, সে জাগে কাঁদিবার জন্য;—তাহার পর বিদ্যুতের সঙ্গে একটা তুলনা দেওয়া ছিল, সেটা আমি বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছি (আমার স্মরণশক্তির যা তেজ তাহা তোমার কাছে অবিদিত নাই)—তুমি অল্প দুঃখে আমাকে লেখাপড়া শিখান হইতে বিরত হও নাই। যাহা হউক, তখন তিনটা বাজিয়াছে, খোকাকে উঠাইয়া দুধ খাওয়াইলাম। দুধ খাইয়া খোকা ঘুমাইতে লাগিল। একটা কথা আছে, কোন স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে বাকী রাতটুকু যদি আর ঘুমান না যায়, সে স্বপ্ন সফল হইতে পারে; সুতরাং আর ঘুমাইব না স্থির করিলাম। কি

করি? মনে করিলাম একখানা বই-টই লইয়া পড়ি; তাহার পর মনে হইল, যদিও না ঘুম পাইত, বই হাতে করিলে ত জাগিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া তোমার কতকগুলি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম।

এগুলি সব এবার তোমার গ্রীষ্মের ছুটির পর কলিকাতায় গিয়া লেখা। এক একখানি করিয়া চিঠি পড়িতে লাগিলাম, আর আমার অতীত দিনের কথাগুলি একে একে মনে উদয় হইতে লাগিল। এ দিনের সঙ্গে সে দিনের কত প্রভেদ! আমি এখন যে অবস্থায় আছি, বোধ হয় প্রেমিক প্রেমিকার এই অবস্থাই সুখের। আজ কাল আসিবে, ইহাতে বড়ই আনন্দ। যখন মিলন হয়, তখন কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে কাটিয়া যায়, কিছু বোঝা যায় না। তারপর বিরহের ক্রন্দন আরম্ভ হয়। তাহার পর যখন আবার পুনর্মিলনের দিন অত্যন্ত নিকটিয়া আসে, তখন বড় সুখ। সূর্য্য উঠিবার অনতিপূর্ব্বে যেমন আকাশ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, তেমনি এ সময়ও মনটাময় ছবি আঁকিয়া যায়। শুনিতে পাই, স্বর্গে চিরমিলন। তাহা কি তত সুখের? আমি যদি বিশ্বকর্ম্মা হইতাম (বিশ্বকর্ম্মাই স্বর্গ গড়িয়াছিল, না কে? কে জানে বাপু রামায়ণ টামায়ণ অত আমার মনে নাই) তবে এমন স্বর্গ গড়িতাম, যে প্রতি প্রেমিক প্রেমিকার মনে হইত, আমার হৃদয়নিধি আজি কালি ফিরিয়া আসিবেন। যাহা হউক, তোমার চিঠিগুলি পড়িতে লাগিলাম, আর আমি যত কাঁদিয়াছি, যত নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি সব মনে পড়িতে লাগিল। তুমি যখন কাছে থাক, তখন মনে হয়, ছাড়িয়া গেলে নাকি আবার বাঁচিয়া থাকা দায়। সেই তুমি বিদেশে চলিয়া যাও, অথচ বাঁচিয়া থাকি; কিন্তু দগ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকি। বাড়ীতে এত লোকজন, ছেলেপিলে, কিন্তু সব যেন খালি খালি বোধ হইত। সমস্ত জিনিসপত্র যাহা তুমি ব্যবহাব করিতে, সমস্ত যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদে মনে হইত। ঐ চেয়ারে তুমি বসিয়া পড়িতে, তোমার চেয়ারখানিতে আমি বসিয়া থাকিতাম। মনে মনে অনুভব কবিতাম, আমি শ্রীমতী সুরবালা দেবী নহি; আমি শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ—প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পাঠ কবি, এবং সিটি কলেজে আইনের শ্রেণীতে হাজিরা লেখাইয়া অন্যের অলক্ষিতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ি; আপাততঃ ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। এই মনে করিয়া 'সুরি' বলিয়া ডাকিতাম; নিজেই 'সুরি' সাজিয়া তাহার উত্তর দিতাম; কত কথা হইত, আমি ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া শয্যায় আবোহণ করিতাম। খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে তাহার মুখখানি দেখিতাম, ঠিক যেন ছোট তুমি। মা বলেন, ছেলেবেলায় ঠিক তুমি খোকার মত ছিলে। খোকাব পানে চাহিয়া চাহিয়া তবু অনেক পরিমাণে সান্ত্বনা পাইতাম। সকলে বলে, মা ছেলেকে বেশী ভালবাসিবে, কারণ সেই কোমল শিশুর মুখে তাহার প্রিয়তমের মধুমূর্ত্তির আভাস দেখা যায় এবং ঠিক এই কারণে বাপ মেয়েকে বেশী ভালবাসিবে। খোকা যদি না হইত, তবে তোমার বিরহ কেমন করিয়া সহ্য কবিতাম কে জানে!

আমার বিরহকালে দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল ঐ ঘড়িটি। আমার এ শয়নকক্ষে খোকা ছাড়া ঐ একমাত্র সজীব পদার্থ। অনেক বাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ কিন্তু ও বেচারীর নিদ্রা নাই—টক্ টক্ টক্ টক্। ভাবিতাম, এ আমাদের কি না জানে? কি না দেখিয়াছে? সেই ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কহাইবার জন্য তোমার সাধাসাধি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ৪ঠা আষাঢ় ভোর রাত্রে তোমার বিদায় গ্রহণের দৃশ্য পর্যন্ত সব কথার এ সাক্ষী আছে। ইহাকে কত কথা বলি কিন্তু কোনও কথা কানে তুলে না, এই একটা এর ভারি দোষ! এ যদি আমার সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? তুমি যখন আসিবে তখন ইহাকে বলিতাম, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইয়া দে, তারপর আ-স্তে আ-স্তে আ-স্তে চলিবি। দশটা হইতে এগারোটা আর বাজে না। এগারোটা বাজিল ত বারোটা বাজিতে চাহে না! চারিটা বাজিয়া গিয়াছে তবু আর রাত্রি পোহায় না! সময় চুরি করিতে তাহাকে বলি না। দিনের বেলায় খুব শীঘ্র

শীঘ্র চলিলেই ত হইল! চব্বিশ ঘণ্টায় দিনমান ত? সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা অবধি এই যোল ঘণ্টা চারি পাঁচ ঘণ্টায় চলিয়া সমস্ত রাত্রে বাকি সময়টা পোষাইয়া লও না বাপু! আর এখন? এখন বলি, তোর কাঁটাগুলো বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া ২৫শে আশ্বিনের সন্ধ্যা আনিয়া দে। তা সে শুনিবে না—সেই টক্-টক্-টক্-টক্—গা জ্বলে যায়! একটু জোরে চল না মুখপোড়া! খেতে পাও না? তুমি যে কেবলা চাকরের বাপ হলে! তুই তোকারি করিলে, গালি দিলে না শুন, তুমি বলিব, আপনি বলিয়া কথা কহিব। হাতযোড় করিয়া গলবস্ত্র হইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত আছি—স্তব করিতেও আপত্তি নাই! রবিবারে রবিবারে দম পায় প্রত্যহ স্বহস্তে দুই বেলা দম দিব স্বীকার করিতেছি। এতেও সে শুনে না। কাঁটা দুটা ভাঙ্গিয়া ডায়েলে কালি ঢালিয়া দিলে তবে রাগ যায়।

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চিঠি পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সকাল হইয়া গেল। তখন সব তুলিয়া রাখিয়া উঠিতে হইল। মনে হইতে লাগিল, আজ আমার চিঠি আসিবেই, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। কতবার ভাবিলাম হে ঠাকুর, যদি স্বপ্ন দিলে, তবে আজ আমার একখানি চিঠি আনাইয়া দাও; অনেক কষ্টে বেলা দশটা অবধি কাটিল। সাড়ে দশটার মধ্যে চিঠি আসিবে। আমি তখন রান্নাঘরে; উৎকণ্ঠায় ডালে তিনবার নুণ দিয়া ফেলিয়াছি, মাছগুলো ভাজিতে গিয়া এক পিঠ পোড়াইয়া কালো করিয়া দিয়াছি, আনমনে জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে আথার পাথার খেলাইয়াছি। মা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বকুনি ধরিলেন। আমি ছুটিয়া পথের ধারের জানালায় গিয়া বসিলাম;—বকুনি শুনিবার আমার অবসর কোথায়? চিকের আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলম। কত লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, খাবারওয়ালা, জুতো সেলাই বুরুষ, কনষ্টেবল, ভিখারী, স্কুলের ছেলে, আপিসের বাবু যাইতেছে, আসিতেছে, কিন্তু ডাকওয়ালার দেখা নাই। রাস্তার যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা পাগড়ী দেখা গেল। বলিহারি, ইঁরেজের কি বুদ্ধি বে! ডাকওয়ালার মাথায় লাল পাগড়ী কেন? না অনেক দূর হইতে অনেক লোকের মাঝে সে আসিতেছে দেখা যাইবে বলিয়া। ক্রমে সে নিকটে আসিল হায়! হায়! ডাকওয়ালা নহে, চাপরাশি! চুলোয় যাউক! ইংরাজ, যদি এত বুদ্ধি ধর,—তবে ডাকওয়ালা ছাড়া অন্য কাহাকেও লাল পাগড়ী পরিতে দাও কেন? আইন করিয়া ইহা দমন করা উচিত! ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্যগণ এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন না কেন? তাঁহাদের কি স্ত্রী নাই? তাঁহারা কি এমনি করিয়া প্রবাসী স্বামীর পত্রের প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিয়া কখনও আমার মত নির্দ্দয় ভাবে প্রতারিত হন নাই? যাহা হউক ক্রমে ডাকওয়ালা আসিল। দরজায় চাকরের হস্তে 'চিট্‌ঠি' এই শব্দ করিয়া চিঠিগুলি দিয়া গেল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিটের পর ঝি আসিয়া আমার হাতে লেফাফা দিল, গোলাপী রঙ্গের সমচতুষ্কোণ খামখানি, তাহার উপরে তোমার হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—শ্রীমতী সুরবালা দেবী।

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার জন্যে কি আনিতে হইবে? আমার জন্য আর কি আনিবে ছাই? আমাদের আর এখন সখ করিবার বয়স আছে? খোকাবাবুর জন্য ভাল করিয়া পোষাক লইয়া আসিও, আর যাহা ভাল দেখ তাহাই আনিও। আর অধিনীর জন্য যদি নিতান্তই কিছু আনিতে হয়, তবে একখানি টিয়ে রঙের কাপড় তাহার জমিটা হইবে টিয়াপাখীর গায়ের মত সবুজ, পাড় হইবে ঠোঁটের মত লাল। এক বোতল কুন্তলীন আনিও—এবার পদ্মগন্ধ আনিও; গোলাপগন্ধ সুবাসিত অনেক মাখা হইয়াছে। খান দুই লেবুর সাবান, এক বাক্স ভাল সোপ, দুই জোড়া জুবিলীচুড়ি—সরুগুলি আনিবে, মোটাগুলি ভাল দেখিতে নয়; এক শিশি কুন্তলীনওয়ালাদের এসেন্স দেলখোস; সাদা কালো ছাই রঙের তিন বাণ্ডিল পশম, আর পার ত কোন ভাল দোকান হইতে একটি মাথায় পরিবার

রূপার প্রজাপতি—এইগুলি আনিবে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের আর কি মানায়?

লোকে নিন্দা করিবে যে! মার জন্য একগাছি আসল রুদ্রাক্ষের মালা, বাবার জন্য একখানি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পুস্তক আনিবে। আর আনিবে শ্রীযুক্ত বাবু অমলেন্দুকে; অধিক টাকা না থাকে বরং আর কিছু আনিবার প্রয়োজন নাই; শেষের লিখিত এই ফরমাসটি আনিলে চলিবে। কারণ ইহার দাম এক আনা মাত্র। ইতি—

তোমার—সুরো, সুরু—বা সুরি।

কাজির বিচার

জগদ্বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের বোগ্দাদাধিপতি হারুণ আল রশিদ একদিন সিংহাসনে বসিয়া পাত্র মিত্র সভাসদ্‌বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা ও পুত্রবধূ এই দুইয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কাহাকে অধিক ভালবাসে?"

সভাসদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে সকলে অধিক ভালবাসে, সুতরাং পুত্রবধূকেও সমধিক ভালবাসিবার কথা। অন্যেরা প্রতিবাদ কবিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে, সুতরাং কন্যাকেই সকলে অধিক ভালবাসিবে। কেহ বলিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে হইলেও ঘরে থাকে, কন্যা পরের ঘরে চলিয়া যায়, অতএব পুত্রবধূর প্রতিই স্নেহ গাঢ়তব হয়। অপবেরা ঠিক এই যুক্তিতেই উক্তমত খণ্ডন করিয়া বলিলেন, যে সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাহার প্রতি ততটা স্নেহোদ্রেক হয় না; যে দূরে থাকে, সে-ই অধিক স্নেহেব আধিকারিণী হয়। এইরূপে বাদানুবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না।

এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ সভাসদ্ এতাবৎকাল নীরবে বসিয়া ছিলেন। খালিফ তাঁহাকে বলিলেন,—"মৌলবী সাহেব, আপনি কেন স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন না?" বৃদ্ধ, খালিফের এই প্রকার উক্তিতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন—"হে ঈশ্বর-প্রেরিত মহম্মদীয় ধর্ম্মের রক্ষক, স্ত্রীলোকেরা যে পুত্রবধূ অপেক্ষা কন্যাকে অধিক ভালবাসে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি গল্প জানি, অনুমতি হইলে নিবেদন করিতে পারি।" খালিফের অনুমতিক্রমে প্রবীণ মৌলবী এইরূপ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে এক নগরে এক বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার এক পুত্র আর এক কন্যা ছিল। এই কন্যা ও পুত্রবধূটি একই সময়ে আসন্নপ্রসবা হইলেন। পুত্রবধূর নাম ওয়াজিহন (সুন্দরী) এবং কন্যার নাম জহূরণ (প্রকাশ্যমান) ছিল। এক রাত্রে একই সময়ে ওয়াজিহন ও জহূরণ দুইজনেরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তখনও ধাত্রী আসিয়া পৌঁছে নাই। বিধবা দেখিল পুত্রবধূ ওয়াজিহনের পুত্র সন্তান ও কন্যা জহূরণের কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। ইহা বিধবার সহ্য হইল না। সে ওয়াজিহনের পুত্রকে জহূরণেব সূতিকাগৃহে স্থাপন করিয়া দৌহিত্রীকে আনিয়া পুত্রবধূর নিকট রাখিয়া দিল। বাড়ীতে আর জনপ্রাণীও ছিল না;—প্রসূতিরা গতচেতন ছিলেন; একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ এ বিনিময় ব্যাপারের সাক্ষী রহিল না।

দুই বৎসর অতীত হইল। ওয়াজিহন কন্যাকে এবং জহূরণ পুত্রকে লালন পালন করিতেছেন;—কাহারও মনে অনুমাত্র সন্দেহেরও সঞ্চার হয় নাই।

একদিন সায়ংকালে ওয়াজিহন স্বীয় কক্ষে নামাজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার পালিত শিশুকন্যাটি কোথায় খেলা কবিতে গিয়াছিল। জহূরণের পুত্রটি নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা হইলে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শঙ্কার ভাব পাং,এ

মাতৃহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাবৎ জীবজগতে মাতৃস্নেহের একটা প্রবাহ বহিয়া যায়।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সেই প্রার্থনা-পরায়ণা জননীর হৃদয়ে সেই মাতৃস্নেহপ্লাবিত সন্ধ্যাকালে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। কে যেন তাঁহার কানে বলিয়া দিল—"এ সন্তান তোমারই।"

সেই অবধি তিনি অতি নিপুণতা ও সাবধানতার সহিত সেই বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং সঞ্চালনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ বালকের সমস্তই আশ্চর্যরূপ মিলিতে লাগিল। একদিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট এ কথা বলিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইলেন—"বাঁদি, যদি বারদিগর (দ্বিতীয়বার) এ কথা মুখ হইতে বাহির করিবি, তবে তোর জিহ্বাটা জ্বলন্ত লৌহ দিয়া পোড়াইয়া দিব।" এইরূপ ব্যবহারের পর ওয়াজিহনের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার গুণবতী শ্বাশুড়ীই সেই সন্দিগ্ধ অপকার্য্যের কর্ত্রী। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি সেই নগরের কাজির নিকট বিচারপ্রার্থিনী হইলেন।

কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কোন সাক্ষী সাবুদ আছে?

ওয়াজিহন বলিলেন—"আমার স্বাক্ষী স্বর্গে ঈশ্বর এবং মর্ত্ত্যে আমার এই মাতৃহৃদয়।"

কাজি মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া এই মোকর্দ্দমার কিনারা করিবেন? দুই চারিদিনের মধ্যে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষ (নাম করিলে গোস্তাকি হইবে) তদানীন্তন বোগ্দাদাধিপতির কর্ণেও একথা পৌঁছিল। তিনিও অপর সকলের ন্যায় সমুৎসুক হইয়া কাজিব বিচারফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই তিন মাস অতীত হইয়া গেল তবুও মোকর্দ্দমার কিছুই হইল না। অবশেষে খালিফ হুকুম দিলেন, তিন মাসের মধ্যে যদি কাজি বিচার সমাধা কবিতে না পারেন, তবে তিনি সপরিবারে নির্ব্বাসিত হইবেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাজি সাহেব যারপরনাই দুশ্চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে ভাবিলেন আমার নির্ব্বাসন ত হইবেই, অতএব সে অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এখন হইতেই ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করি। যদি ঈশ্বর দয়া করেন—যদি কোন উপায় স্থির করিতে পারি—তবেই ফিরিব, নতুবা মক্কায় গিযা জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিব। এইরূপে কাজি গৃহত্যাগ করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নগর হইতে নগরান্তরে, পর্ব্বত পার হইয়া, নদী পার হইয়া, জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিলেন। অষ্টাদশ দিবসের পর সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সেই গৃহস্থের একখানি মাত্র ঘর, তাহাতেই সে সপরিবারে শয়ন করিত। অতিথিকে বলিল—"মহাশয় আপনি যদি ঐ গোশালায় রাত্রি যাপন করিতে প্রস্তুত হন, তবে অবস্থিতি করুন।" কাজি স্বীকৃত হইলেন।

পথশ্রমে তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। গৃহস্থ প্রদত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া অবিলম্বেই নিদ্রিত হইলেন। অনেক রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভাগ্য মনুষ্যের মত তিনিও সেই ঘোর অন্ধকারময়ী স্তব্ধ রজনীতে স্তব্ধভাবে আপনার অদৃষ্টান্ধকারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জনকতকে অস্ত্রাধারী দস্যু সেই গোশালায় প্রবেশ করিল। দুইটি গাভী এবং তাহাদের দুইটি বৎস বাঁধা ছিল—দস্যুরা একটি গাভী এবং লোকটি বৎসকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাহার চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত গাভী ও বৎস অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। গাভীটি "হা বৎস" এবং বৎসটি "হা মাতা" বলিয়া রোদন করিতেছিল। কাজি বিদ্যাবলে পশুপক্ষীদিগের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তিনি এই ক্রন্দন ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন

গাভীটি বলিতেছে—"বাছা তোর মা গিয়াছে; আমার বৎস গিযাছে; আয তুই আমার সন্তান হইয়া থাক্, আমি তোর মা হইয়া সান্ত্বনা লাভ করি।" বৎসটি বলিল—"মা তুমি আমায় খাওয়াইবে কি? তোমাব বৎস স্ত্রীজাতীয় ছিল; আমি পুরুষ; তোমাব অল্প পরিমিত স্তনদুগ্ধে কেমন কবিয়া আমার ক্ষুধা নিবাবণ হইবে?"

এই কথা শুনিতেই কাজি সাহেবেব মস্তিষ্কে একটি সত্যের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। ভাবিলেন ঠিক কথা। ঈশ্বব স্ত্রী জাতিকে দুর্ব্বল এবং পুরুষ জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়াছেন। উভয়ের দেহপুষ্টির জন্য সমান আহাব কখনও প্রযোজন হইতে পাবে না। যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় তাহাও এই অপূর্ব্ব কৌশলে সৃষ্ট বিশ্বজগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পুং-বৎস-মাতা গাভী এবং স্ত্রী-বৎস-মাতা গাভীর স্তন্যপরিমাণ সমান নহে।

এতদিনে সে মোকর্দ্দমার কিনাবা হইল। কাজি প্রাতঃকালীন প্রার্থনায ঈশ্বর ও মহম্মদকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রফুল্ল মনে দেশে ফিরিলেন। বোগদাদে রাজসন্নিধানে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি কবিতে প্রস্তুত হইযাছেন। এতদিনে দেশময় এ কথা প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল। খালিফ কাজিকে আজ্ঞা কবিলেন—"তুমি বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী প্রভৃতি সমস্ত লইয়া এই রাজধানীতে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিচার কার্য্য সম্পাদন কবিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে কাজি বাজসভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। বাজ্যের সমস্ত গণ্য মান্য লোক—আমির, ওমরাহগণ উপস্থিত হইযাছেন, বিচাব কার্য্য আরম্ভ হইল।

কাজি পূর্ব্ব হইতে প্রায় একশত চতুষ্পদ পশু বাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি সভাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। খালিফ কহিলেন—"এ সব কি হইবে?" কাজি কহিলেন, "এ সকল সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত।"

সকলে একান্ত কৌতূহলেব সহিত বিচাব প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে বাদিনী তাঁহাব মোকর্দ্দমাব সমস্ত বিববণ প্রকাশ কবিলেন। প্রতিবাদিনী দোষ অস্বীকাব করিল। তখন বৃদ্ধা ধাত্রীব সাক্ষ্য গ্রহণ কবা হইল। সে বলিল—"সন্তান দুইটি ভূমিষ্ঠ হইবাব বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা পবে আমি উপস্থিত হইযাছিলাম। প্রতিবেশিনীবা সাক্ষ্য দিল—'আমবা সন্তান জন্মের বাত্রি প্রভাত হইলে দুইজনেবই সূতিকাগাবে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ওয়াজিহনের কোলে কন্যা এবং জহুরণেব কোলে পুত্র সন্তানই দেখিয়াছিলাম।"

ইহার পর কাজি বলিলেন—"এখন বাক্‌শক্তিসম্পন্ন সাক্ষীদিগেব পরীক্ষা শেষ হইল; এইবার সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত সাক্ষীগুলিব পবীক্ষা লওয়া যাইতেছে;—মাননীয় সভাসদ্‌বর্গ এবং সর্ব্বসাধারণ মনোযোগ করুন।"

পূর্ব্বকথিত পশুপাল হইতে একটি পুং-বৎসযুক্ত এবং স্ত্রী-বৎসযুক্ত গাভী আনা হইল, বৎস দুইটি সমবয়স্ক। দুইটি সমভাব বৌপ্য পাত্রে গাভী দুইটির দুগ্ধ দোহন করণান্তর তুলাদণ্ডে পরিমিত করা হইল। সর্ব্বসাধাবণ প্রত্যক্ষ করিল, পুং-বৎসযুক্ত গাভীটির দুগ্ধ অধিক হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হরিণ প্রভৃতি বহু বহু পশুমাতার পরীক্ষা লওয়া হইল এবং প্রত্যেক বারেই ফল পূর্ব্বানুরূপ হইল।

পরীক্ষা শেষ হইলে কাজি বলিতে লাগিলেন—"হে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সভাসদ্‌গণ, আপনারা জানেন, ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিকে বলবত্তর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারণে সর্ব্বজীবের আদিম খাদ্যভাণ্ডারে তিনি পুরুষের জন্য অধিক এবং স্ত্রীজাতির জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প খাদ্য সঞ্চিত বাখিয়াছেন, তাহাও আপনারা প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে (ওয়াজিহন ও জহুরণকে দেখাইয়া) এই স্ত্রীলোক দুইটির স্তন দুগ্ধ এইরূপ তুলনা করিয়া দেখা যাউক যাহার দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হইবে তাহাকেই পুত্র সন্তানের মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে। কেমন, এ প্রকার নিষ্পত্তিতে আপনাদের সকলের সম্মতি আছে ত?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"আছে।"

বলা বাহুল্য ওয়াজিহনের দুগ্ধই গুরুতর হইল। ওয়াজিহন সভা সমক্ষে আপনার পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। জহূরণকে তাঁহার কন্যা প্রত্যার্পিত হইল।

খালিফ এই বিচার পদ্ধতি দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মণিহার মোচন করিয়া কাজি সাহেবের গলে পরাইয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে রাজধানীর প্রধান কাজির (চীফ-জাস্টিস্) সম্মানসূচক পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

দণ্ডস্বরূপ সেই শ্বাশুড়ীকে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত এক জনহীন প্রান্তরে, নির্ব্বাসিত করা হইল।

যুবকের প্রেম

বিবাহের পর তিনটি বৎসরও ঘুরিল না—মহেন্দ্র বিপত্নীক হইল।

মাত্র দুই বৎসর নয় মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল চঞ্চলা। হিন্দুর মেয়ের চঞ্চলা নাম রাখা ভাল হয় নাই, কারণ, বধূ হইয়া তাহাকে পতিকূলে ধ্রুবতারার মত স্থির থাকিতে হইবে। ছেলেবেলায় সে বড় দুষ্ট ছিল বলিয়াই মা-বাপ তাহার ফুটিতে না ফুটিতেই, চপলা চঞ্চলার মতই সে আকাশের গায়ে লুকাইবে?

মহেন্দ্র তাহাদের জিলায় অবস্থিত মিশনারী কলেজ হইতে দুইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। পড়াশুনায় মন তাহার কোন কালেই ছিল না। তাহার মন ছিল খেলায়—তাস পাশা খেলায় নয়—ক্রিকেট, ফুটবল, কুস্তী, জিমন্যাস্টিক ইত্যাদিতে। কলেজের ফুটবল টীমের সেই ছিল কাপ্তেন, জিম্‌ন্যাস্টিকের আখড়ায় সেই ছিল মাষ্টার। দেহে তাহার বিলক্ষণ বলও জন্মিয়াছিল।

পাশ করিতে না পারিলেও, আর একটা জিনিস সে বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল— ইংরাজী ভাষা এবং আদবকায়দা। মিশনারী সাহেবগণের সহিত সর্ব্বদা মিশিবার ইহা ফল। খেলায় তাহার নিপুণতা ও দেহবলের জন্য সাহেবেরা তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন।

মহেন্দ্র বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর সে-ই বাড়ীর কর্ত্তা হইয়াছিল। সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না, সামান্য কিছু জমীজিরাৎ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। সকলেই আশা করিয়াছিল মহেন্দ্র মানুষ হইয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিলে সংসারের কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও মহেন্দ্র মানুষ হইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। তখন পাড়ার প্রবীণাগণ তাহার মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—ছেলের বিয়ে দাও; তা হ'লেই সংসারের দিকে টান হবে, টাকা রোজগারের চেষ্টা করবে।"—তাই, একুশ বৎসর বয়সে মা তাহার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন,—চঞ্চলার বয়স তখন এগারো। বৎসরখানেক হইল, চঞ্চলা "ঘরবসত" করিতে আসিয়াছিল। প্রবীণাদেব ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করিয়া মহেন্দ্র ঘরেই বসিয়া রহিল, উপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা দেখিল না। শেষের এক বৎসর সে ত বউ কাল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে, সেই শোকে মহেন্দ্র কিছুদিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সারা সকালবেলাটা মাথাটি নীচু করিয়া, উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়ায়, সাত ডাকেও কেহ তাহার উত্তর পায় না। শ্রান্ত হইলে, তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। "রান্না হয়ে গেছে, স্নান ক'রে এস"—বলিলে সে কথা কাণেই তোলে না। অবশেষে বিস্তর তাগিদে স্নান করিয়া খাইতে বসে, কিন্তু পাতে অর্দ্ধেক ভাত তরকারী ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়। বিকালে জিম্‌ন্যাস্টিক বা ফুটবলের

আড্ডা হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাকে ফিরাইয়া দেয়—যায় না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ ঘুমায় না—এপাশ ওপাশ করে, মাঝে মাঝে কাঁদে। ইহা দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা গোপনে বলাবলি করে—"আহা বড্ড দুজনে ভাব হয়েছিল কিনা!"—আর, আঁচলে আপন আপন চক্ষু মুছে।

পাড়ার প্রবীণারা মহেন্দ্রের মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, "শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দাও—তা হলেই মন আবার ভাল হবে।" মা বলিতে লাগিলেন, "না দিদি, এখন আমি ওকে ও কথা বলতে পারব না। বড্ড শোকটা পেয়েছে—আর কিছুদিন যাক—একটু সামলে উঠুক আগে।"

।। দুই ।।

ছয় মাস কাটিয়াছে। এখন মহেন্দ্র অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে। আহারে আবার রুচি জন্মিয়াছে। কেহ হাসির কথা বলিলে, এখন সে পূর্ব্বের মতই হাসিয়া উঠে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ খেলিতে যায়। পূর্ব্বের মত সবই করে, কিন্তু কিছুতেই জীবনের সে স্বাদটুকু আর পায় না।

অবসর বুঝিয়া এক দিন মা তাহার নিকট পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—"না মা, ও কার্য আর করছিনে।"

মা বলিলেন, "পাগল ছেলে! এখন তোর বয়স কি? তোর বয়সের কত ছেলের প্রথম বিয়েই হয় না যে! তোর দ্বিগুণ বয়সের কত লোক, পরিবার মরবার পর দু'মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ে করেছে—তুই করবিনে কেন? ঐ ওপাড়ার চাটুয্যেদের মেঝকর্ত্তা—" মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "যার যা প্রবৃত্তি হয়, সে তা করুক মা, আমার দ্বারা কিন্তু ও কার্যটি হবে না।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত। তাহার পর কোনও দিন মা, কোনও দিন মাসী, কোনও দিন পিসী, কোনও দিন খুড়ি-জ্যেঠী-ঠানদিদিরা এ বিষয়ে মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্র উত্যক্ত হইয়া স্থানত্যাগ করাই স্থির করিলেন। একটা কার্যকর্ম্মের উপায় না হ'লে সংসারই বা চলবে কি ক'রে? তাই মনে করছি, তুমি যদি মত কর তবে কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি।"

এতদিনে ছেলের সুবুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাই ত করা উচিত বাবা! লেখাপড়া শিখেছ, একটা চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা ভাল কার্য-কর্ম্ম জোটাতে পারবে। তা কলকাতায় যাও—এস গিয়ে—তাতে আমার কোনও অমত নেই।"—মনে ভাবিলেন, কায-কর্ম্ম করিতে করিতেই ছেলের মন ভাল হইবে,—আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে,—সংসারটা বজায় থাকিবে।

সেই গ্রামের একজন কায়স্থ কলিকাতায় লোহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। বড় কারবার। তিনি বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্র গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি শুনিয়া রাজী হইলেন; বলিলেন, "বেশ ত। আমার সঙ্গেই তুমি চল আমার আড়তেও অনেক লোক প্রতিপালিত হচ্ছে—কিন্তু তুমি ভাল লেখাপড়া শিখেছ, সে রকম সামান্য চাকরী ত তোমার উপযুক্ত হবে না, ভবিষ্যতেও তেমন কোনও উন্নতি নেই। কোনও একটা ভাল আপিস-টাপিসে ঢোকবার চেষ্টাই দেখতে হবে তোমার জন্যে দু'চার জন বড়লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা দেখবো।"

যথাদিনে মহেন্দ্র আম্রশাখাযুক্ত ঘট প্রণাম করিয়া, জননী প্রভৃতির পদধূলি লইল। মা, তাহার কপালে দধির ফোঁটা দিয়া, "চিরজীবী হও—রাজ-রাজেশ্বর হও"—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটি ব্যাগে নিজ সামান্য বস্ত্রাদি, মৃতা পত্নীলিখিত খানকতক পুরাতন চিঠি এবং মাতৃদত্ত দশটি মাত্র টাকা লইয়া, মহেন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিল।

।। তিন ।।

মহেন্দ্র মফঃস্বলে প্রতিপালিত হইলেও সে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে নহে—কলিকাতা তাহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, পিতার জীবনকালে তাঁহার সহিত কয়েকবার সে কলিকাতায় আসিয়া এক মাস দেড় মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পৌঁছিবার দুই দিন পরে সেই কায়স্থ বাবুটি মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং কয়েকজন বড়লোকের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "চেষ্টা করা যাবে। মাঝে মাঝে এসে খবর নিও।"

মহেন্দ্র দুই চারি দিন অন্তর তাঁহাদের বৈঠকখানায় গিয়া ধর্ণা দিতে লাগিল; সব দিন যে কর্ত্তা মহাশয়ের দেখা পাইত, তাহা নহে; দেখা পাইলেও বিশেষ কোনও আশার বাক্য শুনিতে পাইত না। "বি-এটা পাশ করা থাকলে চট্ করে একটা কিছু হয়ে যেতে পারতো।—যা হোক, চেষ্টায় আছি, দু'চার জন লোককে বলেও রেখেছি, দেখি কি হয়।" এইরূপ কথা শুনিয়াই ফিরিতে হইত।

আফিস অঞ্চলেও মহেন্দ্র ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। সারাদিন ধূলায়, রৌদ্রে ঘুরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গদিতে ফিরিয়া আসিত। আহার করিয়া সকাল সকাল শয়ন করিতে যাইত; মৃতা পত্নীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। নির্জ্জন পাইলে ব্যাগ হইতে চঞ্চলার পত্রগুলি বাহির করিয়া পাঠ করিত; পড়া শেষ করিয়া, সজল নয়নে সেগুলি আবার নেকড়ায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিত।

কলিকাতায় এইভাবে একমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কায-কর্ম্মের কোনও কিনারা হইল না। এই সময় পূর্ব্বোক্ত বড়লোকগণের মধ্যে একজন প্রাতে দুই ঘণ্টা তাঁহার পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পড়াইবার জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র তাহা গ্রহণ করিল—তবু পকেট খরচাটা ত চলিবে!

যখন দুই মাস কাটিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র প্রায় হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সরকার মহাশয়ের অন্নধ্বংস করিতে তাহার মনে লজ্জাও হইতে লাগিল। ভাবিল, আর একটা মাস দেখিব—কিছু যদি না জুটে, তবে দেশে ফিরিয়া গিয়া, চাষবাস কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

কিন্তু সেটা তাহাকে করিতে হইল না—ভাগ্যদেবী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং প্রসন্ন বদনে হাসিয়া, তাহার আশার সুসার করিবার জন্য এক অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করিলেন।

।। চার ।।

সে দিন শনিবার ছিল, আফিসগুলি বেলা দুইটার সময় সব বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্র আর কি করে, গদীতে ফিরিয়া গিয়া জন্তুটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল, তার চেয়ে যাই, গড়ের মাঠে গিয়া গাছের ছায়ায় একটু শুইয়া থাকি। তাই সে করিল। রাস্তা হইতে অল্পদূরে, একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়া তথায় গেল এবং গায়ের উড়ানীখানি খুলিয়া, গুটাইয়া সেটিকে উপাধান স্বরূপ করিয়া, বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আরামে মহেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘণ্টা দুই এই ভাবে নিদ্রা যাইবার পর, সে জাগিয়া উঠিল। শরীরে আবার বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল। রৌদ্র তখন পড়িয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে, উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার উপর আসিল। পথে তখন অনেক বায়ুসেবনকারী বহির্গত হইয়াছে।

কিয়দ্দূর পথ আসিয়া, মহেন্দ্র দূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। দেখিল কেল্লার দিক হইতে একখানা বগীগাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই গাড়ীকে থামাইবার

জন্য রাস্তার লোক হো-হো করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে—কিন্তু ঘোড়া নিকটে আসিবামাত্র তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী মোড় ঘুরিয়া, মহেন্দ্র যে রাস্তায় ছিল, সেই রাস্তা লইবার চেষ্টায় কোণের লাইটপোষ্টে ধাক্কা খাইল। পশ্চাতে যে সহিস দাঁড়াইয়া ছিল, সে ছিট্‌কাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল; গাড়ী বিদ্যুদ্‌বেগে মহেন্দ্রের দিকে আসিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইল, একজন অল্পবয়স্কা শ্বেতকায়া মহিলা মধ্যস্থলে বসিয়া, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশু—একটি বালক, একটি বালিকা। তিনি নিজেই গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন, অশ্বের ছিন্ন বল্‌গা তখনও তাঁহার হাতেই রহিয়াছে।

মহেন্দ্র যেখানে ছিল, সে স্থানের কাছাকাছি চার পাঁচজন ইংরাজ ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন। খিদিরপুর ডকের বহুসংখ্যক কুলি সেই সময় উত্তর দিক হইতে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সাহেবেরা লম্ফ দিয়া সেই সব কুলির মধ্যে পড়িয়া, ছড়ি উচাঁইয়া ধমক দিয়া, তাহাদিগকে আনিয়া, পথের প্রস্থভাগ জুড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা চীৎকার করিতে করিতে ছড়ি আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কুলিরা হল্লা করিতে লাগিল। মহেন্দ্র স্বেচ্ছায় এই কুলিদের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

অশ্ব কাছাকাছি আসিয়া, পথ এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া সহসা ফিরিয়া ময়দানের দিকে মুখ করিল এবং নিমেষ মধ্যে খানা পার হইয়া, ময়দানে প্রবেশ করিয়া ছুটিতে লাগিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজ গলা হইতে চারদখানা নামাইয়া তাহার উভয় প্রান্ত একত্রে গাঁইট দিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিয়দ্দূর প্রাণপণে ছুটিয়া অশ্বের নাগাল পাইয়া সেই চাদরের ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া বিপুল বলে তাহা টানিতে টানিতে আড় হইয়া ছুটিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত সাহেবরাও ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের এই সাহস ও কৌশল দেখিয়া, "ব্রাভো ইয়ংম্যান—হোল্‌ড অন্‌" (সাবাস যুবক, ধরিয়া থাক) বলিয়া তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। অশ্বের গতিবেগ প্রতি মুহূর্তে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে সাহেবেরা আসিয়া পৌঁছলেন এবং সেই চাদর দুই তিনজনে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়াই অশ্ব পরাজয় স্বীকার করিল—সে দাঁড়াইল।

দুইজন সাহেব তখন মেমসাহেব ও শিশুদ্বয়কে বগী হইতে নামাইলেন। মেমসাহেবের মুখ শাকের বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। দাঁড়াইতে পারিলেন না। সেইখানে ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই যে কাহাকেও ধন্যবাদ দিবেন। শিশু দুইটি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেমসাহেবের মূর্চ্ছার উপক্রম দেখা গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এক সাহেবের পকেটে ব্যাণ্ডি ভরা ফ্ল্যাস্ক ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া মেমসাহেবরে মুখে ধরিলেন। মেমসাহেব ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিলেন।

সাহেবরা কেহ মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিলেন কেহ তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, সকলেই তাহাকে অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব একটু চাঙ্গা হইলে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি কেল্লায় থাকেন, মেজর গ্রীণের পত্নী। শিশু দুইটি তাঁহার নিজস্ব নহে—কর্ণেল হ্যামিল্টনের সন্তান—তিনি তাহাদিগকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সহিসটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়া তাহার জিম্মায় রাখিয়া, সাহেবরা বিবি গ্রীণ ও শিশুদ্বয়কে রাস্তার উপর লইয়া আসিয়া একটা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া দিলেন। বিবি, সাহেবদিগকে ও মহেন্দ্রকে মধুর ভাষায় ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু তুমি আমায় কেল্লায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।"

মহেন্দ্র কোটবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, বিবি বলিলেন, "না না—তুমি ভিতরে আসিয়া বস।" মহেন্দ্র তাহাই করিল, গাড়ী কেল্লা অভিমুখে ছুটিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া, বিবি গ্রীণ মহেন্দ্রকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থূলকায় বর্ষীয়ান্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিবি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "জন্ এই বাবু আমার জীবনদাতা।" মহেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, মেজর গ্রীণ।"

ইঁহারা প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মেজর সাহেবকে সেলাম করিল। সাহেব মহেন্দ্রের করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইলেন। এক সোফার উপর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র উত্তর দিতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "বাঃ তুমি ত বেশ ইংরাজী বল, বাবু! তুমি একজন সুশিক্ষিত লোক।"

বেহারার মুখে সংবাদ পাইয়া, কর্ণেল হ্যামিণ্টনও এই সময় আসিয়া পড়িলেন এবং মহেন্দ্রের প্রতি সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল উভয় সাহেব বসিয়া, মহেন্দ্রের সহিত নানা কথোপকথন করিলেন, তাহাব পর উভয় সাহেব উঠিয়া গিয়া পরামর্শ করিলেন। পরে কর্ণেল সাহেব মহেন্দ্রকে আসিয়া বলিলেন, "বাবু তুমি আজ আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমাদের আজীবন স্মরণ থাকিবে। তোমার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস অত্যন্ত প্রশংসার্হ। আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে যদি আমরা সামান্য কিছু উপহার দিই, তাহাতে তুমি বিরক্ত হইবে কি?"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি একশো টাকার নোট বাহিব করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

মহেন্দ্র নোটখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কোনও উপহার বা পুরস্কারের আশায় ত এ কার্য্য করি নাই। প্রত্যেক ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিয়াছি মাত্র। টাকা না লইবার অপরাধ আপনারা গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

সাহেব দুইজনে আবার কি বলাবলি কবিলেন। তাহার পর মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছ বলিলে; কোনও স্থানে কোন আশা পাইয়াছ কি?"

"না সাহেব, এ পর্যন্ত পাই নাই।"

"আমাদের আফিসে একটি চাকরি খালি আছে। বেতন একশ টাকা, সেটি পাইলে তুমি খুসী হও?"

"হ্যাঁ সাহেব—সেটি পাইলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করিব।"

"বেশ—কাল তুমি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিও এবং বেলা একটার সময় আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

"নিশ্চয় আসিব। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"কিছুই না—কিছুই না, তবে ঐ কথা ঠিক রহিল। আমরা এখন ক্লাবে চলিলাম। স্ত্রীর প্রতি—এল্‌সি, বাবুকে একটু চা খাওয়াইবে না?"

বিবি গ্রীণ বলিলেন, "চা আনিতে হুকুম দিয়াছি। তোমরা চা খাইয়া যাইবে না?"

মেজর সাহেব বলিলেন, "না প্রিয়তমে, আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আমরা ক্লাবে গিয়াই যাহা হয় পান করিব।"—বলিয়া তিনি কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

'যাহা হয়' কথাটির অর্থ বুঝিয়া, বিবি গ্রীণ আপন মনে একটু হাসিলেন। চোরের অপেক্ষায় মহেন্দ্রকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

।। পাঁচ ।।

পরদিন দরখাস্ত লইয়া কেল্লার আফিসে গিয়া মেজর সাহেবের সঙ্গে মহেন্দ্র সাক্ষাৎ করিল। মেজর সাহেব যথাস্থানে লইয়া গিয়া, সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া, নিয়োগপত্র সহি করাইয়া দিলেন। আগামী কল্য হইতেই তাহাকে কার্য্য করিতে হইবে।

বাসায় ফিরিবার পথে, একটা পোষ্ট আপিসে দাঁড়াইয়া, মহেন্দ্র পোষ্টকার্ডে জননীকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

মহেন্দ্রের আশ্রয়দাতা আড়তদার সেই কায়স্থবাবুটি এ সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মহেন্দ্র সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহাকে বলিল, "গোটাকতক টাকা পেলে আফিস যাবার জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় তৈরী করাতাম। মাইনে পেয়ে শোধ করতাম।"

কায়স্থবাবুটি তৎক্ষণাৎ তাহার আবশ্যকমত টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পরদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে, ধর্ম্মতলার একটা ভাল দর্জ্জির দোকানে মহেন্দ্র দুইটা ইংরাজী সুট ফরমাস দিয়া আসিল।

যেদিন চাকরী হইল, সেদিন রাত্রে বাসায় শয়ন করিয়া, স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিল বুকে করিয়া মহেন্দ্র অনেক অশ্রুবর্ষণ করিল।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়া মহেন্দ্র সেই ছেলেপড়ানো চাকরীটি ছাড়িয়া দিল, কায়স্থ বাবুর ঋণ পরিশোধ করিল; একটা মেসের বাসা স্থির করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল, আরও কিছু কাপড়-চোপড় ফরমাস দিল এবং মাকে দশটি টাকা মণিঅর্ডার করিল।

মহেন্দ্রের চালচলন, ইংরাজী কথ্য-ভাষাজ্ঞান ও কর্ম্মপটুতায় সাহেবেরা তাহার উপর বেশ সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন মেজর সাহেব বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চা-পানার্থে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। বিবি গ্রীণ সে দিনও তাহাকে সমাদরে ও মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

চা-পানান্তে মেজর সাহেব বারান্দায় চেয়ার বাহির করাইয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বসিলেন, বিবি গ্রীণ বেড়াইতে যাইবার সাজসজ্জা করিবার জন্য ভিতরে গেলেন। মেজর সাহেব বলিলেন, "মোহেন্ আফিস হইতে বাড়ী গিয়া তুমি কি কর?"

আফিসে এখন সাহেবরা মহেন্দ্রের নামটি সংক্ষিপ্ত কবিয়া তাহাকে "মোহন" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। মহেন্দ্র উত্তর দিল, "চা-পান করিয়া বাসাতেই থাকি, কিছু পড়ি-টড়ি, কোনও দিন থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপে যাই।"

"বেড়াইতে যাও না?"

"এখান হইতে বাসায় ফিরিতেই আমার বেড়ানো হইয়া যায়।"

"দেখ আমি উর্দ্দু পাশ করিয়াছি; কিন্তু বাঙ্গলা এখনও পাশ করি নাই। বাঙ্গলা পাশ করাও আমার আবশ্যক। আমার একজন শিক্ষক প্রয়োজন, তাহাকে আমি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া মাহিনা দিব—অধিক দিতে পারিব না। তুমি আমায় পড়াইবে? আফিসের পর এক ঘণ্টা—এই ধর পাঁচটা হইতে ছয়টা।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেতনের জন্য কিছুমাত্র আসে যায় না। আপনার অনুগ্রহেই আমি চাকরীটি পাইয়াছি, অতি আহ্লাদের সহিত আমি আপনাকে বাঙ্গলা শিখাতে প্রস্তুত আছি।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ কথা। কত দিনে আমি বাঙ্গলা শিখিতে পারিব, বল দেখি?

"আপনি কি পরিমাণ শিখিতে চান, তাহা না জানিলে বলা শক্ত।"

"পরীক্ষা পাশ করার মত—বেশী শিখিয়া কি করিব? আমি অন্যান্য মিলিটারী অফিসারগণের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলা পাশ করিতে ছয় মাস যথেষ্ট। কাল হইতেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক, কি বল?"

"বেশ ত! কাল আমি আফিসের পরেই আসিব। একখানি বর্ণপরিচয় বহি আপনার জন্য কিনিয়া আনিব কি?"

"আনিও।" বলিয়া পাৎলুনের পকেট হইতে সাহেব একটি টাকা বাহির কবিয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে ধরিলেন।

মহেন্দ্র বলিল, "টাকা রাখুন। ঐ বহির দাম পাঁচ পয়সা মাত্র, আমি কিনিয়া আনিব এখন।"

সাহেব টাকাটি পকেটে ফেলিয়া, একটি দুয়ানি বাহিব করিয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন।

এই সময়ে মেমসাহেব বাহিব হইয়া আসিলেন; সহিস টমটমখানি আনিয়া হাজির করিল। মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সাহেব সস্ত্রীক টমটমে গিয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্রও ইঁহাদের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। ঘোড়ার প্রতি চাহিয়া বলিল, "এটা ত আপনার সে ঘোড়া নয়।'

সাহেব বলিলেন, "না। সেটাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। এটা নূতন কিনিয়াছি, এ বেশ ঠাণ্ডা।"—বলিয়া হস্তসঙ্কেতে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া তিনি টমটম হাঁকাইয়া দিলেন।

পরদিন আফিসের পর মহেন্দ্র সোজা মেজর সাহেবের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারান্দায় বিবি গ্রীণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে বাঙ্গলা পড়াইতে আসিয়াছেন বুঝি? কিন্তু আপনার ছাত্র ত পলাতক!"

"তিনি কোথায় গিযাছেন?"

"ভয় নাই। একটু পরেই আসিবেন। তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন ততক্ষণ আপনাকে চা দিতে। ভিতরে আসুন; চা আমাদের প্রস্তুত।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

চা ঢালিয়া, রুটী-মাখনের প্লেটটা মহেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিয়া, টেবিলের উপরে রক্ষিত বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ বইখানি তিনি কৌতূহলবশতঃ তুলিয়া লইলেন। সেখানি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করিতে হয়?"

অ-আর পাতা দেখাইয়া মহেন্দ্র বলিল, "এইগুলি স্বরবর্ণ—ভাওয়েল্‌স্‌,—আর, এই পাতায় এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ—কনসোনেন্টস্‌।"

চা-পান করিতে করিতে মেমসাহেব অক্ষরগুলির দিকে চাহিতে লাগিলেন। "এগুলির চেহারা ত ভারি অদ্ভুত! দেখিলে বাস্তবিক হাসি পায়। কোন্‌টির কি নাম?"

মহেন্দ্র বলিল, "এইটি অ।"

"এক মুহূর্ত্ত থামুন।"—বলিয়া মেমসাহেব তাঁহার পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি সোনাব পেন্সিল বাহির করিয়া অক্ষরতলে লিখিলেন।" awe."

"এটি?"

"আ।"

মেমসাহেব তাহার তলায় লিখিলেন—"ah!" এইরূপে স্বরবর্ণের প্রত্যেক অক্ষরের নিম্নে সেগুলির উচ্চারণ লিখিযা লইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মেজর গ্রীণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেমসাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ব্যাড্‌ বয়! মুন্সীজী কতক্ষণ আসিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহা হউক তুমি যে সময় নষ্ট করিলে, তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। তোমার কার্য্য অনেকটা আমি অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছি।"—বলিয়া তিনি অক্ষরগুলি দেখাইয়া উচ্চারণও পড়িতে লাগিলেন।

মেজর সাহেবের চা-পান শেষ হইতে প্রায় ছয়টা বাজিল। পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া স্ত্রীর প্রতি বলিলেন, "আজ আর আমার পড়িবার সময় কই? অক্ষরগুলির উচ্চারণ তুমি ত লিখিয়াই রাখিয়াছ, কাল সকালে ওগুলা আমি অভ্যাস করিব এখন। চল, এবার হাওয়া খাইতে যাওয়া যাক। মোহেন, কাল আসিয়া তুমি দেখিবে, ঐ সমস্ত অক্ষর আমার চেনা হইয়া গিয়াছে, আমি নূতন পাঠ লইব।"—বলিয়া সহাস্যে মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া তিনি "সস্ত্রীক শকটারোহণে" হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন।

পরদিন মহেন্দ্র সাহেবের কুঠিতে গিয়া দেখিল, সাহেব আছেন। তিনি মহেন্দ্রকে বসাইয়া বলিলেন, "ওহে দেখ, তোমাদের বাঙ্গলা অক্ষরগুলা ড্যাম ডিফিকল্ট! উচ্চারণ অতি বদ। আজ আমি সেগুলা অভ্যাস করিবার বেশী সময় পাই নাই, কাল করিব; করিয়া নূতন পাঠ লইব। আজ তুমি এক পেয়ালা চা খাইয়া যাও।"

চা-পানের পর মেমসাহেব প্রথমভাগখানি আনিয়া স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলার উচ্চারণ টুকিয়া লও না, জন্। স্বরবর্ণগুলা চেনা শেষ করিয়া যদি সময় পাও ব্যঞ্জনবর্ণগুলাও কতকটা চিনিয়া রাখিতে পারিবে।'

সাহেব বলিলেন, "বেশ বুদ্ধি করিয়াছ। ওগুলা তুমিই লিখিয়া রাখ, প্রিয়তমে।"

মেমসাহেব একটি একটি করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু "ত" লইয়া বড় বিপদ হইল। তিনি "ত" কোনমতেই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না—"ট" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া সাহেব হাসিয়াই আকুল।

।। ছয় ।।

লেখাপড়া এই ভাবেই চলিতে লাগিল। সাহেব গৃহে উপস্থিত থাকিলে, দুই দিন ডাঁড়াইয়া এক দিন পড়েন। যেদিন মহেন্দ্র আসিবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করেন, সে দিন স্ত্রীকে বলিয়া যান, নূতন পড়াটা তুমিই শিখিয়া লইও কাল সকালে তোমার কাছেই জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।"

মেমসাহেব এ দিকে দ্রুতগতি শিখিয়া ফেলিতেছেন। এক মাস হইয়া গেল, সাহেবের 'সাধু পূজা'ই ভাল করিয়া আয়ত্ত হইল না। কিন্তু মেমসাহেবের প্রথম ভাগ প্রায় শেষ—রাখালের গল্প হইতেছে। তাই কি পুরা সময়টা তিনি পড়েন? দুজনে বসিয়া কত গল্প হয়—কত হাসি তামাসা—কত রঙ্গ-ব্যঙ্গ।

একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের দেশে, শিক্ষকেরা ছাত্র বা ছাত্রীর গুরুজনস্বরূপ গণ্য—নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"গুরুজনের সামনে তাঁদের নাম করিতে নাই, তুমি বলিয়াছ। কিন্তু আমি যে তোমার নাম করিয়া ডাকি—মিষ্টার মোহেন্ বলি, এটা ত উচিত হইতেছে না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তাতে আর দোষ কি? তুমি ত আর বাঙ্গালীর মেয়ে নও।"

"আর, তুমি আমায় মিসেস গ্রীণ বল, সেটাও ভাল শোনায় না। আমার ইচ্ছা, আমি তোমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিব—আর তুমি আমায় এল্‌সি বলিয়া ডাকিবে। সে কি ভাল হইবে না?"

"তুমি আমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিলে কোনও ক্ষতি হইবে না—কিন্তু আমি তোমায় এল্‌সি বলিয়া ডাকিলে তোমার স্বামী কি সেটা পছন্দ করিবেন?"—বলিয়া মহেন্দ্র একটু হাসিল।

মেমসাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ,—বটে, তিনি হয়ত মনে করিবেন, তোমাতে আমাতে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। রাগ করিতে পারেন বটে। তবে কাজ নাই—যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক। বুড়াকে চটাইয়া লাভ কি?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ রঙ বেরঙের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। রঙ্গ ক্রমে চড়িতে লাগিল। তবে সাহেব উপস্থিত থাকিলে বাজে কথা একটিও হইত না।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে সাহেবকে করাচী যাইবার আদেশ হইল। দুই সপ্তাহকাল সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

সে দিন পড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সময় মহেন্দ্র বলিল, "তা হলে, আপনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমি আসিব।"

মেমসাহেব বলিলেন, "আমি বুঝি পড়িব না? দুই সপ্তাহ না পড়িলে আমি সব ভুলিয়া যাইব যে!"

সাহেব বলিলেন, "তুমি যেমন আসিতেছ, তেমনি আসিও মোহেন্। মেমসাহেবকে পড়াও।"

মহেন্দ্র সম্মত হইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

।। সাত ।।

মেজর সাহেবের অনুপস্থিতিসত্ত্বেও মহেন্দ্র তাঁহার মেমকে প্রতিদিন পাঁচটা বাজিলেই পড়াইতে যায়। পড়ানো শেষ হইতে প্রথম দুই দিন ছয়টা স্থানে সাতটা বাজিয়াছিল, তৃতীয় দিন একেবারে আটটা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া বিবি গ্রীণ বলিলেন, "উঃ—আটটা! অনেক দেরী হইয়া গেছে ত! মোহেন্ তুমি, কেন আমার সঙ্গেই আজ ডিনার খাইয়া যাও না।'

মহেন্দ্র বলিল, "বেশ ত—ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।'

"আচ্ছা তুমি তবে ততক্ষণ হাত-মুখ ধুইয়া লও, নীচেই গোসলখানা আছে। আমিও উপরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আসি। সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারে বসিব।'—বলিয়া তিনি বেয়ারাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "সাহেবকা ওয়াস্তে গোসলখানা ঠিক করো।" বেয়ারা চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে সে নিম্নতলে একটি কামরায় লইয়া গেল। এটি শয়নকক্ষ, কিন্তু অব্যবহৃত বলিয়া মনে হইল। সেই কক্ষের সংলগ্ন গোসলখানায়, একখানি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে ও জল রহিয়াছে। মহেন্দ্র শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, সিগারেট মুখে করিয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, এল্‌সি তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়া আছে। তাঁহার অঙ্গে কালো সিল্কের সান্ধ্য পরিচ্ছদ, পাউডার-চর্চ্চিত অর্দ্ধনগ্ন শুভ্র বক্ষের উপর একটি মুক্তাহার দুলিতেছে। এল্‌সি বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে।

মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, "কি পড়া হইতেছে?"

'এ একখানি নভেল, নূতন বাহির হইয়াছে। তুমি বোধ হয় এখনও এখানি পড় নাই?"—বলিয়া মহেন্দ্র হস্তে এল্‌সি পুস্তকখানি দিল।

মহেন্দ্র বহিখানির সদর পৃষ্ঠা দেখিয়া বলিল, "না, এখানি পড়ি নাই। তবে এই লেখকের অন্য কয়েকখানি উপন্যাস আমি পড়িয়াছি।"

এল্‌সি বলিল, "এখানি খাসা বই। আমার পড়া হইলে তোমায় দিব এখন—পড়িয়া দেখিও বেশ মজা আছে। আচ্ছা মোহেন্ তোমাদের বাঙ্গলা ভাষায় নভেল আছে?"

"হ্যাঁ,—আছে বইকি, অনেক আছে।"

"সে সব নভেল কি রকম? তুমি ত ইংরাজি নভেল অনেক পড়িয়াছ, বাঙ্গলা নভেলও কি সেই ধরনের?"

"অনেকটা সেই ধরনের বইকি।"

"তাতে লভ মেকিং (প্রেমলীলা) আছে?"

"তা আছে বইকি! প্রেমলীলা ছাড়া কি আর নভেল হয়?"

"সে ত নিশ্চয়। বাঙ্গলা নভেলে নায়িকারা সব কি রকম হয়?"

"যা হওয়া উচিত—খুব সুন্দরী হয়। তবে বয়সটা তাদের কিছু কম হয়। ইংরাজী নভেলে যেমন নায়িকারা হয় ১৮/১৯, বাঙ্গলা নভেলে তেমনই ১৩/১৪ বছরের হয়।"

এল্‌সি হাসিয়া বলিল, "আমার বয়সও কিন্তু ১৯ বৎসর। আমি স্বচ্ছন্দে ইংরাজী উপন্যাসের নায়িকা হইতে পারি—কি বল? কিন্তু বাঙ্গলা উপন্যাসের ত পারি না। আচ্ছা এ দেশের ঐ সব ছোট ছোট মেয়েরা প্রেম করিতে জানে?"

"আমাদের গরম দেশ কিনা। অল্পবয়সেই আমরা ও বিষয়ে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠি।"

"কার সঙ্গে ঐ সব মেয়েরা প্রেম করে?"

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও বাঙ্গলা উপন্যাসে "আর্টের" যুগ—পরকীয়া প্রেমের যুগ—তেমন "নির্ভীকভাবে আরম্ভ হয় নাই।" সুতরাং মহেন্দ্র বলিল, "তারা প্রেম করে স্বামীর সঙ্গে—অথবা যার সঙ্গে শেষে বিবাহ হইবে, তার সঙ্গে।"

শুনিয়া এল্‌সি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে ত নিতান্ত সেকেলে ফ্যাশান! স্বামী বা হবু স্বামীর সঙ্গে প্রেমে আবার কোনও মজা আছে নাকি?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমাদের সাহিত্য এখনও তত মজাদার হইয়া উঠে নাই।"

উভয়ে উঠিয়া খানা-কামরায় গেল। টেবিলটি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। দুইটি ফুলদানিস্থ পুষ্পগুচ্ছের মাঝে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলিতে লাগিল।

দুই কোর্স শেষ হইবার পর, পরিবেষণকারী "বয়" রক্তবর্ণ তরল পদার্থপূর্ণ ডিক্যাণ্টার আনিয়া মেমসাহেবের 'ওয়াইন' গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিল। এল্‌সি মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে একটু ক্লারেট দিবে কি? না হুইস্কি? আমার স্বামী কিন্তু হুইস্কিই পছন্দ করেন।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমি ও সব কখনও পান করি নাই। আমি মিশনারীদেব সহবাসে মানুষ, তাঁরা সুরাপান করাকে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে কবেন।"

এল্‌সি হুকুম করিল, "বয়, সাহেবকো পোর্টস সরাপ।"

বেয়ারা সাইডবোর্ড হইতে পোর্টের বোতল ও পোর্টগ্লাস লইয়া আসিল। মহেন্দ্রের পার্শ্বস্থ ক্লারেট গ্লাসটি সরাইয়া, সেখানে পোর্টগ্লাস রাখিয়া উহা পূর্ণ কবিয়া দিল।

তখন "উপন্যাসে প্রেমতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয়ের গ্লাস খালি হইবামাত্র বয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। তৃতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া মহেন্দ্রের দেহ মনে একটা অপূর্ব্ব পুলকসঞ্চার হইল। তাহার কথাবার্ত্তা আরও সরস হইয়া উঠিল—কথায় কথায় উভয়ের হাসির ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের বিশেষ কোনও রংদার কথা শুনিয়া "Naughty boy!" (দুষ্টু বালক) বলিয়া, হাসিতে হাসিতে এল্‌সি তাহার বাহুতে বা পিঠে থাবড়া মারিতে লাগিল। গোলাপী চোখে, এল্‌সির পানে চাহিয়া মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, এ যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা—এমন সুন্দরী সুরসিকা রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ।

আহার শেষ হইলে উভয়ে ড্রইং রুমে গিয়া বসিল।

সেদিন মহেন্দ্র যখন বাসায় ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় একটা।

।। আট ।।

পরদিন রবিবার ছিল। বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মহেন্দ্র শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রির ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে লাগিল।

সব কথা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—"ছি ছি!—এ আমি কি করিলাম! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজীবন আমার মৃতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া সেই ভালবাসায় তন্ময় হইয়া থাকিব, তাহাকে ধ্যান করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিব, একনিষ্ঠ

পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব—সে প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় রহিল? ছি ছি—আমি কী নীচ! কি দুর্ব্বল! কি অপদার্থ! আমি ত মনুষ্য নামের অযোগ্য। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

সারাদিন মহেন্দ্র বিষণ্ণ বদনে বসিয়া কাটাইল। যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে—এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল। একবার বাক্স খুলিয়া স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিল। মনে হইল, চিঠিগুলি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"অপবিত্র পশু!" ঐ কলঙ্কিত হস্তে আমাকে স্পর্শ করিবার অধিকার তোমার নাই!" মহেন্দ্রের হস্তে সেই চিঠির বাণ্ডিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অনুভূত হইল। সে উহা বাক্সে ফেলিয়া, বাক্স বন্ধ করিল।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়াও সে অনেকক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করিল। অবশেষে স্থির করিল, জোর করিয়া শাসন করিয়া, অবাধ্য মন-মাতঙ্গকেও পথ হইতে ফিরাইতে হইবে। প্রলোভনের পথে আর পদার্পণ করা উচিত নয়। মেজর সাহেব যতদিন না ফেরেন, ততদিন আর তাঁহার বাড়ীতে সে যাইবে না—তিনি ফিরিলেও আর যাইবে না—তাঁহাকে বাঙ্গলা পড়ানো পরিত্যাগ করাই সে স্থির সঙ্কল্প করিল। নেশার ঝোঁকে একবার বিপথে পা দিয়াছে বলিয়া আজীবন যে সেই পথেই চলিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই—আবার চেষ্টা করিয়া, সংযম-সাধনা করিয়া দৃঢ়চিত্তে সুপথেই নিজেকে চালনা করিতে হইবে।

পরদিন সোমবারে মহেন্দ্র তাহার আফিসে গেল। পূর্ব্ব হইতে সে স্থির কবিযা রাখিয়াছিল, আজ পাঁচটা বাজিলেই সটান্ সে বাসার পথ ধরিবে—সাহেবের কুঠীর ধারে কাছেও যাইবে না। কিন্তু তিনটার পর এ বিষয়ে তাহার মনে একটু দ্বিধা প্রবেশ করিল। এরূপভাবে না বলিয়া কহিয়া পলায়ন করা কি নিতান্ত অভদ্রতা হইবে না? তাব চেয়ে যথাসময়ে গিয়া মেমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, কোনও একটা ওজর দেখাইয়া বিদায় লওয়াই ভাল। ভদ্রতাও রক্ষা হইবে—সকল দিক বজায়ও থাকিবে; কারণ, মহেন্দ্রের সঙ্কল্প এখন স্থির—এল্‌সির মোহজালে আর কিছুতেই সে নিজেকে জড়াইতে দিবে না।

ক্রমে, "ভদ্রতা রক্ষার" জন্য মহেন্দ্রের মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ঘন ঘন ঘড়ির পানে চাহিতে লাগিল, কতক্ষণে পাঁচটা বাজে! অবশেষে পাঁচটা বাজিল। মহেন্দ্র কলম ফেলিয়া, কাগজপত্র গুছাইয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া, হ্যাট ও ছড়ি হস্তে আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মেজর সাহেবের কুঠীর নিকট গিয়া দেখিল, এল্‌সি বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিযাই মহেন্দ্র হ্যাট্ তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বারান্দায় উঠিতেই, এল্‌সি অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ওয়েল্ মোহেন্, নটি বয়!—কাল তুমি আস নাই কেন বল ত? আমি তোমার উপর ভা—রি রাগ করিয়াছি!"

মহেন্দ্র বলিল, "কাল যে রবিবার ছিল।"

"হলই বা রবিবার! তুমি ত জান, আমার স্বামী এখানে নাই, আমি একলাটি রহিয়াছি। নাই বা পড়িলাম—দুজ'নে বসিযা গল্পে-সল্পে আমোদে সন্ধ্যাটা ত কাটানো যাইত! কাল বিকালে তোমার কোথাও কোন কাজ ছিল বুঝি?"

"না, কাজ এমন বিশেষ কিছুই না।"

"আচ্ছা এখন চা খাইবে চল। আজ আর পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। চা খাইয়া, চল, দু'জনে ময়দানে একটু বেড়াইয়া আসা যাউক।"

॥ নয় ॥

মহেন্দ্রের 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা' 'স্থির-সঙ্কল্প-সাধনা, কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার আর খোঁজ নাই। দিনের পর দিন পবস্পরের নেশায় দু'জনে মসগুল হইয়া রহিল।

সেদিন বিকালে মহেন্দ্র মেমসাহেবকে পড়াইতে গিয়া দেখিল, সে ম্লানমুখে বসিয়া আছে, টেবিলের উপর একখানা হল্‌দে খাম। এল্‌সি বলিল, "মোহেন্, টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কাল প্রাতে আমার স্বামী আসিয়া পৌঁছিবেন।"—বলিয়া টেলিগ্রামখানি মহেন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্র সেখানি পড়িয়া, বিষণ্নবদনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

এল্‌সি বলিল, "দেখ মোহেন্, এখন হইতে আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলিতে হইবে। শুধু, আমার স্বামী ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া নয়—তোমায় আমায় লইয়া আমাদের সমাজেও একটু কাণাঘুসা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, একজন নেটিভের সঙ্গে অত মেশামিশি কি জন্য?"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে কি এখন হইতে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এল্‌সি? তাহা হইলে কেমন করিয়া আমি বাঁচিব, প্রিয়তমে?"

"তাহা হইলে কি আমিই বাঁচিব? না প্রিয়তমে, সে হইতেই পারে না। তুমি পূর্ব্বে যেমন আমার স্বামীকে রোজ পড়াইতে আসিতে, পড়াইয়া চলিয়া যাইতে, সেইরূপ করিবে। তবু চোখের দেখা ত হইবে। যাহাতে মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা করিয়া নির্জ্জনে তোমাতে আমাতে মনের কথা আদান প্রদান সুযোগ পাই, তাহার একটা ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তুমি মুখ হাত ধুইয়া লও। চা খাইয়া, চল, ময়দানে গিয়া একটু বেড়ানো যাক।"

সন্ধ্যার পর কেল্লা হইতে বাহির হইয়া ময়দানের এক জনহীন স্থানে বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া, সেইখানে দুইজনে বসিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল।

অবশেষে স্থির হইল, পার্ক লেনে অথবা ঐ অঞ্চলের কোনও উপযুক্ত বাড়ীতে, বেনামীতে একখানি ঘর ভাড়া লইতে হইবে। সুযোগমত সঙ্কেত অনুসারে সেইখানেই মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ এবং মনের কথাব আদান প্রদান চলিবে। এল্‌সি বলিল, তাহারা বোধ হয় ২/৪ মাসের ভাড়া অগ্রিম চাহিয়া বসিবে। কিছু আসবাবও আমাদের আবশ্যক হইবে। আমি সেজন্য তোমায় এক হাজার টাকা দিব। আজ রাত্রেই টাকাটা দিয়া রাখিব—নইলে আমার স্বামী আসিলে অসুবিধা হইতে পারে। এখন ওঠা যাক চল, আমাদের ডিনারের সময় হইয়া আসিল।"

মেজর গ্রীণ পরদিন প্রাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকালে যথানিয়মে মহেন্দ্র তাঁহাকে পড়াইতে গেল। মেজর সাহেব পড়িলেন না—মহেন্দ্রকে চা খাওয়াইয়া, হাসি-খুসী গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া, সস্ত্রীক টমটমে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পরদিনও এইরূপ হইল।

এ দুই দিন এখান হইতে বিদায় হইয়া, মহেন্দ্র পার্ক লেন অঞ্চলে "উপযুক্ত বাড়ী"তে খালি ঘর খুঁজিয়া বেড়াইল। কিন্তু তখন রাত্রি, কোথাও কোনও সুবিধা করিতে পারিল না। সুতরাং সে স্থির করিল, ববিবারে এই পাড়ায় আসিয়া এ কার্যটি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় দিন, আফিসে মেজর সাহেব মহেন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "মোহেন্, আমার এখন অনেক কাজ পড়িয়াছে। এখন আমি আর বাঙ্গলা পড়িবার সময় পাইব না। আর তোমার কষ্ট করিয়া আমার কুঠিতে আসার প্রয়োজন নাই।"—বলিয়া তিনি মহেন্দ্রেব প্রাপ্য টাকা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র দেখিল, মেজর সাহেবের মুখখানা গম্ভীর—বিরক্তির ছায়াও তাহাতে সুস্পষ্ট।

মহেন্দ্র আফিসে নিজ স্থানে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, না পড়িবার কারণ সাহেব যাহা বলিলেন, তাহাই কি সত্য? না, কাহারও নিকট কোন "কাণাঘুষা" শুনিয়া তাঁহাব মনে একটা সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে? যাহা বলিলেন, তাহা আফিসে না বলিয়া, নিজ

গৃহেও ত বলিতে পারিতেন! তাঁহার কুঠীতে আর আমি যাই, ইহা কি তাঁহার ইচ্ছা নয়? বাস্তবিক, এ দিকে একটু বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল বইকি; সেটা নিতান্ত নিৰ্ব্বুদ্ধিতার কাৰ্য্য হইয়াছে।"

ইহার দুই দিন পরে মেজর সাহেব আফিসের বারান্দায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলেন, কিছুদূরে তাঁহার গৃহভৃত্য একখানি চিঠি হাতে করিয়া মহেন্দ্রের আফিসের দিকে যাইতেছে। সাহেব বেয়ারাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি চিঠিখানি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া, প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহাকে নিজের খাসকামরায় আনিয়া বলিলেন, "কিস্কা চিঠ্‌ঠি—ডেখলাও।"

প্রভুর সক্রোধ মূৰ্ত্তি দেখিয়া বেয়ারা কম্পিত হস্তে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল। 'টুম্ আভি বাহার বারাণ্ডামে ঠাহ্‌রো"—বলিয়া সাহেব চোখে চশমা আঁটিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর হস্তাক্ষরে মহেন্দ্রের নাম লেখা। খামের মুখে জল দিয়া ভিজাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা সন্তর্পণে খুলিয়া চিঠি পাঠ করিলেন। সেই কয়েক লাইন ইংরাজীর অনুবাদে এই—

"প্রিয়তম,

আজ তিন দিন তোমায় চোখের দেখাটিও পাই নাই। সে জন্য কি কষ্টে যে আছি, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রি নয়টার পর এলিয়ট ট্যাঙ্কের পশ্চিমে, আমাদের সেই নিৰ্জ্জন বৃক্ষতলে বেঞ্চখানিতে তুমি বসিয়া থাকিও। সৌভাগ্যবশতঃ একটা সুযোগ ঘটিয়াছে—ঐ সময় সেখানে গিয়া আমি তোমার সহিত ঘণ্টা দুই যাপন করিতে পারিব। এস—এস—এস—তোমায় না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব।

তোমারই—এল্‌সি।"

মেজর সাহেব কাগজে টুকিয়া লইলেন—এলিয়েট—ট্যাঙ্ক—পশ্চিমে—বেঞ্চে। তাহার পর, খামখানি আঠা দিয়া আঁটিয়া ডাকিলেন—"বেয়ারা!" বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন, "যাও, চিঠ্‌ঠি মোহেন্‌বাবুকে দেও। হাম ইস চিঠ্‌ঠিকো দেখা, মেমসাহেব ইয়ে মোহেন্‌বাবু কোইকো মৎ বোলো খবরদার। বোলনেসে—বোলনেসে—"

মেজর সাহেব তাঁহার টেবিলের দেরাজ টানিয়া একটা রিভালভার বাহির করিয়া বেয়ারার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বোলনেসে, হাম তুমকো শূট করেগা—জান মারেগা—সমঝা?"

বেয়ারা কম্পিতপদে এক হাত পিছাইয়া গিয়া, করজোড়ে কাতরস্বরে কহিল, "নেহি খোদাবন্দ্—হাম কুছ নেহি বোলেগা। কোইকো নেহি বোলেগা। মেরা জান পিয়ারা হায়।"

মেজর সাহেব রিভালভারটি দেরাজে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—ইয়াদ্ রাখ্‌খো, যাও।"

।। দশ ।।

বিকালে মেজর সাহেব স্ত্রীকে বলিলেন, "এল্‌সি, আজ আমি বাড়ীতেই খাইব। বাবুৰ্চ্চিকে বলিয়া দাও।"

এ কথা শুনিয়া মেমসাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া সে বলিল, "তবে যে তুমি বলিয়াছিলে, আজ তোমাদের ইউনাইটেড সার্ভিস্ ক্লাবে একটা ভোজ আছে—ন'টার সময় তোমায় সেখানে যাইতে হইবে—বাড়ীতে খাইবে না!"

"হ্যাঁ, তা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু—সেখানে যাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। আজ এম্পায়ারে একটা খুব ভাল ফিল্‌ম্ আছে—চল ডিনারের পর দু'জনে দেখিয়া আসা যাউক।"

এল্‌সি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, অগত্যা স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ডিনার শেষে রাত্রি নয়টার সময় টমটম জোতাইয়া, মেজর সাহেব স্ত্রীকে লইয়া বাহির হইলেন। বায়স্কোপে পৌঁছিয়া টমটম বিদায় করিয়া দিলেন—ট্যাক্‌সিতে ফিরিবেন।

সাড়ে নয়টার বায়স্কোপ আরম্ভ হইল। দশটার পূর্ব্বেই মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি একটু থাক প্রিয়তমে; আমি দশ মিনিট মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি। বড় পিপাসা পাইয়াছে, বারে গিয়া একটা পেগ পান করিয়া আসি।"

এল্‌সি কোন কথা বলিল না—স্বামীর সঙ্গ তাহার বিষয়ৎ বোধ হইতেছিল। মেজর সাহেব চলিয়া গেলে সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল আজ আর মোহেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনই উপায় নাই—সে বেচারী সঙ্কেতস্থানে বসিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিবে।

সাহেব রাস্তা পার হইয়া দ্রুতপদে ময়দানের ভিতর দিয়া চলিলেন। দশ মিনিট পরে উদ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পথ হইতেই দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চের উপর ফেল্টহ্যাট মাথায় দিয়া কে একজন একাকী বসিয়া আছে।

পথ হইতে নামিয়া, ঘাসের উপর দিয়া সন্তর্পণে তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন—"মোহেন্?"

মহেন্দ্র চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কে, মেজর গ্রীণ?"

"হ্যাঁ। আমি মেজর গ্রীণ। তুমি এ সময় এখানে বসিয়া কি করিতেছ, মোহেন্?"

"বায়ু সেবন করিতেছি।"

সাহেব গর্জ্জিযা উঠিলেন, "রাস্কেল! ব্লাগার্ড! বায়ু সেবন করিতেছ? না, আমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছ? বিশ্বাসঘাতক! ড্যাম নিগার শূয়ারকা বাচ্চা! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার—এক জন য়ুরোপীয় মহিলা—আমাব স্ত্রীব সহিত প্রেম কর? আমি এই দণ্ডে তোমায় কুকুরের মত হত্যা কবিব। তোমাব ঈশ্বরকে স্মবণ কর!"—বলিয়া সাহেব সাঁ করিয়া ভিতরের বুক পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিলেন। উহার উজ্জ্বল নলটি অদূরস্থ গ্যাসের আলোকে চক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু রিভলভার ছুঁড়িবার অবসর সাহেব পাইলেন না। মহেন্দ্র পালোয়ানগণের নিকট শেখা একটা "ল্যাং" মারিয়া, সেই মুহূর্ত্তে সাহেবকে ধরাশায়ী করিয়া, তীরবেগে ঘোড়দৌড়েব মাঠের দিকে ছুটিল।

মেজর সাহেব তাঁহার স্থুল দেহখানি যথাসাধ্য শীঘ্র উঠাইয়া, আবার দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, পলায়নমান মহেন্দ্রের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করিলেন—আওয়াজ হইল গুড়ুম। সৈনিক পুরুষের শিক্ষিত হস্ত—মহেন্দ্রের মাথায় ফেল্ট হ্যাট্ উড়িয়া গেল।

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িল না দেখিয়া, সাহেব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। স্থূলদেহ লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়িতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাঁহার রিভলভার গর্জ্জন করিল, "গুড়ুম—গুড়ুম!"

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িলও না, তাহাকে সাহেব আর দেখিতেও পাইলেন না। অগত্যা তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রিভলভার পকেটে পুরিযা, পোষাকের ধূলাকাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবার বায়স্কোপ অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া, বার-এ দাঁড়াইয়া অল্প একটু সোডা সংযোগে একটা ডবল-পেগ ব্রাণ্ডি লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্দ্ধেকটা খাইয়া, সেটা ফেলিয়া দিয়া ভিতরে গিয়া স্ত্রীর নিকট বসিলেন। এল্‌সি বলিল, "দশ মিনিট মধ্যে আসিব বলিয়া গেলে—প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল, ছিলে কোথায়?"

মেজর সাহেব সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।"

।। এগার ।।

মহেন্দ্র সেই নির্জ্জন ময়দানের ভিতর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে যখন দেখিল, বন্দুকের শব্দ বন্ধ হইয়াছে, তখন দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণে সে "গ্রাস রাইড' রাস্তা পার হইয়া, প্রায় ধোবীতালাওয়ের নিকট পৌঁছিয়াছি- । অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী সাহেবের আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তখন সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্রমে লোয়ার সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িয়া, একখানা চল্‌তি ঠিকাগাড়ী খালি পাইযা, তাহা ভাড়া করিল, "জানানী-সোয়ারী'র মত সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করিয়া, রাত্রি এগারটার সময় নিজ বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া, ভোরে উঠিয়া, মহেন্দ্র ধুতি গামছা [illegible] তাহার মৃতা পত্নীর চিঠির বাণ্ডিলটি লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেল। জলে নামিয়া [illegible]মে বাণ্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। আফিসে সাহেবের নামে কর্ম্মত্যাগপত্র লিখিয়া উহা ডাকে দিয়া, নিজ জিনিষপত্রসহ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিল এবং সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিয়া জননীকে প্রণাম করিল।

মা বলিলেন, "কি বাবা, ছুটি নি[illegible]লি?"

"না মা,—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম। প[illegible] এ[illegible] আর পোষাল না।"

অমন চাকরীটা ছাড়িয়া আসাতে মা বড় [illegible]ত লাগিলেন।

মেমসাহেবের সেই হাজার টাকায়, চাষের [illegible] বাড়াইয়া হাল-গরু কিনিয়া মহেন্দ্র চাষবাস আরম্ভ করিযা দিল এবং পরের মাসেই নিকটস্থ গ্রামের একটি সুন্দরী "ডাগব" মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল।

বৎসর দুই পরে মহেন্দ্র তাহাদের গ্রামের লাইব্রেরীতে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে মেজর গ্রীণের নাম ছাপা দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া খবরটা পড়িল। ইহা বিলাতী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত। ভারতীয় সেনাবিভাগের মেজর গ্রীণ এক বৎসরের ফার্লো লইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন; তিনি লণ্ডনের আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া, বিবি এল্‌সি গ্রীণের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়াছেন এবং কে-রেস্পণ্ডেণ্ট, লয়েডস্ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী টার্ণার নামক কোনও যুবকের বিরুদ্ধে হাজার পাউণ্ড খেসারতের ডিক্রী পাইয়াছেন।

পুলিনবাবুর পুত্রলাভ

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

পুলিনবাবুর বয়স যখন ১৫ বৎসব মাত্র, সেই সময়েই একটি ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এখন তাঁহার বয়স ৩০ এবং পত্নী সুশীলাসুন্দরীর বয়স ২৫ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি এই দম্পতি একটি সন্তানের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে দুইজনই মনক্ষুণ্ণ—বোধ হয় সুশীলাই বেশী।

পুলিনবাবু পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদ্র জমিদার। তবে, পাড়াগাঁয়ে বাস করিলেও তিনি নিজে পাড়াগেঁয়ে নহেন—কারণ, প্রথমতঃ গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূর নহে—রেলে ৫/৬ ঘণ্টার পথ মাত্র; দ্বিতীয়তঃ বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া, সভ্য ভব্য হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সুশীলা নির্জ্জলা পাড়াগেঁয়ে।

আত্মীয় পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী যখন দেখিল সে সুশীলার ২০ বৎসর বয়স হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হইল না, তখন সকলেই তাহাকে "বাঁজা" বলিয়া স্থির করিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, পুলিনের আবার বিবাহ করা উচিৎ, নচেৎ বংশলোপ অনিবার্য্য। পুরুষেরা বলিল, পুলিন যদি স্ত্রীর ভযে বিবাহে বিরত থাকিয়া, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা নষ্ট করে, তবে তার তুল্য নরাধম আর জগতে নাই। স্ত্রীলোকেরা—যাঁহারা প্রবীণা হইয়াছেন—বলিতে লাগিলেন, স্বার্থের জন্য স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে না দেওয়া, সুশীলার অত্যন্ত গর্হিত কাজ হইতেছে এবং এরূপ কার্য্য শুধু বর্ত্তমান যুগেই সম্ভব—তাঁহাদের আমলে এরূপ ঘটিতে কখনও শোনা যায় নাই। তাঁহারা মাঝে মাঝে এই লইয়া সুশীলাকে মৃদু গঞ্জনা দিতেও ত্রুটি করেন না।

এইরূপে উত্যক্ত হইয়া, সুশীলা কিছু দিন হইতে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে; কিন্তু পুলিন সে কথা কাণেই তুলেন না।

সংসারে এখন সুশীলাই গৃহিণী। একটি বিধবা ননদ ও একটি বিধবা যা আছে—তাহারা সুশীলার বয়ঃকনিষ্ঠ।

আজ গ্রামে একটা নিমন্ত্রণে গিয়া, সুশীলা কয়েকজন গিন্নিবান্নী রমণীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য শুনিয়া আসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে রাজি করিবে, নচেৎ—

নচেৎ গঙ্গায় ডুবিবে, অথবা বিষ খাইবে, অথবা পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, তাহা সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই। রাত্রে আহারাদির পর শয্যায় প্রবেশ করিয়া, স্বামীর নিকট সুশীলা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

পুলিন বলিল, "দূর পাগলী!"

সুশীলা বলিল, "এটা আমার পাগলামি হল কিসে? বিয়ে করলে যদি একটি ছেলের মুখ দেখতে পাও, বাপ-পিতামো যদি জলপিণ্ডি পান, সেটা কি তোমার করা উচিত নয়?"

পুলিন বলিল, "দেখ সুশী, বিয়ে আমি একটা কেন দশটা করতে পারি। কিন্তু জান ত, যেমন স্ত্রীলোক বাঁজা আছে, তেমনি পুরুষ বাঁজা আছে। আমি যদি সেই রকম পুরুষ হই—তাহলে সে স্ত্রীরও সন্তান হবে না। চিরদিনের জন্যে মিছে কেবল তোমায় সতীনের যন্ত্রণা দিয়ে যাব সেটা কি ভাল?"

সুশীলা গম্ভীর ভাবে বলিল, "কে বললে ছেলে হবে না? তা ছাড়া, আমায় সতীনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তারই বা মানে কি? তুমি কি নতুন বউ এনে আমাকে আর

খেতে দেবে না, না পরতে দেবে না, না আমায় বিষনয়নে দেখবে? সে রকম লোক তুমি নও, তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

পুলিন পাশ ফিরিয়া, পাশের বালিস আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিল, "রাত ১২টা বাজে, এখন একটু ঘুমতে দেবে? না, খালি গজর গজর করবে?"

সুশীলা চুপ করিয়া গেল।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

দুই দিন পরে বেলা ৯টার সময়, পুলিন তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুই একজন প্রতিবেশীর সহিত আরামে ধূমপান ও গল্পগুজবে মগ্ন আছে—এমন সময় অন্তঃপুর হইতে তাহার তলব আসিল। হুঁকাটি একজনের হাতে দিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, নিম্নতলের ঢাকা বারন্দার উপর একখানি কুশাসন বিছাইয়া, গ্রামের দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি লইয়া বসিয়া আছেন—সুশীলা, কক্ষমধ্যে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া।

পুলিন বারান্দায় উঠিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই যে! প্রণাম হই। কতক্ষণ আসা হয়েছে?"—বলিয়া, তাঁহার পানে চাহিয়া, অন্যের অলক্ষিতে একটু হাসিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর হস্তসঙ্কেতে আশীর্ব্বাদ করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "বেশীক্ষণ নয়—এই ঘণ্টাখানেক হল এসেছি বাবা। মা লক্ষ্মী কালই আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা কাল আর সময় পাইনি, আজ এসেছি।"

পুলিন ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তলব কেন গিন্নী? দৈবজ্ঞ ঠাকুরকেই বা আনিয়েছ কেন? নিজের একটা সতীন-টতীন ঠিক করেছ নাকি? ঠিকুজী কুষ্ঠী মেলাবে?"

সুশীলা বলিল, "হ্যাঁ, মেলাব। তুমি এখন হাত পা ধুয়ে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে ঐ তসরের কাপড়খানা পর দেখি!"

পুলিন বলিল, "সুবোধ ও সুশীল স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ায় এবং কখনও তাহার কথার অবাধ্য হয় না। সে যা পায় তাই খায়—গালিগালাজ, সম্মার্জনী কিছুতেই আপত্তি করে না।—তা, আমি তসরের কাপড় পরে কি করবো?"

সুশীলা বলিল, "দৈবজ্ঞ ঠাকুর তোমার হাত দেখবেন।"

পুলিন বলিল, "হাত দেখবেন? কি সর্বনাশ! কই, আমি ত নিজের কোনও অসুখ বিসুখ বুঝতে পারছিনে! ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। দোহাই তোমার—আমার ভাতটি যেন বন্ধ কোর না!"

সুশীলা বলিল, "যাও—যাও, বুড়ো বয়সে আর ঢং দেখে বাঁচিনে! সে হাত দেখা নয়। হাত দেখে, উনি অদৃষ্টের ফলাফল বলে দেবেন।"

পুলিন শুনিয়া হাসিল। বলিল,"তুমি ত জান সুশী ওসবে আমার বিশ্বাস ফিশ্বাস নেই। মিছে কেন আমায় কর্ম্মভোগ করাবে?"

সুশীলা বলিল, "তোমার বিশ্বাস নেই, আমার আছে। আমি যা বলি তা কর।"

স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে অবশেষে পুলিনকে বাধ্য হইয়া তসর পরিয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া বসিতে হইল।

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "দাও দেখি বাবা! ডান হাতখানি দাও।"

পুলিন হাত বাড়াইয়া দিল। সেখানি লইয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "যদিও বউমা, তোমার পুত্রভাগ্যটা জানবার জন্যেই বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন, তথাপি পরমায়ুটাই আগে পরীক্ষা করতে হয়। কেননা শাস্ত্র বলেছেন—পূর্ব্বমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেব চ। বাঃ— এই যে বুড়ো আঙ্গুলে ধনুরেখা রয়েছে। শাস্ত্র বলেছেন,—

ধনুর্যস্য ভবেৎ পাণৌ, পঙ্কজং বাথ তোরণম্।
তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ ধ্রুবম্।।

বাবা, এতে ক'রে তোমার রাজোচিত ঐশ্বর্য্য, আর আশী বছর পরমায়ু সূচিত হচ্চে। আচ্ছা, এইবার তবে পুত্রভাগ্যটা দেখি!"—বলিয়া তিনি পুলিনের পাণিপার্শ্ব অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন!—তারপর, হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া, সুশীলার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটি পুত্রসন্তান তোমার স্বামীর অদৃষ্টে ত রয়েছে দেখছি মা!"

সুশীলা ঘোমটার ভিতব হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ কটি?"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর আরও কিছুক্ষণ হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বিবাহ ত একটিই দেখছি। আচ্ছা, এস ত মা, তোমার হাতখানি আর একবার দেখি!"

সুশীলা আসিয়া, নিজ বাম হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর সেখানি লইয়া পরীক্ষা করিযা বলিলেন, "নাঃ—আমার ভুল হয়নি। তুমিই তোমার স্বামীর সন্তানের জননী হবে, মা! এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।"

অতঃপর দৈবজ্ঞ ঠাকুর দক্ষিণান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পুলিন, তসর ছাড়িয়া নিজ সাহেব বস্ত্র পরিধান করিতেছিল, সুশীলা তাহার কাছে গিয়া বলিল, "বলি হ্যাঁগা—দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে কত টাকা ঘুষ খাইয়েছ?"

পুলিন বলিল, "ঘুষ! ঘুষ আমি কি জন্যে খাওয়াব?"

"নইলে, আমার ২৫ বছর বয়স হল, এখনও আমি সন্তানের জননী হব বলে গেল কেন?"

পুলিন বলিল, "বাঃ—সে আমি কি জানি? আমি ত তোমায় সাফ বলেছি আমি ও সব বুজরুকি বিশ্বাস করিনে। তুমি নিজেই বল যে তোমার বিশ্বাস হয়;—এখন তুমি জান আর তোমার দৈবজ্ঞ ঠাকুরই জানে—আমি কি জানি?"—বলিয়া পুলিন বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা বসিয়া কিয়ংক্ষণ ভাবিল। তারপর ডাকিল, "গেনির মা!"

ঝি, গেনির মা আসিয়া বলিল, "কেন গিন্নীমা?"

"তুই কাল দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ডাকতে গিয়েছিলি, কর্ত্তা কি তা জানতে পেরেছেন?"

গেনির মা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কত্তা জানতে পেরেছেন?—তা, কেমন করে বলবো মা? ওঃ—হাঁ—মনে হয়েছে। ঠিক ত! কাল যখন আমি দৈবজ্ঞ ঠাকুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠেছি, সামনেই দেখি কত্তা মোশাই—নাঠি হাতে করে কোথা থেকে বেড়িয়ে আসছেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গেনির মা, এখানে কি করতে এসেছিলি? আমি মাথাটি নীচু করে বল্লাম, আজ্ঞে মাঠাকরুণ দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই বলতে এসেছিলাম।"

সুশীলা রুষ্টস্বরে বলিল, "কই আমাকে ত এসে সে কথা তুই বলিসনি!"

গেনির মা বলিল, "ভুলে গেছনু মা—ভুলে গেছনু। আর মা, এখন কি আর সব কথা মনে থাকে ছাই! দশ গণ্ডাই হবে কি বিশ গণ্ডাই হবে বয়স হল, এখন তোমাদের রেখে যেতে পারলেই বাঁচি মা!"

অতঃপর সুশীলা, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দশম বর্ষীয় পৌত্র উমাপদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সমস্ত কথাই সে প্রকাশ করিল। গতকল্য বিকালে জমিদার বাবু তাহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং বৈঠকখানায় বসিয়া তাহার পিতামহের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, উপরন্তু উঠিবার সময় দশটা টাকা প্রণামী দিয়া আসিয়াছেন।

শুনিয়া সুশীলা মনে মনে বলিল, "হুঁ—সুশীলা বামনী আবার জানে না কি! কেবল মরবে কবে তাই জানে না। আমার সঙ্গে এই চালবাজি। আচ্ছা আসুক মিন্সে বাড়ীর ভিতর!"

স্ত্রীব পীড়াপীড়ি ও জেরায় পড়িয়া, অবশেষে "মিঙ্গে" কে স্বীকার করিতেই হইল যে ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষী সৃষ্টি করা রূপ দুষ্কার্য্য সে করিয়াছে এবং নাক কাণ মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, এরূপ কার্য্য আর কখনও তাহার দ্বারা হইবে না।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

আষাঢ় মাস। আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। সুশীলা তখন শয়নকক্ষের জানালাব কাছে বসে আকাশের গায়ে নীরদ ও সৌদামিনীর খেলা দেখিতেছিল। তার মনটা বড় ভাল নাই—কারণ তার স্বামী "৩/৪ দিনে ফিরিব" বলিয়া একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, আজ সপ্তাহ অতীত হইল, আজিও তিনি ফিরিলেন না, বা কোন সংবাদও পাঠাইলেন না।

এই সময় গেনির মা আসিয়া প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে প্রভুপত্নীর নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, "মা, একটা বিষম খপর শুনে এলাম এখনি!"

সুশীলা তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর গেনির মা?"

"কত্তা নাকি শুনলাম, কলকাতায় গিয়ে একটা বিয়ে করেছেন?"

"বিয়ে করেছেন? ধুৎ—কে বললে গিয়ে তোকে? স্বপ্ন দেখছিস নাকি?"

"না সপ্‌নি কেন দেখব মা! ঘোষেদের ঝি পেসন্ন বল্লে।"

"কি বললে?"

"ঘোষজা মশাই ত মাসখানেক বাড়ী ছিল না কিনা,—হাইকোটে তেনার শালার কি মোকদ্দমা চলছিল, তাই সে সেখানে গিয়েছিল। কাল বিকেলে ফিবে এসেছে। এসে ঘোষগিন্নীর সঙ্গে বলাবলি করছিল, তাই পেসন্ন বাইরে থেকে শুনেছে।"

সুশীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি পেসন্ন বললে গেনিব মা?"

গেনির মা বলিল, "আর কি কি বললে?—মনে করে দেখি দাঁড়াও! দশ গণ্ডা বছব বয়স হল! কোনও কথা কি মনে রাখতে পারি ছাই। হ্যাঁ হ্যাঁ—আর বললে যে, বউ নাকি বেশ ডাগর সাগর, যেমনি উপ্ তেমনি নেকাপড়া জানে।"

শুনিয়া সুশীলার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তার চোখ দিয়া প্রায় জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এতদিন যে জন্য আমি অনুনয় বিনয় করিতেছি—সেই কার্য্য করিলই শেষে—তবে ওরূপ ভাবে, আমাকে লুকাইযা করিবার কি দরকার ছিল? কলিকাতা যাইবার সময় সকল কথা খুলিয়া বলিলেই ত হইত। এরকম ভাবে, আমাকে অপমান করিল কেন?

আহারাদি শেষ হইলে সুশীলা ঘোষগৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এই গ্রামের একজন ক্ষুদ্র জমিদার। পুলিন ইহাকে দাদা সম্বোধন করিয়া থাকে।

খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া বাগানে বাগানে সেই বাড়ীতে যাওয়া যায়। সুশীলা অন্তঃপুবে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘোষগৃহিণী আহারান্তে পান খাইতে খাইতে তাঁহার চন্দনা পাখীকে পড়াইতেছেন। সুশীলাকে দেখিয়া তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরম সমাদরে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ সাধারণ ভাবের কথাবার্ত্তার পর সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "শুনলাম বট্‌ঠাকুর কলকাতা থেকে ফিরেছেন। আমাদের ওরা আজ এক সপ্তাহ হল কলকাতায় গেছে; ৩/৪ দিনে ফেরবার কথা, তা আজও ফিরলো না, আমি ত তাই ভেবে মরছি দিদি!"

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "না কিচ্ছু ভাবনা নেই, ঠাকুরপো ভালই আছেন, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে!"

"দেখা হয়েছিল?—যা হোক ভাল আছে শুনে তবু নিশ্চিন্ত হলাম। ওর সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল দিদি, তা কিছু বললেন বট্‌ঠাকুর?"

"হ্যাঁ—বললে, পরশু বুঝি। কোথায় নেমন্তন্ন ছিল, সেইখানে দুজনে দেখা হয়।"

"নেমন্তন্ন ছিল? কিসের নেমন্তন্ন ভাই?"

ঘোষগৃহিণী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কে জানে বিয়ের না কিসের!"

"কবে আসবে তা কিছু শুনলে?"

"হ্যাঁ—বললেন তাঁর আসতে এখনও হপ্তাখানেক দেরী আছে।"

সুশীলা মনে মনে হিসাব করিল—পরশু বিয়ে হয়ে গেছে—কাল গেছে কালরাত্রির—আজ ফুলশয্যে—শ্বশুরবাড়ীতে অষ্টমঙ্গলা সেরে বাড়ী ফিরতে এখনও হপ্তাখানেক দেরী ত আছেই বটে।"

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "কেন তোমরা কি তাঁর কোনও চিঠিপত্র পাওনি?"

"না দিদি, গিয়ে অবধি একখানি চিঠিও লেখেনি।"—বলিয়াই সুশীলা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "ওকি—ওকি ভাই কাঁদছ কেন? এই ঠিক দুপুর বেলায়, স্বামীর কথা কইতে কি কাঁদতে আছে? তাতে তাঁর অমঙ্গল হবে যে!"—বলিয়া তিনি স্নেহের হস্তে সুশীলার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

সুশীলা নিজ অঞ্চলেও মুখ চক্ষু মুছিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ দিদি, একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি সত্যি বলবে? যদি মিথ্যে বলবে ত আমার মাথা খাবে। তোমার মা কালীর দিব্বি, মা মনসার দিব্বি, বাবা তারকনাথের দিব্বি, বাবা বিশ্বনাথের দিব্বি—সে নাকি আবার বিয়ে করেছে?"

এই সকল ভীষণ দিব্যগুলি শুনিয়া ঘোষগৃহিণীর মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি মুখখানি নত করিয়া বলিলেন, "তোমায় কে বললে এরই মধ্যে?"

"সে যেই বলুক। কথাটা সত্যি ত?"

"উনি ত বললেন ভাই। কারু কাছে প্রকাশ করতে আমায় মানা করেছিলেন, আমি ত কাউকে বলিনি, তবে তুমি শুনলে কি করে তুমিই জান, আর ভগবান জানেন। আর কেউ দেখে এসে বলেছে বোধ হয়। এ সব কথা কি আর চাপা থাকে? বলে ধর্ম্মের ঢাক আপনি বেজে উঠে।"

"তাই বেজেছে দিদি। আমি যখন জানতেই পেরেছি তখন আর আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে? যা যা তুমি শুনেছ সব আমায় বল।"

ঘোষগৃহিণী যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই—বিবাহ করিবার কোনও ইচ্ছাই পুলিন বাবুর ছিল না কেবল ঘটনাচক্রেই ইহা হইয়া গিয়াছে। গিয়াছিলেন একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে—পুলিনবাবুও ঘোষ মহাশয়ও। কন্যার পিতা তাদৃশ ধনবান নহেন কিন্তু কন্যাটি খুব সুন্দরী আর লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, বয়সও একটু হইয়াছে—১৫/১৬ বছরের কম হইবে না। ঘড়ি আংটি প্রভৃতি দান-সামগ্রী একটু খেলো হইয়াছিল বলিয়া বরের বাপ আরও ২০০ টাকা অতিরিক্ত দাবী করিয়া বসেন। এই লইয়া বরপক্ষ কন্যাপক্ষে বিবাদ ও গালাগালি হওয়াতে, বরপক্ষ বর উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করেন। মেয়ের জাত যায় দেখিয়া, সভাস্থ সকলের অনুরোধে পুলিনবাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই সেই মেয়েকে বিবাহ করি[illegible]ন।

এই বিবরণ শেষ করিয়া ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "তা ভাই, কিছু দুঃখ কোর [illegible] জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এগুলো ভবিতব্যি কিনা, এতে মানুষের হাত নেই। তোমায় ত ভগবান ছেলে-পিলে দিলেন না। দেখ এইবার যদি তোমার শ্বশুরের বংশটা রক্ষা হয়,—এতে দুঃখ করা তোমার উচিত নয়।"

সুশীলা বলিল, "না, না, তার জন্যে আমি দুঃখ করবো কেন? আমি নিজেই ত তাকে

কতদিন থেকে বলছি ওগো বিয়ে কর, বিয়ে কর—তবু সে করলো না। ঘটনাচক্রে এবার হয়ে গেল।"

বাড়ী ফিরিয়া সুশীলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাই কি ঠিক? অত বড় কলকাতা সহরে, সে ছাড়া কি আর কোনও পাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না?"

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

বাড়ী ছাড়িবার ঠিক তেরো দিন পরে, পুলিন ফিরিয়া আসিল। তাহার অঙ্গে একটি নূতন সিল্কের পাঞ্জাবী, পরিধানে জড়িপাড় ধুতি স্কন্ধে জড়িপাড় উড়ানি, পায়ে নূতন একজোড়া পাম্প শু এবং হাতের কব্জীতে নূতন সোনার ঘড়ি। এতদ্ভিন্ন, তাহার হাতে একটি নূতন চামড়ার ব্যাগও ছিল। সুশীলা তাহার স্বামীর এরূপ সৌখীন বেশভূষা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। অনুমান করিল, এগুলি হয়ত নূতন শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রাপ্ত—অথবা, উক্ত মধুপুরীতে গমন উপলক্ষে ক্রীত। হাতের ব্যাগ মেঝের উপর নামাইযা রাখিয়া পুলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

সুশীলা শুষ্কস্বরে বলিল, "ভাল আছি। এত দেরী তোমার?"

"কাজের ঝঞ্ঝাটে"—বলিয়া পুলিন বস্ত্রপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

সুশীলা ভারি গলায় বলিল, "তা, দেরী করলে বেশ করলে, একখানা চিঠি লিখেও ত খবরটা দিতে হয়। আমি যে এদিকে ভেবে মরি!"

চটিজুতা পায়ে দিয়া, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে পুলিন বলিল, "ওঃ—তুমি বুঝি ভাবছিলে? তা, অতটা আমার খেয়াল হয়নি।"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "নূতন রসে মজে' ছিলে—পুরানোর কথা আর খেয়াল হবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "গিয়েছিলে ত বন্ধুর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। তায়, এত কি ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলে, শুনি?"

পুলিন আমতা আমতা করিয়া বলিল, "ঝঞ্ঝাট—অর্থাৎ খবর পেলাম কি জান? শুনলাম, হিমালয়ের জঙ্গলে একটা মস্ত বড় সাধু আছেন—৩০০ বছর বয়স—তিনি, ছেলে হবার জন্যে যে কবচ দেন তা একেবারে অব্যর্থ। তাই, সেই কবচ আনবার জন্যে সেই জঙ্গলে গিয়েছিলাম। উঃ—সে বিরাট জঙ্গলে যেতে তিন দিন, আসতে তিন দিন। তাই তো তোমায় চিঠি লিখতে পারিনি—সেখানে ত খাম পোষ্টকার্ড পাওয়া যায় না!"

সুশীলার মন, ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। একে ত এই প্রবঞ্চনা—তার উপর এত মিথ্যা কথার সৃষ্টি! ছি ছি! সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সেই জঙ্গলে বোধ হয় ভাল ভাল কাপড় চাদর, পাম্প শু, হাতঘড়ি-টড়ি খুব সস্তা? সেখানেই এ সব কেনা হল নাকি?"

পুলিন বলিল, "নাঃ—এ সব কলকাতাতেই কিনেছিলাম। তা, তোমার জন্যেও কিছু কিনে আনবো ভেবেছিলাম, কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেল!"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "এখন ত ফুরবেই!" প্রকাশ্যে বলিল, "সে ভালই হয়েছে। বেলা হল, এখন স্নান করে ফেল।"

"হ্যাঁ—স্নান করে দুটি খেয়ে শুয়ে পড়ি। গাড়ীতে রাত্রে ত ঘুম হয়নি।"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "শুধু কাল রাত্র কেন? ষোলবছুরী অপ্সরী পেয়েছ—তার আগেরও ক' রাত সে কি আর তোমায় ঘুমুতে দিয়েছে?"

পুলিন উঠিয়া স্নানাহার করিল, তার পর শয্যায় লম্বমান হইয়া, অবিলম্বেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল।

সুশীলা সেদিন আহারে বসিল বটে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র—কিছুই খাইল না। বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা এ সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "শরীরটে ভাল নেই। বোধ হয় জ্বর হবে।"

আহারান্তে সুশীলা নিজ শয়নকক্ষে গেল না, পাশের ঘরে গিয়া একখানা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিল। কিন্তু ঘুমাইতেও পারিল না। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যে হুহু করিতেছিল—সর্ব্বশরীরে যেন জ্বালা ধরিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক এইরূপ শয্যাকণ্টকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবার পর, সে উঠিল। বাড়ীর অন্যান্য সকলে নিদ্রিত। সুশীলা নিজ শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। পালঙ্কোপরি স্বামী নিদ্রিত—তাহার মুখে মাঝে মাঝে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে—বোধ হয় সে কোনও স্বপ্ন দেখিতেছে। সুশীলা স্থির করিল, নিশ্চয়ই সেই ষোলবছুরী পরীকেই স্বপ্ন দেখিতেছে। ইচ্ছা হইল, স্বামীর সেই হাসিমুখে এক কিল মারিয়া তার মুখের দাঁত ও সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দেয়!

শয্যায় নিকটেই টেবিলের উপর, নূতন চামড়ার ব্যাগটি ছিল; সুশীলা তাহা লইয়া, পার্শ্বের কক্ষে গিয়া, খুলিয়া ফেলিল; অন্যান্য জিনিষের সহিত তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল, কয়েকখানি ছাপা রঙীন কাগজ ও একখানি ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফখানি একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি, বয়স ১৫/১৬ বৎসর হইবে। সুন্দর একখানি বারাণসী শাড়ী পরা, সর্ব্বাঙ্গে ভাল ভাল অলঙ্কার। সুশীলা নিশ্চয় করিল, ইহাই বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা তাহার নব পত্নীর ছবি। সে প্রায় এক মিনিট ধরিয়া, ছবিখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া, তাহার রূপের খুঁৎ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার মুখের হাসি ও দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়া রাগে সুশীলার গা জ্বলিয়া উঠিল—গৃহস্থ ঘরের মেয়ের অত ঢং কেন? সে শুনিয়াছিল, আজকাল কলিকাতা সহরের মেয়েরা যখন থিয়েটার বায়স্কোপ বা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যাইবার জন্য সাজগোজ করিয়া বাহির হয়, তখন তাহারা কুলবধূ অথবা বাইজী তাহা চেনা দুষ্কর। সুশীলা অস্ফুট স্বরে বলিল—মুখে আগুন! মুখে আগুন!

লাল সবুজ হলদে কাগজগুলি খুলিয়া দেখিল, সেগুলি বিবাহের "প্রীতি উপহার" স্নেহাশীষ প্রভৃতি। উপরে ছাপা আছে "শ্রীমান ইন্দভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভ পরিণয়"—কিন্তু 'ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভপরিণয়'—কিন্তু ইন্দুভূষণ লাল কালী দিয়া কাটিয়া তাহার উপর হাতে লেখায় "পুলিনবিহারী"।

জিনিষগুলি সমস্ত ব্যাগের মধ্যে পুনঃস্থাপন করিয়া, সুশীলা চোরের মত সন্তর্পণে গিয়া উহা পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসিল। তার পর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া খালি মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

রাত্রে আহারের পর, পুলিন শয্যাপ্রান্তে বসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক সেবন করিতেছিল, সুশীলা আসিয়া সেই শয্যার অপর প্রান্তে বসিয়া বলিল, "তুমি এমন জোচ্চোর হলে কবে থেকে?"

পুলিন বলিল, "কেন, কি জুচ্চুরি করলাম?"

"কলকাতায় গিয়ে তুমি বিয়ে করে আসনি?"

পুলিন বলিল, "বিয়ে? বিয়ে কি? কখন আবার বিয়ে করলাম? স্বপ্ন দেখছ নাকি?"

সুশীলা বলিল, "তাই বোধ হয়। তা, বিভাবতীকে বেশ পছন্দ হয়েছে ত?"

পুলিন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "বিভাবতী কে?"

"ন্যাকামি রাখ না! তুমি ভেবেছ ডুবে ডুবে জল খাবে শিবের বাবাও টের পাবে না!—কিন্তু ধর্মের ঢাক যে আপনি বেজে ওঠে। আমি সব জানি—সব শুনেছি" বলিয়া সুশীলা, গেনির মা ও ঘোষগৃহিণীর নিকট যাহা শুনিয়াছিল সমস্তই বলিল।

শুনিয়া পুলিন মাথাটি নীচু করিয়া অপরাধীর মত বসিয়া রহিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই জন্যেই বলে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! তোমারই অনুরোধে এ কাজ করা—আর তুমিই আমায় দুষছো?"

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আমার অনুরোধেই যদি করা, ত আমার কাছে এত লুকোচুরি কি জন্যে?"

"সেটাও তোমার ভাল ভেবেই করছিলাম, সুশীলা! ভেবেছিলাম এখন তোমায় কিছু বলবো না—সে বউ সেইখানেই থাকবে; তার পর, একটি ছেলে হলে, তখন সব তোমায় ভেঙ্গে বলবো। হাজার হোক তুমি স্ত্রীলোক বই ত নও—সতীন হয়েছে শুনলে পাছে এখন তুমি দুঃখ পাও—সে ভেবেই গোপন করেছিলাম আর কি!"—বলিয়া পুলিন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবার তামাক টানিতে মন দিল।

সুশীলা কহিল, "তুমি শোও। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

পুলিন বলিল, "দিনের বেলা খুব ঘুমিয়েছি—এখনও আমার ঘুম পায়নি। তামাকটা খেয়ে নিয়ে, তার পর একখানা চিঠি শেষ করে শোব এখন, তুমি ততক্ষণ শোও না!"

সুশীলা বলিল, "ওঃ—চিঠি লিখতে হবে? তা, আমি এ ঘরে উপস্থিত থাকলে, লেখার অসুবিধে হবে না? বেশ প্রাণ খুলে প্রাণের কথা লিখতে পারবে কি? সে দরকার নেই, আমি ও ঘরে গিয়ে শুচ্চি—তুমি নিশ্চিন্দ হয়ে বসে তোমার প্রেমপত্র লেখ।" বলিয়া সুশীলা নামিয়া, সজোর পদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

।। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।।

স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা আর বড় নাই। মুখ দেখাদেখিও এক রকম বন্ধ বলিলেই হয়। এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিল। সুশীলাদের শয়নকক্ষ ছিল ত্রিতলে, অন্যান্য সকলে দ্বিতলে বা নীচের ঘরে শয়ন করিত, সুতরাং এই দম্পতীর এরূপ মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না।

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর, পুলিন ঘণ্টা দুই আড়াই দিবানিদ্রা উপভোগ করিত। সুশীলা মাঝে মাঝে এটা ওটা লইবার বা রাখিবার জন্য সে ঘরে প্রবেশ করিত এবং কাজ সারিয়াই চলিয়া যাইত।

আজ দ্বিপ্রহরে এইরূপে স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বার হইতে সে দেখিল, স্বামী নিদ্রিত—কিন্তু তাহার বুকের উপর কি একটা জিনিষ রহিয়াছে। আস্তে আস্তে শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, উহা একখানা কালো মোটা পোষ্টবোর্ড—তাহাতে ইংরাজিতে কি সব ছাপা রহিয়াছে।

সুশীলা অতি সন্তর্পণে সেখানি স্বামীর বুক হইতে উঠাইয়া লইয়া দেখিল, তাহার অপর দিকটায়—সেই সুন্দরী; "ষোলবছুরী"র ফটোগ্রাফ!

আবার সন্তর্পণে ফটোগ্রাফখানি স্বামীর বুকে রাখিয়া সুশীলা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অপরাহ্নে পুলিন নিদ্রাভঙ্গের পর হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বিছানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। সুশীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্বামীর শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আমি বাপের বাড়ী যাব।"

পুলিন দেখিল, সুশীলার মুখ চোখ স্ফীত—সে বোধ হয় অনেক কাঁদিয়াছে। বলিল, "হঠাৎ এ মতলব?"

"আমি আর এখানে থাকবো না।"

"কেন? কি হল আবার?"

"আমি কারু সুখের কণ্টক হয়ে থাকতে চাইনে!"

"কেন, কার আবার সুখের কন্টক হলে তুমি?"

"তোমার! আর কার? আমি রয়েছি বলেই ত তোমার বিভাবতীকে এখানে আনতে পারছ না!"

"আমার বিভাবতী আবার কে?—ওঃ বুঝেছি—তা, আমি তাকে এখানে আনবার জন্যে ছটফট করছি তুমি কিসে বুঝলে?"

"দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে? ফটোগেরাপ বুকে করে শুয়ে থাকার চেয়ে, তাকে এখানে নিয়েই এস,—এসে সুখে রাজ্যি ভোগ কর। আমি তোমার আপদ বালাই, আমি দূর হয়ে যাই।"—বলিয়া সুশীলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"ওকি সুশী ছিছি—কাঁদ কেন?" বলিযা পুলিন খপ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিল। সুশীলা সজোরে আপন হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পশ্চাতে হটিয়া, গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁও না বলছি খপর্দ্দার।"

"কেন? তাতে দোষ কি?"

"যে স্বামী অন্য স্ত্রীলোককে ছুঁয়েছে, তাকে আমি ছুঁতে চাইনে। তাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।"

পুলিন বলিল, "ওঃ—এই ব্যাপার! স্পর্শদোষ? তবে যে আগে তুমি বিয়ে করবার জন্যে আমায় অত পীড়াপীড়ি করতে? এখন বিয়ে যদি করলাম, তায় আমায় এত অপরাধ হল?"

সুশীলা বলিল, "বিয়ে করতেই বলেছিলাম; তার ফটোগেরাপ বুকে করে ঘুমুতে তোমায় বলিনি ত! সে সব কথা ছেড়ে দাও—যার যা অদৃষ্টে ছিল তাই হয়েছে। এখন আমার আর এখানে একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে নেই—আমি বাপের বাড়ী যাব। তুমি যদি আমায় রেখে আসতে না পার, বল আমি অন্য উপায় দেখবো।"

পুলিন কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া কি চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "তা বেশ, আমিই রেখে আসবো এখন। বল কবে যেতে চাও।"

"কালই।"

"বেশ, উত্তম কথা। কালই তোমায় নিয়ে যাব। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই—গাড়ীতে দু'জনে একটু তফাতে তফাতে বসলেই হবে,—স্পর্শদোষটা ঘটবে না।"

।। সপ্তম পরিচ্ছেদ ।।

পরদিন পুলিন, সুশীলাকে লইয়া যাত্রা করিল। সুশীলার পিত্রালয়ে যাইতে হইলে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া শিয়ালদহে গিয়া আবার গাড়ীতে চড়িতে হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন পুলিন সুশীলাকে লইয়া গিয়াছে অথবা পিত্রালয় হইতে আনিয়াছে তখন এই সুযোগে পথে কলিকাতায় ২/১ দিন যাপন করিয়া, তাহাকে থিয়েটার সার্কাস প্রভৃতি দেখাইত।

বেলা দশটার সময় হাওড়ায় নামিযা, পূর্ব্ব প্রথামত, পুলিন সুশীলাকে লইয়া, "আর্য্য আশ্রম" নামক বাঙ্গালী হোটেলে গিযা উঠিল। পর্দ্দানশিনা স্ত্রীলোকগণের জন্যও সেখানে উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

আহারাদির পর উভয়ে বিশ্রামার্থ পৃথক পৃথক শয্যায় শয়ন করিল। পুলিন বলিল, "সুশী, শেষকালে তোমার মনে কি এই ছিল?"

সুশীলা বিরক্তিভবে বলিল, "কি আবার?"

"তুমি আমায় এমনভাবে ত্যাগ করবে জানলে কি আমি আবার বিয়ে করি? এমন বিয়ে করে লাভ?"

"বিয়ে করে ত সুখী হয়েছ তুমি!—সেই লাভ।"

পুলিন আর কিছু না বলিয়া, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

নিদ্রাভঙ্গে উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় উঠিয়া বসিলে, সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের গাড়ী ক'টায়?"

"রাত ন'টায়।"

"তুমি একবার সেখানে যাবে না?"

"কোথায়?"

"তোমার বিভাবতীর কাছে।"

পুলিন খুসী হইয়া বলিল, "তুমি সুদ্ধ যাও যদি, ত যাই। চল না, দেখে আসবে তাকে। তোমায় সে দিদি বলতে অজ্ঞান। কলকাতা থেকে যেদিন আমি ফিরে যাই, সেদিন সে কত যে কাঁদলে। বললে, 'আমায় এখানেই ফেলে রাখলে দিদিকে ত আমি দেখতে পাব না, তাঁর একদিন সেবাও করতে পাব না!'—তার কথাবার্ত্তায় বুঝতে পেরেছিলাম, তোমায় সে খুব ভক্তি করে। চল না, সে তোমায় দেখলে কত খুসী হবে।"

সুশীলা বলিল, "আমার গলায় একগাছা দড়ি আর একটা কলসী কি জোটে না ভেবেছ তুমি—যে তার সঙ্গে যাব আমি দেখা করতে?"

পুলিন ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তবে থাক।"

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে সুশীলা বলিল, "তুমি যাও না, গিয়ে দেখা করে এস। এখন ত মোটে ৪টে—আমাদেব গাড়ীর এখনও ৫ ঘণ্টা দেরী।"

পুলিন বলিল, "এখন থাক্—সে তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফেরবার পথেই হবে এখন।'—বলিয়া তামাক সাজিতে বসিল। পূর্ব্বে ভৃত্যাদি না থাকিলে সুশীলা নিজে তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত, এখন আর দেয় না।

তামাক সাজিয়া, কিয়ৎক্ষণ ধূমপানের পর পুলিন বলিল, "সুশীলা, তোমায় আমায় এখন থেকে বোধ হয় চির-বিচ্ছেদ?"

সুশীলা কঠোর স্বরে বলিল, "এইরকম তাই বইকি।"

"আমার শেষ অনুরোধ একটি রাখবে?"

"কি?"

"চল তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে ফটোগ্রাফ তোলাই। আগে যখনি কলকাতায এসেছি তখনই ওকথা তুমি আমায় বলেছ—কিন্তু একবারও হয়ে ওঠেনি।—একখানা ফটোগ্রাফ থাকলে তবু, চিহ্ন ত একটা থাকবে!"

সুশীলা নীরব রহিল। তাহার মৌন সম্মতি জানিয়া পুলিন বলিল "তবে তোমার বেনারসীখানা বের করে পর—আর খানকতক গহনা-টহনাও পরে নাও।"

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া সুশীলা বলিল, "সে সব কিছু আমি পারবো না।"

পুলিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার উপর ত এখন আর আমার কোনও জোর নেই। আচ্ছা, তবে গাড়ী ডাকতে পাঠাই?"

গাড়ী আনাইয়া সুশীলাকে লইয়া পুলিন হাতীবাগানে এক ফটোগ্রাফের দোকানে গিয়া উঠিল।

ফটোগ্রাফওয়ালা খাতির করিয়া উভয়কে একটি কামরায় লইয়া গিয়া বসাইল। তাহার সহকারী পার্শ্বের ষ্টুডিও মধ্যে ক্যামেরা ঠিক করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়ের ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া গেল।

বিশ্রামকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে আবার উপবেশন করিল। ফটোগ্রাফওয়ালা বলিল, "লেমনেড, বরফ, কি চা—কিছু আনিয়া দেবো?"

পুলিন বলিল, "না।—দেখুন, এই যে সেবার আপনার দোকান থেকে আমি এই ফটোখানা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম—এ নিয়ে ত মহাতর্ক উপস্থিত হয়েছে মশাই!"—বলিয়া পুলিন পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। সুশীলা ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে দেখিল—ইহা সেই বিভাবতীর ফটোগ্রাফ।

ফটোগ্রাফওয়ালা বলিল, "কেন, তর্ক কিসের?"

পুলিন বলিল, "আপনি ত বলেছিলেন যে এখানা ষ্টার থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস হেনাবালার?"

"হেনারই ত। কেন কি হয়েছে?"

"আমার এক বন্ধু বলেন, এখানি মিনার্ভার সুধামুখীর ছবি।"

ফটোওয়ালা বলিল, "না না—সুধার এ চেহারা? এ হেনার ফটোগ্রাফ— যে হেনা এখন ষ্টারে বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী সাজছে। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের পর কুন্দনন্দিনীর সাজেই এখানি তোলা।"

পুলিন বলিল, "ষ্টারে বিষবৃক্ষ হচ্ছে নাকি? দেখতে গেলে হয়। কখন আরম্ভ?"

"আজ রবিবার—বেলা পাঁচটায় আরম্ভ।"

গাড়ী নীচে অপেক্ষা করিতেছিল। আবোহিদ্বয়কে লইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই উহা ষ্টার থিয়েটার গিয়া উপস্থিত হইল।

পুলিন নামিয়া সুশীলাকে টিকিট কিনিয়া দিয়া, তাব হাতে ফটোখানি দিয়া বলিল, "চেহারা মিলিয়ে দেখো—যে কুন্দনন্দিনী সাজবে, তার সঙ্গে মেলে কি না।" বলিয়া সুশীলাকে ঝির জিম্মা করিয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইল।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিল। গাড়িতে স্বামী স্ত্রীতে বেশী কিছু কথাবার্তা হইল না।

বাসায় ফিরিয়া উভয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিল। তারপর, পুলিন তামাক সাজিতে বসিল। সুশীলা বলিল, "হ্যাঁগা—এ ফটোখানা ত সেই যে কুন্দনন্দিনী সেজেছিল তারই বটে। তুমি ওখানা কিনেছিলে কেন?"

পুলিন গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমায় জব্দ করবার জন্যে।"

"কি জব্দ?"

"যাতে তুমি মনে কর আমি ফের বিয়ে করেছি—আব ঐ আমার নতুন স্ত্রী।"

"কেন তুমি বিয়ে করনি?"

"বালাই ষাঠ।—আমি কেন বিয়ে করবো? আমার শত্রু যে সে দুই বিয়ে করুক।"

"তবে কেন নিজে মুখে তুমি স্বীকার কবেছিলে যে বিয়ে করেছ?"

"তোমায় ভোলাবার জন্যে।"

সুশীলা বলিল, "উঃ—কি ধাপ্পাবাজ তুমি!—আচ্ছা সে যেন হল। তুমি ঐ হেনা না ফেনার ছবি বুকে করে বাড়ীতে কাল দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছিলে কেন?"

"ঘুমুইনি—জেগেই ছিলাম। তুমি আসছ, পায়ের শব্দ পেয়েই ওখানা বুকে করে চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে পড়েছিলাম।"

"আমায় জ্বালাতনের জন্যই ত? ভণ্ড মিন্সে! আচ্ছা, সে যেন বুঝলাম, তোমার ব্যাগের মধ্যে সেই সব প্রীতি উপহারে যে বিভাবতীর নাম ছাপা ছিল সে তবে কে?"

"ঐ যে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে কলকাতায় এসেছিলাম, সেই।"

"কার সঙ্গে তার বিয়ে হল?"

"নাম মনে নেই।"

"যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, তাবই সঙ্গে হল কি?"

"তারই সঙ্গে।"

"তবে কেন ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর বলেছিলেন যে সে বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তারা ঘর তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল?"

"তাকে ঐ কথাই বলতে আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে এমন ভাবে বউদির কাছে গল্পটা করবে, আরও ২/১ জন মানুষ শুনতে পায়।"

সুশীলা বলিল, "এত ফষ্টামিও তোমার পেটে!—জোচ্চর মিন্সে! আচ্ছা—বিয়ের পদ্যে তবে সে বরের ছাপা নাম কেটে তোমার নাম হাতের লেখায় বসানো ছিল কেন?"

পুলিন বলিল, "ওটা, মজাটুকু করবার জন্যে।"

"তবে সেটা জাল, বল

"একরকম তাই বইকি!'

পুলিন তামাক সাজিয়া আনিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "আমি তা হলে ১ নম্বর ধাপ্পাবাজ, ২ নম্বর ভণ্ড, ৩ নম্বর জোচ্চর, ৪ নম্বর জালিয়াৎ—আর কিছু আছে?"

সুশীলা বলিল, "তোমার মত নিষ্ঠুর কি আর ভূভারতে আছে? এই ৮/১০ দিন, কি কষ্টটাই তুমি আমায় ভোগ করালে বল দেখি। পুরুষ মানুষ, তুমি কি জানবে স্বামীর ভালবাসা হারালে স্ত্রীলোকের কি বুকফাটা কষ্ট!"—বলিয়া সুশীলা চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুলিন হুঁকা ফেলিয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "ছি ছি সুশী—কেঁদ না, চুপ কর!"

এ বার সুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইল না, স্পর্শদোষ সহ্য করিল।

একটু পরেই, হোটেলের ঠাকুব দুই থালায় লুচী তরকারী প্রভৃতি দিয়া গেল। সুশীলা সে সমস্ত গুছাইয়া স্বামীকে খাইতে বসাইল।

পুলিন খাইতে লাগিল। সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তবে তোমার সেবার কলকাতায় অতদিন দেরী হল কেন?"

"ঐ যে বললাম, কবচ আনতে গিয়েছিলাম। তবে হিমালয়ের জঙ্গলে নয়, বাঙ্গলা দেশেরই একটা পল্লীগ্রামে।"

"এ কথাটা সত্যি?"

"কেন কবচ ত তুমি নিজে চক্ষে দেখেছ—তুমি পরলে না ত আমি কি করব? কাল চল কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে, মাকে দর্শন করে, দুজনে কবচ দুটি ধারণ করি।"

তাহাই হইল। এ যাত্রায় সুশীলার পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটিল না। অসম্ভবও সম্ভব হয়। বৎসর না ঘুরিতেই, কবচ ধারণের সুফল ফলিল;—এই দম্পতি পুত্রলাভ করিল।

রাণী অম্বালিকা

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

অম্বরপতি মানসিংহের অন্তঃপুরে বিভিন্ন মহিষীগণের আবাসার্থ ভিন্ন ভিন্ন মহাল সকল নির্ম্মিত ছিল। এইরূপ একটি মহালের একটি সুসজ্জিত কক্ষে, সায়ংকালে, গবাক্ষ সমীপে উপবেশন করিয়া, রাণী অম্বালিকা দেবী অন্তঃপুরের সিংহদ্বার অভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। তাহার মুখখানি কিছু বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে অন্যমনে কি যেন ভাবিতেছেন, তাঁহার মনোমধ্যে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কক্ষমধ্যে সুগন্ধি তৈলপূর্ণ দীপাবলী উজ্জ্বল আলোকে বিতরণ করিতেছে এবং সেই আলোক রাণীর দোদুল্যমান হীরক-খচিত কর্ণভূষণে পতিত হইয়া, শতগুণ উজ্জ্বলতর হইয়া, কক্ষগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। অম্বালিকা দেবীর বয়স ত্রিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে—কিন্তু এখনও তিনি পরমা সুন্দরী। বস্তুতঃ তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যের মোহে আকৃষ্ট হইয়াই, পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন; অম্বালিকার পিতা বিজয়সিংহ যে তাঁহারই অধীনস্থ একজন ক্ষুদ্র সামন্ত প্রজা, ধনে মানে কুলমর্য্যাদায় যে তাঁহার বহু নিম্নে, সে কথা গণনার মধ্যে আনেন নাই।

কাবুল বিদ্রোহ দমন করিয়া, প্রায় একপক্ষকাল মহারাজ মানসিংহ গৃহে ফিরিয়াছেন, কিন্তু আজিও রাণী অম্বালিকা তাঁহার দর্শন পান নাই। অদ্য রজনীতে মহারাজ এই মহালেই বিশ্রাম করিবেন, এইরূপ সংবাদ আছে। কিন্তু আপাততঃ রাণী অম্বালিকার উৎকণ্ঠার কারণ,

স্বামীর উপেক্ষা বা আগমন-বিলম্ব নহে। মহারাজের কাবুল অবস্থিতি সময়ে, রাণীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসে, তাঁহার জনক বিজয়সিংহ অত্যন্ত পীড়িত, তাঁহার জীবন সংশয়; মৃত্যুকালে প্রিয় দুহিতাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াছেন। রাণীদের পিত্রালয়ে গমন তখনকার দিনে রাজাবরোধের একান্তই নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে মহারাজের হুকুম লইয়া রাণী ক্বচিৎ কখনও পিতৃগৃহে যাইতেন। মহারাজ অনুপস্থিত, অম্বালিকা তাই পট্টমহাদেবীর (বড় বা পাটরাণীর) পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন। তিনি হুকুম দিলেন; অম্বালিকা পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সেখানে মাসাধিককাল থাকিয়া, পিতৃসেবায় তাঁহাকে সুস্থ ও নিরাময় করিয়া, অল্পদিন হইল ফিরিয়াছেন। মহারাজের কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছেন। এখন বিষম চিন্তা, এই পিত্রালয়-গমন সংবাদ শুনিয়া মহারাজ কি বলিবেন!

একজন সুবেশা পরিচারিকা আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল, "রাণীজী!"

রাণী চমকিয়া, মুখ ফিরাইয়া পরিচারিকার পানে চাহিলেন।

পরিচারিকা, রাণীর দুশ্চিন্তার কারণ অবগত ছিল। কহিল, "মহারাজ কি এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে আসিবেন? এখন হইতে এমন করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিজেকে ক্লান্ত করিতেছেন কেন?"

রাণী বলিলেন, "অত রাত্রি হইবে কি?"

"তা আর হইবে না? যখন আসেন, এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে কবে আর আসিয়া থাকেন?"

"কেন মিনা, একদিন ত ছিল যখন তিনি সন্ধ্যা না লাগিতেই আসিতেন!"—বলিয়া রাণী একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন।

পরিচারিকার নাম মৃণালিনী—সংক্ষেপে মিনা। এই দাসী, রাণী অম্বালিকার পিত্রালয় বিজয়গড় গ্রামেরই একজন দরিদ্র বিধবা; রাণীর বিবাহের পর তাঁহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

মিনা বলিল, "সে সব দিনের কথা ছাড়িয়া দিউন রাণীজী!"

রাণী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে ত অনেকদিনই দিয়াছি! তবু সে সব দিনের কথা স্মরণেও সুখ! প্রথম যখন আমায় বিবাহ করিয়া আনেন, তখন তোর মনে আছে মিনা? তখনি চারি--পাঁচ—ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত, অবিচ্ছেদে, আমার পূজা গ্রহণ করিতেন। আর এখন? মাসে একদিন দর্শন পাই কিনা সন্দেহ!"

দাসী বলিল, "তখন আপনিই ছিলেন সবচেয়ে নূতন রাণী। তারপর, এই ১৫ বছরে মহারাজের আরও কতগুলি মহিষী হইয়াছে বলুন দেখি?"

রাণী বলিলেন, "গড়ে বছরে তিনটি।"

"তবে কেন ব্যস্ত হন রাণীমা?"

রাণী অবনত নয়নে উত্তর করিলেন, "আমি কি আর বুঝি না? সবই বুঝি। এই বৃহৎ রাজপুরীতে, তিনি ভিন্ন আমার আর কে আছে বল্? আমার যদি একটি সন্তান থাকিত, তবে তাহাকে লইয়া আমি ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম। কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার অদৃষ্টে লিখিলেন না!—তুই যা, রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণেরা আমার আজ্ঞামত মহারাজের ভোজনের সকল ব্যবস্থা করিতেছে কি না দেখিয়া আয়।"

পরিচারিকা চলিয়া গেলে অম্বালিকা দেবী, উঠিয়া কক্ষমধ্যে কিয়ৎকাল পাদচারণ করিলেন; তাহার পর ভিত্তিগাত্র বিলম্বিত, রৌপ্যখচিত একখানি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া, নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে দুই একগাছি করিয়া রূপার তারও দেখা দিয়াছে।—কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় আসিয়া গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। ক্রমে প্রহরের ঘণ্টা বাজিল। দ্বিতীয় যামে, সংবাদ আসিল, মহারাজ দুঃখের সহিত জানাইতেছেন, আজ অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁহাকে রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইবে; অতরাত্রে আসিয়া তিনি রাণী অম্বালিকা দেবীর বিশ্রামভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন না।

অম্বালিকা দেবীর নয়নযুগল সজল হইয়া আসিল। পরিচারিকাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আসিবেন, তাহা কি মহারাজ কিছু বলিয়াছেন?"

মিনা উত্তর করিল, "সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজভৃত্য বলিল, সে সম্বন্ধে প্রভুর কোনও আদেশ নাই।"

রাণী শুধু বলিলেন, "বেশ"।

প্রদোষে রাণী যে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, একে একে সে সমস্তই মোচন করিলেন। দাসী তাঁহাকে শয়নের বেশ পরিধান করাইয়া দিয়া বলিল, "এখন ভোজন করিবেন কি?"

রাণী বলিলেন, "করিব, পরে। তুই একটা কাজ করিতে পারিস?"

"কি বলুন।"

"অন্যান্য রাণীদের মহালে গিয়া জানিয়া আয় দেখি, মহারাজ আজ রাত্রে কোথায় বিশ্রাম করিবেন।"

দাসী চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাণী হৈমবতীর মহালে, মহারাজের আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু মহারাজ এখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই, অধিক রাত্রে তাঁহার আসিবার কথা আছে।"

রাণী হৈমবতী মহারাজ মানসিংহের নূতনতমা মহিষী। তিনি হস্তিরাজ ভীমসিংহের দুহিতা।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

এই ঘটনার ৫/৬ দিন পরে, মহারাজ মানসিংহ, রাণী অম্বালিকার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাণী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। মহারাজ রাণীব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন, "এ কি, এত রোগা হইয়া গিয়াছ কেন? বিজয়গড়ে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়াছি; যাইবার সময় এখান হইতে কিছু ঘৃতাদি খাদ্য লইয়া গেলেই হইত!"

রাণী বুঝিলেন, মহারাজের এ বাক্য, স্নেহজনিত নহে,—পরন্তু, তাঁহার পিতার দারিদ্র্যেব প্রতি শ্লেষকটাক্ষ। মহারাজ কিরূপ গর্ব্বিত ও মদোদ্ধত, তাহা রাণীর জানিতে বাকী ছিল না। তিনি অবনত বদনে নিরুত্তর রহিলেন।

মহারাজ কিন্তু এ ব্যাপার এখানেই থামিতে দিলেন না। অম্বালিকা তাঁহার বিনা হুকুমে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি ত বিষম বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, তদুপরি, একটা রাজকীয় ব্যাপারের জন্য তাঁহার মনটা আজ অপ্রসন্ন ছিল।

কথায় কথায় কথা বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে রাণী বলিলেন, "আপনি উপস্থিত ছিলেন না—তাই আপনার হুকুম লইতে পারি নাই। রমণীর পিত্রালয় গমন এতই কি অপরাধের?"

মহারাজ বলিলেন, "প্রজা সাধারণের রমণীগণের পক্ষে অপরাধ নহে বটে; রাজপরিবারে উহা নিয়মবিরুদ্ধ। তুমি ত রামায়ণ পড়িয়াছ; সীতাদেবী বিবাহের পর সেই যে অযোধ্যার আসিয়াছিলেন; আর কি কোনও দিন তিনি মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন? মহাভারত পড়িয়াছ, দ্রৌপদী দেবী, বিবাহের পর কোনও দিন আবার পাঞ্চালনগরে পিতৃদর্শনে যাইতেছেন, এ বর্ণনা কোথায় আছে? তবু ত তাঁহাদের পিতা রাজ্যেশ্বর। আর, তোমার পিতা? যদি আমার অনুমতি লইয়া যাইতে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল; তুমি সৈরিণীর ন্যায় চলিয়া গিয়াছিলে!"

রাণী বলিলেন, "কেন, মহারাজ, আমাকে এরূপ কটুবাক্য সকল বলিতেছেন? আপনার অনুমতি লইবার উপায় ছিল না; তাই আমি পট্টমহাদেবীর অনুমতি লইয়া গমন করিয়াছিলাম।'

মহারাজ বলিলেন, "মহাদেবীর অনুমতি লইয়া গিয়াছিলে; কিন্তু এ বিষয়ে অনুমতি দিবার তিনি কে?"

অম্বালিকা বলিলেন, "ওটা আমাবই ভুল হইয়াছে, মহারাজ! বিগত-যৌবনা মহাদেব অনুমতি না লইয়া, নূতন রাণী হৈমবতীর নিকট অনুমতি লইয়া গেলেই বোধ হয় মহারাজের ক্রোধাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতাম।"

মহারাজ মুখ বিকৃত কবিয়া বলিলেন, "ঈর্ষাটি ত দেখিতেছি, ষোল আনাই আছে। তোমার পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়াই যদি হইয়াছিল, তবে পাল্কী পাঠাইয়া সেই ভিক্ষুকটাকে এখানে আনাইয়া লইলেই পারিতে। এখানে রাজবৈদ্যগণ সেটার চিকিৎসা করিত, ঔষধপথ্যাদির ব্যয়টাও তার বাঁচিয়া যাইত।"

এই কথা শুনিবামাত্র, রাণী ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "সকলেরই ত রূপবতী পিসি ও ভগিনী থাকে না মহারাজ, থাকিলে, আপনার ন্যায়, আমার পিতাও হয়ত তাহাদেব মুসলমানকে দিয়া, সম্পত্তিশালী ও গণ্যমান্য হইতে পারিতেন।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই রাণী মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, হায় হায়, কি করিলাম!—রাণা প্রতাপসিংহ একবাব ইঁহাকে ঐ বিষয়ে উপহাস করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ নিজেকে কিরূপ অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা রাণী জানিতেন।

বাস্তবিক, অম্বালিকাব আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গর্জ্জন কবিয়া বলিলেন, "পাপীয়সী! তুই আমায় অপমান কবিলি? এত সাহস তোব? যা, আমাব অন্তঃপুবে হইত তুই দূর হইয়া যা। আর ইহজীবনে আমি তোব মুখদর্শন কবিব না। তোকে, সাতদিন মাত্র সময় দিলাম। এই সাতদিনেব ভিতব, তুই তোব পিতাকে আনাইযা, তাহার সহিত চলিযা যাইবি—ইহাই তোর প্রতি আমার শেষ ও অপরিবর্ত্তনীয় দণ্ডাদেশ!"—বলিয়া, মহারাজ, কম্পিতপদে বাণী অম্বালিকাব মহাল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

রাণী অম্বালিকা, অনাহাবে, অনিদ্রায় সাবা রাত্রি কাঁদিযা কাটাইলেন। পরদিন তিনি বহু মিনতি কবিয়া, ক্ষমা চাহিযা, মহাবাজেব নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহাবাজ পত্র পাঠান্তে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন ও কহিয়াছেন, রাণীকে বলিস, মহাবাজ মানসিংহের মুখ হইতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় কথা বাহির হয় না।

সে রাত্রিও অম্বালিকা কাঁদিযা কাটাইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, তাঁহার দ্বারে একখানি পর্দ্দাঘেরা তাঞ্জাম আসিয়া লাগিল। মিনা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাণী হৈমবতী দর্শনপ্রার্থিনী।

"তাঁহাকে লইয়া আইস।"—বলিয়া অম্বালিকা সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, এ দর্শনের উদ্দেশ্য কি? সমবেদনা-জ্ঞাপন?—না, রঙ্গ দেখিতে আসা? কিন্তু হৈমবতী ত সে প্রকৃতির মেয়ে নহে। তাহার মুখে সদাই হাসি—মনে কিছুমাত্র খলতা কপটতা নাই—ইহা ত সকলেই বলে; অম্বালিকার বৎসরাধিক কাল তাহাকে দেখিতেছেন, তাঁহারও বিশ্বাস সেইরূপ।

হৈমবতী প্রবেশ করিয়া, অম্বালিকাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র—দেহ-নদী প্লাবিয়া নবযৌবনেব জোয়ার ছুটিতেছে।

হৈমবতী কহিলেন, "দিদি, আমি মহারাজের নিকট সকল কথাই শুনিয়াছি। তুমি মহারাজকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা বলাটা বড়ই দোষের হইয়াছে বইকি। অত্যন্ত রাগের বশে ওকথা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু না বলিলেই ভাল হইত, একথা তুমিও বোধ হয় এখন বুঝিতেছ।"

অম্বালিকা বলিলেন, "এখন কেন, যে দণ্ডে আমার এ পোড়া মুখ হইতে ও কথা বাহির হইয়াছিল, সেই দণ্ডেই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় কি?"

হৈমবতী অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি যে এ সকল কথা সরল অন্তঃকরণেই বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে অম্বালিকার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। চিঠি ও মহারাজের মৌখিক উত্তরের কথাও নূতন রাণী অবগত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আর একখানা চিঠি লিখিয়া দেখিলে হয় না?"

"আর কি লিখিব, বহিন?"

"তুমি মহারাজকে কি লিখিয়াছিলে তাহা আমি জানি না। এস না, দুইজনে পরামর্শ করিয়া একখানা চিঠি লেখা যাক।"

অম্বালিকা বলিলেন, "যা ভাল বোঝ তাই কর ভাই।"

অম্বালিকা কাগজ কলম লইলেন। পরামর্শের বড় একটা প্রয়োজন হইল না, হৈমবতী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "অম্বালিকা লিখিতে লাগিলেন। বিদূষী বলিয়া হৈমবতীর খ্যাতি ছিল। পত্র সমাপ্ত হইলে, হৈমবতী বলিলেন, "আজই এখানি মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দাও। আজ রাত্রে, আমার কুঞ্জেই তাঁর স্থিতি। আমিও কথাটা পাড়িব—দেখি যদি তাঁর মন ভিজাইতে পারি।"

"যা হয় করিস ভাই।"—বলিয়া অম্বালিকা, সপত্নীক বিদায়-চুম্বন করিলেন।

হৈমবতী বলিলেন, "কাল আবার এই সময় আমি আসিব; মহারাজ কি উত্তর দেন, তাহাও দেখিয়া যাইব।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রাণী হৈমবতী আবার আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁহার মুখখানি বেশ হাসি হাসি। তাঁহার মুখ দেখিয়া অম্বালিকার মনে ভরসা হইল, বোধ হয় কোনও সুসংবাদ আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি ভাই?"

হৈমবতী তাঁহার বস্ত্রমধ্য হইতে, পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "আজ আমিই, তোমার বরের পত্রবাহিকা।"—বলিয়া পত্রখানি, অম্বালিকার হস্তে প্রদান করিলেন।

অম্বালিকা তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাহাতে এই কয়েক পংক্তি মাত্র লেখা ছিল :—

"আমার আদেশ অপরিবর্ত্তনীয়। তুমি এতদিন এখানে যেরূপ সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে জীবনযাপন করিয়াছ, তদভাবে পিতৃগৃহে তোমার বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তুমি গমন কালে তোমাকে আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব স্থির করিয়াছি। তদ্‌ভিন্ন, এখানে তোমার যাহা যাহা প্রিয়বস্তু আছে, তাহাও তুমি পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে পার।"

পত্র পড়িয়া, অম্বালিকার মনে এইমাত্র যে আশার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পত্রখানি সপত্নীর হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানি পড়িয়াছ?"

হৈমবতী বলিলেন, "পড়িয়াছি। আমারই ঘরে বসিয়া ত এ পত্র তিনি লিখিয়াছেন। আমি দিদি, তোমার হইয়া তাঁহাকে অনেক স্তুতিমিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন গলাইতে পারিলাম না। তোমার চিঠির কথা তিনি উল্লেখ করিলেন; জেব হইতে সেখানি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন, চিঠিখানি যে আমারই মুশবিদায় লেখা তাহা ত তিনি জানেন না! আমি ভালমানুষ সাজিয়া, মনোযোগের ভাণ করিয়া সমস্ত পত্রখানি পড়িলাম। শেষে বলিলাম,

দিদির বাবা ত শুনিয়াছি গরীব গৃহস্থ; এখানে এত বৎসর মহারাজ তাঁহাকে যে প্রকার সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে পালন করিয়াছেন, সহসা সে সকল হইতে বঞ্চিত হইলে, তিনি বাঁচিবেন কি? গরীব গৃহস্থ ঘরের অশন বসন কি এ বয়সে তাঁহার সহ্য হইবে?—ত।হাতে মহারাজ উত্তর করিলেন, আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। বলিয়া কাগজ কলম চাহিলেন। পত্র লেখা হইলে আমি বলিলাম, ওখানি আমাকেই দিন, কল্য আমি দিদির সহিত শেষ দেখা করিতে যাইব, পত্রখানি তাঁহাকে দিয়া আসিব। তাই ওখানি আমার হাতেই দিলেন।"

অম্বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অত দান খয়রাতেব কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকেই যদি হারাইলাম, তবে লক্ষ মোহর লইয়াই বা কি করিব, আসবাবপত্র সেখানে লইয়া গিয়াই বা কি করিব? তারপর, আমার সম্বন্ধে আর কোনও কথা হইয়াছিল?"

"হইয়াছিল বইকি। আমি বলিলাম, দিদি আপনাকে কত ভালবাসেন, তাহা আপনি জানেন না। তিনি শ্লেষ করিয়া বলিলেন, স্বামীকে মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া অপমান করা ত ভালবাসারই একটা প্রধান লক্ষণ বটে!—আমি বলিলাম, মানুষের কি ভুল হয় না? একদিন একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই কি আজীবন তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, তুমি জানিয়া রাখ নূতন রাণী, মহারাজ মানসিংহের এক কথা।—অন্যান্য কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাইবার পূর্ব্বে দিদিকে আপনি কি একটিবার শেষ দেখা দিবেন না?—তিনি বলিলেন, আমি নিজ হইতে যাইতে চাহি না, তবে সে যদি বিশেষ আকিঞ্চন করে, তবে একবার শেষ দেখা কেন না করিব?—দিদি, আমি বলি কি, তুমি এখনি একখানি চিঠি তাঁহাকে লিখিয়া তোমার সেই প্রার্থনা জানাও।"

অম্বালিকা সজল নয়নে বলিলেন, "আর দেখা করিয়া কি হইবে বহিন?"

হৈমবতী বলিলেন, "না না দিদি, একবার তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করিতেই হইবে।"

"তোমার কি ইচ্ছা, আবার আমি তাঁর কাছে কাঁদাকাটি করিব, পায়ে ধরিব—দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইব? না ভাই, সে আর কাজ নাই। আবু হোসেনের রাজ্যভোগ ত আমার ফুরাইয়াই গিয়াছে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, আর কেন বৃথা চেষ্টা?"

হৈমবতী আব্দারের স্বরে বলিলেন, "না দিদি ও চিঠি তোমার লিখিতেই হইবে। লিখিলেই, শেষ দিন মহারাজ এখানে আসিবেন। কাঁদাকাটি, পায়ে ধরা করিতে তোমায় বলি না। আমার অন্য একটা অভিসন্ধি আছে।"

"কি অভিসন্ধি?"

"তাহা এখন বলিব না। আগে ও চিঠির জবাব আসুক; কাল আসিয়া বলিব। একটা ভারি মজার মৎলব আমার মাথায় আসিয়াছে।"—বলিয়া হৈমবতী হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন আবার দ্বিপ্রহরে তিনি আসিলেন। এবারেও তাঁহার হাসি হাসি মুখ।

অম্বালিকা বলিলেন, "চিঠির জবাব আসিয়াছে।"

হৈমবতী বলিলেন, "জানি। দিদি, একটি নিভৃত কক্ষে চল, একটু পরামর্শ আছে।"

অম্বালিকা তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

দুই দণ্ড পরে উভয়ে যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন হৈমবতীর মুখখানি তেমনই হাসি হাসি; অম্বালিকার মুখখানি যেন আর তত বিষণ্ণ নহে।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

যথাদিনে মহারাজ মানসিংহ, গম্ভীর মুখে, রাত্রি এক প্রহরের পর আসিয়া দর্শন দিলেন। খাজাঞ্চিখানা হইতে লোক আসিয়া তৎপূর্ব্বেই রাণী অম্বালিকাকে লক্ষ মোহর ওজন করিয়া দিয়া গিয়াছিল।

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আজ রাত্রি এখানে আপনি যাপন করিবেন, এ অবস্থায় এ দুরাশা কি মনে স্থান দিতে পারি?"

মহারাজ বলিলেন, "না, আমার কাজ আছে, শীঘ্রই যাইতে হইবে।"

রাণী কিয়ৎক্ষণ নতমুখে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "অন্ততঃ, আহার করিয়া যান।"

মহারাজ পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সময় হইবে না।"

রাণী বলিলেন, "তা বটে! এত সৌভাগ্য আমার এ পোড়া অদৃষ্টে সহিবে কেন? আমার ঘরে আপনি কি কিছুই আর খাইবেন না?"—বলিতে বলিতে, রাণী অম্বালিকার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া আসিল।

মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, একপাত্র সরবৎ না হয় দাও, পান করি।"

রাণী উঠিয়া স্বয়ং সরবৎ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। মহারাজ সরবৎ পান করিয়া, তাম্বুল গ্রহণ করিলেন।

পান খাইতে খাইতে মহারাজ বলিলেন, "আজ সারাদিন বড় পরিশ্রম গিয়াছে, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। শীঘ্রই উঠিব।"—বলিতে বলিতেই তাঁহার নেত্রযুগল মুদ্রিত হইয়া আসিল।

"মহারাজ, শয়ন করুন।" বলিয়া রাণী অম্বালিকা সযত্নে তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া, মস্তকতলে উপাধান সংযোগ করিলেন। অচিরেই মহারাজের নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

রাণী হৈমবতী, পার্শ্বের কক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নিদ্রিত মহারাজের প্রতি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন জব্দ, মিন্সে!"

অম্বালিকা উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "কোনও অনিষ্ট হইবে না ত ভাই?"

হৈমবতী বলিলেন, "আমার বাপের বাড়ীর রাজবৈদ্য, তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। তাঁহার ঔষধে অনিষ্ট হইবে? সারারাত অতি গভীর নিদ্রা! এদিকে সব ঠিক আছে ত? এইবার পাল্কী বেহারাদের ডাকিয়া পাঠাও।"

"তা, পাঠাইতেছি। নিজের ভাল করিতে গিয়া, পাছে তোমার কোনও অনিষ্ট করিয়া বসি, বোন, সেই আমার বিষম ভাবনা হইতেছে। মহারাজ কল্য প্রাতে জাগিলে সব কথাই ত খুলিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে! তোমার পরামর্শেই যে আমি এ কার্য্য কবিয়াছি, তাহা তাঁহাকে জনাইতে তোমার নিষেধ নাই বলিয়াছ; কিন্তু শুনিয়া, তিনি যদি তোমার উপর রাগ করেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "ঈস্, আমার উপর রাগ করিবেন, এত মুরদ তাঁর? বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা আমি, এক কিলে ওঁর নাক ভেঙ্গে দিতে পারি, সে ভয় নাই?" বলিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন।

অম্বালিকা বলিলেন, "শেষরক্ষা হইলেই বাঁচি, ভাই।"

হৈমবতী বলিলেন, "সে ঠিক হইবে, কোনও চিন্তা নাই দিদি। মহারাজ জাগিলে, তাঁহাকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, যেমন যেমন করিতে হইবে, আমি যেমন তোমায় শিখাইয়া দিয়াছি, সে সব ভুলিয়া যাইবে না ত?"

"না ভাই, ভুলিব কেন?"

দুইখানি সুসজ্জিত পাল্কী আসিয়া দ্বারে লাগিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর, মহারাজকে ধরাধরি করিয়া একখানি পাল্কীতে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। অপর পাল্কীতে রাণী অম্বালিকা আরোহণ করিলেন। বত্রিশ জন বেহারায়, সে পাল্কী দুইখানিকে হাওয়ার মত উড়াইয়া লইয়া চলিল। অগ্রে ও পশ্চাতে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও মশালবাহকগণ ছুটিল। এ সকল লোকই রাণী হৈমবতীর পিতৃরাজ্য হস্তিপুর হইতে আনীত।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে পাল্কী দুইখানি বিজয়গড় গ্রামে প্রবেশ করিল। রাণীর পিতা বিজয়সিংহ, সুসজ্জিত বেশে, রাজজামাতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। জামাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া এবং কন্যা নিদ্রাভঙ্গ করিতে নিষেধ করায়, তাঁহাকে লইয়া গিয়া, পালঙ্কে শয়ন করাইয়া দিলেন।

।। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।।

বেলা চারি দণ্ডের সময়, মানসিংহের চেতনা-লক্ষণ দেখা দিল। অম্বালিকা তখন তাঁহার পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতেছিলেন।

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, অনেকক্ষণ সূর্যোদয় হইয়াছে, গাত্রোত্থান করিবেন না? স্নানাদি ও সন্ধ্যাবন্দনার সময় যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়!"

মহারাজ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, শয়নকক্ষের চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? আমি কোথায়?"

অম্বালিকা বলিলেন, "মহারাজ, এ আপনার শ্বশুরভবন।"

মহারাজ উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "শ্বশুরভবন। কোন্ স্থান?"

"বিজয়গড়? এখানে আমি কি করিয়া আসিলাম?"

"আপনার এই দাসী আপনাকে লইয়া আসিয়াছে।"

মহারাজ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ রাণী?—হাঁ—হাঁ—আমার এখন স্মরণ হইতেছে, আমি নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর ছিলাম, রাজধানীতে তোমার আলয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি কি নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে আনয়ন করিয়াছ? কি ভয়ানক কথা! জান রাণী, রাজদ্রোহ—কঠিন অপরাধ!"

"অপরাধ করি নাই মহারাজ, রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইয়াই এ কার্য্য আমি করিয়াছি। আমি রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র।"

"কে আজ্ঞা দিল? কোন্ সে রাজা? দিল্লীশ্বর?"

"না মহারাজ, দিল্লীশ্বর এ আদেশ আমাকে কেন দিবেন? আমার হৃদয়েশ্বর যিনি, তাঁহারই আদেশে এ কার্য্য আমি করিয়াছি।"

"কে, আমি?"

"আপনি ছাড়া আমাব হৃদয়েশ্বর কে, মহারাজ?"

"তুমি কী বলিতেছ, মহিষী? আমি তোমায় আজ্ঞা দিয়াছি যে, তুমি আমায় বিজয়গড়ে লইয়া যাও? কবে আমি তোমায় এরূপ আজ্ঞা দিলাম?"

"আমার নিকট মহারাজের স্বহস্তলিখিত পরওয়ানা আছে। এই দেখুন।"—বলিয়া রাণী, মহারাজের শেষ পত্রখানি তাঁহার সমক্ষে মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই দেখুন মহারাজ, আপনি লিখিয়াছেন, এখানে যাহা যাহা তোমার প্রিয়বস্তু আছে, তাহাও তুমি পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে পার। তা—হিন্দু-রমণীর নিকট স্বামী অপেক্ষা অধিক প্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে মহারাজ? আপনিই আমার জীবনের প্রিয়তম বস্তু, তাই আপনাকেই আমি এখানে লইয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া মহারাজের বদনমণ্ডল হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি হাস্যবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর, মহিষীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

রাণীর আদর করা শেষ হইলে, মহারাজ জেরা আরম্ভ করিলেন। রাণী হৈমবতীর এ বিষয়ে কোনও নিষেধ ছিল না। অম্বালিকা সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, 'ছুঁড়িটা ত আচ্ছা দুষ্টু!"

শ্বশুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, সেই দিন ও রাত্রি জামাতৃ-আদরে বিজয়গড়ে যাপন করিয়া, মহারাজ স-মহিষী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাণী হৈমবতীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, এই ব্যাপার লইয়া মহারাজ তাঁহার সঙ্গেও অনেক হাস্য পরিহাস করিলেন; রাগ করিলেন না—তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার করিলেন না; সুতরাং সে যাত্রা প্রৌঢ়বয়স্ক মহারাজের সমুন্নত ঘ্রাণেন্দ্রিয় অভগ্নই রহিয়া গেল।

সতী

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

চৌরঙ্গি অঞ্চলে, বিলাত-ফেরতগণের এক ক্লাবের বারান্দায় বসিয়া চারি বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। সকলেই প্রায় সমবয়স্ক, তবে কেহই চল্লিশের নীচে নহেন। সকলেই খ্যাতি, মান ও বিত্ত সঞ্চয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আজ এই ক্লাবে, একটা উৎসব ছিল। সে সকল কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে;—মেম্বরগণ এইখানেই ডিনার ভোজন সমাধা করিয়াছেন; অনেকে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; ইঁহারাও এই গ্লাসটা শেষ হইলেই উঠিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প। এমন সময়, ছাত্র-জীবনে, বিলাতে কে কিরূপ প্রেম-চর্চ্চা করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত ব্যক্তি, দত্ত সাহেব বলিলেন, "আমাদের সময় ধীরেনকে নিয়ে একটা ভারি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তোমরা কেউ তখনো বিলেত যাওনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধীরেনের কথা কি শোননি? ধীরেন ঘোষাল।"

শ্রোতৃগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "সেই বহু লক্ষপতি প্রতাপ ঘোষালের ছেলে ধীরেন ঘোষাল?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "সেই।"

"হ্যাঁ—বিলেতে পৌঁছে আমি তার কথা শুনেছিলাম। আহা! বেচারি বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিল। তারই কোনও প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের কথা তুমি বলছ নাকি? শুনেছিলাম, সে ত অত্যন্ত ভালমানুষ ছিল—নিতান্ত গোবেচারী।

দত্ত সাহেব সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "ভালমানুষ গোবেচারীরা প্রেমে পড়বে না ত পড়বো কি তুমি আমি? রাজহংসের মত ক্ষীরটুকু খেয়ে নীরটুকু বর্জ্জন করাই ছিল আমাদের প্রথা। কিন্তু সেটা কি সকলে পারে ভায়া? তার কথা, সে একটা রীতিমত যা রোমাঞ্চকর ব্যাপার! ক'টা বাজলো? ১১টা। শুনবে সে কথা?"

সেন সাহেব, হুইস্কির গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়া বলিলেন, "The night is young yet. Fire away" (রজনী এখন যুবতী—বলিয়া যাই।)

(রজনী এখনও যুবতী—বলিয়া যাও।)

দত্ত সাহেব তখন যে কাহিনী বিবৃত করিলেন, আমরা নিম্নে তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

ধীরেন প্রথমে যখন বিলাতে পদার্পণ করিল, তখন সে একটি জানোয়ার বলিলেই হয়। তখনও টাই বাঁধিতে শিখে নাই—বাঁধা টাই ব্যবহার করিত। 'পেভমেণ্ট'কে বলিত ফুটপাত, 'হেষ্টোরাঁ'কে বলিত হোটেল এবং পার্সকে বলিত মনিব্যাগ! যাহারা হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি পান করে, তাহাদিগকে সে ভয়ানক দুশ্চরিত্র ও নিতান্ত নরাধম জ্ঞান করিত। বিলাতে আমি ছাড়া তাহার পূর্ব্বপরিচিত কোনও বন্ধু ছিল না—সুতরাং সে আসিয়া আমার বাসাতেই উঠিল—আমিই ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিয়াছিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি পড়বে?"

"প্রথমতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপর, ডিগ্রী নিয়ে, জাহাজ-নির্ম্মাণ শিখতে বাবা বলে দিয়েছেন। বাবার মৎলব আছে, ভবিষ্যতে একটা কোম্পানি গঠন করে, জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা খুলবেন।"

"তা হলে ত অন্ততঃ বছর পাঁচেকের ধাক্কা বল। তা, বাবা মাসে মাসে কত পাউণ্ড করে তোমায় পাঠাবেন?"

"পাঠাবেন কি? সমস্ত টাকাই আমার সঙ্গে তিনি দিয়েছেন, অর্থাৎ ড্রাফট দিয়েছেন।

ড্রাফট্ ভাঙিয়ে নিয়ে, কোনও ব্যাঙ্কে জমা রাখতে বলেছেন—প্রয়োজন মত মাসে মাসে বের করে নিতে হবে।"

"কত পাউণ্ড?" "চার হাজার।"

আমি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "চার হাজার পাউণ্ড? ষাট হাজার টাকা? Lucky dog!" (ভাগ্যবান কুকুর!)

ধীরেন বলিল, "বাবা বলেছেন, বিদেশ বিভুঁই—হঠাৎ কোনও বিপদ আপদ হয়, ব্যারাম পীড়া হয়,—কিছু বেশী টাকা সঙ্গে থাকা ভাল! যা অবশিষ্ট থাকবে, ফেরবার সময় দেশে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "আদর্শ পিতা! কিন্তু, পুত্ররত্ন যদি তার এই কাঁচা বয়সে, বদখেয়ালিতে টাকাগুলি উড়িয়ে দেয়?"

ধীরেন সগর্ব্বে বলিল, "সে বিশ্বাস আমার উপর বাবার আছে। জন্মকাল থেকে এই ২৫ বৎসর তিনি আমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, এ তিনি বেশ জানেন, অন্যায় ভাবে টাকা ওড়াবার ছেলে আমি নই।"

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

৮/১০ দিন লণ্ডনে থাকিবার পর, ধীরেন গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল। আমাকে বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে চল ভাই—সব ঠিক ঠিকানা করে দিয়ে আসবে।" তৎপূর্ব্বেই তাহার সেই চার হাজার পাউণ্ডের ড্রাফ্ট ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা হইয়াছিল। আমি ধীবেনকে সঙ্গে লইয়া গ্লাসগো গিয়া, তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। একটা উচ্চশ্রেণীর বোর্ডিং হাউসে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিলাম।

গ্লাসগো হইতে প্রায়ই সে আমায় চিঠিপত্র লিখিত। মাস ছয় পরে, ধীরেনের নিমন্ত্রণে, আমি একদিন গ্লাসগো যাত্রা করিলাম। দেখিলাম, এই ছয় মাসে, সে অনেকটা মানুষের মত হইয়াছে। এখন আর ইংরেজী উচ্চাবণে ভুল করে না, রোষ্ট ফাউলে মাষ্টার্ড মাখিয়া খাইতে উদ্যত হয় না এবং ডিনারের পর দুই এক গ্লাস হুইস্কি সেবন করিতেও অভ্যস্ত হইয়াছে। যে বোর্ডিংয়ে তাহাকে আমি রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সে ছাড়িয়াছে—এখন রুম্‌স্ লইয়া বাস করে। বন্দোবস্ত একটু উচ্চ ধরনের, মূল্যও তদনুযায়ী দিতে হয়।

প্রথম কয়েকদিন সে আমার নিকট কিছুই ভাঙ্গে নাই। আমার লণ্ডনে ফিরিবার পূর্ব্বদিন, সান্ধ্যভোজনের পর, তার বসিবার ঘরে আগুনেব কাছে বসিয়া আমরা যখন হুইস্কি খাইতেছিলাম—তখন সে আমায় বলিল—"দত্ত—আমার জীবনে একটা নূতন ঘটনা ঘটছে!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ঘটনা হে?"

সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি প্রেমে পড়েছি!"

আমি বলিলাম, "বহুৎ আচ্ছা! মরদকা বাচ্চা, এই ত চাই। তা, ছুঁড়িটা সুন্দরী ত?"

ধীরেন চটিয়া বলিল, "ছুঁড়ি নয়। সে ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে এবং তোমাদের মত—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সবাই পাষণ্ড, আর তুমি খুব সাধু তা আমি জানি। তা তুমি কি করতে চাও শুনি?"

ধীরেন গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি তাঁকে বিবাহ করতে চাই।"

শুনিয়া আমি একটি শিস্ দিয়া, এক মিনিট কাল নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "তাঁকে--ইস্। প্রেমে জরজর! সখী আমায় ধর ধর! শেষে শ্লেষভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁকে প্রোপোজ (বিবাহ প্রস্তাব) করেছ নাকি?"

ধীরেন বলিল, "না, তা এখনও আমি করিনি।"

ধীরেনের প্রণয়িণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তার নাম ব্যর্থা ম্যাকজন।

তাহার বয়স ২২ বৎসর। বিধবা মা আছেন। একটি ভাই একটি বোন আছে। ভাইটি হাই-ষ্ট্রীটে মুদির দোকান করে, এটি তার পৈতৃক দোকান। ব্যর্থা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল; গ্লাসগো সহরেই একটি ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের গভর্ণেস স্বরূপ সেই বাটীতে থাকে।

বলিলাম, "ভায়া, এমন কার্য্যটি কোর না। ওরা হল রাজার জাত, আমরা হলাম কালা আদমি—ওদেব প্রজা। তুমি যদি মেম বিয়ে করে এ দেশেই বসবাস করতে পার, তা হলে সে একরকম চলে যেতে পারে। কিন্তু যদি তাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাও, তা হলে তোমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। তোমার মা বাপ আত্মীয়স্বজন সকলেই তোমার ঐ মেমকে বিষনয়নে দেখবেন। আর তোমার মেম দেখবেন, সে দেশের ইংরেজ সমাজ, কালা আদমি বিবাহ করার জন্যে তাঁকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখছে। তোমরা হবে ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা। এখনও প্রোপোজ কবনি, সেই মঙ্গল; সময় থাকতে সাবধান হও। এর বেশী আর আমি তোমায় কিছু বলতে চাইনে।"

ধীরেন রুক্ষস্বরে বলিল, "পাদ্রী সাহেব, তোমার এ অযাচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সকলকেই তুমি নিজেদের মত মনে কোর না।"

আমিও একথা শুনিয়া একটু চটিলাম বইকি। বলিলাম, "দেখ, তুমি এই ছ'মাস মাত্র বিলেতে এসেছ, আমি আজ তিন বৎসর আছি! তুমি এখনও ওদের চেননি, আমি ওদের হাড়হদ্দ বুঝে নিয়েছি। তুমি কি ভাব ব্যর্থা তোমার প্রেমে জরজর হয়েছেন?"

"অন্ততঃ আমি হয়েছি। তিনিও যে আমায় ভালবাসেন, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি প্রোপেজ করলে বোধ হয় তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

আমিও ব্যঙ্গভরে বলিলাম, "নিশ্চয়ই করবেন না। তুমি যে একজন বহু লক্ষপতিব সন্তান, তা শ্রীমতী জানতে পেরেছেন যে! তুমি যে নির্বোধের সর্দ্দার, পড়েছ একজন এডভেঞ্চরেসের হাতে, আর মনে করছ তিনি বুঝি একজন সীতা বা দময়ন্তীই হবেন। আমার কথা না শুনলে শেষে তোমায় নাকের জলে হতে হবে তা তোমায় বলে দিচ্চি ভায়া।"

ধীরেন গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, আমার সঙ্গে আর কোনও কথা কহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরস্পরকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া আমরা নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন প্রাতরাশের পর সাড়ে নয়টার ট্রেনে আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

তিন মাস পরে ধীরেনের পত্রে জানিলাম, সেই গর্দ্দভ, কুমারী ব্যর্থাকে প্রোপোজ করিয়াছে—বসন্তের মধ্যভাগে মে মাসে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়। পত্রখানি পড়িয়া রাগে সেখানা মুচড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। আপন মনে বলিতে লাগিলাম—একটা মাস এগিয়ে ১লা এপ্রিল বিবাহ হলেই ভাল হত—"সকল মূঢ়ের দিন" টাই তোদের বিবাহেব পক্ষে সুপ্রশস্ত।

শীত ফুরাইল, বসন্তকাল আসিল। কই, ধীরেনের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ত এখনও আসিল না! আমার উপর সে যা চটিয়াছে, বোধ হয় আমায় নিমন্ত্রণই করিবে না।

নিমন্ত্রণপত্র আসিল না—কিন্তু একদিন এক টেলিগ্রাম আসিল। সর্ব্বনেশে টেলিগ্রাম। ব্যর্থা টেলিগ্রাম করিয়াছে—"ধীরেন সাংঘাতিক পীড়িত। সে তোমায় দেখিতে চায়—শীঘ্র এস।"

সেইদিনই সন্ধ্যার পর গ্লাডষ্টোন ব্যাগে খানকতক কাপড় চোপড় পুরিয়া আমি স্কচ এক্সপ্রেসে গ্লাসগো যাত্রা করিলাম।

পরদিন বেলা দশটার সময় গ্লাসগোতে নামিয়া, ক্যাব লইয়া, সোজা ব্যর্থার ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিলাম। দরজায় কড়া নাড়িতে একটা লালমুখী মোটা মাগী আসিয়া দরজা

খুলিয়া দিল। বলিল, "তুমি কি মিষ্টার ড্যাট? আমার কন্যা ব্যর্থা কি তোমায় টেলিগ্রাম করিয়াছিল?"

ও হরি! এই বুঝি বিবি ম্যাকজন? আমি ভাবিয়াছিলাম এ বাড়ীর দাসী। টুপী তুলিয়া বলিলাম, "হাঁ মিস ব্যর্থার টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি আসিয়াছি। তিনি কোথায়?"

বিবি ম্যাকজন বলিলেন, "ভিতরে আসুন বলিতেছি।"—আমাকে ড্রয়িংরুমে লইয়া গিয়া বসাইয়া বলিলেন, "ব্যর্থা হাসপাতালে। মিষ্টার ঘোষাল সেখানে বসন্তরোগে শয্যাশায়ী—ব্যর্থাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে।—আমি মেয়েটাকে কত নিষেধ করিয়াছিলাম, মিনতি করিয়াছিলাম, রাগ করিয়াছিলাম,—বলিয়াছিলাম, মিষ্টার ঘোষাল লক্ষপতির সন্তান, তাঁহার ত টাকার অভাব নাই—উচ্চ বেতনে ভাল নার্স নিযুক্ত করিয়া দাও—না হয় আমিও কিছু সাহায্য করিব—ও সব ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—"

দেখিলাম বক্তৃতা দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা; বাধা দিয়া বলিলাম "ঘোষাল এখন কেমন আছেন, আপনি জানেন কি?"

বিবি ম্যাকজন বলিলেন, "কাল বিকালেও আমি সংবাদ লইতে গিয়াছিলাম। হাউস সার্জ্জন বলিলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি আরও বলিলেন, তোমার মেয়ে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবা করিতেছে'—তার ধৈর্য্য তার সহিষ্ণুতা তার বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিলেন; আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন, যথেষ্ট সাবধানতা লওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি রোগের বীজ ব্যর্থার শরীরে সংক্রমিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। মিষ্টার ড্যাট—আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে; এখন চলুন দু'জনেই যাই—দুইজন বা তিনজন ভাল ভাল বহুদর্শী নার্স নিযুক্ত করিয়া ব্যর্থাকে বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করি—নাহিলে,—নাহিলে,—ব্যর্থাকে যদি ঐ রোগে আক্রমণ করে—তবে আমার কি হইবে!"—বলিয়া বৃদ্ধা চোখে রুমাল দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, যাই চলুন; আমার ব্যাগটা দয়া করিয়া এখন আপনার গৃহে রাখুন, ফিরিয়া, একটা বাসা ঠিক করিয়া উহা লইয়া যাইব।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ব্যাগ দিন, দয়া করিয়া দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি কাপড় বদলাইয়া আসিতেছি। আপনার জন্য এক পেয়ালা চা ও কিছু প্রাতরাশ পাঠাইয়া দিব কি?"

আমি বলিলাম, "না ধন্যবাদ। প্রাতরাশ আমি ট্রেনেই শেষ করিয়াছি।"

বৃদ্ধা ব্যাগ লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, পূর্ব্বে যাহা মনে করিয়াছিলাম, ধীরেন বহু লক্ষপতির সন্তান শুনিয়াই ব্যর্থা তাহাকে জালে ফেলিয়াছে—সে ধারণা দেখিতেছি ভুল। আসল ভালবাসা না থাকিলে নিজের জীবন কেহ সঙ্কটাপন্ন করিতে পারে না এ কথা সুনিশ্চিত।

দশ মিনিট পরে, বৃদ্ধা নামিয়া আসিলেন। রাস্তায় বাহির হইয়া ক্যাব লইয়া আমরা হাসপাতালে গিয়া পৌঁছিলাম।

হাউস সার্জ্জন সাহেবের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "ঘোষালের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই যাইতেছে। জীবনের আশা খুবই কম।"

ব্যর্থার মা বলিলেন, "আমার মেয়ের কি হইবে, ডাক্তার? তার রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? ঈশ্বরের দোহাই, ডাক্তার, আমার মেয়েকে রোগীর নিকট হইতে তাড়াইয়া দাও। নহিলে সেও বাঁচিবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি সাবালিকা। স্বেচ্ছায় না গেলে আমরা ত জোর করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে পারি না।"

"তাকে খুব ভয় দেখাও। বল, এইবেলা তুমি সরিয়া পড়, নহিলে তুমি সুদ্ধ মরিবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে ভয়ও দেখাইয়াছি। কোনও ফল হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন,

উনি আমার স্বামী এবং উনি হিন্দু। উনি যদি মরেন, আমি নিজেকে হিন্দু বিধবা বলিয়া মনে করিব—এবং সতী হইব।"

বিবি ম্যাকজন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? সতী হইব কি?"

ডাক্তার সাহেব শিক্ষিত ব্যক্তি, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই না মিঃ ড্যাট?"

আমি বলিলাম, "তাই বটে।"

শুনিয়া বিবি ম্যাকজন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"Oh, how foolish! How horrible!" (উঃ—কি মূঢ়তা! কি ভয়ঙ্কর!) হায় হায়, কি হবে ডাক্তার? রোগী যদি মরে, ব্যর্থা যদি তার সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়া মরিতে চায়, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে। আমার যে একগুঁয়ে মেয়ে, সব পারে ও! উহা নিবারণের কি কোনও উপায় নাই ডাক্তার?"

ডাক্তার বলিলেন, "যথেষ্টই আছে। আমাদের আইনে উহা চলিবে না। আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে পুলিশ গিয়া বাধা দিবে।"

"Thank God"—(ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)—বলিয়া বৃদ্ধা একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আমাদের সেখানে রাখিয়া, ডাক্তার রোগীকে দেখিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া রোগী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করিবেন চলুন—কিন্তু আধঘণ্টা মাত্রই।"

বসন্ত রোগীর সান্নিধ্যে কাহাকেও লইয়া যাইতে হইলে যে সকল প্রক্রিয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা করিয়া, ডাক্তার আমায় ধীরেনের কক্ষে লইয়া গেলেন। তার সারাদেহ কম্বলে ঢাকা—কেবল মুখখানি বাহির হইয়া আছে। সে মুখ আমি চিনিতে পারিলাম না—বসন্ত গুটিকায় তাহা আছন্ন। দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল; কিন্তু রোগীর সাক্ষাতে অশ্রুপাত করা অন্যায় বিবেচনায় বহু কষ্টে আমি উহা সম্বরণ কবিলাম।

ডাক্তার সাহেব ব্যর্থাকে বলিলেন, "মিস ম্যাকজন, তুমি চল, স্নানাদি করিয়া, তোমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তিনি তোমায় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন!"

ব্যর্থা, ধীরেনের শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি ততক্ষণ তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা কও, প্রিয়তম, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

ক্ষীণস্বরে ধীরেন কি বলিল আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না। ব্যর্থা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ, ধীরেন?"

ধীরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "আর, কেমন আছি ভাই! আমার দিন ত ফুরিয়ে এসেছে! বড়জোর আর একদিন কি দু'দিন বোধ হয়!"

আমি বলিলাম, 'নন্‌সেন্স! ও কি কথা? তুমি ভাল হবে। ২/১ দিনের মধ্যেই বোধ হয় একটু সুরাহা হবে।"—মুখে বলিলাম বটে কিন্তু বুকে জোর পাইলাম না।

ধীরেন বলিল, "সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমি গেলে আমার বাপ মার কি হবে? তাঁদের না হয় অন্য পুত্রকন্যা আছে—কিন্তু ব্যর্থার কি হবে?"

বলিলাম, "শুনলাম, উনি যেমন তোমার সেবা করছেন, তেমন সেবা মা কিম্বা স্ত্রী ছাড়া বোধ হয় আর কেউ পারে না।"

ধীরেন বলিল, "বেশী—বেশী। কোথায় মনে করেছিলাম আর মাসখানেক পরে ওকে বিবাহ করে সুখী হব—তা না হয়ে, হল কিনা চিরবিদায়ের ব্যবস্থা!"

আমি মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। শেষে বলিলাম, "ভাই, ছ'মাস পূর্ব্বে তুমি যখন প্রথম ওঁর কথা আমায় বলেছিলে, তখন ওঁর সম্বন্ধে আমি নিষ্ঠুর ও অপমানকার

মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম, এখন দেখছি তা ভুল—মহা ভুল। সে জন্যে তুমি আমায় মাফ কর ভাই।"

ধীরেন বলিল, "এ দেশে যেমন পাঁচটা আমরা দেখি, সেই অনুসারেই তুমি বলেছিলে, তোমার দোষ কি? তুমি ত জানতে না। আর, ওর যে এত গুণ তা আমিই কি তখন সব জানতাম? ওকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে আমার মা বাপ আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হবেন শুনে, ও কি বলেছিল জান? ও বলেছিল, আমি ত সেখানে গিয়ে মেমের মত থাকব না। তোমার বোনদের ছবিতে যেমন দেখেছি আমি সেই রকম শাড়ী পরবো, সিন্দুর পরবো, হাতে খাব, খালি পায়ে বেড়াব—তা হলেও কি আমি তাঁদের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারবো না?—সবই হল। শাড়ী শাঁখা সিন্দুর সবই পরা হল!" বলিতে বলিতে ধীরেনের চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেবের নিকট ব্যর্থা যে সতী হইবার কথা বলিয়াছিল, সে কথা ধীরেন ত শোনে নাই, ভাবিলাম এখন উহাকে বলি। তার পর আবার মনে হইল, সে কথা বলিয়া উহার যাতনা বাড়াইয়া আর ফল কি?

একটু শান্ত হইয়া ধীরেন বলিল, "ভাই, দুটি কাজের জন্যে তোমায় ডেকেছি। প্রথম, আমার মৃত্যু হলে, এরা যেন আমায় কবর না দেয়। লণ্ডনে ক্রিমেটোরিয়ম্ আছে, আমার কফিন সেইখানে নিয়ে দাহ কোর। দ্বিতীয় কথা, ব্যাঙ্কে আমাব এখনও পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর জমা আছে। বাসায় আমার ওয়ার্ডরোবের দেরাজে আমার চেকবই আছে। দু'তিনখানা চেক আমার সই করাও আছে। অন্ত্যেষ্টি খরচ দুই একশো পাউণ্ড যা লাগে তা বাদে, সমস্ত টাকার চেক লিখে ব্যর্থাকে দিও। এই দুটি কাজের জন্যেই বিশেষ করে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আর, দেশে ফিরে গিয়ে, আমার মা বাবাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিও। আর কি বলবো?"—আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেব এই সময় আসিয়া বলিলেন, "মিষ্টার ড্যাট, আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা কবেন ত আবার আসিযা সাক্ষাৎ করিতে পাবেন।"

ধীরেনের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এখন তা হলে আসি ভাই।"—বলিয়া উঠিলাম।

করিডরে যাইতে যাইতে দেখিলাম, স্নান সারিযা, তপস্বিনী গৌরীব মত, ব্যর্থা রোগীকক্ষ অভিমুখে যাইতেছেন। আমি টুপি তুলিলাম,—কেবলমাত্র এটিকেট বক্ষাব জন্য নহে,—তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার বুক ভরিয়া গিয়াছিল।—নীরবে আমি তাঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিলাম।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

আর তিনটি দিন মাত্র ধীবেন জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, সেই কাল ব্যাধি, ব্যর্থার শরীরেও আত্মপ্রকাশ করিল।

আমি তৎপূর্ব্বেই ধীরেনের চেকবই হইতে দুইখানি চেক কাটিয়া রাখিয়াছিলাম। একখানি অন্ত্যেষ্টি-ব্যয় জন্য, অপরখানি ব্যর্থার নামে। ধীবেনের মৃত্যুর পরদিন ব্যর্থার চেকখানি আমি ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়া যথাকর্ত্তব্য তাঁহাকেই করিতে বলিয়াছিলাম।

পরদিন ব্যর্থার সঙ্গে গিয়া আমি দেখা করিলাম।

ব্যর্থা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে লণ্ডন ফিরিবেন?"

বলিলাম, "তোমাকে আরোগ্যের পথে দেখিয়া, তারপব আমি যাইব।"

ব্যর্থা একটু মৃদু হাসিল। বলিল, "ধীরেনের কফিন ভাল জায়গায় আছে ত?"

"আছে।"

দেখুন, আমি মরিলে আমাকেও যেন কবর দেয় না। আমিও দাহ হইব। এবং—বুঝিলেন?"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি। ঈশ্বর করুন, তাহা যেন আমায় না করিতে হয়। আপনি ভাল হইয়া উঠুন।"

ব্যর্থা বলিল, "ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, দেখা যাউক। দেখুন ধীরেনের সেই চেকের কথা। যদি আমি বাঁচি, ও চেক আমি লইব; যদি না বাঁচি, তবে ঐ টাকা এই হাসপাতালে, ধীরেনের স্মৃতিরক্ষার্থে দিয়া যাইব। ডাক্তার সাহেবকে আমি সে কথা বলিয়াছি।"

প্রতিদিন আমি গিয়া ব্যর্থার সংবাদ লইতাম। সপ্তম দিনে ব্যর্থার আত্মা তার প্রিয়তমের আত্মার অনুসরণে অনন্তের পথে ছুটিল।

পরদিন রাত্রের ট্রেনে, একজোড়া কফিন বুক্‌ করিয়া, একই ভ্যানে পাশাপাশি রাখাইয়া লণ্ডনে লইয়া গেলাম। ক্রিমেটোরিয়ামের অধ্যক্ষকে যাত্রার পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। অপরাহ্ণ কালে লণ্ডনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে তাহাদের শববাহী গাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল সেই গাড়ীতে উভয় কফিন লইয়া, দাহগৃহের একটি লৌহময় চেম্বারের মধ্যে দুটিকে পাশাপাশি স্থাপন করাইয়া, ফুল কিনিতে গেলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। শ'খানেক টাকার ফুল ও মালা কিনিয়া আনিয়াছিলাম, কফিন দুইটির উপর সেগুলি সাজাইয়া দিলাম। তারপর, চেম্বারের লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল। অধ্যক্ষ, বিদ্যুৎগৃহে প্রবেশ করিয়া, সুইচ টিপিয়া দিলেন।

"এইবার তোদের ফুলশয্যা হোক'—বলিয়া, চোখে রুমাল দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

দত্ত সাহেবের কাহিনী শেষ হইল, তখন রাত্রি প্রায় ১টা। "বাই জোভ!—এত রাত হয়েছে?"—বলিয়া শ্রোতৃগণ উঠিলেন। নীচে নামিয়া, নিজ নিজ মোটরে আরোহণে ক্লাব পরিত্যাগ করিলেন।

রেলে কলিসন

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ পড়িতেছিলাম, এমন সময় বঙ্গভঙ্গের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া সভা-সমিতিতে ছুটাছুটি, ফেডারেশন হলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ এবং স্বদেশী বস্ত্রের মোট কাঁধে করিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে লাগিলাম। দুই একটা সভায় বক্তৃতা করিবার পর, সুবক্তা বলিয়া কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করা গেল। মনে আছে বীডন উদ্যানে এক সভা অন্তে স্বয়ং সুরেন বাঁড়ুয্যে আমার পিঠ থাবড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "জিতা রও বাবা!" এই সময় কলিকাতা ইউনিভারসিটির নাম হইয়া গেল—"গোলামখানা"। কে একজন, একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে "গোলামখানা" লিখিয়া সেনেট হাউসের দেওয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিল। সুতরাং অনেকের সঙ্গে আমিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পড়াশুনার দিকে ঝোঁক কোনও দিনই আমার ছিল না, পিতা মাতাও জীবিত নাই যে তাড়ানা করিবেন। পড়িতাম শুধু ফ্যাসনের অনুরোধে—আর পাঁচজনে যাহা করে তাহা করাই উচিত বলিয়া,—সে বালাই দূর হইল; হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কালক্রমে উত্তেজনার ভাবটা কতক কমিয়া গেলে, স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসা করিব বলিয়া ঠিক করিলাম। ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁকটা আমার বাল্যকাল হইতেই। যখন স্কুলে পড়িতাম, মনে আছে, নয় আনা দিয়া একশিশি লজেঞ্জুষ কিনিয়া, পয়সায় তিনটা করিয়া ছেলেদের নিকট বিক্রয় করিয়া বারো আনা করিতাম। জলছবি আনাইয়া, ঐরূপে খুচরা বিক্রয়

করিয়া, টাকায় আট আনা লাভ করিতাম। অভাবের জন্য যে এরূপ করিতাম তাহা নহে আমার পিতার কিছু ধন সম্পত্তি ছিল। ছেলেরা আমায় বলিত, "আর জন্মে তুই মাড়োয়াড়ী ছিলি।" তাই বোধ হয় ছিলাম; ব্যবসার প্রসঙ্গ শুনিতে, ব্যবসায়িগণের সঙ্গে মেলামেশা করিতে মনে যে আনন্দ হইত, কোনও জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বা দেশপ্রসিদ্ধ কবির সহিত আলাপেও তাহা হইত না।

দেশে আমার পৈতৃক নগদ টাকা কিছু ছিল—বেশী নয়, হাজার পাঁচেক হইবে। ব্যবসায়ে সব টাকাটা একেবারে ফেলিব না স্থির করিয়া, দুই হাজার টাকার ধুতি শাড়ী প্রভৃতির জন্য আহমেদাবাদের এক বিখ্যাত মিলে অর্ডার পাঠাইলাম। বউবাজার স্ট্রীটে একখানা দোকান ঘর ভাড়া লইয়া, মাল রাখিবার জন্য র‍্যাক নির্মাণ করিতে মিস্ত্রী লাগাইয়া দিলাম। সাইন বোর্ড আঁকাইতে দিলাম, তাহাতে লেখা থাকিবে "বন্দেমাতরম্ বস্ত্র ভাণ্ডার—সোল প্রোপাইটর এ, বি, কাঞ্জিলাল।" বলিতে ভুলিয়াছি, আমার নাম শ্রী অটল বিহারী কাঞ্জিলাল।

র‍্যাক-আদি নির্ম্মিত হইল; সাইন বোর্ড প্রস্তুত এবং একদিন আহমেদাবাদ হইতে পত্র আসিল, মিলের মালিক পাঁচ গাইট মাল পাঠাইয়া "বিল্‌টী" (মালের রসিদ) খানা ভিপি করিয়াছেন, টাকা দিয়া ভি-পি লইয়া আমি যেন মাল খালাস করিয়া লই। তৎসঙ্গে একটি 'চালান' (জিনিষের ফর্দ্দও) আসিয়াছে। পরদিন পোষ্ট আপিস হইতেও ইণ্টিমেসন পাইলাম। মহোল্লাসে সেইদিনই গিয়া দুই হাজার বাহাত্তর টাকা দিয়া ভি-পি ছাড়াইয়া লইলাম।

রসিদ আসিয়াছে ডাকগাড়ীতে, মাল রওনা হইয়াছে মালগাড়ীতে সুতরাং পৌঁছিতে দেরী হইবে; তাই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া, হাওড়ার মালগুদামে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কত লোকের কত গাঁইট আসিয়া স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে—কিন্তু আমার মাল ত কই আসে নাই! একজন বাবু বলিলেন, "আহমেদাবাদ কি এখানেই মশাই। আরও হপ্তাখানেক পরে এসে খবর নেবেন।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

সপ্তাহ পরে আবার গিয়া সংবাদ লইলাম—না, মাল আজিও আসে নাই। দুইদিন, তিনদিন অন্তর মালগুদামে যাইতে লাগিলাম, মালের কোনও পাত্তাই নাই। এইরূপে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল।

একদিন মালগুদামে দাঁড়াইয়া, একজন পরিচিত লোককে আমার দুর্দ্দশার কথা বলিতেছিলাম। নিকটেই একজন মাড়োয়ারী বালক দাঁড়াইয়া ছিল,—বছর বারো বয়স হইবে—সে ছোঁড়া শুনিয়া, হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি রাগত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁসতা হ্যায় কাহে জী?" ছোকরা পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিল, "হাসছি বাবু, আপনার আক্কেল দেখে। মাল এসে পৌঁছল কি না, তার ঠিক নেই, এক ঝুড়ি টাকা দিয়া বিল্‌টী ছাড়িয়া নিলেন! বিলটীর ভি-পি এলে আমরা প্রথমে মালগুদামে এসে খবর নিই যে মাল এসেছে কি না। মাল স্বচক্ষে দেখে, তবে আমরা পোষ্ট আপিসে যাই। বিল্‌টী তিন হপ্তা ডাকঘরে জমা থাকে।"

ছোকরার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ঠিক কথাই ত! কিন্তু কই, এ কথা ত এতদিন কেহই আমায় বলে নাই। এই বারো বছরের ছোঁড়া এ কথা জানে,—অথচ সে কালিদাস পড়ে নাই, ভবভূতি পড়ে নাই,—শেক্সপিয়রের মিলটনের নামও তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কেহ শ্রবণ করে নাই।

মাল আসিল না। রেল কোম্পানীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছি, তাঁহারা ছাপা ফরম ফিলআপ করিয়া উত্তর দিয়াছেন, "অনুসন্ধান করিতেছি।" সে তাঁরা করুন; আমি ত মাল পাইবার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা করিয়া রেল কোম্পানির নিকট

হইতে টাকা আদায় করিতে হইবে—কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ, বস্ত্র খরিদের জন্য স্বয়ং আহমেদাবাদ যাত্রা করিলাম। বিভিন্ন মিলে গিয়া স্বয়ং দেখিয়া মাল অর্ডার দিব। বিভিন্ন মিলে—কারণ সব খরিদ্দারের পছন্দ একরকম নহে। এ জ্ঞানটুকুও সম্প্রতিই অর্জ্জন করিয়াছি। ফিরিয়া আসিয়া, হাওড়ায় আমার মাল পৌঁছিয়াছে স্বচক্ষে দেখিয়া, তার পর পোষ্ট আপিস হইতে বিল্‌টীর ভি-পি ছাড়াইব।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

বোম্বাই মেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। ইন্টার ক্লাশের টিকিট ছিল। ইটার্সি ষ্টেশন ছাড়াইয়া রাত্রি হইল। ব্যাগে লুচী, আলুভাজা ও মোহনভোগ ছিল, তাহাই খাইয়া, বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার কামরায় তখন দুইজন মাত্র আরোহী ছিল। আমি জাগিয়া থাকিতেই তাহারা নামিয়া গেল। তার পর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম জানি না, কর্ণবধিকারী বিরাট ভীষণ শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বেঞ্চির উপর হইতে ছিটকাইয়া মহাবেগে কোথায় যেন পতিত হইলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি সমস্তই অন্ধকার। একটা মড়মড় কড়কড় শব্দ এবং সেই সঙ্গে অনেক লোকের করুণ আর্তনাদ কানে আসিতে লাগিল। নিজে তখনও আমি দুলিতেছি—আমার ডান দিকের উরুতে এবং মাথার পশ্চাতে ভীষণ যন্ত্রণা। বুঝিলাম, ট্রেনে কলিসন হইয়াছে।

দোলানি ও মড়মড় কড়কড় শব্দ শীঘ্রই থামিয়া গেল। উরুতে হাত দিয়া দেখিলাম একটা কাঠের টুকরা সেখানে বিঁধিয়া রহিয়াছে। সেটা খুলিয়া ফেলিতেই, যন্ত্রণা একটু কমিল বটে, কিন্তু দর দর ধারায় রক্তপাত হইতে লাগিল তাহা স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম, এ কলিসনে আমি মরি নাই, মরিলে ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িত না; ভাঙা গাড়ীব স্তূপের ভিতর জীবন্ত সমাধি লাভ করিয়াছি।

বাহির হই কি কবিয়া? কই, কোনও দিকে ত একটু আলোকের কণাও দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু শ্বাসকষ্টও ত অনুভব করিতেছি না—বায়ু প্রবেশের পথ কোথাও নিশ্চয়ই আছে এবং সেই পথেই, নরনারীর সমবেত কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদও শ্রবণপথে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

বাহির হইবার কোনও উপায় কি নাই?

এই অন্ধ তমোগহ্বরে, অনাহারে মৃত্যুই কি আমার অদৃষ্টলিখন? তার চেয়ে, মস্তক চূর্ণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে পাড়ি দিতে পারিলেই ত ভাল হইত। সেই অন্ধকারে চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলাম। একটা কোমল দ্রব্য স্পর্শ করিলাম—মনুষ্যদেহ। স্পর্শে আরও জানিলাম, তরুণী নারীদেহ। তাহাকে ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মরে গেছ নাকি?"

কোনও উত্তর নাই। ও তবে মরিয়াছে। জীবিত ও মৃত—একত্র সমাধিস্থ। আরও চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিলাম, আর কাহাকেও পাইলাম না। আরব্য উপন্যাস পড়িয়া ছিলাম, সিন্ধবাদ সে কোন দেশে গিয়াছিল, সেখানে স্বামী মরিলে জীবন্ত স্ত্রীকে এবং স্ত্রী মরিলে জীবন্ত স্বামীকে একত্র সমাধিস্থ করা হয়—আমি কি সেই দেশে রহিয়াছি এবং এই তরুণীই কি আমার মৃতা পত্নী? বিশেষ চেষ্টায় স্মরণশক্তি প্রয়োগ করিয়া জ্ঞান হইল—না, তাহা নয়, আমি অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবক এবং মাল খরিদ করিবার জন্য এই ট্রেনে আহমেদাবাদ যাইতেছিলাম।

নিজ ডরুর ক্ষত স্থানে হাত দিয়া যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় একটা গোঙানি শব্দ শুনিতে পাইলাম। জয় জগদীশ্বর!—ও তবে মরে নাই—বাঁচিয়াই আছে। মৃত্যুনদীর তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, একটি জীবিত প্রাণীর সঙ্গলাভে যেন কৃতার্থ হইয়া গেলাম। হাত বাড়াইয়া মেয়েটির গা ঠেলিয়া বলিলাম, "তুমি বেঁচে আছ?"

সে ক্রন্দনের স্বরে বলিল—আগে মাঈ গে মাঈ!"
বুঝিলাম বাঙ্গালীর মেয়ে নয়, হিন্দী কথা কয় যে!
জিজ্ঞাসা করিলাম, "বহুত চোট্ লাগা?"
সে কেবল কাৎরাইতে লাগিল।
ক্ষণপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বহুৎ জখম হুয়া?"
সে বলিল, "বড়া দুখাতা হায় মাঈ যে মাঈ!"
বলিলাম, "কাঁদনেসে ক্যা হোগা? গাড়ী লড় গিয়া। হামলোগ সব চাপা পড় গিয়া তুমারা নাম ক্যা?"
সে বলিল, "সরস্বতী"—বাঙ্গলা ধরনে নয়, সংস্কৃত ধরনে শব্দটা উচ্চারণ করিল।
ক্রমে ক্রমে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, তাহার পিঠে শিরদাঁড়ায় আঘাত লাগিয়া বড় যন্ত্রণা হইতেছে, রক্তপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই ট্রেনে অন্য কামরায় তাহার পিতাও আছেন, সে দেড়া মাসুলের মেয়েকামরায় ছিল। হাওড়ায় ট্রেনে উঠিবার সময়, আমাদের কামরার পাশে ইন্টার ক্লাসের মেয়েকামরা দেখিয়াছিলাম; বুঝিলাম মাঝের পার্টিসন ভাঙ্গিয়া, বিধাতা তাহাকে আমার কামরায় আনিয়া ফেলিয়াছেন।
সরস্বতী বলিল, "এ বাঙ্গালী বাবু, হামলোক জিয়েগা?"
বলিলাম, "দেখো, রামজীকা ক্যা মর্জ্জি!
বালিকা তখনও কাতরাইতেছে দেখিয়া বলিলাম, "এ জী! তুমারা পিঠমে একটু হাত বুলায় দেগা?"
সে বলিল, "হাঁ বাবুজী!"
বলিলাম, "আচ্ছা, তবে থোড়া কাছমে সরে আও।"
সে তেমনি কাতরাইতে লাগিল। বোধ হয় অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা তাহার বিলুপ্ত। আমি কষ্টে সৃষ্টে তাহার নিকটবর্তী হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিলাম, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া পড়িয়া আছে, পিঠের মাঝখানটা বিষম ফুলিয়াছে। তাহার "আঙিয়া"র সে স্থানটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আমি অতি মৃদুভাবে সেখানে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বোধ হয় বালিকার আরাম হইতেছিল, তাহার কাতরাণী একটু কমিল।
কথাবার্ত্তাগুলার বাঙ্গলা অনুবাদই দেওয়া হইক।
সে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবু, আমরা বাঁচবো?"
বলিলাম, "নারায়ণ জানেন।"
"আমার বাবার কি হ'ল?"
"তাও নারায়ণই জানেন।"
মেয়েটি "বাবু হো!"—বলিতে বলিতে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, "এ জী, কেঁদো না, কপালে যা আছে তা কে খণ্ডাবে বল!"
ক্রমে সে একটু শান্ত হইল। আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তাহারা গুজরাটী ব্রাহ্মণ। সে এখনও কুমারী। পিতা আছেন, মা নাই। পিতার নাম নগীনদাসজী—তিনি আহমেদাবাদে কাপড়ের ব্যবসা করেন। তিনি কারবার সম্পর্কিত কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; সরস্বতী কখনও কলিকাতা দেখে নাই—আব্দার লইয়াছিল, তাই মাতৃহারা কন্যাটিকেও তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এখন দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সরস্বতীর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র।
সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ জী, তোমার কোন্‌খানে লেগেছে?"
আমি বলিলাম, "মাথার পিছনটায়, আর ডরুতে।"
সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কষ্ট হচ্ছে কি?"

আমি বলিলাম, "হচ্চে বইকি একটু ডরুতে যত যন্ত্রণা হোক বা না হোক মাথা বড়ই ঝনঝন করছে।"

সে বলিল, "মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবো?"

"দেবে? আচ্ছা দাও"—বলিয়া তাহার নিকট আমি একটু সরিয়া গেলাম।

সে, হাত বুলাইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "দেখ সরস্বতী! রামজীর কি আশ্চর্য্য লীলা দেখ! কলিসন হ'ল, গাড়ী চুরমার হয়ে গেল, চারিদিকে ভাঙ্গা লোহা লকড়ি স্তূপাকার—মাঝখানে একটা ঘর হয়ে গেল, তার ভিতরে শুধু তুমি আর আমি। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?"

সে বলিল, "খুব আশ্চর্য্য বাবুজী। বড় পিপাসা, একটু জল।"

জল আর কোথায় পাওয়া যাইবে? হঠাৎ মনে হইল, আমার কোটের পকেটে ডিবা ভরা পান ছিল। হাত দিয়া দেখি, সে ডিবা আছে। বলিলাম, "জল এখানে কোথায় পাব? পান, আছে খাবে?"

দাও!

ডিবাটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "খুলে নিয়ে খাও।"

সে পানের ডিবা লইল। খুলিয়া, পান খাইয়া বলিল, "তুমি খাবে?"

আমি বলিলাম, "আমার দু'হাতেই তো রক্ত মাখা। তুমি যদি খাইয়ে দিতে পার ত খাই।"

সে, নিঃসংকোচে স্বহস্তে আমায় পান খাওয়াইয়া দিল!

মানুষের মনের গতি বিচিত্র। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী হইয়াও, তাহার এই নারীহস্তের মমতা মাখা সেবায় আমার মনে মধুর ভাবের সঞ্চার হইল। বলিলাম, "এ জী! যদি আমরা বাঁচি, তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

সে বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস, রামজীর তাঁই ইচ্ছা। নয় ত দেখ, আমাদের দুজনকে এভাবে এক কামরায় মধ্যে পুরবেন কেন?"

বালিকা কহিল, "তা ঠিক। কিন্তু বাবু, আমার বাবুজী কি বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন?"

"তিনি যদি আপত্তি না করেন, তবে বিয়ে করবে?"— বলিয়া আমি তাহার হাতখানি ধরিলাম।"

সে বলিল, "আচ্ছা"

আমি তার হাতখানি ধরিয়া চুম্বন করিলাম। বলিলাম, "বাবুজী কেন মত করবেন না? আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। তুমি আমি দু'জনে তাঁর পা ধরে কাঁদবো; তবু কি তাঁর দয়া হবে না?"

সরস্বতী বলিল, "আচ্ছা। কিন্তু, তুমি ত আমাকে দেখনি আমি সুন্দরী কি কুৎসিৎ।"

বলিলাম, "তুমিও ত আমায় দেখনি। রামজী আমাদের দু'জনকেই দেখেছেন, দেখ শুনেই এভাবে আমাদের একত্র করে দিয়েছেন।"

সরস্বতী বলিল, "তা ঠিক।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই সরস্বতী ঘুমাইয়া পড়িল—ডাকিয়া আর তার সাড়া পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, সরস্বতী আমায় ঠেলা দিতেছে—"এ জী। ওঠ ওঠ!"

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, নানা ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করিতেছে। বাহিরেও অনেক লোকের গোলমাল।

সেই অল্পালোকে, সরস্বতীর মুখপানে আমি চাহিলাম। চক্ষু বুজিয়া গ্রহণ করিয়াছি

বটে, কিন্তু রামজী আমায় ঠকান নাই। বলিলাম, "বোধ হয়, সরস্বতী, আমরা উদ্ধার পাব। বাইরে অনেক লোকের গলার স্বর শুনছি—ওরা আরোহিদের বাঁচাতে এসেছে।"

সপ্রতীক্ষ হৃদয়ে আমরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিলাম। তারপর আমাদের অতি নিকটে, কাঠ ভাঙ্গার দুড়দাড় শব্দ পাইলাম। ক্রমে ক্রমে আলোক প্রবেশের পথ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে, একস্থান সম্পূর্ণভাবে ফাঁক হইয়া গেল। কয়েকটা কাঠের টুকরা ঝরঝর করিয়া আমাদের গায়ে আসিয়া পড়িল। একজন লোক মুখ বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "জিতা হায়?"

আমরা বাহির হইলাম। সরস্বতী দাঁড়াইতে পারে না—আমার কাঁধে ভর দিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল।

একজন সাহেব আসিয়া আমার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। সরস্বতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম, "ইনি আমার পত্নী।" সাহেব, খাতায় মিষ্টার ও মিসেস এ. বি. কাঞ্জিলাল লিখিয়া বলিল, "তোমরা হাঁটিতে পারিবে। হাঁটিয়া পরের ষ্টেশনে চলিয়া যাও। সেখানে, বিনা পয়সায় পাস মিলিবে, যেখানে ইচ্ছা যাইও।"—বলিয়া সাহেব চলিয়া গেল।

আমরা দুইজনে সরস্বতীর পিতার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম তৎপূর্ব্বেই দুইখানা রিলীফ টেন ভরিয়া বহু মৃত ও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নাগপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সরস্বতী বলিল, পরের ষ্টেশন অবধি হাঁটিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। নিকটে একখানা গ্রাম দেখা যাইতেছিল। আমরা বিশ্রামের আশায়, কষ্টেসৃষ্টে সেই গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম।

এক সম্পন্ন কৃষকের গৃহে আশ্রয় মিলিল। কৃষক-প্রদত্ত গরম দুধ উভয়ে খানিকটা করিয়া পান করিয়া, তাহার বাহিরের ঘরে চাটাইয়ের উপর শুইয়া দুইজনে ঘুমাইতে লাগিলাম। এখানেও সরস্বতীকে আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম।

।। উপসংহার ।।

কৃষকের গৃহে তিনদিন অবস্থিতি করিয়া, একটু সুস্থ হইয়া কৃষক ও কৃষক-পত্নীকে যথাযোগ্য উপহারাদি দিয়া, আমরা নাগপুর যাত্রা করিলাম। তথাকার হাসপাতালে সরস্বতীর পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তাঁহার একটা হাত একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ডাক্তার তাহা আমূল কাটিয়া দিয়াছে, জ্বরঘোরে তিনি অচেতন।

আমরা উভয়ে তাঁহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলাম। ৫/৬ দিন পরে তাঁহার কতকটা জ্ঞাপন হইল। সপ্তাহ পরে, তিনি সংলগ্নভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। বলিলেন, "বেটী। তোকে যে এ জীবনে আর দেখিতে পাইব সে আশা আমার ছিল না!"

আর কয়েকদিন পরে তিনি উঠিয়া বসিতে পারিলেন।

ক্রমে ক্রমে, আমাদের সকল কথাই তাঁহাকে আমরা বলিলাম। কি অবস্থায়, উভয়ের নিকট উভয়ে সত্যবদ্ধ হইয়াছি তাহা শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "মেয়েকে যে আমি জীবিত ফিরিয়া পাইলাম ইহাই আমার ঢের। তোমাদের মিলন, রামজীর ইচ্ছা, বলিয়াই তিনি তোমাদের ওরূপ সঙ্কটের অবস্থা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—আমারও তাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের মিলনে আমি বাধা দিব না।"

নগীনদাসজী আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। আর্য্যসমাজ মতে আমাদের বিবাহ হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে, বড়বাজারে ঘর ভাড়া লইয়া আমি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান

খুলিলাম। মালপত্র তিনিই আনাইয়া দিলেন। আমার দোকান চল্‌তি হইল দেখিয়া তিনি আহ্‌মেদাবাদ যাত্রা করিলেন।

স্বদেশীর কৃপায়, আমার দোকান দিন দিন বেশ গুলজার হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্বশুর মহাশয় বৎসরে একবার করিয়া কলিকাতায় আসিয়া মাসখানেক কাটাইয়া যান। নিজ ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করেন, আমাকে যথোপযুক্ত উপদেশাদি দেন এবং অবসর সময়টা, তাঁহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণকে লইয়া নানাবিধ আনন্দ উদ্যোগে কাটাইয়া দেন।

দাম্পত্য প্রণয়

এক

পল্লীগ্রামে পাশার আড্ডা বসিয়াছে। যাঁহারা খেলিতেছেন, তাঁহারা একমনেই খেলিতেছেন। অপর যাঁহারা জমায়েৎ হইতেছেন, তাঁহারা গুড়ুক ফুঁকিতেছেন ও নানাবিধ গল্প করিতেছেন। এমন সময় প্রৌঢ়বয়স্ক সীতানাথ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সভায় আসন গ্রহণ করিয়া বেণী বসুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনেছ বোসজা? এবার তারকেশ্বরে যে ভারি ধূম।"

"চড়ক মেলায় নাকি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোহান্ত এবার কাশী থেকে যাই, কলকাতা থেকে খ্যামটা নাচ আনাচ্চে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ত আছেই—আবার কলকাতায় নাকি এক রকম ছিয়াচার উঠেছে, তাও এক দল আসবে। পশ্চিমে থেকে ভুরে খাঁ চাঁদ খাঁ এসেছে, তারা ভোজবাজি দেখাবে—সে নাকি একেবারে আশ্চর্য্য কাণ্ড।"

বসুজা বলিলেন, "বটে! এবার তা হ'লে ত ভারি ধূম দেখতে পাই! যাচ্চ নাকি?"

"যাচ্চি ছেড়ে—হুঁ—হুঁ—গিয়েছিই ধ'রে নাও। বলা বাগ্দীর গাড়ীখানা নগদ আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে বায়না ক'রে রেখেছি। সংক্রান্তিব দিন ভোরে উঠে রওনা।"—বলিয়া সীতানাথ সকলের পানে চাহিয়া গর্ব্বভরে হাস্য কবিলেন।

তারকেশ্বরে সংক্রান্তি—মেলায় এবার এই অভূতপূর্ব্ব আয়োজনের সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তারকেশ্বর যাইবার পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল নরহরি বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া, নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। নরহরির বয়স ৩২/৩৩ বৎসর—সে এ গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ—অর্থেরও অভাব নাই।

রাধাচরণ বলিল, "বিশ্বাস ভায়া, তুমি যে কিছু বলছ না? তুমি কি যাবে না নাকি?"

নরহরি বিষণ্ণভাবে বলিল, "দেখি!"

দত্ত মহাশয় গ্রাম সম্পর্কে নরহরির ঠাকুরদাদা। তিনি ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "তুমি দেখবে কি, আমি আগেই দেখে রেখেছি। তোমার যাওয়া হবে না। নাতবৌকে ফেলে কি আর তুমি যেতে পারবে?"

নরহরি বলিল, "সেই ত! বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মনিষ্যি নেই—একলা কার কাছে থাকে বলুন!"

এ কথা শুনিয়া অনেকেই নরহরির পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। বসুজা মহাশয় থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঢের ঢের স্ত্রৈণ পুরুষ দেখেছি ভায়া, কিন্তু তোমার মত আর একটি দেখিনি। এতই যদি বিরহের ভয়, তবে না হয় যোড়েই চল। দু'দিকই বজায় থাকবে।"

একজন বলিল, "দোহাই বোসজা! ও পরামর্শটি দেবেন না ওকে। ও যদি সত্যিই পরিবারটিকে গলায় বেঁধে তারকেশ্বর যায়, তাহলে আমাদের কি দশা হবে ভাবুন দেখি একবার! আমাদের 'তিনি'রাও ধিনি ধিনি ক'রে নেচে উঠবেন; বলবেন, আমরাও যাব। না ভাই নরহরি, ও কার্য্যটি কোর না, কোর না। 'দুহু দোঁহা মুখ চেয়ে'—প্রেম-চর্চ্চা তোমরা ঘরে বসেই কর।"

অতঃপর নরহরিকে অব্যাহতি দিয়া, অপর সকলে যাইবাব পরামর্শে বসিয়া গেল। তামাক ছিলিমটা শেষ করিয়া নরহরি উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

দুই

উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা আজিকালিকার কথা নহে—প্রায় ৫০/৫৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। তখন সবেমাত্র কাশী অবধি বেল খুলিয়াছে। সবেমাত্র সহরের লোকেরা ইংরাজী পড়িতে সুরু করিয়াছে। দূর পল্লীগ্রামে, অধিকাংশ লোকই তখন নিরক্ষর, কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। তাও, পনেরো আনা তিন পাই লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ২/৪ বছরে যতটুকু বিদ্যালাভ সম্ভব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত—অধিক আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ছিল না। এক পাই আন্দাজ লোকই পাঠশালা পার হইয়া সংস্কৃত শিখিতে চেষ্টা করিত। সকলেরই কিছু কিছু জোৎ-জমি ছিল, তাহাতেই তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইত। অবসরকালে কোনও বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহাবা তাস-পাশা খেলিত বা গুড়ুক ফুঁকিত—এবং নানারূপ খোস-গল্পে সময় কাটাইত। ইংরাজী না পড়ায়, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনীকে তাহারা যথোচিত সম্মান করিয়া চলিত এবং কোনও অলৌকিক ঘটনাব কথা শ্রবণ করিলে, এখনকার লোকের মত অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া "হাম্বাগ" বলিয়া উড়াইয়া দিত না—বিশ্বাস করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

এই গ্রামখানির নাম মাণিকপুর, তারকেশ্বর এখান হইতে হাঁটা পথে সাত ক্রোশ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপহসিত নরহরি বিশ্বাসের সংসারে স্ত্রী কুসুমকুমারী ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। কুসুমের বয়স প্রায় ২৩ হইতে চলিল, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। আর যে হইবে, তাহারই বা আশা কই? গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই বলিত, কুসুমকুমারী বন্ধ্যা এবং নরহরির পুনরায় বিবাহ করা উচিত, নহিলে পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের লোপ অনিবার্য্য।

এই দুঃখটুকু ভিন্ন এই দম্পতীর জীবনে আর কোনও দুঃখের ছায়ামাত্রও ছিল না। স্বাস্থ্য উভয়ের অটুট—ম্যালোরিয়ার নামও সেদিনে কেহ কখনও কর্ণগোচর করে নাই। মদন ও রতির তুল্য রূপবান রূপবতী না হইলে, উভয়েই আকার অবয়বে সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন ছিল। নরহরি ধনশালী ব্যক্তি না হইলেও, তখনকার হিসাবে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই বিবেচিত হইত। তাহার জোৎ-জমা ছিল, বাগান ছিল, পুকুর ছিল; সে সকলের উপস্বত্বে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। আর একটি অমূল্য সম্পদের তাহারা অধিকারী ছিল—অবিচ্ছিন্ন ও গভীর দাম্পত্য প্রণয়। বস্তুতঃ, তাহাদের দাম্পত্য প্রণয় গ্রামের মধ্যে প্রবাদ বচনের মতই প্রচারিত ছিল। স্বামীরা বলিত, "স্ত্রী যদি হতে হয়, তবে ঐ বিশ্বেসদের কুসুমের মতই হওয়া উচিত।" স্ত্রীরা বলিত, "স্বামী যদি হ'তে হয়, তবে ঐ নরহরি ঠাকুরপোর মতই যেন হয়। আজ প্রায় ১৫/১৬ বচ্ছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে—এখনো পর্য্যন্ত দুটিতে যেন জোটের পায়রা।"

কিন্তু এ সকল মন্তব্য তাহারা প্রায় নিজ নিজ দাম্পত্য কলহের সময়েই প্রকাশ করিত। সুস্থমনে পুরুষরা বলিত, বুড়া হইতে চলিল, এ বয়সেও সেই বিশ বছরের ছোঁড়ার মত, 'পলকে প্রলয়' গণিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ানো, নরহরির নির্লজ্জ ন্যাকামি ছাড়া আর

কিছুই নহে। স্ত্রীলোকেরা বলিত, "বুড়ী মাগী,—সময়ে একটা মেয়ে জন্মালে আজ নাতির দিদিমা হত, এ বয়সে চৌদ্দ বছুরী ছুঁড়ীর মত 'প্রাণনাথ' বলে স্বামীর গায়ে ঢলে ঢলে পড়া!—গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এ সকল মন্তব্য যে এই দম্পতীর কানে আসিয়া পৌঁছিত না, এমন নহে,—শুনিয়া তাহারা হাসিত মাত্র—এবং পরস্পরকে অধিক আদরে-সোহাগে ডুবাইয়া রাখিত।

তিন

মহা ধূমধামের সহিত তারকেশ্বরে চড়ক-মেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চড়ক ত মাত্র এক দিন, কিন্তু মেলাটি সপ্তাহকাল থাকিবে। মাণিকপুরের অধিকাংশ পুরুষই—কেহ গো-শকটে, কেহ পদব্রজে—তারকেশ্বরে আসিয়াছে এবং বলা বাহুল্য পথে নারী বিবর্জ্জিতা নীতির অনুসরণ করিয়া কেহই নিজ স্ত্রী কন্যা ভগিনীকে সঙ্গে লয় নাই। ২/৩. দিন পরে গ্রামবাসী কেহ কেহ মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং উৎসবের বর্ণনায়, যাহারা যায় নাই বা যাইতে পায় নাই, তাহাদিগকে ব্যস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

৩রা বৈশাখ অপরাহ্নকালে পাড়ার ৩/৪ জন বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোক কুসুমকুমারীর কাছে আসিয়া ধরিয়া বসিল—"এত ধূমধাম, আমরা কিছুই কি তার দেখতে পাব না? সংসারে কি কেবল খেটে মরতেই এসেছি? তোমাব স্বামীকে বল, আমাদের সকলকে তারকেশ্বরে নিয়ে চলুন।"

খুড়ীমা, জ্যেঠাইমা—যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুসারে সম্বোধন করিয়া কুসুম বলিল, "কিন্তু শুনলাম, সেখানে যে রকম ভীড় হয়েছে, বাসা পাওয়াই যে শক্ত হবে। পুরুষমানুষেরা গাছতলাতেও পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা মেয়েছেলে ত তা পারবো না!"

এক বৃদ্ধা কহিলেন, "সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই। আমার ভাইঝির বিয়ে হয়েছে, তারকেশ্বরের খুব কাছেই। এমন কি, সে গ্রামের বাইরে বেরুলেই মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাওয়া যায়। সেইখানে গিয়ে আমরা থাকবো এখন। আমি যখন বাবাকে দর্শন করতে যাই, সেইখানেই গিয়েই ত থাকি। জামাইটি বড় ভাল, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, আমাদের গুরুর আদরে রাখবে তুমি দেখো।"

অবশেষে কুসুম স্বীকৃত হইল। বলিল, "আচ্ছা, ওঁর কাছে কথাটা পেড়ে দেখি, উনি কি বলেন।"

পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "ওগো নাতবৌ, তুই যদি বায়না নিস্ ত নাতির সাধ্যি নেই যে, সে কথা ঠেলে।"

বাস্তবিক, বৃদ্ধার ভবিষ্যদ্‌বাণীই সফল হইল। নরহরি সম্মত হইল। পরদিন প্রাতে একখানি গো-শকটে সস্ত্রীক নরহরি এবং অপর একখানিতে ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমা তারকেশ্বর যাত্রা করিলেন।

চার

মাণিকপুর গ্রাম হইতে আগত বেণী বসু, সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি একত্র বাসা করিয়াছেন। যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়া খুব আনন্দেই তাঁহারা সময় কাটাইতেছিলেন। বিশেষতঃ বেণী বসু থিয়েটার দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এই দলটি কলিকাতার কোনও একটি "অবৈতনিক" সম্প্রদায়। পুরুষমানুষই গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজে। এক দিন শকুন্তলা, এক দিন নব-নাটক এবং একদিন নীলদর্পণ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই

আর এক দিন নীলদর্পণ অভিনীত হইবে। থিয়েটারের দল যেখানে বাসা করিয়াছে, বেণী বসু তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই দলের কয়েক জন লোকের সহিত বেশ আলাপও জমাইয়া তুলিয়াছেন। সীতানাথ ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিয়াছেন, গ্রামে ফিরিয়া তথায় একটি থিয়েটারের দল খুলিতে হইবে। এই অবৈতনিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অভিনেতা শিবনাথ সান্যাল এ বিষয়ে ইঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শিবুর বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসব, কথাবার্ত্তায় খুব চৌকস; কিন্তু একটু ইংরাজী বুকনি মিশানো তার অভ্যাস। অভিনয় কার্য্যে সে ওস্তাদ।

পাকাপাকি পরামর্শ করিবার জন্য বেণী আজ শিবনাথকে নিজেদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া থিয়েটারী বাসায় গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পর শিবনাথকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় আসিতেছিলেন। পথে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ। বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, তুমি যে এসেছ দেখছি!"

নরহরি বলিল, "না এসে আর কি করি বল বেণীদা! গিন্নী যে ছাড়লেন না।"

"গিন্নীকেও এনেছ নাকি?"

"এনেছি বইকি। তা ছাড়া মিত্তির বাড়ীর ঠান্‌দিদি, মুখুয্যেদের খুড়ীমা, জ্যেঠাইমাও .এসেছেন। তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন, আমি তাঁদের আনতে যাচ্ছি।"

আচ্ছা, তা বেশ বেশ! এলেই যদি, দু'দিন আগে আসতে হয়; নীলদর্পণ দেখতে পেতে। আচ্ছা তাতে ক্ষতি নেই, কা'ল রাত্রে আবার নীলদর্পণ হবে। দেখতে যেও নিশ্চয! সে যে কি চমৎকার—দেখলে আর জীবনে ভুলতে পাববে না। চল হে শিবু রাত হয়ে যাচ্ছে।"

পথে শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে ফেলো?"

বেণী বসু নরহবির পরিচয় দিলেন; তাহার অসাধাবণ পত্নীভক্তির বিষয়ও সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শিবু হাসিতে লাগিল।

বাসায় পৌঁছিয়া বেণী বসু দেখিলেন, সীতানাথ হুঁকা হাতে বসিয়া পাকা রুই মাছের পোলাও রন্ধন তদারক করিতেছেন। বলিলেন, "শিবুকে ধরে নিয়ে এলাম ঠাকুর্দ্দা! আর একটা খবর শুনেছেন? নরহরি এসেছে। এইমাত্র পথে আসতে আসতে তার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

সীতানাথ বলিলেন, "কে? আমাদের গ্রামের নরহরি? সত্যি নাকি? বউকে ফেলে? দেখি দেখি, সূয্যি আজ কোন দিকে অস্ত যাচ্চেন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সীতানাথ বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন।

বেণী বসু বলিলেন, "বউকে ফেলে আসবে, তাও কি সম্ভব, ঠাকুর্দ্দা? সঙ্গেই এনেছে।"

সীতানাথ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "বউকে এই ভিড়ে, গলায় বেঁধে নিয়ে এসেছে নাকি? কেলেঙ্কারী!"

বেণী বসু ইতিমধ্যেই মাদুর বিছাইয়া, শিবনাথকে লইয়া তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সীতানাথ দুই জনকে ভাঁড় সিদ্ধি দিয়া নিজে এক পাত্র লইয়া পান করিতে করিতে বলিলেন, "কেলেঙ্কারী আর কাকে বলে। এক পাড়ায় বাস, আমাদের গিন্নীরাও ত সবই শুনেছেন দেখেছেন; বাড়ী ফিরে গেলে আমাদের দশাটা কি হবে বল দেখি দাদা!"

বেণী বসু কহিলেন, "জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে! ইচ্ছে করে, আচ্ছা ক'রে নোরেটাকে জব্দ ক'রে দিই।"

"তা, দাও না—একটু শিক্ষা হোক। কিন্তু কি উপায়ে জব্দ করবে, সেইটে বল দেখি?"

বেণী বসু সিদ্ধির খালি ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "কত রকম উপায় হ'তে পারে। এই ধরুন, গ্রামে কারু নামে এখান থেকে যদি একটা উড়ো চিঠি লেখা যায় যে নরহরির স্ত্রীকে সুন্দরী দেখে, মোহান্ত মহারাজ—'

ঠাকুর্দ্দা বাধা দিয়া কহিলেন, "না না—সতীলক্ষ্মী—তা কি করতে আছে? ছি ছি তা

কোরো না! হাজার হোক গৃহস্থের বউ! এমন কোনও উপায় বের কর, যাতে দু'জনের খুব চুলোচুলি বেধে যায়। দিনকতক একটু মজা দেখে নিয়ে, তার পর সব ভেঙ্গে দিলেই হবে এখন, কি বল শিবু ভায়া?"

শিবু বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই ভাল। ওঁর ওয়াইফ কি খুব সুন্দরী নাকি?"

বেণী বসু বলিলেন, "এমন কিছু ডানাকাটা পরী যে তা নয়, তবে রংটা ফর্সা আছে, মুখ-চোখও ভাল।"

"নাম কি?"

"কুসুমকুমারী।"

"এডুকেটেড? চিঠি লিখতে পারে?"

বেণী বসু বলিলেন, "তোমার যেমন কথা! এ কি কলকাতার মেয়ে যে লেখাপড়া জানবে? কেন, জানলে কি করতে? তার নাম কোনও জাল প্রেমপত্র-টত্র—

শিবু বলিল, "না, এমনিই জিজ্ঞাসা করলাম।"

এই সময় আর দুইজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিয়া জুটিলেন। এ প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সীতানাথ উঠিয়া পাকের স্থানে গিয়া, পোলাও রন্ধনের তদ্বিরে ব্যাপৃত হইলেন।

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যায় আবার নীলদর্পণের অভিনয় হইল। স্ত্রী ও ঠান্‌দিদি প্রভৃতিকে লইয়া নরহরি থিয়েটার দেখিয়া আসিল।

তাহার পরদিন থিয়েটারের দল কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। যাত্রার দল, বাই, খেমটা প্রভৃতি এখনও আসর গরম রাখিয়াছে, এমন সময় মেলায় আর একটা নূতন "আকর্ষণ" উপস্থিত হইল। একজন নাকি অসাধারণ সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি লোকের হাত দেখিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ ত তুচ্ছ কথা, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন। তবে, তাঁহার দক্ষিণাটা কিছু বেশী—নগদ ষোল আনা। তিনি নাকি কেদার বদরীর পথে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতে এখনও ৫/৬ হাজার টাকা লাগিবে, তাই বাবাজী এই উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন মাত্র —নচেৎ তাঁহার আহার দৈনিক আড়াই সের দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফলমূল মাত্র।

বেণী বসু এক দিন গিয়া হাত দেখাইয়া আসিলেন। পরিচিত অপরিচিত যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিতে লাগিলেন, "বাবাজীর ক্ষমতা একেবারে অদ্ভুত! অত্যাশ্চর্য্য! আমার জীবনের পূর্ব্বকথা যা যা বললেন, শুনে ত মশাই আমি 'থ' হয়ে গেছি।" আবার কেহ কেহ এমনও বলিতেছে, "বেটা বুজরুক্! আন্দাজি ঢিল মারে, এক একটা লেগেও যায়। টাকা উপায়ের একটা ফন্দি করেছে।"—কিন্তু তথাপি হাত গণাইবার লোকের অভাব হইতেছে না। বাবাজী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন; বেলা ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক এবং অপরাহ্ন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পুরুষগণের হাত দেখিবেন। একটি কাগজে নামধাম ও জন্মনক্ষত্র লিখিয়া, সেই কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া, চেলার দ্বারা ভিতরে বাবাজীকে পাঠাইয়া দিতে হয়; যথাসময়ে ডাক পড়ে।

সে দিন সন্ধ্যার পর রন্ধন করিতে করিতে খুড়ীমা নরহরির স্ত্রী কুসুমকে বলিলেন, "আচ্ছা বউমা, তুমি একবার গিয়ে হাত দেখাও না কেন! তোমার ছেলেপিলে হ'ল না কেন কি ব্রত-ট্রত মানত-টানত করলে হতে পারে, সেটা জেনে এলে হয়।"

জ্যেঠাইমা ও ঠান্‌দিই এ প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। কুসুম গিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল; নরহরি আপত্তি করিল না।

পরদিন প্রাতে কুসুমকে লইয়া ইঁহারা বাবাজীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নিয়ম অনুসারে নাম ও জন্মনক্ষত্র লেখা কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া চেলা বাবাজীর দ্বারা ভিতরে

পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একে একে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের ডাক হইতে লাগিল। ক্রমে শেষে যিনি গিয়াছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, চেলা ডাকিল, "কুসুমকুমারী দাসী কার নাম? শীগ্‌গির এস।"

কুসুম উঠিল। ভিতরে যাইতে তাহার পা কাঁপিল। প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ জটাজুটধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ বাবাজীকে দেখিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন, "জিতা রও বেটী! তুমি কি জানতে চাও বল।"

কুসুম সভয় কণ্ঠে বলিল, "আজ ১৫ বচ্ছর হ'ল আমার বিয়ে হয়েছে—আজ পর্যন্ত একটি সন্তানের মুখ দেখতে পেলাম না, তাই আমরা স্ত্রী-পুরুষ বড়ই মনের দুঃখে আছি বাবা! কি পাপে এ রকম হ'ল, কি করলে সে পাপ খণ্ডাতে পারে, সেইটো যদি বাবা দয়া করে আমায় বলে দেন!"

বাবাজী বলিলেন, "হঁঃ তোমার একটি সন্তান দরকার? তার জন্যে চিন্তা কি? কি সন্তান চাও? পুত্তুর সন্তান, না কন্যে সন্তান?"

কুসুম সলজ্জভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, "একটি পুত্তুর সন্তান হ'লে আমার শ্বশুরবংশের জলপিণ্ডি বজায় থাকত, বাবা!"

বাবাজী বলিলেন, "হঁ—পুত্তুর সন্তান চাই? এ আর বিচিত্র কথা কি? এস, সরে এস, বাঁ-হাতখানি তোমার দেখি।"

কুসুম সভয়ে অগ্রসর হইয়া, নিজ বাম হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। বাবাজী হাতখানি ধরিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "না, তোমার পুত্তুর সন্তান হবে না,—কোন সন্তানই হবে না।"

কুসুম কাতরভাবে বলিল, "কেন বাবা? কি পাপের জন্যে—"

বাবাজী বাধা দিয়া বলিলেন, "বিশেষ কোনও পাপের জন্যে নয় মা—কোনও একটা গূঢ় কারণের জন্যেই তোমার সন্তানভাগ্য নষ্ট হয়ে গেছে।"

কুসুম হাতযোড় করিয়া বলিল, "কেন বাবা কি গূঢ় কারণ?"

বাবাজী বলিলেন, "সে গূঢ় কারণটি পূর্ব্বজন্মঘটিত। শুনতে চাও?"

কুসুমের কৌতূহল অতিমাত্রা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ বাবা দয়া ক'রে বলুন—জানবার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।"

বাবাজী বলিলেন, "কিন্তু সে যে অতি গুহ্য কথা, মা! অন্য কিছু ত নয়—পূর্ব্বজন্মের কথা,—নরলোকে তা প্রকাশ করাই নিষেধ। তবে আমি তোমায় বলতে পারি, যদি তুমি আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পার যে, সে কথা এ জীবনে কাউকে, এমন কি, তোমার স্বামীকেও বলবে না। যদি এ নিষেধ অমান্য কর, তবে একমাসের মধ্যেই তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে। বেশ করে ভেবেচিন্তে দেখ।"

কুসুম কোনও ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই বলিল, 'না, বাবা, আমি কারুখ্‌কে বলবো না। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—" বলিয়া সভয় কম্পিতহস্তে বাবাজীর পদস্পর্শ করিল।

বাবাজী তখন মুখখানি বিষম গম্ভীর করিয়া, অনুচ্চ স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"পূর্ব্বজন্মেও তুমি কায়স্থ কূলেই জন্মেছিলে—তুমি একজন লক্ষ্মীমন্ত লোকের স্ত্রী ছিলে। মুক্‌সুদাবাদ সহরে, তোমার স্বামীর মস্ত একটা নুনের গোলা ছিল, প্রায় লাখো টাকার কারবার। নৌকো নৌকা বোঝাই নুন আসতো,—২০/২৫ জন দুলে, বাগ্দী—নৌকা থেকে নামিয়ে, পিঠে ক'রে বয়ে বয়ে, গোলায় নিয়ে গিয়ে তুলতো। আবার নুন কোথাও চালান দিতে হ'লে, গোলা থেকে বের ক'রে পিঠে ক'রে নিয়ে গিয়ে নৌকোতে বোঝাই দিত। এই ছিল তাদের কাজ। এ জন্মে যে লোক তোমার স্বামী হয়েছে, সেও ছিল তোমাদের মাইনে করা মুটিয়া,—জেতে বাগ্দী ছিল।"

কুসুম বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! বাগ্দী!" ঘৃণায় তাহার দেহ-সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

"হ্যাঁ—বাগ্দী ছিল। নামটি যদি জানতে চাও, তাও ব'লে দিতে পারি। কেষ্টা বাগ্দী। গতজন্মে তুমি বড়ই রাগী ছিলে মা, কিন্তু বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলে। স্বামীর মৃত্যুর পর কারবারটি তুমি নিজেই চালাতে লাগলে। ঐ কেষ্টা বাগ্দী ছিল বিষম চোর। তোমার নুনের গোলা থেকে গঙ্গার ঘাট প্রায় পোয়াটেক পথ। কেষ্টা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই পথে দুই এক বস্তা নুন আধা-কড়িতে কাউকে বেচে ফেলতো। একদিন ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে খবর হ'ল। সেই শুনে তুমি রেগে কাঁই! সরকারকে হুকুম দিলে, "হারামজাদা বেটাকে দশ জুতো মেরে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও।"—কেষ্টা অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, সরকারের পায়ে ধ'রে কেঁদে বললে, 'দোহাই সরকার মোশাই, এবার আমায় মাফ করতে আজ্ঞে হয়—আর কক্ষনো এমন কাজ করবো না।'—সরকার বললে, 'কর্ত্রীঠাক্রুণ নিজে হুকুম দিয়েছেন, আমি মাফ করবার কেরে বেটা?"—হুকুম তামিল হল। কেষ্টার পিঠে দশ ঘা জুতো মেরে তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কেষ্টা, দুঃখে, অভিমানে সেই দিন গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে স্থির করলে। গঙ্গার ধারে গিয়ে, হে মা গঙ্গে, 'হে মা পতিতপাবনি! এই অধম সন্তানকে তোমার কোলে ঠাঁই দাও মা!—তোমার অভাগা সন্তানের এইমাত্র ভিক্ষা, মা, আর জন্মে আমি ঐ হারামজাদী কর্ত্রীঠাক্রুণকে যেন উঠতে-বসতে জুতোপেটা করতে পারি।' এই বলতে বলতে কেষ্টা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল।"

কুসুম বলিল, "সে আমার জুতো মারতেই চেয়েছিল। তবে আমার স্বামী হয়ে জন্মালো কেন?"

বাবাজী বলিলেন, "এইটে আর বুঝতে পারলে না, মা? নিজের বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোককে কি জুতা মারা চলে? শাস্ত্রের নিষেধ যে!"

কথাগুলি শুনিয়া কুসুমের তখনই বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, "কিন্তু বাবা, কই, সে ত আমার সঙ্গে কোন দিন কোন দুর্ব্ব্যবহার করেনি! বরঞ্চ—"

গণৎকার বলিল, "দাঁড়াও মা, এখনই কি তাই সে করবে?—এখনও যে তুমি, কি বলে হুঁ হুঁ—ছেলেমানুষ কিনা! আর বছর কতক যাক তোমার চুল ২/১ গাছি পাকুক, তখন দেখো, তোমার সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে। অত কথায় কাজ কি, তোমায় একটা পরীক্ষা আমি বলে দিচ্ছি, তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে আর জন্মে ও বাগ্দী ছিল কি না!"

কুসুম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরীক্ষা বাবা?"

বাবা বলিলেন, "ও যখন ঘুমুবে, তুমি ওর পিঠ চেটে দেখো।—আর জন্মে পিঠে নুন ব'য়ে ব'য়ে পিঠ এমন নোন্‌তা হয়ে গেছে যে, এখন ২/৩ জন্ম লাগবে ওর সেই নুন কাটতে!—আচ্ছা, এখন ঘরে যাও মা, অনেক লোক এখনও অপেক্ষা করছে।"

কুসুম তখন গণৎকার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, ম্লানমুখে সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিলে, সুযোগমত নরহরি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাত দেখে বাবাজী কি বললেন?"

কুসুম সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ছেলে হবে না বললেন!"[১]—বলিয়া ম্লানমুখে চলিয়া গেল।

ছয়

নরহরি সেইদিনই আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্নকালে আবার তারকেশ্বর দর্শনে চলিল। তথায় গ্রামস্থ বন্ধুগণের আড্ডায় পৌঁছিয়া দেখিল, সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থানে গিয়া দুই একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আর সকলে কোথায়

জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "তারা হাত গোণাতে গেছে।" গণৎকার ঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অনেক প্রশংসাবাদ করিল। বলিল, আমরাও যাচ্ছি— যাবে তুমি?"

নরহরি ভাবিল, কুসুম ত হাত দেখাইয়া গিয়াছে, গণৎকার ঠাকুর তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, সন্তান হইবার কোনও আশা নাই। যাই না, আমিও হাত দেখাই, আমাকেই বা কি বলেন শুনা যাক। আমিই যে কুসুমের স্বামী তাহা ত আর ঠাকুর জানেন না। তাঁহার যথার্থ গণনাশক্তি আছে অথবা বুজরুকি মাত্র, তাহা পরীক্ষা করিবার এই সুযোগ। বলিল, "বেশ চল, আমিও হাত দেখাব।"

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নাম-ধাম ও জন্মনক্ষত্র লিখিত কাগজে জড়াইয়া একটি চেলার দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া নরহরি অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার ডাক হইল।

নরহরি ভিতরে গিয়া প্রণাম করিতেই বাবাজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি তোমার মনস্কামনা, বল বাবা!"

নরহরি বলিল, "মনস্কামনা এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার হাতটা একবার দেখুন! আমার আয়ুস্থান, ধনস্থান—এইগুলো সব কেমন, সেইটে জানবার অভিলাষ।"

"আচ্ছা, স'রে এস—দাও, হাত দাও দেখি।"

নরহরি, বাবাজীর নিকট বসিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া, বাবাজীর পরিচ্ছদটি দেখিতে লাগিল। এত টাকা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু—ওঃ—কি বৈরাগ্য! আলখাল্লাটি ছেঁড়া এবং তালি দেওয়া, তাও রং মিলে নাই। অথচ ইচ্ছা করিলে ইনি রোজ একটা নূতন রেশমী আলখাল্লা কিনিয়া পরিতে পারেন।

বাবাজী কিয়ৎক্ষণ নরহরির হস্ত নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া, বলিলেন, "তোমার আয়ুস্থান ত তেমন সুবিধে নয়, বাবা! ৫২ বছর মাত্র তোমার পরমায়ু ঐ সময় তোমার অপঘাতমৃত্যু। বিষপ্রয়োগে তোমার মৃত্যু—তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।"

শুনিয়া নরহরি শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ঠাকুর!"

ঠাকুর বলিলেন, "আমি কি বলছি? বলছে তোমার অদৃষ্টলিপি। ধনস্থান—বড় মন্দও নয়; ৪০ বৎসর হলে হঠাৎ কোনো একটা উপায়ে তোমার বিপুল ধনাগম হবে। যশ জিনিষটে ধনেরই অনুগামী কিনা! তাব পর পুত্রস্থান—কই, না, এখানে ত কিছুই নেই, একেবারে শূন্য যে! তোমার কি কোনও ছেলেপিলে হয়েছে?"

নরহরি হতাশভাবে বলিল, "না।"

বাবাজী বিষণ্ণভাবে মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন, "একদম শূন্য!"

"কেন বাবা, পুত্রসন্তান আমার শূন্য হ'ল কেন? এটা খণ্ডাবার কি কোন উপায় নেই? কোনও রকম ব্রত-ট্রত কি যাগ-যজ্ঞ করলে দোষটি খণ্ডাতে পারে না?"

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলে, "তোমার কয় স্ত্রী?"

"একটি মাত্র।"

বাবাজী ঠোঁট গুটাইয়া বলিলেন, "হু! সে আমি তোমার হাত দেখেই বুঝতে পেরেছি। এ স্ত্রীর গর্ভে তোমার সন্তান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি অন্য বিবাহ কর, তা হ'লে সন্তান আপনিই হবে, তার জন্যে যাগ-যজ্ঞ কিছুই করতে হবে না। কিন্তু এ স্ত্রী হ'তে হবে না। শুধু তাই নয় বাবা, এ স্ত্রীকে তুমি বেশী 'নাই' দিও না।"

"কেন বাবা? 'নাই' দিলেই বা কি অশুভ হবে, না দিলেই বা তার শুভফল কি?"

বাবাজী বলিলেন, "নাই দিলে মাথায় উঠবে। আসল কথা শুনতে চাও? সে কিন্তু গতজন্মের কথা।"

"বেশ ত, বলুন না।"

"বেশ ত বলুন না' বললেই হলো না, বাবা! পূর্ব্বজন্মের কথা—এ সকল গুহ্যাতিগুহ্য বিষয়। যাকে তাকে অমনি বললেই হ'ল? তুমি যদি আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পার যে, আজ আমি তোমায় যা শোনাব, তুমি নরলোকে কারু কাছে তা প্রকাশ করবে না, তবেই তোমায় বলতে পারি! কথাটি যদি তুমি প্রকাশ ক'রে ফেল, তবে তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে।"

নরহরি কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার পর বাবাজীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

বাবাজী তখন বলিতে লাগিলেন, "আর জন্মে তুমি মুক্সুদাবাদে নবাব সরকারে চাকরী করতে। অবস্থা তোমার বেশ ভালই ছিল। বুড়ো বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হ'লে তুমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলে। এ স্ত্রী ভারী সুন্দরী ছিল। যেমন হয়ে থাকে, তুমি তার অত্যন্ত বশীভূত হয়ে পড়েছিলে; যাকে ঘোর স্ত্রৈণ বলে, তাই আর কি! তোমার একটি কুকুর ছিল—ঠিক কুকুর নয়—কুক্কুরী—তোমার আগেকার স্ত্রী সেই কুকুরটিকে বড়ই ভালবাসতেন। তোমার এই দ্বিতীয় পক্ষটি, সেই জন্যে কুকুরটিকে মোটেই দেখতে পারতো না। তাকে মারতো ভাল করে খেতে দিত না। এক দিন সে কুকুরটিকে এক লাথি মেরেছিল, কুকুরটি রাগ না সামলাতে পেরে ঘ্যাঁক্ করে তার পায়ে কামড়ে দেয়। এই আর যায় কোথা! বেটি ত কেঁদেই অনর্থ। তুমি বাড়ী এসে, তাই দেখে রাগের বশে কুকুরের মাথায় এক লাঠি মেরেছিলে, তাতেই তার মৃত্যু হয়। মরবার সময় সে মনে মনে বলেছিল, কার দোষ, বাবু তার কিছুই অনুসন্ধান করলে না, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথা শুনে আমার প্রাণবধ করলেন!—এই ভাবতে ভাবতে সে প্রাণত্যাগ করলে। তার পরেই তার আত্মা, কাশীতে বাবা বটুকভৈরবের দরবারে উপস্থিত। বটুকভৈরবই হলেন কুকুরদের দেবতা কিনা। কুকুরটি হাতযোড় ক'রে বাবাকে বললে 'হে বাবা বটুকভৈরব, এই বর আমাকে দাও, আর জন্মে যেন ওকে এর প্রতিফল দিতে পারি। আমায় যেমন ও বধ করেছে আর জন্মে যেন ওকে মেরে ফলতে পারি।' বাবা বললেন, 'পাগলা কুকুর না হ'লে ত তার কামড়ে মানুষ মরে না। তা ছাড়া তোর পাপ শেষ হয়েছে, তুই এবার মানুষ হয়ে জন্মাবি। তার চেয়ে বরঞ্চ তুই ওর স্ত্রী হয়ে জন্মাস, বিষ খাইয়ে ওকে মেরে ফেলিস।' সেই জন্যেই সেই কুকুর—বা কুক্কুরী—তোমার স্ত্রী হয়ে জন্মেছে—তোমায় বিষ খাইয়ে মারবে তবে ছাড়বে!"

নরহরি বলিল, "কি বলেন আপনি! আমার স্ত্রী আর জন্মে কুকুর ছিল? আমিই তাকে মেরে ফেলেছিলাম? এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করি?"

বাবাজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। প্রকৃত ঘটনা যা, তাই আমি তোমায় বললাম। তুমি পীড়াপীড়ি করলে ব'লেই বললাম, নইলে কারু পূর্ব্বজন্মের কথা সহসা আমি প্রকাশ করি না।"

নরহরি সবিনয়ে বলিল, "বাবা, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, তাই আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ ও কথাটা বেরিয়ে পড়েছিল; আপনি কিছু মনে করবেন না, বাবা! কেবল একটা বিষয়ে খটকা ঠেকেছে। আমাকে বিষ প্রয়োগেই যদি ও মারবে তা হ'লে স্ত্রী হয়ে জন্মাবার কি দরকার ছিল? অন্য যে কেউ ত—"

বাবাজী বলিলেন, "এ ত কুকুর বলেনি, বলেছেন বাবা বটুকভৈরব, দেবতার লীলা কি সহজে বোধগম্য হয়? বোধ হয়, এর মীমাংসা এই—ও সব কাজে স্ত্রীর যেমন সুযোগ হবে, তেমন আর কার?"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে!"

বাবাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে প্রমাণ যদি পাও তা হ'লে বিশ্বাস হবে ত?"
নরহরি বলিল, "আপনার দয়া।"

বাবাজী তাহাকে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর নামটি এতে লেখ।"

বাবাজী লিখিত কাগজখানি ফেরত লইয়া কুসুমকুমারী নামের ২য়, ৩য় ও ৫ম অক্ষর কাটিয়া, সেটি নরহরির হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

নরহরি পড়িল—"কুকুরী।" তাহার গা শিহরিয়া উঠিল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন, "আরও প্রমাণ আছে। রোজ রাত্রে তুমি ঘুমুলে, কুকুরের যা স্বধর্ম্ম—তোমার স্ত্রী তোমার পিঠ চাটে। কোনও দিন জানতে পারনি কি?"

"আজ্ঞে না। আমার ঘুমটা খুব গভীর হয়।"

"আচ্ছা, একদিন ঘুমের ভাণ ক'রে পিছু ফিরে শুয়ে থেক। তা হলেই দেখতে পাবে।"

নরহরি বিদায় গ্রহণ করিল। মেলায় কোনও তামাসা দেখা আর তাহার ভাল লাগিল না। তারকেশ্বরে থাকিতেই আর ভাল লাগিল না।

পরদিন ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমার বিস্তর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সকলকে লইয়া নরহরি বাড়ী ফিরিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর সীতানাথ দত্তের তারকেশ্বরের বাসায় শিবনাথ তাস খেলিতে আসিল। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল হে, শিবু?"

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, "পরামর্শ যেমন যেমন হয়েছিল, ঠিক সেই রকমই বলেছি। কিন্তু দাদা, যাই বল, ছুঁড়িটাকে যখন বললাম তোমার হাজ্‌ব্যাণ্ড আর জন্মে বাগ্‌দী ছিল, তখন তার মুখখানি এমন সরোফুল হয়ে গেল যে দেখে আমার ভারী দুঃখ হতে লাগলো। ভাবলাম, দূর হোক গে, কথাটা পাল্টে নিই;—অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিলাম।"

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মিন্‌ষেটা?"

মিন্‌ষেটার প্রাণে বড় ফিয়ার হয়েছে। স্ত্রী বিষ খাওয়াবে, সোজা কথা?"

বেণী বসু বলিলেন, "কিন্তু বুদ্ধিটে খুব বের করেছিলে ভায়া। হাঃ হাঃ—একজন ছিল কুকুরী, একজন নুন বওয়া মুটে! বাস্তবিক তোমাব বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।" .

শিবু বলিল, "আমরা হলাম ক্যালকাটাস্‌ সন্‌—আমাদের হাড়ে ভেল্কী খেলে!"

সকলে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সীতানাথ বলিলেন, "সাজগোজটিও তোমার চমৎকার হচ্ছে। আচ্ছা ঐ দিনে কত টাকা রোজগার হ'ল?"

শিবু বলিল, ও দিকে ডেলি ২৫/৩০/৪০ টাকা পর্য্যন্ত হচ্ছিল। এখন ক্রমেই কিন্তু কমছে। মেলা ত প্রায় ফিনিস হয়ে এল কি না। লোক আব তেমন কই?"

তাহার পর তাসখেলা আরম্ভ হইল।

সাত

সেদিন নরহরির বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই—কুসুম তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া আসিয়া আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল।

আহারের সময় নরহরির মনে হইতে লাগিল, সে যেন কুকুরের ছোঁয়া ভাত খাইতেছে। খাইয়া তৃপ্তি হইল না; পুরা খাইতেও পারিল না; অর্দ্ধেক পাতে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

আচমন করিয়া পান মুখে দিয়া নবহরি বিছানায শয়ন করিল। কুসুম আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নরহরি বলিল, "যাও আর দেরি কোর না—খেয়ে এসে শুয়ে পড়, সারাদিন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে শরীর একেবারে এলিয়ে গেছে—আমি ত ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছিনে।"

কুসুম রান্নাঘরে চলিয়া গেল। স্বামীর থালার নিকট দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "কি করবো? পাতে আর খাব কি? কায়েতের মেয়ে হয়ে শেষে বাগ্‌দীর এঁটোটা খাব?"—আবার ভাবিল, "আর জন্মেই বাগ্‌দী ছিল, এ জন্মে ত কায়েত। আর হাজার হোক স্বামী ত বটে! খাই না হয়!"

হেঁসেল হইতে আর কিঞ্চিৎ ভাত-তরকাবী আনিয়া পাতে ঢালিয়া লইয়া কুসুম খাইতে

বসিল। কিন্তু বাগ্দীর উচ্ছিষ্ট খাইতেছি মনে করিয়া তাহার গা-টা কেমন "ঘিন্ ঘিন্" করিতে লাগিল।

কোন মতে আহার শেষ করিয়া কুসুম উঠিল। কাজ কর্ম্ম সারিয়া শয়নঘরে গিয়া দেখিল স্বামী বিছানার অপর প্রান্তে পাশবালিশ আঁকড়াইয়া পিছু ফিরিয়া নিদ্রিত। তাঁহার নিঃশ্বাস বেশ গভীরভাবে পড়িতেছে।

কুসুম পান খাওয়া শেষ করিয়া, বাহিরে গিয়া কুলকুচা করিয়া, মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার করিয়া লইল। তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ নিবাইয়া, ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ঘুমুলে?"

কোনও উত্তর নাই। কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমুলে নাকি?"

উত্তর নাই। কুসুম তখন স্বামীকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন বুঝিয়া, জিহ্বা দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতে লাগিল। হাঁ, নোন্‌তা ত বটেই। পিঠে নুনের বস্তা না বহিলে কি কারও পিঠ এত লবণাক্ত হইতে পারে? বাবাজীর কথায় কুসুমের মনে একটু যাহা সন্দেহ ছিল, এতক্ষণে তাহা দূরীভূত হইল। সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এবং তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার পর খাট হইতে নামিল। প্রদীপ জ্বালিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। নরহরি মাথা তুলিয়া একবার দ্বারের দিকে চাহিল স্ত্রীর শাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগমাত্র দেখিতে পাইল। ভাবিল, "এত রাত্রে আবার চললেন কোথায়? হাড়-টাড় চিবুতে নাকি?"

বারান্দায় জলের শব্দ শুনিল, কুসুম কুলকুচা করিতেছে। নরহরি আবার উপাধানে মস্তক দিয়া নিদ্রার ভাণ করিল।

কুসুম ঘরে আসিয়া পান খাইয়া শয্যার প্রান্তদেশে সঙ্কুচিতভাবে শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নরহরি তখন উঠিয়া বাহিরে গিয়া জল-হাতে পিঠের চাটা অংশটুকু বেশ করিয়া ধুইয়া আসিয়া শয়ন করিল।

স্বামী স্ত্রীর সে অখণ্ড স্নেহপ্রেম কোথায় উড়িয়া গেল! ইহাদের মধ্যে কোনও দিন যাহা হয় নাই তাহাই হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে কলহ-কিচিমিচিও হইতে লাগিল। ক্রমে কুসুম শুনিল তাহার সন্তান হয় না বলিয়া স্বামী নাকি আবার বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে কুসুমের মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল।

প্রস্তাবিত সখের থিয়েটারের দল খুলিয়াছে। সীতানাথ হইয়াছেন অধ্যক্ষ। শিবনাথ কলিকাতায় গিয়াই একখানি শকুন্তলা নাটক পাঠাইয়া দিয়াছিল। নীলদর্পণ শক্ত, তাই শকুন্তলারই অভিনয় প্রথমে হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বেণী বসুর বৈঠকখানায় সকলে সমবেত হইয়া মহলা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নরহরি এক দিন এই আড্ডায় আসিয়া বলিল, "আমিও সাজবো, আমাকেও একটা কিছু পার্ট দাও।"

সীতানাথ বলিলেন, "আমাদের কিন্তু রিহার্শাল ভাঙ্গতে কোনও দিন রাত ১০টা, কোনও দিন রাত ১১টাও বেজে যায় অত রাত অবধি পারবে তুমি থাকতে?"—বলিয়া ব্যঙ্গভরে চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

নরহরি বলিল, "তা খুব পারবো।" বাস্তবিক কিছুক্ষণ গোলমালে থাকিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হওয়াই নরহরির উদ্দেশ্য। নরহরিকে রাজমন্ত্রীর পার্ট দেওয়া হইল। বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে সে অভিনয় শিক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরেই কলিকাতা হইতে শিবনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নিজে কম্বমুনি সাজিবে এবং অভিনয়কাল অবধি এইখানে থাকিবে। সে কলিকাতায় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে, টাকা পাঠাইলেই, ড্রেস, সীন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিবে। খুব উৎসাহের সহিত মহলা চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে পোষাক প্রভৃতি আসিল। আগামী কল্য রথযাত্রার দিন প্রথম অভিনয় হইবে। অদ্য ড্রেস রিহার্শাল। কিন্তু নরহরি সহসা অনুপস্থিত।

নরহরিকে ডাকিতে তাহার বাড়ী লোক ছুটিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তার বড় বিপদ, তার স্ত্রী ঝগড়াঝাঁটি করিয়া বাপের বাড়ী যাইতেছে। কল্য ভোরে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পৌঁছাইতে যাইবে, সেই আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ড্রেস রিহার্শালে না হয় সে নাই নামিল। কিন্তু কল্য রাত্রে অভিনয়, নরহরির শ্বশুরালয় ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভোরবেলা রওয়ানা হইয়া সেইদিনই আবার কি সে ফিরিয়া আসিয়া প্লে করিতে পারিবে? অসম্ভব! সুতরাং তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বয়ং তিনি নরহরির গৃহে যাইতে চাহিলেন। বলিলেন, "যাই ব'লে ক'য়ে দুটো দিন যদি দেরী করাতে পারি।"

শিবু বলিল, "তার চেয়ে চলুন, আমিও যাই—গিয়ে ব্যাপারটা ভেঙ্গেই দিয়ে আসি। দু'তিন মাস হয়ে গেল—আর কেন? ফর নাথিং আর তা'দিকে ট্রবোল দেওয়া কেন?"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "তবে তাই কর—রহস্যটা ভেঙ্গেই দাও। তা হ'লে একলাই তুমি যাও। আমাদের সেখানে থাকাটা ঠিক হবে না।"

শিবু বলিল, "না, না—আপনি অন্ততঃ সঙ্গে চলুন ঠাকুর্দ্দা।"

সীতানাথ বলিলেন, "আচ্ছা চল।"

এক হস্তে গেলাস-বাতিযুক্ত একটি দেশী লণ্ঠন, অপর হস্তে বাঁশের লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে শিবনাথ ও সীতানাথ রওয়ানা হইয়া গেলেন।

নরহবির বাসায় পৌঁছিয়া ঠাকুর্দ্দা তাহার নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নরহরি আসিয়া, দরজা খুলিয়া, ইঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইল।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "হ্যাঁ হে ভায়া, তোমাদের হয়েছে কি বল দেখি!"

নবহবি মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "হবে আবার কি? ঝগড়া হয়েছে।"

"ঝগড়া হয়েছে?" আমরা তা জানি, আমাদের ঘরেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকে। তোমরা হলে এ গ্রামের আদর্শ দম্পতি, তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি কি রকম? এ যে বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁঃ—আদর্শ দম্পতি ত কেমন! আমাদেব বাতাস যেন আর কোনও দম্পতির গায়ে না লাগে।"

"বটে? এমন ব্যাপার? কবে থেকে এ রকমটা তোমাদের হয়েছে?"

"মাস দুই হবে। সেই তারকেশ্বরের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা দেখে ফিরে আসা অবধি।"

"কি নি'য়ে তোমাদের গণ্ডগোল বল দেখি?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়। কা'ল রাত্রে বিহার্শাল থেকে ফিরে এসে দেখি—ও নিজের আহাবাদি সেরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার ভাতের থালা মেঝের উপব রাখা। একটা ঝুড়ি চাপা দেওয়া ছিল,—ঘরে কুকুর ঢুকে ঝুড়ি ঠেলে সব খেয়ে গেছে—ভাতগুলো ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে রেখেছে। দেখে ভারি রাগ হ'ল, বিশেব ক্ষিধের সময়। রাগ সামলাতে পারলাম না, চুল ধরে টেনে উঠিয়ে বসিয়ে পিঠে এক কিল মেবে কেবল বলেছিলাম—'দ্যাখ্ দেখি হারামজাদী! কি হয়েছে! তোর ভাইকে দিয়ে এ সব যে খাইযে দিলি, এই রাত্তিরে আমি কি খাই?'—এ নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেঁধে গেল।"

সীতানাথ বুঝাইতে লাগিলেন, "স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ কোন্ সংসারে আর নেই? তাই বলে' স্ত্রীকে বাপের বাড়ী চলে যেতে দেওয়া—এই বা কেমন কথা? দিন দুই সবুর কর না। থিয়েটারটা হয়ে যাক, তার পরই না হয়—"

নরহরি বলিল, "গিন্নীর রাগ যা হয়েছে—সে রাগ ভাঙ্গানো শিবের অসাধ্য!"

সীতানাথ বলিলেন, "বল কি ভায়া? শিব ত এখানে উপস্থিতই রয়েছেন—যদি বল ত ইনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখেন।"

সীতানাথ ও শিবনাথকে নরহরি অন্তঃপুরে লইয়া গেল। শিবনাথ গিয়াই কপট ভক্তিভরে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, "বউঠাক্‌রুণ, কাল ভোরে ত আপনার কোন মতেই যাওয়া হ'তে পারে না। অসম্ভব! আমরা সকলে এত ট্রবোল্ নিয়ে থিয়েটার করছি, আপনি না দেখেই চ'লে যাবেন? তা হ'লে আমাদের মনে যে বড়ই আপশোষ হবে, বউঠাক্‌রুণ!"

কুসুম ঘোমটা দিয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না।

শিবনাথ বলিল, "আপনি অর্ডার দেন, নরুদাদাকে রিহার্শালে নিয়ে যাই। কাল তখন থিয়েটার দেখে, পরশু হয়, তার পর দিন হয়, বাপের বাড়ী যাবেন এখন।"

কুসুম তাহার সেই ঘোমটার আবৃত মস্তক প্রবলভাবে চালনা করিয়া নিজ অসম্মতি জানাইল।

শিবনাথ বলিতে লাগিল, "দেখুন বউঠাক্‌রুণ, নরুদাদার কাছে সব হিস্ট্রিই শুনলাম। উনি অবশ্য আপনার সঙ্গে যা করেছেন, খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। কিন্তু সেটা কি আপনার মাইণ্ড করা উচিত? আপনি ত জানেন, উনি আর জন্মে ছিলেন বাগ্দী, পুণ্যবলে এবার কায়স্থের ঘরে জন্মেছেন। এখনও সেই বাগ্দী স্বভাবতই ত আছে—এক জন্ম কায়েত হ'লেই বাগ্দী কি আর জেন্টেল্‌ম্যান হয়?"

শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইল এবং ঘোমটা কমাইয়া, বক্তার মুখের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক নজর চাহিয়া দেখিল।

নরহরি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি শিবু! আর জন্মে আমি বাগ্দী ছিলাম?"

শিবনাথ বলিল, "ছিলে না? আবার ভণ্ডামী। বাগ্দী ছিলে; নুনের গোডাউনে মুটেগিরি করতে, সে কথা কি বউঠাক্‌রুণ জানেন না ভেবেছ? তোমার পিঠের নুন আজও কাটেনি—বউঠাক্‌রুণ তা চেটে দেখেছেন। হয় কি না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি এ সব কথা কি ক'রে জানলেন?"

নরহরি বলিয়া উঠিল, "কি বলছ তোমরা সব? আমি আর জন্মে বাগ্দী ছিলাম, নুনের বস্তা পিঠে বইতাম, এই সব কথা আমার স্ত্রীকে কেউ বলেছে নাকি?"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো! তুমিই কি তারকেশ্বরে সেই গণৎকার সন্ন্যাসী সেজেছিলে?"

নরহরি বলিল, "সে সন্ন্যাসী কি তোমার চেনা লোক?"

শিবু বলিল, "খুব চেনা! ওল্ড ফ্রেণ্ড! তার কাছেই ত আমার গাঁজা খেতে শেখা! বউঠাক্‌রুণকে তিনি কি বলেছিলেন, তোমায় কি বলেছিলেন, সবই তাঁর নিজ মুখে আমি শুনেছি। এখানে আসবার আগের দিন, কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা। বাগবাজারের এক আড্ডায় ব'সে বাবাজী গুলী টানছিলেন। আমাকে দেখে ডাকলেন। আমি এখানে আসবো শুনে তিনি বললেন, ওহে, সেই গ্রামে নরহরিকে আর তার স্ত্রীকে বোলো, সে সব বিলকুল মিছে কথা, শুধু রঙ্গ করবার জন্যে বলা, আর তাদের এই টাকা দুটি ফিরে দিও।"—বলিয়া শিবু ট্যাক হইতে কাগজের পুঁটিলি দুইটি বাহির করিয়া নরহরির হাতে দিল।

নরহরি খুলিয়া দেখিল, একটিতে তার স্বহস্তে লিখিত নিজ নামধাম ও জন্মনক্ষত্র; অপরটিতে কোনও অপরিচিত বালক-হস্তাক্ষরে কুসুমের নামাদি লেখা।

নরহরি বলিল, "তবে তুমিই সেই গণৎকার!"

শিবু বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি?"—বলিয়া এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যে, তাহার মৌখিক কথাটা প্রতিবাদ স্বরূপ গণ্য হওয়া কঠিন।

সব গোলমালই মুহূর্তমধ্যে মিটিয়া গেল। ড্রেস রিহার্শালের সময় নরহরি দেখিল, তারকেশ্বরে গণৎকার ঠাকুরের অঙ্গে যে পোষাকটি দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই পোষাক পরিয়াই শিবু কণ্বমুনি সাজিয়াছে—সেই স্থানে সেই বেরঙা তালিটা এ পোষাকেও বিদ্যমান। রিহার্শাল অন্তে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে সে এই কথা বলিল এবং দুই জনে খুব হাসিতে লাগিল। নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত হইল। কিন্তু সব গোলমালই সুন্দর ভাবে মিটিয়া গেল।

বিলাতী রোহিণী

।। এক ।।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ফারম্ ঘোষ এণ্ড চাটার্জি কোম্পানির অংশীদার ও কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, চা-পান কার্য্য সমাধা করিয়া, বেলা ৮টার সময় বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ, জ্বলন্ত কলিকাযুক্ত রূপার গুড়গুড়ি হস্তে খানসামাও নামিয়া আসিল। পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষাতের অভিলাষে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাবু প্রবেশ করিতেই তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া, বাবু একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া, আরামে গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে, ভদ্রলোকগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

মিনিট পনেরো কাল এইরূপ চলিলে, ডাকপিয়ন আসিয়া সেলাম করিয়া, বাবুর হস্তে কয়েকখানি পত্র দিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যবাবু বলিলেন, "বিলাতী ডাক যে! এবার খুব সকালেই এসেছে ত!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া পিয়ন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বাবু তখন সেগুলি হইতে বাছিয়া, একখানি খুলিয়া, পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানি তাঁহার একমাত্র পুত্র। বিলাত প্রবাসী শ্রীমান সুধাংশু ভূষণ লিখিয়াছে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সত্যবাবুর মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্রোধ ও বিরক্তিতে ললাটদেশ সঙ্কুচিত ও নাসিকাগ্র স্ফীত হইতে লাগিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে, সেখানি তিনি টেবিলের উপর আছাড়িয়া ফেলিযা দিযা, অন্যদিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন ভদ্রলোক সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও মন্দ খবর নয় ত?"

সত্যবাবু সেকথার কোনও উত্তর না দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বসুন, আমি একটু ভিতর থেকে আসি"—বলিয়া চিঠিখানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা পবস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। একজন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?" অপর একজন উত্তর করিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

বাবু উপবে গিয়া, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

স্বামীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? ভাল আছে ত?"

"এই দেখ"—বলিয়া সত্যবাবু পত্রখানি স্ত্রীর হস্তে দিলেন।

গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন।—

১৪৮নং কুইন্স্ রোড, লণ্ডন (W)—১২ই আগষ্ট।

শ্রীচরণেষু,

গত রবিবার আপনার পত্র এবং টাকার ড্রাফ্‌ট পাইয়াছি। আপনারা সকলে কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

বাবা, গত কয়েক সপ্তাহ হইতে, লিখি লিখি করিয়া একটি কথা আপনাকে লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সে কথা আর আপনাদের নিকট গোপন রাখা আমার উচিত হইবে না, তাই আজ লিখিতেছি।

বিগত গ্রীষ্মের বন্ধের সময়, আমি যখন ব্রাইটনে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলাম, সেই সময় সমুদ্রস্নানকালে একটি যুবতীর জীবন বিপন্ন হয়। আমিও স্নান করিতেছিলাম, আমি অনেক কষ্টে সেই যুবতীর জীবনরক্ষা করি। সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়।

আমি জানিতে পারি যে তাহার নাম নোরা ডাড্‌লি, সে লন্ডন ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করে, আমারই ন্যায় গ্রীষ্মের বন্ধে সমুদ্রতীরে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়া কোনও বোর্ডিং-এ বাস করিতেছে। তাহার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, শিশুকাল হইতেই বাপ মা নাই, নটিংহামশায়ারে তাহার এক পিতৃব্য থাকেন, এতদিন তিনিই উহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বলিয়া, বৎসর খানেক হইতে নোরা লণ্ডনে আসিয়া চাকরি করিতেছে। ক্রমে তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইত। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াও সেইরূপ।

আমি প্রতিদিন বিকালে তাহার আপিসের ছুটির পূর্ব্বে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি। সে আসিলে, দুইজনে একত্র বেড়াইতে যাই; কোন কোন দিন কোনও সাধারণ ভোজনাগারে সান্ধ্যভোজনও একত্র সমাধা করি।

বাবা আপনি ত জ্ঞানী ব্যক্তি। আপনি ত জানেন এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার পরিণতি কিরূপ দাঁড়ানো সম্ভব ও স্বাভাবিক। যাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে না পাইলে, আমার জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নোরার অবস্থাও তদ্রূপ। একদিন বিকালে কার্য্যবশতঃ আমি যথারীতি তাহার আপিসের নিকট গিয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। সে অনেকক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া, আমার বাসায় আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল; বাসায় আমার কোনও সংবাদ না পাইয়া, বাসার সামনে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছিল; অবশেষে নিজ বাসায় ফিরিয়া গিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়ে, সে রাত্রে সে কিছুই খায় নাই! পরদিন সন্ধ্যার পর হাইড্ পার্কে এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল!

বাবা, এই সব কথা লিখিলাম বলিয়া আমাকে আপনি নির্লজ্জ ও বাচাল মনে করিবেন না। এসব কথা আমার উদ্দেশ্যে, আপনাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। যদিও আপনি একবার বিলাতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন ছিলেন না। ইংরাজললনা হইয়াও নোরা যারপর নাই কোমলহৃদয়া ও প্রেমময়ী। আপনাদের—শুধু আপনাদেরই বা বলি কেন, অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় নরনারীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, মেমেরা একান্ত পাষাণহৃদয়া হয় এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম তাহাদের আদৌ অজ্ঞাত। নোরাকে আমি বিবাহ করিলে আদর্শ হিন্দুপত্নীর মতই যে সে আমাকে ভক্তি ও সেবা করিবে, সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই যে সে অনুসরণ করিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনাদের প্রতিও সে যে যথেষ্ট ভক্তিমতী হইবে তাহাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল। কথায়-বার্ত্তায় আপনাকে "পাপা" এবং মাকে মাম্মা" বলিয়াই সে উল্লেখ করিয়া থাকে।

বাবা, অবস্থা সমস্তই খুলিয়া লিখিলাম। আমি জানি আপনি উদার, মহৎ, কোনরূপ সংকীর্ণতা বা কুসংস্কার আপনার নাই। তাই সাহস করিয়া সকল কথা আপনাকে লিখিয়া, এ বিবাহে আপনার ও মাতৃদেবীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ আমি ভিক্ষা করিতেছি। পাঠ শেষ হইতে আমার এখনও দুই বৎসর বাকী আছে। ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া, আগামী ডিসেম্বর মাসে আমরা বিবাহ করা স্থির করিয়াছি। সে সময় আমার হাজার দুই টাকা আবশ্যক হইবে। বিবাহের পর আমার এলাউন্স বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, কারণ, তখন আর আপনার পুত্রবধূকে চাকরি করিতে দেওয়া শোভন হইবে না। আমরা যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতার সহিত গৃহস্থালী নির্ব্বাহ করিব। নোরা খুব শক্ত মেয়ে, একটি পয়সা তাহার হাতে অপব্যয় হইবার যো নাই।

এই পত্র অদ্য হইতে তিন সপ্তাহ মধ্যে আপনার হস্তগত হইবে। ডাকে ইহার উত্তর আসিতে আরও তিন সপ্তাহ লাগিবে। অতদিন অপেক্ষা করিতে হইলে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। তাই মিনতি করিতেছি, মাতৃদেবীর সম্মতি লইয়া, মাত্র দুইটি কথায় আমায় একখানি

টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন। বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাইবার মাশুল অত্যন্ত অধিক, সুতরাং বিস্তারিত ভাবে সকল কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যদি শুধু দুটি কথা "Bless you" (আশীর্ব্বাদ করি) টেলিগ্রাম করিয়া দেন, তবে আমি আপনার ও জননীদেবীর সম্মতি ও আশীর্বাদ পাইলাম বলিয়া বুঝিব এবং নিশ্চিন্ত হইব। আপনি আমার শতকোটী প্রণাম জানিবেন ও মাতৃদেবীকে জানাইবেন। আপাততঃ বিদায়।

আপনাদের চির স্নেহের—সুধা

গৃহিণী এই পত্রখানি যখন পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিয়দংশ পড়িবার পর, তাঁহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কবিতে লাগিল, তিনি নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পত্রপাঠ শেষ করিয়া স্বামীব দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে?"

সত্যবাবু বলিলেন, "এ বিয়ে যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, 'তা তো বটেই! কিন্তু কি উপায়ে বন্ধ করবে? কেঁদে কেটে, ভয় দেখিয়ে, তুমি আমি দুজনে যদি তাকে বারণ করে চিঠি লিখি তা হ'লে সে কি শুনবে না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "মাগীকে নিয়ে হারামজাদা যে বকম মস্গুল্ হয়ে আছে, মানা করলেই যে শুনবে এমন ত বোধ হয় না।"

"তবে?"

"সেই কথাই ত ভাবছি। একটা কোন উপায় করতেই হবে। মেম বিয়ে করে নিয়ে এলে, এদেশে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না যে! না দেশী সমাজে, না বিলাতী সমাজে, কোন সমাজেই সে যে মুখ দেখাতে পাবে না। পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা পর্য্যন্ত লোপ হবে। দেখ দেখি নচ্ছার বেটার আক্কেলখানা! উনি জানেন আমি উদার মহৎ, আমার ভিতরে কোন রকম কুসংস্কার নেই! আবে, মুর্গীই না হয় খাই, তাই বলে কি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি, আর তোকে মেম বিয়ে করতে অনুমতি দেবো? কি বত্নই পেটে ধরেছিলে গিন্নী!

গিন্নী বলিলেন, "তুমি না হয় নিজেই একবাব যাবে? গিয়ে ছেলেকে ধরে' নিয়ে আসবে?"

সত্যভূষণবাবু পূর্ব্বে যে বিলাত গিয়াছিলেন, তাহা সুধাংশুর পত্রেই প্রকাশ। কারবার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তিন মাসের একবার তাঁহাকে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয়বার কোনও আটক নাই।

সত্যবাবু বলিলেন, "মেবে ধরে তাকে নিয়ে আসবো? সে কি কচি খোকাটি আছে যে গালে একটা চড় কষিযে কান ধবে' হিড়হিড় কবে টেনে আনবো? রাস্কেল শূয়ার কোথাকার! সীতা সাবিত্রীব পদাঙ্কই সে অনুসবণ করবে! খুঁজে খুঁজে কি সীতা সাবিত্রীই বের কবেছে বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড—বাঃ! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুব। সে দেশে চাকরি করা মেয়েরা যে কেমন সীতা সাবিত্রী সে আব জানতে বাকী নেই!"

বিলাত প্রবাসকালে স্বামীর ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্বন্ধে গৃহিণী মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া থাকেন। অন্য সময় হইলে শেষেব এই কথাটি লইয়া আজ তিনি স্বামীকে একটু পরিহাস না করিযা ছাড়িতেন না। কিন্তু ইহা পবিহাসের সময নয। তিনি ভীতভাবে বলিলেন, "সে কি গো? ছুঁড়ি কি তা হলে-গৃহস্থের মেযে নয?"

কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কক্‌খনো নয়। ও খুড়ো ফুড়ো সব ঝুট বাত। দেশে তার খুড়োখুড়ি থাকলে, ছুটির সময় সে সেইখানে গিয়ে কাটাতো—কাপ্তেন খুঁজতে ব্রাইটনে যেত না। তোমার ছেলেটিকে যেমন পেয়েছে গাধারাম! শুনেছে মস্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে, গেঁথে ফেলেছে। বেটা, খাচ্চিস খা, আবার ছাঁদা বেঁধে আনার দরকার কি

বাপু" বামুনের ছেলে কিনা, ছাঁদা বাঁধা ভুলতে পারেনি। করুক না বিয়ে, করে' একবার মজাটি দেখুক। একটি পয়সা দেবো না, তাজ্যপুত্র করবো। হতভাগা পাজি ছুঁচো হনুমান।"

আপিসের বেলা হইয়া যায়। স্নানাহার করিয়া সত্যবাবু আপিসে গেলেন। আহারপাতের কাছে বসাই সার হইল। গৃহিণী ত সারাদিন শয্যা লইয়া রহিলেন।

।। দুই ।।

আপিসে গিয়া, সত্যবাবু পুত্রের চিঠিখানি আর একবার পাঠ করিলেন। ছেলে লিখিয়াছে, দুইটিমাত্র কথা তার করিয়া দিবেন—"Bless you"। সত্যবাবু, একখানি বিলাতী টেলিগ্রামের ফর্‌ম্ লইয়া, রাগের মাথায় তৎপরিবর্ত্তে লিখিলেন, "Damn you" (উচ্ছন্ন যাও)। ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, চাপরাশি আসিয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রামখানা তাহাব হাতে দিবার জন্য উঠাইলেন; আবার নামাইয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, এরূপ টেলিগ্রামখানা এই দীর্ঘযাত্রাপথে যে সকল কর্ম্মচারী ও কর্ম্মচারিণীর হাতে পড়িবে, তাহারাই বা ভাবিবে কি! একজনকে মাত্র গালি দিবার জন্যে, ৫০/৬০ টাকা যে ব্যয় করিয়াছে, তাহাকে লোকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি মনে করিবে? তাই তিনি সেখানা ছিঁড়িয়া, অন্য একখানা টেলিগ্রাম লিখিলেন, তাহাতে শুধু একটি মাত্র শব্দ রহিল—"Wait" (সবুর)।

সন্ধ্যার পর সত্যবাবুর মোটর, বালিগঞ্জে এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিষ্টাব সেনের গৃহেব ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি সত্যবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সেন সাহেব তখন রাত্রি বসন পরিধান করিয়া লাইব্রেরী গৃহে একখানা আরাম কেদারায় পড়িয়া, চশমা চোখে দিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার মুখের পাইপ, পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কিব গ্লাস। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "হঠাৎ যে! খবর কি হে?"

সত্যবাবু পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সেন সাহেবের হাতে দিলেন। সেন তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ যে জবর খবর! তা, টেলিগ্রাম করে দিয়েছ ত?"

কি টেলিগ্রাম করিতে যাইতেছিলেন, সেখানা ছিঁড়িয়া কি টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই রকমই সত্যবাবু বলিলেন। শেষে বলিলেন, "উপায় কি করা যায় বল দেখি? আমি ত নিজে যাওয়া একরকম স্থিরই করেছি। সেখানে গিয়ে কি রকম কার্য্যপ্রণালীটা অবলম্বন করি বল দেখি?"

"নিজে যাচ্ছ? তাহ'লে আর ভাবনাটা কি? কিছু টাকা খরচ করলেই হল।"

"কি করবো? ছুঁড়িকে কিছু টাকা দিয়ে, তাকে ভাগিযে দেবো?"

সেন সাহেব হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়া বলিলেন, "উঁহু! সে সুবিধে হবে না। ছুঁড়ি কি রাজি হবে? সে হয়ত ভাববে বিয়ে হলে এই বুড়োর ষোল আনা সম্পত্তিই ত আমার; এখন দু' কি পাঁচ হাজার নিয়ে কি হবে? কিংবা, সে টাকাও নিতে পারে, বিয়ে করবাব মৎলবও পরিত্যাগ না করতে পারে। তার চেয়ে বরঞ্চ এক কাজ কর না, সত্য!"

সত্যবাবু সাগ্রহে বলিলেন, "কি?"

"দাঁড়াও"—বলিয়া তিনি গ্লাস তুলিয়া সেটা খালি করিয়া বলিলেন, "তোমাকেও একটা পেগ দিক?"

সত্যবাবু সম্মতি জানাইলে, বয়কে ডাকিয়া দুইটা পেগ দিতে আদেশ করিলেন। পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল পড়েছ ত? গোবিন্দলালের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াবার জন্যে ভ্রমরের বাপ মাধবীনাথ যে ফন্দি করেছিলেন, তুমিও তাই কর না কেন?

সত্যবাবু বলিলেন, "নিশাকর পাই কোথা?"

"নিশাকর হবার মত একটি লোক আমার হাতে আছে।"

"কে?"

"নবীন দত্ত। হীরু দত্তের ছেলে নবীন দত্ত। বছর ৫/৭ হতভাগাটা বিলাতে ছিল! শুধু স্ফূর্ত্তি করেই বেড়িয়েছে, পাস টাস কিছু করতে পারেনি! বিলাতে যে কত লীলা সে করে এসেছে তার সংখ্যা নেই। একবার না দু'বার তার জেল পর্য্যন্ত হয়েছিল। বাপ মারা যাবার পব টাকার অভাবে দেশে ফিরে এসেছে—এখন বেকার অবস্থায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরছে। সে যে রকম বদমাইস, কিছু থোক্ টাকা পেলে স্বচ্ছন্দে রাজি হবে এখন। কার্য হাঁসিল করে আসবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "টাকা খরচ করতে আমি রাজি আছি।"

"তাকে তার মেহনতানা দিতে হবে। তারপর, সরঞ্জামি খরচ। সে একটা বাজা-টাজা নবাব-টবাব সেজে, ছুঁড়িকে হাত করে নেবে কিনা! সুতরাং তাকে একটু লম্বা হাতেই টাকা খরচ করতে হবে।"

সত্যবাবু বলিলেন. "বুঝেছি। টাকার জন্যে আট্‌কাবে না। সে লোক কোথায়, তাকে একবার ডাকাও।"

সেন বলিলেন, "সে কি এখন আসবে? সে এখন ক্লাবে বসে পেগ টানছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বরঞ্চ তাকে এখানে রাখবো তুমি সন্ধ্যের পর এস। তার বায়না স্বরূপ একটা চেকও সঙ্গে এন।"

"বেশ, তাই আনবো।"

দুই চাবিটি অন্যান্য কথার পরে সত্যবাবু উঠিলেন।

পরদিন সত্যবাবু যথাসময়ে বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া, দত্ত সাহেবেব দেখা পাইলেন। দত্ত রাজি। ইংবাজিতে বলিল, "এ আর একটা শক্ত কথা কি? সে ঠিক হয়ে যাবে এখন। আমাকে কিন্তু নবাব সাজতে হবে। নবাবোচিত সকল সরঞ্জামই চাই। অন্য সব জিনিষ সেখানেই পাওয়া যাবে, কেবল একটা জমকালো বকমের রূপোর গুড়গুড়ি, লক্ষ্ণৌয়ের খানিকটে সুগন্ধি তামাক, আর কিছু টিকে এখান থেকে সঙ্গে নিতে হবে। আর, একটা ফেজ ক্যাপ।"

তিনজনে বসিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। ইত্যবসবে দত্ত আধ বোতলের উপব উদরস্থ করিয়া ফেলিল। সত্যবাবুব নিকট টাকা লইয়া সে যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাহার পা একটুখানি টলিলও না।

।। তিন ।।

দত্তসাহেবকে সঙ্গে লইয়া, পি-এণ্ড-ও কোম্পানির মল্‌ডেভিয়া নামক মেল ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া, যথাসময়ে সত্যবাব্ লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন, ঐ মেলেই, সত্যবাবু লিখিত একখানি পত্র সুধাংশুর নামে আসিয়া পৌঁছিল, তাহাতে "হাঁ, না" কিছুই নাই, আছে শুধু তাহার প্রণয়িনী সম্বন্ধে গুটিকতক ফাঁকা প্রশ্ন,—কেমন বংশ, খুড়া কিরূপ লোক ইত্যাদি। সময় লইবার ফিকির—আর কিছু নয়।

ট্রেন হইতে নামিয়া উভয়ে একটা হোটেলে গিয়া উঠিলেন। পরদিন প্রাতে, দত্ত বাসা খুঁজিতে বাহির হইল এবং একটু দূর অঞ্চলে বাসা ঠিক করিয়া, সত্যবাবুকে সেখানে লইয়া গেল। সত্যবাবু যে লণ্ডনে আসিয়াছেন, এখন সুধাংশুকে তাহা জানিতে দেওয়া অভিপ্রেত নহে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, দত্ত বাহিব হইয়া, লণ্ডন ব্যাঙ্কে গিয়া উপস্থিত হইল। কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী, ভিতরে বসিয়া কার্য করিতেছে—গরাদের ভিতর দিয়া তাহাদের সকলকেই দেখা যায়। ১৯/২০ বৎসর বয়সের মেয়ে অনেকগুলিই রহিয়াছে, কোন্‌টি নোরা, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। দত্ত তখন ব্যাঙ্কের একজন ছোক্‌রাকে ডাকিয়া, তাহার হস্তে একটি শিলিং গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "ওহে ছোক্‌রা, একটু এদিকে এস ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

অর্থলাভে খুসী হইয়া, দত্ত বাহির করিয়া, বালক দত্তসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে একটা নিভৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যাঙ্কে মিস্ ডাড্‌লি নামে যে একটি যুবতী চাকরি করে, তা'কে তুমি চেন?"

বালক বলিল, "নোরা ডাড্‌লি ত? খুব চিনি। ডাকিয়া দিব?"

"হাঁ—দাও ত।"

বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, যে সকল যুবতী বসিয়া টাইপরাইটিং-এর কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের কানে কানে কি বলিল। বলিতেই, সেই যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাহিরের ভিড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দত্ত ভিড়েব আড়ালে লুকাইয়া সেই যুবতীকে দেখিতে লাগিল। যুবতী, বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া তখন দত্ত সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বাস্তবিক, নোবার সঙ্গে দেখা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; দেখা হইলে, সে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কেন মহাশয়? তখন কি উত্তর দিবে? উদ্দেশ্য—তাহাকে চেনা এবং ব্যাঙ্কে সে কি কার্য্য করে তাহা জানা। উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে।

দত্ত, সেখান হইতে সোজা ফ্লীট স্ট্রীটে গেল। সেখানে অনেক সংবাদপত্রের আফিস। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে, উপর্য্যুপরি তিন দিন প্রভাতে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দিল :—

WANTED

অবসর সময়ে টাইপ-রাইটিং কার্য্যের জন্য একটি যুবতীর প্রয়োজন। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা, দুই ঘন্টা কার্য্য করিতে হইবে। বেতন সপ্তাহে ৪ গিনি। বয়স ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাব বিবরণ সহ আবেদন করুন। বক্স...C/o ম্যানেজার...

বিজ্ঞাপন দিয়া, পাঁচটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে দত্ত আবার ব্যাঙ্কের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন ভারতবর্ষীয় যুবক, একস্থানে দাঁড়াইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। পাঁচটার পরেই ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণসহ নোরাও বাহির হইয়া আসিল। যুবক তাহাকে দেখিবামাত্র টুপী উত্তোলন করিল; উভয়েব করমর্দ্দন হইল; অল্পদূরে দাঁড়াইয়া দত্ত শুনিল, নোরা বলিতেছে, "সিউডা, আজ বেলা ৩টাব সময তুমি কি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলে?" সুধা বলিল, "কই না!" নোরা বলিল, "আজ বেলা ৩টার সময় ব্যাঙ্কের একজন ছোকরা আসিয়া বলিল কোনও কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোক তোমায় ডাকিতেছেন। ভাবিলাম, নিশ্চয় তুমিই কোনও দরকারে আসিয়াছ। বাহিরে আসিয়া তোমায কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ছোকরাটাও চারদিকে ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, "কই তাঁকে ত দেখিতেছি না।"

সুধা বলিল, "আর কেহ বোধ হয় আর কাহাকেও খুঁজিতেছিল।"

"তাই হইবে"—বলিয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গেল। দত্ত মনে মনে হাসিয়া, অম্‌নিবাসে উঠিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে, চারিখানি সংবাদপত্রের আফিস হইতে চার বোঝা আবেদন পত্র আসিয়া পৌঁছিল। দত্ত সেগুলি গণিয়া দেখিল, দুই হাজারেরও উপর। সত্যবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত?" দত্ত বলিল, "হবে না? সারাদিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে সপ্তাহে দেড় গিনি দু'গিনির বেশী পায় না; এটা, অবসর সময়ে ঘণ্টা দুই কার্য করেই চার গিনি! তা ছাড়া, নিয়োগকর্ত্তা ধনী ও অবিবাহিত হলে, অনেক সময় টাইপ্‌রাইটিং ছুঁড়ির সঙ্গে বিয়েও হয়ে যায়।—সেও একটা ফিউচর্ প্রস্পেট্ (ভবিষ্যৎ আশা) আছে ত!"

উভয়ে তখন পত্রগুলি ভাগাভাগি করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আবেদনকারিণীর নামটি মাত্র দেখিয়াই, সেখান ছিঁড়িয়া ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টাকাল বৃথা পরিশ্রমের পর, দত্ত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এই দেখ!—লণ্ডন ব্যাঙ্কের নোরা ডাড্‌লি।—বয়স ১৯ বৎসর। মার দিয়া কেল্লা!"

সত্যবাবু পত্রখানি লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। বলিলেন, "সেই হারামজাদিই বটে। বেটী মূর্খ—দেখ না এইটুকু চিঠির মধ্যে কতগুলো বানান ভুল!"

দত্ত বলিল, "মূর্খ না ত কি! সে যাক্। তোমার ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করেই অবশ্য এ দরখাস্ত করেছে। সন্ধ্যাবেলাটাই ওদের লীলা খেলার সময় কিনা তোমার ছেলে যে মত দিলে বড়?"

সত্যবাবু বলিলেন, "বোধহয় ভেবেছে, বাবার চিঠিতে তেমন উৎসাহ ত কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত ফেরবার আগে ভিন্ন বিবাহই হবে না। সন্ধ্যের পর দু'ঘণ্টা বইত নয়! ৬টা থেকে ৮টা ইতিমধ্যে ফাঁকতালে যা রোজগার হয়ে যায়!"

দত্ত বলিল, "তাই বোধ হয় ওদের পরামর্শ।"

।। চার ।।

সত্যবাবুকে পূর্ব্ব বাসায় রাখিয়া, দত্ত সাহেব কেনসিংটন গার্ডেন্সে আসিয়া উচ্চ ভাড়ায় নূতন বাসা স্থির কবিল। ঘরগুলি পূর্ব্ব হইতেই বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত ছিল, নবাবোচিত কতকগুলি জিনিসও সংগৃহীত হইয়াছে আহারাদির বন্দোবস্তও ধনীজনোচিত। এখানে আসিয়া দত্ত নিজের নাম বলিয়াছে—"নবাব অব্ পান্নাগড়।" একজন খানসামা (valet) নিযুক্ত করিয়াছে এবং মাসিক ভাড়ায একখানা দামী রোল্স্ রয়েস্ মোটর গাড়ীও নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ধ্যার পব এই জাল নবাবটি, নকল পান্নার গোটাকতক আংটি আঙুলে পরিয়া, রূপার গুড়্গুড়িতে, সোনার ঝালরযুক্ত সবপোষে ঢাকা কলিকায়, সুগন্ধি অম্বুরী তামাকু সেবন করিতেছিল। পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। মাঝে মাঝে তাহাও পান করিতেছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। দাসী আসিয়া বলিল, "মিস্ ডাড্লি।"

"নিয়ে এস!"—বলিয়া দত্ত গম্ভীরভাবে গুড়্গুড়ি টানিতে লাগিল।

অর্দ্ধমিনিট পরে, নোরা আসিয়া প্রবেশ করিল। দত্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন ও করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে বসাইল। সে কতদিন লণ্ডনে আছে কোথায় তাহার বাসা, আত্মীয় স্বজন কে কোথায আছে, বিনীত ও মধুরভাবে এই রকম কতকগুলি প্রশ্ন তাহাকে করিতে লাগিল। তারপর নিজ পরিচয় এইরূপ দিল—

"আমার পিতা, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বাল্যকালেই আমাকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি ইংলণ্ডেই ছিলাম। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া যাই। আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গদি পাইয়া আমি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলাম। রাজ্যটি ছোট। আয় তেমন বেশী নয়—বার্ষিক মাত্র চৌদ্দ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি। একদিন আমি মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছি, একটা গ্রামের মাতব্বর প্রজা আসিয়া এক টুকরা সবুজ পাথর আমার হাতে দিল। বলিল, নিজ ক্ষেত চষিতে চষিতে মাটির ভিতর সে উহা পাইয়াছে। পাথরখানা দেখিয়া আমার মনে বড় সন্দেহ হইল। যাচাই-এর জন্য উহা বোম্বাইয়ের কোন বিখ্যাত মণিকারের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা বলিল, উহা উচ্চ অঙ্গের পান্না—তোমবা যাহাকে এমারেল্ড্ বল। ঐটুকু পাথরের মূল্য তাহারা ছয় হাজার টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। ছয় হাজার—অর্থাৎ এদেশের টাকায় প্রায় চারিশত পাউণ্ড। তারপর সেইস্থানে ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি আমি খনন করাইতে আরম্ভ করিলাম। আরও তিন টুকরা পান্না পাইলাম। আমার রাজ্যে যে পান্নার খনি আছে তাহা কেহ জানিত না। এখন বুঝিলাম, এই জন্যই পুরাকাল হইতে ইহার নাম হইয়াছে পান্নাগড়। যাহা হউক, সে সমস্ত জমি প্রজার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, স্থানটির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি, একশো গজ অন্তর এক এক জন সশস্ত্র প্রহরী খাড়া আছে। যদি কোনও ধনী ব্যক্তি বা কোম্পানী ঐ পান্নার খনি লীজ লয়, সেই চেষ্টা

করিতে এখন আমি ইংলণ্ডে আসিয়াছি। দুই একজন ধনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আমি বার্ষিক বিশ হাজার পাউণ্ড হিসাবে ভাড়া চাহি; কিন্তু এখনও দশ বাবো হাজারের অধিক কেহ উঠিতে চাহিতেছে না। সেই সূত্রে অনেক চিঠিপত্র লেখার আমার প্রয়োজন হইবে। তাই টাইপ্‌রাইটিং-এর জন্য আমার একজন লোক প্রয়োজন। তা, তুমি যদি এ কর্ম্মটি গ্রহণ কর তবে ভালই হয়।"

নোরা বলিল, "গ্রহণ করিব বইকি। সেই জন্যই ত আসিয়াছি। কবে হইতে আমার কার্য্য করিতে হইবে, বলুন"।

"আজ হইতেই তোমাকে আমি নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত আছি। কাল তুমি আসিলে, কতকগুলো চিঠি টাইপ করিতে দিব। তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। সারাদিন ব্যাঙ্কে খাটিয়াছ, আহা ছেলেমানুষ তুমি, ফুলের মত অমন যে তোমার মুখখানি, তাহাও শুকাইয়া গিযাছে। কিছু খাইবে?"

নোরা বলিল, "ধন্যবাদ, আমি বাড়ী গিয়া খাইব।"

"কিছু পান কর তবে। একটু শ্যাম্পেন, দু'খানা বিস্কুট! দেখ, আমাদের ভারতবর্ষের নিয়ম এই, বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিলে, তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া আমরা ছাড়ি না।"

নোরা রাজি হইল। দুই গ্লাস শ্যাম্পেন ও খান চারি বিস্কুট খাইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ তবে আমি যাইতে পারি?"

দত্তও দাঁড়াইয়া বলিল, "এখনই যাবে? আচ্ছা, এই লও, তোমার এক সপ্তাহের বেতন অগ্রিম লইয়া যাও।"—বলিয়া দত্ত চারিটি সভবিন ও চাবিটি শিলিং পকেট হইতে বাহির করিয়া নোরার হস্তে দিল। নোরা ধন্যবাদ দিয়া সেগুলি গ্রহণ করিল।

দত্ত বলিল, "যাও যাও, আর দেবী করিও না। তোমার কতই না ক্ষুধা পাইযাছে—আহা ছেলেমানুষ! এখানে ত কিছু খাইলে না, কাল আবাব ঠিক সময় আসিও। বোধ হয আমাদের বনিবনাও ভালই হইবে। তুমি কিন্তু বেশটি!—খাসাটি!"—বলিয়া, এ বিদ্যায় বৃহস্পতি দত্ত সাহেব, নোরার গালটি টিপিয়া দিল। নোরা রাগিল না; মুচ্‌কি হাসিয়া, মাথাটি হেলাইয়া "গুড্ নাইট্" বলিয়া প্রস্থান করিল।

আটটা কুড়ি মিনিটে, হাইড্ পার্কের কোনও নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে সুধাংশুব সহিত সাক্ষাৎ হইবে স্থির ছিল। তখনও এক ঘণ্টার বেশী বাকি। এদিক ওদিক বেড়াইয়া সময়টা কাটাইয়া, যথাসময়ে নোরা সেই স্থানে গিয়া তাহার প্রণয়ী "সিউডা'র সহিত সাক্ষাৎ করিল। নবাব সাহেব ঘটিত সকল কথাই সে সুধাকে বলিল। কেবল তাহার শেষের মন্তব্যটি এবং গাল টিপিয়া দিবার কথাটি গোপন করিয়া গেল।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল, "নবাব সাহেবের বয়স কত?"

নোরা তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "বয়স ঢের হইয়াছে।" (দত্ত সাহেবের বয়স ৩২ বৎসর মাত্র)।

"দেখিতে কেমন?"

"কদাকার।" (দত্ত সাহেব একজন সুপুরুষ বলিয়া গণ্য)

"কথাবার্ত্তা কিরূপ?"

"কাঠখোট্টার মতন। আবার 'হুক্কায়' ধূমপান করে! মাগো, কি দুর্গন্ধ! কেমন করিয়া যে তাহার চাকরি করিব জানি না।"

সুধাংশু এ সমস্ত শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। বলিল, "কি করিবে বল; কিছুদিন ত কাজ কর। বাবার চিঠি ত তোমায় পড়িয়া শুনাইয়াছি। তাঁর ভাবভঙ্গি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হয়ত বা বলিয়া বসিবেন, 'না, এখন বিবাহ করিয়া কাজ নাই; পাঠ শেষ হইলে বিবাহ করিয়া দেশে চলিয়া আসিও।' তোমার এই চাকরিটি যদি স্থায়ী হয়, তবে চাই কি,

বাবাকে না জানাইয়াও কিছুদিন পরে আমরা বিবাহ করিতে পারি। তোমার উপার্জ্জনে এবং আমার এলাউন্সের টাকায় আমাদের সংসার একরকম চলিয়া যাইতে পারিবে। এই সকল ভাবিয়াই, তোমার এ চাকরি গ্রহণে আমি সম্মতি দিযাছি; নচেৎ বাবার নিকট হইতে আশাপূর্ণ পত্র আসিলে, কখনই সম্মতি দিতাম না।"

।। পাঁচ ।।

দুই সপ্তাহ পরে একদিন দত্ত আসিয়া সত্যবাবুকে বলিল, "ভাই, পাঁচশো টাকা দাও।"

"কেন?"

"ছুঁড়ির জন্যে একটা ইভনিং ড্রেস (পোষাক) কিনতে হবে।"

"সেদিন ত দুশো টাকার ইয়ারিং কিনে দিলে, আবার এখনি?"

দত্ত বলিল, "এইবাব যে এই নাট্যবঙ্গে শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠেছে। হপ্তাখানেক মধ্যেই নির্ব্বিবাদে ছেলেকে নিয়ে তুমি জাহাজে চড়বে।"

"কি রকম? এত শীঘ্র হবে মনে কর?"

"হবে। শোননা বলি। কাল আমার বাসায়, দু'জনে শ্যাম্পেন ডিনার খেয়ে, সোফায় হেলান দিয়ে বসে গল্প করছি আর ব্রাণ্ডি টানছি, কথায় কথায় ছুঁড়ি বললে—'নোবি'—নবাবকে সংক্ষিপ্ত করে' নিয়ে, সে আমার নাম রেখেছে 'নোবি কিনা!—বললে, 'নোবি! আমার ইচ্ছা করে, তোমাতে আমাতে দুজনে একদিন কোনও থিয়েটারে যাই!—বললাম, 'বেশ ত! চলনা, যেদিন বলবে। অ্যাপলো থিয়েটারে 'থ্রি লিট্‌ল মেডস্' হচ্চে—ভারি মজার ব্যাপার, কালই চল—বল ত এখনই টেলিফোনে বক্স রিজার্ভ করে রাখি!'—ছুঁড়ি বললে, 'কাল কি কবে যাওয়া হতে পারে?—কি পবে' আমি যাব? তোমার সঙ্গে বোল্‌স্ রযেস্ কার থেকে থিযেটারে নামবো কি এই ঝিয়েব পোষাক পরে'?" আমি বললাম, 'ওঃ—সেইজন্যে? তা চলনা কালই তিন দিনেব কড়াবে বণ্ড্ ষ্ট্রীটে তোমার পোষাক ফরমাস দেওয়া যাক। শনিবার দিন সেই পোষাকে তুমি আমাব সঙ্গে থিযেটারে যেতে পারবে।"—

তাই ভাই কাল পোষাকটি ফবাস দিতে হবে, টাকা দাও।"

সত্যবাবু বলিলেন, "তা দিচ্চি, কিন্তু একহপ্তা পরে, ছেলে নিয়ে বাড়ী যাব তুমি ঠিক বলছ?"

দত্ত বলিল, "শোন তবে, আমার প্ল্যান বলি। এবাব তোমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ছেলের সঙ্গে গিয়ে কাল দেখা কব, যেন আজই এসে পৌঁছেচ। শনিবারে আমি যে থিয়েটারে যাব, তুমিও ছেলেকে নিয়ে সেই রাত্রে ঐ থিযেটারে যেও। দিনের বেলা ছেলেকে বোলো, চলনা থিয়েটার দেখে আসা যাক! বলে', একখানা খবরের কাগজ তুলে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখে, অ্যাপলো থিয়েটারের নাম কবে দেবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি তোমার মতলব। যাতে সুধা তোমাদের দুজনকে একত্র দেখতে পায়।"

"ঠিক তাই। আমরা দুজনেই বেশ গোলাপী চোখে বক্সে' থাকবো আর এদেশে যাকে lovey dovey বলে, সেই রকম, জোটের পায়রা দুটির মত আচরণ করবো।"

সত্যবাবু বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু ছেলে বেটা যদি তাই দেখে ক্ষেপে ওঠে—একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে?"

দত্ত বলিল, "যদি ছুটে গিয়ে, ছুঁড়ির গলায় হাত দিয়ে গর্জ্জন করে' ওঠে—'রোহিণী।—আমি তোমাব যম!"—এই ভয় করছ তুমি?"

"হ্যাঁ, ঐ রকম।"

দত্ত, সত্যবাবুর বাহুতে করাঘাত করিয়া বলিল, "কোনও চিন্তা নেই দাদা! এ

প্রসাদপুরের মাঠ নয়—এখানে গোবিন্দলালের অভিনয় করবার চেষ্টা করলেই, লণ্ডন-পুলিস অমনি মজাটি দেখিয়ে দেবে বাছাধনকে!”

প্রচুর পরিমাণে হুইস্কি টানিয়া, চেক লইয়া দত্ত প্রস্থান করিল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় হাইড্ পার্কে নোরার সঙ্গে দেখা হইলে সুধা বলিল, ‘নোরা, মস্ত খবর। গতকল্য বাবা হঠাৎ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন; আজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, ‘সে মেয়েটিকে একবার নিজের চক্ষে না দেখিয়া কি করিয়া তোমাদের বিবাহ অনুমোদন করি বল? তাই চলিয়া আসিলাম।’—কাল কখন তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করিবে বল দেখি?”

নোরা বলিল, “তাই ত প্রিয়তম,—বড় মুস্কিল হইল যে! নটিংহাম হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমার খুড়া অত্যন্ত পীড়িত। তাই কাল শনিবার আপিসের পর ২টার গাড়ীতে আমি নটিংহাম যাইব স্থির করিয়াছি। খুড়াকে দুই দিন একটু সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসি, উইলে আমায় কিছু দিয়াও যাইতে পারেন।”

“সোমবার প্রাতে আসিয়া আবার আপিস করিব। শনি রবি এই দুইটি দিন কেবল তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ।”

“আচ্ছা, যদি না গেলেই নয়, তবে যাইও। সোমবারে এইখানে আবার দেখা হইবে ত?”

“হ্যাঁ, তা হইবে বইকি। পাপা’র সঙ্গে দেখা করা সম্বন্ধে, সোমবারেই তোমাতে আমাতে পরামর্শ হইবে।”

কিছুক্ষণের কথাবার্ত্তার পর, পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিল। পার্কের বাহির হইয়া, যে পাড়ায় নোরা থাকে, সেই দিকের অম্‌নিবাসে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া সুধা অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিল। নোরা কিন্তু কিয়দ্দুব মাত্র গিয়া, সে গাড়ী হইতে নামিয়া, ট্যাক্সি লইয়া সোজা নবাব সাহেবের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পর, নবাব সাহেবের পোষাক কামরায় গিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, সান্ধ্যবেশ ও নবাবার্জ্জিত নকল হীরা মুক্তার অলঙ্কারগুলি পরিয়া, নবাবসাহেবের সহিত ভোজনে বসিল। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্রেই সে, ‘বড় ক্ষুধা পাইয়াছে’ ‘বড় ঘুম পাইতেছে’ ইত্যাদি অছিলায় হাইড্ পার্কে সুধার নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিয়া, নিজ বাসায় ফিরিবার নাম করিয়া এইখানে আসিয়া রাজভোগে পানাহার করে এবং কথায় বার্ত্তায় অধিক রাত্রি হইয়া গেলে, সব দিন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াও ঘটে না।

শনিবার দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সত্যবাবু পুত্রের নিকট থিয়েটারে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সুধা ভাবিতেছিল, নোরা সহরে নাই, কেমন করিয়া আজ সন্ধ্যা কাটিবে! পিতার এ প্রস্তাবে সে যে বাঁচিয়া গেল।

যথাকালে, সত্যবাবু, পুত্রসহ অ্যাপলো থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধগিনি মূল্যের এক একখা[illegible]কিট ও ছয় পেনি মূল্যের একখানি প্রোগ্রাম কিনিয়া ষ্টলে গিয়া তাঁহারা আ[illegible] গ্রহ[illegible] [illegible]লেন। ১৫/২০ মিনিট পরে, অভিনয় আরম্ভের জন্য আলোক নির্ব্বাপিত হইল। প্রায় সেই সময়েই, দ্বিতলের চার-গিনি বক্সখানিতে, কাহারা প্রবেশ করিল, সুধাংশু [illegible]াল দেখিতে পাইল না।

[illegible]ম [illegible]ঙ্ক শেষ হইলে, সুধাংশু সেই বক্সের পানে চাহিয়া দেখিল, মহার্ঘ্য বসনভূষণে [illegible] কোনও সুন্দরী, একজন ভারতীয় যুবাপুরুষের পার্শ্বে বসিয়া হাস্যপরিহাস [illegible]তেছে। এই যুবককে সে পান্নাগড়ের নবাব বলিয়া চিনিতে পারিল, পূর্ব্বে ২/১ বার দূর হইতে ইহাকে দেখিয়াছিল। প্রথমটা সুধাংশুর চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছিল, নোরাকে সে চিনতে পারে নাই। তারপর সে বুঝিতে পারিল, ঐ তরুণী ত আর কেহ নয়, তাহারই সাধের প্রণয়িনী নোরা!

দেখিয়া, সুধার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বলিল, “বাবা, বড় গরম, আমি বাইরে থেকে

আসি।"—বলিয়া থিয়েটারের বার্-এ গিয়া, এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি লইয়া, চোঁচোঁ করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

ফিরিয়া আসিয়া সে আবার পিতার পার্শ্বে বসিল, কিন্তু অভিনয়ের এক অক্ষরও আর তাহার কানে গেল না। আলো জ্বলিলেই, সেই বক্সের পানে আবার চাহিয়া রহিল। দুইজনে হাসি গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সোহাগে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে—রীতিমত "লভ ডভি" অবস্থা! সত্যবাবুও মাঝে মাঝে আড়চোখে সেই বক্সের পানে চাহিতেছিলেন। সুধাংশু কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। সত্যবাবু বলিলেন, "তোমার কি শরীর ভাল নেই, অসুখ করছে? বাড়ী যাবে?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

রাত্রি ক্রমে ১১টা বাজিল, অভিনয় শেষ হইল। অন্যান্য দর্শকগণের সঙ্গে ইহারাও পিতাপুত্রে বাহির হইল। ভেষ্টিবুলে আসিয়া সুধা বলিল, "বাবা, এইখানে একটু দাঁড়ান, আমি শীগ্‌গির আসছি।"—বলিয়া সে রাস্তার ধারে নামিল।

ঐ অদূরে পেভ্‌মেণ্টের উপর, কারের অপেক্ষায় নবাব সাহেবের বাহু অবলম্বন নোরা দাঁড়াইয়া। সুধা হন হন করিয়া তথায় গিয়া, উত্তেজিত ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "নোরা, নটিংহাম যে লণ্ডনের এত কাছে তাহা জানিতাম না। কখন ফিরিলে? খুড়াটি কেমন আছে বল দেখি!"

নোরা মহা বিপদে পড়িল। পান্নাগড়ের রাণী হইবার আশাও সে মনে পোষণ করে; কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না বলিয়া, সুধাংশুকে সে হাতছাড়া করে নাই। এখন একুল ওকুল দুই কূল যাইবার দাখিল। সুতরাং সে নবাব-কূল বজায় রাখিবার আশায়, মস্তক উত্তোলন করিয়া উদ্ধত স্বরে বলিল, "Sir, I didn't know you." (মহাশয় আমি আপনাকে চিনি না।)

সুধা ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "বটে! কবে থেকে, প্রেয়সী?"

নবাব সাহেব বলিয়া উঠিলেন, How dare you insult the future Ranee of Pannagarh!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণমূলে ধাঁ করিয়া এক ঘুষি!

ঘুষি খাইয়া সুধা ঠিকরাইয়া কয়েক পা হটিয়া গেল। আহত স্থানে হাত দিয়া, পুলিস পুলিস বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পথচারী দুই চারিজন লোক, গোড়া হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রকাশ্যভাবে একজন মহিলার এই অপমানে তাহারা আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল, "Serve you right, young man!" গোলমাল শুনিয়া, একজন পুলিস কনষ্টেবলও ছুটিয়া আসিল। লোকের নিকট ব্যাপার অবগত হইয়া সুধার স্কন্ধে তাহার সেই স্থূল হস্ত অর্পণ করিয়া বলিল, "Off with you druken nigger. Think twice, before you insult an English lady again."—হট্ যাও মাতাল কালা আদমি! ভবিষ্যতে একজন ইংরাজ রমণীকে অপমান করিবার আগে, বেশ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিও।—বলিয়া সুধাংশুকে এক ধাক্কা দিল।

সত্যবাবু নিকটেই ছিলেন। পুত্রকে লইয়া তাড়াতাড়ি ক্যাবে তুলিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে, নোরার বিশ্বাসঘাতকতার কথা পিতাকে বলিতে বলিতে, সুধা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। একে কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী সন্তান, তার উপর মদের নেশা! সত্যবাবু পুত্রকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ওদিকে রোলস্ রয়েস্ কারে বসিয়া "নবাব" নেকু সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে, প্রিয়তমে?"

নোরা বলিল, "কে জানে কে! একদিন আমাদের ব্যাঙ্কে একখানা চেক ভাঙ্গাইতে

গিয়াছিল, সেই সময় আমি উহাকে সাহায্য করি। সেই অবধি ও আমার পিছু লইয়াছে, নানাভাবে আমায় জ্বালাতন করে।"

"তাই নাকি? বদমাস্! এবার বোধ হয় উহার শিক্ষা হইবে।"

"হওয়া ত উচিত।"—বলিয়া নোরা নীরব হইল।

পরদিন রবিবার। সত্যবাবু পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, তুমি মনে বড়ই আঘাত পেয়েছ। আমি বলি কি আমার সঙ্গে দেশে চল। সেখানে কিছুদিন থাকলে, তোমার মনটা আবার সুস্থ হবে।"

সুধাংশু সহজেই সম্মত হইল। সোমবার প্রাতে পিতাপুত্রে টমাস কুকের বাড়ী গিয়া জানিলেন, অদ্য রাত্রে লণ্ডন হইতে ট্রেনে চড়িলে, মার্সেল্‌স্ বন্দরে ভারতগামী একখানি ফরাসী জাহাজ ধরা যাইবে। সত্যবাবু দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া আনিলেন।

অবসর মত সত্যবাবু দত্তসাহেবের সহিতও দেখা করিলেন। তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন; টাকাকড়িও বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আহা, ছেলেটাকে অমন করে' ঘুষি মারাটা তোমার ভাল হয়নি কিন্তু।"

দত্ত বলিল, "দাদা যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল নইলে চলবে কেন? ঐ মুষ্টিযোগটুকু না হলে কি আর বাবাজী অমন লক্ষ্মীটির মত তোমার সঙ্গে বাড়ী যেতে রাজী হতেন? ভাল পরামর্শই হযেছে—আজ রাত্রেই সরে পড়। দেশে গিয়েই, একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বাবাজীব বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর তাকে বিলেত মুখোও হ'তে দিও না।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আবার নেড়া বেলতলায় যায়! এখন, তুমি কি করবে বল? কবে দেশে ফিরবে?"

"হপ্তাখানেক পরেই। আসছে মেলে, আমিও আমার হবু রাণীটিকে কদলী প্রদর্শন ক'রে—চম্পট পরিপাটি দেবো আর কি!"

"হ্যাঁ, বেশী দেরী করো না।"—বলিয়া সত্যবাবু উপকারী বন্ধুব সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ কবিলেন।

কালিদাসের বিবাহ

(পশ্চিমাঞ্চলের কিংবদন্তী)

[বাঙ্গালা দেশে কালিদাসের বিবাহ সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—গৌড়াধিপতি মাণিকেশ্বরের রত্নাবতী নাম্নী অত্যন্ত রূপবতী ও বিদুষী এক কন্যা ছিলেন। বিচারে যিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন, তাঁহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিবেন রত্নাবতী এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা বিচারে হারিয়া ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই মহামূর্খকে আনিয়া রাজকন্যার সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। তদনুসারে তাঁহারা অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, দেশভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি গাছের ডালে বসিয়া সেই ডাল কাটিতেছে, সুতরাং তাহাকেই তাঁহারা আদর্শ মূর্খ স্থির করিয়া গৌড়ে লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে রাজকন্যাকে বিচারে পরাস্ত করাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দেওয়াইলেন। এই বরই ভবিষ্যতের কবি-বর কালিদাস। ফুলশয্যার রাত্রেই রাজকন্যা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বরটি কত বড় মূর্খ—ক্রোধে তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। অপমানিত কালিদাস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অরণ্যমধ্যে মায়াবেশধারিণী দেবী সরস্বতীর দর্শন পাইলেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া, অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী ভিন্ন রূপ; নিম্নে আমরা গল্পাকারে তাহা প্রকাশ করিলাম।]

পুরাকালে বঙ্গদেশে সত্যবান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাঁহার নাম চম্পক-কলিকা। মেয়েটি বড়ই সুন্দরী—তাঁহার রঙটি যেন চাঁপাফুলের কুঁড়ির মত, সেইজন্যেই তাহার ঐরূপ নামকরণ হয়। মা-বাপে, কখনও তাহাকে 'চম্পা', কখনও বা শুধু 'চাঁপা' বলিয়া ডাকিতেন।

চাঁপা জন্মিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রাজার প্রধানমন্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল—তাহার নাম চূড়ামণি। প্রধানমন্ত্রীর দাসী, চূড়ামণিকে কোলে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া যাইত; রাণীমা ছেলেটিকে কোলে করিতেন, সন্দেশ খাইতে দিতেন।

ক্রমে চম্পা বড় হইল। তখন চূড়ামণি রাজবাড়ী গিয়া চম্পাকে কোলে করিত; তাহার সহিত খেলা করিত। চাঁপা আধ-আধ কথায় তাকে "চূলো দাদা' বলিয়া ডাকিত।

ক্রমে চাঁপা আরও বড় হইল। রাজা তাহাকে পাঠশালায় পড়িতে পাঠাইলেন। চাঁপার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া গুরু মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। অন্য পড়ুয়ারা বলিতে লাগিল—"তা হবে না? হাজার হোক রাজার মেয়ে ত!"

চূড়ামণিও সেই পাঠশালায় পড়িত; কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার তাদৃশ মন ছিল না। চাঁপা যখন পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়, চূড়ামণি সে সময় অনেক উপরে পড়িত; কিন্তু দুই তিন বৎসর মধ্যেই চাঁপা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে ছাড়াইয়া গেল। ইহাতে চূড়ামণি মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল বটে, কিন্তু চাঁপার সহিত ছেলেবেলা হইতে তাহার যেমন ভাবটি ছিল, তাহার খর্ব্বতা হইল না। চাঁপা কিন্তু মনে মনে বলিত—"ঐ চূড়োদাদা ভারি গাধা!"

চূড়ামণি ছেলেটি দেখিতে কিছু মন্দ ছিল না—তবে রঙটি তাহার শ্যামবর্ণ। রাজকন্যা আড়ালে বলিত—"মাগো—কি কালো!" তাহার আর একটু দোষ ছিল—সে একটু তোৎলা। তবে সাধারণতঃ তাহাব তোৎলামি বড় জানা যাইত না—রাগিলেই তাহা বৃদ্ধি পাইত। চম্পা মাঝে মাঝে "চুড়োদাদার" অসাক্ষাতে তাহার তোৎলামিকে ভেঙ্গাইয়া আনন্দ পাইত।

।। দুই ।।

রাজকন্যার বয়স তখন নয় কি দশ, চূড়ামণির বয়স চৌদ্দ বৎসর। একদিন পাঠশালার পর রাজোদ্যানে চাঁপা ও চূড়ামণি খেলা করিতেছিল—রাজকন্যার দাসী সে সময়টা কোথায় গিয়াছিল; চূড়ামণি রাজকন্যাকে বলিল, "চাঁপা, তুই আমায় বিয়ে করবি?"

কথাটা শুনিবামাত্র চন্‌ করিয়া রাজকন্যার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বললে চূড়ামণি?"—বিরক্ত হইলে, সে আর 'চূড়োদাদা' বলিত না।

চূড়ামণির বুদ্ধিটা কিছু মোটা;—চাঁপা যে তাহাকে 'চূড়ামণি' বলিল, তাহা সে অত খেয়াল করিল না। ভাবিল, রাজকুমারী বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। তাহা সে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিয়া বলিল, "চাঁপা বলি শোন্‌—যদি আমাকেই বিয়ে করতে তোর ইচ্ছা হয়, তবে এক কাজ করিস।"

চাঁপা তাহার রাগের কোনও লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া বলিল, "কি কাজ?"

"তুই যখন বড় হবি, তোর বাবা এখানে সেখানে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করবেন, সেই সময় তুই তোর বাবাকে বলিস—আর যদি বাবাকে বলতে লজ্জাই করে—তোর মাকেই বলিস না হয়, যে মাম আমার অন্য কোথাও সম্বন্ধ কোর না; আমি ঐ চূড়োদাদাকেই বিয়ে করব। তা' হলেই বুঝেছিস, আমার সঙ্গেই তাঁরা তোর বিয়ে দিয়ে দেবেন? সে বেশ মজা হবে—না ভাই? কি বলিস, তোর মন আছে?"

চাঁপা আর রাগ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "চূড়ামণি, তোমার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়!" চূড়ামণি একথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। রাজকন্যার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন? আস্পর্দ্ধাটা কি হল?"

চাঁপা বলিল, "তোমার বাবা আমার বাবার চাকর, তুমি চাও আমায় বিযে করতে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! আমি হলাম রাজার মেয়ে, আমার বিয়ে হবে মস্ত বিদ্বান রূপবান কোন রাজপুত্রের সঙ্গে! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে? বলতে লজ্জা কবে না?"

এই কথা শুনিয়া চূড়ামণিরও রাগ হইয়া পড়িল। বলিল, "ওঃ—রাজপুত্তুব বি-বিয়ে করবে তুমি? বটে! বলি, কোন্‌ রাজপুত্তুরকে বিয়ে করবে বল দেখি? কা-কা-কার কপাল ফিরল?"

চাঁপা বলিল, "সে, যার সঙ্গে যার ভবিতব্যতা আছে, তার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কিন্তু তোমার মুখে এ ব্যঙ্গ শোভা পায় না চূড়ামণি! যারা চাকর-বাকর, তারা চাকর-বাকরের মত থাকলেই ভাল হয়।"—বলিতে বলিতে চম্পার মুখখানি রাঙা চক্‌চক্‌ করিযা উঠিল।

চূড়ামণি বলিল, "আ-আমার মত সুপাত্র তোমার অদৃষ্টে নেই; কাজেই দু-দুষ্টু সরস্বতী তোমার স্কন্ধে ভর করে' তোমার মু-মুখ দিয়ে ঐ সকল কথাগুলো বলালেন। নি-নি-নি-নিজের পায়ে নিজে কেউ কুড়ুল মারলে, অন্য লোকে আর কি-কি-কি করবে বল! আমি বুঝি হলাম চাকর-বাকর! বলি রা-রাজকন্যে, তো-তোমার বাবার এই রা-রাজ্যটা চালাচ্চে কে? সে খবর রাখ কি? তোমার বাবার ত ভারি মুম্মু-মুরুদ কিনা?—আমার বাবা না থাকলে, এ রাজ্য যে এতদিন কবে লো-লো-লোপাট হয়ে যেত! তোমার বিয়ের স-স-সময় হলে, তোমার বাবা ত আমার বাবাকেই পা-পা-পা-পাত্র খুঁজে আনতে বলবেন!—তুমি দেখো তখন কেমন এক পা-পাত্র নিয়ে আসি তোমার জন্যে। এর শোধ সেই সময় যদি না তুলি, তবে আমার নাম চু-চূ-চূড়ামণিই নয়!"

রাজকন্যা ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল, "কি শোধটা তুলবে চূড়ামণি?"

চূড়ামণি ইহাতে আরও চটিয়া বলিল, "কি শোধটা তু-তুলব, শুনবে তুমি?—আজ থেকে আমার এই পি-পি-পিতিজ্ঞে রইল, একজন আকাট গ-গণ্ডমুখ্যু গরীবকে এনে

তোমার সঙ্গে বি-বিয়ে দেওয়াব তবে ছাড়ব। তা-তা যদি আমি পারি, তু-তু-তুমি ছুরি দিয়ে আমার এই দে-দে-দেওয়ালে পে-পে-পেরেক পুঁতে টা-টা-টাঙ্গিয়ে রেখ।"

চাঁপা ওষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত করিয়া বলিল, "যে লম্বা লম্বা কান, দেওয়ালে টাঙ্গালে মেঝেয় লুটোবে যে!"

"আ-আ-আমার কা-কা"—করিয়া চূড়ামণি কি বলিতে যাইতেছিল। তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া, বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে চাঁপা তথা হইতে চলিয়া গেল।

॥ তিন ॥

বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে লাগিল। রাজকন্যা অন্তঃপুরচারিণী হইলেন, চূড়ামণির সহিত আর তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অন্তঃপুরেই তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বালিকা ক্রমে নব যুবতী হইয়া উঠিলেন।

চূড়ামণি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে; সে এখন তাস-পাসা খেলিয়া, গুড়ুক ফুঁকিয়া, আড্ডা দিয়া বেড়ায়। রাজকন্যা সে বাল্য কলহ বহুকাল বিস্মৃত হইয়াছেন—কিন্তু চূড়ামণি তাহা মনে পুষিয়া রাখিয়াছে।

রাজা সত্যবান একদিন তাঁহাব প্রধানমন্ত্রীকে ডাকিযা, কন্যার জন্য একটি যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

মন্ত্রী গৃহে আসিয়া পুত্রের নিকট রাজাদেশের কথা জানাইযা বলিলেন, "পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল, রাজার ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য দেশে দেশে ভাট পাঠান হত। ইনি ভাট না পাঠিয়ে আমাকেই যেতে হুকুম করলেন! আমাব একে এই বুড়ো বয়স, তায় অম্বলেব ব্যারাম, সাত দেশে ঘুরে বেড়াবার এই কি আমাব বয়স? রাজাব যেমন কাণ্ড!"—বলিয়া বৃদ্ধ মুখখানি অত্যন্ত কাতর করিয়া রহিলেন।

চূড়ামণি বলিল, "ঠিক কথাই ত বাবা! আপনি বুড়ো হযেছেন, এখন কি আর দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো আপনার পোষায়? আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমিই ববং যাই, ভাল দেখে একটি পাত্র খুঁজে আনি।"

মন্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, তবে রাজাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কবি।"

রাজা সত্যবান এ প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছ। তুমি গেলে এ রাজ্য চালায় কে? তা বেশ ত, চূড়ামণিই যাক। চম্পার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ওর ভাব—দুটিতে ভাইবোনের মত খেলা কবেছে। ও নিশ্চয খুব ভাল পাত্রই আনবে।"

চূড়ামণি রাজাজ্ঞা পাইয়া, চম্পার জন্য বর খুঁজিতে বাহিব হইল। দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, একজন আদর্শ মূর্খের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেক দিন কাটিল, কিন্তু মনের মতনটি কাহাকেও পাইল না।

অবশেষে একদিন এক বনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে, চূড়ামণি দেখিল, গলে যজ্ঞোপবীত, সুন্দর সুগঠিত দেহ এক যুবক বৃক্ষেব শাখায় বসিয়া সেই শাখারই মূলদেশ কর্ত্তন করিতেছে। দেখিয়া চূড়ামণি উল্লসিত হইযা উঠিল। মনে মনে বলিল, "হাঁ—এই উপযুক্ত পাত্র বটে। রাজকন্যের জন্যে বর খুঁজতে বেবিয়ে অনেক মুর্খই দেখলাম, কিন্তু এটির মত কেউ নয়।"

যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে, এস এস নেমে এস;—একটা কথা বলি শোন।"

যুবক নামিয়া আসিয়া চূড়ামণির পানে হাঁ করিযা চাহিয়া রহিল।

চূড়ামণি জিজ্ঞাসা করিল, "গাছের ডালটি কাটছিলে কেন?"

"আমার কাঠের দরকার।"

"কাঠ কি হবে?"

"কাঠ আবার কি হয়? উনুনে দিয়ে রান্না করতে হয়!"

চূড়ামণি বলিল, "হেঁ হেঁ—তাও ত বটে! তোমার নাম কি হে ছোকরা?"

যুবক বলিল, "কালিদাস!"

"কালিদাস? বেশ বেশ। কি জাত? গলায় ত পৈতে দেখছি, ব্রাহ্মণ বুঝি?"

"এজ্ঞে।"

"কি কর? পড়াশুনো কিছু কর?"

"এজ্ঞে পাঠশালায় একবার ভর্ত্তি হয়েছিলাম। গুরুমশাই বড্ড মারে তাই ছেড়ে দিয়েছি।"

চূড়ামণি বলিল, "বেশ বেশ। তোমাদের বাড়ি কোথায়? বাপের নাম কি?"

উত্তরে যুবক নিজ পরিচয় দিল। নিকটেই গ্রামে বাড়ী, বাল্যকালেই পিতৃমাতৃবিয়োগ হইয়াছে, লেখাপড়া সে কিছুই শেখে নাই—শিখাইবেন বা কে? গ্রামের লোকের গরু চরাইয়া দিনপাত করে। বিবাহ হয় নাই।

চূড়ামণি মনে মনে বলিল, "ছেলেটির যে রকম ভাল চেহারা, একে যদি আমি রাজপুত্র বলে চালিয়ে দিই ত হঠাৎ কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।"

যুবক বলিল, "এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য গাছ থেকে আমায় নামালে? না, আর কোনও কথা আছে?"

চূড়ামণি বলিল, "আছে। বিয়ে করবে?"

"কাকে?"

"আমাদের রাজার মেয়েকে?"

"রাজার মেয়ে? তা মন্দ হবে না। আমরা কিন্তু কুলীন; কি পাব?"

"ধন দৌলত ঢের পাবে। যত চাও।"

যুবক একটু ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "সে যেন হল। কিন্তু মেয়েটি কেমন?

"পরমা সুন্দরী। রাজার মেয়ে, বুঝছ না! গায়ের রঙটি যেন চাঁপা ফুলের মত। মুখখানি যেন পূর্ণিমার চাঁদ। যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি ঠোঁট—একেবারে পরী হে পরী! করবে বিয়ে?"

যুবক সোল্লাসে বলিল, "করব। কোথা সে মেয়ে?"

"আমার সঙ্গে এস তবে"—বলিয়া চূড়ামণি কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাজধানীর পদতলবাহিনী নদীতীরে পৌঁছিয়া চূড়ামণি কালিদাসকে সেই নদীতে স্নান করাইয়া, উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, নিকটস্থ এক মন্দিরে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি এখানে চুপটি করে বসে থাক। আমি সহরে গিয়ে তোমার জন্যে হাতীঘোড়া লোকলস্কর সব পাঠিয়ে দিচ্চি—তুমি যেও। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই, কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশী কোয়ো না—খুব গম্ভীর মেজাজে বসে থাকবে। বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া কালিদাস সেখানে বসিয়া রহিলেন। চূড়ামণি নগরে গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল, "মগধ দেশের যুবরাজকে পাত্র স্থির করে, তাঁকে নিয়ে এসেছি। অমুক মন্দিরে তিনি অপেক্ষা করছেন—তাঁকে আনবার জন্যে হাতীঘোড়া লোকলস্কর পাঠিয়ে দিন।"

এ সংবাদে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। বর আসিলে সকলেই দেখিল—অতি সুন্দর যুবাপুরুষ—রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র বটে।

চারি দিবস ব্যাপিয়া "লগন্" উৎসব চলিল। চম্পক-কলিকা ইতিমধ্যে বর দেখিবার জন্য গোপনে এক দাসী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বর অত্যন্ত সুপুরুষ শুনিয়া তিনিও খুসী হইলেন। পঞ্চম দিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

রজনীতে কালিদাস শয়নমন্দিরে নীত হইলেন। সুবর্ণময় পালঙ্কে পুষ্পসুকোমল শয্যায় শয়ন কবিবামাত্র, তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকন্যা সোনার থালায় কবিয়া "পঞ্চারতি" লইয়া প্রবেশ করিলেন।

বরকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। জাগাইবার অভিপ্রায়ে, মল ঝম্‌ঝম্ কবিয়া এদিক ওদিক একটু বেড়াইলেন; কিন্তু বরের ঘুম ভাঙ্গিল না। রাজকন্যা তখন বরের নাসিকার নিকট সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ধরিলেন—তাহাতেও বব জাগিল না। তাহার পর, গোলাপপাশ লইয়া সুশীতল গোলাপজল বরের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন—তাহাতেও কোন ফল হইল না। বর না জাগিয়ে "পঞ্চরতি"* করিবেন কেমন করিয়া? তাই লজ্জার মাথা খাইয়া, ববের গায়ে হাত দিযা তিনি ডাকিতে লাগিলেন—"ওগো—শুনছ?"

কেই বা শোনে!—কালিদাস গভীর নিশ্বাস লইতে লইতে আরামে নিদ্রা যাইতেছেন।

রাজকুমারী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এই কি মগধের বাজপুত্র!—এ ত বাপের জন্মে ভাল বিছানায় শোয়নি বলে বোধ হচ্চে।"—মনে মনে তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি পালঙ্ক হইতে নামিয়া, বরের হাত ধরিয়া সবলে এক 'হেচকা টান' মারিলেন।

কালিদাস উঠিয়া বসিলেন। রাজকুমারীর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিযা তাঁহার ভয় হইল। বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! এটা আপনাব বিছানা বুঝি? আমি ভুলে এখানে এসে শুয়েছি বুঝি? আমায় মাফ করুন, আমি ত জানতাম না; রাজভৃত্যেরা বললে, তাই এখানে শুলাম। আমি এখনি চলে যাচ্চি।" ক্রোধে রাজকন্যাব বাক্যস্ফূবণ হইল না। হস্তদ্বাবা ইঙ্গিতে তিনি কালিদাসকে যাইতে নিষেধ করিলেন। ক্রোধ কিয়ৎ পবিমাণে প্রশমিত হইলে বলিলেন, "ভুল করনি—এ তোমারই শয্যা বটে। আমায 'আপনি আপনি' বোলো না—আমি তোমার স্ত্রী। চোখের ঘুম ছাড়লো? একটু বেড়াবে এস না।"

সে সমস্ত মহলটাই বাজকন্যাব—সে বাত্রে সেখানে আব জনপ্রাণী নাই। রাজকন্যা প্রথমে স্বামীকে স্বীয পাঠমন্দিবে লইযা গেলেন। তথায় কাব্য অলঙ্কার পুরাণ ইতিহাস নানা গ্রন্থ বক্ষিত আছে—তাহাব মলাটগুলি সোনা রূপাব পাতে মোড়া; হীবা মোতি চুনী পান্না খচিত। কালিদাস একখানি পুঁথি তুলিয়া লইযা বলিলেন, "এটা কি গো? বেশ চক্‌চক্ করছে ত!"

রাজকন্যা বলিলেন, "ও একখানি কাব্য।"

কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাব্য কি? এতে কি হয?"

বাজকন্যা বলিলেন, "পড়তে হয়।"

কালিদাস বলিলেন, "পড়তে হয? ওঃ—বুঝেছি—ক-খ'র বই। আমি ছেলেবেলায় ক-খ শিখেছিলাম, এখন ভুলে গেছি।"

বাজকন্যা কোনও উত্তর না দিয়া, বিরক্তিভবে কক্ষান্তবে চলিলেন। কালিদাসও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি যাহা দেখেন, তাহারই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন—"এটা কি গো? এতে কি হয়? রাজকন্যা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই মগধের রাজপুত্র! যাহা দেখিতেছে, সবই ইহার পক্ষে নূতন? জীবনে এ কি কিছুই দেখে নাই?"

পবে রাজকন্যা চিত্রশালায় প্রবেশ করিলেন। বড় বড় চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত রামায়ণ মহাভারতাদির নানা চিত্র তথায শোভা পাইতেছে। কালিদাস যে ছবিই দেখেন, তাহারই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবেন—"এটা কি গো?"—রামাযণ মহাভাবতের কোন চিত্রই কালিদাস চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে নবদম্পতি একখানি বৃন্দাবন-চিত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বসিয়া রাধিকার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন—কিয়দ্দূবে বড় বড় গরু চরিতেছে। এই প্রথম কালিদাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, বলিতে লাগিলেন—"আহা!—কিবে গাইগুনি! কিবে বাঁট!- আঃ, ইচ্ছে করছে একটা বোক্‌নো নিয়ে চ্যাক্‌চোক্ করে দুধ দুই।"

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুধ দুইতে জান নাকি?"

কালিদাস বলিলেন, "তা আর জানিনে!—গরু চরিয়ে আর দুধ দুয়েই ত এত বড়টা হলাম।" রাজকুমারী বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। কৌশলে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাসের জন্মেতিহাস, চূড়ামণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন—সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, ললাটে করাঘাত করিয়া নিকটস্থ পর্য্যাঙ্কপ্রান্তে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তখন সহসা সেই বাল্যকালের কথা—চূড়ামণির সহিত কলহ—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বুঝিলেন, চূড়ামণিই তাঁহার এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে রাজকন্যা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল—এই মূর্খ বর্ব্বরের সঙ্গে চিরজীবন কি করিয়া আমি কাটাইব!

অদূরে ভিত্তিগাত্রে একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল, সেই দিকে হঠাৎ রাজকন্যার দৃষ্টি পড়িল। চক্ষের পলকে তিনি উঠিয়া সেই তরবারি গ্রহণ করিয়া, কালিদাসের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন।

কালিদাস দুই লম্ফে পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "এ কি! আমায় কাট কেন?"

রাজকন্যা প্রবলভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "তোমার হাঁত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে।"

কালিদাস বলিলেন, "বাঃ—মজাব লোক তুমি! আমি মরলে তুমি বিধবা হবে না?"

"বিধবা হব সেও ভাল। সারাজীবন তোমায় নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে, বিধবা হয়ে থাকাও ভাল।"

কালিদাস বলিল, "কেন, আমায় নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে কেন? আমার অপরাধ?"

রাজকন্যা বলিল, "তুমি যে মূর্খ!"

কালিদাস বলিলেন, "ওঃ—আমি মূর্খ, তাই তোমার যোগ্য নই? বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি আমায় প্রাণে মেরো না। আমায় যদি তুমি সহ্য করতে না পার, আমি চলে যাচ্চি।"

রাজকুমারী ঝনাৎকারের সহিত তরবারি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যাও—দূর হয়ে যাও।" তাঁহাব গ্রীবা উন্নত, বক্ষ ঘন ঘন স্ফীত হইতেছে, দুই চক্ষু দিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা উছলিয়া পড়িতেছে।

কালিদাস তৎক্ষণাৎ রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

রাজপথগুলি অতিক্রম করিয়া, রাজধানীর বাহির হইয়া, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, কালিদাস সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। রাজধানী হইতে কিছু দূরে এক অরণ্য ছিল। কালিদাস ভাবিলেন—"লোকালয়ে মুখ দেখাইবার আমার আর প্রয়োজন নাই। বনের মধ্যেই প্রবেশ করি, বাঘে ভালুকে আমায় খাইয়া ফেলুক সেই ভাল। স্ত্রী যাহাকে মূর্খ বলিয়া কাটিতে যায়, তাহার জীবনে ধিক্! বাঁচিয়া থাকাব চেয়ে মরিয়া যাওয়াই তাহার শতগুণে ভাল।"—অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কালিদাস ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঘ ভালুকের সাক্ষাৎ পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। জঙ্গলের ফল খাইয়া, গাছতলায় শুইয়া, কয়েকদিন কাটাইলেন।

এইরূপে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিদাস একদিন কালীচন্দ্র নামক এক যোগীপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। কালিদাসের সেবায় ও স্তবস্তুতিতে যোগী প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস নিজ ইতিহাস—বিবাহ, স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত হওয়া প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি মহামূর্খ। আমার মূর্খত্ব কিসে ঘুচে, আমায় তাহা বলিয়া দিন।"

যোগীপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া, ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই অবগত হইলেন। ধ্যানভঙ্গে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি বনে আসিয়াছিলে বাঘে তোমায় খাইয়া ফেলুক এই মনে করিয়া। বাঘের সাধ্য কি! পৃথিবীতে তুমি অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে। এই নশ্বর জীবনান্তে, যশঃশরীরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে। বনের বাঘের কথা কি বলিতেছ, কালরূপী মহাব্যাঘ্রও তোমায় খাইতে পারিবে না। ঐ সরোবরে তুমি স্নান করিয়া এস, আমি তোমায় রবি-মন্ত্র দিতেছি। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া সেই মন্ত্র একাগ্রচিত্তে জপ কর—তোমার উপর দৈবকৃপা বর্ষিত হইবে।"

কালিদাস স্নান করিয়া আসিয়া, রবি-মন্ত্র গহণান্তর জপ করিতে বসিলেন।

ক্রমে রাজধানীতে সংবাদ পৌঁছিল বনমধ্যে কালীচন্দ্র নামে এক মহাযোগীব আবির্ভাব হইয়াছে। দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে আসিতে লাগিল।

কালিদাসের মন্ত্র জপের শেষ দিন, রাজকন্যা চম্পক-কলিকাও সখিগণ সহ যোগীদর্শনে আসিলেন। যোগী তখন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, কালিদাস বসিয়া মন্ত্রজপ করিতেছিলেন। জপের নির্দ্দিষ্ট কাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু অধিক বিলম্ব ছিল না।

রাজকন্যা সখিগণ সহ আশ্রমের অদূরে দাঁড়াইয়া, জপনিরত যুবকটিকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তখন কবিত্বপ্রভা স্ফূরিত হইতেছে—রাজকন্যা তাঁহাকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না।

সেদিন বড় গরম। কোথাও গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। গ্রীষ্মবোধ করিয়া রাজকন্যা সখিগণ সহ অল্পে অল্পে সবোবরের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। দেখিলেন, জলে অনেকগুলি পদ্মফুল—কোন্‌টি কলিকা—এখনও ফুটে নাই, কোনটি ফুটিয়া আছে, কোনটি গতকল্যকার বাসি ফুল—মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

রাজকন্যা দেখিলেন, সেইরূপ একটি মুদ্রিতদল পদ্ম ধীবে ধীরে দুলিতেছে। ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি সখিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অনিলস্য গমো নাস্তি দ্বিপদো নৈব দৃশ্যতে।
জলমধ্যে স্থিতং পদ্মং কম্পিতং কেন হেতুনা।

—"বাতাস নাই, কোন পাখীও দেখিতেছি না (যে বলিব, হয়ত পদ্মের উপর বসিয়াছিল, এইমাত্র উড়িয়া গিয়াছে, তাই দুলিতেছে) তবে জলমধ্যে স্থিত পদ্মটি কাঁপিতেছে কেন?"

সখিগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল—কেহই রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

কালিদাসের জপকাল কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। রাজকন্যার শ্লোকটি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই বাজকন্যাকে চিনিতে পারিলেন।

সখীরা কেহ কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া কালিদাস বলিলেন—

পাবকোচ্ছিষ্টবর্ণস্য শর্ব্বর্য্যাং বন্ধং কৃতং।
মোক্ষং ন লভতে কান্তে কম্পিতং তেন হেতুনা।।

—"হে কান্তে, অগ্নির উচ্ছিষ্ট (অর্থাৎ কালো) বর্ণ যার, তাকে (অর্থাৎ ভ্রমরকে—পদ্ম) রাত্রিকালে (মুদ্রিত হইয়া) বন্ধন করিয়াছে, (ভ্রমর বাহির হইবার জন্য ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে) বাহির হইতে পারিতেছে না, তাই (পদ্ম) কাঁপিতেছে।"

এই উত্তর শুনিয়া, প্রথমেই রাজকন্যার বিস্ময়বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি আমাকে "কান্তা" সম্বোধন করিতেছে কেন? এবং শ্লোকরচয়িতার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দেখিয়াও তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ আড়চোখে লোকটির পানে চাহিয়া, শেষে চিনিতে পারিলেন—ইনিই আমার সেই একরাত্রির স্বামী।

তখন রাজকন্যা স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, বিনয়নম্রমস্তকে, মিনতির স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার মূল্য না বুঝিয়া, তোমায় চিনিতে না পারিয়া, তোমার সহিত অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর।"

কালিদাস বলিলেন, "রাজকুমারী, তুমি কোনও অপরাধ কর নাই—তোমায় মার্জ্জনা করিবার কিছুই নাই। তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ। তুমি যদি সেদিন আমার সহিত ওরূপ কঠোর ব্যবহার না করিয়া, আমায় আদর যত্ন করিতে, তবে আমি যেমন মূর্খ ছিলাম, চিরজীবন সেইরূপই থাকিয়া যাইতাম।

তোমার নিকট ওরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া মনেব দুঃখে আমি এই বনে আসি এবং মহাযোগীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁহাব অর্চ্চনা করিয়া আমি কবিত্ব-বরলাভ করিয়াছি—কিন্তু তুমিই এ সকলের মূলীভূত কারণ। সুতরাং যাবজ্জীবন তোমার নাম কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক আমি স্মরণ করিব।"

রাজকন্যা স্বামীকে ফিরাইয়া নিজ পিতৃ-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কালিদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমা হইতেই আমাব জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে; সুতরাং তুমি আমার গুরুস্থানীয়া। কল্যাণি, তুমি গৃহে যাও,—তোমার সহিত আমার পতি-পত্নী ভাব এখন আর সম্ভব নহে।"

অবশেষে দুঃখিত চিত্তে রাজকন্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে কালিদাস গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইযা, নানাদেশ পর্যটন করিতে করিতে অবশেষে ধারা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার কবিত্বখ্যাতি ইতিপূর্বেই দেশবিদেশে রটিয়া গিয়াছিল। ধারাধিপতি ভোজরাজ, মহাসমাদরে তাঁহাকে নিজ সভায় সভাকবি করিয়া রাখিলেন।

[মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৫]

উকীলের বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুবোধচন্দ্র হালদার আজ চারি বৎসর যাবৎ ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—লোকটা ভারি চালাক চতুব,—উহার পসার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু হায়, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে। বাস্তবিক বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুবোধবাবুর পসার হয় না, এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক;—বিদ্যাব ছাপ ত তাঁহাব নামের পশ্চাতেই মুদ্রাঙ্কিত। বুদ্ধিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পাশ করিয়া তিনি দিনাজসাহী জেলায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। শুনিয়াছিলেন, সেখানে কাজকর্ম্মও যথেষ্ট—এবং 'বার'ও তেমন 'ষ্ট্রং' নহে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ভবানীপুরে তাঁহার এক স্বগ্রামের উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার হাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল। উকীলবাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের পর বলিলেন, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

উকীলবাবু বলিলেন—"ব্যাপাব কি?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিঞ্চিৎ উপহাব এনেছি, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।"

উকীলবাবু কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপহার এনেছ হে?"

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাহিব হইল—একটি চকচকে নূতন অলপাকাব চাপকান এবং একটি ঝক্‌ঝকে নূতন শামলা। জিনিষ দুইটি বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন, "এইগুলি অনুগ্রহ করে আপনাকে নিতে হবে।"

উকীলবাবু সুবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি?"

"এ দুটি আপনি নিয়ে—আপনার পুবানো চাপকান আব শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।"

এতক্ষণে উকীলবাবু অন্ধকাবে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ—বুদ্ধি করেছ ভাল।"

সুবোধ বলিলেন, "আজ্ঞে, যাচ্চি নতুন জায়গায় ওকালতী করতে। একে আনকোরা নতুন উকীল,—তার উপর যদি নতুন শামলা আব চাপকান দেখে, তা হলে মক্কেল কি আর কাছে ঘেঁসবে? উকীলবাবু বলিলেন, "দেখ হে আমি বলে দিচ্চি—তুমি শীগগিরই পসার করে তুলতে পারবে। তুমিই বারের উপযুক্ত লোক।"

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্দ্র কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাকতৈল কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাখিয়া সম্মুখের চুলের কিয়দংশ শুভ্র করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে স্ত্রীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন শুনিলেন, বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর কেমন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেলটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিনকাল কি ভয়ানকই পড়িল! যে এত বুদ্ধি ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিয়া মক্কেল জুটাইতে পারিল না।

সুবোধচন্দ্রের বাসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানি—রাস্তার উপর একটি ফটক আছে—তাহার পর সামান্য একটু কম্পাউণ্ড—তাহার পর গৃহের বারান্দা। বাড়ীটির ভাড়া মাসে কুড়ি টাকা করিয়া, কিন্তু তিন চারি মাস ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে। যে

মুদীর দোকান হইতে চাউল প্রভৃতি আসে—তাহারও শ'খানেক টাকা প্রাপ্য। বাড়ীওয়ালা ও মুদী সুবোধবাবুকে বিষম বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাঁহার ধনরত্ন উপার্জন না হউক, তিনি দুইটি কন্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর উপার্জন করিয়াছেন একটি বন্ধুরত্ন—জগৎপ্রসন্নবাবু। জগৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব। জগৎবাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহার অবস্থা সুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মক্কেলগণের মধ্যে কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীতের প্রভাত। অফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধবাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্ব্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন—"দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা জাভার চিনি। লোকে মনে করে হলদে চিনি হলে দেশী হয়, শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী, কিন্তু তা মহা ভুল। জাভা, মরিশস্ প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি হচ্ছে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।"

সুবোধবাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীর নিকট শুনিলেন, আজ ঝি বাকী বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে—নালিস করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ হস্তে একছিলিম তামাক সাজিয়া সুবোধচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। কলেজে পাঠকালে, অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গলের' ন্যায়, তিনিও ধূমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ উকীলগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; অল্প বিস্তর 'ইত্যাদি'ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব্বপ্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া অবিলম্বে সুবোধবাবু দুই টাকা মূল্যের এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট আনা একসের তামাকে তাঁহার পনেরো দিন চলিতে লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, 'ইত্যাদির' দাম অনেক—তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতরাং ইত্যাদি করতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক পোড়াইয়াও যখন পশার হইল না, তখন সুবোধবাবু একদিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল—"কম্‌লি" তাহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহার করেন, তাহা আট সের নহে—চারি আনা সের মাত্র।

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণপ্রায়। আজ রবিবার—কাছারি যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত মনে সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিলেন—আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামান্য যাহা পৈতৃক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন আর চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক স্থানে কার্ম্মের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে—আয়ের অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু পান, কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে লাগিলেন—আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাহিরে মোহনভোগওয়ালা, "ঘী—গাওয়া-ঘী' ওয়ালা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মক্কেলহীন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, চারি আনা সেরের এক ছিলিম তামাক সুবোধবাবু নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরে হাতায় পদশব্দ শ্রুত হইল। কে আসে? মক্কেল নহে ত? নিকটস্থ

আলমারীর মস্তক হইতে সুবোধবাবুর একখানি পুরাতন ব্রীফ্ চট্ করিয়া পাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পদশব্দ কম্পাউণ্ড হইতে বারান্দায় উঠিল। পরমুহূর্ত্তে জগৎপ্রসন্নবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র।

ব্রীফ্ সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধবাবু বন্ধুকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।—"আরে এস এস—এত সকালে কি মনে করে?"

"আর ভাই বসে বসে কি করি—আসা গেল একটু গল্পগুজব করতে।"

"বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছট্‌ফট্ করে মরছিলাম। আজকের 'বেঙ্গলী' নাকি? দেখি।"

কাগজ লইয়া সুবোধবাবু চাকরি খালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জগৎবাবু বলিলেন, "শুনেছ? পরশু বেলা ৭টার সময় ফুলাব সাহেব এসে পৌঁছবেন।"

সুবোধ বলিলেন, "৭টার সময়? শুনে খুসী হলাম। আমার বাড়ী আসবেন না ত?"

জগৎ হাসিয়া বলিলেন, "বলা যায় কি? আসেনই যদি—এত ভয় কেন?"

"না ভাই—আমার স্বদেশী ঘরকন্না, তাতে ঝি-টিও পালিয়েছে। তাঁকে খাতির করব কি করে?"

"খাতির যদি করতে পার, তা হলে সুবিধে করে নিতে পার—তা জান সুবোধ? বেচারি যেখানে যাচ্ছে—কেউ খাতির করছে না! কোনও মিউনিসিপ্যালিটি অভ্যর্থনা করছে না—অনেক জায়গার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পর্য্যন্ত অভিনন্দনপত্র দেবার প্রস্তাব করে বে-সরকারী সভ্যদের কাছে হার মেনে যাচ্চে।"

সুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "খাতিব করলে একটা চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় ত বল, আমি নিজে একটু অভিনন্দনপত্র দিয়ে ফেলি।"

"শোননি—পূর্ব্ববঙ্গের একজন উকীল ফুলাব সাহেবেব নামে একটা কবিতা রচনা করে গভর্ণমেন্ট প্লীডারের পদ পেয়ে গেছে।"

সুবোধচন্দ্রের জীবনে এই একটা পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। পরিহাস করিয়া যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হঠাৎ গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যা বলেছ। একটা গভর্ণমেণ্ট প্লীডারি পেলে যে গো-জন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি?"

জগৎবাবু কিন্তু কথাটা পরিহাসের ভাবেই গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "ইংরাজি কবিতা লিখতে পারবে?"

"না, কখনও দুটো লাইন মেলাইনি।"

"চেষ্টা করে দেখনা। একটা কবিতা লিখে সোনার জলে ছাপিয়ে ফেল। ফুলার সাহেব আসবার দিন সেইটে বিতরণ কর,—আর ফুল্লার সাহেবকেও এক কপি পাঠিয়ে দাও। এই ফরিদসিংহের সরকারী উকীল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি—তাঁকে নিয়ে গোলযোগ চলছে। উত্তর না করিয়া, কপালে হাত দিয়া বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

জগৎপ্রসন্ন পূর্ব্বমত পরিহাসের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"নাও, কাগজ কলম বের কর। আমি না হয় তোমায় সাহায্য করছি। ছেলেবেলায় আমার কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল। কি বলে আরম্ভ করা যায়? Hail Fuller—Lord of East Bengal—তার পর, কি মিল করা যায় বল দেখি?"

সুবোধ উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন। জগৎ বলিলেন, "তারচেয়ে বরং Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal—শুনতে বেশ গম্ভীর। মিল করা যায় কি? Bengal-এর সঙ্গে 'all', 'call', 'fall' অনেক মিলই ত আছে হাঁ হাঁ—হয়েছে Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal.

How glad are Dinajshahi people all
To—to—
তার পরে কি হে? বল না। সব কবিতাটাই আমি রচনা করব—আর তুমি ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হবে?"
সুবোধ বলিলেন, "না হে—কবিতার কাজ নয়। আমি আর একটা কথা ভাবছি।"
"মনে হয়েছে।
To welcome thee to their most ancient town.
The worthy representative of the Crown.
না, 'Worthy' কেটে কর 'glorious'—সবটা শোন দিকিন—লিখে নাও—
Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal.
How glad are Dinajshahi People all
To welcome thee to their most ancient town,
The glorious representative of the Crown—
লিখে ফেল—লিখে ফেল। এমন ভাবরত্ন হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না।"
সুবোধ বলিলেন, "দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পার?"
জগৎ কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেল্লিক বেরসিক তুমি ত হে! হচ্ছে কবিতার চর্চ্চা। এমন সময় বললে কিনা টাকা ধার দিতে পার? যাও, আমি তোমার কবিতা রচনায় সাহায্য করব না।"—সুবোধের মুখে হাসি নাই। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত। বলিলেন, "না ঠাট্টা নয়। গোটা পঞ্চাশেক দাও। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।"
"কি মৎলবটা শুনি?"
"বড় দাঁও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভর্ণমেন্টকে ঠকিয়ে আমি একটা সুবিধে করে নেবই নেব। দেখি এসপার কি ওসপার।"
জগৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি করতে চাও?"
"ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করব।"
"কি পাগল! কে তুমি? রাজা নও, জমিদার নও, বড় চাকরিও কর না,—তোমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেনই বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষ্টেশনে যেতে নেমন্তন্ন করবেন? দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইভেট ইন্টারভিউ করবার সুযোগ পাবে?"
"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব, যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাবই যাব। তা হলেই কার্য্যোদ্ধার।"
জগৎবাবুর মুখ হইতে হাস্যপরিহাসের ভাব এখন তিরোহিত। বলিলেন, "কি পাগলামি করছ? দেশসুদ্ধ লোক কেউ ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করবে না—তুমি একা করবে? তুমি দেশদ্রোহীর মত নিজের স্বার্থের জন্যে দেশ-নায়কদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করবে?"
সুবোধ বলিলেন, "জগৎ, তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি, স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে বাসাখরচ চালাচ্ছি, দেশ-নায়কেরা কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে—'ওহে, তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত?"—ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে আমি দুধ কিনতে পারিনে; শুধু কোলের মেয়েটির জন্যে একসের করে দুধ নিই; অন্য ছেলে মেয়েদের আমার স্ত্রী সুজি সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে খাওয়ায়—তা তুমি খবর রাখ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন ঝিই বেশীদিন টেকে না,—কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে নিজের উন্নতি করে নিতে পারি, তা কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণমেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে তা ত নয়। গভর্ণমেন্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে—আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা

সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি? কতকাল আর এরকম করে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব,—ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব?"

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "কি করবে স্থির করেছ?"

"বাড়ীটে বেশ করে সাজাব।"

"তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে?

"না, তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকামাত্র, বীজবপন মাত্র। তারপর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে ফুলার সাহেবের সু-নজরে পড়ে যাব—কাজ বাগিয়ে নেব।"

"যোগাড়টি হবে ত? না, শুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে?"

"ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে হবে না।"

"আমায় কি করতে হবে?"

"যখন যেমন বলব, তখন তেমন করবে। আপাততঃ আমি বাড়ী সাজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার খুব নিন্দে করে বেড়াও।"

"সে কাজ শক্ত নয়,—তা পারব।"

"আর খুব সাবধান, তোমার আমার মধ্যে যে এই ষড়যন্ত্রটি চলছে—বাইরের লোক কেউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"তার জন্যে ভয় নেই।"

"তাই হলেই হল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই।"

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্চি।"—বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্রোত্থান করিলেন।—সুবোধও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। যাইবার সময় জগৎ বলিলেন, "দেখ, ষড়যন্ত্র জিনিষটার ভিতর একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে ধরছে। এ খেলা মন্দ নয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে—সেইটিই সংশয়।"

সুবোধ বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই উন্মাদ ব্যাধিটুকু কিছুদিন টিকে যাক—আমাদের ষড়যন্ত্রটি সফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট।' আর আমার হাতযশ।"—বলিয়া জগৎ সহাস্যে সুবোধের করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাটসাহেব আসিবেন। অথচ নগরবাসী কেহ কোন উৎসবের আয়োজন করিতেছে না। বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে। নূতন লাটসাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির বে-সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজোলিউসন করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নানাস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবরেজিষ্ট্রার-সাহেবের চেষ্টায়, জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি "আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া" সভা গঠিত হইয়াছে—সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাটসাহেবকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, আঞ্জুমানের বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজীভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দনপত্র পাঠ করে কে? এই বিষম সমস্যার বিষয় তার যোগে অবগত হইয়া, ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজি-জানা পরিষদকে দিনাজসাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসীগণ এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধবাবু উকীলের বাটী সজ্জিত করিবার জন্য দশ বারোজন লোক লাগিয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদারুপত্র আসিয়াছে। কয়েকটা সদ্যচ্ছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধবাবুর ফটকের উপর বাখারীর 'আর্চ্চ' তৈয়ারী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে 'আর্চ্চ' দেবদারুপত্র মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুইটি কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণঘট। গৃহের জানালাগুলির চারিপার্শ্বে গেঁদাফুলের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া, তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধবর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পাত্র ও পুষ্পকে সজীব রাখিবার জন্য এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে পিচকারি দিয়া সে গুলিতে জলসেচন করিতে লাগিল।

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সুবোধবাবু পুলিস আফিসে ছুটিলেন। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল, যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে, আগামীকল্য সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহের কম্পাউণ্ডে কিছু বাজী পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিস সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার গৃহদ্বার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানি লম্বা তক্তা আনাইয়া তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার উপর লাল কাগজের কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণসূচক শব্দ-সমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় বালক ও যুবক আসিয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাঁহাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এ কি করছেন?"

সুবোধচন্দ্র অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিলেন, "কাল লাটসাহেব আসছেন কিনা, তাই বাড়ীটা একটু সাজাচ্ছি।"

"কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না, আপনি সাজাচ্ছেন কেন?"

"কেন, তাতে দোষটা কি?"

"বঙ্গচ্ছেদের জন্য সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে; এই কি উৎসবের সময়?"

"শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি? কেন শোক কিসের? সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।"

"আপনি কি তবে বঙ্গচ্ছেদ আনন্দের বিষয় বলে মনে করেন?"

সুবোধচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০শে আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভাই বাঙালী—মায়ের অঙ্গে এ খড়গাঘাত—এ রুধিরপাত—যতদিন এর প্রতিবিধান না হবে, ততদিন যেন কোন বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই"—ইত্যাদি। সুবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিল। একজন বলিল, "আপনার পায়ে ধরি—এ সব ভেঙ্গে ফেলুন।"—সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন,—আমরা স্কুল থেকে চাঁদা তুলে, নিজেদের জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব। অনুমতি করুন আমরা নিজে এ সব ভেঙ্গে ফেলি।"

সুবোধচন্দ্রের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, "যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। সকল কাজেই তোমরা খোঁচা দিতে শিখেছ। যাও লেখাপড়া করগে।" বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সুবোধ ভাবিলেন—এ সকল বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত, কি জানি রাত্রে আসিয়া যদি সব ভাঙ্গিয়া দেয়? তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া পুলিস সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন, সাহেব বাড়ী নাই—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়াছেন। সুবোধবাবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গলোয় গিয়া পুলিশ সাহেবের নিকট নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। সুবোধবাবু গিয়া উভয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস সাহেব বলিলেন, "কি বাবু? কি চাই?"

"হুজুর, কাল লাটসাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, স্কুলের ছেলেরা রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে।"

পুলিশ সাহেব বলিলেন, "আপনিই কি আজ বাজি পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন?

"হ্যাঁ হুজুর, আমিই।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পুলিশ সাহেব বলিলেন, "ইঁহারই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।" সুবোধকে বলিলেন, "আচ্ছা, সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনার বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য আমি এখনই চারিজন কনষ্টেবল হুকুম করিতেছি।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উকীল?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

"বেশ। আপনার রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন? সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন, "হুজুর, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।"

"অল্‌রাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। আপনার নামটি কি?"

সুবোধ নাম বলিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড লইয়া, স্বহস্তে নাম পূরণ করিয়া তাঁহাকে দিলেন।

সুবোধবাবু ঝুঁকিযা সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পবদিন যথাসময়ে লাটসাহেবেব আগমন হইল। কাছারির পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। লাটসাহেবের ফেটন্ গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। কমিশনব সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। ফুলার সাহেবকে দেখিবামাত্র সুবোধ নতমস্তকে সেলাম করিলেন। লাটসাহেব স্মিতমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহাব সেলাম প্রত্যার্পণ করিলেন। কদলীবৃক্ষ ও পত্রপুষ্পের সজ্জা নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষদেশে সাদা জমির উপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল।

Long Live Fuller,
Welcome to Dinajsahi

দেখিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ক্রমে ফেটন্ অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দরবার সজ্জিত হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দরবার। নয়টা বাজিলে পর, একখানি ঠিকাগাড়ী আনাইয়া সুবোধবাবু দরবারে উপস্থিত হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া দিলেন। পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন।

দরবারে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। রাজা ও জমিদারের মধ্যে দুই তিনজন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্তই গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী—ডেপুটি মুনসেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ করিবার জন্য কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের পর দিন কাটাইয়া দেয়। কাছারি যাইবার জন্য একস্যুট মাত্র পোষাক আছে, তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই, তাহারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাপকান, মলিন শামলা এবং তালি দেওয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে—না আসিলে চাকরি যায়। ডেপুটি, মুনসেফ, আমলা প্রভৃতি সরকারী চাকর ছাড়া, হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল, বে-সরকারী লোক অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার জন পনেরো মুসলমান সভ্য উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নবদন ফুলার সাহেব দরবারে প্রবেশ করিলেন। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইল। আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। ফুলার সাহেব প্রথমে ইংরাজিতে ও পরে উর্দ্দুভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর "ইন্ট্রোডক্সনের" পালা।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুবোধবাবুও সাহসপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্টেট সাহেব তাঁহাকেও লাটসাহেবের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে সেলাম করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল। আমি তোমার সুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উকীলেরা ভারী রাজদ্রোহী—আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর ইঙ্গিতে বাঁদরনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই।"

"আমি লোকের কথায় নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না হুজুর।"

"বেশ। তুমি বৈকালে সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে প্রাইভেটে ইন্টারভিউ কবিতে আসিও।"—বলিয়া ফুলার সাহেব সুবোধকে বিদায় দিলেন। পরে অন্যলোকে "ইন্ট্রোডিউস" হইল।

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়া পকেট হইতে একখানি প্রাইভেট ইন্টারভিউর নামহীন কার্ড বাহির করিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন—"তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; His Honour স্বযং তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যথাসময়ে উপস্থিত হইও।"—সুবোধ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ এ কি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎপ্রসন্ন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"দরবারেব কার্ড পাবে? প্রাইভেট ইন্টারভিউ করতে নিমন্ত্রণ হবে?"—সবই ত হইল। এখন গভর্ণমেণ্ট প্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য! যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, সে সমস্তই ঘটিয়া যাইতেছে। তবে কি সুদিন উপস্থিত হইল? এতদিনের পর কি গ্রহদশা খণ্ডিত হইল?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধচন্দ্র গৃহাভিমুখে পদচালনা করিলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া স্বকৃত পত্রপুষ্পসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লাটসাহেব সজ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা করিয়াছেন। অনিমেষ নেত্রে সুবোধবাবু নিজ কীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল। তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ-নেত্রে নিজ গৃহশোভা দেখিতেছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের উপর হইতে, এক গামলা গোবর ও কাদা-গোলা জল সুবোধবাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল।

সুবোধচন্দ্র চকিতনেত্রে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কে বিদ্রূপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"Long live Sobodh Babu—Welcome to Pandemonium."

গোবর ও কাদা-গোলা জল তাঁহার শামলা বহিয়া চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয়া প্যান্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধবাবু জুতা চব্ চব্ করিতে করিতে যথাসাধ্য ত্বরিত-পদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই একটিমাত্র পোষাক—তাহা গেল নষ্ট হইয়া। এখন কি পরিয়া সুবোধবাবু প্রাইভেটে ইন্টারভিউ করিতে যান?

স্নান আহার করিয়া তিনি অনাথবাবু ডেপুটির বাসায় ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া একসুট পোষাক ধার চাহিলেন।

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "মশায়, আচ্ছা, তা পোষাক না হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্ম্মভোগ কেন? আমরা গোলামী করছি—আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার বাড়ী সাজানই বা কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? প্রাইভেট ইন্টারভিউ করবার এত আগ্রহই বা কেন?"—সুবোধবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেন, "সাহেব নিজে বলেছেন, না গেলে সেটা কি ঠিক হয়?

ডেপুটিবাবুর হঠাৎ মনে হইল—এ সব কথা এ লোকটাকে বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়া দেয়—তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"না—তা যাবেন বইকি! সাহেব নিজে বলেছেন—অবশ্য আপনার যাওয়া উচিত। বসুন, পোষাকটা নিয়ে আসি।"

প্রাইভেট ইন্টারভিউ হইয়া গেল—বাজিও পুড়িল। রাত্রি ৯টার সময় শাল মুড়ি দিয়া, সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগৎবাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সাবাস্—সাবাস্। তুমি যা বললে তাই হল যে। তারপর লাটসাহেবের কাছে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারির কথা তুলেছিলে?"

সুবোধ বলিলেন, "পাগল! তা হলে যে সন্দেহ করবে। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ! সে সব এখনও দেরী আছে। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।"

"এবার কি করবে?"

"টেলিগ্রামের ফরম আছে?"

"আছে।"

"বের কর দিকিন খানকতক।"

জগৎবাবু টেলিগ্রামের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ বলিলেন—"বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দেমাতরম্ কাগজে তার পাঠাতে হবে।"

"কিসের তার?"

"আমার কীর্ত্তি।"

"সে হয়ে গেছে। বেঙ্গলীর সংবাদ-দাতা সুকুমারবাবু তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে বারের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর দরবারে উপস্থিত ছিলে।"

"আর সে গোবরজলের কথাটা?"

"সেটা বোধ হয় লেখেননি।"

"আরে সেইটিই হল আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম মুসাবিদা করে এনেছি। সুকুমারবাবুর টেলিগ্রামে আমার প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার। আর গোবরজলের কথাটা আর Welcome to Pandemoniumটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় dramatic হয়েছে। সাধারণের কল্পনা ভারি উত্তেজিত করবে।"

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবোধবাবু সেই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাইরে আসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে দুইজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিলেন, "মশায়, শুনলাম নাকি কাল আপনি যখন দরবার থেকে ফিরছিলেন, তখন ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবরগোলা জল ফেলেছে?"

"ফেলেছিল বটে।"

"এ কথা সাহেবদের কানে গেছে। পুলিস সাহেব আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকর্দ্দমা চালাতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপনাকে সাহায্য করব। দুঃখের বিষয় এটা পুলিসগ্রহণীয় মোকর্দ্দমা নয়। হলে, আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়িবাচ্ছা সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ একটা নালিস করে দিন।"

সুবোধবাবু বলিলেন, "কাউকে ত দেখতে পাইনি, কার নামে নালিস করব?"

"ও বাড়ীতে ছেলেপিলে যারা আছে, তাদের নাম আমরা এখনি সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আর তাদের বাপ,—উকিলবাবুটি,—তিনি নিশ্চয় ওদের abet করেছেন। তাঁরও নাম লাগিয়ে দিন।"

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন, আমি ত কাউকে দেখতে পাইনি, কাউকে সনাক্ত করতে পারব না। এ অবস্থায় নালিস করলে কোনও ফল হবে না।"

দারোগাবাবুরা তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

সুবোধবাবু ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন—যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবরজল ঢেলেছিল, তারা আমার আশাতীত উপকার করেছে। খবরটা এতক্ষণ বোধ হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তটা জড়িয়ে এমন একটা হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হতে বেশী বিলম্ব হবে না।

বাস্তবিক তাহাই হইল। তিন দিনের মধ্যে দেশময় ঢিঢি পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ নকল করিয়া বাঙ্গলা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গালিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন, "এমন স্বদেশদ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত।" একজন রসিক লেখক, "সুবোধবাবুর পাপমুক্তি" নামক একটি কবিতায় লিখিলেন গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ, লাট দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুবোধবাবুর যে পাপ সঞ্চয় হইয়াছিল, গোবরজলে তাহা ধৌত হইয়া গিয়াছে।—এই উপলক্ষে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজেও সুবোধবাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ লিখিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু রাজভক্ত শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। সুবোধবাবুর সৎসাহসের প্রশংসাও বাহির হইল।—এদিকে দিনাজসাহীতে সুবোধবাবুর গঞ্জনার সীমা রহিল না। বারলাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্য উকীলগণ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সুবোধবাবুর অনুপস্থিতিকালে একজন উকীল একদিন জগৎবাবুকে বলিলেন, "কি হে, তোমার বন্ধুর মৎলবটা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটি হতে চায়, না কি হতে চায়?"

জগৎবাবু রাগিয়া বলিলেন, "আর মশায়, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও লোকটার উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুত্ব—"

"বন্ধুত্ব! অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে অপমান বোধ হয়।"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে? এমনটা করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?" জগৎবাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন, "আমি ওর সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাটসাহেবের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান উকীল কিশোরীমোহনবাবুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। কিশোরীবাবু বৃদ্ধ, অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। সুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায়, তিনিই কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, "সুবোধ কাজটা যা করেছে তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই। ছেলেমানুষ, না বুঝে করে ফেলেছে। তাই বলে কি ওর ওপর অমন করে জুলুম করতে আছে! আহা বেচারি কাগজে যা গালটা খেয়েছে, অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর তোমরা ওকথা উত্থাপন কোরো না।"—ফলতঃ দুই চারিজনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সুবোধবাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল। আফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

"এস এস—আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো মনের কথা বলবার ফুর্সৎ পাইনে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম জমিয়ে তুলেছ, আসতে ভয় করে পাছে ধরা পড়ে যাই। কিন্তু আসল কাজে ত কোনও চিহ্ন দেখছি নে,—কেবল কি গাল খেয়েই মরলে?"

"আসল কাজই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। সবুরে মেওয়া ফলবে হে—মেওয়া ফলবে।"

"কাগজে দেখলাম ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের চাকরি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না!"

"না ভাই—এ খণ্ডপ্রলয়ের পর 'বারে' আর সুবিধে হবে না। হলাম যেন সরকারী উকীল—কিন্তু বার লাইব্রেরীতে কেউ আর আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে কি সুখ হবে?

"তবে কি করবে?"

"একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে মাস গেলেই। হাকিমী পদটাও লোভনীয়।"

"তবে তাই দরখাস্ত কব না।"

"না, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাঁধি দাঁড়াও।"

"আর কি গোড়া বাঁধবে?"

"একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘরে করে দাও, ব্যস আর কিছু চাইনে। তাহলেই ডেপুটিগিরি আমার বাঁধা।

"আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।"

"কিশোরীবাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"যাচ্চ নাকি?"

"অবশ্য।"

"তোমার নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু গোলযোগ করেছিল। তারপর কিশোরীবাবু বলে কয়ে তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।"

"ঐ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। যখন খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাধাও।"

"তারপর?"

"তারপর আমি উঠে আসব। তারপর লম্বা টেলিগ্রাম কাগজে ক্যাগজে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না হে—অত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। কাজটিও শক্ত। পারব না।"

"পারতেই হবে। এইটিই আসল—এরি ওপর সব নির্ভর করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার দাবীর জোর হবে।" অনেক বলা কহার পব জগৎবাবু রাজী হইলেন। এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন নিমন্ত্রণ সভায় যথাপরামর্শ কার্য্য হইল। জগৎবাবু ঠিক মুহূর্ত্তে বলিলেন, "মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম। সুবোধবাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার করলে আমার জাতিপাত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল, "আমরাও খাব না।"—বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল।

সুবোধবাবু উঠিয়া বলিলেন—"মশায়—একজনেব জন্যে আপনারা এত জন কেন অভুক্ত ফিবে যাবেন? তার চেয়ে আমিই উঠে যাচ্চি।"—বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরীবাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই, চলে যেও না। এস তোমায় আলাদা বসিযে খাইয়ে দিই।" সুবোধবাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন, "এত অপমান সহ্য হয় না"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া, অন্যের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। বাঙ্গলা কাগজের সম্পাদকগণ লিখিলেন, এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া দিনাজসাহী যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা সমস্ত জেলার অনুকরণযোগ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। অফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্যকার ইংলিশম্যান কাগজ খোলা রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, দিনাজসাহীর উকীলবাবু সুবোধচন্দ্র হালদারকে আসাম গভর্ণমেণ্ট ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসের কর্ম্ম দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।"—সুবোধ বলিলেন, "তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুললো। এত কাণ্ড করে—এত গাল খেলে—শেষে পুলিসের চাকরি।"

জগৎবাবু বলিলেন, "গভর্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। এ আড়াইশো টাকায় আরম্ভ হবে—ডেপুটিগিরি দুশো টাকা বই ত নয়।"

"মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিনকাল পড়েছে—আমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্চে না। দেখ, এই এক মাস জাল-স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। পুলিসের চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে। কোথায় কে বিলিতি নুন ফেলে দিয়েছে—যাও তাকে ধর। কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতরম্ বলছে—মাব তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই আমি পারব না। তার চেয়ে 'বারে' আমার এ উপবাসই ভাল।"

জগৎবাবু বলিলেন, "দেখ, আমাব বোধ হয়, ডেপুটিগিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পারলে গভর্ণমেণ্ট তোমাকে তাই দিতে চাইত। সেটা গভর্ণমেণ্টকে জানান ভাল। যাও, শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।"

"এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না। শুধু ইংলিশম্যানের এই প্যাবা দেখেই ছুটব?"

"ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেণ্টের চিঠিরই সমান।"

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন রাত্রেই সুবোধচন্দ্র শিলঙ যাত্রা করিলেন।

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল সুবোধবাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। সুবোধবাবু এখন ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তাঁহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় না। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা পান করেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে।

[প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১৪]

হাতে হাতে ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিবাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসে বসিয়া, ডাক্তার হবগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালারবাবুকে বলিতেছিলেন, "তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আব একটা মিকশ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

সিগনালারবাবু বলিতেছেন, "আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম। এই একটি মাত্র ছেলে কিনা, আমার স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।"

এই বলিয়া সিগনালাববাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধুলি গাড়ীভাড়া ডাক্তাববাবুব হাতে দিতে চাহিলেন।—ডাক্তাববাবু বলিলেন, "ও কি? না—না, বাখুন।"

সিগনালারবাবু বলিলেন, "তা হলে যে বড়ই অন্যায় হয়!"

"না—না। কিছু অন্যায হয় না। আপনার ছেলেটিকে আমি আরাম করে দিই; তারপর না হয় একদিন—অমাবস্যে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমন্তন্ন করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন, তাব আর কি?"—বলিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকের কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিবে প্ল্যাটফর্ম্মে, অনেক লোকের কণ্ঠে বন্দেমাতবম্ ধ্বনি শোনা গেল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও কি?"

"কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচাবক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।" উভয়েই বাহিরে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত "বীর-ভারত" সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনযকৃষ্ণ সেন।

ডাক্তাববাবু সরকাবী চাকব হইলেও, অন্যান্য সবকারী চাকরের ন্যায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাত্রিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কাণাঘুষা করিয়া থাকে। বিনয়বাবুব সঙ্গে আলাপ করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেনও আসিয়া পড়িল।

উকীল, মোক্তার এবং ছাত্রগণ পরিবৃত হইযা প্রচাবক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসব হইলেন। তাঁহার নিকট একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যেই প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল—"এইও—কালা আদমিকা গাড়ী নেহি হায়।"

প্রচারক মহাশয় বলিলেন, "কেন সাহেব, আমার টাকাগুলোও কি কালা? আমারও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে।"—বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, "বাদশাহ-কা-দোস্ত" আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধুতি-কামিজ রেশমী চাদরধারী মূর্ত্তিমান রাজদ্রোহীকে এক ধাক্কা দিয়া ফ্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল। বিনয়বাবু "বীর-ভারত" পত্রিকার সম্পাদক হইলেও অত্যন্ত কৃশকায় ব্যক্তি। নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া, প্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একজোড়া সোনার চশমা,—তাহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চুরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার সহচরগণ বন্দেমাতরম্ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই তিন জনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেই দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়ন করিয়া নহে)—ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন;—তাহার মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তিনি চিকিৎসার্থ হাসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন বিনয়বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যমশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন;—পরদিন নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া "বীর-ভারতে" এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

হরগোবিন্দবাবু স্থানীয় হাসপাতালের সরকারী ডাক্তাব। লোকটি বৃদ্ধ হইয়াছেন,—নেটিভ ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহবে দুইজন এম-বি, কয়েকজন এল-এম-এস থাকা সত্ত্বেও হরগোবিন্দবাবুর বিপুল পসার। তাঁহাব উপব লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন আর কাহারও উপর নহে। প্রাইভেট কল্ তাঁহাব যথেষ্ট, এমন কি সময়ে সময়ে ভদ্রলোক স্নানাহার করিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।—হরগোবিন্দবাবুর দুই পুত্র;—একটির নাম অজয়চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি-এ পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুশীল, স্থানীয় জেলা স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল—গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।—রাত্রি দশটার পর হরগোবিন্দবাবু হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অজয় বলিল, "বাবা, সাহেবটা কেমন আছে?"

"ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা বেচারীকে বড্ড মেরেছে।" অজয় বলিল, "তার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল হয়েছে। শাদা রঙ বলে মনে করে যেন লাট। বেশ হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখ, সে অন্যায় করেছিল তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন লোককে পাঁচজন পড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব? একে ত ন্যায়যুদ্ধ বলে না!"

অজয় বলিল, "ইংরাজের সহিত বাঙ্গালীব কখনও ন্যায়যুদ্ধ হতে পারে?"

"কেন?"

"সবই যে অন্যায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকর্দ্দমা হয় তবে হাকিম কি ন্যায়বিচার করবে?" ডাক্তারবাবু হাসিলেন। বলিলেন, "তোমার যুক্তিটা ত বেশ দেখছি। অন্যে অন্যায় করে, সেই নজিরে আমিও অন্যায় করব?"

অজয় সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারায় ন্যায় অন্যায় স্থির হতে পারে না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ, একজন রাজজাতীয়

এবং সম্ভবতঃ একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে কোনও দোষ হয় না।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ এবং রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?"

অজয় বলিল, "গায়ের জোর না থাক, মনে জোব পাচ্ছে। মনের জোরেই গায়ের জোর।"

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তারবাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন, "তা ঠিক বটে। মনের জোরই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ করেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজেব সমকক্ষতা হইতে পাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার বিশেষ ভাব কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য, অত্যাচাব নিবারণেব জন্যে, মা বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংবেজের প্রতি বল প্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না?"—এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহারের স্থান হইয়াছে। পিতা পুত্র তখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতে, সাহেবমারা ঘটনা লইয়া রাজপুরুষ মহলে, হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিসকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। তদন্তভাব কোতোয়ালীর দাবোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগাবাবু আহার নিদ্রা ত্যাগ কবিয়া, সহবময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন। কয়েকজন ছোকবা দলের উকীল ও মোক্তাবকে গ্রেপ্তার করিযা ফেলিলেন। ষণ্ডা ষণ্ডা দেখিযা কয়েকজন বিদ্যালযের বালককেও ধৃত করিলেন।

একদিনেই তদন্ত অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পবদিন ভোব ছয়টাব সময় সেইমত ডাক্তারবাবু শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায বসিযা ধূমপান আবম্ভ কবিয়াছেন, ধুতি ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হেলিতে দুলিতে দারোগা বদনচন্দ্রবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দুই চারিটা বাজে কথার পর দাবোগাবাবু বলিলেন, "আর ত মশায় চাকরি থাকে না।"

ডাক্তারবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কি হযেছে?"

"পরশুকার সেই সাহেব-মারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

"কেন? আসামী ত অনেকগুলি ধরেছেন শুনলাম।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু একটু ব্যঙ্গসূচক মৃদুহাস্য করিলেন।—দারোগাবাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করলেন কি কবে?"—বলিয়া ডাক্তারবাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্য করিলেন।

"গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই কবেছি। ঐ সব ছোঁড়াগুলো বড়ই দুর্দ্দান্ত। এক একটা গুণ্ডা। স্বচক্ষে এমন কতদিন দেখেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাস্তা দিয়ে টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে যাচ্চেন, ওরা উল্টোদিক থেকে আসছে, সেলামটা পর্য্যন্ত করলে না।"

"তাই গ্রেপ্তার করেছেন?"

"না না তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল তাতে আব সন্দেহ নেই। সাক্ষী আছে, কিন্তু মাতব্বর সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে হাজতে পুরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।"

দারোগাবাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তা হলে কি চাকরি থাকবে? মাঝে আর একটি দিন মাত্র আছে, পরশু বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।"

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে? আমি কি করব?"

"আজ্ঞে হেঁহেঁ—আপনি ত সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুনলাম—সাক্ষীটা দিতে হচ্চে।"—বলিয়া দারোগাবাবুর সুপ্রচুর দাড়ি গোঁফের মধ্য হইতে দন্তরাজির শুভ্রশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তারবাবুর মুখপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি সেদিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে, কিন্তু ঘটনাস্থলে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়া দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে তা আমি কিছুই দেখতে পাইনি।"

দারোগাবাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তাই ত! বড় মুস্কিল হল যে! আহা, এ কথা যদি আগে জানতাম!"

"কেন, হয়েছে কি?"

ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "না জেনে বড়ই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করেছি।"

"কি, খুলে বলুন না।"

"কাল বিকালবেলা ক্লাবঘরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দারোগা, কি রকম সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ হল?"—আমি বললাম, 'হুজুর, একজন কনষ্টেবল, দুজন চৌকিদার এরা ঘটনা দেখেছে, সমস্ত আসামী চিনেছে।'—শুনে সাহেব মহা খাপ্পা হয়ে বললেন—'নন্‌সেন্স!—কনষ্টেবল আর চৌকিদার? কোনও ভাল সাক্ষী নেই?—সাহেবের চোখ রাঙানি দেখে ভয়ে বললাম, হাঁ হুজুর আছে বইকি। সবকারী ডাক্তার হরগোবিন্দবাবু সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত আসামী চিনেছেন। সাহেব বললেন—'অলরাইট।'—বলে টেনিস খেলতে গেলেন।"—ইহা শুনিয়া হরগোবিন্দবাবু একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "না জেনে শুনে এমন কথা আপনি সাহেবকে বললেন কেন?"

"বিলক্ষণ! আমি কি করে জানব মশায়? আপনি সেখানে উপস্থিত, নিজে সাহেবকে হাসপাতালে এনেছেন,—আপনি কিছুই দেখেননি তা আমি জানব কেমন করে?"

"তবে যান, এখন প্রকৃত কথা সাহেবকে বলে আসুন।"

দারোগাবাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? এক মুখে দুকথা বলব কেমন করে? আমার তেমন স্বভাবই নয়।"

"তবে আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে বলি।"

দারোগাবাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি কি ক্ষেপেছেন? ও কথা বললে সাহেব বিশ্বাস করবে? মনে করবে, আপনি স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন। আপনারও বিপদ আমারও বিপদ। তাতে আবার সাহেবের কানে গেছে আপনি কর্‌কচ্‌ খান, আপনার বাড়ীতে দেশী কাপড় ব্যবহার হয়।"

বিরক্তির সহিত ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কর্‌কচ্‌ খাই, দেশী কাপড় পরি বলে কি আমি রাজদ্রোহী হয়ে গেলাম নাকি?"—দারোগাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আহা আহা চটেন কেন? আজকাল কি রকম দিনকাল পড়েছে তা ত দেখছেন। ওরা তাই মনে করে।"

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে এখন উপায়? বেশ কাজটি করে বসেছেন যা হোক!"

"উপায় আর কি? সাক্ষী দিতে হবে। বেড়াতে বেড়াতে একবার চলুন না থানার

দিকে। আসামীগুলোকে বসিয়ে রেখেছি, দেখবেন। সবগুলোকে কোর্টে সনাক্ত না করতে পারলে, গোটাকতক করলেও হবে। পুলিস ডায়েরি থেকে অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলোও পড়ে আপনাকে শোনাব।"—এই কথা শুনিবামাত্র, ক্রোধে হরগোবিন্দবাবুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াবার আর লোক পেলে না? বেরো—দূর হ—এখান থেকে। কোই হায় রে? দে ত বেটাকে কান ধরে উঠিয়ে।" বদনচন্দ্রবাবু উঠিলেন। চাদবখানি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "মশায়, এর ফলভোগ করতে হবে।

হরগোবিন্দবাবু গর্জন করিয়া বলিলেন, "যা তোর বাবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্‌গে যা। যা পারিস তা কর্।" দারোগাবাবু তখন ত্বরিত পদক্ষেপে সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাগে তিনটা হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, দারোগাবাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। হাফেজ আলি হেড কনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিলেন, "জমাদার সাহেব, ডাক্তারের ছেলে দুটোর কি নাম জানেন?"

"কোন্ ডাক্তার?"

"হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দ। গভর্ণমেণ্টের নিমক খেয়ে যে নিমকহারামী করে।"

"না—তা ত জানি না।"

"শীঘ্র সন্ধান করে আসুন।"

"কেন?"

"তাদের গ্রেপ্তাব করতে হবে। সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় তারাও ছিল প্রমাণ পেয়েছি।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিযা জমাদাব প্রস্থান করিল। তখন দারোগাবাবু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত থানাব বাবান্দায ছুটাছুটি কবিযা বেড়াইতে লাগিলেন। এত অপমান। চাকরে কান ধবিয়া উঠাইযা দিবে? দাবোগাকে তুই-তোকাবি! কেন, হবগোবিন্দ মনে করিয়াছে কি?

দারোগাবাবু ভাবিতে লাগিলেন—"ছেলে দুটোতে ত এখনি ধরে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আবও জব্দ কবতে হবে। ওব নামে একটা মোকর্দ্দমা খাড়া করতে হচ্চে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তাব চোরেদের কাছ থেকে অল্প মূল্যে চোরাই মাল কেনে। খানাতল্লাসী করে বাড়ী থেকে বাশি বাশি চোবাই মাল বের করে ফেলব এখন—তার কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত? হবে না আবার? দাবোগারা হল ডেপুটিবাবুদের গুরুপুত্তর! ছেড়ে দেবেন? সাধ্য কি। পুলিস-সাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করাব—অমনি ডেপুটি বাছাধনের তিনটি বছব প্রেমোসন ষ্টপ্। দাবোগার এত খাতির ডেপুটিরা করে কি জন্যে? এই জন্যেই ত! কিন্তু জজ সাহেব যদি আপীলে খালাস দেয়? যদি বলে এত বড় একটা ডাক্তার, এত টাকা রোজগার করে, সে চোরাই মাল রাখে এও কি সম্ভব হয়? তার চেয়ে ইয়ে করা যাক্—বরং একটা ঘুষের মামলা দাঁড় করাই। এই যে সে দিন হাঙ্গামার মোকর্দ্দমায় কয়েকটা জখমী পাঠিয়েছিলাম পরীক্ষা করতে, ডাক্তারবাবু 'সামান্য জখম' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারই একটাকে দিয়ে নালিশ করাই যে তার জখম গুরুতর ছিল, ডাক্তার আসামীদের কাছে তিনশো টাকা ঘুষ নিয়ে 'সামান্য জখম' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তা হলে আর যাবেন কোথা? আমার হুকুমে বেটা নালিশ করবে না? সাধ্য কি!—ধরে ১১০ ধারায় চালান করে দেব সে ভয় রাখে না?"

এই সময় জমাদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তারের বড় ছেলের নাম অজয়চন্দ্র, ছোট ছেলের নাম সুশীলচন্দ্র।" দারোগাবাবু, তখন কাগজ কলম লইযা কোর্টবাবুর নিকট

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে একটি কন্‌ফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল শ্রীজুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর
সমীপেষু—

বিচারপতী!

হুজুরের হুকুম মোতাবেক সাহেব-মারা মোকর্দ্দমার তদন্ত কবিতে করিতে আর দুই আসামীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের পীতা সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় হয় অজয়চন্দ্র অতী দুর্দ্দান্ত বেক্তী কলিকাতায় সুরেন্দ্রবাবুর কলেজে অধ্যয়ন করে প্রকাশ তাহারই হুকমসূত্রে অন্য অন্য আসামীগণ শাহেবকে মাইরপীট করিয়াছে, দুইজনকে ৫৪ ধারা অনুসারে অদ্য ধৃত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীডনস্কোয়াব হাঙ্গামাতে লীপ্ত ছিল সে এখানে আসিয়া একটি লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র সুশীলচন্দ্র অল্পবয়স্ক হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটী টীল ছোড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য সাহেব মেম দেখিলেই টীল ছুড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় শাহেব মারা রক্তাক্ত লাঠী প্রভৃতি নুক্কাইত আছে লাঠীখেলা সমিতীর চাঁদার খাতায় মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আস্কারা হইতে পারে বিধায় প্রার্থনা ফৌঃ কাঃ বিঃ ৯৬ ধারা অনুসারে উক্ত হরগোবিন্দ ডাক্তারের বাটী খানাতল্লাসী করিতে ছার্চ্চওয়াবেন্ট দিযা শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগ্যাধীন শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ এছাই।

১ দফা প্রকাশ থাকে যে উক্ত হরগোবিন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস শ্বপক্ষ দেশী চিনী ও করকচ নবন সর্ব্বোদা আহার করে স্ত্রির বেনামীতে ভারত কটন মীলে পাঁচশত টাকার শেয়াল খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগণ আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাঠাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাস থাকে পরম্প্রায় সুনিলাম উক্ত হরগোবিন্দ বলিয়াছে আসামী জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করে না।

ইতিমধ্যে জমাদার অজয় ও সুশীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। কিৎয়ক্ষণ পরে দুইজন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইতে চাহিলেন, কিন্তু দারোগা বলিলেন, "সাহেবের হুকুম নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সার্চ্চওয়ারেন্ট সহি করিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া থানার দারোগাবাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরুচুরির আসামীর সঙ্গে দারোগাবাবুর দরদস্তর চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল, হাল গোরু বিক্রয় করিয়া দারোগাবাবুর পান খাইবার জন্য কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে তাহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। দারোগা বলিতেছেন, দুই শত টাকার এক কাণা কড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না। এমন সময় সার্চ্চওয়ারেণ্ট উপস্থিত হইল। দারোগা তখন খুসী হইয়া একশত টাকা লইয়াই খাতেমা রিপোর্ট দিলেন—"তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দুসী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া গোহালে অনধীকার প্রবেস করতঃ জাব খাইতেছিল তদাক্রোসে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।"

গোরুচোরকে বিদায় দিয়া, বদনবাবু সাবধানে সার্চ্চওয়ারেন্টখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দ্দি পবিধান করিয়া, দশ বারোজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দাবোগাবাবু বীরদর্পে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী-স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ডাকিয়া, দারোগা ডাক্তারবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁকডাক আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাঁহাকে সার্চ্চওয়ারেন্ট দেখাইয়া স্ত্রীলোকগণকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। কনেষ্টবলগণকে দারোগা বলিলেন, "সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়"।—যে গুলির চাবি ছিল সেগুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিষপত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দাবোগাবাবু জুতার ঠোক্কর মারিয়া মারিয়া সেগুলো বিক্ষিপ্ত করিয়া "তল্লাস" করিতে লাগিলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, বডিস, মোজা, রুমাল প্রভৃতি দারোগাবাবুব জুতার ঠোক্করে চারিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর বধূমাতার বাক্স হইতে, অজয়চন্দ্রের হস্তলিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্ব্বে তাহা নিজ পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাক্স হইতে একখানি 'আনন্দ মঠ' পুস্তক বাহির হইল,—তাঁহা দেখিয়া দারোগাবাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন। পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমারি সিন্দুক ভাঙ্গিযা অনেক "তল্লাসী" হইল। ডাক্তারবাবুর প্রেস্ক্রিপসন বহি, তিনটা চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব বহি, সুরেন্দ্রবাবুর বাঁধানো ছবি, বিপিন পাল, লাজপৎ রায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিকপত্র,—সমস্তই দারোগবাবু ধৃত করিয়া লইলেন। ঔষধের আলমাবি খুলিয়া, একস্থান হইতে একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধ বোতল পরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,—লেবেলে একটা হরিণের চিত্র। বোতলটি লইয়া, কর্কটি খুলিয়া দারোগাবাবু একবার ঘ্রাণ লইলেন। পরে সাক্ষীদ্বযকে বলিলেন, "ডাক্তার তয়ের লোক।—একটু হবে?"

সাক্ষী দুইটি বলিলেন, "না মশায়, আমরা মদ খাইনে।"

দারোগাবাবু তখন একটি মেজর গ্লাসে খানিক ঢালিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্জ্জলা পান করিয়া ফেলিলেন। পরমুহূর্ত্তে মুখ শিটকাইয়া বলিলেন, "এটা কি? ব্র্যাণ্ডি বটে ত?"

সাক্ষীগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন, "হাঁ ব্র্যাণ্ডিই বটে।"

অতঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "গদি বালিসগুলো কাট ত। অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।"

কনেষ্টবল তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানাপত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাদা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তুলা বাহির করিয়া ফেলিল। তুলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে খানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগাবাবু তখন কাগজ কলম লইয়া দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদনবাবু বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—লাঠি আছে কি না দেখ।"

কনষ্টেবলগণ তখন চতুর্দ্দিকে লাঠি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাটীর পশ্চিমে ভৃত্য শিউরতনের সম্পত্তি মজঃফরফুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাঁশের দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, চশমা চক্ষে দিয়া দারোগাবাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন—"বৃহৎ বাসের লাঠি দুইটী রক্তের চীর্ণ পূর্ব্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।"

ফিরিস্তিতে সাক্ষীগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দবাবুকে ব্যঙ্গসূচক একটি সেলাম করিয়া সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দায় একটি কোণে একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।—পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তারবাবু একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে হরগোবিন্দবাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দবাবু গিয়া বলিলেন, "মশায় দেখলেন?"

বাবু দুইটি বলিলেন, "দেখলাম ত।"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?"

একটি বাবু বলিলেন, "কি হবে?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দবাবু অধীর হইয়া বলিলেন, "কি বলেন? আসবেন আপনারা?"

একজন বলিলেন, "তার চাইতে এক কাজ করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—"। অপর বাবুটি স্পষ্ট বক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে। আপনি একজন সরকারী চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে—আমাদের ত হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় করে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে থাক।"

"প্রমাণ হই মশায়।"—বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দবাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব তখন টেনিসের পোষাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেটখানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লাব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দবাবু তখন সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবু?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। খানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না?"

"আজ্ঞে হাঁ, দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই"।

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"How dare ypu! দুইদিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলেদের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন?

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব, বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুরের মধ্যে ডাক্তারবাবু স্ত্রীকন্যাগণের নিকট বসিয়া ছিলেন। একে পুত্র দুইটি বিনা কারণে কারাবদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান লাঞ্ছনা,—সকলেই আজ বড় বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এখনও আজ পাকাদির কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না। কাহারও ক্ষুধা নাই—কেহই কিছু খাইবে না। ডাক্তারবাবুর বড় মাথা ধরিয়াছে। ক্রমে তিনি মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। কন্যাটি পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, "ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু।"

ভৃত্য শিউরতন বাহিরে গেল। ফিরিয়া বলিল, "একঠো রোগী আছে—বোলাহাট থেকে এসেছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আজ আমার শরীর অসুস্থ। যেতে পারব না বল। অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক।"—শিউরতন গিয়া তাহাই বলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। আবার কে ডাকিল—"ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু।"

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল—"ঐ লোকঠো আবার এসেছে, বলে ডাংদারবাবুর সাথ ভেট না করে হামি যাব না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি ত উঠতে পারি নে—আচ্ছা বাবুকে নিয়ে আয়।"

বধূ কন্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তাববাবুকে প্রণাম করিল। বলিল, "বড় বিপদ। আপনি না গেলে নয়।"

"কার ব্যারাম?"

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

"কার ব্যারাম হয়েছে? কি ব্যারাম?"

"সে আর কি বলব। কোন্ মুখেই বা বলি?"

ডাক্তারবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি কে?"

"আমি থানার রাইটার কনেষ্টবল। আমার নাম হারাধন সরকার। দারোগাবাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তাব জন্যে তিনি লজ্জায় মরে আছেন। তার উপর এই বিপদ।"

"কি ব্যারাম?"

"বুকে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেই নয়।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমাকে কেন? আর কি ডাক্তার নেই?"

মুন্সীবাবু তখন পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন—বলিলেন, "দয়া করুন।"

টাকা দেখিয়া ডাক্তারবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিলেন, "টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন? সকলেই কি পুলিসের মত অর্থপিশাচ?—লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না। উঠুন—আপনার পথ দেখুন।"

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সীবাবু প্রস্থান করিলেন। বধূ, কন্যা প্রভৃতি আবার আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন, "একটু গরম দুধ এনে দেব?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দাও।"

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই ঝির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন। যুবতীটি বলিলেন, "গিন্নিমা কোথায়?"

"কে গা তোমরা?"

ঝি বলিল, "উনি বদন দারোগার পরিবার।"—সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কেন—কেন?"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, আমার স্বামীর প্রাণ যায়। আমার হাতেব নোযা যাতে বজায় থাকে তা করুন।"

গৃহিণী বলিলেন, "এমন ব্যারাম?"

"হ্যাঁ মা। ডাক্তারবাবু বলেছেন অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা,—তাঁব ব্যারামে অন্য ডাক্তার বুঝবে না, ত বাঁচবে কেমন করে? এইখানে কি খেয়ে গেছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখানে কি খেলেন? এখানে ত কিছু খাননি।"

যুবতী বলিলেন, "আমায় একবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে চলুন। তিনি আমার বাপ—এ সময় আমার লজ্জা নেই।"

গৃহিণী ইঁহাকে হরগোবিন্দবাবুর কাছে লইয়া গেলেন। যুবতী ডাক্তারবাবুব পা জড়াইযা ধবিয়া বলিলেন, "বাবা, আমায় বক্ষা করুন।"—গৃহিণী সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতীও সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতী তখন বলিলেন, "তিনি বলছিলেন, খানাতল্লাসী কববাব সময় ওষুধেব আলমারিতে একটা ব্যাণ্ডির বোতল ছিল, ব্রাণ্ডি মনে কবে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্চে সেটা ব্র্যাণ্ডি নয, কোনও বিষ-টিষ।"

একথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ওষুধের আলমাবিতে ব্র্যাণ্ডির বোতল?"

শুনবামাত্র ডাক্তারবাবুর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সম্বোধন করিযা বলিলেন, "আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চললাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিবে এলে আপনি যাবেন।"—যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সজলনেত্রে বলিলেন, "বাবা, আমার কপালের সিঁদুর থাকবে ত?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের হাত মা।"—বলিয়া তিনি ঔষুধ ও যন্ত্রাদি লইয়াকয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সারারাত্রি জাগিয়া ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দাবোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণাভাবে অজয় ও সুশীল খালাস পাইল। অন্য সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

[প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৫]

প্রবাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুন মাস। বালসূর্য্যের কনকরশ্মিতে লণ্ডন নগর উদ্ভাসিত। পথে পথে পুষ্পবালিকারা রাশি রাশি ফুল বিক্রয় করিতেছে। একখানি ফোর-হুইলারে চড়িয়া, মালপত্র সহ দুইজন বঙ্গীয় যুবক টেমস্ নদীর একটি জেটিতে উপনীত হইল। অদ্য বেলা বারোটার সময় এই ঘাট হইতে এডিনবরা অভিমুখে একখানি জাহাজ ছাড়িবে। যুবক দুইটি গ্রীষ্মবকাশে তথায় যাইতেছে।

একজনের নাম হেমচন্দ্র দত্ত। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল। বিলাতে আসিয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত উপাধিলাভ করিয়া, গত বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছে। আবার নভেম্বর মাসে দেশে ফিরিবে। অপর যুবকটির নাম অতুলচন্দ্র মিত্র। সে ধনীর সন্তান। আজ ছয় বৎসর বিলাতে আছে—এখনও পাস-টাস বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। দেশ হইতে আসিবার সময় ইহার অভিভাবকেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিলাতে পৌঁছিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্যেও চেষ্টা করিবে, বারেও নাম লেখাইবে। সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হও উত্তম; না হও, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবে। অতুলচন্দ্র বিলাতে আসিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্য 'চেষ্টা' করিতে লাগিল, কিন্তু আজি কালি করিয়া বারে ভর্ত্তি হওয়া আর হইল না। বারে ভর্ত্তি হইবার বার্ষিক ফী দেড়সহস্র পরিমাণ রজতমুদ্রারূপ পক্ষিশাবক যাহা আনিয়াছিল, ইতিমধ্যে ক্রমে তাহাদের পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে সেগুলি উড়িয়া গেল। তিন বৎসর অতীত হইল। অতুলচন্দ্র উপর্য্যুপরি দুইবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করিল। তাহার পিতামাতা লিখিলেন, তবে এইবার ব্যাবিষ্টারির সনন্দ লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। তখন অতুল বাড়ীতে লিখিতে বাধ্য হইল, ব্যারিষ্টারির জন্য এখনও ভর্ত্তি হওয়া হয় নাই। টাকা চাই।—ব্যারিষ্টারির পড়াও তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পরীক্ষাদি দিবার কোনই আয়োজন অতুলচন্দ্র করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে বলে লণ্ডন বড়ই চিত্তবিক্ষেপকর। তাই খানকতক চকচকে নূতন বহি কিনিয়া লইয়া, দুইমাসের জন্য এডিনবরায় যাইতেছে। সেখানে নির্জ্জনে ভাল করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবে, এই মহৎ সঙ্কল্প এখন তাহার মনে জাগরুক।

গাড়ীখানি জেটির কাছে পৌঁছিল। দুইজনে নামিয়া মুটিয়ার সাহায্যে জিনিষপত্রগুলি জাহাজে তুলিল। নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে জিনিষ গোছাইয়া উভয়ে উপরে ডেকে গেল। তখন বেলা দশটা মাত্র। আরোহী অতি অল্পসংখ্যকই আসিয়াছে। অনেকে জিনিষপত্র অগ্রীম জাহাজে পাঠাইয়া দিযাছে, নিজেরা যথাসময়ে আসিবে।—যুবক দুইজন সিগারেট মুখে করিয়া ডেকের উপব ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিল। হঠাৎ একস্থানে স্তূপীকৃত কতকগুলি বাক্স পেটারার মাঝে একটা জিনিষ হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অতুল সে সময়ে কিয়দ্দূরে, জাহাজের রেলিং ধরিয়া যাত্রীগণের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল। হেম ডাকিয়া বলিল—"ওহে অতুল, দেখ দেখ।"

অতুল উৎসুক হইয়া নিকটে আসিল। হেম দেখাইল, একটি তোরঙ্গের আওটায় লেবেল বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—"Miss Roy".

অতুল বলিল, "মিস্ রায় কে বিলেতে এসেছেন আমি ত ঠিক করতে পারছিনে?"

হেম বলিল, "আমিও ত শুনিনি।"—তখন দুইজন কলিকাতাস্থ রায়-পরিবারগণের একে একে নামোল্লেখ করিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাইল না।

অতুল বলিল, "চল একবার সমস্ত জাহাজটা ঘুরে দেখি, মানুষটা কি রকম।"

হেম বলিল, "এত লোকের মাঝে চিনতে পারবে?"

অতুল বলিল, "শত শত কুমুদ কহ্লারের মধ্যে একটি পদ্ম যদি ফুটে থাকে, তবে কি তাকে বেছে বের করা শক্ত?"

হেম হাসিয়া বলিল, "কি অবিচার। এমন সুন্দর সুন্দর ইংরেজের মেয়েরা হল কুমুদ কহ্লার, আর তোমার বাঙ্গালীর মেয়ে হল পদ্ম?"

"নিশ্চয়। 'কোথায় এমন মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে।' রবি ঠাকুরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে না কিসে পড়েছিলাম।"—হেম অতুলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "ধন্য তোমার বাঙ্গলা সাহিত্যজ্ঞান! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রীতি!"

অতুল বলিল, "চল, একটু খুঁজে দেখা যাক।" দুইজনে তখন জাহাজের নানাস্থানে খুঁজিল, কিন্তু একখানি সুস্নিগ্ধ, সলজ্জ, শ্যামবর্ণ মুখ কোথাও দেখা গেল না। দুইজনে হতাশ হইয়া আবার ডেকে ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ অতুল বলিল, "দেখ, একটা জিনিষ বড় ভুল হয়ে গেল।"

"কি?"

"এক বোতল ব্রাণ্ডি আনা হয়নি। দুই চার ডোজ্ নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি সমুদ্রপীড়ার অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। জাহাজে পাওয়া যাবে বোধ হয়, দেখি।"—বলিযা অতুল অদৃশ্য হইল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিল। অতুল আর আসে না দেখিয়া হেমচন্দ্র তাহার উদ্দেশে নিম্নে অবতরণ করিল। অতুলের ক্যাবিনে গিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। আঙ্গুলের গাঁট দিয়া বারকতক হেম দরজায় ঘা মারিল। ভিতর হইতে অতুল বলিল—"Come in."

হেম দ্বার খুলিয়া দেখিল, অতুল বসিয়া আছে, নিকটে খোলা ব্রাণ্ডির বোতল—গেলাস হাতে করিয়া অতুল প্রতিষেধক সেবন করিতেছে।

অতুল বলিল, "Just in good time—এস, একটু খাও।"

হেম চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "না, তুমি খাও। আমি খাব না।"

"কেন?"

"আমি কি কখনও খাই, যে খাব?"

"হানি কি? Don't be so girlish, Hem—ঐ তোমাব দোষ! একটু খেলে তোমার জাতি যাবে না। ঔষধার্থে সুরাং পীবেৎ—একথা শাস্ত্রেই আছে।"

হেম আসিয়া বলিল, "কোন্ শাস্ত্রে পড়লে? কালিদাসেব বৈবাগ্য শতকে, না জয়দেবেব রামায়ণে?"

"রামায়ণ যদি পড়তে ত জানতে পাবতে,—সীতা রাম—তাঁরাও—মদ বল্‌ব না, কথাটা শুনতে খারাপ—আসব পান কবতেন?"

"তা তুমিও আসব পান কর, আমি যাই।"

"যাবে কোথা? বস না। বসলেও কি তোমার জাত যাবে? নাও, একটা সিগারেট ধরাও।"

হেম উপবেশন করিল। সিগারেটের বাক্স হেমের সম্মুখে ধরিয়া অতুল গাহিল—

"এস সখা, কাছে বস,
বসিতে কি আছে দোষ?
তুমি যারে ভালবাসো—

By Jove—ভুলেই যাচ্ছিলাম। মিস্ রায়ের কোনও পাত্তা পেলে?

"না।"

অতুল এক আউন্স পরিমাণ প্রতিষেধক পান করিয়া বলিল—"দেখ হেম, আমার বোধ হচ্চে, এই মিস্ রায়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি প্রেমে পড়ে যাব।"—হেম কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "খপর্দ্দার। আমি প্রেমে পড়ে যাব বলে আগেই ঠিক করে রেখেছি।"

অতুল বলিল, "তা হতেই পারে না, আমি পড়বো।"

"বাঃ, আমি প্রথম আবিষ্কার করল্যাম তাঁর লাগেজ।"

"তাই বলে কি তোমার অধিকার জন্মে গেল নাকি? তা হলে যে কুলিটা তোরঙ্গ এনেছে তারই ত দাবী সব চেয়ে বেশী হয়।"

"সে ত আর উমেদাব নয়, যারা উমেদার তাদের মধ্যে কাব অধিকার বেশী দেখ। আমি লাগেজ আবিষ্কার করেছি, তুমি কি করেছ?"

অতুল বলিল, "মিস্ রায় নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করবেন।"

হেম বলিল, "নিশ্চয়ই না। আমাকে পছন্দ করবেন।"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্তদ্বয় মুচড়াইয়া বলিল, "দেখ দেখি আমার কেমন গোঁফ।"

হেম খাপ হইতে সোনার চশমা বাহির করিয়া পরিয়া বলিল, "দেখ দেখি আমার কেমন চশমা।"

"All right—let's have a toss up"—বলিয়া অতুল পকেট হইতে একটা পেনি বাহির করিল। "Heads, I win—tails, you lose" বলিয়া পেনিটা তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিব সাহায্যে সজোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। *পেনি মেঝেতে আসিয়া পড়িল। অতুল তখন ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—"Tails, you lose—যাক্—আমারই জিৎ হয়েছে।"

হেম কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা তবে তুমিই তাকে বিয়ে কোরো।"

এমন সময় জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। উভয়ে বাহির হইয়া ডেকের উপর আবোহণ করিল। সেখানে অনেক নরনারী একত্র ছিল, কিন্তু কোন শ্যামাঙ্গীর দর্শন পাওয়া গেল না। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটা বাজিয়াছে। লণ্ডনেব নগবসীমা বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া জাহাজ এখন দুই পার্শ্বে যব ও সর্ষপের ক্ষেত্র রাখিয়া সাগবাভিমুখে ছুটিয়াছে। ক্রমেই নদীর প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। ঘণ্টাখানেক পরেই জাহাজ সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইবে।

যাত্রীগণ পরস্পবকে জিজ্ঞাসা কবিতেছে—"Are you a good sailor?"—অর্থাৎ আপনি সমুদ্রপীড়ায সহজে আক্রান্ত হন না ত? এমন সময় ঢং ঢং করিযা মধ্যাহ্নভোজনের ঘণ্টা বাজিল।—অতুল ও হেম দুইজনে ভোজনকক্ষে নামিযা গেল। একটু নিরিবিলি খুঁজিয়া দুইজনে স্থান গ্রহণ করিযাছে, এমন সময় দুইটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। একটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, অপবটি বিংশতিবর্ষীয়া হইবেন। যিনি বর্ষীয়সী তিনি ইংরাজদিগের মত অত শাদা ধব্‌ধবে নহে—যেন ইতালীয় বা সন্দেহ। তাঁহার গাত্রবর্ণ ইংরাজদের মত অত সাদা ধব্‌ধবে নহে—যেন ইতালীয় বা স্পেনদেশীয়গণের মত। চুল কালো।

---

* পেনির যেদিকে ইংলণ্ডরাজলক্ষ্মী ব্রিটানিযাব মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে তাকে heads এবং যে দিকে সলাঙ্গুল সিংহ ও ইউনিকর্ণের মূর্ত্তি আছে সেই উল্‌টা দিকটাতে tails বলে। তর্কস্থলে একজন heads ও অপ্ব জন tails গ্রহণ কবিযা উপবিউক্ত মত পেনি ফেলিয়া দেয,—মাটিতে পডিযা যাহার দিকটা উঁচু হইযা থাকে তাহাবই জয়। এখানে অতুল বঙ্গ কবিযা উভয় দিকটাই নিজে গ্রহণ করিয়াছে, সুতবাং তাহাব জয অবশ্যম্ভাবী। ইহা একটি পুবাতন পবিহাস। বাঙ্গলাতেও এইরূপ একটা পরিহাস আছে—"দাদা, হয আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই, তুমি ঠাকুরপূজো কর; নয় তুমি ঠাকুরপূজো কর, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই।"

অতুল ও হেমের নিকট দিয়াই ইঁহারা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অতুল দেখিল, বর্ষীয়সী মহিলাটির হস্তে স্বর্ণকঙ্কণ, তাহাতে বঙ্গদেশীয়-শিল্পকরের কারুকার্য্য অভ্রান্তরূপে বর্ত্তমান। অতুল ও হেমের মধ্যে পরস্পর চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল।

ইঁহারা চলিয়া গেলে হেম বলিল—"কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের গায়ের রঙ কি অত পরিষ্কার হয়? এ' ত য়ুরোপীয়দের মত—শুধু তাদের মত চোখ ঝলসানো শাদা নয়, দিব্য স্নিগ্ধ গৌরকান্তি।"

"কি জানি। কিন্তু আর একটা সন্দেহের বিষয় রয়েছে। বাঙ্গালীর মেয়েরা ত কখনও বিলেতে গাউন পরে আসেন না—শাড়ী পরে আসেন।"

"আমার বোধ হয় অনেক দিন এ দেশে আছেন।"

"য়ুরোপীয় মহিলাটি বোধ হয় মিস্ রায়ের গভর্ণেস (শিক্ষয়িত্রী) হতে পারেন।"

"ওঁর হাতে বাঙ্গলা বালাটি লক্ষ্য করেছিলে?"

"করেছিলাম। মিস্ রায় উপহার দিয়ে থাকবেন, আশ্চর্য্য কি?"

অতুল ও হেম এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আহার সমাধা করিল। মাঝে মাঝে কক্ষের অপর প্রান্তে, অনুমিত মিস্ রায়ের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আহার সমাধা হইলে দুইজনে ডেকে উঠিয়া দুইটি বৃহৎ চুরুট ধরাইল। ঐ দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে,—তাহার তরঙ্গায়িত সুনীল দেহময় শুভ্র ফেনপুঞ্জ নৃত্য দৃষ্টি করিতেছে। দুইখানি ডেক-চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে দুইজনে তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিলা দুইজনেও ডেকে আসিয়া পৌঁছিলেন। অতুল ও হেম যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাঁহারা দূরস্থিত সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতুল ও হেম তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Wont you take these chairs, ladies?"—প্রবীণা বলিলেন, "না—না—বসুন। আপনাদের কেন আমরা বঞ্চিত কবিব?"

অতুল বলিল, "চেয়ারের অভাব কি? আপনারা বসুন, আমবা অন্য চেয়ার আনিয়া বসিতেছি।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া মহিলা দুইজন উপবেশন করিলেন। একস্থানে জাহাজের অনেক চেয়ার গাদা করা ছিল, অতুল চট্ করিয়া তাহার মধ্য হইতে দুইখানি টানিয়া আনিল।

প্রবীণা বলিলেন, "আপনারা কি এই প্রথম এডিনবরায় যাইতেছেন?"

অতুল বলিল, "এই প্রথম। আর আপনারা?"

"আমরা ত এডিনবরারই লোক। আমার মেয়ে লীলা লণ্ডনে কেনসিংটন্ কলেজ অব্ মিউজিকে পড়িতেছিল, এ বৎসর পাঠ সাঙ্গ হইল, তাই আমি উহাকে লইতে আসিয়াছিলাম।"

'ইনিই আপনার কন্যা বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমার আরও একটি কন্যা, একটি পুত্র আছে। তাহাবা এডিনবরাতে। আমার ছেলেটি য়ুনিভার্সিটিতে প্রোফেসার। আপনারা ইংলণ্ডে কত দিন আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমার ছয় বৎসর হইল। আর আমাব বন্ধু মিষ্টার দত্ত চারি বৎসর আসিয়াছেন।"

শুনিয়া মহিলাটি বলিলেন, "দত্ত!—আপনি কি বাঙ্গালী? আপনারা দুইজনেই কি বাঙ্গালী?—হেম বলিল, "আমরা দুইজনেই বাঙ্গালী। ইঁহার নাম মিষ্টার মিত্র।"

"I am so glad—কলিকাতায় আমাদের অনেক আত্মীয় বন্ধু আছেন। আমার স্বামী বাঙ্গালী ছিলেন।"

হেম ও অতুল যুগপৎ বলিয়া উঠিল, "বটে! বলেন কি! তবে আপনাকে আমাদের স্বজাতীয়া বলিয়া দাবী করিতে পারি।"

"অন্ততঃ আমার কন্যা লীলাকে পারেন। ও কলিকাতাতেই জন্মিয়াছিল। আমার স্বামী

এডিনবরায় যখন ডাক্তারি পড়িতেন, সেই সময় আমাকে বিবাহ্ করিয়াছেন। তাহার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। সেখানে আমরা পাঁচ বৎসর ছিলাম। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।"—বলিয়া মিসেস রায় চক্ষু আনত করিলেন।

কথা ফিরাইবার জন্য মিস্ রায় বলিলেন, "আপনারা কি good sailors?"

অতুল বলিল, "সমুদ্র শান্ত থাকিলে আমি অসাধারণ good sailor—আর, আমার বন্ধুও তাই।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। হেম বলিল, "আপনি কেমন?"

"আমিও আপনাদেরই মত। মা খুব good sailor—নয় মা?"

মিসেস রায় বলিলেন, "না—না—গর্ব্ব করিতে নাই। ইহা আমি বারম্বার দেখিয়াছি, সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে যে নিজেকে good sailor বলিয়া দর্প করে, সেই প্রথমে পড়ে। তবে এ পথটা তেমন তরঙ্গসঙ্কুল নহে। যখন The Wash-এর কাছাকাছি পৌঁছিব, তখন ঢেউ একটু বেশী হইবে বটে। কিন্তু সে পথটুকু পার হইতে ঘণ্টা দুই লাগিবে।"

এই প্রকার নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইল। রাত্রি-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতে সকলে উঠিলেন। মিসেস রায় বলিলেন, "আমরা যেখানে খাইতে বসি, আপনারাও সেই টেবিলে আসিয়া যোগদান করুন না?"

হেম ও অতুল বলিল, "ধন্যবাদ। সে ত আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর দিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর জাহাজ The Wash-এব সম্মুখীন হইল। জাহাজ যেই দুলিতে আবম্ভ কবিল, অমনি যাত্রীগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া ক্যাবিনে গিয়া সটান শুইযা পড়িলেন। ডেকের উপর চলা দুষ্কর। সিঁড়ি দিয়া নামা দুষ্কর। যথেষ্ট 'প্রতিষেধক' সেবন করা সত্ত্বেও অতুল আগেই কাৎ হইয়াছে। ক্রমে হেমও পড়িল। কেবল দুই চারিজন ইংরাজ পুরুষ তখনও ডেকের উপর বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় টেবিলের অনেক আসনই শূন্য।

বেলা চাবিটা বাজিলে জাহাজ যখন ইয়র্কশায়ারের সম্মুখীন হইল, তখন জাহাজের দোলানী বন্ধ হইল। যাত্রীগণ একে একে ডেকে আসিযা দর্শন দিতে লাগিলেন। সকলেই যেন কতদিনের রোগশয্যা হইতে উঠিযাছেন। রায়-জায়া ও কন্যা, হস্তে উপন্যাস ও কুশনাদি লইযা ক্যাবিন হইতে বাহির হইলেন। হেম ও অতুল তাহা দেখিয়া তাঁহাদের বোঝা নিজেবা বহন করিয়া, ডেকে লইয়া গিযা, চেয়ার ভাল জায়গায় রাখিয়া ইঁহাদের বসাইয়া দিল। সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় ক্রমে ইঁহারা সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুখে হাসি ফুটিল—কথা বাহির হইল।—চায়ের ঘণ্টা হইলে হেম ও অতুল বলিল, "আপনারা নামিবার কষ্ট করিবেন না। আপনাদের চা প্রভৃতি আনিয়া দিতেছি।"

মিস্ রায় বলিলেন, "I am famishing. Get me plenty of bread and butter, please, Mr. Mitra, and some fruit."

অতুল বলিল, "All right, bread and butter Miss,* you shall have them."

মিস্ রায় বলিলেন, "I am not a bread and butter miss."

অতুল বলিলেন, "Yes, you are."

---

* অল্পবয়স্কা যুবতীকে পরিহাস কবিয়া Bread and butter Miss বলা হয়। বালক-বালিকাগণকে রুটি মাখনই বেশী খাইতে দেওয়া হয, মাংসাদি কম, ইহা হইতেই এ পবিহাসের উৎপত্তি।

"No, I aint."—বলিয়া মিস্ রায় অতুলকে হস্তস্থিত উপন্যাসখানিক দ্বারায় আঘাত করিলেন।—নীচে গিয়া হেম বলিল, "কি হে! এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে তুলেছ!"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্ত দুই হস্তে মুচড়িয়া বলিল, "কেবল এই গোঁফ জোড়টির গুণে দাদা।"

গ্রীষ্মকালে "রাত্রি" নয়টা পর্য্যন্ত দিবালোক থাকে। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার কথা। Waish পার হইতে দুই ঘণ্টার স্থানে চারি ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। রাত্রি হইলে জাহাজকে বন্দরে ঢুকিতে দিবে না; প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি সমাগমের পূর্ব্বে পৌঁছে কি না পৌঁছে এই বলিয়া যাত্রীগণ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।

যখন দূরে তীরভূমি দেখা গেল, তখন অন্ধকার হয় হয়। ক্রমে রাত্রি আসিল। লীথ্ বন্দরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কল্য প্রভাতে ভিন্ন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পাইবে না।—রাত্রি কাটিল। প্রভাতে উঠিয়া যাত্রীগণ প্রাতরাশ সমাধা করিলেন। মিসেস রায় বিদায়ের প্রাক্কালে অতুল ও হেমকে বলিলেন, "আপনারা কোথায় থাকিবেন?"

"আপাততঃ কোনও হোটেলে উঠিব। তাহার পর রুমস্ খুঁজিয়া লইব।"

"আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে আপনাদিগকে দেখিতে পাইলে সুখী হইব। এই লউন আমাদের ঠিকানা। এ কার্ডে At Home on Saturday evening লেখা আছে বলিয়া শনিবার অবধি অপেক্ষা করিবেন না। যেদিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা আসিবেন।"—বলিয়া হেম ও অতুলকে একখানি করিয়া কার্ড দিলেন।

লীথ্ বন্দর হইতে রেলপথে এডিনবরায় যাইতে হয়। বস্তুতঃ লীথ্ এডিনবরারই উপনগর মাত্র। জাহাজ হইতে নামিয়া, রেলপথে কয়েক মিনিট ইঁহারা এডিনবরায় পৌঁছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। মার্চ্চমণ্ট রোডেব একটি বাড়ীতে রুমস্ লইয়া হেম ও অতুল বাস করিতেছে। রায় পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা ইঁহাদের খুব বাড়িয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ হেমের। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রায়ই হয়।

আজ রবিবার। বেলা সাড়ে দশটার সময়, রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া অতুল নিজ শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বসিবার কক্ষে গিয়া দাসীর জন্য ঘণ্টা বাজাইল।

দাসী আসিলে অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টার দত্ত কি প্রাতরাশ শেষ করিয়াছেন?"

"হ্যাঁ মহাশয়, তিনি আজ অন্য দিনের অপেক্ষা শীঘ্রই প্রাতরাশ শেষ করিয়া কোথায় বাহির হইয়াছেন।"—এমন সময় নিকটস্থ গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অতুল বলিল, "আজ রবিবার বুঝি,—গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতেছে।"

দাসী বলিল, "হ্যাঁ মহাশয়, আজ রবিবার। এ বাড়ীর সকলেই গির্জ্জায় গিয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ শেষ হয় নাই বলিয়া আমি শুধু আছি।"

"ওঃ—আমার জন্য তুমি গির্জ্জায় যাইতে পাও নাই? আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আচ্ছা, আমার খাবার দিয়া তুমি যাও—অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

"ধন্যবাদ মহাশয়,"—বলিয়া ঝি একটি ট্রে ভরিয়া প্রাতরাশের দ্রব্যসম্ভার আনিয়া দিল। সেগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

অতুলের মুখে সিগারেট। খাদ্যের নিকট চেয়ার সরাইয়া আনিয়া এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল। অন্যমনে অল্প অল্প করিয়া চাটুকু পান করিতে লাগিল।

আপন মনে অতুল বলিতে লাগিল, "আর কিছু নয়, হেম গির্জ্জায় গিয়াছে। গত রবিবারেও গিয়াছিল। হঠাৎ তার এমন ধর্ম্মে মতি হল কি করে? Cherchez lafemme—বুঝেছি—কুমারী লালার 'প্রেয়ার বুক' বহন করবার লোভেই ভায়া রাতারাতি এমন ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছেন।"—এক পেয়ালা চা শেষ হইল। খাবারের বিবিধ পাত্রগুলির ঢাকা খুলিয়া খুলিয়া অতুল দেখিতে লাগিল। শেষে দুইটি ডিম্ব মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাই খাইল। কল্য রাত্রে থিয়েটারের পর কোথায় গিয়াছিল, তিনটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছে—সেই জন্য শরীর কিছু খারাপ,—খাইতে ইচ্ছা নাই।

আর এক পেয়ালা চা খাইয়া অতুল টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। নূতন সিগারেট ধরাইয়া, জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া হেম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করিয়া অতুল সিদ্ধান্ত করিল, হেম যে লীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। আর লীলা?—লীলাও যে হেমের অনুরাগিণী, ইহাও অতুল বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে অতুল বলিয়া উঠিল—"What the devil does he mean by it? Will he marry the girl?"

ভাবিল—হেম যেরূপ শীতল প্রকৃতি ও হিসাবী লোক, ও যে নিছক প্রেমের জন্য বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ত বিশ্বাস হয না। Love in a cottage উহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়াছে, দেশে ফিবিয়া গেলে বিলাতফেরত-সমাজে হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে। বিবাহযোগ্য কন্যাগণেব মাতারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। নীলামের ডাকে সর্ব্বোচ্চ দরে হেম নিজেকে বিক্রয় করিবে। কোনও ধনকুবেরের একটি কালো মেয়ে এবং পাঁচ অঙ্কেব একখানি চেক, হেম বিবাহ করিবে। বেচারি মিস্ রায়—আমি বাস্তবিক তোমার জন্য দুঃখিত। সুন্দরী মিস্ রায়, সুগায়িকা, সুশিক্ষিকা কোমলহৃদয়া মিস্ রায়,—তোমার সব ভাল, কিন্তু তুমি দরিদ্র বিধবাব মেয়ে। তোমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তোমার মার ক্যাশবাক্সটি শূন্য। কোনও আশা করিও না—কোনও আশা করিও না।

এগারোটা বাজিল। অতুল তখন ভাবিল—"যাগ্‌গে পরের চিন্তা করে কি হবে, নিজেব চিন্তা কিছু করা যাক।"—মনে পড়িল, এডিনবরায় দুই মাস নিরিবিলিতে আইন অধ্যয়ন করিবে বলিয়া খানকতক বহি কিনিয়া আনিয়াছিল, সেগুলির এখনও পাতা কাটাও হয় নাই। উঠিয়া গিয়া বহিগুলি তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া আনিল। সেগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিল এবং ভাবিল—"আজ পাতা কাটিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিই।" তাহার পর হঠাৎ মনে হইল—"আজ যে রবিবার—অনধ্যায়। যদিও আমি খৃষ্টান নহি—তথাপি যস্মিন দেশে যদাচারঃ—ওগুলো মানিয়াই চলা ভাল। আজ থাক—শবীরটাও ভাল নাই। বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠঃ—একেবারে বৃহস্পতিবার দিন আরম্ভ করা যাইবে।"—সরস্বতী আবার তোরঙ্গ রূপ জেলে "রিম্যাণ্ডেড" হইলেন।

বারোটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর ভাল লাগিল না। পাড়ায গির্জ্জায় উপাসনা শেষ হইয়া গিয়াছে। পথে দলে দলে নরনারী বালকবালিকা তাহাদের পোযাকী কাপড় পরিয়া গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। অতুল উঠিয়া বেশ পরিধান করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। নগরের মধ্যস্থলে প্রিন্সেস গার্ডেনস্ নামক বিস্তীর্ণ মনোহর উদ্যান আছে,—সেইখানে গিয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে গাছেব ছায়ায় একটি বেঞ্চিতে বসিয়া সিগারেট ধরাইল।

এমন সময় দেখা গেল, কিছু দূরে মিস্ রায়কে লইয়া হেমচন্দ্র আসিতেছে। অতুল অপেক্ষা করিল, ক্রমে ইঁহারা নিকটে আসিলেন। তখন অতুল দাঁড়াইয়া মিস্ রায়ের প্রতি টুপি উত্তোলন করিল। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "আপনারা কি গির্জ্জার ফেরৎ নাকি?"

হেম বলিল, "হ্যাঁ। গির্জ্জায় গরমে মিস্ রায় মূর্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাই উপাসনান্তে ইঁহাকে একটু শীতল বায়ু সেবন করাইতে আনিয়াছি।"

অতুল বলিল, "শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন আপনি কেমন আছেন মিস্ রায়?"

লীলা বলিলেন, "ধন্যবাদ, এখন বেশ আছি। আপনি কখনও গির্জ্জায় যান না বুঝি?"

অতুল বলিল, "গির্জ্জায়? হ্যাঁ, যাই বইকি। প্রতি বৎসর ক্রিসমাসডের দিন যাই।"

মিস্ রায় হাসিয়া বলিলেন, "যাহারা রবিবারের দুইবেলা গির্জ্জায় যায় না, একবার মাত্র যায়, গ্ল্যাডষ্টন তাহাদিগকে শ্লেষ করিয়া oncer বলিয়াছেন। আপনি দেখিতেছি once-a-yearer."

অতুল বলিল, "আত্মার পরিত্রাণের জন্যই ত গির্জ্জায় যাওয়া? তা, আমার আত্মা আছে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ, মিস্ রায়। তাই গির্জ্জায় যাওয়ার চাড় হয় না।"

লীলা বলিলেন, "আপনার আত্মা পরহস্তগত নয় ত?"

"তাহা হইলেও ত বুঝিতাম, যেখানে হউক কোথাও আছে। যাহাদের আত্মা পরহস্তগত, তাহারা ত নিয়মিতরূপেই গির্জ্জায় যায় দেখিতে পাই।"—বলিয়া অতুল হেমচন্দ্রের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিল। হেম যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না। কুমারী লীলার গণ্ডস্থল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। বলিলেন, "এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে,—আসুন না, একটু বেড়ান যাক্।"

অতুল উভয়ের মুখপানে সস্মিতভাবে দৃষ্টিপাত করিল। পরে হেমের দিকে চাহিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল—"Thanks—but shall I not be intruding?"

হেম বলিল, "অবশ্যই না।"

তিনজনে নানা কথোপকথন করিতে করিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হেম ও অতুল দুই দিকে—মিস্ রায় মধ্যস্থলে। ভারতবর্ষের অনেক কথা হইতে লাগিল। অতুল বলিল, "মিস্ রায়, ভারতবর্ষ আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

"করে না আবার? খুব করে। ছেলেবেলায় আমি কলিকাতায় ছিলাম, তাহাই ছায়াবৎ আমার স্মরণ হয়। আমি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—নদী, বন, পাহাড় এ সব কিছুই দেখি নাই। সেই সব আমার দেখিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, ভারতবর্ষের কি ফুল ভাল, গোটাকতক নাম করুন না।"—অতুল বলিল, "বেলা, যুঁই, গন্ধরাজ, বকুল, টগর—"

হেম বলিল, "কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম, কেতকী, কামিনী—"

মিস্ রায় বলিলেন, "কামিনী? সে কি রকম ফুল?"

অতুল বলিল, "ছোট শাদা ফুল রাত্রে ফুটে, গন্ধটুকু বড় মৃদু—অথচ বড় মিষ্ট—তাই ইহার নাম কামিনী অর্থাৎ lady flower."—লীলা বলিলেন, "Lady flower" কি সুন্দর নাম! আচ্ছা, মিষ্টার মিত্র, এ দেশের ও আমাদের দেশের ফুলের মধ্যে প্রভেদ কি?"

অতুল বলিল, "আপনার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে, আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, যেহেতু আপনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া উল্লেখ করিলেন।"

লীলা বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার পিতা বাঙ্গালী। আমার নিজের জন্ম ভারতবর্ষে। আমি সে দেশকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিব না ত কোন দেশকে করিব? আমি ত প্রবাসিনী।"

অতুল বলিল, "প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষের দুহিতাকে একদিন ভারতবর্ষে দেখিয়া সুখী হইবে"—হেমের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি আমার সহিত এ প্রার্থনায় যোগদান কর না হেম?"—হেম বলিল, "অবশ্য।"—কিন্তু তাহার স্বরটা অতুলের মত হাস্যবিকশিত নহে—যেন অপরাধীর মত।

অতুল বলিল, "আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—এ দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় ফুলের

তফাৎ কি। এ দেশীয় ফুল অধিকাংশই চটকদার কিন্তু গন্ধশূন্য। ভারতবর্ষীয় ফুল দেখিতে তত বাহারে না হউক—কিন্তু সৌরভে ভরপুর! তেমন মিষ্ট গন্ধ এ দেশে কোনও ফুলে নাই।"

মিস্ রায় বলিলেন, "কেন, ভায়োলেটস্—লিলিজ্ অব্ দি ভ্যালি?"

"আমাদের মনে ধরে না। আপনি একবার ভারতবর্ষীয় ফুল আঘ্রাণ করিলে আপনারও মনে ধরিবে না।"

এই সময় কুমারী রায় ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "একটা বাজিযাছে। আমাদের গৃহে আজ মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে মিষ্টাব দত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিষ্টার মিত্র,—আপনাকেও অনুরোধ করিবার জন্য মা এখানে নাই, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, আপনিও যদি আসেন তবে মা অত্যন্ত খুসী হইবেন।"—হেম বলিল, "এস না। আহাবাদির পব বৈকালে সকলে মিলিয়া বেশ জটলা কবা যাইবে। মিস্ রায় গাহিবেন।"

মিস্ রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র আমার গান মোটেই পছন্দ করেন না।"

অতুল বলিল, "পছন্দ কবি কি না হেমকে জিজ্ঞাসা করুন—কিন্তু—"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া লীলা বলিলেন, "পছন্দ করেন—'কিন্তু'। আপনার কিন্তু-ওয়ালা পছন্দ আমি চাই না—যান।"

অতুল বলিল, "আপনার গানে কিন্তু নয়। কিন্তু আজ রবিবার। আপনারা ভয়ঙ্কর ধার্ম্মিক পরিবার। রবিবারে তাস খেলেন না, ধর্ম্মসঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাওয়া পাপ মনে করেন। আমার কেমন কু-অভ্যাস, ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিলেই আমার হাই উঠিতে থাকে। রবিবাবে নয় এমন একদিন আসিয়া, আপনার গান শুনিব। বার্ণস্ রচিত গুটিকতক প্রেমের সঙ্গীত অনুগ্রহ কবিয়া গাহিবেন। ইংবাজি এবং স্কচ্ সুবে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! ইংরাজি সুরের সঙ্গে বাঙ্গলা সুর কিছুই মেলে না। কিন্তু স্কচ্ সুরগুলি শুনিলে বাঙ্গলা রাগিণী মনে পড়ে। বার্ণসেব গানে আমি মুগ্ধ হইযা যাই।"

লীলা বলিলেন, "বার্ণসের কোন্ কোন্ গান আপনি বেশী ভালবাসেন?"

"কোন্টার নাম করিব? অনেক আছে! সেইটি—

Ye banks and braes O' bonnie Doon

কি সুন্দব সুর—ঠিক যেন বাঙ্গলার মত।"

হেম বলিল "জানেন মিস্ বায়, আমাদেব দেশের একজন কবি, ঠিক এই সুরে এই ভাবের একটি বাঙ্গলা গান বচনা করিয়াছেন!"—মিস্ রায় বলিলেন, "কি গানটি, বলুন না।"

"আপনি ত বাঙ্গলা বুঝিবেন না।"

"তবু কথাগুলি শুনি।"

হেম মৃদুস্ববে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল—

"ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদু বায়;
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোল বহিয়া যায।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
না জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়।"*

বার্ণসের চিরপরিচিত সুর। শুনিয়া মিস্ রায় থাকিতে পারিলেন না—গুন্ গুন্ করিয়া হেমের সহিত সুর দিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইলে অতুল বলিল, "Avaunt, ye sinners!—রবিবারে আপনারা প্রেমের গান গাহিলেন?"—বলিয়া প্রচুর হাস্য করিয়া, টুপী তুলিয়া অতুল বিদায় গ্রহণ করিল।

---

* শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব বচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও এক মাস অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে অতুল ও হেম বসে পরিধান করিয়া বাহির হইল। আজ মিসেস রায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দুই মাস এডিনবরা বাসের পর, আগামীকল্য বেলা দশটার গাড়ীতে উহারা লণ্ডন-যাত্রা করিবে। তাই আজ সন্ধ্যায় বিদায় ভোজ।—সেদিন অন্য আর কেহ নিমন্ত্রিত ছিল না। মিসেস রায়ের পুত্র এবং অপর কন্যাটিও স্থানান্তরে।

আহারের পর সকলে আসিয়া ড্রয়িংরুমে বসিলেন। রায় গৃহিণী বলিলেন, "মিষ্টার দত্ত, কলিকাতায় আমাদের যে আত্মীয় আছেন, তাঁহাদের শিশুদিগের জন্য কিছু উলের জিনিষ তৈয়ারী করিয়াছি। আপনাকে যদি একটি পার্শেলে করিয়া সেইগুলি দিই, আপনি লইয়া গিয়া তাঁহাদেব দিতে পারেন না?"

"অবশ্যই পারি। অতি আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন অসুবিধা হইবে না ত?"

"কিছুমাত্র না।"

"আপনি কোন্ মাসে লণ্ডন হইতে গৃহ-যাত্রা কবিবেন?"

"নভেম্বর মাসে।"

"তবে ত আর তিন মাস আছে। গৃহ-যাত্রার পূর্ব্বে আর কি একবার এডিনবরায় আসিবেন না?"

"ইচ্ছা আছে। এই দুই মাসে আপনারা আমাকে যে পরিমাণ আদর যত্ন করিয়াছেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যদি একবার দেখা না করিয়া যাই, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতাব কাজ হইবে।"

মিসেস রায় বলিলেন, "Very good of you to think so."

কুমারী লীলা আজ সুন্দব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাব হৃদয় হইতে আনন্দ যেন আজ কোথায় অন্তর্হিত। মাঝে মাঝে হাসিতেছেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যায় তাহা চেষ্টাকৃত হাসি।—অতুল বলিল, "আজ মিস্ রায়ের গুটিকতক বাছা বাছা গান আমরা শুনিয়া যাইব।"

মিস্ রায বলিলেন, "বেশ, কিন্তু আপনাকেও আজ গাহিতে হইবে।"

"যে গাহে তাকে বলুন। হেম গাহিবে।"

"উনি ত গাহিবেনই। কিন্তু আজ আপনার গান না শুনিয়া ছাড়িতেছি না।"

কুমারী লীলা পিয়ানোয় বসিলেন। একটি—দুইটি—তিনটি—অনেকগুলি গান হইল। তখন হেম একটি বাঙ্গলা গান গাহিল।—অতুল বলিল, "মিস্ বায, আপনাব Bonnie Prince Charlie গানটি একবাব শুনি।"

ইংরাজেব ইতিহাসে যিনি Young Pretender নামে অভিহিত, স্কট্‌ল্যাণ্ডে তাঁহাব নাম আজিও Bonnie Prince Charlie। এখনও সে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহারা মনে করে, Prince Charlie-ই তাহাদের প্রকৃত বাজা ছিলেন;—এখন তাঁহার বংশধর যদি কোথাও থাকেন তবে তিনিই স্কট্‌ল্যাণ্ড-সিংহাসনেব ন্যায্য অধিকারী। এখনও প্রত্যহ স্কট্‌ল্যাণ্ডের মাঠে, নদীতীরে, গিরি-শিরে, উপত্যকা-ভূমিতে—Bonnie Prince Charlie সম্বন্ধে শত শত গাথা গীত হইয়া থাকে।

মিস্ রায় পিয়ানোর নিকট বসিযা যে গানটি গাহিলেন, তাহারা রাফ্রা—অর্থাৎ প্রত্যেক কলির শেষে ধুয়া আছে—

Charlie's my darling—my darling– my darling.

মিস্ রায় সুন্দবভাবে ধ্বনির সহিত সমস্ত হৃদয় মিশাইয়া দিয়া গানটি গাহিতেছিলেন। যখন তৃতীয় কলির রাফ্রা শেষ হইল, অনুচ্চ পরিহাসে অতুল তখন হেমকে বলিল, "I

say Hem, wouldn't you like to be Charlie?" হেম চুপি চুপি বলিল—"Shut up"—কুমাবী রায় শুনিতে পা৹ ইহা অবশ্যই অতুলের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু লীলা সেই মুহূর্ত্তে পিয়ানোর উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট ইহাদেব পানে চাহিলেন এবং তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। তিনি সহসা গান বন্ধ করিয়া দিলেন। অতুল বড়ই অপ্রতিভ হইল। হেম বলিল, "থামিলেন যে?"

মিস্ রায় বলিলেন, "তিনটা verse (কলি) ত গাহিলাম, আব কেন?"

হেম ও অতুল বাকীটুকু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মিস বায হাসিযা আবার গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আব হইল না। গানে সে প্রাণসঞ্চার আর করিতে পারিলেন না। যেন সুরলযটুকু বজায় রাখিয়া গ্রামোফোন বাজিয়া গেল।

গান শেষ করিয়া মিস্ রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র, আজ আপনাকে গাহিতেই হইবে। কিছুতেই ছাড়িব না।"

অতুল বুঝিল, এইমাত্র কৃত-অপবাধ মিস্ রায ক্ষমা করিয়াছেন। মনে অত্যন্ত আবাম পাইয়া বলিল, "কি গান গাহিব?"

হেম বলিল, "তোমার একটা হাসির গান গাও না।"

"হাসির গান? শুনিয়া আপনারা হাসেন যদি?"

কুমারী লীলা বলিলেন, "হাসিব বইকি! হাসিব গানে হাসিব না?"

অতুল বলিল, "তার চেয়ে বরং একটা করুণ বসের গান গাই। আপনারা হাসিবেন, সে আমি সহ্য কবিতে পারিব না। আমার মনে হইবে, গানেব জন্য নহে, গানে আমার অক্ষমতা দেখিয়া আপনারা হাসিতেছেন। আমি একটি নিরাশ-প্রণযের—করুণবসের গান গাই।"

মিসেস বায বলিলেন, "আশা করি আপনি নিজে একজন নিবাশ-প্রণয়ী নহেন।"

কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়া অতুল বলিল, "হ্যাঁ মিসেস বায—আমিও একজন নিবাশ-প্রাণী! একদিন সন্ধ্যাকালে একটি বাগানে, আমি আমাব হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা একজন বালিকাকে অর্পণ করিয়াছিলাম। সে নিষ্ঠুর উপেক্ষার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি আমার জীবন শ্মশানতুল্য হইয়া গিয়াছে।"

কুমারী রায় বলিলেন, "তাইত! এ ঘটনা কোথায় ঘটিল? এখানে না লণ্ডনে?"

"এখানেও নয় লণ্ডনেও নয়। দেশে—দেশে মিস্ রায়। আমাব বয়স তখন দশ বৎসব—তাহার বয়স সাত।"—বলিয়া যেন অশ্রুরোধ করিবার জন্য অতুল চক্ষে রুমাল দিল।

শুনিয়া সকলের মহা হাসি। কুমারী রায় বলিলেন, "রুমালখানি নিংড়াইয়া ফেলুন—নিংড়াইয়া ফেলুন; ওখানি চোখের জলে অত্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে।"

অতুল শুষ্ক রুমালখানি লইয়া সজোরে নিংড়াইতে আরম্ভ করিল।

মিসেস রায় বলিলেন, "কই, মিষ্টার মিত্রের গান হইল কই? গল্পে গল্পে আসল কথা ভুলিয়া যাইতেছি।"

লীলা বলিলেন, "হ্যাঁ মিষ্টার মিত্র এইবার গান।"

অতুল তখন পিয়ানোর নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিল তাহার ভাবানুবাদ এই :—

কহিল নায়ক তিতি অশ্রুনীরে—
বিদায়—বিদায়—বালা;
আর না আসিবে এ অভাগা জন
জানাতে হৃদয় জ্বালা।
কতদিনকার আশালতা মোর
ছিন্ন হইল আজি;

শুকাইয়া গেল ফুটেছিল যত
বাসনা-কুসুম-রাজি।
এমন কোমল তনুখানি তব,
এমন মধুর হাসি,
কে জানিত ছিল, হৃদয়ে তোমার
কেবল গরল রাশি!
আজি হতে মোর জীবন হইল
দগ্ধ সাহারা প্রায়—
অটুট যাতনা চির নিশিদিন
কেমন সহিব হায়।
কহিল নায়িকা— এ ঘোর যাতনা
রহিবে না নিরবধি,
সর্ব্বরোগ-হর বীচামের পিল
খাও কিছু দিন যদি।

গান শুনিয়া মহিলাদের হাসি আব থামে না। কুমারী লীলা বলিতে লাগিলেন, "Dear oh dear! oh,—I never!—Just fancy her prescribing Beecham's pills for her lover—of all things in the world!"

হাসির তরঙ্গ থামিলে হেম বলিল, "একবার একটা গির্জ্জার লোকেদের সঙ্গে, বীচাম কোম্পানী কি চাতুরী খেলিয়াছিল জানেন না বুঝি?"

মহিলারা বলিলেন, "না—কি হইয়াছিল?"

"কোনও পল্লীগ্রামে একটি dissenting chapel ছিল,—তাহারা উপাসনাপ্রণালী ও সঙ্গীতাদিতে প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিত না। উপাসনাব সময় লোকের হাতে হাতে সেই বহি প্রতি রবিবারে দেওয়া হইত। কালক্রমে বহিগুলি ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু সে গির্জ্জার এমন সঙ্গতি ছিল না যে বহিখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া লয়। ইহা শুনিয়া বীচাম কোম্পানি বলিল,—'আমরা ছাপাইয়া দিতেছি, কিন্তু বহিতে আমাদের ঔষধের বিজ্ঞাপন একটু আধটু দিয়া দিব।' গির্জ্জার কর্ত্তৃপক্ষ ডীকনগণ ভাবিলেন, মলাটে কি শেষ পৃষ্ঠায় যদি উহাদের একটু বিজ্ঞাপনই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা কি?—বিশেষ যখন বিনামূল্যে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বহি ছাপিয়া আসিল। প্রথম দিন উপাসনার সময় সেই বহি হইতে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে। উপাসকগণ সমস্বরে কয়ারের সহিত যোগদান করিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের মহিমা গান হইতে হইতে, হঠাৎ গানের শেষ কলিতে বীচামের পিলের গুণানুবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গান থামিয়া গেল। গির্জ্জাসুদ্ধ লোক অবাক। তখন দেখা গেল, বহিখানিতে প্রত্যেক সঙ্গীতের শেষে, পিলের প্রশংসাপূর্ণ একটি করিয়া নবরচিত কলি তাহারা জুড়িয়া দিয়াছে।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। আরও একটু গান হইলে, মিসেস রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র, আমায় একটু অনুগ্রহ করিবেন?"

"বলুন। আমি আপনার আজ্ঞাবহ।"

"মিষ্টার দত্তের হাতে কলিকাতায় যে জিনিষ পাঠাইব, তাহা নীচে ভোজন-কক্ষে রহিয়াছে। সেগুলি প্যাক করিতে আমায় সাহায্য করিবেন?"

"অতি আনন্দেব সহিত। চলুন।"

"চলুন। মিষ্টার দত্ত নিশ্চয়ই আমাদিগকে আধ ঘণ্টার জন্য ক্ষমা কবিবেন। লীলা, তুমি দুই একটা গান শুনাইয়া মিষ্টার দত্তকে ততক্ষণে entertain কর"—বলিয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেলেন।—হেমের সহিত একা হইবামাত্র, লীলা হাসি গল্প কোথায উড়িযা

গেল। তিনি নীরবে অবনত মস্তকে গানের বহিখানিব পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। হেম তাঁহাকে কোনও কথা বলিলে তিনি ঘাড় নাড়িয়া বা, একাক্ষবযুক্ত শব্দে উত্তব দিতে লাগিলেন।

কুমারীর এই ভাবান্তব দেখিয়া হেম বলিল, "আপনি আজ গান গাহিয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক আমরা বড় স্বার্থপব। নিজেদেব আনন্দের জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়াছি।"

লীলা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আর দুই একটি গান গাহিয়া অন্যকে আনন্দ বিতরণ করুন, তাহা হইলে আপনাব আত্মগ্লানি কমিয়া যাইবে।"

হেম বলিল, "কি গান গাহিব? বাঙ্গলা না ইংরাজি?"

"বাঙ্গলা আমি কি বুঝিব? ইংবাজি গান।"

হেম তখন পিয়ানোব কাছে বসিযা বার্ণস্ বচিত, "My love is like a red rose" নামক বিখ্যাত গানটি গাহিল। আমবা নিম্নে তাহাব একটি বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম—

আমার সে প্রিয়তমা লোহিত গোলাপ যেন,
নবীন বসন্তে বিকশিত;
আমার সে প্রিয়া যেন মধুর রাগিণী খানি,
সুধাস্ববে তানলযে গীত।
কত যে সুন্দবী তুমি হে মোব প্রেয়সী বালা,
প্রেম মোব কত যে গভীর!
সকল সিন্ধু জল না শুকাবে যত দিন,
তত দিন প্রেমে বহে স্থিব।
যত দিন সিন্ধুজল নাহি যাবে শুকাইয়া
বৌদ্রতাপে না গলিবে গিরি,
ততদিন এই প্রেম রহিবে রহিবে স্থিব,
শত শত জন্মান্তবে ঘিবি।
বিদায এখন তবে দেহ সখি কিছু দিন,
হে আমাব একমাত্র প্রিয়া;—
সহস্র যোজন পথ দূবে যদি চ'লে যাই—
তবু—তবু—আসিব ফিরিয়া।

গানেব শেষ দুইটি চবণ—হেম বাবম্বাব গাহিতে লাগিল—

Sae fare thee weel, my only love,
And fare thee weel awhile,
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile,
Though it were ten thousand mile, my love,
Though it were ten thousand mile—
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile.

বার্ণসের সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষময় লুটাইতে লাগিল।

গান শেষ হইলে হেম দেখিল, মিস্ রায় জানালাব নিকটে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। হেম ধীবে ধীবে তাঁহাব নিকট গিয়া বলিল, "আপনার কি বেশী গরম বোধ হইতেছে?"

"না, বেশ জ্যোৎস্না উঠিযাছে, তাই একটু দেখিতেছি।"

হেম বলিল, "মিস্ রায়, অনেক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা বলিব বলিব মনে করিতেছি—কিন্তু বলিতে পারি নাই। আমি যেদিন হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই ভালবাসিয়াছি।

আমি আপনাকে কত ভালবাসিয়াছি তাহা আপনি জানেন না। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কি? আজ আমার হৃদয় আপনার পদপ্রান্তে রাখিলাম—আপনি কি প্রত্যাখ্যান করিবেন?"

মিস্ রায় জানালা ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হেম বুঝিল, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তখন সে তাঁহার কটিদেশে হস্ত বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইল। মিস্ রায় নিজে অশ্রুসিক্ত মুখখানি, হেমের স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। হেম বলিল—"মিস্ রায়—লীলা—বল, আমায় সুখী করিবে। ভারতবর্ষের দুহিতাকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য কি আমাকে দিবে না? বল—হ্যাঁ। বল—বল।"

অশ্রুসিক্ত স্বরে লীলা বলিলেন, "হ্যাঁ।"

হেম তখন লীলার মুখখানি তুলিয়া সযত্নে অশ্রু মুছাইয়া দিল। তাহার পর, প্রিয়ার অধরবৃন্ত হইতে প্রণয়ের প্রথম কুসুম নিজ অধর দ্বারা চয়ন করিয়া লইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিল। বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। দ্বার খুলিয়া মিসেস রায় ও অতুল প্রবেশ করিলেন।

হেম, লীলার সহিত বাহুসম্বন্ধ হইয়া হাস্যমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "মিসেস রায়, অদ্য আপনার কন্যা আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

এ কথা শুনিয়া রায় গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

অতুল শুনিয়াই দুই হাত ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"Don't—don't Mrs. Roy—don't bless them. Stop thief—fire—murder—"

অতুলের রঙ্গভঙ্গের বিষয় সকলে অবগত ছিলেন। মিসেস রায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

অতুল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মিসেস রায়, ঐ হেমকেই জিজ্ঞাসা করুন। জাহাজ ছাড়িবার আগেই toss up হইয়াছিল—আমিই জিতিয়াছিলাম। আমারই অধিকার মিস্ রায়কে বিবাহ করিবার। বলুক হেম!"

হেম ও লীলা মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস রায় বলিলেন, "কিন্তু তুমি ত লীলাকে woo কর নাই। যে woo করিয়াছে সে win করিয়াছে।"

অতুল ঘাড় বাঁকাইয়া, গালের উপর একটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "সে কথা ঠিক। ঐটা আমার বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। কথামালার খরগোস ও কচ্ছপের গল্প হইল আর কি! ঘুমাইয়া পড়িয়া আমি হারিয়া গেলাম। আচ্ছা তবে হেমেরই জিৎ। All right good luck to you Hem, old chap, My best, My very bestest congratulations"—বলিয়া হেমের হাত ধরিয়া ভয়ানক ঝাঁকি দিতে লাগিল।

দশ হাজার মাইল নহে—চারিশত মাইল অতিক্রম করিয়া হেম দুই মাস পরে আবার লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ফিরিয়া আসিল। শুভদিনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বলা বাহুল্য অতুলই "নিতবর" হইয়াছিল।

[প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৬]

মাতৃহীন

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে দিন সংবাদ বাহির হইল আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় বার অকৃতকার্য্য হইয়াছি, সে দিন একটু যে মনঃক্ষুণ্ণ হই নাই এমন কথা বলিতে পারি না। অথচ পরীক্ষোত্তীর্ণগণের তালিকায় শরৎকুমার মিত্র নামটি ছাপা না হওয়া সম্বন্ধে এক প্রকার কৃতনিশ্চয় ছিলাম। তাহার কারণ এই যে সারা বৎসর আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নানা গুরুতর কার্য্যে নিরতিশয় ব্যস্ততা, প্রযুক্ত পাঠ অভ্যাসের মোটেই সময় পাই নাই। পাস হইতে পারিব না এই ধারণা পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই আমার ছিল এবং লিখিয়া আসিয়া সে মত পরিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন বিবেচনা করি নাই।

ফেল হইয়া অবনতমস্তকে আমার বেজওয়াটারের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন নভেম্বর মাস। সারা দিনে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওযা যায় নাই। মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। ভিতর ও বাহির হইতে অন্ধকারের চাপে আমার বুকটা যেন পিষিয়া যাইতে লাগিল। আমার বাসার অনতিদূরেই "দি আর্টেজিয়ান" নামক একটি দোকান, ছিল, সেখানে মনের আঁধারের ঔষধ বিক্রয় হইত। ল্যাণ্ডলেডিকে ডাকিয়া সেই ঔষুধ এক বোতল আনাইয়া লইলাম। সোডাওয়াটাব অনুপানযোগে কয়েক মাত্র তাহা সেবন করিতেই আমাব মন হইতে মেঘান্ধকাব কাটিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে তথায় নবোদিত সূর্য্যের অপাব আলোক অনুভব করিলাম। মনে হইল, "উঃ ভাগ্যিস ফেল হইয়াছি। নহিলে ত ব্যাবিষ্টাবি পরীক্ষা দিবার মতি হইত না। বৎসরখানেক পরিশ্রম করিলেই সব পরীক্ষাগুলি পাস করিতে পারিব—টার্ম ত আমার কমপ্লিট করাই আছে। ব্যারিষ্টাবিতে বিপুল আর্থোপার্জ্জন আমার অদৃষ্টে রহিয়াছে, বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে? আমাব পিতা ব্যারিষ্টারি কবিয়া বিস্তর টাকা রোজগার কবিয়াছিলেন—আমিও বাপকা বেটা হইব, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।"—আমার সঙ্গে একত্র পরীক্ষা দিয়া যাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য মনে দুঃখ হইল। ভাবিলাম,—"আহা বেচারিরা সাবাজীবন খাটিলেও মাসে দুই তিন হাজার টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। আব দশ বৎসর পরে হাইকোর্টের সেই প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, মক্কেলকুলের মাথার মণি, মিষ্টার শরৎ মিত্র?"—দশ বৎসর কাটিয়ছে—কিন্তু মক্কেলরা যে উক্ত দুর্লভ রত্নের সন্ধান পাইয়াছে এমন ত কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না।

সে কথা যাউক—আমার বর্ত্তমান অবস্থা এ গল্পের বিষয়ীভূত নহে। তৎকালে বিলাতে কি ঘটিয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিবার জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সন্ধ্যার পর সাজসজ্জা করিয়া থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। আমার সঙ্গে কেহ ছিল না—আমি একা। শেক্সপিয়ার প্রণীত একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় হইল। অভিনয় দর্শনে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমি বারটার সময় বাসায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধটি আরও দুই এক মাত্রা সেবন করিয়া শয়নের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। শেক্সপিয়ারের নাটকের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে—মাত্রা বাড়িয়া গেল। তখন মনে হইল,—কি আক্ষেপ, বাঙ্গলা দেশে একজনও শেক্সপিযার নাই। আমি কি ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয় শেক্সপিয়ার হইতে পারি না? কেন পারিব না? যখন দেশে ছিলাম, "বিশ্বদর্পণ" নামক মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে আমাব কবিতা ছাপা হইত। তখনি বন্ধুরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কালে আমি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইয়া দাঁড়াইব। আমার ভিতরে প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে—ইহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম। আমি বঙ্গের ভবিষ্যৎ শেক্সপিয়ার তাহাতে সন্দেহ মাত্র রহিল না। কল্যই একটা ঐতিহাসিক নাটক

রচনা আরম্ভ করিয়া দিব। "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—এই কথাগুলি অনুচ্চস্বরে বারম্বার বলিতে বলিতে জিহ্বা জড়াইয়া আসিল। তখন উঠিয়া কোন ক্রমে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন নয়টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, তুষারপাত হইতেছে। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া মহোৎসাহে সেই তুষারের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম। অমনিবাসে আরোহণ করিয়া বৃটিশ মিউজিয়মে গিয়া উপস্থিত। একশিলিং দিয়া একখানি চকচকে বাঁধানো খাতা কিনিয়া, মিউজিয়ামের পাঠাগারে (Reading Room) প্রবেশ করিলাম। এই খাতাখানিই বঙ্গীয় শেক্সপিয়ারের সর্ব্বপ্রথম নাট্যরচনা বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

বৃটিশ মিউজিয়মের এই পাঠাগার জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির সর্ব্ববিদ্যা এখানে পুঞ্জীভূত। এই সুবিপুল পাঠাগারটির তলদেশ বৃত্তাকার। কেন্দ্রস্থলে কতকটা স্থান কর্ম্মচারিগণের বসিবার জন্য। সেই স্থানটি দিয়া বৃত্তাকারে সজ্জিত তিনসারি পুস্তকাধার—তাহাতে সহস্রাধিক খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থতালিকা রক্ষিত। এই তালিকা বর্ণানুক্রমিক—গ্রন্থকারের নামানুসারে এবং বিষয়ানুসারে সঙ্কলিত। তাহার পর হইতে ব্যাসার্দ্ধের আকারে বহু সারি টেবিল—প্রত্যেক টেবিল বহু পাঠকের উপবেশন-কল্পে বিভক্ত ও সংখ্যাকৃত।

পাঠাগার বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও অধিক সংখ্যক পাঠার্থী আগমন করেন নাই। আমি আসন গ্রহণ করিয়া, তালিকা হইতে খুঁজিয়া রাজপুত ইতিহাসের দুইখানি গ্রন্থেব নাম লিখিয়া দিয়া আসিলাম। দশ মিনিট পরে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বহি দুখানি দিয়া গেল।

তখন সেই ইতিহাস গ্রন্থ খুলিয়া আমার নাটকের বিষয় নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম। নায়ক পদের জন্য একজন রাজা আবশ্যক—যিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দুই একটা বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। সে যুদ্ধ দেশের জন্যই হউক, অথবা নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্যই হউক কিছু আসে যায় না—যুদ্ধকালে তাঁহার মুখ আমি দেশভক্তির সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা বসাইয়া দিব, তজ্জন্য চিন্তা নাই। রাজা অপেক্ষা রাজপুত্র হইলেই ভাল হয়, কারণ রাজা প্রায়ই অবিবাহিত পাওয়া যায় না। তাঁহাকে প্রেমে পড়াইবার সুযোগ অতি দুর্লভ। নায়ক যে ললনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—তাঁহার নামটি খটমট হইলে চলিবে না। নামটি যদি মোলায়েম হয়, তবে তিনি সঙ্গীতকুশলা বা অশ্বারোহণদক্ষা না হইলেও ক্ষতি নাই—আমি তাঁহার ও সকল অক্ষমতা দূর করিয়া দিবার ভার লইতে পারি। একঘণ্টার অধিক কাল এইরূপ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর দেখিলাম, একজন বর্ষীয়সী শুভ্রকেশিনী ইংরাজমহিলা ধীর পদক্ষেপে পাঠাগারে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার হস্তে কালো চামড়ার একটি "কেস" বা আধার ঝুলিতেছে—এইরূপ আধারে চিত্রকরগণ তাঁহাদের চিত্রলিখনের সরঞ্জাম রাখিয়া থাকেন। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। আমার কাছাকাছি আসিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া, তিনি যেন স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখিলাম, পরক্ষণেই আবার আত্মসম্বরণ করিয়া, মৃদুমন্দ গমনে আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন এবং আমার স্থান হইতে চারি পাঁচটি আসনের ব্যবধানে উপবেশন করিলেন।

আমি ভাবিলাম, বৃদ্ধা ক্ষীণদৃষ্টি—আমাকে প্রথমে কোন পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকিবেন। এ তুচ্ছ ঘটনা আমার মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—আমি আবার নায়ক-মৃগয়ায় ব্যাপৃত হইলাম। এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। মনোমত নায়কের সন্ধান না পাইয়া, আরও দুই একখানা পুস্তকের অন্বেষণে যাইতেছিলাম। সেই মহিলাটির নিকট

দিয়া যাইতে দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখে দুই তিনখানি ভারতবর্ষীয় ছবির পুস্তক খোলা রহিয়াছে—আর তিনি কাগজে পেন্সিল দিয়া একটা জঙ্গল আঁকিতেছেন। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, জঙ্গলের অন্তরালে একটা বাঘ থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সৈনিকবেশধারী একজন ইংরাজ পুরুষ তার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিতেছেন।

ক্রমে একটা বাজিল—লাঞ্চের সময় উপস্থিত। বহি স্বস্থানে রাখিয়া আমি বাহির হইয়া গেলাম। অল্প দূরেই ভিয়েনা রেস্টোরাঁ নামক ভোজনশালা ছিল, তথায় প্রবেশ করিয়া খাইতে বসিলাম।

দুই এক মিনিট পরেই দেখি, সেই বৃদ্ধাটিও প্রবেশ করিলেন। আমারই টেবিলে আমার সম্মুখস্থিত চেয়ারখানি দখল করিলেন। আমার পানে চাহিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন—"Good afternoon—আপনি এইমাত্র বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে ছিলেন না?" আমি তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম—"আমি আপনাব আসন হইতে অল্প দূরেই উপস্থিত ছিলাম।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমায় ক্ষমা করিবেন—আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন?"

"আমি বাঙ্গালী।"

"কলিকাতার?"—আমি বলিলাম—"কলিকাতাতেই আমাদেব নিবাস।"

বৃদ্ধ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আমার এ সকল প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত? আমি শুধু অলস কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছি না।"

আমি বলিলাম—"সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনাব যাহা জানিবার আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অবাধে আমায় জিজ্ঞাসা করুন।"

"বহু ধন্যবাদ। পাঞ্জাব কিংবা মধ্যভারতে আপনি বেড়াইয়াছেন কি?"

"মধ্যভারতে কখনও যাই নাই, তবে পাঞ্জাবের কয়েকটি নগর দেখিয়াছি।"

এই সময় পরিচারক আসিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। "আমায় এক মুহূর্ত্ত ক্ষমা করুন"—বলিয়া বৃদ্ধা, খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া, স্বেচ্ছামত দ্রব্যগুলি ফরমাস করিলেন। তাহার পর আমায় বলিলেন—"আমার জিজ্ঞাস্য কি, আপনাকে বুঝাইয়া বলি। আমি কয়েকটি বিখ্যাত মাসিকপত্রের জন্য ছবি আঁকিয়া থাকি। ভারতবর্ষই আমার বিশেষ বিষয়। সম্প্রতি কোনও পত্রসম্পাদক একটি ভারতীয় শিকাবের গল্প আমার বিশেষ বিষয়। সম্প্রতি কোনও পত্রসম্পাদক একটি ভারতীয় শিকারের গল্প আমায় ছবি আঁকিবাব জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। গল্পটি এই—পাঞ্জাবেব একজন রাজা এবং একজন বৃটিশ সৈনিক একত্র হস্তিপৃষ্ঠে জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দূর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া রাজার মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি হস্তী হইতে নামিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজ সৈনিক শব্দানুসারে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঘকে গুলি করিলেন। এ গল্পের জন্য সম্পাদক দুই একখানি ছবি চাহেন। একখানি রাজাব পলায়নের ছবি, দ্বিতীয়খানি বাঘ মারিবার ছবি। দ্বিতীয়খানি আমি আঁকিতেছি। কিন্তু প্রথমখানি সম্বন্ধে আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। ভারতবর্ষের রাজাদের যে পোষাক, দরবার প্রভৃতির ছবিতে দেখা যায়, সেই পোষাক পরিয়াই তাঁহারা শিকার করিতে যান অথবা শিকারেব উপযুক্ত অন্য কোনও রূপ পোষাক আছে?"

এই কাহিনী শুনিয়া আমার রক্ত গরম হইয়া গেল। আমি যথাসাধ্য আত্মসংযমের সহিত বলিলাম—"মহাশয়া, ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া রাজা পলাইলেন কেন? ইংরাজ সৈনিক ত ভয়ে পালাইতে পারিত এবং রাজা গিয়া সে ব্যাঘ্রকে শিকার করিতে পারিতেন।"

আমার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মহিলাটি মৃদুহাস্য করিলেন। বলিলেন—"আপনি ভুলিয়া

যাইতেছেন, আমি ও গল্পের লেখক নহি। আমি পারিশ্রমিক লইয়া ছবি আঁকিব মাত্র।"

আমি তখন লজ্জিত হইলাম। বলিলাম—"আমি অন্যায় করিয়াছি—আমায় ক্ষমা করিবেন। স্বদেশবাসীর নিন্দা শুনিয়া হঠাৎ আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আপনার দেশভক্তি দেখিয়া প্রীত হইলাম। এখন আমাব প্রশ্নের উত্তর দিন।"—আমি বলিলাম—"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমি স্বচক্ষে যে দুই চারিটা রাজা দেখিয়াছি—তাহা হয় কলিকাতার রাজপথে, নতুবা রেলওয়ে ট্রেনে। শিকারে বাহির হইয়াছেন এমন রাজা দেখিবার কোনও সুযোগ পাই নাই।"

ইহা শুনিয়া মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"কল্য একবার ভাল করিয়া সচিত্র পুস্তকাদি অন্বেষণ করিয়া দেখিব, শিকার পরিচ্ছদে কোনও রাজার ছবি পাওয়া যায় কি না।"—অতঃপর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি এদেশে কত দিন আছি প্রভৃতি বিষয় তিনি অতি সঙ্কোচের সহিত আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে নিজের একখানি কার্ড আমায় দিয়া বলিলেন—"আমার বাসা নিকটেই। যদি অবসর মত একদিন আসেন তবে আমার অঙ্কিত অনেকগুলি রেখাচিত্র আপনাকে দেখাইতে পারি।"

আমি এ সদয় নিমন্ত্রণের জন্য তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিয়া, আমার নিজের একখানি কার্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলাম। আমার নামটি দেখিয়া তিনি বলিলেন—"মিত্র? কলিকাতার সেই পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মিত্র আপনার কেহ হইতেন নাকি?"

আমার পিতার যশোব্যাপ্তির প্রমাণ পাইয়া গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"আমি তাঁহারই পুত্র। আপনি তাঁহার নাম শুনিলেন কি করিয়া?"—বৃদ্ধা বলিলেন—"সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে একটা অবিকৃত ধারণা কবিয়া লইবার জন্য মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরিতে গিয়া কলিকাতার সংবাদপত্র আমি পাঠ করিয়া থাকি। উঃ—আজ এ ভোজনশালায় লোকের কি ভীড় হইয়াছে! গরমে আমাব নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। আমি চলিলাম।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পব দুইদিন মহিলাটিকে আর বৃটিশ মিউজিয়মে দেখিলাম না। এ দুইদিনে আমার নাটকের প্লট স্থিব করিয়া রচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

তৃতীয় দিন রাজপুত ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকের জন্য তালিকা অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম সেই বৃদ্ধা—কার্ড হইতে জানিয়াছিলাম—ইহার নাম মিস্ ক্যাম্বেল—আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইলেন। সহাস্যবদনে আমায় অভিবাদন করিয়া নিজ কর প্রসারিত করিয়া দিলেন। করমর্দ্দন ও কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"রাজপুতানা আপনি দেখিতেছেন বুঝি?"—বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে স্বাভাবিকস্বরে বাক্যকথন নিষিদ্ধ।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"আপনার কি এই খণ্ডটি আবশ্যক? এই লউন, আপনার হইলে আমি দেখিব এখন।"

"আসুন না, দুইজনে একসঙ্গেই দেখি। রাজাদের শিকার-পরিচ্ছদ কিরূপ দেখিবার জন্য আজ বাজপুতানাব ইতিহাস অন্বেষণ করিব। আপনি কি, খুঁজিতেছেন?"

"আমি রাজপুত ইতিহাস হইতে একখানা নাটক লিখিতেছি।" "আপনি নাট্যকার?"

লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আমি নাট্যকার নহি। তবে একখানি নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে।" "বেশ বেশ একদিন আপনাব নাটকেব গল্পটি শুনিব।"

"সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা"—বলিয়া তাঁহার জন্য আমি কয়েকখানি পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম। উভয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

আমি প্রত্যহই পাঠাগারে গিয়া নাটক লিখিতে লাগিলাম। মিস্ ক্যাম্বেলও প্রতিদিন আসিতেন। কিন্তু আর কোনদিন তাঁহাকে ভিয়েনা রেষ্টোরাঁতে যাইতে দেখিলাম না। তিনি সম্ভবতঃ বাড়ী গিয়া লাঞ্চ খাইয়া আসিতেন।—একদিন তাঁহার বসিবার স্থানে গিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলাম—"আজ বিকালে আপনার ওখানে ছবি দেখিতে আসিব কি?"

তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"বেশ ত। নিশ্চয়ই আসিবেন। আজ আমার ওখানেই আপনাকে চা পান করিতে হইবে। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব এখন।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া আমি স্বস্থানে আসিয়া নিজ কার্য্যে মন দিলাম।

বেলা তিনটা বাজিলে মিস্ ক্যাম্বেল আসিয়া বলিলেন—"চলুন যাওয়া যাক্।" সঙ্গে তাঁহার আবাসে গমন করিলাম। ব্লুমসবরি ম্যানসনস্ নামক একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার একটি ফ্ল্যাট লইয়া বৃদ্ধা বাস করেন। ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে তাঁহার চিত্রশালিকা (Studio)—সেখানে লইয়া গিয়া আমাকে বসাইলেন। বলিলেন—"পাঁচ মিনিটের জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন। পাচিকাকে চায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসি। আপনি ততক্ষণ দেয়ালের এ ছবিগুলি দেখুন।"—বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি অলসভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছবিগুলি দেখিতে লাগিলাম। অধিকাংশই জলবর্ণের চিত্র। বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নীলহ্রদ, নৃত্যশীলা শৈলনির্ঝরিণী, সিন্ধুজলধৌত সৈকতভূমি—প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য। দুই একখানি তৈলচিত্রও আছে। ঈজেলের উপর স্থাপিত একটি অর্দ্ধসমাপ্ত নারীমূর্ত্তিও দেখিলাম।—কিয়ৎক্ষণ পরে মিস্ ক্যাম্বেল ফিরিয়া আসিলেন। ছবিগুলি একে একে আমায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"এইগুলি আমার সাধের ছবি। শিল্পকলার সাধনার জন্য এইগুলি আমি আঁকিয়াছি। জীবিকার জন্য যে সকল ছবি আমায় আঁকিতে হয়,—যেমন পলায়নপর রাজা প্রভৃতি—এইবার সেইগুলি দেখুন।"—বলিয়া তিনি একটি বৃহৎ পোর্টফোলিও বাহির করিলেন।—আমি বলিলাম—"আপনার সে ছবির কি করিলেন?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন—"দরবারের বেশেই রাজাকে আঁকিয়া দিতে হইয়াছে। আমি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিয়া পরিচ্ছদ সমস্যার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—সাময়িক পত্রের ছবিতে অত খুঁটিনাটি ধরিতে গেলে চলে না। রাজাকে বেশ স্থূলকায় করিযা আঁকিয়া, তাঁহার সঙ্গে দরবারের পোষাকই পরাইয়া দিন। নহিলে পাঠকেরা রাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে কেন?—সুতরাং আমাকে সেইরূপই আঁকিতে হইল।"

পোর্টফোলিওর ছবিগুলি দেখিলাম, অধিকাংশই গল্প বা উপন্যাসের উপযোগী করিয়া চিত্রিত। সেগুলি দেখিতে দেখিতে চা প্রস্তুত হইবার সংবাদ আসিল। মিস্ ক্যাম্বেল আমাকে লইয়া তাঁহার ড্রয়িংরুমে গেলেন।—চা পান করিতে করিতে গল্প হইতে লাগিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার চকচকে বাঁধান খাতাখানি তুলিয়া লইয়া মিস্ ক্যাম্বেল দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এইখানিই আপনার নাটক বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কতদূর হইল?"

"তৃতীয় অঙ্ক হইতেছে। আরও দুইটি অঙ্ক হইবে।"

তিনি খাতার পাতা উল্টাইতে বলিলেন—"ইহার গল্পটি কি বলুন দেখি?"

আমি গল্পটি বর্ণনা করিতে লাগিলাম। ঘটনা সন্নিবেশ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে তিনি পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলেন। দেখিলাম, সেগুলি অত্যন্ত উপযোগী ও সমীচীন। অবশেষে

খাতাখানি রাখিয়া তিনি বলিলেন—"আমার আক্ষেপ এই যে, আপনার রচনা পাঠ করিবার আনন্দ লাভ করিতে পারিব না। অথচ আমি এক সময় বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"বাঙ্গলা শিখিতেছিলেন? কি চমৎকার! কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন?"

"যৎসামান্য।"

"এখনও কিছু কিছু মনে আছে?"

"না। সে বহু বৎসরের কথা। এইটুকু মাত্র মনে আছে, গোপাল এবং রাখাল দুইটি বালক ছিল। ইহাদের মধ্যে রাখালকেই আমার বেশ লাগিত—তার ভিতরে যথেষ্ট প্রাণ ছিল। গোপালটা একেবারে অপদার্থ—যাহাকে আমরা goody goody বলি।"

আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। বলিলাম—"আপনার যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিতেছি, আপনি যদি আবার চেষ্টা করেন, অল্পদিনেই বাঙ্গলা শিখিয়া ফেলিতে পারেন!"

মিস্ ক্যাম্বেল বলিলেন—"এ বয়সে আর শিখিয়া কি হইবে? যখন শিখিতাম তখন আমি বিংশতিবর্ষীয়া বালিকা।"—বলিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন দিবালোক অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তথাপি আমার সন্দেহ হইল, তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন জলে ছলছল করিতেছে। তাঁহার চিত্ত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলাম—"আর এক পেয়ালা চা পাইতে পারি কি?"

তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন—আপনার পেয়ালা খালি হইয়াছে আমি লক্ষ্যই করি নাই। আমার আতিথেয়তা মোটেই অনুকরণীয় নহে"—বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে আমার পেয়ালা লইয়া চায়ে পূর্ণ করিয়া দিলেন। বলিলেন—"আপনি ঐতিহাসিক নাটকই লিখিবেন, না গার্হস্থ্য নাটকও লিখিবার ইচ্ছা আছে?"

"ক্রমে গার্হস্থ্য নাটকও লিখিব বইকি।"

"আমি আপনাকে একটি গার্হস্থ্য নাটকের প্লট দিতে পারি। বাস্তবজীবনের ঘটনা—একটি হৃদয়ভেদী প্রণয়-কাহিনী।"—আগ্রহের সহিত বলিলাম—"বহু ধনবাদ। প্লটটি কি বলুন না।"

"আগে এই নাটকটি শেষ করুন। তাহার পর একদিন বলিব।"

আরও দশ মিনিট গল্পে কাটিলে অন্ধকার বাড়িয়া উঠিল। পরিচারিকা আসিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দিল। আমি তখন মিস্ ক্যাম্বেলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।—তিনি উঠিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। শেষমুহূর্ত্তে বলিলেন—"আপনার নাটক সমাপ্ত হইলে, একদিন আসিয়া অনুবাদ করিয়া আমায় শুনাইতে হইবে মনে রাখিবেন।"—"আমি সেই সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব"—বলিয়া, অভিবাদনান্তর বিদায় হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার ঐতিহাসিক নাটক শেষ হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাঠাগারেই মিস্ ক্যাম্বেলকে দিয়াছি। ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তাঁহার আবাসে আরও দুইবার চা পান করিয়াছি। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারি, আমাকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন।—একদিন বৃটিশ মিউজিয়মে তিনি আমায় বলিলেন—"কল্য আমার হাতে কোন কাজ নাই। তোমার নাটকখানি শুনাইবে?"

"বেশ ত। কাল কখন আসিব বলুন?"

"কাল পাঠাগারে আসিবে কি?"

"আসিব।"—"তবে নাটকখানি সঙ্গে আনিও। এখান হইতে একটার সময় গিয়া কাল আমার সঙ্গে তুমি লাঞ্চ খাইও।"

"বহু ধন্যবাদ। আপনি কাল আসিতেছেন কি?"—"না, আমি আসিব না।"

"আচ্ছা, আমি তবে একটার সময় আপনার আবাসে উপস্থিত হইব।"

তখন ডিসেম্বর মাস। শীতটা খুবই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তুষারপাত হয়। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম—বৃষ্টি পড়িতেছে।—প্রাতরাশ সমাপন করিতে নয়টা বাজিল—বৃষ্টি থামিল না। দশটা বাজিল, তবু থামে না। আমার ল্যাণ্ডলেডি প্রচলিত প্রবাদবাক্য কোট্ করিয়া বলিল,—সাতটার পূর্ব্বেই যখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে এগারটাব মধ্যে নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। কিন্তু এগারটা বাজিবামাত্র ল্যাণ্ডলেডির ভবিষ্যদ্বাণীর যেন প্রতিবাদ কবিবার জন্যই, বৃষ্টি প্রবলতর ভাবে আরম্ভ হইল। বারোটা বাজিল, তখনও তদ্রূপ। অন্য সময় হইলে এমন দিনে আমি বাহির হইতাম না। কিন্তু আজ প্রথম রসগ্রাহী ব্যক্তি আমার প্রথম রচনা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। আজ কি আমি থাকিতে পারি? ক্যাব ডাকাইয়া, মিস্ ক্যাম্বেলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। [*Rain before seven, clear before eleven.]

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"How very sweet of you to come in this weather! তোমার জুতা বোধ হয ভিজিয়া গিয়াছে?"—আমি বলিলাম—"বেশী ভিজে নাই। আমি ত বৃটিশ মিউজিয়মে যাই নাই। বাসা হইতে ক্যাবে আসিয়াছি। তবে উঠিবার নামিবাব সময় অল্প ভিজিয়া থাকিবে।"—আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। ঝুঁকিয়া, আমার জুতা দেখিয়া বলিলেন—"এই যে বেশ ভিজিয়াছে। খুলিয়া ফেল, খুলিয়া ফেল।"

একজন মহিলার সম্মুখে জুতা খুলিয়া ফেলিবার প্রস্তাব মাত্রে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমাব ভাব দেখিয়া বলিলেন—"Sily boy! তুমি এমন horrified হইতেছ কেন? সকল নিযমেরই ব্যতিক্রম আছে। খুলিযা ফেল, নহিলে শক্ত ব্যারামে পড়িবে।

আমি অপবাধীর মত বলিলাম—"বেশী ত ভিজে নাই। বরং আগুনের কাছে পা রাখিয়া বসিযা থাকি, জুতা শুকাইয়া যাইবে এখন।"

তিনি বলিলেন—"খুব ভিজিযাছে। তবে জল এখনও তোমার মোজায় পৌঁছে নাই, মোজাও ভিজিয়া গেলে সর্ব্বনাশ হইবে। জুতা খুলিয়া আগুনেব কাছে রাখ। লাঞ্চের এখনও বিলম্ব আছে। দাসী আসিবার পূর্ব্বেই তোমার জুতা শুকাইয়া যাইবে।"

আমি তথাপি ইতস্ততঃ কবিতেছি দেখিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন—"নহে ত বল আমি অন্য ঘরে যাই। তোমার জুতা না শুকান পর্য্যন্ত আসিব না। তোমার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহার সম্মুখে তুমি কি জুতা খুলিতে না? আমাকে তোমার মা মনে কর না কেন?"

তাঁহার শেষ কথাগুলি এতই করুণা মাখা, আমার মাতৃহারা হৃদয়ে এমনই সুধাবৃষ্টি করিল যে, আমি আব দ্বিরুক্তি না করিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম।

তখন দুইজনে আমরা অগ্নির সম্মুখে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। ক্রমে দেড়টা বাজিল। আমার জুতাও শুকাইয়া গেল। জুতা পরিযা আবার আমি ভদ্রলোক হইলাম।

মিস ক্যাম্বেল তখন লাঞ্চ আনিবার জন্য দাসীকে বলিযা আসিলেন। ক্ষণকাল পরে আমাকে তাঁহার ভোজনকক্ষে লইয়া গেলেন। গল্প-গুজবের মধ্যে আমরা আহার সমাধা কবিলাম। দাসী টেবিল সাফ করিয়া লইলে, সেই কক্ষেই বসিয়া আমার নাটক পাঠ আবম্ভ করিলাম। কতকগুলো দৃশ্যের গল্পভাগ মুখেই বলিয়া গেলাম। যে যে দৃশ্যে আমার রচনার বিশেষ বাহাদুরী আছে মনে কবিলাম, সেই সেই দৃশ্য অনুবাদ করিযা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলাম। মোটেব উপর, তিনি প্রীত হইলেন। বলিলেন—"প্রথম উদ্যমেব পক্ষে খুবই ভাল হইয়াছে।" এইরূপে চারিটা বাজিল। চা পান কবা গেল।—এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশ অন্ধকার। আমি বলিলাম—"আপনি আমার একটি*গার্হস্থ্য নাটকের

প্লট দিবেন প্রতিশ্রুত আছেন,—আজ সেটি বলিবেন কি?"—"বলিব। ড্রয়িংরুমে চল, সেইখানে বলিব। এ ঘরটা শীঘ্র অন্ধকার হইয়া যায়।"

আমরা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কুণ্ডস্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায়। চারিদিকের বায়ুপথরোধী সার্সি বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি কনকনে শীত। দাসী আসিয়া কুণ্ডে প্রচুর পরিমাণে কয়লা নিক্ষেপ করিয়া, পোকর দিয়া খুব খোঁচাইয়া দিল। অগ্নিদেব তখন আবার নবোদ্যমে জ্বলিতে লাগিলেন।—মিস্ ক্যাম্বেল তাঁহার পশমের শালখানি গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এই লণ্ডনের অনতিদূরে একটি সহরতলীতে—তোমার নাটকে উহা হ্যামারস্মিথ বা রিচমণ্ড বলিয়া লিখিতে পার—একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহাদের একটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা ছিল। পুত্রটি একবিংশতি বর্ষীয়;—তাহার নাম কি রাখিবে? জর্জ্জ—না হয় ফ্রেড্রিক। ফ্রেড্রিকের আদরের নাম ফ্রেড বেশ শুনাইবে। কন্যা দুইটির মধ্যে বড়টির নাম—মনে কর এলিজাবেথ বা লিজি। এইটি তোমার নায়িকা। নামটা বড় সেকেলে—তোমার বুঝি পছন্দ হইল না। তবে তাহাকে মড কিম্বা গ্ল্যাডিস বলিতে পার। মডের বয়স তখন ঊনবিংশতিবর্ষ। কনিষ্ঠ ক্যাথরিন, মডের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

"লেখাপড়ার দিকেই বড় মেয়েটির বেশী ঝোঁক ছিল। সে ফরাসী, জার্ম্মান ও ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ভিক্টর হিউগো, গইটে এবং ডান্টের মূলগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত। গ্রীকও শিখিতেছিল। ইতিমধ্যে কেমব্রিজ হইতে ফ্রেড তার মাকে পত্র লিখিল, সেখানে একটি ভারতবর্ষীয় তাহার সহপাঠী বন্ধু আছে, ইচ্ছা, ছুটির দেড়মাস তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখে। মাতা আহ্লাদের সহিত সম্মতি দিলেন। ফ্রেড লিখিল অমুক তারিখে আমরা পৌঁছিব।

"মড় কিন্তু এ সংবাদে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। পিতামাতাকে বলিল, ভারতবর্ষীয় লোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে কেমন করিয়া থাকিবে? তাঁহারা কত বুঝাইলেন, কিছুতেই মডের শঙ্কা দূর হইল না। ফ্রেড বন্ধুসহ যে দিন পৌঁছিবে, তার পূর্ব্বদিন মড্ পলাইয়া লণ্ডনে তাহার মাসীর বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইল।

"দুই তিন দিন পরে, ফ্রেড ও তাহার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, মাতা মড়কে আনিতে গেলেন। মড্ যখন দেখিল, ভারতবর্ষীয় লোকটার মাথায় পালকের টুপী নাই, রঙ মাখে না, হাতে তীর ধনুক নাই, ভালুকের চামড়া পরে না—তখন সে আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

"ক্রমে মড্ আবিষ্কার করিল—তিনি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"নায়কের নামটি কি রাখিব?"

মিস্ ক্যাম্বেল বলিলেন—"তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের কি নাম হয় আমার চেয়ে তুমিই ত ভাল জান। যাহোক একটা নাম রাখিয়া দিও।"

আমি ভাবিয়া বলিলাম—"চারুচন্দ্র দত্ত।"

"বেশ হইবে। ক্রমে মড্ জানিল, চারু সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। তখন সে মাকে ধরিযা বসিল, আমি সংস্কৃত শিখিব। চারু শুনিয়া বলিল—'বেশ ত। আমারও ফরাসী ভাষা শিক্ষার অত্যন্ত ইচ্ছা। আপনি আমায় ফরাসী পড়াইবেন আমি আপনাকে সংস্কৃত পাঠ দিব।"

"এইরূপে উভয়ে উভয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তখন মে মাস। আকাশ পরিষ্কার নীল। বাড়ীর পশ্চাতের বাগানটি বাটারকপ্, প্রিমরোজ ও ডেজি ফুলে ভরিয়া গিযাছিল। বাগানের মাঝখানে একটি লাইলাকের গাছ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে তখন ফুল আর ধরে না। ঘরের মধ্যে গরম—তাই প্রভাতে ও বৈকালে, একটি চিনা-বেতের টেবিল আর দুখানি হাল্কা চেয়ার সেই লাইলাকের তলায় বিছাইয়া তাহারা পরস্পরকে পাঠ দিত। গাছটির শাখায় ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া একজোড়া মেভিস পক্ষী সারাদিন প্রণয়গান গাহিত। ক্রমে দুজনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইল।

"মডের পিতামাতা এ ব্যাপারের কিছুই সন্ধান রাখেন নাই—কিন্তু ফ্রেড ঠিক ধরিয়াছিল।—সে, বোন দুটি এবং চারুকে সঙ্গে লইয়া কোন দিন রিচমণ্ড পার্কে, কোন দিন কিউ গার্ডেন্সে বেড়াইতে যাইত। মড্ ও চারু—বেড়াইতে বেড়াইতে—অনেক সময় ক্যাথরিন ও ফ্রেডকে খুঁজিয়া পাইত না। ফ্রেডের কৌশলে এরূপ ঘটিত সন্দেহ নাই।

"ক্রমে চারু মনে করিল, মডের পিতামাতার নিকট আর ইহা গোপন রাখিলে তাহার পক্ষে অন্যায়াচরণ হয়। তখন সে মডের পিতার কাছে গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিল। মডের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল।—"সমস্ত শুনিয়া, মডের পিতা গম্ভীর হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি মড্‌কেও সেখানে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্নেহের স্বরে উভয়কে বলিলেন—তোমরা এখন দুজনেই অল্পবয়স্ক। সংসারাভিজ্ঞতা তোমাদের কিছুই নাই। পরস্পরের প্রতি তোমাদের এ আকর্ষণ—ইহা স্থায়ী প্রেম অথবা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র,—তাহারও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিতে চারুর এখনও বৎসরাধিক কাল বিলম্ব আছে। আমি বলি, এ এক বৎসর তোমরা আত্মপরীক্ষা কর। এক বৎসর তোমরা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ করিও না। যদি বৎসরান্তে তোমাদের মনের ভাব এই রূপই থাকে—তবে তোমাদের পরিণয়ে আমি সম্মতি দেব।

"মড্ ও চারু এ কথা শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। অথচ পিতার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিল। চারুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল। এক বৎসরের জন্য উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনেত্রে বিদায় গ্রহণ করিল।

"মডের পিতার নিকট তাহারা যে সত্যে আবদ্ধ হইয়াছিল, এক বৎসর কাল ধর্ম্মভাবে তাহা পালন করিল। কেবল ফ্রেডের নিকট পরস্পরের সংবাদ তাহারা পাইত। মড্ ভাইকে কেমব্রিজে যে পত্র লিখিত, ফ্রেড চারুকে সে সকল দেখিতে দিত। এক বৎসর কাল সেই পত্রগুলিই চারুর অবলম্বন ছিল। আবার, ছুটিতে ফ্রেড বাড়ী আসিলে, চারু তাহাকে যে সকল পত্র লিখিত, ফ্রেড সেগুলি ভগিনীকে দেখাইত।

"এইরূপে সুদীর্ঘ পরীক্ষাকাল অতিবাহিত হইল। চারু আবার আসিল। মডের পিতামাতার সম্মতিক্রমে তাহারা বিবাহ-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল। পরম আনন্দে দুইজনে দিনযাপন করিতে লাগিল।—"জুন মাসের ১৬ই তারিখে চারু বারে কলড্ হইবে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিবাহের দিনস্থির হইল। বিবাহের পর এক পক্ষ কাল নবদম্পতি ইতালীদেশে মধুচন্দ্র যাপন করিয়া, ব্রিন্দিসি হইতে স্বদেশে যাত্রা করিবে।

"তাহার পিতামাতা এ বিবাহে সম্মত হওয়া সম্বন্ধে চারুর মনে সংশয় ছিল। অথচ পিতামাতার প্রতি তাহার ভক্তি ও ভালবাসা যথেষ্ট। তাঁহাদের আশীর্বাদ লাভ না করিয়া বিবাহ করিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতেছিল না। তাই সে একখানি দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা লিখিয়া, অনেক মিনতি করিয়া পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

"চারু হিসাব করিয়া দেখিল, যেদিন বারে সে কলড্ হইবে, তাহার দুইদিন পরে ভারতবর্ষ হইতে পিতার উত্তর আসিবে। পত্র প্রতীক্ষার শেষ সপ্তাহ সে অতি বিমর্ষভাবে কাটাইল। তাহার মনে হইল, পিতামাতার বিনা আশীর্ব্বাদে বিবাহ করিতে হইলে, মিলনের অর্দ্ধেক আনন্দ তাহার চলিয়া যাইবে।"—এই সময় দাসী আলো জ্বালিয়া দিতে আসিল। আলো জ্বালিয়া, অগ্নিকুণ্ডে আবার প্রচুর পরিমাণে কয়লা নিক্ষেপ করিল। অগ্নিদেব লেলিহ রসনা বিস্তার করিয়া নৃত্য পর?—কি উত্তর আসিল?"

মিস্ ক্যাম্বেল বলিলেন—"পত্রের কোন উত্তর আসিল না। ১৮ই জুন—সে দিন ওয়াটার যুদ্ধজয়ের বার্ষিকোৎসব—পত্রের পরিবর্ত্তে চারুর বৃদ্ধ পিতা স্বয়ং আসিয়া পড়িলেন। মডের পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করুন। আমার ঐ একমাত্র পুত্র। আমাদের বুড়াবুড়ীর ঐ একমাত্র অবলম্বন। দেশে লইয়া গিয়া

প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উহাকে জাতিতে তুলিয়া লইব। সেইখানে হিন্দুমতে উহার বিবাহ দিব। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে জন্মের মত উহার জাতিচ্যুতি ঘটিবে—বংশাবলীক্রমে আর কখনও সমাজে উঠিবার আশা থাকিবে না। ছেলেকে আমি ঘরে রাখিতে পারিব না। মরিবার সময় আমাদের মুখে ও জলগণ্ডুষ দিবার অধিকারী থাকিবে না। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে আমার স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করিবে—আমি দুঃখে পাগল হইয়া যাইব। কাশ্মীর বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া, বোম্বাই হইতে জাহাজে আমি আসিয়াছি। সারাপথ চিঁড়া খাইয়া আসিয়াছি। আমার ধন আমায় ফিরাইয়া দিন।'—"মডকেও তিনি মাতৃসম্বোধন করিয়া ঐ প্রকার বলিতে লাগিলেন।

"মড়ের পিতা বলিলেন—'পাত্র পাত্রী উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক। উহারা ভাল বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। আমি নিশ্চয়ই তাহাতে বাধা দিব না, আপনারও বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। মনে রাখিবেন ইহা ইণ্ডিয়া নয়—ইহা গ্রেট ব্রিটেন—স্বাধীন দেশ।"

"মডের পিতা তখন চারুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। চারু বলিল—'আমি বিবাহ করিব। পিতার সম্মতি পাইলাম না—ইহা আমার পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য। তথাপি আমি বাগ্‌দত্তা বধূকে পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিতে প্রস্তুত নহি।'

"চারুর পিতা বলিলেন—"ওরে পাষাণ, বাগ্‌দত্তা বধূ পরিত্যাগই কি কেবল অধর্ম্ম? পিতৃমাতৃহত্যা কি পুণ্য কার্য্য?'

"চারু তথাপি অটল রহিল, কিন্তু মড্ বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল—'এমন অবস্থায় আমি কখনই চারুকে বিবাহ করিব না।'

"তাহার পিতা মাতা, ফ্রেড, ক্যাথরিন তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মড্ কিছুতেই রাজী হইল না।

"অবশেষে চারু তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া প্রেমের দোহাই দিয়া কত মিনতি করিল। কিন্তু মড্ তথাপি স্বীকৃত হইল না।

'তখন চারু বলিল—'আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যেরূপ ঐকান্তিক বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতাম, তাহা যদি যথার্থ হইত, তবে আমাদের মিলনের কোন বাধাই তোমায় নিরস্ত করিতে পারিত না। আমার সে বিশ্বাস কি তবে ভুল?'

"মড্ এ কথার প্রতিবাদ করিল না।

"চারু বলিল—'বুঝিয়াছি। বিচ্ছেদ যখন অপরিহার্য্য, তোমার অচল ভালবাসা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেও জীবনে অনেক সান্ত্বনা পাইতাম, সে সান্ত্বনা হইতেও তুমি আমায় বঞ্চিত করিলে।'

"মড্ তথাপি এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না।

"চারু তখন মডের দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হস্তের মধ্যে ধারণ করিয়া, তাহার উপব অজস্র চুম্বন ও অনাবিল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর জন্মের মত বিদায় লইল।"

এই শোক কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমারও চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। মিস্ ক্যাম্বেল নীরব হইলেন। কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার পর?"

কয়েক মুহূর্ত্ত মিস্ ক্যাম্বেলও কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ডযুগল দিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইতে লাগিল। আমি এ দৃশ্য দেখিয়া মস্তক অবনত করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—"মড্ তখন প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু একদিন প্রতিবাদ করিবে। পরলোকে আবার যখন চারুর সহিত দেখা হইবে—তখন প্রতিবাদ করিবে বলিয়া সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চারু চলিয়া গেলে পর মড্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না। কিন্তু যে দুর্ভাগিনী, অত সহজে মরিবে কেন? দেশ হইতে আনাইয়া চারু তাহাকে দুই জোড়া

সোনার চুড়ি দিয়াছিল। সেই চুড়ি সর্ব্বদা সে পরিয়া থাকিত। কয়েক বৎসর হইল, একদিন হঠাৎ সে একখানি ভারতীয় সংবাদপত্রে দেখিল, তাহার বাঞ্ছিত ইহজগতে আর নাই। সেই দিন সে হাতের চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিল। সে শুনিয়াছিল, হিন্দুবধূ বিধবা হইলে হাতে আর চুড়ি পরে না। মডের শয়নকক্ষে তাহার প্রণয়ীর একখানি তৈলচিত্র আছে। তাহাই দেখিয়া, ইহজগতের পরপারে চিরমিলনের প্রতীক্ষা করিয়া সে জীবন ধারণ করে।"

বলিয়া মিস্ ক্যাম্বেল নীরব হইলেন। আমি অশ্রুমোচন কবিয়া, পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে ভাবিতে লাগিলাম—কে সেই ব্যারিষ্টার! কলিকাতা। অধিকাংশ প্রবীণ ব্যারিষ্টারকেই ত আমি চিনি। কোন্ বৎসরের এ ঘটনা জানিতে পারিলে, ল-লিষ্ট দেখিয়া নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিব। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ বৎসর ও ঘটনা ঘটিয়াছিল?"

কোনও উত্তর নাই।

আমি তখন মাথা তুলিয়া দেখিলাম, মিস্ ক্যাম্বেল নিস্পন্দ—তাঁহার চক্ষু পলকশূন্য—তাঁহার মস্তক একদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্বনাশ!—ইনি মূৰ্চ্ছিতা।

ভিত্তিগাত্রলগ্ন ঘণ্টার ফিতা ধরিয়া ভয়ানক জোরে টান দিলাম। দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কি মহাশয়?"

"তোমাব ঠাকুরাণী মূর্চ্ছা গিয়েছেন; জল—জল আন।"

দাসী ছুটিয়া জল আনিতে গেল। আমি সমস্ত জানালাগুলো খুলিয়া দিলাম। বরফের মত শীতল বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। মিস্ ক্যাম্বেলের অঙ্গ হইতে শালটা খুলিয়া ফেলিযা দিলাম। জল আসিল। তাঁহার চোখে সেই কনকনে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলাম। দাসী তাঁহার পোষাকের কিয়দংশ খুলিয়া দিল। স্মেলিং সল্ট আনিয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রে ধরিল। মিস্ ক্যাম্বেল তখন ধীরে ধীবে মাথাটা তুলিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কি হইয়াছে?"

দাসী বলিল—"ঠাকুরাণী, আগুনের গবমে আপনি মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম—"ঘরের সকল জানালা এমন বন্ধ কবিয়া এত আগুন জ্বালা ভুল হইয়াছিল। এখন আপনি কেমন আছেন মিস্ ক্যাম্বেল?"

"আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম? কষ্ট দিলাম—মাফ করিও। এখন ভাল আছি।"

আমি বলিলাম—"চলুন, আপনাকে শয্যায় লইয়া যাই।"

"চল"—বলিয়া তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু আবার তাঁহাব দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। ছিন্নলতার ন্যায় তিনি চেয়ারে লুটাইযা পড়িলেন।

দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয়নকক্ষে লইযা গেলাম। পালঙ্কের উপর তাঁহাকে শোযাইয়া দাসীকে বলিলাম—"আমি ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনি। তুমি ততক্ষণ যতটা পার ইঁহার বহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দাও"—বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র দেখিলাম, ভিত্তিগাত্রে একখানি তৈলচিত্র—আমার পিতার যুবামূর্ত্তি! ইহা যে ফোটোগ্রাফের অনুলিপি, তাহার এক খণ্ড আমার অ্যালবামেও রক্ষিত আছে।

সমস্তই বুঝিলাম। ছুটিয়া গিয়া ডাক্তার আনিলাম। তাঁহার ঔষধে এবং আমাদের শুশ্রূষায়, রাত্রি নয়টার মধ্যে মিস্ ক্যাম্বেল প্রকৃতিস্থ হইলেন। একপেয়ালা গরম সুরুয়া তাঁহাকে পান করাইয়া, রাত্রির মত আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত ঘটনার পর একটি বৎসর আমি বিলাতে ছিলাম। মিস্ ক্যাম্বেলের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম। তিনি আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবার সময় মাতৃসম্বোধন করিয়া লিখিতাম; কিন্তু সাক্ষাতে বলিতে পারিতাম না—কেমন লজ্জা করিত।

পরে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে আমায় দেখিবামাত্র আমার পিতার সহিত প্রবল সৌসাদৃশ্য অনুভব করিয়াছিলেন। আমার পরিচয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি সে দিন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিয়েনা রেষ্টোরাঁতে প্রবেশ করিয়াছেন; নচেৎ প্রকাশ্য স্থানে ভোজনাদি করা তাঁহাব নিতান্তই অপ্রীতিকর।

যথাসময়ে আমি বাবে কলড্ হইলাম। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিলাম। বলিলাম—"আপনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন। এখন সর্ব্বদা আপনার সেবাযত্নের আবশ্যক। আমার গৃহে আসিয়া, মাতৃগৌরবে আমার সেবা গ্রহণ করুন।"—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না। বলিলেন—"এ বয়সে জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্য কোথাও গেলে আমি শান্তি পাইব না।"

দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি মেলেই তাঁহাকে পত্র লিখিতাম এবং তাঁহার পত্র পাইতাম। আমার যখন বিবাহ হইল, আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তিনি সেই সোনার চুড়ি দুই জোড়া পাঠাইয়া দিলেন। আমার স্ত্রী সর্ব্বদা সেগুলি পরিয়া থাকেন।

তাহার পর খোকা জন্মিল। তিনি লিখিলেন, খোকা একটু বড় হইলেই, তাহাকে ও তাহার মাকে লইযা আমি যেন একবার বিলাত যাই। মরিবার পূর্ব্বে, আমাদের তিন জনকে একবার দেখিবাব তাঁহার বড় সাধ হইয়াছে। এ কথা উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্রেই লিখিলেন। সে বৎসর পূজার ছুটিতে আমরা বিলাত যাইব, সমস্ত স্থির হইল। তাঁহাকে এ সংবাদ লিখিলাম। কিন্তু পত্রখানি দেড়মাস পরে ফিরিয়া আসিল। খামের উপর লণ্ডনের পোষ্ট আপিস ববাবষ্ট্যাম্পেব ছাপ মারিয়া দিয়াছে—"মালিক মৃত, পত্র বিলি হইল না।"

আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম।

[মানসী, চৈত্র ১৩১৭]

মাদুলী

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। ছাঁপোষা ভট্টাচার্য্য

দুর্গাপুর গ্রামে পূর্ব্বকালে সহস্রাধিক তন্তুবায় বাস করিত। গ্রামের মধ্যভাগে একটা চত্বরাকৃতি স্থানে সপ্তাহে দুইবাব করিযা হাট বসিত। সেই হাটে বিস্তর দেশী ধুতি, শাড়ী, উড়ানি বিক্রয় হইত। দূব দূরান্তর হইতে পাইকারগণ আসিযা সেই সকল বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। দুর্গাপুরেব কাপড় যে খুব সূক্ষ্ম বা মসৃণ ছিল তাহা নহে—পোষাকী কাপড় এখানে অল্পই প্রস্তুত হইত। তবে এখানকার কাপড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া একটা প্রসিদ্ধি ছিল। আটপৌরে ধুতি শাড়ী দুর্গাপুরের হইলেই অধিক আদর পাইত। সে কালে দুর্গাপুরের তাঁতিরা সমৃদ্ধিশালী ছিল। তাহারা দোল দুর্গোৎসব করিত, অনেকের ইষ্টক-নির্ম্মিত বাসভবন ছিল, কেহ কেহ ভূসম্পত্তিও করিয়াছিল। তখনকার দিনে তাহারা নির্ব্বোধ মূর্খ বলিয়া বিখ্যাত ছিল না। দুই কলম লিখিতে পড়িতে জানে এমন তাঁতি অনেক ছিল। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি। সে সকল কথা এখন স্বপ্নের মত—উপকথাব শ্রেণীভুক্ত। দেশে বিলাতী কাপড়ের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায় মাটি হইল। ক্রমে তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িল। এখনও দুর্গাপুরে তাঁতি আছে—তবে সংখ্যায় অল্প। সকলে আজ জাতিব্যবসা করে না। যাহারা করে, তাহারা কোনক্রমে দিনপাত করে মাত্র।

আজ দুর্গাপুরের হাটে রাইচরণ বসাক ধুতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস—সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পৃথিবীর উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়া এখন ক্ষান্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন। একটা বটগাছের ছায়ায়, ঘাসের উপর রাইচরণ বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে

একখানি গামছা বিছান—সেই গামছার উপর দুই জোড়া মাত্র নীল মাখানো ...রা কালাপেড়ে ধুতি সাজানো রহিয়াছে। এত অল্প পরিমাণ জিনিষ লইয়া রাইচরণ পূর্ব্বে কখনও হাটে আসে নাই। কিন্তু আজ তাহার বড় অর্থাভাব। ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত জুটাইয়া পুটাইয়া গতকল্য সে জমিদারের খাজনা দিয়াছে।

রাইচরণের বয়েস চল্লিশ পার হইয়াছে। দেহখানি শীর্ণ। মাথাব চুলগুলি বড় বড়, চক্ষুযুগলের নিম্নভাগের অস্থিদ্বয় অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—গাল দুইটি গহ্বরাকৃতি। তাহার মুখখানি যে এমন শুষ্ক দেখাইতেছে। রৌদ্রতাপই তাহার একমাত্র কারণ নহে। আজ বেচারীর আহার হয় নাই। ঘরে চাউল ছিল না। উঠানের গাছ হইতে দুইটা পাকা গাব পাড়িয়া, তাহাই খাইয়া হাটে আসিয়াছে। কাপড় বিক্রয় করিযা চাউল কিনিয়া লইয়া যাইলে তবে রান্না চড়িবে। গৃহে তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুসন্তান আছে। রাইচরণের বড় কষ্ট।

দশক্রো...র মধ্যে দুর্গাপুরের হাটই প্রধান। বহুগ্রামের লোক হাট করিতে আসিয়াছে। জনতার অ... নাই। সকল ...পশরার নিকটই ক্রেতার ভিড়—কেবল রাইচরণ ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিতেছে—"বাবু মশায় কাপড় নেবেন? উৎকৃষ্ট কাঁচি ধুতি। হাতে বহরে আছে।"—কিন্তু তাহার এ আহ্বানে কেহই কর্ণপাত করিতেছে না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইল। কাপড় দেখিল—দর জিজ্ঞাসা করিল। রাইচর...িল—"আড়াই টাকা করে জোড়া পড়বে বাবু।"—দর শুনিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যে... হইতে ধুতি ফেলিয়া দিয়া হেলিতে দুলিতে সেস্থান পবিত্যাগ করিয়া গেল। ...াইচ...ণ কত ডাকিল—"বাবু—ও বাবু মশায়—আপনি কত দেবেন?—আপনি কত ব... ?"—কিন্তু বৃদ্ধ আব ফিরিয়াও চাহিল না।—বাইচরণ মুখখানি ম্লান করিয়া ব... রাইল। বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছে। তাহাব তিন বৎসরের মেয়ে পুঁটুমণি ও পাঁচ বৎসবের ছেলে হরিদাস সকালে একপয়সার মুড়কি কিনিয়া তাহাই ভাল করিয়া খ...ইয়াছিল। এতক্ষণ ভাতের জন্য তাহারা কত না কাঁদাকাটি করিতেছে। তাহার স্ত্রীর জন্যও গাব সে বাখিযা আসিয়াছিল, সে দুইটি হতভাগিনী খাইয়াছে কি? এসকল কথা ভাবিতে ভাবিতে রাইচরণের কোটরগত চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

অথচ চিরদিন তাহার এ অবস্থা ছিল না। রাইচরণের পিতা কৃষ্ণদাস বসাক একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। তাহার পাকা বাড়ী ছিল, পুষ্করিণী ছিল, একশত বিঘা ধানের জমি ছিল। গৃহে অনবরত দশখানা তাঁত চলিত—বেতনভোগী ভৃত্যেরা সে তাঁত চালাইত। কৃষ্ণদাসের জীবিতকালেই ম্যাঞ্চেষ্টারের কৃপায় অধিকাংশ তাঁত বন্ধ হইয়া গিযাছিল বটে, কিন্তু তথাপি গৃহে কখনও অন্নাভাব হয় নাই। এমন কি বংশানুক্রমে যে সকল পূজাপার্ব্বণ চলিয়া আসিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাহিত হইত। রাইচরণ সাবালক হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। এখন আর তাহার সে পাকা বাড়ী নেই—সংস্কারাভাবে ইষ্টকের ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পাশেই রাইচরণ মৃত্তিকার কুটীর তুলিয়াছে। সে একশত বিঘা জমির মধ্যে তিন চারি বিঘা মাত্র অবশিষ্ট আছে—বাকী সমস্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিলামে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। বাগান, পুকুর সমস্তই ঐরূপে ভট্টাচার্য্যের করকবলিত হইয়াছে। একদিনে নহে—একবারে নহে। ক্রমে ক্রমে—অল্পে অল্পে। বিপদের সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই রাইচরণের একমাত্র বন্ধু, হাত পাতিলেই কর্জ্জ দিতেন। সুদটা কিছু উচ্চহারেই লেখাইয়া লইতেন। রাইচরণ তজ্জন্য তাঁহাকে অনুযোগ করিলে বলিলেন—"বাপু হে, আমিও ছাঁপোষা মানুষ। ওর কমে দিতে গেলে আমার সংসার চলে কেমন করে বল?"—কিন্তু দশটাকা কর্জ্জ লইয়া বৎসর দুই তিন পরে, দেড় শত টাকার একতর্ফা ডিগ্রী তাহার নামে কেমন করিয়া হইত, তাহা রাইচরণ মোটেই বুঝিতে পারিত না। জিজ্ঞাসা করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেন—

"ইংরাজের আইন আদালত বড় শক্ত ব্যাপার—কি থেকে যে কি হয়, ও কিছু বোঝবার যো নাই। আমরা আগম নিগম তন্ত্র পুরাণ সবই ত পড়েছি—তবু আমাদেরই বুঝতে মাথা ঘুরে যায়; তুমি ত তাঁতির ছেলে, জাত-বোকা।"

রৌদ্র ক্রমে নিবিয়া গেল। হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যাহাদের দূরে যাইতে হইবে, তাহারা আর থাকিতে পারে না। ময়রার দোকানে দুই এক পয়সার জল খাইয়া তাহারা স্ব স্ব গ্রামাভিমুখে পদচালনা করিল। হাটের চারিপার্শে অনেকগুলি স্থায়ী দোকান। মনোহারী দ্রব্যের দোকান, মুদীর দোকান, কাপড়ের দোকান। ঐ যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন কাপড়ের দোকানদারি দেখা যাইতেছে, উহাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের। ওখানেও এখন আর তেমন ভিড় নাই। কেবল দুই চারিজন চাষীলোক, লাট্টু-মার্কা ও বলদ-মার্কা বিলাতী ধুতির জমি ও মূল্যের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া, কোন্‌খানা কিনিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে বস্ত্র বিক্রয় সম্বন্ধে হতাশ হইয়া রাইচরণ উঠিয়া পড়িল। স্থির করিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দোকানেই দুই জোড়া দিবে। বলিয়া কহিয়া আজ নগদ মূল্যটা চাহিয়া লইবে। ভট্টাচার্য্যের দোকানে কাপড় দেওয়া রাইচরণ মোটেই পছন্দ করিত না। হাটের খরিদ্দারের নিকটে যে মূল্য পাওয়া যায়, ভট্টাচার্য্য তাহা দেন না। তাহাও নগদ নহে। বিক্রয় করিয়া মূল্য দিয়া থাকেন। একটা ধারাবাহিক হিসাব চলিয়া আসিতেছে। মূল্য বাবদ যত টাকা পাওনা আছে বলিয়া রাইচরণ মনে মনে হিসাব করিয়া রাখিত, খাতা দৃষ্টে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদপেক্ষা অনেক কম বলিতেন। প্রতিবাদ করিলে উত্তর দিতেন—'বাপু হে, আমার পাকা খাতায় লেখা রয়েছে, তুমি বললেই হবে? জান ত কথাই আছে, লেখার কড়ি বাঘে না খায়।"—নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে রাইচরণ তাঁহার দোকানে কাপড় দিত না।

গামছা জড়ান ধুতি বগলে করিয়া সে যখন দোকানে প্রবেশ করিল, ভট্টাচার্য্য তখন হুঁকা হাতে করিয়া তহবিল বাক্স সম্মুখে রাখিয়া পাকা খাতা "দৃষ্টি" করিতেছিলেন। রাইচরণ প্রণাম করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুর, দু জোড়া ধুতি এনেছি—নিতে হবে।"

"আচ্ছা দাও—কত দাম?"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য ধুতিগুলির জমি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাইচরণ বলিল—"এ দু জোড়ার দাম চার টাকা।"

ভট্টাচার্য্য হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"চার টাকা কিরে? খদ্দের যে আমায় চার টাকা দেবে না।"

"কেন দেবে না দাদাঠাকুর। আশী-নব্বই নম্বর সুতোর কাপড় বিক্রী করে আপনার পাঁচ টাকা হবে।"—ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ক্ষ্যাপা! পাঁচ টাকা কে দেবে? আর কি সে দিন আছে? দুটাকা জোড়া বিলাতী ধুতির জমিটে একবার মিলিয়ে দ্যাখ্ দেখি। সে ছেড়ে, আড়াই টাকা জোড়া দেশী কাপড় কে কিনবে বাপু? বড্ড যদি দেয় ত সাড়ে চার টাকা দু জোড়ায়। তাও কতদিন পড়ে থাকবে বলা যায় না। হয় ত পুজোর এ দিকে কাটবেই না।"

রাইচরণ বলিল—"তা কাটবে দাদাঠাকুর, খুব কাটবে। এ দু জোড়া হিসেবে না চড়িয়ে আজ আমায় নগদ চারটি টাকা দিন!"

"নগদ? কোথা পাব রে? বিক্রী হোক তবে ত পাবি।"

রাইচরণ তখন হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুর, আপনি ব্রাহ্মণ—দেবতাতুল্য। আপনার কাছে মিথ্যা বলছিনে। আজ আমার বড় দরকার—তাই নগদ টাকাটা চাচ্ছি।"

"কি দরকার?"

"আজ আমার ঘরে চাল নেই বলে সমস্ত দিন সপরিবারের খাওয়া হয়নি। বাজার করে নিয়ে যাব তবে হাঁড়ি চড়বে।"—ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"তা ত হল। কিন্তু আমার দিকটিও ত তোমার দেখা উচিত বাপু। নগদ আমি যে চারটি টাকা দেব,—আর পুজো অবধি ও মাল যদি পড়ে থাকে, তবে এ ক'মাসে চার টাকার সুদটা হিসেব কর দেখি?"

রাইচরণ বলিল—"সুদের কথা ধরবেন না দাদাঠাকুর।"

"না ধরলে চলে কই বাপু? আমিও ত ছাঁ-পোষা মানুষ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যখন অত করে বলছ—তখন হিসেবে দুটো টাকা নিয়ে যাও।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাক্স হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া রাইচরণের হস্তে দিলেন। কিছুদূরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া দোকানের কাজ করিতেছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ওহে মৃত্যুঞ্জয় লেখ ত, রাইচরণ বসাক তন্তুবায় জমা দুই জোড়া আশী-নব্বই নম্বরের প্রমাণ ধুতি বাবদ চার টাকা, খরচ দুই টাকা গুজরৎ খোদ।"—বলিয়া তিনি গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। রাইচরণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

মৃত্যুঞ্জয় জমাখরচের খাতায় রাইচরণের নামে সত্তর আশী নম্বরের দুই জোড়া ধুতি বাবদ সাড়ে তিন টাকা জমা লিখিয়া রাখিল। তাঁতিদের হিসাব লিখিবার সময় বাচনিক আদেশ হইতে এই প্রকার ছুট বাদ দিয়া লেখাই এ দোকানের নিয়ম ছিল। মৃত্যুঞ্জয় পিতার উপযুক্ত পুত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। নবীন সন্ন্যাসী

রাইচরণ একটি টাকা ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অন্দরে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো—কাপড় বিক্রী হল?"

ক্ষুন্ন স্বরে রাইচরণ বলিল—"হাটে খদ্দের জুটল না। ভট্চার্য্যির দোকানে দিয়ে এসেছি।"

রাইচরণের হস্তস্থিত পুঁটুলির প্রতি চাহিয়া তাঁতিনী বলিল—"দিলে নাকি কিছু?"

"দুটি টাকা দিলে। একটি ভাঙ্গিয়ে আট আনার বাজার করে এনেছি।"

"মোটে দুটি টাকা!"

"তাই দেয় না। কত কাকুতি মিনতি করে নিয়েছি।"—তাঁতিনী বলিল—"কেন আবার ভট্চার্য্যিব দোকানে গেলে? সে ঠক্—জুয়াচোর—তাকে কি এখনও চিনতে পারলে না?"

রাইচরণ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ছি ছি—অমন কথা মুখে আনিস নে পুঁটুর মা। ব্রাহ্মণের কি নিন্দে করতে আছে? ব্রাহ্মণ হলেন কলির দেবতা।"

"মুখে আগুন কলির দেবতার। যে দেবতা হয় তার কি এমন ব্যাভার? দেবতা কি গরীবের সর্ব্বনাশ করে?"

রাইচরণ একটু উষ্ণ হইয়া বলিল—"ও কথা বলিসনে। দ্যাখ্, এজন্মে আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি; ব্রাহ্মণের নিন্দে করে আর পাপ বাড়াসনে। নরকেও তাহলে স্থান হবে না।"

তাঁতিনী একটু নরম হইয়া বলিল—"তা হাটে বিক্রী হল না যখন, কাপড় দুজোড়া না হয় ফিরেই আনতে। সর্ব্বস্বটা ঐ ভট্চার্য্যিকে খাওয়ালে, তবু তোমার সখ মিটল না?"

"ফিরে আনলে আজ ছেলেপিলেকে খাওয়াতাম কি?"

তাঁতিনী ধীরে ধীরে বলিল—"ওদের আমি খাইয়েছি। আজ তুমি হাটে চলে গেলে, পুটু, হরিদাস ক্ষিধেয় লুটোপুটি করে কাঁদতে লাগল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে আমার গলার মাদুলীটে বেচে পাঁচটা টাকা নিয়ে এলাম। চাল ডাল কিনে এনে রেঁধে খাওয়ালাম?"

এই কথা শুনিয়া রাইচরণ কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। বলিল—"অ্যাঁ?—"অ্যাঁ?—করেছিস কি! সে মাদুলী বিক্রী করেছিস?"

তাঁতিনী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"আমি কি করব বল? ছেলেটার পেট ধরে সে কান্না যদি তুমি দেখতে! আমার চোখের সমুখে আমার ছেলে মেয়ের ক্ষিধেয় প্রাণ বেরিয়ে যাবে, মা হয়ে আমি কি সইতে পারি? তোমার ফিরতে সন্ধে হবে জানি। কি দিয়ে তাদের থামাই? ঘরে আর কি ছিল যে বিক্রী করব?"—বলিয়া তাঁতিনী চক্ষে অঞ্চল দিল।

রাইচরণ বলিল—"সে কি আজকের মাদুলী! কত পুরুষ ধরে ঐ মাদুলী আমাদের ঘরে রয়েছে। ও মাদুলীর এমনি গুণ যে ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ হলে মাদুলী ধুয়ে সেই জল খাইয়ে দিলে অসুখ ভাল হয়ে যায়। সেই মাদুলী তুই বিক্রী করলি। মাদুলীর গুণে কখনও আমাদের কোন বিপদ হয়নি। মাদুলী গেল, এবার আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।"

তাঁতিনী বলিল—"তা কি আমি জানিনে? আমি সব জানি। আমাদের পোড়া কপাল। কিন্তু দেখ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। স্যাকরা মাদুলীটা ভেঙ্গে দেখলে, তার ভিতর পাকান গুটান একটা ভুর্জ্জিপত্র। আমাকে বললে তাঁতিবউ, এতে বোধ হয়, কোন মন্তর তন্তর লেখা আছে—এটা নিয়ে যাও। সেটা আমি নিয়ে এসেছি। যা গুণ সে ত সেই মন্তরের—সোনাটুকুর ত নয়? একটা তামার মাদুলীতে সেটা পুরে নিলে হয় না?"

রাইচরণ কতকটা সুস্থ হইয়া বলিল—"তাত জানিনে। কোন ভাল লোককে জিজ্ঞাসা করা যাবে। যা হয়ে গেছে তাব আব উপায় নেই, হরিদাস, পুঁটু কোথা?"

"তারা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার জন্যে ভাত রেখেছি, হাত পা ধুয়ে খেতে বস।"

"তুই খেয়েছিস?"—তাঁতিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তুমি উপসী রয়েছ, আমি কি খেতে পারি? তুমি খাও—আমি পরে খাব এখন।"

হস্তপদাদি ধৌত করিয়া রাইচরণ আহাবে বসিল। আহারান্তে রোয়াকে একখানি ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। কুলুঙ্গিতে একটি কেরোসিন তৈলের ডিবা অজস্র ধূমোদগার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোক বিতরণ করিতেছে। রাত্রি একপ্রহর অতীত হইল। শয়ন কবিতে যাইবে বলিয়া বাইচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় উঠানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া বলিল—"বন্দোমাতরম্।"

রাইচরণ সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল। উঠানেব দিকে চাহিয়া দেখিল, আগন্তুকের অঙ্গে সন্ন্যাসীর গৈরিকবসন। মস্তকে পাগড়ি। স্কন্ধদেশ হইতে ঝুলি ঝুলিতেছে। শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে"—উত্তর হইল—"আমি সন্ন্যাসী।"

রাইচরণ তখন ব্যস্ত হইয়া উঠানে নামিয়া আগন্তুককে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আসুন আসুন। উপরে উঠে বসুন।"—আহ্বান মত সন্ন্যাসী রোয়াকে উঠিয়া আসিলেন। ডিবার আলোকে রাইচরণ দেখিল, সন্ন্যাসীর বয়স বিংশতিবর্ষের হইবে না। গৌরবর্ণ দেহখানি হইতে লাবণ্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। এরূপ কমনীয় কান্তিযুক্ত সন্ন্যাসী রাইচরণ আর কখনও দেখে নাই। তাহার মনে অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল। তাড়াতাড়ি একখানি পীড়ি পাতিয়া দিয়া বলিল—"ঠাকুর, বসতে আজ্ঞা হোক্।"—সন্ন্যাসী উপবেশন করিলেন। বাইচরণ জোড়হস্তে বলিল—"কি মনে করে ঠাকুরের আগমন হয়েছে?

যুবক সুমিষ্টস্বরে বলিলেন—"আজ রাত্রিব মত আমাকে একটু স্থান দিতে পারবে?"

রাইচরণ সাগ্রহে বলিল—"যখন দয়া করে অধমের ঘরে পা'র ধুলো দিয়েছেন, তখন স্থান অবিশ্যিই দিতে পারব। পুঁটুর মা—ও পুঁটুর মা—ঠাকুরের পা ধোবার জন্যে একঘটি জল নিয়ে আয় ত।"

পুঁটুর মা আহারান্তে দ্বারের নিকট অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। ঐ কথা

শুনিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া একঘটি জল আনিয়া দিল। রাইচরণ, সন্ন্যাসীর পদযুগল ধৌত করিতে লাগিল। তাঁতিনী বলিল—"ঠাকুর, আপনার বোধ হয় সেবা হয়নি?"

"আহারের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"রীতিমত আহার যে হয়েছে তা বলতে পারিনে। পথে কিছু ফলমূল খেয়েছিলাম। আমাদের সমিতির একটা নিয়ম এই যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করা অভ্যাস করতে হবে। তাই আমি অনেক সময়, খাদ্য উপস্থিত থাকলেও খাইনে। আজ আর কিছু খাব না।"

রাইচরণ তাঁহার পা মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তাও কি হয় ঠাকুর? গৃহস্থের বাড়ী সাধুসন্ন্যাসী এসে উপবাসী থাকলে ভারি অপরাধ হয়। গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। বাবা, আমাদের দয়া করুন।"

পুঁটুর মা বলিল—"আমরা বড় গরীব বাবা। আমরা যে আপনার সেবা করি সে সাধ্য আমাদের নাই। তবে ঘরে চাল ডাল আছে, আলু আছে—যদি দয়া করে সেবা করেন ত আমরা কৃতার্থ হই।"—দরিদ্র গৃহস্থের এরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া যুবক সন্ন্যাসী বলিলেন—"আচ্ছা বেশ—সব যোগাড় করে দাও—আমি রেঁধে খাই।"—এ কথা শুনিয়া রাইচরণ স্ত্রীকে বলিল—"তুই যা, পুকুর থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয়। আমি তাঁতঘরের রোয়াকে ততক্ষণ একটা উনান কাটি।"—বলিয়া রাইচরণ খন্তা খুঁজিয়া বাহির করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। বাবার দয়া হইল

দেখিতে দেখিতে সমস্ত আযোজন সম্পূর্ণ হইল। সন্ন্যাসীঠাকুব রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁতি ও তাঁতিনী সসম্ভ্রমে কিযদ্দূরে বসিয়া রহিল, অতিথিব কখন কি আবশ্যক হয় বলা যায় না।—সন্ন্যাসী রন্ধন করিতে করিতে তাঁতিকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুর্গাপুরে কোন্ কোন্ জাতির বাস, এখানকার তাঁতিগণের সাধারণ অবস্থা কিরূপ, গ্রামে ধনীব্যক্তি কে কে আছে, তাহারা কিরূপ চরিত্রের লোক—ইত্যাদি। রাইচরণের সাংসারিক অবস্থার কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁতি ও তাঁতিনী উভয়ে মিলিয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী সমস্তই বলিল। পূর্ব্বে তাহাদের স্বচ্ছলতার কথাও বলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রমে কিরূপে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছেন, এ কথা তাঁতিনী—তাঁতির বারম্বার বাধা সত্ত্বেও—ভাল করিয়া বর্ণনা করি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমৃদ্ধির কথাও বলিল।

সন্ন্যাসী তখন তাঁত সম্বন্ধে রাইচরণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এ গ্রামে পূর্ব্বে তাঁদের অবস্থা কিরূপ ছিল, এখনই বা কিরূপ, এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা আর চরকায় সূতা কাটে কি না, সেই সুতায যদি কাপড় বোনা যায় তবে বিলাতী কাপড় অপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব কি না—এই সমস্ত সংবাদ। জাতীয় ব্যবসায়ের প্রসঙ্গে রাইচরণের মুখ খুলিয়া গেল। গ্রামের তাঁতিগণের পূর্ব্বসমৃদ্ধি এবং আধুনিক দুরবস্থার বিষয় সে তাহার প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করিল। বলিল, তাহারই পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রামের প্রধান তন্তুবায় বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। অথচ আজ সে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত। পূর্ব্বকালে তাহাদের ইষ্টকালয় ছিল। তাহারই ভগ্নস্তূপ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আলো ধরিয়া দেখাইয়া দিল। রাইচরণের চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল—তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া যুবক বলিলেন—"কেঁদ না রাইচরণ—কেঁদ না। তোমাদের দুঃখের রাত পুইয়ে এসেছে। স্বদেশী জিনিষের প্রতি ক্রমেই লোকের ভক্তি বাড়ছে। শীঘ্র এমন দিন আসবে যখন কাপড় বুনে তোমবা কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

দেশের শিল্পের উপর, বিশেষতঃ তাঁতের উপর, ভগবানের শুভদৃষ্টি পড়েছে। তাঁতির কান্না শুনে ভগবানের আসন টলেছে। কেঁদ না—চুপ কর।"

রাইচরণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। চুপি চুপি তাহার স্ত্রীর কানে কানে বলিল—"দ্যাখ্—ইনি একজন ঈশ্বরজনিত লোক হবেন। যা বলছেন, আমার কিন্তু খুব মনে নিচ্ছে। ইনি একজন বড় দরের সাধুপুরুষ।"

তাঁতিনী চুপি চুপি বলিল—"আমারও তাই মনে হয়। দেখছ না কিবা চেহারা, যেন রাজপুত্তুর। ইনি কোনও দেবতা হবেন, মানুষের রূপ ধরে এসেছেন। মাদুলীটের কথা একে জিজ্ঞাসা কর না।"—রাইচরণ বলিল—"তুই জিজ্ঞাসা কর্।"

কিন্তু তাঁতিনী হঠাৎ সে কথা বলিতে পারিল না। উভয়পক্ষে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল নীরব।

অবশেষে সন্ন্যাসী আবার যখন দুই একটি কথা কহিলেন, তখন তাঁতিনী বলিল—"বাবা, তোমার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।"—যুবক সুস্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—"কি, বল।"

"আমার একটি বড় অপরাধ হয়ে গেছে।"

"কি হয়েছে?"

তাঁতিনী তখন মাদুলীর ইতিহাস আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। কেন যে মাদুলী আজ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, খুলিয়া বলিল। রাইচরণ যে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাও জানাইল। সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"সে ভূর্জ্জপত্রখানি আন, কি মন্ত্র লেখা আছে দেখি।"

তাঁতিনী সেখানি আনিয়া দিল। যুবক সাবধানে সেটি খুলিয়া, আলোকের নিকট ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোনও লেখা দেখিতে পাইলেন না। এখানে ওখানে দুই একটা অলক্তক চিহ্ন আছে—কোনও কালে হয়ত অক্ষর ছিল—কিন্তু এখন অদৃশ্য। সেখানি আবার গুটাইয়া রাখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, পরে আমি ভাল করে দেখব এখন।"

তাঁতিনী বলিল—"আমরা মনে করেছিলাম যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে গিয়ে এর বিধেন নেব, কিন্তু আমাদের খুব ভাগ্যি যে তুমি এসে পড়েছ বাবাঠাকুর, তুমিই এর বিধেন দাও। যাতে আমাদের কোন বিপদ না হয় এমন কর বাবা।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর নীরবে আপনার রন্ধনকার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। মাদুলী বিক্রয়ের করুণ ইতিহাসটি তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী হঠাৎ বলিলেন—"আচ্ছা দেখ, তোমরা যদি অনেক টাকা পাও ত কি কর?"—তাঁতিনী বলিল—"কত টাকা বাবা?"

"এই হাজার—কি দু হাজার—কি পাঁচ হাজার।"

তাঁতিনী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবাঠাকুর, তুমি কি সোনা তৈরি করতে জান?"

রাইচরণ গোপনে তাহার স্ত্রীর হাত টিপিয়া দিল চুপে চুপে বলিল—"চুপ কর্। বোধ হয় বাবার দয়া হয়েছে।" পরে প্রকাশ্যে বলিল—"যদি টাকা হয় বাবা—তবে তীর্থধর্ম্ম করি।"

"শুধু তাই? তা করলেই কি টাকার সদ্ব্যয় হয়?"

রাইচরণ বলিল—"আমি মুখ্যু মানুষ—আমি আর কি জানি বাবা? আপনি উপদেশ দিন।

"আমি যে রকম উপদেশ দেব, তা যদি তুমি পালন করতে পার, তা হলে হয়ত ভগবান তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারেন। অবশ্য যদি তাঁর দয়া হয়।"

রাইচরণ আগ্রহের সহিত বলিল—"হ্যাঁ বাবা, যে রকম বলবেন তাই করব।"

পাক সমাপ্ত হইল। হাঁড়ি নামাইয়া রাখিয়া, হস্ত ধৌত করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁতি ও

তাঁতিনীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন—"যদি ভগবান তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দেন—"—তাঁতিনী বাধা দিয়া বলিল—"কেমন করে দেবেন বাবা?"

রাইচরণ তাড়া দিয়া বলিল—"চুপ কর্ মাগী!"

যুবক হাসিয়া বলিলেন—"ভগবান কি নিজে হাতে করে কাউকে কিছু দেন? কোন মানুষের হাত দিয়ে পাঠান। রাইচরণ, যদি ভগবান তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দেন, তবে জেনো, তার মধ্যে কেবল এক হাজার টাকা তোমায় খেতে পরতে দিয়েছেন। সে তুমি নিজের জন্য ব্যয় করবে। আর বাকী যে চার হাজার, সে তোমায় তাঁতের জন্যে ব্যয় করতে হবে। চার হাজার টাকায়, এই গ্রামে তুমি একটি তাঁতশালা স্থাপন করবে। যতগুলো হয় তাঁত খাটিয়ে, এ গ্রামেব তাঁতিদের ডেকে, তাদের রীতিমত মাইনে দিয়ে প্রতিদিন কাপড় বোনাবে। সেই কাপড়, বিনা লাভে বিক্রী করবে। কেমন এ কাজ তুমি পাববে?"

রাইচরণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল—"আজ্ঞে বাবাঠাকুর, খুব পারব, কেন পারব না? আমার সাতপুরুষ ত ঐ কাজই কবে এসেছে। বেশ পারব।"

"লাভ করতে পাবে না। তৈরী করার যা খরচ, সেই হিসাব করে বেচতে হবে।"

"আজ্ঞে, আমি যদি লাভ করি তবে সে যেন আমার পক্ষে গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত হয়।"

"উত্তম কথা! এক হাজার টাকা—সম্পূর্ণ তোমার। যে রকম ইচ্ছে খরচ করতে পারবে।"

"আজ্ঞে।"

"তা হলে পাঁচ হাজার টাকা পাবে তুমি। কেমন করে পাবে বলে দিই। ভগবান তোমাকে ও টাকা ভট্‌চায্যি মহাশয়ের হাত দিয়ে পাঠাবেন।"

তাঁতিনী বলিল—"ভট্‌চায্যি দিলে হয়—ও হয়ত নিজেই গাপ করবে।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"ভগবানের টাকা হজম করা সহজ নয়। কি রকমে টাকা ভট্টাচায্যি দেবেন, তাও বলে দিই। হঠাৎ তোমার এই ভিটেখানি নেবার জন্য তাঁব ভারি আগ্রহ হবে। ভগবানই ওঁকে ঐ মতি বুদ্ধি দেবেন। ভট্‌চায্যি প্রথমে অল্প টাকা দিয়ে তোমাব ভিটে কিনতে চাইবেন। তুমি দিও না। ক্রমে উনি দর বাড়াতে থাকবেন। তবু তুমি দিও না। শেষে যখন উনি পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠবেন, তখন তুমি দিও, নগদ টাকা নিয়ে তবে দেবে।"

"যেমন আজ্ঞে করেন।"

"একটা বিষয় সাবধান করে দিই, আমার সঙ্গে তোমাদের যে এ সব কথাবার্ত্তা হল তা কারুর কাছে প্রকাশ কোরো না। যদি একটি প্রাণীও এ কথা শোনে, তা হলে সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। টাকা কড়ি কিছুই পাবে না। আমি এখানে এসেছিলাম, তা পর্য্যন্ত যেন প্রকাশ না হয়।"

রাইচরণ বলিল—"শুনছিস্ ত পুঁটির মা—সাবধান। তোর আবার পেটে কথা থাকে না।"

"আচ্ছা বেশ। এখন তোমরা শয়ন করগে। আমায় একটু পূজাপাঠ করতে হবে। তারপর আহার করে আমি শয়ন করব। তোমরা খুব ভোরে আমায় উঠিয়ে দেবে—দুদণ্ড রাত বাকী থাকতে থাকতে গ্রাম পরিত্যাগ করে যাব।"—রাইচরণ হাতজোড় করিয়া বলিল—"বাবাঠাকুরের সেবা হোক্—তবে আমরা শুতে যাব। কিছু যদি দরকার হয়?"

"কিছু দরকার হবে না। তোমরা যাও!"—"তাঁতঘরে ঠাকুরের বিছানা করা আছে"—বলিয়া তাঁতি ও তাঁতিনী প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রদীপটা কাছে আনিয়া, ঝুলি হইতে একখানি গীতা বাহির করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। ভট্টাচার্য্যের স্বপ্নদর্শন

ভোর রাত্রে তাঁতি ও তাঁতিনী আসিয়া সন্ন্যাসীকে জাগাইয়া দিল।

সন্ন্যাসী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"তোমার মাদুলীর ভিতর যে কাগজখানি ছিল, সেখানি বড় ভাল জিনিষ। এই কাগজখানি, একটু বেলা হলেই, তাঁতিনী তুমি ভট্টাচার্য্যি মহাশয়কে গিয়ে দেখাবে। মাদুলী ভাঙ্গাতে কাগজখানি অশুদ্ধ হয়েছে কিনা— তিনি শোধন করে একটা তামার কি অন্য কিছুর মাদুলীতে ভরে দেবেন। গলায ধারণ কোরো, কোন বিপদ আপদ হবে না।" বলিয়া সন্ন্যাসী ভূর্জ্জপত্রখানি তাঁতিনীকে দিলেন। তাঁতি তাহার ছেলে মেয়েটিকে আনিয়া বলিল—"ঠাকুর, এদের আশীর্ব্বাদ করুন—মাথায় পা'র ধুলো দিন।" তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

একটু বেলা হইলেই তাঁতিনী ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইল। তিনি তখন সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া, কাঁধে চাদর হাতে ছাতি লইয়া দোকানে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

তাঁতিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুর, আমাদেব বড় বিপদ।"

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, নিশ্চয়ই টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন— "কি হল আবার?"—তাঁতিনী তখন মাদুলীর আমূল ইতিহাস বলিয়া, রাইচরণের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিল। আর বলিল—"তা দাদাঠাকুর সে ত সোনার গুণ নয়, মন্তবটিবই ত গুণ? সেকরা মন্তরলেখা সে ভূজ্জিপত্রখানি আমায় ফিরিযে দিয়েছে। তাই আপনার কাছে বিধেন নিয়ে এসেছি যে, ভূর্জ্জিপত্রখানি অন্য মাদুলীতে পুরে দিলে হয় না?"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামকবচ না ইষ্টকবচ?"

"তা কি জানি দাদাঠাকুর!"—বলিয়া তাঁতিনী তাঁহাব হস্তে ভূর্জ্জপত্রখানি দিল।

ভট্টাচার্য্য পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চোখে দিয়া, ভূর্জ্জপত্রখানি পাঠ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের ভাব আশ্চর্য্য রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিকটস্থ তক্তপোষে তিনি বসিয়া পড়িলেন।—তাঁতিনী শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাঠাকুর, অমন করছ কেন?"—ভট্টাচার্য্য দুই হাতে কপাল টিপিয়া বলিলেন—"হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল।"

"কাউকে ডাকব?"

"না না—এখনি ভাল হয়ে যাব। ভাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ—তুমি কি বলছিলে? মাদুলীটা কোথায় পেয়েছিলে?"

"আমাদের বাড়ীতে বহুকাল ছিল। আমার শ্বাশুড়ীর কাছে শুনেছিলাম, সাতপুরুষ ধরে আমাদেব ঘরে এ মাদুলী আছে। আমার শ্বাশুড়ী তার শ্বাশুড়ীর কাছে পেয়েছিল, তার শ্বাশুড়ী তার শ্বাশুড়ীর কাছে পেয়েছিল। আমার শ্বাশুড়ী মরবার সময় আমায় বলে গিয়েছিল, এটি সাবধানে রেখ, খুইও না—তুমি মরবার সময় তোমার বউকে দিয়ে, এই রকম সাবধান করে দিও।"—ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ঈশ্, তা হলে খুব পুরোনো জিনিষ দেখছি। মন্তরটি যা লেখা রয়েছে, বড় ভাল মন্তর! এমন মন্তর আজকাল পাওয়াই যায় না। তা, এ ভূর্জ্জপত্রটুকু শুধু অন্য মাদুলীতে পুরে দিলেই ত চলবে না! ভাঙ্গা হয়ে গেছে—ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে যে! একে পূজো করে শোধন করতে হবে। তার জন্যে আমার পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে দিন দেখা দরকার। এক কাজ কর—এটি আমার কাছে এখন থাক। দিন দেখে শোধন করে, একটি তামার মাদুলীতে ভরে দেব এখন।" তাঁতিনী বলিল—"তাই রাখ।"

ভট্টাচার্য্য গলা ঝাড়িয়া মুখখানি অত্যন্ত সকরুণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর তাও বলি তাঁতিবউ, তোমার বুদ্ধিটি বড় হাল্কা। বেশ ত, ঘরে ভাত ছিল না, আমাদের বাড়ী এসে চাইলে কি তোমার ছেলে মেয়ের জন্য দুথালা ভাত পেতে না? মাদুলীটি বেচতে গেলে কেন? তাঁতিবুদ্ধি একেই বলে।"

তাঁতিনী বলিল—"বুদ্ধি থাকলে আর এমন দুর্দ্দশা হবে কেন দাদাঠাকুর।"

"সেই কথাই ত বলচি। আচ্ছা, এখন বেলা হল—দোকানে যাই।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।—পরদিন প্রাতঃকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাইচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুব ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ বস! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব বলে ডেকেছিলাম। তোমার ঘরদোর যা আছে তা ত দেখছি নিতান্ত ভাঙ্গাচোরা।"

"কি করব দাদাঠাকুর, পেটেই খেতে পাইনে ত ঘর সারাব কোথা থেকে? মাটির ঘর বৈ ত নয়, বছর বছর না সারালে টেকে না।"

"ঐ যে নীলু বাগ বলে ওপাড়ায় একঘর কৈবর্ত্ত ছিল, সে অন্য গ্রামে গিয়ে বাস করছে, তার ভিটেটা আমি খরিদ করে নিয়েছি জান ত?"

"আজ্ঞে জানি।"

"উচু রোয়াকওয়ালা বেশ শক্ত পোক্ত দু-খানা ঘর আছে, রান্নাঘর আছে, গোয়াল আছে, দুটো আমগাছ আছে—আরও সব আওলাৎ আছে। আমি বলি কি, সেই বাড়ীতে গিয়ে তুমি বাস কর না কেন? আমি তোমায় অমনি দিচ্ছি—যদি তোমার ভিটেটুকু আমায় ছেড়ে দাও।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী ত্রিরাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে ফলিতে লাগিল দেখিয়া রাইচরণের আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন দাদাঠাকুর, আমার ভিটে নিয়ে আপনি কি করবেন?"

"আমি ও জায়গায় একটি শিব প্রতিষ্ঠা করব মনে করেছি। কি বল, দেবে? তোমার কিছু লোকসান নেই, বরং লাভই আছে। অমন ভাল বাড়ী, গাছপালা, অমনি পাচ্ছ।"

রাইচরণ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"আজ্ঞে, পৈত্রিক ভিটে, সাতপুরুষ ওখানে বাস করেছে—"—ভট্টাচার্য্য মধুর হাস্য কবিয়া বলিলেন—"হেঃ—তাঁতিবুদ্ধি কিনা? সাতপুরুষ বাস করেছে ত কি হয়েছে রে? অমন ভাল ঘরদোর মাঙ্গনা পাচ্ছিস—অমন গাছপালা! আমাদের কেউ দিতে চাইলে ত আমরা বর্ত্তে যাই।"—রাইচরণ কথা কহে না। ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এবার মন-কাড়িযা-নেওয়া হাসি হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"তোর মনের ভাবখানা আমি বুঝতে পেরেছি। তুই মনে করেছিস, আমার ভিটেটা কিছু না হবে ত এক বিঘে জমির উপর। নীলু বাগের যে বাড়ী দশ কাঠা হবে কিনা সন্দেহ; বেশীটা দিয়ে আমি কমটা কেন নিই। এই মনে করছিস ত?"

আর কোনও উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া রাইচবণ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তখন ভট্টাচার্য্য হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"কে বলে তাঁতির বুদ্ধি নেই? আচ্ছা বাপু, তোর ভিটেতে যেমন জমি বেশী আছে—তেমন না হয় দু একশো টাকাই ধরে নিবি। কেমন, সন্তোষ হলি ত?"—রাইচরণ তথাপি কিছু বলে না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"তাঁতি বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পারছিসনে বুঝি? আচ্ছা যা, পরামর্শ করে, ওবেলা এসে আমায় বলিস। নগদ দুশো আর নীলু বাগের বাড়ীখানা পাবি। তোর ভিটের সমস্ত জমিটুকু আমায় ছেড়ে দিতে হবে।"—রাইচরণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।—অপরাহ্নে ভট্টাচার্য্য সাগ্রহে তাহাব প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু সে আসিল না। সূর্য্যাস্তের সময় তাই তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে স্বয়ং রাইচরণের গৃহে পদধূলি দিলেন।

"কিরে রাইচরণ? কর্ত্তাগিন্নীতে পরামর্শ করে কি ঠিক করলি?"

রাইচরণ মুখখানি নীচু করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, সাতপুরুষের বাস্তভিটে কেমন করে ছাড়ি?"

"ঐ এক কথা শিখে রেখেছিস—সাতপুরুষের বাস্তভিটে।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়

উঠানের চতুর্দ্দিকে পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; অবশেষে বলিলেন—"একটি শিব প্রতিষ্ঠে করব বলে নিতান্ত ঝোঁকটা হয়েছে আমার, তাই তোর অত খোসামোদ করছি। নইলে এ ভিটে নিয়ে আমি আর কি করব? আচ্ছা যদি দুশো টাকায় তোর মন না ওঠে—তা হলে না হয় আরও কিছু বেশী নে, পাঁচশো টাকা আর নীলুর সেই বাড়ী।"

রাইচরণ নির্ব্বাক। ভট্টাচার্য্য তাহার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিয়া বলিলেন—"কি বলিস?"

"আজ্ঞে—আমার কেমন মনটা সরছে না। আমাব মনে হচ্ছে এ পৈতৃক ভিটে বেচে ফেললে আমার আর ভদ্রস্থতা থাকবে না।"—ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"হুঃ—ভারি ভদ্রস্থতা আছে কিনা! এ দিকে ত রাত পোয়ালে কি খাবি তার ঠিক নাই। পাঁচ পাঁচশো টাকা দিতে চাচ্ছি—যত দিন বাঁচতিস্ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতিস। তোর কপালে নেই সুখ, লোকে কি করবে বল্?"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য চারিদিকে আবার পায়চারি কবিতে লাগিলেন। যেখানে রাইচরণের পূর্ব্বপুরুষগণের পাকাবাড়ী ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িয়া ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—"এই যে সব ইঁট পড়ে রয়েছে, ছোট ছোট পাতলা ইঁট—এ সব সেকেলে ইঁট ভারি পোক্ত হয়। এমন ইঁট আর একালে তৈরি হয় না। একালের ইঁট হাত থেকে মাটিতে পড়লে ভেঙ্গে যায়। সে কালের এ সব ইঁট এখনও এত মজবুত যে শাবল মারলেও ভাঙ্গে না। ইঁট যা পড়ে আছে দেখছি—এরই ত দাম পাঁচশো টাকা হবে। এই ইঁট দিয়ে মন্দির তৈরী করলে, সে একেবারে চিরস্থায়ী। (উচ্চৈঃস্বরে) রাইচরণ—আমি দরই বাড়িয়ে যাচ্চি—দরই বাড়িয়ে যাচ্চি দেখে তুই বোধ হয় ঠাউরেছিস—আমার ভারি গরজ? আচ্ছা বলি শোন্। এই ইঁটগুলো সুদ্ধ যদি আমায় দিস, তবে হাজার টাকা দেব। বস্—আর এক পয়সা না। কোথা পাব আমি এর বেশী? আমি ছাঁপোষা মানুষ—হাজার টাকা দিতেই আমার জিব বেরিয়ে যাবে। যদি হাজার টাকায় হয় ত বল, নইলে বাবা মহাদেব মাথায় থাকুন—মন্দির প্রতিষ্ঠে করা আমাব দ্বারা হল না।"—বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাইচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন।—রাইচরণ কিছুই বলে না। তখন তিনি তাহাকে ছাড়িযা তাঁতিনীকে ধরিলেন; বলিলেন—"বলি তাঁতিবউ, রাইচরণ না হয় বুড়ো হয়েছে—ভীমরতি হয়েছে। তোমার ত এখনও যুবত্ব বয়স; তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না—এ ভিটে, যা অন্য কেউ একশো টাকা দিয়েও কিনবে না—তাব জন্যে আমি হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠছি। এমন নয় যে বাড়ীখানি বেচে ফেলে কোথায় তোমরা দাঁড়াবে তার ঠিকানা নেই। একখানা বাড়ী পর্য্যন্ত দিচ্ছি। নীলু বাগ কৈবত্তর সেই বাড়ী—দেখেছ ত? হাজার টাকা দিতে চাচ্ছি—তবুও রাজী নয়। তুমিই না হয় ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল। হাজার টাকা কি অল্প টাকা?—তোমার ঐ যে ভাতের হাঁড়ি রয়েছে, ওরই এক হাঁড়ি টাকা, বরং বেশী। আজ আমি এখন চললাম। সন্ধ্যা-আহ্নিক করবার সময় বয়ে যাচ্ছে। ওকে বেশ করে বুঝিয়ে কাল সকালে এস, তারপর সদরে গিয়ে রীতিমত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাপড়া করে, কওলা করে দিও—হাজার টাকা নগদ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে এসে বস। এখন চললাম।"—পরদিন প্রাতে তাঁতি কিম্বা তাঁতিনী কেহই ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব কাছে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি লোক দিয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাবা আসিলে বলিলেন—"কি গো? কি পরামর্শ হল তোমাদের?"

রাইচরণ বলিল—"পরামর্শ আর কি হবে দাদাঠাকুর, ভিটে বেচতে পারব না।"

"কেন শুনি?"

"বাপরে, সাতপুরুষের ভিটে কি বেচতে পারি? আমার ছেলেপিলের অমঙ্গল হবে।"

"ঈশ্—ভারি যে পণ্ডিত হয়েছিস রে! অমঙ্গল হবে! কেন, অমঙ্গল হবে কেন? কেউ কি ও ভিটেতে কসাইখানা খুলছে? শিবের মন্দির হবে, দিন রাত ধূপধুনো পুড়বে, পুজো হবে, কাঁসর ঘণ্টা বাজবে—তোর সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে তা জানিস?"

রাইচরণ পূর্ব্ববৎ নীরব।—কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আচ্ছা কত হলে তুই দিবি, তাই বল্ না। তোর দরটাই শুনি।" রাইচরণ কথা কহে না।

ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দু হাজার নিবি?"—রাইচরণ পূর্ব্ববৎ।

ভট্টাচার্য্য তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন—"হাসি ঠাট্টা নয়—সত্যিই আমি দু হাজার পর্য্যন্ত উঠব। আসল কথাটা তবে তোকে খুলে বলি। বাবা মহাদেব আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন,—বলেছেন, রাইচরণ তাঁতির ঐ ভিটেটি বড় পবিত্র স্থান—ঐ ভিটেতে একটি মন্দির তুলে তুমি আমায় স্থাপনা কর। তাই তোর ভিটেখানির উপর আমার এত ঝোঁক। নইলে দুনিয়ার আর শিব প্রতিষ্ঠে করবার কি জায়গা পেলাম না? আমার নিজের বাড়ীতেই ত করতে পারি। আজ সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করে নে—চল্ দুজনে সদরে যাই। কাল দিনটেও ভাল আছে। কাল রেজেষ্টরি হাকিমের সম্মুখে, এক হাতে তোর কওলা নেব, অন্য হাতে দু হাজার খানি টাকা দেব। কি বলিস্?"

রাইচরণ বলিল—"আজ্ঞে, সেটি পারব না।"

ভট্টাচার্য্য একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"শাস্ত্রে যে আছে অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই—তা ঠিক। তোর অদৃষ্টে নেই সুখ—নইলে তোর এমন বুদ্ধিই বা হবে কেন? সেকালে এক ব্রাহ্মণ ছিল—ভারী গরীব। অন্ন জোটে না, ছেলেপিলেকেও পেটভরে খেতে দিতে পারে না। ব্রাহ্মণ রোজ সকালে ভিক্ষে করতে বেরুত, সাত গাঁ ভিক্ষে করে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরত। একদিন এইরকম ফিরছে, আকাশ দিয়ে হরপার্ব্বতী রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। দুর্গা বলিলেন—নাথ, ঐ ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখে আমাব বড় দুঃখ হয়। রোদ্দুর নেই বৃষ্টি নেই, রোজ এই রকম করে সাত গাঁ ভিক্ষে করে বেড়ায়, তবু পেটভরে খেতে পায় না। ওকে তুমি কিছু ধন দাওনা কেন, যাতে ওর দুঃখ ঘোচে? মহাদেব হেসে বললেন—ক্ষেপি! ওর অদৃষ্টে নেই ধন—আমি ওকে দেব কোত্থেকে? দুর্গা বললেন—তোমার যেমন কথা! তুমি যদি ওকে ধন দাও তাহলে নাকি ওর ধন হয় না! মহাদেব বললেন—আচ্ছা দেখবি—তবে দ্যাখ্। ও যে পথে যাচ্ছে সেই পথে আমি একখানা সোনার ইঁট ফেলে রাখছি, ও পায় কি না দ্যাখ্।—বলে মহাদেব কিছু দূরে একখানা সোনার ইঁট ফেলে রাখলেন। চলতে চলতে ব্রাহ্মণের হঠাৎ কেমন খেয়াল হল, সে মনে মনে ভাবলে—আমি ভিক্ষে করে এত বছর ধরে রোজ রোজ এই পথ দিয়ে ঘরে ফিরি,—এ পথ আমার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে বোধ হয় চক্ষু বুজেও ঠিক চলে যেতে পারি। আচ্ছা দেখিই না কেন পারি না। বলে ব্রাহ্মণ চক্ষু দুটি বুজে পথ চলতে আরম্ভ করলে। যেখানে সোনার ইঁট পড়ে ছিল সেই জায়গাটা চক্ষু বুজেই পার হয়ে গেল—তোদের হয়েছে তাই। দু হাজারের বেশী আমি দিতে পারব না—আমায় কেটে ফেললেও না। আচ্ছা এখন যা, ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখে—যা হয় ও বেলা আমায় বলিস এখন।"

তাঁতি ও তাঁতিনী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ী গিয়া তাঁতিনী বলিল—"ওগো দেখ, আমি বলি কি, ভট্চায্যি যে দু হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে ওতেই রাজী হও। বেশী লোভ করতে গিয়ে একূল ওকূল দুকূল যাবে।"

রাইচরণ বলিল—"ঠাকুর ত বলে গেছেন পাঁচ হাজার টাকা আমি পাব।"

"পাঁচ হাজার টাকা ভট্চায্যি দিতে পারবে কি? যা পাওয়া যাচ্ছে তাই যথেষ্ট। হাতেরটা ছাড়তে নেই।"

"ওরে ক্ষেপি! পাঁচ হাজার টাকা কি ভট্চায্যি আমায় দিচ্ছে? পাঁচটা পয়সা দেয় না ত পাঁচ হাজার টাকা! ও টাকা ভগবান দিচ্ছেন—ওর হাত দিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুর ত বলেই গেলেন।"

তাঁতিনী চিন্তিত হইয়া বলিল—"ঠাকুর বলে গেলেন বটে,—কিন্তু তিনি ত আর সত্যি দেবতা নন, তিনিও মানুষ। তাঁর কথাই কি বেদ বাক্যি? যদি শেষ পর্য্যন্ত না ফলে?"

রাইচরণ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ছি ছি এমন কথা বলিস্‌নে পুঁটুর মা। তাঁরা হলেন সাধু পুরুষ—তাঁদের কথা মিথ্যে হবার যো আছে? তাঁদের কথায় সন্দেহ করাও পাপ। আমি পাঁচ হাজার টাকাই পাব।"

বাস্তবিক তাহাই হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরদিন তিন হাজার ও তৎপরদিন চার হাজারে উঠিলেন। তাহাতেও যখন রাইচরণ রাজী হইল না, তখন তিনি আবার তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"রাইচরণ তোর কি পরকালের ভয় নেই?" "কেন দাদাঠাকুর?"

"আমি যে এত করে তোর খোসামোদ করছি, ঐ জায়গাটির জন্য চার হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাচ্ছি—তুই রাজী হচ্ছিসনে! বাবা মহাদেব আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন, তোর ভিটের ঐ জায়গাটুকু তাঁর বড় প্রিয় স্থান, ঐখানে আমি যদি তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠে করতে পারি তবে বাবা আমাকে এমন বর দেবেন বলেছেন, যাতে আমার বংশে কেউ কখন কষ্ট পাবে না—সবই রাজার মত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। তাই আমার এই আকিঞ্চন। তুই জমিটুকু আমায় বেচলে একজন ব্রাহ্মণের বংশাবলীক্রমে উপকার করা হয়। আর যদি না দিস্, আমায় মনঃক্ষুণ্ণ করিস, তবে ব্রহ্মশাপ কি তোর লাগবে না ভেবেছিস?"

রাইচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"চার হাজার বলছেন?"

"নগদ চার হাজার।"

"আর নীলুবাগের সে বাড়ীখানাও?"

"সে বাড়ীখানাও।"

"আচ্ছা দাদাঠাকুর, অত করে যখন বলছেন—তবে না হয় দিচ্ছি—কিন্তু আরও এক হাজার উঠতে হচ্ছে। নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর নীলুবাগের ঐ বাড়ীখানা।"

এ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাইচরণের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"ভ্যালা রে মোর বাপ্‌রে! কে বলে তাঁতির বুদ্ধি নেই? আচ্ছা আমি রাজি। পাঁচ হাজার টাকাই পাবি। আর নীলুবাগের বাড়ীখানা। তা হলে আজই চল্, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক্। সদরে গিয়ে কালই লেখাপড়া হবে।"

"যেমন আজ্ঞে করেন।"—পরদিন ভট্টাচার্য্য সদরে রাইচরণকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া দলিল রেজিস্টারি করাইয়া লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।। নূতন শাস্ত্র

গ্রামে ফিরিয়া রাইচরণ নিজের সামান্য জিনিষপত্র—আর তাঁতখানি, নীলুবাগের বাড়ীতে উঠাইয়া আনিল। সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিশ্রুতি অনুসারে, তাঁতশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কি করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইল।

সে দিন সন্ধ্যার পর রোয়াকের উপর বসিয়া রাইচরণ ধূমপান করিতেছিল, এমন সময় একজন ভদ্রবেশধারী যুবক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বন্দেমাতরম্।" তাহাব অঙ্গে কামিজের উপর ছিটের কোট, গলায় ময়লা রেশমী চাদর, পরিধানে মোটা ধুতি, পায়ে কানপুরের বুটজুতা।

রাইচরণের হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। অবাক হইয়া সে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিল।

যুবক বলিল—"কিন্তু বন্ধু চিনতে পারলে না? পাঁচ হাজার টাকা পাইয়ে দিলাম, এরি মধ্যে ভুলে গেলে?"—গলার স্বর চিনিয়া রাইচরণ বলিল—"কে, সন্ন্যাসী ঠাকুর?"

যুবক হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সেদিন সন্ন্যাসী ঠাকুরই ছিলাম বটে—আজ ইয়াং বেঙ্গল। যখন যেমন তখন তেমন।"—রাইচরণ বিস্ময়ে দিশাহারা হইয়া বলিল—আসুন আসুন উপরে আসুন। বসতে আজ্ঞা হোক্।"

যুবক বসিলে রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"বাবার আজ এ বেশ কেন?"

যুবক বলিল—"এই আমার সাধারণ প্রতিদিনকার বেশ। সেবার গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতে বেরিয়েছিলাম, তাই সন্ন্যাসীর বেশে এসেছিলাম।"

রাইচরণ কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। সংশয়ের সহিত বলিল—"আজ কি মনে করে আগমন?"

"আজ দেখতে এলাম তুমি ভট্‌চায্যি বুড়োর টাকাগুলো নিয়ে কি করছ। এখনও ত তাঁতটাত কিছুই বসাতে আরম্ভ করনি দেখছি। আর দেরী করছ কেন? সমুখে পুজো—বিস্তর দেশী কাপড় বিক্রী হবে। ভগবানের ইচ্ছায় এবার পুজোতে বিদেশী কাপড় খুব কম লোকেই কিনবে। তাঁত চালাও—তাঁত চালাও। নইলে কেমন করে তাঁদের উন্নতি করবে? এবার স্বদেশীর জয়জয়কার।"—রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি—কি—তবে সন্ন্যাসী নন?"

"না গো কর্ত্তা, সন্ন্যাসী কেন হতে যাব? বালাই ষাট!"

রাইচরণের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। ভয়ে ভয়ে বলিল—"আচ্ছা, আপনি যদি সন্ন্যাসী নন, তবে আমায় পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ালেন কি করে? আমার সেই ভিটেটুকু, যার দাম একশো টাকাও হবে না—তার জন্যে ভট্‌চায্যি যে পাঁচ হাজার টাকা আমায় দিলে—আপনি কি করে তাকে এ মতি দেওয়ালেন?"

যুবক হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"আমি মতি দেওয়াইনি। লোভ নামক যে একটি ভূত আছে, সেই ভট্‌চায্যির ঘাড়ে চেপে মতি দিইয়েছে।"

"রাইচরণ শিহরিয়া বলিল—"ভূত?"

"ভয় পেও না, ভয় পেও না। রাত্রে, অন্ধকারে, পুকুরপাড়ে যে ভূত বেড়ায়, খোনা খোনা কথা কয়, সে ভূত নয়। রূপক বুঝতে পার না হে? আচ্ছা তোমায় তবে খুলেই বলি শোন। সে দিন তোমার স্ত্রী একটা সোনার মাদুলী বেচে এসেছিল মনে আছে?"

"আছে।"

"তার ভিতবে একখানা ভূর্জ্জপত্র ছিল—স্যাকরা ফিরিয়ে দিয়েছিল—তোমার স্ত্রী আমায় সেটা দেখতে দিয়েছিল, মনে আছে?" "হ্যাঁ, তা দিয়েছিল বটে।"

"তোমাদের দুঃখ দেখে, আর ভট্‌চায্যি তোমাদের অমন করে ঠকিয়ে ঠকিয়ে সর্ব্বস্বটা নিয়েছে শুনে, আমার মনে হল বেটাকে জব্দ করতে হচ্ছে। তোমরা শুতে গেলে, সেই ভূর্জ্জপত্রখানা খুলে দেখলাম—কোন্ কালের কি মন্ত্র আলতা দিয়া লেখা ছিল—কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। আমি সেই ভূর্জ্জপত্রে তখন কালো কালি দিয়ে লিখলাম—'আমার বংশাবলীর মধ্যে যদি কাহারও কখনও অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, সে যেন আমার বসত বাটীর পূজার ঘরের ঈশান কোণ খনন করিয়া দেখে, সেখানে সাত ঘড়া মোহর পোঁতা রহিল।' এই লিখে, ভূর্জ্জপত্রখানি গুটিয়ে রেখে দিলাম। ভোরবেলায় চলে যাবার আগে তাঁতিনীকে যা বলে গিয়েছিলাম তা ত তুমি স্বকর্ণেই শুনেছ।"—এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাইচরণ একমিনিট কাল নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল—"তা হলে কাজটা ত ভাল হয়নি বাবুমশায়!"

"কেন, মন্দটা কি হয়েছে?"

"ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ! সে যে মহাপাপ।"

যুবা আবার হাসিতে লাগিল। বলিল—"ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্বটা এসেছিল কোথা থেকে? দুনিয়ার গরীব অসহায় লোককে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা করেছিল, এ কথা ত তোমরাই বলেছ। সে টাকা গ্রহণে কিছুমাত্র দোষ নেই।"—রাইচরণ বলিল—"বাবু আমি শুনেছি, যে পাপ করবে, ভগবান তাকে সাজা দেবেন। ভট্‌চার্য্যি যদি আমার সর্ব্বনাশ করে থাকেন, সে বিচার করবার জন্যে ভগবান রয়েছেন। তুমি আমি তাকে সাজা দেবার কে বাবা?"

যুবক বলিল—"ভগবান কি নিজের হাতে কিছু করেন? মানুষের হাত দিয়েই করান।

সে অপরের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করে ধন সংগ্রহ করে, তার ধন হরণ করায় কিছুমাত্র পাপ নেই, বরং সৎকাজে লাগালে পুণ্য আছে। এই আনন্দমঠের শিক্ষা, বর্ত্তমান যুগের নূতন শাস্ত্র।"

"বাবুমশায়, যদিও আমি শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়িনি, তবে একবার বোসেদের বাড়ীতে ভাগবত হয়েছিল, সেখানে শুনেছিলাম পবের জিনিষ অপহরণ হিন্দুর পক্ষে ভয়ানক পাপ—তা করলে নরকে যেতে হয়।"

যুবক অধীর হইয়া বলিল—"নরক? ড্যাম ইওর নরক। ও সব কুসংস্কার। আজ আমার বেশীক্ষণ বসবার সময় নেই। আর একদিন এসে এ সব কথা তোমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেব। এখন তাড়াতাড়ি তাঁতগুলো খোলবার বন্দোবস্ত কর। আর দেরী কোরো না। এবার যেদিন আসব, সেদিন দেখতে চাই যে সমস্ত তাঁত হু হু শব্দে চলছে। আর মনে আছে ত? ঠিক পড় চবে না? লাভ নেবে সে কড়ারে ত তোমায় টাকা দেওয়া হয়নি।"

"আজ্ঞে তা আমি বলিনি। তাঁত-টাত আমি খুলব না। আমি ও টাকা ভট্‌চার্য্যিকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।"

যুবক বলিল—"অ্যাঁ! ফিরিয়ে দেবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সব টাকা?"

"সব টাকা। একটি কানা কড়িও আমি রাখব না।" রাইচরণের স্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

রাইচরণ হাসিয়া বলিল—"খাবার ভাবনা কি বাবু? জীব দিয়েছেন যিনি আহাব দেবেন তিনি। গাছের পাতা খেয়ে থাকব সেই ভাল, তবু অধর্ম্মের কড়ি খাব না। দেখুন, আর-জন্মে কত পাপ করেছিলাম, তাই এ জন্মে এত কষ্ট পাচ্ছি। আবার এ জন্মে যদি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করি, তা হলে আর-জন্মে কুকুব শেয়াল হয়ে জন্মাতে হবে যে!"

ক্রোধকম্পিত স্বরে, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কবিয়া চীৎকার করিয়া যুবক বলিল—"ফিবে দেবে?"

"হ্যাঁ বাবু—কাল সকালবেলাই গিয়ে সমস্ত টাকা ভট্‌চায্যিকে ফিবে দিয়ে আসব।"

"মূর্খ—নরাধম—দেশদ্রোহী"—বলিয়া সবুট পদাঘাতে রাইচরণকে ধরাশায়ী কবিয়া, যুবা রজনীর অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

এই নগণ্য নিরক্ষর তাঁতিকেই নিজ প্রিয় সন্তান জ্ঞানে ভারতমাতা বক্ষে ধারণ করিলেন।

[মানসী, আশ্বিন ১৩১৮]

সতীদাহ

(সত্য ঘটনা)

হিন্দুধর্ম-বিহিত বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার স্বেচ্ছাকৃত আত্মজীবন-বিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার।

এই ভয়ঙ্কর প্রথাটি যে অতি প্রাচীন, তাহা ডাইওডোরস লিখিত গ্রন্থেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"অ্যান্টিগোনস ও ইউমিনিস যখন পরস্পরেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন একদিন ইউমিনিস, অ্যান্টিগোনসের নিকট নিজ সৈন্যের মৃতদেহগুলি সৎকার করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটি অদ্ভুত কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। মৃতের মধ্যে একজন ভারতীয় সৈনিক ছিল, তাহার দুই স্ত্রী,—উভয়েই স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। কনিষ্ঠা স্ত্রীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিল। বিধবার বাঁচিয়া থাকা ভারতীয় শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হইলে আমরণ তাহাকে নিন্দিত ও অপমানিত জীবন যাপন কবিতে হয়। সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না, কোনও প্রকার ধর্ম্মোৎসবে যোগদানও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে এক স্ত্রী পুড়িয়া মরিবার কথাই আছে, এ ক্ষেত্রে দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। উভয়েই সে সম্মান দাবী করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। একজন বলিল—'আমি জ্যেষ্ঠা, আমিই এ গৌরবের ন্যায্য অধিকারিণী।' কনিষ্ঠা কহিল—'তুমি অন্তঃসত্ত্বা, শাস্ত্রানুসারে তোমার পুড়িয়া মরা নিষিদ্ধ।' অবশেষে কনিষ্ঠারই জয় হইল। জ্যেষ্ঠা তখন নিজ পরিধেয় বসন ও মস্তকের কেশ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল—যেন তাহাব কতই না দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। কনিষ্ঠা সানন্দে বিবাহোচিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সগর্ব্বে দাহস্থানে উপনীত হইল। নিজ বসনভূষণ সখিগণকে বিতরণ কবিযা, সকলেব নিকট শেষ বিদায় লইয়া, অবিচলিত পদক্ষেপে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষসূচক চীৎকার ও হরিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ কবিতে লাগিল।

যে পরিবারে কেহ "সতী" হয়, সমাজের মধ্যে সে পরিবারের যশের সীমা থাকে না। যে ব্রাহ্মণ এ ব্যাপারে পৌবোহিত্য করেন, তাঁহাব নাম ও দক্ষিণা দুই-ই বাড়িয়া যায়। এমন কি দেশীয় বাজপুরুষ জাঁকজমকের সহিত সতীদাহস্থানে আসিয়া দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হন।

বিধবারা শুধু সাময়িক কৃত্রিম উত্তেজনার বসেই এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সন্দেহ নাই। তবে সব সমযে একথা খাটে না। মেজর কার্ণাক বারোদারাজ্যে রেসিডেন্ট থাকার সময নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

বরোদা-নিবাসী একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়ব-রাজ দৌলৎ রাও সিন্ধিয়াব অধীনে কারকুণেব কর্ম্ম করিতেন। ১৮১৫ সালে তাঁহার পত্নী (ববোদায়) এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্বামীব মৃত্যু হইয়াছে। স্বপ্ন দর্শন করিয়া কয়েকদিন অবধি তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

একদিন কূপ হইতে জলের কলসী মাথায় করিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। গলার হারই সে দেশে সধবার চিহ্ন, সেটি তিনি কলসীর গলায় বাখিয়া আনিতেছিলেন। হঠাৎ একটা কাক পড়িয়া কলসীর গলা হইতে সেই হার মুখে লইয়া উড়িয়া পলাইল। এইরূপ দুর্নিম্মিত্ত ঘটায় ভয়ে ও চিন্তায় ব্রাহ্মণকন্যা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কলসী সেখানেই আছাড়িয়া ফেলিয়া গৃহে আসিয়া বলিলেন, "আমি সতী হইব।"

রেসিডেন্ট সাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র, সেই ব্রাহ্মণগৃহে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক বুঝাইলেন, এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সাহেব তখন বরোদা মহারাজের নিকট গিয়া সমুদয় বিবরণ কহিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে মহারাজও স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এমন সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেন তুমি অকারণে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছ? যদি সত্য সত্যই তোমার স্বামী মরিয়া থাকেন, তুমি যাবজ্জীবন রাজসরকার হইতে খোরপোষ পাইবে, তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের উপর আর যাহার যাহার অশনবসন নির্ভর করিত, সকলকেই আমি প্রতিপালন করিব, তুমি ও সংকল্প পরিত্যাগ কর।" কিন্তু তথাপি তিনি অটল রহিলেন। মহারাজ তখন নিজ সিপাহীগণকে আদেশ দিয়া আসিলেন—"তোমরা এ বাড়ীর চারিদিকে অষ্টপ্রহর পাহারা দাও, সাবধান যেন কোনওক্রমে স্ত্রীলোকটি বাহিরে না যাইতে পারে।"

মহারাজ প্রস্থান করিলে, সিপাহীগণকে ব্রাহ্মণকন্যা অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন—"কেন তোমরা আমায় আটকাইয়া রাখিয়াছ, ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু সিপাহীরা রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না। অবশেষে স্ত্রীলোকটি একখানা ছোরা আনিয়া সিপাহীদিগকে বলিলেন—"তোমরা যদি আমায় ছাড়িয়া না দাও, এই ছোরা আমি নিজের বুকে মারিব। ব্রহ্মরক্তপাতে তোমাদের রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।"—তখন ভয়ে সিপাহীরা পথ ছাড়িয়া দিল।

রমণী তখন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলে আসিয়া পৌঁছিল। চিতা রচিত হইল। স্বামীব একটি অন্নগঠিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, সেটি চিতায় স্থাপন করিয়া, রমণী স্নানাদি সমাপন করিলেন। তাহার পর অবিকম্পিত পদে, চিতায় উঠিয়া অন্নমূর্ত্তি-স্বামীর পদতলে উপবেশন করিলেন। তাহার পর, চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে, স্ত্রীলোকটির স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসিল, লোকে হিসাব করিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণের মৃত্যুর সময়টি, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর স্বপ্নদর্শন সময়ের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ, ১৩২৩]

বিলাত-ফেরতের বিপদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভা মেয়েটিকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, তবে মুখ-চক্ষুর গঠন অনিন্দ্যনীয়। আর, সে গঠনে বেশ একটা কমনীয় ভাব আছে। বয়সে অষ্টাদশ বৎসর? তাহার পিতা বাবু অতুলচন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম, বর্ত্তমান সময়ে আলিপুরের সবজজ। ভবানীপুর বকুলবাগান গলিতে তাঁহার বসতবাটী।

চারি বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রভা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধুগণ সে সময় সকলেই মনে করিয়াছিলেন, সুপ্রভা এইবার বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হইবে এবং ক্রমে ক্রমে বি-এ, এম-এ পাস করিবে। কিন্তু তাহার পিতা বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র, উহাতে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা হয় না, উল্টা স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। তাঁহার মত এই যে, 'হোমষ্টাডি'ই আসল ষ্টাডি—সুতরাং তিনি কন্যাকে কলেজে দিলেন না। লোকে পরোক্ষে বলিল, রায় মহাশয় ব্যয়বাহুল্যভয়েই এই অপকর্ম্মটি করিলেন। যাহা হউক, সুপ্রভা এই চারি বৎসর ঘরে বসিয়া অনেক ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে—যদিও তাহার পনেরো আনা অংশ উপন্যাস।

পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা বলিয়া সুপ্রভা বড় অভিমানী। তাহার একটি কুকুর আছে, সেটির নাম বিমলারাণী বা সংক্ষেপে বিমি। সুপ্রভা তাহার সহিত এমনভাবে কথাবার্ত্তা করে, যেন সে মানবী। তাহার সমস্ত মনের কথা বিমির সহিত। সুপ্রভা মনে করে, আন্যান্য পশুপক্ষীর ন্যায় বিমিও অন্তর্যামী—তবে কথা কহিতে পারে না এই যা।

আসল কথাটাই এখনও বলা হয় নাই। নব্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত সুপ্রভার বিবাহ। বৎসর দুই তিন হইল প্রকাশ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে এবং ইতিমধ্যে তাহার কিছু 'প্র্যাকটিস'ও জমিয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের নিকট, প্রকাশ চেম্বার ভাড়া লইয়াছে। সেইখানেই তাহার আফিস, সেইখানেই বাসস্থান।

অপরাহ্নকাল। দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে, পিয়ানোর নিকট বসিয়া সুপ্রভা একটি নূতন সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছিল। তাহার মা আজ সন্ধ্যার সময় প্রকাশকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রকাশ আসিলে সুপ্রভা আজ এই গানটি গাহিবে। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রণে এবং অনিমন্ত্রণে প্রকাশ প্রায়ই আসে। একমাস পরে শুভবিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বালিগঞ্জে একটি ছোট বাড়ীও ঠিক হইয়াছে, বিবাহ হইলে নবদম্পতি সেইখানে বসতি করিবে।—পিয়ানো বাজিতে লাগিল—গানের মহলা চলিতেছে। শ্রোতা, একমাত্র বিমি। পশ্চাতের দুই পদের উপর উচ্চ হইয়া [illegible] উর্দ্ধকর্ণে, নিপুণ সমালোচকের মত বিমি গান শুনিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার কান দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মানবভাষায় এ কর্ণকম্পনের অনুবাদ সম্ভবতঃ—"বাঃ, কি চমৎকার।' —এমন সময় বহিরঙ্গণে একখানি গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ উঠিল।

এক মিনিট পরে সোনার চশমাধারিণী, ত্রিংশবর্ষীয়া একজন মহিলা, মরক্কো চামড়ার একটি ছোট পেগি ব্যাগ হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুপ্রভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে বলিল—"মিস্ মল্লিক, আসুন আসুন। অনেক দিন পরে যে!"

বিমি তাহাকে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল। সঙ্গীতে বাধা পড়িল বলিয়াই তাহার রাগ, অথবা অন্তর্যামী হওয়াতে অন্য কোনও বার তাহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, বলা যায় না।—কুকুরের গায়ে এক থাবড়া মারিয়া সুপ্রভা বলিল—"কি অভদ্র তুই! চুপ কর্।"

মিস্ মল্লিক মুখখানি গম্ভীর ও বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন—"মা কোথা?"

"ভিতরে আছেন। মল্লিক তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিলেন—"তুই আসিস্ নে। মিসেস রায়ের সঙ্গে আমার কথা আছে।"

তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সুপ্রভা শঙ্কিত হইল। বলিল—"কেন, কি হয়েছে?"—মিস্ মল্লিক উত্তর না করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সুপ্রভা কুকুরের মুখখানি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"বিমি, কি হয়েছে রে? আমাকে যেতে দিলে না কেন? কি কথা? আমার বিষয় কোন কথা নাকি? যদি তাই হয় তবে ন্যাজ নাড়, নয় ত ন্যাজ নাড়িস্‌নে।"

বিমি আদরে গলিয়া গিয়া, সোফার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। সম্মুখের পদদ্বয় দিয়া সুপ্রভার হাতখানি আটকাইয়া, তাহার সুকুমার অঙ্গুলিগুলিতে মৃদু মৃদু দংশন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার লাঙ্গুল আন্দোলিত হইয়া সোফার উপর বিচিত্র চট্‌পটাধ্বনি সৃজন করিল।

"তুই ত সব জানিস্—কখ্‌খনো নয়—বলিতে বলিতে সুপ্রভা কুকুরকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। তাহাতে বিমলারাণীর লাঙ্গুলান্দোলন কিছু মাত্র হ্রাস হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভিতরে একটি শয়নকক্ষের খোলা জানালার কাছে সুপ্রভার মাতা চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, দাসী তাঁহার আলুলায়িত কেশদাম হস্তে লইয়া তাহার মধ্যে চিরুণী সঞ্চালন করিতেছিল। পার্শ্বে মর্ম্মরমণ্ডিত একখানি ছোট গোল টেবিলের উপর এক শিশি সুগন্ধি তৈল রক্ষিত। প্রবেশদ্বারে পর্দ্দা ফেলা ছিল; বাহিরে দাঁড়াইয়া মিস্ মল্লিক বলিলেন—"আসতে পারি?"

কণ্ঠস্বর চিনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"কে, সরযূ? এস।"

মিস্ মল্লিক প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া কাছে বসিলেন।

"তার পর সরযূ, অনেক দিন এদিকে আসনি যে! সব খবর ভাল ত?"

অন্যদিকে চাহিয়া বিষণ্ণ স্বরে মিস্ মল্লিক বলিলেন—"ভাল নয়।"

"কেন, কি হয়েছে?—সরযূ মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া, ইংরাজিতে বলিলেন—"আপনার দাসীকে অন্যত্র যাইতে বলুন।"—আজ্ঞানুসারে দাসী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গৃহিণী তখন বলিলেন—"কি হয়েছে সরযূ? ব্যাপার কি?"

"সুপ্রভার সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে কি স্থির?"

"স্থির বইকি। একমাস পরে দিন স্থির হয়েছে। কেন বল দেখি?"—গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শঙ্কাকুল।—ব্যাগের কোমল হাতলটি অঙ্গুলির দ্বারা মুচড়াইতে মুচড়াইতে সরযূ বলিলেন—"বড় খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছি, মিসেস রায়। আমায় মাফ্ করবেন। এ বিয়ে হতে পারে না—ভেঙ্গে দিতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া গৃহিণীর মুখ শুকাইয়া গেল। কম্পিত স্বরে বলিলেন—"বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে? কি সর্ব্বনাশ! কেন, কি হয়েছে?"—মুখখানি নত করিয়া মিস মল্লিক ধীরে ধীরে বলিলেন—"প্রকাশ বিলাতে বিয়ে করে এসেছে।"

"প্রকাশ বিয়ে করে এসেছে!" "বল কি!—তাও কি হতে পারে? অসম্ভব! প্রকাশকে আমরা বরাবর বেশ ভাল, ধার্ম্মিক ছেলে বলেই জানি; সে কি আমাদের এমন করে ঠকাবে? না না—একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই কোন শত্রুতে এ কথা রটনা করেছে। কে বলেছে বল ত?"

"কেউ বলেনি মিসেস রায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজেই আবিষ্কার করেছি।"

"আবিষ্কার করেছ!—তুমি কি করে আবিষ্কার করলে?"

সরযূ তখন ধীরে ধীরে পেগি ব্যাগটি খুলিয়া, একখানি চিঠি বাহির করিয়া মিসেস

রায়ের হস্তে দিলেন।—খামখানির উপরিভাগে মোটা অক্ষরে লেখা আছে—"উইলিয়ম হোয়াইট্‌লি লিমিটেড।" তাহার নিম্নে একটা মোটা কসি। মধ্যস্থলে টাইপ্‌রাইটিং অক্ষরে লেখা আছে—

মিসেস পি, সি চৌধুরী
১২৬ অ্যাড্‌লেড্‌ রোড, হ্যাম্পষ্টেড্‌।

যথাস্থানে একখানি লাল পেনিষ্ট্যাম্প আছে—তাহাতে পোষ্টাফিসের ছাপ।

কম্পিত হস্তে গৃহিণী খাম হইতে পত্রখানি মোচন করিলেন। ভিতরে ছাপা ও টাইপরাইটিং অক্ষরে লেখা যাহা ছিল তাহার অবিকল অনুবাদ এই—

উইলিয়ম হোয়াইট্‌লি লিমিটেড্‌
ধোপা বিভাগ।

ওয়েষ্টবোর্ণ গ্রোভ
লণ্ডন।
২৬শে জানুয়ারী, ১৯০৮

প্রিয় মহাশয়া,

আপনার কল্যকার তারিখের পত্রের উত্তরে আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার একখানি রুমাল অনবধানতাবশতঃ গতবারে ধোলাই কাপড়ের সঙ্গে পাঠান হয় নাই। এ সপ্তাহের কাপড়ের সঙ্গে সেখানি যাইবে। আশা করি ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার বিশ্বস্তভাবে
উইলিয়ম হোয়াইট্‌লি লিমিটেড্‌

মিসেস পি, সি, চৌধুরী
১২৬ অ্যাড্‌লেড্‌ রোড,
হ্যাম্পষ্টেড্‌।

পত্রখানি দুইবার পড়িয়া, গৃহিণী বলিলেন—"এ কোন্‌ পি, সি, চৌধুরী? এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?"

"আমার ভাই প্রকাশের চেম্বার থেকে আমার পড়বার জন্যে একখানা উপন্যাস চেয়ে এনেছিল। সেই বইয়ের মধ্যে এ চিঠি পেয়েছি।"

শুনিয়া মিসেস রায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। সরযূ বলিতে লাগিলেন—

"কাল বিকেলে বইখানা এনে দিয়েছিল। কাল আর দেখবার অবসর পাইনি। আজ দুপুরবেলা বই খুলে দেখি, এই চিঠি তার মধ্যে, শিরোনামা পড়েই চমকে গেলাম। ভাবলাম, কি ভয়ানক!—বিলাতে একজন মিসেস পি, সি, চৌধুরী ছিল? প্রথম মনে হল, শিরোনামায় হয় ত ভুলে মিসেস লিখেছে—চিঠি খুলে পড়লেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে যাবে। আবার ভাবলুম ভুলই হোক যাই হোক, পরের চিঠি পড়বার আমার অধিকার কি? তখন আমার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—'প্রকাশের সঙ্গে সুপ্রভার যখন বিয়ের কথা হয়েছে, তখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার অধিকার তোমার আছে।'—ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। যদি বাস্তবিকই প্রকাশ বিলাতে বিয়ে করে এসে থাকে, তবে সুপ্রভার সঙ্গে ত তার কোন মতেই বিয়ে হতে পারে না। যদি সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এসেও থাকে, তা হলেও নয়; কারণ ব্রাহ্মসমাজে দ্বৈতবিবাহের পাপ প্রবেশ করবে, এ ত কোন মতেই হ'তে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং এ চিঠি দেখা, শুধু আমার অধিকার নয়—কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমাজের কাছে, ধর্ম্মের কাছে এর জন্যে আমি দায়ী। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে চিঠিখানা খুলে পড়লাম। সন্দেহ ঘুচে গেল। লিখতে ভুল একবার হতে পারে—তিন তিনবার ভুল হয় না। ভিতরেও রয়েছে মিসেস—আবার প্রিয় মহাশয়া।"

গৃহিণী কষ্টে কথা কহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি যা বলছ, যদি তাই হত তাহলে সে

স্ত্রীলোকের যেটা নিজের নাম, যেমন, নেলি কি জেসি, তাই থাকত। মিসেস পি, সি, লিখলে কেন?"

"সধবা স্ত্রীলোককে স্বামীর নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে লেখাই নিয়ম। মিসেস নেলি চৌধুরী লিখলে বোঝাত যে সে বিধবা স্ত্রীলোক।"

"কেন, আমাদের দেশে মিসেস সরোজিনী গুপ্ত, মিসেস প্রভাবতী ঘোষ এ রকম ত লেখে। তারা ত সধবা।"

সরযূ বিজ্ঞভাবে বলিলেন—"ও রকম লেখা ভুল। আমি বাবার কাছে শুনেছি।"—সরযূর পিতা একজন বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার—সুতরাং আর কথা চলিল না।

গৃহিণী একটি গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই। মেয়ের জন্যে মনের মতন পাত্র পাওয়া আমাদের সমাজে কত শক্ত তা ত দেখছ। আশা করেছিলাম, সুপ্রভার একটা ব্যবস্থা হল—কিন্তু সবই পণ্ড হয়ে গেল।"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া সরযূ উঠিয়া বলিলেন—"আমি এখন আসি। চিঠিখানা রেখে যাব কি?"

"রাখ।"

সরযূ চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিলেন। গৃহিণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ কথা আর কাউকে বলেছ কি?"

"না, এখনও বলিনি।"—সরযূর হাত দুটি ধরিয়া গৃহিণী বলিলেন—"দেখ, এখন আর কারু কাছে এ কথা প্রকাশ কোরো না।"

"বেশ। আমি কাউকে বলব না। আমার যা কর্ত্তব্য আমি তা করলাম, এখন আপনাদেব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনারা বিবেচনা করুন। তবে একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশের এক বিবাহ সত্ত্বেও, সে স্ত্রীকে ত ত্যাগই করেছে, সে সব চুকে গেছে এই মনে করে যদি তার সঙ্গে সুপ্রভার বিবাহ দেবার চেষ্টা করেন, তা হলে এ কথা আমায় প্রকাশ করতেই হবে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ আমি কোন মতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেব না—বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়। নমস্কার।"—বলিয়া মি মল্লিক প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই সুপ্রভা আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল, জননী কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নিস্পন্দভাবে বসিয়া। তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে ক্রোধ, ঘৃণা ও বিরক্তি উছলিয়া পড়িতেছে।

"কি হয়েছে মা?"—বলিয়া সুপ্রভা পার্শ্বস্থিত টেবিল হইতে পত্রখানি উঠাইয়া লইল। ঠিকানা পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"এ কি মা? দেখব?"

"দেখ।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সুপ্রভা বলিল—"এ কি মা?"

মা বলিলেন—"প্রকাশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারবে না। সে বিলাতে বিয়ে করে এসেছে।"—সুপ্রভা পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল, ডাকঘরের ছাপ তারিখ দেখিল। তাহার পর চিঠিখানি সজোরে মেঝের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া, চক্ষে অঞ্চল দিয়া, দ্রুতবেগে নিজ শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একঘণ্টা পরে, অতুলবাবুর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র, সন্তোষচন্দ্রবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন। ইনি একজন নব্য ব্রাহ্ম; নীতি ও ধর্ম্মাচারণ সম্বন্ধে কাহারও তিলমাত্র শিথিলতা দেখিলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং বিশেষ করিয়া বিলাত ফেরত যুবকগণের উপরে একেবারে খড়্গহস্ত।

সন্তোষবাবু আসিয়াই খুল্লতাতপত্নীর শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুপ্রভা কোথা?"

"শুয়ে আছে।"

"এখন শুয়ে? কেন, অসুখ করেছে নাকি?"

"না।"

"তবে ব্যাপার কি কাকীমা? তোমার চেহারাই বা এ রকম হয়ে গেল কেন? কেঁদেছ? তোমার চোখ লাল হয়ে উঠেছে, ফুলেছে।—কি হয়েছে বল ত।"

বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহিণী তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

পত্র পড়িয়া, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া, দুই চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া সন্তোষবাবু বলিতে লাগিলেন—

"আমি ত গোড়া থেকেই জানি, একটা ব্যাঘাত হবেই হবে। তোমরা যে বিলেত-ফেরত বলে একেবারে অজ্ঞান হলে! বিলাত-ফেরতরা কি সহজ লোক? এমন অপকর্ম্ম নেই যা তারা বিলাতে গিয়ে করে না। আর, এখানে ফিরে এসেই বা কি? এক একটি মদের পিপে বল্লেই হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ডক্টর ন্যাগের যে চিত্র এঁকেছেন, তা পড়েও ত লোকের চৈতন্য হল না! আর ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের যে কি রোগ হয়েছে—বিলাত-ফেরত নইলে তাঁদের পছন্দই হয় না। কেন রে বাপু—যারা বিলাত যায়নি তারা কি মানুষ নয়? আসল কথা কি জান? বিলাত-ফেরতের স্ত্রী হলে বেয়ারা খানসামা সবাই মেমসাহেব বলে ডাকবে। মাঠাকরুণ বলে ডাকলে যেন ওঁদের গায়ে জ্বর আসে—একেবারে অসহ্য। তা মেয়েদেরই বা দোষ দেব কি! এ কালের—এ যুগের দোষ। বাহ্য চাকচিক্য দেখেই সকলে মোহিত—ভিতরটায় পদার্থ কিছু আছে কি না, তা কেউ খোঁজ নেয় না। এ চিঠি তোমাদের হাতে পড়ল কি করে?"

"প্রকাশের চেম্বার থেকে একখানা বই কোনও লোক পড়তে নিয়ে যায়। সে বইয়ের মধ্যে চিঠি ছিল। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় সত্যই প্রকাশ বিলেতে বিয়ে করে এসেছে?"

সন্তোষবাবু পত্রখানি আবার পাঠ করিলেন। শেষে বলিলেন—"প্রমাণ ত অকাট্য।"

"আচ্ছা, এও ত হতে পারে, বিলাতে হয়ত বিয়ে করেছিল, সে স্ত্রী মরে গেছে?"

সন্তোষবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"তা যদি হত, তাহা হলে প্রকাশ ও কথা লুকোবে কেন? তা হলে স্পষ্টই বলত, বিলাতে আমি বিবাহ করেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি বিপত্নীক। বেশ বোঝা যাচ্ছে সেখানে বিবাহ করেছিল, তার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। ভেবে দেখেছে, সে স্ত্রীকে এ দেশে নিয়ে এলে লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। একে নতুন ব্যারিষ্টার, পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তিও তেমন কিছু নেই, মেমসাহেব গাউনের বিল শুধতে শুধতেই দেউলে হয়ে যাবে। তাই তাকে ফেলে চলে এসেছে। কত লোক এমন করেছে, শুধুই কি প্রকাশ? রবিবাবুর 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্প পড়নি? প্রকাশ যাকে বিয়ে করেছিল সে হয়ত গরীবের মেয়ে, মিসেস অনাথবন্ধু সরকারের মত সাতসমুদ্র পার হয়ে এসে হাজির হতে পারবে না—তাই সুযোগ বুঝে নিশ্চিন্ত মনে সট্‌কান দিয়েছে। উঃ—কি ভয়ানক কথা! কি বিশ্বাসঘাতকতা। সে হতভাগিনীর এখন উপায় কি হয়েছে তা ভগবানই জানেন। হয়ত দুটি একটি ছেলে মেয়ে সুদ্ধ তাকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে। কি ঘোর অধর্ম্ম!"

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য চা আনিয়া দিল।

সে কক্ষের প্রান্তে, সুপ্রভার শয়নকক্ষের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে বিমি শুইয়াছিল। চা-পানের সময় বিমি প্রতিদিন হাজির থাকে, দুই একখানা বিস্কুট পায়। আজ তাহাকে নিকটে না দেখিয়া সন্তোষবাবু একখানা বিস্কুট হাতে তুলিয়া ডাকিলেন—"বিমে বিমি বিমি।"

বিমি সেইখানে শুইয়া লাঙ্গুল নাড়িল—কিন্তু আসিল না। বিস্কুটের প্রতি তাহার এতাদৃশ ঔদাসিন্য পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

চা-পান করিতে করিতে সন্তোষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাকামশায় এখনও এলেন না?"

গৃহিণী বলিলেন—"আজ তাঁর আসতে দেরী হবে। কাছারীর পর কলকাতায় গেছেন—একটা কি সভা আছে।"—সন্তোষবাবুর চা-পান শেষ হইলে গৃহিণী বলিলেন—"তুমি একটু বস। আমি সুপ্রভাকে দেখি।"

"না কাকীমা—সুপ্রভাকে এখন অনুতাপ করতে দাও—তাতে ওর অনেক উপকার হবে।"

গৃহিণী বলিলেন—"অনুতাপ করবে কেন? ওর কি অপরাধ? আহা বাছা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। আমি গিয়ে ওকে ওঠাই।"—সন্তোষ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি আর বসব না, যাই। কাল এসে কাকামশায়ের সঙ্গে দেখা করব এখন।"

"না সন্তোষ, তুমি বস। আজ আবার একটা ভাবি মুস্কিল হয়েছে। প্রকাশকে ডিনাবে নেমন্তন্ন করেছিলাম, সে হয়ত এখনি এসে পড়বে। আমার যে রকম মনের অবস্থা, আমি তার সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা কইতে পারব না। অন্ততঃ তিনি বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত তুমি থাক। তিনি সাতটার মধ্যেই আসবেন।"

সন্তোষবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"সে নরাধমকে আর এ বাড়ীতে আসতে দেওয়া উচিত কি?"

"আজ সে নিমন্ত্রিত, আজ ত আব তাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যাবে না! তিনি আসুন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে। শেষে ত এ বাড়ী বন্ধ করতেই হবে।"

"কিন্তু কাকীমা, আমি যে তার সঙ্গে বসে মন খুলে গল্পগুজব করতে পারি, এমন বোধ হয় না। হয়ত নিজেকে সামলাতে না পেবে কোন রূঢ় কথা বলে ফেলব।"

"ও প্রসঙ্গ তোমার তোলবার দরকার কি?—না, না—কোন রকম রূঢ়তা তার সঙ্গে কোর না। সেটা অন্যায় হবে। তুমি তার কাছে বসে দু চারটে অন্য কথাবার্ত্তা কইতে থেক, তোমার কাকা আসামাত্র তোমার ছুটি।"—বলিয়া গৃহিণী কন্যার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসব হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর প্রকাশচন্দ্র সিমুলিয়ার ধুতি পরিয়া, আদ্দির গিলাকরা পাঞ্জাবীর উপর রেশমী চাদরের বাহার দিয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল। ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল সন্তোষচন্দ্রবাবু বসিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছেন।

"সন্তোষবাবু যে, নমস্কার"—বলিয়া প্রকাশ তাঁহাকে সস্মিতভাবে অভিবাদন করিল।

সন্তোষবাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"আসুন—আসুন।"—তাঁহার মুখভাব ও কণ্ঠস্বর রাত্রিচর পক্ষীবিশেষের মত গম্ভীর। পুনরায় বসিয়া গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রকাশ ইঁহার প্রকৃতি পূর্ব্বাবধি অবগত ছিল। বলিল—"অত পড়বেন না—অত পড়বেন না—চোখ খারাপ হয়ে যাবে।"—সন্তোষবাবু ভাবিলেন, অভ্যাগত নিকটে বসিয়া থাকিতে গ্রন্থ অধ্যয়ন করাটা ভদ্রতা হইতেছে না। কাকীমার অনুরোধ স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য প্রসন্নতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"পার্কারের বই পড়ছিলেন। বড় ভাল বই। আপনি পড়েছেন?"

সন্তোষবাবুকে একটু রাগাইবার অভিপ্রায়ে নিরীহতার ভান করিয়া প্রকাশ বলিল—"হ্যাঁ পড়েছি বইকি। গিলবার্ট পার্কারের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই আমি পড়েছি। ওখানা কোন্ উপন্যাস?"

সন্তোষবাবু অন্তরে জ্বলিয়া বলিলেন—"উপন্যাস।—উপন্যাস কেন হবে? এ থিওডোরের পার্কারের 'টেন সার্ম্মন্স'—ধর্ম্মগ্রন্থ।"—প্রকাশ বলিল—"ওঃ—না, ও সব পড়িনি।"

সন্তোষবাবু আবার গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষণপরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"বিলেতে থাকতে সেখানকার ধর্ম্মজীবনের দিকটা একটু চর্চা করেছিলেন কি?—পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত, বোধ হয় সময় পাননি?"

"না, পড়াশুনো নিয়ে যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম, তা বলতে পারিনে। তবে মাঝে মাঝে গির্জ্জায় গিয়েছি বটে, তাও প্রায় মেয়েদের রক্ষক (escort) স্বরূপ।"

সন্তোষবাবু মনে মনে বলিলেন—হুঁ! রক্ষকস্বরূপ না ভক্ষকস্বরূপ!" প্রকাশ্যে বলিলেন—"লণ্ডনে সোয়ালো স্ট্রীটে ভয়জী সাহেবের যে থীষ্টিক চার্চ্চ আছে সেখানে কখনো গিয়েছিলেন কি? শুনেছি মাঝে মাঝে ষ্টপফোর্ড ব্রুক সাহেব সেখানে এসে উপদেশ দেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।"

প্রকাশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কোথায় বললেন? সোয়ালো স্ট্রীটে? সোয়ালো স্ট্রীট? কোন্‌খানটা বলুন দেখি? হ্যাঁ—মনে পড়েছে। পিকাডিলিতে একটা সোয়ালো স্ট্রীট আছে বটে। প্যালেসে যেতে আসতে সে স্ট্রীটের মুখটা দেখতে পেতাম—ভিতরে কখনও ঢুকিনি।"

সন্তোষবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"প্যালেসে যেতে আসতে?"

"হ্যাঁ। না, না রাজবাড়ীতে নয়, রাজবাড়ীতে আমার গতিবিধির সুযোগ ছিল না। প্যালেস হচ্ছে একটা মিউজিক হল অর্থাৎ ভ্যারাইটি থিয়েটার আর কি! একবার একটা বড় মজা হয়েছিল। এক লর্ড বিশপের স্ত্রী, সন্ধ্যাবেলা ট্রেন থেকে ষ্টেশনে নেমে, ক্যাব নিয়ে কোচম্যানকে বলেছিলেন প্যালেসে নিয়ে চল। তিনি অবশ্য রাজপ্রাসাদ—বাকিংহাম প্যালেসে যাবেন। ক্যাবি করেছে কি, তাঁকে সোজা একেবারে প্যালেস মিউজিক হলে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত। মহিলাটি ত একেবারে বজ্রাহত—মূর্ছা যান আর কি!"

"কেন, বজ্রাহত কেন?"

প্রকাশ দুষ্টামির হাসি হাসিয়া চক্ষু দুইটি মিট মিট করিয়া বলিল—"মিউজিক হল্ জিনিষটে একটু—ওর নাম কি—ইয়ে কি না—not quite the proper thing you know"—বলিয়া প্রকাশ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

শুনিয়া সন্তোষবাবুও অর্দ্ধ বজ্রাহত হইলেন। ভাবিলেন—"আমাদের যুবকেরা বিলাতে গিয়ে বিবেকবুদ্ধি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে বসে দেখছি। সে স্থানে যেতেন তা আবার জাঁক করে বলছেন। কাকামশায় এখনও এলেন না—কতক্ষণ এই অকালকুষ্মাণ্ডটার সঙ্গে বসে কথা কইবার কর্ম্মভোগ আমায় করতে হবে জানিনে। আমার যে অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

বাড়ীর কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত না দেখিতে পাইয়া প্রকাশচন্দ্র একটু অধীর হইতেছিল। অন্য সময় সে যখন আসিত, প্রায়ই দশ পনেরো মিনিট এক কক্ষে সুপ্রভাকে একাকিনী পাইত—পরে তাহার মা প্রভৃতি আসিতেন। প্রকাশ ভাবিতেছিল, আজ ভাল এক আপদ আসিয়া জুটিয়াছে। পর্দ্দার অন্তরালে ভিতর দিকে শব্দমাত্রে প্রকাশ চমকিয়া উঠিতেছিল। তাহার সতৃষ্ণ চক্ষু বারবার পর্দ্দার পানে আকৃষ্ট হইতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সন্তোষবাবু বলিলেন—"লণ্ডনে আপনি কোথায় থাকতেন?"

"অ্যাড্‌লেড্ রোড, হ্যাম্পষ্টেড্।"

"বাড়ী ভাড়া করেছিলেন?"

"না, অত টাকা কোথা?"

"তবে কি হোটেলে?"

"হোটেলেও নয়—সে ত আরও ব্যয়সাধ্য। আমি রুম্‌স্ নিয়ে ছিলাম। ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে বন্দোবস্ত।"

"মেসের বাসার মতন বুঝি সেখানে শুধু পুরুষেরাই থাকে, না স্ত্রীলোকও থাকতে পায়?"

"দুইই। গরীব অবস্থার অনেক বিবাহিত ব্যক্তি, যারা আলাদা বাড়ী ভাড়া করে খরচ কুলোতে পারে না, তারাও রুম্‌স্ নিয়ে থাকে। একটি শোবার ঘর একটি বসবার ঘর নিলে কাজ চলে গেল।"

"আপনি ক'টি ঘর নিয়েছিলেন?"

"দুটি। একটি শোবার একটি বসবার।"

সন্তোষবাবু মনে মনে বলিলেন—"হুঁ! একলা মানুষ, দুটো ঘরের প্রয়োজন কি? শোবার ঘরে কি বসা যায় না?"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "বরাবরই কি হ্যাম্পস্টেডে থাকতেন?"

"না।—প্রথম বছরখানেক প্রিন্সেস স্কোয়ারে রুম্‌স্ নিয়ে থাকতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্যারিসে বেড়াতে গেলাম—সেখানে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। ফিরে এসে হ্যাম্পস্টেডে যাই। ও দিকটা সহরতলী কিনা, খরচপত্র একটু সস্তা।"—সন্তোষবাবু স্বগত উক্তি করিলেন—"হু! প্রিন্সেস স্কোয়ারে থাকতেই বিবাহ করা হয়েছিল—প্যারিসে গিয়ে 'হনিমুন'—ফিরে এসে ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজন হল।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"থিয়েটারে প্রায়ই যেতেন বুঝি?"

"প্রথম বছরখানেক খুবই যেতাম। তার পর হ্যাম্পস্টেডে গিয়ে, ঘন ঘন যাওয়া আর হয়ে উঠত না। অনেকটা দূর কিনা। তবে মাঝে মাঝে, কোন ভাল নাটকের অভিনয় হলে যাওয়া যেত।"—সন্তোষবাবু মনে মনে বলিলেন—"হু! শুধু দূর বলে নয়। আগে একখানা টিকিট কিনলেই হত, এখন যে দুখানা করে লাগবে। এ ত আর নিরীহ বাঙ্গালীর মেয়ে নয়, যে এক ধমক খেয়ে চুপ করে রান্নাঘরের কোণে বসে থাকবে, আর স্বামী মশায় আমোদ করে বেড়াবেন! এ বিলাতী মেমসাহেব, শক্ত ঘানি।"

প্রকাশ আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীর কাউকে দেখছিনে যে?"

সন্তোষবাবু বলিলেন—"কাকামশায় কাছারী থেকে কলকাতায় গেছেন—সেখানে কি একটা সভা আছে, সুপ্রভা শুয়ে আছে, কাকীমাও বোধ হয় তার কাছে।"

প্রকাশ সঙ্কিত হয়ে বলিল—"সুপ্রভা শুয়ে আছেন? কেন? তাঁর কি অসুখ করেছে নাকি?"

"না।"

"তবে শুয়ে কেন?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না"—বলিয়া সন্তোষবাবু আবার গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন।

প্রকাশ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুপ্রভা এমন অসময়ে শয়ন করিয়া, অথচ শারীরিক অসুস্থতার জন্য নহে—কারণ কি তাহাও সন্তোষবাবু বলিতে অসম্মত। এতদিন যাতায়াত করিতেছে, আর কখনও ত এমন হয় নাই। হইল কি?

এমন সময় অঙ্গনে গাড়ীর শব্দ হইল। সন্তোষবাবু বলিলেন—"কাকামশাই এলেন বোধ হয়।'—কাছারীর বেশে অতুলবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন—"প্রকাশ যে! কতক্ষণ এলে? সন্তোষ এসেছ? বস বস"—ইত্যাদি প্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিয়া অতুলবাবু প্রকাশের নিকট বলিলেন। সভাতে কি হইয়াছিল, তাহারই গল্প করিতে লাগিলেন। সন্তোষবাবু ছুটি পাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভার শয়নকক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কামরা আছে সেইটি তাহার নিজস্ব বসিবার ও পড়িবার ঘর। এই কক্ষে মিসেস রায় একটি সোফার প্রান্তভাগে বসিয়া ছিলেন—সুপ্রভা তাঁহার কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিয়া ছিল। মা আদর করিয়া কন্যার গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন। ঝিমি মেঝের কার্পেটের উপর চিন্তিতভাবে বসিয়া একদৃষ্টে সুপ্রভার মুখের পানে চাহিয়া ছিল।

সুপ্রভা বলিতেছিল, আর এখানে একদণ্ড তার মন টিকিতেছে না—কল্য প্রভাতের গাড়ীতেই সে হয় মুঙ্গের নহে ত, মধুপুর চলিয়া যাইবে। মুঙ্গেরে তাহার দাদা এবং মধুপুরে তাহার পিসিমা আছেন।

মা বলিতেছিলেন, উনি বাড়ী আসুন, পরে পরামর্শ করিয়া যা হয় করা যাইবে। এত উতলা হইলে চলিবে কেন? যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহার সঙ্গে বিবাহ হইল না ইহাতে আর দুঃখ কি? বরং সময় থাকিতে জানিতে পারা গিয়াছে সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।—মা কন্যাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি কন্যাব অশ্রুবর্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছিল না। অঞ্চলাগ্রে দিয়া তিনি কন্যার এবং নিজেও অশ্রু মুছিয়া শেষ করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় বাহিরে দাঁড়াইয়া সন্তোষবাবু বলিলেন—"কাকীমা আসতে পারি?"

সুপ্রভা উঠিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিল। সন্তোষবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"সুপ্রভা কেমন আছে?"—গৃহিণী বলিলেন—"কাল সকালের গাড়ীতেই ও মুঙ্গের কিম্বা মধুপুর কোথাও চলে যেতে চায়।"

"মুঙ্গের অপেক্ষা বরং মধুপুরেই পিসিমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেখানে পাহাড় জঙ্গ ল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ওর মন শান্ত হবে।"

এমন সময় অতুলবাবু আসিয়া বলিলেন—"প্রকাশ ড্রয়িংরুমে বসে রয়েছে—তোমরা এখানে? সুপ্রভা কোথায়?"

গৃহিণী তখন স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। চিঠিখানিও দেখাইলেন।

সব শুনিয়া অতুলবাবু হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাত দিয়া কপালটি টিপিয়া ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্তোষবাবুকে বলিলেন—"প্রকাশকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে?"

"না—স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিনি। তবে কথায় বার্ত্তায় এমন সব বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যাতে ওব সেখানে বিবাহ করাই সম্ভব বলে মনে হয়।" বলিয়া কোন্ কোন্ কথা হইতে সন্তোষবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।

অতুলবাবু দাঁড়াইযা উঠিয়া বলিলেন—"না না, ওকে সাফ্ সাফ্ জিজ্ঞাসা করতে হবে। ও সব ঘোব প্যাঁচের কথার প্রয়োজন কি? আমি এখনি গিয়ে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করছি। চিঠিখানা দাও।"—বলিয়া অতুলবাবু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

সুপ্রভা নিজ শয়নকক্ষ হইতে সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনিতে পাইতেছিল। উৎকর্ণ হইয়া পিতার ফিরিবার পদশব্দ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে অতুলবাবু ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—"প্রকাশকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে আকাশ থেকে পড়ল। বললে 'Good Heavens : আমি বিলেতে বিবাহ করে এসেছি! নিশ্চয়ই না।—It is a vile calumny, কে বলেছে?' আমি তখন তাকে চিঠিখানা দেখালাম। চিঠি পড়ে সে হাসতে লাগল। বললে, কি ভয়ানক! এ চিঠি থেকেই এত কাণ্ড হয়েচে? এ চিঠির অর্থ এই। বাড়ীর গিন্নীরাই সেখানে সাধারণতঃ ধোপা, মুদী, গোয়ালা, মাংসবিক্রেতা প্রভৃতির সঙ্গে যা কিছু করবার করে থাকেন। পুরুষরা ও সব দেখে শোনে না। তাই আমি যখন তাদের চিঠি লিখলাম যে একখানা রুমাল আসেনি। তখন তারা ধরে নিলে যে বাড়ীর গিন্নীই ও চিঠি লিখে থাকবেন।"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমার বিশ্বাস হয়?"

"কেন বিশ্বাস হবে না? আমি ত এতে অবিশ্বাসযোগ্য কিছুই দেখছিনে। ও আরও বললে, সম্প্রতি ওদের বন্ধু একজন নূতন ব্যারিষ্টার তাদের বাড়ীব মেযেদের জন্যে বেশবিন্যাসের কতকগুলো জিনিষের মূল্যতালিকা চেয়ে বিলাতে কোন দোকানে চিঠি লিখেছিল। তারা মূল্যতালিকার নোডকে ঠিকানা লিখে পাঠিয়েছিল মিস্ জে, সি, ঘোষ, সেই অবধি ওরা তাকে ঠাট্টা কবিয' মিস্ ঘোষ বলে।"

এই সমস্ত কথা হইতেছে, এমন সময় প্রকাশ বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল—"আসতে পারি?"

অতুলবাবু উঠিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। প্রকাশ বসিয়া মিসেস রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আমি যা কৈফিয়ৎ দিয়েছি, তাতেও যদি আপনাদের সন্তোষ না হয়, তা হলে আমি আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিতে পারি।"—গৃহিণী বলিলেন—"কি প্রমাণ?"

"আমি যদি বাস্তবিকই সেখানে বিবাহ করেছিলাম এমন হয়, তা হলে ঐ চিঠির তারিখের পূর্ব্বে এবং পরে, প্রতি সপ্তাহে স্ত্রীলোকের উপযোগী অনেক কাপড়ও ত ধোপার বাড়ী গিয়েছিল?"

"সম্ভব।"

"বিলাতে ধোপা নিযুক্ত হলে, তারা একখানি ছোট বাঁধানো খাতা দেয়। প্রতি সোমবারে কাপড় ধুতে দেবার সময়, সেই খাতার একটা পৃষ্ঠায় কাপড়ের তালিকা লিখে দিতে হয়। সেই খাতা আর গত সপ্তাহের প্রাপ্য টাকা, ধোপার লোক এসে ময়লা কাপড়ের সঙ্গে নিয়ে যায়। আবার শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ধোয়া কাপড়ের সঙ্গে সেই খাতাখানি ফিরে আসে, তাতে তারা হিসেবও লিখে দেয়—যেমন প্রত্যেক শার্ট চার পেনি, কলার এক পেনি, রুমাল আধ পেনি ইত্যাদি। আমার চেম্বারে বিলাতের পুরানো কাগজপত্রের সঙ্গে আমার ধোপার খাতাখানিও আছে। কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে আজই সকালে সেখানি আমি দেখেছি। আমার গাড়ী প্রস্তুত। আমি যদি এখনি চেম্বার থেকে সে খাতাখানি এনে আপনাদের দেখাতে পারি যে, তার পাতার পর পাতায় কোথাও স্ত্রীলোকের কাপড়ের কোন নামগন্ধ নেই, তা হলে আপনাদের বিশ্বাস হবে ত?"—গৃহিণী স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। অতুলবাবু বলিলেন—"প্রকাশ তোমার কথায় আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে—অন্ততঃ আমার ত হয়েছে। তোমার প্রতি যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তার জন্যে আমরা বিশেষ লজ্জিত। তবু আমি বলি, তুমি সে খাতাখানি এনে, সংশয়ের শেষ রেখা কারু মনে যদি থাকে, মিটিয়ে দাও।"

গৃহিণী বলিলেন—"আমারও মনে আর কোনও সংশয় নেই। খাতা এনে দেখানো আমার জন্যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে যদি তুমি ইচ্ছে কর, এনে সুপ্রভাকে দেখাতে পার।"

"বেশ, আমি চললাম।"—বলিয়া প্রকাশ নিষ্ক্রান্ত হইল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্রকাশের গাড়ী ফিরিল। প্রকাশ খাতাখানি হাতে করিয়া দুই তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

ড্রইংরুমে আসিয়া দেখিল, তাহা জনশূন্য। বাহিরের অন্ধকারে খোলা বারান্দার কোণে কে যেন রহিয়াছে। প্রকাশ বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। কাহার চুল হইতে যেন একটা সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে, রেশমী কাপড়ের খস্ খস্ শব্দও যেন শুনা গেল।

আরও কাছে সরিয়া গিয়া প্রকাশ চিনিতে পারিল—সুপ্রভা, তাহার কোলে বিমি।

আরও কাছে গিয়া প্রকাশ ডাকিল—"সুপ্রভা।"

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—"কেন?"

"খাতা এনেছি। এই দেখ।"

সুপ্রভা খাতাখানি লইয়া ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।—প্রকাশ ক্ষোভে ও অভিমানে বলিল—"খাতা দেখতে চাও না? সন্দেহ মেটাতে চাও না? এই তোমার বিচার?"

সুপ্রভা তখন বিমিকে নামাইয়া দিয়া, প্রকাশের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

[মানসী, আশ্বিন ১৩১৮]

বাল্যবন্ধু

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৌষ মাস। ঠিক সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি কালীঘাটের ট্রাম হইতে ভবানীপুর থানার সম্মুখে নামিয়া পড়িল। তাহার মাথায় আলবার্ট টেরি, গায়ে একজোড়া বাদামী রঙের শাল, পায়ে ফুলমোজার উপর পাম্প-সু, হাতে একগাছি রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইবে।—তাহার পর প্রায় দশ মিনিট কাল পদচালনা করিয়া লোকটি প্রাসাদোপম এক বৃহৎ বাসভবনের বর্হিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিতে বাবুটির পানে অর্দ্ধমিনিটকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"নেহি হাঁয়।"

লোকটি বলিল, "বাবু কাঁহা গিয়া?"

দ্বারবান কথাটা কানে তুলিল না—পার্শ্বোপবিষ্ট খানসামার সহিত গল্প করিতে লাগিল। বড়লোকের বাড়ীতে যাহারা মোটর-কার বা জুড়ি-গাড়ী বা অন্ততঃ নিজস্ব কম্পাস-গাড়ীতে চড়িয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের দেখিয়া দ্বারবানেরা দাঁড়াইয়া উঠে, সেলাম করে;—যাহারা ঠিকা-গাড়ীতে যায়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্যই করে না।

লোকটি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এ দারোয়ানজি, বাবু কাঁহা?"

বাবুটির বিনয় দেখিয়া দ্বারবানের অনুগ্রহ হইল।—"বাবু ময়দানমে হাওয়া খানেকো গায়ে হাঁয়। কাহে, কুছ কাম হাঁয়?"

"হাঁ—বহুৎ জরুবি কাম হাঁয়।"

"আপ কোন হাঁয়?"

"বাবু হামকো পছান্তে হে।"

"বৈঠেয়েগা? আইয়ে।"—বলিয়া দ্বাববান গজেন্দ্রগমনে অগ্রসর হইয়া বাবুটিকে ভিতরে লইয়া গেল। বাগান পার হইয়া বহির্ব্বাটির প্রশস্ত বারান্দা। সে বারান্দার একদিকে একটি কক্ষ, অপব প্রান্তে দ্বিতলে উঠিবার সোপানাবলী। কক্ষ হইতে একখানি চেয়ার বাহির করিয়া বাবুটিকে দ্বারবান সেই বারান্দায় বসাইল।—বাবু জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুকো আনেমে দেব হোগা?"

"নেহি—আব্ জল্‌দি আওয়েঙ্গে"—বলিয়া দ্বারবান স্বকার্য্যে গেল।

প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করিবার পর গৃহস্বামী সান্ধ্যভ্রমণ করিয়া ফিরিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। গৃহস্বামী বলিলেন—"কে?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল—"আমি।"

আলোক আগন্তুকের পশ্চাতে ছিল। গৃহস্বামী সেই প্রায়ান্ধকারে তাহার পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আগন্তুক তখন বলিল—"বিপিনদা, চিনতে পারলে না?"

বিপিনবাবু বলিয়া উঠিলেন—"নলিনী?—তাই বল! এস এস। কখন এলে?"

"এই কিছুক্ষণ।"

"চল, উপরে চল।"—বলিয়া নলিনীর হাতটি ধরিয়া তিনি উপরে লইয়া গেলেন। একটি বিদ্যুৎ-আলোকিত সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। ভৃত্য আসিয়া বিপিনবাবুর বুট খুলিয়া চটিজুতা পরাইল, অলষ্টার খুলিয়া লইয়া আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিল, শালের পাগড়ি মস্তক হইতে স্থানান্তরিত করিল।

"তারপর নলিন্—খবর কি বল। কতদিন যে এদিকে আসনি, মনেই পড়ে না। শেষবার যা এসেছিলে আমার বোধ হয়, দু বছর কি তিন বছর হবে। কালীঘাটের ফেরতা বউমাকে খুকীকে নিয়ে একদিন এসেছিলে, মনে পড়ে? খুকী কেমন আছে?"

"ভাল আছে। তারপর একটি ছেলেও হয়েছে।"

"বটে—বেশ বেশ। কতদিনের হল?" "দু বছরের হয়েছে।"

"দেখ!—এ খবরটা পর্য্যন্ত আমায় দাওনি! অথচ একসময় ছিল, যখন তোমায় আমায় প্রতিদিন অন্ততঃ একটিবার করে দেখা না হলে দিনটে অন্ধকার মনে হত। এই বাড়ীর প্রত্যেক ঘর, বাগান, আস্তাবল পর্য্যন্ত ছেলেবেলায় দুজনে তোলপাড় করে বেড়িয়েছি। ওঃ—কি দুষ্টুই ছিলাম আমরা"—বলিয়া বিপিনবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নলিনী সে হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আর, আজ তোমার দারোয়ানটা বললে, বাবু আপ কোন্ হায়?"

"ওর কি অপরাধ বল! তোমার যেমন ঘন ঘন যাতায়াত! ও বেচারী এক বছর বাহাল হয়েছে বইত নয়! সে কথা থাক্। বউমা ভাল আছেন ত? একটু চা খাবে?"—বলিয়া বিপিনবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিলেন।—চা পান করিতে করিতে বিপিনবাবু বলিলেন, "এখনও সে সকল.পুরো দমে চলছে নাকি?"

নলিনী লজ্জায় মস্তক অবনত করিল।

বিপিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "দেখ নলিনী, ও সবগুলো ছাড়। বয়স হল—এখন আর নব্য ছোকরাটি নও। ছেলেপিলের বাপ হয়েছ। যা করেছ তা করেছ—আর কেন? একেবারে না ছাড়তে পার—ক্রমে পরিমাণে কমাও। কমাতে কমাতে শেষে একেবারে বন্ধ করে দিও।"

নলিনী আকুল নয়নে বলিল, "দেখ বিপিনদা, আমার কি অসাধ আমি ছাড়ি? কিন্তু পেরে উঠিনে যে! প্রতিবৎসর তিনবাব করে—একবার ইংরাজি নববর্ষে, একবার বাঙ্গলা নববর্ষে, একবার নিজের জন্মদিনে—প্রতিজ্ঞা করি আর মদ স্পর্শ করব না। কিছুদিন ভাল থাকিও। তারপর যে-কে সেই।"—বলিয়া নলিনী আবার মস্তক আনমিত করিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বিপিনবাবু বলিলেন, "দেখ তুমি যদি ছাড়তে চাও, তা হলে শুধু মদ ছাড়ব প্রতিজ্ঞা করলেই হবে না। দলটি পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে। সেই দলে মিশবে—অথচ প্রতিজ্ঞাটি বজায় থাকবে—এ অসাধ্য—অসম্ভব। দলটি ছাড়।"

"তাই ছাড়ব। এক সপ্তাহ ওদিকে মোটে যাইনি। আমি আজ এক সপ্তাহ মদ খাইনি—তা জান বিপিনদা? এবারে সত্যি সত্যি ছাড়তে পারলাম, কিংবা অন্য অন্য বার যেমন হয়েছে এবারও তেমন হবে—এখনও বলতে পারিনে। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি। নিজেকে বেঁধে রেখেছি বলে অসহ্য যাতনা ভোগ করছি। দিনে রাতে পনের ষোলবার চা খাই। এই তুমি চা দিলে, খেয়ে একটু সুস্থবোধ করছি। এবার মদ না ছেড়ে আমার উপায় নেই—এবার ভরাডুবি হতে বসেছি—তা জান?"—বিপিনবাবু বলিলেন, "না—কি হয়েছে?"

"বাড়ী তিনখানা কয়েক বছর থেকে মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। তারা নোটিস দিয়েছে, এক মাসের মধ্যে যদি টাকা পরিশোধ না করি, তা হলে তারা ফোবক্লোজ করবে।"

বিপিনবাবু বিমর্ষভাবে বলিলেন, "সুদে আসলে কত টাকা হয়েছে?"

"বিশ হাজারের উপর।" "অ্যাঁ?—বল কি!—এই ক-বছরে এই কাণ্ডটি করে বসেছ?"

নলিনী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আর এক পেয়ালা চা আনাও ভাই—বেশ কড়া করে।"

বিপিনবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া চা আদেশ করিয়া বলিলেন, "এখন উপায়?"

নলিনী কম্পিত স্বরে বলিল, "ভাই, উপায় তুমি। তাই আমি আজ তোমার কাছে এসেছি। তিন বছর এদিকের রাস্তা মাড়াইনি—আজ এসেছি। তুমি ত ছেলেবেলা থেকে আমার শত অপরাধ ক্ষমা করেছ, আমার দোষ নিও না। তুমি আমায় টাকাটা ধার দাও, আমি বাড়ীগুলো উদ্ধার করি। নইলে আমার সবই গেল। ছেলেপিলে নিয়ে গাছতলায়

দাঁড়াতে হবে''—বলিয়া নলিনী মুখ নত করিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিপিনবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

চা আসিল। পান করিতে করিতে নলিনী তাহার বাল্যবন্ধুর পানে চাহিয়া তাঁহার মনের গতি বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপিনবাবু যেন একটু অন্যমনস্ক।

চা পান শেষ করিয়া নলিনী বলিল, ''বিপিনদা, কি বল? আমি শুধু হাতে টাকা চাচ্ছিনে। তুমিই বাড়ীগুলো বন্ধক রাখ—রেখে টাকা দাও।''—বলিয়া সে বিপিনবাবুর মুখপানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিপিনবাবু ফিরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ''একটা গর্ত্ত কেটে অন্য গর্ত্ত বুজিয়ে কি লাভ? তার চেয়ে বরং একখানা ভাড়াটে বাড়ী বিক্রী করে ফেলনা কেন?''

''তাতে কুলোবে না বিপিনদা। ভাড়াটে দুখানা বাড়ীই যদি বিক্রী করা যায় তা হলে হতে পারে বটে—বরং হাজার পাঁচেক টাকা উদ্বৃত্তও থাকে। কিন্তু তার পরে? বাড়ী দুখানার ভাড়া থেকে, ধর, আমার সংসার খরচটা চলে যায়। আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছি, এ গোলমালটা চুকে গেলেই পৈত্রিক ব্যবসা আরম্ভ করব। বাবা ত এই দালালী করেই যেমন করে হোক মাসে হাজার দেড় হাজার টাকা রোজগার করেছেন। তিনি যে সব হৌসের সঙ্গে কাজ করতেন, আমি সে সব হৌসের সাহেবদের সঙ্গে এ ক'দিনে দেখাও করেছি। বাবার নাম শুনে, তাঁরা সকলেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তবু অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করাটা ঠিক নয়। মনে কর, আমি যদি দুদিন পরে মরেই যাই, আমার ছেলেপিলে খাবে কি? বাড়ী দুখানা যতদিন আছে, ততদিন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্যে কোনও ভাবনা নেই। তা ছাড়া আরও একটা কথা—পৈত্রিক নগদ যা কিছু পেয়েছিলাম, সবই ত বদ্‌খেয়ালিতে উড়িয়ে দিয়েছি। পৈত্রিক বাড়ী দুখানাও যাবে—কথাটা ভাবতে প্রাণে লাগে।''

''তা ঠিক''—বলিয়া বিপিনবাবু ঘড়ির পানে দৃষ্টি করিলেন। চেয়ারের উপর একবার এপাশ একবার ওপাশ কবিতে লাগিলেন। যেন একটা অস্থিরতা আসিয়া পড়িয়াছে।

নলিনী বলিল, ''কি বল, টাকাটা দেবে?''

''অ্যাঁ?—টাকা?—বলিয়া বিপিনবাবু পুনরায় ঘড়ির পানে চাহিলেন। উঠিয়া দেওয়ালের নিকট একটা দেরাজ ছিল, সেটা টানিযা কি যেন হাৎড়াইতে লাগিলেন। শেষে তাহার মধ্য হইতে একখানি চিঠি বাহিব করিয়া আনিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলেন। চিঠি পড়া শেষ হইলে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, ''গাড়ী যোৎনে বোলো—রমেশবাবুকো হিঁয়া হামারা নেওতা হায়।''

নলিনী এতক্ষণ বিষণ্ন মনে অপেক্ষা করিতেছিল। এইবার বলিল—''বিপিনদা, কি বল? বাড়ী দুখানা বিক্রী করে দেনাশোধ করি—বাকী টাকাগুলো বছরখানেকের মধ্যে উড়িয়ে দিই—তারপর অন্নাভাবে মুটেগিরি করি—সেই কি তোমার ইচ্ছে?''

বিপিনবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, ''কত টাকা বললে?''

''একুশ হাজার টাকা দেনাশোধ করবার জন্যে, আর হাজার চারেক টাকা দালালী ব্যবসাটার গোড়াপত্তনের জন্যে দরকার,—এই পঁচিশ হাজার।''

বিপিনবাবু কেবলমাত্র বলিলেন, ''হুঁ।''

নলিনী বলিল, ''ভাই, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। এটুকু উপকার কি তোমার কাছে আমি প্রত্যাশা করতে পারিনে? ব্যাঙ্কে তোমার কত লাখ টাকা পড়ে পচছে ; চার পাঁচ পার্সেন্টের বেশী সুদ পাও না। আমার মহাজনেরা শতকরা একটাকা মাসে সুদ নেয়—আমি সেই সুদ তোমায় দেব। প্রতি বছরের সুদ—আসলে গিয়ে মিশবে। আমার বাড়ী তিনখানার যা দাম, দশ বছরের সুদে-আসলেও ততদূর উঠবে না। তোমার টাকা মারা যাবে না ভাই।''

বিপিনবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া, নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য কোন্ কোন্ বস্ত্রাদি বাহির করিতে হইবে তাহাই নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া অবশেষে নলিনী বলিল, "দেখ বিপিন, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাবছ, এতগুলো টাকা এই অল্‌বড্ডে লোকটাকে ধার দেব— শোধ যা করবে তা মা গঙ্গাই জানেন। অথচ নালিশ করে বাড়ীগুলো ডিক্রী করে নেওয়া, সেও বিষম চক্ষুলজ্জা। বাল্যবন্ধু—তাকে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করলে লোকেই বা বলবে কি! আচ্ছা ভাই—আমি একটা প্রস্তাব করছি। বাড়ী তিনখানা আমি পাঁচ বছরের মেয়াদে তোমায় কট্‌কবলা লিখে দিচ্ছি। যেদিন পাঁচ বছর শেষ হবে, সেদিন বা তার আগে, সুদে আসলে তোমার সমস্ত টাকা আমি পরিশোধ করতে পারি, উত্তম, বাড়ী আমার থাকবে। না পারি—বাড়ী তোমার হয়ে গেল—ডিক্রীজারির হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। কি বল?"

এতক্ষণে যেন বিপিনবাবুর অন্যমনস্ক ভাবটা ঘুচিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল—শয়নকক্ষে বস্ত্রাদি প্রস্তুত। বিপিনবাবু বলিলেন—"অভি থোড়া দের হাঁয়।" দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দিল গাড়ী যোতা হইয়াছে। তাহাকে বলিল—"আভি আধঘণ্টা দেব হাঁয়।" নলিনীর মনে ভরসা হইল।

তখন অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বিপিনবাবু টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।—নলিনী বলিল—"আমি দালালী ব্যবসা করে যা কিছু উপার্জ্জন করব বিপিনদা—সমস্তই এই ঋণশোধ করব। সংসার খরচ আমি বাড়ী দুখানার ভাড়া থেকেই চালিয়ে নেব। যেমন করে হোক্ আমার ত খুব আশা হয়, বছর তিন হলেই টাকাটা শোধ হয়ে যাবে। তবু আরো দুটো বছর হাতে রাখলাম। নাঃ—এবার আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। শিক্ষা যার নাম—ঠেকে শিখলাম দাদা—ঠেকে শিখলাম। মদ আমার কাছে আজ থেকে গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত। নাকখৎ কানমলা—যদি আমি আর মদের ত্রিসীমানায় যাই। যে রাস্তায় মদের দোকান সে রাস্তা দিয়েই নলিনী শর্ম্মা আর হাঁটবে না। আর এক পেয়ালা চা হুকুম কর।"

সপ্তাহ মধ্যেই সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া গেল। দলিলাদিও রেজেষ্ট্রি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।—বউবাজারে একটি গলির ভিতর নাতিবৃহৎ একখানি দ্বিতল অট্টালিকা, ইহা নলিনীর পৈত্রিক বাসভবন।

পৌষ মাস, বেলা নয়টা বাজিয়াছে। উপরতলার একটি কক্ষে তক্তপোষের উপর মলিন ছিন্নশয্যায় নলিনীর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী তাহার পীড়িত শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। গায়ে ছিটের দোলাই বাঁধিয়া একটি নয় বৎসরের বালিকা কক্ষখানির সর্ব্বত্র চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মাঝে মাঝে মার কাছে আসিয়া বলিতেছে, "কি খাব?"

কক্ষখানিতে দৈন্যদশা যেন মূর্ত্তিমতী। নামে হেমাঙ্গিনী হইলেও, যুবতীর গায়ে কোথাও একতোলা সোনা নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। গহনার কলি এখনও গায়ে আছে এবং কেমন করিয়া গহনাগুলি একে একে গিয়াছে, তাহারও ইতিহাস অভাগিনীর বক্ষে পৃষ্ঠে বাহুতে মুদ্রিত আছে। এমন কি শেষ আঘাতের ক্ষতও এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই।

বালিকা ক্রমে কান্নার সুর ধরিল। মা তখন অঞ্চল দিয়া তাহার মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ছি মা, কাঁদে কি? একটুখানি ধৈর্য্য ধরে থাক—তিনি এলেন বলে।"

বালিকা আরও কিয়ৎক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল। মাঝে মাঝে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া, রাস্তার যতদূর দেখা যায়, দেখিতে লাগিল পিতা আসিতেছেন কি না। কই তাহার ত কোন চিহ্নও নাই!—ক্রমে দশটা বাজিল। বালিকা আসিয়া বলিল, "আর যে থাকতে পারছিনে মা,—বাবা কোথা গেছেন?"

"তিনি বাড়ীভাড়ার টাকা আদায় করতে গেছেন মা—এখনই আসবেন। টাকা ভাঙ্গিয়ে বাজার করে নিজে আসবেন; তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসবেন, খোকার জন্যে বেদানা

নিয়ে আসবেন—এই এলেন বলে।"—বালিকা বলিল, "একটা পয়সা দাও না মা—দোকান থেকে মুড়কি কিনে এনে ততক্ষণ খাই।"

"পয়সা ঘরে থাকলে কি এতক্ষণে দিতাম না মা?"—বলিতে বলিতে যুবতীর চক্ষুযুগল জলসিক্ত হইয়া উঠিল।

. হায়,—এমন অবস্থাই হইয়াছে! ঘরে আজ এমন একটি পয়সা নাই যে মেয়ে মুড়কি কিনিয়া আনিয়া খায়। অথচ দুই বৎসর পূর্ব্বেও এই বালিকা তাহার টমি কুকুরকে কত রসগোল্লা খাওয়াইয়াছে।

মাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা বড় অপ্রতিভ হইল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না মা, থাক্। বাশি মুড়কি খেলে আমার অম্বল হয়। বাবা আসুন—তখন খাবার খাব।"

গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস এই। নলিনী তাহার বন্ধু বিপিনবাবুর কাছে টাকা লইয়া ঋণশোধ করিল এবং দালালী ব্যবসাও আবম্ভ করিল বটে—কিন্তু মাসখানেক যাইতে না যাইতে বিয়ার ধরিল। তাঁহার "বন্ধু"গণ তাহাকে বুঝাইয়া দিল, বিয়ার সাহেবলোকে জলের পরিবর্ত্তেই ব্যবহার করেন—উহা পানীয়বিশেষ, মদ্য নহে—বিয়ার পান করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে না। বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিয়ারের পালা শেষ হইল, প্যাকিং কেসে গৃহ ভরিয়া উঠিল; খালি বোতল বিক্রয় করিয়া বাড়ীর ভৃত্য যাহা জমাইয়াছিল, তাহা দিয়া সে স্ত্রীর জন্য একজোড়া সোনার শাঁখা গড়াইয়া লইল। এ এক বৎসবে দালালী ব্যবসায়ে নলিনী কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল বটে—কিন্তু ঋণের একটি পয়সাও পরিশোধ হয় নাই।

পরবৎসরে নলিনীর দালালী ব্যবসায়ে গলায় পাথরবাঁধা অসহায় বিড়াল শাবকের মত, "আসল" মদ্যের পাথারে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল। সে বৎসব শেষে, ব্যবসায়ের মূলধনের আর একটি পয়সাও অবশিষ্ট রহিল না।

ইহার পর নলিনী কযেকমাস অর্থাভাবে "বিদেশী-বর্জ্জন" করিল। বলিতে লাগিল, বিলাতী অপেক্ষা কান্ট্রি অনেক ভাল, লিভাব খারাপ কবে না। কিন্তু স্বদেশীব্রতে সমান নিষ্ঠা চিরদিন কাহারও থাকে না। সময়ে বিলাতী এবং অসময়ে দেশী চলিতে লাগিল।

বাড়ী দুইখানির ভাড়া হইতে যাহা আসে সংসাব খরচ নির্ব্বাহের পর আর বড় কিছু থাকে না। সুতরাং মদ্য ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপাবগুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ক্রমে নলিনী তাহার আংটী, ঘড়ি-চেন, শাল-জামিয়াব, এমন কি ছড়ি-ছাতার বাঁট হইতে রূপা খুলিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে আলমারি, টেবিল, ভাল ভাল ল্যাম্প প্রভৃতিও গেল। এইরূপে তৃতীয় বর্ষ শেষ হইল—ঋণ ও তাহার সুদ গোকুলে বাড়িতে লাগিল।

চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে, স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিব প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িল। অসহায়া অবলা আপত্তি করিতে গিয়া মার খাইযা, চোখের জলে মাটি ভিজাইয়া, একে একে সবগুলি বাহির করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ হইল।

আজ দুই সপ্তাহকাল নলিনী মদ্যপান করে নাই—স্ত্রীর মস্তকে হস্ত রাখিয়া দিব্য করিয়াছে আর জীবনে কখনও করিবে না। মাসের প্রথমে বাড়ীভাড়ার টাকা আদায় করিয়া মাসের উপযোগী চাউল প্রভৃতি কিনিয়া রাখিত—তাই গত বাত্রেও আহার জুটিয়াছে। কিন্তু আজ আর চাউল না আসিলে হাঁড়ি চড়িবে না।

গির্জ্জার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারোটা বাজিল। ঝি—এটি পৈত্রিক আমলের পুরাতন ঝি, তাই আজিও পালায় নাই—আসিয়া বলিল—"বউমা, কয়লা ধরাব কি? বাবু এখনও এলেন না!" হেমাঙ্গিনী বলিল, "ধরাও গে ততক্ষণ।"

"হ্যাঁ গা, বাবু এত দেরী করছেন কেন? আমি ত বাছা ভাল বুঝছিনে। মলঙ্গা কি কলুটোলা দুকোশ দশকোশ নয়—সেই প্রাতঃকালে বেরিয়েছেন, এখনও দেখা নেই। হাতে নগদ টাকা পেয়ে আবার জগন্নাথ শার দোকানে ঢুকলেন নাকি? তা হলে এখন আর বাড়ী আসছেন না—সেই যাব নাম তিনটে।"

হেমাঙ্গিনীর মনেও এ আশঙ্কা গোপনে জাগিতেছিল—কিন্তু সে মৌখিক বলিল—"না, না, তা যাননি। তিনি এলে তবে খোকা বেদানার রস খাবে, সে কি তিনি জানেন না?"

"খোকা এখন কেমন আছে বউমা?"

"এখন আর গা গরম নেই—ঘুমুচ্ছে।"

"তবে আমি কয়লার আগুন দিয়ে এসে খোকাকে নিই—তুমি তারপর চান করে ফেল—" ঝি বলিতে যাইতেছিল, একটু মুখে জল দিও,—কিন্তু তাহার স্মরণ হইল ঘরে কিছু নাই—তাই সে থামিয়া গেল।—যত বেলা হইতে লাগিল, হেমাঙ্গিনীর আশঙ্কাও তত বাড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে খোকাকে তক্তপোষে শোয়াইয়া দিয়া সে স্বয়ং জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দেখিল, টলিতে টলিতে নলিনী আসিতেছে। হস্ত রিক্ত—পশ্চাতে কোনও ঝাঁকামুটে নাই। আলোয়ানখানা গায়ে দিয়ে প্রভাতে বাহির হইয়াছিল, তাহাও গায়ে নাই।—দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে দুই হাতে জানালার গরাদ শক্ত করিয়া ধরিল।

সিঁড়ি বাহিয়া কোনও মতে নলিনী উপরে উঠিয়া আসিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া পকেট হইতে মুঠা করিয়া কয়েকটা টাকা পয়সা বাহির করিয়া সজোরে ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া দিল। জড়িতস্বরে বলিল—"এই নাও, ঝিকে বাজারে পাঠাও। আমি শুলাম।"—বলিয়া দড়াম করিয়া মেঝের উপর পড়িল। একটা কাঁসার গেলাস রাখা ছিল, তাহার কাণায় লাগিয়া মস্তকের একস্থানে কাটিয়া গেল—রক্তপাত হইতে লাগিল।

"হায় হায় হায়"—বলিয়া তাড়াতাড়ি হেমাঙ্গিনী মাতাল স্বামীর মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল। কন্যা তাড়াতাড়ি ঘটি করিয়া জল আনিয়া দিল। হেমাঙ্গিনী নিজ পরিধানের ছিন্নবস্ত্র ছিন্ন করিয়া, জলে ভিজাইয়া আহত স্থান টিপিয়া ধরিল। কন্যাকে বলিল—"পাখা নিয়ে বাতাস কর্।" নলিনী অচেতন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শুশ্রূষার পর, অল্পে অল্পে নলিনী চক্ষু খুলিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিল। শেষে ভগ্নস্বরে বলিল—"মাতাল-স্বামীর—সেবা করছ?"

হেমাঙ্গিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কেন খেলে?—তুমি যে আমার মাথায় হাত রেখে দিব্যি করেছিলে আর খাবে না—তবে কেন খেলে?"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নলিনী বলিল—"হিমু।"

"কি বল।"

"যদি কেউ কারুর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে—আর সে কথা রাখতে না পারে—তা হলে কি হয় হিমু?"

"যার মাথায় হাত দিয়েছিলে, সে মরে যায়। আমি মরে যাব।"

পূর্ব্ববৎ স্বরে নলিনী বলিল, "তাই আজ আমি শেষ বোতল খেয়ে এসেছি। শুধু তুমি মরে যাবে না হিমু! তুমি মরে যাবে—আমি মরে যাব—খোকা মরে যাবে—খুকী মরে যাবে—আমরা সবাই মরে যাব।"—স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, "ছি ছি বলতে নেই। অমন কথা মুখে আনতে নেই। তুমি ঘুমোও।"

"না হিমু, এখন মুখে আনতে আছে। তুমি মরে যাবে—আমি মরে যাব—খোকা মরে যাবে—খুকী মরে যাবে। না খেতে পেয়ে আমরা সবাই মরে যাব। একটা কাবুলিওয়ালার কাছে গায়ের আলোয়ান বিক্রী করে পাঁচটি টাকা পেয়েছিলাম। আট আনার মদ খেয়েছি, সাড়ে চার টাকা আছে—ঘরে ছড়িয়ে ফেলেছিলাম—কই সেগুলো?"—বলিয়া নলিনী মেঝের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

"সে ঝি কুড়িয়ে রেখেছে—বাজার করতে গেছে।"

"আমার খুকী কই—আমার খোকা কই?"

"ঝি খোকাকে কোলে করে, খুকীর হাত্ ধরে বাজারে গেছে। ওদের খাবার কিনে দেবে—চাল ডাল তরকারী সব কিনে আনবে। মেঝের উপর শুয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে—চল বিছানায় শোবে চল। ওঠ।"

"উঠছি। যতদিন ঐ সাড়ে চারটি টাকা আছে, ততদিন খাওয়া চলবে। তার পর উপবাস। অনাহারে মৃত্যু। সর্ব্বস্ব গেছে হেম। মলঙ্গা লেনের বাড়ীতে ভাড়া চাইতে গেলাম—ভাড়াটে। এটর্ণি-বাড়ীর চিঠি দেখালে। তাতে লেখা আছে, ও বাড়ী এখন তাদের মক্কেল ভবানীপুবের বিপিন বাঁড়ুয্যের সম্পত্তি—অন্য কাউকে যেন ভাড়ার টাকা না দেয়—ভাড়া এখন থেকে বিপিনবাবুর প্রাপ্য। ভাড়াটে জিজ্ঞাসা করলে, একথা ঠিক? আমি বললাম, খুব ঠিক।—বলে কলুটোলায় গেলাম। সেখানকার বাড়ীর ভাড়া চাইলাম—সে ভাড়াটেও ও রকম একখানা চিঠি বের করলে। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, এ যা লিখেছে, তা কি ঠিক? আমি বললাম—খুব ঠিক। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মদ না খেয়েও আমি মাতালের মত হয়ে গেলাম। মনে মনে 'খুব ঠিক—খুব ঠিক' বলতে বলতে একটা কাবুলিওয়ালার দোকানে গিয়ে, আলোয়ান বিক্রী করলাম। ভাবলাম, এইবার ত আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাব।—যাই, শেষবার একবাব মদ খেয়ে নিই। ভেবে জগন্নাথ শার দোকানে ঢুকলাম। এতদিনে ঠিক হযেছে—নয় হিমু? যে মদ খায়, ক্রমে তার সর্ব্বস্ব যায়—তাকে পথের ভিখারী হতে হয়—না খেতে পেয়ে তার স্ত্রী, তার ছেলে মেয়ে মরে যায়, নয় হিমু? একথা খুব ঠিক—খুব ঠিক।" নলিনীর চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু বহিতে লাগিল।—হেমাঙ্গিনী তাহার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিল—"ছি,—অমন কথা তুমি কেন বলছ? সর্ব্বস্ব গেছে—গেছেই। তুমি ভাল হও—সৎপথে থাক—আবার কত হবে। ওঠ বিছানায় চল। জামাটা ছেড়ে ফেল, ভিজে গেছে।"

নলিনী অসহায় বালকটির মত স্ত্রীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর শয্যায় শয়ন করিয়া বলিল—"এবাড়ী ছেড়ে দেবার জন্যেও নোটিস দেবে। এ বাড়ীও তার হয়ে গেছে। তার পর, গাছতলায় পড়ে, অনাহারে আমাদের মৃত্যু।"—হেমাঙ্গিনী বলিল—"না তুমি ভেব না। বাড়ী থেকে উঠে যেতে হয় যাব, তার আর কি? দেশে গিয়ে থাকব।"

"দেশে না হয় একখানা ভাঙ্গা ফুটো বাড়ীই আছে—বিষয়সম্পত্তি ত নেই। খাব কি?"

"সে জন্যে তুমি ভেব না। ভগবানের রাজ্যে কেই কি না খেয়ে মরে? গাছের পাখীকে, বনের পশুকে, জলের মাছকে যিনি আহার যোগাচ্ছেন—তিনি কি আমাদের না খেয়ে মরতে দেবেন? কখনই না।"

নলিনী নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। শেষে ধীরে ধীরে বলিল, "গাছের পাখী, বনের পশু কি মদ খাবার জন্যে স্ত্রীর গায়ের গহনা কেড়ে নেয়?"

"তা নেয় না সত্যি। তুমি আর মদ খেও না—তুমি ভাল হও—আবার কত হবে। আমি আজ পাঁচ বছর সকাল সন্ধে হরির তলায় কত মাথা খুঁড়েছি—কত ঠাকুর দেবতাকে মানত করেছি—যাতে তোমার সুবুদ্ধি হয়—আমার সে সব প্রার্থনা কি নিষ্ফল হবে? এত কষ্টের পর কি দেবতারা আমার পানে মুখ তুলে চাইবেন না? তুমিও ভগবানকে ডাক—অবশ্য তাঁর দয়া হবে। আবার সব হবে। তোমার পায়ে পড়ি তুমি মন খারাপ কোরো না, একটু ঘুমাও দেখি। ঝি বুঝি এতক্ষণে এল—নীচে তার সাড়া পাচ্ছি। তুমি ঘুমুলে তবে আমি রান্না করতে যাব। ঘুমোও।"—নলিনী কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমার মাথার ভিতরে আগুন জ্বলছে—আমার কি ঘুম হবে?"

"খুব হবে। তুমি স্থির থাক। খুকী খাবার খেয়ে এসে তোমার পায়ে হাত বুলুবে এখন—আমি এক হাতে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—এক হাতে পাখার বাতাস করি।"—বলিয়া হেমাঙ্গিনী সেইরূপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নলিনী আবার চক্ষু খুলিল। স্ত্রীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"হিমু!"

"কি?"

"আমি কত দিন তোমায় মেরেছি—তোমায় জুতো পর্য্যন্ত মেরেছি। তুমি কেন আমার সেবা করছ?"—অল্প হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল—"কেন সেবা করছি? বেশ কবছি—যাও, আমার খুশী"—বলিয়া অবনত হইয়া স্বামীর মুখচুম্বন করিল।

তাহার পর নলিনী ঘুমাইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈকালে এটর্ণি আফিস হইতে নলিনীর নামে পত্র আসিল যে তাহার বসতবাটীখানি এখন ভবানীপুরের বিপিনবাবুর সম্পত্তি, অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে যেন বাড়ী সে খালি করিয়া দেয়।

সে রাত্রি এই অভাগ্য দম্পত্তির যে কি ভাবে কাটিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

পরদিন প্রভাতে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বলিল—"দেখ, একবাব ভবানীপুবে গিয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করলে হয় না?"—নলিনী বলিল—"কি ফল হবে?"

"দেখ, তিনি তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তাঁর কাছে পঁচিশ হাজার টাকা ধার করেছ বলেই যে তিনি এমন করে আমাদের সর্ব্বনাশ করবেন এ ত সহজে বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয়, তোমায় ভয় দেখাবার জন্যে তিনি এমন করেছেন। তুমি গিযে একটু বললে-কইলেই বোধ হয় সময় আর কিছু বাড়িয়ে দিতে পারেন।"

নলিনী ওষ্ঠযুগল বক্র করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—হুঁ—ছেলেবেলাকার বন্ধু। তারা হল বিষয়ী লোক,—টাকাই তাদের ধ্যান টাকাই তাদের দেবতা। ছেলেবেলার বন্ধু। যখন পাঁচ বছর আগে তার কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলাম, তখনই সে বন্ধুত্বেব পরিচয পেয়েছি। টাকা দেবার নাম শুনলেই যেন ঘূর্ণরোগ ধরল, ছটফট করতে লাগল। শেষে যখন কট্‌কবলার কথা বললাম তখন সে স্থির হল। তুমিও যেমন, বিষয়ী লোকের আবার বন্ধুত্ব!"

হেমাঙ্গিনী আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে বলিল—"লোকে বলে—ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। তুমি হয়ত তাঁর প্রতি অবিচাব করছ।"

"হ্যাঃ—ভালবাসা!—ছিল বটে এককালে ভালবাসা। সে ভালবাসা টাকার বস্তার চাপে ত্রাহি ডাক ছেড়ে অনেক দিন মরে গেছে।"

হেমাঙ্গিনী নীরবে বসিয়া রহিল। ক্রমে তাহার চক্ষুযুগল সজল হইয়া উঠিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া নলিনী ব্যথিত হইল। বলিল—"আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, তখন যাই, গিয়ে একবার বলে কয়ে দেখি। সময় বাড়িয়ে নেওয়া মিছে। কোথা পাব টাকা যে একবছর কি দুবছর পরে শোধ করব? দেখি যদি ভাড়াটে বাড়ী দুখানি নিয়েই সে সন্তুষ্ট হয—এ বাড়ীখানি আমায় ছেড়ে দেয়।"—বলিয়া নলিনী যাইতে প্রস্তুত হইল।

হেমাঙ্গিনী বলিল—"একটু জল মুখে দিয়ে যাও—কাল রাত্তির থেকে কিছু খাওনি।"—বলিয়া দুইটি সন্দেশ আর এক গেলাস জল আনিয়া দিল। বাক্স খুলিয়া ট্রামের পয়সা বাহির করিতেছিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"আর কত আছে?"

"সোয়া-তিন টাকা।"

"থাক ট্রামের পয়সা কাজ নেই—ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হেঁটে যাব এখন।"

হেমাঙ্গিনী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাক্স বন্ধ করিল।

নলিনী যখন পদব্রজে ভবানীপুরে বিপিনবাবুর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। দ্বারবানের নিকট শুনিল, বাবু বাড়ীতেই আছেন। অনেক

সাধ্যসাধনার পর দারোয়ানজি নলিনীর আগমনসংবাদটা জানাইতে স্বীকৃতি হইল। ক্রমে নলিনীর ডাক পড়িল।

বিপিনবাবু তখন নীচের তলার বারান্দার প্রান্তবর্তী কক্ষখানিতে, টেবিলের সম্মুখে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে আধ পেয়ালা ঠাণ্ডা চা পড়িয়াছিল—পেয়ালার কানায় দুই তিনটা মাছি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—নলিনীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও প্রথমটা বিপিনবাবু সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইলেন না। একটু অপেক্ষা করিয়া নলিনী বলিল—"বিপিনদা।"

বিপিনবাবু তখন চক্ষু তুলিলেন। দেখিলেন, নলিনীর বেশে আর সে পূর্ব্বেকার পারিপাট্য নাই। চুলগুলা উড়িতেছে। তিন দিন না কামাইয়া দাড়ীগুলা খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। গায়ে একটা বর্ণবিকৃত কোট, তাহার উপর একখানা পুরাতন বালাপোষ। মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটা বসিয়া গিয়াছে, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই।—বিপিনবাবু বলিলেন—"নলিনী যে—বস।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নলিনী উপবেশন করিল। বিপিনবাবু আবার সংবাদপত্রে মগ্ন হইলেন। নলিনী নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপ প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। বিপিনবাবু তখন সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে নলিনীর পানে চাহিয়া বহিলেন—

"তারপর—কি মনে করে?"

নলিনী বলিল—"তুমি আমার মনের কথা কি বুঝতে পারছ না? আগে ত পারতে?"

বিপিনবাবুর ওষ্ঠযুগলের গোপন অন্তরালে, বিদ্রূপের একটু হাস্যরেখা দেখা গেল কি? বোধ হয় না—নলিনীর ভ্রম। উত্তরে বিপিনবাবু মাত্র বলিলেন—"ছেলেপিলে সব ভাল আছে ত?"

"ভাল আছে। আজ তাদেরই জন্যে তোমাব কাছে দববার করতে এসেছি—নিজের জন্যে আসিনি।"

চেয়ারের পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া, একটু টানিযা টানিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

"তুমি জান না ব্যাপাব কি?"

"তুমি না বললে আমি কি করে জানব?"

"বাড়ী তিনখানা কি যাবে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—"কোন্ বাড়ী? কোথায় যাবে?"

নলিনীর আর সহ্য হইল না। আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"ন্যাকামি রেখে দাও না! কোন্ বাড়ী তুমি জান না! কোথায় যাবে তুমি জান না! মানি তোমার লাখো লাখো টাকা, দুশো চারশো কারবার। তাই বলে, সে কট্‌কবালার দোহাই দিয়ে আমার বাড়ী তিনখানি উদরস্থ করে ফেলেছ—অথচ এ সব কিছুই মনে নেই—এ কথা তুমি তামা-তুলসী ছুঁয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না। আমি নির্ব্বোধ বটে, কিন্তু অত নির্ব্বোধ নই।"—বলিতে বলিতে নলিনীর চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তাহার ওষ্ঠযুগল অকারণে স্পন্দিত এবং নাসিকা বারম্বার স্ফীত হইতে লাগিল।

নলিনীর এই আকস্মিক ঔদ্ধত্যে বিপিনবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি যেন কিছু বলিবেন বলিবেন মনে হইল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলেন। খোলা জানালাপথে বাহিরে বাগানের পানে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।—কিয়ৎ পরে ভৃত্য আসিয়া চায়ের পেয়ালা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর চা আনব কি?"—বিপিনবাবু বলিলেন—"না"। ভৃত্য পেয়ালা লইয়া গেল।

তিনি তখন দেরাজ টানিয়া চুরট বাহির করিয়া নিজে একটি ধরাইলেন। নলিনী চুরট খাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

চুরট টানিতে টানিতে বিপিনবাবু নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তা, বাড়ীর কথা কি জিজ্ঞাসা করছিলে?"—নলিনী বলিল—"জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, পঁচিশ হাজার টাকা তোমার কাছে ধার নিয়েছিলাম বলে কি আমার তিনখানা বাড়ীই যাবে?"

"দলিলে সেই কথা লেখা ছিল না কি?"

"দলিলে লেখা ছিল তা আমি জানি। শাইলক্ মশাই, দলিলে লেখা ছিল বলেই কি পাউণ্ড অব্ ফ্লেশ আদায় করে নিতে হবে?"

এই নূতন সম্বোধনে বিপিনবাবুর মুখ আবার অপ্রসন্ন হইল। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"টাকা সুদে আসলে কত দাঁড়িয়েছে, হিসাব করেছ?"

"করেছি?"

"কত?"

"প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার।"

"তুমি আমাকে শাইলক্ বলে গাল দিয়েছ। আমি যে শাইলক্ নই, তার প্রমাণ আমি তোমায় দিচ্ছি। তোমার বাড়ী তিনখানার এখন বাজার-দাম কত হতে পারে মনে কর?"

"এ পাঁচ বছরে কলকাতায় বাড়ীর দাম প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আমার তিনখানা বাড়ীর দাম এখন অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

"সম্ভবতঃ আরও বেশী। দলিলে যে পাঁচ বৎসরের মেয়াদ ছিল, তা খেলাপ হয়ে গেছে। এখন তুমি লাখ টাকা দিলেও ও বাড়ী তিনখানা তোমায় ফিরিয়ে দিতে আমি আইনতঃ বাধ্য নই ত?" "তা নও।"

"আচ্ছা। তুমি আমায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দাও—আমি বাড়ী তিনখানা দিচ্ছি। কেমন, শাইলক্ হলে, সে রাজি হত?"—নলিনী অধোবদনে বসিয়া রহিল।

ছি নলিনী, কেবল রাগিতেই জান! কেবল কাটা কাটা বোলই শিখিয়াছ! মাথা একটু খেলে না? বলিলে না কেন—"আচ্ছা, বাড়ী তিনখানা বিক্রী করে তোমার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কেটে দিয়ে, পাঁচ হাজার টাকা দাও।"—তোমার বিপিনদা কি উত্তর দিতেন একবার শোনা যাইত।—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, বিনীত কাতরস্বরে নলিনী বলিল—"ভাই, পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার কথা কি বলছ আজ যদি পঁয়তাল্লিশটে টাকা নিয়ে বাড়ী ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করতে, তাও আমার সাধ্য হত না। ঘরে যা আছে কাল পর্শু—তিন দিনের খোরাক হবে। শেষে বলিলেন—"আমায় কি করতে বল?"—নলিনী চুরটে একটা টান দিয়া, অল্পে অল্পে সেই রাশিকৃত ধূম ফু ফু করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। শেষে বলিলেন—"আমায় কি করতে বল?"

নলিনী তখন হাত দুটি জোড় করিয়া বলিতে লাগিল—"ভাই, ছেলেবেলায় আমাদের দুজনের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসার দোহাই, আমাকে নষ্ট কোরো না। আমার সুদ কিছু তুমি মাফ্ কর। আমার বাড়ী তিনখানার দাম এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর, তা তুমি নিজেই বলেছ। তুমি বিষয়ী লোক, আমার চেয়ে এ সব জিনিষ তুমি অনেক ভালই জান। তুমি ভাড়াটে বাড়ী দুখানি নিয়েই আমায় নিষ্কৃতি দাও। ও দুখানার দামও অন্ততঃ ছত্রিশ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা হবে—আমার দেনার আসল পঁচিশ হাজার টাকার চেয়ে ত অনেক বেশী। মনে কর সুদটা কিছু কমই পেলে। আমার পৈত্রিক ভিটেখানি আমায় ছেড়ে দাও। নইলে ছেলেপিলে নিয়ে আমায় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। আমার মাথা গোঁজবার স্থানটুকু থাকলে, আমি দুঃখ ধান্দা করে হোক্‌কি, যেমন করে হোক্, ছেলেপিলেগুলিকে ডাল ভাত দিতে পারব। আমি তোমার কাছে নগদ কিছু চাচ্ছিনে—যদিও আজ তিনটি মাত্র টাকা আমার সম্বল। তিন দিন আমার খাবার আছে, এর মধ্যে আমি কিছু একটা যোগাড় করে নেব। সুদের টাকা কিছু আমায় মাফ্ কর। বসতবাড়ীর কবলাখানি আমায় ফিরিয়ে দাও।"

বিপিনবাবু মস্তক অবনত করিয়া শুনিতেছিলেন,—তাঁহার চুরট নিবিয়া গিয়াছিল। নলিনীর বাক্য শেষ হইলে জানালার বাহিরে বাগানেব পানে, একবার নলিনীর পানে চাহিয়া, চুরটটি ধরাইয়া আবার বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ, তুমি তোমার ছেলেপিলের কথা বললে, সেইরকম আমারও ছেলেপিলে আছে। আমরা খাটিখুটি, রোজগারপত্তর করি, সে আমাদের ছেলেপিলের জন্যই ত? আমাদের অবর্ত্তমানে তারা কোনও রকম কষ্ট না পায়, সেইটে আমাদের কবে যেতে হবে, সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের একটা গভীর কর্ত্তব্য রয়েছে। আমার বাপ পিতামহ যা বিষয় আশয় আমায় দিয়ে গেছেন, সেই সব বাড়িয়ে গুছিয়ে, আমি আমাব ছেলেপিলেদের দিয়ে যাব এই আমার কর্ত্তব্য। বন্ধুত্বের খাতিরে, ছেলেবেলার ভালবাসার দোহাই মেনে, যদি সে বিষয়সম্পত্তির কোনও অংশ আমি বববাদ করি, তা হলে সেটা কি আমার অধর্ম্ম হবে না?"

বাল্যবন্ধুর এই গভীর ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবোধ দেখিয়া, বড় দুঃখেও নলিনীর হাসি পাইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে হাসিটুকু তাহার ওষ্ঠ হইতে মিলাইয়া গেল। ঘৃণায় তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিল—"সংসারের কি বিচিত্র গতি! যে একদিন, আমার পায়ে একটি কাঁটা ফুটিলে সমবেদনায় ম্রিয়মাণ হইত, সে আজ আমার এ দূর্দ্দশা দেখিয়াও অবিচলিত। যে হৃদয় ফুলেব মত সুকুমার ছিল, অর্থলিপ্সা তাহাকে পাষাণের মত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে—দেবতাকে পিশাচে পবিণত করিযাছে।"

নলিনী বলিল—"হ্যাঁ—কাল বিকেলে আমাকেও তারা সাত দিনেব পর বাড়ী ছেড়ে দিতে নোটিস দিয়েছে।"—চুরটে কয়েক টান টানিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—"আমার বিবেচনায় একখানা ছোটখাট ভাড়াটে বাড়ী খুঁজে নেওযা তোমাব উচিত। উপরে একখানি কি দুখানি শোবাব ঘর, নীচে একখানি রান্নাঘর, একখানি ভাঁড়ার ঘর, আর কল পাইখানা থাকবে—এই হলেই তোমাব সঙ্কুলান হয়ে যাবে। তা এবকম একখানি বাড়ী, সহরের ভিতর অবশ্য বেশী লাগবে, এ ভবানীপুব অঞ্চলে খুঁজলে দশ পনের টাকাতেও পেতে পার। ইচ্ছে কর ত আমার সরকারকে বলি, খুঁজে দেবে এখন। বড় বাড়ী তোমার দরকারই বা কি? তোমরা স্ত্রী পুরুষ, একটি ছেলে, একটি মেয়ে বইত নয়, ঐরকম একখানি ছোট বাড়ীতে বেশ সঙ্কুলান হয়ে যাবে এখন। কি বল?"—নলিনী কথা কহিল না—মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—"বলব সরকারকে খুঁজে দেখতে?"

নলিনী উচ্চকণ্ঠে বলিল—"থাক, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে—আমিই খুঁজে নিতে পারব। অনেক দয়াই ত করলে, আর একটু যদি দয়া কর, তা হলে আর নতুন বাড়ী খোঁজার দরকার হবে না। না খেতে পেয়ে আমরা স্ত্রী পুরুষ ত বেশী দিন বাঁচব না। আমরা মরে গেলে, আমাদের ছেলেমেয়েই বা বেঁচে থাকবে কেমন করে? তুমি দয়ার সাগর, দয়া করে সময়টা একটু বাড়িয়ে দাও। সাতদিনের জায়গায় একমাস করে দাও। যে বাড়ীতে জন্মেছি—সে বাড়ীতেই মরি। তোমার ঐ বাড়ীতে একমাস থাকতে থাকতেই সব সাফ হয়ে যাবে এখন।"

কথাগুলা যেন প্রেতের মত অট্টহাস্য করিতে করিতে সেই কক্ষমধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের বিকট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে যেন রক্তধারা ঝরিতেছে—নলিনীর বুকের মধ্যের সদ্য রক্ত। বিপিনবাবুর আবার বাগানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

নলিনী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্বরে বলিল—"তবে বিদায় হই। মিছে তোমার সময় নষ্ট করছি।"—বিপিনবাবু কোমলভাবে বলিলেন—"বস।"

নলিনী বসিয়া উদাসদৃষ্টিতে বিপিনবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

বিপিনবাবু বলিলেন—"একটু চা আনাবো? খাবে?" "না, থাক।"

দেরাজ হইতে একটা চুরট বাহির করিয়া বলিলেন—"একটা খাও না।"

"তুমি খাও।"

চুরট রাখিয়া, প্রথমে ধীরে, পরে উত্তেজনার স্বরে বিপিনবাবু বলিতে লাগিলেন—"একটু আগে তোমায় যা বলেছি, বন্ধুত্বের খাতিরে আমার ছেলেপিলের প্রতি আমি অবিচার করতে পারব না—সে মত আমার বদলায়নি। তবে, আমি তোমার সমস্যা যে বুঝতে পারছিনে, তাও নয়। পৈত্রিক ভিটাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে অনশনে প্রাণত্যাগ, ওসব নাটুকে নভেলি কথা ছেড়ে দাও। এখন স্ত্রীপুরুষের ভরণপোষণের জন্যে তোমায় জীবিকার সন্ধানে বেরুতে হবে। মনে নেই? ছেলেবেলায় ইস্কুলে আমরা পড়তাম—উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতি, লক্ষ্মীঃ—উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হয়। না খেতে পেয়ে মরে যাব, আমার ছেলেমেয়ে মরে যাবে, এসব কি কথা? তুমি পুরুষমানুষ—এ কি পুরুষের কথা? এ স্ত্রীলোকের কাঁদুনি। মনকে দৃঢ় কর—কোমর বেঁধে দাঁড়াও। এই কলকাতা সহরে দশ লক্ষ লোকের আহার জুটছে—তোমার জুটবে না? উদ্যোগী হও—কখনই তোমার স্ত্রী পুত্রকে অনাহারে মরতে হবে না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিপিনবাবু অর্দ্ধমিনিট কাল নীরব হইলেন। তাহার পর স্বর নামাইয়া বলিলেন—"এ অবস্থায় নূতন বাড়ী খুঁজে সেখানে গিয়ে বসা, মাসে মাসে তার ভাড়া যোগানো—তোমার পক্ষে ভারি অসুবিধাজনক হবে। আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করছি। তোমার বসতবাড়ীখানি আমি এক বৎসরের জন্যে তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যদি চেষ্টা কর, আমার বিশ্বাস এই এক বছরেব মধ্যে তুমি নিজের অবস্থার অন্ততঃ এটুকু উন্নতি করে নিতে পারবে, যাতে বাড়ীভাড়া দিয়ে এই কলকাতা সহবে সপবিবাবে গরীব গৃহস্থের মত বাস করতে পার। আজ তারিখ থেকে একবৎসর পর্য্যন্ত তুমি ও বাড়ীতে বাস কর।"

কথা শেষ হইবামাত্র নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"বাল্যবন্ধু ধন্যবাদ! এই অসাধারণ দয়ার জন্যে ধন্যবাদ! পাদ্রীসাহেব, এই অযাচিত উপদেশের জনা ধন্যবাদ!"—বলিয়া নলিনী দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কক্ষের বাহির হইয়া বারান্দায় নলিনী ঘড়ি দেখিল, বেলা তখন পৌনে দশটা। ফটকের বাহির হইয়া হরিশ মুখুয্যের ষ্ট্রীট ধরিয়া দ্রুতপদে উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। ক্রমে যখন সে ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার ললাট ঘর্ম্মসিক্ত—ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঝুর ঝুর করিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল। একটা বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় নলিনী বিশ্রামার্থ দাঁড়াইল।

অদূরে চৌরঙ্গির অগণ্য সৌধশ্রেণী। ঘণ্টা বাজাইয়া হু হু করিয়া আফিসযাত্রীবোঝাই ট্রামগাড়ী ছুটিতেছে। কর্ম্মকোলাহলের অন্ত নাই। নলিনী দাঁড়াইয়া উদাসনেত্রে তাহাই দেখিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, এত লোক কর্ম্মস্থানে যাইতেছে—আমারই কোনও কর্ম্ম নাই। যদিও বিপিনবাবুর কথাগুলিকে সে অযাচিত উপদেশ বলিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছে, তথাপি সে উপদেশবাণী তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। নলিনী মনে মনে বলিতে লাগিল—"উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতিঃ লক্ষ্মীঃ" ঠিক কথা। কেন আমি খেতে না পেয়ে মরব? কেন আমার স্ত্রীপুত্র খেতে না পেয়ে মরবে? ঠিক কথা—আমি কর্ম্মের সন্ধান করব, যে কোনও কর্ম্ম হোক—আমার মান অপমান নেই। একবেলাও যদি আহার পাই, তাহলেও প্রাণধারণ হবে। তাও কি জুটবে না? অবশ্য জুটিয়ে নেব! আমায় বাঁচতেই হবে—আমায় স্ত্রী ছেলেমেয়েকে বাঁচাতেই হবে। দেখি ভগবান কি করেন।—নলিনী মনে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল।—

চৌরঙ্গির একটা ত্রিতল অট্টালিকার উপর, বড় বড় লাল অক্ষরে এক ইংরাজি দোকানে নাম পড়া যাইতেছিল। নলিনী সেইদিকে পদচালনা করিল।

দোকানের দ্বারে পৌঁছিয়া, দ্বারবানকে অনেক খোসামোদ করিয়া ত্রিতলের উপর বড়সাহেবের আফিসকক্ষে নলিনী নীত হইল। সাহেব খাতাপত্র লইয়া হিসাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। লোকটি পৌঢ়বয়স্ক—মস্তকে কেশ অত্যন্ত বিরল—গোঁফ দাড়ী কামানো। নলিনী প্রবেশ করিয়া বলিল—"গুড্‌মর্ণিং সার!"

সাহেব কাগজ হইতে চক্ষু তুলিয়া ইংরাজিতে বলিলেন—"গুড্‌মর্ণিং! কি চাই বাবু?"

"কর্ম্ম চাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি আমায় কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তবে আমি খাইতে পাই। নহিলে আমায় চুরি কিম্বা আত্মহত্যা দুইয়ের একটা করিতে হইবে।"

সাহেব নলিনীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া এবং তাহার এই অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করিলেন। একটু শঙ্কিতও হইলেন। ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত লোহার সিন্দুকটির দিকে স্বতঃই তাঁহার চক্ষু আকৃষ্ট হইল—সিন্দুক বন্ধই আছে। নিজের পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, চাবি যথাস্থানেই আছে। কি জানি, লোকটা যদি হঠাৎ আক্রমণ করে, এই ভাবিয়া ভৃত্য ডাকিবার ঘণ্টা বাজাইলেন। ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব তখন মিষ্টস্বরে বলিলেন, "বাবু, আমি বড় দুঃখিত হইলাম, উপস্থিত আমাদের আফিসে কোনও কার্য্য খালি নাই। তুমি বরং তোমার সার্টিফিকেটগুলির নকলসহ ডাকে আমার নামে একখানা দরখাস্ত পাঠাও। কর্ম্মখালি হইলেই তোমার বিষয় বিবেচনা করিব। গুড্‌মর্ণিং।"—ভৃত্যকে বলিলেন—"বাবুকো রাস্তা দেখাও।"

নলিনী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, বাহিব হইয়া গেল। পরে আরও একটি ইংরাজি দোকানের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আর সফলকাম হইল না। কোনও দ্বারবানের অনুগ্রহ হইল না, কোথাও তাহার অনুগ্রহ হইল ত সাহেবের ফুরসৎ হইল না।

নলিনী তখন ধীরে ধীরে ধর্ম্মতলার দিকে অগ্রসর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে কোনও বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র আফিসের ফটকের সম্মুখে উপনীত হইল। দেখিল, ফটকের বাহিরে একস্থানে কতকগুলি ইউরেশিয়ান ও ফিরিঙ্গি সাহেব দাঁড়াইয়া কি পড়িতেছে। নিকটে গিয়া বুঝিল, তক্তার উপর সেইদিনকার সংবাদপত্রখানি অংশে অংশে লগ্ন রহিয়াছে। অধিকাংশ লোকই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করিতেছে।

ইহাই ত নলিনী চায়। সেও মনোযোগসহকারে বিজ্ঞাপনগুলি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর তাহার মনে হইল, অন্ততঃ দুইটি বিজ্ঞাপন আছে যাহা তাহার কাজে লাগিতে পারে। অন্যান্য ব্যক্তিগণ, কেহ বা পকেটবুকে, কেহ বা ফাঁস কাগজে নিজ নিজ মনোমত বিজ্ঞাপনগুলি টুকিয়া লইতেছিল। কিন্তু নলিনীর পকেটে ত কাগজও নাই, পেন্সিলও নাই, কিনিয়া লইবার পয়সাও নাই। প্রথমে সে ভাবিল, বিজ্ঞাপন দুইটা মুখস্থ করিয়া লইবে। মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, তাহার মাথা ঠিক নাই, মুখস্থ হইতেছে না। তখন হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে দেখিল, একখানা থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল কাগজ পথে পড়িয়া রহিয়াছে। নলিনী সেটি কুড়াইয়া লইল। কাগজ সংগ্রহ হইল। পেন্সিলের কি হয়? একজন ইউরেশিয়ান সাহেব ময়লা টুপী ছিন্ন কোট পরিয়া, সেখানে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন টুকিতেছিল। লেখা শেষ হইবামাত্র, নলিনী তাহার নিকট গিয়া হিন্দিতে বলিল, "সাহেব, পেন্সিলটা একবার দিতে পার?"—এই অনুরোধে সাহেব চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "গেট্ আউট ইউ ড্যাম নিগার।"

মুহূর্ত্তমধ্যে নলিনী সাহেবের গণ্ডে এক প্রবল চটেপাঘাত করিল।

বাঙ্গালী হস্তের স্বদেশী চড় খাইয়া সাহেব প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। একটু পরেই, আস্তিন গুটাইয়া নলিনীকে সে আক্রমণ করিল। তখন দুইজনে ঘোর বাহুযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে শত শত পথচারী ইহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। কোথা হইতে এক পাহারাওয়ালা আসিয়া "ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া" বলিতে বলিতে ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অনেক কষ্টে দুইজনকে ছাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে একজন সার্জ্জেন্ট সাহেবও আসিয়া উপস্থিত হইল। ইউরেশিয়ানের নাসিকা হইতে রক্তপাত হইতেছে, নলিনীর বালাপোষ ও জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সার্জ্জেন্ট সাহেবকে দেখিবামাত্র ইউরেশিয়ান সাহেব বলিল, "এ নেটিভ আমায় মারিয়াছে।"

নলিনী উত্তেজিত স্বরে আধা বাঙ্গলা আধা হিন্দিতে বলিল—"আমি শুধু শুধু মারিয়াছি? অপরাধের মধ্যে উহার কাছে পেন্সিলটা একবার চাহিয়াছিলাম। বেটা আমায় বলে কি না হট্ যাও ইউ ড্যাম নিগার! আমি নিগার উনি কি? রঙ ত আমার উপরেও এক পোঁচ।"

সার্জ্জেন্ট সাহেব তখন কনেষ্টবলের সাহায্যে দুইজনকেই থানায় লইয়া চলিল। সেখানে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, উক্ত ইউরেশিয়ানের, কনেষ্টবলের এবং সার্জ্জেন্টের জবানবন্দি লইয়া, নলিনীর বিরুদ্ধে রাজধানীর পথে শান্তিভঙ্গ করিবার এক মোকর্দ্দমা কায়েম করিলেন। নলিনীর নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া বলিলেন—"আজ শনিবার। পরশু সোমবার লালবাজার পুলিস কোর্টে তোমার মোকর্দ্দমা হইবে। তোমার যদি কেহ জামিনদার থাকে তবে ২০০ টাকার জামিনে তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি।"

নলিনী বলিল, "আমার কেহ জামিনদাব নাই।" তখন তাহাকে হাজতে বন্ধ করা হইল।

শনিবার বাকী দিন ও রাত্রি, রবিবার দিন ও রাত্রি নলিনীর কি ভাবে যে কাটিল, তাহা সেই জানে, আর যিনি সকলের অন্তর্য্যামী তিনিই জানেন। হঠাৎ তাহার নিরুদ্দেশে, হেমাঙ্গিনীর কি অবস্থা হইয়াছে, সে নিশ্চয় ভাবিতেছে, মনের দুঃখে নলিনী হয়ত বিবাগী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নয় আত্মহত্যা করিয়াছে। হায়, সে অভাগিনী হয়ত অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছে। কে তাহাকে সংবাদ দিবে, কে দুইটা ভরসার কথা বলিবে? ছেলেটির মেয়েটির বা কি অবস্থা হইয়াছে? ঘবে তিনটি টাকা ছিল, এখনও তাহারা অনশনে পড়ে নাই। কিন্তু আদালতের বিচারে নলিনীর যদি জেল হয়, তবে তাহারা কি খাইবে, কোথায় যাইবে? হয়ত তাহার স্ত্রীকে ছেলেটি কোলে করিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া ভিক্ষা কবিতে বাহির হইতে হইবে। লৌহকারার মধ্যে বসিয়া বসিয়া নলিনী এইরূপ আকাশ পাতাল চিন্তা করে, আর তাহার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া সেই প্রস্তরময় কক্ষতল আর্দ্র হয়। রক্ষী তাহাকে নিয়মিত সময়ে খাদ্য দিয়া যায়, সে খাদ্য স্পর্শ করে মাত্র। রাত্রেও সে ঘুমাইতে পারে না, একাকী জাগিয়া বসিয়া থাকে।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় তাহাকে বিচারার্থ হাজির করা হইল। ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিবার পর তাহার ডাক পড়িল।—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নে, যথার্থ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই নলিনী বলিল।—ইউরেশিয়ান সাহেব সাক্ষ্য দিল, সে একটা বিজ্ঞাপন দেখিতেছিল, এমন সময়ে আসামী বিজ্ঞাপনটি আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। সাহেব তাই বিনীতভাবে আসামীকে একটু সরিতে অনুরোধ করে। ইহাতেই আসামী ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে ভয়ানক রকম মারিতে আবম্ভ করিল! প্রহারের চোটে তাহার নাক দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত বহিয়াছিল, কনেষ্টবল ও সার্জ্জেন্ট সাহেব দেখিয়াছে।—সাহেবের জবানবন্দি শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নলিনীকে বলিলেন—"তোমার উকিল আছে?"

"কেহ না।"

"জেরা করিবে?" "কি জেরা করিব?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন স্বয়ং নলিনীর উক্তমত পেন্সিল চাওয়া প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না ইউরেশিয়ান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সে বলিল, ও সকল কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।—তারপর কনষ্টেবল ও সার্জ্জেন্ট সাহেব যেমন যেমন দেখিয়াছিল, তাহা সাক্ষ্য দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাহাকেও সাফাই সাক্ষী দিতে চাও?"—নলিনী বলিল—"প্রকৃত ঘটনা রাস্তার সবাই দেখিয়াছিল—সবাই বলিবে আমার কথা সত্য।"

"তাহাদের কাহারও নাম ঠিকানা বলিতে পার?"

"কি করিয়া বলিব?"—তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঁচ মিনিট ধরিয়া রায় লিখিলেন। অবশেষে বলিলেন—"তোমার ২৫ টাকা জরিমানা, না দিলে এক সপ্তাহ কয়েদ।"

কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর নলিনীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'টাকা দিবে?"

নলিনী বলিল—"কোথায় পাইব?"—কোর্টের কনষ্টেবল তখন নলিনীকে জেলে লইয়া যাইবার জন্য কাঠগড়ায় গেল। এমন সময় কে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"হুজুর, আসামী আমার বন্ধু, আমি জরিমানার টাকা দাখিল করিতেছি।"—নলিনী বিস্মিত হইয়া লোকটির পানে চাহিল। দেখিল একজন ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ। মাথায় চেরা সীঁথি, চোখে সোনার চশমা, গায়ে একজোড়া মূল্যবান শাল। মুখ, নলিনীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব।

যুবক টাকা দাখিল করিয়া নলিনীকে মুক্ত করিয়া লইলেন। তাহার পর নিকটে গিয়া চুপি চুপি তাহাকে বলিলেন—"আমার সঙ্গে আসুন। এখন কোথাও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।"

নলিনী মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়া, রাজপথের নিকট আসিয়া নলিনী দেখিল একখানি ব্রূহাম গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি বলিলেন—"উঠুন।"—নলিনীর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য যে বাড়ী গিয়া স্ত্রী পুত্রাদির সংবাদ লওয়া—তাহা সে বিস্মৃত হইল। পুত্তলিকার ন্যায় সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তৎপশ্চাৎ বাবুটিও উঠিলেন। গাড়ী তখন দ্রুতবেগে শিয়ালদহ অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গাড়ীতে সমস্তক্ষণ বাবুটি নীরবে বসিয়া রহিলেন—নলিনীরও মনের অবস্থা কথপোকথনের উপযোগী ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া কেবল তাহার বিপন্ন হতাশ্বাস স্ত্রী কন্যার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কেবল মাঝে মাঝে এক একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, দেখিতেছিল গাড়ী কোথায় যাইতেছে।

গাড়ী ক্রমে শিয়ালদহ পুল পার হইয়া বেলিয়াঘাটায় প্রবেশ করিল ও ক্ষুদ্র বাগান-যুক্ত একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। বাবুটি নলিনীকে বলিলেন—"আসুন।"

নলিনী অবতরণ করিয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিল। বাবুটি বলিলেন—"আপনার স্নান আহার বোধ হয় কিছুই হয়নি?"

"না, স্নান হয়নি। বেলা ন'টার সময় আমায় খাবার এনে দিয়েছিল, কিন্তু আমি খাইনি। আমি হাজতে ছিলাম কিনা।"

"তা জানি"—বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন—"বেয়ারা!"

"হুজুর"—বলিয়া বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাবুকো গোসলখানামে লেযাও। একঠো ধোতি নিকাল দেও।"

নলিনী বলিল—"না থাক। আমি বাড়ী গিয়েই স্নানাহার করব। আজ তিন দিন আমি বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ। আমার খবর না পেয়ে তারা যে কি অবস্থায় আছে তা ভগবানই জানেন।"

"বাড়ীতে আপনার কে কে আছে?"

"আমার স্ত্রী আছেন, একটি মেয়েও একটি ছোট ছেলে আছে, একজন ঝি আছে।"

"আপনার বাড়ী কোন্‌খানে?"

"বউবাজারে, ব্যানার্জ্জি লেনে।"

"এখনি যাবেন?"

নলিনী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার মনটা ভারি খারাপ রয়েছে। আপনি আজ জেল থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন—আমি জীবনে কখনও ভুলব না। অনুমতি করেন যদি, আমি ওবেলা আবার এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"—

বাবুটি একটু দুঃখিত স্বরে বলিল—"শুধু মুখে যাবেন? একটু কিছু জলটল খেয়ে যান।"

নলিনী বলিল—"যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"কি বলুন?"

"আপনার নামটা কি, আর কেনই বা আমার জন্যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করলেন?"—বাবুটি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"একটা কথা কি মশাই? এ যে দুটো কথা হয়ে গেল!"—ভৃত্য রূপার আলবোলায় তামাক আনিয়া দিল। দুই চার টান টানিয়া নলিনীর হাতে দিয়া বাবু বলিলেন—"খান।"

নলিনী ধূমপান আরম্ভ করিল। বাবুটি বলিলেন—"আমার নাম শ্রীভুবনেশ্বব রায়। বাড়ী রাজশাহী জেলায়।"

"রাজশাহী জেলায় কোথায়?"

"বন্দীপুর গ্রামে।"—নলিনী ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনিই কি বন্দীপুরের বিখ্যাত জমিদার ভুবনেশ্ববরাবু?"

ভুবনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"খ্যাতি-ট্যাতি কিছু নেই। আমি সামান্য লোক।"

ব্রাহ্মণ ঠাকুর নলিনীর জন্য সরবৎ ও বেকাবীতে কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলেব উপব রাখিল। পিপাসায় নলিনীব কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, সববৎটুকু পান করিযা তাহাব দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। একটি রসগোল্লা হাতে তুলিয়া বলিল—"আমাব দ্বিতীয় কথাটির ত উত্তর দিলেন না?"

ভুবনবাবু বলিতে লাগিলেন—"আপনার্ব সে ঘটনা শনিবাবে হয়েছিল না?—কাল রবিবার কাগজে আমি পড়লাম। পড়ে মনটায় বড় আহ্লাদ হল। আমরা বাঙ্গালীরা আত্মসম্মানের জ্ঞানটা এমন হাবিয়ে বসেছি যে পথেঘাটে প্রতিদিন অপমানিত হচ্ছি, অথচ তার কোন প্রতিকার করতে পারিনে। কাগজে লেখা ছিল, আপনি সেই ফিরিঙ্গিটার কাছে পেন্সিলটা একবার চেয়েছিলেন, তাই সে আপনাকে ড্যাম নিগার বলে। তখনি আপনি তার নাকে— "

নলিনী বাধা দিয়া বলিল—"নাকে নয়, গালে।"

"গালে? লেখা ছিল তার নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছিলেন।"

"ঘুষি নয়, চড়। তার পর যখন সে আমায় আক্রমণ করলে, তখন ঘুষি চালিয়েছিলাম বটে।"—ভুবনবাবু হা হা কবিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বেশ কবেছিলেন, উত্তম করেছিলেন। দেখবেন, সে ফিবিঙ্গি ইহজীবনে আর কোন বাঙ্গালীকে ড্যাম নিগার বলবে না। হ্যাঁ—তারপর কি বলছিলাম? কাগজেই লেখা ছিল, সোমবার পুলিশ আদালতে আপনার মোকর্দ্দমা হবে। ভাবলাম যাই দেখি লোকটার চেহারা কি রকম। ভেবেছিলাম, মস্ত একটা দীর্ঘাকৃতি জোয়ান, মোটা মোটা হাড়, মোটা হাতের আঙ্গুল, এইরকম একজন বীরকে দেখব। ও হরি, আপনি যখন ডকে এসে দাঁড়ালেন, দেখি যে এক তালপাতার সেপাই। কথাটা ঠিক— গায়ের জোবে বীর হয় না—মনের জোরেই বীর। এই ত

রাশিয়ানরা, জাপানীদের তুলনায় এক একটি অসুর বিশেষ—তবু তাঁরা হেরে মরলেন কেন?"

নলিনী নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। জলখাবার শেষ করিয়া পান চিবাইতেছিল। ঘড়িতে ঠং করিয়া একটা বাজিল। নলিনী উঠিয়া বলিল—"যদি অনুমতি করেন তবে এখন আসি। সন্ধ্যার পর আসব এখন।"

ভুবনবাবু বলিলেন—"তখন ত আমি বাড়ী থাকব না। আপনি বরং কাল সকালবেলা আটটার সময় আসবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কিছু মনে না করেন।"

"কি?"

"আপনি চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখছিলেন, চাকরি পেলে করবেন?"

"করব বইকি!"

"কত টাকা মাইনে হলে স্বীকার করেন?"

"আমার বড় দুরবস্থা। দুবেলা দুমুঠো ডাল ভাতের যোগাড় হয়, এমন চাকরিও পেলে আমি করি।"

"আর কখন চাকরি করেছেন?"

"না।"

"কতদূর পড়েছিলেন?"—"এন্ট্রান্স ফেল। হেয়ার স্কুলে পড়তাম।"—ভুবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এমন অবস্থায়, মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকার বেশী চাকরি যোগাড় করা শক্ত। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি। কাল বেলা আটটার সময় আসবেন।"

নিশ্চয়ই আসিব প্রতিশ্রুতি দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিয়া নলিনী গৃহাভিমুখে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নলিনী গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র ঝি বলিয়া উঠিল—"তোমার কি আক্কেল বল দেখি বাবু? তুমি আজ তিন দিন বাড়ীছাড়া, বউমা কেঁদে কেটে জ্বর করে বসেছে, আমরা ভাবনায় ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছি, দিন কাটে ত রাত কাটে না, রাত কাটে ত দিন কাটে না, পুলিস আদালত থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় আবার চলে গেলে বল দিকিন?"

"জ্বর হয়েছে নাকি?"—বলিতে বলিতে নলিনী দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল। ঝি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।—শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নলিনী দেখিল, তাহার স্ত্রী খোকাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, খুকি বসিয়া একটা বাটিতে করিয়া মুড়কি খাইতেছে।

নলিনী বলিল—"তোমার জ্বর হয়েছে?"

হেমাঙ্গিনী নীরবে খোকাকে স্বামীর কোলে দিয়া, মাথাটি হেঁট করিয়া চক্ষে অঞ্চল দিল।

খুকি মুড়কি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া, ছলছল নেত্রে পিতার পানে চাহিয়া রহিল।—নলিনী স্ত্রীর চক্ষু হইতে অঞ্চল অপসৃত করিয়া বলিল—"কেঁদ না কেঁদ না, চুপ কর। জ্বর কি এখনও রয়েছে হিমু?"—সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল।—হেমাঙ্গিনী ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—"জ্বর নেই।"

নলিনী গিয়া বিছানায় উপবেশন করিল। ঝিব তখন আবার মুখ খুলিল। সে বলিতে লাগিল—"জ্বর হবে না? এসে যে দেখতে পেয়েছ, এই ঢের। পরশু তুমি সকালবেলা বেরিয়ে গেলে, সমস্ত দিন এলে না, আমরা কোনও খবরই পেলাম না। সমস্ত দিন বউমা নাইলে না খেলে না। সাড়ে চার আনা পয়সা টেরাম ভাড়া দিয়ে আমার ভাসুরপোকে তোমায় খুঁজতে ভবানীপুরে পাঠান হয়েছিল, এসে বলল তুমি দশটার সময়ই বিপিনবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ। এই না শুয়ে কেঁদে কেঁদে সন্ধোবেলা বউমার জ্বর হল। কি

জ্বরের ধুম—কি কাঁপুনি! গায়ে দুখান নেপ চাপা দিয়ে আমি চেপে ধরে রইলাম, তবু কাঁপুনি যায় না। গা যেন আগুন। কেঁপে কেঁপে শেষে জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তার পর আমি উনুন জ্বেলে বক্‌নোতে করে দুটো আলুভাতে ভাত রেঁধে ছেলেমেয়েটাকে খাওয়াই। আহা সারাদিন বাছারা কিছু খায়নি, কিছু খায়নি—"—খুকী বাধা দিয়া বলিল—"কেন ঝি, তুই ত আমাদের মুড়কি কিনে এনে দিয়েছিলি, আমরা ত খেয়েছিলাম।"

নলিনী বলিল—"তুমি দাঁড়িয়ে থেক না হিমু, দুর্ব্বল শরীর, বিছানায় এসে বস।"

হেমাঙ্গিনী খোকাকে কোলে লইয়া মেঝেতে বসিল।

নলিনী বলিল—"আমি পুলিস আদালতে গিয়েছিলাম সে খবব কি করে পেলে ঝি?"

ঝি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল--"তার পর বলি শোন না। ভোরবেলা জ্বরটা ছেড়ে গেল। বেলা ৮টার সময় বোসেদের বাড়ী গিয়ে মেঝবাবুকে বললাম—বাবু, আমাদের ত এইরকম বিপদ, বউমা ত কেঁদে কেটে জ্বর করে বসেছে, আমাদের বাবু কোথায় গেল, খবর নিতে পার? মেঝবাবু ত গেবাজ্যিই করে না—কথাই কানে তোলে না, শেষে বললে—কোথা মদ খেয়ে পড়ে আছে, আমি কোথা খুঁজব বল। অনেক বলা কওয়াতে শেষে বললে, ঝি, এ কলকাতা সহর, কোথা তাকে খুঁজে পাব? আচ্ছা আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।—তিন চার বার গিয়ে মেঝবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবু কোনও খবর পেলে? বললে—না ঝি, কোনও খবর পাইনি। সেই কথা এসে বউমাকে বললাম—বউমা ত আবার কান্না আরম্ভ করলে! বলে আমি বিষ খাব—আমি গলায় দড়ি দেব—

"বাঁধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল—"হ্যাঁ—তুই আর জ্বালাসনে ঝি। যা, শীগ্‌গিব উনুনটা ধরিয়ে দিগে। রান্না চড়াই।"

ঝি বলিল—যাচ্ছি মা যাচ্ছি। তার পর জান বাবু, আজকে সকালে ৮টার সময় মুড়ি মুড়কি কিনে এসে খোকাখুকীকে খাইয়ে, বউমাকে বললাম, বউমা, দু আনার পয়সা দাও বাজার থেকে চুণো মাছ কিনে আনি, মাছের ঝোল ভাত রেঁধে খোকাখুকীকে খাওয়াও, দুদিন খাওনি, তুমিও দুটো খাও। বউমার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল—বললে—ঝি, আমার মাছ খাওয়া ভগবান রেখেছেন কি না তা ত জানিনে। আমি বললাম চুপ কর চুপ কর, অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই, ঘেন্নায় মরি ঘেন্নায় মরি। তার পর পয়সা নিয়ে বাজারে গেলাম মাছ কিনতে, মাছ নিয়ে ফিরছি, পথে দেখা হল মুখুয্যেদেব ছেলে বিজয়ের সঙ্গে। বিজয় বললে—জান ঝি, তোমাদের বাবু পরশু একটা সাহেবকে খুব মার দিয়েছে, বেদম মার! বলে পোড়ারমুখো ছেলে হা হা করে হাসতে লাগল। আমি বললাম—ও বিজয়, আমাদেব বাবু কোথায় বিজয়? বিজয় বললে, তোমাদের বাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। জান ঝি, তোমাদের বাবু সাহেবটার নাকে এমন ঘুষি মেরেছিল যে তার নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়েছে।—বলে আব পোড়ারমুখো ছেলে হা হা করে হাসে। আমি বললাম, ও বিজয় আমাদের বাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখেছে? সে বললে তা কি জানি, আজ লালবাজারে পুলিস আদালতে তোমাদের বাবুর মোকর্দ্দমা হবে, আমরা অনেক ছেলে দেখতে যাব, আজ আর ইস্কুল যাচ্ছিনে। বলে, হাসতে হাসতে চলে গেল। নয় বউমা, আমি এসে বলিনি?"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"হ্যাঁ বলেছিলে। সে সব কথা পরে হবে এখন ঝি, তুমি কয়লায় আগুন দিয়ে বাজার থেকে দু পয়সার চিনি আন। বাবুকে একটু সরবৎ করে দিই, জল খান।"

ঝি চলিয়া গেল। নলিনী বলিল—"জলখাবার আনতে দিতে হবে না—আমি এইমাত্র জলখাবার খেয়ে এসেছি।"—নলিনী তখন সংক্ষেপে, শনিবার হইতে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিল—"বোধ হয় অনাহারে মরতে হবে না। সেই বাবুটি বলেছেন, ত্রিশ চল্লিশ

টাকা মাইনের একটি চাকরি তিনি আমায় জুটিয়ে দেবেন। দেখি কি হয়।"—হেমাঙ্গিনী বলিল—"নিশ্চয় হবে। ভগবান কখনই আমাদের ভুলবেন না। তুমি এস, স্নান করে ফেল।"

স্নান করিতে করিতে ঝির নিকট বাকী ইতিহাসটুকুও নলিনী অবগত হইল। মোকর্দ্দমার কথা শুনিয়া বোসেদের মেঝবাবুর কাছে আবার সে গিয়াছিল। মেঝবাবু সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য মারপিটের মোকর্দ্দমা, বেশী কি আর হইবে, বড় জোড় বিশ ত্রিশ টাকা জরিমানা হইতে পারে। তাই শুনিয়া ঝি নিজের পুরাতন বালাজোড়াটা বন্ধক বাখিয়া অনেক কষ্টে পঞ্চাশটি টাকা সংগ্রহ করিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিতে কবিতে পুলিস আদালতের দিকে যাইতেছিল। কাছাকাছি পৌঁছিয়া দেখিল বাবু একজন অপরিচিত লোকের সহিত আদালতের সিঁড়ি হইতে নামিয়া গাড়ী করিয়া কোথা চলিয়া গেলেন। ও বাবু ও বাবু বলিয়া ঝি ডাকিয়াও ছিল, কিন্তু বাবু তাহা শুনিতে পান নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ৮টাব সময় নলিনী গিযা ভুবনেশ্বরবাবুব সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ভুবনেশ্বরবাবু নলিনীকে দেখিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন—"আসুন—আসুন। বসুন। তার পর, বাড়ী গিয়ে কাল কি দেখলেন? তাঁরা খুবই উতলা হয়েছিলেন বোধ হয়?"

"খুব উতলা হয়েছিলেন। তবে, কাল ৮টা থেকে আমার খবরটা তাঁরা পেয়েছিলেন, প্রাণে বেঁচে আছি জানতে পেবেছিলেন।" বলিযা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই নলিনী বর্ণনা কবিল। তাহার এই পারিবারিক করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভুবনবাবুর চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল।

নলিনীর কথা শেষ হইলে ভুবনবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়া বলিলেন—"তামাক খাবেন? ওরে, তামাক দে।"

নলিনী বলিল—"আমার সে বিষযটা—"

ভুবনবাবু বলিলেন—"চাকরির কথা জিজ্ঞাসা কবছেন? কাল সন্ধ্যার পর এ জন্যেই আমি বেরিযেছিলাম। শ্যামবাজাবে যোগনীবাবু বলে আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি ব্রাউন জোন্স কোম্পানির বাড়ীর হেডক্লার্ক। আফিসে তাঁর ভারি খাতিব, সাহেবেরা একেবারে হাতধরা! আফিস খুব ভাল, উন্নতিও শীগ্‌গির শীগ্‌গির হয়। যোগীনবাবু বললেন—তাঁদের আফিসে এ সময় কোনও চাকরিই খালি নেই। তবে কাজ অনেক বেড়েছে, সাহেবদের বলে কয়ে আপনাকে পেড় এপ্রেন্টিস কবে ঢুকিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু মাইনে মোটে পঁচিশটি টাকা।"

শুনিয়া নলিনী বড় বিমর্ষ হইল। বলিল—"পঁচিশ টাকায় কি করে চলবে?"

"তাই ত বলছি। আজকাল চাকরির বাজার যা পড়েছে সে আর কহতব্য নয়। তবে যোগীনবাবু বললেন—এক বচ্ছর ঐ পঁচিশ টাকা মাইনেতে এপ্রেন্টিসি করে, আপনি যখন পাকা হবেন, তখন আপনার মাইনে হবে পঞ্চাশ। বছরে পাঁচ টাকা বেড়ে বেড়ে পাঁচ বছবে হবে পঁচাত্তব। এইটিই ওদের সব চেয়ে নীচু গ্রেড—ফার্ষ্ট গ্রেড হচ্ছে তিনশো টাকা। আফিস খুবই ভাল—অনেক গভর্ণমেন্ট আফিসের চেয়ে ভাল। কিন্তু প্রথম বছরটা কিছু কষ্ট। আমি ত বলি আপনি ঢুকে পড়ুন—আখেরে আপনাব ভাল হবে।"

নলিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"একবেলা আহার করলে, পঁচিশ টাকা মাইনেতে কোনও রকমে কুলোতে পারে।"

"দৈনিক আপনার বাসাখরচ কত হলে নির্ব্বাহিত হতে পারে?"

"একটা টাকা প্রায়।"

"মাসে ত্রিশ টাকা।"

"ধোপা আছে, নাপিত আছে, কাপড়টা জামাটা আছে।"

ভুবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"ছেলে পড়াবেন? যাদের অল্প আয়, তারা অনেকেই প্রাইভেট টিউশন করে সংসার চালায়।"

"পেলে করি।"

"তবে এই বাড়ীতেই করতে পারেন। আমার ভাগনেটি এখানে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। সকালবেলা ইংরাজি পড়াবার, অঙ্ক কষাবার তার মাষ্টার আছে। সন্ধ্যেবেলায় তাকে বাঙ্গলা পড়াবার জন্যে একজন মাষ্টার খুঁজছিলাম। দশ টাকা মাইনে। এই সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত আর কি। আপনি যদি স্বীকার করেন তা হলে—"

নলিনী বলিল—"অবশ্য স্বীকার করব। আপনি আমার যে রকম উপকার করেছেন—আপনার ভাগনেকে পড়িয়ে আমার টাকা নেওয়াই উচিত নয়। কিন্তু উপায় কি? আর, আমাকে নিরুপায় দেখেই ভাগনেকে পড়াবার নাম করে আপনি আমায় সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাও আমি বুঝতে পারছি। আমি আর আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব? ঈশ্বর আপনার ভাল করুন।"—তামাক আসিল। ভুবনবাবু নলটি নলিনীর হাতে দিয়া বলিলেন—"না না—আপনি সে রকম মনে করবেন না। উপকার টুপকার কিছুই নয়। একজন লোক আমার দরকার, যে কাজ কববে, তাকেই টাকা দিতে হবে। অন্যকে না দিয়ে না হয় আপনাকেই দিলাম।"

উভয়ে তামাক খাইতে খাইতে কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। নলিনী অবগত হইল, এ বাড়ীখানি ভুবনেশ্বরবাবুর বিধবা ভগিনীর। তিনিই ইহাদের অভিভাবক—মাঝে মাঝে আসিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া যান। একজন পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এখানে থাকিযা ইহাদেব রক্ষণাবেক্ষণ করে। ভুবনবাবু আর দুই তিন দিন মাত্র কলিকাতায় আছেন—তাহার পর বন্দীপুবে ফিরিয়া যাইবেন। আবার আসিতে বোধ হয় সেই চৈত্র মাস। আগামী পবশু ইংরাজি মাসের ১লা তারিখ। স্থির হইল, পরশু হইতেই নলিনী উভয় কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। অদ্য বিকালে ভুবনবাবু নলিনীকে লইয়া হেডক্লার্কবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন।

উঠিবার সময় ভুবনবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, ওবেলা পাঁচটার সময় তা হলে আসবেন। হ্যাঁ—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। আপনার উপস্থিত অবস্থার কথা ত সমস্তই খোলাখুলি আমায় বলেছেন। আপনি মাইনে যা পাবেন, আফিসের পঁচিশ টাকা আমার দশ টাকা—সে ত মাসকাবার হলে? এ একমাস কি করে চালাবেন?"

নলিনী মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"আর অন্য কি উপায় আছে? ভাবছি ঝির ধাব করা সেই টাকা থেকে কিছু কিছু ধার করে এ মাসটা চালাই।"

ভুবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমার পরামর্শ শুনবেন?"

"বলুন। আপনি যা বলবেন তাই আমার শিরোধার্য্য।"

"ঝির ধার করা টাকা নিয়ে কাজ নেই। ওতে কেবল সুদই বেড়ে যাবে—শোধ হবার আশা বড় থাকবে না। পরশু সন্ধ্যেবেলা আমার ভাগনেকে পড়িয়ে, আপনি একটি টাকা নিয়ে যাবেন। এই রকম রোজ সন্ধ্যেবেলা একটি করে টাকা নিয়ে যাবেন। ত্রিশ দিনে ত্রিশ টাকা হবে—তার মধ্যে দশটি টাকা আপনার মাইনে—কুড়িটি টাকা ঋণ। আপনি মাসকাবারে আফিস থেকে যে পঁচিশটি টাকা মাইনে পাবেন, তা থেকে কুড়িটি টাকা ঋণ আপনি শোধ করবেন। আপনার নিজস্ব পাঁচটি টাকা থাকবে, তাতে আপনার পাঁচদিনের বাসাখরচ হবে। ষষ্ঠ দিন থেকে, আপনি আবার রোজ একটি করে টাকা নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় মাসের শেষে, আপনার পনেরটি টাকা ঋণ হবে, আফিসের মাইনে পেয়ে তা আপনি পরিশোধ করবেন। বুঝেছেন ত? ছ মাস এই রকম চললে, আপনার আফিসেব মাইনে এখানকার মাইনে পঁয়ত্রিশটি টাকাই আপনি ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন।"

"আপনার একমাসের বাসাখরচ ত্রিশটি টাকা, আমি আগাম না দিয়ে, রোজ একটি করে টাকা দেবার প্রস্তাব করেছি, এ থেকে আপনি বোধ হয় ভাবছেন, আপনাকে অবিশ্বাস করেই আগাম দিচ্ছিনে?"—নলিনী ব্যগ্রস্বরে বলিল—"আমি এত অধম অকৃতজ্ঞ নই—তা মনে করিনি। আপনি আমার ভালর জন্যেই এ রকম বন্দোবস্ত করছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

"আপনার অবস্থা চিরদিনই ভাল ছিল। এখনই আপনি এই দুরবস্থায় পড়েছেন। হাতে এক সঙ্গে টাকা পেলে বুঝেসুঝে খরচ করা আপনার পক্ষে শক্ত হবে—শেষে ঋণে জড়িয়ে পড়বেন। সেইটি যাতে এড়াতে পারেন, এমন বন্দোবস্ত হওয়া চাই। আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না—হতাশ হবেন না। হিন্দুস্থানীরা বলে—ছোড়িও না হিম্মৎ, বিসরিও না হরিনাম।—হিম্মৎ বলে সাহসকে। হিম্মৎটি রাখবেন,—আর ভগবানকে ভুলবেন না—আপনার ভাল হবে।"

নলিনী তখন ভুবনেশ্বরবাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রাউন জোন্স কোম্পানীর আফিসের বড়বাবু যোগীন্দ্রবাবু দত্ত জাতিতে কায়স্থ। লোকটির বয়স আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু সার্ভিস বহি অনুসারে পঁয়তাল্লিশ মাত্র। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম; দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল, মস্তকের সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছে, গোঁফগুলি কাঁচা পাকা—এখনও কাঁচার অংশই বেশী—দাড়ি কামানো। কালো সার্জ্জের ইজার চাপকান পরিয়া, তদুপরি ভাঁজ করা একযোড়া শাল ফেলিয়া, শামলা মাথায় দিয়া ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে শ্যামবাজার হইতে আফিসে আসেন। আফিসে আসিয়া, শালযোড়াটি সযত্নে পাট করিয়া দেরাজের মধ্যে রাখিয়া দেন। আর রাখিয়া দেন, পকেট হইতে বাহির করিয়া, দাগকাটা লেবেল আঁটা একটি ছয় আউন্স ঔষধের শিশি। শরীরটা যখন অত্যন্ত "ম্যাজ্ ম্যাজ্" করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই ঔষধ দুই এক দাগ পান করেন। ঔষধটা নিশ্চয়ই খুব তীব্র—কারণ পান করিয়াই মুখটা বিকৃত করেন; তখন রুমাল দিয়া ওষ্ঠযুগল উত্তমরূপে মুছিয়া, পকেট হইতে গোটা দুই ছোট এলাচ বাহির করিয়া তাহাব দানাগুলি চর্ব্বণ করিতে থাকেন।

আফিসে বড়বাবুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বড়সাহেব একেবারে তাঁহার হাতধরা—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এমন ক্ষমতা না থাকিলে কি এক কথায় নলিনীর চাকরি করিয়া দিতে পারিতেন? বড়বাবু যাহা বলেন, বড়সাহেব তাহাই বাইবেল-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই কারণে অধস্তন কেবাণীগণ সর্ব্বদাই তাঁহার খোসামোদ করিয়া থাকে।

পয়লা তারিখে বেলা দশটাব সময় আসিয়া নলিনী নূতন কার্য্যে ভর্ত্তি হইল। পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিস করিয়া, বাড়ী গিয়া হাত মুখ ধুইয়া, আবাব ছয়টাব পর ছেলে পড়াইতে বাহির হইল। দৈনিক খরচের জন্য একটি টাকা লইয়া রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। এত পবিশ্রম কবা কোনও কালে তাহার অভ্যাস ছিল না—প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হইত। ক্রমে সহিয়া যাইতে লাগিল।

নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন স্মরণ হইলেই তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত। কিন্তু গতানুশোচনাব সময় সে বড় পাইত না। আফিসে সারাদিন কাজের ভীড়—সন্ধ্যার পরেও তাহাই—রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িত—একঘুমে রাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং এক হিসাবে এই পরিশ্রম তাহার আহত হৃদয়ের পক্ষে পরম ভেষজস্বরূপ হইল।—এইরূপে এক মাস গেল, দুই মাস গেল, ছয়টি মাস অতীত হইল। এই ছয় মাসে একদিনও সে মদ্য স্পর্শমাত্র করে নাই। চাকরির প্রথম প্রথম মদের

দোকানের সম্মুখ দিয়া পথ চলিবার সময় প্রতিবার তাহার মনে প্রলোভন উপস্থিত হইত— ঢুকিয়া পড়ি। কিন্তু তখনই পকেটে হাত দিয়া দেখিত পকেট শূন্য। গৃহে দুই চারি আনা থাকিত বটে কিন্তু পুত্রকন্যার শুষ্কমুখ ও জীর্ণবস্ত্র স্মরণ করিয়া, সে দুই চারি আনা আনিয়া আর ও কার্য্যে অপব্যয় করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। এইরূপে ক্রমে তাহার মনের শক্তি বাড়িতে লাগিল, রিপুর শক্তি প্রতিদিন ক্ষীণতর হইতে লাগিল। এখন পথ চলিতে চলিতে, অন্যমনে কখন সে মদের দোকান পার হইয়া আসে তাহা সে জানিতেও পারে না।

সপ্তম মাসের প্রথমে, তাহার উপার্জ্জনের পঁয়ত্রিশটি টাকা সম্পূর্ণ তাহার হাতে আসিল। প্রথম রবিবার মাছ তরকারি ছাড়া, মাসের খরচের উপযোগী অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই কিনিয়া রাখিল।

ইতিমধ্যে ভুবনবাবু তিন চারিবার আসিয়াছিলেন, দুই একদিন করিয়া থাকিয়া ফিরিযা গিয়াছেন।—পূজার পর কার্ত্তিক মাসের শেষে ভুবনেশ্বরবাবু আবাব কলিকাতায় আসিলেন। নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এপ্রেন্টিসির এক বছর পুরতে আর দেরী কত?"—নলিনী বলিল, "দশ মাস হল প্রায়—আর দু মাস।"

"দু মাস পরে আপনার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হবে ত?"

"এক মাস পরে, বড়বাবু আমার সম্বন্ধে এক মন্তব্য লিখবেন, আমি কার্য্যক্ষম কি না। যদি কার্য্যক্ষম বলে লেখেন তবে আর এক মাস পবে আমার পদ পাকা হবে, মাইনেও পঞ্চাশ টাকা হবে।" "আর যদি তা না লেখেন?"

"যদি না লেখেন, তা হলে বছর পূর্ণ হলেই আমার চাকরি খতম হয়ে যাবে।"

"আপনার কাজকর্ম্মে বড়বাবু সন্তুষ্ট আছেন ত?"

"এখন পর্য্যন্ত অসন্তোষের কোনও লক্ষণ ত দেখিনি।"

"বেশ বেশ। তা, উনি মন্তব্য ভালই লিখবেন বোধ হয়। লোকটি ভাল।"

পরদিন রবিবার ছিল, নলিনীকে ভুবনবাবু আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন। নলিনী স্নানাদি করিয়া নয়টার সময়েই আসিয়া দর্শন দিল। আহারাদি করিতে বেলা বারোটা হইল। ইতিমধ্যে দুইজনে বসিয়া অনেক গল্পগুজব হইল—আফিসের কথা, বড়বাবুব কথা, নলিনীব সাংসারিক কথা। ভুবনবাবু বলিলেন—"তা হলে, ও বাড়ীতে আপনি ত আব মাস দুই আছেন। তার পর একটা ভাড়াটে বাড়ী খুঁজতে হবে ত?"

"তা হবে বইকি। এই বেলেঘাটাতেই আমি একটি ছোট বাড়ী দেখে রেখেছি। এখন সেটি খালি নেই—মাস দেড়েক পরে খালি হবে। সেইটি নেব স্থিব করেছি।"

"কোন্‌খানে?"

"আপনার বাড়ী থেকে বেরিয়ে, খানিকটে বাঁ হাতি গিযে উত্তর দিকে যে গলিটি গেছে, সেই গলির মধ্যে ছোট বাড়ী, উপরে দুখানি নীচে দুখানি ঘর। নীচে একটি কল আছে।"

"কত ভাড়া?"

"পনেরো টাকা।"

"দু মাস পরে আপনার উপার্জ্জন যেমন পঁচিশটি টাকা বাড়বে, তেমনি খরচও পনেরোটি টাকা বেড়ে গেল।"

"তা কি আর করা যাবে! কায়ক্লেশে কোনও রকম করে দিনপাত করা।"

দুইদিন পরে ভুবনেশ্বরবাবু নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গেলেন। এবার তিন মাসের কম আর তাঁহার কলিকাতায় আসা হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

ইহার কিছুদিন পরেই নলিনী লক্ষ্য করিল, বড়বাবু তাহার প্রতি পূর্ব্বের মত আর সদয় ব্যবহার করেন না। একটু ছুতা পাইলেই নলিনীকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দেন। নলিনীর কোনও কাজই তাঁহার পছন্দ হয় না।—নলিনীর কাজে সামান্য একটু ভুলচুক হইলেই বড়বাবু তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ বাবু, এ রকম করলে কিন্তু তোমার দ্বারা এ আফিসের কাজ হবে না।"—এইরূপে খিটিমিটি প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিল।

সোমবার দিন একজন সহকর্ম্মী বিনোদবাবু নলিনীকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনার প্রতি বড়বাবুর অসন্তোষের কারণটা টের পেয়েছি।"

নলিনী বলিল, "কি বলুন দেখি?"

"আপনি বন্দীপুরের জমিদার ভুবনেশ্বরবাবুকে চেনেন?"

"খুব চিনি।"

"তিনি কবে এসেছিলেন?"

"এই সম্প্রতি এসেছিলেন। এক হপ্তা হল ফিরে গেছেন।"

"তিনি আমাদের বড়বাবুর একজন বন্ধু, তা জানেন?"

"জানিনে আবার? তিনিই ত বড়বাবুকে ধরে আমার চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন।"

"জানেন যদি, তবে এমন কাজ কেন কঁরলেন?"

নলিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি করেছি?"

"কি করেছেন ভেবে দেখুন। তাঁর কাছে আপনি বড়বাবুর সম্বন্ধে কি বলেছিলেন—তাইতেই আগুন লেগে গেছে।"—নলিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি কি বলেছি?"

"আপনি নাকি বলেছেন বড়বাবু বদ্ধ মাতাল, ওষুধের মার্কামারা শিশি করে আফিসে ব্রাণ্ডি নিয়ে আসেন—ঘণ্টা ঘণ্টা সেই ব্রাণ্ডি খান। পরশু সন্ধ্যেবেলায় ওঁর বাড়ীতে আমরা শনিবার করতে গিয়েছিলাম, উনি ঐ সব কথা বললেন।"

নলিনীর স্মরণ হইল, যে দিন সে ভুবনবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, সে দিন ঔষধের শিশির কথা হইয়াছিল বটে। তবে সে বড়বাবুকে মাতালও বলে নাই, তাঁদের কোনরূপ নিন্দাও করে নাই। সেই কথা নলিনী বিনোদবাবুকে বলিল।

বিনোদবাবু বলিলেন, "ঐ ত! মুখে মুখে কথা বেড়ে যায় কিনা। আচ্ছা, আমি বড়বাবুকে বুঝিয়ে বলব এখন। আপনার উচিত নলিনীবাবু, মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ীতে যাওয়া, ওঁর একটু খোসামোদ করা। দেখছেন না আজকাল খোসামোদেরই বাজার। আমরা ত প্রায়ই ওঁর বাড়ীতে শনিবার করতে যাই—আপনি যান না কেন?"

নলিনী একটু হাসিয়া বলিল, "আপনারা মোটা মোটা মাইনে পান, আপনাদের শনিবার করা পোষায়। আমি গরীব মানুষ আপনাদের দলে পড়ে যদি শনিবার করতে শিখি, তা হলে আমার দুর্গতিটা কি হবে বলুন দেখি? পেটেই খেতে কুলায় না ত শনিবার করি কোত্থেকে বলুন?' —বিনোদবাবু বলিলেন, "তা যাবেন। মদ আপনার আপত্তি থাকে, নাই বা খেলেন। বসবেন, গল্পগুজব করবেন—চলে আসবেন।"

পরদিন শনিবার নলিনী বিনোদবাবুর সঙ্গে বড়বাবুর সান্ধ্য-সমিতিতে উপস্থিত হইল। অপর সকলেই বোতলবাহিনীর সেবায় তৎপর হইলেন, নলিনীই কেবল বসিয়া রহিল। মদ খাইবার জন্য কেহ কেহ নলিনীকে সাধ্য-সাধনা করিল—স্বয়ং বড়বাবুও দুই একবার বলিলেন, কিন্তু নলিনী সম্মত হইল না। এখন তাহার পানস্পৃহা ত নাই-ই; বরং মদের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছে। তথাপি কি করিব, চাকরির খাতিরে পর পর আরও দুই শনিবার গিয়া বসিয়া রহিল।

এ কয়দিন বড়বাবু নলিনীর প্রতি একটু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সোমবার হইতে আবার তিনি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনী ইহার কারণ কিছুই বুঝিল না।

মঙ্গলবার দিন বিনোদবাবু নলিনীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"আপনার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই? এই কত কষ্টে বড়বাবুর মন পেলেন,—আবার সব বিগড়ে দিলেন?"

নলিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, কি করেছি?"

"আপনি নাকি কার কাছে বলেছেন, শনিবার রাত্রে বড়বাবু মদ খেয়ে ধেই ধেই করে নাচেন? আরও নাকি কি সব বলেছেন?"

অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া নলিনী বলিল—"কই, এমন কথা আমি ত কাউকেই বলিনি।"

"ভুবনবাবুর কাছে?"

"বিলক্ষণ! তিনি ত প্রায় মাসখানেক হল কলকাতা-ছাড়া।"

"বড়বাবু কারু নাম করলেন না। শুধু বললেন, একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছেন। রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেছেন। বললেন, আমাদের আফিসে ও রকম বেম্ম-টেম্ম নিয়ে চলবে না, ঘরের কথা বের করে দেয়—সর্ব্বনেশে লোক। আচ্ছা নলিনীবাবু, আপনি সত্যি ব্রাহ্ম নাকি?"

নলিনী বলিল, "না মশাই, আমি ব্রাহ্ম হব কেন? আমি কালী দুর্গা সবই ত মানি।"

"তবে এক কাজ করুন। এখন বড়বাবুকে আপনার দেখান দরকার যে আপনি আমাদেরই একজন।"

"কি করলে দেখান যায়?"

"আপনি আমাদের সঙ্গে বসে দুই এক গ্লাস খেলেই, অনায়াসে আপনার ব্রাহ্ম বদনাম ঘুচে যায়।"

নলিনী করযোড়ে বলিল, "মাপ করবেন মশাই—সেটি আমি পারব না। আপনি বড়বাবুকে বুঝিয়ে বলবেন, আমি কারু কাছে তাঁর নামে কোনও নিন্দা বা কুৎসা করিনি—করবও না।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "আমি ত বলব—তিনি বিশ্বাস করলে হয়।"

পর শনিবারে নলিনী মোটেই আর বড়বাবুর বাড়ী গেল না।

সোমবারে বিনোদবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরশু রাত্রে আপনি যাননি যে?"

"গেলেই নানা কথা ওঠে, তাই যাইনি।"

"না গিয়ে ভারি অন্যায় করেছেন। বড়বাবু কি বলছেন জানেন?" "কি?"

"বলেছেন, তবে নিশ্চয়ই সে আমাদের নামে ঐ সব অপবাদ রটিয়েছে—এখন ধরা পড়ে গেছে—কোন্ মুখে আর আসবে? আরও বলেছেন, আপনার সম্বন্ধে বাৎসরিক মন্তব্য লেখবার সময় আপনাকে কর্ম্মে অপটু বলে দেবেন।"

শুনিয়া নলিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কোথায় সে আশা করিতেছিল, এবার বেতন পঞ্চাশ টাকা হইবে, পনেরো টাকা বাড়ীভাড়া দিয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা মাসে তাহার দশটি টাকা অধিক থাকিবে—উহারই মধ্যে সংসার একটু স্বচ্ছল হইবে—হঠাৎ এ কি বিপদ। অন্য সময় নহে—বড়বাবু যে দিন মন্তব্য লিখিবেন ঠিক তাহার দুইটি দিন আগে। চাকরি গেলে কি উপায় হইবে?—আর একমাস পরে বাড়ীটিও ছাড়িতে হইবে। দাঁড়াইবে কোথায়, খাইবে কি?

দুইদিন পরে জলখাবার ঘরে বিনোদবাবু চুপি চুপি নলিনীকে বলিলেন—"আজ বড়বাবু আপনার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখেছেন। আজ পাঁচটার পর আপনি একটু থাকবেন। উনি বাড়ী চলে গেলে ফাইলটা বের করে দেখতে হবে কি লিখলেন।"

নলিনী কার্য্যের ভান করিয়া পাঁচটার পরেও বিলম্ব করিতে লাগিল। বড়বাবু যথা সময়ে চলিয়া গেলেন। আফিসের অন্যান্য বাবুরাও একে একে অদৃশ্য হইলেন। বিনোদবাবু

তখন বড়বাবুর দেরাজ খুলিয়া রিপোর্ট বাহির কবিলেন। তাহাতে লেখা আছে, "নলিনী কার্য্যের অপটু, বৎসরান্তে তাহাকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।"

পড়িয়া নলিনী চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিনোদবাবু অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"আচ্ছা, আজ সন্ধ্যেবেলা বড়বাবুর বাড়ী আমি যাব এখন। আর একবাব তাঁকে বুঝিযে সুঝিয়ে বলে দেখি।"

"আমি যাব কি?"

"কি জানি কি রকম মেজাজে থাকবেন তা ত বলতে পারিনে—আজ আপনার গিয়ে কাজ নেই। যদি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেন, কাল তখন নিয়ে যাব।"

"কি বলেন, আমি কি করে জানতে পারব? বলেন ত রাত্রে আপনার বাড়ীতে আসি।"

"তা আসবেন—রাত ন'টার সময আসবেন। তার মধ্যেই আমি ওঁর ওখান থেকে ফিরে আসব এখন।"

নলিনী মুখখানি বিষণ্ন করিযা বাড়ী গেল।

কয়দিন হইতেই হেমাঙ্গিনী স্বামীব ভাবান্তব লক্ষ্য করিতেছিল। আজ নলিনীর মুখ চক্ষুর অবস্থা দেখিযা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল—"কি হযেছে?"

"বলব এখন"—বলিয়া হাত মুখ ধুইয়া নলিনী ছেলে পড়াইতে গেল। সেখান হইতে একটু শীঘ্র বিদায় লইয়া, রাত্রি আটটাব সময়েই বিনোদবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। তখন তিনি ফেবেন নাই।—নলিনী কিয়ৎক্ষণ বসিযা অপেক্ষা করিবার পর বিনোদবাবু ফিরিলেন। উৎকণ্ঠিত হইযা নলিনী জিজ্ঞাসা কবিল, "কি খবব?"

বিনোদবাবু ম্লানমুখে বলিলেন—"বড় সুবিধে নয়।" "তবু?"

"তিনি বললেন, নলিনী আমাদেব যে বকম অপমান কবেছে তাতে কোনও মতেই ওকে আর আফিসে রাখা যায় না।—আমি তখন ওঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলাম। অনেক বলতে কইতে শেষে বললেন—আচ্ছা ও যদি কাল এসে আমাদের সঙ্গে দুই এক পাত্র মদ খায়, তা হলেই জানব যে ও নির্দ্দোষী, আমাদের ঘৃণা করে না। তা হলে ও রিপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে অন্য রিপোর্ট লিখব। আমি অনেক করে বললাম, যখন খাবে না ওর প্রতিজ্ঞা, তখন ঐ নিয়ে কেন গরীবের অন্নটি মাবছেন? বড়বাবু বললেন—কেন, ও খাবে না কেন? আমি কি ওর হিষ্ট্রি জানিনে? ভুবনের কাছেই ত শুনেছি। এক সময় পিপে পিপে পান করেছে, আর এখন আমাদের অনুরোধে একটি গেলাস খেতে পারে না?—বড়বাবু একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছেন।"

নলিনী মাথায় হাত দিয়া, নীরবে বসিয়া আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদবাবু বলিতে লাগিলেন, "কি করবেন বলুন—চোখ কান বুজে খেয়ে ফেলুন। একবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হলেই আপনি যে একেবারে জাহান্নমে যাবেন তা নয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা না করেই বড়বাবুকে বলে এসেছি—আচ্ছা সে খাবে, কিন্তু একটি দিন মাত্র। তাও সবাইকের সামনে নয়—আমরা এই তিনজনে থাকব। শুধু আপনার মান রক্ষা করবার জন্যে। আপনি যে বলবেন ফি শনিবার এসে আমাদের সঙ্গে খাবে, তা হবে না কিন্তু। বড়বাবু তাইতেই রাজি হয়েছেন। বলেছেন, কালকে রিপোর্টখানা চেপে রাখবেন—বড়সাহেবের কাছে পাঠাবেন না। কেমন নলিনীবাবু আপনি রাজি ত?"

নলিনীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কষ্টে বলিল, "কাল আফিসে বলব।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ বেশ করে ভেবে দেখুন। আপনিও এই ধনুর্ভঙ্গ পণ ছাড়ুন। একদিন একটু মদ খেলেই যদি চাকরিটি বজায় থাকে—তা হলে খাওয়াই উচিত। আর, আপনি ত ব্রাহ্মণেব বিধবা নন যে আপনার পরকাল নষ্ট হবে। কাল সন্ধ্যেবেলা আসবেন এখন, দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

বাড়ী ফিরিয়া, আহারাদি কোনও মতে শেষ কবিয়া নলিনী শয্যায় প্রবেশ করিল। .অন্যদিন, সারাদিন পরিশ্রমের পর বিছানায় পড়িবামাত্র ঘুমাইয়া যায়, আজ আর তাহা হইল না। আজ সে বিষম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে, না চাকরি রক্ষা করিবে? চাকরিটি যদি যায়, তবে কি হইবে?

নলিনী মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, যে দিন এ বাড়ীতে বাসের মেয়াদ পূর্ণ হইবে, তাহার চারদিন পরেই তাহার চাকরির বৎসরও শেষ হইবে। বিপদেব উপর বিপদ। বাল্যকালের পাঠ মনে পড়িল—বিপদ্বিপাদং সম্পৎসম্পদং অনুবধ্যাতি—বিপদ বিপদকে এবং সম্পদ সম্পদকে অনুধাবন করে। এই দুই বিপদ তা তাহাদের করাল বদন বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—উহাদের পশ্চাতে না জানি আর কোন্ কোন্ বিপদ লুক্কায়িত আছে!

হায়, নলিনী কি করিবে? কেনই বা ভুবনবাবুর সাক্ষাতে ঔষধেব শিশির গল্প করিয়াছিল?—যাক্, সে আর ভাবিয়া কি হইবে?—ভুবনবাবুও নাই যে তাঁকে দিয়া বড়বাবুর কাছে সুপারিশ করাইবে। এবার তিন মাসের পূর্ব্বে তিনি আসিতে পারিবেন না বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে চিঠি লিখিলে বা টেলিগ্রাম করিলে হয় না? সময়ই বা কই? কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়বাবু অপেক্ষা করিয়া, পরশু মন্তব্য দাখিল কবিবেন। দাখিল করিলেই বড়সাহেব তাহাতে সহি করিয়া দিবেন—বস্—সব ফর্সা। তাহাব পর গৃহ নাই—অন্ন নাই। অন্য কোনও আফিসে কর্ম্মেব সুবিধা হইতে পারিবে না কি?—কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায়, ইহারা নলিনীকে যে সার্টিফিকেট দিবে না। যদি বা দেয়, তাহাতে লিখিয়া দিবে—কার্য্যে অপটু বলিয়া বৎসরান্তে পদচ্যুত করা গেল। সে সার্টিফিকেট কোথাও দেখাইযা ফল কি?

নলিনী বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে উক্ত প্রকাব অকূল পাথার চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ নিম্নে উঠান হইতে বাসন মাজার শব্দ নলিনীর কর্ণে আসিল—আজ হেমাঙ্গিনী স্বয়ং বাসন মাজিতেছে—কারণ ঝির জ্বর হইয়াছে। এই পৌষ মাসের শীত, রাত্রে হেমাঙ্গিনীকে স্বহস্তে বাসন মাজিতে হইতেছে। অথচ এমন দিন ছিল যখন একটা কেন, দুইটা ঝির একসঙ্গে পীড়া হইলেও বাড়ীর মেয়েদেব বাসন মাজিতে হইত না। সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর ইহাও মনে হইল, বাসনও আর বেশী দিন মাজিবাব আবশ্যকতা থাকিবে না। পথ যখন গৃহ হইবে, ভিক্ষা যখন জীবিকা হইবে, তখন বাসনও থাকিবে না, বাসনে করিয়া কিছু খাইবারও থাকিবে না। নলিনীর মনশ্চক্ষের উপর একখানি ছবি যেন ভাসিয়া উঠিল—নলিনী আগে আগে মেয়েটির হাত ধরিয়া, হেমাঙ্গিনী পাছে পাছে ছেলেটি কোলে করিয়া, কলিকাতার পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। যেন শ্যামবাজারের বড়বাবুর বাড়ীর দ্বারেই দাঁড়াইয়া আছে। নলিনীর চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, গৃহকার্য্য শেষ করিয়া, হেমাঙ্গিনী শয়ন করিতে আসিল; শয্যায় প্রবেশ করিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল—"তুমি এখনও ঘুমোওনি?"

অশ্রুসিক্তস্বরে নলিনী বলিল, "না।"

ক্রমে হেমাঙ্গিনীকে সকল কথাই সে খুলিয়া বলিল।

নলিনীর কথা শেষ হইলে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিযা, হেমাঙ্গিনী বলিল—"তুমি কি স্থির করেছ?"

"আমি কিছুই স্থির করতে পারিনি। ক'দিন থেকে ক্রমাগত ভাবছি, ভেবে ত কিছুই কূলকিনারা পাচ্ছিনে। তুমি কি বল?"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর কেশের মধ্যে সাদরে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। যতক্ষণ দেহে আমার প্রাণ থাকবে, আমি তোমায় ধর্ম্মপথে থাকতেই পরামর্শ দেব—অধর্ম্মপথে যেতে কখনই বলব না। দেখ, অনেক কষ্টে

তুমি সামলে উঠেছ। প্রতিজ্ঞা একবার যদি ভঙ্গ কর—আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবে না।"

নলিনী বলিল, "তা কি আমি জানিনে? তা খুবই জানি। আমার মন যে কত দুর্ব্বল, তা আমি জানি। কিন্তু আমি কেবল তোমাদেরই কথা ভাবছি। আমি যদি একা হতাম—অবিবাহিত হতাম—তা হলে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কোনও দ্বিধা আমার মনে স্থান পেত না—বলতাম, চাকরি গেলে গেলই—আবার অন্য কোনও উপায় হবে। কিন্তু তোমাদেরই জন্যে—"

ভুল বলিতেছ নলিনী—ভুল বলিতেছ। যদি অবিবাহিত থাকিতে, তবে, কোন কালে তুমি রসাতলে পৌঁছিয়া যাইতে। তুমি যে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলে, সে কাহাদের মুখ স্মরণ করিয়া?

হেমাঙ্গিনী বলিল, "তুমি কিছু ভেব না। সে উপায় ভগবান করবেন। তোমার কাজ তুমি কর—তুমি ধর্ম্মপথে থাক—তাঁর কাজ তিনি করবেন।"

"তোমার মনে কিছু ভাবনা হচ্ছে না?"

"কিছু না। তিলমাত্র না। যিনি সকল জীবকে আহার দিচ্ছেন, তিনি আমাদের অনাহারে মারবেন না!"

"এ তোমার দৃঢ় বিশ্বাস?"

"এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তবে আমি বিনোদবাবুকে কাল বলি যে আমাব দ্বাবা মদ খাওয়া হবে না?"

"বল।"

নলিনী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। তাহার কানের কাছে ভুবনেশ্বরবাবুব শেষ উপদেশ—

ছোড়িও না হিম্মৎ,
বিসবিও না হরিনাম—

ভৈরবস্বননে যেন বাজিতে লাগিল। সে দৃঢ়চিত্তে বলিল—"বেশ। তবে তাই হোক। আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কবব না। চাকবি যাক্। আমি ভগবানের পাযে নিজেকে, তোমাদের সমর্পণ করলাম।"—বলিযা নলিনী স্ত্রীকে বক্ষে বাঁধিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল।

আজ ববিবাব। যে তারিখে বিপিনবাবু নলিনীতে এক বৎসর কাল বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন, সেই তাবিখ আবার ফিরিযা আসিয়াছে। গত কল্য পূর্ণ হইয়াছে।

আজ প্রভাতে নলিনী অত্যন্ত বিমর্ষ। হেমাঙ্গিনীর মুখখানিও অতি শুষ্ক—তবে সে মনেব ভাব মনে গোপন কবিয়া সাধ্যমত স্বামীর চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বেলা দশটা বাজিলে নলিনী স্নান করিল।

খোকার জন্য, খুকীর জন্য তিনখানি আসন পাতা হইয়াছে। তিনজনে খাইতে বসিল। দরিদ্র গৃহস্থের দৈনন্দিন আহার্য্য দ্রব্য—বেশী কিছু নয়। খোকাখুকী খুব আমোদ করিয়াই খাইতে লাগিল। নলিনী ভাত খাইতেছে—আর মাঝে মাঝে খোকাখুকীর পানে চাহিতেছে। কেবলই তাহার মনে হইতেছে, বেশী দিন আর এখানে বসিয়া ইহারা ভাত খাইবে না।

নলিনী আজ ভাল করিয়া আহার করিতে পারিল না। কোন মতে আধ-খাওয়া করিয়া, স্ত্রীর মিনতিসত্ত্বেও উঠিযা পড়িল।

আহাব্যন্তে শয্যায় গিয়া, নলিনী শয়ন করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী নিজে স্নানাহার শেষ করিয়া, শয্যায় বসিয়া স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিল।

নলিনীব ঘুম আসিল না। বেলা দুইটা অবধি এইরূপ ছট্‌ফট্ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। তামাক সাজিবে বলিয়া কলিকা হাতে করিল। হেমাঙ্গিনী তাহার হাত হইতে কলিকা কাড়িয়া লইয়া তামাক সাজিয়া দিল। নলিনী তামাক খাইতে লাগিল, হেমাঙ্গিনী অনতিদূরে পান সাজিবার সরঞ্জাম সম্মুখে রাখিয়া সুপারি কাটিতে লাগিল।

তামাক শেষ করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত নলিনী বলিল—"কই—আজও ত নোটিস-টোটিস কিছু এল না? কাল এক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "তোমার এ বিপদ—চাকরিটি পর্য্যন্ত গেল, তা কি বিপিনবাবু শোনেননি? এমন সময় তিনি কখনই বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে বলবেন না। শরীরে একটুও ত দয়ামায়া আছে!"

নলিনী বলিল, "খুব দয়ামায়া আছে! বোধ হয় কাজেব ভিড়ে ভুলে গেছে—আজ কি কাল নোটিস আসবে দেখে নিও।"

বেলা তিনটা বাজিল। খোকা বলিল, "বাবা জুতো ছিঁড়ে গেছে—বলেছিলে যে রবিবারে জুতো কিনে এনে দেবে? আজ ত রবিবার।"

নলিনী খোকাকে বুকে লইয়া বলিল, "আজ নয় বাবা, অন্য এক রবিবাবে কিনে এনে দেব।"

অভিমানের সুরে খোকা বলিল, "যখনই বলি, তখনই ত বল অন্য এক ববিবারে।"

খুকী আসিয়া বলিল, "মা, পয়সা দাও না, মুড়ি কিনে আনি, ক্ষিধে পেয়েছে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "আজ আর মুড়ি খেও না মা—সন্ধ্যে হলেই ভাত খেও এখন।"

মেয়ে পয়সার জন্য অনেক বাহানা করিল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী আজ কিছুতেই পয়সা বাহির করিল না। এখন প্রত্যেক পয়সাটি তাহার কাছে মোহবের মত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ঝি আসিয়া বলিল, "বউমা বেলা যে গেল। বাজাবে যেতে হবে কি? আলু নেই।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "থাক ঝি, আজ আর আনতে হবে না, বেগুন আছে, তাইতেই চলে যাবে এখন।"

নলিনী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল—হা ভগবান!

এমন সময়, নীচে সদর দরজা হইতে উচ্চ শব্দ আসিল—"বাবু—এ নলিনীবাবু।"

কে ডাকে? স্ত্রী পুরুষ উভয়ে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল উর্দ্দিপরা একজন চাপরাশি, হস্তে পিয়ন-বুক, দ্বারে করাঘাত করিতেছে।

হেমাঙ্গিনী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"কে আবার! বিপিনের চাপরাশি—তাদেরই উর্দ্দি। নোটিস এসেছে।"

কোনও মতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, দ্বার খুলিয়া, পিয়ন-বুকে সহি দিয়া, চিঠি লইয়া নলিনী উপরে আসিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যে হাতে চিঠি ধরিয়া আছে সে হাত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

চিঠি হাতে করিয়া, নলিনী বিছানায় বসিল। বলিল—"হিমু, তুমি যে বলছিলে তার শরীরের দয়ামায়া আছে, দেখ কেমন দয়ামায়া। কিছুদিন সময় দিয়েছে কি আজই উঠে যেতে বলেছে দেখি।"—বলিয়া নলিনী ধীরে ধীরে চিঠিখানি বাহির করিল। ভাঁজ খুলিয়া—একি! চিঠির সঙ্গে গাঁথা একখানি চেক্। নলিনীর নামে চেক্—বারো হাজার তিনশো পঞ্চান্ন টাকার চেক্। বিপিনবাবুর দস্তখৎ রহিয়াছে।

নলিনী প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মাথা বন বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল, "হিমু, আমাব মাথায় জল দাও।"

হেমাঙ্গিনী অত্যন্ত ভীত হইয়া, ঘটি হইতে শীতল জল লইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া স্বামীর মাথায় দিতে লাগিল। বিছানা ভিজিয়া গেল। তাহার পর একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট এইরূপে কাটিলে নলিনী ধীরে ধীরে আবার চক্ষু খুলিল। বলিল—"ভেব না—ভাল খবর। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।"—বলিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—

ভবানীপুর

ভাই নলিনী,

বাল্যকাল হইতে আমরা একত্র খেলা করিয়াছি, আমাদের সেই বাল্যজীবন বড় মধুময় ও পবিত্র ছিল। হায়, যদি চিরদিনই সেইরূপ থাকিত।

মনে আছে, বাল্যকালে যদি কখনও আমরা একে অপরের প্রণয়ে সন্দিহান হইতাম তাহা হইলে কত না কষ্ট পাইতাম।

আজিও তোমার প্রতি আমার মনোভাব সেইরূপই আছে। কিন্তু আজ ছয় বৎসর কাল তুমি মনে করিতেছ, আমি সে পূর্ব্বস্নেহ একেবারে বিস্মৃত হইয়া, এখন একটি হৃদয়হীন অর্থপিশাচে পরিণত হইয়াছি। আমায় এরূপ মনে করিয়া নিশ্চয়ই তুমি হৃদয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করিয়াছ—আব আমিও এ কারণে অল্প মনোবেদনা সহ্য করি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের উভয়ের সকল কষ্ট সার্থক হইয়াছে।

তুমি যখন পিতার মৃত্যুর পর কুসঙ্গে পড়িয়া টাকা উড়াইতে লাগিলে, তখন মাঝে মাঝে আমি তোমায় সে জন্য কত ভর্ৎসনা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার কথায় কর্ণপাত মাত্র কর নাই। তুমি যখন তোমাব মহাজনদের ঋণপরিশোধ করিবার জন্য আমার কাছে টাকা চাহিতে আস, তখন, পাছে আমার কাছে বন্ধক রাখিয়া পরে আবার তুমি বাড়ীগুলি অন্যত্র বন্ধক দাও সেই জন্য আমি সেগুলির কট্‌কবালা লিখাইয়া লইয়াছিলাম। পাঁচ বৎসর কাল নিয়ত আমি তোমার সকল কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ লইয়াছি। যখন দেখিলাম তোমার চরিত্র-সংশোধন হইল না, তখন আমি মনে মনে একটা উপায় স্থির করিলাম। অধঃপতনের অন্ধতম গহ্বরে পতিত হইয়াও তোমার হৃদয়ে একটিমাত্র আলোকরেখা অবশিষ্ট ছিল, তাহা স্ত্রীসন্তানের প্রতি তোমার মমতা। এইটি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম, স্ত্রীসন্তানের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ দেখিলে হয়ত তোমার সুমতি হইবে। তাই বাড়ীগুলি কাড়িয়া লইয়া, তোমায় কপর্দ্দকশূন্য করিলাম। গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে তোমায় নিক্ষেপ করিলাম।

পুলিস কোর্টে মোকর্দ্দমার বিষয় সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমিই ভুবনেশ্বরকে তোমার উদ্ধারার্থে পাঠাই। ভুবনেশ্বর আমার একজন প্রিয় বন্ধু। আমিই হেডক্লার্ক যোগীন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করিয়া তোমাব চাকরির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম, প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা তোমায় দেওয়ান, তাহাও আমার পরামর্শ। ছেলে পড়াইবার অছিলায় রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত তোমায় আবদ্ধ রাখা—সেও আমার পরামর্শ, কারণ রাত্রি নয়টার সময় মদের দোকান বন্ধ হইয়া যায়।

গোপনে গোপনে তোমার প্রতিদিনকার সংবাদই আমি রাখিতাম। যখন দেখিলাম, দশমাস কাল তুমি মদ্য স্পর্শ করিলে না, তখন অনেকটা আশা হইল। তথাপি, আর একটু কঠোর পরীক্ষায় তোমায় ফেলিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম। মদ্যপান করিলে তোমার চাকরি পাকা হইবে এবং না করিলে চাকরি যাইবে, এ পরীক্ষাটি আমারই উদ্ভাবিত—যোগীন্দ্রনাথ আমার অনুরোধ পালন করিয়াছেন মাত্র।

আজ দেখিতেছি, একদিকে ভীষণতর দারিদ্র্য অপর দিকে বেতন বৃদ্ধির প্রলোভন উভয়ের সমবেত আক্রমণেও তুমি অটল। ভাই, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আর কোন আশঙ্কা নাই।—তুমি তোমার সম্পত্তির যে অংশ নিজদোষে নষ্ট করিয়াছ, তাহা ত গিয়াছে। আমি যতটুকু বাঁচাইতে পারিয়াছি, তাহা আজ তোমায় প্রত্যার্পণ করিতেছি।

তোমাকে যত টাকা আমি ধার দিয়াছিলাম, তাহার সুদের হার শতকরা বারো টাকা

হিসাবে লেখা ছিল। আমি ব্যাঙ্ক হইতে যে সুদ পাই, সেই সুদ মাত্র করিয়া পাঁচ বৎসরান্তে তোমার কাছে আমার প্রাপ্য ধার্য্য করি। যে দিন তোমার বাড়ী দুখানি আমি কাড়িয়া লই, তাহার সপ্তাহ পরেই আমি সে দুখানি সুবিধা দরে বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার নিজহিসাবের প্রাপ্য টাকা, প্রাপ্তমূল্য হইতে কাটিয়া লইয়া, বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলাম। এক বৎসরে সুদে আসলে তোমার যাহা হইয়াছে, সেই পরিমাণ একখানি চেক্ এই পত্রমধ্যে তোমায় পাঠাইলাম।— তোমার বসতবাটীর দলিলখানি তোমায় ফেরৎ পাঠাইলাম। উহার পৃষ্ঠে দাবী পরিশোধ লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলাম। ঐটুকু রেজিষ্টারি করাইয়া লইবে।

একবার ভাবিয়াছিলাম, আমার আসল পঁচিশ হাজার টাকাটা মাত্র কাটিয়া বাকী সমস্ত তোমায় ফিরাইয়া দিব। কিন্তু তাহা হইলে, তুমি আমার নিকট আর্থিকভাবে উপকৃত, এই একটা ধারণা তোমার মনে থাকিয়া যাইত। তাহাতে তোমার আত্মসম্মান খর্ব্ব হইত— তাই ও পন্থা আমি পরিত্যাগ করিলাম। তুমি এখন যাহা পাইলে তাহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্তির এক পয়সাও অধিক নহে। আমার কাছে তুমি আর্থিকভাবে উপকৃত, এ আত্মগ্লানির কারণ তোমার রহিল না।

তুমি যদি ঐ আফিসে চাকরি করিতে ইচ্ছা কর, আমি যোগীন্দ্রবাবুকে বলিয়া দিব এখন। তিনি অনুরোধ করিলেই বড়সাহেব পূর্ব্ব হুকুম প্রত্যাহার করিযা তোমায় স্থায়ী পদ দিবেন। যদি চাকরি করিতে ইচ্ছা না থাকে, ঐ বারো হাজার টাকা মূলধন লইয়া তুমি দালালী ব্যবসায় কিংবা অপর কোনও ব্যবসা করিতে পার। কিন্তু পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করাই ভাল—সে কার্য্য তুমি কিছুদিন করিয়াও ছিলে—একেবারে আনাড়ি নও।

ভাই, আমি নিজে গিয়াই তোমায় এ চেক্ দিতে পারিতাম এবং এ সকল কথা বলিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার অপেক্ষা পত্রলেখাই সহজ মনে করিলাম। অনেক দিন তোমায় দেখি নাই—একদিন অবসর মত আসিও।

তোমাব বাল্যবন্ধু—
শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রপাঠ করিয়া নলিনী স্ত্রীকে শুনাইল। তারপব গাড়ী ডাকিয়া, বাড়ীতে তালাবন্ধ করিয়া সকলে কালীঘাটে পূজা দিতে গেল। ফিরিবার পথে সে গাড়ী বিপিনবাবুব ফটক এইবার দ্বারবানের বিনা ওজরেই পার হইয়া গেল। বিপিনবাবুর স্ত্রী, হেমাঙ্গিনীকে সহজে ছুটি দিলেন না। সকলে সান্ধ্যভোজন সেইখানেই সমাধা করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন গির্জ্জা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিতেছে।

[মানসী, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩১৯]

লেডি ডাক্তার

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববঙ্গে, নদীতীরে একটি অনতি-প্রশস্ত বাঙ্গলো-গৃহের বারান্দায় ঈজিচেয়ারে বসিয়া, ইংরাজী পায়জামা সুট পরিহিত পঞ্চবিংশবর্ষীয় একজন সুশ্রী যুবক প্রাভাতিক চা পান করিতেছিলেন।

যুবকের নাম সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—এই মহকুমায় দ্বিতীয় হাকিম। ইঁহার পিতা একজন নামজাদা প্রথম গ্রেডের ডেপুটি ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় সাহেবদের ধরিয়া সদ্য বি, এ, পাস করা এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে ডেপুটিগিরিতে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, ছয় মাস পরে তিনি নিশ্চিন্তমনে পরলোকযাত্রা করেন। সে আজ তিন বৎসরের কথা।

ভাদ্র মাস। নদীটি কূলে কূলে পূর্ণ। দূরে—তিন চারিখানি জেলেনৌকা দেখা যাইতেছে। আকাশ মেঘভারে স্তম্ভিত। নদীর অপর পারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে।

বারান্দার নিম্নেই ফুলবাগান। শ্বেত, রক্ত, নীল—নানাবর্ণের দেশী ও বিলাতী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাত্রে বৃষ্টির জলে ফুলের মধু ধুইয়া গিয়াছে, ভ্রমরেরা নিরাশ মনে গুন্ গুন্ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। চেরা বাঁশের বেড়া দিয়া বাগানটি ঘেরা। বেড়ার গায়ে ঝুমকা লতা উঠিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। বাগানের শেষে কাঠের ফটক।

সত্যেন্দ্রনাথ পূরাদস্তুর সাহেব না হইলেও অত্যন্ত সাহেবীভাবাপন্ন—অর্থাৎ সংক্ষেপে সে একজন "ভাবাপন্ন সাহেব"। বাবু বলিলে সে রাগিয়া উঠে না কিন্তু সাহেব নামে অভিহিত হইলে খুসী হয়। বাড়ীতে ধুতি পরিতে বিশেষ আপত্তি নাই কিন্তু পায়জামা সুটই সুরুচিসম্মত মনে করে। পাচক ব্রাহ্মণ আছে, সে যথাশাস্ত্র হিন্দুমতেই পাক করে, কিন্তু কখনো খানসামা খলিল মিঞা মুর্গী রাঁধিয়া আনে এবং টেবিলের উপর ছুরি-কাঁটা-চামচ দিয়া খানা সাজাইয়া দেয়। এ বাঙ্গলোয় সত্যেন্দ্রনাথ একাকী বাস করে—সে বিপত্নীক। আর কেহ আত্মীয়স্বজনও এখানে নাই।—চা-পান শেষ করিয়া সত্যেন্দ্র বেহারাকে ডাকিল। আদেশ অনুসারে সে তাহার পাইপ, তামাকের টিন ও দিয়াশলাই আনিয়া দিল। পাইপ সাজিয়া সত্যেন্দ্র নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।—পাইপ মুখে করিলে, ইংরাজি কাপড়পরা বাঙ্গালীকে অনেকটা ঠিক সাহেবের মত না হউক অন্ততঃ ফিরিঙ্গির মত দেখায়। তুমি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান—যতই কেন ইংরাজি কাপড় পর না, তোমার মুখের লালিত্যটুকু, বুদ্ধি ও সৌজন্যের আভাটুকু তোমার বাঙ্গালীত্ব ধরাইয়া দিবে। কিন্তু পাইপটি দাঁতের মধ্যে চাপিলেই মুখভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে—উহার মধ্যেই একটু কাঠখোট্টা গোছের দেখায়—মনে হয়, অত্যল্প কারণেই হয়ত এ ড্যাম্ বলিয়া গর্জ্জন উঠিবে! তাই বেচারি সত্যেন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে পাইপ-সেবন অভ্যাস করিয়াছে। যখন প্রথম সাহেবগিরিতে প্রবৃত্ত হইয়া পাইপ ধরিয়াছিল, সে কি সামান্য কর্ম্মভোগ! প্রথমবার পাইপ খাইবার পর ছুটিয়া বারান্দার প্রান্তদেশে গিয়া সে এমন একটি কার্য্য করিয়া ফেলিল যাহা নাম করা ভদ্রসমাজে নিষিদ্ধ। মাথায় ঘটি ঘটি করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া, বিছানায় পড়িয়া ঘণ্টা দুই পাখার বাতাস খাইয়া, ঘুমাইয়া, তবে সে সুস্থ হয়। তখন, অনেক দাম দিয়া খুব নরম তামাক কিনিয়া আনিত, তথাপি ধূমে তাহার জিহ্বা একেবারে জ্বলিয়া যাইত। এত জ্বলিয়া যাইত যে লবণাক্ত ব্যঞ্জনাদি খাইতে গিয়া চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকিত। এখন সে সব দিন কাটিয়া গিয়াছে। নরম তামাক এখন তাহার ভাল লাগে না।

একখানা সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সত্যেন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা ৮টা বাজিল। মেঘ কাটিয়া একটু রৌদ্রের আভাস দেখা দিল। আর্দ্দালী পোষ্ট আফিস হইতে সত্যেন্দ্রের ডাক আনিল।

একখানা সংবাদপত্র, একখানা ইংরাজ দোকানের মূল্যতালিকা, একখানা বাড়ীর চিঠি, আর একখানা চিঠির খামে মেয়েলি ছাঁদের অপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা। কৌতূহলবশতঃ শেষোক্তখানিই সত্যেন্দ্র প্রথমে খুলিয়া পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা

মহাশয়,

দয়া করিয়া আপনি আমাকে যে নিয়োগপত্র পাঠাইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।—আমি কল্য এখান হইতে রওয়ানা হইয়া পরশু শনিবার প্রাতে সাতটার গাড়ীতে সেখানে পৌঁছিব। ও অঞ্চলে আমি কখনও যাই নাই—সমস্তই আমার অপরিচিত। সেখানে লেডি-ডাক্তারের জন্য কোনও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে কি না জানি না। যদি না থাকে, তবে আমি কোথায় গিয়া উঠিব, কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সৌভাগ্যবশতঃ আপনি বাঙ্গালী ভদ্রলোক। আপনিই যখন হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি, তখন আশা করি নূতন স্থানে পৌঁছিয়া আমার কোনও অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। আপনি বোধ হয় সেখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। অতএব যদি আপনাদের অসুবিধা না হয় তবে সেখানে নামিয়া দুই একদিন আপনার বাসায় আমি স্থান পাইতে পারি না কি? সে দুই একদিনে আমি নিজের বাসা ঠিক করিয়া লইব।

আমি আমার আয়াকে সঙ্গে লইয়া যাইব—সে আমার পাকাদি করিতে পারে। দয়া করিয়া আমার জন্য একজন মুসলমান খানসামা ঠিক করিয়া রাখিবেন। আপনাকে এই সকল কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম—আশা করি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আর একটি কথা বলিতে সাহস করিতে পারি কি? আমি অসহায়া স্ত্রীলোক, সেখানে ষ্টেশনে নামিব। আপনার বাসা খুঁজিয়া লইতে সমর্থ হইব কি না জানি না। যদি দয়া করিয়া গাড়ীর সময় ষ্টেশনে আসেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

বিনীতা—

কুমারী সুবালা মজুমদার

পত্রখানি বাঙ্গলায় লেখা বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে একটু ক্ষুন্ন হইল। তবে খামের ঠিকানা দেখিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল। উহাতে "বাবু" লেখা নাই, "এস্কোয়ার" লেখা আছে। ভাবিল—ইংরাজিতে বোধ হয় তাদৃশ ব্যুৎপন্না নহে, তাই বাঙ্গলায় লিখিয়াছে—আমাকে অসম্মান করা নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ্য নহে। ঠিকানায় ইংরাজি লেখার ছাঁদটি অনেকক্ষণ ধরিয়া সে দেখিতে লাগিল।

লেখাটি দেখিতে দেখিতে সত্যেন্দ্রের মনে একটি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হইল। সে বঙ্গললনারা আমাদের ঠান্‌দির কালে একেবারেই নিরক্ষর ছিল,—আমাদের মা-মাসীর আমলে কোনও মতে চিঠিপত্র লিখিতে, রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিত মাত্র—যাহারা বর্ত্তমান কালে মাসিকপত্র ও উপন্যাসাদির অক্লান্ত পাঠক হইলেও, এখনও চিঠি লিখিতে বানান ভুল করে—সেই জাতীয় একজন, পরিষ্কার ইংরাজি হরফে ঠিকানা লিখিয়াছে!

সত্যেন্দ্রের মনে একটা নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। যে জাতীয় বাঙ্গালীর মেয়ের সহিত সে পরিচিত—যাহারা শাড়ীর নিচে শেমিজ পরে, কোমরে রেশমী রুমালও ঝুলায়, কিন্তু জুতা পায়ে দেওয়া "খৃষ্টানি" জ্ঞান করে—এই সুবালা সে জাতীয় মেয়ে নহে। সে, শ্রীমতি সুবালা দাসী নহে—মিস্ মজুমদার। পায়ে জুতা মোজা আছে, মুখে ঘোমটা নাই, গোড়ায় গাড়ীর দরজা বন্ধ করে না। সে মা-ঠাকুরুণ নহে—দিদিমণি নহে—মেমসাহেব।

আকাশে মেঘ আবার বাড়িয়া উঠিল, নদীর বুকে ঢেউ বেশী করিয়া খেলিতে লাগিল, বাগানে লাল গোলাপগুলি বাতাসে বেশী করিয়া দুলিতে লাগিল, আর সত্যেন্দ্রের মনে ধীরে ধীরে একটি কল্পনামূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই শয্যাতাগ করিল—আজ সাতটার গাড়ীতে মিস্ মজুমদার—সুবালা—আসিবেন। তাড়াতাড়ি চা-পান শেষ করিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি যত্নে নিজ ক্ষৌরকর্ম্ম আরম্ভ করিল। তাহা শেষ হইলে মুখ হাত ধুইয়া সাবধানে বেশ-বিন্যাস করিতে লাগিল। যখন পৌনে সাতটা তখন ঘোষ সাহেব প্রস্তুত। পাইপ মুখে দিয়া ছড়ি হাতে কবিয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিল।

চিঠিখানি পাইয়া গতকল্য বেচারি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। মিস্ মজুমদার যাহা মনে করিয়াছেন—তাহার বাসায় স্ত্রী-কন্যা আছে—সে কথা ত দুর্ভাগ্যবশতঃ (সৌভাগ্যবশতঃ?) সত্য নহে। তাহার বাঙ্গলোয় স্থান অবশ্য যথেষ্টই আছে—কিন্তু একাঘরে একজন অপরিচিতা অনাত্মীয়া আনা কি উচিত? লোকে কি বলিবে? আর, সে যুবতীই বা সম্মত হইবে কেন?—তবে সুবালাকে কোথায় তোলা যায়? সাব-ডিভিশনাল অফিসার সুরেশবাবু নিজে তত "হিঁন্দু" না হইলেও তাঁহার গৃহিণীটি বিলক্ষণ নিষ্ঠাবতী। তিনি যে এই জুতা-মোজা-লেস-ব্রোচধারিণীকে আদর আপ্যায়ন করিয়া অন্তঃপুরে স্থান দিবেন এমন আশা নাই। তবে সে বেচারির কি উপায় হইবে? এক, ডাকবাঙ্গলো আছে। কিন্তু ডাকবাঙ্গলোয় থাকিতে প্রতিদিন পাঁচ ছয় টাকা পড়ে। সে গরীব ত মোটে ষাটটি টাকা বেতনে আসিতেছে—যদি বাসা খুঁজিয়া পাইতে দুই চারিদিন বিলম্ব হয়—সে কি পারিয়া উঠিবে? হ্যাঁ—ঠিক হইয়াছে। এবার সত্যেন্দ্রের মাথায় বুদ্ধি আসিয়াছে। সুবালাকে আনিয়া ডাকবাঙ্গলোতেই তোলা হইবে। চা-টা মাত্র ডাকবাঙ্গলোর খানসামা যোগাইবে—বাকী সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সত্যেন্দ্র নিজ বাঙ্গলো হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাহাতে ব্যয়ের অনেক সাশ্রয় হইবে— দৈনিক দুই টাকার অধিক ডাকবাঙ্গলোয় লাগিবে না; তাহা সুবালা অনায়াসেই দিতে পারিবে।

গতরাত্রে অনেকক্ষণ অবধি বিনিদ্র অবস্থায় উক্তরূপ চিন্তা করিয়া সত্যেন্দ্র এই সমস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে অধিক রাত্রে তাহার মাথা এমন গরম হইয়া উঠিয়াছিল যে নিদ্রা আর কিছুতেই আসে না। স্নানকক্ষে গিয়া হাত পায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া মুখ কান বেশ করিয়া ধুইয়া আসিয়া তবে কোনও মতে একটু ঘুমাইয়াছিল।

ষ্টেশন অধিক দূর নহে—দশ মিনিটের মধ্যেই সত্যেন্দ্র প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী যখন ভীষণ গর্জ্জনে ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে লাগিল তখন তাহার বক্ষমধ্যে কে যেন প্রবল নৃত্য জুড়িয়া দিল।

গাড়ী আসিলে মধ্যম শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণেব কামরা হইতে সুবালার আয়া মুখ বাড়াইয়া কুলি কুলি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র সেইদিকে গেল। দেখিল, আরে ছি—ঘাগরাপরা আয়া নহে—শাড়ীপরা একটা বাঙ্গালী ঝি নামিতেছে।

তৎপশ্চাৎ সুবালাও নামিল। সত্যেন্দ্র দেখিল—বাদামী রঙের পার্শী শাড়ী পরা, গায়ে সেই রঙের আলপাকা-জ্যাকেট, মাথায় লেস, উনিশ কুড়ি বছরের একটি গৌরাঙ্গী যুবতী চকিত দৃষ্টিতে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছে।

সত্যেন্দ্র তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া মাথা হইতে টুপী তুলিয়া বলিল—"Have I the pleasure of speaking to Miss Majumder?" (আমি কি কুমারী মজুমদারের সহিত কথা কহিবার সুখলাভ করিতেছি?)—সুবালা দুইপদ অগ্রসর হইয়া একটি ছোট নমস্কার করিয়া বলিল—আমিই। মিষ্টার ঘোষ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?"

"আমিই মিষ্টার ঘোষ।"

"ওঃ—আপনিই? আমি ভেবেছিলাম আপনি তাঁর ছোট ভাই-টাই। আপনি যে নিজে এত কষ্ট করে এসেছেন এ আমার আশাতীত।"—সত্যেন্দ্র ইংরাজি হইতে অনুবাদ করিয়া বলিল—"কষ্ট কিছু নয়—আনন্দ। গাড়ীতে আপনার কিছু অসুবিধা হয়নি ত?"

"না। বিশেষ কিছু নয়।"

ইতিমধ্যে কুলিরা সুবালার জিনিষপত্র মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"ব্রেকভ্যানে কিছু আছে?"

"না, ব্রেকভ্যানে কিছু নেই। একখানা নেওয়ারের খাট, দুখানা টেবিল, একটা আলমাবি আব চারখানা চেয়ার, মালগাড়ীতে বুক করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো কতদিনে আসবে বলুন দেখি?"

"মালগাড়িতে আসতে দেরী হয়—সপ্তাহখানেক লাগবে। আপনি আসুন।"

সুবালা ধীরে ধীরে সত্যেন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চলিল। ষ্টেশনের যত লোক এই নব-পর্য্যায়ের জীবটির পানে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া রহিল।

পথে যাইতে যাইতে সুবালা জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে আপনার বাড়ীতে কে কে আছে?" "এখানে কেউ নেই।"

"কেউ নেই? তবে আমি সেখানে কি করে যাব?"

সুবালার এই সঙ্কোচমিশ্রিত ভীতিটুকু দেখিয়া সত্যেন্দ্র মনে মনে খুসী হইল। বলিল—"আমার বাড়ীতে ত আপনাকে নিয়ে যাচ্ছিনে—আপনাকে ডাকবাঙ্গলোয় রাখব।"

সুবালা শঙ্কিত হইয়া বলিল—"ডাকবাঙ্গলোয়? সেখানে ত অনেক খরচ।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"সে জন্যে আপনি ভাববেন না।"

সুবালা সত্যেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

ক্রমে উভয়ে ডাকবাঙ্গলোয় আসিয়া পৌঁছিল। খানসামা আসিয়া হাকিমকে সেলাম করিয়া একটি কামরা খুলিয়া দিল। সত্যেন্দ্র বলিল—"চা-কা পানি তৈয়ারী হায?"

খানসামা বলিল—"হ্যাঁ হুজুর।"—লেডি ডাক্তার আসিতেছেন ইহা সত্যেন্দ্রের আর্দ্দালি পূর্ব্বেই খানসামাকে বলিয়া গিয়াছিল।—সত্যেন্দ্র বলিল—"মেমসাহেবকা ওয়াস্তে চা লে আও।"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর, ছোট-হাজরে নিয়ে আয়েঙ্গে না শুধু চা?"—বেচারী বাঙ্গালী মুসলমান—হিন্দি-মিন্দি তাহার ভাল আসে না—কিন্তু সাহেবলোকের সঙ্গে হিন্দি না কহিয়া উপায় নাই।—খানসামাকে ছোট-হাজীর আনিতে আদেশ করিয়া, সুবালার পানে চাহিয়া সত্যেন্দ্র বলিল—"আপনি তা হলে এখন মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। বেলা ১১টার সময় আমার বাড়ী থেকে আপনার ব্রেকফাষ্ট আসবে। আর যদি কিছু দরকার টরকার হয়—"—সুবালা বলিল—"বেশ। আপনার দয়া আমি কখনও ভুলব না। একটা কথা বলতে পারি কি?"

"বলুন।"

"দেখুন, ডাকবাঙ্গলোয় অনেক খরচপত্র। যদিও আপনিই খরচপত্র দেবেন বললেন, তবুও নাহক টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়। যদি আপনার অসুবিধা না হয়, আজ বিকেলেই একটা বাড়ী ঠিক করলে হত।"—সত্যেন্দ্র ভাবিল—ডাকবাঙ্গলোর খরচ আমি দিব, কই এমন কথা ত আমি বলি নাই। সুবালা ভুল বুঝিল কেমন করিয়া? তা হউক, আমিই দিব এখন। প্রকাশ্যে বলিল—"আচ্ছা, বাড়ী খুঁজতে আজ লোক পাঠাব।"

"কাল থেকে আমায় কাজ আরম্ভ করতে হবে ত?"

"হ্যাঁ—কাল সকালবেলা এসে আমি আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব—সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।"

"আপনি এখন যাচ্ছেন—আবাব কাল সেই সকালে আসবেন?"—সুবালাব স্বব যেন ভাবি নৈবাশ্যপূর্ণ।

সত্যেন্দ্র বলিল—"যদি কোনও দবকাব থাকে—"

কাছে সবিযা গিযা মিনতিব স্ববে সুবালা বলিল—"দেখুন, আমি এই অপবিচিত স্থানে এসেছি, এখানে আপনি ছাড়া আমাব আব কেউ নেই। আপনি আমাকে একটু না দেখলে শুনলে—"—সত্যেন্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা, আমি ওবেলা এসে আবাব আপনাব খবব নেব এখন।"

"ক'টাব সময আসবেন?"

"এই—পাঁচটা আন্দাজ।"

"আপনি এখানে এসে আমাব সঙ্গে চা খাবেন?"

"বেশ।"—বলিয়া টুপি উত্তোলন কবিযা সত্যেন্দ্র বিদায গ্রহণ কবিল। খানসামা চা ও ডিম্বাদি লইযা আসিল। কামবায প্রবেশ কবিযা, টেবিলেব কাছে বসিযা ছোট-হাজবি খাইতে খাইতে সুবালা বলিল—"খানসামা।"

"জি হুজুব।"

"আমি কে জান?"

'জি, আপনি মেমডাক্তাব।"

"হ্যাঁ—আমি মেমডাক্তাব হযে এখানে এসেছি। তোমাব বিবি কোথায?"

"এইখানেই আছে হুজুব। ঐ যে বাবুর্চিখানাব পূর্বে টিনেব ছাদ বযেছে, ঐ আমাব সবকাবী ড্যাবা।"—কুক্কুটাণ্ডেব পীতাংশ ছুবি দিয়া টোষ্টে মাখাইতে মাখাইতে সুবালা বলিল—"তোমাব বিবিব কি ছেলেপিলেব কোনও ব্যাবাম হলে তখনি আমায খবব দেবে। আমি এসে দেখে দাওযাই দেব। আমায কিছু ফিজ দিতে হবে না—বুঝলে?"

খানসামা সেলাম কবিযা বলিল—"হুজুবেব মেহেববানি।'

সুবালা চা পান কবিতে লাগিল। কিযৎপবে জিজ্ঞাসা কবিল—"যে বাবু আমায সঙ্গে কবে নিযে এলেন, উনি কে?"

খানসামা বলিল—"ঘোষ সাহেব—এখানকাব দ্বিতীয হাকিম।"

"মুন্সেফ না ডেপুটি?"

"ডেপুটি।"

"মাইনে কত?"

"আড়াইশো।"

"ওঁব ছেলেপিলে ক'টি?"

"কি জানি হুজুব—ওনাব ছেলেপিলে ত এখানে কেউ থাকে না। তবে শুনেছি ওনাব বিবি জিন্দা নেই—এক বছব হল মবেছে।"

সুবালা মনে মনে বলিল—আপদ গেছে। প্রকাশ্যে বলিল—"আহা বেচাবি।—বড়লোকেব ছেলে?"

"শুনেছি ওনাব বাপও একজন ডেপুটি ছিল—৮০০ টাকা দর্মা ছিল।"

সুবালা একটু মুচকি হাসিযা চক্ষু ঘুবাইযা বলিল—"আচ্ছা খানসামা, ঘোষ সাহেবেব স্বভাবচবিত্র কেমন?"

খানসামা একটু নিস্তব্ধ থাকিযা বলিল—"হুজুব আমবা গবীব নকব চাকব। ওনাবা বড়লোক—হাকিম। ওনাদেব স্বভাবচবিত্র আমবা কেমন কবে জানব?"

চা শেষ কবিযা কমাল দিযা মুখ মুছিতে মুছিতে সুবালা বলিল—"ঘোষ সাহেব মদ-টদ খান?"

খানসামা এবাব যেন একটু বিবক্ত হইযা বলিল—"তাও আমি জানিনে হুজুব।"

টেবিল পরিষ্কার করিয়া খানসামা প্রস্থান করিল।

একটা আরামকেদারায় পড়িয়া সুবালা বলিল—"ও কামিনী—আয় না—বুটজোড়াটা খুলে নে না—পা যে টাটিয়ে গেল।"

কামিনী জুতা খুলিতে লাগিল। সুবালা বলিল—"শুনলি ত কামিনী, খানসামা যা যা বললে?"

"শুনলাম ত!"

"কি রকম বোধ হয়? জালে পড়বে?"

"মানুষটা ত বোকা-সোকা রকমের বলেই বোধ হল।"

"দেখা যাক"—বলিয়া একটা রেলওয়ে সিগারেট ধরাইয়া সুবালা টানিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একমাস কাটিয়াছে। আর সপ্তাহখানেক পরেই পূজাব জন্য কাছাবি বন্ধ হইবে।

সত্যেন্দ্র খাজনাখানায় বসিয়া কাজ করিতেছিল, বড় ডেপুটি সুরেশবাবু আসিয়া বলিলেন—"সত্যেন্দ্র—একটু এদিকে এস ত।"

সত্যেন্দ্র উঠিয়া সুরেশবাবুর সহিত বাবান্দায় গেল। সুরেশবাবু চুপি চুপি বলিলেন—"আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাঙ্গলোয় এস—একটা বিশেষ কথা আছে।"

সুরেশবাবুর মুখভাব যেন কিছু অপ্রসন্ন। তাহা লক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্র বলিল—"কেন, ব্যাপার কি?"

"সেইখানেই বলব। তুমি আসতে চাও।"—বলিয়া সুরেশবাবু স্বকার্য্যে গেলেন।

সুরেশবাবু লোকটি শ্যামবর্ণ—দোহারা চেহারা। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়—বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল। মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িয়া গিয়াছে। একজন কার্য্যকুশল রাজপুরুষ বলিয়া সরকারে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। সত্যেন্দ্রকে ইনি বাল্যকাল হইতেই জানেন এবং বিশেষ স্নেহও করিয়া থাকেন। তাহার পিতার সঙ্গে কয়েক স্থানে ইনি একত্র কর্ম্ম করিয়াছেন।

সুরেশবাবু আজ অমন তাগাদা করিয়া কেন তাহাকে যাইতে বলিলেন, খাজনাখানায় ফিরিয়া গিয়া বসিয়া তাহাই সত্যেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিল। তাঁহার মুখ আজ অমন অপ্রসন্নই বা কেন? পূর্ব্বে সে অধিকাংশ দিনই সুরেশবাবুর বাঙ্গলোয় বসিয়া সন্ধ্যাযাপন করিত, এদিকে যাতায়াত খুবই কমিয়া গিয়াছে—তাই কি তিনি রাগ করিয়াছেন?—না, সেরূপ প্রকৃতির লোক তিনি ত নহেন। অন্য কিছু কাবণ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। একটা বিশেষ কথা আছে বলিয়াছেন। কি কথা?—সুবালা ও তাহার সম্বন্ধে কোনও মিথ্যা রটনা সুরেশবাবুর কানে পৌঁছিয়াছে কি? সত্যেন্দ্র মনে মনে এই প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল, কারণ, সহবে যে একটা কাণাকাণি চলিতেছে তাহা সে অবগত ছিল।

তা—কাণাকাণির কিঞ্চিৎ কারণ ঘটিয়াছে বইকি! ডাকবাঙ্গলোয় সুবালা অবস্থানকালীন প্রায়ই বিকালে সত্যেন্দ্র সেখানে গিয়া চা-পান করিত। একদিন রাত্রে সেখানে নাকি সে খানাও খাইয়াছিল। তাহার পর, সুবালার বাড়ী ঠিক হইলে, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া সত্যেন্দ্র তাহার তত্ত্বাবধান করিয়াছে। এদিকে উপর্য্যুপবি তিন চাবিদিন বিকালে সুবালাকে লইয়া টমটমে চড়িয়া সে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। সন্ধ্যাব পর ফিবিয়া সুবালার বাড়ীতেই নামে, সেখানে দুই একপাত্র চা-পান ও গল্পগুজব কবিয়া রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী আসে। সুতরাং লোকে গুজব তুলিয়া দিয়াছে, ঘোষ সাহেব লেডি-ডাক্তারকে বিবাহ করিবেন।

আজ কাছারি হইতে ফিরিয়া সত্যেন্দ্র টম্‌টম্‌ জুতিতে বলিল না। জলযোগাদির পর ছয়টার সময় সুরেশবাবুর বাঙ্গলোর অভিমুখে পদচালনা করিল।

পৌঁছিয়া দেখিল—বাঙ্গলোর সম্মুখে খোলা জায়গায় চেয়ারে টেবিল প্রভৃতি বাহির করিয়া সুরেশবাবু বসিয়াছেন। সরকারী ডাক্তারবাবু ও মুসলমান সাব-রেজিষ্ট্রার সাহেবও সেখানে উপস্থিত। একজন ভৃত্য বড় হাতপাখা দুলাইয়া সকলকে ব্যজন করিতেছে।

সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া সাব-রেজিষ্ট্রার বলিলেন—"ঘোষ সাহেবকে অনেকদিন পরে এখানে দেখলাম যে!"—বলিয়া ডাক্তারবাবুর পানে চাহিয়া তিনি একটু গোপন হাস্য করিলেন। সত্যেন্দ্র এটুকু লক্ষ্য করিল এবং রোষে তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। যথাসাধ্য আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ—ক'দিন আসতে পারিনি।"

সকলের জন্য এক এক পাত্র চা আসিল। চা-পানান্তে ডাক্তারবাবু ও সাব-রেজিষ্ট্রার বিদায় লইলেন।—তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। সুরেশবাবু ব্যজনকারী ভৃত্যকে বলিলেন—"রহনে দেও—অভি পাংখাকা জরুরৎ নেহি হায়।"—ভৃত্য পাখা লইয়া চলিয়া গেল।

নির্জ্জন পাইবামাত্র সুরেশবাবু বলিলেন—"ওহে সত্যেন্দ্র—এসব কি শুনছি?"

"কি শুনেছেন?"

"তুমি নাকি বিবাহ কববে?"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"করিই যদি—আমার এমনই কি বেশী বয়স হয়েছে?—আমার চেয়েও বুড়ো কত কত লোক ত বিবাহ করে।"

সুরেশবাবু বলিলেন—"না, তোমার বিবাহের বয়স গিয়েছে এমন কথা ত আমি বলছিনে। তবে কি না—যদি বিবাহ করতেই হয়—"

সত্যেন্দ্র বলিল—"যদি বিবাহ করতেই হয়—তা হলে এইবেলা করাই ভাল নয়? ক্রমে বয়স ত আরও বেড়ে যাবে।"—সুরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—"না, হাসিব কথা নয়। আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে বল দেখি!"

"কিসেব ব্যাপার?"

"এই লেডি ডাক্তারের সঙ্গে তোমার বিয়ে, এই যে একটা গুজব রটেছে—এর আসল ব্যাপারটা কি?"

"গুজব মাত্র। যাঁরা গুজব রটিয়েছেন তাঁদের কল্পনাশক্তির তারিফ করতে হয়।"

"তা হলে গুজবটা সত্যি নয় ত?"

"নিশ্চয়ই নয়। কেন, আপনি কি সত্যি বলে মনে করেছিলেন?"

"আমাব ত সেই আশঙ্কা হয়েছিল। যা হোক এটা যে সত্যি নয়, শুনে আমার মন থেকে একটা ভাবনার বোঝা নেমে গেল। কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিছু মনে কোরো না।"

"কি?"

"তুমি ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে অত বেশী মেলামেশা কর কেন?"

একটু বিরক্তির স্ববে সত্যেন্দ্র বলিল—"কার কথা বলছেন? মিস্‌ মজুমদারের কথা বলছেন কি?"

'স্ত্রীলোকটা' বলিয়া উল্লেখ করায় সত্যেন্দ্রেব এই উষ্মা দেখিয়া, মনে মনে হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আর কার কথা বলব? তুমি না কি টম্‌টম্‌ করে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাও—সন্ধ্যার পর ওর বাড়ীতে বসে চা খাও—এগুলো কি ভাল? তোমার অল্প বয়স—বাড়ীতে কোনও অভিভাবক নেই—দুজনের এত ঘনিষ্ঠতা কি নিরাপদ?"

শুনিয়া সত্যেন্দ্র হা হা করিয়া উঠিল। বলিল—"সুরেশবাবু, আপনি দেখছি একেবারে সেকেলে হয়ে পড়েছেন। পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব হয় না? ঘনিষ্ঠতা হয় না? তাতে যদি

কোনও দোষ না থাকে তবে মিস্ মজুমদারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতায় দোষ কি?"

সুরেশবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ভিতরে কোন দোষ না থাকতে পারে—কিন্তু দৃশ্যতঃ খারাপ।"

"খারাপ দেখাতে পারত, যদি মিস্ মজুমদার একজন অসূর্য্যম্পশ্যা পর্দ্দানশীলা স্ত্রীলোক হতেন। তা ত উনি নন—উনি শিক্ষিতা স্বাধীনা—কেন খারাপ দেখাবে? এই যে সাহেবেরা—?"—সুরেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"সাহেবদের কথা ছেড়ে দাও। তুমিও সাহেব নও—মিস্ মজুমদারও মেম নয়। না হে, অতটা বাড়াবাড়ি কোরো না। কার মনে কি আছে কিছু বলা যায়?"—সত্যেন্দ্র বলিল—"আপনার শেষ কথাটার মানে বুঝলাম না—কার মনে কি আবার থাকবে?"

"ঐ তোমার মিস্ মজুমদারের মনে কি আছে তুমি কি জান? উনি ত কচি খুকী নন—তোমার সঙ্গে এতটা মেলামেশা হলে ক্রমে ওঁর একটা অখ্যাতি রটে যেতে পারে, তা কি উনি জানেন না? খুবই জানেন। তা জেনে শুনেও যখন এতদূর গড়াতে দিচ্ছেন—তখন নিশ্চয়ই ওঁর মনে একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে।"

"কি অভিসন্ধি?"

"উনি অবিবাহিতা যুবতী—তুমি গৃহশূন্য যুবক, দশটাকা রোজগার করছ, বিবাহ ছাড়া আর কি অন্য অভিসন্ধি হতে পারে? আমার ত বিশ্বাস, উনি তোমায় গাঁথবার চেষ্টায় আছেন।"—সত্যেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল—"আপনাদের কেমন একটা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে—স্ত্রীলোকমাত্রকেই অবিশ্বাস করা। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, মিস্ মজুমদারের ও রকম কোনও অভিসন্ধি নেই। আর আপনি যে বললেন, আমার সঙ্গে মেলামেশা করে ওর একটা অখ্যাতি জন্মাতে পারে এটা উনি বিলক্ষণ জানেন—ঐখানেই আপনার ভুল। কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা করলে কেউ যে সেটাকে কুচক্ষে দেখবে—তা তিনি স্বপ্নেও জানেন না।"

সুরেশবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ, তাই ও কথা বলছ। আমার পরামর্শ যদি শোন, ওর সঙ্গে আর মেলামেশা কোরো না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব-ফন্ধুত্ব আমি বুঝিনে। চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোক জান ত? ঘি আর আগুন। ও সব সাহেবিয়ানা ছেড়ে দাও। তুমি এরই মধ্যে ওঁকে যে রকম সোনার চোখে দেখছ—ওঁর একটু অসম্মান তোমার গায়ে সয় না—কোন্ দিন তুমি ওঁর সঙ্গে বা প্রেমেই পড়ে যাও, এই আমার ভাবনা। যে গুজব এখন গুজবমাত্র—কোন্ দিন সেটা সত্যি না হয়ে দাঁড়ায়।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"সে ভয় করবেন না। ওঁর সঙ্গে মিশে একটু আমোদ পাই—তাই মিশি। প্রেমেও পড়ব না, বিবাহও করব না। এখন তবে উঠি, রাত হল।"—বলিয়া সত্যেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কতকটা নিজের প্রবৃত্তির ঝোঁকে, কতকটা সুরেশবাবুর উপর রাগ করিয়া তাঁহাকে দেখাইবার জন্য, সুবালার সহিত সত্যেন্দ্র আরও বেশী করিয়া মেলামেশা আরম্ভ করিয়া দিল।

পূজার ছুটির পর ফিরিয়া আসিয়া সুবালার নিমন্ত্রণে তাহারই গৃহে সত্যেন্দ্র মাঝে মাঝে সান্ধ্যভোজন করিতে লাগিল। আহারাদির পর গল্প করিতে করিতে রাত্রি দশটা—কোনও দিন এগারোটা বাজিয়া যায়।

আবার—শুধু নিমন্ত্রণ খাইলেই চলে না—মাঝে মাঝে প্রতিনিমন্ত্রণও করিতে হয়। সুবালাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকবাঙ্গলোয় আনিয়া সত্যেন্দ্র খাইয়াইতে লাগিল। আহারের

পর গল্পগুজব করিতে অনেক রাত্রি হইয়া পড়িত—সুবালা একাকিনী বাড়ী যাইতে পারে না—সত্যেন্দ্র তাহাকে পৌঁছাইয়া আসে।

এইরূপে আরও এক মাস কাটিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে সত্যেন্দ্র এজলাসে বসিয়া একটি মারপিটের মোকর্দ্দমায় সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতেছে, এমন সময় বড় ডেপুটিবাবুর নিকট হইতে 'চিট্' আসিল; তাহাতে ইংরাজিতে লেখা আছে—"আজ বিকালে আমার বাঙ্গলোয় অবশ্য অবশ্য আসিবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে।" সত্যেন্দ্র তাহাতে উত্তর লিখিয়া দিল—"আসিব।" মনে মনে বলিল—"না জানি আবার কি নূতন গুজব শুনেছেন! আবার যদি বক্তৃতা করতে আসেন—আমি আজ কড়া কড়া শুনিয়ে দেব!"—এজলাসের পর বাড়ী গিয়া সত্যেন্দ্র সুবালার নিকট হইতে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণপত্র পাইল।—যথাসময়ে সুরেশবাবুর বাঙ্গলোয় উপস্থিত হইয়া দেখিল আজ তিনি একাকী আফিস কক্ষে বসিয়া চা পান করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"সত্যেন্দ্র—এস। একটু চা খাবে?"—সত্যেন্দ্র বলিল—"না।"—তাহার ইচ্ছা, এখানে চটপট কাজ সারিয়া, চা সুবালার বাড়ীতে গিয়া পান করে।

সুরেশবাবু আপন মনে চা পান করিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র মুহুর্মুহু ঘড়ির পানে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সুরেশবাবু বলিলেন—"কোথাও যেতে হবে? তাড়াতাড়ি আছে?"—সত্যেন্দ্র তাঁহাকে অগ্রাহ্য করার হিসাবে বলিল—"হ্যাঁ মিস্ মজুমদারের ওখানে নিমন্ত্রণ—আছে।"

চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া, ভৃত্যহস্ত হইতে তোয়ালিয়া লইয়া মুখ মুছিতে মুছিতে সুরেশবাবু বলিলেন—"দেখ সত্যেন্দ্র, সেইকালেই আমি তোমায় বলেছিলাম, তখন তুমি আমার কথা শুনলে না। তোমাব আব মিস্ মজুমদারের ব্যাপার সাহেবের কানে উঠেছে—সাহেব একেবারে আগুন হয়ে গেছেন।"

ডেপুটিরা যখন "সাহেব" শব্দ উচ্চারণ করেন তখন তাহার অর্থ জেলার কালেক্টার সাহেব বুঝিতে হইবে।

সত্যেন্দ্রের মানসিক তাপমানের পারদ হঠাৎ কয়েক ডিগ্রী নামিয়া গেল। বলিল—"সাহেবের কানে উঠেছে? কি কথা উঠেছে?"

ডিবা হইতে দুইটা পান লইয়া মুখে পুরিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—"এই দেখ না!"—বলিয়া বাক্স খুলিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া সত্যেন্দ্রের হাতে দিলেন।

কালেক্টার সাহেব স্বহস্তে আদেশ লিখিলেন, এই বেনামী পত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাব ডিভিশনাল অফিসার যেন নিজ মন্তব্য লিখিয়া পাঠান—পরে সাহেব স্বয়ং আসিয়া রীতিমত তদন্ত করিবেন। আদেশলিপির সঙ্গে একটুকরা সাধারণ বালির কাগজ গাঁথা—তাহাতে কাঁচা হস্তে বড়বড় অক্ষরে বাঙ্গলায় লেখা আছে ঃ—

শ্রিযুক্ত কালাকঠোর সাএব বাহাদুর কমলেসু। পরে এখানে জে নতুন মেম ডাকতার আসিয়াছে তিনি ওতিসয় খারাব নোক, তেনার চরিত্তির ভাল নহে এখানকার দিতিও হাকিম ঘোষ সাএবের সগগে তিনি বরই বারাবারি করিতেছে তেনার চরিত্তির বিসয় সকলেই জানিয়াছে এই জন্য এখানকার কোনও ভদ্দরলোক নিজবাটিতে তেনাকে ডাকিতে পারে না অতেব আপুনি সিগ্র আসিয়া তদনত করিয়া ওই মেম ডাকতারকে বদলি করিতে আগ্যা হয়।

পড়িয়া সত্যেন্দ্রের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পত্রখানা সজোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া বলিল—"মিথ্যা!—মিথ্যা! আগাগোড়া মিথ্যা!"

ডেপুটিবাবু শান্তভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"এ চিঠি পেয়ে আমিও কিছু কিছু তদন্ত করেছি।"

"আমি আর নতুন কি জানব? সহরসুদ্ধ লোক যা জানে, তাই জানতে পেরেছি।"

"কি সে?"

"এই যে, তুমি প্রায়ই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লেডি ডাক্তারের বাড়ীতে থাক। কয়েকদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুজনে ডাকবাঙ্গলোতেও একত্র ছিলে।"

"তাতে কি প্রমাণ হয়?"

সুরেশবাবু মুখ অবনত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"কি প্রামাণ হয় তুমি নিজেই মনে বুঝে দেখ। তুমি ত ছেলেমানুষ নও।"

হস্তদ্বয়ের মধ্যে মস্তক রক্ষা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিল।

সুরেশবাবু মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন—"শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে এই কেলেঙ্কারিটি করলে। সময় থাকতে সাবধান যদি হতে! তখন বলেছিলাম বলে তুমি চটেই গিয়েছিলে। এখন কি করে সামলাবে সামলাও।"

সত্যেন্দ্র মাথা তুলিল। বলিল—"আপনি বিশ্বাস করেন আমি দোষী?"

সুরেশবাবু বলিলেন—"না—তবে কতকটা অবিবেচনা হয়েছে বটে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"সাহেব এসে তদন্ত এই সকল কথা জানতে পারলে, তিনি কি করবেন মনে হয়?"

"আমার মনে হয়, লেডি ডাক্তারকে বরখাস্ত করবেন—নয় তোমাকে এখান থেকে বদলি করে দেবেন। দুজনকে এক জায়গায় যে রাখবেন না, সেটা নিশ্চয়।"

"কিন্তু মিস্ মজুমদার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। দোষ যা হয়েছে—আপনি যা বললেন, অবিবেচনার দোষ—সে আমি করেছি। আমার দোষে সে গরীবের চাকরি যাবে? তাব চেয়ে আমায় বদলি করে দেন সেই ভাল।"

সুরেশবাবু বলিলেন—"তুমি বললে রাগ কর—তবু আমি বলি—তুমি তাকে যতটা অবলা সরলা মনে কর তা সে নয়। তার যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মানের জ্ঞান থাকত, তা হলে কখনই সে তোমার এতটা বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দিত না। দিয়েছে, জেনেশুনে—খালি তোমায় গাঁথবার মৎলবে।"—সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—"না সুরেশবাবু—ঐটে আপনার ভুল। তার মনে কিছু মাত্র খলতা নেই। আমার সঙ্গে যে এতটা মেলামেশা করেছে—সে কেবলমাত্র নির্দ্দোষ আমোদের জন্যে। আর, আমাদের আচরণ থেকে অন্যলোকে যে অন্য কিছু.মনে করতে পারে, সেটা তার কল্পনাতেও আসেনি।"

সুরেশবাবু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"আমি শুনেছি, ইংবেজদের মধ্যেও অনাত্মীয় যুবকযুবতীর মেলামেশা সম্বন্ধে খুব কড়া নিয়ম। এ রকম ভাবে মেলামেশা তারাই করে, যাদের আজ বাদে কাল বিয়ে হবে।—মিস্ মজুমদার কি এ খবরটি রাখেন না?"

সত্যেন্দ্র বলিল—"আপনি যা শুনেছেন ওটা ভুল। ইংরেজদের মধ্যে ওবিষয়ে খুবই স্বাধীনতা আছে। দেখবেন, কালেক্টার সাহেব এসে তদন্ত করে যখন প্রকৃত ঘটনা অবগত হবেন, তখন আমাদের দোষী বলে মনে করবেন না।"

সুরেশবাবু একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। বলিলেন—"সে যাহোক, এ রকম অবস্থায় দুজনকে কখনই এক জায়গায় রাখে না—আমি তার দুই একটা দৃষ্টান্ত জানি।"

যাইবার জন্য সত্যেন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। সুরেশবাবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফটক অবধি আসিলেন। বিদায়কালে সত্যেন্দ্র বলিল—"দেখুন—একটা কাজ করলে হয় না?"

"কি?"

"আমি যদি কালই ধরুন বদলির জন্যে দরখাস্ত করি—তা হলে এ ব্যাপারটা চাপা পড়ে না?"

"পড়লেও পড়তে পারে। তাই করবে নাকি?—অবশ্য অপমান হয়ে বদলি হওয়ার চেয়ে নিজে দরখাস্ত করে বদলি হওয়া শতগুণে ভাল।"

"আমি ভেবেচিন্তে দেখি। যেমন হয় কাল এসে আপনাকে বলব।"—বলিয়া সত্যেন্দ্র বিদায় প্রার্থনা করিল।—সুরেশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সবচেয়ে ভাল করে চাপা পড়ে—যদি তুমি মিস্ মজুমদারকে বিয়ে করে ফেল।"—সত্যেন্দ্র বলিল—"সে অসম্ভব।"

"ভগবান তোমার এই সুমতি চিরদিন রাখুন"—বলিয়া সুরেশবাবু সত্যেন্দ্রের করমর্দ্দন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুবালার বাসাটি হাসপাতাল হইতে অধিক দূর নহে। ফটক পার হইয়া সামান্য একটু বাগানের মত। বাগান পার হইয়া বারান্দাযুক্ত একখানি বাহিরের ঘরে। এই ঘরের এক পার্শ্বে ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার।

বাহিরের ঘরখানি দিব্য সাজানো। এ সমস্ত আসবাব ছবি প্রভৃতি পূজার ছুটির সময় সত্যেন্দ্রই কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। সুবালা মাঝে মাঝে বলিয়া থাকে—"বিলটা আমায় দিলেন না?" সত্যেন্দ্র বলে—"খুঁজে দেখব।"—কিন্তু সে বিল কোথায় যে গিয়াছে, কিছুতেই আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না!

সুবালা আজ আসমানি রঙের একখানি রেশমী শাড়ী পরিয়াছে। গায়ে শেওলা রঙের মখমলের একটি জ্যাকেট। এ দুটিও সত্যেন্দ্রের উপহার। শাড়ীর প্রান্ত একটি সোনার "মনে রেখ" ব্রোচ্ দিয়া আবদ্ধ। এ ব্রোচটি সত্যেন্দ্র দেয় নাই—সুবালা কলিকাতা হইতে আনিয়াছিল।

টেবিলের কাছে বসিয়া কুঞ্চিত রেশমের শেড্‌যুক্ত একটি সৌখীন ল্যাম্পেব সাহায্যে সুবালা একখানি বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ কবিতেছিল।

সত্যেন্দ্র প্রবেশ করিতেই সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আসুন। আজ এত দেরী যে? আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভুলেই গেলেন।"

অন্যদিন হইলে, ভুলিয়া যাইবার অসম্ভবতা-সূচক একটা উত্তর সত্যেন্দ্র দিত এবং সুবালা তাহাই আশাও করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া সে কথা বাহির হইল না।

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুবালা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?"

"ডেপুটিবাবুর ওখানে"—বলিয়া সত্যেন্দ্র উপবেশন করিল।

আজ আর দুইজনে গল্প ভাল জমিল না। সুবালা যতই তাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা করে, একাক্ষর উত্তর ভিন্ন আর বড় কিছুই বাহির করিতে পারে না। সত্যেন্দ্রের মুখখানি আজ গম্ভীর—চিন্তাযুক্ত।—অবশেষে সুবালা বলিল—"আজ আপনার কি হয়েছে বলুন ত?"

"কি আর হবে?"—সুবালা একটু মনোযোগের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের মুখ নিরীক্ষণ করিল। শেষে বলিল—"আপনার নাড়ী দেখি?"

সত্যেন্দ্র হাতটি বাড়াইয়া দিল।

সুবালা তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল—"লিভার খারাপ হয়েছে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"না সে সব কিছু নয়।"

সুবালা বলিল—"না যদি, তবে আপনার মুখ আজ এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেন?"

সত্যেন্দ্র কোনও উত্তর দিল না—অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

সুবালা একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল—"বলুন না।"

সত্যেন্দ্র যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কি?"

"আপনার মন আজ কোথা?"

"মন?"

"হ্যাঁ।"

সময়ান্তর সত্যেন্দ্র এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল—"চুরি গেছে।" কিন্তু আজ আর রসিকতার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিল—"আপনি কিছু বলছিলেন?"

"জিজ্ঞাসা করছিলাম—আজ আপনি এত অন্যমনস্ক কেন? বাড়ী থেকে কোনও মন্দ চিঠি পেয়েছেন?"

"না।—খাবার হল?"

"হয়েছে বোধ হয়—দেখি।"—বলিয়া সুবালা উঠিয়া গেল। ভিতবে গিয়া রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল—"কামিনী—শোন্—কাছে আয়।"

কামিনী খুন্তী হাতে করিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে চুপি চুপি কি সব বলাবলি করিতে লাগিল। কামিনী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া "হুঁ" বলিতে বলিতে মাথা নাড়িতে লাগিল। শেষে সুবালা বলিল—"দেখ্ কামিনী—পোর্টের সে বোতলটায় কিছু আছে?"

"খানা সাজিয়ে, সে বোতলটা টেবিলের উপর রেখে দিস। ওকে বলেছি, তোমার লিভার খারাপ হয়েছে। যা তা একটা কিছু ওষুধ বলে মিশিয়ে, খানিকটে পোর্ট খাইয়ে দেব। আজ যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হবে।"

কামিনী বললে—"তা রেখে দেব। কিন্তু খুব সাবধান, বুঝলে? শেষকালে একেবারে হাতছাড়া না হয়ে যায়—সেই অখিল শীলের বেলায় যেমন হয়েছিল।"

"যা যা তোর আর উপদেশ দিতে হবে না"—বলিয়া সুবালা বাহিরে আসিল। দেখিল সত্যেন্দ্র ঘরে নাই—বাহিবের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। দূরে—অশত্থ গাছের মাথাব উপর চাঁদ উঠিতেছে।

কাছে গিয়া সুবালা বলিল—"আসুন—ভিতরে আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

সত্যেন্দ্র বলিল—"ঘরে বড় গরম, তাই একটু হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম। খাবার দেরী কি?"

"বেশী দেরী নেই। মিনিট পনেবো। এইখানে ততক্ষণ বসবেন? চেয়ারে আনব?"

"আপনি কষ্ট করবেন না—আমি আনছি"—বলিয়া সত্যেন্দ্র দুই হাতে দুইখানা চেয়ার বাহির করিয়া আনিল।

বসিয়া সুবালা বলিল—"আপনার লিভাব্র নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। ক'দিন থেকেই দেখছি কিনা, আপনার চোখ হলদে হয়ে গেছে। আজ আমি আপনাকে একটা ওষুধ খাইয়ে দেব।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"না, আমার কিছু হয়নি।"—অভিমানের স্বরে সুবালা বলিল—"আমি ডাক্তার—আমি বলছি—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"আচ্ছা—আমি ওষুধ খাব—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার শারীরিক অসুখ কিছু নয়।"

"তবে কি? মানসিক?"

সত্যেন্দ্র নীরব রহিল। খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত।

আহারান্তে দুইজনে আবার বারান্দায় বসিল। চাঁদ আরও উচ্চে উঠিয়া, বারান্দাটি জ্যোৎস্নায় ভাসাইয়া দিয়াছে।—সত্যেন্দ্র "ওষুধ" পান করিয়াছে। বেশ লাগিয়াছিল—একটু বেশী করিয়াই পান করিয়াছে। লিভারের উপর তাহার প্রভাব কতদূর হইয়াছে বলিতে পারি না—তবে মস্তিষ্কের ভিতরটি যেন প্রফুল্ল চন্দ্রকিরণে চম্ চম্ করিতেছে!

শারীরিক অসুখ যদি নহে—মানসিক অসুখটা কি, জানিবার জন্য সুবালা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—"তা আপনার মনের কথা আপনি অমায় বলবেন কেন? আমি ত আপনার কেউ নই!"

সত্যেন্দ্র আবেগভরে সুবালার হাতটি ধরিয়া বলিল—"আপনি কি আমার কেউ নন?"

পূর্ব্ববৎ অভিমানভরে সুবালা বলিল—"যদি কেউ হতাম—তা হলে কি আপনি না বলে থাকতে পারতেন।"

"শুনলে পাছে আপনি কষ্ট পান—তাই আমি বলছিনে।"

"আপনি কষ্ট পাচ্ছেন—তাতেই কি আমার মনে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে না? শুনলে এর চেয়ে আর কি বেশী কষ্ট হবে আমার? আমি কি আপনার সুখেরই ভাগী? দুঃখের ভাগী কি নই?"

বায়ুভরে বারান্দার নিম্নস্থ রজনীগন্ধার ঝাড়গুলি দুলিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুলের মৃদু সৌরভে বারান্দাটি ভরিয়া গেল। সত্যেন্দ্র বলিল—"সে কথা যে আপনাব কাছে উচ্চারণ করাও শক্ত!"—সুবালা নতমুখে বলিল—"আমাকে যদি আপনি আপনার বলে মনে করতেন, তা হলে শক্ত হত না।"

"তবে শুনবেন।"

"বলুন।"

সত্যেন্দ্র তখন সঙ্কোচের সহিত, অল্পে অল্পে, সেই বেনামী চিঠির কথা প্রকাশ করিল। কালেক্টার সাহেব কি লিখিয়াছেন তাহাও বলিল।

শুনিয়া সুবালা প্রথমটা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর মস্তক নত করিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কাঁপিয়া কাঁপিয়া ক্রন্দনের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র বলিল—"ওকি! ওকি মিস্ মজুমদার! আপনি কাঁদছেন?—বলিয়া সুবালার হস্তযুগল ধারণ করিল। আদরের স্বরে বলিল—"মুখ তুলুন—মুখ তুলুন—ছি!—কাঁদে কি?"

সুবালা মুখও তুলিল না—তাহার কান্নাও বাড়িয়া গেল।

"আমার কথা শুনুন—ছি অমন করবেন না—শান্ত হোন। লিখলেই বা—লিখেছে ত কি হয়েছে?"—বলিয়া সুবালার মুখটি হাত হইতে ছাড়াইয়া লইল; নিজের রুমাল দিয়া তাহার শুষ্ক চক্ষু মুছিয়া দিতে লাগিল।—সুবালা বলিল—"কি হয়েছে? কি হতে বাকী আছে? আমার যে সর্ব্বনাশ হল!"—বলিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

সত্যেন্দ্র বলিল—"এখন থেকে অত উতলা হবার দরকার কি? কালেক্টার সাহেব এসে কি করেন দেখাই যাক না।"

সুবালা এবার নিজের মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—"তিনি এসে তদন্ত করলেই ত সব প্রকাশ হয়ে যাবে। আমরা এ ছ মাস একসঙ্গে টম্‌টমে বেড়িয়েছি—রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত দুজনে একত্র থেকেছি—সবই ত তিনি জানতে পারবেন!"

সত্যেন্দ্র বলিল—'টম্‌টমে বেড়িয়েছি—এক সঙ্গে ডিনার খেয়েছি, রাত্রে বসে গল্প করেছি—এতে আর দোষ কি হয়েছে? অজ্ঞ বাঙ্গালী আমাদের দোষী মনে করতে পারে; তিনি ইংরেজ—তিনি কখনও তা মনে করবেন না।"

সুবালা উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আপনি বলেন কি! তিনি আমাদের দোষী মনে করবেন না? এ রকম করে একসঙ্গে বেড়ায়, একসঙ্গে খায় কারা?—যাদের আজ বাদে কাল বিয়ে হবে।"—সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। সুরেশবাবু যাহা বলিয়াছিলেন, এও যে সেই কথাই বলে! তবে কি তাহারই ভুল—ইহাদের কথাই ঠিক?

সত্যেন্দ্র নতনেত্রে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সুবালা ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল—'ছি ছি শেষে—এই কলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল। আমি যখন হয়েছিলাম, তখনই আমার মা কেন নুন খাইয়ে আমায় মেরে ফেলেনি। আমার জীবনে ধিক্। আমার বেঁচে সুখ কি? এ কলঙ্কের বোঝা আমি ত সইতে পারব না—আমি আজ রাত্রেই আর্সেনিক খাব।—বলিয়া চক্ষে রুমাল দিয়া সুবালা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুবালার অবস্থা দেখিয়া সত্যেন্দ্রেরও কান্না পাইতে লাগিল। সে এখন বেশ বুঝিয়াছে—

সম্পূর্ণ তাহারই দোষে এই সমস্ত ঘটিল। বলিল—"মিস্ মজুমদার—আপনার কান্না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। যাইবার যাত হয়েই গেছে। এখন কি করলে ভাল হয় বলুন, তাই করি। সুরেশবাবু বলছিলেন, যদি আমি স্বয়ং দরখাস্ত করে এখান থেকে বদলি হয়ে যাই—তা হলে বোধ হয় কালেক্টার সাহেব কোনও তদন্ত আবশ্যক মনে করবেন না। তাই আমি মনে করেছি, কালই আমি বদলির দরখাস্ত দিই।"

সুবালা চক্ষু তুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সত্যেন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল। আবার মুখে রুমাল দিয়া বলিতে লাগিল—"নিষ্ঠুব!—নিষ্ঠুর!—এত নিষ্ঠুর আপনি, তা জানতাম না।"

সত্যেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। বলিল—"ও কথা কেন বলছেন আপনি?"

সুবালা হঠাৎ সত্যেন্দ্রের বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল—"নিষ্ঠুর!—আপনি চলে যাবেন? আমায় ফেলে চলে যাবেন? যাবার আগে আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার বেঁচে মরে থাকার চেয়ে, একেবারে মরে যাওয়াই ভাল।"

সত্যেন্দ্র এ কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। কি সর্ব্বনাশ!—এমন ব্যাপার? তলে তলে এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে! তাহা ত সে কোনও দিন স্বপ্নে ভাবে নাই!

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সত্যেন্দ্র নিজ কর্ত্তব্য স্থির কবিয়া লইল। সুবালাকে সে বিবাহ করিবে। তাহা ভিন্ন উপায় নাই—না করিলে ঘোর অধর্ম্ম হয়।

সত্যেন্দ্র আদর করিয়া সুবালার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"সুবালা—কেঁদ না, চুপ কর। এই যদি তোমার দুঃখের কারণ হয়;—তা হলে তার প্রতিবিধান ত খুব সহজ।"

সুবালা বলিল—"কি প্রতিবিধান তুমি করবে?—এ কলঙ্ক থেকে আমায় বাঁচাতে পারবে?"

"পারব সুবালা—পারব। আমি তোমায় বিবাহ করব—যদি তুমি সম্মতি দাও।—তা হলেই কালেক্টার সাহেবেব তদন্ত বন্ধ হয়ে যাবে—সব দিক বজায় থাকবে।"

একথা শুনিয়া আবার সুবালা সত্যেন্দ্রের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র বলিল—"আর কাঁদ কেন সুবালা?"—অশ্রুবিগলিত স্বরে সুবালা বলিল—"তুমি যে আমায় বিয়ে করবে বলছ, তুমি আমায় ভালবাস?"

"ভালবাসি।"—মাথা নাড়িয়া সুবালা বলিল—"না তুমি বাস না।"

"বাসি।"—সুবালা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—"বাস যদি, তবে কেন বলেছিলে আমি বদলি হয়ে এখান থেকে চলে যাব?"—সত্যেন্দ্র হঠাৎ কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তুমি যে আমায় ভালবাস আমি ত সে কথা জানতাম না।"

সুবালা বলিল—"আমি তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেই দিন থেকেই ভালবাসি।"

পরামর্শ হইল, কল্যই সত্যেন্দ্র একদিনের ছুটি চাহিয়া কালেক্টার সাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাইবে। ছুটি পাইলেই সদরে গিয়া সিভিল বিবাহের রেজিষ্ট্রারকে, তিনি আইন অনুসারে বিবাহের নোটিস দিয়া আসিবে। নোটিসের একপক্ষ পরে, তিন মাসের মধ্যে তাহাদের বিবাহ হইতে পারে।

কল্য বিকালে টম্‌টম্ লইয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সত্যেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

সুবালা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই, কামিনী একমুখ হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ভ্যালা ভ্যালা ধন্যি মেয়ে—ভালো অ্যাক্‌টো করেছ! একেবারে ফাস্টো কেলাস!"

সুবালা বলিল—"তুই শুনলি নাকি?"

"আমি শুনিনি? বসবার ঘরে, দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি। আঃ—কি কষ্টে যে হাসি চেপে রেখেছিলাম, সে আমিই জানি। বিশেষ তুমি যখন গলা

কাঁপিয়ে বলতে লাগলে—নিষ্ঠুর!—নিষ্ঠুর!—তখন আর একটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম আর কি! সুন্দর অ্যাক্‌টো করেছ। তুমি যদি ডাক্তারি না করে থিয়েটারে ঢুকতে, তা হলে আজ তোমার অন্ন খায় কে!"

"মিছে নয়। উঃ—ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পোর্টের বোতলটা বের কর্ ত কামিনী।"—বলিয়া সুবালা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাসায় পৌঁছিয়া সত্যেন্দ্র দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। এত রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া সে একটু চমকিত হইল! তাহার ধারণা ছিল, এগারোটা এখনও বাজে নাই।

বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া দেখিল, টেবিলের উপর একখানি পত্র রহিয়াছে। তাহার জননীর হস্তাক্ষর। বিছানায় বসিয়া পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। আবার দারপরিগ্রহ করিবার জন্য অনেক কাঁদাকাটা করিয়া মা পত্র লিখিয়াছেন। একটি সুন্দরী পাত্রীও তিনি ঠিক করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ সত্যেন্দ্র যেন পত্রপাঠ এক মাস ছুটির দরখাস্ত করে এবং বাড়ী গিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই শুভকার্য্য সারিয়া ফেলে।

পত্র শেষ করিয়া সত্যেন্দ্র মনে মনে একটু হাসিল। বলিল—"আজ দেখছি চারিদিক থেকেই বিয়ের সংবাদ। আমি বিয়ে করব—কিন্তু তুমি যে পাত্রী স্থির করেছ, তাকে নয় মা। সে পুণ্যিপুকুর পূজো করা, বোধোদয় পড়া, ঘোমটা দেওয়া, আলতা পরা বউ আমার পোষাবে না। ইংরেজিতে কথা কয়, জুতো পায়ে দিয়ে খট্‌মট্ করে বেড়ায়, টেবিলে বসে খানা খায়, পিয়ানো বাজিয়ে গান গায়—এমন একটি বউ আমার চাই।"

আলো নিবাইয়া, শয়ন করিয়া সুবালার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্রই সে ঘুমাইয়া পড়িল।—পরদিন প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। ঘড়িব পানে চাহিয়া দেখিল, সাতটার কাছাকাছি; তথাপি শয্যাত্যাগ করিবার জন্য তাহার কোনও ত্বরা দেখা গেল না। বিছানায় চুপ করিয়া পড়িয়া গত রাত্রির ঘটনাপরম্পরা সে চিন্তা করিতে লাগিল।

চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে বড় অশান্তি উপস্থিত হইল। ভাবিল—"এ কি করিয়া বসিলাম! যাহা কোনও দিন কল্পনাও করি নাই, তাহাই করিয়া ফেলিয়াছি যে! কাজটা কি ভাল হইল?"—"যাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি—তাহার সম্বন্ধে আমি ত কিছুই জানি না বলিলেই হয়। শুধু এই মাত্র জানি, সে ক্যাম্বেল ইস্কুলে পড়িয়া ডাক্তারি পাস করিয়াছে। উহার পিতা কে তাহা জানি না—মাতা কে জানি না—কিরূপ বংশ তাহাও অবগতি নহি—কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর ও মানুষ হইয়াছে তাহাও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—হঠাৎ বিবাহ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম!—এ যে অন্ধকারে লাফ দেওয়ার মত! কাজটা ত ভাল হইল না।—"উহাকে বিবাহ করিলে, পরিণামে যাহাই হউক, এখন ত সদ্য সদ্য আমার জাতি যাইবে। মুর্গীই খাই আর যাই করি—তবু ত আমি হিন্দু সমাজের ভিতর আছি! বিবাহ করিলেই আমার মা, আমার ভাইবোনেরা, আমার আত্মীয়স্বজন—সকলে আমার পর হইয়া যাইবে। আমি এ কি করিলাম।

"কিন্তু এখন আর এসব কথা ভাবিয়া কি হইবে? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—না, আরও পূর্ব্বে ভাবিতে উচিত ছিল। অজানা একটি যুবতীর সঙ্গে আমি কেন এত মেলামেশা—এত ঘনিষ্ঠতা করিলাম! যদি না করিতাম তাহা হইলে ত এ কাণ্ডটি ঘটিত না। কর্ম্মসূত্রের এ জাল স্বহস্তে বয়ন করিয়া কেন নিজেকে জড়াইলাম?

"কিন্তু কথা যখন দিয়াছি—আর ফিরিবার উপায় নাই। ফেরা বোধ হয়, ধর্ম্মতঃ উচিতও হইবে না। মূঢ়তাবশে সেই সরলা রমনীর মনে প্রণয়-সঞ্চার করিয়াছি। বুড়া চাণক্য পণ্ডিত ঠিকই লিখিয়াছিল—ঘি গলিয়াছে। এখন যদি পশ্চাৎপদ হই—বিবাহ না করি—

তবে সে বিশ্বস্ত হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়—মৃত্যুর অধিক কলঙ্ক তাহার চিরজীবনের সঙ্গী হইবে। সুতরাং এখন আর অন্য চিন্তা নিষ্ফল।"

একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সত্যেন্দ্র শয্যা হইতে উঠিল। মুখাদি প্রক্ষালনের পর, ছোট-হাজীব খাইতে খাইতে তাহার মনে পড়িল—বদলিব দরখাস্ত দেওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলাম আজ গিয়া সুরেশবাবুকে জানাইবার কথা আছে। ভাবিল—যাই, গিয়া একদিন ছুটির দরখাস্তখানা দিয়া আসি—আর, সকল অবস্থা তাঁহাকে বলিয়াও আসি।

সত্যেন্দ্র গিয়া দেখিল, সুরেশবাবু তাঁহার আফিসকক্ষে বসিয়া একটি মোকর্দ্দমার রায় লিখিতেছেন। বলিলেন—"সত্যেন্দ্র—এস। দরখাস্ত লিখে এনেছ দেখছি যে।"

সত্যেন্দ্র বসিয়া, কাগজখানা সুরেশবাবুর হাতে দিল। পড়িয়া তিনি বলিলেন—"এ কি? একদিনের ছুটি নিয়ে কি করবে?"

মুখখানি ম্লান করিয়া সত্যেন্দ্র বলিল—"আমার সব ওলট পালট হয়ে গেছে সুরেশবাবু। আমি মিস্ মজুমদারকে বিয়ে করব। সদরে গিয়ে রেজিষ্টারকে তিনি আইন অনুসারে নোটিস দিয়ে আসবে।"—সুরেশবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সত্যেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"এই কাল সন্ধ্যেবেলা বললে, ওকে তুমি বিবাহ্ কবিবার কথা কল্পনাও করতে পার না; এরই মধ্যে আবার মত পরিবর্ত্তন হবার কারণ কি?"

সত্যেন্দ্র তখন, গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে তাঁহার কাছে বর্ণনা করিল।

সমস্ত শুনিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—"তোমায় যেন ভালমানুষটি পেয়েছে!—কতখানি পোর্ট খাইয়ে দিয়েছিল?"—সত্যেন্দ্র এ কথায় একটু বিরক্ত হইল। বলিল—"পোর্ট খেয়েই কি আমি ও কাজ করেছি? অবস্থা ত সব শুনলেন—ওকে যদি এখন আমি বিবাহ্ কবতে অস্বীকার করি, সেটা কি আমার পক্ষে ঘোর অন্যায় হয় না?"

সুরেশবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না, অন্যায় হয় না। যদি পাশ্চাত্য বিবাহ-নীতি অনুসারেই বিচার করা যায়, তা হলে তুমি ওকে বিবাহ করলেই অন্যায় হয়।"

"কেন?"

"কারণ—তুমি ওকে ভালবাস না।"

"কি করে জানলেন আমি ভালবাসিনে?"

"যদি ভালবাসতে, তা হলে এর অনেক আগেই ওকে বিবাহ্ করবাব ইচ্ছা তোমার হত। এ গণ্ডগোলটির জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে না। কাল সন্ধ্যার পর আমার কাছ থেকে যখন গেলে, তখন পর্য্যন্ত ওকে বিবাহ্ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব—আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই চার আউন্স পোর্ট আর খানিকটে চোখেব জলের প্রভাবেই তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে উর্ব্বর হয়ে প্রেম-তরু গজিয়ে উঠল?"—সত্যেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—"তোমায় এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, তোমার বাপ আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন, সেই অধিকারেই এ সকল কথা তোমায় আমি বলছি—তুমি কিছু মনে কোরো না সত্যেন। তুমি ছেলেমানুষ—তোমার বুদ্ধি এখনও কাঁচা। আমার পরামর্শ শোন!"

"কি বলুন।"

"হতে পারে মিস্ মজুমদার খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু তুমি ওঁকে কতটুকুই বা জান? অন্য রকম হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। রাগ করো না,—আমার ত সন্দেহ হয় উনি জেনেশুনে তোমায় এই জালে জড়িয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে তা তুমি বুঝতে পারছ না? জাত যাওয়া-টাওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমি বলি কি, কিছুদিন এখন চোখকান খুলে থাক না।—রেজিষ্টারকে নোটিস দেবার এত তাড়াতাড়ি কি?"

"তাড়াতাড়ি—কালেক্টার সাহেবের তদন্ত ভয়ে।"

"আমি ওটা কিছুদিন চেপেই রাখব না হয়। আমার রিপোর্ট না পেলে তিনি আসবেন না; আগে দুই চারখানা তাগিদ আসুক তবে আমি রিপোর্ট পাঠাব। তুমি মাসখানেক কি অন্ততঃ পনেরো দিন সবুর কর। বিবাহ—যার ফল আজীবন ভোগ করতে হবে—বংশাবলীক্রমে ভোগ করতে হবে—সে কি তাড়াতাড়ি স্থির করে ফেলবার জিনিষ?"

সত্যেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা, তাই হোক। আমি অপেক্ষা করলাম।"

সুরেশবাবু তাহার ছুটির দরখাস্তখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সত্যেন্দ্র প্রস্থান করিল।—বাসায় গিয়া দেখিল, সুবালার বেহারা একখানি চিঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুবালা আজ তাহাকে "প্রিয়তম" পাঠ লিখিয়া, সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। স্বাক্ষর করিয়াছে, "তোমার প্রেমার্থিনী সুবালা।"

চিঠি পড়িয়া সত্যেন্দ্র বেহারাকে বলিল, "যাও পিছে জবাব ভেজেঙ্গে।" কিয়ৎক্ষণ পরে লিখিয়া পাঠাইল—তাহার শরীর অসুস্থ, রাত্রে কিছু খাইবে না। বিকালে গিয়ে দেখা করিবে।

বিকালে গিয়া দেখিল সুবালা বাগানে দাঁড়াইয়া ফুল তুলিতেছে। হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাহার পানে চাহিয়া সুবালা বলিল—"এস—কেমন আছ?"

"শরীরটা বড় খারাপ।"

"কি হয়েছে?"

"বড় মাথা ধরেছে।"—এ সংবাদে সুবালা ভারি কাতব হইয়া পড়িল। বলিল—"এস, তোমার মাথায় ওডিকলোন দিয়ে দিই।"

সত্যেন্দ্র সুবালার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বসিবার কক্ষে গেল। গোলাপজলের সহিত ওডিকলোন মিশাইয়া সুবালা তাহার মস্তকে দিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র একটু সুখ বোধ করিলে সুবালা জিজ্ঞাসা কবিল—"ছুটির দরখাস্ত করেছ?"

"না।"

"কেন?"—সুবালার কণ্ঠস্বরে বিলক্ষণ উৎকণ্ঠা প্রবেশ পাইল।

"এখন কাজকর্ম্ম বেশী পড়েছে, দিনকতক যাক্।"

সুবালা নিরাশ হৃদয়ে ভূমির পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে সত্যেন্দ্র উঠিয়া বলিল—"এখন যাই।"—সুবালা কাতর স্বরে বলিল—"এখনি যাবে কেন?"

"হিমটা আজ আর লাগাব না।"—বলিয়া সত্যেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

উপর্য্যুপরি তিনদিন সত্যেন্দ্র আর ও পথ মাড়াইল না; এ তিনদিন সুবালা উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাকে অনেকগুলি পত্র লিখিল—নানা অছিলায় তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল—কিন্তু সত্যেন্দ্র একটা না একটা ওজর করিয়া কাটাইয়া দিতে লাগিল।—চতুর্থ দিন রবিবার ছিল। অপরাহ্নকালে সত্যেন্দ্র ভাবিল, সুরেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি—ফিরিবার পথে সুবালাকেও দেখিয়া আসিব।—ঘণ্টাখানেক সুরেশবাবুর বাড়ীতে বসিয়া সত্যেন্দ্র গল্পগুজব করিল, সেই বেনামী চিঠিখানি বাহির করিয়া, উভয়ে তাহার প্রেরক সম্বন্ধে নানারূপ অনুমান করিতে লাগিল। পাঁচটার পর উঠিয়া সত্যেন্দ্র সুবালার বাড়ীর দিকে চলিল।

বাগান পার হইয়া সম্মুখের বারান্দায় উঠিতেই সত্যেন্দ্র দেখিল, সুবালার বেহারা একখানা পত্র হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। সত্যেন্দ্রকে দেখিবামাত্র সে যেন একটু ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি নিজের জামার পকেটের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

ঐ রঙের ঐ প্রকার খামেই সুবালা সত্যেন্দ্রকে চিঠি লিখিয়া থাকে। বেহারার আচরণ ও মুখভাব দেখিয়া সত্যেন্দ্রের ভারি সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"কিস্‌কা চিঠি হায় রে?"

বেহারা থতমত খাইয়া বলিল—"চিঠি নেহি হুজুর একঠো কাগজ।"

সত্যেন্দ্র চক্ষু রাঙাইয়া বলিল—"নিকালো দেখেঁ।"

বেহারা কম্পিতহস্তে চিঠি বাহির করিয়া দিল। সত্যেন্দ্র দেখিল, খামে তাহারই নাম—যদিও সুবালার হস্তাক্ষর নহে। নিমেষ মধ্যে খুলিয়া পাঠ করিল :—

স্রিযুক্ত ঘোষ সাএব কমলেসু

পরে মেম সাএবের সরিরর বরই খারাপ হইয়াছে তিনি সর্য্যাগত, তেনার ওতশিয় মাতা ধরিয়াছে আপুনি সিগ্র আসিয়া তেনাকে দেখিবে ওধিক আর কি লিখিব।

শ্রীমতি কামিনী দাসি

চিঠিখানি পড়িবামাত্র একটা কথা বিদ্যুতের মত সত্যেন্দ্রের মনে প্রবেশ করিল। চিঠি পকেটে রাখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাবান্দায বসিয়া সুবালা ও কামিনী তাস খেলিতেছে, সুবালা তাস হাতে করিয়া উচ্চস্বরে হাসিতেছে।

জুতার শব্দ পাইয়া, সত্যেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা দুইজনে ধড়মড় করিয়া দাঁড়াইযা উঠিল। কামিনী তাসগুলা কুড়াইয়া লইয়া একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সত্যেন্দ্র বারান্দায উঠিয়া দেখিল, সুবালার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বিহ্বলকণ্ঠে বলিল—"এস। এতদিন আসনি কেন?"—সত্যেন্দ্র তাহার পানে কটমট করিযা চাহিয়া বলিল—"তোমার নাকি মাথা ধরেছে?"—সুবালা মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ধরেছে বই কি। সেই বেলা তিনটে থেকে ধরেছে। তোমায় কে বললে?"

"আমি তোমার বারান্দায় উঠেই বেয়ারার কাছে চিঠি পেলাম। কামিনী লিখেছে।"

"হ্যাঁ—কামিনীকে বলেছিলাম চিঠি লিখে তোমায় ডেকে পাঠাতো।"

"আচ্ছা এক কাজ কর—একটু গোলাপজল আর ওডিকোলন মিশিয়ে মাথায় দাও। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, আমি চললাম।" বলিয়া মস্ মস্ করিযা সত্যেন্দ্র বাহিব হইয়া গেল।—যথাসাধ্য ক্ষিপ্রচরণে সুরেশবাবুর বাঙ্গলোয় গিয়া সে দেখিল, তিনি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি বাহির কবাইযা বাবান্দার নিম্নে বাগানে বসিয়াছেন। সত্যেন্দ্র হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"সে বেনামী চিঠিখানা বের করুন ত।"

টেবিলের উপরেই আফিস বাক্স ছিল। সুরেশবাবু পত্রখানি বাহির করিয়া দিলেন।

সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া সেই চিঠি আর কামিনীব এই চিঠি পাশাপাশি ধরিয়া মিলাইয়া দেখিল। পরে দুইখানাই সুরেশবাবুর সম্মুখে ফেলিয়া বলিল—"দেখুন, একহাতের লেখা কি না।" পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটেব ঘর্ম্ম মুছিয়া সত্যেন্দ্র একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।—সুরেশবাবু পত্র দুইখানি পরীক্ষা কবিয়া, হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"একই হাতের লেখা, বানান ভুল, ভাষার ভুলগুলি পর্য্যন্ত মিলে যাচ্ছে। দেখলে হে? বৃদ্ধস্য বচনং—"—যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সত্যেন্দ্র তখন সমস্তই বর্ণনা করিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—"ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে গেছে। তিন চার দিন তুমি যাওনি—ওরা ভাবলে, বুঝি বা শিক্লি কাটলে তুমি। তাই কামিনীকে দিয়ে চিঠি লেখালে, যাতে তুমি মনে কর, আহা বেচারির এত অসুখ কবেছে যে নিজে চিঠিখানাও লিখতে পারেনি। বেহারাকে নিশ্চয়ই শিখিয়ে দিয়েছিল যে সাহেব যদি জিজ্ঞাসা করেন ত বলিস্ মেমসাহেব বিছানায় পড়ে ছটফট করছেন। বেহাবা তোমার বাঙ্গলোয় যাবে—তার পর তুমি আসবে—ইতিমধ্যে তাসের বাজিটে সেরে নিয়ে মেমসাহেব বিছানায় পড়ে ছটফট করতেনও। কিন্তু তুমি যে হুপ্ করে গিয়ে পড়বে, তা আর কি করে জানবে বল?"

সত্যেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা নিজের নামে অমন বদনাম দিয়ে ঝির দ্বাবায় ও রকম বেনামী চিঠি লেখাবার উদ্দেশ্য কি?"—সুরেশবাবু বলিলেন—"উদ্দেশ্য ত জলের মত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। একটা গোলমাল হবে, ধর্ম্ম ভেবে ওকে তুমি বিবাহ করতে সম্মত হবে—এই আর কি। যা উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখিয়েছিল—তা সফলও হয়ে উঠেছিল। দেখ তোমার

সরলা অবলার কীর্ত্তিখানি। উঃ—যে স্ত্রীলোক নিজের নামে অমন কলঙ্ক নিজে হাতে লেপে দিতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে? এখন তোমার চোখ ফুটেছে ত?"

"ফুটেছে বইকি।"

"উঃ—খুব রক্ষে পেয়ে গেছ। নির্ম্মল জলাশয় ভ্রমে ঐ এঁদোপুকুরে ত ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলে! খুব বেঁচে গেছ—দুর্গা দুর্গা!"—পরদিন সত্যেন্দ্র তিন মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত দিল। ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়া, মাতৃনির্ব্বাচিত সেই সুন্দরী ডাগর মেয়েটিকেই বিবাহ করিয়া ফেলিল।

[মানসী, আশ্বিন ১৩২০]

সম্পাদকের আত্মকাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রকৃত নামটি গোপন করিয়া এই কাহিনী উপলক্ষ্যে যে কোনও একটি ছদ্ম-নাম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি—ধরুন আমার নাম শ্রীমনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি একখানি মাসিক পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক—আমার কাগজখানির নামও গোপন করিয়া তৎস্থলে লিখি—"আর্য্যশক্তি"। এই কপতটাটুকু অবলম্বন করিলাম বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। কারণ অদ্য যে আত্মকাহিনীটি বিবৃত করিতে বসিয়াছি তাহাতে আমার বুদ্ধিমত্তা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই—বরঞ্চ তদ্বিপরীত। আমার আসল নামটি শুনিলে আপনারা অনেকেই হয়ত আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন; কারণ আমি বঙ্গসাহিত্যে একজন নগণ্য ব্যক্তি নহি এবং আমার কাগজখানিরও যথেষ্ট নাম হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এই যে, নাম যত হয়, টাকা কড়ি তাহার উপযুক্ত কিছুই হয় না। সম্মুখেই পূজা—প্রেসের দেনা শোধ করিতে হইবে, কাগজের দোকানেও অনেক টাকা বাকী, যে ফারম আমাদের ছবির ব্লক প্রস্তুত করে, তাহারাও তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তহবিলের অবস্থা শোচনীয়। তাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া, রঙ্গীন কাগজে এক লম্বা চৌড়া হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া কলিকাতায় অজস্র বিলি করিলাম এবং মফঃস্বলেও নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিলাম, এ বৎসর আর্য্যশক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা কয়েক সহস্র (ঠিক কয়েক সহস্র লিখিয়াছিলাম মনে নাই) অধিক ছাপাইয়াও কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারিতেছি না। দামোদরের বন্যার মত হু হু করিয়া গ্রাহকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আর অধিক দিন যে নূতন গ্রাহকগণকে সম্পূর্ণ সেট কাগজ দিতে পারিব, এমন ভরসা নাই। অতএব যাঁহারা "আর্য্যশক্তি'র নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাটা কিন্তু সত্য নহে। নূতন গ্রাহক মোটেই হইতেছিল না, এবং "আর্য্যশক্তি"র অবিক্রীত সংখ্যাগুলি স্তূপাকার হইয়া বাড়ীতে স্থানাভাব ঘটাইয়াছিল। কিন্তু ঈদৃশ মিথ্যাভাষণে পাপ নাই, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলা যাইতে পারে। এরূপ আড়ম্বর করিয়া বিজ্ঞাপন না দিলে আমার কাগজ চলে না; না চলিলে আমার প্রাণরক্ষা হয় না, কারণ এই কাগজই আমার একমাত্র জীবিকা এবং আমি যে একজন সৎকুলীন ব্রাহ্মণ, সে কথাটা অলীক নহে।—সপ্তাহকাল মধ্যে হ্যাণ্ডবিলের ফল পাইতে লাগিলাম। অনেকগুলি নূতন অর্ডার আসিল—কিছু টাকা পাইলাম। দেনা কতক কতক পরিশোধ করিলাম এবং বাকী টাকা, পূজার অবকাশে দেশভ্রমণে যাইব বলিয়া রাখিয়া দিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী-আন্দোলন পুরা দমেই চলিতেছে। বঙ্গসাহিত্যের মরা গাঙ্গেও ভাবের বান ডাকিয়া উঠিতেছে—আমিও "আর্য্যশক্তি"তে উদ্দীপনাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোলদীঘি, বিডন-বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে; কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। সিমলাশৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে—আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।

পূজা সংখ্যা আর্য্যশক্তি বাহির হইয়াছে। কার্ত্তিকের কপি প্রেসে দিয়া ভ্রমণে বর্হিগত হইব—প্রভাতে আফিসে বসিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতেছিলাম। অনাদিবাবুর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস আর্য্যশক্তিতে মাসে মাসে বাহির হইতেছিল—কার্ত্তিকের কিস্তি যথাসত্বর পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাফ লিখিতেছি, এমন সময় একজন অপরিচিত যুবক, পাঞ্জাবী কামিজের উপর রেশমী চাদর ঝুলাইয়া, ছাতা হস্তে আমার আফিসে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনার নাম মনতোষবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—ভাবিলাম বোধহয় নূতন গ্রাহক হইতে আসিয়াছে—তিনটি টাকা পাওয়া যাইবে।

লোকটি আমায় নমস্কার করিয়া, বিনা আহ্বানেই পাশেব বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"অনেক দিন থেকে আপনাকে দেখবার জন্যে উৎসুক ছিলাম। আপনি একজন দেশবিখ্যাত লোক। আজ আমার সুপ্রভাত।"

আমি বিনয়সূচক একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলাম, "আপনার নাম কি?"

"আমি একজন অখ্যাত অজ্ঞাত লোক। আমার নাম শুনলে ত আপনি চিনতে পারবেন না। আমি মফঃস্বলে থাকি। সম্প্রতি একটি কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। আর্য্যশক্তিতে আপনার প্রবন্ধ পড়ে আপনার উপর বড়ই শ্রদ্ধা হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম, একবার গিয়ে আলাপ করে আসি। আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

দেখিলাম, গ্রাহক হইবার গতিক নয়। একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম, তবে তাহার স্তবে তুষ্টও হইলাম। একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ক্ষমতা।"

সে বলিল, "আপনার মত আর দু চার জন 'সামান্য ব্যক্তি' বাঙ্গলাদেশে থাকলে আব ভাবনা ছিল কি? অন্য লোকে কি মনে করে জানি নে, কিন্তু আমার ত বিশ্বাস—এই স্বদেশী আন্দোলনকে আর্য্যশক্তিই জাগিয়ে রেখেছে।"

আমি বললাম, "সাধ্যমত দেশের একটু কাজ করতে চেষ্টা কবে থাকি।"

বাবুটি বলিল, "আজকাল আর্য্যশক্তিই বোধহয় বাঙ্গলার প্রধান মাসিকপত্র?"

একটু বিনয়সূচক হাস্য করিয়া বলিলাম—"আমাদেব কিছু বলা শোভা পায় না; তবে অনেকেই এখন এ কথা বলছেন বটে। গত সপ্তাহের 'বঙ্গদূত' দেখেছেন?"

"না—কি লিখেছে?"

"আমাদের পূজো সংখ্যার একটা সমালোচনা করেছে"—বলিয়া দেরাজ হইতে বঙ্গদূতখানি বাহির করিয়া বাবুটিব হস্তে দিলাম। তাহাতে ঠিক ঐ কথাই ছিল—আর্য্যশক্তিই এখন বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র। তবে ও কথাটি বঙ্গদূত বলে নাই—আমি নিজেই বলিয়াছিলাম কারণ, সমালোচনাটি আমারই স্বরচিত।

যুবক পাঠান্তে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "বাঃ—বেশ লিখেছে। ঠিকই লিখেছে; আচ্ছা মশায়, কোন্ শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আর্য্যশক্তির বেশী প্রচার?"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "দেশের অধিকাংশ গণ্যমান্য পদস্থ লোকই আমাদের গ্রাহক। এদিকে বর্ম্মা থেকে আরম্ভ করে ওদিকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত—যেখানেই বাঙ্গালী আছে—সেখানেই আর্য্যশক্তির আদর।"

কথাটা বিলক্ষণ অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম। আমরা যে কেবল কাগজে ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দিই এমন নহে—সুযোগ পাইলে মুখে মুখেও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকি।

লোকটি বলিল, "তা ত হবেই—তা ত হবেই। আমরাও দেখেছি কি না—আর্য্যশক্তিতে এক একটা স্বদেশী প্রবন্ধ বেরিয়েছে—আর কলেজের ছেলেরা মেতে উঠেছে।"

"হ্যাঁ—কলেজের ছেলেদের মধ্যেও আমার যথেষ্ট গ্রাহক। আগে তত ছিল না। স্বদেশী প্রবন্ধগুলো যে সময় থেকে বেরুতে আরম্ভ করেছে—সেই সময় থেকে কলেজের ছেলেরা খুব গ্রাহক হচ্ছে।"—বাবুটি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা মনতোষবাবু, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?—আর্য্যশক্তির গ্রাহক কত হয়েছে?"

একটু চিন্তার ভান করিয়া বলিলাম, "ঠিক মনে নেই।"

"দশ হাজারের বেশী বোধ হয়?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন মনে মনে কত হিসাব করিতেছি, এরূপ ভাবটা দেখাইয়া বলিলাম, "না—দশ হাজার এখনও উঠেনি।"

বাস্তবিক উঠে নাই। অর্দ্ধেকও উঠে নাই। সিকি উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কেন জানি না, বাবুটি ধরিয়া লইল, দশ হাজার পূরিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। বলিল—"উঃ—ন হাজারের উপর গ্রাহক! বোধ হয় বাঙ্গলা আর কোন মাসিকপত্রের গ্রাহক ন হাজার উঠেনি?"

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলাম, "অর্দ্ধেকও নয়।"

লোকটি তখন ধীরে ধীরে পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল। একটু কাসিয়া, একটু হাসিয়া, সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আমি দুটি স্বদেশী প্রবন্ধ লিখেছি। এ দুটি—আর্য্যশক্তিতে ছাপাবার মত হবে কি?"—বলিয়া কাগজগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম,—"তাই বল!—তোমার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে বোঝা গেল। এত আমড়াগেছে না করে প্রথমে সোজাসুজি বললেই হত! তোমার এ প্রবন্ধ যদি রাবিশ হয়, তুমি আমায় ক্ষণজন্মা পুরুষ বলেছ বলেই কি আমি ছাপাব?"—প্রবন্ধ দুইটি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, শেষে স্বাক্ষর রহিয়াছে—শ্রীরসিকমোহন সেনগুপ্ত। বলিলাম—"আচ্ছা, রেখে যান, সময় মত পড়ে দেখব। যদি ছাপাবার উপযুক্ত হয় তবে অবশ্য ছাপা হবে।"

"কার্ত্তিকে বেরুবে কি?—অবশ্য, যদি মনোনীত হয়?"

"কার্ত্তিকে?-কার্ত্তিকের কপি ত একরকম ঠিকই হয়ে গেছে। অগ্রহায়ণের আগে আর—"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। বলিল—"আচ্ছা, দেখবেন। না হয় অগ্রহায়ণেই দেবেন। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হল, মনতোষবাবু আপনার অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এখন তবে আসি—নমস্কার।"

"নমস্কার—" বলিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ উঠিয়া আবার বসিলাম।

লোকটিও দ্বারের বাহির হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল, আমার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ। পূজা-সংখ্যার একটা ইংরাজী সমালোচনা লিখিয়া তাহা প্রকাশের জন্য অবিনাশকে কোনও দৈনিক সংবাদপত্রের আফিসে পাঠাইয়াছিলাম। প্রবেশমাত্র তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হল হে?"

অবিনাশ বলিল, "কাল সকালে বেরুবে। আমি নিজে বসে থেকে কম্পোজ করিয়ে প্রুফ দেখে দিয়ে এসেছি। ও লোকটা কেন এসেছিল?"

"রসিকবাবু?"

"ওর নাম কি রসিকবাবু নাকি? আপনাকে তাই বলেছ বুঝি?"

"না, মুখে বলেনি, নিজের লেখা বলে এই দুটো প্রবন্ধ দিয়ে গেছে—নীচে সই রয়েছে

শ্রীরসিকমোহন সেনগুপ্ত।”—অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “ওর মাথা! ওর চৌদ্দপুরুষেও কারু নাম রসিকমোহন সেনগুপ্ত নয়।”

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে ও কে?”

“ডিটেক্‌টিভ। এর নাম ভূপতি রায়!”

ভীত হইয়া বলিলাম, “ডিটেক্‌টিভ? বল কি! বোধ হয় ভুল করছ।”

অবিনাশ জোরের সহিত বলিল, “হ্যাঁ, ও ডিটেক্‌টিভ। আমি ওকে খুব চিনি। পঞ্চাশ দিন ওকে আমি লালবাজারে দেখেছি। কি বললে?”

শুনিয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। একে এই নূতন তালিকার গুজব—তাহার উপর কতকগুলা অযথা মিথ্যা কথা বলিয়া আর্য্যশক্তির প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উহার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিলাম। ও এখন তাহারও উপর পুলিশোচিত রঙ চড়াইয়া কি ভীষণ রিপোর্টই যে দাখিল করিবে, তাহা ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অবিনাশ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল—“কি সব কথাবার্ত্তা হল, আমায় বলুন দেখি।”—যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম, সমস্ত কথা অবিনাশের নিকট ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া সে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “কাজটা ভাল হয়নি। যে দিন-সময়।”—টেবিল হইতে সেই কাগজগুলা উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

“কি?”

“আরে সর্ব্বনাশ!—এর নাম কি প্রবন্ধ? এ যে একেবারে আগুন। এই ছাপলেই হয়েছে আর কি! সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি।”

“বল কি!”

“শুনুন না।”—বলিয়া প্রবন্ধদ্বয়ের কয়েকটা স্থান সে পড়িয়া পড়িয়া আমায় শুনাইল।

আমি বলিলাম—“সর্ব্বনাশ! বোধ হয় আমাদের ফাঁসাবার মৎলবেই প্রবন্ধ দুটো রেখে গেছে। দাও ছিঁড়ে ফেলি।”—বলিয়া প্রবন্ধ দুইটি আমি খণ্ড খণ্ড কবিয়া ছিঁড়িয়া ওয়েষ্টপেপার-বাস্কেটে ফেলিয়া দিলাম।

অবিনাশ বলিল—“এ বেরুলে সদ্য সদ্য আমাদের বিরুদ্ধে ১২৪ক—আর পাঁচটি বছর করে শ্রীঘর। ওগুলো শুধু ছিঁড়ে ফেললে চলবে না। একেবারে উনুনে ফেলে দিয়ে আসুন। কি জানি, যদি আমাদের আফিস খানাতল্লাসী করায়—ঐ টুকরোগুলো নিয়ে গিয়ে জোড়া দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিষম প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করাবে।”

আমি বললাম, “ঠিক বলেছ অবিনাশ! তাই বোধ হয় সে বাস্কেলের মৎলব।”—ছিন্নাংশগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, অন্তঃপুরে গিয়া সেগুলি জ্বলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিলাম।

স্নান করিয়া, পূজা আহ্নিক সারিয়া, জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি, অবিনাশ বসিয়া মাথা গুঁজিয়া একমনে কি লিখিয়া যাইতেছে। চার পাঁচ খানা কাগজ লিখিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, “হচ্ছে কি?”

“একটা প্রবন্ধ লিখছি।”

“কি প্রবন্ধ?”—বলিয়া লেখা কাগজগুলি উঠাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অবিনাশ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের অসামান্য ন্যায়পরায়ণতা, অপার সদাশয়তা, আদর্শ প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘছন্দে একটি পরম রমণীয় স্তব রচনা করিয়াছে। যে সকল অপরিণামদর্শী অজ্ঞলোক ঈদৃশ মহানুভব পিতৃমাতৃতুল্য গভর্ণমেন্টের বিপক্ষতাচারণ করিতেছে, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। বুঝিলাম, সেই ডিটেক্‌টিভের কাগজগুলি গুছাইয়া, কোণ ফুঁড়িয়া সুতা গাঁথিয়া বলিল,—“লিখে দিন—‘মনোনীত—কার্ত্তিকের জন্য’—লিখে সই করে দিন।”

আমি তাহাই লিখিয়া সহি করিয়া দিলাম। অবিনাশ আমার বুদ্ধি বল—অবিনাশ আমার দক্ষিণ হস্ত। প্রবন্ধটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া অবিনাশ বলিল, "বেলা হয়েছে, এখন তবে বাড়ী চললাম। স্নানাহার করিগে।"

আমি বললাম, "ওহে, এক কাজ কর না। আজ এইখানেই স্নানাহার কর। কি জানি যদি পুলিস-টুলিস এসে পড়ে, তুমি থাকলে অনেকটা ভরসা হয়।"

অবিনাশ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ ত আমার থাকবার যো নেই মনতোষবাবু! বাড়ীতে একজন কুটুম্ব এসেছেন। আমি না গেলে—"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, তা যাও, কিন্তু আজ ওবেলা একটু সকালে সকালে এস।"

"তা আসব।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবিনাশ সেই যে গেল—আর তিন দিন ধরিয়া তাহার টিকিটিও দেখিতে পাইলাম না। এ তিন দিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম। পতিত-পতত্রে বিচলিত পত্রে—মনে হয় ঐ বুঝি পুলিস আসিল। গলির মোড়ে লাল পাগড়ি দেখিলেই কাঁপিয়া উঠি।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জেলকে আমার এত ভয় কেন? কেন তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ জেলে ধর্ম্মবিচার নাই, জাতিবিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করি না। জেলে আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার জন্য কুশাসনই বা পাইব কোথায়, একটু গঙ্গাজলই বা আনিয়া দেবে কে? আমি যাহার তাহার হাতে খাই না। এক, বাড়ীর লোক, কিংবা সুপরিচিত ব্যক্তি, যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্রাহ্মণ, তাহারই হাতে খাই। জেলে ত সে আব্দারটি আমার খাটিবে না। দ্বিতীয় কারণ—বিধবা হইতে আমার ব্রাহ্মণীর ঘোরতর আপত্তি। দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হইলে, আমি জীবিত অবস্থায় জেল হইতে যে বাহির হইব না ইহা নিশ্চয়। আমার বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্যও তেমন ভাল নহে। জেলের অন্ন খাইযা আমি কয়দিন বাঁচিব বলুন? আমি মরিয়া গেলে আমার ব্রাহ্মণীর দশাই বা কি হইবে, আর আমার নাবালক পুত্রকন্যাগুলিই বা দাঁড়াইবে কোথায়? এই দুইটি বাধার জন্য জেলে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা,—নচেৎ আমার মনে যে একটা অহেতুকী জেলভীতি আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। ইহা হীন ভয় নহে—সুদুর্লভ পরিণামদর্শিতা।

যাহা হউক, রাম রাম বলিয়াত তিন দিন কাটিয়া গেল, কোন বিপদ ঘটিল না। খানাতল্লাসী হইবার হইলে এতদিন হইত। মনে কতকটা ভরসা পাইলাম।

চতুর্থ দিনে অবিনাশ আসিলে বলিলাম, "কিহে, ক'দিন ছিলে কোথায়? আসনি যে?"

অবিনাশ বলিল, "আজ্ঞে বাড়ীতেই ছিলাম। খানাতল্লাসী-টল্লাসী কিছু হয়নি ত?"

"না। সেই ভয়ে আসতে না বুঝি?"

"আজ্ঞে, ভয়ে নয়, ভবিষ্যৎ ভেবেই আসিনি। ধরুন, যদি পুলিস আসত, আর আপনাকে আমাকে দুইজনকেই ধরে নিয়ে যেত, তা হলে আর্য্যশক্তির কি দশা হত বলুন দেখি? কাগজখানি বন্ধ হয়ে যেত, আপনার এত বড় একটা কীর্ত্তি লোপ হত, বঙ্গসাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হত।"

"নূতন তালিকায় সাহিত্যবিভাগ থেকে তিনটে নমিনেশন যাচ্ছে। একজন বড় কবি, একজন বড় মাসিক-সম্পাদক, আর একজন বড় দৈনিক-সম্পাদককে ডিপোর্ট করা হবে। শেষের নামটি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু এ দেশে সবচেয়ে বড় কবি কে এবং সবচেয়ে প্রধান মাসিকপত্র কোন্‌টি, এই নিয়ে কাউন্সিলে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে—বাদানুবাদ চলছে।"—আমি বলিলাম, "তাতে আর আমাদের ভয় কি? ধরতে হয় কেদার মিত্তিরকে ধরুক। ওদের আকারও আমাদের চেয়ে বেশী ছবিও আমাদের চেয়ে বেশী ছাপে,

গ্রাহকসংখ্যাও অনেক বেশী—প্রায় আমাদেব ডবল। কেদার মিত্তিরের 'ধূমকেতুর' কাছে কি আমাদের 'আর্য্যশক্তি'কে কেই বা পোছে?"

অবিনাশ গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সে ত ঠিক কথাই—কিন্তু আমরা যে ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছি কি না যে, আমাদেরই গ্রাহক সবচেয়ে বেশী—প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী। এটা কতকটা আসামীব স্বীকারোক্তি গোছের হয়ে পড়ছে, বুঝছেন না?"

শুনিয়া আমার বুকেব ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু মৌখিক সাহস দেখাইযা বলিলাম, "বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দাও। বিজ্ঞাপনে কে কি না লেখে? এই যে তুমি তোমার কেতাবের বিজ্ঞাপনে ফি মাসে ছাপাচ্ছ—বিষবৃক্ষের পব এমন উপন্যাস আর প্রকাশিত হয় নাই,—লোকে ভুলছে? কেউ ত কিনছে না। গভর্ণমেন্ট কি আর এমনই নির্ব্বোধ যে, বিজ্ঞাপন দেখে ভুলে যাবে?—রুই কাৎলা কেদাব মিত্তিরকে ছেড়ে চুনোপুঁটি আমাকে ধরবে?"

"শুরু ত বিজ্ঞাপনে নয়, আপনি ভূপতি বায়কেও ত ঐ রকম সব কথা বলেছেন কিনা।"

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, ভূপতি রায় ত ভারি একটা লোক—তার কথা অমনি গভর্ণমেন্ট শুনলে আর কি! তাব বিপোর্টেব যদি কোনও ভ্যালু থাকত—তা হলে সেই দিনই আমাদের অফিস খানাতল্লাসী হত না?"

অবিনাশ সংশয়ের সুরে বলিল—"তা বটে।"

কাজকর্ম্ম যাহা ছিল, তাহা সারিয়া অবিনাশ বেলা দশটার সময় বাড়ী গেল। অন্যদিন বিকালে তিনটার সময় আসে—এদিন আব আসিল না। তাহাব এই অনিয়ম দেখিয়া আমি মনে মনে বিরক্ত হইলাম।—সন্ধ্যাবেলা অবিনাশ আসিয়া বলিল, "না কোনও ভয়েব কারণ নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, "কেন, নূতন কিছু শুনলে নাকি?"

অবিনাশ বলিল, "শ্যামবাজারে বেণীমাধববাবু থাকেন, জানেন ত? বডবাবু—পাঁচশো টাকা মাইনে পান। আপনার যদি ডিপোর্টেশনই স্থির হয়ে থাকে, তবে আর কেউ জানতে পারবাব আগে তিনি জানতে পাববেন। তাই মনে করলাম—যাই, গিয়ে কৌশলে সংবাদটা নিই।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল?"

"আজ্ঞে না। আলাপ থাকলে ত অসুবিধেই হত। কৌশলে কথা বেব কবে নেবাব মৎলবে গিয়াছিলাম কিনা। দেখলাম—তিনি কখনও আপনাব নামও শোনেন নি—আর্য্যশক্তি বলে যে একখানি কাগজ আছে, তাও জানেন না। আমরা যা ভয় করেছি, যদি তাই হত, তা হলে এতদিন ত এ সম্বন্ধে কত চিঠিপত্র, কত মন্তব্য ওঁর হাত দিয়ে যেত—আপনার নাম, আর্য্যশক্তির নাম বেশ ভাল রকমই জানতে পারতেন। তাই একটা ফন্দি করলাম।"

কৌতূহল উদ্‌গ্রীব হইযা বলিলাম—"কি—কি—কি? বল বল—বলত।"

অবিনাশ তখন আরম্ভ করিল—"বাবুটির কাছে গিয়ে আমি বললাম—"কোন্ মনতোষবাবু আপনার কাছে পাঠিযে দিলেন।"—তিনি বললেন—'কোন্ মনতোষবাবু?'—আমি বললাম 'যাঁর আর্য্যশক্তি।'—তিনি বললেন—'পেটেন্ট ওষুধ বুঝি? তা বাপু, পেটেন্ট ওষুধ-ফসুদ আমার তেমন বিশ্বাস নেই।'—আমি বললাম—'না, পেটেন্ট ওষুধ নয়—আর্য্যশক্তি মাসিক পত্রিকা'—তিনি বললেন—মাসিক পত্রিকা?—না, আমারই ভুল হয়েছে। ওষুধটার নাম আর্য্যশক্তি নয়—শক্তিচূর্ণ। তা, প্রাণতোষবাবু কি বলেছেন?'—আমি বললাম—'প্রাণতোষবাবু নয়—মনতোষবাবু। তিনি আর্য্যশক্তির সম্পাদক। তিনি আপনাকে এই কথা বলে পাঠালেন—আপনি হচ্ছেন আপিসের বড়বাবু, যদি আপনাদের আফিসে

আর্য্যশক্তির গোটাকতক গ্রাহক করে দেন, তবে বড় উপকার হয়। আর আপনি নিজেও যদি গ্রাহক হন। আর্য্যশক্তি খুব ভাল কাগজ—প্রতিমাসে ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশিত হয়। আজকালকার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক—অনাদিবাবু—তাঁরই উপন্যাস বিদায়ীবাণী মাসে মাসে আর্য্যশক্তিতে বের হচ্ছে। দামও বেশী নয়—বছরে তিনটি টাকা।'—বাবুটি বললেন—'সে ত বুঝলাম, কিন্তু আমি একখানা মাসিকপত্র নিই যে। তার নামটা কি ভাল—হ্যাঁ, ধূমকেতু। তা বাপু, সেইখানাই পড়ে ওঠবার সময় পাইনে—আবার নতুন মাসিকপত্র নিয়ে কি করব বল? আর, আমার আফিসের বাবুদের সম্বন্ধে, আমার বলাটা ভাল দেখায় কি? তার চেয়ে বরং বেলা দুটোর সময় বাবুরা যখন টিফিনঘরে তামাক খেতে নামে, সেই সময় সেইখানে গিয়ে তুমি তাদের ধর—কিছু ফল হলেও হতে পারে।' আমি তখন একটু ক্ষুণ্নস্বরে বললাম—'যে আজ্ঞে—নমস্কার।'—বলে চলে এলাম।"

শুনিয়া বুকটা একেবারে হাল্কা হইয়া গেল। অবিনাশের বুদ্ধিকৌশলকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিলাম। এত খুসী হইলাম,—আজ যদি সে অবিবাহিত থাকিত, আমি তাহাকে নিজ জামাতা করিবার প্রস্তাব করিতাম। সে উপায় না থাকায়, রাত্রে খাইবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম—এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোলাও রাঁধাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম।

বসিয়া বসিয়া দুইজনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পশ্চিমভ্রমণ সম্বন্ধে তাহার সাহায্যে একটি প্রোগ্রামও স্থির করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, তাহারও ষোল আনা ইচ্ছা—আমার সঙ্গে যায়। বলিলাম, "তুমিও যাবে?"

সে বলিল—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে। 'কিন্তু পাথেয় নাস্তি।"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম—"কুছ্ পারোয়া নেই। খরচ আমার। তুমি চল।"

পরদিন বম্বে মেলে যাত্রা করিব, স্থির রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রা করিবার সময় ছোট খুকী হাঁচিল। আমি আবার বসিয়া, নিঃশেষিত হুঁকাটি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"ও কিছু নয়—সর্দ্দির হাঁচি।"

আফিসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জিনিষপত্র উঠিয়াছে। আমি আবার যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ছাতার বাঁট্টা গেল কপাটের আংটায় আটকাইয়া!

আবার ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। এক গেলাস জল খাইলাম। দুইটা পান মুখে দিলাম। দিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া সাবধানে বাহির হইয়া, গাড়ীতে চড়িলাম। আমার পাচক চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃহৎ এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া কোচবাক্সে গিয়া বসিল। সে আমার সঙ্গে যাইবে। অবিনাশ বাড়ী হইতে সোজা ষ্টেশনে গিয়া জুটিবে, পরামর্শ ছিল।

টিকিট পূর্ব্বেই কেনা ছিল। মধ্যম শ্রেণীতে গিয়া আরোহণ করিলাম। অবিনাশ উপরের বাঙ্কে উঠিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। আমি নীচের বেঞ্চিতে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলাম।

মনটা বড় ভাল ছিল না। এক ত গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলেই বাঙ্গালীর মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার উপর যাত্রাকালে দুই-দুই বার বাধা পড়িল। ভাবিতে লাগিলাম—কি অদৃষ্টে আছে, ভগবানই জানেন। হয়ত নূতন তালিকায় আমার নাম উঠিয়াছে—সেই বিদেশ হইতেই ছোঁ মারিয়া আমায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। বেণীমাধববাবু হয়ত অবিনাশের সঙ্গে ছলনা করিয়াছেন—আমার ও আমার কাগজ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অভিনয়মাত্র। কিংবা হয় ত বড়সাহেব স্বয়ং স্বহস্তে গোপনে এ সকল বিষয় লেখালিখি করিতেছেন—বড়বাবুকে জানিতে দেন নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে খুকীই বা হাঁচিবে কেন—এবং ছাতা আটকাইয়া যাইবারই বা কারণ কি?

ভাবিয়াই বা ফল কি? অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এই বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা কিছুতেই ছাড়িল না।

পরদিন প্রাতে গয়ায় নামিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদে বেণীঘাটে স্নান করিয়া, অক্ষয়বট দেখিয়া, সহর প্রদক্ষিণ করিয়া, তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরেব পাঞ্জাব মেলে কাণপুর যাত্রা কবিলাম। কাণপুরে দুই তিন দিন থাকিয়া আগ্রায় যাইব। এলাহাবাদে একজন আগ্রায় তোতারামের হোটেলের কথা আমাকে বলিয়া দিয়াছিল। ছাড়িবাব পূর্ব্বে কলিকাতায় আমার ম্যানেজারকে লিখিয়া দিলাম—জরুরি চিঠিপত্র যেন আগ্রায তোতারামের হোটেলের ঠিকানায পাঠাইয়া দেয়—সেখানে তিন চারি দিন অবস্থান করিব।

কাণপুর দেখিয়া, বিকালেব মেলে আগ্রা যাত্রা কবিলাম। তুণ্ডুলায গাড়ী বদল করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তোতাবামের হোটেল খুঁজিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইল না—তাহাদেব লোক গাড়ীর সময় ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া থাকে।

তোতারামের দুইটি বাড়ী আছে—একটি একতলা, অপরটি দ্বিতল। একতলা বাড়ীতে প্রতি কামরায় দুই তিন জন যাত্রীর স্থান, দৈনিক এক টাকা কবিয়া ভাড়া। দ্বিতল বাড়ীতে একটি করিয়া স্বতন্ত্র কামরা পাওয়া যায়, দৈনিক ভাড়া দুই টাকা কবিয়া, উপরেই কল পাইখানা আছে। স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধন স্থান আছে। আমরা সেই দ্বিতল বাড়ীতেই গিয়া উঠিলাম।

পরদিন প্রাতে বাহির হইয়া, শহব ও জুম্মা মস্‌জিদ দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কেল্লা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম স্বদেশী হইয়া অবধি বাঙ্গালীকে আব সহজে কেল্লা দেখিবার পাস দেয় না। তথাপি গাইড বলিল, একটা দরখাস্ত লিখিযা দিন—আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

চেষ্টা করিতে করিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, পাস মিলিল না। দিনটা বৃথাই গেল।

পরদিন আহারের পূর্ব্বে তাজ ও এৎমাদুদ্দৌলা এবং অপরাহ্নে সিকান্দ্রা দেখিবাব পরামর্শ করা গেল। তৎপরদিন এক্কা করিয়া ফতেপুর সিক্রী যাওয়া যাইবে।—যথা পরামর্শ, বেলা সাতটার পর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাজ দেখিতে বাহিব হইলাম।

ফটকের ভিতর প্রবেশ কবিয়া দেখি, বাগানের ভিতর কিছু দূরে একজন বাঙ্গালীবাবু বেড়াইতেছেন। আমাদের দেখিয়া লোকটা দাঁড়াইল—আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা ধীরে ধীবে তাজমহলেব দিকে অগ্রসব হইলাম। সে লোকটিও, যেখানে ছিল, সেখান হইতে বাগানে বাগানেই অগ্রসর হইয়া, তাজেব পাদদেশে আমাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহার বয়স অনুমান পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ, দীর্ঘাকার, হস্তপদাদির অস্থিগুলি সুপুষ্ট, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। চোখে সোনার চশমা, মোটা মোটা গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি। তাহাকে দেখিয়াই কেমন আমার ধারণা জন্মিল, সে পুলিসের লোক।

কিন্তু সে আমাদের কিছু বলিল না। একটু যেন মনোযোগের সহিত আমাকেই দেখিতে লাগিল—অবিনাশের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না।—আমরা জুতা খুলিয়া উপরে উঠিলাম। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সে লোকটিও প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিল।

উপরে নকল, নিম্নে আসল সমাধি দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। পশ্চাতে একটা মিনারেটের পাদদেশে পৌঁছিয়া লোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। এই সুযোগে অবিনাশের হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইলাম—বলিলাম—"এস, উপরে উঠি।"

বহু পরিশ্রমে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম। তথাকার বিশুদ্ধ মৃদু বায়ু বড় মধুর লাগিতে লাগিল। বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম—সে লোকটিকে কোথাও দেখিলাম না।

বায়ুসেবনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর অবিনাশকে বলিলাম—"কে হে লোকটা, আমাদের পানে কট্‌মট্‌ করে চাইতে লাগিল?"—অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"পুলিসের লোক।"

"কি করে জানলে?"

"ওর কপালে, চুলের ঠিক আধ ইঞ্চি নীচে—একটা লাল গোল দাগ দেখেছেন?"

"না—আমি অত লক্ষ্য করিনি।"

"আমি করেছি। পুলিস-ক্যাপের দাগ। ওদের সবকারী টুপীগুলো ভারি টাইট হয় কিনা।"

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একটু পরে বলিলাম—"আমাকেই ধরতে এসেছে নাকি?"

"হতে পারে—নাও হতে পারে। পুলিসের লোকে কি আর পশ্চিমে বেড়াতে আসে না?—তাজমহল দেখে না?"

আমি মনকে বুঝাইবার ছলে বলিলাম—"বেড়াতেই এসেছে বোধ হয়—কি বল অবিনাশ?"

সে গম্ভীরভাবে বলিল, "আশ্চর্য্য কি!"—সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম—লোকটা আবার বাগানে গিয়াছে। অবিনাশের গা টিপিয়া ইসাবা কবিয়া তাহাকে দেখাইলাম।

লোকটা এক স্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাজমহলের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে দৃষ্টি উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে তুলিয়া, একে একে মিনারেটের মস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে পকেট হইতে বাইনকুলার দূরবীণ বাহিব করিয়া আমাদের প্রতিই লক্ষ্যস্থাপন করিল।

তাহাব এই আচরণে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অবিনাশ বলিল—"গতিক ভাল নয়!"

গতিক যে ভাল হইবে না—যখন খুকী হাঁচিয়াছিল, আমি তখনই জানিতে পারিয়াছিলাম।

আমার যেন কান্না পাইতে লাগিল।—"কি করা যায় হে?"—বলিয়া আমি অবিনাশের হাত চাপিয়া ধরিলাম।

"এখানে বসে থাকি আসুন। ও লোকটা চলে গেলে তখন আমরা নামব।"

লোকটা বেশীক্ষণ রহিল না। মিনিট দশ পনেবো ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া, ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।—আমরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, নামিলাম। ফটকের বাহির হইয়া গাড়ীর নিকটে গিয়া দেখি, কোচম্যান কোচবাক্সে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইয়া, এৎমাদ যাইতে আজ্ঞা দিয়া আমি গাড়ীতে উঠিতেছি—এমন সময় দেখি, নিকটস্থ ছবির দোকান হইতে খানকতক ছবি হাতে করিয়া লোকটা বাহির হইল। গাড়ী ছুটিল। মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, ও বোধ হয় আমাদের দেখিতে পায় নাই।

অবিনাশকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবছ হে?"

সে বলিল—"কপালে দাগ আছে বলেই যে পুলিসের লোক—এমন কিছু স্থিরতা নেই। যারা ইংরাজি কোট প্যাণ্টালুন পরে, শক্ত হ্যাট মাথায় দেয়, তাদেরও কপালে ও রকম দাগ হয়ে যায়। সেই কথা আমি ভাবছিলাম।"

"তবে বাইনকুলার কষে আমাদের দেখছিল কেন?"

"আমাদের দেখছিল কি তাজমহলের শোভা দেখছিল, তাই বা কে জানে?"

"হতে পারে।"—বলিয়া আমিও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এৎমাদে পৌঁছিয়া, দেখিয়া বেড়াইতেছি—এমন সময় পশ্চাতে জুতার শব্দ পাইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—সেই মূর্ত্তি। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এবার লক্ষ্য করিলাম—অবিনাশ যা বলিয়াছে, তাহাই—কপালের উর্দ্ধদেশে একটি পরিষ্কার লাল গোল দাগ রহিয়াছে। অবিনাশের পর্য্যবেক্ষণ শক্তিতে চমৎকৃত হইলাম।

সরিয়া সরিয়া লোকটার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। এৎমাদের গঠন-সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য, কিছুই আর ভাল লাগিল না। অবিনাশকে বলিলাম—"চল হে বাসায় যাই।"

"চলুন"—বলিয়া অবিনাশ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যখন ফটক পার হইতেছি, তখন একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলাম—দেখিলাম, লোকটা এৎমাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমাদের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। গা টিপিয়া অবিনাশকে বলিলাম—"কি হে, কিসের শোভা দেখছো?"

অবিনাশ বলিল—"গতিক ভাল নয়।"

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি করিলাম। আহারে বসিলাম। ঐ মাত্র। কিছু খাইতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহারাদিব পব অবিনাশকে বলিলাম—"ওহে সিকান্দ্রায় যাওয়া যাবে কি? লোকটা যে রকম পিছু নিয়েছে, সেখানেও যদি যায়?"

অবিনাশ বলিল—"আমাদের পিছু নিয়েছে কি দুটো জায়গায় আমরা ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গেছে, তাব ঠিক কি? যে আগ্রা দেখতে আসে, সেই সবই ত দেখে।"

"যদি আমরা সিকান্দ্রায় গিয়েও দেখি—সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে?"

"তা হলে একটু চিন্তাব কারণ বটে। সিকান্দ্রা এখান থেকে ছ' মাইল দূব—সেখানেও যদি সে ঠিক আমাদের সঙ্গেই পৌঁছে যায়, তা হলে ঘটনাক্রমে থিয়োরিটা একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বইকি।"

আমি বলিলাম—"বিশেষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।"

যাহা হউক, বেলা আড়াইটার সময় সিকান্দ্রা যাত্রা কবিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া কোথাও লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—শবীব অত্যন্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন হইতে দুশ্চিন্তা কিয়ৎপরিমাণ অপসৃত হওয়াতে ক্ষুধাও বেশ চাগিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম, "এখন রান্না আরম্ভ করলে খেতে বাত্রি দশটা বেজে যাবে। তাব চেয়ে বাজার থেকে লুচি, কচুরী, আচার, রাবড়ী এই সব কিনে আন, খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ি।"

আহারাদি শেষ করিয়া, আটটার পূর্ব্বেই শয়ন করিলাম। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলিতে লাগিল।

অবিনাশ ত দশ মিনিটের মধ্যেই নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। ভাবিলাম—সুখী তাহারা, যাহারা বিখ্যাত নহে—যাহাদের ডিপোর্টেশনের ভয় নাই।

এপাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম—আমার আর নিদ্রা কিছুতেই আসে না। রাত্রি যখন আন্দাজ সাড়ে আটটা—তখন শুনিতে পাইলাম—বাহিরের বারান্দায় দুইজন লোক চাপা গলায় কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "মনতোষবাবু" নামটা কানে যাইবামাত্র কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

কথাবার্ত্তা পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল—কিন্তু কোনও কথা আর ধরিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে উঠিয়া, দ্বারের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে বাহিরে চাহিলাম। বারান্দায় বাতি জ্বলিতেছে—দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে—হোটেলওয়ালা এবং সে।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হোটেলওয়ালা কথা কহিতে কহিতে আমার বন্ধ দ্বারের পানে দুইবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।—হায় অবিনাশ!—তোমার সেই ঘটনাক্রমের থিওরি এখন কোথায় গেল? হোটেলওয়ালা বলিল—"এখন বাবুকে উঠাইব কি?"

সে বলিল—"না। কাল ভোরে আবার আমি আসিব। আমার এখন কাজ আছে।"

"হুজুর কোথায় উঠিয়াছেন?"

"পুলিশ আফিসের হেডক্লার্ক গঙ্গাধরবাবুকে জান?"

"নাম শুনিয়াছি।"

"সেইখানে আছি। দেখ—আমার কোন কথা বাবুকে যেন বলিও না—খবর্দ্দার। বুঝিলে?"

"না হুজুর—যখন বারণ করিতেছেন, তখন বলিব কেন? আদাব।"

লোকটি চলিয়া গেল।—আমার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া অবিনাশকে উঠাইলাম। তাহাকে সকল কথা বলিলাম।

শুনিয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভগ্নস্বরে বলিলাম—"ও অবিনাশ!—কিছু বলছ না কেন? এখন উপায় কি?"

অবিনাশ সংক্ষেপে বলিল, "পালান।"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম—"ও যে আমায় ধরতে এসেছে তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কি বল অবিনাশ—অ্যাঁ?"

অবিনাশ বলিল—"যখন সে পুলিস-হেডক্লার্কের বাড়ীতেই অতিথি—তখন নিশ্চয়ই সে কলকাতার ডিটেক্‌টিভ। ওর কোনও কথা আমাদেব বলতে হোটেলওয়ালাকে যে বারণ করে গেল, তাতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে ওর কুমৎলব আছে—পাছে জানতে পেরে আপনি পালিয়ে যান। ভোরবেলা এসে বাড়ী ঘেরাও করবে—এই বেলা সরে পড়ুন।"

"কোথা পালাই?"

"যেখানে হয়। এখানে থাকলে কাল সকালে এসেই ক্যাঁক্ করে ধরে ফেলবে। হাওয়াগাড়ী করে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দু দণ্ড রাত্রি থাকতে কনেষ্টবল দিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে রাখবে।"—"পালাতে বলছ—পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াব অবিনাশ?"—বলিতে বলিতে আমার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"আপনি ত আর খুন করেননি যে, যখনই ধরবে, তখনই ফাঁসি দেবে! এখন যদি দু এক বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন—তার পর এ সব স্বদেশীর গোলমাল থেমে থুমে গেলে—আর আপনাকে ধরতে চাইবে না।"

বসিয়া বসিয়া অকূল সমুদ্র ভাবিতে লাগিলাম—আর কোঁচার খুঁটে বারংবার চক্ষু মুছিতে লাগিলাম। এই বয়সে কোথায় পলাইয়া বেড়াইব? খাইবই কি? অবিনাশকে সেই কথা বলিলাম।

সে সান্ত্বনার কোমলস্বরে বলিল—"আপনি নাম ভাঁড়িয়ে আমায় চিঠি লিখবেন। আমি আর্য্য সক্তির তবিল থেকে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেব—যেখানে যখন থাকবেন। তবে আপনাকে একটা কৌশল করতে হবে।"

"কি?"

অবিনাশ একটু চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি আজ পালান—আমি কালই কলিকাতায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমি লোককে বলব, আপনি দিল্লী গেছেন—দু চার দিন পরে ফিরবেন। সপ্তাহখানেক পরে, যেখানে আপনি থাকবেন, সেখান থেকে একটা কাল্পনিক প্রেরকের নাম দিয়ে আমায় একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন—যেন হঠাৎ আপনার কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে।"

কথাটা শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাতে কি ফল হবে?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"ফল দু রকমের আশা করছি। প্রথমতঃ—আপনি মরে গেছেন শুনলে, গবর্ণমেণ্ট আপনার নামে ওয়ারেন্ট বন্ধ করে দেবে—ধরা পড়বার ভয়

আর থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ—আপনার মৃত্যু উপলক্ষ্যে সভা-টভা করে, প্রবন্ধ লিখে, জীবনচরিত ছাপিয়ে এইটে প্রচার করে দেব যে, আপনি কিছুই রেখে যেতে পারেননি—আপনার অনাথা বিধবা আর অসহায় পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণের আর কোনই উপায় নেই—আর্য্যশক্তির আয়ই একমাত্র সম্বল—আর্য্যশক্তির গ্রাহক সংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ না হলে তাদের অনশনে প্রাণত্যাগ করতে হবে। এই রকম ফন্দি করে কিছু গ্রাহক বাড়িয়ে নেব।"

অবিনাশের বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একটু ভরসাও পাইলাম। বলিলাম—"আমার দেরাজে আমার ফটোগ্রাফ আছে। বাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে নিয়ে, আমার জীবনচরিতের সঙ্গে সে ছবিও একখানা ছেপে দিও। কিন্তু মরার খবর দেবে বলছ,—বাড়ীর লোক কেঁদে কেটে অস্থির হবে যে?"

"গোপনে তাদের বলে দেব এখন। তবে লোক দেখান একটু কান্নাকাটি করতে হবে বইকি।"—আমি বলিলাম,—"তা যেন হল। কিন্তু বছর দুই পরে যখন আমি বেরুব—তখন লোকে কি বলবে?"

অবিনাশ বলিল,—"তখন এই সংবাদ প্রচার করা যাবে যে, কয়েকজন দুর্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে হঠাৎ আপনি ধৃত হয়ে তিব্বতে কিংবা চীনে—ঐরকম একটা জায়গায় নীত হয়েছিলেন, এখন মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। অমুক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে আপনার এই দুই বৎসরের আত্মচরিত বেরুবে—সে কাহিনী পাঠ করে পাঠক যুগপৎ হর্ষে, ক্রোধে ও বিস্ময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠবেন—ত শত উপন্যাসের ঘনীভূত নির্য্যাস—এই সব বলে-টলে আরও খুব একচোট গ্রাহক বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"তার পর?"

"সে রকম একখানা উপন্যাস আমি ইতিমধ্যে রচনা করে রাখব এখন, তাই আপনার বেনামীতে মাসে মাসে ছাপা যাবে।"

ভাবিলাম ভাগ্যিস অবিনাশকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, নহিলে এসব বুদ্ধি কে দিত!

আমার ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা যেন হল, এখন পালাবার উপায় কি বল দিকিন?"—"উপায় বলে দিচ্ছি।"—বলিয়া অবিনাশ টাইম-টেবিল বাহির করিল। লণ্ঠনটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ ঝুঁকিয়া টাইম-টেবিলের পাতা উল্টাইয়া বলিল—"আচ্ছা ক্যাণ্টনমেন্ট থেকে পৌনে দশটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার ছাড়বে; সেখানা সিটি ষ্টেশনে দশটা তিন মিনিটে পৌঁছবে, উনিশ মিনিটে ছাড়বে। সিটিতে গিয়ে আপনি সে গাড়ী ধরুন। তুণ্ডলায় রাত্রি এগারোটায় পৌঁছবেন। সেখান থেকে বারোটার সময় পশ্চিমে যাবার এক এক্সপ্রেস আছে। তাতে চড়ে লম্বা দিন।"

"তার পর কাল সকালবেলা পুলিস এসে তোমায় ত জিজ্ঞাসা করবে। তুমি কি বলবে?"

"বলব—আপনি কলিকাতা চলে গেছেন। ওরা বড় বড় ষ্টেশনে আপনাকে ধরবার জন্যে টেলিগ্রাফ করে দেবে এখন। মরুক বেটারা খুঁজে।"

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম সাড়ে নয়টা। বলিলাম—"আর ত দেরী করলে চলবে না। বেরুন যাক তা হলে।" বলিয়া আমি একটি ছোট ব্যাগে অত্যাবশ্যক দুই চারিটি জিনিষ লইলাম, টাকাকড়ি কোমরে বাঁধিয়া লইলাম। বলিলাম—"তুমি জামা গায়ে দাও। আমায় তুলে দিয়ে আসবে চল।"—অবিনাশ বলিল—"আমাকেও যেতে হবে?"

কাতর মিনতির স্বরে বলিলাম—"তুমি না সঙ্গে থাকলে আমি যে হাতে পায়ে বল পাইনে অবিনাশ।"—অবিনাশ প্রস্তুত হইতে লাগিল। দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া বলিলাম—"অবিনাশ, তুমি আমার ছেলে নও—কিন্তু আমাব ছেলেরই মতন। তোমার

উপর আমার সংসার—আমার ব্যবসা—সব ভারই রহিল। দেখো, আমার স্ত্রী কন্যা যেন কোনও কষ্ট পায় না অবিনাশ!"—প্রবল অশ্রুবন্যায় আমার চক্ষু বন্ধ হইয়া আসিল।

অবিনাশ সজলনেত্রে বলিল—"আমাকে আর অত করে বলতে হবে না। আমায় পায়ের ধূলো দিন।" বলিয়া সে আমার পদযুগল স্পর্শ করিল। তাহারও চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।—ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যাগহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—"ওহে, আমরা যে এমন অসময়ে বেরুব, হোটেলওয়ালা বেটার সন্দেহ হবে না ত? আমরা পালাচ্ছি ভেবে ও যদি তাকে খবর দেয়?"

অবিনাশ বলিল—"সন্দেহ যাতে না হয় তার উপায় আমি করছি। ব্যাগটা আমার হাতে দিন"—বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। হোটেলওয়ালাকে ডাকিয়া হিন্দীতে বলিল—"ওহে, ক্ষুধায় যে নাড়ী আমাদের চোঁ চোঁ করিতেছে। এই ব্যাগটায় ভরিয়া কিছু লুচীটুচী কিনিয়া আনিব ভাবিতেছি—তা অত রাত্রে খাবারের দোকান খোলা পাওয়া যাইবে কি?

হোটেলওয়ালা বলিল—হাঁ বাবু পাইবেন বইকি।"

"আচ্ছা, যাই দুজনে গিয়ে খাবার কিনিয়া আনি। তোমাদের দরজা কখন বন্ধ হয়?"

"রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে কোনও যাত্রী আসে কি না দেখিয়া তবে আমরা দরজা বন্ধ করি।"—"আচ্ছা—তার অনেক আগেই আমরা আসিব। দেখিও বাপু—আমরা ফিরিবার পূর্ব্বে যেন দরজাটা বন্ধ করিয়া দিও না। বিদেশ বিভূঁই—বিঘোরে যেন মারা না যাই।"

"না বাবু—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এগারোটার আগে দরজা বন্ধ হইবে না।"

বাহির হইয়া, মোড়ে পৌঁছিয়া, এক্কা ভাড়া করিয়া সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিতেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ বলিল—"ভয় নেই, ষোল মিনিট থামে।"—মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীটা একটু দূরে গিয়ে পড়িয়াছিল। আমি অগ্রে, অবিনাশ পশ্চাতে, সেই দিকে পদচালনা করিলাম। কাছাকাছি দেখি, লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ মূর্ত্তি!

সে আমার দিকে কট্‌মট্‌ কবিয়া একবার চাহিয়া নিমেষের মধ্যে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "মাফ করবেন—আপনিই কি মনতোষবাবু?"—অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। আজ প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহব পর্য্যন্ত আমায় ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছে। ভাবিলাম পাছে পালাই—তাই ট্রেনেব সময় ও প্ল্যাটফর্ম্মে পাহারা দিতেছে!—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অবিনাশ অদৃশ্য। হায়, এই নরাধমের উপর আমি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার ভার অর্পণ করিয়াছিলাম।

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া লোকটা পুনর্ব্বার বলিল—"আপনিই কি মনতোষবাবু—আর্য্যশক্তির সম্পাদক?"

আমি তাহার মুখের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ।"—আমার মাথা বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল—দেহ অবশ হইয়া আসিল।—তাহার পর লোকটি কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম, ওয়েটিং রুমের টেবিলের উপর শুইয়া রহিয়াছি, আমাব দেহ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। এক দিকে অবিনাশ, অপর দিকে সেই লোকটি, দাঁড়াইয়া আমায় পাখা করিতেছে। অদূরে, ঔষধের বাক্স খুলিয়া এক ডাক্তার বসিয়া আছে।

আমি চক্ষু খুলিতেই অবিনাশ বলিল,—"কেমন বোধ হচ্ছে মনতোষবাবু? সেই কালেই আমি বলেছিলাম—আপনার শরীর দুর্ব্বল—আজ রাত্রে ট্রেনে উঠে কাজ নেই।—ভাগ্যিস আমাদের অনাদিবাবু ছিলেন—এই যে অনাদিবাবুকে চিনতে পারছেন না? আমাদের আর্য্যশক্তির লেখক অনাদিবাবু—আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, উনি ধরে ফেললেন—নইলে আপনার ভারি আঘাত লাগত।"

আমার কথা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। ক্ষীণস্বরে বলিলাম—"অনাদিবাবু? কোথায় তিনি?"

যাঁহাকে আমরা ডিকেট্‌টিভ বলিয়া সারাদিন ভ্রম করিয়াছিলাম, "এই যে ইনি" বলিয়া অবিনাশ তাঁহাকেই দেখাইয়া দিল।

এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, মস্ত ভুল হইয়াছিল—ভয়ের কোনও কারণ নাই। আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।—ঘণ্টা দুই পরে সুস্থ হইয়া জাগিয়া, তখন সকল কথাই শুনিলাম। অনাদিবাবু আমার আর্য্যশক্তির একজন প্রধান লেখক, ঢাকায় ওকালতি করেন, কিন্তু চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ কখনও হয় নাই। ইনিও ছুটিতে পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের আফিসে গিয়া ম্যানেজারের নিকট শুনিয়াছিলেন, আমি অমুক তারিখ হইতে অমুক তারিখ পর্য্যন্ত আগ্রায় তোতারামের হোটেলে থাকিব। তাজে ও এৎমাদে আমাকে দেখিয়া, আমিই যে মনতোষবাবু, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল; কারণ, আমার উপহৃত একখানি ফোটোগ্রাফ তাঁহার গৃহে আছে। তথাপি সঙ্কোচবশতঃ আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই।

পরে তোতারামের হোটেলে গিয়া খাতায় আমার নাম দেখিয়া তিনি কৃতনিশ্চয় হন। আমি নিদ্রিত ছিলাম ভাবিয়াই আমাকে জাগাইতে নিষেধ করেন। পরদিন হোটেলে আসিয়া আমায় একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যে, তাঁহার কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে হোটেলওয়ালাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। পুলিশ আফিসের হেডকেরাণী গঙ্গাধরবাবু তাঁহার মাতুল—তাঁহারই বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ক্যাণ্টনমেণ্টে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, নিমন্ত্রণ সেই ট্রেনেই ফিরিতেছিলেন। তাঁহার মাতুলের বাসা সিটি ষ্টেশনের সন্নিকটেই। শেষবার একবার অবিনাশের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সে আমায় খুব বাঁচাইয়া দিয়াছে—আমার মূর্ছার প্রকৃত কারণটি অনাদিবাবু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই।

অনাদিবাবুকে লইয়া বড়ই আনন্দে আগ্রায় কয়েকদিন যাপন করা গেল। তাঁহার মাতুলের সুপারিশে ফোর্ট দেখিবার পাসও পাওযা গেল। আগ্রা হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন, তথা হইতে দিল্লী দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

[সাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩২০]

নীলুদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নীলমণির শ্বশুর একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বিবাহ দিবার সময় তাহার পিতা ভাবিয়াছিলেন, "আমার ছেলের একজন মুরুব্বি হইল।" বাস্তবিক, যদি নীলমণি বি, এ, পাস করিতে পারিত এবং তাহার শ্বশুর মহাশয় জীবিত থাকিতেন,—তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই নীলমণিকে একটা ডেপুটি করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এমনই পোড়া অদৃষ্ট—এ দুইয়ের একটিও ঘটিল না। তাই নীলমণি আজ মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের কেরাণী।

ভীমদাসের লেন একটি ক্ষুদ্র বাড়ীভাড়া করিয়া নীলমণি সপরিবারে বাস করে। তাহার দুইটি কন্যা, একটি পুত্র। কন্যা দুইটিই বড়—কমলার বয়স এগার বৎসর, সরলা পাঁচ বৎসরে পড়িয়াছে। পুত্র সুশীল সরলার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

এরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সপরিবারে বাস করা প্রাণান্তকর ব্যাপার। কষ্টের অবধি নাই। যে বাড়ীটিতে বাস করে, তাহার অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। নীচের ঘরগুলো যেমন অন্ধকার, তেমনিই স্যাঁৎসেঁতে। উপরেও এখানটা ভাঙ্গা, ওখানটা ফুটা, কড়ি বরগাগুলা জীর্ণশীর্ণ, ছাদ কখন পড়িয়া যায় ঠিকানা নাই। সারাইয়া দিতে বলিলেই বাড়ীওয়ালা বলে ভাড়া বাড়াইয়া দিন, সারাইয়া দিতেছি। একটি ঝি আছে—সে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন কামাই করে। বাঁধা বেট অপেক্ষা কিছু অল্প বেতনে সে সন্তুষ্ট এবং বাজারের পয়সা চুরি করে না—এই দুইটি গুণের জন্য নীলমণি তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। একটু দুধ—তা নীলমণির ছেলে মেয়েগুলি চোখে দেখিতে পায় না। দুই একটা সন্দেশ রসগোল্লা—তাহাও কালেভদ্রে তাহাদের অদৃষ্টে জুটে। গলির মোড়ের দোকান হইতে এক এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহারা জল খায়। নীলমণিবা স্ত্রীপুরুষ দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়াই জীবন-ধারণ করে।

অথচ নীলমণি লোকটি এক সময় বেশ সৌখীন ছিল। একদিন ছিল যখন সে সস্তা কাপড় কিনিত না, সস্তা জামা জুতা—এ সকল ব্যবহাব করা অপমানজনক মনে করিত। পিয়ার্স অথবা ভিনোলিয়া ছাড়া অন্য সাবান মাখিত না, গামছায় গা মুছিত না,—তোয়ালে কিনিত। তাহার স্ত্রীও বাল্যকালে ধনী পিতার গৃহে প্রতিপালিত। তাহার অন্যান্য ভগিনীগণ অবস্থাপন্ন লোকদের হাতেই পড়িয়াছে—সে বেচারীর কষ্ট সহজেই অনুমেয়। মুখটি বুজিযা সংসারের কাজকর্ম্মগুলি করে; কিন্তু যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, তখন স্বামীকে গঞ্জনা দেয় না; নিজেই বসিয়া কাঁদে। তাহাতে নীলমণির কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হয় না।

পৌষ্ মাস। আজ বকরিদের ছুটির জন্য আফিস বন্ধ। বেলা এগারোটার সময় আহারাদি করিয়া নীলমণি বাজারে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কমলার জন্য একটি ফ্ল্যানেলের বডি কিনিতে হইবে এবং খোকার জন্য একটি গলাবন্ধ ও দুইজোড়া রঙীন সুতি মোজা। গৃহিণী বাক্স খুলিয়া চারিটা টাকা আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন।—নীলমণি বলিল—"আর একটি টাকা দিতে পারবে?"

"কেন?"

"সরলার জন্যে একটি মেমপুতুল কিনে আনতাম।" কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়ায় একটি বালিকার হাতে পোষাক পরা মেমপুতুল দেখিয়া, বাড়ী আসিয়া সরলা ভারি বাহানা লইয়াছিল। নীলমণি তখন বলিয়াছিল—"আচ্ছা কাঁদিসনে—মাইনে পেলে কিনে দেব।"

গৃহিণী বলিলেন—"এক টাকা দামের একটা পুতুল কিনে দিতে পারি, এমন কি আমাদের অবস্থা? কোথা পাব?".

নীলমণি বলিল—"একটি টাকা বই ত নয়—পার যদি ত দাও। আহা বেচারি বড় কেঁদেছিল।"—কাঁদকাঁদ হইয়া গৃহিণী বলিলেন—"কেঁদেছিল তাও সত্যি বটে—আর একটি টাকা বেশী কিছু নয় তাও ঠিক। মেয়েকে খেলনা কিনে দিতে কোন্ বাপ-মার আসাধ? কিন্তু আমাদের কি তেমনি কপাল?"—বলিয়া গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিলেন।—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, টাকা চারিটা পকেটে ফেলিয়া, নীলমণি বাহির হইয়া গেল।

সদর রাস্তায় পৌঁছিয়া ট্রামের অপেক্ষায় মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় একখানা চলন্ত সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই আরোহী মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"গাড়োয়ান গাড়োয়ান—খাড়া করো।"—গাড়ী থামিলে দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি লাফাইয়া পড়িয়া হন্ হন্ করিয়া নীলমণির নিকট আসিয়া বলিল—"নীলুদা!"

নীলমণি লোকটির মুখের পানে চাহিয়া, চিনিতে পারিল্ না। তাহার অঙ্গে ইংরাজি বেশ, মস্তকে হ্যাট, হাতে মূল্যবান ছড়ি, মুখে চুরুট। বযস আন্দাজ বত্রিশ, দিব্য মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা, রঙ বেশ ফর্সা। চিনিতে না পারিয়া নীলমণি তাহার পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।—অর্দ্ধমিনিট এইভাবে কাটিল, লোকটি সকৌতুকে বলিল—"কি নীলুদা—চিনতে পারলে না?—খুব লোক ত তুমি!—বড়মানুষ হয়েছ নাকি হে?—কি হয়েছ? হাকিম-টাকিম কিছু হয়েছ বুঝি?"—বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া তাহার সেই হাস্য দেখিয়া, নীলমণির লুপ্তস্মৃতি যেন ফিরিয়া আসিল। বলিল—"ওঃ—সুধাংশু?"

লোকটি নীলমণিকে ব্যঙ্গভরে সেলাম করিয়া বলিল—"জি হুজুর। সেই বান্দাই বটে। ছেলেবেলা থেকে এত বন্ধুত্ব—এত ভাব আব আজ সাফ চিনতে পাবলে না!"

"কি করে চিনতে পারব ভাই? আজ প্রায় পনেরো বছর দেখিনি। তুমি তখন বোগা ছিলে—কালো ছিলে। এখন বেশ ফর্সা হয়েছ—মোটাসোটা হয়েছ।"

"কেন মোটা হব না? পশ্চিমে থাকি, জল হাওয়া ভাল, ঘি দুধ সস্তা—কেন মোটা হব না? তুমি আছ কোথা?"

"কাছেই—১৭ নং ভীমদাসের লেনে।"

"কি কর?"

"বাঙ্গালীর ছেলের যা প্রধান অবলম্বন—কেরাণীগিরি।"

"আমি লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি করতাম—কিন্তু সে চাকরি ছেড়ে দিযে, ক'দিন হল কলকাতায় এসেছি। ব্যবসা করব। গ্রেট ইষ্টার্ণে আছি। আরও দু-তিন দিন থাকতে হবে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকবে?" "থাকব।"

"সন্ধ্যার পর আসব। ওঃ—পনেরো বচ্ছর পর আজ দেখা। তোমাকেই আমার হোটেলে যেতে বলতাম; কিন্তু ভাই, সেখানে বড় বড় সাহেবরা থাকে কিনা—তারা তোমার এই ধুতি চাদর দেখলে চটেই যাবে। আমিই আসব। কোন্ গলি বললে?"

"১৭ নং ভীমদাসের গলি। এই কাছেই। ঐ রাস্তাটা দিয়ে খানিক গিয়ে, ডানহাতি বড় থামওয়ালা যে একটা লাল বাড়ী আছে—তারই সামনে আমার বাসা ১৭ নম্বর।"

"আচ্ছা ভাই, এখন চললাম। বড্ড তাড়াতাড়ি। পরিবার নিয়ে আছ ত?"

"হ্যাঁ। তুমি আজ সন্ধ্যেবেলা আমারই ওখানে খাবে।"

"খাব? বেশ। রাত আটটার সময় আসব।"—বলিয়া সুধাংশু গাড়ীতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"জোরসে হাঁকাও।"—উপরে যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে দুই তিন মিনিটের অধিক কালক্ষয় হয় নাই। সুধাংশু চলিয়া গেলে নীলমণির মনে হইল, কয়েক মিনিটের জন্য একটা উল্কাপিণ্ড যেন তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া অদৃশ্য হইল।

ট্রামে উঠিয়া নীলমণি ভাবিতে লাগিল—"সুধাংশুকে দেখিয়া আর চিনিবার যো নাই! তখন রোগা ডিগ্‌ডিগে ছিল, বুকের হাড় দেখা যাইত—সে এখন কেমন মোটাসোটা হইয়াছে, মানুষের মতন হইয়াছে। পয়সাই আসল জিনিষ, পয়সা থাকিলে আমারই কি আজ এমন চেহারা থাকিত? দুইজনে এক ক্লাসে পড়িতাম, আমি ছিলাম সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে—আমি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করিয়াছিলাম, ও করে তৃতীয় বিভাগে। এফ-এ ও ত পাসই করিতে পারিল না। কনিক্‌স্-সেকসন্ কিছুতেই উহার মাথায় ঢুকিত না। তখন কে জানিত, জীবন-পরীক্ষাক্ষেত্রে ও আমার এত উপরে উঠিয়া যাইবে? লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি করিত বলিল—কি চাকরি তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অবশ্য কোনও বড় চাকরিই করিত। চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছে—দু পয়সা জমাইয়াছে, তবে ত আসিয়াছে? গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আছে বলিল—সেখানে ত দৈনিক ৮/১০ টাকা করিয়া লাগে শুনিয়াছি। সুধাংশু বড়লোক হইয়াছে।"

নীলমণি উক্তপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল—আর ট্রামও ধর্ম্মতলায় আসিয়া পৌঁছিল। চাঁদনীর সম্মুখে নামিয়া নীলমণি ভাবিল—"আজ যে উহাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিলাম—কি খাওয়াইব? নিজেরা রোজ যা ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি খাই—তাহা কি উহার পাতে দিতে পারিব? বাল্যকালের বন্ধু, আজ কতদিন পরে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে একটা হেঁজিপেজি লোকও নহে—রীতিমত খাতির কবিতে হইবে ত!" এই ভাবিয়া নীলমণি চাঁদনীতে ঢুকিয়া খোকার গলাবন্ধ ও মোজা মাত্র লইয়া, বাকী টাকায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে দেড় সের মটন, একটা ভেটকি মাছ ও কুড়িটা কমলালেবু কিনিয়া বাড়ী আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির বাড়ীতে নীচের তলায় ঘরগুলিব অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কোনও ভদ্রলোক আসিলে সেখানে তাহাকে বসান যায় না। পবে দুইখানি শয়নঘর, তাহারই একখানি হইতে বিছানা মাদুর সরাইয়া বালিকা দুটিব সাহায্যে নীলমণি পরিষ্কাব করিতে আরম্ভ করিল। একটা ঝাড়ু লাঠিতে বাঁধিযা, চারিদিকেব দেওয়ালে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া, বালতি বালতি জল ঢালিয়া মেঝেটি ধুইয়া ফেলিল। দেওয়ালে স্থানে স্থানে দাগ ছিল; পানে খাইবার চুন জলে গুলিয়া সে সমস্ত ঢাকিয়া দিল।

বারান্দার এক কোণে একখানি ভাঙ্গাচোরা ক্যাম্প টেবিল বহুদিন সঞ্চিত ধূলায় আত্মগোপন করিয়া পড়িয়া ছিল। সেইখানিকে টানিযা আনিয়া ধুইয়া মুছিয়া ঘরের মেজেতে স্থাপন করা হইল। সেখানির পদচতুষ্টয় নিতান্ত নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে, কাছে বসিয়া তাহার গাত্রে সামান্য ভর দেওয়া মাত্র ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিযা বিপরীত দিকে হেলিয়া পড়ে। স্থানে অস্থানে পেরেক ঠুকিয়াও যখন বিশেষ ফল পাওয়া গেল না, নীলমণি তখন একটা দড়ি লইয়া পায়াগুলা ঘিরিয়া খুব করিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহাতে টেবিলখানি স্থির হইল। দুইখানিমাত্র চেয়ার বাড়ীতে ছিল। একখানি বেতের ছাউনি, একখানি কাঠের।

বেতেরখানিতে সুধাংশুকে বসিতে দেওয়া হইবে, কাঠের খানিতে নীলমণি নিজে বসিবে এই মৎলবই রহিল। টেবিলেব শোভার জন্য একখানি কাপড় আবশ্যক—বিশেষতঃ আচ্ছাদন না দিলে দড়িদড়াগুলি ঢাকে না—তাই গৃহিণীর চেক্ র‍্যাপারখানি তাহার উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল।

এই সমস্ত আয়োজন করিতে চারিটা বাজিল। নীলমণি তখন গড়গড়াটি কাপড়ে ছাঁকা ছাই দিয়া উত্তমরূপে মাজিয়া, তাহার নলে গজ ভরিয়া, জল ফিরাইয়া রাখিল। হঠাৎ মনে হইল, সে সাহেব মানুষ, যদি তামাক না খায়? সে যে চুরুট খায় তাহা নীলমণি দেখিয়াছে; সুতরাং পয়সা লইয়া নীলমণি চুরুটের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু পাড়ার কোনও দোকানে ভাল চুরুট পাওয়া গেল না। পয়সায় দুইটা করিয়া গলায় লালসুতা বাঁধা পানের দোকানের

সেই নিকৃষ্ট চুরুট—তাহা কেমন করিয়া সুধাংশুর হাতে দিবে? দূরে গিয়া ভাল দোকান হইতে চুরুট কিনিয়া আনার সময়ও নাই। পাড়ার একটি চুরুটসেবী উকীল ছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া নীলমণি পাঁচটা ভাল চুরুট চাহিয়া আনিল। সেগুলি এবং একটি দেশলাই চায়ের পিরিচে সাজাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর পরিষ্কার কাপড় জামা পরিয়া নীলমণি বন্ধুর আগমণ প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। আটটা বাজিয়া গেল, সাড়ে আটটা বাজিল, নয়টা বাজে, কই এখনও ত সুধাংশুর দর্শন নাই! ভুলিয়া গেল নাকি? নীলমণি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। যদি না আসে—এত খরচপত্র করিয়া আয়োজন সবই বৃথা হইবে! স্ত্রী বলিল—"তিনি বড়লোক—উইলসনের হোটেলে সে রাজভোগ ছেড়ে কি গরীবের বাড়ীতে খেতে আসবেন?"

নীলমণি বলিল—"সুধাংশু ত সে রকম প্রকৃতির লোক নয়—অন্ততঃ আগে ত ছিল না।"

বলিতে বলিতে, শব্দে ও আলোকে ক্ষুদ্র গলিটি সচকিত করিয়া একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া নীলমণির ভাঙ্গাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। নীলমণি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল—সুধাংশু নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে, মোটরে উপবিষ্ট একজন ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুইচারিটা কথা কহিবাব পর "গুড্‌নাইট' বলিয়া মোটরবিহারী সাহেব গাড়ী চালাইয়া দিল।

সুধাংশু তখন নীলমণির দিকে ফিরিয়া বলিল—"ভাই, বড়ই দেরী হয়ে গেছে! তোমবা বোধ হয় ভাবছিলে?"

নীলমণি বলিল—"ভাবছিলাম বইকি। মনে করলাম বুঝি ভুলেই গেলে।"

সুধাংশু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—"তা বলবে বইকি! স্মৃতিশক্তিটা কার কত প্রখর—আজ দুপুরবেলাই ত তার পরীক্ষা হয়ে গেছে।"—বলিতে বলিতে উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল!

উপরে উঠিয়া সুধাংশু বলিল—"নীলুদা, এই বাড়ীতে থাক কি করে?"

"কি করব ভাই—এর চেয়ে ভাল বাড়ী পাই কোথায়?"

চেয়ারে বসিয়া শুধাংশু বলিল—"তোমার ছেলেপিলে ক'টি?"

"দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। তোমার ক'টি?"

সুধাংশু হাসিয়া বলিল—"আমি ছেলেমেয়ে কোথা পাব? আমি কি বিয়ে করেছি?"

নীলমণি সবিস্ময়ে বলিল—"আজও বিয়ে করনি? বল কি হে! বিয়ে করলে না কেন?"

"ফুরসুৎ পাইনি। পরের ছেলে মেয়েকেই আদর করে বেড়াই। তোমার ছেলে মেয়েদের ডাকনা, দেখি।"

নীলমণি, কমলা ও সরলাকে ডাকিয়া আনিল। মেয়ে দুটি আসিয়া সুধাংশুকে প্রণাম করিল। চেয়ারের দুই দিকে দাঁড় করাইয়া মিষ্ট কথায় সুধাংশু তাহাদিগকে আদর করিতে লাগিল, শেষে বলিল—"তোমাদের ভাইটি কই?"

সরলা বলিয়া উঠিল, "থোতা ধুমুত্তে।"

সুধাংশু নীলমণির পানে চাহিয়া বলিল—"কি বলে?"

নীলমণি উত্তব করিল—"ও বলছে খোকা ঘুমুচ্ছে। দেখনা মেয়েব পাঁচ বছর বয়স হল, এখনও জিভের জড়তা ভাঙ্গল না। অন্য সব বর্গ ছেড়ে ত-বর্গই বেশী ব্যবহার কেন?"

সুধাংশু বলিল—"তা হোক দু এক বছবে সেরে যাবে। মেয়েটি খুব চট্‌পটে।"

"ভারি বুদ্ধি ওর। এক একটি কথা কয় যেন আশী বছরের বুড়ি! এত খবরও রাখে ও—মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য করে দেয়।"

বড় মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া সুধাংশু বলিল—"যাও ত মা, তোমার বাবার একখানি ধুতি আমায় এনে দাও ত। আমি পাৎলুন ছাড়ি।"

কাপড় ছাড়িয়া বলিল—"নীলুদা, কম্বল-টম্বল, শতরঞ্জি টতরঞ্জি নেই? তাই পাত না। বাঙ্গালীর ছেলে—একটু বসবো, একটু গড়াব—এ চেয়ারে কি পোষায়? সারাদিন ঘুরে ঘুরে শরীরটে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

টেবিল চেয়ার দেওয়ালের কোণে সরাইয়া, ওঘর হইতে শতরঞ্জ বালিশ আনিয়া নীলমণি পাতিয়া দিল। চুরুটের পাত্রটি কাছে ধরিয়া বলিল—"খাবে?" সুধাংশু একটি তুলিয়া লইয়া, আলোকে ধরিয়া সেটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—"তামাক-টামাক রাখ না? দিনরাত চুরুট খেয়ে খেয়ে আর ভাল লাগে না।"

"হ্যাঁ—তামাক আছে বইকি।"—বলিয়া নীলমণি বাহির হইয়া গেল।

সুধাংশু ডাকিল—"ও কমলা—ও সরলা।"—বালিকাদ্বয় আসিয়া সুধাংশুর কাছে বসিল। সুধাংশু বলিল—"আমি তোদের কে হই জানিস?"

কমলা বলিল—"কাকা হন।" সরলা বলিল—"থায়েব কাকা।"

সুধাংশু হাসিয়া বলিল—"দূর পোড়ারমুখী! সায়েব আমার কোন্‌খানটা দেখলি?"

"না, আপনি থায়েব। উলথনেল হোতলে থাকেন।"

"সে খবরটিও পেয়েছিস?"—বলিয়া সুধাংশু সরলার গালটি টিপিয়া দিল।

সরলা উৎসাহিত হইয়া বলিল—"ভোঃ পোঃ কোলে বাঁধি বাদিয়ে হাওয়া গালীতে আথেন।"

একটু পরেই, গড়গড়াটি হাতে করিয়া, জ্বলন্ত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল। সুধাংশু বলিল—"নীলুদা, তুমি কি নিজে হাতে তামাক সাজলে? ঝি নেই?"

"ঝি আজ আসেনি।"

"আমাকে বললে না কেন, আমি সাজতাম। ছোট ভাইটি থাকতে—"

"তা হোক—তা হোক"—বলিয়া নীলমণি তামাক ধবাইতে আরম্ভ করিল। দুই চারি টান টানিয়া, সুধাংশুর হাতে নলটি দিয়া বলিল—"খাও ধরেছে।"

তামাক খাইতে খাইতে সুধাংশু বলিল—"নীলুদা—কোন্ আফিসে চাকরি করছ?"

"হিলারি সিম্‌সনের বাড়ী।"

"কত মাইনে পাও?"

"পঁয়ষট্টি টাকা।"

"চলে?"

"গড়গড়িয়ে চলে কি আব? কোনও রকম করে *ঠেলেঠুলে* চালানো।"

"আর কোনও আয় নেই?"

"না।"

সুধাংশু গম্ভীর হইয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। ক্রমে নীলমণির হাতে নলটি দিয়া বলিল—"কত বছর চাকবি করছ?"

"এগার বছর। যে বছর বড় মেয়েটি হয় সেই বছব চাকবিও হযেছিল। তাই ওর নাম হল কমলা।"

"মেয়ের বিয়ের জন্যে কত জমালে?"

"জমাব কোথা থেকে ভাই? পেটে খেতেই ত কুলোয় না।"

"কি করে মেয়ের বিয়ে দেবে?"

"ভগবান আছেন।"

"ভগবান ত আছেন।"—বলিয়া সুধাংশু গাম্ভীর হইয়া রহিল।

নীলমণি বলিল—"সে সব ভেবে আর কি হবে?—সে কথা যাক। এখন নিজের কথা

বল। এফ্-এ ফেল হয়ে সেই যে তুমি কলকাতা থেকে চলে গেলে, বললে বর্ম্মায় যাচ্ছি চাকরি করতে—তারপর থেকে ত তোমার কোনও খবরই পাইনি। বর্ম্মায় গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বইকি। দু বছর সেখানে চাকরিও করেছিলাম।"

"কি চাকরি করতে? ছাড়লে কেন?"

"টুঙ্গুতে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের হেডক্লার্ক ছিলাম। সায়েবের সঙ্গে অবনিবনা হওয়াতে চাকরি ছেড়ে সিঙ্গাপুরে চলে গেলাম।"

"একেবারে সিঙ্গাপুর?"

"হ্যাঁ—সেখানে দিনকতক চায়ের দোকান করে ফেল হয়ে গেলাম। সেখান থেকে জাহাজের খালাসি হয়ে মান্দ্রাজে আসি। মান্দ্রাজে দিনকতক ছাপাখানায় চাকরি করে—সেখান থেকে করাচী যাই। করাচী থেকে কোয়েটা—সেখানে পাঠানেরা আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করাতে পালিয়ে হোলকার রাজ্যে গিয়ে কিছুদিন আবগারির দারোগা-গিরি কাজ করি। তারপর সেখান থেকে লক্ষ্ণৌয়ে আসি—তালুকদাস ব্যাঙ্কের কেরাণী হয়ে ঢুকে—শেষের তিন বছর হেডক্লার্কের পদ পেয়েছিলাম।"

"উঃ—অনেক ঘুরেছ বল? তা পাঠানেরা তোমায় মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল কেন?"

"সে অনেক কথা—ছোটখাট একটি উপন্যাস বললেই হয়।"

নীলমণি হাসিয়া বলিল—"নায়িকা-টায়িকা ছিল নাকি?"

"ছিল বইকি। ওসমান বললে জগৎসিংহ—এ পৃথিবীতে তোমার আমার দুজনের স্থান নেই।"—বলিয়া সুধাংশু হাসিতে লাগিল।

"আচ্ছা, ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল দেখি?"—বলিয়া নীলমণি সুধাংশুর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

সুধাংশু প্রথম কথা কহিল। একটু পরে বলিল, "ও সব এখন ভাল লাগছে না। সে সব কথা পরে বলব ভাই। তোমার অবস্থা দেখে আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেছে সত্যি! আচ্ছা, ও আফিসে তোমার উন্নতির আশা কি রকম?"

নীলমণি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মরবার সময় নগদ শ' খানেক টাকার গ্রেডে পৌঁছতে পারি।"

"বস্?"

সুধাংশু কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে উঠিয়া বসিয়া নীলমণির হাতটি ধরিয়া বলিল—"নীলুদা—চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে চল।"

"কোথায়?"

"চাকরি ছেড়ে দাও। চাকরিতে কিছু নেই দাদা—কিছু নেই। ঐ কোনও রকম পেটভাতায় কেটে যায়। লক্ষ্ণৌয়ে আমি দুশো টাকা মাইনে পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা কারবারও আমার ছিল—গোপনে। হঠাৎ একটা দাঁও এসে পড়ল, কারবারটা থেকে হাজার পঁচিশেক টাকা পেয়ে গেলাম। চাকরি ছেড়ে দিয়ে, সেই টাকাটা নিয়ে আমি ব্যবসা করতে এসেছি। এখন, ব্যবসার একটা প্রধান জিনিষ হচ্ছে—অন্ততঃ একজন সহকারী লোক চাই, যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। অন্যায় করে', ব্যবসার ক্ষতি করে', একটি পয়সা পেলে তাও নেবে না—আবার লক্ষ টাকা পেলে তাও নেবে না। আমি এই রকম একজন লোক চাই। তোমায় ছেলেবেলা থেকে জানি—তুমিই সেই লোক। তুমি এস আমার সঙ্গে।"—নীলমণি একটু ভাবিয়া বলিল—"তা, কি ব্যবসা করছো?"

"অভ্রের ব্যবসা। একটা পাহাড় নিয়েছি, তাতে অভ্রের খনি আছে।"

"কোথা?"

"ধানবাদের কাছে। ঐ যে সাহেবটি দেখলে, ওদেরই কাছে নিয়েছি। ওরাই

ইজারাদার—ছোটনাগপুরের এক অসভ্য বুনো রাজার পাহাড়—তার কাছ থেকে ওরা ইজারা নিয়েছিল। বছর দুই কাজও কবেছিল, এখন ওরা পাঁচ বছরের মেয়াদে আমায় দর ইজারা দিয়েছে। বছরে পনেরো হাজার টাকা করে খাজনা। লেখাপড়া হয়ে গেছে। প্রতি বছর আগাম খাজনা দিতে হবে। প্রথম বছরের খাজনা আমি জমা দিয়েছি।"—বলিয়া সুধাংশু কোটের ভিতরদিককার বুকপকেট হইতে একটি চামড়ার কেস বাহির করিয়া নীলমণির হাতে দিল। বলিল,—"খুলে দেখ, ওর মধ্যে রসিদ আছে।"

নীলমণি পকেটকেসটি খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে পনের হাজার টাকার রসিদখানি রহিয়াছে। আর রহিয়াছে একগোছা নোট— প্রত্যেকখানি ৫০০ টাকা করিয়া। নীলমণি সেগুলি গণিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"তাই তোমার এই এক রত্তি পকেটকেসে নগদ যা রয়েছে—তাতে আমাব দুটো মেয়েরই বিয়ে হয়ে যাবে!"

সুধাংশু বলিল—"তা যায়। কিন্তু ওগুলি আমি চাকরি কবে বোজগার করিনি ভাই—ব্যবসা থেকে পেয়েছি। চাকবিব মুখে মার ঝাড়ু। ছেড়ে দাও।"

নীলমণি বলিল—"অভ্রের খনি নিয়েছ—কেমন খনি? ভাল?"

"উঃ—চমৎকার। আমি একজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তিন চারদিন ধরে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করিযেছি। সে বলেছে, বাবমাসে বিনা ওজরে পাঁচ বাবোং ষাট হাজার টাকাব অভ্র উঠবে—যদি ছুট বাদ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকারই কম ধরা যায়, তাহলে খরচা পনের হাজার—আর ভাড়া পনের হাজার বাদ দিয়ে, বিশ হাজার টাকা লাভ খুব হবে।"—নীলমণি ক্ষুদ্রপ্রাণী গরীব গৃহস্থ—অত বড় বড় টাকার অঙ্ক শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।—সুধাংশু বলিল—"কি বল নীলুদা—আসবে?"

সংশয়জড়িত স্বরে নীলমণি বলিল—"সুবিধে হবে?"

সুধাংশু বলিল—"শোন নীলুদা—আমি প্রথম থেকেই সমস্ত কথা তোমায় খোলাখুলি বলি। মূলধন আমার—বুদ্ধি আমার—কেবল মেহনৎ তোমাব। তোমায় আমি শূন্য অংশীদার করে নিতে রাজি আছি। তা না করে, একটা নির্দিষ্ট বেতনও ঠিক করে দিতে পারতাম কিন্তু দুটি কাবণে তা আমাব মনঃপূত নয়। প্রথমতঃ— আমি এ চাইনে যে তুমি হবে আমার বেতনভোগী চাকর—আব আমি হব তোমার মনিব। দ্বিতীয়তঃ, অংশীদার হলে তুমি যেমন প্রাণপণে ব্যবসাটির উন্নতি-চেষ্টা করবে, বাঁধা মাইনে হলে তুমি কখনই তা করবে না—পেবে উঠবে না। না—না—তুমি প্রতিবাদ কোরো না, আমি মনুষ্য-চরিত্র বেশ ভাল করেই জানি। এই বয়সে অনেক দেখেছি, অনেক ঠকেছি, অনেক ঠকে তবে শিখেছি। বাঁধা মাইনে হলে তুমি যে ইচ্ছে কবে আলস্য কবে' আমার কাজে অবহেলা করবে, তা আমি বলছিনে। কিন্তু তোমাব উদ্যমের উপবেই যদি তোমার লাভের তারতম্য নির্ভর করে, তা হলে তোমার উদ্যম উৎসাহ আপনিই বেড়ে যাবে।"

নীলমণি মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"তা, তুমি যেমন ভাল বোঝ।"—সে আরও যেন কি বলিব বলিব করিল, কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ চুপ করিয়া রহিল।

সুধাংশু তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল—"সব কথা এখন থেকে পরিষ্কার হয়ে থাক। বলেছি মূলধন আমার, মাথা আমার, তোমাব মেহনৎ। সুতরাং লাভের অংশ তোমার অপেক্ষা বেশীই আমি দাবী করব। লাভের প্রতি টাকায় চার আনা তোমার, বারো আনা আমার হবে। যদি বিশ হাজার লাভ হয়, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার হল। যদি অত না হয়—দশ হাজার হয়,—তাও না হয় আট হাজারও হয়—তবু তোমার দু হাজার থাকবে। এখানকার চাকরির চেয়ে ত ভাল হবে—কি বল?"

নীলমণির মনে দুই প্রতিকূল শক্তি যুগপৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম ধনলিপ্সা—দ্বিতীয় সংশয়বুদ্ধি। কোথায় পঁয়ষট্টি টাকা আর প্রাণান্তকর টানাটানি—আর কোথায় অজস্র স্বচ্ছলতা! আবার মনে হইতেছিল, "যো ধ্রুবাণি

পরিত্যজ্য" ইত্যাদি; যা হউক কষ্টেসৃষ্টে দুইবেলা দুমুঠা জুটিতেছে,—এ চাকরি ছাড়িয়া, সে অভ্রের খনিতে গেলে যদি শেষে তাও যায়? ব্যবসায়ে যেমন লাভ আছে, তেমন লোকসানও ত আছে। সুধাংশু ত বড় বড় লাভের অঙ্কের কথাই বলিতেছে—কি পরিমাণ লোকসান হইলে ব্যবসায়ের অবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইবে, তাহার উল্লেখ ত একবারও করিতেছে না।

নীলমণিকে এই প্রকার চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া সুধাংশু বলিল—"কি বল নীলুদা?"

নীলমণি বলিল—"ভেবে তোমায় বলব।"

সুধাংশু উত্তেজিতস্বরে বলিল—"ননসেন্স। এত ভাবনা চিন্তা কিসের? বুকে সাহস কর—করে চাকরির মুখে মার ঝাঁটা। সাহস নেই বলেই ত বাঙ্গালীর কিছু হয় না—কেরাণীগিরি ভরসা। তোমার কাজ নয়; আচ্ছা আমি বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করি"—বলিয়া—"বউদিদি বউদিদি" সুধাংশু খালি পায়ে রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল।

নীলমণির স্ত্রী তখন কমলালেবুর পায়স চড়াইয়াছিলেন। সুধাংশু আসিতেই ঘোমটা টানিয়া দিলেন। সুধাংশু চৌকাটের বাহিরে বসিয়া নিজ বক্তব্য রেলের গাড়ীর বেগে বলিয়া যাইতে লাগিল। ভবিষ্যতের এক পরম রমণীয় উজ্জ্বল শব্দচিত্র আঁকিয়া দেখাইল।

সকল শুনিয়া বউদিদি কমলাকে দিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো, আজ রাত্রিটা সময় দিন—"ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কল্য যাহা হয় জানাইব।

আহারাদির পর সুধাংশু পোষাক পরিতে পরিতে বলিল—"কাল তাহলে কখন আমি জানতে পারব?"

"তোমার হোটেলে ত আমার প্রবেশ নিষেধ?"

"এক কাজ কর! কাল ঠিক সাতটার সময় আমার হোটেলের সমুখে দাঁড়িয়ে থেক। আমি চা খেয়ে বেরুব। লালদীঘিব ধারে বেড়াতে বেড়াতে দুজনে কথাবার্ত্তা হবে।"

"বেশ—আমি আসব।"

পরদিন অবধারিত সময়ে নীলমণি হোটেলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।—সুধাংশু বাহির হইয়া আসিল। নীলমণি বলিল—"মত হয়েছে—চাকরি ছেড়ে তোমার সঙ্গেই যাব।"

দুইজনে লালদীঘির ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে এ বিষয়ে আরও অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।—সুধাংশু বলিল—"আজকের দিনটে আফিস থেকে কোন রকমে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে পার?"

"কেন?"

"একখানা মোটর-কার কিনবো, দুটো ঘোড়া কিনবো, আর তোমার জন্যে গোটাকতক ইংরেজী সুট তৈরি করাতে হবে।"—নীলমণি হাসিয়া বলিল—"আমার জন্য ইংরাজি সুট?"

"সেখানে কি তুমি ধুতি পরতে পাবে? সর্ব্বনাশ! জমাদারেরা, কুলিরা তোমায় তা হলে গ্রাহ্যই করবে না। সেখানে আমি বড়সাহেব—তুমি ছোটসাহেব। রীতিমত ষ্টাইলে থাকতে হবে। ভেখ্ না হলে কি ভিক্ষা মেলে নীলুদা?"

"কিন্তু এখন ত আমার হাতে টাকা নেই।"

"আমার কাছে আছে। আমি দেব এখন—তোমার হিসেবে খরচ লিখে রাখব।"

বেলা বারোটার সময় বড়বাবুকে বলিয়া-কহিয়া বাকী দিনটুকুর জন্য নীলমণি ছুটি লইল। সুধাংশুর সহিত ঘুরিয়া সমস্ত দিন বাজার করিল। পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একখানা মোটরকার কেনা হইল—দু হাজার সুধাংশু নগদ দিল—বাকী তিন হাজার, মাসে পাঁচশত করিয়া ছয় মাসে পরিশোধ করিবে কড়ার-পত্র লিখিয়া দিল। বাইশ শত টাকায় একটা শাদা একটা লাল ঘোড়া কিনিল। নীলমণির জন্য যে সুটগুলি ফরমাস দেওয়া হইল, তাহারও মূল্য একশত টাকার উপর।—দিনান্তে সুধাংশু বলিল—"এখন তবে আসি ভাই। আমি কালই

খনিতে চলে যাব। পয়লা জানুয়ারী থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। তুমি কালই কর্ম্মত্যাগ-পত্র দাখিল করে দিও। এক মাস পরে আমার কাছে আসবে। এই একখানা পাঁচশো টাকার নোট রাখ, সুটগুলোর দাম দিও; আর যা যা কেনবার-টেনবার দরকার হয়, কিনে নিয়ে যেও। যাবার সময় একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করে যেও; পয়সা বাঁচাবার জন্যে নীচু ক্লাসে যেও না যেন—খবর্দ্দার। এ পাঁচশো টাকায় যদি না কুলোয়, আমায় টেলিগ্রাফ কোরো—আমি আরও টাকা পাঠিয়ে দেব। এখন আমাব হাতে আর বেশী নেই। বউদিদিকে আমার প্রণাম দিও। বোলো, সময় অভাবে তাঁর সঙ্গে আর দেখা করতে পারলাম না। ধানবাদেই আবার দেখা হবে। এখন তবে আসি ভাই—গুড্‌বাই।"

সুধাংশুর নবাবী কাণ্ডকারখানা দেখিয়া নীলমণি অবাক হইয়া গিযাছিল। ট্রামে উঠিয়া—আজ সে প্রথম শ্রেণীতে উঠিল—কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—"কে জানে, শীঘ্র হয়ত এমন দিন আসিবে, যখন আমিও সুধাংশুর মত এইরূপ লম্বা হাতে কলিকাতার বাজারে টাকা ছড়াইতে পারিব। সুধাংশু যে বলিয়াছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—একথা খুবই ঠিক।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার পৌষমাস আসিয়াছে—একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নকাল। পাহাড়ের নিকট তাহার সেই কক্ষলেখানির পশ্চাতেব বারান্দায় আরাম-কেদারায় পড়িয়া নীলমণি একখানি খনিজবিদ্যার ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিতেছিল। তাহার স্ত্রী নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া খোকার জন্য পশমের গলাবন্ধ বুনিতেছেন।

নীলমণি আর সে নীলমণি নাই। "হইবে না কেন? পশ্চিমে থাকে—জল হাওয়া ভাল—ঘি দুধ সস্তা"—সে এখন মোটা হইয়াছে—তাহার রঙ ফর্সা হইয়াছে। তাহার স্ত্রীরও আর সে চেহারা নাই। মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ কবিয়া, প্রতিদিন "নাই নাই" এই দুশ্চিন্তার কবল হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া, এখন তাঁহাব অকালবার্দ্ধক্য তিরোহিত—দেহখানিতে যৌবনলাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছে।—একজন ভৃত্য ঠেলাগাড়ীতে খোকাকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে। কমলা কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটি টিনের ঝারি লইয়া বারান্দার প্রান্তস্থিত ফুলগাছের টবগুলিতে জলসেক করিতেছে। সরলা, ঝির সঙ্গে হেড কেরাণীবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে।

টবে জলসেক শেষ করিয়া কমলা তাহার জননীর কাছে আসিযা দাঁড়াইল। এই সামান্য পরিশ্রমে এই শীতেও তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাহার ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"যাও মা, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলগে।"

কমলা চলিয়া গেলে গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁগা, মেয়ের বিয়ের কথা কিছু ভাবছ? মেয়ে যে—বলতে নেই—বড় হয়ে উঠল!"—বাস্তবিক কমলা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই এক বৎসরে সে যেন দুই বৎসরের বাড় বাড়িয়া লইয়াছে।

পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইয়া নালমণি বলিল—"কি বলছ?"

"বলছি—মেয়ের বিয়ের জন্যে একটি পাত্র-টাত্র ঠিক কর—মেয়ে যে বেটের বড় হয়ে উঠল।" নীলমণি বলিল—"এ মাঠে পাত্র কোথা পাব বল?"

"একবার দিনকতকের জন্যে কলকাতায় গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই পাত্র পাওয়া যাবে। তা তুমি ত এখান থেকে নড়বে না!"

"আমি নড়লে চলে কই বল।" সুধাংশু যদি কলকাতায় যাওয়া কমিয়ে, এখানে কিছুদিন স্থির হয়ে বসে—কাজে কর্ম্মে মন দেয়—তা হলে আমি যেতে পারি।"

"এবার ঠাকুরপো কলকাতায় গিয়ে এতদিন দেরী করছেন কেন? কবে আসবেন কিছু খবর এসেছে?"

"আজই আসবার কথা আছে। ষ্টেশনে তার হাওয়াগাড়ী গেছে।"

"তা হলে, তাঁকে একবার বলে কয়ে, কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে—মাসখানেকের জন্যে আমাদের নিয়ে কলকাতায় চল। পাত্র ঠিক হয়ে যাবেই।"

"সে ত অনেক খরচ। যাতায়াতেব খরচ, তারপর সেখানে একটা বাড়ীভাড়া করতে হবে—হাতে ত বেশী টাকা নেই। আর মাসখানেক হলেই আমাদের বাৎসরিক হিসেবটা হয়ে যায়। আমার প্রাপ্য টাকাটা পেলেই, কলকাতায় গিয়ে পাত্র অনুসন্ধান করি।"

"হিসেব দেখেছ? বছরের শেষে কত দাঁড়াল?"

"এ বছর আমাদের প্রায় ষোল হাজার টাকা লাভ হয়েছে। আমাব অংশে চার হাজার হল—তার মধ্যে হাজার-দুই টাকা ত নিয়ে ফেলেছি।"

গৃহিণী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"দু হাজার কবে নিলে?"

"কলকাতায় পাঁচশো—এখানে এই এক বছরে প্রায় দেড় হাজার। দু হাজার টাকা মাত্র এখন আমার পাওনা। অন্য সব খরচ খরচা করে, দু হাজারের মধ্যে যা থাকবে সে টাকায় কি মনের মত পাত্র মিলবে?—একটা বছর অপেক্ষা করা যাক না—আসছে বছর ফাল্গুন মাস নাগাদ হলে, মেয়ের বিয়েতে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করতে পারব।"

"তা—আসছে বছর যদি এত লাভ না হয়?"

নীলমণি বিজ্ঞভাবে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—"বেশী হবে—আরও বেশী হবে। প্রথম বছর অনেক বেশী হল—সব ব্যবসাতেই হয়; তাই লাভের অঙ্ক কম দাঁড়াল। আসছে বছর অন্ততঃ চব্বিশ হাজার লাভ দাঁড়াবে—এটা খুব আশা করতে পারি।"

"তা তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। কিন্তু শীঘ্র সেরে ফেললেই ভাল করতে।"

এমন সময় ভিতরের কামরা হইতে "বাবা বাবা" ধ্বনি উত্থিত হইল—সরলার সোল্লাস কণ্ঠস্বর। জুতা পায়ে দিয়া পট্‌পট্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে বলিল—"বাবা থায়েব কাকা এ্যতথে।"—মা বলিলেন—"তুই দেখলি নাকি?"

"হ্যাঁ—আমি খিল থঙ্গে আথিলাম কিনা—তখন মোতল গালী এল! থায়েব কাকা আমায় দেখে নুমাল ঘুলতে লাগল।"—জননী হাসিয়া বলিলেন—"তুই কি ঘুরুলি?"

সরলা বিষণ্ণস্বরে বলিল—"আমি কি ঘুলুব? আমাল কি নুমাল আছে?"—পিতার দিকে ফিরিয়া সঙ্কুচিত হইয়া নিম্নস্বরে বলিল—"বাবা, আমাকে একখানি নুমাল কিনে দেবে? আল একখানি মোতল-কাল?"—নীলমণি বলিল—"এক সঙ্গে অত টাকা পাব কোথা মা? এখন বরং একখানি রুমাল কিনে দেব, মোটর-কার পরে হবে।"

পিতার জানু দুটি ধারণ করিয়া আবদারের স্বরে সরলা বলিল—"না, বাবা—বেথী তাকা না থাকে, এখন বলং একখানি মোতল-কাল কিনে নাও; নুমাল পলে হবে।"

এই কথা শুনিয়া সরলার পিতামাতা হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। সরলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার হাসির মধ্য হইতে একটা সন্দেহ যেন উঁকি মারিতেছিল—ভাবটা যেন—"তোমরা হাসছ যখন, আমিও না হয় হাসি—কিন্তু হাসির এমনই কি কারণ উপস্থিত হয়েছে?"—হাসি থামিলে, গৃহিণী বলিলেন—"আহা দিও ওকে একখানি মোটরকার কিনে। একখানি ছোটখাট কার কত হলে হয়?"

"দু হাজার।"

"আহা—তা দিও। সাহেবকাকার মোটরখানি দেখে মেয়ের নাল পড়ে। ও আমায় চুপি চুপি ওর মনের গোপন প্রার্থনাটি কতদিন জানিয়েছে। তোমায় লজ্জায় বলতে পারত না—আজ বলে ফেললে।"—নীলমণি বলিল—"আচ্ছা—এবার কলকাতায় গিয়ে একখানি এনে দেব না হয়। সব টাকা ত একসঙ্গে দিতে হয় না—কিস্তি কিস্তি দিলেই চলে।"

সেই একদিন—আর এই একদিন। ঠিক একটি বৎসর পূর্ব্বে—এই সরলার জন্যই নীলমণি এক টাকা মূল্যের একটি মেমপুতুল আনিতে চাহিয়াছিল—নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া গৃহিণী টাকাটি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নীলমণি বাঙ্গলো হইতে সুধাংশুর বাঙ্গলোটি প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যবধান। সুধাংশু আসিয়াছে শুনিয়া নীলমণি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় সুধাংশুর ভৃত্য একখানা পত্রসহ এককুড়ি কাঁকড়া, একশোটা কমলালেবু এবং এক টুকরি কপি প্রভৃতি তরকারীপাতি আনিয়া দাঁড়াইল। পত্রে লেখা ছিল, বিশেষ প্রয়োজন আছে নীলমণি যেন শীঘ্র গিয়া সাক্ষাৎ করে।—কাঁকড়া কপি প্রভৃতি দেখিয়া নীলমণি স্ত্রীকে বলিল—"তবে ভায়ারও রান্না এইখানেই কর—রাত্রে তাকে খেতে নিয়ে আসব এখন।"—গৃহিণী বলিলেন—"তা বেশ।"

নীলমণি তখন সজ্জিত হইয়া, ছড়ি হাতে করিয়া বড়সাহেবের বাঙ্গলো অভিমুখে পদচালনা করিল।—পৌঁছিয়া দেখিল, সুধাংশুর চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত, উড়িতেছে। পশ্চাতের বারান্দায় টেবিলের নিকট একখানা চেয়ারে সে বসিয়া আছে—মস্তক করতলে রক্ষিত, নিম্নের ওষ্ঠ দন্তে দংশন করিয়া রহিয়াছে।—তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া শঙ্কান্বিত কণ্ঠে নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল—"সুধাংশু তোমার কি হয়েছে?"—সুধাংশু এতদূর বিমনা ছিল যে, নীলমণি প্রবেশের পদশব্দও শুনিতে পায় নাই। চমকিয়া উঠিয়া বলিল—'নীলুদা এসেছ?—বস।"

নীলমণির উপবেশন করিয়া তাহাব মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সুধাংশুকে নীরব দেখিয়া একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল—"ব্যাপার কি? তোমার শরীর ভাল আছে ত?"

"শবীর? ভাল আছে বইকি।"

"কি হযেছে।"

"বড় মুস্কিলে পড়েছি নীলুদা। বাৎসরিক খাজনা দাখিল করবার সময় এসেছে—পাঁচদিনের মধ্যে পনেরো হাজার টাকার দরকার—দাখিল করতে না পারলে ইজারা রহিত হয়ে যাবে।"

নীলমণি বলিল—"তা দাখিল করে দাও। ব্যাঙ্কের টাকা ত রয়েছে।"

"ব্যাঙ্কে টাকা কোথা? হাজারখানেক টাকা মাত্র আছে।"

নীলমণি আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল—"হাজারখানেক মাত্র।—আর সব টাকা কি হল?"

"টাকা আর কি হয়? চিরকাল যা হয়ে থাকে—উড়ে গেছে।"

"বল কি? এত টাকা খরচ হয়ে গেছে? এ বৎসর ত আন্দাজ ষোল হাজার টাকা আমাদের লাভ হয়েছে।"

"হয়েছে ত— কিন্তু টাকা তো নেই। খরচ করে ফেলেছি। লাভের টাকা, আমার নিজের যা কিছু ছিল—সবই খরচ হয়ে গেছে।"

নীলমণি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দুই হাজারও তবে গিয়াছে? সুধাংশু যে প্রতিবার কলিকাতায় গিয়া আমোদ-প্রমোদ, হোটেল-খরচে, জিনিষপত্র কেনায় অনেক টাকা উড়াইতেছে তাহা নীলমণি জানিত এবং মাঝে মাঝে এ জন্য তাহাকে ভৎর্সনাও করিত। সুধাংশু বলিত, "স্ত্রী নেই, ছেলেপিলে নেই, আমি আর কার জন্যে টাকা জমাব ভাই?—যা পাই তাই খরচ করি—চিরকাল আমার এই দশা।"—কিন্তু সে যে এত টাকা নষ্ট করিয়াছে—লাভের সমস্ত টাকা এবং নিজের পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত মূলধন উড়াইয়া দিয়াছে—তাহা নীলমণি স্বপ্নেও জানিত না। পাট্টার কঠিন সর্ত্ত—বৎসর পূর্ণ হইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বৎসরের দেয় খাজনার সমস্ত টাকা জমা না হইলে ইজারা রদ ও রহিত হইয়া যাইবে, তাহাও নীলমণি অবগত ছিল। সুতরাং অবস্থা যে কিরূপ গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল।

সুধাংশু বলিল—"এখন উপায় কি? পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ পাবার ভরসা আছে, ব্যাঙ্কে হাজার টাকা আছে—আমার নিজের কাছেও হাজার খানেক আছে—এখন আট হাজার টাকার অস্থিত। তোমার কিছু আছে?"

"বড় জোর পাঁচশ।"

"বউদিদির কাছে কিছু নেই?"

"তার গহনাগুলি বেচলে আর শ'পাঁচেক হতে পারে।"

"বাকী থাকে সাত হাজার।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। নীলমণি অকূল পাথার চিন্তার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—"হায় হায় এমন ব্যবসায়, এমন কারবার, শুধু অপরিণামদর্শীর অপব্যয়ের জন্য ভস্মসাৎ হইয়া গেল! কি হইবে এখন উপায় কি? সুধাংশু অবিবাহিত—যেখানে থাকিবে, করিয়া খাইতে পারিবে। আমার এখন উপায় কী?—স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আমি এখন দাঁড়াই কোথা?—অদৃষ্ট আমার সঙ্গে এ কি ভীষণ খেলা খেলিল! চাকরিটি গেল—আবার কলিকাতায় গিয়া চাকরির উমেদারী করিতে হইবে। সম্বল মাত্র পাঁচশত টাকা—তাহা আর কতদিন খাইব? কমলার বিবাহেরই বা উপায় কি হইবে?"

কক্ষের মধ্যে ভৃত্য বাতি জ্বালিয়া দিল। সুধাংশু হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া ভিতরে গেল। টেবিলের নিকট বসিয়া একখানা চিঠির কাগজে কি কতগুলো লিখিতে লাগিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল, নীলমণি সেই অন্ধকার বারান্দায় তখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। সুধাংশু বলিল—"নীলুদা, এই কাগজখানা রাখ।"

নীলমণি বলিল—"কি কাগজ?"

"আমার উইল।"

কথাটা শুনিয়া নীলমণির বুকের ভিতর ছলাৎ করিয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা হইল, হয়ত রাত্রে সুধাংশু আত্মহত্যা করিবে। কি সর্ব্বনাশ!—তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"উইল কি রকম? তোমার মৎলবখানা কি?"

সুধাংশু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিল। বলিল—"ভয় কি নীলুদা—এ সে রকম উইল নয়। আমি হঠাৎ মরছিনে—তেমন ছেলেই নই। বস বস; আমার যা মৎলব সব বলছি।"

নীলমণি উপবেশন করিল। সুধাংশু বলিতে লাগিল—'টাকার উপায় যখন হল না, তখন এ ব্যবসা গুটাতে হল। আমি অন্য একটা ব্যবসার ফন্দি করছি—কলকাতায় এ ক'দিন শুধু যে টাকা ধার পাবার চেষ্টাতেই ঘুরে বেড়িয়েছি তা নয়। যদি টাকা না যোগাড় হয়, তা হলেই বা কি করব, কোথা যাব—সমস্ত ঠিকঠাক করে এসেছি। সিলনে খুব বড় বড় জঙ্গল আছে—প্রচুর নারিকেল ফলে। একটা বড় দেখে জঙ্গল ঠিকা নিয়ে নারিকেল পাড়িয়ে পাড়িয়ে কতক আস্ত আর কতক তেল তৈরী করিয়ে কানেস্তারাবন্দী করে ভারতবর্ষে চালান দেব—কতক চিনির রসে ডুবিয়ে শিশিবন্দী করে কোকোনাট ড্রপস্ লেবেল এঁটে বিলাতে পাঠাব—সেখানে ছেলেপিলে খুব খাবে। ব্যাঙ্কের হাজার টাকা, নিজের কাছে যে হাজার টাকা আছে তা, আর ঘোড়া দুটো বিক্রী করলে হাজার দুই পাব—এই চার হাজার মাত্র এবার হল আমার মূলধন। জাহাজে ডেক—প্যাসেঞ্জার হয়ে যাচ্ছি—এবার আর নবাবী নয়। ব্যয়-সংক্ষেপে যতদূর করতে হয়। সুন্দর ব্যবসাটি মাটি হল ভাই। তুমি আসবার আগে, পাহাড়টার পানে আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। যাক। যায় এবং আসে—এই হল সংসারের নিয়ম। হ্যাঁ—তার পর আমার উইলের কথা। এ ব্যবসা থেকে আমার কাছে তোমার দু হাজার টাকা প্রাপ্য রয়েছে।

তার বদলে, আমি তোমায় আমার মোটরকারখানি দিয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওখানি তুমি বিক্রী কোরো। আর এই বাঙ্গালোয় আমার যা আসবাবপত্র আছে সেগুলি তুমি বিক্রী করবে। ওতেও হাজারখানেক টাকা হবে। ক'মাস ধরে আমার নিজের চাকর-বাকর, খনির কেরাণী, জমাদার প্রভৃতি মাইনে পায়নি—ঐ টাকা থেকে মাইনে-পত্তর চুকিয়ে দিও। কে কত পাবে তার একটা তালিকা আমি তোমায় দিয়ে যাব। চাকরি ছাড়িয়ে তোমায় নিয়ে এলাম—বড় আশা করেই এনেছিলাম—কিন্তু সে আশা সফল হল না। যাক। তুমি এখন কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করবে বোধ হয়?—আমার পরামর্শ যদি শোন—তবে চাকরি না করে একটা কোনও ব্যবসা ফেঁদ।—আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সিলনে নারিকেলের কাজে আমার সুবিধা হয়—আর, তুমি যদি আসতে ইচ্ছা কর—এস।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর নীলমণি বলিল—"কবে সিলনে যাচ্ছ?"

"কাল সকালের গাড়ীতেই কলকাতা রওনা হব। সেখানে তিন চার দিন থেকে জাহাজে উঠব।"

"তোমার বউদিদির সঙ্গে দেখা করবে না? তিনি যে তোমায় ঐখানেই খেতে বলেছেন।"

সুধাংশু একটু ভাবিয়া বলিল—"ভাই, এটি মাফ করতে হবে। এ মুখ এখন তাঁকে দেখাব না। যদি ঈশ্বর কখনও দিন দেন—তা হলে আবার—"

সুধাংশুর গলা ভারি হইয়া আসিয়াছিল। বাক্য শেষ করিতে পারিল না। ফোঁটা দুই চোখের জল সেই অন্ধকারে তাহার গলা গড়াইয়া জামার আস্তিনে পতিত হইল।

নীলমণি কোনও ক্রমে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে রাত্রি এই ভগ্নহৃদয় হতাশ্বাস দম্পতির কেমন করিয়া কাটিল তাহা যিনি অন্ধকারেও সমস্ত দেখিতে পান, তিনি দেখিয়াছেন।

পরদিন প্রাতে নীলমণি সুধাংশুর বাঙ্গলোয় গিয়া তাহার সহিত ষ্টেশনে গেল। গাড়ীতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া, মোটর লইয়া শূন্যমনে বাঙ্গলোয় ফিরিয়া আসিল।

সরলা একটি পেনিফ্রক পরিয়া শুধু পায়ে বারান্দার সম্মুখে খেলা করিতেছিল। তাহার মা সজলনেত্রে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন বেলা দশটা। সরলা ইতিমধ্যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিল, তাহার কাকা মোটরখানি তাহাদিগকে দিয়াছেন—কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করে নাই। পিতাকে একাকী মোটর হইতে নামিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, থায়েব কাকা, এ মোতলখানি আমাদেল দিয়েথেন?"

নীলমণি উদাসদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ।"

শুনিবামাত্র সরলা একমুখ হাসিয়া, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বারান্দায় উঠিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ওলে খোকা ওরে দিদি আয় থিগ্‌গিল্ আয়। থায়েব কাকা আমাদেল মোতল-কাল দিয়েথেন, তলবি আয়।"

সরলার এবংবিধ আচরণ দেখিয়া, এত দুঃখেও তাহার পিতামাতার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি দেখা দিল।

এ দিকে সমস্ত বিলি ব্যবস্থা করিয়া, ধানবাদের বাস উঠাইয়া নীলমণি সপরিবারে কলিকাতায় গেল। তাহার সেই পুরাতন আফিসের বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া, বড়সাহেবের নিকট কাঁদাকাটা করিয়া—আবার চাকরিটি পাইল, কিন্তু দণ্ড স্বরূপ সাহেব তাহার বেতন পাঁচটি টাকা কমাইয়া দিল।

মোটরকারখানি বিক্রয় করিয়া আড়াই হাজার টাকা পাওয়া গেল। তাহা হইতে দেড় হাজার খরচ করিয়া বৈশাখ মাসে কমলার বিবাহ হইল। বাকী হাজার টাকা সরলার বিবাহের জন্য পোষ্ট আফিস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

[ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২০]

যুগল সাহিত্যিক

প্রথম পরিচ্ছেদ।। শুভসংবাদ

সন্ধ্যার পর, কলিকাতার কোনও একটি সুপ্রশস্ত ত্রিতল গৃহের বৈঠকখানায বসিযা, চায়ের পেয়ালা সম্মুখে লইয়া, তিনটি যুবক কথোপকথন করিতেছিল।

যেটি গৃহস্বামী, তাহাব নাম রাজেন্দ্রনাথ বসু। বযস পঞ্চবিংশতি বর্ষ, মাথার চুলগুলি বেশ বড় বড়, মাঝে চেরা সীঁথি, দিব্য নধর-কান্তি পুরুষ! দেশে জমিদাবী আছে, কলিকাতায় আরও দুইখানি বাড়ী আছে, কোনও অভাব নাই, চাকরি বা কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। আর দুইজন প্রতিবেশী বন্ধু, একজনের নাম অধরচন্দ্র, অপরেব নাম শরদিন্দু।

পাড়াব আরও দুইজন যুবক আসিযা উপস্থিত হইল। পার্শ্বেব কক্ষে চায়েব জন্য জল ফুটিতেছে। গৃহস্বামীর আজ্ঞায়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভৃত্য আবও দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। সন্ধ্যাব পর বাজেন্দ্রনাথেব বাড়ীতে চায়ের সদাব্রত। যেই আসুক, তাহারই জন্য চা প্রস্তুত।

গল্প কবিতে করিতে রাজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ঘড়ির পানে চাহিতেছে। বাহিবে পদশব্দ শুনিলেই দ্বারের পানে চাহিয়া দেখে। তাহাব এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শবদিন্দু বলিল—"আজ তিনকড়িবাবু এখনও এলেন না?"

বাজেন্দ্র বলিল—"হ্যাঁ, তাই ত ভাবছি। আজ এখনও এল না কেন? আটটা বাজে প্রায়!"

আটটা বাজিবার পূর্ব্বে, তিনকড়ি আসিয়া প্রবেশ করিল। আজ তাহার মুখখানি বেশ হাসি হাসি।

রাজেন্দ্র বলিল—"কি হে, আজ এত দেরী যে?"

তিনকড়ি একখানি চেয়াব টানিযা বসিয়া বলিল—"আজ আফিস থেকে বেরুতেই দেরী হয়ে গেল। আজ একটা শুভসংবাদ আছে ভাই।"—সকলে উৎসুক হইয়া তিনকড়ির মুখের পানে চাহিল। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল, বল।"

"আমার মাইনে বেড়েছে।"

রাজেন্দ্রনাথ সজোবে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল—"হুর্‌রে! কত? কত বাড়লো?"

তিনকড়ি বলিল—"২৫ টাকা বেড়েছে।"

রাজেন্দ্রনাথের মুখে আনন্দ-জ্যোতি ফুটিযা উঠিল। বলিল—"ব্র্যাভো! এস আজ আর এক এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক। ওরে রামধনিয়া—আওর চা লে আও।"

উপস্থিত সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল। শরদিন্দু বলিল—"শুধু চা খেলেই কি আমরা ছাড়ব? রীতিমত ভোজ চাই। তিনকড়িবাবু খাওয়াচ্ছেন কবে বলুন।"

রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"তিনকড়ির হয়ে আমিই খাওয়াব। কবে খাবেন বলুন।"

অধর বলিল—"সমুখের এই শনিবারে।" "বেশ—তাই হবে।"

নূতন পেয়ালায় চা-পান করিতে করিতে মহা-উৎসাহের সহিত ভোজ সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল।

মাসের ত্রিশটি দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়ি রাজেন্দ্রের সঙ্গেই বসিয়া কাটায়। আফিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতে যে দেরী—তারপরই এখানে ছুটিয়া আসে। এইখানেই সে প্রতি সন্ধ্যায় চা-পান করে। জলযোগও এইখানেই সম্পন্ন হয়। এই নিয়মই বহুবৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই রাজেন্দ্রনাথ ও তিনকড়ির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রাজেন্দ্র যদিও ধনীর সন্তান এবং তিনকড়ির পিতা সামান্য চাকুরিজীবি ছিলেন, তথাপি উভয়ের বন্ধুত্বে কোনও

ব্যাঘাত হয় নাই। দুইজনে প্রায় সমবয়সী, বাল্যকালে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিত, একসঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের পাঠ আরম্ভ করে। বি-এ পড়িবার সময়, কয়েক দিন অগ্রপশ্চাৎ উভয়েরই বিবাহ হয়। তখন হইতেই উভয়ের বন্ধুত্ব আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। নিজ নিজ নবীনা প্রেয়সীর গুণগান পরস্পরের কর্ণে অবিশ্রাম গুঞ্জন করিয়া কিছুতেই ইহাদের তৃপ্তি হইত না এবং উক্ত মহাশয়াগণেব পিতৃগৃহে অবস্থানকালীন কাহারও একখানি প্রেমলিপি আসিলে, যতক্ষণ সেখানি সে বন্ধুকে না দেখাইতে পারিত ততক্ষণ ছটফট করিতে থাকিত।

এই সময় হইতেই এ দুইজনের বন্ধুত্বের নিবিড়তার আরও একটি কারণ উপস্থিত হয়—উভয়েই কবিতা-রচনা আরম্ভ করে। একজন একটি কবিতা রচনা করিলেই, অপরকে সেটি দেখাইবার জন্য ছুটিত। সে সব দিনে, কবিতা প্রকাশের চেষ্টাও যে ইহারা না করিয়াছিল এমন নহে। উভয়েই অনেকগুলি করিয়া কবিতা কয়েকটি মাসিকপত্রে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি সম্পাদকের পর সম্পাদক ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র বলিল—'মাসিকের সম্পাদকগণ কাব্যবিচার সম্বন্ধে নিতান্তই অপটু—তাহাদের কবিতা পাঠান, বেণাবনে মুক্তা ছড়ানর মতই নির্ব্বুদ্ধিতা'—পরামর্শ হইয়া রহিল—যখন সময় আসিবে, উভয়েই পুস্তকাকারে কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়া সাহিত্যজগৎকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবে। রাজেন্দ্র এতদিন কোন্ কালে তাহার কাব্য ছাপাইয়া উক্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তিনকড়ির অর্থাভাব—বহি ছাপাইবার সঙ্গতি তাহার ছিল না—সে রাজেন্দ্রের নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতেও অসম্মত—সেজন্য বাধ্য হইয়া এতাবৎকাল সাহিত্য-জগৎকে বঞ্চিত রাখিতে হইয়াছে।

চা পান শেষ কবিয়া, ভোজের পরামর্শ পাকাপাকি করিয়া, অভ্যাগতগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। রহিল কেবল তিনকড়ি।

দুইজনে একা হইলে রাজেন্দ্র বলিল—"যাক—এতদিন পরে তবু একটু স্বচ্ছলতা হল। ততটা টানাটানি ত আর থাকবে না!"

তিনকড়ি বলিল—"হ্যাঁ ভাই। এমনি অবস্থা ছিল, কোনও মাসে একটি পয়সা রাখতে পারতাম না!—এবার একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব।"

রাজেন্দ্র বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। শেষে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

তিনকড়ি বলিল—"হাসলে যে?" "একটা কথা ভাবছি।"

"কি?—বল না।"

"মনে পড়ে?—একদিন আমরা বলেছিলাম—বই ছাপিয়ে আমাদের কবিতা বের করব?"

"খুব মনে পড়ে। আর, আমার বই ছাপানোর ক্ষমতা ছিল না বলেই, তুমিও নিজের বই এতদিন ছাপাওনি—তাও আমি জানি।"—বলিয়া তিনকড়ি বন্ধুর পানে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

রাজেন্দ্র বলিল—"না—না—তা নয়। আচ্ছা, বই ছাপতে কত খরচ পড়ে?"

কিরূপ ছাপাইতে কত খরচ, কিরূপ কাগজেরই বা কত দাম, তিনকড়ি অনেক দিন হইতেই এ সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজেন্দ্রকে সমস্ত হিসাব দিয়া বলিল—'ছবি দেবে? আমার ক্ষমতায় অবশ্য কুলোবে না—তোমার বইয়ে খানদুই রঙীন, আর খানচারেক একবর্ণের ছবি দিতে পার। আজকাল সকলেই বইয়ে ছবি দিচ্ছে।"

ছবি দিতে হইলে কত খরচ তাহাও রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—ছবি দিবার প্রলোভনটি তাহার মনে বিলক্ষণই ছিল। কিন্তু খরচের ফর্দ্দ শুনিয়া রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিল, তিনকড়ির পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত হইবে। সুতরাং সে প্রলোভন মনেই দমন করিয়া বলিল—"না,—ছবিতে কাজ নেই।—অমনিই ভাল।"

সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। একই প্রেসে, একই রকম কাগজে, দুইজনের বহি মুদ্রিত হইবে।

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া তিনকড়ি উঠিল। রাজেন্দ্র বলিল—"তা হলে আব দেরী কোরো না।—পাণ্ডুলিপিটি শীগ্‌গিব তৈরী কবে ফেল।"

তিনকড়ি বলিল—"হ্যাঁ—কাল সকালেই আমি শুরু করে দেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।। বড়ভাই ও ছোটভাই

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে করিতে তিনকড়ির মনে কিন্তু বড়ই দ্বিধা উপস্থিত হইল। পুরাতন কবিতাগুলি যতই সে পড়ে, ততই তাহার মনে হয়,—ছি—ছি—এ ছাপাইয়া কি হইবে!—দুই বৎসর পূর্ব্বে নিজের এই কবিতাগুলি তাহাব কাছে উচ্চদবেব বলিয়াই মনে হইত,—এখন কিন্তু সেগুলি নিতান্তই বিশেষত্ব বর্জ্জিত ও সাধারণ বলিযা তাহাব বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রের বাড়ী গিযা সে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—"ভাই, তুমি বই ছাপাও—আমি ছাপাব না।"

রাজেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?—হঠাৎ আবাব কি হল?"

"আমার ও ছাই-পাঁস ছাপিয়ে কি হবে?—শুধু লোকেব কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া বই ত নয়।"—বাজেন্দ্রেব মনে প্রথমাবধিই ধাবণা, তাহার নিজেব কবিতা তিনকড়িব অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর। আর্ট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাকি তাহার কবিতায আছে—তিনকড়ির কবিতায নাই। তিনকড়ি, তাহাব বন্ধুব মনেব এই ভাবটি অবগত ছিল; কিন্তু স্নেহবশতঃ কখনও ইহার প্রতিবাদ করে নাই। খোসামোদ কবিবার অভিপ্রায়ে নয়, বন্ধুত্ব প্রীতিকামনা করিয়াই, সে বরং মাঝে মাঝে এ ভ্রান্ত বিশ্বাসটুকু পোষাকতাই কবিত।

রাজেন্দ্র বলিল—"না—না, হাস্যাস্পদ হতে হবে কেন?—পাণ্ডুলিপিটি শেষ হলে তুমি আমাব কাছে দিও—আমি বেশ কবে দেখে শুনে, যেখানে যা পবিবর্ত্তন আবশ্যক, কবে দাঁড় কবিয়ে দেব এখন।"

এই আশ্বাস তিনকড়ির কাছে সমধিক ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইল। সে বলিল—"জোড়াতালি দিয়ে কি আর হয় ভাই?—সে কাজ নেই।"

রাজেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; শেষে বলিল—"তুমি না ছাপালে আমাবও ছাপানো হয় না!"—তাহার স্বর ভারি নৈরাশ্যযুক্ত।

তিনকড়ি বলিল—"তোমার ভাল কবিতা,—তুমি কেন ছাপাবে না ভাই!—ছাপাও।"

"না,—সে কিছুতেই হবে না।"—বলিয়া রাজেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া শেষে তিনকড়ি বলিল—"আচ্ছা, না হয় আমিও ছাপাব।—কিন্তু বেশী বড় বই নয় ভাই। ওরই মধ্যে খুব বেছে বুছে, অল্প গুটিকতক কবিতা দিয়ে একখানি বই ছাপাব।"

রাজেন্দ্র বলিল—"আমার বইখানি হবে বড়—তোমার খানি হবে ছোট?"

তিনকড়ি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল—"আমিও যে ছোট। তোমার বইখানি হবে বড়ভাই, আমার খানি ছোটভাই। তোমার চেয়ে আমার বইখানি সকল বিষয়েই ছোট, হবে; আকারেও ছোট,—কবিত্বেও ছোট।"

শেষের কথাটিতে রাজেন্দ্রের ত কোন সন্দেহই ছিল না। হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, তাই হোক। এবার থেকে, বুঝেছ তিনু, তুমি এক কাজ কোরো।—কোনও একটা কবিতা তোমার মাথায় এলেই, আমায় প্রথমে বোলো। ঠিক কি রকম ছাঁচে ফেললে সেটির বেশ খোল্‌তাই হবে, আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব। তারপর, তুমি সেটি লিখবে। কিছু ভেব না তিনু,—আমি বেশ জানি, তোমার ভিতরে পদার্থ আছে। তোমার শুধু একটু উপদেশ দরকার। আমি তোমায় ঠিক তৈরি করে তুলব;—তখন দুই ভাই দিগ্বিজয়ে বেরুব।"

যথাসময়ে বলা যায় না—অনেক বিলম্বে, বিস্তর টালমাটাল করিয়া ছাপাখানা অবশেষে বহি দুইখানি শেষ করিয়া দিল। রাজেন্দ্রের পুস্তকের নাম হইয়াছে "প্রসূনাঞ্জলি", তিনকড়ির পুস্তকের নাম "গুঞ্জরণ"।

বহিগুলি আসিবামাত্র, সর্ব্বপ্রথমখণ্ড উভয়ে উভয়ের করকমলে অকৃত্রিম প্রণয়োপ-হারস্বরূপ অর্পণ করিল।

তাহার পর প্রথম কার্য্য, প্রধান অপ্রধান সমস্ত সম্পাদককে এক এক খণ্ড বহি সমালোচনার্থ প্রেরণা করা। সারাদিন এই কার্য্যে অতিবাহিত হইল।

তিনকড়ি বলিল—"এবার সম্ভবতঃ মাসিক-সম্পাদকেরা কবিতার জন্যে তোমায় ধরে পড়বে।—তোমার উপর খুব জুলুম আরম্ভ হবে।"

রাজেন্দ্রনাথ উদারভাবে বলিল—"নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে, দেওয়া যাবে দু একটা।—তোমার খাতা বেছেও দু একটা পাঠান যাবে।"

তিনকড়ি বলিল—"আরে রাম,—আমার লেখা কেউ চাইবেও না, ছাপাবেও না।"

রাজেন্দ্র বলিল—"কি!—ছাপাইবে না?—তাদের ঘাড় ছাপবে।—তোমার লেখাও ছাপতে হবে, এই কড়ারে তবে আমি লেখা দেব। যে সম্পাদক তোমার কবিতা ছাপতে নারাজ—তিনি আমার লেখাও পাবেন না—মাথা কুটে মরলেও না!"—তিনকড়ির পিঠ ঠুকিয়া রাজেন্দ্র আবার বলিল—"আমরা দুই ভাই।—বড়ভাই যেখানে, ছোটভাই সেখানে।—ছোটভাইটিকে যিনি আদর না করবেন, বড়ভাইকেও তিনি পাবেন না।"

স্নেহে আনন্দে তিনকড়ির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। হায়, হতভাগ্যগণ!—কি কুক্ষণেই তোমরা বই ছাপাইয়াছিলে!

সম্পাদকগণের নামে বহি পাঠান শেষ হইলে, অন্যান্য সকলকে উপহার দিবার ধুম পড়িল। রাজেন্দ্রের বহি তাহার শ্বশুরবাড়ীতেই প্রায় ত্রিশখানা খরচ হইয়া গেল। এমন কি উক্ত 'মধুপুরী'তে, সামান্য বাঙ্গলা লেখা পড়া জানা খানসামা ছিল, সেও একখণ্ড জামাইবাবুর বহি বখ্‌শিস্ পাইল। রাজেন্দ্রের বৈঠকখানা-বিহারী সান্ধ্য চা-পায়িগণ প্রত্যেকে উভয়গ্রন্থই পাইল। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিগণের অন্যান্য বন্ধুবর্গের করকমলও বঞ্চিত রহিল না। যে সকল আত্মীয়-বন্ধু বিদেশে থাকিতেন, সকলের নামেই এক একখানি বহি গেল। বঙ্গের খ্যাতনামা সুধিবৃন্দ, প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ,—সকলেরই নামে ডাকযোগে বহি প্রেরিত হইল। তাহার পর কিছুদিন ধরিয়া দুইজনে দেখা হইলেই—কাহাকেও বহি পাঠাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে কিনা, তাহারই আলোচনা হইত। "ওহে—অমুককে ত আমি এখনও বই পাঠাইনি—তুমি পাঠিয়েছ?"—"না ভাই, আমারও ভুল হয়ে গেছে। ছি—ছি, কি মনে করবেন বল দেখি?"—ইত্যাদি প্রকার কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইতে লাগিল। ত্রুটি সংশোধনে তিলমাত্র বিলম্ব হইত না।

বিক্রয়ার্থ, পুস্তকের দোকানে দোকানেও বহি পাঠান হইল। তবে দোকানদারেরা অধিকসংখ্যক বহি একসঙ্গে লইতে চাহিল না,—বলিল, আমাদের গুদামে স্থানাভাব।

রাজেন্দ্র অনেকগুলি মাসিকপত্রের গ্রাহক ছিল। সমালোচনা কবে বাহির হইবে, কবে বাহির হইবে—করিয়া দুইজনে অস্থির হইয়া উঠিত এবং মাসিকপত্র আসিলেই খুলিয়া আগে সমালোচনার পৃষ্ঠাগুলি দেখিত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়ি আসিয়া দেখিল, রাজেন্দ্র কিছু বিমর্ষ। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?"

রাজেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া, দেরাজ খুলিয়া একখানি নূতন মাসিকপত্র বাহির করিল।

তিনকড়ি, উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল—"বঙ্গপ্রভা নাকি? সমালোচনা বেরিয়েছে?—দেখি দেখি।" রাজেন্দ্র একটা স্থান খুলিয়া তিনকড়ির হাতে কাগজখানি দিল।

তিনকড়ি দেখিল, প্রাপ্ত-পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার স্তম্ভে তাহার গুঞ্জরণের সমালোচনা। রুদ্ধশ্বাসে সেটি পাঠ করিল। বেশী নয়—বর্জ্জাইস অক্ষরে বারো চৌদ্দ লাইন মাত্র। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের আকার, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, প্রেস, প্রকাশক কে, মূল্য কত ইত্যাদি সংবাদেই চারিপাঁচ ছত্র ব্যয় হইয়া গিয়াছে—বাকি কয় ছত্র সমালোচনা। তা, বহিখানিকে ভালই বলিয়াছে। লিখিয়াছে—"এই নব্য-কবির ভাষায় ঝঙ্কার আছে, ভাবে নূতনতা ও গভীরতা আছে, তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সাহিত্যের আসরে তিনকড়ি বাবুকে আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি।"

রাজেন্দ্র বলিল—"কি করে জানব ভাই?"

"তাই ত!"—বলিয়াই 'গুঞ্জরণে'র সমালোচনাটি অভিনিবেশ সহকারে সে দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে লাগিল। এই সামান্য কয়েকটি প্রশংসাবাক্যেই তাহার অন্তরপ্রদেশে পুলকের হিল্লোল বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সহসা রাজেন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তাহা শুনিয়া তিনকড়ি যেন চমকিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তরে কষাঘাত করিয়া কহিল—স্বার্থপর!—তিনকড়ি বলিল—"আমার ত বোধ হয়, 'গুঞ্জরণকে'ই যখন এ কথা বলেছে, তখন প্রসূনাঞ্জলি'র আরও ভাল সমালোচনা করবে।"

রাজেন্দ্র বলিল—"দেখা যাক—কি বলে।"

চা আসিল। পান করিতে করিতে দুইজনে গল্পগুজব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধরচন্দ্র আসিল। রাজেন্দ্র তাহাকে সমালোচনাটি পড়িতে দিল। সে পড়িয়া বলিল—"এই দশ লাইন সমালোচনা না করলেই নয়!—যদি কল্লি বাপু, ত একটু বড় করেই কর্।"

তিনকড়ি বলিল—"যে যেমন বই তার তেমনি সমালোচনা হবে ত। ভাল বইয়ের সমালোচনা বেশ করেছে,—দেখ না।"

প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা নাই শুনিয়া অধর মত প্রকাশ করিল—"সেখানার সমালোচনা বোধ হয় একটু বড় করেই লিখবে হয়ত, এ মাসে স্থানাভাব হয়েছিল।"

তিনকড়ি বলিল—"আমারও ত তাই মনে হয়।"

উঠিবার সময়, তিনকড়ির ইচ্ছা হইল স্ত্রীকে দেখাইবার জন্য কাগজখানি চাহিয়া লইয়া যায়,—কিন্তু বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। রাজেন্দ্রের সেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিল, 'যদি দুইখানি বহিরই সমালোচনা থাকিত—সে কেমন আনন্দ হইত! না—এই, আধখানা আনন্দে কোনও সুখ নাই।'

তিনকড়ি প্রস্থান করিবার মিনিট কুড়ি পরে রাজেন্দ্র আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখিল, ভোজকক্ষের বারান্দায় তিনকড়ির বাড়ীর ঝি বসিয়া আছে।

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহার স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁগা, তোমার কাছে এ মাসের 'বঙ্গ প্রভা' আছে?"

"কেন?"

"কিরণ আমায় চিঠি লিখে চেয়ে পাঠিয়েছে—বলেছে কাল সকালেই আবার ফিরে পাঠাবে।"—কিরণবালা তিনকড়ির স্ত্রীব নাম।

রাজেন্দ্র আসনে বসিতে যাইতেছিল, এই কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল। তাহার পর জুতা পায়ে দিয়া খট্‌মট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল; "বঙ্গপ্রভা"খানি আনিয়া স্ত্রীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

স্ত্রী, অবাক হইয়া স্বামীর মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহাব পর কাগজখানি কুড়াইয়া, বাহির হইয়া, ঝিকে দিলেন।

ঝি শঙ্কিতস্বরে বলিল—"হ্যাঁ বউমা,—বাবু কি রাগ করেছেন?"—বারান্দায় বসিয়া সে মুক্ত দ্বারপথে সমস্তই দেখিতে পাইয়াছিল।

গৃহিণী বলিলেন—"না, রাগ করবেন কেন?"

ঝির কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হইল না। সে একটু চিন্তাযুক্ত হইয়াই বাড়ী ফিরিল। যাহা কিছু দেখিয়াছিল এবং শুনিয়াছিল, সমস্তই গিয়া বর্ণনা করিল।

এ দিকে রাজেন্দ্র মাথাটি নীচু করিয়া কোনও মতে ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে ক্রমাগত বলিতেছিল, "অকৃতজ্ঞ!—স্বার্থপর! এক মিনিট দেরী সইল না? বাড়ী গিয়েই স্ত্রীর কাছে গল্প করেছ? আনন্দে এতই উন্মত্ত হয়েছ?"

পরদিন কিন্তু মনে মনে রাজেন্দ্রের বড় লজ্জাবোধ হইল। ভাবিল, "কাল অনর্থক আমি তিনকড়ির উপর রাগ করেছিলাম। নিজের বইয়ের ভাল সমালোচনা হয়েছে, স্ত্রীর কাছে তা গল্প করে' সে এমন কি অন্যায় কার্য্য করেছে? আর, স্বামীর প্রশংসা পড়বার জন্যে আগ্রহ তার স্ত্রীর পক্ষে ত নিতান্তই স্বাভাবিক। অবশ্য যদি আমার বইয়ের কোনও নিন্দা ঐ সংখ্যায় বেরুত, তা সত্ত্বেও তিনু যদি ওরূপ আচরণ করতো, তবে আমার রাগ বা অভিমান করবার কারণ ছিল বটে। ঝি গিয়ে যদি বলে থাকে, না জানি তিনকড়ি কি মনে করছে!"

ওদিকে তিনকড়িও যখন শুনিল, কিরণ তাহার অজ্ঞাতসারে "বঙ্গপ্রভা" আনিতে রাজেন্দ্রের বাড়ী ঝি পাঠাইয়াছে, তখন সে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইল। তাহার পর ঝি যখন আসিয়া সকল কথা বলিল, তখন সে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া গেল। স্ত্রীর উপর রাগও হইল। তিনকড়ি ভাবিতে লাগিল, 'ছি ছি বড় অন্যায় হয়ে গেছে। রাজেন্দ্র আমাকে অতি স্বার্থপর হৃদয়শূন্য ভাবছে!' এই চিন্তায় রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না; পরদিন আফিসেও মনটা বড় খারাপ রহিল।

সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ি আসিলে হাস্যমুখে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে, গিন্নী কাল রাত্রে সমালোচনা পড়ে কি বললেন?"

তিনকড়ি লজ্জিতভাবে বলিল—"কি আব বলবে? বললে বেশ লিখেছে।"

"কিছু অতিরিক্ত পুরষ্কার-টুরস্কার দিলেন না? দুটো বেশী করে পান-টান—কি অন্য কিছু?"—বলিয়া রাজেন্দ্র বক্র-হাসি হাসিল!

এইরূপ হাস পরিহাসে উভয়ের হৃদয় আবার স্বাভাবিক সুস্থতা লাভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।। বিবাহ-সভা

দুইদিন পরে চোরবাগানের কালী মিত্রের বাড়ী উভয়েরই বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার পর তিনকড়ি সাজসজ্জা করিয়া আসিল। রাজেন্দ্রের সঙ্গে, তাহার গাড়ীতেই চোরবাগান যাত্রা করিল।—বিবাহ-সভায় বসিয়া গল্প-গুজব চলিতেছে, এমন সময় একজন প্রৌঢ়-বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি চারিদিক হইতে "আসুন আসুন" রব উত্থিত হইল। তাঁহাকে স্থান করিয়া দিবার জন্য অনেকেই সসম্ভ্রমে সরিয়া বসিতে লাগিল। "থাক্ থাক্, আপনারা কষ্ট করবেন না, আমি এইখানেই বসছি"—বলিয়া তিনি তিনকড়ি ও রাজেন্দ্রের সান্নিধ্যেই উপবেশন করিলেন।

তিনকড়ি নিকটস্থ একজন পরিচিত ব্যক্তির কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি কে?"

"চেনেন না? ইনি মনতোষবাবু, 'আর্য্যশক্তি'র সম্পাদক। আচ্ছা আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি"—বলিয়া তিনি ডাকিলেন, "মনতোষবাবু, ও মনতোষবাবু—এদিকে একটু সরে' আসুন না। এই ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্চেন। এঁর নাম তিনকড়ি বিশ্বাস, বেঙ্গল আফিসে চাকরি করেন; আর, একজন কবি। এঁর নাম রাজেন্দ্রবাবু—রাজেন্দ্রনাথ বসু। ইনি মস্তলোকের ছেলে, শ্যামপুকুরের বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নাম শুনেছেন ত? ইনি তাঁরই পুত্র।"

মনতোষবাবু বলিলেন—"বেশ বেশ। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি সুখী হলাম। তা, তিনকড়িবাবু আপনি কবি?"—"আজ্ঞে না"—বলিয়া তিনকড়ি হাসিতে লাগিল।

"আপনিই কি 'গুঞ্জরণ' বলে বই লিখেছেন?"

তিনকড়ি একটু সলজ্জভাবে বলিল—"সেটা অস্বীকার করতে পারিনে।"

মনতোষবাবু বলিলেন—"অস্বীকার করলে চলবে কেন? আমাকে সমালোচনার জন্যে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার বই পড়েছি। বইখানি আমার বেশ লেগেছে, তিনকড়িবাবু। আজকাল যাঁরা সব কবিতা লিখছেন, কেবল শব্দাড়ম্বরই বেশীর ভাগ, ভাবের সাড়া বড় পাওয়া যায় না। তা, আপনার কবিতায় ভাব আছে—বেশ ভাব আছে।"

এই প্রকাশ্য সভায়, সহস্র লোকের মাঝখানে, সুবিখ্যাত 'আর্য্যশক্তি'র প্রবীণ সম্পাদকের মুখে এই প্রশংসাবাদ শুনিয়া, তিনকড়ির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল—"আমার সামান্য কবিতা আপনার ভাল লেগেছে শুনে বড় আহ্লাদ হল।"

মনতোষবাবু বলিলেন—"আসছে মাসের আর্য্যশক্তিতে সমালোচনা দেখবেন।"

তিনকড়ি সহসা রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিযাছে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনকড়ি বলিল—"মনতোষবাবু, আপনি রাজেন্দ্রবাবুর বইখানিও পড়েছেন বোধ হয়? সেখানিও আপনার কাছে সমালোচনার জন্যে গেছে।"

"কোন্ রাজেন্দ্রবাবুর বই? এঁর বই?"

"হ্যাঁ। ইনিও 'প্রসূনাঞ্জলি' বলে একখানি কবিতার বই ছাপিয়েছেন।"

মনতোষবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কি জানি মনে ত পডছে না। আচ্ছা দেখব এখন।"—তিনকড়ি বলিল—"আমার কবিতার চেযে এঁব কবিতা ঢেব ভাল।—এঁব দেখেই এক রকম আমার লিখতে শেখা।"

"বটে!—বলেন কি?—আচ্ছা আমি দেখব।—কি বই বললেন—কুসুমাঞ্জলি?"

"আজ্ঞে না—প্রসূনাঞ্জলি।"

"আচ্ছা—বেশ। তা তিনকড়িবাবু—কোনও মাসিকপত্রিকায় ত আপনার কবিতা দেখতে পাইনে!" তিনকড়ি বলিল—"না,—মাসিকে লিখিনে।"

"কেন লেখেন না?—লেখা উচিত।—মাসিকে লেখা বেরুলে, অতি অল্পসময়েব মধ্যেই বহু লোকে তা পড়ে' ফেলে। আমাব আর্য্যশক্তিতে যদি আপনাব একটি কবিতা ছাপা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার লোকেব চোখে সেটা পড়বে। আর আপনি যদি বই ছাপিয়ে বের করেন—সে বই দশ হাজাব লোকেব চোখে পড়তে কত বছব লাগবে বলুন দেখি?"

তিনকড়ি হাসিয়া বলিল—"দু তিন পুরুষের কম ত নয়—যদি ততদিন আমার বই বেঁচে থাকে।"—সম্পাদক বলিলেন—"তবে?—আপনি আমার আর্য্যশক্তিতে লিখুন।—বেশ ভাল দেখে গোটা দশ বারো কবিতা—বেশ বাছা বাছা, বুঝেছেন—পাঠাতে পারবেন?—আপনার কতগুলো প্রকাশিত কবিতা মজুত আছে?"

"বিস্তর কবিতা মজুত আছে।—আপনার তিন মাসের আর্য্যশক্তির আগাগোড়া, মায় বিজ্ঞাপনের পাতা সুদ্ধ, ভরিয়ে দিতে পারি।"—বলিয়া তিনকড়ি হাস্য কবিতে লাগিল।

"তা বেশ—পাঠাবেন। বেশী নয়, গোটা দশ বারো। সবগুলোই যে এক মাসে ছাপাব তা নয়—কোনও মাসে একটি, কোনও মাসে দুটি—বুঝেছেন?—পাঠাবেন ত?"

"পাঠিয়ে দেব।"

"আগামী সংখ্যা আর্য্যশক্তি এখনও দু ফর্ম্মা ছাপা হতে বাকী আছে। যদি কাল কি পরশু পাঠান, তবে এই মাসেই দুই একটি কবিতা যেতে পারে।—পাঠাবেন?

"বেশ!—কালই আপনাকে এক ডজন কবিতা আমি পাঠিয়ে দেব।"

"আপনি কি আর্য্যশক্তির গ্রাহক?"

"আজ্ঞে না।"

"আচ্ছা—আপনার নাম, লেখকের তালিকায় আমরা চড়িযে নেব এখন। কবিতাগুলি পাঠাবার সময়—আপনার ঠিকানাটিও অনুগ্রহ করে লিখে দেবেন।"

"বেশ—লিখে দেব।"

এই সময় শব্দ শুনা গেল—"ব্রাহ্মণ মশায়েরা—গা তুলুন।"

মনতোষবাবু উঠিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, ঐ কথা রইল তা হলে"—বলিয়া নিজ জুতা অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি নয়নপথের অন্তরাল হইলে তিনকড়ি রাজেন্দ্রকে বলিল—"লোকটি বেশ অমায়িক—না?"

রাজেন্দ্র কাষ্ঠহাস্যের সহিত বলিল—"হ্যাঁ।"

"মাসিকপত্রে লেখা ছাপান সম্বন্ধে উনি যা বললেন, সেটা কিন্তু খুব ঠিক বলে মনে হয়। অল্পসময়ের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত লেখাটা ছড়িয়ে পড়ে।"

রাজেন্দ্র অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"দেখ ভাই, আমবা আগে যা মনে করতাম যে মাসিকপত্র সম্পাদকেরা কাব্যবিচার সম্বন্ধে এক একটি আস্ত গোরু, তা কিন্তু নয়। কি বল?"—রাজেন্দ্র শুধু বলিল—"হ্যাঁ।"

"আর্য্যশক্তিখানা আজকাল বেশ নাম করে নিয়েছে। আর ঠিক পয়লা তারিখে বেরোয়—এইটেই ওর খুব বাহাদুরী, নয়?"—রাজেন্দ্র কষ্টেসৃষ্টে বলিল,—"হ্যাঁ।"

এমন সময় শব্দ শুনা গেল, "কায়স্থ মশায়েরা, বৈদ্য মশায়েরা অনুগ্রহ করে গা তুলুন।"

রাজেন্দ্র ও তিনকড়ি তখন "গা তুলিয়া" সকলের সঙ্গে ভোজন-স্থান অভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।। মেঘোদয়

দুইজনের বন্ধুত্বের নির্ম্মল আকাশে এইরূপে একটুখানি মেঘের সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বুঝিতে পাবিল, রাজেন্দ্রের মনে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ্যে কোনও কথা হইল না, তিনকড়ি মনে মনেই বলিল—"এ ত বড় জুলুম! আমার লেখা যদি লোকে ভাল বলে—তাহাতে উহার এ অসন্তোষ কেন? উহার লেখা যদি পাঁচজনে ভাল বলে, তাহাতে আমার ত আহ্লাদই হইবে।"—প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ি যেমন রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যাইত, সেইরূপ যাইতে লাগিল। যেমন গল্পগুজব চলিত, সেইরূপই চলিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বের মত সেরূপ প্রাণ-খোলা হাসি-কথা আর যেন দুইজনে হয় না।

তিনকড়ি মনে মনে আশা করিতে লাগিল। যদি আর্য্যশক্তিতে দুইজনের পুস্তকেরই অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে রাজেন্দ্রের মনে আর কোনও দুঃখ থাকিবে না, মেঘ কাটিয়া যাইবে। সেও ত আর বিলম্ব নাই; আজ বাঙ্গালা মাসের ২৮শে, আর তিনটি দিন মাত্র অপেক্ষা।—২রা তারিখে বেলা ৯টার ডাকে আর্য্যশক্তি আসিল। মোড়ক খুলিয়া তিনকড়ি দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শেষের দিকে তাহার একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে, গুঞ্জরণের প্রায় এক কলমব্যাপী সমালোচনা রহিয়াছে; আর প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনায় কেবলমাত্র লেখা এই 'প্রসূন'গুলির না আছে রূপ-না আছে গন্ধ!"

পড়িয়া তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ভাবিতে লাগিল—"ইহা দেখিয়া বাজেন্দ্র একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবে। তাহার যেরূপ মনের গতি, সে ত আমাকে কিছুতেই আর ক্ষমা করিতে পারিবে না। একি হইল! ইহা অপেক্ষা, যদি উভয়ের পুস্তকেরই প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইত, সে যে ছিল ভাল!"

গুঞ্জরণের সমালোচনাটি তিনকড়ি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল। বিবাহসভায় সম্পাদক মহাশয় মৌখিক যে প্রশংসা-বাক্য করিয়াছিলেন—লেখায় তাহার অনেক অধিক রহিয়াছে। কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। সমালোচনাটি পড়িতে পড়িতে তাহার অঙ্গে যেন পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল—কিন্তু সে যেন কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে পুষ্প-বৃষ্টি।

পত্রিকাখানি হাতে করিয়া, মোহাবিষ্ট নয়নে তিনকড়ি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে তাহার স্ত্রী আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"হ্যাঁগা—এখনও স্নান করলে না, অফিসের বেলা হল যে!"

সে শব্দে চকিত হইয়া তিনকড়ি বলিল—"অ্যাঁ—কি বলছ?"

কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া কিবণ বলিলেন—"বসে বসে কি ভাবা হচ্ছিল?—হাতে ওখানি কি?"

"আর্য্যশক্তি।"

"এসেছে?—সমালোচনা আছে?—দেখি দেখি"—বলিয়া তিনি কাগজখানি স্বামীর নিকট হইতে একপ্রকার কাড়িয়াই লইলেন।

"দেখ।"—বলিযা তিনকড়ি স্নান করিতে গেল।

তিনকড়ি আহারে বসিলে, পাখার বাতাস করিতে করিতে কিরণ বলিলেন—"তা, এতে রাগ করলে চলবে কেন বাপু?—ও সমালোচনা তুমি ত আব লেখনি। তাদের যে বইখানা ভাল লেগেছে, সেখানা তারা ভাল বলেছে; যেখানা মন্দ লেগেছে, সেখানা মন্দ বলেছে। এতে তোমার দোষ কি?"

তিনকড়ি বিষণ্ণভাবে বলিল—"সে কথা যদি সে বুঝবে তাহলে আর ভাবনা কি ছিল?"

আফিসে সারাটা ি ন তিনকড়িব মনটা খারাপ হইয়া বহিল।

সন্ধ্যাবেলা রাজেন্দ্রের নিকট যাইযা কেমন করিয়া সে দাঁড়াইবে, কি বলিযা তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? মনে মনে স্থির কবিযা রাখিল, বলিবেন—"মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ কাব্যবিচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ—এই দুইটি সমালোচনাই তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর, উহাদেব অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না। ভাল জিনিষের আদর সর্ব্বসাধারণে কবিবেই কবিবে—মাসিকেব সমালোচনায তাহাবা কখনই ভুলিবে না!"—ইত্যাদি ইত্যাদি।—কিছুতেই কিন্তু তিনকড়ি মনে উৎসাহ পাইল না। কথায চিঁড়া ভিজিবাব সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিযা, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনকড়ি ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের বাটী অভিমুখে অগ্রসব হইল।

পৌঁছিয়া দ্বারবানের নিকট শুনিল, বাঁবু আজ দুইটাব 'প্যাসেঞ্জাব' গাড়ীতে সুন্দরগঞ্জে তাঁহার জমিদারীতে চলিয়া গিযাছেন। কবে ফিবিবেন, কিছুই বলিযা যান নাই।

তিনকড়ি, বন্ধুব এই সহসা-অন্তর্দ্ধানেব কারণ বুঝিল, বুঝিযা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া চুপ করিয়া শয্যাব উপব পড়িয়া বহিল।

স্ত্রী নিকটে আসিলে বলিল, রাত্রে সে কিছুই খাইবে না—তাহাব মাথাটা বড় ধরিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।। সমালোচনা ও সম্পাদক

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল—বাজেন্দ্রেব কোনও খোঁজ খবব নাই। তিনকড়ি তাহাদের বাড়ীতে গিযা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কবে—'বাবু' কবে ফিবিবেন, কিছু সংবাদ আসিয়াছে কি?—উত্তর পায়—'কোনও সংবাদ আসে নাই।'

রাজেন্দ্রের ফিরিতে যখন এতই বিলম্ব হইতেছে—তখন তাহাকে একখানা চিঠি লেখা প্রয়োজন। এই ভাবিয়া তিনকড়ি কাগজ-কলম লইযা চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথমে অন্যান্য কথা লিখিয়া নাম-স্বাক্ষর করিযা শেষে 'পুনশ্চ' দিযা বলিল—"আর্য্যশক্তির সে সমালোচনা দেখিয়াছ বোধ হয়! সে সমালোচনা নিতান্তই অর্ব্বাচীনের মত লেখা, তাহার কোনও মূল্য নাই।"

আবার সপ্তাহ কাটিল—কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিয়া তিনকড়ি দেখিল, "বঙ্গপ্রভা" আসিয়াছে। প্রসূনাঞ্জলির কি সমালোচনা হইল দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত মোড়ক খুলিল; অনেক পুস্তকের সমালোচনা রহিয়াছে—কই প্রসূনাঞ্জলির নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

তিনকড়ি জানে, রাজেন্দ্রের ডাক প্রতিদিন ঠিকানা কাটিয়া সুন্দরগঞ্জে পাঠান হয়, এই একদিনের মধ্যেই এই সংখ্যার 'বঙ্গপ্রভা'খানি তাহার হস্তগত হইবে। সে তখন আবার একটি নূতন আঘাত প্রাপ্ত হইবে।—এই সময় আরও তিনখানি কাগজে তিনকড়ির পুস্তকের প্রশংসা বাহির হইয়া গেল। তাহার মধ্যে কেবল একখানি কাগজ প্রসূনঞ্জলির উল্লেখ করিয়াছে; সমালোচনায় কেবলমাত্র লিখিয়াছে—"ইহা একখানি মামুলী কবিতাপুস্তক।" তিনকড়ি জানিত, রাজেন্দ্র এ কাগজখানির গ্রাহক নয়। তাই আশা করিতে লাগিল, ইহা রাজেন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়িবে না।—কাগজের পর কাগজে অনুকূল সমালোচনা বাহির হওয়াতে, তিনকড়ির একদল ভক্ত জুটিয়া গেল; তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ির বৈঠকখানায় আসিয়া তাহাকে ঘিরিযা বসিত। পাঁচ ছয় দিন অন্তর তিনকড়ির এক টিন করিয়া চা ফুরাইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে শরদিন্দুই বাস্তবিক সমজদার লোক ছিল। তাহার বয়স তিনকড়ি অপেক্ষা অল্প—কিন্তু এক একটি এমন কথা বলিত যে, তিনকড়ি আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। ইংরেজি ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য লোকটার বেশ পড়া ছিল। সে প্রায়ই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"তিনকড়িবাবু—নূতন কিছু লিখলেন নাকি?" নূতন কোনও লেখা পাইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং প্রায়ই যথেষ্ট সুখ্যাতি কবিত। এইটি তিনকড়ির চক্ষুষ্মান্ ভক্ত। আর একটি ছিল, অন্ধ ভক্ত। তাহার নাম বিহারীলাল। সে পটলডাঙ্গার একটি ছাপাখানায় প্রিণ্টারী কর্ম্ম করিত, কিন্তু বাঙ্গলা কাব্য তাহার বেশ পড়া ছিল। সে, তিনকড়ির কোনও রচনায় কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাইত না। কেহ কোন দোষ বাহির করিলে, তাহার সহিত বিহারী কোমর বাঁধিয়া তর্ক আরম্ভ করিত। তিনকড়িব বাড়ীর অতি নিকটেই তাহার বাসা ছিল। গুঞ্জরণের প্রায় সমস্ত কবিতাই তাহাব মুখস্থ। তাহার মতে, রবিবাবুর পর বঙ্গদেশে একটি মাত্র কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি তিনকড়িবাবু।

একমাস কাটিয়া গেল, রাজেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। পূর্ব্বেও সে মাঝে মাঝে জমিদারীতে যাইত বটে—কিন্তু এতদিন ধরিয়া সেখানে থাকিত না; দুই একদিন অন্তর তিনকড়িকে পত্রও লিখিত। ক্রমে তিনকড়ি একটু দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল।

নূতন "আর্য্যশক্তি" আসিয়াছে—এবার তিনকড়ির দুইটি কবিতা ছাপা হইয়াছে। একটি ত একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়। সম্প্রতি আবার "বঙ্গপ্রভা" সম্পাদকও কবিতা চাহিয়া তিনকড়িকে পত্র লিখিয়াছেন।—যশের আস্বাদন পাইয়া, বন্ধুবিচ্ছেদ-দুঃখ তিনকড়ি অনেকটা ভুলিয়া রহিল। তাহার ভক্তগণ ক্রমাগত তাহাকে আর একখানি বহি প্রেসে দিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইলে, বিহারী বলিল—"আপনি আমাদের প্রেসে ছাপতে দিন—যা বিল হবে, ম্যানেজারকে বলবো এখন, আমার মাইনে থেকে মাসে ১০ টাকা করে কেটে নিয়ে শোধ কববে। বই বিক্রী হলে তখন আপনি আমার টাকা শোধ করবেন।"

তিনকড়ি বলিল—"তোমার ত চল্লিশটি টাকা মাইনে—মাসে মাসে দশটি টাকা কাটা গেলে তোমার সংসার চলবে কি করে?"

মহা উৎসাহের সহিত বিহারী বলিল—"সে আমি যেমন করে পারি চালিয়ে নেব।"

এইরূপ কিছু দিন যায়। একদিন আফিসের একটি বাবুর হাতে নূতন "রত্নাকর" মাসিকপত্রখানি দেখিয়া তিনকড়ি চাহিয়া লইল।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে, শেষদিকে দেখে—প্রসূনাঞ্জলিব সমালোচনা রহিয়াছে। বেশ অনুকূল সমালোচনা; তবে তিনকড়ির মনে হইল;—প্রশংসাটি একটু যেন মাত্রা ছাড়িয়া

গিয়াছে। ভাবিল, তা হউক—উহাতে রাজেন্দ্রের বেদনাতুর হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ হইবে।

বাবুটিকে তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"মশায় ও কাগজখানি কবে পেলেন?"

"আজকেই। আফিসে আসবার পথে, ওদের আফিসে গিয়া হাতে করে নিয়ে এলাম।"

"এ কাগজখানি অনুগ্রহ করে আমায় দিন—আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি কাল আপনাকে আর একখানি এনে দেব।"

"আচ্ছা বেশ।"

তিনকড়ি ভাবিল—"আজ রত্নাকর পোষ্ট হইয়া, কাল প্রাতে রাজেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীতে পৌঁছিবে। কাল ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইলে, পরশু জমীদারীতে উহার হস্তগত হইবে। এ কাগজখানি আমি আজই তাহাকে পাঠাইয়া দিই—একদিন পূর্ব্বে সে পাইবে। আমাব জন্যেই বিক্ষত হৃদয়ে সে আজ গৃহত্যাগী—শুশ্রূষাটুকুও আমার হাত দিয়া সে প্রাপ্ত হউক!—এই মনে করিয়া, উচ্ছ্বসিত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনকড়ি তাহার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিল—"রত্নাকর"খানিও পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে বাহির হইয়া, সেই বাবুটির জন্য এসংখ্যা কাগজ কিনিবার অভিপ্রায়ে, বাড়ী ফিরিবার পথে তিনকড়ি "রত্নাকর" আফিসে গেল। ম্যানেজার তখন সমুদয় কাগজ ডেস্প্যাচ্ শেষ করিয়া, শ্রান্তদেহ চেয়াবে এলাইয়া দিয়া, সুখে ধূমপান করিতেছেন।

তিনকড়ি গিযা এ সংখ্যার কাগজ চাহিল।—ম্যানেজার বলিলেন—"বসুন মশাই—দিচ্ছি।"

নিকটস্থ বেঞ্চিতে তিনকড়ি উপবেশন করিল।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়েব নাম?"

"আমার নাম শ্রীতিনকড়ি দাস বিশ্বাস।"

এমন সময় একটি বাবু ভিতরদিকের দরজায় মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ম্যানেজারবাবু সুন্দরগঞ্জে কাগজগুলো পাঠালেন?—দেখবেন যেন ভুল না হয।"

ম্যানেজার বলিলেন—"পাঠিয়েছি। ভুলিনি।"

সুন্দরগঞ্জের নাম শুনিয়া তিনকড়ি কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না; ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি সুন্দরগঞ্জ জানি, সেখানে আপনাদেব কে কে গ্রাহক আছেন মশায়?"

ম্যানেজার বলিলেন—"গ্রাহক?—গ্রাহক সেখানে কেউ নেই।"

"তবে—ঐ যে উনি সুন্দরগঞ্জে কাগজ পাঠাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

ম্যানেজার চুরুটে লম্বা টান দিয়া বলিলেন—"সেখানে খোদ কর্ত্তাই যে রয়েছেন—সম্পাদক মশায়।"—তিনকড়ি বেশ বুঝিতেছিল, এ সকল কথা জিজ্ঞাসাবাদ তাহার পক্ষে একান্তই অনধিকারচর্চ্চা; কিন্তু তাহার দুর্নিবার কৌতূহল, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তা সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"সম্পাদক মশায় সেখানে কি কর্‌ছেন মহাশয়?"

"হাওয়া বদলাচ্ছেন! পদ্মাব উপরেই, সেখানকার জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সুন্দর একটি কাছারী বাড়ী আছে, সেখানে রয়েছেন।"

"আর কার নামে কাগজ পাঠালেন?"

"সম্পাদক মশায়ের ভাইপো—করুণাবাবু। তিনি সম্প্রতি সেখানে নায়েবী কর্ম্মে বহাল হয়েছেন। আর একখানা গেল রাজেন্দ্রবাবুর নামে।"

ম্যানেজার মহাশয়ের চুরুট শেষ হইল। উঠিয়া, আলমারি হইতে একখানি "রত্নাকর" বাহির করিয়া তিনকড়ির হাতে দিয়া বলিলেন—"এই নিন—ছ আনা দাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।। কবিতার নমুনা

সপ্তাহপরে তিনকড়ি বহু-আকাঙ্ক্ষিত পত্রখানি পাইল। পোষ্টকার্ডে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা—

ভাই তিনু,

তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম, আজ একখানি পত্র ও মাঘের রত্নাকর পাইলাম—তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। নানা কাজের ভিড়ে পত্রাদি লিখিবার অবকাশ পাই নাই। যাহা হউক, আগামী বুধবারে কলিকাতায় ফিরিব—সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে।

ইতি—

তোমার স্নেহের রাজেন

দিন গণিয়া গণিয়া অবশেষে বুধবার আসিল। আফিস হইতে ফিবিয়ে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া, তিনকড়ি বাহির হইতে চাহিল।

কিরণ বলিল—"চায়ের জল চড়িয়াছে।"

"চা আমি সেখানে খাব।"

"ঝি জলখাবার আনতে গেছে, এখনি এল বলে। অন্ততঃ খাবারটা খেয়ে যাও।"

"না, আমি সেইখানেই খাব।"—বলিয়া তিনকড়ি বাহির হইয়া গেল।

রাজেন্দ্রব গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল, দ্বারের নিকট তাহাব গাড়ী প্রস্তুত। উপরে উঠিয়া দেখিল,— বৈঠকখানা শূন্য। দুই এক মিনিট পরে সাজ-সজ্জা করিয়া রাজেন্দ্র বৈঠকখানায় আসিল।

তিনকড়ি বলিল—"কি হে—কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?"

"হ্যাঁ।—কেমন আছ?"

"ভাল আছি।—কোথা চললে?"

"এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে।"

"কোথা?"

রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ কবিয়া বলিল—"কৃষ্ণবিহাবীবাবুর বাড়ী।"

"কৃষ্ণবিহারীবাবু কে?"

রাজেন্দ্র এই সময় নিজের পকেট হইতে ঘড়ি ও চেন বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"ওরে, সোনার ঘড়ি আর গার্ডচেনটা নিয়ে আয়।"

তিনকড়ি আবার জিজ্ঞাসা কবিল—"কোন্ কৃষ্ণবিহারীবাবু?"

রাজেন্দ্র অন্যমনে বলিল—"অ্যাঁ?—ঐ যে—কি বলে 'রত্নাকর' কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণবিহারীবাবু।"—উভয়ের পরিচিত বন্ধুবর্গের নাম উভয়ে বিলক্ষণ অবগত ছিল। তাই তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁর সঙ্গে কবে আলাপ হল?"

রাজেন্দ্র একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল—"বেশী দিন নয়।"

এই সময় খানসামা সোনার ঘড়ি ও গার্ডচেন আনিয়া দিল।—তাহা গলায় ধাবণ করিয়া রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তিনকড়ি বলিল—"একটু পরেই যেও না হয়। এই ত মোটে সাড়ে সাতটা; এরই মধ্যে তোর পোলাও সেখানে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না! বস।"

"বসব?—আচ্ছা"—বলিয়া রাজেন্দ্র উপবেশন করিল। এক মিনিট—দুই মিনিট—তিন মিনিট—দুজনেই নীরব! তিনকড়ি মাঝে মাঝে বন্ধুর দিকে দৃষ্টি করিতেছে—সে দৃষ্টিতে বিষাদ এবং আমোদ সমভাবেই মিশ্রিত। রাজেন্দ্রের ভাবটা অন্যরূপ, সে ক্রমাগত উসখুস করিতে লাগিল।—তাহার ভাব দেখিয়া তিনকড়ি বলিল—"আচ্ছা, এখন তা হলে উঠি। আর তোমার দেরী করে দেব না।"—রাজেন্দ্র যেন বাঁচিল। তিনকড়ি উঠিবার পূর্বেই সে উঠিয়া পড়িল। বলিল—"উঠলে? আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে।"—বলিয়া

উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। রাজেন্দ্র আর বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

তিনকড়ি বুকের ভিতর একটা ভারী বোঝা লইয়া, এক পা এক পা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে যে জলখাবার খাইয়া আসে নাই, চা খায় নাই, সে কথা স্ত্রীকে বলিতে পারিল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ির গৃহে ভক্ত-সমাগম হইল। তাহাদের সঙ্গে বসিয়া সে গল্পগুজব করিতে লাগিল।—পূর্ব্বে কোনও দিন সন্ধ্যাবেলা রাজেন্দ্রের বাড়ী যাইতে বিলম্ব হইলে, রাজেন্দ্র দ্বারবান পাঠাইয়া দিত। তিনকড়ির মনে—সম্পূর্ণ না হউক—একটু ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, হয়ত এখনি রাজেন্দ্রের দ্বারবান ডাকিতে আসিবে।—রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, কেহই ডাকিতে আসিল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর উপযাচক হইয়া তিনকড়ি রাজেন্দ্রনাথের গৃহে গেল। রাজেন্দ্র তখন একা বসিয়া, সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। তিনকড়িকে দেখিয়া বলিল—"এস—কাল আসনি যে?"

তিনকড়ি বসিয়া বলিল—"কাল কয়েকটি লোক এসেছিলেন—তাঁরা প্রায় রাত্রি সাড়ে ন'টা অবধি বসে রইলেন; তাই আর আসা হল না।"

"ওঃ!"—বলিয়া রাজেন্দ্র আবার খবরের কাগজে মন দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাগজ ফেলিয়া রাজেন্দ্র বলিল—"রামধনিয়া, দু পেয়ালা চা লাও রে।"

তিনকড়ি বলিল—"তারপর, সেদিন কৃষ্ণবিহারীবাবুর বাড়ী আর কে কে নিমন্ত্রিত ছিলেন?"

"অনেকেই ছিলেন। ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধনবাবু, কবি শ্যামাকান্ত, তারপর তোমার 'আর্য্যশক্তি'র সম্পাদক মনতোষবাবু, 'বঙ্গপ্রভা'র গৌরীনাথবাবু—আরও অনেকে ছিলেন।"

"তা হলে বেশ দিব্যি সাহিত্যেকের মজলিসটি জমেছিল বল।"

"হ্যাঁ।"

তিনকড়ি অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কথাবার্ত্তা আর তেমন জমিল না। চা পান করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, তিনকড়ি বিদায় গ্রহণ করিল।

এখন হইতে আর তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ী যায় না। দুই চারিদিন অন্তর একদিন যায়। উভয়ের মধ্যে মৌখিক শিষ্টাচারটুকু মাত্র রহিল, সে প্রাণখোলা বন্ধুত্ব এখন আর নাই।

তিনকড়ি দেখিল, রাজেন্দ্রের জনকয়েক ভক্ত জুটিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রায়ই তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া, প্রসূনাঞ্জলির এবং 'রত্নাকরে' প্রকাশিত তাহার নব নব কবিতার অজস্র প্রশংসাবাদ করে।—একদিন গিয়া দেখিল, তাহার প্রধান ভক্ত অধরচন্দ্র বসিয়া আছে। উভয়ের মধ্যে কি কথোপকথন হইতেছিল, তিনকড়িকে দেখিয়া তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

আর একদিন দেখিল, অধরের সঙ্গে বসিয়া রাজেন্দ্র কি কতকগুলো কাগজপত্র দেখিতেছিল, তিনকড়ি প্রবেশ করিতেই রাজেন্দ্র সেগুলি দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিল।

এই রকম দেখিয়া, শুনিয়া তিনকড়ি তাহার যাতায়াত আরও কমাইয়া দিল। কোনও সপ্তাহে দুই একবার যায়—কোনও সপ্তাহে মোটেই যায় না।!"

একদিন রবিবার প্রাতে ৮টার সময় তিনকড়ি গিয়া দেখিল, অধরচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনকড়িকে দেখিয়াই অধরবাবু বলিলেন—"আসুন!—আজকাল যে আর আপনার দর্শনই পাওয়া যায় না।!"

তিনকড়ি বসিয়া দেখিল—টেবিলের উপর টাটকা "রত্নাকর" পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল—"এ মাসের নাকি?"—বলিয়া কাগজখানি উঠাইয়া লইল।

"রত্নাকর" পত্রে প্রতিমাসে মাসিকপত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনাগুলি ছোটবড় অনেক লেখকেরই বিভীষিকা! তিনকড়ি কাগজখানি খুলিয়া প্রথমেই মাসিক-সমালোচনা পড়িতে লাগিল। দেখিল, গত মাসের আর্য্যশক্তিতে প্রকাশিত তাহার একটি কবিতাকে সম্পাদক সমালোচনার তীক্ষ্ণ-ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তাহার উপর বিদ্রূপের লবণ বর্ষণ করিয়াছেন। পাঠশেষে তিনকড়ি মুখ তুলিয়া দেখিল, রাজেন্দ্র ও অধরচন্দ্র পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া গোপন অর্থপূর্ণ হাস্য করিতেছে।

ধরা পড়িয়া, অধর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"ওসব কি পড়ছেন, তিনকড়িবাবু। ও সংখ্যায় রাজেন্দ্রবাবুর 'ছত্র তরী' বলে যে কবিতাটি বেরিয়েছে, সেইটি দেখুন।"

তিনকড়ি সেটি অন্বেষণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল। অধরচন্দ্র সমস্তক্ষণ সকৌতুক তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঠ শেষ হইলে বলিল—"কেমন লাগলো তিনকড়িবাবু?"

তিনকড়ি বলিল—"বলি কি, বলুন? আমি ত ওর অর্দ্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারিনি!"

অধর এবার প্রকাশ্যভাবেই রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া হাস্য করিল। তাহার পর আবার তিনকড়ির দিকে ফিরিয়া, মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"অভিধান মুখস্থ করুন—অভিধান মুখস্থ করুন। আজকালকার দিনে কি আর ফাঁকি দিয়ে কবি হওয়া যায়?"

নিজের কবিতার অন্যায় সমালোচনার বিষে তিনকড়ির মন তখনও জর্জ্জরিত। তথাপি ক্ষীণস্বরে বলিল—"বেশ হয়েছে।"—অধর উত্তেজিতভাবে বলিল—"শুধু বললেন,—'বেশ হয়েছে।'— সে কি তিনকড়িবাবু?—এই বুঝি আপনার বিচার শক্তি?—না অন্য কোনও গূঢ় কারণ আছে? আমি বলছি এ কবিতাটি কেবলমাত্র 'বেশ' হয়নি—গত দশ বৎসরের মধ্যে এ রকম কবিতা একটিও পড়িনি। আহা, কি বর্ণনার ছটা!—কি শব্দের ঝঙ্কার!"—বলিয়া হাতমুখ নাড়িয়া চক্ষু ঘুরাইয়া, অধর মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিল—

"কূর্চ্চশেখর তুত্থাঞ্জন বিকীর্ণ চতরঙ্গে,
আযতচ্ছদা নর্ত্তনপরা অভ্রঙ্কষ-ভঙ্গে।
ভোজনাকাঙ্ক্ষ যতেক ধ্বাভক্ষ ইল্বল ধরি ভুঞ্জে,
জিহ্মমোহন উল্লম্ফন কেবে বল্বজপুঞ্জে।
ঘট্টে ঘট্টে দিক্করীগণ শোভিছে ঘৃষ্টগাত্রী—
জলজিঘৃক্ষু কেহ পূর্ণিছে পলঙ্কবক পাত্রী।"

"কবি তাঁর ছিদ্র তরী খানি বেয়ে নদী দিয়ে যাচ্ছেন—পথের দুই তীরের এই বর্ণনা!—ভাষার কি জোর!—ওঃ—গা যেন শিউরে উঠে! কি তিনকড়িবাবু—কথা কচ্চেন না যে?"—বলিয়া উপহাসভরে স্বীয় ওষ্ঠ ও চক্ষুযুগল সঞ্চালিত করিতে করিতে অধর তিনকড়ির পানে চাইতে লাগিল।—তিনকড়ি অবনতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অধর বলিতে লাগিল—"বিশেষ ঐখানটা বড় সুন্দর হয়েছে—'দিক্করীগণ শোভিছে ঘৃষ্টগাত্রী,'—চোখের সামনে যেন ছবিখানি দেখতে পাচ্ছি!"

উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করিল—" 'দিক্করী' মানে কি, অধরবাবু?"

অধর বলিল—"দিক্করী মানে জানেন না?—অর্থাৎ কি না, যারা দিক্ করে—বিরক্ত করে;—কাপড় দাও, গহনা দাও, সাবান দাও, এসেন্স দাও—এই সব বলে যারা নিত্য আমাদের দিক্ করে।—বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল—"স্ত্রীলোক?"

"হ্যাঁ—যুবতী। তারা আমাদের বড় দিক্ করে কি না, তাই তাদের নাম দিক্করী।"

রাজেন্দ্র বলিল—"আঃ—কি কর অধর? ভাষা নিয়ে ওরকম ঠাট্টা ভাল নয়। উনি তোমার কথা সত্যি ভেবে নেবেন। না মশায়, অধরবাবুর কথা আপনি শুনবেন না। দিক্করী মানে যুবতী বটে—কিন্তু ওটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ। অভিধান দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

কিয়ৎক্ষণ এই সকল আলোচনা শ্রবণান্তর তিনকড়ি গৃহে ফিরিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।। বন্ধুত্বের সমাধি

মাসখানেক পরে এক শনিবারে, বেলা দুইটার সময় তিনকড়িব অফিস বন্ধ হইল। তাহার পূর্ব্বে বেশ জোরে পশলা-দুই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তার মোড়ে তিনকড়ি ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। দুই তিনখানা ট্রাম আসিল, সমস্তই লোকে বোঝাই। শেষে বিবক্ত হইয়া, কাপড় যথাসাধ্য গুটাইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া পদব্রজেই তিনকড়ি গৃহাভিমুখে চলিল।—লালবাজাবের মোড়ে আসিয়া দেখিল, ছোট বড় লাল ও নীল অক্ষরে একখানি প্ল্যাকার্ড উপরে মারা রহিয়াছে—

দেশ-প্রসিদ্ধ কবি
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত
কাব্যামৃতের উৎস-ধারা
নব-গীতি
প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১টাকা মাত্র।

এই বিজ্ঞাপনটি যেন তিনকড়ির বক্ষে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ভাবিল—"একি!—রাজেন্দ্রের একখানি নূতন বহি ছাপা হইয়াছে—আর আমি আজ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিলাম না! আমি রাজেন্দ্রেব এত পর হইয়াছি! কেন? কি অপরাধ করিয়াছি আমি?"

সেইখানে দাঁড়াইযা, বিজ্ঞাপনটি পড়িতে পড়িতে তিনকড়ির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। পথচারী লোকের ভীড় পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ঠেলিতে—সে আর দাঁড়াইতে পারিল না—অগ্রসর হইয়া চলিল।

যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথের দুইধাবে সেই প্ল্যাকার্ড দেখিল। কলিকাতা সহবকে কে যেন এই নব-কাব্যেব "নামাবলী" পরাইযা দিয়াছে।—যাইতে যাইতে তিনকড়ি একটি বৃহৎ বাঙ্গলা পুস্তকেব দোকানেব সম্মুখীন হইল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, টাকা রহিয়াছে। দোকানে প্রবেশ কবিয়া বলিল—"মশায, একখানি নবগীতি দিন ত।"

দোকানের কর্ম্মচারী বহিখানি বাহির করিয়া দিল। মূল্য দিয়া পুস্তকখানি হাতে করিয়া তিনকড়ি দেখিল—বহুমূল্য নীল-রেশমী কাপড়ে বাঁধা মলাট, সোনায় সোনায় ঝক্‌মক্ করিতেছে। উৎসর্গপত্রে রহিয়াছে—"অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন মহাশয় করকমলেষু।" উৎকৃষ্ট পুরু চকচকে কাগজে, উজ্জ্বল কালো কালীতে, পাইকা অক্ষরে কবিতাগুলি ছাপা, প্রত্যেক পৃষ্ঠার চারদিকে লালকালীর সৌখীন বর্ডার। মুখপত্রে একখানি ত্রিবর্ণ ছবি, ভিতরে আর্টপেপারে ছাপা আরও কয়েকখানি একরঙ্গের ছবি। যেরূপ [illegible] করিয়া ছাপান ও বাঁধান হইয়াছে, প্রত্যেকখানি বহিতে ১টাকার অধিক খরচই পড়িযা গিয়া থাকিবে। বহিখানির বাহ্যসৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনকড়ির চক্ষু ঝলসিয়া গেল।—বাড়ী পৌঁছিয়া টেবিলের উপর বহিখানি রাখিয়া, কর্দ্দমাক্ত জুতা ও সিক্ত বস্ত্র তিনকড়ি পরিবর্ত্তন করিল। তাহার স্ত্রী আসিয়া বহিখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"এ কি!—রাজেন্দ্রবাবুর বই?"—তিনকড়ি বলিল—"দেখতেই ত পাচ্ছ!"

"বাঃ—বেশ সুন্দর হয়েছে ত। কবে বেরুল?"

"আজই বেরিয়েছে।"

প্রথম দুই তিন পৃষ্ঠা খুলিয়া কিরণ বলিলেন—"প্রণয়োপহার—প্রিয়বন্ধুবরেষু—এ সব কিছু এবার লিখে দেননি?"—অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনকড়ি বলিল—"না।"

গত চারি পাঁচ দিন তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যায় নাই। বিকালে বৃষ্টি থামিয়া গিয়া আকাশও পরিষ্কার হইয়া গেল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—যাই।—আবার ভাবিল—গিয়া কি হইবে? সন্ধ্যার পর তাহার নির্জ্জন বৈঠকখানা গৃহে আলো জ্বালিয়া বসিয়া "নবগীতি" পড়িতে লাগিল।—প্রায় সমস্ত কবিতাই পূর্ব্বে তাহার পড়া

ছিল। সেকালে,—যখন দুইজনের প্রণয়ভঙ্গ হয় নাই—তখন রাজেন্দ্রের খাতাতেই অনেকগুলি পড়িয়াছিল; বাকিগুলি 'রত্নাকরে' দেখিয়াছে। গোটাকতক নূতন কবিতাও আছে।

পুস্তকখানি, দুইজনের মৃত বন্ধুত্বের সুসজ্জিত সমাধির মত তাহার মনে হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিহারীলাল প্রবেশ করিয়া বলিল—"একা বসে কি করছেন?"

"এস।—রাজেনের নব-গীতি পড়ছিলাম।"—বলিয়া তিনকড়ি বহিখানি নামাইয়া রাখিল।

বিহারী তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল—"হ্যাঁ—রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখছিলাম। রাজেনবাবু বই ছাপতে দিয়েছেন, আপনি ত আমায় একদিনও বলেননি।"

"আমিই জানতাম না।"

"আপনিও জানতেন না!—বলেন কি? আপনাদের দুজনে এত ভাব।"

তিনকড়ি একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

বহিখানি তুলিয়া লইয়া মলাট উল্টাইয়া বিহারী বলিল—"কই?—লিখে দেননি?"

"এই বই উপহার নয়।—কিনে এনেছি।"

বিহারী আশ্চর্য্য হইয়া তিনকড়ির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"কিনে এনেছেন?—কি রকম?"—তিনকড়ি একটু বিরক্তির স্বরেই যেন বলিল—"দোকান থেকে কিনে এনেছি, আর কি রকম?"—বিহারী কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া তিনকড়ির পানে চাহিযা রহিল। শেষে বলিল—"ওঃ, বুঝেছি।"

শরদিন্দুবাবু এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"তিনকড়িবাবু আছেন নাকি?—এই যে বিহারীও এসেছ।"—তিনকড়ি বলিল—"আসুন শরদিন্দুবাবু, বসুন।"

শরদিন্দুবাবু বসিয়া বলিলেন—"নব-গীতি এসেছে দেখছি। বাঃ বেশ বাঁধাইটি করেছে ত!"—বিহারী বলিল—"ঐ পর্য্যন্ত। ভিতরে কেবল রাবিশ ভরা।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন—"না হে, তিনকড়িবাবুর সামনে ওকথা বোলো না—উনি রাগ করেন।"

"চা হল কি না দেখি"—বলিয়া তিনকড়ি উঠিয়া ভিতরে গেল।

বিহারী বলিল—"শরদিন্দু, আজকাল রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তিনকড়িবাবুর কি সেরকম ভাবটি নেই?"

"কেন? তুমি কি তা আজ জানলে?"

"হ্যাঁ, আমি ত কই আগে কিছু শুনিনি।"

"দেখ না, আগে তিনকড়িবাবু রোজ সন্ধ্যাবেলা রাজেনের ওখানে যেতেন। এখন কালে-ভদ্রে যান। আমি ত রাজেনের ওখানে প্রায়ই যাই কিনা—আগেও যেতাম, আজকালও যাই। আগে তিনকড়ির প্রশংসা রাজেনের মুখে ধরত না; আজকাল গিয়ে শুনি, প্রায়ই তিনকড়ির লেখা নিয়ে অধরবাবুতে রাজেন্দ্রবাবুতে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলছে।"

বিহারী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ! 'রত্নাকরে' তিনকড়ির কবিতার সেই সমালোচনাটা, সে ত ঐ অধরেরই লেখা। অধর আজকাল রাজেনের মহাভক্ত হয়ে উঠেছেন কিনা। রাজেনকে খুসী করবার জন্যে তিনকড়িকে কি রকম করে অপদস্থ করবে ভেবে পাচ্ছে না।

বিহারী দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল—"উঃ কি নীচ-প্রবৃত্তি। কিন্তু দেখ, আজ পর্য্যন্ত তিনকড়িবাবু রাজেনের বিরুদ্ধে, কিংবা তার কবিতার নিন্দা করে, ভুলেও একটি কথা বলেননি।"

"চটে যান—চটে যান। রাজেনের নিন্দা করিলে তিনকড়িবাবু এখনও চটে যান।"

"অথচ তিনকড়িবাবুর লেখা রাজেনের চেয়ে ঢের ভাল।"

"তার আর সন্দেহ আছে? তিনকড়িবাবুর লেখায় রীতিমত কবিত্ব আছে, খাঁটি কবিত্ব যাকে বলে। রাজেনের কবিতা কি?—কেবল কতকগুলো দুর্ব্বোধ্য শব্দ-সাজিয়ে দেওয়া।"

"বাস্তবিকই তাই। দেখ, বই বেরিয়েছে, রাজেন একখানি তিনকড়িবাবুকে উপহারও দেয়নি। উনি দোকান থেকে এক টাকা খরচ করে কিনে এনেছেন। আচ্ছা, কেন বল দেখি? দুজনের এত ভাব ছিল, হঠাৎ এ রকম হয়ে গেল কেন?"

"ঐ যে তিনকড়িবাবুর কেতাবের ভাল সমালোচনা হতে লাগল, ওর কেতাবকে কেউ পুঁছলও না। কাজেই ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল।"

"কেন, 'রত্নাকরে' ত প্রসূনাঞ্জলির বেশ ভাল সমালোচনাই শেষে বেরিয়েছিল।"

শরদিন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে চক্ষু মিটি মিটি করিয়া বলিলেন—"সে কি অমনি অমনি বেরিয়েছিল? রাজেন জমিদারীতে যাচ্ছিল, ষ্টীমারে 'রত্নাকর'-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হয়। নিজের কাছারিতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে, বিস্তর তোযাজ করে, তাঁকে পোলাও কালিয়া খাইয়ে, বিনা-জামিনে তাঁর ভাইপোকে নায়েবী চাকরি দিয়ে, তবে সমালোচনাটি হাঁসিল করেছিল। এখনও সম্পাদক মশায়ের জন্যে সুন্দরগঞ্জ থেকে কানেস্তারা কানেস্তারা ঘি আসছে,—বস্তা বস্তা গোবিন্দভোগ চাল আসছে, কত কি আসছে,—তবে ঐ সব ট্র্যাশ্ মাসে মাসে 'রত্নাকরে' ছাপা হচ্ছে—অমনি?"

এই সময়ে—"আহা, আপনি নিজে কষ্ট করলেন তিনকড়িবাবু?"—তিনকড়ি বলিল—"কষ্ট কি? আপনারা খাবেন, এ আমার কষ্ট না সুখ? ঝির জ্বর হয়েছে।"

"আপনার চা কই?"

"এই যে আনছি"—বলিয়া তিনকড়ি আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বিহারী চা-পান করিতে করিতে বলিল—"আমার যে লেখা আসে না। নইলে এই 'নব-গীতি'র এইসা এক সমালোচনা আমি লিখতাম—যে বাছাধন টের পেয়ে যেতেন। তুমি লেখনা, শরদিন্দু।"

"আরে রামচন্দ্র! আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?"

তিনকড়ি নিজের চা ও পানের ডিবা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজবের পর সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।। ভক্তের আবদার

ইতিমধ্যে বিলাতে রবীন্দ্রবাবুর বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। বিলাত হইতে তারে খবর আসিতে লাগিল, তথাকার সুধিবৃন্দ বঙ্গীয় কবিবরের মস্তকে প্রশংসার পুষ্পচন্দন এবং প্রকাশকগণ তাঁহার চরণে স্বর্ণবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজেন্দ্রের ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া বসিল—"আপনি রবিবাবুর চেয়ে কিসে কম? আপনার 'নব-গীতি'খানি অনুবাদ করে যদি বিলাতে পাঠিয়ে দেন তবে আপনারও জয়জয়কার পড়ে যায়।"—রাজেন্দ্র ভাবিল, কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু অনুবাদ করিবে কে?—তাঁহার নিজের ইংরেজী-বিদ্যায় ত কুলাইবে না।

অবশেষে, অনেক পরামর্শ করিয়া, কোনও বে-সরকারী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপকের দ্বারায় অনুবাদ করানই স্থির হইল। অধ্যাপক মহাশয়, প্রচুর দক্ষিণা লোভে এই কার্য্যটি করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

শনৈঃ শনৈঃ অনুবাদ অগ্রসর হইতে লাগিল। উচ্চ মূল্যের পার্চ্চমেণ্ট কাগজে, ইংরেজের কারখানায়, পাণ্ডুলিপি টাইপ্‌রাইট করান আরম্ভ হইল। শেষ হইলে রাজেন্দ্র সেগুলি রেজিষ্ট্রী ডাকে ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানির নামে পত্রসহ প্রেরণ করিল।

"নব-গীতি" প্রকাশের পর হইতে, আর তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যায় নাই। যদি রাজেন্দ্র স্বয়ং তিনকড়ির বাড়ী আসিয়া তাহাকে একখানি "নব-গীতি" উপহার দিত

করিত, তাহা হইলেও মিটমাট হইয়া যাইতে পারিত—কিন্তু রাজেন্দ্র সে পরিশ্রম স্বীকার করে নাই। তিনকড়ি বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, সে সংবাদও কোনও দিন সে লয় নাই। তিনকড়ি যায় নাই বটে—কিন্তু "নব-গীতি" অনুবাদ, বিলাতে পাঠান প্রভৃতি সকল কথাই সে অবগত ছিল; শরদিন্দুবাবু আসিয়া গল্প করিয়াছেন। ইহার ফলে যে কি হয়, জানিবার জন্য তিনকড়ির যে কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মে নাই এমন নহে।

এই সময় "রত্নাকরে" "নব-গীতির" এক সুদীর্ঘ সচিত্র সমালোচনা বাহির হইল। চিত্রখানি ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত, নিম্নে মুদ্রিত—"বঙ্গের প্রতিভাশালী সুকবি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু।" সমালোচনাটি আগাগোড়া রাজেন্দ্র ও নব-গীতির একটি স্তব বিশেষ। রবীন্দ্রবাবুর নিম্নেই অত্যন্ত ব্যবধানে ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তিনকড়ি প্রভৃতি অন্যান্য নব্য-কবিগণ অপেক্ষা রাজেন্দ্রবাবু যে কত উচ্চে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে দুর্ভাগ্য প্রথমোক্তগণের কাব্য হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। তিনকড়ির উপরেই সমালোচকের যেন আক্রোশটা বেশী বেশী। বাজারে গুজব, সমালোচনাটি সম্পাদক মহাশয়েরই রচিত—তবে স্থানে স্থানে অধরচন্দ্রবাবুর হাতও যথেষ্ট আছে।

এই সমালোচনা পাঠ করিয়া বিহারীলাল ত একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সে বলিল—"লাঠি মেরে আমি সম্পাদকের মাথা ফাটিয়ে দেব। তারপর যা থাকে আমার কপালে।"

শরদিন্দু বলিল—"তিনকড়িবাবুর বিরুদ্ধে ঐ অংশটা, ওটা সম্পাদকের লেখা নয়। ওটা শুনেছি রাজেন্দ্রের বৈঠকখানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে; অধর লিখেছে।"

বিহারী বলিল—"তবে ঐ রাজেন্দ্রেরই মাথা ফাটিয়ে দেব।"

বিহারী দুই দিন পথে পথে লাঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।—তিনকড়ি ইহা শুনিয়া তাহাতে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করাতে তবে সে নিরস্ত হয়।

পরদিন শরদিন্দুর বাসায় বিহারী উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমি একখানি বই লিখেছি।"

"বল কি! তুমিও গ্রন্থকার হলে?"

"বামা শ্যামা সবাই যখন গ্রন্থকার হল, আমিই বা বাকি থাকি কেন?"

"বেশ ত—ছাপিয়ে ফেল।"

"ক্ষেপেছ? এ দেশে ছাপাব না। এ দেশের গুণের আদর নেই।"

"তবে?"

"একেবারে বিলাতে।"

শরদিন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দূর পাগল!"

বিহারী বলিল—"সত্যি, অনুবাদও হয়ে গেছে। সেই কি কোম্পানি বললেন, তাদের নাম ঠিকানা বলে দাও ত। আমার একটি জানা লোক বিলাতে আছে, তার কাছে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে বলে দেব, সে নিজে যেন সেই কোম্পানির কাছে নিয়ে যায়।"

"কে বিলেতে আছে?"

"কেন, আমাদের সুবোধ। সে আমার ছেলেবেলোকার বন্ধু। দাও না, সে কোম্পানির নাম-ঠিকানা বলে দাও না।"

শরদিন্দু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বিহারী বুঝি তামাসা করিতেছে। কিন্তু তাহার আগ্রহ দেখিয়া শেষে ভাবিলেন, হয় ত তিনকড়ির পুস্তক অনুবাদ করাইয়াছে, তাহাই পাঠাইবে, কৌশল করিয়া সে কথাটি গোপন রাখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাঠাবে বল না! তোমার বই নয় এ আমি শপথ করে বলতে পারি।"

'যার বই-ই পাঠাই—তুমি ঠিকানা দাওনা বাপু।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন—"ঠিকানা ত আমার মনে নেই, তার নাম হচ্ছে

ম্যাক্‌মিলান্‌দের বাড়ী থেকে একখানা দুষ্প্রাপ্য বই আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, দেখি দাঁড়াও, তাদের চিঠিখানা যদি খুঁজে পাই।" কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর বলিলেন—"এই নাও পেয়েছি। এই চিঠিতে তাদের নাম ঠিকানা সবই আছে।"

বিহারী চিঠিখানি লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।। কবি সম্বর্দ্ধনা

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে লাগিল, বিলাত হইতে কোনও উত্তর আসে না। রাজেন্দ্রনাথ ও তাহার ভক্তগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। যাহারা ভক্ত নয় অথচ ও সংবাদ অবগত ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল—"ম্যাক্‌মিলান্‌ কি আর পাগল হয়ে গেছে যে সেই রাবিশ ছাপবে?"

অবশেষে একদিন রাত্রি নয়টার সময় পত্র আসিল। সেদিন শনিবার, বিলাতী ডাক সন্ধ্যার পর বিলি হইবার সম্ভাবনা আছে ইহা রাজেন্দ্র সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া সে সারা সন্ধ্যা কম্পিতহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া কাটাইল। নয়টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে দ্বারবান প্রত্যাশিত পত্রখানি আনিয়া, রাজেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

সকলে ঝুঁকিয়া দেখিল, বিলাতী পত্র বটে, বিলাতী টিকিট রহিয়াছে।

কম্পিত-হস্তে বিবর্ণ-মুখে রাজেন্দ্র পত্রখানি খুলিল। ভক্তগণ অনিমেষ-নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঠান্তে "এই দেখ" বলিয়া সেখানি টেবিলের উপরে ফেলিয়া, কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া রাজেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সকল ভক্তই হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু অধর বিদ্যুদ্‌গতিতে সেখানি পাঠ করিয়া, ভাবের প্রবাল্যে, "মেরে দিয়েছি—মেরে দিয়েছি" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে, কক্ষময় উন্মত্তবৎ নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অপর ভক্তগণ তখন আনন্দকলস্বরে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রনাথ চক্ষু খুলিয়া বলিল—"অধর ও কি করছ? বস—বস।"

অধর বলিল—"না—আমি বসবো না!—আমি নাচবো!—বলিয়া সে পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র বলিল—"ওহে অধর, শোন।"

নৃত্য করিতে করিতে অধর বলিল—"কি?"

"এখনি যাও। একখানা সেকেন্ড-ক্লাস গাড়ী ভাড়া করে—'বেঙ্গলী' অফিসে যাও। এই চিঠি দেখিয়ে বলে এস, কাল সকালেই যেন একটা 'প্যারা' বেরিয়ে যায়।"

একজন ভক্ত বলিল—"শুধু বেঙ্গলী আফিসে কেন? ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, ডেলিনিউজ, মিরর, অমৃতবাজার—সবাইকে খবর দেওয়া উচিত।"

ইহা শুনিয়া অধর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। "আচ্ছা দাও"—বলিয়া চিঠিখানি লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বেলা নয়টা হইতে রাজেন্দ্রনাথের গৃহে লোকসমাগম আরম্ভ হইল। সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আত্মীয়বন্ধু অনেকেই আসিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল।—আসিল না কেবল তিনকড়ি।

অপরাহ্নে ত পুরা-মজলিস। অধর বলিতেছিল—"সে হবে না রাজেন্দ্রবাবু! সে আমরা কিছুতেই শুনবো না।"

অন্যান্য ভক্তগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই না। এতগুলি লোককে আপনি নিরাশ করবেন?"

রাজেন্দ্র বিনয়সূচক মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"কি এমন একটা কাণ্ড করেছি, যে তার জন্যে সভা করে ধূমধামে আমার সম্বর্দ্ধনা করবেন?—সামান্য বিষয়—"

অধর বলিল—"আপনার কাছে সামান্য হতে পারে, আমাদের কাছে সামান্য নয়। রবিবাবু বিলেতে গিয়া যা করেছেন, আপনি শ্যামপুকুর থেকে এক পা না নড়েও তা করে ফেললেন। বাঙ্গালীর মুখ, বাঙ্গালাদেশে বসেই আপনি উজ্জ্বল করে দিলেন। অভিনন্দন না করে আমরা কিছুতেই ছাড়ছিনে।"

অনেক উপরোধ-অনুরোধ কাঁদাকাটির পর অবশেষে রাজেন্দ্রনাথ সম্বর্দ্ধনা-গ্রহণ করিতে সম্মত হইল।

অধর অবিলম্বে একটি দল গঠন করিয়া, চাঁদা-সংগ্রহের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। পরবর্ত্তী শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সম্বর্দ্ধনা স্থির হইয়াছে; সভাপতি হইবেন, 'রত্নাকর'-সম্পাদক কৃষ্ণবিহারীবাবু। সময় অতি অল্প; ইহার মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। অভিনন্দন-পত্র রচিত হইল, ছাপিতে দেওয়ার পূর্ব্বে ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে সেখানি দেখাইতে লইয়া আসিল।

রাজেন্দ্র বলিল—"চাঁদা কত উঠল?"

"এই দেখুন না"—বলিয়া অধর খাতাখানি খুলিয়া রাজেন্দ্রের সম্মুখে মেলিয়া দিল।

রাজেন্দ্র নামগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল—"তিনকড়িও চাঁদা দিয়েছে দেখছি।"

অধর বলিল—"কোন্ লজ্জায় না দেবে?"

রাজেন্দ্র বলিল—"লজ্জার খাতিরে দেয়নি, ওটা নিজের উদারতা দেখাবার জন্যে দিয়েছে। ভিতরে কিন্তু জ্বলে পুড়ে মরছেন।"

অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া রাজেন্দ্র তাহা মঞ্জুর করিয়া দিল।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পান্তির মাঠে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছে। তোরণ-দ্বার পত্র-মালায় সজ্জিত, উপরে ফুটন্ত ফুলের অক্ষরে লেখা—"কবি রাজেন্দ্র জয়।" প্রবেশ করিয়া বিবিধবর্ণ নিশান-শোভিত, বিস্তীর্ণ পটমণ্ডপ। ভিতরে লাল ও সবুজ কাগজে নির্ম্মিত গুচ্ছ-গুচ্ছ শৃঙ্খল দুলিতেছে। এক প্রান্তে লোহিত-বস্ত্রাবৃত ঈষদুচ্চ বেদিকা। তাহার মধ্যস্থলে কারুকার্য্যখচিত রেশমী আবরণযুক্ত একখানি মাঝারি আকারের টেবিল। তাহার উপর দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত আধারে দুইটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া, শোভা ও সৌরভ বিতরণ করিতেছে। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় সুন্দর কেদারা—একখানিতে সভাপতি বসিবেন, অপরখানি কবিবরের জন্য। বেদিকার উপর আরও অনেকগুলি চেয়ার—গণ্যমান্য-দর্শক ও কবিবরের খাস-ভক্ত-সম্প্রদায় উপবেশন করিবেন। বেদিকার নিম্নে প্রথমে তিন সারি চেয়ার, তাহার পর বহু সারি বেঞ্চি চলিয়া গিয়াছে।

প্রভাতকাল হইলে সারাদিন পথে পথে এই সভার সংবাদ দিয়া অসংখ্য বিজ্ঞাপন বিতরিত হইয়াছিল। পাঁচটা বাজিতেই অনেকে আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ চেয়ার, কেহ বেঞ্চি প্রভৃতিতে বসিয়া রহিল; অনেকে বিলম্ব আছে দেখিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পাঁচ-সাত-দশজনে জটলা করিয়া নানাপ্রকার বাদানুবাদও করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"কে হে রাজেন্দ্রবাবু? কখনও নামও ত শুনিনি।—যা হোক তামাসাটা দেখে যেতে হচ্চে।" উহারই মধ্যে যে একটু খোঁজ-খবর রাখিত, সে বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজেন্দ্রনাথ বসুর কবিতা আমি কাগজে পড়েছি বটে। তা, এমন ত কিছুই নয়। কারা একে এমন করে নাচাচ্চে?"—অপর একজন বলিল—"শোনেননি? ম্যাক্‌মিলান্ যে রাজেনবাবুর বই তর্জ্জমা করে ছাপাচ্ছে। পনেরো হাজার টাকা দেবে!"—একজন চশমাধারী যুবক বলিল—"হুজুগ হুজুগ মশায়—আর কিছু নয়। বিলেতটি হচ্ছে আসল হুজুরের জায়গা—একটা নূতন কিছু পেলে হয়! নইলে এত দেশ থাকতে শেষে রাজেন বোসের কবিতা ছাপাতে চায়?"—সর্ব্বত্রই আলোচনার মধ্যে হাসি টিট্‌কারীর ভাবটাই বেশী বেশী শুনা যাইতে লাগিল।

ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও কবিবরের দর্শন নাই। সভাপতিও বিলম্ব

করিতেছেন। শীতকালের বেলা, ক্রমে অন্ধকার হইয়া পড়িল। ফরাস আসিয়া একে একে ঝাড়গুলি জ্বালিয়া দিতে লাগিল। উদ্যোগীরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মাঝে মাঝে ফটকের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেছে—উৎসুক নেত্রে পথের পানে চাহিয়া থাকিতেছে।

সভা এখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ক্রমে রব উঠিল—"এসেছেন—এসেছেন।" একখানি বৃহৎ মোটরকার আসিয়া তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিষ্ফল রোষেই যেন ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সভাপতি মহাশয়, কবিবর, অধরচন্দ্রবাবু এবং আরও দুইজন ভক্ত সভায় প্রবেশ কবিলেন। সভাস্থ একজন ভক্ত অমনি "বন্দেমাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই চারিজন বিদ্যালযের বালক ভিন্ন আর কেহ বড় একটা তাহাতে যোগ দিল না।

সকলে উপবেশন করিলে, হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের সহিত একটি অভ্যর্থনা-সঙ্গীত হইল। তাহার পর, যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইযা, কৃষ্ণবিহারীবাবু সভাপতিব আসনে উপবেশন করিলেন; সম্মুখে ছাপা অনুষ্ঠানপত্র ছিল।

একজন ভক্ত, "কবি-বাজেন্দ্র-জয়" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিযাছিলেন; সভাপতির অনুবোধে, টেবিলেব পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহা তিনি পাঠ কবিলেন।

তাহাব পব সভাপতি মহাশয় একটু করিযা, গায়ের শালখানি এদিক ওদিক একটু আধটু টানিয়া দিযা, একতাড়া কাগজ হস্তে—"অদ্য আমরা" বলিয়া আরম্ভ করিয়া, গম্ভীব স্বরে এক অভিভাষণ পাঠ আবম্ভ করিলেন।

সভাস্থ লোকে স্থিব মনোযোগ দিল না। সর্দ্দাবেবা মাঝে মাঝে—"বড গোল হচ্চে—ওদিকটায বড গোল হচ্চে" বলিযা চিৎকার করিতে লাগিল; তথাপি কেহ বড় গ্রাহ্য করিল না। নিজেদের চাপা গলায় গল্প-হাসি ইত্যাদি চালাইতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বসিয়া সভার ভাবগতি লক্ষ্য করিতেছিল। সভা হইতে একটা অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপেব ঢেউ বহিযা আসিয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল।—সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষে হইলে কেহই কোনও রূপ উল্লাস প্রকাশ করিল না; ববং গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইল। দারুণ নিরুৎসাহে রাজেন্দ্রের বুক যেন ভাঙ্গিযা পড়িতে লাগিল।

এইবার অভিনন্দনপত্র পাঠ করিবার পালা। সভাপতির অনুরোধক্রমে, অধরচন্দ্রবাবু টেবিলেব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে ক্ষীণস্বরে পাঠ আবম্ভ কবিলেন; পবে তাঁহাব কণ্ঠধ্বনি পর্দ্দায়-পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল। ক্রমে যখন বলিলেন, "আমবা শুনিয়া যৎপবোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যে, মহাশয়ের অমরকাব্য 'নব-গীত'খানিব ইংবেজী অনুবাদ বিলাতের বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানি পবম আদবে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন"—অমনি সভায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"মিথ্যা কথা।" সভাসুদ্ধ লোক সচকিত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাজেন্দ্রও চাহিযা দেখিল, মুখ সম্পূর্ণ অপরিচিত। সভাপতি মহাশয় উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"কে হে তুমি?"

লোকটি বলিল—"আমি যেই হই না কেন। রাজেন্দ্রবাবুর কোনও কাব্যই ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানি প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়নি। তাবা অমন গাধা নয়।"

সভাপতি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমাদের প্রমাণ আছে।"

লোকটি উচ্চকণ্ঠে বলিল—"প্রমাণ দেখান।"

সভাপতি বলিলেন—"কে তুমি? কেন তোমায় প্রমাণ দেখাব? এই দণ্ডে সভা থেকে বেরোও, দূর হয়ে যাও।"

সভাস্থ অনেকে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রমাণ চাই—প্রমাণ চাই।"

রাজেন্দ্র তখন কম্পিত দেহে দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে একখানি পত্র বাহিব করিযা

সভাপতিব হস্তে দিল।—সভাপতি বলিলেন, "এই শুনুন প্রমাণ"—বলিয়া পত্রখানি মায হেডিং তাবিখ ধীবে ধীবে পাঠ কবিলেন। সভাস্থল একেবাবে নিস্তব্ধ, সুচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়।

পত্র শেষ হইলে পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি বলিল—"ও পত্র জাল। কাগজেই অদৃশ্য কালীতে তার প্রমাণ লেখা আছে। চিম্‌নিব তাপে চিঠিখানি ধরুন, দেখুন ভিতব থেকে কালো কালো কি লেখা ফুটে বেবোয।"

সভাপতি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ অনেকে চীৎকাব কবিতে লাগিল—"প্রমাণ চাই—প্রমাণ চাই।"

সভাপতি কম্পিত-হস্তে পত্রখানি উত্তাপে ধবিলেন। কিযৎক্ষণ পবে সেখানি নামাইয়া, ঝুঁকিয়া পরীক্ষা কবিতে লাগিলেন; অন্য অনেকেও সেখানে গিয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটি বলিল—"দেখুন কি লেখা আছে। লেখা আছে কি না—

কবি নহে তুমি হে রাজেন্দ্রবাবু
পবন্তু কপিবব।
কলিকাতা ছাড়ি কিষ্কিন্ধ্যা যাও
যেখানে তোমাব ঘব।

যদি লেখা না থাকে—বুক ঠুকে তাও বলুন।"

সভাব লোক একদৃষ্টে সভাপতি মহাশযেব পানে চাহিযা বহিল। দেখিল, তিনি পত্রখানি টেবিলে ফেলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে চেযাবে বসিযা পডিলেন। দুইহস্তে নিজ চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদন কবিযা বহিলেন।

তখন সভায় বিষম গণ্ডগোল উঠিল। কেহ কুকুব ডাকিতে লাগিল, কেহ বিড়াল ডাকিতে লাগিল, কেহ শৃগালসঙ্গীত অনুসবণ কবিযা 'হুক্কা হুযা' ববে সভা সবগবম কবিযা তুলিল।

এই সভায পশ্চাতেব বেঞ্চিতে তিনকড়িও উপস্থিত ছিল। অন্যান্য সকলেব ন্যায সেও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইযা বাড়ী ফিবিযা গেল, কি কবিযা যে কি হইল, কিছু স্থিব কবিতে পাবিল না। ব্যাপাবটা একটা জটিল প্রহেলিকাব মত তাহাব মনে হইতে লাগিল।

পবদিন জানিতে পাবিল, এটি তাহাব "ভক্ত" বিহাবীলালেব কীর্ত্তি। সে-ই নিজেব প্রেস হইতে ম্যাক্‌মিলানেব নামাঙ্কিত চিঠিব কাগজ ছাপাইয়া, আবক দিয়া 'কিষ্কিন্ধ্যা' কবিতাটি তাহাব ভিতব লিখিযা দিযাছিল। তাহাব পব জাল চিঠিখানি টাইপবাইটব কবাইযা, স্বতন্ত্র লেফাফায ভবিযা বিলাতে তাহাব কোনও এক বন্ধুব নিকট পাঠাইযা দেয়। সেইখান হইতে লণ্ডনেব মোহবাঙ্কিত হইযা চিঠিখানি আসিযাছিল। সভায দাঁড়াইযা যে ব্যক্তি প্রতিবাদ কবিযাছিল, বিহাবীব প্রেসেবই একজন কম্পোজিটাব। ইহা শুনিযা, ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে তিনকড়ি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ কবিতে লাগিল। সেইদিন হইতে অদ্যাবধি আব সে বিহাবীব মুখদর্শন কবে নাই।

বাজেন্দ্রেব কিন্তু আজিও বিশ্বাস, তিনকড়ি নিশ্চযই তলে তলে ইহাব মধ্যে ছিল।

[ভাবতবর্ষ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২০]

বায়ু পরিবর্ত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

"হরিধন—ও হরিধন—বাবা, জ্বরটা ছাড়ল কি?"

কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের ভিতর হইতে হরিধন উত্তর করিল—হুঁ—ছাড়ল!—একেবারে ছাড়বে।"

মা বলিলেন, "ষাট্ ষাট্—ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস! ও কথা কি বলতে আছে রে?"

হরিধনের কম্প আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।

"বড্ড শীত করছে কি বাবা?"

"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

"মাথাটা কামড়াচ্ছে?"

"খসে যাচ্ছে। খসে যাচ্ছে?"

"আমার ত এখন বিছানা ছোঁবার যো নাই। বউমাকে পাঠিয়ে দেব, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে?"

"যা হয় কর। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

আশ্চর্য্য এই যে, না নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র হরিধনের কাঁপুনি বন্ধ হইয়া গেল, তাহাব কাতরানিও আর শোনা গেল না। প্রথমে মুখটি, তাহার পর একখানি অস্থিসার হস্তেব অগ্রভাগ, লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। খোলা জানালাপথে অপরাহ্ন রৌদ্র প্রকাশ করিয়া, শয্যার একটা স্থান উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত কবিয়া অপ্রসন্নভাবে হরিধন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই এই বিধবার একমাত্র পুত্র। বয়স প্রায় বাইশ তেইশ হইবে, কিন্তু গোঁফদাড়ি এখনও ভাল করিযা দেখা দেয় নাই। দুই তিন বৎসর হইতে হরিধনকে ম্যালেরিযায ধবিযাছে, যখন ভাল থাকে, খাইয়া খেলিয়া বেড়ায়, তখন ইহাকে দেখিলে উনিশ কুড়ির অধিক মনে হয না। দেহখানি পোড়া কাঠের মত, চক্ষু দুইটি কোটরগতি, উদরটি ডাগর, পা দুখানি সরু সরু।

এই গ্রামের নাম বলরামপুর। পূর্ব্বে হরিধনদের অবস্থা পল্লীগ্রামেব পক্ষে বেশ স্বচ্ছলই ছিল বলিতে হইবে। তাহার পিতা বংশীধর চট্টোপাধ্যায় নিজ বুদ্ধিবলে অনেক জমি-জিরাৎ করিয়াছিলেন, মেটে বাড়ী ভাঙ্গিয়া দালান কোঠা তুলিয়াছিলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের বৈবাহিক (জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) কোনও রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন, মহারাণীর জুবিলী উপলক্ষে রাজার সহিত গোপনে তিনি বিলাত গিযাছিলেন, এই কথা রাষ্ট্র হইবামাত্র বংশীধর ভৈরবকে একঘরে করিয়া গ্রামে একটা দলেব দলপতি হইয়া উঠিলেন। শুধু ভৈরব চট্টোপাধ্যায়েব জাতি মারিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার সহিত অনেকগুলি মামলা মোকর্দ্দমাও পাকাইয়া তুলিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর বংশীধব দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সমাজশাসন ও মোকর্দ্দমাচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর কাবু হইয়া পড়িলেন। ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভুপালচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরী পাইলেন, গ্রামের লোক আর বংশীধরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল না—এবং একে একে তাঁহাব দলকে পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবচন্দ্রের দলে গিযা ভিড়িতে লাগিল। বংশীধবেব কিন্তু রোখ্ চাপিয়া গিয়াছিল, আরও কয়েক বৎসর মোকর্দ্দমা চালাইয়া একপ্রকাব সর্ব্বস্বান্ত হইযা, অবশেষে পরলোকগমন কবিলেন। তাই হরিধন আজ দরিদ্র—পৈত্রিক সম্পত্তির সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সংসারটি বৃহৎ নহে, তাই রক্ষা। গৃহে মা, স্ত্রী, পিসিমা ও একটি পিসতুতো ভাই ছাড়া আর কেহই নাই, অদ্যাবধি তাহার সন্তানাদি হয় নাই।

বাহিরের বারান্দায় স্ত্রীর পদধ্বনি শুনিবামাত্র হরিধন মুখে আবার লেপ চাপা দিল। স্ত্রীর নাম সরলা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, রঙ নিট ময়লা, তবে মুখখানি নিন্দার নহে। সরলা আসিয়া বিছানার পাশে বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বামীর মুখ হইতে লেপটি সরাইয়া, কপালে হাত রাখিয়া বলিল—"কই না এখন ত গা তেমন গরম নেই।"

হরিধন মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "নাঃ—গা গরম থাকবে কেন? একেবারে বরফ হয়ে গেছে।"—বলিয়া হুঁ হুঁ করিয়া কাতরাইতে আরম্ভ করিল। "বাপ রে-মা গোঃ" বলিয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল।

"দেখি মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিই।"—বলিয়া সরলা হরিধনের ললাটস্পর্শ করিল। হরিধন সে হাতটা সবেগে সরাইয়া ফেলিয়া বলিল—"থাক্—আর অত দয়ায় কাজ নেই। গা যার বরফের মত ঠাণ্ডা, তার কি আর মাথা কামড়ায়?"

সরলা বুঝিল, গা যথেষ্ট গরম নাই বলায় স্বামী রাগ করিয়াছেন। তাই কয়েক মিনিট সে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর আবার হরিধনের কপালে হাত রাখিয়া বলিল—"উঃ—সত্যিই ত। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে! অনেকক্ষণ উনুনের কাছে বসে থেকে উঠে এসেছিলাম কিনা, আমারই হাত গরম ছিল, তাই তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।"

হরিধন ঝাঁকিয়া উঠিয়া, হাতখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"যাও যাও—সোহাগ কাড়াতে হবে না। এখান থেকে যাও বলছি—নইলে অপমানিত হবে।"—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

খানিক পরে ফিরিয়া দেখিল—সরলা বসিয়া কাঁদিতেছে। বলিল—"বসে রইলে কেন?"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ কেন?—আমি কি করেছি?"

সরলা একদৃষ্টে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হরিধন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া বলিতে লাগিল—"যার স্বামী জ্বরে পড়ে কোঁ কোঁ করছে—সে যায় নেমন্তন্ন খেতে, আমোদ করতে?"

সরলা ধীরে ধীরে বলিল—"খুড়ীমা নিজে এসে বলে গিয়েছিলেন, আমরাই হলাম আত্মীয়, আমরা না গেলে কি ভাল দেখাত?"

"আত্মীয়! আমার বাবা যাদের একঘরে করেছিলেন, তাদের বাড়ীতে যাও নেমন্তন্ন খেতে। কেন? বাড়ীতে গিলতে পাও না? এত পেটের জ্বালা?"

সরলা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "আহা কি মিষ্টি কথাই শিখেছ! লোক কি খেতে পায় না বলেই আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যায়? আর, ঠাকুর একঘরে করেছিলেন, এখন ত ওঁরা একঘরে নেই—এখন ত সকলেই ওঁদের নিয়ে চলছে—আর আমরা জ্ঞাতি হয়ে—"

হরিধন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "জ্ঞাতি শত্রু পরম শত্রু—জান না? আমাদের কি গ্রাহ্য করে, না কেয়ার করে? অমন জ্ঞাতির মুখে মারি পাঁচ জুতো। আর যে লোভ না সামলাতে পেরে তাদের বাড়ী যায় নেমন্তন্ন খেতে, তার লোলায় মারি আমি পাঁচ ঝাঁটা।

সরলা তখন চক্ষে অঞ্চল দিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রির মধ্যে হরিধনের জ্বরটুকু ছাড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া পেয়ারাপাতা চিবাইয়া মধু ধুইয়া সে ডি-গুপ্ত সেবন করিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া খানকতক বিস্কুট লইয়া জলযোগ করিতেছে, এমন সময় উঠানের প্রান্তভাগ হইতে শব্দ শুনিল—"কোথায় গো জ্যেঠাইমা।" চাহিয়া দেখে, স্বয়ং ভূপাল চট্টোপাধ্যায়।

বিস্কুটগুলা তাড়াতাড়ি পকেটে লুকাইয়া কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া, গম্ভীর সাধুভাব ধারণ করিয়া হরিধন বসিয়া রহিল।

পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আজ তিন সপ্তাহ হইল ভূপালবাবু আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একদিনও এ বাড়ীতে তিনি পদার্পণ করেন নাই; তাহার কারণ ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতে আসেন, তখন গ্রামস্থ অপর সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিল, করে নাই কেবল হরিধন। নিজেও যায় নাই, মাকে পিসিকেও যাইতে দেয় নাই। তথাপি ভূপালবাবুর মাতা এবার আসিয়া ইঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। হরিধনের মা, হরিধনকে না জানাইয়া, বউটিকে লইয়া গত কল্য সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন—এবং শুধু তাহাই নহে, সেখানে বলিয়া আসিয়াছেন—"জ্বর বলে হরিধন আসতে পারলে না, বাছা কত দুঃখ করতে লাগল।"—বলা বাহুল্য, ইহা একেবারেই কাল্পনিক।

কিন্তু ফলটা ভালই হইল। ভূপালবাবু আসিয়া ডাকিলেন—"কোথায় গো জ্যেঠাইমা—হরিধন কেমন আছে?"—বলিতে বলিতে বারান্দার দিকে আসিলেন। হরিধনকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এই যে হরিধন, কেমন আছ হে?"

হরিধন ক্ষীণস্বরে উত্তর কহিল, "জ্বরটা এখন ছেড়েছে।"

"কালকে শুনলাম—জ্যেঠাইমার কাছে—যে তোমার জ্বর। কাল ত আর গোলমালে দেখতে আসতে পারিনি। রাত্তির বারোটার কম খাওয়ান দাওয়ানর জের মিটল না। তাই ত, ভারি কাহিল হয়ে গেছ যে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ তিন বছর ধরে ভুগছি। পাঁচ সাত দশ দিন ভাল থাকি, আবার পড়ি।"

ভূপালবাবু বলিলেন, "এ ত ঠিক নয়। তোমার হাওয়া বদলান উচিত।"

এই সময় হরিধনের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভূপালবাবু বলিলেন, "জ্যেঠাইমা, হরিধনের শরীর যে বড়ই কাহিল হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ বাবা, দেখ না। খালি খানকতক হাড়ে ঠেকেছে।"

"তাই ত বলছিলাম, আর ত গাফিলতি করা উচিত নয়। পশ্চিমে কোন ভাল জায়গায় গিয়ে মাসকতক হাওয়া বদলাতে পারলে ভাল হত।"

"ভাল ত হত বাবা, কিন্তু উপায় কি? কোথায় বা পাঠাই, কেইবা নিয়ে যায়!"

ভূপালবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

হরিধন চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "আর, রকম করে যে ক'টা দিন কাটে। সহায় সম্পত্তি থাকত, এতদিন কোন্ কালে পশ্চিমে চলে যেতাম। চলুক, এমনি করে যদ্দিন চলে।"—বলিয়া সে একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

হরিধনের মাতা এ কথা শুনিয়া চক্ষে অঞ্চল দিলেন। ভূপালবাবুরও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বলিলেন—"হরিধন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? এ সময়টা মুঙ্গেরে জলহাওয়া খুব ভাল। শীতের ক'টা মাস সেখানে থাকলে উপকার হতে পারে।"

হরিধন অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল। তাহার মা বলিলেন, "নিয়ে যাও না বাবা। তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারি।"

"তা, আমি নিয়ে যেতে পারি জ্যেঠাইমা। এখন এদের এখানেই রেখে যাচ্ছি—তা হলেও, সেখানে আমার বামুন চাকর সবই আছে, কোনও কষ্ট হবে না। আমার বোধ হয়, সেখানে গিয়ে মাস দুই তিন থাকলেই জ্বরটা বন্ধ হয়ে যাবে, পিলেটাও কমে যাবে। কেল্লার মধ্যে গঙ্গার ধারেই আমার বাঙ্গলো—বেশ ফাঁকা, দিব্যি হাওয়া বাতাস।"

মা বলিলেন, "তাই যাও বাবা হরিধন, তোমার দাদার বাসায় থেকে শরীরটে সেরে এস। কেমন?"

হরিধন নিরুত্তর।

দাদা বলিলেন। "কেল্লার ভিতর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেড়াবার জায়গা যথেষ্ট আছে। খাসা মাঠ—তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করছে। বিকালে সাহেবেরা মেমেরা সেখানে খেলা করে। ভাল ভাল রাস্তা—মাঝে মাঝে বড় বড় বাগান। খুব বেড়াতে পারবে। আর এই শীতকালে নতুন আলু, কপি, কড়াইশুঁটি উঠেছে। মাছ বেশ সস্তা। গঙ্গায় বড় বড় রুই কাৎলা। আমার বাড়ীতেই গরু আছে, রোজ চার পাঁচ সের করে দুধ দেয়। খাঁটি ঘি—এ দেশের ঘিয়েম মত ভেজাল নয়। চার আনা করে সের পাঁঠার মাংস। আবার এ সময়টা অনেক পাখীও পাওয়া যায়। তিতির, বটের, চাহা, বুনো হাঁস, টিল—শিকারীরা সব বেচতে আসে। আবার উড়ে বামুনটি রাঁধেও ভাল।"

উপকৃত হইতে তাহার মনে একটু দ্বিধা। তাই আত্মসংবরণ করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিল।

ভূপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, যাবে?"

হরিধন বলিল, "আচ্ছা দাদা, একটু ভেবে চিন্তে আপনাকে জানাব।"

বধূর সঙ্গে পরামর্শ না কবিয়া হরিধন কিছু বলিবে না, এই ভাবিয়া ভূপালবাবু মনে মনে হাস্য করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরিধন মুঙ্গেরে আসিল। দেখিল ভূপালবাবুব বাঙ্গলোখানি দিব্যি, আসবাবপত্র যথেষ্ট এবং মূল্যবান। ভৃত্যও অনেকগুলি। শুনিল, উড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণটির খোরাক পোষাক বারো টাকা বেতন। দাদার সম্পদ দেখিয়া হবিধন মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

তাহার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহে একবার জ্বর হইয়াছিল। সবকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন আসিয়া নাড়ী টিপিলেন, উত্তাপ লইলেন, ঔষুধের ব্যবস্থা করিলেন। হরিধন দেখিল, ভূপালবাবু চারিটি টাকা ভিজিট ডাক্তারকে দিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহে স্পষ্ট জ্বর আর হইল না, সামান্য একটু গা গরম হইল মাত্র।

তৃতীয় সপ্তাহে আর কোনও উপসর্গ রহিল না। বেশ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইল। হরিধন সকালে বিকালে একটু একটু বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

এক মাসে তাহার মুখের ফ্যাকাসে বং আবাব কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, চোখের কোল পুরিয়া আসিল, উদরের আয়তন অর্দ্ধেক কবিয়া গেল,—দেখিয়া ভূপালবাবু আনন্দলাভ করিলেন।

হরিধন বুঝিল, এ বড়লোকেব বাড়ী, আমাকে দবিদ্র বলিয়া জানিলে চাকর-বাকরেরা অগ্রাহ্য করিবে। সুতরাং দাদা কাছারী চলিয়া গেলে, ভৃত্যগণকে ডাকিয়া আধা হিন্দি আধা বাঙ্গলা ভাষায় তাহাদের নিকট নিজ মহিমা প্রচার করিতে সে ব্যাপৃত হইল।—একদিন বলিল—"আমরাই গ্রামের জমিদাব। আমাব দশ আনা অংশ—তোমাদের বাবুর ছয় আনা মাত্র। আমরাই বড় তরফ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেবা বাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। এখন প্রজারা আমাদের রাজা বলে—আমবা বড় তরফ কিনা।" ইত্যাদি।—পরদিন বর্ণনা করিল—"তোমাদের বাবুব এ বাঙ্গলো কি বাঙ্গলো! দেশে আমাদের সে বাড়ী যদি দেখ! প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী—কাছারী মহল, বৈঠকখানা মহল, অন্দর মহল। এ রকম বাঙ্গলো সেখানে আমাদের অনেক প্রজারই আছে। হ্যাঁ—তোমাদের বাবুর দেশের বাড়ী এ বাঙ্গলোর চেয়ে ঢের ভাল বটে—কিন্তু আমাদের বাড়ীতে বাইশ জন। ইহা হইতেই বাড়ীর আয়তন বুঝিতে পারিবে।"—ইত্যাদি।—আর একদিন জানাইল—"তোমাদের এ বাঙ্গলোয় দুটি মোটে ঘড়ি—একটি বৈঠকখানায়, একটি বাবুর শোবার ঘরে। দেশে আমাদের বাড়ীতে ঘড়ি সবসুদ্ধ সতেরটা। দম দিবার জন্য মাহিনা-করা ঘড়িওয়ালা নিযুক্ত আছে"—ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ডাকিয়া হরিধন একদিন নির্জ্জনে বলিল, "দেখ ঠাকুর, দুধের সর যা পড়ে, সরটা তুলে রেখ, বিকেলে আমার জলখাবারের সময় দিও। আর দেখ, মাছ এলে মুড়োটুড়োগুলো রোজ বাবুর পাতেই দাও কেন? আমাকে দিও। আর আমায় যখন ডাল দেবে, খানিকটে ঘি আগুনে বেশ করে তাতিয়ে আমার ডালের বাটীতে ঢেলে দিও। তোমায় বরং মাসে মাসে আমি কিছু কিছু দেব। আপাততঃ এই দুটি টাকা নাও।"—বামুন ঠাকুর হাসিয়া বলিল—"না বাবু, টাকা দিতে হবে না, টাকা রাখুন। আপনার এখন এই নতুন শরীর, বেশী গুরুপাক জিনিষ খেতে দিতে বাবু বারণ করেছেন। আপনি আগে বেশ করে সেরে উঠুন, তখন যা খেতে চাইবেন, দেব।"

টাকা দুইটি হরিধনের নিজস্ব নহে। তিন চাবি দিন পূর্ব্বে নিজেব চাবি দিয়া ভূপালবাবুব বাক্স গোপনে খুলিয়া এই টাকা দুইটি সে অপহরণ করিযাছিল।

ভূপালবাবুর একটি ভাল ফাউন্টেন পেন ছিল। পাছে হারাইয়া যায়, এই ভযে তিনি এটি আফিসে লইয়া যাইতেন না। বাড়ীতে সর্ব্বদা এটি ব্যবহার করিতেন। একদিন তিনি কাছারী গেলে, নিজের চিঠি লিখিবার জন্য হরিধন তাঁহার টেবিলের নিকট বসিল। অন্য কলম থাকা সত্ত্বেও ফাউন্টেন পেনটিই তুলিয়া লইল। কিন্তু ব্যবহার জানিত না। পেঁচ ঘুরাইতে গিয়া কলমটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ সেটি লইয়া নাড়াচাড়া কবিয়া, ব্যবহাব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে একটি সাধারণ কলমেই পত্র লিখিল।

ভূপালবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, কলমটি ভাঙ্গা। বেহারাকে ডাকিযা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, হরিবাবুকে এই ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতে দেখিয়াছে, কলমটিও নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়াছে।

ভূপালবাবু তখন হবিধনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনের রাগ মনের মধ্যে যথাসাধ্য চাপিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—"হরিধন, আমার কলমটি ভাঙ্গলে কি কবে?"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এই ভাবে হরিধন বলিল, "কলম? কোন্ কলম?"

এই ন্যাকামি দেখিয়া ভূপালবাবুর আরও রাগ হইল। পূর্ব্ববৎ আত্মসংযত ভাবে বলিলেন— "আমার এই ফাউন্টেন পেনটি?"

"কই, আমি ত ভাঙ্গিনি। আমি ত ও কলম ছুঁইওনি—বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিনে।"

ভূপালবাবু একটু কঠোব স্বরে বলিলেন, "তুমি আজ দুপুরবেলা এ ঘবে বসে চিঠি লিখছিলে না?"

"চিঠি! আমি ত তিন চারদিন কাউকে কোন চিঠিই লিখিনি।"

"লেখনি!—আচ্ছা, এ দিকে এস। দেখ এ কি?"—বলিয়া ভূপালবাবু টেবিলের ব্লটিংপ্যাডের এক স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন।

হরিধন ঝুঁকিয়া দেখিল, খামে ঠিকানা লিখিয়া প্যাডের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার উল্টা ছাপটি স্পষ্ট রহিয়াছে। নির্ব্বাক হইয়া ভূপালবাবুর মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল কবিয়া চাহিয়া রহিল।

ভূপালবাবু তখন একটু নরম হইয়া বলিলেন, "এই ত আরও সব কলম রয়েছে, তাই একটা নিয়ে লিখলেই হত। ও হল অন্য রকম কলম—তুমি আনাড়ি—জান না—খুলতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছ।"

হরিধন একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "কলমটির দাম কত?"

"কেন?"

"আপনার যখন সন্দেহ আমিই ভেঙ্গেছি, তখন ঐ কলম একটি বাজার থেকে আপনাকে কিনে এনে দেব।"—দাদার বাক্স হইতে অপহৃত টাকা আরও কয়েকটি তাহার নিকট মজুত ছিল। ভূপালবাবুর মনে হরিধনেব প্রতি যে একটু ক্ষমার ভাব আসিতেছিল, এই উত্তর শুনিবামাত্র তাহা তিরোহিত হইল। তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—"পাবে কোথা

এ কলম? এ মেকারের কলম এ দেশেই পাওয়া যায় না। কালেক্টার সাহেব বিলাত থেকে এনেছিলেন, আমায় একটি উপহার দিয়েছিলেন!"

আরও কিছু দিন গেল।

ভূপালবাবু বেলা ১১টার সময় কাছারী চলিয়া যাইতেন। এক এক দিন তাহার পূর্ব্বেই ডাক পাইতেন—কিন্তু প্রায়ই পাইতেন না। চিঠিপত্রগুলা তাহার টেবিলের উপর রাখা হইত—কাছারি হইতে ফিরিয়া সেগুলি তিনি পাঠ করিতেন। চিঠি আসিলে পোষ্টকার্ডগুলি হরিধন সমস্তই আগাগোড়া পাঠ করিত। খামের চিঠিও খুলিয়া দেখিবাব লোভ হইত, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। একদিন দেখিল, একখানি খামের চিঠিতে তাহাদের গ্রামেব ডাকঘরের ছাপ, ঠিকানাটিও স্ত্রীলোকেব হাতের লেখা। অনুমান কবিল, ইহা নিশ্চয়ই বউদিদির চিঠি। বউদিদি ভাল রকম লেখাপড়া জানেন, গ্রামে এ প্রসিদ্ধি ছিল। হরিধন ভাবিল, দাদাকে না জানি কত কি রসেব কথাই বউদিদি লিখিয়াছে। ক্রমে প্রলোভন দুনির্বার হইয়া উঠিল। জল দিয়া ভিজাইয়া খামখানি খুলিয়া হরিধন পত্র পাঠ করিল। খুলিবার সময় খাম একটু ছিঁড়িয়াও গিয়াছিল।

বিকালে ভূপালবাবু বাড়ী আসিয়া পত্রখানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন, জল দিয়া ইহা খোলা হইয়াছে। কে খুলিয়াছে বুঝিতেও তাঁহাব বাকী রহিল না। ভৃত্যগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই একজন চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া গেল।

রাগে ভূপালবাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। হরিধন তখন বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই মাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া আলোয়ান গায়ে, ছড়ি হস্তে, বাহির হইয়া আসিল।

ভূপালবাবু ডাকিলেন, "হরিধন।"

"আজ্ঞে।"

"তুমি এ খামখানি খুলেছিলে?"

হরিধন যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "খাম?—আজ্ঞে আমি ত খুলিনি।"

ভূপালবাবু তাহাকে ভেঙ্গাইয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে তুমি ত খোলনি, তবে কে খুলেছিল?"

"কে খুলেছিল কি জানি? আমি ত বিন্দুবিসর্গও জানিনে।"

ভূপালবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ফের মিথ্যে কথা!"

"আজ্ঞে আমি খুলিনি; পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারি, খুলিনি।"—বলিয়া হরিধন পটাপট কোটের বোতাম খুলিতে আরম্ভ করিল।

ভূপালবাবু বলিলেন, "আর তোমার পৈতে ছুঁয়ে শপথ করে কাজ নেই। পৈতের ভারি ত মান রাখছ কিনা। ছি ছি ছি—এমন কদর্য্য প্রবৃত্তি কেন তোমার? এক ত অন্যায় কাজ করেছ, আবার মিথ্যে বলে তা ঢাকবার চেষ্টা করছ? ছিঃ—অতি নীচ তুমি।"—বলিয়া ভূপালবাবু স্থানান্তরে গেলেন।"

"আমার নামে মিছামিছি বদনাম!—বলিয়া গজ গজ করিতে করিতে হরিধন বাহির হইয়া গেল।

বেড়াইয়া ফিরিয়া সে শয়ন করিতে গেল। রাত্রে আহারের সময় চাকরেরা তাকে অনেক ডাকাডাকি করিল—হরিধন উঠিল না। শেষে ভূপালবাবু স্বয়ং আসিয়া ডাকিলেন। সে বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন দিন হরিধনের স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে শীত গেল, বসন্তকাল আসিল।

ইদানিং হরিধনের উপর ভূপালবাবু বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ক্যাশবাক্সে টাকা থাকিত—টাকা প্রায়ই কমিয়া যায়; হিসাব মিলাইতে পারেন না। হরিধনই যে টাকা চুরি করিতেছে, এ সন্দেহ তাঁহার হইল। কিন্তু কোনও সাক্ষী সাবুদ পাইলেন না। হরিধন সাবধান হইয়া গিয়াছিল; যাহাতে কোনও ভৃত্য দেখিতে না পায়, এরূপ আটঘাট বাঁধিয়া তবে সে আজকাল অপকার্য্য করিয়া থাকে।

জামালপুর মুঙ্গেরের অতি নিকটে। রেলের একটা ষ্টেশন মাত্র। কিছু দিন হইতে হরিধন জামালপুরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। ভূপালবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"জামালপুরের আফিসে একটি চাকরির চেষ্টায় আছি।" জামালপুরে রেলের কয়েকটি বড় বড় আফিস আছে। ভূপালবাবু ভাবিলেন, জামালপুবে যদি চাকরি হয় তবে ভালই হয়—আপদ দূর হইয়া যায়।

সেদিন রবিবার। ভূপালবাবু বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। লোকটি দক্ষিণ হস্তে একটি ছাতা, বাম হস্তে গামছায় জড়ান ধুতি।

আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া ভূপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"আমি এই ট্রেনে জামালপুর থেকে এলাম।"

"আপনার নাম?"

"আমার নাম শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায, আমি জামালপুবের লোকো আফিসে কর্ম্ম করি।"

"বসুন। কি মনে করে আগমন?"

"আজ্ঞে গঙ্গাস্নানে এসেছি। তাই মনে কবলাম, আপনাব সঙ্গে একবার দেখাটাও কবে যাই।"

"বেশ।"—বলিয়া ভূপালবাবু প্রতীক্ষা কবিলেন।

বাবুটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হরিধন বলে আপনার একটি ভাই আছে না?"

"হ্যাঁ আছে। জ্ঞাতিসম্পর্ক।"

"হরিধন প্রায়ই আমার ওখানে যায়-টায়। আপনাকে বলেছে বোধ হয়?"

"কই—না।"

বৃদ্ধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে—বছর বারো তেরো বয়স, এখনও বিবাহ দিয়ে উঠতে পারিনি। আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে জানেনই ত! তায় আমার টাকার জোর নেই—সামান্য পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পাই, তাইতেই কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনাকে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে দেখাই। বাপ হয়ে নিজ মুখে আর কি বলব, ভরসা করি, আমার মেয়েটিকে দেখলে আপনার অপছন্দ হবে না।"

ভূপালবাবু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "আমাকে মেয়ে দেখাবেন?—কেন?"

রাসবিহারীবাবু একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে যদি আপনার পছন্দ হয়—তাহলে—হরিধনের সঙ্গে—"

বাধা দিয়া ভূপালবাবু বলিলেন, "হরিধনের সঙ্গে বিয়ে?—অসম্ভব।"

বৃদ্ধ বিনয়সূচক একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "হরিধন বিয়ে করতে রাজী হবে না, এই ধারণাতেই বোধ হয় আপনি এটা অসম্ভব মনে করছেন? তা, সে সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে। বাড়ীতে শুনেছি, আমার সন্নযুকে দেখে ওর ভারি পছন্দ হয়েছে। এমন কি—কথাটা আপনার কাছে প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে কি না জানি না—ও নাকি বলেছে,

অভিভাবকদের অমতেও বিবাহ্ করতে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে। এতদিন হরিধন বিয়ে করতে চায়নি, কত বড় বড় সম্বন্ধ ফিরে গেছে, এখন বিয়ে করতে ওর মন হয়েছে শুনে আপনাদের খুবই আহ্লাদ হবে। আপনি মহৎ ব্যক্তি—আমি কন্যাদায়গ্রস্ত—আমার প্রার্থনা বিফল করতে পারবেন না এই ভরসাতেই আসা।"

শুনিয়া ভূপালবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হরিধনের এই নূতন কারসাজির পরিচয় পাইয়া ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাসবিহারীবাবু মনে করিলেন, হয়ত ইনি ভাবিতেছেন, ছেলেকে বশ করিয়া পণের টাকা ফাঁকি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। তিনি বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন—"আমি গরীব মানুষ হলেও, নিতান্ত কিছুই যে দেব না, তা নয়। আমার এই একটিমাত্র মেয়ে, আর ছেলেপিলে নেই। এই মেয়েটিকে পার করতে পারলেই আমাব খালাস। আমার পৈত্রিক কিছু ছিল, আর দেশের বাড়ীখানা বাঁধা দিয়ে কিছু ধারও পাব। পাঁচশো টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, আর পাঁচশো টাকা বরাভরণ দানসামগ্রীতে, এই দু হাজার টাকা আমি কষ্টে সৃষ্টে দিতে পারব। হরিধনকে বলেছি, সে তাতেই রাজি। অবশ্য আপনাদের পক্ষে এ কিছুই নয়। আপনাদের সম্মান রক্ষা করতে পারি, এমন সাধ্য আমার কই? গরীব ব্রাহ্মণকে দায় হতে উদ্ধার করুন।"—বলিয়া বৃদ্ধ ঝুঁকিয়া ভূপালবাবুর পদস্পর্শ করিবার উপক্রম করিলেন।

"হাঁ হাঁ করেন কি—করেন কি!"—বলিয়া ভূপালবাবু তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন; বাবুটিকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি হরিধনের বিষয় ভাল করে অনুসন্ধান করেছেন কি?"

"আজ্ঞে আপনার ভাই—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আমি কোনও অনুসন্ধান করিনি, তবে হরিধন সকল কথাই বাড়ীতে আমাব স্ত্রীর কাছে বলেছে।"

"সকল কথা বলেছে?—ওর এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তা বলেছে?"

এই কথা শুনিয়া রাসবিহারীবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"স্ত্রী বর্ত্তমান!—বলেন কি? স্ত্রী বর্ত্তমান!"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ও ত বলেছিল, ওর এক বিবাহ ছিল বটে—কিন্তু সে স্ত্রী আজ দুবছর হল গত হয়েছে। কোন ছেলেপিলেও নেই।"

"ছেলেপিলে নেই বটে, কিন্তু স্ত্রী জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে। যদিও গত হলেই সে হতভাগিনীর সকল কষ্ট ঘুচতো বটে।"

"বলেন কি?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাই ত! এমন—তা ত জানতাম না। বলেছিল, দু'বছর হল স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে—সেই থেকেই ওর মনে একটা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—তাই আর বিয়ে কবেনি। কত বড় বড় সম্বন্ধ এসে ফিরে গেছে। এমন কি, গত অগ্রহায়ণ মাসে উত্তরপাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে এক সম্বন্ধ এসেছিল, তারা নগদে জিনিষে গহনায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, তবুও বিবাহ করেনি!"

ভূপালবাবু বলিলেন, "বিলকুল মিথ্যে কথা।"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"দেখুন একবার! সতীনে ত আমি মেয়ে দেব না—তা যতই বড়লোক হোক। আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয়, ঐ একটিমাত্র মেয়ে, একজন সচ্চরিত্র গরীবের হাতে পড়ে যদি একবেলা খেয়েও থাকে, সেও ভাল, তাতেও আমার মেয়ে সুখে থাকবে। সম্পদের লোভে সতীনের উপর আমি মেয়ে দিতে পারব না—প্রাণ থাকতে নয়।"

"ও বুঝি নিজেকে একজন মস্ত সম্পত্তিশালী বলে আপনাদের কাছে বড়াই করেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে, ওর জমিদারির আয় বছরে পনেরো ষোল হাজার টাকা। এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছে, ওর পকেটখরচের জন্য ওর গোমস্তা মাসে মাসে ২০০ টাকা করে পাঠাচ্ছে। গোমস্তা টাকা পাঠাতে এ মাসে দেরী করেছে বলে আমার কাছে সেদিন ৫০ টাকা ধার নিয়ে এল। বিষয় সম্পত্তির কথাও সব মিছে নাকি?"

"একেবারে মিছে। বিষয় সম্পত্তির মধ্যে ওর বিঘে পঞ্চাশ ব্রহ্মোত্তর জমি আছে; কতক খাজনায় বিলি করা, কতক ভাগে চাষ কবায়, তাইতে কোন বকমে সংসার চালায়।"

বাবুটি ইহা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"তা হলে ত গরীবের ৫০টি টাকা গেল দেখছি। সেই দিনই মাইনে পেয়ে টাকাগুলি এনেছিলাম মশায়, বাক্সতেও তুলিনি। সেই টাকা ক'টি ওকে দিয়ে, পুঁজি ভেঙ্গে মাসকাবারের চাল ডাল কিনেছি।"

এমন সময় দেখা গেল, মস্তকে বাঁকা টেরি, গায়ে শার্টের উপর গলাখোলা ইংরাজি কোট, হাতে (ভূপালবাবুরই) রূপা বাঁধানো মরক্কা বেতের ছড়ি, লম্বা কোঁচা, ক্ষুদ্র নবাবটির মত হরিধন প্রাতভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। হইলে হইতে-পাবিত শ্বশুরটিকে অসময়ে অস্থানে উপস্থিত দেখিয়া সে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু ভূপালবাবু তাহাকে ডাকিলেন।

সে আসিয়া দাঁড়াইলে; ভূপালবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তুমি কি আর জচ্চুরি করবার জায়গা পেলে না? এই গরীব ব্রাহ্মণটির মাথা খেতে উদ্যত হয়েছ?"

হরিধন বলিল, "মাথা খেতে কি রকম?"

"এঁর মেয়েটিকে জচ্চুবি করে বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলে?"

"বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলাম বটে—কিন্তু জচ্চুবি কি করেছি? কুলীনের ছেলে, আমি ইচ্ছে করলে দশটা বিয়ে কবতে পারি। কেন করব না?"

"বিয়ে ত করতে পাব, কিন্তু এঁকে কি সব বলেছ?"

"কি বলেছি? উনিই ত বললেন, বাবা আমি গরীব—কন্যাদায়গ্রস্ত—আমার জাত রক্ষা কর। আমি বললাম, মশায় আমাব এক স্ত্রী রয়েছে যে, তা কি করে হবে? উনি বললেন, তা হোক—কত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সেইজন্যে অগত্যা আমি রাজি হয়েছিলাম। কি অন্যায়টা করেছি?"

বাবুটি বলিলেন, "হ্যাঁ হরিধন! তুমি ঐ কথা বলেছিলে?—না তুমি বলেছিলে—দু বছর হল তোমার স্ত্রী মরে গেছে?"

হরিধন চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।"

শুনিয়া বাবুটি কাঁদ কাঁদ হইয়া ভূপালবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি মিথ্যা কথা বলিনি—কেন মিথ্যা বলব? যদি দয়া করে আপনি একবার জামালপুরে আসেন ভূপালবাবু, তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিতে পারি, কার কথা সত্য, আর কাব কথা মিথ্যা।" হরিধন বলিল, "আপনার সব মিথ্যা কথা!"

ভূপালবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "বদমায়েস! পাজি!—চুপ করে থাক্। ধাপ্পাবাজি করেছিস—ধরা পড়ে কোথায় লজ্জিত হবি, না উল্টে ভদ্রলোকের অপমান!"

হরিধন ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "কেন ওঁকে আমি কি অপমান করলাম। উনিই ত আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন!—আমি ত—"

ভূপালবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আবার কথা কচ্চিস?—চুপ রাস্কেল। এই—তেওয়ারী!"

"জি হুজুর!"—বলিয়া তাঁহার দ্বারবান তেওয়ারী আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপালবাবু হুকুম দিলেন—"বাবুকা বাকস্, বিছাওনা, কাপড়ালেত্তা, ছাতা, জুতা, যাঁহা

যো কুছ হায়, সব হিয়া মাঙ্গাও!"—অন্য একটা ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"দোঠো কুলি বোলাও!"

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিধনের জিনিষপত্রগুলা সব আসিল। ভূপালবাবু বলিলেন, "বাক্স খোল—এর টাকা পঞ্চাশটা বের করে দাও।"

হরিধন বলিল, "টাকা ত—টাকা ত—এখন নেই।"

ভূপালবাবু ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি হল সে টাকা?"

"আজ্ঞে সে টাকা—সে টাকা খরচ হয়ে গেছে।"

"খরচ হয়ে গেছে?—কখ্খনো নয়—খোল বাক্স—দেখি।"

তথাপি হরিধন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ভূপালবাবু বলিলেন, "দেখ, ভাল চাও ত মানে মানে টাকাগুলি বার করে দাও, নইলে এখুনি কনষ্টেবল ডাকিয়া পাঠাইব—তোমার জচ্চুরি বের করে দেব!"

হরিধন কাঁপিতে কাঁপিতে বাক্স খুলিল। টাকা গণিতে গণিতে বলিতে লাগিল—"এঁর টাকা ত একটিও নেই, সবই খরচ হয়ে গেছে। এ ক'টি আমার নিজের ছিল—আগেকার—দেশ থেকে এনেছিলাম।"—গণনা ভুল হইয়া গেল—আবার গণিয়া টাকাগুলি রাসবিহারীর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল।

এই সময় কুলিরাও আসিয়া পৌঁছিল। ভূপালবাবু বলিলেন, "এই কুলিলোগ—চীজ্ উঠাও। বাবু যাঁহা যানে মাঙ্গে হঁয়া লে যাও।"—হরিধনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি এই দণ্ডে আমার বাড়ী হইতে দূর হয়ে যাও। আর আমি তোমার মুখদর্শন করিতে চাইনে।"

রাসবিহারী টাকাগুলি পকেটে লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মশায় করেন কি? শান্ত হোন—ওকে মাফ করুন! হাজার হোক আপনার ভাই। এই কুলিলোগ—যাও যাও। আসি মশায়—নমস্কার।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

ভূপালবাবু কুলিদের বলিলেন, "উঠাও চীজ্—দেখতা হায় ক্যা?—তেওয়ারী, তুম বাবুকো নিকালকে ফাটক বন্দ কর্ দেও। আওর কভি ঘুস্নে দেও মৎ।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া হরিধন ষ্টেশন অভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখে, পথের ধারে একটি শিরীষ বৃক্ষের ছায়ায় রাসবিহারীবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিধন তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "ওহে শোন শোন—দাঁড়াও!"

হরিধন দাঁড়াইল। তিনি কাছে আসিয়া স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কোথায় যাবে?"

"দেশে যাব।"

"গাড়ীভাড়ার টাকা সঙ্গে আছে?"

"না।"

"তবে?"

"বাক্সে একটা কোট আছে, একখানা আলোয়ান আছে, দেখিগে, ষ্টেশনে যদি কাউকে বিক্রী করে গাড়ী ভাড়ার টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি।"

বাবুটি পকেটে হাত দিয়া বলিলেন, "তার দরকার নেই। এই নাও—টিকিট কিনে যেও।"—বলিয়া পাঁচটি টাকা হরিধনের হাতে দিলেন। তাহার পর ছাতাটি খুলিয়া, স্নানার্থে কষ্টহারিণীর ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে পদচালনা করিলেন।

হরিধন দেশে পৌঁছিয়া পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"মুঙ্গেরে ভূপালদাদার বাড়ীতে যে সকল খৃষ্টানী কাণ্ডকারখানা, তাতে তাঁর বাসায় থেকে হিঁদুর ছেলের জাত বাঁচিয়া চলা দুষ্কর। মুর্গী ত তাঁর দুটি বেলার আহার, আর বিকেলের

জলযোগ। তাতেও অনেক কষ্টে সৃষ্টে, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কোনও রকমে জাত রক্ষে করে পড়েছিলাম। কিন্তু যেদিন স্বচক্ষে দেখলাম দাদার মুসমান আরদালী বেটা, দাদার জন্যে গোমাংস কিনে নিয়ে এল, সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না।

অমনি জিনিষপত্তর বেঁধে, কুলি ডেকে বেরিয়ে পড়লাম। দাদা কত বললেন, এ বেলাটা থেকে খেয়ে দেয়ে যেও—অন্ততঃ একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যাও—আমি বললাম, আজ্ঞে না থাক্—আমার তেষ্টা পায়নি।—অবশ্য সেখানে আমার শরীরে খুবই উন্নতি হচ্ছিল—আর মাস দুই থাকতে পারলে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়েই আসতাম। কিন্তু কি করি মশায়, ধর্ম্মের চেয়ে ত প্রাণ বড় নয়!—তাই চলে আসতে হল।"

[সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২১]

খোকার কাণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসের নূতন হিম লাগিয়া হরসুন্দরবাবুব যে কাসিটির সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আজিও ভাল হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, সারারাত্রি নিদ্রা নাই স্ত্রী পঙ্কজিনীর শুশ্রূষার গুণে যদি একটু বা ঘুম আসিল, দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই হরসুন্দরবাবু খক্ খক্ কবিয়া কাসিতে কাসিতে একেবারে উঠিয়া বসেন। দেড় মাস কাল অনেক প্রকার ঔষধপত্র হইয়াছে কিন্তু কিছুই ফল পাওয়া যায় নাই। কাসি আর কার না হয়?—তবে ভাবনার কথা এই যে ব্যাধিটা কৌলিক—হরসুন্দরবাবুর পিতার হইযাছিল এবং তাঁহাব দুইটি সহদোব অল্প বযসেই এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই কাবণে হবসুন্দববাবু একটু ভীত হইযা পড়িযাছেন। দুইটি কোম্পানিতে দশ হাজার টাকায় তাঁহার জীবন বীমা কবা ছিল, পলিসি দুইখানি এবং রসিদগুলি সেদিন বাহির করিয়া, স্ত্রীর জিম্মা কবিয়া দিয়াছেন। একখানি কোম্পানির কাগজ ছিল, সেখানিও পঙ্কজিনীর সাক্ষাতে তাহার নামে এনডোর্স কবিয়া রাখিয়াছেন।

হরসুন্দরবাবুর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরেব কাছাকাছি। পঙ্কজিনী ইঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই হরসুন্দরবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং সেই অবধি তিনি নববিধান সমাজের একজন বিশেষ উৎসাহশীল সভ্য। এম-এ উপাধি গ্রহণের পর আইন পরীক্ষাতেও পাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ওকালতী ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা কহিতে হয় শুনিয়া, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্কুল-মাষ্টারি কার্য্যে প্রবেশ করেন। বিগত পাঁচ বৎসর হইতে কোনও বে-সরকারী কলেজে তিনি অধ্যাপকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন। রামদয়াল মল্লিকের লেনে একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী, তিন বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র—তাহার নাম সত্যসুন্দর অথবা খোকা—রামটহল নামক একজন পশ্চিমী ভৃত্য এবং পিয়ারী নাম্নী একজন কাহার-কুলোদ্ভবা ঝি আছে, কিন্তু সচরাচর তাহাকে 'আয়া' বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর হরসুন্দরবাবু পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া ছিলেন, পঙ্কজিনী বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। পালঙ্ক হইতে দূরে একটি কোণে টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—আলো খুব কমানো ছিল—সেই সামান্য আলোকও পাছে হরসুন্দরবাবুর চোখে আসিয়া লাগে তাই একখানি 'সঞ্জীবনী' সেই ল্যাম্পের গায়ে হেলাইয়া আড়াল করা হইয়াছে। আয়া খোকাকে লইয়া কক্ষান্তরে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, বাড়ীটি নিস্তব্ধ। পঙ্কজিনী স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনে মনে 'মা কালী', 'মা

দুর্গা' প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-বহির্ভূত নিষিদ্ধ দেবতাগণকে ডাকিয়া সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেছিল, যেন তাঁহারা কৃপা করিয়া উপায়বিহীনার স্বামীটিকে সত্বর আরোগ্যদান করেন।

এরূপ একজন পুরাদস্তুর ব্রাহ্মের স্ত্রী কালী দুর্গাকে ডাকিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। নিজের যোগ্য স্ত্রীলাভ কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? হরসুন্দরবাবুরও ঘটে নাই। অনেক সময়েই দেখা যায় অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তির স্ত্রী উগ্রচণ্ডাস্বরূপিণী, মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণী বর্ণজ্ঞানহীনা, কোপনস্বভাব দুশ্চরিত্রের জীবন-সঙ্গিনী পাতিব্রত্যগুণ সমাজের আদর্শ-স্থানীয়া। যোগ্যের সহিত যোগ্যর যোজনা উপন্যাসের বাহিরে প্রায়ই হয় না—বিশ্বসৃষ্টির অনাবৃষ্টি বিশেষ করিয়া এইখানেই।

বিবাহের সময় পঙ্কজিনী যেরূপ গোঁড়া হিন্দু ছিল, ভিতরে ভিতবে এখনও সে তাহাই আছে। হিন্দুকন্যার পক্ষে একটু অধিক বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম কয়েক বৎসর স্বামীর অনাচার ও অহিন্দুয়ানী দেখিয়া সে যে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল এমন নহে—সে ভাবিত, আজিকালিকার লেখাপড়া জানা অধিকাংশ যুবকই ত ঐরূপ। পরে যখন হরসুন্দরবাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার পিত্রালয়ে ইহা লইয়া খুবই একটা গোলযোগ উঠিয়াছিল। এমন কি তাহার পিতা, জামাতার নিকট কন্যা পাঠাইবেন না বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া পঙ্কজিনী কাঁদাকাটা আরম্ভ করে এবং পিত্রালয়ে ফিরিবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল জানিয়াও, স্বামীর নিকট চলিয়া আসে। এখন পঙ্কজিনীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা কালী মা দুর্গা তাহার স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন, তবে চুল পাকিবার দাঁত নড়বার সময় তিনি অবশ্যই গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈত্রিক-ধর্ম্মের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবেন। এমন ত কতলোক আসিয়াছে। তাহাদেরই গ্রামের কুমুদিনীর পিতা এরূপ করিয়াছিলেন এবং ছেলেবেলায় মাতার সহিত সেই প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়ার কথা আজিও পঙ্কজিনীর স্পষ্ট মনে আছে।—পার্শ্বের একটি কক্ষ হইতে ঘড়িতে আটটা বাজিবার শব্দ আসিল। হরসুন্দর এইবার পাশ ফিরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"পঙ্কজ, ক'টা বাজল?"—এই কথাকয়টি বলিবার সঙ্গেই তিনি কাসিতে আরম্ভ করিলেন।

পঙ্কজিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাসি থামিলে বলিল—"আটটা বেজেছে। তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। ওষুধ এনে দিই!"

ঔষধ পান করিবার পর হরসুন্দরবাবু একটু সুস্থ হইলেন। একটি আধটি করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। খোকার কথা, ঘরসংসারের কথা, নিজের রোগের কথা কহিতে কহিতে বলিলেন—"পঙ্কজ, একটা কথা আজ ক'দিন থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি—"

পঙ্কজিনী বলিল, "কি কথা?"

হরসুন্দর বলিলেন, "দেখ, আমরা ত দুজনেই এ ক'বছর ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করেছি। আমি এই ধর্ম্ম মানবজাতির একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি। কিন্তু পঙ্কজ, তোমার বিশ্বাসটিও কি সেইরকম দৃঢ় হয়েছে?"

পঙ্কজিনী বিনা দ্বিধায় বলিল, "হয়েছে বইকি।"—সে জানিত, অন্যরূপ উত্তর করিলে স্বামী মনে ক্লেশ পাইবেন। আজ বলিয়া নয়, অনেকদিন হইতেই সে এই প্রকার কপটতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। প্রথম দুই এক বৎসর সে সত্য কথা বলিত, স্বামীর সহিত যথাবুদ্ধি তর্ক-বিতর্কও করিত—কিন্তু দেখিল, তাহাতে স্বামীকে আঘাত করা ছাড়া আর কোনও ফল হয় না। তাহার বিশ্বাস মিথ্যা বলাও পাপ, স্বামীর মনে ক্লেশ দেওয়াও পাপ; কিন্তু স্বামীর মনে ক্লেশ দেওয়ার পাপ, মিথ্যা বলার পাপের চেয়ে শতগুণ গুরুতর।

হরসুন্দব বলিলেন, "আচ্ছা, সে ত গেল ধর্ম্মসম্বন্ধে। সমাজনীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবি. স্ত্রীলোকদেব লেখাপড়া না শিখিযে ঘবে বন্ধ কবে রাখাব চেয়ে ওদেব রীতিমত

শিক্ষা দেওয়া আর স্বাধীনতা দেওয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর তা তুমি বিশ্বাস কর ত?"

পঙ্কজিনী মুখস্থ পড়ার মত বলিল, "তা আর নয়? পুরুষ, স্ত্রী উভয়ে মিলে ত সমাজ। পুরুষ লেখাপড়া শিখবে, স্ত্রীলোক মূর্খ হয়ে থাকবে—এমন হ'লে সমাজের আধখানাই যে অন্ধকারে ঢাকা রইল। স্ত্রীলোককে ঘরে বন্ধ করে রাখা সেই বর্ব্বরযুগের প্রথা মাত্র—তাতে কখনই মঙ্গল হতে পারে না।"—হরসুন্দরবাবু কিযৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। রামটহল এই সময় পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "মেমসাহেব, বাবুর জন্য বার্লি তৈয়ারী হইয়াছে, আনিব কি?"—পঙ্কজিনী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বার্লিটুকু এখন খাবে কি?"

হরসুন্দর বলিলেন, "থাক্। ন'টা বাজুক।"

তদনুরূপ আদেশ পাইয়া রামটহল চলিয়া গেল। হরসুন্দরবাবু স্ত্রীর হাতখানি নিজ হস্তযুগলের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "পঙ্কজ, আর—বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

এইবার ছলনা করিয়া মিথ্যা উত্তর দেওয়া পঙ্কজিনীর পক্ষে একটু কঠিন হইল। এ সম্বন্ধেও পঙ্কজিনী পুরাতন প্রচলিত হিন্দুমতই পোষণ করিত—কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এটার উল্টা উত্তর দিতে তাহার প্রাণে বাজে। স্বামী এতাবৎকাল বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন—তাই পঙ্কজিনী একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল।

হরসুন্দরবাবু পঙ্কজিনীর হাতখানির উপর স্নেহের সহিত, বড় ভালবাসিয়া, হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্নটির পুনরুক্তি করিলেন। পঙ্কজিনী তখন দুইদিক বজায় রাখিবার চেষ্টায়, থামিয়া থামিয়া বলিল—হ্যাঁ—তা মন্দ কি?—কারু কারু পক্ষে—দরকার হতে পারে।"

হরসুন্দরবাবু বলিলেন, "সেই কথাই ঠিক পঙ্কজ সেই কথাই ঠিক। এক সময়ে আমি মনে করতাম, ত্রিশ বৎসরের নিচে যে কোনও স্ত্রীলোক বিধবা হলে, তার পক্ষে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য—নইলে সামাজিক নীতিব হানি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমার সে মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয়েছে, স্বামী মারা গেলেও যার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না—এমন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধবা-বিবাহ করা বোধ হয় সঙ্গত নয়। তোমার কি বিশ্বাস পঙ্কজ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া পঙ্কজিনীর বুকের ভির্তরটা হঠাৎ যেন কি রকম হইল। তাহার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। চক্ষু দিয়া অশ্রুজল যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে কথা কহিতে পারিল না।—একটু অপেক্ষা করিয়া হরসুন্দরবাবু আবার জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস পঙ্কজ?"—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিল, "আমার কি বিশ্বাস, শুনবে?"

"বল।"

"আমার বিশ্বাস, যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, তার বয়স পঞ্চাশই হোক আর পনেরোই হোক, সে দশ ছেলের মা-ই হোক আর নিঃসন্তানই হোক, রাজরাণী হোক আর পথের ভিখারিণীই হোক—তার যদি কপাল পোড়ে—যদি সে বিধবা হয়—তাহলে আবার বিবাহ করা তার পক্ষে মহাপাপ, মহাপাপ।"—পঙ্কজিনী চুপ করিল। তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল না, থাকিলে দেখিতে পাইত, তাহার রোগক্লিষ্ট স্বামীর মুখে একটা প্রসন্নতার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরসুন্দরবাবুর পীড়া ক্রমশই বাড়িয়া উঠিল, উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। মাঝে মাঝে দুই একদিন করিয়া কলেজ কামাই হইতে লাগিল। একদিন একটু স্বস্থ

দেখা দিল। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে সে দিন ১৬ টাকা ভিজিট দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে একজন বিখ্যাত সাহেব-ডাক্তারকে আনিয়া দেখান হইল। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া হরসুন্দরবাবু একটু ভাল আছেন, আজ পাঁচ দিন পরে কলেজে গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরের পর পঙ্কজিনীর একজন সখী শরৎশশী আসিয়া দর্শন দিল। শরৎ পঙ্কজিনীর সমবয়স্কা, ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার স্বামী হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। শরৎশশী হিন্দুঘরের বধূ হইলেও, বেশ লেখাপড়া জানে—বরং পঙ্কজিনীর অপেক্ষা বেশীই জানে। স্বামীর কাছে একটু ইংরাজিও পড়িয়াছে। শবৎশশীর একটি ছেলে হইয়াছিল, সেটি পাঁচ বৎসরের হইয়া মারা যায়। পঙ্কজিনীর ছেলেটি নাকি কতকটা তাহারই মত দেখিতে। তাই শরৎ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া, খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরে। খোকাও মাসীমা বলিতে অজ্ঞান।

আজ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া শবৎশশী বলিল, "দেখ ভাই, তোমরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী, তাই হয়েছে মুস্কিল কিনা। নইলে এ রোগ ত এতদিন কোন্ কালে আরাম হয়ে যেত।"

পঙ্কজিনী আগ্রহের সহিত বলিল, "কেমন করে ভাই?"

শরৎ বলিতে লাগিল, "আমার বাপের বাড়ীর গ্রামে বাবা ষণ্ডেশ্বর বলে খুব জাগ্রত এক ঠাকুর আছেন। তাঁর যিনি পুরুত, হরিমোহন ঠাকুব, তিনি তেল পড়ে দেন। আর কিছু না, পোয়াটাক খাঁটি সর্ষের তেল সেখানে নিয়ে যেতে হয়। পুরুতঠাকুর তার উপর কি মন্তর তন্তর বলে, তেলের ভাঁড়টি সমস্ত রাত বাবা ষণ্ডেশ্বরের পায়ের কাছে রেখে দেন। পরদিন, বাবার প্রসাদী একটি বিল্বপত্র আর সেই তেল বুকে মালিস করতে হয়। বললাম কিনা, একেবারে ধন্বন্তরী—যে ব্যবহার করেছে সেই ভাল হয়ে গেছে।"

পঙ্কজিনী বলিল, "তা ভাই, আমরা ব্রাহ্ম বলে কি সে তেলে উপকার হবে না?"

"কেন হবে না—খুব হবে।"—এই সময় খোকা কোথা হইতে আসিয়া শরৎশশীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাসীব মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, মার দিকে ফিরিয়া বলিল—"থুব হবে—থুব হবে।"—শরৎশশী বালককে আদর করিতে করিতে বলিল, "দেখ, শিশুর মুখ দিয়ে ঠাকুব কি বলছেন শোন।"—পঙ্কজিনীর গা যেন শিহরিয়া উঠিল।

শরৎশশী বলিল, "কত মুসলমান পর্য্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ভাল হচ্ছে—আর তোমাদের হবে না? ঠাকুরদের কাছে কি হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান আছে ভাই? তাঁদের কাছে সব সমান।"— খোকা হাত নাড়িয়া বীর-বসাত্মক স্বরে বলিল—"থব্ থোমান।"

পঙ্কজিনী নিজের স্বামীর চরিত্র বেশ জানিত। বাবা ষণ্ডেশ্বরের তৈল শুনিলে ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিবেন ইহা নিশ্চয়। সুতরাং পঙ্কজিনী স্থির করিল, তিনি নিদ্রা গেলে গোপনে বিল্বপত্রটি মাথায় ছোঁয়াইয়া বুকে তেল মালিস করিয়া দিবে। সখীকে বলিল—"আচ্ছা ভাই, সে তেল তুমি আমাকে আনিয়ে দাও। আমি চুপি চুপি তাঁর বুকে মালিস করে দেব—তিনি জানতে পারবেন না। কবে নাগাদ আসতে পারে?"

শরৎশশী কোলের উপর খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল—"আমি আজই দেশে চিঠি লিখে দেব এখন। কিন্তু দেখি দাঁড়াও। চিঠি লিখে দিলে হয়ত তেল পাঠাতে তারা দেরী করবে; তার চেয়ে বরং একটা চাকরকে পাঠিয়ে দেব।"

"সেই হলেই ভাল হয়। তা হলে কালই যাতে পাঠান হয়, তাই কর ভাই। কখন গাড়ী আছে?"

"ভোরের গাড়ীতে পাঠাব। পরশু সেখান থেকে তেল নিয়ে বেলা বারোটার সময় বেরুলে, বিকালে এখানে এসে পৌঁছবে।"—পঙ্কজিনী মিনতির স্বরে বলিল—"তবে তাই দাও ভাই। তার যাবার আসবার গাড়ীভাড়া কত লাগবে? টাকা নিয়ে যাও।"

শরৎ বলিল, "সে বেশী কিছু নয়। তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি কাল সকালেই লোক পাঠাব এখন। কিন্তু আর একটা কথা আছে ভাই।" "কি?"

"ভাল হয়ে গেলে, বাবা ষণ্ডেশ্বরকে পূজো দিতে যেতে হয়। যে যেমন মানৎ করে। সে বৎসর আমার দেওরের যখন এই ব্যারাম বেড়েছিল, আমিও মানৎ করে তেলপড়া এনেছিলাম। তারপর, সে ভাল হয়ে গেলে, বাবার কাছে আমি ষোল আনার পূজো দিলাম, আর মাথায় এক সরা দুহাতে দুসরা ধুনো পোড়ালাম।"

পঙ্কজিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আমিও তাই করব। বাবা ওঁকে ভাল করে দিন, আমি গিয়ে বাবাকে ষোল আনার পূজো দেব, মাথায় এক সরা দুহাতে দুসরা ধুনো পোড়াব।"

শরৎ বলিল, "কিন্তু বাবু তোমাকে কি যেতে দেবেন ভাই?"

"জানতে পারলে কি আর যেতে দেবেন? কোনও একটা ছল করে যেতে হবে আর কি। সে যেমন করে হোক তখন করা যাবে। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাই!"

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শরৎশশী সন্তর্পণে তাহার মুখে একটি চুমো খাইয়া পঙ্কজিনীর কোলে তাহাকে দিয়া গৃহে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যদিন কলেজ হইতে হরসুন্দরবাবু পদব্রজেই বাড়ী আসিয়া থাকেন, কিন্তু আজ গাড়ীভাড়া করিয়া আসিলেন। ডাক্তার সাহেবের ঔষধে যেটুকু বা সুফল ফলিয়াছিল, আজ তিন ঘণ্টাকাল কলেজে চীৎকার করিয়া তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া, কষ্টে উপরে আসিয়া, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া পঙ্কজিনী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল, ডাক্তার সাহেবের সেই ঔষধ সেবন কবাইতে লাগিল; বেলা পাঁচটা বাজিতে হরসুন্দরবাবু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সন্ধ্যাব পব জ্বব-ঘোবে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।

ভৃত্য রামটহল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, ডাক্তাবকে খবর দিব কি?"

পঙ্কজিনী বলিল, "না, এখন ডাক্তারের কোনও প্রয়োজন নাই।" মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে বাবা ষণ্ডেশ্বর, আমি তোমারই পায়ে আশ্রয় নিয়েছি। তুমি যদি মুখ তুলে না চাও, তা হলে আমার কি উপায় হবে বাবা? আমি আর কোনও ডাক্তাব ডাকব না। তুমিই আমার ডাক্তার। যাতে আমার হাতের নোয়া বজায় থাকে তাই তুমি কর—দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমার।"—একটি টাকা বাহির করিয়া অচেতন স্বামীব কপালে ছোঁয়াইয়া, বাবা ষণ্ডেশ্বরেব পূজাব জন্য পঙ্কজিনী সেটি নিজ সিন্দুরকৌটায় তুলিয়া রাখিল।

রাত্রি ত কোনও ক্রমে কাটিয়া গেল। সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রাতে হবসুন্দরবাবুব ধর্ম্মবন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা দেখিয়া একজন ছুটিয়া সাহেব ডাক্তারকে আনিতে গেলেন। সাহেব আসিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইঁহারা যখন ঔষধ সেবন ও শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে পঙ্কজিনীকে উপদেশ দিতেছিলেন, সে তখন মাথা হেঁট করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "দেখুন, ওষুধপত্র অনেক রকমই হল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা না হলে এ রোগ ভাল হবে কি?"

ইঁহাদেব মধ্যে যিনি প্রাচীন ছিলেন তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি ঠিক বলেছ। ঈশ্বরের কৃপাই আসল জিনিষ। তাঁর কৃপা হলে বিনা ওষুধেও ভাল হতে পারে, কৃপা না হলে স্বয়ং ধন্বন্তরীও কিছু করতে পারবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা মা, সে খুব ভাল কথা। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি। আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা সকলে এসে, এখানে বসে ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁর কৃপাভিক্ষা করব। এটি পূর্ব্বে আমাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু পাপী আমরা—সে কথা আমাদের মনেই হয়নি। আজ তোমার কাছে শিক্ষা পেলাম মা কিন্তু ওষুধ বন্ধ করবাব

প্রয়োজন নেই। ওষুধও তাঁরই দান। তাঁর চরণামৃত মনে করে রীতিমত তোমার স্বামীকে সেবন করাও। সন্ধ্যার সময় আমরা আসব।"

সন্ধ্যার পর ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া দেখিলেন, অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে—তবে জ্বরটা একটু কম। একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি উত্তমরূপে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পঙ্কজিনীর অশ্রাব্য স্বরে গোপনে মত প্রকাশ করিলেন—আজিকার রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

তাহার পর সকল ব্রাহ্ম মিলিয়া রোগীর শয্যার নিম্নে মেঝের উপর বসিয়া একঘণ্টা কাল একান্ত মনে উপাসনা করিতে লাগিলেন। অদূরে পৃথগাসনে নিদ্রিত খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া, পঙ্কজিনীও ইঁহাদের সহিত সমবেত উপাসনার ভান করিতেছিল। সে কিন্তু মনে মনে বলিতেছিলেন—"বাবা ষণ্ডেশ্বর, কাল যতক্ষণ তোমার তেলপড়াটি এসে না পৌঁছায়, ততক্ষণ আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখ বাবা! তোমার তেলপড়া এসে পৌঁছলে আর আমি ভয় করিনে। দুঃখিনীর পানে মুখ তুলে চাও—দোহাই বাবা—সাত দোহাই তোমার।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরাকার পরব্রহ্মের অনুকম্পাতে হউক অথবা বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেলপড়ার গুণেই হউক,—ডাক্তারি ঔষধের প্রভাবেই হউক, অথবা রোগ-ভোগের কাল পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হরসুন্দরবাবু দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পঙ্কজিনীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।—এক মাস গেল, হরসুন্দরবাবু এখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহার চোখের কালি দূর হইয়াছে, কণ্ঠের অস্থি ঢাকিয়া আসিতেছে, বিলক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করেন, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়। বাবা ষণ্ডেশ্বরের প্রসাদী সেই শুষ্ক বিল্বপত্রটি, নিজের ব্রহ্মসঙ্গীত বহিখানির ভিতর চাপিয়া, পঙ্কজিনী বাক্সে লুকাইয়া রাখিযাছে। এখনও মাঝে মাঝে সেই বিল্বপত্রটি বাহির করিয়া সুযোগ মত নিদ্রিত স্বামীর মস্তকে স্পর্শ করায়।

শরৎশশী মাঝে মাঝে আসিয়া তাগাদা করে—"অনেক দিন হয়ে গেল, মানৎ রক্ষা না করাটা আর ত ভাল হচ্ছে না ভাই। শেষে কি বাবার কোপে পড়ে যাবে?"

কি অছিলা করিয়া পূজা দিতে যাওয়া যাইতে পারে, দুই সখীতে মিলিয়া প্রায়ই তাহার পরামর্শ হয়—কিন্তু কোনও মীমাংসা হয় না। শরৎশশীর পিত্রালয় সৃষ্টিপুর গ্রাম, পায়রা-ডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ পথ। এই পথেই সৃষ্টিপুরে পৌঁছিবার অর্দ্ধক্রোশ বাকী থাকিতেই বাবা ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরটি পাওয়া যায়। বিকালের গাড়ীতে রওয়ানা হইলে, রাত্রিটা সৃষ্টিপুরে থাকিয়া, পরদিন পূজা দিয়া অপরাহ্নকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসা যায়। কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি—কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে পঙ্কজিনী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না।—একদিন পঙ্কজিনী কপাল ঠুকিয়া স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ—শরৎশশী একদিনের জন্যে আমাকে তার বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চায়।"

হরসুন্দরবাবু কহিলেন, "কেন?"

"এই বেড়িয়ে আসবার জন্যে—আর কেন?"

"সেখানে খাবে কি?"

"তারা যা খায় তাই খাব—ডাল ভাত তরকারী।"

"তারা যে হিঁদু। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা থাকে। তারা যা রাঁধে বাড়ে, সমস্তই সেই শালগ্রামকে ভোগ দিয়ে তবে খায়। তুমি ত সে প্রসাদ খেতে পারবে না। তবে খাবে কি?"

হরসুন্দরবাবু কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ পঙ্কজ, আসল কথা তোমায় খুলে বলি। যারা মিথ্যা পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা কর, এটা আমি পছন্দ করিনে। সেখানে তোমার যাওয়া হবে না।"

ফাল্গুন মাস পড়িল। আজিও পূজা দিতে যাইবার কোনও কিনারা হইল না। একদিন শরৎশশী আসিলে পঙ্কজিনী বলিল, "আমার ত ভাই এই মুস্কিল, তুমি যদি গিয়ে আমার হয়ে পূজোটি দিয়ে এসো.তা হলে হয়না?"—শরৎ বলিল, "তোমার মানৎ সে ত নয়। তুমি মানৎ করেছিলে, নিজে গিয়ে বাবার পুজো দেবে, সরা পোড়াবে—একথা বললে চলবে কেন?—ছি ছি—ও কথা মনেও কোরো না। শেষকালে কি বাবার কোপে পড়ে যাবে?"

দিন দুই পরে একদিন হরসুন্দরবাবু কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে। খুক্ খুক্ করিয়া একটু একটু কাসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পঙ্কজিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি ভাল করিয়া তাহাব নিদ্রা হইল না। সে কেবল মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে আমায় মাফ কব বাবা! এক মাসের মধ্যে যেমন করে হোক গিয়ে তোমার পূজাটি দিয়ে আসব, তাতে আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক। আমার উপর কোপ কোবো না বাবা—আমার স্বামীকে ভাল রাখ।"—এবার হরসুন্দরবাবু অতি অল্পেই সারিয়া উঠিলেন এবং দুই সপ্তাহ পবে, পঙ্কজিনীর প্রার্থিত সুযোগটি উপস্থিত হইল।

হরসুন্দরবাবু একদিন কলেজ হইতে ফিবিয়া বলিলেন। "গুডফ্রাইডে উপলক্ষে চাবদিন ছুটি হচ্চে—এ চারদিন আমি বাড়ীতে থাকব না।"—পঙ্কজিনী বলিল, "কেন? কোথা যাবে?"

"আমরা ক'জন বন্ধু মিলে কয়েকটি গ্রামে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তণ করে আসব।"

"কোন্ কোন্ গ্রামে যাবে?"

"হালিসহরে আমাদের আড্ডা হবে। যাঁবা যাঁরা যাবেন তাঁদের মধ্যে কযেকজনের ঐ অঞ্চলে বাড়ী। কয়েকটি গ্রামে এক একদিন সঙ্কীর্ত্তন করবে।"—পঙ্কজিনী আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল—"একে এই কাহিল শরীব—কষ্টে অনিয়মে আবাব অসুখ করতে কতক্ষণ?"

হরসুন্দর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যদি ঈশ্বরেব কার্য্যে শবীরপাত হয় তবে তাব চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? কোন ভয় কোবো না পঙ্কজ , ঈশ্বব আমাকে রক্ষা কববেন।"

ছুটির প্রথম দিন প্রাতে হরসুন্দরবাবু যাত্রা কবিলেন। গতরাত্রে তিনি যখন নিদ্রায় অচেতন, সেই সময়ে পঙ্কজিনী বাবা ষণ্ডেশ্বরেব সেই প্রসাদী বিল্বপত্রটি বাহির করিয়া তাঁহার মাথায় বুকে বুলাইয়া দিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুক্র শনি রবি সোম চারিদিন ছুটি, সোমবার বিকালে হরসুন্দরবাবু গৃহে ফিরিবেন। শরৎশশী পিত্রালয়ে চিঠি লিখিয়া বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। শনিবার অপরাহ্ণের গাড়ীতে ইহারা যাত্রা করিল—সঙ্গে গেল শরৎশশীর দেবর উমাপদ।

শরৎশশীর মাতা প্রভৃতি মহা সমাদরে পঙ্কজিনীর অভ্যর্থনা করিলেন। বাড়ীর গোরুর গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে প্রাতে উঠিয়া ষণ্ডেশ্বরতলায় যাইয়া পূজা দিযা, সেখান হইতে পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশনে যাত্রা করিবার পরামর্শ হইল। শরৎশশীর মাতা ইহাতে প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, বাছারা আসিল, একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে পাবিলাম না—ইত্যাদি। কিন্তু শরৎশশী মাকে বুঝাইল, পঙ্কজের সংসারে সে একা, বাড়ীতে আর কেহ নাই, আজ অপরাহ্ণে উহার বাড়ী না ফিরিলেই নয়। পূজা দিয়া, আবার আহারাদির জন্য ফিরিয়া আসিলে বারোটার গাড়ী আর ধবা যাইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অন্য গাড়ী নাই ইত্যাদি।

প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, শরৎশশীর একখানি তসরেব শাড়ী পরিয়া পঙ্কজিনী প্রস্তুত

হইল। ট্রেনে জলযোগ করিবার জন্য লুচি প্রভৃতি বাঁধিয়া শরৎশশীর মাতা কন্যার হস্তে দিলেন। উমাপদ আহারাদি করিয়া পদব্রজেই যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইবে।

পূজা সমাপনান্তে শরৎশশীদের গাড়ী যখন পায়রাডাঙ্গা পৌঁছিল, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। তখনও উমাপদ আসিয়া পৌঁছে নাই।—বারোটা বাজিল, গাড়ী রাণাঘাট ছাড়িল, টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। পথ যতদূর দেখা যায়—তাহার মধ্যে উমাপদ নাই।

পঙ্কজিনী বলিল, "এখন কি উপায় হয়? এ গাড়ী না পেলে সেই সন্ধ্যের আগে ত আর গাড়ী নেই!"—শরৎ বলিল, "তার জন্যে আর ভয় কি? ঠাকুপো না এসে পৌঁছয়—আমাদেব রিটার্ণ টিকিট ত বয়েইছে, গাড়োয়ান গিয়ে আমাদের মেয়ে-কামরায় চড়িয়ে দেবে এখন, আমরা শেয়ালদয়ে নামব। সেখানে বাড়ী থেকে গাড়ী তো আসবেই।"

অবশেষে তাহাই হইল। উমাপদ পৌঁছিল না। গরুব গাড়ীর গাড়োয়ান অতুল গিয়া ইঁহাদিগকে মেয়ে-কামরায় উঠাইয়া দিল।

সঙ্গে বোতল ভরা দুধ ছিল, খোকাকে তাহা পান করান হইল। লুচি প্রভৃতি বাহির করিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ কবিল। ঘটিতে জল ছিল, মুখ হাত ধুইয়া ডিবা হইতে পান বাহির করিয়া খাইতে খাইতে গাড়ীর অপবাপব রমণীদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিল।

ট্রেন যখন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে প্রবেশ কবিতেছে, তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্ম্মের একস্থানে প্রায় পনেরোজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাদের সঙ্গে খোল করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, কয়েকজনের হস্তে ধ্বজা ও পতাকা। পঙ্কজিনী ও শরৎশশী উভয়েই জানালাব কাছে বসিযা ছিল—মাব কোলে থাকিয়া খোকাও অপার ঔৎসুক্যের সহিত বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছিল।

গাড়ী আবও নিকটে আসিলে পঙ্কজিনী ও শবৎ উভযেই চিনিল, হরসুন্দরবাবু সেই দলে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিবামাত্র তাহার যুগপৎ মুখ ফিরাইয়া লইল—কিন্তু খোকা সেইদিকে তাহার ক্ষুদ্র হস্তটি বাড়াইযা দিযা উল্লাসে চীৎকাব করিযা উঠিল—"বাবা—আমাল্ বাবা।"

পঙ্কজিনী গাযের রেশমী চাদরখানা তাড়াতাড়ি খোকাব মাথায ঢাকা দিয়া বলিল, "চুপ চুপ।"— খোকা বিপুল বিক্রমে হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বলিতে লাগিল—"আমি বাবাল্ কাছে যাব।" শরৎ বলিল, "চুপ, দুষ্টু ছেলে—কে তোর বাবা? না, তোর বাবা নয়।"

গাড়ী দাঁড়াইল।

ক্রন্দণেব উপক্রম করিয়া খোকা বলিল, "হাঁ আমাল্ বাবা। আমি বাবাল্ কাছে যাব।"

শরৎশশী জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ধ্বজাপতাকাধারী দলটি এই দিকেই আসিতেছে। পঙ্কজিনীও তাহা দেখিল, দেখিয়া নিজেব ও খোকার মস্তক উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বেঞ্চের কোণটিতে জড়সড় হইয়া বসিল। শবৎশশী উঠিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া জানালার কবাটগুলো তুলিয়া দিল।—ধ্বজাপতাকাধারী বাবুগুলি ছুটাছুটি করিয়া এই গাড়ীখানির কাছে আসিয়া বলিলেন—"মেযেদের গাডী, আগে চল।"—বলিয়া তাঁহারা ছুটিতে লাগিলেন। এক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—কামরার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ এই ব্যাপারটি অবাক হইয়া দেখিতেছিল। কেহ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

পঙ্কজিনী মুখ খুলিল—খোকাও মুক্তি পাইল। তাহাব মুখের ভাব এমন হইয়াছে যেন সে এইমাত্র একটা চুরি কি ডাকাতি করিয়া আসিল।—নিকটে একজন বৃদ্ধা বসিয়া হরিনামেব মালা ফিরাইতেছিল, সে ইহাদেব পানে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমরা কারা বাছা?"

পঙ্কজিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল।"

শরৎ বলি, "কেন গা?"

"তাই জিজ্ঞাসা করছি। মানুষ কি মানুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না?"

শরৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমাদের পরিচয় দিতে একটু বাধা আছে।"

এই উত্তর শুনিয়া গাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল এবং ইহাদের পানে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।—বৃদ্ধা কিন্তু নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, পরিচয়ই না হয় না দিলে। তোমরা কোথা যাচ্ছ বল দেখি।"

এই জেরায় বিরক্ত হইয়া শরৎশশী বলিল, "আমরা কাশী যাচ্ছি।"

"কাশী যাচ্ছ? সঙ্গে কে আছে?" "নারায়ণ।"

বৃদ্ধা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হলে সঙ্গে কেউই নেই বল!"

শরৎশশী বলিল, "যা বোঝ!"

বৃদ্ধা দুই চারিবার মালা ফিরাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যে ওখানে যে বাবুটিকে দেখে ছেলেটি বাবা বাবা করে উঠল, সে বাবুটি কে?"

পঙ্কজিনী এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল—"অত খোঁজে তোমার কাজ কি বাছা?"

"তিনি এই খোকার বাবা কি?"

শরৎশশী বলিল, "ক্ষেপেছ?—খোকার বাবার কি ঐ রকম চেহারা! খোকা কাকে দেখে কাকে মনে করেছে।"—বৃদ্ধা বলিল, "ছেলে বলছে বাবা—তোমরা বলছ বাবা নয়! এসব কি কাণ্ড? তোমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি?"

শরৎশশী বলিল, "হ্যাঁ, পালাচ্ছি। তুমি পালাবে আমাদের সঙ্গে? কাশী বেশ জায়গা।"

এই কথা শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?—আমায় তোরা এমন কথা বলিস? কালামুখী শতেকখোয়ারীরে—এ গাড়ীতে সব ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যাচ্ছে—এ গাড়ীতে তোরা পোড়াকপালীরা কেন উঠেছিস? রোস, এবার গাড়ী দাঁড়াক, টিকিট ম্যাষ্টারকে ডাকিয়া তোদের নাবিয়ে দিচ্ছি।"

পঙ্কজিনী এই নূতন গোলমালের সম্ভাবনা দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িল। বলিল—"বাছা রাগ কবছ কেন? ঠাট্টা ক'রে বলেছে বই ত নয়।"

বৃদ্ধা বসিয়া গজ্ গজ্ করিয়া আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

পঙ্কজিনী শরতের কানে কানে বলিল, "এখন কি উপায় হয় ভাই? উনি ত ঐ পাশের গাড়ীতেই রয়েছেন!"

শরৎ বলিল, "উনি কলকাতা যাচ্ছেন কি কোথায় যাচ্ছেন তার ঠিক কি? হয়ত পথে কোনও ষ্টেশনে নেমে যেতে পারেন। কোথাও হয়ত সঙ্কীর্ত্তন করতে যাচ্ছেন।"

পঙ্কজিনী বলিল, "তা হলেই বাঁচি। এখন ভরসা নারায়ণ।"

এই চুপি চুপি কথার কিয়দংশ বৃদ্ধার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং সে স্থির করিল, ইহারা বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইতেছে—পাশের গাড়ীতে এই খোকার বাপ আছে। পাছে ধরা পড়িয়া যায় সেই চিন্তায় ইহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।

এই সময় ট্রেন আসিয়া নৈহাটিতে দাঁড়াইল। ধ্বজাপতাকাধারী বাবুরা নামিয়া, মেয়েগাড়ীর নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন।

ইঁহাদিগকে দেখিয়া বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"ওগো বাবুরা—শোন শোন।"

বাবুরা কিন্তু শুনিতে পাইলেন না—চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তখন তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া একজন কুলীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী এখানে কতক্ষণ থামে রে?"

কুলি বলিল, "দশ মিনিট।"

বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। ভীড়ের মধ্যে ধ্বজাপতাকা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।—পঙ্কজিনী বলিল, "সর্ব্বনাশ করলে। ডাকতে গেছে বোধ হয়।"

শরৎ ঝুঁকিয়া বাহিরে তাকাইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই।"

পঙ্কজিনী কাতরভাবে বলিল, "তা হলে কি হবে? এখনি ত এসে পড়বেন?"

শরৎ উঠিয়া বলিল, "এস শিগগির এস।"—বলিয়া দ্বার খুলিয়া নিজে নামিল, পঙ্কজিনীকেও হাত ধরিয়া নামাইল। বৃদ্ধা যেদিকে তাহার বিপরীত দিকে চারি পাঁচখানা গাড়ী ছাড়াইয়া একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস দেখিতে পাইল। বলিল—"এস, এর মধ্যে উঠে লুকিয়ে থাকি। তা হলে আর আমাদের খুঁজে পাবে না—গাড়ী ছেড়ে দেবে।"—এদিকে বৃদ্ধা ভীড়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সেই বাবুর দলকে বাহির করিয়া নিকটস্থ একজনের গায়ে হাত দিয়া বলিল—"ওগো বাবা—তোমাদের একজনের—কার তা জানিনে—বউটি কাশী পালাচ্ছে।"

এই কথা শুনিযা সকলেই বৃদ্ধার মুখেব দিকে চাহিলেন। একজন সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বলছ বাছা? বুঝতে পারছিনে।"

বৃদ্ধা বলিল, "ওগো—নাম ত জানিনে, তোমাদেরই মধ্যে একজনের বউ, রঙটি শ্যামবর্ণ, এই গাড়ীতে পালিযে যাচ্ছে। কোলে একটি ছোট ছেলে আছে—সঙ্গে আর একটি স্ত্রীলোক আছে।"—এখন, এই দলের দুই তিনজনের গৃহে একটি ছোট ছেলেসুদ্ধ শ্যামবর্ণা বধূ ছিল। তাহাদেব বাড়ীও এই অঞ্চলে। অপর সকলে ইহাদেরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। হরসুন্দরবাবু কাছে আসিয়া বুড়ীকে বলিলেন, "তুমি কি পাগল নাকি?"

বৃদ্ধা চটিয়া বলিল, "পাগল বইকি! তোমাদের কথাতেই পাগল। গাড়ী যখন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে ঢুকছিল, তোমবা পেলাটফরমে দাঁড়িয়েছিলে, আমাদের মেয়েগাড়ীতে একটি তিন চার বছরের ছেলে, তোমাদের একজন কাকে দেখে বাবা বাবা বলে চেঁচিয়ে উঠল। তার মা তাকে থামাতে পাবে না। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি সেই ছেলের মা-টি আর সেই অন্য স্ত্রীলোকটি কাশী পালিয়ে যাচ্ছে। যদি ধরতে চাও ত আমার সঙ্গে এস। না ধরতে চাও আমাব বযেই গেল। আমি চললাম—এখনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।"—বলিয়া বৃদ্ধা খব্ খব্ কবিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাবুরা পবস্পবের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেরই মনে হইল আমার স্ত্রী কখনই নয়, তাহা একেবারে অসম্ভব—দলের অন্য কাহারও স্ত্রী হইতে পারে, সুতরাং পরোপকারার্থ সকলেই উৎসাহিত হইযা উঠিলেন। সেই সব ধ্বজাপতাকা লইয়া সকলেই বৃদ্ধার পশ্চাৎবর্তী হইলেন।—মেয়ে-কামবাব নিকট পৌঁছিয়া বৃদ্ধা বলিল, "এই গাড়ী।"—দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিযা দেখিল, তাহাবা নাই।—বাবুরা পৌঁছিয়া দেখিল, "কই? কই?"

বুড়ী বলিল, "এই গাড়ীতেই ত ছিল। নেমে কোথায় পালিয়েছে।"

একজন বাবু বলিলেন, "দেখলাম মশায়, আমি সেই কালেই ত বলেছি মাগী উন্মাদ পাগল, মিছামিছি আমাদেব ছুটোছুটি করালে।"

একজন স্ত্রীলোক বলিল, "তাবা নেমে, ঐদিকে একখানা গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে।"

"সচক্ষে দেখেছি। ঐ—ঐখানটায"—বলিযা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীখানা দেখাইয়া দিল।—বাবুরা [illegible] তখন সেই দিকে ছুটিলেন। গাড়ী ছাড়িবারও [illegible]।

অগ্রগামী বাবুটি ছুটিয়া সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর নিকট গেলেন। জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া, হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিলেন—"এইখানে—এইখানে—আসুন—আসুন।"—গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া ড্রাইভারকে সবুজ লণ্ঠন দেখাইল।

অপর বাবুগণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠেলাঠেলি করিয়া সেই পনেরোজন

কামরার মধ্যে উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—ভিতরে দাঁড়াইয়া বাবুরা দেখিলেন, বেঞ্চিতে একেবারে প্রান্তভাগে দুইটি স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া বসিয়া আছে। একজনের কোলে ছেলে আছে—জুতো-মোজা সুদ্ধ ছেলেটির পা দুটি বাহির হইয়া রহিয়াছে।

পরস্পরকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কার স্ত্রী?"—সকলে বিস্ময়ে স্ত্রীলোক দুইটির পানে চাহিয়া রহিলেন।—বন্ধজানালা গাড়ীতে অত লোকের নিঃশ্বাসে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। একটি বাবু কয়েকটি জানালার সার্সি ঝিলমিল নামাইয়া দিলেন।

অপর একটি বাবু উচ্চস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ গা তোমরা কার স্ত্রী?"

বলা বাহুল্য, কোনই উত্তর পাওয়া গেল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় একজন বলিলেন—"তোমরা কোথা থেকে আসছ, কোথা যাচ্ছ, আমাদের স্পষ্ট করে বল। লজ্জার এ সময় নয়।"

তথাপি স্ত্রীলোক দুইটি জড়পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল।

তৃতীয় একজন বাবু বলিলেন, "তোমাদের গতিক দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না। আমরা শুনেছি তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ। এ ভয়ানক অন্যায় কথা। তোমাদের পরিচয় দাও, নইলে পরের ষ্টেশনে পুলিশ ডেকে তোমাদের ধরিয়ে দিব।"

শরৎশশী এবার উস্‌খুস্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। মুখ হইতে চাদর সরাইয়া সরোষে সে বলিয়া উঠিল—"কি!—আপনারা আমাদের পুলিসে ধরিয়ে দেবেন! পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামুক, দাঁড়ান, কে কাকে পুলিসে ধরিয়ে দেয় তা দেখছি! আপনারা স্ত্রীলোকের কামরায় উঠেছেন কোন্ সাহসে? স্ত্রীলোকের কামরায় পুরুষ উঠলে কি হয় তা কি জানেন না?"

এই কথা শুনিয়া বাবুরা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একজন বলিলেন—"এটা কি মেয়েদের কামরা নাকি?"—যে বাবুটি দ্বারের নিকটে ছিলেন, তিনি মাথা বাহির করিয়া লেবেল পাঠ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—লেডিজ লেখা রয়েছে বটে।"

শরৎশশী প্রথমটা আন্দাজে বলিয়াছিল, এবার সুযোগ পাইল। পূর্ব্ববৎ ক্রোধের ভান করিয়া বলিতে লাগিল—"আপনারা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত অসচ্চবিত্র লোক। দুটি স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় গাড়ীতে বসে আছে, আপনারা কি অভিপ্রায়ে হুড়মুড়িয়ে সে গাড়ীতে উঠে পড়লেন? আপনারা নিশ্চয়ই নেশা করেছেন।"—বলিয়া শরৎশশী সিংহিনীর ন্যায় বাবুগুলির পানে চাহিয়া রহিল।—একজন বাবু বলিলেন, "অমন কথাটি বলবেন না। আমরা কেউই মদ খাই না। আমরা বলি—মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং।"

শরৎ অধিকতর তীব্রস্বরে বলিল, "মদ না খেয়ে থাকেন, তাড়ি খেয়েছেন। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠে গুণ্ডামি করবার চেষ্টা করলে কি ফল হয়, সে শিক্ষা আজ আপনাদের ভাল রকমই হবে। আপনাদের কারু কাছে বোধ হয় সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নেই?"

সেকেণ্ড ক্লাসের ত নহেই—কোনও ক্লাসের টিকিট কাহারও কাছে ছিল না। ইঁহারা নৈহাটিতে সঙ্কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া, কাঁচড়াপাড়া হইতে নৈহাটির ইন্টারমিডিয়েট টিকিট কিনিয়াই সকলে আসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অনেকেরই মুখে ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। একজন সাহস করিয়া বলিলেন—"আপনাদের কাছে কোন্ ক্লাসের টিকিট আছে দেখি?"

শরৎ বলিল, "টিকিট দেখবেন? দাঁড়ান—গাড়ী থামুক—পুলিস ডেকে আপনাদের ভাল করেই টিকিট দেখাব। আমার পাশে যিনি বসে রয়েছেন, ইনি কার স্ত্রী আপনারা জানেন? ইনি যাঁর স্ত্রী, তিনি মনে করলে, আপনাদের প্রত্যেককে একটি বছর করে জেলে পাঠাতে পারেন। ঘুঘু দেখতে এসেছিলেন এবার ফাঁদ দেখুন।"

বাবুরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"উনি বোধ হয় কোনও জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।" একজন বিনীত স্বরে বলিলেন—"আমরা ত কোনও অসদভিপ্রায়ে আসিনি।"

"কি অভিপ্রায়ে এসেছিলেন, আদালতে প্রমাণ করবেন।"

হরসুন্দরবাবু এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্যাপার এ পর্য্যন্ত গড়াইলে, আর নীরব থাকা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। বুঝিলেন সেই পাগলা বুড়ীর কথা শুনিয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইঁহাদের খোসামোদ ভিন্ন আর উপায় নাই। সঙ্কীর্ত্তন করিতে আসিয়া পুলিস হাজতে বন্ধ হওয়া মোটেই প্রীতিকর নয়। এই ভাবিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে—দয়া করে আমাদের মাফ করুন। পরের ষ্টেশনেই আমরা সকলে নেমে যাব। আপনার পায়ে পড়ি আমাদের ক্ষমা করুন—ঈশ্বর জানেন—আমাদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই—চাদরঢাকা মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা।"

হরসুন্দরবাবু বলিয়া উঠিলেন—"কে? খোকা?"

চাদরের ভিতর হইতে "বু—বু—বু" একটা শব্দ হইল—কে যেন খোকার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। খোকা সজোরে জুতাসুদ্ধ পা দুটি ছুড়িতে লাগিল। মা ও ছেলেতে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মার গায়ের আবরণ খুলিয়া ছিঁড়িয়া ছেলে লাফাইয়া পড়িল। হরসুন্দরবাবু দেখিলেন—তাঁহার স্ত্রী—পরিধানে তসরের শাড়ী, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় সিন্দুর ও চন্দনলিপ্ত ফুলের মালা—আঁচল হইতে কতকগুলা চন্দনমাখা ফুল ও বিল্বপত্র গাড়ীর মেঝেতে ছিটাইয়া পড়িল।—হরসুন্দরবাবু স্তম্ভিত। খোকা আসিয়া তাঁহার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। অপর ভদ্রলোকগণ অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

হরসুন্দরবাবু বলিলেন, "খোকা, কোথা গিয়েছিলি বাবা?"

খোকা উৎসাহের সহিত শিরশ্চালনা করিয়া বলিল, "থাকুলেল্ পূজো দিতে। আমি গিয়েছিলাম, মা গিয়েছিল, মাছি গিয়েছিল! থাকুলেল্ মাথায় বলো বলো দুটো ছাফ—ফোঁস্। বেশ ভাল থাকুল।"

পঙ্কজিনী মাথায় গায়ে চাদর পুনরাবৃত করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। শরৎশশীও তদ্রূপ। যতক্ষণ সে মনে করিয়াছিল কেহ আমাকে চিনিবে না, ততক্ষণ সে বাচালতা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন ধরা পড়িয়া লজ্জায় সে মৃতবৎ। দণ্ডায়মান অন্যান্য বাবুগণ এই ব্যাপার দেখিয়া, কেহ ব্যঙ্গ কেহ সহানুভূতির দৃষ্টিতে হরসুন্দববাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ট্রেনের গতিবেগ হ্রাস হইতেছিল—ক্রমে বারাকপুরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য বাবুগণ টুপ্ টুপ্ করিয়া নামিয়া গেলেন। হরসুন্দরবাবু "হা জগদীশ্বর!"—বলিয়া মাথায় হাত দিয়া মাঝের বেঞ্চিখানির উপর বসিয়া পড়িলেন। ট্রেন বারাকপুর ছাড়িল।

খোকা মেঝে হইতে ফুল ও বিল্বপত্রগুলি কুড়াইয়া, "বাবা নাও—বাবা নাও" বলিতে বলিতে পিতার পাশে রাখিতে লাগিল। হরসুন্দরবাবু হঠাৎ দাঁত খিঁচাইয়া সেগুলি মুঠা মুঠা করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। পিতার ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া খোকা অপরাধীটির মত তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

দুই এক মিনিট বসিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরসুন্দরবাবু বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎশশী সভয়ে পঙ্কজিনীর কানে কানে বলিল, "মূর্চ্ছা গেলেন নাকি?"

পঙ্কজিনী তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে আসিল। তাঁহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—"ভাল আছ ত ? শুয়ে পড়লে কেন?"

হরসুন্দরবাবু কথা কহিলেন না। শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল।

পঙ্কজিনী স্বামীর শিয়রে বেঞ্চির উপর বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাতে বুলাইতে লাগিল। একটু পরে বলিল—"রাগ করেছ?'

হরসুন্দরবাবু চক্ষু বুজিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে উনি কে?"

"আমাদের শরৎ। ওদেরই বাড়ীতে গিয়েছিলাম।"

"হরসুন্দর ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কেন গিয়েছিলে?"

পঙ্কজিনী বলিল, "তুমি বাড়ী নেই। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ও বাপের বাড়ী যাচ্ছিল, আমায় বললে তুমি ও চল, দুদিন বেড়িয়ে আসবে। তাই গিয়েছিলাম।"—হরসুন্দর চক্ষু খুলিলেন। প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল বিষণ্ণভাবে স্ত্রীব পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"তোমাদের কপালে ও ফোঁটা কিসের? চন্দন মাখান সে সব ফুল বেলপাতাই বা কিসের?"

পঙ্কজিনী বলিল, "এসব—এসব—খোকা খেলা করবে বলে এনেছিলাম।"

স্ত্রীর এই মিথ্যাভাষণে হরসুন্দরবাবুর মুখে চক্ষে একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"তোমার কপালে ও ফোঁটাটা নিয়েও খোকা খেলা করবে নাকি? আর তুমি এ তসরের শাড়ীই বা পেলে কোথা?"—পঙ্কজিনী বলিল, "শরৎ আমায় পরতে দিয়েছিল।"

হরসুন্দরবাবু বলিল, "এ সব শাড়ী ত হিন্দু মেয়েরা পূজো করবার সময় পবে। এ শাড়ী পরে কোথায় গিয়েছিলে, কি কি করেছ সব সত্য করে আমায় বল। যে কাজ করেছ, সেই অপরাধই অমার্জ্জনীয়। মিথ্যা বলে আর অপরাধ বাড়িও না।"

পঙ্কজিনী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ কবিল। তেলপড়া আনাইবার পরামর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল।—শুনিয়া হরসুন্দরবাবু কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলেন, "পঙ্কজ, তোমার মনে এই ছিল? এতদিন ধরে তোমায় যে এত শিক্ষা দিলাম, সে সমস্তই কি ভস্মে ঘি ঢালা হল? ধর্ম্মবন্ধুদের সাক্ষাতে তুমি আমার মুখে চূণকালি মাখালে! সমাজে এ মুখ যে আমার আর দেখাবার উপায় রইল না পঙ্কজ!"

পঙ্কজিনী বলিল, "তোমার পায়ে ধরে বলছি, আমায় মাফ কর। নিতান্ত প্রাণেব দায়েই আমি এ কাজ করেছিলাম। সে তেলপড়াটুকু না পেলে আব কি তোমায় ফিবে পেতাম।"

হরসুন্দরবাবু বলিলেন, "সে পৌত্তলিক তেলপড়া বুকে মালিস কবে আরাম হওযার চেয়ে—আমার মৃত্যুই ভাল ছিল।"—ট্রেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

[মানসী, আশ্বিন ১৩২১]

যজ্ঞ-ভঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্ধ্যাচলে, বিন্ধ্যাদেবীর মন্দিরের অনতিদূরে গঙ্গার তটভাগে একখানি দ্বিতল বাটী দেখা যাইতেছে—বহির্দ্বারের উপর সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলক বৃহদক্ষরে লিখিত—"হিন্দু স্বাস্থ্যনিবাস।" নামটি যাহাই হউক, স্থানটি সাধারণ্যে 'বাঙ্গালী-বাবুকা-হোটেল" বলিয়াই পরিচিত। ভদ্র বাঙ্গালী তীর্থদর্শনে আসিলে, অনেকেই এখানে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। তাহা ছাড়া, প্রতি বৎসর পূজার পূর্ব্বে কতকগুলি সবলপ্রকৃতি স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের কুহকে ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়েন, কিন্তু আহারাদি ব্যবস্থা দেখিয়া কেহই স্থায়ী হন না।

আশ্বিন মাস পড়িয়াছে। একদিন প্রভাতে এই স্বাস্থ্যনিবাস বা বাঙ্গালী-বাবুকা-হোটেলের দ্বিতলস্থিত একটি কক্ষে, একজন স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকেব নিদ্রাভঙ্গ হইল। বদ্ধদ্বার ও ঈষন্মুক্ত জানালাগুলির ফাঁক দিয়া অল্প অল্প আলোক প্রবেশ কবিতেছে। চক্ষু খুলিবার পর প্রায় দুই মিনিটকাল, বাবুটি আলস্যবশতঃ শয্যায় রহিলেন। তাহার পর সহসা কি যেন মনে পড়াতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বিছানাব পাশে চেযাবের উপর তাঁহার গেঞ্জিটি, কাজটি রাখা ছিল; তাড়াতাড়ি সেগুলি পরিধান করিয়া, দ্বার খুলিয়া ডাকিলেন—"মথুরা!"

বাবুর নিজস্ব খানসামা মথুরা তখন বাবান্দাব কোণে দাঁড়াইযা গোপনে সিগারেট টানিতেছিল—তাড়াতাড়ি সেটি ফেলিযা দিয়া বলিল—"আজ্ঞে।"

"শীগ্‌গির তামাক দে"—বলিয়া বাবুটি জানালাগুলি ভাল কবিয়া খুলিয়া দিলেন। মৃদু মৃদু শীতল বাতাস আসিতে লাগিল। বিছানার উপর বসিযা তিনি গঙ্গার শোভা দেখিতে লাগিলেন।

ইঁহার নাম বঙ্কুবিহারী বসু। বাড়ী চব্বিশ-পবগণাব অন্তর্গত খালিশপুর গ্রামে। ইনি সম্পন্ন লোকেব সন্তান। বয়স ত্রিংশৎবর্ষ—কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিক দেখায়। ইনি একজন নব্যতন্ত্রের হিন্দু; মস্তকে একটি সুপুষ্ট শিখা ধারণ করেন। দেহখানি ক্ষীণ, বর্ণটি রক্তাল্পতাবশতঃ পাণ্ডু, চক্ষু দুইটি কোটরাগত, গাল ঝরিয়া গিয়াছে, অঙ্গুলিগুলি অস্থিসার। দেখিলেই মনে হয়—হ্যাঁ, স্বাস্থ্য জিনিষটার ইঁহার খুবই অভাব বটে। কলিকাতার কোনও কলেজে ইনি এফ-এ অবধি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবাব ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দেন। সে অবধি বাড়ীতেই বসিয়া আছেন। মধ্যে মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়া ছাপার কেতাব দেখিয়া, যোগশিক্ষা আরম্ভ করেন। বৎসরখানেক যোগ্যভ্যাসের পর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল—সে ভাঙ্গা আজিও জোড়া লাগে নাই। এখন আর বঙ্কুবাবু যোগাভ্যাস করেন না, তবে ও সকল বিষয়ে চর্চ্চা একেবারে ছাড়েন নাই।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। ধূমপানান্তে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, বঙ্কুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন মথুরা ইহার মধ্যে মেঝেটি ঝাঁট দেওয়াইয়া মাঝখানে একখানি কুশাসন বিছাইয়া রাখিয়াছে—সম্মুখে গঙ্গাজলের কোশা প্রভৃতি সজ্জিত। বাসি কাপড় ছাড়িয়া তসর পরিতে পরিতে বঙ্কুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"চায়ের জল ঠিক আছে?"

"আজ্ঞে।"

"আর টোষ্টগুলো কাল কাঁচা ছিল, আমার জাতটে কি মারবি? আজ খুব ভাল লাল করে নিস্—একটু পোড়া-পোড়া হলেও ক্ষতি নেই।"—"যে আজ্ঞে"—বলিয়া মথুরা প্রস্থান করিল।

উত্তমরূপে অগ্নিশোধিত না হইলে মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি ভক্ষণ বঙ্কুবাবু অতি অনাচার বলিয়া গণ্য করেন।

আহ্নিক-পূজা শেষ করিয়া বঙ্কুবাবু গীতা-পাঠ আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যে খানসামা এক পেয়ালা ধূমায়মান চা এবং একটা পাত্রে কয়েক টুকরো মাখন দেওয়া টোষ্ট আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। গীতার এক অধ্যায় শেষ করিয়া, চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া, চা-সহযোগে বঙ্কুবাবু সেই পাঁউরুটি ভক্ষণে রত হইলেন।

চা-সেবনান্তে বাবু অ র একবার তামাক হুকুম করিলেন। বলিলেন—"তামাক সেজে একখানা এক্কা ডেকে আন্‌ত—অষ্টভূজা যাব।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই নিবাসে আসিয়া কেহ অধিক দিন থাকে না; বঙ্কুবাবুও পলাইতেন—কিন্তু তাঁহার অবস্থিতির একটু বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। অষ্টভূজা পাহাড়ে উঠিবার সোপান-শ্রেণী যেখানে আবস্ত হইয়াছে, তাহার অনতিদূরেই একজন বাঙ্গালী তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী বাস করেন—নাম কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী। তাঁহার ক্ষমতা নাকি একটু অসাধারণ রকমের, করকোষ্ঠী বিচারেও তাঁহার নাকি আশ্চর্য্য পারদর্শিতা। কত লোকের কত কঠিন ব্যাধি নাকি তিনি আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। এই শোষোক্ত ক্ষমতার কথা শুনিয়া, কয়েকদিন হইতে মাঝে মাঝে বঙ্কুবাবু, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেছেন—কিন্তু এখনও কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। বাবাজী সহজে কাহাকেও ঔষধাদি দেন না। কেহ ঔষধ প্রার্থনা করিলে বলিয়া থাকেন—"বাবা, রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে যাও—আমি কি ডাক্তার?"—বঙ্কুবাবুও রোগের কথা পাড়িয়া প্রথম দিন এই উত্তরই পাইয়াছেন। যাহার উপর বাবার বিশেষ দয়া হয়, সেই নাকি ঔষধ পায়। ঔষধ বিশেষ কিছুই নয়—নির্ব্বাপিত হোমকুণ্ড হইতে একমুষ্টি ভস্ম (বিভূতি) তুলিয়া বাবা দেন। বঙ্কুবাবুর বিশ্বাস, যোগবল বা সাইকিক্ ফোর্সের দ্বারা সেই ভস্মগুলিতে এমন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায় যে, সেগুলিই মহৌষধে পরিণত হয়।

ধূমপান শেষ হইবার পূর্ব্বেই মথুরা আসিয়া সংবাদ দিল, এক্কা আসিয়াছে, তখন বেলা প্রায় আটটা। গলায় একখানা চাদর ফেলিয়া ছাতা লইয়া বঙ্কুবাবু বাহির হইলেন। ভৃত্যকে বলিলেন— এগারোটার সময় ফিরিবেন, স্নানের জন্য গরম জল যেন প্রস্তুত থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক্কাখানি ঝন্ ঝন্ করিয়া বিন্ধ্যাচলের বাজারের ভিতর দিয়া চলিল। হিন্দুস্থানী ললনাগণ স্নানান্তে, একহাতে ফুলের ডালি অন্যহাতে গঙ্গাজলপূর্ণ লোটা লইয়া, দলে দলে "বিন্ধ্য-মাই"র মস্তকে জল চড়াইতে যাইতেছে—তাহারা পথপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

বাজার পার হইয়া প্রশস্ত রাজপথ দিয়া এক্কা ছুটিয়া চলিল। দুই পার্শ্বে বিস্তর পাথরের কারখানা—শিল, যাঁতা প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বসতি ছাড়াইয়া পথ মাঠের মধ্যে পড়িল। একপার্শ্বে রেলওয়ে লাইন, অপর পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র। এইরূপ একমাইল পথ অতিক্রম করিয়া আর একটি বসতি দেখা গেল। পথের দুইধারে অনেকগুলি বাঁশের লাঠির দোকান। বসতি শেষ হইলে পথ রেলওয়ে লাইন পার হইয়া, আম্রবনের মধ্য দিয়া, অষ্টভূজা পাহাড়ের দিকে চলিল।—এক্কা হইতে নামিয়া আশ্রমে পৌঁছিয়া বঙ্কুবাবু দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর শয়নকক্ষের কবাট বন্ধ,—তাঁহার একটি শিষ্য-বালক ছায়াময় বারান্দার একপ্রান্তে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছে। বঙ্কুবাবু নিকটে গিয়া বলিলেন—"পাঁও লাগি বাবাজী!"

"জীব সহস্রম্"—বলিয়া এই ক্ষুদ্র বাবাজী বঙ্কুবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিল। বলিল— "বৈঠিয়ে বাবুজী। আজ এৎনা সবেরে?"

বঙ্কুবাবু বলিলেন, "বিকালে আসিলে সাধুবাবার সঙ্গে ভাল রকম কথাবার্ত্তা কহিতে পাই না—অনেক লোকজন থাকে—তাই আজ এবেলা আসিয়াছি। কিন্তু বাবাকে ত

দেখিতেছি না—কবাট বন্ধ কেন?"—চেলা বলিল, "এখনও গুরুমহারাজ জাগেন নাই।"

এখনও জাগেন নাই!—বঙ্কুবাবু জানিতেন, সাধু-মহাত্মারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। তাই তিনি একটু বিস্মিত হইলেন।—চেলা বলিল—"কাল শনিবার ছিল কিনা—তাই আজ উঠিতে এত দেরী হইতেছে; মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে উঠিবেন না।"

এ আবার কি কথা?—কলিকাতার বড়লোকেরাই ত বাগান-বাড়ীতে গিয়ে শনিবার করিয়া থাকে—রবিবারে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ঘুম ভাঙ্গে না। সাধু-সন্ন্যাসীরাও কি শনিবার করেন নাকি? তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"শনিবার ছিল, ত কি হইয়াছে?"

চেলা বলিল, "প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বাত্রে হোম হইতেছে কিনা। সাবারাত্রি হোম হয়। যে বাবুটি হোম করাইতেছিলেন, এই কতক্ষণ হইল তিনি ফিরিয়া গেলেন।"

বঙ্কুবাবু বলিলেন, "হোম হইতেছে? কিসের হোম, বাবাজী?"

কিসের হোম হইতেছে, বাবাজী আসলে কিছুই জানে না; কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে হাল্কা হইতে হয়। তাই গম্ভীরভাবে বলিল—"সে অতি গোপনীয় কথা।"

"কে করাইতেছেন?"

"আপনাদেরই একজন বাঙ্গালীবাবু।"

"বাঙ্গালী? কে? নাম কি?"

"জানি না।" "বাড়ী কোথা?"

"জানি না।"

ব্যাপাবটা কি জানিবার জন্য বঙ্কুবাবুর বড়ই কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুটি কতদিন এ হোম কবাইবেন?"

বাবাজী আন্দাজে বলিল, "তিন বাত্রি হইয়া গিয়াছে—এখনও আট রাত্রি হইবে; একাদশ রাত্রিতে পূর্ণাহুৎ।"—বঙ্কুবাবুর ধাবণা হইল, নিশ্চয়ই কোনও পীড়াব উপশমার্থ এ হোম হইতেছে। বাবাজীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা রকমে জিজ্ঞাসা কবিলেন—কিন্তু সদুত্তর পাইলেন না। তখন বঙ্কুবাবু এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। বলিলেন—"বাবাজী, যদি সকল কথা ঠিক ঠিক আমায় বল, তাহা হইলে গাঁজা খাইতে তোমায় দুইটি টাকা দিব।"

টাকা দুইটির লোভ সম্বরণ করা বাবাজীর পক্ষে দুষ্কর; অথচ সত্য বলিতে হইলে বলিতে হয়, "আমি কিছুই জানি না।"—সুতরাং বাবাজী বঙ্কুবাবুর চিত্তবিনোদনার্থ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিবে স্থির করিল। বলিল—"আচ্ছা বাবু যদি না-শুনিয়া আপনি নিতান্তই না-ছাড়েন, তবে বলিতেই হইবে—টাকা দুইটি দিন। কিন্তু খবরদার, কাহারও কাছে প্রকাশ না হয় যে, আমি এ সব কথা বলিতেছি। যদি প্রকাশ হয়, তবে গুরুমহারাজ আপনাকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবেন, আমাকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।"

বঙ্কুবাবু মৃদু হাসিয়া টাকা দুইটি দিলেন। বাবাজী তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

"সে বড় আশ্চর্য্য কথা বাবু। প্রতি রাত্রে দুইটি ক্যানেস্তারা করিয়া একমণ ঘি আসে। হোম হইতে থাকে—যখন আধমণ ঘি পুড়িয়া যায়, তখন অগ্নির মধ্য হইতে একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসে। গুরুমহারাজ তাহাকে হুকুম করেন, 'যাও, সমুদ্র হইতে ভাল ভাল মাণিক মুক্তা তুলিয়া আনিয়া বাবুটিকে, দাও।' বলিতেই সে স্ত্রীলোক চলিয়া যায়, সে স্ত্রীলোক আবার ফিরিয়া আসে, মুঠা মুঠা করিয়া কি সব জিনিষ বাবুকে দেয়, দিয়া আবার অগ্নির মধ্যে লুকাইয়া পড়ে।"—এই কাহিনী শুনিয়া বঙ্কুবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে যোগিনী-সাধন বলে, ইহা বোধ হয় তাহাই। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ত!—বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ?"—বালক খুব দৃঢ়ভাবে বলিল, "স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"কোন্‌খানে হোম হয়?"

"ঐ ঘরে"—বলিয়া বালক একটা জানালার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।—প্রাতে আসিয়া ভস্মাদি সে পরিষ্কার করিয়াছে সুতরাং জানে।

বঙ্কুবাবু জানালাটির পানে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহার একটি কবাটের কিয়দংশ উইপোকায় খাইয়া ছোট একটা গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছে। তখনই মনে মনে তিনি একটা মৎলব আঁটিয়া লইলেন।—কিয়ৎক্ষণ সেখানে বসিয়া, অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, বঙ্কুবাবু উঠিলেন। বলিলেন—"সাধুবাবার উঠিতে ত অনেক দেরী দেখিতেছি, আজ তবে চলিলাম। তাঁহাকে আমার প্রণাম দিও!—আসি তবে বাবাজী, পাঁও লাগি।"—বাবাজী হাত উল্‌টাইয়া বলিল, "জীব সহস্রম্‌।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রবি, সোম এবং মঙ্গল—এ তিনটি দিন বঙ্কুবাবুর যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা তিনিই জানেন।—যোগিনী-সাধন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে, তাহা তিনি পুস্তকেই পাঠ করিয়াছিলেন। সেই পরম গূঢ় ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন, এ চিন্তা প্রবল জ্বরের মত তাঁহার সমস্ত দেহ মনকে যেন আক্রমণ করিল।—দুই পাতা ইংরেজী পড়িয়া আজিকালি যাহারা অতি-প্রাকৃত বিশ্বাস করে না—তাহাদিগকে মনে মনে তিনি খুব ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন—

"There are more things in Heaven and Earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

মঙ্গলবারে সূর্য্য অস্তগমন করিলেন। আর ঘণ্টা চারি পরেই যাত্রা করিতে হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি—বড়ই অন্ধকার। পথটিও জনশূন্য—রাত্রে একাকী সেই পাহাড়ের ধারে যাওয়া উচিত হইবে কি? যদি কোনও বিপদ-আপদ হয়? মথুরা খানসামাকে সঙ্গে লইলে কেমন হয়?—বঙ্কুবাবু মনে মনে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর অন্ধকারও ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক জায়গায় একটা হোম হচ্ছে, তাই দেখতে যাব; ফিরতে যদি বেশী রাত্রি হয়, ত সেখানেই শুয়ে থাকব—কাল সকালবেলা আসব।"—মথুরা বলিল, "যে আজ্ঞে।"

একটি বিদ্যুতের বাতি পকেটে করিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। বঙ্কুবাবু একটা মোটা এণ্ডির চাদর গায়ে দিলেন—অধিক রাত্রে একটু ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বাজারে গিয়া একখানি এক্কা ভাড়া করিলেন।

এক্কাওয়ালা বলিল, "কোথায় যাইতে হইবে বাবু?"

"অষ্টভুজা। যাতায়াতের কত ভাড়া লাগিবে?"

"এত রাত্রে অষ্টভুজা?"

"আমার পূজা মানৎ আছে। অনেক রাত্রি অবধি পূজা হইবে। পূজা শেষ হইলে ফিরিব।"

"সেই পাহাড়ের নীচে, সমস্ত রাত্রি আমি থাকিব কি করিয়া বাবু? সেখানে জনমনুষ্য নাই।"

"তবে, কি হইবে?"—

এক্কাওয়ালা একটু ভাবিয়া বলিল, "যদি এক কাজ করেন বাবু—ত হয়!"

"কি বল?"

"আমি আপনাকে পাহাড়ের নিকট অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া, রেল-ফটকের কাছে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে ফিরিয়া অপেক্ষা করিব। আপনার কাজ শেষ হইলে, সেইখানে

আসিয়া আপনি আবার একা চড়িবেন। বেশী দূর ত নয়—বড় জোর একপোয়া পথ।—আর, অর্দ্ধেক ভাড়া আমায় আগাম দিতে হইবে।"

অগত্যা বঙ্কুবাবু তাহাতেই রাজি হইলেন। ভাড়া কত লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া একাওয়ালাও চতুর্গুণ ভাড়া হাঁকিয়া বসিল। তাহাতেই সম্মত হইয়া বঙ্কুবাবু যাত্রা করিলেন।—আমবাগানের মধ্যে একটা বৃহৎ পাকা ইন্দারা আছে; সেইখানে একা থামাইয়া বঙ্কুবাবু নামিয়া পড়িলেন। একার সামান্য লণ্ঠনটি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে—সে আলোকে বড় কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে নিস্তব্ধ। একাওয়ালা বলিল, "আর খানিকদূর অবধি আপনাকে লইয়া যাইব?"

"না—থাক্। তুমি রেল-ফটকের কাছে একা রাখিও। আমি ফিরিবার সময় তোমায় জাগাইয়া লইব।"—বলিয়া জুতাজোড়াটা একায় রাখিয়া দিলেন।

একা চলিয়া গেল। সেই সামান্য লণ্ঠনটির আলোকও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হওয়াতে অন্ধকার যেন ভীষণ হইয়া উঠিল। বঙ্কুবাবুর মনে হইতে লাগিল, চারিদিকে অদৃশ্য-ডাকিনী-যোগিনীগণ ধেই ধেই করিয়া যেন নৃত্য করিতেছে। ভয়ে তাঁহার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করতে লাগিল।

আশ্রমের অবস্থান অনুমান করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্কুবাবু অগ্রসর হইলেন। পাথরের টুকরায় হোঁচট খাইতে লাগিলেন, পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। উচ্চনীচ স্থানে পা পড়িয়া, দুই একবার পতনোন্মুখ হইলেন। বিদ্যুতের বাতিটি টিপিয়া খানিক পথ দেখিয়া লন—আলো নিবাইয়া, সেই পথটুকু অতিক্রম করিয়া, আবাব মুহূর্ত্তের জন্য সেটি জ্বালেন। জ্বালিয়া বাখিতে সাহস হয় না।

কিয়দ্দূর গমন করিলে, বৃক্ষশাখাব অন্তরাল দিয়া উর্দ্ধে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, উহা দেবী অষ্টভুজাব মন্দিব। আর কিয়দ্দূর গিয়া, সাধুবাবার আশ্রম হইতে নির্গত ক্ষীণ আলোকরশ্মিও দেখিতে পাইলেন। ক্রমে অত্যন্ত সাবধান পাদবিক্ষেপে, আশ্রমেব সমীপবর্ত্তী হইলেন।

বাহিরে কেহই নাই। দ্বার বন্ধ। দুই একটা জানালার ফাঁক দিয়া একটু একটু আলোক বাহিব হইতেছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিযা, পূর্ব্বদৃষ্ট সেই জানালাটির কাছে গিয়া বঙ্কুবাবু দাঁড়াইলেন। ছিদ্রপথে চাহিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর ধূনি জ্বলিতেছে—কিছুদূরে কালিকানন্দ বসিয়া আছেন। তাঁহার অন্তরালে আর এক ব্যক্তি—বঙ্কুবাবু ভাল দেখিতে পাইলেন না। কালিকানন্দের পরিধানে রক্তবস্ত্র, গলায় বড় একজোড়া রুদ্রাক্ষের মালা, দীর্ঘকেশ মস্তকের উপর ঝুঁটির আকাবে বাঁধা। সম্মুখে এক পাত্রে খানকতক লুচি এবং একটা বাটিতে মাংস রহিয়াছে। একটি বিলাতী মদের বোতলও রহিয়াছে। একটা কি সাদা পদার্থ—বাটির আকার—তাহাতে বাবাজী মদ ঢালিলেন। আঙ্গুলে করিয়া একটু মদ সেই লুচি ও মাংসের উপর ছিটাইয়া দিয়া, কি কতকগুলা মন্ত্র বলিতে লাগিলেন, তাহার পর খানদুই লুচির উপর কতকটা মাংস রাখিয়া, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া ডাকিনী যোগিনীগণের আহাবার্থ বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। এই সময় অপর ব্যক্তিকে বঙ্কুবাবু দেখিবার অবকাশ পাইলেন—লোকটি যেন পরিচিত বোধ হইল—কিন্তু সেই ধূনির সামান্য আলোকে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন না। কালিকানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"চন্দ্রনাথ—এস, প্রসাদ পাও।"

চন্দ্রনাথ নাম শুনিয়াই বঙ্কুবাবুর সন্দেহ দূর হইল। লোকটি উঠিয়া নিকটে আসিল। বঙ্কুবাবু দেখিলেন,—বিলক্ষণ চিনিতে পারিলেন। চন্দ্রনাথ আর কেহ নহে—তাঁহারই ভগিনীপতি সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা!—চন্দ্রনাথ মাসখানেকের অধিক, গৃহত্যাগ করিয়া পশ্চিম ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কুবাবু শুনিয়াছিলেন। তিনি যে বিন্ধ্যাচলে আছেন, আর যোগিনী-সাধনে মাতিয়াছেন তাহা বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও জানিতেন না।

আহার ও মদ্যপানের পর উভয়ে মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য বাহির হইলেন। সে সময়টা বঙ্কুবাবু জানালার নিকট হইতে সরিয়া, গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে লুকাইলেন।

ফিরিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া উভয়ে ধূনির নিকট বসিলেন। একখানা চক্‌চকে লোহার তাওয়া লইয়া, কয়লা দিয়া কালিকানন্দ তাহার উপর কি লিখিতে লাগিলেন। শেষ হইলে হাসিয়া বলিলেন—"দেখ—তোমার ভাইয়ের চেহারার সঙ্গে মিল্‌ছে কি?"

তাহার পর নানাবিধ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। কালিকানন্দ বলিলেন—"দেবীর ধ্যান কর। মনে মনে ভাব, মা যেন দীর্ঘকায়া কৃষ্ণবর্ণা, উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁব দুই হাতে যেন দুটো নরমুণ্ড—তাই তিনি চিবুচ্ছেন। এই রকম ধ্যান কর।"

চন্দ্রনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানশেষে কালিকানন্দ তাঁহাকে আরও কতকগুলো কি মন্ত্র বলাইতে লাগিলেন। সব কথা বঙ্কুবাবু ভাল ধরিতে পারিলেন না—তবে নিম্নলিখিত কথাগুলি বেশ বোঝা গেল—

ওঁ শত্রুনাশকার্য্যে নমঃ। সুরেন্দ্রনাথস্য শোণিতং পিব পিব মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ। এই মন্ত্র শুনিয়া বঙ্কুবাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। স্পষ্ট বুঝিতে পাবিলেন, ইহা যোগিনী-সাধন নহে—সুরেন্দ্রনাথকে মারিয়া ফেলিবার জন্য মারণ-যজ্ঞ হইতেছে!

কাঁপিতে কাঁপিতে বঙ্কুবাবু সেইখানে বারান্দার উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁহাব সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইতেছে। ক্রমে তিনি ভূতলশায়ী হইয়া চেতনা হারাইলেন।

এইভাবে কতক্ষণ কাটিল, বঙ্কুবাবু তাহা কিছুই জানেন না। যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন, পশ্চিম গগণে ক্ষীণদেহ চন্দ্রোদয় হইতেছে। মন্ত্রধ্বনি তখনও ভিতর হইতে শুনা যাইতেছে। স্পষ্ট শুনিলেন—"সুরেন্দ্রনাথং মারয় মারয় তস্য শোণিতং পিব পিব মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ।"

বঙ্কুবাবু তখন নিঃশব্দে উঠিয়া ধীবে ধীবে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। আম্রবনের ভিতরে থাকিয়া, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অনেক কষ্টে পথ চিনিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাব বুকের ভিতর যেন ঢেঁকি পড়িতেছে—হাতে পায়ে বল নাই—বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত।

দশ মিনিটের পথ অর্দ্ধঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বঙ্কুবাবু রেল-ফটকের কাছে উপস্থিত হইলেন। এক্কাওয়ালাকে জাগাইয়া, স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন তাঁহার মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। খানসামা বাবম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"বাবু, আপনার কি কোন অসুখ করেছে?"

বঙ্কুবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—হ্যাঁ শরীরটে ভাল নেই।"

সারাদিন বসিয়া বসিয়া বঙ্কুবাবু ভাবিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ পরলোকগত জমিদার কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র—তবে ইহারা সহোদর নহে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রনাথ বিষয়-সম্পত্তি দেখিতেন—সুরেন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত। সেই সময়েই সুরেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কুবাবুর পরিচয়। তিন বৎসব হইল, বঙ্কুবাবুব একমাত্র ভগিনী টুনুরাণীর সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। পরবৎসর সুরেন্দ্র বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী গেল; বলিল সে চাকরি করিবে না, ওকালতীও পড়িবে না, বাড়ীতে থাকিবে এবং দাদার সহিত মিলিয়া নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; যাহাতে গ্রামের উন্নতি হয়, প্রজার উন্নতি হয়,—সেই সকল বিষয়ে যত্নবান হইবে। চন্দ্রনাথ, ভ্রাতার সেই সংকল্পকে নিতান্তই আজগুবি খেয়াল বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠকে বিরত করিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই—কিন্তু সুরেন্দ্র অটল রহিল। ফলে, চন্দ্রনাথের সিংহাসনে ভাগ বসিল, জমিদারীতে তাঁহার একাধিপত্য খর্ব্ব করিতে লাগিল এবং উভয়ের আদর্শ ও ধর্ম্মবুদ্ধির বিভিন্নতাবশতঃ পদে পদে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। যে প্রজাকে শাসন করিবার জন্য, যাহাকে ভিটামাটি উচ্ছন্ন করিবার জন্য চন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর হন, সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যেই

তাহার পক্ষাবলম্বন করে। থানার দারোগাকে চন্দ্রনাথ এতদিন মৎস্য-মাংস-ঘৃত-দুগ্ধ ও নগদে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই দারোগা দুই প্রজার মধ্যে এক মোকদ্দমায় একজনের নিকট পান খাইবার জন্য ২০০ টাকা লইয়াছিল—এইমাত্র অপরাধে সুরেন্দ্র সেই প্রজাকে উত্তেজিত করিয়া নিজে খরচ দিয়া দারোগার নামে ঘুষের মোকর্দ্দমা দায়ের করাইয়াছিল। এইরূপে দুই ভ্রাতার বিচ্ছেদ ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে চন্দ্রনাথ এক প্রজাকে হাত করিয়া সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা ফৌজদারী নালিশ করাইয়া দেন। আদালতের বিচারে সুরেন্দ্র নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। সেইদিন আদালত হইতেই চন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ হইয়া যান—ইহা আজ দুই তিন মাসের কথা। এ সমস্তই বঙ্কুবাবু অবগত ছিলেন। মনোমালিন্য যতই হউক, ভাই হইয়া ভাইয়ের প্রাণনাশের জন্য চন্দ্রনাথ যে ক্রূরকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্কুবাবু ক্রোধে, ভয়ে ও দুঃখে বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মনে মনে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, এ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিফল হইবার নহে। এসম্বন্ধে তাঁহার একখানি পুস্তক ছিল, তাহা বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

"জপেদেকাদশাহে চ রোগঃ স্যান্নাত্রসংশয়ঃ।
দণ্ডধিকৈকবিংশাহে মৃত্যুরেবরিপোর্ভবেৎ।।"

বঙ্কুবাবু ভাবিতে লাগিলেন—'ছোকরা বাবাজী বলিয়াছে, তিনরাত্রি এরূপ হইয়াছে, এখনও আট রাত্রি হইবে।' তাহার এ সংবাদটি সম্ভবতঃ সত্য। যোগিনী-সাধনের যে বর্ণনাটি করিয়াছিল, দেখা যাইতেছে, সেটি মিথ্যা; রাত্রিকালে আশ্রমে সে থাকে না, কেমন করিয়া জানিবে? বেশ বুঝা যাইতেছে, টাকা দুইটির লোভে মিথ্যা বলিয়াছে। আরও সাতরাত্রি। এই ক্রূরকর্ম্ম হইবে—তাহার পর, সুরেন্দ্র রোগগ্রস্ত হইবে—একবিংশতি দিবস পরে অবধারিত মৃত্যু। বঙ্কুবাবু দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। একমাত্র ভগিনী টুনুরাণী, সবে এই তিন বৎসর মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে; পনেরো বৎসরের বালিকা—সে বিধবা হইবে? মেয়েটি বড় ভাল—বড় সুন্দরী—যেন প্রতিমাখানি; কত আদরের একটি মাত্র বোন—তাহার কপাল কি এমনি করিয়াই পুড়িয়া যাইবে? টুনুর বৈধব্যবেশ বঙ্কুবাবু কল্পনা চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং বারম্বার রুমালে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন।

এখন উপায় কি? কি করিলে এ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়?—ভাবিয়া চিন্তিয়া বঙ্কুবাবু স্থির করিলেন, আজ রাত্রির গাড়ীতেই মনোহরপুর যাত্রা করা আবশ্যক। সুরেন্দ্রকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া, দুইজনে পরামর্শ করিয়া, যাহা হউক একটা উপায় স্থির করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যনিবাসেই মথুরাকে অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া, বঙ্কুবাবু ট্রেনে উঠিলেন। বলিয়া গেলেন, দুই চারিদিন পরেই আবার তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

পরদিন মনোহরপুর গ্রামে অপরাহ্নকালে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সহিত কথোপকথন করিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথের বয়স অনুমান চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কান্তিমান যুবক—গুম্ফ ও শ্মশ্রু ক্ষৌরীকৃত। নাক চাপিয়া একযোড়া সোনার ফ্রেমযুক্ত "পাঁস্-নে" চশমার এক প্রান্ত হইতে সূক্ষ্ম রেশমী 'কার্' নামিয়া তাহার গলদেশে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বউদিদি সুরেন্দ্ররই সমবয়স্কা—হয়ত দুই এক বৎসরের বড় হইবেন। তাঁহার নাম কুমুদিনী। রঙটি সুরেন্দ্রের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। একখানি দুই-পাড়ের শাড়ী পরিয়া রহিয়াছেন। মুখখানি বিষণ্ণ। পুস্তকাদি বিক্ষিপ্ত একটি টেবিলের পাশে, চেয়ারে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়া—সম্মুখে কিয়দ্দূরে স্থাপিত সোফার একটি প্রান্তে তাহার বউদিদি হেলান দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

বউদিদি বলিতেছেন—"ঠাকুরপো, যাও—তুমি গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আন। যা হবার তা হয়ে গেছে, তাই বলে চিরদিন কি ভাইয়ে-ভাইয়ে বিচ্ছের্দ থেকে যাবে? কোন্ সংসারে

এমন না হয়? ঝগড়া-বিবাদ মন-কষাকষি হয়—আবার ক্রমে মিটমাট হয়ে যায় যেমন ছিল তেমনি হয়।"—সুরেন্দ্র বলিল—"তাই আশীর্ব্বাদ কর বউদিদি। তাই যেন হয়। কিন্তু আমার কি দোষ বল?"

"তোমার দোষ ত আমি বলছিনে ভাই। তিনি যত অন্যায়ই করে থাকুন, তবু তিনি তোমার দাদা—গুরুজন। দাদার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত? যা হয়ে গেছে, সে সব মন থেকে মুছে ফেল। তুমি যাও, গিয়ে তাঁকে নিয়ে এস। পূজো আসছে—যারা অতি দীনদরিদ্র, পেটের দায়ে বিদেশে থাকে, তারাও হাসিভরা মুখে বাড়ী আসছে—নিজের স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোনকে পেয়ে সুখী হচ্ছে। আর তোমার দাদা—এত বড় জমিদারীর মালিক যিনি—তিনি এ সময় গৃহত্যাগী হয়ে পথে পথে বেড়াবেন?"—শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে বউদিদির স্বর মোটা হইয়া আসিল—আর্দ্র চক্ষুযুগল সেই অপরাহ্নের আলোকে চিক্ চিক্ করিতে লাগিল।

কাছারি হইতে চন্দ্রনাথ সেদিন পশ্চিম-যাত্রা করিবার পর, মাসখানেক বাড়ীতে কোনও সংবাদই দেন নাই। মাসান্তে মথুরা হইতে তাঁহার পত্র আসিল। নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, এখন কিছুদিন হইতে তিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। দেওয়ানের নামে মাঝে মাঝে পত্র আসে, সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। কবে গৃহে ফিরিবেন, সে কথা চন্দ্রনাথ কিছুই লেখেন না।

আজ বিকালে দেওর-ভাজে সেই সকল কথাই হইতেছিল। কুমুদিনী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে কাঁদেন, দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে বড় কষ্ট হয়। তাহার জন্যই দাদা দেশত্যাগী হইয়াছেন, একথা ভাবিতেও তাহার ভাল লাগে না। সুরেন্দ্র এখন মনে করে, অত করিযা দাদার বিপক্ষতা করাটা ভাল কাজ হয় নাই। নিতান্ত উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াই তিনি ওরূপ আচরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অবনতমস্তকে ধীবে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ বলিল, "আমার ত কিছুতেই আপত্তি নেই বউদিদি; দাদা যদি ভালভাবে থাকেন, তা হলে সব গোলই মিটে যায়। তিনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, তাতে আমি রাগ করিনি বা দুঃখিত হইনি—এমন কথা বলতে পারিনে; তা হলে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু সে সব আমি ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি।"

কুমুদিনী বলিলেন—"বিন্ধ্যাচল কতদূর?" "কাশী আর এলাহাবাদেব মাঝামাঝি হবে।"

"তা হলে আর দেরী কোরো না ভাই।"—বলিয়া মিনতিপূর্ণ চক্ষে দেবরের পানে চাহিয়া রহিলেন।—সুরেন্দ্র বলিল—"যেতে আমি পারি বউদিদি। কিন্তু আসবেন কি? আমার কথা রাখবেন কি? আমার প্রতি তাঁর কেমন ভাব তা ত তুমি জান।"

বউদিদি বলিলেন—"এখন আর তাঁর মনের ভাব সে রকম নেই। কখখনো সে রকম নেই। তিনি ঝোঁকের মাথায় এক এক সময় একটা কাজ করে ফেলেন; তার পর যখন বুঝতে পারেন, যে অন্যায় করে ফেলেছেন, তখন তাঁর আপশোষের সীমা থাকে না। আমি তাঁকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি ত! নইলে দেখ না, কেবল তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?—মনে একটা অনুশোচনা তাঁর নিশ্চয়ই হয়েছে।"

সুরেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা বউদিদি—আমি তা হলে পরশুই রওয়ানা হই।"

এ কথা শুনিয়া কুমুদিনী বড়ই আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—"তাই যাও ভাই—গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তিনি লজ্জায় আসতে পারছেন না। তাঁর কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? তুমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেই তাঁর মুখটি রক্ষা হয়।"

সূর্য্যাস্তের সময় উপস্থিত। দেবরের জলযোগের আয়োজন করিবার জন্য কুমুদিনী বাহির হইয়া গেলেন। সুরেন্দ্র চেয়ারখানি ঘুরাইয়া টেবিলের সম্মুখে লইয়া, দেরাজ হইতে শাবরের চামড়া বাহির করিয়া তাহার "পাঁস্-নে" চশমাজোড়াটি পরিষ্কার করিল। তৎপরে গো-পালন সম্বন্ধে একখানি ইংরাজি বহি খুলিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বউদিদি বাহির হইয়া যাইবার পাঁচ মিনিট পরেই সুরেন্দ্রের স্ত্রী টুনুরাণী আসিয়া প্রবেশ করিল। পা টিপিয়া পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে স্বামীর বহিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল।

বৈজ্ঞানিক গোহালের বর্ণনামধ্যে নিমজ্জিত সুরেন্দ্রনাথের নাসারন্ধ্রে টুনুরাণীর কেশকলাপ হইতে উত্থিত একটি মৃদু-সুগন্ধ প্রবেশ করিল। তাহার মৃদুতর নিঃশ্বাসের শব্দও কানে গেল। সুরেন্দ্রের মনটি তখন গোহাল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পশ্চাতের দিকে হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া সে টুনুরাণীর বসনাঞ্চল ধরিয়া ফেলিল।

ধরা পড়িয়া বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্র বন্দিনীকে টানিয়া পার্শ্বের দিকে আনিল।

টুনু বলিল, "ছাড়—ছাড়—কে এসে পড়বে।"

সুরেন্দ্র বলিল, "চোরকে ধরেছি ছাড়ব কেন?"

টুনু অঞ্চলাগ্র জোরে টানিতে টানিতে বলিল, "আঃ—কি কর? ছাড়—দোর খোলা রয়েছে— কেউ দেখতে পাবে; ছাড়—পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে আসি।"

সুরেন্দ্র বলিল,—"জরিমানা দাও—তবে ছাড়ব।"

নির্ম্মম বিচারক তদ্দণ্ডে জরিমানা আদায় করিয়া লইল। তাহার পর মুক্তি দিয়া বলিল—"পর্দ্দাটি টেনে দিয়ে এস।"

পর্দ্দা টানিয়া দিয়া টুনুরাণী আসিয়া স্বামীর পার্শ্বদেশে দাঁড়াইল। বইখানির প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"কি বই গো? ছবি আছে?"

"আছে বইকি, দেখবে?"—বলিয়া সুরেন্দ্র পর পর পাতা উল্টাইয়া দেখাইতে লাগিল। নানা আকারের গোরু-বাছুর গোহাল প্রভৃতির ছবি।—টুনু বলিল—"সবই গোরুর গল্প?"

"সব।"

"রাম বল। তাই বসে বসে পড়ছ?"

"কেন, গোরুর গল্প কি মন্দ? তোমার ফার্ষ্ট-বুকেও ত কত গোরু, ঘোড়া, হাড়্‌গিলে পাখীর গল্প রয়েছে।"

গত বৎসর টুনুরাণী বাঙ্গলা লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া ইংরাজি ফার্ষ্টবুক আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু গর্দ্দভের পাতা অবধি পড়িয়া, আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। আজ কয়েক মাস তাহার পড়া একেবারে বন্ধ আছে।—সুরেন্দ্র বলিল—"যাও বা একটু শিখেছিলে, তাও ভুলে গেলে। বইখানা আন দেখি—পড়া দিই।"—টুনু বলিল, "তোমার গোরুর গল্প ভাল লাগে, তুমি পড়। আমি সে সব পড়ব না। আমার এখন এককাল গিয়ে তিনকালে ঠেকেছে। ঐ সব গোরু-বাছুর হাড়্‌গিলে পাখীর গল্প এ বয়সে পড়া কি আমার শোভা পায়,—না ভাল লাগে?"

সুরেন হাসিয়া, স্ত্রীকে কাছে টানিয়া বলিল,—"তবে এ বয়সে তোমার কিসের গল্প ভাল লাগে?"—টুনু গম্ভীর মুখে বলিল, "যাতে সব ঠাকুর-দেবতার কথা আছে—যেমন মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, স্বর্ণলতা, এই সব। পড়লে, দুদণ্ড মনটাও ভাল থাকে— পরকালেরও কাজ হয়।"

সুরেন্দ্র এই নির্ভীক স্বীকারোক্তি শুনিয়া হাসিতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতে ঝি বলিল—"বউদিদি ছোটবাবুর জলখাবার এনেছি।"

টুনুরাণী তখন ক্ষিপ্রহস্তে টেবিল হইতে বই কাগজ সরাইতে সরাইতে বলিল—"নিয়ে এস ঝি।"—ঝি প্রবেশ করিয়া জলখাবার প্রভৃতি রাখিয়া গেল।

সুরেন্দ্র জলযোগে মন দিল। টুনু টেবিলে কাগজপত্র গোছাইতে গোছাইতে বলিল, "হ্যাঁগা—তুমি নাকি পরশু বিন্ধ্যাচলে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। খবরটি পেয়েছ এরই মধ্যে?"

"আমায় নিয়ে যাবে?"

"তুমি!—বিন্ধ্যাচলে গিয়ে কি করবে?"

"কি করব?—লোকে তীর্থে কি করে আবার? ঠাকুর দেখব।"

"আমি সেখানে হয়ত দুই-এক দিন মাত্র থাকব। শুধু দাদাকে আনতে যাওয়া। দুই-এক দিন থেকেই চলে আসব।"

"আমি কি বলছি, আমি সেইখানেই থেকে যাব? তোমরা আমাকে যতই বুড়ো মনে কর, তীর্থবাস করবার সময় এখনও আমার হয়নি। আমিও দুই এক দিন থেকেই তোমার সঙ্গে চলে আসব।"—জলযোগ শেষে, গেলাসটি তুলিয়া গম্ভীরভাবে সুরেন্দ্র বলিল—"না না—তুমি গিয়ে কি করবে?"

"বলছি ত—ঠাকুর দেখব। আর মেজদাদাকে অনেক দিন দেখিনি—তাকেও দেখে আসব।" "বঙ্কুদাদা? তিনি বিন্ধ্যাচলে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন সেখানে আছেন?'

"দিন পনেরো হবে। আজ তাঁর চিঠি পেয়েছি।"

জলপানান্তে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সুরেন্দ্র বলিল, "ভালই হল। ঠিকানা কি লিখেছেন।"

"মনে নেই। চিঠিখানা আনব?"—বলিয়া টুনু চলিয়া গেল। চিঠি আনিয়া স্বামীকে দেখাইল। ইহা তিনদিন পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল হইতে লেখা। পড়িয়া সুরেন্দ্র বলিল, "ভালই হল। বঙ্কুদাদার ওখানে গিয়েই উঠব।"

টুনু বলিল, "সে ত হোটেল। আমি তবে কোথায় থাকব? বরং দাদাকে টেলিগ্রাফ করে দাও—দু চার দিনের জন্যে আমাদের থাকবার মত একটা বাড়ী যেন ঠিক করে রাখেন।"

পান মুখে দিয়া সুরেন্দ্র বলিল, "না—না—পাগল!—তুমি কোথা যাবে।"

বারম্বার এক কথা! ক্রমাগত নিষেধ—নিষেধ—কেবল না—না—! এবার টুনুরাণীর অভিমান হইল। রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—"আমি পাগল! আমি কোথা যাব!—কোথাও নিয়ে যেতে বললেই আমি পাগল! উনি সব জায়গায় যাবেন, আমায় কোথাও নিয়ে যাবেন না। এই সেদিন কলকাতায় গেলেন—আমি এত করে বললাম, ওগো আমায় নিয়ে চল, শনিবার আছে, থিয়েটার দেখে আসি, তা নিয়ে যাওয়া হল না। আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি!"—টুনুরাণীর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, কথা শেষ হইতেই ফোঁটায় ফোঁটায় গড়াইয়া পড়িল।

"ওকি! ওকি!"—বলিয়া সুরেন্দ্র তাহার বালিকা-বধূর হাতটি ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল। রুমাল দিয়া চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা—এবার যখন কলকাতা যাব, তোমাকেও নিয়ে যাব। শনি-রবি দু রাত থিয়েটারে যেও।"

টুনু হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"না—আমি বিন্ধ্যাচল যাব।"

এই সময় দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠে করতাড়না করিয়া ঝি বলিল—"ছোটদাদাবাবু—আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকে কে এসেছেন।"—সুরেন, টুনু—দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। সুরেন বলিল—"কে ঝি?"—ঝি বলিয়া উঠিল—"মেজদা এসেছেন!" "মেজদা!"—বলিয়া সুরেন্দ্র ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। মহাসমাদরে শ্যালকের হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"বঙ্কুদাদা, ব্যাপার কি? কি বিপদের কথা আপনি বলবেন, আমি ত কিছুই অনুমান করতে পারছিনে।"

বঙ্কুবাবু বলিলেন—"এখানে বলব? কেউ যদি শুনতে পায়? বড় গোপনীয় কথা।"

"না, এখানে কেউ আসবে না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

বঙ্কুবাবু তখন সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া সুরেন্দ্র বজ্রাহতের মত বসিয়া রহিল।

বঙ্কুবাবু বলিলেন—"ভাই, এর উপায় কি করা যায়?"

সুরেন্দ্র যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল; কোনও উত্তর করিল না।

বঙ্কুবাবু বলিতে লাগিলেন—"আমি আজ দুদিন ক্রমাগত ভাবছি। দুশ্চিন্তায় আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ হবার উপক্রম হয়েছে। কোনও দিকে কূলকিনারা দেখছিনে। এ সকল বিষয়ে তেমন কিছু জানিও না। তবে সহজ-বুদ্ধিতে যা মনে হয়, ঐ রকম, কি তার চেয়ে বেশী ক্ষমতাপন্ন কোনও তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী যদি পাওয়া যায়, তা হলে ঐ যন্ত্র নিষ্ফল করবার জন্যে তাঁকে দিয়ে কোনও ক্রিয়া-ট্রিয়া করান যেতে পারে। কিন্তু সেরকম লোকই বা হঠাৎ খুঁজে পাই কোথা? তুমি কাউকে জান?"—সুরেন্দ্রনাথ নীরব শিরশ্চালনা করিয়া জানাইল—"না।"

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বঙ্কুবাবু বলিতে লাগিলেন—"আর এক উপায় হতে পারে; কিন্তু তাতে কোন ফল হবে কি না জানি না। আমরা সবাই—তুমি, আমি, টুনু—বিন্ধ্যাচলের সেই সাধুবাবার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি। সকল কথা তাঁকে জানাই। বলি—বাবা, সে কোনও অপরাধ করেনি, কোনও দোষে দোষী নয়—তাকে কেন নষ্ট করবেন আপনি? এই কচি মেয়েটা, একে আপনি কি অপরাধে এই বয়সে বিধবা করবেন?—টুনুর মুখ দেখলেও কি বাবার দয়া হবে না? তোমার কি মনে হয়?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিল—"বঙ্কুদাদা, আপনি এই সব হাম্বাগ্ বিশ্বাস করেন? আমি রইলাম কোথায়, সে রইল কোথায়! কয়লা দিয়ে লোহার তাওয়াতে আমার মূর্ত্তি লিখে, 'মারয় মারয় শোনিতং পিব পিব' জপ করে, আমাকে মেরে ফেলবে? এ আপনার বিশ্বাস হয়?"

"খুব বিশ্বাস হয়। মারণ, স্তম্ভন, উচাটন—এসব তন্ত্রশাস্ত্রে লেখা রয়েছে যে ভাই! মুনি-ঋষিরা কি সব মিছে করে লিখে গেছেন?"

"আপনি পড়েছেন?"

"হ্যাঁ, অল্প-স্বল্প কিছু কিছু পড়েছি। ও রকম হয়, তাও শুনেছি। এগারো রাত্রি ঐ রকম প্রক্রিয়া করলে, রোগ উপস্থিত হবে—আর ঠিক একুশ দিনের দিন মৃত্যু! না না—ওসব গোঁয়ার্তুমি কোরো না। আর তুমি, মুখে বলছ বিশ্বাস কর না, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল দেখি ভাই, তোমার মনে ভয় হয়নি?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিল—"বুকে হাত দিয়েই বলছি, কিছু ভয় হয়নি।"

"তবে অমন মুষড়ে পড়েছ কেন? মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছ কেন?"

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া সুরেন্দ্র বলিল—"দাদা, আমি কি তাই ভাবছি? আমি ভাবছি, আমার যিনি জ্যেষ্ঠা—যাঁর এবং আমার গায়ের রক্ত মাংস হাড়গুলি পর্য্যন্ত একই বাপের কাছ থেকে পাওয়া—যিনি জন্মাবধি আমায় কত ভালবেসেছেন, কত স্নেহ করেছেন, নিজের খাবার থেকে কেটে আমায় খাইয়েছেন—তিনি এমন নিষ্ঠুর হয়ে পড়লেন যে, আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত!—এই ভেবেই মনে আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। ভয়ে আমি মুষড়ে যাইনি বঙ্কুদাদা!"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—আহারের

ম্লান হইয়াছে।—মনের এইরূপ অবস্থায় পাছে টুনুরাণী কিছু সন্দেহ করে, কি হইয়াছে জানিবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তাই সে রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করিল না। বহির্ব্বাটীতে বঙ্কুবাবুর জন্য যেখানে শয্যা প্রস্তুত হইল, তাহার নিকটেই ভিন্ন শয্যাতে সেও শয়ন করিল।

শয়ন করিয়াও অনেক রাত্রি অবধি দুইজনে কথাবার্ত্তা হইল,—কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না। বঙ্কুবাবু বলিতে লাগিলেন—"তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি ত বিশ্বাস করি। আমার মনের শান্তির জন্যে, উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্যে, আমার পরামর্শ তোমার শোনা উচিত।"

সুরেন্দ্র ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না। বলিল—"আচ্ছা দাদা—কাল যা হয় একটা কিছু উপায় স্থির করা যাবে।"—ভোর-রাত্রে সুরেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কেবল সে মনে মনে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিলে, হঠাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ডাকিল, "বঙ্কুদাদা—ও বঙ্কুদাদা!"

ডাকাডাকিতে বঙ্কুবাবু জাগিয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্র বলিল—"দাদা, বিন্ধ্যাচল যাওয়াই স্থির।"

শুনিয়া সুখী হইয়া বঙ্কুবাবুও উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"বেশ ভাই, তবে আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাত্রা করি চল—আর দেরী নয়।"

সুরেন্দ্র বলিল—"হাতে পায়ে ধরা নয় দাদা। আমি একটি উপায় স্থির করেছি।"

"কি উপায়?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সে এখন বলছিনে। বিন্ধ্যাচলে গিয়ে শুনতে পাবেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাকগাড়ী বিন্ধ্যাচলে দাঁড়ায না, তাই মির্জ্জাপুরেই নামিবার পবামর্শ ছিল। মির্জ্জাপুব হইতে বিন্ধ্যাচল আড়াই ক্রোশ মাত্র—ঘোড়ার গাড়ীতে একঘণ্টায পৌঁছান যায়।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময সকলে মির্জ্জাপুরে নামিলেন। নিকটেই ধর্ম্মশালা আছে, সেখানে গিয়া স্নানাহার সারিয়া বেলা তিনটার সময় বিন্ধ্যাচল যাত্রা স্থিব হইল।

ধর্ম্মশালার দ্বিতলে দুইটি ভাল ঘর পাওয়া গেল। জিনিষপত্র ও মেয়েদেব সেখানে রাখিযা, পাকাদিব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া বঙ্কুবাবু গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন।

স্নান করিতে করিতে বঙ্কুবাবু বলিলেন—"কি মৎলবটা করেছ, এইবার বল শুনি।"

সুরেন্দ্র বলিল—"আগে কাজটা হয়ে যাক্ তারপর শুনবেন দাদা!"

"হয়ে গেলে শুনব?—দেখতেই পাব।"

"না দাদা,—আপনার সেখানে যাওয়া হবে না।"

"আমি যাব না?—কেন?"

"যে কৌশলটি আমি উদ্ভাবন করেছি—আপনার সঙ্গে গেলে তা পণ্ড হয়ে যাবে।"

বঙ্কুবাবু একটু ভীত হইয়া বলিলেন—"কৌশল? তাঁর সঙ্গে কি কৌশল করবে তুমি? ওহে, না না—কৌশল-টৌশল করতে যেও না—তাঁরা হলেন সিদ্ধপুরুষ, হয়ত বিপদে পড়ে যাবে।"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"আপনি যা বলছেন, তাই যদি সত্য হয়, তাহলে বেশী বিপদে আর কি পড়ব দাদা? মরার বেশী ত আর গাল নেই! কিছু ভাববেন না—ঠিক কার্য্য উদ্ধার করে আসব।"—বঙ্কুবাবু বলিলেন—"যা ভাল বোঝ কর ভাই—দেখো যেন বিপদ-আপদ ঘটিয়ো না। আমায় যেতে বারণ করছ, আমি কি তা হলে ধর্ম্মশালাতেই থাকব?"

"না, আপনিও আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে যাবেন। বিন্ধ্যাচলের বাজারে নেমে আপনি দাদার বাসায় গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি টুনুকে, বউদিদিকে নিয়ে অষ্টভুজা দর্শনে চলে যাব। সন্ধ্যা নাগাদ দাদার বাসায় এসে পৌঁছব।"

বঙ্কুবাবু মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"তোমাদের দাদার বাসায় আমি যাচ্ছিনে।"

"কেন দাদা?"

"কেন?—সে কথাও জিজ্ঞাসা করছ? যে ব্যক্তি আপনার ভাইয়ের প্রাণ নিতে উদ্যত—সেই খুনীর সঙ্গে বসে আমি মিষ্টালাপ করব? সে আমার দ্বারা কোন মতেই হবে না!"

কথাগুলি শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখ লজ্জায়, দুঃখে এতটুকু হইয়া গেল। বিষন্নস্বরে বলিল—"আচ্ছা, আপনি তবে সেই হিন্দুনিবাসে গিয়ে উঠবেন। দাদার সঙ্গে দেখা করে, সন্ধ্যার পর আমি আপনার কাছে যাব এখন।"—আহারাদি শেষ হইলে বঙ্কুবাবু গাড়ী ডাকিতে গেলেন, সুরেন্দ্রনাথ একটু নূতনতর বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইল। সৌখীন পাঞ্জাবী কোর্ত্তাটি খুলিয়া ফেলিয়া প্রথমে একটা টুইলের টেনিস্-শার্ট, তাহার উপর একটা গালাখোলা ইংরাজী কোট পরিধান করিল। কোটের বুকপকেটে একটা পেন্সিল-গোঁজা পকেট-বুক ভরিয়া দিল। মস্তকেব বামভাগে সচরাচর যেরূপ টেড়ি কাটিত তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, ঠিক মাঝখানে চেরা সিঁথি কাটিল—কপালের কাছে দুই ধারের চুল বুরুষের সাহায্যে দুইটি শিঙের মত উচ্চ করিয়া দিল। পাম্পশু ছাড়িয়া, সুতি মোজার উপর একজোড়া নালবাঁধা হাতীকাণের বুটজুতা পরিল। কার্‌সুদ্ধ সোনার পাঁস্-নে চশমাজোড়াটি খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিল। একখানা আধময়লা রেশমী চাদর গলায় চড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কুবাবু ফিরিয়া আসিয়া তাহার চেহারা দেখিয়া অবাক্। বলিলেন—"একি সাজ? গলা-খোলা কোট, এ শার্ট, এ বুট পেলে কোথা? কোনও দিন ত তোমায় এ সব পরতে দেখিনি!"

"চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করে এনেছি। আজ আমি সে সুরেন্দ্র নই। আজ আমি কে জানেন দাদা?" "কে?"—শ্যালকের কাণে কাণে সুরেন্দ্র বলিল, "পাটের দালাল।"

বঙ্কুবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি যে মতলব করেছ, কিছুই বুঝতে পারছিনে। দেখো ভাই, সাবধান, চালাকি করতে গিয়ে যেন সাধুবাবার অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এসো না।"

গাড়ী আসিয়াছিল। ধর্ম্মশালার ভৃত্যগণকে বখসিস্ করিয়া, জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া ইঁহারা রওয়ানা হইলেন। সুরেন্দ্রের অনুরোধসত্ত্বেও বঙ্কুবাবু গাড়ীর ভিতরে বসিলেন না—কোচবাক্সে উঠিয়া ছাতা মাথায় দিয়া, কোচম্যানের পাশে বসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যথা-পরামর্শ বঙ্কুবাবু বিন্ধ্যাচলের বাজারে নামিয়া গেলেন, গাড়ী অষ্টভুজা-অভিমুখে চলিল।

অষ্টভুজা-পাহাড়ের নিম্নে পৌঁছিলে, সুরেন্দ্রনাথ সাধুবাবার আশ্রমটি অনায়াসেই চিনিতে পারিল—বঙ্কুবাবু উত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। পাহাড়ে উঠিয়া প্রথমে ইঁহারা অষ্টভুজা-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। মন্দিরটি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গহ্বর-বিশেষ। মূর্ত্তির দক্ষিণভাগে গহ্বরের একটা স্থান হইতে এক সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে—কোথায় গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই—ভিতরটা মহা অন্ধকার। পুরোহিত প্রদীপ লইয়া, সুড়ঙ্গের মুখে ধরিল—কতকটা অংশে আলোক পড়িল বটে—তাহার পর আবার অন্ধকার। দেখিয়া টুনুরাণীর বড় ভয় করিতে লাগিল।

দর্শন শেষ করিয়া সিঁড়ি দিয়া পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে সুরেন্দ্র বলিল, "বউদিদি,

ঐ যে নীচে আমগাছগুলির মধ্যে একখানি একতলা পাকা বাড়ী দেখছ, শুনেছি ওটা একটি সাধুর আশ্রম। তিনি নাকি একজন সিদ্ধপুরুষ—আর খুব ক্ষমতা-টমতা আছে। যাবে, ওঁকে প্রণাম করবে?" বউদিদি খুসি হইয়া বলিলেন, "চল না ভাই।"—আর কয়েকটি সিঁড়ি নামিয়া সুরেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, বউদিদি, প্রণাম করতে হলে, কিছু প্রণামীও দিতে হয় ত?"

"দিতে হয় বইকি! শুধু হাতে কি প্রণাম করতে আছে?"

সুরেন্দ্র পকেট হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া বউদিদির হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও—তোমরা দুজনে পাঁচ টাকা করে প্রণামী দিও।"

সাধুবাবার আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে সুরেন্দ্রের ভাড়া গাড়ীখানিও অপেক্ষা করিতেছিল। নামিয়া, আশ্রমের দিকে কোচম্যানকে ইঙ্গিত করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইল। দূর হইতে দেখিল, আশ্রমের বারান্দায় বিপুল-কলেবর জটাজুটধারী এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, একজন ভৃত্য তাঁহাকে পাখা করিতেছে। অল্পদূরে তিন চারিজন হিন্দুস্থানী ভক্ত করযোড়ে উপবিষ্ট। সুরেন্দ্র বলিল—"উনিই বোধ হয় সাধুবাবা, ওখানে আরও সব লোকজন রয়েছে। তোমরা দুজনে প্রণাম করে গাড়ীতে এসে বসে থেক, আমি বাবার কাছে বসে একটু কথাবার্ত্তা কব এখন।"—কুমুদিনী বলিলেন, "আমরা তা হলে ত কিছুই শুনতে পাব না।"

"কেন পাবে না? গাড়ী ঐদিকেই যাচ্ছে। কাছেই গাড়ীখানা থাকবে এখন, তোমরা খড়খড়ি তুলে বেশ দেখতে পাবে, শুনতে পাবে।"

নিকটবর্ত্তী হইয়া বউদিদি বলিলেন, "টুনীব কবে ছেলে হবে, জিজ্ঞাসা কোরো।"

ইঁহাদের লইয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। দেখিল, সাধুবাবা একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া বসিয়া, একটি ছবিকাটা পিতলের গেলাসে সিদ্ধিপান করিতেছেন। ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সাধুবাবা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলেন, ইহাবা দরিদ্র নহে—সম্পন্ন-লোকের মত দেখিতে।

বারান্দায় সমীপবর্ত্তী হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া সুরেন্দ্র বুটজোড়াটিব ফিতা খুলিল। জুতা ছাড়িয়া স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া সহ ধীবে ধীবে বারান্দায় উঠিল।

সাধু-বাবা মোটা গলায় বলিলেন—"এস!" হিন্দুস্থানী ভক্তেরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দূরে বসিল। এক এক পা করিয়া কাছে গিয়া প্রথমে বউদিদি পবে টুনুরাণী টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সুরেন্দ্র কপটভক্তিভবে প্রণাম করিয়া, বাবাব পদপ্রান্তে একটি চক্‌চকে গিনি রাখিয়া দিল।

সাধুবাবা বলিলেন—"জয়োহস্তু! মা অষ্টভুজা তোমাদের মঙ্গল করুন। বস। আবে চামারিয়া, একঠো দরী-উরী কুছ লাও ত রে।"—সুরেন্দ্র বলিল, "বাবা, ঐ আমাদের গাড়ী রয়েছে, এদের গাড়ীতে বসিয়ে বেখে আসি।"—যেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বাবাজী বলিলেন, "আচ্ছা।"

ইঁহাদের গাড়ীতে বসাইয়া, সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। ইহাদেব মধ্যে ভৃত্য সাধুবাবার সম্মুখে একখানি শতরঞ্জি বিছাইয়া দিয়াছিল—সুরেন্দ্র তাহার উপর উপবেশন করিল;—বকধার্ম্মিকের মত করযোড়ে ধীরে ধীরে বলিল—"যে রকম শুনেছিলাম—সেই রকম দেখলাম। বাবার দর্শনলাভ করে আজ কৃতার্থ হলাম।"

সাধুবাবা সহাস্যমুখে একবার দূরোপবিষ্ট সেই হিন্দুস্থানী ভক্তবৃন্দের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। তাঁহার ভাবটা যেন—"শুনছ তো তোমরা? শোন। দেশবিদেশে আমার কত নাম, তার প্রমাণ পেলে ত?"—পরমুহূর্ত্তে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমাদের বাড়ী কোথা?"

গাড়ী হইতে বউদিদি শুনিতে না পান, এমন সাবধানতার সহিত অনুচ্চস্বরে উত্তর করিল—"আজ্ঞে কলকাতা।" "বেশ। বাবুর নাম কি?"

সুরেন্দ্র আপনার প্রকৃত নামই বলিল—বউদিদি শুনিতে পাইবার মত স্বরেই বলিল।

"কি করা হয়?"—স্বর নামাইয়া সুরেন্দ্র উত্তর করিল—"আজ্ঞে পাটের দালালি করি।"

"তোমরা কয় সহোদর?"

"আজ্ঞে আমি নিয়ে পাঁচটি। আমিই জ্যেষ্ঠ।"—এটাও পূর্ব্ববৎ অনুচ্চস্বরে।

"সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোক দুটি কে?"

"একটি আমার স্ত্রী"—(এইটুকু উচ্চকণ্ঠে)—"অন্যটি আমার স্ত্রীর দিদি।"—(এটুকু স্বর নামাইয়া)

"বেশ বেশ। এখানে কতদিন থাকা হবে?"

অনুচ্চস্বরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে স্বর তুলিয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিল—"আজ্ঞে কাল এখান থেকে এলাহাবাদ যাব। এবছর আমাদের পাটের কাজটা খুব মন্দা কিনা, তাই ভাবলাম, একবার তীর্থদর্শন করে আসি। অন্য বছর হলে এমন দিনে পূর্ব্ববঙ্গের নদীতে নদীতে নৌকা করে পাট কিনে বেড়াতাম। পথে আসতে আসতে দানাপুরে একজন লোকের মুখে বাবার মহিমার কথা শুনলাম। তাই শুনে ঐ শ্রীপাদপদ্ম দেখবার জন্য মনে ভারি আকাঙ্ক্ষা হল। বাবার দয়ায় সে আকাঙ্ক্ষা পূরণও হয়েছে। নইলে বরাবর এলাহাবাদেই চলে যেতাম। শুনেছি নাকি, বাবার অদ্ভুত ক্ষমতা, আপনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।"—সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"কিছু না—কিছু না। তারা মা যা করান, তাই করি—মা যা বলান, তাই বলি।"

"শুনলাম—বাবা হাত দেখে যাকে যা বলে দেন, সব আশ্চর্য্য রকম মিলে যায়?"

"তারা মা বলান—তারা মা বলান। আমার ক্ষমতা কিছুই নেই বাপু। দেখি তোমার হাতখানি।"—সুরেন্দ্র দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া দিল; বাবাজী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া হাতখানি দেখিয়া বলিলেন, "ধনস্থান, পুত্রস্থান, পুণ্যস্থান অতীব শুভ। বিশেষতঃ পুণ্যস্থান। ধর্ম্মে মতি রেখ বাবা—তুমি সৌভাগ্যশালী পুরুষ।"

"আমার পুত্রকন্যা কয়টি হবে?"

হাতখানি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সাধু বলিলেন—"ঠিক করে বলতে হলে, তোমার স্ত্রীর হাতখানিও দেখা প্রয়োজন।"

"আচ্ছা নিয়ে আসি"—বলিয়া সুরেন্দ্র উঠিয়া গেল। বউদিদিকে বলিল।

বউদিদি বলিলেন, "যা টুনী—হাত দেখিয়ে আয়।"

টুনী বউদিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ওগো মাগো—আমি যেতে পারব না। আমার বড্ড ভয় করছে।"

বউদিদি বলিলেন—"তোর আবার ভয় কিসের? বাঘ-ভালুক ত নয়, যে, খেয়ে ফেলবে। যা নেমে যা।"

"নাগো দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—আমি যাব না।"

সুরেন্দ্র অগত্যা ফিরিয়া গেল। সাধুবাবাকে বলিল—"আমার পরিবার ভয়ে আসছে না।"

বাবাজী হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রের হাতখানি আবার গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"পরমায়ু স্থানও মন্দ নয়।"

"কত বৎসর আমি বাঁচব?"—বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিল।

বাবাজী বলিলেন—"চুয়াত্তর—সাড়ে চুয়াত্তর বছর বাঁচবে। কিন্তু বাবা, বছরখানেকের মধ্যে যে একটি বিষম ফাঁড়া দেখছি!"

সুরেন্দ্র যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কি ফাঁড়া বাবা? কবে? কবে?"

"আগামী ভাদ্র মাসে। জল-ভয়!"

"আরে সর্ব্বনাশ! জল-ভয়? তা হলে বুঝতে পেরেছি। নৌকা করে পূর্ব্ববঙ্গে কোথাও পাট খরিদ করতে গিয়ে—বোধ হয়—"—বাবাজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নৌকা-ডুবি।"

ভয়কম্পিত স্বরে সুরেন্দ্র বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!—তা হলে এখন উপায় কি বাবা?"

"হোম করাতে হবে।"

"হোম?—তা বেশ ত। কবে শুরু কবা দরকার?"

"যত শীঘ্র হয়! যত দেরী হবে, তত খারাপ হবে।"

সুরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"তাই ত!"

বাবাজী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—"তার জন্যে অত চিন্তিত হচ্ছ কেন? তোমার জানা তেমন কোনও ভাল লোক না থাকে, আমিই করে দেব এখন। কিন্তু ছ'মাস লাগবে।"

সুরেন্দ্র পুনর্ব্বার করযোড়ে বলিল, "তা হলে বাবা মাস-খানেক পরে, দয়া করে যদি আমার কলকাতার বাড়ীতে আসেন।"—বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—"দু চার দিনেব ত কাজ নয় বাপু—ছ-ছটি মাস লাগবে যে। ছ মাস কি আমি এ আশ্রম ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে পারি? ভক্তেরা তা হলে প্রাণে মারা যাবে যে! তুমি বাড়ী ফিরে, আমায় টাকা পাঠিয়ে দিও—আমি এইখানে বসে হোমটি করে দেব।"

"তা বেশ, সেও মন্দ নয়। তা যদি করেন, তবে ত বড়ই ভাল হয় বাবা। কত টাকা লাগবে?"—"আপাততঃ শ'খানেক হইলেই কাজ আরম্ভ করা যাবে। পবে, যেমন যেমন লাগবে আমি তোমায় জানাব।"

"সবসুদ্ধ কত লাগবে?"

মনে মনে হিসাব করিয়া বাবাজী বলিল—"সাড়ে তিনশো আন্দাজ। ছ মাস ধবে হোম করতে হবে কিনা। প্রতি অমাবস্যায় হোম হবে—এক রাত্রে একমণ ঘি পুড়ে যাবে। ছ মণ গাওয়া ঘিয়ের দাম ধর ছ-পঞ্চাশং তিনশো—ঘি-টে এদিকে সস্তা।—আর অন্যান্য খবচ পঞ্চাশটে টাকা রাখা গেল।"

"বেশ বাবা।—তা হলে এলাহাবাদে আমি বেশী দেবী করব না। বাড়ী ফিবে, হপ্তাখানেক পরেই মনি অর্ডার করে আপনাকে একশো টাকা পাঠিয়ে দেব। এ বিপদে যাতে উদ্ধাব হই বাবা, তাই আপনাকে করতে হবে।"—বলিয়া বাবাজীর পা জাড়াইয়া ধবিল।

বাবাজী বলিলেন—"কোনও শঙ্কা কোবো না। আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি।"

"বাবা, দয়া করে তা হলে আপনার নাম ঠিকানাটি লিখে দিন—মনি অর্ডার লেখবাব জন্যে।"

"তা দিচ্ছি—আরে চামারিয়া, কলমদান আউর কাগজ লে আও তো বে।"

চামারি কাগজ কলম আনিয়া দিল। বাবাজী লিখতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় সুরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"বাবা, একটা নিবেদন আছে।"

"কি বল।"

"আমার হাত দেখে যা যা বললেন, সব ফলগুলি যদি দয়া কবে শ্রীহস্তে লিখে দেন, তা হলে স্মরণ রাখবার পক্ষে বড় সুবিধা হয়। লিখে, শেষে আপনার নাম ঠিকানা তারিখও বসিয়ে দিন—তা হলে ঐ একখানি কাগজে দুই কাজই হবে।"

"ফলাফলও লিখে দেব? আচ্ছা বেশ। সংস্কৃতে লিখব, না বাঙ্গলায়?"

"সংস্কৃত আমি কি বুঝব বাবা, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ! দয়া করে বাঙ্গালাতেই লিখে দিন।"

বাবাজী তখন কাগজ লইয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া লিখিলেন। পবে তাহা সাবধানে একবার পাঠ করিয়া, সুরেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। সুরেন্দ্র মনে মনে পড়িল,—

"শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ দত্তস্য করকোষ্ঠী বিচার ফলমেতৎ লিখ্যতে। ধনস্থান, পুত্রস্থান, পুণ্যস্থান, অতীব শুভ। পরমায়ু চুয়াত্তর বর্ষ পাঁচ মাস দ্বাবিংশতি দিবস। আগামী সৌরবর্ষস্য ভাদ্রে মাসি শ্রীমানের একটি গুরুতর ফাণ্ডা দেখা যায়। জলপথে নৌযাত্রার বিপদ-সম্ভাবনা কিন্তু যথাশাস্ত্র হোমাদি অনুষ্ঠান করিলে সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেক।

লিখিতিংশ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী—

মোং বিন্ধ্যাচল, অষ্টভুজা পাহাড়ের নিম্নে কালিকাশ্রম।

তাং ১৬ই আশ্বিন।"

কাগজ লইয়া প্রাণামান্তে সুরেন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বধূদ্বয়কে লইয়া সুরেন্দ্র যখন বিন্ধ্যাচলে দাদার বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৈঠকখানায় দেখিল, বঙ্কুবাবু বসিয়া আছেন।

এখানে তাঁহাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কতক্ষণ?" দাদা কই?"—বঙ্কুবাবু বলিলেন, "তোমার দাদা মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়েছেন। মেয়েদের বাড়ীর মধ্যে বেখে এস।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলে বঙ্কুবাবু বলিলেন—"ওদিকের খবর কি?"

সুরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাজ হাসিল, বঙ্কুদাদা!—কেল্লা ফতে।"

"কি রকম?"

"এগার দিন মারণ ক্রিয়ার পর আমাব কঠিন রোগ হবে, একুশ দিন পরে আমি মরে যাব—এই কথা ছিল ত?"

বঙ্কুবাবু অধীর হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—তা কি হল, বল।"

"এই দেখুন বাবাজীর দস্তখতী স্বীকার-পত্র—সাড়ে চুয়াত্তর বছর আমার পরমায়ু। একটা 'ফাণ্ডা' আছে বটে, তাও বছরখানেক পরে। এই দেখুন, বাবাজীর দস্তখৎ, এই দেখুন আজকের তারিখ। এখনও কালি শুকোয়নি। কাগজখানি যে জাল নয়, খোদ বৌদিদি তার সাক্ষী।"—বলিয়া হাসিতে হসিতে সুরেন্দ্র কাগজখানি বঙ্কুবাবুর হাতে দিল।

কাগজখানি পড়িয়া বঙ্কুবাবু কয়েক মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে একটি বড়রকম নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"বাঁচা গেল!"

সুরেন্দ্র তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন বঙ্কুদাদা, এখন আপনাব বিশ্বাস হল ত, লোকটা আসলে জুয়াচোব?"

বঙ্কুদাদা গম্ভীব ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না।"

সুবেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"অ্যাঁ! বল্লেন কি?—এর চেয়ে কি বেশী প্রমাণ আপনি চান?"—বঙ্কুবাবু বলিলেন—"এ থেকে এইমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তোমার দাদার মারণ-যজ্ঞটি মাঝখানেই শেষ হয়ে যাবে—আব বেশী অগ্রসর হবে না, পূর্ণাহুতি ঘটবে না।"

সুরেন্দ্র হঠাৎ কোনও উত্তব করিতে পারিল না। প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল নীরব থাকিয়া বলিল—"আপনি হার মানলেন বঙ্কুদাদা। ধন্য আপনার সরলতা! সেকথা যাক। তারপর, আমবা আসছি শুনে দাদা কি বললেন-টললেন?"

"তোমার দাদার সঙ্গে ত আমার দেখা হয়নি। আমি এসেছি আধঘণ্টা হবে। এসে শুনলাম, তোমার দাদা বেরিয়েছেন। গাড়ী থেকে নেমে হিন্দু-স্বাস্থ্যনিবাসেই গিয়েছিলাম। সেখানে বসে বসে যতই এসকল কথা ভাবতে লাগলাম, ততই রাগ বেড়ে গেল। ভাবলাম—এরকম নির্লিপ্ত হয়ে থাকাটা কিছুই নয়—যাই, চন্দ্রনাথকে দু চার কথা বেশ শক্ত করে শুনিয়ে দিইগে। ভালই হল। এবার ঐ লেখা তার নাকেব উপর ধরে দিয়ে, আমার যা বলবার আছে তা বলে, চলে যাব।"—সুরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না না বঙ্কুদাদা—তা করবেন না; সে হবে না।"

বঙ্কুদাদা কঠোরস্বরে বলিলেন—"কেন? হবে না কেন?"

"দাদা যে লজ্জা পাবেন।" "লজ্জা পাবেন!—বেহায়ার কি লজ্জা আছে?"

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না না—সে হবে না।"

বঙ্কুবাবু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—"ঐ ত তোমার দোষ! তিনি তোমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, লজ্জা পাওয়ার চেয়েও অনেক গুরুতর দণ্ড তাঁর প্রাপ্য; তবে ত উপযুক্ত শিক্ষা হবে! তুমি না বল, আমি বলব।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিল—"আপনার পায়ে পড়ি বঙ্কুদাদা—সে কোনমতেই হবে না। আমি হলাম তাঁর ছোট ভাই—আমি তাঁকে লজ্জা দেব,—দুঃখ দেব? সেটা কি আমার উচিত?

আমি ত কিছুই মানি-টানিনে—নাস্তিক বললেই হয়। আপনি ত হিন্দু; আপনিই বলুন—আমি তাঁকে লজ্জিত অপমানিত করলে, আমার কি তাতে অধর্ম্ম হবে না?"

বঙ্কুবাবু রাগিয়া বলিলেন—"তিনি কি তোমার সঙ্গে খুব ধর্ম্মব্যবহার করেছেন?"

সুরেন্দ্র এবার একটু অধীর হইয়া কহিল—"কি বলেন বঙ্কুদাদা!—এ কথার কি এই উত্তর?"—বঙ্কুবাবু নীরব গম্ভীরভাবে বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"তা হলে—এ কাগজ তাঁকে দেখাচ্ছ না বল?—মারণ-যজ্ঞ যেমন চলছে, তেমন চলবে?"

"না—তা নয়। এ কাগজ আমি তাঁকে দেখাব—শুধু তাঁর ভ্রমটি ভেঙ্গে দেবার জন্যে। এ কাগজ দেখলে নিশ্চয়ই তাঁর মনে হবে,—যার সাড়ে চুযাত্তব বছর পরমায়ু, সে এখনই মরবে কি করে? কাগজ দেখাব—কিন্তু আমি যে মারণ-যজ্ঞের কথা সবই শুনেছি, তা ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানতে দেব না। এ কাগজ দেখলেই দাদা বুঝতে পারবেন, ব্রহ্মচারী মশাই একটি আদত জুয়াচোর—যজ্ঞ পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর আর আগ্রহ থাকবে বলে বোধ হয় না।"

বঙ্কুবাবু উঠিতে চাহিলেন। সুরেন্দ্র বলিল—"এখন কোথা যাবেন?—এইখানেই থাকুন—খাওয়া-দাওয়া করুন।"—বঙ্কুবাবু বলিলেন—"না ভাই—আমি যাই। তোমাব মত আমার আত্মসংযম নেই—তোমার দাদাকে দেখলে, আমি কি বলে ফেলি তার ঠিক কি? শেষে তুমি রাগ করবে।"—একথা শুনিযা সুরেন্দ্র তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। বলিল—"কাল সকালে স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে আপনাব সঙ্গে দেখা করব।"

রাত্রি আটটার সময় চন্দ্রনাথবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া, তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; স্বীয় পূর্ব্বকৃত কার্য্যের স্মরণে অপরিমেয় লজ্জায় তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্র বুঝিল। সে তখন এমন ভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কবিল, যেন কিছুই হয় নাই—যেন দুই ভ্রাতার মধ্যে সেই পূর্ব্বের স্নেহ-বন্ধন সমভাবেই দৃঢ় বহিয়াছে।

ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রের বউদিদিও আরামে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

এত বিলম্বে বাসায় পাকাদির ব্যবস্থা আরম্ভ করিলে, খাইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই চন্দ্রনাথবাবু বাজারে লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে বসিয়া থাকিয়া, ভাল লুচি ও কচুরি ভাজাইবে, কয়েক প্রকার আচার ও কিছু মিষ্টান্ন এবং ভাল বাবড়িও একসের কিনিয়া আনিবে।

কুমুদিনী স্বামী ও দেবরের কাছে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। দেশের কথা, পথের কথা, অষ্টভুজা-মূর্ত্তিদর্শনের কথা—অবশেষে বাবাজীর আশ্রমে বিলম্ব হওয়ার কথা বলিয়া, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো, বাবাজী একখানা কাগজে, কি সব লিখে যে তোমাকে দিলেন? বলেছিলে বাসায় এসে দেখাবে—দেখালে না ত!"

বাবাজীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবামাত্র চন্দ্রনাথবাবুর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্ত্রীর শেষ কথাটি আরও যেন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

সুরেন্দ্র বলিল—"সে আর দেখে কি হবে?—সে তোমাদেব আর দেখে কাজ নেই।"

ব্যাপারটা গোপন করিবার প্রয়াসে কুমুদিনীর কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্রমে তিনি রীতিমত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া, সুরেন্দ্র তাঁহার হাতে দিল।

চন্দ্রনাথবাবু "দেখি—দেখি" বলিয়া কাগজখানি স্ত্রীর হাত হইতে লইলেন। মনে মনে পাঠ করিয়া তিনিও গোপনে একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কুমুদিনী কিন্তু কাগজখানি পড়িয়া বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তাই ত! এ যে ভারি বিপদের কথা হল?—এখন উপায়?"

সুরেন্দ্র বলিল—"এই দেখ! এই জন্যেই ত তোমায় দেখাচ্ছিলাম না। ও সব বিশ্বাস করো না বউদিদি। সে বাবাজী হয়ত একটা ভণ্ড—আমি ওসব কিছু বিশ্বাস করিনে।"

বউদিদি বলিলেন—"তুমি ত কিছুই বিশ্বাস কর না—ঘোব নাস্তিক। আহা, বাবার কেমন খাসা চেহারা!—আমার ত দেখে খুব ভক্তিই হল। না—না—এর একটা কিছু প্রতিকার করতে হবে বইকি। কাল সকালে না হয় সবাই আবাব তাঁর কাছে যাই চল। ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য কি রকম হোম-টোম করতে বলেন, জিজ্ঞাসা করে আসি। হ্যাঁগা—তুমি কি বল?"

সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রও প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা দাদা! আপনি এই কালিকানন্দকে দেখেছেন?"

মাথাটি অবনত করিয়া ক্ষীণস্বরে চন্দ্রনাথবাবু বলিলেন—"না। তবে—তবে—লোকের মুখে অনেক—শুনি বটে।"

"লোকে কি বলে? সত্যি সাধু—না ভণ্ড?"

চন্দ্রনাথবাবু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"সবাই ত—বলে—আসল ভণ্ড।"

সুরেন্দ্র তখন উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল—"শুনলে বউদিদি! শোন। আমার ত দেখেই মনে হয়েছিল, লোকটা জোচ্চোর। তোমাদের এত সহজে কি করে বিশ্বাস হয়, কে জানে। মেয়েরা যদি গেরুয়াপরা ছাইমাখা জটাধারী কাউকে দেখলে—অমনি—ভক্তিরসে গলে গেল—ধরে নিলে ইনিই এ কলিযুগের প্রধান অবতার।"—বলিয়া সুরেন্দ্র হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।—চন্দ্রনাথবাবু সে হাসিতে যোগ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তেমন কৃতকার্য্য হইলেন না।—দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শনের পরামর্শ হইল। বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও বন্ধুবাবু ইহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন না।

[ভাবতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২১]

কুমুদের বন্ধু

"গিরো ময়ূরা গগনে পয়েদা
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু র্যো
যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্।।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা ৺রজনীকান্ত সোম মহাশয়ের পুত্র কুমুদনাথ আজ লণ্ডনে মহা বিপন্ন।

পিতার জীবিতকালেই ভেষজ-রসায়ন অধ্যয়ন করিবার জন্য সে বিলাতে আসিয়াছিল। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র কুমুদ, যখন যত টাকা চাহিত, পিতা তাহাই পাঠাইয়া দিতেন। মাসিক বরাদ্দও অন্যান্য ছাত্রের অপেক্ষা কুমুদের অনেক অধিক ছিল। সুতরাং তাহার চাল অত্যন্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। দুইবৎসর পিতার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার পিসেমহাশয় এবং দোকানের ম্যানেজার ব্যবসা চালাইতেছেন। ম্যানেজারের আমল হইতে কুমুদের টাকার যোগান কিঞ্চিৎ কম পড়িয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু মাসে মাসে নিয়মিত ভাবেই টাকা আসিত। এদিকে দুই আড়াই মাস আর টাকা আসে নাই। কুমুদ প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখিয়া তাগিদ করিয়াছে—ইদানীং দুইখানা টেলিগ্রামও করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও উত্তর পায় নাই।

আজ সোমবার—ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবে। চিঠির মধ্যে টাকার ড্রাফট্ আসে কি না আসে, এই চিন্তায় গত রাত্রে কুমুদের ভাল করিয়া নিদ্রা হয় না। সাতটা না বাজিতেই আজ সে শয্যাত্যাগ করিল—অন্যদিন আটটার পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

লণ্ডনের বেজওয়াটার নামক অংশে রুমস্ লইয়া সে বাস করে। প্রতি সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে টাকা দিবার কথা—আজ দুই মাস কাল কুমুদ তাহাকে একটি পয়সাও দিতে পারে নাই। উপরন্তু বন্ধুবান্ধবগণেব নিকট—কাহারও কাছে দুই পাউণ্ড, কাহারও কাছে চারি পাউণ্ড—এইরূপ করিয়া অনেক ধার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ ডাকে তিন মাসের টাকাটা যদি আসিয়া পড়ে, তবেই মঙ্গল, নচেৎ কুমুদকে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে।

শয়নকক্ষটির আসবাবগুলি সুন্দর ও মহার্ঘ। চারিদিকের দেওয়াল ধূসর ও স্বর্ণবর্ণ চিত্রিত কাগজে আবৃত। মেঝের উপব পুরু গালিচা পাতা। দেওয়ালের একস্থানে একটি মোটা রেশমের ফিতা ঝুলিতেছে—কুমুদ উঠিয়া তাহার হাতলটি টানিয়া ধরিল। একমিনিট পরে গৃহদাসী দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মহাশয়?"

"ডাক আসিয়াছে?"

"না—এখনও আসে নাই।"

"গরম জল লইয়া আইস।"

গরম জল আসিলে, মুখ ধুইয়া কুমুদ পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। পরিধান শেষে সোনার সিগারেট-কেসটি খুলিয়া দেখিল একটিও সিগারেট নাই। গতকল্য তাহার সিগারেট ফুরাইয়াছিল; অর্থাভাবে নতুন বাক্স কিনিতে পারে নাই। সে তখন ম্লান মুখে প্যাণ্টালুনের দুই পকেটে দুই হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মে মাস। বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বড় বড় শব্দ করিয়া দুগ্ধবিক্রেতার গাড়ী, রুটিওয়ালার গাড়ী, বাড়ী বাড়ী যোগান দিয়া ফিরিতেছে।

ক্রমে দূরে ডাকওয়ালার মূর্ত্তি দেখা গেল। ক্রমে সে এই বাড়ীর নিকটবর্ত্তীও হইল। কুমুদ তখন ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

চিঠি আসিল—কি

কিন্তু কই—সোম কোম্পানীর ছাপা লেফাফা ত নাই। ম্যানেজারের পত্র আসে নাই—টাকা আসে নাই—কুমুদের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

অন্যান্য পত্রগুলি লইয়া ধীরে ধীরে সে নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। সেগুলি পড়িতে পড়িতে এই পত্রখানি পাইল—

কলিকাতা—২৪শে এপ্রিল

ভাই কুমুদ,

তোমার পত্র গত রবিবার দিন পাইয়াছি। তোমার টাকা যাইতে কেন বিলম্ব হইতেছে জানিবার জন্য সোমবার দিন তোমাদের আফিসে গিয়াছিলাম। ম্যানেজারবাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দোকানে যিনি ছিলেন তিনি বলিলেন, ম্যানেজারবাবু আজকাল দোকানে বড় আসেন না।

বাজারে গুজব, "সোম কোম্পানি" ফেল হইবে। তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তোমার পিসেমহাশয়ের সহিত যোগসাজসে ম্যানেজারবাবু নাকি দোকানের টাকা ভাঙিতে আরম্ভ করেন। দোকানের দেনার দায়ে তোমাদের বসতবাটিখানি নীলাম হইয়া গিয়াছে, উহা নাকি তোমার পিসেমহাশয় একজনের বেনামীতে কিনিয়া লইয়াছেন।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, আগামী ১লা জুন তারিখে ম্যানেজার ইনসল্‌ভেন্সির দরখাস্ত করিবেন। দোকানের জিনিসপত্র তিনি সরাইতেছেন এবং মিথ্যা হিসাবাদিও প্রস্তুত করিতেছেন। তুমি যদি ১লা জুনের পূর্ব্বে আসিয়া পৌছিতে পার এবং ম্যানেজারকে দত্ত ক্ষমতাপত্র প্রত্যাহার করিয়া লও, তবেই তোমার দোকানটি বাঁচে। নইলে সর্ব্বস্বই গেল। কোনও এটর্ণি বন্ধুর নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া, আমি তোমাকে এ পত্র লিখিলাম। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার শীঘ্র আসা একান্ত আবশ্যক।

তোমার স্নেহের
হরিপদ

পত্র পড়িয়া কুমুদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আজ ১৩ই মে, ১৭ই মে শুক্রবার মার্সেল্‌স্ হইতে পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজ ছাড়িবে। সে জাহাজ ধরিতে পারিলে, ৩১শে মে বোম্বাই এবং ২রা জুন কলিকাতায় পৌছান যাইবে—নিষ্ফল!

সময়মত পৌছান যাইতে পারে, এমন কোনও ফরাসী বা ইতালীয় জাহাজ যদি থাকে। আর ভাড়ার টাকা? হাতে গোটা পাঁচ ছয় পেনি মাত্র আছে—আর ত কিছুই নাই। কুমুদ জানিত, ফরাসী ও ইতালীয় জাহাজে থার্ডক্লাসও আছে—অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়া। যদি ধার করিয়া সংগ্রহ হইয়া উঠে।

দাসীকে ডাকিয়া কুমুদ বলিল—"আমাকে শীঘ্র এক পেয়ালা চা এবং কিছু খাবার আনিয়া দাও আমি এখনই বাহির হইব।"—পনেরো মিনিট পরে দাসী দুইটি সিদ্ধ ডিম, কয়েক টুকরো রুটির টোষ্ট, মাখন ও মর্ম্মালেড এবং চা আনিয়া দিল। তাড়াতাড়ি কোনও মতে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া, ছড়ি লইয়া কুমুদ বাহির হইয়া পড়িল।

লাড্‌কেট-সার্কাসে টমাস কুক কোম্পানীর হেড অফিস। সেখানে গিয়া সংবাদ লইয়া কুমুদ জানিতে পারিল, যদি আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিতে পারে, তবে মার্সেল্‌সে একখানি ফরাসী জাহাজ সে ধরিতে পারিবে। সে জাহাজ সময়মত বোম্বাই পৌছিবে।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল—"এত বিলম্বে টিকিট কিনিলে জাহাজে স্থান পাইব ত?"

কর্ম্মচারী বলিল—"এখন গ্রীষ্মকাল—ভারতগামী জাহাজের পক্ষে Slack Season—যে সব জাহাজ ভারত হইতে আসিতেছে, সেইগুলিই যাত্রীতে বোঝাই। স্থান যথেষ্ট হইবে।"

"আমি কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে যাইব"।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াও কুমুদ জানিয়া লইল। হিসাব করিয়া দেখিল, সর্ব্বসুদ্ধ ২৫ পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলে, কোনও গতিকে সে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারে।

কুমুদ তখন বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট ঋণ প্রার্থনা করবার জন্য বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা যখন পাঁচটা, তখন হাইগেটের অম্‌নিবস হইতে পিকাডিলির মোড়ে কুমুদ নামিল।

তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে।

সারাদিন বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও সাত পাউণ্ডের অধিক সংগ্রহ হয় নাই। এখন ১৮ পাউণ্ডের অস্থিতি!

বন্ধুরা সকলে এখানে থাকিলেও বা হইত। অনেকেই সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মযাপন করিতে গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর কুমুদও গিয়া থাকে, এ বৎসর কেবল অর্থাভাবেই সে যাইতে পারে নাই। যাহাদের অর্থের অনটন, সেই সকল ছাত্রেরাই লণ্ডনে পড়িয়া আছে।

ধাব চাহিতে গিয়া দুই এক স্থানে কুমুদ একটু অপমানিতও হইয়াছে। সে দারুণ অভিমানী।

প্রাতে সেই দুইটি ডিম খাইয়া বাহিব হইয়াছিল, এখনও পর্যন্ত সে আজ জলস্পর্শও করে নাই। মানসিক উদ্বেগে ক্ষুধার কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল।—অম্‌নিবস হইতে নামিয়া মোড়ে দাঁড়াইয়া কুমুদ ভাবিতে লাগিল। যাহাদের যাহাদের কাছে যাইবার, সে সকলই ত শেষ হইয়াছে। আরও দুই চারিজন পরিচিত ছাত্র আছে বটে, কিন্তু তাহাদেব মধ্য হইতে ১৮ পাউণ্ড সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব।—কুমুদ ভাবিতে লাগিল, "এখন কি করি?—বাসায় ফিরিয়া যাইব? ফিবিবামাত্র ল্যাণ্ডলেডি তাহার সুদীর্ঘ বিলখানি আনিয়া হাজির করিবে!"

কিয়দ্দূরে একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার সাইনবোর্ড দেখা যাইতেছিল। কুমুদ তাহার শ্রান্ত পদদ্বয় ধীরে ধীরে সেইদিকে চালনা করিল। সেলুন-বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একগ্লাস হুইস্কি ও সোডা হুকুম করিল।

পরিচারক যথাসময়ে পানীয় আনিয়া দিল। কুমুদ হু হু করিয়া তাহা অর্দ্ধেকের উপর এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর, টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া, দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল।

সময়মত দেশে পৌঁছান অসম্ভব—সুতরাং সমস্তই গেল। তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইল। দেশ হইতে টাকা আর আসিবে না।—তাহারা বলিবে কুমুদ জুয়োচোর। ল্যাণ্ডলেডি সম্ভবতঃ উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিশ দিবে—বাকী টাকার জন্য জিনিবপত্রগুলি আটক করিবে। পরদিন, এক টুকরা রুটির জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাহাকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে।

কুমুদ মাথা তুলিল। গেলাসে অল্প যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা পান করিল। পরিচারক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি তাজা সান্ধ্য-সংবাদপত্র রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর এক গ্লাস আনিব কি?

"আন"—বলিয়া কুমুদ সংবাদপত্র খুলিল। অলসভাবে ইতস্ততঃ চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে, বড় বড় অক্ষরে তিনছত্র হেড-লাইন দেওয়া অর্দ্ধ কলমব্যাপী একটি সংবাদ দেখিতে পাইল। পড়িয়া জানিল—লিভারপুল—নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত বণিক, ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এবং ঋণশোধের কোনও উপায় না দেখিয়া, গত রাত্রে তিনি অফিস-কক্ষে বসিয়া রিভলভারের দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছেন।

পড়িয়া কুমুদ আপন মনে বলিল—"ঠিক ত!—পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—এই ত পথ রহিয়াছে।"

পরিচারক হুইস্কির গ্লাস ও বিলখানি আনিয়া দিল। মূল্য দিয়া, হুইস্কিটুকু পান করিতে করিতে কুমুদ ভাবিতে লাগিল—"কে কাঁদিবে? বাবা নাই, মা নাই, ভাই নাই। বোনেরা আছে তারা কাঁদিবে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিবে। আর—না সে বোধ হয় কাঁদিবে না ; শাদা কখনও কালোর জন্যে কাঁদে?

হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করিয়া কুমুদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"যদি বাঁচিয়া থাকি—তবে প্রথমটা ত জুয়াচোর খেতাবটি মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তাহার পর জীবিকা সংগ্রহের জন্য এদেশে কত লাঞ্ছনাই যে ভোগ করিতে হইবে। তাহার স্থিরতা কি? বাঁচিয়া কি সুখ হইবে? তার চেয়ে সন্ধ্যার পর হাইড পার্কে বসিয়া, গুড়ুম করিয়া একটি আওয়াজ—এবং সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।"

কুমুদ যেন কল্পনায় দেখিতে লাগিল, পরদিনের সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় হেড লাইনে ছাপা রহিয়াছে—

HYDE PARK TRAGEDY
AN INDIAN STUDENT
SHOOT HIMSELF
WITH A REVOLVER

কিয়ৎক্ষণ পরে টেবিল ধরিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার চক্ষু তখন লাল জবাফুলের মত। পরিচিত কেহ যদি সে অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইত, তবে ভিতরকার কোনও কথা না জানিয়াও শঙ্কাকুল হইয়া উঠিত।

পানশালা হইতে বাহির হইয়া কুমুদ অম্‌নিবস লইল। হর্বণে একটি বন্দুকের দোকানে গিয়া, একটি রিভলভার ও আধ ডজন টোটা খরিদ করিল। কোটের ভিতরদিককার বুকপকেটে সেগুলি লুকাইয়া নিজ কলেজের কমন্-রুমে গিয়া কতকগুলি পত্র লিখিতে বসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুমুদ বসিয়া একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিল। ভারতবর্ষের জন্য দুইখানি মাত্র—বাকীগুলি এখানকার বন্ধুবান্ধবকে। যাহাদের নিকট টাকা ধার লইয়াছিল, তাহাদিগকে লিখিল—"দেশে আমি পত্র লিখিতেছি, আমার দোকানের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেখান হইতে তোমাদের টাকাগুলি পরিশোধ হইবে। তাহা যদি না থাকে, তবে ভাই যে টাকা আমায় ঋণ দিয়াছিলে বলিয়া আর মনে করিও না, তোমাদের হতভাগা বন্ধুকে অসময়ে দান করিয়াছিলে বলিয়াই ধরিয়া লইও।" ল্যাণ্ডলেডিকে লিখিল—"আমার বহি, জিনিসপত্র বেচিয়া তোমার প্রাপ্য টাকা লইও।" যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা ভিখারীদের দান করিও।" আর একজনকে একখানি পত্র কুমুদ লিখিবে ভাবিল। কলম হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল শেষে না লেখাই স্থির করিল।

পত্রগুলি পকেটে লইয়া কুমুদ উঠিল; রাত্রি তখন আটটা, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এ সময়ে লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। কলেজ হইতে বাহির হইয়া, একটা পোষ্ট-আফিসে দুইখানি টিকিট খরিদ করিয়া, ভারতবর্ষীয় চিঠি দুইখানিতে লাগাইল। সে দুখানি ডাকে ফেলিতে যাইতেছিল—কিন্তু ভাবিল না, অন্যান্য চিঠিগুলির সহিত এ দুখানিও পকেটেই থাকুক, কল্য পুলিস এগুলি পোষ্ট করিয়া দিবে।

পকেটে হাত দিয়া দেখিল, রিভলভার ও ডাকটিকিট কিনিয়া চারটি পেনি অবশিষ্ট আছে। অম্‌নিবাসে এক পেনি এবং হাইড্ পার্কে যে চেয়ারখানিতে বসিয়া অন্ধকার ও নির্জ্জনতার প্রতীক্ষা করিবে তাহার ভাড়া এক পেনি দিতে হইবে—বাকী দুইটি পেনি থাকে। পৃথিবীতে সে দুটিতে আর তাহার আবশ্যক নাই। ছেলে কোলে করিয়া একজন

ভিখারিণী যাইতেছিল, কুমুদ পেনি দুইটি তাহাকে দিল। "God bless you. Sir"—বলিয়া রমণী সরিয়া গেল।

অম্‌নিবাস আসিল। হাইড পার্কের মার্ব্বল আর্চ্চ নামক ফটকের সম্মুখে কুমুদ যখন নামিল, তখন সাড়ে আটটা। হাইড্ পার্কে প্রবেশ করিয়া সে ভাবিল, "আর আধঘণ্টা। আধঘণ্টা পরে অন্ধকার হইবে।"—এখনও বিস্তর নর-নারী পার্কের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে ঘাসের উপর জোড়া জোড়া চেয়ার—প্রায় সকলগুলিতেই এক এক যুগলমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এখানে ওখানে ঘাসের উপর বসিয়া বা শুইয়া লোকে গল্প করিতেছে। জনবহুল অংশ পরিত্যাগ করিয়া কুমুদ নিভৃত স্থানের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল।

দিবালোক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শূন্যমনে কুমুদ একস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাহার বাহুস্পর্শ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র টুপী তুলিয়া বলিল—"এথেল! How lucky!" কুমুদ যাহাকে সম্ভাষণ করিল, অনুমান বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাহার বেশে পারিপাট্য ছিল না, তাহার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতা মহিলার মত নহে, ইংরাজিতে যাহাকে "Lady" বলে সে তাহা নহে। সে কোনও হোটেলে ভোজনকক্ষের পরিচারিকা মাত্র; সেই ভোজনশালাতেই বৎসরখানেক পূর্ব্বে ইহার সহিত কুমুদের প্রথম পরিচয়।

যুবতী বলিল—"যাও যাও, তোমার আর ন্যাকামি করিতে হইবে না। How lucky! আমাকে দেখিয়া যেন তুমি কত খুশিই হইয়াছ! বোধ হয়, পুরা একমাস পরে আজ তোমায় আমায় সাক্ষাৎ। আচ্ছা তুমি—my goodness! তোমার চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে কেন? তোমার কি অসুখ করিয়াছিল?"

কুমুদ বলিল—"না।"—সে মনে মনে ভাবিতেছিল, জানিয়া শুনিয়া পৃথিবীতে অন্য কাহারও বিশেষ কোনও অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না—কিন্তু ইহাব নিকট অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ইহার কাছে আজ ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া যাইব—আমাকে সেই সুযোগটি দিবার জন্যই বোধ হয়, ঈশ্বর দয়া করিয়া ইহাকে এ সময় আনিয়া দিলেন।

এথেল বলিল—'চল বেড়াই। কুমি, সত্য এ একমাস তুমি ভাল ছিলে? আমার সহিত ছলনা করিতেছ না? যদি ভাল ছিলে, তবে একমাস আমাদের হোটেলে আস নাই কেন?"

"টাকা ছিল না বলিয়া।"

"Rot! টাকা ছিল না বলিয়া তুমি আমাদের হোটেলে খাইতে আস নাই! কেন, তোমার টাকা কি হইল?"

"তিন মাস দেশ হইতে আমার টাকা আসে নাই। আমাদের ব্যবসায় ফেল হইয়াছে।"

"বল কি?"—বলিয়া এথেল শঙ্কিতভাবে কুমুদের পানে চাহিল। হাইড পার্কের মধ্যস্থলে সার্পেন্টাইন নামক একটি দীর্ঘিকা আছে। এই সময় ইহারা কথা কহিতে কহিতে সেই সার্পেন্টাইনের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই দীর্ঘিকায় অনেকগুলি ছোট ছোট বোট আছে, তাহা ভাড়া লইয়া লোকে জলবিহার করিয়া থাকে। এথেল বলিল—"কুমি ডিয়ার, চল বোট লইয়া আমরা একটু বেড়াই। অন্ধকারে জলের উপর ভাসিতে বড় আরাম!"—কুমুদ বলিল—"বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ভাড়া নাই; একটি পেনি মাত্র আছে এবং উহাই পৃথিবীতে আমার শেষ পেনি।"—বলিল— 'What do you mean? পৃথিবীতে শেষ পেনি মানে কি?"

কুমুদ বলিল—"দেখ, সার্পেন্টাইনের ওপারটি বেশ নির্জ্জন—চল আমরা ঐখানে গিয়া বসি। তোমার সঙ্গে কোনও কথা আছে!"—এথেল বলিল—"চল।"

সার্পেন্টাইনের তটপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া উভয়ে যখন পরপারে পৌছিল তখন অন্ধকার

হইয়া পড়িয়াছে, পার্কের নানাস্থানে বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আলোক হইতে দূরে, একটা চেষ্টনট্ গাছের নিচে জল হইতে অল্প দূরে ঘাসের উপর দুইজনে উপবেশন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এথেল অন্ততঃ এটুকু বেশ বুঝিয়াছে, আজ কুমুদের মনটা বড়ই খারাপ। তাই সে তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য রমণীজনসুলভ নানা কথা নানা গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল, কুমুদ শুনিতে পায় না। দুই তিনবার পুনরুক্তি করিলে, সুপ্তোত্থিতের মত জিজ্ঞাসা করে—"কি বলিতেছ?"—অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়াছে। আকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মৃদু বায়ুভরে নৃত্যশীল সার্পেণ্টাইনের বক্ষে সেই নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়, হাতের উপর মাথা রাখিয়া কুমুদ সার্পেণ্টাইনের জলের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। এথেল বলিল—"কি ভাবিতেছ, কুমি?"—কুমুদ বলিল—"তুমি শেলির নাম শুনিয়াছ?"

"কে? তোমার কোনও কোনও বন্ধু বুঝি?"

"Goosie!—তিনি বিগত শতাব্দীর একজন মহাকবি ছিলেন।"

"বটে!—তা জানিতাম না।"

"তিনি প্রথমে হেন্‌রিয়েটা নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ভঙ্গ হয়। তাহার পর, একদিন রাত্রিকালে, হেন্‌রিয়েটা আসিয়া এই সার্পেণ্টাইনের জলে ডুবিয়া মরে।"—কথাটা শুনিয়া এথেলের দেহ কন্টকিত হইয়া উঠিল। বলিল—"উঃ, কি ভয়ানক!—তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"আমি শেলির জীবনচরিত পড়িয়াছি।"

শুনিয়া এথেল প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে, শঙ্কিত চিত্তে কুমুদের দিকে সে চাহিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখভাব কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সে এক কৌশল করিল।—আব্দারের স্বরে এথেল বলিল—"আচ্ছা কুমি, আমি যদি সেই হেন্‌রিয়েটার মত এই সার্পেণ্টাইনের জলে গিয়া ঝাঁপ দিই—তাহা হইলে তুমি কি কর?

কুমুদ বলিল—"আমিও জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি—তোমায় তুলিয়া আনি।"

"তুমি সাঁতার জান?"

"Rather!—দেশে থাকিতে বাজি রাখিয়া গঙ্গা কতবার পার হইয়াছি।"

এথেলের বক্ষ কাঁপাইয়া একটি আরামের নিঃশ্বাস পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল—"Thank God!"-কুমুদ বলিল—"কেন এথেল, Thank God! বলিলে কেন?"

এথেল নীরব।—কুমুদ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি সন্দেহ, আজ আমি সার্পেণ্টাইনে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিব?"

এথেল কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"যাও আমি বলিব না।"

কুমুদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়, এ কে আসিয়া ছলছল নেত্রে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়? আমার স্বদেশীয়া নহে স্বজাতীয় নহে এমন কি আমার স্ববর্ণাও নহে—আমার কেহই নহে—ইহার এত ব্যথা কেন?—কুমুদের দুইটি চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

আরও দুই চারি কথার পর কুমুদ বলিল—"দেখ এথেল, আমি তোমার কাছে অপরাধী আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করিবে কি?"—এথেল বলিল—"কি অপরাধ?"

"মনে বুঝিয়া দেখ—আমি কি তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করি নাই?"

কুমুদের হাতটি ধরিয়া এথেল বলিল—"কেন তুমি আজ একথা বলিতেছ?"—তাহার

স্বর কাঁদ কাঁদ।—কুমুদ বলিল—"কেহ যদি কাহারও নিকট কোনও অপরাধ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে না কি? তুমি আমায় ক্ষমা কর এথেল।"

কুমুদের হাতটি ছুড়িয়া দিয়া এথেল বলিল—"যাও, তুমি যদি ওসব বলিবে—তবে আমি কাঁদিব। তুমি আজ এমন হইয়াছ কেন?"

তাহার ভাব দেখিয়া কুমুদ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

কুমুদ অর্দ্ধশয়ানভাবে পড়িয়া ছিল—এথেল নিকটে বসিয়া ছিল। আর কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর, এথেল খেলাচ্ছলে কুমুদের কোটের বোতাম ধরিয়া টানিতে লাগিল। হঠাৎ একটা স্থলে কোন পদার্থ আছে অনুভব করিল। ক্ষিপ্রহস্তে, কুমুদের পকেট হইতে সে জিনিষটি টানিয়া বাহির করিয়া কদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"কুমি—এ কি?"

কুমুদ বলিল—"ওটা রিভল্‌ভার।"

"রিভল্‌ভার কেন?"

"রাত-বিরাতে পথে ঘাটে বেড়াই, সঙ্গে থাকা ভাল। দাও, ঘাঁটিও না।"

কিন্তু ইহার মধ্যে এথেল বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কুমুদের কথা শেষ হইতে না হইতে দ্রুতপদে জলের দিকে ছুটিল।

"কি কর—কি কর"—বলিয়া কুমুদও তাহার পশ্চাদ্ধাবন কবিল। জলের নিকটে গিযা তাহার ব্লাউজের পশ্চাদ্ভাগ চাপিযা ধরিল।

তন্মুহূর্ত্তেই এথেল, সার্পেন্টাইনের মধ্য ভাগ লক্ষ্য কবিয়া প্রাণপণ বলে বিভলভারটি নিক্ষিপ্ত করিল।—জলের কোনও অদৃশ্য অংশ হইতে "কব" করিয়া একটা শব্দ শুনা গেল। নরশোণিতের পরিবর্ত্তে, সেই শিশুরাক্ষস, স্বীয় অগ্নিময়ী তৃষা জলেই নিবাবণ করিতে বাধ্য হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এথেলের হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া কুমুদ বলিল—"শয়তানী—একি কবিলি?"

এথেল বলিল—"শয়তান!—খুব করিয়াছি—বেশ কবিয়াছি—আমাব খুসী—আমাব হাত ছাড়, লাগে!"

কুমুদ বলিল—"ভাবিয়াছিস—রিভলভার ভিন্ন আমাব অন্য কোনও উপায় নাই?"

এথেল বলিল—"উঃ উঃ—আমাব হাত কাটিয়া গেল—লাগে যে—ছাড় না—Brute!"

কুমুদ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীবে পূর্ব্বস্থানে আসিযা বসিল—এবাব শয়ন করিল না।—এথেল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দেখ দেখি কি করিয়াছ! আমাব রিষ্টলেট ভাঙ্গিয়া কব্জীর মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উহুহু।"—বলিয়া সে হাত ঝাড়িতে লাগিল।

পকেটে দিয়াশালাই ছিল—একটা জ্বালিয়া কুমুদ দেখিল, এথেল সত্য বলিয়াছে। এনামেলের চুড়ি ভাঙ্গিয়া খানিকটা এথেলের কব্জিতে প্রবেশ করিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে।

দেখিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহাকে জলেব ধারে লইয়া গেল। ভাঙ্গা চুড়িটুকু তুলিয়া, রুমাল ভিজাইয়া স্থানটি ধুইয়া দিল। গোটাকতক ঘাস ছিঁড়িয়া সেগুলো বেশ করিযা চিবাইয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিল—তাহাব পর রুমাল ছিঁড়িয়া জলপটি বাঁধিয়া দিল। স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এখনও বড় জ্বালা করিতেছে এথেল?"—এথেল বলিল—"না, একটু কমিয়াছে।"

"বাস্তবিক এথেল—আমি একটা জানোয়ার! এস।"—বলিযা উভয়ে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল।—বসিয়া কুমুদ বলিল—"বড় লাগিতেছে কি?"—চল, কোনও ডাক্তারখানায় গিয়া ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধাইয়া দিই।"—এথেল বলিয়া উঠিল—"এক পেনিতে কি ব্যাণ্ডেজ হয়?"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কুমুদ বলিল—"ঠিক। ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

এথেল বলিল—"আমরা বাহিরে যাই চল। ডাক্তারখানায় নয়—কোনও একটা রেঁস্তোরায় চল। আমার কাছে টাকা আছে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।"

কুমুদ বলিল—"তুমি কি ডিনার খাইয়া আস নাই?"

"সে ত সাতটার সময় খাইয়াছি। এ তিন চারি ঘণ্টায় আমার ক্ষুধা পায় না বুঝি! তুমি কখন ডিনার খাইয়াছ?"

"খাই নাই।"

"খাও নাই!—চা?"

"চাও খাই নাই।" "লাঞ্চ?"

"লাঞ্চও খাই নাই। বাড়ী হইতে আটটার সময় দুইটি ডিম, দুইখানি টোষ্ট খাইয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাহার পর হইতে আব কিছুই খাই নাই।"

শুনিয়া এথেল বলিল—"Poor dear!—সারাদিন কিছুই খাও নাই!—চল চল—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।"

ফটকের বাহির হইয়া উভয়ে একটি ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া এথেল জিজ্ঞাসা করিল—"কোনও প্রাইভেট সেলুন খালি আছে?"

পরিচারিকা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"আছে মহাশয়া—আসুন।"

প্রাইভেট সেলুনে উভয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি আসিল। এখানে আব কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না—এমন কি না ডাকিলে পরিচারিকাও আসিবে না।

কিঞ্চিৎ পানাহারের পর কুমুদেব দেহে যেন নবপ্রাণ সঞ্চার হইল। আহারাদি শেষ হইলে পরিচারিকা আসিয়া টেবিল পরিষ্কাব করিয়া লইয়া গেল।

চেয়ার ছাড়িয়া, সোফার উপর আরাম করিয়া দুইজনে উপবেশন করিলে, এথেল বলিল—"আচ্ছা কুমি, তোমার এ পাগলামি কেন উপস্থিত হইল বল তো!"

প্রথমে কুমুদ কিছুই প্রকাশ করে না,—অনেক পীড়া পীড়ির পর নিজের অবস্থা বলিতে আবম্ভ কবিল। আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল—"এ অবস্থায়, এথেল, আমি আত্মহত্যা ছাড়া আর কি করতে পারি বল? আমার আর কি উপায় আছে? আজ না হয় তুমি বাধা দিলে। কাল হউক—পরশু হউক—ঐ পথ ভিন্ন আমার আর কোন্ পথ আছে? যদি তাহা না করি, অনাহারে মরিতে হইবে, তাহার চেয়ে—"

এথেল বলিল, "কত পাউণ্ড হইলে তোমার দেশে যাওয়া হয় বলিলে?"

"পঁচিশ পাউণ্ড!"

"কাল সন্ধ্যার ট্রেণ শেষ ট্রেণ?"

"হ্যাঁ।"

"কাল কতক্ষণ অবধি টাকা পাইলে তোমার কাজ চলিবে?"

"বেলা তিনটা।"

"আচ্ছা—আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কুমুদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি!—তুমি পঁচিশ পাউণ্ড কোথা পাইবে এথেল?"

এথেল বলিল—"দশ পাউণ্ড আমাব নিজেরই আছে; পোষ্ট আফিসে আছে—যখন খুসী বাহির করিতে পারিব। বাকী ১৫ পাউণ্ড আমি সংগ্রহ করিবাব চেষ্টা করিব। যদি আমি সফল হই, তাহা হইলে তুমিও সকল কুমৎলব পবিত্যাগ করিবে ত?"

"করিব।"

"Honour Bright?"

"Honour Bright"

"আচ্ছা কাল বেলা তিনটাব সময় তুমি চান্সেবি লেন ও ফ্লীট ষ্ট্রীটেব মোড়ে থাকিও, আমি আসিব। যদি সংগ্রহ কবিতে পাবি, সেই সময় তোমায় দিব।"

"বেশ।"

বাত্রি তখন সাড়ে এগাবোটা। ভোজনশালা হইতে বাহিব হইযা দুইজনে এথেলেব বাসাব দিকে অগ্রসব হইল। সে প্রায় দুই মাইল পথ। ঘবেব বাহিবে যখন তাহাবা পবস্পবেব নিকট বিদায গ্রহণ কবিল, তখন ইংবেজি তাবিখ পবিবর্ত্তিত হইয়া গিযাছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন নির্দিষ্ট স্থানে ও সমযে কুমুদ এথেলেব সাক্ষাৎ পাইল। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা কবিল—"কি হইযাছে?"

"টাকা সংগ্রহ হইযাছে। কুকেব আফিসে চল—টিকিট কিনিযা ফেলা যাউক।"

"তুমি আমাব সঙ্গে আসিবে?—তোমাব কাজ—"

এথেল হাসিযা বলিল –"আমাব তো ছুটি। আমাব এই পটি বাঁধা হাতে পবিবেষণ কবিলে কেহ তা খাইবে না।—তাই ম্যানেজাব হাত ভাল না হওযা অবধি আমায় ছুটি দিয়াছেন। সুবিধাই হইযাছে—নইলে টাকাব চেষ্টায ঘুবিযা বেড়াইবাব সময পাইতাম না।"

দুইজনে কুকেব আফিসে গিযা টিকিট ক্রয কবিল।

সন্ধ্যা আটটাব সময় ভিক্টোবিযা ষ্টেশন হইতে কুমুদেব ট্রেন ছাড়িবে। দুইজনে একত্র ডিনাব খাইযা, যথা সমযে ষ্টেশনে গিযা পৌছিল।

কুমুদ বলিল—"এথেল—তোমাব এ উপকাব জীবনে আমি ভুলিব না। যদি আমাব ব্যবসায়টিকে বাঁচাইতে পাবি—দুইমাস পবেই তোমাব এ টাকা আমি পাঠাইযা দিব।"

এথেল কোনও উত্তব কবিতে পাবিল না। অশ্রুবাষ্পে তাহাব কণ্ঠবোধ হইযাছিল।

ক্রমে গাড়ী ছাড়িবাব সময হইল।

এথেল বলিল—"গুডবাই কুমি—এই বোধ হয আমাদেব শেষ দেখা।"

কুমুদ বলিল—"ও কথা কেন বলিতেছ এথেল?"

এথেল বলিল—"যখন উভয়েব মধ্যে সাত হাজাব মাইল ব্যবধান হইযা পড়িবে, তখন আব তুমি আমায় মনে বাখিবে কি?"

"তোমায ভুলিব? বাঁচিযা থাকিতে ত নয।"

এথেল বলিল—"ঐ বাতি দেখাইতেছে। গাড়ীতে ওঠ, গুডবাই।"

"গুডবাই নয় এথেল—ও-বিভোয়া, যতদিন না আবাব দেখা হয। আবাব দেখা হইবে।"—বলিযা কুমুদ এথেলেব হাতখানিব উপব নিজ ওষ্ঠ যুগল স্পর্শ কবিল।—গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

[ভাবতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২]

নিষিদ্ধ ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের দুর্গাচরণবাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালঙ্করা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেঝ মেয়ে, রায়-বাহাদুর।"— কন্যাটিকে বলিলেন—"মা, এঁকে প্রণাম কর।"

ভবানীপুর-নিবাসী রায় প্রফুল্ল কুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ পরিবৃত্ত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোষে বসিয়া বাঁধা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটাসোটা, হাস্যোজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাঁসিয়াযুক্ত বহুমূল্য শালের যোড়া গায়ে দিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রসন্নদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। দিব্যি মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশ-নামা পারিষদ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "মা, তোমার নামটি কি বল ত?"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারিত হইল না। দুর্গাচরণবাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন, "বল মা, বল।"

মেয়েটি তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "শ্রীমতি নন্দরাণী দাসী।"

রায়বাহাদুর বলিলেন—"নন্দরাণী? বেশ। নামটিও বেশ। কেমন হে যতীনদাদা?"

সতীন্দ্র-নামধারী পারিষদ বলিল—"খাসা নাম।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "নন্দরাণী নাম—বাড়ীতে সবাই রাণী বলে ডাকে।"

"রাণী? তা আপনার মেয়ে রাজরাণী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁৎ। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কি বলেন?"

ঘোষাল মশায় বলিলেন, "এ মেয়ে আপনারই পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"

রায়বাহাদুব বলিলেন, তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস, এখানে বস। দুর্গাচরণবাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মেয়েটি ইতস্ততঃ করিতেছিল; তাহার পিতা বলিলেন—"বস মা, বস।"—বলিয়া নিজেও উপবেশন কবিলেন। মেয়েটিও মাথা নীচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড় মা?"

"আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ আর সরল শুভঙ্করী।"

"পান সাজতে জান?" "জানি।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অবধি বাড়ীর সব পান ঐ ত সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পান।"

রায় বাহাদুর রূপার ডিবা হইতে একটা পান লইয়া কপ্ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "বেশ পান। রান্না-বান্না কিছু শিখেচ মা?"

রাণী বলিল, "শিখেছি।"

"তাও শিখেছ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পার?"—মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পারি।"

রায় বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এরই মধ্যে শিখেছ? লক্ষ্মী মেয়ে!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমি আর বাপ হয়ে কি বলব রায়বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন তবে দেখতেই পাবেন। গত মাসে আমার স্ত্রী যখন আঁতুড়ে, বড় মেয়েটি শিবপুরে, অনেক কাকুতি মিনতি করাতেও বেয়াই মশাই তাকে পাঠালেন না, রাণীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।"

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায়বাহাদুর বলিলেন, "নেব না? নেব না? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে? কি বল হে সতীশ?"

সতীশ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি!"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর মাকে ছুটি দিই।"—বলিয়া নন্দরাণীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, আমার মাথার পাকা চুল তুলে দিতে পারবে? দুপুরবেলা, খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে বসে বসে, একটি একটি করে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কি?—এটি বোধহয় শেখনি, কি বল মা?—তোমার বাবার মাথায় তো পাকা চুল নেই!"—বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণীর মুখেও ঈষৎ হাস্যসঞ্চার হইল। মুখটি তুলিয়া সে রায় বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে "কলৌ সুজনা ইব" চুলেব সংখ্যা খুবই কম এবং দূর দূরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনকেই সম্মতিজ্ঞান করিয়া রাযবাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হবে। যাও এখন বাড়ীর ভিতরে যাও।"

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। নন্দরাণী তক্তপোষ হইতে নামিবামাত্র, সে আসিয়া তাহাব হস্তধারণ করিযা অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিযা লইয়া প্রায় এক মিনিট কাল রায়বাহাদুর নীববে ধূমপান করিলেন। পরে হুঁকা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "তার পর ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া তোমার মত বল। ঐ যা, একেবারে আপনি থেকে তুমি বলে ফেললাম!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "তুমিই বলুন। 'আপনি' বললেই বরং আমাকে লজ্জা দেওযা হয। আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট। বয়সে—ধনে—মানে—"

রায়বাহাদুর বলিলেন—"হ্যাঁ হে, হ্যাঁ, তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট তা ত স্বীকারই করছি। তা বলে, চুল পেকেছে বলেই আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি তা ভেব না—হা হা হা।"—বলিয়া তিনি দুর্গাচরণবাবুর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া দিলেন, পারিষদগণও খুব হাসিতে লাগিল।

দুর্গাচরণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যবে অনুমতি করেন তবেই বিবাহ হতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই হোক। তবে আমি সামান্য লোক—গরীব—"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "গরীব ত হয়েছে কি? গরীব ত হয়েছে কি? গরীবই বা কিসের? তুমি কি কারু কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছ? আর হলেই বা গরীব? গরীবের মেয়ের কি বিয়ে হবে না? সে আইবুড়ো থাকবে? হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। তুমি বোধ হয় আজকালের বরপণ প্রথা ভেবে এ কথা বলছ? সে প্রথার আমি বিরোধী—ভয়ঙ্কব বিরোধী।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথা শুনেই ত—"

"শুনেই ত কি? পড়নি? আমার সামাজিক-সমস্যা-সমাধান কেতাব পড়নি? তাতে বরপণ বলে একটা চ্যাপ্টারই যে রয়েছে। বরপণ প্রথাকেই আমি যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছি— একেবারে যাচ্ছেতাই করে—পড়নি?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "পড়েছি বই কি। আপনার বই কে না পড়েছে? আপনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "কোথা বিখ্যাত?—হ্যাঁ বঙ্কিম একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কিনা। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়তাম। আজকের কথা? বঙ্কিমের খুব নাম হয়েছে বটে। তার একখানি নতুন বই বেরিয়েছে, রাজসিংহ। পড়েছ? হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। অথচ আমার বই পোকায় কাটছে, কেউ কিনছে না। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সে দিন।"

একজন ঔৎসুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হল?"

রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বঙ্কিমকে বললাম, ওহে তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ্ আর লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশের উপকার হয়। আমার কথা ত কেউ শোনে না, তোমার কথা শুনবে। এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! বরপণ প্রথার দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখ দেখি। আর একখানা লেখ, যা পড়ে বাঙ্গালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখ যৌথ কারবার সম্বন্ধে। কেন বাঙ্গালীরা যৌথ কারবার ফেল হয়ে যায়, কি কি উপায় অবলম্বন করলে তা সফল হতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বেশ করে বুঝিয়ে দাও। প্লটও তোমায় বলে দিচ্ছি। তাতে দেখাও যে জনকতক বাঙ্গালী যুবক কলেজ থেকে বেরিয়ে, একসঙ্গে মিলে যৌথ কারবার আরম্ভ করলে, আর দিন দিন তাদের খুব উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তারা এক একটি লক্ষপতি হয়ে দাঁড়াল, গভর্ণমেণ্ট থেকে খেতাব পেলে ইত্যাদি। তা নয়, খালি লভ্ আর লড়াই—লভ্ আর লড়াই!—ও সব লিখে দেশের কি উপকার হবে বল দেখি?"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিমবাবু কি বললেন।"

হুঁকাটি হাতে লইয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "হাসতে লাগল। বললে—'আচ্ছা তা হলে যৌথ কারবারের নভেলটাই আরম্ভ করি। কাঁচা মালের কি দর আর কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যায়, রেলভাড়াই বা কত, সেগুলোও পরিশিষ্ট করে ছেপে দেব কি?'—বিদ্রূপ হল!—'তোমার যা খুসী তাই কর'—বলে রাগ করে আমি চলে এলাম।"

রায় বাহাদুরের মুখখানি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল তামাক খাইয়া তবে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, 'টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ যদি করেন, তা হলে ত আর কোন বাধাই নেই। যে দিন অনুমতি করেন, সেই দিনেই বিবাহ হতে পারে। সামনে ফাল্গুন মাসে—'

রায় বাহাদুর বলিলেন, "রও—রও। আরও কথা আছে। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বিবাহ সম্বন্ধে আমার আর একটি মত আছে। সে বিষয়ে যদি তুমি স্বীকার হও, তবেই আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি।"

দুর্গাচরণবাবু একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কি মত, আজ্ঞা করুন।"

রায় বাহাদুর একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিলেন, "সামাজিক সমস্যা সমাধান কেতাবে বাল্যবিবাহ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। পড়েছ?"

দুর্গাচরণবাবু বিপন্নভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা—বোধ হয়—কি জানি—ঠিক মনে পড়ছে না।"

"সে প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি, বাল্যবিবাহ খুব ভাল জিনিস। আমাদের সমাজে এই একান্নবর্ত্তীপরিবার-প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকবে, ততদিন বাল্যবিবাহ ভিন্ন উপায় নেই। কেবলমাত্র স্বামীটিই স্ত্রীলোকের পরিজন নয়, তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী ভাসুর দেওর ননদ ভাজ—এ সব নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হবে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই বউকে সেই পরিবারভুক্ত হতে হবে। কেমন কিনা?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, প্রমাণ হল, বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু—এর মধ্যে একটু কিন্তু আছে ভায়া। সেটি আমার আবিষ্কার। কি বল দেখি? কিন্তু—কি?"

দুর্গাচরণবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স না হলে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোল বৎসর আর ছেলের বয়স চব্বিশ—নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এর পূর্ব্বে তাদেব একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারিশাস্ত্র খুলে দেখ, আমার মত যথার্থ কিনা বুঝতে পারবে।"—বলিয়া রায় বাহাদুর একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া, মুখটি উন্নত করিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণবাবু অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কথা ত ঠিকই। কিন্তু বড় মুস্কিল যে! আমার রাণীর বয়স, এখন ধরুন বারো, শ্রাবণ মাসে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়বে। তবে কি তিন চার বছর এখন জামাই আনতে পাবো না? বাড়ীর মেয়েরা তা হলে যে—"

—রায়বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন জামাই আনতে পাবে না? অবশ্যই পাবে। যেদিন বলবে, তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দেব। তাকে খাওয়াও দাওয়াও, আদর কর, যত্ন কর—বাড়ীর মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করুক—কিন্তু ঐ নিয়মটি প্রতিপালন করতে হবে।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "বড় সমস্যাব কথা!"

রায়বাহাদুর উৎসাহে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন—"সমস্যাই ত! সমস্যাই ত!—এই রকম সব সমস্যার সমাধান করেছি বলেই ত আমার কেতাবের নাম 'সামাজিক সমস্যা-সমাধান'। এর সুন্দর উপায় আমি বের করেছি । যদিও হঠাৎ সেটা কারু মনে আসে না, আসলেও উপায়টি কিন্তু খুবই সোজা।"

"কি উপায়?"

"বউ অন্দরে থাকবে, ছেলে বাইরের ঘরে শোবে। ব্যস, হয়ে গেল।—কেমন সহজ উপায় নয়?"—বলিয়া রায় বাহাদুর হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দুর্গাচরণবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেটা কি ভাল হয়?"

কেহ কথার প্রতিবাদ করিলে রায়বাহাদুর অত্যন্ত রাগিয়া যান। বলিলেন, "আমি ভাল বুঝেছি—তাই লিখেছি। তোমার ভাল বোধ না হয়, অন্যত্র তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে পার। আমার এক কথা। পাহাড় নড়ে ত নড়বে, প্রফুল্ল মিত্তিরের কথা নড়বে না।"—বলিয়া তিনি গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুরের এই ভাবান্তর দেখিয়া দুর্গাচরণবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। পাত্রটি হাতছাড়া হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা জমিদারির আয়, কলিকাতায় দুই তিনখানি বাড়ি আছে, রায় বাহাদুরের ঐ একমাত্র পুত্র, বি-এ পড়িতেছে, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুপুরুষ—এক পয়সা পণ দিতে হইবে না—এমন সুযোগটি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই সবিনয়ে, নানা মিষ্ট কথায় দুর্গাচরণবাবু তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। "বাড়িতে" পরামর্শ করিয়া, যেমন হয় আগামী কল্য প্রাতে গিয়া রায় বাহাদুরকে জানাইয়া আসিবেন বলিলেন।

রায় বাহাদুর তখন, হাসিতে হাসিতে স-পারিষদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ি, যুগল ওয়েলারের পদভরে দুর্গাচরণবাবুর ক্ষুদ্র গলি কাঁপাইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসেই শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রায় বাহাদুরের পুত্রের নাম শ্রীমান হেমন্তকুমার। ফুলশয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি। কিন্তু তাহার পর যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। রায় বাহাদুর পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি তাঁহার ভীষণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী নিজের স্বামীকে বেশ চিনিতেন, সুতরাং হুকুম রদ করাইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না।

সপ্তাহ কাল থাকিয়া রাণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।—দুর্গাচরণবাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেখ, জামাইকে সকালবেলা নিয়ে এসে বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউয়ের দেখা হয়নি এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জান তা?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই-ষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণবাবু রাণীকে শিবপুরে তাঁহার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে রাখিয়া মাতব্বর এলিবাই সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া আসিয়া, তাহার পর হেমন্ত কুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতর্চ্চনা করিলেন।

আষাঢ় মাসে রায় বাহাদুর বধূকে নিজে বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এতদিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্ব্বাটীতে নির্ব্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার এগ্‌জামিনের পড়া, কিন্তু মেঘদূত মুখস্থ করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষাযাপন করিতে লাগিল।—দুইবার জলযোগ ও দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমাব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন-পনেরো পরে একদিন হঠাৎ উভয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখাচোখি হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একদিন জল খাইয়া ফিরিবার পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ একস্থানে জড়সড় হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে কেহ নাই। যাইবার সময় সে বধূর শাড়ীটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটিত। ক্রমে পত্র বিনিময়, তাম্বূল বিনিময় এবং আরও কি কি বিনিময় ঠিক জানি না—সেই ক্ষণিক মিলনই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শরৎকাল আসিল। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে, (মাসের পয়লা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখনও রেওয়াজ হয় নাই) "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় "চকোরের ব্যথা" শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়। পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—"বধূমাতা অনেকদিন আসিয়াছে। মার জন্য বোধ হয় তাঁহার অত্যন্ত মন কেমন করে। অতএব আশ্বিন মাস পড়িলেই তুমি তাহাকে কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবে।"—দুর্গাচরণবাবু আসিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কার্ত্তিক মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবার দুই তিনদিন পরে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপরিচিত—বাঙ্গলায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হইল, কারণ কলেজের ঠিকানায় কখনো তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটের উপর মোহর দেখিল—শিবপুর। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল, "গিন্নীর চিঠি নাকি?"—"না"—বলিয়া পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুকপকেটে লুকাইয়া রাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভাণ করিয়া রহিল।

আসলে তাহার মনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুরে আমার বড় শ্যালীর শ্বশুর বাড়ী, সেখান হইতেই কি পত্র আসিল?

(২) কখনও ত আসে না, আজ আসিল তাহার কারণ কি?

(৩) রাণী কি তাহার দিদির মারফৎ তাহাকে চিঠি পাঠাইয়াছে?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদির মারফৎ আমাকে এ চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কি না?

(৫) যদি লিখি, তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কি না?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন? এমন কঠিন, এমন নিষ্ঠুর কেন?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি নিকটেই সে বসিয়াছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল না—কারণ পকেটের ভিতর লেফাফার মধ্যেই তাহার তৃষাহর পদার্থটি ছিল। বাগানে নামিয়া গিয়া পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল

তাহাতে লেখা ছিল—

১৭নং বিনোদ বোসের গলি
শিবপুর।
২৫শে কার্ত্তিক।

কল্যাণবরেষু

ভাই হেমন্ত, আমাকে চিনিতে পারিবে কিনা বলিতে পারি না, কাবণ একদিন মাত্র বাসরঘরে আমায় তুমি দেখিয়াছিলে, তাহাও ৮।৯ মাস পূর্ব্বে। আমি তোমার দিদি হই, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপরে লিখিত ঠিকানায় আমাব শ্বশুরালয়।

আমার দিদিশাশুড়ি তোমায় দেখেন নাই—একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। তোমাব কলেজ হইতে শিবপুর এমন ত কিছু দূর নহে—বড় জোর এক ঘন্টার পথ। শিবপুর ঘাটে নামিয়া, যাহাকে আমাদের ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তোমাব সঙ্গে আমারও অনেক অত্যাবশক কথা আছে—অতএব, যত শীঘ্র পাব, অবশ্য অবশ্য একদিন আসিবে। বেলা বারোটা হইতে দুইটাব মধ্যে আসিলেই ভাল হয়। আমাব শ্বশ্রুঠাকুরাণীর অনুমতি অনুসারে এ পত্র তোমায় লিখিতেছি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার দিদি যামিনী।

পুঃ—রাণী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী রবিবার বাবা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।

পত্রখানি, বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিনবার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রস টুকু জমা হইয়া থাকে।

সে দিন কলেজে বাকী কয় ঘন্টা কি যে বক্তৃতা হইল, হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রাণী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন? তাহার দিদিশাশুড়ি সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল? সেখানে গেলে, রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না। "পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন—আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্য ভঙ্গ করাই কেন"—এইরূপই যদি দিদির মনের ভাব হয়?—হয়, হউক। তাহারা যদি আমায় জল

খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পান পর্য্যন্ত খাইব না।—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বইকি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয় আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন? রাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি?—দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্যদিন অপেক্ষা একঘন্টা পূর্ব্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারোটা হইতেই লেকচার আরম্ভ।

পৌনে এগারোটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইবে। চারিটার পূর্ব্বে গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারবাণের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকাগাড়ী লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্রাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্রামকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকাগাড়ীতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গা বক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে!—দাঁড়ি বেটারা কুঁড়ের বাদশাহ!

শিবপুর ঘাটে নামিয়া বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্ত্তা হাওড়ার উকিল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় কোন হাউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু ভাল আছেন ত? আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।"—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "কি ভাই চিনতে পার?"—বলিয়া উনিশ কিংবা কুড়ি বৎসর বয়সের, গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইঁহাকে দেখিয়াছিল বটে।—"যামিনী দিদি?"—বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল, "হয়েছে ভাই, আমি অমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। আর, আশীর্ব্বাদের দরকারই বা কি? রাণীর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হয়েছে—সেইদিনই ত রাজা হয়েছ।"— বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ধজানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণী কণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল।—"কে লা ছুঁড়িগুলো—পালা বলছি এখান থেকে"—বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র, ঝম ঝম শব্দ করিতে করিতে কয়েক জোড়া চরণ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি আমায় ডেকেছেন কেন?"

"কেন বল দেখি? যদি বলতে পার ত—সন্দেশ খাওয়াব"—বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

"বলতে পারলাম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই"—বলিয়া হেমন্ত খোকাকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

খোকা এই অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে রাজি হইল না। তাহার মা তাহাকে কত করিয়া বুঝাইল, "যাও বাবা—কোলে যাও; তোমার মেছোমছাই হন, তোমায় কত ভালবাসেন, কত আদর করবেন, নক্ষি বাবা—যাও বাবা। পাজি হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি ত ওঁর বয়েই গেল।"

বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর যামিনী বলিল, হ্যাঁ ভাই, ক'টা অবধি তুমি এখানে থাকতে পারবে?"

হেমন্ত এ অঙ্কটি পূর্ব্বেই মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল, "বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।"

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল সাড়ে বারোটা প্রায় বাজে। বলিল, "আচ্ছা, দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।"

দুই মিনিট পরে হেমন্ত শুনিল ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, যামিনী-দিদির পায়ে ত একগাছি করিয়া ডায়মন-টাকা মল দেখিয়াছি—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কে আসে? দিদিমার আওয়াজ কি এ রকমটা হইবে?

সে শব্দ কিন্তু ঘর অবধি আসিল না, বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "দিদিমার এখন অবসর হল না ভাই—এখনও তাঁর আহ্নিক সারা হয়নি। অন্য কাউকে তোমার যদি দরকার হয় তা বল। আব কাউকে চাই?"

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় ও আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব ঢিব করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল, কুসুম রঙের শাড়িতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এই নাও—তোমার রাণী নাও ভাই রাজা। রাজা ও রাণীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো অবধি তুমি রাজত্ব কর। আমি ততক্ষণ তোমার জন্যে জলখাবার তৈরী করিগে।"—বলিয়া যামিনী কোন উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া, সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল। রাণী পিত্রালয়ে। এখন আর হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা। কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল, "এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। কলকাতার মেসে গিয়ে এ ক'টা মাস আমি থাকি।"

পুত্রের এই অধ্যয়নস্পৃহায় পিতা কোনও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আফিসের পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে 'ধরিয়া' লইয়া যাইত। যামিনীর ভগিনীস্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রাণীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুন মাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইল, রায় বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।—গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে রায় বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন, "বাড়ীতে গোলমালে পড়াশুনো ভালো হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাক।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মার কাছে গিয়া, মেসে থাকা যে কি কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া, ভর্ৎসিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল। পিতা-আজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ী আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রাণীর শাড়ীর রঙটি পর্য্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুই রবিবার এইরূপে কাটিলে, বাড়ীর একজন ঝিকে ঘুস দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে রবিবারে ঝির মারফৎ উভয়ের পত্রব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটিতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। বড় আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষ্যেও রাণী একবার তাহার কাছে আসিতে পারিবে—কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ী আসে, চুপ করিয়া উদাসনেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।—এক রবিবারে ঝি নিরিবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল, "দাদাবাবু, বউদিদিমনি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"—হেমন্ত বলিল, "কেন ঝি ? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল, "হাজার হোক দাদাবাবু সোয়ামি ত। দাদা দিদিমণি বলেন, এমন কপাল করে এসেছিলাম যে সোয়ামিকে চোখেও একবার দেখতে পাইনে।"

"তুই কি করে জানলি ঝি?"

"যে ঘরে বউদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুই কিনা।"

পর রবিবার ঝি বলিল, "দাদাবাবু, একটি বার আপনি বউদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।"

হেমন্ত বলিল, "উপায় কি?"

"আপনি যদি এক কাজ কবেন্ ত হয়।"

"কি কাজ, ঝি ?"

"আপনি যেমন রবিবারে আসেন, একদিন যদি বলেন আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি কিছু হয়েছে, এই বলে যদি থেকে যান, তাহলে অনেক বাত্রে সবাই ঘুমুলে, আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপনাকে দোর খুলে দিতে পারি।"

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাণী যে ঘরে শয়ন করে, সিঁড়ি দিয়া দুতলায় উঠিয়া সেই প্রথম ঘর। তাহার পিতার শয়নঘর সেখান হইতে কিছু দূরে। খুব সাবধানে যাইতে পারিলে বোধ হয় সফল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বড় ভয় করে। যদি ধরা পড়িয়া যাই—ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি!—ঝি বলিল, "কি বলেন দাদাবাবু?"

"তোমার বউদিদিমণি কি বলেন?"

"তিনি বলেন, না ঝি ওসব কাজ নেই, আমার বড় ভয় করে।"

"আচ্ছা আমি ভেবে দেখব"—বলিয়া ঝিকে হেমন্ত আপাততঃ বিদায় দিল।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নাটক পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যদি দড়ির মই পাই, তবে বাগান দিয়া পশ্চাতের জানালার পথে আমিও রাত্রে রাণীর ঘরে প্রবেশ করিতে পারি। অনেক সন্ধানে জানিতে পারিল, সাহেববাড়ীতে ১৫ টাকা মূল্যে দড়ির মই কিনিতে পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া সেই মই একটি হেমন্ত কিনিয়া আনিল।

পরবর্ত্তী রবিবারে ছোট একটি হাত ব্যাগের মধ্যে সেই মইটি লুকাইয়া হেমন্ত বাড়ী গেল। যথাসময়ে ঝির দ্বারায় সেই মই এবং একখানি পত্র স্ত্রীর নিকট চালান করিয়া দিল।

পত্রে এই প্রকার লেখা ছিল ঃ—

হৃদয়ের রাণী আমার,

একবৎসর কাল বিচ্ছেদ সহিলাম, আর পারি না। তোমায় একটিবার দেখিতে না পাইলে

এইবার আমি পাগল হইয়া যাইব। ঝি যে উপায় বলিয়াছিল, তুমি তাহাতে অমত করিয়াছিলে। আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, উহা নিরাপদ নহে। এবার কিন্তু একটি সুন্দর উপায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তুমি যদি সাহস কর, তবেই আমাদের মিলন হইতে পারে।

ঝির হাতে যে জিনিসটি পাঠাইলাম, তাহা একটি দড়ির মই। উহার একটাপ্রান্ত তোমার ঘরের বাগানের দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালায় বাঁধিয়া যদি নিম্নে ঝুলাইয়া দাও, তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিয়া অনায়াসে তোমার ঘরে উঠিয়া যাইতে পারি। দড়ি খুব শক্ত—ছিঁড়িবার কোনও ভয় নাই। এখন তুমি সাহস করিলেই হয়।

কল্য রাত্রি এগারোটার সময় মইটি জানালায় বেশ শক্ত করিযা বাঁধিয়া উহা নীচে ফেলিয়া দিবে। এগারোটা হইতে সাড়ে এগারোটাব মধ্যে আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর দিয়া তোমার জানালার নিকট গিয়া পৌছিব। —এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও তাহা হইলে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষ্মীটি আমার, ইহাতে অমত করিও না। কোনও ভয় নাই, বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোরবেলায ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।

তোমার স্বামী।

ঘন্টা দুই পরে ঝি আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা কবিল, "কি ঝি. মত হয়েছে?"

ঝি বলিল, "হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

'তবে, কাল রাত্রে এগারোটার পবে আমি আসব?"

"আসবেন।"

"আচ্ছা তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেক।"

"ঠিক থাকব দাদাবাবু।"—কলিকাতায় শীতটা এবার বড় শীঘ্রই পড়িয়া গিযাছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই, তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যারাত্রেও গায়ে লেপ সহ্য হয়, দিবসেও লোকে গবম মোজা ব্যবহার কবিতে আবন্ত করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কোহাট গিবিবর্ত্মে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।—অন্ধকার রাত্রি। বিজ্জিলতাব ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগাবটা বাজিল। ভবানীপুরের যে অংশে রায়বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাস, তাহা রসা রোড হইতে কিছুদূর পশ্চিমে। সদর ফটকটি বড় রাস্তার উপর, বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের দুই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ। বাগানের পশ্চিম দিকে পথটি ত আরও জনহীন, কারণ তাহার অপর পারে কয়েকটা সুরকির কল, রাত্রে সেখানে কেহ বড় থাকে না।

এগারটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারিপাড়া রাস্তার মোড়ে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কালো আলোয়ানে আবৃত দেহ একব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ী তখন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যুবক আর কেহ নহে বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুত পদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়েছে, সেখানে হেমন্ত দেখিল একজন কনস্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া, এক বাড়ীর দেউরীতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মন—হেমন্ত আড়াচোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছুদূর অবধি বাগানের প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল, ঐ অন্ধকার অংশের কোনও একটা সুবিধামত স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিম্‌ন্যাষ্টিক করিয়াছিল, এখনও রীতিমত ফুটবল খেলে—তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযোগী একটা স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেই দিকেই হেমন্ত যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিল, দোকানী অথবা মিস্ত্রী শ্রেণীর একজন লোক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল।—হেমন্ত আবার ফিরিল। যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে বাগানে একটা বৃহৎ জামরুল গাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছিড়িয়া গেল, কনুইয়ে আঘাত লাগিল। অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে।

প্রাচীরে বসিয়া, ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাহাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না। —এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলেও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এইখানে ঘুপটি মারিয়া বসিয়া থাকি—বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেন্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতে ছিল, সে এই শব্দে দাঁড়াইল, ভাবিল বোধ হয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্ব্বেও এখান হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো চোর!"—বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তর হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল। শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর—"আরে কোন হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর—"একঠো চোর হায় কনেষ্টবলজি।" "কাঁহা কাঁহা?"

"ঐ হুঁয়া। মিত্তিরবাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায। বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে জামরুল খাতা হায়।"—এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হোঁ" বলিয়া কনেষ্টবল এক ভীষণ চীৎকার ছাড়িল

হেমন্ত প্রাচী[illegible] াসিয়া প্রমাদ গণিল। পরক্ষণেই শুনিল, নাগরা জুতার আওয়াজ ছুটিয়া আসিতেছে। বুলস্-আই লণ্ঠনের তীব্র আলোকও পথে পড়িল।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ দিল। সেখানে কতকগুলা ভাঙ্গা ইঁট পড়িয়া ছিল, তাহাতে হেমন্তর শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কনষ্টেবলটা ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানালা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একেবাবে অন্ধকার!

দাঁড়াইয়া, ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ ধুতি লটর-পটর করিয়া দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া বাখিল, ভোবে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ানখানা যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইলে। কোনও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া গেল। তিন চারিজন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, কাঁহা—কাঁহা কনষ্টেবলজি?"—কনষ্টেবল বলিল, "জামরুলকে পেঁড়োয়া ভিরে।"—তখন লোকগুলা ধীরে ধীরে জামরুল

গাছের দিকে অগ্রসর হইল।—হেমন্ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল, কণ্ঠস্বরে চিনিল, তাহাদের বাড়ীর জমাদার মহাবীর সিং এবং দুইজন দ্বারবানের সঙ্গে কনষ্টেবলটা আসিয়াছে।

কিয়দ্দূরে গিয়া মহাবীর সিং বলিল, "কেহ তো না বুঝায়হে।"

কনষ্টেবল বলিল, "ভাগ গেলই কা?—আপন আঁখিয়াসে হাম কুদতে দেখলি হো, তোহর কির।" এক মুহূর্ত্ত পরে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলিতে বলিতে সকলে জামরুল গাছের দিকে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপরে লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদের সময়েও তাহার হাসি পাইল।

"ধৌগো হো—পাকডলি চোর"—বলিয়া তাহারা হাল্লা কবিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল, "ধেত্তেরিকে—ই ত খালি লুগা বুঝাহে।"—বস্ত্র খানা তাহারা নামাইয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোকে পরীক্ষা কবিতে লাগিল।

এমন সময় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ক্যা হ্যায়? কা হ্যায় মহাবীর সিং?"

কনষ্টেবল প্রভৃতি সেখান হইতে চিৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর বাগিচা মে চোর ঘুষা হায়।"—রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "খোঁজ খোঁজ—পাকড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহারা অসিয়া পড়িবে। এখন উপায কি? প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। হেমন্ত জুতা খুলিয়া ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছের আড়ালে আডালে প্রাচীবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।—কিয়ৎক্ষণ পরে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল—"উ কা শারোয়া ভাগে হে!"—সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথব তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুড়িয়া দিল।—"আরে বাপরে বাপ—জান গইলে বে বাপ—বলিযা একজন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।—রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "কা হুযা?"

এই সময় আরও দুই তিনখানা প্রস্তর সবেগে আসিযা পড়িল। লোকগুলা হাটিয়া গেল। বলিল, "হজুর—পাথলসে মহাবীর সিং কা কুপা ফো দিহিস হে।"

"আচ্ছা রহো, হাম বন্দুক নিকালতেঁহেঁ"—বলিযা রায বাহাদুব সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।—হেমন্ত দেখিল, প্রাচীবের নিকট যাওয়া এখন আব নিবাপদ নহে। রাণীর শয়নকক্ষের জানলা বরং কাছে। কোনও গতিকে সে যদি জানালাব কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—তারপর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্দ্ধপথ উঠিয়াছে, তখন খিড়কী দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠন বাহী ভৃত্য সহ রায় বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধূর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টিপতিত হইবা মাত্র তিনি হাঁকিলেন, "কে রে? কে রে?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌঁছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রায়বাহাদুর হাঁকিলেন, "চোর ঘরমে ঘুষা—চোর ঘরমে ঘুষা। দৌড়ো—সব আদমি ভিতরে চলো—পাকড়ো"—বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া গিয়া উপরে বধূর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।—ঝি কাঁপতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

রায় বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্ছিত অবস্থায় পড়িয়া, চোর পালঙ্কের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

পরদিন রায় বাহাদুর "সামাজিক-সমস্যা-সমাধান" পুস্তকের একস্থান খুলিয়া "চতুর্ব্বিংশতি কথাটি কাটিয়া "দ্বাবিংশতি" এবং ষোড়শ কথাটি কাটিয়া "চতুর্দ্দশ" করিয়া দিলেন। যদি কখনও বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে এইরূপ সংশোধিত আকারেই ছাপা হইবে।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২২]

সখের ডিটেকটিভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতকাল, রাত্রি ৮টা ২২মিনিটে ডায়মণ্ড হার্ব্বার হইতে আগত কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানা সংগ্রামপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কয়েকজন আরোহী ওঠা নামা করিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।—ঠিক এই ব্যামহস্তে একজন মধ্যবয়স্ক স্থূলকায় ভদ্রলোক দৌড়িয়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম বৃথা হইল, পোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া, ইঞ্জিন মহাশয় বাবুটিকে উপহাস ছলেই যেন "ধেৎ ধেৎ" করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবুটি হতাশ হইয়া চলন্ত ট্রেণখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—আর, হাঁফাইতে লাগিলেন।

গাড়ী বাহির হইয়া গেলে বাবুটি ধীরপদে আবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গোল লণ্ঠন হাতে ছোট ষ্টেশন মাষ্টারবাবু দাঁড়াইয়া আগন্তুক আরোহিগণের নিকট টিকিট লইতেছিলেন। বাবুটি পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ ব্যক্তি ফটক পার হইযা গেলে ছোটবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, আবার কটায় ট্রেণ?"

ছোটবাবু বাতির আলোকে টিকিটগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "কোথাকার ট্রেণ?"

"কলকাতায় ফেরবাব।"

"আবার সেই রাত্রি ১টা ১৮মিনিটে।"

বাবুটি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"একটা আঠারো। আমাদের হল, আঠারো প্লাস্ চব্বিশ—একটা বেয়াল্লিশ মিনিট—পৌনে দুটোই ধর। তাই ত!"

ইত্যবসরে ছোটবাবু সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। একজন খালাসী চাকাওয়ালা মই ঘড়ঘড় করিয়া টানিতে টানিতে প্ল্যাটফর্ম্মের আলোক গুলি নিবাইয়া দিতেছিল। বাবুটি ধীরে ধীরে ফটকের বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নিম্নে গিয়ে দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে একটি হালুইকরের দোকানে মিটমিট করিয়া আলোক জ্বলিতেছে—তাহার পর যত দৃষ্টি চলে, কেবল অন্ধকার। নিকটতম গ্রামও এখান হইতে অন্তত একক্রোশ দূরে অবস্থিত—রাস্তাটির দুই ধারে কেবল গাছ ও জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে; মাঝে মাঝে শৃগালের হুক্কাহুয়া রবও শোনা যাইতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুটি অনুভব করিলেন, কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ না করিলে সমস্ত রাত্রি কাটিবে না। যদিও, যাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন সেখানে সান্ধ্য জলযোগটা একটু গুরুতর গোছেরই হইয়াছিল, এবং তাহাদের আয়োজনে বিলম্বর জন্যই গাড়ী ফেল হইয়া এই বিপত্তি উপস্থিত—তথাপি সারারাত্রির উপযুক্ত বোঝাই ত লওয়া হয় নাই। হালুইকরের দোকানটি আছে তাই রক্ষা, নচেৎ অর্দ্ধাশনেই রাত্রি কাটাইতে হইত। ভাবিতে ভাবিতে বাবুটি হালুইকরের দোকানের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃদ্ধ হালুইকর চশমা চোখে দিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল, বলিল,"আস্তাজ্ঞে হোক্, আসুন।" দোকানের ভিতর দেয়াল ঘেঁসিয়া একটি সরু বেঞ্চি ছিল, তাহার উপর বাবুটি উপবেশন করিয়া বলিলেন "কি কি আছে?"

হালুইকর বলিল, "আজ্ঞে, বাবুর কি চাই বলুন। রসোগোল্লা আছে, পান্তুয়া আছে, মিহিদানা আছে, কচুরি আছে, সিঙ্গাড়া আছে—তাজা আজই ভেজেছি।"

ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাবুটি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সুযোগে ইহার পরিচয়টি দেওয়া আমাদেব কর্ত্তব্য হইতেছে। সুখের বিষয় তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। নামটি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ বিজ্ঞাপন অনুসারে "বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার নূতন পরিচয দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

আপনারা নিশ্চয়ই লেখনীপ্রসূত কোন না কোন ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছে স্বয়ং না থাকেন, বাড়ীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিযা দেখিবেন।

ইঁহার নাম গাবর্দ্ধন দত্ত। কলিকাতায় বাস করেন। এই ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে কোন গ্রামের একজন ভদ্রলোকের কন্যাব সহিত ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে ইনি কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া আটটা চব্বিশের গাড়ীতে যদি বওনা হইতে পাবিতেন, তবে রাত্রি পৌনে দশটায় কলিকাতায় পৌঁছিযা, গবম গরম লুচী, ঘন বুটের দাল, সদ্য ভর্জ্জিত রোহিত মৎস্য, হংসডিম্বেব কালিয়া প্রভৃতি ভক্ষনান্তে, নিরাপদে লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন—কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?—বাসি কচুরি, ভিতবে আঁঠি ওয়ালা রসগোল্লা প্রভৃতি যথাসাধ্য ভক্ষণ করিযা গোর্বদ্ধনবাবু হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। হালুইকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা থাকে?"—হালুইকব বলিল, "রাত্তির ল'টা বড়জোর সাড়ে ল'টা।"

"তারপর?"

"তারপর দোকান বন্ধ কবে গিযে আহার কবি। আহাবাদি করে শযন কবি।"

গোবর্দ্ধনবাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিলেন। হালুইকব বলিল, "বাবু তা হলে ইষ্টিশান চল্লে?"

"করি কি?"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ধীবে ধীরে আবাব ষ্টেশনে গিযা উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংগ্রামপুর ছোট ষ্টেশন। তার-আফিস, টিকিট-আফিস প্রভৃতি সমস্ত একই কামরায় অবস্থিত। ওয়েটিং রুম পর্য্যন্ত নাই।

গোবর্দ্ধনবাবু প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিযা দেখিলেন, সেই আফিস-কামবা তালাবন্ধ। বাহিরে কম্বল গায়ে দিয়া একজন খালাসী বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটিমাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহারও আলোক অত্যন্ত কমাইয়া দেওযা।

গোবর্দ্ধনবাবু খালাসীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বাবু কোথা রে?"

"খেতে গেছে বাসায়।"

"কখন আসবেন?"

"এই এলেন বলে।"

একখানি বেঞ্চ ছিল, গোবর্দ্ধনবাবু তাহারই উপব উপবেশন করিলেন। ব্যাগটি খুলিয়া পাণের ডিবা বাহির করিলেন, সিগারেট ও দিয়াশালাই বাহির করিলেন। জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পা দুটি বেঞ্চির উপর তুলিয়া গাত্রবস্ত্রখানি বেশ করিয়া ঢাকা দিয়া বসিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ ও ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চারিদিকে খোলা মাঠ, হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই গোবর্দ্ধনবাবুর

শীতবোধ হইতে লাগিল। কোথায় বাড়ীতে এতক্ষণ চারিদিকে দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন, কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে এই কষ্টভোগ! যদি না মেয়ে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে ত এই কর্ম্মভোগ হইত না! মেয়ের বাপেরা জলযোগের অনাবশ্যক আড়ম্বর করিয়া গাড়ী ফেল করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর রাগ হইল ; বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর রাগ হইল—ছেলের বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়িই কেন তাহার? গোবর্দ্ধনবাবু বলিয়াছিলেন, এ বছরটা যাক, আসছে বছর তখন দেখা যাবে—সে কথা তিনি কোন মতেই শুনিলেন না। বধূ আসিয়া কি চতুর্ভুজ করিয়া দিবে? বাল্য-বিবাহের উপরও তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। —শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার বাল্য-বিবাহকে আচ্ছা করিয়া গালি দিয়া একখানি নূতন ধরনের উপন্যাস তিনি লিখিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর খানিকটা আলোক আসিয়া পড়িল। বাতি হাতে করিয়া ছোটবাবু আসিলেন ; আফিস-কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন।—আরও কিয়ৎক্ষণ শীতভোগ করিবার পর গোবর্দ্ধনবাবু ধৈর্য্য হারাইলেন। উঠিয়া গিয়া দরজাটি ফাঁক করিয়া বলিলেন, "ষ্টেশন মাষ্টারবাবু, পৌনে দুটোর গাড়ীর ত এখনও অনেক দেরী, বাইরে বড্ড শীত, ভিতরে এসে কি বসতে পারি?"—বাবুটি ষ্টেশন মাষ্টার নহেন, 'ছোটবাবু' মাত্র তাহা গোবর্দ্ধনবাবু জানিতেন ; কিঞ্চিৎ খোসামোদ করার অভিপ্রায়েই ওরূপ সম্ভাষণ করিলেন।—ছোটবাবু বলিলেন, "আসুন।"

প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু একখানি পিঠভাঙ্গা চেয়ারে বলিলেন। এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন, ছোটবাবুর বয়স ৪০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। সাদা জিনের প্যাণ্টালুনের উপর কালো মোটা গরম কোট পরিয়া রহিয়াছেন। মোটা মোটা গোল গোল বোতামগুলাতে কি সব ইংরাজি অক্ষর লেখা। টেলিগ্রাফের কলের কাছে বসিয়া খুট্ খুট্ করিয়া কাজ করিতেছেন।

গোবর্দ্ধনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে লম্বা গোছের একটি টেবিল, তাহার উপর ঘষা কাঁচের একটি সরু উচ্চ লণ্ঠন রক্ষিত, লাইন ক্লিয়ার বহি ও অন্যান্য খাতাপত্র যথাযথ ছড়ান, একটি টিনের গাঁদ-দানি, অপর একটি টিনের আধারে তেলকালীর প্যাড এবং সেই স্টেশনের একটি মোহরছাপ, সীসার কাগজ-চাপা, একগাছা রুল—এই সব দ্রব্য রহিয়াছে।

ছোটবাবু তারের কাজ শেষ করিয়া, আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া একটি হাই তুলিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত দুটি পিঠের দিকে করিয়া গা ভাঙ্গিলেন, তাহার পর একটি দেরাজ ধরিয়া খড় খড় করিয়া টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি বহি বাহির করিয়া, আলোকের নিকট সরিয়া আসিয়া পড়িতে বসিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু গলাটি বাড়াইয়া দেখিলেন, বহিখানি তাঁহারই প্রণীত "ভীষণ রক্তারক্তি" নামক উপন্যাস।

গোবর্দ্ধনবাবু নূতন লেখক নহেন; যাহাদের বহি বৎসরের পর বৎসর সিন্দুক বা আলমারিতে কীটভোগ্য হইয়া বিরাজ করে সে শ্রেণীর গ্রন্থকার নহেন; তথাপি এই দূর পল্লীতে একজনকে নিজ পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া তাঁহার মনটা উল্লসিয়া উঠিল। তাঁহার শীত কোথায় চলিয়া গেল!—ছোটবাবু একমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, "বিজ্ঞাপনে যে লিখি,—'একবার পড়িতে বসিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ'—সেটা কি নিতান্ত মিছে কথা লিখি?"

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে, এই ভক্ত পাঠকটির নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য গোবর্দ্ধনবাবুর প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভাবিলেন, "পুরাতন একখানা মলিদা গায়ে

দিয়া, কাদামাখা জুতা পায়ে দিয়া নিরীহ ভাল মানুষটিব মত বসিয়া রহিয়াছি—আমি যে কে, জানিতে পারিলে বাবুটির কি বিস্ময়ের অবধি থাকিবে! ইহার পর চিবদিন উনি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না কি—'একবার বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি এমন সাদাসিধে যে দেখলে গোবর্দ্ধনবাবু বলে মনেই হয় না। অতি মহাত্মা লোক!'—না হয় আমিই উঁহার নামটি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার নামও উনি জিজ্ঞাসা কবিবেন"—গলা বাড়াইয়া গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, ছোটবাবু তখন ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন—যেখানে প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মির্জ্জা বেগ পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকা বকুলমালাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে গভীর রাত্রে ডাকাতি করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।—এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 'চমকপ্রদ' সুতরাং রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না।

পরিচ্ছেদটি শেষ হওয়া মাত্র গোবর্দ্ধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নামটি কি? জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"—বাবুটি পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, "শ্রীবীবেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।"—বলিয়া চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ কবিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিবাস?"

বাবুটি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "হুগলির কাছে।"

"কোন গ্রামে?"

"শঙ্করপুর"—বলিয়া তিনি চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে বলিলেন, "কোথাকার অভদ্র লোক!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না ত মশায়? আজকাল ইংরাজি ফ্যাসান অনুসারে এগুলো বেয়াদপি বলে গণ্য তা জানি। কিন্তু আমবা মশায় সেকেলে লোক—অত মেনে চলতে পারিনে। কিছু মনে করবেন না।"—বাবুটি তাঁহার পানে একটি নজর মাত্র চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য কবিয়া বলিলেন, "না"—গোবর্দ্ধনবাবু তখন আত্ম-পরিচয় দান সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কড়িকাঠ গণিবাব অভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কড়িকাঠ নাই, ঢেউ খেলান করোগেটেড লোহার ছাদ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু যখন বহিখানি শেষ করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বাবোটা। বহি বন্ধ করিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রায় এক মিনিট কাল তিনি সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে স্থিবদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধনবাবুর দিকে ফিরিযা বলিলেন, "সেই অবধি বসে রয়েছেন?"

"আজ্ঞে কি করি বলুন!"

"ভারি কষ্ট হল ত আপনার। পান খাবেন?"—বলিয়া পকেট হইতে পানেব ডিবাটি বাহির করিয়া আগন্তুকের নিকট ধরিলেন। পান লইয়া গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন, "হায়, এ ব্যক্তি জানিতেও পারিতেছে না, যাহাকে পান দিতেছে সে লোকটা কে এবং কত বড়!"

ছোটবাবু বলিলেন, "মশায় মাফ্ করিবেন। আপনি প্রায় তিনঘণ্টা এখানে বসে আছেন, আপনাকে কোনও খাতির করিনি। ঐ বইখানা নিয়ে এমনি ইয়ে হয়ে পড়ছিলাম—একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। কোথা থেকে আসছেন? মশায়ের নামটি কি?"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কলকাতা থেকে এসেছিলাম। আমার ভাইপোর জন্যে কাছেই একটি গ্রামে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম ; আমার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত।"

নামটি শুনিবামাত্র ছোটবাবু পূর্ব্বপঠিত বহিখানির সদর পৃষ্ঠাটি খুলিযা আলোকের নিকট ধরিলেন। বহি নামাইয়া গোবর্দ্ধনবাবুর পানে চাহিলেন। আবার বহিখানির সদর

পৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিলেন।—তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কি ভাবছেন?"

বাবুটি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "মশায়—আপনিই কি—এই বই লিখেছেন?"

গোবর্দ্ধনবাবু নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বই ওখানা?"

"ভীষণ রক্তারক্তি।"

"ওঃ—হ্যাঁ আমারই একখানা বই বটে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ—আপনি!—আপনিই গোবর্দ্ধনবাবু? মশায় আপনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার আমি করেছি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। ছি ছি!"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "না না—কিছুই অন্যায় ত আপনি করেননি। কি অন্যায় করেছেন?"

"অন্যায় করিনি? আপনি এখানে তিন তিন ঘণ্টা কাল ঠায় বসে আছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসাও করিনি মশায় আপনি কে, কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না—বই নিয়ে এমনই মেতে ছিলাম। অন্যায় করিনি?"

"কিছু না কিছু না। বরং আমার বই নিয়ে আপনি মেতে উঠেছিলেন সেটা ত আমার পক্ষে কমপ্লিমেন্ট। আমার কোন্ কোন্ বই আপনি পড়েছেন?"

"আজ্ঞে আর কিছু পড়িনি, তবে পাঁজিতে আপনার অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। এবার আনাতে হবে এক একখানা করে। আজই কি এ বইখানা পড়া হত? বইখানি একজন প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে। পাঁচটার গাড়িতে এসেছিল কলকাতা থেকে—মস্ত একদল। বাইরে প্ল্যাটফর্ম্মে ঐ যে বেঞ্চিখানি রয়েছে—তারই উপর জনকতক বসেছিল। তারা চলে গেলে দেখি, বইখানি বেঞ্চির নিচে পড়ে রয়েছে। এনে পড়তে আরম্ভ করলাম।—বাপ! আরম্ভ করলে কি আর ছাড়বার যো-টি আছে? আচ্ছা মশায় ও সব ঘটনা কি সত্যি, না আপনি মাথা থেকে বের করেছেন?"

আসল কথাটা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইংরেজি নভেল হইতে 'না বলিয়া গ্রহণ'—তাই গোবর্দ্ধনবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মাথা থেকে বের করেছি।"

"আপনার খুব মাথা কিন্তু! কি অসাধারণ কৌশল! আপনি যদি পুলিস লাইনে ঢুকতেন ত খুব ভাল ডিটেক্‌টিভ হতে পারতেন। হ্যাঁ—ভাল কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখুন, বইখানার ভিতর একখানা চিঠি ছিল। আশ্চর্য্য চিঠি। আমি ত মশায় পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি দেখুন দেখি।"—বলিয়া দেরাজ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি গোবর্দ্ধনবাবুর হাতে দিলেন।

ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া, চোখে দিয়া আলোর কাছে ধরিয়া গোবর্দ্ধনবাবু পত্রখানি পাঠ করলেন, ভাই কুঞ্জ,

মঙ্গলবার রাত্রে শত্রুদুর্গ আক্রমণ, মনে আছে ত? তুমি সদলবলে ঐ দিন বিকাল পাঁচটার গাড়িতে আসিয়া পৌঁছিবে, অন্যথা না হয়। সকলে এখানে সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পরই মার্চ্চ করিতে হইবে। রাত্রি দশটায় যুদ্ধারম্ভ। কার্য্য সমাধা করিয়া ভোর তিনটার গাড়িতে তোমরা ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

ইতি

তোমাদের নিতাই।

পত্রখানি পড়িয়াই গোবর্দ্ধনবাবুর মনে হইল, ইহা স্বদেশী ডাকাতী ভিন্ন আর কিছুই নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা একদল এসেছিল বললেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ক' জন?"

"জন কুড়ি হবে।"

"বয়স কত সব? চেহারা কি রকম?"

"বয়স—পনেরো ষোল থেকে উনিশ কুড়ির মধ্যে। চেহারাগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা—খুব হাসি স্ফুর্ত্তি গোলমাল করতে করতে গেল।"

"ভদ্রলোকের ছেলে সব?"

"হ্যাঁ। বেশ ফিট্‌ফাট্‌ কাপড় চোপড়। কারু কারু চোখে সোনার চশমা।"

"কোন্‌ ক্লাসের টিকিট নিয়ে এসেছিল?"

"ইন্টারমিডিয়েট।"

"সিঙ্গল না রিটার্ন?"

"রিটার্ন।"

"তাদের টিকিটগুলো বের করুন।"

ছোটবাবু একটা দেরাজ টানিয়া একগাদা টিকিট হইতে লাল রঙের আধখানা টিকিটগুলো বাছিয়া বাছিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। শেষ হইলে গোবর্দ্ধনবাবু গনিয়া দেখিলেন, সুর্ব্বসুদ্ধ উনিশখানা আছে। প্রত্যেকখানিই কলিকাতা হইতে, নম্বরগুলি পরপর। পকেট বুক বাহির করিয়া টিকিটের নম্বর ও ছাপগুলির বিবরণ গোবর্দ্ধনবাবু নোট করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "স্বদেশী ডাকাত।"

ছোটবাবু বলিলেন, "স্বদেশী ডাকাত! অ্যাঁ? স্বদেশী ডাকাত! বলেন কি?"

"পরিষ্কার স্বদেশী ডাকাত। আপনাব কাছে ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস আছে?"

"না। কেন বলুন দেখি?"

চিঠিখানির একটি স্থানে আঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "এই দেখুন, খামের উপর যে মোহর পড়ে, তারই শাদা দাগ এ চিঠিতে রয়েছে। একটা ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস পেলে ছাপটা পড়তাম।"—ছোটবাবু চশমা চোখে দিয়া দাগটা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন, "কিছু পড়া গেল না।"

গোবর্দ্ধনবাবু সেই ঘষা কাঁচের লণ্ঠনটির দ্বার খুলিয়া ভিতরে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষে একটুকরো কাগজ লইয়া লণ্ঠনের একটা স্থানে ঘষিতে লাগিলেন। কাগজটুকু ভুষা কালী মাখা লইয়া গেল। বাহির করিয়া, তাহার উপর জোরে দুই তিনটা ফুঁ দিয়া, গোবর্দ্ধনবাবু সেখানি চিঠির সেই শাদা ছাপ-পড়া অংশে লঘু হস্তে বুলাইতে লাগিলেন। ছোটবাবু অবাক হইয়া ইঁহার কার্য্যপরম্পরা দেখিতেছিলেন।

ছাপটি পরীক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজই বেলা ৯টার ডেলিভারিতে বউবাজার পোষ্টাফিস থেকে এ চিঠি বিলি হয়েছে।"—বলিয়া চিঠিখানি ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু সেখানি আলোকে ধরিয়া দেখিলেন, কালো জমির উপরে সাদা অক্ষরে OW AZA তাহার নিম্নে 9A তাহার নিম্নে 5 Jy ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানি গোবর্দ্ধনবাবুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ধন্য আপনার বুদ্ধি! নইলে আর অমন সব নভেল আপনার মাথা থেকে বেরোয়!"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিতে লাগিলেন, "এই ডাকাতদের অন্ততঃ একজন—যার নাম কুঞ্জ—বউবাজার অঞ্চলে থাকে। নিতাই বলে দলের একজন পূর্ব্বেই এসেছিল—যা কিছু দেখবার শোনবার খবর নেবার সমস্ত ঠিকঠাক করে এই চিঠি লিখেছে। এই অঞ্চলেব কোনও ধনী লোকের বাড়ি আজ রাত্রি দশটার সময় তারা ডাকাতি করেছে—ভোর তিনটের গাড়িতে তারা ফিবে যাবে।"

এমন সময় কলিকাতা হইতে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। ছোটবাবু লণ্ঠন হাতে সেখানি 'পাস' করিতে ছুটিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবর্দ্ধনবাবু একাকী বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এ ডাকাতগণকে যে কোনও উপায়ে হউক ধরিতে হইতেছে। ধরিতে পারিলে গভর্নমেন্টের কাছে যথেষ্ট সুনাম হইবে, চাইকি একটা রায় বাহাদুর খেতাবও মিলিতে পারে।"—অনেকদিন হইতেই রায় বাহাদুর হইবার জন্য গোবর্দ্ধনবাবুর আকাঙক্ষা। নভেল লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন মান সম্ভ্রম হইল কই? ইঁহার পুস্তকসংখ্যার তুলনায় অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক বহিও যাঁহারা লেখেন নাই, যাঁহাদের বহি আলমারিজাত হইয়া থাকে, বৎসরে ২৫ খানির বেশি বিক্রয় হয় না, তাঁহাদের কত মান, কত সম্ভ্রম, মাসিকপত্রে ছবি বাহির হইতেছে, কত সভার সভাপতি হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছেন—কিন্তু গোবর্দ্ধনবাবুকে কেহ ত ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না!—তিনি ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করেন—ঐ সকল লোক কেবল গ্রন্থকার নহেন—সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার এবং অপর কোনও উচ্চপদস্থ। তাই অনেকদিন হইতেই তাঁহার মনে হইতেছে, যদি কোনও একটা সুযোগে রায় বাহাদুর বা অন্ততঃ রায় সাহেবও তিনি হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার এই "কেবলমাত্র গ্রন্থকার" অপবাদটি ঘুচিয়া যায়—সমাজে নিজ প্রাপ্য সম্মান তিনি আদায় করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার মনে হইল, বোধ হয় এই সুযোগেই তাহা হইবে; নহিলে ভগবান তাঁহারই একখানি গ্রন্থের মধ্যে করিয়া মূলসূত্র স্বরূপ ঐ চিঠিখানি পাঠাইয়া দিবেন কেন?

ট্রেন চলিয়া গিয়াছিল। ছোটবাবু যাত্রীদের টিকিট কালেক্ট করিয়া অফিসে ফিরিয়া আসিলেন। পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া পান খাইলেন, গোবর্দ্ধনবাবুকেও দিলেন। নিকটস্থ চেয়ারখানিতে বসিয়া বলিলেন, "তাই ত মশায়—কার সর্ব্বনাশ হল কে জানে।"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "দেখুন, আজ এ ডাকাতদের ধরতে হবে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "কে ধরবে?"

"আপনি ও আমি।"

"আমি? সর্ব্বনাশ!—তাদের কাছে রিভলভার আছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবেন না?"

গোবর্দ্ধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না, এখন আর তাদের কাছে রিভলভার নেই। সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখে তারা আসবে।"

'তা হলেও ধরা কি সোজা কথা মশায়? তারা উনিশ কুড়ি জন লোক—"

"জাপ্‌টে ধরতে গেলে কি আর হবে? কৌশলে ধরতে হবে।"

"তার পর?"

"তার পর পুলিশ ডেকে তাদের হ্যাণ্ডোভার করে দেওয়া।"

"তার পর?"

"তার পর সকলের শ্রীঘর।"

"তার পর?"

"তার পর আবার কি?

"ওদের দলের অন্যান্য লোক যারা আছে, তাহা যে আপনাকে আমাকে কুকুর মারা করে মারবে?"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "অনুগ্রহ করে আপনার লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, ঘরখানি দেখি।"

ছোটবাবু লণ্ঠন আনিতে চলিয়া গেলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কৌশল চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ছোটবাবু লণ্ঠন লইয়া আসিলে উভয়ে গিয়া ঘরখানি দেখিলেন। একটি মাত্র দরজা। উপরে, ছাদের প্রায় কাছে, এদিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বায়ু চলাচলের জন্য জানালা কাটা

রহিয়াছে, তাহাতে এখনও সার্সি বসানো হয় নাই। গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, সেগুলি মেঝে হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে—সুতরাং ওখান দিয়া পলায়নের সম্ভাবনা নাই। বলিলেন, "এই ঠিক হবে।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধনবাবু দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরু শালকাঠের ফ্রেমে আড়ভাবে সেই কাঠের ছোট ছোট তক্তা বসানো, আগাগোড়া রিভেট করা। উপরে একটি, নিম্নে একটি মোটা শিকলও আছে। খুব মজবুত, সহজে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিবে না। ছোটবাবু বলিলেন, "রেলের ভাল তালা আছে, আপনাকে দিই চলুন।"

"চলুন। আরও সব সরঞ্জাম দরকার। চলুন অফিসে বসে তার পরামর্শ করিগে।"

ফিরিবার পথে ছোটবাবু মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে আপনাকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করছি, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, দোহাই আপনার।"

"না, তা হবে না।"

আফিসে ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ইতিমধ্যে পৌনে দুইটার গাড়ি আসিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলকাতা-নিবাসী সেই নিরীহ যুবকেরা আসিয়াছিল, তাহাদের বন্ধু নিতাইয়েব বিবাহে বরযাত্রী হইয়া। নিতাই ছেলেটি অনেকদিন হইতেই কিঞ্চিৎ মিলিটারি ভাবাপন্ন; রঙ্গ করিয়া যখন নিজ বিবাহকে "যুদ্ধারম্ভ" এবং শ্বশুর-বাটীকে "শত্রুদুর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও জানিত না, তদ্দ্বারা বন্ধুগণকে সে কি বিপজ্জালে জড়াইতেছে।

যে গ্রামে বিবাহ হইল, তাহা স্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিবাহ ও আহারাদির পর, বরের নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ কবিল। তাহাদের জন্য গো-যান প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেগুলি তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া যুবকেরা পদব্রজেই স্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইল। বরাবর সরকারি রাস্তা, পথ ভাল হইবার আশঙ্কা ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে গান গাহিতে গাহিতে, অতি আনন্দেই তাহাবা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুইটা, তখন স্টেশনের আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। একজন বলিল, "এস ভাই 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যাই।"—বঙ্গ আমার জননী আমার" গাহিতে গাহিতে তালে তালে পা ফেলিয়া, দশ মিনিটের মধ্যে তাহাবা স্টেশনে পৌঁছিল।

প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়া দেখিল, এক ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া মলিদা গায়ে দিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রেনের আর দেরী কত মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, "আপনারাই কি আজ বিকেল পাঁচটার গাড়িতে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদেব দলের কেউ কলকাতা থেকে ছাড়বার সময় গাড়ি মিস করেছিল?"

"তা ত জানিনে; তবে আরও তিনজনের আসবার কথা ছিল বটে, তারা আসেনি হয়ত সময়মত স্টেশনে এসে জুটতে পারেনি; কেন মশায়?"

বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক হয়েছে। আপনাদেরই দলের লোক। তিনজন নয়, দুজন লোক সন্ধ্যা সাতটার গাড়িতে এসে পৌঁছিলেন। তার মধ্যে একজনের ভয়ানক জ্বর।"

"কোথায়? কোথায় তারা?"

"ঐ রেলি ব্রাদারের আড়তে তাঁরা আছেন। যিনি সুস্থ, তিনি আমাদের এসে বললেন, মশাই, এই ত বিপদ, একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কোথায় আশ্রয় দিই, ঐ রেলি ব্রাদারের

আড়ত দেখিয়ে দিলাম। বাসা থেকে তক্তপোষ, লেপ বিছানা সব পাঠিয়ে দিলাম। দু তিনবার গিয়ে দেখেও এসেছি—খুব জ্বব, ১০৫-এব কম ত হবে না। আর, কি পিপাসা!—দশ মিনিট অন্তর খালি বলে জল দাও। সুস্থ লোকটিব কাছেই শুনলাম, আপনারা রাত্রি তিনটের গাড়িতে কলকাতা ফিরবেন।"

যুবকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল "ওহে বোধ হয় শান্তি আর শৈলেন। শান্তিরই বোধ হয় জ্বর হয়েছে—তার ত ম্যালেরিয়া লেগেই আছে কিনা।"

পাগড়ীবাঁধা বাবুটি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—শান্তিবাবুবই জ্বর হযেছে। নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন, দেখবেন।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য ইনি আমাদের গোবর্দ্ধনবাবু ভিন্ন আর কেহ নহেন।

যুবকেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তাহাবা বলাবলি কবিতে লাগিল, "জ্বব যদি একটু কম থাকে, গাড়িতে নিয়ে যাবার মত অবস্থা থাকে, তবে নিয়েই যাব; নইলে আমাদের সকলকেই এখানে থাকতে হবে।"

রেলি ব্রাদারেব আড়তে পৌঁছিয়া বাবুটি বলিলেন, "ঐ ঘরে আছে চলুন।"—দ্বাবের ফাঁক দিয়া একটু একটু আলো আসিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া মাথাটি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বাবুটি বলিলেন, "ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। ফীবার মিক্সচারটায় কিছু উপকার হয়ে থাকবে। দুজনেই ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে আপনাবা যান।"

যুবকগণ দেখিল, সেই লম্বা ঘবের প্রান্তভাগে পালঙ্ক পাতা বহিযাছে। পাশে একটি টেবিলেব উপব গোটা দুই ঔষধেব শিশিও দেখা গেল। দেওযালে একটা ল্যাম্প মিটি মিটি করিযা জ্বলিতেছে। যুবকগণ জুতাব গোড়ালি শূন্যে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সকলে প্রায একসঙ্গেই শয্যাব নিকট পৌঁছিল। একজন লেপেব প্রান্তটি আস্তে আস্তে উঠাইতে লাগিল। ক্রমে অনেকখানি উঠাইযা ফেলিয়া বলিল, "কই?"

দুই তিনজনে লেপটা টানিয়া বলিল, "গেল কোথা?"

অপব সকলে বলিল, "সে বাবুটি কই? তিনি গেলেন কোথা?"

কেহ কেহ বলিল, "দেখ ত দেখ ত, বাইরে বোধ হয আছেন।"

তিন চারিজনে দ্বাবেব কাছে গিযা দ্বার টানিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। চীৎকার কবিযা তাহাবা বলিল, "ওহে, বন্ধ যে!"

বাকী সকলে তখন দ্বারেব নিকটে গেল। সকলেই দ্বাব ধবিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, দ্বাব একচুলও নড়িল না।

সকলেরই মনে তখন একটু ভয় হইল। কেহ কেহ বলিল, "ওহে কুঞ্জ—এ কি ব্যাপাব?"

কুঞ্জ বলিল, "কিছুই বুঝতে পারছি নে। আমাদের এ রকম করে বন্ধ করলে কেন? লোকটার উদ্দেশ্য কি?"

অভয় বলিল, "একবার ডেকে দেখা যাক।"—বলিয়া সে দরজাব কাছে মুখ রাখিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—"ও মশাই? ও পাগড়ীমাথায় বাবুটি, বলি শুনছেন? দোরটা বন্ধ করে দিলেন কেন? খুলে দিন খুলে দিন।"

একে একে দুইয়ে দুইয়ে তখন তাহারা এই প্রকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কবিতে লাগিল কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ তখন হতাশ হইযা মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

অবনী বলিল, "ওহে, গতিক ভাল নয। এব মধ্যে বন্ধ থাকলে প্রাণে মারা যাব যে। এ মজবুত কবাট ভাঙ্গা যাবে না। ঐ ল্যাম্পটা নিয়ে এস। ওর তেলটা কবাটের গায়ে মাখিযে আগুন ধবিয়ে দাও। কপাট পুড়িয়ে ফেল।"

কুঞ্জ বলিল, "সর্ব্বনাশ!—তা হলে ধোঁয়ায় শেষকালে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব যে। জানালা নেই—শুধু ছাদের কাছে ছোট ছোট ঐ দুটি ভেন্টিলেটর, তাও কাঁচবন্ধ বলে বোধ হচ্ছে। অন্য উপায় চিন্তা করে।"

শ্যামাপদ বলিল, "সে বোধ হয় পালিয়েছে। চেঁচামেচি করি এস, কারু না কারু সাড়া পাব।"

কেশব বলিল, "এই শীতের ভোরে কে আছে এখানে যে আমাদের সাড়া পেয়ে এসে আমাদের উপকার করবে?"

সকলে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইতে ভস্ ভস্ করিয়া একটা শব্দ আসিল। অভয় বলিল, "ঐ আমাদের ট্রেনও বেরিয়ে গেল।"

জল্পনায় কল্পনায় আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল। কেন যে লোকটি এরূপ ব্যবহার করিয়া গেল, তাহাই সকলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কূলকিনারা পাইল না। অবশেষে স্থির করিল, লোকটা বোধ হয় পাগল হইবে।

কুঞ্জ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, খাটখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সকলকে সে ডাকিয়া বলিল, "দেখ উপরে যে ঐ ভেন্টিলেটর রয়েছে, ওতে সার্সি টার্সি বোধ হয় নেই। আমি অনেকক্ষণ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। ঐ দিয়ে ছাড়া বেরুবার আর কোন উপায় নেই কিন্তু।"

অভয় কহিল, "ও ত বিষম উঁচু, ওখানে পৌঁছান যায় কেমন করে?"

কুঞ্জ বলিল, "এ নেওয়ারের খাটখানা ভাঙ্গা যাক। খাটের কাঠ চারখানা, টেবিলের পায়া চারটে, নেওয়ার দিয়ে খুব কষে বাঁধা যাক এস। একটা মইয়ের মত হবে। দেওয়ালেব গায়ে সেইটে দাঁড় করালে জানালার ও ফুটো অবধি পৌঁছান যাবে বোধ হয়।"

তিন চারিজন দেখিয়া অনুমান করিয়া বলিল, "বোধ হয়।"

কুঞ্জ বলিল, "তিনকড়ি, তুই সাইজে সবচেয়ে ছোট আছিস। পারবি উঠতে?"

তিনকড়ি বলিল, "খুব পারব। কিন্তু তারপর? ও দিকে নামব কি করে?"

"ওদিকে আবার জমি অবধি পেলে ত! ওদিকে যদি বেশি নীচু হয়?"

কুঞ্জ বলিল, "আগে উঠে ত দেখ্।"

তখন সেই ল্যাম্পের আলোকের সাহায্যে সকলে মিলিয়া খাটের নেওয়ার খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা শেষ হইলে, অনেকে মিলিয়া খাটের পায়া হইতে পাট্‌রিগুলা বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। টেবিলও এইরূপে ভাঙ্গা হইল। খাটের পাট্‌রি এবং টেবিলের পায়া নেওয়ার দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বাহিরে কাক ডাকিয়া উঠিল, গবাক্ষ পথে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া তখন সেই মইকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। উহা গবাক্ষ ছাড়াইয়াও প্রায় একহাত উর্দ্ধে উঠিয়াছে—দেখিয়া সকলের বুকে এই প্রথম কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বলিল, "যদি বেরুতে পারি, বেরিয়ে আমি কি করব? স্টেশনে যাব?"

কুঞ্জ বলিল, "না না—স্টেশনে গিয়ে কি হবে? তাহারাই ত আমাদের শত্রু। প্রথমে দরজায় গিয়ে দেখবি। যদি দেখিস শুধু শিকল বন্ধ আছে, শিকল খুলে দিবি। যদি দেখিস তালা বন্ধ, থানায় গিয়ে দারোগাকে সব কথা বলবি। কাছে কোথাও নিশ্চয়ই থানা আছে—দারোগা এসে আমাদের উদ্ধার করবে!"

সকলে মিলিয়া সেই মইটা ধরিয়া রহিল। তিনকড়ি অতি কষ্টে, বাঁধনের গাঁটে গাঁটে পা দিয়া, উপরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে গবাক্ষের নিকট পৌঁছিয়া তথায় সে বসিল।

নিম্ন হইতে জিজ্ঞাসা হইল, "তিনকড়ি, কি দেখছিস?"

"মাঠ। মাঠে একটা শেয়াল চরছে।"

"মানুষ-টানুষ কাউকে দেখছিস?"

"কাউকে নয়।"

"কতখানি নিচে জমি? এ কাঠ পৌঁছবে?"

"না। অনেক নিচু। এক কাজ কর না।"

"কি?"

"নেয়ার খোল। টুকরোগুলো মুখে মুখে করে গিরো বাঁধ। দু-খাই করে পাকিয়ে দড়ার মত কর। একটা মুখ আমায় দাও। সেটা আমি নিচে নামিয়ে দিই। আর একটা মুখ তোমরা সকলে মিলে ধরে থাক। আমি ওদিকে নেমে পড়ব এখন।"—সকলে বলিল, "বেশ বুদ্ধি করেছ—বাঃ।"—তখন সেই আঠারো জোড়া হাত, নেওয়ারে খুলিতে, বাঁধিতে এবং পাকাইতে লাগিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত।

নিম্ন হইতে সকলে বলিয়া দিল, "আগে গিয়ে দেখ্ দরজার খালি শিকল বন্ধ আছে না তালা দেওয়া আছে। যদি তালা দেখিস, এসে নিচে থেকে আমাদের বলবি। যত শীঘ্র পারিস থানায় যাবি—গিয়ে দারোগাকে সব কথা বলে এখানে নিয়ে আসবি।"

"আচ্ছা, আমি নামলাম।"—বলিয়া, দড়ি ধরিয়া জানালার ভিতর দিয়া তিনকড়ি নিজেকে গলাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণভয়ে ছোটবাবু, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই চুপি চুপি আসিয়া নিজের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়া তালা এবং শিকল খুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। যুবকেরা কেহই তখন দ্বারের কাছে ছিল না, কোনও শব্দ পায় নাই। ছোটবাবু ভাবিয়াছিলেন, অনতিবিলম্বেই ইহারা জানিতে পারিবে এবং দ্বার খোলা পাইয়া পলায়ন করিবে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর 'কুকুরমারা' হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

দরজা খুলিয়া দিয়া ছোটবাবু আবার আফিসে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই লম্বা টেবিলখানির উপর খানকতক লাইন ক্লিয়ার বহি মাথায় দিয়া ঘুমাইতেছেন। ছোটবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটি লুকাইয়া রাখিয়া, বসিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গোবর্দ্ধনবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন। মলিদা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "ভোর হয়েছে যে। থানায় লোক পাঠালেন?"

ছোটবাবু বলিলেন, "না, এক বেটা খালাসীকেও দেখতে পাচ্ছিনে।"

"আমি নিজেই যাব না কি? থানা কতদূর এখান থেকে?"

"এক মাইল হবে।"

"আচ্ছা মশাই, এক কাজ করিনা কেন?—থানায় খবর না পাঠিয়ে, বরং কলকাতায় একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের নামে। মিলিটারি পুলিস নিয়ে, একেবারে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে তারা আসুক। এ সব স্থানীয় পুলিসকে বিশ্বাস নেই মশায়। আমি যে এত কষ্ট করে ধরলাম, দারোগা নিজে নাম নেবার জন্যে শেষে হয়ত আমায় আমলই দেবে না। টেলিগ্রাম একখানা করে দিই, কি বলেন?"

"সে মন্দ নয়। বেশ ত, আপনি বসে টেলিগ্রাম লিখুন, আমি ততক্ষণ বাসায় গিয়ে আপনার চায়ের জোগাড় করে আসি।"

"আঃ—এমন সময় এক পেয়ালা গরম চা পেলে ত বেড়ে হয় মশায়!—একে এই শীত, তাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ!"

ছোটবাবু বাসায় গেলেন। গোবর্দ্ধনবাবু কাগজ কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিতে বসিলেন। অনেক কাটকুট করিয়া শেষে মুসাবিদাটা এই প্রকার দাঁড়াইল।

"আমি কার্য্যবশত এ অঞ্চলে আসিয়া অদূরে কোনও গ্রামে একটি ভীষণ স্বদেশী ডাকাতি হইয়াছে জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে এবং কৌশলে উনিশ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিযাছি। মিলিটারি পুলিস লইয়া শীঘ্র আসুন।
গোবর্দ্ধন দত্ত।"

মুসাবিদাটি দুই তিন বার পড়িয়া, গোবর্দ্ধনবাবু অবশেষে নিজে স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিযা দিলেন "বেঙ্গলি নভেলিস্ট"—বাঙ্গলা ঔপন্যাসিক। দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব মনে না করেন যে কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক এই টেলিগ্রাম পাঠাইতেছে—দ্বিতীয়তঃ, কে ধরাইয়া দিল সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয়।

এই সময় বাহিরে গোবর্দ্ধনবাবু অনেক লোকের কোলাহল ও জুতার আওয়াজ শুনিযা, টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া, কৌতূহলবশত বাহিরে গেলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

সেই তাহারা—সেই দল—কাঁধে তাহাদের খাটভাঙ্গা টেবিলভাঙ্গা বড় বড় কাঠ। একজন বলিয়া উঠিল—"ঐ রে, পাগড়ী মাথায় ঐ শালা!"

গোবর্দ্ধনবাবু বুঝিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। কিন্তু প্রাণ বড় ধন। সেটা বাঁচাইবার জন একবার চেষ্টা কবিযা দেখিতে হয।

সুতরাং তিনি ছুটিলেন। 'ডাকাইত' গণও, "ধর্ শালাকে ধর্" বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনবাবু কিয়দ্দূর ছুটিয়া, প্ল্যাটফর্মের তাবের বেড়া টপ্‌কাইয়া, মাঠ দিয়া জঙ্গল দিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। গাছের কাঁটায় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িল, গা ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি ছুটিলেন। একপাটি জুতা খুলিয়া পথে পড়িয়া রহিল, একপাযে জুতাসুদ্ধ তিনি ছুটিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় জুতাটিও খুলিয়া পড়িল, তথাপি ছুটিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, পাথরকুচি বিঁধিতে লাগিল—ক্রমে তাঁহাব গতি মন্দ হইযা আসিল। অবশেষে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিযা দেখিলেন, ঘন জঙ্গল। কান পাতিয়া রহিলেন। ডাকাইতগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন কবিযা আসিতেছে কি না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না।

মনে মনে তখন গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন, স্টেশনে উহারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা কবিবে না, কারণ নিজেদের প্রাণের ভয় ত আছে। তাই ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিযা তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পা কাটিয়া ব্যথা হইযাছে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। পথ ভুলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ৯টার সময় স্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ডাকাইতগণ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, ছোটবাবু বাসায় গিয়াছেন। বাসায় গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।—ছোটবাবু হাসিযা বলিলেন, "কি, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাকাতরা আপনাকে খুঁজছিল যে।"

গোবর্দ্ধন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল তারা?"

"তারা এতক্ষণ কলকাতায় পৌঁছে গেছে।"

ছোটবাবু তখন যুবকগণের নিকট বাস্তবিক যাহা শুনিয়াছিলেন,—তাহাদের বরযাত্রী যাওয়া প্রভৃতি—তাহা বর্ণনা করিলেন।—গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা কি করে বেরুলো তারা?"

ছোটবাবু এইবার কল্পনাব সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সে মশায় আশ্চর্য্য কৌশল। সাতটার ট্রেনে তারা চলে গেলে, আড়তে গিয়ে দেখলাম কিনা বাইরে তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। খাট ভেঙ্গে, নেওয়ার খুলে তারই মই তৈরি করেছে, করে সেই জানালাব ফুটোয় উঠ, একে একে টুপ্ টুপ্ করে লাফিয়ে পড়েছে। উঃ—কি কৌশল, কি সাহস!"

গোবর্দ্ধনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, দেখুন, তারা ডাকাতই বটে, বিয়ের বরযাত্রী নয়। বরযাত্রী এসেছিল এটা আপনাকে মিথ্যে করে বলে গেছে।—যা হোক, আমার নামটাম তাদের কাছে বলেননি ত?"

"আরে রামঃ! আমাকে অনেকবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বটে, কিন্তু আমি বললাম—'মশায়, কতলোক আসছে কতলোক যাচ্ছে, কতলোকেব খবর রাখব বলুন! তবে হ্যাঁ, মলিদাচাদর গায়ে মাথায় পাগড়ী জড়ানো একটা লোককে প্ল্যাটফর্মে রাত্রে দেখেছিলাম বটে। ঐ যা বলছেন আপনারা—বোধ হয় পাগল-টাগল হবে।"

গোবর্দ্ধনবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নামটি আমার বলেননি যে, এইটি ভারি উপকার করেছেন। ফের যদি তারা, কি তাদের দলের লোক, এসে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে দোহাই আপনার, বলবেন না।"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুর হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, "ক্ষেপেছেন, সে কি আমি বলি? জিভ কেটে ফেললেও না।"

ছোটবাবুর বাসাতেই স্নানাহার করিয়া, দ্বিপ্রহরের গাড়িতে গোবর্দ্ধনবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।—পরদিন ডাকেই ছোটবাবু একটি বৃহৎ বুক-প্যাকেট পাইলেন—গোবর্দ্ধনবাবু তাঁহাকে নিজ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ একসেট উপহার পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকে উপহারেব কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, "আপনার চিবকৃতজ্ঞ গোবর্দ্ধন।"

মানসী ও মর্মবাণী, শ্রাবণ ১৩২৩]

কুকুর-ছানা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেলা দুইটার সময়, সেন্ট জনস্ উড্ নামক লন্ডনেব একটি ছোট স্টেশনে শবৎকুমাব রেলগাড়ি হইতে অবতরণ করিল। জানুয়ারী মাস, আকাশ তুষারবর্ষী ধূসর মেঘে সমাচ্ছন্ন, দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর ভিতর, প্ল্যাটফর্মে, আফিস ঘরে বিদ্যুতেব আলো জ্বলিতেছে। শুধু আজ বলিয়া নয, প্রায় তিন সপ্তাহ একাদিক্রমে লন্ডনে সূর্য্যদেবেব দর্শন পাওয়া যায় নাই। ফটকে টিকিট দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া শরৎকুমাব দেখিল, তুষারপাত হইতেছে—কে যেন আকাশমার্গ পরিপ্লাবিত করিয়া অনববত ধারায় শুভ্র মল্লিকারাশি বর্ষণ করিতেছে। অল্প অল্প বায়ু বহিতেছে। শরৎকুমার কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এই তুষারপাত দেখিতে লাগিল। তুষারপাত দেখিতে সে বড় ভালবাসে। বংশাবলীক্রমে হাজার হাজার বৎসরে রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া আসিতেছে, আকাশে মেঘ উঠিতে দেখিলে যাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে;—তুষারপাতও তাহাদের চক্ষে পরম রমণীয় দৃশ্য।

শরৎকুমাব দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক—বৎসরাবধি সে বিলাতে রহিয়াছে। স্বদেশ হইতে যাত্রা করিবাব মাস দুই পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল—পিতা ও শ্বশুর উভয়ে মিলিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন। সে এখানে ব্যারিষ্টারি পড়িতেছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। লন্ডনের 'মেডা ভেল্' নামক অংশে তাহার বাসা।

স্টেশনের নিম্নে যে রাস্তাটি, তাহা অম্‌নিবাস চলাচলের পথ। শরৎ প্রায় পাঁচ সাত মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু একখানিও অম্‌নিবাস আসিল না। তখন সে বিরক্ত হইয়া, পদব্রজেই বাসায় যাওয়া স্থির করিল। পকেট হইতে পাইপটি বাহির করিয়া তাহাতে ভরিল। দন্তে তাহা চাপিয়া ধরিয়া, ওভারকোটের কলারটা বেশ করিয়া উঠাইয়া দিয়া, তাহার

বোতাম বন্ধ করিল। একটা থামের আড়ালে সরিয়া গিয়া দুই তিনটি কাঠি খরচ করিয়া পাইপ ধরাইল। তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

রাজপথ দিয়া যাইতে হইলে একটু ঘুর হয়, নিকটেই-রিজেন্টস্ পার্ক নামক সুবিস্তৃত সরকারি বাগান—তাহার ভিতর দিয়া যাইলে পথ একটু সংক্ষিপ্ত হয়, সেইজন্য শরৎ পার্কে প্রবেশ করিল। আকাশ যে দিন পরিষ্কার থাকে—রৌদ্র উঠিলে ত কথাই নাই—সেদিন সেই পার্কের ভিতর শিশুরাজ্যের মেলা বসিয়া যায়। যুবতী নার্সারি গভর্নেসগণ চটুলবেশে সজ্জিত হইয়া, মুনিবের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে এখানে 'হাওয়া খাইয়াইতে' লইয়া আসে। এক একখানি বেঞ্চিতে দুই তিনজন যুবতী বসিয়া মনের সুখে গল্পগুজব করে, ছেলেমেয়েগুলি চারিদিকে হাস্য কলরবের সহিত ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে থাকে। অনেক স্ত্রীলোক এই পার্কে বেড়াইতে আসে;—পুরুষের সংখ্যা কম। আজ কিন্তু পার্কটি জনশূন্য। ফুলগাছগুলি নিতান্ত নির্জীব; অধিকাংশ বড় গাছগুলির পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, কেবল এখানে ওখানে দুই একটি ওক্-বৃক্ষ আছে, তাই একটু সবুজ রঙ চক্ষে পড়ে। পাখী—তাহারা শীত পড়িতেই পলাইয়া গিয়াছে।

বরফ যেমন পড়িতেছিল, তেমনি পড়িতে লাগিল। পথের উপর আধ হাত উচ্চ, পেঁজা তুলার মত বরফ জমিয়াছে, কঙ্করগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত। শরৎকুমার সেই বরফ মাড়াইয়া ঘস্ ঘস্ শব্দে চলিতেছে; তাহার বুটজুতার চাপে, এক একটি করিয়া ছাঁচ তৈয়ার হইয়া যাইতেছে, আবার নূতন বরফ পড়িয়া সে গর্ত্তগুলিকে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে বরফ উড়িয়া তাহার ওভারকোটের গায়ে আসিয়া বসিতেছে, কিন্তু কাপড় ভিজিতেছে না। ছাতার উপর বরফ জমা হইয়া ছাতাকে ভারী করিয়া তুলিতেছে। ছাতা হইতে, ওভারকোট হইতে বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া শরৎ আবার অগ্রসর হইতেছে।

এই মনুষ্যহীন পশুপক্ষিবর্জ্জিত পার্কের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া শরৎকুমার যাহা দেখিল, তাহাতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। দেখিল, পথপার্শ্বে প্রকাণ্ড একটি ওক্-বৃক্ষ, তাহার নিম্নে একখানি বেঞ্চি, সেই বেঞ্চির উপর একটি সাদা-কালো রঙের কুকুর-ছানা পশ্চাতের পা দুখানির উপর উবু হইয়া বসিয়া, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শরৎ সেখানে দাঁড়াইল। কুকুরটি তাহাকে দেখিয়া, চারি পায়ে ভর দিয়া সেই বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রাণপণে লাঙ্গুলটি আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহার ভাবটা যেন—'ওগো, আমার বড় বিপদ। শীতে যে মারা যাইতে বসিয়াছি, আমায় রক্ষা কর।'

শরৎ কুকুরটার নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহার মাথায় দুইটি অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, "Hello, whose little doggie are you?" (তুমি কার কুকুরটি?)

কুকুর-ছানা তাহার লম্বা জলসিক্ত কাণ দুইটি পশ্চাৎভাগ গুটাইয়া ব্যাকুলনয়নে শরৎকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—"ঈশ্বর কি আমার কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে উত্তর দিব? যারই কুকুর হই না কেন, এখন আমার প্রাণ ত বাঁচাও!"

কুকুরটির গায়ে বড় বড় লোম। কান দুইটির অগ্রভাগ, চক্ষুর চারিধার, পিঠে একস্থান এবং লাঙ্গুলের মূলদেশ কালো—বাকী সমস্ত অংশ সাদা। গাছের পাতা হইতে বরফ ঝরিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে, গায়ের গরমে সে বরফ গলিয়াছে, জলে কুকুরটি ভিজিয়া বিড়ালটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল টক্ টক্ করিতেছে। বয়স চারি পাঁচ মাসের অধিক হইবে না। দেখিতে বড় সুন্দর।

শরৎকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—যদি কুকুরের মালিককে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পতনশীল তুষারে দৃষ্টিচক্র অবরুদ্ধ। শ্রবণচক্রের মধ্যে যদি কেহ থাকে, এই আশায় শরৎ বার দুই তিন উচ্চস্বরে হাঁকিল, "I say whose dog is this? Has any one lost a dog?"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পালিত কুকুরের গলায় প্রায়ই একটি করিয়া কলার থাকে, সে কলারে কুকুরের নাম ও গৃহের ঠিকানা ক্ষোদিত থাকে। শরৎ দেখিল ইহার গলায় কোন কলার নাই।

শরৎ কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "What are you going to do, you poor devil? Will you come home with me ?" (তুই এখন কি করবি বল দেখি হতভাগা, আমার সঙ্গে বাড়ি যাবি?)

কুকুর তাহার ঠাণ্ডা কালো নাকটি শরতের হস্তে ঘষিয়া, কর্ণ, চক্ষু ও লাঙ্গুলের সাহায্যে উত্তর করিল, "সে হলেই ত ভাল হয়।"

শরৎ তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, বেশ করিয়া কুকুরটির গা মুছিয়া দিল। তাহার পর সেই কৃষ্ণের জীবকে তুলিয়া লইয়া, নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

১২ নং মন্মাউথ্ রোডে শরৎকুমার বাস করিত। ল্যাণ্ডলেডির নিকট হইতে একটি বসিবার এবং একটি শয়ন করিবার ঘর সে বন্দোবস্ত লইয়াছিল।

কুকুর পকেটে করিয়া বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া শরৎ দেখিল, ল্যাচ্‌-কী নাই; বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটি লইয়া যাইতে ভুলিয়াছে। সুতরাং দ্বারে আঘাত করিতে হইল। অল্পক্ষণ পরে স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়বয়স্কা ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

শরৎকুমার প্রবেশ করিয়া হলে দাঁড়াইয়া টুপী খুলিতেছে, তার ল্যাণ্ডলেডি চিৎকার করিয়া উঠিল, "Oh Lud Mr. Bagchi! What's that peeping our of your pocket?" (ও বাগচী মশায়, আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে ওটা কি?)

শরৎ বলিল, "একটা কুকুর-ছানা"—বলিয়া সেটিকে টানিয়া পকেট হইতে বাহির করিল।

ল্যাণ্ডলেডি শরতের হাত হইতে কুকুরটিকে লইয়া, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল, "Isn't he a beauty! Isn't he a darling! আচ্ছা মিষ্টার বাগচী, এটি আপনি কোথায় পাইলেন? My sweetie! My dearie! My popsie wopsei nopsi! এটি আমায় দিবেন মিষ্টার বাগচী? আহা দেখুন দেখুন, কেমন লাল লাল চোখ দুটি! গায়ের লোমগুলি কি সুন্দর! Oh don't—don't kiss me you naughty naughty naughty boy!"—বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি কুকুর-ছানাটিকে টেবিলের উপর নামাইয়া দিল।—সে এই আদরে উৎসাহিত হইয়া তাহার কচি জিহ্বাটি বাহির করিয়া আদরকারিণীর মুখ চাটিয়া দিয়াছিল।

শরৎকুমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। কুকুর-ছানার ইতিহাসটুকু আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া বলিল, "ও, যে ক্ষুধায় মরিতেছে। বাড়িতে দুধ আছে?"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "আছে। আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব কি?"

"তাই দাও।"—বলিয়া শরৎকুমার দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ৯টার সময় শরৎকুমার বসিয়াছে। দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ—বাহিরে বিষম কুয়াশা। দাউ দাউ করিয়া কয়লার চাঙড় জ্বলিতেছে। কুকুর-ছানাটি আগুনের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া চর্ব্বণরত শরতের মুখের পানে চাহিয়া আছে। গলায়, তাহার খানিকটা লাল রেশমী ফিতা বাঁধা। কলার নাই, 'ন্যাড়া ন্যাড়া' দেখায় বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি গতকল্য এটি বাঁধিয়া দিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার নামকরণও হইয়া গিয়াছে—শরৎকুমার তাহার নাম রাখিয়াছে—"টোবি"।

মাঝে মাঝে শরৎ একটু বিস্কুট ভাঙ্গা ফেলিয়া দিতেছে, টোবি তৎক্ষণাৎ তাহা খাইয়া ফেলিতেছে। প্রাতরাশ শেষ হইলে খানিকটা শুক্‌নো টোস্টে চায়ের বাকী গরম দুধটুকু ঢালিয়া টোবিকে দিবে এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতরাশ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া শরৎকে সুপ্রভাত অভিবাদন করিল। কুকুরটিকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বলিল, "কাল রাত্রে এ ত আপনাকে বেশি বিরক্ত করে নাই মিষ্টার বাগচী?"

"না, বিরক্ত করে নাই। উহার শুইবার জন্য তুমি যে পুরাতন কম্বল দিয়াছিলে, তাহাতে কিন্তু ও শোয় নাই। খানিক রাত্রে আমার খাটেব কাছে আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। আমি আবার উহাকে কম্বলে শোয়াইয়া দিলাম। খানিক পরে আবার আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। তখন আমি বুঝিলাম, ছেঁড়া কম্বলে শুইযা থাকিতে ও রাজী নয়। নিজের বিছানায় তুলিয়া লইলাম।—তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "কাগজে আজ বিজ্ঞাপন দিবেন ত?"

"হা, দিতে হইবে বইকি। পরেব কুকুর, ক'দিন রাখিব!"

কুকুরটিকে আদর কনিতে করিতে ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "যাহার কুকুর সে যদি না আসে ত বেশ হয়। খাসা কুকুরটি, এইখানে থাকুক।"

প্রাতরাশ শেষ করিয়া, কুকুরটিকে ল্যাণ্ডলেডির জিম্বায় রাখিয়া শরৎকুমার বাহির হইল। টেম্পলে যাইবার পথে একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের কার্যালয়ে গিয়া তিনদিনের জন্য একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইতে দিল।

পরদিন প্রাতে সেই সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ইংরাজি বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল :—

কুড়াইয়া পাইয়াছি

একটি কুকুর। কুকুরের বর্ণ, জাতি, নাম, বয়স, সনাক্তেব কোনও বিশেষ চিহ্ন, কোথায় হারাইয়াছিল—এই সমস্ত বিবরণ সহিত, যাঁহার কুকুর তিনি আবেদন করুন। বক্স নং ৬০৪৩, কেয়ার অব্ ডেলি টেলিগ্রাফ।

তাহার পরদিন সেই সংবাদপত্রের আফিস হইতে এক বাণ্ডিল চিঠি শরৎকুমাবেব নিকট আসিয়া পৌঁছিল। লন্ডন ও শহরতলীর দশ বারোজন কুকুব-হারা বমণী ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। কোন কোন রমণী পত্রমধ্যে ছয়পেনীব টিকিট পাঠাইযা লিখিয়াছেন, "এই বর্ণনার সহিত যদি মিলে তবে দয়া করিয়া পত্রপাঠ মাত্র আপনাব ঠিকানা তারযোগে আমায় জানাইবেন, আমি গিয়া কুকুরটিকে লইয়া আসিব।—বড় উদ্বিগ্ন রহিলাম"—ইত্যাদি।

মাশুল পাঠাইয়াছিল, তাহাদের সেই মর্মে তার করিয়া দিল—বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া জানাইল।

পরদিন আরও কয়েকখানি পত্র আসিল। এক রমণী লিভারপুল হইতে তাঁহার হৃত কুকুরের বর্ণনাদি করিয়া লিখিয়াছেন—কুকুর হারাইবার পরদিন তিনি বাধ্য হইয়া লন্ডন ছাড়িয়া গিয়াছেন, ফিরিতে এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে।—প্রাপ্ত কুকুরটি যদি তাঁহারই সেই কুকুর হয় তবে এ কয়দিন কুকুরটিকে ভাল করিয়া খাওয়াইবাব জন্য পত্র মধ্যে পোস্ট্যাল নোট পাঠাইয়াছেন। কি কি খাইতে কুকুরটি ভালবাসে এবং কোন কোন দ্রব্য খাইলে তাহার অসুখ করে, তাহারও একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন। কিন্তু কোন পত্র লেখিকাকেই কুকুরের যথার্থ অধিকারিণী বলিয়া শরতের মনে হইল না। যিনি টাকা পাঠাইয়াছিলেন, শরৎকুমার তাঁহার টাকা ফেরৎ দিল, বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া সংবাদ দিল।—আরও দুই তিন দিন এইরূপ পত্র আসিতে লাগিল, কিন্তু কাহার কুকুর কোনও কিনাবা হইল না।

ইতিমধ্যে কুকুরটির উপর শরৎকুমারের অত্যন্ত মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল, "যাক—বাঁচা গেল—কুকুবটি তা হলে আমারই হয়ে গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে। শীত গিয়া বসন্তকাল আসিয়াছে। এখন আর প্রতিদিন সে বৃষ্টি নাই, সে তুষারপাত নাই। দিবাভাগে ঘরে আর আলো জ্বালিতে হয় না। গাছে গাছে নূতন পাতা গজাইতেছে, বাগানে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। সূর্যদেব এখন আর দর্শনদুর্লভ নহেন।

কুকুরটি এ পাঁচ মাস অল্প একটু বড় হইয়াছে—তবে জাত ছোট, বেশি বাড়িবে না। সে এখন মাংস খাইতে পারে। শিকারী হইয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া ঘুপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকে, নেংটি ইঁদুর বাহিব হইলে তাহাকে ধরিতে ছোটে। মাঝে মাঝে এক একটা ধরিয়াও ফেলে। বাগানে রবিন পাখীর ঝাঁক আসিয়া বসিলে টোবি ছুটিয়া যায়। তাহারা কিচিমিচি করিতে করিতে ফর্ ফর্ শব্দে উড়িয়া পালায়।

সেদিন রবিবার ছিল। বেলা দুইটার সময় শরৎকুমার ডিনার শেষ করিয়া, নিজের ঘরে গিয়া বসিল। গৃহস্থ ঘরে ডিনারটা অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পরেই খাইতে হয়, কেবল রবিবারে তাহা নহে। রবিবারের বিকেলবেলাটা দাস-দাসীদের ছুটি দেওয়া হয়, তাহারা ইচ্ছামত বেড়াইয়া টেড়াইয়া আবার সেই রাত দশটার সময় গৃহে ফিরে। তাই রবিবারে সন্ধ্যাব সময় আর উনান জ্বলে না; বাত্রে লোকে ঠাণ্ডা খাবারই খাইয়া থাকে।

বসিবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে পাইপ খাইতে খাইতে, ঘুমে শরতেব চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। টোবি চঞ্চল হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ সে জানালার উপর লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে একটা কিছু দেখিয়া ভেক্ ভেক্ করিযা ডাকিতে লাগিল। তাহাব ডাকে শরৎকুমারের তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। বাহির পানে চাহিয়া দেখিল একজন কাফ্রি যাইতেছে, তাহাকে দেখিযাই কুকুব ডাকিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বেশ রৌদ্র!

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুমালে দুই চোখ মুছিয়া বলিল, "কিবে টোবি, বেড়াতে যাবি?"— প্রথম দুই চাবিদিন টোবির সহিত সে ইংরাজি কহিয়াছিল; কিন্তু যখন দুইজনে ভাব হইয়া গেল, তখন শরৎকুমার বাঙ্গালা ধবিল। মনের কথা কি মাতৃভাষা ভিন্ন কহা যায়? সুতরাং টোবি এখন বেশ বাঙ্গালা বোঝে।

টোবি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এ প্রস্তাব সমর্থন কবিল।

শরৎকুমার তখন কাবার্ড খুলিয়া তামাকের টিন বাহির করিয়া পাউচ্‌টি ভরিয়া লইল। একটা নূতন দেশলাই লইল। অর্দ্ধপঠিত একখানা উপন্যাস বগলে কবিয়া, ছড়ি লইয়া, টোবির সহিত বেড়াইতে বাহির হইল।

বাহির হইয়া শরৎকুমার রিজেন্টস্ পার্কের পথই ধরিল। প্রভুব সহিত পার্কে মাঝে মাঝে টোবি বেড়াইতে গিয়াছে—সেখানে গিয়া খেলা করিতে তাহার বড়ই ভাল লাগে। সে কিছুদূর মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া, তাহার পর অগ্রবর্ত্তী হইল। কুকুরের উচিত মনিবের পিছু পিছু যাওয়া, ইহাই সুসভ্য-কুকুর-সমাজের দস্তুর বা 'এটিকেট' তাহা টোবি বিলক্ষণ জানিত; কিন্তু আনন্দের আবেগে সে আজ আর এটিকেট বজায় রাখিতে পারিল না—আগে আগেই চলিল। টোবি আগে আগে ছুটে, আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরিয়া দেখে মনিব আসিতেছে কি না। এইরূপ কযেক মিনিট চলিয়া, উভয়ে রিজেন্টস্ পার্কে উপনীত হইল।

একে রবিবার, তায় কয়েকদিন পরে আজ রৌদ্র উঠিয়াছে, পার্কে একেবারে মেলা বসিয়া গিয়াছে। সুসজ্জিতবেশা বহু বালিকা, কিশোরী ও যুবতীতে স্থানটি পবিপূর্ণ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে বেঞ্চির উপর বসিয়া জটলা করিতেছে, কেহ কেহ বই পড়িতেছে।

মাঝে মাঝে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফুলের ক্ষেত। কোথাও ফর্গেট-মি-নটস্ ফুটিয়া

সেখানটা একেবারে নীলে-নীল হইয়া গিয়াছে, কোথাও লালে-লাল হইয়া জিরেনিয়ম ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে প্রিম্‌রোজ বায়ুভরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

টোবিকে লইয়া শরৎকুমার প্রথমে খানিক চক্র দিয়া বেড়াইল। সুন্দর কুকুরটি দেখিয়া কোন কোন সাহসী বালক-বালিকা তাহাকে ধরিতে আসিল, টোবি ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর শরৎ সেই বেঞ্চিটার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে পাঁচ মাস পূর্ব্বে টোবিকে সে পাইয়াছিল। বেঞ্চি খালি আছে দেখিয়া শরৎ সেখানে বসিল—কুকুরও লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিল।

শরৎ পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির কবিয়া পাইপটি সাজিল। তাহার সম্মুখে পথ দিয়া বৌদ্রসেবনরত কত লোক যাইতেছে আসিতেছে। পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া, আরামে সে ধূমপান কবিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ দেখিল, একজন বর্ষীয়সী মহিলার সহিত, বারো-তেবো বছরেব একটি মেয়ে, মৃদু মৃদু পদক্ষেপে সেদিকে আসিতেছে। নিকটে পৌঁছিয়া, সেই মেয়েটি শরতের কুকুরের পানে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে গেল। ইহা দেখিয়া শরৎ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ কুকুরটি দেখিতে ভাল বলিয়া অনেকেই, বিশেষতঃ বালিকাবা, তাহার পানে চাহিয়া দেখিত।

ইঁহারা শরৎকে ছাড়াইয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে মেয়েটি বর্ষীয়সীকে কি বলিল। উভয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। কি বলাবলি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে, কঙ্কর পথ হইতে ঘাসে নামিয়া, ধীরে ধীরে শরতের বেঞ্চির নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন।

বৃদ্ধা শরতের পানে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "বড় সুন্দব কুকবটি ত!"

শরৎ তৎক্ষণাৎ টুপী খুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "I, am glad you think so." —(আপনি এরূপ মনে করেন তাহাতে আহ্লাদিত হইলাম)

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমরা এখানে একটু বসিতে পারি? কুকুরটিকে একটু আদর করিতে পারি?

শরৎ বলিল, "Oh certainly. Nothing would give me greater pleasure". (নিশ্চয়। ইহার চেয়ে আর কিছুই আমাকে অধিক আনন্দদান কবিবে না)—বলিতে বলিতে শরৎ হস্তস্থিত পাইপটি উবুড় করিয়া বেঞ্চির গায়ে ঠুকিল, খানিকটা আধপোড়া তামাক ঘাসের উপর পড়িয়া ধূমত্যাগ করিতে লাগিল।

মনিবকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কুকুরটিও বেঞ্চির উপব দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মহিলাটি বালিকা সহ বেঞ্চিতে বসিলেন—শরৎও বেঞ্চির প্রান্তভাগে বসিল। বৃদ্ধা কুকুরটিকে কোলে করিয়া লইলেন, মেয়েটি নীরবে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

টোবি বৃদ্ধার কোল হইতে নামিয়া মনিবেব কাছে আসিবার জন্য একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রহিলেন। টোবি প্রশ্নপূর্ণ নয়নে শরতের দিকে চাহিতে লাগিল—তাহার ভাবখানা যেন, "কে এরা? আমায় এমন করছে কেন? নামতে দিচ্ছে না যে! দেবো ঘ্যাক্ করে এক কামড়? সেটা বোধ হয় একটু অসভ্যতা হবে—না, কি? কিছু বল না কেন?"

মেয়েটি ইতিমধ্যে কুকুরের বামকর্ণ ধরিয়া, তাহার প্রান্তভাগের লোমগুলি সরাইয়া বলিল, 'মা, দেখ।"

মহিলাটি ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন। শরৎ ও দেখিল, কাণটি সেখানে একটি দুয়ানি পরিমাণ কাটা। লোমে ঢাকা থাকে বলিয়া দেখা যায় না। মহিলাটি কন্যার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠিক।"

ব্যাপারটা কি, শরৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল—তবে কি ইহাদেরই কুকুর নাকি?

টোবিকে কোল হইতে নামাইয়া মহিলাটি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি একজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র?"

কুকুরটি হারাইবার আশঙ্কায় শরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কি পড়েন আপনি?" "আইন পড়ি।"

"কোথা? লিন্‌কন্স ইন্? সেখানে আমার একটি ভাইপোও পড়ে।"

"না, আমি গ্রে'জ ইনে পড়ি।"

"বেশ বেশ। কতদিন এ দেশে আছেন?—আপনাকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিয়া আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত?"

"না না—বিরক্তির কথা কি! আমার সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন ইহা ত আমার গৌরবের বিষয়। আমি এ দেশে আঠারো মাসের উপব আছি।"

মহিলাটি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। শরৎ ভাবিতে লাগিল, এইবার বোধহয় কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

তাহাই হইল। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এ কুকুরটির বয়স কত?"

"তাহা ত ঠিক জানি না। বছরখানেকের হইবে বোধ হয়।"

"কুকুরটি বেশ শান্ত, এইটি কি আপনি কিনিয়াছিলেন? না, কোনও বন্ধু আপনাকে উপহার দিয়াছিলেন?"

শরৎকুমার বুঝিল, এইবার সময় উপস্থিত হইযাছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে প্রলোভন হইল—মিথ্যা করিয়া বলি, কিনিয়াছিলাম। আমায় ধরে কে?

কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সে বলিল, "কুকুরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

মেয়েটি এতক্ষণ শবতের সঙ্গে কোনও কথা কহে নাই। এবার আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "কোথায় পাইয়াছিলেন?"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল, "এইখানেই পাইয়াছিলাম। এই বেঞ্চির উপর পাঁচ মাস হইল, কুকুরটি বসিযা ছিল। তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বরফ পড়িতেছে। কুকুরটি এই বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিল, এ অঞ্চলে জনপ্রাণী কেহ ছিল না। আমি কুকুরটিকে বাড়ি লইয়া গিয়াছিলাম—নহিলে এখানেই সেদিন মরিয়া যাইত।"

শরৎ নীরব হইল। তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। তাহার মনে হইল সে যেন চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত—আদালতে জবাব দিতেছে। মেয়েটি ও তাহার মাতা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

শরৎ তখন তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি উহাকে বাড়ি লইয়া গিয়া, আগুনের কাছে রাখিয়া, খাবার দিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইলাম। পরদিন ডেলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। তিনদিন উপর্য্যুপবি সে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, অনেকে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহার কুকুর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না।"

শরৎকুমারের মুখ তখন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা তাহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কুকুরের গলায় কলাব ছিল না, নয়?"

শরৎ বলিল, "না। কলারে যদি কুকুরের মালিকের নাম ঠিকানা লেখা থাকিত, তাহা হই.। কাগজে আমায় বিজ্ঞাপন দিতে হইত না।"

মেয়েটি বলিল, "কুকুর শিকলে বাঁধা ছিল। কলার একটু ঢিলা ছিল। মাথা গলাইয়া পলায়ন করে।"

শরৎ বলিল, "কুকুর কি আপনার?"

মহিলাটি বলিল, "হ্যাঁ। আমার কন্যারই কুকুর। শুধু চেহারা দেখিয়া আমি বলিতেছি না। যখন কুকুর হারাইয়াছিল, তাহার মাস দুই পূর্ব্বে একটা বিড়াল ইহার বাঁ কানে কামড়াইয়া দিয়াছিল। সেখানে ঘা হয়। Vat-এর কাছে পাঠাইতে হইয়াছিল, কানটি সে একটুখানি কাটিয়া দিয়াছিল। এই দেখুন না"—বলিয়া টোবির কানটি হইতে লোম সরাইয়া সেই দুয়ানি পরিমাণ কাটাটুকু তিনি দেখাইলেন।

বৃদ্ধা আবার বলিলেন, "কুকুর হারাইবার পর Times-এ এক সপ্তাহ্ কাল আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু কুকুরের কোন সন্ধান পাই নাই। তাহার পর কুকুর পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমরা ফ্রান্সে চলিয়া যাই। এক সপ্তাহ্ মাত্র আমরা সেখান হইতে ফিরিয়াছি।"

শরৎ বলিল, "আমি Times দেখি নাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি দেখেন নাই। দেখিলে তখনই আমরা কুকুরটি ফিরিয়া পাইতাম। এখন কুকুরটি কি—"

শরৎ বলিল, "নিশ্চয়! আপনাদের কুকুর—আপনারা লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কিন্তু—আপনি কুকুরটিকে এই পাঁচ মাস পুষিয়াছেন, উহার উপর নিশ্চয়ই আপনার মায়া পড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কুকুরটি আপনার নিকট হইতে লওয়া ত আমাদের উচিত হইবে না। কি বলিস ফ্লোরা?"

ফ্লোরা কুকুরটিকে বুকে চাপিয়া ব্যাকুল নয়নে শরতের পানে চাহিয়া রহিল। বলিল, "কুকুরটি ছাড়িতে আপনার কি বড় দুঃখ হইবে মহাশয়? তা যদি না হয় তবে আমায় দিন। ইহাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম—এ পাঁচ মাস ধরিয়া ইহার জন্য আমার মন কেমন করিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা যথার্থ, কুকুর হারাইবার পর দুইদিন ফ্লোরা খায় নাই। সেই অবধি যখন তখন কুকুরটির কথাই বলে। আজ প্রাতেও—"

শরৎ বলিল, "বেশ ত, কুকুর লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কিন্তু ফ্লোরা—সেটা কি উচিত হইবে? এ কুকুর উনি অতদিন পুষিয়াছেন, উনিই রাখুন। আমি তোমাকে ভাল কুকুর কিনিয়া দিব—এর চেয়েও খুব সুন্দর।"

ফ্লোরা চক্ষু ছল ছল করিয়া বলিল, "না মা, অন্য কুকুর আমি চাই না। এই কুকুরই আমার সবচেয়ে ভাল। উনি ত দিতেছেন। ওঁর কিছুই দুঃখই হইবে না বলিতেছেন। নয় মহাশয়।"

শরৎ বলিল, "তোমার কুকুর তুমি লও।"

বৃদ্ধা তখন শরৎকে মিষ্ট কথায় অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নিজের নাম ঠিকানা-যুক্ত একখানি কার্ড বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। শরতের সঙ্গে কার্ড ছিল না—তাহার নাম ঠিকানা বৃদ্ধা লিখিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি এখন কোন কাজে ব্যস্ত আছেন কি?"

"না।"

"Will you do us a very great favour ?" (আপনি কি আমাদের উপর খুব একটু অনুগ্রহ করিবেন?)

"I'm at your service" (আমি আপনার আজ্ঞাবহ)

"আমাদের যদি বাড়ি পৌঁছাইয়া দেন, তবে বড় উপকৃত হই।"

"বেশ ত। যখন বলিবেন।"

"তবে আসুন। আমার গাড়ি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

ফ্লোরা কুকুরটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। তখন সকলে ফটকের দিকে চলিলেন। মহিলাটিকে হাত ধরিয়া শরৎ মোটর কারে উঠাইয়া দিল। তাহার পর টোবিকে উঠাইয়া

দিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে সে তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। দ্বিতীয়বার শরৎ তাহাকে ধরিবামাত্র, সে আচড়-পিচড় করিতে লাগিল—কিছুতেই উঠিবে না। আকুলভাবে শরতের মুখের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "কোথায় পাঠাচ্ছ আমায়?"

বৃদ্ধা—ইঁহার নাম মিসেস কলিন্স—বলিলেন, "মিষ্টার বাগচী, আপনি উঠিয়া বসুন দেখি, কুকুর আপনিই উঠিবে।"

শরৎ তখন কারে উঠিল। টোবিও তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া পা-দানে উঠিল, পা-দান হইতে ভিতরে উঠিয়া মনিবের পায়ের কাছটিতে বসিয়া রহিল।

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "পথে একস্থানে এক মিনিটেব জন্য একটু কাজ আছে।"—বলিয়া চালককে একটা ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

গাড়ি ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল—বাহিরে সাইনবোর্ড রহিয়াছে।

Mr. GEORGE RANDALL

Veterinary Surgeon

অর্দ্ধ মিনিট পরে র‍্যাণ্ডাল আসিয়া টুপী খুলিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস কলিন্স তাঁহাকে বলিলেন, "মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, তোমার মনে পড়ে কি একটি ছোট কুকুর তোমায় চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়াছিলাম?"

"মনে পড়ে বই কি!"

"কবে সে?"

"বোধ হয় নভেম্বর মাসে।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "কি হইয়াছিল কুকুরটির বল দেখি?"

"কানে ঘা হইয়াছিল, শুনিয়াছিলাম, বিড়ালে তাহার কানে কামড়াইয়া দিয়াছিল। কানটি আমি খানিক কাটিয়া দিয়াছিলাম।—এইটিই কি সেই কুকুর?"

"তোমার কি বিশ্বাস?"

"আমার বিশ্বাস, এইটিই। ঠিক সেই রকম দেখিতে—তবে এখন একটু বড় হইয়াছে।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "হ্যাঁ মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, এই কুকুবটিই বটে।—আচ্ছা, ধন্যবাদ। গুড আফটারনুন।"

র‍্যাণ্ডাল পুনর্ব্বার অভিবাদন করিল।

মিসেস কলিন্স চালককে হুকুম দিলেন—"বাড়ি"।—মোটব আবার ছুটিল।

শরৎ এতক্ষণ নত মস্তকে বসিয়া ছিল। এবার বলিল, "মিসেস কলিন্স, ইহার কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আপনি বলিয়াছিলেন আপনার কুকুর, ইহাই যথেষ্ট ছিল।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়। তবে কি জানেন, আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই জন্যই।"

মোটর কার বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। শবৎ দেখিল, ইহা রিজেন্টস্ পার্কের অতি নিকট—রাস্তার এপার ওপার।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আজ আমরা আপনাকে বড়ই কষ্ট দিলাম মিষ্টাব বাগচী। আসুন, একটু চা খাইয়া যান।"

শরৎ প্রথমে আপত্তি করিল। অবশেষে সম্মত হইয়া ইঁহাদের সহিত বাড়ির মধ্যে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই চা আসিল। টোবি এতক্ষণ শরতের কাছ ঘেঁসিয়া ছিল। পরের বাড়ি আসিয়া নূতন লোকের মাঝে পড়িয়া সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া রহিয়াছে। বাড়িতে চা-প্যানের সময় এত যে তাহার লম্ফঝম্ফ—এখানে তাহার কিছুই নাই।

শরৎ মাঝে মাঝে টোবির পানে চাহিতেছে, আর তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া

উঠিতেছে। যদি সে প্রথমাবধি জানিতে পারিত যে পাঁচ মাস পরে কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে তাহার প্রতি এতখানি মায়া জন্মিতে দিত না—যাক, এখন আর গতানুশোচনা করিয়া কি হইবে?

মিসেস কলিন্স শরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চা-পান শেষ হইলে কন্যাকে তিনি কক্ষান্তরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া আবার অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু ফ্লোরা কিছুতেই তাহার দাবী ছাড়িতে চাহিল না। ইতিমধ্যে চেন ও কলার কিনিবার জন্য দাসীকে সে দোকানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

চেন ও কলার আসিবামাত্র ফ্লোরা টোবির গলা হইতে পুরাতন কলারটি খুলিয়া শরতের হাতে দিল। নূতন কলার পবিতে টোবি খুব আপত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট কুকুর, অত বড় মেয়ের সঙ্গে জোরে সে পারিবে কেন? ফ্লোরা তাহার গলায় নূতন চেন ও কলার দিয়া, সোফার পায়ায় তাহাকে বাঁধিল।

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মিসেস কলিন্স এখন তবে বিদায় লই।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "এখনি যাইবেন?"

টোবির দিকে শরৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ফ্লোরা আসিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "আপনার দয়া কখনও আমি ভুলিব না। কুকুরটি লইলাম বলিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না মিষ্টার বাগচী।"

শরৎ বলিল, "অপবাধ কিসের?"—তাহার ইচ্ছা হইল, কুকুবকে যত্নে রাখিবার জন্যে ফ্লোরাকে একটু অনুবোধ জানায়; কিন্তু তাহার বুকটা কেমন করিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা বাহির করিতে পারিল না।

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "গুড বাই মিষ্টার বাগচী। আপনার সৌজন্যে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম। আপনাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমার কার অপেক্ষা করিযা আছে।"

শরৎ বলিল, "ধন্যবাদ। কারে প্রয়োজন নাই, আমি হাঁটিয়াই বাড়ি যাইব। এই কাছেই ত। গুড বাই।"

শরৎ কক্ষের বাহির হইবামাত্র টোবি ঝড়াং ঝড়াং কবিয়া চেনে হ্যাঁচকা টান দিতে দিতে উচ্চ চিৎকার আরম্ভ করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে শরতের পা কাঁপিতে লাগিল। সিঁড়ির ব্যানিষ্টার ধরিয়া কোনও মতে সে নামিতে লাগিল। টোবির ব্যাকুল চিৎকার তাহার কর্ণে যেন গলিত লৌহের মত প্রবেশ করিতেছিল। ত্রিতল হইতে দ্বিতল, দ্বিতল হইতে একদলে নামিয়া, টুপী ও ছড়ি লইবার জন্য শরৎ হলে গিয়া দাঁড়াইল। টোবির ব্যাকুল ক্রন্দনের স্বর তখনও তাহার কানে আসিতেছে।

গৃহভৃত্য টুপী ও ছড়িটি তাহার হাতে দিয়া, দ্বাব খুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। রাজপথে পৌঁছিয়া দ্রুতবেগে বাসার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাসায় পৌঁছিয়া, ল্যাচ-কী দিয়া দরজা খুলিয়া, টুপী ছড়ি হলে ছাড়িয়া শরৎকুমার একেবারে দ্বিতলে শয়নকক্ষে গিয়া দ্বাব বন্ধ করিয়া দিল। দর্পণে হঠাৎ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল, "কারু সঙ্গে দেখা হয়নি সে ভালই হয়েছে।"—তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, ছল ছল করিতেছে, ওষ্ঠযুগল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কোট এ কামিজের কলার খুলিয়া ফেলিয়া, একটা আরামচৌকিতে শরৎ এলাইয়া পড়িল। তাহাদের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় হলে দাঁড়াইয়া টোবির যে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন সে শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহাই অবিশ্রান্তভাবে তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া শরৎকুমার চেয়ারে পড়িয়া রহিল। কল্পনায় দেখিতে পাইল তাহাদের বাড়িতে টোবি বাঁধা রহিয়াছে, বসিয়া হোহোহো করিয়া

ক্রমাগত কাঁদিতেছে, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে শরতের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি শরৎ রুমাল বাহির করিয়া চোখেব জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল—আমি এ কি করিতেছি!—কাঁদিতেছি!—পুরুষ মানুষ হইয়া, দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের মত কাঁদিতেছি!—ছি ছি।

শরৎ তখন ঝাড়া দিয়া চেয়াব হইতে উঠিযা পড়িল। পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সাজিতে লাগিল। যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবটা মনের ভিতর আঁকড়িয়া ধরিয়া, গুন গুন করিয়া একটা ইংবাজি হাসির গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে কার্পেটের উপর পা ঠুকিতে লাগিল।

পাইপ সাজা হইলে, দেশলাইয়ের জন্য কোটের পকেটে হাত দিতেই টোবির কলারটি হাতে ঠেকিল। সেটি বাহির করিয়া ম্যান্টেল্ শেল্ফের উপর রাখিতে রাখিতে, আবার তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। সাজা পাইপটি তখন সে মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময়, ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া শরতেব শযনকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার খাবাব লইয়া আসিব কি?"

শরৎ পূর্ব্বেই স্থির করিয়া বাখিয়াছিল, বাসায় আজ খাইবে না;—পরিবেষণ করিবার সময় ল্যাণ্ডলেডি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে টোবি কোথায় গেল, কি হইল ইত্যাদি। সে সময় যদি নিজেকে সামলাইতে না পারে?—ল্যাণ্ডলেডির সাক্ষাতে—সে বড় লজ্জা। কাল তখন যাহা হয় হইবে। তাই শরৎ উত্তর করিল, "না মিসেস জোন্স—আমি এখনই বাহিরে যাইতেছি, বাড়িতে খাইব না।"

ল্যাণ্ডলেডি মনে করিল, বোধ হয় বাহিরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে। খাবারটা বাঁচিয়া গেল—সে খুশিই হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "টোবির জন্য কিছু খাবার বাখিব কি?"

"না, প্রয়োজন হইবে না।"

ল্যাণ্ডলেডি মনে করিল, টোবিও তবে মনিবের সঙ্গে যাইবে, সেইখানেই খাইয়া আসিবে। পূর্ব্বে এরূপ মাঝে মাঝে হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ফিরিতে কত রাত্রি হইবে মহাশয়?"

"এগারোটা।"

"আচ্ছা, তবে দরজার তালাবন্ধ করিব না, হলে মোমবাতি জ্বালিয়া রাখিব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস জোন্স।"

মুখ হাত ধুইয়া শরৎকুমার বাহির হইল। ভাবিল, যাই, হাইড পার্কে গিয়া বসিয়া থাকি, সেইদিকে একখানি অম্নিবাস যাইতেছিল, শরৎ লাফাইয়া তাহাতেই আরোহণ করিল। রিজেন্টস্ পার্কের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কি মনে হইল, অম্নিবাস হইতে সে নামিয়া পড়িল। মিসেস কলিন্সের বাড়ির দিকে চলিতে লাগিল।

সে বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিয়া, রাস্তার অপর পার হইতে ত্রিতল যে ঘরটিতে বসিযা সে চা পান করিয়াছিল, সেই ঘরটির পানে চাহিয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া আলোক বাহির হইতেছে, কে পিয়ানো বাজাইতেছে, সে শব্দ আসিতেছে। টোবিব কান্নার শব্দ আসিতেছে না।

শরৎ ভাবিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এতক্ষণ বোধ হয় চুপ করিয়াছে। চিরদিন কি আর কেহ কাঁদে? মানুষেই কাঁদে না, তা কুকুর!

শরৎ ধীরে ধীরে গৃহদ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দ্বারলগ্ন বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়িতে একটি নূতন কুকুর আজ আসিয়াছে জান ত?"

দাসী বলিল, "জানি।"

"সেটি—পূর্ব্বে—আমার কাছে ছিল। আমি বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।"

দাসী বাধা দিয়া বলিল, "জানি মহাশয়। আপনাকে দেখিয়াছি। আমিই চা আনিয়াছিলাম।"

"ওঃ—তুমি? আচ্ছা, দেখ—আমি চলিয়া যাইবার সময় কুকুরটি বড়ই কাঁদিতে লাগিল। এখন আর কাঁদিতেছে না ত?"

"না, এখন কাঁদিতেছে না। আপনি চলিয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল। মিস ফ্লোরা তাহাকে কত আদর করিতে লাগিল, কেক, বিস্কুট এ সব খাইতে দিল, কিছুই খাইল না। খানিক পরে চুপ করিল বটে—কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও এক একবার হোউ হোউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কিছু খাইয়াছে কি?"

"তাহা ত আমি জানি না মহাশয়। তবে মিস ফ্লোরা রান্নাঘরে আসিয়া খানিকটা কোল্ড ফাউল আর খানিকটা রাইস পুডিংস্ এই কতক্ষণ হইল লইয়া গিয়াছে।—আপনি কি ভিতরে আসিবেন? গৃহিণী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিব?"

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—এখন আমি ভিতরে যাইব না। আমি অন্য কাজে যাইতেছি। গুড নাইট।"—বলিয়া দাসী দ্বার রুদ্ধ করিল। শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে একটি ফটক পার হইয়া রীজেন্টস্ পার্কের ভিতরেই প্রবেশ কবিল। এ সময় হাইড পার্কে যেরূপ জনতা এখানে সেরূপ নহে। তবে আলোও জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে লোকজনও বেড়াইতেছে। শরৎ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। বসিয়া ভাবিল—"আশ্চর্য্য! এখানেই তাকে পেয়েছিলাম, এখানেই তাকে হারালাম।"—রুমাল বাহির করিয়া শরৎ চক্ষু মুছিল।

বসিয়া বসিয়া কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এই পাঁচ মাস কুকুরটি কবে কি করিয়াছিল, সমস্ত একে একে তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন যখন সে প্রাতরাশের পর বাহির হইত, টোবিও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে চাহিত। জোর করিয়া তাহাকে ভিতবে পুরিয়া দরজা টানিয়া দিতে হইত। প্রতিদিন বিকালে সে যখন বাড়ী ফিরিত, দ্বার খুলিয়াই দেখিত, হলে টোবি চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। সে প্রবেশ করিবামাত্র টোবির কি আনন্দ—কি লম্ফঝম্ফ! ঠিক পাগলের মত ব্যবহার করিত। চায়ের সময় বসিয়া বসিয়া বিস্কুট খাইত। প্রথমে শরৎ টোবির জন্য সস্তা দামের কুকুর-বিস্কুট কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহার পর শুনিল, বিস্কুটের কারখানায় দিনান্তে ঘর ঝাঁট দিয়া যে সকল টুকরা গুড়াঁগাড়া জমা হয়, তাহা দিয়াই কুকুর-বিস্কুট প্রস্তুত হয়। সেই কথা শুনিয়া আর সে টোবির জন্য কুকুর-বিস্কুট কিনিত না—অধিক মূল্য দিয়া মানুষ যে বিস্কুট খায়, তাহাই কিনিত। ডিনারের সময় টেবিলের নিচে টোবি চুপ করিয়া তাহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া থাকিত,—তাহার আহার শেষ হইবামাত্র কি রকম করিয়া জানিতে পারিত, বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে থাকিত। শরৎ তখন টোবির খাবারের প্লেট নামাইয়া দিত—টোবি খাইত। রোষ্ট ফাউল তাহার একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। দাসী বলিয়াছে, ফ্লোরা তাহার জন্য রান্নাঘর হইতে ফাউল লইয়া গিয়াছে—কিন্তু টোবি খাইবে কি? সন্দেহ। একদিনের কথা মনে পড়িল, তখন মাসখানেক টোবি আসিয়াছে। শরতের বাহিরে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি দশটার সময় যখন ফিরিল, ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল,"মহাশয়, আপনার কুকুরটি অদ্ভুত। আমরা খাইয়া, প্লেট ভরিয়া খাবার আনিয়া টোবিকে দিলাম, সে স্পর্শও করিল না। খালী বাড়ীময় আপনাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। শেষে আপনার বসিবার ঘরে, খাবারসুদ্ধ তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এখন যদি খাইয়া থাকে ত বলতে পারি না।"—শরৎ বসিবার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র টোবি মহা লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল। শুধু লম্ফঝম্ফ নয়—উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে লম্ফঝম্ফ—যেন বলিতেছে—"কোথায় গিয়েছিলে বল দিকিন।—আমি ত মনে করেছিলাম, আমায় চিরদিনের জন্য ফেলে চলে গেছ—

আর তোমায় দেখতে পাব না।''—উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে, তখন টোবি আহারে মন দিল; পূর্ব্বে তাহা স্পর্শও করে নাই। শরৎ আবার অশ্রুমোচন করিল।—ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। ১১টার সময় ফটক বন্ধ করিয়া দিবে। শরৎ উঠিল।

বাড়ী গিয়া সে শয্যায় আশ্রয় করিল। ঘুম কি আর আসিতে চায়? প্রায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া, শেষে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল।—পরদিন বেলা ৮টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে অভ্যাসগত গৃহকোণস্থিত টোবির শুইবার টুক্‌রীটির দিকে তাহার চক্ষু গেল। সেটি আজ শূন্য! অন্যদিন দেখে, টোবি তাহার মধ্যে গুটিসুটি হইয়া ঘুমাইতেছে। শরৎ ডাকে— ''টোবি—টোবি—ট্যাব্!''—টোবি অমনি ছুটিয়া পালঙ্কের নিকটে আসে, আগের পা দুটি বিছানার ধারে তুলিয়া দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে থাকে, শরৎ তাহাকে একটু আদর করে। আজ আর আদর লইতে আসিবার কেহ নাই।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎ শয্যা ত্যাগ করিল। মুখ হাত ধুইয়া, পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। কোটটিতে স্থানে স্থানে টোবির শাদা রোঁয়া লাগিয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে বুরুষ দিয়া সেই রোঁয়াগুলি ঝাড়িয়া কোটটি শরৎ গায়ে দেয়। আজও রোঁয়া ঝাড়িতে লাগিল। ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার মনে হইল, 'আজই শেষ—কাল থেকে আর কারু রোঁয়া কোট থেকে ঝাড়তে হবে না।''

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারাদিন শরৎকুমারের যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। টেম্‌প্লে গিয়া আইনে লেকচার শোনা, লাইব্রেরিতে গিয়া পাঠ, কমন-রুমে গিয়া বিশ্রাম,— প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট সকল কর্ম্মগুলিই যন্ত্রচালিতের মত সে করিয়া গেল। যখন বাড়ী ফিরিবার সময় হইল, তখন মনে হইল আজ ত দ্বারটি খুলিবামাত্র টোবি আমার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না!—তাই বাড়ী যাইতে তাহার প্রাণ চাহিল না, একটা রেস্তোরাঁয় চা পান করিয়া, হাইড পার্কে বেড়াইতে গেল।—সেখানে পৌঁছিয়া, একখানা বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘন্টাখানেক থাকিয়া বড়ই বিরক্ত বোধ হইল। একবার ভাবিল বাড়ী যাই— কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, গিয়া ডিনার খাইয়া সকালে সকালে শুইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। আজ ত খাইবার সময় টোবি আসিয়া তাহার পায়ের কাছটি ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকিবে না!

ধীরে ধীরে শরৎকুমার হাইডপার্ক হইতে বাহির হইল। তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে থিয়েটারের একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার মনে হইল, থিয়েটারে যাই, ঘন্টা তিনেক ভুলিয়া থাকিব ; তাহার পর কোনও রেস্তোরাঁয় কিছু খাইয়া, বাড়ী গিয়া শয়ন করিব।

আটটার সময় শরৎকুমার এক থিয়েটারে গিয়া পৌঁছিল। অর্দ্ধঘন্টা পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। শরৎ বসিয়া দেখিতে লাগিল—কিন্তু কি অভিনয় হইতেছে ভাল বুঝিতেই পারিল না। দেহ তাহার থিয়েটারে, মন যে আকাশ পাতাল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! খানিক শোনে, আবার অন্যমনা হইয়া যায় ; আবার যখন শুনিতে আরম্ভ করে, তখন পূর্ব্বের কথা কিছুই স্মরণ নাই।—প্রায় দেড়ঘন্টা কাল এইরূপে কাটিলে, বিরক্ত হইয়া শরৎকুমার বাহির হইয়া পড়িল। তখন ক্ষুধাটা বেশ অনুভব করিল। আহার করিবার জন্য নিকটস্থ একটা রেস্তোরাঁর দ্বার পর্য্যন্ত গেল—গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল, ''আমি ত খেতে যাচ্ছি—কিন্তু টোবি!—সে কি খেয়েছে?''—তখন সে স্থির করিল, যাই, কল্যকার মত গিয়া দাসীটার কাছে একবার সন্ধান লই।—তৎক্ষণাৎ অম্‌নিবাসে আরোহণ করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে মিসেস কলিন্সের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল।

আবার সেই দ্বারস্থ বিদ্যুতের বোতাম টিপিল; আবার একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল,—কিন্তু এ গত কল্যকার সে দাসী নহে, অন্য রমণী।—শরৎ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ''আমি সেই কুকুরটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।''

দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কুকুর?"

"সেই যে কুকুরটি কাল আমার সঙ্গে আসিয়াছিল।"

"কি হইয়াছে মেরী"—বলিতে বলিতে মিসেস কলিন্স অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শরৎকে দেখিয়া বলিলেন, "মিষ্টার বাগচী!—গুড ইভনিং। আসুন আসুন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?"

"গুড ইভনিং"—বলিয়া শরৎ প্রবেশ করিল। মিসেস কলিন্সের সহিত করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "ক্ষমা করিবেন, এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিলনা। কুকুরটি কেমন আছে, সেইটুকু শুধু দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় ছিল।

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "উপরে আসুন। অনেক কথা আছে"—বলিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।—অনেক কথা কি আছে শরৎ কিছুই আন্দাজ করিতে পারিল না। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিসেস কলিন্স একটি সোফায় বসিয়া, নিকটস্থ একটি চেয়ারে শরৎকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।—শরৎ বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মিসেস কলিন্স বলিলেন, "আমাদের দ্বারা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মিষ্টার বাগচী। কি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

শরৎ শঙ্কিত ভাবে বলিল, "কেন? কি হইয়াছে, টোবি কি—"

"পলাইয়া গিয়াছে।"

"কখন?"

"আজ বিকালে, পাঁচটার সময়। আমরা কেহই বাড়ী ছিলাম না। ফ্লোরাকে লইয়া আমি সেন্ট জেমস্ হলে কনসার্ট শুনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, কুকুরটি নাই। চেনটা যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু আধখানা ছেঁড়া।"

শরৎ বলিয়া উঠিল, "তবে বোধ হয় আমার বাসাতেই গিয়াছে!"—বলিয়াই সে অনুশোচনায় মরিয়া গেল। ভাবিল ছি ছি—কেন ও কথা বলিলাম? যদি গিয়া থাকে, গিয়াইছে; এখনি আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক সঙ্গে দিবে হয়ত!

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার সে ভাব নিবৃত্ত হইল। মিসেস কলিন্স বলিলেন, "না মিষ্টারবাগচী, আপনার বাসায় যায় নাই। আমি তিনবার আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম।"

শরৎ বলিল, "তবে কোথায় গেল?"—মিসেস কলিন্স কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, শেষে বলিলেন, "আমার বোধ হয় কুকুরটি আর জীবিত নাই।"

শরৎ রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "জীবিত নাই? বলেন কি? কি করিয়া জানিলেন?"

"বলিতেছি। কুকুরটি খুঁজিবার জন্য শুধু যে আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম তাহা নয়। পথে চারিদিকে খবর লইবার জন্যও লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ আন্দাজ ছয়টার সময়, এজোয়ার রোডের মোড়ে একটি শাদাকালো কুকুর যাইতেছিল। নিকটস্থ একটা কসাইয়ের দোকান হইতে দুইটা বড় বড় কুকুর ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। সম্মুখের দোকানের লোকেরা বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। কুকুরটি রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া সেখানে পড়িয়া ছিল—পুলিশ আসিয়া, তাহার গলায় কোন কলার না দেখিয়া, কাহার কুকুর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মিউনিসিপ্যালিটির লোক ডাকিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে।"—শরৎকুমারের বাক্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাম হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া, মুখ নীচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "আপনি এ সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হবেন বুঝিয়াও আপনাকে

জানানই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমারই দোষে এটি ঘটিল। আমার উচিত ছিল, কল্যই ফ্লোরাকে নিবারণ করা—কুকুরটি তাহাকে লইতে না দেওয়া। কিন্তু তাহা আমি পারি নাই। কুকুরটি কল্য রাত্রে কিছুই খায় নাই—অদ্য দিনের বেলাও ফ্লোরা তাহার মুখের কাছে প্লেট ভরিয়া নানাবিধ খাদ্য আনিয়া ধরিয়াছিল, তাহা সে স্পর্শও করে নাই। তখনও আমি বলিয়াছিলাম—ফ্লোরা, কুকুরটি না খাইয়া মরিয়া যাইবে, যাহার কুকুর তাহাকে ফিরিয়া দিয়া আয়। ফ্লোরা কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'না, মা, কতক্ষণ আর না খাইয়া থাকিবে—ক্ষুধা অসহ্য হইলে খাইবেই। কুকুরটি আমি দিব না।'—তাহার চোখের জল দেখিয়া আবার আমার দুর্ব্বলতা আসিল। কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম।"

মিসেস কলিন্স চুপ করিলেন। শরৎ যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস কলিন্স আবার বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। আপনি আমায় ক্ষমা করিতে পারিবেন কি না আমি খুব সন্দেহ করি।—কিন্তু জানিবেন, আমি এ জন্য বড়ই দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। আমাদের কুকুরটিকে আপনি পাঁচ মাস প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহার খোরাকীস্বরূপ আপনাকে টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া আপনাকে অপমান করিব না। তবে যদি আপনি অনুমতি করেন, আপনার দানস্বরূপ পাঁচ গিনি আমি 'ডগস্ হোম'-এর সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিই।"—শরৎ এতক্ষণে মাথা তুলিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, আমি আপনাকে বিলম্ব করাইব না মিষ্টার বাগচী। গুড নাইট।"—শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিল। "গুড নাইট মিসেস কলিন্স"—বলিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

দশ মিনিটের পথ হাঁটিয়া আসিতে শরৎকুমারের আধঘণ্টা লাগিয়া গেল। পা আর চলে না। একস্থানে ত সে পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল, নিকটে একটা বাড়ীর রেলিং ছিল, তাহাই ধরিয়া সে সামলাইয়া লইল।—বাসায় পৌঁছিয়া, হলে টুপী ও ছড়ি রাখিয়া, মোমবাতিটি হাতে করিয়া শরৎ উপরে গেল। শয়নকক্ষের দ্বার খুলিয়া—এ কি! এ কি স্বপ্ন, না সত্য?

টৌবি অক্ষতদেহে ঘরের মাঝখানে শুইয়া রহিয়াছে। শরৎকে দেখিয়া সে কষ্টে তাহার কাছে আসিয়া, লেজ নাড়িতে লাগিল। দুই দিনের অনাহারে লম্ফঝম্ফ করিবার শক্তি আর তাহার নাই!—'ট্যাব্—ট্যাব্—আমার ট্যাব!"—বলিতে বলিতে বিস্ময়ে আনন্দে দিশাহারা হইয়া শরৎ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। তখনও তাহার গলায় সেই আধখানা চেন ঝুলিতেছে।

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, শরৎ ল্যাণ্ডলেডিকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। ড্রেসিং গাউনের উপর একটা উলের শাল জড়াইয়া, ল্যাণ্ডলেডি উপর হইতে নামিয়া আসিল—বলিতে বলিতে আসিল "Are you happy now, Mr. Bagchi?" (বাগচী মশায়, এখন খুসী হয়েছেন ত?)—শরৎ বলিল, "ব্যাপারটা কি বল দেখি মিসেস জোন্স।"

মিসেস জোন্স তর্জ্জনী হেলাইতে হেলাইতে বলিল, "একবার নহে—দুইবার নহে তিনবার মিষ্টার বাগচী—তিনবার আমায় মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। সাড়ে পাঁচটার সময় বাহিরে যাইব বলিয়া যাই দরজাটি খুলিয়াছি, দেখি টৌবি বাহিরে বসিয়া আছে, গলায় আধখানা শিকল। আমাকে দেখিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। কতবার আপনার সঙ্গে রিজেন্টস্ পার্কে গিয়াছে ত! পথ চেনে। আমি উহাকে রান্নাঘরে লইয়া গেলাম। এক বাটি দুধ দিলাম, চক্ চক্ করিয়া খানিকটা খাইয়া, আর খাইল না। প্লেট ভরিয়া মাংস দিলাম তাহাও ছুঁইল না। রান্নাঘরেই উহাকে রাখিলাম। জানিতাম, এখনি উহাদের লোক খুঁজিতে আসিবে। হইলও তাই। একবার কি মহাশয়, তিন তিনবার আসিয়াছিল। তিনবার আমায় মিথ্যা করিয়া বলিতে হইয়াছে—কই কুকুর ত এখানে আসে নাই!"

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন মিসেস জোন্স তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন?"

"আপনার অবস্থাটা কি বুঝিতে পারি নাই মহাশয়? আজ প্রাতে আপনার মুখ দেখিয়াই সে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন? উহাদের কুকুর কিসের? এক পাউণ্ড বা দুই পাউণ্ড দিয়া কিনিয়াছিল বলিয়াই উহাদের কুকুর?—ইঃ! টাকাই সব? ভালবাসা কি কিছুই নয়?"

শরৎ বলিল, "তাহা হইলে তোমার মত এই যে, টাকা দিয়া প্রাণ কেনা যায় না, ভালবাসা দিয়াই কেনা যায়!"

"নহে ত কি! তাহা আমার মত—এবং যতদিনে আমি বাঁচিয়া থাকিব, ঈশ্বর করুন, ততদিন ঐ মতই যেন আমার বজায় থাকে।"

"তাই যেন থাকে। এখন বল দেখি, ঘরে কিছু খাবার-টাবার আছে?"

"কেন, আপনি কি খাইয়া আসেন নাই?"

"না।"

"My goodness"—সারাদিন উপবাস করিয়া আছেন?—আচ্ছা আমি খাবার আনিতেছি।"—বলিয়া মিসেস জোন্স নামিয়া রান্নাঘরে গেল।

খানিক পরে ঠাণ্ডা মাংস, আচাব (pickles) এবং রুটি মাখন ও পনির আনিয়া দিল।

শরৎ টেবিলে, টোবি মেঝের উপব—এক সঙ্গেই আহারে প্রবৃত্ত হইল। খাইতে খাইতে, মিসেস কলিন্সের বাটী যাওযা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই শরৎ ল্যাণ্ডলেডিকে বলিল।

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "তা, আপনি ও কথা শুনিযা এত চিন্তিত হইয়াছিলেন কেন? টোবি চেন ছিঁড়িয়া পলাইযা আসিয়াছে, উহাব গলায় চেনও আছে কলারও আছে। যে কুকুর মারা গিয়াছে তাহার গলায় কলার ছিল না শুনিয়াই ত আপনাব বোঝা উচিত ছিল, সে অন্য কাহারও কুকুর। সাদা কালো কুকুব কি লণ্ডনে এই একটিমাত্র বাস কবে মহাশয়?"

শরৎ বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, মিসেস জোন্স! ওটা আমাব এতক্ষণ খেযালই হয নাই।"

সেদিন অবধি শরৎ টোবিকে আব রিজেন্টস্ পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায় নাই। হাইড পার্কে গিয়াছে, কেন্‌সিংটন পার্কে, কিউ বাগানে কুকুরকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে—কিন্তু রিজেন্টস্ পার্কের মাটি আর মাড়ায় নাই।

[মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৩]

অদ্বৈতবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

খুব সমারোহের সহিত দর্জ্জিহাটার মাখন সুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। স্ট্র্যান্ড রোডের পশ্চিমধারে "সুর এণ্ড কোং" সাইনবোর্ড লেখা সেই প্রসিদ্ধ কাঠের আড়তখানি এই মাখন সুরের সম্পত্তি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া সুর মহাশয় অল্প মূলধনে সামান্য ভাবে এই আড়তখানির পত্তন করেন। কমলা সদয়নেত্রে চাহিলেন—বৎসরের পর বৎসর মাখন ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আরম্ভে, মাসিক ১২ টাকা ভাড়ার একখানি 'খোলার বাড়ি' লইয়া তিনি সপরিবারে বাস করিতেন;—এখন দর্জ্জিহাটা স্ট্রিটে তাঁহার প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা।

সুর মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের নাম অদ্বৈতচরণ ও নিতাইচরণ। জ্যেষ্ঠ অদ্বৈতচরণের বয়স এখন একত্রিশ বৎসর। রঙটি তাহার মিশমিশে কালো, দাড়ি গোঁফ কামানো, চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, তবে দাঁতগুলি বেশ বড় বড় বটে। অদ্বৈত ভারি চালাক চতুর, ব্যবসায়-বুদ্ধিটা খুব; লোকে বলে, বাপের ব্যবসা যদি রাখিতে পারে তবে অদ্বৈতই পারিবে—নিতাইটা কোন কর্ম্মের নয়। অথচ নিতাই লেখাপড়া জানে, কলেজে পড়িতেছে; অদ্বৈত ইংরাজির এ-বি-ও জানে না। বাঙ্গলা লেখাপড়া—অর্থাৎ শিশুবোধক, ধারাপাত, শুভঙ্করী—এই শিখিতে শিখিতেই অদ্বৈত অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রকে তখন উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পিতা তাহার বিবাহ দিলেন এবং দোকানে কাজ শিখাইতে লাগিলেন। নিতাই তখন সাত বছরের ছেলে। কি ভাবিয়া বলা যায় না, তাহাকে সুর মহাশয় ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দোকানের খরিদ্দারগণ মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্রাদি লিখিত। সে সকল পত্র অন্য কাহারও কাছে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইত, জবাব লিখিবার জন্য ইহার উহার তাহার খোসামোদ করিতে হইত; তাই রাগ করিয়া বোধ হয় সুর মহাশয় নিতাইকে ইংরাজি পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহার বয়স এখন কুড়ি বৎসর। বি-এ পড়িতেছে—কিন্তু হইলে কি হয়, ব্যবসায়-বুদ্ধি তাহার কিছুই নাই। নিতাই নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। তাহার রঙটি দাদার মত অত কালো নহে; চোখ দুটি বড় বড়, কিন্তু দেহটি কিঞ্চিৎ কৃশ। তিন বৎসর হইল তাহারও বিবাহ হইয়াছে—এখনও সন্তানাদি হয় নাই। অদ্বৈতচরণের দুইটি ছেলে, তিনটি মেয়ে।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেল। গ্রাম হইতে এই উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার ও বায়োস্কোপ দেখা শেষ করিয়া একে একে বাড়ি ফিরিল। অদ্বৈত, নিতাইকে নিভৃতে পাইয়া বলিল, "এতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, আমরা দুই ভাই পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম। কোন ভাবনা ছিল না, চিন্তা ছিল না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেয়েছি। এখন তাঁর স্বর্গবাস হল। এখন কারবারটি সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি?"

নিতাই তাহার চশমাবদ্ধ চক্ষু দুইটি দাদার পানে তুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল, "এ বিষয়ে তুমি কিছু ভেবেছ?"

নিতাই পূর্ব্ববৎ কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

"কারবারটি সম্বন্ধে কি রকম বন্দোবস্ত করা যাবে, এইবার একটা ঠিক করতে হয় ত। পৈতৃক সম্পত্তি—আমরা দু ভাই—আমার আট আনা, তোমার আট আনা!"

নিতাই এবার চক্ষু নত করিল। বলিল, "ওঃ!"

অদ্বৈত বলিল, "দোকান আমার একার নয়, —তোমার আমার দুজনেরই। কি ভাবে দোকান চালান হবে, সেইটে একটা ঠিক কর।"

নিতাই বলিল, "আমি ত ও সব বিষয় কিছু জানিনে দাদা। আপনি যা ভাল বোঝেন—"

অদ্বৈত তাহার নেড়া মাথার পশ্চাদ্ভাগে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দোকানটি, ধর, যেমন চলছিল সেইভাবেই চলবে ত? আর না হয়, তুমি যদি আলাদা হয়ে কারবার চালাতে চাও—তাও হতে পারে। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোককে ডেকে বাড়িখানা, আর দোকানে যা আছে, দুজনকে তাঁরা ভাগ-বাটরা করে দিতে পারেন। ভবিষ্যতে কোন রকম গোলমাল না হয়, এই আর কি।"

নিতাই বলিল, "দাদা, ও কথা আমায় কেন বলছেন? আপনি ত জানেন, বিষয়বুদ্ধি আমার কম!—আমি ও সব কিছু জানিও না, বুঝিও না। ও সব সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।"

অদ্বৈত কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে বলিল, "তা বেশ। যেমন আমরা আছি, সেই রকমই থাকি। ভেন্ন হওয়া ত ভাল নয়, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুই হিসাবেই খারাপ। তবে বুঝলে কিনা ভাই, একে কলিকাল, তার উপর তুমি ইংরাজি পড়েছ। গোড়া বেঁধে কাজ করা ভাল। আমার উপরেই তুমি যখন ভার দিচ্ছ, আমার যা মৎলব তা তোমায় বলি শোন।"

নিতাই নিরুপায়ভাবে দাদার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাবটা যেন, "এই সব বাজে কথা আমায় না শুনাইয়া যখন ছাড়িবেই না, তখন বল, শুনিতেই হইবে।"

অদ্বৈত বলিল, "আমি বলি, যে, ব্যবসা যেমন চলছে তেমনি চলুক। বাবা যেমন গদীর কাজকর্ম্ম সব নিজে দেখতেন, আমাকেও সেইরকম দেখতে হবে। আমার খাটুনি খুব বাড়বে—তা আর কি করবো?—তারপর দোকানের খরচ আর ন্যায্য সংসার খরচ বাদে যেটা মুনাফা হবে, সেইটে আধাআধি বখরা করে, আমার হিস্যা আমার নামে তোমার হিস্যা তোমার নামে খাতায় জমা করা থাকবে। কি বল?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া পলায়ন চেষ্টায় নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল। অদ্বৈত বলিল, "বস বস। আরও কথা আছে, শোন।"—নিতাই নিতান্ত নিরুপায়ভাবে আবার বসিয়া পড়িল।

অদ্বৈত বলিল, "মুনাফার টাকা, ধর, তোমার হিস্যা আমার হিস্যা খাতায় জমা হল। তারপর সে টাকাটা"—বলিয়া অদ্বৈত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, টাকাটার গতি কি হবে, তাহাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল, "সে টাকাটার সমস্তই কি আমরা তুলে নেব? না—তার কিছু অংশ ব্যবসাতেই আবার ফেলব? তোমার মত কি?

"যেটা ভাল হয়—"

"আমার মত কিছু টাকা, শতকরা পঞ্চাশ টাকা অন্ততঃ বছর কতক এখন ব্যবসাতেই ফেলা যাক। বাবা যখন আরম্ভ করেছিলেন, তখন ক'খানাই বা দোকান ছিল!—এখন দেখ, গঙ্গার ধারটা কাঠের আড়তে আড়তে ছেয়ে গেছে। কারবারটা একটু ফলাও না করলে শেষে আমরা দাঁড়াতেই পাব না—মালপত্তর কিছু বেশি রাখা দরকার।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া নিতাই উঠিল। ধীরে ধীরে দাদার ঘর হইতে বাহির হইয়া, বাকী পথ দ্রুতপদে অতিক্রম করিয়া তেতলায় সে নিজের পড়িবার ঘরে উপনীত হইল। দ্বার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া, জানালার কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে লাগিল। একে ব্যবসার প্রসঙ্গ, তাও আবার শুষ্কং কাষ্ঠং! বখরা আর হিস্যা আর মুনাফা!—দাদার যেমন কাণ্ড!—নিতাইয়ের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল আর কি!

খোলা জানালা দিয়া রবিকরোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, নিতাই ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। তাহার পর উঠিয়া, টেবিলের উপর হইতে একখানি বই আনিয়া মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিল—

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাই নিজের পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত রহিল, অদ্বৈত দোকানের উন্নতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

প্রথমে অদ্বৈত দোকানের গদিকে "অফিসে" পরিণত করিল। দুইখানা ভাঙ্গা নড়বড়ে অনুচ্চ চৌকি যোড়া দিয়া তাহার উপর ছিন্ন মলিন মাদুর বিছাইয়া কর্ম্মচারীরা বসিয়া খাতাপত্র লিখিত, অদ্বৈত সেখানে টেবিল চেয়ারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। দোকানে ঘড়ি ছিল না, রাধাবাজার হইতে ২১।।০ মূল্যে অদ্বৈত এক দেওয়ালঘড়ি কিনিয়া আনিল। ঘরে তৈয়ারি বাঙলা কালীর পরিবর্ত্তে ইংরাজি কালি, খাগড়ার কলমের পরিবর্ত্তে ইস্টিল পেন, এবং কালী শুকাইবার জন্য নেকড়ার পুঁটুলির পরিবর্ত্তে ব্লটিং কাগজ আমদানী হইল।—তাগাদা প্রভৃতি কার্য্যে নানাস্থানে যাইতে হয, সবস্থানে ট্রামেরও সুবিধা নাই, সময় নষ্ট হয়, তাই অদ্বৈত একদিন কুকের বাড়ির নিলামে ১৫০ টাকা দিয়া একখানা ভাঙ্গা আফিস গাড়ি খরিদ করিয়া ফেলিল। সেটা সারাইয়া রঙ করাইয়া চাকায় রবার বসাইতে আরও ৩৫০ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। ঘোড়াও কেনা হইল।—মাখন সুর কিন্তু চিরটা কাল হাঁটিয়াই কলিকাতা শহর দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছে—পাঁচটা পয়সা খরচ হইবে বলিয়া সহজে ট্রামে উঠিত না।

দোকানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত আত্মোন্নতি কার্য্যেও অবহেলা করে নাই। পৈতৃক আমলে ৪২ ইঞ্চি বহরের লাট্টুমার্কা ধুতি এবং চাঁদনির পিরাণ, তাহার অঙ্গাবরণ ছিল। সে সকল ব্যবস্থা বদলাইয়া গেল। শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গায় ধুতি, ভাল ভাল কামিজ, কোট, উত্তম উড়নি, জোড়া জোড়া বিলাতি জুতা—সর্ব্বদাই খরিদ হইতে লাগিল। কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া আরও দুই একটা বিষয়ে অদ্বৈত দ্রুত উন্নতিলাভ করিল—তাহা আর প্রকাশ করিব না—তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সঙ্গীত-কলার সহিত তাহার যোগ আছে।

পিতার আমলে এক আধ দিন মাঝে মাঝে নিতাই দোকানে গিয়া বসিত, এখন তাহাও করে না। সর্ব্বদাই নিজের পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অদ্বৈত মাসে মাসে নিয়মিতভাবে হাতখরচের জন্য ত্রিশটি করিয়া টাকা আনিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার কলেজের বেতন বস্ত্রাদি ও বহি কেনার ব্যয় সংকুলান হইয়া যায়। তবে তাহার স্ত্রী গোলাপকামিনী মাঝে মাঝে তাহাকে 'ইহা চাই, উহা চাই' বলিয়া বিরক্ত করে। ঐ ত্রিশ টাকার মধ্যেই যতদূর হয় গোলাপকামিনীর কামনাও সে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। অক্ষম হইলে, দিনকয়েক অন্তঃপুরে না গিয়া বহির্ব্বাটিতেই শয়ন করিয়া থাকে।—মাসের পর মাস কাটিল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। নিতাই বি-এ এবং ক্রমে এম-এ পাশ করিল।

ইতিমধ্যে নিতাইয়ের দুইটি সন্তান হইয়াছে। ছেলেদের দুধ প্রভৃতি সংসার হইতেই সরবরাহ হয়, কিন্তু তাহাদের পোষাকী কাপড় জুতা প্রভৃতি দ্রব্য নিতাইকেই কিনিতে হয়—অথচ ঐ ৩০ টাকা মাত্র সম্বল। তাই সে এখন আর ইচ্ছামত পুস্তকাদি কিনিতে পারে না—প্রায়ই ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরিতে গিয়া, সারাদিন বসিয়া পড়ে।

আষাঢ় মাস। বিকালের দিকে আকাশে খুব মেঘ করিযা উঠিল। ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরীর পাঠাগারে বসিয়া যাহারা পড়িতেছিল, তাহারা বই গুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া গেল। তাহাদের দেখাদেখি নিতাইও উঠিল; যে বহিখানি পড়িতেছিল, তাহার জন্য রসিদ লিখিয়া দিয়া বহিখানি হাতে করিয়া নিতাই বাহির হইল। লাইব্রেরিতে তাহার টাকা জমা ছিল।

বাহিরে আসিয়া নিতাই দেখিল, পশ্চিম দিকটা একেবারে কালো চিক্কন মেঘে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতেছে। মোড়ে একখানা গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, ভাবিল গাড়ি করি। তখন মনে হইল, তহবিলে তাহার টাকা নাই, ভাড়া দিবে কোথা

হইতে? সুতরাং ফুটপাথ ধরিয়া পদব্রজেই সে গৃহাভিমুখে চলিল। প্রত্যহই সে পদব্রজে আসিত, পদব্রজেই যাইত;—ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নহে,—এই যাতায়াতই সারাদিন-রাত্রির মধ্যে তাহার একমাত্র ব্যায়াম—এটুকু না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। ক্যানিং স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ঝড় আরম্ভ হইল। কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকায় রাস্তায় খুব ধূলা জমিয়াছিল, সেই ধূলা উড়িয়া চারিদিক একেবারে অন্ধকার হইয়া উঠিল। নিতাই সাবধানে পথ চলিতে লাগিল।

এইরূপে কষ্টে ক্রমে হ্যারিসন রোডের মোড় অবধি পৌঁছিলে, প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিতাইয়ের ছাতা ছিল না, ছাতা থাকিলেও সেই ঝড়ে কোনও ফল হইত না। বহিখানি ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়, এই চিন্তাতেই নিতাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি কোটটি খুলিয়া, তাহারই মধ্যে বহিখানি বেশ করিয়া জড়াইল। তাহার উপর চাদরখানি জড়াইল। পুঁটুলিটি বগলে করিয়া ভিজিতে ভিজিতে নিতাই পথ চলিতে লাগিল।

সে যখন গৃহে পৌঁছিল, তখন ঝড়ের বেগ কতকটা কম, কিন্তু বৃষ্টি সমানেই পড়িতেছে। দ্বিতলে একেবারে নিজের শয়নঘরে গিয়া পৌঁছিল।

গোলাপকামিনী মেঝের উপর বসিয়া পান সাজিতেছিল, স্বামীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল, "ও আমার পোড়া কপাল!—এ কি কাণ্ড!"

"ভিজে গেছি"—বলিয়াই নিতাই বইখানির বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিতে লাগিল।

গোলাপ বলিল, "ছাতা নিয়ে যাওনি?"

"না। ছাতা ত আমার নেই।"

"কেন, ছাতা কি হল?"

"হারিয়ে গেছে।—আর, যে ঝড়, ছাতা থাকলেই বা কি হত? এ বৃষ্টি কি ছাতা আটকায়?"

"যেখানে রোজ পড়তে যাও, সেইখান থেকেই আসছ ত?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে ঠিকেগাড়ি পাওয়া যায় না? এই দুর্যোগে, একখানা গাড়ি ভাড়া করে আসতে হয় না? একটা কি দেড়টা টাকাই না হয় লাগত!"—নিতাই ভিজা বইখানির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "টাকা ত আর নেই। এ মাসের টাকা ত সব খরচ হয়ে গেছে। একখানা শুকনো কাপড় বের করে দাও পরি, বড্ড শীত করছে।"

গোলাপকামিনী তখন ঘরে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া, আলনা হইতে একখানা তোয়ালে লইয়া স্বামীর দেহ মুছাইয়া দিতে লাগিল। মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "নিজের বুদ্ধির দোষে কষ্ট পাও। যার বাপের এত টাকা, তার একটি টাকা জোটে না বৃষ্টির দিনে গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি আসতে? তোমার দাদা যে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এত নবাবী করছেন, সে কার টাকায়? বাপের টাকায় নয়? আর তোমার বরাদ্দ মাসে ত্রিশটি করে টাকা? কেন তুমি নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নাও না? ব্যবসাতে যা লাভ হয়, অর্দ্ধেক ত তোমার। এই পাঁচ বচ্ছর, তোমার হিস্যের টাকা সব গেল কোথা শুনি? তুমি ত নিজেই গাড়ি ঘোড়া কিনতে পার। তুমি মাসে মাসে ত্রিশটি করে টাকা নেবে কেন? কেন তুমি নেবে? কেন তুমি দাদাকে বল না মাসে মাসে আমায় একশো কি দুশো টাকা দাও—এ পাঁচ বছরে আমার ভাগে টাকা যা জমেছে—আমায় মিটিয়ে দাও। লোকের পরিবার কত ভাল ভাল গয়না পরে, কাপড় পরে—আমাকে তুমি কি দিয়েছ? তোমার নিজের কাপড়-চোপড়ের কি দুর্দ্দশা দেখ দেখি! তোমার নিজের এক ছটাক বুদ্ধি নেই, তুমি বুঝবে না, আমার কথাও শুনবে না। তোমার ব্যাপার দেখে দেখে আমি যে আর সহ্য করতে পারিনে—আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।"—বলিতে বলিতে গোলাপকামিনী কাঁদিয়া ফেলিল।—শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, একটি ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দিয়া, নিতাই

আরাম বোধ করিল। গোলাপ তাহাকে জলখাবার আনিয়া দিল; খাইয়া পাঠগৃহে পলায়ন করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু গোলাপ তাহাকে জোর করিয়া বসাইল।

একঘণ্টা কাল স্ত্রীর অনেক অনেক উপদেশ অনুনয় বিনয় শ্রবণ করিয়া নিতাই প্রতিশ্রুত হইল, কল্য প্রভাতেই দাদাকে গিয়া সে বলিবে যে এখন হইতে হাত খরচের জন্য মাসিক একশত টাকা করিয়া তাহার প্রয়োজন; এবং গত পাঁচ বৎসরে তাহার ভাগে যে টাকাটা জমিয়াছে তাহাও দাদার কাছে চাহিয়া লইয়া, গোলাপের নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে নিতাই তাহার পাঠের ঘরে বসিয়া বিষণ্ণ মুখে ভাবিতেছে, ওসব কথা দাদাকে গিয়া কি করিয়াই বা বলা যায়!—অথচ না বলিলেও উপায় নাই। গোলাপ বলিয়াছে সাত দিন সে অপেক্ষা করিবে, দেখিবে তাহার পরামর্শ মত কার্য্য হয় কি না; হয় উত্তম,—না হয়, ছেলেপিলে লইয়া সে বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে—এত কষ্ট সহ্য করা তাহার পোষাইবে না!

কিন্তু নিতাইকে আর দাদার খোঁজে যাইতে হইল না,—অদ্বৈত নিজেই আসিয়া নিতাইয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

অদ্বৈত বলিল, "নিতাই, বিশেষ ব্যস্ত আছ কি?"

"আজ্ঞে না।"

"ভারি বিপদে পড়েছি নিতাই।"

নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কেন দাদা, কি হয়েছে?"

অদ্বৈত একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ব্যবসাটি ত আর রাখা যায় না। কাঠের বাজার এমন মন্দা পড়েছে যে সে আর কহতব্য নয়। ক'বছর ত ক্রমাগত লোকসানই দিচ্ছি। দেনায় দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাবার যো হয়েছে।"

নিতাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দাদার পানে চাহিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল—দাদার কাছে টাকা চাহিবার এই উপযুক্ত অবসর বটে!

অদ্বৈত বলিল, "মাড়োয়ারীর কাছে হুণ্ডিতে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম—সুদে আসলে সাত হাজার দাঁড়িয়েছে। শোধ করতে পারিনি—বেটা নালিশ করে দিয়েছে। ডিক্রি হলেই দোকানখানি ক্রোক করবে—নীলেমে চড়াবে—বাজারে ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে—সর্ব্বনাশ হবে। তাই ভাই তোমাকে না জিজ্ঞাসা করেই, বাড়িখানি বন্ধক রেখে দশ হাজার টাকা এক জায়গায় ধার নেবার বন্দোবস্ত করেছি। আপাততঃ ঐ টাকাগুলো ফেলে দিয়ে মান ইজ্জৎ ত বজায় রাখি,—পরে ক্রমে ক্রমে টাকা শোধ করে বাড়িখানি উদ্ধার করে নিলেই হবে। এ বিষয়ে তুমি কি বল?"

অদ্বৈতের চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বড় দুঃখ হইল। সে বলিল, "তা, যা ভাল বোঝেন তাই করুন দাদা; আমি আর কি বলব?"

"তাহলে তোমার অমত নেই? বাঁচালে ভাই। আমি জানি তুমি সে রকম নও, তাই সাহস করে তোমায় না জিজ্ঞাসা করেই বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। মাড়োয়ারীর সাত হাজার—আর খুচরো-খানি হাজার তিনেক টাকা দেনা আছে—সেগুলো সব ঐ টাকা থেকে শোধ করে, নিশ্চিন্ত হতে পারি। তুমি কি আজ লাইব্রেরিতে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি বারোটার সময় যাও ত? আজ একটু সকাল সক্যাল খেয়ে নিও। এগারোটার সময় আমার সঙ্গে গাড়িতেই বেরিও। এটর্নি আফিসে গিয়ে বন্ধকী দলিলখানাতে সই

করে, অমনি সেই গাড়িতেই রেজিস্ট্রী আফিসে গিয়ে দলিলখানা রেজিস্ট্রী করাতে হবে। বোধ হয় একটা দেড়টার মধ্যেই সব কাজ হয়ে যাবে। আমি বরং লাইব্রেরিতে নামিয়ে দিয়ে আসব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ি বন্ধক দিয়া টাকা ধার করার পর নিতাই একদিন দাদাকে বলিল যে মাসে ত্রিশ টাকায় তাহার সঙ্কুলান হয় না, বড় টানাটানি হয়।—অদ্বৈত বলিল, "সে তুমি কি বলবে ভাই, আমি কি দেখতে পাচ্ছিনে? এখন ঈশ্বর ইচ্ছেয় তোমাব ছেলেপিলে হয়েছে—খরচ বেড়েছে--সবই বুঝি। এক সময় মনে করেছিলাম, ছেলেপিলে হলে তোমার হাতখবচেব টাকা মাসে ১০০ টাকা করে দেব। কিন্তু ভগবান যে বাদ সাধলেন! কারবারের যা অবস্থা, খরচ বাড়াব কি, খরচ কমাবার চেষ্টাতেই মুখে রক্ত উঠে মরি। তা এক কাজ কর, এ মাস থেকে তুমি মাসে ৫০ টাকা করে নিও। ভগবান যদি আবার দিন দেন, তখন—"

পঞ্চাশ টাকার কথা শুনিয়া গোলাপকামিনী প্রথমে মাথানাড়া দিয়াছিল—কিন্তু নিতাই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে কারবারের যেরূপ অবস্থা, টাকার যেরূপ টানাটানি—তাহাতে ইহাই এখন যথেষ্ট।—গোলাপ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কারবারেব ভারি খোঁজ তুমি রাখ কিনা!"

নিতাই বলিল, "কারবারের অবস্থা যদি ভাল হবে, তবে দাদা ও কথা বলবেন কেন?"

গোলাপ ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল, "দাদা বলেছেন, তাই একেবারে বেদবাক্যি!—গা জ্বালা করে কথা শুনলে!"

আরও এক বৎসর কাটিল।

ভাদ্র মাস। অনেকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গুমট কবিয়াছে। রাত্রে গোলাপ শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল, তাহাব নিদ্রা আসিতেছিল না। নিতাই নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, রাত্রি বারোটার সময় সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। শয়নকক্ষে গিয়া স্ত্রীকে জাগরিত দেখিযা বলিল, "তুমিও যে জেগে রয়েছ দেখছি। আমি ভেবেছিলাম, এত রাত্রি হয়েছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়িতে গিয়ে হয়ত কত ডাকাডাকি করতে হবে।"

গোলাপ বলিল, "যে গরম, ঘুম হচ্ছে না। তোমায় কে দরজা খুলে দিলে?"

"আমি কড়া নাড়তেই, দাদা নিজে গিয়ে খুলে দিলেন। দেখলাম, নিচের ঘরে বাতি জ্বলছে, দোকানের দুজন মুহুরী রয়েছে, কি সব হিসেবপত্র লেখা হচ্ছে।—দাদাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, কাজের ভিড়ে দিনের বেলা খাতা লেখার সুবিধে হয় না, তারপর পূজো এসে পড়ল, পূজোব দেনা-পাওনাব হিসেবপত্র তৈরি হচ্ছে।"

স্বামীর আগমনে গোলাপ শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল। মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'ইঃ—পূজোর হিসেব তৈরি হচ্ছে!"

নিতাই শয্যাপ্রান্তে বসিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, কি হচ্ছে তবে?"

"হচ্ছে একটা মজা।"

"কি? কি?"

"ক'দিন থেকেই ত রাত্রে ঐ নিচের ঘরে খিল বন্ধ কবে 'পূজার হিসেব' তৈরি হচ্ছে। ও—রে আমার পূজোর-হিসেব-করুণী রে!"

নিতাই বিস্মিত হইয়া বলিল, "পূজোর হিসেব নয়। তবে কি হচ্ছে তুমি জান?"

"জানি।"

"কি?"

"খুব সাবধান। কাউকে যদি না বল তা হলে বলি তোমায়।"

"আচ্ছা, কাউকে আমি বলব না।"

গোলাপ চুপি চুপি বলিল, "খাতা বদলানো হচ্ছে!"

"বদলানো হচ্ছে কেন?"—গোলাপ চক্ষু ঘুরাইয়া নাক ফুলাইয়া বলিল, "আজ্ঞলী! খাতা বদলানো হয় কেন? কোনও একটা মোকদ্দমা-টোকদ্দমা হবে, তার জন্যে আর কি। এইটুকু বুদ্ধিতে আসে না, এম-এ পাস করেছিলে কেন?"

নিতাই বিছানা হইতে নামিয়া কৌটা আনিয়া দিল। গোলাপ একটু দোক্তা লইয়া মুখে দিয়া বলিল, "আমি জানলাম কি করে শুনবে? পরশু বুঝেছ, অনেক রাত্রে উঠে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। দেখলাম নীচে ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে আলো বেরুচ্ছে, মানুষ কথা কইছে। 'এ সময় ওখানে কে কি করে?'—এই ভেবে পা টিপে টিপে পা টিপে টিপে চোরটির মতন নিচে নেমে গেলাম। আস্তে আস্তে জানালাটির কাছে গিয়ে ফুটো দিয়ে দেখলাম, বট্‌ঠাকুর বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন, মুহুরী দুজন খাতা লিখছে। কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম, আড়তে যে সব মাল নেই, কোন কালে ছিল না, সে সব মাল মজুত আছে বলে লেখা হচ্ছে। বট্‌ঠাকুর বললেন—দেখ দেখি বর্ম্মার সেগুন কত টাকার হল? একজন বললে—ঠিক দিয়ে আট হাজার টাকার হয় কি না সন্দেহ। বট্‌ঠাকুর বললেন—হাজারই যখন করলে তখন একটুর জন্যে আর কেন? দশ হাজারই দাঁড় করাও।"

নিতাই শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, মনে কেবলই ভাবিতে লাগিল, "এ সব যে জাল জুচ্চুরী ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে! দাদার মৎলবটা কি?"

পরদিন প্রাতে দাদাকে নিতাই বলিল, "দাদা, এ মাসের টাকাটা আজ আমায় পাঠিয়ে দেন ত ভাল হয়। হকারের দোকানে একসেট ভাল এডিশন গিবন্স হিস্ট্রি আছে, ২৫ টাকা চেয়েছে, সেইটে আজ কিনে আনব।"

অদ্বৈত বলিল, "আচ্ছা, টাকাটা পাঠিযে দেব এখন।"

সারাদিন নিতাই টাকার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু টাকা আসিল না। হকার বলিয়াছিল, আজ সারাদিন বইগুলি সে রাখিবে, অন্য কাহাকেও সে বিক্রয় করিবে না। আজ যদি নিতাই সেগুলি না কিনিযা লয়, কল্য যে খরিদ্দার সে পাইবে তাহাকেই বেচিয়া ফেলিবে।

সন্ধ্যার পর নিতাই ভাবিল, যাই আড়তে গিয়া টাকা লইয়া আসি, কাল তখন প্রাতে উঠিয়া হকাবের দোকানে গিয়া বহিগুলি কিনিয়া ফেলিব; আজ রাত্রে বাড়ি আসিবার সময় দাদা যদি টাকা আনিতে ভুলিয়া যান তবে কল্য বেলা ১টার পূর্ব্বে আর টাকা পাওয়া যাইবে না, বহিগুলি হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

গোলাপ বলিল, "এমন সময় বেরুচ্ছ কোথা?"

নিতাই বলিল, "আড়তে যাচ্ছি, টাকা আনতে।"

"কখন ফিরবে?"

"আধ ঘণ্টার মধ্যেই।"

"ওগো, বেরুচ্ছ যখন, একটা কাজ করবে?" "কি?"

"চার আনা পয়সা নিয়ে যাও, দুছড়া বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে এস"—বলিয়া গোলাপ স্বামীর হাতে একটি সিকি দিল।

কুনুয়ের নিকট ছেঁড়া কোটটি গায়ে দিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ছড়ি হস্তে ঠক্ ঠক্ রিতে করিতে নিতাই আড়তের দিকে অগ্রসর হইল। স্ট্র্যাণ্ডের মোড়ে গ্যাস পোস্টের নিকট দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি একগোছা বেলফুলের মালা বেচিতেছিল, তাহার নিকট যাইতে ফুলের সৌরভ পাইয়া নিতাই ভাবিল, ফিরিবার সময় দুই গাছি এই মালা গোলাপের জন্য সে কিনিয়া লইয়া যাইবে।—আড়তে পৌঁছিয়া নিতাই দেখিল, চাকরবাকর সকলে চলিয়া গিয়াছে, কেবল আফিস ঘরে টিম্ টিম্ করিয়া একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, আর

তাহার দাদা গালে হাত দিয়া টেবিলের নিকট একাকী বসিয়া আছেন।—নিতাই ডাকিল, "দাদা।"

স্বর শুনিয়া অদ্বৈত হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "কে, নিতাই? এত রাত্রে কি কারণে?"—নিতাই বলিল, "দাদা, সেই টাকাগুলো তা আজ—"

অদ্বৈত বলিল, "আচ্ছা, সে আমি যাবার সময় নিয়ে যাব এখন।"

নিতাই বলিল, "যদি ভুল হয়ে যায়, তা হলে কিন্তু—"

অদ্বৈত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ—ভুল হবে কেন? টাকা আজ রাত্রেই পাবে—পাবে। এখন বাড়ি যাও।"—দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিতাই একটু আশ্চর্য্য হইল। "আচ্ছা তা হলে যাই।"—বলিয়া আফিস ঘর হইতে সে বাহির হইল।

অদ্বৈত ডাকিয়া বলিল, "ওহে শোন। একটা কথা শোন।"

নিতাই পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

"বাড়ি গিয়ে, আমার জন্যে এক কলসী জল গরম করতে বোলো ত। গিয়েই আমি চান করব।"—নিতাই বলিল, "এত রাত্রে স্নান করবেন!"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—চান করব।"

"আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

"বেশ আছে—বেশ আছে—চট্ করে বাড়ি যাও।"

এই সময় দোকানের একজন কর্ম্মচারী খালি গায়ে একটা কেরোসিনের টিন হাতে করিয়া আফিস ঘরে প্রবেশ করিল। নিতাইকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া সে ব্যক্তি বলিল, "কে, ছোটবাবু?"—নিতাই বলিল, "এত রাত্রে তেল কিনতে গিয়েছিলে নাকি?"

সে বলিল, "আজ্ঞে না। কতকগুলো কাঠে উই লেগেছিল, তাই সেগুলোতে খানিক কেরোসিন ছড়িয়ে দিয়ে এলাম।"—বলিয়া সে ব্যক্তি অদ্বৈতবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল, "নিতাই তুমি যাও চট্ করে, দেরী কোরো না।"

নিতাই বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। গোলাপ বলিল, "আমার মালা কই?"

নিতাই বলিল, "ঐ যাঃ—ভুলে গেছি।"

আহারাদি করিয়া নিতাই তাহার বন্ধু হৃদয় মল্লিকের বাটিতে গেল; সেখান হইতে উভয়ে বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে।

অনেক রাত্রে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বাড়ির সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছুটিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া সকলে শুনিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আড়তে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিতাই তখনও ফিরে নাই।

খালি গায়ে, খালি পায়ে অদ্বৈত আড়তের দিকে ছুটিল। রাত্রি তখন দুইটা। বাড়ির অনেকেই কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। স্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌঁছিয়া আড়তের দিকে চাহিয়া সকলে দেখিল, অগ্নিদেব শত শত লোলরসনা বিস্তার করিয়া, ভৈরব হুঙ্কারে নৃত্য করিতেছেন।

রাস্তায় অসম্ভব ভিড় ঠেলিয়া অদ্বৈত আড়তের সম্মুখে পৌঁছিয়া পাগলের মত আগুনের পানে চাহিতে লাগিল। বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিল, "হায় হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!—কি সর্ব্বনাশ হযে গেল—হায় হায হায়।"

শুধু সুর কোম্পানির আড়তই যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়;—আশে পাশের আরও দুই তিনখানি আড়তের অনেক কাঠ পুড়িয়া গিয়াছে। "সুর কোম্পানি"র পঞ্চাশ হাজার টাকার আগুন-বীমা করা আছে।

অগ্নিদাহের দুই দিন পরে, রাত্রে গোলাপকামিনী নিতাইকে বলিল, "ওগো, একটা ভারি মজার কথা শুনলাম।"

নিতাই বলিল, "কি?"

গোলাপ টিপি টিপি হাসিয়া বলিল, "আমাদের আড়তে কি করে আগুন ধরেছিল জান?"

"কি করে?"

গোলাপ কাছে সরিয়া আসিয়া, স্বামীর কানে কানে বলিল, "খুব সাবধান, কারুকে বোলো না। রাত্রে আড়তে গিয়ে, বট্‌ঠাকুর নিজে আগুন দিয়ে এসেছিলেন।"

নিতাই বলিল, "কে বললে তোমায়?"

গোলাপ বলিল, "সেদিন তুমি আড়ত থেকে ফিরে এসে বট্‌ঠাকুরের জন্যে এক কলসী জল গরম করতে বললে না? রাত্রি ন'টার সময় তুমি খেয়েদেয়ে চলে গেলে বায়স্কোপ দেখতে। বট্‌ঠাকুর যখন বাড়ি এলেন, তখন রাত দশটা। দিদি আমার কাছ থেকে সাবান চেয়ে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'তোমার ভাসুর মেখে চান করবেন।' দিদিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'এত রাত্রে সাবান মাখবেন কেন?' দিদি বললেন,—'কি জানি ভাই, গায়ে কি রকম করে কেরোসিন তেল পড়ে গেছে, গা-ময় গন্ধ।'

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনে সে রাত্রে আড়তে দৃষ্ট ঘটনাবলীর একটা সুসঙ্গত অর্থবোধ যেন হইতে লাগিল। সে কথা স্ত্রীকে না জানাইয়া, কেবলমাত্র সে বলিল, "তার পর?"

"তারপর, কাল রাত্রে, বুঝেছ, তুমি ত ঘুমিয়ে গেলে,—ভঁাড়ার ঘরে দোক্তার কৌটোটা ফেলে এসেছিলাম, সেইটে গেলাম খুঁজতে। কৌটাটা নিয়ে যখন ফিরছি, দিদির ঘরের কাছ দিয়ে আসছি, ফিস্ ফিস্ করে কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার ঐ অভ্যেস কিনা, কেউ গোপনে কিছু বলা কওয়া করছে দেখলেই আড় না পেতে থাকতে পারিনে। জানালায় একটা ফুটো আছে, সেই ফুটোতে কানটি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দিদি বলছেন, 'বীমার টাকাটা কত দিনে পাওয়া যাবে?' বট্‌ঠাকুর বলছেন, 'তিন মাসের কম ত নয়ই।' দিদি বললেন, 'মাল কত টাকার পুড়ছে?' বট্‌ঠাকুর বললেন, 'হাজার চার পাঁচ খুব হবে। খাতায় পঁয়ষট্টি হাজার লিখে রাখা হয়েছে।

তা ধর, পঞ্চাশ হাজার পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুহুরী দুজনকেই ত দুহাজার দিতে হবে।' দিদি বললেন, 'ওদের দুহাজার কেন? ওরা ত আর তোমায় আগুন দিতে দেখেনি!' বট্‌ঠাকুর বললেন, 'আগুন দিতেই দেখেনি, খাতাও বদলেছে ওরা, কাঠে ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা কেরাসিন তেলও ঢেলেছে ওরা। ওদের দুহাজার। তারপর, বিশ বাইশ হাজার টাকা দেনা রয়েছে। সব দিয়ে থুয়ে হাজার পঁচিশেক থাকবে বোধ হয়।' দিদি বললেন, 'ঐ সব টাকারই আবার কাঠ কিনবে?' বট্‌ঠাকুর বললেন 'ওর কমে কি আর ভাল রকম আড়ত একটা হয়!' দিদি হেসে বললেন, 'বুদ্ধি করেছ ভাল।'

স্ত্রীর মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া নিতাই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল।

গোলাপ বলিল, "দেখ দিকিনি, বট্‌ঠাকুরের কেমন বুদ্ধি! এক মায়ের পেটের ভাই ত তোমরা দুজনেই, তবে তোমার এমন বুদ্ধি খেলে না কেন?"

নিতাই ঘৃণায় এ কথার কোনও উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরে অদ্বৈত একখানা কাগজ হাতে করিয়া নিতাইয়ের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই কাগজখানা পড়ে দেখ ত, এতে কি লেখা আছে আমায় সব বুঝিয়ে বল।"

নিতাই দেখিল, কাগজখানা এটর্নি বাড়ির ফরমে লেখা। অগ্নিদাহের বিবরণ দিয়া, অদ্বৈত ও নিতাই দুই ভাইয়ের তরফ হইতে বীমা কোম্পানির নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবী করা হইতেছে।

নিতাই সমস্তটা অনুবাদ করিয়া দাদাকে শুনাইল।

অদ্বৈত বলিল, "ঠিক আছে। কলমটা দাও ত।"

কলম লইয়া অদ্বৈত কাগজে নিজ নাম সহি করিয়া দিল। নিতাইকে বলিল, "তুমি সই কর।" নিতাই বলিল, "দাদা, আমি ত এ কাগজে সই করতে পারব না।"

অদ্বৈত বলিল, "কেন?"

"এতে যে সব মিথ্যে কথা লেখা রয়েছে।"

অদ্বৈতের মুখখানা হঠাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন? মিথ্যে কোন্‌খানটা? আমাদের ফার্ম আগুন লেগে পুড়ে যায়নি?"

নিতাই বলিল, "গিয়াছিল। কিন্তু আগুন দিয়েছিল কে?"

অদ্বৈত রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কে আগুন দিয়েছিল?"

নিতাই বলিল, "আপনি।"

অদ্বৈত কম্পিত স্বরে বলিল, "আ—আ—আমি?"

"আপনিই।"

"তু—তু—তুমি এমন কথা বল!"

"বলি।"

"কি করে জানলে তুমি?"

"সে দিন রাত্রি দেড়টার সময় আপনি আড়তে কেন ঢুকেছিলেন দাদা?"

"আমি!—আড়তে ঢুকেছিলাম? কে বললে তোমায়? আমি ত ঘবে শুয়েছিলাম। আগুনের খবর শুনে তখন সেখানে ছুটে গেলাম।"

নিতাই বলিল, "না দাদা, ও কথা কেন বলছেন? সেদিন রাত্রে হৃদয় মল্লিকের সঙ্গে আমি বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম। তার মোটবে তার সঙ্গে ফিরছিলাম। আড়তেব কাছাকাছি মোটর যখন এল, তখন দেখলাম, কে একজন আড়তের ফটকেব তালা খুলছে। তার পরেই মোটবের দিকে আপনি চেয়ে দেখলেন, বাতির উজ্জ্বল আলো আপনাব মুখেব উপর পড়ল। ভাবলাম, বিশেষ কোন কাজে আপনি আড়তে এসেছেন।

সে রাত্রি হৃদয় মল্লিকদের ওখানেই আমি শুয়ে রইলাম। সকালবেলা বাড়ি ফিরে সকল ব্যাপার শুনলাম।"

বামহস্তে কপাল টিপিয়া ধরিয়া অদ্বৈত এই কথাগুলি শুনিতেছিল। শেষ হইলে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হা ভগবান!"

ঘৃণায় নিতাইয়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অদ্বৈত নিতাইকে নিজ শয়নকক্ষে ডাকাইয়া পাঠাইল। নিতাই সেখানে গিয়া দাঁড়াতেই সে বলিল, "বস ভাই, অনেক কথা আছে।"

নিতাই বসিল।

অদ্বৈত বলিল, "তোমার মনের ইচ্ছেটা কি? আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়—আমরা পথের ভিখিরী হয়ে যাই—গাছতলায় বাস কবি?"

নিতাই কোন কথা বলিল না। নীরবে নত মস্তকে বসিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল, "বীমার টাকাটা যদি না পাওয়া যায়, তবে আমাদের আহার চলবে কি করে তা কিছু ভেবেছ? আড়তে ত কুটোগাছটিও নেই। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে এই কলকাতা শহরে, হা অন্ন হা অন্ন করে প্রাণ বেরিয়ে যাবে যে!"

নিতাই বলিল, "আমি একটা চাকরির চেষ্টা করছি দাদা।"

অদ্বৈত বলিল, "চাকরি? কত টাকা মাইনের চাকরি তুমি আশা কর? বি-এ, এম-এ'ব কি দুর্দ্দশা সব ত দেখছি। একশো টাকা জোটে কি না সন্দেহ। তাতে কি আমাদের সংসাব চলবে? মাসে পাঁচটি—শো টাকার এক পয়সা কমে এ সংসারটি যে চলে না ভাই!"

এমন সময় নিতাইয়ের বউদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরপোর মত হল?"—"জিজ্ঞাসা কর"—বলিয়া অদ্বৈত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বউদিদি বলিলেন, "কেন ঠাকুরপো অমত করছ? ওতে দোষটা কি হয়েছে? সইটি করে দাও, লক্ষ্মী ভাই আমার।"

নিতাই উঠিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গোলাপকামিনী একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। স্বামীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "বলি হ্যাঁগা! তোমার রকমখানা কি? তুমি সইটি করে দিলে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যায়, সংসারটি বজায় থাকে, তা করছ না কেন বল দিকিন?"

নিতাই বলিল, "ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা আমার দ্বাবা হবে না।"

গোলাপ ঝাঁঝিযা উঠিয়া বলিল, "মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিসে হল শুনি?"

নিতাই বলিল, 'প্রবঞ্চনা নয়? কি তবে?"—গোলাপ বলিল, "প্রবঞ্চনা! একে বুঝি বলে প্রবঞ্চনা! একটা সই করে দিলে বুঝি প্রবঞ্চনা হয়!—যা বলি তা শোন। নিজের ঘটে নেই তোমাব বুদ্ধি--আমাব কথাও শুনবে না! এই করে করে, চিরটা কাল কষ্ট পেয়ে এসেছ। একবার আমার কথাটা শুনে দেখ দেখি।"—নিতাই বলিল, "কি বল।"

"ওসব আহাম্মুকী ছেড়ে দাও। দাদাকে গিয়ে বল, 'দাদা, আমি সই করব—কিন্তু আপনি যে টাকাটা পাবেন, তা থেকে দশটি হাজার টাকা আমায় দিতে হবে। এইতে যদি রাজি হন্ তবে বলুন আমি সই করে দিচ্ছি।' সই করে দাও। এই একটা দাঁও—বুঝতে পাবছ না? তারপর টাকাটা নিয়ে কোম্পানির কাগজ কিনে রাখ।"

নিতাই শ্লেষের সহিত বলিল, "তোমার নামে কিনব ত?"

গোলাপ বলিল, "কেনই যদি, তাতে তোমায় কেউ দুষবে না গো—লোকে অমন করে থাকে। আমার নামেই কেন, আর তোমার নামেই কেন—সে তোমারই থাকবে। আমি কিছু সে কাগজ আঁচলে বেঁধে বাপের বাড়ি নিয়ে যাব না—অসময়ে তোমারই কাজে লাগবে।"

নিতাই বলিল, "দেখ গোলাপ, আমায় কেন মিছে ওসব কথা বলছ! আমি জেনে শুনে ওরকম অধর্ম্মের কাজ করতে পারব না।"

পরদিনও নিতাইয়ের উপর এইরূপ পীড়াপীড়ি চলিল। অদ্বৈত বলিল, "দেখ, এতে অধর্ম্ম হবে কেন মনে করছ? আমি কি কারু কোন লোকসান করছি?"

"কি মুস্কিল!—তাতে তাদের আবার লোকসান কি? ঐ জন্যেই ত তারা ব্যবসা খুলেছে। বছরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা নিচ্ছে—কখনও কখনও দশ বিশ হাজার দিচ্ছে। আমায় এই পঞ্চাশ হাজার দিলে কি তারা ফেল হয়ে যাবে?"

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

অদ্বৈত আবার বলিল, "হ্যাঁ, এমন যদি হত যে একজন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের করে নিচ্ছি—ও টাকাটা আমায় দিয়ে তার ব্যবসা মাটি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বটে অধর্ম্ম আছে—তার ক্ষতি করছি। এ কি একজনকার? এই ধর, শিবপুরে কোম্পানির বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি যদি দুটো কুল পেড়ে খাই, তাতে কি কোনও পাপ আছে? লক্ষ লক্ষ কুল হয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই-ই—যার কুলগাছ সে ত জানতেও পারবে না।

অধর্ম্ম হবে বলে তুমি কেন ভয় করছ?—বেশ করে তলিয়ে বুঝে দেখ দেখি। এতে কোনও দোষ নেই, এ ত আমাদের ন্যায্য পাওনা।"—

নিতাই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু বুঝিতে পারিল না। অবশেষে বাড়ির লোকের বিষম উৎপীড়নে, তাহার বন্ধু হৃদয় মল্লিকের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, বাড়ি ছাড়িয়া সে পলাইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একমাস পরে লাহোর হইতে দাদাকে নিতাই পত্র লিখিল—

শ্রীচরণেষু—

আমি আপনাদের না বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, এজন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এখানকার কলেজে একটি প্রফেসারি চাকরি খালি আছে শুনিয়াই আমি চলিয়া আসি। সেই চাকরিটির জন্য এতদিন উমেদারিতে ছিলাম; শুনিয়া সুখী হইবেন, আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে, কর্ম্মটি আমি পাইয়াছি। বেতন মাসিক ২০০ টাকা।

এই স্থানে সকল জিনিসই সুলভ। ঐ টাকায় অনায়াসে আমাদের সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন এখানে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমার বিবেচনায় এখন আপনার কলিকাতায় থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যবসায়টিই যখন গেল, কি অবলম্বন করিয়া সেখান থাকিবেন? অতএব যত শীঘ্র হয় আপনি সপরিবারে এখানে চলিয়া আসিলেই ভাল হয়। বাড়িখানি উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আপাততঃ আমাদের নাই—তবে ঋণের সুদ মাসে মাসে আমি মাহিনার টাকা হইতে দিব। যদি ভগবান আবার কখনও সুদিন দেন, তখন বাড়িখানি উদ্ধার করা যাইবে।

এখানে বাড়ীভাড়া সস্তা। মাসিক, ত্রিশ চল্লিশ টাকা ভাড়ায়, আমাদেব সকলেব সঙ্কুলান হইতে পারে এমন একখানি বাড়ি পাওয়া যাইতে পারে। আপনার অনুমতি পাইলেই বাড়ি ঠিক করিব।—যদি রাহাখরচ প্রভৃতির টাকা আপনার হাতে না থাকে, তবে জানাইবেন। আমি কোনও উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

এখানকার জল হাওয়া বেশ ভাল। আমি ভাল আছি। আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আপনি আমার বহু বহু প্রণাম জানিবেন এবং বউদিদি ঠাকুরাণীকে জানাইবেন। বালক বালিকাগণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আপনার পত্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন রহিলাম।

শ্রী নিতাইচরণ সুর

পত্রখানি পাইয়া অদ্বৈতচরণ মনে মনে হাসিতে লাগিল। এখন কি তাহার যাইবাব উপায় আছে? আড়তে প্রত্যহ কাঠ আসিতেছে—সে সমস্ত দেখাশুনা, বন্দোবস্ত করা—কাজের ভীড় অত্যন্ত অধিক। দরখাস্তে নিতাইয়ের নাম জাল করিয়া বীমা কোম্পানির নিকট হইতে সে নিজের "ন্যায্য পাওনা" আদায় করিয়া লইয়াছে।

[মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩]

মাষ্টার মহাশয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান শহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দুখানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুজ্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়াবী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি বৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। এ বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মত যাত্রা ত আনিবেই, অধিকন্তু কলিকাতায় কোনও ঢপওয়ালীকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। ঢপ সঙ্গীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাইগঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালাকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বর্দ্ধমানে অথবা কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালী অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালী সমধিক খ্যাতিসম্পন্না, এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালীকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে—ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক। কারণ গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মোড়লের পো, অমন করে বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হতে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়—কার্ত্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি হারে বিধেতা, তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কি হয়েছে, কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীগ্রাম থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল! হা—রে কপাল!"—বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক ক্রোশ পথ জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া

রোয়াকের প্রান্তে আসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তার পর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু!"

রামচরণ বলিল, "কি হয়েছে? যা হবার নায় তাই হয়েছে। বড় বড় শহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এ সব পাড়াগাঁযে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হস্কুল বসিয়েছে।"

তিনজনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি আবাব? হস্কুল কি?"—রামচরণ বলিল, "আরে ছাই আমিই কি জানতাম আগে হস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিবি পড়ার পাঠশালকে হস্কুল বলে।"—দত্তজা বলিলেন, "ওঃ—ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। একজন মাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরুমশায়কে নাকি মাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম ম্যাষ্টার বসে' দশ বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।"—হীরু দত্ত একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার কোথা থেকে এনেছে তা কিছু শুনলে?"—'সব খবরই নিয়ে এসেছি। বৰ্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারাণ চক্রবর্ত্তী। পনেবো টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময় একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল পিল্‌পিল্ করিয়া লোকে সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে নন্দীপুবের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিযাছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ হবে?" নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিযা, হাত নাড়িযা বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিনপুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়াদাওয়া করে আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে ত কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫ টাকা দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা ২৫ টাকা মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্যি করলাম। এখন যাও তোমরা বাড়ি যাও, স্নানাহার করগে।"

"জয় গোঁসাইয়ের জয়! জয় হীরু দত্তের জয়!"—সোল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খৰ্ব্বাকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁর এতই বেশি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থে আবার তাহা বাঙলা

করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্ব্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া, এই ২৫ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং!—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাহার ইংরাজিয়ানা চাল চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরদিনই ইস্কুল খুলিল। পনেরো ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক পুস্তক খরিত করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে, নন্দীপুরের লোকের পথে ঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি!" নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্দ্ধমানে বাড়ি, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্দ্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত। যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপ সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্ব্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জে একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কিনা। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও ত কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও ত ঐ চাকরি করছে।"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি?"

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"একেই বলে কলিকাল। সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জান না বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না! আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম। মাষ্টার আমায় বললে, 'দাও ওর কান মলে।' আমি কান মলে দিতেই, ওর মুখচোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো, আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কিনা আমার কাণে হাত দেয়! সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তার পরে পাঁচ ছয় বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"—অতঃপরে গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্ত্তৃক ব্যক্ত এ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারাণ মাষ্টার বলিল, "আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জে থেকে তোমরা দুজন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ কার কথা সত্যি কার কথা মিথ্যে।'

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল, "অ্যাঁ! এই কথা বলেছে? ও সব ত বিলকুল ফল্‌সো—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টাবের কাছে নিযে গিযে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে! একেবারে সন্ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগ্নোরেন্ট—অজ্ঞান।"—উভয় মাষ্টারের পরস্পবেব প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।—অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।—উভয় গ্রামের মাতব্বব ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখাব উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয় পবাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামেব সম্মতিক্রমে স্থিব হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পবকে একটি ইংরাজি কথাব মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপবকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পাবেন, তবে উভযে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠেকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।—বিচারেব দিন স্থিব হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা; স্থান—উপরিউক্ত বটবৃক্ষতল; সময—সূর্য্যাস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধার্য্যদিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জেব মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টাবকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাগাবা প্রভৃতি বাদ্যকবগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইযা চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ কবিতে কবিতে গ্রামে ফিরিযা আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টাবেব পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন—"কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাষ্টার যেন কিছুতেই তাব মানে বলতে না পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনাবা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি! এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা কবব যে তা শুনেই হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হযে যাবে—মানে বলা ত দূবের কথা।" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পাব, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"—কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টাব ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ কবিযা যাইতে হইবে।—সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্ব্বেই আনিয়া, নিজ গ্রামের সীমা -বেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসীগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ্ মাদুর বিছাইয়া বসিযা গেল উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি। এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ কবিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধাগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া উর্দ্ধে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন" বলিয়া উভয় উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।—ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।—নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুন হইয়া গেল। সকলে আগ্রহে বিচার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারাণ মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। হারাণ মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি এর মানে কি—"HORNS OF A DILEMMA"

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূট প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে—উভয় সঙ্কট—কেমন কি না?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল। ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি, এই দুজনে যা ইংরেজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে' তোমায় ঠকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ হয়ে আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দু' গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল—"I DON'T KNOW". হারাণ মাষ্টার উচ্চস্বরে বলিল—"আমি জানি না।"

শ্রবণ মাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে গোঁসাইগঞ্জ দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানেনা—হেরে গেল দূও—দূও।"

হারাণ মাষ্টার মহা বিপন্ন ভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা ও রামশিঙ্গা সমবেতভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ-নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল।

গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর ননী ছানা ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৬]

প্রজাপতির পরিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। উকীলের চিঠি ।।

সন্ধ্যার পব আদালত হইতে গৃহে ফিবিয়া প্রৌঢ়বযস্ক উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, একখানা হাত-ভাঙ্গা ইজিচেয়ারের উপর লম্বমান হইয়া, একেবারে যেন এলাইয়া পড়িলেন। চাপকানটা খুলিয়া রাখার সামর্থ্যও তাঁহার দেহে যেন আজ আর নাই।

গৃহিণী রান্নাঘর হইতেই স্বামীব পদশব্দ শুনিয়াছিলেন। তিনি তখন ময়দা মাখিতেছেন, বড় মেয়ে কমলা তাঁহার কাছে বসিয়া কুটনা কুটিতেছে। ময়দা মাখা শেষ হইতে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগিল; গৃহিণী তখন হাত ধুইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, কমলাকে রুটী ক'খানা বেলিযা বাখিতে বলিযা স্বামীর নিকটে আসিযা দাঁড়াইলেন; তাঁহাব অবস্থা দেখিযা বলিলেন, "হ্যাঁগা, এখন পোষাক ছাড়নি?"

শ্যামাচবণবাবু নীববে মাথাটি নাড়িলেন।

গৃহিণী শঙ্কাজড়িত স্ববে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "হ্যাঁগা, অমন কবে রয়েছ কেন? শবীব ভালো আছে ত?"– সঙ্গে সঙ্গে স্বামীব ললাটে হস্তস্পর্শ কবিযা দেখিলেন,—না, গা গবম হয নাই।

শ্যামাচবণবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "শবীর ভালই আছে।"

"তবে তুমি অমন কবে রয়েছ কেন, বল না! আজ কি বেশী মেহনত হয়েছে? আদালতে বেশী কাজ ছিল?"

শেষের কথাটিতে শ্যামাচরণের ওষ্ঠাধবে মৃদু হাসিব বেখা দেখা দিল—সেটা দুঃখেব হাসি। আজ বিশ বৎসব ত প্র্যাকটিস হইল, মক্কেলেব কাজেব ভীড়ে মাবা যাইবাব অবস্থা ত এ পর্য্যন্ত কোনও দিন হয নাই। তিনি প্রশ্নেব কোন উত্তব দিলেন না, ধীবে ধীবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপকানটি খুলিযা স্ত্রীর হাতে দিলেন। হেঁট হইযা জুতাব ফিতা খুলিতে যাইতেছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "তুমি ব'স, আমি খুলে দিচ্চি।"

স্ত্রীর সাহায্যে বস্ত্র পবিবর্ত্তন সমাধা করিয়া শ্যামবাবু বলিলেন, "খবর খারাপ; হংসবাজ সুন্দরমলবা উকীলের চিঠি দিয়েছে, একমাসেব মধ্যে তাদের টাকা শোধ না কবলে নালিশ করবে।"—বলিয়া শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! তা, সে কথা এখন আব ভেবে কি কববে বল! এক মাস ত সময় আছে, সে তখন যা হবার তাই হবে। তুমি যাও, হাতে মুখে জল দাও, আমি তোমার চা ঠিক করিগে।"—"যাই"—বলিয়া শ্যামাচরণ গামছাখানি কাঁধে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

শ্যামাচরণবাবুর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিবাস হালিসহর গ্রামে। প্রত্যহ নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া চুঁচুড়াব আদালতে ওকালতী করিতে গিয়া থাকেন। তাঁহাব একটি পুত্র, দুইটি কন্যা। সুরেন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসব। হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া দুই বৎসর যাবৎ সে কলিকাতায় আইন অধ্যযন কবিতেছে। বড় মেযে কমলা সন্তানসম্ভাবিতা, মাসখানেক হইল সে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। ছোট সবলা নিজ শ্বশুরালয়েই রহিয়াছে।

কন্যা দুইটির বিবাহ দিযা শ্যামাচরণবাবু ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন। হুগলীব হংসরাজ সুন্দরমল মাড়োয়ারী ফারমের নিকট হ্যাণ্ডনোটে তিন হাজার টাকা কর্জ লইয়াছিলেন। তাহাদেব প্রাপ্য এখন চার হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। উপার্জ্জন যাহা করেন, তাহাতে পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ কবিয়া, কলিকাতাস্থ পুত্রের পড়াব খরচ যোগাইয়া,

মহাজনের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। একমাসের মধ্যে চার হাজার টাকা কোথা হইতে আসিবে?

রাত্রিতে আহারাদির পর কর্ত্তা-গিন্নীর কথোপকথন হইতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন, "লোকে আমায় বলে, তোমার টাকার ভাবনা কি? তোমার বি-এ পাশ করা ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে এখনই ত অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা ঘরে তুলতে পার!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত বলবেই লোকে। আজকালকার বাজারে বি-এ পাশ ছেলের দাম ত পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনসংখ্যা! কিন্তু ছেলেকে যে রাজী করতে পারিনে, সেই ত হয়েছে বিপদ কিনা!"

কর্ত্তা বলিলেন, "ছেলে যদি রাজী হয় ত এখনও হতে পারে। কোন্নগরের মুখুয্যের সেই মেয়েটির এখনও বিয়ে হয়নি। এ শনিবারে সুরোকে ডেকে পাঠাব? আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা যাক এস। অলঙ্কার, দানসামগ্রী এ সব ছাড়া নগদ পাঁচ হাজার দিতে তখনই ত তারা রাজী ছিল—বোধ হয় টেনে টুনে সাড়ে পাঁচ কি ছয়ও করা যেতে পারে। বাপের এই অবস্থা শুনলেও কি তার মন গলবে না?"

গিন্নী বলিলেন, "এদিকে ত মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি খুব দেখায়। কিন্তু কথা বললে শোনে না, ঐ ত দোষ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভক্তি টক্তি নয়—ও সব শুধু বচন—বচন! আজকালকার ছেলেদের ত ঐ রকমই হয়েছে কিনা! মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য; কিন্তু কাজের বেলায় ফক্কিকার!"

স্বামীর মুখে পুত্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য শুনিয়া গৃহিণীর মনে একটু আঘাত লাগিল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু যে কথা সে বলে, তাও ত কিছু অন্যায্য কথা নয়! সেবার বললে, দেখ মা, এই বরপণের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ জর্জ্জর হয়ে রয়েছে; যে মেয়ের বাপ গরীব, তার ত কষ্টের অবধি নেই। দেশের এই অমঙ্গল দূর করবার জন্যে আমরা কলেজের ছাত্ররা মিলে সমিতি করেছি, কত বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, খবরের কাগজে কত প্রবন্ধ লিখছি, কত ছেলেদের খোসামোদ করে ধরে এনে প্রতিজ্ঞা পত্রে সই করিয়ে নিচ্ছি,—আমাকেই সকলে সে সভার সম্পাদক করেছে; এখন আমিই যদি পণ নিয়ে বিবাহ করি, তা হলে লোকসমাজে আমার মুখ দেখাব কেমন করে?—আমাদের বিষম দুরাবস্থা, তাই যা বল; কিন্তু ছেলের কথা ত অসঙ্গত নয়!"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ত সবই বুঝি। কিন্তু বাপের এই অপমান, এই দুঃখের চেয়ে সমাজে আর মুখ দেখাতে না পারার দুঃখ অপমানই কি এত বড় হল?"

গৃহিণী এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না। যাহা হউক, স্থির হইল, এ শনিবারে বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিয়া কল্যই সুরেনকে পত্র লেখা হইবে।

সুরেন পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতি শনিবার না হউক, এক শনিবার অন্তর বাড়ী আসিতই। ইদানিং "বিবাহপণ নিবারণী সমিতি'র সম্পাদক হইয়া তাহার অত্যন্ত সময়াভাব ঘটিয়াছে, খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ চলিতেছে। তাই এখন সে মাসে একবার করিয়া বাড়ী আসে মাত্র। ইংরাজী মাসের প্রথম শনিবারে বাড়ী আসে, পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎও করা হয়, মাসিক খরচের টাকাটাও লইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। যুবকের কর্ত্তব্যজ্ঞান ।।

শনিবার সন্ধ্যার ট্রেণে সুরেন আসিয়া পৌঁছিল। সে দিন আর মা তাহাকে কিছুই বলিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়া, পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সুরেন মার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসুমনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী তাঁহার আসনের নিম্ন হইতে উকীলের চিঠিখানি বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

সুরেন সেখানি পাঠ করিয়া মার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তাই ত! এখন উপায়?"

মা বলিলেন, "তুমি, বাবা, উপযুক্ত ছেলে,—উপায় তুমিই কর।"

সুরেন নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি কি উপায় করবো, মা?"

মা বলিলেন, "কোন্নগরের মুখুয্যেদের সেই মেয়েটিকে বিয়ে কর। এখনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।"

সুরেন বলিল, "কিন্তু মা, আমি ত বলেছি—"

পুত্রকে বাধা দিয়া জননী বলিলেন, "তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। তুমি বলেছ, বিবাহপণ-নিবারণী সভায় তুমি একজন মস্ত পাণ্ডা, তুমি পণ নিয়ে বিবাহ করিলে সমাজে আর তুমি মুখ দেখাতে পারবে না। সে সবই আমি বুঝি। কিন্তু এদিকে যিনি তোমার জন্মদাতা, মহাগুরু—যিনি এত কষ্ট করে আপনি না খেয়ে তোমায় খাইয়ে, তোমায় এত বড়টা করে তুলেছেন, নিজের গায়ের রক্ত জল করে তোমায় মানুষ করেছেন, তিনি যে দেনার দায়ে জেলে যান! উনি জেলে গেলে সমাজে কি তোমার মান সম্ভ্রম বাড়বে, বাবা?"

সুরেন কিয়ৎক্ষণ নতমস্তকে বসিয়া কি চিন্তা করিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "আর কি কোন উপায় নেই, মা?"

মা বলিলেন, "আর কোনও উপায় নেই। কমলার বিয়ের পর আমার যে ক'খানা গহনা বাকী ছিল, সরলার বিয়ের সময় সে সবই গেছে, তা ত তুমি জান। হাতে এই যে দুগাছি রুলি দেখছ, এই সার। কোথাও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে যেতে হলে আমার যেন মাথা কাটা যায়—একজন উকীলের পরিবার, তার এই দুরাবস্থা! কিন্তু সে কথা যাক। সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীখানি। তা, পাড়াগাঁয়ে এ পুরানো বাড়ী, এ বেচলে হাজার টাকা পাওয়া যায় ত ঢের। আর এই থালা, ঘটি বাটি—লেপ-কাঁথা বিছানা—এ সব বিক্রি করলেই বা আর কত হবে?" বলিতে বলিতে গৃহিণীর নেত্রযুগল সজল হইল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল।

সুরেন বলিল, "তা বলছিনে। আর কোথাও যদি ধার পাওয়া যায়—"

"কে আর ধার দেবে, বাবা? কি বিষয় সম্পত্তি আছে যে, তাই দেখে ধার দেবে?—বিশেষ, মহাজন যে হবে, সে এটা জানতেই পারবে যে, আর এক মহাজনেব কাছে টাকা ধার নিয়ে, ৪।৫ বছরের মধ্যে তার একটি পয়সাও শোধ করতে পাবনি; নালিশের ভয় দেখাচ্ছে বলে, তাদের দেবার জন্যেই এই টাকা ধার করা হচ্ছে।"

সুরেন নীরবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা বলিলেন, "সুপুত্রের যা কর্ত্তব্য, তাই তুমি কর, বাবা। পিতাকে সত্য থেকে মুক্ত করবার জন্যে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন, তুমি তোমার পিতাকে জেল থেকে মুক্ত করবার জন্যে বিয়ে করবে, এটা কি একটা বড় কথা হল? মেয়েটি আমি দেখেছি; খাসা, ঘর আলোকরা মেয়ে। সদবংশ, সকল রকমেই উপযুক্ত কুটুম্ব। লোকে যেমনটি চায়, এও তেমনটি। আর অমত করো না বাবা, রাজী হও, এই বোশেখ মাস পড়তেই শুভ কার্য্যটি হয়ে যাক।"

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া, "আচ্ছা মা, ভেবে চিন্তে দেখি" বলিয়া সুরেন উঠিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে, শ্যামাচরণবাবু অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বললে খোকা?"

পুত্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, গৃহিণী সে সমস্তই বিবৃত করিলেন। শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "বোধ হয় মন গলেছে; রাজী হবে! কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "মা সুবচনী, মা মঙ্গলচণ্ডী তাই করুন। আমি তোমাদের পুজো দেবো মা, ছেলেকে আমার সুমতি দাও।"

সন্ধ্যেবেলায় কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কিছু বলেছে?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "না, এখনও কিছু বলেনি। কাল কলকাতায় ফেরবার আগে বলে যাবে বোধ হয়।"

সোমবার প্রাতে গৃহিণী পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার অনুসন্ধানে গিয়া, শয্যার উপর একখানি পত্র পাইলেন। কম্পিত হস্তে সেখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

আমি তোমার অধম সন্তান, তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। সারাদিন, সারারাত্রি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি; যে আদর্শকে আমি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে কোনও মতেই বিচ্যুত হইতে পারিব না, প্রাণ গেলেও নহে। আমাকে তোমরা, পার ত ক্ষমা করিও। ভোরের ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ইতি

প্রণত—শ্রীসুরেন।

পত্র পড়িয়া গৃহিণীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। স্বামীকে গিয়া তিনি সে পত্র দেখাইলেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, "যাকগে—না করলে ত বয়েই গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু এবার টাকা নিতে এলে বলে দিও, আর আমি তার খরচ যোগাতে পারব না। খাইয়ে পরিয়ে তাকে এত বড়টা করলাম, লেখাপড়া শেখালাম, এখন নিজের পথ সে নিজেই দেখুক।"

গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পর মাসে প্রথম শনিবারে সুরেন টাকা লইতে আসিল না, সুতরাং ও কথা তাহাকে বলাও হইল না। কলিকাতা হইতে পিতাকে সে চিঠি লিখিল—

বাবা

আমি আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান, আপনার আদেশ আমি পালন করিতে না পারিয়া, কিরূপ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছি, তাহা আমার অন্তর্য্যামীই জানেন। অপর কথা, আপনার এরূপ অর্থসঙ্কটের সময় আমার পড়ার খরচের জন্য আপনাকে বিব্রত করা আর আমার উচিত নহে। এ কয়দিন .চেষ্টা করিয়া মার্চ্চেন্ট আফিসে আমি একটি ৪০টাকা বেতনের কেরাণীগিরি যোগাড় করিয়া লইয়াছি, তাহাতেই আমার খরচ চলিবে। আপনার ও জননীদেবীর পাদপদ্মে আমার শত শত প্রণাম। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্যপথে চিরদিন স্থির থাকিতে পারি। আমি আপনাদের ক্ষমার অযোগ্য, তা জানি,

তথাপি ক্ষমাপ্রার্থী
শ্রীসুরেন।

ইহার কয়েকদিন পরে শ্যামাচরণ আসিয়া স্ত্রীকে জানাইলেন, হংসরাজ সুন্দরমলের যিনি উকীল, তিনি তাঁহার মক্কেলগণকে বলিয়া কহিয়া স্তুতিমিনতি করিয়া, ঋণ পরিশোধের সময়টা এক মাসের স্থানে ছয় মাস করিয়া লইয়াছেন।

গৃহিণী বলিলেন,"তা ত হল! কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেই বা চার হাজার টাকা আসবে কোথা থেকে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "দেখি ভগবান কি করেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "কলিতে ভগবানের বিচারই যদি থাকবে, তা হলে আর ভাবনা কি?"

"দেখা যাক"—বলিয়া শ্যামাচরণবাবু চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। বন্ধু-সঙ্গম ।।

ভগবান বিচার করুন না করুন, প্রজাপতি কিন্তু একটি ভারি মজা করিলেন।

হালিসহর নিবাসী উমাচরণ চৌধুরী মহাশয় রাজপুতানার কোনও দেশীয় করদরাজ্যে

উচ্চ বেতনে চীফ জাষ্টিস বা প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কয়েকদিন হইল, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা অমলার বিবাহেব জন্য ছুটি লইয়া তিনি সপরিবারে স্বগ্রামে আসিয়াছেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে উমাচরণ ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতানায় গমন করেন ; মাঝে একবার মাত্র দেশে আসিয়াছিলেন, সেও ১০।১২ বৎসরের কথা।

এই উমাচরণ ছিলেন শ্যামাচরণের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। নামসাম্যের জন্য বাল্যকালেই ইঁহারা "বন্ধু" পাতাইয়াছিলেন। এখন উভয়েরই চুল পাকিলেও, পরস্পর সেই "বন্ধু" সম্ভাষণই চলিয়া থাকে।

উমাচরণ ক্রমে শ্যামাচরণের সাংসারিক ব্যাপারের সমস্ত কথাই শুনিলেন। শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন ; বন্ধুর সঙ্গে গোপনে কি একটা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সুরেনকে পূর্ব্বে তিনি ১০।১১ বৎসরের বালকটি মাত্র দেখিয়াছিলেন। একদিন কলিকাতায় যাইয়া, নিজে অপ্রকাশ থাকিয়া সুরেনকে দেখিয়া আসিলেন। তাহার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে গোপনে একটু অনুসন্ধানও করিলেন। বুঝিলেন, সে যুবকের চরিত্র অনিন্দ্যনীয়।

ফিরিয়া আসিয়া উমাচরণ বলিলেন, "বন্ধু, তোমার ছেলেটিকে দেখে এলাম। আমার ত বেশ পছন্দই হয়েছে। আমার অমলাকে তা হলে তুমি নাও—সে তোমার ছেলের অনুপযুক্ত হবে না।"

শ্যামাচবণ বলিলেন, "তা হলে, সেই পরামর্শই রইল ত? ছেলের যা কোট, বিয়েব সময় শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে, একটি হত্তুকী দিয়ে তুমি কন্যাদান করবে ; তার পরদিন চুপি চুপি এসে আমি টাকাটা নিয়ে যাব। দেনাটাও ফেলে দেবো, বউমার জন্যে গয়নাগাঁটিও গড়তে দেবো।"

উমাচরণ কিছুক্ষণ ভাবিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "সে যেন হল, কিন্তু তোমার যে দেনাশোধ হয়ে গেল, তুমি যে পুত্রবধূর অলঙ্কার গড়াচ্ছ, এ সব কার টাকাতে সে কথা জানতে কি খোকার বাকী থাকবে? তখন যদি সে বেঁকে বসে? যদি বলে আমায ঠকিয়ে বিবাহ দেওয়া হয়েছে, ও স্ত্রীকে আমি গ্রহণ কববো না?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "না না—তা কি আর সে কবতে পারে? একবাব বিয়ে হযে গেলে, তারপর বিবাহিতা স্ত্রীকে কি সে ত্যাগ করতে পাবে? লেখাপড়া শিখেছে, একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান ত আছে।"

উমাচরণ বলিলেন, "কি জান ভাই, আজকালকার ছেলেদের কর্ত্তব্যজ্ঞান যে ভীষণ! কোন্‌টা যে তাদের কর্ত্তব্য আর কোন্‌টা যে নয়, তা আমবা, সেকেলে মানুষ, বুঝিও না ছাই! কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাপকে যে জেলে পাঠাতে প্রস্তুত, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে, তা আর আশ্চর্য্য কি?"

এই সময় ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিয়া গেল। সুরেনের চিঠি। সুরেন লিখিয়াছে, আগামী ১২ই এপ্রিল তাহাদের ল' কলেজ গ্রীষ্মবকাশের জন্য বন্ধ হইবে। যে ফারমে সে চাকরি করে, তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে তাঁহাদেব একটি ব্রাঞ্চ খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেই কারণে ছোটসাহেবের সঙ্গে তাহাকেও দার্জ্জিলিঙে গিয়া মাসখানেক থাকিতে হইবে। মাসখানে সে এখন বাড়ী আসিতে পাবিবে না, ইত্যাদি—পত্রখানি পড়িয়া, শ্যামাচরণ সেখানি বন্ধুর হাতে দিলেন।

পত্র পড়িয়া, উমাচরণ বলিলেন, "ভালই হল!"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাল হল?"

"দাঁড়াও, একটু ভেবে চিন্তে দেখি, তারপর তোমায় বলবো এখন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। কয়েকখানি পত্রাংশ ।।

(১)

দার্জ্জিলিং
১০ই বৈশাখ

বন্ধুবরেষু,

আমরা গতকল্য নিরাপদে দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়াছি। উপস্থিত স্যানিটোরিয়মে আসিয়া উঠিয়াছি, ২।১ দিনের মধ্যেই একটি বাড়ী লইব। সুরেন বাবাজীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় এখনও পাই নাই। যেমন যেমন হয়, পরে তোমায় জানাইব। বউঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার এবং কমলা মাকে স্নেহশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি

তোমার বন্ধু উমাচরণ

(২)

দার্জ্জিলিং
১৩ই বৈশাখ

বন্ধু,

গতকল্য বিকালে ম্যালে বেড়াইতে বেড়াইতে সুরেন বাবাজীকে দেখিতে পাইলাম। পরিচয় লইয়া, বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম, "অ্যাঁ, তুমি হালিসহরের শ্যামাচরণের ছেলে? আমার বাড়ী যে হালিসহর, আর তোমাব বাবা যে আমার বাল্যবন্ধু!"—তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিলাম। যাহা গোপন করা আবশ্যক এবং যাহা প্রকাশ করা চলিবে, সে সম্বন্ধে গিন্নীকে সব শিখাইয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে তিনি তাহাকে আহারের জন্য জিদ করিলে সুরেন সম্মত হইল। অমলার সঙ্গেও তাহার আলাপ করাইয়া দিয়াছি। অমলা কাল গান শুনাইয়াছে— গান শুনিয়া সুরেন খুব খুসী হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। আগামী কল্য বিকালে তাহাকে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছি এবং বলিয়াছি, চা-পানের পর সকলে একত্রে বেড়াইতে যাওয়া যাইবে।

(৩)

দার্জ্জিলিং
১লা জ্যৈষ্ঠ

বন্ধু,

সুরেন প্রায় প্রতিদিনই বিকালে এখানে আসিয়া চা খায়, এবং সান্ধ্যভোজনও মাঝে মাঝে এখানে সম্পন্ন করে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে তোমায় জানাইয়াছি। সুরেন যতক্ষণ না আইসে, অমলা বেটী ততক্ষণ পথপানে চাহিয়া থাকে ; অথচ এমন ভাবটা দেখায়, যেন তাহার মনে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। তোমার ছেলেটিও, ভাই, বড় কম যান না। অমলা যতক্ষণ ঘরে না থাকে, ততক্ষণ সে যেন ছটফট করে। মধ্যে একদিন আমাদের শরীরটা ভাল নয় বলিয়া সুরেনের জিম্মাতে অমলাকে বেড়াইতে পাঠাইয়াছিলাম। দুজনে একলা বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া, মনের আনন্দ গোপনের জন্য দুজনেই সেই "অমানুষিক" চেষ্টার দৃশ্যটা, যদি ভাই দেখিতে! উহারা মনে করে, আমরা বুড়াবুড়ী কিছুই বোধ হয় বুঝিতে পারি না, সন্দেহও করি না। দুজনে বাহির হইয়া গেলে, বুড়াবুড়ী আমরা ত হাসিয়াই আকুল। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কয়েকদিন হইল, আমরা বার্চ্চ হিলে বেড়াইতে গিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়া নিজেরা বাড়ী ফিরিয়া আসি। ঘন্টাখানেক পরে উহারা ফিরিল। তখন নিজেদের মুখ হইতে হাসিতামাসার ভাবটা মুছিয়া ফেলিয়া, দুশ্চিন্তার ভাবনা আনয়ন করা আমাদের পক্ষেও বিশেষ আয়াস সাধ্য হইয়াছিল।

(৪)

দার্জ্জিলিং
১২ই জ্যৈষ্ঠ

ভাই বন্ধু,

গতকল্য সুরেন আমার নিকটে আসিয়া অমলার হস্ত প্রার্থনা করিয়াছে। আমি বলিলাম, "বেশ ত, তা হলে তোমার বাপকে আমি চিঠি লিখি।" সে বলিল, "বাবাকে চিঠি লিখলে তিনি এখনই আপনার কাছে অনেক টাকা চেয়ে বসবেন।" আমি বলিলাম, "তাতে আমি পিছপাও নই। বিনা টাকায় আজকালকার বাজারে কার আর মেয়ের বিয়ে হয় বল?" সে বলিল, "বাবা যদি টাকা নেন, তাহলে কিন্তু আমি বিবাহ করতে পারবো না। আপনি অমলাকে শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে, একটি হত্তুকি পণ দিয়ে যদি দান করেন, তবেই আমি বিবাহ করতে পারি।" শুনিয়া আমি কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিলাম, "কি! এত বড় কথা তুমি বল আমায়? শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে হত্তুকি দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবো? কেন আমায় কি তুমি একটা যে-সে লোক পেয়েছ? তোমার চোখে আমি একটা পথের ভিখারী বুঝি, না?"

ধমক খাইয়া ছেলেটা মুষড়াইয়া গেল ; আমতা আমতা করিযা বলিল, "না না, সে ভাবে আমি বলিনি, আপনি রাগ করছেন কেন?"—তার পর সে তাব পণনিবারণী সভার কথা, আরও কত কি সব মাথামুণ্ড বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ওঃ, কলকাতার সেই পণ নিবারণী সভা? প্রোফেসব অমূল্য বোস যার সভাপতি?" খোকা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" আমি বলিলাম, "সেই লোকই ত সম্প্রতি বিবাহ কবে শ্বশুরেব টাকায় বিলাত গেছে। খববের কাগজওয়ালারা তাই নিযে তাকে কি রকম গালাগালিটা দিয়েছে দেখ না!"—বলিয়া সেইদিন প্রাতে প্রাপ্ত একখানা সংবাদপত্র তাহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া সুরেন ভারি দমিয়া গেল। বলিল, "তা হলেই বুঝুন না? আমি সেই সভার সম্পাদক। আমিও যদি ঐ কার্য্য করি, আমাকেও ত এমনি করে গালাগালি খেতে হবে!" এই কথা শুনিয়া যেন আমি একটু ঠাণ্ডা হইয়াছি, এইরূপ অভিনয় কবিয়া বলিলাম, "কিন্তু বাপু, তুমি হাজার রাজী থাকিলেও তোমার বাপের অমতে তোমাকে আমি জামাই কি করে করি বল? তোমার বাবাকে আমি ছেটোবেলা থেকে জানি ত। তিনি ভাবি একরোখা মানুষ। শেষকালে বলে বসবেন, ও বউ আমি গ্রহণ করবো না। তার চেয়ে বাপু, তোমার বাবাকে চিঠিপত্র লিখে সব ঠিকঠাক করি, তিনি অনুমতি দিলেই শুভ কার্য্যটি হতে পারবে।" খোকা বলিল, "সে আশা বৃথা। তিনি বড় অর্থসঙ্কটে পড়ে আছেন। বিনা টাকায় কখনই তিনি সম্মতি দেবেন না।" আমি বলিলাম, "তা হলে বাপু, এ কাজের মধ্যে আমি নেই। বাপ-মাকে লুকিয়ে তুমি আমার মেয়েকে বিযে করবে, সে হতেই পারে না, অসম্ভব। আমার মেয়ের অন্যত্র সম্বন্ধ করতে হবে। তুমি বাপু, এ বাড়ীতে আর এস না। অমলা ত এখন নিতান্ত ছোট্টটি নেই—তোমাদের দেখা-শুনা হলে মিছামিছি মন খারাপ হবে বই ত নয়।" এই কথা শুনিয়া আমাকে একটি প্রণাম করিয়া সুরেন প্রস্থান করিল।

রাত্রিতে গিন্নীর কাছে শুনিলাম, মেয়েটা কোথায় দাঁড়াইয়া এ সকল কথা শুনিয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মেয়ের খোঁজে যাইয়া দেখেন, সে বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। তার মায়ের কাছে সে আর কোনও কথা গোপন করিতে পারে নাই; অন্যত্র তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিলে সে আফিম খাইবে। গিন্নী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন "মেয়েটার কষ্ট দেখে মনে হতে লাগলো, সব কথা তাকে খুলেই বলি। কিন্তু তোমার নিষেধ সেই জন্যে তার কাছে কিছু ভাঙ্গতে পারলাম না।" আমি তাহাকে বলিলাম, "কালকের দিনটে চুপ করে থাক। পরশু চিঠি লিখে সুরেনকে ডেকে পাঠিও।

অমলাকে তুমি বলে রেখ, সুরেন আজ আসবে, বাপ-মার অনুমতি নেওয়া সম্বন্ধে তাকে রাজী করা। অমলারই ভার। এ বিষয়ে সুরেন রাজী হলে, আর কোনও গোল নেই, এই মাসেই বিয়ে হতে পারে। সুরেন এলে পরে, অমলার কাছে তাকে রেখে তুমি চলে এস। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এখন।"

পরামর্শতই কার্য্য হইয়াছিল। যাইবার সময় সুরেন আমায় বলিয়া গিয়াছে, আজই সে তোমাকে চিঠি লিখিবে।

আচ্ছা, ভাই দিনে দিনে হইল কি বল ত? আমরাও ত একদিন বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু কই, তাহার মধ্যে এমন সব মজার ব্যাপারের বাষ্পমাত্রও ত ছিল না। সেকালে জন্মিয়া আমরা কি ভুলই করিয়াছি, হায় হায়! বড়ই ঠকিয়া গিয়াছি। ধুত্তোর সে কাল!

(৫)

দার্জ্জিলিং
১২ই জ্যৈষ্ঠ

পরম-পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী দেবী
শ্রীচরণকমলেষু।

মা!

দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া, পৌঁছান সংবাদটি মাত্র তোমায় দিয়াছিলাম। তারপর নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত তোমাদের পত্র লিখিতে পারি নাই, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

এখানে পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই বাবার বাল্যবন্ধু হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হয়। ইঁহার নাম আমি তোমাদের কাছে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।

এবার ছুটিতে প্রথম হালিসহরে গেলে তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল শুনিলাম। তাঁহার কন্যা অমলাকে অবশ্যই তোমরা দেখিয়াছ; তাহার সহিত তিনি আমার বিবাহ দিতে চাহেন; টাকাকড়িও যথেষ্ট দিতে প্রস্তুত আছেন, এরূপ আভাস পাইয়াছি।

পণ লইয়া বিবাহ করার আমি কিরূপ বিরোধী, তাহা ত তোমরা ভাল রূপই জান। আমি পণনিবারণী সভার সেক্রেটারি হইয়া ঐ কার্য করিলে দেশের চক্ষুতে আমি যে অত্যন্ত হেয় হইয়া পড়িব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজে আমাকে নানারূপ শ্লেষ, বিদ্রূপ ও গালাগালি করিবে। কিন্তু টাকা না পাইলে, বাবা জেলে যান।

সেটা ঘটিতে দেওয়া আমার পক্ষে ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়, তাহাতে সন্দেহ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, আমার পরমগুরু পিতৃদেবের মঙ্গলার্থে আমার আদর্শ, আমার প্রতিজ্ঞা, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই বলি দিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইব।

অতএব, মা, বাবাকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইয়া, তাঁহাকে বলিও যে, আমি আর তাঁহার অবাধ্য সন্তান নহি! তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আমি নতমস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তবে অন্য কোথাও নহে—এই চৌধুরী মহাশয়ের সহিতই কথাবার্ত্তা হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

আমার এখানকার কার্য্য একসপ্তাহ পরে শেষ হইবে। কলেজ খুলিতে এখনও বিলম্ব আছে। সাহেবকে বলিয়াছি, তিনি আমায় তিন সপ্তাহের ছুটী দিবেন, ঐ তিন সপ্তাহে বাড়ী গিয়া তোমাদের চরণ সেবায় অতিবাহিত করিব, স্থির করিয়াছি।

সেবক
শ্রীসুরেন।

পুঃ—চৌধুরী মহাশয়কে পত্রখানি শীঘ্রই লেখা প্রয়োজন। কারণ শ্রাবণের মাঝামাঝি তাঁহার ছুটী ফুরাইবে, তিনি আবার রাজপুতনায় চলিয়া যাইবেন।

।। উপসংহার ।।

মহাসমারোহে, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরবৎসর সুরেন ওকালতী পাশ করিয়া, সস্ত্রীক রাজপুতনায় চলিয়া গেল। সেখানেই শ্বশুরের আদালতে সে এখন ওকালতী করে। তাহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে। উমাচরণবাবুরও পেন্সন লইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। পেন্সন লইবার কাজে জামাতাকে তিনি একটি ছোটখাট জজীয়তী পদে বহাল করিয়া আসিতে পারিবেন, মহারাজ বাহাদুর এরূপ আভাসও দিয়াছেন।

[বার্ষিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩২]

চিরায়ুষ্মতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বরকন্যার মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ' জিনিষটার অস্তিত্ব সেকালে আমাদের দেশে আদৌ ছিল না, বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হওয়ার পর হইতেই বাঙ্গালী তরুণ-তরুণী সমাজে উহার সূত্রপাত হইয়াছে—ইহা মনে করা অত্যন্ত ভুল। কারণ যে সময়ের ইতিবৃত্ত নিম্নে আমরা প্রকাশ করিতেছি, তাহা সিপাহী বিদ্রোহের ৩।৪ বৎসর পরের এবং দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মালীপুর গ্রামখানিতে বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার কয়েকঘর আছেন, যাঁহারা নিজেদের 'স্বভাব কুলীন' বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন।

মালীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরবিলাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি স্বভাব কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বিঘা কয়েক মাত্র ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল,—তাহা ছাড়া বিঘা দুই জমার জমিও রাখিতেন। তখনকার দিনের মোটা ভাত কাপড়ের পক্ষেও ইহা যথেষ্ট ছিল না। স্বচ্ছন্দে ও সুশৃঙ্খলে তাঁহার সংসার চলিত না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স এ সময় চল্লিশ পার হইয়াছিল। নিজ পিতার জীবিতকালে, তাঁহার আদেশ কুলীনের কুলরক্ষার জন্য একে একে তাঁহাকে তিন 'সংসার' করিতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইচ্ছা করিলে তিনি 'সংসার'-সংখ্যা আরও বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এই তিন সংসারের মধ্যে মধ্যমা বাইমণি অকালে পরলোক গমন করেন ; কনিষ্ঠা ক্ষীরোদাসুন্দরী ধনীকন্যা, তিনি পিতৃগৃহের ক্ষীর সর ছাড়িয়া গরীব স্বামীর মোটা ভাত পছন্দ করিতেন না বলিয়া, জেষ্ঠা সারদাসুন্দরীই আসিয়া শ্বশুরালয়ে জাঁকিয়ে বসেন এবং কালক্রমে তিনিই গৃহিণীর পদবীলাভ করিয়াছেন।

সারদাসুন্দরীর গর্ভে হরবিলাসের তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল ; তাহার মধ্যে বড়টি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দ্বিতীয়টি কন্যা—নাম রাখিয়াছিলেন প্রভাবতী, তাহার বয়স এখন বারো। কনিষ্ঠ পুত্রটি এ সময়ে তিন বৎসরের শিশু মাত্র।

প্রভার আজিও বিবাহ হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে কুলীনগৃহে বড় বড় মেয়েরাও অবিবাহিত থাকিত ; কারণ স্বভাব বা অন্ততঃ 'স্বকৃতভঙ্গ' কুলীনের পুত্র ভিন্ন, অন্যপাত্রে কন্যাদান তাঁহারা অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিতেন।

এই সময় সহসা হরবিলাসের ভাগ্য পরিবর্তন হইল। সংবাদ আসিল, আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনায়, তাঁহার হুগলী জেলার রাজগ্রাম নিবাসী মাতুল ও মাতুলের একমাত্র পুত্র গঙ্গায় নৌকাডুবিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, হরবিলাস ব্যতীত কোনও ওয়ারিশান নাই। ইহা শুনিয়া হরবিলাস অগৌণে মাতুলালয় যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতুলানী ভিন্ন আর কেহ নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা একজন সম্পন্ন গৃহস্থের উপযোগী। এই সম্পত্তি লাভে নিত্য অভাব অনটনের হাত হইতে চিরজীবনের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া, নিজ বাস্তুভিটা ও জমিজমা যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া, দেনাশোধ করিয়া, গ্রামের বাস উঠাইয়া, মাঘ মাসে হরবিলাস মাতুলালয়ে গিয়া স্থায়ী ভাবে বাস আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজগ্রামে আসিয়া হরবিলাস বিষয়-সম্পত্তি দখল ও তাহার তত্ত্বাবধানে মন দিলেন। সারদাসুন্দরী তাঁহার নূতন সংসার গোছাইয়া লইতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল, কিন্তু একটা বিষয়ে সারদাসুন্দরী বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাঙ্গাল দেশের ভাষা শুনিয়া প্রতিবেশিনীরা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্য ভাবে একটু আধটু ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করে—ইহাতে সারদাসুন্দরী মনে মনে চটিয়া যান। কেবল পাড়ার হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী এই পর্য্যায়ভুক্ত নহেন ; ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সারদাসুন্দরী বেশ আনন্দ পান। ফলে, অল্পকাল মধ্যেই উভয় পরিবারে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইল। হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকল বিষয়ে হরবিলাসের পরামর্শদাতা ও উপকারী বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন। মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণও চলিতে লাগিল। হরিচরণকে হরবিলাস দাদা বলিয়া ডাকেন।

হরিচরণের দুইটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নীলমাধব—তাহার বয়স তখন ১৭।১৮ বৎসর। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া, ইংরাজি পড়িবার জন্য সে শ্রীরামপুর মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে, প্রত্যহ দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে যায়। কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়মাধব দশে পড়িয়াছে।

হরবিলাস গৃহে একটি বড় ঘরের দুই দিকে দুইখানি তক্তপোষ পাতা। একখানিতে হরবিলাস এবং অপরখানিতে গৃহিণী পুত্রকন্যাদের লইয়া শয়ন করেন। হরবিলাস এ গ্রামে আসিবার মাস দুই তিন পরে, একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া প্রভাবতী শুনিল, তাঁহার পিতামাতা নিম্নস্বরে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন :—

মাতা। হ্যাঁগা প্রভার বিয়ের কথা ভাবছো না? মেয়ে যে বলতে নেই দেখতে দেখতে ডাগর হয়ে উঠলো!

পিতা। ভাববার সময় পাচ্ছি কই? বিষয়-আশয়গুলো ভাল করে দেখে শুনে নিতেই ত এ ক'মাস কাটলো। এইবার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে হবে বইকি।

মাতা। দেখ, আমার মনে একটা কথা উদয় হয়েছে। তুমি শুনলে কি বলবে জানিনে।

পিতা। কি কথা?

মাতা। আচ্ছা, চাটুয্যেদের ঐ নীলমাধব ছেলেটির সঙ্গে দিলে হয় না?

পিতা। কি সর্বনাশ! ও ছেলে যে তিন পুরুষে!

মাতা। তা হলই বা তিন পুরুষে! ওকে মেয়ে দিলে কুলমর্য্যাদায় তুমি একটু নেমে যাবে, এই না? ছেলেটি কিন্তু আমার ভারি পছন্দ হয়েছে তুমি যাই বল!

পিতা। নিজে স্বভাব কুলীন হয়ে শেষে তিন পুরুষে পাত্রকে মেয়ে দেবো?

মাতা। স্বভাব কুলীনের ছেলে এ সব দেশে ত বড় পাওয়া যায় না! তাহলে দেশ থেকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এলে না কেন? দেখ পাঁচটা নয় সাতটা নয়, ঐ একটি মেয়ে। যে পাত্রে দিলে মেয়ে সুখে থাকবে, সেই পাত্রে দেওয়াই ভাল নয় কি? স্বভাব কুলীন

পাত্র এনে বিয়ে দেবে, তার হয়ত আর পাঁচটা বিয়ে হয়ে আছে—আরও দশটা করবে,—স্বামীর ঘর করা যে কি বস্তু, তা মেয়ে জীবনে কখনও জানতে পাববে না। তার চেয়ে এই ভাল নয়? নীলু ছেলেটি দেখতে শুনতে যেমন, স্বভাব চরিত্রও তেমনি—তার উপর ইংরেজী লেখাপড়া শিখছে, চাকরী কববে। আমি ত বলি বট্‌ঠাকুবেব কাছে তুমি একবার কথাটা পেড়ে দেখ।

পিতা। নীলুই যে তোমার মেয়েকে বিযে করবাব পর আর পাঁচটা বিয়ে করবে না তা তুমি কি করে জানলে? ভঙ্গ হলেও, ও তিন পুরুষে বইত নয়!

মাতা। কি বল তুমি তার ঠিক নেই! ও যে ইংরেজী পড়ছে গো! যারা ইংরেজী পড়ে, তারা সাহেবের চাকরী কবে,—তারা কি আব বিযের ব্যবসা করতে যায়?

পিতা। হ্যাঁ, আমিও ঐ রকম শুনেছি বটে, যারা ইংরেজী পড়ে তারা একটার বেশী বিয়ে করতে চায় না। আচ্ছা, তা কথাটা ভেবে চিন্তে দেখি। পিতৃকুলের মর্য্যাদাটা খোয়াব? এই একটা আপশোষ, নইলে আর কি!

মাতা। আপশোষই বা কিসের? যে দেশে যেমন চল্। আমাদেব দেশে হলে, অবিশ্যি, এটা একটা নিন্দের কথা হত। কিন্তু এদেশে, এরা ত কই ততটা মনে করে না।

পিতা। তা ঠিক। ইংরেজ হল দেশের বাজা, কলকাতা হল তাদের রাজধানী। কলকাতার হাওয়া লেগে এদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে বইকি! নইলে ধর, আমাদের দেশে বামুন কায়েতের ঘরের বিধবারা কি পান খায়, না মাথায় চুল রাখে? এদেশে দেখ বিধবারা দিব্যি চুল রাখছে, খাসা পান খেযে ঠোঁটটি লাল করে বেড়াচ্ছে, তাতে ত কোনও নিন্দে নেই! যস্মিন দেশে যদাচারঃ—কথাটা তুমি নেহাৎ অন্যায় বলনি বটে। আচ্ছা তা হলে চাটুয্যে মশায়ের কাছে কাল কথাটা না হয় পেড়েই দেখি।

মাতা। তবে তোমায় খুলেই বলি। গিন্নির কাছে ওকথা আমি বলেছিলাম। তিনি বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে আমায় বলেছেন যে, "তা যদি হয তা হলে ত খুবই ভাল। কিন্তু মুখুয্যে মশায় হলেন বাঙ্গাল দেশের একটা জাঁদরেল কুলীন, উনি কি আমার ছেলেকে মেয়ে দেবেন?" দিদি আমায় বললেন, "তুমি ভাই তোমাব কর্ত্তাকে বলে কয়ে যদি রাজী করাতে পার, তা হলে আমাদের কোনও আপত্তি হবে না।"

হরবিলাস বলিলেন, "তা হলে ভিতরে ভিতরে কাজটা তুমি অনেকখানি এগিয়ে রেখেছ বল? এতক্ষণ তবে আমার সঙ্গে নখ্‌রা করছিলেন কেন?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "ঐ ছেলেটাকে জামাই করতে যদি তোমার এত সাধ হয়ে থাকে, তবে তাই কর। মেয়ে আমার সুখে থাকলেই হল। না হয় তিন পুরুষ নেমেই গেলাম, তার আর কি করা যাবে। অনেক রাত্রি হল, এখন ঘুমোও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাবতী তার পিতামাতার কথোপকথন, অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে সমস্তটাই শুনিল। শুনিয়া সে মনে মনে বলিল, 'কি মুস্কিল! ওদের নীলু হবে আমার বর? তার সামনে কত হেসেছি, কথা কয়েছি, বাচালতা করেছি, এখন আমি হব তার বউ? সে বাড়ী ঢুকলে, ঘোমটা দিয়ে আমায় পালাতে হবে? কি কেলেঙ্কারী মা, কি কেলেঙ্কারী! প্রথম যখন আমরা এলাম, ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল, তখন মা আমায় বলেছিলেন, নীলুকে তুই দাদা বলবি। আমি বলেছিলাম, "কেন গা, পরের ছেলেকে আমি দাদা বলতে যাব কেন? সে আমি পারবো না।" ভাগ্যিস দাদা বলিনি! ওমা, যাব কোথা? কি ঘেন্না মা, কি ঘেন্না! তা, এরা ত একরকম সব ঠিকঠাক করেই ফেলেছেন দেখছি। আমাকে নীলুর পছন্দ হবে ত? সে যদি তার মা-বাপকে বলে, ও মেয়ে আমার পছন্দ নয়—ওকে আমি বিয়ে করতে চাইনে। তখন কি হবে? এক ছেলে সোমত্ত ছেলের কথা কি মা-বাপ ঠেলতে

পারবেন? কিন্তু, পছন্দ বোধ হয় হবে তার আমাকে। হ্যাঁগা, আমি ত আর কালো কুচ্ছিৎ নই। ওর গায়ের রঙের চেয়ে আমার রঙ ত অনেক ফর্সা। তবে আমি লেখা পড়া জানিনে, মুখ্যু, এই যা বল। এদেশের মত, আমাদের দেশে মেয়েছেলের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ত এখনও হয়নি! হলে, এতদিন আমি বা কোন্ দু চারখানা বই না পড়ে ফেলতাম। তার যদি ইচ্ছা হয়, বিয়ের পর আমায় শেখালেই পারবে—কেন মানা করছে বাপু?"

'বরের' কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া, স্বপ্ন দেখিল, বর যেন ঘোমটা খুলিবার জন্য তাহাকে কত সাধ্য-সাধনা করিতেছে—আর সে যেন বলিতেছে—"ও কি নীলু, ছি! কি ছেলেমানুষী করছ তুমি? কনে বউকে, বরের সাক্ষাতে কি ঘোমটা খুলতে আছে? দাঁড়াও আগে বড় হই, তারপর তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো।'

ঘুম ভাঙ্গিলে, এই স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া প্রভার বড়ই হাসি পাইল। ভাবিল, "স্বপ্নে বরকে বলেছি 'ছি নীলু!' বরকে কি মানুষ নাম ধরে ডাকে? আমি যেন কী!"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যথা সময়ে হরবিলাস কথা পাড়িলেন। তিনি আহ্লাদের সহিত সম্মতও হইয়াছেন, তবে এখন অকাল চলিতেছে, সেই বৈশাখের পূর্ব্বে আর বিবাহের দিন নাই।

নীলুর সহিত প্রভার বিবাহ হইবে, একথা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। প্রভা আর নীলুর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে না; এমন কি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। হঠাৎ উভয়ে চোখাচোখি হইয়া গেলে, নীলু একটু মুচকি হাসে, প্রভা ব্যস্তভাবে সেখান হইতে পালাইয়া যায়।

বিবাহের এখনও ৭।৮ মাস বিলম্ব থাকিলেও উভয় পরিবারে এখন হইতেই বেয়ান বেয়ান সম্বোধন প্রচলিত হইয়াছে। পূজার সময় প্রভার মা তাঁর হবু জামাইকে ধুতি চাদর ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া তত্ত্ব করিলেন। পরদিন, ও বাড়ী হইতে প্রভার জন্যও তত্ত্ব আসিল।

ক্রমে বিজয়ার দিন আসিল। সারাদিন প্রভার মনে এই কথাটাই তোলপাড় করিতে লাগিল—"সন্ধ্যার পর যখন ও-বাড়ীতে প্রণাম করতে যাব, আর সকলকে ত প্রণাম করব? তাকেও প্রণাম করব কিনা? যদি তাকে প্রণাম করি, তবে কি সেটা আমার বেহায়াপনা হবে? যদি না করি, সেটাই বা কেমন দেখায়?" এক একবার মনে হইতে লাগিল, যাই মাকে কথাটা না হয় জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখি, তিনি যে রূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন সেইরূপই করা যাইবে। কিন্তু লজ্জায় বাধিল; মাকে প্রভা একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর মার সঙ্গে প্রভা ও বাড়ীতে প্রণাম করিতে গেল। নীলু বাড়ী নাই, উভয়-সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে, আরামের শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তথায় বিজয়াকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল—"আজকের দিনে তাঁকে একটি প্রণাম করা হল না!" বাড়ী ফিরিয়াও মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়াতে তাহার বুকের ভিতরটা খচ খচ করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সারদাসুন্দরী পাড়ার অপর কয়েকজন 'গিন্নীবান্নির' সহিত ও-পাড়ার পুরোহিত ঠাকুরের বাড়ী বিজয়া করিতে গেলেন। পরিষ্কার চাঁদনি রাত্রি। প্রভার পিতাও কাঁধে চাদর ফেলিয়া ছড়িহস্তে বাহির হইলেন। বাড়ীতে রহিল কেবল প্রভা আর তার মামী ঠাকুরাণী।

প্রভা মামীর ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল, কি একটা প্রয়োজনে নিজেদের শয়ন-ঘরে আসিল। তাহা সারিয়া মামীমার ঘরে যাইবার জন্য যেই দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়াছে, অমনি জোৎস্নালোকে দেখিল—সম্মুখে তার বর। দেখিয়াই সে ব্যস্তভাবে মাথায় ঘোমটা দিতে হাত উঠাইল, কিন্তু দুষ্ট নীলু খপ করিয়া তাহার হাতখানি

ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আর ঘোমটা দেয় না! এখানে কে আছে? আগে আমার সঙ্গে কত হাসতে, গল্প করতে সে সব ত বন্ধই করেছ। ইদানীং এমনই ডুমুরের ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছ যে, মুখখানি দিনান্তে একবার দেখতেও পাইনে। আজ বছবকাব দিনেও একটি বার দেখবো না?"

প্রভা লজ্জায় রাঙা হইয়া চুপি চুপি বলিল, "হাত ছাড় না, ও কি?"

নীলুও নিম্নস্বরেই বলিল "ছাড়বই বা কেন? যার যা জিনিস, সে কি তা ছাড়ে?" বলিয়া প্রভার অপর হস্তটিও ধারণ করিয়া প্রভাকে নিজের দিকে টানিল।

প্রভা যেন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িল, তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। অশিষ্ট বালক, তাহাকে নিজ বক্ষে জড়াইয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিল!

প্রভার তখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে গলায় আঁচল দিয়া, হাঁটু গাড়িয়া বসিযা, নীলমাধবকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইল।

নীলু তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বেঁচে থাক, সুখে থাক। তোমাব মা বাপকে প্রণাম করতে এসেছিলাম, কিন্তু তারা ত বাড়ী নেই, ফিরে এলে তাঁদের বোলো যে, আমি এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে তবু বিজযাটা হল। কিন্তু দেখ প্রভা, মা দুর্গা দয়া করেন, আসছে বছর তোমার আমার বিজয়া কিন্তু এরকম উঠানে দাঁড়িয়ে আর নয়! কি বল?" মৃদু হাসিয়া আদরে প্রভার চিবুক স্পর্শ করিল।

তারপর বলিল "পোড়া বোশেখ মাস যে কবে আসবে তা জানিনে! একটা কথা বলে যাই—মাঝে মাঝে দেখা দিতে কৃপণতা কোর না। যেদিন তোমাব মুখখানি একটি বারও না দেখি, সে দিনটা যেন অন্ধকার বলে মনে হয। আচ্ছা এখন তবে আসি!" বলিয়া নীলু চলিয়া গেল।

মামীমা তাঁহার অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যটি আগাগোড়া দেখিযাছেন, কিন্তু কথোপকথন শুনিতে পান নাই। আপন মনে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওমা! এ যে দেখচি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এখনও ত বাপু বিয়ে হযনি—এরই মধ্যে এত! আব ছুঁড়িটা ত বেহায়া কম নয়। কালে কালে এ সব হল কি? দুর্গা দুর্গা।"

সারদাসুন্দরী বাড়ি ফিরিলে, মামীমা গোপনে তাঁহার নিকট এ ব্যাপারটি বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া, সারদাসুন্দরী হাসিলেন। রাত্রে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মনে মনে আশীর্বাদ কবিতে লাগিলেন—"ঐ স্বামী নিয়ে তুমি চিরসুখী হও মা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এবার শীতটা খুব প্রবলভাবেই পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণের হিম লাগিয়া অনেকের সর্দ্দি কাসি হইতে লাগিল, এবং কেহ কেহ জ্বরেও পড়িতে লাগিল; কিন্তু সে ম্যালেরিয়া নহে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার নামও তখন কেহ শোনে নাই।

একদিন সংবাদ আসিল, নীলুর জ্বর হইয়াছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি কাসি খুব প্রবল। প্রথমে নীলুর পিতা মাতা এটাকে বিশেষ কিছু একটা বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু তিন দিন জ্বর ছাড়িল না দেখিয়া ভীত হইয়া চতুর্থ দিন কবিরাজ ডাকিলেন।

প্রবীণ কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে, তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটা সাংঘাতিক সংবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন, "জ্বর আর দিন দুই তিনে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি; কিন্তু ছেলেটিব দেহে যক্ষ্মাকাসের সূচনা হয়েছে।"

কি সর্ব্বনাশ! শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে, গৃহিণীকেও তিনি বিষয় অবগত করাইলেন। প্রভার পিতামাতাও শুনিলেন।

সকলেই মহা চিন্তিতভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জ্বর তখনকার মত বন্ধ হইল বটে; কিন্তু কাসিটুকু থাকিয়া গেল। মাঝে মাঝে বাড়ে, মাঝে মাঝে কমে। যখন বাড়ে তখন আবার জ্বর হয়; কমিলে জ্বর ছাড়িয়া যায়। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এইরূপ ক্রমে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল।

একদিন রোগের চিকিৎসান্তে কবিরাজ মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কর্ত্তা মহাশয়কে বলিলেন, "চাটুয্যে, তুমি হরবিলাসের মেয়েটার সঙ্গে নীলু বাবাজীর বিয়ে দেওয়া স্থির করেছিলে নয়?"

"হ্যাঁ, আসছে বৈশাখ মাসে ত বিয়ে হবার কথা আছে।"

"অমন কাজটি কোরো না। নীলুর এ রোগ, নির্দ্দোষ হয়ে কোনও দিন সেরে যাবে, এ আশা নেই। তবে খুব সাবধানে থাকলে, কিছুদিন ছেলে বাঁচতে পারে। ওর বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্প মন থেকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও। আমার কথার মর্ম্মটা তুমি বুঝতে পেরেছ?"

কর্ত্তা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ তা বুঝেছি।"

ক্রমে হরবিলাসও একথা শুনিলেন। নীলুর আশা ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তা গিন্নীতে পরামর্শ করিয়া, মেয়ের জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। চৈত্র মাসে বকুলগ্রামে একটি পাত্র স্থির হইল। কথাবার্ত্তাও ঠিক হইয়া গেল, বৈশাখের মাঝামাঝি বিবাহ হইবে।

বৈশাখের আরম্ভেই নীলু আবার জ্বরে পড়িল। কবিরাজ মহাশয়ের যথাসাধ্য চিকিৎসাতেও এবার রোগের কোনও উপশম দেখা গেল না। কবিরাজ মহাশয় গোপনে চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, "এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার!" রোগ বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে।

১০ই বৈশাখ, কবিরাজ মহাশয়ের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে হরবিলাস তাঁহার রোগীর অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "শিবের অসাধ্য। আর বড় জোর এক সপ্তাহ মেয়াদ।"

১৭ই বৈশাখ প্রভার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছিল। হরবিলাস আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন—বিবাহের দিন মাসখানেক পিছাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ সেই সময় যদি ও-বাড়িতে কিছু হয়,—এ-বাড়িতে শানাই বাজাইয়া বিবাহের উৎসব বড়ই খারাপ দেখাইবে।

প্রভা, একথা শুনিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মাকে গিয়া বলিল, "মা, আমার বিয়ের দিন পিছিয়ে দেবার দরকার নেই। ঐ তারিখেই আমার বিয়ে দাও। আর, বকুলগ্রামে নয়—ঐ পাত্রের সঙ্গেই।"

মা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা পাগলী? যে সে মরতে বসেছে।"

প্রভা বলিল, "তা হোক!"

"তা হোক কি লা? বিয়ের পর তেরাত্তির পোয়াতে না পোয়াতেই যে বিধবা হবি!"

প্রভা বলিল, "তাই যদি আমার কপালে থাকে মা, তবে হব। অন্য কারুকে বিয়ে করার চেয়ে, আমি তার বিধবা হয়ে থাকবো সেও আমার ভাল।"

"সে কি? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনিও নি বাছা!"

প্রভা বলিল, "বিধবা হওয়াই যদি আমার অদৃষ্টে থাকে মা, তবে যেখানেই তোমরা আমায় বিয়ে দাও না কেন, অদৃষ্ট কি খণ্ডাবে?"

মা বলিলেন, "তা নয় বটে। তবে কেউ দশ বছর কেউ বিশ বছর সধবা থেকে, ছেলেপিলের মা হয়ে সংসার-ধর্ম্ম করে বিধবা হয়, তুই যে সদ্য সদ্যই হবি।"

"হই হব মা। তুমি যদি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে না দাও তাহলে এ প্রাণ আমি রাখবো না।"

মা বলিলেন, "কার কপালে কি আছে তা কেউ বলতে পারে না। ও ছেলে যদি বাঁচেও তা হলে বিয়ে দিতে কবিরাজ মানা করেছে, শুনিসনি?"

প্রভা বলিল, "জানি, সবই আমি শুনেছি, বুঝেছিও—তিনি ত বলেননি যে বিয়ের মন্ত্র পড়লেই তার মৃত্যু হবে।"

মা বলিলেন, "তা নয় বটে। তা হলে, জীবনে তোর ছেলেপুলে আর হবে না।"

প্রভা বলিল, "তা, না হোক।"

মা কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "আচ্ছা কর্ত্তা কি বলেন দেখি।"

প্রভা বলিল, "বলাবলি নয় মা। আমি আজ থেকে উপবাস শুরু করলাম। একদিন—দুদিন—তিনদিন—উপবাসেও মানুষ মরে না। বেশি দিন হলে মরে। মা, তুমি সতীলক্ষ্মী—তোমার পা ছুঁয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম, ওর সঙ্গে বিয়ে হবাব দিন ভোরবেলা আইবুড়ো ভাত খাব—তার আগে আমি জল-গ্রহণ করবো না"—বলিয়া প্রভা হাঁটু গাড়িয়া জননীর পদযুগল স্পর্শ করিল।

সারদাসুন্দরী স্বামীকে গিয়া সকল কথা বলিলেন।

হরবিলাস মেয়েকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, নীলু ভাল হয়ে উঠুক। ওরই সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো—তুই এখন জল খা।"

প্রভা পিতার পা ধরিয়া বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না বাবা!"

হরবিলাস অবশেষে হতাশ হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহা বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "এ যে প্রায় সত্যযুগের কথার মত শোনাচ্ছে হে! কে এরা? আর জন্মের স্বামী-স্ত্রী নাকি?"

হরবিলাস বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন!"

বৈশাখ মাস ভরাই প্রায় বিবাহের দিন ছিল; পরদিন বেশ প্রশস্তই ছিল। সমারোহে নয়—চোখের জলের মধ্যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর, শ্বাশুড়ী সজল-নেত্রে মস্তকে দুর্ব্বা সহযোগে আশীর্ব্বাদ করিবাব সময় শুধু এইমাত্র বলিলেন, "সাবিত্রী যেমন যমের মুখ থেকে তাঁর স্বামীকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন, তুমিও যেন তাই করতে পার মা।"

পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাহের পর হইতে নীলমাধব একটু একটু করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। মাসখানেক মধ্যেই সে বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সকলেরই ইহাতে অবিমিশ্র আনন্দ, কেবল কবিরাজ মহাশয়ের আনন্দেব সঙ্গে বিস্ময় মিশ্রিত ছিল। তিনি কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নহে, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একদিন তিনি হরবিলাসের বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমার মেয়ের কুষ্ঠী আছে?"

হরবিলাস বলিলেন, "আমাদের ও অঞ্চলে মেয়েছেলের কুষ্ঠী আর কে তৈরি করায়!"

"ঠিকুজী আছে?"

"হ্যাঁ, তা আছে। কেন বলুন দেখি?"

"ঠিকুজী হলেও চলবে। সেখানি আমায় এনে দাও, ভায়া। আমি তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কিছু গণনা করতে চাই।"

হরবিলাস ঠিকুজীখানি আনিয়া কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে দিলেন।

সপ্তাপরে ঠিকুজীখানি লইয়া আসিয়া কবিরাজ বলিলেন, "তোমার কন্যার বৈধব্য যোগ নেই। সে আমরণ সধবা। আমার ওষুধের গুণে নয়, তোমার মেয়ের এয়োতের জোরেই নীলু বেঁচে উঠেছে।"

কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা কিন্তু সমানেই চলিতে লাগিল। ছয় মাস পরে তিনি

বলিলেন, "এখন আর কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু এখনও দু-এক বৎসর স্বামী স্ত্রীতে আলাদা থাকতে হবে।"

নীলু আবার স্কুলে যায়। পরবৎসর সে থার্ড ক্লাসে উঠিল। তাহার পিতার মামাশ্বশুর রেল বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তাহার সাহায্যে সে একটি স্টেশনের কার্য্য পাইয়া বিদেশে চলিয়া গেল। আর এক বৎসর পরে স্ত্রীকে নিজ কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইল।

প্রভা চিরায়ুস্মতীই রহিল। ৪৭ বৎসর বয়সে, স্বামীব কোলে মাথা রাখিয়া, পুত্র-কন্যাগণকে পাশে বসাইয়া সে সতীলোকে যাত্রা করিয়াছিল।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩৩২]

বিলাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

"সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, লোটা কম্বল লইয়া, সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়েই আশ্রয় গ্রহণ করিব? না, ভোজালীর আঘাতে বা পিস্তলের মুখে দুশ্চারিণী কুলকলঙ্কিনীর সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠ আলিঙ্গনে হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা চিরতরে জুড়াইব?—ইহাই হইয়াছে এখন ব্রজমাধববাবুর প্রবল চিন্তা।

হায় সেদিন, আর এদিন! সেই, একুশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পিতৃ-অনুরোধে সবান্ধবে "কনে দেখিতে" যাওয়া! মনে বড়ই আশঙ্কা ছিল, কনেটি পাছে নিতান্ত নাবালিকা হয়, দেখিতে "গৃহস্থ ঘরের পাঁচ-পাঁচি"র মত হয়, প্রশ্নের উত্তরে পাছে বলে, "আমি দুতিয়ে ভাগ পড়ি।" ধনী ভাবী শ্বশুরের সেই সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে সুখাসনে বসিয়া, অধীর প্রতীক্ষা—পরে কক্ষমধ্যে সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত, চতুর্দ্দশ বসন্তের সেই একগাছি মালার মত কন্যার সহসা আবির্ভাব, চারি চক্ষুর সেই প্রথম মিলন—কি অশুভক্ষণেরই সে মিলন! তারপর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হেম-নবীন-রবির কবিতা-আবৃত্তি! শ্রবণ-নয়ন সেদিন কি পীযুষ ধারাতেই অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর সেই পরিণয়োৎসব—দুই দিন পরে, মধ্যরাত্রে সুবাসিত কুসুমসমাকীর্ণ সুমনোহর শয্যামধ্যে সেই প্রথম মিলন! তখন ব্রজমাধববাবুর মনে হইয়াছিল জীবনের বাকি সারাটা পথই বুঝি এই মতই কুসুমাস্তীর্ণই রহিবে—এই সৌরভময়ী লাবণ্য সরসীতে সন্তরণ করিয়াই জীবনটা বুঝি কাটিবে। সেদিন কে জানিত যে, এমন দিনের মুখও আবার দেখিতে হইবে!

আশা ত অনেকই ছিল, কোনটাই বা পুরিয়াছে? ব্রজমাধববাবুর পিতা, বয়সে প্রবীণ হইলেও, নিতান্ত সেকেলে লোক ছিলেন না। বৈবাহিক নিজ ব্যয়ে জামাতাকে বিলাত পাঠাইয়া, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে তাহার পাঠ সমাপন করাইয়া, ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবেন, হাইকোর্টে প্রথম কয়েক বৎসর অর্থানুকূল্যে তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবেন, এই আশাতেই এখানে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর ছয় মাস কাটিতে না কাটিতেই, সহসা হার্টফেল হইয়া তাঁহার মৃত্যু—তারপর প্রকাশ হইল, নিজ পুত্রগণের তরুণ স্কন্ধে তিনি চাপাইয়া গিয়াছেন—লক্ষাধিক টাকার ঋণ! ব্রজমাধববাবুর আশা ভরসা সমস্তই ফর্সা হইয়া গেল। কোথায় তিনি হইবেন চৌরঙ্গি বা অন্ততঃ বালিগঞ্জ-বিলাসী ব্যারিষ্টার, নিজস্ব মোটরগাড়ীতে বসিয়া হাইকোর্টে আসিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে বার-লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবেন, না, তিনি হইয়াছেন আসিয়া দেড়শত মুদ্রা বেতনে বেসরকারী কলেজের বিনয়নম্র অধ্যাপক! ট্রাম আরোহণে কলেজে যান—ফিরেন পদব্রজে। শ্যামবাজারে

একটি গলির ভিতর তাঁহার বাসা; ঝি পাছে পয়সা চুরি করে বলিয়া, প্রতিদিন প্রাতে স্বহস্তে বাজার করিয়া থাকেন। পুত্র কন্যা জন্মে নাই তাই রক্ষা! নহিলে কলিকাতা সহরে এই অল্প বেতনে, গ্রাসাচ্ছাদনে নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন হইত।

আজ রবিবার, কলেজ নাই। স্ত্রীও গৃহে নাই—ভবানীপুরে, তাহার পিত্রালয়। নিম্নতলে নির্জ্জন বৈঠকখানায় বসিয়া ব্রজমাধববাবু অপার চিন্তাসাগবে নিমগ্ন। "খুন? না সন্ন্যাস অবলম্বন? কি করি? এ অবস্থায় কি করা উচিত? কি করা কর্ত্তব্য?" এটা তিনি স্থির করিয়াছেন, ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া বসিবেন না—যাহা করিতে হয়, বেশ ধীরভাবে, ঠাণ্ডা মাথায়, ভাবিয়া চিন্তিয়া—তারপর।

সহসা ব্রজমাধববাবু ডাকিলেন, "ঝি।"

ঝি কলতলায় বাসন মাজিতেছিল; উত্তর দিল, "কেন বাবু?"

"একবার এদিকে এসো ত।"—বলিয়া ব্রজবাবু এক টুকবো কাগজে কি লিখিতে লাগিলেন।

ঝি বাসন মাজা ফেলিয়া রাখিযা, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া বস্ত্রাঞ্চলে হাত মুছিতে মুছিতে বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবেশ করিল। ব্রজবাবু তাহার হাতে কাগজখানি দিযা বলিলেন, "ঐ যে ১৮ নম্ববে উকীল বিপিনবাবু থাকেন, তাঁর কাছে চিঠিখানা নিয়ে যাও ত! একখানা বই দেবেন, নিয়ে এস।"

ঝি চিঠি লইয়া প্রস্থান করিল। পাঁচ সাত মিনিট পবেই, চামড়ায বাঁধা একখানা মোটা বহি আনিয়া প্রভুর টেবিলের উপব বাখিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

বহিখানি, "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন।" ব্রজবাবু সেখানি খুলিয়া তাহাব সুদীর্ঘ সূচীপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে, যে পৃষ্ঠায় নবহত্যা অপবাধেব বর্ণনা আছে, সেই পৃষ্ঠা খুলিযা অভিনিবেশ সহকাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। জটিল বিষয, অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠ কবিলেন। আইনজ্ঞ নহেন, তাঁহাব ধারণা ছিল, অসতী স্ত্রীকে হত্যা কবিলে ফাঁসি ঠিক নহে। 'হাতে-নাতে' ধরিয়া তদ্দণ্ডে খুন করিলে ফাঁসি হয় না বটে, অন্যথায হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজিব রহিয়াছে, মোহন নামে এক ব্যক্তি তাব স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাহাকে ধরিবার অভিপ্রাযে, রাত্রে শয্যায় নিদ্রাব ভান করিয়া পড়িয়া ছিল। অনেক রাত্রি হইলে, স্ত্রী ধীবে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিল, দ্বারের অর্গল সন্তর্পণে মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইল। মোহনও উঠিল। ঘবে একখানা কুড়াল ছিল, তাহা হাতে লইয়া, একটু দূরে থাকিয়া, প্রায়ান্ধকার পথে অভিসাবিকার অনুসরণ করিল। স্ত্রী, নির্জ্জন রাজপথ বাহিয়া, কিছু দূরে গেল। ফকির উদ্দিন নামক এক ব্যক্তি, এক স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল; স্ত্রীলোকটা সেখানে দাঁড়াইয়া, তার সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা কহিতে লাগিল। মোহন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, আত্মসম্ববণে অক্ষম হইয়া, দুই তিন লম্ফে সেখানে উপস্থিত হইয়া, মোসম্মাতের মস্তকে সজোরে কুঠারাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীর জীবনলীলা সাঙ্গ। মোহনের ফাঁসি হইয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল আইন পাঠ করিয়া, ব্রজবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহিখানি বন্ধ করিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া সেখানি যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাপারটা এই, ব্রজমাধববাবুর স্ত্রী উষারাণী, আবাল্য ধনী পিতার গৃহে প্রতিপালিত হওয়াতে, একটু অতিরিক্ত রকম সৌখিন হইয়া পড়িয়াছিল। বসন-ভূষণ, প্রসাধন দ্রব্য খুব উচ্চমূল্যের না হইলে তার মনেই ধরিত না। তাহা ছাড়া, সাধারণ হিন্দু কুলবধূর ন্যায় "জুজুবুড়ী' হইয়া গৃহকোণে আবদ্ধ থাকা, অথবা বাহির হইলে দেড় হাত ঘোমটা দিয়া সসঙ্কোচ পদবিক্ষেপ তাহার মোটেই পছন্দ হইত না। থিয়েটার, বায়োস্কোপ,

এগজিবিশন প্রভৃতি দেখিতে সে বড়ই ভালবাসিত এবং তাহার ইচ্ছা হইত, বিলাতফেরতেরা যেমন সস্ত্রীক প্রকাশ্য ভাবে ঐ সকল স্থানে গিয়া থাকেন, সেও স্বামীর সহিত সেইভাবে অবাধে সঞ্চরণ করে। কিন্তু ব্রজমাধববাবুর সেটা আদৌ পছন্দসই ছিল না। তিনি বলিতেন, "আমি ত বিলাতফেরৎ নই যে তোমাকে মেম সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়াব!"—এই কারণে উষা অসন্তোষে কাল যাপন করিত। এবং ঐ সকল স্থানে যাইতে হইলে, স্বামীর সঙ্গে না গিয়া, নিজ দলভুক্ত সখীগণের সাহচর্য্যে যাওয়াই পছন্দ করিত।

মধ্যে তিন মাসের জন্য ব্রজমাধববাবুর একটি মোটা রকম টিউসনি জুটিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষার্থী এক ধনী সন্তানকে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পড়াইতে হইত। অভাবের তাড়না, অতি আগ্রহের সহিতই এ কাজটি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিতে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া যাইত। একদিন বাড়ী ফিরিলে উষা তাঁহাকে বলিল, "ওগো, তোমায় না বলে একটা কাজ করে ফেলেছি। তুমি শুনলে রাগ করবে না বল।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "কি কাজ করেছ আগে বল শুনি, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।"

"আগে বল যে রাগ করবে না।"—আবদারের স্বরে এই কথা বলিয়া, উষা স্বামীর হস্ত ধারণ করিল।

"কোনও দামী জিনিস কিনে ফেলেছ বুঝি?"

এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে। ফলে, মাসের শেষ দিকে, সংসার খরচের টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায়, টাকা ধার করিয়া আনিয়া উষাকে দিতে হইয়াছে।

উষা বলিল, "না, তা নয়!"

"তবে? কোথাও গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। বায়োস্কোপে।"

"কার সঙ্গে? প্রতিমা এসেছিলেন?"

এই প্রতিমা সুন্দরী, উষার একজন বাল্যসখী। তার স্বামী বিলাতফেরৎ না হইলেও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি—সাহেবি চালচলনে দীক্ষিত,—স্ত্রীটিও তাঁর মনের মত। পূর্ব্বে দুই চারিবার প্রতিমা আসিয়া এভাবে উষাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, তাই প্রতিমার কথাই ব্রজবাবুর মনে পড়িল।

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে উষা বলিল, "না, প্রতিমা আসেনি, আমি একলাই গিয়েছিলাম।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "একলা? যদি কোনও বিপদ আপদ হত? যদি কোন অসভ্য লোক, তোমায় কোনও অপমানসূচক কথা বলত?"

উষা হাসিয়া বলিল, "আমরা ত আর ঘোমটা দিয়ে কলাবউটি সেজে বেরুইনে যে বদমাইস লোকে 'মেয়ে-ছেলে' দেখে দুটো ঠাট্টা করে নেবে! আমরা তখন মেম-সাহেব—ভয়ের বস্তু!"

ব্রজবাবু বলিলেন, "তা যাই হোক, আর এমন একলা যেও না।"

উষা বলিল, "আচ্ছা, তা যাব না! এবার মাফ করলে ত?"

"হ্যাঁ, তা করলাম।"

এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা ব্রজবাবু ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহার দেহ অসুস্থ। তাহার নিকট বসিয়া কিয়ৎক্ষণ গল্পস্বল্প করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে একটু কাজ ছিল, উহা সারিয়া যখন বাসায় ফিরিলেন, রাত্রি তখন নয়টা। তিনিও দ্বারের কাছে পৌছিয়াছেন, অমনি একখানি কুঠিয়ালী মোটরগাড়ী আসিয়া তথায় দাঁড়াইল।

ব্রজবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, ইংরাজ বেশধারী এক বাঙ্গালী যুবক মোটর হইতে নামিয়া, এক সুবেশা যুবতীকে অবতরণে সাহায্য করিতেছে। সে যুবতী আর কেউ নহে, তাঁহার

পত্নী উষারাণী। এরূপভাবে একজন পরপুরুষের সহিত স্ত্রীকে মোটরে দেখিয়া, ব্রজবাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল।

ব্রজবাবু স্তম্ভিতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া ইহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল।

উষা নামিয়া, স্বামীকে দেখিবামাত্র তাঁহার পানে চাহিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে কহিল, "এই যে, ভালই হল; তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মিষ্টার লাহিড়ী বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, তিনি ত এখন বাড়ী নেই, আপনি অন্যদিন কোনও সময় বরং আসবেন। তা তুমি এসে পড়েছ ভালই হয়েছে। ইনি আমাদের বেলাদিদিব ভাই— মিষ্টার লাহিড়ী। (লাহিড়ী সাহেবের পানে ফিরিয়া) ইনিই আমার স্বামী, প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি।"

লাহিড়ী সাহেব তৎক্ষণাৎ ব্রজবাবুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "হা-ডু-ডু স্যঃ।"—মুখ হইতে ভখ্ করিয়া একটা মদের গন্ধ বাহির হইয়া ব্রজমাধববাবুব ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিল।

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, "আসুন, মিষ্টার লাহিড়ী, ভিতরে আসুন।"

লাহিড়ী সাহেব অতি ভদ্র ভাষায় ক্ষমা চাহিয়া, ব্রজবাবুর সহিত পুনশ্চ করমর্দ্দন করিযা, উষাব প্রতি "টুপি উত্তোলন" পূর্ব্বক, মোটরে উঠিয়া প্রস্থান কবিলেন।

স্ত্রীসহ ব্রজবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উষা বলিল, "হ্যাঁগা, আজ যে এত শীগগির ফিরলে?"

মনে মনে ব্রজবাবু বলিলেন, "অসুবিধে হল বুঝি?"—প্রকাশ্যে শীঘ্র ফিবিবাব যথার্থ কারণ যা তাই বলিলেন।

স্বামীকে অত্যধিক গম্ভীর দেখিয়া উষা বলিল, "তোমায় না বলে ওদেব সঙ্গে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম তাই তুমি রাগ করেছ? তুমি বেরিয়ে যাবার একটু পবেই, বেলাদিদি এসে উপস্থিত। আমিও কিছুতেই যাব না, তিনিও কিছুতেই ছাডবেন না। শেষে আমি বললাম, দেখ, একলা দুকলা মেয়েমানুষ, বিনা অভিভাবকে এ বকম হটব হটব করে, এখানে ওখানে যাওয়া আমাদের উনি পচ্ছন্দ করেন না। বেলাদিদি বললেন, এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তা হলে কোনও বাধা নেই। আমার মেজদাদা, ক'দিন হল লাহোর থেকে এসেছেন, তিনি বায়স্কোপের ভেষ্টিবুলে আমার অপেক্ষায় থাকবেন, তুমি চল। তাই শুনে আমি গেলাম। বায়স্কোপের পর, বাড়ীতে বেলাদিদিকে নামিয়ে দিযে মিষ্টার লাহিড়ী আমায় পৌছে দিতে এসেছিলেন।"

ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি লাহোরে থাকেন বুঝি? সপরিবাবে?"

"না উনি এখনও অবিবাহিত।"

"কি করেন সেখানে?"

"ব্যারিষ্টারি করেন। খুব রোজগার।"

"ওঃ"—বলিয়া ব্রজবাবু মৌনাবলম্বন করিলেন।

স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া উষাও একটু চটিয়া গেল। এমন কি অপরাধ কবিয়াছে সে, যার জন্য এত? স্বামীর প্রতি অভিমানে দিন দুই উষা ভাল করিয়া কথা কহিল না।

কয়েকদিন পরে, একদিন উষা একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবাব জন্য সাজগোজ করিতেছিল; ব্রজবাবুও যাইবেন, তিনিও বস্ত্র পরিবর্তন করিতে আসিলেন। উষা একটা সুগন্ধির নূতন শিশি খুলিয়া, নিজ বসনে ইচ্ছামত মাখিয়া স্বামীর রুমালে একটু মাখাইয়া দিয়া বলিল, "কেমন সুগন্ধি বল দেখি!"

ব্রজবাবু ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "বাঃ—সুন্দর।" পরে শিশিটি হাতে লইয়া দেখিলেন, গন্ধটির নাম নার্কিস। বলিলেন, "এটা খুব দামী বোধ হয়? কত দিয়ে কিনলে?"

উষা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বড়গুলোর দাম বেশী—এগুলো ছোট, এগুলোর দাম কম।"

"তবু কত?"

উষা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "সাড়ে তিন টাকা।"

ঘটনাচক্রের অদ্ভুত গতি। ইহার দুই দিন পরে, ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া ব্রজবাবু তাহার টেবিলের উপর একশিশি নার্কিস দেখিতে পাইলেন। এ শিশিটি উষার শিশির প্রায় দ্বিগুণ। শিশিটি হাতে তুলিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, "নার্কিস-এর গন্ধটি বড় চমৎকার।"

ছাত্র বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। দামও তেমনি।"

"কত দাম এর?"

"ছত্রিশ টাকা।"

ব্রজবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "অ্যাঁ—বল কি? ছত্রিশ টাকায় এইটুকু এক শিশি এসেন্স?"

ছাত্র বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। যুদ্ধের সময় দাম আরও বেড়ে গিয়েছিল, এখন তবু একটু কমেছে।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আমি ছোট শিশি দেখেছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—ছোট শিশিও আছে, সে একটার দাম চব্বিশ টাকা।"

ব্রজবাবু আর কিছু বলিলেন না। নিজ কার্য্য সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন। নার্কিস বা তাহার মূল্য সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত কোন কথাই কহিলেন না।

মাসের তখন মাঝামাঝি। ব্রজবাবু ভাবিতে লাগিলেন, দেড়শত টাকা মাহিনার গরীব অধ্যাপকের স্ত্রী, চব্বিশ টাকা দিয়া এক শিশি এসেন্স কেনে—এই বা কি রকম কথা! ভাবিলেন, মাসের শেষ সপ্তাহে উষা নিশ্চয় বলিবে সংসার খরচের টাকা ফুরাইয়াছে, আবার কোথাও টাকা ধার করিতে ছুটিতে হইবে।

কিন্তু মাসকাবার হইয়া গেলে, উষা টাকা চাহিল না।

উষা মুখ ভার করিয়া থাকে, স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহে না। মাঝে মাঝে থিয়েটারে যায়, বায়স্কোপে যায়, সব সময় স্বামীকে জিজ্ঞাসাও করে না। কখনও বলে প্রতিমাদির সঙ্গে গিয়েছিলাম, কখনও অন্যান্য সখীর নাম করে। কৈফিয়ৎ দেয়, "তুমি রাত দশটা অবধি বাইরে থাকবে; ঘরে একলাটি আমার কি করে কাটে বল দেখি?" শুনিয়া ব্রজবাবু ভালমন্দ কিছুই বলেন না। তিনিও মুখ ভার করিয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাসখানেক এইভাবে কাটিল। মাতার পীড়া-সংবাদ শুনিয়া উষা কয়েকদিন পিত্রালয়ে গিয়া থাকিতে চাহিল, ব্রজবাবু আপত্তি করিলেন না। উষা ভবানীপুরে যাইবার কয়েক দিন পরে, একদিন প্রাতে ব্রজবাবু অপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা একখানা চিঠি পাইলেন। খুলিয়া পত্রপ্রেরকের স্বাক্ষর অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে কেবলমাত্র লেখা আছে—আপনার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।" বেনামী চিঠিখানাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

মহাশয়,

শুনিয়াছিলাম, ১২ বৎসর মাষ্টারী করিলে, লোকে বুদ্ধি হারাইয়া গর্দ্দভে পরিণত হয়। আপনার মাষ্টারী ত তাহার অর্দ্ধেকও হয় নাই—তথাপি আপনার এ দুরাবস্থা কেন?

চোখে কি কিছুই দেখিতে পান না? আপনার রসবতী বিলাসিনী পত্নী এত যে লীলাখেলা করিতেছেন, কিছুই কি বুঝিতে পারেন না?

তিনি থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপ দেখিয়া বাড়ী ফিরিলে, আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত,

"কি অভিনয় দেখিলে বল দেখি?"—তিনি যাহা উত্তর করিবেন, তাহা আপনার যাচাই করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সে চুলোয় যাক। তাঁহার হাতে যদি চব্বিশ টাকা মূল্যের ছোট এক শিশি নার্কিস দেখেন, অথবা তাঁহার পরিধানে যদি ষাট টাকা জোড়ার একখানা বেলডাঙ্গায় শাড়ী দেখেন, অথবা তাঁহার গলায় যদি খোদ হ্যামিল্টনের বাড়ীর সাতশত টাকা মূল্যের একছড়া নেকলেস দেখেন, তবে কি আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে, এগুলি আমি ত তোমায় কিনিয়া দিই নাই, তুমি কোথায় পাইলে?

অধিক আর কিছু লিখিতে চাহি না। চোখ কাণ খুলিযা রাখিবেন এবং ভুলিবেন না যে, বুড়া চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছে, ওরূপ স্ত্রীর সহিত একত্র বাস স-সর্প গৃহে বাস করার তুল্য, এবং আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ যদি দ্বাব (স্ত্রী) পবিত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহাও কর্ত্তব্য।

ইতি—

আপনার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু

পত্রখানা পড়িয়া ব্রজবাবুর দেহের রক্ত যেন টগবগ্ কবিয়া ফুটিতে লাগিল। মাথা বিষম ঘুরিতে লাগিল। ঊষার নিকট ছোট নার্কিসের শিশি তিনি দেখিয়াছেন বটে। সে উহা নিজে কেনে নাই তাও নিশ্চিত। কিনিলে, মূল্য চব্বিশ টাকাব স্থানে সাড়ে তিনটাকা বলিত না ; আন্দাজি বলিয়াছে। কিন্তু কই সে বেলডাঙ্গায় শাড়ী এবং হ্যামিল্টনের বাড়ীর নেকলেস ত ব্রজবাবু দেখেন নাই! আছে, নিশ্চয়ই আছে। যে ব্যক্তি নার্কিসের কথা ঠিক লিখিয়াছে, শাড়ী নেকলেস সম্বন্ধেও তাহার উক্তি ঠিক হওযাই সম্ভব। ঊষাব নিকট এত টাকা নাই যে, সে নিজে ওসব কিনিতে পারে। সুতবাং, বেনামী পত্রোক্ত তাহাব সেই লীলা-সঙ্গীরই ওগুলি উপহার। কে সে ব্যক্তি? সেই হতভাগ্য লাহিড়ীই কি? পত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে, সে যে থিয়েটারে বায়স্কোপে গিয়াছিলাম বলে, তাহা মিথ্যা কথা,—অন্য কোথাও গিয়া তাহার প্রেমাস্পদেব সঙ্গে মিলিত হয়।

ব্রজবাবু মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "স-সর্প গৃহে বাস" উল্লেখ করিয়া পত্রপ্রেবক আমাকে সাবধান করিয়াছে। আমার প্রাণহানি কবাও কি পাপীয়সীর উদ্দেশ্য নাকি? আশ্চর্য্য নহে কারণ লাহিড়ী অবিবাহিত, আমি মরিলেই উহাদের "বিধবা বিবাহ" হইতে পাবিবে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত? উহাকে খুন কবিয়া পাপেব উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া, নিজে ফাঁসি যাইব? না, সন্ন্যাসী হইয়া সংসাবাশ্রম ত্যাগ কবিব? এই সময়ই ব্রজবাবু পীনাল কোড আনাইয়া, খুনের ধাবা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই প্রকার নানা চিন্তায় ব্রজবাবুর দিন কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে কলেজ মহলে সংবাদ রটিল, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপক আবশ্যক, একজন উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া, ব্রজবাবুর মনে হইল, এই কার্য্যটি যদি জোগাড় করিতে পারা যায় তবে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইযা যাইতে পাবে। স্ত্রীকে খুনও করিতে হয় না, নিজেকে সন্ন্যাসীও হইতে হয় না। স্ত্রীকে তাহার পিত্রালযে বাখিয়া, বিলাতে গিয়া, আর না ফিরিয়া আসিলেই হইল।

অনেক সহি সুপারিশ যোগাড় করিয়া, ব্রজবাবু গিয়া বিশ্ববিদ্যালযের কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "এ কাজের উমেদার বড় নেই। দেশ ছেড়ে, স্ত্রী

পুত্র পরিজন ছেড়ে, কেউই চিরদিন বিলাতে গিয়া থাকিতে চায় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন মাত্র অধ্যাপক এই কর্ম্মের প্রার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁকে কথা দিয়েছি যে তাঁকেই পাঠাব। তাঁর নিজের খুবই ইচ্ছে, কিন্তু শুনলাম, এ খবর শুনেই তাঁর স্ত্রীর ফিট হতে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর আত্মীয় স্বজন খুবই বাধা দিচ্ছেন। তাঁর যদি না যাওয়া হয় তবে আপনাকেই পাঠাতে প্রস্তুত আছি।"

ব্রজবাবু মনে মনে বলিলেন, "আমার স্ত্রীর ফিট হবে না।" প্রকাশ্যে, কর্ত্তা মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

পরদিনই কর্ত্তা মহাশয় ব্রজবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রজবাবু তৎসমীপে উপস্থিত হইলে বলিলেন, "সে ভদ্রলোকের যাওয়া হল না। আপনি রাজী ত?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কবে যেতে হবে?"

"যত শীঘ্র পারেন। পরশু বিলাতী মেল কলকাতা থেকে রওনা হবে। এত শীঘ্র বোধ হয় আপনি পেরে উঠবেন না। তারপরের মেলে, অর্থাৎ আজ থেকে ন দিন পরে যাত্রা করতে পারবেন ত?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয় পারবো।"

কোথায় গেলে ব্রজবাবু নিয়োগপত্র ও পাথেয় প্রভৃতির জন্য অর্থ পাইবেন ইহা বুঝাইয়া দিয়া কর্ত্তা মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলেন।

ব্রজবাবু, সাহেব বাড়ীতে গিয়া সুট প্রভৃতির ফরমাস দিলেন। তারপর স্ত্রীকে আনিতে ভবানীপুরে লোক পাঠাইলেন। তাকে সকল কথা জানাইয়া, তাহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া জন্মশোধ বিদায় লইতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন উষা স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিল। বেলা তখন ১২টা। স্বামীকে গৃহে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি কলেজ যাওনি?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "না। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।"

উষা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "শেষ হয়েছে কি রকম?"

ব্রজবাবু তখন বিলাতে তাঁহার চাকরি গ্রহণের কথা বলিলেন।

উষা বলিল, "সে কি! ভিতরে ভিতরে এই সব তুমি ঠিক করে ফেলেছ? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?"

ব্রজবাবুর মুখমণ্ডলে ক্ষণকালের জন্য একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। তারপর তিনি বলিলেন, "এটা ত হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিনা! এ যুগে ত স্বামী-স্ত্রী আর পরস্পরের অধীন নয়!"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ স্ত্রী, নিজের ইচ্ছা অনুসারে যা খুসী তাই করতে পারে, স্বামীর তাতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই ; আর স্বামীও, নিজের ইচ্ছা মত কাজ করতে পারে, স্ত্রীর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।"

উষা কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরে, শ্লেষের স্বরে বলিল, "এতটা উদার হয়ে উঠলে, বিলেত যাবার নামেই?"

ব্রজবাবু সেইরূপ স্বরে উত্তর করিলেন, "যাদের বিলেত যাবার নামগন্ধও হয়নি, তারাও ত কত লোকে এই রকম উদার মত পোষণ করে!"

উষা বলিল, "কথাটা কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা হল?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "যা বোঝ তুমি!"

এ কথা শুনিয়া উষার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া, জানালার কাছে গিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজবাবু মনে মনে বলিলেন, "ষ্টেজে যেও—প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হতে পারবে তুমি।" কিন্তু এক কালের মমতা, ধীরে ধীরে স্ত্রীর দিকে অগ্রসরও হইলেন। মুখ হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "তা, এত কান্না কিসের?—এস এস, ধীরভাবে কথাটা আলোচনা করা যাক।"

উষা কিন্তু সহজে আসিল না। অনেক সাধ্যসাধনা করিতে হইল।

অবশেষে দুইজনের "ধীরভাবে" কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

ব্রজবাবু বলিলেন, "আর এক হপ্তা মাত্র ত আমি দেশে আছি। আমি চলে গেলে, তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে থাকবে ত?"

উষা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়ে বলিল, "না।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "তবে? কোথায় থাকতে চাও তুমি?"

"কোথাও থাকতে চাইনে।"

"বুঝলাম না।"

"হয় আমি তোমার সঙ্গে যাব, নয় তোমাকেও যেতে দেব না। রেখে দাও তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের থিওরি। ও থিওরির মাথায় মারি আমি—যা দিয়ে ঘরঝাঁট দিই তাই।"

ব্রজবাবু একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। মৌখিক স্বামী-বিচ্ছেদবেদনা দেখাইয়া, স্বৈরিণীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দকে ঢাকিয়া রাখার অভিনয় বলিয়া ত ইহা বোধ হইতেছে না। তাই তিনি বলিলেন, "হয় আমার সঙ্গে তুমিও বিলাতে যাবে, নয় আমাকেও যেতে দেবে না এই তোমার ইচ্ছা? কথাটা কি সত্য, উষা?"

উষা বলিল, "আমাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করার, তোমার কি কোনও কারণ ঘটেছে?"

ব্রজবাবু বলিয়া ফেলিলেন, "ঘটেছে। ভেবে দেখ, এই দু তিন মাসের মধ্যে তুমি কি আমাকে অনেকগুলো মিথ্যা কথা বলনি?"

একথা শুনিয়া উষা একটু দমিয়া গেল। সে নতমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্প্রতি স্বামীর নিকট কি মিথ্যা সে বলিয়াছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, "বল বল, চুপ করে রইলে কেন?"

উষা ভীতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, দুই-একটা বলেছি বোধ হয়।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "বলেছ। আচ্ছা, এখন আমি তোমায় যা যা জিজ্ঞাসা করবো, সমস্ত কথার সত্যি উত্তর দেবে কি?"

উষা বলিল, "দেবো। তুমি জিজ্ঞাসা কর আমায়।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "সে দিন তুমি আমায় একটা গন্ধ দেখিয়েছিলে তার নাম নার্কিস। সেটার দাম কি সত্যি সাড়ে তিন টাকা?"

উষা অবনত মুখে বলিল, "না, তার দাম ২৪ টাকা।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আচ্ছা বেশ। এবার সত্যি কথা বলেছ। আচ্ছা, তোমার এমন কোনও কাপড় গহনা আছে কি, যা আমি তোমায় দিইনি, এমন কি দেখিনি পর্য্যন্ত?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ, আছে।"

"দেখাবে সে সব আমায়?"

"আচ্ছা দেখাচ্ছি।"—বলিয়া উষা উঠিয়া, তাহার কাপড়ের আলমারি খুলিয়া, একখানি সুন্দর সাচ্চা জড়িপাড় শাড়ী বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "আমার এই শাড়ী খানি তোমায় এখনও দেখাইনি।"

ব্রজবাবু সেখানি স্পর্শও করিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাকার শাড়ী এ?"

"বেলডাঙ্গার?"

"দাম কত?"

"এখানির দাম ত্রিশ টাকা।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "হুঁ। আর কিছু আছে? গহনা-টহনা?"

"আছে। তাও দেখাচ্ছি।"—বলিয়া ঊষা তাহার গহনার বাক্স হইতে হরতন আকারের একটা মখমলের কেস বাহির করিয়া আনিয়া, উহা খুলিয়া, স্বামীর সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। সূর্য্যালোকে জড়োয়া নেকলেস ঝকমক করিয়া উঠিল। ব্রজবাবু স্পর্শ করিলেন না, তবে লক্ষ্য করিলেন, ডালার ভিতর-অংশে সোনার অক্ষরে হ্যামিল্টন কোম্পানির নাম লেখা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর দাম কত?"

ঊষা অসঙ্কোচে বলিল, "৭০০ টাকা।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "হুঁ—আর কিছু নেই বোধ হয়?"

ঊষা বলিল, "না আর আমার এমন কিছু নেই, যা তোমার কাছে লুকোনো।"

উভয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব। তারপর ঊষা বলিল, "তুমি আমায় যা কথা জিজ্ঞেস করলে, আমি সব সত্য উত্তর দিলাম। এখন তুমি আমার একটি কথার সত্য উত্তর দাও।"

"বল।"

"আমার এ কাপড় গহনা এসেন্স সম্বন্ধে, এ রকমভাবে তুমি আমায় জেরা করলে কেন?"

ব্রজবাবু নিজ পকেট হইতে সেই বেনামী চিঠিখানা বাহির করিয়া, ঊষার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানি পড়ে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে। আর, কেন যে তোমায় ছেড়ে আমি বিলেতে যাচ্ছি, তাও বুঝতে পারবে।"

ঊষা একনিঃশ্বাসে পত্র পাঠ করিয়া, সেখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে বসিল। ব্রজবাবু হতভম্ব হইয়া এই দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, ঊষা ক্রন্দনের স্বরে কহিল, "ঠিক হয়েছে, আমার উপযুক্ত শাস্তি আমি পেলাম। স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা বলা, স্বামীকে লুকিয়ে কাজ করার শাস্তি যে এত বড়, তা কিন্তু আগে আমি বুঝতে পারিনি। সে যা হয় হোক। এখনই—শীগগির একখানা ট্যাক্সি আনাও। তুমিও আমার সঙ্গে চল ভবানীপুর। এই গহনা, কাপড়, আর গন্ধ মাকে দেখিয়ে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, এসব আমি কোথায় পেয়েছি। আর তোমার মোটা বেতের ছড়িগাছটা হাতে নাও।"

ব্রজবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"যে এই বেনামী মিথ্যা চিঠি তোমায় লিখেছে, সেই লোকটাকে আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো। তুমি তাকে মারবে—খুব মারবে—যেন ছমাস সে বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারে। তার জন্যে যদি তোমায় জেলে যেতে হয়, তাও যেও। তুমি জেল থেকে ফিরে আসবার আশায় আমি প্রাণ ধরে থাকবো, তোমার সংসার বজায় রেখে দেবো।"

ব্রজবাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কাকে? কাকে মারবো?"

"সেই সত্যকে।"

"কোন সত্য?"

"সে আমার বাপের বাড়ীর কাছে থাকে। ছেলেবেলা থেকে সে আমায় জ্বালাতন করছে—যখন আমার বিয়ে হয়নি—তখন থেকে। ইদানীং ও, আমি মার কাছে গেলে, আমার সঙ্গে গোপনে কথা কইতে চেষ্টা করে। মাকে আমি সব কথাই বলে দিয়েছিলাম। আগে সে আমাদের বাড়ীতে ঘরের ছেলের মত আসতো যেত; মা সেটা বন্ধ করে

দিয়েছেন। কিছুতেই না পেরে, সে আমার এই সর্ব্বনাশের আয়োজন করেছে। উঃ কি পা‌ি কি শয়তান! চল তুমি, তার পাপের প্রতিফল তাকে দেবে চল। মার খেয়ে সে পড়ে গেলে, আমি এই হাইহিল জুতোসুদ্ধ গুণে তিনটি লাথি তার মুখে মারবো। ওগো চল, চল।"—বলিয়া উষা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখের অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, তাহার দেহ থর থর কবিয়া কাঁপিতেছে।

ব্রজবাবু অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। দুই একটা প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

বিবাহের পূর্ব্বে সত্যর অভদ্রতা সম্বন্ধে সকল কথা উষা কেবল মাকে বলিয়াছিল, আর কাহাকেও বলে নাই। তাহা শুনিয়া মা বিরক্ত হইয়া সত্যকে নির্জ্জনে তিরস্কার এবং বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তারপর উষার বিবাহ হইল, সত্যও বিবাহ করিল। দুই তিন বৎসর সত্য আর উষাদের বাড়ীতে আসে নাই। তাহার স্ত্রী আসিত, বাড়ীতে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিত, তাস খেলিত—ইদানীং আবার উষা থাকিলে, স্ত্রীকে ডাকিবার ছলে, সত্য যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। মাস কয়েক পূর্ব্বে উষা যখন দিন পনেরো গিয়া পিত্রালয়ে ছিল, তখন আবার সত্য পূর্ব্ববৎ আচরণ আরম্ভ কবে। উষা মাকে উহা জ্ঞাপন করায়, মা আবার তাহাকে বাড়ি আসা বন্ধ করেন। এবার উষা পিত্রালয়ে গেলে, একদিন মার সঙ্গে তাহার অনেক কথা হয়। একাকিনী অথবা কোনও সখীব সঙ্গে থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতিতে যাওয়ার কথা, ইহাতে ব্রজবাবু অসন্তুষ্টি, একদিন প্রতিমাদের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখা, ফিরিবার সময় প্রতিমার ভাই তাহাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে আসার কথা, নামিবার সময় স্বামীর সামনে পড়িয়া যাইবাব কথা, এবং পরে কিছুদিন ধরিয়া এ বিষয় লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে মান অভিমানের কথা, সমস্তই উষা মাকে বলিয়াছিল, মা শুনিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন; এ সমস্ত সময়টা সত্যর স্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল;—সেই নিশ্চয় গিয়া স্বামীর নিকট সে সব কথা গল্প করিয়াছে। তারপর ঐ শাড়ি, ঐ নেকলেস ঐ গন্ধ ছয় মাস পূর্ব্বে মার নিকট থাকাকালীন ক্রীত হয়। পিতার মৃত্যুব পব, মা তাহাকে গোপনে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকা হইতেই, ভাইদের সাহায্যে উষা ঐ গন্ধ, ঐ শাড়ী এবং ঐ নেকলেস ক্রয় করে। সত্যের স্ত্রী ঐ সমস্ত জিনিসই দেখিয়াছে, দামের কথাও শুনিয়াছে এবং আপাততঃ উষা স্বামীর বকুনির ভয়ে ওসব তাঁহাকে দেখাইবে না, ইহাও সে জানিয়া গিয়াছিল। সব কথা নিশ্চয় সে সত্যর নিকট গল্প করিযাছিল। সত্য, এই সুযোগ পাইয়া ঐ কুৎসিত পত্র লিখিয়া নিজ হীন প্রতিহিংসাবৃত্তি চবিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সকল কথা শুনিয়া ব্রজবাবু, আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

উষা বলিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি—এই শাড়ী, নেকলেস, গন্ধ আর ঐ শত্রুর চিঠি নিয়ে এখনি তুমি মার কাছে যাও। তাঁকে এ সব দেখিয়ে, তিনি কি বলেন তা শুনে এস। আমি না হয় বাড়িতেই থাকি।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "না, তার দরকার হবে না। তোমার কথাতেই আমার বিশ্বাস হয়েছে।"

উষা অনেক পীড়াপীড়ি করিল। কিন্তু ব্রজবাবু কিছুতেই এই সবেজমিন তদন্তে যাইতে রাজী হইলেন না।

তারপর বিলাত যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, দুজনে যাওয়াই ভাল। তবে চিরজীবনের জন্য নহে। বছর পাঁচেক সেখানে থাকিয়া, আবার দেশে ফিরিলেই চলিবে। তখন, আর একটা প্রোফেসারি জুটাইয়া লইতে কতক্ষণ?

যাত্রার পূর্ব্বদিন দুজনে ভবানীপুরে বিদায় সম্ভাষণ করিতে গমন করিল। উষা সেই শাড়ী এবং সেই হার পরিয়াই স্বামীর সহিত ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল।

[সচিত্র শিশির, পৌষ ১৩৩২]

সুশীলা না পিপুলা?

ভাগলপুরে আমার পিতা ওকালতি করিতেন, সেই স্থানেই আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ।

আমাদের বাড়ি হইতে অল্প ব্যবধানেই পিতার বন্ধু আব একজন উকীলের বাড়ি ছিল। তাঁহার নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকালে আমি তাঁহাদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই খেলা করিতে যাইতাম। চন্দ্রনাথবাবুকে আমি কাকামশাই ও তাঁহার পত্নীকে কাকীমা বলিতাম। কাকীমার তখনও কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি আমাকে খুবই যত্ন করিতেন;—কোলে বসাইয়া আমাকে মিঠাই খাওয়াইতেন, মুখ ধোয়াইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, আমায় পাউডার মাখাইতেন। চলিয়া আসিবার সময় মুখে চুমো খাইয়া বলিতেন, "আবার কাল এস, বাবা।" মা আমায় মারিলে কাকীমা'র কাছে গিয়াই আমি নালিশ করিতাম। তাঁহার উপর আমার আব্দার ও মান-অভিমানের সীমা ছিল না।

কিন্তু কাকীমার গৃহে আমার এই অত্যধিক আদর অধিক দিন রহিল না। আমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তিনি স্বয়ং জননী হইলেন—একটি আধটি নয়—একসঙ্গে দুই-দুইটি কন্যা তিনি প্রসব করিয়া বসিলেন। ইহাকেই বলে, "রামজী যব্ দেতা তব্ ছাপ্পর ফোড়্কে দেতা।" আমি তখন সাত বৎসরের বালক হইলেও, ঘটনাটি বেশ স্মরণ আছে। তাহার অল্পদিন পূর্বেই আমি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, কাকীমার কন্যা দুইটি দিন দিন "শুক্লপক্ষের শশিকলা'র মতই বাড়িতে লাগিল। আমিও ক্লাসের পর ক্লাস উঠিতে লাগিলাম। আমি আর বড় একটা কাকীমার বাড়ি যাই না। একটু বড় হইলে, তাঁহার মেয়ে দুইটি আমাদের বাড়ী খেলা করিতে আসিতে লাগিল। একটির নাম সুশীলা, অপরটির নাম পিপুলা বা প্রফুল্লনলিনী। একে ত যমজ ভগিনী, কোনটি কে চেনাই শক্ত—তার উপর আবার তাদের মা দুষ্টামী করিয়া দুইটিকে একই রকমে সাজাইতেন। দুইটির চুল ঠিক একই রকমে বাঁধিয়া, একই রঙের ডিজাইনের ফ্রক দুইটিকে পরাইতেন, জুতা মোজা পরিলে তাহাও ঠিক একই রকমের হইত। আমাদের বাড়িতে দুইটি প্রায় একসঙ্গেই আসিত। কখনও একটি একলা আসিলে বাড়ির সকলেই জিজ্ঞাসা করিত—"সুশীলা না পিপুলা?" যে আসিত, সে নিজের নামটি বলিত।

আমাদের বাড়ির পশ্চাতে একটু ফুল-ফলের বাগান ছিল, আমি কখনও সুশীলাকে কখনও পিপুলাকে, কখনও উভয়কে সেই বাগানে লইয়া যাইতাম। সকল ফলের মধ্যে পেয়ারাটাই ছিল তাহাদের অত্যন্ত লোভের বস্তু। পেয়ারা পাড়িয়া দিতাম, উভয়ে খাইত। কখনও স্বহস্তে পেয়ারা পাড়িবার আব্দার লইত—পাকা পেয়ারা খুঁজিয়া তাহার নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া একে একে উভয়কে আমি কাঁধে তুলিয়া বসাইতাম, তাহারা আনন্দ কলরবে পেয়ারা পাড়িত।

তখন আমার পৈতা হইয়া গিয়াছে—বয়স বারো বৎসর। সুশীলা পিপুলা পাঁচ। একদিন আমার সাক্ষাতেই কাকীমা মাকে বলিলেন, "সুশীলা কি পিপুলা, একটিকে ভাই তোমায় নিতে হবে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, ছিলে খুড়ী, হবে—শ্বাশুড়ী।" বারো বৎসর বয়সের সকল ছেলের এই কথোপকথনের অর্থ বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু আমি জলের মতোই বুঝিয়াছিলাম; বাল্যকালে আমি বোধহয় একটু অকালপক্কই ছিলাম। পরদিন স্কুলে গিয়া, ক্লাসের বুজম্ ফ্রেণ্ড হরিগোপালকে জলখাবার ঘরের নিকট একাকী পাইয়া চুপি চুপি বলিলাম, "ওরে, আমার যে বিয়ে।"—হরিগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রে?"

বলিলাম, "তা জানিনে ভাই। বোধহয়, বড় হলে পাস-টাস করলে।"

হরিগোপাল তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "ধ্যুৎ, সে ত ঢের দেবী। কোথায় সম্বন্ধ শুনি? কার সঙ্গে?"

"চন্দ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে।"

"সেই সুশীলা পিপুলা?"

"হ্যাঁ।"

"কোনটার সঙ্গে?"

"তা এখনও জানিনে, ভাই। দুটোর মধ্যে একটার সঙ্গে।"

"তা, তোর কোনটাকে পছন্দ শুনি?"

"তা কি জানি ভাই, দুটোই ত এক রকম।"

হরিগোপাল আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়। সে তখন সিগারেট খাইতে ও নভেল পড়িতে শিখিয়াছে। এসব বিষয়ে আমার চেয়ে সে ঢের বেশী বিজ্ঞ। হরিগোপাল গম্ভীরভাবে বলিল, "তোর মা-বাপ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই সুশীলাকে বিয়ে করবি, না পিপুলাকে বিয়ে করবি, তুই কি উত্তর দিবি, শুনি?"

"তাই ত, ভাই, কি উত্তর দেবো বলে দাও।"—হরিগোপাল গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এর মধ্যে আসল কথা কি হচ্ছে, জানিস?"

"কি?"

"আসল কথা হচ্ছে লভ্—ভালবাসা। অনেক নভেলে আমি পড়েছি, ভালবাসা ভিন্ন বিয়ে হলে সে বিয়েতে সুখ হয় না। এখন তোকে খোঁজ নিতে হবে, কে তোকে বেশী ভালবাসে—সুশীলা না পিপুলা। যে তোকে বেশী ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করবি—এ ত সোজা কথা।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি ক্লাসে চলিয়া গেলাম।

পরদিন রবিবার ছিল, সুশীলা-পিপুলা আসিলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, তোরা দুজনেব মধ্যে কে আমায় বেশী ভালবাসিস, বল্ দেখি? যে আমায় বেশী ভালবাসে, তাকেই আমি বিয়ে কববো।"

পিপুলা বলিল, "আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায তুমি বিয়ে কর সুরোদাদা।"

সুশীলা বলিল, "না সুবোদাদা, ওকে তুমি বিয়ে কোরো না—আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায় বিয়ে কব।"—পিপুলা বলিল, "হ্যাঁ তোকে বিয়ে করবে বইকি। তুই সেদিন সুরোদাদাকে কি ভয়ানক কামড়ে দিয়েছিলি, মনে নেই? সুরোদাদার পায়ে এখনো দাঁতের দাগ রয়েছে!"—সুশীলা মিনতিমাখা অনুতাপের স্বরে বলিল, "আর আমি তোমায় কামড়াবো না সুরোদাদা, আমাকেই বিয়ে কর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

সুশীলা-বিষয়ে পিপুলা কথিত অপবাদের ইতিহাসটুকু এই;—মাস দুই পূর্ব্বে পেয়ারা পাড়িবার জন্য সুশীলাকে আমি কাঁধে তুলিয়াছিলাম; নামাইবার সময় আমারই অসাবধানতা বশতঃ সে পড়িয়া যায়। এই পতনে রাগিয়া সে আমারই পায়ের গোছে এখন কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, তাহার সেই ধাবালো ৩।৪টা দাঁত আমার পায়েব মাংসে প্রবেশ করিয়া রক্ত বহাইয়া দিয়াছিল। ঘা পর্যন্ত হইয়াছিল, সে ক্ষত শুকাইতে মাসখানেক লাগে।

বিবাহের জন্য দুই বোনে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল। অবশেষে সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তখন সান্ত্বনার ছলে তাহাদিগকে বলিলাম, "আচ্ছা আচ্ছা, তোরা ঝগড়াঝাটি কবিসনে, আমি দুজনকেই বিয়ে করবো।"

।। দুই ।।

ষোল বৎসর বয়সে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে গেলাম। (তখন ভাগলপুরে কলেজ খোলে নাই) কালক্রমে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

ছুটীতে বাড়ী আসিয়া দেখিতাম, সুশীলা-পিপুলার সেই একই ভাব—অর্থাৎ কোনটি কে, চিনিবার উপায় নাই। ১০/১১ বৎসরের হইলে তাহারা আর ফ্রক পরিত না—শাড়ী পরিত; কিন্তু তখনও তাহাদের মা, দুইটিকে একই পাড়ের শাড়ী ও জামা পরাইতেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে তাহারা পড়ে। স্কুলের গাড়ী আসিলে হিন্দুস্থানী দাই নামিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া চিৎকার করে—"মনে আছে ভাই?"—ভিতর হইতে বালিকারা উত্তর দেয় "সীতারাম"—এবং বহি-সেলেট লইয়া বাহির হইয়া আসে,—ইহাই ছিল সেই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচলিত সঙ্কেত।

এ কয় বৎসর প্রথম প্রথম সুশীলা-পিপুলা আমার সহিত পূর্ব্বের মত মিশিত বটে, কিন্তু যতই তাহারা বড় হইতে লাগিল, ততই মেলামেশা কমিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম প্রথম আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময়ে তাহাদের জন্য কিছু কিছু খেলনা, ছবির বই প্রভৃতি উপহার আনিতাম। শেষ দুই বৎসর আর কিছু আনি নাই। এখন তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে বড় একটা বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না, কদাচিৎ আমাদের বাড়ী আসিলে তাহারা মায়ের কাছে গিয়া বসিত; কদাচিৎ আমি তাহাদের বাড়ীতে গেলে কাকীমার সঙ্গে বসিয়া খানিক গল্প করিয়া চলিয়া আসিতাম।

পূজার ছুটি ফুরাইতে আর দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে। দ্বিপ্রহরে আহারের পর আমি একখানা উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম; অপরাহ্নে ঘুম ভাঙ্গিলে মা আসিয়া আমার কক্ষে বসিলেন। দুই চারি কথার পরেই আসল কথাটি পাড়িলেন—"বাবা, ছেলেবেলা থেকে তোর ও বাড়ীর কাকীমার ইচ্ছে, সুশীলা পিপুলা একটির সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। এ কথা তুই জানিস ত?—অনেক সময়েই ঘরে একথা আমরা বলাবলি করেছি।"

আমি বলিলাম, "জানি বইকি, মা।"

"এ বিষয়ে তোর কোনও অমত নেই ত?"

"আমার মতামতের জন্যে কি আর যাচ্চে আসছে মা?—তুমি, বাবা যা বলবে, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।"

মা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সে ত জানি, তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা বেশ, তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওদের বাপ একটির পাত্র স্থির করিয়াছেন। একটি তাকে একটি তোকে দিতে চান। সুশীলা পিপুলা দুজনের মধ্যে কাকে তোর পচ্ছন্দ বল্ দেখি?"

কাহাকে আমার পছন্দ, তাহা আমি মনে মনে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তবু, মা কি বলেন শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমজ বোন ওরা, দেখতে ত দুজনেই সমান—তোমার কাকে পছন্দ, তাই বল।"—মা বলিলেন, "শুধু যে দেখতে দুজনেই সমান, তাই নয়, দুজনেরই মেজাজ, মতিগতিও সমান। আমি ত বাবা জন্মাবধি ওদের দেখছি—দোষে গুণে দুজনেই ঠিক একই রকমের। তবে, যেন মনে হয়, ওরই মধ্যে পিপুলা একটু অভিমানী। দুজনেই অভিমানী, তবে পিপুলা যেন একটু বেশী।"

আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি ওদেরই কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি সুশীলাকেই বিবাহ করিব। ছেলেবেলায় সে-ই আমায় কামড়াইয়া দিয়াছিল—তাহারই দাঁতের চিহ্ন এখনও আমার পায়ের গোছে বর্ত্তমান; সুতরাং এক হিসাবে সে নিজস্ব বলিয়া আমায় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর, এই কামড়ানো অপরাধের জন্য পাছে তাহাকে বিবাহ করিতে না চাই, এর জন্য পাঁচ বৎসরের সুশীলার সেই ব্যাকুলতা, সেই কান্না, এতদিনেও আমি ভুলিতে পারি নাই—তাহার সেই কচি মুখচ্ছবি আমার অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আর একটা কথা, তাহারও নামের আদ্যাক্ষর "সু", আমারও নামের তাই, সেই জন্য আমি মনে করিতাম, বিধাতা বুঝি

সুশীলাকেই আমাব জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাই মাকে বলিলাম, "ও অভিমানী-টভিমানী দরকার কি, মা, তার চেয়ে সুশীলাই ভাল।"—মা বলিলেন, "বেশ—তাই হবে।"

সুশীলাকে আমি মনোনীত করায় পিপুলা হইল খালি। পাত্রপক্ষ যথাদিনে পিপুলাকে আসিয়া দেখিয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। কাকীমা উভয় কন্যার বিবাহ একই দিনে দিবাব অভিপ্রায প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাই হইল। পিপুলাকে যিনি বিবাহ করিলেন, তিনি আমার চেয়ে বছর দুই বয়সে বড়—নাম সরোজনাথ। পাটনায় তাঁহার পিতা জজ আদালতের সেরেস্তাদার—এন্ট্রান্স পাশ করিবার পর তিনিও পিতার অফিসে চাকরি পাইযাছেন।

সুশীলার জ্যেঠা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমায় সুশীলাকে দান করিলেন; কাকা মহাশয সরোজকে পিপুলাকে দান করিলেন। কন্যাদানের আসন ও ছাদনাতলা দুইটি হইযাছিল বটে—পুরোহিতও দুইজন; কিন্তু বাসরঘর হইল একটি মাত্র। একবাসবে দুই বব পাইয়া, নিমন্ত্রিতা তরুণীগণ সেদিন আমোদের চূড়ান্ত কবিয়াছিলেন।

আমার অভিপ্রায় ছিল, ফুলশয্যার রাত্রিতে নববধূ আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ কবিবামাত্র আমি আমোদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিব—"সুশীলা না পিপুলা?"—কিন্তু আনাড়ী আমি জানিতাম না,—সে সময় বধূর সঙ্গে কয়েকজন নিমন্ত্রিতা পুরমহিলাও আসিয়া থাকেন। সুতরাং প্রশ্নটা মুলতুবী রাখিতে হইয়াছিল। শয়নগৃহ নির্জ্জন হইলে, আমি নববধূর উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি গো, তুমি সুশীলা না পিপুলা?"

যে বর বাল্যকালে কাঁধে চড়াইয়া পেয়াবা খাওয়াইয়াছে এবং যাহাকে কামড়াইয়া রক্তপাত পর্যন্ত করা হইয়াছে—নববধূ হইলেও তাহাকে লজ্জা করা একটু কঠিন বইকি!—সে লজ্জা সুশীলা করিল না—দুষ্টামীব উত্তবে দুষ্টামী করিয়া বলিল, "কাকে পেলে খুসী হও?"

আমিই বা দুষ্টামী ছাড়িব কেন? বলিলাম, "পিপুলাকে।"

সুশীলা বলিল, "তাকে কাগে নিয়ে গেছে। এখন আর হায় হায় করলে কি হবে বল?"

সরোজের রঙটা কিছু কাল, তাই সুশীলার এই বক্রোক্তি। পরে শুনিয়াছিলাম, দুই জামাইযের দেহবর্ণের পার্থক্য বিষয়ে মেয়ে-মহলে একটু আলোচনাও হইয়াছিল। সকলে বলিয়াছিল—"যেমন দুটি বোন—নিক্তিব ওজনে রূপে গুণে সমান—জামাই দুটিও সেই বকম হলে বেশ হত!"

।। তিন ।।

পরবৎসর, আমি আইন পাস কবিয়া ভাগলপুরেই ওকালতী সুরু করিলাম।

সুশীলা বেশীব ভাগ আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। মাঝে মাঝে "ও-বাড়ী" যাইত। উভয় ভগিনী একত্র হইলে কাকীমা—অধুনা শাশুড়ী ঠাকুরাণী—মেয়ে দুইটিকে পূর্ব্বের ন্যায় আর সমান সাজে সাজাইতেন না। আমি 'আটপৌরে' জামাই—পাছে অজ্ঞাতে কোন গোলমাল কবিয়া ফেলি, ইহাই বোধ করি, তাঁহাব আশঙ্কা ছিল।

শাশুড়ীব এই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন কিন্তু অধিক দিন রহিল না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত একদিন সংবাদ আসিল সরোজ পাটনায় হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গিয়াছে।

পিপুলা বিধবা-বেশ ধারণ করিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। যমজ দুই ভগিনীর বেশে এই হৃদয়বিদারক পার্থক্য দর্শনে আত্মীয়বন্ধু সকলেরই চক্ষুতে জল বহিল।

বৎসবখানেক মধ্যে পিতৃদেব বুঝিয়াছিলেন ওকালতী ব্যবসাটি আমার ঠিক উপযোগী নহে; তাই তাঁহার উপদেশে মুন্সেফীর জন্য আমি আবেদন করিয়াছিলাম।

পিপুলার বৈধব্যের পর বৎসরখানেক মধ্যে পাটনা সহরে ভীষণ প্লেগ রোগ দেখা দিল এবং সেই ব্যাধিতেই আমার জনক ও জননী এক সপ্তাহের ব্যবধানে, উভয়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই সর্ব্বনাশে আমি মাসখানেকের উপর জড়পুত্তলিকাবৎ হইয়া রহিলাম। তাহার পর আমার মুন্সেফীতে নিয়োগবার্ত্তা গেজেট হইল। আমি ত প্রথমে উহা প্রত্যাখান করিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমায় অনেক করিয়া বুঝাইলেন। ফলে, ঐ পদ আমি গ্রহণ করিলাম। আসবাবপত্র কতক বিক্রয় করিয়া, কতক একটা কামরায় তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, বাড়ীটা ভাড়া দিয়া, সুশীলাকে লইয়া কর্ম্মস্থানে মোতিহারিতে গমন করিলাম।

এই নতুন স্থানে সুশীলার সেবা যত্নে, পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনে আমার চিত্ত ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। কাজকর্ম্মে আমার সুখ্যাতিও হইল। ছুটিতে ভাগলপুরে যাইতাম, শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করিতাম।

সেবার পূজার ছুটিতে গিয়া দেখিলাম, শ্বশুর মহাশয়ের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ওয়ালটেয়ারে বাড়ীভাড়া লইয়াছেন—মহাপঞ্চমীর দিন যাত্রা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পূজার ছুটিটা মাত্র সেখানে যাপন করেন; কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বিশেষ জেদাজেদীতে বড়দিনের ছুটিটা পর্যন্ত সেখানে কাটাইতে সম্মত হইয়াছেন। আমাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, আমিও সহজেই সম্মত হইলাম।

ওয়ালটেয়ারে যে স্থানে আমাদের বাড়ীটি লওয়া হইয়াছিল, তাহা একেবারে ফাঁকা—সহর হইতে মাইল খানেক দূরে হইবে। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকিবার পরেই শ্বশুর মহাশয়ের স্বাস্থ্যেব উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। প্রাতে ও বৈকালে আমরা বেড়াইতে বাহির হইতাম। এখানে আসিয়াই শাশুড়ী ঠাকুরাণী পিপুলাকে থান ছাড়াইয়া আবার পাড়ওয়ালা কাপড় পরাইলেন, হাতে দুগাছি পাতলা সোনার চুড়ি পরাইয়া দিলেন। এ বিদেশে আর কে আছে যে, দেখিয়া নিন্দা করিবে? ইহাতে মায়ের প্রাণে একটু শান্তিলাভ হয়, এই মনে করিয়া শ্বশুর মহাশয়ও এই কার্য্য অনুমোদন করিলেন।

পূজার একমাস ছুটি দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল। মোতিহারিতে ফিরিবার জন্য আমি তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিলাম। সুশীলা আসিয়া আমায় বলিল, "দেখ, বাবা মার ইচ্ছে, এ দুটো মাস আমি এইখানেই থাকি। তোমাকে তাঁরা ভরসা করে বলতে পারছেন না।"

আমি বলিলাম, "তোমার কি ইচ্ছে, তাই বল।"—সুশীলা বলিল, "আর কিছু নয়,—সেখানে একলা তোমার কষ্ট হবে—নইলে দুটো মাস না হয় আমি থেকেই যেতাম।"

বুঝিলাম সুশীলার মনোগত অভিলাষ, দুই মাস এখানেই পিতামাতার নিকট অবস্থান করে। হাসিয়া বলিলাম, "না, আমার তেমন বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না। তুমি দুমাস এখানে থেকে, ওঁদের সঙ্গেই ফিরো। আমি একটা রবিবারে ভাগলপুরে এসে তোমায় নিয়ে যাব এখন।"

সুশীলা বলল, "তবে বাবা মাকে বলিগে আমায় রেখে যেতে তোমার মত আছে।"

বলিলাম, "তা বলগে।"

।। চার ।।

যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলাম।

মোতিহারি জিলায় অনেকগুলি অরণ্য আছে। অরণ্যের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হইল। আমার প্রেয়সী-হীন গৃহ আর গৃহ বলিয়া মনে হইল না, অরণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অতিকষ্টে দুই মাস গৃহারণ্যে কাটাইলাম। ৫।৭ দিন অন্তর সুশীলার একখানি পত্র পাইতাম—তাহাতে অরণ্য বাসের ক্লেশ কতকটা লাঘব হইত। কবে বড় দিন আসিবে—

কবে আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইব—কবে 'মঝু গেহ, গেহ বলি মানব''—এই চিন্তাতেই দিনযাপন করিতাম।—পৌষের প্রারম্ভে হঠাৎ শ্বশুর মহাশয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম—''বাবাজী, বড়ই দুঃখের বিষয়, গত শুক্রবাব সন্ধ্যার পব তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ হার্টফেল হইয়া পিপুলা মারা গিয়াছে। এই শোকে আমরা পাগলেব মত হইয়াছি। কিছুদিন আমরা কাশীধামে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি। আগামী রবিবার সন্ধ্যা ৮টার সময় এক্সপ্রেস গাড়ীতে আমরা মোকামা পাস কবিব, তুমি যদি কিছুদিনের ছুটি লইয়া আমাদের সঙ্গ লইতে পার, তবে বড়ই ভাল হয় বাবা! এ শোকের সময় তোমায় কাছে পাইলে, আমাদের অনেক সান্ত্বনা। বিশেষ চেষ্টা কবিও। এ বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব।''

পত্রখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনেব মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বাল্যকালে, যমজ ভগিনীব দুইজনের মধ্যে একজনের জ্বব হইলে, অপরটিরও গা গরম হইত। উহারা বড় হইলে সেরূপ আর দেখা যায় নাই বটে,—কিন্তু—ইহা যে মৃত্যু! যদি আমার সুশীলার কিছু হয়, তবে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?

বড়দিনের ছুটি হইতে তখনও ১৫ দিন বিলম্ব আছে। কাছারী গিয়া, জজসাহেবকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, সোমবাব হইতে বড়দিনের বন্ধেব দিন পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুব করাইয়া লইলাম। শ্বশুর মহাশয়কে সেই মর্ম্মে তাবও করিযা দিলাম।

যথাদিনে আমি মোকামা স্টেশনে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কামরা রিজার্ভ কবিয়া যাইতেছিলেন, আমিও সেই কামরায় উঠিলাম। শাশুড়ী আমাকে দেখিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুশীলাও ঘোমটার ভিতর ফোঁপাইতেছে—বুঝিতে পাবিলাম। বড় ইচ্ছা হইল তাহার হাতটি ধবিয়া তাহাকে সান্ত্বনার কথা বলি, তাহার চোখ মুছাইয়া দিই, কিন্তু শ্বশুব-শাশুড়ীর সমক্ষে তাহা করিবার উপায় নাই। শ্বশুর মহাশয় চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিপুলার পীড়া ও চিকিৎসার কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।—দানাপুর স্টেশনে ট্রেণ পৌছিলে, লুচি প্রভৃতি খাবার কেনা হইল। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, ''সুশীলা, দেখ ত মা, ঐ ব্যাগেব মধ্যে পানেব কৌটায় সাজা পান আর আছে কি না? না থাকে ত কিনতে হবে।''—সুশীলা উঠিয়া, ব্যাগ হইতে পানের কৌটা বাহির করিয়া, তাহা খুলিয়া পিতাকে দেখাইল—কৌটাটি শূন্য! পানের খিলিও কেনা হইল।

শাশুড়ী, দুইটি শালপাতায়, আমাদের দুইজনকে খাবার দিয়া বলিলেন, ''সুশীলা, সোরাই থেকে ওঁদের দুগ্লাস জল গড়িয়ে দাও ত মা।''

সুশীলা উঠিয়া গ্লাসে জল গড়াইয়া দিল। আমরা আহার শেষ কবিলাম। হাত ধুইয়া, পান খাইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। শ্বশুব-শাশুড়ী দুজনেই মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। সুশীলা এখন আর কাঁদিতেছে না। একবার যদি চোখাচোখি হয়, এই আশায় আমি সুশীলার পানে মাঝে মাঝে চাহিতে লাগিলাম,—কিন্তু সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। তখন হঠাৎ মনে পড়িল, আমি রহিয়াছি বলিয়া সুশীলা বা শাশুড়ী কেহই খাইতে পারিতেছেন না। আরা স্টেশনে গাড়ী থামিলে আমি শ্বশুর মহাশয়কে বলিলাম, ''আমি তবে এখন ও কামরাটায় গিয়ে শুইগে।''—আমাব বিছানার বাণ্ডিলটি বগলে করিয়া, আমি নামিয়া গেলাম।

।। পাঁচ ।।

পরদিন কাশীধামে পৌছিয়া আমরা এক ''যাত্রাওয়ালা''র বাড়ীতে উঠিলাম। দুইখানি ঘর ভাড়া লওয়া হইল। এখানে ২/১ দিন থাকিয়া, একটি বাড়ী খুঁজিয়া লইবার পরামর্শ ছিল।

বাসায় জিনিষপত্র রাখিয়া ধূলাপায়ে গঙ্গাস্নান এবং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে বাহির হওয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া পাকাদি সমাপন হইতে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল। আহারান্তে বিশ্রাম। শ্বশুর মহাশয় ও আমি একটি শয়ন কক্ষে শয়ন করিলাম, সুশীলাকে লইয়া শাশুড়ী অপর কক্ষে রহিলেন।—নিদ্রাভঙ্গে সন্ধ্যার সময় উঠিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, আমরা তিনজনে বিশ্বনাথের আরতি দর্শনে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আর পাকাদির উদ্যোগ হইল না, বাজার হইতে লুচি, আলুরদম, রাবড়ী প্রভৃতি আনাইয়া তাহার দ্বারা জলযোগ সম্পন্ন হইল।

আহারান্তে ধূমসেবন করিতে করিতে শ্বশুর মহাশয় আমার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। আমি মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছি এতক্ষণ বুঝি সুশীলা ও শাশুড়ীর খাওয়া হইল। এইবার বোধ হয়, শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া ও ঘরে যাইবেন এবং সুশীলাকে এ ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। সুশীলার সঙ্গে দেখা করিবার—তাহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। একরাত এক দিন এত কাছাকাছি দুজনে রহিয়াছি—অথচ দেখা সাক্ষাৎ নাই। একবার মাত্র—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে গমনের সময় আমি সুশীলার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম। দুজনে চোখাচোখি হইয়াছিল—কান্নায় ফোলা সে চোখ দুটি, আমার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র সুশীলা চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। সুশীলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আদর করিবার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় যখন ১০টা, শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাদের কক্ষে আসিলেন। পান আনিয়াছিলেন, তাহা রাখিয়া বলিলেন, "তোমরা তা হলে শোও এখন দোর বন্ধ করে।"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরাও শোওগে, রাত হল।"

শাশুড়ী বলিলেন, "বাড়ীর কি হল?"

শ্বশুর উত্তর দিলেন, "যাত্রাওয়ালা বললে, তার সন্ধানে দু তিন খানি বাড়ী খালি আছে। কাল সকালে সেগুলো দেখাবে। তার পর যেটা পচ্ছন্দ হয়।"

"আচ্ছা"—বলিয়া শাশুড়ী প্রস্থান করিলেন। শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া দ্বারে খিল লাগাইয়া দিলেন।

আমি পিছু ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুর মহাশয়ের নাসিকা ধ্বনি আরম্ভ হইল। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি নিদ্রা হইল না। অবশেষে এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম, —ধুত্তোর কাশীর কাঁথায় আগুন! এখানে কি সবই উল্‌টো? বিশ্বনাথের মন্দির আলাদা, অন্নপূর্ণার মন্দির আলাদা—আমারই বা দুঃখ করলে চলবে কেন?—অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, যাত্রাওয়ালার সঙ্গে আমরা বাড়ী দেখিতে গেলাম। নদীয়া ছত্রে একটি বাড়ী আমাদের বেশ পচ্ছন্দ হইল। তখনই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরটি আমার শয়নের জন্য নির্দিষ্ট হইল। যাত্রাওয়ালা একজন চাকর ও একজন ঝি ঠিক করিয়া দিবার ভার লইল।—সেখান হইতে ফিরিয়া, গঙ্গাস্নানান্তে দেবদর্শনাদি সারিয়া, যাত্রাওয়ালার বাসায় আসিয়া আহারাদি করিলাম। বিশ্রামান্তে বিকালে নূতন বাসায় উঠিয়া যাওয়া গেল। বহুকাল বিচ্ছেদের পর আজ আমার সুশীলাকে পাইব জানিয়া মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলাম।—আমার এই প্রণামটি লইয়া, বাবা বিশ্বনাথ বোধহয় হাসিয়াছিলেন।

আরতি দেখিয়া আসিয়া, নৈশ ভোজন সমাপনান্তে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, রাত্রি তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। অধীর আবেগে আমি সুশীলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।—কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর ধীর পদক্ষেপে সুশীলা আসিয়া প্রবেশ করিল। ধীরে দ্বারটি ভেজাইয়া দিল। জন্মদরিদ্র ব্যক্তি সহসা মহারত্ন লাভ করিলে

যেমন আত্মবিস্মৃতি হইয়া পড়ে, আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িল,—"সুশীলা না পিপুলা?"—কথাগুলি উচ্চারণমাত্র সকল কথা আমার মনে পড়িল—আমি মরমে মরিয়া গেলাম। ছি ছি আমি কি একটা মানুষ, না পশু?—মেঝের উপর আমার বিছানা পাতা ছিল। সুশীলা সজল নয়নে ধীরে ধীরে বিছানার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বিছানায় আসিল না; কিছু দূরে, মেঝের উপর বসিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "আমায় মাফ কর সুশীলা, আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। পিপুলা আজ নেই—আজ ওরকম রসিকতা করা আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে!"—বলিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় লইবার জন্য বাহু বাড়াইলাম।—সুশীলা হঠাৎ দূরে সরিয়া বলিল, "আমায় ছুঁয়ো না।"—তাহার এই ভাব দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আমি তোমায ছোঁব না কেন সুশীলা?"

উত্তর—"আমার পানে বেশ করে চেয়ে দেখ দেখি—আমি কি তোমার সুশীলা?"

তাহার মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভয়ে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইযা উঠিল। বলিলাম, "নিশ্চয়ই তুমি আমার সুশীলা।"—উত্তর পাইলাম—"না, আমি তোমাব সুশীলা নই। তোমাব সুশীলাকে ওয়ালটেয়ারে চিতার আগুনে পুড়িয়ে এসেছি। আমি হতভাগিনী পিপুলা।"—এই বলিয়া সে চোখে অঞ্চল দিল।—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কক্ষচ্যুত হইয়া যেন আমার চাবিদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি নারায়ণ স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিলাম। আমাব দেহ কাঁপিতে লাগিল। আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—শয্যায় এলাইয়া পড়িলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিটকাল এইরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম। তাহাব পব আবার চক্ষু খুলিলাম। একদৃষ্টে সুশীলা বা পিপুলা যেই হোক—তাহার মুখপানে চাহিযা বহিলাম।—সুশীলাই ত—কে বলিল পিপুলা? অন্যে দুইজনের পার্থক্য বুঝিতে না পারুক—যাহার সঙ্গে আমি ছয় বৎসর ঘর করিয়াছি—তাহার সম্বন্ধে আমারও কি ভ্রম হওয়া সম্ভব? বলিলাম, "তোমার এ কি নিষ্ঠুর পবিহাস, সুশীলা?"

"পরিহাস নয়। সত্যিই সুশীলাকে যমে নিয়ে গেছে।"

"তবে যে বাবা আমাকে লিখেছিলেন, পিপুলা মাবা গেছে।"

"বাবার তখন মাথার ঠিক ছিল না, তাই ওরকম লিখেছিলেন।"

"কি বল তুমি?"

"যা সত্য ঘটনা, তাই আমি তোমায় বলছি। সুশীলাকে পুড়িয়ে এসে, পরদিন বাবা মাকে বললেন—এখানে আমাদের কেউ চেনে না—সুশীলা মবেনি, হতভাগিনী পিপুলাই মরেছে। এ বয়সে পিপুলার বৈধব্যবেশ আমি চোখে দেখতে পারছিলাম না—দিন-রাত আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছিল। আজ থেকে ও আর পিপুলা নয, ও সুশীলা—ও গিয়ে ওর স্বামীর ঘর করুক।"

আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগিযা আছি, কিছুই বুঝিতে পাবিলাম না, বলিলাম, "মা শুনে কি বললেন?"

"মা বললেন, ছি ছি তাও কি হয়? পিপুলা সুশীলা সেজে গিয়ে স্বামীর ঘর করবে কি? জামাই কি এ জাল ধবতে পাববে না? বাইরের লোক না পারুক, তুমি আমি যেমন ঠিক চিনি কোন্‌টি পিপুলা, জামাইও নিশ্চয সেই রকম চিনবে যে, এ সুশীলা নয়। তখন কি উপায় হবে? আর যদি ধর, জামাই চিনতে নাও পারে,—হিঁদুর মেয়ের পরলোক বলেও ত একটা জিনিষ আছে? জালিয়াতী করে, ইহলোকে দুদিন নাহয় পিপুলা সুখভোগ করে নিলে। তারপর—পরলোকে কি উপায় হবে?"—বলিয়া পিপুলা চুপ করিল।

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, "তারপর?"

"তারপর বাবা বললেন, 'আমি তোমাদের ও সব পরলোক-ফরলোক মানিনে।' মা

বললেন, "তা না মানতে পার, কিন্তু মানুষে মানুষে সত্য ব্যবহার আর জালজুয়াচুরির মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম—তা ত মান?' বাবা বললেন, 'তা মানি বটে'। শেষকালে বাবাতে মায়েতে পরামর্শ হল স্ত্রীবিয়োগ হলে অনেকেই ত ছোট শালীকে বিয়ে করে। এই কাশীতে অনেক তান্ত্রিক সাধক, অনেক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের মধ্যে এক রকম বিবাহ প্রচলিত আছে তার নাম শৈব বিবাহ। তোমার মত করে, এখানে তোমাতে আমাতে শৈব বিবাহ দেওয়ার জন্যেই বাবার কাশী আসা। তোমার এ বিষয়ে মত কি, তাই জানবার জন্যে বাবা মা আমায় আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না—চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কে এ? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি? সুশীলা এ নয়, কে বলিল? সুশীলা আর পিপুলা—কোন্‌টি কে? তফাৎই বা কি? এ ত ঠিক আমার সেই সুশীলার মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "আমি পিপুলা"—এ কথা না বলিলে, আমি ত ইহাকে সুশীলা বলিয়াই গ্রহণ করিতাম।

চোখ খুলিলাম। পিপুলা সেইভাবেই বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি বড় বিষণ্ণ। আমি তাহাকে গ্রহণ করিব, না প্রত্যাখান করিব—এই সংশয়েই কি?

বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার মত কি বল?"

পিপুলা বলিল, "আমি জানিনে।"—বলিযা সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই সে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তাহ পরে, অতি গোপনে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে আমাদের উভয়ের শৈব বিবাহ হইল। পুরোহিত হইলেন, নদীয়াছত্র নিবাসী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রথম মিলন-রাত্রিতে পিপুলা বলিল, 'মনে আছে তোমার? ছেলেবেলায় আমরা দুবোনেই তোমায় বিয়ে করবার জন্যে কেঁদেছিলাম—তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

আমি বলিলাম, "মনে আছে। বলেছিলাম, কাঁদিসনে—আমি তোদের দুজনকেই বিয়ে করবো।"—পিপুলা বলিল, 'তাই করলে, তবে ছাড়লে!"—পিপুলার নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল। যাহাকে বিবাহ করিলাম—জনসমাজে সে-ই সুশীলা বলিয়া পরিচিত হইল।

আমাদের একটি কন্যা জন্মিয়াছে। তাহার বিবাহের সময় কি হইবে, এই সমস্যা মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়।

ঠকাইয়া কাহাকেও মেয়ে দিব না। যাহাকে পাত্র নির্বাচন করিব, আসল কথা সমস্তই তাহাকে খুলিয়া বলিব। সুতরাং একটি উচ্চশিক্ষিত উদারমতালম্বী সুপাত্রের প্রয়োজন। তবে এখনও তাহার দেরী আছে। কন্যাটি আমার দেড় বৎসরের মাত্র।

[বার্ষিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৩]

ভুল

সন্ধ্যাকালে, একজন সপ্তবিংশতি বর্ষীয় যুবক এবং দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া একটি যুবতী, ইডেন গার্ডেনের একটি জনবিরল এবং প্রায়ান্ধকার অংশে, জলের ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল। উভয়েই বাঙ্গালী, তবে যুবকের অঙ্গে ইংরাজি পবিচ্ছদ এবং যুবতীর পরিধানে শাড়ী ব্লাউজ, কিন্তু পদদ্বয় জুতা মোজায় আবৃত। ইহাবা উভয়েই রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান। যুবকের নাম সরোজ রায় এবং যুবতীয় নাম লিলি বা লীলাবতী সান্যাল।

সরোজ বলিল, "কতদিন আর তুমি আমায় আশায় আশায় রাখবে লীলা? আমি যে তোমায় কত ভালবাসি, তা কি আজও তুমি বুঝতে পারনি?—আমাব ভালবাসায, আজও কি তোমার সন্দেহ আছে?"

লীলা অন্ধকার জলের প্যানে চাহিয়া, মৃদুস্বরে বলিল, "না, সন্দেহ নেই সরোজ—কিন্তু"

সরোজ মিনতির স্বরে বলিল, "কিন্তু—কি, বল? কেন তুমি আমায় নিতে রাজী হচ্ছ না?

লীলা বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "তুমি জান সরোজ, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে—তবে কেন আপত্তি লীলা? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, তবে আর আমাদের মিলনে বাধা কি? আমার আয় কম বলে? বিবাহ করলে, সে আযে, আমরা ভদ্রভাবে স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারবো না, এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। তোমায় ত বলেছি, আফিসের বড়সাহেব আমায় পাকা কথা দিয়েছেন, হেডক্লার্কবাবু পেন্সন নিলেই সেই পদে তিনি আমায় পাকা করে দেবেন। আর বড় জোর বছরখানেক,—পেন্সন তাঁকে নিতেই হবে—আব এক্সটেন্সন তিনি পাবেন না। তখন আমার ২৫০ টাকা মাইনে হবে, সে টাকায কি এই কলকাতা সহরে আমরা ভদ্রভাবে গৃহস্থালী পেতে বসতে পারবো না?"

লীলা বলিল, "তা কেন পারবো না—তবে—"

"তবে, কি বল? ঈশ্বর যদি আমাদের সন্তানাদি দেন, তবে ঐ আযেও সুশৃঙ্খলে আমাদের চলবে না এই তোমার আপত্তি? অবশ্য, ছেলেমেয়েদের দামী দামী পোষাক পরিয়ে, ঘরের মোটরকারে চড়িয়ে তাদের দামী স্কুলে পাঠানো চলবে না বটে। কিন্তু সন্তানের শিক্ষার জন্যে এটা নইলে কি চলে না? আমার বাবাও গরীব ছিলেন, তাঁর বড় বাড়ী, মোটর গাড়ী এ সব কিছুই ছিল না, অথচ আমাদের দুই ভাই, তিন বোনকে তিনি সুশিক্ষিতই করতে পেরেছিলেন—তিনটির মধ্যে একটি মেয়েব ভাল বিবাহ দিয়ে গেছেন। গৃহস্থালীভাবে জীবনযাপন করা, গৃহস্থালীভাবে ছেলেমেয়ে মানুষ করা এতে এমন কি কষ্ট বা অপমান, লীলা?"

লীলা বলিল, "তুমি ত জান সরোজ—আমিও গবীবের মেয়ে—গৃহস্থালীভাবেই মানুষ হয়েছি—আমার বিবাহিত জীবনে ও আমার ছেলেমেয়ের জন্যে বড় বাড়ী, মোটরগাড়ী—এসব কিছুরই আবশ্যক আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি অনেক দিন থেকেই আমায় পীড়াপীড়ি করছ—আমি রাজী হইনি—তোমায় যথেষ্ট ভালবাসি না, বা তোমায় আমার যোগ্যপাত্র বলে মনে করি না বলে নয়। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমায় কত ভালবাসি। জগৎ জানেন, বরং আমিই তোমার যোগ্য পাত্রী নই; বেশী লেখাপড়া শিখতে পারিনি—ক্যাম্বেলের পাস করা লেডি ডাক্তার মাত্র—রূপ নেই—কালো আমি; তুমি আমাকে বিবাহ করবার জন্য আগ্রহ করছ—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমি যে কেন রাজী হতে পারছিনে, তা আজ তোমায় বলি। তুমি জান, আমার মা নেই; ভাই বোন কেউ

নেই;—আমার বাবা অথর্ব হয়েছেন। একান্ত অসহায়—আমি বিয়ে করে স্বামীর ঘরে গেলে, আমার বাবাকে দেখবে শুনবে—কে তাঁর সেবা করবে? সেই কারণেই আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হতে পারিনে সরোজ—অন্য কোন কারণ নেই।"—বলিয়া লীলা চুপ করিল।

সরোজও প্রায় এক মিনিট কাল নীরব রহিল। তারপর সে সন্তর্পণে লীলার একখানি হস্ত নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল, "এই মাত্র তোমার আপত্তি, লীলা? তা তুমি এতদিন কেন আমায় বলনি—তা হলে ত এর মীমাংসা অনেকদিন আগেই হয়ে যেতে পারত। তোমাকে বিবাহ করে আমি একদিন সুখী হব—আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরকন্নার একটি ছবি, এমন দিন নেই যে আমি কল্পনায় চিত্রিত করিনি; কিন্তু সে চিত্র থেকে তোমার বাবাকে আমি ত কোন দিনই বাদ দিয়ে দেখিনি। তোমার বাবার কাছ থেকে তোমায় আমি ছিনিয়ে নিয়ে সংসার পাতবো—এমন হৃদয়হীন আমি ত নই লীলা।—তাঁকে আমাদের সংসারে নিয়ে এস, আমাদের মাথার মণি করে রাখবো। তুমি একা তাঁর সেবা যত্ন করে থাক—আমরা দুজনে মিলে করবো।—তা হলে, ত আর কোনও বাধা নেই লীলা?"

লীলা বলিল, "কিন্তু তুমি ত জান সরোজ, তিনি বড়ই স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে জামাইয়ের সংসারে ভার বোঝা হয়ে বাস করতে রাজী হবেন, এমন ত মনে করা যায় না!"

"আমি কি হাতে পায়ে ধরেও তাঁকে রাজী করাতে পারবো না?"

"আশা কম। তুমি তাঁকে বলে দেখতে পার। একটা কথা বলি, তুমি মনে কিছু দুঃখ কোরনা সরোজ—তুমি যদি মাসে মাসে তাঁর সম্পূর্ণ খরচ তার কাছে নিতে স্বীকৃত হও, তাহলে তুমি আমি দুজনে মিলে তাঁর হাতে পায়ে ধরে হয়ত তাঁকে রাজী করতেও পারি।"

সরোজ বলিল, "ঐ শর্ত্তে ভিন্ন তিনি যদি রাজী না-ই-হন, তাহলে অগত্যা তাই হবে। দেখ সকল বাধাই ত ঘুচে গেল, এবার তুমি বল লীলা, তুমি আমায় গ্রহণ করবে। আমাকে আর সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখ না—আমাকে সুখী কর।"

লীলা বলিল, "আমাকে পেলে যদি তুমি সুখী হও—তা হলে—আমাকে নাও তুমি।"

ষোল-আনা লওয়া, গির্জ্জায় ভিন্ন অপর কোথাও ত সম্ভব নয়। তাই, আপাততঃ সরোজ বায়না লইল—লীলাকে বুকে জড়াইয়া, তাহাকে চুম্বন করিল। আজ ছয় মাসের অধিককাল, উভয়ে উভয়ের মন জানিয়াছে—উভয়ের এরূপ নিভৃত ও দীর্ঘকাল সাক্ষাতের সুযোগও বহুবার হইয়াছে—কিন্তু সরোজ বাক্যে ভিন্ন, লীলার সহিত প্রণয়ীজনোচিত ব্যবহার কোনও দিন করে নাই—তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি, তাহার ভদ্রতা জ্ঞান, লেশমাত্র অসংযম হইতে এতদিন তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

তারপর এবিষয়ে দুজনে আলোচনা হইল। লীলার পিতা যখন ইহাদের অর্থের উপর কিছু মাত্রও ভাগ বসাইতে সম্মত নহেন—সরোজ যাহা বেতন পায়, এবং লীলা চিকিৎসা ব্যবসায়ে যাহা উপার্জন করে, তাহাতে, ব্যয়বাহুল্য না করিয়া, সস্তা অঞ্চলে একখানি ছোটখাট বাড়ী লইয়া সাধারণ ভদ্রগৃহস্থের মত থাকিলে এখনও এ দুটি প্রাণী, সম্মিলিত জীবনযাপন করিতে পারে। য়ুরোপীয় সমাজে, বিবাহের দিনটি স্থির করিবার ভার একমাত্র "কনে"র উপর,— তদনুসারে সুখমিলনের সেই দিনটি যত শীঘ্র সম্ভব নির্দ্ধারিণ করিবার জন্য সরোজ লীলাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। লীলা বলিল, "আচ্ছা তাই হবে গো তাই হবে! বাবার কাছে আগে সব কথা বলি। কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ী আসছ ত, সেই সময় শুনতে পাবে।"

সরোজ বলিল, "আচ্ছা লীলা, আমি এক কাজ করি। এখনি তোমাদের বাড়ী যাই চল না। আমি বরং নীচে লুকিয়ে বসে থাকবো এখন ; বাবার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে এক মিনিটের জন্যে তুমি নীচে এসে আমায় বলে যাবে।"—লীলা বলিল, "না না সে কি হয়? কাল সকালে এসে তুমি শুনবে। তোমার যে আর দেরী সইছে না দেখছি!"

"মানুষের সহন শক্তির একটা সীমা ত আছে? আর কত সওয়া যায় বল!"—বলিয়া সরোজ প্রিয়তমার ওষ্ঠে একটি এবং উভয় গণ্ডে দুইটি চুম্বন করিল।

"লোভী বালক!"—বলিয়া লীলা সরোজের বাহুতে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "আটটা বাজে বোধ হয়। এখন ওঠা যাক চল। আমি বাড়ী গিয়ে তবে বাবার খাবার ঠিক করবো।"

দুজনে তখন উঠিয়া, গেটের দিকে চলিল। বাহির হইয়া, উভয়ে কালীঘাটগামী ট্রামে উঠিল। এলগিন রোডের মোড়ে নামিয়া, লীলাকে তাহার গৃহদ্বার অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া, সরোজ নিজের বাসায় গেল। উভয়েরই বাসা কাছাকাছি।

সরোজের এই বাসায় আরও ২/৩ জন খৃষ্টীয় যুবক বাস করেন—মেসেরই মত। সরোজ নিজ বাসায় গিয়া ভৃত্যের নিকট শুনিল তাহার জন্য একখানি টেলিগ্রাম অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মা ও ভাইয়েরা আসানসোলে থাকেন, ভাবিল, হয়ত তাঁহাদেরই কাহারও কোনও অসুখ বিসুখ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপর হইতে, হলুদবর্ণ খামখানি ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামটি পড়িল। একবার—দুইবার—তিনবার পড়িল। উহা বোম্বাই হইতে আসিতেছে—জার্ম্মাণ লটারী এজেন্ট তার করিয়াছেন—

"আপনার ক্রীত টিকিটখানি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং প্রাইজ লাভ করিয়াছে, আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড! সাড়ে—সাত—লক্ষ—টাকা! সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।"—বিড় বিড় করিয়া এই কথা দুই তিন বার উচ্চারণ করিবার পরই, সরোজ সংজ্ঞা হারাইয়া সেইখানেই ভূমিশায়ী হইল।

"ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া"— বলিয়া ভৃত্য চীৎকার করিয়া উঠিল। পাশের ঘরের মিস্টার ঘোষাল ছুটিয়া আসিলেন। ভূপতিত সরোজের হাত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পাঠ করিয়া মুহূর্ত মাত্রে সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বাড়ীর সামনেই রাস্তার অপর পারে বরফের দোকান ছিল ভৃত্যকে বরফ আনিতে ছুটাইয়া, অন্য একজনকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই সরোজের জামা প্রভৃতি খুলিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার মাথায় বরফ প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিল। ভোরবেলায় ডাক্তার বলিলেন, "আর কোনও ভয় নাই।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মিস্টার ঘোষাল ফী কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার উত্তর দিলেন, "থাক্—উনি ভাল হয়ে উঠুন, ওঁর কাছেই ফী নেবো এখন। আমি বাড়ী গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়েই আবার আসছি!" বলা বাহুল্য রোগের কারণ স্বরূপ টেলিগ্রামখানি ডাক্তারবাবু স্বচক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লীলার পিতা শ্রীযুক্ত হরনাথ সান্যাল মহাশয়ের বয়স ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক সময় তিনি একজন বলশালী পুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। নাটোর টীমে ক্রিকেট খেলিয়া খুব নামও করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি—এখন তিনি বাতে পঙ্গু, চোখেও আর ভাল দেখিতে পান না। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেন। এমন কিছু বড় চাকরি নয়—ফিনান্স দপ্তরে কেরাণীগিরি করিতেন,—শেষ পর্যন্ত ১৫০ টাকা বেতন হইয়াছিল,—এখন পঁচাত্তরটি টাকা মাসে পেন্সন পান। তাঁর সহধর্ম্মিণী ১০ বৎসর পূর্বেই গত হইয়াছেন। একমাত্র লীলা ছাড়া, আর কোনও সন্তান তাঁহার জীবিত নাই। সুতরাং এই কন্যাই সংসারে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র বন্ধন।

কলেজে পঠদ্দশাতেই হরিনাথ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়—নিজ নামটিরও পরিবর্ত্তন করিয়া মিস্টার হ্যারি স্যাণ্ডেল হইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে

আবেদন করিয়া ও ফী দিয়া, এই নাম পরিবর্ত্তন পাকা করিয়া লইয়াছিলেন। সরকারী কাগজপত্রে এখনও তাঁহার নাম হ্যারি স্যাণ্ডেল—ঐ নাম সহি করিয়া মাসে মাসে পেন্সনের টাকা আনিয়া থাকেন, কিন্তু চিঠিপত্র লিখিতে এখন তিনি শ্রীহরিনাথ সান্যাল স্বাক্ষর করেন। বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে দেশে যখন স্বদেশী ভাবের বন্যা বহিল, তখন হইতেই তাঁহার এই মতি পরিবর্ত্তন। ধর্ম্ম, মানুষের অন্তরের জিনিষ, অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই—যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম্ম—কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত। খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাঁহাকে যে "সাহেব" হইতে হইবে, এমন কোন কথা ত নাই-ই ; বরং তাহা হইতে চেষ্টা করাই স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতা। একদিন কৌতূহলবশতঃ স্যাণ্ডেল সাহেব কলেজ স্কোয়ারে বিপিন পালের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া, রুমালে চোখের জল মুছিয়া, গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া-সোজা তিনি ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটির কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করেন এবং পকেটে যে কয়টি টাকা ছিল, তাহা দিয়া মিলের ধুতি ও শাড়ী ক্রয় করিয়া বাড়ী আসেন। বহুকাল যাবৎ তিনি ধুতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—বাড়ীতে পায়জামা স্যুটই ব্যবহার করিতেন। সেদিন, আফিসের ইংরাজি পোষাক ছাড়িয়া, নূতন ধুতি একখানি পরিধান করিলেন। ভাবের আবেশে, সেই কোরা ধুতির গন্ধটিও যেন তাঁহার আতর গোলাপের তুল্য মনে হইল। মিসেস স্যাণ্ডেল অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই—বাড়ীতে বিলাতী ও বাইরে যাইতে হইলে দেশী শাড়ী পরিতেন। স্বামীর অনুরোধে তিনিও বিলাতীর পরিবর্ত্তে স্বদেশী মিলের শাড়ী ধরিলেন। পাঁচ বছরের মেয়ে লীলার নাম ছিল তখন লিলি—বা লিল্—তাহাকে হরিবাবু লীলাবতী করিলেন। পিতাকে সে ড্যাডি ও মাতাকে মাম্মি বলিত, তাহাকে বাবা মা বলিতে শিখাইলেন। টেবিল চেয়ারের পরিবর্ত্তে কম্বলের আসন পাতিয়া ভাত খাওয়া প্রচলিত হইল। জীবনযাত্রা প্রণালীতে দেশীয় প্রথা অবলম্বনে কিছু-ব্যয় লাঘবও হইল।

একে মেয়েটি কালো, তাঁর নিজের তেমন অর্থ-সামর্থ্য নাই—বিবাহের জন্য ভাল ঘর বর জুটিবে কি না তাহা ঈশ্বরই জানেন—না যদি জোটে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে মেয়েটা কষ্টে না পড়ে, এই মনে করিয়া, হরিনাথবাবু তাহাকে ডাক্তারি পড়িবার জন্য ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। লীলা আজ দুই বৎসর হইল ক্যাম্বেল হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। মেয়ের প্র্যাকটিসের সুবিধার জন্য হরিনাথবাবু গলিমধ্যে পূর্ব্ব বাসা ত্যাগ করিয়া এলগিন রোডে উঠিয়া আসিলেন। এই দুই বৎসরেই লীলা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে বয়সও কম, ব্যবসায়েও নূতন ব্রতী, তাই লোকে এখনও তাহার চিকিৎসার প্রতি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। তবে চিকিৎসায় যত হউক না হউক, ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি-পরিচর্যা সম্বন্ধে লীলার বেশ সুনামই হইয়াছে।

পূর্ববর্ণিত যুবক সরোজ রায়ের সহিত ইহাদের পরিচয় একবৎসর মাত্র। সরোজ পূর্ব্বে ইটালিতে বাস করিত—এ পাড়ায় সে উঠিয়া আসার পর আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত। যুবকটিকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র দেখিয়া, হরিনাথবাবু তাহাকে আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। মাসকয়েক মধ্যেই সরোজ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, লীলাকে বিবাহ করিবার বাসনা জানায় ও তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করে। হরিনাথ আহ্লাদের সহিত সে সম্মতি প্রদান করিয়া বলেন "বেশ ত বাবা, লীলা যদি রাজী হয়, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তুমি তার মন পাবার জন্যে চেষ্টা কর।"—অসাধ্য সাধন সরোজকে করিতে হইবে না। ইহা বুড়া বিলক্ষণ জানিতেন। সরোজের প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র লীলা কেমন আগ্রহভরে তাহা শ্রবণ করে, কোনও দিন তার আসিবার কথা আছে কিন্তু আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিলে কিরূপ অধীর হইয়া ঘর বাহির করিতে থাকে, এবং আসিলে কিরূপ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া উঠে, ক্ষীণ দৃষ্টি সত্ত্বেও এ সকল তাঁহার চক্ষু এড়ায় নাই।

অতঃপর, সরোজ লীলাকে লইয়া কোথাও বেড়াইতে যাইতে চাহিলে, কিংবা ইংরাজি থিয়েটার বা বায়স্কোপের বৈকালিক অভিনয়ে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, হরিনাথ বাবু প্রসন্ন মনে সম্মতি দিতে লাগিলেন। সরোজ অন্যদিন ত আসেই—প্রতি রবিবারে নিয়মিত ভাবে এখানে আসে এবং ইঁহাদের সঙ্গে একত্র গির্জ্জায় যায়।

মাস দুই পরে একদিন হরিনাথবাবু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ মা, সরোজ কি তোকে কোনও কথা বলে?"

হাজার হোক বাঙ্গালীর মেয়ে, পিতার প্রশ্নের মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিয়াও লীলা নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বাবা?"

হরিনাথ বলিলেন, "সরোজ আমার কাছে পূর্ব্বে বলেছিল, তোকে সে বিয়ে করতে চায় তোর কাছে সে রকম প্রস্তাব সে করেছে?"—লীলা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল, 'ওঃ—সে কথা ত মাঝে মাঝে বলেন। আমি রাজ্বী হইনি, বাবা।"

"কেন মা, সরোজ ত বেশ ছেলে। কেমন ভদ্র, কেমন শিক্ষিত, কেমন সচ্চরিত্র—চাকরিতেও সুনাম করেছে, ক্রমে উন্নতিও হবে, তবে কেন তুই আপত্তি করেছিস?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি কি তোমার এতই ভার বোঝা হয়েছি যে তুমি আমায় বিদায় করতে চাও?"

হরিনাথ আদরে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভাব বোঝা তুই কেন হবি, মা? বরং তুই মেয়ে হয়েও আমার ছেলের কাজ করছিস। যে কটি টাকা পেন্সন পাই তাতে ত আমাদের সব খরচ কুলোয় না,—নিজের উপার্জ্জনের টাকা তাতে যোগ করে তুই সংসার চালাচ্ছিস। তা নয় ; কিন্তু মা, আমি ত বুড়ো হয়েছি, আমি আর ক'দিন? আমার অভাব হলে, কে তোকে দেখবে শুনবে, কাকে আশ্রয় করে তুই জীবন কাটাবি? তাই আমার সাধ, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোর একটা কিনারা দেখে যাই। আমি আর ক'দিন বল্?"

লীলা রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "ঐ সব অমঙ্গলের কথা তুমি খালি খালি আমায় কেন বল বাবা? তুমি কি ভাব ঐ সব শুনতে আমার বড় মিষ্ট লাগে?"—হরিনাথবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, ও কথা না হয় আর নাই বললাম। কিন্তু তুই সংসারী হবি, তোব ছেলেমেয়ে হবে— সে সব দেখতে কি আমার সাধ হয় না রে? বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখিস।"

সেদিন এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই শেষ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে হরিনাথবাবু কথাটা পাড়িতেন, লীলার কিন্তু সেই একই উত্তর—'আমি চলে গেলে তোমাব সেবা কে করবে বাবা?"—আজ পিতাকে আহার করাইয়া, তাঁহাকে শয্যায় দিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে লীলা সরোজের সহিত তার অদ্যকার অধিকাংশ কথোপকথন নিবেদন করিল। সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যদি তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ হয় যে, আমি তোর কাছে গিয়ে না থাকলে তুই বিবাহই করবিনে, তা হলে তাই হবে। কিন্তু আমার খরচস্বরূপ মাসে মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা জামাইকে নিতে হবে, সেটা তাকে বুঝিয়ে বলিস।"—লজ্জা ত্যাগ করিয়া, বিবাহের দিন স্থির সম্বন্ধে সরোজের আগ্রহের কথাও লীলা পিতাকে জানাইল। তিনি বলিলেন, "তা বেশ। এ মাসের ত আর দিন দশেক মোটে বাকী—আসছে মাসের মাঝামাঝিতে একটা রবিবার দেখে দিন স্থির করে বলিস। তোর জন্যে কিছু গহনা গড়াতে হবে, কাপড়-চোপড়ও তৈরী করতে হবে—তাতে যেটুকু সময় দরকার, তার বেশী আর দেরী করে ফল কি?"

পিতাকে ঘুম পাড়াইয়া, লীলা নিজ শয়নকক্ষে গিয়া, তখনি রবিবার ১৭ই মার্চ্চ দিনটি স্থির করিল। দশদিন আর সতেরো—সাতাশ দিন। তারপর চির মিলনোৎসব আনন্দের আবেগে, সরোজের ফটোখানি বাহির করিয়া লীলা বারবার চুম্বন করিল। অবশেষে সেখানি

বালিসের তলায় রাখিয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া শয়ন করিল ; কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না।—পরদিন প্রাতে, অন্যদিন অপেক্ষা শীঘ্রই লীলা শয্যাত্যাগ করিল। পিতা জাগিবার পূর্ব্বেই স্নানাদি সমাপন করিয়া লইল। সাড়ে সাতটার সময় সরোজ আসিবে, এখানেই ছোট হাজরী খাইবে—তারপব তিনজনে একত্র গির্জ্জায় যাইবে এরূপই পরামর্শ ছিল।

লীলার মনটি আজ বড় প্রফুল্ল। এতদিন কর্ত্তব্যের খাতিরে সরোজকে সে তেমন আমল দিতে পারে নাই—সরোজের মনে কষ্ট দিয়াছে—আজ সে বাধা অপসৃত—আজ সরোজ আসিলে সে তাকে সুখী করিতে পারিবে। লীলার মনের ভিতব আজ কেবল গানের লহর উঠিতেছে—মাঝে মাঝে গুন গুন করিয়া সে গান গাহিতেছে। গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া, আজ সরোজকে এইখানে খাইবার জন্য সে অনুরোধ করিবে। আজ অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ, দুজনে একসঙ্গে থাকিবে। আজ কোনও বায়স্কোপে ভাল ফিল্ম আছে কিনা কে জানে! ওবেলা দুজনে দেখিতে গেলে হয়। না—বায়স্কোপে নয়—হাজার লোকেব মাঝে নয়, একটিও মনের কথা কহিবার সুযোগ পাওযা যাইবে না—তার চেয়ে ইডেন গার্ডেন কিংবা গড়ের মাঠই ভাল। একটু সকালে বাহিব হইযা শিবপুরের বাগানে গেলেও হয়।

বেলা ৮টা বাজিতে আর বেশী দেরী নাই। ছোট হাজরী প্রস্তুত—সরোজ আসিলেই হয়। নীচে সদব দরজার নিকট একটু শব্দ হইলেই লীলার কাণ খাড়া হইয়া উঠে। না, ও ত সরোজের পদশব্দ নয়! লীলা অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া, রাস্তার ধারের দ্বিতল বাবান্দায় বাহির হইযা একদৃষ্টে পথপানে চাহিযা রহিল। কত লোক আসিতেছে, কই সরোজের এখনও দেখা নাই কেন? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল—পিতাব চা পান ও ছোট হাজবীর সময উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া, লীলা বাবুর্চ্চিকে চা ভিজাইয়া টোস্ট সেঁকিতে হুকুম দিল।

সাড়ে ৮টা বাজিলে, লীলার মনে কু গাহিতে আবম্ভ করিল। হঠাৎ সবোজের কোনও অসুখ করিল না ত? নহিলে যে মানুষ কাল বাত্রেই আসিবার জন্য উদ্যত—সে আজ নির্দ্ধারিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিল না! ইচ্ছা হইতে লাগিল, সরোজের বাসায় বয়কে পাঠাইয়া সংবাদ লয়, কিন্তু বয় এখন গেলে, পিতার চা পানে আরও বিলম্ব হইয়া যাইবে। তাই সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল। পিতাকে আনিয়া ছোট হাজরী খাইতে বসাইল।

চা পান করিতে করিতে হঠাৎ হবিনাথবাবুব স্মরণ হইল—কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই সরোজ ত আজ এল না!"

লীলা ম্লান মুখে বলিল, "আজ ত বরং অন্য রবিবারের চেয়ে সকালেই তাঁর আবার কথা ছিল বাবা, কি জানি কি হল!"

"বোধহয় কোনও কাজে আটকে পড়েছে"—বলিয়া হরিনাথ বাবু চায়ের পাত্রটি শেষ করিলেন।

বারান্দায় ঈজি চেয়ার পাতা থাকে, ছোট হাজরীর পর হরিনাথবাবু তাহাতে বসিয়া ধূমপান ও স্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্র পাঠ কবেন। আজও যথারীতি সেই চেয়ারে গিয়া বসিলেন। বয, গুড়গুড়িতে তামাক দিয়া গেল—কিয়ৎক্ষণ ধূমপানের পর, পকেট হইতে চশমাখানি বাহিব করিয়া চোখে লাগাইযা স্টেটস্‌ম্যানের ভাঁজ খুলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। লীলা খানাকামরায় গৃহকার্য্য করিতেছে—এবং মাঝে মাঝে বারান্দায় বাহির হইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে।

হঠাৎ এক সময় হরিনাথবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"লীলা—শোন্—শোন্—শুনে যা!"

লীলা সেলভিট কাপড় দিয়া একটা কাচের গ্লাস পালিস করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "কি বাবা?"

কাগজখানা কন্যার হাতে দিয়া, একটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "পড়্ এইখানটা!"

বড় বড় হেডলাইন দিয়া তাহার নিম্নে মিস্টার সরোজনাথ রায়ের অসাধারণ সৌভাগ্যের সংবাদটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লীলার হাত কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে তার হাত হইতে কাগজখানি পড়িয়া গেল। নিকটস্থ চেয়ারখানাতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা, তাহলে কি হবে?"

হরিনাথবাবু কন্যার দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষীণদৃষ্টি, মেয়ের মুখ যে কত ফেকাসে হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। লীলা আবার বলিল, "কি হবে বাবা?"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে মা—তিনি তোকে রাজরাণী করে দিলেন। কি অসীম দয়া তাঁর!"

লীলা নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল—"দয়া? দয়া কি? না অভিশাপ? প্রথমেই ত দেখছি যে লোকের সাড়ে সাতটার মধ্যে আসবার কথা, ৯টা বেজে গেল, তবু তার দেখা নেই!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কাল সন্ধ্যেবেলা এ খবর সরোজ তোকে বলেনি?"

"না বাবা।"

"বোধহয় গোপন রেখেছে। সে দেখতে চেয়েছিল হয়ত, সে যেমনটি আছে, তেমনি তাকে তুই গ্রহণ করিস কি না। তার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর তুই তাকে গ্রহণ করলে, তার মনে হতে পারতো—আমাকে নয় আমার টাকাকেই এ গ্রহণ করছে। এখন সে ত জানছে—টাকার লোভে কাল তুই বিবাহে সম্মতি দিসনি!"

"কি জানি বাবা, কাল হয়ত তিনি নিজেই জানতেন না।"

"হ্যাঁ তাও হতে পারে বটে।"

লীলা বলিল, "কিন্তু বাবা, আমি যে সম্মতি দিয়ে ফেলেছি! কি হবে এখন?"

কন্যার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া হরিনাথ বলিলেন, "কিসের কি হবে?"

লীলা বলিল, "বাবা, সে আজ একটা রাজা—আমরা সামান্য লোক। তাব সঙ্গে আর আমরা কি করে মিশবো বাবা? মিশতে পারবো কি?"

"কেন? ওঃ, বুঝেছি। আচ্ছা, ভেবে দেখি কথাটা। তুই ভয় করছিস—সে এখন বড়লোক হয়ে, আমাদের মত অবস্থার লোককে হয়ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে। এই ত?"

লীলা বলিল, "তার যে হেড বাবুর্চ্চি হবে, তার মাইনে নিশ্চয়ই তোমার পেন্সনের চেয়ে বেশি হবে বাবা!—তুমি কি—"

"এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর, আর কি আমি জামাইয়ের বাড়ী গিয়ে বাস করতে পারব, এই কথা জিজ্ঞাসা করছিস ত?—না, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না মা। কিন্তু সরোজ যে রকম ছেলে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে কি তার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে?"

"প্রথম নমুনা ত এই দেখছই বাবা। তুমি কি বল, তাই শোনবার জন্যে সে কাল রাত্রেই এসে, নিচের ঘরে দুঘণ্টা একলা বসে থাকতে প্রস্তুত ছিল। তাতে আমি আপত্তি করায়, আজ সকালে সাড়ে সাতটা হতে না হতেই এখানে ছুটে আসবে বলেছিল। সাড়ে নটা বাজে—এখনও পর্যন্ত তার দেখা নেই!—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর কাকে বলে, বাবা?"

হরিনাথবাবু বলিলেন, "তা না হতেও পারে। এই সংস্রবেই—হঠাৎ তার কোনও কাজ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে—তাই নিয়ে সে ব্যস্ত আছে।"

লীলা বলিল, "আচ্ছা বাবা, যেদিন আমার ডাক্তারি পাশ হওয়ার খবর জানা গেল,—আমি যদি ছুটে এসে সে খবর তোমায় না দিতাম, তুমি যদি পরদিন খবরের কাগজে তা পড়তে, তা হলে তোমার কেমন লাগতো?"

"ওঃ, সে নিজে এসে তোকে এ খবরটা দেয়নি বলে তুই অভিমান করছিস?—তা,

সে নিজেই এখনও জানতে পেরেছে কি না তার ঠিক কি? সে হয়ত স্টেটস্‌ম্যান দেখেনি।"

"গুড মর্ণিং—গুড মর্ণিং—এই যে আপনারা দুজনেই রয়েছেন!"

"কে? ঘোষাল? এস—এস—খবর কি?"

ঘোষাল বলিল, "বসবার সময় নেই মিস্টার সান্যাল। কাল সন্ধ্যার পর, সরোজ হঠাৎ ভারি পীড়িত হয়ে পড়েছে। আপনারা দুজনে একবার আসুন আমার সঙ্গে।"

হরিবাবু তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ? সবোজের অসুখ হয়েছে? কি অসুখ? কি অসুখ? কেমন আছে সে?"

ঘোষাল বলিল, "বসুন বসুন। মিস সান্যাল—আপনি দয়া কবে', পাঁচ মিনিটের মধ্যে জুতো বদলে আসুন। এই যে, স্টেটস্‌ম্যান রয়েছে—আপনারাও খবরটা তা হলে পড়েছেন নিশ্চয়। কাল রাত আটটার সময় সরোজ বেড়িয়ে বাসায় ফিবে এসে, বোম্বাই থেকে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম পায়। পেয়েই তার ফিট হয়—আমরা তখনি ডাক্তার আনি, মাথায় বরফ দিই—সারারাত অজ্ঞান ছিল—এখন সকালে একটু জ্ঞান হয়েছে।"

হরিবাবু বসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!—তারপর—তারপর ডাক্তার কি বললে? জীবনের কোনও—"

"না, জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই এ কথা ডাক্তার আজ সকালে বলে গেলেন। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর, সরোজ আমায় বললে, আপনাদিগকে তার অসুখের খবর দিতে। তাই আমি আপনাদের নিতে এসেছি। মিস্ সান্যাল—দয়া করে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

লীলা ছুটিয়া উপরে চলিয়া গেল।

পিতা পুত্রী উভয়ে যখন গিয়া সরোজেব বাসায় পৌঁছিলেন, তখন সরোজ আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারকে ইসারায় ডাকিয়া হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বুঝছেন?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "আর কোনও ভয় নেই। ২/১ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম, আর কিছুই দরকার হবে না। কাল না হোক—পরশু নিশ্চয়ই উনি আবার তাজা হয়ে উঠবেন।"

লীলা সারাদিন সরোজের পাশে বসিয়া কাটাইল। সরোজ মাঝে মাঝে জাগে, বেশ কথাবার্ত্তা কহে, আবার ঘুমাইয়া পড়ে। জাগিলে, লীলা তাহাকে একটু একটু গরম দুধ খাওয়ায়।

এদিন এইভাবে কাটিল। পরদিন, বেশ উন্নতি দেখা গেল। আজ, নিদ্রাকাল অল্প—জাগরণ সময় অধিক।

এক সময়, লীলা ছাড়া ঘরে আর কেহ নাই দেখিয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাকে সে কথা বলেছিলে লীলা?"

"বলেছিলাম।"

"তিনি রাজী হয়েছেন?"

"হয়েছিলেন।"

লীলা যে "হয়েছেন" না বলিয়া 'হয়েছিলেন' বলিল, রোগীর মস্তিষ্ক তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিল না। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ"—বলিয়া সরোজ আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তার প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া, লীলার প্রাণের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠিল; কারণ ইহারই মধ্যে মনে মনে স্থির সে করিয়াছে—এ বিবাহ হইতে পারে না। এখন নয়—সরোজ বেশ ভাল হইয়া উঠুক, তখন মিনতি করিয়া, নিজবাক্য ফিরাইয়া লইতে হইবে।

ডাক্তারের কথাই সত্য হইল। পরদিন সরোজ বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। তারযোগে যে সংবাদ আসিয়াছিল, জার্ম্মান লটারির বোম্বাই এজেন্ট পত্রযোগেও সে সংবাদ

জানাইয়াছেন। তিন সপ্তাহ পরে জার্ম্মানি হইতে চেক আসিবে, ইহাও তিনি লিখিয়াছেন।

সরোজ তাহার কর্ম্মে ইস্তফা দিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু হরিনাথবাবুর পরামর্শে সে তাহা করে নাই—মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়া একমাসের ছুটি লইয়াছে।

এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। জার্ম্মানির ডাক আসিয়া পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে। জার্ম্মানি হইতে চেকখানা আসিয়া পৌঁছিলেই মূল্য দিবার কড়ারে ইতিমধ্যে বাইশ হাজার টাকা মূল্যের একখানি রোল্‌স বয়েস মোটরকার সে কিনিয়াছে।

সে গাড়ি এখন দোকানের আস্তাবলেই আছে—বাড়ি কেনা হইলেই গাড়িখানা আনা হইবে। প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে গাড়ি আসিয়া সরোজের মেসের দ্বারে দাঁড়ায়। সরোজ তাহাতে আরোহণ করিয়া যেখানে ইচ্ছা যায়। একখানি ভাল বাড়ির সন্ধানেও সে আছে।

বেলা ৯টার সময় নবক্রীত মোটরে চড়িয়া সান্যাল ভবনে আসিয়া সরোজ দেখিল, নিম্নে খানা-কামরায় লীলা রহিয়াছে—তাহার পিতা ছোট হাজরী সারিয়া উপরে চলিয়া গিয়াছেন। সরোজ বলিল, "লোয়ার সার্কুলার রোডে একখানি ভাল বাড়ির খবর পেয়েছিল লীলা। বর্ত্তমান মালিক ৫/৬ বছর আগে, দেড় লাখ টাকায় সেখানি কিনেছিলেন। এখন তাঁর অবস্থা খারাপ—বোধহয় ৭০/৭৫ হাজারেই সেখানি পাওয়া যেতে পারে। চল বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিনজনে বাড়িটা দেখে আসি।"

লীলা বলিল, "বাবাকে নিয়ে যাও—আমি এখন যেতে পারবো না। আমার কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ লীলা? চল, চল, লক্ষ্মীটি।"

লীলা বলিল, "আমার রোগী আছে—তাকে এখনি দেখতে যেতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ—আমি বসি। ততক্ষণ বাবার সঙ্গে একটু গল্প করি—তুমি কাজ সেবে এস। তারপর তিনজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমার গাড়ি নিয়েই তুমি যাও।"

লীলা বলিল, "হ্যাঁ—চার টাকা ভিজিটের ডাক্তারণী, রোলস্ বয়েসে চড়ে রুগী দেখতে যাবে! আমি ঠিকেগাড়ি আনতে পাঠিয়েছি।"

সরোজ, লীলার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা, আজকাল তুমি এমন কেন হয়ে গেছ লীলা?—আমার কাছ থেকে যেন দূরে দূরে থাকতে চাও। কেন, আমি কি করেছি? তোমার কাছে আমি কি কোনও অপরাধ করেছি?"

"না, অপরাধ তুমি কেন করবে?"—বলিতে বলিতে, লীলার বুক কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বাহিরে ছক্কড় গাড়ি দাঁড়াইবার শব্দ হইল। "আচ্ছা, আমি তা হলে চললাম—ফিরতে আমার দেরি হতে পারে। তুমি বাবাকে নিয়ে বাড়ি দেখে এস।"—বলিয়া, ডাক্তারি ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া, লীলা বাহির হইয়া গেল।

সরোজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিল, "কি জানি—কিছু বুঝতে পারছিনে!"

বাস্তবিকই, সরোজের নিকট লীলার ব্যবহার আজকাল অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। নির্জ্জনে পাইয়া, তাহাকে কোনওরূপ আদর করিতে গেলেই সে সরিয়া দাঁড়ায়। মুখখানি সদাই বিষণ্ণ করিয়া থাকে। কে জানে, তার কি হইল।

বাড়ি দেখিয়া ফিরিবার সময়, হরিনাথবাবু সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া সরোজকে বিদায় দিলেন। লীলা তখনও রোগী দেখিয়া ফেরে নাই।

রাত্রিভোজন শেষ হইলে, লীলা সরোজকে বলিল, "তুমি একটু বস—আমি বাবাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।"

দ্বিতলের ভিতরের বারান্দার রেলিং ধরিয়া সরোজ দাঁড়াইয়া রহিল। চৈত্র মাসের সুবিমল জ্যোৎস্না ধারায় গগন ভুবন প্লাবিত।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করিবার পর লীলা ফিরিয়া আসিল।

সরোজ বলিল, "লীলা, এস এই বারান্দায় এস।"

লীলা বারান্দায় গেলে সবোজ বলিল, "আজ কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে দেখ লীলা!"

লীলা ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বেশ।"

"আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?—এই জ্যোৎস্নায়, দুজনে ময়দানে কিংবা ব্যারাকপুর রোডে খানিক বেড়িয়ে আসি। যদি হুকুম কর, সমুখের বাড়ি থেকে, এখনই আমি ফোন করে গাড়িটা আনাই।"

লীলা বলিল, "বাবা ঘুমিয়েছেন!"

"তাঁর বিনা অনুমতিতে রাত্রে আমার সঙ্গে বেড়াতে পার না, এই কথা বলছ ত? দুদিন বাদে যে তোমার স্বামী হবে তার সঙ্গে রাত্রে তুমি বেড়াতে বেরুলে বাবা নিশ্চয়ই রাগ করবেন না। বল লক্ষ্মীটি—গাড়ি আনাই?"

লীলা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

"সব কথাতেই না! না—না—না এই তোমার বুলি হয়েছে। এমন পাষাণ কেন হলে লীলা? এমন ত তুমি ছিলে না?—আচ্ছা, বেড়াতে না যাও না যাবে। এস এইখানে আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে দুজনে গল্প করি। তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বসে মনের কথা কইনি যেন কত কাল—কত বছর। এ ক'দিন একটু চুমো পর্যন্ত দাওনি তুমি আমায়। এস—আজ একবার তোমায় বুকে নিই।"—বলিয়া সরোজ লীলার হস্ত ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে আর্কষণ করিল।

"না—বলিয়া লীলা হাত ছাড়াইয়া, দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

সরোজ দুঃখিত স্বরে বলিল, "কেন লীলা?—তুমি কি আমায় আর সহ্য করতে পারছ না?—আমি কি তোমার চক্ষুশূল হযেছি? তোমায় বিরক্ত করছি? চলে যাব?

"না।"

"ওগো মিস্ 'না'—ওগো 'না' সুন্দরী!—তোমার মুখে কি না ছাড়া অন্য কোনও কথা জীবনে আর শুনতে পাব না?"

লীলা বলিল, "সরোজ, তুমি মনে দুঃখ কোর না। তোমায় বিবাহ করা, আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। আমি তোমায় যে বাক্য দান করেছিলাম—দয়া করে, সে বাক্য আমায় ফিরিয়ে দাও!"

সরোজ লীলার কাছে সরিয়া আসিয়া, কিন্তু তাকে স্পর্শ না করিয়া বলিল, "সে কি? কি বলছ তুমি? কেন, এক হপ্তা আগে যা সম্ভব ছিল, আজ তা হঠাৎ অসম্ভব হল কেন?—আমার নামে, আমার চরিত্র সম্বন্ধে কেউ কি কোনও মিথ্যা কথা তোমায় বলেছে—যা বিশ্বাস করে তুমি আমায় পরিত্যাগ করাই স্থির করেছ? যদি সেরকম কিছু শুনে থাক—তবে জেনো—তা সর্ব্বৈব মিথ্যা—মিথ্যা—কোনও স্বার্থপর লোক, নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায়—বা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে, মিথ্যা করে তোমায় বলেছে!"—শেষ কথাগুলি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবেই সরোজ উচ্চারণ করিল।

লীলা বলিল,"না সরোজ—তুমি শান্ত হও—সেরকম কোনও কথা কেউ আমায় বলেনি! কার এমন সাহস যে ও রকম কথা আমায় বলে? আর, বললেই বা আমি তা বিশ্বাস করব কেন? না—তা নয়। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ—এক হপ্তা আগে যা সম্ভব ছিল তা আজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল কেন?—কেন তা তোমায় বলছি, শোন। যখন তোমার আমার মিলন সম্ভব ছিল—তখন তোমার আমার সাংসারিক অবস্থাও সমান ছিল। এখন তুমি রাজার ঐশ্বর্য্য লাভ করেছ—আমি যে ফকিরের মেয়ে সেই ফকিরের মেয়েই আছি। অবস্থাগত সাম্য না থাকলে, সে মিলন কি কখনও সুখের হতে পারে? তাই আমি তোমায় বিবাহ না করাই স্থির করিয়াছি। আমি গরীবের মেয়ে, চিরকাল গরীবভাবেই কাটিয়েছি—

আজ তোমায় বিয়ে করে, রাজরাণীর মত জীবনযাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব—অসম্ভব। সে কল্পনা পর্যন্ত আমার অসহ্য! সে নিম—নিমের চেয়েও তেতো, আমায় গিলতে বাধ্য কোর না সরোজ। তুমি বলেছিলে আমায় ভালবাস। যদি যথার্থই আমায় ভালবাস, তাহলে এ নির্যাতন আমায় কোর না—আমি কিছুতেই তোমার হতে পারবো না সরোজ! আমায় দয়া কর—আমায় ক্ষমা কর—আমায় মুক্তি দাও। আমার বুকে তুমি মৃত্যুবান হেন না—আমায় বেঁচে থাকতে দাও—তুমি আমায় ভুলে যাও—তুমি চলে যাও।" বলিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া, লীলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরোজ বলিল, "আচ্ছা লীলা, প্রথমটি পারবো না, তোমার দ্বিতীয় আদেশ আমি পালন করছি—আমি যাচ্ছি। কিন্তু এও তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি—তোমার প্রতি আমার সে ভালবাসা,—কোনও দিন এক তিল কমবে না। ভুলতে আমি তোমায় পারবো না—অন্ততঃ কবরে যাবার আগে নয়। আচ্ছা তবে আসি।"—বলিয়া সরোজ মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ির ব্যানিস্টর ধরিয়া নামিয়া গেল।

দুই সপ্তাহ পরে বোম্বাই হইতে সরোজের নামে আর একখানি চিঠি আসিল।

সরোজ সেখানি পাঠ করিয়া, ম্লানমুখে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি চিন্তা করিল। তারপর হঠাৎ তাহার মুখখানি প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া, সে তাড়াতাড়ি সান্যাল গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন ১১টা। বয়ের নিকট শুনিল, সাহেব আহার সারিয়া পেন্সন আনিতে গিয়াছেন, মিস্ সাহেব উপরে আছেন।

সরোজ উপরে গিয়া দেখিল, লীলা বসিবার ঘরে সোফায় পড়িয়া কি একখানি বহি পড়িতেছে। তাহার চেহারা অত্যন্ত শুষ্ক—এই দুই সপ্তাহেই সে অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে।

সরোজ আসিয়া, হঠাৎ লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে গাঢ় চুম্বন করিয়া বলিল, "লীলা—ঈশ্বর দয়া করেছেন। তোমার আমার মধ্যে রূপোর যে পাহাড় উঠে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেয়েছিল, ঈশ্বর সেটা সরিয়ে নিয়েছেন। এই চিঠিখানি পড়ে দেখ লীলা।"—বলিয়া খামখানি লীলার হস্তে দিল।

লীলা পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িল ঃ—

প্রিয় মহাশয়,

গত মাসের ২০শে তারিখে আমরা আপনাকে তারযোগে, এবং ঐ তারিখে লিখিত পত্রযোগেও জানাইয়াছিলাম যে, আপনার ক্রীত জার্ম্মাণ লটারির টিকিটখানি ৫০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং প্রাইজ লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ঐ সংবাদ ভুল; টেলিগ্রামের দোষেই ঐ ভুল ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে যে টেলিগ্রাম আমরা পাইয়াছিলাম তাহাতে স্পষ্টই লিখিত ছিল যে ৬৫৯৭৯নং টিকিট, ঐ ৫০ হাজার পাউণ্ড প্রাইজ লাভ করিয়াছে। উহা, আপনার টিকিটেরই নম্বর—তদনুসারেই আপনাকে আমরা টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। কিন্তু গতকল্য আমরা জার্ম্মাণী হইতে যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে লেখা আছে, ঐ প্রাইজ প্রাপ্ত টিকিটখানির নম্বর—৬৫৯৯৭— টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারীদের দোষে নম্বরটি এরূপভাবে উল্টাইয়া আসিয়াছিল। অতএব ভিক্ষা, আপনাকে এই ভুল সংবাদ প্রদানের জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করিবেন।" ইত্যাদি।

পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া, লীলা বলিল, "এ কি কাণ্ড সরোজ!"

সরোজ বলিল, "আর ত আমি রাজা নই?"

"না।"

"ফকীরের সঙ্গে ফকীরণীর মিলন সম্পূর্ণ সম্ভব ত?"

"সম্ভব।"

"এবং সঙ্গত?"

"এবং সঙ্গত।"

"এবং, সেটা যত শীঘ্র হয়—তাই উচিত নয় কি?"

লীলা হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় উচিত, রাজামশাই।"

সরোজ বলিল, "আবার তুমি আমায় রাজা বলে গাল দিচ্ছ?"

"সে রাজা বলিনি—আমার হৃদয়ের রাজা!"—বলিয়া লীলা এই নূতন রাজার গলাটি দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া, কয়েকটি চুম্বন, নজর স্বরূপ প্রদান করিল।—একমাস পরে বিবাহ হইয়া গেল। বাড়ী কেনা হইল না; রোলস্ রয়েসখানাও কেনা হইল না। সকল অবস্থা শুনিয়া, ফারমের বড় সাহেব সরোজকে চুক্তি হইতে মুক্তি দিলেন কিন্তু একমাসের ভাড়া স্বরূপ ৫০০ টাকা চার্জ করিলেন। লীলা তার গহনা বেচিয়া ঐ টাকা শোধ করিয়া দিল।

তিনটি গরীব—গরীবানাভাবে মহানন্দে বাস করিতে লাগিল। বৎসরখানেক পরে একটি ক্ষুদ্র নূতন গরীব আসিয়া এই গরীবদের কুটীর আলোকিত করিল। সরোজও হেডক্লার্ক হইল।

সে সংবাদ শুনিয়া লীলা বলিল, "আমরা যদি হিন্দু হতাম ত বলতাম, খোকার পরেই তোমার মাইনে বেড়েছে।"

['নিরুপমা' বর্ষস্মৃতি সংখ্যা, ১৩৩৩]

উপন্যাস কলেজ

"সুন্দরী যত হোক আর না হোক, ভাল রকম লেখাপড়া জানা মেয়ে ভিন্ন, আর কাউকে বিয়ে করবে না।"—ইহাই ছিল অবিনাশের আকৈশোর প্রতিজ্ঞা। একটি মাত্র ছেলে—পিতা অবিনাশের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণও করিয়াছিলেন সে ম্যাট্রিকে এবং আই-এ-তে বৃত্তি পাইয়াছিল, ডবল অনার্স লইয়া বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছে, দেশে কিছু বিষয় সম্পত্তিও আছে—এমন সুপাত্র—বিবাহের বাজারে তাহার দর আট হাজার পর্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু সদয়-হৃদয় পিতৃদেব নগদ ছয় হাজার টাকা লোকসান স্বীকার করিয়া, বেসরকারী কলেজের গরীব অধ্যাপক হরকুমার গাঙ্গুলীর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

বিশেষ করিয়া সুন্দরী বধূ কামনা না করিলেও, প্রজাপতি অবিনাশকে সুন্দরী বধূই দিলেন। কনের নাম সুষমা, বয়স ১৬।। বৎসর, এ বৎসর সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে—রেজাল্ট এখনও বাহির হয় নাই।

বিবাহ হইল ৫ই আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই হইতে পারিত, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ছেলের বিবাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইতে নাই। অবিনাশের পিতা রাধাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুলনা জেলার অধিবাসী। পুত্রবিবাহ জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া এক মাসের জন্য শ্যামবাজারে বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন।

ফুলশয্যার রাত্রেই কনেকে বিশেষভাবে জেরা করিয়া অবিনাশ জানিতে পারিল যে সে কবিতা লেখে এবং কবিতায় পরিপূর্ণ দুইখানি খাতা ভবানীপুরে তাহার বাক্সমধ্যে আছে। শুনিয়া আনন্দে অবিনাশ যেন পাগল হইয়া উঠিল। বলিল, "আসবার সময় খাতা দুখানি আনলে না কেন সুষু?—আমি দেখতাম!"

নববধূ বলিল, "সে খাতা আমি কাউকে দেখাই?"

অবিনাশ বলিল, "কিন্তু আমি কি 'কাউ'?"

কনে বলিল, "তুমি 'কাউ' হবে কেন, তুমি 'বুল্'।"

বধূর এই রহস্যপটুতায় একটা দীনবন্ধু বা ডি-এল রায়ের প্রতিভার সন্ধান পাইয়া

অবিনাশ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "সাধে কি আর শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবো প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম?"—কোনও কবিতা যদি মুখস্থ থাকে, তবে তাহাই শুনিবার জন্য অবিনাশ বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কোনও কবিতাই সুষমার মুখস্থ নাই। বরের আগ্রহ ও আক্ষেপ দর্শনে অবশেষে সে আশ্বাস দিল—"আট দিন পরে, আমার সঙ্গে তুমি ত যোড়ে যাবে আমাদের বাড়ী, তখন দেখাব।"

অবিনাশ বলিল, "আট দিন ধৈর্য্য ধরে থাকাই বা যায় কেমন করে?"

।। দুই।।

আট দিন আট রাত্রি অতিবাহিত হইল। উভয়ের আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গতা, অভিন্নহৃদয়তা, এই আট দিনে এতই বিশাল ও গভীর হইয়াছে যে, অবিনাশের স্থির বিশ্বাস—বোধোদয় কথামালা পড়া কোনও মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে, আট বৎসরেও তাহা হইত কি না তাহা সন্দেহ।

আট দিন পরে অবিনাশ "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী গেল। স্ত্রীর লিখিত কবিতা পাঠে তাহার অষ্টাহব্যাপী আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। কবিতাগুলি পড়িয়া সে এতই প্রশংসা করিতে লাগিল যে, বেচারী সুষমা সত্য সত্যই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, "কি বল তুমি তার ঠিক নেই! ভারি ত কবিতা—তারই এত সুখ্যাতি!" অবিনাশ, রবিবাবু কোট করিয়া বলিল, "পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা—জান না নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা!"—অবিনাশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—যত শীঘ্র সম্ভব, কবিতাগুলি পুস্তাকাকারে সে ছাপাইয়া ফেলিবে। কলেজ খুলিলেই মেসে বসিয়া স্বহস্তে খাতা নকল করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবে।

নিজালয়ে অষ্টাহ, শ্বশুরালয়ে অষ্টাহ—এই ষোড়শ দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল অবিনাশ ভাল বুঝিতেই পারিল না। অবশেষে বিদায়-রজনী উপস্থিত হইল। গভীর নিশীথে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, পরস্পরের বক্ষে অবিরল অশ্রুজল সেচন ইত্যাদি ইত্যাদি একরকম শেষ হইলে অবিনাশ বলিল, "তুমি রোজ একখানি করে চিঠি আমায় লিখবে। নইলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে—পড়াশুনো চুলোয় যাবে—আমি ফেল হব।"

সুষমা বলিল, "লতা লিখবো বইকি! তুমিও আমায় রোজ একখানি চিঠি লিখবে ত?"

অবিনাশ বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"আর ফি শনিবারে আসবে ত? বাবা ত তোমায় বলেই রেখেছেন—মা-ও যাবার সময় তোমায় বলবেন। শনিবার বিকেলে আসবে, রবিবার থেকে, সোমবার সকালে উঠে চা-টা খেয়ে মেসে ফিরে যাবে। কেমন, কথা রইল ত?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়!—কিন্তু অতদিন অতদিন বাদে এক একটিবার দেখা—সহ্য করা শক্ত যে সুষু! মাঝে অন্ততঃ একটি দিন—ধর বুধবার—তোমার মুখখানি আর একবার আমার দেখতে পাওয়া চাই।"

সুষমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কিন্তু তা কি করে হবে?"

অবিনাশ বলিল, "আমি তার একটা উপায় স্থির করেছি। তুমি প্রতি বুধবারে, বেলা ঠিক আটটার সময়, তোমাদের ছাদে উঠে, উত্তর-পশ্চিম কোণটায় দাঁড়াবে। আমিও ঠিক সেই সময় হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যাব। যদিও এ বাড়ী গলির ভেতর, কিন্তু হরিশ মুখুয্যের রোড থেকে ছাদের প্রায় আধখানা বেশ দেখা যায় তা জান ত?"

সুষমা বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি। হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যখন বর-টর যায় আমরা ছাদে উঠে দেখি কিনা।"—বলিয়া সুষমা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

হাসির কারণ জানিবার জন্য অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুষমা বলিল, "একটা কথা মনে হল তাই হাসলাম।"

"কি কথা—বল—বল।"

"মনে হল, এতদিন ছাদে উঠে পরের বর দেখে মরেছি, এখন নিজের বরটিকে দেখে বাঁচবো। কেবল রোশনাই, বাজনাবাদ্যি থাকবে না এই যা তফাৎ।"

অবিনাশ প্রিয়তমার এই রসিকতায় স্বয়ং কালিদাসের কবিত্বমাধুর্য্য উপলব্ধি করিল। আনন্দাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া, চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর তোমার প্রকাশভঙ্গি! কিন্তু কেন রোশনাই থাকবে না? চোখে যাদের প্রেমের মানিক জ্বলছে, তাদের কি রোশনাইয়ের অভাব? হৃদয়ে যাদের স্বর্গের বীণা বাজছে তাদের অন্য বাজনার দরকার কি?"

অবিনাশ শ্বশুরালয় হইতে শ্যামবাজারে পিতামাতার নিকট ফিরিবার দিন দুই পরেই, তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অবিনাশ কিন্তু বাড়ী যাইবার কোনও উদ্যোগ করিল না। পিতাকে বলিল, "আর মোটে হপ্তা ত আছে কলেজ খুলতে। আবার যাওয়া, আবার আসা, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ বইত নয়! তার চেয়ে বরঞ্চ মেসেই গিয়ে থাকি!"

পুত্রের অন্তরের গোপন অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, পিতা মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, সেই ভাল। পড়াশুনা বেশ মন দিয়ে কোর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সে আমায় বলতে হবে না। এখন মেস ত প্রায় খালি, পড়াশুনোর বেশ সুবিধে হবে। অনেকটা সেই কারণেও, এখন বাড়ী যেতে চাচ্ছিনে।"—বলিয়া অবিনাশ সরিয়া পড়িল। ভাবিল, বুড়োদের ঠকানো কি সহজ!

।। তিন।।

পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এ পাঁচ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সুষমা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস হইয়াছে—ইহা ত বিবাহের অল্পদিনের পরেরই ঘটনা। অবিনাশ উচ্চ সম্মানের সহিত এম-এ পাস হইয়া, আশুবাবুর কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে। এই সময় তাহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে—কন্যাটি এখন তিন বৎসরের। ভবানীপুরে, শ্বশুরালয়ের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া অবিনাশ সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর ফিরিয়া নিজ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ ডাকিল, "ও বউ, শোন"—অবিনাশ তার স্ত্রীকে এইরূপই সম্বোধন করিয়া থাকে; শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কিন্তু অবিনাশ তাহা গ্রাহ্য করে না।

"বউ, একটা কথা শুনে যাও।"

বউ তখন ঝির সাহায্যে রান্নাঘরে বসিয়া রুটি বেলিতেছিল—স্বামীর আহ্বানে উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ঘরে আসিল। দেখিল, স্বামী একখানি খবরের কাগজ নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছেন।—স্ত্রীর পদশব্দে অনিবাশ মুখ তুলিয়া বলিল, "ব্যস্ত ছিলে?"

"রুটি বেলছিলাম।"

"দেরী কত বউ?"

"কেন, ক্ষিদে পেয়েছে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে যাবে।"

"না, ক্ষিদে পায়নি। একটা বিশেষ কথা ছিল,—তা, সব সেরেই তুমি এস।"

"কেন, কি হয়েছে, বল না।"

"সে, একটু সময় লাগবে। তুমি কাজ সেরে এস, তারপর ধীরেসুস্থে কথাবার্ত্তা হবে।"

স্বামীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সুষমা ভীত হইয়া বলিল, "হ্যাঁগা, কোনও মন্দ খবর নাকি?"

অবিনাশ ব্যস্তভাবে বলিল, "না না কোনও মন্দ খবর নয়—ভাল খবরই। যাও তুমি কাজ সেরে এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সুষমা চলিয়া গেল।—অবিনাশ আবার সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইয়া, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে লাগিল ঃ—

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

সাহিত্য-সেবাকাঙ্ক্ষীর অপূর্ব্ব সুযোগ

উপন্যাস কলেজ

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কথা-সাহিত্যের কিরূপ সমাদর তাহা অনেকেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ যুগটা বিশেষ করিয়া গল্প ও উপন্যাসেরই যুগ বলিতে হইবে। ভাল গল্প ভাল উপন্যাসের জন্য প্রকাশকেরা, মাসিক সম্পাদকগণ হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ তাঁহারাই প্রতিদিন, নবীন লেখক-লেখিকাগণের রচিত শত শত গল্প ও উপন্যাস, অনুপযুক্ত বোধে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ, লেখক-লেখিকাগণ কোনরূপ ট্রেনিং (তালিম) না পাইয়াই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। রীতিমত গুরুপদেশ ভিন্ন, কোনও কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করা যায় না। দেশের এই মহা অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকজন বিখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক মিলিয়া এই "উপন্যাস কলেজ" স্থাপন করিয়াছেন। রীতিমত উপদেশ দিয়া, সাপ্তাহিক এক্সারসাইজ সংশোধন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে কথাসাহিত্যে রচনার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে দুইটি বিভাগ আছে—ছাত্র বিভাগ ও ছাত্রী বিভাগ। সোম, বুধ ও শুক্রবারে ছাত্র বিভাগে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে ছাত্রী বিভাগে লেকচারাদি হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভর্ত্তি হইবার ফী ১০ টাকা এবং মাসিক বেতন ৬ টাকা মাত্র। এখনও উভয় বিভাগে কয়েকটা করিয়া সীট খালি আছে—যাঁহাদের প্রয়োজন, সত্বর আবেদন করুন। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে, এক আনার স্ট্যাম্প সহ আবেদন করুন। ঠিকানা—২২৫নং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটির উপরিভাগে একটি সুবৃহৎ পাঁচতলা বাড়ীর ছবি আছে।

বিজ্ঞাপনটি বার দুই পড়িয়া, অবিনাশ কাগজখানি রাখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইল। স্ত্রীর অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে, তাহার মনে বড় আশা হইয়াছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমতী সুষমা দেবীর পদার্পণ মাত্র দেশময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে—তাহার বৈঠকখানায় পুস্তকপ্রকাশক ও মাসিক সম্পাদকগণের ভিড় লাগিয়া যাইবে, দেশসুদ্ধ লোক সমস্বরে বলিবে, হ্যাঁ, এতদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটি কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া গেল বটে! কিন্তু অবিনাশের সে মনের আশা মনেই লয় পাইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর কয়েক মাস মধ্যে, স্ত্রীর অনেকগুলি কবিতা একত্র করিয়া, অবিনাশ "পুষ্পহার" নামক একখানি বহি ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিয়াছিল। কিন্তু পুষ্পহারের আদর হয় নাই—আগাগোড়া সব কথা ভাবিলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হয় যে, সমালোচকগণ ও পাঠক সাধারণ জোট বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া, তার বউয়ের বইখানি বয়কট করিয়াছে। তাছাড়া বই বাহির হইবার পর বছরখানেক ধরিয়া, সুষমার অন্ততঃ একশোটি নূতন কবিতা, অবিনাশ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকে পাঠায়—তার মধ্যে ৯৫টি ফেরৎ আসিয়াছিল, পাঁচটি মাত্র ছাপা হইয়াছিল, তাও মফঃস্বলের পত্রিকায়। এই কারণে, অবিনাশ বড়ই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থির বুঝিয়াছে, কাব্যের যুগ এখন আর নাই;—এ যুগে স্বয়ং কালিদাস একখানি নূতন মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি হাতে করিয়া কলিকাতায় আসিলে, কোন প্রকাশকই নিজব্যয়ে তাহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সম্মত হইবেন না—অথচ তাঁহারাই রামা শ্যামা নিধের অতি ওঁচা উপন্যাসও গোগ্রাসে গিলিতেছেন! বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিত হইয়াছে—বঙ্গে গল্প উপন্যাসেরই যুগ আসিয়াছে বটে। সুষমার মত প্রতিভাশালিনী লেখিকা যদি উপন্যাস রচনায় মন দেয়, তবে তাহার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উহারা বিজ্ঞাপনে ঐ যে কথা লিখিয়াছে, গুরুপদেশ ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না তাহাও ঠিক। ঐ কলেজেই বউকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া অবিনাশের ইচ্ছা—এখন বউ রাজী হইলে হয়।

।। চার।।

বউ রাজী হইল, কিন্তু অনেক তর্কবিতর্ক, মান অভিমানের পর।

সুষমা বলিয়াছিল, "আমি না হয় একটু ইংরিজিই শিখেছি, কিন্তু তা বলে মেম ত আর হইনি। জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে এ বয়সে আমি কলেজে যেতে পারি কখনও?"

"কেন, জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে তুমি বায়স্কোপ দেখতে যেতে না বউ? আজকালই না হয় খুকী হয়ে অবধি—"

"সে ত তোমার সঙ্গে যেতাম।"

"তা বেশ ত! একলা যেতে যদি তোমার ভয় হয়, আমি সঙ্গে করে তোমায় রেখে আসবো গো!"

"দুজনকার-ট্রাম ভাড়া লাগবে ত? তারপর, কলেজের ছ টাকা মাইনে আছে, কাপড়-চোপড়ের খরচ, ধোবার খরচও বাড়বে—চালাবে কেমন করে?"

"মাইনের টাকায় না কুলোয়, আমি না হয় একটা প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করে নেবো এখন, তার জন্যে ভাবনা কি? না হয় দিনকতক একটু টানাটানি করেই কাটানো যাবে। তারপর, যখন তোমার এক একখানি উপন্যাস বেরুবে, তখন টাকা যে হুড় হুড় করে আসতে আরম্ভ হবে বউ!"

"তা কি কিছু বলা যায়? এতদিন কবিতা লিখেছি—গল্প উপন্যাস লিখতে কখনও ত চেষ্টা করিনি! চেষ্টা করলেই যে সফল হব এমন কি কথা আছে?"

"আসল কথা কি জান? প্রতিভাই হল আসল জিনিষ। সে প্রতিভা তোমার যথেষ্ট রয়েছে— সেটা তুমি কাব্যেই খাটাও আর উপন্যাসেই খাটাও—তোমার হাত থেকে উঁচুদরের রচনা বেরুতে বাধ্য যে।"

"প্রতিভা-ট্রতিভা আমার কিছুই নেই। ও সব আমি পারবো না,—এ নিয়ে আমায় পীড়াপীড়ি কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া সুষমা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।—অবিনাশ অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সুষমা আড়চোখে স্বামীর পানে চাহিল; একটু অনুতাপের স্বরে বলিল, "অমনি রাগ হল পুরুষের!"—স্ত্রীর দিকে না চাহিয়া অবিনাশ বলিল, "রাগ নয় বউ, দুঃখ।"

স্বামীর হাত ধরিয়া সুষমা বলিল, "কেন কিসের দুঃখ তোমার। সবাইকার স্ত্রী কি আর অনুরূপা নিরুপমা হতে পারে।"

অবিনাশ বলিল, "না না, আমার দুঃখের কারণ তা নয়। আমার দুঃখের কারণ, মোহভঙ্গ।"

"কেন, কি মোহ তোমার ভঙ্গ হল শুনি?"

অবিনাশ আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখ, এতদিন আমার ধারণা ছিল যে আমাদের দুজনের প্রেম, আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম। এখন দেখছি আমার সে ধারণাটা একটা মোহ—একটা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুষমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কেন ভুল কিসে?"

অবিনাশ বলিল, "যথার্থ দাম্পত্য-প্রেম কাকে বলে? প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী বলে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়াই কি দাম্পত্য প্রেম? বঙ্কিমবাবু কি বলেছেন মনে নেই? সমহৃদয়তা, একাভিসন্ধিতা—সেইটেই হল আসল দাম্পত্য-প্রেম। নইলে, আমি বলবো যাব দক্ষিণে, তুমি বলবে যাবে উত্তরে—এ রকম হলে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম হয় না।"

স্বামীর বেদনা-জড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুষমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সস্নেহে তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "তুমি দুঃখ কোরো না—আমি তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।"

তখন আবার দুইজনে 'ভাব' হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটি আবার পঠিত হইল। কত কথার আলোচনা হইল। সুষমা সেই বিজ্ঞাপনের উপরিভাগের মুদ্রিত পঞ্চতল অট্টালিকা দেখিয়া বলিল, "উঃ বাড়ীটা ত মস্ত!" অবিনাশ বলিল, "তা হবে না? এত বড় একটা ব্যাপার— কত ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হবে তার কি হিসেব আছে?"

।। পাঁচ ।।

ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, উভয়ে একদিন গিয়া কলেজটি দেখিয়া আসিবার পরামর্শ ছিল, সেই পরামর্শ আজ কার্য্যে পরিণত হইবে। আজ বিকালের ঘণ্টায় অবিনাশের ক্লাস ছিল না; বেলা দুইটার সময় সে বাড়ী আসিয়াছে। চারিটা বাজিলেই, স্ত্রীকে প্রস্তুত হইবাব জন্য সে তাগাদা দিতে লাগিল।

সুষমা জুতা মোজা পরিয়া, সাজিয়া গুছিয়া, বেলা সাড়ে চাবিটার সময় স্বামীব সহিত বাহির হইল। দুজনে ট্রামেই গেল। কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া, পাঁচ মিনিট মধ্যেই নূতন রাস্তায় উপন্যাস কলেজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিল, বাড়ীটা বিজ্ঞাপনের ছবির অনুরূপ প্রকাণ্ড পঞ্চতল অট্টালিকাই বটে; কিন্তু সমস্তটাই উপন্যাস কলেজ নহে। নীচের তলার কুঠুরিগুলিতে চা চপ কাটলেটের "কেবিন", সাইকেল মেরামতের দোকান, পানবিড়ির দোকান, ময়রার দোকান প্রভৃতি— দোতলাটা মাত্র কলেজ। ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতলে মাড়োয়ারীগণ বাস করে।

যাহা হউক, উভয়ে দ্বিতলে উঠিল। প্রথমেই একটা কক্ষের বাহিরে আঁটা তক্তায় "অফিস" অঙ্কিত দেখিয়া, পর্দ্দা ঠেলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। গোঁফদাড়ি কামানো, ঝাঁকড়া চুল, চোখে সোনার চশমা আঁটা এক যুবক রেজিস্টাবি বহি, খাতাপত্র লইযা বসিয়া ছিলেন, তিনি আগন্তুকদ্বয়ের পানে চাহিয়া, চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া, একখণ্ড নিয়মাবলী এবং একখানি ভর্ত্তি হইবাব ফরম্ অবিনাশের হাতে দিলেন। অবিনাশ ও সুষমা একত্র তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

পাঠ শেষে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "ছাত্রীবিভাগে কতগুলি মেয়ে ভর্ত্তি হয়েছে মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, "জন ত্রিশ এ পর্যন্ত ভর্ত্তি হয়েছে। আরও অ্যাপ্লিকেশন আসছে। পঞ্চাশ পূর্ণ হলে আর আমরা নেবো না; মেয়েদের ক্লাসঘরে আর বেশী ধরবে না। এত ছাত্রী ভর্ত্তি হতে চাইবে আগে ত আমরা ভাবিনি।"

"মেয়েদের ক্লাসে কে কে পড়াবেন?"

কেরাণীবাবু একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া তাহার উপর চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, "ছোট গল্প সম্বন্ধে লেকচার দেবেন সরোজ রায়, আর শৈলেন চাটুয্যে। উপন্যাস সম্বন্ধে রজনীবাবু আর লীলাবতী সেন। ভাষা বর্ণনা শেখাবেন নৃপেন সোম আর চঞ্চলা দেবী।"

সকলেই জানেন—সুষমা অবিনাশও জানিত—বর্ত্তমান বঙ্গীয় "তরুণ" সাহিত্যে এই লেখক-লেখিকাদের স্থান কত উচ্চে। অবিনাশ বলিল, "এঁরা ত আজকালকার খুব নামজাদা সাহিত্যিক।"—কেরাণীবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়।"

"ঐ যে সরোজবাবু নাম করলেন, 'নবরশ্মি' মাসিকপত্রের সম্পাদক সরোজবাবু কি?"

"তিনিই।"

"তা হলে স্টাফ্ ত খুব স্ট্রং হয়েছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নইলে আর ভর্ত্তি হবার জন্যে এত ভিড়!"

"আচ্ছা—নমস্কার মশাই—এখন তাহলে আমরা উঠি।"—বলিয়া অবিনাশ দাঁড়াইল। কেরাণীবাবু বলিলেন, "যদি ভর্ত্তি হওয়াই স্থির হয়, তবে বেশী দেরী করবেন না,—কারণ স্থান বড়ই কম,—আর যে রকম অ্যাপ্লিকেশন আসছে—"

"যে আজ্ঞে—দেরী করবো না—খুব সম্ভব, কালই এসে টাকা জমা দিয়ে যাব।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

।। ছয় ।।

পরদিনই অবিনাশ গিয়া সুষমার ভর্ত্তি হওয়ার ফী প্রভৃতি জমা দিল। সপ্তাহ পরে লেকচার আরম্ভ হইল। সেদিন অবিনাশ বেলা দুইটার সময় স্ত্রীকে তাহার কলেজে পৌঁছাইয়া, নিজকর্ম্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। বেলা চারিটার সুষমার ছুটি হইবে—অবিনাশের কার্য্যও তৎপূর্ব্বেই শেষ হইবে। উপন্যাস কলেজে গিয়া স্ত্রীকে লইয়া সে ট্রামে বাড়ী ফিরিবে।

ছুটির পর রাস্তায় বাহির হইয়া সুষমা স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ, বলেছিল যে পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত ছাত্রী নেওয়া হবে—তা নয়, আমি নিয়ে মোটে সাতাশটি মেয়ে ত দেখলাম—আর সবাই কোথায় গেল?"

অবিনাশ বলিল, "আজ ত মোটে প্রথম দিন কিনা। যারা ভর্ত্তি হয়েছে, সবাই বোধহয় আজ আসেনি। ক্রমে ক্রমে সব আসবে বোধহয়।"

ট্রামে উঠিয়া, দুজনে বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। বাড়ী আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর, চা খাইতে বসিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি কি হল বউ?"

"আমরা সবাই ক্লাসে বসলাম। তারপর ঘণ্টা বাজলো, বর্ণনা শিক্ষার প্রফেসর নৃপেন সোম এলেন। বোর্ডের গায়ে একখানা মস্ত ছবি টাঙ্গিয়ে দিলেন। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি এক মিসে; চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে; বয়স ত্রিশের বেশী নয়। প্রফেসার বললেন,—'এই লোকটার চেহারা তোমরা সবাই এক মনে বেশ করে খানিকক্ষণ দেখ—তারপর, খাতায় এর চেহারার বর্ণনা লেখ—আর, উপস্থিত এর মনের ভাব কি হওয়া সম্ভব—তাও অনুমান করে লেখ।'—এই বলে তিনি পকেট থেকে এক তাড়া প্রুফ বের করে, দেখতে বসে গেলেন। আমরা ছবিখানা দেখে, বর্ণনা লিখতে লাগলাম।"

"তারপর?"

"ঘণ্টা শেষ হলে, তিনি খাতাগুলো সব নিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টায় এক একখানা খাতা নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন, আর ভুল-ত্রুটিগুলি সব বোঝাতে লাগলেন।"

"তুমি কি লিখেছিলে?"

"আমি চেহারাটা বর্ণনা করবার পর লিখেছিলাম, প্রথম যৌবনে একটি মেয়ের সঙ্গে এর ভালবাসা হয়েছিল; কিন্তু মেয়ের বাপের ঘোর আপত্তি থাকায় বিয়ে হতে পারেনি। তখন দুজনে পরস্পরের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করে বিদায় নিয়েছিল যে, তারা আজীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন করে, পরলোকে মিলনের আশায় থাকবে। মেয়েটি পিতৃগৃহেই রইল, যুবকটি মনের খেদে বনবাসী হল। দশ বৎসর পরে যুবকের ইচ্ছা হল,—দূর থেকে একবার তার প্রিয়তমাকে চোখের দেখা দেখে আসব। বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে দেখলে, তার প্রিয়তমা দিব্যি বিয়ে-থাওয়া করে, ছেলেমেয়ের মা হয়ে সংসার ধর্ম্ম পালন করছে। তাই দেখে, যুবকের মনে ভয়ানক দুঃখ ও রাগ হয়েছে।"

অবিনাশ বলিল, "এনক আর্ডেন। অন্য ছাত্রীরা সব কি লিখেছিল?"

সুষমা বলিল, "সে সব অদ্ভুত। কেউ লিখেছিল, এ খুন কিম্বা ডাকাতি করতে যাচ্ছে—কেউ লিখেছিল গাঁজা খেয়ে এ পাগল হয়ে গেছে—এই রকম সব।"

"প্রফেসর কি বললেন?"

"তিনি আমারটাই খুব ভাল হয়েছে বললেন। বললেন 'যে সকল লোকের সঙ্গে তুমি সংস্রবে আস,—তোমার স্বামী, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী—সকলের মুখ দেখে তাদের মনের ভাবটা বিশ্লেষণ করতে সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। মনস্তত্ত্বই হল আসল জিনিষ—সেইটে যিনি যত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন,—উপন্যাস রচনায় তিনি তত বেশী সিদ্ধিলাভ

করবেন।'—বললেন, 'তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, একমনে সাধনা কর।'—আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন।"

এই সংবাদ শ্রবণে অবিনাশের বুকটা আহ্লাদে দশ হাত হইল। বলিল, "তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ যে আছে, এটা ত অনেক দিন আগেই তোমার এ অধম ভৃত্য আবিষ্কার করেছিল।"—সপ্তাহে তিন দিন সুষমার ক্লাস হইয়া থাকে। অবিনাশ তাহাকে নিয়মিতভাবে কলেজে পৌঁছাইয়া দেয় এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। লেক্‌চার, এক্সারসাইজ প্রভৃতি কিরূপ হইতেছে তাহা নিত্যই সে খবর লয়।

একদিন সুষমা বলিল, "ওগো, কালকে আমাদের ডবল ক্লাস—বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলেজ। ছোট গল্পের প্রফেসর সরোজ রায়, আমাদের একটি গল্পের চুম্বক দেবেন—ক্লাসে বসে—সেই গল্পটি চার ঘণ্টায় আমাদের সবাইকে লিখতে হবে। যে গল্প সবচেয়ে ভাল হবে, সেটি সরোজবাবু তাঁর 'নবরশ্মি' কাগজে ছেপে দেবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা বেশ, কাল আমি তোমায় সময় মত কলেজে পৌঁছে দেবো এখন।"

পরদিন অবিনাশ তাহাই করিল। তার নিজ ক্লাস সেদিন তিনটা হইতে চারটা। সুতরাং দুই ঘণ্টা কাল তাহাকে গোলদীঘির ধারে বসিয়া "স্বভাগের শোভা সন্দর্শনে" কাটাইতে হইল। বৃক্ষছায়ায় বেঞ্চির উপর বসিয়া, বায়ুভরে গোলদীঘির ঈষত্তরঙ্গিত বক্ষের পানে চাহিয়া, তাহার নিজ বক্ষও আশার হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী সুষমা দেবীর নব প্রকাশিত উপন্যাসের প্ল্যাকার্ডে কলিকাতার দেওয়াল ছাইয়া যাইবে। এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন পথে, ট্রামে ট্রেনে, সভাসমিতিতে, আমাকে দেখাইয়া লোকে ফুসফুস্ করিয়া বলাবলি করিবে—'ও লোকটা কে জান হে? ওই হচ্ছে সুষমা দেবীর স্বামী!"—আশা কাণে কাণে কহিল—"আসিবে, সেদিন আসিবে।"

।। সাত।।

এক্সারসাইজ স্বরূপ লিখিত সুষমার গল্পটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনায় প্রফেসার সরোজ রায় সেটি 'নবরশ্মি' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যেদিন উহা প্রকাশিত হয়, অবিনাশ স্বয়ং 'নবরশ্মি' কার্য্যালয়ে গিয়া ঐ সংখ্যা পঁচিশখানি কিনিয়া আনিয়া, কুড়িখানা ডাকযোগে আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট পাঠাইয়া দিল। বউয়ের গল্পটির শিরোনামার উভয় পার্শ্বে মোটা লাল পেন্সিলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল। কোনও বন্ধুবান্ধব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দুই চারি কথার পরই অবিনাশ বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা, 'নবরশ্মি' কাগজে বউয়ের একটা গল্প বেরিয়েছে পড়েছ কি?"—এবং বন্ধুকে, সেখানে বসাইয়া, গল্পটি আগাগোড়া না পড়াইয়া ছাড়িত না। একখানি 'নবরশ্মি' সর্ব্বদাই তাহার পকেটে থাকিত, এবং প্রায় প্রতিদিনই সে নিজে গল্পটি দুই একবার পড়িত।—একদিন অবিনাশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল তোমাদের কি বিষয়ে লেকচার হচ্চে বউ?"

সুষমা বলিল, "প্রেম-তত্ত্ব। প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের স্বরূপ আর প্রেমের প্রকারভেদ হয়ে গেছে—কথা-সাহিত্যে প্রেমের প্রভাব এখন হচ্চে। কিন্তু সরোজবাবু যা বলছেন, তা কিন্তু আমার মনে লাগে না।"

"সরোজবাবু কি বলছেন?"

"তিনি বলছেন, দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে, নিষিদ্ধ, পরকীয়-পরকীয়া প্রেমের রস বেশী—আবেগ বেশী, উম্মাদনা বেশী, তাই নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র থাকলেই গল্প উপন্যাস সবচেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। এই কথা শুনে, সাত আটটি মেয়ে চটেমটে ত কলেজ ছেড়েই দিয়েছে।"

"আজকাল তোমাদের কলেজে ছাত্র সংখ্যা কত?"

"আমি নিয়ে উনত্রিশটি।"

"কেন? প্রথম দিনেই ছিল সাতাশটি। পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত নেওয়া হবে—সে পঞ্চাশ ত কোন কালে পুরে যাবার কথা। এত কমে গেল কি করে বউ?"

সুষমা বলিল, "পঞ্চাশ কোনও দিনই হয়নি। একচল্লিশ বিয়াল্লিশ জন হয়েছিল। তারপর আবার অনেকে ছেড়ে দিলে।"

"কেন? ছেড়ে দিলে কেন?"

"দুজনার, ছেলে হবে বলে তারা চলে গেছে। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে সাত আটজন পালালো। আরও তিন চারজন, তাদের স্বামীদের মত থাকলেও শ্বশুর-শাশুড়ীর মত নেই, তাঁরা শুনে রাগ করেছেন, সেই অজুহাতে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। দেখ, আমারও কিন্তু আর· ভাল লাগছে না—পাছে তুমি রাগ কর, সেইজন্যে এতদিন আমি তোমায় বলিনি। বিশেষ ঐ সরোজ রায়—যখন থেকে 'নবরশ্মি'তে আমার গল্পটা বেরিয়েছে, তখন থেকে আমার সঙ্গে যেন কি রকম ব্যবহার করে।"

"কি রকম ব্যবহার করে?"

"পুরুষ শিক্ষক আর যুবতী ছাত্রীর মধ্যে যে শোভন ব্যবধানটুকু থাকা দরকার, তা সে আর রেখে চলছে না।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "ওটা তোমার ভুল, সুষমা। তরুণ সাহিত্যের তিনি একজন অত বড় লেখক—অত বড় কাগজের সম্পাদক—হঠাৎ তাঁর প্রতি কোন মন্দ উদ্দেশ্য আরোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমিই হলে ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী—সবার চেয়ে তোমার উপরেই বেশী ভরসা রাখেন—তাই বোধ হয় একটু আত্মীয়তার ভাব এসে পড়েছে। ওটা কিছু নয়।"

কিছুদিন পরে সুষমার খুকীর জ্বর হইল। জ্বরটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই কারণে এক সপ্তাহ সুষমা কলেজ যাইতে পারিল না।—সপ্তাহ পরে, খুকী আরোগ্য লাভ করিলে, অবিনাশ স্ত্রীকে আবার যথারীতি কলেজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

যথাসময়ে স্ত্রীকে আনিতে গিয়া অবিনাশ শুনিল, আজ কলেজ বন্ধ—রাসপূর্ণিমার ছুটি। স্ত্রীর খোঁজ করিতে দ্বারবান বলিল, মাইজী বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। প্রবল জ্বরে তিনি কাঁপিতেছিলেন, চক্ষু দুইটি 'লাল-সুরুখ' হইয়াছিল, দ্বারবান ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়াছে।—অবিনাশ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে ট্রামে বাসায় ফিরিল। বাসায় আসিয়া ভৃত্যের নিকট শুনিল,—মাইজী কলেজ হইতে ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আর উপরে উঠেন নাই, ঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাস্নানের বস্ত্রাদি আনিতে আদেশ দিয়া কালীঘাট যাতায়াতের জন্য তাহাকে ঠিকগাড়ী আনিতে বলিলেন, গাড়ী আসিবামাত্র খুকীকে ও ঝিকে লইয়া তিনি কালীঘাট যাত্রা করিয়াছেন।

শুনিয়া অবিনাশ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর শরীর কেমন দেখলি?" ভৃত্য বলিল, "কেন, শরীর ত ভালই ছিল বাবু। তিনি বলেছেন, গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে পূজো দিয়ে তারপর ফিরবেন। বললেন, বাবু এলে বোলো তিনি যেন না ভাবেন।"

ব্যাপারটা অবিনাশের নিকট দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত মনে হইল। প্রবল জ্বর ও রক্ত চক্ষু লইয়া কলেজ হইতে যে মানুষ চলিয়া আসিল, বাড়ী আসিয়াই, তার জ্বর ভাল হইয়া গেল, সে গঙ্গাস্নানে বাহির হইল! হঠাৎ কালীঘাটে পূজা দিবারই বা অর্থ কি? যাহা হউক, অবিনাশ ধৈর্য্য সহকারে স্ত্রীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

।। আট ।।

সন্ধ্যার সময় সুষমা ফিরিল। সদ্যস্নাতা, পরিধানে গরদ, সীমান্তে মোটা করিয়া সিন্দুর লিপ্ত—অবিনাশ স্ত্রীর এই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীতিবিহ্বলনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

সুষমা আসিয়াই গড় হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।—অবিনাশ বলিল, "বউ, ব্যাপার কি? জ্বর হয়েছে বলে তুমি কলেজ থেকে ট্যাক্সি করে চলে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ জ্বর হল কেমন করে? আর তাই হয়েছিল যদি ত গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলে কেন বউ?"

"জ্বর হয়নি।"

"কিন্তু দারোয়ান যে বললে!"

"সে তাই মনে করেছিল বটে! জ্বর আমার হয়নি।"

"তবে! হঠাৎ এই অবেলায় স্নান—আর, তাড়াতাড়ি কালীঘাটে পূজো দিতে যাওয়া—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে বউ!"—সুষমা বলিল, "পরে বলবো।"

"কখন বলবে?"

"রাত্রে। এখন এইসব ঝি চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটু নিরিবিলি না হয়ে তোমায় সব কথা খুলে বলতে পারবো না।"

অবিনাশ বলিল, 'তুমি যে আমায় বড়ই দুশ্চিন্তায় ফেললে সুষমা। কোনও অমঙ্গল, কোনও অশুভ ঘটেছে কি?"

"হ্যাঁ—না।"

"ঘটেওছে, ঘটেওনি? কি বলছ তুমি? বিস্তারিত না পার, সংক্ষেপে বল।"

সুষমা বলিল, "সংক্ষেপেই বলছি—আমি আর ও কলেজে পড়বো না। সব কথা শুনলে, তুমিও আমায় আর সেখানে যেতে বলবে না। এখনও আমার মনটা বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত রয়েছে—আর কোনও কথা এখন তুমি আমায় জিজ্ঞেস কোর না গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া প্রায় সাশ্রু নয়নে সুষমা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রান্নাঘবে গিযা স্বামীর চায়ের উদ্যোগ করিতে বসিল।

রাত্রে সুষমা স্বামীর কাছে সকল কথাই বলিল—"তোমায় ত আমি আগেই বলেছিলাম, সরোজ রায় লোকটা কী রকমভাবে আমার পানে চায়—দেখে আমার ভারি রাগ হয। তুমি আমায় বলেছিলে, ও সব কিছু নয়, ও সব আমার মনের ভ্রম।—খুকীর অসুখের জন্যে সাত দিন কলেজে যাইনি ত! আজ তুমি আমার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে। আমি উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ক্লাস সব শূন্য। দারোয়ান বললে, আজ রাসপূর্ণিমার ছুটি আপনি কি জানতেন্ না?—আমি বললাম, না, আমি ত এক হপ্তা কলেজে আসিনি। বলে, আমি বারান্দায় গেলাম, তোমায় যদি রাস্তায় দেখতে পাই ত তোমায় ডাকবো বলে, রেলিং-এর উপর ঝুঁকে দেখলাম তুমি প্রায় কলুটোলা স্ট্রীটের কাছে গিযে পৌঁছেছ—ডাকলে তুমি শুনতে পাবে না। কলেজেই অপেক্ষা করবো—না একটা ট্যাক্সি আনিয়ে বাড়ী ফিরবো, দাঁড়িয়ে ভাবছি—এমন সময় দেখি, সরোজ রায় ক্লাসঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে—সুষমা, শুনে যাও।'—'আজ ছুটি আমি জানতাম না স্যার'—বলে আমি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। সরোজ রায় কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এ ক'দিন আসনি কেন?' বললাম, 'আসতে পারিনি স্যার—আমার খুকীব অসুখ হয়েছিল।'—'কি অসুখ হয়েছিল?'—বলতে বলতে সরোজ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, খুকীর অসুখ হয়েছিল, আমি সংক্ষেপে বললাম। শূন্য ক্লাসঘরে আমার গা ছমছম করছিল, কোনও রকমে কথাটা সেরে পালাতে পারলে বাঁচি। সরোজ বললে—'এখন খুকী ভাল হয়েছে ত? যাক্। কিন্তু তুমি যে কামাই করলে, ছুটি নিয়েছিলে?'—বললাম, 'আজ্ঞে না, ছুটি নিতে হয় তা আমি জানতাম না স্যার।' সরোজ বললে, 'কামাই কবার জন্যে তোমার জরিমানা হবে তা জান?'—বললাম, 'তা যদি হয় ত দেবো স্যার।'—সরোজ বললে, 'দেবে? দেবে?'—তার কথার স্বর আর তার ভঙ্গি দেখে আমার গা কেঁপে উঠলো। চলে আসবার জন্যে আমি

ফিরে দাঁড়াতেই—সরোজ পিছন থেকে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে—এই তোমার জরিমানা—বলে—না গো—আর আমি বলতে পারবো না।''—বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাগে অবিনাশের সর্ব্বশরীর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রীর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ''কেঁদ না—যা হবার তা হয়ে গেছে। সে দুর্ব্বৃত্তকে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি দেবো। তারপর, তুমি কি করলে তাই আমায় বল।''

সুষমা ক্রমে স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, ''আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে, ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলাম।—চড় মেরে, আমার নিজেরই হাত ঝন্ঝন্ করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম, 'দারোয়ান আমায় শীগ্‌গির একখানা ট্যাক্সি ডেকে দাও, আমি বাড়ী যাব।'—আমি তখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। দারোয়ান বললে, 'বোখার হুয়া মাইজী?'—আমি বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, বহুৎ বোখার হুয়া। দাঁড়াতে পারছিনে।' সে নিজের টুল ছেড়ে উঠে বললে, 'আঁখভি বহুৎ লাল হুয়া। আপ হিঁয়া বৈঠিয়ে মাইজী, হাম অভিটেক্সি বোলায় দেতে হাঁয়।'—ট্যাক্সিতে বসে বসেই স্থির করেছিলাম, এ অপবিত্র দেহ নিয়ে বাড়ী ঢুকে স্বামীর মন্দির কলুষিত করবো না—গঙ্গাস্নান করে সতী শিরোমণি কালীমাকে প্রণাম করে, তাঁর প্রসাদী সিন্দুর মাথায় পরে পবিত্র হয়ে তবে বাড়ী ঢুকবো।''—বলিয়া সুষমা নীরব হইল। স্বামীর কোলে মাথা দিয়া, বিছানার উপর দেহ এলাইয়া দিল। অবিনাশও নীরবে স্ত্রীর মাথায়, কপালে, বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।—স্বামীর এই নীবব সান্ত্বনায় কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমা অনেকটা শান্ত হইল। ক্রমে যে উঠিয়া বসিল।

''আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সুষমা, এর উপযুক্ত প্রতিফল সেই পাষণ্ডকে আমি দেবো, এবং কালই।—তুমি শান্ত হও—যা হয়েছে তা ভুলে যেতে চেষ্টা কর।''—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল।—সুষমা বাধা দিয়া বলিল, ''এখন না—গঙ্গাস্নান করে গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে এই ঠোঁট দুটো বেশ করে আমি মেজে ফেলেছি! তারপর, মা কালীর মন্দিবের চৌকাঠের উপবও ঠোঁট দুটো বুলিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার মনের গ্লানি যায়নি—তোমার পায়ের ধূলো দাও, তাই আমি ঠোঁটে মেখে এ দুটোকে পবিত্র করে নিই।''—বলিয়া সুষমা স্বামীর পদযুগল ধারণ করিযা, নিজ মস্তকে ঠেকাইয়া তাহাতে চুম্বন করিতে লাগিল।—পরদিন 'নবরশ্মি' অফিসে প্রবেশ করিয়া ক্রোধোন্মত্তও অবিনাশ সরোজকে সড়াং সড়াং করিয়া কয়েক ঘা বেত মারিয়াছিল, সে কথা লইয়া সাহিত্যিক মহলে কিরূপ হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল তাহা বোধহয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কারণ কেহই জানিতে পারে নাই। 'নবরশ্মি'র তরফ হইতে ইহাই প্রচার করা হইয়াছিল যে, অবিনাশবাবুর প্রেরিত কোনও প্রবন্ধ অমনোনীত করার জন্যই নিরীহ মহাশয় ওরূপভাবে তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

[ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩]

সুধার বিবাহ

বৃহদায়তন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। কর্ত্তা সাটিনমোড়া সোফায় হেলান দিয়া, রূপার গুড়গুড়ি হইতে সোনার মুখনলে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন। গৃহিণী অদূরে একখানি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গিন্নী বলিলেন, "আর তুমি দো-মনা করছ কেন? অতুলের সঙ্গেই খুকীর বিয়েটি দিয়ে ফেল। দেখতে দেখতে মেয়ে ডাগর হয়ে উঠল, যেঠের কোলে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে, আর দেরী হলে সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ, তুমি ও-সব মতটতগুলো ছাড়। মেয়ে চৌদ্দ বছরের হয়েছে ত ভারি একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ!"

গিন্নী বলিলেন, "আবার কি? হিঁদুর ঘরের আইবুড়ো মেয়ে চৌদ্দ বছরের হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কুয়োর ব্যাঙ। কুয়োয় বসে আছ, দুনিয়ার খবর ত রাখ না। বিলেতের, আমেরিকার বড় বড় ডাক্তারদের আজকাল মত এই যে, ষোল বছরের কমে কখনই মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ষোল বছরের কমে কখনই আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না—নির্ম্মলার দিইনি। আমার মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করবো না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

গিন্নী বলিলেন, 'আমরা ত বিলেতেও বাস করিনে, আমেরিকাতেও বাস করিনে। যে সমাজের যা প্রথা—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "এই কলকেতা সহরে কত বড় বড় লোকের ঘরে, ষোল সতেরো কুড়ি বছরের পর্য্যন্ত আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, সে খবর রাখ কুয়োর ব্যাঙ? সেজন্যে তাদের কি কেউ নিন্দে করছে, না তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারছে না? ঐ অতুলের হাতে মেয়ে দেবার কল্পনাও কোরো না—সে অসম্ভব একেবারে।"

"কেন, অসম্ভব কিসে শুনি? অতুলকে মেয়ে দিলে মেয়ে অজাতে পড়বে, না অঘরে পড়বে?"

"অ-জাতে পড়বে না তা স্বীকার করছি, কিন্তু অ-ঘরে পড়বে নিশ্চয়। তবে তোমরা অঘর বলতে যা বোঝ আমি সে অর্থে বলছিনে।"

"কি অর্থে বলছ তুমি?"

"তা হলে বুঝিয়ে বলি, শোন। তোমার মেয়ে ধনী পিতার গৃহে আজন্ম প্রতিপালিত। ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি এতকাল সে যেভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত, যে ঘরে গেলে সে সমস্ত সে না পাবে, সেই ঘরই তার পক্ষে অঘর। তোমার মেয়ে দামী জরিপাড় শান্তিপুরী ভিন্ন অন্য শাড়ী পরে না। একখানা শাড়ী একদিন পরা হলেই ধোবাকে ফেলে দেয়। রূপোর থালা-বাসনে খেয়ে-দেয়ে এমনই তার অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কাঁসার থালা-বাসনে খেতে হলে তার গন্ধ লাগে। বিদ্যুৎপাখার তলায় না শুলে রাত্রে তার ঘুমই হয় না। দুটো তিনটে দাসী সারাদিন তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। সে কি তোমার ঐ দুশো টাকা মাইনের অতুল-মাস্টারের ঘরে গিয়ে, মিলের শাড়ী পরে বাঁট পেতে কুট্‌নো কুট্‌তে পারবে, না শিল পেতে বাটনা বাটতে পারবে, না কয়লা ধরিয়ে ভাত রাঁধতে পারবে?"

গিন্নী নীরবে বসিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কেন, পারবেই না বা কেন? হলেই বা বড় মানুষের মেয়ে। হিঁদুর মেয়ে ত—মেমসাহেব ত আর নয়! নিজের সংসারে, নিজের স্বামীর পুত্তুরকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়ান, ঘরের কাজকর্ম্ম করা—সেটা ত মেয়েমানুষের ভাগ্যের কথা। ও যদি বলে, আমি পারবো, ও যদি বলে আমি তাতেই খুসী, তবে আমরা কেন তাতে বাধা দিই? দুটিতে ভাব হয়েছে বড্ড, এ বিয়ে না দিলে মেয়ে কিন্তু আমার অসুখী হবে, তা তোমায় বলে রাখলাম। শুধু অসুখীই বা বলি কেন? অধর্ম্ম হবে। মেয়েমানুষের যা প্রধান ধর্ম্ম—সতীধর্ম্ম—তাতে আঘাত লাগবে।"

কর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্ত সবিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর বলিলেন, "ওঃ—এতদূর গড়িয়েছে? খুকী তোমাকে বলেছে বুঝি ঐ সব কথা? অ্যাঁ, দুটিতে ভাব হয়েছে বড্ড? তাই নাকি?"—বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া মাথাখানি নাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী আনত-নেত্রে সভয়ে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাব হয়েছে? অর্থাৎ লভ্ হয়েছে? ওর গুষ্টীর পিণ্ডি হয়েছে! ডাক ত একবার হাবামজাদীকে, কোথায় গেল? সব কথা তাব নিজের মুখে শুনে একটা বিহিত করি।"

গিন্নী বলিলেন, "নাও, আর বাপগিরি ফলাতে হবে না। ভারী বিহিত করবে তুমি! সে স্কুলে চলে গেছে। এই ত গাড়ী তাকে রেখে ফিরে এল। এগারোটা বাজে, এখন উঠে স্নান করবে? না, আমার সঙ্গে বসে বসে ঝগড়াই করবে কেবল?"

কর্ত্তা ঘড়ির দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "হুঁ—আমিই ত ঝগড়া করছি বটে। কিন্তু তুমি যে ভাবিয়ে দিলে গিন্নী! 'ভাব হয়েছে' এ আবার কোন্ দেশী কথা?"

গিন্নী বলিলেন, "কেন, এই যে এখনই বলছিলে বিলেতের আমেরিকার ডাক্তারদের মত অনুসারেই আমাদের চলা উচিত। তা, সে সব দেশে বিয়ের আগে বর-কনের ভাব হয় না? মনেব ভিতর একজনকে ভালবাসবে, বাইরে অন্যজনকে বিয়ে করে তার ঘর করতে যাবে, এটা কি ধর্ম্ম?"

কর্ত্তা চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, "তা সেজন্যে বিশেষ চিন্তা নেই, লভ-ফভ্ ও সবগুলো নিছক ছেলেমানুষী বইত নয়। দেখাশুনা বন্ধ হলে সেটা সময়ে আপনিই সেরে যাবে। আর কিন্তু খবর্দ্দার সুধা যেন নির্ম্মলের বাড়ীতে না যায়, বুঝলে? তা হলেই ও সব বাঁদরামি দুদিনেই চুকে-বুকে যাবে।"

"হ্যাঁ চুকে যাবে! দিনেকের দিন যতই বুড়ো হচ্ছেন, ততই ভীমরতি ধরছে!"—বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার স্নানের জন্য ভৃত্যগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিতে উঠিয়া গেলেন।

তা, ব্যাপারটা এই। এই যিনি রূপার গুড়গুড়িতে সোনার মুখনলে তামাক খাইতে খাইতে এতক্ষণ দাম্পত্যকলহে নিযুক্ত দিলেন, ইঁহার নাম বরদাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী, তা ছাড়া দেশে জমিদারী আছে। অগাধ টাকা। ইঁহার দুই কন্যা, একটি মাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলহাসিনী বা নির্ম্মলা কলিকাতাতেই স্বামী-গৃহে বাস করে। তাহার বয়স আঠারো বৎসর মাত্র। তাহার স্বামী বিনয়ভূষণ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। শ্বশুরের তুল্য না হইলেও, বিনয়ভূষণ ধনী লোক, দেশে তার বিষয় সম্পত্তি আছে, চাকরিটুকুই ভরসা নহে। খুকী অর্থাৎ কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুধাংশুনলিনী বা সুধা। তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, বেথুন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। বরদাবাবুর পুত্রটি এখন সপ্তমবর্ষীয় বালক মাত্র। অতুলও রসায়নের অধ্যাপক, কিন্তু বেসরকারী কলেজের। দুইশত টাকা মাত্র বেতন পায়। অতুল ও বিনয় পূর্ব্বে সহপাঠী ছিল। বন্ধু-গৃহেই বন্ধু-শ্যালিকা সুধার সহিত অতুলের পরিচয়ের সূত্রপাত। ক্রমে সেই পরিচয় রীতিমত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা ও তার স্বামী উভয়েরই ইচ্ছা, অতুলের সঙ্গেই সুধার বিবাহ হয়।

অতুলের যেদিন আসিবার কথা, নির্ম্মলা সেদিন বাপের বাড়ী গিয়া সুধাকে লইয়া আসে। আবার সুধা কোনও দিন আসিলে, অতুলকে খবর দিতে বিনয় ভুলে না। বস্তুতঃ ইহাঁদিগের ষড়যন্ত্র বা সহযোগিতার ফলেই ব্যাপারটি এরূপ 'সঙ্গীন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহারা দুটি বোনেই সুন্দরী, তবে সুধা বেশী সুন্দরী। বিশেষ তাহার গাত্রবর্ণটি চমৎকার। এমন রঙটি বাঙালী ঘরে দুর্লভ—আর্ম্মাণী বিবির অপেক্ষা কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে।

।। দুই।।

তিন মাস পরে, একদিন সন্ধ্যায় আফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতে করিতে বরদাবাবু পত্নীকে বলিলেন, "ওগো, কালকে খুকীকে দেখতে আসবে।"

"কারা, কোথা থেকে?"

"মৈমনসিং জেলার মুকুন্দনগরের রাজবাড়ী থেকে। রাজা মুকুন্দনাথের নাম শুনেছ ত? মস্ত বড়লোক। যেখানে তাঁর রাজধানী, সেখানকাব নাম পূর্ব্বে কি একটা ছিল; এখন এই রাজার নামে সে স্থানের নাম মুকুন্দনগর হয়েছে। বাজা উপাধি হলে কি হয়, অনেক মহারাজার চেয়ে টাকা বেশী।"—গৃহিণী বলিলেন, "রাজা মুকুন্দনাথেব নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনছি। তাঁর বয়স হয়েছে নিশ্চয়! এ বয়সে আবার বিয়ে করবেন নাকি?"

"দূর্ পাগলী! রাজা কেন, রাজকুমারের জন্য। রাজা মুকুন্দনাথের এক মামা, কুমারের গৃহশিক্ষক, তার এক বন্ধু, আর একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত—এই চারজনে কুমারের জন্যে পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছে। আমাদের স্ব-শ্রেণীর লোক যিনি যেখানে আছেন, সকলের বাড়ী গিয়ে তারা মেয়ের সন্ধান করছে। তিন মাস হল তারা এই কাজে বেরিয়েছে, নানা স্থানে ঘুরে এখন তারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"রাজকুমারের বয়স কত?"

"কুড়ি-একুশ।"

"স্বভাব-চরিত্র কেমন? বড়লোকের ঘরের বওয়াটে ছেলে নয় ত? তা যদি হয়, তা হলে কিন্তু তাঁকে মেয়ে দেবো না, তা তিনি রাজকুমারই হোন, আর বাদশা-কুমারই হোন।"

এই কথায় বরদাবাবু একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লুচি ছিঁড়িয়া আলুর দমে মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "তা স্বভাব ভাল হবারই সম্ভাবনা। অত বড় রাজার ছেলে!"

গিন্নী বলিলেন, "যা বললে! বড়লোকের ছেলের, বাজাব ছেলের স্বভাব-চরিত্র কি আর বেগড়ায়? যত বেগড়ায় গরীবের ছেলের! যত গবীব কেরাণী, মাস্টার, এদের ছেলেরাই সচরাচর মদ খেয়ে কু-পল্লীতে পড়ে থাকে, রাত্রে বাড়ী আসতে পারে না—নয়?"—কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথা বলছিনে! তবে সহবৎ বলে একটা জিনিষ আছে ত? সে যাই হোক, মেয়ে যদি তাদের পছন্দই হয়, সে সব বিষয়ে খোঁজখবর না নিয়েই কি আর বিয়ে দেবো?"

"কখন দেখতে আসবে?"

"কাল বিকেলে চারটে থেকে পাঁচট্যর মধ্যে। আমি তিনটের পরেই আফিস থেকে ফিরে আসবো।"

"নির্ম্মলাকেও আনানো উচিত ত?"

বরদাবাবু যেন কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, আনিও তাকে।"

অতঃপর বরদাবাবু নীরবে জলযোগ সমাপ্ত করিলেন। তিনি যখন উঠিতেছিলেন, গৃহিণী তখন বলিলেন, "হ্যাঁগা, তবে যে বলেছিলেন, মেয়ের ষোল বছর না হলে কোন মতেই বিয়ে দেবে না—তোমার মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে না!"

ভৃত্য রূপার জগ্ হইতে জল ঢালিতেছিল, প্রকাণ্ড রূপাব চিলিমচির উপর বরদাবাবু হস্ত প্রক্ষালন করিতেছিলেন, সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। মুখাদি ধৌত করিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এক সময় তাই বলতাম বটে। এখন ভেবে দেখছি, এরকম একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়—"—গৃহিণী বলিলেন, 'তা হলে বল, তোমার মত-বিশ্বাস-কিশ্বাস কিছুই নয়—ও-সব ভণ্ডামি মাত্র, তুমি একজন সুযোগবাদী!'

বরদাবাবুর মনে হইল, সুযোগবাদী না হইলে কি তিনি এত বড় একটা এটর্ণী হইতে পারিতেন? কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ গিন্নী, তোমায় যখন বিয়ে করে এনেছিলাম, তখন তুমি ক-খও চিনতে না। নিজে রাত জেগে মাস্টারি করে তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, তার কি এই প্রতিফল?"

'কেন?'

"নইলে আজ তুমি আমায় এমন সাধু-ভাষায় গালাগালি দিচ্ছ!

"কখন আবার তোমায় আমি গালাগলি দিলাম?"

"কেন, শালা না বললে কি গালাগালি হয় না? ঐ যে তুমি আমায় সুযোগবাদী বললে!"

"সেটা বুঝি গালাগালি হয়?"

"ভয়ঙ্কর! তুমি যদি পরিবার না হয়ে খবরের কাগজের সম্পাদক হতে, তা হলে আমি তোমার নামে মানহানির নালিশ করে দিতাম।"

সেই রাত্রিতেই শুধা শুনিল, রাজবাড়ীর লোকে তাহাকে দেখিতে আসিবে। শুনিয়া তাহার প্রাণে বড়ই ভয় হইল। এই তিন মাস কাল অতুলের সহিত সাক্ষাৎ নাই—পিতার আদেশে দিদির বাড়ী যাওয়া তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে দিদি মাঝে মাঝে আসে বটে, এবং দিদির নিকট হইতে অতুলের সংবাদ পায়। দিদির মধ্যবস্থতায় অতুলের সঙ্গে গোপনে সে পত্রব্যবহার করিবার অভিলাষও জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহাতে রাজী হয় নাই, বলিয়াছিল, "না ভাই, কি জানি, বাবা যদি শেষ পর্যন্ত মত নাই করেন, সে সব তুই ভুলে যাবারই চেষ্টা কর্।" সুধা বলিয়াছিল, 'দিদির যেমন কথা! চেষ্টা কর্‌লেই বুঝি মানুষকে মানুষ ভুলতে পাবে?"

সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলো নিবাইয়া বিছানায় বসিয়া সুধা প্রথমটা খানিক কাঁদিল। তারপর আলো জ্বালিয়া, নিজ আলমারি হইতে অতুলের ফটোগ্রাফখানি বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানি দেখিল। শেষে আলো আবার নিবাইয়া অতুলের ছবিখানি বালিসের তলায় রাখিয়া মনে মনে দেব-দেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে বাবা মহাদেব, হে বাবা জগন্নাথ! তোমাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। রাজবাড়ীব সেই পাজি ছুঁচোগুলো আমায় যেন পছন্দ না করে।—আমায় যেন তারা বিষ-নয়নে দেখে! আমি তোমাদের সব্বাইকে পূজো দেবো—আমায় তোমরা রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।"—আজ রাত্রিতে সুধার ভাল ঘুম হইল না! মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। দেব-দেবীগণের চরণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। অতুলের ছবিখানি দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভয়ে আলো জ্বালিতে পারে না, কারণ পাশের কক্ষেই মাতা শয়ন করেন এবং মাঝের দরজা খোলাই থাকে। পূর্ব্বে কতবার রাত্রি জাগিয়া নভেল পড়িতে গিয়া ধরা পড়িয়া মা'র নিকট বকুনি খাইয়াছে। আজ এমন করিয়াই রাত পোহাইল।

বেলা একটার সময় নির্ম্মলাকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠানো হইল। দুইটার মধ্যেই নির্ম্মলা আসিয়া পৌঁছিল।

রাজবাড়ীর লোকেরা যথাসময়ে আসিয়া কন্যা দেখিলেন। জ্যোতিষী-মহাশয় প্রথমে সুধার কোষ্ঠীখানি পরীক্ষা করিয়া, অভিমত প্রকাশ করিলেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা বটে।" রাজ-মাতুল বলিলেন, "বরদাবাবু, এতদিনে আমাদের ভ্রমণ শেষ হল। চার মাস কাল আমরা নানা স্থানে মেয়ে দেখে বেড়াচ্চি, কিন্তু আপনার মেয়ের মত এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে আমরা কোথাও পাইনি। রঙটার উপরেই রাজা-বাহাদুরের বিশেষ রকম ঝোঁক। আপনার এই মেয়ের মত বা এর চেয়েও সুশ্রী মেয়ে যে আমরা দেখিনি, তা নয়। তবে গায়ের এমন বর্ণটি আর কোথাও পাইনি। যাকে শাস্ত্রে আলে গোরী বলে, এ মেয়ে তাই। এই মেয়েই আমাদের পছন্দ। আজ রাত্রেই আমরা দেশে ফিরবো, রাজা-বাহাদুরকে রাণীমাকে গিয়ে সব কথা বলি। কুমার-বাহাদুর হয়ত নিজে এসে একবার দেখতে চাইবেন। তারপর শুভকার্য্যের দিন স্থির করা যাবে। যদি অনুমতি করেন, আজ তা হলে আমরা উঠি।"

বিবাহ-পরীক্ষায় মেয়ের এই উচ্চ অনার্সের সহিত পাসের সংবাদে বরদাবাবু আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিঞ্চিৎ "মিষ্টিমুখ" করিয়া যাইবার জন্য ইঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ আয়োজনাদি চলিতেছিল। শুধু মিষ্টরসে নহে, ষড়্‌রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া আগন্তুকগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণীও আনন্দিত হইলেন। এ তিন মাসে তাঁর মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুধা অতুলকে ভুলিয়াছে। মেয়ে রাজরাণী হইবে, এ সংবাদে কোন্ মাতা না আনন্দিত হইবেন?

সুধার কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই রাত্রি কাটিল। অবশেষে যে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল,—দেব-দেবীগণ সমস্তই ঝুটা,—হিন্দুধর্ম্ম একেবারেই ফাঁকি।

।। তিন ।।

কুমার-বাহাদুর কবে সুধাকে দেখিতে আসিবেন, এই চিন্তায় বরদাবাবু দিবানিশি ব্যস্ত রহিলেন।—সপ্তাহান্তে মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল। বাজ-মাতুল লিখিয়াছেন, "আমরা ফিরিয়া আসিয়া রাজা-বাহাদুর ও রাণীমার বরাবর আপনার কন্যার বিষয়ে সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি। শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত খুশী হইয়াছেন। কুমার-বাহাদুর যাইবেন না, তবে রাজা-বাহাদুর স্বয়ং একবার গিয়া কন্যাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা বিধায়, বোধহয়,আগামী মাসের পবই তক্ কলিকাতা যাত্রা করিতে পারিবেন।"—সুতরাং রাজা-বাহাদুরের শুভাগমনের এখনও প্রায একমাস বিলম্ব আছে জানিয়া বরদাবাবু আবার নিজ কাজকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

অতুলবাবু তাঁহার বন্ধু বিনয়বাবুর মুখে বরদাভবনের সকল সংবাদই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাইয়া থাকেন। মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর লোকদের মেয়ে দেখার কথা, গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে বাজা বাহাদুরের বিশেষ ঝোঁকের কথা এবং একমাস পরে রাজা-বাহাদুর যে স্বয়ং কন্যা দেখিতে আসিবেন, সে সংবাদও পাইলেন।—দুই বন্ধুতে অত্যন্ত গোপনে কি পরামর্শ চলিতে লাগিল।

অতুলবাবু প্রত্যহ নিজ কলেজের পর প্রেসিডেন্সি গিয়া বিনয়বাবুব রসায়নাগারে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। উভয়েই রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উভয়ে মিলিয়া কি সব রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন তাঁহারাই জানেন।

সপ্তাহকাল দুইজনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বসিয়া এইরূপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইলেন।

তাহার পর একদিন নির্ম্মলা কিসের একটা শিশি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া পিত্রালয়ে গিয়া তাহার কনিষ্ঠাকে দিল। চুপি চুপি কি সব উপদেশও তাহাকে দিয়া আসিল। সুধা শিশিটা নিজ আলমারির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

ইহার কয়েকদিন পরে, সন্ধ্যার পর কর্ত্তা-গৃহিণীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। রাজা-বাহাদুরের আসিবার ত অধিক বিলম্ব নাই—এক সপ্তাহ মাত্র। মেয়ে দেখিয়া, তবে বিবাহের দিনস্থির হইবে, সে বিষয়ে যদি মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে, এই সম্বন্ধে বরদাবাবুর পত্নীর সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "দিনস্থির ত করবে, কিন্তু মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে আমি যে মোটেই সাহস পাচ্চিনে।"

"কেন, কি ভাবভঙ্গি দেখলে?"

"সেদিন তারা এসে মেয়ে দেখা অবধি ও যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকে। মুখে হাসি নেই, ভাল করে খায় না,—রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে এও আমি টের পেয়েছি। দেখছ না, কি রকম রোগা হয়ে যাচ্চে, ভেবে ভেবে বাছার আমার সোনার বরণ কালী হয়ে যাচ্চে। মেয়ে ডাগর হয়েছে, তার অমতে জোর জবরদস্তি করে বিয়ে দিতে চাইলে শেষে হিতে বিপরীত হয়ে না দাঁড়ায়!"—বরদাবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—এই সব ছেলেমানুষী কথা শোন কেন?"—কিন্তু মনে মনে তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলা যায় কি, কালের যেরূপ গতি, কাপড়ে কেরোসিন ভিজাইয়া আগুনই ধরাইয়া দিবে, না আফিম আনাইয়া ভক্ষণ

করিবে, কে বলিতে পারে? গৃহিণীকে অবশেষে তাঁহার আশঙ্কার কথা খুলিয়াই বলিলেন এবং মেয়ে সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

পরদিন বরদাবাবু সুধাকে ডাকিয়া মিষ্টি-কথায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু সুধা কোনও উত্তর করিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন এইভাবেই কাটিতে লাগিল। দিনের পর দিন সুধার দেহবর্ণ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। কন্যার এ অবস্থা দেখিয়া বরদাবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবী পুত্রবধূর গাত্রবর্ণের উপরই যে রাজার অত্যধিক ঝোঁক।

মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল, অমুক দিন অমুক সময় স-পারিষদ রাজা-বাহাদুর মেয়ে দেখিতে বরদাভবনে উপস্থিত হইবেন।

বড় বড় সাহেবী দোকান হইতে বরদাবাবু মেয়ের জন্য দামী দামী ফেস্‌ক্রীম, কম্‌প্লেক্সনলোশন প্রভৃতি আনিয়া দিলেন। তাঁহার কড়া আদেশে সে সকল সুধার সর্ব্বাঙ্গে মালিসও হইতে লাগিল। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল ;—মেয়ে দিন দিন কালো হইতে লাগিল।

।। চার ।।

রাজা-বাহাদুরের আসিবার আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে। আগামী কল্য প্রাতের ট্রেনে তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন এবং অপরাহ্নকালে মেয়ে দেখিতে আসিবেন। কি উপায় হইবে, প্রাতঃকালীন চা-পানান্তে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া ইহাই বরদাবাবু চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে একখানি মোটর গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল।

বরদাবাবু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি হইতে নামিতেছেন। দেহটি স্থূল, গায়ে একটা আধময়লা সুতি পিরাণ, তার উপর ময়লা লাট হইয়া যাওয়া একটা সিল্কের চাদর।

কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বারবান আসিয়া নিবেদন করিল, মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর একজন কর্ম্মচারী দর্শন প্রার্থী।

"নিয়ে এস"—বলিয়া বরদাবাবু গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

লোকটি দ্বারবানের সহিত আসিয়া, বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া প্রবেশ করিল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বরদাবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে হুজুরকে বিরক্ত করলাম না তা?"

বরদাবাবু বলিলেন, "না না বিলক্ষণ। বিরক্ত কেন করবেন? বসুন বসুন।"

লোকটি হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, সে গোস্তাকী কি করতে পারি? আজ বাদে কাল হুজুর হবেন আমার অন্নদাতা মনিবের বৈবাহিক—সুতরাং হুজুও মনিবস্থানীয়। দু একটি কথা নিবেদন করবার জন্যে এসেছিলাম, হুকুম হলে বলতে পারি।

বরদাবাবু বলিলেন, 'বলুন না, আমাদের সঙ্গে ও সব ফর্ম্মালিটির কিছু দরকার নেই। বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ?"

লোকটি সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, "আমাদের রাজা-বাহাদুর কাল সকালের ট্রেনে আসবেন, এই স্থির ছিল। হুজুরকেও পত্রে তা জ্ঞাত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি হঠাৎ আজকেই এসে পড়েছেন। ল্যান্সডাউন রোডে নাটোর রাজবাড়ীতে উঠেছেন। আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, কালকের পরিবর্ত্তে আজ বিকেলে তিনি যদি মেয়ে দেখতে আসেন, তাতে আপনাদের কোনও অসুবিধে আছে কি? কারণ কাজটা যদি আজ সেরে ফেলতে পারেন, তা হলে আজ রাত্রেই আবার রাজধানী রওয়ানা হতে পারেন, সেখানে জরুরী কাজ আছে।"

বরদাবাবু বলিলেন, "রাজা-বাহাদুর পৌঁছে গেছেন নাকি? বেশ বেশ। তা আজ বিকেলে

যদি তিনি আসেন তাতে আমার কোনই অসুবিধে নেই। আমি বরঞ্চ নাটোরে-রাজবাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। ক'টার সময় যাব বলুন দেখি?

লোকটি বিনীতভাবে বলিল, "আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আমিত বাড়ী দেখে গেলাম। আমিই তাঁকে সঙ্গে করে আনবো। আচ্ছা যদি অনুমতি হয়, এখন তা হলে উঠি।"—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বরদাবাবু বলিলেন, "বসুন বসুন তাড়াতাড়ি কি? একটু চা খেয়ে যান।"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে তা আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করবো। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটু প্রার্থনা আছে।"

"কি, বলুন।"

"মাকে—আমার বউ-রাণীমাকে এখন একবাব দেখতে পাব না? ও-বেলা অবশ্য রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে এসে ত দেখবই। কিন্তু মার রূপ-গুণ সম্বন্ধে কি রকম বর্ণনা শুনেছি,—তাঁকে একটিবার দেখবার জন্য মনটা বড়ই উতলা হয়েছে।"

বরদাবাবু ভৃত্যদ্বারা সুধাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এক মিনিট পরেই সুধা আসিয়া বলিল, "ড্যাডি, আমায় ডাকছেন?

"হ্যাঁ মা। মুকুন্দনগর রাজবাড়ী থেকে এই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তোমার মাকে গিয়ে বল এঁর জন্যে এক পেয়ালা চা, আর কিছু খাবার যেন পাঠিয়ে দেন।"

লোকটি বলিল, "বরদাবাবু, থাক্ থাক্। চা খাব ওটা ভুলে বলেছি। আমার এখনও যে স্নান-আহ্নিক হয়নি সেটা খেয়ালই ছিল না। মা লক্ষ্মী, তুমি বাড়ীব ভিতর যাও ত!"

একে ত মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর নাম শুনিয়াই সুধা জ্বলিয়া গিয়াছিল। কে এ ব্যক্তি যে এমন আদেশের স্বরে তাহার সহিত কথা কহে? উভয় নেত্র হইতে লোকটার প্রতি অগ্নিবাণ হানিয়া সুধা প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইবামাত্র আগন্তুকের মুখ হইতে সেই বিনীত ও নম্রভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ব্যাঙ্গপূর্ণ-স্বরে তিনি বলিলেন, "এইটিই ত আপনার মেয়ে সুধাংশুনলিনী? মুকুন্দনগরের রাজবাড়ীর লোকেরা এই মেয়েকেই ত দেখে গিয়েছিল?"

কথা বলার ধরণে বরদাবাবু একটু রুষ্টভাবে বলিলেন, হ্যাঁ, তাই।"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কেন মশাই, আর কি জোচ্চুরি করবার জায়গা পেলেন না? এই মেয়ে আপনার আর্ম্মাণী বিবির মতন সুন্দরী? এ ত রীতিমত শ্যামবর্ণ—কালো বললেও অন্যায় হয় না। বলি, কি রং-টং আরক-টারক মাখিয়ে রাজবাড়ীর লোকেদের চোখে সেদিন ধূলো দিয়েছিলেন, বলুন ত?"—বরদাবাবুও ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মশাই, সরে পড়ুন দেখি। ফের যদি কোনও অপমানসূচক কথা এখানে উচ্চারণ করেন, তবে দারোয়ান দিয়ে আপনাকে বের করে দেবো। আপনার রাজাকে গিয়ে না হয় বলবেন আমার মেয়েকে যে রকম দেখে গেলেন,—তাতে তিনি আমার মেয়েকে না নেন, নাই নেবেন!"

লোকটি বলিল, "রাজা-বাহাদুরকে কোনও কথা বলবার দরকার হবে না,—কারণ আমিই রাজা মুকুন্দনাথ রায়। আমি ইচ্ছা করেই একদিন আগে কলকাতায় এসেছি—আর, মেয়ের যথার্থ স্বরূপ কি তাই দেখবার জন্যেই, নিজেরী কর্মচারী সেজে অসময়ে এক ভাবে এসেছি। কারণ, আমি জানি, কলকাতার লোকেরা অনেকে ভয়ানক জোচ্চর। তার উপর বাঙ্গাল দেশের লোককে তার গো-গর্দ্দভ বলেই মনে করে—ভাবে বাঙ্গালকে অতি সহজেই ঠকানো যায়। কিন্তু সেটা আপনাদের ভুল। বাঙ্গালকে সহজে ঠকানো যায় না। ভাগিস্ এভাবে এসে দেখলাম! নইলে ও-বেলাই ত আবার রং-টং মাখিয়ে পেত্নীর বাচ্ছাটিকে পরীর বাচ্ছা সাজিয়ে দেখাতেন! উঃ—বাপরে বাপ—কলকাতার লোকেরা কি জোচ্চোর—কি জোচ্চোর!"—বলিয়া গট্ গট্ করিয়া সদর্পে রাজা বাহির হইয়া গেলেন।

।। পাঁচ ।।

তারপর কি হইল? প্রমাণ হইল হিন্দুদেব-দেবীগণ মিথ্যা নহেন, হিন্দুধর্ম্মও ফাঁকি নহে। সুধার এতদিনকার সকরুণ আবেদনে দেব-দেবীগণ কর্ণপাত করিয়াছেন।

বরদাবাবু অবশেষে বুঝিলেন, অতুল ছাড়া অন্য পাত্রে বিবাহ দিলে মেয়ে সুখী হইবে না—হয়ত বাঁচিবেই না। সুতরাং বিবাহে তিনি মত কবিলেন।

সুধার মুখে আবার হাসি দেখা দিল। দিদির দেওয়া সেই আরকের শিশিটা খালি হইয়া গিয়াছিল, আর তাহা ভর্ত্তি করিয়া আনানোর প্রয়োজন হইল না।

মলিন বর্ণ দিনে দিনে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের মাসে বিবাহ। সুধার দেহবর্ণ তখন আবার পূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিযাছে।

বিবাহ হইয়া গেলে বিনয়বাবু বরের কানে কানে বলিলেন,—"জয়, রসায়নের জয়!"

[মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৪]

ডোরা

রাত্রি ৯ টার সময় হ্যারিসন রোড হইতে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া, পটলডাঙ্গার একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। আরোহিণী—দুইটি তরুণী। একজনের মাথায় হ্যাট, অঙ্গে ইংরাজী গাউন ; অপরটির পরিধানে শাড়ী—কিন্তু পায়ে জুতো-মোজাও আছে, হ্যাটধারিণী সামনে ঝুঁকিয়া শোফেয়ারকে বলিল, "ডেখো, ২০ নম্বর কাঁহা?"

"জি হুজুর"—বলিয়া চালক গাড়ীর গতিবেগ কমাইল, এবং উভয় পার্শ্বের বাড়ীগুলির নম্বর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিল। অবশেষে ২০ নম্বর দেখিতে পাইয়া, সেই বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাইল। শাড়ীপরা মেয়েটি মেম-জনোচিত উচ্চারণে তাহার সঙ্গিনীকে ইংরাজীতে বলিল, "ডক্টর রবিনসন ২০ নম্বরই বলিয়াছিলেন ত? আমার কিন্তু স্মরণ নাই।"

অপরা যুবতী বলিল, "হ্যাঁ—২০ নম্বর বলিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে আছে।"

শোফেয়ার ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিল। উভয়ে তখন নামিয়া সদর দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। শাড়ীপরা মেয়েটি দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন খোট্টা চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

শাড়ীধারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ীতে রোগী আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ডক্টর রবিনসন চিকিৎসা করছেন?"

"আজ্ঞে, মেটিয়া কলেজের ডাংদার ইলাজ করছেন।"

"হ্যাঁ ঠিক। বলগে, ডাক্তার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা নার্স।"

"বহুৎখু।" বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। গাউনপরা মেয়েটি তখন রাস্তায় নামিল। ট্যাক্সির ভাড়া দিয়া উহাকে বিদায় করিয়া আবার সঙ্গিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাড়ীপরা মেয়েটির বয়স বোধ উনিশ-কুড়ি হইবে,—রঙটি বেশ ফর্সা। অন্য মেয়েটিব বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়—হ্যাট ও গাউন পরিলে কি হইবে—রঙটি তাহার কালো, তবে, "গদাধরের পিসীর" মত কালো নহে বটে।

অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য ফিরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আসুন।" যুবতীদ্বয় ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বাড়ীখানি বিদ্যুৎ আলোকে আলোকিত। নিতান্ত নূতন না হইলেও বেশী পুরাতন নহে। উঠনটি জঞ্জালে ভর্ত্তি নহে,—সিঁড়ির দেওয়ালে পাণের পিক নাই—বেশ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌-ঝক্‌ তক্‌-তক্‌ করিতেছে।—যুবতীদ্বয় দ্বিতলের বারান্দায় পৌঁছিয়া দেখিল, বিশ-বাইশ বছরের এক যুবক, একটা আধ-ময়লা টুইল-সার্ট গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইংরাজিতে বলিল, "ডক্টর রবিনসন কি আপনাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন?"

ইংরাজী বেশধারিণী বলিল, "হ্যাঁ। তিনিই আমাদের পাঠাইয়াছেন। এ বাড়ীর কর্ত্তা কে?"

যুবক উত্তর করিল, "যিনি কর্ত্তা, তিনিই অসুস্থ।"

"ফীজ্‌ সম্বন্ধে আমরা তবে কাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিব?

"আমার সঙ্গেই কহুন।"

"আপনি তাঁর পুত্র বুঝি?"—যুবক ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "না, আমি তাঁর বন্ধু—তিনি আমারই সমবয়সী। তিনি নিজ অধিকারে একজন জমিদার—মৈমনসিং জিলার অধিবাসী—এখানে থাকিয়া বিজ্ঞান কলেজে এম. এস-সি পাঠ করিতেছেন।"

এই পরিচয় শুনিয়া যুবতীদ্বয়ের মনে যেন একটু সম্ভ্রমের ভাব উদয় হইল। শাড়ীপরা মেয়েটি এবার বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন জ্বর হয়েছে?"

"আজ এগারো দিন।"

"বাড়ীর মেয়েছেলেরা সব কোথায়?"

"এ বাড়ীতে মেয়েছেলেরা কেউ থাকে না। এটা ত বাসা-বাড়ী কিনা! আমিও থাকি অন্য বাসায়। তবে, এ ক'দিন এখানেই রয়েছি, নইলে রোগীকে দেখে শোনে কে?"

"রোগী কোথায়? কোন্‌ ঘরে? চলুন, রোগীকে আমরা দেখি।"

যুবক উভয়কে লইয়া সেই বারান্দার প্রান্তস্থিত একটি কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। পালঙ্কের উপর একটা রেশমী চাদর আবৃত হইয়া তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সের এক যুবক শুইয়া আছে। একজন বৃদ্ধ ভৃত্য পালঙ্কের ধারে বসিয়া ধীরে ধীরে রোগীর পায়ে হাত বুলাইতেছে। মেমসাহেবদ্বয়কে দেখিয়া সে ব্যক্তি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।—

যুবতীদ্বয় প্রায় আধ মিনিটকাল রোগীর মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর চার্ট দেখিতে চাহিল। ডাক্তার সহেবের আদেশক্রমে ছয় ঘণ্টা অন্তর রোগীর দেহের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি এই চার্টে লিপিবদ্ধ হইতেছে। যুবতীদ্বয় চার্ট দেখিতেছিল, যুবকটি বলিল, "শুশ্রূষা সম্বন্ধে ডাক্তার স্যাহেব কি—"

হ্যাটধারিণী নিজ আবদ্ধ ওষ্ঠযুগলে অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া যুবককে কথা কহিতে নিষেধ করিল। তারপর অতি মৃদুস্বরে বলিল, "গোল করেন কেন? দেখিতেছেন না, রোগী নিদ্রিত?" তারপর সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া সেইরূপ স্বরে বলিল, "ডোরা, তুমি রোগীর নিকট থাক, আমি অন্য ঘরে গিয়া বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহি।" যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এস, বাবু।"

।। দুই ।।

এ কক্ষখানি এই গৃহস্বামীর পড়িবার ঘর। সবচেয়ে ভাল চেয়ারখানি দখল করিয়া শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "বস বাবু, বস"

ইহার মুরুব্বীয়ানা দেখিয়া যুবকের হাসি পাইতেছিল। যুবতী বলিল, "তোমার নামটি জানিতে পারি কি?"—যুবক বলিল, "আমার নাম অনিল চ্যাটার্জ্জি।"

যুবতী বলিল, "আমার নাম মিস্‌ জেসি ব্রাউন। আমার সঙ্গে যে আসিয়াছে, তাহার নাম মিস্‌ ডোরা রয়"—অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "উনিও কি ক্রিশ্চান নাকি?"

"নিশ্চয়। কামাক স্ট্রীটে যে নার্সেস হোম আছে, সেইখানে আমরা থাকি। ক্রিশ্চান না হইলে কি ডোরা সেখানে থাকিতে পাইত?"—বলিতে বলিতে জেসি তাহার হাতব্যাগ

খুলিয়া একটা সিগারেট কেস বাহির করিল। নিজে একটি সিগারেট ধরাইয়া কেস্‌টি অনিলের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'হ্যাভ্ ওয়ান" (খাও একটা)—অনিল বলিল, "ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি না"—জেসি অনিলের দিকে চাহিয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ইন্‌ডীড!—হোয়াট্ এ গুড লিটল্ বয়!" (বল কি! ভারি নক্ষি ছেলে ত!)

অনিল বলিল, "তোমার সখী ঐ ডোরা—"

জেসি বাধা দিয়া বলিল, "মিস্ রয়, ইফ্ ইউ প্লীজ!" (মিস্ রয় বলা উচিত!)

অনিল বলিল, "হ্যাঁ—মাফ করিবেন। মিস্ রয়ও কি সিগারেট খান নাকি?"

জেসি নিজ সিগারেটে দুই তিন টান দিয়া "না" সূচক শিরশ্চালনা করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "বেঙ্গলী হ্যায়।"—অনিল মনে মনে বলিল, "আহা মরি! তুমি যে কত খাঁটি ইংরেজ, তা তোমার গায়ের রঙেই মালুম!" প্রকাশ্যে বলিল, 'হ্যাঁ, যে কথা তোমায় ও ঘরে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। শুশ্রূষা কিভাবে করিতে হইবে, ডাক্তার সাহেব কি তোমাদের জানাইয়াছেন?"

জেসি কয়েক টান সিগারেট টানিয়া বলিল, "আমাদের কাজ আমরা জানি,—সে সম্বন্ধে তোমার কোনও আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই বাবু। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, আমরা দুইজনে পালাক্রমে চব্বিশ ঘণ্টাই রোগীর নিকট থাকিব। মিস্ রয়ের ফীজ দৈনিক ১০ টাকা করিয়া, আমার ১৫ টাকা—আমি সিনিয়র কিনা!—আমি উহার ৩ বৎসর পূর্ব্বে পাস করিয়াছিলাম।"—অনিল বলিল, 'বেশ, ঐ ফীই তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।"

"আর যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া সেও তোমরাই দিবে।"

"অবশ্যই দিব।"

"উত্তম কথা। রোগীর নাম কি।"

"নিবঞ্জন রায়চৌধুবী।"

"বলিলে জমিদাব। জমিদাররা খুব বড়লোক হয়, না?"

"হ্যাঁ, বড়লোক বইকি!"

"মিস্টার রায়চৌধুরীর বয়স কত?"

"চব্বিশ।"

"বাপ, মা আত্মীয়স্বজন সব কোথায়"

"বাপ, মা, ভাই, বোন কেহই নাই। আত্মীয়স্বজন যাঁহাবা আছেন, দেশেই আছেন। এঁর এক আত্মীয়,—সম্বন্ধে মাতুল, তিনিই এস্টেটের ম্যানেজাব। নিরঞ্জনের বয়স যখন ১০ বৎসর, সেই সময় উঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন হইতেই ঐ মাতুল আদালত হইতে গার্জ্জেন নিযুক্ত হইয়া বিষয়-সম্পত্তি বক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, নিরঞ্জনকেও লেখাপড়া শিখাইতেছেন। উনি আজিও বিবাহ করেন নাই। এম. এস-সি পাস করিয়া বিলাতে গিয়া 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' শিক্ষা করিবেন ইচ্ছা আছে। বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না।"

জেসি বলিল, "বাবু, তুমি বড্ড বাজে বকো। ও সব কথা তোমায় কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে?"—বলিয়া সে একমনে সিগারেট টানিতে লাগিল।

মিস্ জেসি সিগারেট শেষ করিয়া ছাইদানী অভাবে উহা বারান্দায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'টাইফয়েড রোগীর শুশ্রূষার জন্য যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহার কি কি আছে, কি কি নাই, আমায় দেখাও। যাহা যাহা নাই, যে সকল এখনই আনাইয়া লইতে হইবে।"

অনিল তখন উঠিয়া জেসিকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গেল। জিনিষপত্র দেখিয়া, আর যাহা যাহা আবশ্যক, জেসি সে সমস্ত জিনিষের একটি তালিকা লিখিয়া দিল। বলিল,

"এগুলি কাল সকালে আনাইয়া লইলেই চলিবে। যাহা আছে, আজ রাত্রের জন্য তাহাই যথেষ্ট। এখন মিস্ রয়কে একবার ডাকিয়া দাও, তুমি রোগীর নিকট থাক। পালা সম্বন্ধে মিস্ রয়ের সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া লই।"—অনিল উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ডোরা আসিয়া প্রবেশ করিল। জেসি প্রস্তাব করিল—আজ রাতটা ডোরাই থাকিবে, কল্য প্রাতে ৮টার সময় আসিয়া জেসি উহাকে ছুটি দিবে। তাহার পর ছয় ঘণ্টা অন্তর পালা বদলাইবে। ডোরা কোনও আপত্তি করিল না।—জেসি বলিল, "তবে তুমি রোগীর কাছে যাও। ঐ চ্যাটার্জ্জি ছোকরাকে একটা ট্যাক্সির জন্য লোক পাঠাইতে বল। গুড নাইট ডিয়া।"—বলিয়া জেসি হস্ত প্রসারণ করিল।

"গুড নাইট" বলিয়া ডোরা উঠিয়া জেসির করমর্দ্দন করিল।

জেসি বলিল, "খুব সাবধান, রোগীর ঘরে যেন গোলমাল না হয়। ঐ চ্যাটার্জ্জি লোকটা ভারি বক্ বক্ করে। গোল করে ত উহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিও। আর দেখ চার্ট যেন ঠিক ঠিক তৈরী হইতে থাকে। ডক্টর রবিনসন এ বিষয়ে কি রকম কড়াক্কড়, তা জান ত? আর উত্তাপ ১০২ ডিগ্রীর উপর উঠিলেই মাথায় আইস-ব্যাগ দিবে। যেন ভুল না হয়।"

"ভুল হইবে না। গুড নাইট"—বলিয়া ডোরা প্রস্থান করিল।

।। তিন ।।

যে দিনের ঘটনা উপরে বর্ণিত হইল, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার সাহেব আসিয়া নিরঞ্জনের ব্যাধি টাইফয়েড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণীদের দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টা শুশ্রূষার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া যান। যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে রোগশয্যার প্রান্তে বসিয়া তাহার মনিবের পায়ে হাত বুলাইতে দেখা গিয়াছিল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ—সে নিরঞ্জনের পিতার আমলের ভৃত্য—নিরঞ্জনকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। রাত্রি ৯টার মধ্যে দুইজন নার্স আসিবে, ইহা বলিয়া ডাক্তার সাহেব প্রস্থান করিবার পর, দেশে মাতুল মহাশয় রাজেন্দ্রবাবুকে নিরঞ্জনের পীড়ার সংবাদ তারযোগে জানাইয়া তাঁহাকে আসিতে বলা হয়। অনিলই ট্যাক্সিতে গিয়া টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়াছিল। তদনুসারে বৃদ্ধ রাজেন্দ্রবাবু তৃতীয় দিন প্রভাতেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার সাহেব এবং অপর একজন খ্যাতিমান বাঙ্গালী ডাক্তার দুই বেলাই আসিয়া রোগীকে দেখিতেছেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে জেসি এবং ডোরা কর্ত্তৃক অক্লান্ত শুশ্রূষাও চলিতেছে। অনিলও প্রত্যহ আসে,—বন্ধুকে দেখিয়া যায়।—সঙ্কটের দিনগুলি একে একে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চারি সপ্তাহ পরে চিকিৎসকগণ বলিলেন, আর কোনও আশঙ্কা নাই,—তবে পথ্য দিবেন আরও কয়েক দিন বিলম্বে। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন এখন আর দুই জন শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন নাই—একজন থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। ডোরা প্রথম প্রথম ছুটি হইলে "নার্সেস্ হোম"-এ গমন করিত। তাহার পর এই বাড়ীতেই তাহাকে নিভৃত ও স্বতন্ত্র একটি ঘর দেওয়া হয়, বামুনঠাকুরের রান্না ডাল, ভাত, তরকারী উপাদেয় জ্ঞানে আহার করিয়া, ছুটীর সময়টা সে এই বাড়ীতেই যাপন করিতে থাকে। তাহা ছাড়া, ডোরা কোনও মেমসাহেবগিরি ফলায় না বলিয়াও বটে এবং অতি যত্নে রোগীর শুশ্রূষা করে বলিয়াও বটে, ইহাকে সকলেরই বড় ভাল লাগিয়াছে। রাজেন্দ্রবাবু তাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করেন, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য ভৃত্যেরা তাহাকে অসঙ্কোচে দিদিমণি বলিয়া ডাকে,—সে যেন পরিবারস্থ একজনের মতই হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মিস্ জেসিকে বিদায় দিয়া ডোরাকে রাখাই স্থির হইল।

পরদিন রাজেন্দ্রবাবু নিরঞ্জনকে বলিলেন, "বাবা এখন তুমি বেশ সেরে উঠেছ, এইবার আমি ফিরে যাই না কেন? দুহপ্তার উপর হল এসেছি—সেখানে কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলছে

না চলছে কিছুই তা বুঝতে পারছি না। একবার মনে করেছিলাম, তুমি পথ্য পেলে তারপর যাব—কিন্তু তা হলে আরও ৩/৪ দিন দেরী হয়ে যায়।"—নিরঞ্জন বলিল, "আমার জন্যে বেশী কিছু ভাববেন না মামাবাবু। আমি ত এখন বেশ ভাল হয়ে উঠেছি—ক্ষিদেও খুব হয়েছে—দুটি ভাত পেলেই এখন বাঁচি। আপনি কবে যেতে চান?"

"আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হই।"

"আচ্ছা বেশ, যা ভাল হয় তাই করুন মামাবাবু।"

এই সময় ডোরা প্রবেশ করিল। রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডোরা মা, তোমার চা খাওয়া হল?"

"না মামাবাবু, আমি যে আজ আপনার সঙ্গে চা খাব কাল আপনি বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, বেশ ত। চল, তোমার ঘরে বসেই দুজনে চা খাইগে।"

নিরঞ্জন বলিল, "ডোরা, তুমি চা খেয়ে এসে আমায় খবরের কাগজ পড়ে শোনাবে ত?"

"শোনাব বইকি'—বলিয়া ডোরা রাজেন্দ্রবাবুর সহিত চলিয়া গেল।

এক টেবিলে, ডোরার সহিত একত্র বসিয়া চা পান করিতে করিতে রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে একটু কথাবার্ত্তা কইবার জন্যেই তোমাকে ডেকে এনেছি। আজ ত আমি চললাম, মা!"

"চললেন? আমিও তা হলে যাই, কি বলেন?"

"তুমি আরও দিনকয়েক থাক না, নিরু পথ্য পাক্—তারপর যেও।"

মাথাটা নত কবিয়া ডোরা বলিল, "আচ্ছা, তাই।"

"কিন্তু মা, যে সব কথা আমি তোমায় বলেছি, তা মনে রেখ।"

ডোরা পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে বলিল, "সব মনে রাখবো, মামাবাবু।"

"যখন কোনও কিছু তোমার দরকার হবে, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে লিখে পাঠিও।"

"লিখবো।"

"তোমার পিতা জীবিত থাকলে, তাঁর কাছে তুমি যা বলতে পারতে, যা চাইতে পারতে, যা আব্দার কবতে পাবতে—আমাব কাছেও তুমি ঠিক তাই করবে।"

"সে ত আমার সৌভাগ্য, মামাবাবু।"—ডোরার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

চা-পান শেষ করিয়া রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "যাও মা, তুমি এখন নিরুর কাছে গিয়ে বসগে। আমি একবার বাজাবে বেরুব। কিছু জিনিসপত্তর কিনতে হবে।"

ডোরা বলিল, "আমিও আজ খেয়ে দেয়ে একবার নার্সেস হোমে যাব। বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবো। আপনি ত সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর রওয়ানা হবেন?"

"হ্যাঁ, রাত ৯টায় ট্রেন।"

"আমি আপনাকে স্টেশনে তুলে দিতে যাব, মামাবাবু?"

"বেশ। তা যেও মা।"—বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু একটি চুরুট ধরাইয়া, স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া, ছড়ি হাতে কবিয়া বাহির হইলেন। ডোরাও গিয়া নিরঞ্জনের কক্ষে প্রবেশ করিল।

।। চার ।।

"আজ ত আপনি পথ্য পেলেন, আমি ও বেলা তবে চলে যাই?"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাত খেয়ে কেমন থাকি, সেটা দেখা কি আমার দয়াবতী নার্সের কর্ত্তব্য নয়, ডোরা?"

"ভালই থাকবেন, নিরঞ্জন বাবু।—আচ্ছা, না হয় কালই আমি যাব। কি বলেন"

"আমার বলার আর মূল্য কি, বল!"

ডোরা হাসিয়া নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া বলিল, "আপনি ভারি ছেলেমানুষ!"

নিরঞ্জন বলিল, "আমি ছেলেমানুষ যদি, তবে আমাকে তুমি, আপনি, মশাই, নিরঞ্জনবাবু—এসব বল কেন?"—ডোরা বলিল, "বয়সে কি ছেলেমানুষ? বুদ্ধিতে ছেলেমানুষ"—নিরঞ্জন বলিল, "কাল থেকে, রোজ বিকেলে ট্যাক্সিতে গঙ্গার ধারের রাস্তায়, ময়দানে, ডাক্তার আমায় বেড়াতে বলেছেন, শুনেছ ত?"

"শুনেছি।"

"তবে?—সে সময় তুমি যদি আমার সঙ্গে না থাক, আমার হঠাৎ যদি কিছু হয়?"

"আমি বুঝি রোজ রোজ তোমাকে সঙ্গে করে হাওয়া খেতে নিয়ে যাব? এটাও কি নার্সদের একটা ডিউটির মধ্যে গণ্য নাকি?"—বলিয়া ডোরা হাসিতে লাগিল।

নিরঞ্জন বলিল, "নার্স আর রোগী—মানুষের সঙ্গে মানুষের এ ছাড়া কি আর অন্য কোনও সম্বন্ধ হতে পারে না?"—এই সময়ে রামকৃষ্ণ খানসামা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, তোমার ভাত দিয়েছি, খাবে এস।"—ডোরা উঠিল। নিরঞ্জন খপ্ কবিয়া ডোরার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।"—ডোরা রামকৃষ্ণেব দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখছ রামুদা, আমি ক্ষিধেয় মরছি, আমায় যেতে দিচ্ছেন না!"

নিরঞ্জন ডোরার হাত ছাড়িয়া দিল। ডোরা হাসিতে আসিতে বাহির হইয়া গেল।

ডোরা আসনের উপর বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। অদূবে রামকৃষ্ণ বসিযা তাহাব সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। এ কথা, সে কথার পর বলিল, "দিদিমণি, দাদাবাবু ত আরাম হয়ে উঠলেন, এইবার তুমি—"—বৃদ্ধের কথা আটকাইয়া গেল। ডোরা মুখ তুলিয়া বলিল, "এইবার আমি—কি রামুদা? আমায় বিদায় কবতে চাচ্ছ?"

রামু বলিল, "না না—বিদায় কেন? বিদায় কেন? সে কথা কি আমি মুখে আনতে পারি দিদি? তবে বলছিলাম কিনা, তোমার ত কাজ-কর্ম্ম—এ ভাবে বসে থাকলে—"

ডোরা পাতে খানিকটা মাছেব ঝোল ঢালিয়া বলিল, "কেন, তুমি ত আমায় বোজ দশটি করে টাকা ফী যুগিয়ে যাচ্ছ। ভাবছ বোধ হয়, এখন আর আমাব মনিবেব টাকাগুলো মিছে কেন লোকসান হয়? তোমার মনিবের ত গাদা গাদা টাকা বামুদা—পাঁচশো গাধায় বইতে পারে না। আমি না হয় রোজ দশটা কবে টাকা নিলামই বা!"

রামকৃষ্ণ বলিল, "না না, সে কথা কি বলছি দিদিমণি? তা নয়। তবে কিনা—"

ডোরা কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিল, "যাও যাও বামুদা, বুড়ো হয়ে তোমাব ভীমরতি ধরেছে—আমি কোথাও যাব না, আমি এইখানে থাকব। আমি খৃষ্টান বলে যদি তোমাদেব আপত্তি থাকে—ঐ কি সব বলে আজকাল, শুদ্ধি-টুদ্ধি করিয়ে আমায় হিন্দু করে নাও না! দুদিন না হয় খৃষ্টানই হয়েছি—হাজার হোক হিঁদুব মেয়ে ত বটে!"

রামকৃষ্ণের মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। সে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল, "আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না দিদিমণি?"

ডোরা বলিল, "আমি খুব বুঝেছি, যাও, তুমি এখন খেতে বসগে—১১টা বেজে গেছে। আমি তোমার দাদাবাবুর জাত মেবে দেবো না, কিছু ভয় নেই। হ্যাঁ, জাতত ভাবি আছে কিনা। আমি এ বাড়ীতে আসা অবধি কতগুলো মুর্গী তোমাদেব ঐ উঠানে জবাই হয়েছে, বল দেখি! তোমাকে একদিন রামপাখীর ঝোল খাইয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও!"

"রাম রাম, ছি ছি"—বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণ উঠিয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ডোরা আর চারিদিন এ বাড়ীতে রহিল, প্রত্যহ বিকালে নিরঞ্জনকে হাওয়া খাওয়াইয়াও আনিল। তবে, রোজ একবার করিয়া "নার্সেস্ হোম"-এ ঘুরিয়া আসিত।

।। পাঁচ।।

আজ বিকালে চা-পান করিয়া ডোরা বিদায় লইবে। সে যাইবার সময় নিরঞ্জন বলিল, "ডোরা, তুমি আমার জীবন দান করেছ। তোমার সেবা-শুশ্রূষাতেই আমি বেঁচে উঠেছি। নইলে বোধ হয়, এ যাত্রা মহাযাত্রাই করতে হত।"—ডোরা নিরঞ্জনের গায়ে একটা থাবড়া মারিয়া বলিল, "হ্যাঁ—কি বল তুমি যাও! ভাল লাগে না ও সব কথা।"

নিরঞ্জন বলিল, "আমি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলিনি সত্যি কথাই বলছি আমি, ডোরা! তাই ভেবেছি, আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ—তোমার যদি আপত্তি না থাকে—"

ডোরা বলিল, "আছে—আমার আপত্তি আছে—আমি তোমার কৃতজ্ঞতা চাইনে!"

নিরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা, কৃতজ্ঞতা নাই নিলে। আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ—"

ডোরা বলিল, "উঃ, তুমি ত আজকাল অনেক ভাল ভাল কথা শিখেছ দেখছি! নিদর্শন মানে কি ভাই? সত্যি আমি জানিনে।"

নিরঞ্জন বলিল, "তোমার বাপ-মা মারা যাওয়ার পর পাঁচ বছরের বেলা থেকে তুমি মিশনারীদের হাতে—কে তোমায় বাঙ্গালা শেখাবে বল! নিদর্শন মানে হচ্ছে, কি বলে গিয়ে—ইয়ে—অর্থাৎ—"—ডোরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "চিহ্ন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—চিহ্ন—চিহ্ন।"

"তারপর? বলে যাও—এখনও মেনু বলনি।"

নিরঞ্জন বলিল, "কৃতজ্ঞতা নিতে তোমার আপত্তি থাকে থাকুক—বন্ধুত্বের—"

ডোরা বলিল, "স্নেহের—স্নেহেব আরও ভাল কথা।"

নিরঞ্জন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ স্নেহের—স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ—আমি তোমার জন্যে একযোড়া ব্রেসলেট আনিয়ে বেখেছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে—"

ডোরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপত্তি? না—না কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কই সে ব্রেসলেটযোড়া দেখি না ভাই?"—নিরঞ্জন উঠিয়া আলমারী খুলিতে খুলিতে বলিল, "ডোরা, তুমি একটা প্রহেলিকা। তোমায় বোঝা ভাব।"—ডোরা বলিল, "আমি তোমার ভার বোঝা বলেই ত আমায় তাড়াচ্ছ। তবু এখনও বউ আসেনি।"—নিরঞ্জন বলিল, "বউ কি আসবে?"

"আসবে না? তোমার কপালে থাকে ত একদিন আসবে বইকি!"

নিরঞ্জন একটি ক্যাস-বাক্স আলমারী হইতে বাহির করিয়া আনিতে আনিতে বলিল, "ডোরা, সত্যিই তুমি কি পাঁচ বছর বয়সে থেকে মিশনারীদের হাতে? এ সব খাঁটি বাঙ্গালী বোলচাল শিখলে কোথা তুমি?"

ডোরা বলিল, "আমাদের হোম্-এ এমনও সব বাঙ্গালী ক্রিশ্চান নার্স আছে যারা বাঙ্গালী ঘরের হাঁড়ির খবর সবই জানে। তাদের কাছে আমি শিখেছি।"

নিরঞ্জন ক্যাস-বাক্স খুলিয়া একটি ভেলভেটের কেস বাহির করিল এবং সেটি খুলিয়া ডোরার সামনে ধরিল। "বাঃ—কি সুন্দর!"—বলিয়া ডোরা তাহা নিরঞ্জনের নিকট হইতে চিলের মত ছোঁ মারিয়া লইল এবং ব্রেসলেট পরিতে উদ্যত হইল।

নিরঞ্জন বলিল, "এস ডোরা, আমি নিজে তোমার হাতে পরিয়ে দিই।"—ডোরা বলিল, "না না, তোমায় পরাতে হবে না, তুমি লাগিয়ে দাও আর কি! আমি নিজে পরি।"

ব্রেসলেট পরিয়া হাত দুখানি তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে ডোরার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ছোট মেয়ে, মনের মত খেলনা পাইলে তাহার মুখে যে খুসীর হাসিটি ফুটে—ঠিক সেইরূপ।—পরমুহূর্ত্তে ডোরা গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলবার অভিপ্রায়ে নত হইবামাত্র, ডোরা হরিণীর মত ক্ষিপ্রচরণে উঠিয়া পলাইল এবং বারান্দায় গিয়া রামুদা! রামুদা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

রামু আসিলে বলিল, "রামুদা, দেখ, তোমার দাদাবাবু আমাকে কেমন গহনা দিয়েছেন!"—বলিয়া বালিকার ন্যায় আনন্দোচ্ছ্বাসে হাত দুটি তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিল।

রামু হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বেশ হয়েছে দিদি—বেশ হয়েছে। ও আমি আগে দেখেছি—মামাবাবু যে দিন সায়েব-বাড়ী থেকে কিনে আনেন, সেই দিনই আমি দেখেছি। বেশ মানিয়েছে দিদির হাতে।"—ডোরা বলিল, "মামাবাবু কিনে এনেছিলেন বুঝি? ওঃ—তাই বুঝি সে দিন সকালে চা খাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাজারে যাচ্ছি জিনিষ কিনতে।'—তোমরা ভিতরে ভিতরে বুঝি এই ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছিলে?"

নিরঞ্জন বলিল, "রামুরই ত দোষ। আমি মামাবাবুকে বললাম ডোরা আমার এত সেবা করলে, যাবার সময় ওকে ত কিছু উপহার দেওয়া উচিত। মামা বললেন, একটা চেক দেওয়া যাবে। রামু সেখানে দাঁড়িয়েছিল, ও বললে, না না, ও সব চ্যাক্‌চোকে দরকার নেই। যে হাতে দিদিমণি তোমার অত সেবাটা করলে, সে হাত দুখানি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দাও। তাই ত ব্রেসলেট কেনা পরামর্শ হল।"—ডোরা বলিল, "তাই বুঝি? আমাকে কিছু বলা হল না। বললে, আমি মামাবাবুর সঙ্গে যেতাম; নিজে দেখে পছন্দ করে কিনতাম, আরও হয়ত কত সব ভাল ভাল ছিল, পেলাম না।"—বলিয়া মুখে বিষণ্ণতার ভান করিল।

খোট্টা ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিমণি, ট্যাক্সি আয়া হ্যায়।"—ডোরার নির্দেশমত ভৃত্য তাহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইয়া গেল। ডোরা আবার নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন ডোরার সহিত নামিয়া তাহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু ডোরা বলিল, "তুমি এস না। রামুদার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।"

নিরঞ্জন মনে করিল, গাড়ীতে উঠিবার সময় ভৃত্যগণকে বখশিস্ দিবে বলিয়া ডোরা তাহাকে সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিল। ধরা গলায় বলিল, "আচ্ছা, এস তা হলে।"

পাচক ও ভৃত্যকে ডোরা আগেই বখশিস্ দিয়া রাখিয়াছিল। সদর দরজার নিকট পৌঁছিয়া সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া রামুর পদস্পর্শ করিল।—রামু স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "ছি ছি দিদি, ও কি, ও কি? আমায় পেন্নাম করতে আছে? আমি যে শুদ্দুর।"

ডোরা বলিল, "প্রণাম করতে আছে। তুমি আমায় ভালবাসলে কেন? আমরা খৃষ্টান, যীশু ভজি—ও সব জাতিভেদ-টাতিভেদ মানিনে।"—বলিয়া চোখের জল মুছিয়া ডোরা ট্যাক্সিতে উঠিল।—"মেয়েটা পাগলী!" আপন মনে এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে রামু ভিতরে গেল।—ডোরা চলিয়া গেলে নিরঞ্জনের মনে হইল,—বাড়ীটা যেন বিষণ্ণ শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। বিদ্যুতের আলোক যেন আর তেমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে না। একখানা ঈজি-চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া নিরঞ্জন কত কি ভাবিতে লাগিল।

রাত্রি ৮টার সময় রামু তাহার পথ্য—দুধ-পাঁউরুটি আনিয়া হাজির করিল। নিরঞ্জন খাইতে বসিল, কিন্তু ভাল লাগিল না। এ কয় দিন ডোরাই তাহার পথ্য আনিয়া দিত এবং কাছে বসিয়া খাওয়াইত।—কোনও রকমে কতকটা খাইয়া, আচমন করিয়া, নিরঞ্জন আবার ঈজি-চেয়ারে আশ্রয় লইল। চেয়ারে পড়িয়া থাকাও ভাল লাগে না। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া, বাহিরের বারান্দায় পায়চারী করে। ক্লান্ত হইলে আবার আসিয়া চেয়ারে বসে।

এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল। ঘুম পায় না।

রামু আহার সারিয়া এই ঘরের মেঝেতেই নীচে বিছানা পাতিতে পাতিতে বলিল, "দাদাবাবু এখনও শুলে না? দশটা যে বাজতে চলল। শোও, নইলে অসুখ করবে যে!"

নিরঞ্জন বলিল, "ঘুম আসছে না রে!"

"কেন দাদাবাবু? রোজ ত এ সময় ঘুমোও তুমি।"

"আজ মনটা বড় খারাপ। আজ অনেক কথা ভাবছি।"

রামু নিজ বিছানার উপর আরাম করিয়া বসিয়া বলিল, "কি ভাবছ, দাদাবাবু?"

নিরঞ্জন বলিল, "দ্যাখ্—একা একা আর ভাল লাগে না। আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে

হয়েছে।"—রামু বলিল, "বেশ ত! সে ত ভাল কথা দাদাবাবু!—তুমি বিলেত থেকে ফিরে না এলে বিয়ে করবে না বলেছিলে,—তাই ত এত দিন, মেয়ে দেখার জন্যে যে এসেছে, তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামাবাবুকে আমি চিঠি লিখে দিই—স্বঘর স্বজাতের একটি সুন্দরী পাত্রী স্থির করে রাখুন। সামনে আশ্বিন কার্ত্তিক মাস, অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই তোমার বউ এনে দিই। আমিও ত বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই,—তোমায় যেমন কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম, তোমার দু একটি ছেলেমেয়েকেও মানুষ করে দিয়ে যাই।"

নিরঞ্জন বলল, "স্বঘরে স্বজাতে যদি নাই হয়! আমি যদি অন্য জাতের কোনও মেয়েকে— যদি খৃষ্টানও হয়,—তাকে বিয়ে করি, তাতেই বা কি?"

রামু বলিল, "কায়েতের ছেলে হয়ে তুমি খিষ্টেন বিয়ে করবে কেন, দাদাবাবু? তাতে পিতৃপুরুষের জল পিণ্ডি লোপ হয়ে যাবে যে! মামাবাবুই বা মত দেবেন কেন?'

নিরঞ্জন বলিল, "মামাবাবু ত আর তোমাদের মত গোঁড়া হিন্দু নন!"

রামু বলিল, "হ্যাঁ তা আমি জানি। মামাবাবু ত ছোঁড়া বয়সে যখন এখানে কলেজে পড়তেন, তখন ত ব্রেহ্ম সভায় গিয়ে খিষ্টেন হবার মৎলবই করেছিলেন। ওনার বাপ-মা এসে কত কষ্টে ওঁকে ফিরিয়ে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে দ্যান।"

"তুই এত খবর জানলি কি করে রে?"

"আমি জানিনে? আমার যখন গোঁফ উঠেনি, তখন থেকেই ত তোমাদের সংসারে আমি রয়েছি। কর্ত্তামশায়ের বিয়ের পর, তিনি যখনই শ্বশুরবাড়ী যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ওনাদের ঝি-চাকরদের কাছে তখন সব কথাই আমি শুনেছিলাম।"

"তা হলেই বুঝে দ্যাখ্ কোনও খৃষ্টান মেয়েকে যদি আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়— মামাবাবু বোধ হয় বাধা দেবেন না।"

রামু উচ্চ হইয়া উঠিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!—দাদাবাবু কি ভাবছ বল দেখি? তুমি কি ডোরা দিদির কথা মনে করে আমায় এই সব কথা বলছ?"

নিরঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যদি তাই হয়। তবে বলি শোন্। আমি মনে মনে স্থিরই করেছি, যদি বিয়েই করি, তবে ডোরাকে ছাড়া আর কাউকে করবো না!"

রামু ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল, "রাম রাম, দুর্গা দুর্গা! ছি ছি দাদাবাবু, ও কথা তুমি মুখেও এন না। কি সর্বনাশ!"—রামুর এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে নিরঞ্জন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন রামুদা ও কথা বলছিস কেন?"

রামু বলিল, "তবে শুনবে দাদাবাবু? মামাবাবু তোমায় জানাতে বারণই করে গিয়েছিল— কিন্তু এখন আর না বলে উপায় কি? রাম রাম! দুর্গা দুর্গা! হে মা কালী, রক্ষা কর!"

নিরঞ্জন চেয়ারে উচ্চ হইয়া উঠিয়া বলিল, "কি রে রামু, ব্যাপার কি? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলি নাকি?"—রামু তখন যেন এলাইয়া পড়িল। বলিল, "পাগল হইনি দাদাবাবু— তবে শোন। ঐ ডোরা—তোমার—আপন বোন!"

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "সে কি রে?—বোন কি করে? আমার ত কোনও দিন বোন হয়েছিল বলে শুনিনি!"

রামু বলিল, "তোমার—মা'র পেটের বোন নয়। তবু—ও তোমার—আপন বোন।"

"আমার বাবার মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

নিরঞ্জনও এতক্ষণে ঈজি-চেয়ারে এলাইয়া পড়িল। বলিল, "বাবার যে আর এক বিয়ে ছিল, তা ত আমি কোনও দিন শুনিনি রামুদা।"

রামু বলিল, "কর্ত্তার বিয়ে আর ছিল না বটে। কিই বা বলি ছাই!—তুমি দাদাবাবু তখন বছর দুয়েকের হবে। কর্ত্তা তখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, এক মাস দুমাস করে

থাকতেন। সেই সময় ঐ ঘটনা হয়। কর্ত্তা তাঁকে ভবানীপুরে বাড়ী কিনে দিয়েছিলেন, মিশনারী মেম রেখে তাঁকে লেখাপড়া শেখাতেন। ঐ ডোরা যখন জন্মালো, তখন ত আমরা ভবানীপুরের বাড়ীতেই। তোমার বয়স তখন তিন কি বড় জোব চার।"

নিরঞ্জন প্রথমটা এ কথা গুলির অর্থ ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে—আসল অর্থটা তাহার মাথায় আসিল। সে কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার মা এ কথা জানতেন?"

"না।"

"মামাবাবু?"

"প্রথম প্রথম তিনি জানতেন না, পরে জেনেছিলেন। কর্ত্তার স্বর্গলাভের পব, মামাবাবু মাঝে মাঝে এসে ডোরার মার সঙ্গে দেখা করতেন, তখন ওব নাম ডোবা ছিল না, তখন ওর নাম ছিল পুঁটি—মিশনারীবা ওর ডোরা নাম রেখেছিল! পুঁটির মা, মামাবাবুকে দাদা দাদা বলতো। পুঁটিকে তিন বছবের রেখে কর্ত্তা স্বর্গে গেলেন, পাঁচ বছরেব রেখে পুঁটির মাও গেলেন। মরবার আগেই বাড়ীখানি, টাকা-কড়ি, গহনাপত্র যা তাঁর ছিল, মিশনারীদেব ফাণ্ডে দান করে যান, আর বলে যান, আমার মৃত্যুর পর আমার মেয়েটিকে নিয়ে গিযে তোমরা মানুষ কোরো—ওকে লেখাপড়া শিখিও, ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিও।"

"এ সমস্ত কথা তোকে কে বললে?"

"মামাবাবু সে সময় খোঁজ-খবর নিতে কলকাতায় এসেছিলেন, তিনিই গিয়ে আমাকে বলেন।"—নিরঞ্জন আবার দুই তিন মিনিটকাল নীরবে বসিযা রহিল। তাহার পব জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রামুদা, ডোরা কি এ সব কথা কিছু জানে? তাব আমার কি সম্বন্ধ, তা কি সে জানতে পেরেছে?"

"পেরেছে বইকি। আপন ভাই জেনেই ত প্রাণ দিয়ে তোমার সেবা কবেছে। নইলে ভাড়াটে নার্স কি আর অত কবে দাদাবাবু?"

"ডোবা কি করে জানলে?"

"মামাবাবু আসবার ৩/৪ দিন পরে, একদিন তিনি ডোরাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করতেই—সে কর্ত্তার নাম করে দিলে। তারপব কথায় কথায় সবই বেরিয়ে পড়লো। ডোরার বাসায় তার মা-বাপেব ফটোগেরাপ ছিল,—এনে দেখালে—কর্ত্তা চেয়ারে বসে রয়েছেন, ডোরার মা চেয়ারেব পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। সে ফটোগেরাপও ভবানীপুরের বাড়ীতে আমার সামনেই তোলা হয়েছিল!—উঃ, বাপ রে! সে সব কথা যাক্—তুমি এখন শোও দাদাবাবু। অআমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্চে না। আর কিছু যদি শুনতে চাও, কাল আবাব শুনো।'—বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইল।

নিরঞ্জন সেইভাবে অনেকক্ষণ চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার পর আলো নিবাইয়া শয়ন করিল।—পরদিন নিরঞ্জন, রামুর সহিত পরামর্শ করিয়া, মামাবাবুকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিল। প্রস্তাব করিল, ডোরাকে নার্সেস হোম হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিবে এবং প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধি করাইয়া, বিলাত-ফেরত সমাজে তাহার বিবাহ দিবে। অবশ্য ডোরাব জন্মরহস্য—অন্ততঃ পাত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া, সে সম্মত হইলে, তারপর বিবাহ। কিছু বেশী টাকাই না হয় লাগিবে।

মামাবাবুর উত্তর যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি সানন্দে মত দিয়াছেন। সেই দিনই বিকালে নিরঞ্জন নার্সেস হোম-এ গিয়া বোনটিকে বাড়ী লইয়া আসিল।

শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তান্তে ডোরার নূতন নাম হইল—কমলা। পরবৎসর যোগ্য পাত্রের সহিত কমলার এবং যোগ্য পাত্রীর সহিত নিরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু সে সব ত অন্য গল্প।

[মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৫]

কানাইয়ের কীর্ত্তি

কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোডের উপর এক ত্রিতল অট্টালিকা। ফটক পার হইয়া খানিকটা বাগান—তারপর বাড়ীর গাড়ীবারান্দা। সেই গাড়ীবারান্দার সিঁড়ির নিকট এক ছিন্ন মলিনবেশ যুবক, পায়ে জুতা নাই, বয়স আন্দাজ ১৮/১৯—নীরবে বসিয়া ছিল। গতকল্য তাহার আহার হয় নাই। আজ এখন বেলা ৮টা---আজ ত হয়ই নাই। এমন সময় সিঁড়ি দিয়া কেহ নামিবার পদশব্দ হইল। যুবক সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যিনি নামিয়া আসিলেন, তিনিই এ গৃহের কর্ত্তা—ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, পায়ে চটিজুতা। বয়স তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের কম হইবে না। রঙ বেশ ফর্সা। গোঁফ দাড়ি কামানো। ভদ্রলোক নিম্নে আসিয়া পৌছিবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি সেই ছিন্নবেশ যুবকের উপর পতিত হইল। যুবক মাথা খুব ঝুঁকাইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তাঁহার পশ্চাৎ, বৃহৎ গুড়িগুড়ি হস্তে এক ভৃত্য নামিল। বাবুটি কোনও কথা না বলিয়া, তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন,----ভৃত্য গুড়িগুড়িটি সেখানে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল। যুবক নিম্নস্বরে বলিল, ''খানসামাজি! একবার বল না''

ভৃত্য মুখ বাঁকাইয়া আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল! ফিরিয়া আসিয়া, ইঙ্গিতে যুবককে বলিল, ''যাও''---বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

ছেলেটি তখন সভয় পদবিক্ষেপে ভিতরে গিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে গৃহস্বামী তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কবিয়া বলিলেন, '' কি হে ছোকরা, তুমি কি চাও বল দেখি? ''--

যুবক বলিল, '' আজ্ঞে, একটা চাকবি--বাকবী।''

'' লেখাপড়া জান''

'' আজ্ঞে, বাংলা জানি। দেশে থাকতে ছেলেবেলায় গুরুমশাইয়ের পাঠশালে পড়েছিলাম কিছুদিন। নিকতে পড়তেও জানি, হিসাব নিকতেও পারি। বড় গরিব, দিন চলে না, তাই কলকাতায় এসেছি চাকরি-বাকরির চেষ্টায় ''

'' থাক কোথায়? ''

'' আজ্ঞে কালীঘাটে আমাদের দেশের একজন-----''

বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, '' বাজার সরকারী-টরকারী এই রকম একটা কোন চাকরী খুঁজছ বোধ হয়? তা বাপু, বাজার সরকার ত আমাদের থাকে না। বেয়ারাব কাজ করতে রাজী হও ত বল। আমার বেয়ারা কাজ ছেড়ে চলে গেছে। কি জাত তুমি, নাম কি তোমার?''

'' আজ্ঞে আমার নাম শ্রীকানাইলাল নন্দী। আমরা কায়স্থ। অন্য কোন কাজও যদি খালি নাই থাকে, তবে বেয়ারার কাজই আমাকে দিন বাবু। তবু ত দুটো খেয়ে পরে বাঁচবো!''

''এখানে খাবে কি করে? এখানে ত বাবুর্চ্চিতে রাঁধে। আমি ত হিন্দু নই,---ক্রিশ্চান।''

'' আজ্ঞে সে কথা বলিনি। মাইনে পাব ত, সেই টাকায় খাব পরবো। আমায় কি করতে হবে বাবুমশাই?''

''এই, বেয়ারার যা কাজ---বাড়ীর সব আসবাবপত্র ঝাড়পোঁচ করা, ঘরে ঘরে বিছানা ঠিক করা, রুপোর বাসন-টাসনগুলো মাজা, ঘষা, মিস্ বাবাকে কলেজে দিয়ে আসা নিয়ে আসা। বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পার্কে নিয়ে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আনা---এই রকম সব কাজ আর কি!''

''মাইনে কত পাব হুজুর?''

'' কুড়ি টাকা। এ পাড়ার বাঁধা রেট।''----কানাই মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল। তারপর বলিল,

" আচ্ছা যে আজ্ঞে হুজুর, কবে থেকে আসবো তা হলে?"

বাবু বলিলেন, " কাল ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখ। কাল থেকে কাজে লাগো। ঠিক সাড়ে ছটায় আসতে হবে রোজ। সাতটায় আমি উঠি, আমাকে তামাক-টামাক দিতে হবে। রাত্রে ডিনার হয়ে গেলে তারপর তোমার ছুটী। মাঝে অবশ্য দুপুরবেলা দু তিন ঘন্টার জন্যে তোমায় খেতে ছুটি দেওয়া যাবে। কাজ খুব হাল্কা,—তবে সর্বদা হাজির থাকা চাই। কাল সকালে এসে খানসামাকে বলবে, তোমার উর্দ্দি দেবে। পাগড়ী চাপকান আর ধুতি। এ সব ছেড়ে রেখে উর্দ্দি পরে কাজ করবে।"—এই বলিয়া তিনি টেবিলের উপর রক্ষিত বিদ্যুৎ ঘন্টার বোতাম টিপিলেন। খানাসামা আসিয়া দাঁড়াইল। এই নবনিযুক্ত বেয়ারা সম্বন্ধে নিজ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া কানাইকে বলিলেন," আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।"

কানাই আবার ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইল। গাড়ীবারান্দা হইতে নামিয়া, চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া, বাড়ীর পিছন দিকে গেল। অদূরে বাবুর্চ্চিখানা, সেখান হইতে মাংস রান্নার গন্ধ আসিতেছে। সেই গন্ধে ক্ষুধাতুর যুবকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বাটীর পশ্চাতের বারান্দায় খানসামা বসিয়া একরাশ কাচের গেলাসে ঝাড়ন সহযোগে পরিস্কার করিতেছিল। কানাই সেখানে গিয়া বলিল," খানসামাজী তুমকো নাম কেয়া"—খানসামা হাসিয়া বলিল," নাম কেয়া, তুমি আমাকে খোট্টা তজবিজ করলে নাকি? আমার নাম গোলাম রসুল, আমি বাঙ্গালি মুসলমান, হুগলী জেলায় চেড়াগাঁয়ে আমার ঘর। তোমার নাম কি? ঘর কোথায়?"

কানাই নিজ নাম ও নিবাস বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল," এখানে বাবুর কে কে থাকেন?"

খানসামা উত্তর করিল," বাবু! বাবু কে? সাহেবের কথা পুছ করছ? বাবু বোলো না, সাহেব গোস্‌সা হবে"

" বটে, তাই নাকি? তা আমি ত জানতাম না খানসামাজী! ধুতি পবে তামাক খাচ্ছেন দেখে আমি ত বাবু বলে ফেলেছি। "

" উনি কি তোমাদের হেঁদু? ইশাই যে! সাহেব বলবে। সাহবের মেম নেই, এন্তেকাল করেছে। এ কুঠিতে সাহেবের দুটি বেটি, এক বেটা থাকে। ছোট সাহেবের এখনও সাদি হয়নি। ছোট মিস্ বাবারও সাদি হয়নি। বড় দামাদ সরকারী কাজে বিলাযেৎ মুলুক গিযেছে, তাই বড় বেটী এখন বাপের কাছে থাকে। তার দুই লেড়কা, তিন লেড়কী! ব্যস্।" বলিযা খানসামা সজোরে কাচের গ্লাসে ঝাড়ন ঘষিতে লাগিল। বলল "যাও দেখি, এই টেবেব উপব সাফ গেলাসগুলো রয়েছে, এগুলো ঐ খানকামরায় রেখে এস। দেখো, ফেলে দিয়ে ভেঙ্গো না যেন।"—কানাই সাবধানে ট্রে তুলিয়া লইয়া খানকামরায প্রবেশ করিল। দেখিল, টেবিলের উপর দুইটি চীনামাটির পাত্রে অনেকগুলি আপেল ও ন্যাসপাতি সাজানো রহিয়াছে।

বাহিরে আসিয়া কানাই আবার খানসামার নিকট বসিয়া, সাহেব ও তাঁহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরে বাবুর্চ্চিখানা হইতে শব্দ আসিল, "রসুল ভাই—জেরা এদিকে আয় ত!"

রসুল, হাতের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই সুযোগে কানাই চট্ করিয়া খানকামরায় প্রবেশ করিয়া একটা ন্যাসপাতি ও দুইটা আপেল নিজ পকেটে পুরিয়া বাহিরে আসিয়া, আবার যথাস্থানে বসিল।

মিনিট পাঁচেক পরে রসুল ফিরিয়া আসিল। কানাই তখন দাঁড়াইয়া উঠিল বলিল,"আচ্ছা, এখান আসি তবে, বেলা হল। সেলাম ভাইসাহেব।"

"সেলাম। কাল বিহানে এসে, আমার কাছ থেকে তোমার উর্দ্দি চেয়ে নেবে। সাবুন দেবো, হাতমু আচ্ছিতরে ধুয়ে, উর্দ্দি পরে আপন কামে যাবে। সাহেবলোক ময়লা একদম দেখতে পারে না—খুব সাফাই চায়।"

"আচ্ছা"---বলিয়া কানাই প্রস্থান করিল। কিছুদূর গিয়াই পদ্মপুকুর। ঘাটে নামিয়া, পকেট হইতে ফল তিনটি বাহির করিয়া জলে ধুইয়া লইয়া, বোঁটাসুদ্ধ খোসাসুদ্ধ কামড় মারিয়া গোগ্রাসে চিবাইতে লাগিল। ফল তিনটি নিঃশেষ করিয়া পদ্মপুকুরে জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিল। হাত পা ধুইয়া উপরে আসিয়া ছায়াতলে একখানি বেঞ্চ দেখিয়া, তাহার উপর শয়ন করিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছিল, কানাই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

।। ২ ।।

চাকরিতে ভর্ত্তি হইবার এক সপ্তাহ পরে, কানাই অতি প্রাতে প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ফটকের বাহিরে একটি "মনিব্যাগ" কুড়াইয়া পাইল। সেটি লইয়া বাগানে লেবুগাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া খুলিয়া দেখিল, ভিতরে দুইখানি দশ টাকার নোট এবং খুচরায় তিন টাকা কয়েক আনা রহিয়াছে। তার মনের মধ্যে প্রলোভন হইল, টাকাগুলি সে আত্মসাৎ করে। নোট ও টাকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, ব্যাগটা রাস্তায় ফেলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু তাহার মনে একটু দ্বিধাও উপস্থিত হইল। ছি ছি---শেষকালে চুরি! একদিন পেটের জ্বালায় ফল চুরি করিয়া খাইয়াছিল বটে। কিন্তু টাকা চুরি একান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইবে যে! খুব সম্ভব, বড় সাহেব কিংবা ছোট সাহেবেরই এ ব্যাগ। বড় সাহেবের বোধ হয় নয়, ছোট সাহেবেরই হইতে পারে। কারণ গত রাত্রে বড় সাহেব ত কোথাও বাহির হন নাই, ছোট সাহেবের বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, কানাই যখন বাড়ী যায়, তখনও তিনি ফেরেন নাই---তিনিই বোধ হয় বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় অসাবধানে এ ব্যাগ ফেলিয়া গিয়াছেন। নাঃ, লোভ করিয়া দরকার নাই,---তামাক দিতে গিয়া এ ব্যাগ বড় সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

কানাই লোভ রিপুকে জয় করিল। বড় সাহেবের নিকট ব্যাগটি দিল।---সে ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। ছোটসাহেব গতকল্য রাত্রি ১২টার সময় তাঁর ক্লাব হইতে ডিনার খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া, ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিবার জন্য ব্যাগটি তাঁহার পাৎলুনের পকেট হইতে বাহির করিয়াছিলেন। তারপর, ভাড়া দিয়া, উহা পাৎলুনের পকেটে রাখিতে গিয়ে মাটিতে পড়িয়া যায়। সাহেবের তখন বিলক্ষণ মত্তাবস্থা---ব্যাগ পড়া খেয়াল করিতে পারেন নাই।

পিতার অনুরোধে ছোট সাহেব কানাইকে তাহার এই সাধুতার জন্য দুইটি টাকা বখশিস করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে, কানাইয়ের পশার এ বাড়ীতে খুব বাড়িয়া গেল। তা ছাড়া নিজ কাজকর্ম্মেও দিন দিন সে বেশ নিপুণতা দেখাইতে লাগিল।

তেতলায় একটি মাত্র ঘর,---সেই ঘরে ছোট সাহেব শয়ন করিতেন। সে ঘরে বাড়ীর অন্য কেহ সচরাচর প্রবেশ করিত না। একদিন বড় সাহেব ছোট সাহেব আফিসে চলিয়া যাওয়ার পর, কানাই তাঁহাদের ঘর ঠিক করিতেছিল। ছোট সাহেবের ঘর ঠিক করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, আলমারির গায়ে চাবিটি লাগানো রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ আলমারি চাবিবন্ধ করিয়া, চাবি নিজের কাছে রাখিল।---কালীঘাটের বাসা হইতে আহার সারিয়া কানাই বেলা দুইটার সময় ফিরিয়া আসিত। আজ সে সময় ফিরিয়া দেখিল, বড় মেম সাহেব (ব্যানার্জ্জি সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা) নিজ শয়নকক্ষে দ্বার বন্ধ করিয়া রহিয়াছেন---দ্বিপ্রহরে তিনি কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা গিয়া থাকেন। মিস্ বাবাও কলেজে রহিয়াছেন।

কি মনে করিয়া, কানাই তেতলায় গিয়া ছোট সাহেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। চাবি লইয়া আলমারিটি খুলিল। থাকে থাকে পোষাক সজ্জিত রহিয়াছে। আলমারির মধ্যভাগে তিনটি দেরাজ। সেগুলি একে একে টানিয়া খুলিল। একটা দেরাজে লাল সুতায় গাঁথা এক তাড়া নোট রহিয়াছে। নোটগুলি গণিয়া দেখিবার জন্য সে উঠাইল, কয়েকখানি

গণনাও করিল, তারপর কি মনে করিয়া সেগুলি রাখিয়া দিয়া আবার দেরাজটি বন্ধ করিয়া দিল। লাল সুতাটি খুলিয়া গিয়াছিল, ইহা সে লক্ষ্য করে নাই। পোষাকগুলির পানে চাহিয়া তাহার বড় লোভ উপস্থিত হইল। এক প্রস্থ পোষাক নামাইয়া লইল। তারপর সেগুলি একটি একটি নিজ অঙ্গে পরিধান করিল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নেকটাই বাঁধিল। ভাল হইল না। কয়েকটা হ্যাট ছিল, তাহার মধ্যে পছন্দসই একটা লইয়া মাথায় দিয়া, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া খুসিতে তাহার মনটি ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, একটা কি যেন অঙ্গহানি হইতেছে। ঠিক ঠিক। ছোট সাহেবের সিগারেট একটা লইয়া তাহা ধরাইল। পাৎলুনের বাঁ দিকের পকেটে বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সিগারেট টানিতে টানিতে ঘরের মধ্যে গর্ব্বিতভাবে পদচারণা করিতে করিতে, আয়নায় নিজ মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল এবং হাসিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া চমকিয়া দেখিল, ছোট সাহেবের জ্যেষ্ঠা সহোদরা দাঁড়াইয়া।

ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। মেমসাহেব রক্তিমনেত্রে কম্পিত স্বরে বলিলেন, "বেয়ারা! আচ্ছা, সাহেবরা আসুন, তার পর মজা দেখতে পাবি!"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ছোট সাহেব বাড়ী আসিয়া ভগিনীর নিকট এই ব্যাপার শুনিয়া ত রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে সব কথা জানাইয়া বলিলেন, "বাবা আজই ওকে ডিস্‌মিস্‌ করুন।"—ব্যানার্জ্জি সাহেব কন্যার নিকটও সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সে পোষাক ছিল কোথায়? আলমারির ভিতরে?"

"হ্যাঁ।"

"বেয়ারা চাবি পেলে কোথা?"

"চাবি, আমি অফিস যাবার সময় ভুলে আলমারিতে লাগিযে রেখে চলে গিয়েছিলাম।"

"আলমারিতে টাকাকড়ি কিছু ছিল নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল মাইনে পেলাম,—১৭০টাকা সমস্তই ঐ আলমারিতে ছিল।"

"সে টাকা আছে কি না, খোঁজ করেছ?"

"আজ্ঞে না, দেখে আসি,"—বলিয়া তিনি উপরে গেলেন।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "না টাকাকড়ি ঠিক আছে। তবে নোটগুলো একসঙ্গে গাঁথা ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই ও খুলেছিল,—এলোমেলো হয়ে রয়েছে!"

ব্যানার্জ্জি সাহেব হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "দেখ, ইচ্ছা করলে বেয়ারা সমস্ত টাকাগুলি চুরি করে নিতে পারতো। নিয়ে, তোমার চাবি কোথাও ফেলে দিলে, ওকে ধরে কে? তুমি নিজেই মনে করতে চাবি তুমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছ।—টাকা চুরির প্রলোভন সে জয় করেছে। শুধু আজ বলে নয়। সেবার গেটের কাছে তুমি তোমার পার্স ফেলে এসেছিলে, তাতে কুড়ি টাকা না পঁচিশ টাকা ছিল, ইচ্ছা করলে ও স্বচ্ছন্দে গাপ করতে পারতো, কিন্তু তা করেনি। পোষাক পরে সাহেব সাজলে নিজেকে কি রকম দেখায়, তাই দেখার লোভটুকু মাত্র ও জয় করতে পারেনি। ওটা নিছক ছেলেমানুষী বই আর কিছুই নয়। ওকে কি সেই জন্যে ডিস্‌মিস্‌ করা ন্যায়বিচার হবে? তোমরাই বল।"

পুত্র কন্যা, পিতার মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। ব্যানার্জ্জি সাহেব তখন কানাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৃত্রিম রোষে তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। নিজ হাতে নিজ কাণ মলিয়া, নাকে খৎ দিয়া কানাই সে যাত্রা রেহাই পাইল।

।। তিন ।।

ছোট মিস্‌ সাহেবের নাম বীণা ব্যানার্জ্জি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। তাহার বয়স সতেরো বৎসর,—ডায়োসীজন কলেজের ছাত্রী। শাড়ী ও জুতা মোজা পরিয়া পদব্রজেই সে কলেজে যায়। কানাই তাহার বহি-খাতাগুলি বহন করিয়া লইয়া যায়। এবং চারি ঘটিকার সময়

কলেজে গিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে।---কলেজে যাইবার পথে একদিন কানাই দেখিল, ইংরাজী পরিচ্ছদে এক বাঙ্গালী যুবক অপর দিক হইতে আসিতেছে। বীণাকে দেখিয়া সে টুপী তুলিল, এবং পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই এক মিনিট মাত্র কথা কহিয়া, তাহার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বীণা সে চিঠি ব্লাউজের বুকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। ঠিক পরদিন সেই সময় সেই স্থানেই আবার সেই যুবকের সহিত দেখা। এবার বীণা তাহার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া, তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল।

কানাই মনে মনে বলিল, " কে এ লোকটা? কই কুঠীতে কোনও দিন আসে না ত? "— অথচ, মিস্ বাবাকে এ বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

এইরূপ পত্র চালা-চালি মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। এ বিষয়ে কানাইয়ের কৌতূহলও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তারপর কিছু দিন আর সে সাহেবের দর্শন পাওয়া গেল না।

একদিন কলেজে যাইবার পথে বীণা বলিল, " দেখ বেয়ারা, তুমি ১১টার সময় খেতে বাড়ী যাও?"—কানাই বলিল, " জী হুজুর।"

"তুমি আমার একটি কাজ করতে পারবে? আমি তোমায় বখশিস্ দেবো। "

"কেন পারবো না হুজুর?"

"তোমার বাসা কালীঘাটে ত? টাউনসেন্ড রোড জান?"

"জানি হুজুর, তানসেন রোড আমার পথেই পড়ে ।"

"এই চিঠিখানি নাও । এই নম্বরে গিয়ে চিঠিখানি দেবে। যা জবাব পাও তা নিয়ে আসবে। কিন্তু, আমাব এ চিঠি কিংবা সে জবাবের চিঠি, কেউ যেন দেখতে না পায়। জবাব এনে চুপি চুপি তুমি আমায় দিলে, আমি তোমায় বখশিস্ দেবো। "

"বহুৎখু হুজুর "—বলিয়া কানাই সেলাম করিয়া, পত্রখানি লইয়া, নিজ পকেটের মধ্যে লুকাইল। —খাইতে ছুটী পাইয়া বাড়ী যাইবার সময় কানাই পদ্মপুকুরের বাগানে প্রবেশ কবিল। খামেব মুখ জলে ভিজাইয়া, চিঠিখানি বাহিব করিয়া পড়িল। যা ভাবিয়াছিল, তাই। প্রেমপত্র। কয়েক দিন হইতে প্রণয়ী যুবক জ্বরোগে আকান্ত হইয়া শয্যাশায়ী--তাই বিরহ জ্বরাক্রান্তা প্রণয়িণী অত্যন্ত উদ্বিগ্না। চিঠি পড়িয়া, হাসিযা, কানাই মনে মনে বলিল, " ওবে ছুঁড়ি। ডুবে ডুবে জল খাস্ তুই।" আবার উহা খামে বন্ধ করিল। জলে ভেজা অংশটুকু যাহাতে ভাল করিযা শুকাইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে রৌদ লাগাইতে লাগাইতে টাউনসেন্ড রোডে পৌঁছিয়া যথাস্থানে উহা দিল। সাহেবের বেযারা আসিয়া বলিল, "কাল এই সময় এসে জবাব নিয়ে যেও।"—পরদিন দ্বিপ্রহবে নিজ বাসায় যাইবার পথে, জবাব লইয়া, কানাই পত্রখানি বাসায় গিয়া উহা খুলিয়া পাঠ কবিল।

আরও কয়েকদিন কানাইকে এইরূপ ভাবে পত্র বহন করিতে হইল। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পত্র খুলিয়া সে পড়িল। উভয়ের পত্রগুলি হইতে ইহা সে জানিতে পারিল যে, এই সাহেব মিস্ বীণার পাণিপ্রার্থী হইয়া ব্যানার্জি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাত্রের পিতা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ধোপা ছিলেন বলিয়া, ব্যানর্জ্জি সাহেব আপত্তি করেন। মৌখিক অবশ্য কন্যার অল্প বয়েসের জন্য আপত্তি জানাইয়াছিলেন। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। সুযোগ মত পলাইয়া, চন্দননগরের গির্জায় উভয়ে বিবাহিত হইবার পরামর্শ এখন ইহাদের চলিতেছে। কানাইয়ের বেশ বখ্শিস্ লাভ হইতে লাগিল।—প্রণয়ী সাহেব সুস্থ হইয়া পুনরায় কলেজের পথে বীণার সহিত সাক্ষাৎ ও পত্র বিনিময় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূজার বন্ধ আসিল। ছুটির মধ্যে একদিন বীণা গোপনে কানাইয়ের হাতে একখানা ডাকেব চিঠি দিয়া বলিল,"বাড়ী যাবার সময় এই চিঠিখানি তুমি ডাকে ফেলে দেবে।"

কানাই চিঠিখানির ঠিকানা দেখিল, সেই প্রণয়ী সাহেবেরই নাম, তবে ঠিকানা

চন্দননগর। খুলিয়া উহা সে পাঠ করিল। বীণা লিখিয়াছে, তাহার পিতা বায়ু পরিবর্তনের জন্য শীঘ্রই দেরাদুন যাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সে পলাইয়া চন্দননগরে যাইবে, বিবাহের সমস্ত যেন ঠিকঠাক করিয়া রাখা হয়।—চিঠি জুড়িয়া কানাই উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল।

॥ ৪ ॥

ব্যানার্জ্জি সাহেবের যাত্রার দুইদিন পূর্ব্বে কানাই আবার ডাকে ফেলিবার জন্য মিস্ বাবার ঐরূপ আর একখানি পত্র পাইল। পড়িয়া দেখিল, বীণা পলায়নের দিন স্থির করিয়া লিখিয়াছে—পিতার যাত্রার তিন দিন পরে, বেলা একটা চল্লিশের গাড়িতে সে হাওড়া হইতে রওয়ানা হইবে। সাহেব যেন চন্দননগর স্টেশনে উপস্থিত থাকেন।

এই পত্র পড়িয়া কানাই অত্যন্ত চটিয়া গেল। বুড়া বাপের অমতে, তাঁর মনে দুঃখ দিয়া, ধোপার ছেলেকে বিবাহ না করিলেই কি নয়? মনে মনে বলিল, "দাঁড়াও তোমায় জব্দ করছি আমি।" স্থির করিল, ইহা ডাকে দেওয়া হইবে না, ইহা সাহেবকে দেখানোই উচিত! পত্রখানি সে রাখিয়া দিল।—অন্যদিন রাত্রি ৯টায় সকলের ডিনার শেষ হইলে, কানাই ছুটি পায়। দশটা না বাজিলে ব্যানার্জ্জি সাহেব শয়ন করিতে যান না। সাহেবের প্রবাস যাত্রার জন্য কাপড় চোপড় গুছাইবার অছিলায় কানাই বাসায় গেল না।

রাত্রি ১০টা বাজিলে ব্যানার্জ্জি সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্য দিন কানাই তাহার তামাকু সাজিয়া পালঙ্কের পার্শ্বে রাখিয়া যায়, শয়নকালে ব্যানার্জ্জি সাহেব দেশলাই জ্বালিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া ল'ন। আজ নিজেই সে কলিকা ধরাইয়া আনিয়া, মনিবেব শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া বলিল,"হুজুর, আমার বেয়াদপি মাফ করবেন, এই চিঠি খানি পড়ে দেখুন।"—বলিয়া চিঠিখানি বিছানার উপর রাখিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যানার্জ্জি সাহেব খামের উপর কন্যার হাতের লেখায় সেই যুবকের নাম দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এই চিঠি কোথা পেলি তুই?"

কানাই বলিল,"মিস্ সাহেব এটা ডাকে লাগাবার জন্যে আমায় দিয়েছিলেন।"

ব্যানার্জ্জি পত্র উল্টাইয়া দেখিলেন উহা খোলা। পত্র পড়িতে পড়িতে ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পাঠশেষে চিঠি হাতে প্রায় দুই মিনিট কাল তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুই খুলেছিস বুঝি?"

"হুজুর! চিঠি পড়ে ভাবলাম, যাঁর নুন খাই, তাঁর কোনও অনিষ্ঠ জেনে শুনে হতে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য হবে না। তাই এই চিঠি ডাকে না লাগিয়ে হুজুরকে দেখাবার জন্যে রেখেছি।"

"তা বেশ করেছিস—এতে আমি তোর কাছে উপকৃত হলাম। না হয় খৃষ্টানই হয়েছি, বামুনের ছেলে হয়ে ধোপা জামাই প্রাণ থাকতে আমি করতে পারবো না। কিন্তু ভাল কথা, এ চিঠি তুই কাকে দিয়ে পড়িয়েছিস?"

"কাউকে দিয়ে পড়াইনি হুজুর। আমি নিজেই পড়েছি। শুধু এখানা নয়, দুজনের অনেক চিঠি আগে আমি পড়েছি। পালাবার পরামর্শ হচ্ছিল, তাও আমি জানতে পেরেছিলাম কিছু দিন আগে।"

"কিন্তু এ যে ইংরেজী চিঠি, তুই পড়লি কি করে?"

"আমি একটু একটু ইংরেজী জানি হুজুর। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি।"

"তুই ম্যাট্রিক পাস? তবে যে বলেছিলি, সামান্য বাঙ্গালা জানিস মাত্র।"

"গেল বছর পাশ করেছি। একটা কেরাণগিরি-টিরির চেষ্টাতেই আমি কলকাতায় আসি। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। শেষকালে ভাবলাম, দূর হোক, যে চাকরি পাই সেই চাকরিই করবো। হুজুরের বেয়ারার দরকার আছে শুনে, তাই হুজুরের

কাছে এসে চাকরি প্রার্থনা করেছিলাম। লেখাপড়া শিখে বেয়ারার কাজ করবো, তাই নিজেকে মূর্খ বলে পরিচয় দিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা, এখন তুই যা। তোকে বেয়ারার কাজ বেশী দিন আর করতে হবে না। ছুটীর পর অফিস-টফিস খুললে আমি তোর উপযুক্ত একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।"

কানাই সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব বলিলেন,"হ্যাঁ, শোন্। এ চিঠির বিষয় কোনও কথা কারু কাছে যেন প্রকাশ করিসনে, বুঝলি!"

"না হুজুর—কারুর কাছে প্রকাশ করবো না।"—বলিয়া পুনরায় সেলাম করিয়া কানাই প্রস্থান করিল।—ব্যানার্জ্জি সাহেব একাকী দেরাদুন যাইবেন ব্যবস্থা ছিল, কন্যা বীণাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। বীণা অনেক ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সে সব কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই।

দেরাদুন হইতে ফিরিয়া বীণাকে তিনি কলেজের বোর্ডিং-এ ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কানাইকে তিনি ত্রিশ টাকা বেতনের একটা কেরাণীগিরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে বীণার প্রণয়ী বিশ্বাসঘাতকতা করিল। টাকার লোভে সে অপর এক দেশীয় খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের কুৎসিত কন্যাকে বিবাহ করিল।—বীণা শুনিয়া প্রথমটা খুবই কাঁদাকাটা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে সে সামলাইয়া লইল। বৎসরখানেক পরে, ব্যানার্জ্জি সাহেব নির্বিঘ্নে নিজ মনোমত পাত্রে বীণাকে সম্প্রদান করিলেন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্ত্তিক ১৩৩৫)

ঘড়ি

ঘড়ি অর্থে ঘটিকা-যন্ত্র নহে। উহা একজন ষোড়শী পাহাড়িয়া সুন্দরীর নাম। বায়ু-পরিবর্ত্তন জন্য পাহাড়ে গিয়া সেই ঘড়িকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলাম, কেবল মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব, আগের কথা আগে বলাই ভাল।—ইদানীং কিছুদিন হইতে আমার স্বামীর শরীরটা তেমন ভাল যাইতেছিল না, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, হজমের গোলমাল, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না—এইরূপ নানানখানা, ঔষধপত্রও খান, কিন্তু ফল তেমন পাওয়া যায় না। বয়স হইয়াছে, (আমার হয় নাই, আমি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) তার উপর আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, (তিনি আলিপুরের ট্রেজরি হাকিম) সহ্য হইবে কেন? তাই তাহাকে বলিলাম, "তোমার ছুটি ত ঢের পাওনা রয়েছে, মাস-তিনেকের ছুটী নিয়ে দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে হাওয়া বদলাবে?"

তিনি বলিলেন, "ছুটী ত পাওনা আছে। কিন্তু ধর, দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে তিন মাস বাস করা, সে ত বিস্তর খরচ।"

আমি বলিলাম, 'টাকা আগে, না প্রাণটা আগে?" বহু তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে প্রাণীটাই আগে। এপ্রিল, মে ও জুন তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, এ-দিকে দার্জ্জিলিঙে তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিলেন, যেন মাসিক শ'খানেক টাকা ভাড়ায় একটি ভাল বাড়ী তিনি ঠিক করিয়া রাখেন।

সংসারে আমাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি ওঁর প্রথম পক্ষের, নাম সুধীরকৃষ্ণ, আমরা ডাকি সুধা বলিয়া। আমায় যখন উনি বিবাহ করিয়া আনিলেন, তখন সুধার বয়স নয় মাস মাত্র। আমিই সুধাকে মানুষ করিয়াছি। সুধা বড় হইয়া জানিয়াছে

বটে যে, আমার গর্ভে সে জন্মে নাই—কিন্তু তাহা মস্তিষ্কের ভিতর জানাইয়াছি মাত্র,—হৃদয়ের ভিতর সে জানে, যে আমি উহার জননী। সুধার বয়স একুশ বছর, সে বি-এ পড়িতেছে, আগামী বৎসর পাস দিবে। কন্যার নাম ইন্দিরা, কিন্তু আমরা ডাকি খুকি বলিয়া—যদিও সে নিতান্ত খুকী নহে, চৌদ্দ বৎসরের হইয়াছে, গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তাহার বিবাহ এখনও দিই নাই, মেয়ের ষোল বছর বয়স হওয়ার আগে বিবাহ দেওয়া উঁহার মত নয়।

ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু দার্জ্জিলিঙের বন্ধু চিঠি লিখিয়াছেন, দার্জ্জিলিঙে এবার অত্যন্ত ভীড়, একশো টাকার ভিতর ভাল বাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, কার্সিয়াঙে ঐ টাকায় ভাল ভাল বাড়ী পাওয়া যায়, যদি মত হয় ইত্যাদি। উনি বলিলেন, তবে চল, কার্সিয়াঙেই যাওয়া যাক্। সেইমত চিঠি লিখে দেওয়া হইল। কয়েক দিন পরে উত্তর আসিল—"আমি নিজে কার্সিয়াঙে গিয়া, সেন্ট মেরী পাহাড়ের গায়ে একখানি সুন্দর বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছি, তিন মাসে দুই শত পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হইবে। সেখানে আমার এক বন্ধু ডাক্তার গিরিজাবাবু আছেন, তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি, কোন্ তারিখে পৌঁছিবেন, তাঁহাকে আপনি পত্র লিখিবেন, তিনি আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন" ইত্যাদি।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজ বন্ধ হইতে তখনও তিন সপ্তাহ বিলম্ব আছে, খুকীর ছুটি হইতে বুঝি এক মাস। উনি বলিলেন, খুকির স্কুল কামাই হয় হউক, সুধার কলেজ কামাই করিয়া কাজ নেই, শেষে পার্সেন্টেজের গোলমাল হইতে পারে। সুধা তাহার এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত বন্দোবস্ত করিল, তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিন সপ্তাহ কলেজ করিবে—কলেজ বন্ধ হইলে আমাদের নিকট যাইবে। আমাদের এক বামুন ঠাকুর আছে, রামখেলাওন নামে এক ভৃত্য আছে এবং সতু বা সত্যবতী নামে এক ঝি আছে। আমাদের ক্ষুদ্র সংসার, বেশী চাকর বাকর লইয়া কি করিব, ইহাতেই আমাদের বেশ চলিয়া যায়। স্থির হইল, বামুন ঠাকুর ও রামখেলাওন আমাদের সঙ্গে যাইবে, ঝি তিন চারি বৎসর বাড়ী যায় নাই, অনেক দিন হইতে সে ছুটী ছুটী করিতেছিল, তাহাতে তিন মাসের ছুটী দেওয়া গেল।

ধার্য্য দিনে আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া দার্জ্জিলিঙ মেলে গিয়া উঠিলাম। পরদিন প্রাতে শিলিগুড়িতে নামিয়া ছোট রেলে চড়িয়া, পর্ব্বতগাত্রে রেল-লাইন পাতার বিষয়ে ইংরাজের অদ্ভুত কৌশল এবং মেঘের ও ঝরনার অপরূপ খেলা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। রেললাইন কখনও কার্ট রোডের উপর দিয়ে কখনও নীচে দিয়া, কখনও পাশে পাশে চলিয়াছে। বেলা দশটার সময় কার্সিয়াং স্টেশনে গিয়া নামিলাম।

ডাক্তারবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সহজেই খুঁজিয়া লইলেন। আমার স্বামীকে বলিলেন, "এ কি করেছেন আপনারা? রেলে কেন এলেন? আজকাল দার্জ্জিলিঙ কিম্বা কার্সিয়াং যাত্রী কি কেউ রেলে আসে? শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সিতে আসে। রেলের চেয়ে তাতে ভাড়াও কম পড়ে, আর দেড় ঘন্টা দুঘন্টা আগে পৌছান যায়।"

স্বামী বলিলেন, "তা ত আমি জানতাম না। আমি সটান কার্সিয়াঙেরই টিকিট কিনেছিলাম"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "চলুন এখন, বাড়ীতে আপনার সবই ঠিকঠাক ক'রে রেখেছি—মায় চাল-ডাল, তরী-তরকারী, ঘি, মশলা, কাঠ-কয়লা পর্য্যন্ত। একটা নানীও ঠিক ক'রে রেখেছি।"

স্বামী বলিলেন, "নানী কি?"—ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এখানে ঝিকে নানী বলে। আপনি শুধু একজন বামুন আর একজন চাকর নিয়ে আসবেন লিখেছিলেন, তাই ঘর সাফ করে, বাসন-টাসন মাজার জন্যে একটা নানী ঠিক ক'রে রেখেছি।"

কেটা-কেটির (পাহাড়িয়া কুলী-কুলিনীর) স্কন্ধে জিনিষপত্র চাপাইয়া, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে

আমরা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে উঠিলাম। বাড়ীটির নাম "বেলভিউ কটেজ"—চারিদিকে হাতার মধ্যে অজস্র ডালিয়া, গোলাপ, ফরগেট-মি-নট ও নাম-না জানা অনান্য কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

ডাক্তারবাবু সব দেখাইয়া শুনাইয়া বলিয়া কহিয়া দিয়া নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২ ॥

নানীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—এ কি ঝি না মেমসাহেব? তার ছিটে ঘাগরার কি বাহার! মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত ঝোলানো ফুলকাটা ওড়নার কি বাহার। পায়ে জুতা মোজা—তবে লেডী জুতা নয়, পুরুষ-মানুষের জুতা। খট্-মট্ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর বেড়ায়, বাসন মাজিয়া শেষে তাহা সাবান দিয়া ধুইয়া ঘরে তোলে, আমাদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে, সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া চুল আঁচড়ায়, তার সাজগোজের কি ঘটা। সদাই গুন-গুন করিয়া গান গাহে, কর্ম্মের অবসরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া নির্ভীকভাবে "কাটোয়া" পান করে—মনিব বলিয়া গ্রাহ্য নাই। (কাটোয়া হাতে গড়া স্বদেশী সিগারেট বিশেষ। বাজারে এক প্রকার কুচোনো তামাক পাতা বিক্রয় হয়, সেই তামাক কাগজে পাকাইয়া সুবৃহৎ সিগারেটের আকার ধারণ করিলে "কাটোয়া" হয়) নানীর কার্য্য বাসন মাজা, ঘর ঝাঁড় দেওয়া ও বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের ছাতা প্রভৃতি বহন করিয়া পথপ্রদর্শন করা। এ দেশে এ সময় কখন বৃষ্টি আসে, কিছুই ঠিক নাই। হয় ত, যখন বাহির হইলাম, তখন রৌদ্র চন্-চন্ করিতেছে, পনের মিনিট পরেই দেখি, ও-মা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন) ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। তাই সঙ্গে ছাতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমন লোক নাই, এমন স্থান নাই—যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নানী বলিতে পারে না, এমন বিষয় নাই—যাহা তাহার অজ্ঞাত। এমন কি, সাহেব লোক মরিলে তাহার কবর খুঁড়িতে নয় ফিট গর্ত্ত করা নিয়ম, তাহাও সে অবগত আছে। সে জাতিতে পাহাড়ীয়া (নেপালী) হইলেও হিন্দী বেশ বলিতে পারে, সুতরাং তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমাদের কোনও অসুবিধা নাই। নানী ডোমারাম বস্তিতে মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় এক ঘর লইয়া বাস করে। প্রাতে আসিয়া, এবং রাতে বিদায়কালে নিত্য বলে, বাবু সেলাম, মাইজী সেলাম, খুকী সেলাম, ঠাকুর সেলাম।—যদিও তাহা শুখা মাহিনা, তথাপি ঠাকুর রোজ তাহাকে একথালা ভাত দেয়—তাই ঠাকুরও সেলাম—ঠাকুরের এই খাতির।

আমরা পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে খুকী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "মা, শুনেছ, নানীর এক মেয়ে আছে, তার নাম কি জান?"—বলিলাম, "না, কি নাম?"

"তার নাম—ঘড়ি।"—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল, "আচ্ছা মা, সে মেয়েকে যদি আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করতে হয়, তবে রেজিস্টারিতে তার কি নাম লেখানো হবে? শ্রীমতী ঘড়িসুন্দরী দেবী?"—বলিয়া পুনশ্চ সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।—আমি বলিলাম, "যেমন অদ্ভুত দেশ, নামগুলোও কি তেমনি অদ্ভুত! কত বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিস?"

"হ্যাঁ, আমার চেয়ে বড়। নানী বললে, তার বয়স সতেরো। কোন্ এক সাহেবের কুঠিতে সে আয়াগিরি করে, মেমসাহেবের লেড়কা খেলায়, মা, তাকে একদিন নিয়ে আসতে বল না নানীকে, আমি ঘড়ি দেখবো।"—বলিলাম, "আচ্ছা, বলবো।"

দু এক দিন পরে নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নানী, তোর খসম আছে ত?"

নানী বলিল, "উ তো বহুৎদিন ভাগ্ গিয়া।"

বলিলাম, "ভাগ্ গিয়া কি রে? কোথা ভাগ্ গিয়া?"

নানী তখন তার জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিল, বলিল, তাহার কন্যা যখন মাত্র

দুই বৎসরের, তখনই তার স্বামী পলাইয়া এক সাহেবের সহিত কলিকাতায় চলিয়া যায়। না লেখে চিঠি পত্র, না পাঠায় টাকা-কড়ি। কিছুদিন তার জন্য অপেক্ষা করিয়া নানী উদরান্নের জন্য, ডাউহিল স্কুলে আয়াগিরি চাকুরি গ্রহণ করে। সে স্কুলে খালি সাহেবদের মেয়ে পড়ে। অনেক মেয়ে সেই স্কুলে বাসও করে, বোর্ডিং হাউসও আছে, আবার অনেক মেয়ে বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়াও যায়। চারি পাঁচ বৎসর পরে, কলিকাতা হইতে আগত এক সাহেবের খানসামার মুখে সে তার স্বামীর সংবাদ পায়। সে নাকি এক বড়া সাহেবের বাবুর্চিগিরি করিতেছে, এবং সেখানেই এক স্বজাতীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া, নূতন সংসার পাতিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। সেই সাহেবের ঠিকানায় স্বামীকে সে এক পত্রও লেখাইয়াছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। তারপর হইতে কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীর সংবাদ বলিতে পারে নাই। দুই বৎসর হইল , স্কুলের সে চাকরী তাহার গিয়াছে। তাহার জিম্মা হইতে এক দুষ্ট "বাবা" (মেয়ে) পলাইয়া যায়। তাই সাহেবরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তারপর হইতে সে কখনও সাহেবের বাড়ীতে আয়াগিরি, কখনও বাঙ্গালীর বাড়িতে নানীগিরি করিয়া জীবনযাপন করিতেছে।

বলিলাম,"তবে এদিকে দশ বারো বছর তোর স্বামীর আর কোনও খবর পাসনি?"

"না মাইজি।"

"খোঁজ নে না। যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে ত তুই আবার সাদি করতে পারিস। তোদের দেশে ত বিধবা-বিবাহ হয়।"

নানী বললে, "না মাইজী, সাদি আর আমি করতে চাইনে। পাহাড়ী লোক বড় মদ খায়, খেয়ে জরুকে মারে। এ আমি বেশ আছি।"

"এখানে তোর মেয়ে ছাড়া আর কেউ আছে?"

"আছে মাইজী। আমার এক ভাই আছে, সে ক্লারেন্ডনে চাকরি করে।"

"তার নাম কি?"

"আঠ নম্বর।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আঠ নম্বর কি রে? মানুষের নাম কি ও রকম হয়?"—নানী বলিল, পূর্ব্বে তার অন্য নাম ছিল বটে, কিন্তু ক্লারেন্ডনে ঢুকিয়া অবধি তাহার নাম হইয়া গিয়াছে আঠ নম্বর। ঐ নামেই সকলে তাকে ডাকে।

কর্ত্তার কাছে আমি এই গল্প করিলে তিনি বলিলেন, নানীর ভাই বোধ হয়, ক্লারেন্ডন হোটেলে ৮নং খিদমৎগার। মন্টিকৃষ্টো গল্পের নায়ক এডমন্ড ড্যান্টেসের সুদীর্ঘ কারাবাসকালে তাহার নাম লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যেমন একটা নম্বরে পরিণত হইয়াছিল, ইহাও বোধ হয় তাই।

আমার অনুরোধে নানী তাহার মেয়েকে একদিন লইয়া আসিল। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ সুশ্রী, নূতন যৌবন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢল্ ঢল্ করিতেছে, বেশ সভ্য-ভব্য, ফিট্-ফাট্। পাহাড়িয়া মেয়েদের বস্ত্রেই তাহার অঙ্গ আবৃত, তথাপি উহা তার মাতার অপেক্ষা দামী ও সুদৃশ্য। মা মাথায় দেয় সূতি ওড়না, মেয়ের মাথায় সিল্কের ওড়না। মা'র মত সে মামুলি জুতা-মোজা পরে না—সিল্কের ফ্লেশ-কলার মোজার উপর রীতিমত লেডি জুতা। মা'র মত সে 'কাটোয়া' পান করে না, কাঁচি সিগারেট খায়। কর্ত্তার সাক্ষাতেও সে সিগারেট ধরাইল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। নানী বলিল, যে সাহেববাড়ীতে সে চাকরি করে, সেখানে মাসে পঁচিশ টাকা বেতন পায়—সব টাকাই নিজ বিলাসিতায় ব্যয় করে। খুকী ত ঘড়ি দেখিয়া মহা খুসী।

কয়েক দিন পরে শুনিলাম, ঘড়ির সে চাকরি গিয়াছে, তাহার মনিব সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন, ঘড়ি অন্য চাকরির চেষ্টায় আছে। এখন সে প্রতিদিন তার মা'র সহিত আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিল। খুকীর সহিত তার খুব ভাব হইয়া গেল। এখন

সে প্রতিদিন ঘড়ি দেখিতেছে। তার সঙ্গে খুকী লুডো খেলে, তাস খেলে, ঘুঁটি খেলে—এই শেষের খেলাটি খুকিই তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছে।

।। তিন ।।

আমরা এক মাস কার্সিয়াঙে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে কর্ত্তার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে। জ্বর আর হয় নাই, হজমের গোলমালও নাই, রাত্রিতে বেশ নিদ্রাও হইতেছে। আরও উন্নতি হইত, যদি তিনি আরও বেশী করিয়া বেড়াইতেন। সকালের দিকে তিনি মোটেই বাহির হইতে চান না—আমি খুকিকে লইয়া বাহির হই। সঙ্গে অবশ্য নানী যায়,-—আমাদের ছাতা, ওভার-কোট প্রভৃতি বহন করিয়া। বেড়াইতে যাইতে নানীর মহা উৎসাহ। বিকালে চা-পানের পর কর্ত্তাকে লইয়া বাহির হই। বেশী হাঁটিতে তিনি পারেন না, বুড়া মানুষ ত! অথচ—বুড়া বলিবার যো নাই, বলিলে রাগ করেন। তিনি যখন আমায় বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ষোল, তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র—পূর্ণ যুবাকাল। তখন তিনি আমায় চিঠি লিখিয়া নীচে সহি করিতেন—'ইতি তোমার বুড়ো।"—এখন, বিশ বৎসর পরে, আর তিনি নিজেকে বুড়া বলিয়া স্বীকার করিতে চান না।

এক সপ্তাহ হইল, সুধার কলেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে আসে নাই। সে জন্য আমরা মহা ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছি। আমরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও মহাত্মা গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার কথা এখানে আসিয়া খবরের কাগজে পড়িয়াছি। মহিষবাথানে গোলমালের কথা, যতীন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের কথা প্রভৃতিও পড়িয়াছি। প্রত্যহই সংবাদপত্রে দেখি, গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে, থামিবার কোন লক্ষণ নাই। সুধা যদিও সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করে নাই, তথাপি আমরা জানি, তাহার ষোল আনা ঝোঁক সেই দিকেই। কলেজ বন্ধ হইল, ছেলে কলিকাতায় কি করিতেছে? এমন সময় কর্ত্তার নামে সুধার এক পত্র আসিল, সে পত্র পড়িয়া আমাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহার পিতাকে লিখিয়াছে—

"আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ফল কি হইল? যে ফল দশ বৎসর পরে প্রকট হইবে, সে ফলের কথা না ধরিলেও আমরা যে আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আপনি লাঠি লইয়া মারিতে আসিলে আমিও লাঠি লইয়া মারিতে যাই, এটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু আপনি তোপ-বন্দুক লইয়া গুলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, আর আমি বুক ফুলাইয়া 'মারো' বলিয়া দাঁড়াই, এটা বাঙ্গালীর পক্ষে ত বটেই, সকল জাতির পক্ষেই অসাধারণ ব্যাপার। আর যেখানে এরূপ ব্যাপার একটি দুটি নহে, সহস্রাধিক হইয়া গিয়াছে, সেটাকে আশাপ্রদ চিহ্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে।"

কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছে—

"সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য বিষয়, বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রোপাগাণ্ডায় একদিনে বাঙ্গালি সিগারেট ছাড়িয়া দিয়াছে। কোনও পানওয়ালার নিকট সিগারেট পাইবেন না। একজন নির্লজ্জ বাঙ্গালী এক খোট্টা পানওয়ালার কাছে কাঁচি-মার্কা সিগারেট চাহিয়াছিল, সে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—'বাবু, কাঁচি-মার্কা নেহি হ্যায়, জুতি-মার্কা হ্যায় খাওগে?"

ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পত্রে সে তার পিতাকে কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিয়া লিখিয়াছে।—পত্র পড়িয়া উনি ত তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, "দেখেছ ছেলে বেটার কাণ্ড! আমি জয় মহাত্মা গান্ধী ব'লে চাকরিটি ছেড়ে দিই, তারপর খাই কি? নুন? নুন খেয়ে ক'দিন বাঁচবো?"

ছেলেটা পাছে সত্যাগ্রহীর দলে ভিড়িয়া যায়, এই ভাবনায় আমরা স্বামী-স্ত্রী অস্থির হইয়া উঠিলাম। বুদ্ধি খাটাইয়া ছেলেকে পত্র লিখিলাম—

"বাবা সুধা, উনি তোমার পত্র পাইয়াছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজে উত্তর লিখিতে পারিলেন না। শরীরের উন্নতির জন্য পাহাড়ে আনিলাম, কিন্তু উন্নতি তেমন ত দেখিতে পাইতেছি না। বিদেশ-বিভুঁই, যদি অসুখ বাড়ে, তবে আমি একা স্ত্রীলোক তাঁহাকে লইয়া আতান্তরে পড়িয়া যাইব। এক সপ্তাহ হইল, তোমার কলেজ বন্ধ হইয়াছে, তুমি সেখানে কেন দেরী করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। পত্রপাঠমাত্র তুমি চলিয়া আসিবে, একটি দিনও বিলম্ব কবিও না।"

এ চিঠির ফল ফলিল, সুধা চলিয়া আসিল। পোষাক তাহার আগাগোড়া খদ্দবে নির্ম্মিত। খুকীর ও আমার জন্য এক বোঝা খদ্দরের শাড়ী, শেমিজ প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে। বলিল, "মা, তোমাদের খদ্দর ছাড়া অন্য কিছুই পরা চলবে না।" আমি বলিলাম, "খদ্দব ত পরবোই বাবা! কিন্তু যা আছে, সে কাপড়-চোপড়গুলো ছিঁড়ুক আগে।" প্রথমে সে বলিল, ও-সব পোড়াইয়া ফেলাই উচিত। অনেক টাকাব জিনিষ, সব পোড়াইয়া লোকসান কবিবার মত অবস্থা আমাদের নয়, এই সব অজুহাতে শেষে রফা হইল, বাড়ীতে সেগুলো পবা চলুক, কিন্তু বেড়াইতে বাহির হইবার সময় খদ্দরই পরিতে হইবে। তথাস্তু।

সুধা আসিয়া চা খাইল না, বলিল, উহাতে বিলাতী চিনি আছে, তা ছাড়া ওটা একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা। উনি এখানে আসা অবধি স্টেট্স্ম্যান কিনিতেন—সুধা আসিযা তাঁহার স্টেট্স্ম্যান কেনা বন্ধ করিষা দিল। দেশী খবরেব কাগজ পূর্ব্বাবধিই বন্ধ হইযা গিযাছিল। সুতরাং কলিকাতার, তথা সারা দেশেব আর কোনও সংবাদ পাই না। একদিন লোকমুখে শুনিলাম, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সেদিন সুধা উপবাস করিবে বলিযা বাহানা ধরিল। অনেক কষ্টে তাহাকে কিছু দুধ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইলাম, আমিও তাহাই খাইয়া রহিলাম। ছেলে উপবাসী—মা খায় কোন্ লজ্জায়?

॥ ৪ ॥

তিন-চারি দিন পরে খুকি আসিয়া বলিল, "মা, ঘড়ি বেশ ইংবেজী কথা কইতে পাবে। দাদার সঙ্গে ফর্-ফর্ ক'বে ও ইংরেজি বলছিল, আমি ত বুঝতেই পারলাম না?"

নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ নানী, তোর মেয়ে ইংরেজী কথা কইতে জানে?"

সে বলিল, "হ্যাঁ মাইজী, জানে বইকি। আমি যখন ডাউহিল স্কুলে চাকরি কবতাম, ও তখন ইংরেজী বাবাদের সঙ্গেই খেলা করত কিনা। সেখানকাব বড় সাহেব যিনি ছিলেন, তিনি পাদরী। তিনি দয়া ক'রে ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসে ব'সে ওকে পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন,—যদিও কোনও কালা আদমির মেয়েকে সেখানে ভর্ত্তি করা হয় না।"

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ সুধা, ঘড়ি নাকি ইংরেজী বলতে পারে?"

সুধা বলিল, "হ্যাঁ মা, ও বেশ ইংরেজী বলে। কিন্তু কথা যেমন বলতে পারে, বই তেমন পড়তে পারে না। আর, বানান সব অশুদ্ধ। কাণে শুনে শেখা কিনা। আমি ওকে বই পড়তে শেখাব মনে করেছি। খুকীও সেই সঙ্গে পড়বে।"

দুই একদিন পরে দেখিলাম, খুকী ও ঘড়িকে লইয়া সুধা রীতিমত স্কুল খুলিয়া বসিয়াছে। দুবেলায় তিন চারি ঘন্টা উহাদের পড়ায়।

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "ও পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে সুধাকে মিশতে বারণ ক'রে দিও।"

আমি বলিলাম, "কেন, তাতে আর দোষ কি?"

তিনি বলিলেন, "তোমার সোমত্ত ছেলে, ঐ সুন্দরী সোমত্ত মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেশা কি ভাল? শেষে কি থেকে কি হবে বলা যায় কি? জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন একসঙ্গে স্থাপন করবে না।"—আমি বলিলাম, "না, না, ছেলে আমার সে চরিত্রের নয়। কোনও ভয় নেই। ঐ একটা নেশা নিয়ে মেতে আছে, থাকুক না। নয় ত শেষে কোন্ দিন ব'লে বসবে, চললাম আমি নুন তৈরি করতে।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

দিন পনেরো পরে একদিন খুকি আসিয়া চুপি চুপি আমায় বলিল, "মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"—তার চক্ষু দুটি ছল্‌ছল্। ---ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"কি হয়েছে রে?"

"ঘড়িকে দাদা ভালবাসে। ওকে বিয়ে করবে।"

বলিলাম," দূর পাগলী! ঘড়ি হল পাহাড়ি মেয়ে, ওকে তোর দাদা বিয়ে করতে যাবে কেন?"--খুকী বলিল, "হ্যাঁ মা, দাদা ওকে ভালবেসেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঘড়ির বই-খাতার মধ্যে একখানা কাগজ রয়েছে, তাতে লেখা আছে, *I love you*—তার মানে, আমি তোমায় ভালবাসি। দাদার নিজের হাতের লেখা---আমি দাদার হাতের লেখা চিনি ত!"—বলিতে বলিতে মেয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঁদিবার তাহার কারণ ছিল। উহাদের ক্লাসেই একটি মেয়ে পড়ে, উহার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়, তার নাম লীলাবতী ব্যানার্জ্জী। আমার স্বামী মুখার্জ্জী। খুকী তাহাদের বাড়ী যায়, লীলাও আমাদের বাড়ী আসে। দুইজনে অত্যন্ত ভাব। খুকীর একান্ত ইচ্ছা, সেই লীলার সঙ্গেই তার দাদার বিবাহ হয়। বালিকাদের এই মতলব শুনিয়া, লীলার মাও নিজে আমার কাছে এই প্রস্তাব করিয়াছেন,---তবে আমি এখনও স্পষ্টাক্ষরে আমাদের সম্মতি জানাই নাই। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে ভাল, তাহার পিতাও সম্পন্ন লোক, সুতরাং প্রাপ্তিযোগও ভাল আছে, হইলে মন্দ হয় না। উঁহার ইচ্ছা, ছেলে বি-এ পাস করিয়া ডেপুটি হইলে তবে তাহাব বিবাহ দিবেন, সেই জন্যই লীলার মাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলি নাই। খুকী আমার মন ভিজাইবার জন্য সময়ে অসময়ে লীলার নানা সদ্‌গুণের কথা আমায় বলিয়া থাকে। তাই এ ব্যাপারে খুকীর এত দুঃখ।

কথাটা শুনিয়া আমার মাথায় ত বজ্রাঘাত হইল। লীলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিই আর না দিই, একটা পাহাড়িয়া মেয়ের সঙ্গে দিব কেন? কর্ত্তাকে গিয়া জানাইলাম। শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "সেই কালেই আমি তোমাকে সাবধান করে দিইনি?"---খুব খানিকটা বকিলেন। তা বকুন, বকুনি আমার পাওনা হইয়াছে বইকি। আমি চুপ-চাপ বসিয়া বকুনি হজম করিয়া, শেষে বলিলাম, "সে ত যা হবার তাই হয়ে গেছে, এখন উপায় কি বল?"

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিবার পর তিনি বলিলেন, "সুধা যে ওকে বিয়ে করতে চায়, সে কথা তোমায় কে বললে? সুধা বললে?"---উত্তর করিলাম, "না, সুধা বলেনি, খুকি বললে, ঐ যে ইংরেজীতে ওকে লিখেছে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুকি এখন নভেল পড়তে শিখেছে কিনা, ও মনে করে, ভালবাসলেই বুঝি বিয়ে করতে হয়। আমার ত মনে হয়, বিয়ে করবার কল্পনা সুধা করেনি, এত নির্ব্বোধ সে নয়। তুমি পাহাড়ী মেয়েদের চরিত্র জান না, ওদের এ বিষয় নীতিজ্ঞান খুব শিথিল, কিন্তু আমি যা আশঙ্কা করেছি, তাই যদি হয়ে থাকে বা হবার উপক্রম হয়ে থাকে, সেও ত ঠিক নয়। অত্যন্ত অন্যায়। তুমি এক কাজ কর। মেয়েটাকে ত বিদায় করই, নানীকেও বিদায় কর। এ বিষয়ের জড় মেরে দাও।"

কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। নানীকে তাহার বেতন চুকাইয়া দিয়া বলিলাম, "তুমি আর কাল থেকে এস না, আমি অন্য নানী ঠিক করবো!"

নানী "কাহে মাইজী, কেয়া কসুর হুয়া?" ইত্যাদি কত কথা বলিল, আমি গম্ভীর হইয়া রহিলাম, কোনও উত্তর দিলাম না।---ঘন্টাখানেক পরে সুধা আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, নানীকে তুমি জবাব দিয়েছ? কি দোষ হয়েছে ওর?"

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ওর কোনও দোষ হয়নি। দোষ হয়েছে তোমার।"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার? কি দোষ করেছি আমি?"

আমি কঠোরভাবে বলিলাম, "দোষ করনি তুমি? ঘড়ি একটা যুবতী মেয়ে, ওর সঙ্গে

কি ব্যবহার করেছ তুমি? আমাদের এতদিন ধারণা ছিল, তুমি অতি সৎ ছেলে। তুমি যে এমন ইতর হতে পার, তা ত আমরা জানতাম না। তোমার এই ইতর ব্যবহারে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, উনি ত রেগে কাঁই হয়েছেন।"

সুধা পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে বলিল, "কেন, কি ইতর ব্যবহার করেছি আমি?"

"তুমি ওকে ইংরাজিতে লেখনি— 'আমি তোমায় ভালবাসি?' খুকি ওর খাতা-পত্রের মধ্যে সেই কাগজ দেখেছে, খুকি তোমার হাতের লেখা চেনে।"—সুধা বলিল, "ওঃ, এই কথা? তবু ভাল। হ্যাঁ মা,আমি ও কথা তাকে লিখেছি বটে, কিন্তু আমি ত কোনও, কি বলে গিয়ে Dishonourable—অর্থাৎ অসাধুভাবে ও-কথা তাকে লিখিনি। আমি তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছি এবং সেও আমায় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।"

বলিলাম, "সে কি রে? বামুনের ছেলে হযে তুই একটা অজাতের মেয়েকে বিয়ে করবি?"

সুধা বলিল, "কেন মা, তাতে দোষ কি? সেও ভারতবর্ষে জন্মেছে—নেপাল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত, আমিও ভারতবর্ষের সন্তান। মহাত্মা বলেছেন, জাতিভেদ-প্রথা এ দেশ থেকে যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই মঙ্গল।"

বলিলাম, "জাতিভেদ তুই না মানিস, আমরা ত মানি। কেন, বাঙ্গালাদেশে স্বজাতির ঘরে ইংরেজী কইতে পারে, এমন মেয়ে কি নেই? ঘড়িকে বিয়ে করবার মতলব তোর কেন হল? এতদিন যে তোকে খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম, তার কি এই প্রতিফল তুই দিচ্ছিস আমাদের? যে আমার বাসন-মাজা ঝি, তাকে আমায় বলতে হবে বেয়ান? আর ঘড়ির বাপ কোন সাহেবের বাবুর্চ্চি, উনি তাকে বেয়াই ব'লে অভ্যর্থনা করবেন?"

সুধা বলিল, "মানুষ যে, সে মানুষ,—সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান,—জন্মগত বা কর্ম্মগত হীনতার জন্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ করা ত উচিত নয় মা"—বলিয়া মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে সে মস্ত এক লেক্‌চাব ঝাড়িল। সব কথা আমি বুঝিতে পাবিলাম না। অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুধাও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "শোন মা, আমার জীবনেব প্রোগ্রাম তোমায বলি। তোমরা যে মনে কবেছ, আমি বি-এটা পাস করলেই লাটসাহেবকে ধবে বাবা আমাকে একটি ডেপুটি বানিয়ে দেবেন, সেটি হচ্চে না। আমি চিরজীবন দারিদ্র ববণ কবে নিয়ে দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করতে চাই। সে কাজে একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী আমার আবশ্যক। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি, ঘড়িই আমাব জীবনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত। প্রথমতঃ সে চিরস্বাধীন নেপাল দেশের মেয়ে, চির-পরাধীন বাঙ্গালীর মেয়ে নয়। জীবনের কর্ম্মে যখন আমার অবসাদ আসবে, নৈরাশ আসবে, ক্লৈব্য আসবে, সে তখন তার নৈতিক বল দিয়ে আমাকে আবার সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার জীবনের কর্ম্মে ও তোমার সহায় হবে কি বিঘ্ন হবে, এখন থেকে তা তুমি কি ক'বে বুঝলে বাপু?"

সুধা সোৎসাহে বলিল, "তা আমি না বুঝেই কি এ কাজে প্রবৃত্ত হচ্চি মা? আমার সঙ্গে দারিদ্রের কঠোর জীবনযাপন করতে ও হাসিমুখে প্রস্তুত। ও বলেছে, এক মুঠো ভুট্টা-ভাজা খেয়ে ও দিন কাটিয়ে দিতে পারে। ওর কাপড়-চোপড় যা আছে সেগুলো ছিঁড়ে গেলে খদ্দর ভিন্ন আর কিছু ও পরবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। দিনে ও এক প্যাকেট ক'রে কাঁচি সিগারেট খেত, প্রকাশ্যভাবেই খেত—এ দিকে তিন চারিদিন আর ওকে সিগারেট খেতে দেখেছ? তুমি বোধ হয় অত লক্ষ্য করনি—সিগারেট ও একদম ছেড়ে দিয়েছে। পাহাড়ীরা চা না খেলে বাঁচে না, সে চা-ও ও ছেড়ে দিয়েছে। আমি মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি দিয়েছি, সেখানি ও বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাথার শিয়রে রেখেছে, সকালে

উঠে ভক্তিভরে সেই ছবিকে ও প্রণাম করে। ওকে আমার চাই মা—ওকে না পেলে জীবনের ব্রত একা উদ্‌যাপন করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হবে।"

"কিন্তু বাবা, কর্ত্তার হুকুমে আমি কাল থেকে নানীকে জবাব দিয়েছি।"—ছেলের ভাবভঙ্গি দেখিয়া, উপস্থিত ইহার বেশী আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

সুধা বলিল, "এ বাড়ী ছাড়াও ভগবানের পৃথিবীতে যথেষ্ট স্থান আছে মা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কর্ত্তাকে গিয়া সকল কথা জানাইলাম। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ছেলের অদৃষ্টে যদি এতদূর অধোগতিই লেখা থাকে, তবে তাই হবে।"

তাই হবে কি? আমার ছেলে বিবাহ করিবে ঐ ঝিয়ের মেয়েকে? কখনই তা হইতে দিব না। হিন্দুধর্ম্ম কি মিথ্যা? দেব-দেবীরা কি নিদ্রিত? আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর শরণ লইব, দেখি, তিনি আমার মঙ্গলবিধান করেন কি না, এ বিপদ হইতে আমায় উদ্ধার করেন কি না—আমার ছেলের মতিগতি ফিরাইয়া দেন কি না। আমি মনে মনে বারংবার প্রণাম করিয়া একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে মা মঙ্গলচন্ডী, আমার ছেলেকে সুমতি দাও, আমি তোমায় ষোল আনার পূজা দিব।"

ঘড়িকে ত বিদায় করিলাম। কিন্তু সংবাদ পাইলাম, প্রতিদিন বিকালে সুধা বেড়াইতে বাহির হইয়া ঘড়ির সঙ্গে মিলিত হয়, তাহাকে লইয়া দুই তিন ঘন্টা বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে।

একদিন খুকী সুধাকে বলিল, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাও না, একলা যাও কেন?"

"তোদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় কই?"

"কার সঙ্গে বেড়াও, ঘড়ির সঙ্গে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুধা রাগে কট্‌মট্ করিয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "আমার যা খুসী তাই করি, তোদের কি?"

খুকী বলিয়াছিল, "না তাই জিজ্ঞাসা করছি। ঘড়িকে নিয়েই বেড়াও ত?"

সুধা বলিয়াছিল, "হ্যাঁ, বেড়াইয়া আমি তাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেছি।"

॥ ৫ ॥

আট দিন কি দশ দিন পরে, একদিন বেলা দশটার সময় গোইথাল হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছি, বাড়ীর কাছে পৌছিয়া মনে হইল, তরকারীপাতি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, একবার বাজার দেখিয়া যাই। সুতরাং রামখেলাওনকে বিদায় দিয়া খুকীকে লইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মইলির দোকানে ঢুকিয়া তরকারীপাতি দর করিতেছি, এমন সময় খুকী আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "মা, দেখ, ঐ ঘড়ি না?"

রাস্তার অপর দিকে একটা দোকানের সামনে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া যেন ঘড়ির মতই একটা মেয়ে দাঁড়াইয়া কি কিনিতেছে। জিনিষ লইয়া সে রাস্তায় উঠিবামাত্র দেখিলাম,ঘড়িই বটে, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট। একটা সিগারেট বাহির করিয়া, ধরাইয়া সে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল—আমরা মইলির দোকানের ভিতর ছিলাম, আমাদের অবশ্য সে দেখিতে পাইল না।

খুকী বলিল, "তবে যে মা, দাদা বলে, ঘড়ি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে!"

বলিলাম, "নিজের চোখেই ত দেখলি। দাদাকে তোর বলিস গিয়ে।"

খুকী বলিল, "হুঁ—দাদা আমার কথা বিশ্বাস করবে কিনা! মনে করবে, তার মন ভাঙ্গাবার জন্য আমি মিছে কথা বলছি।"

মনে বড় ধিক্কার হইল। বাঃ, আমার বউমা, প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দিয়া, সিগারেট ফুঁক্তিে ফুঁকিতে চলিয়াছেন! কি ভাগ্যবতী শাশুড়ী আমি!

তরকারী কিনিয়া একটা কেটি (মুনিয়ানী বালিকা) লইয়া খুকীর সহিত আমি সেই দোকানটায় গেলাম। দেখিলাম, দোকানদার খোট্টা নয়—একজন পাহাড়িয়া। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু আগে একজন পাহাড়িয়া মেয়ে তোমার দোকান হইতে এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়া লইয়া গেল, ও কে বলিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "ওর নাম ঘড়ি। কেন মাইজী, উহাকে আপনার কোন দরকার আছে কি?"

আমি বলিলাম, "না, উহার মা আগে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত, উহাকে দেখিয়াছিলাম, চেনা-চেনা মনে হইতেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

দোকানদার বলিল, "ও রোজ এই সময় আসিয়া এক প্যাকেট করিয়া কাঁচি সিগারেট কিনিয়া লইয়া, আপনার কাজে যায়।"

"কি কাজ করে ও?"

"কাছারীর রাস্তায় পাহাড়িয়া মেয়েদের জন্য যে ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছে, সেই স্কুলে ও পড়ায়। সাড়ে দশটায় স্কুল বসে।"

"ওঃ"—বলিয়া কিঞ্চিৎ সওদা তাহার দোকান হইতে কিনিয়া আমি গৃহে ফিরিলাম।

খুকীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিলাম বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সুধাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে এবং বেলা দশটার সময় বাজারের মধ্যে ঘুড়িয়া বেড়াইতে হইবে, যাহাতে ঘড়ির কীর্ত্তি সে দেখিতে পায়।

পরদিন চা-পানের পরে খুকী সুধার ঘরে গিয়া বলিল, "দাদা, বিকেলে ত তুমি আমাদের একদিনও বেড়াতে নিয়ে যাবে না, তোমার ঘড়িকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করবাব সেই সময়। যা হোক, বাবা বিকেলে বেরোন, তোমার জন্যে কিছু আটকায় না। এ বেলা ত বাবা বেরোন না, এ বেলা কেন তুমি আমাদের সঙ্গে চল না।"

সুধা বলিল, "কেন, রামখেলাওনকে সঙ্গে নিয়ে যা না।"

খুকী বলিল, "রামখেলাওন ত যাবেই, নইলে ছাতা-টাতাগুলো বইবে কে? তুমি আমাদের সঙ্গে একদিনও বেরোও না বলে মা কত দুঃখ করেন।"

সুধা বলিল, "করেন নাকি? আচ্ছা, তবে চল্, আমিও যাচ্ছি।"

যে মতলব করিয়া সুধাকে বেড়াইতে লইয়া গেলাম, তাহা সিদ্ধ হইল না। দশটার পূর্ব্বে বাজারের ভিতর ঢুকিয়া তরকারী কিনিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এবং মাঝে মাঝে সেই দোকানটার দিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু ঘড়িকে দেখিতে পাইলাম না। দশটা বাজিল, সওয়া দশটা হইল, সাড়ে দশটা হইয়া গেল, তথাপি ঘড়ির দর্শন নাই। অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সে রাত্রিতে একমনে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিতে লাগিলাম। কেন মা, আমার প্রতি এমন নির্দ্দয়া হইলে তুমি? তোমার চরণে আমি অপরাধ করিয়াছি মা, যে জন্য আমার মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করিতেছ না?

পরদিন প্রাতে আবার সুধাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিবার পথে দশটার পূর্ব্বে বাজারেও প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না।

সে দিন বিকালে সুধা যেমন বেড়াইতে বাহির হয়, সেইরূপই হইল। অন্য দিন কর্ত্তার সঙ্গে আমরা বেড়াইয়া ফিরিবার অল্পক্ষণ মধ্যে সেও ফিরে। কিন্তু আজ তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল।

যত রাত্রি হইতে লাগিল, ভাবনাও তত বাড়িতে লাগিল। এত দেরী কেন? ছেলের কোন বিপদ-আপদ ঘটিল না ত? উঁহাকে বলিলাম, উনি তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "কচি

খোকাটি ত নয়, ভাবনা কিসের? যখন হয় আসবে। রাত হল, আমাদের খাবার দিতে বল।"

খুকীর ও উঁহার খাবার দিতে বলিলাম। আমার ঠাঁই হয় নাই দেখিয়া উনি বলিলেন, "তুমি এখন খাবে না?"

প্রবীণা গৃহিণীরা আমায় ক্ষমা করিবেন। চিরদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বিদেশে কাটাইয়াছি, যদিও সাহেব-মেম বনি নাই, বিশেষ কোনও অখাদ্য কুখাদ্য খাই না, মেঝের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া কাঁসার থালাবাটিতে ভাত-ডালই খাইয়া থাকি, তথাপি স্বামী ও পুত্র-কন্যা সহ একত্র বসিয়া খাওয়াই আমাদের প্রথা। নহিলে উনি ছাড়ে না। সেই যে কথায় বলে না—

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে'

—আমারও হইয়াছে তাই।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "সুধা আগে বাড়ী আসুক, তার পর খাব।"

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে পান-জল দিলাম, ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিল।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল, কিন্তু সুধা ফিরিল না। মা হওয়া বড় জ্বালা! বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভৃত্যও লণ্ঠন লইয়া ছেলেকে খুঁজিতে বাহির হইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় আমাদের বাড়ী উঠিবার পথে টর্চ্চ-লাইট পড়িল। ঐ বোধ হয় সুধা আসিতেছে।

টর্চ্চ-লাইট আমাদের বাড়ীর দিকেই উঠিতে লাগিল। সুধা আসিল। "হ্যাঁ রে, এত রাত্তির করলি কেন?" বলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম। মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, চোখের দৃষ্টিও কেমন বিভ্রান্ত। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ বাবা, শরীর ভাল আছে ত?" বলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গরম নয়।

"চল মা, বলছি"—বলিয়া সুধা তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া সুধা বলিল, "তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে মা?"

বলিলাম, "উনি খেয়েছেন, খুকীও খেয়েছে।"

"তুমি খাওনি কেন মা?"

"ছেলের খাওয়া না হলে মা কি খেতে পারে বাবা?"

সুধা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁস-ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা অমন করছিস? কি হয়েছে?"

সুধা হঠাৎ তক্তপোষ হইতে নামিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "আমি বড় অভাগা, মা! আমায় তুমি মাফ কর।"

আমি তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিলাম, "কেন রে, কি হয়েছে শীগ্‌গির বল বাবা, আমার যে কান্না পাচ্ছে।"

সুধা বলিল, "তোমাদের কথার অবাধ্য হয়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে, ঘড়িকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, সে সঙ্কল্প আমি পরিত্যাগ করেছি মা। আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কর।"

এ কথা শুনিয়া আনন্দে মন উল্লাসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, "জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, এ কলিতে তুমিই মা জাগ্রত দেবতা। ষোল আনার পূজো মেনেছিলাম, আমি

বত্রিশ আনার পূজো তোমায় দেব মা—কলকাতায় ফিরেই।" কিন্তু মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া, দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিলাম, "তা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেছ, ভালই করেছ। কিন্তু কি হল বাবা?"

সুধা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "মহাত্মাকে সে অপমান করেছে মা!"

"কি ক'রে অপমান করলে?"

"মহাত্মাকে সে গান্ধী-চ্যাপ বলেছে, আরও অকথা কুকথা বলেছে।"

"কি রকম? তোমার সাক্ষাতে এমন সব কথা বলতে সে সাহস করলে?"

"আমাব সাক্ষাতে নয় মা। আমি তার সঙ্গে রোজ যেমন বেড়াই, তেমন বেড়িয়ে, তাকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে বাড়ী আসছিলাম। সেও বাড়ীর দিকে গেল। খানিক দূরে এসে হঠাৎ মনে হল, তাকে আর একটা কথা বলে আসি। যদি তার নাগাল পাই, এই ভেবে ফিরে গেলাম। স্টেশনের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম। তখন সে আব একা নয়, ইংরেজী কাপড পরা একটা পাহাড়ী ছোঁড়া তার সঙ্গে আছে। দুজনে গিয়ে এক পানওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওরা কথাবার্ত্তা কি কয, শোনবাব জন্যে আমি নিঃশব্দে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোঁড়াটা পানওযালাব কাছে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট চাইলে। পানওয়ালা বললে, "বিলাতী সিগারেট বে্চনা গান্ধী মহারাজকা হুকুম নেহি হ্যায়, সাহেব!' ঘড়ি বললে,—'*That Gandhi Chap has become a great nuisance*'—অর্থাৎ সেই গান্ধীটা এক মহা আপদ হয়ে দাঁড়িযেছে।—এই শুনেই রাগে আমি আব থাকতে পাবলাম না। তাদের সমুখে গিয়ে বললাম —অবশ্য ইংরেজীতে—'ঘড়ি, এ তুমি কি কথা বলছ তুমি?' ছোঁড়াটা ত আমাকে দেখেই সবে পড়ল। ঘড়ি কি উত্তব দেবে, খানিকক্ষণ ভেবে পেল না। তাবপর হেসে বললে—'ওটা আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছি বইত নয়!'—আমি তাকে কপট, মিথ্যাবাদিনী এই সব ব'লে তিরস্কার করে, তার মুখের উপর স্পষ্ট ব'লে এসেছি মা—এ মুহূর্ত্ত থেকে তোমাব সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ আমাব রইল না—যে মুখে তুমি মহাত্মাকে অপমান কবেছ, সে মুখ আমি আর দেখতে চাইনে।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ করেছ বাবা। ও-সব পাহাড়ী মেয়ে, ওদেব কি কোনও নীতিজ্ঞান আছে? তোমাকে বলে, ও সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেছে, অথচ লুকিয়ে লুকিযে খেতে ছাড়তো না, এ আমি নিজের চক্ষে দেখেছি বাবা, খুকীও দেখেছে।"

"খেত নাকি মা? কবে দেখেছ তুমি?"

আমি কবে এবং কোথায় উহা প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলাম, তাহা সুধাকে বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "তাই নাকি? কি ঘোর মিথ্যাবাদিনী! অথচ আজ বিকেলেই সে আমাকে বলেছে,'যে দিন থেকে তুমি আমাকে মানা করেছ, সে দিন থেকে সিগারেট আমি স্পর্শ করিনি—সিগারেটের উপর আমার ভয়ানক ঘৃণা জন্মে গেছে'।"

মাতা-পুত্রে উভযেই প্রায পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ হইযা বসিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, "রাত হল, এবার খাবে চল বাবা। ও-সব চিন্তা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল।"

সুধা বলিল, "খাব মা, কিন্তু আজ আমি আলাদা থালায় খাব না। তোমার পাতেব প্রসাদ খেয়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে যে পাপ করেছি, সে পাপ থেকে আমি মুক্ত হব।"

"আচ্ছা তাই হবে। দুজনকার লুচিই এক থালায় দিতে বলি। তুমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় বদলে নাও।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম।

দুয়ার খুলিয়া দেখি, খুকী দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া গেল। হলে গিয়া খুকী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনেছি মা! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—ঘড়ি হতচ্ছাড়ী উনানমুখী বাঁদ্‌রী—তুই নিমতলার ঘাটে

যা—নিমতলার ঘাটে যা—তুই মর্ মর্ মর্!" বলিয়া সে মট্-মট্ করিয়া আপন আঙ্গুল মট্‌কাইতে লাগিল।

"ছি মা, কাউকে কি মর্ মর্ বলিতে আছে? সবাই সেই ভগবানের ছেলে-মেয়ে! রাত হয়েছে, যাও, তুমি এখন শুয়ে পড়বে।"—বলিযা আমি রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

রাত্রে সুসংবাদটা শুনাইলে উনি বলিলেন, "আমি জানি, আমার ছেলে, অমন দুর্ব্বুদ্ধি তার বেশী দিন থাকবে না!"

দেখ একবার অবিচার! ওঁর ছেলে বলিয়াই নিজ বাহুবলে সে যেন জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিয়াছে! আর আমি মাগী যে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে কত মাথা খুঁড়িয়া, কত পূজা মানিয়া ছেলের মন ফিরাইলাম, সে কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসিল না!

[মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭]

একালের ছেলে

আমি পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ, আমার নাম শ্রীকরালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খিজিরপুর। আমার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসব মাত্র, তখনই আমার পিতা স্বগ্রামনিবাসী রেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশযের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী ওরফে রাজুর সহিত আমার বিবাহ দেন। রাজুর বয়স তখন আট বৎসর—আমার শ্বশুরমহাশয় গৌরীদান করিয়া, আশা কবি পরলোকে তাঁহার পুণ্যোচিত পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হয় নাই। শ্বশুরমহাশয়ের কোনও পুত্র ছিল না, সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণে তাঁহার বাসগৃহ, পুষ্করিণী, আমবাগান এবং প্রায় পঞ্চাশ বিঘা লাখেরাজ জমি আমি প্রাপ্ত হই এবং এতাবৎ কাল ভোগদখল করিতেছি। আমাব পিতাও নিঃস্ব ছিলেন না, পিতা ও শ্বশুর মিলিত সম্পত্তির উপস্বত্বে, তাঁহাদের মিলিত আশীর্ব্বাদে, আমি পল্লীগ্রামের পক্ষে, স্বচ্ছল অবস্থাতেই জীবনযাপন করিতেছি।

আমি ক্রমে ক্রমে দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা লাভ করি, ঈশ্বরেচ্ছায় সকলগুলিই জীবিত আছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম প্রফুল্লকুমার, গ্রামের ইস্কুলে সে মাইনর পাস করিলে, বর্দ্ধমানে তাহাকে এক আত্মীয়ের বাসায় রাখিয়া রাজস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিই। তথা হইতে সে ম্যাট্রিক পাস করিয়া মাসিক দশ টাকা জলপানি পায়। আই-এ পড়িবার জন্য কলিকাতা যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অত দূরদেশে ছেলে পাঠাইতে গৃহিণীর মত হইল না। শরীর আছে অশরীর আছে, দায় আছে, বিপদ আছে তার চেয়ে বর্দ্ধমানই ভাল, তিন চারি ঘন্টার মধ্যে পৌছান যায়। আমার সে আত্মীয়টি ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। সে সময় তিনি বর্দ্ধমান হইতে বদলী হইয়া গেলেন। সুতরাং ছেলেকে রাজকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া স্টুডেন্ট মেঁস অথবা ছাত্রাবাসে তাহাকে স্থাপন করিয়া আসিলাম। এই ছাত্রাবাসটি মহাজনটুলীতে অবস্থিত।

গত বৎসর ফাল্গুন মাসে কামারহাটী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উষাবালার সহিত প্রফুল্লকুমারের বিবাহ দিয়াছি। বৈদ্যনাথের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নহে, কিছুই দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর তাহাতে খুবই আপত্তি ছিল, কিন্তু মেয়েটি ভারি সুন্দরী দেখিয়া আমি সেদিকে বিষম ঝুঁকিয়া পড়ি। ঠিকুজী-কোষ্ঠীতেও রাজযোটক দেখা গিয়াছিল। উহারা বলিয়াছিল মেয়ের বয়স এগারো, কিন্তু

গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "কখখনো নয়। তেরোর একদিন কম যদি হয় ত আমার নাক কাণ কেটে দিও।"—আমার গৃহিণীটি কিঞ্চিৎ মুখরা।—আমার দ্বিতীয় পুত্রটির বয়স দশ বৎসর মাত্র। তাহার নাম হরেন্দ্রনাথ, সে গ্রামস্থ মাইনর ইস্কুলে পাঠ করে। কন্যা তিনটির যথাযোগ্য ঘরে-বরে বিবাহ দিয়াছি, তাহারা এখন ছেলেপুলের মা হইযাছে, নিজ নিজ সংসার করিতেছে।

মহালয়ার দিন প্রফুল্লকুমার বাড়ী আসিল। স্টেশনে গো-যান পাঠাইয়াছিলাম, হরেন সে গো-যানে তার দাদাকে আনিতে স্টেশনে গিয়াছিল। ইহা আমার নিজস্ব গো-যান। এখানে আসিতে হইলে মেমারি স্টেশনে নামিতে হয়, মেমারি এখান হইতে সাত ক্রোশ ব্যবধান।

পরদিন এক প্রহর বেলা থাকিতে কামারহাটী হইতে প্রফুল্লকুমারের পূজার তত্ত্ব আসিতে দেখিয়া আমার বুক দুরদুর করিয়া উঠিল। না জানি কিরূপ তত্ত্ব বেহাই পাঠাইয়াছেন এবং সে তত্ত্ব গৃহিণীর পছন্দ হইবে কি না। তত্ত্ব পছন্দ না হইলে গৃহিণী রাগিয়া "কুরুক্ষেত্র" করিবেন, এ আশঙ্কা আমার মনে ছিল। গত জামাইষষ্ঠীর সময় ইহার সূচনা পাইয়াছিলাম। ছেলের তখন গ্রীষ্মের ছুটী, বাড়ীতে রহিয়াছে। বেহাই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জামাতাকে লইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে ছেলে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল। আমি তখন বাড়ীর ভিতরেই ছিলাম, দিবানিদ্রান্তে উঠিয়া তামাক খাইতেছিলাম। ছেলে হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া ঠান্ডা হইলে গৃহিণী বলিলেন, "ওরা কি কি দিলে, দেখি?"—প্রফুল্ল তোরঙ্গ খুলিয়া বলিল, "এই ধুতি-চাদর দিয়েছেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "জুতো?"

"না, জুতো দেননি।"

"সিল্কের জামা-টামা?"

"না, সিল্কের জামা দেননি। বললেন, বাবাজী, জুতো-জামা এ পাড়াগাঁয়ে ত পাওয়া যায় না, এক কলকাতা থেকে আনানো। তা আন্দাজি আনালে মাপ ছোট হবে কি বড় হবে তার ত ঠিক নেই। সেইজন্য আর—"—গৃহিণী পুত্রকে ভেঙাইয়া বলিলেন, "সেই জন্যে আর সে ব্যবস্থা করেননি! তা বেশ ত, তোর হাতে দুখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলিলেন না কেন, বাবাজী, ছুটীর পর বর্দ্ধমানে গিয়ে জুতো-জামা কিনে নিও?"

প্রফুল্ল নির্ব্বাক হইয়া নতমুখে চোরটির মত দাঁড়াইয়া রহিল।—ক্রোধে গৃহিণীর চক্ষু লাল। কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া বলিলেন, "বল্। আমার কথার জবাব দে!"

ছেলেরই যেন অপরাধ! গৃহিণী তখন ধুতি-চাদর হস্তে লইয়া, তাহার জমি পরীক্ষা করিয়া, আমার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমার পেয়ারের বেহাইয়ের আক্কেলখানা। ধুতির জমিটা একবার দেখ। মোটা ক্যাট্-ক্যাট্ করছে। এই ধুতি মানুষ জামাইকে দেয়?"

আমি হুঁকা নামাইয়া বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, "কেন, জমি মন্দই বা কি? সুতো মোটা নয়, বেশী খাপি জমি তাই মোটা দেখাচ্ছে। দুদিন টিকবে।"

গৃহিণী আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "নাঃ, সুতো মোটা নয়! চোখে ধরেছে চাল্‌সে, সরু কি মোটা দেখতে পাচ্চ, না ছাই পাচ্চ। চশমা চোখে দিয়ে, একবার দেখ দেখি।"

আমি বলিলাম, "গাঁয়ের তাঁতিদের বোনা কাপড় ত! বেশী মিহি সুতো তারা পাবে কোথা বল? সে ছোট পাঁড়াগা—ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের কাপড়-চোপড় সেখানে কি কিনতে পাওয়া যায়?"—গৃহিণী চক্ষু রাঙাইয়া বলিলেন, "বেহাইয়ের হয়ে তুমি ওকালতী কোরো না খপর্দ্দার বলছি।" ছেলেকে বলিলেন, "তোর আর এ ধুতি-চাদর প'রে কাজ নেই। এ তুলে রেখে দিই, পুজোর সময় ঠাকুর-মশাইয়ের ছেলেকে দিলেই হবে।"

পুরোহিত-মহাশয়, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানকে আমি পূজায় প্রতি বৎসর বস্ত্রাদি দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি আশঙ্কায় আকুল হইলাম। একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি তত্ত্ব বহিয়া আনিয়াছে। সে ব্যক্তি আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র দিল। তাহার পরিচয় লইলাম—নাম গোবর্দ্ধন, জাতিতে সদ্‌গোপ, বৈবাহিক মহাশয়ের অনুগত লোক, তাঁহার জমি চাষ করে। দ্রব্যাদিসহ লোকটিকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া, আমি পত্র পড়িলাম। বৈবাহিক মহাশয় তত্ত্ব-সামগ্রীর দৈন্য ও অপ্রচুরতার জন্য অনেক বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। অবশেষে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, প্রেরিত লোকটির সহিত প্রফুল্লকুমার বাবাজীবনকে যেন কয়েক দিনের জন্য পাঠাইয়া দিই।

অল্পক্ষণ পরেই প্রবেশ করিয়া দেখি, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। গৃহিণী, উগ্রচণ্ডা-মুর্ত্তি। তত্ত্ব-সামগ্রী বারান্দাময় ছড়ানো—পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি সেগুলো, লাথাইয়া লাথাইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাকে দেখিবামাত্র ঝঙ্কার দিয়া তিনি যে সব কথা বলিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আর কাজ নেই। যে লোকটি তত্ত্ব আনিয়াছিল, সে বারান্দার কোণে বসিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। গৃহিণী তাহাকে বলিতেছেন, "ওঠ্ বেটা নচ্ছার পাজি চাষা, তোল্ এ-সব জিনিষ তোর তোরঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যা- -এ-সব আমি চাইনে।"—আমি গৃহিণীকে বলিলাম, "ছি ছি কি করছ পাগলামী?" বলিয়া জিনিষগুলি আমি কুড়াইয়া কুড়াইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিলাম।

কত কষ্টে কত সাধ্য-সাধনায় তাঁকে ঠাণ্ডা করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণে আর প্রয়োজন নাই। জিনিষগুলি তিনি রাখিলেন, কিন্তু ছেলেকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। অধিকন্তু তাহাকে বলিলেন, "খপর্দ্দার সে বউয়ের কখনও মুখ দেখবি ত মাতৃহত্যের পাতক হবি। এগ্‌জামিনটে হয়ে যাক্, এবার কোনও ভদ্দর-লোকের মেয়ে এনে তোর বিয়ে দেবো। সে বউ ত্যাগ করলাম আমি।"

গৃহিণীকে বলিলাম, "অনেক পথ হেঁটে এসেছে, লোকটিকে জল-টল খাবার দাও।" তাহাকে বলিলাম, "তুই বাবা আজ এখানে থেকে বিশ্রাম কর্। কাল ভোরে উঠে যাস।"- --বলিয়া আমি বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম।—কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, লোকটি বাহির হইয়া আসিতেছে। আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা-ঠাকুর, আমি চললাম।"

আমি বলিলাম, "এখনি চললি? খাওয়া-দাওয়া হল না। খাওয়া-দাওয়া ক'রে এখানে ঘুমিয়ে কাল সকালে গেলে হত না?"

সে বলিল, "কাল সকালেই রওয়ানা হব বাবা-ঠাকুর। এ-গাঁয়ে আমার একঘর কুটুম্ব আছে, তাদের সঙ্গে দেখা-শুনো করাও দরকার, রাতটে সেইখানেই থাকবো।"

"সেইখানে থাকবি? আচ্ছা তা বেশ। বোস্ তা'হলে একটু। বেয়াই-মশাইকে চিঠি একখানা লিখে দিই। ঐখানে তামাক-টিকে সব আছে, তামাক সাজ্।"

গোবর্দ্ধন তামাক সাজিতে বসিল। আমি বেয়াইকে পত্র লিখিলাম। লিখিলাম, "আপনার প্রেরিত উপহার দ্রব্যগুলি পাইয়া আমরা সকলে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনার সাদর আহ্বানে প্রফুল্ল বাবাজীবনকে এই সঙ্গে পাঠাইতাম, কিন্তু পরীক্ষার আর বেশী বিলম্ব না থাকায়, বাবাজীবন এখন পড়াশুনা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। এখন সেখানে গেলে বৃথা কয়েকদিন সময় নষ্ট হইবে। পরীক্ষাটি হইয়া যাক্, আপনার জামাই আপনারই রহিল, বাবাজীর এখন যাওয়া হইল না বলিয়া আপনি বা বেয়ান-ঠাকুরাণী যেন দুঃখিত না হন ইহাই আমার প্রার্থনা। বধূমাতার জন্য সামান্য কিঞ্চিৎ উপহার যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আগামী পঞ্চমীর দিন তাহা পাঠাইব। দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।"—ইত্যাদি।

পত্র লেখা শেষ করিয়া, গোবর্দ্ধনকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলাম, "বাবা গোবর্দ্ধন, এই চিঠিখানি বেয়াইকে দিবি। আর, আমার একটি কথা তোকে রাখতে হবে। বাবা!"

"কি কথা কর্ত্তা-মশাই?"

"এখানে যা দেখলি শুনলি—এই, রাগের মাথায় গিন্নী যা বলেছেন করেছেন, সে সব আর সেখানে প্রকাশ করিসনে বাবা! কুটুম্বিতা স্থলে এ-সব আকছার হয়েই থাকে, কোন্ সংসারে না হয়? কিন্তু জানতে পারলে বেয়াই বেয়ান মনে বড়ই কষ্ট পাবেন। এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও সেখানে প্রকাশ করিসনে লক্ষ্মী বাপ আমার! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোকে আশীর্ব্বাদ করছি, তোর ভাল হবে। আমি চিঠিতে লিখে দিলাম যে জিনিষপত্তর তিনি যা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে আমরা খুব খুসী হয়েছি। বুঝলি ত? তুইও সেই রকম বলবি। আর এই নে, দুটি টাকা, কাল যাবার সময় পথে জলটল খাবি।"—বলিয়া তাহার হাতে দুটি টাকা দিলাম।

গোবর্দ্ধন হাতযোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা যখন নিষেধ কবলেন, তখন এ-সব কথা আমি চেপে যাব বইকি। ছি ছি, এ-সব পেরকাশ করবাব কথা?" টাকা দুটি টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "কিন্তু মাঠাকুরুণ ঐ যে বললেন ছেলের আবার বিয়ে দেবেন সেটা বাবাঠাকুর?"—বলিলাম, "না রে না। ওটা রাগের মাথায় বলেছেন বইত নয়। ওকি একটা কথা হল? ও-সব কথা কিছু তুই প্রকাশ করিসনে।"—গোবর্দ্ধন স্বীকৃত হইল। বলিলাম, "দেখিস বাবা! ব্রাহ্মণের কাছে কথা দিয়ে যেন কথার খেলাপ কবিসনে।"

"না বাবা ঠাকুর, কথার খেলাপ হবে না।"—বলিয়া সে আমার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল।

কয়েক দিনই লক্ষ্য করিলাম, ছেলেটাব মনে সুখ নাই, মুখখানি বিষণ্ন করিযা বেড়ায। তার গর্ভধারিণীর আচরণে মনে সে ব্যথা পাইযাছে। তাহাও বটে,—এবং সেই জামাইষষ্ঠীর সময় গিয়াছিল, পূজার ছুটীতেও শ্বশুর-বাড়ী যাইবে আশা কবিযাছিল, তাহাব সে আশা ভঙ্গ হওয়াতেও বোধ হয় সে মনঃক্ষুণ্ন। এখনই না হয বুড়া হইযাছি, কিন্তু যে বয়েসের যে আশা আকাঙ্খা, যে সাধ-আহ্লাদ, তাহাও ত জানি! ফাল্গুন মাসে উহার পরীক্ষা। মাঘ মাস গেলেই বিবাহের এক বৎসর পূর্ণ হইযা যাইবে, ছেলে বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই বৌমাকে আনাইয়া রাখিব।—দেখিতে দেখিতে মহাপূজা আসিযা পড়িল। উৎসবের হাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য্যে ছেলের মুখখানিও আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

।। ২ ।।

ছুটি ফুরাইলে বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া প্রফুল্ল বর্দ্ধমানে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বলিল, এবার বড়দিনের ছুটিতে আর বাড়ী আসিবে না, কাবণ, তখন পরীক্ষা অত্যন্ত সন্নিকট—পড়াশুনা লইয়া তাহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইবে। পবীক্ষা শেষ হইলে, একেবারে ফাল্গুন মাসে আসিবে। গৃহিণী বলিলেন, "চা—র মা—স। চার মাস বাদে বাড়ী আসবি? একটা ছুটী-ছাটাতে দু তিন দিনের জন্যেও এসে দেখা দিয়ে যেতে পারবি নে?"

প্রফুল্ল বলিল, "ছুটি-ছাটা তেমন আর কই?"

"কেন জগদ্ধাত্রী পূজোর ছুটী, তবে গিয়ে সরস্বতী পূজোর ছুটী?"

"জগদ্ধাত্রী পূজোর দুদিন ছুটী আছে বটে, সঙ্গে একটা রবিবারও পড়েছে। কিন্তু তিন দিনের জন্য আসতে গেলে সাতটি দিন পড়াশুনাব ক্ষতি। আগে দুদিন কতক্ষণে বাড়ী যাব কতক্ষণে বাড়ী যাব ক'রে ক'রে পড়ার মন বসবে না। ফিরে গিয়েও, পড়ায় মন বসাতে দুদিন লেগে যাবে?"—গৃহিণী বলিলেন, "সারা বছরই ত মেহনত করলি বাবা, এক হপ্তায় আর কি এসে যাবে? তাতে কি আর পাস হওয়া আটকাবে?"

ছেলে বলিল "পাস হওয়া না আটকাতে পারে। কিন্তু শুধু পাস হলেই ত চলবে না মা! গতবারে যেমন জলপানিটি পেয়েছিলাম, এবারেও যাতে সেই রকম পেতে পারি সেই চেষ্টাই করছি কিনা।"

পড়াশুনায় প্রফুল্লের বরাবরই খুব আঁঠা।—অন্য ছেলেদের যেমন "ওরে পড়্ রে ওরে পড়্রে" বলিয়া তাগাদা করিতে হয়, প্রফুল্লকে কোনও দিন সেরূপ করিতে হয় নাই। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—ছেলে আমার সে তপস্যায় কোনও দিন অবহেলা করে নাই। তাই আমি বলিলাম, "প্রফুল্ল যা বলছে তা ঠিক কথাই। আচ্ছা বাবা, পরীক্ষা হয়ে গেলেই তুমি এস। তোমার পড়ার বিঘ্ন আমরা করতে চাই না।"

ঘট প্রণাম করিয়া, আমাদিগকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল শুভযাত্রা করিল।

প্রফুল্ল প্রতি রবিবার আমাকে একখানি করিয়া পত্র লেখে সে পত্র আমি পাই সোমবার বেলা তিনটার সময়। শুক্রবার জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল, শনিবার মার বিসর্জ্জন, রবিবার প্রাতে গৃহিণী বলিলেন, রাত্রে প্রফুল্ল-সম্বন্ধে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন বড় খারাপ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "জগদ্ধাত্রী পূজোর ছুটিতে ফি-বছরই ছেলে বাড়ী আসে, এবার আসেনি বলে আমার মনটাও খারাপ ছিল। তোমারও ছিল নিশ্চয়। সে জন্যেই ও রকম স্বপ্ন দেখেছ—ও কিছু নয়, সে ভালই আছে, কোনও চিন্তা নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়। কিন্তু তবু তুমি গিয়ে একবার তাকে দেখে এস।"

বলিলাম, "আজ রবিবার, আমি বর্দ্ধমানে গিয়ে ছেলেকে দেখে ফিরে আসতে কাল বেলা দুপুরের কম ত নয়,—কাল সোমবার বেলা তিনটের সময় তার চিঠিই ত আসবে।"

সমস্ত দিন গৃহিণীর মনটি বিষণ্ণ হইয়া রহিল। সোমবার আহারাদি সারিতে বেলা একটা বাজিল। তামাক খাইয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "আমি যাই পোষ্ট আফিসে গিয়ে ছেলের চিঠি নিয়ে আসি। বেলা দেড়টার সময় রাণার ডাক আনে, তবু দেড় ঘন্টা আগে চিঠিখানি পাব।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম। গ্রামেই পোষ্ট অফিস আছে।

ডাকবাবু সমাদর করিয়া আমায় আফিস-ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন। দেড়টা তখন বাজিয়া গিয়াছে। শুনিলাম রাণার এখনও আসিয়া পৌছে নাই। দুইটা বাজিতে চলিল, তখনও রাণারের দেখা নাই। ডাকবাবু বলিলেন, "ট্রেণ লেট থাকলে, একটু দেরীও হয়।"

ঠিক যখন সওয়া দুইটা, তখন বাহিরে রাণার আসিবার ঝম্-ঝম্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ডাক আসিল। ডাকবাবু ব্যাগ কাটিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কই না, আপনার কোনও চিঠি ত নেই।"

ভগ্নমনে গৃহে ফিরিলাম। চিঠি আসে নাই শুনিয়া গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চোখ মুছাইয়া বলিলাম, "ছি ছি, চোখের জল ফেলতে আছে? তাতে যে ছেলের অকল্যাণ হবে। আমি এখনই বর্দ্ধমান রওনা হচ্চি। সন্ধ্যা নাগাদ সেখানে পৌছব। আজ রাত্রের মধ্যেই ছেলের ভাল খবরটি তোমায় এনে দেবো। তুমি ধৈর্য্য ধর, আর ঠাকুরদের ডাক,-—তাঁরা সমস্তই মঙ্গল করবেন।"—বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।—এক ঘন্টার মধ্যেই গরুর গাড়ীতে মেমারি যাত্রা করিলাম। বর্দ্ধমানে মহাজনটুলিতে ছেলের বাসায় যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঘর সব খালি। "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিতে, একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল, সে আমার পরিচিত, আমাদের পাশের গ্রামেই বাস। তার নাম সুরেন্দ্র, বাল্যকাল হইতে প্রফুল্লের বিশেষ বন্ধু। আমাকে জ্যেঠামশাই বলিয়া ডাকে। আমাকে দেখিয়াই, "জ্যেঠামশাই যে!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। বলিলাম, "ভাল আছ ত বাবা? প্রফুল্ল কই? সে কেমন আছে?"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি। প্রফুল্লও ভাল আছে।"

"কই সে?"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে সে ত এখন বাসায় নেই।"

"কোথা গেল? কখন আসবে?"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে—সে—সে—কি একটা গ্রামে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বস্তির—"

"বস্তির? বস্তির গেছে কেন?"

"আজ্ঞে সেখানে, আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের বিয়ে কিনা। সেই জন্যে গেছে। কালই রওয়ানা হয়েছে।"

"ফিরবে কখন?"

"কাল বোধ হয় ফিরবে, এসে কলেজ করবে। নয় ত বড় জোর পরশু। তবে বৌভাতটা না হয়ে গেলে তারা যদি না ছাড়ে, তবে দুই একদিন দেরীও হতে পারে। পার্সেন্টেজ তার যথেষ্ট আছে, দুই এক দিন দেরীতে কোনও ক্ষতি হবে না। আসুন না জ্যেঠামশাই, আমার ঘরে এসে বসুন।" বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল।

আমাকে বসাইয়া বলিল, "ঐ বিয়েতে আমারও নেমন্তন্ন ছিল, আমাকেও ধরেছিল যাবার জন্যে। আমি অনেক কষ্টে কাটিয়ে দিয়েছি, প্রফুল্ল আর কাটাতে পারলে না। আমার চেয়ে প্রফুল্লের সঙ্গে তব বেশী ভাব কিনা! প্রফুল্লের বিয়েতে সে ত আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল, স্মরণ নেই বোধ হয়? রোগা ছিপ্‌ছিপে, কালো, বাঁ-গালে একটি আঁচিল আছে।"

আমি বলিলাম, "কই বাবা আমার মনে পড়ছে না। তোমাদের আট-দশ জন বন্ধু গিয়েছিল, বিশেষ, আমি তখন ভারি ব্যস্ত—অত স্মরণ হচ্চে না।"—সুরেন বলিল, "আজ্ঞে তা তো বটেই! তা হঠাৎ যে জ্যেঠামশাই? সহরে কোনও কাজ ছিল বুঝি?"

কি কাজে আসিয়াছি তাহা সুরেনকে খুলিয়াই বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ প্রফুল্ল সকালে বলছিল বটে যে কাল পোষ্ট কার্ড কিনে রাখতে ভুলে গেলাম, আজ রবিবার, বাবাকে চিঠি লিখি কি করে? একদিন দেরীই হয়ে গেল, কাল পারি ত বস্তির থেকেই চিঠি লিখবো এখন। জ্যেঠাইমা যখন অত উতলা হয়েছেন, তা হলে জ্যেঠামশাই, আর আপনার এখানে দেরী করা উচিত নয়। জ্যেঠাইমা সেখানে ভেবে খুন হচ্চেন, আপনি তা হলে সাতটা বাইশ মিনিটের গাড়ীতে রওয়ানা হোন।"

বলিলাম, "হ্যাঁ বাবা, তাইতে রওনা হব মনে করেই এসেছি। মেমারিতে আমার গরুর গাড়ী অপেক্ষা করছে।"

"তাই ত! আপনাকে জল-টলও কিছু খাওয়াতে পারলাম না। বাড়ী পৌছাতে বোধ হয় রাত দুপুর হ'বে?"

"রাত এগারোটা ত বটেই। ইষ্টিশানে গিয়ে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে খেয়ে নেবো এখন, সে জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা! আচ্ছা, এখন তা হলে উঠি। বস্তিরে সেই গোলমালে যে প্রফুল্ল চিঠি লিখতে পারবে, সে আশা কম। সে ফিরে এলেই—কালই আসুক বা দুদিন পরেই আসুক—পৌছেই যেন একখানা চিঠি আমায় লিখে দেয়।" বলিয়া আমি উঠিলাম।

সুরেনও আমার সঙ্গে স্টেশনে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তাহাকে মানা করিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

রাত্রি বারোটায় বাড়ী পৌছিয়া গিন্নীকে সুখবরটি দিতে তবে তিনি শান্ত হইলেন।

বৃহস্পতিবারের দিন প্রফুল্লর চিঠি আসিল। বর্দ্ধমান হইতেই লিখিয়াছে। বৌভাত পর্যন্ত উহারা তাহাকে কিছুতেই আসিতে দেয় নাই। পোষ্ট কার্ড কিনিয়া রাখিতে নিজ ভুলের জন্য আমরা এত কষ্ট পাইয়াছি, এ জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছে।

।। ৩ ।।

প্রতি সোমবার নিয়মিতভবে প্রফুল্লর পত্র আসিতে লাগিল।

পৌষ-তত্ত্বের পূর্ব্বে, গৃহিণীকে লুকাইয়া, বেহাই-মহাশয়কে আমি রেজিস্ট্রি করিয়া দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম। লিখিয়া দিলাম, আজকাল যে নতুন ফ্যাসানের দোরোকা শাল

উঠিয়াছে, তাহাই গায়ে দিতে তাঁহার জামাতার অত্যন্ত সখ। তিনি যেন স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ভাল শাল একখানি কিনিয়া আনেন, আর ষোল গিরা একটি কাশ্মীরা কোট, গরম গেঞ্জি, গরম মোজা প্রভৃতি। আমি কিঞ্চিৎ টাকা পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলাম বলিয়া তিনি যেন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হন, তাঁহার কিরূপ অনটনের সংসার তাহা আমি অবগত আছি বলিয়াই, কুটুম্ব হিসাবে নয়, বন্ধুভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিলাম, ইহাতে তিনি যেন আমার অপরাধ না লয়েন এবং কথাটা গোপন রাখেন ইত্যাদি।—পৌষের তত্ত্ব দেখিয়া গৃহিণী খুশী হইলেন। বলিলেন, "আহা ছেলে যদি বাড়ী থাকতো, তবে বড় আনন্দ হতো।"

বলিলাম, "দুমাস পরেই ত সে আসছে। এসে দেখবে এখন।"

গৃহিণী ধরিলেন, "না গো তুমি একবার যাও বর্দ্ধমান। ছেলেকে এ-সব দিয়ে এস। সে তার বন্ধু-বান্ধবীকে দেখাবে, কত আমোদ হবে তার।"

নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় গৃহিণীর অনুরোধ পালন করিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল। জিনিষগুলি লইয়া একদিন আহারাদির পর রওয়ানা হইলাম। ছেলেকে দেখিয়াও আসিলাম, জিনিষগুলি দিয়াও আসিলাম। শুনিলাম বাইশে ফাল্গুন তাহার পরীক্ষা শেষ হইবে, তেইশে সে বাড়ী যাইবে।—গৃহে ফিরিয়া পাঁজি দেখিলাম, বাইশে ফাল্গুনের পূর্ব্বে দ্বিরাগমনের ভাল দিন নাই। সেই অনুসারে বেহাই-মহাশয়কে পত্র লিখিলাম।

বাইশে ফাল্গুন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেহাই নিজে আসিয়া তাঁহার মেয়েকে ঘর-বসত করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন। বিবাহের সময় মার অমন যেমন রূপ দেখিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। ঘর আলো-করা পুত্রবধূ যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তবে সে যেন পুত্রের জন্য এমন পাত্রীরই সন্ধান করে।—পরদিন আমি স্নান করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ লাল, চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতেছে, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ। বলিলেন, "ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি হয়েছে?"

তিনি বলিলেন, "বউমা নিজের ত মাথা খেয়েইছে, আমাদেরও মাথা খেয়েছে।"

"কেন, কি করেছে বউমা?"

গৃহিণী আমার কাণে-কাণে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

আমি বলিলাম, "মাথা খেয়েছে কেন বলছ? কেন? ক'মাস? প্রফুল্ল কি মাসে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল? হ্যাঁ, জষ্টি মাসে। তা হলে—তুমি কি বলছ।

"মাথামুন্ডা কি বলিব, কথা শেষ করিতে পারিলাম না। শঙ্কাকুল নয়নে গৃহণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম।—গৃহিণী বলিলেন, "তা হলে ত ভরাভর্ত্তিই হত—খালাস হবার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তা নয়, চার মাস কি বড় জোর পাঁচ মাস।"

আমি নিজ কপাল টিপিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিয়া নারায়ণ স্মরণ করিলাম। একটু সামলাইয়া লইয়া, মুখ তুলিয়া বলিলাম, "তোমার ভুল নয় ত?"

গৃহিণী বলিলেন, "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি পাঁচ-পাঁচটা সন্তানের মা, তিনটে মেয়ে আমার কাছে থেকে খালাস হল,—আমারই ত ভুল হবে! সে যাক্, বউমাও ত অস্বীকার করছে না। এ সর্ব্বনাশ কে করলে জিজ্ঞাসা করলে কোনও উত্তর দিচ্চে না। খালি কাঁদছে। এখন বউ নিয়ে কি করবে কর। ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

আমার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আহা, মেয়েটাকে আপন সন্তানের মতই ভালবাসিয়াছিলাম। আমায় এ কি শাস্তি দিলে, ভগবান? চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আহা ওর দোষ কি, দুধের বাছা! দোষ ওর বাপ মা'র—যারা এমন অসাবধান। ঝাঁটা মারা উচিত তাদেরই মাথায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, অসাবধান! জেনে শুনেই তারা এমনটা ঘটতে দিয়েছে। গোড়া থেকেই আমি তোমায় বলিনি, ও ছোট-লোকের মেয়েকে ঘরে এন না। তুমি কি আমার

কথা তখন শুনলে? বউয়ের রূপ দেখে একেবারে গলে গেলে। এখন রূপ ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। ছোটলোক—ছোটলোক! মেয়ের রোজগার খাচ্ছিল, বুঝতে পারছ না? নইলে পৌষের তত্ত্বে অত টাকা খরচ করলে কোথা থেকে? উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই যার, সে জামাইকে দেড়শো টাকা দামের শাল দিতে পারে? পূজোর-তত্ত্বওত দেখেছিলে!"

দেড়শো টাকা দামের শাল কোথা হইতে আসিল, অন্য অবস্থা হইলে আমি এখনই তাহা প্রকাশ করিতাম। কিন্তু প্রকাশ করিয়া ত কণামাত্র ফল নাই! জিজ্ঞাসা করিলাম," বাড়ীর আর কেউ এ কথা জানতে পেরেছে?"

—গৃহিণী বলিলেন, " না, বোধ হয় না!"

বলিলাম, "তা হলে খুব সাবধান, কেউ কিছু জানতে না পারে। আমি নিজে গিয়ে বউমাকে তার বাপের বাড়ী রেখে আসবো এখন।"

"রেখে এস, কিন্তু আজই। আজ তেইশে ফাল্গুন, আজ রাতেই ছেলে বাড়ী এসে পৌঁছাবে মনে আছে ত?"

"হ্যাঁ, তা তো মনে আছে। আচ্ছা, আজই গিয়ে রেখে আসি। তেল দাও, যাই স্নানটা করে ফেলি।"—বেলা একটার সময় গরুর গাড়ী ঠিক থাকিতে বলিয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে আসিয়া পাতের কাছে বসিলাম মাত্র। ভাতের গ্রাস গলা দিয়া নামিতে চাহে না। চোখ ফাটিয়া কেবল জল আসে।

অৰ্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম, "বউমাকে চারটি খাইয়ে দাও। ছেলে এসে পৌঁছবার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার।"—খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলাম। গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "গাড়ী সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।"

"বউমা খেয়েছেন?"

"না, কিছুই খায়নি। আমারও মনের অবস্থা এমন নয় যে, পীড়াপীড়ি করি। চুলোয যাক্—ওর ত এখন মরাই মঙ্গল।"

"এই কাল মোটে বউ এল। আজই হঠাৎ আবার বাপের বাড়ী চলল, লোকে জিজ্ঞেস করলে কি বলবে?"

"বলবো কি, বলেছি। বলেছি যে বেয়াই কাল রাতে বাড়ী ফিরে গিয়েই দেখলেন, তার পরিবারের কলেরা হয়েছে। বাঁচবার আশা কম। তখনই লোক ছুটিয়ে দিয়েছিলেন মেয়েকে আনবার জন্য। অপর লোকের সঙ্গে না পাঠিয়ে কর্ত্তা নিজেই যাচ্ছেন তাঁকে রাখতে, গাড়োয়ানও এই কথাই জানে।"

"বউমাকে তৈরী হতে বলগে।" বলিয়া আমি জামা গায়ে দিলাম।

এই সময় বাহিরে ঠং-ঠং করিয়া বাইসিক্লেরে শব্দ হইল। কে আসিল? উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, বাইসিক্ল হস্তে প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া, গাড়োয়ানের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তার অপর পাশে, অপর বাইসিক্ল হস্তে তার বৰ্দ্ধমানের বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ।

এক মিনিট পরে প্রফুল্ল ও সুরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত—দর-দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। প্রফুল্ল আসিয়াই আমার পা জড়াইয়া বলিল, "বাবা আমায় মাফ করুন।"

"কেন, কেন বাবা, হঠাৎ কি হয়েছে?"

"শ্বশুর-মশায় তাঁর মেয়েকে এখানে রেখেই বৰ্দ্ধমানে গিয়েছিলেন আমায় আনতে। গাড়োয়ানের কাছেও শুনলাম। বাবা, আপনি যখন জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় বৰ্দ্ধমানে আমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তখন আমি কারুর বিয়ের নেমন্তন্নে যাইনি, আমি গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়ী। আপনাদের লুকিয়ে গিয়েছিলাম, সুরেন সব কথাই জানতো, তাই আমায় বাঁচাবার জন্যে সে মিথ্যে করে ঐ সব কথা আপনাকে বলেছিল।"

সুরেন ছোকরা নত মস্তকে দাঁড়াইয়া। শুনিয়া আমার বুক হইতে হাজার মণ পাথরের ভার নামিয়া গেল। আমি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া, উদ্দেশে নারায়ণ প্রণাম করিলাম। প্রফুল্লর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার গর্ভধারিণীও আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সমস্ত শুনিয়া চোখে অঞ্চল দিয়া চলিয়া গেলেন,—বোধ হয় বউমার কাছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্ল ও সুরেনকে স্নানাহার করাইতে লইয়া গেলেন।

অপরাহ্নে স্বয়ং বেহাই-মশাই গো-যানে আসিয়া উপস্থিত—কামারহাটি হইতে নয়, বৰ্দ্ধমান হইতে, প্রফুল্ল ও সুরেন্দ্রের সহিত এক ট্রেনে আসিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকল কথা শুনিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে কামারহাটি যাইতে হইলে, পাণ্ডুয়া স্টেশনে নামিয়া তিন ক্রোশ। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে কামারহাটি অবধি পাকা সড়ক আছে, উহা সাত ক্রোশ ব্যবধান। প্রফুল্ল সাত ক্রোশ পথ বাইসিক্লে অতিবাহিত করিয়া, শুধু সেই জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে যে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিল তাহা নয়, প্রতি শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যাইত এবং সোমবার ভোরে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া, বাসায় আসিয়া স্নানাহার করিয়া কলেজ করিত। তার শ্বশুর জানিতেন যে জামাই লুকাইয়া যাওয়া-আসা করে।

স্বভাবতঃ তিনি জামাইয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করিতে চাহেন নাই। মাঝে মাঝে চিঠি লিখিতেন, কোন চিঠিতেই কোনও দিন লেখেন নাই যে, প্রফুল্ল বাবাজীবন আসিয়াছিল সে ভাল আছে, বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়াছে।

কথা তিনি প্রকাশ করিবেন না শাশুড়ীর কাছে এই আশ্বাস পাইয়াই প্রফুল্লর যাতায়াত তখন ঘন-ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাই নয়। শুনিলাম, পাজীটা নাকি বউমাকেও, নিজের পায়ে হাত দেওয়াইয়া শপথ করাইয়া লইয়াছিল যে, ঘর-বসত করিতে আসিয়া সে কথা সেও যেন এখানে প্রকাশ না করে।

আমাদের কালে যে সব ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব বলিয়া গণ্য ছিল, একালের ছেলেদের পক্ষে তাহা আব নাই, আমরা স্ত্রী-পুরুষে এই আলোচনা করিয়া গোপনে অনেক হাসাহাসি করিলাম।

আষাঢ় মাসে প্রফুল্লর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। জলপানি ত পায়ই নাই, পাস হইয়াছে মাত্র, তাও থার্ড ডিভিসনে।

['নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' আশ্বিন ১৩৩৭]

জামাতা বাবাজী

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল, আমার একমাত্র জামাতাটি নিরুদ্দেশ, অথচ কারণ কিছুই জানা যায় নাই।

রাজসাহী জিলা-স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাবাজী (তখন আমার জামাতা হন নাই) কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। দুই বৎসর তথায় পড়িয়া, আই-এ পরীক্ষা দিয়া বৈশাখ মাসে তিনি রাজসাহীতে পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন। পিতা তাঁহার, রাজসাহীর প্রসিদ্ধ গর্ভমেন্ট প্লীডার রায় শ্রীযুক্ত শশিশেখর দত্ত বাহাদুর। সেই সময় তাঁহার এই পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রের সহিত আমার কন্যা লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ হয়।

৮ই শ্রাবণ বিবাহ হইল—তখন সপ্তাহখানেক মাত্র গেজেট বাহির হইয়াছিল, বাবাজী দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়াছিলেন। পূজোর ছুটীতে বাবাজী রাজসাহী আসিলে, আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিয়াছিলাম। এক সপ্তাহকাল বাবাজী আমার নিকট ছিলেন, কিন্তু তখন ত এ বিপত্তির কিছুমাত্র সূচনা আমি পাই নাই। কলেজ খুলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাবাজী আবার আসিয়া তিন দিন ছিলেন, বস্তুতঃ এখান হইতেই তিনি কলিকাতায় রওয়ানা হবেন, তখনও ত আমাদিগকে এ বিষয়ের কিছুমাত্র আভাস তিনি দেন নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া মাসখানেক বাবাজী যথারীতি পত্রাদি লিখিয়াছিলেন,—তার পর হইতে নিস্তব্ধ। বাবাজীকে পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। খুকী, পূর্ব্বে যে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার পত্র পাইত, সে-ও কোনও পত্র পায় নাই। তিন সপ্তাহ এইরূপ ভাবে কাটিলে ব্যাকুল হইয়া বৈবাহিক মহাশয়কে রাজসাহীতে পত্র লিখিলাম, তাঁহার উত্তরে জানিলাম, তিনিও তিন সপ্তাহ পুত্রের কোনও পত্র পান নাই। পুত্রকে জবাবী টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ আসিবার পর, অনুসন্ধানার্থে নিজ মাতুলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়েছিলেন। বাসার ছেলেরা নাকি বলিয়াছে, "কেন? পূর্ণ ত আজ তিন সপ্তাহ হল, বাড়ী চলে গেছে।"—বাড়ী যায় নাই শুনিয়া বাসার ছেলেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। কোথায় সে গিয়াছে, উহা তাহারাও অনুমান করিতে অসমর্থ। বৈবাহিক আরও লিখিয়াছেন, "ছেলের এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার কারণ কি? শেষবাব যখন আপনার ওখানে গিয়াছিল, সে সময়ে বউমার সহিত তাহার কোনও ঝগড়া-কলহ হইয়াছিল কি না, সন্ধান লইবেন ত!" কন্যার নিকট জানিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, সে রকম কিছুই ত হয়নি।"

আমিও সে মর্ম্মে বেহাই মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিলাম।—এই ত অবস্থা! আমি এখন কি করি বলুন দেখি! বেহাই মহাশয় ত বেশ নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় আছেন দেখিতেছি! তাঁর আর দুই পুত্র আছে, তিনি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার যে ঐ একমাত্র কন্যা। শুধু তাহাই নহে, আমার পরলোকগতা প্রথমা পত্নীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন—আমাব বড় আদরের ধন। আমার খুকুরাণীব মুখে আর হাসি দেখিতে পাই না, সর্বদাই মুখখানি তাব বিষণ্ণ, চক্ষু দুইটি ছলছল করে। এখন আর নিতান্ত বালিকাটি নাই, চোদ্দ বছরে পড়িয়াছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছে, সবই বুঝিতে পারে ত! তাহার বিষাদ-মলিন মুখখানি দেখিলে আমাব বুকের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে।

ছেলেটি ভাল দেখিয়া, মহাশয়, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া ওখানে মেয়েব বিবাহ দিয়াছিলাম। আমার মত অবস্থার লোকের, এক মেয়ের বিবাহে, পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা কি সোজা কথা? কিন্তু তবু আমি করিয়াছিলাম —কেন? না মেয়েটি সুখে থাকিবে, এই আশায়। কিন্তু দেখুন দেখি একবার দৈব-বিড়ম্বনা!

আমার অবস্থাও বলি, শুনুন। আমার নিবাসও রাজসাহী জিলায়, ইছমাইলপুর গ্রামে, নাটোরের তিনটা স্টেশন পরে রঘুরামপুরে নামিয়া তিন ক্রোশ আসিতে হয়। স্টেশনে

গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, পাল্কীও পাওয়া যায়, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী নাই। আমার নাম শ্রীপ্রমথনাথ দেব---উত্তরবাটী কায়স্থ আমরা। পিতার মৃত্যুতে আমি কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলাম, আর কিছু কোম্পানীর কাগজ। তা কোম্পানীর কাগজগুলি মেয়ের বিবাহে ত প্রায় নিঃশেষই হইয়া গিয়াছে। ভূসম্পত্তি ছাড়া, আমার একটি সামান্য কারবারও আছে---গুড় প্রস্তুতের একটি কারখানা। কয়েকটি ইক্ষুমাড়াই কল আছে। সেই কলে ইক্ষু মাড়িয়া, রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করি। আমি অবশ্য নিজে হস্তে করি না, বেতনভোগী কারিগরেরা আছে। কতক ইক্ষু আমার নিজের চাষের, বাকীটা কিনিয়া আনি। আশে-পাশে পাঁচখানা গ্রামে ব্যাপারীরা আসিয়া সেই গুড় খরিদ করিয়া লইয়া যায়। ভূসম্পত্তির আয়ে এবং কারখানার মুনাফায় একরূপ ভদ্রভাবেই আমার দিন গুজরাণ হয়।

আমার প্রথমা পত্নী জীবিতা নাই, সে আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। খুকীকে চারি বৎসরের রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। আমার বয়স তখন বত্রিশ বৎসর মাত্র। আত্মীয়-বন্ধুরা সকলেই আবার বিবাহ করিবার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।—আমার এত সাধের---এত আদরের খুকীকে আমি বিমাতার হাতে তুলিয়া দিতে পারিব না। আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, তিনি বিধবা, নিজ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে আনাইয়া খুকীর লালন-পালনের ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলাম।

এ দিকে আত্মীয়-বন্ধুরা বিবিধ প্রকারে আমায় বুঝাইতে লাগিলেন— "এই মোটে বত্রিশ বছর তোমার বয়স, সারাটি জীবন পড়ে রয়েছে, কি করে তোমার কাটবে? তোমার দিদিই বা নিজের সংসার ছেড়ে কত দিন তোমার কাছে থাকতে পারবেন? বিমাতা হলেই যে একটি আস্ত রাক্ষসী হবে, এমনই বা কি কথা? সে রকম হয় কারা? যারা ছোটলোকের ঘরের মেয়ে। ভদ্রবংশের একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে করে আন, সে তোমার মেয়েকে নিজ সন্তানের মতই লালন পালন করবে---তোমার সংসার বজায় রাখবে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত আট মাস থাকিয়া, দিদিও ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কি করি, অগত্যা বিবাহই করিয়া ফেলিলাম।

দিদি নববধূকে সংসার বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহাকে ঘরে আনিলাম, তিনি মাতৃবৎ স্নেহাদরেই আমার খুকীকে বুকে তুলিয়া লইলেন। এপক্ষেও আমার দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

পুত্র তিনটি আপনাদের আশীর্ব্বাদে জীবিতই আছে, কিন্তু কন্যা দুইটিকে তাহাদের শৈশবই যমের মুখে তুলিয়া দিয়াছি।

॥ ২ ॥

এক মাস কাটিয়া গেল, জামাতার কোনও সংবাদ নাই। গত পূর্ণিমা-রাত্রিতে বাবা সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়াছি। গৃহিণী স্থানীয় কালী-মন্দিরে মানত করিয়াছেন, জামাতা ফিরিলেই জোড়া পাঁঠা দিয়া মার পূজা করিবেন। পাড়ার বর্ষীয়সী জ্ঞানদা-ঠাকুরাণী প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া গৃহিণী ও খুকীকে "নীলকুল বাসুদেবের কথা" শুনাইয়া যাইতেছেন—আমিও শুনিতেছি। ইহার ফলশ্রুতি এই প্রকার--- "ধন না থাকলে তার ধন হয়, পুত না থাকলে তার পুত হয়, বন্দী থাকলে ছাড়ান পায়, দূরের সুসমাচার নিকটে আসে।"—জ্ঞানদা-ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, ইহা একেবারে অব্যর্থ,—এই কথা শুনাইয়া, অনেক গৃহস্থকে তিনি চিঠি আনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছেন,—তবে ভক্তি থাকা চাই।

কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি নিজে একবার কলকাতায় গিয়ে সন্ধান কর। বাসার ছেলেরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় গেছে. বেয়াইয়ের মামার

কাছে সে কথা তারা গোপন করেছে! তাদের বাবু-বাছা ব'লে খোসামোদ করে কথা বের করে নাও গে। মেয়েটার মুখপানে ত আর তাকানো যায় না?"

অদ্য আহারাদির পব কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। গরুর গাড়ীও বলিয়া রাখিয়াছি।—বেলা তখন এগারোটা স্নানের পূর্ব্বে বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল, বাঁড়ুয্যেদের পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর উঠান দিয়া, লাল পাগড়ী মাথায় ব্যাগ কাঁধে পিয়ন আসিতেছে। একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম—দেখি এই দিকেই আসে কি না। বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল।—এই যে, এই দিকেই যে আসে!—পিযন আসিয়া প্রণাম কবিল। তার পর হস্তস্থিত একগোছা চিঠির মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি আমার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। খামের চিঠি।

আমি তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে চশমা আনিয়া চোখে দিয়া ঠিকানা পড়িলাম। জয় বাবা সত্যনারায়ণ! জয় বাবা নীলকুল বাসুদেব! খুকীর নামে চিঠি, জামাতার হস্তাক্ষর! কোথা হইতে লিখিল, জানিবার জন্য টিকিটের উপরকার ছাপটা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তেল-কালী, এমন ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বাবাজী যে প্রাণগতিকে ভাল আছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ মনে করিয়া, দ্রতপদে বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে ডাকিলাম। তিনি আসিলে হাসিমুখে বলিলাম, "বাবা সত্যনারায়ণ, বাবা নীলকুণ্ঠ বাসুদেব মুখ তুলে চেয়েছেন। এই নাও তোমার জামাইয়ের চিঠি, খুকীকে দাও গে। আর তাকে জিজ্ঞাসা ক'বে এসে আমায বল, জামাই কোথা আছেন, কেমন আছেন, কবে বাড়ী আসবেন। আমি ঘরে গিয়ে বসছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন,—তাঁহাব মুখখানি গম্ভীর, চোখ দুটি ছলছল করিতেছে, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার সমস্ত আনন্দ উৎসাহ কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ভীতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিযা রহিলাম।

গৃহিণী চিঠি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

বলিলাম, "কেন? জামাই লিখেছেন মেয়েকে চিঠি, আমি পড়বো কেন?"

'পড়, দোষ নেই। আমিও পড়েছি। মেযে ত চিঠি পড়েই আছাড খেযে পড়েছে। আমায় বললে 'মা, চিঠি বাবাকে দেখাও, যা করতে হয়, তিনি করুন'।"

কম্পিত হস্তে খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িলাম। পড়িয়া আমাব মাথা ঘুরিয়া গেল, চোখে অন্ধকার দেখিলাম। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"সাধ্বি!"

আমি মাসখানেক নানা গুরুতর কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমাব চিঠি লিখিবাব তিলমাত্র অবসর পাই নাই।

আমরা কয়েক জন যুবক মিলিয়া সন্তানধর্ম্ম অবলম্বন কবিযাছি। তুমি আনন্দমঠ পড়িয়াছ কি না জানি না, যদি পড়িযা থাক, তবে সন্তান কাহাকে বলে, তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছ। জননী জন্মভূমিকে পরধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই সন্তানের জীবন-ব্রত। কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" নামে আমরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিতেছি, আমার অনুরোধ, বাবাকে বলিয়া তুমি তাহার গ্রাহক হইয়া নিয়মিতভাবে উহা পাঠ করিবে।

আমি দল গঠন করিয়া আপাততঃ গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার কবিতে বাহির হইয়াছি। কবে কোথায় থাকি, কিছুরই স্থিরতা নাই। যে স্থান হইতে এই পত্র তোমায় লিখিতেছি, কল্যই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

মা'র শৃঙ্খল যত দিন না ভগ্ন করিতে পারি, ততদিন আমাদের গৃহ-সংসার নাই, পিতামাতা নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল দেশ। (আনন্দমঠ দেখ) এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদ্‌যাপন করিতে পারি, তবেই গৃহে ফিরিব, তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে, আবার আমি সংসারী হইব, নচেৎ এই শেষ তুমি আমার সহধর্ম্মিণী,

আমার বিশ্বাস আছে যে, ধর্ম্মপথে তুমি আমার সহায় হইবে, বিঘ্নরূপিণী হইবে না। বিভুপদে সতত প্রার্থনা করিবে, যেন আমাদেব উদ্যম সফল হয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ব্রত উদ্‌যাপনান্তে একদিন গৃহে ফিবিতে পারি। ইতি---

দেশমাতার সন্তান
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

পুনশ্চ। পত্রখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কারণ, অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী খানা-তল্লাসী হওয়া বিচিত্র নহে।—পত্র পড়িয়া গৃহিণীর হস্তে উহা ফেরত দিয়া, দুই হাতে দুই রগ্ টিপিয়া, বালিস বুকে দিয়া, কিছুক্ষণ আমি শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও দেহ হইতে দর-দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। "ও মা, কি বিপদ হলো গো! বিপত্তে মধুসূদন! বিপত্তে মধুসূদন!"---বলিতে বলিতে গৃহিণী আমায় পাখাব বাতাস করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেক আমি একটু সামলাইয়া উঠিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম 'তুমি মেয়ের কাছে যাও, এখানে কি করছ? তাকে সামলাও গে।"—গৃহিণী চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত দিন মনে মনে আশা ছিল, বেহাই-মহাশয সাহেবদের প্রিয়পাত্র অনুগত লোক,---ছেলেটা বি-এ পাস কবিলে সাহেবদের ধরিয়া তাহাকে তিনি একটা ডেপুটি করিয়া দিতে পারিবেন। অন্ততঃপক্ষে আই-এ পাসেব পর মুন্সেফী পদ দেওয়াইতে পারিবেন, মেয়ে আমাব হাকিমের পবিবাব হইবে। সে সব আশা-ভরসা সমস্তই ফর্সা হইযা গেল!

ক্রমে মনে ক্রোধের সঞ্চাবও হইল। তোর কি বাপু সমস্তই অদ্ভুত? স্বদেশীয় হয়ে একেবারে গৃহত্যাগ? কেন রে বাপু, এত বাড়াবাড়ি কেন? যা রয বসে, তাই করলেই ত হয়! স্বদেশী হয়েছিস, বেশ ত! মাযের দেওযা মোটা কাপড় পর্, দেশী চিনি, করকচ নুন ব্যাভার কর, বিড়ি খা---কেউ ত মানা করছে না। একেবারে গৃহত্যাগ, পত্নীত্যাগ! তাই যদি তোব মনে ছিল, তবে এক ভদ্রকন্যাকে বিবাহ করে তাকে সর্ব্বনাশ কবলি কেন?

তখন মনে পড়িল যে, বিবাহেব সময এরূপ মনোভাব তাহাব ত ছিল না! স্বদেশীর ঢেউ ত পূর্ব্বাবধিই উঠিয়াছিল। বিবাহে, পূজার তত্ত্বে, বিলাতী জুতা, সিল্কেব বিলাতী ছাতা, বিলাতী সাবান, এসেন্স প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য ত তাহাকে উপহার দিয়াছি। সে সব ত হাসিমুখে সে গ্রহণ কবিয়াছে ও ব্যবহাব করিযাছে দেখিয়াছি। তবে এবার কলিকাতায় ফিরিয়া সে এমন উৎকট স্বদেশী হইযা উঠিল কি করিয়া?---এ অবস্থায় আমি আর কলিকাতায় গিয়া কি কবিব? তাব চেয়ে বরং রাজসাহী গিয়া বৈবাহিকেব সঙ্গে দেখা করিয়া, এ বিপদে কি উপায অবলম্বন কবা যাইতে পাবে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে সেই কথাই তাঁহাকে বলিলাম, তিনিও এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। গরুর গাড়ী পূর্ব্বেই বলা ছিল। স্নানাহার সারিযা, দুর্গা বলিয়া রাজসাহী যাত্রা করিলাম।

॥ ৩ ॥

যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন ঈশ্বরদি হইতে রাজসাহী যাইবার রেল খুলে নাই। নাটোরে নামিয়া অশ্বযানে বত্রিশ মাইল অতিবাহিত করিয়া রাজসাহী যাইতে হইত। রাজসাহীর উকীলবাবুরা একটা কোম্পানী গঠন করিয়া, যাতায়াতের জন্য কতকগুলি অশ্বযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলেব ব্যবস্থা ছিল।

নাটোরে নামিয়া, অশ্বযানে আরোহণ করিযা যখন রাজসাহী গিয়া পৌঁছিলাম, বেলা তখন চারিটা, বৈবাহিক-মহাশয় তখনও কাছারী হইতে ফিবেন নাই। তাঁহার পুত্রেরা অতি সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল। হাত-মুখ ধুইয়া, ডাব ও সরবৎ পান করিয়া বৈঠকখানা-ঘরে আরাম-কেদারায় পড়িয়া আমি বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

সাড়ে পাঁচটায় বৈবাহিক-মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া কাছারীর বেশেই আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। অদ্য প্রভাতে প্রাপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইলাম।

পড়িয়া বলিলেন, তিনিও গতকল্য পুত্রের নিকট হইতে ঐ ধরনের একখানি চিঠি পাইয়াছেন। বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, বোসো তুমি, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে এই ধড়া-চূড়াগুলো ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দিয়ে আসি। অনেক কথা আছে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অর্দ্ধঘন্টা পরে তিনি আমায় অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তেতলার একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ধূমপান করিতেছিলেন আমি সেইখানে গিয়া বসিলাম। তিনি আমার হাতে গুড়গুড়ির নলটি দিয়া বলিলেন, "আমার কি হয়েছে ভাই জান? চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কাউকে আমার বলবারও উপায় নেই যে, ছেলে আমার সন্তান হয়েছে—গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে বেরিয়েছে। কথাটা প্রকাশ হলেই ক্রমে সাহেবদের কাণে গিয়ে উঠবে, তখন আমার চাকরি বজায় রাখাই হবে দায়।"—বলিলাম, "এখন কি উপায় হবে বেয়াই-মশাই? কোথায় সে আছে, জানতে পারলে না হয় সেখানে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়া যায়, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যায়।"

বেহাই বলিলেন, "চিঠিখানা ত লিখেছে পাবনা জেলার চন্দ্রপুর পোষ্ট অফিস থেকে। অন্ততঃ ছাপ থেকে যা বোঝা গেল।"

"ছাপ ত আমিও পরীক্ষা করেছিলাম, কালীর ধ্যাবড়া, কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"আমার চিঠিতে ছাপটা অত অস্পষ্ট নয়—দাঁড়াও, চিঠিখানা বের করি।"—বলিয়া বেহাই লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্যে হইতে চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পত্র পড়িয়া দেখিলাম, আমার কন্যার পত্রে যে সব কথা ছিল, সেই সব কথাই আছে, কেবল ভাষার একটু এদিক ওদিক। ছাপ দেখিলাম, কয়েকটা মাত্র অক্ষর পড়া গেল—চন্দ্রপুর হইতে পারে।

এই সময় ভৃত্য দুই পেয়ালা চা আনিল। বেহাই এক পেযালা আমাব হাতে দিযা বলিলেন, "এখন কিছু খাবে, ভাই? দু-এক টুক্‌বা ফল-টল , দুই-একটা মিষ্টি টিষ্টি?"

আমি বলিলাম, "না ব্যাই-মশাই,—এই ত ঘন্টাখানেক আগে জল খেয়েছি। এখন আর কিছু নয়। ছেলের সম্বন্ধে কি উপায় ঠাওরালেন?"

বলিলেন, "মাথা-মুন্ডু কি আর ঠাওরাব বল? চন্দ্রপুর কোথা, তাও ত জানিনে। কাল ঐ চিঠি পেয়ে, মামাকে পাবনা পাঠিয়ে দিয়েছি। পাবনায় গিয়ে প্রথমে সে খবর নেবে, চন্দ্রপুর কোথা। তারপর চন্দ্রপুরে গিয়ে সন্ধান নেবে, সেখান থেকে সেই দল কোথা গেছে। এই রকম করে যদি তাদের ধরতে পারে।"

"এই মামাটি কে, সেই, যাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন? আপনার কি রকম মামা ইনি?"

"দূর-সম্পর্ক। সম্বন্ধ মামা হলেও, আমার চেয়ে অন্ততঃ বছর দশেকেব ছোট। দেশে থাকতো, অবস্থা খারাপ, এখানে আমার কাছে আসে চাকরির চেষ্টায়। চাকরি-বাকরী কিছু জুটিয়ে দিতে পারিনি, তবে জজ-আদালতের নকল-সেরেস্তায় বলে দিয়েছি, ঠিকেঠাকা কাজ করে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। বাকী সময় টাউটগিরি করে উকীলদের কাছে মক্কেল ধরে নিয়ে যায়, ফীয়ের টাকা থেকে কিছু কিছু কমিশন পায়। লোকটা খুব চালাক চতুর আছে।"

"তার কথা কি ছেলে মানবে?"

"ছেলের গর্ভধারিণী অনেক কাঁদাকাটি করে এক চিঠি লিখে দিয়েছেন, সেই চিঠি মামা নিয়ে গেছে। কিন্তু ধরতে পারলে তবে ত!"

সকল দিক চিন্তা করিয়া, মামা না ফেরা পর্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করিব স্থির করিলাম। পরদিন সকল কথা বর্ণনা করিয়া বাড়িতে পত্র লিখিয়া দিলাম।

চারদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিলেন। ছেলের দেখা পান নাই, তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐ পত্র লেখার তারিখ হইতে তিন দিন পরে, সেই স্বদেশীর দল রেলে

উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। স্টেশনে গিয়া টিকিট আফিসেও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

বৈবাহিক বলিলেন, "যাক আর ভেবে কি হবে? অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এখন বাবাজী যদি কেবলমাত্র স্বদেশী প্রচার করেই ক্ষান্ত হন, তা হলেও রক্ষে। কিন্তু ঐ যে লিখেছে অদূর ভবিষ্যতে বাড়ী সার্চ্চ হওয়া বিচিত্র নয়, এ থেকে ভয় হয়, হয় ত স্বদেশী ডাকাতি-টাকাতি করারও মৎলব আছে। তা হলেই ধরাও পড়বেন, আর বছর চার পাঁচ শ্রীঘরে বাস। কয়েক স্থানেই ত স্বদেশী ডাকাতি হয়ে গেছে—ওঁরা ঐ রকম করেই ত দেশ উদ্ধার করার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন কি না! আজকাল এ সব বিষয়ে গভর্ণমেন্টের খুব করা নজর। মহকুমায় মহকুমার থানায় থানায় সার্কুলার গেছে"—ক্ষুণ্ন মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাবাজী গ্রেপ্তার হইলে সে কথা খবরের কাগজে বাহির হইবে। বাড়ী আসিয়াই তাই কলিকাতার দৈনিক বসুমতী সংবাদপত্রের গ্রাহক হইলাম। কাগজের ঠিকানা প্রভৃতি রাজসাহী হইতেই টুকিয়া আনিয়াছিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্বদেশীওয়ালাদের কর্তৃক খুন বা ডাকাতির সংবাদ বাহির হয়। খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদন্ডের কথার ত বিরাম নাই। খবরের কাগজের মোড়ক খুলিবার সময় আমার হাত কাঁপে—খুলিয়াই হয় ত দেখিব, খুন বা ডাকাতি অপরাধে আমার জামাই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র কাটিল, বৈশাখ আসিয়া পড়িল। একদিন এক ভীষণ সংবাদ পাঠ করিলাম। মজঃফরপুরের উকীল কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা, স্থানীয় জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে রাত্রে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কে বা কাহারা সে গাড়ীতে বোমা মারিয়া কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে মেমদ্বয়কে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে—জোর পুলিশ-তদন্ত চলিয়াছে। পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। হা রে ভ্রান্ত নির্ব্বোধ পাষণ্ডগণ! এইরূপ মহাপাপ করিয়া তোরা দেশ উদ্ধার করিবি? সেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, পাপের ফল কি কখনও শুভ হইয়াছে, না হইতে পারে?—পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, আমার জামাই যদি এই দলে থাকে, তবেই ত সর্ব্বনাশ! ধরা পড়িলে ফাঁসি ত অনিবার্য্য! কাগজখানা আর বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম না, বৈঠকখানাতেই লুকাইয়া রাখিলাম, কি জানি, যদি স্ত্রী-কন্যার চোখে পড়ে।

ক্রমে জানিতে পারিলাম, দুই জন হত্যাকারী ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন নিজেকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ক্ষুদিরাম বসু নামক এক যুবকের, বিচারে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।—ইহার কিছুদিন পরেই কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার মুরারীপুকুর বাগানে পুলিশ এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে, ঐ ব্যাপারে দেশব্যাপী খানাতল্লাসী চলিতেছে, আরও কত লোক ধরা পড়িবে—ঈশ্বর জানেন, আমার জামাইও সেই দলে ছিলেন কি না। দুশ্চিন্তায় আমার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ হইল। খবরের কাগজ খুলিয়া প্রথমেই ধৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাঠ করি। সে দলে আমার জামাই ছিল, পুলিশ যদি ইহা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে বৈবাহিকের বাড়ী ত তল্লাস হইবে নিশ্চয়, আমার বাড়ীও হইতে পারে।—দুর্গানাম জপ করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ধৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আমার জামাতার নাম দেখিলাম না, আমার বাড়ীও তল্লাস হইল না। তখন কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলাম।

॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় পক্ষে আমার বিবাহ মৈমনসিংহ জিলায় হইয়াছিল। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার শ্বশুর কালীচরণ সরকার মহাশয় সেই গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র

অবিনাশবাবু গৃহে বসিয়া বিষয়সম্পত্তি দেখেন, মধ্যম আশুতোষবাবু মৈমনসিংহ বারের একজন প্রধান উকীল, কনিষ্ঠ হবেন্দ্রবাবু জামালপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর।

আষাঢ় মাসে আমার মধ্যম শ্যালক আশুবাবুর নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম—৫ই শ্রাবণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ। বিবাহ-কার্য্য পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া সম্পন্ন করিবেন। সপবিবাবে যা৾ৼবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

সাত আট বৎসর হইল গৃহিণী পিত্রালয়ে যান নাই সে কারণেও বটে, সকলেরই মন খারাপ, গোলমালে আনন্দ-উৎসবে কয়েকদিন মনের ভার কিছু লঘু হইবে সে আশাতেও বটে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াই স্থির করিলাম।—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দ, বাল্যকালে একবার মাতুলালয়ে গিয়াছিল, মধ্যম হাবু ও কনিষ্ঠ বাদল মামার বাড়ী কখনও দেখে নাই—মামার বাড়ী যাইবার আনন্দে তিনজনেই নৃত্য করিতে লাগিল। যথাদিনে আমরা যাত্রা করিলাম।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে গৃহখানি ভরিয়া গিয়াছে। পরদিন বিবাহ হইযা গেল, তৎপরদিন জামাই-মেয়ে বিদায় করিয়া গৃহ বিষাদের ছায়ায় ডুবিল।

আহারান্তে কনিষ্ঠ শ্যালক হরেন্দ্রবাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার এলাকায় স্বদেশী হাঙ্গামা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। বলিলেন, "আমাদের হয়েছে দাদা, শাঁখের কবাত। স্বদেশীওয়ালারা মনে করে, পুলিস তাদের পরম শত্রু। আবার গভর্ণমেন্ট মনে করেন, আমরা তলে তলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সহানুভূতি করি।"

এই প্রসঙ্গ যখন উঠিল, হরেনকে আমার জামাইয়ের সকল কথাই বলিলাম। আমরা কিরূপ উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেছি, তাহাও জানাইলাম।

হরেন বলিল, "আপনার জামাইয়ের নামটি কি? সে রাজসাহীর গভর্ণমেন্ট প্লীডারের ছেলে না?"—উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম। হরেন বলিল, "আমার এলাকায় ও নামের কোনও স্বদেশীওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, থানায় গিয়ে লিষ্টখানা দেখতে হবে। চারিদিকে পুলিসের গোয়েন্দা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফি হপ্তায় প্রত্যেক থানা থেকে রিপোর্ট আসছে। গভর্ণমেন্টের একেবারে কড়া হুকুম।"

হরেন মাত্র তিন দিনের ছুটী পাইয়াছিল। আগামী কল্যই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বলিল, "দাদা, এক কাজ করুন না। বেরিয়েছেন যখন, একটু ভাল করে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে নিন না। চলুন না জামালপুরে। আমার ওখানে হপ্তাখানেক থেকে, তারপর বাড়ী যাবেন।"

আমি সম্মত হইলাম। বিশেষ, জামালপুর মহকুমার লিষ্টিতে আমার জামাইয়ের নাম উঠিয়াছে কি না, তাহাও দেখিতে পাইব।—হরেন বলিল, "আমি ত ফিরবো ঘোড়ায়। আপনি দিদিকে নিয়ে, আপনার ছোট শালাজকে নিয়ে নৌকায় আসুন। ঘুরে ঘুরে যেতে হবে, পৌঁছতে দেরী হবে বটে, কিন্তু জলপথে বেশ আনন্দ পাবেন।"

এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।—পরদিন হরেন প্রস্থান করিল। আশুবাবু মৈমনসিংহ ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। মেয়ে অষ্টমঙ্গলার পর যোড়ে ফিরিয়া আসিলে, জামাই-মেয়ে লইয়া তিনি মৈমনসিংহ যাইবেন। তাঁহার অনুরোধে, আমরা আর দুই দিন গোবিন্দপুরের বাটিতে অবস্থান করিলাম।

গোবিন্দপুর গ্রাম নন্দিনী নাম্নী একটি ছোট নদীর তীরে অবস্থিত। ঘাটে ভাউলে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, বজরাও দুই চারিখানি আছে, কিন্তু যাত্রার দিন বজরা একখানিও পাওয়া গেল না। বজরাগুলি বেশ বড় বড় হয়। তাহার ভিতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামরা সকল থাকে, অনেক লোক ধরে, বেশ আরামে যাওয়া যায়। অগত্যা দুইখানি ভাউলে ভাড়া করা গেল, কারণ একখানিতে দুইটি পরিবারের সঙ্কুলান হইবে না। সকলে মিলিয়া একত্রে বজরায় যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল, সে সুযোগ না হওয়াতে উভয় গিন্নী গজ্‌গজ্ করিতে লাগিলেন।

একদিন এক রাত্রি নন্দিনী বাহিয়া গিয়া, অবশেষে আমরা বংশজ নদীতে পড়িলাম। এই বংশজ নদী, মধুপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই নদী জামালপুর অবধি গিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।---বংশজ নদী দিয়া কয়েক ঘন্টা গিয়া যে বন্দরে আমরা সন্ধ্যার মুখে পৌঁছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম, একটি বজরা খালি হইতেছে। এক মাড়োয়ারী মহাজন নদীপথে নানাস্থানে গিয়া চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছিল, জামালপুর অবধি তাহার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না, সেইখানে নামিয়া সে বজরা ছাড়িয়া দিল। জামালপুর তখনও এক রাত্রি ও অর্দ্ধ দিনের পথ। গৃহিণীদের আগ্রহে, সেইখানেই আমরা ভাউলে দুইখানির ভাড়া মিটাইযা দিয়া সেই বজরা লইলাম। আকাশে মেঘ ছিল না, ত্রয়োদশীর চন্দ্র উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতেছিল, মাঝি সানন্দে বজরা ছাড়িয়া দিল।

॥ ৫ ॥

রাত্রি ১০টায় আহারাদি শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করা গেল। অনেক রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিযা গেল, গরমে আর ঘুম আসিতে চাহে না। আমি বিছানা ছাড়িয়া বজরার ছাদে উঠিয়া বসিলাম।—উভয় তীরে ঘন জঙ্গল। চন্দ্রালোকে সেই জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘন্টাকাল এইরূপে কাটিল, সহসা জঙ্গল হইতে দুইবার বন্দুক ডাকিল---দুরুম্ দুরুম্।—জঙ্গলের কোলে অন্ধকারে দুইখানা ছিপ বাঁধা ছিল, সেই ছিপ দুখানা সন্‌সন্ করিযা আমাদের বজরাব দিকে আসিতে লাগিল। "ডাকাত পড়িছে কর্ত্তা"—বলিয়া মল্লাগণ দাঁড় ফেলিয়া ঝুপঝাপ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

বিপদ গণিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিযা আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। এক মিনিট পরেই ডাকাইতরা আসিয়া বজরায় উঠিল, শব্দে বুঝিতে পারিলাম। তাহারা দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "মাড়োয়ারীবাবু, এ মাড়োয়ারীবাবু, জলদি দরজা খোলো।"

মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিলাম, পূর্ব্বের সেই ধনী মাড়োয়ারীবাবুই যে এ বজরায় এখনও আছে, এই ভ্রম করিয়া ইহার বজবা আক্রমণ করিয়াছে।

তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "জলদি খোলো। কুছ ডর নেহি। রুপিয়া লেলেঙ্গে জান ছোড় দেঙ্গে।"—সাহস সংগ্রহ করিয়া কম্পিত স্বরে আমি উত্তর করিলাম, "বাপ্‌সকল, এ বজরায় মাড়োয়ারী ত কেউ নেই। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, গরিব গেরস্ত মানুষ।"

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "বলে কি রে? ভুল হল নাকি?"

এক ব্যক্তি বলিল, "না না, ভুল হয়নি, এই বজরাই বটে। কাল দুপুরবেলা থেকে আমি পিছু নিয়েছি। এ বেটা বোধ হয় সরকার-টরকার, মনিবকে বাঁচাবার জন্যে চালাকি করছে। দরজা ভেঙ্গে ফেল।"—দরজার উপর কুড়ালির ঘা পড়িতে লাগিল, শব্দে ইহা বুঝিলাম। বলিলাম, "না না বাবু, তোমাদের ভুলই হয়েছে কুড়ুল থামাও, দরজা খুলে দিচ্ছি, তোমরা ভিতরে এসে স্বচক্ষে দেখ।"

কুড়ুলের ঘা থামিল। দরজা খুলিয়া দিলাম। দুই তিনটা জ্বলন্ত টর্চ্চলাইট হাতে করিয়া দশ-বারোজন ডাকাত হুড়মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তাহারা সকলেই তরুণ বয়স্ক—এই আঠারো উনিশ, বড়জোর বিশ বাইশ—ইহার বেশী নহে। তাছাড়া চেহারা ও বেশবাশ কাহারও ডাকাইতের মত নয়, সকলেই ঠিক যেন ভদ্রসন্তান। ধুতি সকলেরই মালকোঁচা-মারা, কাহারও গায়ে কোট, কাহারও শার্ট, দুই তিনজনের চোখে সোনার চশমা, দুইজনের হাতে দুইটা পিস্তল। মনে মনে বুঝিলাম, ইহারা নিঃসন্দেহে স্বদেশী ডাকাইতের দল।—টর্চ্চলাইটের সাহায্যে সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে

লাগিল। একধারে গিন্নীরা তাঁহাদের বালকবালিকাগণকে বুকে আগলাইয়া গাদাগাদী করিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, একজন ডাকাইত তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "মা লক্ষ্মী সকল, আপনারা ভয় পাবেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই আমাদের মা, তাঁদের গায়ে আমরা হাত দিইনে, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।"

এক ছোকরা আমাকে ধমক দিয়া বলিল, "তোমরা কারা? এ বজরায় যে মাড়োযারী মহাজন ছিল, সে কোথা গেল?"

আমি বলিলাম, "আমরা মাত্র আজ সন্ধ্যেবেলা, মোল্লাগঞ্জের ঘাটে এ বজরা ভাড়া নিয়েছি, বাবা। যে মাড়োয়ারী মহাজন এতে আসছিল, সেইখানেই সে নেমে গেল কিনা। আমরা গরীব গৃহস্থ লোক, সঙ্গে টাকাকড়ি বেশী কিছুই নেই, পথ-খরচের মত সামান্য দশ বিশ টাকা আছে। এই চাবি নাও, বাক্স-তোরঙ্গ সব খুলে তোমরা দেখ বাবা।"

একজন হাত বাড়াইয়া চাবির গোছা লইল। অপর এক ব্যক্তি বলিল, "ও ড্যাম্ ইট্! দশ বিশ বি হ্যাংড। ফেলে দে চাবি। চল্ এখন স'ড়ে পড়া যাক্।"

ঠিক এই সময় বাহিরে দুইবার সিটির আওয়াজ হইল,—সেই বাঁশীগুলা, ফুটবল খেলিবার সময় যাহা বাজায়,—ভিতরে মটর না কাঁকর কি থাকে, ফর্ ফর্ করিয়া বাজে।

এই আওয়াজ শুনিবামাত্র সকলের মুখে ভীতি-চিহ্ন দেখা দিল। বাহির হইতে একজন কে বলিল, "পুলিশবোট। যারা যারা সাঁতার জান, জলে লাফিয়ে পড়।"

এ কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক যেন আমার জামাতার কণ্ঠস্বর!

পরমুহূর্ত্তে ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া কয়েকজনের জলে লাফাইয়া পড়িবার শব্দ হইল। আমি বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, দুইটা পান্সীভর্ত্তি লাল পাগড়ী—একখানাতে স্বয়ং ইন্সপেক্টর হরেন্দ্রবাবু। বজরার গায়ে পান্সী লাগিবামাত্র সকলে টপাটপ বজরায় উঠিয়া পড়িল। এক ব্যক্তি জলে লাফাইতে যাইতেছিল, হরেন্দ্রবাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যাহারা ইতিপূর্ব্বে জলে পড়িয়াছিল, তাহাদের ধরিতে পুলিশ কোনও চেষ্টা করিল না। একজন সিপাহী বড় একটা টর্চ্চলাইট জ্বালিল, অপর সিপাহীরা এক এক জনে এক এক ডাকাইতকে সজোরে জাপটাইয়া ধরিল। তাহাদেরই আলোকে আমি সভয়ে দেখিলাম, হরেনবাবু যাহাকে ধরিয়াছেন, সে আর কেহ নহে, আমারই জামাতা শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র বাবাজী!

হরেনবাবু আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? আপনি!"

আমি ইঙ্গিতে তাঁকে কথা বলিতে নিষেধ করিলাম। ভিতরে কোনও রহস্য আছে বুঝিয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধৃত আসামীদের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহার আদেশে কনেস্টবলরা প্রত্যেক আসামীকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। এক-একজনকে বাঁধিয়া, ধরাধরি করিয়া পুলিসবোটে নামাইতে লাগিল।

আমি ইসারা করিয়া হরেনবাবুকে ভিতরে ডাকিলাম। ভিতরে গিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি দাদা এ বজরায় এলেন কি ক'রে?"

বলিলাম, "সে অনেক কথা, পরে সবই বলবো। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে বাঁচাও।"

"কেন? আর বিপদ কি?"

"ঐ যে ছোকরা জলে লাফিয়ে পড়ছিল, তুমি তাকে ধরে টেনে তুললে, সেই আমার জামাই।"—হরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ, তাই নাকি? তা হলে ত বিপদ বটে।"

আমি তার হাত দুটি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলাম, "তোমার ভাগ্নী-জামাইকে, যেমন ক'রে পার, বাঁচাও ভাই।"

হরেন বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, কি করতে পারি দেখি।" বলিয়া সে বাহির হইল। আমিও তাহার পিছু পিছু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাহার আদেশ অনুসারে বাকী আসামীদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইতে লাগিল।

আমার জামাইকেও বাঁধিল। বাবাজী কাতর ভিক্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে লাগিল।

একে একে সব আসামীকে পুলিসবোটে নামানো হইল, শুধু বাকী রহিল পূর্ণ। হরেনের ইসারায় আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

পূর্ণকে লইতে দুই তিনজন কনেস্টবল বজরায় আসিল। কোনও আসামী না দেখিয়া, শুধু হরেনকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারা বোধ হয় স্থির করিল, অন্য কনেস্টবলরা তাহাকে পুলিসবোটে স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবে।—হরেন কহিল, "সব আসামী ঠিক হ্যায়?"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ হুজুর, সবকোইকো শিকলি চঢ়ায়া।"

"গিনো, কয়ঠো হুয়া?"

তাহারা গণনা করিয়া বলিল, "আঠ আসামী হুজুর।"

"আচ্ছা. ঠিক হ্যায়।"—বলিয়া হরেন তাহাদিগকে আর আব কি সব আদেশ দিতে লাগিল।

ডাকাইতগণের ছিপ দুইখানিকে পশ্চাতে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, পুলিসের পান্সী দুইখানি খুলিয়া দিল।—আমাদের বজরার মাঝি-মল্লারা বোধ হয় দূরে দূরে অন্ধকারে জলে ভাসিতে ভাসিতে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ভিজা বিড়ালের মত একে একে তাহারা আসিয়া বজরায় উঠিতে লাগিল।—হরেন ভিতরে আসিয়া স্বহস্তে পূর্ণর হাতের বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিল, "কেমন হে ছোকরা, স্বদেশী করবার সখ মিটেছে ত এখন?"

আমি বলিলাম, "আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?"

হরেন আমার পানে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "এখনি খাঁড়ার ঘা হয়েছে কি? আপনার জামাই বলে যে ছেড়ে কথা কইব, তা ভাববেন না। আমরা পুলিসের লোক, বাগে পেলে নিজের বাপকেও রেয়াৎ করিনে। থানায় নিয়ে গিয়ে প্রথম ত উত্তম-মধ্যম প্রহার। তারপর হাতে হাতকড়ি দিয়ে চালান দেবো—সাতটি বছর শ্রীঘর।"

মিনতির স্বরে বলিলাম, "ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেছে, এবার ওকে মাপ করুন—ছেড়ে দিন। আর কখ্‌খনো এমন কাজ ও করবে না।"

"ছেড়ে দেবো?—ছেড়ে দিলেই ত আবার গিয়ে ঐ সব দলে মিশবে। এবার ডাকাতি করেছে —এর পরে বোমা ফেলবে—মানুষ খুন করবে।"

বলিলাম, "না না, তা আর ও করবে না।"

হরেন বলিল, "কি হে ছোকরা,—ছেড়ে দিলে আবার এই সব করবে ত?"

পূর্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আর করিবে না।

হরেন বলিল, "শুনিলাম, ইনি তোমার শ্বশুর। আচ্ছা, এঁর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করতে পার?"—পূর্ণ ঝুঁকিয়া আমার পদস্পর্শ করিয়া হরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

হরেন বলিল, "বল, স্বদেশী দলে আর আমি কখনো মিশবো না।"

পূর্ণ শপথ করিল।

"বল, আবার কলেজে ভর্ত্তি হয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করবে।"

সে শপথও পূর্ণ করিল।

আমি তখন পূর্ণর পানে চাহিয়া বলিলাম, "বাবাজী, উনি তোমার মামাশ্বশুর হন,—তোমার শাশুড়ী-ঠাকুরুণের সহোদর ভাই। ওঁকে প্রণাম করে ওঁর পা ছুঁয়েও ঐ রকম দিব্যি কর।"—পূর্ণ তাহাই করিল।—পূর্ণর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে হরেন বলিল, "সঙ্গে ত দুটো পিস্তল ছিল, কি ভাগ্যি খুন করনি কাউকে।"

পূর্ণ সলজ্জভাবে বলিল, "আজ্ঞে গুলির সাপ্লাই ফুরিয়ে গিয়াছিল। বারুদ ত আমরা নিজেরাই তৈরী করি।"—হরেন আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা দেখুন, মাঝিমাল্লারা সব জুটেছে কি না। বজরা ছেড়ে দিতে বলুন।"

বজরা খুলিলে, আমি বলিলাম, "বাবাজীর এখন কি ব্যবস্থা করা যায় ভায়া?"

"তাই ত ভাবছি, কনস্টেবলরা সবাই ওকে দেখেছে। জামালপুরে বজরা থেকে নেমে বাসায় যাবার সময় তারা যদি ওকে চিনে ফেলে, তা হলেই মুস্কিল। একখানা উড়ো চিঠির ওয়াস্তা। এক কাজ করা যাক না। বাবাজীকে মেয়ে সাজানো যাক। পুলিস-বোট দুখানা আমাদের ঢের আগেই জামালপুরে পৌঁছে যাবে। ঘাটে দুখানা ঘোড়ার গাড়ী রাখতে হুকুম দিয়েছি। একখান্যাতে মেয়েরা,—দিদি, লীলা-টীলা যাবে এখন। সেই গাড়ীতে, বউ সেজে ঘোম্‌টা দিয়ে জামাইও উঠবে। অপর গাড়ীখানায় আপনি, আমি, ছেলেরা।"

সেই পরামর্শই স্থির হইল।

তারপর হরেনের কাছে ব্যাপার সব শুনা গেল। গোবিন্দপুর হইতে থানায় ফিরিয়াই সে গোয়েন্দার মুখে সংবাদ পায়, একজন ধনী মাড়োয়ারী অনেক টাকা লইয়া বজরা ভাড়া করিয়া নানাস্থানে চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছে। স্বদেশীর একটা দল তাহার পিছু লইয়াছে—খুব সম্ভব, ডাকাতি করাই অভিপ্রায়। হরেন তাই প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার এলাকায় বজরা প্রবেশ করার পর হইতেই বজরার পিছু পিছু তার পুলিসবোট দুখানি আসিতেছিল। মোল্লাগঞ্জ তার এলাকার বহিরে। সেখানে আরোহী বদলের খবরটা সে পায় নাই এবং দেখা যাইতেছে, স্বদেশী ডাকাইতরাও পায় নাই।

পূর্ণ বলিল, "না, আমরাও পাইনি। আমাদের লোক মোল্লাগঞ্জের বজরার ভিতর দিয়ে বাইসিক্লে চলে এসেছিল, ঘাটে ত সে যায়নি।"—হরেন বলিল, "সে মাড়োয়ারীটা বোধ হয় কি রকম করে গন্ধ পেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি মোল্লাগঞ্জে নেমে পড়েছে।"

॥ ৬ ॥

থানায় পৌঁছিয়া, হরেন আমার ও মাঝি-মল্লারগণের এজেহার লিখিয়া লইযা, পরদিন সাক্ষীস্বরূপ আদালতে হাজির হইবার জন্য আমাদের সমন ধরাইল।

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মোকর্দ্দমা উঠিলে, দশ দিনের জন্য উহা মুলতুবী হইযা গেল।—আমি এই অবসরে স্ত্রী-পুত্রকন্যা ও বধুবেশী জামাতাকে লইযা দেশে ফিরিয়া আসিলাম। জামালপুর মহকুমার এলাকা পার হইবার পর, সুযোগ বুঝিয়া, বাবাজীকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলাম—তাহাই হরেনের পরামর্শ ছিল।

জামাতাকে নিজ বাটীতেই রাখিয়া, আমি নিজে গেলাম রাজসাহীতে বেহাইকে সুসংবাদটা দিতে। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর লোক ছাড়া এ কথা কি আর কেউ জানতে পেরেছে?"

বলিলাম, "না, কারুর কাছে এ কথা যাতে প্রকাশ না হয, সেই রকম ব্যবস্থা করেছি।"

"ভাল করেছ। প্রকাশ হলে, ছেলেও যাবে, হরেনবাবুরও জেল অনিবার্য্য।"

"সে কথা সে আমায় আগেই বলেছে।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর বেহাই বলিলেন, "গ্রীষ্মের ছুটীতে পূর্ণ বাড়ী এল না কেন কেউ কেউ এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছি, সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে গেছে হাওয়া খেতে।"—"কলেজও বোধ হয় এত দিনে খুলে থাকবে।"

"আচ্ছা, তুমি গিয়ে পূর্ণকে এখানে পাঠিয়ে দাওগে। কিংবা দাঁড়াও, কাল শনিবার আছে, কাছারীর পর আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল। ছেলেকে, বউমাকেও সঙ্গে নিয়ে আসি। তারপর হপ্তাখানেক বাদে ছেলেকে কলকাতায় রেখে আসবো। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল, তা কি আর করা যাবে!"—আমি বলিলাম, "কিন্তু মেয়েকে ঘর-বসতে পাঠাবার কোনও আয়োজনই ত আমি করিনি"—বেহাই ছল-ছল নেত্রে ভারি গলায় বলিলেন, "সে সব পরে হবে এখন। যা আয়োজন করেছ, তারই ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না ভাই।"

[মাসিক বসুমতি, কার্ত্তিক ১৩৩৭]

বি-এ পাশ কয়েদী

পশ্চিমের একটি সহর। জজের আদালত, ফৌজদারী আদালত, কালেক্টরী প্রভৃতি সহরের ভিতর হইলেও, জেলখানাটি সহরের বাহিরে এক মাইল দূরে অবস্থিত। জেলার কর্ত্তা অর্থাৎ জেলরবাবু নাম ইন্দ্রভূষণ সান্যাল—বয়স চুয়াল্লিশ বৎসর। স্ত্রীর নাম মনোরমা, বয়স আটত্রিশ। ইঁহাদের দুইটি পুত্র—নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র, বয়স পনর এবং পাঁচ বৎসর। কন্যা হয় নাই।

জেলখানার ফটকের উপর দ্বিতলে জেলরবাবুর সরকারী বাসা। পশ্চাতে টানা বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে জেলখানার ভিতরটা অনেকখানি দেখা যায়। জেলরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সকালে বিকালে সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া জেলপ্রাঙ্গণে কয়েদিগণের আহার, গতিবিধি ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন।

মনোরমার বড় কষ্ট। কোনও প্রতিবেশিনী নাই যে, আসিয়া দুই দণ্ড গল্প করিবে, দুহাত তাস খেলিবে, অথবা চুলটা তাঁহার বাঁধিয়া দিবে। ডেপুটি জেলরবাবু, অ্যাসিস্টান্টবাবু, জেলের ডাক্তারবাবু—সকলেই বাঙ্গালী, ইঁহাদেরও সরকারী বাসা রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী নাই, বা থাকিয়াও নাই। ডেপুটিবাবু বিপত্নীক, অ্যাসিস্টান্টবাবুর স্ত্রী তিন মাস হইল সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, ডাক্তারবাবুর গৃহের যিনি গৃহিণী তাঁহাকে ডাক্তারবাবু স্ত্রী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, বিবাহটা তাঁহাদের গন্ধর্ব্ব মতে হইয়াছিল—কাজেই উক্ত মহিলার কোনও ভদ্রপরিবারের সহিত মেলামেশা নাই।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিত্রালয় হইতে মনোরমা এক অনাথা কায়স্থ-কন্যাকে ঝি-স্বরূপ আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে প্রায় মনোরমার সমবয়সী ছিল, তার নাম ছিল—কাতু বা কাত্যায়নী। নামে ঝি হইলেও, পূর্ব্বকালে রাজকন্যাদের যেমন "সহচরী"থাকিত, কাতু ছিল মনোরমার সেইরূপ সহচরী। উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। কিন্তু গত বৎসর কাতুর গুরুজনপদস্থ কোনও আত্মীয়ের বিনা বেতনে একটি ঝির প্রয়োজন হওয়াতে , সে ব্যক্তি অনেক স্নেহ , করুণা এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কাত্যায়নীকে পত্র লেখে এবং অবশেষে পুত্র পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যায়।—মনোরমাকে গৃহকার্য্য বেশী করিতে হয় না। বামুন আছে, চাকর আছে, তাছাড়া সরকার হইতে দুইজন জল-আচরণী কয়েদী পাওয়া যায়, তাহারা প্রাতে আসিয়া জল তোলে, বাসন মাজে, গ্রীষ্মকালে পাখা টানে। বিকালে পাঁচটার সময় তাহাদের অবশ্য আবার জেলে প্রবেশ করিতে হয়। সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম তেমন নাই, কি করিয়া মনোরমার দিন কাটে? তার স্বামী দুইখানি মাসিকপত্রের গ্রাহক—মাসের প্রথম সপ্তাহটা সেইগুলি পড়িয়া কাটে। আর বাকী সাড়ে তিন সপ্তাহ? উপন্যাস—তাও কালে-ভদ্রে দুই একখানা কেনা হয় মাত্র। সুতরাং মনোরমার বড় কষ্ট।

।। ২ ।।

জেলারবাবু প্রাতে উঠিয়া চা-পানান্তে সাতটার সময় আফিসে যান, আবার সাড়ে দশ কিংবা এগারোটায় বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করেন। তৎপরে দিবানিদ্রান্তে বেলা সাড়ে তিনটায় উঠেন এবং চারিটার সময় আবার আফিসে গিয়া দুই তিন ঘন্টা সরকারী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আজ আহারাদির পর মনোরমার যখন অবসর হইল, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

মনোরমা পশ্চাতের বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া, খোলা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া, একখণ্ড মাসিকপত্র হাতে লইয়া শয়ন করিল। চুল শুকাইবার উদ্দেশ্যেই এ সময় এভাবে

তাহার শয়ন। ভিতরের ঘরে পালঙ্কের উপর তাহার স্বামী নিদ্রিত, বড় ছেলে নগেন স্কুলে গিয়াছে, ছোট খোকা অনেক দুষ্টামি করিবার পর অবশেষে পিতার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়াছে।

মনোরমা পত্রিকার ছবিগুলি দেখা শেষ করিয়া, তার পর সূচীপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সংখ্যায় কয়টা গল্প আছে, তাহাই দেখিবার বিষয়। গল্প-সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিল, "পোড়ারমুখো কাগজওয়ালাদের একটু যদি আক্কেল আছে! কেবল প্রবন্ধ আর প্রবন্ধ, কচুপোড়া খাও! প্রবন্ধ নিয়ে ত মানুষ ধুয়ে খাবে! হাতীর মত কাগজখানা—তিনটি মোটে গল্প! এ পড়তে কতক্ষণই বা লাগবে?"--বলিয়া প্রথম গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গল্পের অর্দ্ধেকটা পড়া হইবার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা যখন আড়াইটা, তখন হঠাৎ মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কে তার পায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঠিকাদারবাবুর স্ত্রী সরোজিনী। "ও মা, তুমি!" বলিয়া মনোরমা উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কতক্ষণ এসেছ, ভাই?"

সরোজিনী বলিল, "তা প্রায় আধ ঘন্টা হবে!"

"আধ ঘন্টা চুপ করে বসে আছ? আমায় জাগালে না কেন?"

"আহা অকাতরে শুয়ে ঘুমুচ্ছ, তুলতে মায়া হল, শেষে যখন দেখলাম, ঘুম আর ভাঙ্গে না, তখন কি করি, অগত্যা পাপ কাজটাই করে ফেললাম। তা দিদি, খবর সব ভাল ত? ছেলেপিলে ভাল আছে? দশ বারো দিন আসতে পারিনি, মেঝ ছেলেটার জ্বর হয়েছিল।"

মনোরমা বলিল, "ফটিকের জ্বর হয়েছিল? কি জ্বর? কেমন আছে, এখন বেশ সেরে উঠেছে ত?—সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, এখন সেরে উঠেছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। সর্দ্দি-জ্বরই হয়েছিল, তবু ভাবনা ত কম হয়নি। চাব দিন হল জ্বরটা ছেড়েছে, কাল দুটি মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। তোমাদের খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ ভাই, আমরা ভালই আছি। বোসো একটু, চোখে-মুখে জলটা দিয়ে আসি। এই মাসিকপত্রখানা ওল্টাও ততক্ষণ।"—বলিয়া মাসিকপত্র নবাগতাব হাতে দিয়া মনোরমা উঠিয়া গেল।—সরোজিনী মাসিকপত্রের ছবিগুলো দেখা শেষ হইলে, কাগজ রাখিয়া বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়া জেলের প্রাঙ্গণের দৃশ্য দেখিতে লাগিল,—বিশেষ দেখিবার তখনও যদিও কিছু ছিল না। কয়েদীরা সব বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছে, কেবল চারিজন কয়েদী প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ পুষ্করিণী হইতে ঘড়া-ঘড়া জল তুলিয়া বাঁকে ঝুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, আবার খালি ঘড়া লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

সরোজিনীর স্বামী ভূতনাথবাবু এই জেলের ঠিকাদার। কয়েদীদের আহারের জন্য চাউল, দাইল, নুন, তেল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই তিনি সরবরাহ করিয়া, মাসান্তে জেলরবাবুর নিকট তাঁহার বিল দাখিল করেন। সরকারী হুকুমে অনুসারে জেলরবাবুকে প্রতি রবিবারে সহরে গিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদির বাজার-দর জানিয়া আসিতে হয়, তজ্জন্য তিনি গাড়ীভাড়া পাইয়া থাকেন। তিনি সেই জ্ঞান অনুসারে ঠিকাদারবাবুর বিল সংশোধনান্তে উহা পাস করেন। সুতরাং জেলরবাবুর উপর ঠিকাদারবাবুর অসীম ভক্তি। দেখা হইলেই আভূমি নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করেন এবং অপর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে, কারণে অকারণে জেলরবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, ধার্ম্মিকতা , এমন কি তাঁহার আকৃতি অবয়বের পর্য্যন্ত অজস্র প্রশংসা করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "কি বলেন মশাই, অ্যাঁ? আমি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বলছি?" এ-দিকে আবার ঠিকাদার-গৃহিণীও, জেলর-গৃহিণীকে "দিদি" বলিতে অজ্ঞান। বাড়ীতে গাই আছে, খাঁটি দুধের ছানা কাটিয়ে সন্দেশ করিয়া আনিয়া দেয়, কুল পাকিলে কুলের আচার, কাঁচা আম উঠিলে কাসুন্দি ও আম-তেল প্রস্তুত করিয়া উপহার দেয়। বাজার হইতে উত্তম বোম্বাই আম কিনিয়া আনিয়া মনোরমাকে

দিয়া বলে 'দেশ থেকে এসেছিল, আমাদের বাগানের আম।' বাঙ্গাল দেশের মেয়ে, ভাল সৌখীন কাঁথা সেলাই করিতে জানে, এবার জেলর-গৃহিণীর সন্তান সম্ভাবনা হইলে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিবে, বলিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে মনোরমা পানের ডিবা ও দোক্তার কৌটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পান কটা সেজে আনতে দেরী হয়ে গেল, ভাই। চাকর-বাকরদের সাজা পান আমার মুখে রোচে না জানই ত?"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি বইকি, দিদি। কি চমৎকার যে তোমার পান সাজা! যে খেয়েছে, সেই জানে। উনি কি বলেন জান? উনি বলেন, আমি এই যে কাজকর্ম্ম না থাকলে নিত্যি জেলরবাবুর বাড়ী যাই, সে কেবল গিন্নীঠাকুরুণের সাজা পান খাবার লোভে। আমায় বলেন, তুমি তাঁর কাছে ঐ রকম পাণ-সাজা শিখে এস না কেন? দিও ত দিদি দু এক দিন দেখিয়ে।"—"আচ্ছা দেবো"—বলিয়া মনোরমা মুচকি হাসিল। কারণ, নিজ হাতে পাণ সে নিজের জন্যই সাজিয়া থাকে। অতিথি অভ্যাগত ত দূরের কথা, স্বামীর পানও সে কদাচিৎ সাজে, কিন্তু সরোজিনী অপ্রতিভ হইবে বলিয়া সে আর তাহা প্রকাশ করিল না। পান ও দোক্তা সেবন করিতে করিতে দুইজনে গল্প করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর সরোজিনী বলিল, "ভাল কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের বাড়ীর পাশে যে উকীলবাবু আছেন না—কেদার ভট্টাচায্যি—তাঁদের দেশ থেকে একজন অনাথা স্ত্রীলোক এসে রয়েছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, জাতে ব্রাহ্মণ। তার তিন কূলে কেউ নেই, দেশে থাকতে খেতে পেত না, এখানে এসেছে—যদি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা রাঁধুনি-গিরি কাজ-কর্ম্ম জোটে। উকীলবাবুর বাড়ীতে আমি ত প্রায়ই যাই কিনা, উকীলবাবুর বউ, মেয়েরাও আমাদের বাড়ী আসে যায়। তোমাদের সব কথাই আমি তাদের বলেছি ত! তাই উকীলবাবুর পরিবার সে-দিন বললে, তুমি ত জেলরবাবুর বাসায় প্রায়ই যাও, জিজ্ঞাসা কোরো না তাঁদের, তাঁরা যদি মেয়েটিকে রাখেন।"—মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা ত?"

"না, বিধবা কেন হবে? সধবা। কিন্তু স্বামী তার থেকেও নেই। সন্ন্যাসী হযে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চ'লে গেছে, কোনও খোঁজ-খবর নেই।"

"কত দিন নিরুদ্দেশ হয়েছে?"

"তা দিদি আমি জিজ্ঞাসা করিনি। পাঁচ-সাত বছর হবে বোধ হয়। না, অত হবে না,—তার কোলে একটি ছেলে, তার বয়স চার বছর।"

"ছুঁড়ীর বয়স কত?"

"আমার চেয়ে ছোটই হবে। এই—আঠাবো-উনিশ বোধ হয়। বললে, এটি তার প্রথম সন্তান নয়—আর একটি হয়েছিল, সেটি ছ মাসের হয়ে মারা গেছে।"

মনোরমার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে "আহা" শব্দটি বাহির হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "মানুষটা নষ্ট-দুষ্টু নয় ত?"—সরোজিনী বলিল, "তা কি ক'রে জানবো দিদি? সে নারায়ণই জানেন। কিন্তু দেখে ত নষ্ট-দুষ্টু বলে মনে হয় না। খুব ঠাণ্ডা, মুখে কথাটি নেই, চোখ দুটি সদাই ছল্‌ছল্ করছে। তাছাড়া ধর নষ্ট-দুষ্টুই যদি হত, রাঁধুনিগিরি করতে আসবে কেন? ভরা সোমত্ত বয়স, দেখতেও মন্দটি নয়!"

"নাম কি তার?"

"মোক্ষদা।"

"কোথায় বাড়ী বললে?"

"ঐ যে উকীলবাবুদের বাড়ী যেখানে। বরিশাল জেলার কোন্ একটা গ্রাম—নামটা মনে আসছে না।"—মনোরমা একটু ভাবিয়া বলিল, "একদিন নিয়ে এসো না তাকে সঙ্গে ক'রে—দেখি মানুষটা কেমন। কর্ত্তার মতটাও জিজ্ঞাসা ক'রে রাখি। তাকে আমরা রাখবো কি রাখবো না, সে-কথা এখন থেকে কিছু ব'লে দরকার নেই।"

সরোজিনী বলিল, "বেশ,—তা কবে আনবো বল? তাকে শুধু বলবে এখন চল এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।"—মনোরমা বলিল, "কাল কি পরশু যে দিন হয় নিয়ে এস।"

"বেশ, পরশুই তাকে আনবো তা হলে।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর সরোজিনী বিদায় গ্রহণ করিল।

রাত্রিতে শয়নের পূর্বে মনোরমা স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িল।

ইন্দ্রবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বাম্‌নীর কাজ খুঁজছে, তা বামুন ত তোমার রয়েছে, কি করবে সে?"

মনোরমা কহিল, "রান্না-বান্নার কাজই যে তাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, তা নয। ঘরকন্নার অন্য সব কাজও ত আছে। এই বিদেশে পড়ে আছি, একটা মানুষ-জন নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই, দুটো কথা কোয়েও ত বাঁচবো।"

ইন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তোমাব একটি সহচরীর দরকার, তাই বল!"

মনোরমা কহিল, "সে তুমি যাই বল। তার পর বামুনঠাকুরের যদি দুদিন অসুখ বিসুখই হল, বামুনের মেয়ে, তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। হল বা ছোটখোকাকে স্নানটা করিয়ে দিলে। এই রকম সব কাজ আর কি! তার পর ধর, যা সন্দেহ করছি, তাই যদি শেষে দাঁড়ায়—"বলিয়া মনোরমা লজ্জায় অবনতমুখী হইল।

ইন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। ছোটখোকা হবার সময় কাতি ধাই ছিল, তাই অনেক উপকার পাওয়া গিয়েছিল। আচ্ছা, তুমি ত তাকে আসতে বলেছ। আসুক, তাব সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে দেখ, তার পর যা বিবেচনা হয় করা যাবে।

।। ৩ ।।

মোক্ষদা আসিলে, তাহাকে দেখিয়া, তাহাব সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার ভাবি পছন্দ হইয়া গেল। সরোজিনী বলিয়াছিল, তাহার বয়স আঠাবো-উনিশ, কিন্তু মোক্ষদা নিজে বলিল, তাহার একুশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাইশ চলিতেছে। পাড়া-গাঁযের মেযে হইলেও, কথায়-বার্ত্তায় বেশ সভ্য-ভব্য, আর, একটু লেখাপডা-জ্ঞানও আছে। বলিল, বাল্যকালে সে স্কুলে পড়িয়াছিল, চতুর্থমান পর্য্যন্ত পড়া হইলে তার বিবাহ হয এবং সেজন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায। বাঙ্গলার সঙ্গে তিনখানা ইংবাজী কেতাবও সে পড়িয়াছিল, মিশ্রভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিয়া গঃ সাঃ গুঃ কষিতেও সুরু করিয়াছিল, তাছাড়া ভূগোল-প্রবেশ, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিও পড়িযাছিল, কিন্তু এখন সে-সব আব তাহাব মনে নাই। ছেলেটিও তার বেশ শিষ্ট-শান্ত। কোনওরূপ অন্যায-আব্দাব নাই, দৌবাত্ম্য নাই।

মনোরমা তাহাকে খোরাক-পোষাক ও মাসিক চার টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে। মনোরমা বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা বলিয়াছিল, "আমি আর কি বলবো—আপনি বিবেচনা করে যা দেবেন, তাই আমার যথেষ্ট। ভদ্রঘরে আশ্রয় পেলাম, এই আমাব পরম সৌভাগ্য।"

মোক্ষদার কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া মনোরমার বড় দুঃখ হইল। স্বামীকে বলিযা ঠিকাদারবাবুর দ্বারা মোক্ষদা ও তাহার পুত্রের জন্য আবশ্যক বস্ত্রাদি আনাইয়া দিল। ঠিকাদারবাবু যেরূপ সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।

মোক্ষদা মনোরমার হাতের কাজ কাড়িয়া নিজে করে। নিজ পুত্র অপেক্ষা মনোরমার পুত্র দুইটিকে অধিক যত্ন করিয়া থাকে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে সে দিদি এবং কর্ত্তাকে দাদাবাবু বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও কর্ত্তার সামনে সে বাহির হয় না, তাঁহার সঙ্গে কথা কহা ত দূরের কথা।—আজ রবিবার। রবিবার বিকালে ইন্দ্রবাবু আফিস যান না, এই সময় তাঁহার বাজারদর যাচাই করিবার জন্য সহরে যাইবার কথা। কাছাকাছি কোথাও ঠিকা-

গাড়ীর আড্ডা নাই, গাড়ীর আবশ্যক হইলে সেই সহরে লোক পাঠাইতে হয়। ভৃত্য গিয়াছে গাড়ি আনিতে। বড় ছেলে নগেন ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। ইন্দ্রবাবু স্ত্রীর সহিত পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো দেখ, ঐ পুকুরের পাড়ে নিমগাছের তলায় ছোকরা গোছের একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে দেখছ?"

মনোরমা বলিল, "হ্যাঁ, কে ও?"

"ও একজন সাধারণ কয়েদী নয়, ও বি-এ পাস!"

"বি-এ পাস? বল কি? চুরি করেছিল নাকি?"

"না চুরি নয়, ডাকাতি করেছিল বলা যায়। ও যে একজন মস্ত স্বদেশী।"

"কোনও স্বদেশী ডাকাতি বুঝি?"

ইন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ডাকাতিও কি স্বদেশী আর বিলিতি হয়?"

"তা নয়। দেশ-উদ্ধারের জন্যে টাকা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে যে ডাকাতি, তাকেই আমি স্বদেশী ডাকাতি বলছিলাম। ওব নাম কি? কোথায় ডাকাতি করেছিল?"

"ওব নাম শরৎ বাঁড়ুয্যে। কোথায় ডাকাতি করেছিল তা এখন আমার মনে নেই, কিন্তু সে সময় খবরের কাগজে আমি ওর মোকর্দ্দমার কথা পড়েছিলাম।"

"কত দিনের কথা?"

"বছর তিনেক হবে, কিন্তু কিছু বেশী। আমরা তখন পাটনায। আগে ও আলিপুর জেলে ছিল—এই মাস-দেড়েক হবে এখানে এসেছে।"

"কত দিন পরে ওর খালাস হবে?"

"পাঁচ বছব জেল হয়েছিল, এখনও বুঝি বছর-খানেক বাকী আছে।"

যাহার বিষয়ে এই আলোচনা হইতেছিল, এতক্ষণে সে লোক অদৃশ্য হইয়াছিল। মনোরমা বলিল, "আহা, ব্রাহ্মণেব ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, দেখ দেখি একবার কর্ম্মের ভোগ! কেন বাপু, তোরা এ-সব করিস? কি কাজ এখানে ওকে করতে হয়? আফিসের কাজ করে ত? লেখাপড়াজানা কয়েদী যখন!"—ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "সাধারণতঃ লেখাপড়া-জানা কয়েদী হলে তাকে আফিসেব কাজই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ যে অসাধারণ! গভর্ণমেণ্টের হুকুম নেই। ওকে বাগানের কাজ দিয়েছি, বেশী খাটতে হয় না।"

প্রত্যেক জেলের সংলগ্ন একটা করিয়া বাগান থাকে, সেখানে জলের খরচের জন্য শাক-সব্জী তরকারিপাতি উৎপন্ন করা হয়। জেলের কয়েদীরাই সে সব বাগানের কার্য্য করিযা থাকে।—এ সময় ভৃত্য আসিযা সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে। ইন্দ্রবাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।—রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া মনোরমা স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ, আমার মোক্ষদা ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক কথা জানে। তোমাতে আমাতে যখন কথা হচ্ছিল, ঘরের ভিতরে পান সাজতে-সাজতে ও ব'সে শুনেছিল।"

"কোন্ ছেলেটি?"

"ঐ যে তোমার বি-এ পাস করা ডাকাত, শরৎ মুখুয্যে না কি।"

"শরৎ বাঁড়ুয্যে।"

"যখন ঢাকায় ওর মোকর্দ্দমা হয়েছিল, খবরের কাগজে সব কথা মোক্ষদা পড়েছিল। বললে, ও ত ডাকাতি করেনি, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় করে ওকে জেলে পুরেছে। বি-এ পাস ক'রে ঢাকা জেলার কোন্ ইস্কুলে নাকি ও হেডমাস্টারি করত। সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল। সেই গ্রামের আর আশপাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বর ছিল। ও ছিল সেই সমিতির সভাপতি। কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বললে, তার কাপড়ের দোকান ছিল। ওরা বার বার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলিতী কাপড় আমদানী করে দোকানে বিক্রী করছিল। টাকার মহাজনীও করতো। গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জোৎ-জমা নীলেম করে নিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করতো,

এই রকমে সেই সাহা পোড়ারমুখো অনেক টাকা জমিয়েছিল। স্বদেশীওয়ালারা কত বারণ করে, তবু সে শোনে না। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার হিসেবেও বটে, দেশের কাজে লাগাবার জন্যে টাকা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে, সমিতির লোকরা নৌকা করে গিয়ে এক রাতে সেই সাহা-মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে। একজন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ করে দেয়। ঐ শরৎ বাঁড়ুয্যে, সেই সমিতির সর্দ্দার ছিল কিনা, তাই গভর্ণমেন্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিযেছে, নইলে ও নিজে ডাকাতি করেনি, ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না।"

ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে ঐ রকমই যেন পড়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে। তোমার সহচরী ঐ দেশেরই লোক বুঝি?"

"না, না, ওর বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী দুই-ই ত বরিশাল জেলায়। এ হল ঢাকা জেলার ঘটনা, ও খবরের কাগজে সেইসময় পড়েছিল বললে।"

ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমিও ত পড়েছিলাম, আমার ত মনে ছিল না। ওর খুব স্মরণ-শক্তি ত!"—মনোরমা বলিল, "খবরের কাগজ পড়ার ওর ভারি সখ কিনা। তোমার যে ইংরিজি কাগজ আসে, ও ত পড়তে পারে না। একদিন বলছিল, দাদাবাবু একখানা বাংলা কাগজ নেননা কেন, তা হলে আমরাও পড়তে পারি।"—ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "একখানা ইংরিজি কাগজ নিচ্ছি, আবার একখানা বাংলা—এত টাকা কোথায়?"

|| ৪ ||

মাসখানেক পরে, ইন্দ্রবাবুর পাচক ব্রাহ্মণ তিন মাসের ছুটী চাহিল। দেশে তার শ্বশুর নাকি মারা গিয়াছে, কন্যাই তার একমাত্র সন্তান, জোৎ-জমি যাহা কিছু শ্বশুর রাখিযা গিয়াছে, সমস্তই তাহার প্রাপ্য, কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতি জ্ঞাতিরা সে সকল জবর দখল করিবাব চেষ্টায় আছে। এই বলিয়া, কয়েকদিন পরেই বামুন-ঠাকুর দেশে রওযানা হইল।

ঠিকাদারবাবুর সাহায্যে অন্য একজন পাচক সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাকশালার ভার পড়িল মোক্ষদার উপর। মনোরমাও তাহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

এইরূপ কয়েকদিন চলিল, ইন্দ্রবাবু একদিন দ্বিপ্রহ .র আহারে বসিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ; সেই স্বদেশী কয়েদী শরৎ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা হল।"

"কি কথা হল।"

"সে আমায় বলছিল, 'মশাই, জেলেব অন্ন খেয়ে খেয়ে আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল! বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম করবার জন্যে আপনার ত দুজন কয়েদী সরকার থেকে বরাদ্দ আছে, আমায় যদি সেই একজনের জায়গায় নিযুক্ত করেন ত একবেলা দুটো খেয়ে বাঁচি।'—আমি বলিলাম, 'তুমি বি-এ পাস্, তুমি কি জলতোলা, বাসনমাজা, এ-সব নোংরা কাজ করতে পারবে? তা ছাড়া, তুমি বামুনের ছেলে, এঁটো বাসনই বা তোমায় দিয়ে মাজাই কি ক'রে? রাঁধতে জান? সে বললে, কেন আপনার বামুন ত আছে।'—জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি ক'রে জানলে আমার বামুন আছে?' সে বললে, 'ঐ নাথুনী আর গুরুচরণ যারা রোজ আপনার বাসায় কাজ করতে যায়, তারা বলে যে!' আমি বললাম, 'বামুন ছিল, পালিয়েছে। রাঁধতে জান ত বল, গুরুচরণের বদলে তোমাকে নিই।' সে বললে, 'আজ্ঞে, রান্না-বান্না মোটামুটি যে না জানি, তা নয়। মা-ঠাকরুণ একটু আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবো।' আমি তাতে হেসে বললাম, 'আচ্ছা, দেখি বিবেচনা ক'রে।'—কি করবো, আনবো তাকে?"—এই বি-এ পাস কয়েদী সম্বন্ধে মনোরমার মনে কিছু কৌতূহল ছিল; তাছাড়া ব্রাহ্মণ সন্তান ডাকাতি না করিয়াও কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে জানিয়া তাহার উপর সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাই সে স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইল।—ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "ও যে বলছে, ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, তুমি তা পারবে ত?"

মনোরমা বলিল, "সেই ত মুস্কিল। ওর সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করবে যে!"

"কেন? কাল যদি একজন নতুন রাঁধুনি-বামুন আসে, তুমি কি তার সঙ্গে কথা কইবে না?"--মনোরমা বলিল, "কিন্তু, সে ত বি-এ পাস হবে না।"

ইন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, ' কি ভাগ্যিস আমি বি-এ পাস করিনি! তা হলে ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কথাই কইতে না বল?"--মনোরমা লজ্জিত-হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বল তুমি, তার ঠিক নেই। তুমি আর ও সমান?"

।। ৫ ।।

দুই দিন পরে শরৎ আসিয়া, স্নান করিয়া মনোরমার পাকশালায় প্রবেশ করিল। তাহার কথাবার্ত্তা চালচলন অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র। মনোরমাকে গোড়াতেই সে মাতৃ সম্বোধন করায়, তাহার সম্বন্ধে সঙ্কোচের ভাব মনোরমার মন হইতে অনেকটা দূর হইল। তথাপি মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "যাও না ভাই, কি কি রাঁধতে হবে, বামুন ঠাকুরকে ব'লে দাও গে না।"

মোক্ষদা জিভ কাটিয়া বলিল, "না দিদি, আমি পারবো না ওর সঙ্গে কথা কইতে। তুমি গিন্নী-বান্নী মানুষ, তুমি যাও।"

অবশেষে মনোরমা গিয়া বামুন-ঠাকুরকে রান্নার বিষয় বলিল। আরও বলিল, "আমার বড় ছেলে নগেন দশটার সময় খেয়ে ইস্কুলে যাবে। বাবু খেতে বসবেন সাড়ে এগারোটায়।"

বামুন-ঠাকুর বলিল, "তা হলে মা, বড়বাবুর ভাত ক'টা আগে চড়িয়ে দেবো এখন, কর্ত্তাবাবুর আর অন্য সবাইকের ভাত শেষে রাঁধবো।"

"তাই করো"--বলিয়া মনোরমা চলিয়া আসিল।

মাঝে মাঝে মনোরমা গিয়া আধঘোমটা দিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, দেখিল, বামুন-ঠাকুরের কার্য্যে কোনরূপও ভুল হইতেছে কি না।

বামুন-ঠাকুর দুই তিনবার শয়ন-ঘরের নিকট আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া গেল। দেখিল, নগেন্দ্রকে যথাসময়েই সে ভাত দিল, যদিও সব রান্না তখনও তাহার হয় নাই।

ইন্দ্রবাবু আফিস হইতে ফিরিয়া স্নান করিতে যাইবার সময় রান্নাঘরের নিকট দাঁড়াইয়া সকৌতুকে একবার বি-এ পাস বামুন-ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি হে শরৎবাবু রান্নার তোমার কত দূর?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমায় আর বাবু ব'লে লজ্জা দেন কেন? আর সব রান্নাই আমার হয়ে গেছে, ভাতটা চড়িয়েছি, আপনি স্নান করুন,ততক্ষণ ভাতও হয়ে যাবে,"

খাইতে বসিয়া, অর্দ্ধেক খাওযা হইলে ইন্দ্রবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি বামুন ঠাকুর নিজে নিজেই রেঁধেছে? তুমিই বোধ হয় দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছ ওকে?"

মনোরমা বলিল, "আমি কিছু দেখিয়ে দিইনি।"

"তবে মোক্ষদা দেখিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।"

"ও ত রান্না-ঘরের ত্রিসীমানায় যায়নি। কেন, বামুন-ঠাকুর রেঁধেছে কেমন?"

"বেশ রেঁধেছে গো!"—বলিয়া ইন্দ্রবাবু শরৎকে ডাকাইলেন।

শরৎ আসিয়া অনতিদূরে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "আর কি এনে দেবো?"

ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "আর কিছু এনে দিতে হবে না। কিন্তু শরৎ, ঠিক করে বল দিকিনি, সত্যিই কি তুমি বি-এ পাস?"—শরৎ কিছু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল।

ইন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, "তুমি বলেছিলে মোটামুটি এক রকম রাঁধতে তুমি জান। এত মোটামুটি রকম নয়, এক্সপার্ট হাতের রান্না। এ তুমি শিখলে কি ক'রে?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমি যখন মাস্টারি করতাম, তখন ছেলেদের নিয়ে আমি একটা

বোর্ডিং বলুন, আশ্রম বলুন, খুলেছিলাম। আমরা আশ্রমই বলতাম। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমরা অনুসরণ করতাম, নিজের নিজের সব কাজ আমরা নিজেরাই করতাম—এমন কি, বাসনমাজা, ঘর-ঝাঁড় দেওয়া পর্য্যন্ত। কোনও চাকর বাকর আমাদের ছিল না। প্রথম প্রথম পাকপ্রণালী হাতের কাছে রেখে রোজই আমি নিজেই রাঁধতাম, ছেলেরা পালাক্রমে আমায় সাহায্য করত। ক্রমে তারাও সব শিখে ফেললে। তারপর, মাঝে মাঝে রাঁধতাম, পালা ছিল। হাতে-কলমে শেখা আর কি।"—ইন্দুবাবু হাসিতে লাগিলেন। মনোবমা বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে বামুন-ঠাকুরের পানে চাহিতে লাগিল। ইন্দুবাবু বলিলেন,"তোমার খালাসের বুঝি আর এক বছর বাকী আছে?"—শরৎ বলিল, "দশ মাস।"

"দশ মাস? হয়ত শেষে গুড্‌কণ্ডাক্টের (সচ্চরিত্রতার) জন্য এক মাস তুমি রেহাই পাবে। তবে তুমি স্বদেশী কয়েদী, বলা যায় না, এ অনুগ্রহ গভর্ণমেন্ট তোমায় না-ও করতে পারেন। আপাততঃ আমি ব্যবস্থা করেছি, সারাদিন তুমি আমার বাসাতেই থাকবে, ও-বেলা তখন খাবার-টাবারগুলো ক'রে দিয়ে পাঁচটার সময় জেলে ঢুকে থাকবে। সারাদিন ব'সে তুমি কি করবে? তুমি তোমার আত্মজীবন-চরিত লেখ, খালাস হ'য়ে সে বই তুমি ছাপাবে। স্বদেশীর যে রকম হিড়িক, তোমার বই হু-হু করেই বিক্রি হবে। যত দিন আবার কাজ-কর্ম্ম একটা না জোটাতে পার, সেই বইয়েব আয়ে তোমার চ'লে যাবে।"

শরৎ বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনার এ পরামর্শ ভাল।"

পরদিন বড়খোকা (নগেন্দ্র) ইস্কুল হইতে ফিরিয়া একখানা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক্ (খাতা) বামুন-ঠাকুরকে দিল, মা তাকে পয়সা দিয়েছিলেন।

॥ ৬ ॥

তিন মাস অতীত হইল, কিন্তু ইন্দুবাবুর বামুন-ঠাকুর ফিরিয়া আসিল না। মনোরমা বলিল, "ওরা ত ঐ রকমই করে। একবার ছুটি নিয়ে দেশে গেলে আর সহজে আসতে চায় না।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "শ্বশুরেব বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে তার বোধ হয অবস্থা ফিরে গেছে, আর চাকরি করবার দরকার নেই। কাজ ত চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু শরৎও বোধ হয় আব বেশী দিন এখানে থাকবে না।"

"বদলির হুকুম এসেছে নাকি?"

"না, আসেনি এখনও। কিন্তু আসতে কতক্ষণ? স্বদেশী কযেদীকে গভর্ণমেন্ট বেশী দিন ত এক জেলে রাখে না।"

"এখানে কত দিন হল ওর?"

"মাস-ছয়েক হল বুঝি।"

"ওর মেয়াদের ত আর ছমাস মাত্র বাকী আছে। বেশ কাজ-কর্ম্ম করছিল, অতি ঠান্ডা স্বভাব, সচ্চরিত্র—বাকী ছটা মাস এখানে ও থাকলেই বেশ হত!"

এই তিন মাসে শরৎ সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিযাছে। অন্যান্য কয়েদী যাহারা জেলরবাবুর বাড়ীতে আসিয়া গৃহকার্য্য করিবার হুকুম পায়, একটা দুর্লভ সুযোগ তাঁহারা লাভ করে—লুকাইয়া তামাক খাইতে পায়। বাড়ীর চাকর-বাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া, এই সুবিধাটুকু ভোগ করিযা লয়। কিন্তু জেলে ত তামাক খাবার কোনও উপায় নাই। শরৎ তামাক, সিগারেট, বিড়ি কিছুই খায় না। এমন কি, আহারান্তে পান পর্য্যন্ত নয়। প্রথম দিন শরতের আহার হইয়া গেলে মনোরমা ভৃত্য-হস্তে দুটি পান তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু শরৎ বলিয়াছিল, "মাকে বল পাণ ত আমি খাইনে। দয়া ক'রে দুটো সুপুরি-লবঙ্গ যদি দেন ত খাই।" বড়খোকাকে, ছোটখোকা, এমন কি, মোক্ষদার ছেলেটির সঙ্গে পর্য্যন্ত শরতের অত্যন্ত ভাব। বড়খোকা, শরৎ কত দিন দেশ-বিদেশের গল্প বলে, বিশেষ করে নেপোলিয়নের যুদ্ধের গল্প এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারে যে, শুধু বড়খোকাকে নহে,

মনোরমা, মোক্ষদাও শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। মনোরমা ত এখন শরৎকে দেখিয়া মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত দেয় না। মনোরমা বলে,"ও আমার বড় ছেলে।" মোক্ষদা মাথায় কাপড় দেয় বটে, কিন্তু শরতের সঙ্গে রীতিমত কথা কহে। পূর্ব্বে ইন্দুবাবু মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সহচরীটাকে শরতের কাছে বেশী যেতে-টেতে দিও না। দুজনেরই পুরো সোমত্ত বয়স, জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন একসঙ্গে রাখবে না।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "সে বুদ্ধি কি আমার নেই? হাজার হোক, গেরস্তের মেয়ে আমাদের আশ্রয় রয়েছে! ওর ভাল-মন্দ আমাকেই দেখতে হবে ত!"—কিন্তু অল্পে অল্পে এ নিষেধ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। একদিন মোক্ষদাকে শরতের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মোক্ষদা এখন শরতের সঙ্গে কথা কয় দেখছি।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "এক বাড়ীতে থেকে কথা না কইলে চলে? কুটনো কুটে দেওয়া, বাটনা বেটে দেওয়া, রান্না-বান্নার যোগাড় ক'রে দেওয়া, সবই ত এখন মোক্ষদাই করে। ওগো, শরৎ সে ছেলে নয়, দেবচরিত্র পুরুষ। ওরা দুজনে রান্নাঘরে ব'সে কাজ-কর্ম্ম করছে, কতদিন এমন আমি আচমকা গিয়ে পড়েছি, কখনও দুজনকে কথাবার্ত্তা কইতেও দেখিনি। গম্ভীর মুখ। কেউ কারু পানে তাকায়ও না।"—যে-দিন স্ত্রীর সহিত ইন্দুবাবু শরতের অন্য জেলে বদলি হইবার প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার এক সপ্তাহ পরে তিনি আফিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, শরতের বদলির হুকুম এসেছে।"

"কোথা"

"বক্সার সেন্ট্রাল জেলে।"

"কবে যেতে হবে?"

"পাঁচ দিন পরে।"

ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকিয়াও খবরটা দিলেন। শুনিয়া সে মুখখানি চুণ করিয়া রহিল।

শরতের বদলির সংবাদে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই দুঃখিত।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ঠিকাদারবাবুকে বলি, যদি জানাশুনা একটা ভাল বামুন যোগাড় করে দিতে পারেন।"—শেষ দিন কর্ম্ম করিয়া বিকালে জেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরৎ মনোরমাকে বলিল, "মা, এ-ক'মাস আপনার বাড়ীতে বড় সুখেই ছিলাম। যেন বাড়ীর ছেলের মত ছিলাম—আমি যে জেল খাটছি, তা আমার মনেই হত না। কাল বেলা নটার সময় আমায় নিয়ে যাবে। যাবার আগে একবার আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে যেতে চাই। আপনি বাবাকে বলে হুকুমটা করিয়ে দেবেন, নইলে ত সে সময় আমাকে আসতে দেবে না।"

মনোরমা সজল-নয়নে স্বীকৃত হইল।

পরদিন যথাসময়ে শরৎ আর আসিল না।—আজ মোক্ষদাই রাঁধিবে। তবে আজ ফতেহাদোয়াজ দাহামের ছুটি বলিয়া নগেনের স্কুল নাই। রান্নার তাড়াতাড়ি নাই।

সাতটার সময় যখন জেলরবাবু আফিসে যাইতেছিলেন, তখন মনোরমা তাঁহাকে শরতের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দুবাবু চলিয়া গেলে মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "তুমি তা হলে স্নান-টান সেরে নিয়ে রান্নার যোগাড় দেখ। তোমার স্নান হয়ে গেলে আমিও স্নান ক'রে রান্নাঘরে যাব।"

।। ৭ ।।

অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু সকালেই—সাড়ে দশটা না বাজিতেই, ইন্দুবাবু আফিস হইতে বাড়ি ফিরিলেন। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় মনোরমা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিয়া প্রবেশ করিল।—ইন্দুবাবু বলিলেন, "কি গো, কোথায় ছিলে?"

"রান্না করছিলাম।"

"কেন, মোক্ষদা?"—মনোরমা মুখখানি গম্ভীর করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তার পর বলিল, "ওর হাতে আমাদের আর খাওয়া চলবে না।"

"কেন, কি হয়েছে?"—মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ও—খারাপ—মেয়ে!"

ইন্দুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ? সে কি? কে বললে? কোথা শুনলে তুমি?"

"আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ভাত চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, এখনও ফুটতে দেরী আছে। সব কথা বলি, শোন।"—বলিয়া মনোরমা একখানা চেয়ারে বসিল।

ইন্দুবাবু শঙ্কিত-নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল দেখি।"

তখন মনোরমা বলিতে লাগিল, "তুমি আফিস যাবার সময় শরৎকে পাঠিয়ে দিতে তোমায় বললাম ত? সে আটটার সময় আমায় প্রণাম করতে এল। মোক্ষদা তখন স্নানের ঘরে, আমি এই ঘরে ব'সে তেল মাখছি। শরৎ এসে আমার কাছে বসল। সে থাকতে থাকতেই মোক্ষদা স্নানের ঘর থেকে বেরুল, বেরিয়ে ওদিকে চলে গেল। তারপর শরৎ আমায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে, আমি স্নানের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখি, আমার গামছাখানা নেই। আবার বেরিয়ে, গামছা খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের বাইরে দেখি, শরৎ আর মোক্ষদা দুজনে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোক্ষদার মাথা শরতের কাঁধের উপর, দুজনে একেবারে জ্ঞানশূন্য। তারপর মোক্ষদার মাথাটা শরৎ তুলে, তার মুখে চুমো খেয়ে, চোখ মুছতে মুছতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মনে করেছিল, গিন্নীমাগী স্নানের ঘরে বন্ধ, কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।"

'তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ, তা শরৎ দেখলে?"

"না।"

"আর মোক্ষদা?"

"মোক্ষদা আমায় দেখলে বইকি—একটু পরেই।"

"তুমি কি বললে?"

"রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছিলাম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না। কোনও রকমে শুধু বললাম, 'মোক্ষদা, তুমি আব রান্নাঘরে ঢুকো না।'—বলেই আমি গামছাখানা নিয়ে স্নানের ঘরে গেলাম। প্রায় পনেবো মিনিট স্নান করতে পারলাম না, কাঠের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলাম। তার পব স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে ও ঘরে গিয়ে দেখি, কয়েদীদের নিয়ে যাবার জন্যে জেলের গাড়ী ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর মোক্ষদা জানালার গরাদ ধবে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ফটকের পানে চেয়ে আছে। আমি যে ঢুকেছি, তা বিবির হুঁস পর্য্যন্ত নেই।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, 'অ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছ জেনেও? পরেও লজ্জা-সরম একেবারে বিসর্জ্জন?"—মনোরমা বলিল, "ওগো, বুঝছ না, ধরা প'ড়ে দু কাণ-কাটা হয়ে গেল কিনা! এককাণ-কাটা যায় গাঁয়ের বা'র দিয়ে দু কাণ কাটা যায় ভিতর দিয়ে।"

"কোথা সে এখন? পালিয়েছে বোধ হয়?"

"পালাবে কেন? নিজের বিছানায় শুয়ে, বিরহিণী বোধ হয় বিরহের কান্না কাঁদছেন।"

ইন্দুবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকার পর থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সংসারে মানুষ চেনবার উপায় নেই! ঐ পাজিটাকেই তুমি একদিন বলেছিলে—দেবচরিত্র পুরুষ! আর তাও ঐ মোক্ষদারই সম্বন্ধে। আর মোক্ষদাও যে এমন ভিজে বেড়ালটি, তা ত একদিনের জন্যেও সন্দেহ হয়নি! ছি ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ কি কান্ড! দুপুরবেলা আমি এ-ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুই। তুমিও মাঝে মাঝে সহবে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছ। দিব্যি সুযোগটি পেয়েছিল ওরা। ছি ছি ছি! চুলোয় যাকু! এখন কি করা যায় বল দেখি?"—মনোরমা বলিল, "ঝাঁটা মেরে বিদায় করা ছাড়া আর কি করবার আছে? তুমি স্নান ক'রে ফেল, আমার ভাতও বোধ হয় হয়ে এল।"

আহারান্তে ইন্দুবাবু শয্যায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাকটা শেষ হইলেই

শয়ন করিবেন।—মনোরমা মোক্ষদার ভাত বাড়িয়া অবহেলাভরে তাহার ঘরে থালাখানা ফেলিয়া আসিয়া, স্বামীর পাতে নিজে খাইতে বসিল।—ইন্দুবাবু তামাকটা শেষ করিয়া কি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইবেন একটা বই-টই খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় বড়খোকা একখানা খাতা হাতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, শরৎ-দা তার আত্ম-জীবনীখানা ফেলে গেছে।"

ইন্দুবাবু অন্য বহি না খুঁজিয়া, কৌতূহলবশতঃ সেইখানা হাতে লইয়াই শয়ন করিলেন। প্রথমে শেষটা দেখিলাম, সমাপ্ত হইয়াছে কি না। দেখিলে, সমাপ্ত হয় নাই, ঢাকা জেলায় তাহার গ্রেপ্তারের কথা পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এখানে সেখানে দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা রহিয়াছে—"আমার বিবাহ।" সেই পৃষ্ঠাতেই রহিয়াছে অমুক গ্রামের অমুকের কন্যা শ্রীমতি মোক্ষদাসুন্দরীর সহিত আমার বিবাহ হইল।

পড়িয়াই তাঁহার মনে হইল, এই মোক্ষদাই নহে ত? পড়িতে পড়িতে শেষ দিকে দেখিলেন, গ্রেপ্তারেব সময় দেশে স্ত্রী তাহার গর্ভবতী ছিল। তারিখ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই মোক্ষদার পুত্রের সহিত বয়স মিলিয়া যায়।

অবাক্ হইয়া ইন্দুবাবু বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময মনোরমা আহারান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "ওগো, মোক্ষদাকে একবার এখানে ডাক ত।"

"কেন"

"বিশেষ দরকার। এক মুহূর্ত্ত দেরী কোরো না।"

মনোরমা মোক্ষদার ঘরে গিয়া দেখিল, সে যেমন শুইয়া ছিল, তেমনই শুইয়া আছে, তাহার ভাত যেমন তেমনি পড়িয়া আছে। কর্ত্তার জরুবী তলব মনোরমা কঠোর-স্বরে তাহাকে জানাইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে মনোরমাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোক্ষদা, ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মোক্ষদা, ঐ শরৎ কয়েদী তোমার কি কেউ হয়?"

মোক্ষদা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার স্বামী।"

"তুমি তা হলে এখানে হঠাৎ এসে পড়নি? তোমার স্বামী এখানে বদলি হয়ে এসেছে জেনেই তুমি এসেছিলে?"—আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া মোক্ষদা যাইবার উপক্রম করিল।

ইন্দুবাবু কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "মোক্ষদা, অন্যায় সন্দেহ করবার জন্যে তুমি আমাদের মাফ কব।"—মোক্ষদা গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইন্দুবাবুকে প্রণাম করিল।

মনোবমা সংশয়ভরে জিজ্ঞাসু-নযনে স্বামীর পানে চাহিল। ইন্দুবাবু চক্ষু নত করিয়া বলিলেন, "মোক্ষদা সত্যি কথাই বলেছে।"

মনোরমা তখন "চল চল" বলিয়া আদব করিয়া মোক্ষদার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া, জোর কবিযা ভাতেব থালার কাছে বসাইল।

পবে জানিতে পারা গেল, বহু দিন স্বামীর অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে মাঝে মাঝে শুধু যদি চোখের দেখা দেখিতে পায় এই আশায়, জেলখানার কোনও বাবুর বাড়ীতে চাকরি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই মোক্ষদা এ সহরে আসিয়াছিল। প্রতিবেশী ঠিকাদারবাবুর স্ত্রীর এ বাড়ীতে যাতায়াত আছে শুনিয়া, সে হাতে স্বর্গ পাইয়াছিল।

অবশ্য এতটা সে আশা করে নাই যে, যে বাড়ীতে কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে, তার স্বামীও সেই বাড়ীতে প্রতিদিন আসিবেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর্য্যন্ত সুযোগ পাইবে।

মনোরমা বলিল, "দেখ, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

"কি?"

"শরৎ সেই যে তোমায় বলেছিল, জেলের অন্ন খেয়ে আমার প্রাণ গেল, আপনাব বাড়ী আমি রাঁধবো, তার কারণ আছে। মোক্ষদা প্রাযই পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জেলের

উঠান দেখতো। আমি ভাবতাম, বুঝি তামাসা দেখছে। তখন কি জানি, ও স্বামীকে দেখছে। শরৎও পাঁচ দিন ওকে দেখে থাকবে। তাই এ বাড়ীতে কাজ করবার জন্যে ছোঁড়ার এত আগ্রহ হয়েছিল।"—ইন্দুবাবু বলিলেন, "তাই সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য সংযম ওদের। তিন মাস ছিল দুজনে এক বাড়ীতে, অথচ শেষ দিনটি ভিন্ন—"—মনোরমা বলিল, "সত্যি!"

মনোরমার ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষদা রহিল। বস্তুতঃ জেল হইতে খালাস পাইয়া শরৎ যখন স্ত্রীকে লইতে আসিল, মনোরমার ছেলে তখন দুই মাসের হইয়াছে।

[মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৮]

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"

আবিনাশবাবু বেলা ৫টার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়া, নিজ শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া ধড়া-চূড়া ছাড়িতে ছাড়িতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু পত্নী সুষমাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ভিতর-বারান্দায় ঝিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি, এঁরা গেলেন কোথায়?"—ঝি বলিল, "মা ছাদে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।"—বলিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। একটু পরেই সুষমা নামিয়া আসিল। প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল, "হ্যাঁগা, তুমি কখন এলে? আমি ত তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি!"

অবিনাশ বলিল, "এই ত এসে কলেজের কাপড়-চোপড় ছাড়লাম। তুমি ছাদে ব'সে কি করছিলে, বউ?"

সুষমা একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা রিভাইজ করছিলাম।"

"রিভাইজ শেষ হল?"

"একটু বাকি আছে। আর ঘন্টাখানেক বসতে পারলেই হয়ে যাবে।"

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ তাই বল বউ! সেই জন্যেই আজ তুমি আমার পায়ের শব্দ শুনিতে পাওনি। তুমি ত এখানে ছিলে না—এ ধূলো-মাটির পৃথিবীর বাহ্ উর্দ্ধে কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করছিলে।"

সুষমা বলিল, "তুমিই ত ক'দিন থেকে আমায় পীড়াপীড়ি করছ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা একটু বদলে ফেল, বদলে ফেল। ছাদে ব'সে আমি তোমারই হুকুম তামিল করছিলাম, তবে আমায় অত ঠাট্টা কেন?"—বলিয়া সুষমা ঠোঁট ফুলাইল।

অবিনাশবাবু স্নেহমিশ্রিত কৌতুকের সহিত স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "নিজের বউকে যদি একটু ঠাট্টা করবো না, তবে কার বউকে করবো বল দেখি?"—বলিয়া বহু প্রসারণ করিয়া এরূপ উদ্যমের সহিত স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইলেন যে, সুষমা পিছাইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আঃ কি কর? বাইরে ঝি রয়েছে না! বুড়ো হ'তে চললেন, তবু সখ মিটলো না। যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি ততক্ষণ তোমার জলখাবার ঠিক করিগে।"—বলিয়া সুষমা বাহির হইয়া গেল।—দশ মিনিট মধ্যে অবিনাশবাবু হাত-মুখ ধুইয়া আসিলেন। চেয়ারে বসিয়া পাথরের টেবিলের উপর রক্ষিত জলযোগ ও চা-যোগ করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো শুনছো বউ আজ একটা নূতন খবর আছে।"

"কি নূতন খবর?"

"ওরা ত ভয়ানক ধরেছে আমাকে।"

"ওরা কারা?"

"এই—গোপালবাবু, উমাচরণবাবু, যোগেনবাবু, নির্মলবাবু, আরও ক'জন।"—

অবিনাশবাবু যে নামগুলি করিলেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহার সহকর্ম্মী—বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রোফেসর।"—সুষমা বলিল, "কি ধরেছেন, খাবেন?"

অবিনাশবাবু মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "না, তোমার নাটক শুনবেন।"

"অ্যাঁ!"—বলিয়া সুষমা নিকটস্থ খাটের উপর বসিয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ও কি, অমন আঁৎকে উঠলে যে? এমনি কি বিপদটা হল শুনি?"

সুষমা বলিল, "আমি নাটক লিখেছি না মাথামুণ্ডু কি একটা ছেলেখেলা করেছি তার ঠিক নেই, ঐ সব মহা-মহা পণ্ডিত লোকদের ডেকে এনে তা শোনাতে হবে?—শুনে তাঁরা, কি ভাববেন বলদিকিন? ছি ছি ছি! আমার এমন লজ্জা করছে!"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ঐ সব মহা-মহা পণ্ডিত লোকেরা তোমার নাটক শুনে যদি ছি ছি করবেন, তোমার নাটক আমার তবে এত ভাল লাগলো কি ক'রে? আমি তা হলে একটা মহামূর্খ বল!"—বলিয়া অবিনাশবাবু রাগ করিবাব ভাণ করিলেন।

সুষমা বলিল, "এই দেখ, সকল কথার তুমি উল্টো মানে কর কেন বল দেখি? আমি কি তোমায় মহামূর্খ বলেছি? তুমিও ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর, তাঁরাও তাই। তুমি তাঁদের চেয়ে কিসে কম?"

"তবে? আমার মতামতের কোনও মূল্য নেই কেন?"

সুষমা খাট হইতে নামিয়া আসিয়া, স্বামীর স্কন্ধে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমার নাটক তোমার অত ভাল লেগেছে, তা কেবল, তুমি আমায় অত ভালবাস ব'লে। আবার তাদের বউ যদি নাটক লিখতো, তবে তাদেরও খুব ভাল লাগতো।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "জানিনে,—আমার ধরণা ছিল, ভাল জিনিষ সবাইকারই ভাল লাগে। তাই আমি গর্ব্ব ক'রে তাদের কাছে কথাটা বলেছিলাম।"

"তুমি তাঁদের কাছে কি বলেছ বল দেখি? নিশ্চয়ই অযথা খুব বাড়িয়ে বলেছ।"

"অযথা কেন বলবো? যথার্থই বলেছি।"

"ঠিক কি কথা তাঁদের তুমি বলেছ, সত্যি ক'রে আমায় বল দেখি!"

"বলেছি নাটকখানি খুব ভাল হয়েছে।"

"ব্যস, আর কিছু না? সত্যি ক'রে বল।"—অবিনাশবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন। "আবার বলেছি, গিরীশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকের পর, এ রকম ভাল গার্হস্থ্য নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যে আর জন্মায়নি। তা সত্যি কথা যা, তাই,বলেছি। তাতে দোষটাই বা কি হয়েছে, আর রাগে তুমি ভুরুই বা কোঁচকাচ্ছ কেন?—সুষমা বলিল, "আচ্ছা, সত্যি হোক মিথ্যে হোক তুমি ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ কর কেন বল দেখি? এটা কিন্তু তোমার একটা রোগ—তা তুমি যাই বল। আমি গোপনে একটা ছেলেমানষী করলাম,—শুধু তুমি জানলে আর আমি জানলাম। তাই নিয়ে কি [illegible]রে ঢাক পিটোতে হয়?

"ঢাক আমি না পিটোলে ঢাক যে আপনি পিটে যাবে [illegible]! তার উপায কি বল?"

"ঢাক আপনি পিটবে কেন?"

"বই ছাপাতে হবে না?"

"কেন, আবার কিছু লোকসান দেবার ইচ্ছা হয়েছে? বিয়ের অল্পদিন পরেই কত খরচপত্র ক'রে আমার কবিতার বই ছাপিয়েছিলে। বিক্রি হল? তারপর আমায় [illegible] পা নিরূপমা বানাবার চেষ্টায় দিলে আমায় 'উপন্যাস-কলেজে' ভর্ত্তি ক'রে। কলেজ [illegible]ক বেরিয়ে ক্রমাগত বলতে লাগলে, একখানা উপন্যাস লেখ উপন্যাস লেখ। কি করি, তোমার পীড়াপীড়িতে উপন্যাস লিখলাম। 'তাও ছাপলে গ্রন্থ হল নগদ মূল্য এক টাকা।' কোনও রকমে খরচটা উঠে গিয়েছিল,—আর বিক্রি হয়? যে প্রথম সংস্করণ সেই প্রথম সংস্করণেই মা আমার বিরাজ করছেন ত!"—ঝি অবিনাশবাবুর গুড়গুড়ি প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। অবিনাশবাবু ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "প্রেমের ইন্দ্রজাল বেরুলে হয়ত প্রথমটা

তেমন বিক্রি নাও হতে পারে, কিন্তু থিয়েটারে যখন প্লে হতে আরম্ভ হবে—তখন হু হু ক'রে বিক্রি হতে থাকবে যে, এডিশনের পর এডিশন উড়ে যাবে—তা জান?"—সুষমা বলিল, "থিয়েটারে প্লে হলে ত?"

"যত সব রাবিশ নাটক প্লে হচ্চে, আর তোমার নাটক প্লে হবে না?"

"আমার নাটক যে রাবিশ-তরো নয়, তা কে বললে?"—অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমি বলছি। রবিবার দিন ওরা সব আসছেন ত? সেই সব মহা-মহা পন্ডিত লোক যখন শুনবেন, তখন তাঁরাও বলবেন। তুমি একা রাবিশ বললে ত চলবে না গো!

পুষ্প সম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা
দেখনি নিজ মোহন কি যে তোমার মালিকা!

ছড়িগাছটা দাও, হরিশ পার্কে একটু বেড়িয়ে আসি। ফিরে এসে ববিবার সম্বন্ধে দুজনে পরামর্শ করা যাবে।"

।। দুই ।।

এ কয়দিন ধরিয়া অবসর সময়টুকু স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া নাটকখনি বারংবার পাঠ কবিযা, মন্ত্রণা করিয়া, কথা বদলাইয়া, দৃশ্য বদলাইয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া, শনিবার রাত্রে উহাব প্রসাধনক্রিয়া সমাপন করিল। কাল রবিবার। অবিনাশবাবুর সহকর্ম্মী সাতজন অধ্যাপক—এবং অবিনাশবাবুর ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্র পঞ্চানন বসু—বি-এ পরীক্ষায ইংরাজি সাহিত্যে সে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই আটজনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বেলা ৫টার সময় তাঁহাবা আসিযা অবিনাশবাবুর গৃহে সমবেত হইবেন। চা-পানেব পব নাটক পড়া আরম্ভ হইবে। পড়িতে তিন ঘন্টার কম লাগিবে না। তারপর রাত্রি-ভোজন। এইরূপ পরামর্শ-ই হইযাছে।

রবিবার প্রাতে চা-পান সমাধা করিয়া অবিনাশবাবু বাজার কবিতে গেলেন। ফর্দ্দ অনুসারে কাঁচা ও পাকা বাজার করিয়া সে সব বাড়ীতে আনিযা ফেলিযা, ট্রামযোগে মিউনিসিপল মার্কেটে গমন করিলেন, কেবল মট্‌নটার জন্য—আর সব ত জগুবাবুর বাজারেই পাওয়া গিয়াছে।

রন্ধন জন্য দুইজন রসুইয়ে-ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হইযাছিল। তাহারা বাঁধিয়া, পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। বেলা ২টাব পর ব্রাহ্মণেরা হুঁকা হাতে কবিয়া আসিয়া নিম্নতলেব পাকশালা দখল করিল। চা ও জলখাবার প্রস্তুতের ব্যবস্থা সুষমা নিজের হাতে রাখিয়াছিল, উহা দ্বিতলে স্টোভ জ্বালাইয়া সম্পন্ন হইবে।

পাঁচটার পর নিমন্ত্রিতগণ একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিতে লাগিলেন। সকলে আসিযা জমায়েৎ হইতে সাড়ে-পাঁচটা বাজিয়া গেল। ঝির সহায়তায় অবিনাশবাবু চা ও জলযোগেব দ্রবাদি বৈঠকখানায় আনিতে লাগিলেন।

চা-পর্ব্ব যখন শেষ হইল তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। গোপালবাবু এই অধ্যাপক দলের মধ্যে প্রবীণতম, তিনি বলিলেন,—"এবার নাটকখানি বের কর হে অবিনাশ।"

অবিনাশবাবু দ্বিতলে গিয়া, নাটকের খাতা হাতে সুষমাকে লইয়া নামিয়া আসিলেন। বৈঠকখানা ঘরের পাশেই আর একটি ঘর ছিল, লোকটা-জনটা আসিলে এই ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা হইত। উভয় ঘরের মাঝে একটা দ্বার ছিল, এই দ্বারটির উপর পর্দ্দা ফেলা ছিল। পর্দ্দার অনতিদূরে একখানি চেয়ার পাতিয়া তাহাতে সুষমাকে বসাইয়া, অবিনাশবাবু বৈঠকখানা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।—পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি খুবই ছিল, কিন্তু তথাপি উত্তমরূপে পাঠ করিতে অবিনাশবাবুর কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। কারণ বারংবার পড়িয়া পড়িয়া উহা প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক—সাহিত্য-রসজ্ঞান তাঁর ভালই ছিল। বেশ দরদ দিয়াই তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রথমেই গোপালবাবু বলিয়া রাখিয়াছিলেন, পাঠ শেষ না হইলে কোনও শ্রোতা যেন কোন সমালোচনা না করেন। তথাপি শ্রোতৃগণ স্থানে স্থানে "বাঃ, কি সুন্দর!" "কি চমৎকার!" "খাসা হয়েছে এখানটি", ইত্যাদি মন্তব্য করিতে ছাড়িলেন না। এইরূপ এক-একটা মন্তব্য শুনিয়া অবিনাশবাবুর কণ্ঠস্বর ভাবোচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া ওঠে, পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া সুষমার দেহেও রোমাঞ্চ উৎপাদিত হয়।

পাঠ যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকা। সকলেই বলিলেন, প্রথম প্রয়াসের পক্ষে নাটকখানি বেশ ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। স্থানে স্থানে চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ গানগুলি বেশ সুন্দর। কেহ কেহ বলিলেন, ইহা কোনও ভাল থিয়েটারে অভিনায়ার্থ দেওয়া উচিত, গুণের আদর নিশ্চয়ই হইবে।

নির্ম্মলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানি ছাপাচ্ছেন ত?"

উমাচরণবাবু বলিলেন, "না হে, আগে ছাপিও না। আগে কোনও থিয়েটারে খাতাখানি দাও। ওরা ত জিনিষটে ঠিকঠাক সাহিত্যের দিক থেকে দেখবে না, ওরা দেখবে স্টেজে এটা জমবে ভাল কি না। সেইজন্য ওরা অনেক সময় নাট্যকারকে দিয়ে স্থানে স্থানে বদল-সদল কবিয়ে নেয়, হয়ত একটা সীনকে সীনই বাদ দেয়, কিংবা নাট্যকারকে দিয়ে লিখিয়ে একটা নূতন সীনই ঢুকিয়ে নেয়। সেই সবগুলো হয়ে গেলে তারপর বই ছাপানো ভাল।"

গোপালবাবু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "না হে অবিনাশ, তা কোরো না। তোমার মত একটা লোকের পক্ষে, নাটকের খাতা বগলে ক'রে আর পাঁচটা ছেঁড়া নাট্যকাবেব সামিল হয়ে থিয়েটারের কর্ত্তাদের কাছে হেইঁগো মশাই হেঁইগো মশাই ব'লে দরবার করতে যাওয়া—সেটা বড়ই অপমানজনক হবে। আমি কি চাই জান? আমি চাই, বইখানি ছাপা হোক,—কাগজে কাগজে তার সমালোচনা বেরুক, থিয়েটারওয়ালারাই এসে অভিনযের অধিকারের জন্যে তোমার কাছে দরবার করুক। কি বল হে যোগেন?"—গোপালবাবুর এই যুক্তিই সকলে মানিয়া লইলেন। অবিনাশবাবুর প্রিয় ছাত্র পঞ্চানন একজন কবি, নানা মাসিক পত্রিকার সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, কবিতার বহিও সে দুইখানি ছাপাইয়াছে। প্রেস ঠিক করিবার, প্রুফ দেখিবার ও সমালোচনা বাহির করাইবার ভার সে গ্রহণ করিল।

॥ ৩ ॥

"প্রেমের ইন্দ্রজাল" নাটক আজ ছয় মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজে কাগজে উহার উচ্চ প্রশংসাযুক্ত সমালোচনাও বাহির হইয়াছে, কিন্তু কোনও থিয়েটারের অধ্যক্ষ এখনও ইহাব অভিনয় অধিকার লাভের জন্য অবিনাশবাবুর নিকট দরবার কবিতে আসিলেন না।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে হিসাব পাওয়া গেল, ছয় মাসে মোট সতেরখানি মাত্র বহি বিক্রয় হইয়াছে।

হিসাব দেখিয়া সুষমাব মুখখানি মলিন হইয়া গেল। অবিনাশবাবুর বুকটিও অত্যন্ত দমিয়া গেল। কিন্তু মনের সে ভাব তিনি গোপন করিয়া সুষমাকে বলিলেন, "দেখ বউ, এতে নিরুৎসাহ হবার কিছুই নেই। এ ত উপন্যাস নয়, এ হল নাটক। নাটক প্রধানতঃ কোথায় বিক্রী হয় জান? থিয়েটারে, অভিনয়ের সময়। থিয়েটার দেখিতে গিয়েই লোকে নাটক কেনে। নইলে শুধু ঘরে বসে পড়বার জন্যে নাটক কেনে খুব অল্প লোকেই।"

সুষমা বলিল, "কিন্তু ওঁরা যে বলেছিলেন, বই বেরুলে থিয়েটারওয়ালারা অভিনয় অধিকারের জন্যে আমাদের দরজার মাটি চষে ফেলবে, তাই বা কোথায়? কাগজে কাগজে বইয়ের যে অত সুখ্যাতি বেরুল, তারই বা ফল কি হল?"—অবিনাশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ তুমিও যেমন! ঐ সব মাসিকপত্র-টত্র থিয়েটারওয়ালারা পড়ে বুঝি? তাদের সময় কোথা?

এমন একখানা ভাল নাটক যে বেরিয়েছে, সে খবরই এখনও হয়ত তাদের কাছে পৌঁছয়নি। বই যে খুব ভালই হয়েছে, তার প্রমাণ ত ঐ সব সমালোচনা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।"

"সব সমালোচনাই বোধ হয় তোমার ঐ ভক্তিমান ছাত্র পঞ্চাননেরই লেখা। সব কাগজেই ও কবিতা লেখে,—কাগজওয়ালাদের সঙ্গে খাতির আছে, সে যা সমালোচনা লিখে দিয়েছে তাই বোধ হয় তারা ছেপেছে।"

যদিও পঞ্চানন স্পষ্টতঃ এ কথা স্বীকার করে নাই,—তথাপি অবিনাশবাবুরও মনে মনে সন্দেহ ছিল যে, সমালোচনাগুলি তাহার কর্তৃক,—অন্ততঃ তাহারই ইঙ্গিতে লিখিত। সুতরাং এ কথার জবাব না দিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু, যেদিন নাটক পড়া হল, ইউনিভার্সিটির অতগুলো দিগ্‌গজ প্রোফেসার, তাঁবা কি বলেছিলেন তোমার মনে নেই?--তুমি কি বলতে চাও, তাঁদের সে প্রশংসা আন্তরিক নয়, কপটতা-পূর্ণ?"

সুষমা বলিল, "তাঁদের প্রশংসা যে কপটতা-পূর্ণ সে কথা আমি বলতে চাইনে। সত্যিই তাঁদের ভাল লেগে থাকবে,—তাঁরা যা বলেছেন, সে তাঁদের আন্তবিক কথাই সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখ। তাঁরা সকলেই তোমার বন্ধু,. তোমায় স্নেহ করেন, ভালবাসেন। বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থার দিনে, তাঁদের এক প্রিয়বন্ধুর স্ত্রী বই লিখেছে এই সংবাদেই তাঁবা খুসী। তুমি আদর ক'রে বই শুনতে তাঁদেব নিমন্ত্রণ করেছ--তাঁরা ত বই ভাল লাগবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তা ছাড়া, আগে থেকেই বইয়েব প্রশংসা ক'রে তুমি তাঁদের মন ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলে। তাঁরা জিনিষটাকে দেখেছেন স্নেহের বন্ধুপ্রীতির রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে, সুতরাং ঠিক দেখেননি।"

স্ত্রীর এই বক্তৃতা শুনিয়া অবিনাশবাবু কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "সে যা হোক, আমি কি স্থির করেছি জান? যস্মিন দেশে যদাচারঃ। এ য়ুরোপে নয়—ঘরে ব'সে থেকে গুণী তার ন্যায্য প্রাপ্য পায় না। চেষ্টা-চবিত্র ক'রে গুণীকে তার প্রাপ্য আদায় ক'রে নিতে হয়। পঞ্চাননের সঙ্গে ডায়মন্ড থিয়েটারের ম্যানেজারেব আলাপ আছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন যাই, গিয়ে বই একখানা দিয়ে আসি। তুমি কি বল?"

সুষমা একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা বলিল, "তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমি আর কি বলবো?"

॥ ৪ ॥

আরও ছয় মাস কাটিল। নাটকখানি পঞ্চাননের ওকালতী সত্ত্বেও "ডাযমন্ড" থিয়েটার ফেরৎ দিয়াছে। তারপর "অ্যাভিনিউ" থিয়েটার, তারপর "বীণাপাণি" থিযেটার চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফল পূর্ব্ববৎ। পাণ্ডুলিপিখানি এখন "লীলা" থিয়েটাবের হস্তে —তাঁহারা কি করেন বলা যায় না।

"প্রেমের ইন্দ্রজাল" খানি সুষমা বাস্তবিক প্রাণ দিয়া লিখিয়াছিল। মুখে সে ইহাকে রাবিশ বলুক আর যাহাই বলুক, অন্তরের অন্তস্থলে তাহার বিশ্বাস যে নাটকখানি উচ্চদরের হইয়াছে। তাই বহি বিক্রয়ের হিসাব দেখিয়া এবং উপর্য্যুপরি তিনটি থিয়েটার হইতে নাটকখানি ফেরৎ আসায় সে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছে।

ভাদ্র মাসে একদিন ভিজাকাপড়ে ঘন্টাখানেক গৃহ-কার্য্য করায় সুষমার জ্বর হইয়া পড়িল। তিন চারি দিন জ্বরভোগের পর উহা ছাড়িল বটে, কিন্তু পরদিন আবার প্রবলতর বেগে দেখা দিল। সারা ভাদ্র মাস এইরূপ চলিল। ইহাতে সুষমার দেহ বলিতে গেলে কঙ্কালসার হইয়া পড়িল।—অবিনাশবাবু যে কয় ঘন্টা কলেজে থাকেন, তা ছাড়া সমস্তক্ষণ রুগ্না পত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটান। তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রত্যহ সুষমার অবস্থার সংবাদ লন।

সুষমা এখন অনেক সময় অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। একদিন জ্ঞান হইলে সে স্বামীকে

বলিল, "ওগো, দেখ আমি ভারি চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখেছি। যেন একটা প্রকাণ্ড বড় হল, তার শেষে স্টেজ, সেই স্টেজে যেন 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' প্লে হচ্চে, লোক একেবারে গিস্ গিস্ করছে। কত সব সাহেব মেম পর্য্যন্ত দেখতে এসেছে। তোমাকেও দেখলাম সেই সাহেব মেমদের দলেই। আমি যেন দোতলার চিকের আড়ালে ব'সে আছি। আচ্ছা লীলা থিয়েটারের হলটা কি খুব বড়?"—অবিনাশবাবু বলিলেন, "তাদের হল ত আমি দেখিনি। দু তিন দিন শুধু ম্যানেজারের বসবার ঘরে ঢুকেছিলাম।"

"ওগো, তুমি যাও না একদিন, ম্যানেজার কি বলে জেনে এসো।"

"তোমায় ফেলে কি ক'রে আমি যাই বউ?"

"তা হোক, তুমি যাও একদিন। কালই যাও না, কলেজের পর। এত যখন দেরী হচ্ছে, তারা বোধ হয় নেবে ঠিক করেছে। ফিরে আসবার হলে এতদিনে আসতো বোধ হয়। ডায়মন্ড থেকে, অ্যাভিনিউ থেকে, বীণাপাণি থেকে ফিরতে ত এত দেরী হয়নি।"

"আচ্ছা দেখি, যদি কাল সময় করতে পারি।"—বলিয়া অবিনাশবাবু ঘড়ি দেখিয়া, রোগিণীর মুখে চোখে চামচে করিয়া বেদানার রস দিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে ডাক্তারবাবু আসিলে অবিনাশবাবু তাঁহাকে রোগিণীর অবস্থা, বিশেষ করিয়া ঐ স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মনটা অত খারাপ বলেই চিকিৎসার তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশ্বর করুন লীলা থিয়েটার ওঁর নাটকখানি নেয়!" সেদিন কলেজের পর, পঞ্চাননকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশবাবু লীলা থিয়েটারে গমন করিলেন। ম্যানেজারবাবু বলিলেন, "না মশাই, বইখানি চলবে না—এই নিন" বলিয়া পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলেন।—গুরুপত্নীর রোগের অবস্থা, তাঁহার স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত, ডাক্তারবাবুর উপদেশ, পঞ্চানন সমস্তই অবগত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্র অত্যন্ত বিমর্ষ মনে ফিরিতেছিলেন। পঞ্চানন হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, "স্যার!"—অবিনাশ দাঁড়াইলেন। পঞ্চাননের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চক্ষু দুইটি ব্যাকুল মিনতি-পূর্ণ। বলিলেন, "কি হে?"

পঞ্চানন বলিল, "স্যার আমি একটা অন্যায় কর্ম্ম করবো—একটা মিথ্যে কথা বলবো, আমায় অনুমতি দিন। আমি তাঁকে গিয়ে বলবো, 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' লীলা থিয়েটার নিয়েছে—বই রিহার্সলে পড়েছে—আসছে শনিবারের পরের শনিবারে প্লে আরম্ভ হবে।"

অবিনাশ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওঃ, চল। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া অবিনাশবাবু ট্রামের জন্য দাঁড়াইলেন। পঞ্চানন বলিল, "স্যার, আপনার বোধ হয় মিথ্যে কথা তেমন সহ্য হয় না, আপনার এখন বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমি বাড়ী গিয়ে তাঁকে ঐ কথা বলিগে। তাঁকে বলবো যে বিশেষ কাজে আটকে প'ড়ে আপনি লীলা থিয়েটার হলে যেতে পারেননি, আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি গিয়ে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি রিহার্সল চলছে। তাই ছুটতে ছুটতে স্যারকে খবরটা দিতে এসেছি, স্যার কই?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তাই না হয় বলগে। আমি গোপালবাবুর বাড়ীতে খানিক ব'সে তার পর যাব এখন।"—পঞ্চানন বলিল, "আর স্যার, খাতাখানি কাইন্ডলি উপরে নিয়ে যাবেন না, বৈঠকখানা ঘরে দেরাজে বন্ধ ক'রে তার পর উপরে যাবেন।"

"বেশ, তাই করবো।"—বলিয়া উভয়ে ট্রামে উঠিলেন। অবিনাশবাবু চোরবাগানের মোড়ে নামিয়া, গোপালবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন।—আরও ঘন্টাখানেক পরে বাড়ী পৌঁছিয়া অবিনাশবাবু দেখিলেন, সুষমা নিদ্রিত, তাহার গালে চোখের জলের দাগ।

ঘন্টাখানেক পরে সুষমা জাগিয়া বলিল, "ওগো, পঞ্চাননের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?"

"হ্যাঁ, হয়েছে বইকি। তাকে লীলা থিয়েটারে পাঠিয়েছি। ম্যানেজার কি বললে কালকে কলেজে বোধ হয় শুনতে পাব তার কাছে।"

সুষমা ক্ষীণস্বরে বলিল, "সে এসেছিল ঘন্টাখানেক আগে। ওরা বইটে নিয়েছে—রিহার্সল চলছে—পঞ্চানন দেখে এসেছে। আসচে শনিবারের পরের শনিবারে নাকি খুলবে বলেছে!"

অবিনাশবাবু মুখে কৃত্রিম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "নিয়েছে? আঃ, বাঁচা গেল। আজ হল কি বার? বুধবার। বুধে বুধে আট, বৃহস্পতিতে নয়, শুক্রে দশ, শনিতে এগারো। এগারো দিন পরে প্লে আরম্ভ হবে, প্রথম রজনীতে আমরা দুজনে দেখতে যাব না? তুমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে নাও।"—সুষমা বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে!"

সুষমার বেদনার রস পান করিবার সময় হইয়াছিল। উহা পান করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু লক্ষ্য করিলেন, তাহার মুখে শান্তি বিবাজ করিতেছে।

॥ ৫ ॥

এই কাল্পনিক শুভসংবাদ বাস্তবিক সুষমাব ব্যাধিতে মহৌষধির কার্য্য করিল। দিন দিন সে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।—পঞ্চাননেব পরামর্শে বিজ্ঞাপনের ভয়ে বাড়ীতে সংবাদপত্রের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সে মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার গুরুপত্নীকে রিহার্সল-সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক কাহিনী বলিয়া যায়।

শুক্রবার আসিল। সুষমার জ্বব আর নাই, কিন্তু, আজিও সে অন্নপথ্য করে নাই। স্বামীকে বলিল, "ওগো আমি ত পারলাম না, তুমি কাল থিয়েটারে যাও, কি বকম অভিনয় হয়, লোকে ত কি ভেবে নেয়, জেনে এস।"

অবিনাশ বলিলেন, "পাগল! আমি যাব একা 'প্রেমেব ইন্দ্রজাল' দেখতে? যখন যাব, দুজনে যাব, তুমি শরীরে একটু বল পাও আগে। পঞ্চাননকে পাঠিয়ে দেবো, সে দেখে এসে বলবে প্লে কেমন ওৎরালো।" সুষমা আব কোনও কথা বলিল না।—"প্রেমের ইন্দ্রজাল"-এর পাণ্ডুলিপি পঞ্চানন পূর্ব্বেই চাহিয়া লইয়া গিয়াছিল। উহা হইতে সে একখানি প্রোগ্রাম ছকিয়া তাহা ছাপাইয়া লইল। উপরে লীলা থিয়েটাবেব নাম, তারপর পাত্র-পাত্রীর পরিচয়, অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক—এমন কি শেষে ইংবাজি হরফে ছাপা ম্যানেজারের নামটি পর্য্যন্ত।—রবিবার প্রাতে, এই প্রোগাম হাতে লইয়া সে অবিনাশবাবুর গৃহে আসিল এব অভিনয়-সম্বন্ধে অনর্গল অনেক কাল্পনিক-কাহিনী বলিয়া গেল। এমনকি, অভিনয়কালে একজন মাতাল পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকের গাত্রে বমি করিয়া দিয়া কিভাবে লাঞ্ছিত ও বিতাবিত হয় তাহাও জানাইল।

॥ ৬ ॥

তিন দিন পরে সুষমা অন্নপথ্য করিল। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন যত শীঘ্র সম্ভব ইহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। পূজোব ছুটি হইতে সপ্তাহ মাত্র বাকী, সে সপ্তাহ অবিনাশবাবু ছুটি লইয়াছেন। শুক্রবাব দিন ছিল ভাল, ঐ দিন পাঞ্জাব-মেলে তিনি সস্ত্রীক চুণাব যাত্রা কবিলেন।—চুণারে সুষমার স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। দুই মাস পরে স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় অবিনাশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া সুষমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' এখনও লীলা থিয়েটারে হচ্ছে?"

"না,—তারা এখন অন্য বই আরম্ভ করেছে।"

"তাইত! আমাদের যে দেখা হল না।"

"না, পেশাদারী থিয়েটারে, দেখা হল না বউ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে সখের দল আছে, লাটসাহেব কলকাতায় ফিরলেই তারা ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে প্রেমের ইন্দ্রজাল' অভিনয় করবে।"

এ কথাটা সত্য---কাল্পনিক নয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে পঞ্চাননই ছিল প্রধান পান্ডা।

সুষমা সত্যিই একদিন দ্বিতলে চিকের আড়ালে বসিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'প্রেমের ইন্দ্রজাল'-এর অভিনয় দেখিল। অনেক সাহেব মেম আসিয়াছেন তাহাও দেখিল। দ্বিতীয় অঙ্কে ড্রপ পড়িলে কে এক সাহেব তাহার স্বামীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কি সব কথা বলিতে লাগিলেন। তারপরেই সাহেব অন্য কতকগুলি সাহেব ও মেমের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।---বাড়ী আসিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা সে সাহেবটা কে গা? তোমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড ক'রে হাসতে হাসতে কথা কইছিল দেখলাম।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে সাহেব কে শুনবে? বড় কেউকেটা নয়, স্বয়ং লাটসাহেব। তিনি যখন উঠলেন, আমাদের ভাইসচ্যান্সলার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে এই বলে পরিচয় ক'রে দিলেন---ইনিই এই নাটকের রচয়িত্রীর স্বামী---আমাদের একজন সম্মানিত অধ্যাপক।"

"শুনে লাটসাহেব কি বললেন?"

"বললেন, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার প্রতিভাশালিনী পত্নীকে আমার সম্মান ও অভিনন্দন জানাইও।"---ইহার পর সুষমা যখন শুনিল যে, "প্রেমের ইন্দ্রজাল" কোনও দিনই লীলা থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই, প্রোগ্রামখানি পর্য্যন্ত জাল, ঐ সংবাদ তাহাব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সস্নেহ ষড়যন্ত্র মাত্র---তখন আর তার মনে বিশেষ দুঃখ হয় নাই।

[জামাতা বাবাজী গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত]

হারানো মেয়ে

বহুকাল পশ্চিমে সমরবিভাগে চাকরি করিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে সারদাবাবু পেন্সন লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, জীবনেব শেষ বৎসর কয়েকটা পিতৃপিতামহের ভিটায় কাটাইয়া দিবেন।

সপরিবারে দেশে ফিরিয়া, ঘর-দুয়ার কতক কতক মেরামত করিয়া, নিজ গ্রামে তিনি বসবাস আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মনও টিকিল না, তাহার উপর ম্যালেরিয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন সারদাবাবু গ্রামের বাস উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া, ভবানীপুরে একটি দ্বিতল বাটী খরিদ করিয়া স্থায়ী হইয়া বসিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র তিন কন্যা। বড় ছেলেটি লাহোরে চাকরি করিতেছে এবং সপরিবারে সেখানেই আছে। ছোট ছেলে লাহোর কলেজে বি-এ পড়িতেছে। বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে, সে নিজে শ্বশুরালয় লক্ষ্ণৌয়ে থাকে। ছোট মেয়ে চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে, তাহার বিবাহ এখনও দিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেজন্য সারদাবাবু গৃহিণীর নিকট নিত্য গঞ্জনা লাভ করেন।

ভবানীপুরে আসিয়া সারদাবাবু উৎসাহের সহিত আদিগঙ্গায় প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সূত্রে পাড়ার আর কয়েকজন গঙ্গাস্নানার্থী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহারাও সারদাবাবুর মতই নিষ্কর্ম্মা ও পরিণতবয়স্ক, ক্রমে পরস্পরের গৃহে যাতায়াত এবং পরিণামে সারদাবাবুরই বৈঠকখানায় আড্ডা স্থাপন হইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বন্ধুরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হন। সারদাবাবু পশ্চিমে ছিলেন, টাকাও রোজগার করিয়াছেন বিস্তর, দিল্ ছিল দরিয়ার মত বিস্তৃত, আতিথ্য-বিষয়ে চিরদিনই মুক্ত-হস্তই ছিলেন। এখানেও চা-চুরুট-তামাক বিতরণে কার্পণ্য করা তাঁহার ধাতে সহিল না।

যে বন্ধুগুলি সংগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একটির প্রতি সারদাবাবুর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার নাম ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। বয়স তাঁহার সারদাবাবুর চেয়ে দুই এক বৎসর বেশীই হইবে। তিনিও গভর্ণমেন্টের পেন্সন-ভোগী। ঠিক পাড়ায় নয়, একটু দূরেই তাঁহার গৃহ। তথাপি এই আড্ডায় আসিয়া প্রায়ই তিনি হাজিরা দেন।

এখন ইহার প্রতি সারদাবাবুর বিশেষ আকর্ষণের কারণটা খুলিয়া বলি। ভগবতীবাবুর একটি পুত্র আছে, পঁচিশ ছাব্বিশ তার বয়স। তাহার নাম কুলদাচরণ, সেই ভগবতীবাবুর একমাত্র পুত্র। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কুলদার বিবাহ হইয়াছিল, আজ এক বৎসর কাল সে বিপত্নীক। প্রথম সন্তান প্রসব করিবার কালেই কুলদাব স্ত্রী মারা যান, একটি ছেলে হইয়াছিল, সেটি সাতদিন মাত্র জীবিত ছিল। কুলদা আই-এ পাস করিয়া আফিসে ঢুকিয়াছিল, এখন পঁচাত্তর টাকা বেতন পায়। অফিস ভাল, উন্নতির আশা আছে, ছেলেটি দেখিতেও ভাল, তার উপর বেশ বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র। ভবানীপুবে আসিয়াও সারদাবাবু মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, সুবিধা মত অন্য কোন পাত্র যদি না-ই পাওয়া যায়, তবে কুলদার সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

কিন্তু ভগবতীবাবুর সাক্ষাতে এখনও এ কথা তিনি পাড়েন নাই। আরও ভাল পাত্র যদি পাই, এই আশায় কিছুদিন কাটাইলেন। কিন্তু তেমন মনের মত পাত্র জুটিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ভগবতীবাবুর কাছে তিনি কথাটা পাড়িলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে অন্য কোনও বন্ধু সাবদাবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন না। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা দিয়া গেল। চা-পান করিতে করিতে সারদাবাবু ভগবতীবাবুকে বলিলেন, "চাটুয্যে-মশাই, আপনার বৌমা তো প্রায় এক বৎসর হল গত হয়েছেন, ছেলের বিয়ে দিচ্চেন না কেন? আমার ছোট মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন তো! মেয়ে বড় হয়েছে সাজবেও ভাল আপনার ছেলের সঙ্গে। যদি মত কবেন—"

ভগবতীবাবু বলিলেন, মেয়ে ত আপনার খাসা মেযে। কিন্তু হলে হবে কি! ছেলেব বিয়ে আমি কি ইচ্ছে ক'রে দিচ্চিনে সারদাবাবু? ছেলে রাজী হয় কই?"

"কেন রাজী হয় না কেন? কিই বা তার বয়স! ও-বযসে কত লোকের তো প্রথম বিবাহই হয় না।"

ভগবতীবাবু বলিলেন, "তা সে বোঝে কই বলুন! আমার ধরুন ঐ একটা ছেলে। ও যদি আর বিয়ে না করে তা হলে তার বংশটাই লোপ হল। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ হল, ও কিছুতেই রাজী হয় না। আমি কত বোঝালাম, ওর গর্ভধারিণী কত কান্নাকাটি করলেন, কিছুতেই কিছু হল না। দেখে শুনে আমরা তো একরকম হালই ছেড়ে দিয়েছি মশাই। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট!—বলিয়া ভগবতীবাবু চা-পান শেষ করিয়া পান মুখে দিলেন।

সারদাবাবু বলিলেন, "সে বউয়ের শোকটা বড্ড বেশী লেগেছে বোধ হয ওকে।"

"তা লেগেছে বটে। বউমা যাওয়ার পর থেকে ও মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছে, আতপান্ন ধরেছে, একবেলা মাত্র খায়,—বলে আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছি। ব্রহ্মচর্য করছে, আব পদ্য লিখছে।"

"পদ্য লেখে নাকি?"

"হ্যাঁ, বউয়ের নামে রাশি রাশি পদ্য লিখেছে। ফি রবিবারে, খেয়ে দেয়ে, খাতা পেন্সিল নিয়ে, ইষ্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে শিবপুরে কোম্পানির বাগানে যায়, সেইখানে গাছতলায় ব'সে ব'সে না কি বউয়ের জন্যে কাঁদে, আর পদ্য লেখে। এ কথা তার বন্ধুদের মুখেই আমি শুনেছি।"—সারদাবাবু বলিলেন, "ও রকম তো কতই শোনা গেছে। ঐ রকম ব্রহ্মচর্য্য-টর্য্য বেশী দিন তো টেকে না—শেষ কালে হয় নিজেই খুঁজে পেতে আবার বিয়ে করে, না হয় একটা কেলেঙ্কারি ক'রে বসে।"—উভয়ে নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণও একে একে আসিয়া সভাস্থ হইতে লাগিলেন।

।। ২ ।।

উপরে বর্ণিত ঘটনার মাসখানেক পরে, এক রবিবারে কবি-ব্রহ্মচারী কুলদাচরণ আহারাদি সারিয়া যথানিয়মে খাতা পেন্সিল লইয়া, শিবপুর যাত্রা করিল।

বৃক্ষতলে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, কবিতার খাতা খুলিয়া কুলদা কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত। আজ এক ঘন্টার উপর এই ভাবে সে বসিয়া আছে, মোটে পাঁচটি লাইন লেখা হইয়াছে, ষষ্ঠ লাইনটি দুই তিনবার লিখিয়া কাটিয়াছে, কিছুতেই আর মনের মত হইতেছে না, এমন সময় অদূরে কোন রমণীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল।—কুলদা চমকিয়া উঠিল। এখানে, এ সময়, কে স্ত্রীলোক কাঁদে? খাতা ও পেন্সিল পকেটে ভরিয়া, সে চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে ছুটিল।

দুইটা মাত্র বৃক্ষের অন্তরাল পার হইয়া কুলদা দেখিল, বৃক্ষতলে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মুখখানি সে দেখিতে পাইল না, হাত দুখানির রঙ বেশ ফর্সা, বস্ত্রাদি ভদ্রলোকের মেয়ের মতই। আকার দেখিয়া, মেয়েটি বালিকা না যুবতী তাহা কুলদা ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না।

নিকটে গিয়া বলিল, "এখানে ব'সে আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?"

শুনিয়া মেয়েটির মুখ হইতে হস্তাচ্ছাদন খুলিয়া, একবার মাত্র আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। আবার সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহার কান্নার বেগ বাড়িয়া গেল।

মেয়েটি তরুণ-মুখখানি দেখিয়া কুলদা অনুমান করিল, ইহার বয়স বড় জোর তের চৌদ্দ বছর, সুতরাং স্থির করিল, ইহাকে আপনি বলার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি কাঁদছ বল না। তোমার কিছু ভয় নেই, কি হয়েছে বল। যদি তোমার কোনও উপকার আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তা নিশ্চয়ই আমি করবো।"

তবু মেয়েটি মুখও খোলে না, উত্তরও করে না। কুলদা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে, মেয়েটি অবশেষে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি হারিয়ে গেছি।"

কুলদার প্রশ্নের উত্তরে নিজের ইতিহাস মেয়েটি যাহা বলিল তাহা এই। জন্মাবধি পিতামাতার সহিত সে পাঞ্জাবে ছিল, জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে পাঠ করিত। তাহার নাম কমলা। সম্প্রতি পিতার সহিত সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ বেলা দশটার পর স্টীমারে পিতা তাহাকে এই বাগান দেখাইতে আনিয়াছিলেন। বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পায়; তাই পিতা তাহাকে এইখানেই বসাইয়া, খাবার কিনিতে বাজারে গিয়াছেন। তিন ঘন্টা অতীত হইযাছে এখনও তিনি ফিরিলেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন অভাবনীয় বিপৎপাত হইযাছে।—কুলদা মনে মনে বলিল, "দেখ দেখি একবার আক্কেল লোকটার! মেড়োর দেশে থাকে কিনা—কত আর বুদ্ধি হবে? এই সোমত্ত মেয়েটাকে এখানে একলা ফেলে বাজারে গেছেন খাবার কিনতে! বাজার কি এখানে?"

মেয়েটি আবার কান্নার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া কুলদা বলিল, "তুমি কিছু ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই তোমার বাবা আর বেশী দেরী করবেন না, এইবারে ফিরবেন। চল বরঞ্চ আমরা ফটকের কাছে গিয়ে বসে থাকি। তিনি আসছেন দূর থেকেই আমবা দেখতে পাব। তিনিও বাগানে ঢুকতেই তোমায় দেখতে পাবেন। এস আমার সঙ্গে, কিছু ভয় নেই তোমার। তোমাকে তোমার বাবার হাতে জিম্মে করে দিয়ে তার পর আমি যাব এখান থেকে।"

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে কুলদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করেও বাবার যদি দেখা না পাই, তা হলে কি হবে আমার?"

কুলদা বলিল, "তোমার কোন চিন্তা নেই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করেও যদি তাঁর দেখা না পাওয়া যায়, তোমাকে ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব, তার পর

তোমার বাবার সন্ধান করবো। জলন্ধরে তোমার মাকে চিঠি লিখবো, তোমার আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছেন চিঠি লিখবো।"—বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইল, মেয়েটির পিতা কিন্তু ফিরিল না। কুলদা তখন শেষ স্টীমারে তাহাকে কলিকাতায় আনিল এবং বাড়ী আসিয়া তাহাকে নিজ জননীর নিকট সমর্পণ করিয়া সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে জানাইল।—জননী গোপনে একটু হাসিলেন।

।। ৩ ।।

এক সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু মেয়েটির পিতার কোন সন্ধান কুলদা করিতে পারিল না।

ভগবতীবাবু হারানো মেয়েটির পিতার খোঁজ করিবার ভার পুত্র কুলদার উপরেই দিয়াছেন।

কুলদা আফিসে গেলে, দ্বিপ্রহরে সারদাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রায়ই কমলাকে দেখিতে আসেন।

বলা বাহুল্য কমলা সারদাবাবুরই কন্যা। সারদাবাবু ও কুলদার পিতা উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া, কমলাকে শিখাইয়া পড়াইয়া সেদিন শিবপুর বাগানে বসাইয়া অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন।

আরও এক সপ্তাহ নিষ্ফল কাটিয়া গেলে কুলদার মাতা বলিলেন, "কমলার বাপের কোনও খোঁজ যখন পাওয়াই গেল না, কি আর করা যাবে? হাজার হোক ব্রাহ্মণের মেয়ে ত, ফেলতে ত পারবো না, এখানেই ও থাকুক। আমার তো মেয়ে নেই, ওর দ্বারাই আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ হবে। পরে তখন একটি পাত্র দেখে-শুনে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।"

কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে কমলা হিন্দী ও সংস্কৃত ভালই শিখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত নাটকাভিনয়ে সে একটি মেডেল পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সে ভালরূপ শিখিবার সুযোগ কখনও পায় নাই। জননীর অনুরোধে কুলদা তাহাকে বাঙ্গলা পড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। অন্য দিন আফিস থাকায় বেশী সময় কমলাকে সে দিতে পারে না, রবিবারে বেশীক্ষণ পড়াইয়া পোষাইয়া লয়। শিবপুরের বাগানে যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতাও স্থাপিত হইয়াছে বেশ দেখা গেল। আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ছাত্রীকে না দেখিলে, কুলদার পিপাসিত-চক্ষু চারিদিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। আর, কমলার রান্না পাঞ্জাবী ব্যঞ্জনগুলি তাহার মুখে লাগে যেন অমৃত!

মাসখানেক পরে কুলদার জননী একদিন কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "উনি কমলার একটি সম্বন্ধ স্থির করেছেন। বরের বয়স কিছু বেশী হয়েছে—তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবে, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু লাগবে না।"—বলা বাহুল্য ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

এই কাল্পনিক সংবাদ শ্রবণমাত্র কুলদার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। চোখে জল আসিল। জননীকে জানাইল, অমন সুন্দরী ভাল মেয়েকে ওরকম পাত্রের হাতে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। তার চেয়ে না-হয় অগত্যা নিজেই সে উহাকে বিবাহ করিবে।

উত্তম কথা। দিনস্থির হইল।

বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে কমলার পিতারও সন্ধান পাওয়া গেল। কুলদা ভাবিল, আশ্চর্য্য কথা! তিনি এই ভবানীপুরেই বাস করিতেছিলেন। এবং এ বাড়ী হইতে অধিক দূরেও নহে। জলন্ধর হইতে তাঁহার স্ত্রীও নাকি আসিয়াছেন।

কমলাকে সারদাবাবু স্বগৃহে লইয়া গেলেন। যথা দিনে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কুলদা এখন আর আতপান্ন খায় না, সিদ্ধ চাউলই খাইতেছে, মাছ-মাংসও ধরিয়াছে এবং দুইবেলাই উত্তমরূপে ভোজন করে। শিবপুরের বাগানে যাওয়া এবং "পদ্য" লেখা ত পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল।

['জামাতা বাবাজী' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত]

দুধ-মা

সারকুলার রোডের উপর বৃহৎ বাগানওয়ালা, ঐ যে নীলবর্ণের দ্বিতল গৃহখানি, উহা ডাক্তার ডি. ভাদুড়ীর বাসভবন। ফটকের পার্শ্বে উজ্জ্বল পিত্তল-ফলকে কালির অক্ষরে সে কথাই লেখা আছে। বিলাতী পবীক্ষায় তিনি ইংরেজী বর্ণমালার কি কি অক্ষর উপাধি পাইয়াছিলেন,তাহার ফিরিস্তিসহ ইহাও প্রকাশ যে, তিনি মিণ্টো মেডিক্যাল কলেজে ধাত্রী-বিদ্যার অধ্যাপক এবং উক্ত কলেজসংলগ্ন হাসপাতালে প্রসূতি-বিভাগের বড় কর্ত্তা। এই বাড়ীখানি তাঁহার নিজস্ব নহে, ভাড়াটিয়া বাড়ী। তাই বলিয়া কলিকাতা সহরে তাঁহার নিজের বাড়ী যে নেই, এমন নহে। ইটালী পদ্মপুকুরে তাঁহার পৈত্রিক বাটী রহিয়াছে, তাহা ভাড়া খাটে। বিবেকানন্দ রোডের উপর তাঁহার একখানি ত্রিতল বাটী নির্ম্মিত হইতেছে। নির্ম্মাণ শেষ হইলে উহাও আপাততঃ তিনি ভাড়া দিবেন বলিয়া প্রকাশ। নিজের বাড়ী থাকিতে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিবার কারণ এই যে,তাঁহাব প্রাকটিস্‌টা এই অঞ্চলেই বেশী, অনত্র বাস করা তাঁহাব ব্যবসাযের পক্ষে ক্ষতিজনক হইতে পাবে।

কলেজের বেতনে এবং প্র্যাক্‌টিসে ডাক্তার সাহেব প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার গৃহিণীর দুই সেট জড়োযা গহনা এবং কোম্পানীর কাগজে লোহার সিন্দুক ভর্ত্তি। তাঁহার দুইখানা মোটরকার, সমাজে মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই। তাঁহারও নাই, তাঁহার স্ত্রীরও নাই। তাঁহারা নিঃসন্তান, ইহাই তাঁহাদের মনস্তাপের কারণ। ডাক্তার সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাঁহার স্ত্রী বিভাবতীর বয়স চল্লিশ, সুতরাং সন্তান হইবার আশা-ভরসাও অনেক কাল বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, কয়েক দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া, গরমটা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুবৃহৎ শয়নকক্ষে ঘূর্ণায়মান বিদ্যুৎপাথার নিম্নে পালঙ্কোপরি ডাক্তার-দম্পতি আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। পশ্চিম দিকের তিনটি জানালা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সেই জানালা দিয়া ক্ষীণ উষালোক প্রবেশ করিতেছে। গৃহোদ্যানেব বৃক্ষশাখাবাসী কাকবা ডাকাডাকি করিতেছে, এখনও মনস্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন সময়ে হঠাৎ ডাক্তার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল---রুদ্ধ দ্বারে বাহির হইতে কে যেন করসন্তান করিতেছে। "কে?"—বলিয়া ডাক্তার সাহেব শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। "মা, মা গিন্নীমা!"—বেড়্‌সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া ডাক্তার সাহেব ঘড়ি দেখিলেন, মাত্র পাঁচটা। এখনও এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ঘুমাইবার কথা--অসময়ে এ কি উৎপাত? বিরক্তিতে ডাক্তার সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? ঝি?"

উত্তর হইল---"আজ্ঞে। দোবটা খুলুন, বাবা!"

বিলাত ফেরত ডাক্তার সাহেবের পত্নী গিন্নীমা? মেমসাহেব নহেন? তাঁহার পরিচালিকা যে, সে ঝি? আয়া নহে? আর সেই অসভ্য ঝি প্রভুকে বলে বাবা? হুজুর বলে না? কিন্তু ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে। গৃহকর্ত্রী বিভাবতীর মতামত এ সব বিষয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁহাকে কেহ মেমসাহেব বলিলে তিনি দস্তুরমত চটিয়া যান। টেবিলে বসিয়া কাঁটা-চামচ সহযোগে আহার করেন বটে, কিন্তু রাঁধে ও পরিবেষণ করে বামুন ঠাকুব। তবে তিনি যে ঘোর হিন্দু বলিয়া বা অশিক্ষিতা বলিয়া এরূপ মনে করেন, তাহাও নহে। তিনি বেথুনে পড়া মেয়ে, দুইটা পাশ করিয়াছিলেন এবং আজিও স্বামীর সহিত ইংরাজি হোটেলে গিয়া নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস গ্রহণেও আপত্তি কবেন না।

"বাবা, দোরটা একবার খুলুন।"

ডাক্তার সাহেব ইতিমধ্যে শয্যা হইতে নামিয়া চেয়ারের উপর হইতে ড্রেসিং গাউনটা লইয়া গায়ে দিয়াছিলেন। দ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন, ঝি সোনার মা দাঁড়াইয়া ঠক্‌-ঠক্‌ করিযা কাঁপিতেছে, ভয়ে মুখ তাহার বিবর্ণ, নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।—ডাক্তার সাহেব

তাহার মুর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, ঝি?"

সোনার মা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "আজ্ঞে, ছেলে।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছেলে? কার ছেলে? কি হয়েছে তার?"

এই সময় ডাক্তার-গৃহিণীরও ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, কি হয়েছে? কি বলছে ঝি?"

"ভিতরে এসে বল্"—বলিয়া ডাক্তার সাহেব টেবিলের নিকট গিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া আসিয়া পালঙ্ক-প্রান্তে পা ঝুলাইয়া বসিলেন।

সোনার মা বলিল, "কোন্ অবাগী শতেক্‌খোয়ারী এমন কাজ করলে মা, তা ত জানিনে। একটা মরা ছেলে এনে, আমাদের সদর বারান্দায় শুইয়ে রেখে গেছে।"

গৃহিণী। মরা ছেলে? কত বড় ছেলে?

সোনার মা। আঁতুড়ের ছেলে বলেই মনে হল। একেবারে কচি ছেলে মা, একেবারে কচি। আমি ঘুম থেকে উঠে মনে করলাম, যাই, বাসি পাটগুলো সকালে সকালে সেরে ফেলি। সদর বারান্দা ঝাঁট দেব বলে ঝাঁটাগাছটা হাতে করে যাই সদর দরজা খুলেছি, অমনি দেখি মা, ন্যাকড়ায় জড়ানো কি একটা পড়ে রয়েছে। একেবারে চৌকাঠের কাছেই, আর একটু হলেই মাড়িয়ে ফেলেছিলাম আর কি! বলি, কি ওটা পড়ে রয়েছে? ভাল আলো ত হয়নি। তায় বুড়ো মানুষ, চোখে একটু ঝাপসা দেখি। ঝুঁকে দেখি মা, কচি ছেলের মুখ। সর্ব্বাঙ্গ ন্যাকড়ায় জড়ানো, মুখটি শুধু বেরিয়ে রয়েছে। আহা, কোন্ অবাগীর বাছা, যেন রাজপুত্তরটি গো! নড়েও না, চড়েও না। মা গোঃ বলে ভয়ে আমি ছুটতে ছুটতে এলাম আপনাদিকে খবর দিতে।

ডাক্তার। মেয়ে না ছেলে কি করে জানলি তুই?

ঝি। কি জানি বাবা নারায়ণই জানেন।

ডাক্তার। নারায়ণ কেন, গা খুলে দেখলে আমরাও বুঝতে পারবো।

গৃহিণী। মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক, এ নিশ্চয় কোনও নষ্ট স্ত্রীলোকের কাজ। বিধবা টিধবা কেউ প্রসব হয়েছে, তার আত্মীয়-বন্ধুরা গলা টিপে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গেছে।

সোনার মা। তাই হবে্ক গো, তাই হবে্ক। পুলিশে খবর দাও মা, তারা ধরে নিয়ে গিয়ে হারামজাদী নচ্ছার মাগীকে ফাঁসি দিক।

ডাক্তার সাহেব মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "উঁহু, তা নয় বোধ হয়। গলা টিপে মারেনি বোধ হয়। তা হলে মরা ছেলে রাস্তার জঞ্জালের টিনে কিম্বা কোনও পুকুরে-টুকুরে ফেলে দিয়ে যেত। ডাক্তারের বিশেষতঃ ভাদুড়ী ডাক্তারের সদরে রেখে যাবে কেন? গিন্নী তুমি যা বলেছ, কোনও নষ্ট স্ত্রীলোক ওকে প্রসব করেছে, সে কথা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সে বোধ হয় জ্যান্ত—ঘুমুচ্ছে বলে ঝি মনে করেছে মরা ছেলে। অন্ততঃ যখন রেখে গিয়েছিল, তখন জ্যান্তই ছিল আমার বিশ্বাস। আমি যদি ওকে বাঁচাতে পারি, সেই আশাতেই বোধ হয় এ কাজ করেছে। যাই, দেখি ব্যাপারটা কি!"—বলিয়া তিনি খাট হইতে নামিলেন।

গৃহিণীও কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সোনার মাও চলিল। সে বলিতে বলিতে গেল—"আহা বাছা রে! এলি এলি অমন রাক্ষুসীর গর্ভে কেন এলি? আর কি কোথাও ঠাঁই পেলিনে?" ইত্যাদি।

ডাক্তার সাহেব সদর বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অন্যান্য ভৃত্যরা সেখানে গিয়া অবাক হইয়া সেই পরিত্যক্ত মানবের পানে চাহিয়া আছে। ন্যাকড়ায় নহে,

ক্রিকেট ফ্ল্যানেলে শিশুটি জড়ানো। ডাক্তার সাহেব কিন্তু দৃষ্টিমাত্র বলিলেন, "কে বললে মরা ছেলে? ঘুমুচ্ছে। ঐ যে নিঃশ্বাস পড়ছে।"—বলিয়া তিনি শিশুর আবরণ ধরিয়া তাহাকে নাড়িয়া দিলেন। শিশু তখনই চক্ষু খুলিল ট্যা-ট্যা করিয়া, কাঁদিয়া উঠিল।

সকলেরই বিমর্ষ মুখে হাসি ফুটিল। সোনার মা বলিযা উঠিল, "জয় বাবা সত্যনারায়ণ! জয় মা কালীঘাটের কালী!"

গৃহিণী স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো বাঁচবে?"

ডাক্তার বলিলেন, "তা এখনই বলা যায় না। চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "চেষ্টা কর গো, ওকে বাঁচাও। আমি ওকে নেবো।"

ডাক্তার সাহেব শিশুকে তুলিয়া তাঁহার ডাক্তারখানা-ঘরে লইয়া গেলেন। বহিরাবরণ খুলিলেন, উহা কাহারও পাৎলুন ছেঁড়া বলিয়া বোধ হইল। তাহার নিম্নে সুকোমল সিল্ক ফ্ল্যানেল, উহাও যেন কাহারও কামিজ বা পাঞ্জাবী ছেঁড়া। মেয়ে নয়, ছেলেই বটে।; এবং বাস্তবিক সদ্যোজাতই বটে। গতকল্য দিবসে বা হয়ত রাত্রিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। নাড়ী কাটা হইয়াছে। স্নান করানোও হইয়াছে। শিশু সমভাবেই কাঁদিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয় গো, তাই অত কাঁদছে। দুধ আনবো?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, একটু হর্লিক তৈরী কর।"

স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া গৃহিণী জল সেইখানেই গরম করিতে লাগিলেন।

।। দুই ।।

শিশুর পরিচর্য্যার ভার আপাততঃ সোনার মার উপরই পড়িল। সে চারি পাঁচটি সন্তানের জননী—শিশুপালনবিধি ভালরূপই জানে। এখন দিন দুই তিন হর্লিক চলিবে তারপর একজন দুগ্ধবতী ধাত্রীর প্রয়োজন। হাসপাতালে যাইবার সময় স্বামীকে বিভাবতী বলিয়া দিলেন, "দেখো না গো, তোমার প্রসূতি বিভাগে যদি কাউকে পাও।"

বেলা সাড়ে এগারোটায় ডাক্তার সাহেব হাসপাতাল হইতে ফিরিলেন। পুলিশের একজন ইন্সপেক্টরও তাঁহার সঙ্গে আসিযাছিল। হাসপাতালে পৌঁছিয়াই ডাক্তার সাহেব ঘটনার বিবরণ থানায় পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইন্সপেক্টর বিনোদবাবু তাই "এনকোয়ারি" জন্য ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছেন।

দ্বিতলের একটি আলো-বাতাসযুক্ত ভাল ঘরে শিশু স্থান পাইয়াছে। ডাক্তার সাহেব বিনোদবাবুকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিশুর জন্য ছোট খাটে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। মাথায় তার রেশমে বোনা সুন্দর কানঝাঁপা টুপী, গায়ে সাহেবদের কচি ছেলের মত ফ্ল্যানেলের লম্বা কুর্ত্তি, পায়ে লাল উলের মোজা। পাশে সোনার মা বসিয়া আছে। ডাক্তার সাহেব ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কোথা থেকে এল রে? কেউ দিয়ে গেল নাকি?"

সোনার মা মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মা এ কম্পাউন্ডার বাবুকে দিয়ে হগ সাহেবের বাজার থেকে আনিয়েছেন।"

ইন্সপেক্টরবাবু এতক্ষণ একদৃষ্টিতে শিশুর মুখপানে চাহিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন। "রঙ ত খুব ফর্সা! হ্যাঁ মশায়, এটা সাহেবদের ছেলে নয়ত?"

ডাক্তার সাহেব। না, না, তা নয়। য়ুরোপীয়ান কচি ছেলের রং এর চেয়ে আরও অনেক ফর্সা হয়—একেবারে ধবধবে শাদা। আঁতুরের ছেলের রঙ এ রকম হলে ক্রমে সেটা শ্যামবর্ণে দাঁড়ায়।

বিনোদবাবু। তা হলে আপনার মতে এ সাহেবের ছেলে নয়, বাঙ্গালীরই ছেলে?

ডাক্তার। বাঙ্গালী, কি খোট্টা, কি মাড়োয়ারী, তা কি করে বলবো? তবে এর পিতামাতা দেশী লোকই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"এতকাল আপনি ম্যাটর্নিটি ওয়ার্ডের চার্জ্জে রয়েছেন, আপনি ত এ সম্বন্ধে

বিশেষজ্ঞ।"—বলিয়া ইন্সপেক্টরবাবু পকেট-বুক বাহির করিয়া কি লিখিয়া লইলেন। বলিলেন, "সেই ফ্ল্যানেলগুলো, যাব কথা চিঠিতে আপনি লিখেছিলেন, সেগুলো কোথায়?"

ডাক্তার সাহেবের আদেশে সে সব আনীত হইল। বিনোদবাবু সেগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ব্যাপারটা সম্ভবতঃ সি. আই. ডি-তে যাবে। ছেলের প্রসূতিকে যদি তারা খুঁজে বের করতে পারে, তবে এইগুলোর সাহায্যেই পারবে। আর ত কোনও সূত্র পাচ্ছিনে।—আচ্ছা, আপনাদের হাসপাতাল-সংক্রান্ত কোনও স্ত্রীলোকের এ কাজ নয় ত? কোনও দেশী নার্স কিম্বা চাকরাণী?"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "সেটা আপনি খোঁজ করে দেখুন। হাসপাতালের কেউ যদি হয়, তবে সে আজ তার নিজের বাসায় শয্যাগত—কাজে আসেনি।"

বিনোদবাবু আবার পকেট-বুক বাহির করিয়া কি লিখিলেন! পকেট-বুক বন্ধ করিয়া বলিলেন, "এই ফ্ল্যানেলগুলো আমায় নিয়ে যেতে হবে। দয়া করে কাউকে বলুন, একটা খবরের কাগজে এগুলো বেঁধে আমায় দিক।"

একজন ভৃত্য আসিয়া ডাক্তার সাহেবেব আদেশ প্রতিপালন করিল।

যাইবার সময় বিনোদবাবু বলিলেন, "দেখুন একবার ছেলেটাব অদৃষ্ট! বুড়ো মুনিঋষিদের কথা এই জন্যেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়—অদৃষ্ট মূলাধাব। জন্মালেন কোন্ বস্তির কোন্ খোলার ঘরে, মা হয়ত বাজারের কোন্ তরকারীউলী, বড় জোর কোনও গেরস্ত বাড়ীর ঝি, বাপ হয়ত চানাচুর বেচেন কিম্বা রিক্সাই টানেন, একটা অবৈধ সংস্রবের ফলে জন্ম, এক রাত্রি যেতে না যেতেই ভানুমতীর খেলা—ভিখারীর ছেলে একেবারে রাজপুত্তুর, আপনি নিঃসন্তান মানুষ, হয়ত একে প্রতিপালন করবেন, লেখাপড়া শেখাবেন, ক্রমে বিলেতে পাঠাবেন, কালে উনি হবেন হয়ত কোনও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা সিভিল সার্জ্জন, নযত হাইকোর্টের জর্জ। কি আশ্চর্য্য কারখানা!"—বলিযা বিনোদবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেবও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বিনোদবাবু, আপনি পুলিশ, না কবি?"

বিনোদ। কেন?

ডাক্তার। আপনার কল্পনা যে রকম সুদুবগামিনী, আপনাকে কবি বলেই বোধ হয।

বিনোদ। বরং আমাকে জ্যোতিষী বলতে পারেন—আমি জাতকের কুষ্ঠীর একটা খসড়া করে দিলাম।

এই বলিয়া ইন্সপেক্টরবাবু হাসিয়া, শিশুর গালে দুইটি আঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া, খবরের কাগজে জড়ানো বমালের বান্ডিলটি উঠাইয়া লইয়া "গুড্ ডে ডক্টর" বলিয়া ডাক্তার সাহেবের সহিত করমর্দ্দনান্তে মস্ মস্ শব্দে প্রস্থান করিলেন।

।। ৩ ।।

ইন্সপেক্টরবাবু অদৃশ্য হইবামাত্র গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "বলি হ্যাঁগ, তুমি পুলিসে চিঠি লিখতে গেলে কোন্ আক্কেলে বল দেখি?

ডাক্তার। পিনাল কোড অনুসারে একটা মস্ত অপরাধ হয়েছে যে! একে বলে abandonment—শক্ত সাজা! আমি সরকারী ডাক্তার, পুলিসে খবর দিতে যে আমি বাধ্য।

গৃহিণী। ঐ সব ফ্ল্যানেল নিয়ে গেল। ঐ সূত্র ধরে মাকে যদি খুঁজে বের করে?

ডাক্তার। জেল হবে। এ অপরাধে সাত বছর পর্য্যন্ত জেল হতে পারে।

গৃহিণী। তা হোক। সাত বছর কেন চৌদ্দ বছর জেল হোক। কিন্তু আমার ছেলেকে ত কেড়ে নিয়ে যাবে না?

ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে নাকি?"

গৃহিণী। ছেলে নয়? ও যে আমায় মা বলেছে।

ডাক্তার। স্বপ্ন দেখেছ?

গৃহিণী। স্বপ্ন দেখবো কেন? তখন কাঁদছিল, ঠিক যেন শব্দ শুনলাম---ও মা! ও মা! নয় রে সোনার মা?

সোনার মা। হিঁ বাবা। আমি স্পষ্ট শুনলাম ও মা! ও মা! বলে ছেলে কান্‌তে নেগেছে।

ডাক্তার। পাগল নাকি? কচি ছেলে ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদেছে, তুমি শুনেছ ও মা! ও মা!

গৃহিণী। সে যাই হোক, আমি কিন্তু ওকে দিচ্ছিনে---ওর মা-ই আসুক, আর ওর বাবা-ই আসুক।

ডাক্তার। ওর মা বাবা ছেলে দাবী করতে আসবে, সে সম্ভাবনা কম। ছেলের তাদের দরকার থাকলে এখানে এসে ফেলে যাবে কেন? হ্যাঁ, ভাল কথা। ছেলেকে দুধ দেবার জন্যে একজন ধাই খোঁজার কথা হচ্ছিল ত? তা ভাগ্যক্রমে একজন পেয়ে গেছি।

গৃহিণী। ধাই কোথায় পেলে? ক'মাসের ছেলে তার? দুধ আছে ত?

ডাক্তার। ছেলে নয়, মেয়ে। প্রসবের ঘন্টাখনেক পরেই মরে গেছে। সাত মাসে না আট মাসে হয়েছিল, সে কি আর বাঁচে?

গৃহিণী। তোমাদের হাসপাতালেই?

ডাক্তার। না, এ সব হয়েছিল বাইরেই। মেয়ে মরে যাওয়ার পর, প্রসূতির অবস্থা দেখে, কাল বিকেলে তাকে হাসপাতালে দিয়ে গেছে।

গৃহিণী। হ্যাঁগা, এ ছেলে ত সাত মাসে হয়নি? এ ত বাঁচবে?

ডাক্তার। দেখে বোধ হয় এ পুরো দশ মাসে প্রসব হওয়া ছেলে।

গৃহিণী। তা বলে এ বাঁচতে পারে, কি বল? আচ্ছা, হাসপাতালের সে মাগী হিন্দু না মুসলমান?

ডাক্তার। হিন্দু। ঐ যে মোড়ে লাল রঙের গির্জ্জা, তার পাদ্রী সাহেবকে জান ত? তাঁর মেমকেও জান। সেই যে গত বছর লাট্ সাহেবের গার্ডেন পার্টিতে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে পড়ছে না?

গৃহিণী। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে। মেমসাহেব তারপর একদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। আমরা দুজনেও ত তাঁদের বাড়ী চায়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। তা, কি হয়েছে?

ডাক্তার। ছুঁড়ী সেই মেমসাহেবের আয়ার মেয়ে কিনা। পাদ্রী সাহেবের চিঠি নিয়েই ওর মা এসে ছুঁড়িকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে গেছে।

গৃহিণী। ছুঁড়ীর বয়স কত?

ডাক্তার। ১৭/১৮ হবে। প্রথম পোয়াতি বোধ হয়।

গৃহিণী। ছুঁড়ী ভাল হবে, তবে ত আসবে। কেমন আছে? কত দিন লাগবে?

ডাক্তার। আজ সকালে ত তাকে ভালই দেখে এসেছি। ওষুধ দিয়ে এসেছি। চার-পাঁচদিনে সেরে উঠবে বোধ হয়।

গৃহিণী। চার-পাঁচ দিন! অত দিন কেবল হর্লিক খেয়ে খোকা বাঁচবে?

ইতিমধ্যেই গৃহিণী শিশুর খোকা নাম দিয়াছেন শুনিয়া ডাক্তার সাহেব হাসিলেন। বলিলেন, "কাজেই"।

গৃহিণী। তুমি ত মনে মনেই কালনেমির লঙ্কা ভাগ করছ! ভাল হয়ে ছুঁড়ী বা তার মা যদি না রাজী হয়?

ডাক্তার। মনে মনে লঙ্কা ভাগ আমি করিনি। ছুঁড়ীর মার সঙ্গে কথা আমার হয়নি

বটে, তবে মেমসাহেব ছুঁড়ীকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে রেখেছি, তিনি বলেছেন, বেশ ত। আমি কি ভাবে একটা ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছি, তাঁকে সব বললাম কিনা।

শুনে তিনি বললেন, তা হলে এই মেয়েটাই বোধ হয় দুধ দিয়ে সে ছেলেকে বাঁচাবে, এই রকমই ঈশ্বরের বি ান। বাইবেল কোট্ করলেন। সকল জীবের আহারের ব্যবস্থা ঈশ্বরই করেন, সে বিষয়ে তাঁর কোন ভুল-চুক হয় না—এই ভাবের একটা বচন। তোমার কথাও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে। বলেছেন, শীঘ্রই একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

গৃহিণী। আহা মেমসাহেবটি বেশ। খুব আমুদে—একটুও অহঙ্কার নেই। নিজেদের চেয়ে নেটিভদের কিছুমাত্র হীন মনে কবেন না। আব, কি সুন্দর বাংলা বলেন দেখেছ?

ডাক্তার। উনি যখন কুমারী ছিলেন, ওঁর অভিপ্রায় ছিল, মিশনরী হয়ে এ দেশে আসবেন। তাই বিলাতেই রীতিমত বাংলা শিখেছিলেন তারপর পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়।

বামুন ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, ভাত ঠান্ডা হইয়া যাইতেছে। দুজনে খাইতে গেলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে, ডাক্তার গেলেন একটু বিশ্রাম করিতে। কারণ, আবার তিনটার সময় তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইবে। গৃহিণী গেলেন খোকার তত্ত্বাবধানে।

চারিদিন পর রিক্সা করিয়া খোকাব দুধ-মা আসিল,আসিয়াই খোকাকে কোলে লইয়া শুইল। নাম বলিল, ফুলটুসিয়া। সোনার মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জেরা করিয়া সারা দিনে ফুলটুসিয়ার চৌদ্দপুরুষের খবর সংগ্রহ করিয়া লইল। জাতিতে তাহারা দোষাধ, পাটনা জেলায় বাড়ী, পিতা জীবিত নাই। এখানে শিয়ালদহের নিকট তাহার মাতুল সপরিবাবে বাস করে, সেখানেই সে থাকিত। কারণ, তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী জীবিত নাই। আট বছর বয়েসে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী পাটনা কলেজের কোন্ সাহেবের কুঠিতে বেয়াবাব কাজ করে, গত বৎসর বড়দিনের ছুটীতে সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিল। পূজার বন্ধে সাহেব যদি আসেন, তবে সেও আসিবে, কিন্তু পূজোর বন্ধে সাহেব বড় একটা কলিকাতায় আসেন না, মুসৌরী বা সিমলা পাহাড়ে যান, তবে বড়দিনের ছুটীতে নিশ্চয় আসিবেন—প্রতি বৎসরই আসেন। ইত্যাদি।

পরদিন ডাক্তার সাহেব আসিয়া পত্নীর সহিত চা-পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোমার খোকার দুধ-মা খোকাকে যত্ন-টত্ন করছে?"

গৃহিণী। হ্যাঁ, তা করছে বটে। কিন্তু—

ডাক্তার কিন্তু কি?

গৃহিণী। মা গো—কি কালো ছুঁড়ী, যেন আবলুস কাঠ!

ডাক্তার। জাবত দোষাধ কিনা! দোষাধ পশ্চিমে খুব ছোট জাত। তুমি বলছ মাগোঃ কি কালো—ওর স্বামী বোধ হয় ওকেই দ্যাখে রম্ভা কি তিলোত্তমা—বলিয়া ডাক্তার সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "বলছিল, ওর স্বামী তার মনিবের সঙ্গে পূজোর বন্ধে আসতে পারে। তখন ছুঁড়ী হয়ত দশ -বারোদিনের ছুটী চাইবে—তা হলে তখন খোকার কি হবে?"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "সে ত এখন মাস দুই দেরী আছে। ছুটী যদি চায়-ই, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

দুধ-মা খোকাকে যেরূপ যত্ন করিতে লাগিল, তাহাতে সকলেই তাহার উপর প্রীত হইলেন। ফুলটুসিয়া নামটা বড় লম্বা বলিয়া উহা সংক্ষিপ্ত করিয়া সকলে তাহাকে ফুলি বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ফুলি পাঁচ বৎসর হইতেই তার মার সহিত কলিকাতায় আছে, বাঙ্গালীর মতই বাংলা বলিতে পারে, বরং হিন্দী বলিতেই সময়ে সময়ে তার আটকায়।

খোকা তাহার দুধ খাইবে বলিয়া ডাক্তার সাহেব তাহার আহারের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তার স্নানের জন্য উত্তম সাবান ও পরিধানের উত্তম ও প্রচুর শাড়ী শেমিজ আসিল।

।। ৪ ।।

কয়েক দিন পরে পাদ্রী সাহেবের মেম, বিভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার আয়াকন্যা ফুলটুসিয়া ভাল আছে দেখিয়া খুসী হইলেন। খোকাকেও দেখিলেন, আদর করিলেন। বলিলেন, "মিসেস ভাদুড়ী, শুনিলাম, ছেলেটিকে আপনি পোষ্যগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন। উহা ভাল কথা। ছেলেটি দেখিতেও বেশ সুশ্রী। ইহার নাম কি রাখিবেন?"

বিভাবতী। ছেলে বাঁচুকই আগে, মেমসাহেব। আমাদের বাঙ্গালী প্রথা, ছমাস বয়েসে অন্নপ্রাশন হয়, সেই সময় শিশুর নামকরণ হয়।

মেমসাহেব। উহার নাম রাখিবেন থিওডোর। থিওডোর অর্থে ঈশ্বরের দান। আপনার সন্তান ছিল না, তাই ঈশ্বর দয়া করিয়া আপনার কাছে উহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। থিওডোর ভাদুড়ী—বেশ শুনাইবে না?

বিভাবতী হাসিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত শুনাইবে। আপনি যে নাম প্রস্তাব করিলেন, তাহার বাঙ্গলা হয় ভগবৎপ্রসাদ বা নারায়ণপ্রসাদ।'

মেমসাহেব। পুলিস ছেলেটির পিতামাতাকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে, এখনও কোন সন্ধান তারা পায় নাই, ইহা আপনার স্বামীর নিকট শুনিলাম। যদি পুলিস-তদন্তে প্রকাশ হয়, ইহার পিতা হিন্দু নয়, মুসলমান, তবে কি নাম হইবে?

বিভাবতী। তবে ইহার নাম হইবে খোদাবক্স—খোদার বক্‌শিস—মানে ঠিক থাকিবে। কিন্তু মেমসাহেব, আমরা বাঙ্গালী, উহার বাঙ্গলা নামই রাখিব।

মেমসাহেব। দেখুন মিসেস ভাদুড়ী, আমার মনে হয়, পুলিস কোনও দিন ইহার পিতামাতাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে না—ইহার জাতিকুল চিরদিন রহস্যাবৃতই রহিয়া যাইবে। কালক্রমে ইহার বিবাহাদি দিতে হইবে, হিন্দু সমাজে ইহাকে চালাইবেন কি করিয়া? আমার পরামর্শ, ইহাকে প্রভু যীশুর ভৃত্য করিয়া দিন—ইহাকে ব্যাপ্‌টাইজ করুন। বৃহৎ একটা খ্রীষ্টান দেশীয় সমাজ রহিয়াছে, সেই সমাজে মিশিলে ইহার বিবাহাদি সম্বন্ধে কোনও গোল থাকিবে না। এমন কি এ যদি কোনও য়ুরোপীয় কন্যাকেও বিবাহ করিতে চায়, তাহাতেও কোন বাধা হইবে না। আমার কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার স্বামীর সঙ্গেও পরামর্শ করিবেন। যদি ইহাকে পবিত্র খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা আপনাদের অভিমত হয়, আমার স্বামীকে জানাইলে তিনি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ব্যাপ্‌টিজমের সময় থিওডোর নাম পছন্দ না করেন, বরং ইহার নাম দিবেন দেবপ্রসাদ—নারায়ণপ্রসাদ নাম চলিবে না। কারণ, উহা পৌত্তলিক নাম।

বিভাবতী মেমসাহেবকে চা-পান করাইয়া বিদায় দিলেন। যাইবার সময় মেমসাহেব আবার বলিয়া গেলেন, "শিশুকে যদি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আপনাদের আপত্তি না থাকে ত আমায় জানাইবেন। বড়দিনের সময় সে ব্যবস্থা করা যাইবে।"

স্বামী বাড়ী আসিলে বিভাবতী তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো, পাদ্রী সাহেবের মেম যে মাঝে মাঝে কেন আসছেন, তা এত দিনে প্রকাশ হয়েছে। তাঁর মতলব কি জান?"

"কি?"

"আমাদের সবাইকার যীশু ভজাবার চেষ্টা।"

"কি রকম?"

মেমসাহেবের সঙ্গে আজ অপরাহ্নে তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা

সবিস্তারে বিভাবতী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ঐ ছেলে বই আমাদের আর কে আছে" ছেলে খ্রীষ্টান হইলে আমরা দুজনেও খ্রীষ্টান হব, এই বোধ হয় ওঁদের ভরসা।"

ডাক্তার সাহেব শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিযা বলিলেন. "আমাদের শুদ্ধ যীশু ভজাবার চেষ্টা ওঁদের না-ও থাকিতে পারে। এ রকম কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে-মেয়েকে ওঁরা খ্রীষ্টান করে নিজেদের দল পুষ্ট করে থাকেন। ভাবছেন বোধ হয়, এও ত কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, এটাই বা হাত ফস্কে যায় কেন? কিন্তু একটা কথা মেমসাহেব যা বলেছেন, তা ঠিক। ওকে হিন্দুসমাজে চালানও ত যাবে না। আমরা যে পরামর্শ করেছিলাম, ছমাস বয়স হলেই ঘটা করে ওর অন্নপ্রাশন দেবো, সেও ত হবে না। অন্নপ্রাশনে যে রীতিমত পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করতে হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষ ত ওর পূর্ব্বপুরুষ নয়।"

বিভা। তবে কোন্ সমাজে খোকা এর পরে মিশবে?

ডাক্তার। কেন, ব্রাহ্মসমাজে ত রয়েছে।

বিভা। তাঁরাও শুনতে পাই, বিবাহাদি ব্যাপাবে আজকাল জাত সম্বন্ধে খুঁৎ খুঁৎ করেন।

ডাক্তার। কেউ কেউ। সবাই নয়।—ফলে পৌষ মাস আসিল এবং চলিয়া গেল। খোকার অন্নপ্রাশনও হইল না, ব্যাপ্‌টিজমও হইল না।

।। ৫ ।।

খোকা এখন এক বৎসরের হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে—-এখন তার দেহকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যায়। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি। সে বিভাবতীকে মা এবং ডাক্তার সাহেবকে বাবা বলিতে শিখিয়াছে; হামাগুড়ি দিয়া এ-ঘর ও-ঘর কবে, বসিতেও পারে, এইবার কোন্ দিন দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠে, তাহার পালক পিতা-মাতা সেই প্রতীক্ষায় আছেন। দুধ-মাকে খোকা বলে ফুই-মা। ফুলিই তাহাকে ইহা শিখাইয়াছে।

সম্প্রতি তাহাকে স্তনদুগ্ধ ছাড়াইয়া দেওযা হইয়াছে, এবং রাত্রিতে পাছে ফুলি গোপনে স্তন্যদান করে, এই জন্য বিভাবতী তাহাকে নিজের বিছানায় শযন কবাইতেছেন। ফুলিকে জবাব দিবারই কথা হইতেছে, কিন্তু এখনও খোকা অর্দ্ধরাত্রিতে জাগিযা উঠিযা "আমি ফুই-মা যাব" বলিয়া মহা কান্না জুড়াইয়া দেয়। তখন ফুলিকে জাগাইয়া খোকাকে তাহার কোলে দিতে হয়। বিভাবতী সেখানে বসিয়া থাকেন। ফুলি খোকাকে চুমো খাইয়া আদর-সোহাগ করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দেয়, বিভাবতী তখন তাহাকে আবার নিজের শয্যায় লইয়া আসেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে সোনার মা বলিয়াছিল, "দেখ গিন্নীমা, ফুলি খোকার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কয়, এমন ভাবে ওকে সোহাগ করে—যেন ও-ই ওব মা।"

বিভা বলিলেন, "তা হবে না বাছা! পাঁচদিনের ছেলেটি থেকে বুকের দুধ খাইয়ে ওকে মানুষ করলে, "আপন সন্তানের মতই খোকার উপর ওব মায়া বসে গেছে ত!"

সোনার মা বলিল, "খোকারও ফুলির কোলে যেতে পেলে কি হাসি, কি কথা, কি আনন্দ! বাস্তবিক ফুলির কোলে খোকাকে দেখিলে কে বলিবে, ফুলি খোকার বেতনভোগিনী ঝি মাত্র?-—খোকার বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এই সময় জানা গেল, ফুলটুসিয়া সন্তান সম্ভাবিতা। তখন কর্ত্তা-গৃহিণীতে পরামর্শ করিলেন, এবার উহাকে বিদায় করা আবশ্যক। কর্ত্তা বলিলেন, "সেদিন ফুলির মা এসেছিল, আশ্বিন মাসে ওর ছেলে হবে বললে; ভাদ্র মাসের গোড়াতে ওকে ত যেতেই হবে। এখন থেকেই ওকে বিদেয় করা ভাল।"

বাস্তবিক ওকে দিনদিন ফুলির যেরূপ ন্যাওটা হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে বিভাবতীর মনে একটু যে ঈর্ষার সঞ্চার হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "ক্রমে এখন খোকার জ্ঞান হচ্ছে। এখন ঐ দোষাধের মেয়েটাব সংস্রবে ওকে রাখলে, ওর

মনে নানা রকম কুশিক্ষার বীজ বপন করা হবে।"—বৈশাখের মাঝামাঝি ফুলিকে বিদায় করা হইল। সে অনেক কাঁদাকাটা করিল, যাইবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। বলিল, "খোকাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো মা? কেমন করে আমার মুখে ভাত-জল রুচবে?"

বিভাবতী বলিলেন, "তোর মামার বাসা ত এখান থেকে বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে আসবি, খোকাকে দেখে যাবি। আর আশ্বিন মাসে তোর নিজের খোকা হবে, তখন তাকে পেয়ে এ খোকাকে ভুলতে পারবি।"

খোকার জন্য নতুন ঝি রাখা হইল। প্রথম কয়েক দিন ফুলির জন্য খোকা খুব হেদাইল, রাত্রিতে "ফুলি-মা যাব" বলিয়া বায়না ধরিল। ডাক্তার সাহেব তাহাকে নূতন নূতন খেলনা আনিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে খোকা ফুলিকে ভুলিল।

ফুলি মাঝে মাঝে খোকাকে দেখিতে আসে, তাহাকে কোলে করে—আদর করে। এক এক দিন সমস্ত দিন এইখানেই কাটাইয়া যায়। ক্রমে তাহার প্রসবকাল যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার আসাও তত কমিতে লাগিল।—আশ্বিন মাসে পাদ্রী সাহেবের আয়া আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, ফুলির একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। আরও বলিল, তার জামাইয়ের মনিব কলিকাতায় কলেজে বদলি হইয়া আসিতেছেন, জামাই এখন কলিকাতাতেই থাকিবে।

খোকার নূতন ঝি খোকাকে বেশ যত্ন করে। বিকালে ঠেলাগাড়ীতে তাহাকে পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায়। কোনও কোনও দিন খোকা পিতা-মাতার সহিত বিকালে মোটরে হাওয়া খাইয়া আসে। এখন তাহার বেশ কথা ফুটিয়াছে।

ফুলির ছেলে তিন মাসের হইলে তাহাকে কোলে লইয়া ফুলি একদিন বেড়াইতে আসিল। ছেলেটি ফুলির চেয়েও একপোঁছ কালো হইয়াছে, বোধ হয় পিতৃগুণে। ডাক্তার-গৃহিণী তাহাকে দুইটি টাকা এবং কয়েকটা কমলালেবু উপহার দিলেন।

॥ ৬ ॥

ফাল্গুন মাসে সহরে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিল। ডাক্তার সাহেব পরিবারস্থ সকলকে, মায় ঝি-চাকরকে পর্য্যন্ত, টীকা দিলেন।

কয়েক দিন পরে খোকা কিন্তু জ্বরে পড়িল। তিন দিন পরে তাহার উদরে, মুখে ও গালে গুটিকা-চিহ্ন দেখা দিল। পর দিন আর সংশয় রহিল না যে, খোকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

খোকার ঝি পলায়ন করিল। ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, "দশ এগারো মাস প্রতিপালন করিল, এত দিনেও খোকার প্রতি মনে তাহার দয়া-মায়া স্নেহ-মমতা কিছুই কি জন্মিল না? আশ্চর্য্য!"—সোনার মার কথায় জানা গেল যে, খোকার পলাতকা ঝি ইদানীং অপরাহ্নে সব দিন খোকাকে পার্কে বেড়াইতে লইয়া যাইত না, গোপনে নিজেদের বস্তিতে লইয়া যাইত এবং সেখানে কোনও কোনও দিন খোকাকে মুড়ি, ফুলুরি কিনিয়াও খাওয়াইত। জ্বর হইবার দুইদিন পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিল। এত দিন এ কথা প্রকাশ করে নাই বলিয়া সোনার মা যথেষ্ট তিরস্কৃত হইল।

হাসপাতাল হইতে নার্স আসিল। চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা রীতিমত চলিতে লাগিল। তথাপি রাত্রি-দিন খোকার কাছে থাকিবার জন্য একজন ঝির অভাব অনুভূত হইল।

পাছে তাহাকেই এই কার্য্যে নিয়োগ করা হয়, সম্ভবতঃ এই ভয়েই সোনার মা বলিল, "ফুলিকে ডেকে পাঠাও না। সে শুনলে এখনই ছুটে আসবে।"

ডাক্তার-দম্পতিও বিবেচনা করিলেন, ফুলি খোকাকে যেরূপ ভালবাসিত, এ সংবাদ শুনিলে সে বোধ হয়, না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।

হইলও তাহাই। জননী ও স্বামীর নিষেধ ও প্রবল বাধা সত্ত্বেও ফুলি তাহার পুত্রকে মাতুলানীর নিকট রাখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং সজল-নয়নে খোকাকে কোলে লইয়া বসিল।

অক্লান্ত সেবা-শুশ্রুষা ও চিকিৎসা সত্ত্বেও খোকা বাঁচিল না।

গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বিভাবতী শয্যা লইলেন, কিন্তু ফুলির সে কি কান্না! "ওরে আমার ধন রে, আমার বুকের কলজে রে, আমায় ছেড়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে?" ইত্যাদি শুনিয়া পাষাণও যেন বিগলিত হইতে চাহিল।

।। ৭ ।।

সৎকারের এখন কি ব্যবস্থা হয়? কম্পাউণ্ডারবাবুকে তাহার আয়োজন পাঠাইয়া ডাক্তার সাহেব একটা ঈজি-চেয়ারে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, পাদ্রী সাহেব আসিয়াছেন।

ডাক্তার সাহেব একটু বিরক্ত হইয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। ফুলি তখনও মাঝে মাঝে ডুক্‌রাইয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিতেছে।

"ঈশ্বর দিয়াছিলেন, ঈশ্বরই লইলেন, তজ্জন্য শোক কবা বৃথা" ইত্যাদি কয়েকটি প্রচলিত সান্ত্বনা-বাক্যের পর পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "ডাক্তাব ভাদুড়ী, আপনার নিকট আমার একটি আবেদন আছে"

ডাক্তার। কি বলুন?

পাদ্রী। শিশুর মৃতদেহটি আমাকে দান করুন। আমি উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানে অনুসারে সমাধিস্থ করিব।

ডাক্তার। তাহাতে আপনার লাভ? জীবিত থাকিলে উহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কবিতে পারিলে আপনার লাভ—অর্থাৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালনের সন্তোষ লাভ হইতে পারিত, ইহা আমি বুঝিতে পারি কিন্তু মৃতদেহকে খ্রীষ্টীয় প্রথায় সমাধিস্থ করিযা কি ফল হইবে? আমি এতদিন উহাকে সন্তানবৎ পালন করিয়াছি, আমি খ্রীষ্টান নহি, উহাকে খ্রীষ্টীয় প্রথায় সমাধিস্থ করিতে দিতে আমার আপত্তি আছে। জনক না হইলেও আমি উহার পিতা।

পাদ্রী সাহেব দৃষ্টি অবনত করিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি উহার পিতামহ।"—ডাক্তার সাহেব পরম বিস্ময়ে, উচ্চ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বলিতেছেন আপনি?"

পাদ্রী। বলিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু না বলিলেও নয়। আপনি আমার পুত্র জোসেফকে দেখিয়াছেন?

ডাক্তার। আমি গত বৎসর আপনার আলয়ে চা-পানের নিমন্ত্রণে গিয়া আপনার এক পুত্রকে দেখিয়াছিলাম, বছর কুড়ি বাইশ বয়স।

পাদ্রী। সেই। সেই দুশ্চরিত্র কুলাঙ্গারই ঐ পুত্রের জনক।

ডাক্তার। আর, জননী?

পাদ্রী। যাহাকে আপনি শিশুর দুধ-মা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে হতভাগিনী বালিকা।

এই সময় দ্বিতল হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিল—"ওরে আমার সোনা রে, আমার মানিক রে, তোর ফুলিমাকে ছেড়ে তুই কোথায় গেলি রে!" পাদ্রী সাহেব বলিতে লাগিলেন, "poor Girl! poor Girl!"—ফুলির আচরণ, শিশুর গাত্রবর্ণ-রহস্য, ডাক্তার সাহেবের নিকট দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গেল।

তাহার পর পাদ্রী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই।—ব্যাপারটা জানাজানি হইলে মেমসাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার আয়ার ইচ্ছা, ফুলির গর্ভ নষ্ট করা, কারণ, জামাতা আসিয়া শিশুর গাত্রবর্ণ দেখিয়া কখনই বিশ্বাস করিবে না যে, শিশু তাহারই ঔরসজাত—বিশেষ যখন ফুলির মা সাহেবের বাড়ীতে চাকরি করে এবং ফুলিরও সেখানে যাতায়াত আছে। পাদ্রী সাহেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে খপরদ্দার, উহা পাপের উপর

মহাপাপ। ওরূপ করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুত্রের কলঙ্কভয় এবং লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তখনই পুলিসে সংবাদ দিবেন। আয়া বলিয়াছিল, "আমার জামাই আসিয়া ছেলে দেখিলে তখনই আমার মেয়েকে পরিত্যাগ করিবে, তাহার উপায়?" তাহাতে পাদ্রী সাহেব আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যাহা হউক একটা সুব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে ফুলির মাতা শিশুকে আনিয়া এই বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল, কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল, নিঃসন্তান ডাক্তার ভাদুড়ী উহাকে পাইয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন, এবং কার্য্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই। শিশুর জন্য একজন দুধ-মা আবশ্যক হইবে বুঝিয়াই ফুলিকে ডাক্তার সাহেবের হাসপাতালেই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নচেৎ হাসপাতালে দিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আয়া তাহার কন্যাকে শিখাইয়া দিয়াছিল, তোর ছেলে হইয়াছিল না, বলিস মেয়ে হইয়াছিল, তাহা হইলে তোর সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইবে না। আর বলিল, দশ মাসে হয় নাই, আট মাসে হইয়াছিল। তাহা হইলে জামাইও কোন অন্যায় সন্দেহ করিতে পারিবে না।

এই সকল বিবরণ শেষ করিয়া পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "দেখুন পাপে ঐ শিশুর জন্ম। আমরা উহাকে ব্যাপ্‌টাইজ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাও তখন আপনি দিলেন না। এখনও উহার আত্মা প্রভু যীশুর শরণ লইলে অনন্ত নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে—ইহাই আমি বিশ্বাস করি। সেই জন্যই আমার কর্ত্তব্য উহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অনুমোদিত অনুষ্ঠানের সহিত সমাধিস্থ করা।"

ডাক্তার সাহেব সম্মত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সে পুত্র জোসেফ এখন কোথায়"—পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "এ ব্যাপার ধরা পড়িবার পর আমরা তাহাকে বহু তিরস্কার করি এবং গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে চাহি। অবশেষে উহার জননীর একান্ত অনুরোধে উহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিভিনিটি অধ্যয়ন করিতেছে, কালক্রমে ধর্ম্মযাজক হইবে।"—ডাক্তার সাহেব মনে মনে বলিলেন, "ছেলের দুষ্কৃতির তবে ত খুব কঠোর শাস্তিবিধানই হইয়াছে!" প্রকাশ্যে অবশ্য কিছু বলিলেন না।—পাদ্রী সাহেব বিদায় লইয়া গির্জ্জায় গিয়া লোকজনসহ একটা শবাধার পাঠাইয়া দিলেন, পরদিন মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করা হইল।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, কবরের শিরোদেশে মার্ব্বেল-পাথরে ক্ষোদিত কতকগুলি ইংরাজী কথা লিখিত রহিয়াছে—তাহার অনুবাদ এই—"নামহীন গোত্রহীন দুই বৎসর সাত মাস বয়স্ক শিশু, প্রভু যীশুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিল।"

[(?) চৈত্র ১৩৩৮]

দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের জমিদার পরলোকগত শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে চন্দ্রমোহন নামক একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক পাকশালার সহকারীরূপে নিযুক্ত ছিল। ছেলেটি বড় চালাক, চতুর ও মিষ্টভাষী বলিয়া বাটীর সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সে মুহুরিদের সাধ্যসাধনা করিয়া দুই চারিখানি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। অতঃপর তাহার মনে গ্রন্থকার হইবার উচ্চাভিলাষ জাগিতে লাগিল। খানকতক কাগজ সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রমোহন পুস্তকাকারের একখানি দিব্য খাতা সিলাই করিল। ভিতবে প্রথম পাতায় ধরিয়া ধরিয়া বড় করিয়া অ আ লিখিল। পরের পাতায় আর একটু ছোট ছোট করিয়া ক খ লিখিল; তাহার পর কর, খল, না লিখিয়া দুই অক্ষরে ঐরূপ অন্য অন্য কথা—কল, খগ,—ইত্যাদি লিখিল; এইরূপে বদলাইয়া বদলাইয়া অর্থবিহীন অসংযুক্ত বর্ণ শব্দরাশি স্থানে স্থানে সন্নিবদ্ধ করিল। পাড়ার ছেলেগুলার নাম করিযা, কে ছুরিতে পা কাটিয়া ফেলিয়াছে, কাহার পড়িবার বই নাই, কে পাঠশালায় যায না, কে তিন দিনে নূতন বহি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, কে-ই বা তাহা যত্ন করিয়া পড়িয়া শেষে ছোট ভাইয়ের কাজে লাগাইয়া দেয়, কে বাড়ীতে আসিয়া নানারূপ উৎপাত করে, কে "লক্ষ্মী" হইয়া পড়াশুনা করে,—ইত্যাদি সমসাময়িক ইতিহাসে পাঠের পর পাঠ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। পুস্তকের শেষে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক এবং উপরে প্রত্যেকেব নাম, তাহারও ক্রটি হইল না। এইরূপে প্রথমভাগ রচনা শেষ হইল। মলাটের উপর স্বীয় চিত্রবিদ্যার অপূর্ব্ব নমুনা রাখিয়া বর্ডার প্রস্তুত করিল। তাহার পব যথাস্থানে লিখিল—"বর্ণপরিচয প্রথমভাগ—চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত।" বুঝি তাহাব ধারণা ছিল, প্রথমভাগ লিখিতে পারিলেই বিদ্যাসাগব উপাধি গ্রহণের অধিকার জন্মে! একদিন একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"প্রথমভাগে ঐ যে গোপালের, বাখালেব কথা লেখা আছে, ওসব কি সত্যি?" সে বলিল—"সত্যি না আরো কিছু! ও সব বানানো।" সেই অবধি সে মনে করিত, আমার প্রথমভাগে সমস্তই সত্যকথা বহিল, তবে আমাব খানিই ভাল।

একদিন কেমন করিযা এই গ্রন্থকার-বালকের প্রথম উদ্যমখানি কর্ত্তাদেব চোখে পড়িল। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া হাসিয়াই আকুল হইলেন। বাটীর সকলে একত্র হইয়া এই অপূর্ব্ব প্রথমভাগ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাঃ চন্দোর! তুই রাতারাতি যে বিদ্যেসাগর হয়ে গেলিরে!" সকলে পরামর্শ করিলেন, এবার অবধি ইহাকে বিদ্যাসাগর নাম দেওয়া যাক্। প্রথমে যুবকেরা তাহাকে অবিশ্রান্তভাবে বিদ্যাসাগর বলিতে লাগিল; পরে বালকেরাও তাহাই ধরিল; ক্রমে কর্ত্তারা, মহিলারা ধরিলেন। অবশেষে কর্ম্মচারিবর্গ, দাসদাসী, পাড়াপ্রতিবেশী, সকলেই চন্দ্রমোহনকে বিদ্যাসাগর বলিতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসর পরে, তাহার পূর্ব্বনামের চিহ্নমাত্রও সে গ্রামে রহিল না; নবজাত বালকবালিকারা সে পুরাতন নামের কোন সংবাদই পাইল না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে শিবদাসবাবু একবার সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। এখন "বিদ্যাসাগব" তাঁহার প্রধান পাচক, সেও সঙ্গে আসিল।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত শিবদাসবাবুর সম্প্রীতি ছিল্। কলিকাতায় আসার কিয়দ্দিন পরেই, শিবদাসবাবুর সাদর আহ্বানে তাঁহার আবাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শুভাগমন হইল। কর্ত্তা গোপনে সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—আজ আসল বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন, খবরদার কেহ যেন আজ চন্দ্রকে বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিও না। গৃহিণী ঠাকুরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম ভৃত্য বালকটাকে পর্য্যন্ত শিবদাসবাবু স্বয়ং বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সকাল বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ চন্দ্রমোহনকে চন্দ্রমোহন বলিয়াই ডাকিল; কিন্তু শেষে আর রাখিতে পারা গেল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাঝে মাঝে, এ ঘর ও ঘর হইতে "বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর" শব্দ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠেন, তাহার অব্যবহিত পরেই শব্দ আসে, "চুপ্ চুপ্ চুপ্।" আবার শুনিতে পান—"ও বিদ্যেসাগর! ডালে নুন হয়নি কেন?" "ও বিদ্যাসাগর! হাত চালিয়ে নাও না, হাঁ করে কি দেখছ!" "ও বিদ্যেসাগর! পায়েসটার যে ধোঁয়ার গন্ধ বেরিয়েছে"—আবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আসে—চুপ্ চুপ্ চুপ্।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ত কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। অবশেষে এই মহাপুরুষেরও লজ্জায় বাঁধ ভাঙ্গিল। অতিমাত্র কৌতূহলী হইয়া তিনি স্মিতমুখে শিবদাসবাবুকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিবদাসবাবু হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বের ইতিহাস সবিস্তারে নিবেদন করিলেন—শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রচুর হাস্য করিতে লাগিলেন। আহারাদি শেষ হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ত্রস্ত সঙ্কুচিত পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন। বলিলেন—"তা বেশ হয়েছে। তুমিও বিদ্যেসাগর, আমি বিদ্যেসাগর, আজ অবধি তুমি আমার মিতে হলে।"

সেই পাচক ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিবেশী বন্ধুর মত তিনি আলাপ করিতে লাগিলেন তাহার ঘরের সংবাদ লইলেন, তাহার সুখদুঃখের কাহিনী অবগত হইলেন। চন্দ্রমোহনকে লইয়া গিয়া ছাপাখানায় তিনি একটা চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী চন্দ্রমোহনের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না—সে সেখানে থাকিতে পারে নাই।

[ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০২]

গুল বেগমের আশ্চর্য্য গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে খাদির দেশে এক প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার নাম শ্যামশাদলালপোষ। তাঁহার তুল্য জ্ঞানী, ধনী ও প্রজাপালক বাদশাহ তৎকালে প্রায়ই দেখা যাইত না। তাঁহার সৈন্যবলও অপরিমিত ছিল।

এই প্রতাপশালী নরপতির সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই যুবা বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন।

একদিন জ্যেষ্ঠপুত্র তহমাশ পিতার সমীপে আসিয়া সেলাম করিয়া কহিলেন—"পিতা, ইচ্ছা করিয়াছি কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে বাহির হইব। সম্প্রতি আমার চিত্ত নানা কারণে বিষাদগ্রস্ত। পর্য্যটনে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইবে। এখন আপনার আজ্ঞা পাইলেই হয়।"

বাদশাহ পুত্রের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"বৎস, ইহা উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। দেশ ভ্রমণে নানা জ্ঞান লাভ হয়, বহুদর্শিতা উপস্থিত হয় এবং চিত্তবৃত্তিও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

বাদশাজাদা আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেশ ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন করিতে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিলেন। নিজ বয়স্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে আমন্ত্রণ করিলেন। মীরশিকারী মৃগয়ার উপযুক্ত বাজ, শিকরা, কুক্কুর প্রভৃতি সংগ্রহ করিল। অনেকগুলি তাম্বু, প্রচুর পরিমাণ আহরীয় দ্রব, বহুসংখ্যক সৈন্য, উত্তম উত্তম অশ্বগণ সঙ্গে লইয়া বাদশাজাদা তহমাশ মৃগয়া ও দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস গমন করিলে পর, এক বিপুলকায় পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। সেই স্থান শিকারের উপযুক্ত জানিয়া বাদশাজাদা তথায় ছাউনি ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং অশ্বারোহণে বন্ধুগণসহ শিকারে বহির্গত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ শিকার করিবার পর বাদশাজাদা দেখিলেন, অতি সুন্দব একটি হরিণ চবিযা বেড়াইতেছে। তাহার দেহ এমন সুচিত্রিত, তাহার শৃঙ্গ এমন সুঠাম, তাহার চক্ষু এমন স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ যে, সেই হরিণকে দেখিয়াই বাদশাজাদার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে আজ্ঞা দিলেন—"সাবধান, ইহাব দেহে কেহ অস্ত্রাঘাত করিও না। ইহাকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে হইবে। ফাঁদ পাতিয়া হউক, জাল ফেলিয়া হউক, যে কেহ ইহাকে ধবিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রচুর পারিতোষিক দিব।"

ইহা শ্রবণ করিয়া সকলে মন্ডলাকাব হইয়া সেই হরিণকে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। হরিণ দেখিল তাহার আব মুক্তি নাই। নিজের প্রাণসংশয় জানিয়া সে এক লম্ফ দিয়া, মন্ডল হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বায়ুবেগে জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া বাদশাজাদা তহমাশ স্বয়ং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু হরিণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া লম্ফে লম্ফে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতে লাগিল। বাদশাজাদা তথাপি হতাশ হইলেন না, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও বন্ধুগণ বহু দূরে পড়িযা রহিল। হরিণের পশ্চাৎ ধাবন কবিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। ঘর্ম্মে বাদশাজাদাব সমস্ত পোষাক ভিজিয়া উঠিল। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে হরিণও দৃষ্টিপথেব বাহির হইয়া পড়িল। বাদশাজাদা তখন অশ্ববেগ সংযত কবিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কোথায় আসিয়াছেন, সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করিযা কতদূর আসিযাছেন, কোন পথেই বা প্রত্যাবর্ত্তন কবিতে হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্বটিও পিপাসায কাতব হইয়া নিজ জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহা দেখিযা বাদশাজাদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া লাগাম হস্তে ধবিয়া, জল অন্বেষণ কবিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অন্বেষণ কবিতে করিতে এক সুবৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহাব নিম্নে একটি জলকুণ্ডও দেখা গেল, সে জল যেমন স্বচ্ছ তেমনি সুশীতল। সেই কুণ্ডের চাবিপার্শ্বে নানা পুষ্পবৃক্ষ সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিযা, বাদশাজাদা স্বযং প্রাণ ভরিয়া সেই জল পান করিলেন এবং অশ্বকেও পান করাইলেন।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইতস্ততঃ পবিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেটি একটি মনুষ্যহস্ত রচিত পুষ্পবটিকা। নিকটে কোন মনুষ্যবাস থাকিতে পাবে এই অনুমান করিযা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন অনতিদূরে একটি কুটীব রহিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক অপূর্ব্ব প্রভাসম্পন্ন, রাজচিহ্নধারী বৃদ্ধ ব্যক্তি নামাজ পড়িতেছেন। বাদশাজাদা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নামাজ সমাপ্ত করিয়া সেই বৃদ্ধ বাদশাজাদাকে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। বাদশাজাদা তাঁহার নিকটে গিয়া সেলাম কবিযা দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন-—"বৎস, তুমি কে? কোথা হইতে আসিযাছ? আর এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ মহাবনে কি প্রয়োজনেই বা আসিয়াছ?"

ইহা শুনিয়া বাদশাজাদা তহমাশ নিজ বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত কবাইলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় আপনিই বা কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? এবং এই মনুষ্য সমাগমহীন অরণ্যেই বা কেন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন? আপনার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন বর্ত্তমান দেখিতেছি, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"হে যুবা, আমার কাহিনী অতি দুঃখপূর্ণ। তুমি শুনিয়া কি করিবে?"

কিন্তু বাদশাজাদা কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। আত্ম-কাহিনী বলিবার জন্য বৃদ্ধকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন----"হে বিদেশী, আমি বিলায়ৎ কাবুলের বাদশাহ। আমার নাম জাহাঙ্গীর শাহ্। আমার বহু ধনরত্ন ছিল এবং খোদাতালা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সাতটি পুত্র দিয়াছিলেন। আমার পুত্রগণ সকলেই জ্ঞানে, গুণে, বীর্য্যে ভূষিত ছিল। আমি পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলাম। একদিন ঘটনাক্রমে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কোনও ভ্রমণকারীর মুখে শুনিল যে, তুর্কিস্থান এবং চীন রাজ্যের সীমায় যে রূমদেশ আছে, তথায় কৈমুশ শাহ নামে এক বাদশাহ রাজত্ব করেন। তাঁহার কন্যার নাম মেহেরঙ্গেজ। সেই কন্যার মত রূপবতী নারী, আর পৃথিবীতে নাই। স্বয়ং পূর্ণিমার চন্দ্রও যেন তাহার মুখদর্শনে লজ্জা প্রাপ্ত হন। তাহার অঙ্গের কোমলতা কুসুমদলকেও পরাজিত করিয়াছে। তাহার গণ্ডদেশের আভা দেখিলে গোলাপ ফুলের প্রতি আর চাহিতে ইচ্ছা করে না। মেহেরঙ্গজ পিতার একমাত্র কন্যা----রাজ্যের অধিকারিণী। এই কন্যা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বাদশাজাদাগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যা এই বিষম পণ করিয়া বসিল যে, "গুল বা সনোবর চে কর্দ্দ?" অর্থাৎ ---গুল, সনোবরের সহিত কি করিয়াছিল?----এই প্রশ্নের যে উত্তর দিতে পারিবে তাহাকেই বিবাহ করিব, আর যে বিবাহার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না তাহার মস্তক তরবারি দ্বারা কাটিয়া দুর্গদ্বারে টাঙ্গাইয়া দিব।

"হে যুবক, ভ্রমণকারীর নিকট আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এই কথা শুনিয়া, সেই কন্যাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। আমার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে নিবেদন করিয়া বিদায়ের প্রার্থনা জানাইল। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

"অবশেষে আমি কহিলাম----'হে পুত্র, যদি সেই কন্যাকে লাভ করিবার জন্য তুমি এতই ব্যগ্র হইয়াছ, ত বল, আমি স্বয়ং সসৈন্যে রূমের বাদশাহের নিকট গিয়া তোমার জন্য সে কন্যা প্রার্থনা করি। যদি তিনি সম্মত হন, উত্তম কথা। যদি সম্মত না হোন, তবে আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার দেশ ধ্বংস করিয়া বলপূর্ব্বক সে কন্যাকে লইয়া আসিয়া তোমার সহিত বিবাহ দিব।' ইহা শুনিয়া আমার পুত্র কহিল----'পিতঃ, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ধন, প্রাণ, দেশ ধ্বংস করা একান্ত অনুচিত। আমি স্বয়ং যাইয়া, প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিব।'

"ফলতঃ, কোনমতেই তাহাকে বিরত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহাকে বিদায়ের অনুমতি দিলাম। সে রূমদেশে পৌঁছিয়া প্রশ্নের উত্তর-দানে অক্ষম হইল। তখন প্রতিজ্ঞামত মেহেরঙ্গেজ তাহার মস্তক কাটিয়া দুর্গদ্বারে টাঙ্গাইয়া দিল।

"আমি এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিয়া চল্লিশ দিন শোকে ও দুঃখে নিমগ্ন রহিলাম। আমার রাজবাটী ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মিত্রবর্গ অসহ্য শোকে নিজ নিজ বস্ত্র ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার ভ্রাতৃগণ মস্তকে ধূলি মাখিয়া পাগলের মত বেড়াইতে লাগিল।

"এইরূপে চল্লিশ দিন কাটিলে আমার দ্বিতীয় পুত্র বলিল----'আমি যাই। প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে ভ্রাতৃহন্ত্রীকে করতলগত করিয়া প্রতিশোধ লই।" আমি অনেক বারণ করিলাম, কিছুতেই সে শুনিল না। ফলতঃ সেও গিয়া, প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিয়া প্রাণ হারাইল। পুনরায় আমি শোকসাগরে মগ্ন হইলাম। "আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? একে একে আমার সাতটি পুত্র এইরূপে মেহেরঙ্গেজকে লাভ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইল।

"আমি সেই অবধি মহাশোকে দগ্ধ হইতেছি। বাদশাহী ছাড়িয়া দিয়া এই অরণ্যে আসিয়া

।নর্জ্জনে বাস করিতেছি এবং ঈশ্বরকে ডাকিতেছি।"----এই পর্য্যন্ত বলিয়া, জাহাঙ্গীর শাহ নীরব হইলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

এই কাহিনী শুনিয়া, মেহেরঙ্গেজকে দর্শন ও তাহাকে লাভ করিবার জন্য বাদশাজাদার মনে প্রবল অভিলাষ জন্মিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে বাদশাজাদার সঙ্গেব সিপাহী ও বন্ধুগণ তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বাদশাজাদাকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং বলিল----"আপনি আমাদিগকে এতদূবে ছাড়িয়া এই গভীব বনমধ্যে কেন প্রবেশ করিলেন? ঈশ্ববেচ্ছায় আপনাকে খুঁজিয়া পাইলাম সেই মঙ্গল; যদি আমাদেব অন্বেষণ ব্যর্থ হইত তাহা হইলে অদ্য রজনী আপনার কি কষ্টেই না কাটিত!"

বাদশাজাদা তহমাশ তখন তাহাদের সহিত বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আজ্ঞা প্রচার করিলেন, আর আমি অধিক দূর দেশে ভ্রমণে যাইব না। এইবার রাজধানীতে ফিরিব। পরদিন প্রভাতে সকলে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাদশাজাদার বয়স্য ও সখাগণ দেখিল, তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বের মত আর হাস্য পরিহাসে রত হন না, আহারে রুচি নাই, সদ্যই অন্যমনষ্ক থাকেন। বয়স্যগণ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে বাদশাজাদা তাহাদিগকে সকল কথাই বলিলেন। শুনিয়া তাহারা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল।

ক্রমে বাদশাজাদা তহমাশ রাজধানীতে পৌছিলেন। নগরবাসীর আনন্দে কোলাহল করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। পুত্র নিবাপদে ফিরিয়াছে বলিয়া বাদশাহ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুদিন অতীত হইতে না হইতেই বাদশাহ লক্ষ্য করিলেন যে, পুত্রেব আর সে পূর্ব্বাভাব নাই। মুখে হাসি নাই, মনে আনন্দ নাই, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বদন। ইহা দেখিযা বাদশাহ পুত্রকে কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বাদশাজাদা লজ্জাবশতঃ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। অগত্যা বাদশাহ পুত্রেব বয়স্যগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, তাহাবা সকল কথাই বাদশাহ সমক্ষে নিবেদন কবিল।

বাদশাহ তখন পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন----"বৎস, যদি তুমি মেহেরঙ্গেজকে লাভ করিবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে আমি তাহার সদুপায় করিতেছি। রাজনীতি অনুসারে, প্রথমে রূমের বাদশাহেব নিকট এক বিনতিপূর্ণ পত্র লিখিয়া তোমার জন্য তাঁহার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। বহুমূল্য বত্নসকল উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাঁহার জন্য উপহাব পাঠাইব। ইহাতে যদি তিনি সম্মত হন, উত্তম। না সম্মত হন, তখন সসৈন্য রূমযাত্রা করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া আসিব। তুমি তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না।"

পিতার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বাদশাজাদা কহিলেন----"পৃথিবী-পালক, একজনকে বিনাদোষে লাঞ্ছনা করা নীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। তদপেক্ষা আমি গিয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়া মেহেরঙ্গেজকে বিবাহ করিয়া আনিব।"

বাদশাহের পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ, সকলেই কহিলেন----"বাদশাজাদা যদি নিতান্তই যাইবেন, তাহা হইলে উঁহার সহিত যথেষ্ট সৈন্যবল প্রেরণ করা হউক, কারণ পথে কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে কিছুই বলা যায় না।" ফলতঃ বাদশাজাদা তহমাশ সৈন্য সামন্ত এবং উষ্ট্রপৃষ্ঠে নানাবিধ রত্নরাজি উপহার লইয়া রূমযাত্রা করিলেন।

কৈমুশ বাদশাহের রাজধানী কুস্তন্তুনিয়া(অথবা ইস্তাম্বুল) নগরে পৌছিয়া দেখিলেন, তথায় এক প্রকাণ্ড দুর্গ দণ্ডায়মান। দুর্গদ্বারে বাদশাহ ও বাদশাজাদাগণের এক হাজাব কাটা

মুন্ড ঝুলিতেছে। বাদশাজাদার সঙ্গীগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন—"মহাশয়, এখনও নিবৃত্ত হউন, নতুবা আপনারও মস্তক কাটিয়া এইখানে ঝুলাইয়া দিবে।" কিন্তু বাদশাজাদা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তহমাশ দেখিলেন যে, গৃহ ও পথাদি অতি রমণীয়। রাজপথে ধূলি দমনার্থ সর্ব্বদা জল ছিটান হইতেছে। পথের পার্শ্বদেশে ফুলের বাগান। মালীগণ সর্ব্বদা সেই সকল বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতে ব্যস্ত। স্থানে স্থানে বাদ্যমঞ্চ গঠিত আছে, সেখানে শানাই ও অন্যান্য বিবিধ যন্ত্র সুমধুর সঙ্গীত আলাপ করিতেছে। নাগরিকগণ নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়া হাস্যমুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নগরের মধ্যে মধ্যে সাধারণ বিহার-বাটিকা। পানাহারের জন্য স্থানে স্থানে তাম্বু রচিত হইয়াছে। জরির পর্দ্দায় দ্বারদেশগুলি অলঙ্কৃত। বাদশাজাদা এইরূপ নগরের শোভাসম্পদ দেখিতে দেখিতে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে একটি সুবর্ণ গঠিত ডঙ্কা ছিল এবং সেই ডঙ্কায় রত্নের অক্ষরে লেখা ছিল,—"যদি কেহ এই নগরে আসিয়া বাদশাজাদী মেহেরঙ্গেজের হস্ত প্রার্থনা করে, তবে সে যেন এই ডঙ্কা বাজায়।"

বাদশাজাদা তাহা দেখিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ডঙ্কা বাজাইতে উদ্যত হইলেন। তাহার বন্ধুগণ তখনও একবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যদি কোনও মতে তাঁহাকে এই ভীষণ দশা হইতে বাঁচাইতে পারে। তাহারা বলিল, "রাজকুমার, আমরা অদ্যমাত্র এই নগরে উপস্থিত হইয়াছি। এখনও ইহার বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। বাসস্থানও এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। অতএব এখন নিবৃত্ত হউন, পরে একদিন সময়মত ডঙ্কা বাজাইবেন।" তহমাশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি কি এখানে বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে আসিয়াছি? ডঙ্কা বাজাইলে আমি রাজসমীপে নীত হইব। আমার পরিচয় পাইলে বাদশাহ অবশ্যই আমার থাকিবার স্থান প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডঙ্কা বাজাইয়া দিলেন।

ডঙ্কা বাজিবামাত্র রাজবাটী হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে কৈমুশশাহ বাদশাহের নিকট লইয়া গেল। কৈমুশশাহ বাদশাজাদা তহমাশের রূপদর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত স্নেহ উপস্থিত হইল। পরিচয় পাইয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি কেন প্রাণ দিতে এখানে আসিয়াছ? আমার কন্যা অতি রূপবতী বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন। কত কত বাদশাহ ও বাদশাজাদাকে সে যে প্রশ্নোত্তর দানে অক্ষম বলিয়া হত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমার অনুরোধ, তুমি এ কঠিন সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।"

বলা বাহুল্য তহমাশ কোন মতেই নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন অগত্যা বাদশাহ নিজ পত্নী গুলরুখ বেগম সহ বাদশাজা তহমাশকে সঙ্গে লইয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া নিজ কন্যাকে কহিলেন—"তোমার এ কি পণ? কত কত বাদশাজাদা তোমার সহিত বিবাহার্থ আগমন করিল, তুমি এক প্রশ্নের ছলে তাহাদের সকলকেই হত্যা করিলে। এখনও বলিতেছি, এই ভীষণ পণ পরিত্যাগ কর। এই দেখ খাদির দেশের বাদশাজাদা তহমাশ বহুবিধ রত্নাদি উপহার লইয়া তোমার হস্ত কামনায় সমাগত। প্রশ্নের পণ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহা যদি না কর, সহস্র বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য মনুষ্য বধ করিলেও কেহ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইবে না। তোমাকে আজন্ম কুমারীই থাকিয়া যাইতে হইবে। "—এই কথা শুনিয়া মেহেরঙ্গেজ কহিল—"পিতঃ, আমি একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। আমার ভাগ্যে যদি আজন্ম পতিলাভ না হয় সেও ভাল, তথাপি বিনা প্রশ্নোত্তর-দানে কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইব না।"

তখন মেহেরঙ্গেজ রাজকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"গুল বা সনোবর

চে কর্দ্দ?" অর্থাৎ গুল সনোবরের সহিত কি করিয়াছিল? রাজকুমারের মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিয়া উত্তর দিলেন। মেহেরঙ্গেজ বলিল----"হইল না।" বলিয়া জল্লাদকে হুকুম দিল----"অবিলম্বে ইহার শিরচ্ছেদ করিয়া মুন্ড দুর্গদ্বারে টাঙ্গাইয়া দাও।" আজ্ঞামাত্র জল্লাদ রাজকুমারকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদ করিল।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাদশাহ শ্যমশাদলালপোষ কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া চল্লিশ দিন অবধি পুত্রশোকে মুহ্যমান রহিলেন। পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কহমাশও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়া মেহেরঙ্গেজের হস্তে প্রাণ দিল। পরে পরে আরও চারিপুত্র এই প্রকারে প্রাণ দিলেন। কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আলমাশ রূহবক্স তখনও পিতামাতার শোক-দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে বাকী রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদশাজাদা আলমাশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনি সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ এবং চৌষট্টি কলায় সুদক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা রত্নজড়িত সিংহাসনে বসিয়া পুত্রশোকে নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতেছেন। আলমাশ পিতার এই দশা দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন, "পিতাঃ, বাদশাহ কৈমুশের কন্যা আমার ছয়টি ভ্রাতাকে হত্যা করিযাছে, আমার অভিলাষ যে আমি গিয়া সেই পাপীয়সীর উপর প্রতিশোধ লই। তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া, তাহাকে নিজ পত্নী করিয়া, যথোপযুক্ত দণ্ড তাহাকে প্রদান করি।"

ইহা শুনিয়া বাদশাহ কহিলেন----"বৎস, একে একে আমার ছয়টি পুত্র কালকবলে পতিত হইয়াছে, এখন একমাত্র তুমি অবশিষ্ট আছ। তুমিই আমার বৃদ্ধাদশার ভরসাস্থল, তোমার দ্বারাই ' 'মার পৈত্রিক রাজ্য বজায় থাকিবে। তুমিও কি জানিয়া শুনিয়া সেই পাপীয়সীর হস্তে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছ?"

আলমাশ রূহ কহিলেন---"পিতঃ, যদি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ না লইতে পাবি, তবে এ জীবনে ফল কি? তাহা হইলে আমার রাজ্যসুখও বৃথা। আমার পুরুষার্থও বৃথা।" ফলতঃ পিতাকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া আলমাশ রূমদেশেব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আলমাশ কোনও সৈন্যসামন্ত বা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইলেন না। একাকীই যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন দিবসান্তর কৈমুশ শাহের রাজধানীতে পৌছিয়া, দুর্গদ্বারে নিজ ছয ভ্রাতাব মুন্ড দেখিয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্ত দেখিয়া ও জানিয়া লইলেন, কিন্তু যাহা বিশেষ কবিযা জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন---অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর----তাহার কোনও সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে যখন সন্ধ্যা সমাগত হইল, তখন নগর হইতে বাহির হইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি সামান্য চাষা লোকের গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য যাঞ্ছা করিলেন। কৃষক আনন্দমনে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল।---সেই কৃষকের কুটীরে সমস্ত রাত্রি অবস্থান করিয়া, পরদিন প্রভাত হইবামাত্র আলমাশ পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইল। প্রশ্নের উত্তর কি, সে বিষয়ে বাদশাজাদা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। এইরূপে দুঃখিত অন্তঃকরণে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মেহেরঙ্গেজের মহালের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মহালেব চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। দ্বারে সশস্ত্র সৈন্যগণ পাহারা দিতেছে। রাজকুমারের মনে প্রবল ইচ্ছা হইল, একবার কোনও মতে ইহার ভিতবে প্রবেশ করিয়া মেহেরঙ্গেজকে দেখিতে হইবে। না জানি সে কি রূপ, যাহার লালসায় উন্মত্ত হইয়া এত বাদশাহ এবং বাদশাজাদা প্রাণ দিল! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজকুমার সেই প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভাবিলেন, যদি কোথাও গোপন পথের সন্ধান

পাই ত প্রবেশ করি। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একস্থানে একটি কৃত্রিম নদী মহালের ভিতর হইতে, প্রাচীরের নিম্নদেশ দিয়া বহিয়া, বাহির হইয়া আসিতেছে। সুযোগ পাইয়া সেই কৃত্রিম নদীতে বাদশাজাদা অবতরণ করিলেন এবং ডুব দিয়া, প্রাচীরের নিম্নপথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া রাজকুমার দেখিলেন, সে স্থান একটি মনোহর প্রমোদ কানন। নদীর দুই পার্শ্বে হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজি ও লতাপুষ্প শোভায়মান, তাহার ছায়া নদীর নির্ম্মল জলে পড়িয়া দ্বিতীয় প্রমোদ কাননের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে বুলবুল পক্ষী বসিয়া ঐক্যতানবাদন করিতেছে। ফুলে ফুলে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিয়া মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে। কোকিল ও কোকিলাগণ পরস্পরের মনোহবণ কবিবার জন্য অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনিতে আকাশমার্গ পরিপ্লাবিত কবিতেছে।

তখন সেখানে কেহই ছিল না। বাজকুমার একস্থানে বৌদ্রে বসিয়া নিজ গাত্র ও পরিধেয় বস্ত্র শুকাইয়া লইলেন। তাহার পব সাবধানে প্রমোদ কাননের ভিতর অগ্রসর হইলেন। ক্রমে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নিকট হইতে অনতিদূবে পরীসদৃশ কয়েকটি কন্যা বসিয়া আছে। কিংখাব নির্ম্মিত একটি সুন্দর ফরাস, তাহার উপর রত্ন সিংহাসন। সেই সিংহাসনে দিব্যাঙ্গনা সদৃশ একটি কন্যা বসিয়া, তাহারই চতুষ্পার্শে পরীসদৃশ সখিগণ বসিয়া আছে। অনুমানে বুঝিলেন, সিংহাসনস্থিতা কন্যা মেহেরঙ্গেজ হইবে। সেই সুন্দরীর অঙ্গের লাবণ্যে সমস্ত প্রমোদ কাননে যেন উদ্ভাসিত। তাহার কেশদামের সৌগন্ধ কুসুমগন্ধকেও পরাজিত কবিয়াছে। দেখিযা রাজকুমাব ভাবিলেন, বিধাতা তাহাকে এরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারিণী করিযাছেন, সে কেন এমন নিষ্ঠুরবৎ সহস্র প্রাণি হত্যা করিতেছে?

রাজকুমাব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময একজন সখী একটি স্বর্ণনিম্মিত পেয়ালা হস্তে করিয়া নদী হইতে জল লইতে আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বাজকুমার ত্বরিতপদে বৃক্ষেব অন্তবালে লুক্কাইত হইলেন। সেই সখী নদীতে পেয়ালা ডুবাইবাব সময় দেখিল, জলে এক অপরূপ রূপবান পুরুষের ছায়া। সেই ছায়া দেখিবামাত্র সেই সখীর হস্ত হইতে পেযালা স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে অত্যন্ত উন্মনা হইয়া উঠিল। হয়ত বা কোন দেবতার ছায়া হইবে ইহা অনুমান করিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে স্বামিনীর সমীপে ফিরিয়া গেল। সেখানে গিযা সে সকল বিবরণ নিবেদন করিল। তখন মেহেরঙ্গেজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল---"আমার এ প্রমোদবনে পুরুষ কেমন করিয়া প্রবেশ করিল?" একজন সাহসিকা সখী বলল,---"আমি যাইয়া ইহাব তত্ত্ব লইতেছি।" বলিয়া সে নদীতীবে উপস্থিত হইল।

এদিকে রাজকুমারের মনে হইল, যদি ইহারা আমাকে ধরিযা ফেলে তবে আমার প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা। অতএব পাগল সাজিতে হইতেছে। কিন্তু সে সখীও আসিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইল না, কেবল জলমধ্যে ছায়ামাত্র দেখিয়া গেল। সে গিয়া মেহেরঙ্গেজকে বলিল,----"বাদশাজাদী, যাহা দেখিলাম তাহা কোনও দেবতা অথবা গন্ধর্ব্বের ছায়া হইবে। এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই। অথচ কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না।" তাহা শুনিযা মেহেরঙ্গেজ সেই ছায়া দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। নদীতীরে গিয়া সেই ছায়া অবলোকন করিবামাত্র তাহার হৃদয় মীনকেতনের পঞ্চশর বিদ্ধ হইয়া পড়িল। সে আপন একজন দাসীকে কহিল-----"কাহার এ ছায়া? তাহাকে অন্বেষণ করিয়া সত্বর আমার নিকটে আনয়ন কর!" আজ্ঞা অনুসারে দাসী চতুর্দ্দিকে অণ্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। পলাইবার পথ থাকিলে বাদশাজাদা আলমাশ পলায়ন করিতেন, কিন্তু কোন উপায় ছিল না। অগত্যা তিনি সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে দাসী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। দাসীকে দেখিবামাত্র তিনি পাগলামির ভান করিয়া হো হো করিয়া

হাসিলেন এবং ভূমিতে মাথা রাখিয়া দুই তিন বার ডিগবাজী খাইলেন। দাসী তাঁহাকে বলিল—"ওহে পাগল, তুমি কোথা যাও? বাদশাজাদী তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমার সঙ্গে আইস।" রাজকুমার কহিলেন—"বাদশাজাদী? কোন দেশের বাদশাজাদী? আমি ত শুনিয়াছি এ দেশের বাদশাজাদীকে ইঁদুরে খাইয়া ফেলিয়াছে।" দাসী কহিল—"পাগল চুপ্ কর। ওসব কথা বলিস্ না। আয় বাদশাজাদীর কাছে আয়।"

রাজকুমার দাসীর সঙ্গে আগমন করিলেন। মেহেরঙ্গেজ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে? কি উপায়ই বা এখানে আগমন করিয়াছ? শুনিয়া রাজকুমার প্রথমে রোদন করিলেন। পরে হাস্য করিয়া বলিলেন—"শুন নাই বাদশাজাদী? আজ সহরে বড় মজা হইয়াছে। এক সওদাগরের এক হরিণ ছিল। রাত্রে সে হরিণটা কেমন করিয়া ছাগল হইয়া গিয়াছে। আর একটা তুলার পাহাড় ছিল, বৃষ্টিতে সেটা গলিয়া ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে। আর সেখানে একটা উট চরিতেছিল, বন হইতে একটি বিড়াল বাহির হইয়া তাহাকে গপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজকুমার পুনরায় রোদন ও হাস্য করিতে লাগিলেন।

মেহেরঙ্গেজ সখীগণকে কহিল—"কি পরিতাপ! আহা, এমন সুন্দর যুবা পুরুষ কি করিয়া পাগল হইয়া গেল? ইহাকে ছাড়িও না, কোথায় বিঘোরে মারা যাইবে। ইহাকে এই প্রমোদকাননেই রাখিয়া দাও। দেখিও কোন প্রকার যত্নের ত্রুটি না হয়।"

বাদশাজাদা ভাবিলেন, উত্তম হইল। এইবার মেহেরঙ্গেজের সখীগণের নিকট হইতে যে কোনও উপায় পারি প্রশ্নের উত্তরটা জানিয়া লইব।

তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িল মেহেরঙ্গেজের সখী দিল-আবামের প্রতি। দিল-আরাম প্রত্যহ আসিয়া রাজকুমারের পরিচর্যা করিত, তাঁহাব সহিত বসিয়া কথোপকথন করিত। ক্রমশঃ দিল-আরামের চিত্ত রাজকুমাবের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে মন্মথবাণবিদ্ধা হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল।

রাজকুমার পাগলামির ভাণ সর্ব্বদা সমভাবে স্থির বাখিতে পাবিতেন না। অনেক সময়েই সহজভাবে দিল-আরামের সঙ্গে কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করিতেন। একদিন দিল-আরাম নির্জ্জন পাইয়া রাজকুমারকে কহিল—"তুমি কে এবং এস্থানে কেনই বা আসিয়াছ? তোমার বাড়ী কোথায়? আমি তোমার প্রেমে পাগল হইয়াছি। তুমি এস্থান হইতে আমাকে তোমার গৃহে লইয়া চল, তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব এবং যত্ন শুশ্রূষা করিয়া তোমার ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দিব।" রাজকুমার এ কথা শুনিয়া আবার পাগলের ভাণ আরম্ভ করিলেন দিল-আরামও দুঃখিত মনে কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন যখন দিল-আরাম রাজকুমারের নিকট আসিতেছিল তখন দেখিল, মেহেরঙ্গেজের দাসী রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া মেহেরঙ্গেজের মহালের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া দিল-আরামের মনে ঈর্ষা ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে চুপে চুপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া, মহালের এক কক্ষে লুকাইয়া মেহেরঙ্গেজ ও রাজকুমারের কথাবার্ত্তা গোপনে শুনিতে লাগিল।

দিল-আরাম শুনিল, মেহেরঙ্গেজ পাগলের সহিত যে প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মেহেরঙ্গেজও পাগলকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া দিল-আরামের চিত্ত ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পর মেহেরঙ্গেজ পাগলকে বিদায় দিল।

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন দিল-আরাম রাজকুমারকে স্বভবনে লইয়া গেল। সেখানে নির্জ্জনে রাজকুমারের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিল—"প্রিয়তম, তুমি কে এবং তোমার গৃহ কোথায় বল। কি প্রয়োজনেই বা

এদেশে আসিয়াছিলে? আমি সমস্ত জানিতে পারিলে যেমন করিয়া হউক তোমাকে এখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া তোমার চরণসেবায় রত হই।" এই কথা বলিয়া দিল-আরাম অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

বাদশাজাদা দেখিলেন, এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ আমার প্রতি যেরূপ প্রেমভাবাপন্ন, আমার কোন অনুরোধই এ ঠেলিতে পারিবে না। এই বিবেচনা করিয়া, সস্নেহে দিল-আরামের অশ্রু নিজ রুমালে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"সুন্দরি, আমার কি প্রয়োজনে এখানে আসা যদি শুনিতে এতই উৎসুক হইয়াছ তবে আমার বলিতে কোন বাধা নাই। আমি কেবল, জানিতে চাহি—"গুল্ বা সনোবর চে কর্দ্দ?' ইহার উত্তর যদি জানা থাকে ত বলিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর।"

ইহা শুনিয়া দিল-আরাম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল—"যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমায় বিবাহ করিবে এবং তোমার সমস্ত বেগমগণের মধ্যে আমায় প্রধানা করিবে, তাহা হইলে ও প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি যতদূর জ্ঞাত আছি তাহা তোমায় বলিব।"

দিল-আরামের কথা হইতে রাজকুমার বুঝিলেন, সে এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর জ্ঞাত নহে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে সাবাধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"হে প্রেয়সী,যদি তোমার সহায়তায় আমার মনস্কমনা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে, তুমি যেরূপ বলিতেছ ঐ রূপই করিব।" তখন দিল-আরাম বলিল—"নাথ, 'গুল্ বা সনোবর চে কর্দ্দ', ইহার উত্তর ত আমি অবগত নহি। তবে এই মাত্র জানি যে, মেহেরঙ্গেজের সিংহাসনের নিম্নে একজন হাবসী লুকাইয়া থাকে, সেই মেহেরঙ্গেজকে এই প্রশ্নের কথা বলিয়াছে। আমি আরও জানি যে ঐ হাবসী, বাকাফ সহর হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া মেহেরঙ্গেজের সিংহাসন তলে লুক্কাইত হইয়াছে। সুতরাং তুমি যদি বাকাফ সহরে যাইতে পার, তাহা হইলেই এ প্রশ্নের গুপ্তভেদ করিতে পার, নচেৎ আর কোনও উপায় দেখি না।"

এই কথা শুনিয়া বাদশাজাদা আলমাশ চিন্তা করিতে লাগিলেন—তবে আমাকে বাকাফ যাত্রা করিতে হইবে। না জানি সে নগর কত দূর এবং তথায় যাইতে কতই না বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু যত দূরই হউক, যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি তখন যাইবই তাহাতে অন্যথা হইবে না।

রাজকুমারকে চিন্তা করিতে দেখিয়া দিল-আরাম কহিল—"যদি মেহেরঙ্গেজকে বধ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রশ্নের উত্তর আনিতে যাইবার ক্লেশ স্বীকার করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। আমি সহজেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারি। মেহেরঙ্গেজকে মদ্য দিবার কালে তাহার সহিত এমন বিষ মিশাইয়া দিতে পারি যে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইবে।"

রাজকুমার কহিলেন—"না প্রিয়তমে, ছলে শক্রবধ করা পুরুষার্থ নহে। আমি স্বয়ং বাকাফ সহরে গিয়া প্রশ্নের উত্তর আনয়ন করিয়া নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিব।"

অতঃপর দিল-আরামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সুযোগ মত সেই কৃত্রিম নদী পথে রাজকুমার বাহির হইলেন। যাহার গৃহে পূর্ব্বে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই কৃষকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাকাফ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তম বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া, বাদশাজাদা অলমাশ বাকাফ নগর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বাকাফ নগর কোথায়, কোন দিকে, কোন পথে যাইতে হইবে, তাহা কিছুই অবগত ছিলেন না। অথচ মনের আবেগে অশ্ব ছুটাইয়া যাইতে লাগিলেন।

কয়েক দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইল। পথচারী কত লোককেই জিজ্ঞাসা করেন,

বাকাফ সহর কোথা? কেহই সন্ধান বলিতে পারে না। এই কারণে বাদশাজাদার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সপ্তম দিবসে তিনি দেখিলেন, সবুজ বস্ত্র পরিধান করিয়া একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি অশ্বারোহণে পথে যাইতেছেন। রাজকুমাব সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জুনাব, বাকাফ নগর কোন পথে যাইতে হইবে বলিতে পাবেন?"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে যুবক, তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন—"আমি একজন পথিক মাত্র। যদি বাকাফ নগরের সন্ধান আমায় বলিতে পারেন ত বলিয়া উপকৃত করুন।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"বৎস, তুমি বাকাফ নগরে যাইবার আশা পরিত্যাগ কর। সে পথ অতি ভয়ানক। যদি সারা জীবন সে পথ অন্বেষণ কর, তাহা হইলেও সফল হইবে না।"

কিন্তু রাজকুমার অহমাশ কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে বৃদ্ধ বলিলেন—"সহর বাকাফ, কাফ দেশে অবস্থিত। সে দেশে দৈত্যগণ বাস করে। এই স্থান হইতে কিছু দূরে যাইলে, সম্মুখে দুইটি পথ দেখিতে পাইবে। তোমার দক্ষিণ দিকে যে পথ সেপথ অবলম্বন করিও।

বাম দিকের পথে কদাপি পদার্পণ করিও না। দক্ষিণ দিকের পথ একদিন এবং এক রাত্রি চলিলে পর, সম্মুখে একটি স্তম্ভ দেখিতে পাইবে। সেই স্তম্ভে এক শ্বেত প্রস্তব খন্ড যোজিত আছে। সেই শিলায স্বর্ণের অক্ষরে কিছু লেখা আছে। সেই লেখা পড়িয়া, তদনুসারে পথ অবলম্বন করিবে। কদাপি তাহার বিরুদ্ধ পথ গ্রহণ করিবে না। করিলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে।"

রাজকুমার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধকে সেলাম করিযা অশ্বচালনা কবিলেন। একদিন এবং এক রাত্রির পর কথিত স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইল। শ্বেত প্রস্তবে স্বর্ণাক্ষবে খোদিত ছিল যে পথিকের উচিত দক্ষিণ মার্গ অবলম্বন কবা। যদি কেহ বাম মার্গ অবলম্বন করে তবে তাহাকে অল্প ক্লেশ পাইতে হইবে কিন্তু শীঘ্র আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আর মধ্যবর্ত্তী যে পথ তাহা বাফাই সহবের পথ। কিন্তু সে পথ এতই ভয়ানক যে পথিকেব প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রাজকুমার এই শিলালিপি পাঠ কবিয়া, নির্ভয়ে মধ্য পথই অবলম্বন করিলেন। একদিন এক রাত্রি সেই পথে চলিবার পর একটি সুন্দর ময়দান দৃষ্টিগোচব হইল। তথায় উচ্চ বনস্পতিরাজি আকাশে মস্তক মিলিত করিয়াছে। কিছু দূরে একটি উদ্যানবাটিকাও রহিয়াছে। রাজকুমার সেই বাটিকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, উদ্যানবাটিকাব প্রবেশপথ মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত। একজন মসীবর্ণ হাবসী দ্বার বক্ষা করিতেছে। তাহাব ওপবেব ওষ্ঠ উল্টাইয়া নাসিকা স্পর্শ কবিয়াছে। নিম্নের ওষ্ঠ ঝুলিয়া নাভিদেশে নামিয়াছে। বহুসংখ্যক পশুচর্ম একত্র সেলাই কবিয়া সে নিজ পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ কবিয়াছে। নিকটস্থ এক দাড়িম্ব বৃক্ষে একশত মণ পাথরেব এক ঢাল ঝুলিতেছে। একটি শামশাদ বৃক্ষে পঞ্চাশ মণ লোহার নির্মিত তাহার তরবারি ঝুলিতেছে। পাথরের শয্যায, পাথরের বালিশ মাথায় দিয়া সেই হাবসী শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। রাজকুমার ঈশ্বরের নাম লইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষে অশ্বকে বন্ধন করিলেন। তৎপরে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উদ্যানের শোভা পরম রমণীয়। দেখিলেন, কতকগুলি হবিণ চরিতেছে। তাহাদের শৃঙ্গগুলি সোনা দিয়ে বাঁধানো। সোনার কাজ করা মখমলের আঙ্গিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকের গলায় একখানি করিয়া রেশমী রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া রাজকুমারের মনে বিস্ময় উৎপন্ন হইল। ভাবিলেন—"কে এ উদ্যানের মালিক? সে ত অত্যন্ত সৌখিন লোক দেখিতেছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু হরিণগণ আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। হরিণগুলির চক্ষু বিনতিপূর্ণ,

যেন তাহারা রাজকুমারকে বলিতে লাগিল----"এ পথে যাইও না যাইও না।" কিন্তু রাজকুমার ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি হরিণগণকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখিলেন একটি সুন্দর গৃহ রহিয়াছে। বাটীর চতুর্দ্দিকে বিবিধ ফুলের বাগান। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুন্দর পুষ্পসকল সেখানে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তাহাদের গন্ধও অভিনব প্রকারের। রাজকুমার সে বাটীর এক দ্বার দেখিতে পাইয়া নির্ভয়ে সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কয়েকটি সুসজ্জিত কক্ষ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, একটি কক্ষে একজন অপ্সরাসদৃশী রূপবতী কামিনী মখমল ও কিংখাব গালিচার উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই রাজকুমারের মন প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই কামিনীও রাজকুমারের অলৌকিক রূপ দর্শনে অস্থির হইয়া পড়িল।

রাজকুমারকে দেখিবামাত্র সেই তরুণী উঠিয়া দণ্ডায়মান হইযা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল--"হে শুভদর্শন, তুমি কে? তোমার আগমনে আমি অতীব পুলকিত হইলাম। তুমি কোথা হইতে আসিলে আব কোথায়ই বা যাইবে?"

বাজকুমার সেই কামিনীর পার্শ্বদেশে উপবেশন কবিয়া নিজের তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন। শুনিয়া, রমণী কহিল—"হে প্রিয়, এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইলে? এখনও এ পণ পরিত্যাগ কর। সে পথে কোন মনুয্য অদ্যাবধি যাইতে পারে নাই। তুমি এইখানেই থাক, কোথাও যাইও না। নিজ করকমল আমাব গলায় বেষ্টন কবিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, আমার তুল্য সুকুমারী ললনা প্রাপ্ত হইলে। প্রিযতম, তোমাব মুখদর্শনে আমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছি। এইখানে অবস্থান কবিযা আমার সহিত সুখসম্ভোগে কালাতিপাত কর।"

রাজকুমার কহিলেন—"প্রিয়ে, তোমাব নাম কি?"

রমণী কহিল—"আমার নাম লতিফাবানু। তুমি বাকাফ নগরে গেলে যে অভিপ্রায় পূর্ণ হইত, আমি এইখানে বসিযাই তাহা পূর্ণ কবিযা দিব। আমি যাদুবিদ্যার অধিকারিণী। এ সংসার সুখের আগার। এস আমরা পবস্পর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপভোগ করি।" এই বলিয়া লতিফাবানু রাজকুমাবেব প্রতি বিলোল কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিল।

বাদশাজাদা আলমাশ কহিলেন—"সুন্দরী, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যত দিন না কৈমুশ শাহ্ বাদশাকে সপরিবারে বন্দী কবিতে পারি, এবং দুষ্টা মেহেরঙ্গেজকে ধাবমান অশ্বগণের পদতলে পতিত কবিয়া তাহার অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করাইয়া, সেই মাংস চিল ও কুক্কুরগণকে না খাওয়াইতে পারি, ততদিন কোনও সংসার-সুখের বশীভূত হইব না। আমি বাকাফ নগরে গিয়া নিজ অভিপ্রায় সফল করিয়া, পবে তোমাকে বিবাহ করিব। তখন তোমার সুন্দর গ্রীবাতে ভুজবন্ধন করিয়া তোমার যৌবনসুধা পান করিব।"

লতিফাবানু রাজকুমারকে ভুলাইবার জন্য সেই নির্জ্জন কক্ষে অনেক প্রকার হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু রাজকুমার অটল রহিলেন। তখন লতিফাবানু মনে করিল "ইহাকে মদ্যপান করাইলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। নেশার অবস্থায় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া আমার দাস হইয়া আমাকে সুখী করিবে।" মনে মনে এই বিচার করিয়া লতিফাবানু সহচাবীগণকে ডাকাইয়া পানপাত্র ও মদ্য আনিতে কহিল। অবিলম্বে একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত হীরকখচিত পানপাত্র উপস্থিত হইল এবং বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মদিরা আনীত হইল। এই সকল রাখিয়া সহচরীগণ বিদায় হইল।

লতিফাবানু এক পাত্রে মদিরা ঢালিয়া প্রথমতঃ রাজকুমারের হস্তে প্রদান করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন—"প্রিয় সখী, প্রথম পাত্র তোমারই পান করা উচিত।"—বলিয়া রাজকুমার স্বহস্তে সেই পাত্র লতিফাবানুর অধরের নিকট ধরিলেন। লতিফাবানু তাহা পান করিয়া আর এক পাত্র মদ্য ঢালিয়া, রাজকুমারেব গলদেশে বামভুজ বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে পান করাইয়া দিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চলিতে লাগিল। ক্রমে মত্ততাব প্রভাবে লতিফাবানু বুদ্ধি-

বিপর্য্যয় ঘটিল। সে রাজকুমারের গলবেষ্টন করিয়া প্রেমভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। রাজকুমারের বিলক্ষণ মত্ততা উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি অটল রহিলেন।

রাজকুমারের এইরূপ অনিচ্ছা দেখিয়া অবশেষে লতিফাবানু সখীগণকে ডাকাইয়া নৃত্যগীত করিতে আদেশ দিল। ভাবিল, নৃত্য ও সঙ্গীত প্রেমের উত্তেজক—কিছুকাল এইরূপ উৎসব করিলে রাজকুমারের মন গলিতে পারে। সখীগণ নানা যন্ত্র-তন্ত্র আনিয়া নৃত্যগীত অতিবাহিত হইল, তথাপি রাজকুমার প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না।

চতুর্থ দিন রাজকুমার বলিলেন—"প্রিয়ে লতিফাবানু, তিন দিন এখানে বৃথা আমোদে অতিবাহিত করিলাম। এবার আজ্ঞা কর, বাকাফ নগরে যাত্রা করি। তোমার প্রণয় আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় বাকাফ নগরে গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া আসিয়া তোমার প্রেম-সরোবরে অবগাহন করিব।"

ক্রোধে অভিমানে লতিফাবানুর অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল। সে ভাবিল—"আমি এত করিয়া ইহার প্রণয় যাঞ্ছা করিলাম তথাপি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিল না? আচ্ছা, ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" দাসীকে আজ্ঞা করিল—"ও ঘরে যে এক কৌটা মাজুম আছে তাহা আনিয়া দাও ত।" মাজুম আসিলে ছলনাময়ী পাপীয়সী রাজকুমারকে বলিল—"প্রিয়তম, ইহা, একটু ভক্ষণ কর। ইহা অত্যন্ত প্রণোয়ত্তেজক।" রাজকুমার তাহা ভক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন লতিফাবানু সর্পাকৃতি একটা যষ্ঠি বাহির করিয়া, তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া, সেই যষ্ঠি লইয়া রাজকুমারের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিল। রাজকুমার ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যন্ত্রণায় ঘুরপাক খাইতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে পুনরায় ভূমিতে পতিত হইলেন। পতিত হইবামাত্র তিনি একটি হরিণের আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

লতিফাবানু তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়া রাজকুমারের শৃঙ্গ সোনায় বাঁধাইয়া দিল। মখমলের উপর জরির কাজ করা এক আঙ্গিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিল। গলায় একটি রেশমী রুমাল বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে উদ্যানে ছাড়িয়া দিল।

এদিকে বাদশাজাদা হরিণত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বুদ্ধিসুদ্ধি পূর্ব্ব মতই রহিল, কেবল বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি বাগানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া কেবলই পলাইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "আমি এখানে নিরাপদে আছি বটে, কিন্তু আমার জীবন বিফল হইল। তাহার অপেক্ষা যদি আমি পলাইতে পারি, যদি ব্যাঘ্র ভল্লুকেও আমাকে খাইয়া ফেলে, এ বিফল জীবন অপেক্ষা তাহাও ভাল।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নির্গমনের কোনও পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরিণবেশী বাদশাজাদা এই প্রকার মনোদুঃখে সেই বাগানে দশ বারো দিন যাপন করিলেন। একদিন বাগানের এক কোণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার প্রাচীরেব উপরাংশ বর্ষাজলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা তাদৃশ উচ্চ নহে। দেখিয়া বাদশাজাদার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বিপুল বলের সহিত এক লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাচীরের বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন—আশঙ্কা পাছে আবার লতিফাবানুর মায়াজালে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সারাদিন ছুটিয়া ছুটিয়া, সেই বাগান হইতে বহু ক্রোশ দুরে গিয়া পড়িলেন। সেখানে একটি জলাশয় ছিল। কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া

এবং তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া রাত্রের মত সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখেন, একটি বিপুল অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে এক সহস্র বাতায়ন সন্নিবিষ্ট ছিল। গৃহের নিকট গিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দেখা গেল। সেই রমণীকে দেখিয়াই বাদশাজাদার বিশ্বাস হইল, ইনি স্নেহশীলা করুণাময়ী রমণী—লতিফাবানুর মত কামুকী ও পাষাণ-হৃদয় নহেন। মনে হইল, এই রমণী হয়ত বা আমাকে এই ইন্দ্রজাল হইতে মুক্ত করিয়া প্রাণদান দিতে পারেন।

এদিকে সেই রমণী হরিণকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। স্বীয় পরিচারিকাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখ দেখ, কি সুন্দর হরিণ! ইহার শৃঙ্গ কেমন স্বর্ণজড়িত! অঙ্গে কেমন সুন্দর জরিদার মখমলের আঙ্গারাখা। গলায় কেমন রেশমী রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। বোধহয় কোনও বড়লোকের পালিত হরিণ হইবে—কি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তুমি যাও উহাকে ধৃত করিয়া আন। আমি পুষিব।" আজ্ঞা পাইয়া পরিচারিকা নীচে নামিয়া আসিল। এক মুষ্টি সবুজ নবীন ঘাস লইয়া, হরিণের নিকট যাইয়া, "আয় আয়" বলিয়া প্রলোভিত করিতে লাগিল। বাদশাজাদারও মন সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছটফট করিতেছিল, তিনি সহজেই ধরা দিলেন। দাসী তাঁহার গলার রুমাল ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

ভিতরে গিয়া বাদশাজাদা দেখিলেন, সেই সুন্দরী নবীন যুবতী একটি রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার রূপের জ্যোতিতে কক্ষখানি ঝলমল করিতেছে, যুবতীর নাম জমিলাবানু। হরিণকে দেখিবামাত্র তিনি তাহাকে কাছে আনিতে বলিলেন। হরিণের গায়ে আদর করিয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন। হরিণও নিজ মস্তকটি তাঁহার কোলে রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝে মাঝে মস্তক তুলিয়া জমিলাবানুর প্রতি সকাতর ভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিল। জমিলাবানু উত্তম মেওয়া ফল আনিয়া হরিণকে খাইতে দিলেন। উত্তম সুগন্ধি গোলাপী সরবৎ তাহাকে পান করিতে দিলেন। বাদশাজাদা এতদিন ঘাস খাইয়া বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিল। এই সকল উপাদেয় পানভোজন পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। খাওয়া হইলে জমিলাবানু নিজ রুমাল দিয়া হরিণের মুখ মুছাইয়া দিয়া আবার আদর করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তাঁহার এই স্নেহ-ব্যবহারে রাজকুমারের মনে অতি পরিতাপ উপস্থিত হইল। মনে করিলেন—"হায়, এই সুন্দরী আমাকে সামান্য পশু বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। আমার যদি মনুষ্যদেহ থাকিত, যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে আত্মপরিচয় দিয়া ইঁহার শরণাপন্ন হইতাম।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া জমিলাবানু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাসীকে বলিলেন—"দেখ দেখ, হরিণ কাঁদিতেছে। পশু হইয়া এমন করিয়া কাঁদে কেন? এরূপ ত কখনও দেখি নাই!"

দাসী বলিল—"স্বামিনি, বোধ করি এ কোনও মনুষ্য হইবে। কাহারও ইন্দ্রজাল প্রভাবে পশুদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

যখন এই প্রকার কথোপকথন হইতেছিল, তখন হরিণ ধীরে ধীরে নিজ মস্তক জমিলাবানুর পদতলে স্থাপন করিয়া, ব্যকুল দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জমিলাবানুর মনে প্রতীত জন্মিল যে, দাসীর কথাই সত্য। বলিলেন—"দাই, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ঠিক। নিশ্চয়ই ইহা লতিফাবানুর কার্য্য। সেই এইরূপ মনুষ্যকে পশু করিয়া রাখে। তুমি যাও, ও ঘর হইতে মাজুমের ডিবিয়া লইয়া আইস।" আজ্ঞানুসারে দাসী ডিবিয়া লইয়া আসিল। জমিলাবানু তাহার কিয়দংশ লইয়া আদর করিয়া হরিণকে খাওয়াইয়া দিলেন। মাজুম খাইয়াই হরিণ অচেতন হইয়া গেল। তখন জমিলাবানু গদির নিম্নে হইতে একটি ছড়ি বাহির করিয়া, তাহা মন্ত্রপুত করিয়া ধীরে ধীরে হরিণের স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। হরিণ তখন মাটিতে লুটাপুটি করিতে

লাগিল এবং অবিলম্বে মনুষ্যমুর্ত্তি পবিগ্রহ কবিল।—মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইযা প্রথমে বাজকুমাব জানু পাতিযা ঈশ্বব সমীপে নিজ অন্তবেব ধন্যবাদ প্রেবণ কবিলেন। তাহাব পব জমিলাবানুব দিকে ফিবিযা বলিলেন—"হে সুচবিতে, তুমি আমাব পুনর্জ্জীবন দান কবিলে। কি বলিযা তোমায ধন্যবাদ দিব? আমাব প্রত্যেকটি কেশ তোমাব দযাব জন্য কৃতজ্ঞ।"

তখন জমিলাবানু বাজকুমাবকে স্নান কবাইযা বাজবস্ত্র পবাইযা দিলেন। তৎকালে বাজকুমাবেব অলৌকিক রূপ এরূপ জ্যোতির্ম্ময হইযা প্রকাশ পাইল যে জমিলাবানু তখনি তাঁহাব পদে দেহ মন সমর্পণ কবিলেন। বাজকুমাব ত হবিণাবস্থা হইতেই জমিলাবানুব রূপদর্শনে হৃদয হাবাইযাছিলেন।

জমিলাবানু তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি কে এবং কোথা হইতেই বা আসিযাছেন? আপনাব প্রযোজনই বা কি, সমস্ত প্রকাশ কবিযা বলুন।"

বাজকুমাব তখন নিজ আমূল বৃত্তান্ত জমিলাবানুব সম্মুখে বর্ণনা কবিলেন।

তাঁহাব ইতিহাস শুনিযা জমিলাবানু কহিলেন—"হে প্রিয, বাকাফ নগবে যাইবাব এক চতুর্থ মাত্র পথ তুমি অতিক্রম কবিযাছ। এখনও বাবো আনা অংশ পথ বাকী আছে। ইহাবই মধ্যে তুমি এত দুঃখ ক্লেশ পাইযাছ, বাকী পথ অতিক্রম কবিতে হইলে তুমি প্রাণে বাঁচিবে না। সে পথ অতীব ভযানক। অতএব তোমাব পণ পবিত্যাগ কব। মিছামিছি প্রাণ খোযানো বুদ্ধিমানেব কর্ম্ম নহে। আমাব এই অনাথভবন নিজ সুখভবন মনে কবিযা এইখানেই জীবনকালেব সুখ সম্ভোগ কব। তোমাব মনুষ্যমূর্ত্তিতে দেখিবামাত্র আমি তোমাকে দেহ মন সমর্পণ কবিযাছি। তোমাব সুখকেই আমি নিজেব সুখ বলিযা জ্ঞান কবিব এবং সকল প্রকাবে তোমাব সন্তোষ সাধনে যত্নবতী থাকিব।"—বাজকুমাব কহিলেন—"প্রেযসী, তোমাব নিকট আমি জীবন পাইযাছি, সুতবাং এ জীবন তোমাবই। অল্পদিনেব জন্য তোমাব বিচ্ছেদ ক্লেশ সহ্য কবিযা, বাকাফ নগবে গিযা, নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ কবিযা ফিবিযা আসি। তাহাব পব তোমায মুসলমান ধর্ম্মানুসাবে বিবাহ কবিযা, চিবদিন হৃদযে বাঁধিযা বাখিব।"

জমিলাবানু যখন দেখিলেন যে, বাজকুমাব কোন মতেই বাকাফ যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, তখন দাসীকে আজ্ঞা কবিলেন—"হজবৎ ইসাক পযগম্ববেব ধনুর্ব্বান, তৈমুসী ঢাল এবং অকবব সুলেমানী তববাবি লইযা আইস।" দাসী উক্ত তিন অস্ত্র আনিলে পব জমিলাবানু বাজকুমাবকে কহিলেন—"এই তিনটি অস্ত্র সঙ্গে লইযা যাও। এ তিন অস্ত্র অত্যন্ত দুর্লভ সামগ্রী। এই অকবব সুলেমাণী তববাবীব গুণ এই যে, যদি পর্ব্বতগাত্রেও ইহা আঘাত কবা যায, তবে সাবান যেমনি তাবেব ধাবে সহজে কাটিযা যায, এ পর্ব্বতও সেইরূপ কাটিযা যাইবে। আব এই তৈমুসী ঢালেব গুণ এই যে ইহা যাহাব নিকট থাকিবে, শত যোদ্ধাও যুগপৎ তাহাকে আক্রমণ কবিলে বিপদাশঙ্কা নাই। আব এই পযগম্বব ইসাকেব ধনুর্ব্বাণেবও গুণ অদ্ভুত। এই ধনুব শবসন্ধান অব্যর্থ, যে যত বডই বলবান হউক, এই শবেব আঘাতে তাহাব মৃত্যু নিশ্চিত। এই তিনটি অমূল্য বস্তু সাবধানে বক্ষা কবিবে। আব এক কথা এই পথে অগ্রসব হইলে সী-মোবগেব বিনা সাহায্যে পথ অতিক্রম কবিতে পাবিবে না। কাবণ বাকাফ পথে সাতটি বৃহৎ বৃহৎ নদী আছে। সে নদী সমুদ্র অপেক্ষাও ভযানক, পাব হওযা মনুষ্যজাতিব পক্ষে একান্ত অসম্ভব।"—বাজকুমাব জিজ্ঞাসা কবিলেন—"প্রিয সখি, সী-মোবগ কোথায আছে? এবং কি কবিযাই বা আমি সে স্থানে পৌঁছিব?"

জমিলাবানু কহিলেন—"এখান হইতে একদিনেব পথেব পব একটি গৃহ আছে। সে স্থানের নাম সফহাপৃথী। সেখানে একটি কুণ্ড দেখিতে পাইবে। তুমি সেখান ব্লাত্রে বিশ্রাম কবিও। বাত্রে অনেক পশু সেখানে আসিবে, তাহাব মধ্যে দুই চাবিটা পশু বধ কবিযা আপনাব কাছে বাখিযা দিও। বাত্রি গভীব হইলে আশী হাত লম্বা একটি ব্যাঘ্র আসিবে।

সেই ব্যঘ্র বনের রাজা। তাহার সহিত আর অন্যান্য ব্যাঘ্রও আসিবে। ব্যাঘ্ররাজকে দেখিবামাত্র তাহার সম্মুখে গিয়া তাহাকে সেলাম করিও এবং রুমাল দিয়া তাহার সমস্ত শরীর সাবধানে মুছাইয়া দিও। তাহার পর বধ করা পশু মাংস তাহাকে খাইতে দিও। তাহা হইলে ব্যাঘ্ররাজ তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবে এবং অপর কোন পশু তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই প্রকারে সারা পথ ব্যাঘ্ররাজের সেবা করিও। তাহার পর দুই তিন দিনের পথ যাইলে সম্মুখে দুইটি রাস্তা দেখিতে পাইবে। সাবধান, দক্ষিণ দিকের পথে যাইও না। বামদিকের পথ ধরিও। সেই পথে যাইতে যাইতে ক্রমে হাবসীদিগের এক দুর্গ দেখিতে পাইবে। সেই নগরের নাম খুমাশা সেই স্থানে চল্লিশজন মহাবীর হাবসী সেনাপতি আছে। প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ-পাঁচ সহস্র করিয়া হাবসী সৈন্য, তাহাদের বাদশাহের নাম তুর্ম্মতাক। যদিও তুর্ম্মতাক অতি প্রতাপশালী তথাপি এই তরবারি প্রভৃতির প্রভাবে সে তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে। তাহারই সাহায্যে তুমি নদী পার হইয়া বাকাফ দেশে পৌছিতে পারিবে। সাবধান, আমি যাহা বলিলাম, ঠিক ঠিক সেই মত করিবে, কোনরূপও অন্যথা না হয়।" এই বলিয়া জমিলাবানু নিজ অশ্বশালা হইতে পবনসদৃশ বেগবান এক অশ্ব রাজকুমারকে আনাইয়া দিলেন।

রাজকুমার তখন সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিলেন। জমিলাবানু তাঁহার বিরহক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক দূর অবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পরে সাশ্রু নয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।—এদিকে রাজকুমার সমস্ত দিবস চলিয়া সফহাপৃথী নামক স্থানে উপনীত হইলেন। সেখানে দুইটি মার্গ দেখা গেল। তখন জমিলাবানুর কথা স্মরণ করিয়া রাত্রির জন্য সেইখানেই বিশ্রামের আয়োজন করিলেন।

অল্প রাত্রি হইলে বহু সংখ্যক পশু সেখানে চরিতে আসিল। বাদশাজাদা তাহাদের মধ্যে-কয়েকটিকে বধ করিয়া আপনার পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। যখন অর্দ্ধরাত্রি সমাগত হইল তখন সেই বন হইতে সমস্ত পশু চলিয়া গেল। ক্রমে আশী হাত লম্বা ব্যাঘ্ররাজ আসিয়া দর্শন দিল। মনুষ্যচক্ষু কখনও সেরূপ ব্যাঘ্র অবলোকন করে নাই। বাদশাজাদা সাহস পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া তাহাকে সেলাম করিলেন এবং বানু-প্রদত্ত রুমাল দিয়া ব্যাঘ্রের সমস্ত শরীর হইতে বনের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন। পরে শিকারের পশু তাহাকে ভক্ষণ করিতে দিলেন। ব্যাঘ্র পরম আনন্দে সেই মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজকুমার হাত জোড় করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহার শেষ হইলে রাজকুমার সেই রুমাল দিয়া ব্যাঘ্রের মুখ ভাল করিয়া মুছিয়া দিলেন। অন্যান্য ব্যাঘ্রগণ পরিত্যক্ত মাংস ভোজন করিতে লাগিল।

আহারান্তে ব্যাঘ্ররাজ পরম অ্যাপ্যয়িত হইয়া রাজকুমারের কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিল। বলিল—"তুমি নির্ভয়ে এখানে থাক। কোনও জন্তু তোমায় হিংসা না করে, আমি এমন হুকুম দিতেছি। সমস্ত পথ আমার ব্যাঘ্রেরা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ব্যাঘ্ররাজ প্রস্থান করিল। রাজপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য একটি ব্যাঘ্রকে রাখিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র বাদশাজাদা অশ্বধাবিত করিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে দুইটি পথ। ভাবিলেন, দক্ষিণদিকের পথে বিস্তর বিপদ, বাম দিকের পথেই যাই। ঈশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক তাহাই করিলেন। দুই তিন দিন সেই পথে যাইয়া সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দুর্গ দেখিতে পাইলেন। সেই দুর্গের প্রত্যেক বুরুজে তাপ সজ্জিত রহিয়াছে। দুর্গদ্বারে বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হাবসী সৈন্যগণ পাহারা দিতেছে। রাজকুমার ধীরে

ধীরে সেই দুর্গের দ্বারদেশের নিকটে আসিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, জিনপোষ বিছাইয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিলেন। এমন সময় কয়েকজন হাবসী আসিয়া রাজকুমারকে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—"ভাই সকল আজ বড় শুভদিন। একজন মানুষ আসিয়াছে। আমাদের বাদশাহ তুর্ম্মতাক মনুষ্যের মাংস বড়ই ভালবাসেন। ইঁহাকে ধরিয়া তাঁহাব কাছে লইয়া গেলে আমাদের সকলের ভাল বকশিস্ মিলিবে।"

ইহা বলিয়া দশ-বারোজন হাবসী রাজকুমারের কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে চাহিল। রাজকুমার ধীরে ধীরে সুলেমানী তরবারী বাহির করিয়া এক আঘাতে হাবসীগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

দুর্গদ্বার হইতে সৈন্যগণ এই ব্যাপার দেখিয়া কয়েকজন সশস্ত্র হাবসীকে পাঠাইয়া দিল। সুলেমানী তরবারির প্রভাবে রাজকুমার তাহাদিগকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহু হাবসী আসিল এবং রাজকুমারের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তুর্ম্মতাক বাদশাহ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। নিজ প্রধান সেনাপতি চলমাক্ নামক মহাযোদ্ধাকে ডাকিয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। চলমাক্ সহস্র সহস্র হাবসী সৈন্য সঙ্গে লইযা বাহির হইলেন। বাজকুমারের নিকটে আসিয়া কহিলেন—"ওরে নিবুদ্ধি, তুই গোটাকতক হাবসী সৈন্য মাবিয়াই কি নিজেকে মহাবীর বলিযা মনে করিতেছিস? তোর শক্তি কতখানি এবার আমি দেখিব।" রাজকুমার এই দুর্ব্বচন শুনিয়া ক্রোধে সুলেমানী তরবারী বাহির করিয়া হাবসীগণের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া ক্রোধে চলমাক্ এক বর্শা ঘুরাইয়া রাজকুমারকে লক্ষ্য করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারকে ধবিবার জন্য ধাবিত হইলেন। রাজকুমাব সুলেমানী তরবারী দ্বারা চলমাক্‌কে এমন আঘাত করিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহাব প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সেনাপতি নিহত দেখিয়া হাবসী সৈন্যগণ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

এই সমাচার তুর্ম্মতাকের নিকট পৌঁছিবামাত্র ক্রোধে ও অপমানে তিনি অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন। আজ্ঞা দিলেন, "সৈন্যগণ সজ্জিত হও, আমি স্বয়ং এবার যুদ্ধযাত্রা করিব।"

পরদিন প্রভাতে, প্রলয়ের মেঘপুঞ্জ সদৃশ, অগণ্য হাবসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া, স্বয়ং তুর্ম্মতাক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর, রাজকুমার সহস্রাধিক হাবসী সৈন্য বধ করিলেন বটে, কিন্তু অত্যাধিক পরিশ্রমে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, এবার বুঝি রণে পরাজয় মানিতে হয়। একা অত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? এমন সময়ে দেখা গেল, ব্যাঘ্ররাজ দুই সহস্র ব্যাঘ্র সৈন্য লইযা, বজ্রগম্ভীর স্বরে হুহুঙ্কার করিতে করিতে, রাজকুমারের সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ব্যাঘ্রগণ হাবসী সৈন্যদের ধরিয়া সদ্য সদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজকুমারের সাহস ও বলবুদ্ধি হইল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পয়গম্বর ইসাকের ধনুর্ব্বাণের সাহায্যে সহস্র সহস্র হাবসী সৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন।

তুর্ম্মতাক ইহা দেখিয়া ভাবিলেন—"নিশ্চয়ই এমনুষ্য নহে—কোনও দৈত্য বা দানব হইবে। মনুষ্য হইলে কি একাকী এত হাবসীকে বধ করিতে পারিত? আর ব্যাঘ্ররাজই বা আসিয়া সাহায্য করে কেন? অতএব যুদ্ধে আর মঙ্গল নাই। পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লই।" এই চিন্তা করিয়া তুর্ম্মতাক সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই পয়গম্বর ইসাক প্রদত্ত এক শর আসিয়া তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইল এবং তিনি ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হাবসীগণকে জয় করিয়া ব্যাঘ্ররাজের সহিত রাজকুমার দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজেতাকে রাজা জানিয়া হাবসীগণ তাঁহাকে সিংহাসনে সমর্পণ করিল। নানাবিধ

খাদ্যদ্রব্য ও সুরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তিনি ব্যাঘ্ররাজের সহিত সে সমস্ত পানাহার করিয়া, বিশ্রামসুখে সেই দুর্গে দুই তিন দিন কাটাইলেন। তুর্ম্মতাকের একটি মাত্র কন্যা ছিল। তিনি তাহাকে আনাইয়া, মহম্মদী কলমা শিখাইয়া, তাহাকে পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সে কন্যা অতীব সুন্দরী। বলিলেন—"কুমারী, তুমি এখন তোমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া তুর্ম্মতাক কন্যাকে সিংহাসনে বসাইয়া, ব্যাঘ্ররাজকে অনুরোধ করিয়া এক ফৌজ ব্যাঘ্র সৈন্য তাহার রক্ষার্থ রাখিয়া, রাজকুমার বাকাফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাবসী রাজ্য পরিত্যাগ করিবার পর দুই তিন মাস অতীত হইলে বাদশাজাদা অলমাশ এক প্রকাণ্ড উপবনে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় বিবিধ বর্ণে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। চামেলী, চম্পা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলকুল মনোম্মাদকর সুগন্ধি বিতরণ করিতেছে। উপবনের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি লতাবৃক্ষপূর্ণ উচ্চ পর্ব্বত। নিম্নে বড় বড় বনস্পতিসকল দণ্ডায়মান। একটি সুশীতল বারিপূর্ণ কুন্ডল বহিয়াছে। পর্ব্বত হইতে জল নামিয়া সেই কুন্ডে প্রবেশ করিতেছে এবং অপব এক স্থান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। বাদশাজাদা সেই কুন্ড দেখিলেন, এই বোধ হয় জমিলাবানু কথিত সী-মোরগের আবাস স্থান।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই স্থানে বিশ্রামের আয়োজন করিলেন। চরিবার জন্য অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। কুন্ডে নামিয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, প্রথমে নামাজ পড়িলেন। অবশেষে পেটিকা হইতে খাদ্য বাহির কবিয়া কিছু ভোজন করিয়া জিনপোষ পাতিয়া বৃক্ষতলে শয়ন কবিলেন।

কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইয়াছে। এমন সময তাঁহার অশ্ব মহাভয়ে শব্দ করিতে করিতে তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া দন্ডায়মান হইল। রাজকুমার জাগিযা উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইলেন, এক বৃহৎ অজগর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত একটি মহাবৃক্ষের নিকট যাইতেছে। তাহার দেহভারে পথস্থিত প্রস্তরখন্ডসকল চূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া যাইতেছে। সর্পকে দেখিবামাত্র রাজকুমার ইসাক্ পয়গম্বরের ধনু লইয়া সর্পকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর চালাইলেন। তীরের আঘাতে সর্প অতি বিকট শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং যাতনায় ভূমিতে পুচ্ছ আছড়াইতে লাগিল। বিষের উত্তাপে নিকটস্থ বৃক্ষসকল জ্বলিয়া উঠিল। রাজকুমারের শরীর সে উত্তাপে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় একটি তীর লইয়া সর্পের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। সর্প তখন ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

বাদশাজাদা সেই সময় দেখিলেন, যে বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া সর্প যাইতেছিল, সেই বৃক্ষে একটি পক্ষীর বাসা রহিয়াছে। পক্ষীশাবকগণ মুখ বাহির করিয়া সর্পের সহিত রাজকুমারের যুদ্ধ দেখিতেছিল। রাজকুমার ভাবিলেন ইহারাই বোধ হয় সী-মোরগ পক্ষীর শাবক হইবে। এই ভাবিয়া সর্পদেহ খন্ড খন্ড করিয়া কাটিয়া, সেই মাংস পক্ষী শাবকদিগকে খাইতে দিলেন। শাবকগণ মাংস আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিদ্রা গেল। এদিকে রাজকুমারও কুণ্ডে নামিয়া নিজ দেহ হইতে সর্পরক্ত ধৌত করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, জিনপোষ বিছাইয়া শয়ন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে আকাশ যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। সূর্য্য ঢাকিয়া গেল। সন্‌সন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সী-মোরগ ও সী-মুরগী চরিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

সী-মোরগ বৃক্ষের নিকট আসিয়া বলিল—"আমরা যখন ফিরিয়া আসি, তখন প্রত্যহ আমাদের শাবকগণ ক্ষুধায় কলকল করিতে থাকে, আজ তাহারা কোথায়?" এই কথা

বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল, কুণ্ডের তীরে রাজকুমার নিশিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সী-মোরগ নিজ পত্নীকে বলিল—"নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আমাদের শাবককে হত্যা করিয়াছে। মাঝে মাঝে আমাদের শাবককে কে আসিয়া খাইয়া ফেলে, এতদিন সন্ধান পাই নাই। আজ বুঝিলাম এই ব্যক্তিরই কার্য্য।" এই বলিয়া ক্রোধে সী-মোরগ একখণ্ড তিনশত মণ ওজনেব পাথর পর্ব্বত হইতে খসাইয়া মুখে করিয়া নিদ্রিত রাজকুমারের উপর ফেলিতে চাহিল।

ইহা দেখিয়া সী-মুরগী বলিল—"আগে নিজেব বাসা অন্বেষণ কবিয়া দেখ শাবক আছে কি নাই। যদি শাবক থাকে তবে নিবপরাধ ব্যক্তির হত্যাজনিত পাপ কেন মাথায় লইবে?

তাহারা বাসায় গিয়া দেখিল—শাবকগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পিতামাতার আগমনে তাহারা জাগিয়া উঠিল। বলিল—"বাবা, মা ঐ যে কুণ্ডতীরে মনুষ্যটি শুইয়া আছেন, উনিই আজ আমাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, এক অজগর সর্প আমাদিগকে খাইতে আসিতেছিল, উনিই তাহাকে বধ করিয়া, তাহাব মাংস কাটিযা আমাদিগকে খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তাহাই পেট ভরিয়া খাইয়া আমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম।"

ইহা শুনিয়া সী-মোরগ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রাজকুমারকে জাগাইয়া তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয আপনি কে? আর কি জন্যই বা এ দুর্গম প্রদেশে আগমন করিয়াছেন?" রাজকুমার তখন নিজের আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই সী-মোরগকে অবগত করাইলেন।

সী-মোরগ বলিল—"আপনি বাকাফ সহরে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে সমুদ্র সমান সাতটি নদী পার হইতে হইবে। সে নদী পার হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আপনি কেমন করিয়া পার হইবেন?"

রাজকুমার বিনয় করিযা সী-মোরগকে কহিলেন—"আপনি যদি দযা কবেন তবেই পার হইতে পারি।"

সী-মোবগ বলিল—"আপনি আজ আমাব শাবকগণের প্রাণবক্ষা কবিয়া আমার যেরূপ মহদুপকার করিযাছেন, তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব এবং অবশ্যই আপনাব সহাযতা করিব। আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি আমার পাখায় আবোহণ করিবেন, আমি সাতটি নদী পার করিয়া আপনাকে বাকাফ সহরে পৌঁছিয়া দিব।"

শুনিয়া রাজকুমার সী-মোরগকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সী-মোরগ কহিল—"এক কাজ করুন। পথে খাইবার জন্য আহার ও পানীয় সংগ্রহ কবিয়া লউন। এখানে অনেক বন্য গর্দ্দভ চরিতে আসে। সাত দিনের খোরাপ স্বরূপ সাতটি বন্য গর্দ্দভ মারিয়া তাহাদের মাংসে কাবাব প্রস্তুত করিয়া লউন। তাহাদের ছালে মশক নির্ম্মাণ করিযা সাত মশক জল ভরিয়া লউন। আমি একদিন সমস্ত দিন উড়িয়া এক একটি নদী পাব হইব। তখন ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। তখন আমাকে এই মাংস খাইতে দিবেন এবং এই জল পান করাইবেন। আপনিও আবশ্যক মত পানাহার করিবেন।"

পরদিন রাজকুমার সাতটি বন্য গর্দ্দভ মারিয়া কাবাব প্রস্তুত করিলেন এবং ছালের মশকে জল ভরিয়া লইলেন।

তৎপরদিন প্রভাতে সী-মোরগ একদিকের পক্ষে রাজকুমারকে বসাইয়া অন্যদিকের পক্ষে কাবাব ও জল লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল।

এইরূপ সাতদিনে একটি করিয়া সাতটি নদী পার হইয়া, সী-মোরগ রাজকুমাবকে লইয়া বাকাফ নগরে উপনীত হইল।

তখন সী-মোরগ বলিল—"এই বাকাফ নগর। এখানে খুব সাবধানে থাকিবে। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা আমি এ জীবনে ভুলিব না। এই আমার কয়েকটি পালক তোমায় দিতেছি, সাবধানে রাখিয়া দাও। যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও,

একটি পালক জ্বালাইও তাহা হইলেই আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া, নিজের কয়েকটি পালক রাজকুমারকে দিয়া সী-মোরগ বিদায় গ্রহণ করিল।

সী-মোরগ প্রস্থান করিলে পর বাদশাজাদা আলমাশ বাকাফ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারাদিন পথে পথে বেড়াইয়া নগরের শোভা দর্শন করিলেন। সন্ধ্যাকালে একজন নগরবাসীর সহিত আলাপ পরিচয় হইল। তাহার নাম ফরুখপাল। রাজকুমারের সুন্দর মূর্ত্তি ও বিনয়পূর্ণ কথাবার্ত্তায় ফরুখপাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে অবস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ করিল। রাজকুমার আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইয়া ফরুখপালের গৃহে গিয়া তাহার সহিত বসবাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজকুমারের সহিত ফরুখপালের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। একদিন দুইজনে একত্র বসিয়া মদ্যপান করিতেছিলেন—এমন সময় ফরুখপাল বলিল—"বন্ধু তুমি এদেশে কি কামনা করিয়া আসিয়াছ তাহা ত আজিও বলিলে না।" রাজকুমার কহিলেন—"বলিলে তুমি কি তাহার সুসার করিতে পারিবে?" ফরুখপাল বলিল—"অবশ্যই চেষ্টা করিব। যদি আমার সাধ্য হয়, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। ইহা ত বন্ধুত্বের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

রাজকুমার আশান্বিত হইয়া বলিলেন—"একটি প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য আমি এত বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এদেশে আসিয়াছি।"

ফরুখপাল বলিল—"সে প্রশ্নটি কি?"

রাজকুমার বলিলেন—"গুল বা সনোবর চে কর্দ্দ?"

প্রশ্ন শুনিবামাত্র ফরুখপালের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া গেল। সে সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"দুর্ব্বৃত্ত, তুই যদি আমার বন্ধু না হইতিস তবে এখনি তোর শিরোচ্ছেদ করিতাম"

এই কথা শুনিয়া রাজকুমার অতিশয় ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে দিন চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদিন মাদকতা অপসৃত হইলে ফরুখপাল বলিল—"বন্ধু, গতকল্য হঠাৎ ক্রোধ হওয়ায় তোমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়ছি। আসল কথা এই যে তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুই অবগত নহি। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে সানোবর আমাদের বাদশাহের নাম এবং গুল তাঁহার বেগমের নাম। বাদশাহ এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোনও বিদেশী আসিয়া গুলের নাম এবং আমার দশার কথা জিজ্ঞাসা করে, আমার প্রজারা তৎক্ষণাৎ তাহার শিরচ্ছেদন করিবে। তুমি যদি এ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহ, তবে আমার পরামর্শ বাদশাহের নিকট চাকরি গ্রহণ কর, ক্রমে সুযোগ মত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিও।"

রাজকুমার বলিলেন—"ভাই, বাদশাহের নিকট কেমন করিযা চাকরিতে ভর্ত্তি হইবে?"

ফরুখপাল বলিল—"আমি সে বন্দোবস্ত করিযা দিতে পারি। রাজবাড়ীতে আমার কিঞ্চিৎ আধিপত্য আছে।"

পরদিন বাদশাহের নিকট রাজকুমারকে লইযা গিয়া ফরুখপাল বলিল—"জাঁহাপনা, এই এক ব্যক্তি আপনার গুণগ্রাম ও দয়াশীলতা শ্রবণ করিয়া, আপনার খেদমৎ করিবার অভিলাষী হইয়া অনেক দূর হইতে আগমন করিয়াছে।"

সনোবর শাহ রাজকুমারের রূপ কান্তি দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে চাকরিতে বহাল করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার উপর অধিকতর প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজ সভাসদ করিয়া মিত্রস্থানীয় করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়। রাজকুমারের প্রতি বাদশাহের মিত্রতা ক্রমে প্রগাঢ় হইতে লাগিল। একদিন সভামধ্যে তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু, তোমার

ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। যদি তোমার কোনও মনস্কামনা থাকে নিবেদন কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।"

একথা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন—"প্রভু, যদি নির্জ্জনে পাইতাম তবে মনস্কামনা নিবেদন করিতাম।"

ইহা শুনিবামাত্র বাদশাহ সভাভঙ্গ করিয়া রাজকুমারকে লইয়া বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বসিয়া বলিলেন—"কি তোমার মনস্কামনা?"

রাজকুমার বলিলেন—"যদি প্রাণ দান দেন ত বলি।"

বাদশাহ বলিলেন—"আচ্ছা প্রাণদান দিতে স্বীকৃত হইলাম।"

রাজকুমার তখন বলিলেন—"গুল বা সানোবর চে কর্দ্দ?"

ইহা শুনিবামাত্র বাদশাহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন। বলিলেন—"রে দুর্ব্বৃত্তনরাধম, কি বলিব তোকে প্রাণদান দিয়াছি, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই তোর মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত করিতাম।"

রাজকুমার কহিলেন—"প্রভু আমাকে শুধু প্রাণদান দিবার প্রতিজ্ঞা কবেন নাই। আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত আছেন। এখন দুনিয়ার বাদশাহ যদি কথা ঠিক না রাখেন, তবে সংসারে কে আর কাহাকে বিশ্বাস করিবে?"

একথা শুনিয়া বাদশাহ মৌন হইয়া রহিলেন। আরও কিছু দিবস অতীত হইল। একদিন বাদশাহ পানোৎসবে বত হইলেন, রাজকুমারও সঙ্গে ছিলেন। যখন বাদশাহ পান করিযা মত্ততার অবস্থায় উপনীত হইলেন। তখন রাজপুত্র একটি বীণা লইযা তাহার ঝঙ্কারসহ কণ্ঠ মিলাইয়া অপূর্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই বীণাবাদন ও গীত শুনিয়া বাদশাহ অত্যন্ত মোহিত হইয়া গেলেন এবং রাজকুমাবকে বলিলেন—"অদ্য তুমি আমায যে গীত শুনাইলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি কি বখশিস্ চাও বল, আমি তাহাই দিব।"

রাজকুমার তখন বলিলেন—"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ, আমার সেই প্রশ্নটি ছাড়া আব কিছু অভিলাষ নাই।" বাদশাহ তখন মত্ততার অবস্থায় বলিলেন—"যদি স্বীকাব কব যে, সে প্রশ্নেব উত্তর শুনিলে পর, তোমার মাথা আমি কাটিযা লইব, তবে বলিতে পারি।"

রাজকুমার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"প্রভু যদি আমার কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ করিতে পারেন, কোনও বিষযে ক্রটি না থাকে, তবে মাথা দিতে আমার আপত্তি নাই।"

বাদশাহ তখন বলিলেন—"আচ্ছা, তবে অন্তঃপুরে চল। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে বলিয়া, তোমার মাথাটি কাটিয়া লইব।" এই বলিয়া বাজকুমারকে লইয়া বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বাদশাহ হুকুম দিলেন—"কুকুরকে লইয়া আইস।" কয়েকজন ভৃত্য তখন একটি কুকুরকে আনিল। তাহার রত্নজড়িত গলাবন্ধ, সোনাব শিকলে বাঁধা ছিল। ভৃত্যগণ তাহাকে আনিয়া মখমলের গদীতে বসাইয়া দিল। কয়েকজন বাঁদী তখন একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোককে আনিল। তাহার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী। কোমরে লোহার শিকল। একটি থালায় একজন হাবসীর কাটামুন্ড রাখা হইয়াছে। কয়েকটি পাত্র পূর্ণ কবিয়া নানাবিধ সুরস খাদ্য এবং একটি পেয়ালায গোলাপের সরবৎ আসিয়া কুকুরের সম্মুখে বাখিযা দেওয়া হইল। স্ত্রীলোকও ক্ষুধায় যাতনায় সেই উচ্ছিষ্ট কিয়দংশ ভক্ষণ করিল। তখন বাদশাহ উঠিয়া, একটি লাঠি লইয়া, সেই কাটা মুণ্ডের উপর সজোরে এক আঘাত করিলেন। আঘাতের চোটে সেই মুন্ড হইতে কয়েক বিন্দু রক্ত বাহির হইল। রক্ষীগণ বলপূর্ব্বক সেই রক্ত স্ত্রীলোকটিকে চটাইয়া দিল অতঃপর কুকুর, কাটামুণ্ড ও সেই স্ত্রীলোককে সেখান হইতে লইয়া যাওয়া হইল।

রাজকুমার এসমস্ত ব্যাপার অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিল। উহারা চলিয়া গেলে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"শাহানশাহ—এ কি দেখিলাম? জীবশ্রেষ্ঠ যে মনুষ্য, তাহাকে কেন কুকুরের উচ্ছিষ্ট খাইতে বাধ্য করিলেন?"

বাদশাহ বলিলেন—"যুবক, যে স্ত্রীলোক দেখিলে, উহারই নাম গুল। আমারই নাম সনোবর। আমাদের কাহিনী অতি হৃদয়বিদারক। তুমি কি না শুনিয়া নিবৃত্ত হইবে না?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন—"না প্রভু, না শুনিলে আমার মন শান্ত হইবে না?"

তখন বাদশাহ নিজ কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হে যুবক, আমি একদিন শিকার করতে গিয়াছিলাম। একাকী এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ শিকার করিয়া, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। জল অন্বেষণ করিতে করিতে গভীর জঙ্গল মধ্যে এক কূপ দেখিতে পাইলাম। কোথায় ডোল কোথায় দড়ি পাইব? ইজারাবন্দকে দড়ি করিয়া, টুপীতে বাঁধিয়া জল তুলিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কূপের মধ্যে গিয়া টুপি আটকাইয়া গেল, টানাটানি করি তথাপি উঠে না। তখন মনে করিলাম, কূপের মধ্যে কোনও ভূতযোনি আছে, সেই টুপি আটকাইয়াছে। তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম—"এ কূপের মধ্যে কোন্ মহাত্মন আছে? আমি তৃষ্ণাতুর পথিক, টুপী ছাড়িয়া দাও।"

তখন কূপের মধ্য হইতে শব্দ হইল—"হে ঈশ্বরভক্ত, আমরা বহু বর্ষ হইতে এই কূপের মধ্যে পড়িয়া আছি। আমাদের উত্তোলন করিয়া প্রাণদান কর।"

আশ্চর্য্য হইয়া, অত্যন্ত বল সহকারে দড়ি টানিয়া তুলিলাম, দেখিলাম দুইজন বৃদ্ধা অন্ধ স্ত্রীলোক। উহাদের শরীর শুকাইয়া ধনুকের মত হইয়া গিয়াছে। হাত পা শুকাইয়া কাঠির মত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। দাঁত সমস্ত পড়িয়া গিয়াছে।

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা এ কূপে কেমন করিয়া পড়িয়াছিলে?"

স্ত্রীলোকগণ কহিল—"হে পথিক, এদেশের বাদশাহ রাগ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিয়া এই কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এক ঔষধ বলিতেছি, তাহা আনিয়া আমাদের চক্ষে দাও, তাহা হইলে আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইব এবং তোমার পরম উপকার করিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ঔষধ?"

তাহারা বলিল—"এখান হইতে অল্প দূরে একটি নদী আছে। তাহার তীরে নদী হইতে উঠিয়া একটি গোরু চরিতে আসে। গোরু আসিলে তুমি লুকাইয়া থাকিও, কারণ তোমায় দেখিলে মারিয়া ফেলিবে। সেই গোরু চলিয়া গেলে তাহার গোবর কিঞ্চিৎ আনিয়া আমাদের চক্ষে প্রলেপ দাও।"

তাহা শুনিয়া আমি নদীতীরে গিয়া এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে জল হইতে একখানি প্রকাণ্ড গোরু বাহির হইয়া আসিল। তাহার গাত্র রূপার মত শুভ্র। তাহার শৃঙ্গ শাণিত ইস্পাতের ন্যায় চাকচিক্যশালী, গোরু কিয়ৎক্ষণ চরিয়া আবার জলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তখন নামিয়া কিঞ্চিৎ গোবর উঠাইয়া লইলাম। কূপের নিকট আসিয়া সেই বৃদ্ধাদের চক্ষে অল্প গোবর প্রলেপ দিবামাত্র তাহারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল এবং আমাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তখন বৃদ্ধাগণ কহিল—"হে বিদেশী ইহা পরীদিগের রাজ্য। এখানকার বাদশাহের এক পরম রূপবতী কন্যা আছে। তাহার মুখ চন্দ্রের অপেক্ষা দৃষ্টিসুখকর। তাহার চক্ষু দেখিলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়। তাহার ওষ্ঠ কুন্দের মত লাল, তাহার একটি চুম্বনে সহস্র দুঃখের শান্তি হয়। তাহার পিতামাতা তাহাকে অত্যন্ত আদর করেন, সেই জন্য অদ্যবধি বিবাহ দেন নাই, আমি তোমাকে কন্যার নিকট লইয়া যাইব। সমস্ত দিন সে কন্যা একাকী থাকে। তুমি পরমানন্দে তাহার সহিত মিলন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে। ঈশ্বর না করুন

তাহার পিতামাতা যদি তোমার মিলনবার্ত্তা অবগত হয়, তবে তোমাকে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তুমি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না। অগ্নিকুণ্ডের নিকট যখন ভৃত্যেরা তোমাকে লইয়া যাইবে তখন বলিও—"আমাকে একটু তেল মাখিতে দাও যাহাতে সহজেই পুড়িয়া মরিতে পারি।" তাহারা সম্মত হইবে। তখন তুমি ফুকারিয়া বলিও—"কেহ আমাকে একটু তেল মাখাইয়া দিতে পার? আমরা তখন আসিয়া তোমার অঙ্গে এমন তেল লেপন করিব যে, অগ্নি তোমার পক্ষে সুশীতল অনুভূত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া, সেই পরীকন্যার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। তাহারা আমাকে লইয়া পরীর বাদশাহের মহলে লইয়া গেল। সেখানে সেই কন্যা ছাড়া আর কেহই ছিল না। সকলেই দূর বনে চরিতে গিয়াছিল।

সেই পরীকন্যাকে দেখিবামাত্র আমি প্রণয়তৃষ্ণায় পীড়িত হইতে লাগিলাম। সে একটি বত্নপালঙ্কে নিদ্রিত ছিল। সেই পালঙ্কে মখমলের বালিস ছিল, রেশমের মশারী লাগানো ছিল। মশারী এত সূক্ষ্ম সুতায় নির্ম্মিত ছিল যে, তাহার মুখকমল স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। আমি সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের শোভা অবাক হইয়া ক্ষণকাল দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে তবে ইহাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালা জাগরিত হইল। আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল। কেশবেশ সুসম্বৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে?

আমি কহিলাম—"প্রাণেশ্বরি, আমি তোমার প্রণয়প্রার্থী। আমি তাহাকে দেখিয়া যেরূপ প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলাম, বোধ হয় আমাকে দেখিয়া সেও তদ্রূপ হইল। আমি তখন সাহস করিয়া মশারী তুলিয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলাম। তাহার সহিত উচ্ছ্বসিত স্বরে সুমধুর প্রেমালাপ করিতে লাগিলাম। সে ষোড়শী সুকুমারীও আমার প্রেমালাপে প্রীতি অনুভব করিল এবং আমাকে প্রণয়জড়িত স্বরে নানা মধুর বাক্য বলিতে লাগিল।

দিবা যখন শেষ হইল, সেই তরুণী তখন আমাকে একটি সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া লুকাইয়া রাখিল। পরদিন প্রভাতে তাহার পিতামাতা চরিতে গেলে, আবার আমায় বাহির করিল। আমরা সারাদিন প্রেমসুখে অতিবাহিত করিলাম। প্রতিদিন এইরূপ হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমি রাজ্য ভুলিয়া সেই সুখময়ীর প্রেমে মগ্ন রহিলাম।

একদিন দৈবাৎ দিবাভাগে পরী বাদশাহ আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। পরী-বাদশাহর বেগম কন্যাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। পরী বাদশাহ ক্রোধান্ধ হইয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন—'ইহাঁকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ কর।"

ভৃত্যগণ আমাকে বাঁধিয়া লইয়া পোড়াইতে চলিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। আমি তখন বলিলাম—"তোমরা দয়া করিয়া আমায় একটু তেল মাখিতে দাও, যাহাতে সহজে পুড়িয়া মরিতে পারি।" তাহারা সম্মত হইল। তখন উচ্চৈস্বরে বলিলাম—"এমন কেহ আছ আমাকে একটু তেল মাখাইয়া দিতে পার?" তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধদ্বয় আসিয়া আমার সঙ্গে যাদুপূর্ণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। ইহার পর ভৃত্যগণ আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। একদিন একরাত্রি জ্বলিবার মত ইন্ধন তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল। অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। আমি তৈলের প্রভাবে সুস্থ শরীরে তাহার মধ্যে বসিয়া রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে, আমি পুড়িয়াছি কি না দেখিবার জন্য পরী বাদশাহ ও তাঁহার বেগম আগমন করিলেন। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে সসম্মানে সেলাম করিলাম, আমাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহারা পরম বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, তুমি জীবিত আছ?" পরী বেগম কহিলেন—"নিশ্চয়ই ও কোনও দেবযোনিসম্ভূত হইবে। মনুষ্য নহে।" তাঁহারা আমাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। পরী বেগম বাদশাহকে কহিলেন—"এ মরে নাই ভালই হইয়াছে। কল্য হইতে আমার কন্যা কাঁদিয়া মরণাপন্ন হইয়াছে। চল ইহাকে লইয়া গিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিই।"

মহাসমারোহে পরী-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। কয়েক দিবস শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেই পরীকন্যারই নাম গুল। হে বিদেশী, সেই কন্যাকেই তুমি আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়াছ। তাহার কারণ ক্রমে বলিতেছি।

দেশে ফিরিয়া গুলবেগমের সহিত প্রণয়সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। একদিন ভোরের সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গুলবেগমেব হাত পা বরফের মত শীতল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছিল, হাত পায়ে জল দেওয়াতেই অমন শীতল হইয়া গিয়াছে। আমি তখন উহার কথা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম, কয়েকদিন পরে পুনরায় জাগিয়া ঐ প্রকার দেখিলাম এবং বেগম ঐ উত্তরই দিল। তখন আমার সন্দেহ হইল যে বোধ হয় রাত্রে কোথাও যায়, তাই শীতে হাত পা শীতল হয়। এ কথা আমি মনে মনেই রাখিলাম, প্রকাশ করিলাম না।

একদিন অশ্বশালায় গিয়া দেখি আমার উৎকৃষ্টতম অশ্বটি জীর্ণ শীর্ণকলেবর হইয়া রহিয়াছে। রক্ষকগণকে গালিমন্দ দিতে লাগিলাম, বলিলাম—"তোরা নিশ্চয়ই দানা চুরি করিস। নহিলে আমার এমন মোটা তাজা ঘোড়া এমন হইয়া গেল কেন?" তখন প্রধান অশ্বরক্ষক বলিল—"জাঁহাপনা, যদি প্রাণদান পাই তবে ইহার কারণ খুলিয়া বলি।" আমি প্রাণদান দিলাম। সে তখন বলিল—"পৃথিবীপালক, প্রত্যহ রাত্রে বেগম সাহেবা এই অশ্বকে খুলিয়া কোথায় লইয়া যান এবং ভোর বেলায় ফিরাইয়া আনেন। অত্যধিক পরিশ্রমে ঘোড়া এমন দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া আমি মৌন হইয়া রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে পরীক্ষা করিবার জন্য কপট নিদ্রাগ্রস্ত হইয়া জাগিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, বেগম আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া উঠিল। পার্শ্বদেশে শিঙ্গার কামরায় গিয়া দাঁতে মিশি, চোখে সুরমা, গণ্ডস্থলে গোলাপী রঙ প্রভৃতি দিয়া বহুমূল্য পেশোয়াজ পরিয়া, নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, অশ্বশালার দিকে গমন করিল। আমার সেই বেগবান উৎকৃষ্ট অশ্বটি খুলিয়া লইয়া, তাহাতে আরোহণ করিয়া বাহির হইল। আমি অন্য একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া গোপনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। আমার প্রিয় কুকুরটিও ঘোড়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে গুলবেগম নগর ছাড়াইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। সেখানে একজন হাবসী, কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সাধারণ হাবসীগণের মতই তাহার গাত্রবর্ণ মসীতুল্য ছিল, তাহার মুখাবয়ব অতি কদাকার ছিল। হাবসী কুটীরেব বাহিরে দণ্ডায়মান ছিল। গুলবেগম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকট গেল। তাহাকে দেখিবামাত্র সেই হাবসী নিজের পা হইতে জুতা খুলিয়া বেগমকে পটাপট মারিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—"হারামজাদী! আজ এত দেরী করিয়া আসিলি কেন?" যে বেগমকে আমি কখনও ফুল ছুঁড়িয়াও মারি নাই, সেই সুকুমারীকে এইরূপ ভাবে প্রহৃত হইতে দেখিয়া ভাবিলাম বোধ হয় মরিয়া যাইবে। কিন্তু অভাগিনী মরিল না। সেই হাবসীব চরণ চুম্বন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"কি করিব, আমার স্বামী আজ দেরী করিয়া নিদ্রা গিয়াছে তাই আসিতে একটু বিলম্ব হইল। আমার কোনও অপবাধ নাই, প্রাণেশ্বর আমাকে মার্জ্জনা কর।"

তখন হাবসী বলিল—"আমি তোকে কতদিন বলিয়াছি তোর স্বামীটাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেল্। তাহা ত তুই শুনিবি না। সে হতভাগা বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের সুখ নাই।" এই বলিয়া বেগমকে আরও প্রহার করিতে লাগিল।

বেগম তখন বলিল—"নাথ, ক্ষমা কর। আমি কল্যই আমার স্বামীকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিব। তুমি তখন নিষ্কন্টকে রাজ্য ও আমাকে অধিকার করিবে।"

ইহা শুনিয়া হাবসী ক্ষান্ত হইল এবং তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া কুটীরে লইয়া গেল। আমিও দূর হইতে দাঁড়াইয়া কুটীরের ভিতর দেখিতে লাগিলাম। আমি আর থাকিতে না পারিয়া, সিংহনাদ করিয়া, তরবারি হস্তে হাবসীকে আক্রমণ করিলাম।

হাবসীও চীৎকার করিয়া, অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহার ভৃত্য চারিজন হাবসী সশস্ত্র হইয়া আগমন করিল। তাহারা পাঁচজন, আমি একজন। তরবারি-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি ক্রমে ক্রমে ভৃত্যগণের মধ্যে তিন হাবসীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলাম। তখন চতুর্থ হাবসী ভৃত্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আমার বেগমের সর্ব্বনাশকারী হাবসীর সঙ্গেই আমার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি রক্তক্ষয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তথাপি হাবসীর হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, দুই হস্তে দুই তরবারির দ্বারায় যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। এতক্ষণ গুলবেগম নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে ইহা দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে আমাকে এমন ধাক্কা মারিল যে আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন হাবসী সুবিধা পাইয়া আমার বুকে চড়িয়া বসিল। বেগম নিজের কোমর হইতে এক ছুরি বাহির করিয়া, আমাকে হত্যা করিবার জন্য হাবসীর হাতে দিল। আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই আমাকে যমালয়ে দর্শন করিতে হইত। এমন সময় আমার প্রভুভক্ত কুকুর এক লম্ফ দিয়া হাবসীব টুটি কামড়াইয়া ধরিল। হাবসীর হাতের ছুরি হাতেই রহিয়া গেল। সে আমার পার্শ্বে ভূমিতে পড়িয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া হাবসীকে ও গুলকে বাঁধিয়া ফেলিলাম, তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাজবাটীতে লইয়া আসিলাম। সেই হাবসীর মাথা কাটিয়া এক থালায় রাখিয়া দিলাম। তুমি থালায় সেই হাবসীর মুণ্ড দেখিয়াছ। আমার কুকুরটিকেও দেখিয়াছ। ঐ কুকুরই আমার জীবনদাতা। তাই উহার এত আদর। আর গুলকে যে দণ্ড দিতেছি, তাহা উহার মহাপাপের তুলনায় লঘুদণ্ড বলিতে হইবে। আর যে হাবসী ভৃত্য পলাইয়া গিয়াছিল, সে কৈমুশ শাহ বাদশাহের দেশে লুকাইয়া আছে। ইহাই আমার জীবনের হৃদয়বিদারক ইতিহাস।

নবম পরিচ্ছেদ

সনোবর শাহ এই বৃত্তান্ত শেষ করিয়া রাজকুমারকে বলিলেন—"হে বিদেশি, এখন তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর অবগত হইলে, এখন নিজের প্রতিজ্ঞা পালন কর। আমি তোমার মস্তকটি কাটিয়া লইব।"

রাজকুমার বলিলেন—"দেখিতেছি আমাকে বধ করিবার জন্য আপনার সম্পূর্ণ ইচ্ছা; আমিও তাহাতে পশ্চাৎপদ নহি। কেবল এক বিষয়ে মীমাংসা এখনও অবগত হই নাই। আপনার সঙ্গে কথা ছিল, আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভঞ্জন করিয়া আমার মাথা কাটিয়া লইবেন। অতএব হে দেশাধিপতি, সেই চতুর্থ হাবসী ভৃত্য এত লোক থাকিতে মেহেরঙ্গেজের সিংহাসন তলেই বা লুক্কাইত হইল কেন এবং মেহেরঙ্গেজই বা কি কারণে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে? আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমার মস্তক কর্ত্তন করুন।"

সনোবর শাহ অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং রাজকুমারের সম্পূর্ণ সংশয় দূর করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার মস্তক কর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন।

রাজকুমার আর কিছুদিন সনোবর শাহের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া একদিন দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সনোবর শাহ তাঁহাকে বহু রত্ন-মানিক্যাদি উপহার দিয়া দুঃখিত মনে বিদায় দিলেন।

রাজকুমার তখন বাজার হইতে সাত দিনের আহারোপযোগী মাংসের কাবাব ক্রয় করিয়া, সাতটি মশক জলে পূর্ণ করিলেন। তাহার পর সী-মোরগের একটি পালক আগুনে জ্বালিয়া দগ্ধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সী-মোরগ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমার খাদ্যাদিসহ তাহার পক্ষে আরোহণ করিয়া একে একে সাতটি নদী পার হইলেন।

সী-মোরগ এবং সী-মুর্গী বিবিধ প্রকারে রাজকুমারের আতিথ্য গ্রহণ করিল। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে হাবসীর দুর্গে পৌঁছিয়া, হাবসী কন্যাকে বিবাহপূর্ব্বক বহুরত্নসহ গৃহযাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পথ পর্য্যটনের পর ব্যাঘ্ররাজের দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে পূর্ব্বমত ব্যাঘ্ররাজের সেবা করিলেন এবং ব্যাঘ্ররাজা নিজ সৈন্য সঙ্গে দিয়া মহাবন তাঁহাকে পার করাইয়া দিল।

আরও কয়েক দিবস পরে জমিলাবানুর দেশে পৌঁছিলেন। সেখানে প্রতিশ্রুতি মত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিন বহুসুখে অতিবাহিত করিয়া, জমিলাবানুকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে রাজকুমার লতিফাবানুর দেশে পৌঁছিলেন। তাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া জমিলাবানু একে একে সমস্ত হরিণকে ইন্দ্রজালমুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা নানা দেশ বিদেশের বাদশাজাদা। জমিলাবানু ও অলমাশকে বহু ধন্যবাদ দিতে লাগিল। অলমাশ তখন সেই যুবকগণকে আজ্ঞা দিলেন—"যাও লতিফাবানুকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।" তাহারা অবিলম্বে লতিফাবানুকে বাঁধিয়া রাজকুমারের পদতলে নিক্ষিপ্ত করিল। রাজকুমার বলিলেন, "ইহার মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কুকুরকে খাওয়াইলে তবে ইহার উপযুক্ত দন্ড হয়।" কিন্তু জমিলাবানু লতিফাবানুর ভগ্নী ছিল। ভগ্নীর প্রাণরক্ষার্থ জমিলাবানু রাজকুমারকে অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার বলিলেন—"আচ্ছা এ যদি পবিত্র মোহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং শপথপূর্ব্বক ইন্দ্রজাল চর্চ্চা পরিত্যাগ করে, তবে ইহাকে ক্ষমা করিতে পারি।"

লতিফাবানু প্রাণভয়ে স্বীকৃত হইল। রাজকুমার তখন তাহাকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং শপথ করাইয়া লইলেন যে, আর কখনও ইন্দ্রজাল চর্চ্চা করিবে না। অতঃপর তাহাকে ক্ষমা করিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। নানা দেশের রাজপুত্রগণও আনন্দিত মনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পথভ্রমণে এক মাস কাটিলে পর বাদশাজাদা পুনর্ব্বার রূমদেশে পৌঁছিলেন। কৈমুশ শাহের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মহাবলে রাজ দ্বারের ডঙ্কা বাজাইয়া দিলেন।

ডঙ্কা বাজিবামাত্র কয়েকজন রাজভৃত্য তাহাকে কৈমুশ শাহের নিকট লইয়া গেল। বাদশাহ বলিলেন—"হে যুবক, তোমার কি মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে? কত হাজার রাজপুত্র আসিয়া প্রশ্নোত্তর দানে অসমর্থ হইয়া প্রাণ দিয়াছে তাহা কি তুমি জান না? তোমার নিকট তোমার প্রাণের মূল্য কি কিছুই নাই?"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"পৃথিবীপতি আমি বহু কষ্টে এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আমাকে বাদশাজাদী সমীপে পাঠাইতে আজ্ঞা করুন।"

বাদশাহ তখন রাজকুমারকে মেহেরঙ্গেজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাজকুমার মেহেরঙ্গেজের মহালে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল্লাদও আসিয়া দন্ডায়মান হইল। জল্লাদ এক টুকরা ইষ্টক লইয়া তরবারীতে শান দিতে লাগিল।

রাজকুমার মেহেরঙ্গেজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"বাদশাজাদী, তোমার প্রশ্ন কি?

বাদশাজাদী কহিলেন—"গুল বা সনোবর চে কর্দ্দ?"

ভ্রাতৃহন্ত্রীকে দেখিয়া রাজকুমারের দুই চক্ষু দিয়া ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"গুল্ সনোবরের সঙ্গে যাহা করিয়াছিল তাহার জন্য সে উত্তমরূপ প্রতিফলও পাইয়াছে। আর তোমার কৃত দুষ্কৃতির জন্য তোমাকেও সেইরূপ প্রতিফল পাইতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া মেহেরঙ্গেজের মন ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। তথাপি সে বলিল—"ও কথা বলিলে চলিবে না। যদি তুমি আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে পার তবেই মানিব।"

রাজকুমার বলিলেন—"যদি গুল্ ও সনোবব কাহিনী শুনিবার তোমার এতই ইচ্ছা তবে তোমার পিতাকে পাত্রমিত্র সহ এই খানে আসিয়া সভা করিতে আহ্বান কর, আমি এসে কাহিনী সভাসমক্ষে বলিব।"

মেহেরঙ্গেজ সম্মত হইলেন। রাজকুমারকে বৈকালে আসিতে বলিয়া দিলেন।

বৈকালে রাজকুমার গিয়া দেখিলেন, বাদশাহ পাত্রমিত্র এবং প্রাধান নাগরিকগণ লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছেন। বাদশাজাদি ও বেগমও দুইখানি সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

রাজকুমার তখন বলিলেন—"বাদশাজাদি, যাহার কাছে তুমি এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছ সে মনুষ্যকে সভায় উপস্থিত কর। কারণ আমার কথা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একজন দক্ষ লোক এখানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

রাজকুমারী তখন বলিলেন—"আমি কোনও বিদেশীর নিকট একথা শুনিয়াছিলাম। এখন কোথা হইতে তাহাকে উপস্থিত করিব?"

রাজকুমার কাইলেন—"আচ্ছা, আমিই না হয় একজন দক্ষ লোক এখানে উপস্থিত করিতেছি।" এই বলিয়া বাদশাজাদীর সিংহাসনের নিকট গিয়া পর্দ্দা উঠাইয়া চুলের মুঠি ধরিয়া এক প্রকাণ্ডকায় হাবসীকে টানিয়া বাহির করিলেন।

সভাস্থ লোক ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। বাদশাজাদী লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিল। বাদশাহ ও বেগমও লজ্জায় বাক্‌শক্তিবিহীন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তখনও মেহেরঙ্গেজ আশা ছাড়ে নাই। তখনও বলিতেছে—"বল বল গুল সনোবরের সহিত কি করিয়াছিল?"—বাদশাজাদী ভাবিতেছিল, যদি না বলিতে পারে তবে এখনই ইহাকে কাটিয়া লজ্জা ও অপমানের প্রতিশোধ লইব।

তখন রাজকুমার গুল ও সনোবরের আমূল বৃত্তান্ত সভামধ্যে বর্ণনা করিলেন। প্রত্যেক কথায় হাবসীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কেমন, একথা সত্য কি না?" হাবসী বলিতে লাগিল—"সত্য।"

সভাস্থ সকলে এ আখ্যান শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের বুদ্ধি ও সাহসের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। বাদশাহ বহুসংখ্যক রত্ন-মানিক্য সহ সভাস্থলেই অলমাশকে মেহেরঙ্গেজকে সমর্পণ করিলেন। শুভদিনে বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু রাজকুমার তাহার সহিত বিবাহযোগ্য ব্যবহার করিতে বিরত রহিলেন। কয়েকদিন রূমদেশের রাজধানীতে থাকিয়া, জমিলাবানু এবং মেহেরঙ্গেজ সহ নিজ রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সিংহাসনতলস্থ সেই হাবসীকেও বাঁধিয়া আনিলেন।

তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শামশাদলালপোষ পরমানন্দে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। রাজ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। বাদশাহ এত দান ধ্যান আরম্ভ করিলেন যে, দেশের সমস্ত কাঙ্গাল নেহাল হইয়া গেল। জমিলাবানুকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন মহতী সভা আহুত হইল। তথায় রাজকুমার গৃহত্যাগের দিন হইতে অদ্যাবধি নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। অবশেষে তিনি সেই হাবসীকে ও মেহেরঙ্গেজকে হাত পা বাঁধিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিয়া পিতাকে বলিলেন—"এই হাবসীর চক্রান্তে, এই মেহেরঙ্গেজ আপনার সাত পুত্রকে বধ করিয়াছে। এখন ইহাদের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।"

বাদশাহ তখন হাবসীকে বদ্ধদশায় সভার প্রাঙ্গণে ফেলিয়া, তাহার উপর দিয়া চারিজন অশ্বারোহীকে অশ্ব ছুটাইতে আদেশ করিলেন। একে একে চারি অশ্ব হাবসীর উপর দিয়া ছুটিলে তাহার অঙ্গ খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া গেল এবং সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

মেহেরঙ্গেজ ভাবিতেছিল, আমারও বোধ হয় এই দশা হইবে। ভয়ে সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সভাসদ্‌গণের মন দ্রবীভূত হইল। তাহারা করযোড়ে

বাদশাহের কাছে প্রার্থনা করিল—"এ অতি পাপীয়সী বটে। অনেক নিরপরাধী মনুষ্যকে বধ করিয়াছে। তথাপি এ রাজবংশভূত—বিশেষতঃ স্ত্রীলোক। দয়া করিয়া ইহার প্রতি লঘুদণ্ড বিধান করুন।"

বাদশাহ তখন বলিলেন—"আমার পুত্র যখন উহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তখন ও আমার পুত্রের সম্পত্তি। উহার প্রতি যাহা বিধান হয়, করিতে আমার পুত্রকেই ভার দিলাম।"

বাদশাজাদা মেহেরঙ্গেজের রূপজ্যোতি দেখিয়া সভার প্রার্থনা শুনিয়া, তাহাকে প্রাণে না মারিয়া জমিলাবানুর দাসী করিয়া রাখিলেন।

কয়েক বৎসর পরে শামশাদলালপোষ স্বর্গারোহণ করিলেন। অলমাশ তখন বাদশাহ হইয়া জমিলাবানুর সহিত সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

ভূত না চোর?

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রপিতামহ মহাশয় বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দিল্লী সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই অবধি বংশানুক্রমে আমরা দিল্লীরই অধিবাসী বাঙ্গালী বলিয়া এখনও নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের পরিমাণ উচ্চ-ক্রমেব হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আদিবাস ডুমুরদহ গ্রাম বঙ্গের মানচিত্রে কোন স্থানে অবস্থিত, তাহাও জ্ঞাত নহি। বাস্তবিক, আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলে এতদিন আমি মাতৃভাষার একটি কথাও মনে করিয়া রাখিতে পারিতাম কি না বিশেষ সন্দেহ।

আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল থাকিলেও, পিতা ও পিতামহের দোষে আমি এক প্রকার নিঃস্ব। শুনিয়াছি আমার পিতামহের আমলে আমাদের এই অট্টালিকাখানি এই সুবিস্তৃত দিল্লী সহরের তদানীন্তন কোনও রঙ্গিণীর, চরণবেণুকায় বঞ্চিত হয় নাই। আমার পিতার চরিত্রও নির্দ্দোষ ছিল না;—কিন্তু তাঁহার ক্যাসবাক্সে টাকাও অধিক ছিল না। শেষ দশায় তিনি বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া যান; তাহার মৃত্যুর পরে, আমি স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় কবিয়া বহুকষ্টে বাড়ীখানি উদ্ধার করি। এখন অনেক উমেদারীর পর জজ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।

মহল্লা "মোসাক্ চৌকে" আমাদের বসতি। দিল্লীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের বাড়ীটি সেকেলে ধরনের, চকমিলান প্রকাণ্ড তিনতলা অট্টালিকা—অনেকগুলি ঘর। আমরা স্বামী স্ত্রী দুইটি প্রাণী, দুইটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আমরা অত বড় বাড়ী লইয়া কী করিব? অনেক দিন হইতে মনে করিতেছিলাম, যদি ভাড়াটিয়া পাই, তবে তেতলার উপরের ঘরগুলি ভাড়া দিই। তেতলার ভাল ঘরগুলি এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রে ছাদের মুক্ত বায়ুর মহাসুখ অন্যের জন্যে ছাড়িয়া দিতে যে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বাড়ীর ভিতর দিয়া না যাইয়া, বাহির হইতেও তেতলার উপর পৌছান যায়।

রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের সদর দরজা, তাহার বামদিকেই একটু গলির মত আছে। সেই গলিতে সিঁড়ির যে দরজা আছে, তাহা দিয়া পরে পরে দোতলায় ও তেতলায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির যে দরজা দোতলায় খুলিয়াছে, সেইটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিলেই, আর আমাদের সঙ্গে তেতলার কোনও সম্বন্ধই রহিল না। নীচের তলায় আমার প্রপিতামহ মহাশয়ের "দফতরখানা" ছিল—কর্ম্মচারী লোকজনে সদা পূর্ণ থাকিত; সেই জন্য ছেলেমেয়েদের বাহিরে যাইতে হইলে এই সিঁড়ির দরজার মুখে পাল্কী আসিয়া লাগিত;—অর্থাৎ এইটাই যেন আমাদের খিড়্কী দরজার মত ছিল।

আমি যে উপরতলাটি ভাড়া দিব, তাহা অনেক দিন হইতে অনেক লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইয়াছি। কয়েকটা লোক চাহিয়াও ছিল, কিন্তু কেহই মনের মত হয় নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। হয় অতি অল্প ভাড়া দিতে চায়, নয়ত মুসলমান, নয়ত আর কোনও বাধা থাকে। একদিন রবিবার অপরাহ্নে বৈঠকখানা ঘরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছি, মৌলবী সাহেব তক্তপোষের উপর ছেলেদের লইয়া সুর করিয়া করিয়া "চুয়া হঙ্গে রফ্‌তন্ কুনধজানে পাক্" ইত্যাদি গোলেস্তা পড়িতেছেন, এমন সময় একটি ফিরিঙ্গি সাহেব আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহেব দেখিয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিলাম, নিজে তক্তোপোষে বসিলাম।

সাহেব বলিলেন—"বাবু, আপনার নাম সেরেস্তাদারবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তেতলার মহল ভাড়া দিবেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কত ভাড়া? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম—"আপনি লইবেন? বেশ ত! আগে দেখুন কেমন ঘর দুয়ার। পছন্দ যদি হয়, তাহার পর সে কথা হইবে।"

সাহেব সম্মত হইলেন। আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিঁড়ির খিড়কী-দরজাব চাবি চাহিয়া আনিলাম। সাহেবকে লইয়া উপরে গেলাম। ঘরগুলি, গোসলখানা ইত্যাদি সমস্ত দেখিয়া সাহেব ভারী খুসী হইলেন। শেষে ছাদের উপর যাওয়া গেল। সেখানে একটি ছোট কুঠারি ছিল; সাহেব বলিলেন। এটিই আমার "বাবুর্চিখানা" হইবে।

দেখা শেষ হইলে দুইজনে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। ভাড়ার কথা হইল। সাহেব বলিলেন—"কত চাহেন?" আমি বলিলাম, "কত দিতে পারেন?" সাহেব বলিলেন—"দশ"। আমি শুনিয়া হাসিলাম। মৌলবী সাহেব তাঁহার সেই সুদীর্ঘ দাড়ী দোলাইয়া হা হা হা হা করিয়া সপ্তমে এমন হাসিলেন যে সম্মুখে রাজপথচারী দুই চারিজন লোক ঘরের মধ্যে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। মৌলবী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই—"এমন ইন্দ্রালয় (ফির্‌দোস্ত) ইহার ভাড়া দশ টাকা!" সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবু, আপনি কত চাহেন?" আমি বলিলাম—"পঁচিশ"। সাহেব বলিলেন—"অত হইবে না, পনেরোর বেশী এক পয়সা নহে।" আমি বলিলাম—"সাহেব আপনি বিবেচনা করুন।"

তেতলার উপর, ভেন্টিলেটেড্ ঘর, অমন ছাদ ইত্যাদি। সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমার মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি আমিব লোক; আমি বড় গরীব লোক। আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি অল্প ভাড়ায় দেন ত ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

সাহেবের করুন কাতরোক্তিতে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। হোক না কালো ফিরিঙ্গি সাহেব—হ্যাট্‌কোটধারী ত বটে! ঐ পরিচ্ছদবিশিষ্ট জীবগণের নিকট হইতে গালি ধমকই আমাদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া অনেক দিন হইতে মনে মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে। সুতরাং ও শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মিষ্ট কথা শুনিলেই ভিজিয়া যাইতে হয়—কাতরোক্তিতে আর হইবে না?

আমি বলিলাম—"আচ্ছা সাহেব, আপনি বসুন। দশ মিনিট পরে আসিয়া আপনাকে বলিব।" সাহেব নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অলরাইট বাবু।"

গৃহিণী ত প্রথমে সাহেব শুনিয়া কিছুতেই রাজি হন না। বলিলেন—"সাহেবকে ভাড়া দিব যদি, তবে মুসলমানেরা কি দোষ করিয়াছিল? কে জানে বাপু, তোমার কেমন প্রবৃত্তি!" আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম—সাহেবরা মুসলমান নহে, উহারা অন্য জাতি। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। গৃহিণী বলিলেন—"সেই ত মাংস রাঁধিবে, পেঁয়াজ রাঁধিবে, গন্ধে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে?" আমি বলিলাম—"সেই ভয় নাই; সাহেবের রসুইঘর ছাতের উপর হইবে, এখানে দুর্গন্ধ আসিবে না।"—শুনিয়া গৃহিণী আশ্বস্ত হইলেন এবং মত করিলেন। ভাড়ার কথা তাঁহার কোনও বক্তব্য ছিল না।

অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সেরেস্তাদার স্বামী তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, ইহাই তাঁহার চিরদিন বিশ্বাস। তবে তিনি বলিলেন—"সাহেব যদি ননী আর চারুকে কিছু কিছু ইংরাজী পড়াইতে স্বীকার হন, তবে অল্প ভাড়ায় বা ভাড়া না লইয়া দেওয়া যাইতে পারে।" শুনিয়া আমার মনে হইল, ঠিক ত! "দেখা যাক্" বলিয়া একটা পান মুখে দিয়া নীচে চলিয়া গেলাম।

সাহেবকে বলিলাম—"আপনি যদি আমার ছেলে দুটোকে প্রত্যহ দুই ঘন্টা ইংরাজী পড়াইতে পারেন, তবে আপনার কিছু ভাড়া লাগিবে না।" এ প্রস্তাবে সাহেব পরম আহ্লাদিত হইয়া সম্মত হইলেন এবং আমাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—তাঁহার পত্নী আমার "লেডি"র—(হা হা—শৈলবালা লেডি! ভারি হাসির কথা) "ক্যাপিটার কম্প্যানিয়ন" উত্তম সঙ্গিনী) হইবেন, এবং অনেক প্রকার উল-টুলের কাজ শিখাইয়া দিতে পারিবেন। আমি ভাবিলাম আমার স্ত্রী সেই ম্লেচ্ছনীকে চৌকাঠের এ দিকে পদার্পণ করিতে দিলে ত! সাহেব বলিলে—"বাবু, তবে আমি পরশু বৈকালে জিনিষপত্র ও মেমসাহেবকে লইয়া আসিব। কাল আপনি ঘরগুলো পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন।"—বলিয়া তিনি আমার সহিত শেক্‌হ্যান্ড করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাহেব সপরিবার জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন—"বাবু আমি গাজীপুর হইতে পত্র পাইয়াছি আমার শ্যালক বড় পীড়িত। আমরা আজই রাত্রে সেখানে চলিলাম। জিনিষপত্র সব চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। বোধ হয় দুই সপ্তাহের এদিক ফিরিতে পারিব না।" বলিয়া সাহেব ও মেম খিড়কীর সিঁড়ির দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাবেলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকাল সকালশয়ন করা আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। যখন রাত্রি নয়টা বাজে, তখন আমাদের বাড়ীটি অন্ধকার হয় এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। রাত্রি চারিটা বাজিলেই সকলকার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, ছেলেরা বিছানায় থাকিয়াই "শুক্‌রো সিপাসো মিন্নতো ইজ্জৎ খোদা এরা" করিয়া পারসী শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকে। আমরা স্ত্রী পুরুষে সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। বেশ আলো হইলে তবে সকলে শয্যাত্যাগ করি।

সাহেব যে দিন গাজীপুর গেলেন, তাহার তিন চারিদিন পরে অনেক রাত্রে (বোধ হয় বারোটা হইবে—বারোটাই আমাদের "অনেক রাত্রি") হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধ হইল যেন উপরে দুব্ দুব্ করিয়া কি শব্দ হইতেছে। কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলাম, শব্দ আর শোনা গেল না। একটু তন্দ্রা আসিল। আবার যেন শব্দ হইল। মনে করিলাম, ও কিছু নয়, কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অনেকক্ষণ কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, আর কিছুই শুনিলাম না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রে কাহার মৃদুহস্তস্পর্শে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আর ভয়ের কোনও কারণ রহিল না। শৈলবালা কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ওঠ ওঠ উপরের ঘরে ভূত আসিয়াছে।"

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম—ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে নাকি?"

তিনি বলিলেন—"হাসি রাখ। উপরে ভারি শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি দিয়া কে যেন ওঠা নামা করিতেছিল। আমার গা কেমন করিতেছে।"

আমি সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলাম। ঠিক সেই সময়ে উপরে গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইল। মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ভাবিলাম, ভয় পাওয়া উচিত নহে। আমি ভয় পাইয়াছি দেখিলে এই বাঙ্গালিনীর ত মূর্চ্ছা হইবে। সুতরাং সাহস করিয়া বলিলাম—"বেড়াল-টেড়াল আসিয়াছে বোধ হয়।"

স্ত্রী বলিলেন—"তুমি কি পাগল হইলে? বেড়ালের পায়ের শব্দে কখনও গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হয়?"

আমি বলিলাম—"কুকুর ত হইতে পারে?"

"কুকুর কোথা দিয়া যাইবে?"

"সাহেবের কুকুর বোধ হয় সাহেব ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন।"

"সাহেবের ত কুকুর আসে নাই।"

মনে করিলাম—তাই ত! বলিলাম—"বোধ হয় চোর-টোর।"—গৃহিণী এ কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। খোকা কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাহার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম মনে নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, শৈলবালার চক্ষু রক্তবর্ণ। বলিলেন, সমস্ত রাত্রি ভয়ে তাঁহার ঘুম হয় নাই। আবার নাকি বেশী রাত্রেও শব্দ হইয়াছিল। আমি যে আর একদিন ঐরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলি নাই। এইবার বলিলাম। শুনিয়া তিনি অধিক ভীত হইলেন।

যথা সময়ে ছেলেরা আহার করিয়া স্কুলে গেল। আমি কাছারি গেলাম। মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া রহিল। কাহারও কাছে এ কথা বলিলাম না। সহকর্ম্মীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"অক্ষয়বাবু আজ আপনার অসুখ করেছে নাকি?" একজনকে ঠাকুরদাদা বলি। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"কাল রাত্রে নাতবউ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বুঝি?" ইত্যাদি।

সে দিন একটু সকাল সকাল কাছারি বন্ধ হইল। পরদিন বক্‌রাইদের ছুটি। বাড়ী ফিরিযা আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল। তাহারা খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। আমরা পরামর্শ করিলাম। আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে ব্যাপারটা কি।

সকাল সকাল বালকবালিকাদিগকে খাওয়াইয়া তাহাদিগকে বিছানায় দেওয়া হইল। আমি ভাল আহার করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অমন করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া থাকিলে কি খাওয়া যায়? আর শৈলবালা—তিনি ত নাম মাত্র আসনে বসিলেন। দুইটা বাতি ঠিক করিয়া রাখিলাম। দিয়াশলাই রাখিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—"চল আমরা ওঘরে গিয়া কিছু পড়ি-টড়িগে।" আলোক সম্মুখে রাখিয়া গৃহিণী একখানি বাঙ্গলা বহি লইয়া পড়িতে লাগিল, আমি তামাক খাইতে খাইতে শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মন তখন উদ্‌ভ্রান্ত।

কতক শুনি, আবার গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলি। এই রকম করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। তখন আস্তে আস্তে হট্ হট্ করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। শৈলবালা বলিলেন—"ঐ দেখ।" বলিয়া বহি বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে শব্দ বেশ স্পষ্ট আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম—"আর কিছু নয়, উপরে চোর গিযাছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"চোর হইলে একদিনে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, রোজ রোজ আসিবে কেন? ও ভূত বই আর কিছু নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল। আমি বলিলাম—"একবার কোন্ হ্যায়রে বলিয়া একটা হাঁক দিব?"

"হানি কি?"

আমি তখন উঠিয়া জানালার কাছে গেলাম। মুখ বাহির করিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কোন্ হ্যায় রে?" স্বরটা যেন বড় উচ্চ হইল না। পুনশ্চ সপ্তমে বলিলাম—"কোন্—হ্যায় রে?"

কিন্তু শব্দ বন্ধ হইল না।

শৈলবালা বলিলেন—"ভূত তোমার ভয়ে মরে কাঠ হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ পরে শব্দ বন্ধ হইল। আমি তখন সগর্ব্বে বলিলাম—"দেখ ভূত না চোর। এ চোর তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

গৃহিণী বলিলেন—"হায় হায় সাহেবের সর্ব্বস্বটা চুরি করে নিয়ে গেল গো!"

আমি বলিলাম—"দেখ, সে বেচারি আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষগুলি রাখিয়া গেল। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া চোরকে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দিই, তবে নিতান্ত অধর্ম্ম হয়। আমি উপরে গিয়া চোর ধরি।"

প্রশ্ন হইল—"কেমন করিয়া যাইবে?"

"চোর যেমন করিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির দরজার তালা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে।"

"দুয়ার কি আর খুলিয়া রাখিয়াছে? চোর যদি হয় নিশ্চয়ই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।" আমি বলিলাম—"দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

গৃহিণী বলিলেন—"সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে কি আর তোমাকে ফিরিয়া পাইব? বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ভোজালি হাতে করিয়া যাইব।"

গৃহিণী বলিলেন—"না, সে কখনই হইবে না। চোর নয়—চোর নয়।"

আমি বলিলাম—"যদি চোর না হয়, ভূতই হয়, তবে সিঁড়ির খিড়কী দরজায় সাহেবের তালা যেমন তেমনই থাকিবে। দেখিয়া আসিতে ক্ষতি কি?"

গৃহিণী কহিলেন—"এই রাত্রে! কাল সকালে গেলেই ত হইবে।"

আমি বলিলাম—"যদি চোরই হয়, তবে পুলিশ ডাকিতে পারিব। চাকরবাকরকে জাগাইব। সকালে চোর পলাইলে আর কি হইবে?"

শৈলবালা আমাকে তিন সত্য করাইয়া লইলেন, যদি চোরই হয়, তালা ভাঙ্গিয়াই থাকে, তবে আমি নিজে উপরে যাইব না। শেষে তাঁহার গা ছুঁইয়া শপথ করিতে হইল। যাইবার সময়—"আমার মাথা খাবে, আমার মরা মুখ দেখবে" এই দুইটা দিব্য প্রয়োগ করিয়া দিলেন। আমি লণ্ঠন লইয়া নীচে গেলাম। সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিলাম। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির দরজায় উপস্থিত হইলাম। সাহেবের তালা যেমন তেমনই আছে। তাহাতে মাছিটিও বসিয়া পায়ের দাগ রাখিয়া যায় নাই।

এ পথ ব্যতীত উপরে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। মানুষের ত নাই—ভূতের থাকিতে পারে—কিন্তু ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অনেক ভাবিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। তবে কি মানুষ বেলুনযোগে আমার ছাদে অবতীর্ণ হইল? ইহা ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীতে, অন্ততঃ আমাদের দেশে ত এরূপ বৈজ্ঞানিক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক উপরে গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম—"তালা ত ঠিক আছে।"

তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি ত বলিয়াইছি।"

আবার "কোন্ হ্যায়রে" বলিয়া হাঁক দেওয়ার পর আধ ঘন্টা আন্দাজ অতীত হইয়াছে। আবার শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"রাম রাম করিয়া আজিকার এ কালরাত্রি কাটিয়া যাক্—কালই সকালে তুমি অন্য বাড়ী ভাড়া কর সেইখানে যাই। আমার এ ছেলেপিলের ঘরকন্না, কোথা থেকে হতচ্ছাড়া সাহেবকে আনিয়া জুটাইলে, বাড়ীটা ভূতের বাথান হইয়া দাঁড়াইল।"

আমি ত নীরব। ভূত—(ভূত না বলিয়া আর কি বলিব?) যেন উপরে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর যেন মনে হইল, দুইটা ভূত। একটা এ ঘরের উপর, একটা ও ঘরের উপর। আমার স্ত্রীও ইহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন,—"ঐ দেখ, একটা ছিল, দুটো ভূত হল। সে হতভাগা মিন্‌সে কখনই সাহেব নয়। কোনও যাদুকর সাহেবের বেশ ধরে এসেছে। সেই কালো কালো বাক্সগুলো করে ভূত ভরে এনেছিল, তা কে জানত? মা গো মা, কি সর্ব্বনাশ হল।"—বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি ত মহাবিপদে পড়িলাম। কি বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করি? কি বলিয়া ভয় ভাঙ্গিয়া দিই? ঘড়ি দেখিলাম, তখনও বারোটা বাজিতে কয়েকমিনিট বাকী। শৈলবালা রামনাম জপ করিতে করিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাড়ীটা চক্‌মিলান। যে বারান্দার উপরে যাইবার সিঁড়ি-দরজা আছে, সে বারান্দার ঠিক বিপরীত দিকের বারান্দায় আমার শয়নঘর। আমি জানালা দিয়া ওদিকের বারান্দা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। যখন ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিতে আরম্ভ কবিল, তখন দেখিলাম, সিঁড়ির সেই দরজাটি আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি, কিন্তু সে সময়টা একটু মেঘ থাকাতে আলোক অল্প ছিল। সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম, শ্বেত বস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তির মত কি একটা সিঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল।

দুই তিন মিনিট পরে আবার সেটাই ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজা অতি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। আমি শৈলবালাকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় দুয়ার খুলিয়া সেই শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি বাহির হইল। এই সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—"ও কি?" আমি বলিলাম—"ভূতই হউক, আর মানুষই হউক ওই সে। আমি একবার দেখিব উহা কি। আমার ভোজালি কই?" বলিয়া দেওয়াল হইতে ভোজালি পাড়িয়া লইলাম। স্ত্রী আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধবিলেন। আমি সবলে হাত ছাড়াইয়া এক লম্ফে ঘরের বাহিরে গেলাম। নিমেষের মধ্যে সিঁড়ির দুয়ারের কাছে উ পস্থিত হইলাম। মেঘটা তখন অপসৃত হইল—জ্যোৎস্না প্রকাশ হইল।

দেখিলাম সিঁড়ির দরজার কাছে অনেকটা স্থান যেন রক্তমাখা! তেতলার উপর হইতে যেন কাহার কাতরাণিও শুনিতে পাইলাম। লিখিতে লজ্জা নাই, আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল—মনে করিলাম বীরত্বে কাজ নাই, পলাইয়া যাই। কিন্তু রহস্যের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া , সাহস সংগ্রহ করিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বজ্রমুষ্টিতে ভোজালী ধরিয়া, যেন সাক্ষাৎ শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি-মিনিট অতীত হইয়াছে। সেই শাদা ছায়াটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এই সময়। তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া পড়িয়া ভোজালি তুলিয়া প্রাণপণে চীৎকার কবিলাম—"কে তুই বল্, নহিলে খুন করিব।" সেই মূর্ত্তি "My God"—বলিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহাব পর অতি দ্রুতভাবে ইংরাজিতে বলিল—"আমি—আমি—আমি—বাবু;—আমি!" পরিচিত কণ্ঠস্বর। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যাহাকে বাড়ী ভাড়া দিয়েছি, সেই সাহেব!!

আমি তখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সেই সময় উপর হইতে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। বলিলাম—"সাহেব তুমি খুন করিয়াছ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি খুন করিব কেন? তুমিই আব একটু দেরী হইলে আমাকে খুন করিয়াছিলে।"

আমি পায়ের কাছে দেখাইয়া বলিলাম—"এত রক্ত কেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ও বুঝি রক্ত? ও তো জল। এই দেখ"—বলিয়া সাহেব একটি জলপূর্ণ ছোট বালতী তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন—"এই নূতন সিমেন্টের উপর জল পড়িয়া জ্যোৎস্নায় রক্ত বলিয়া তোমার ভ্রম হইয়াছিল।"

এই সময় আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। সাহেব বলিলেন—"বাবু তুমি বিস্মিত হইয়াছ, ভয়ও পাইয়াছ। আমার স্ত্রী পীড়িতা—তাই ত কাতরাণি শব্দ। সকল কথা কাল সকালবেলা বলিব। আমি কোথাও যাই নাই। গাজীপুর যাওয়ার কথা ছলনা মাত্র। আমি দেনার জ্বালায় এমন করিয়াছি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম শৈলবালা মূর্চ্ছিতা। অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলাম।

সমস্ত রাত্রি সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে সুস্থ করি। সকালে সাহেবের মুখে শুনিলাম, তিনি সেই রাত্রে আবার চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল, সে ইঁহাদিগকে ভিতরে দিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সাহেবের নাকি মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা চাকরী হইবে—

হইলেই তিনি অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইবেন। পাছে আমরা জানিতে পারি এই ভয়ে তাঁহার দিনের বেলার চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। অনেক রাত্রি হইলে রান্না খাওয়া করিয়া লইতেন। আমাদের রান্নাঘরের পাশে যে চৌবাচ্চা, বলিলেন—না জানিয়া সাহেবের ছোঁয়া জল খাইয়া আমাদের সপরিবারে জাতি গিয়াছে।

যাহা হউক আগামী বারের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহাকে এলাহাবাদে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিব, এরূপ আশা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিয়াছি। ভাগ্যে আমার স্ত্রী জ্যোতিষ জানেন না। এই সে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গিয়াছে, আপাততঃ দশ বারো বৎসরের মধ্যে আর তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

[ভারতী, চৈত্র ১৩০৩]

বীরবলের গল্প

কথিত আছে আকবর বাদশাহের সভাসদ্ রাজা বীরবল* অত্যন্ত চতুর, সুরসিক ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং বাদশাহকেও তিনি দুকথা শুনাইয়া দিতে ভয় করিতেন না। বীরবলের প্রতি বাদশাহের স্নেহ ও শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল।

একদিন বাদশাহ দরবার বরখাস্ত (সভা বিসর্জ্জন) করিবার সময়, সে কালের প্রথা অনুসারে উপস্থিত পাত্রমিত্রগণকে পাণ ও আতর বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ এক ফোঁটা আতর নিম্নস্থ গালিচার উপর পড়িয়া গেল। বাদশাহ হঠাৎ ঝুঁকিয়া, সেই আতরের ফোঁটাটি আঙুলে মুছিয়া তুলিয়া লইলেন। তুলিয়াই রাজা বীরবলের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। বীরবল মস্তক নত করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিলেন। সভাভঙ্গের পর বাদশাহ বিশ্রামস্থানে গেলেন কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরে এই কথাটাই ক্রমাগত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল—"কেনই বা আমি নেহাৎ কঞ্জুষের মত সে আতরের ফোঁটাটুকু তুলিতে গেলাম! একজন গরীব লোক যে আতর কখনও চোখে দেখে নাই, সে ওরূপ করিলে সাজিত। কিন্তু আমি দুনিয়ার মালিক আকবর বাদশা হইয়া ছি ছি বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। বীরবল দেখিয়াছে—একদিন নিশ্চয়ই সে ইহা লইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিবে।"

এই ত্রুটিটুকু সারিয়া লইবার মানসে, পরদিন বাদশাহ হুকুম দিলেন, "রাজবাড়ীর সামনে ঐ সে জলের হাউজটা আছে, উহা খালি করিয়া, উৎকৃষ্ট আতরে ভর্ত্তি করিয়া দাও—এবং সহরে ঢোল দাও যে, বাদশাহ প্রজাদের জন্য আতর-সত্র খুলিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে আসিয়া ঘটি, বাটি, কলসী ভর্ত্তি করিয়া আতর লইয়া যাইতে পারে।"

ঘড়া ঘড়া আতর ঢালিয়া সেই প্রাকাণ্ড হাউজ ভর্ত্তি করা হইল। দুই তিন ঘন্টার মধ্যে, হাজার হাজার লোক আসিয়া ঘটি, বাটি, কলসী ইত্যাদি ভরিয়া সেই মূল্যবান আতর সমস্তটা লুটিয়া লইয়া গেল। আকবর বাদশাহ বীরবলকে সঙ্গে লইয়া এই আতুরলুট দেখিতেছিলেন, শেষ হইলে বলিলেন, "রাজা, কেমন আনন্দ হইল বল দেখি?

বীরবল উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, হাউজ দিয়া কি বিন্দু ঢাকা যায়?"

শুনিয়া বাদশাহের মনে বড়ই ক্রোধের উদয় হইল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বীরবল এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাহি না। তুমি দূর হও। তোমার ধনসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিবে,——ইহাই তোমার দণ্ড।"

"যো হুকুম জাঁহাপনা"—বলিয়া কুর্নিশ করিয়া বীরবল প্রস্থান করিলেন।

---

*প্রবাদ এই যে, রাজা বীরবল কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

দুই

বীরবল নির্ব্বাসিত। তাঁহার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, সমস্তই বাদশাহের আদেশে বাজেয়াপ্ত।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে বাদশাহের রাগ পড়িয়া আসিল। তখন তাঁহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। "আহা, কেন তাহাকে তাড়াইলাম? বড় ভাল লোক ছিল,—যেমন রসিক, তেমনি বুদ্ধিমান। বড় আনন্দেই তাহার সহিত কাল কাটাইতাম। কেন তাহাকে তাড়াইলাম?"—বাদশাহ প্রতিদিনই বীরবলের অভাব অনুভব কবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দেশে দেশে গুপ্তচর পাঠাইলেন—সন্ধান পাইলে নিজে গিয়া তাঁহার মান ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবেন।

দুই মাস গেল, চারি মাস গেল, ছয় মাস গেল, কিন্তু বীরবলের কোন সন্ধানই নাই। অবশেষে বাদশাহ স্থির করিলেন, একটা কৌশল করিয়া দেখিবেন। হুকুম দিলেন, "আমার অধীনে যত বড় বড় সামন্তরাজ আছে, তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত কর।"—তালিকা প্রস্তুত হইল, ৫০ জন সামন্তরাজের নাম লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর বাদশাহ হুকুম দিলেন, "৫০টা মেড়া খরিদ করিয়া আন।"

মেড়া খরিদ হইল। তখন নিম্নলিখিত পরোয়ানা সহিত, ঐ ৫০ জন সামন্তরাজের প্রত্যেকের নিকট এক একটা মেড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরোয়ানা :

"আকবর বাদশাহ এতদ্বারা তোমার প্রতি হুকুম করিতেছেন, রাজকর্ম্মচাবীর সহিত প্রেরিত মেড়াটি এক মাসকাল তুমি প্রতিপালন করিবে। ইহাকে প্রত্যহ চারি সের পরিমাণ উৎকৃষ্ট দানা খাইতে দিবে। যে রাজকর্ম্মচারী ইহা লইয়া যাইতেছে, সে নিজ তত্ত্বাবধানে মেড়াকে দানা খাওয়াইবে। একমাস পরে মেড়াটি রাজধানীতে ফেরৎ পাঠাইবে, কিন্তু সাবধান, বর্ত্তমানে ইহার দেহের ওজন যাহা আছে, ঠিক সেইরূপ থাকা চাই। যদি এক তোলা পরিমাণও ইহার দেহের ওজন বৃদ্ধি পায়, তবে তোমার লক্ষ্য টাকা জরিমানা হইবে। প্রকাশ্য দরবারে এই মেড়ার ওজন করা হইল....মণ....সের....পোয়া....ছটাক....কাঁচ্চা!"

—অর্থাৎ, যে মেড়া যে রাজাকে পাঠানো হইতেছে,—সেটার কত ওজন, তাহা সেই রাজার নামীয় পরোয়ানায় লিখিত হইল।

এই মেড়া ও পরোয়ানা পাইয়া, রাজ্যে রাজ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল; প্রত্যহ চারি সের উৎকৃষ্ট দানা খাইযাও মেড়াব ওজন বাড়িবে না, ইহা ত অসম্ভব কথা! কেহ কেহ বলিল, "ইহা কেবল টাকা আদায়ের ফন্দি, আর কিছু নয়। তার চেয়ে খোলাখুলি পরোয়ানা দিলেই হইত, এক লক্ষ টাকা আমায় পাঠাইয়া দাও।"

তিন

বীরবল রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, যে সামন্ত রাজার সীমানার মধ্যে ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বাস করিতেছিলেন, সেই রাজার নিকটও রাজকর্ম্মচারীসহ একটি মেড়া ও পরোয়ানা গিয়া পৌছিল। সে রাজা কিছু অমিতব্যয়ি ছিলেন, ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই পরোয়ানা পাইয়া তিনি ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "তাইত একে এই টানাটানি,—এক মাস পরে এক লক্ষ টাকা পাই কোথা? কি ফেসাদেই পড়া গেল, ছি ছি!'—লোকমুখে বীরবলও এই ব্যাপার অবগত হইলেন। তখন তিনি চাপকান পাগড়ী ইত্যাদি পরিধান করিয়া, রাজবাড়ী গিয়া রাজার সহিত দর্শন প্রার্থনা করিলেন।—রাজার নিকট গিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, শুনিলাম আপনি নাকি মহা মেড়া-সমস্যায় পড়িয়াছেন?"

"হ্যাঁ, সমস্যা নয় ত আর কি?"

"আমি আপনার একজন দীন প্রজা। যদি আদেশ করেন, আমি সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারি।"—"তাহা হইলে ত বাঁচি। কি সমাধান? বল্ বল্!"

"মহারাজের চিড়িয়াখানা আছে, তাহাতে কতকগুলি বড় বড় খাঁচায় বড় বড় বাঘ আবদ্ধ আছে, দেখিয়াছি। সেই একটা বাঘের খাঁচার কাছে মেড়াটাকে বাঁধিবার হুকুম দিন। এক মাস ও মেড়া সেইখানেই বাঁধা থাকবে। চারি সের কেন, যত খাইতে পারে দানা উহাকে দিবার আদেশ করিয়া রাখুন।"—এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য হইল।

মাসান্তে রাজকর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব জিম্মায় মেড়া লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মেড়াগুলি একে একে আবার ওজন করা হইল। সেগুলির ওজন কাহারও দশ সের, কাহারও বিশ সের, কাহারও এক মণ বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল একটি মেড়া, অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার ওজন প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

বাদশাহ্ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এ মেড়াটি এমন কাহিল হইয়া গেল কেন? ইহাকে চারি সের দানা কি রোজ দেওয়া হইত না?"

কর্ম্মচারী হাতযোড় করিয়া বলিল, "চারি সের কেন জাঁহাপনা৫/৬ সের দানা ইহাকে প্রত্যহ দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার সিকি ভাগও এ খাইত না। খাইবে কি—ইহাকে একটা মস্ত বাঘের খাঁচার সামনে এই এক মাস বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটা যখন তখন ইহাকে দেখিয়া তর্জ্জন করিত, লোলুপ নেত্রে ইহার পানে চাহিয়া জিভ বাহির করিত, সে জিভ দিয়া টস্ টস্ করিয়া লাল ঝরিত। মেড়া দানা খাইবে কি, ভয়েই কাঠ হইয়া থাকিত। আতঙ্কে আতঙ্কে দিন দিনই রোগা হইতে লাগিল।"

বাদশাহ্ বলিলেন, "কে এ রকম করিতে সে রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিল জান?"

"শুনিয়াছি তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ প্রজা তাঁহাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বাদশাহ্ মনে মনে বলিলেন, সে ব্রাহ্মণ আর কেহ নয়, সেই বীরবল! নহিলে এত বুদ্ধি কার?—বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ সেই রাজ্যে একজন দক্ষ গুপ্তচরকে পাঠাইয়া দিলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বীরবলই নাম ভাঁড়াইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। তিনিই রাজাকে পরামর্শ দিয়া মেড়াকে বাঘের খাঁচার সম্মুখে বাঁধাইয়াছিলেন।"

বাদশাহ্ বলিলেন—'সে আমি আগেই বুঝিয়াছি।"

তারপর বাদশাহ্ হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজোচিত সমারোহে সেই রাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, মহা সমাদরে বীরবলকে ফিরাইয়া আনিলেন। বলা বাহুল্য, বীরবল তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন।

[রামধনু, কার্ত্তিক ১৩৩৫]

কাজির বুদ্ধি

বাদশাহী আমল।

দিল্লীর প্রধান বিচারপতি, কজি নবাব মির্জ্জা হামিদুদ্দীন অফ্‌সরউল্‌মূল্‌ক্‌ বাহাদুর সান্ধ্যনামাজ সমাপনান্তে, অন্তঃপুরে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া, সোনার আলবোলায় তাওয়াদার মৃগনাভিসুগন্ধি তামাকু সেবনে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময় তাহার খাস খাননামা আসিয়া সংবাদ দিল, মাণেকচাঁদজী নামক এক ব্যক্তি দর্শনপ্রার্থী।

কাজি সাহেব চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নাম বলিলে?"

"মাণেকচাঁদজী।"

"কে সে, কি পরিচয় দিল?"

"পরিচয় কিছুই দেয় নাই। বলিল, সে বড় বিপন্ন, তাহার উপর অত্যন্ত বে-আইনি হইয়াছে,— আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনার নিকট সে নিজ দুঃখ নিবেদন করিবে।"

"তা, এখানে কেন? বিচারালয়ে, আমার পেস্কারের নিকট নিজ দরখাস্ত দাখিল করিতে বল।"— ভৃত্য সবিনয়ে উত্তর করিল, "হুজুর, সে বলিল, তাহার যাহা বক্তব্য তাহা অত্যন্ত গোপনীয়, ধর্ম্মাবতার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। বড়ই কাঁদাকাটা করিতেছে, তাহার উপর বড়ই জুলুম হইয়াছে।"

কাজি সাহেব নীরবে আলবোলায় কয়েক টান দিয়া শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, বৈঠকখানায় তাহাকে বসাও, আমি ক্ষণকাল পরে আসিতেছি।"—খানসামা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

কাজি সাহেব কিছুক্ষণ আরামে ধূমপান করিলেন। তারপর উঠিয়া, ধীরপদে বাহির হইয়া বৈঠকখানাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

মানেকচাঁদ বসিয়া ছিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্ভ্রমে কাজি সাহেবকে সেলাম করিল। 'বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে"—বলিয়া কাজি সাহেব নিজেও উপবেশন করিলেন।

কাজি সাহেব দেখিলেন, লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর, তাঁহার অপেক্ষা অন্ততঃ দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। বেশবাস, ধনীজনোচিত নহে—দরিদ্রেরই মত। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাহেন আপনি?"—মানেকচাঁদ বলিল, "আমি হুজুরের নিকট ন্যায়-বিচার চাহি। গরীবের উপর বড়ই জুলুম হইয়াছে।"

"কি হইয়াছে খুলিয়া বলুন।"

মানেকচাঁদ তখন নিজ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

"হুজুর, তিন চারি পুরুষ আমরা এই দিল্লী নগরীর অধিবাসী। পূর্ব্বপুরুষের আমল হইতেই আমাদের চিনির কারবার আছে। পিতার মৃত্যুর পর আমিই সেই কারবারের মালিক হই,— কারণ আমিই আমার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। কারবার চালাইতে লাগিলাম। বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মও করিতে লাগিলাম। বেশ সুখেই কয়েক বৎসর কাটিল। কারবারটি আমি নিজে বড় দেখিতাম না। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের দিকেই আমার আকর্ষণ বেশী। টাকা পয়সার প্রতি কোনও দিনই নজর করি নাই। পুরাতন আমলের কর্ম্মচারীরা ছিল, তাহারাই দেখিত শুনিত। আমি তাহাদের উপরেই সমস্ত ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে আপন সাধন-ভজন লইয়াই থাকিতাম। কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, নিজেরাই সব লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছে। ভাবিলাম, খাউক, আমি খাইতেছি, উহারা খাইবে না? আমি বসিয়া খাইতেছি, উহারা খাটিয়া খাইতেছে—হয়ত, আমার চেয়ে উহাদের অভাব আরও বেশী। এইভাবেই চলিতেছিল। হুজুরের বোধ হয় স্মরণ আছে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই দিল্লী সহরে হায়জাবিমারীর (কলেরা) অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। সে বৎসর হাজার হাজার লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। রামজীর কি মর্জ্জি হইল, তিনি আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সকলকেই আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাণেকচাঁদ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাজি সাহেব বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর ভাইয়া,—আল্লা যাহা করিয়াছেন, শোক করিয়া তাঁহার কার্য্যে প্রতিবাদ করা তোমার উচিত নয়। চুপ কর, চুপ কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মাণেকচাঁদ একটু সামলাইয়া লইল।

কাজি সাহেব বলিলেন, "তোমার উপর বে-আইন জুলুম কি হইয়াছে, তাহাই বল।"

মাণেকচাঁদ আবার বলিতে লাগিল ঃ—

"আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার মৃত্যুর পর, কিছুদিন আমি পাগলের মত হইয়াছিলাম। অবশেষে ভাবিলাম, আমি সংসার-মায়া জড়ীভূত হইয়া বোধহয় রামজীর ইচ্ছা নয়, তাই তিনি আমার সকল বন্ধন কাটিয়া দিলেন। সংসারের মোহে আর আকৃষ্ট হইব না; সাধন-ভজন করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব। ইহাই স্থির করিয়া আমি কারবারটি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। গৃহের দ্রব্যসামগ্রীও অনেক বিক্রয় করিলাম। ইহাতে লক্ষাধিক টাকা হইল। ভাবিলাম, এখন কিছুদিন তীর্থ পর্য্যটন করি, তারপর ফিরিয়া আসিয়া ঐ টাকায় একটি দেবমন্দির স্থাপন করিয়া সাধন-ভজনে নিযুক্ত হইব। ভাবিলাম, এত টাকা এখন রাখি কোথায়? এই সহরে আমার একজন ধনী বন্ধু আছেন,—শুধু ধনী নহেন, খুব পণ্ডিত ব্যক্তি—তাঁহার নাম মুন্সী ভবানীশঙ্কর—"

কাজি সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "কোন্ ভবানীশঙ্কর? যিনি চন্দন চৌকে বাস করেন?"

"হাঁ, তিনিই। চন্দন চৌকে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা—"

কাজি সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ, তাঁহাকে চিনি আমি।"

মাণেকচাঁদ বলিল, "ভবানীশঙ্কর আমার বাল্যকালের বন্ধু। আমরা এক মখ্‌তবেই পাঠ করিয়াছি। ভাবিলাম, ভবানীশঙ্করের নিকট লক্ষ্য টাকা গচ্ছিত রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইব। তাই, তাহার কাছে গিয়া, সমস্ত কথা বলিয়া, লক্ষ টাকা তাহার নিকট জমা দিলাম।"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসীদ লইয়াছিলে?"

মাণেকচাঁদ বলিল, "বাল্যবন্ধু, মানী লোক, লজ্জায় আমি রসীদ চাহিতে পারি নাই। তবে সে নিজেই বলিয়াছিল, 'একটা রসীদ দিব কি?—আমার খাতায় অবশ্য জমা করাই থাকিবে!" আমি লজ্জার খাতিরে বলিয়াছিলাম, রসীদ আর কি হইবে? তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইব, রসীদ হারাইয়া ফেলিব বইত নয়!"

কাজি সাহেব বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর, আমি অবশিষ্ট টাকা লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলাম। দুই বৎসর কাল নানা তীর্থে ঘুরিয়া, এক সপ্তাহ মাত্র দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সীতারামজীর একটি মন্দির বানাইবার জন্য, যমুনাতীরে একটি স্থান ঠিক করিয়া, গতকল্য আমি টাকাগুলি আনিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু কাজী সাহেব, বলিব কি, ভবানী টাকার কথা একদম অস্বীকার করিল। বলিল, আমি নাকি পাগল হইয়া গিয়াছি, তাই এই অসম্ভব কথা বলিতেছি। আমাকে হাঁকাইয়া দিয়াছে। ভাবিতাম, ভবানীশঙ্কর অমন ভাল লোক, অত বড় বিদ্বান,—ও কখনও অধর্ম্ম করিবে না। কিন্তু দেখুন একবার কাণ্ডখানা!-—এখন কাজি সাহেব, আপনি যদি দয়া করেন, তবেই আমার টাকাগুলি উদ্ধার হয়!"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, " আচ্ছা রসীদ না হয় লও নাই, টাকাটা জমা রাখিবার সময় সেখানে অন্য কেহ উপস্থিত ছিল কি ?"

"কেহই ছিল না। শুধু সে আর আমি।"

"তবে বাপু আমি কি করিব বল। একটা রসীদ নাই, একটা সাক্ষীও নাই—কি করিয়া তোমার টাকা উদ্ধার করিয়া দিব?"

মাণেকচাঁদ বলিল, "তবে কি হুজুরের ন্যায় ধর্মাজ্ঞ বিচারপতি দিল্লী সহরে থাকিতে, গরীবের উপর এই বে-আইনি হইবে? কোনও উপায় চিন্তা করুন ধর্ম্মাবতার!"

কাজি সাহেব ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আরে, চীলম্ বদল্ দে।" মাণেকচাঁদকে বলিলেন। "আচ্ছা, আমি চিন্তা করি, তুমি কল্য সন্ধ্যায় আবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আর,

সাবধান, আমার কাছে আসিয়াছিলে, নালিস করিয়াছ, একথা কেহই যেন ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারে। এখন যাও।”

“হুকুম তামিল করিব হুজুর”—বলিয়া মাণেকচাঁদ কাজি সাহেবকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।—কাজি সাহেব সেইখানেই বসিয়া আবার আলবোলার নল মুখে লইলেন এবং চক্ষু মুদিয়া চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ঘন্টাখানেক পরে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, “ঠিক হোগা।”—চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, “আরে কৌন্ হ্যায়, চীলম্ বদল্ দে।”—পরদিন সন্ধ্যার পর মাণেকচাঁদ আসিয়া হাজির হইল। কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি বার?”

“আজ হুজুর মঙ্গলবার।”

“পরশু বৃহস্পতিবারে, বিকালে, তুমি আবার ভবানীশঙ্করেব নিকট গিয়া টাকা চাহিবে। যদি সে পুনরায় অস্বীকার করে, তবে তুমি তাকে এই বলিয়া শাসাইবে, ‘আচ্ছা, তবে অগত্যা আমাকে প্রধান কাজি সাহেবের দরবারে নালিসমন্দ্ হইতে হইবে। কল্য শুক্রবার আদালত বন্ধ। পরশু শনিবার প্রথম কাছারিতে নিশ্চয়ই আমি তোমার নামে নালিস দায়ের করিব, দেখি তিনি ইহার কোনও প্রতিকার করেন কি না।”—এই বলিয়া তুমি বাড়ী চলিয়া যাইবে।”

“যো হুকুম হুজুর।”—বলিয়া মাণেকচাঁদ প্রস্থান করিল।

পরদিন কাজি সাহেব মুন্সী ভবানীশঙ্করকে এই পত্রখানি লিখিলেন—

“বন্ধু,

বহুদিন আপনার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই। আজ সন্ধ্যার পর আমার গরীবখানায় যদি একবার দর্শন দেন ত বিশেষ বাধিত হই। জরুরী কথাবার্ত্তা আছে। ইতি।”

পত্র পাইয়া ভবানীশঙ্কর একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। হঠাৎ কাজি সাহেবেব এ তলব কেন? তবে মাণেকচাঁদ তাঁহার কাছে গিয়া আমার নামে কিছু লাগাইছে নাকি?—তাই তাহাব টাকা ফেরৎ দিবার জন্য বন্ধুভাবে আমাকে অনুরোধ কবিবাব জন্যই ডাকেন নাই ত?”

সন্ধ্যার পর ভবানীশঙ্কর গিয়া কাজি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কাজি সাহেব অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, “দেখুন বাবুসাহেব, সহরে কি পরিমাণ জাল জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজির প্রাদুর্ভাব হইযাছে ইহা দেখিতেছেন ত?”

ভবানী। হাঁ সাহেব, দেখিতেছি বইকি। ধর্ম্ম রসাতলে গেল। পাপ অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।”

কাজি। “মামলা মোকর্দ্দমা এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, আমার ত মশায় খাটিয়া খাটিয়া প্রাণটা গেল। বিশেষ এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। সেদিন বাদশাহের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার কাছে সকল কথা আমি বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, “আচ্ছা কাজি সাহেব, আপনি বরং আপনার অধীনে দুইজন নায়েব কাজী নিযুক্ত করুন। তাহাতে আপনার শ্রম লাঘব হইবে এবং মামলা মোকর্দ্দমার শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবে। দুইজন উপযুক্ত লোক স্থির করিবার ভার আমি আপনাকেই দিলাম। এমন দুইজন লোক স্থির করিবেন, যাঁহারা খুব বিদ্বান, অত্যন্ত ধার্ম্মিক, যাঁহাদের নামে শত্রুতে কোনও অপযশ করিতে পারে না। রাজকোষ হইতে তাঁহাদের উপযুক্ত বেতনও মঞ্জুর করিব।” দরবার বরখাস্ত হইলে, আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, বাদশাহ পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘দেখুন কাজি, দুইজন নায়েব কাজি—একজন মুসলমান, একজন হিন্দু হওয়া আবশ্যক। কারণ হিন্দু মুসলমান উভয়েই আমার সমতুল্য প্রজা। কিন্তু ঐ কথা স্মরণ রাখিবেন—এমন দুইজন লোক চাই, যাঁহাদের নামে কোনও দিনও কোনও শত্রুও কোন অধর্ম্মের আরোপ করে নাই।’ তা, ভবানীশঙ্করজী—এ সহরের হিন্দুদের মধ্যে আপনাকেই আমি অত্যন্ত বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। আপনি কি এই কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন? মুসলমান একজনকে আমি স্থির করিয়াই রাখিয়াছি। যদি সম্মত হন ত বলুন, আগামী সোমবার বাদশাহ আবার আমায় তলব করিয়াছেন,—সেই দিন এই বিষয়ে তাঁহার পরোয়ানা হাঁসিল করিয়া আসিব।”

নায়েব-কাজিগিরি! এই দিল্লী সহরের?—বেতন যাই হোক,—উপরি আরও যে বিলক্ষণ! ভবানীশঙ্কর কাজি সাহেবকে বহু ধন্যবাদ দিয়া, কর্ম্মগ্রহণে নিজ সম্মতি জানাইলেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর মাণেকচাঁদ আবার গিয়া ভবানীশঙ্করের দ্বারস্থ হইল। টাকার কথা বলিবামাত্র, আবার তিনি গালিমন্দ করিয়া মাণেকচাঁদকে তাড়াইয়া দিলেন। মাণেকচাঁদও, শনিবার প্রথম কাছারিতেই নালিস দায়ের করিব বলিয়া শাসাইয়া গেল।

মাণেকচাঁদ চলিয়া গেলে, কিছুক্ষণ পরে ভবানীশঙ্করের মনে হইল, "হায় কি করিলাম! শনিবার দিনও যদি আমার নামে ঐ কুৎসিত নালিস কাজি সাহেবের নিকট দায়ের করে, তবে ত আমার উপর কাজি সাহেবের সন্দেহ জন্মিতে পারে। তাহা হইলে আমার নায়েব-কাজিগিরি চাকরিটাও ত ফস্কাইয়া যাইবে দেখিতেছি। তার চেয়ে বরং মাণেকচাঁদের লক্ষ টাকার লোভটা পরিত্যাগ করাই যাউক। চাকরিতে বহাল হইলে অমন কত লক্ষ ঘরে আসিবে।"

পরদিন প্রভাতেই ভবানীশঙ্কর ভৃত্য পাঠাইয়া মাণেকচাঁদকে আবার ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "বন্ধু, তোমার মুখখানি এমন রাগ-রাগ কেন বল দেখি। ঠাট্টা বোঝ না ভাই! দুই দিন আমি তোমার সহিত একটু ঠাট্টা করিলাম বইত নয়। এই নাও তোমার লক্ষ টাকা।"

মাণেকচাঁদ টাকা গণিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল।

সোমবার দিন সন্ধ্যায় ভবানীশঙ্কর কাজি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাদশাহের পরোয়ানা বাহির হইল? কবে হইতে আমায় এজলাস করিতে হইবে?"

কাজি সাহেব দুঃখিতভাবে বলিলেন, "না, মঞ্জুরী পাইলাম না। বাদশাহ্ বলিলেন, দেশময় বড়ই দুর্ভিক্ষ বাধিয়াছে—প্রজারা অনাহারে মরিতেছে—তাহাদের খাদ্য জোগাইতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া যাইবে। এ বৎসর আর নায়েব-কাজি বাহাল করা হইবে না। একলাই আমার সব কাজ করিতে হইবে। দেখি, এ বুড়া হাড়ে কতদিন চালাইতে পারি।"

[রংমশাল, ১৩৩৫]

বেশ্যা খুন

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন সন্ধ্যার পব, কলিকাতার কোনও এক কু-পল্লীতে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। এক বারবিলাসিনী খুন হইয়াছে, ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল। যে বাড়ীতে খুন হইয়াছে, তথায় পুলিস গিয়া লাস দেখিল, আসামীকে গ্রেপ্তার করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আসামী পালাইবার চেষ্টা করে নাই।

ইনস্পেক্টর আসিয়া সরেজমিন তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি দ্বিতল। যে সকল রমণী দ্বিতলের বিভিন্ন ঘরে ভাড়া লইয়া বাস করিত, তাহার এইরূপ এজাহার দিল আজ সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে, এই ব্যক্তি (আসামিকে দেখাইয়া) সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। আমরা সে সময় সাজ-সজ্জা করিয়া, ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া, খরিদ্দারের অপেক্ষায় নিজ শয্যায় বসিয়া ছিলাম। আসামী প্রথমে প্রথম ঘরটির সামনে দাঁড়াইয়া, ভিতরে উপবিষ্টার পানে অল্পক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর আর একটি ঘরের সামনে দাঁড়াইল, তারপর আর একটি—বুঝিলাম খরিদ্দার জিনিষ পচ্ছন্দ করিতেছে। অবশেষে সে, আমাদের মৃতা সখীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট ভেজাইয়া দিল। অতি অল্পক্ষণ পরে সেই ঘর হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আমাদের কানে আসিল। আমরা ভীত হইয়া বাহির হইলাম এবং সেই কামরার দিকে ছুটিলাম। দুয়ার ঠেলিতে উহা খুলিয়া গেল। দেখি, আমাদের সখী, মেঝেয় বিছানো তার শয্যার উপর গলাকাটা অবস্থায় পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং আসামী, বিছানার পাশে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া

ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। হাতে একখানি রক্তমাখা ক্ষুর, তাহা দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আমরা খুন খুন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেহ নিস্পন্দ হইয়া গেল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিল—তারপর পুলিসও আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রশ্ন। এ ব্যক্তি কে? মৃতার ঘরে এ কতদিন হইতে যাতায়াত করিতেছে?

সকলের উত্তর। মৃতার ঘরে ইহাকে পূর্ব্বে কোনও দিন আসিতে আমরা দেখি নাই। এ কে তাহা জানি না, পূর্ব্বে কখনও ইহাকে দেখি নাই।

একতলায় যে রমণীগণ বাস করিত, তাহারা বলিল, সন্ধ্যার একটু পরে এ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উপরে যাইবার সিঁড়ি কোথা? সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে সে উপরে গেল। অল্পক্ষণ পরে উপর ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিয়া আমরা উপরে গেলাম এবং দেখিলাম—দ্বিতলে রমণীগণ যে দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ বলিল। আরও বলিল, আসামীকে পূর্ব্বে তাহারা কোনও দিন দেখে নাই।

পুলিশ লাস হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

যথাসময়ে আসামী নরহত্যার ধারায় চালান হইয়া, বিচারার্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে প্রেরিত হইল।

সে বাড়ীর রমণীগণ পুলিশের নিকট যাহা বলিয়াছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসেও সেইরূপ বলিল। শেষে, যে ডাক্তার সাহেব লাস পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইলেন।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ণনা করিলেন। গলার সেই কাটার মাপ,—লম্বায় কতখানি, কোনখানে কতটা গভীর ছিল, তাহা বলিলেন। সরকারী উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বলিতে পারেন, এ কাটা suicidal (মৃতা নিজের গলা নিজে কাটিয়ছে) অথবা homicidal (অপর কেহ কাটিয়াছে?)

এখন, Medical jurisprudence গ্রন্থগুলিতে এরূপ অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ নিজের গলা নিজে যদি কাটে, তবে অস্ত্রটা রহিল তার ডানহাতে, সে উহার গলার বাঁদিকে বসাইয়া, টানিয়া ডানদিকে লইয়া গিয়া থামিল। সুতবাং বাঁদিকের ক্ষতের গভীবতা হইবে সবচেয়ে কম। গভীরতা ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, ডানদিকে যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে হইবে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অন্য কেহ যদি তাহাকে হত্যা করিবার মানসে এইরূপ করে, তবে সে অস্ত্র ধরিবে নিজের ডান হাতে; বসাইবে, যাকে খুন করিতেছে তার গলার ডানপাশে, সেখানে গভীরতা হইবে সবচেয়ে কম; ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, বাঁদিকে যেখানে ক্ষত শেষ হইয়াছে, সেখানে গভীবতা হইবে সবচেয়ে বেশী।—কিন্তু, সকল সময়, গভীরতার এরূপ তারতম্য পাওয়া যায় না—তখন ডাক্তার এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হন।

এ মোকর্দ্দমাতেও ডাক্তার উল্লিখিত কারণে বলিতে পারিলেন না যে, এই কাটা suicidal অথবা homicidal.

আদালত আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিছু বলিতে চাও?'

আসামী। আমি কিছুই বলিব না।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইল। সরকারী উকীল যাহা বক্তৃতা করিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—

সেই ঘরে এই ব্যক্তি এবং হত্যা রমণী ছাড়া, কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না যে, বলিব হয়ত সেই তৃতীয় ব্যক্তিই হত্যাকর্ত্তা। স্ত্রীলোকটার, নিজের গলা নিজে কাটিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কাবণ নাই। যদি এমন হইত যে, এ ব্যক্তি অনেকদিন হইতে উহার নিকট যাতায়াত করে, দুজনের মধ্যে প্রেম হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত মনে করাও যাইত যে, কোনও ঝগড়া কলহের কারণ, অভিমানে রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, সে বাড়ীতে আসামীকে তাহারা পূর্ব্বে কোনও দিন দেখে নাই। তাহা হইলে আসামীই রমণীকে হত্যা করিয়াছে ইহা স্থির। কেন করিল? চুরির অভিপ্রায়ে হইতে পারে। হয়ত পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, গলাটি কাটিয়া দিলেই রমণী চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে—তখন সে অভাগিনীর টাকা-কড়ি গহণা-পত্র লইয়া বাহির হইয়া,

কপাটটি ভেজাইয়া, চম্পট দিবে। কিন্তু অভাগিনী মৃত্যুযন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করাতেই আসামীর উদ্দেশ্য বিফল হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। হাইকোর্টের আগামী সেসনে, তাহার বিচার হইবে। আসামী প্রেসিডেন্সি জেলে হাজত বন্ধ রহিল।

ইতিমধ্যে দেশে যুবকের আত্মীয়-স্বজন খবর পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অসম্ভব। ও যে অর্থলোভে নারী হত্যা করবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। সে প্রকৃতির ছেলে ত ও নয়।" তাঁহারা, সেসনে আসামীর পক্ষাবলম্বন কবিবাব জন্য বড় বড় উকীল কৌসুলি নিযুক্ত করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসের কাগজপত্রের নকল পড়িয়া, এবং আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মুখে আসামীর সচ্চবিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনিয়া, আসামীর উকীলেবা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। জজের অনুমতি লইয়া, প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া তাঁহারা আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসামীকে বলিলেন, "আসল ঘটনা সমস্ত আমাদের খুলিয়া বল।"

আসামী। বলিব না।

উকিল। না বলিলে আমরা তোমার পক্ষাবলম্বন করিব কি করিয়া? ব্যাপার যেরূপ দেখিতেছি, ইহাতে তোমার যে ফাঁসির হুকুম হইতে পারে।

আসামী। হউক। ফাঁসি যাইব। আমি কিছুই বলিব না।

উকীলেরা সেদিন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মিনতি এড়াইতে না পারিয়া, আবার তাঁহারা গিয়া আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপ দুই তিনবার সাক্ষাতে অনেক বুঝানো সুঝানোর পর, আসামী অবশেষে আসল ঘটনাটি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিল।

"কলিকাতা হইতে দূরে, অমুক গ্রামে আমার বাস। সেখানে আমার একখানি মণিহারী দোকান আছে, উহাই আমার উপজীবিকা। দুই তিন মাস অন্তর আমি মাল খরিদ করিতে কলিকাতায় আসি। এবারও সেইরূপ আসিয়াছিলাম।

"দশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলি শুনুন। আমার এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল, অল্প বয়সে সে বিধবা হইয়া যায়। তার রূপ ছিল, সেই রূপের জন্যই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। ষোল সতেরো বৎসর বয়সে, কোনও দুর্বৃত্তর সহিত সে কুলত্যাগ করে। এই ঘটনায়, লজ্জায় অপমানে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। সমাজে আমাদের মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম কোন আত্মীয়-বন্ধু তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতাম, সে মরিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার নামও আমাদের গৃহে আর উচ্চারিত হইত না। সে যে একদিন ছিল, ইহাও আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম।

"এবার কলিকাতায় আসিয়া, মাল খরিদ শেষে, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ভাবিলাম, যখন কলিকাতায় আসিয়াছি, তখন একটু আমোদ-প্রমোদ করিয়া লই। তাই, সে পল্লীতে গিয়া, সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। গৃহিবাসিনীরা যাহা যাহা বলিয়াছে সমস্তই সত্য। উপরে গিয়া আমি এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া, অবশেষে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া, কপাট ভেজাইয়া দিয়াছিলাম। "কি গো তোমার নাম কি?"—আমি এই প্রশ্ন করিবা মাত্র, অভাগিনী অতি বিস্মিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার এই ব্যবহারে আমিও বিস্মিত হইয়া, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াই বুঝিলাম, সে আর কেহ নহে, দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কুলত্যাগিনী আমারই সেই ভগিনী। সেও অবশ্য আমায় চিনিয়াছিল। "হা ভগবান।"—বলিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ দেওয়াল-আলমারি হইতে একটা ক্ষুর বাহির করিয়া, চক্ষের নিমেষে সে নিজ গলায় বসাইল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাহাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে আমি ক্ষুরখানা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলাম। কিন্তু, তৎপূর্ব্বেই তাহার শ্বাসনালী ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সে বিছানায় পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তারপর লোকজন আসিয়া পড়িল।"

এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবার পর, আসামী পক্ষের লোকেরা মৃতার কলিকাতা বাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে সে কোন্ বাড়ীতে থাকিত, তার পূর্ব্বে কোন্ বাড়ীতে থাকিত, এইরূপ সন্ধান করিতে করিতে, যে বাড়ীতে তাহার হরণকারী প্রথম তাহাকে আনিয়া রাখিয়াছিল, সে বাড়ী খুঁজিয়া বাহির হইল। সে বাড়ীর বাড়ীউলি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ, নবাগতার সকল পরিচয়ই জানিত—তাহাবা আসিয়া সাক্ষী দিয়া প্রমাণ করিল যে, আসামীর উক্তি যথার্থ। জজসাহেব উহা বিশ্বাস কবিয়া আসামীকে বেকসুব খালাস করিয়া দিলেন।

['জামাতা বাবাজী' গ্রন্থে প্রকাশিত]

কাটা মুণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোগ্‌দাদের বাদশাহ্ হারুণ-অল-রশিদ একজন ভুবন-বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহাব মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে, তাঁহার বংশে আলি মহম্মদ নামক একজন বাদশাহ্ সিংহাসন প্রাপ্ত হ'ন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিযা দেখিলেন, দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্ম আর পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইতেছে না। দেশে অনেক লোক প্রতিমাপূজক হইয়া উঠিতেছে, নানাবিধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া বাদশাহ্ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্থির কবিলেন, তিনিও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ প্রাতস্মরণীয় হারুণ-অল-রশিদের ন্যায় তেব্‌দিল অর্থাৎ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন এবং ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। রাজ্যের কোথায় কোন ব্যক্তি খাইতে পাইতেছে না, সমস্ত নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহারও প্রতিবিধান করিবেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি নানাপ্রকার ছদ্মবেশে প্রতি রজনীতে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কোনও দিন ফকীরের বেশ, কোনও দিন খাজা অর্থাৎ সওদাগরের বেশ, কোনও দিন আমির ওমরাহেব বেশ—ফল কথা তাঁহার ছদ্মবেশ এতই গোপনীয় ছিল যে, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। কেবল তাঁহার দুই চারিজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও অনুচর সে বিষয় অবগত ছিল।

ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রবল অসন্তোষ উপস্থিত হইল, এমন কি বিদ্রোহ হয় হয়। তখন বাদশাহ্ মনে করিলেন, এখন আমার এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, আমাব নিজ বিশ্বস্ত মন্ত্রীগণও কিছুই জানিতে না পারে। তাহাদের নিজের মনের অবস্থা কিরূপ, তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক।

ছদ্মবেশের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন দরজিকে নিযুক্ত করিতেন। এবার কোনও মন্ত্রীকে কিছু না বলিয়া মনসুরি নামক তাঁহার অতি বিশ্বস্ত গোলামকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "সহরে গিয়া কোনও একজন দরজিকে লইয়া আইস। গভীর রাত্রি হইলে তাহাকে আনিবে। এরূপ সাবধানে আনিবে যে, সে দরজিও যেন না জানিতে পারে যে, সে কোথায় আসিতেছে।"

গোলাম নত হইয়া বলিল—"বেশ আস্তান। প্রভুর আদেশ এইক্ষণেই পালন করিব।"

এই বলিয়া মনসুরি বিদায় লইল। সন্ধ্যা হইলে বেজেস্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়, তথায় যাইয়া একজন সামান্য দরজির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র দুর্গন্ধময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি সামান্য দোকানে গিয়া দেখিল, এক বৃদ্ধ দরজি বসিয়া একটা পুরাতন কোট মেরামত করিতেছে। দরজির দোকানে মৃত্তিকার প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে, তাহার চক্ষুতে চশমা লাগানো। দেখিয়া মনসুরি ভাবিল—"এই ঠিক লোক পাইয়াছি।"

দোকানে উঠিয়া মনসুরি বলিল—"খলিফা সাহেব! সেলাম আলেকুম।"

দরজি তখন নিজকার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "আলেকুম সেলাম, কি চান আপনি?"

মনসুরি কহিল—"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম আবদুল্লা, কিন্তু লোকে আমাকে বাবাদল বলিয়া ডাকে।"

"আপনি কি দরজি?"

"হ্যাঁ, আমি দরজির কার্য্যও করি এবং মাছুয়াবাজারে যে ক্ষুদ্র মসজিদ আছে, সেখানে মুয়েজ্জিনের কার্য্যও করিয়া থাকি। আপনার কি হুকুম?"

"বাবাদল সাহেব, একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে?"

"কেন পারিব না? অবশ্য পারিব।"

"অনেক পয়সা পাইবে!"

"উত্তম কথা।"

মনসুরি তখন বলিল—"কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। যেখানে তোমাকে পোষাকের মাপ লইতে হইবে, সে অতি গোপনীয় স্থান। আমি রাত্রিতে তোমার চোখ রুমাল বাঁধিয়া সেখানে লইয়া যাইব। রাজি আছ?"

দরজি তখন বলিল—"তাই ত! এ যে বড় বিষম কথা। আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভয় হয়। আচ্ছা, তবে যদি আমাকে ভালরূপ বখ্‌শিস দাও আমি সম্মত আছি। বেশী পয়সা পাইলে আমি স্বয়ং ইব্লিশ অর্থাৎ সয়তানেব জন্যও পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

মনসুরি বলিল—"তবে এই লও" বলিয়া দবজিব হস্তে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল।

একবারে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা গরীব দরজি জীবনেও কোন দিন পায় নাই, মুদ্রা পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল—"কখন যাইতে হইবে?"

মনসুরি কহিল—"রাত্রি বারোটার সময় এই দোকানে থাকিও, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন নিজের স্ত্রীকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইযা, দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গেল।

তাহার স্ত্রীর নাম দিলফেরেব। সেও দবজির মতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর নিকট এই সুসংবাদ শুনিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রা দুইটি পাইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। সেই রাত্রিতে তাহারা গরম গরম কাবাব কিনিয়া আহার করিল। কিছু আঙ্গুর ও মিষ্টান্নও আনিয়া ভোজন করিল। ভোজনান্তে উত্তম দুই পেয়ালা কফি প্রস্তুত করিয়া দুইজনে পান কবিতে করিতে মনের সুখে গল্প করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন বারোটা বাজিল, বাবাদল তখন নিজ দোকানে গিয়া দর্শন দিল। মনসুরিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনা বাক্যব্যয়ে মনসুরি তখন বাবাদালের চক্ষুতে রুমাল বাঁধিল। তাহার পর, নানা পথ দিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, একটি পশ্চাতের দ্বার দিয়া তাহাকে রাজবাটীতে প্রবেশ করাইল। সুলতানের একটি গোপনীয় কামরায় লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া দিল।

বাবাদল চক্ষু খুলিলে দেখিল, একটি সুন্দর সুসজ্জিত কামরা, কিন্তু সেখানে একটি মাত্র ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। মনসুরি বলিল—"এখানে থাক, আমি এখনই আসিতেছি"—বলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে শালের রুমালে জড়ান একটি পদার্থ লইয়া মনসুরি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এই দেখ, একটি ফকীরের পোষাক। এখন দেখিয়া বল, কয় দিনে এরূপ একটি পোষাক তৈয়ারী করিতে পারিবে?" বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

দরজি তখন সেই পোষাকটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা শেষে, সেটিকে আবার শালের রুমালখানিতে জড়াইয়া রাখিয়া দিল। মনসুরির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে একজন উন্নতকায় উত্তম পোষাকপরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে

দেখিয়া গরীব দরজির প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া, শালের রুমালে বাঁধা সেই বাণ্ডিলটি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বেচারা দরজি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। নীরবে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিল।

সেই সময় আবার দরজা খুলিল, অন্য একজন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহারও হস্তে শালের রুমাল জড়ানো একটি বাণ্ডিল। প্রবেশ করিয়া সে ব্যক্তি অত্যন্ত নত হইয়া দরজিকে বারংবাব সেলাম করিতে লাগিল। কাছে আসিযা সেই বাণ্ডিলটি দরজির পদতলে রাখিয়া, মৃত্তিকা চুম্বনপূর্ব্বক সে ব্যক্তিও প্রস্থান করিল।

ইহা দেখিয়া দরজি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ সব কি? আমাকে এত সেলাম করেই বা কেন, কোথায় আসিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কি বিপদ না জানি হইবে।"

ইতিমধ্যে মনসুরি আবার ফিরিযা আসিল। বলিল, "তবে বাণ্ডিল উঠাও—বল কয়দিনে এরূপ পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে?"

বাবাদল বলিল, "তিন দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিব।" বলিয়া বান্ডিল উঠাইয়া লইল। মনসুরি দরজির চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, এবং নানা পথ ঘুরাইযা, তাহার দোকানে পৌছাইয়া দিল। চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া বলিল—"তিন দিন পরে আবার আসিব। যদি পোষাকটি প্রস্তুত পাই, তবে আর দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পোষাক লইয়া যাইব।"—বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিল। দিলফেরেব স্বামীর জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বাবাদলকে দেখিয়া বলিল, "কি হইল?"

বাবাদল বলিল, "নমুনা লইয়া আসিয়াছি, কিছুই না, কেবল একটা সামান্য ফকীরেব পোষা ক তৈয়ারী করিতে হইবে। তৈয়ারি হইলে আরও দুই মোহর দিবে বলিয়াছে।"

দিলফেরেব বলিল, "কিরূপ নমুনা দেখি?"

দরজি বলিল, "এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, শয়ন করা যাউক। কল্য প্রভাতে দেখাইব।"

দিলফেরেব বলিল, "না এখনই দেখাও। আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। না দেখিলে রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না!" এ কথা বলিয়া দিলফেরেব নিজেই বাণ্ডিলটি খুলিতে লাগিল। খুলিবামাত্র তাহা হইতে ফকীরের পোষাক বাহির হইল না, বাহির হইল একটা কাটা মুণ্ড! টাট্‌কা কাটা একটা মানুষের মুণ্ড রুমাল হইতে পড়িয়া ঘরের মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। বৃদ্ধ দরজি ও তাহার স্ত্রী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মুন্ড দেখিয়াই বুড়া বুড়ি ভয়ে হস্ত দ্বারা নিজ চক্ষু আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর চক্ষু খুলিয়া পরস্পরের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে বুড়ির বড় রাগ হইল। দাঁত মুখ খিঁচিয়াই স্বামীকে বলিল, "হতভাগা বুড়া! খুব কাজ আনিয়াছিস। এইবার বড় লোক হইবি। রাত পোহাইলে পুলিশ আসিয়া হাতে দড়ি দিয়া লইয়া যাইবে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে। তখন খুব বড়লোক হইবি।"

বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আল্লা সেল্লা! বাবা সেল্লা! তাহার মা জাহন্নামে যাউক, তাহার বাপ জাহন্নামে যাউক, যে আমার উপর এই মহা বিপদ নিক্ষেপ করিয়াছে। যখনই শুনিলাম, চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তখনই ভাবিয়াছিলাম যে, তাহাদের মৎলব ভাল নয়। আল্লা! এখন কি করি? সে পাজীর বাড়িও চিনিতে পারিব না যে গিয়া কাটা মুণ্ড ফিরাইয়া দিব। দিলফেরেব! এখন কি করা যায়?"

বৃদ্ধ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"যেমন করিয়াই হউক, এ কাটা মুণ্ডটাকে এখনি কোথাও সরাইতে হইবে। নহিলে প্রভাত হইলেই সর্ব্বনাশ। "দরজি বলিল, "প্রভাত হইতে আর দেরী কি? রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোথায় এটাকে ফেলা যায়?"

বৃদ্ধ আবার কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এক কাজ কর। আমাদের বাড়ীর পাশে যে হাসান

রুটিওয়ালা রহিয়াছে, সে ভোরে উঠিয়া রুটি প্রস্তুত করিবে বলিয়া রোজ রাত্রিতে তুন্দুরায় ময়দা ভরিয়া চুল্লীর মুখের কাছে রাখিয়া দেয়। একটা তুন্দুরাতে এই মুণ্ডটা ভরিয়া তাহার চুল্লীর কাছে রাখিয়া আইস, সে ভোরে উঠিয়া আগুন জ্বালিয়া অন্য তন্দুরাসহ এটাকেও ভিতরে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলেই মুণ্ডটা অর্দ্ধেক জ্বলিয়া যাইবে, আর কেহ চিনিতে পারিবে না।"

বাবাদল বলিল, "বাহবা দিলফেরেব! সুন্দর উপায় বলিয়াছ। তবে এখনই তাহাই কর।"

বুড়ি তখনই গিয়া হাসান রুটিওয়ালার চুল্লীর মুখের কাছে তুন্দুরায় ভরিয়া মুণ্ডটা রাখিয়া আসিল। সে ফিরিয়া আসিলে দরজি উত্তমরূপে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন দুইজনে শয্যায় শয়ন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "যাহা হউক, এই দামী শালের রুমালখানা ত আমাদের লাভ হইয়া গেল!"

রাত্রি শেষ হইলে হাসান রুটিওয়ালা উঠিয়া নিজ পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "মামুদ!—ওরে মামুদ! ওঠ্। আগুন জ্বাল্।"

তখন পিতাপুত্র বাহির হইয়া আসিল। কাঠ, খড়, শুক্‌নো পাতা প্রভৃতি নানা দাহ্য দ্রব্য চুল্লীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া অগ্নি দিল।

একটা কুকুর রুটির টুক্‌রো টাক্‌রা খাইবার জন্য দোকানের নীচে রাস্তায় সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিত। সেই কুকুরটা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার করে আর মধ্যে মধ্যে নাক তুলিয়া যেন কি শুঁকিতে থাকে।

হাসান বলিল, "মামুদ! দেখ্ ত, কুকুরটা অমন করে কেন?" মামুদ একটা কাঠ লইয়া কুকুরকে তাড়াইতে গেল, কিন্তু কুকুরটা এক লম্ফে দোকানে উঠিয়া একটা তুন্দুরায় টান দিল। হাসান ও মামুদ মহাক্রোধে কুকুরকে মারিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুকুরের টানাটানিতে তুন্দুরায় মুখ খুলিয়া গিয়া কাটামুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া হাসান বলিল, "আল্লা আল্লা! এ কোন্ শয়তানের কার্য্য? কি সর্বনাশ! কে খুন করিয়া এ মাথা এখানে রাখিয়া গেল? কি সৌভাগ্য যে কুকুরটা বুঝিতে পারিয়াছিল, নহিলে আমাদের চুল্লী অপবিত্র হইয়া যাইত। আল্লা খুব বাঁচাইয়াছেন। এখন মুণ্ডটা কি করা যায়? এটাকে এখানে দেখিলে লোকে ত আমাদিগকেই খুনি বলিয়া সন্দেহ করিবে! শেষে কি ফাঁসি যাইব নাকি?"

মামুদ বলিল, "বাবা! এটা ত সরাইতে হইতেছে। এখন প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই, কি করা যায়?"

হাসান বলিল, "আমাদের দোকানের পাশে যে কিওর আলি নাপিতের দোকান আছে সেইখানেই এটাকে রাখিয়া আয়। কিওর আলি এখনি দোকান খুলিবে, তাহার এক চক্ষু অন্ধ, সে তোকে দেখিতে পাইবে না। এই বেলা যা।"

ইতিমধ্যে কিওর আলি আসিয়া আপনার দোকান খুলিল। তখনও ভাল আলো হয় নাই। মামুদ আস্তে আস্তে গিয়া দেখিল, কিওর আলি পার্শ্বের ঘরে গিয়া জল গরম করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মামুদ তখন একটা বাঁশ মুণ্ডের গলার ভিতর ঢুকাইয়া, সেটাকে একখানা কুর্শীর উপর খাড়া করিয়া দিল। খানকতক তোয়ালিয়া কুর্শীর আসে পাশে জড়াইয়া দিল। এইরূপ রাখিয়া মামুদ আস্তে আস্তে পলায়ন করিল।

জল গরম করিয়া কিওর আলি দোকানে প্রবেশ করিল। একে অন্ধকার, তাহাতে এক চক্ষু নাই, কিওর আলি ভাবিল, কোনও খরিদ্দার মাথা কামাইবার জন্য আসিয়া বসিয়াছে। তাই সে বলিল, "সেলাম আলেকুম ভাই! আজ যে এত সকালে আসিয়াছ?"

এই বলিয়া আপন মনে একটা টিনের পাত্রে একটু গরম জল ঢালিল, সাবান লইল, ক্ষুরখানি চোখাইয়া, খরিদ্দারের নিকট আসিয়া, সাবান জল মাখাইবার জন্য মাথাটায় হাত দিল। মাথা তৎক্ষণাৎ কুর্শী হইতে মেঝেতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলে।

ইহা দেখিয়া নাপিত ভয়ে এক লম্ফে দোকান হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও রাস্তায় কোন লোক চলাচল করিতেছে না। তখন আবার আস্তে আস্তে

দোকানে উঠিয়া, মুণ্ডটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। আপন মনে বলিল, "এ যে দেখিতেছি শুধুই মাথা, দেহটা তবে কোথায় গেল?" পরে মুণ্ডটাকে সম্বোধন কবিযা বলিল, অ্যাঁ! তুই কোথা হইতে আসিলি? আমাকে ফাঁসাইবার চেষ্টা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার একটা মাত্র চক্ষু বলিয়া মনে করিস্ না যে, আমি বড় নিরীহ ব্যক্তি। তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি। আমার দোকানের পাশে ইয়ানাকি নামক গ্রীসদেশীয় একজন কাবাবচি আছে, সে তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী জু কাফেরগণের জন্য কাবাব তৈযারী করে। কাবাবেব জন্য সে যে সকল মাংস কাটিয়া রাখিয়াছে তোকে তাহাবই মধ্যে ফেলিয়া আসি, কাবাবচি আসিয়া অন্য মাংসেব সঙ্গে তোকেও কাটিয়া কুটিয়া কাবাব বানাইযা ফেলিবে। মরুক কাফের বেটারা মনুষ্য-মাংসেব কাবাব খাইযা।"

ইয়ানাকির কাবাবের দোকান ছিল, সরবত প্রভৃতি নানাবিধ পানীয় দ্রব্যও সে বিক্রয কবিত। আর গোপনে বিক্রয় করিত মদ্য। কিওর আলি মাঝে মাঝে গোপনে ইয়ানাকির দোকানে গিয়া মদ্যপান করিয়া আসিত। কাটা মুন্ডটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া, পশ্চাতে লইয়া কিওর আলি ইয়ানাকির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইয়ানাকি বলিল, "আদাব আরজ মিঞা। আজ এত ভোরেই তৃঞা পাইযাছে নাকি?"

কিওর আলি বলিল, "আদাব আরজ! হ্যাঁ এখন বেশী নয়, এই এক ছটাক আন্দাজ দোযাস্তা, একটু বেশী সরবত মিশাইযা আনিয়া দাও ত, গলাটা বড় শুকাইযাছে।"

ইয়ানাকি তখন হাসিতে হাসিতে পাশের ঘরে মদ্য মিশ্রিত সরবত প্রস্তুত করিতে প্রবেশ করিল। কিওর আলি এই সুযোগে মাংসেব ঝুড়ির ভিতর কাটা মুণ্ড লুকাইযা রাখিল। পরে ইযানাকি আসিলে, সরবত পান করিয়া বলিল—"গরমাগরম খানিকটা কাবাব তৈযারী কবিয়া আমাব দোকানে পাঠাইয়া দাও ত, বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" এই বলিযা বাবাবচিকে পয়সা দিয়া কিওর আলি প্রস্থান করিল। মনে ভাবিয়াছিল, কাবাব পাঠাইয়া দিলে, তাহা ফেলিযা দিলেই চলিবে; ঐ ঝুড়িব মাংস হইতেই কাবাব প্রস্তুত করিব ত? কিছু পয়সা নষ্ট হইলে, কিন্তু একটা মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম।

এদিকে কিওর আলি চলিযা গেল, ইয়ানাকি তাহার কাবাবেব জন্য এক টুকরা মাংস ঝুড়ি হইতে খুঁজিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "তাজা মাংস দিতেছি না। মুসলমানের পক্ষে বাসি মাংসই যথেষ্ট।" এই বলিযা এক টুকরা বাসি মাংস অন্বেষণ করিতে করিতে, কাটা মুণ্ড বাহিব হইয়া পড়িল।

ইয়ানাকি তখন আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া বলিল—সর্ব্বনাশ! এ কি? এটা কোথা হইতে আসিল? কাহার মুণ্ড? দেখিতেছি মুসলমানের মুণ্ড। বেশ হইযাছে। এইরূপ সব মুসলমানের মুণ্ড আমি কাটিতে পারি, তবে বড় সুখ হয়। মুসলমানেরা আমাদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে। ইচ্ছা করে সব মুসলমানের মুন্ড কাটিয়া কাবাব বানাই।"

কিন্তু পরক্ষণেই ইয়ানাকির মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে মনে বলিল, "এ ত খুন হইয়াছে দেখিতেছি। কে আমার শত্রু আছে খুনটা আমার ঘাড়েই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু এখন এ মুণ্ডটা লইয়া কি করি? কোথায় ফেলি?"

ইয়ানাকি চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল, "ঠিক হইয়াছে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত সেই জু-টার মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া আছে, সেইখানেই এটা রাখিয়া আসি।"

তৎকালে মুসলমান রাজ্যে যদি রাজদণ্ডে কোনও ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদ হইত, তবে তাহাব দেহ তিন দিন অবধি রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইত। উদ্দেশ্য, ইহা দেখিয়া সকলে ভয় পাইবে, কেহ আর সেরূপ গুরুতর অপরাধ করিতে সাহসী হইবে না।

তখন মাত্র প্রভাত হইয়াছে। রাজপথে লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। ইয়ানাকি সেই কাটা মুন্ডটা কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া কিছুদূরে পতিত সেই জু'র মৃতদেহের নিকটে গেল। সে ব্যক্তির শিরচ্ছেদ হইয়াছিল। সেই দেহের পা দুইটার মধ্যস্থানে কাটা মুণ্ড রাখিয়া পলাইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে রৌদ্র উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইল। যে পথে জুর মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেই পথে লোক গিয়া দেখিল, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, একটা মানুষের দুইটা মাথা, একটা উপরে একটা পায়ের নিকট।

এই সংবাদ সহরে প্রচার হওয়া মাত্র দলে দলে লোক দেখিতে ছুটিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গে একজন সিপাহীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পায়ের নিকট মুণ্ডটা দেখিয়া বলিল, "আল্লা, আল্লা, ইয়া আল্লা—এ ত কাফেরের মস্তক নয়, এ যে আমাদের সেনাপতি আগা সাহেবের মুণ্ড! কে তাঁহাকে খুন করিল? খুন করিয়া আবার বিধর্ম্মী জু'র পদতলে মুণ্ডটা রাখিয়া গিয়াছে? এত অপমান!" বলিয়া মহাক্রোধে সিপাহী ছুটিয়া গিয়া নিজের দলের সমস্ত সিপাহীকে সংবাদ দিল।

এই আগা সাহেব কিছুদিন হইতে বাদশাহের কোপ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ সন্দেহ করিতেন সেনাপতি ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই সৈন্যগণ কেহ কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই বাদশাহের হুকুমে আমাদের আগা সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে।" কেহ বা বলিল—'তাহা হইলে বাদশাহ মুণ্ডটা গোপনে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, ওরূপ করিয়া বিধর্ম্মী জু'র পদতলে ফেলিয়া অপমান করিবেন কেন? ইহা নিশ্চয়ই জু-গণের কাজ। মার তাহাদের।"

বলিতে বলিতে সিপাহীগণ ছুটিয়া ঘটনাস্থলে আসিল। আগা সাহেবের মস্তক দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জু-জাতিকে যেখানে দেখিতে পাইল সেইখানেই প্রহার করিতে লাগিল। সহরে ভয়ানক শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হইল। জু-গণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু বাস্তবিক জু-গণ আগা সাহেবকে হত্যা করে নাই। যে রাত্রে বাবাদল সুলতানের নিকট নীত হইয়াছিল, সে রাত্রেই সুলতান একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে হুকুম দিয়াছিলেন—"যাও আগাসাহেবের মাথা কাটিয়া আমায় আনিয়া দাও।"

যে সময় বাবাদল সুলতানের গোপন কামরায় বসিয়াছিল, সেই সময়েই আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যের ফিরিবার কথা।

এ দিকে, পাছে মনসুরি জানিতে পারে যে, বাদশাহ কি ছদ্মবেশে এবার নগর ভ্রমণ করিবেন তাই বাদশাহ মনসুরির চক্ষেও ধূলা দিবার জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মনসুরি বাবাদলকে ফকীরের বেশ আনিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মনসুরি জানিবে, বাদশাহ ফকীরের বেশে রাত্রি ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই বাদশাহ স্বয়ং আসিয়া বাবাদলের নিকট সে শালমোড়া বাণ্ডিল উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই শালে একটা সওদাগরের বেশ জড়াইয়া বাবাদলকে দিবেন, তাহা হইলে মনসুরিও জানিতে পারিবে না। বাদশাহ বাণ্ডিল লইয়া গেলে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সে-ই আগা সাহেবের মাথা আনিতে গিয়াছিল। একে সে কামরায় আলোক ক্ষীণ ছিল, তাহাতে বাদশাহের গোপন কামরায় অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাই সে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভাবিয়াছিল, ইনিই বাদশাহ, বোধ হয় বাহিরে যাইবেন বলিয়া দরজির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই সেই বাণ্ডিলটি বাবাদলের পায়ের কাছে রাখিয়া, নত হইয়া সেলাম ও ভূমিচুম্বন করিয়াছিল।

এদিকে সেই রাত্রে মনসুরি বাবাদলকে লইয়া চলিয়া গেলে পর, বাদশাহ সেই কামরায় সওদাগরের পরিচ্ছদ সহ প্রবেশ করিলেন। দরজি ও মনসুরিকে না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

তখন একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে আগা সাহেবের মুণ্ড কাটিয়া আনিতে হুকুম দিয়াছিলাম, সে ফিরিয়াছে?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হ্যাঁ প্রভু, সে ফিরিয়াছে।"

বাদশাহ বলিলেন, "তাহাকে ডাকিয়া আন।"

সে ব্যক্তি আসিলে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ দুনিয়ার মালেক, কার্য্য শেষ করিয়া ত মুণ্ডটা হুজুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া গিয়াছি।"

বাদশাহ্ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কখন?"

ভৃত্য বলিল, "এই অল্পক্ষণ হইল, প্রভু দরজির ছদ্মবেশ পরিযা গোপন কামরায় বসিয়াছিলেন, তখন দিয়া গেলাম।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বাদশাহ্ সমস্তই বুঝিতে পাবিলেন। ভাবিলেন একটা মহা ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভৃত্যগণের সম্মুখে কোনওরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে মুনসুরি ফিরিয়া আসিল। তখন বাদশাহ্ তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শেষে আজ্ঞা দিলেন, "যাও এখনি যেখানে পাও দরজিকে ধরিয়া কাটা মুণ্ড ফিরাইয়া আন, নহিলে মহা অনর্থপাত হইবে।

আজ্ঞা পাইয়া মনসুরি ছুটিল, কিন্তু সে দরজির দোকানই দেখিয়াছে, তাহার বাড়ী কোথায় জানিত না। রাত্রিতে বেজেস্তানের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। এইরূপে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল।

তখন মনসুরি শুনিল, কিছু দূরে ভাঙ্গা গলায় এক ব্যক্তি এক মসজিদ হইতে সত্যধর্ম্ম বিশ্বাসী মুসলমানগণকে প্রাতঃকালীন নামাজ করিতে আহ্বান করিতেছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মনসুরি সেই দিকে গেল। দেখিল বাবাদল দুই কানের পশ্চাতে হাত দিযা ফুকারিতেছে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লা মোহম্মদ্‌র রসুলাল্লা।"

মনসুরি তখন তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবাদলের চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। মনসুরিকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"ওহে তুমি কিরূপ লোক? একজন গরীবেব উপর এমন কবিয়াই কি অত্যাচাব করিতে হয়? খুব পোষাকের নমুনা দিয়াছিলে! কেন, সে কাটা মুণ্ড সহ্গাদ করিবার জন্য কি আর কোনও লোক পাও নাই! পোষাক তৈয়াবী এইভাবেই হয় বটে। তোমার সে প্রভুটি কে বল ত? সে একজন মুসলমানকে হত্যা করিলই বা কি জন্য? তোমার প্রভু নিশ্চয়ই একজন বজ্জাৎ কাফের, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মনসুরি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"বৃদ্ধ! সাবধান, তুই কাহাকে গালি দিতেছিস জানিস?" বৃদ্ধ একটু ভয় পাইয়া বলিল,—"কেন কে সে?"

মনসুরি বলিল,—"তিনি শাহানশাহ বাদশাহ বোগ্‌দাদের অধিপতি।"

ইহা শুনিয়া বাবাদল কাঁপিতে লাগিল। বলিল,—"মাফ্ করুন, মাফ্ করুন। না জানিযা আমি দুনিয়ার মালেক বাদশাহকে গালি দিয়াছি মাফ্ করুন।" বলিতে বলিতে নিজের দুই কর্ণ মর্দ্দন করিতে করিতে বাবাদল জানু পাতিয়া ভূমিতে বসিল।

মনসুরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কাটা মুণ্ড কোথায়?"

বৃদ্ধ বলিল,—"আমার বাড়ীতে নাই।"

"সেটা এতক্ষণ আগুনের মধ্যে পাক হইতেছে।"

মনসুরি বলিল,—"পাক হইতেছে? খাইবি নাকি? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল্।"

বৃদ্ধ তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। মনসুরি শুনিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া হাসান রুটিওয়ালার দোকানে যাইল। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে হাসান স্বীকার করিল, সে তাহা নাপিতের দোকানে রাখিযা আসিয়াছে।

মনসুরি, হাসান ও বাবাদল তিনজনে তখন নাপিতের দোকানে গেল। নাপিত প্রথমে ভয়ে কিছুই স্বীকার করিল না। অবশেষে সে সকল কথা বলিল।

চারিজনে তখন কাবাবচি ইয়ানাকির দোকানে উপস্থিত হইল। সে সময় সিপাহীরা সকল বিধর্ম্মীকে প্রহার করিতেছিল, সেই সময়ই ইয়নাকি প্রাণভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং ইয়ানাকির দেখা পাওয়া গেল না।

এই সময় মনসুরি রাস্তার কিছু দূরে গোল শুনিয়া সেই দিকে গেল, গিয়া দেখিল আগা সাহেবের কাটা মুণ্ড সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন মনসুরি আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাদশাহের নিকট গিয়া সকল কথা বলিল।

বাদশাহ দেখিলেন, সৈন্যগণ ক্ষেপিয়া রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তখন তিনি হুকুম দিলেন, আগা সাহেবের মুণ্ড আনিয়া মহা সমারোহে তাহার উপর কবর দাও। আগা সাহেবের সিপাহীগণকে পাঁচ পাঁচ মোহর বখশিস্ কর।

মহা সমারোহে আগা সাহেবের মুণ্ড সমাধিস্থ হইল। সিপাহীদের মনোমত এক ব্যক্তিকে বাদশাহ আগার পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। বাদশাহের হুকুম অনুসারে মনসুরি গিয়া বাবাদল দরজিকে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আসিল। বুড়া দরজির আর কোনও কষ্ট রহিল না।

[প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৫]

আধুনিক সন্ন্যাসী

।। ১ ।।

বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শিখা ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম। মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না। আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া মাংস হইত। সেদিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়েসের বন্দোবস্ত করিতেন।

বাঁকীপুরে একটি "মহাদেব-স্থান" আছে,—সেখানে প্রায়ই গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম,—যদি কোন সাধুমহাত্মার দর্শন পাই। 'সাধুর দর্শন মোটেই দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সাধুমহাত্মার দর্শন কখনও ঘটে নাই, অধিকাংশ সাধুই নিরক্ষর,—শাস্ত্রজ্ঞানে আদৌ নাই বলিলেই হয়,—কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে; আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ! তবু তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব সে বসিহো, সব সে বসিহো
সব সে মিলিহো ধায়
ক্যা জানে ক্যা ভেখ্ মে
নারায়ণ মিল যায়।

আমি তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর পাঁচদিন মাত্র বিলম্ব আছে। একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গঙ্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পুস্তকাদি বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা তিনটা। গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাটগুলি হইতে দূরে, একখানি খড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। আমি নগ্নপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিন-চারিজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে বসিয়া আছে। সাধুবাবা হিন্দিতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

আমি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলাম। সেই মিষ্টান্ন এবং একটি সিকি সাধুবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য ভক্তগণেরও উপহার সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে।

সাধুবাবা হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বাঙ্গালী,—আমাদের বাঙ্গলা রামায়ণ আছে; কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,—সেরূপ আমাদের রামায়ণে নাই।"—বলিয়া তিনি তুলসীদাস হইতে নানাস্থান আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে আমার মনে যেন একটু খট্‌কা লাগিল। কথাটা যেন একটু খোসামোদের মত শুনাইতেছে না?—খরিদ্দার খুসী করার মত? কাজ হাসিল করার মত? আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিলেন,—পত্র লেখাইবাব প্রয়োজন হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিতেন—"আহা, রাজুর হাতের লেখাগুলি যেন মুক্তোর মত।—একখানি চিঠি লিখে দেবে বাপধন?"

হিন্দুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিযা গেল। তখন সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় কবিয়া গণিয়া দেখিলেন। সিকি, দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি হইয়াছিল। গণিয়া বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইযা উঠিল। আমি তখন মনে ভাবিতেছি, 'ইনিও একটি ভন্ডসাধু। আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে।'—কিন্তু পরক্ষণেরই সাধুবাবা যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার পূর্ব্বাভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাধুবাবা বলিলেন, "আজ প্রণামীতে প্রায় একটাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডাবে যাইবে। ইহাতে ষোলজন লোকের একবেলার আহার সম্পন্ন হইবে।"

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেড়াইয়াছি,—কোনও সাধুর মুখে ত কখন দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি মমতার কথা শুনি নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি প্রণামিতে যাহা পান, সমস্তই কি ঐ প্রকাবে সদ্ব্যবহার করেন?"

"সমস্ত। একটি কপর্দ্দকও আমি রাখি না।"

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্য কয়েকটি মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা দেখাইযা বলিলেন, "এই দেখ। আমাব কি ক্ষুধায় মরিবার উপায় আছে?"

আমি বলিলাম, "আপনি সন্ন্যাসী মানুষ,—নানাস্থানে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুবিযা বেড়ান,—এমন ত অনেক দিন হইতে পাবে যে ভক্তেব উপহাব আসিয়া পৌছিল না। সেদিন কি করেন?"

সাধুবাবা বলিলেন, "একটু ভুল করিযাছ। ইহা ভক্তের উপহার নহে,—ভগবানেবই উপহাব। আমার কাজ আমি করিয়া যাই, তাঁহার কাজ তিনি করেন।"

মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাব নাম কি?"

"রাজীবলোচন ঘোষাল।"

আমার অনান্য পরিচয়ও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্তই বলিলাম। সব শুনিযা তিনি বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে—আব তুমি পাঠে অবহেলা করিযা ঘুবিযা বেড়াইতেছ?"

আমি বলিলাম, "অর্থকরী বিদ্যায় আমার চিন্তা নাই। সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গই আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ।"

সাধুবাবা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, পথ অনেক আছে। যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এক পথে দাঁড়াইয়া, অপর পথের পানে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, অপর পথেও তুমি পৌছিলে না, অথচ যে পথে আছ সে পথেও অগ্রসব হইতে পারিলে না। যে পথে থাক, আশে পাশে তাকাইবে না, সম্মুখে সিধা তাকাইবে। এই জন্যই ত ঘোড়ার চোখে দুইটা ঠুলি বাঁধিয়া দেয়; ঘোড়া কেবল সম্মুখের পথেই দেখিতে পায়, সম্মুখে ছুটিয়া চলে।"

এখন হইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম; কিন্তু তখন ইহা শুনিযা মোহিত হইণা গেলাম। মনে হইল, হ্যাঁ—এইবার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি বটে। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত আকাঙ্খা দেখিয়া বলিলেন, "আগে আরব্ধকার্য্য সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কাছে আসিও।"

আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর একবার মাত্র আপনার শ্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা করুন।"

"তোমার পরীক্ষা কবে?"

"এই সোমবার দিন।"

"আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবার আমার কাছে আসিও। আমার 'শ্রীচরণদর্শন' করিবার জন্য নহে,—তোমার পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্যক কথা বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরে, আমি উঠিবার সঙ্কল্প করিতেছি, সাধুবাবা বলিলেন, "সাধুসেবা কবিবার তোমার বড়ই আকাঙ্খা,—একটা কাজ কর দেখি।"

আমি যেন নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

বাবা বলিলেন, "ঐখানে কমণ্ডলুটা আছে, গঙ্গা হইতে জল ভরিয়া লইয়া আইস।"

আমি জল আনিয়া রাখিলাম। সাধুবাবা অন্যদিকে চাহিয়া, অন্যমনে বলিলেন—" Thanks —সাধু সন্ন্যাসির মুখে " Thanks" ও এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

।।২।।

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এ পাঁচদিন অনবরত অধ্যায়ন করিয়া পরীক্ষার দিন প্রভাতে উঠিযা সাধুদর্শন করিতে চলিলাম।

আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে কি আবশ্যক কথা সাধুবাবা বলিবেন, এ বিষয় আমার মনে একটা কৌতূহল হইয়াছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বিদ্রুপ করিয়া বলিয়াছিল,—"বোধ হয় কোনও প্রশ্ন-টশ্ন বলে দেবেন। ওঁদের ভূত ভবিষ্যত সবই জানা আছে কিনা।"

আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গুজব শুনা গিয়াছে ঐ সাধুবাবা ইংরাজীতে একজন ব্যুৎপন্ন লোক,—তিনি নাকি এম-এ পাস! সুধাংশুবাবু নামক আমার একজন সহপাঠী—তিনি এম-এ পাস শুনিযা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—'এম-এ পাস না হাতী পাস।"—তাহার পর হইতে বাগে সুধাংশুবাবুর সহিত আমি ভাল করিযা কথা কহিতাম না।

গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাম। স্নানান্তে, সিক্ত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া, সাধুবাবার কুটীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখন সেই মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীবের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পব সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন কবিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আজ তোমাব পরীক্ষা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমায় আজ কিছু বলিব বলিযাছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা, অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ, আর্য্যধর্ম্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিযা দেবতাব পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ, দেবতাব প্রীতিব জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।"

সাধুবাবা বলিলেন, "ভুল! দেবতা নির্ব্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না ফুল দেবতার প্রীতির জন্য নহে,—পূজকের প্রীতিব জন্যই। ফুলের গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহবর্দ্ধন করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। সেই

সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।"

আরও দুই চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের শেক্সপিয়ারের কি কি নাটক পাঠ্য আছে?"

আমি বলিলাম, "Hamlet, Julius Ceasar ও Tempest."

সাধুবাবা বলিলেন, "আহা, Hamlet ! উহার তুল্য পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই।" বলিয়া—" To be, or, not to be, that is the Question." হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলেন।

সাধুবাবা যে এম-এ পাস এ সম্বন্ধে তখন আর আমার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

বাসায় ফিরিলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল, "কি হে, বাবাজী কি বললেন?"

আমি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া দুই একজন বলিল, "দেখ, লোকটা এম-এ পাস হোক্ না হোক্;—বুজরুক নয়।" কেহ কেহ বলিল, "লোকটার উপর ভক্তি হচ্ছে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, একদিন দেখতে যেতে হবে।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলাম, পরীক্ষাটা হইয়া যাউক—ইহাদিগকে একবার লইয়া দেখাইয়া আনিব,—সাধুবাবা কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি! ইংরাজি সাহিত্যে সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, সকলকে, বিশেষতঃ সুধাংশুকে দেখাইব, সাধুবাবা কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই বাসার কয়েকজনকে লইয়া সাধুদর্শনে চলিলাম। গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। এই সাধুবাবা যেন বিশেষ করিয়া আমারই সম্পত্তি—দেখুক সকলে, দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হউক। যাহারা গৈরিক বসনে, জটা ধাবণ করিয়া, ভস্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহারা যে সকলেই "হাম্বাগ" নহে,—তাহা দেখুক উহারা।

মাঠের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, কুটীর শূন্য, কিন্তু তাহার চারিপাশে অনেক লোকেব সমাগম হইয়াছে। সাধুবাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কতিপয় লোক বলিল—"সাধুবাবা! এই কতক্ষণ হইল সাধুবাবাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গেল।

তিনি কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া সট্‌কাইযাছিলেন। ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল ডিটেকটিভ পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার কবিয়া লইয়া গেল।"

আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুধাংশু আমার পানে ফিক্ ফিক্ কবিয়া হাসিতে লাগিল।—হাতে বন্দুক থাকিলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া ফেলিতে পারিতাম।

[প্রবাসী, মাঘ ১৩১১]

।। সমাপ্ত ।।